সূচীপত্র।

—*:*—

দ্বিতীয় খণ্ড।

উৎসর্গ পত্র।

ভক্তিভাজন, অগ্রজ

শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায়

মহাশয়ের

শ্রীপাদ-পদ্মে

গ্রন্থকার এই সামান্য গ্রন্থ খানি

অকপট ভক্তির

চিহ্ন স্বরূপে

সমর্পণ করিয়া সুখী

হইল।

বিজ্ঞাপন।

বহুকাল পূর্ব্বে বিমলা লিখিত হইয়াছিল। তৎকালের মতামতের সহিত আমার ইদানীন্তন কালের মতামতের একতা নাই; এজন্য নূতন সংস্করণ উপলক্ষে, গ্রন্থের কিয়দংশ পরিবর্ত্তন করিলাম। ইতি—

শ্রীদামোদর দেবশর্ম্মা।

আশ্বিন। ১৩০৯

বিমলা।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বলি কি না বলি?

অবন্তীপুর গণ্ডগ্রামের দক্ষিণ সীমায় একটী সুপরিষ্কৃত সামান্য ভবনের একতম প্রকোষ্ঠে একটী পরমাসুন্দরী ষোড়শী যুবতী বসিয়া লিখিতেছিলেন। তাঁহার অনিন্দ্যবদনে চিন্তার চিহ্ন প্রকাশিত, বিশাল লোচন-যুগল অশ্রুবারি পরিপ্লুত। ঘনকৃষ্ণ কেশ-রাশি অসংবদ্ধ ও উচ্ছৃঙ্খল ভাবে অংশ নিপতিত—গুচ্ছ-দ্বয় দ্বারা পরিণত বক্ষঃস্থল সমাবৃত। যুবতীর পরিধান অতি নির্ম্মল শ্বেত শাটী। তাঁহার হস্তে দুই গাছি স্বর্ণ-বলয়, কণ্ঠে সৌবর্ণ্য কণ্ঠী, কর্ণে হিরণ্ময় দুল বিলম্বিত। দেহে অন্য আভরণ নাই। যুবতীর বর্ণ উষার সৌর-কর-রাশির ন্যায়। বঙ্গাঙ্গনার দেহে তাদৃশ বর্ণ সম্ভবে না। য়িহুদির বর্ণের সহিত তদীয় বিমল বর্ণের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। নবীনার নেত্রদ্বয় বিশাল, আয়ত ও মনোহর, তাঁহা সলজ্জ মধুরভাবে পরিপূরিত; তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বথা কমনীয়। অপূর্ব্ব যৌবন-শ্রী তাঁহার বর-বপুর সর্ব্বত্র প্রদীপ্ত। সমস্ত অঙ্গই যথোপযুক্ত ও পূর্ণতা প্রাপ্ত।

নবীনা যে প্রকোষ্ঠে বসিয়া আছেন তাহা অতি সামান্য কিন্তু অতি পরিষ্কার। একখানি পরিষ্কার শয্যাচ্ছাদিত খট্টায় যুবতী উপবিষ্টা, তাঁহার সম্মুখে লেখ্য সামগ্রী সমন্বিত একটী বাক্স। খট্টার সন্নিকটে একটী সুন্দর সিন্দুক। তদুপরি কতকগুলি বাঙ্গালা পুস্তকাদি,—ভিতরে কি আছে তাহা জানি না; সম্ভবতঃ তাহাতে নবীনার বস্ত্রাদি পরিরক্ষিত। গৃহে বিলাসিতা বা আড়ম্বরসূচক কোন পদার্থই নাই।

নবীনার লিখন পরিসমাপ্ত হইল। তিনি বস্ত্রাঞ্চলে নেত্র পরিমার্জ্জিত করিয়া কতকগুলি পূর্ব্ব-লিখিত পত্রের সহিত উপস্থিত লিপি একত্রিত করিলেন। পরিশেষে সমস্ত এক-খানি আবরণ মধ্যগত করিয়া তদুপরি শিরো-নাম লিখিলেন। লিখিলেন,—"শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সমীপেষু।" লিপি সমাধা করিয়া তাহা বাক্সের উপর রক্ষা করিলেন।

পত্রিকা সমাপন করিয়া যুবতী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন এবং উপধানে মুখ লুকাইয়া সেই শয্যায় অধোবদনে শুইয়া পড়িলেন। এই সময় তাঁহার পশ্চাদ্দিকের উন্মুক্ত দ্বার দিয়া একটী সুন্দর যুবক প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যুবক নিঃশব্দ পাদ-সঞ্চারে খট্টা-

সন্নিধানে আগমন করিলেন। যুবতী তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। আগন্তুকের মূর্ত্তি অতি প্রশান্ত, গম্ভীর, সতেজ ও রমণীয়। তাঁহার বর্ণ উজ্জ্বল ও গৌর। নেত্রদ্বয় বুদ্ধির ও প্রতিভার জ্যোতিঃ বিকীরণ করিতেছে। মস্তকের কেশ অব্যবস্থিত ও বিশৃঙ্খল; তৎপক্ষে যুবকের বিশেষ মনোযোগ আছে বলিয়া বোধ হয় না। দেহ উচ্চ ও পরিণত। অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দৈহিক শক্তির পরিচায়ক। তাঁহার বদনের ভাব তেজ ও নির্ভীকতা প্রকাশক। তাঁহার পরিচ্ছদ পরিষ্কার ও আড়ম্বর পরিশূন্য।

যুবক আসিলেন, যুবতী তাহা জানিতে পারিলেন না। হয়ত জানিতে না পারাই যুবকের উদ্দেশ্য; কারণ তাঁহার গতি অতি ধীর ও মন্থর। আগন্তুক খট্টা-সন্নিহিত হইয়া নবীনার পশ্চাতে দাঁড়াইলেন। কোন অব্যক্ত কারণে যুবতী যে মনস্তাপ ভোগ করিতেছেন, তাহা যুবক সহজেই বুঝিতে পারিলেন। যুবকের হৃদয় ভাবনায় অবসন্ন হইল—বদন বিষাদ-কালিমায় সমাচ্ছন্ন হইল।

নবীনার অবেণী-সংবদ্ধ কেশরাশি, তাঁহার কমনীয় কান্তি আচ্ছাদিত করিয়া, অতি মনোহর ও স্বাভাবিক ভাবে নিপতিত রহিয়াছে। স্থানে স্থানে চিকুরদামের বিরল বিনিবেশ বশতঃ, রন্ধ্র পথ দিয়া যুবতীর অতি মনোহর উত্তপ্ত বর্ণের আভা বিভাসিত হইতেছে। যেন নীল নভস্থলে তারাগণসহ শশধর শোভা পাইতেছে; বা নীলাম্বুনিধি-হৃদয়ে আলোকালয় (লাইট হাউস) প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; অথবা নীল জলে অমল কমল ভাসিতেছে। কিন্তু সে শোভা—সে অপার্থিব সৌন্দর্য্য তখন যুবকের চিত্তাকর্ষণে সমর্থ হইল না। যুবতীর কাতর ভাবই তখন তাঁহার চিত্তের একমাত্র আলোচ্য বিষয়। সহসা তাঁহার চক্ষু নবীনার সম্মুখস্থ লিপির প্রতি পরিচালিত হইল। তিনি তাহার শিরোনাম পাঠ করিলেন। তাঁহার চিত্ত দারুণ সন্দেহে আকুল হইয়া উঠিল। তিনি অতি কোমল ও সস্নেহ স্বরে ডাকিলেন,—"বিমলা!"

বিমলা চমকিয়া উঠিলেন। তিনি, বাস্ততাসহ ললাট নিপতিত কেশস্তবক অপসারিত করিয়া, উঠিয়া বসিলেন। সম্মুখস্থ যুবকের দৃষ্টির সহিত তাঁহার দৃষ্টি সম্মিলিত হইল। তাঁহার বদন বিশুষ্ক হইয়া আসিল, এবং লোচনদ্বয় অশ্রুসমাকুল হইয়া উঠিল। তাঁহার ভাব দেখিয়া স্পষ্টই অনুমিত হইল যে, তিনি এতক্ষণ যে অবক্তব্য যাতনা-ভারে প্রপীড়িতা হইতেছিলেন, সেই যাতনা অধুনা শতগুণে সংবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তিনি ব্রীড়া সহকারে মস্তক অবনত করিলেন। লজ্জায় তাঁহার বদন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। লোচন যুগল মনোহর আবেশময় ভাবধারণ করিল। অধর-প্রান্তে ঈষৎ সলজ্জ হাসি দেখা দিল। কি মনোহর! কি নয়নরঞ্জক! যুবক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"বিমলা! এখানে একাকী বসিয়া কি ভাবিতেছ?"

বিমলা পত্রখানি অপসারিত করিবার চেষ্টায় তাহা হস্তে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কৃতকার্য্য হইবার পূর্ব্বেই যুবক জিজ্ঞাসিলেন, —"ও কাহার পত্র বিমলা?"

বিমলা ধীরে ধীরে কহিলেন,—"ও কিছু নয়, তুমি বইস।"

যুবক কহিলেন,—"বিমলে! একটী কথা তোমাকে বলি বলি করিয়া এতদিন বলিয়া উঠিতে পারি নাই। ইদানীং কিছুদিন হইতে তোমার পূর্ব্বভাবের যেন কতকটা অন্যথা হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হইতেছে। আজ

যেন সেই ভাবান্তর আরও প্রবল দেখিতেছি। তোমার অপূর্ব্ব সরলতা সেই মধুরভাব, আমার আগমনে সেই প্রফুল্লতা—আজি সে সমস্তের বড়ই অন্যথা দেখিতেছি। বিমলা! তবে এখন হইতে বুঝিতে হইবে কি যে, আমি তোমার হৃদয় হইতে ক্রমশঃ অন্তরিত হই-তেছি?"

বিমলার বিষণ্ণ বদনে সমধিক বিষাদ-চিহ্ন প্রকাশিত হইল। তথাপি ঈষৎ হাস্যসহকারে তিনি বলিলেন,—"আমি বাতুলের কথায় উত্তর দিই না।"

যুবতী যে পত্র লিখিতেছিলেন, তাঁহার কোন বৃত্তান্ত না জানিলেও, যুবকের মনে তৎসম্বন্ধে কেমন একটা আশঙ্কা জন্মিয়াছিল। তিনি অন্য কথা পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, —"বিমল! ও কাহার পত্র। বলিলে না? তুমি না বলিলেও আমি কিন্তু বলিতে পারি।"

বিমলা উৎকণ্ঠিতভাবে বলিলেন,—বল দেখি কাহার পত্র?"

যুবক হাসিয়া কহিলেন,—"যাহার পত্র সে চাহিতেছে, দেও।"

যুবতী পত্রী গোপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

যুবক হাসিয়া কহিলেন,—"কেন গোপন করিতেছ? আমার পত্র আমি উহা দেখিব।"

যুবতীর মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি কহিলেন,—কি দেখিবে, উহাতে কিছুই নাই।"

যোগেশ কহিলেন,—

"কিছু থাকুক বা না থাকুক, আমার পত্র, আমি দেখিব, ইহাতে তোমার আপত্তি কি?"

বিমলা বলিলেন,—"তোমারই পত্র বটে। কিন্তু এখন তোমাকে পত্র দিবার প্রয়োজন নাই।"

যোগেশ হাসিয়া বলিলেন,—"কিন্তু পত্র যদি না দেও, তবে উহার মধ্যে যাহা লিখিয়াছ, তাহার মর্ম্ম আমাকে বল।"

বিমলা ক্ষণেক চিন্তা করিলেন; বুঝিলেন পত্রে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ব্যক্ত করা বা যাঁহার উদ্দেশ্যে তাহা লিখিত হইয়াছে, তাঁহা-কেই তাহা পাঠ করিতে দেওয়া উভয়ই এখন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে ভাবের প্রাবল্যে পত্র লিখিয়াছেন, সে ভাবের কোন পরিবর্ত্তন না হইলেও, যাঁহার উদ্দেশ্যে তাহা লিখিত, এক্ষণে তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া, বিমলার পূর্ব্ব সাহস বিলুপ্ত হইয়াছে। তিনি মনঃক্ষোভ কথঞ্চিৎ সংবরণ করিয়া কহিলেন, —"পত্রে যাহা আছে তাহা তোমার আর জানিয়া কাজ নাই।"

যোগেশ বুঝিতে পারিলেন, বিমলা বাক্য সমাপনের পর একটী অনতি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার বদনে নিদারুণ বিষাদের চিহ্ন প্রকটিত হইয়াছে। প্রণয়ীর হৃদয়ে এ ভাব আঘাত করিল।

যোগেশ বলিলেন,—"বিমল! পত্রের কথায় যদি তোমার হৃদয়ে কোনরূপ ক্লেশ উৎপাদন করিয়া থাকি, তবে আর উহা দেখিতে চাহিব না। যাহাতে তোমার অন্তরে কষ্ট জন্মে, সেরূপ কার্য্য সম্পাদন করা আমার উদ্দেশ্য নহে। স্থির বিশ্বাস আছে, এ জীবনে কখন সেরূপ মতি হইবে না। যদি পত্র দেখাইতে কোন আপত্তি থাকে, তাহা হইলে আর কখনও এ মুখ হইতে, ও কথার উত্থা-পনও শুনিতে পাইবে না। কিন্তু আবার জিজ্ঞাসা করি—কোন আপত্তি আছে কি?"

বিমলা নির্ব্বিঘ্ন ভাবে কহিলেন,—"পত্র তোমার উদ্দেশ্যেই লিখিত—তা তুমি দেখিবে—তা—"

বিমলা আর কিছু বলিলেন না। যোগেশ বুঝিলেন, স্ত্রী-স্বভাব-সুলভ—বিশেষ বিমলার ন্যায় রমণী-চরিত্রগত—লজ্জা ভিন্ন অন্য আপত্তি কিছুই নাই। বিমলা তাঁহাকেই পত্র লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে তাহা দেখাইতে বা তাঁহার নিকট তাহার মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিতে অস্বীকার কেন? যোগেশ ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। কেবল লজ্জাই কি ইহার কারণ? না, আর কিছু আছে। বিমলা তাঁহাকে কি লিখিয়াছেন? ভাবিলেন—লিপি মধ্যে হয়তো অশুভ সংবাদ আছে; হয়তো সেই সংবাদ আমার বহু যত্ন-পালিত আশা-লতার মূলে কুঠারাঘাত করিবে; হয়তো সেই সংবাদ আমার সম্মুখে অন্ধকারময় ভবিষ্যতের অসুখ-পূর্ণ দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিবে; হয়তো সেই সংবাদ আমার সুখ-চন্দ্রিমা বিরাজিত হৃদয়-গগনে ঘোর অমানিশা উপস্থিত করিবে। এ সন্দেহ তাঁহাকে নিতান্ত ব্যাকুল করিয়া তুলিল। মনুষ্য শুভ সংবাদ অপেক্ষা, অশুভ সংবাদ সম্বন্ধে নিয়ত সমধিক চিন্তা করিয়া থাকে। ইহা মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। জননী শয়নে স্বপনে ভাবিয়া থাকেন, হয়তো তাঁহার প্রবাস-গত প্রিয় পুত্র পীড়ায় কাতর হইয়াছে, তথায় এমন আত্মীয় কেহ নাই যে, তাহার ব্যাধি-বিকলিত চিত্তের সান্ত্বনা করে, বা ঔষধাদি প্রয়োগ দ্বারা তাহার যথোপযুক্ত শুশ্রূষা করে। প্রিয়জনের জন্য এবংবিধ দুশ্চিন্তার সমধিক উদাহরণ ও প্রয়োগ-স্থল প্রদর্শন করিবার প্রয়োজন নাই; কারণ তাহা মনুষ্য-হৃদয়ের সাধারণ ধর্ম্ম। এই চিরন্তন ধর্ম্মই সন্দেহের মূল। ইহাই নায়ক-নায়িকার হৃদয়-নিকেতনে বিদ্বেষ-বিষ সঞ্চারিত করিবার কারণ। এই মনোবৃত্তির শাখা-প্রশাখা হইতে জগতে কত সময় কত লোমহর্ষণ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। এই মন্দ সন্দেহই সেক্ষপীয়রের "ওথেলো" নাটকের জীবন; তাঁহার অন্যান্য অধিকাংশ নাটকেও ইহার ছায়া আছে। এই মনোবৃত্তি রামায়ণ প্রভৃতি মহাকাব্যের পদে পদে প্রকাশিত; অনেক সংস্কৃত কাব্য-নাটকও ইহার সংস্রব-শূন্য নহে। বঙ্গীয় বিস্তর কাব্যেও ইহার আভাস আছে।

যোগেশ আবার ভাবিতে লাগিলেন, হয়তো লিপি মধ্যে আমার ঈপ্সিত সংবাদ আছে। আশা সংসার-সাগরস্থিত, বিপদ-বাত্যা-বিঘূর্ণিত তরণীর সুদৃঢ় কর্ণধার। আশার ছলনায় কে না ভুলে? যে না ভুলে, জানিও তাহার হৃদয় প্রবাহে জোয়ার ভাটা নাই; তাহার হৃদয়-গগনে অমানিশার অন্ধকার ভিন্ন পৌর্ণমাসীর শুক্ল স্নিগ্ধ আলোক কখন প্রকাশ পায় না। দারুণ যন্ত্রণা ও ক্লেশ-রাশি পরিপ্লুত-সংসার রাজ্যে প্রবেশ করিয়া যে একবারও আশার কুহকে মুগ্ধ হইয়া ভবিষ্যতের নিমিত্ত অননুভূতপূর্ব্ব সুখসমস্ত কল্পনা করে নাই, নিশ্চয়ই সে সংসারের কিছুই জানে না। সে সংসারের কোন সুখই সম্ভোগ করে নাই। যোগেশ আশার ছলনায় ভুলিলেন। ভাবিলেন, পত্রে বুঝি সুসংবাদ আছে।

ব্যস্ততা সহ বলিলেন,—"বিমল! তবে পত্র দেও, কি লিখিয়াছ দেখি। যদি না দেও, তবে উহাতে কি লিখিত আছে বল।"

বিমলা সঙ্কুচিত হইলেন। পত্র দেওয়া দুরূহ, বলা আরও কঠিন। সুতরাং কিঙ্কর্ত্তব্য-বিমূঢ়ার ন্যায় অবনত মস্তকে পত্রিকা হস্তে বসিয়া রহিলেন।

যোগেশ বলিলেন,—"যদি না বলিলে, তবে পত্র দেও।"

অনন্যোপায় হইয়া বিমলা অগত্যা যোগেশকে পত্র দিলেন।

কহিলেন,—"আমি তোমার কথা শুনিলাম, তুমি আমার একটী কথা শুনিবে না ?"

যোগেশ কহিলেন,—"তুমি যাহা বলিবে তাহা যদি অসাধ্য হয়, তথাপি শুনিব।"

বিমলা ঈষৎ বিষণ্ণ ভাবে কহিলেন,—"তুমি পত্র এখনই এখানে পড়িতে পাইবে না, সময়ান্তরে উহা পাঠ করিও। তাহা হইলে আমি সুখী হইব।"

যোগেশ পত্র উন্মোচন করিতেছিলেন, তাহা না করিয়া হাসিয়া কহিলেন,—"এই কথা! বেশ, বাটী গিয়া পত্র পড়িব—এখন পড়িব না। বিমল! তোমার এই বালিকা ভাবের কথাগুলি কি মনোহর! চিরকালই কি সমান যাইবে ?"

বিমলা মস্তক বিনত করিলেন। যোগেশ আবার কহিলেন,—"বিমল! পত্রের মর্ম্ম জানিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি, অতএব আমি এখনই বাটী চলিলাম।"

বিমলা হাসিয়া কহিলেন,—"আমাকে বালিকা বলিতেছিলে না ?"

যোগেশ গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন,—"সংসারে সকলেই বালক বালিকা; আমি এখন যাই।"

বিমলা বলিলেন,—"ব্যস্ত হইবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। পত্র দেখিয়া তাহা উপেক্ষা করিও না। তাহাতে—"

আর কিছু বলিলেন না। যোগেশ আর কোন কথা শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতেও পারিলেন না। বিমলার সুন্দর-বদন-শ্রী পুনরায় দর্শন করিয়া, তিনি প্রস্থান করিলেন। যোগেশ দৃষ্টি-সীমা অতিক্রম করিলে বিমলা নয়নাবর্ত্তন করিয়া কহিলেন,—

"হৃদয় দগ্ধ হও।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পত্র।

যোগেশ ব্যস্ততা সহকারে বাটী আসিলেন। বিমলার আলয় হইতে তাঁহার নিবাস দূর নহে। সন্ধ্যা সমুপস্থিত। যোগেশের তৎপ্রতি লক্ষ্য নাই। তাঁহার হৃদয়-জগতে যে ঘোরতর সন্ধ্যা সমাগতা, তিনি তাহারই চিন্তায় ব্যস্ত। হৃদয়ে সন্ধ্যা; কারণ তথায় তখন আলোক অন্ধকার দুইই মিশিতেছে। আলোক—বিমলার পত্রী মধ্য হইতে সুসংবাদের আশা; অন্ধকার—বিমলার পত্র মধ্য হইতে ক্ষোভ-জনক সংবাদের ভয়। যোগেশের হৃদয়াকাশে সন্ধ্যা। বাহ্য প্রকৃতির সন্ধ্যা তাঁহার চক্ষে লাগিল না। বাটী আসিয়া যোগেশ ব্যস্ততা সহকারে স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তথায় আলোক নাই; প্রকোষ্ঠ অন্ধকার, যোগেশ তাহা ভাবিলেন না। ত্বরায় বিমলার পত্র উন্মোচন করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্ত বিকম্পিত হইতে লাগিল, বক্ষ-বেপন সংবর্দ্ধিত হইল। চিত্তের অবস্থা কি হইল, তাহা বর্ণনা করা সহজ নয়। পত্রিকা উন্মুক্ত হইল। যোগেশ তাহা পড়িতে বসিলেন। কিন্তু অন্ধকার হেতু এক বর্ণও পড়িয়া উঠিতে পারিলেন না; উঠিয়া ভৃত্যকে আলোক দিতে আদেশ করিলেন। ভৃত্য

আলোক আনিলে যোগেশ পত্রিকা পাঠে নিযুক্ত হইলেন। পড়িলেন,—

"যোগেশ!

"তোমাকে কি লিখিব? যাহা লিখিব ভাবিতেছি, তাহা লিখিতে পারিতেছি না। লিখিতে পারিতেছি না, কিন্তু হৃদয়ের কথা হৃদয়ে রাখিলে তো চলিবে না। এক সপ্তাহ ভাবিয়া ভাবিয়া আমি মনকে দৃঢ় করিয়াছি। আজি আমি তোমাকে মনের কথা জানাইব।

"যোগেশ! এ জীবনে আমি তোমার হইতে পারি না, তুমিও আমার হইতে পার না। এ প্রফুল্ল কুসুমদ্বয় একত্র শোভা পায় ইহা জগদীশ্বরের অভিপ্রায় নহে। সে সুখ, সে সন্তোষ, সে শোভার জন্য আমরা সৃষ্ট হই নাই। তোমার সহিত আমার বিবাহ হইতে পারে না। দারুণ সমাজ তাহার কারণ। অদ্য যদি তোমার সহিত আমার বিবাহ হয়, কল্য তোমার জাতি যাইবে; তোমার সহিত কেহ আহার, ব্যবহার করিবে না, হয় তো অনেকে কথাই কহিবে না, তুমি সমাজ-মধ্যে চিরকাল ঘৃণিত হইয়া থাকিবে। তাহাও হউক, তাহাও সহ্য করিতে আমরা প্রস্তুত আছি; কিন্তু এ বিবাহের পরিণামে আর এক মহদনিষ্ট ঘটিবে। হয়তো তোমার বংশ-পরম্পরা চিরদিন এই অবিবেচনার ফলভোগ করিবে। আমি এ সকল কথা ভাবিয়া দেখিয়াছি। স্থির বুঝিয়াছি, তোমার সহিত আমার পরিণয় অশুভের নিদান হইয়া উঠিবে। আমার অপেক্ষা ভবিষ্যতে তোমারই যন্ত্রণা অধিক হইবে। তবে কেন যোগেশ? তবে বিবাহে কাজ নাই তুমি মনকে দৃঢ় কর।

"আমি জানি তুমি আমাকে অন্তরের সহিত স্নেহ কর। তুমি আমাকে যার-পর-নাই ভাল বাস। যদি আমি তাহা না জানিতাম, তাহা হইলে বড়ই ভাল হইত। কিন্তু যোগেশ! ইহা তুমি নিশ্চয় জানিও যে, আমার হৃদয় আমার আত্মা, তোমার অমানুষী স্নেহ, অসীম প্রীতি, অপার উদারতার সম্মান প্রতিদান করে না, এমন নহে। তুমি কি তাহা জান না যোগেশ? এ হৃদয়-যুগলে এ সকল কি নূতন ভাব? বিস্মৃতির সীমা অতিক্রম করিয়া ভূত-ঘটনা-সাগরে যতদূর সম্ভব প্রবেশ করিতেছি। দেখিতেছি—সেই তুমি, সেই আমি, হায়! কেন ইহার বিপর্য্যয় ঘটে নাই? এ হৃদয়ের যদি কিছু স্পৃহণীয় পদার্থ থাকে, তাহা তুমি; যদি কিছু আনন্দের নিলয় থাকে, তাহা তোমার বদন; যদি কিছু সুখ থাকে, তাহা তোমার মধুমাখা কথা। যোগেশ! তুমি দেবতা-দুর্লভ সামগ্রী বলিয়াই আমার আজি এত কষ্ট। আমি অদ্য তোমাকে যে সংবাদ দিতেছি, আমার বেশ বিশ্বাস আছে, তাহা তোমার প্রীতিপ্রদ হইবে না, তাহাতে তুমি অনুমোদন করিবে না, এবং তাহা তোমার মর্ম্মে আঘাত করিবে। কিন্তু তোমার প্রতি আমার অবিচলিত ভক্তি, তোমার মঙ্গলে আমার অন্তরের একান্ত অনুরাগ, তোমার সুখে আমার সুখ, প্রভৃতি অচ্ছেদ্য সম্বন্ধনিচয় আজি একবাক্য হইয়া এই পরামর্শে আমার মতি জন্মাইয়া দিতেছে। তুমি মনকে দৃঢ় কর! আমি মনকে দৃঢ় করিয়াছি—পাষাণে হৃদয়কে গঠিত করিয়াছি। আমি পাষাণী।

"মনকে দৃঢ় কর বলিতেছি, কিন্তু মনকে দৃঢ় করা বড় কঠিন। আমার অনুরোধে যোগেশ, তুমি কি না করিয়াছ? আমার জন্য তুমি কি কষ্টই না পাইয়াছ? আমার অনুরোধে তুমি এ কষ্টও স্বীকার কর। তুমি কত দিন আমাকে বলিয়াছ যে, আমি যাহাতে

সুখী হই, তাহা যদি নিতান্ত ক্লেশ-সাধ্য হয়, তথাপি তুমি তৎ সম্পাদনে পরমানন্দিত হও। আমি জানি তাহা তোমার সুখের কথা নহে। তুমি আমার পরামর্শে কর্ণপাত করিলে যথার্থই বলিতেছি, আমি সুখী হইব। যোগেশ, আমার এই কথাটী শুনিয়া আমাকে সুখ কর

"যোগেশ! তোমাকে আবার বলি—এ পাপ পৃথিবী আমাদের পবিত্র প্রণয়ের স্থান নহে। তুমি আমাকে শিখাইয়াছ যে, এ জীবনের পর এক জীবন আছে, তথায় দলাদলি নাই, কপটতা নাই, পাপ নাই। তথায় কেবল পুণ্য, সাধুতা ও পবিত্রতা বিরাজ করে। সে কি আনন্দের স্থান যোগেশ! সে স্থানে কি এখন যাওয়া য'য় না? তুমি বলিয়াছিলে, সকলকেই সে স্থানে যাইতে হইবে—আর আসিতে হইবে না। কি সুন্দর স্থান! সেই স্থানে আমরা মিলিব! তথায় আমাদের বিবাহ হইবে! এ সংসারে আমাদের বাসনা সফল হইবে না। এ সংসার-কাননে আমরা প্রজাপতিযুগল হইয়া উড়িতে পাইব না, এখানে আমরা কপোত-কপোতিকা হইয়া বাসা বাঁধিতে পাইব না, এ মক্ষিকাদ্বয় মিলিয়া এখানে স্বতন্ত্র মধু-চক্র নির্ম্মাণ করিতে পাইব না, এ শুক-শারীর কথা এজগৎ শুনিবে না, এ বৃথা আশা ত্যাগ কর যোগেশ! এ জগতে আমাদের সম্মিলন বিধাতার ইচ্ছা নয়।

"তুমি আমার জন্য ভাবিও না; তুমি সুখী হইলেই আমার পরম সুখ। আমি জানি এ জগতে আমাদের সম্মিলন না হইলে, তোমার অনেক মঙ্গল হইবে। তোমার মঙ্গল অপেক্ষা আমার আর কি প্রার্থনীয় হইতে পারে? তোমার কল্যাণ কামনায় অন্য আমি হৃদয়কে লৌহবৎ কঠিন করিয়া, পাষাণবৎ দুর্ভেদ্য করিয়া, বজ্রাধিক ভয়ঙ্কর করিয়া এই কঠোর পরামর্শ লিপি-বদ্ধ করিতেছি। যাহা লিখিতেছি, জানিও তাহা আমার অন্তরের কথা। আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক, সন্তোষ সহকারে, এই মত স্থির করিয়াছি; অতএব তুমি আমার জন্য ভাবিও না।

"আমার জন্য তুমি কোনরূপ অসুখী হইও না; আমি বেশ থাকিব; মনকে প্রবোধ দিব, এ জগৎ আমাদের স্থান নয়। কিন্তু তুমি যদি অসুখী হও, তুমি যদি দুঃখিত ও ব্যথিত হও, তাহা হইলে আর আমার সুখ কোথায়? অতএব তোমার চরণে আমার সানুনয় অনুরোধ, তুমি কদাচ চিত্তকে অস্থির হইতে দিও না। যোগেশ! তোমার জনক আছেন, জননী আছেন, ভগ্নী আছেন; তুমি এতগুলি লোকের লক্ষ্যস্থল—এতগুলি লোকের আনন্দধাম। তোমার চিত্ত প্রশান্ত না থাকিলে, কেবল তুমি আমি কেন, সকলেই কষ্ট পাইবেন। অতএব যোগেশ! তুমি চিত্তকে স্থির করিও।

"আর এক কথা যোগেশ! আর একটী কথা বলিয়া আমার এই কঠোর লিপির শেষ করিব। তোমার একটী বিবাহ করিতে হইবে। সুশীলা, সুন্দরী বালিকাকে তোমার পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। কেন তুমি তাহা করিবে না? এক কারণে দুই জনেরই যাতনার আবশ্যক কি? যোগেশ! তুমি বিবাহ করিও। সেই রমণী তোমাকে ভাল বাসিবে। তোমাকে স্নেহ করিবে। আমি যখন দেখিব, তুমি একটি সুন্দরী রমণীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছ, আর যখন দেখিব, সেই রমণী তোমাকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেছে, তখন আমার আনন্দের সীমা

থাকিবে না। কালক্রমে যোগেশ! তোমার প্রফুল্লকুসুমবৎ আনন্দময় সন্তান হইবে; তাহারা হাসিতে হাসিতে নাচিয়া বেড়াইবে। আমি তাহাদের ক্রোড়ে লইব, অন্তরের সহিত ভাল বাসিব, মাতৃবাৎসল্যে লালন পালন করিব। যোগেশ! তুমি তাহাদের বলিয়া দিও, তাহারা যেন আমাকে 'মা' বলিয়া ডাকে। এ সকল আনন্দে তুমি বঞ্চিত হইও না। তুমি বিবাহ করিও। তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে।

"ভাবিও না, যোগেশ! যে, আমার হৃদয় তোমার প্রতি স্নেহশূন্য হইয়াছে, বা ভবিষ্যতে হইবে। এ হৃদয়ে যাহা আছে, তাহার কথা কি বলিব? তাহা আমি জগৎকে দেখাইতে চাহি না; লোককে শুনাইতে চাহি না। সে অন্তরের ভাব আমি অন্তরে বহন করিয়া সুখী হইব। যিনি জানিবার তিনিই তাহা জানেন। যোগেশ! তুমিই কি তাহা জান না?

"এ জীবনে তোমার সহিত আমার সর্ব্বদা দেখা হইবে; দেখা হওয়াই প্রার্থনীয়। দেখা হইবে, কিন্তু পূর্ব্বের ভাব যেন আর কিছু মনে না থাকে। এ সকল কথা স্মৃতি হইতে বিলুপ্ত হউক। তোমার সহিত আমার বিবাহ হইবে স্থির হইয়াছিল, তাহা যেন তোমার আমার আর মনে না হয়। কিন্তু যোগেশ? এ অতুলনীয় প্রণয়, অসীম স্নেহ, অবিচ্ছেদ্য ঐক্য, ইহা কি ভাসিয়া যাইবে? না, তাহা অসম্ভব; জীবন যাইবে, তথাপি এ স্বর্গীয় প্রবৃত্তি সমস্ত লোপ পাইবে না। ঈশ্বর করুন, যেন তাহা চিরদিন সমান থাকে। তোমার সহিত আমার সতত সাক্ষাৎ হইবে যোগেশ। কিন্তু তুমি আমাকে স্নেহময়ী ভগ্নী বলিয়া ভাবিও; আমিও তোমাকে পরম ভক্তিভাজন অগ্রজ বলিয়া ভাবিব। তাহাতেই আমার আনন্দ হইবে; তাহাতেই আমি সুখী থাকিব। একথা যোগেশ, কখন ভুলিও না

"এ জগতে তুমি ভিন্ন আর কেহ আমার এ পূর্ণ হৃদয়ের, পূর্ণ প্রেমের অধিকারী হইতে পারে না; সুতরাং জানিও যোগেশ তোমার আদরের, তোমার স্নেহের বিমলা তোমা ভিন্ন আর কাহারও নহে; আর কাহারও হইবে না। সংসার আমাদের বিরোধী হউক, সমাজ আমাদের পবিত্র আশা-লতাকে বিদলিত করুক, এ পাপ পৃথিবী আমাদের স্বর্গীয় সুখের যথা-সাধ্য প্রতিবন্ধকতা করুক, —আমাদের অন্তরের ভাব কেহ মুছিয়া দিতে পারিবে না; তাহার ধ্বংস হইবে না। এখন না হউক যে কোন কালে তাহা জয় লাভ করিবে। সেই হৃদয়ের অতি পবিত্র ভাব-সূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া, আর তোমার প্রেমময় মূর্ত্তি হৃদয়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া, তোমার মধুমাখা কথা সকল স্মরণ করিয়া, আমি পরম সুখে জীবন কাটাইব। এ জীবনে তাহাই আমার সুখ।

"আর কিছু লিখিব না। লেখা তো সুখের নয়! আমি হৃদয়কে আশ্বস্ত করিয়াছি তুমিও তাহাই কর।"

তোমারই
"বিমলা।"

পত্র পাঠ সমাপ্ত হইল। পত্র হস্তে সংজ্ঞা-শূন্যের ন্যায় যোগেশ সেই স্থলে বসিয়া রহিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মূল।

কেন বিমলার সহিত যোগেশের বিবাহ হইতে পারে না? কেন বিমলা অন্ত চির-সেবিত-প্রণয় পাদপের বিরোধে খড়্গ ধারণে উদ্যত? এ প্রণয়ীযুগল কে? ইহাদের প্রণয় মধ্যে কি রহস্য আছে? এ সকল কথা এই স্থলেই পাঠকগণকে বিদিত করা বিধেয়। উপস্থিত দুই পরিচ্ছেদ তাহাতেই পর্য্যবসিত হইবে।

বিমলার পিতা রামকুমার চট্টোপাধ্যায় নিরতিশয় নিঃস্ব ছিলেন। অবন্তীপুর থাকিয়া জীবিকাপাত করা অসম্ভব হওয়ায় তিনি সম্পত্তির অনুসন্ধানে কলিকাতায় আইসেন; তখন তাঁহার বয়স ষোড়শ বর্ষ মাত্র। পিতা স্থবির ও অক্ষম মাতাও বৃদ্ধা। তাঁহাদের ক্লেশ নিবারণার্থ বালক রামকুমার নিঃসহায় ও নিরাশ্রয় হইয়া কলিকাতা আসিলেন। পিতার যতদিন সাধ্য ছিল, স্বয়ং পুত্রকে যথাসাধ্য লেখা পড়া শিখাইয়াছিলেন। রামকুমার পিতার নিকট ব্যাকরণ অভ্যাস করিয়াছিলেন। ইংরাজি শিক্ষা তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। কাজ কর্ম্ম হইবে ভাবিয়া রামকুমার কলিকাতা আসিলেন বটে, কিন্তু দুরদৃষ্ট বশতঃ কাজ-কর্ম্ম দূরে থাকুক, কলিকাতায় উদরান্নের সংস্থান হওয়াও দুর্ঘট হইয়া উঠিল। অতি-কষ্টে রামকুমার একজন ভদ্র মুৎসুদ্দির সহিত পরিচিত হইয়া, তাঁহার অধীনে মাসিক ৮৲ আট টাকা বেতনে এক সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। রামকুমার অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন বালক ছিলেন। অতি সহজেই প্রভুর সন্তোষজনক কাজ করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রভুও বড় ভদ্র ব্যক্তি ছিলেন। নিঃসহায়, ব্রাহ্মণ-সন্তান রামকুমারের উপর দয়া করিয়াই তিনি তাঁহাকে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পরে যখন রামকুমার যথোচিত নিপুণতা সহকারে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, তখন তিনি সন্তুষ্ট হইয়া রামকুমারের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। ক্রমে রামকুমারের বেতন ২০৲ কুড়ি টাকা হইল। এক দিন তাঁহার প্রভু বলিলেন,—"ইংরাজি না জানিলে আর উন্নতি হইবে না; অতএব রামকুমার তুমি একটু ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ কর।" রামকুমার, প্রভুর উপদেশ বশবর্ত্তী হইয়া, ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করিলেন।

কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ার বৎসরেক পরে রামকুমারের পিতৃবিয়োগ হইল। নিরতিশয় কাতর ভাবে রামকুমার বাটী গিয়া পিতৃশ্রাদ্ধাদি শেষ করিয়া আসিলেন। এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে তিনি কিছু ঋণী হইয়া পড়িলেন। পর বৎসর রামকুমারের মাতৃদেবী গঙ্গালাভ করিলেন। যথাবিহিত কার্য্য সম্পন্ন হইলে, তাঁহাকে আরও ঋণগ্রস্ত হইতে হয়, এজন্ত তাঁহার প্রভু তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ ব্যয় বাহুল্য করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। ফলতঃ পুনরায় কর্জ্জ করাও অসম্ভব। পূর্ব্ববারেই রামকুমার প্রভুর নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করেন,—পুনরায় তাঁহার নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করার সুবিধা হইল না। রামকুমার প্রভুর নিদেশ-বশবর্ত্তী হইয়া সংক্ষেপে মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিলেন। তথাপি তাঁহাকে কিঞ্চিৎ ঋণজালে বদ্ধ হইতে হইল।

রামকুমার কলিকাতায় আসিলেন। সংসারে তাঁহার আর কেহ থাকিল না। পিতৃমাতৃ-

হীন রামকুমার পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন; পুনরায় এক মাত্র আশ্রয়স্থল, দয়াবান্ প্রভুর শরণাপন্ন হইলেন। নানা প্রকারে প্রবোধ দিয়া প্রভু তাঁহাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করাইলেন। ক্রমে রামকুমার পূর্ব্ববৎ যত্ন সহকারে কার্য্য করিতে লাগিলেন। চারি পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইল। ইংরাজিতেও তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি জন্মিল।

এই সময় রামকুমারের প্রতিপালক চেষ্টা সহকারে একটী সৎপাত্রী অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার বিবাহ দেওয়াইলেন। বিবাহ কলিকাতা হইতে নির্ব্বাহিত হইল। তখন রামকুমারের বয়স ছাব্বিশ বর্ষ। তাঁহার পত্নী দ্বাদশ বর্ষীয়া। পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহার সহধর্ম্মিণী এক কন্যাসন্তান প্রসব করিলেন।

প্রভুর যত্নে রামকুমার বিলক্ষণ উন্নতিশালী হইয়া উঠিলেন; তাঁহার আয়ও সংবর্দ্ধিত হইল। যথাকালে রামকুমার প্রভুকে বলিলেন, 'কন্যার অন্নপ্রাশন নিজ নিবাসে না দিলে ভাল দেখাইবে না, লোকেও বড় নিন্দা করিবে।' তাঁহার প্রভু প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। রামকুমার যথাসাধ্য সমৃদ্ধি সহকারে অবন্তীপুরে আসিয়া কন্যার অন্নপ্রাশন ব্যাপার সম্পন্ন করিলেন। কন্যার নাম হইল বিমলা।

বিবিধ কারণে রামকুমার অতঃপর স্ত্রী-কন্যাকে কলিকাতার বাসায় না রাখিয়া অবন্তীপুরে রাখা শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন। তাঁহার প্রভুও এ প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন। অবন্তীপুরে রামকুমারের এক সহৃদয় অকপট মিত্র ছিলেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার সহিত সৌহৃদ্য। সেই মিত্রের নাম গঙ্গাগোবিন্দ। গঙ্গাগোবিন্দ নিঃস্ব ছিলেন না পল্লীগ্রামে দোল-দুর্গোৎসব করিয়া চলে, তাঁহার এমন সঙ্গতি ছিল। গঙ্গাগোবিন্দের এক পুত্র ও এক কন্যা ছিল। সেই পুত্র যোগেশ। যোগেশ জ্যেষ্ঠ। তাঁহার সহোদরার সহিত উপস্থিত আখ্যায়িকার কিঞ্চিৎ সম্বন্ধ আছে। তাঁহার নাম সরমা।

গঙ্গাগোবিন্দ, রামকুমারের স্ত্রী কন্যাকে যথোচিত যত্ন ও তত্ত্বাবধান করিবার ভার গ্রহণ করিলেন। যখন রামকুমারের পরিবার যোগেশের পিতার যত্নাধীনে পরিরক্ষিত হইল, যোগেশ তখন নিতান্ত বালক। যোগেশ সতত রামকুমারের বাটীতে যাতায়াত করিতেন, প্রায়ই তথায় আহার ও শয়ন করিয়া থাকিতেন। রামকুমারের স্ত্রী যোগেশকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। যোগেশের বাল্যাবস্থায় কথা বড় মিষ্ট ছিল; যে শুনিত, সে মুগ্ধ হইত। বিমলা তখন এক বছরের। বিমলা কাঁদিলে, যোগেশ সান্ত্বনা করিতেন; যাহাতে বিমলা সর্ব্বদা হাসে তাহার চেষ্টা করিতেন; বিমলাকে বড় ভাল বাসিতেন।

বৎসরত্রয় পরে ইংরাজী অধ্যয়নার্থ যোগেশকে রামনগরে প্রেরণ করা হইল। অধিক দূর দেশে গিয়া বা অসৎ সংসর্গে মিশিয়া বা অখাদ্য ভক্ষণ করিয়া যোগেশ অর্থোপার্জ্জন করিবে এ আশায় গঙ্গাগোবিন্দ তাঁহাকে ইংরাজি শিক্ষিত করেন নাই। ভদ্র-সন্তানের বিদ্যাই ভূষণ, এই বিশ্বাসে তিনি পুত্রকে ইংরাজিতে কৃতবিদ্য করিতে উদ্যোগী হন। যোগেশের সোদরা সরমাও যোগেশের ন্যায় সতত রামকুমারের বাটীতে যাইতেন। যোগেশ অপেক্ষা তাঁহার বয়স দুই বৎসর কম। এইরূপে উভয় পরিবার অভেদাত্মা হইয়া কাল কাটাইতে থাকিলেন। এইরূপ স্থলে আত্মীয়তা ঘনীভূত হইবার কথা।

কলিকাতা হইতে অবন্তীপুর যাইবার সহজ উপায় ছিল না; যাতায়াতে বিলম্ব ঘটিত। এজন্য রামকুমার সতত বাটী আসিতে পারিতেন না; সময় ও সুবিধা হইলেই আসিতেন। মাসে একবার আগমন ঘটিয়া উঠিত। তিনি আসিয়া পরিবারের যে রূপ যত্ন হইতেছে দেখিতেন, তাহাতে বুঝিতেন যে, তত যত্ন করিয়া উঠা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য। ফলতঃ পরিবারকে এরূপে পৃথক্ রাখিয়াও তিনি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত ছিলেন।

ক্রমে বিমলার বয়স নয় বৎসর হইল। তাঁহার রূপরাশি অতুলনীয় হইয়া উঠিল; স্বভাব যৎপরোনাস্তি মনোরম হইতে লাগিল; গুণের সীমা রহিল না; রূপে গুণে বালিকা বিমলা সকলের লোচনানন্দদায়িনী ও সন্তোষবিধায়িনী হইয়া উঠিলেন। পরিচিতের মধ্যে তাঁহাকে ভাল বাসিত না, এরূপ লোক ছিল না। যে একবার তাঁহাকে দেখিত, সে আবার বার বার তাঁহাকে দেখিতে চাহিত। যে একবার তাহার কথা শুনিত, সে পুনরায় তাহা শুনিবার নিমিত্ত ব্যগ্র থাকিত। বিমলা নারীজাতির ভূষণস্বরূপ হইয়া উঠিলেন।

যোগেশ সর্ব্বদা বাটী আসিতেন। বাটী আসিয়া যে কয়দিন থাকিতেন, তাহার অর্দ্ধাধিক কাল বিমলাদের বাটীতেই অতিবাহিত হইত। বিমলার মাতা লেখা পড়া জানিতেন। তিনি কন্যাকে কিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। যোগেশ বাটী আসিয়া বিমলার লেখা পড়ার পরীক্ষা করিতেন; মাতার যাহা সন্দেহ থাকিত, তাহার নিরাকরণ করিতেন, নূতন পাঠ দিতেন এবং নানা বিষয়ে কথোপকথন করিতেন। ফলতঃ এইরূপে যোগেশ ও বিমলার হৃদয় মধ্যে বিশেষ আত্মীয়তা বদ্ধমূল হইল। সমসুরবদ্ধ সুমিলিত বাদ্যযন্ত্র সমূহের ন্যায় তাঁহাদের বিশেষ একতা জন্মিল। উভয়ের হৃদয় এক কেন্দ্রাভিমুখে পরিধাবিত হইতে লাগিল। এক উদ্যানের সমভাবাপন্ন যুগলকুসুমের ন্যায়, উভয়ে বিশ্বোদ্যান বিশোভিত করিতে লাগিলেন। বিমলা বালিকা—বয়স নয় বৎসর। যোগেশ বালক—বয়স ষোড়শ বর্ষ। কি আশ্চর্য্য নৈসর্গিক নিয়ম! প্রণয় কাহাকে বলে তাহা জানা নাই, ভালবাসা কিসে প্রকাশ হয় তাহার বোধ নাই; যৌবনের লীলা কি তাহার জ্ঞান নাই, কোন কার্য্যেই পাথিব কৃত্রিমতা বা বিকার বিমিশ্রিত নাই, তথাপি স্বভাব তাঁহাদের হৃদয়-নিকেতনে পরম পবিত্র মমতা, স্নেহ ও প্রীতি পরিস্থাপিত করিল। তৎপ্রভাবে উভয়ের উভয়কে দর্শনে আনন্দ—অদর্শনে বিষাদ। ইহাই পবিত্র প্রকৃত প্রণয়ের ভিত্তি। এই মোহাদি পরিশূন্য স্বাভাবিক প্রণয় চিরস্থায়ী—অপার্থিব সম্পত্তি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কাণ্ড।

অবন্তীপুরের জমিদার বরদাকান্ত রায় সমাজের নেতা ও দলপতি। জমিদারীর মধ্যে তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ও অবিসংবাদিত প্রভুত্ব। রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী নামে এক উচ্চ শ্রেণীর জীব তাঁহার শ্যালক। এই ব্যক্তি জাতি বিষয়ে ও কুলসম্বন্ধে যাহাই হউন, অন্যান্য বিষয়ে একটী মহারত্ন। তাঁহার আকৃতি চমৎকার; শরীরটী যেন আল্‌কাতরা মাখান

কাষ্ঠ বিশেষ ; চক্ষু কোটারাগত। রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর অন্যান্য অবয়ব অত্যন্ত ক্ষীণ হইলেও কেবল উদর সমস্ত অভাব সংকুলান করিয়াও অতিরিক্ত পরিমাণে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি কখন পাঠশালায় যান নাই, সুতরাং উদরে বর্ণমালার প্রথম অক্ষরও প্রবেশ করে নাই। তাঁহার বয়স অন্যূন ত্রিংশ বর্ষ। তিনি গুলি খাইতেন। যখন গুলির নল দিয়া আড্ডায় বসিয়া রামকৃষ্ণ চতুর্ব্বর্গ ফললাভের পন্থা অন্বেষণ করিতেন, তখন কে যেন পিপায় চোঙ লাগাইয়া আল্‌কাতরা ঢালিতেছে বোধ হইত। রামকৃষ্ণ কথা গুলি পরিষ্কার বলিতে পারিতেন না, কিছু বাধিয়া যাইত। তাঁহার গজদন্ত প্রভৃতি নানা রকমের চারি পাটী দাঁত আকর্ণ বিস্তৃত ছিল। তাহাদের ঢাকিয়া রাখা তাঁহার সাধ্যাতীত; কাজেই সতত রামকৃষ্ণের হাস্যমুখ। হরিদ্রাবর্ণের ছাতা পড়া দাঁত সর্ব্বদা বাহির হইয়াই থাকিত। রামকৃষ্ণ ধনবানের শ্যালক; সুতরাং তিনি বড়লোক। অবশ্য।

এই ঘৃণিত ব্যক্তির সহিত দেবী-সম-রূপ-গুণসম্পন্না বিমলার বিবাহ দিবার নিমিত্ত, জমিদার বরদাকান্ত রায় রামকুমারের নিকট প্রস্তাব করিলেন। বলা বাহুল্য, রামকুমার তৎক্ষণাৎ প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। বরদাকান্ত যৎপরোনাস্তি বিরক্ত ও কুপিত হইলেন।

এই সময়ে বিমলার সহিত যোগেশের বিবাহ হইলে বড় সুখের বিষয় হয় ভাবিয়া, উভয় পক্ষই মনে মনে তাহার আন্দোলন করিতে লাগিলেন। এ যুগলকে দেখিয়া কে তাহা মনে না ভাবিয়া থাকিতে পারে? নির্ম্মল নির্ঝরবৎ যে দুই জীবন-স্রোত, স্বভাব-শৈল-নিঃসৃত হইয়া সমভাবে নাচিতে নাচিতে, খেলিতে খেলিতে, অনন্ত সমুদ্রবৎ অনন্ত কালাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে; যে দুই সুকুমার প্রসূন সমভাবে ফুটিতেছে, হেলিতেছে, দুলিতেছে; যে দুই বালক-বালিকার একের আনন্দ, উৎসাহ, আহ্লাদ, উন্নতি, হাস্য, রোদন প্রভৃতি অপরের সহিত সংবদ্ধ; তাঁহাদের পরস্পরের চিরন্তন সম্মিলন কাহার না স্পৃহণীয়? উভয় পক্ষই এই যুগলের বিবাহ কামনা করিতে লাগিলেন। কোন পক্ষই, পাছে অমত হয় ভয়ে, মনের কথা অপর পক্ষকে জানাইতে সাহস করিলেন না। কিন্তু এরূপ কথা চাপিয়া রাখা সুকঠিন; কথা চাপা থাকিল না। রামকুমার ও গঙ্গাগোবিন্দ উভয়ে উভয়ের মনোগতভাব জানিতে পারিলেন। আনন্দের সীমা রহিল না; বিবাহ হইবে স্থির হইয়া গেল। তাহার পর হইতে রামকুমার ও গঙ্গাগোবিন্দ উভয়ে উভয়কে বৈবাহিক সম্বোধনে সম্ভাষিত করিতে লাগিলেন। আত্মীয়তা আরও দৃঢ় ও গাঢ় হইল।

বিমলা বালিকা। বিবাহ সম্বন্ধে এরূপ অল্প-বয়স্কা বালিকাদের সংস্কার অতি অপূর্ব্ব। কতকগুলি লোকজন সমবেত হইবে এবং গোলমাল করিয়া গ্রাম তোলপাড় করিবে; নানাবিধ বাজনা—বাদ্য বাদিত হইয়া লোক জনকে অস্থির করিয়া তুলিবে; ভোজ-ব্যাপারে বিস্তর লোক আসিয়া উদর পুরিয়া আহার করিবে; অদ্ভুত সজ্জায় সজ্জিত হইয়া এক ব্যক্তি পুরোহিতের নির্দেশ মত বাক্য উচ্চারণ করিবে; বিবিধ রঞ্জিত বস্ত্র ও অলঙ্কারে শরীর সমাচ্ছন্ন হইবে—এইরূপ ব্যাপারের নাম বিবাহ। বিমলার বিবাহ বিষয়ে জ্ঞান প্রায় এইরূপ। এরূপ জ্ঞানহীনা বালিকাকে বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ করা বিধেয়

কি না, তাহার উত্তর সামাজিক নিয়ম-নিয়ন্তৃগণ বলিতে পারেন। বিমলা জানিতেন, বিবাহ আর যাহা কেন হউক না, তাহা কলহ নহে। যোগেশের সহিত কলহ-মনান্তর ব্যতীত যাহা হউক না কেন, তাহাতেই আনন্দ। সুতরাং যোগেশের সহিত বিবাহ হইবে ভাবিয়া বিমলার আনন্দ। যোগেশের আনন্দ তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ গাঢ়, অপেক্ষাকৃত সারবান্। বিবাহ স্থির হইয়া গেল। সকলেই পরমানন্দিত।

রামকৃষ্ণের সহিত বিবাহে অমত হওয়ায়, বরদাকান্ত বিরক্ত হইয়া এত দিন চুপ করিয়া ছিলেন। ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার বিরক্তিতে ভীত হইয়া অতঃপর রামকুমার বিবাহে অমত করিবেন না। তাহা হইল না, অধিকন্তু বিমলার অন্য সম্বন্ধ হইতেছে শুনিতে পাইয়া, বরদাকান্ত পুনরায় সকোপে আজ্ঞা করিলেন—অনতিবিলম্বে রামকৃষ্ণের সহিত বিমলার বিবাহ দিতেই হইবে। তাহার অন্যথা হইলে আমি যথাসাধ্য দণ্ড দিব।' গঙ্গাগোবিন্দের সহিত রামকুমার পরামর্শ করিলেন। বলা বাহুল্য, তিনি ঘোর বিরক্তির সহিত এ প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। বরদাকান্তের প্রস্তাব রামকুমার এককালে উপেক্ষা করিলেন। বরদাকান্ত যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া স্থির করিলেন, 'আমার কথা শুনিল না, দেখিব কোন্ বেটা তাহার কন্যাকে বিবাহ করে।' বরদাকান্তের আদেশক্রমে গ্রামে রামকুমার অচলিত,একঘরে ও সমাজচ্যুত হইলেন। তাঁহার অপরাধ? নৃশংসের অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া, অপত্য-স্নেহ বিসর্জ্জন দিয়া কন্যাকে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন না। একি সহজ পাপ? ইহারই নাম বঙ্গীয় সমাজ-শাসন! তুমি বঙ্গীয় সংবাদ-পত্র-সম্পাদক! একতা, ভ্রাতৃভাব, উন্নতি, সভ্যতা, বিদ্যা ও স্বাধীনতার ধুয়া ধরিয়া চীৎকারে মেদিনী অস্থির করিতেছ, আপনার কণ্ঠও বিদীর্ণ করিতেছ। ফল কি হইতেছে? অরণ্যে রোদন। কেবল রাজধানী বা তদ্বৎ উন্নত স্থানে স্বকীয় জ্ঞান সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিও না। পল্লীগ্রামে দৃষ্টিসঞ্চালন কর, তাহার পর একতা ও স্বাধীনতার ধুয়া তুলিও।

রাজকুমারের কন্যার বিবাহ হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল। গঙ্গাগোবিন্দ গ্রাম মধ্যে অসম্ভ্রান্ত বা সামান্য ব্যক্তি ছিলেন না; তাঁহারও ক্ষমতা ছিল। কিন্তু সে প্রভুত্ব ও সে ক্ষমতা বরদাকান্তের অপেক্ষা অনেক কম। লোকে তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান, ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। কিন্তু বরদাকান্তকে লোকে ভয় করিত, ইচ্ছা না থাকিলেও, তাঁহাকে সম্মান করিতে হইত; যে না করিত, তাহার নিকট হইতে জোড় করিয়া সম্মান আদায় করা হইত; লোককে ভয়ে, স্ব স্ব সুখ শান্তি উপেক্ষা করিয়াও বরদাকান্তের মন যোগাইতে হইত। গঙ্গাগোবিন্দের প্রতি লোকের আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল, তাঁহার বিপদে লোকে আন্তরিক ক্ষুণ্ণ হইত, সম্পদে আন্তরিক আনন্দিত হইত কিন্তু অসাধু, ক্ষমতাশালী, অদূরদর্শী জমিদারের বিরাগাশঙ্কায় দুর্ব্বল প্রজাগণ সতত মনের কথা গোপন করিয়া রাখিত। সেই জন্যই বরদাকান্তের অপেক্ষা গঙ্গাগোবিন্দের ক্ষমতা অনেক কম। রামকুমার সমাজচ্যুত হইলেন। গঙ্গাগোবিন্দ তৎপ্রতিবিধানার্থ যথাসাধ্য প্রয়াস পাইলেন। তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল। জমিদারের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিতে কাহারও সাহস হইল না। রামকুমার সমাজচ্যুত হইয়াই রহিলেন।

যোগেশের সহিত বিমলার বিবাহের আপাততঃ আর উচ্চবাচ্য হইল না। মনে মনে ইচ্ছা থাকিলেও, গঙ্গাগোবিন্দ নানারূপ অগ্র-পশ্চাৎ ভাবিয়া অগত্যা বাসনা প্রকাশ করিলেন না; অথচ পুত্রের অন্যত্র বিবাহ দিবারও কোন চেষ্টা করিলেন না। ঘটনাবলী সময়ক্রমে কিরূপ দাঁড়ায় তিনি ধীরভাবে তাহাই দেখিবার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রামকুমারও সাহস করিয়া গঙ্গাগোবিন্দের বিবাহের কোন কথা উল্লেখ করিতে পারিলেন না। গ্রামান্তরে অন্য পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়াও রামকুমারের পক্ষে অসম্ভব। যে বিবাহ করিবে, গ্রামস্থ জনগণের নিকট হইতে পাত্রীর কুল ও বংশাদি বিষয়ক বিশেষ সন্ধান না লইয়া, সে কখনই বিবাহ করিবে না। কুল বংশাদি নিখুঁত হইলেও রামকুমার সমাজচ্যুত; তাঁহার কন্যাকে কে বিবাহ করিবে? বিমলার এত সৌন্দর্য্য, এমন সুশিক্ষা, এমন শান্তস্বভাব, এত উদারতা, এত প্রসাদ, তাহার পরিণাম কি এই হইল? উপায়াভাবে এইরূপেই দিন কাটিতে লাগিল।

"বিপদ কখন একাকী আইসে না।" এ সত্য যিনি প্রথম ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তিনি মানব-জীবন-ক্ষেত্র-সম্ভূত ঘটনা-কলাপের প্রকৃতি সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। কলিকাতায় রামকুমারের প্রভু জ্বর-বিকার রোগে মানবলীলা সংবরণ করিলেন। রামকুমার পূর্ব্বকৃত ঋণ পরিশোধ করিয়া প্রভুর নিকট আরও কিছু টাকা জমাইয়াছিলেন। অন্তিমকালে প্রভু তৎসমস্ত রামকুমারকে দিলেন। বিদেশে টাকা-কড়ি লইয়া বিব্রত হইতে হইবে ভাবিয়া, রামকুমার সঞ্চিত অর্থ সমস্ত গঙ্গাগোবিন্দের নিকট রাখিলেন। গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন,—"ভ্রাতঃ! আমার নিকট যে টাকা রাখিলে, তুমি খরচ না পাঠাইলেও তাহার আয়ে তোমার সংসার সুচারুরূপে চলিতে পারিবে; রামকুমার সম্পূর্ণরূপ নিশ্চিন্ত হইলেন।

কাল কাহারও বাধ্য নহে। সংসারে আমাদের যত গর্ব্ব, যত অহঙ্কার, যত আশা, যত লোভ, সমস্তই আকাশ-কুসুমবৎ অলীক; মানব সংসার-সমুদ্র-বক্ষে জল বুদ্বুদ। এই ভাসিতেছে, এই নাচিতেছে—এই নাই। রামকুমারের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইল। প্রভুর মৃত্যুর সপ্তাহদ্বয় পরে রামকুমার দুরন্ত ওলাউঠা রোগাক্রান্ত হইলেন। তিনি অনেকের প্রিয় ছিলেন। অনেকে ব্যথিত হইয়া তাঁহার রোগোপশমের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিছুই হইল না। তিন দিন পরে রামকুমার স্ত্রী, কন্যা, অর্থ-লিপ্সা অর্জ্জন-স্পৃহা প্রভৃতি সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া পরলোকে প্রস্থান করিলেন; আসন্নকালে স্ত্রী-কন্যার সহিত রামকুমারের শেষ সাক্ষাৎ হইল না। কয়েক দিন মধ্যে নিদারুণ সংবাদ তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল। এই বিপদ-বার্ত্তা শ্রবণে তাঁহাদের কি অবস্থা হইল, তাহা এখানে বলিবার প্রয়োজন নাই। গঙ্গাগোবিন্দ, যোগেশ ও সরমা প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ এই বিপদের সময় বিবিধ প্রকারে বিমলা ও তাঁহার জননীর চিত্তে শান্তি ও প্রবোধ বিধান করিতে লাগিলেন। তখন বিমলার বয়স বারো বৎসর। যোগেশের বয়স অষ্টাদশ বর্ষ।

কালে সকলই মন্দীভূত হয়। স্বামী-পুত্র-বিহীনা অনাথাও কালে হাসে, আশা-ভঙ্গজনিত ঘোর মনঃক্লেশ সংবরণ করিয়া কালে নবীনা প্রেমোন্মত্তা কামিনী পুনরায় আমোদে যোগ দেয়। কালে বিমলা ও তাঁহার জননীর

শোক কমিয়া আসিতে লাগিল। রামকুমারের উপার্জ্জিত অর্থের আয়ে তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের ভাবনা ছিল না; গঙ্গাগোবিন্দেরও যত্নের ত্রুটি ছিল না। বিমলা ও তাঁহার গর্ভ-ধারিণীর সন্তোষ সাধনই যোগেশের ব্রত-স্বরূপ ছিল।

ক্রমে বিমলা যৌবনে পদার্পণ করিলেন। যোগেশ রামনগরের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বাটী আসিলেন। বাটী আসিয়া বিমলাদের আবাসে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। চির-সঞ্চিত প্রণয় আরও দৃঢ় হইতে লাগিল। যৌবনাগমে তাহা বিভিন্ন ভাব ধারণ করিল। যুবক-যুবতী বিবাহের কথা একদিনও ভুলেন নাই। বিবাহ কি তাহা তাঁহারা এক্ষণে সম্যক্ প্রকারে বুঝিয়া-ছেন। কেন বিবাহ হইতে পারে না, তাহাও তাঁহাদের অবিদিত নাই। ইংরাজি শিক্ষিত ও উন্নতিশীল হওয়ায় যোগেশের চক্ষুতে বিবাহ বিষয়ে কোনই প্রতিবন্ধক লক্ষিত হইল না। তিনি কৌশলে, পিতার অভিপ্রায় জানি-লেন। জানিলেন, দুর্দ্দান্ত পশু-প্রকৃতিক জমি-দারের ভয় ব্যতীত বিবাহসম্বন্ধে তাহার অন্য কোন আপত্তি নাই। যোগেশ তাদৃশ জমিদার-ভীত নহেন। যোগেশের বিশ্বাস, দেশ অরাজক নহে; আইন আছে, পুলিশ আছে, সুশাসন আছে; কে কাহার কি করিতে পারে? এক দিন, কথা-প্রসঙ্গে যোগেশ বিমলার নিকট বিবাহের কথা উত্থাপন করিলেন। বুঝিলেন,—বিমলার কোনই অমত নাই এবং তাঁহার আহাই হৃদয়ের একান্ত বাসনা, কেবল তজ্জন্য পরিণামে যোগেশ কষ্ট পাইবেন এই আপত্তি। যোগেশ তাঁহাকে নানারূপে বুঝাইলেন। বিমলা নীরবে সমস্ত শুনিলেন। যোগেশ ভাবিলেন, বিমলা সমস্ত বুঝিয়া মৌনে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। মহানন্দে ভাসমান হইয়া যোগেশ সময়পাত করিতে লাগিলেন। সপ্তাহদ্বয় পরে বিমলা তাঁহাকে এক পত্র লিখিলেন। সে পত্র পাঠক মহাশয় দেখিতে পাইয়াছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আমি তোমারই।

সে এ সংসারের কে? যাহার হৃদয়ে মনুষ্য-জীবনের সার সম্পত্তি প্রণয় নাই, সে এ সংসারের কে? প্রণয়, মমতা, আত্মীয়তা, মায়া প্রভৃতি মানব-হৃদয়ের উচ্চ বৃত্তিসমস্ত যাহার অন্তরে স্থান পায় নাই, বুঝিতে পারি না, সে এ সংসারের কে? তুমি কন্দ মূল-ফলাশী, বিমল-ধবল-জটাকেশ-সমন্বিত মহর্ষি—হইতে পার, তোমার ধর্ম্ম-জ্ঞান অতি নিষ্কলঙ্ক ও তোমার নৈতিক উন্নতি অতি উচ্চ; কিন্তু তুমি এ সংসারের কে? তুমি আসিয়া সংসারের কি অধিক উন্নতি হইল? তোমার জীবন জগতের কি কাজে লাগিল? সংসারের হিতার্থে যাহার জীবনের এক দিনও পর্য্য-বসিত হইল না; বিপন্নের বিপদ মোচনার্থ যাহার হৃদয় এক দিনও বিগলিত হইল না, সংসারের অসংখ্যবিধ প্রলোভন সমস্তের এক-টীও যাহার চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারিল না, তাহার হৃদয় পাষাণ—পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন তাহাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করা বিহিত কি না, তাহা বিশেষ বিচার্য্য! ফলতঃ প্রণয়াদি কমনীয় প্রবৃত্তিসমস্ত মনুষ্য হৃদয়ের ভূষণ। স্বেচ্ছায় সেই ভূষণসমস্ত পরিশূন্য হওয়া

প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী। যে তাহা করে, সে কদাচ প্রশংসনীয় নহে। তোমাকে বিশ্বাস কি? তোমার দয়া নাই, স্নেহ নাই, সৌহৃদ্য নাই, তোমাকে বিশ্বাস কি? কেহ কেহ তোমাকে পরম জিতেন্দ্রিয় ও অতিশয় ধার্ম্মিক বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে পারেন, কিন্তু আমরা বরং চোর বা নরহন্তাকে বিশ্বাস করিতে পারি, তথাপি তোমাকে বিশ্বাস করিতে পারি না। আমাদের উপস্থিত গ্রন্থের নায়ক উল্লিখিতরূপ জিতেন্দ্রিয় বা ধার্ম্মিক নহেন। তিনি বিমলার সদিচ্ছা-প্রণোদিত, কিন্তু অসুখ-বিষ-পরিপূর্ণ অনুরোধ-পরতন্ত্র হইয়া হৃদয়ের চিরদিনের আশা-ভরসা বিসর্জ্জন দিতে পারিলেন না। ভাল বল, মন্দ বল, তাঁহার হৃদয় বিমলার অনুরোধ শুনিল না। কয়দিনে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া তিনি পুনরায় বিমলার নিকট গমন করিলেন। পাঠক! এ প্রণয়ীযুগল আপনাদের অনাগত জীবনের কি ব্যবস্থা করিতেছেন শুনি গিয়া চলুন।

বিমলার সেই প্রকোষ্ঠ। বিমলা সেই খট্টায় উপবিষ্টা, যোগেশ দাঁড়াইয়া। উভয়ের দক্ষিণ হস্ত পরস্পর নিবদ্ধ। নিবদ্ধ হস্তযুগলের উপর বিমলার বদন-মণ্ডল। বিমলার নেত্র-নিঃসৃত অশ্রু-বারি হস্ত বহিয়া তাঁহারই বস্ত্রে পড়িতেছে। বিমলা কাঁদিতেছেন।

বহুক্ষণ পরে যোগেশ কহিলেন,—"বিমলা। আমার যাহাতে ভাল হয়, তৎপ্রতি কি আমার দৃষ্টি নাই? স্বীয় শুভাশুভ সম্বন্ধে আমি কি অন্ধ?"

বিমলা সেইরূপ ভাবেই বলিলেন,—"আমি তা বলিতেছি না। তোমার বুদ্ধি আমার অপেক্ষা সহস্র-গুণ অধিক। তবে আমি এ জানি যে, ভালবাসায় মনুষ্যকে অন্ধ করে। তুমি আমাকে অপরিমিত ভাল বাস। হয়তো সেই ভালবাসাই তোমাকে স্বীয় শুভাশুভ সম্বন্ধে অন্ধ করিতেছে।"

যোগেশ বলিলেন,—"আমি কয়দিন নিরন্তর সমস্ত কথা ভাবিয়া দেখিয়াছি। বুঝিয়াছি, তোমা ছাড়া হইয়া রাজপদও আমার পক্ষে অতিশয় সুখকর ও বিষাদময়।"

বিমলা কহিলেন,—"আমিতো ঐ জন্যই বলিতেছিলাম যে, ভালবাসায় মনুষ্যকে স্বীয় শুভাশুভ সম্বন্ধে অন্ধ করে। ভালবাসাই তোমাকে অন্ধ করিতেছে।"

যোগেশের মূর্ত্তি গম্ভীর হইল। তিনি কহিলেন,—বিমলা! তবে তোমার মত কি? তুমি কি বল, এত আশা, এত ভরসা সমস্তই লয় হউক। এত স্নেহ-মমতা সমস্তই শূন্যে মিশিয়া যাউক।"

বিমলা নীরব। যোগেশ ক্ষণেক পরে পুনরায় কহিলেন,—"যদি তোমার তাহাই অভিপ্রায় হয়—হউক। তাহাতে আমার আপত্তি নাই। তোমার অভিপ্রায়ের বিরোধী কার্য্য করা আমার কদাচ ইচ্ছা নহে। কিন্তু তোমাকেই অনুরোধ করি, তুমিই বল দেখি, তাহা কি সম্ভব?"

বিমলা কহিলেন,—"উপায় কি? যোগেশ! তাহা ভিন্ন আর উপায় কি?"

যোগেশ বিষণ্ণ হাস্য সহকারে কহিলেন,—"কি আশ্চর্য্য কথা! উপায় নাই বলিয়া অসম্ভব ব্যাপারের অনুষ্ঠান করা বাতুলের কার্য্য। আর কেনই বা উপায় নাই বিমলা? আমি তোমাকে বলিতেছি, বিবাহ হইলে আমার কোনই বিপদ হইবে না।"

বিমলা বিপন্নস্বরে ও নিরাশ-দৃষ্টি-সহকারে কহিলেন,—"না না যোগেশ! তুমি ও কথা বলিও না। আমি বিশেষ শুনিয়াছি, এ হস্ত-

ভাগিনীর সহিত বিবাহ হইলে তোমাকে আজীবন কষ্ট পাইতে হইবে।"

যোগেশ বলিলেন,—"কেন হইবে? একজন ধর্ম্মজ্ঞানহীন অবিবেচক লোকের অত্যাচার ভয়ে, আমরা কেন জীবনের সকল সুখ বিসর্জ্জন করিব? ভাবিয়া দেখ বিমলা, আমরা কোন অন্যায় কার্য্য করিতেছি না; অকারণ কাহারও অনিষ্ট করিতেছি না; কাহাকেও অনর্থক মর্ম্মপীড়া দিতেছি না; তবে কেন আমরা কাহারও ভয়ে ভীত হইব? ভগবান্ আছেন। তিনি দেখিতেছেন, আমাদের কোন অপরাধ নাই। তবে আমরা মনুষ্যের শাসনে ভয় করিব কেন?"

বিমলা বলিলেন,—"সে যে অতি পরাক্রান্ত। সে ইচ্ছা করিলে, তোমার অশেষ অনিষ্ট করিতে পারে। সে যে তাহা করিবে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।"

যোগেশ কহিলেন,—"অসম্ভব নহে; কিন্তু সে যাহাই কেন করুক না, তাহার প্রতিকার নাই, এমন নহে। আমরা এ স্থান ত্যাগ করিয়া দেশান্তরে যাইব, রাজদ্বারে আশ্রয় গ্রহণ করিব, স্বকীয় শক্তিতে তাহার উৎপীড়ন নিরুদ্ধ করিতে না পারিলে পরের সহায়তা গ্রহণ করিব। কিন্তু অত্যাচারের ভয়ে সকল সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিব কেন?"

বিমলা নীরব। অনেকক্ষণ চিন্তার পর বলিলেন,—"সকলই কঠিন—সকলই দুষ্কর—সকলই অসাধ্য।"

যোগেশ বলিলেন,—আবার সেই কথা। তবে তোমার পরামর্শমতে এক্ষণে সমস্ত বিস্মৃত হওয়াই শ্রেয়ঃ?"

বিমলা বিনত মস্তকে জিজ্ঞাসিলেন,—"তা পার নাকি?"

যোগেশ জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি পার?"

বিমলা নীরব। যোগেশ সাগ্রহে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বল বিমলা, মনের কথা ব্যক্ত কর।"

মৃদু সলজ্জ স্বরে বিমলা উত্তর দিলেন,—"না—হা—কিন্তু কি করিব?"

যোগেশ প্রেমাশ্রু-পরিপ্লুত নেত্র হইয়া কহিলেন,—"কি করিবে? করিবার শত সহস্র উপায় আছে। কোন উপায় না হয়, তখন উভয়ে একযোগে প্রাণত্যাগ করিব। কিন্তু এ সাধের আশা আমরা কেন ত্যাগ করিব? বিমলা, তোমার কথায় বুঝিতেছি, এ ভালবাসা ভুলিয়া থাকা তোমার পক্ষে অসম্ভব। তুমি যাহা বিস্মৃত হইতে পার না, আমি যে তাহা বিস্মৃত হইতে পারিব এরূপ অনুমান কেন করিতেছ?"

বিমলা পূর্ব্বং ভাবে কহিলেন,—"তুমি পুরুষ।"

যোগেশ কহিলেন,—"কোমল কমনীয় কামিনী-হৃদয় যাহা সহ্য করিতে পারে না, পুরুষে অপেক্ষাকৃত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতাবলে তাহা সহিতে পারে, একথা আমি স্বীকার করি। কিন্তু এরূপ অবস্থাপন্ন প্রণয় বিস্মৃত হওয়া মনুষ্য সাধ্যের অতীত। যাহা জীবনের সহিত গ্রথিত হইয়া গিয়াছে, দেহের অস্থিমজ্জার সহিত যাহা বিমিশ্রিত হইয়াছে, শরীরেরপ্রত্যেক ধমনীতে রক্তের সহিত যাহা বিচলিত হইতেছে, এরূপ অতি অমূল্য প্রণয়ের কথা বিস্মৃত হওয়া কদাচ মনুষ্যের সাধ্য নহে। মনুষ্যের সাধ্য হইলেও, কদাচ আমার সাধ্য নহে। জ্বলন্ত পাবকে সহাস্যে প্রবেশ করা যায়, অতিপ্রিয় জীবন অনায়াসে ত্যাগ করা যায়, গরল-উদ্গারী সর্পকে স্বেচ্ছায় চুম্বন করা যায়, তথাপি তোমাকে

বিস্মৃত হওয়া আমার সাধ্যাতীত। তোমার কোন্ দিনের কোন্ কথাটী ভুলিব বিমলা? তোমার আশৈশব জীবনের সমস্ত ব্যাপার যেন অধুনা আমি চিত্রিতপটের ন্যায় সম্মুখে দর্শন করিতেছি; সে সমস্ত কি মধুর, কি সরল, কি আনন্দ-বিধায়ক! বিমলা, তোমার মনে পড়ে কি না বলিতে পারি না, সেই এক দিন তুমি "মেঘনাদবধ কাব্য" অধ্যয়ন করিতেছিলে। তখন তোমার বয়স নয় বৎসর। আমি তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছিলাম। অশোককাননে সীতা ও সরমা কথোপকথন করিতেছিলেন। স্থানটী গ্রন্থমধ্যে অতি মনোরম। আমি অতি অনুরাগের সহিত তোমাকে তাহা বুঝাইতে ছিলাম। তুমি অনেকক্ষণাবধি একমনে আমার অধ্যয়ন ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিলে। কিন্তু বালিকার চঞ্চল চিত্ত এক বিষয়ে বহুক্ষণ সংযত থাকা সম্ভাবিত নহে। তুমি অন্যমনস্ক হইলে। নিকটে কাঁচি ও কাগজ ছিল। তুমি কাঁচি দিয়া কাগজে ফুল কাটিতে লাগিলে। আমি হস্তস্থিত মেঘনাদ বন্ধ করিয়া তোমার নবনীত নিভ চিবুকে সাদরে একটু কোমল আঘাত করিলাম! তুমি প্রথমে হা হা শব্দে হাসিয়া উঠিলে। পরক্ষণেই বলিলে "যোগেশ, তুমি আমাকে আঘাত করিলে, আমিও তোমাকে আঘাত করিব।" আমি হাসিলাম। তুমি মারিবার জন্য হাত উঠাইলে। আমি তোমার হাত ধরিলাম। তুমি অপর হস্তে মনোরথ সিদ্ধির চেষ্টা করিলে। আমি সে হস্তও ধরিলাম। তুমি হস্তদ্বয় উন্মুক্ত করিবার নিমিত্ত যথেষ্ট প্রয়াস পাইলে, পারিলে না। আমি আবার হাসিলাম। তোমার বড় লজ্জা হইল। লজ্জায় তোমার বদনকমল গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। তুমি অপ্রতিভ হইয়া বলিলে, "আমার এক অনুরোধ শুনিতে হইবে।" আমি বলিলাম, "কি অনুরোধ বল" তুমি বলিলে, "হাত ছাড়িয়া দেও, আমি মারিব।" আমি উচ্চহাস্য হাসিলাম, তোমার পবিত্র ভাব, অসীম সরলতা ও বালিকা-ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। বলিলাম, "মার" হস্ত ছাড়িয়া দিলাম। তুমি মরিবার জন্য হস্তোত্তোলন করিলে কিন্তু মারিতে পারিলে না। হাসিয়া আমার বক্ষমধ্যে বদন লুকাইলে। কি মধুর! কি পবিত্র! জীবন যাইলেও কি এ সমস্ত কথা বিস্মৃত হওয়া সম্ভব? বিমলা, তুমি পাগলিনী।"

বিমলা যেন কিছু লজ্জিত ভাবে বলিলেন,—"তোমার এতও মনে থাকে?"

যোগেশ বলিলেন—"একি ভুলিবার কথা? আরও বলি শুন।"

বিমলা বলিলেন,—"না আর বলিয়া কাজ নাই। এ সকল কথা বলিয়া কি সুখ?"

যোগেশ বলিলেন,—"একি সুখ? তোমাকে কি বলিয়া বুঝাইব বিমলা, এ সকল কথার আলোচনায় কি সুখ? বোধ করি এ সুখের আর তুলনা নাই, বোধ করি এই সকল প্রসঙ্গের আলোচনার ন্যায় আনন্দ জগতে আর কিছুতেই নাই।"

বিমলা কাজেই নীরব হইলেন।

যোগেশ বলিতে লাগিলেন,—"আর এক দিনের কথা বলি শুন বিমলা। তখন আমি রামনগরে পড়ি। গ্রীষ্ম কালের পর যখন বাটী হইতে রামনগর যাই, তখন তুমি আমাকে মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিবার জন্য বলিয়াছিলে। পড়া শুনার ব্যস্ততায় দুই সপ্তাহ তোমাকে পত্র লিখিতে পারি নাই। দুই সপ্তাহ পরে বড় মন খারাপ হইয়া উঠিল। সংবাদ পাইলাম, তোমার যারপর নাই কঠিন

পীড়া হইয়াছে। ব্যস্ত হইয়া যেখানকার পুস্তক সেইখানেই রাখিয়া বাটী চলিয়া আসিলাম। দেখিলাম, রোগে তোমার ঢুলু ঢুলু বদন বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে। তোমার জীবন সংশয়াপন্ন হইয়া উঠিয়াছে।”

বিমলা মধ্যস্থলে বাধা দিয়া কহিলেন,—“তখন যদি মরিতাম—”

যোগেশ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়াই বলিতে থাকিলেন,—যথাসম্ভব যত্নে চিকিৎসা হইতেছে, কিন্তু কোনই উপকার হইতেছে না। আমি অতি কষ্টে মনকে দৃঢ় করিয়া তোমার ক্লেশ-নিপীড়িত শয্যা-পার্শ্বে উপবেশন করিলাম। তুমি একবার নয়নোন্মীলন করিয়া আমার প্রতি চাহিলে, চাহিয়া কহিলে, “ছি! তুমি কি মিথ্যাবাদী।” অমনই তোমার নয়ন নিমীলিত হইল। অর্দ্ধঘণ্টা-কাল আর তুমি চক্ষু মেলিলে না। লোকে ভাবিল, তোমার প্রলাপ আরম্ভ হইয়াছে; তোমার অবস্থা আরও মন্দ হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আমি তোমার বাক্যের যথার্থ অর্থ বুঝিলাম। ভাবিলাম, আমিই কি তবে বিমলার ব্যাধির কারণ? আমার নেত্র দিয়া দরদরিত ধারায় অশ্রুবারি প্রবাহিত হইতে লাগিল। তোমার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া বসনে বদনাবৃত করিয়া রোদন করিতে লাগিলাম। অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল পরে তুমি নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলে, আমি তোমার শয্যা-পার্শ্বে সমভাবে বসিয়া কাঁদিতেছি। তুমি বলিলে, “যোগেশ কাঁদিও না। আমি কঠিন কথা বলিয়াছি। তুমি বলিয়াই বলিয়াছি; অন্য হইলে বলিতাম না। আমার পীড়া অনেক উপশম হইয়াছে।”তুমি হাসিলে। ধীরে ধীরে তোমার বদনে স্বাস্থ্যের চিহ্ন সমস্ত প্রদীপ্ত হইল। আমি রোদন সংবরণ করিলাম। চিকিৎসক আসিয়া তোমাকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, “অর্দ্ধাধিক রোগ সারিয়াছে। ঔষধ ব্যবস্থা হইল। আমি তোমাকে ঔষধ খাওয়াইতে গেলে, তুমি হাসিয়া সমস্ত ঔষধ আমার বস্ত্রে ফেলিয়া দিলে। বলিলে,—“ঔষধ যথেষ্ট হইয়াছে।” প্রত্যুত দুই দিনে তোমার রোগ সারিয়া গেল। কি আশ্চর্য্য প্রণয়! কি পবিত্র, নির্ম্মম, নিষ্কলঙ্ক স্বভাব! তুমি এই সকল ভুলিতে বলিতেছ। এ সকল কি ভুলিবার কথা বিমলা?”

বিমলার নয়ন দিয়া অশ্রুবিন্দু পড়িতে লাগিল। যোগেশ কহিতে লাগিলেন,—“তোমার প্রত্যেক কার্য্যই পবিত্র মধুরিমাময়। প্রত্যেক কার্য্যই জ্বলন্ত অক্ষরে আমার হৃদয়-ফলকে লিখিত রহিয়াছে। তাহার কোন্‌টী ফেলিয়া কোন্‌টীর কথা বলিব বিমলা?”

বিমলা গলদশ্রু লোচনে কহিলেন,—“আর বলিও না যোগেশ, বলিয়া আর কাজ নাই।”

যোগেশ বলিলেন,—“কিন্তু তুমি কাঁদিতেছ কেন বিমলা?”

বিমলা উত্তর দিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু পারিলেন না।

যোগেশ বলিলেন,—“তোমার যাহাতে কষ্ট হয় তাহা করিব না। কিন্তু বিমলে! তুমি যে আমার হইবে না, এ কষ্ট সহি কি প্রকারে? তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি, এ জ্বালা সহ্য করিয়া এক দিনও জীবন থাকিবে কি?”

বিমলা অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া সহসা কহিলেন,—“যোগেশ, আমি তোমারই। সংসার এক দিকে, আর তুমি এক দিকে। তোমারই সুখের জন্য তোমার আশা ত্যাগ করিতে পারি। এত পবিত্রতা, এত শ্রেষ্ঠতা, দুর্ব্বলহৃদয়া রমণী-চরিত্রে থাকা অসম্ভব। অন্যের থাকিলেও আমার তাহা নাই। অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে, যোগেশ,

প্রিয়তম, আমি তোমার ভিন্ন কাহারও নহি।"

বিমলার বদন-মণ্ডল প্রদীপ্ত হইল। লোচন দিয়া উৎসাহ-রশ্মি নিঃসৃত হইতে লাগিল। এত কথা যোগেশকে বলিলাম ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ লজ্জার উদয় হইল। লজ্জায় চারুশীলা বিমলা যেন কোথায় লুকাইবেন ভাবিতে লাগিলেন। বদন বিনত হইল। যোগেশ হাতে স্বর্গ পাইলেন। ধরণীধাম সুখের নিকেতন বোধ হইল। দেখিলেন, যেন ঘর দ্বার, চারিদিক হাস্য করিতেছে। সানন্দে বিমলাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, —"প্রাণেশ্বরি! এতক্ষণ আমার সহিত কি তামাসা করিতেছিলে?"

বিমলা কথা কহিতে পারিলেন না। তাঁহার বদন লজ্জায় ম্লান হইতে লাগিল।

কিয়ৎকাল পরে যোগেশ বিমলার নিকট হইতে বিদায় লইয়া মহানন্দে প্রস্থান করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অবরোধ।

গ্রীষ্মকালের এই সময়টী কি মনোরম; সূর্য্য ডুবে নাই, কিন্তু ঐ বুঝি ডুবে। পৃথিবী একটী মনোহর বর্ণে বিমণ্ডিত; রাঙ্গা নয়, স্বর্ণবর্ণ নয়, হরিৎ নয়—তিনেরই সংমিশ্রণ জনিত একটী মনোহর বর্ণে বসুন্ধরা সমাচ্ছন্ন। আকাশ নির্ম্মল—সাদা আর কালমেঘে পূর্ণ। এক খানি সাদা মেঘ, সংসারের রঙ্গ দেখিতে দেখিতে, মন্দ মন্দ বেগে ছুটিতেছে। কিন্তু ঐ যা—মেঘ ভাঙ্গিয়া গেল। ভগ্ন অংশদ্বয় আর দুই খানি মেঘের সহিত মিলিল। না মিলিয়া কিছুই থাকিতে পারে না। প্রকৃতি সতত সকলকে মিলিতে শিখাইতেছে। ঐ মেঘ বিচ্ছিন্ন হইল, কিন্তু তাহা তৎক্ষণাৎ পরের দেহে নিজ দেহ ঢালিয়া দিল। এ সংসারে মিলনই স্বভাব-সিদ্ধ। যাহা স্বভাব-সিদ্ধ তৎসাধনই সুখ। মিলন জগতের প্রধান সুখ। তুমি মনুষ্য, তুমি সময়ে সময়ে এই প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ কর কেন? ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি কিছুই তোমার সঙ্গে আইসে নাই। তুমি যখন জন্মিয়াছিলে তখন মাতৃগর্ভ হইতেই সম্পত্তিরাশি সঙ্গে লইয়া আইস নাই। যাহাকে তুমি মূর্খ বা দরিদ্র বলিয়া ঘৃণা করিতেছ, তাহার জন্ম-বৃত্তান্তও অবিকল তোমার ন্যায়। তবে কেন ধনবান! তুমি দরিদ্রের সহিত মিলিতে চাহ না? কেন বিদ্বান্! তুমি মূর্খের সহিত সহবাস ইচ্ছা কর না?—মেঘ বিচ্ছিন্ন হইয়া আবার মেঘের সহিত মিলিল। এইরূপে মেঘমণ্ডলী মিলিয়া আকাশে বড় রঙ্গ করিতেছে। এক স্থানে কতকগুলি মেঘ সমবেত হইয়া ভয়ানক রাক্ষসের ন্যায় আকার ধারণ করিতেছে; অপর স্থানে মেঘসকল মিলিত হইয়া তুষারাবৃত শ্বেত গিরির ন্যায় শোভা প্রদর্শন করিতেছে। ঝির ঝির করিয়া অনতিশীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটী পক্ষী শূন্যে উঠিতেছে, নাচিতেছে, উড়িতেছে, পড়িতেছে। একটী ক্ষুদ্র পক্ষী অনেক দূর উঠিল,—ঐ গেল—অদৃশ্য হইল। উচ্চে উঠিয়া পাখী পাখা ছাড়িয়া দিল—একেবারে অনেক দূর নামিয়া পড়িল। পাখী বুঝি দেখাইল—অধিক উঠিলে এইরূপে পড়িতে হয়।

এইরূপ সময়ে বিমলা এক আশৈশব

পরিচিতা আত্মীয়ার আলয় হইতে নিজালয়ে প্রত্যাগমন করিতেছে। অদ্য আত্মীয়া বিশেষ কর্ম্মোপলক্ষে বিমলাকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাটী লইয়া গিয়াছিলেন। বিমলা সমস্ত দিন আত্মীয়ালয়ে অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যার অব্যবহিত কাল পূর্ব্বে বাটী ফিরিতেছেন। এরূপ পল্লীগ্রামে নিতান্ত সম্পন্ন না হইলে, লোক-জন সঙ্গে লইয়া বা যানাদি আরোহণে গমনাগমনের প্রথা নাই। বিমলা একাকিনী আসিতেছেন। একাকিনী বলিয়া কিছু ভীতি ও ব্যস্ততা সহ চলিতেছেন। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। বিমলাও প্রায় নিজালয়-সন্নিহিত হইলেন। এমন সময় সহসা পার্শ্বস্থ প্রকাণ্ড ভগ্নাবশেষ ভবন হইতে শব্দ হইল,—"বিমলা! একবার আমাদের বাটীতে আইস।"

স্বর নারী-কণ্ঠ-নিঃসৃত। যে বাটী হইতে শব্দ সমুত্থিত হইল,তাহা সুশীলা নাম্নী বিমলার এক ক্রীড়া-সহচরীর আলয়। সুশীলা ধনীর কন্যা। কিন্তু কাল-ধর্ম্মে ও অদৃষ্ট চক্রে সম্প্রতি নিদারুণ দীনতা তাঁহাদিগকে বিদলিত করিতেছে। সুশীলা পিতৃ-হীনা। তাঁহার জননী একসুপাত্র সন্ধান করিয়া তনয়ার বিবাহ দিয়াছিলেন। মাতা কন্যা-সহ অন্য উপায়াভাবে জামাতৃ-গৃহে বাস করিতেন। তিনি কখন কদাচিৎ অবন্তীপুর আসিয়া আপনাদের জীর্ণ ভবন দেখিয়া যান। ইদানীং তাঁহারা অনেক দিন এখানে আইসেন নাই। আহ্বান শব্দ শ্রবণে বিমলা অনুমান করিলেন, হয়তো সুশীলা ও তাঁহার মাতা আসিয়াছেন। মনে বড় আনন্দ হইল। ব্যস্ততা সহ প্রবেশ-দ্বার দিয়া বিমলা ভবন-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সন্ধ্যাকাল, তাহাতে মন সুশীলার দর্শনাশায় উল্লসিত, সুতরাং বিমলা অন্য কিছুই লক্ষ্য করিলেন না; নচেৎ তিনি বুঝিতে পারিতেন, ভবনে জন সমাবেশের কোনই লক্ষণ নাই। যাহাই হউক বিমলা ভবন-মধ্যে প্রবেশ করিলেন,—তথায়ও কেহ নাই তো!

বিমলা সভয়ে বলিলেন,—"তোমরা কোথা গা?"

প্রান্তের এক প্রকোষ্ঠ হইতে শব্দ হইল,—

"এ দিকের ঘরে মা।"

বিমলা সেই দিকে চলিলেন।

প্রকোষ্ঠগুলির অবস্থা অতি ভয়ানক। জীর্ণ, অসংস্কৃত ও অপরিচ্ছন্ন। ভিত্তির ইষ্টক সমস্ত শ্বেতাবরণাচ্ছাদিত নহে, তাহাও লোণা ধরিয়া বিকৃত দশাপ্রাপ্ত। তলদেশ বন্ধুর ও অপরিষ্কার। স্থানে স্থানে স্তূপাকার ইঁদুরের মাটি। অধিকাংশ জানালা ও দ্বারের কবাট দীর্ঘকাল শীতবাতাতপ সহ্য করিয়া এবং চরমে নিকটস্থ কোন গৃহস্থের চুল্লী মধ্যে দেহ-সমর্পণ করিয়া জীবনের সার্থকতা সাধিত করিয়াছে। ফলতঃ রাত্রিকালে বিনা আলোকে তন্মধ্য দিয়া গমন করা দুঃসাধ্য। বিমলা কিয়দ্দূর গিয়া আর যাইতে পারিলেন না। বলিলেন,—"তোমরা কি প্রদীপ জ্বাল নাই? যাই কেমন করিয়া?"

প্রান্তের প্রকোষ্ঠ হইতে পুনরায় শব্দ হইল,—"যে বিপদ মা! কিছুই মনে নাই।"

বিপদের কথা শুনিয়া বিমলার মনে হইল, সুশীলা বুঝি পীড়িতা হইয়াছেন। তাহা না হইলে তিনি এতক্ষণ স্বয়ং আসিয়া বাল-সহচরীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। বিমলা সমস্ত প্রতিবন্ধক উপেক্ষা করিয়া অতিকষ্টে যথাস্থানোদ্দেশে চলিলেন। নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—"কোন্ ঘরে গা?"

সম্মুখের প্রকোষ্ঠ হইতে উত্তর আসিল,—"এই ঘরে।"

বিমলা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় কেহই নাই। বিমলার মনে বড় ভয় হইল। বলিলেন,—"হাঁ গা, কোন্ ঘরে গা?"

কোনই উত্তর হইল না। কিন্তু সহসা গৃহের সমস্ত দ্বারাদি রুদ্ধ হইয়া গেল। বিমলা দারুণ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কেহই তাঁহাকে সাহস দিলেন না। অপেক্ষাকৃত স্থির হইয়া বিমলা রুদ্ধদ্বার উন্মোচনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন—পারিলেন না। অধিক কাতর ভাবে ভীতি-বিকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন,—"কে আছ, আমাকে দ্বার খুলিয়া দেও।"

উত্তর নাই। কাকুতি মিনতি করিলেন, তথাপি উত্তর নাই। বিমলা উৎকণ্ঠা হেতু স্রোতস্বিনী মধ্যগত তৃণখণ্ডের ন্যায় কম্পিতা হইতে লাগিলেন। দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না। সেই নির্জ্জন, অন্ধকার, অপরিস্কৃত প্রকোষ্ঠের মধ্যে পারাবত, চর্ম্মচটিকা ও মূষিকের পুরীষরাশির উপর, বিমলা উপবেশন করিলেন। লোচন-যুগল দিয়া অশ্রুরাশি প্রবাহিত হইতে লাগিল। কিঙ্কর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া বিমলা সেই অবরোধে বসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

কে জানে বিমলার অদৃষ্টে কি আছে? ভবিষ্যতের গূঢ়তম প্রদেশের ঘটনাবলী কে বলিতে পারে? যে পারে নিশ্চয়ই সে মনুষ্য অপেক্ষা উচ্চ জীব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পাষাণ ও কুসুম।

অপরাহ্ন কালে অবন্তীপুরের জমিদার বরদাকান্ত রায়ের অন্তঃপুরের একতম প্রকোষ্ঠ মধ্যে এক পর্য্যঙ্কোপরে এক অপ্রিয়দর্শন যুবক বসিয়া রহিয়াছেন। এই যুবক জমিদার বরদাকান্তের একমাত্র পুত্র, রুদ্রকান্ত রায়। সেই পর্য্যঙ্ক-সন্নিধানে নত-বদনা এক পরমা সুন্দরী যুবতী রমণী দণ্ডায়মানা। সেই সুন্দরী রুদ্রকান্তের পত্নী—মালতী। কমলার সহিত বাগ্দেবীর বিসংবাদ চির প্রচলিত কথা—রুদ্রকান্তের লক্ষ্মী-শ্রী আছে, সুতরাং তিনি ঘোর মূর্খ। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতায় মূর্খতা তাদৃশ দোষের কথা নহে। কারণ অভিনব সভ্যতার প্রণালীতে মূর্খতাকে আবরিত করিবার অনেক উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। রুদ্রকান্ত সে সকল উপায় সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন না; তথাপি যৎটুকু জানিতেন, তাহাতেও কোন ক্রমেই তাঁহাকে মূর্খ বলিবার উপায় ছিল না। কারণ যথোচিত বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত তিনি কয়েক বৎসর কলিকাতায় বাস করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার বর্ত্তমান কালানুযায়ী সভ্যতা ও শিক্ষা উভয়ই লাভ হইয়াছে। সেই সময় হইতেই তিনি অপরিমিত সুরা সেবন করিতে শিখিয়াছেন, কাফরির ন্যায় কদর্য্য কেশরাশিতে গন্ধদ্রব্য দিয়া বহু আয়াসে তিনি স্থানে সিঁথি কাটিতে শিখিয়াছেন, গণ্ডস্থলে নবোদ্‌ভ্রান্ত শ্মশ্রুরাজি রাখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, নেত্রদ্বয় স্বর্ণসীমাবদ্ধ চস্‌মা সমাচ্ছন্ন করিতে শিখিয়াছেন, এবং চুরোটের ধূম সেবন করিতে অভ্যাস করিয়াছেন। তবে তিনি মূর্খ কিসে? বাস্তবিক তিনি যে আদৌ ইংরাজী শিখেন নাই, এমন বোধ হয় না। কারণ তিনি দ্বারবান্ চাকর প্রভৃতির সহিত কথা কহিতে হইলে চীনাবাজারে হাস্যজনক ইংরাজী ব্যবহার করিতেন, এবং পিতা প্রভৃতি গুরুজনের সহিত সাক্ষাৎ মাত্রই "গুডমর্ণিং"

বলিতেন "সেক্‌হেণ্ড" করিতে যাইতেন। লোকের উপর বিরক্ত হইলে তিনি "ড্যাম" ও "হুইট্‌ পিট্‌" বলিয়া গালি দিতেন। লেখা পড়ার কথা উঠিলে, যদি সহজে পলায়ন করিবার উপায় না পাইতেন, তাহা হইলে অনায়াসে "হ্যামিণ্টন্স প্যারাডাইজ লষ্ট," "গোল্‌ডস্মিথস্‌ স্পেক্টর," "লর্ড বাইরণের এনাটমি" প্রভৃতি পুস্তকের বাদানুবাদ করিতেন। সুতরাং বোধ হয়, ইংরাজী ভাষায় তাঁহার সুন্দর ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁহার সভ্যতাসম্মত নীতিশিক্ষা হয় নাই, এমন নহে। কলিকাতায় অবস্থান কালে রুদ্রকান্ত সময়ে সময়ে ব্রাহ্ম সমাজে যাইতেন। তদ্ধেতু তিনি "স্ত্রী স্বাধীনতা," "ভ্রাতৃভাব," "স্বাধীন প্রেম" প্রভৃতি বিবিধ প্রয়োজনীয় শব্দ অভ্যাস করিয়াছিলেন। আর তাঁহাকে কি করিতে বল? তাঁহার ত্রুটি কোথায়? এ হেন ব্যক্তিকেও কেহ কখন মূর্খ বা অসভ্য বলিতে সাহস করেন কি?

পিতা-মাতার নিকট রুদ্রকান্তের আদরের সীমা নাই। তাঁহারা জানিতেন, তাঁহাদের ছেলের মত উপযুক্ত ছেলে এই "বিশ্ব বাঙ্গালায়" আর কখন জন্মে নাই। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, রুদ্রকান্ত কালেজের "ঔট্‌"। সুতরাং তাঁহাদের আনন্দ ও গর্ব্বের সীমা নাই! রুদ্রকান্ত নিতান্ত উগ্রস্বভাব, দুর্ব্বিনীত, হঠকারী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ। এই আশ্চর্য্য জীবের দৌরাত্ম্যে অবন্তীপুর তোলপাড়, তথাকার লোকসমস্ত অস্থির ও জ্বালাতন।

রুদ্রকান্তের বয়স পঁচিশ হইতে ত্রিশের মধ্যে তিনি কৃষ্ণকায় ও শোভাহীন। তাঁহার বর্ণে কোনই উজ্জ্বলতা নাই এবং দেহে একটুও লাবণ্য নাই। তাঁহার লোচনদ্বয় সতত রক্তবর্ণ ও যেন জলভারাকুল। তাঁহার মস্তকের কেশ স্থূল ও চাকচিক্যবিহীন। তাঁহার দেহ অসঙ্গতরূপ খর্ব্ব এবং সর্ব্বাঙ্গের গঠন সামঞ্জস্য পরিপূর্ণ।

মালতীর প্রকৃতি সর্ব্বথা রুদ্রকান্তের বিপরীত। তিনি দরিদ্র-তনয়া। কলিকাতা-সন্নিহিত কোন্নগরে তাঁহার পিত্রালয়। পিতা-মাতার যত্নে মালতী যে লেখা পড়া শিখিয়াছেন, "কালেজের ঔট্‌" রুদ্রকান্তের হাতে না পড়িলে, তাহা বিশেষ গৌরবের হইত সন্দেহ নাই। স্বামীকে অন্তরের সহিত ভক্তি করা যে স্ত্রীর পরমধর্ম্ম, মালতী তাহা বিশিষ্টরূপে জানিতেন। রুদ্রকান্তের স্বভাব যৎপরোনাস্তি কলুষিত জানিয়াও মালতী কদাচ তাঁহাকে ঘৃণা বা অনাদর করিতেন না, বরং যাহাতে রুদ্রকান্তের স্বভাব সংশোধিত হয়, মালতী কায়-মনোবাক্যে তাহারই চেষ্টা করিতেন। রুদ্রকান্ত কিন্তু মালতীকে দুই চক্ষুর বিষ দেখিতেন। মালতীর সহিত কিয়ৎকাল সহবাস করিতে হইলে তিনি ঘোর যাতনা বোধ করিতেন। স্বামীর বিরাগভাজন হওয়ার অপেক্ষা, রমণী-জীবনে আর অধিক যন্ত্রণা কিছুই হইতে পারে না। সুশীলা মালতীর ক্লেশের সীমা ছিল না। সংসারে অন্ন, বস্ত্র দাস, দাসী কিছুরই অভাব ছিল না সত্য, কিন্তু রমণীজীবনের সার সম্পত্তি স্বামী-প্রেম কেমন অমূল্য সামগ্রী, তাহা মালতী কখন জানিতে পারেন নাই। এ ঘোর মর্ম্মবেদনার কে প্রতিবিধান করিবে? কে তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহার স্বামীর চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করিবে? পল্লীগ্রামের জমিদারের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। রুদ্রকান্ত একটী ছোট খাট সিরাজ উদ্দৌলা। কাহার সাধ্য তাঁহার বিরুদ্ধে কথা কহে? প্রজাগণ নীরবে রুদ্রকান্তের উৎপাত সহ্য করিতেছে। উপায় নাই। যদি জনরব শত বাধা

অতিক্রম করিয়া কখন পুত্রের কোন নিন্দার কথা বহন করিত, পিতা তৎক্ষণাৎ হাসিয়া বলিতেন,—"যৌবনে এরূপ দোষ অপরিহার্য্য।" সুতরাং মালতীর ক্লেশ অপ্রতিবিধেয়।

মালতী পরমাসুন্দরী। তাঁহার বয়স সপ্তদশ বর্ষ। ছয় বৎসর কালে তিনি স্বর্ণ পিঞ্জরের পক্ষিণীর ন্যায় রুদ্রকান্তের অবরোধ নিরুদ্ধা। ইতিমধ্যে এক দিনও তাঁহার স্বামী তাঁহাকে প্রীতিপূর্ণ পবিত্র সম্বোধনে সম্ভাবিত করেন নাই। সে ত দূরের কথা—ঘৃণাসূচক কথা ও অন্তঃপুরজনোচিত ব্যবহার ভিন্ন তিনি কদাচ কোন শিষ্ট ব্যবহার করেন নাই। মালতীর এ অসুলভ সৌন্দর্য্য, পবিত্র সরলতা, স্বাভাবিক বিনয়, অসাধারণ শিষ্টাচার প্রভৃতি সদ্‌গুণ সমস্তই ভস্মে ঘৃত হইল। দিবাকর চিরমেঘাচ্ছন্ন রহিল—এ বিমল কমলকে একবারও প্রফুল্ল করিল না; পৌর্ণমাসী শশধর জলদ-পটল সমাচ্ছন্ন হইল—চকোরিণী আনন্দ পাইল না; প্রচণ্ড বাত্যা কাক-চক্ষু-সন্নিভ মেঘরাশি অপসারিত করিল—তৃষিতা চাতকিনী বারি-ধারা পাইল না। এ কুসুমের অনুপম শোভা যে দেখিবার সে দেখিল না;—ইহার সন্তোষসংসাধক সৌরভ যে সম্ভোগ করিবার সে তাহা সম্ভোগ করিল না। আশ্রয়-তরুর শাখা নাই, এ লতিকা কিরূপে শোভা বিকাশ করে? মালতীর দুঃখের সীমা নাই।

অদ্য মালতীর পরম সৌভাগ্য! রুদ্রকান্ত অদ্য তাঁহার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ভুলিয়া আসেন নাই, তাহা হইলে আসিবামাত্র চলিয়া যাইতেন। মালতীর পর্য্যঙ্কে রুদ্রকান্ত উপবিষ্ট। মালতী সভয়ে, অবনত মস্তকে, অথচ আনন্দিতভাবে পার্শ্বে দাঁড়াইয়া।—

মালতী ধীরে ধীরে মধুর স্বরে কহিলেন,—"আজ যে দাসীর প্রতি বড় অনুগ্রহ।"

রুদ্রকান্ত রুক্ষভাবে বলিলেন,—"আমার দরকার আছে।"

মালতী কহিলেন,—"হতভাগিনীর অদৃষ্ট কি এতই প্রসন্ন হইবে যে, তুমি বিনা প্রয়োজনেও আমার নিকট আসিবে? যাহাই হউক, আমার নিকট যে তোমার কোন দরকার পড়িয়াছে, ইহাও আমার পরম সৌভাগ্য।"

মালতী যাহা বলিলেন, রুদ্রকান্তের শ্রুতি যুগলে তাহা প্রবেশ করে নাই; তাহার মন অন্য চিন্তাবিষ্ট ছিল। কহিলেন,—"ও হো! আমার বরাত আছে, শীঘ্র যাইতে হইবে।"

মালতী বলিলেন,—"যদি দয়া করিয়া আসিয়াছ, তবে একটু বইস। দাসীর ভাগ্যে এমন ঘটনা ঘটে না।"

রুদ্রকান্ত কহিলেন,—"আমার এত সময় নাই যে, তোমার সঙ্গে এখানে বৃথা সময় কাটাই।"

মালতী বলিলেন,—"ভাল, তোমার যদি কাজ থাকে, কি সময় না থাকে, তাহা হইলে আমি এমন বলি না যে, তুমি আমার কাছে থাক, তবে পথভুলে আসিয়াছ যদি—"

রুদ্রকান্ত রাগত স্বরে বলিলেন—"আঃ আমি তোর নাকে কান্না শুনিতে আসি নাই। জ্বালাতন করিস্ না।"

মালতীর চক্ষুতে জল আসিল, কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিয়া কহিলেন,—"তুমিই ত আমাকে কাঁদাচ্চ। এ কান্না তুমি না শুনলে কে শুনবে?"

রুদ্রকান্ত বলিলেন,—"আমার এত দায় নাই। আমি ঢের শাস্ত্র পড়েছি। স্ত্রীর কাছে দিবারাত্র বসিয়া থাকিতে হইবে এমন কোন শাস্ত্রে লেখে না।"

মালতী চক্ষু মুছিয়া কহিলেন,—"তা

স্ত্রীকে সতত কাঁদাইতে হইবে, এমন ব্যবস্থা লেখে কি ?”

মহাবিরক্তির সহিত রুদ্রকান্ত বলিলেন,—“ভাল জ্বালা ! কে তোরে ধরে মার্‌ছে, যে তুই কাঁদ্‌ছিস্ ?”

মালতী সজলনয়নে কহিলেন,—“এ কষ্টের চেয়ে ধরে মারা ভাল।”

রুদ্রকান্ত অত্যন্ত কর্কশভাবে কহিলেন,—“কষ্টটা কি ? যে তোর বিদ্যা না জানে, তার কাছে গিয়ে কষ্টের কথা বলে কাঁদিস্, তার দয়া হবে। আমি সব জানি ; তোর বাপ বেটা মহা পাঁপুরে,। তার বাপের জন্মে লক্ষ্মীর সংস্থান নাই। আমি যেই তোরে দয়া করে বিয়ে করেছি, তাই তোর এত সুখ। তাই এত গহনা, ভাল কাপড়, চাকর, নফর, সুখের সীমা নাই ! এতেও তোমার কষ্ট ! ওরে আমার কষ্ট রে ! এতেও যদি মন না উঠে, তবে না হয় বাপের বাড়ী গিয়ে ঘুঁটে কুড়িয়ে খাওগে।”

মালতীর চক্ষু দিয়া দরদরিত ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি অঞ্চল বদনাবৃত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রুদ্রকান্ত মহা বিরাগের সহিত কহিলেন,—“আমি এলেম ও র কাছে, তা ভাগ্য বলে মানা নাই, আবার উপরন্ত কান্না ! থাক্ তোর কান্না নিয়ে,—আমি চল্লেম।”

বদনের বসন উন্মুক্ত করিয়া মালতী দেখিলেন, রুদ্রকান্ত যথার্থই চলিয়া গিয়াছেন। সরলা, অভিমান-প্রবণ-হৃদয়া মালতী যথায় দাঁড়াইয়াছিলেন, তথায় বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কে তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইবে ? কে তাঁহার মর্ম্মবেদনা বুঝিবে ?

রুদ্রকান্ত চলিয়া গেলেন। পাষাণ সহজে অঙ্কিত হয় না ; রুদ্রকান্তের হৃদয়ে মালতীর রোদন-জন্য অশ্রুপাত হইল না। কিন্তু তিনি অবিলম্বে আবার ফিরিয়া মালতীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। কহিলেন,—“যে দৌরাত্ম্য—এখানে এসে তো কাজের কথা হবার উপায় নাই। আমি যা জিজ্ঞাসা করি আগে তার উত্তর দে, তারপর সারাদিন বসে কাঁদিস্।”

মালতী বস্ত্রাঞ্চল অপসারিত করিলেন,—দেখিলেন রুদ্রকান্তের মূর্ত্তি আরও রুদ্র। আবার বস্ত্রাঞ্চলে বদনাবৃত করিয়া মালতী রোদন করিতে লাগিলেন। রুদ্রকান্ত কহিলেন,—“আস্পর্দ্ধা দেখ। যদি ভাল চাস্, তবে আমি যা বলি আগে তা শোন্।”

মালতী সেই ভাবেই বলিলেন,—“বল।”

রুদ্রকান্ত বলিলেন,—“এক সুট গহনায় আমার আজ এখনই দরকার। তোর গহনা আমাকে এখনই দে।”

মালতী কহিলেন,—“গহনায় আমার কোন দরকার নাই। তুমি এখনই সব অলঙ্কার নিয়ে যাও।”

এই বলিয়া মালতী চাবির রিং ফেলিয়া দিয়া পূর্ব্ববৎ রোদন করিতে লাগিলেন। রিং মধ্যে অনেকগুলি চাবি ছিল। ব্যস্ত, অস্থির-প্রকৃতি রুদ্রকান্ত বাক্সের যথার্থ চাবি না লাগাইয়া অপর একটা চাবি লাগাইলেন। বাক্স খুলিল না। জড়প্রকৃতি সম্পত্তির বাধ্য নহে, সে সামান্য জ্ঞান তাঁহার নাই। তিনি ভাবিতেছিলেন, বাক্স, চাবি, রিং সকলই তাঁহার পিতার জমিদারির প্রজা। আর একটী চাবি লাগাইলেন। তাহাতেও বাক্স খুলিল না। এরূপে কয়েকটি অন্য চাবি দিয়া বাক্স খুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কাজেই চেষ্টা ব্যর্থ হইতে লাগিল। এক সঙ্গে বাক্স, চাবি ও মালতী তিনেরই উপর তাঁহার

ভয়ানক রাগ জন্মিল। একটী স্বতন্ত্র চাবি লাগাইয়া, দেহে যত শক্তি আছে সমস্ত প্রয়োগ করিলেন। বাক্সের কলটি একেবারে খারাপ হইয়া গেল; না ভাঙ্গিলে খুলিবার আর আশা রহিল না। রুদ্রকান্তের অসহ্য ক্রোধ জন্মিল। তিনি বাক্সের উপর "ড্যাম" বলিয়া এক প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। বাক্সের কাঠ মজবুত ছিল—ভাঙ্গিল না, লাভের মধ্যে হস্তে ভয়ানক আঘাত লাগিল। আরও রাগ হইল।

এই সময়ে মালতী বলিলেন,—"বাক্সের ঠিক চাবি লাগান হয় নাই।"

রুদ্রকান্ত বাক্স হস্তে লইয়া মালতী সন্নিধানে আসিলেন এবং উগ্রভাবে কহিলেন,—"কি! আমার সহিত তামাসা? গহনা দিবার মতলব নাই; তাই বেঠিক চাবি দিয়া আমাকে এতক্ষণ এরূপ কষ্ট দিয়াছিস্। গহনা কি তোর বাবার যে তুই দিবি না? দাঁড়া তুই—"

এই কথার পর পাষাণ্ড, নৃশংস রুদ্রকান্ত মালতীর নবনীতনিভ সুকোমল সুন্দর বদনে তিন চারি বার পদাঘাত করিয়া বাক্স হস্তে প্রস্থান করিলেন!!! মালতী ধরাবলুণ্ঠিতা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পাদুকার আঘাতে বদনের স্থানে স্থানে ক্ষত হইয়াছিল। সে সকল ক্ষতমুখ প্রবাহিত রুধির ধারায় মালতীর অনুপম বদনমণ্ডল প্লাবিত হইল!!! অদৃষ্ট।

সাধ্বি মালতি, দৈহিক বেদনা অতি সামান্য কথা। তাহার যন্ত্রণা বোধ হয় তোমাকে ব্যথিত করিতে অক্ষম। অন্তরে বড়ই বেদনা পাইয়াছ কি? সে তীব্র যাতনা তোমার মর্ম্মগ্রন্থি ছিন্ন করিয়া দিতেছে কি? এ অসহনীয় জ্বালা নিবৃত্তির কি কোনই উপায় নাই? বাহ্যক্ষত সমূহের কথা দূর হউক—তোমার অন্তরস্থিত উৎকট ক্ষতমুখ সুশীতল করিবার কি কোনই ঔষধ নাই? তোমার এই দুরন্ত যন্ত্রণা প্রশান্ত করিবার কি কোনই শান্তিসলিল নাই? আছে—সকলই আছে। তুমি ধর্ম্মশীলা—তুমি আর্য্যকুলললনা। এ তুচ্ছ যাতনা কিরূপে হেলায় অতিক্রম করিতে পারা যায়, এঅকিঞ্চিৎকর বেদনা কিরূপে অনায়াসে উপেক্ষা করিতে পারা যায়, এ যৎসামান্য অগ্নুদগম কিরূপে ফুৎকারে নির্ব্বাণ করা যায়, তাহার সকল উপায়ই তুমি জ্ঞাত আছ। তোমার হৃদয়ে যে অতুলনীয় ধর্ম্ম আছে তাহারই বলে তুমি এ যাতনা-সমুদ্র গোষ্পদবৎ অতিক্রম করিবে এবং তাহারই সাহায্যে তুমি পূর্ণানন্দের অধিকারিণী হইবে। আধি ও ব্যাধি, জ্বালা ও যন্ত্রণা, অপমান ও তিরস্কার, ঘৃণা ও লাঞ্ছনা তোমার নিকট হইতে লজ্জায় দূরে পলায়ন করিবে।

এ সংসারে ত্যাগই পরম ধর্ম্ম। যে যে মহাপুরুষ বসুন্ধরায় সর্ব্বশক্তিমান ভগবান্ বলিয়া পূজিত হইয়া আসিতেছেন, তাঁহারা সকলেই ত্যাগের অবতার। রাম, লক্ষ্মণ, শ্রীকৃষ্ণ, বেদব্যাস, বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্যদেব সকলেই ত্যাগের অবতার—সকলেই দেবতা। ভোগে সুখ নাই, ত্যাগেই পূর্ণ সুখ। ভোগের ফল ক্ষণস্থায়ী, ত্যাগের ফল অনন্ত। মালতি, স্বামীকে ভোগ করার লোভ তুমি ত্যাগ করিয়াছ; অন্তরের ভক্তি-চন্দন-চর্চ্চিত প্রীতিকুসুম দ্বারা হৃদয়-বেদিকায় তাঁহার পূজা করিতে শিখিয়াছ। তবে আর তুমি না জান কি? তবে আর তোমার সুখের পথে কণ্টক বিস্তার করিতে পারে, এমন সাধ্য কাহার আছে? আমরা পৌত্তলিক—বড়ই গৌরবের পরিচয়। আমরা মৃন্ময়, দারুময়,

পাষাণময়, ভগবান্ জ্ঞানে পূজা করিতে জানি এবং সেই পরাজয় পরিতৃপ্তি ও পূর্ণানন্দ উপভোগ করি। যদি মাটীর পুতুলকে আমরা এতই আপন করিয়া লইতে পারি, তাহা হইলে সজীব। স্বামীরূপ পরম দেবতাকে কেন না প্রত্যক্ষ ভগবান্ জ্ঞানে হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অবিরত বিবিধ বিধানে পূজিত করিবে? নাই বা স্বামী আদর করিলেন? নাই বা তিনি কথা কহিলেন? কোন্ দেবতা আমাদের সহিত কথা কহেন? আমাদের কোন্ পুতুল আমাদের সহিত আদরের খেলা করেন? আমরা অন্তরে তাঁহাদের প্রেমাঞ্জলি অনুভব করি এবং মনে মনে তাঁহাদের প্রীতি ও প্রসন্নতা উপভোগ করি। বাহ্য অনুভবে আর কাজ নাই। বাহ্য উপভোগ বড়ই প্রবঞ্চক ও চপল। ছাড়িয়া দেও, দেবি, এ বাহ্য ভোগের লালসা হৃদয় হইতে বিসর্জ্জন দেও। আর কোন যন্ত্রণাই তোমাকে ব্যথিত করিবে না, কোন অনাদরই তোমাকে কাতর করিতে পারিবে না এবং কোন দুর্ব্যবহারই তোমাকে অবসন্ন করিতে সক্ষম হইবে না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সংবাদ।

তিন দিন বিমলার উদ্দেশ নাই। সহসা তিনি কোথায় গেলেন বা তাঁহার কি হইল, তাহা কেহই জানিতে পারিলেন না। আত্মীয়বর্গ ঘোর চিন্তায় আকুল। তাঁহার জননীর যে অবস্থা তাহা বর্ণন করিয়া কি বুঝাইব? বিমলার বাটী অন্ধকার। বিমলার পরিষ্কার প্রকোষ্ঠ ধূলিজঞ্জাল সমাচ্ছন্ন। তাঁহার পুস্তক সমস্ত অব্যবস্থিত।

অতি প্রত্যূষে যোগেশ স্বীয় নিবাসালয় সন্নিধানে পদব্রজে বেড়াইতে বেড়াইতে বায়ু সেবন করিতেছেন। তাঁহার মুখমণ্ডল বিশুষ্ক, ঘোর চিন্তায় আকুল, আকৃতি শ্রীভ্রষ্ট, লোচনযুগল অস্থির, বদনে কালিমা, আহার ও নিদ্রার অভাবে দেহ বিশীর্ণ।

এক দিন যোগেশ বিবিধ উপায়ে বিমলার সন্ধান করিতেছেন। তিনি বিদ্বান্, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও ধীর, তাঁহার চেষ্টায় অচিরে যে বিমলার সন্ধান হইবে, তদ্বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই।

গ্রামের লোকেরা বিমলার এই অচিন্তিতপূর্ব্ব অন্তর্ধানে বিস্মিত ও ব্যাকুল হইয়াছে! অনেকেই আশঙ্কা করিতেছে, ইহাতে হয়তো বরদাকান্তের হাত আছে; এ কথা কেহই স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতে সাহস করিতেছে না। সকলেই বুঝিয়াছে, যোগেশ কখনই নীরবে এ ব্যাপার সহ্য করিবেন না। শীঘ্রই একটা তুমুল কাণ্ড যে বাধিবে, তাহা অনেকেই মনে করিতেছে।

সময়টী অতি মনোহর। বৃক্ষপত্র কাঁপাইতে কাঁপাইতে, বিলম্বিত ফল দুলাইতে দুলাইতে, নবলতিকা নাচাইতে নাচাইতে অল্প অল্প শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। পথপার্শ্বস্থ, গুল্মসমস্ত শিশিরের শুভ্রাবরণ ছাড়িতে পারে নাই। এখনও প্রকৃতি নীরব। কেবল সময়ে সময়ে এক এক জন "তারা দুর্গতিনাশিনী মাগো" বলিয়া সুপ্তোত্থিত হইতেছে। এক বৃদ্ধ উঠিয়া ঘরের দাবায় বসিয়া তামাক খাইতেছে, কাশিতেছে, সময়ে সময়ে উচ্চৈঃস্বরে হাই তুলিতেছে, তুড়ি দিতেছে ও দুর্গা নাম উচ্চারণ করিতেছে। দুইটী কুকুর খেলা করিতেছে। একটী ছুটিতেছে, আর একটী তাহার অনুসরণ করিতেছে। নিকটস্থ

হইয়া উভয়ে উভয়কে কামড়াইতেছে, উল্লম্ফন করিতেছে, একটী পড়িতেছে, আবার ছুটিতেছে আবার নিকটস্থ হইতেছে। সহসা প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিল। পার্শ্বস্থ আম্র বৃক্ষ হইতে সপ্তস্বরনিনাদী মধুময় কণ্ঠে পাপিয়া "চোখ্‌ গেল" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। স্বর কাঁপিতে কাঁপিতে দিগন্ত পর্য্যন্ত প্রধাবিত হইতে লাগিল। ক্রমে পূর্ব্বাকাশে সূর্য্য দেখা দিলেন। বৃক্ষ, গৃহ, দ্বার, বন সমস্ত পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

চিন্তাকুল-চিত্ত যোগেশ আপন মনে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার মন নিতান্ত উদ্বিগ্ন। অস্থির চিত্তের নিয়মানুসারে যোগেশ পরিক্রমণ করিতেছেন,—তাহার নির্দ্ধারিত সীমা নাই। কখন বা একটু দূরে গিয়া পড়িতেছেন, কখন বা মধ্য পথ হইতে বিপরীত দিকে ফিরিতেছেন। পশ্চাতে কোন শব্দ হইতেছে, তিনি ভাবিতেছেন, কে বুঝি তাঁহাকে ডাকিতেছে। পার্শ্বে কোন অব্যক্ত ধ্বনি হইতেছে, তিনি ভাবিতেছেন, কে বুঝি কাঁদিতেছে। যোগেশ এইরূপ নিদারুণ চঞ্চলচিত্তে পরিভ্রমণ করিতেছেন, কখন বা বিনা প্রয়োজনে এক স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইতেছেন। যোগেশ যখন এবংবিধ অবস্থায় অবস্থাপিত, সেই সময় একজন লোক তাঁহার নিকটস্থ হইল। যোগেশ তাহা দেখিতে পাইলেন না। লোক বিশেষ নিকটস্থ হইল। যোগেশের সে দিকে লক্ষ্যও নাই—মনোযোগও নাই। লোক নিকটস্থ হইয়া বুঝিল, যোগেশ বাবুর মনের অবস্থা ভাল নাই। আগন্তুক "হাঃ হাঃ" শব্দে হাসিয়া উঠিল। যোগেশ চমকিত হইয়া তাহার দিকে চাহিলেন—দেখিলেন, ব্যক্তিটা রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী।

রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী অতি ব্যঙ্গব্যঞ্জক বিকট হাস্যসহকারে কহিল,—হাঃ হাঃ! কেও যোগেশ বাবু যে, হাঃ হাঃ—"

যোগেশ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"মহাশয়! অতি প্রত্যুষে কোথায় গমন কচ্চেন?" রামকৃষ্ণ পূর্ব্ববৎ ব্যঙ্গস্বরে কহিলেন,—"যাব আর কোথা? মহাশয়ের নিকটেই আসা।"

যোগেশ অপেক্ষাকৃত বিস্ময় সহকারে কহিলেন,—"আমারই নিকটে? আসুন, বাটী গিয়া বসি চলুন।"

রামকৃষ্ণ কহিলেন,—এখন বসিবার সময় নয় বাবু। আমাদের আজি কালি পাথরে পাঁচ কীল বাবা। বুঝেছ, যেখানে ছুঁই না চলে, আমরা সেখানে বেটে চালাই। বাবা, আমাদের আঁটে কে?"

যোগেশ ভদ্রতা সহকারে কহিলেন,—"যদি বসিবার সময় না থাকে, তবে কি অভিপ্রায়ে আসা বলুন।"

রামকৃষ্ণ বলিলেন,—"অভিপ্রায় এমন কিছু নয়। তোমার সহিত রুদ্রকান্ত বাবাজীর কি দরকার আছে; একবার যেতে পারবে কি?"

যোগেশ বিনীতভাবে বলিলেন,—"তা আমি ঠিক করিয়া বলিতে পারি না, তবে চেষ্টা করিয়া দেখিব।"

রামকৃষ্ণ বলিলেন,—"চেষ্টা? চেষ্টা কেন হে? তুমি এতই কি কাজের লোক? যাবেই বল না কেন? তা যাক্‌ মরুক্‌গে—তোমাকে কেমন কেমন দেখ্‌ছি কেন?"

নিতান্ত অনিচ্ছায় যোগেশ উত্তর দিলেন,—"আজ্ঞে হাঁ আমার মনটা একটু চিন্তিত আছে।"

আবার রামকৃষ্ণ বিজাতীয় বিদ্রূপ স্বরে কহিলেন,—"চিন্তিত? কেন? ওহো! বুঝেছি বুঝেছি! তোমার বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেল

বলে বুঝি! তা যা হউক, তোমার কাছে খাঁটী খবর পাব। বলি বিমলা নাকি বেরিয়ে গেছে?"

যোগেশের লোচন দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। তিনি সক্রোধে বলিলেন,—"তোমাকে মানুষ বলিয়া বোধ করি না, তাই তুমি বাঁচিয়া গেলে। যাও, তুমি এখনই আমার সম্মুখ হইতে দূর হও।"

রামকৃষ্ণ বলিলেন,—"তা তো বল্‌বেই জানি। এখনই এই,ইহার পরে না জানি আরও কত হবে। বড় আঁতে ঘা লেগেছে বাবা"

আর কোন কথা না বলিয়া রামকৃষ্ণ প্রস্থান করিলেন। যোগেশ অব্যবস্থিত ভাবে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার চিত্ত ভয়ানক অস্থির হইল। রামকৃষ্ণের তীব্র বিদ্রূপ, তাহার কথার ভঙ্গী, অকারণে অসময়ে তাহার আগমন, প্রভৃতি নানা চিন্তায় তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল। তাঁহার মন বিজাতীয় আশঙ্কা ও সন্দেহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। হঠাৎ কি মনে হইল, সত্বর বাটী আসিবার নিমিত্ত পুনরাবর্ত্তন করিলেন। সহসা একটী প্রতিবেশিনী পরিচিতা বালিকা তাঁহার নিকটে আসিল। তিনি তাহা লক্ষ্য করিলেন না। দেখিলেন—কিন্তু সে দেখা শূন্য দৃষ্টি। বালিকাকে পশ্চাতে রাখিয়া যোগেশ চলিয়া গেলেন।

বালিকা সঙ্কুচিত ভাবে ডাকিল,—"দাদা"

যোগেশ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া বালিকার বদনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। বালিকা যাহা বলিবে, তাহা ভুলিয়া গেল। ক্ষণপরে মন স্থির করিয়া কোমল স্বরে যোগেশ জিজ্ঞাসিলেন,—"কুসুম! কোথা যাচ্ছ?"

কুসুমের এখন সাহস হইল। বলিল, দাদা, তোমার এই চিঠি!"

যোগেশ কুসুমের হস্ত হইতে পত্র গ্রহণ করিলেন। দেখিলেন,—শিরোনামে তাঁহারই নাম লেখা। পত্র তাঁহারই বটে। লেখাটী যেন স্ত্রীলোকের মত। হস্ত-বিকম্পিত হইল। মন অস্থির হইয়া উঠিল। ব্যস্ততা সহ যোগেশ পত্রিকা উন্মোচন করিয়া পাঠ করিলেন। তাহাতে এই কয়টী কথা লিখিত ছিল।

"রুদ্রকান্ত বাবুর চাতুরীতে বিমলা অবরুদ্ধ হইয়াছেন। কোথায় আছেন জানি না। আপনারা তাঁহার জন্য ঘোর চিন্তিত বলিয়া যাহা জানিতাম তাহা জানাইলাম। অনুসন্ধান করিলে সহজে সন্ধান পাইবেন। হতাশ হইবেন না।"

"পত্রখানি পড়িয়া ছিন্ন করিবেন নচেৎ আমার বড় বিপদ হইবে।"

"যিনি এই কার্য্যের মূল, তাঁহার নাম আপনাকে জানাইলাম। অনুরোধ করি, তাঁহাকে বিপদাপন্ন ও অপমানিত করিবার চেষ্টা করিবেন না।"

"আমি কে, তাহা জানিয়া কাজ নাই। ইতি"

পত্রে তারিখ নাই। লেখকের নামও নাই। যোগেশ পত্র পড়িয়া বাতুলের ন্যায় অস্থির হইলেন। তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এখন রামকৃষ্ণের বিদ্রূপোক্তি, তাহার আগমন প্রভৃতির কারণ তিনি বেশ প্রণিধান করিলেন, এবং রুদ্রকান্ত ও রামকৃষ্ণ যে এই সর্ব্বনাশের মূল তাহাও তিনি এখন বেশ অনুভব করিলেন। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া যোগেশ প্রথমতঃ অজ্ঞাত লেখকের অনুরোধানুসারে পত্রখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। কুসুম ভাবিল, পত্রখানি দিয়া সে বুঝি কোন দুষ্কর্ম্ম করিয়া থাকিবে। সে ভয়ে এক দৌড়ে, যোগেশের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল।

যোগেশ তাহাকে আরও কি জিজ্ঞাসিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহা হইল না।

নবম পরিচ্ছেদ।

পরিণাম।

যোগেশ ব্যস্ত হইয়া বাটী আসিলেন, তথায় আসিয়া পিতাকে সমস্ত সংবাদ জানাইলেন। বিমলার মাতাকে এত কথা জানাইবার ইচ্ছা ছিল না। তথাপি তিনিও অনেক কথা জ্ঞাত হইলেন।

রুদ্রকান্ত কর্ত্তৃক এই ভয়ানক কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে শুনিয়া গঙ্গাগোবিন্দ অবাক্ হইলেন। মনে ভয়ানক ক্রোধ জন্মিল। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ক্রোধ প্রকাশ বা বলপ্রয়োগে কোন ইষ্ট না হইয়া বরং অধিকতর অনিষ্টই সংঘটিত হইবে বিবেচনায়, ক্রোধ প্রশমিত করিলেন। তাহার পর নিঃসংশয়ে স্থির হইল, বিমলা অবন্তীপুরে নাই। তাঁহাকে রুদ্রকান্ত কোন স্থানান্তরে রাখিয়াছেন। সে স্থান কোথায় কেহ তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।

যোগেশ বলিলেন,—"যখন অবন্তীপুরে বিমলা নাই, তখন ইহা এক প্রকার স্থির হইতেছে যে, যে কয় স্থানে বরদাকান্তের জমিদারী বা কুঠী আছে, তাহারই কোন না কোন স্থানে অবশ্যই বিমলা আছেন। সেই সকল স্থানে অনুসন্ধান করিলে অবশ্যই বিমলার সন্ধান পাওয়া যাইবে।"

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন,—"অনুমান যথার্থ বটে কিন্তু সে স্থান সকলের অনুসন্ধান করা নিতান্ত সহজ কার্য্য নহে।"

যোগেশ বলিলেন,—"এ বিপদের পরিমাণে সমস্তই সহজ।"

গঙ্গাগোবিন্দ কহিলেন,—"সন্ধান পাইলেও বিমলাকে উদ্ধার করা সহজ হইবে না।"

যোগেশ বলিলেন,—"আপনি সে জন্য চিন্তা করিবেন না। আমি অদ্য রামনগরে গিয়া পুলিশে সমস্ত জানাইব। পুলিশের সাহায্যে সমস্তই সহজ হইবে। অবন্তীপুরেই বরদাকান্ত রায় বড় বলবান্। এবার তাঁহার বল বিক্রম তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্রকে কখনই রক্ষা করিতে পারিবে না।"

গঙ্গাগোবিন্দ অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন,—"তাহাই ভাল। তুমি অদ্যই রামনগরে যাত্রা কর, তথায় কেশবের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা উচিত হয় করিও। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। আমার বুদ্ধি এ সকলের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে না। দেখিও যেন নূতন বিপদ উপস্থিত না হয়। যে কার্য্য করিবে, বিশেষ বিবেচনা করিয়া করিবে। দুর্জ্জনকে পরিহার, বিজ্ঞের পরামর্শ। তুমি ওদিকে যথাবিহিত যত্ন ও চেষ্টা কর; আমিও একবার বরদাকান্তের নিকট যাইব। যদিও তিনি বিন্দুমাত্র সৎস্বভাবান্বিত নহেন, তথাপি তিনি প্রবীণ। আমি জানি, তিনি সমস্তই জানিয়াছেন, এবং তিনিই পুত্রের সমস্ত দুষ্ক্রিয়ার উৎসাহদাতা, তথাপি একবার তাঁহার সহিত দেখা করা মন্দ পরামর্শ নহে।"

যোগেশ কহিলেন,—"আপনার ইচ্ছা হয় দেখা করিবেন। কিন্তু তাহাতে কোন ইষ্ট সম্ভাবনা দেখিতেছি না। লোকটা কতদূর অদ্ভুত তাহা আপনার অগোচর নাই। যদি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয়, তাহা হইলে বিশেষ সতর্কভাবে কথাবার্ত্তা কহিবেন। তবে আমি এখনই প্রস্থানের উদ্যোগ করি।"

গঙ্গাগোবিন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। বেলা ৩৷৹টা বা ৪টার সময় পাল্কীবাহকাদি সমস্ত প্রস্তুত হইল। যোগেশ রামনগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

সন্ধ্যার অব্যবহিত কাল পরে বাহকেরা উভয় গ্রামের মধ্যবর্ত্তী এক প্রান্তর-পার্শ্বস্থ বৃক্ষ-মূলে পাল্কী নামাইয়া হস্তপদাদি প্রক্ষালন, বারিসেবন ও বিশ্রমার্থ অনতিদূরস্থ জলাশয় সমীপে গমন করিল। যোগেশ পাল্কী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহার মন নিতান্ত উদাস —অনন্ত চিন্তা-সমাচ্ছন্ন। কি করিতে কোথা যাইতেছেন, বা কি করিলে কি হইবে, কিছুই যেন অবধারিত নাই। প্রান্তরের দিকে পশ্চাৎ করিয়া, পাল্কীর উপর ভর দিয়া যোগেশ অনন্ত শূন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মন যেন, অনন্ত শূন্য সাগর মধ্যে একাকী পরিভ্রমণ করিতেছে। একাকী—সঙ্গে আর কেহ নাই। এক সঙ্গে, এক কালে, বহুবিধ ঘটনা হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিলে, মন বিচলিত, অস্থির ও ধারণা শূন্য হইয়া পড়ে। একটী ঘটনার চিন্তা হইলে, ন্যায়ের নিয়মানুসারে, ধারাবাহিকরূপে ঘটনার পরিণাম চিন্তা করা যায়; কিন্তু বহু ঘটনা সমসময়ে চিত্তক্ষেত্রে সমাগত হইলে কদাচ তদ্রূপ হয় না। তখন চিত্তের উপর আর আধিপত্য থাকে না, ভাবনার ক্রম বা ধারা থাকে না, আবশ্যক অনাবশ্যক জ্ঞান থাকে না। তখন চিত্ত যেন উদাসীন ভাবে অনন্ত নীল নভস্থলে কপোতিনীবৎ উড্ডীন হইতে থাকে, অনন্ত সাগর-বক্ষে বায়ুবিতাড়িত তরণীর ন্যায় বিচলিত হইতে থাকে—উদ্দেশ্য শূন্য, লক্ষ্য-শূন্য, বাসনা-শূন্য চেষ্টা-শূন্য। যোগেশের চিত্তের অবস্থা অধুনা সেইরূপ। তিনি ঘোর চিন্তায় সমাচ্ছন্ন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার এক্ষণে কোনই বিশেষ চিন্তা নাই। তাঁহার চিত্তের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা।

সহসা পশ্চাতের দিক্ হইতে এক কৃষ্ণকায় বলিষ্ঠ ব্যক্তি সমাগত হইল। যোগেশ তাহার আগমন জানিতে পারিলেন না। আগন্তুক নিকটস্থ হইয়া যোগেশের মস্তক লক্ষ্য করিয়া, হস্তস্থিত লাঠিদ্বারা এক বিষম আঘাত করিল। অব্যর্থ আঘাতে যোগেশ সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন। মৃত্যুর যাবতীয় লক্ষণ তাঁহার শরীরে প্রকাশ পাইল। হত্যাকারী, যোগেশের মৃত্যু হইয়াছে নিশ্চয় করিয়া দৌড়িয়া পলায়ন করিল। যোগেশের সংজ্ঞাশূন্য দেহ ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া রহিল। তাঁহার আত্মীয়, বন্ধু বান্ধব, বাহক প্রভৃতি কেহই এ বিপদের সংবাদ পাইল না।

কালের কুটীল নিয়মের কে অন্যথা করিবে? মনুষ্য! তুমি কিসের গর্ব্ব কর? ভাবিয়া দেখ, তোমার যাবতীয় গর্ব্বের মূলস্থান দেহ ও জীবন কি সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর সম্পত্তি! আশা-চক্রে নিবদ্ধ থাকিয়া মানব কি না করিতেছে? মানবের প্রত্যেক কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিলে বোধ হয়, যেন মানব স্থির করিয়াছে, তাহার জীবন অবিনশ্বর বা কল্পান্তস্থায়ী। কি ভ্রান্তি! প্রত্যেক কার্য্যে দেখিতেছি, জানিতেছি ও বুঝিতেছি যে, আমি যে কিছু লইয়া গর্ব্ব করি, তাহার কিছুই চিরস্থায়ী নহে। সকলই ক্ষণবিধ্বংসী। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, মানব ক্ষণকালের নিমিত্তও এই সিদ্ধান্তকে হৃদয়ে স্থান দেয় না! এই আশ্চর্য্য, কৌশলময় মোহই মানবকুলের সাংসারিক কার্য্যসমস্তের নিয়ন্তা। এই মোহ না থাকিলে, মানব জীবনের উৎসাহ, আনন্দ, আশা, সুখ, দুঃখ, শোক প্রভৃতি সমস্তই বিদূরিত ও তিরোহিত হইয়া যাইত— সংসার বিসদৃশ স্থান হইয়া উঠিত—মানব-

জীবন নিরতিশয় ভারভূত হইয়া পড়িত। এই মোহ না থাকিলে, মানব! আজি কি তুমি সংসারে থাকিতে পারিতে? এই মোহ না থাকিলে, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তুমি কি স্বীয় অদৃষ্টের উন্নতি করিতে? এই মোহ না থাকিলে, রোগ, শোক, দুঃখ-রাশিপরিবৃত বিশ্বধামে তুমি কি ক্ষণকালের নিমিত্তও তিষ্ঠিতে? এই মোহ না থাকিলে, মানব! তুমি কি অঙ্গুলি পরিমিত ভূমির জন্য প্রাণাধিক সহোদরের সহিত কদাচ অবক্তব্য কলহানল প্রজ্বলিত করিতে? হে দরিদ্র! এই মোহ না থাকিলে, নিত্য শাকান্ন সেবন করিয়া তুমি কি অসন্তুষ্ট হইতে? না থাকিলে সংসারের সকল বন্ধনই নির্ম্মূল হইয়া যাইত। ফলতঃ, সংসার যেরূপ প্রণালীক্রমে সংগ্রথিত, মোহ তাহার প্রধান সূত্র।

যোগেশের সংজ্ঞাশূন্য দেহ ভূপৃষ্ঠে নিপতিত রহিল। কোথায় বিমলা? যে বিমলার জন্য যোগেশের এই বিপদ, সে বিমলা এক্ষণে কোথায়? কোথায় সংসার? কোথায় স্নেহময় পিতা? কোথায় পরম শত্রু রুদ্র-কান্ত? মানবের এ বড় আশ্চর্য্য অবস্থা! এ অবস্থায় শত্রু-মিত্র নাই, দ্বেষ হিংসা নাই, খলতা-কপটতা নাই, প্রণয়-অপ্রণয় নাই, মায়া মমতা নাই! সংসারের যাবতীয় স্পৃহা, আশা, ইচ্ছা এই অবস্থায় বিলীন হয়। যোগেশের মনে এখন আর কামিনী-কুলকুসুম বিমলার প্রণয় নাই, মানব-কুল-কলঙ্ক রুদ্রকান্তের শত্রুতা নাই, সংসারের কোন প্রবৃত্তিই নাই!!! যোগেশের অচেতন দেহ ধরণীপৃষ্ঠে নিপতিত রহিল। তাঁহার বিপদের সময় কেহ জানিল না, কেহ শুনিল না, কেহ দেখিল না। তাঁহার বিপদে কেহ আহা বলিল না, কেহ হায় হায় করিল না। দেহ সমভাবে পড়িয়া রহিল।

অনতিবিলম্বে তাঁহার বাহকেরা আসিয়া অই অবস্থা প্রত্যক্ষ করিল। তাহারা ভয়ে নিতান্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। তাহাদের স্কন্ধেই যে এই ভয়ানক দায় আরোপিত হইবে, ইহা তাহারা বিলক্ষণরূপ স্থির করিল। লাস কোন প্রচ্ছন্ন স্থানে ফেলিয়া দিয়া পলাতক হওয়াই তাহারা সৎপরামর্শ মনে করিল। তখন তাহারা পরামর্শানুযায়ী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

পিতা।

সন্ধ্যাকালে বরদাকান্ত রায় তামাক খাইতে খাইতে স্বকীয় বারান্দায় পরিক্রমণ করিতেছেন। বরদাকান্তের বয়স পঞ্চাশের উপর। মাথার চুলের অর্দ্ধাধিক পাকা। তাঁহার গোঁপ বড় জাঁকাল। পাকা গোঁপ কলপপ্রয়োগে কাল মিচমিচে। তনু লোমশ ও স্থূল। আকৃতি খর্ব্ব। বর্ণ ঘন-কৃষ্ণ।

বরদাকান্ত রায় তামাক খাইতেছেন; এমন সময় তথায় গঙ্গাগোবিন্দ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত হইলেন। রায় মহাশয়ের মুখে সততা ও সৌজন্যের ত্রুটী নাই। তিনি মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখিবামাত্র যথোচিত ভদ্রতা সহকারে অভ্যর্থনা করিলেন। উভয়ের শিষ্টাচার প্রসঙ্গ সাঙ্গ হইলে, নিপতিত কাষ্ঠাসনে উভয়েই উপবেশন করিলেন।

রায় মহাশয় কহিলেন,—"মুখোপাধ্যায় মহাশয়! কি মনে করিয়া শুভাগমন?"

মুখোপাধ্যায় কি বলিয়া প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবেন, তাহা ভাবিতে লাগিলেন। ক্ষণেক চিন্তার পর কহিলেন,—

"বিশেষ মনে কিছুই নাই। আপনার সহিত সাক্ষাতাদি করাই উদ্দেশ্য। রুদ্রকান্ত বাবু আছেন ভাল?"

বরদাকান্ত যেন কিছু বিষণ্ণ স্বরে কহিলেন,—"কাল ইংরাজী পড়ার দোষ বিস্তর।"

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন,—"কেন, বলুন দোষ?"

বরদাকান্ত বলিলেন,—"ও পাপ যেখানে প্রবেশ করেছে, সেখানেই সঙ্গে সঙ্গে নানা রোগ। মস্তিষ্কের ও চক্ষুর পীড়া হবেই হবে। একটী ছেলে। আগে না জানিয়া ইংরাজী অভ্যাস করিতে দিয়া বড়ই অন্যায় হইয়াছে। এখন আর হাত নাই।"

গঙ্গাগোবিন্দ জিজ্ঞাসিলেন,—"কেন, রুদ্রকান্ত বাবুরও মস্তিষ্কের পীড়া জন্মিয়াছে নাকি?"

বরদাকান্ত উত্তর দিলেন,—"সে কথা কেন জিজ্ঞাসা করেন। বাবাজি মাথা ও চক্ষু লইয়া সমস্ত দিন কাতর।"

গঙ্গাগোবিন্দ সমস্তই বুঝিলেন; মস্তিষ্কের পীড়াটা কেবল নেশার ঘোর। চক্ষুর ব্যাধি কেবল চসমা ব্যবহারের সখ। সে কথা গোপন করিয়া কহিলেন,—"তবে তো বড় দুঃখের বিষয়! একটী সন্তান, অতুল বিষয়। অনায়াসে নিশ্চিন্ত থাকিয়া জীবিকা যাপন করিবেন। এ দৈব-বিড়ম্বনা বড় যাতনা। সকলই বিধাতার ইচ্ছা।"

বরদাকান্ত পরম ভক্তের ন্যায় কহিলেন,—"ভগবান্—তুমি সকলই করিতে পার।"

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন,—"বিশেষ যত্ন রাখিবেন।"

বরদাকান্ত কহিলেন,—"যত্নের কোনই ত্রুটি নাই।"

গঙ্গাগোবিন্দ কহিলেন,—"আপনার কুবেরের ভাণ্ডার। এক মাত্র সন্তানের ব্যাধি-শান্তির নিমিত্ত আপনার যত্নের ত্রুটি হওয়া কদাচ সম্ভব নহে। তবে এরূপ পীড়ায় অর্থ ব্যয় ছাড়া আরও কিছু সাবধানতা আবশ্যক।"

বরদাকান্ত ঔৎসক্য সহকারে জিজ্ঞাসিলেন,—"কি রকম?"

"গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন,—"যৌবনে মনুষ্যশরীরে কতগুলি দোষ জন্মে। সেই দোষগুলি যাহাতে কম হয়, তাহার আবশ্যক।'

বরদাকান্ত দন্তে রসনা কাটিয়া কহিলেন,—"রাধামাধব! বাবাজিউর শরীরে কোনই দোষ নাই। তবে যদি কখন কিছু শুনিতে পান, সে অতি সামান্য। যৌবনে নিতান্ত সাধু ব্যক্তিরও তাহা থাকেই থাকে। সে জন্য পীড়ার কোন হ্রাস বৃদ্ধি হয় না।"

গঙ্গাগোবিন্দ মনে মনে বলিলেন,—"তোমার মাথা।" প্রকাশ্যে বলিলেন,—"এমন দোষও শুনা যায়, যাহা কোন ক্রমেই সামান্য বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না।"

বরদাকান্ত কুপিত স্বরে বলিলেন,—"মুখোপাধ্যায় মহাশয়? রুদ্র আমার সচ্চরিত্রের একশেষ। আপনি যদি তার বিরুদ্ধে কখন কিছু শুনে থাকেন, নিশ্চয় জানবেন সেটা ভুল।"

গঙ্গাগোবিন্দ গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"এই যে সম্প্রতি, বিমলার ব্যাপার শুনা যাইতেছে, এটীও কি ভুল?"

বরদাকান্ত কিছু থতমত খাইয়া বলিলেন,—"সেটা জনরব মাত্র।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় কহিলেন,—"চখে দেখা বিষয় যেমন কদাচ অবিশ্বাস করা যায়

না, তেমনই এ ব্যাপারের এমন প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে তাহা কদাচ অবিশ্বাস করা যেতে পারে না। আপনি হাজার বলুন, তথাপি এ আমার নিশ্চয় বিশ্বাস যে, রামকৃষ্ণ ও রুদ্রকান্তই এই ভয়ানক কাণ্ডের মূল।"

বরদাকান্ত একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"এ আপনার অন্যায় কথা। এমন বিশ্বাস হলে কি করা যেতে পারে।"

গঙ্গাগোবিন্দ কহিলেন,—"করা সবই যেতে পারে। আপনি একটু মনোযোগী হলে সকলই হয়। আপনার উৎসাহ না পাইলে, রুদ্রকান্তের এমন সাহস হয় কি?"

বরদাকান্ত চটিয়া বলিলেন,—"আপনি আমায় কি করিতে বলেন? বালক যদি একটা মন্দ কাজ করেই থাকে, তাই বলিয়া কি তাকে মেরে ফেলা বিধি?"

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন,—"পিতা মাতার কাছে সন্তান চিরদিন বালক। আপনার বালক সংসারে যার-পর নাই দৌরাত্ম্য করিবে, আপনি বালক বলিয়া সমস্তই উপেক্ষা করিবেন; কিন্তু লোকে তাহা সহ্য করিবে কেন? অবশ্যই তাহার প্রতিবিধান করা আবশ্যক। আপনাকে বলিয়া যদি তাহার উপায় না হয়, তাহা হইলে অগত্যা অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।"

বরদাকান্ত যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"আমার ছেলে যা খুসি করিয়াছে তাহাতে লোকের যা ক্ষমতা থাকে করে যেন। কাহারও পাঁচীরে আমার একচালা নয়। আমি কাকেও ভয় করি না।"

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন,—"কারও পাঁচীরে আপনার একচালা নয় সত্য, এবং কাকেও আপনি ভয় করেন না তাও যথার্থ। কিন্তু রায় মহাশয়! অধর্ম্ম কার্য্য কদিন চাপা রাখিবেন? পাপের ফল ভুগিতেই হইবে। আমি আপনাকে বলিতেছি, আপনি সাবধান হউন; পুত্রকে সাবধান করুন্ এবং বিমলা কোথায় আছে বলিয়া দিউন।"

বরদাকান্ত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন—"আপনি কি আমাকে ভয় দেখাতে এসেছেন নাকি? সাহস তো মন্দ নয়।"

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন,—সাহসের কোন কথা নাই। আপনাকে ভয় দেখাতেও আমার আসা নয়। ভাল ভেবেই আপনাকে বলিতে এসেছি। আপনি প্রবীণ। ভবিয়াছিলাম, আপনি এ সকল শুনিলে অবশ্যই কোন সদ্যুক্তি হইবে। বুঝিলাম, তাহা হইবে না। আমার অপরাধ কি? প্রকৃত কথা বলিয়া যাই। রুদ্রকান্ত কৃত যাবতীয় দুষ্কৃতি লোকে এতদিন সহ্য করিয়াছে। কিন্তু এবারকার এ কার্য্য কেহ সহ্য করিবে না। জানিবেন, এজন্য প্রাণপণ চেষ্টা হইবে।"

বরদাকান্ত বলিলেন,—"আপনি যান, তার তদ্বির করুনগে। সাহসের কথাও মন্দ নয়।"

বরদাকান্ত রায় সে স্থান ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। ক্রোধে তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইল। দেহ কাঁপিতে লাগিল। আবার বলিলেন,—"আস্পর্দ্ধা কম নয়। লোকসব বড় বাড়িয়ে তুলেছে। এর প্রতি বিধান না কল্লে নয়।"

সম্পত্তিশালী, দুর্দ্দান্ত ও দুর্বিনীত ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গেলেও সে ভাবিয়া থাকে যে, তাহাকে গালি দেওয়া হইল। যাহার মত ও অভিপ্রায় নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন ও পরিচালিত হইয়া থাকে, সে কখন ঘটনাক্রমে তাহার অভিপ্রায়ের অন্যথা বা প্রতিবাদ হইতে দেখিলে যৎপরোনাস্তি ক্ষুণ্ণ হয় ও মর্ম্মান্তিক যাতনা পায়। অভ্যাসের দোষেই এরূপ ঘটিয়া

থাকে। এই জন্যই বরদাকান্ত মনে করিতে লাগিলেন যে, গঙ্গাগোবিন্দ প্রতি বাক্যে তাঁহাকে অযথা অপমানিত করিলেন। এ সিদ্ধান্ত মনে হইয়া তাঁহার আরও যাতনা হইল। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যেমন করিয়া হউক, এ অপমানের প্রতিশোধ দিতে হইবে। দমন না করিলে স্পর্দ্ধা আরও বাড়িয়া উঠিবে।

গঙ্গাগোবিন্দ দেখিলেন, বরদাকান্ত নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছেন। তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা হওয়া অসম্ভব বলিলেন,—"মহাশয় আমি এক্ষণে বিদায় হই।"

বরদাকান্ত সে কথার কোনও উত্তর দিলেন না। গঙ্গাগোবিন্দ বিরক্ত, দুঃখিত ও বিমর্ষ হইয়া প্রস্থান করিলেন।

যোগেশের সহিত বাদানুবাদ কালে গঙ্গাগোবিন্দ হতাশভাবের কথা বলিয়াছিলেন এবং একবার বরদাকান্তকে এই সকল কথা জানাইয়া অরণ্যে রোদন করিবেন মনে করিয়াছিলেন। বরং সে সময় যোগেশ পিতাকে সাবধানতাসহ বরদাকান্তের সহিত কথা কহিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। গঙ্গাগোবিন্দ বড়ই নীরিহ ব্যক্তি কার্য্যক্ষেত্রে তিনি বাধ্য হইয়া বরদাকান্তকে দুই একটা অপ্রিয় কথা বলিয়া ফেলিলেন। বুড়া বাস্তবিকই প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইয়াছে। (নিরীহ মানুষ হঠাৎ রাগিলে বড় বেশী রাগিয়া থাকে।)

যখন গঙ্গাগোবিন্দ বাটী ফিরিলেন, তখন রাত্রি অনেক। তাঁহার মনের অবস্থা বড় ভয়ানক। কথঞ্চিৎরূপে আহারাদি শেষ করিয়া গঙ্গাগোবিন্দ শয়ন করিলেন, কিন্তু নিদ্রা আসিল না। কোথায় যোগেশ? কোথায় বিমলা? অত্যাচারী ক্ষমতাবান্ ব্যক্তি নিয়ত অত্যাচার করিবে, তাহা অবাধে সহ্য করিতে হইবে, এ চিন্তা তাঁহার পক্ষে বিষম হইয়া উঠিল। মনুষ্য-মন স্বভাবতঃ স্বাধীনতাপ্রিয়। সেই স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতে ও তদনুযায়ী কার্য্য করিতে মানব নিতান্ত ব্যাকুল। গঙ্গাগোবিন্দ বরদাকান্তের এবংবিধ ন্যায়বিরুদ্ধ ও যুক্তিবিরুদ্ধ প্রভুতায় যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন, আজি হউক বা কালি হউক, বরদাকান্তের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতেই হইবে। যেরূপে হউক, তাহার এ অন্যায় দর্প চূর্ণ করিতেই হইবে। গঙ্গাগোবিন্দের মন এবংবিধ চিন্তা-পরম্পরায় অস্থির হইয়া উঠিল। নিদ্রা আসিল না।

রাত্রি অনেক হইল। তিন প্রহর অতীত। পৃথিবী নিস্তব্ধ, শান্ত ও স্থির। শন্ শন্ শব্দে নৈশ সমীর প্রবাবিত হইতেছে। চন্দ্রদেব মেঘ হইতে মেঘান্তরালে লুকাইতে লুকাইতে সত্বর স্বকার্য্য সাধন করিয়া পলায়ন করিতেছেন। আকাশ, নির্ম্মল ও প্রশান্ত—যেন অনন্ত সমুদ্র। আকাশ হাসিতেছে, তাহার তারা হাসিতেছে, তাহার চন্দ্র হাসিতেছে। এত হাসি কেন হাসে? পৃথিবীর রঙ্গ দেখিয়াই তাহারা সকলে হাসিতেছে। ফলতঃ রাত্রিতে ধরণীর অনেক রঙ্গ। দিনে মানবগণ কার্য্য লইয়া ব্যস্ত হয়, সংসার মহা কোলাহলে পরিপূর্ণ থাকে সত্য, কিন্তু তখন এত রঙ্গ থাকে না। আকাশ, চন্দ্র, তারা রজনীর রঙ্গের চিরন্তন সাক্ষী, সেই জন্য তাহাদের এত হাসি। হাসিতে, উপহাসে বা বিদ্রূপে ধরিত্রীর এ রঙ্গ কমিতেছে না বরং বাড়িতেছে। প্রকৃতি নিস্তব্ধ, শান্ত ও স্থির।

সহসা একি বিপদ? গঙ্গাগোবিন্দের গোশালা, রন্ধনশালা, নিবাসগৃহ সমস্ত এককালে ধূঁধূঁশব্দে জ্বলিয়া উঠিল। এ রাত্রিতে

কে এ বিপদ ঘটাইল! রমণীগণের ভয়বিকলিত আর্ত্তনাদ ও কোলাহল উঠিল। গাভীগণ বিপদব্যঞ্জক স্বরে শব্দ করিতে লাগিল। সন্নিহিত বৃক্ষসমূহস্থিত পক্ষিগণ ঘোর চীৎকার করিয়া উঠিল। কুকুর সকল প্রাণপণে ডাকিতে লাগিল। সর্ব্বোপরি গঙ্গাগোবিন্দ জল জল শব্দে চীৎকার ও পরকীয় সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। বিস্তৃত অগ্নি ধূ ধূ শব্দে জ্বলিতে লাগিল। এক এক জন করিয়া কয়েক জন প্রতিবেশী সমবেত হইল। কিন্তু কেহই কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে গঙ্গাগোবিন্দের ভবন বহ্নি-চর্বিত ভস্মাবশেষ হইয়া ভূমিতলে মিশিয়া গেল।

বলা বাহুল্য, এ বিষম অগ্নিকাণ্ড আপনি ঘটে নাই। সহজেই অনুমান করা যাইতেছে, ইহার মধ্যে অবশ্যই বরদাকান্ত রায়ের হস্ত আছে। অকারণ প্রতিহিংসার গতি এতদপেক্ষা অধিক হইতে পারে না। প্রভুতা ও ক্ষমতাবলে মানুষ এত অন্যায় অত্যাচার করিতে পারে, তাহা বিশ্বাস করা যায় না। যে বিধাতা তুঙ্গশৃঙ্গ হিমাদ্রি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই সেই উপাদানে এই জঘন্য জীবগণের হৃদয় নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আশ্চর্য্য! বরদাকান্ত ও তাঁহার পুত্রের অন্যায় অত্যাচারে একটী নিরীহ ভদ্রপরিবার এককালে উচ্ছিন্ন হইয়া গেল। পাপের কি শাস্তি নাই? দৌরাত্ম্যের কি প্রতিফল নাই?

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

বিমলা।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জাহ্নবী-তীরে।

ঘোর তিমিরা রজনী। জাহ্নবী কুল্ কুল্ শব্দে প্রবাহিতা। প্রকৃতি শান্ত ও নিস্তব্ধ। চতুর্দ্দিক জনশূন্য। বহুদূরে বলরামপুরের জমিদারী কাছারীর দ্বিতল গৃহে যে আলোক জ্বলিতেছে তাহাইই ক্ষীণ ভাতি মাত্র পরিদৃষ্ট হইতেছে।

সুরধুনী-তীরে একখানি নৌকা সংলগ্ন। নৌকায় আরোহী নাই, তথাপি নাবিকগণ প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে, যেন এখনই নৌকা ছাড়িতে হইবে।

ধীরে ধীরে নিশীথিনীর গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া এক যুবক ও যুবতী নৌকা সন্নিধানে আগমন করিলেন। অন্ধকারে তাঁহাদের মূর্ত্তি অদৃশ্য হইলেও, আমরা বলিতে পারি, তাঁহারা উভয়েই দেবকান্তি। উভয়েরই গঠন সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার।

যুবকের এক হস্তে এক ক্ষুদ্র পুঁটুলি, অপর হস্ত সঙ্গিনী সুন্দরী নবীনার বাহু সংলগ্ন।

যুবক নৌকায় আরোহণ করিলেন এবং যেন জগতের একমাত্র সাররত্ন বোধে, যেন আপনার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর জ্ঞানে, যেন দেবদুর্ল্লভ সম্পত্তি মনে করিয়া অতীব সাবধানতার সহিত সুন্দরীকে নৌকায় উঠাইলেন। উভয়ে নৌকায় দরমাবৃত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মাঝিরা নৌকা ছাড়িয়া দিল। যুবক একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

দেখিতে দেখিতে নৌকা তীর হইতে বহু দূরে গমন করিল এবং তীরবেগে ভাটার স্রোতে ভাসিয়া চলিল।

শোকসংক্ষুব্ধ স্বরে যুবক বলিলেন,—"জন্মভূমি ত্যাগ করিতে হৃদয়ে একটু বেদনা জন্মে।"

যুবতী বলিলেন,—"তোমার সকল ক্লেশের মূলই আমি। অশুভক্ষণে এ ভাগ্যহীনাকে চরণে স্থান দিয়া তুমি ধন্য করিয়াছ; কিন্তু তদবধি নরেন্দ্র, প্রাণেশ্বর, হৃদয়দেবতা তোমার কত ক্লেশই সহ্য করিতে হইতেছে।"

নরেন্দ্র সেই অন্ধকারময় নৌকার মধ্যে রমণীকে বেষ্টন করিয়া বলিলেন—"কেন দেবি, কেন প্রাণেশ্বরি, কেন এরূপ কঠোর বলিতেছ? তোমাকে লাভ করিয়া এ অধম ধন্য হইয়াছে, তোমার মত গুণময়ী দেবীকে জীবনের সঙ্গিনী পাইয়া আমার আনন্দ ও উৎসাহ, আশা ও উত্তম শত গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। মনোরমে, তুমি আমার জীবনের ধ্রুবতারা। তোমার মুখ লক্ষ্য করিয়া আমি কঠোর জীবনসংগ্রামে নিযুক্ত হইয়াছি; তোমাকে সুখী ও বিনোদিত করিতে

পারিব মনে করিয়া আমি সংসার-সমুদ্রে ডুবিয়া আছি। তুমি আমার মঙ্গলময়ী আরাধ্যা দেবী। কেন তুমি আপনাকে সকল অশুভের মূল বলিয়া জ্ঞান করিতেছ মনোরমা?"

মনোরমা বলিলেন,—"তুমি আমাকে এতই কৃপা কর যে, আমার জন্য তোমার যে সকল প্রত্যক্ষ অনিষ্ট ও অসুবিধা হইতেছে, তাহাও তুমি দেখিতে পাইতেছ না। মনে করিয়া দেখ নরেন্দ্র, আমার জন্য চিরদিন তুমি কত কষ্টই না ভোগ করিয়া আসিতেছ! কাণপুরে আমার পিতা সামান্য কর্ম্ম করিতেন, অতি ক্লেশে আমাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। তুমিও তখন কাণপুরে এক মহলার বাসায় থাকিয়া লেখা পড়া করিতে। আমার পিতা তোমাকে ভালরূপ জানিতেন এবং তোমার রূপ গুণের সতত প্রশংসা করিতেন। তখন আমার বয়স আট বৎসর; তোমার বয়স তখন ষোল বৎসর। সেই সময় হইতে তুমি আমাকে দয়া কর; সেই সময় হইতেই এ দাসী তোমার চরণে চির-বিক্রীতা।"

নরেন্দ্র বলিলেন,—"কি মধুর! মনোরমা, তোমার সে বাল্যকালের সমস্ত কথাবার্ত্তা ও ব্যবহার আমি যেন এখনও চক্ষুর সমক্ষে দেখিতেছি। তখনই তোমাকে দেবী বলিয়া জানিয়াছি, এখন বুঝিয়াছি, দেবলোকেও এমন দেবী আর নাই।"

মনোরমা বলিলেন,—"আমার প্রতি তোমার চিরদিনই এইরূপ দয়া। যাহা হউক, যদি সেই বাল্যকালের কথা তোমার এখন এত সুমিষ্ট বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে আরও বলি।"

নরেন্দ্র বলিলেন,—"বল। তোমার সকল কথাই সুমিষ্ট; তোমার মুখে সেই মধুর অতীত ইতিহাস যেন মধুমাখা বলিয়া বোধ হইতেছে।"

মনোরমা বলিতেছেন,—"তাহার পর তিন চারি বৎসর বড় সুখে কাটিয়া গেল। তোমাকে নিত্য দেখিতে পাইতাম, কতক্ষণে তুমি আমাদের বাসায় আসিবে, অনুক্ষণ তাহার প্রতীক্ষা করিতাম। তুমি আসিলে বোধ হইত, সংসারের সকল আনন্দ, সকল সুখ যেন তোমার সঙ্গে সঙ্গে আসিল। যত দুঃখ জ্বালা, যত দুশ্চিন্তা সকলই যেন তোমার ভয়ে দূরে পলায়ন করিল। সে সময়ের সেই সুখের অবস্থা কোন সম্রাটও কখন ভোগ করিতে পারেন কিনা সন্দেহ।"

নরেন্দ্র বলিলেন,—"তারপর বল। বড় মিষ্ট কথা।"

মনোরমা বলিতে লাগিলেন,—"জীবনের চারি বৎসর এইরূপ পরমানন্দে কাটিয়া গেল। তাহার পর সহসা আমার দরিদ্র পিতা স্বর্গলাভ করিলেন। সেই দুঃখের দিনের কথা মনে হইলে প্রাণ ফাটিয়া যায়।"

নরেন্দ্র বলিলেন,—"প্রাণেশ্বরি, আর সে কথায় কাজ নাই।"

মনোরমা বলিলেন,—"না নরেন্দ্র, অতীত জীবনের অতঃপর যে কাহিনীর বর্ণনা করিব তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ও তোমার অনন্ত করুণা ও অসীম মহত্ত্বের পরিচায়ক। পিতার মৃত্যুর পর আমার দুঃখিনী জননী শয্যা গ্রহণ করিলেন। আমাদের গ্রাসাচ্ছাদনের কোনও উপায় ছিল না; তাহার উপর মাতৃদেবী কঠিন পীড়ায় পীড়িতা হইলেন। তুমি সেই সময় করুণাময় দেবতার ন্যায় আমাদের জন্য কিনা করিয়াছ? তুমি আমাদের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াছ, আপনার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিয়ত আমাদের পরিচর্য্যা করিয়াছ, আহার নিদ্রা বিস্মৃত হইয়া আমাদের হিতচিন্তায় সময়পাত করিয়াছ। মাতৃদেবীর পীড়া ক্রমেই গুরুতর হইয়া উঠিল। আমার

পিতা জানিতেন, তুমি আমাদের পাল্টা ঘর। তিনি কত দিন আমার জননীর নিকট সে কথা বলিয়াছিলেন এবং সময় মত তোমার চরণে আমাকে সম্প্রদান করিবেন, এই মধুর আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন; এক্ষণে মৃত্যু নিকট হইয়াছে বুঝিয়া মাতা আমাকে দাসী-রূপে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত তোমাকে অনুরোধ করিলেন। তুমি কৃপাপরবশ হইয়া এ দীন-হীনাকে চরণে স্থান দিতে সম্মত হইলে। যথা-সম্ভব সুপ্রণালীক্রমে আমাদের বিবাহ হইয়া গেল।"

নরেন্দ্র বলিলেন—"আহা! সে দিন জীবনের কি শুভদিন। যিনি আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন, তিনি সেই দিন ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুসারে, পবিত্র প্রণালীক্রমে আমার হইলেন।"

মনোরমা বলিলেন,—"কিন্তু সে দিন হইতেই তোমার জীবনে ভয়ানক দুর্দ্দিনের সূত্র পাত হইল। আমি তখন তেরো বছরের। তুমি পিতৃমাতৃহীন দরিদ্র ব্যক্তি—পরের বাসায় থাকিয়া লেখাপড়া করিতে। আমি তোমার গলগ্রহ হইলাম। কিছুদিন পরেই মাতৃদেবী পিতৃদেবের অনুসরণ করিলেন আমাকে লইয়া পরের বাসায় থাকা সম্ভবপর না হওয়ায় তুমি আমার মাতার অধিকৃত বাসায় আসিলে। আমি পারি বা না পারি, আমার সেবা তোমার সন্তোষজনক হইল, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য।"

নরেন্দ্র বলিলেন,—"তোমার সেবার কথা কেন বলিতেছ? তুমি যে আমার স্থায় অধম-জনের হৃদয়ে অন্তরের ভালবাসা অজস্র ধারায় ঢালিতে লাগিলে, তাহাতে আমি এই নরদেহে স্বর্গসুখের অধিকারী হইলাম।"

মনোরমা বলিতে লাগিলেন,—"কাণপুরে তোমার একটী কর্ম্ম জুটিল; তাহাতে আমাদের বেশ স্বচ্ছন্দে দিন চলিতে লাগিল। সহসা তুমি সংবাদ পাইলে তোমার জন্মভূমির স্কুলের হেড মাষ্টারী খালি হইয়াছে। অনেক দিনাবধি একবার স্বদেশে আসিতে তোমার বড়ই বাসনা হইয়াছিল। তুমি সেই পদের প্রার্থী হইলে; তোমার আবেদন গ্রাহ্য হইল, এ চরণাশ্রিত দাসীকে সঙ্গে লইয়া পঞ্চাশ টাকা বেতনে হেডমাষ্টার হইয়া তুমি দেশে আসিলে।"

নরেন্দ্র বলিলেন—"বড় আনন্দেই দেশে আসিয়াছিলাম সন্দেহ নাই। ভাগ্যবলে তোমার মত ভূর্লোক-দুর্ল্লভ রত্ন লাভ করিয়াছি। এ রত্ন আত্মীয় কুটুম্ব সমাজে দেখাইবার জন্য প্রাণ বড় ব্যাকুল ছিল।"

মনোরমা বলিলেন,—কিন্তু যাহাকে দয়া করিয়া তুমি ভূর্লোক দুর্ল্লভ রত্ন বলিতেছ, সেই তোমার কাল হইল। এখানকার লোকে নানা নিন্দার কথা ক্রমে ক্রমে প্রচার করিতে লাগিল। কেহ বলিল, 'ইহার সঙ্গিনী নারী বিবাহিতা পত্নী নহে।' কেহ বলিতে থাকিল, "এ নারীর জন্মবৃত্তান্ত বড়ই নিন্দনীয়।' কেহ বলিতে লাগিল, "এ অভাগী হিন্দুর মেয়ে নহে।' আরও কত কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইতে লাগিল। তোমার দুর্নামের সীমা থাকিল না, ক্রমে তোমার সহিত লোক আহার ব্যব-হার বন্ধ করিল। আমাদের শাস্ত্রসম্মত বিবা-হের কোন প্রমাণ দিতে পারা গেল না; আমার পিতামাতার বিশেষ পরিচয়ও তুমি দিতে পারিলেন না। কাজেই লোকের সিদ্ধান্ত বলবান্ হইল। ক্রমে লোকে তোমাকে অতি দুর্নীতিপরায়ণ চরিত্রহীন পুরুষ বলিয়া স্থির করিল। শেষে দশের চেষ্টায় তোমার চাকরীও গেল।"

নরেন্দ্র বলিলেন,—"তাহা যাউক; আমি

সে জন্য এক বিন্দুও দুঃখিত নহি। আমি ভগবানে পূর্ণ বিশ্বাস করি। তিনি অবশ্যই স্থানান্তরে আমাদের জীবিকার উপায় করিয়া দিবেন। যে দেবীর নামে লোকে মিথ্যা কথা প্রচার করিয়াছে, আমি জানি, তিনি সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক। লোকের কথায় আমার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।"

মনোরমা বলিলেন,—"তাহার পর হাতে যে যৎসামান্য টাকা ছিল, তাহা নিঃশেষ হইয়া গেল। অধিকন্তু জমিদারপুত্র দুর্বৃত্ত রুদ্রকান্ত আমাদিগের বিবিধ কলঙ্ক-কাহিনী শুনিয়া কৌশলে এক দিন আমাকে দর্শন করিল। তাহার পর হইতে আমাদের দুর্ভাগ্য পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে আমাদের উপর অশেষ অত্যাচার আরম্ভ করিল। এক্ষণে জীবিকার চেষ্টায় অধিকন্তু রুদ্রকান্তের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ বাসনায় আমাদিগকে দেশত্যাগী হইতে হইল।"

নরেন্দ্র বলিলেন,—"তা হউক। রুদ্রকান্ত পাপিষ্ঠ তাহার শাস্তি ভগবান্ অবশ্যই সমুচিত সময়ে যথোপযুক্ত রূপে প্রদান করিবেন। আর স্থানীয় লোকেরা অবশ্যই কোন না কোন দিন আপনাদিগের দুর্ব্ব্যবহারের জন্য অনুতাপ করিবে।"

মনোরমা বলিলেন—"অসম্ভব নহে। কিন্তু আমি যাহা বলিতেছিলাম, তাহা সত্য কি না বল। তোমার যত দুর্গতি সে সকলই এ অভাগিনীর জন্য। তোমার ন্যায় সর্ব্বগুণময় পুরুষকে একটা সামান্যা নারীর জন্য অশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে, এ কথা যখন মনে হয়, তখন এ প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে বাসনা হয়।"

নরেন্দ্র বলিলেন,—"ছি মনোরমে, এমন কথা মুখেও আনিও না। তোমার জন্য আমার কষ্ট বা অসুবিধা যদি হইয়া থাকে, তাহাতে কাতরতার কোনই কারণ নাই। তুমি আমার জীবনের মঙ্গলময়ী দেবী। তোমার জন্য অসাধ্যসাধন করিতে আমি বাধ্য। সামান্য লোকের সামান্য বিদ্বেষ বা বিসদৃশ ব্যবহার আমাকে কখনই অবসন্ন করিতে পারিবে না। দয়াময় ভগবানের কৃপায় সকলই শুভ হইবে।"

মনোরমা বলিলেন,—"এক্ষণে আমরা নিঃসম্বল। তোমার হাতে মোটে সাড়ে তিন টাকা আছে। তাহার এক টাকা এখনই মাঝিদের দিতে হইবে, তাহার পর কি হইবে তাহা বিধাতা জানেন।"

নরেন্দ্র বলিলেন,—"অতি উত্তম কথা মনোরমে! তাহার পর কি হইবে, তাহা বিধাতা জানেন।"

অচিরে উষার সম্মোহন আলোক এই বিষণ্ণ দম্পতিকে বিনোদিত করিতে লাগিল। পবিত্র সলিলা ভাগীরথী-হৃদয়ে প্রত্যূষ কি মনোহর—কি তৃপ্তিপ্রদ দৃশ্য! সলিলসম্পৃক্ত প্রভাতসমীর চিন্তাক্লিষ্ট প্রণয়িযুগলকে শীতল করিতে লাগিল। সলিলোত্থিত বাষ্পরাশি, হেমন্তকালীন, কুজ্ঝটিকার আকার ধারণ করিয়া দিগ্বলয়কে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। নৌকা সেই তরল তিমির বিচ্ছিন্ন করিয়া নাচিতে নাচিতে চলিতে লাগিল। অচিরে ভগবান্ ভাস্করের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি পূর্ব্বাকাশের নিম্নভাগে পরিদৃষ্ট হইল।

নরেন্দ্রনাথ ও মনোরমাকে বহন করিয়া নৌকা প্রাতঃকালে আসিয়া হরিপাড়ার ঘাটে লাগিল। মাঝিদের ভাড়া মিটাইয়া দিয়া, প্রণয়িযুগল নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন।

সহসা মনোরমা দক্ষিণপার্শ্বে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন—"দেখ দেখ নরেন্দ্র ঐ

বালির উপর একটী ভদ্র লোকের মৃতদেহ—লোকটি যেন শয়ন করিয়া রহিয়াছে!"

নরেন্দ্র কিয়ৎকাল দেখিয়া বলিলেন—"মৃতদেহ বটে। ভদ্রলোকও বটে। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে মৃত নয়। বস্ত্রাদিতে রক্ত দেখিতেছি। অবশ্য ইহার মধ্যে কোন রহস্য আছে। দাঁড়াও, নিকটে গিয়া ভাল করিয়া দেখি।"

এই বলিয়া নরেন্দ্রনাথ সেই দেহ-সন্নিধানে গমন করিলেন। মনোরমাও সঙ্গে চলিলেন। নিপতিত নরদেহের বসন বস্ত্র সমাচ্ছন্ন। নরেন্দ্র তাহা নির্ম্মুক্ত করিলেন না; অন্য প্রকারে পরীক্ষা করিয়া কহিলেন,—"দেহ মৃত নয়, কিন্তু মৃত-প্রায়।"

মনোরমা সবিস্ময়ে কহিলেন,—"বল কি?"

"দেখিতেছি দেহে এখনও জীবন আছে। অযত্নে থাকিলে এখনই মরিয়া যাইবে। যত্ন করিলে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে।"

মনোরমা সোদ্বেগে কহিলেন,—"নরেন; তবে উপায় কর।"

"দেখা যাউক।"

তাঁহারা অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জনরব।

কাহার জন্য কে কাঁদে? তুমি অনাথা! পতিবিয়োগবিধুরা, অন্নাভাবে দ্বারে দ্বারে রোরুদ্যমানা কিন্তু বল দেখি, তোমার দুঃখে পৃথিবীর কয়টা লোক কাঁদে? যে তোমায় দেখিল, হয়তো সে একবার আহা বলিল, এক মুষ্টি তণ্ডুল দিল, বা যৎসামান্য সাহায্য করিল! জগতে সহানুভূতি-স্রোত এই পর্য্যন্ত প্রধাবিত। কিন্তু বল দেখি, কে তোমার হৃদয়ের সহিত নিজ হৃদয় মিশাইয়া কাঁদিল? বল দেখি, কে তোমার দুঃখ নিজদুঃখ বিবেচনায় তাহা বিদূরিত করিতে সচেষ্ট হইল? তোমার ক্লেশরাশিতে কাহার হৃদয়গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইল? এরূপ কাঁদিবার লোক এ জগতে বড় কম। যদি এই পাপ, স্বার্থ, লোভ, দুরাকাঙ্ক্ষাময় পৃথ্বীরাজ্যে তদ্বিধ লোক দেখিয়া থাক, নিশ্চয় জানিও তিনি দেবতা, তিনি এ জগতের লোক নহেন। সাধারণ উপাদানে তাঁহার হৃদয় বিনির্ম্মিত নহে। তিনিই সাধু, উদার, মহৎ ও উপাস্য।

কাহার জন্য কে কাঁদে? আজি আমি প্রাণাধিক প্রিয়তম আত্মীয় বিয়োগে উন্মত্তবৎ অধীরতা সহকারে ধূলি ধূসরিত-কায়ে চীৎকার করিয়া মেদিনী বিদীর্ণ করিতেছি, সংসার যন্ত্রণার আলয় বলিয়া বোধ করিতেছি, চতুর্দ্দিক শূন্য ও নিরানন্দময় দেখিতেছি; কিন্তু ঐ দেখ আমার পার্শ্বস্থ প্রতিবেশীর নবকুমার হইয়াছে। তাঁহার আনন্দের সীমা নাই। তিনি বাটীতে নহবৎ উঠাইয়াছেন, আনন্দ-ধ্বনিতে তাঁহার বাটী তোলপাড় হইতেছে। কাহার জন্য কে কাঁদে? আবার ঐ দেখ, আমার শোক বিচলিত চীৎকারে তাঁহার আনন্দের বিঘ্ন জন্মিতেছে বলিয়া, তাঁহার লোক আসিয়া আমাকে কাঁদিতে বারণ করিতেছে। হায়! এসংসারে কাহার জন্য কে কাঁদে?

কাঁদিলে কি কাঁদার সীমা হইবে? মানুষ কত কাঁদিবে? প্রত্যেকের জন্য যদি প্রত্যেককে কাঁদিতে হয়, তবে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও সংসার ক্রন্দনের বিরাম পাইবে না। মানুষকে

অহর্নিশ কাঁদিতে হইবে। সংসার ক্রন্দন-রোলে পরিপূরিত হইয়া উঠিবে। কাঁদিয়া পার পায় না, কাহার জন্য কেহ কাঁদে না।

বিমলার বিপদের সীমা নাই, যোগেশের অবস্থা তদপেক্ষাও শোচনীয়, গঙ্গাগোবিন্দ বিপদ-বিদলিত। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই যৎপরোনাস্তি বিপদ। কিন্তু তুমি কি বল, যতদিন তাঁহাদের বিপদ বিদূরিত না হয়, যতদিন তাঁহারা পূর্ব্ববৎ আনন্দসাগরে ভাসিয়া না বেড়ান, ততদিন সংসারের সমস্ত লোক অনন্যকর্ম্মা হইয়া তাঁহাদের দুঃখে যোগদান করুক, তাঁহাদের সহিত কাঁদুক, আপনাদিগকেও তাঁহাদিগের ন্যায় বিপদাপন্ন মনে করুক। সাম্যবাদি, যদি তোমার যুক্তিতে এরূপ উপদেশ দেয়, তবে নিশ্চয় জানিও, তোমার উপদেশ কখনই কার্য্যে পরিণত হইবে না। বিমলা প্রভৃতির বিপদ যথেষ্ট হইলেও, সংসার তজ্জন্য আত্মামোদ ত্যাগ করিল না। সংসারে কাহার জন্য কে কাঁদে?

কুৎসার কর্কশকণ্ঠ বিবিধ কাল্পনিককাহিনী কীর্ত্তন করিয়া নরেন্দ্র মনোরমাকে দেশত্যাগী করিল। অপরাধের অনুমাত্র সংস্পর্শ না থাকিলেও, মানব-সমাজ তাঁহাদিগকে পাপপরায়ণের অগ্রগণ্য বলিয়া অবধারণ করিল। তাঁহাদের দুরবস্থায় কেহ সমবেদনা প্রকাশ করিল না। পবিত্র সহানুভূতির নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কেহ তাঁহাদের কাতর হৃদয়ে শান্তিসলিল সেচন করিল না। কাহার দুঃখে কে কাঁদে?

গত রজনীতে নিন্দিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত নরেন্দ্র মনোরমা বলরামপুর ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন। কোথায় তাঁহারা গমন করিয়াছেন, কিরূপ জীবন ভবিষ্যতে তাঁহারা অবলম্বন করিবেন, কতদিনে তাঁহারা স্বগ্রামে পুনরাগমন করিবেন, ইত্যাদি কোন বিষয়ই গ্রামের কাহাকেও তাঁহারা জানান নাই। গ্রামে তাঁহাদের বন্ধু নাই; কোন কথা বলিতে গেলেই অধিকতর পরিহাসাস্পদ হইতে হইবে, ইহা তাঁহারা জানেন।

অদ্য প্রাতে বলরামপুরের ঘোষ বাবুদিগের চণ্ডীমণ্ডপে অনেক লোক বসিয়া তামাক ভস্ম করিতেছেন। আজি যে কোন বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে বা উৎসব কার্য্যে তাঁহারা এস্থলে সমবেত হইয়াছেন এমত নহে। এই চণ্ডীমণ্ডপ গ্রামের পবলিক হল অর্থাৎ সাধারণ অধিষ্ঠান স্থানস্বরূপ। যত কর্ম্মহীন, যত কুৎসাপরায়ণ যত পরছিদ্রান্বেষী, যত তাম্রকূট-সেবী সকলে এ স্থানে নিত্য মিলিত হইয়া থাকেন। প্রত্যুষ হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত এ স্থানে লোক সমারোহ। লোকেরা একবার স্নানাহার করিতে যায়, কাহারও বিশেষ প্রয়োজন থাকিলে একবার গিয়া কাজ সারিয়া আইসে, গভীর রাত্রিতে এই অধিষ্ঠানক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব আলয়ে গিয়া শয়ন করে। বৈকালে তাস পাশাও চলে। অনেক পল্লীগ্রামেই এরূপ এক একটা টাউনহল অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

বলরামপুরের এই টাউন হলে অদ্য প্রাতে মুখোপাধ্যায় মহাশয় আসিয়াছেন। দাদা ঠাকুর দেখা দিয়াছেন, ন' কর্ত্তা উপস্থিত, খুড়া মহাশয় জুটিয়াছেন, আরও অনেকে আসিয়াছেন, এবং ক্রমে আসিতেছেন।

এক যুবা ব্যস্তভাবে সেই মহতী সভায় উপস্থিত হইল। তখন সভায় এ বৎসর ইলিশ মাছের দুষ্প্রাপ্যতা বিষয়ক বাদানুবাদ চলিতেছিল। যুবা সকলের কথায় বাধা দিয়া বলিল,—"কালি মরেছে।"

ন'কর্ত্তা জিজ্ঞাসিলেন,—"কে রে? কেউ মরেছে নাকি?"

যুবা বলিল,—"মরবে কেন? মরলে তো বাঁচাই যেত; এখান থেকে পালিয়েছে।"

দাদাঠাকুর জিজ্ঞাসিলেন,—'কে, বল্ না!"

যুবা বলিল,—"মাষ্টার,—তোমাদের হেড মাষ্টার।"

দাদাঠাকুর জিজ্ঞাসিলেন,—"একা?"

যুবা একটু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—"তাহলে তো ভালই হতো। দুজনেই

ন'কর্ত্তা জিজ্ঞাসিলেন,—"কোথা গেল? কখন গেল?"

যুবা বলিল,—"তা কি জানি?"

দাদাঠাকুর বলিলেন,—"ছুঁড়িটা গেল কেন? সে যে মেয়ে মানুষের টেক্কা রে বেটা।"

যুবা বলিল,—'তা আমার উপর রাগ করছ কেন? আমি তো তাদের যেতে বলিনি?"

দাদাঠাকুর বলিলেন,—"রাগ করি সাধে? সকল আশায় ছাই পড়িল যে। আমি ঠিক জান্‌তাম, একদিন না একদিন তাকে হাত করব। অনেকটা সুবিধা করে এনেছিলাম।"

ন'কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি রকম?'

দাদাঠাকুর বলিলেন,—"একদিন ঘাটের পথে ছুঁড়িকে একটা ঠাট্টা করেছিলাম।"

ভজহরি বলিল,—"তার পর?

দাদাঠাকুর বলিলেন,—"তার পর সে কোন কথা না বলে চলে গেল।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—"এতে আর তোমার সুবিধা করা হল কই?"

দাদাঠাকুর বলিলেন,—"বুঝলে না? যদি মন না হতো, তাহলে কথটা নিয়ে একটা গোল করত।"

যুবা বলিল,—"দাদাঠাকুর, সে হয় তো তোমার কথা শুনতেই পায় নাই। সুবিধার কথা যদি বল্লে, তাহা হইলে আমি বরং অনেকটা ঠিক করেছিলেম বটে। একদিন বলেছিলেম, মাটিতে পা ফেলে হেঁটো না, পা ফেটে রক্ত বেরুবে। সুন্দরী কোনদিকে না চেয়ে গায়ের কাপড় নামিয়ে দিয়ে পা দুখানিও ঢেকে ফেল্লে।"

দাদাঠাকুর বলিলেন,—"সে কিছু নয়। আমারই একটু আশা ছিল।"

ভজহরি বলিল,—"এখন সকল আশায় ছাই। গেল কোথা?"

যুবা বলিল,—"তা কি ছাই জানি? তাহলে এখনই সেখানে ছুটি।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—"অনেকেরই তার উপর লোভ ছিল। রুদ্রকান্ত বাবুতো পাগল হইয়াছিলেন। কিন্তু সকলের মুখে ছাই দিয়া সরিয়া পড়িল। নরেন মাষ্টারের খুব কপাল জোর!"

দাদাঠাকুর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"নরো,ছোঁড়ার খুব কপাল জোরই বটে! আমার জালে পড়েও ফস্‌কে গেল হে!"

ভজহরি বলিল,—যাই বলো, বাঙ্গালীর মেয়ে বোধ হয় না।"

ন'কর্ত্তা বলিলেন,—কখন না। বোধ হয় মোগল, না হয় ইহুদী হবে।"

দাদাঠাকুর বলিলেন,—"বেশ্যার মেয়ে তার ভুল নাই। নরেন মাষ্টার বলে, আমার পরিবার। কপালে আগুন!"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—"এমন পরিবার যেন কখন কাহারও না হয়। বেশ্যার মেয়ে, আবার পরিবার!"

ভজহরি বলিল,—"নিশ্চয়ই অনেক হাত ঘুরে তবে নরেন মাষ্টারের হাতে পড়েছে।"

ন'কর্ত্তা বলিলেন,—"কেবল আমাদের গ্রামে কারও ভোগে লাগল না।"

দাদাঠাকুর বলিলেন,—"কি আর বল্‌বো? আমার হাতে আসে আসে হয়েছিল। সবই মাটী।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—"বড় সরে পড়েছে। নহিলে রুদ্রকান্ত বাবু একটা কাণ্ড বাধাইত।"

খুড়া মহাশয় এতক্ষণ কথা কহেন নাই। তিনি বলিলেন,—"বাবা সে বড় শক্ত মেয়ে, আমি তা বেশ জানি। তোমরা কেহই তাহার কিছু করিতে পারিতে না। আমি জানি কাণপুরে তার মা ছিল, মাগী একটা পশ্চিমে নবাবের নজরে পড়েছিল। সেই নবাবের এই মেয়ে। বিবাহও নয়, পরিবারও নয়, নরেন মাষ্টার ভোগা দিয়ে নিয়ে পালিয়ে এসেছে। ছুঁড়ি আর থাক্‌তে চায় না। নিত্য মাষ্টারের সঙ্গে ঝগড়া।। তাই দায়ে পড়ে নরেন তাকে নিয়ে সরলো।"

ভজহরি বলিল,—"এই কথাই ঠিক। খুড়া মহাশয়,—খাঁটি খবর না জেনে কোন কথা বলবার লোক নন। তা হলে মুসলমানের মেয়ে? এখন কাণপুরেই ফিরে গেল, কেমন?"

খুড়া মহাশয় বলিলেন,—"তাই তো বোধ হয়।"

দাদাঠাকুর বলিলেন,—"কাণপুর কাশীরও ওদিক—তাই তো—দেখি কি হয়?"

যুবা বলিল,—"আমি আজি রাতে পশ্চিম যাব।"

সেদিন সে মহাসভায় আর কোন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল না। মনোরমা চলিয়া যাওয়ায় সকলেই দুঃখিত হইলেন। কিন্তু সে সুন্দরী যে সতী শিরোমণি তদ্বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিল না।

—*—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বালিকা।

শ্যামনগরের প্রান্তভাগে এক প্রশস্ত ভবনের একতম প্রকোষ্ঠে সরমা ও আর একটি বালিকা বসিয়া রহিয়াছেন। সরমা অধ্যয়নে নিযুক্তা। তাঁহার হস্তে 'বীরাঙ্গনা কাব্য'। সরমা পড়িতেছেন, সময়ে সময়ে উদ্বিগ্নের ন্যায়, যেন কি কোথায় হারাইয়াছেন ভাবিয়া চারিদিকে চাহিতেছেন আবার পড়িতেছেন।

সরমা সুন্দরী। তাঁহার বয়স অষ্টাদশ বর্ষ। দেহের গঠন অতি পরিপাটী। বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, অতি স্নিগ্ধ ও মনোরম! লোচনযুগল নিবিড় কৃষ্ণ ও আয়ত। সরমা নিতান্ত কৃশাঙ্গী নহেন বা নিতান্ত স্থূলাও নহেন। তাঁহার দেহ হাড়ে মাসে জড়িত।

সরমার নিকটে যে বালিকা বসিয়া আছে, সে তাঁহার স্বামী কেশবের সোদরা। তাহার বয়স অনুমান সাত বর্ষ। বালিকা একটী বাক্স লইয়া বসিয়া রহিয়াছে। বাক্স মধ্যে নানাবিধ পুত্তলী। বালিকা কাহাকে পুত্র, কাহাকে কন্যা, কাহাকে পৌত্র, কাহাকে দৌহিত্র রূপে সাজাইয়া সংসারের সমস্ত সাধ মিটাইতেছে। কখন বা কন্যা বিবাহযোগ্যা হইল দেখিয়া তাহার বিবাহের নিমিত্ত ঘোর চিন্তা করিতেছে, কখন বা পুত্রবধূ সুন্দরী হয় নাই বলিয়া দুঃখিত হইতেছে। বালিকার বাক্স মধ্যে প্রতি অর্দ্ধ ঘণ্টা, বা তদপেক্ষা অল্প সময়ে কত কত বৎসর অতিবাহিত হইতেছে ও তদনুযায়ী বহুবিধ কার্য্য সমস্তও সম্পন্ন হইতেছে।

সন্ধ্যার আর বিলম্ব নাই দেখিয়া, সরমা

পুস্তক রাখিলেন। বালিকাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"হিমু! কি হচ্চে?"

হেমাঙ্গিনী তখন নাতিনীর বিবাহে লোক জন খাওয়াইতে বড় ব্যস্ত। সরমার কথা তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল না।

সরমা আবার কহিলেন—"হিমু, আপন মনে হাস্‌ছিস, বক্‌ছিস, হাত নাড়্‌ছিস, তুই পাগল হলি নাকি?"

হিমু এবারেও সরমার কথা শুনিল না। সরমা ধীরে ধীরে হাত বাড়াইয়া হেমাঙ্গিনীর একটী পুত্তলী অপহরণ করিলেন। যেটী চুরি করিলেন, সেটি হেমাঙ্গিনীর ছেলে। হেমাঙ্গিনী তখন তাহা জানিতে পারিল না। ক্ষণপরে অপহৃত পুত্রের প্রয়োজন হইল। হেমাঙ্গিনী চারিদিকে সন্ধান করিল, পাইল না। তখন দুঃখিত স্বরে সরমাকে জিজ্ঞাসিল,—"বৌদিদি! আমার ছেলে কি হলো?"

বধূ সরমা হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন,—"হিমু! তোমার কি লুকিয়ে বিয়ে হয়েছিল?"

বালিকা এ পরিহাসের মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল না। বলিল,—"বল আমার ছেলে কোথায়?"

সরমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"আগে তোমার বর হউক, তার পর তবে ছেলে।"

হেমাঙ্গিনী কুপিত ভাবে বলিল—"যাও।"

সরমা বলিলেন,—"কেন, বর কি চাও না?"

হেমাঙ্গিনী বলিল,—"যাও, য়্যা, আমার ছেলে কোথায় বল।"

পরিহাসরসিকা সরমা হেমাঙ্গিনীর পুত্তলী দিলেন। বলিলেন,—"বিয়ে হলে আর তো খেলা হবে না। এখন যত পারিস খেলে নে"—

হেমাঙ্গিনী বলিল,—"তবে বিয়ে হবে না।"

"বিয়ে হবে না, তবে কি আইবুড় থাক্‌বি?"

হেমাঙ্গিনী ঈষৎ হাস্য করিল।

সরমা আবার বলিলেন,—"তবে সেই কথাই ভাল। আজ সকলকে বলিব এখনই যে, হিমুর বিবাহে দরকার নাই।"

সরমার এ কি প্রকৃতি! তাঁহার চিরপরিচিতা পরমাত্মীয়া বিমলার বিপদ সংবাদ তাঁহার অগোচর নাই। অন্য বিপদসমস্তের বার্ত্তা অদ্যাপি নানাবিধ কারণে তাঁহার কর্ণগোচর হয় নাই সত্য; না হউক—তথাপি এক বিমলার বিপদই বা কি তাঁহার পক্ষে কম? তবে সরমার এ ভাব কেন? এ হাস্যমুখ কেন? সরমা নবনীত পুত্তলী। সরমা তো পাষাণী নহেন! এ সুকুমার দেহ মধ্যে কি আয়স হৃদয় প্রতিষ্ঠিত আছে? বিমলার যৎপরোনাস্তি দুর্বিপাক সংবাদ জানিয়া সরমা কই বিরলে বসিয়া কাঁদিতেছেন না তো, কই সে জন্য উদ্বেগ নাই তো! সরমা পড়িতেছেন ও হাসিতেছেন ও বিদ্রূপ-পরিহাস করিতেছেন। এ সংসারে যে না কাঁদিবে, তাহাকে কে কাঁদাইতে পারে? এ সংসার পাপ, তাপ, ক্লেশ, শোক, দুঃখ পরিপূর্ণ। কাঁদিবারই উপযুক্ত স্থল। এই ঘোর বিষাদ ও যন্ত্রণারাশি পরিবেষ্টিত বিশ্বধামে যে না কাঁদিয়া থাকিতে পারে তাহার ক্ষমতা প্রশংসনীয়। সে ব্যক্তি মহৎ। যে না কাঁদিবে তাহাকে কে কাঁদাইতে পারে? এ কথা যথার্থ। কিন্তু সংসারে না কাঁদিয়া কটা লোক থাকিতে পারে? প্রতিহিংসার তীব্র আক্রমণ কে উপেক্ষা করিতে পারে? কৃতান্তের কঠোর শাসন কে হাসিয়া উড়াইতে পারে? যন্ত্রণার জলন্ত শিখায় দগ্ধ

হইয়া কে স্থির থাকিতে পারে? অবনীর অসংখ্য আপদে কাহার মস্তক সর্ব্বদা অচঞ্চল থাকে? এ সংসারে না কাঁদিয়া কে থাকিতে পারে? যে বুঝিয়াছে যে দিবারাত্র ক্রন্দন-ধ্বনিতে স্বর্গ মর্ত্ত্য চরাচর বিদারণ করিলেও কৃতান্তের করাল-কবল হইতে বিগতজীব সুহৃদের পুনর্জীবন প্রাপ্তি অসম্ভব; যে বুঝিয়াছে যে,হৃদয়ের স্তরে স্তরে আজীবন প্রজ্বলিত পাবক-রাশি প্রতিষ্ঠিত রাখিলেও, এ সংসারে মনের বাসনা সফল হইবার সম্ভবনা নাই; যে বুঝিয়াছে যে, নেত্র-নিঃসৃত অশ্রুবারি সমবেত হইয়া যদি অতি বিস্তৃত জলধিরূপে পরিণত হয়, তথাপি জীবনের আশা পূর্ণ হইবে না; যে বুঝিয়াছে যে, অবক্তব্য চেষ্টা করিলেও যে বিপদের প্রতিবিধান করা মনুষ্য সাধ্যের অতীত এবং তজ্জন্য চিন্তা করা মূঢ়ের কার্য্য,সে সহজে কাঁদে না। সেইরূপ লোককে এ জগতে অনেকেই প্রশংসা করে। তিনিই স্থির, ধীর, শান্ত ও বিবেকী বলিয়া উক্ত হন। জগতে সেরূপ উদার দেব-প্রকৃতিক লোক অতি অল্প। মায়া-মোহাবৃত মানব-হৃদয়ের তদ্রূপ উন্নতি সহজে হয় না। যদি কেহ সে উন্নতির নিকটস্থ হন, তিনি প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। সরমার প্রকৃতি অনেকাংশে এইরূপ স্বর্গীয় উদারতার নিকটস্থ। তিনি পাষাণী নহেন। তাঁহার হৃদয় দয়াদাক্ষিণ্যাদি কমনীয় গুণসমূহে পরিপূর্ণ।

হেমাঙ্গিনী বলিল,—"বৌ দিদি! তুমি যে বই পড়ছ, আমাকে তাই পড়াবে?"

সরমা বলিলেন,—"এ বই বিয়ের পর বরের কাছে পড়তে হয়।"

"তবে আমার বিয়ে হউক।"

"কার সঙ্গে?"

"যার সঙ্গে হয়।"

"আমার সঙ্গে?"

"দূর!"

"কেন?"

"মেয়ে মানুষে মেয়ে মানুষে কি বিয়ে হয়?"

"তবে রাঙ্গা বর খুঁজতে বলি।"

হেমাঙ্গিনী নীরব।

সরমা বলিলেন,—"আমার সঙ্গে বিয়ে হলে আমি তোমায় পুতুল খেলতে দিব।"

"কেন, আর কারও সঙ্গে বিয়ে হলে খেলা করতে দেবে না?"

"না।"

"কেন?"

"তখন তোমাকে বরের ইচ্ছামত চলতে হবে; বর যা বলবে তাই করতে হবে।"

"বর কি মারে?"

সরমা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন;—"না। বর ভালবাসে, আদর করে।"

"মিথ্যা কথা। তা হলে বর আমাকে খেলা করতে, আমোদ করতে দেবে না কেন?"

"যে তোমাকে ভালবাসে, তুমি তাকে ভাল বাস না?"

"বাসি; তোমাকে, দাদাকে, মাকে আমি সবাইকে ভালবাসি।"

"তোমার বর তোমাকে ভালবাসলে তুমি তাঁকে ভাল বাসবে?"

"বাসব।"

"যাতে বর খুসী হন, তা না করলে তোমার ভালবাসা হলো কই?"

"আমি যাতে খুসী হই তা না করলে বরেই বা আমাকে ভাল বাসা হলো কই?"

সরমা মনে মনে বলিলেন,—"প্রণয়ের

প্রথম কথা কাহাকে শিখাইতে হয় না। কি আশ্চর্য্য! কিন্তু বঙ্গদেশ”—

অপর প্রকোষ্ঠে পদ-ধ্বনি হইল। তৎক্ষণাৎ কেশব সরমার সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

কেশবের বয়স পঞ্চবিংশ বৎসরের ন্যূন নহে। তাঁহার দেহ পূর্ণ ও আয়ত, বক্ষ বিশাল, বাহুদ্বয় মাংসল, লোচন যুগল উজ্জ্বল ও বুদ্ধি প্রকাশক। বদন সুন্দর—সাহস, ভদ্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ ব্যঞ্জক।

কেশব বিদ্বান্। ভদ্র ও অমায়িক বলিয়া সর্ব্বত্র তাঁহার সুখ্যাতি যথেষ্ট; তিনি সাধারণের প্রিয়পাত্র। লোকের বিপদ বা সম্পদ উভয় অবস্থাতেই কেশব অগ্রসর। কেশবকে দেখিয়া বোধ হয় যে, ধন ও বিদ্যা এক সঙ্গে থাকিতে পারে না, এ কথা মিথ্যা। কেশব অপেক্ষা ধনে রামনগরে অনেক প্রধান লোক আছেন! কিন্তু কেশবের প্রতি সাধারণের যেরূপ অনুরাগ, সেরূপ আর কাহারও প্রতি আছে বলিয়া বোধ হয় না। কেশবের নিরহঙ্কারিতা, অমায়িকতা ভদ্রতা ও পরোপকার প্রবৃত্তিই তাহার কারণ। কেশবের সাহসও বড়। যে কার্য্যে লোকে ভয়ক্রমে হস্তক্ষেপ করে না, কেশব আবশ্যক হইলে তাহা সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

কেশব গৃহ মধ্যে হাসিতে হাসিতে প্রবেশ করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—

“সরমা! কি হইতেছে?”

সরমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—তোমার ভগ্নীর বিবাহের পরামর্শ হচ্ছিল।”

হেমাঙ্গিনী পুত্তলীর বাক্স ফেলিয়া এক দৌড়ে সে ঘর হইতে প্রস্থান করিল। কেশব হাসিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—“তা কি স্থির হলো?”

“ও বিবাহ করবে না।”

“কেন?”

“ও প্রণয় চায়! পুরুষ তো ভাল বাসিতে জানে না।”

কেশব হাসিয়া বলিলেন,—“ভেবে ভেবে খুব স্থির করেছ তো!”

সরমা গাম্ভীর্য্য সহকারে কহিলেন,—মিছে কথা নাকি?”

কেশব সরমার চিবুক ধরিয়া কহিলেন,—“হাঁ তাকি হতে পারে। তোমার মুখের কথা আর বেদ একই।”

সরমা বদনে কাপড় দিয়া হাসিলেন।

কেশব কহিলেন,—

“যোগেশের কি অন্যায় দেখ দোখ। বিমলার সেই সংবাদ দিল, আর তো কিছু লিখিল না। কি জানি কি হইল। আমি তো বড় উদ্বিগ্ন হইয়াছি। রুদ্রকান্ত বড় দুষ্ট লোক। কি করি বল দেখি?”

সরমা বলিলেন,—“তুমি সেখানে একটী লোক পাঠাও।”

কেশব কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন,—“না, লোক পাঠাইলে হইবে না। কালি প্রাতে আমি স্বয়ং যাইব স্থির করিয়াছি।”

সরমা কহিলেন,—আমি অনেক দিন তাঁহাদের দেখি নাই। আমিও তোমার সঙ্গে যাই না কেন?”

না, এ সঙ্গে তোমার গিয়ে কাজ নাই। তুমি বরং পরে যাইও। আমার বড় ভাল বোধ হইতেছে না।”

সরমা বলিলেন,—কি জানি।”

“কাল আমার সহিত পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমি যতদূর জানিতাম সমস্তই তাঁহাকে বলিলাম। তিনি বলিলেন যে, ‘অবন্তীপুরের জমীদার বড় মন্দ লোক। এ ব্যাপারে তাহার কোন চক্রান্ত আছে বোধ হয়।’ কথাটী আমার মনে

লাগিয়াছে। আমি বড় অস্থির হইয়াছি। কালি প্রাতে যাই, কি বল ?"

সরমা বলিলেন,—"তুমি একা গিয়া ছাই হবে, কাজ হবে না। আমি সঙ্গে থাক্‌লে সব কাজ হতো।"

"এ কথা আমি অস্বীকার করি না। এ হৃদয়ে তুমি বুদ্ধি, এদেহে তুমি প্রাণ, তা আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌তে পারি।"

সরমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"তবে বুদ্ধি প্রাণ ছেড়ে ভেড়াকান্ত হয়ে গেলেই কি, না গেলেই কি ?"

"এবারে না হয় তোমার বুদ্ধি একটু ধার করে নিয়ে যাব।"

"তবু আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হবে না। সাধে কি বলেছিনু যে পুরুষে ভালবাস্‌তে জানে না। আমি সঙ্গে না গেলে তুমি বাঁচ। তাই যাও।"

কেশব সরমাকে আলিঙ্গন করিলেন। সরমা ভুজলতা দ্বারা কেশবের বক্ষদেশ বেষ্টন করিলেন।

পরদিন প্রত্যুষে কেশব দৌবারিকাদি সঙ্গে লইয়া পাল্কী করিয়া রামনগর যাত্রা করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নূতন জীবন।

দিবা দ্বিপ্রহর কালে রৌদ্র চন্ চন্ করিতেছে। আশ্রয় হইতে নিক্রান্ত হওয়া ক্লেশকর। হরিপাড়া গ্রাম যেন জনশূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে। জনপ্রাণী সকলেই ছায়াতলে শয়ন করিয়া শ্রান্তি লভিতেছে। গ্রামের এক পার্শ্বে আম্র, কাঁঠাল, আতা, পেয়ারা প্রভৃতি বিস্তর বৃক্ষের ঝোপ। এই উদ্যান বা বন মধ্যে এক খানি সুপরিষ্কৃত খড়ের ঘর। গৃহস্বামীর গুণে সেই বাগান বা বন সুপরিষ্কৃত, নির্ম্মল ও ঝরঝরে। ঘর খানির অবস্থা আরও প্রশংসনীয়। ঘর খানি এমনই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এমনই সুরুচি-সম্পন্ন যে, অতি মনোরম সৌধ ত্যাগ করিয়া, সেই ঘরের দাওয়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে সাধ হয়।

সেই ঘরের মধ্যে একটী সুপরিষ্কৃত সামান্য শয্যায় একব্যক্তি নিদ্রা দিতেছিলেন। শয্যার অনতিদূরে এক ভুবনমোহিনী সুন্দরী বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। সেই সুন্দরী মনোরমা। মনোরমা ক্ষণেক পরে পুস্তক রাখিয়া দিলেন। নিদ্রিত ব্যক্তিরও নিদ্রা ভাঙ্গিল তিনি উঠিয়া বসিলেন। এই নিদ্রিত ব্যক্তি আমাদের সুপরিচিত যোগেশ। যোগেশ এখানে ? ঘটনাক্রমে আবর্ত্তিত হইয়া যোগেশ এই অচিন্তিত-পূর্ব্ব স্থানে সমাগত; যোগেশ রুগ্ন, ক্লিষ্ট, ক্ষীণ ও দুর্ব্বল। তিনি উঠিয়া বসিলেন; দেখিলেন মনোরমা বসিয়া আছেন। সস্নেহে কহিলেন,—"ভগ্নি! তুমি সেই অবধি নিয়ত এই খানেই বসিয়া আছ ?"

মনোরমা বলিলেন,—"হাঁ।"

যোগেশ কহিলেন,—"ভগ্নি! তোমার এই স্নেহ অতি অমূল্য সম্পত্তি। আমি তো মরিয়াই গিয়াছিলাম। প্রান্তর মধ্যে আমার পাল্কি রাখিয়া বাহকেরা বিশ্রাম করিতে গেল, তৎপরে কে আমায় গুরুতর আঘাত করিল, আর আমি কিছু জানি না। পরে যখন আমার চেতনা হইল, আমি শুনিলাম হরিপাড়ায় রহিয়াছি। দেখিলাম তোমার ও নরেন্দ্রের স্নেহ আমার জীবনে অমৃত ঢালিয়া দিতেছে। ভগ্নি!

তুমি এখনও আমাকে এত যত্ন কেন করিতেছ? আহার নিদ্রার অভাবে তোমার পীড়া হইতে পারে। আমি তো সুস্থ হইয়াছি। আমার জন্য এখন তো আর কোন চিন্তা নাই।"

যোগেশ দেখিলেন মনোরমার চক্ষু দিয়া বিন্দু বিন্দু জল পড়িতেছে। সবিস্ময়ে কহিলেন,—"মনোরমা, কাঁদিতেছ কেন দিদি?"

মনোরমা চক্ষু মুছিয়া কহিলেন,—"এ জগতে স্বামী ভিন্ন আমার আর কোন আপনার লোক নাই। আমার বাপ নাই, মা নাই, ভাই ভগ্নী নাই। আমার স্বামী দেবপুরুষ—অভাগীর প্রতি তাঁহার স্নেহের সীমা নাই। তিনি দয়ার সাগর। তাঁহার মিষ্টকথায়, তাঁহার আদরে, ভালবাসায় আমার হৃদয় ভরিয়া আছে। কিন্তু এ জগতে এ অভাগী আর কোথায় কাহারও মুখে একটী ভাল কথা শুনিতে পায় নাই। কেবল কুৎসা, নিন্দা এবং মিথ্য পবাদ সে শুনিয়া আসিতেছে। তাহার হৃদয় লোকের গঞ্জনা ও অযথা বাক্যবাণে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে। তাই আজি ভাগ্যক্রমে আপনার ন্যায় পরমগুণময় মহাত্মার মুখে মিষ্ট কথা শুনিয়া, আপনাকে সহোদরের ন্যায় আত্মীয় লোক জ্ঞান করিয়া আনন্দে আমার অন্তর পূর্ণ হইয়াছে।"

যোগেশ কহিলেন,—"দিদি, তোমার কথা শুনিয়া আমার হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হইল। তোমার ন্যায় গুণবতী নারী এ জগতে বড়ই বিরল। তুমি সকলের সমাদরের সামগ্রী ও ভক্তির পাত্র। তোমাকে লোকে অনাদর করে এবং অকারণ তোমার সম্বন্ধে নিন্দা রটনা করে, ইহা বাস্তবিকই বিস্ময়ের বিষয়। কেন এরূপ ঘটে, তাহা তুমি জান কি?"

মনোরমা বলিলেন,—"জানি, কিন্তু আজি সে কথায় কাজ নাই। আর একদিন আপনাকে তাহা শুনাইব।"

যোগেশ কহিলেন,—"না দিদি, আজিই দয়া করিয়া আমাকে তোমার অতীত জীবনের ইতিহাস শুনাইতে হইবে। এ জন্য আমার বড়ই আগ্রহ হইয়াছে। যখন প্রথমে আমার চৈতন্য হইল, আমি দেখিলাম আমার শয্যার এক পার্শ্বে তুমি, অপর পার্শ্বে নরেন্দ্র, বসিয়া প্রাণপণে আমার শুশ্রূষা করিতেছ। তোমরা আমার প্রতি যেরূপ যত্নশীল ও উদ্বিগ্ন দেখিলাম তাহাতে বুঝিলাম, ভাই-ভগ্নীও ততদূর হয় না। আমি অবাক্ হইলাম। সকলই স্বপ্ন বোধ হইতে লাগিল। কোথা হইতে কোথায় আসিয়াছি, তাহা কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। যাহা হউক এ বিস্ময় অধিকক্ষণ থাকিল না। অতি অল্প কথায় নরেন্দ্র আমাকে সমস্তই বুঝাইয়া দিলেন। আমি সেই দিন হইতে তোমাকে সোদরাপেক্ষা স্নেহ ও আপন জ্ঞান করি। নরেন্দ্র সংক্ষেপে আমাকে আত্ম-পরিচয় দিলেন। সে পরিচয় শুনিয়া আমার কখনই মনে হয় নাই যে, তোমাদের অতীত জীবনের সহিত কোন বিষাদজনক ঘটনা লিপ্ত আছে। এক্ষণে আমি কাতরভাবে অনুরোধ করিতেছি আমাকে সকল কথা শুনিতে দেও।"

মনোরমা বলিলেন,—"বলিতে কোন আপত্তি নাই; কারণ তাহার সহিত লজ্জাজনক ঘটনার সংস্রব নাই।"

যোগেশ বলিলেন,—"তবে বল।"

তখন মনোরমা কিয়ৎকাল অধোমুখে চিন্তা করিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে জীবনের অতীত ইতিহাস আমূল বিবৃত করিলেন। সমস্ত কথা শুনিয়া যোগেশ বলিলেন, "কই ভগ্নী, ইহার মধ্যে বিষাদজনক বা মর্ম্ম

বিদারক কোন ঘটনাই তো নাই। তবে তুমি কাতর হইতেছ কেন?"

মনোরমা বলিলেন,—"স্বামী হেডমাষ্টার হইয়া বলরামপুরে আগমন পর্য্যন্ত কোনই ক্লেশের কারণ ছিল না কিন্তু তাহার পরই আমাদের জীবন দুঃখময় হইয়া উঠিয়াছে। অকারণে লোকের গঞ্জনায় আমরা মৃতকল্প হইয়াছি, এবং লোকের অত্যাচারে বাধ্য হইয়া আমরা সে স্থান ত্যাগ করিয়াছি।"

তাহার পর মনোরমা সংক্ষেপে ও সুরল ভাবে লোকে যাহা মনেকরে, তাহা যোগেশকে বুঝাইয়া দিলেন এবং লোকেরা যেরূপে তাঁহার বিবাহ, জন্ম ইত্যাদি বিষয়ে অতি ঘৃণাজনক কুৎসা রটনা করে, তাহাও তিনি ব্যক্ত করিলেন।

সমস্ত শুনিয়া যোগেশ বলিলেন,—"বুঝিলাম দেবি, তোমার আক্ষেপের যথেষ্ট কারণ আছে। সৌভাগ্যের বিষয়, লোকের এই সকল কলঙ্ককীর্ত্তন নিতান্ত অমূলক। আমার মনে এ সম্বন্ধে অণুমাত্র সন্দেহও জন্মে নাই। তোমার মুখে এই সকল বিবরণ শ্রবণ করিয়াই—প্রমাণান্তর ব্যতীত আমি অকপটে বলিতে পারি, লোকেরা সমস্ত অলীক বৃত্তান্ত ঘোষণা করিয়াছে। লোকের এই সকল অমূলক কটূক্তির কোন মূল্য নাই। এরূপ কুৎসা কিরূপ ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিতে হয়, তাহা অবশ্যই তুমি জান। এরূপ সামান্য কারণে হৃদয়কে ব্যথিত করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। মিথ্যা কথা কখনই স্থায়ী হয় না। আজি হউক বা দশ দিন পরেই হউক, মিথ্যা কথা উড়িয়া যায়। সততা ও পবিত্রতাকে মিথ্যা অধিকক্ষণ আবরণ করিয়া রাখিতে পারে না। সত্যের সর্ব্বশক্তিমান হস্ত শীঘ্রই মিথ্যার ক্ষীণ শাসন তিরোহিত করিয়া দেয়। এ সামান্য বিষয়ের জন্য তুমি আর একবারও কাতর হইও না। আমি সুস্থ হইয়াছি; বোধ হয় শীঘ্র এ স্থান ত্যাগ করিব। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সর্ব্বাগ্রে এ বিষয়ের প্রতিবিধানে আমি হস্তক্ষেপ করিব। বিশ্বাস করি, অতি সহজেই আমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে।"

মনোরমা বলিলেন—"কোন প্রতিবিধান হউক বা না হউক, প্রার্থনা করি ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। আমরা এ পর্য্যন্ত কাহারও নিকট এরূপ সহানুভূতি লাভ করি নাই, কাহারও করুণা ভোগ করা আমাদের অদৃষ্টে ঘটে নাই, কাহারও নিকট আদরের সম্ভাষণ মাত্রও আমরা শ্রবণ করি নাই। আজি আমার শুষ্কহৃদয়ে শান্তির সুধা সিঞ্চিত হইল।"

মনোরমা বস্ত্রাঞ্চলে নয়নাবৃত করিলেন।

যোগেশ বলিলেন,—"যে তোমাকে দেখিয়াছে, তোমার এই সরলতাপূর্ণ পবিত্রতাপূর্ণ বদনের প্রতি নেত্রপাত করিয়াছে, তোমার পুণ্যপ্রদীপ্ত, কুচিন্তা-বিরহিত নয়নের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে, সাধারণ মানবের অপেক্ষা উচ্চ মঞ্চে তোমার স্থান এবং তুমি পূজনীয় জনগণেরও পূজার পাত্রী। সে কথা যাউক, আমি আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব।"

মনোরমা বদন হইতে বস্ত্রাপরাসিত করিলেন। যোগেশ বলিলেন,—"বলরামপুর ছাড়িয়া তোমরা হরিপাড়ায় আসিয়াছ। এ বাটী কাহার? এ আশ্রয় তোমরা কিরূপে লাভ করিলে? তোমাদের হাতে অতি সামান্য মাত্র অর্থ ছিল। তাহাতে তোমাদের খরচ, অধিকন্তু আমার ন্যায় পীড়িত আশ্রিত ব্যক্তির চিকিৎসাদির খরচ চলিতেছে কিরূপে?"

মনোরমা বলিলেন,—"সকলই আশ্চর্য্য উপায়ে এক মহাত্মার কৃপায় নির্ব্বাহিত হই-তেছে। এ ভবন আমাদের নহে। আমার স্বামীর একজন পূর্ব্ব পরিচিত সুহৃদের। তিনি এক্ষণে সপরিবারে বিদেশবাসী। আমার স্বামী পত্র দ্বারা তাঁহার অনুমতি আনাইয়া এই বাটী অধিকার করিয়াছেন। অর্থসম্বন্ধে আমরা অলৌকিক উপায়ে সাহায্য লাভ করিয়াছি। বাস্তবিক আপনাকে লইয়া আমরা বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়াছিলাম। আপনার চিকিৎসা পথ্য ও শুশ্রূষায় অনেক অর্থের প্রয়োজন। আমার স্বামী এজন্য ভিক্ষা করিবেন সংকল্প করিয়া এক অপরিচিত মহা-ত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সেই মহাত্মা সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমার স্বামীকে আর কাহারও নিকট সাহায্যার্থী হইতে নিষেধ করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ স্বয়ং আমাদের এই আশ্রমে আগমন করিয়া আপনার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। আমার স্বামীর হস্তে যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিয়া তিনি চিকিৎসা প্রভৃতি সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। বারংবার যাতায়াত করিয়া আপনার অবস্থা দেখিতে লাগিলেন। আপনার জন্য অতিশয় উদ্বেগ ও ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যতই আপনার স্বাস্থ্যোন্নতি হইতে লাগিল, ততই তাঁহার প্রসন্নতা বাড়িতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার এবাটীতে যাতায়াতও কমিতে লাগিল। কালি আর আজি তিনি একবারও এখানে আইসেন নাই।

যোগেশ অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন,—"এ অপরিচিত আত্মীয় কে? তোমরা তাহার কোন পরিচয় জানিতে পারিয়াছি কি?"

মনোরমা বলিলেন,—"নাম শুনিয়াছি, তাঁহার নাম কৃষ্ণগোবিন্দ রায়। আর কোন পরিচয় আমি জানি না।"

কথা সাঙ্গ হইতে না হইতেই বাহিরে পদশব্দ শ্রুত হইল। মনোরমা বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, নরেন্দ্র ও কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু অগ্রসর হইতেছেন। বদনের সর্ব্বাংশ অবগুণ্ঠনে আবৃত করিয়া মনোরমা বলিলেন, —"ঐ তিনি আসিতেছেন।"

মনোরমা অন্য দ্বার দিয়া প্রস্থান করিলেন। যোগেশ শয্যার উপরে উঠিয়া বসিলেন এবং আন্তরিক ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত সেই অপরিচিত মহাত্মার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

নরেন্দ্রনাথের সহিত কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু আসিয়া যোগেশের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার দেহ উন্নত ও বলিষ্ঠ। বয়স প্রায় পঞ্চাশ হইলেও, মস্তকের কেশ প্রায় সকলই সাদা। নয়নযুগল জ্ঞান ও প্রতিভা প্রদীপ্ত। তিনি সম্মুখাগত হইলে যোগেশ ভক্তি সহকারে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

কৃষ্ণগোবিন্দ বলিলেন,—"তোমার শরীর বোধ হয় এক্ষণে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে। অতঃপর তুমি কোথায় যাইবে, কি করিবে স্থির করি-য়াছ?"

যোগেশ বলিলেন,—"আমি শুনিয়াছি আপনার কৃপায় আমি জীবন লাভ করিয়াছি। অপরিচিত ব্যক্তির প্রতি এরূপ দয়া মহত্ত্বের পরিচায়ক, আমি অতঃপর রামনগরে যাইব।"

কৃষ্ণগোবিন্দ বলিলেন,—"তুমি আমার অপরিচিত নহ, তোমার পিতার সহিত আমার এক সময়ে বড়ই ঘনিষ্ঠতা ছিল। একটা সামান্য কারণে আমি তাঁহার সহিত কোন সময়ে বড়ই অসদ্ব্যবহার করিয়াছিলাম। সেই সময় হইতে আমি তাঁহার সহিত সম্পর্কশূন্য, অজ্ঞাত ভাবে কালপাত করিতেছি। আজি আমি তোমার

পিতার সহিত সেই পূর্ব্ব অসৌজন্যের কথঞ্চিৎ প্রতিশোধ করিতে পারিয়াছি, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। সে কথা যাউক। তুমি আমাকে তোমার পরম উপকারক বলিয়া জ্ঞান করিতেছ, ইহা তোমার ভুল। আমি বস্তুতঃ তোমার বিশেষ কোন উপকার করি নাই। এই সদ্বিদ্বান্, সচ্চরিত্র, উদারস্বভাব নরেন্দ্র বাবু এবং ইহার, দেবীর ন্যায় গুণময়ী পত্নী আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া নিরন্তর তোমার যত্ন ও শুশ্রূষা করিয়াছেন, তাহাতেই তুমি এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছ। যদি কাহারও নিকট বিপন্মুক্তির নিমিত্ত তোমাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে হয়, তাহা হইলে এই ধর্ম্মময়যুগলের নিকট তোমাকে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকিতে হইবে।”

যোগেশ বলিলেন,—“নরেন্দ্র মনোরমা যে দেব দেবী তাহা আমি বুঝিয়াছি। তাঁহাদের প্রতি আমার হৃদয়ের যে ভাব তাহা ব্যক্ত করিবার সামর্থ্য আমার নাই। বিধাতার বিড়ম্বনায় তাঁহারা সম্প্রতি দুর্দ্দশায় পতিত হইয়াছেন। তাঁহাদের উপর মানব সমাজও অশেষ অত্যাচার করিয়াছে। ইহার কোন প্রতিবিধান করিবার জন্য আমার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে।”

কৃষ্ণগোবিন্দ বলিলেন,—“আমি সকলই শুনিয়াছি, সকলই জানি। সে সকল অলীক কথার কোন মূল্য নাই। অতি সহজেই সকল মিথ্যা কথা উড়িয়া যাইবে, আমি তাহার ব্যবস্থা করিয়াছি। আর তুমি যে দুর্দ্দশার উল্লেখ করিতেছ, তাহা ক্ষণস্থায়ী। এরূপ উপযুক্ত ব্যক্তির দুর্দ্দশা অচিরে তিরোহিত হইবে সন্দেহ নাই।”

যোগেশ বলিলেন—“আপনার ন্যায় মহাপুরুষের মুখে এরূপ আশ্বাসের কথা শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। আপনার প্রতি আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা আরও শতগুণে বর্দ্ধিত হইল।”

কৃষ্ণগোবিন্দ বলিলেন,—“এক্ষণে আর বাক্যব্যয় অনাবশ্যক। তোমার যে সকল বিপদপাত হইয়াছে, তাহা আমার অবিদিত নাই। তুমি গৃহত্যাগ করার পর, তোমাদের আরও কিছু কিছু বিপদ ঘটিয়াছে। সে সকল সংবাদ তোমার এক্ষণে জানিবার প্রয়োজন নাই। এবং সে জন্য চিন্তাকুল হইবারও কোন আবশ্যক নাই। কারণ সকলই সামান্য এবং সকলই সহজে কাটিয়া যাইবে। তোমার পিতা সম্প্রতি রামনগরে আসিয়াছেন। তোমাকে আপাততঃ সেই স্থানেই যাইতে হইবে; নরেন্দ্র মনোরমাকেও সঙ্গে লইয়া যাও। বিমলার সম্বন্ধেও আমি কিছু সন্ধান পাইয়াছি। বোধ করি শীঘ্রই তাঁহার উদ্ধার ঘটিবে। বিশেষ সংবাদ অতাই জানিতে পারিব? যাহা জানিতে পারিব, তাহা তোমাকে জানাইব। রামনগরে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। আমার হাতে অনেক গুরুতর কাজ আছে। আমি আপাততঃ বিদায় হই।”

কোন উত্তর শুনিবার পূর্ব্বেই কৃষ্ণগোবিন্দ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন, যোগেশ কিয়ৎকাল বাক্যহীন পুত্তলিকার ন্যায় নির্নিমেষ নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি অদৃশ্য হইলে, যোগেশ বলিলেন। “ভাই নরেন্দ্র, কে এই শুভানুধ্যায়ী মহাত্মা।”

নরেন্দ্র বলিলেন,—“যতটুকু পরিচয় তুমি জানিতে পারিয়াছ, তাহার অধিক আমিও আর কিছুই জানি না। এক্ষণে আমাদের রামনগর যাইতে হইবে। তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক হইয়াছে।

যোগেশ কাতর ভাবে শয্যায় পড়িয়া বলিলেন,—“যাহা হয় কর ভাই।”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সংবাদ।

কালিকার কথা আজি কে বলিতে পারে? তুমি প্রভুতা, ক্ষমতা, ঐশ্বর্য্য ও বিদ্যা-গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া ধরণীকে তৃণবৎ মনে করিতেছ; কিন্তু তুমি জান কি, এখনই তোমার এ গর্ব্বের কি পরিণাম ঘটিতে পারে? মনুষ্য এ সংসারে, অন্ধকার-গৃহ মধ্যস্থ বিহঙ্গমের ন্যায়, ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, জানে না কোন্ দিকে প্রাত-বন্ধক। মনুষ্য যাহা মনে ভাবিয়া যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে, হয় তো তাহা হইতেছে না, নয় তো বা ঘটিয়া যাইতেছে। কিন্তু স্থির কি? তুমি যাহা স্থির ভাবিতেছ, তাহা তো স্থির নয়; সকলই অনিশ্চিত। ব্যবসায়ি! অর্থাগমের উপায় অন্বেষণার্থ তুমি কতই ফাঁদ পাতিতেছ; যশোর্থী, স্বকীয় নাম পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতি মানববদনে অহর্নিশ সমুচ্চারিত হইতেছে, এই শ্রুতিসুখ ভোগ করিবার নিমিত্ত তুমি কতই চেষ্টা করিতেছ; প্রেমিক প্রণয়ের পূত ভাণ্ডার আয়ত্ত করিয়া, প্রণয়িনীর পীযূষপূরিত মুখারবিন্দ অতৃপ্তনয়নে অনন্তকালের নিমিত্ত সন্দর্শন করিবার আশায়,সংসারের সমস্ত বিপদ তুমি বিদলিত ও উপেক্ষা করিতেছ; বিদ্বান্, বিদ্যার নির্ম্মল-সলিলরাশির উপরে নিরন্তর অকাতরে এক সীমা হইতে অপর সীমা পর্য্যন্ত সন্তরণ দিবার নিমিত্ত তোমার চিত্ত নিয়ত ব্যাকুল রহিয়াছে; কিন্তু তোমরা জান কি তোমাদের এ সকল চেষ্টার কি পরিণাম হইবে? এত সাধে কি বাদ ঘটিবে, তাহা কে জানে? কালিকার কথা আজ কে বলিতে পারে? আশা, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা সকলই বলিতেছে, বাসনার ষোল কলা পূর্ণ হইবে। কিন্তু কই, তা হয় কই, কই, মনের আশা মিটে কই? মনের সাধ মনে মনে রহিয়া যায়, সফল হয় কই? এ জগতে কাহার আশা মিটিয়াছে? কে বলিয়াছে, আকাঙ্ক্ষার সীমা দেখিয়াছি? আলেকজেণ্ডর বলিলেন,—"জগতে আর এমন রাজ্য নাই যে, আমি অধিকার করি।" নিউটন বলিলেন,—"বিদ্যা-সমুদ্র যেমন তেমনই আছে, আমি কেবল তাহার তীরস্থ লোষ্ট্র সঞ্চয় করিয়াছি।" আর্কমিডিজ বলিলেন,—"কোথাও এমন স্থান নাই যে, তথায় স্কু যন্ত্র স্থাপন করিয়া পৃথিবীটাকে সরাইয়া দি।" আর কাহার কথা বলিব? কাহার সাধ মিটিয়াছে? কাহার আশা সফল হইয়াছে? কে বলিবে যে, আমি জগতে মনের বাসনা মিটাইয়া চলিলাম। ভ্রান্ত আশার প্রতিপদে বিঘ্ন! বাসনায় বিস্তর বাধা। তুমি যাহা স্বপ্নেও ভাব নাই, ভ্রমেও মনে স্থান দেও নাই, এমন অননুভূতপূর্ব্ব অভ্যাগত বিপদ সমুপস্থিত হইয়া তোমার সমস্ত আশা স্রোতের জলে ভাসাইয়া দিতে পারে, তোমার সমস্ত বাসনার মূলে গরল ঢালিয়া দিতে পারে, তোমাকে অত্যল্প কালের মধ্যে জীবন্মৃত করিয়া তুলিতে পারে। কালিকার কথা আজি কে বলিতে পারে? ব্যবসায়ি! হয় তো অসাবধানতা কীট তোমার কার্য্যের অভ্যন্তরদেশ ধীরে ধীরে এমন জর্জ্জরিত করিতেছে যে, সহসা তোমার সমস্ত সম্পত্তি উড়িয়া গিয়া এক দিনে তুমি পথের ভিখারী হইতে পার। যশোর্থি! তোমার অজ্ঞাতসারে তোমারই নিকটে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিবৎ এরূপ এক ব্যক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে যে, এক দিনেই তাহার কীর্ত্তিকলাপ, তোমার সমস্ত আশা-ভরসা অতল জলে বিলীন করিয়া দিতে পারে। প্রেমিক! তোমার

জীবন সর্ব্বস্বের বিশ্বাসঘাতকতা বা উপেক্ষা হয় তো তোমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে অগ্নি জ্বালাইয়া তাহাকে চিরকালের নিমিত্ত অসার ও নীরস করিয়া দিতে পারে। বিধাৰ্থি! বিদ্বেষের তীব্র আক্রমণে অথবা শারীরিক সামর্থ্যের অভাবে, কিম্বা রোগ শোকের নিষ্করুণ পেষণে, অথবা প্রতিকূল ঘটনাপুঞ্জের অতর্কিত আবির্ভাবে, তোমার অন্তরকে হয়তো চিরদিনের মত অকর্ম্মণ্য, উদ্যম-বিহীন করিয়া দিতে পারে। সর্ব্বোপরি মৃত্যু আসিয়া সকল সময়েই আমাদের সকল বাসনার অবসান ঘটাইতে পারে। তবে, কালিকার কথা আজি কেহ বলিতে পারে না বলিয়াই তো সংসারে এত গোল ও এত অসুবিধা। কালিকার কথা আজ কেহ বলিতে পারে না বলিয়াই তো আজ অবন্তীপুরের যোগেশ হরিপাড়া অপরিচিত আত্মীয়গণের মধ্যবর্ত্তী। কালিকার কথা আজ কে বলিতে পারে? যোগেশ কি অভিপ্রায়ে কোথায় যাইতেছিলেন, কিরূপ ঘটনায় এই অচিন্তিতপূর্ব্ব স্থানে উপস্থিত। কোথায় প্রাণাধিকা বিমলার সন্ধানার্থ যোগেশ মাথায় সাপ বাঁধিয়া বেড়াইতেছেন, না কোথায় অজ্ঞাত ব্যক্তির বিষম আঘাতে মৃতপ্রায়। যোগেশ সে আঘাতে মরিলেন বটে, কিন্তু তখন তাঁহার অবস্থা মৃতবৎ হইল। যাহার আঘাতে দেহের এই অবস্থা ঘটিল সে পলাতক হইল। যাহারা কোন দোষে দোষী নহে সেই বাহকগণ অন্ধকার রাত্রিতে দেহ বহন করিয়া হরিপাড়ার নীচে গঙ্গায় ফেলিয়া দিল। তাহার পর যাহাদের সহিত কখন দেখা সাক্ষাৎ বা কোন প্রকার পরিচয় নাই, তাহারা তাহা যত্নে তুলিয়া লইল। এ সকলই বিচিত্র ব্যাপার। তাই বলি, এ সংসারে কালিকার কথা আজি কে বলিতে পারে?

বলা বাহুল্য নরেন্দ্র মনোরমার সহিত যোগেশের যৎপরোনাস্তি আত্মীয়তা জন্মিয়াছে। যোগেশ একণে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন। নরেন্দ্রকে পরমাত্মীয় জ্ঞানে যোগেশ তাঁহার নিকট মনের সমস্ত কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। যোগেশকে ভদ্রতার উচ্চ আদর্শ জানিয়া নরেন্দ্র তাঁহাকে স্বীয় মনের মধ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার দিয়াছেন। কাঁদিতে কাঁদিতে, পাঠক, মহাশয়ের সাক্ষাতে মনোরমাও ঐ উপযুক্ত বন্ধুকে হৃদয়ের সমস্ত বেদনা জানাইয়াছেন। মনের বেদনা মনে পুষিয়া রাখা বড় বালাই। এ সংসারে উপযুক্ত পাত্রে বেদনা ঢালিয়া দেওয়াই ভাল। একের বেদনায় অন্যে যদি অংশ লয়, তাহাতে হানি কি?

কল্য প্রাতে যোগেশ নরেন্দ্র ও মনোরমা রামনগর যাইবেন স্থির হইয়াছে। সায়ংকালে যোগেশ হরিপাড়ার সেই ঘরের দাওয়ায় একখানি মাদুর পাতিয়া একাকী বসিয়া আছেন। তাঁহার শরীর বেশ সারিয়াছে তবে এখনও কতকটা দুর্ব্বলতা আছে মাত্র। তাঁহার মনে অনন্ত চিন্তা। কোথায় বিমলা? সেই প্রাণাধিকা সরলা বালা কোন অজ্ঞাত স্থানে অপরিচিত ব্যক্তিগণের হস্তে হয়তো কতই নির্য্যাতন ভোগ করিতেছেন; আর যোগেশ অচিন্তিতপূর্ব্ব বিপদে পড়িয়া মৃতকল্প অবস্থায় অপরিচিত পূর্ব্ব আত্মীয়গণের মধ্যে নিশ্চেষ্ট ভাবে কালপাত করিতেছেন। কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু বলিয়াছেন, তাঁহার পিতা রামনগরে আসিয়াছেন, তাঁহাদের আরও বিপদ ঘটিয়াছে। কেন পিতা রামনগরে আসিয়াছেন? পুত্রের সন্ধানে আসিয়াছেন কি? তাঁহাদের আরও বিপদ ঘটিয়াছে। আর কি বিপদ ঘটিতে পারে? সকলই সম্ভব। বরদাকান্ত ও তাহার পুত্র দুর্দ্দান্ত লোক। তাহারা না করিতে পারে,

এমন কর্ম্ম কিছুই নাই। না জানি তাহারা আত্মীয়গণকে কি বিপদে ফেলিয়াছে। কৃষ্ণগোবিন্দ বলিয়াছেন, বিশেষ চিন্তার কোন কারণ নাই। বিপদ হইয়াছে শুনিলে চিন্তা আপনিই উপস্থিত হইবে। যোগেশ বিবিধ চিন্তায় আকুল। সর্ব্বোপরি প্রধান চিন্তা, এই কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু কে? ইনি পিতার সুহৃদ্‌, অথচ কোন দুর্ব্ব্যবহার হেতু তাঁহার সহিত সম্পর্ক-শূন্য। ব্যবহারে দেখিতেছি, ইনি মহাত্মা। এরূপ মহাপুরুষের পক্ষে কোন প্রকার অসদ্ব্যবহার কখনই সম্ভবপর নহে। জানি না ইহার জীবনে কি রহস্য প্রচ্ছন্ন আছে। কে এ রহস্যজাল বিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহার অন্তর আলোকিত করিবে?

বলরামপুরের কুঠিতে রুদ্রকান্ত ও রামকৃষ্ণ আসিয়াছেন এবং সেখানে রামকৃষ্ণের বিবাহ হইবে এইরূপ একটা সংবাদ অদ্য অপরাহ্নে তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে। কথাটা কি জানিবার নিমিত্ত নরেন্দ্র নিজে বলরামপুর গমন করিয়াছেন।

যোগেশ এই সকল বিভিন্ন দুশ্চিন্তায় ভাসিতেছেন। এইরূপ সময়ে অতি ব্যস্তভাবে নরেন্দ্র তথায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র ব্যাকুলতার সহিত যোগেশ জিজ্ঞাসিলেন,—"কি সংবাদ ভাই?"

নরেন্দ্র বলিলেন,—"সংবাদ কি তাহা আমি ঠিক জানি না। ব্যাপার কিছু ভয়ানক বলিয়াই বোধ হয়। কারণ কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুকেও কিছু উদ্বিগ্ন বলিয়া বোধ হইল। তিনি শতাধিক লাঠিয়াল সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং রামনগর হইতে পুলিশের লোক আনাইবার জন্য লোক পাঠাইয়াছেন।"

যোগেশ বলিলেন,—"তুমি তাঁহাকে বিশেষ সংবাদ জিজ্ঞাসা কর নাই?

নরেন্দ্র বলিলেন,—"সকলই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছেন, তোমাদের চিন্তার কারণ নাই। যাহা ঘটিয়াছে তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি; সে জন্য যাহা কর্ত্তব্য তাহার ব্যবস্থা আমি করিতেছি। তিনি অতিশয় ব্যস্ত; অধিক কথা কহিতে তাঁহার সময় নাই। তোমাকে সঙ্গে লইয়া এখনই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার নিমিত্ত তিনি আদেশ করিয়াছেন।"

যোগেশ আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া তখনই গাত্রোত্থান করিলেন এবং যাত্রার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন, অবিলম্বে নরেন্দ্র ও যোগেশ ভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ আয়োজন।

অদ্য বলরামপুরের কাছারি বাটীতে আনন্দের সীমা নাই। তথায় অদ্য রজনীযোগে এক সমারোহের বিবাহ হইবে। বিবাহের পাত্র রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, পাত্রী বিমলা, বরকর্ত্তা স্বয়ং রুদ্রকান্ত রায়। একজন ব্যতীত সকলেই আনন্দ সাগরে মগ্ন। অদৃষ্টে এমনও ছিল ভাবিয়া রামকৃষ্ণ খুসী। যাহারা বরদাকান্তের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়াছে, তাহাদের প্রতি অত্যাচারের চূড়ান্ত হইবে ভাবিয়া রুদ্রকান্ত খুসী। লোকজন যাহা হইবার নহে তাহাই হইল ভাবিয়া খুসী। মামা ঠাকুরের বিবাহ—স্বপ্নের অগোচর কথা। রূপের হোঁদলকুতকুতে মামা ঠাকুরের বিবাহ হইবে—যেমন তেমন বিবাহ নয়, সাক্ষাৎ স্বর্গের অপ্সরার

সঙ্গে; সুতরাং অনুজনবর্গ মহা খুসী। ফল, কাছারি বাড়ী আনন্দে তোলপাড়। এত আমোদ, এত আনন্দ মধ্যে কেবল একজন বিরলে বসিয়া কাঁদিতেছে।* সে এক জন বিমলা। বিমলা কাঁদিতেছেন, তা তোমার আমার কি? সংসারের কত লোক কত সময় কত কাঁদিয়া থাকে। সকলের কান্না দেখিতে গেলে চলে না। যাহার ইচ্ছা হয় সে কাঁদুক। তা বলিয়া আমরা আপন কাজ ছাড়িব কেন? যে কোনরূপে আত্মকার্য্য উদ্ধার করা চাই। এখন বিমলার রোদন দেখে কে? বিমলার ইচ্ছা আছে কি না আছে, তাহাই বা জানিবার দরকার কি? সংসারে কোন কার্য্যই সর্ব্ববাদিসম্মত হয় না। বিশেষতঃ পাত্রীর মত লইয়া বিবাহ কোথায় হয়? পাত্রীর মত না থাকিলেই বা ক্ষতি কি? সুতরাং বিমলা কি করিতেছেন সে জন্য কেহ চিন্তিত বা কাতর নহে। সে দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই।

কাছারিঘরের পার্শ্বস্থ বৈঠকখানা ঘরে রুদ্রকান্ত ও চারিজন বয়স্য বসিয়া আমোদ-প্রমোদ ও মজচর্চ্চায় রত রহিয়াছেন। এমন সময়ে সম্মুখের দ্বারসংলগ্ন সবুজ রঙ্গের পরদা একটু খানি সরিয়া গেল। সেই ফাঁকের ভিতর দিয়া ঘরের মধ্যে একটী কৃষ্ণ বর্ণের কূপ বা জালা প্রবেশ করিতেছে বোধ হইল। বিশেষ অনুধাবনে বুঝা গেল, সেটী কূপ বা জালা নহে। তাহা কথঞ্চিৎ মনুষ্যের উদর সদৃশ। একে একে হস্ত পদাদি সমস্তই প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিল। তাবতের সম্মিলনে যে অদ্ভুত জীবের উদ্ভব হইল, তাহার নাম রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী। রামকৃষ্ণের হরিদ্রা-বর্ণের দন্ত আজ আর ঢাকিতেছে না। আজ তাঁহার অধরোষ্ঠ ভেদ করিয়া হাস্যের তরঙ্গ বাহির হইতেছে; যেন গোমুখী হইতে গঙ্গার উদ্ভব হইতেছে! রামকৃষ্ণকে দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন।

এক জন বয়স্য বলিলেন,—"মামা! তোমার আজ পাথরে পাঁচ কিল বাবা!"

রামকৃষ্ণের দন্ত আরও বাহির হইল। হাসি আকর্ণ বিশ্রান্ত হইল। রামকৃষ্ণ মাথা চুলকাইতে লাগিলেন। বুঝি কথাটায় একটু লজ্জা হইল। কহিলেন,—"আঁ—হাঃ হাঃ; য়্যাঃ—"

রামকৃষ্ণ উপবেশন করিলেন। এক জন বয়স্য রুদ্রকান্তকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"লগ্ন কত রাত্রিতে?"

রুদ্রকান্ত কহিলেন,—"রাত্রি ৭ টার পর যখন ইচ্ছা।"

"অনেক রাত্রিতে বিবাহ দেওয়াই ভাল।"

রামকৃষ্ণ ব্যস্ত হইয়া কহিলেন,—"কেন—কেন—য়্যাঁ।"

"এদিকে একটু আমোদ প্রমোদ করে শেষাশেষি বিবাহ হওয়াই ভাল।"

রামকৃষ্ণ বলিলেন,—"তা কেন? আমার শরীর খারাপ—তা বিবেচনা কর—তোমার যে উল্টা কথা।"

রুদ্রকান্ত কহিলেন,—"বিলক্ষণ মামা! তুমি কার কথা শুনছ? সন্ধ্যা হইলেই শুভকর্ম্ম শেষ কর্ত্তে হবে।"

রামকৃষ্ণের শ্রীবদনারবিন্দে আবার পূর্ব্বের ন্যায় বেঙ্ক কাঠা হাসি বাহির হইল। কহিলেন,—"তা তো বটেই।"

একজন বয়স্য জিজ্ঞাসিলেন,—আচ্ছা মামা সবই ত স্থির। আর কয়েক ঘণ্টা বাদে তোমার বিবাহ হবেই হবে। কিছুতেই এ আর রদ হয় না। তুমি সত্য করে বল দেখি

বাবা, এখন তোমার মনের অবস্থা কি রকম ?”

এবার রামকৃষ্ণের মধুর হাসি এত বাড়িয়া গেল ও শ্রীমুখ এত ফাঁক হইলে যে, কণ্ঠনালী পর্য্যন্ত দেখা যাইতে লাগিল। অন্য কোন উত্তর না দিয়া তিনি কেবল বারদ্বয় গর্দ্দভবৎ বিকট “অা—অা।” শব্দ করিয়া উঠিলেন।

বয়স্য পুনরপি জিজ্ঞাসিলেন,—“বল্লে না মামা। ছি বাবা আমাদের কাছে লুকোচুরি !’

রামকৃষ্ণ দেখিলেন কথাটার জবাব দেওয়া আবশ্যক। সুতরাং চেষ্টা করিয়া ধীরে ধীরে মুখ বন্ধ করিলেন। ক্ষণেক ভাবিয়া আবার পূর্ব্ববৎ হাসির সহিত মিশাইয়া অশ্রুতপূর্ব্ব কণ্ঠে রামকৃষ্ণ কহিলেন,—“আমার প্রাণটা যেন আজ্ ভো কাটা ঘুড়ির মত লোট খেতে খেতে পড়ে যাচ্চে। লুটে নিলেই হয়।”

সকলে হাঃ হাঃ শব্দে হাসিয়া উঠিল। একজন বলিল,—“মামার রস দেখেছ ?”

রামকৃষ্ণ আবার বলিতে লাগিলেন,—“সত্তি বাবা। আমার শরীরটে যেন আজ গলে জল হযে গিয়েছে। আমি যেন কোথায় রইছি।”

রুদ্রকান্ত বলিলেন,—“মামার যে মনোরথ আজ সিদ্ধ হলো এ আমার বড় আনন্দ। মামা আজ মন খুলে ফুর্ত্তি কর বাবা।”

রামকৃষ্ণ বলিলেন,—ফুর্ত্তিতে আমি যেন হাওয়া হয়ে গিয়েছি। আমার ইচ্ছে হচ্চে তোমায় কোলে করে নাচি।”

সকলে হাসিয়া উঠিলেন। একজন বয়স্য রুদ্রকান্তকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—আমাদেরও আনন্দ কম নয়। বিশেষ আহারটা পরিপাটি রকম হবে।”

রুদ্রকান্ত বলিলেন,—“যায়গাটা বড় খারাপ। আহারের আয়োজনটা বড় সুবিধা মত হয় নাই।”

আর একজন কহিলেন,—“সে কি কথা ? ওটার তদ্বির বিশেষ আবশ্যক।

রামকৃষ্ণ কহিলেন,—“সে যা হয়েছে তা হয়েছে, তার জন্য বড় আট্‌কাবে না।”

বয়স্য বলিলেন,—“বিলক্ষণ। তোমার এখন এই কথাই বটে ?”

রামকৃষ্ণ বলিলেন,—“তা বই কি ? আহার যৎকিঞ্চিৎ হলেই হল। শুভ কর্ম্মটা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হওয়াই হল আসল কথা।”

সকলে হাসিয়া উঠিলেন।—রামকৃষ্ণ কহিলেন,—“সন্ধ্যা হয়ে এলো। বাবাজি তুমি কিছু জলটল খাওগে। এর পর সময় পাবে না।”

রুদ্রকান্ত হাসিয়া বলিলেন,—“সে কি মামা, এখনও ছুইটা বাজে নাই। এই তো আহার করা গেল।”

“আরে না হে না। তোমার ভুল হয়ে থাক্‌বে।”

রুদ্রকান্ত ঘড়ি খুলিয়া দেখাইলেন।

রামকৃষ্ণ কহিলেন,—“ঘড়িটা ঠিক চলছে তো ?”

রুদ্রকান্ত হাসিয়া বলিলেন,—বিলক্ষণ !”

রামকৃষ্ণ একটু কুণ্ঠিত হইয়া নীরব হইলেন।

কুঠির একজন ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী আসিয়া নিবেদন করিলেন,—“বিবাহ স্থানের যে ব্যবস্থা করা গেল, একবার হুজুর আসিয়া দেখিলে ভাল হয়।”

রুদ্রকান্ত গাত্রোত্থান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আর সকলেও চলিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিবাহ-রাত্রি।

সন্ধ্যা উপস্থিত প্রায় বিবাহ অল্প রাত্রিতেই হইবে স্থির হইয়াছে। সুতরাং আর বেশী বিলম্ব নাই। লোক জন সকলেই ব্যস্ত। রামকৃষ্ণ আহ্লাদে ফুটি-কাঁকুড়। রুদ্রকান্ত অস্থির। কাছারি বাটী লোকের কণ্ঠ-স্বরে প্রতিধ্বনিত।

বৈঠকখানার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে রোসনচৌকি লক্ষ্ণৌ ঠুংরি বাজাইতেছে, কয়েক ব্যক্তি বসিয়া তাহা শুনিতেছে। রুদ্রকান্ত বাবু নানা কাজে ব্যস্ত, সুতরাং নিয়মিতরূপে শুনিতে পাইতেছেন না। শুনিতে পাইতেছেন না তাহা নহে। তিনি যখন যে স্থানে রহিয়াছেন, তথা হইতে তাহা বেশ শুনা যাইতেছে; তথাপি তিনি শুনিতে পাইতেছেন না, তাঁহার শুনার অর্থ অন্যবিধ। তিনি কিছুই বুঝেন না, তাঁহার কোন জ্ঞান নাই। তথাপি তাঁহার হাত নাড়া চাই, অসময়ে করতালি দেওয়া চাই এবং পার্শ্বস্থ ব্যক্তির, বিশেষতঃ রোসন-চৌকী ওয়ালার সেলাম করিয়া বলা চাই যে, বাবুর বোধশক্তি বড়ই ভাল; এমন সমঝদার আর মিলে না। কাজেই তিনি শুনিতে পাইতেছেন না। যাহা হউক কোন প্রকারে একটু অবকাশ করিয়া বাবু বাদ্য স্থলে "আহা হায়" শব্দে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার গলার চীৎকারে বাদ্যের বিঘ্ন জন্মিল।

বাদকেরা থামিয়া বাবুকে সেলাম করিয়া করযোড়ে নিবেদন করিল,—"আঃ বাবু আসিয়াছেন, আমরা একটু বাজাইয়া বাঁচি।"

বাবু হাসিতে লাগিলেন। বাদকেরা পুনর্ব্বার অন্যবিধ রাগিণী আরম্ভ করিল।

এমন সময় রামকৃষ্ণ ব্যস্ততা সহ সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন এবং রুদ্রকান্তকে কহিলেন;—"সেকি বাবাজি তুমি বাজনা শুন্‌তে বসিলে তো চলিবে না। শেষটা কি কাজটা পণ্ড হবে না কি? রাত্রি প্রায় বারোটা বাজে, লগ্নভ্রষ্ট করে ফেল্লে দেখ্‌ছি।"

রুদ্রকান্ত মাতুলের পৃষ্ঠে হাত দিয়া কহিলেন,—"আমি থাক্‌তে তোমার কোন চিন্তা নাই বাবা তুমি বস, বাজনা শুন। এখনও ৭টা বাজে নাই। ভয় কি?

রুদ্রকান্ত এই বলিয়া টানিয়া রামকৃষ্ণকে পার্শ্বস্থ মোড়ায় বসাইলেন। রামকৃষ্ণ কলের সঙের ন্যায় বসিয়া রহিলেন। সকলে আমোদ কৌতুকে প্রমত্ত রহিলেন।

এই অতুল আনন্দ-সাগর মধ্যে ঘোরতর বিষাদ রহিয়াছে। এই সুখ-রাশির মধ্যে একজনের হৃদয় দুঃখের মুহুর্ম্মুহু দহনে দগ্ধ হইতেছে। এই আমোদ-স্রোত মধ্যে এক-জনের নেত্র অশ্রু বর্ষণ করিতেছে। এই সমারোহ মধ্যে একজন জগৎ শূন্যময় দেখিতেছে। এই উৎসাহ রাশির মধ্যে একজনের হৃদয় হতাশে পরিপ্লাবিত হইতেছে। দুই তিনটী প্রকোষ্ঠ পার্শ্বস্থ একটি সুপ্রশস্ত প্রকোষ্ঠে বসিয়া বিমলা রোদন করিতেছেন। নিকটে আর কেহ নাই। সমস্ত দিন তাঁহার নিকটে একজন দাসী ছিল। অধুনা বিমলা কৌশল ক্রমে তাহাকে স্থানান্তরিত করিয়াছেন। বিমলা একাকিনী। তাঁহার দেহে সে রূপ নাই, সে ভুবনমোহিনী মধুরতা নাই। বিমলার পূর্ব্ব শ্রী অন্তর্হিত হইয়াছে। অদ্য এক সপ্তাহকাল সরলা বিমলা রুদ্রকান্তের চাতুরিতে পিঞ্জরাবদ্ধা হইয়াছেন; এই সপ্তাহ মধ্যে তাঁহার পরিবর্ত্তনের সীমা নাই। যদিও অত্যাচার তাঁহাকে উৎপীড়িত করে নাই,

তথাপি বিমলার চিন্তার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। যে সরলা বালিকা সংসারের কিছুই জানে না, যাহার হৃদয়ে পবিত্রতা ভিন্ন অন্য কিছুরই স্থান নাই, তাহার এই ঘোর দুর্দ্দশা। কোথায় অবন্তীপুর, কোথায় জননী, কোথায় যোগেশ, আর কোথায় বিমলা? অদ্য বিমলার বিবাহ! কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! জোর করিয়া, ছলনা করিয়া, অদ্য—অদ্যই কেন আর দুই ঘণ্টা পরে শত্রুগণ বিমলার বিবাহ দিবে। তাঁহার ইচ্ছার বিরোধে তাঁহার রুচির বিরোধে, তাহার কাকুতি, মিনতি, রোদন উপেক্ষা করিয়া নিকৃষ্ট রামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার বিবাহ দিবে। রামকৃষ্ণ নিকৃষ্ট বা ঘৃণিত জীব না হইয়া যদি স্বর্গের দেবতা হইত, যদি তাহার রূপরাশিতে ভুবনমোহিত হইত, তাহার বিদ্যা অতুলনীয় হইত, তাহার গুণ অসামান্য হইত, তাহা হইলে বিমলার হৃদয়ে রামকৃষ্ণের নাম একটীও অঙ্কপাত করিতে পারিত না। যে হৃদয় যোগেশের তাহা যোগেশেরই। বিমলার হৃদয় তো তাঁহার নয়—তাহা যোগেশের। তবে এ অসম্ভব চেষ্টা কেন? এ কথা বুঝে কে?

একাকিনী বিমলা বসিয়া রোদন করিতেছেন। তাঁহার নিবিড় কুন্তলরাশি অবেণী-সংবদ্ধ হইয়া, বদনের কিয়দংশ আবৃত করিয়া ভূপৃষ্ঠে বিলুণ্ঠিত হইতেছে। গৃহমধ্যে এক খানি শয্যাচ্ছাদিত পর্য্যঙ্ক রহিয়াছে। বিমলা তাহা স্পর্শ না করিয়া মৃত্তিকায় বসিয়া আছেন। তাঁহার লোচনযুগল রক্তবর্ণ, দেহ ধূলিসমাচ্ছন্ন, কেশরাশি বিশৃঙ্খল, পরিধেয় মলিন, দেহ নিরাভরণ! বিমলা যেন সে বিমলা নহেন। বহুক্ষণ এক মনে বসিয়া, আত্ম-অবস্থা চিন্তা করিতে করিতে বিমলা দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে কহিলেন,—"এ জীবনে কাজ কি? যে জীবনে সুখ নাই সে জীবন রাখিবার প্রয়োজন কি? না—কাহার জীবন রাখিব? যাহার সম্পত্তি তাঁহার চরণে যদি ইহা সমর্পণ করিতে না পারিলাম, তবে এ বোঝা বহিবার প্রয়োজন? না এ জীবন রাখিব না।"

বিমলা আত্মহত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সে স্থান হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। অদূরে একখানি পিঁড়ি পতিত ছিল, বিমলা তৎসমীপে গিয়া উপবেশন করিলেন। তিনি স্থির করিয়াছিলেন, সেই পিঁড়ির আঘাতে মস্তক চূর্ণ করিবেন। বিমলা পিঁড়ি উঠাইলেন। প্রকোষ্ঠের চতুর্দ্দিকে একবার নেত্রপাত করিলেন। জড়জগতের প্রতি আজ তাঁহার এই শেষ দৃষ্টি। লোচন দিয়া এক ফোঁটা, দুই ফোঁটা করিয়া বহু বিন্দু জল পড়িতে লাগিল। বিমলা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—

"যোগেশ! প্রিয়তম! প্রাণনাথ! হৃদয়বল্লভ! এ জীবনে তোমার সহিত আর সাক্ষাৎ হইল না। তোমার নিরুপম বদন আর দেখিতে পাইব না। না পাই—আমার আশা আছে। আমি এ পৃথিবীতে থাকিতে পাইলাম না। আমার কি হইল তাহা তুমি জানিতে পারলে না। কিন্তু আমার বড় আনন্দ যে আমি তোমারই থাকিয়া প্রাণ হারাইলাম। হৃদয়েশ! অভাগিনীর সর্ব্বস্ব ধন যোগেশ! আমার চরমকাল আগত।"

এই বলিয়া বিমলা সেই পিঁড়ি উত্তোলন করিয়া বিষম শক্তি-সহকারে স্বীয় মস্তকে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। আঘাত কার্য্য শেষ হইবামাত্র ভয়ানক শব্দে প্রকোষ্ঠের রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত হইল এবং ব্যস্ততা সহকারে যোগেশ তথায় প্রবেশ করিলেন! যোগেশ দেখিলেন, বিমলার দেহ রুধিরপ্লাবিত, চৈতন্য-শূন্য,

ভূপতিত। তাঁহার সংজ্ঞা লোপ হইল। উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—"বিমলা! বিমলা!"

উত্তর পাইলেন না।

"আমার বিমলার এ অবস্থা কে করিল?" বলিয়া যোগেশ সংজ্ঞা রহিত হইয়া বিমলার শোণিতাক্ত দেহ-পার্শ্বে পড়িয়া গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

দেবী।

সায়ংকালে মালতী সৌধ-শিখরে উপবেশন করিয়া আছেন। তাঁহার বদন দারুণ বিষাদ চিহ্নে পরিপূর্ণ; তাঁহার দেহ শ্রীভ্রষ্ট, তাঁহার নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ। মালতীর কেশপাশ বিশৃঙ্খল, শরীর আভরণ পরিশূন্য। মালতী বিষাদিনী।

মালতী একাকিনী নহেন, তাঁহার পার্শ্বে কুমুদিনী নাম্নী একজন প্রতিবেশিনী যুবতী কামিনী উপবিষ্টা।

মালতীর উদ্বেগের কারণ কি? কেন এ কুসুম-কুমারলতিকা অকালে শুকাইতেছে? কেন ইহার উৎসাহ, আনন্দ ও সজীবতা বিনষ্ট হইতেছে? কেন এ বসন্তের কোকিল গাইতেছে না? কেন এ নবীনা জরা, মরণ ও বার্দ্ধক্যের সাধনা করিতেছে? ইহার একই উত্তর। হৃদয়হীন রুদ্রকান্তই এই সমস্ত অনর্থের মূল।

রুদ্রকান্তের কলঙ্ক সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। অবন্তীপুরের তাবতের মুখে এই কথা। জমীদারের শাসন-ভয়ে মুখ ফুটিয়া কেহ এ কথা বলিতে পারিতেছে না, কিন্তু দুই ব্যক্তি একত্র হইলেই এই কথার আন্দোলন করিতেছে। রুদ্রকান্ত বিমলাকে হরণ করিয়া বলরামপুরের কুঠিতে রাখিয়াছিলেন। তথায় গঙ্গাগোবিন্দের জামাতা ও পুত্র পুলিশের সাহায্যে রুদ্রকান্ত ও তাঁহার অনুচরবর্গকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। অধুনা তাঁহারা হাজতে আছেন। এই সংবাদ অত্যল্পকাল মধ্যে অতিশয় পল্লবিত হইয়াছে এবং বহুবিধ আকার ধারণ করিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে। গৃহ-দাহের পর গঙ্গাগোবিন্দ সপরিবারে অবন্তীপুর ত্যাগ করিয়াছেন। কেশব তাঁহাদিগকে লইয়া গিয়া রামনগরস্থ নিজ ভবনে রাখিয়াছেন। যোগেশকে রুদ্রকান্ত বিনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। যোগেশ মৃতকল্প হইয়াও বাঁচিয়া উঠিয়াছেন। সর্ব্বত্র প্রচার যে, রুদ্রকান্তের চতুর্দ্দশ বৎসর কারাবাস দণ্ড বিহিত হইবে। একমাত্র সন্তানের এবংবিধ বিপদে বরদাকান্ত ও তাঁহার পত্নী নিতান্ত কাতর হইয়াছেন। পুত্রের মুক্তির জন্য তাঁহাদিগকে যে যাহা বলিতেছে, তাঁহারা তাহাই করিতেছেন। বাটীতে পুরোহিত স্বস্ত্যয়ন পাঠ করিতেছেন ও বরদাকান্তের স্ত্রীকে অভয় দিতেছেন। ব্রাহ্মণ নারায়ণকে তুলসী দিতেছেন। দেবীর পূজা চলিতেছে। মঙ্গলচণ্ডীর নিকট ষোড়শ উপচারে পূজা দিবার মানসিক হইতেছে। অনুগত পৌরকামিনীরা আগ তুলিতেছে ও শুভ সংবাদের আশা জানাইতেছে। সকলে বিপন্মুক্তির আশ্বাস দিতেছে। বরদাকান্ত মোকদ্দমার তদ্বিরে অর্থের শ্রাদ্ধ করিতেছেন। কর্ম্মচারিগণকে উৎকোচ, উকীলের খরচ, ব্যারিষ্টারের ফি, লোকের বক্‌সিস্ ও যাতায়াতের ব্যয় প্রভৃতি অসংখ্য বাবদে অর্থ-রাশি ধূলির ন্যায় উড়িতেছে। অর্থ বা

সম্পত্তি কিছুরই দিকে তখন আর কাহারও লক্ষ্য নাই। সাত দিন রুদ্রকান্ত অবরুদ্ধ হইয়াছেন। এই কয় দিনে বরদাকান্ত অন্যূন দশ সহস্র মুদ্রা খরচ করিয়াছেন। অধুনা রুদ্রকান্তকে জামিনে খালাস করিবার প্রযত্ন হইতেছে। তজ্জন্ত আবেদন করা হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাতে সম্পূর্ণ অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। বরদাকান্ত প্রাণপণে স্বীয় উদ্দেশ্ত সিদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন।

সন্ধ্যা সময়ে মালতী ছাতের উপর বসিয়া পতির এই নিদারুণ বিপদের ভাবনা ভাবিতেছেন। যদিও রুদ্রকান্ত তাঁহার প্রতি সদয় ব্যবহারে নিতান্ত বিমুখ, তথাপি মালতী জানিতেন, এ সংসারে রুদ্রকান্তই তাঁহার সর্ব্বস্ব। রুদ্রকান্তের ব্যবহার নিতান্ত বর্ব্বরোচিত হইলেও সাধ্বী মালতী নিয়তকাল রুদ্রকান্তের হিত ও কল্যাণ-কামনায় রত। সেই জন্তই পতির অশুভ সংবাদ শ্রবণে সুন্দরী বিরলে বসিয়া অশেষ চিন্তায় ভাসিতেছেন। সেই জন্ত তাঁহার ঢুলু ঢুলু সুন্দর মুখখানি অস্তোন্মুখ শরচ্চন্দ্রের ন্তায় বিষণ্ণ ও দীপ্তিহীন, সেই জন্তই তাঁহার দেহ ভূষণ-শূন্য, পরিচ্ছদ মলিন, শরীর কাতর ও অবসন্ন।

একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পরে কুমুদিনী কহিল,—"অনর্থক ভাবনা ভাবিয়া এরূপে শরীর পাত করিলে কি হবে? আজ সাত দিন তোমার স্নান নাই, আহার নাই; ইহাতে কি জীবন থাকিবে? বউ! ওঠ, কিছু খাওগে।"

মালতীর নেত্র দিয়া দরদরিত ধারায় অশ্রু পড়িতে লাগিল। তিনি বস্ত্রাঞ্চলে বদনাবৃত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

কুমুদিনী আবার কহিল,—"অনর্থক কেঁদে তো কোনই উপকার হবে না। তবে কেন কেঁদে কেঁদে দেহপাত কর।"

মালতী রোদন-বিকম্পিত স্বরে কহিলেন,—"ঠাকুরঝি! আমার পোড়া কপাল। আমার মত হতভাগিনী এ জগতে আর কেহ নাই।"

কুমুদিনী বাধা দিয়া কহিল,—"বালাই! শত্রুর পোড়া কপাল হ'ক। তোমার মত ভাগ্যধরী আর কে আছে?"

মালতী কহিলেন,—"শুন ঠাকুরঝি! আজ আমার স্বামী হয় তো কতই যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, কতই ক্লেশ পাইতেছেন, আর আমি অভাগিনী পরমসুখে বসিয়া আছি। ছিঃ! আমার মরণই মঙ্গল।"

কুমুদিনী কহিল,—"তা তোমার দ্বারা তো তাঁর এ বিপদের কোনই উপকার হবে না। তবে তুমি কি করিবে?"

"ঠাকুরঝি! তবে স্ত্রী হইয়া সোণার পুতুল সাজির, আমরা কি জন্ত? আমি যদি তাঁর বিপদের সময় কোন কাজেই না লাগিলাম, কোন উপকারই না করিলাম, তবে আমি তাঁর কিসের আপনার? তবে আমাতে আর পরে প্রভেদ কি?"

মালতী আবার কাঁদিতে লাগিলেন। কুমুদিনী কহিলেন,—"তা এর জন্তে এত চিন্তাই বা কি? বড় মানুষের ছেলের এমন কত বিপদ হয়ে থাকে। আবার টাকার জোরে সবই কেটে যায়। দাদাবাবুর এ বিপদও কেটে যাবে।"

"না ঠাকুরঝি, তুমি আমার কাছে মিছে কথা বলো না। সকল লোকেই বলছে যে এবার বড় সর্ব্বনেশে দায় হয়েছে।"

মালতীর চক্ষু দিয়া আবার জল পড়িতে লাগিল। কুমুদিনী আবার কহিল,—"বউ! তুমি ছেলে মানুষ। লোকে এক গুণ কথাকে

দশ গুণ করে বলে ; তুমি কি তা জান না ? লোকের কথা মনে কত্তে নাই।”

মালতী অতীব ক্লেশব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন,—“আমার স্বামীর নিন্দা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। লোকে কেবল সেই কথা বলাবলি করিতেছে। তিনি যে এই ঘটনায় চিরকলঙ্কিত হয়ে থাক্‌বেন, এই আমার বড় দুঃখ।”

“এ কলঙ্ক দুদিনের জন্য, বড় মানুষের ছেলের এ নিন্দা কি চিরদিন থাকে ?”

মালতী এ কথা শুনিয়াই বলিলেন,—“যেখানে তাঁহার কথা উঠিবে, সেইখানেই লোকে যে তাঁহার নিন্দা করিবে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে লোকে তাঁহাকে অশ্রদ্ধা করিবে, তাঁহাকে যে সকলে ঘৃণা করিবে, সে কষ্ট আমার সহিবে না।।”

কুমুদিনী কহিল,—“তুমি কি পাগল হয়েছ ? লোকের কি সাধ্য, তাঁর কথায় কথা কয়, তাঁহাকে একটা মন্দ কথা বলে ?”

মালতী বলিলেন,—“ভয়ক্রমে লোকে যদি মনের কথা প্রকাশ না করে, তথাপি তাহাদের মনে মনে তো অশ্রদ্ধা হবে ?”

“তা কি করবে বল বউ ! সকলই ভগবানের ইচ্ছা। মানুষের কখন কি যে বুদ্ধি উপস্থিত হয়, তার কি ঠিক আছে ? তা না হলে আর এমন ঘটনা হবে কেন ?”

“দেখ তাঁর কেমন মন—তিনি আমার একটী কাথাও শুনেন না, আমার কাছে কোন কথাই বলেন না। তা না শুনুন, না বলুন, আপনি যদি একটু বুঝে চলেন তা হইলে আর কিছুই হয় না।”

“তাঁরও তত দোষ নাই। শুনতে পাই মামার কুপরামর্শেই এই সব বিপদ ঘটিয়াছে।”

“যার পরামর্শেই হউক, আর যে [illegible] [illegible] হৌক তাঁরই [illegible]। মা

মঙ্গলচণ্ডীর ইচ্ছায় এবার তিনি খালাস হয়ে এলে আমি তাঁকে আর কখন এমন সব কাজ কত্তে দেব না।”

“তিনি তো তোমার কথা শুনেন না, তুমি তাঁকে বারণ করবে কিরূপে ?”

“আমি তাঁর পায়ে ধরবো, তাঁর পায়ে মাথা কুট্‌বো, আর বল্‌বো তুমি ছাড়া আমার আর কেহই নাই। তুমি আমাকে এমন করে কাঁদিও না। তোমার কষ্ট হলে আমার বার পর নাই কষ্ট হয়। তিনি তা হলে, আমার কথা শুন্‌বেন।”

“তা এ রকম কথা এতদিন বলনি কেন ?”

“এতদিন ভাবতাম যে, তিনি যা করে সুখী হন, যাতে ভাল থাকেন, তাই করুন।”

“দাদার ঐ কথাটী মহৎ দোষ, আপনি যাহা ভাল বুঝেন তাই করেন, তিনি কারও কথা শোনেন না।”

“না ভাই ! তোমরা তাঁকে জান না। তাঁর মন বড় ভাল। কেবল পাঁচ জনের কুপরামর্শে আর সঙ্গদোষে তাঁর নানা প্রকার দুর্ম্মতি ঘটে। তাঁর মত সরল প্রকৃতির লোক বড় কম। লোকে যদি এমন করে সর্ব্বনাশ না করতো, তা হলে তুমি দেখতে পেতে তিনি কেমন লোক। মা মঙ্গলচণ্ডি ! এই কর যেন, এবার তাঁর কিছু না হয়।”

মালতীর চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল।

কুমুদিনী বলিল,—“বউ ! উঠ অনেক রাত্রি হয়েছে। এখানে আর বসে থাকা ভাল নয়। চল ঘরে যাওয়া যাউক।”

কুমুদিনীর অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া সরলা, স্বামীপরায়ণা, কামিনী-কুল-কমলিনী মালতী সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। কুমুদিনী তাঁহার পশ্চাতে চলিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

ভ্রম।

বিমলার বিপদ দূর হইয়াছে ; রুদ্রশাস্ত্রের হস্ত হইতে সেই সুন্দরীকে উদ্ধার করা হইয়াছে। উপযুক্ত চিকিৎসকের সুব্যবস্থায় এবং আত্মীয়গণের প্রাণপণ যত্নে বিমলা সুস্থ হইয়াছেন। আঘাতজনিত তাঁহার মস্তকের ক্ষত শুষ্ক হইয়াছে এবং তাঁহার কোন চিহ্নও এখন সে স্থানে বর্ত্তমান নাই। তাঁহার দেহ এখনও দুর্ব্বল আছে ; অচিরে সে দুর্ব্বলতা তিরোহিত হইবে বলিয়া সকলেই আশা করিতেছেন।

রামনগরে কেশবের ভবনে সকলেই এখন অবস্থিতি করিতেছেন, নরেন্দ্র মনোরমা আসিয়াছেন, অবন্তীপুর হইতে বিমলার জননী আসিয়াছেন, গঙ্গাগোবিন্দ গৃহদাহের পর হইতে এই স্থানেই অবস্থিতি করিতেছেন। যোগেশ বিমলাও এই স্থানেই রহিয়াছেন। পরম আনন্দে দিন কাটিতেছে।

প্রাতঃকালে বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণে গঙ্গাগোবিন্দ ও কেশব দুইখানি কাষ্ঠাসনে বসিয়া নানাপ্রকার পরামর্শ করিতেছেন। দূরে যোগেশ ও নরেন্দ্র নাথের মূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হইল। কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে যে এক দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ, সুদীর্ঘ ধবলকেশ পুরুষ আসিতেছেন, তিনি কে? কেশব তাঁহাকে জানেন না, আর কখন কোথাও দেখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার মনে হইল না। কিন্তু গঙ্গাগোবিন্দ একটু চঞ্চল হইলেন, কোথায় যেন এই ব্যক্তিকে দেখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার বোধ হইল ; যেন কোন সময়ে এই পুরুষের সহিত পরিচয় ছিল বলিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল। ক্রমেই নবাগত পুরুষ সঙ্গীদ্বয়সহ অগ্রসর হইয়া নিকটস্থ হইলেন। তখন গঙ্গাগোবিন্দ আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং একপদ অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—"কেও শ্যামলোচন ভাই নয়?"

আগন্তুক বলিলেন,—"হাঁ দাদা! আমি সেই অধম ভাইটি এতকাল পরে আপনার সম্মুখে উপস্থিত। এখন আর আমি শ্যামলোচন নহি—এখন আমি কৃষ্ণগোবিন্দ নামে পরিচিত হইয়া সামান্য পল্লীগ্রামে বাস করিতেছি।"

গঙ্গাগোবিন্দ সানন্দে কৃষ্ণগোবিন্দকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—"আর যে তোমাকে কখন দেখিতে পাইব, এরূপ আশা আমার মনে ছিল না। আজি তোমাকে দেখিয়া যে কি আনন্দ হইল, তাহা বলিতে পারি না। যোগেশ মৃতকল্প হইয়াছিলেন ; তুমি সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছ। তোমারই ব্যবস্থায় এবং চেষ্টায় দুর্ব্বৃত্তগণের হস্ত হইতে বিমলা উদ্ধার পাইয়াছেন। তোমার নিকট আমরা অসীম ঋণে বদ্ধ। কিন্তু সে জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অনাবশ্যক। তুমি চিরদিনই অতিশয় সদাশয়। বিশেষতঃ তুমি আমার অভিন্ন-হৃদয় বাল্যবন্ধু। তোমার দ্বারা আমার প্রভূত উপকার চিরদিনই হইয়াছে ; এখনও হইতেছে।"

কৃষ্ণগোবিন্দ বলিলেন,—"ধন্য তুমি! ধন্য তোমার মহত্ব! আমি বঞ্চনা করিয়া তোমার বিষয় কাড়িয়া লইয়াছি। আমি তোমার অকৃত্রিম হিতৈষিতার প্রতিদান করা দূরে থাকুক, তোমার সহিত অশেষ দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছি, তথাপি তুমি আমাকে সদাশয় বলিয়া উল্লেখ করিতেছ। আমি জানিতাম, সাক্ষাৎ হইলে তুমি আমাকে পদাঘাতে দূর করিয়া দিবে ; তাহা না করিয়া প্রেমালিঙ্গন

দানে তুমি এ অধমকে চরিতার্থ করিতেছ। এ সকলই তোমার অশেষ মহত্ত্বের পরিচয় দিতেছ।"

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন,—"তুমি কি বলিতেছ? তুমি কোথায় আমার বিষয় কাড়িয়া লইয়াছ? তুমি আমার পরম মিত্র। তুমি ভ্রমেও কখন আমার সহিত কোন দুর্ব্যবহার করিয়াছ, ইহা আমার মনে হয় না। তবে এরূপ কথা বলিতেছ কেন?"

কৃষ্ণগোবিন্দ কিয়ৎকাল সবস্ময়ে গঙ্গাগোবিন্দের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন,—"তবে কি? রাধাপুরের চর তোমার পৈতৃক সম্পত্তি। আমি তাহা এক নাবালকের অছির নিকট ক্রয় করিয়া দখল করি। ইহা কি প্রবঞ্চনা নহে? ইহা যদি প্রবঞ্চনা না হয়, তাহা হইলে চন্দ্র সূর্য্য মিথ্যা!"

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন,—"তোমার বিষম ভুল হইয়াছে ভাই। রাধাপুরের চর আমার পৈতৃক সম্পত্তি নহে। যে নাবালকের কথা তুমি বলিতেছ, তিনি এখন সাবালক ও সম্ভ্রান্ত লোক হইয়াছেন। সম্পত্তি তাঁহারই। আমি তাঁহার দরপত্তনিদার ছিলাম মাত্র। তুমি ক্রয় করায় আইন অনুসারে আমার স্বত্ব লোপ হইয়া যায়। ইহাতে তোমার বঞ্চনা বা ফাঁকি দেওয়া কিছুই হয় নাই তো।"

কৃষ্ণগোবিন্দ বলিলেন,—"বল কি? আমি জানিতাম, যে নাবালকের অছি, আমাকে তাহা বিক্রয় করিল, তাহারা তাহার প্রকৃত অধিকারী নহে; সামান্য একটা দলিলের বলে আমার সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তাহারা বিক্রয় করিয়া ফেলিল। তাহার পর সে কথা তোমাকে জানাইয়া তোমার দরপত্তনি স্বত্ব আমার বজায় রাখা উচিত ছিল। আমি তাহা না করায় ভয়ানক দুর্ব্যবহার হইয়াছে সন্দেহ নাই।"

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন,—"কিছু না। তুমি আমাকে সে বিষয়ে বাধ্য করিয়া বদ্ধ কর নাই, ইহা তোমার অতিশয় সদ্ব্যবহার হইয়াছে। তুমি কি জান না ভাই, রাধাপুরের চরে আমার ভয়ানক লোকসান হইতেছিল। তুমি আমাকে সে দায় হইতে অব্যাহতি দিয়া আমার মহদুপকার করিয়াছ। সে কথা যাউক, তুমি কেন সহসা দেশত্যাগী হইয়াছিলে? এত দিন তুমি কোথায় ছিলে? কেন নাম বদলাইয়া ফেলিলে?"

কৃষ্ণগোবিন্দ বলিলেন,—"কথাটা ছেলে-পিলের সম্মুখে ... করিয়া বলা উচিত নয়। তুমি জান, আমার একটা মহৎ দোষ ছিল। স্ত্রীলোক ঘটিত বিষয়ে আমি একটু শিথিল ছিলাম। এজন্য কত দিন তোমার নিকট কত তিরস্কার আমি ভোগ করিয়াছি। কিন্তু দোষটা সম্পূর্ণ ছাড়িতে পারি নাই। ছেলেদের সম্মুখে বলিই বা কি? এই রামনগরের এক কুলীন কন্যার সহিত আমার আলাপ হয়। তাঁহার সহিত বিবাহ হইবার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া আমি তাঁহাকে লইয়া পলাতক হই। কাণ্ডটা বড় গুরুতর হইয়া পড়িবে বুঝিয়া আমি খুব দূর দেশে গিয়া নাম বদলাইয়া বাস করি। তোমার সহিত চিরদিনের ভালবাসা, তাই তোমার নামের শেষ নিজের নামের সহিত গাঁথিয়া লই।"

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন,—"এইরূপ একটা জনরব সে সময়ে আমার কর্ণগোচর হইয়াছিল বটে, তার পর?"

কৃষ্ণগোবিন্দ বলিলেন,—"তার পর সকলই শুভ হইয়া গিয়াছে। সেই নারীকে আমি বিবাহ করিয়াছি। এখন তিনিই

আমার গৃহিণী। তাঁহার আত্মীয় স্বজন আমাকে জামাতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কলঙ্ক ও দুর্নাম ঢাকিয়া গিয়াছে। এখন দেশের লোক আবার দেশে ফিরিয়া আসিয়াছি।"

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন,—"বেশ করিয়াছ। কত দিনই যে তোমার ভাবনা ভাবিয়াছি, তাহা আর কি বলিব? প্রায় পঁচিশ বৎসর তুমি দেশ ছাড়া ছিলে। তোমার পত্নী এখন কোথায়?"

কৃষ্ণগোবিন্দ বলিলেন,—"তিনি পঁচিশ বৎসর পরে, আজি আমার সহিত রামনগরে আসিয়াছেন, তাঁহাকে তাঁহার পিত্রালয়ে রাখিয়া আমি তোমাদের নিকট আসিয়াছি। ভাবিয়াছিলাম, তোমার সম্মুখে আমি আর মুখ দেখাইতে পারিব না। এক্ষণে তোমার কৃপায় তোমার ক্ষমা লাভ করিয়া আমি বাধিত হইলাম।"

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন,—তুমি চিরদিনই মহৎ, চির দিনই উদার। এখন তোমার মহত্ত্ব ও উদারতা আরও বাড়িয়াছে। তুমি সম্প্রতি আমাদের যে উপকার করিয়াছ, তাহা তোমার ন্যায় বিদ্বান্, বুদ্ধিমান ও উৎসাহী লোকের লোকের পক্ষেই সম্ভব। কেশব, নরেন্দ্র, যোগেশ তোমরা সকলেই এই মহাত্মাকে প্রণাম কর। ইনি আমার সহোদরের অপেক্ষাও আপন।"

সকলেই অতীব বিনম্রভাবে মহাত্মা কৃষ্ণগোবিন্দের চরণে প্রণাম করিলেন। কৃষ্ণগোবিন্দ বলিলেন,—"আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে, তোমরা সকলেই সুখে থাকিবে, তোমরা সর্ব্বগুণে গুণান্বিত। নরেন্দ্র, দেখিতেছ কি, ঐ কাহারা আসিতেছে?"

নরেন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিলেন বাস্তবিক চারি ব্যক্তি তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। বলিলেন,—"ইহাদের তিন জন বলরামপুর নিবাসী—সকলেই আমার পরিচিত। চতুর্থ ব্যক্তিও যেন আমার পরিচিত বলিয়া বোধ হইতেছে। হাঁ উনিও আমার সুপরিচিত। উনি যে কাণপুরে পৌরোহিত্য করিতেন। উনি এখানে কি প্রকারে আসিলেন?"

নবাগত ব্যক্তি চতুষ্টয় সন্নিকটে আসিলে গঙ্গাগোবিন্দ তাঁহাদিগকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তন্মধ্যে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত দাদাঠাকুর, মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও রাম ভায়া ছিলেন। তাঁহারা বসুদিগের চণ্ডীমণ্ডপ অন্ধকার করিয়া, পরনিন্দা ও পরচর্চ্চার স্রোত বন্ধ করিয়া এখানে আজি কেন শুভাগমন করিয়াছেন?

কেহ কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই দাদাঠাকুর বলিলেন,—"ভাই নরেন্দ্র, তুমি আমার ভগ্নীপতি। মনোরমা আমার সাক্ষাৎ মাসতুতো ভগ্নী।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—"কাজেই সম্পর্কে তুমি আমার জামাই। বাবাজি, আমরা না জানিয়া ও না বুঝিয়া তোমার প্রতি অত্যাচার ও মর্ম্ম ব্যবহার করিয়াছি, সে জন্য তুমি কিছু মনে করিও না বাবা।"

রামভায়া বলিলেন,—"সুতরাং আপনি আমাদের ভগ্নীপতি, শালারা ভগ্নীপতিকে চিরদিনই দুটা ঠাট্টা তামাসা করিয়া থাকে। আপনি কোথায় মগের মুল্লুকে বিবাহ করিয়াছেন, সেখানে কোন আমোদ আহ্লাদ করিবার সুযোগ হয় নাই; তা না হয় দেশে ফিরিয়া আসার পর হইয়াছে। আপনি সে জন্য কিছু মনে করিবেন না।"

পুরোহিত ঠাকুর বলিলেন,—"আমি

বিবাহ দিয়াছি, খবরবার সকলই আমার জানা। আমি এতদিন কাণপুরে যাজকতা করিয়া দশ টাকা সঞ্চয় করিয়াছি। এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি, তাই আর বিদেশে থাকিতে ভাল লাগে না—কয়েক দিন হইল দেশে ফিরিয়া আসিয়াছি। এই কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু সকলই জানেন, আমি আর কি বলিব?

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু পকেট হইতে একখানি পুরাতন পত্র বাহির করিয়া বলিলেন,—"নরেন্দ্রনাথের শ্বশুর মহাশয়ের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। এই বন্ধুত্ব পশ্চিমেই ঘটে। ক্রমে জানিতে পারি, তিনি আমাদের দেশেই বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার সে পত্নী বলরামপুরের এই সরকারী দাদা-ঠাকুরের মাসী। নরেন্দ্রনাথের শ্বশুর অতিশয় ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁহার অবস্থা বড় মন্দ ছিল। তাঁহার লোকান্তর গমনের বৃত্তান্ত আমি জানি, নরেন্দ্রনাথের সহিত মনোরমার বিবাহের বৃত্তান্ত আমি জানি। এই পত্র পাঠ করিলে আপনারাও সকল কথা জানিতে পারিবেন।"

তখন দাদাঠাকুর বলিলেন,—'ভাই নরেন্দ্র, আমাদের ক্ষমা কর। যাহা হইবার হইয়াছে। এখন চল, আমাদের সহিত আবার বলরামপুর যাইতে হইবে।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—"দেশের সকল লোকই তোমাদের জন্য হায় হায় করিতেছে। আর এখানে থাকিয়া কাজ নাই বাবাজি।"

রামভায়া বলিলেন,—"আমরা আপনাদের লইয়া যাইতে আসিয়াছি। আর ইতস্ততঃ করিয়া কাজ নাই।"

পুরোহিত ঠাকুর বলিলেন,—"আমি নিয়ত নরেন্দ্র বাবুর কল্যাণে [illegible] তুলসী দিয়া থাকি। নরেন্দ্র বাবুর বড় পদ হইলে অবশ্যই আমার কথা ভুলিবেন না।"

নরেন্দ্র বলিলেন,—"আপনারা যে প্রকৃত বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়াছেন, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। সম্প্রতি অন্যান্য অনেক গুরুতর প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া আমাকে কিছু দিন এখানেই থাকিতে হইবে। তাহার পর আমি নিশ্চয়ই বলরামপুর গিয়া মহাশয়দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিব। আপনারা সকলেই আমার পরম আত্মীয় ব্যক্তি। আমি সবিনয়ে আপনাদিগকে নমস্কার করিতেছি।"

যোগেশ বলিলেন,—"নরেন্দ্র বাবুর সম্বন্ধে নানাবিধ কুৎসা রটনা করিয়া গ্রামস্থ লোকে তাঁহাকে ও তাঁহার গুণবতী পত্নীকে বড়ই বিব্রত করিয়াছেন। কথা যে সম্পূর্ণ অমূলক তাহা আমরা বেশ জানিতাম। কিন্তু এক্ষণে তাহা অবিসংবাদিত ও নিঃসন্দিগ্ধভাবে সকলের মানিয়া লওয়ায় আমরা পরমানন্দ লাভ করিলাম। এ শুভ যোগাযোগ এই খুড়া মহাশয়ই ঘটাইয়াছেন। আমরা ভাগ্যক্রমে যে খুড়া মহাশয় লাভ করিয়াছি, তাঁহার কৃপায় আমাদের সকল বিপদ ও সকল অসুবিধা দূর হইতেছে।"

কৃষ্ণগোবিন্দ বলিলেন,—"এখন কথা হইতেছে, মুখোপাধ্যায় মহাশয়, পুরোহিত ঠাকুর, দাদা ঠাকুর, রাম ভায়া তোমরা সকলে আজি এখানে থাকিয়া যাও, কালি যাহা হয় পরামর্শ স্থির হইবে।"

কেশব বলিলেন,—"এই সকল মহাত্মা যখন নরেন্দ্র বাবুর আপনার লোক, তখন আমরা আজি উঁহাদের ছাড়িয়া দিব কেন?"

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন,—"দেখিতেছি রামলোচন ভায়া, তুমি একজন প্রকৃতই মহাত্মা হইয়া উঠিয়াছ। তুমি চিরদিনই

বিশেষ উদ্যোগী, তৎপর ও বুদ্ধিমান। এখন যেন সেই সকল গুণ শতগুণে বৃদ্ধি হইয়াছে। আর তোমাকে এক দিনও আমরা চক্ষুছাড়া হইতে দিব না। তোমার গৃহিণীকে এখনই এ বাটীতে আনিবার ব্যবস্থা কর। আপনারা সকলে এখন বিশ্রাম করুন, স্নানাহার করুন। তার পর সময় মত অন্যান্য ব্যবস্থা হইবে।”

মুখোপাধ্যায় একটু চিন্তার পর দাদার মুখের দিকে চাহিলেন, দাদা একটু মাথা চুলকাইয়া ভায়ার দিকে চাহিলেন, ভায়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া পুরোহিতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, পুরোহিত একটু কাতর ভাবে নরেন্দ্র বাবুর দিকে চাহিলেন। তাঁর পর প্রাণপণে তামাকের শ্রাদ্ধ করিতে বসিলেন এবং সেখানেই সেদিন আড্ডা স্থাপন করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

আবার।

রামনগরে কেশবের ভবনের একতম প্রকোষ্ঠে যোগেশ ও বিমলা বসিয়া আছেন। যোগেশ প্রকোষ্ঠ মধ্যস্থ কোচে উপবিষ্ট। বিমলা তাঁহারই পার্শ্বস্থ। বিমলার মুখ যোগেশের বক্ষের উপর ন্যস্ত।

বিমলা বলিতেছেন,—“আর যে কখন তোমাকে দেখিতে পাইব, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। এ সুখ আশার অতীত।”

আনন্দে বিমলার চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইল। যোগেশ সাদরে স্বীয় বস্ত্র দ্বারা বিমলার নেত্র পরিষ্কার করিয়া দিয়া কহিলেন,—“বিমল! এখনও তোমার দৌর্ব্বল্য সারে নাই। তোমার ক্ষত সকল সারিয়াছে বটে, কিন্তু তজ্জন্য তোমার যে রক্তক্ষয় হইয়াছে, তাহা এখনও পরিপূর্ণ হয় নাই। কল্যও ডাক্তার সাহেব আমাকে বলিয়াছেন যে তোমার শরীর এখও দুর্ব্বল।”

বিমলা বালিকার ন্যায় যোগেশের বদনের প্রতি চাহিয়া কহিলেন,—“কই না! আমি তো কোন অসুখ বুঝিতে পারি না। আমার যে আনন্দ, তাহার কাছে অসুখ আসিতে পারে না।”

যোগেশ কহিলেন,—“সে কথা মিথ্যা নয়; তোমার আনন্দ মহৌষধের ন্যায় কার্য্য করিয়াছে। চিকিৎসক আমায় বলিয়াছিলেন, এ রোগ ১৫।১৬ দিনে এরূপ আরোগ্য হওয়া বিস্ময়ের বিষয়। পীড়িতার মনের সজীবতা ও প্রফুল্লতা এবংবিধ উপশমের মূল।”

বিমলা বলিলেন,—যোগেশ! আমি যদি মরিতাম, তাহা হইলে আর তোমাকে দেখিতে পাইতাম না—নয়?”

বিমলার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। যোগেশ বিমলার বদন চুম্বন করিয়া কহিলেন,—“বিমলা! তুমি কি ঘোর অবৈধ উপায়ে বিপন্মুক্তের পথ করিয়াছিলে! তুমি তখন জানিতে না যে, সে কার্য্যের পরিণাম কি ভয়ানক।”

বিমলা উত্তর দিলেন—“যোগেশ! সে জন্য আমায় অনুযোগ করিও না। ভাবিয়া দেখ তখন আমার কি অবস্থা! তখন আমার নিষ্কৃতির আর কি উপায় ছিল? যোগেশ, আমি কি এ জীবনে আর কাহারও হইতে পারিতাম?”

যোগেশের হস্তদ্বয় ধরিয়া বিমলা তাহাতে

স্বীয় বদন রক্ষা করিলেন। যোগেশ বুঝিলেন বিমলার চক্ষুর জল তাঁহার হাতে পড়িতেছে। ভাবিলেন সে শোচনীয় অতীত কথার পুনরান্দোলনা অনাবশ্যক। কহিলেন,—"বিমলা! কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু আর মনোরমার ঋণ ইহজন্মে শোধিতে পারিব না।"

বিমলা বলিলেন,—"দুর্ভাগ্যক্রমে কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুকে আমি দেখি নাই। তোমাদের মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া বুঝিয়াছি, তিনি দেবতা। কিন্তু নরেন্দ্র মনোরমার মত সুন্দর লোক আর দেখি নাই। মনোরমা যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। কি আশ্চর্য্য স্বভাব, তাঁহাদের কি পবিত্র প্রেম। আমার ইচ্ছা করে নরেন্দ্র-মনোরমাকে সিংহাসনে বসাইয়া পূজা করি। যোগেশ! তোমরা তাঁহাদের সুখের পথ যাহাতে মুক্ত হয়, তাহার উপায় করিয়া দেও। তাঁহাদের তো কোনই দোষ নাই।"

যোগেশ বলিলেন,—"কেশব বলিয়াছেন, তিনি চেষ্টা করিয়া নরেন্দ্রকে রামনগরে কোন ভাল কাজে নিযুক্ত করিয়া দিবেন। আমরা সকলেই তাঁহাদের লইয়া আনন্দ করিব ও অভিন্নভাবে থাকিব, ইহা আমাদের স্থির পরামর্শ হইয়াছে।"

"মনোরমার যে কত সরল ও শান্ত স্বভাব তা তোমাকে কি বলিব?"

"তিনি এখন কোথায়?"

"সরমার কাছে বসিয়া হাসিতেছেন, আর তাস খেলিতেছেন।"

"ইতর মনুষ্যেরা তাঁহাদের উপর যে নির্য্যাতন করিয়াছে তাহাতে এ জীবনে যে তাঁহারা আনন্দের মুখ দেখিতে পাইবেন, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই।"

বিমলা কহিলেন,—"দুষ্ট রুদ্রকান্ত কত লোকেরই অনিষ্ট করিয়াছে, তাহার সীমা নাই।"

"পাপের জয় কত দিন থাকে? রুদ্রকান্তের যাবতীয় দুষ্কর্ম্মের শাস্তি এখন আরম্ভ হইয়াছে। হতভাগা অচিরে বুঝিবে যে, এ সংসারে পাপ-পুণ্যের বিচার আছে। ধনসম্পত্তির গর্ব্বে গর্ব্বিত পাপিষ্ঠ এখন বুঝিবে যে, এ সংসারে সকলেই সমান।"

বিমলা কাতর ভাবে বলিলেন—"যোগেশ! তাহার কি হইবে?"

"তাহার যেরূপ অপরাধ, তাহাতে তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত সুদীর্ঘ মেয়াদ হওয়া

"মেয়াদে কি হয়?"

"অনবরত পরিশ্রম করিতে হয়, আত্মীয় জনের সহিত সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, অতি কদন্ন সেবন করিতে হয়, জঘন্য বস্ত্র পরিতে হয়, কম্বল গায়ে দিয়া শীত কাটাইতে হয়, পরিশ্রমে বিরত হইলে বা অনিয়ম কার্য্য করিলে মার খাইতে হয়, ইতরের সহিত বাস করিতে হয়—সে ক্লেশের কথা তোমায় কি বলিব?"

"ধনবানের সন্তান, পরমসুখে বাস করা অভ্যাস। যোগেশ! রুদ্রকান্ত কেমন করিয়া এই সকল ঘোর ক্লেশ সহ্য করিবে?"

যোগেশ কহিলেন,—"যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল।"

বিমলা বিষণ্ণ ভাবে কহিলেন,—"যোগেশ! আমরা যদি তাহার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করি, তাহা হইলে কি হয়?"

"তাহা হইলেও তাহার মন্দ হয়।"

বিমলা দুঃখিত হইয়া নীরবে মস্তক বিনত করিয়া রহিলেন। এই সময় কেশবের একটী পশমওয়ালা, সাদা, ছোট কুকুর, সেই ঘরে

প্রবেশ করিয়া লেজ নাড়িতে নাড়িতে, দুলিতে দুলিতে তাঁহাদের পদনিম্নে ক্রীড়া করিতে লাগিল। বিমলা সভয়ে পদদ্বয় সরাইয়া লইলেন। কুকুর তাঁহার সেই রাঙ্গা ছোট পা দুখানির লোভ ছাড়িতে পারিল না। সে আবার তাঁহার-পদ সমীপে গেল।

বিমলা বলিলেন,—"আঃ! আমার বড় ভয় করে।"

পদদ্বয় উঠাইয়া বসিলেন। কুকুর কোচের উপর উঠিল। বিমলা সে স্থান ত্যাগ করিয়া যোগেশের অপর পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিলেন। যোগেশ কুকুরটী ধরিয়া বিমলার গায়ে ফেলিয়া দিলেন।

বিমলা কহিলেন,—"অঁ্যা—অ্যা—আচ্ছা তুমি থাক।"

যোগেশ উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বিমলা স্বয়ং কুকুরটী ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কুকুর যখন অন্য দিকে মুখ ফিরাইল, তখন, তিনি তাহার লেজ ধরিলেন, কুকুর অমনিই তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইল। তিনি তৎক্ষণাৎ সভয়ে তাহা ত্যাগ করিলেন। বিমলার বিশেষ চেষ্টা, যে কোনরূপে হউক কুকুরটী ধরিয়া একবার যোগেশের গায়ে দিতে হইবে; তজ্জন্য তিনি নানাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। বিমলা এবংবিধ অবস্থা দেখিয়া যোগেশ হাসিতে লাগিলেন। সুন্দরী বিমলা তাহাতে আরও কুপিত হইতে থাকিলেন। বিমলা অনেকক্ষণ চেষ্টা করিলেন—কুকুর ধরিতে পারিলেন না।

তাঁহার দুর্দ্দশা দেখিয়া যোগেশ মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিলেন।

বিমলা কহিলেন,—"যাও—আমি তো আর কারও গায়ে কুকুর দিব না।"

যোগেশ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"ছিঃ বিমলা! কুকুর ধর্ত্তে পার্‌লে না।"

বিমলা কহিলেন,—"তুমি ধর দেখি।"

যোগেশ সীস দিয়া "জেনী" "জেনী" বলিয়া ডাকিলেন। "জেনী" নিকটস্থ হইলে তাহাকে ধরিয়া পুনরায় বিমলার গায়ে দিলেন। বিমলা এবার কুকুর ধরিয়া যোগেশের গায়ে দিব বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন। একবার ধরিলেন, কিন্তু ভয়ে ছাড়িয়া দিলেন। কিছুতেই কৃতকার্য্য না হইয়া, অবনত মস্তকে যোগেশের সমীপস্থ হইয়া বলিলেন,—

"আমাকে কুকুর ধরিয়া দেও।"

যোগেশ হাসিয়া বলিলেন,—"কেন?"

বিমলা বলিলেন,—"আমার দায় পড়েছে, আমি কারও গায়ে দিব না।

যোগেশ হাসিয়া উঠিলেন। কুকুর ধরিয়া বিমলাকে দিতে গেলেন। বিমলা কুকুর লইতে পারিলেন না। যোগেশ কুকুর ছাড়িয়া দিয়া বিমলাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—"বিমলা, তুমি সেই পাগলিনী।

এই সময় সরমা হাসিতে হাসিতে, করতালি দিতে দিতে, প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যোগেশ অপর দ্বার দিয়া প্রস্থান করিলেন।

বিমলা কহিলেন,—"কি হয়েছে?"

সরমা হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—"মনোরমা তিনবার হেরেছেন।"

"এই কথা, আমি না জানি কি হয়েছে!"

"ইঃ! আমার সঙ্গে খেলতে পারিস্?"

"আমি মন করে খেল্লে কারাও পাত্তে হয় না।"

"আচ্ছা কাল দেখা যাবে।"

"মনোরমা কোথায়?"

"পার্শ্বের ঘরে নরেন্দ্রের সঙ্গে কথা কচ্চেন।"

"এখানে আসবেন না?"

"তা কি জানি। বিমল! আমাদের সন্দেশ খাওয়া।"

"কেন—অপরাধ?"

"বটে! ডাকি মনোরমাকে? সন্দেশ নিয়ে আয় বল্‌ছি ভাল।"

"কি দরুণ বল।"

"তোর যে বিয়ে"—

"এই কথা—তবু ভাল।"

"কথাটা বুঝি মনে ধল্লো না।"

"আমি বিয়ে করবো না।"

"তবে রামকৃষ্ণের গতি কি হবে?"

বিমলা সাদরে সরমার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—"সরমা, ও পাপ কথা আর তুলো না।"

"তা যাক্—তোর যে সম্প্রতি বিয়ে তা শুনেছিস্?"

বিমলা অবনত মস্তকে কহিলেন,—"আমার বিশ্বাস হয় না।"

"সত্তি বাবা বল্লেন।"

"কি বল্লেন?"

সরমা সহাস্যে কহিলেন,—"বল্‌বো কেন?"

বিমলা কপট ক্রোধে বলিলেন,—"না বল্লে।"

সরমা বিমলার চিবুক ধরিয়া কহিলেন,—"বাবা সকলের সঙ্গে বিবাহের পরামর্শ করে দিন স্থির কল্লেন।"

"মিথ্যা কথা।"

"না ভাই সত্তি। আধ ঘণ্টা আগে সব কথাবার্ত্তা স্থির হ'য়ে গিয়েছে; সবাই যে তার উদ্যোগ ক'ত্তে গেলেন।"

"সবাই কে কে?"

"এই সবাই গেল আর কি!"

"একতো তোমার তিনি, আর কে?"

"হাঁরে হাঁ, তাই সবাই।"

"তার পর?"

"বিয়ে হবে অনন্তীপুর গিয়ে, পরশু আমরা সবাই যাব।"

আনন্দে বিমলার চক্ষু দিয়া দুই ফোটা জল পড়িল।

সরমা আবার কহিলেন,—"নরেন্দ্র মনোরমা যা'বেন, তার পর বিয়ে গেলে সকলকে এখানে আস্‌তে হবে। বাজারের ধারে যে জমি পড়ে আছে, সেখানে নরেন্দ্রের বাড়ী হবে। নরেন্দ্রের কর্ম্ম ঠিক হয়ে গিয়েছে।"

বিমলা সাদরে কহিলেন,—"সরমা! এত সুসংবাদ তোমার পেটে ছিল! বৎসরের মধ্যে যেন তোমার কোলে খোঁকা দেখি।"

সরমা বিমলার বদন চুম্বন করিয়া কহিলেন,—"ভগ্নি! আমিও যেন তোমার কোলে আমার পিতৃবংশের রতন দেখি। তোমার ক্রোড়ে যেন আমার সোহাগের ভাইপো খেলা করে।"

"মনোরমা এত কথা সব শুনেছেন কি।"

"বোধ করি না।"

"তবে চল ভাই! তাঁকে সব বলিগে।"

উভয়ে হাসিতে হাসিতে বাহিরে গমন করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

পশু।

সায়ংকালে মালতী নিজ প্রকোষ্ঠে বসিয়া অকূল চিন্তায় ভাসিতেছেন। হৃদয় যখন দারুণ চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকে, তখন তাহাতে আর

স্থান পায় না। সংসারের আনন্দ, উৎসাহ, কোলাহল; প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন; দুরাকাঙ্ক্ষার বিষাক্ত প্ররোচন; ক্ষুৎপিপাসাদি স্বাভাবিক ও অপরিবর্তনীয় দৈহিক ধর্ম্ম; ভোগ-সুখাদি অদম্য স্পৃহা, কিছুই তৎকালে মনোরাজ্যে প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। মন অবিশ্রান্তভাবে চিন্তা-তরঙ্গে ভাসিতে থাকে। মালতীর মনের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। স্বামীর চিন্তায় তাঁহার মন ডুবিয়া আছে, নিরন্তর চিন্তায় তাঁহার চিত্ত অবসন্ন; তজ্জন্য অধুনা সাংসারিক অন্য কোন ব্যাপারেই তাঁহার মন নাই। মালতীর দেহ এই কয়দিনে নিতান্ত কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার সে শোভা, সে সৌকুমার্য্য চিন্তা-বিষে জর্জ্জরিত হইয়াছে। মালতী একাকিনী!

এ সংসারে রমণীই সার-রত্ন। রমণী এ সংসারের বিপদ-বাত্যা-বিঘূর্ণিত তরণীর কর্ণধার। রমণীর হৃদয় অতি উদার; তাহা প্রীতি, স্নেহ, মমতা ও প্রণয়ের নিকেতন। মালতীর প্রকৃতি কি মনোহর! কি অমানুষী! যে রুদ্রকান্ত স্ত্রীর সহিত এক দণ্ডও আলাপ করিতে হইলে সময় অপব্যয়িত হইল মনে করে; যে হতভাগ্য পত্নীর সুখ দুঃখের কোনই সংবাদ রাখে না; যে কুলাঙ্গার নিয়ত যাতনানলে পবিত্র হৃদয়া সাধ্বীর হৃদয় দগ্ধ করে; যে মূর্খ এ সংসারে আত্ম-সুখ আত্ম-সন্তোষ ও আত্ম-আমোদ ভিন্ন আর কিছুতেই লক্ষ্য করে না; যে নরাধম স্বতঃ পরতঃ সতত স্ত্রীর মর্ম্ম মথিত, বিদলিত ও ব্যথিত করিতে বিন্দুমাত্র কাতর হয় না; সেই পামর স্বামীর কল্যাণ-কামনায় যে স্ত্রী এতাদৃশ চিন্তাকুল নিশ্চয়ই তাঁহার হৃদয় পার্থিব উপাদানে গঠিত নহে। বঙ্গীয় কুলকামিনী জগতের ভূষণ। এবংবিধ প্রশস্ত চিত্ততা বঙ্গীয় পৌরনারী ভিন্ন আর কাহার সম্ভবে?

মালতী একাকিনী বসিয়া আছেন! সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। তিনি তাহা জানিতে পারিলেন না। অন্ধকারে দিঙ্‌মণ্ডল আচ্ছন্ন হইল। কিন্তু মালতীর হৃদয়স্থিত অন্ধকারের নিকটে সে অন্ধকার স্থান পাইল না। দাসী গৃহ মধ্যে প্রদীপ দিয়া গেল। মালতী তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না।

দাসী বলিল,—"বউ ঠাকরুণ! সমস্ত দিন বসিয়া থাকিবে? সন্ধ্যা হয়ে গেল উঠ।"

মালতীর সংজ্ঞা হইল; তিনি চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন। দাসী চলিয়া গেল। মালতী উঠিলেন, পরে গললগ্নী-কৃত-বাসা হইয়া সরোদনে কহিলেন,—

"মা জগদম্বে! আমার স্বামীকে এ ঘোর বিপদ হইতে নিস্তার কর মা। তিনি যদি বুদ্ধির দোষে একটা দুষ্কর্ম্ম করিয়া থাকেন, দয়াময়ি! তুমি তাহাকে মুক্তি দাও। আমি আর তোমায় কি বলিব? তুমি সকলই বুঝিতেছ। তাঁর কষ্ট সহে না যে মা! তাঁর পরিবর্ত্তে যদি আমাকে শাস্তি দিলে হয়, মা আমি তা অনায়াসে সহিতে স্বীকৃত আছি। তাঁকে আর যাতনা দিও না।"—

মালতীর কথা শেষ হইতে না হইতে, তিনি বাহিরে উচ্চ কণ্ঠ-ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। সে ধ্বনি রুদ্রকান্তের কণ্ঠ-নিঃসৃত। মালতী আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সেই দিকে ধাবিতা হইলেন। তাঁহাকে প্রকোষ্ঠের বাহিরে যাইতে হইল না। ঘোর চীৎকার করিতে করিতে রুদ্রকান্ত সেই প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মালতীর কমনীয় ওষ্ঠাধর ভেদ করিয়া পবিত্র হৃদয় হইতে সমুত্থিত অতি মধুর হাস্যের ছটা বাহিরিল।

রুদ্রকান্ত অতি ব্যস্ত ও নিরতিশয় নৃশংস

স্বরে কহিলেন,—"যোগেশকে এ সংবাদ কে জানাইয়াছিল ?"

"কেন ?"

রুদ্রকান্ত সজোরে মালতীর কেশাকর্ষণ করিয়া কহিলেন,—"কেন—এই দেখ কেন ?"

এই বলিয়া হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা মালতীর নবনীতনিভ দেহে প্রচণ্ড আঘাত করিতে লাগিলেন।

মালতী বলিতে লাগিলেন,—আমার দোষ হইয়াছে, আমাকে ক্ষমা কর। তুমি আগে বিশ্রাম কর, পরে আমায় যা হয় দণ্ড করো।"

ক্রোধে তখন রুদ্রকান্তের চক্ষু রক্তবর্ণ বর্ণ হইয়াছে। তাঁহার শরীর কম্পিত হইতেছে। তিনি কহিলেন,—"হতভাগী! ক্ষমা! তোমায় ক্ষমা একেবারেই করিতেছি, দাঁড়াও।"

তিন চারি বার আঘাতের পর মালতী বলিলেন,—"তোমার পায়ে পড়ি, আমায় আর মারিও না।"

নির্দ্দয় রুদ্রকান্ত দ্বিগুণ বলে সুকুমার দেহে আঘাত করিতে লাগিল। কহিল,—"জানিস্ না আমি কে ?"

ক্ষীণ ও কাতর স্বরে মালতী বলিলেন,—তোমার পায়ে পড়ি, আমায় ক্ষমা কর।"

বলিতে বলিতে মালতী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

পাপিষ্ঠ, পশু-স্বভাব, নরকুল-কলঙ্ক রুদ্রকান্ত সেই ভূপতিত প্রসূনবৎ ভুবন-মোহিনী কান্তিকে পদাঘাত করিতে লাগিল। তখন মালতীর নেত্রদ্বয় ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে ও তাহা স্থির হইয়াছে। দেহ অবসন্ন ও কঠিন হইয়াছে। সংজ্ঞা তিরোহিত হইয়াছে। দন্তে দন্ত সংলগ্ন হইয়াছে। বাক্য কথনের শক্তিহীনা মালতীর মুখ হইতে কেবল একটী অপরিস্ফুট যন্ত্রণা-ব্যঞ্জক ধ্বনি নিঃসৃত হইতেছে।

এবংবিধ গোলমাল শুনিয়া পৌরজনেরা ব্যস্ত হইয়া সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। রুদ্রকান্তকে ধরিয়া রাখে কাহার সাধ্য ? তাঁহার শরীরে তখন বন্যজীবের ন্যায় শক্তি। নর-প্রেত রুদ্রকান্ত তখন বন্য-জীবাপেক্ষাও ঘৃণিত ও বিচারবিগর্হিত কার্য্যে রত। কোন রূপে তাহারা পাষণ্ডকে ধরিয়া অতি ক্লেশে স্থানান্তরে রাখিয়া, পরে সকলে সমবেত হইয়া মালতীর শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইল। দেখিল—মালতীর জীবনাশা নাই।

বরদাকান্ত অন্য পুত্রকে জামিনে খালাস করিয়া বাটী লইয়া আসিয়াছেন। তিনি আনন্দিত মনে বাহিরে বসিয়া লোকজনের সহিত নানা প্রকার কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। তাঁহার নিকটে এই ভয়ানক সংবাদ পৌঁছিল। তিনি দৌড়িয়া অন্তঃপুরে আসিলেন। দেখিলেন, বিপদের উপর বিপদ। উপস্থিত বিপদ সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক। মালতী বাঁচিবেন না।

হায়! ইহারই নাম দাম্পত্য প্রণয়। এ দুঃখের কথা কাহাকে বলিব ? চরণে কুশাঙ্কুর বিঁধিলে যাহার হৃদয়ে আঘাত লাগিবে; মুখ ভার দেখিলে যাহার হৃদয় ফাটিয়া যাইবে; শয়নে, স্বপনে, সর্ব্বকার্য্যে যে মূর্ত্তি হৃদয়ে জাগিবে; যাহার সুখ ও সন্তোষ সংসাধন প্রধান চেষ্টা স্বরূপ হইবে, যে হৃদয়ের দিকে হৃদয় দিগদর্শনের শলাকার ন্যায় নিরন্তর স্থির থাকিবে; তাহাদের এই ঘোর নৃশংস, অবক্তব্য অবিবেচ্য অত্যাচার ও হৃদয়হীন ব্যবহারের কথা নয়ন মুদিয়া নিদ্রার আবেশে ভাবিতেও শরীর শিহরে ও কণ্টকিত হয়। কে জানে বিধাতা এ পাপময় সংসারে কত আশ্চর্য্য জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন ? কে

জানে এ সংসারে আরও কত অচিন্তিতপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটিবে ? ধিক্ ! পামর রুদ্রকান্তকে

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

মিলন ।

সন্ধ্যার পর সরমা ও মনোরমা বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। এমন সময় সেই স্থানে কেশব আগমন করিলেন। মনোরমা স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন।

কেশব কহিলেন—"সরমা ! অবন্তীপুর যাওয়ার তো বিলম্ব পড়িল।"

সরমা ব্যস্ততা সহকারে জিজ্ঞাসিলেন,— "কেন ?"

"সেখানকার বাটী এখনও সম্পূর্ণ প্রস্তত হয় নাই। আরও ১০। ১৫ দিন না যাইলে শেষ হইবে না।"

"বিবাহ কি ততদিন পরে হইবে ?"

"কাজেই।"

"না, তা হবে না।"

"তুমি কি বল।"

"আমোদে বিলম্ব ভাল লাগে না।"

"আমোদ তো করলেই হয়।"

"বিবাহ না হলে আমোদ হয় কিসে ?"

কেশব হাসিতে হাসিতে বলিলেন,— "আমোদ করে এক দিন এর মধ্যে আমোদের বিবাহ দাও না কেন ?"

"সে কি রকম ?"

"কেন, সকলে মিলে আমোদ করে যোগেশ বিমলার বিবাহ দেওয়া যাউক, পরে যথারীতি বিবাহ হবে। লাভের মধ্যে এক-কার্য্যে দুই দিন আমোদ হবে।"

সরমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"বেশ বলেছ তোমার এতও জোগায়। তবে তার জোগাড় কর।"

"এর আর জোগাড় কি ? এত হলেই হল।"

"তবে তুমি দাদাকে ডাক। আমি বিমলা মনোরমা সবাইকে ডাকিতেছি।"

"তা আজ কেন, আর এক দিন হলেই হবে।"

সরমা বলিলেন,—"না আজই হউক। তুমি দাদাকে আর নরেন্দ্রকে ডাকিয়া আন, আমি বিমলাকে আনিতেছি।"

উভয়ে প্রস্থান করিলেন। অনতিবিলম্বে যোগেশ ও কেশব সেই স্থানে আসিলেন। যোগেশ কহিলেন,—"ব্যাপারটা কি ?"

"ব্যাপার দেখিতেই পাবে।"

"আমার বিরুদ্ধে তোমার কোন চক্রান্ত আছে না কি ?

রুদ্রকান্ত জামিনে খালাস হয়েছে—তারই চক্রান্ত।"

"তার আবার চক্রান্ত কি ?"

"রামকৃষ্ণের সঙ্গে বিমলার বিবাহ।"

যোগেশ হাসিয়া উঠিলেন। কেশব কহিলেন,—

"হাসি নয়। সত্যই আজ বিমলার বিবাহ তোমাকে দেখাব এখন।"

বলিতে বলিতে বাহিরে অলঙ্কার-ধ্বনি হইতে লাগিল। বিমলার দেহের সর্ব্বত্র আজ মূল্যবান্ অলঙ্কারে পরিশোভিত। তাঁহার এক হস্ত সরমা অপর হস্ত মনোরমা ধরিয়া সেই প্রকোষ্ঠে হাসিতে হাসিতে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে [illegible] আসিল।

বিমলা ব্রীড়া সহকারে একদিকে অবনত

মস্তকে দাঁড়াইয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন,—"সরমা! ছিঃ ভাই, আমি যাই।"

যোগেশ হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—"কেশব! এ সকল কি ছেলেমি হচ্চে?"

এমন সময়ে সেই স্থানে নরেন্দ্র প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—কেশব বাবু বেশ লোক তো। আমাকে ফাঁকি দিয়ে কাজটা ভাল হচ্ছিল কি?"

"বিলক্ষণ আপনাকে ফাঁকি দিলে চলিবে কেন? আপনাকে ডাকিবার জন্য রামা চাকরকে পাঠিয়ে এসেছি। আপনি এ সব মন্ত্রণা শুন্‌লেন কোথায়?"

"আমি এসেই দেখলেম বৈঠকখানা ফাঁক। সেখোকে জিজ্ঞাসিলাম, সে বল্লে বিবাহ হচ্চে। কথাটা ভাল বুঝ্‌তে না পেরে এদিকে ছুটে আসছি।

কেশব অস্ফুটস্বরে মনোরমাকে কহিলেন,-"ভগ্নি! সরমাকে জিজ্ঞাসা কর, দান কর্‌বে কে?"

মনোরমা জিজ্ঞাসিয়া বলিলেন,—"আপনি।"

যোগেশ কোচের উপর বসিয়াছিলেন। বিমলার হস্ত ধরিয়া কেশব কহিলেন,—"ভগ্নি! এদিকে এস।"

বিমলা লজ্জায় সঙ্কুচিতা হইলেন। সরমার বদন কমল অবগুণ্ঠনে অর্দ্ধাবৃত। তিনি মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "যা না।"

বিমলা কলের পুত্তলির ন্যায় কেশবের পশ্চাতে চলিলেন। বিমলার দেহ এই কয়দিনে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে। অনুরাগ আনন্দ চিন্তাহীনতায় তাঁহার লাবণ্য শতগুণ সংবর্দ্ধিত হইয়াছে। ভূষণে ভূষিতা হওয়ায় সেই স্বভাব-সুন্দরীর শ্রী অন্য বিভিন্নভাব ধারণ করিয়াছে। কেশব বিমলাকে যোগেশের সমীপে আনিলেন এবং তাঁহার হস্ত ও যোগেশের হস্ত একত্র করিয়া কহিলেন,—

"ভাই যোগেশ! বিমলাকে বিধাতা যে নিরুপম গুণ ও অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য প্রদান করিয়াছেন, তাহার পরিচয় তুমি আমার অপেক্ষা সমধিক অবগত আছ। তোমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে প্রণয় আছে, তাহা অবিনশ্বর ও স্বর্গীয় সম্পত্তি। বিপদে বা সম্পদে, দর্শনে বা অদর্শনে, কিছুতেই সে পবিত্র প্রণয়ের হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে পারে না। দৈব-বিড়ম্বনায় এমন সুকুমার প্রসূনদ্বয় এতদিন একত্র শোভা বিকাশ করিতে পায় নাই। অদ্য পরমানন্দে আমরা সকলে এই অমূল্য কুসুমদ্বয়কে একত্র করিয়া দিলাম। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, যেন অনন্তকাল ইহারা সমভাবে জগতের শোভা সম্পাদন করিতে করিতে কালপাত করে।"

কেশব যোগেশের করে বিমলাকে সমর্পণ করিয়া উভয়কে এককোচে বসাইলেন। সকলে মঙ্গল সূচক হুলুধ্বনি করিল। পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠ হইতে শঙ্খধ্বনি হইল।

বাহিরের বৈঠকখানা হইতে গঙ্গাগোবিন্দ উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসিলেন,—"বাড়ীর মধ্যে গোল কিসের হে?"

কেশব হাসিতে হাসিতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন,—"আজ যোগেশ বিমলার বিবাহ হইল।"

কেশব পুনরায় গৃহে প্রবেশ করিলে যোগেশ বলিলেন,—"তুমি এতও জান।"

বিমলা লজ্জায় সঙ্কুচিতা হইয়া অধোবদনে বসিয়া রহিলেন। সময়ে সময়ে উঠিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইলেন না।

তখন যোগেশ বলিলেন,—"এখন ছুটী দেও।"

কেশব হাসিয়া কহিলেন,—"দাঁড়াও উপদেশ দিই। ব্রহ্মজ্ঞানীরা বিবাহের পর উপদেশ দেয় জান না? এ হলো ব্রহ্মজ্ঞানীর মত বিবাহ; এতে একটা লেক্‌চর চাহি। যখন আসল বিবাহ হবে, তখন মন্ত্র বলবে, পুরোহিত আসবেন, শালগ্রাম দেখা দিবেন, এখন একটা ব্রাহ্মী লেক্‌চার না হলে মানায় না।"

যোগেশ বলিলেন,—"ঢের হয়েছে।"

কেশব কহিলেন,—"বিমলা স্বামীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করা বিধেয় তাহা আমি আর তোমায় কি শিখাইব? তবে কর্ত্তব্য-বোধে দুই একটী কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি। স্বামী পরম দেবতা, অর্থাৎ স্বামীর চরণ দর্শন করিলে ভব-সিন্ধু পার হইয়া দিব্যলোকে যাওয়া যায়, স্বামীর পাদোদক পান করিলে পুনর্জন্ম হয় না, স্বামীকে প্রভুর ন্যায় জ্ঞান করিয়া দাসীর ন্যায় থাকিতে হয়, স্বামী কুপিত বা অসন্তুষ্ট হইলে নরকাগ্নিতে পুড়িতে হয়, প্রভৃতি যে সকল কথা সতত শুনিয়া থাক, যদি তুমি তোমার স্বামীর সহিত তদনুযায়ী ব্যবহার কর, তাহা হইলে তোমার প্রণয়ের পবিত্রতা থাকিবে না, তোমার হৃদয়ে সুখ জন্মিবে না, আনন্দ ও শান্তি তোমার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিবে। ভগ্নি! স্ত্রী স্বামীর হিতৈষিণী সখী, স্বামী স্ত্রীর হিতৈষী সখা। একের সুখ-দুঃখ অপরের সহিত দৃঢ় সম্বন্ধ। পরম পবিত্র, অবিচ্ছেদ্য, স্বর্গীয় আত্মীয়তা স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ। স্ত্রী দাসী, বা স্বামী প্রভু, এ পাপ কথা ভ্রমেও মুখে বা মনে আনিতে নাই। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কেহ শ্রেষ্ঠ বা কেহ ইতর হইতে পারে না। সেত দূরের কথা—স্বামী স্ত্রী সর্ব্বাংশে অবিকল তুল্য। ভগ্নি! তুমি বিদুষী ও বুদ্ধিমতী। তোমাকে আমি অধিক আর কি বলিব? স্বামীকে নিয়তকাল সুখে রাখিতে চেষ্টা করিবে, তাঁহার বিষয় কার্য্যের অংশ গ্রহণ করিবে, বিপদে সহায় স্বরূপ হইবে, সম্পদে আনন্দময়ী সঙ্গিনী থাকিবে এবং তাঁহার আত্মায় নিজ আত্মা ঢালিয়া দিয়া সুখ-সাগরে ভাসিবে। বিধাতার কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, যেন তোমাদের হৃদয়ে কদাচ কোন অসুখ না জন্মে। আর যোগেশ! পত্নীর সুখ-সন্তোষ সংবিধানার্থ সতত চেষ্টিত থাকিবে।—

যোগেশ বাধা দিয়া কহিলেন,—"আবার আমায় কেন লেক্‌চর? এক দিক্ দিয়েই চলুক।"

কেশব আবার বলিতে লাগিলেন,—"পত্নীর সহিত—"

যোগেশ উঠিয়া বলিলেন,—"আজ কেশব জ্বালালে।"

নরেন্দ্র বলিলেন,—"কেশব বাবু যাহা বলিতেছেন তাহা অতি আদরণীয় কথা। যোগেশ তাহাতে বাধা দেও কেন ভাই?"

যোগেশ ইত্যবসরে মনোরমার সন্নিহিত হইয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন,—"ভগ্নি! তোমাদের বিবাহ নাকি সকলে জানে না? আমরাও সে দূরদেশের বিবাহ জানিতে চাহি না। আর কেহ কোন কথা না কহিতে পারে, এজন্য আমরা আমাদের সম্মুখে তোমাদের আবার বিবাহ দিব।"

এই বলিয়া মনোরমাকে নরেন্দ্রের সমীপস্থ করিলেন এবং উভয়ের হস্ত একত্র করিয়া কহিলেন,—

"ভ্রাতঃ নরেন্! আজ আমি সর্ব্ব সমক্ষে, উচ্চ শব্দে জগৎকে জানাইয়া, তোমাদের সেই

অতীত, অজ্ঞাত ও দূরদেশে সংঘটিত সম্বন্ধ আজি নূতন করিয়া পাকাইয়া দিতেছি। প্রার্থনা করি, তোমরা চিরসুখী হও। তোমাদের নিকট আমি যে ঋণে বদ্ধ, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন; এ জীবন তোমাদের জন্ম ব্যয় করিলেও তাঁহার পরিশোধ হয় না। তোমাদের যদি পর বলিয়া মনে হইত, তাহা হইলে সে ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করিতাম। এক্ষণে আমি তোমাদের সুখী দেখিলেই পরমানন্দিত হইব। জগদীশ্বর করুন যেন সে আনন্দ আমি চিরদিন অব্যাঘাতে সম্ভোগ করিতে পারি।"

নরেন্দ্র মনোরমা অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পুনরায় হুলুধ্বনি ও শঙ্খশব্দ ঘোষিত হইল।

"যোগেশ কহিলেন—"নরেন্! কেশব বাবুর লেক্চর শুনিতে বড় ব্যাকুল হইয়াছিলে না? এখন শোন যত পার। কেশব লেক্চর দেও।"

কেশব হাসিয়া কহিলেন,—"এবারকার সব ভার তোমার উপর।"

যোগেশ বলিলেন,—"আমার অত আসে না।"

কেশব বলিলেন,—"এক বাড়ীতে দুটো দুটো বিবাহ হল, তা লুচি কই? চল আহারের যোগাড় করা যাউক।"

সকলে হাসিতে লাগিলেন। রমণীগণ ব্যতীত অপর সকলে বাহিরে গমন করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

অন্তিমে।

বেলা প্রায় সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর। মালতী সমভাবে শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। দুইজন সুচিকিৎসক তাঁহার উভয় পার্শ্বে বসিয়া যথামত ঔষধাদি সেবন করাইয়াছেন। কিঞ্চিৎ অন্তরে বরদাকান্ত বসিয়া আকাশ পাতাল চিন্তা করিতেছেন। শয্যার পার্শ্বে রুদ্রকান্তের জননী বসিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। ঘরের বাতায়ন সমীপে প্রতিবেশিনী কামিনীগণ দাঁড়াইয়া এই শোচনীয় ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছে। সকলেই ম্রিয়মাণ; ঘোর চিন্তায় চিন্তিত।

বহুক্ষণ পরে বরদাকান্ত কহিলেন,—"ভগবন্! এ কি বিপদ ঘটাইলে?"

চিকিৎসক পীড়িতার নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। যন্ত্র দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থলের গতি পরীক্ষা করিলেন। পরে হতাশ স্বরে কহিলেন,—"মহাশয়! যত্নের কোনই ত্রুটী হইল না; বড় দুঃখের বিষয় পীড়িতার জীবনে আর কোনই আশা নাই। আর অর্দ্ধঘণ্টা কাল মধ্যে তাঁহার জীবলীলার শেষ হইবে।"

এই কথা শুনিবামাত্র রুদ্রকান্তের জননী আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। পৌরবর্গেরা কাঁদিয়া উঠিল। চিকিৎসকদ্বয় গাত্রোত্থান করিলেন।

বরদাকান্ত সরোদনে জিজ্ঞাসিলেন,—"মহাশয়! আমার কি হইবে? আপনারা যাইবেন না, আমাকে বিপন্মুক্ত করিয়া দেন।"

এই সময় মালতী প্রলাপ বকিতে আরম্ভ

করিলেন। পার্শ্বপরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

চিকিৎসকেরা পুনরায় তাঁহার নাড়ীর গতি পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। কহিলেন,—আর অধিক বিলম্ব নাই। যদি ইচ্ছা করেন তবে এই সময় যথা-কর্ত্তব্য করুন।"

সকলে অধীর হইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। চিকিৎসকদ্বয় এই অবকাশে প্রস্থান করিলেন। বরদাকান্ত কাঁদিতে কাঁদিতে বাহিরে গিয়া এই সংবাদ জানাইলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার সঙ্গে কয়েক জন কর্ম্মচারী ভবন মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহারা আসিয়া মালতীর শয্যা ধরিয়া তাঁহাকে ঘরের বাহিরে লইয়া গেল। সকলে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

একজন বরদাকান্তকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন,—"মহাশয়। শোক করিতেছেন কেন? কাঁচা ছেলে। কাল পরী ধরে নিয়ে এসে বিবাহ দেওয়া যাবে। ইহার জন্য চিন্তা কি? ভাল বই মন্দ হবে না।"

বরদাকান্ত কহিলেন,—"আ—আমার কপাল। আমি কি সে জন্য ভাবিতেছি? আজ যদি আমি মনে করি, কাল আমার দুশো পুত্রবধূ হয়, সে জন্য কিসের ভাবনা! ভাবনা এই যে, রুদ্রকান্ত আমার দুধের গোপাল। সে কিছু জানে না। ছেলেমানুষ বুঝিতে না পেরে একটা কাজ করেছে, তার যে কি হবে তাই ভেবে আমি আকুল হচ্চি।"

এ পাপ পৃথিবীতে বরদাকান্তের সংখ্যা যত কম হয়, ততই মঙ্গল।

বরদাকান্ত হা হুতাশ করিতে লাগিলেন। পৌর কামিনীরা ক্রন্দন করিতে লাগিল।

মালতী নয়ন উন্মীলন করিয়া একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। কহিলেন,—"স্বামী—

একজন স্ত্রীলোক কহিল,—"একবার রুদ্রকান্তকে ডাকিয়া পাঠাও।"

একজন ডাকিতে গেল। পাপিষ্ঠ রুদ্রকান্ত এ সময়েও পত্নীর সহিত চিরকালের মত একবার শেষ সাক্ষাৎ করিতে আসিল না।

একজন স্ত্রীলোক বলিল,—"কি চমৎকার স্বামি-ভক্তি, স্বর্গের দ্বার মালতীর জন্য খোলা রহিয়াছে।"

মালতী আবার একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, যাহাকে দেখিতে চাহিতেছেন সে সেখানে নাই। মালতীর চক্ষু দিয়া এক ফোটা জল পড়িল। সন্নিহিত কুমুদিনী বস্ত্র দ্বারা মালতীর চক্ষু পরিষ্কার করিয়া দিয়া কহিল,—"বউ, কি বলছ?"

মালতী আবার চারি দিকে চাহিলেন। আবার চক্ষু দিয়া জল পড়িল। অতি অস্ফুট-স্বরে কষ্ট সহকারে কহিলেন,—"ঠাকুর—"

সকলে বরদাকান্তকে বলিল,—"আপনি এদিকে আসুন।"

তিনি নিকটস্থ হইলে মালতী তাঁহার চরণ লক্ষ্য করিয়া মস্তকে হস্ত দিলেন। এক জন কামিনী বরদাকান্তের পদধূলি লইয়া মালতীর মস্তকে দিল। মালতী পূর্ব্ববৎ কহিলেন, —"ঠাকুরাণী—"

কুমুদিনী তাঁহারও পদধূলি লইয়া পূর্ব্ববৎ মালতীর মস্তকে দিল। মালতী তখন স্বীয় ক্লেশ-নিপীড়িত দৃষ্টি একে একে সকলের প্রতি অর্পণ করিলেন। সকলেই কাঁদিতে লাগিল ও কহিতে লাগিল,—"এমন সোণার প্রতিমা আর হবে না।"

মালতীর চক্ষু দিয়া আবার জল পড়িতে লাগিল। তিনি কুমুদিনীর হস্ত ধারণ করিয়া

কহিলেন,—"কুমুদ,—" কুমুদ কাঁদিতে লাগিল মালতী আবার কহিলেন,—শেষ-কালে একবার দেখিতে পাইলাম না।"

মালতীর কণ্ঠস্বর নিতান্ত অস্ফুট, নিতান্ত ক্ষীণ। তিনি পুনরপি কহিলেন,—তাঁহার কোন দোষ নাই—"

ঊর্দ্ধে হস্ত তুলিয়া পুনরায় কহিলেন,—"ভগবান্ তাঁহাকে ক্ষমা করুন।"

মালতী আবার নীরব। ক্ষণপরে আবার কহিলেন,—"আমি তো—মরি, তাঁর যেন—কিছু না—হয়—স্বামী আঃ—স্বামী,—"

কুমুদিনী ঘোর চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মালতী আবার কহিলেন,—

"কুমুদ! কেঁদো—না—ভাই—আমার জন্ত আঃ—"

কাঁদিতে কাঁদিতে কুমুদ কহিল,—"বউ! আমাদের ছেড়ে কোথা চল্লি।"

অতি ক্লেশে মালতী কহিলেন,—"কুমুদ—ভয় কি—ভাই—আঃ—স্বামী—"

কুমুদ কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—"তুমিই ধন্ত! যাহা অন্তিম সময়ে সেই স্বামীর নাম মুখে লেগে আছে, সে নিশ্চয়ই স্বর্গে যাবে! বউ! তোমার সার্থক জন্ম।"

মালতী আবার কহিলেন,—"তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না।—না হউক—তিনি মনেই আছেন। তাঁকে বলো—আমি তাঁরই দাসী—যেখানে যে অবস্থায়—থাকি—তাঁর—কুমুদ—আঃ—হিত—আমার—"

মালতী নীরব। তাঁহার নেত্রদ্বয় স্থির হইল। বাক্যকথনের ক্ষমতা প্রায় লোপ হইয়া আসিল। শরীর স্পন্দহীন হইল। দেহ স্থির হইল। কুমুদ কাঁদিয়া উঠিল। মালতী কহিলেন,—"কুমুদ—স্বামী।"

আর কথা মালতীর মুখ দিয়া বাহির হইল না। ধীরে ধীরে নেত্রদ্বয় নিমীলিত হইয়া আসিল। প্রাণবায়ু দেহাশ্রয় ত্যাগ করিল। প্রফুল্ল কুসুম রাশির ন্তায় মালতীর প্রাণহীন দেহ ধরণী-পৃষ্ঠে পড়িয়া রহিল। প্রফুল্ল স্বর্ণলতিকা অকালে শুকাইয়া গেল। পাষাণ, হৃদয়-হীন, স্বামীর হস্তে পড়িয়া জীবনে তাঁহার আদর, আনন্দ বা সুখ হইল না। কষ্ট ভিন্ন সুখ মালতী কদাচ দেখিতে পান নাই। মৃত্যু আসিয়া সেই সমস্ত ক্লেশ-রাশি বিদূরিত করিবার নিমিত্ত, তাঁহার জীবনকে লোকান্তরে লইয়া চলিল। এরূপ অসামান্তা সাধ্বীর নিমিত্ত স্বর্গের মণিময় সিংহাসন অবশুই প্রদত্ত হইবে। অবশুই তাঁহার পথে সুরুভিসম্পন্ন কুসুমরাশি বিস্তৃত হইবে. অবশুই ধর্ম্ম স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইবেন। সংসারের ক্লেশ, যাতনা প্রভৃতির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া মালতীর আত্মা স্বর্গরাজ্যে প্রস্থান করিল। তাঁহার তদবস্থা দর্শনে সকলে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল।

এমন সময়ে সহসা উন্মত্তবৎ অধীরতা সহকারে লাফাইতে লাফাইতে দুরাচার রুদ্রকান্ত সেই স্থানে প্রবেশ করিল এবং মালতীর দেহের নিকটস্থ হইয়া ঘোর চীৎকার সহকারে কহিতে লাগিল;—"আমি তার মাথা ভাঙ্গব। কে আমার মালতীর এমন দশা করিল?"

এই বলিয়া হস্তস্থিত লাঠি সজোরে ঘূর্ণিত করিতে লাগিল। সকলে তাহার এই ভাব দেখিয়া অবাক্ হইল।

বাহির হইতে ৪।৫ জন লোক আসিয়া কহিল,—"পালাও পালাও! দেখিতে কি বাবু পাগল হইয়াছেন। শীঘ্র ধরিবার চেষ্টা কর।"

বরদাকান্ত, "এ আবার কি সর্ব্বনাশ। ভগবান্! তোমার মনে কি এতও ছিল।" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

রুদ্রকান্ত কহিলেন,—"চোপ রও। মেরে হাড় ভেঙ্গে দেব। মালতী, মালতী, আমার মালতী।"

এই বলিয়া সেই বর্ব্বর মালতীর জীবন-হীন দেহ উত্তোলন করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিল।

বরদাকান্ত ব্যস্ত হইয়া কহিলেন,—"তোমরা দেখছ কি? শীঘ্র ধর ওকে।"

অনেক লোক আসিয়া রুদ্রকান্তের লাঠি কাড়িয়া লইল।

"রুদ্রকান্ত কহিল,——"ও——মালতীকে নেবে——ড্যাম—

তাহারা সজোরে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। রুদ্রকান্ত কহিল,—"আমার মালতীকে আর মারিস্‌নে। খবরদার! আহা সোণার অঙ্গে ধুলো লাগে না যেন——"

লোকেরা রুদ্রকান্তকে ধরিয়া বাহিরে লইয়া চলিল। বরদাকান্ত প্রভৃতি অনেকে কাঁদিতে কাঁদিতে সঙ্গে চলিলেন। পৌর কামিনীরা মালতীর মৃতদেহ-পার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

উপসংহার।

সেশন আদালতে সপ্রমাণ হইল যে, রুদ্রকান্ত উন্মাদ; সে পাগরদে প্রেরিত হইল। রামকৃষ্ণের কঠিন পরিশ্রমের সহিত সাত বৎসর কারাবাস দণ্ড হইল।

বরদাকান্ত বিষয়-ব্যাপারে উদাসীন হইয়া সস্ত্রীক কাশী বাস করিলেন। তাঁহার জমিদারী খাজনার অভাবে এবং দেনার দায়ে লাটে উঠিল। কেশবের সাহায্যে গঙ্গাগোবিন্দ তাহার অনেক অংশ ক্রয় করিলেন।

নরেন্দ্র রামনগর স্কুলের হেডমাষ্টার নিযুক্ত হইলেন। নরেন্দ্র ও মনোরমা রামনগরে বাস করিতে লাগিলেন।

যোগেশ ও বিমলা সুখ-সলিলে নিমজ্জিত রহিলেন। তাঁহারা কখন বা রামনগরে, কখন বা অবন্তীপুরে বাস করিতে লাগিলেন।

সমাপ্ত।

যোগেশ্বরী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দর্শন।

শ্রীযুক্ত নীলরতন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রবীণ ব্যক্তি। বয়স পঞ্চাশ অতিক্রম করিয়াছে। শরীরে পাপের ও দুষ্ক্রিয়ার অধিকার না থাকায় শরীরটি আছে ভাল। স্বকীয় বিদ্যা-বুদ্ধি-বলে প্রভূত অর্থোর্জ্জন করিয়া সম্প্রতি তিনি পরিবারাদি-সহ কাশীবাস করিতেছেন। সঙ্গে বিধবা ভগ্নী কালীতারা গুণবতী পতি-পরায়ণা ভার্য্যা আনন্দময়ী এবং একমাত্র কন্যা অন্নপূর্ণা আছেন। এতদ্ব্যতীত দাস ও দাসী, সেবক ও সেবিকা, আশ্রিত ও প্রতিপাল্য, অনেক লোকে নীলরতন বাবুর বৃহৎ ভবন পরিপূর্ণ। কাশীতে দশাশ্বমেধ-ঘাটের সন্নিকটে তাঁহার বাস।

বেলা প্রায় এক প্রহর। নীলরতন বাবু, স্নান সমাপ্ত করিয়া, পূজা পাঠে প্রবৃত্ত হইবার উদ্যোগ করিতেছেন; তাঁহার বিধবা সহোদরা কালীতারা পূজার আয়োজন করিয়া দিতেছেন এবং পতি-পরায়ণা সহধর্ম্মিণী আনন্দময়ী, পূজা সমাপ্তির পর, পতিদেবতার জলযোগের ব্যবস্থা করিতেছেন। অন্নপূর্ণা কক্ষান্তরে বসিয়া রামায়ণ পাঠ করিতেছেন।

বহির্ব্বাটীর অঙ্গন হইতে, কোমল বালক-কণ্ঠ-নিঃসৃত সুস্বর-সংযুক্ত মধুবর্ষী সঙ্গীত-ধ্বনি সহসা সকলেরই কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। সকলেই স্ব স্ব কর্ম্ম বিস্মৃত হইলেন। বালিকা অন্নপূর্ণা রামায়ণ বন্ধ করিয়া, বহির্ব্বাটীতে আগমন করিলেন, এবং নিরতিশয় আনন্দ সহকারে সঙ্গীত শ্রবণ করিতে লাগিলেন। গায়ক গাহিতেছে,—

"পাইব বলিয়ে, আশা করিয়ে,
হরি! শরণ লয়েছি তোমার হে॥
ভক্তি-ভিখারী, আমি হে তোমারি,
তুমি ছাড়া, কেহ নাহি আমার হে॥
জ্ঞানীর জ্ঞেয়ান, যোগীর ধেয়ান,
তোমার চরণ সকলের সার হে॥
(তুমি) জগতের গুরু, বাঞ্ছা-কল্পতরু,
অধম সেবকে কর পার হে॥
জনক জননী, নন্দন নন্দিনী
তুমি ছাড়া বিশ্বে সকলই অসার হে॥
ছেড়েছি সম্পদ, ছাড়িব না পদ,
লভিয়ে করুণা তরিব সংসার হে॥"

গীত সমাপ্ত হইল অন্নপূর্ণা গায়কের নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি এমন গান কোথায় শিখিলে?"

গায়ক উত্তর দিলেন,—আমি গান গাহিয়া ভিক্ষা করি। কোন্ গান কোথা হইতে শিখিয়াছি তাহা মনে নাই। বোধ হয় এ

গানটী আমার গুরুদেবের নিকট শিখিয়া থাকিব।"

অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি ভিক্ষা কর? আকৃতি দেখিয়া তোমাকে ভিক্ষুক বলিয়া কখনই মনে হয় না।"

গায়ক বলিলেন,—"আকৃতি সকল সময়ে ঠিক হয় না। আমি জ্ঞান-লাভের পর হইতে এ পর্য্যন্ত ভিক্ষাই করিয়া আসিতেছি।"

অন্নপূর্ণা আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"কি ভিক্ষা কর তুমি?"

গায়ক উত্তর দিলেন,—"দয়া করিয়া যিনি যাহা দেন।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—দাঁড়াও তুমি, আমি শীঘ্রই আসিতেছি; বাবাকে মাকে তোমার কথা বলিয়াই আসিব। তুমি যাইও না যেন।"

ভিক্ষুক মস্তক আন্দোলন করিয়া অন্নপূর্ণার অনুরোধ পালনে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। দ্রুতপদে অন্নপূর্ণা প্রস্থান করিলেন।

অন্নপূর্ণা যাহা বলিয়াছেন, তাহা যথার্থ। ভিক্ষুকের আকৃতি বাস্তবিকই রাজপুত্রের ন্যায়। তাঁহার মস্তকের মসৃণ ও সমুজ্জ্বল কুঞ্চিত কেশরাশি স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। সমুন্নত ললাট-প্রদেশ, বিভূতি-সমাচ্ছন্ন হইলেও, তাঁহার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করিতেছে। উজ্জ্বল প্রশস্ত নেত্র, লাল টুকটুকে অমুল ওষ্ঠাধর, ঈষৎ বক্রাগ্র সূক্ষ্ম নাসিকা সকলই অপূর্ব্ব শোভার কারণ হইয়াছে। বদন-মণ্ডল প্রীতি ও সন্তোষে সমুদ্ভাসিত, বিশাল বক্ষে রুদ্রাক্ষ ও তুলসীমালা বিলম্বিত, তন্নিম্নে অতি পরিষ্কার যজ্ঞসূত্র শোভমান। দেহের বর্ণ তপ্ত স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল গৌর। পরিধান এক গৈরিক-রাগ-রঞ্জিত বসন, তদ্রূপ এক উত্তরীয় বাম-স্কন্ধের উপর হইতে দক্ষিণ বাহুর নিম্ন দিয়া নিবদ্ধ। মস্তকে এক নামাবলী উষ্ণীষাকারে সুশোভিত। গায়কের বয়স অষ্টাদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বড়ই পরিণত, সুসম্বদ্ধ ও শক্তি-সম্পন্ন।

গায়ক অধোবদনে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। অনতিকাল মধ্যে অন্নপূর্ণা প্রত্যাগমন করিলেন, এবং গায়কের অতি নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—"তুমি আমাদের বাড়ীর মধ্যে এস; বাবা, মা, পিসিমা সবাই তোমাকে দেখিতে চাহিতেছেন।"

ভিক্ষুক বলিলেন,—"অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ভিক্ষা করা আমার গুরুদেবের নিষেধ। আমি আপনার মা ও পিসিমাতা ঠাকুরাণীকে উদ্দেশে বার বার প্রণাম করিতেছি। আমাকে দয়া করিয়া যদি ভিক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা এই স্থানে আনিয়া দিলেই চরিতার্থ হই।"

অন্নপূর্ণার মুখ বিষণ্ণ হইল। তিনি কাতর ভাবে বলিলেন,—"বাটীর ভিতরে যাওয়া নিষেধ? আপনাকে সঙ্গে লইয়া যাইব বলিয়া আসিয়াছি। তা হউক, আপনার নিয়ম ভঙ্গ করিয়া কাজ নাই। আমি আবার যাইতেছি, এবার আপনার ভিক্ষা সঙ্গে লইয়া আসিব, আপনি যাইবেন না যেন।"

অন্নপূর্ণা আবার প্রস্থান করিলেন। ভিক্ষুক অতৃপ্তনয়নে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, এত মাধুর্য্য তিনি ইহার পূর্ব্বে আর কোথাও দেখেন নাই। ভিক্ষুক-যুবকের এ সিদ্ধান্ত অমূলক নহে। বাস্তবিকই বৃদ্ধ বা যুবা, নর বা নারী, যে যখন অন্নপূর্ণাকে দেখিয়াছে, সেই সবিস্ময়ে মনে

করিয়াছে, অপূর্ব্ব দৃশ্য! অন্নপূর্ণা বালিকা; বয়স দশ পার হইয়া একাদশে পড়িয়াছে মাত্র; সুতরাং এখনও একটু চঞ্চল। তাঁহার দ্রুত-গতি ও ব্যস্তভাব বড়ই মধুর বলিয়া বোধ হয়। অন্নপূর্ণা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী; তাঁহার দেহের কুত্রাপি অপূর্ণতা নাই এবং এইটী হইলে এই অঙ্গ আরও একটু ভাল হইত বলিয়া, বিধাতাকে নিন্দা করিবার কোনই অবসর নাই। অন্নপূর্ণা পিতা মাতার এক মাত্র সন্তান; সুতরাং সযত্ন-পালিতা ও সুখ-সেবিতা। তিনি লেখা-পড়া শিখিয়াছেন; কিন্তু কুৎসিত বা কুরীতি-প্রবর্ত্তক কোন পুস্তকই তিনি পাঠ করেন নাই। রামায়ণ ও মহা-ভারত প্রভৃতি ধর্ম্ম উপদেশপূর্ণ পুস্তকই তাঁহার আলোচ্য। মিথ্যা প্রবঞ্চনা ও অসরল ব্যবহার কাহাকে বলে, অন্নপূর্ণা তাহা জানেনও না।

অন্নপূর্ণার অদ্যাপি বিবাহ হয় নাই। বিবাহের কাল উত্তীর্ণ হইতেছে জানিয়াও স্নেহময় পিতা, মনের মত পাত্র না পাওয়ায়, কন্যার বিবাহ দিয়া উঠিতে পারেন নাই। ভগবানের উপর তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস এবং মানবের কর্ত্তৃত্বাভিমান নিতান্ত অসার, ইহা তাঁহার বদ্ধমূল সংস্কার। সুতরাং তিনি জানেন, সমুচিত সময়ে বিধাতা সকল বিষয়েরই সুব্যবস্থা করিয়া দিবেন। এইরূপ ভগবন্নিয়ন্তৃত্বের উপর ঐকান্তিক নির্ভর থাকায়, কন্যার বিবাহকাল উত্তীর্ণ হইতেছে দেখিয়াও চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ উদ্বিগ্ন নহেন।

অন্নপূর্ণার ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া, ভিক্ষুক আবার গান ধরিলেন,—

"কিবা রূপ আমরি!
নয়নে নিরখি, পরাণেতে রাখি,
ঝুরে অবিরাম লোচন বারি॥
(তব) পীত ধড়া, মোহন চূড়া,
করে মোহ নাশ হে মুরলী-ধারী॥
ভাবিলে শিহরে, পুলকেতে পুরে,
অবশিত হয় শরীর আমারি॥
রহি তব দাস, হ'ক্ সর্ব্বনাশ,
বিকাইয়ে থাকি চরণে তোমারি॥"

আবার সেই গীত ধ্বনি চারিদিকে মধু-বর্ষণ করিতে লাগিল।

গীত সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই অন্নপূর্ণার অলৌকিক মূর্ত্তি দরিদ্র ভিক্ষুকের নয়নপথবর্ত্তী হইল। এবার কিন্তু অন্নপূর্ণা একাকিনী নহেন পিতা, মাতা ও পিতৃস্বসাকে সঙ্গে লইয়া তিনি উপস্থিত হইয়াছেন। একজন দাসী পাত্রে করিয়া বিস্তর চাউল ডাইল; আর একজন ঘৃত, লবণ, তৈলাদি উপকরণ লইয়া সঙ্গে আসিয়াছে। অন্নপূর্ণার হস্তে একযোড়া নূতন বস্ত্র ও দুইটী টাকা।

নীলরতন বাবু এবং তাঁহার পত্নী ও ভগ্নী প্রত্যেককেই ভিক্ষুক অবনত মস্তকে প্রণাম করিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই ভিক্ষুককে নমস্কার করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাঁহার কমনীয় কান্তি ও অপার্থিব শ্রী দেখিয়া নারী-গণের নয়ন স্নেহার্দ্র হইয়া আসিল। নীল-রতন বাবু, ভিক্ষুকের পরিচয় জিজ্ঞাসু হইয়া, প্রথমতঃ নাম জিজ্ঞাসা করিলেন।

ভিক্ষুক উত্তর দিলেন,—"উমাশঙ্কর।"

ধাম-সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তরে ভিক্ষুক বলি-লেন,—"গুরুদেব ঘনানন্দ স্বামীর আশ্রমই আমার ধাম"

নিজের অন্য কোন পরিচয়ই ভিক্ষুক জানেন না। কে তাঁহার পিতা মাতা, কোথায় তাঁহার পূর্ব্ব নিবাস ইত্যাদি কোন সংবাদই ভিক্ষুক বলিতে পারিলেন না। শাস্ত্রালোচনা,

গুরুসেবা, উপদেশানুরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান ও ভিক্ষা সংগ্রহ ব্যতীত তাঁহার আর কার্য্য নাই; গুরুদেব ব্যতীত তাঁহার আর আত্মীয় নাই।

অন্নপূর্ণা, ভিক্ষুকের সঙ্গে যাইয়া তণ্ডুলাদি আশ্রমে দিয়া আসিতে দাসীদিগকে আজ্ঞা করিলেন এবং অর্থ ও বস্ত্র স্বয়ং উমাশঙ্করের হস্তে প্রদান করিতে অগ্রসর হইলেন।

তখন উমাশঙ্কর করযোড়ে আনন্দময়ী দেবীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, বলিলেন,—"মা! প্রয়োজনের অধিক ভিক্ষা লইতে আমার প্রতি গুরুদেবের আদেশ নাই। আপনারা যে সামগ্রী আনিয়াছেন, পোনর দিনেও আমরা তাহা শেষ করিতে পারিব না। দুই দিনের সামগ্রী সংগ্রহ করাও আমার নিষেধ। অতএব আমাকে অর্দ্ধসের চাউল ও তদুপযোগী কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উপকরণ দিয়া অবশিষ্ট সামগ্রী অন্য ভিক্ষুকের জন্য রাখিয়া দেন। আর অর্থ ভিক্ষা আমরা মোটেই গ্রহণ করি না। বস্ত্রভিক্ষা করি বটে, কিন্তু অভাব না হইলে লই না; এখন আমাদের বস্ত্র আছে। যখন প্রয়োজন হইবে তখন আমি চাহিয়া লইব।"

নীলরতন বাবু বলিলেন,—"তোমার নিয়ম ভঙ্গ করিতে অনুরোধ করিব না। এই সকল সামগ্রী হইতে তুমি নিজের আবশ্যক মত জিনিষ উঠাইয়া লও।"

উমাশঙ্কর আবার বিনীত ভাবে উত্তর দিলেন, "স্বহস্তে ভিক্ষা দ্রব্য উঠাইয়া লওয়া নিষেধ; আপনারা দয়া করিয়া কিঞ্চিৎ সামগ্রী আমার এই ঝুলিতে ফেলিয়া দেন।"

কালীতারা বলিলেন,—"বাবা, তুমি শাপভ্রষ্ট দেবতা!"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"মা! আমি আপনাদের চরণের দাস।"

আনন্দময়ী বলিলেন,—"বল বাবা! তুমি এই সামান্য ভিক্ষার জন্য প্রতিদিন নানা স্থানে ঘুরিয়া কষ্ট করিবে না? তোমাকে প্রত্যহ আমাদিগের বাটী হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"এ অঙ্গীকার আমি করিতে পারিব না মা! প্রতিদিন এক-স্থানে ভিক্ষা গ্রহণ আমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ।"

আনন্দময়ী বলিলেন,—"তুমি আমাকে মা বলিয়াছ। মাতৃ-আজ্ঞা সন্তানের অবশ্য প্রতিপাল্য। বল তুমি, আমাকে সতত দেখা দিতে আসিবে? ভিক্ষা লও বা না লও একবার করিয়া আমাদিগের বাটীতে আসায় কোন ক্ষতি হইবে না বোধ হয়।"

উমাশঙ্কর উত্তর দিলেন,—"প্রতিদিন না পারিলেও, আমি প্রায়ই আসিব মা। আমার নিয়মিত কর্ম্ম শেষ করিয়া, যখন অবকাশ পাইব, তখনই আপনাদের শ্রীচরণ দর্শন করিতে আসিব। এক্ষণে বিদায় হই।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"কালি আসিবেন।"

উমাশঙ্কর 'আসিব' বলিয়া সকলকে প্রণাম করিলেন এবং কিঞ্চিন্মাত্র তণ্ডুলাদি লইয়া প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গুরু ও শিষ্য।

বেলা দ্বিপ্রহরের পর, ঘনানন্দ স্বামীর আশ্রমে, উমাশঙ্কর পাঠ অভ্যাস করিতেছেন বেদান্ত শাস্ত্রের আলোচনা হইতেছে। মূর্ত্তিমান জ্ঞান-স্বরূপ ঘনানন্দ এক কুশাসনে উপবিষ্ট। তাহার পার্শ্বে কুণ্ড-মধ্যে অগ্নি

প্রজ্বলিত। সম্মুখে তাল-পত্র লিখিত পুঁথি নিপতিত। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি-বিলেপিত, মস্তকে বিপুল জটাভার, কটিদেশে কৌপীন, হস্তে লোহার চিম্‌টা। তাঁহার দেহ সুদীর্ঘ, বাহু যুগল প্রায় আজানুলম্বিত, নেত্রদ্বয় অতীব উজ্জ্বল, সমস্ত শরীর কৃশ। তাঁহার সম্মুখে, এক মৃগচর্ম্মাসনে ভুবনমোহন উমাশঙ্কর বসিয়া একান্ত মনে গুরুদেবের মুখ-নিঃসৃত শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণ করিতেছেন। ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের প্রথম কয়সূত্রে, পূর্ব্বপক্ষ অবলম্বন করিয়া, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যেরূপ প্রণালীতে কর্ম্মাপেক্ষা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহারই ব্যাখ্যা হইতেছে।

পাঠ-সমাপ্তির পর, উমাশঙ্কর বিনীত ভাবে গুরুদেবের নিকট, নীলরতন বাবুর বাটীতে ভিক্ষা গ্রহণের আমূল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। সমস্ত শুনিয়া ঘনানন্দ বলিলেন,-"এ ব্যাপারে তোমার সকল ব্যবহারই সুসঙ্গত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাকে আর কিছু বলিতে ইচ্ছা কর কি?"

উমাশঙ্কর বলিলেন,-"আমি সময়ে সময়ে তাঁহাদিগের আলয়ে গমন করিতে স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছি। এ সম্বন্ধে প্রভুর কিরূপ অনুমতি জানিতে বাসনা করি।"

ঘনানন্দ কহিলেন,—"আমি নীলরতন চট্টোপাধ্যায়কে বিশেষরূপ জানি। তিনি ও তাঁহার পরিবারবর্গ সকলেই জ্ঞানার্থী ও ধর্ম্ম-নিষ্ঠ। তোমাকে অনেক শাস্ত্র ও অনেক ক্রিয়া শিখাইয়াছি। অভ্যাস-বলে কাল-সহকারে তুমি বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করিবে, তাহাতে আমার কোনই সন্দেহ নাই। তুমি আজন্ম আমার আশ্রমে প্রতিপালিত; গৃহীর প্রকৃতি ও নিয়ম কিছুই শিখিবার তোমার সুযোগ ও অবসর হয় নাই। তৎসম্বন্ধে তুমি কিছু শিক্ষা লাভ কর, ইহাই আমার বাসনা। ধার্ম্মিক গৃহস্থের নিকট যাতায়াত করিয়া গৃহীজনের ব্যবহার শিক্ষা করাই উচিত। তদনুরূপ সুযোগ উপস্থিত হওয়ায়, আমি আনন্দিত হইতেছি। তোমাকে অনুমতি দিতেছি, তুমি অবসর পাইলেই যখন ইচ্ছা, তখনই নীলরতনের গৃহে গমন করিতে পারিবে।"

উমাশঙ্কর পুনরায় বলিলেন,—"নীলরতন বাবুর স্ত্রী ও ভগ্নী বড়ই স্নেহময়ী। তাঁহারা আমাকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ-সহকারে পুরমধ্যে লইয়া যাইতে, আসন গ্রহণ করিতে ও ভোজন করিতে আগ্রহ করিলেও করিতে পারেন। এ সম্বন্ধে প্রভুর কি আদেশ?"

ঘনানন্দ স্বামী বলিলেন,—"কেবল নীলরতনের বাটীতে তোমার পুরঃপ্রবেশ ও আসন-গ্রহণের অনুমতি থাকিল। ভোজন নিষিদ্ধ।"

গুরুচরণে প্রণাম করিয়া উমাশঙ্কর উঠিবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া, ঘনানন্দ বলিলেন,—বৎস! আসন গ্রহণ কর। তোমাকে আজি একটি শুভ সংবাদ শুনাইব।"

উমাশঙ্কর সাগ্রহে গুরুদেবের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। ঘনানন্দ বলিতে লাগিলেন,—"বৎস! বহুদিন পরে দেবী যোগেশ্বরী আবার দেখা দিয়াছেন।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"বটে! বড়ই সুসংবাদ সন্দেহ নাই। কিন্তু বাবা, আমার তাহাতে দুঃখই হইতেছে। আপনার মুখে সর্ব্বদা তাঁহার নাম শুনিতে পাই, আপনি মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পান, ইহাও শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু আমি এমনই হতভাগ্য যে, এ পর্য্যন্ত আমার অদৃষ্টে সেই দেবীর দর্শন লাভ ঘটিল না।"

উমাশঙ্কর নিতান্ত বিষণ্ণভাবে বদন বিনত করিলেন। ঘনানন্দ বলিলেন,—"এসম্বন্ধে তুমি দুঃখিত হইতে পার বটে, কিন্তু যে কারণে এতদিন তোমার সহিত যোগেশ্বরী দেবীর সাক্ষাতের সুযোগ ঘটে নাই, তাহা যখন তোমাকে বুঝাইয়া দিব, তখন আর তুমি দুঃখ করিবে না। বৎস! তুমি এতদিন বালক ছিলে। যোগেশ্বরী দেবীর তত্ত্ব প্রণিধান করা ও তাঁহার দুজ্ঞেয় চরিত্র উপলব্ধি করা, আমাদের পক্ষে, এখনও সময়ে সময়ে অসম্ভব হইয়া পড়ে। তুমি ইহার পূর্ব্বে তাঁহার মহিমা কিছুই অনুভব করিতে পারিতে না। সুতরাং এতদিন আমি তোমার সহিত তাঁহার পরিচয় ও সাক্ষাতের বিশেষ চেষ্টা করি নাই।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"ভগবন্! এখনও কি আর সেইরূপ অজ্ঞান বালক আছি?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"না বৎস, বয়োবৃদ্ধির সহিত তোমার যেরূপ জ্ঞানের পরিপক্কতা হইয়াছে, তাহাতে সেই দেবীর রহস্য-পূর্ণ লীলা প্রণিধান করিতে এখন তুমি সম্পূর্ণ সমর্থ হইয়াছ বলিয়া আমি মনে করি।"

উমাশঙ্করের মুখ প্রফুল্ল হইল। ঘনানন্দ বলিতে লাগিলেন,—"আর এককথা; যোগেশ্বরী দেবী এ পর্য্যন্ত যেরূপ স্থানে ও যেরূপ সময়ে আমাকে দেখা দিয়াছেন, বা আমার সহিত দেখা করিয়াছেন, তোমার পক্ষে, তাঁহার সহিত আলাপ-পরিচয়ের তাহা অনুকূল ছিল না। তোমার বয়স ও কোমলতা বিবেচনা করিয়া, আমি তোমাকে সে সকল সময়ে ও সে সকল স্থানে উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করি নাই।"

উমাশঙ্কর জিজ্ঞাসিলেন,—"ভগবন্! এখনও কি আমি সেরূপ অসময়ে, সেরূপ স্থানে যাইবার অনুপযুক্ত আছি?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"না বৎস। তোমার বয়স ও প্রকৃতি এখন আর তদ্বিষয়ের অনুপযোগী বলিয়া আমি মনে করি না।"

উমাশঙ্করের মুখ আবার প্রফুল্ল হইল। ঘনানন্দ বলিলেন,—"আজি গভীর রাত্রিকালে একটী নির্দ্ধারিত স্থানে, তাঁহার সহিত দেখা করিবার নিমিত্ত, তিনি আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। এই জন্যই অদ্য আমি এই প্রসঙ্গ তোমার নিকট উত্থাপিত করিলাম। আজি আমি তোমাকে সঙ্গে লইয়া তথায় যাইব মনে করিয়াছি।"

উমাশঙ্কর গুরুদেবের চরণে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"এ অধমের প্রতি ভগবানের অপরিসীমা দয়া। আজি আমার জীবন সার্থক হইবে।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"কিন্তু বৎস! এ কথা এ সময়েই বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, তাঁহার কোন ব্যবহারেরই স্থিরতা নাই। তাঁহার সহিত সাক্ষাতের ব্যবস্থা স্থির থাকিলেও, হয়তো তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ না ঘটিতে পারে এবং কোন সম্ভাবনা না থাকিলেও, হয়তো সহসা তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ ঘটিতেও পারে।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আমার অদৃষ্ট।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—তাঁহার অন্যান্য বৃত্তান্ত ও ব্যবহারের বিষয় তোমাকে যথাসময়ে জানাইব। তুমি সমস্ত শুনিলেই বুঝিতে পারিবে যে তাঁহার প্রকৃতি কিরূপ রহস্যজালে জড়িত।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আমার প্রতি কৃপা করিয়া, তিনি আমার সহিত বাক্যালাপ করিবেন না বোধ হয় কি?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"এ কথার উত্তর দিতে আমার সাধ্য নাই। তাঁহার কখন কি ভাব হয়, তাহা অন্যের দুরগম্য। তবে তোমার

ন্যায় সন্তানকে স্নেহ না করা তাঁহার অসাধ্য হইবে বলিয়া আমার বোধ হয়।"

উমাশঙ্কর আবার বলিলেন,"—আমার

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জাহ্নবী-তটে।

মাতর্গঙ্গে! তুমি বি পাদপদ্ম হইতে বিগলিত হইয়া, ব্রহ্মার কমণ্ডলু-মধ্যগত হইয়াছিলে; তদনন্তর মহেশ্বরের মস্তকে স্থান গ্রহণ করিয়া, নারকী নরকুলকে পবিত্রাণ করিবার নিমিত্ত ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছ। তোমার উৎপত্তির এই বৃত্তান্ত অনেকেই কবি-কল্পনা বলিয়া মনে করেন। তোমার এই ইতিহাস যথার্থ অথবা কাল্পনিক তাহার বিচারে আমাদের কোনই প্রয়োজন নাই। কিন্তু তুমি যে ভূর্লোক-তারিণী তাহার আর সন্দেহ কি? তোমার অমৃত-কল্প বারি পান করিয়া, মনুষ্য স্বাস্থ্য-সুখ সম্ভোগ করিতেছে; তোমার পবিত্র নীরে অবগাহন করিয়া মানবকুল সন্তোষ ও প্রসন্নতা সঞ্চয় করিতেছে; এবং তোমাকে জড়াতীতা প্রত্যক্ষরূপা দ্রবময়ী দেবী জ্ঞান করিয়া, তাহারা ভক্তি, ধর্ম্ম ও জ্ঞানার্জ্জন করিতেছে। তোমার প্রসন্ন সলিলরাশি যে যে প্রদেশ বিধৌত করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, তত্তৎসন্নিহিত জনপদ সমূহ গৌরব-পদবী লাভ করিয়াছে; তৎপ্রদেশের অধিবাসিবর্গ সর্ব্বত্র সমাদর উপভোগ করিয়াছে এবং তত্রত্য কণ্টকাকীর্ণ ভূমিখণ্ডও পুণ্যতীর্থরূপে সম্পূজিত আসিতেছে। কত কালের কত ও কুকীর্ত্তির চিহ্ন তোমার কলেবরের সহিত সম্পৃক্ত রহিয়াছে। যখন সত্যবতী-নন্দন ভূতলে কৈলাস-কল্প বারাণসীধামের প্রতিষ্ঠা করেন, তখন মা তুমিই সেই সুকীর্ত্তির সাক্ষী। আবার যখন পিতৃদ্রোহী আওরঙ্গজেব, বিশ্বেশ্বরের দেব-মন্দির বিচূর্ণিত করেন, তখন মা, তুমিই তাহার সাক্ষী। যখন শত্রুভীত নৃপকুলগ্লানি লক্ষ্মণেয় সেন, স্বকীয় স্বাধীন রাজদ্বার যবনদিগের নিমিত্ত উন্মোচন করিয়া, কম্পিত কলেবরে পলায়ন করেন, তখন মা, তুমিই তাহার সাক্ষী। আবার যখন মুষ্টিমেয় সৈন্য সাহায্যে, ভাগ্যবান্ লর্ড ক্লাইভ, পলাসী প্রান্তরে ইংলণ্ডের বিজয়-ভেরী নিনাদিত করেন, তখনও মা, তুমিই তাহার সাক্ষী। তোমার যে প্রসন্ন সলিলের উপর দিয়া মল্লিকামালা বিশোভিত কলেবর যুবক-যুবতী, মলয়মারুত সাহায্যে তরণী-যোগে কান্তের লহর তুলিয়া ভাসিতেছে, তোমার সেই সৈকতে, দ্বিতীয় নবীন স্বামীর বিগত-জীব কলেবর সংস্থাপিত করিয়া কিশোরী কামিনী, বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে, হাহাকার রবে বসুন্ধরা বিদীর্ণ করিতেছে। তোমার যে জলে আচমন করিয়া ধর্ম্ম-নিষ্ঠগণ পবিত্রতা উপভোগ করিতেছেন, মা, তোমার সেই সলিল-গর্ভে নরহত্যাকারী নিহত শব সমাহিত করিয়া, আপনার পাপের চিহ্ন সংগোপন করিতেছে। মাতর্গঙ্গে! এ সংসারে নিষ্কাম ধর্ম্ম শিক্ষার তুমিই একমাত্র অতুলনীয় স্থল। পাপ ও পুণ্য, শুভ ও অশুভ সর্ব্বত্র তুমি সমদর্শী। পুণ্যবানের সদনুষ্ঠান, দুরাত্মার দুষ্কর্ম্ম, তোমারই সমক্ষে, কখনও বা তোমারই বক্ষের উপর সম্পন্ন হইতেছে। তুমি কিন্তু নির্ব্বিক, নির্লিপ্ত ও নির্ব্বিরোধ। তোমাকে দেখিলে, শুভাশুভ সর্ব্ববিষয়

তোমার এই অভিনন্দন ও দ্বেষবিরহিত ভাব পর্য্যবেক্ষণ করিলে, উপদেশ লাভের নিমিত্ত আর সৎসঙ্গের প্রয়োজন থাকে না, শাস্ত্রের মর্ম্মগ্রহণের নিমিত্ত ব্যাকুল হয় না এবং ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত বলিয়া হতাশ হইতে হয় না। অয়ি দ্রবময়ি পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে! এই ভক্তাধম ধর্ম্ম-জ্ঞান-বিহীন, পাষণ্ডকে তুমি কৃপা-কণিকা প্রদান করিয়া ধন্য করিবে না কি?

অনন্ত-প্রবাহিণী ভাগীরথীর কূলে দাঁড়াইয়া দুই সন্ন্যাসী। যে স্থানে সন্ন্যাসীদ্বয় দণ্ডায়মান, তাহা কাশীধাম হইতে এক ক্রোশেরও একটু বেশী দূরবর্ত্তী। স্থানটী নির্জ্জন, শান্তিপূর্ণ ও মনোহর। এই স্থানের সন্নিকটে একটী ক্ষুদ্র অরণ্য। সন্ন্যাসীদ্বয় আমাদের পরিচিত ঘনানন্দ ও উমাশঙ্কর।

ঘনানন্দ বলিলেন,—"এই স্থানে, এই সময়ে যোগেশ্বরী দেবী আজি আগমন করিবেন কথা আছে। তাঁহার অন্যান্য কথা তোমাকে ক্রমশঃ জানাইব। তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি যে তাঁহার কোন কার্য্যেই বিশেষ স্থিরতা নাই। সুতরাং এ স্থানে আসিবার কথা থাকিলেও তিনি হয়তো না আসিতেও পারেন।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আমার যেরূপ দুরদৃষ্ট তাহাতে হয়তো সে দেবীর দর্শনলাভ আমার ভাগ্যে না ঘটিতে পারে। প্রভুর নিকট পুনঃ পুনঃ তাঁহার নাম ও মহিমার কথা শুনিয়া আসিতেছি, প্রভুর সহিত তাঁহার প্রায়ই সাক্ষাৎ হয়, ইহাও শুনিয়াছি; কিন্তু দুরদৃষ্ট-ক্রমে এ পর্য্যন্ত তাঁহাকে দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিবার সুযোগ আমার অদৃষ্টে ঘটিল না। প্রভু আমাকে এতদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অনুপযুক্ত বলিয়াই বোধ করিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রভু দয়া করিয়া সে আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন। অতঃপর আমার অদৃষ্ট।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"বৎস বার বার অদৃষ্টের নিন্দা করিও না। তোমার বয়স এখন এমন অবস্থায় উপনীত হইতেছে যে, এ সময়ে তোমাকে অনেক কথা জানাইবার প্রয়োজন হইয়াছে। যতদিন তোমার চরিত্র গঠিত হয় নাই, যতদিন তুমি দৃঢ়-চিত্ত ও প্রকৃষ্টরূপ হৃদয়বলে বলীয়ান্ হও নাই, ততদিন অনেক কথা তোমাকে জানাই নাই। এক্ষণে ভগবানের কৃপায়, আমার সে সকল আপত্তি বিগত হইতেছে, এজন্য ক্রমে ক্রমে অতঃপর অনেক কথা তোমাকে জানাইব স্থির করিয়াছি। আমি বুঝিয়াছি, তুমি সাধারণ মনুষ্য নহ। এক সঙ্গে ধর্ম্মানুষ্ঠান ও বিষয়-ভোগ এতদুভয়ের অত্যদ্ভুত সম্মিলন তোমাতে সংঘটিত হইবে। কি উপায়ে বা কি প্রণালীতে তাহার সুযোগ উপস্থিত হইবে, তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারিতেছি না; কিন্তু তাহা যে ঘটিবে সে সম্বন্ধে আমার কোনই সন্দেহ নাই। সুতরাং বৎস! তোমার অদৃষ্ট অতীব শুভ।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"কি ঘটিবে না ঘটিবে, সে সম্বন্ধে আমার কোনই চিন্তা নাই। শুভাশুভ কিছুই আমি জানি না প্রভো। আপনার চরণের দাসত্ব না ঘুচিলেই জীবনের সকলই শুভ বলিয়া মানিব। এক্ষণে দেবীর দর্শনলাভ আমার প্রাণের একান্ত কামনা হইয়াছে।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"অবশ্যই তাহা সিদ্ধ হইবে, কিন্তু কতক্ষণে, বা কখন ঘটিবে তাহা বলা ভার। অতএব আইস, আমরা এই নদীতীরে ধুনি জ্বালিয়া উপবেশন করি ও কথাবার্ত্তায় সময় কাটাইতে থাকি।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

জ্ঞান।

কৃষ্ণপক্ষের রজনী—অন্ধকার। সেই অন্ধকারে জাহ্নবীতটে বন-পার্শ্বে দুই সন্ন্যাসী উপবিষ্ট। সন্ন্যাসীদ্বয়ের নিকটে ধূনি জ্বলিতেছে। তাহারই আলোকে তাঁহাদের বদনমণ্ডল এক একবার দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। স্থানটী ভয়ানক হইলেও, সন্ন্যাসীদ্বয় নির্ভীক।

যুবক উমাশঙ্কর ঘনানন্দ স্বামীকে জিজ্ঞাসিলেন,—"প্রভো! তার পর?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"বৎস! তার পর জ্ঞান। এই জ্ঞান কেবল শাস্ত্রালোচনা বা সদুপদেশে লভ্য নহে; ইহা যোগের ফল।"

উমাশঙ্কর জিজ্ঞাসিলেন,—"সে যোগ কিরূপ? আপনি বলিয়াছেন যে, প্রাণায়ামাদির অনুষ্ঠানই প্রকৃত যোগ নহে। তাহাতে অন্যান্য অনেক উপকার এবং সঙ্গে সঙ্গে দেহের উপর মনুষ্যের যথেষ্ট ক্ষমতা জন্মিতে পারে; কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি চিত্তের একাগ্রতা সাপেক্ষ। তবে এখন জ্ঞানের নিমিত্ত যে যোগের কথা বলিতেছেন, তাহা আবার কি যোগ?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"তাহা চিত্তের একাগ্রতা। যোগ শব্দ অনেকার্থে ভগবান্ ব্যবহার করিয়াছেন। যোগ বলিলেই যে কুম্ভক সাহায্যে দেহকে ঊর্দ্ধে তুলিতে হইবে, বা বাম ও দক্ষিণ নাসায় বায়ু সঞ্চালনের কৌশলবিশেষ অভ্যাস করিতে হইবে, এমন নহে। সে সকল প্রক্রিয়াও যোগের সহায় বটে, কিন্তু চিত্তের একাগ্রতাই মুখ্য যোগ। এই চিত্তের একাগ্রতা সাধিত করিতে হইলে অভ্যাসই প্রধান সহায়। ইহার পূর্ণতা ঘটিলে, আত্মজ্ঞান অবশ্যম্ভাবী। একাল পর্য্যন্ত অনেক সাধুর সহিত আমার সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছে; সুতরাং আমি নানারূপ যোগী দেখিয়াছি। কোন কোন ব্যক্তি, বায়ু-নিরোধ ও অন্যান্য প্রক্রিয়া দ্বারা, সুদীর্ঘকাল দেহকে যুবার ন্যায় স্বচ্ছন্দ রাখিয়াছেন। কেহ কেহ, আহারাদি বিষয়ে এতই অল্পতা অভ্যাস করিয়াছেন যে, রোগ তাঁহাদিগের দেহকে কখনই স্পর্শ করিতে পারে না। কেহ কেহ, অনিমাদি অষ্ট সিদ্ধির কোন কোন সিদ্ধি লাভ করিয়া, অলৌকিক ব্যাপার সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছেন। আবার কেহ কেহ, কুপথে সাধনা করিয়া, বৃথা জীবনের সুখ-শান্তি বিনষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত যে জ্ঞান তাহা অনেকেরই আয়ত্ত হয় নাই। মনুষ্যসমাজ তাঁহাদিগের ক্রিয়া-কলাপ দেখিয়া, তাঁহাদিগকে অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়া পূজা করিলেও, তাঁহাদিগের নিজের চিত্ত তাদৃশ কোন সম্মানেই আর পরিতৃপ্তি লাভ করিতেছে না। প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে, তাঁহারা আপনাদিগকে অধম বলিয়াই মনে করিতেছেন।

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"বুঝিলাম প্রকৃত জ্ঞান লাভই প্রার্থনীয় এবং একাগ্রতাই তাহার সাধন; কিন্তু শাস্ত্রে যম-নিয়মাদি যে সকল ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়, একাগ্রতা লাভের নিমিত্ত তাহার কি প্রয়োজন নাই?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"শাস্ত্র কখনই মিথ্যা নহে। যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গই যোগ। যেমন মনুষ্য নানা পদার্থ ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে, সেইরূপ নানা উপায়ে জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে। অভ্যাসের প্রাবল্যে কেহ ভোজ্য বিশেষের অনুরাগী হয় এবং তাহাই অনুকূল আহার্য্য বলিয়া গ্রহণ করে

সেইরূপ শিক্ষা ও সংসর্গের প্রাবল্যে যোগিগণ নানা পথ গ্রহণ করেন। শাস্ত্রবিহিত অষ্টাঙ্গ যোগ তাহার অন্যতম। তাহারও পরিণাম ফল একাগ্রতা। কিন্তু স্বতন্ত্র চক্ষে দেখিলে, তাহাতেও অপূর্ণতা দৃষ্ট হয়। কারণ তাহা ভক্তি-বিরহিত। কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান এই তিনটী পরস্পর সাপেক্ষ। কর্ম্ম ও ভক্তি প্রভাবে যে একাগ্রতা জন্মে, তাহা বড়ই মধুর এবং তজ্জনিত যে জ্ঞান তাহাই প্রার্থনীয়।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"তাহাও বুঝিলাম। কিন্তু ইন্দ্রিয়-সংযমাদি বিষয়ে যে সকল শাস্ত্র-বিহিত ব্যবস্থা আছে, তাহা কতদূর প্রতি-পাল্য?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"সে সকল ব্যবস্থা অমূল্য এবং অবশ্য-প্রতিপাল্য। কিন্তু তৎ-সম্বন্ধে আমরা যেরূপ আতিশয্য করিয়া থাকি, তাহা শাস্ত্রের অনুমোদিত হইতে পারে না। আমরা ইন্দ্রিয়াদি সংযম সম্বন্ধে, এককালে তৎসমস্ত পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করি, কিন্তু শাস্ত্রের কদাপি তাহা তাৎপর্য্য নহে। ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি সমূহ জগদীশ্বরে বিধি-বিহিত। তৎসমস্ত পরিত্যাগ করিলে বৈধ ব্যবস্থার উল্লঙ্ঘন করা হয়। যেমন কিঞ্চিন্মাত্র আহার না করিলে শরীর ধারণ অসম্ভব সেই-রূপ এককালে ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি ত্যাগ করিলে, জীব-সংস্থিতি রক্ষিত হওয়া অসম্ভব এবং দেহ ও মনকে সুস্থ রাখাও সুকঠিন স্ত্রীসংসর্গ বিরহিত হওয়া, অনেকেই ধর্ম্ম-মার্গের প্রধান অবলম্বনীয় বলিয়া মনে করেন; কিন্তু শাস্ত্রের তাহা তাৎপর্য্য নহে। জীব-প্রবাহ রক্ষণার্থ ঐ অত্যাবশ্যক প্রবৃ-ত্তির উদ্ভব হইয়াছে, তাহার পরিবর্জ্জন ঐশ্বরিক নিয়মের বিরোধী। তাহার অবৈধ ব্যবহারের নিষেধই সংযম শব্দের লক্ষীভূত। যাহাতে সামাজিক বিশৃঙ্খলা না ঘটে, যাহাতে কাহারও অন্তরে ক্লেশের উদ্ভব না হ যাহাতে প্রবঞ্চনা, স্বার্থপরতা বা নিন্দি ব্যবহারের সুযোগ উপস্থিত না হয়, এরূ ভাবে বৈধ স্ত্রী-সংসর্গ নিষিদ্ধ নহে। কি সাধকের এমন সময় ও অবস্থা উপস্থিত হইতে পারে, যখন তাঁহাকে আর কোন নিয়মের অধীন থাকিতে হয় না; এবং কোন নিয়ম তাঁহাকে শাসনাধীন রাখিতে পারে না তখন তিনি প্রবৃত্তিমাত্র পরিশূন্য হইয়া বিমলা নন্দ উপভোগ করিতে থাকেন। এইরূ আহার-সংযম বিষয়েও, নিরন্তর উপবা ব্যবস্থা নহে। অত্যাহার ও অবৈধ ভোজন পরিবর্জ্জনীয়। অন্যান্য সকল ইন্দ্রিয় ব্যাপ রেই এইরূপ নিয়ম বুঝিতে হইবে। যোগে অবস্থাবিশেষে সকলই স্বতঃ নিরুদ্ধ হইলে হইতে পারে, কিন্তু তাদৃশ অবস্থা প্রাপ্তি পূর্ব্বে, বলপূর্ব্বক বৈধ ইন্দ্রিয় ব্যবহারে একান্ত নিরোধ হইলে, দৈহিক অসুস্থত চিত্ত-চাঞ্চল্য, নিরুৎসাহ, অবসাদ প্রভৃ যোগের প্রতিকূল দুর্লক্ষণ সমূহ অবশ্যই উ স্থিত হয় এবং হিতে বিপরীত ঘটে।"

উমাশঙ্কর জিজ্ঞাসিলেন,—"তবে প্রভে উপদেষ্টা আচার্য্যগণকে শাস্ত্রাচারের সর্ব্ব সমান ব্যাখ্যা করিতে দেখা যায় না কেন?"

ঘনানন্দ উত্তর দিলেন,—"শাস্ত্রের বিরুদ্ধ অর্থ কল্পনা করায়, আর্য্য-ধর্ম্ম ক্রমে না স্থানে নানারূপ উৎকট আকার ধারণ ক রিয়াছে। বঙ্গদেশের ধর্ম্মের সহিত কাশীপ্রদে বাসিগণের ধর্ম্মগত প্রভৃত বৈলক্ষণ্য। এইর মহারাষ্ট্র ও পঞ্জাব প্রদেশের ধর্ম্মগত পার্থক্য ভয়ানক। শাস্ত্রার্থকে বিভিন্ন ভাবে গ্র করায়, এই সকল ধর্ম্মাচারের বিভিন্নরূপ অ ষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।"

সহসা দূরাগত নারী-কণ্ঠ-নিঃসৃত অপূর্ব্ব মাধুর্য্যময় হাস্যধ্বনি উভয়েরই কর্ণে প্রবেশ করিল। তাঁহারা চমকিত হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

ঘনানন্দ বলিলেন,—"বৎস! তোমার আশা সফলিত হইবার সম্ভাবনা উপস্থিত। নিকটেই যোগেশ্বরী দেবীর আবির্ভাব হইয়াছে। এ স্বর্গীয় হাস্য-ধ্বনি তাঁহারই কণ্ঠ-নিঃসৃত! তুমি নীরবে আমার অনুসরণ কর।

উমাশঙ্করের দেহ পুলকিত হইয়া উঠিল। তিনি, ধীরে ধীরে নিরতিশয় আশান্বিত হৃদয়ে, ঘনানন্দের অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যোগেশ্বরী।

ক্রমে অন্ধকারাচ্ছন্ন নভোমণ্ডল আলোকিত হইল এবং বিমল জ্যোৎস্নায় চতুর্দ্দিক সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিল ঘনানন্দ স্বামী ও উমাশঙ্কর ধীরে ধীরে আরণ্য-পথে অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলেন, দূরে এক বিস্রস্ত-বসনা, আলুথালুবেশা, মলিনা সুন্দরী দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধমুখে আকাশের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন। সুন্দরী মলিনা ও বসন-ভূষণ-বিহীনা হইলেও, তাঁহার অলৌকিক শ্রীতে সন্নিহিত প্রদেশ যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। সুন্দরী সধবা; কারণ তাঁহার সীমন্তে অতি সমুজ্জ্বল সিন্দূর-বিন্দু। তাঁহার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া, তাঁহাকে উন্মাদিনী বলিয়াই বোধ হয়।

সবিস্ময়ে, অনুচ্চস্বরে, উমাশঙ্কর বলিলেন,—"প্রভো! ইনিই কি সেই দেবী?"

ঘনানন্দও অনুচ্চস্বরে বলিলেন,—"বৎস! ইনিই যোগেশ্বরী। ইহার মর্ম্ম প্রণিধান করিতে পারিলে, নির্লিপ্ত ধর্ম্মময় জীবন-ব্যাপারের অনেক রহস্য বুঝিতে পারিবে। ইহার জীবন দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় এবং অত্যদ্ভুত প্রহেলিকাবৎ। ইনি কখনও জ্ঞানময়ী পণ্ডিতা, কখনও বা বোধবিহীনা উন্মাদিনী। কখনও পৌরনারীর ন্যায় লজ্জাবতী, কখনও বা বিগলিত-বসনা লজ্জাহীনা। কখনও ধীরা, কখনও বা চঞ্চলা। কখনও গম্ভীরা কখনও বা প্রগল্‌ভা। তুমি আজি ইহাকে এই ভাবে দেখিতে পাইতেছ; ক্রমশঃ ইহার আরও অনেক ভাব তোমার চক্ষুতে পড়িবে। যতই ইহাকে দেখিতে থাকিবে, ততই বিস্ময়ে তোমার হৃদয় মন পরিপূরিত হইতে থাকিবে। ইনি ভোগ-স্পৃহা-বিবর্জ্জিতা, লালসা ও আকাঙ্ক্ষা বিহীনা, নিষ্কাম ধর্ম্মের অত্যদ্ভুত উদাহরণ; কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের অদ্ভুত সম্মিলন স্থল।"

উমাশঙ্কর ভক্তিপূর্ণভাবে জিজ্ঞাসিলেন,—"কে এই দেবী?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—ইনি কে তাহা আমি জানি না। কিন্তু ইহার এক অলৌকিক পরিচয় আমি বলিতে পারি। ইনি আমার স্ত্রী; অথচ অজ্ঞাত কুলশীলা ও অবিবাহিতা। এই দাম্পত্য সম্বন্ধের মধ্যে কোন পক্ষেই কামের সংস্পর্শ নাই এবং গৃহীর ব্যবহারও নাই। তথাপি এই দেবীর বিশ্বাস—ইনি আমার ধর্ম্ম-পত্নী। কোনরূপ সমাজ-সঙ্গত বা ধর্ম্ম-সঙ্গত বিবাহের বন্ধন ঘটে নাই এবং স্ত্রী-পুরুষোচিত কোন ব্যবহারের বাসনাও কদাপি কোন পক্ষের মনে উদয় হয় নাই। তথাপি এই সৌন্দর্য্যময়ী যুবতী আমার আশ্রয় বিহীন, গৃহ-হীন এবং সংস্থান-শূন্য পুরুষের গৃহ-লক্ষ্মী।"

আবার উমাশঙ্কর সবিস্ময়ে বলিলেন,—"তবে তো সত্যই উনি আমার মা। অহো কি ভাগ্য! মা আমার সর্ব্বদা কোথায় থাকেন বাবা? কতদিন হইতে উনি প্রভুর সহিত এই অদ্ভুত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"বৎস! তোমার এই অদ্ভুত মা কখন কোথায় থাকেন তাহার স্থিরতা নাই, কিন্তু যেখানেই যখন থাকুন, অনেক সময়েই ইনি আমাকে দেখা দেন। কখনও কখনও এমনও ঘটে যে, দুই চারি দিবস ইনি অবিচ্ছেদে আমারই সঙ্গে বিচরণ করেন। আমি অতীব প্রচ্ছন্ন ভাবে দেশান্তরে গমন করিয়াছি, জানি না কোন শক্তিবলে, ইনিও সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া আমাকে দর্শন দান করিয়াছেন। স্ত্রী মাত্রই পুরুষের প্রতিপাল্য। কিন্তু আমার এই স্ত্রীর কোন দায়িত্বই আমার স্কন্ধে নাই। ইহার ভরণ-পোষণাদির কোন ভারই আমাকে কখনও বহন করিতে হয় না। কখনও কখনও আমি ইহার ছিন্ন বসন দেখিয়া, নূতন বসন সংগ্রহ করিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছি; ইনি তৎক্ষণাৎ হাসিতে হাসিতে আমার নিকট হইতে প্রস্থান করিয়াছেন এবং অনতিকাল মধ্যে, হয়তো মহার্ঘ কৌশিক বস্ত্র পরিধান করিয়া, আমার সমীপাগত হইয়াছেন। কখনও ইহাকে দুর্ব্বল বোধ করিয়া, আহারের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছি; ইনি তখনই হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিয়া, অনতি-কাল মধ্যে রাশীকৃত বহুবিধ মিষ্টান্নাদি আমার চরণ-সমীপে স্থাপন করিয়াছেন। কোথাও ইহার ভাণ্ডার নাই—দ্রব্যাদি রাখিবার কোন স্থান নাই। তথাপি প্রয়োজন হইবামাত্র, দ্রব্য সমূহের সঙ্কুলান কিরূপে হয়, তাহা আমি নির্ণয় করিতে পারি নাই। সংসারে ইহার কিছুই নাই, অথচ সকলই আছে।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"কি অলৌকিক ব্যাপার! হায় কোন্ পাপে আমি এতদিন এই মাতৃ-দর্শনে বঞ্চিত ছিলাম?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"বৎস! সকল কার্য্যেরই সমুচিত সময় আছে। তোমার মাতৃ-দর্শনের উপযুক্ত সময় এতদিন হয় নাই। এক্ষণে কেমন করিয়া, কোথায়, এই দেবীর সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়, বলি শুন। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে মথুরার ধ্রুব ঘাটে, এই দেবী প্রথমে আমার নিকটাগত হন। তখন ইহার বয়স ষোড়শ বর্ষ। তদবধি ইনি আমাকে স্বামী-সম্ভাষণ করিয়া আসিতেছেন এবং সর্ব্বপ্রকার আকাঙ্ক্ষা-বিরহিত-ভাবে, আমার অনুগামিনী হইয়াছেন। প্রথমতঃ আমি ইহাকে কুলটা কামিনী বলিয়া মনে করিয়াছিলাম; তদনন্তর ইহাকে উন্মাদিনী বলিয়া বোধ হইয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে ইহাকে শাপ-ভ্রষ্টা দেবী ব্যতীত আর কিছুই মনে হয় না। ইহার নাম, পিতৃ-মাতৃ-বৃত্তান্ত, জাতি, কুল, পূর্ব্বাবস্থা কিছুই আমি জানি না। একটা নাম না থাকিলে, অনেক সময় অসুবিধা হয় দেখিয়া, আমি ইহার যোগেশ্বরী নামকরণ করিয়াছি।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"ভগবন্! আজি আমার জীবন সার্থক; আজি আমি সাক্ষাৎ যোগেশ্বরী মাতার সজীব মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। কিন্তু ভগবন্! এ অধম সন্তান কি ঐ দেবীর সহিত বাক্যালাপের সাহস করিতে পারে না?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"অবশ্যই পার। কিন্তু হয়তো প্রথম সুযোগে কথাবার্ত্তা না ঘটিতেও পারে। যোগেশ্বরীর প্রকৃতি রহস্য-

জালে বিজড়িত। তিনি কখন কোন্ ভাবে থাকেন, তাহার স্থিরতা নাই। সুতরাং কখন কথা কহিবেন, কখন না কহিবেন, তাহা স্থির বলা যায় না। তুমি আমার সঙ্গে আইস, আমি যোগেশ্বরীর সহিত তোমার পরিচয় করাইবার চেষ্টা করিব।"

ঘনানন্দ ও উমাশঙ্কর আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া, যোগেশ্বরীর নিকটস্থ হইলে ঘনানন্দ ডাকিলেন,—"যোগেশ্বরি!"

যোগেশ্বরী চমকিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। অন্যমনস্ক ভাব যেন কোথায় বিদূরিত হইয়া গেল। অপূর্ব্ব আনন্দে তাঁহার দেহ যেন কণ্টকিত হইয়া উঠিল এবং প্রেমাবেশে তাঁহার বদনমণ্ডল রঞ্জিত হইল। তিনি, ভক্তি ভাবে ঘনানন্দকে প্রণাম করিয়া, তত্রত্য কিঞ্চিৎ ধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক মস্তকে স্থাপন করিলেন। ঘনানন্দ স্বামীর এই অলৌকিক পত্নী, কখনই স্বামীকে স্পর্শ করিতেন না। দর্শন মাত্রই দূর হইতে স্বামী-চরণের উদ্দেশে তিনি প্রণাম করিতেন এবং তত্রত্য কিঞ্চিৎ ধূলি লইয়া, স্বামীর পদ-রজঃ জ্ঞানে, ভক্তি সহকারে মস্তকে, রসনায় বা বক্ষঃস্থলে অর্পণ করিতেন।

বীণাধ্বনির ন্যায় সুমধুর স্বরে যোগেশ্বরী বলিলেন,—"স্বামিন্! আমি তোমাকে এতক্ষণ আকাশে দেখিতে ছিলাম। তুমি কি বিশ্বব্যাপী? তোমার সঙ্গে কে এই সাধু বালক?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"দেবি! এটী আমার পুত্র—উমাশঙ্কর।"

যোগেশ্বরী বলিলেন—"না। তোমার পুত্রে কাজ নাই। তোমার পুত্র হইলে, আমাকেই তাহার ভার লইতে হইবে। সুতরাং তাহাকে স্নেহ-মমতারও ভাগ দিতে হইবে। আমার হৃদয়ে যাহা কিছু ছিল সকলই আমি স্বামিদেবতাকে সমর্পণ করিয়াছি; তাহা হইতে অংশ করিয়া আর কাহাকেও কিছুই দিবার উপায় নাই। তুমি গৃহীর ছেলে কেন লইয়াছ? যাহাদের ছেলে তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেও; আমাদের ছেলের কাজ নাই।"

উমাশঙ্কর, তৎক্ষণাৎ দেবীর চরণসমীপে নিপতিত হইয়া, কাতর স্বরে বলিলেন,—"মা! মা! কোন পিশাচী জননীও তো সন্তানকে পরিত্যাগ করে না, তুমিতো দেবী। আমি অতি শৈশবে মাতৃহীন; মাতৃ-স্নেহ ভোগ করা আমার অদৃষ্টে কখনই ঘটে নাই। অপরিসীম পুণ্যফলে আজি আমি জগৎ-জননী মা পাইয়াছি। তুমি আমাকে দূর করিয়া দিলেও, আমি তোমার পদাশ্রয় কখনই ছাড়িব না মা!"

যোগেশ্বরী কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"ঠিক কথা! ঐ আকাশে অনেক মেঘ থাকে. তাহা হইতে কত স্থানে কতই বৃষ্টি হয়। তা হউক, তুই আমার ছেলে। কিন্তু তুই বড় ভাগ্যবান্ ছেলে। যে গুরু লাভ করিয়াছিস, তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ। অনেক জন্মের সঞ্চিত সুকৃতি না থাকিলে, এরূপ ভগবানকে গুরুরূপে কেহই পাইতে পারে না। সার্থক তোর সাধনা।"

তাহার পর সেই দেবী, সহসা নয়ন মুকুলিত করিয়া এবং বক্ষের উপর বাহুদ্বয় স্থাপন করিয়া, নিস্পন্দ ভাব ধারণ করিলেন। ললাট হইতে যেন জ্যোতিঃ নিঃসৃত হইতে থাকিল, লোচনযুগল হইতে অবিরল ধারায় অশ্রুপ্রবাহ নিপতিত হইতে লাগিল। তাহার পর. ঘনানন্দকে লক্ষ্য করিয়া, দীর্ঘ-

নিশ্বাস সহ, করযোড়ে কহিলেন,—"ধন্য প্রভুর দয়া। ধন্য এ শিষ্য বালক।"

তাহার পর উমাশঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"প্রভুর কৃপায় ভাগ্যফলে, তোর মত ছেলে পাইলাম। বড় শান্ত, শিষ্ট ছেলে তুই। তুই পরে রাজা হইবি। আমি রাজমাতা। তোর জন্য আমি অনেক জিনিষ রাখিয়াছি। তুই লইবি আয় বাবা।"

এই বলিয়া যোগেশ্বরী, উমাশঙ্করের হস্তধারণ করিয়া, অরণ্য মধ্যে অগ্রসর হইতে থাকিলেন। ঘনানন্দ ধীরে ধীরে তাঁহাদের অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড—অন্ধকার।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রতাপ।

অতঃপর পাঠক মহাশয়কে আমাদের সঙ্গে পুণ্য-ভূমি বারাণসী হইতে, বঙ্গদেশের সোনাপুর নামক গ্রামে আসিতে হইতেছে, এবং ধর্ম্ম-প্রদীপ্ত, ভস্মাচ্ছাদিত সন্ন্যাসীর সামান্য কুটীর ত্যাগ করিয়া, সম্প্রতি তাঁহাকে পাপপঙ্কিল, বিলাস-উন্মত্ত শ্যামলাল বাবুর শোভাময় সৌধমধ্যে প্রবেশ, করিতে হইতেছে।

রাত্রি প্রায় এক প্রহর হইবে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে। পল্লী-গ্রামের জনগণ সকলেই স্ব স্ব আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে; পথ জন-শূন্য।

শ্যামলাল বাবুর সুসজ্জিত বৈঠকখানায়, সুরম্য আলোকাধারে অত্যুজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছে। দুগ্ধফেন-নিভ শয্যায় শ্যামলাল ও হরিচরণ নামক তাঁহার জনৈক বন্ধু বসিয়া আছেন। মদের বোতল ও গেলাস লইয়া রামা খানসামা দূরে দাঁড়াইয়া আছে এবং আদেশ মাত্র, সুরা ঢালিয়া শ্যামলাল বাবু ও তাঁহার বন্ধুকে গ্লাস প্রদান করিতেছে।

শ্যামলাল কৃষ্ণবর্ণ, স্থূলদেহ ও খর্ব্বাকার। তাঁহার নাক মোটা, চক্ষু ছোট, ঠোঁট পুরু বগলের নীচে ও পিঠে দুই চারি খানা দাদ। কিন্তু তাহাতে কি যায় আইসে? শ্যামলাল পিত্রার্জ্জিত বিপুল বিষয়-বিভবের অধিকারী। তাঁহার সম্পত্তির আয় প্রায় চারি লক্ষ টাকা। হাতি-ঘোড়া বিস্তর, বহুবিস্তৃত মনোহর অট্টালিকা অনেক, এবং পরম শোভাময় উদ্যান যথেষ্ট। ঘটনাক্রমে, সুবিধাজনক জন্মলাভ করায় মনুষ্য-লোকে যে কিছু পদার্থ সুখসাধক বলিয়া পরিগণিত, তিনি তৎসমস্তই বিনা আয়াসে প্রচুর পরিমাণে লাভ করিয়াছেন।

শ্যামলালের আকৃতি নিতান্ত ইতর জাতির ন্যায় হইলেও, তাঁহার কোমরে অতি মলিন উপবীত; পরিধানে সুচিক্কণ সিমলার ধুতি। দেহের আর কোথায়ও কোন বেশ-ভূষার পারিপাট্য নাই। মস্তকের কেশ শূকরের লোমের ন্যায় কঠিন; সুতরাং তেরির জ্বালা তাহাদিগকে কখনই ভোগ করিতে হয় না।

শ্যামলাল মূর্খ। পিতা, অন্যান্য সম্পত্তির সহিত, সন্তানকে বিদ্যা-ধন প্রদান করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু গুণধর শ্যামলালের বুদ্ধি এতই সূক্ষ্ম যে, অক্ষর পরিচয়-রূপ কঠোর ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেই তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। যে টুকু বাকি থাকিল, তাহা ঘসিয়া মাজিয়া সরু করিতে গেলে, মূলটুকুও

ক্ষয় হইয়া যাইবে দেখিয়া সন্তানবৎসল পিতা পুত্রকে বিদ্যা দানের আশা পরিত্যাগ করিলেন।

শ্যামলালের বয়স পঁচিশ বা ছাব্বিশ হইতে পারে। পিতা-মাতা অনেক দিন সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং তিনি এক্ষণে সম্পূর্ণ স্বাধীন। শ্যামলালের বিবাহ হইয়াছে; ইহা তিনি জানেন এবং অন্তঃপুরে একটি রমণী তাঁহার পত্নী-পরিচয়ে বাস করেন, ইহাও তিনি বিশ্বাস করেন। এতদ্ব্যতীত স্বকীয় স্ত্রী সম্বন্ধীয় অন্য কোন জ্ঞান শ্যামলালের নাই। স্ত্রীর সহিত শ্যামলালের কখনই সাক্ষাৎ হয় না; কারণ তিনি রসিক। বহু ফুলের মধু খাইতে অভ্যাস না থাকিলে, সে ভ্রমরকে কি কেহ রসিক বলে? আর যে ব্যক্তি, পরকীয় রসে নিরন্তর প্রমত্ত না থাকে, সে কি আবার মানুষ?

শ্যামলালের বন্ধু হরিচরণ তাঁহারই আশ্রিত ও প্রতিপাল্য। তোষামোদ তাহার ব্যবসায়। তাহার মাথায় তিন ভাঁজ তেরি এবং সকল প্রকার নেশায় তাহার সিদ্ধ বিদ্যা; এজন্য চিকাগো একজিভিসন হইতে সে মেডেল পাওয়ার উপযুক্ত। এই হরিচরণ শ্যামলালের নিতান্ত বিশ্বাসভাজন ও রঙ্গরস বিষয়ের প্রধান মন্ত্রী। বয়সে এ ব্যক্তি শ্যামলাল অপেক্ষা কিছু বড়। লেখা পড়ায় সে শ্যামলালেরই দাদা। কিন্তু শ্যামলালের ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন নির্ব্বোধ নহে।

শ্যামলালের দুষ্কর্ম্মের সীমা নাই। তাঁহার অত্যাচারে গ্রামের দীন-দুঃখিগণের স্ত্রী-কন্যা লইয়া বাস করা, এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। অনেক কুল-কামিনী, তাঁহার দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তিরূপ হুতাশনে, আপনাদের ধর্ম্ম-ধনকে আহুতি প্রদান করিয়াছে। যে নারী তাঁহার লালসা-পূর্ণ নয়ন-পথ-বর্ত্তিনী হইয়াছে, তাহাকেই হয় স্বেচ্ছায়, না হয় লোভ-বশবর্ত্তিতায়, অথবা অত্যাচারের উৎপীড়নে বাধ্য হইয়া শ্যামলালের করে আত্ম-সমর্পণ করিতে হইয়াছে। অনেক ভদ্র-পরিবারও এ নিদারুণ অত্যাচারের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই। অদ্য শ্যামলাল এক গুরুতর পাপানুষ্ঠানের উদ্যোগ করিয়াছেন।

রঘুনাথ সার্ব্বভৌম মহাশয়, সোণাপুর নিবাসী হইলেও, বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র সম্মানিত ও সুপ্রসিদ্ধ। তিনি অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা, সুশীলতা ও বিজ্ঞতা অতুলনীয়। এই রঘুনাথের একমাত্র পুত্র নবীনকৃষ্ণ পিতার নিকট এখনও শাস্ত্রা-ভ্যাস করিতেছেন। সার্ব্বভৌম-নন্দনের ষোড়শ-বর্ষীয়া পত্নী সুহাসিনী, দুরদৃষ্টক্রমে দৈবাৎ একদিন, শ্যামলালের পাপ-নয়নের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। সেই সতীত্ব-তেজ-প্রদীপ্তা ব্রাহ্মণকন্যার অলোক-সামান্য রূপ-রাশি দর্শন করার পর হইতে, তাঁহাকে হস্তগত করিবার নিমিত্ত, শ্যামলাল নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়াছেন। শ্যামলালের দূতী, সুন্দরীর নিকট গমন করিয়া, অর্থ-অলঙ্কারাদি বিবিধ প্রলোভনের ফাঁদ পাতিয়াছিল; কিন্তু অভি-মানিনী নবীনা, অবজ্ঞার সহিত, সে প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়াছেন; অধিকন্তু সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট সমস্ত কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। নিরীহ সার্ব্বভৌম, প্রবল প্রতাপান্বিত ভূস্বামীর সহিত বিরোধ অসম্ভব জানিয়া, অচিরে পুত্র-বধুকে পিত্রালয়ে প্রেরণ করিবার আয়োজন করিতেছেন। শ্যামলালও সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া, সুন্দরীর পিত্রালয় গমনের পূর্ব্বেই, বলপূর্ব্বক বাসনা-সিদ্ধির সংকল্প করি-

যাছেন। গদা নামে এক দুরন্ত চণ্ডাল শ্যামলালের এইরূপ কার্য্য-সংসাধনের সহায়। অদ্য এই অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীতে, গদা, দল-বল লইয়া, বলপূর্ব্বক সার্ব্বভৌমের পুত্র বধূকে বাবুর বৈঠকখানায় ধরিয়া আনিবার নিমিত্ত, যাত্রা করিয়াছে। শ্যামলাল নিতান্ত আগ্রহের সহিত গদার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

শ্যামলাল গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন,—"গদা এত দেরি কেন করিতেছে? এরূপ বিলম্বের কোনই কারণ নাই তো।"

হরিচরণ বলিলেন,—"বোধ হয় সুযোগ পায় নাই।"

ক্রুদ্ধ স্বরে শ্যামলাল বলিলেন,—"সুযোগ! কিসের সুযোগ! যে প্রতিবন্ধক হইবে তাহাকে প্রাণে মারিতে পর্য্যন্ত হুকুম দিয়াছি। লুকাইয়া কাজ করিতে তো আমি বলি নাই।"

হরিচরণ বলিলেন,—"কিছুই করিতে হইবে না, সহজেই সব কাজ মিটিয়া যাইবে। ছুঁড়িকে নিয়ে গদা আইসে আর কি।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"তাঁহার রূপের অহঙ্কার সতীত্বের গৌরব, আজ সব চূর্ণ করিব। আমি গোপনে লোক পাঠাইলাম, তাহা ভাগ্য বলিয়া না মানিয়া, অপমান! দেখি তোর এ সতীত্ব কোথায় থাকে!"

হরিচরণ বলিল,—"অপমানটা কিন্তু মনের সঙ্গে নয়; তুই একটা চালাক মেয়ে মানুষ এই রকমই করিয়া থাকে। এই রকমে তাহারা আপনাদের দর বাড়ায়। মনে খুব ইচ্ছা আছে, কেবল লোক দেখান একটু কায়দা মাত্র। আপনার কাছে আসিবার জন্য সীতা-সাবিত্রী পর্য্যন্ত পাগল! তা সার্ব্বভৌমের পুতের বে তো কোথায় লাগে।"

শ্যামলালের স্থূল অধর-প্রান্তে একটু হাসি দেখা দিল। বলিলেন,—"যাই বল, গদার বড় অন্যায় দেরি হইতেছে। রামা! তুই একটা দ্বারওয়ানকে, গদার খবর আনিবার জন্য, সার্ব্বভৌম ঠাকুরের বাটীতে পাঠাইয়া দে দেখি। শীঘ্র যা।"

রামা প্রস্থান করিল।

হরিচরণ বলিলেন,—"আপনি এদেশের রাজা, বিশেষতঃ রসিক-চূড়ামণি। আপনার কাছে যে আসিতেছে, সে কি ভাল রকম সাজ-গোজ না করিয়া আসিতে পারে? চুল বাঁধিবে, টিপ কাটিবে, পান খাইয়া ঠোঁট রাঙ্গা করিবে, পায়ে আল্‌তা লাগাইবে, ভাল কাপড় পরিবে, আতর গোলাপ মাখিবে, তবে তো আসিবে। ইহাতে একটু বিলম্ব হইবারই কথা।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"কথাটা বলিয়াছ নিতান্ত অসঙ্গত নয়। অবশ্য তাহারও ত সখের প্রাণ। তা তুমি ততক্ষণ একটু মদ ঢাল; স্ফূর্ত্তি করা যাউক।"

হরিচরণ ত্বরিত শ্যামলালের হস্তে সুরপাত্র প্রদান করিলেন। তিনি, নিঃশব্দ পাত্রস্থিত পদার্থ গলাধঃ করিয়া বলিলেন,—"কিন্তু ভাই, তাহার যে রূপ, তাহাতে সাজ-গোজ নিতান্তই অনাবশ্যক। সেরূপ দেখিলে মুনি-ঋষিরও মন বিচলিত হয়।"

হরিচরণ বলিলেন,—"দেখেছি, দেখেছি একদিন। তা সে জিনিষ হুজুরেরই যোগ্য বটে।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"তবে দেখেছ তুমি। আরে তেমন না হলে কি আর আমি পাগল হই? গদা বেটা বড় দেরি কচ্ছে; যা হউক একটা খবর দেওয়া উচিত ছিল।"

শ্যামলাল প্রকোষ্ঠ মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে

লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে এক প্রকাণ্ড দর্পণ-সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, স্বকীয় ভল্লুক-তুল্য শ্রী দেখিতে দেখিতে, মনে মনে ভাবিলেন যে, চেহারাটা কমই বা কিসে? ইহার জন্য নারী জাতি যে পাগল হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি?

সহসা দূরে পদ-শব্দ শুনিয়া, শ্যামলাল ব্যস্ততা সহ দ্বার-সন্নিধানে আগমন করিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, "কেও? গদা?"

দূর হইতে উত্তর আসিল,—"না মহারাজ! হামি ডুবে আছে।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"রামচরণ ডুবে! খবর কি? এ দিকে এস। গদা কোথায়?"

দোবে ঠাকুর সম্মুখাগত হইয়া উত্তর দিলেন,—"গোদা নেই আছে মহারাজ।"

শ্যামলাল সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিলেন,—"নেই আছে? কোথা গেল সে?"

দোবে বলিল,—"সে বাত কোই নেই জানছে মহারাজ। কাঁহা ভাগল বা।"

শ্যামলাল জিজ্ঞাসিলেন,—"সে কি কথা! আর ভট্‌চায্যির বৌ?"

দোবে বলিল,—"ওবি নেই আছে হুজুর। গোদার সাথে চলিয়ে গেছে। বাড়ীমে সব লোক কান্না কর্‌ছে, গোল কর্‌ছে, চিল্লাচ্ছে।"

শ্যামলালের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। বলিলেন,—"কি সর্ব্বনাশের কথা! বাড়ীতে সার্ব্বভৌমের পুত্রবধূ নাই, গদা তাকে নিয়ে পালিয়েছে; অথচ এখানে আসে নি। তারে কোথায় নিয়ে গেল? নিশ্চয়ই একটা কুমতলব আছে। গদা! আজ তোরই একদিন, আর আমারই একদিন!"

ক্রোধান্ধ শ্যামলাল বেগে গৃহ-নিষ্ক্রান্ত হইলেন। হরিশরণ ও দোবে ঠাকুর তাঁহার অনুসরণ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পতন।

অপরাহ্ণে শ্যামলালের অন্তঃপুর-সংলগ্ন ছাদের উপর, তাঁহার পত্নী বিধুমুখী দেবী পরিক্রমণ করিতেছেন। বিধুমুখীর বয়স অষ্টাদশ বর্ষ হইতে পারে। তিনি সুন্দরী। নিখুঁত না হইলেও, বড়ই লাবণ্যময়ী এবং পূর্ণাঙ্গী। দূর হইতে তাঁহাকে দেখিলে, সুন্দরীর শিরোমণি বলিয়া মনে হয়। কিন্তু নিকটস্থ হইলে, তাঁহার দৈহিক অনেক সামান্য সামান্য ত্রুটি উপলব্ধি হইতে থাকে। তাঁহার বর্ণ গৌর। কিন্তু রক্তিমাভ বিবর্জ্জিত; যেন কিছু ফিকে; আর একটু লাল হইলে ভাল হইত। চক্ষুদ্বয় বৃহৎ আয়ত, কিন্তু সরলতা-পূর্ণ দৃষ্টি-বিরহিত; যেন কটাক্ষ শরের অক্ষয় তূণ। নাসিকা উন্নত কিন্তু একটু স্থূল, নাসারন্ধ্রদ্বয় আর একটু স্থূল হইলে ভাল হইত। মুখ-গহ্বর একটু বেশী আয়ত। লোচন-তারা আর একটু কালো হইলে ভাল হইত। অধরোষ্ঠ একটু বেশী স্থূল। সর্ব্বাঙ্গের গঠন সুপরিণত, কিন্তু একটু কঠোর; যেন পৌরুষ-ব্যঞ্জক। তথাপি বিধুমুখী সুন্দরী। প্রথম দর্শনে তাঁহার হাব, ভাব ও বিলাসিতা সংবলিত রূপরাশি, দর্শকের চিত্তকে অভিভূত করে। বিধুমুখী সুন্দরী বলিয়াই পরিচিতা এবং স্বয়ং সৌন্দর্য্য-গর্ব্বে গর্ব্বিতা। তিনি বিলাসিনী। অনেক সাবান, তাঁহার দেহের সহিত সংঘর্ষণে, বিলীন হইয়া যায়; অনেক ফুলেল তৈল, তাঁহার কেশের মধ্যে আশ্রয় পাইয়া, চরিতার্থ হয়; অনেক আতর, তাঁহার সঙ্গ সুখ সতত সম্ভোগ করে। অনেক অলঙ্কার, তাঁহার দেহের সহিত মিশাইয়া, আপনারা অলঙ্কৃত হইয়া থাকে। না

সময়ে, নানা প্রকার বস্ত্রাদি, তাঁহার শ্রী-অঙ্গ আবরণ করিবার সুযোগ পাইয়া, ধন্য হয়। সমস্ত দিন বিধুমুখী বিলাসিতা ও দৈহিক পারিপাট্য লইয়াই ব্যস্ত থাকেন।

অদ্য বিধুমুখী, পূর্ণ শোভা বিস্তার করিতে করিতে পরিক্রমণ করিতেছেন এবং চিন্তা করিতেছেন। ভাবিতেছেন কি? ভাবিতেছেন—তাঁহার এই রূপ, এই যৌবন, সকলই বৃথা। যাহার তৃপ্তি হইলে, যে বিনোদিত হইলে, এ সকলের সার্থকতা হইতে পারিত, সে একবারও এ দিকে ফিরিয়া দেখে না; কখনও একটা কথা কহে না; ভ্রমেও আলাপ করে না। এ নিগ্রহ অসহনীয়। কিন্তু যদি এরূপ নিগ্রহ না হইয়া, অনুগ্রহই হইত, তাহা হইলেই কি বিধুমুখী সুখী হইতেন? এরূপ প্রশ্ন সুন্দরী আপনাকে আপনি অনেক বার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং মনে মনে অনেক তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনা করিয়া, ইহার উত্তরও স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। বিধুমুখী মীমাংসা করিয়াছেন শ্যামলাল বানর, তাঁহার কণ্ঠে এ মুক্তামালা কখনই শোভা পাইতে পারে না। শ্যামলাল ঘৃণিত পশু; এ রত্নের মাহাত্ম্য প্রণিধান করা তাঁহার সাধ্যাতীত। শ্যামলালের ন্যায় শূকরের নিমিত্ত এ দেব-ভোগ্য পদার্থের সৃষ্টি হয় নাই। মনুষ্য-সমাজ তাঁহাকে শ্যামলালের ভাগ্য-সূত্রে বিজড়িত করিয়া দিয়াছে বটে; কিন্তু সে অদূরদর্শী সামাজিক নিয়মে বাধ্য থাকিতে তাঁহার আর বাসনা নাই। শ্যামলাল কি সেই নিয়মের সম্মান রক্ষা করিয়াছে? না। সে সকল নিয়ম, সকল শিষ্টাচারের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, নিত্যই ধোপা, বাগদি, মুচি চাঁড়াল প্রভৃতি নানা জাতীয়া নূতন নূতন রঙ্গিণীর সহিত প্রেমানন্দে কালপাত করিতেছে। তবে তিনিই কেন সেই কুৎসিত অবিচারপূর্ণ সামাজিক নিয়মের অধীন থাকিবেন? এ কথা বিধুমুখী স্বীকার করেন যে, শ্যামলাল-রূপ গর্দ্দভের সহিত বিবাহ হওয়ায়, তাঁহার বেশ-ভূষা ও বিলাসিতার যথেষ্ট উপকরণ লাভের বিলক্ষণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু শ্যামলালের প্রতি কৃতজ্ঞতার কোনই কারণ তিনি দেখিতে পান না। এ সকল সুখ-সৌভাগ্য, তাঁহার বিধি-নিয়োজিত ফল বলিয়া তিনি মনে করেন এবং শ্যামলালের পরিবর্ত্তে, কোন ভিক্ষুকের গৃহিণী হইলেও, তাঁহার এতাদৃশ প্রার্থনীয় পদার্থ-প্রাপ্তির ব্যাঘাত হইত না বলিয়া মনে মনে বিশ্বাস করেন।

বলা বাহুল্য যে বিধুমুখী নারী-কুলের কলঙ্ক-স্বরূপা এবং পাপীয়সীগণের শীর্ষ-স্থানীয়া। আমাদের দুরদৃষ্ট যে, এরূপ কলঙ্কিনী কামিনীর প্রসঙ্গও লিপিবদ্ধ করিতে হইতেছে। এ স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, অন্তরে যাহাই হউক, বাহ্যতঃ বিধুমুখী স্বকীয় চরিত্র এ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। তিনি যাহাকে শূকর ও বানরবৎ মনে করেন, সেই শ্যামলালের চিত্ত আকর্ষণ রিয়া, তাঁহাকে নিজের করিবার জন্যও, সুন্দরী অনেক বিফল চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার পর বিধুমুখী পাপে গা ভাসাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

বিধুমুখী যখন স্বকীয় অদৃষ্ট বিষয়ক নানা প্রকার চিন্তা করিতে করিতে,ক্রমশঃ পাপ-পঙ্কিল বাসনার প্রশ্রয় দিতেছেন, সেই সময়ে, তাঁহার অলক্ষিত ভাবে, পশ্চাদ্দিক হইতে, আর এক নারী তথায় প্রবেশ করিল। নবাগতার বয়স পঁয়ত্রিশ হইতে পারে। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; হাব ভাব, চাল, চলন, বড়ই কৃত্রিমতা মাখা; গায়ের রঙটা উজ্জ্বল শ্যাম;

মুখখানি বেশ সরস, হাসি হাসি; মাথায় সযত্ন বিন্যস্ত খোঁপা; পাতলা ফিন্‌ফিনে কালাপেঁড়ে ধুতি পরা; হাতে দুগাছি টক্‌টকে সোণার বালা, কোমরে এক ছড়া রূপার গোট।

এই স্ত্রীলোক অনেকক্ষণ বিধুমুখীর পশ্চাদ্দিকে নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিল। তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—"আমি যদি পুরুষ হইতাম!"

বিধুমুখী তৎক্ষণাৎ গালভরা হাসি হাসিয়া, ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন,—"তাহা হইলে কি হইত সারদা?"

সারদা উত্তর দিল,—"তাহা হইলে ঐ চরণের দাস হইয়া জন্ম সার্থক করিতাম।"

বিধুমুখী সগর্ব্বে বলিলেন,—পুরুষের সঙ্গে মিলন আমার অদৃষ্টে নাই; পুরুষকে দাস করা একটা সুখ বটে। কিন্তু সে সুখভোগ করিতে আমার জন্ম হয় নাই। তুই পুরুষ হইলে, আমি তোর পানে ফিরিয়াও চাহিতাম না।"

সারদা বলিল,—"তাহা হইলে আমি তোমার সম্মুখে বুকে ছুরি মারিয়া প্রাণ বাহির করিতাম।"

বিধুমুখী একটু বিষণ্ণ স্বরে বলিলেন,—"প্রাণ বাহির করা তো দূরের কথা, একটা মনের কথা কহিবার লোকও এ পর্য্যন্ত পাইলাম না।"

সারদা বলিল,—"পেলে না যে, সে কেবল নিজের মনের গুণে। যার কথা বলি তাকেই মনে ধরে না।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"যাহাকে মনে ধরে, তাহার বুঝি আমাকে মনে ধরে না?"

সারদা বলিল,—"মনে ধরে না আবার! 'পাগ্‌লা ভাত খাবি, না হাত ধুব্ কোথায়?"

বিধুমুখী আরও নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"দেখা হইয়াছিল?"

সারদা বলিল,—"দেখা হয়েছিল, কথা হয়েছে।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"কি ঠিক হইয়াছে।"

সারদা বলিল,—"আজ রাত্রে নটবর হরিচরণ, বিধুমুখীর কুঞ্জে এসে দাস-খতে সহি করিবেন।"

আনন্দিত বদনে বিধুমুখী বলিলেন,—"তুমি দ্রৌপদী হও।"

হাসিতে হাসিতে সারদা বলিল,—"গালি দেও কেন বৌ দিদি? অত কমে গরিবদের চলে কি?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"তবে না হয় উর্ব্বশী হও।"

অনেকক্ষণ বিধুমুখী নিতান্ত চিন্তিত ভাবে একস্থানে অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর আপন মনে বলিলেন,—"জানি না পাপ-পুণ্য কি? কিন্তু যে পথে আমি পা দিতেছি, তাহা হইতে কিছুতেই ফিরিব না। যদি মানব জীবন পাইয়াছি, তাহা হইলে সকল সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিব কেন; কিসের অনুরোধে এই সাধের জীবনকে দুঃখে ডুবাইয়া রাখিব? বড়ই বেদনা পাইয়াছি। এ বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিব

তাহার পর সারদার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"এখন আয় ঘরের ভিতর কি কি কথা হইল, কি কি বন্দোবস্ত করিতে হইবে, শুনিগে চল।"

এই দুই পাপ-নিমগ্না নারী প্রস্থান করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

উপদেশ।

প্রত্যূষে শ্যামলাল ভবন-সংলগ্ন উদ্যানে পরিভ্রমণ করিতেছেন; তাঁহার পশ্চাতে দেওয়ান হরকুমার চক্রবর্ত্তী। হরকুমার প্রবীণ ব্যক্তি, বয়স পঞ্চাশ ছাড়াইয়া গিয়াছে। বড়ই শান্ত, সৌম্য ও বিজ্ঞতাব্যঞ্জক প্রিয়দর্শন মূর্ত্তি। শ্যামলালের মূর্ত্তি অধুনা নিতান্ত উগ্র এবং গতি ও ভাব অস্থির।

হরকুমার নিকটস্থ হইয়া বিনীতভাবে বলিলেন,—"আপনি উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া দেখুন কাজটা ভাল হইতেছে না।"

শ্যামলাল ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন,—"আমি উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়াছি কাজটা ঠিক হইয়াছে। আপনার যদি অন্য কোন কথা বলিবার দরকার থাকে বলুন। এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার আবশ্যক নাই।"

হরকুমার বলিলেন,—আপনি আবশ্যক নাই বলিয়া মনে করিতেছেন; কিন্তু আমি বুঝিতেছি, আপনাকে এ ব্যাপার হইতে নিরস্ত করা, আমার প্রধান কর্ত্তব্য। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও তাঁহার পুত্র নবীনকৃষ্ণ নির্ব্বিরোধ এবং বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত লোক। তাঁহাদিগকে কয়েদে পুরিয়া আপনি যে কষ্ট দিতেছেন, ইহাতে আপনার নিন্দার সীমা থাকিবে না।"

অতীব ক্রোধ সহকারে শ্যামলাল বলিলেন,—"নিন্দা! আমার নিন্দা করে এমন লোক এ প্রদেশে কোন্ বেটা আছে? কেবল আপনার মুখেই আমার নিন্দা আর দুর্নামের কথা শুনিতে পাই; কিন্তু আপনার এ ব্যবহার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। নবীনের স্ত্রী কোথায় আছে, গদা তাহাকে সঙ্গে করিয়া কি মতলবে কোথায় লইয়া গিয়াছে, এ সকল কথা নিশ্চয়ই সার্ব্বভৌম আর নবীন জানে। তাহারা এত বড় বদ্‌মায়েস যে, আমি কোন প্রকারে এ পর্য্যন্ত তাহাদের মুখ হইতে এই খবরটা বাহির করিতে পারিলাম না। আপনি যদি তাহাদের জন্য বড়ই কাতর হইয়া থাকেন, তা হইলে তাহাদের নিকট থেকে. এই খবরটা জানিয়া আসিয়া আমাকে বলুন, আমি তৎক্ষণাৎ তাহাদের ছাড়িয়া দিতেছি।"

হরকুমার বলিলেন,—"আমি সে সংবাদ জানিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু তাঁহারা এ বিষয়ের কিছুই জানেন না। গদা, রাত্রি দশটার সময়, নবীনের স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া, চলিয়া আসিয়াছে; তাহার পর কি ঘটিয়াছে, সে সম্বন্ধে তাঁহারা কোন কথাই বলিতে পারেন না।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"মিথ্যা কথা! আপনার যত বয়স বাড়িতেছে ততই বুদ্ধি কমিতেছে। তাই আপনি এই স্পষ্ট মিথ্যা কথাটাকে সত্য বলিয়া মনে করিয়াছেন। এই ভট্টাচার্য্য আর তার ছেলে কতদূর মিথ্যা-বাদী তাহা আপনাকে কালি দেখাইব। আজি সমস্ত দিনের মধ্যে যদি তাহারা আমাকে নবীনের স্ত্রীর খবর না জানায়, তাহা হইলে কালি সকালে খোদাবক্স কোচম্যানকে দিয়া ভাত রাঁধাইয়া, মুরগির ঝোল মাখিয়া, তাহাদের মুখে গুঁজিয়া দিব। তখন দেখিতে পাইবেন, আসল কথা বাহির হয় কি না।"

হরকুমার সভয়ে বলিলেন,—"নারায়ণ! নারায়ণ! এমন অত্যাচারের কথা আপনি মনেও কল্পনা করিবেন না। আমি আপনার সংসারে বহুদিন থাকিয়া প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছি আপনার স্বর্গীয় পিতৃদেব,

আমাকে কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় জ্ঞান করিতেন। তাঁহার শেষ আদেশ মতে আমি অদ্যাপি আপনার কর্ম্মে নিযুক্ত আছি। আপনার হিতাহিত দেখিবার জন্য, তিনি আমাকে হাতে ধরিয়া অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন। সেই জন্যই সকল বিষয়েই আপনাকে সৎপরামর্শ দেওয়া আমার প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করি। আমার দুরদৃষ্ট, আপনি আমার কোন কথাই শুনেন না; বাড়ার ভাগ বিরক্ত হন।"

শ্যামলাল বাধা দিয়া বলিলেন,—"প্রতিপালকের অনুরোধ আপনি বেশ রক্ষা করিতেছেন দেখিতেছি! যাহাতে আমি সুখী হই, আনন্দ পাই, ভাল থাকি, তাহাতেই আপনি প্রাণপণ যত্নে বাধা দেন। এইতো আপনার হিত চেষ্টা! কথা শুনিব কিরূপে। কথার মত কথা বলিলে অবশ্যই শুনা যায়। আপনি দেখিতেছেন, নবীনের স্ত্রীকে না পাইলে আমার সংসারের সকল সুখ নষ্ট হইবে। তাহার কোন উপায় না করিয়া, আপনি কেবল বিরুদ্ধ ব্যবহারই করিতেছেন।"

হরকুমার মনে মনে ভাবিলেন, এ লজ্জাহীন, কাণ্ডজ্ঞান-বিরহিত পাষণ্ডের অন্ন যাহারা ভোজন করে, তাহারাও ঘোর পাপাত্মা। স্বর্গীয় কর্ত্তার অনুরোধে, অনেক দিন এ দুরাত্মার অধীনে যাপন করিলাম। কিন্তু অতঃপর এ নরাধমের সংসর্গ অসহনীয় হইয়া পড়িয়াছে। প্রকাশ্যে বলিলেন,—"আপনার সহিত তর্ক করা অনাবশ্যক। কারণ আপনি ধর্ম্ম-সঙ্গত, যুক্তি-সঙ্গত কোন কথাতেই কর্ণপাত করেন না। তথাপি যাহা বলা আমার কর্ত্তব্য আমি তাহা বলি; শুনা-না শুনা আপনার ইচ্ছা। নবীনের স্ত্রীকে না পাইলে আপনার বিশেষ কষ্ট হইবে বলিতেছেন; কিন্তু সে পর-স্ত্রী, তাহাকে গ্রহণে আপনার অধিকার কি?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"অধিকার আমার সম্পূর্ণ। আমি ধনবান্, আমি বলবান্, আমি জমিদার। সহজে না আসিলে জোর করিয়া আনিতেও আমার অধিকার আছে।

হরকুমার বলিলেন,—"আপনি অনেক কারণে আপাততঃ ধনবান্ জমিদার হইয়াছেন বটে, কিন্তু ঘটনা অন্যরূপ দাঁড়াইলে, এ সৌভাগ্য না ঘটিয়া অন্যরূপ ঘটিলেও ঘটিতে পারিত। সে যাহাই হউক, এরূপ অন্যায় অধিকার আপনার কখনও নাই। আইন আছে, রাজা আছেন, সমাজ আছেন, ধর্ম্ম আছেন এবং সর্ব্বোপরি ঈশ্বর আছেন। এ সকলের কোন ব্যবস্থাতেই কাহারও প্রতি এরূপ অন্যায় অধিকার দেওয়া হয় নাই। একজনের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক একখানা ছেঁড়া নেকড়া কাড়িয়া লইতেও কাহারও অধিকার নাই। জোর করিয়া কুলের কুলবধূ আনা তো অনেক দূরের কথা।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"বা রে! আমি চিরদিন এই কাজ করিয়া আসিতেছি। এ পর্য্যন্ত ভাল, মন্দ কত ঘরের ঝি, বউ আমি ধরিয়া আনিয়াছি। আমার অধিকার না থাকিলে এরূপ হয় কি?"

হরকুমার, মূর্খ শ্যামলালের যুক্তি ও তর্কের প্রণালী আলোচনা করিয়া, মনে মনে হাস্য করিলেন। বলিলেন,—মানিলাম আপনি অনেক দিন হইতে এইরূপ কাজ করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু যাহা অন্যায় কর্ম্ম, তাহা অনেকবার করা হইলেও, চিরদিনই অন্যায়। একজন লোক চিরদিন চুরি করে, তাই বলিয়া চৌর্য্যকার্য্যে তাহার অধিকার হয় না এবং সে কাজ ভাল বলিয়াও পরিগণিত হয় না।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"আমার এ কাজ মন্দ কিসে তাহাতো আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আমি যাহাকে যখন ধরিয়া আনি, তখনই তাহাকে বিশেষরূপ পুরস্কার দিয়া বিদায় করি। এটাও তাহাদের পক্ষে এক রকম সৌভাগ্য।"

হরকুমার বলিলেন,—"আমার তর্কে আপনি বিরক্ত হইতেছেন এবং আরও অসন্তুষ্ট হইবেন বুঝিতেছি; তথাপি উচিত কথা আপনাকে বলাই আবশ্যক। মনে করুন আপনার অন্তঃপুরে আপনার সুন্দরী পত্নী আছেন। এ সংসারে আপনার অপেক্ষা ধন-বল ও ক্ষমতাসম্পন্ন অনেক লোক আছেন, ইহা আপনার অবিদিত নাই। সেইরূপ কোন ব্যক্তি, দৈবাৎ কোন প্রয়োজনানুরোধে এই গ্রামে আসিয়া পড়িলে, মনে করুন আপনার স্ত্রী কোন প্রকারে তাহার চক্ষে পড়িলেন। সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ আপনার সঙ্গের সিপাহি, লোকজন ও ফৌজদিগকে আজ্ঞা করিলেন,—'যেমন করিয়া পার এই সুন্দরী যুবতীকে কাড়িয়া লইয়া আইস।' তাঁহার অধীনস্থ লোকেরা, আপনার উপর ভয়ানক নির্যাতন করিয়া, আপনার গৃহিণীকে সেই পাপাত্মার নিকট লইয়া গেল এবং সেই ধনবান্ আপনার পত্নীর সর্ব্বনাশ করিয়া, আপনার কখনও দেখিবার সম্ভবনা নাই এরূপ অনেক মণিমুক্তা পুরস্কার প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে বিদায় করিল। এরূপ ঘটিলে আপনি কি মনে করেন?"

শ্যামলাল আপনাকে সর্ব্বপ্রকারে জগতে অদ্বিতীয় বলিয়া মনে করে, সুতরাং সহজেই উত্তর দিল,—"এরূপ ব্যাপার কাজে করা দূরে থাকুক" মনেও করিতে পারে এমন লোক দুনিয়ায় আর কেহ নাই। শ্যামলালের নাম শুনিলে ভয় পায় না এমন লোক থাকিতেই পারে না।"

হরকুমার আবার মনে মনে হাসিলেন। বলিলেন,—"তাহাই যেন হইল", কিন্তু তাই বলিয়া অনুগত লোকের প্রতি অত্যাচার করা কি আপনার উচিত? আপনি দেশের রাজা, সকলের রক্ষক, আপনার কি এরূপ অত্যাচার শোভা পায়?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"অত্যাচারটা কি?"

হরকুমার বলিলেন,—"অত্যাচার নয় কি? আপনি যে সকল যুবতীর সর্ব্বনাশ করিতেছেন, তাহাদের সহিত এক আধ দিনের বেশী আপনি আমোদ-আহ্লাদ করেন না। দুই দিন পরে তাহাদের নাম, আকৃতি কিছুই আপনার মনেও থাকে না। আপনার এই ক্ষণিক আমোদ, কিন্তু তাহাদের চিরস্থায়ী সর্ব্বনাশ! তাহাদের জাতি যায়, সমাজ যায়, ধর্ম্ম যায় এবং সংসারের সকল সুখ যায়। কেবল যে সেই স্ত্রীলোকদের এরূপ সর্ব্বনাশ হয়, এমন নহে; তাহাদের আত্মীয় স্বজন, বাপ মা, ভাই, ভগ্নী প্রভৃতি সকলকেই চিরদিন মর্ম্মান্তিক ক্লেশে মাথা হেঁট করিয়া থাকিতে হয়।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"আমি আপনার এরূপ বৃথা তর্কের কোনই অর্থ দেখিতেছি না। ভগবান্ আমাকে সকল উপায় দিয়া পাঠাইয়াছেন, এ ক কেবল কে কি মনে ভাবিবে, কে কি কষ্ট পাইবে, তাহাই ভাবিয়া চুপ করিয়া থাকিবার জন্য? আপনার ও সকল ব্যবস্থা সামান্য লোকের জন্য আমাদের মত বড় লোকের ব্যবস্থা অন্যরূপ। এখন যান আপনি, যেমন করিয়া হউক নবীনের স্ত্রী কোথায় আছে, সংবাদ লইয়া আসুন।"

হরকুমার মনে মনে ভাবিলেন, কি

সর্ব্বনাশ! নরাধম অবশেষে আমার উপরও এই সকল ঘৃণিত কাজের ভার দিতে আরম্ভ করিল! আমি উহার পিতৃবয়স্ক, পিতৃবন্ধু এবং পিতৃতুল্য। নারায়ণের ইচ্ছায় এখন মানে মানে এ পাপপুরী হইতে বাহির হইতে পারিলে হয়। বলিলেন,—"আমার দ্বারা কোন সংবাদ সংগ্রহ হওয়া অসম্ভব। আর আমাকে এরূপ কার্য্যের ভার দেওয়াই আপনার লজ্জার কথা।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"কেন? আপনি কি আমার চাকরি করেন না, মাহিয়ানা খান না? আমার যখন যেরূপ কাজের দরকার হইবে, তাহাই করিতে সকল কর্ম্মচারীই বাধ্য, আপনিও বাধ্য।"

হরকুমার আবার মনে মনে ভাবিলেন, তোমার সর্ব্বনাশ অতি নিকট। এ পাপের শাস্তি অবশ্য শীঘ্রই ঘটিবে। প্রকাশ্যে বলিলেন,—"আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, অনেক দিন আপনাদের অন্ন খাইয়াছি। এক্ষণে আমার দ্বারা সকল কাজ সম্পন্ন হইয়া উঠিতেছে না দেখিতেছি। অতএব দয়া করিয়া আমাকে এক্ষণে কর্ম্ম হইতে অবসর দিলেই ভাল হয়।"

শ্যামলাল হাঃ হাঃ শব্দে হাস্য করিয়া বলিলেন,—"তুমি যে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়াছ ইহা আমি অনেক দিন বুঝিয়াছি। এক্ষণে স্বয়ং বিদায় প্রার্থনা করিতেছ, ইহা তোমার সৌভাগ্য। নচেৎ হয় তো তোমাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিতে হইত। আমার লোক ঠিক করা আছে। হরিচরণ সকল বিষয়েই অতি উপযুক্ত লোক; তাহাকেই দেওয়ানী দিব স্থির করিয়াছি, তুমি অদ্যই তাহাকে কাগজপত্র বুঝাইয়া দিয়া বিদায় হইবে।"

হরকুমার বলিলেন,—"যে আজ্ঞা।"

মনে মনে ভাবিলেন, একে প্রভু এই পাপের অবতার, তাহাতে দ্বিতীয় কলি স্বরূপ হরিচরণ হইবে প্রধান মন্ত্রী। এবার বিষয় আশয় সকলই রসাতলে গেল! যাহা হইবার হউক, আমি দূরে সরিয়া যাইতে পারিলেই বাঁচি। ধীরে ধীরে হরকুমার বাবু প্রস্থান করিলেন।

ঠিক সেই সময়ে অপর দিক দিয়া দুর্বৃত্ত হরিচরণ তথায় উপস্থিত হইল এবং দূর হইতেই বলিল,—"নবীনের স্ত্রীর সন্ধান হইয়াছে, আমার কাছ থেকে কতক্ষণ লুকাইয়া রাখিতে পারে?"

সাগ্রহে শ্যামলাল জিজ্ঞাসিলেন,—"কোথায়? কোথায়?"

হরিচরণ বলিল,—"অনেক দূর! আমাদের এলাকার বাহিরে, এক কুটুম্ব বাড়িতে তাহাকে গদা রাখিয়া আসিয়াছে। তা হউক এলাকার বাহিরে, সেখান থেকেই তাহাকে ধরিয়া আনিয়া তবে অন্য কাজ।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"নিশ্চয়। এতে যত টাকা খরচ হয় তাহাই আমার পণ।"

হরিচরণ বলিলেন,—বড় দুষ্টলোক এই সার্ব্বভৌম আর তাহার ছেলে। ইহারা নিশ্চয়ই সব জানে। অথচ কিছুতেই স্বীকার করিল না। ইহাদের বিলক্ষণ রকম সাজা দিতে হইবে।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"অন্য যত পার সাজা দিও তাহাতে আমার আপত্তি নাই; কিন্তু একটা সাজা দেওয়াই চাই। যখন নবীনের স্ত্রীকে লইয়া আমোদ-প্রমোদ করা যাইবে, তখন সার্ব্বভৌম আর নবনেটাকে হাত পা বাঁধিয়া সেই ঘরে বসাইয়া রাখিতে হইবে

হরিচরণ বলিল,—"আচ্ছা মতলব বাহির করিয়াছেন ধর্ম্মাবতার! নিশ্চয়ই তাহাই করিতে হইবে।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"তোমার ব্যবহারে ও কার্য্যতৎপরতায় আমি নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। আজি হইতে তোমাকে আমার দেওয়ান নিযুক্ত করিলাম। এখনই ঐ বুড়া হরকুমুরে বেটার কাছ থেকে কাগজ পত্র বুঝিয়া লইয়া কাজে প্রবৃত্ত হও গিয়া।"

এই সংবাদ শ্রবণে হরিচরণ কিয়ৎকাল স্তম্ভিত হইল। যাহার বিদ্যা-বুদ্ধি কিছুই নাই, তোষামদ ও ঘৃণিত পরিচর্য্যা যাহার অবলম্বন, সামান্য গোমস্তাগিরি নির্ব্বাহ করাও যাহার পক্ষে অসম্ভব, সে আজি এই বিপুল বিভবের সর্ব্বময়কর্ত্তা হইল। অনেক ক্ষণে তাহার আপনার অবস্থা বিষয়ক হৃদ্‌বোধ জন্মিল। তখন সে করযোড়ে বলিল,—"অতি উপযুক্ত কর্ম্মের ভার হুজুর এবার আমাকে দিয়াছেন। বিষয়-কর্ম্মে হরিচরণ কেমন মজবুত, তাহার প্রমাণ ধর্ম্মাবতার এইবার দেখিতে পাইবেন। নিকটে দশ ক্রোশের মধ্যে কোন লোকের ঝি-বউ যাহাতে নিখুঁত না থাকে, তাহার ব্যবস্থা হরিচরণ প্রথমেই করিবে।"

হরিচরণের এইরূপ সাধু সংকল্প ও কর্তব্য-পরায়ণতার পরামর্শ শ্রবণ করিয়া শ্যামলাল নিরতিশয় প্রীত হইলেন। তাঁহারা এই সকল শুভ কার্য্যের মন্ত্রণা করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। গমন কালে হরিচরণ ভাবিতে লাগিল, 'এই বিপুল বিভবের এখন হইতে আমিই এক রকম মালিক। এই রাজ্যের যিনি রাজ্যেশ্বরী, তিনি আমার চরণ-সেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন। এখন শ্যামলাল কণ্টককে কোন প্রকারে দূর করিতে পারিলেই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। হইবে, হইবে; ক্রমে তাহা না করিয়াই কি ছাড়িব? আজি বিধুমুখীর সন্তোষের সীমা থাকিবে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সঙ্কল্প।

হরকুমার বাবু বিশেষ আনন্দের সহিত উদ্যান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। হরকুমার অতি বাল্য কাল হইতে শ্যামলালের পিতা স্বর্গীয় রাধাবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুগ্রহে প্রতিপালিত। হরকুমার নিতান্ত দরিদ্রের সন্তান; বাল্যকাল হইতে অধ্যয়নানুরাগ বড়ই প্রবল ছিল; কিন্তু পাঠের গ্রন্থসংগ্রহ করা বা অধ্যাপকলাভ করা, উভয়ই তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। ঘটনা-চক্রে বিপুল বিভব-শালী রাধাবিনোদের সহিত এই সময়ে তাঁহার দৈবাৎ আলাপ হয়। এই আলাপেই তাঁহার জীবনের গতি নির্ণীত হয় এবং তাঁহার সকল বিষয়ের যাবতীয় অসুবিধাই বিগত হয়। রাধাবিনোদ বাবু, এই বুদ্ধিমান ও প্রিয়দর্শন বালককে, ভবনে স্থান প্রদান করেন, এবং স্বকীয় অধ্যাপকের নিকট, একসঙ্গে তাঁহার পাঠাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন হরকুমারের অপেক্ষা রাধাবিনোদ কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন; তথাপি একত্রাবস্থান ও একত্রাধ্যয়নাদি হেতু, উভয়ের অবস্থাগত বিশেষ বিভিন্নতা থাকিলেও ক্রমশঃ যথেষ্ট বন্ধুতার উদ্ভব হয়। হরকুমার, স্বকীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে, যথেষ্ট বিদ্যার্জ্জন করিয়াছিলেন, এবং ধীর বুদ্ধি ও সদ্বিবেচনার নিমিত্ত বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছিলেন। রাধাবিনোদের পিতৃ-বিয়োগ হইলে, তিনি স্বয়ং বৈষয়িক কার্য্য পরিচালনায় ব্যাপৃত হইলেন। হরকুমারকে তখন হইতে স্বকীয় প্রতিপালক ও প্রভুর বিষয়-কর্ম্মে সহায় হইল। ক্রমশঃ হরকুমারের বিষয়-বুদ্ধি বিশেষ পরিপক্ব হইয়া উঠিল। রাধাবিনোদ, তদবধি সকল

কর্ম্মভার হরকুমারের হস্তে প্রদান করিয়া স্বয়ং এক প্রকার বিষয়-ব্যাপার হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন।

উত্তরোত্তর কর্ম্মদক্ষতার সহিত, হরকুমার দেওয়ান হইলেন এবং ক্রমশঃ মাসিক পাঁচ শত টাকা বেতন পাইতে থাকিলেন হরকুমারের বাসবাটী হইল এবং বিবাহাদি করিয়া তিনি যথারীতি সংসারী হইলেন হরকুমার নিঃসন্তান।

রাধাবিনোদের সহিত হরকুমারের প্রণয় নিতান্ত ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল এবং পরস্পর প্রভু-ভৃত্যবৎ ব্যবহার একান্ত ভাবে তিরোহি হইয়াছিল।

কাল সহকারে রাধাবিনোদ প্রাণহীন হইলেন। মৃত্যুকালে তিনি হরকুমারের হস্তেই সকল বিষয়ের কর্তৃত্ব নির্ভর করিয়া গিয়াছিলেন। পুত্র-শ্যামলালের ভবিষ্যৎ জীবন নিতান্ত নিন্দনীয় হইবে বলিয়া তাঁহার অনুমান ছিল। তিনি সেইজন্য বার বার শ্যামলালকে সর্ব্বতোভাবে হরকুমার বাবুর উপদেশাধীন থাকিতে ও তাঁহাকে পিতার ন্যায় জ্ঞান করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। শ্যামলাল পিতৃ প্রদত্ত এই উপদেশ কিরূপে পালন করিতেছেন, তাহা পাঠকগণ দেখিয়াছেন।

তিন বৎসর হইল রাধাবিনোদ কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী একমাত্র পুত্র শ্যামলাল বিষয়-কর্ম্ম স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। হরকুমার বাবু বৈষয়িক সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করেন, শ্যামলাল কেবল অর্থ সমস্ত গ্রহণ করিয়া অপব্যয়িত করিতে থাকেন। হরকুমার, এ বিষয়ের প্রতিবাদ ও বিরুদ্ধ চেষ্টা করিয়া, কেবল অপমানিত হইয়া আসিতেছেন।

এক বৎসর হইল শ্যামলালের জননী ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। তাহার পর হইতে শ্যামলালের অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে।

হরকুমার, প্রতিপালক ও শুভানুকাঙ্ক্ষী পরলোকগত সুহৃদের বাসনা-পরতন্ত্র হইয়া অতিকষ্টে তিন বৎসর কাল এই সংসারে শ্যামলালের আজ্ঞাধীন থাকিয়া কাটাইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু আর এ পাপের সংস্রবে অতিবাহিত করা, তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মভীরু লোকের পক্ষে, নিতান্তই অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। তিনি নিরন্তর অবসর গ্রহণ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। অদ্য সেই সুযোগ উপস্থিত হওয়ায়, তিনি পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সযত্ন-রক্ষিত ও বহুদিন সেবিত এই বিপুল সম্পত্তি যে অতঃপর ধ্বংস দশায় উপস্থিত হইবে, ইহা মনে করিয়া তাঁহার দুঃখ হইল না এমন নহে। কিন্তু সে বিষয়ে তাঁহার আর হাত নাই।

হরকুমার, উদ্যান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, কাছারি ঘরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। উদ্যান হইতে কাছারি একটু দূরে অবস্থিত। মধ্যে উভয় পার্শ্বে বড় বড় বৃক্ষযুক্ত প্রশস্ত পথ। সেই পথ দিয়া অনেক লোক যাতায়াত করিতেছিল। সকলেই তাঁহাকে দর্শন মাত্র, সসম্ভ্রমে প্রণামাদি করিয়া দূরে এক পার্শ্বে দাঁড়াইতে লাগিল। এক বলিষ্ঠ কলেবর অথচ ধবল-কেশ পরিষ্কৃত পরিচ্ছদধারী মুসলমান, তাঁহাকে অবনত মস্তকে সেলাম করিয়া, দূরে দাঁড়াইল। সে ব্যক্তি এই সংসারের প্রধান কোচ-ম্যান এবং বহুদিনের পুরাতন ভৃত্য। তাহাকে দর্শন মাত্র হরকুমার বলিলেন, "জরিফ! আজি হইতে তোমাদের নূতন দেওয়ান হইলেন আমি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলাম।"

জরিফ বলিল,—"কি সর্ব্বনাশ! হুজুর ইচ্ছা করিয়া এ কাজ করিলেন কি?"

হরকুমার বলিলেন,—"ইচ্ছা না করিয়া করি কি? আর দশ দিন ইচ্ছা না করিলে, অপমানিত হইয়া যাইতে হইত।"

জরিফ বলিল,—"সে কথা ঠিক। এসংসারে হুজুরের মত লোকের থাকা অসম্ভব। কিন্তু ইহার পর এ সংসারের কি হইবে?"

হরকুমার বলিলেন,—"যাহা ভগবানের মনে আছে তাহাই হইবে। অতি কষ্টে তিন বৎসর কাটাইয়াছি; আর তো একদিনও কাটান যায় না।"

জরিফ বলিল,—"কাহার হাতে এখন হইতে কাজের ভার পড়িবে, তাহা ধর্ম্মাবতার জানিতে পারিয়াছেন কি?"

হরকুমার বলিলেন,—"হাঁ তা জানিয়াছি। হরিচরণ বাবু অতঃপর তোমাদের দেওয়ান হইবেন।"

জরিফ জিজ্ঞাসিল,—"কে সে?"

হরকুমার বলিলেন,—"তাঁহাকে চেন না তুমি? তিনি সর্ব্বদাই বাবুর সঙ্গে থাকেন, বাবুর সকল কর্ম্মেই তিনি আছেন।"

জরিফ বলিল,—"ও: সেই বেটা! যে হতভাগা বাবুর সঙ্গে সর্ব্বদা মদ খায়, আর বদমায়েসী করে?"

হরকুমার বলিলেন—"হাঁ।"

জরিফ বলিল,—"বলেন কি ধর্ম্মাবতার। সেই জানোয়ারটা এই বৃহৎ সংসারের দেওয়ানি করিবে? কি সর্ব্বনাশ! তবে হুজুর হুকুম দেন, আমরাও বিদায় হই। হুজুর না থাকিলে, আমরা আর কাহার কাছে কাজ করিব?"

হরকুমার বলিলেন,—"না জরিফ! তোমার যাওয়া হইবে না। তুমি আর আমি এ সংসারের বড়ই পুরাতন চাকর। তুমি কোচম্যান হইলেও, সকল বিষয়ই জান। স্বর্গীয় কর্ত্তা তোমার গুণে তোমাকে বড়ই ভাল বাসিতেন। হঠাৎ কর্ম্ম ছাড়িও না। তবে যেরূপ কাণ্ড শীঘ্র ঘটিবে, তাহাতে বিষয় সম্পত্তি কিছুই থাকিবে বোধ হয় না। তখন কাজেই তোমাদের সকলকেই সরিতে হইবে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে কাজ ছাড়িও না। তুমি থাকিলে আমি অনেক কথা জানিতে পারিব এবং ঈশ্বর যদি মুখ তুলিয়া চাহেন, তাহা হইলে অনেক কথা জানিবার দরকারও হয়তো ঘটিতে পারিবে।"

জরিফ বলিল—"হুজুরের হুকুম মাথা পাতিয়া পালন করিব। কিন্তু এখন হইতে যতদিন এখানে থাকিতে হইবে ততদিন প্রাণে মরিয়া থাকিব জানিবেন। সে যাহা হউক এখন ধর্ম্মাবতার কোথায় থাকিবেন, কি করিবেন স্থির করিয়াছেন?"

হরকুমার বলিলেন,—"এখন যত শীঘ্র পারি এ দেশ ছাড়িব এবং আমাদের প্রধান তীর্থ কাশীতে গিয়া বাস করিব স্থির করিয়াছি।"

জরিফ বলিল,—"হুজুরকে আমার মনে করাইয়া দিতে হইবে না। মহাশয় না জানেন কি? সুযোগ উপস্থিত হইলে, সে বিষয়টার সন্ধান করিতে ধর্ম্মাবতার ভুলিবেন না। তাহা না করিলে আমাদের পাপ হইবে।"

হরকুমার বলিলেন,—"একদিনও ভুলি নাই, কখনও ভুলিব না। সেরূপ দিন উপস্থিত হইলে তোমাকে সর্ব্বাগ্রে সংবাদ দিব। এই জন্যই তোমাকে এখানে থাকিতে বলিতেছি। অনেক দরকার পড়িতে পারে। এক্ষণে আসি। যাইবার পূর্ব্বে আবার তোমার সহিত দেখা হইবে।"

জরিফ অবনত মস্তকে, প্রায় ভূমিতে হাত স্পর্শ করিয়া, সেলাম করিল। হরকুমার প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় খণ্ড—রৌদ্র ও ছায়া।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্মে কলঙ্ক।

বেলা দ্বিপ্রহর কালে বিলাসপুর নামক পল্লীগ্রামে ৺রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভবনস্থিত একখানি ঘরে অধোমুখে একটি যুবতী বসিয়া আছেন। যুবতী নিতান্ত ম্লান-মুখী ও উদ্বিগ্ন-হৃদয়া। এই সুন্দরী সার্ব্বভৌমের পুত্র বধূ—নবীনকৃষ্ণের স্ত্রী—সুহাসিনী। সুন্দরী বাস্তবিকই সুন্দরী। সুহাসিনীর সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যময়ী। তাহাতে রৌদ্রের প্রখরতা নাই, বিদ্যুতের চঞ্চলতা নাই, ভাদ্রগঙ্গার বেগ নাই, প্রভঞ্জনের গতি নাই। তাহাতে আছে, চন্দ্রকিরণের স্নিগ্ধতা, মলয়-মারুতের শীতলতা, কমলিনীর সৌরভ এবং দূরাগত বিহঙ্গমবরের মধুরতা। তাঁহার উজ্জ্বল আয়ত লোচন সরলদৃষ্টি ভিন্ন জানে না; সুতরাং কুটিল কটাক্ষ বর্জ্জিত। তাঁহার বাক্য পবিত্রতা-সংশ্লিষ্ট; সুতরাং কুৎসিত প্রসঙ্গ বিবর্জ্জিত। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন গঠনের উপর যেন লজ্জার একটী স্বতন্ত্র আচ্ছাদন সংযুক্ত। তাঁহার সুহাসিনী নামটী বস্তুতই অন্বর্থ হইয়াছে। তিনি যখন হাস্য করেন, তখন সে হাসিতে উচ্চ রোল উঠে না, মুখের শোভা বিদূরিত হয় না, মুখ-গহ্বর ব্যাদিত হইয়া রাশি রাশি দন্ত পরিদৃষ্ট হয় না এবং গাম্ভীর্য্যের পরিবর্ত্তে তাহা প্রগল্‌ভতার পরিচয় প্রদান করে না। তাঁহার হাস্য ধীরে ধীরে অধরোষ্ঠের প্রান্তভাগে মিশিয়া যায়; কদাচিৎ দুই তিনটী মুক্তা-বিনিন্দিত দন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার চক্ষু, কপোল ও গণ্ডদেশ সে হাসিতে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। সে হাস্য দর্শকের হৃদয়ে বড়ই আনন্দজনক স্থায়ী ভাবের সঞ্চার করে।

সুহাসিনী অধোমুখে বসিয়া চিন্তা করিতে-ছেন; এমন সময়ে এক প্রৌঢ়-বয়স্কা বিধবা নারী তথায় আগমন করিলেন। তিনি আসিয়াই দূর হইতে জিজ্ঞাসিলেন,—"তা এখন কি করবে মনে কচ্ছ বাছা?"

সুহাসিনী বলিলেন,—"কি যে করব, মাসি মা, তা আর কিছুই ভেবে পাই না। তোমরা ছাড়া এখানে আমার আর কেহ নাই। যা তোমরা বল্‌বে তাই আমি করব।"

মাসি মা বলিলেন,—"বলব যে আমরা মাথা মুণ্ডু কি, তাও বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। তুমি কুটুম্বের মেয়ে। এমন যে খুব নিকট কুটুম্ব তাও নয়। তোমার মা আমার পিস্‌তোত বোন্‌। তা সম্পর্ক যাই কেন হউক না, বিপদে পড়ে ভদ্রলোকের মেয়ে এসেছ, দশদিন থাক্‌লে ক্ষতি ছিল না; কিন্তু আমাদের দশজনকে নিয়ে ঘর কত্তে হয়—আমরা কিছু লজ্জা পাচ্ছি।"

সুহাসিনী বলিলেন,—"লজ্জা! লজ্জা কি জন্য?"

বিধবা উত্তর দিলেন,—"লজ্জার কাজই যে তুমি করেছ বাছা। তুমি শ্বশুর বাড়ী থেকে চলে এসেছ, বল্‌ছ তাঁরা কেউ কিছু জানেন না। তা হইলে লুকিয়ে পালিয়ে আসা ধত্তে হয়। এসেছ এক বেটা ভয়ানক চাঁড়ালের সঙ্গে—রাত্রিকালে। বল্‌ছ জমিদারের ভয়ে পালিয়ে এসেছ। সে লোকটা খুব মন্দ একথা আমরাও শুনেছি; কিন্তু পালিয়ে এলে, অথচ বাড়ীর লোক কেহ টের পেলে না, এ তিন দিনেও কেহ একটীবার খোঁজ

কল্লে না এই বা কেমন কথা! চারিদিক দেখ্‌তে গেলে দশজনে দুষ্যভাব মনে কর্‌বেই তো। আমরা তোমার শ্বশুরের কাছে, স্বামীর কাছে খবর পাঠিয়ে দেবার কথা বল্‌ছি তাতেও তুমি বলছ, খবর পেলে তাঁদের ভয়ানক বিপদ হইতে পারে। এ সকল কাণ্ড আমরা কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না; কোন লোককেও কিছু বল্‌তে পাচ্ছি না। কাজেই আমাদের লোকের কাছে লজ্জা পেতে হচ্ছে।"

সমস্ত কথা সুহাসিনী ধীরভাবে শ্রবণ করিলেন। এতক্ষণে তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার অন্তরের ভাব যাহাই কেন হউক না, বাহ্য ব্যবহার সাধারণের দৃষ্টিতে বাস্তবিকই দোষাবহ হইয়াছে। তিনি অধোমুখে কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন, তাঁহার লোচন-নিঃসৃত দুই বিন্দু অশ্রু ভূ পৃষ্ঠে নিপতিত হইল। কিন্তু তিনি অধিক কথা কহিতে অক্ষম। বিশেষতঃ আপনার নির্দ্দোষতা সপ্রমাণ করিবার জন্য, বাগাড়ম্বর বিস্তার করা, তাঁহার অসাধ্য! তিনি কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া, ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসিলেন—"এক্ষণে আপনারা আমাকে কি করিতে বলেন?"

বিধবা মাসী উত্তর দিলেন,—"বলব আমরা আর কি? তোমারও ত বুদ্ধি আছে, তুমিই কেন বুঝে দেখ না, এখন কি করা উচিত। ভাল শ্বশুর বাড়ী যাওয়া যদি এখন অসম্ভব হয়, বাপের বাড়ি তো আছে, সেখানেই কেন যাও না।"

আবার সুহাসিনী অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। সুহাসিনী পিতৃ-হীনা; বিধবা জননী ছাড়া পিত্রালয়ে আর কেহ নাই। তাঁহাদের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে বটে, কিন্তু পিত্রালয় শ্যামলাল বাবুর জমিদারীর মধ্যে। সুতরাং সেখানে গিয়া আপনার ধর্ম্ম বজায়-রাখা কোন ক্রমেই সম্ভব হইবে না। দুর্ব্বৃত্ত শ্যামলাল যখন তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে, তখন সে বাসনাসিদ্ধির নিমিত্ত কোন কার্য্যেই পশ্চাৎপদ হইবে না। সুহাসিনী মনে মনে এ সকলই বুঝিলেন; সুতরাং পিত্রালয়ে গমন অসম্ভব বলিয়া স্থির করিলেন। এইরূপ চিন্তা করিয়াই তিনি, ধর্ম্ম বজায় রাখিবার অভিপ্রায়ে, এই কুটুম্বালয়ে পলাইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এত কথা সুহাসিনী পরকে বুঝাইয়া বলিতে পারেন না। এত কথা পরের সম্মুখে তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হওয়া অসম্ভব।

তিনি ইহাও বুঝিলেন যে, তাঁহার জন্য এই দুর কুটুম্বগণকে বাস্তবিকই লজ্জিত হইতে হইতেছে; ইহাও তাঁহার মনে হইল যে, তাঁহার ব্যবহার বাস্তবিকই সুসঙ্গত হয় নাই। কিন্তু কি করিলে ইহার অপেক্ষা ভাল হইত, তাহা তিনি এখনও স্থির করিতে পারিলেন না। বুঝিলেন, তাঁহার চরিত্র লোকের চক্ষে কলঙ্কিত হইয়াছে। লজ্জায়, ক্ষোভে, ঘৃণায় তাঁহার হৃদয় ফাটিতে লাগিল। কিন্তু তিনি তখনই মনে করিলেন, বাহ্য কলঙ্ক মায়াত্মক নহে, অন্তরে কলঙ্ক না ঘটিলেই রক্ষা। বড় অসময়ে ইহাদিগের আশ্রয়ে আসিয়া জাতি-ধর্ম্ম বজায় রাখিয়াছি। আমার জন্য ইহাদের লজ্জা পাইতে হইতেছে। আমার অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে। কিন্তু ইহাদিগের কষ্টের কারণ আর কোন মতেই হইব না। বলিলেন,—"তাহাই হইবে মাসি মা; আমি কালি প্রাতে এখানে আর থাকিব না।"

মাসি মা গাত্রোত্থান করিলেন। গমন কালে বলিয়া গেলেন,—"তাই যা হয় একটা কিছু কর বাছা; আমাদের যেন মাথা হেঁট না হয়।"

বিধবা প্রস্থান করিলেন। সুহাসিনী ভাবিতে লাগিলেন, এখানে আর কোন মতে থাকা হইবে না। কিন্তু কোথায় যাইবেন, কি করিবেন সুন্দরী ভাবিয়া তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। গদার কথা তাঁহার মনে পড়িল। বড় অসময়ে সে বড়ই উপকার করিয়াছে। সুহাসিনী যখন বুঝিলেন যে, শ্যামলালের অত্যাচার হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে, তাঁহার শ্বশুর, স্বামী বা আর কাহারও সাধ্য নাই, তখন তিনি, অন্তরালে ডাকিয়া, গদাকে অলঙ্কারের বাক্স দেখাইলেন। তাঁহার স্বর্ণ ও রৌপ্যালঙ্কার প্রায় এক হাজার টাকার ছিল। তাঁহাকে বিলাসপুরে মুখুর্য্যে বাড়ী নির্ব্বিঘ্নে রাখিয়া আসিলে, বাক্স সমেত সমস্ত অলঙ্কার তিনি গদাকে দিতে স্বীকার করিলেন। গদা ভাবিয়া দেখিল, এক সঙ্গে এরূপ লাভের উপায় তাহার জীবনে কখন ঘটে নাই, ভবিষ্যতে ঘটিবারও কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব এরূপ লাভের বিনিময়ে ফাঁকতালে একটা পুণ্য কর্ম্ম করিয়া লওয়া সে অপরামর্শ বলিয়া মনে করিল না। শ্যামলাল বাবু রাগ করিবেন, তাহাতে ক্ষতিই বা কি? গদার এক ভাঙ্গা কুঁড়ে। না হয় সে দেশে আর ফিরিবে না।

সুহাসিনীকে সঙ্গে লইয়া গদা বিলাসপুরে আগমন করিল এবং তাঁহাকে যথাস্থানে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিয়া দেওয়ার পর, প্রণাম করিয়া ও গহনার বাক্স লইয়া পলায়ন করিল—আর দেশে ফিরিল না।

সতীত্ব রক্ষায় রাখিবার নিমিত্ত গদা সহিত সুহাসিনী প্রস্থান করিলেন বটে কিন্তু তাঁহার এই পলায়নবার্ত্তা সার্ব্বভৌম তাঁহার পুত্র কিছুই জানিতে পারিলেন না। সকলেই বুঝিলেন, পাপাত্মা শ্যামলালের দৌরাত্ম্যে, আজি তাঁহাদের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল।

গদা কোথায় গিয়াছে তাহা সুহাসিনী জানেন না। এ অসময়ে তাহাকে আর একবার পাইলে হয় তো অনেক উপকার হইতে পারিত। যে তাঁহাকে মা বলিয়াছে এবং সন্তানের ন্যায় যথেষ্ট উপকার করিয়াছে। কিন্তু সেই বা এখন কোথায়?

সুন্দরী অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং বলিলেন,—"কেহ না থাকে বিপন্ন-বান্ধব নারায়ণ তো আছেন, তিনি অবশ্যই দুঃখিনীকে রক্ষা করিবেন।"

সুহাসিনী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গঙ্গা-যমুনা-সম্মিলন।

অতি প্রত্যূষে, বিলাসপুর হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দক্ষিণে, মাঠের মধ্যে, এক বটবৃক্ষ মূলে এক ভুবন মোহিনী সুন্দরী একাকিনী বসিয়া আছেন। এই সুন্দরী সুহাসিনী। আত্মীয়গণের লজ্জা ও ক্লেশের কারণ হওয়ার অপেক্ষা, স্বকীয় জীবনকে বিপন্ন করা শ্রেয়ঃ বলিয়া তিনি মনে করিয়াছেন; তাই তিনি নিশীথিনীর অন্ধকারে রূপ-রাশি প্রচ্ছন্ন করিয়া একাকিনী বিলাসপুরের আশ্রয় হইতে চলিয়া আসিয়াছেন। বুঝিয়াছেন তাঁহার বিপদ ক্রমেই গাঢ়তর হইয়া আসিতেছে। যে আশ্রয়ে তিনি ছিলেন সেখানে কোন নূতন বিপদের সম্ভাবনা ছিল না। সুহাসিনী নিঃসহায়া—নিতান্ত অল্পবয়স্কা; কিন্তু বিপদ

চারিদিকেই অসীম। কোথায় স্বামী, কোথায় জননী, কোথায় শ্বশুর? নিঃসহায়া কামিনী একাকিনী, ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভোজ্য নাই, বস্ত্র নাই, একটি পয়সা নাই, আশ্রয় নাই! কলঙ্ক চারিদিক হইতে মাথা তুলিয়া তাঁহার কুৎসা কীর্ত্তন করিতেছে ঘটনা সকলই প্রতিকূল হইয়া, তাঁহার দুর্নাম রটনা করিতেছে; কিন্তু সে সকলই মিথ্যা কথা। এতক্ষণ পর্য্যন্ত বস্তুতঃ তিনি পবিত্রতা বজায় রাখিয়াছেন। হউক না কেন মিথ্যা দুর্নাম, মন তো এখনও অপবিত্রতার অনুতাপে দগ্ধ হইতেছে না। সুহাসিনী শত বিপদের মধ্যে এখনও তেজস্বিনী ও প্রসন্নতা পূর্ণা কিন্তু তার পর?

তার পর যে কি তাহাই এখন বিষম সমস্যা। অন্ধকার পলায়ন করিয়াছে; নবোদিত ভাস্করের মধুরোজ্জ্বল কিরণে, তাঁহার রূপ-রাশি সমুদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে। বট-বৃক্ষ-মূলে যেন বনদেবী সজীব ভাবে বসিয়া আছেন। নিকটে পথ, পার্শ্বে প্রকাণ্ড সরোবর। এখনই কত লোক এই পথে যাতায়াত করিবে। এখনই কত লোক নানা প্রয়োজনে এই জলাশয়ে আসিবে। ভাল মন্দ কত লোকের দৃষ্টি-পথেই তাঁহাকে পড়িতে হইবে। তখন কি হইবে? যা করেন ভগবান্!

ঐ কিসের শব্দ! ঐ কার পদ-শব্দ! ঐ কে আসিতেছে। আসিতেছে সত্য কিন্তু স্ত্রীলোক। সুহাসিনী হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। স্ত্রীলোক আসিল, কিন্তু খুব নিকটে আসিল না। দূরে দাঁড়াইয়া কিয়ৎকাল নিস্পন্দভাবে সুহাসিনীর অলোক-সামান্য রূপরাশি সে দর্শন করিতে লাগিল। ক্রমে সাহসে ভর করিয়া সে নিকটস্থ হইল। তাহার কক্ষে এক প্রকাণ্ড মাটীর কলসী; পরিধান স্থূল মলিন বস্ত্র; হাতে কড়; দেহের অন্য কোথাও ভূষণের নাম মাত্রও নাই। কালো কালো শক্ত বলিষ্ঠ গঠন; টিকল মুখ খানি; পূর্ণ যুবতী। বয়স চব্বিশ পঁচিশ ছাড়ায় নাই। এই নবীনা সুহাসিনীর নিকটস্থ হইয়া, কাঁখের কলসী নামাইল, এবং বলিল,—"যদি পুরুষ হইতাম, তাহা হইলে আজ জীবনের সুখের দিন বলিয়া মনে হইত। তবু আজ আমার সুপ্রভাত সন্দেহ নাই।"

সুহাসিনী বলিলেন,—"আমার কিন্তু আজ বড়ই কুপ্রভাত।"

স্ত্রীলোক বলিল,—"তাহাতো রকমেই বুঝিতেছি। নতুবা অসময়ে এখানে কেন? গলায় ছুরি দেওয়ার ব্যবসা থাকিলে এরূপ দুর্দ্দিন ঘটিতে পারে; লক্ষণ দেখিয়া তোমার ভাই সে ব্যবসা আছে বলিয়া বোধ হয় না। তবে এ দশা কেন?"

সুহাসিনী বলিলেন,—"গলায় ছুরি দিতে গিয়া এই অবস্থা ঘটে নাই। চোরে সর্ব্বস্ব চুরি করিতে আসিয়াছিল, তাই বাঁচাইতে গিয়া এই দশায় পড়িয়াছি।"

স্ত্রীলোক বলিল,—"চোর তাড়াইবার লোক ছিল না?"

সুহাসিনী বলিলেন,—"ছিলেন—আছেন কিন্তু চোর বড় বলবান্।"

স্ত্রীলোক বলিল,—"বুঝিয়াছি। পুরুষ হইলে আমিও হয়তো এ ধনীর সর্ব্বস্ব চুরি করিবার চেষ্টা করিতাম। এমন রত্ন লুঠিবার জন্য ডাকাইত তো পড়িবারই কথা। এখন উপায়?"

সুহাসিনী বলিলেন,—"ভগবান্।"

স্ত্রীলোক বলিল,—"তিনিতো আছেনই,

কিন্তু হাতে কলমে আমাদেরই তো সব কত্তে হবে।”

সুহাসিনী বলিলেন,—“তবে উপায় তুমি।”

স্ত্রীলোক বলিল,—“আমিও তাই ভাবছি। তবে বইস তুমি, আমি এক কলসী জল লইয়া আসি।”

স্ত্রীলোক প্রস্থান করিল এবং অবিলম্বে এক কলসী জল লইয়া পুনরাগমন করিল; বলিল,—“চেহারা দেখিয়া বুঝিতেছি, নিশ্চয়ই তুমি বামুনের মেয়ে। আমি কিন্তু কৈবর্ত্ত। তাতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। দয়া করে আমার সঙ্গে এস।

সুহাসিনী জিজ্ঞাসিলেন,—“তা যেন চলিলাম। কিন্তু কি বলিয়া তোমায় ডাকিব বলিয়া দেও।”

স্ত্রীলোক বলিল,—“দাসী বলিয়া—”

সুহাসিনী বলিলেন,—“না, তা কেন? তুমি আমার দিদি।”

স্ত্রীলোক বলিল,—“তা হলে এক মস্ত বোনাই জুটে যাবে। সে হয়তো তোমাকে মালা করে বুকে ঝুলিয়ে ফেলিবে ভাই।”

সুহাসিনী বলিলেন,—“আর তোমাকে টুকনি হাতে করে হরিনাম করতে হবে।”

স্ত্রীলোক বলিল,—“তা না হয় মিন্‌সের কপালই সুপ্রসন্ন হবে। তোমাকে কি বলে ডাকব ভাই?”

সুহাসিনী হাসিয়া বলিলেন,—“অভাগিনী ব’লে।”

স্ত্রীলোক বলিল,—“বালাই! না ভাই। আমরা গঙ্গা-যমুনা। তুমি ভাই গঙ্গা, আর এই কালো কৈবর্ত্তমাগিটা যমুনা। কেমন?”

সুহাসিনী সেই মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন,—“বেশ!”

স্ত্রীলোক যে দাসী বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছিল, তাহা মিথ্যা নহে; তাহার নাম হরিদাসী, কি রামদাসী, কি রাখালদাসী কি এই রকম একটা কিছু হইতে পারে। সাধারণতঃ সে দাসী নামেই পরিচিতা।

দাসী অগ্রসর হইল। সুহাসিনী নতমুখে তাহার অনুসরণ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভবিষ্যতের আভাস।

সার্ব্বভৌম ও তাঁহার পুত্র নবীনকৃষ্ণকে দুর্দ্দান্ত শ্যামলাল ছাড়িয়া দিয়াছে। হরিচরণের কথা শুনিয়া সে বুঝিয়াছে যে, বাস্তবিকই পিতা পুত্র সুহাসিনীর পলায়ন-বৃত্তান্ত জানেন না। ইহাও সে বুঝিয়াছে যে, দুরাত্মা গদা বেটাই এই অনিষ্টের মূল সুতরাং গদার উপর তাহার এক্ষণে ক্রোধের সীমা নাই। যে ব্যক্তি গদাকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় তাহার নিকট হাজির করিয়া দিবে, তাহাকে প্রভূত পুরস্কার দিতে শ্যামলাল প্রতিশ্রুত হইয়াছে। কিন্তু গদার কোনই সন্ধান নাই। গদার স্ত্রী নাই, পুত্র নাই; আছে কেবল এক উপপত্নী; সেও সেই সংবাদ শ্রবণের পর হইতে পলাতকা।

সার্ব্বভৌম ও নবীনকৃষ্ণ মুক্তিলাভ করিয়াছেন বটে; কিন্তু তাঁহাদের উপর নির্য্যাতনের কোনই ত্রুটি হয় নাই। তাঁহাদের অঙ্গে প্রহারের চিহ্ন পড়িয়াছে। মুক্তিলাভের পর তাঁহারা আসিয়া দেখিলেন, তাঁহাদের বাস-ভবন ভস্মীভূত হইয়াছে

পৌর-নারীগণ কে কোথায় চলিয়া গিয়াছে ঠিক নাই। গাভী এবং বৎসের কতক অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ হারাইয়াছে, কতক পলাইয়াছে, অথবা গো-চোরের পালে মিশিয়াছে। পৈতৃক শালগ্রাম শিলা ভস্মসাৎ হইয়াছেন ; তৈজস-পত্র, শয্যা, গৃহোপকরণ কিছুই নাই। পিতা-পুত্র পথের ফকির হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

গ্রামের কোন লোক তাহাদের কোন সাহায্য করিতে ভরসা করিল না। অগত্যা তাহারা গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া, শ্যামলাল বাবুর এলাকার বাহিরে, গ্রামান্তরে এক কুটুম্বের ভবনে, আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সার্ব্বভৌমের বিশ্বাস—তাঁহার পুত্র-বধূ গদার হস্তে পড়িয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছেন এবং তাহার চির-সমাদৃত কুলে কালী দিয়াছেন। আর সে পাপীয়সীর সন্ধানের প্রয়োজন নাই—তাহার মৃত্যু সংবাদই এক্ষণে প্রার্থনীয়। সুহাসিনীর সম্বন্ধে নবীনকৃষ্ণের কিন্তু এরূপ বিশ্বাস এক বারও মনে স্থান পায় নাই। তিনি জানিতেন, তাঁহার সুহাসিনী রূপে গুণে অতুলনীয়া। তাঁহার বিশ্বাস—সুহাসিনী, অনিবার্য্য ধর্ম্মনাশ আশঙ্কায়, নিশ্চয়ই কোন নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, অথবা প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া আপনার ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন; ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, সুহাসিনী কখনই আপনার দেহের পবিত্রতা বিধ্বংসিত হইতে দেন নাই। তাঁহার পিতা, যখন তাঁহাকে ডাকিয়া সুহাসিনীর চিন্তা হৃদয় হইতে বিসর্জ্জন করিতে আজ্ঞা করিলেন এবং তৎসম্বন্ধীয় স্বকীয় ধ্রুব বিশ্বাসের বিষয় পরিব্যক্ত করিলেন, তখন নবীনকৃষ্ণের হৃদয় ফাটিয়া গেল; কিন্তু তিনি নিতান্ত পিতৃ-ভক্ত, এজন্য পিতৃ-বাক্যের কোন প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। অবনত মস্তকে তাঁহার আজ্ঞা-পালনে সম্মত হইলেন।

সরলে সুহাসিনি! ধর্ম্ম-ধন বজায় রাখিবার জন্য তুমি কতই হৃদয়-বলের ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছ। কত বিপদকে তুমি অবলীলাক্রমে আলিঙ্গন করিয়াছ। কিন্তু সতি! তোমার এই আয়াসসাধ্য আয়োজন কি ফল প্রসব করিল তাহা তুমি দেখিতেছ কি? তুমি আজি আত্মীয় সমাজে কলঙ্কিতা রূপে পরিগণিতা, দেবোপম শ্বশুরের ঘৃণার সামগ্রী, অশ্রাব্য কুৎসিত নিন্দার আস্পদ এবং তোমার হৃদয়-দেবতা স্বরূপ স্বামী কর্ত্তৃক পুনর্গ্রহণ সম্ভাবনা বিরহিতা। চারিদিক হইতে কল্পনাতীত বিপদ তোমাকে গ্রাস করিয়াছে ও করিতেছে। [তা করুক;] নিন্দুকের পাপ-রসনা তোমার কলঙ্ক রটনা করুক; প্রতিকূল ঘটনা-সমূহ তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করুক; মানবের যুক্তি তোমাকে কু-পথ-গামিনী বলিয়া অবধারণ করুক; কিন্তু ধর্ম্ম—বিশ্বব্যাপী ধর্ম্ম-দেবতা দেখিতেছেন, তুমি সতী নারীর আদর্শ। আর যাঁহাকে তুমি অত্র পরত্র মুক্তির সেতু স্বরূপ পরম দেবতা জ্ঞান কর, তোমার সেই নবীনকৃষ্ণের হৃদয়ে তোমার সততা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে সাধ্বি! তুমি আর চাও কি? যাও সুহাস! নিন্দার মস্তকে পদাঘাত করিতে করিতে ঘটনা সকলকে বিদলিত করিতে করিতে, সাধ্বি, তুমি নির্ভাবনায় আপনার ধর্ম্ম-পথে অগ্রসর হইতে থাক। কিসের ভয়? ধর্ম্ম অবশ্যই তোমার সহায় হইবেন।

শ্যামলাল! পাপ-মগ্ন শ্যামলাল! তোমার অবিবেচনায়, তোমার প্রভুতার অযথা ব্যবহারে আজ এক স্বর্গের দেবী অশেষ বিপদ-সাগরে, অকথ্য কলঙ্ক-নীরে ভাসিতেছেন; আর এক নিরীহ দেশ-মান্য পরিবার আশ্রয়-

হীন, সম্পদহীন, বিত্তহীন, ভক্ষ্যহীন, ভিক্ষুক রূপে পরিগণিত হইয়াছে। নরাধম! তুমি কি মনে করিয়াছ, এ পাপের কখনই বিচার হইবে না?

বিচার কবে হইবে কি না হইবে, তাহা দুজ্ঞের্য় ভবিষ্যতের অন্ধকারাচ্ছন্ন গহ্বর-নিহিত। কিন্তু সম্প্রতি তোমার দুর্দ্দশা বস্তুতই শোচনীয়। তোমার রূপবতী ভার্য্যা অবিশ্বাসিনী, তোমারই এক ঘৃণিতদাসের অঙ্কশায়িনী; তোমার বিপুল বিভবরাশি অন্য পর-হস্ত-গত। তোমার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ও অর্দ্ধাঙ্গ-স্বরূপা ধর্ম্মপত্নী তোমার সর্ব্বনাশ সাধনে কৃত সঙ্কল্প। অহো! তোমার ভবিষ্যৎ যাহাই হউক, তোমার বর্ত্তমান অতীব পাষণ্ডকে এবং পরম শত্রুকেও ব্যথিত-হৃদয় করিতে সক্ষম। পাপের ঘৃণিত সংসর্গে তুমি হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য, ভোগের অভিনব উপকরণ আহরণার্থ তুমি বিষয়ান্তরে দৃষ্টি বিহীন, স্বকীয় সুখ-সন্তোষের নিমিত্ত পরকীয় সর্ব্বনাশ সাধনে তুমি হৃদয়-হীন। এই জন্যই, হে নরপ্রেত! ন্যায়ময় নারায়ণ তোমাকে এই দুরবস্থায় আনয়ন করিয়াছেন। তুমি এখনও আপনার বর্ত্তমান অবস্থার উপলব্ধি করিতে পার নাই। ভরসা করি, তোমার দুর্দ্দশার চিত্র কালে আরও কঠোরতর, আরও বিভীষিকাময় হইবে না। কে জানে?

দুরাত্মগণের হৃদয় পাষাণবৎ কঠিন হইলেও, কখন কখন তাহার অতি নিভৃত প্রদেশে একটী নিতান্ত কোমল অমৃত-ধারা প্রচ্ছন্নভাবে প্রবাহিত থাকিলেও থাকিতে পারে; কোন সময়ে, কোন শুভ সুযোগে, তাহা প্রবল বলসম্পন্ন হইয়া, সমস্ত অন্তর প্রদেশকে প্লাবিত ও মধুময় করিয়া দিতে পারে এবং তাহার প্রভাবে সেই দুর্ভেদ্য পাষাণও, এক মুহূর্ত্তে নিতান্ত কোমল ও নিরতিশয় প্রেমময় হইয়া উঠিতে পারে। সহসা সেই পাপ-প্রপীড়িত, দুষ্ক্রিয়া-কলুষিত হৃদয়ে শান্তির আবির্ভাব ও সুখের সমাবেশ ঘটিতে পারে। কিন্তু অধম শ্যামলাল! তোমার ব্যবহার দেখিয়া তাদৃশ সুখময় পরিবর্ত্তনের আশা কেহই মনে স্থান দিতে পারে না। জানি না, তোমার ন্যায় পাপাত্মার পরিণাম কিরূপ ভয়াবহ হইবে।

চতুর্থ খণ্ড—জ্যোৎস্না।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যোগ ও ভোগ।

অপরাহ্নে, কাশীধামস্থিত নীলরতন বাবুর ভবনের একতম প্রকোষ্ঠে, শ্যামলাল বাবুর দেওয়ান, আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত হরকুমার বাবু, নীলরতন এবং উমাশঙ্কর বসিয়া আছেন। তাহারই অব্যবহিত পার্শ্বে, প্রকোষ্ঠান্তরে আনন্দময়ী, কালীতারা, অন্নপূর্ণা এবং হরকুমারের স্ত্রী ভবসুন্দরী বসিয়া রহিয়াছেন।

শ্যামলাল কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া হরকুমার বাবু সপরিবারে কাশী চলিয়া আসিয়াছেন। নীলরতন বাবু তাঁহার বাল্য-বন্ধু। হরকুমার পরিবারাদি সহ কাশী আগমন করায়, নীলরতন পরমানন্দিত হইয়াছেন এবং আপনার নিকটে বাসা ঠিক করিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে সযত্নে রাখিয়াছেন। প্রবীণ-বয়স্ক বন্ধুদ্বয়, জীবনের শেষভাগে পুণ্য-ক্ষেত্রে সম্মিলিত হইয়া, পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছেন।

হরকুমার বাবু, দিনমানের অনেক সময়ই, নীলরতন বাবুর বাটীতে অতিবাহিত করেন এবং উভয়ের পরিবারবর্গ, পরস্পরের বাটীতে যাতায়াত করিয়া পরম সুখে সময়-পাত করেন। ঘৃণিত শ্যামলালের সংস্রব ত্যাগ করিয়া, হরকুমার যেন নূতন জীবন লাভ করিয়াছেন। তিনি মিতব্যয়িতা ও সদ্বিবেচনা সহকারে যে বিত্ত সঞ্চয় করিয়াছেন, তাঁহার স্বচ্ছন্দভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে তাহা যথেষ্ট। ধর্ম্ম-চিন্তা ও সাধুসঙ্গই এই দুই বন্ধুর প্রধান কার্য্য। কাশীতে আগমন করার পর, হরকুমারের সহিত উমাশঙ্করের পরিচয় হইয়াছে। নীলরতন বাবুর বাটীতে তিন চারি দিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে এবং ধর্ম্ম-বিষয়ক বহু বাদানুবাদ হইয়াছে। ক্রমশঃ হরকুমারের সহিত উমাশঙ্করের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছে এবং এই নবীন সন্ন্যাসীর বিজ্ঞতা, সচ্চরিত্রতা ও আন্তরিক তেজ সন্দর্শনে, তিনি বিমোহিত হইয়া উঠিয়াছেন।

অধুনা নানা প্রকার কথার পর ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে এবং উমাশঙ্কর শ্রোতৃগণের সমক্ষে তৎসম্বন্ধে স্বকীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন,—"শ্রীকৃষ্ণ বস্তুতঃ পূর্ণ ব্রহ্মরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন কি না, তাহা আমি জানি না এবং সে বিষয়ের কোন বাদানুবাদ করিবার প্রয়োজনও আমি দেখি না। আর্য্যদিগের ব্রহ্ম দ্বিবিধ—সগুণ ও নির্গুণ। সগুণ ব্রহ্মের আরাধনারূপ পথ দিয়া নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানের উদ্ভব হয়, এ তত্ত্ব বস্তুতই অতীব সারবান্ ও পরম শ্রদ্ধেয়। নির্গুণ ব্রহ্মের উপলব্ধির পর আর সগুণ ব্রহ্মের কোনই প্রয়োজনীয়তা। থাকে না সুতরাং সগুণোপাসনা একটী সোপান মাত্র। নির্গুণোপলব্ধিরূপ সৌধে আরোহণ করার পর, সগুণ সোপানের আর কোনই আবশ্যকতা নাই। সুতরাং সোপান যাহাই কেন হউক না, তাহার সহিত বিশেষ কোন সম্বন্ধ দেখা যাইতেছে না। কেবল সোপানের দৃঢ়তা, স্থায়িত্ব ও সরলতাই বিশেষ বিচার্য্য। এরূপ স্থলে দুইটী সোপান আমি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি। সে দুই—শ্রীকৃষ্ণ ও শিব। যেরূপ কর্ম্ম-মার্গ অবলম্বন করিলে জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী, শ্রীকৃষ্ণ তাহা সম্যগ্‌রূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। যেরূপ প্রণালীতে কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের সম্মিলন সম্ভাবিত, শিব তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন।" অতএব এই উভয় সোপানই পরম সমাদরণীয়। কেহ যদি তদুভয়কে ব্যাসের কল্পনা বলিয়া মনে করেন, তাহাতে আমাদের কোনই আপত্তি নাই। সূর্য্যের আলোক পরিদৃশ্যমান সত্য। সূর্য্য কি পদার্থ তাহা নির্ণয় করিতে না পারিলেও আলোকের কোনই অন্যথা হয় না। তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ ও শিব কি পদার্থ তাহা নির্ণয় করিতে না পারিলেও তাঁহাদিগের প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে আমাদিগের মতদ্বৈধ হইবার কোনই কারণ নাই।"

হরকুমার বলিলেন,—"আপনি শিব ও শ্রীকৃষ্ণ এই যে দুই দেবতার উল্লেখ করিতেছেন, আমাদের দৃষ্টিতে তদুভয় সম্পূর্ণ ভিন্নভাবাপন্ন। শিব ঘোর যোগী—পরম সন্ন্যাসী। শ্রীকৃষ্ণ ঘোর বিষয়ী—পরম ভোগী। এতদুভয়ের চরিত্র আলোচনায় একরূপ পরমার্থ কি প্রকারে সাধিত হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতেছি না।"

উমাশঙ্কর উত্তর দিলেন,—"একটু অনুধাবন করিলে দেখা যায় উভয়েরই জীবন এক। একজন ভোগের মধ্যে সন্ন্যাসী; আর

একজন সন্ন্যাসের মধ্যে ভোগী। শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্য সুখ-বিধায়ক পদার্থ পরিবৃত হইয়াও, নির্লিপ্ত। আর শিব, যোগমার্গের পূর্ণসাধক হইয়াও লিপ্ত। উভয়েরই জীবন সমান শিক্ষাপ্রদ। যে ব্যক্তি কামনা পূর্ণ হইয়াও নিষ্কাম, অথবা যে ব্যক্তি নিষ্কাম হইয়াও সকাম, তিনি অবশ্যই জ্ঞানের পূর্ণ অধিকারী।"

হরকুমার জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনি যাহা বলিলেন তাহা সুসঙ্গত হইলেও, শ্রীকৃষ্ণ ও শিবের চরিত্রে তাহার স্ফূর্ত্তি কোথায়? শ্রীকৃষ্ণ ঘোরতর ভোগী; তাঁহার নির্লিপ্ততা কোথায়? শিব ঘোরতর ত্যাগী; তাঁহার লিপ্ততা কোথায়?"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ-গোপাঙ্গনাগণের প্রাণধন, নয়নের মণি; তাঁহাদিগের সহিত তাঁহার প্রেম অতুলনীয়। তাঁহার প্রেম-লীলা সন্দর্শনে পশু-পক্ষী বিমোহিত হইয়াছে, যমুনা উজান বহিয়াছে ও বসুন্ধরা ধন্য হইয়াছে। প্রেমময়ী গোপীরা মান-ভরে তিলেক তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলে, তিনি প্রলয় জ্ঞান করিয়াছেন ও আপনাকে হতভাগ্যের অগ্রগণ্য বলিয়া মনে করিয়াছেন। এই ব্যাপার দেখিয়া কৃষ্ণকে পরম ভোগী ব্যতীত আর কিছুই মনে হয় না। কিন্তু যেমন কংসদূত অক্রুর আসিয়া তাঁহাকে ধনুর্যজ্ঞের নিমন্ত্রণ করিলেন, অমনই, শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে গুরুতর কর্ত্তব্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হইল। তখন যে গোপাঙ্গনাগণের দীর্ঘনিশ্বাসে সৃষ্টি রসাতলে যাইত, যাঁহাদের বিষণ্ণ বদন দেখিলে বিশ্ব-সংসার অন্ধকার হইত, তাঁহাদের আর্ত্তনাদ ও সকাতর অনুরোধ উপেক্ষিত হইল; তাঁহাদিগের রথচক্রাবরোধ গণনায় আসিল না। ভোগে নির্লিপ্ততার অলৌকিক উদাহরণ। আমি একটী ব্যাপারের উল্লেখ করিলাম মাত্র। এইরূপ দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের পর্য্যালোচনা করিলে আপনারা দেখিতে পাইবেন যে, তাঁহার জীবনের সর্ব্বত্র ভোগে নির্লিপ্ততার উদাহরণ দেদীপ্যমান। আবার দেখুন, শিব শ্মশান-বাসী, বিভূতি-বিলেপিত-কলেবর, সর্ব্বত্যাগী এবং কঠোর যোগনিরত; অথচ তাঁহার অঙ্কে সুন্দরী-শিরোমণি, সর্ব্বালঙ্কার বিভূষিতা, নবীনা কামিনী। ত্যাগে লিপ্ততার অলৌকিক উদাহরণ। আমি একটী ব্যাপারের উল্লেখ করিলাম মাত্র। আপনারা এইরূপভাবে পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন, শিবের জীবনের সর্ব্বত্র, এইরূপ বৈরাগ্য মধ্যে লিপ্ততার অত্যদ্ভুত উদাহরণ দেদীপ্যমান।"

নীলরতন বলিলেন,—"আপনার প্রদর্শিত উভয় দৃষ্টান্তই অতীব সুন্দর। বুঝিতেছি যে ভোগ করায় দোষ নাই; কিন্তু নির্লিপ্ত হওয়ার আবশ্যক। এবং সন্ন্যাসে, দোষ নাই; কিন্তু লিপ্ত থাকা আবশ্যক। যে সকল ব্যক্তি নির্লিপ্ত ভাবে ভোগ করিতে পারেন, অথবা লিপ্তভাবে সন্ন্যাস করিতে পারেন, তাঁহারাই চরমফলের অধিকারী হন।"

হরকুমার বলিলেন,—তাহা হইলে, নির্লিপ্ত সন্ন্যাস অপেক্ষা লিপ্ত সন্ন্যাসই শ্রেষ্ঠ এবং সকাম ভোগী অপেক্ষা নিষ্কাম ভোগীই প্রশংসনীয়।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আমার অভিপ্রায় আপনারা সম্যক্‌রূপে প্রণিধান করিয়াছেন, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য।"

হরকুমার বলিলেন,—"কিন্তু আপনার উপদেশের মর্ম্ম প্রণিধান করিয়া আমরা সুখী হইতেছি না; কারণ উপদেষ্টা স্বয়ং অপূর্ণ। আপনার জীবনে কেবল সন্ন্যাসই আছে—ভোগ

নাই। কেবল ত্যাগ আছে—লিপ্ততা নাই। সুতরাং আপনি যে উপদেশ প্রদান করেন, তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিতে অক্ষম।”

উমাশঙ্কর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন এবং কিয়ৎকাল অধোমুখে থাকিয়া উত্তর প্রদান করিলেন,—“আপনার বাক্য ঠিক হইলেও, আমার পক্ষে সম্পূর্ণরূপ প্রযোজ্য নহে। আমি আজন্ম সন্ন্যাসী; কারণ শৈশবে পিতৃমাতৃ হীন, সন্ন্যাসীর আশ্রমে পালিত, সন্ন্যাসীর শিষ্য এবং সন্ন্যাসীর অনুকরণ পরায়ণ। এইরূপ ব্যক্তির ভোগের কোনই সুযোগ বা সম্ভাবনা নাই এবং এতাদৃশ জীবনে বিষয়লেপের কোন অবসর নাই। অতএব কথিত অভিপ্রায়ের সহিত আমার জীবনের সামঞ্জস্য হইতে পারে না।”

হরকুমার বলিলেন,—“আপনার জীবন বাস্তবিকই বিস্ময়াবহ। কোথায় আপনার পিতৃনিবাস ছিল, কে আপনার পিতা-মাতা ছিলেন, তাহার কিছুই কি আপনি জানেন না?”

উমাশঙ্কর বলিলেন,—“কিছু না। কে পিতা, কোথায় নিবাস, সে সকল বৃত্তান্তের কিছুই আমি জানি না। মাতৃ-দেবীর সামান্য স্মৃতি, কখন কখনও ছায়ার ন্যায়, আমার মনে উদিত হয় বটে; কিন্তু তাহা নিতান্ত অস্পষ্ট।”

হরককুমার জিজ্ঞাসিলেন,—“বোধ হয় ঘনানন্দ স্বামী আপনার পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত ঘটিত কিছু কিছু রহস্য জানিতে পারেন। অন্ততঃ ব্রাহ্মণ কুলে আপনার জন্ম। ইহা না জানিলে, তিনি কখনই আপনাকে সন্ন্যাসাশ্রমে গ্রহণ করিতেন না।”

উমাশঙ্কর বলিলেন,—“সম্ভব। আমার জননী বোধ হয় আমাকে গুরুদেবের হস্তেই সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। নচেৎ আমার প্রতি তাঁহার এরূপ অসামান্য কৃপার আর কোনই কারণ দেখিতে পাই না। আমাকে গুরুদেবের হস্তে সমর্পণ করার কালে জননী কিছু পরিচয় প্রদান করিয়া থাকিলেও থাকিতে পারেন; কিন্তু গুরুদেবের মুখে তদ্বিষয়ক কোন সংবাদই আমি কখনও শ্রবণ করি নাই।”

হরকুমার বলিলেন,—“নিশ্চয়ই আপনার জীবনের সহিত কোন অলৌকিক ব্যাপার প্রচ্ছন্ন আছে। যাহাই হউক, আজন্ম পিতা মাতার স্নেহরূপ পরম রসে বঞ্চিত থাকায়, আপনার জীবন সন্ন্যাসরূপ শুষ্কতায় মিশিয়া গিয়াছে। প্রেমে মনুষ্য-হৃদয়কে যে কোমলতা প্রদান করে, তাহার লাভ আপনার জীবনে ঘটে নাই”।

উমাশঙ্কর বলিলেন,—“আমি পূর্ব্বে তাহা বুঝিতে পারি নাই। কারণ, যে যাহা কখনও ভোগ করে নাই, সে তাহার মর্ম্মগ্রহণে অক্ষম। সংপ্রতি আমার এই মরুভূমির ন্যায় কঠোর জীবনের বড়ই মধুর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কৃপা সহকারে ভগবতী স্বয়ং আমার জননীরূপে আবির্ভূতা হইয়া, আমাকে কোলে লইয়াছেন। তাঁহার স্নেহে আমার শুষ্ক অন্তঃকরণ সরস ও মধুময় হইয়া উঠিয়াছে। এখন আমি এ বিশ্ব সংসারকে অভিনব চক্ষে দেখিতেছি। সকল পদার্থই যেন অধুনা অধিকতর সুমিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আমার সেই মাকে অপনারাও দেখিয়াছেন। তিনি যোগেশ্বরী।”

হরকুমার বলিলেন, “পূর্ব্ব জন্মের অনেক সুকৃতি ছিল তাই তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছি এবং দুই তিন দিন তাঁহার আচরণাদি দেখিয়া শুনিয়া যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি এত বয়সের মধ্যে তাদৃশ জ্ঞানোপার্জ্জনের সুযোগ আর কখনও হয় নাই।”

নীলরতন বলিলেন,—"যোগেশ্বরী মাতা কৃপা পূর্ব্বক এক দিন এই ভবনেও পদধূলি দিয়া আমাদিগকে পবিত্র ও চরিতার্থ করিয়াছেন। আমার কন্যা অন্নপূর্ণা, তাঁহার যুগপৎ সুসঙ্গত ও অসঙ্গত, সলজ্জ ও নির্লজ্জ, প্রলাপবৎ ও সারপূর্ণ বাক্য ও ব্যবহার দর্শনে, তাঁহার একান্ত অনুরক্তা হইয়াছে। তিনিও অন্নপূর্ণাকে কন্যার ন্যায় স্নেহ প্রদর্শন করিয়াছেন।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"স্নেহ তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম। আমি এক্ষণে বিদায় হই। বেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে। আশ্রমের অনেক কার্য্যের সময় উপস্থিত।"

নীলরতন বলিলেন,—"আমাদিগের প্রতি আপনার কৃপা অসীম। অন্নপূর্ণা আপনাকে প্রণাম করে নাই; প্রণাম করিতে না পাইলে সে বড়ই কাতর হয়। অতএব একবার পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে পদার্পণ করিলে, সে আপনাকে প্রণাম করিতে পারে।"

নবীন সন্ন্যাসীর বদন-মণ্ডল যেন একটু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল এবং তাঁহার স্থির গম্ভীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন একটু বিচঞ্চল হইল। তিনি ধীরে ধীরে নারীগণের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন এবং কালীতারা ও আনন্দময়ীকে ভক্তি সহকারে প্রণাম করিলেন। অন্নপূর্ণা লজ্জাবনতমুখী; দূর হইতে সন্ন্যাসীকে একটী প্রণাম করিলেন, কিন্তু তাঁহার দিকে একবার চাহিয়া দেখিতেও তাঁহার ভরসা হইল না; একটী কথাও বলিতে পারিলেন না। অন্নপূর্ণার সহিত দুই একটী কথা কহিবে ইচ্ছা করিয়াও, সন্ন্যাসী কিছুই বলিয়া উঠিতে পারিলেন না। কালীতারা ও আনন্দময়ীর সহিত সময়োচিত দুই একটী কথা কহিয়া বাহিরে আসিলেন। অন্নপূর্ণা মনে মনে বলিলেন,—"এ সন্ন্যাসী কখনই মানুষ নহেন; ইনি দেবতা।"

নীলরতন ও হরকুমারের নিকট হইতে বিহিত বিধানে বিদায় গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী বাহিরে আসিলেন এবং আশ্রমাভিমুখে চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিলেন,—"স্বভাব, চরিত্র ও রূপ সকল বিষয়ের আলোচনা করিলে, নীলরতন বাবুর এই কন্যাকে দেবী ভিন্ন আর কিছুই মনে হয় না।"

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলে নীলরতন বলিলেন,—"এই আত্মীয় বন্ধু বান্ধব বিরহিত আজন্ম আশ্রম পালিত বালক যেমন প্রিয়দর্শন তেমনই জ্ঞানবান্। নিশ্চয়ই এই নবীন যোগী কোন মহাপুরুষের সন্তান।"

হরকুমার বলিলেন,—"আমার বোধ হয় সাধু উমাশঙ্করের জীবন কোন অত্যদ্ভুত রহস্য-জালে জড়িত। আমি ইহার তথ্যানুসন্ধান করিব। এই নবীন যোগীর ব্যবহার ও জ্ঞান-গর্ভ বাক্যাবলী আমাকে উত্তরোত্তর এতই বিমোহিত করিয়াছে যে, স্বতই ইহার সম্বন্ধে আমার এক প্রকার আন্তরিক অনুরাগ জন্মিয়াছে। যতদিন ইহার অপরিজ্ঞাত জীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে না পারি, ততদিন আমার চিত্ত সুস্থির হইবে না।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অপূর্ব্ব দর্শন।

উমাশঙ্কর ধীরে ধীরে আশ্রম-প্রদেশে উপনীত হইয়া দেখিলেন অপূর্ব্ব-দর্শন। আশ্রম-বেদিকার উপর সর্ব্বালঙ্কার-বিভূষিত-কায়া, কর-ধৃত-কমলা, হস্যমুখী এক সজীব দেবী প্রতিমা। সেই প্রতিমা যোগেশ্বরী।

যোগেশ্বরী একাকিনী ও নির্ব্বাক্ ভাবে হস্ত-স্থিত কমল-বৃন্ত দ্বারা ভূপৃষ্ঠে নানা প্রকার রেখাপাত করিতেছেন। তাঁহার স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের জ্যোতিতে সন্নিহিত প্রদেশ যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। অঙ্গের ভূষণ সমূহ, তাঁহার প্রদীপ্ত শোভার সান্নিধ্য হেতু, যেন নিষ্প্রভ হইয়াছে। উজ্জ্বল আয়ত লোচন-দ্বয় যেন আপনিই হাসিতেছে; অপরূপ ওষ্ঠাধর যেন প্রগাঢ় আনন্দ-জনিত হাস্য প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারিতেছে না। মুক্তামালা বিজড়িত বেণী পৃষ্ঠদেশ হইতে আসিয়া অঙ্কোপরে স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়াছে। অপূর্ব্ব যৌবন-শ্রীতে যোগেশ্বরীর দেহ ঢল ঢল করিতেছে। এই অলৌকিক শোভা ও যৌবন-শ্রী সন্দর্শনে, ধর্ম্ম-গত-প্রাণের কথা দূরে থাকুক, চিরন্তন পাষণ্ডের হৃদয়েও ভক্তি-ভিন্ন অন্য কোন ভাবের আবির্ভাব হয় না। যোগেশ্বরীকে দর্শন মাত্র স্বতই হৃদয়ে গাম্ভীর্য্য সংবলিত প্রগাঢ় ভক্তি সমুদিত হয়।

এই দেবী-মূর্ত্তি দর্শন মাত্র উমাশঙ্কর আপনাকে ধন্য ও চরিতার্থ জ্ঞান করিলেন এবং ধীরে ধীরে নিকটস্থ হইয়া, ভূপৃষ্ঠে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, ভক্তি-পূর্ণ হৃদয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। তৎক্ষণাৎ যোগেশ্বরীর দৃষ্টি উমাশঙ্করের প্রতি সঞ্চালিত হইল এবং তিনি হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসিলেন—"কেও? ছেলে। আচ্ছা বল দেখি, মা ভাল কি, ছেলে ভাল?"

উমাশঙ্কর বিনীত ভাবে বলিলেন,—"মার গুণের কি সীমা আছে? ছেলে যতই ভাল হউক, মার মত কখনই হয় না।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"তবে আমি তোর ভাল মা?"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"তা আর বলিতে? আপনি দেবী; এই দেবী আমার মা। সার্থক আমার জন্ম যে, মাতৃহীন হইয়াও আমি আবার এমন মা পাইয়াছি।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"আমি অনেক অলঙ্কার পরিয়াছি, এই গুলা আজ বিলাইয়া দিব। তুই লইবি?"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আমি সন্ন্যাসী; অলঙ্কারে আমার কি প্রয়োজন?"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"তুই সন্ন্যাসী ছিলি কিন্তু তোকে গৃহী হইতে হইবে। অত-এব অলঙ্কারে তোর দরকার আছে।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আপনার কথা শুনিয়া আমি ভয় পাইতেছি। আমাকে গৃহী হইতে হইবে? এমন মা ছাড়িয়া আমি কোথাও ত যাইতে পারিব না।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"মা ছাড়িবে কেন বাবা? মা কি কখনও ছেলে ছাড়িয়া থাকিতে পারে? তুমি গৃহী হইলে তোমার মাও গৃহে গিয়া তোমাকে দেখিয়া আসিবে।"

উমাশঙ্কর হাসিয়া বলিলেন,—"এমন মায়ের আশ্রয়ে থাকিলে, কোথাও অসুখের সম্ভাবনা নাই। মা যদি সহায় থাকেন, তাহা হইলে এ অধম সন্তান সর্ব্বত্র গমন করিতেই সম্মত আছে।"

যোগেশ্বরী একে একে দেহের আভরণ উন্মুক্ত করিতে লাগিলেন। সমস্ত খোলা হইলে বলিলেন,—"নেও বাবা! এ সকল ভূষণ তোমার।"

উমাশঙ্কর আবার বলিলেন,—"কেন মা, এই সকল পদার্থ আমাকে দিতেছেন? আমি এ সকল কি করিব? কোথায় রাখিব?"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"না রাখিতে পার, কাহাকেও দেও গে।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"কাহাকে দিব?"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"যাহাকে বড় ভাল বাস।"

উমাশঙ্কর জিজ্ঞাসিলেন,—"যাহাকে বড় ভালবাসি। কে সে?"

হাসিতে হাসিতে যোগেশ্বরী কহিলেন,—"অন্নপূর্ণা।"

উমাশঙ্কর চমকিত হুইয়া উঠিলেন। ভাবিলেন, 'আমি অন্নপূর্ণাকে ভালবাসি সত্য। মা কেমন করিয়থা একা জানিলেন? এ বৃত্তান্ত স্বয়ং অন্নপূর্ণা জানেন না—জগতের আর কেহই জানে না। জননী যোগেশ্বরী দেবী। সুতরাং তাঁহার পক্ষে এ রহস্য পরিজ্ঞাত হওয়া অসম্ভব নহে।' তাহার পর আরও মনে করিলেন, 'অন্নপূর্ণাকে আমি ভালবাসি সত্য। কিন্তু মা বলিতেছেন, আমি অন্নপূর্ণাকে বড় ভালবাসি। মার কথা মিথ্যা হইতে পারে না। কিন্তু তাঁহার এ অনুমান্টি যেন ঠিক হয় নাই।"

ভ্রান্ত উমাশঙ্কর! তুমি শাস্ত্রজ্ঞ, বিচার নিপুণ ও জ্ঞানবান্। তথাপি তুমি এখনও অল্পবয়স্ক ও বহুদর্শিতাবিহীন। তাই প্রেমের তুমি এই এক অদ্ভুত তত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারিতেছ না। প্রেমটী বড়ই আশ্চর্য্য সামগ্রী। ইহা কোথা হইতে, কিরূপে, তিল তিল করিয়া সঞ্চিত হয়, তাহা অনেক সময়েই ঠিক করা যায় না। অনেক সময় এমনও ঘটে যে, প্রেমাস্পদ ব্যক্তির প্রতি প্রেমের আকর্ষণ সঞ্জাত হইয়াছে কি না, ইহা অনুমান করাই যায় না। যখন কোন ঘটনা বিশেষ বা কোন ব্যাপার হেতু, সহসা সেই প্রেম উপলব্ধ হয়, তখনই বুঝা যায় যে, তাহার পরিমাণ কত? অনেক সময় এমনও ঘটে যে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি প্রেমের পরিমাণ কিরূপ তাহা অনুধাবন করিতে না পারিয়া. প্রেমিক তাহাকে আপনার বন্ধুবর্গের সমশ্রেণীস্থ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সহসা একটী আঘাত, বা একটী ক্ষুদ্র ক্রিয়া তাঁহার দর্শন-শক্তি উন্মীলিত করিয়া দেয়, তখন তিনি বুঝিতে পারেন যে, যাঁহাকে সাধারণ প্রেমাস্পদ বলিয়া পূর্ব্বে জ্ঞান ছিল, তাঁহারই প্রেমে হৃদয়, মন ও কলেবর বিভোর হইয়া গিয়াছে; বসুন্ধরা যেন তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়াছে; এবং তিনি যেন সেই প্রেমাস্পদের অনন্ত প্রেম-সাগরে ডুবিয়া আছেন। অতএব সাধু উমাশঙ্কর! অন্নপূর্ণা সম্বন্ধে তোমার প্রেমের প্রকৃত পরিমাণ তুমি প্রণিধান করিতে পারিয়াছ বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি না এবং তোমার ভালবাসা বড় ভালবাসা কি না, এ সম্বন্ধে তোমার মীমাংসা সমীচীন বলিয়াও আমরা গ্রহণ করিতে পারি না।

উমাশঙ্কর যখন যোগেশ্বরীর বাক্য, সমূহের উল্লিখিতরূপে আলোচনা করিতেছেন, সেই সময়ে সেই দেবী তাঁহার নিকটস্থ হইলেন এবং অতীব স্নেহ পূর্ণ ভাবে তাঁহার হস্তধারণ করিয়া বলিলেন,—"বাবা! গঙ্গায় কত ঢেউ যাইতেছে আমাকে গণিয়া বলিয়া দিতে হইবে; আমার বড় দরকার।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"সে কি কথা! এও কি কেহ বলিতে পারে মা?"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"পারে না? মানুষের হৃদয় একটা প্রকাণ্ড সমুদ্র। তাহার সকলভাব যদি কেহ বুঝিতে পারে, তাহা হইলে সে ক্ষুদ্র গঙ্গার তরঙ্গ কয়টা গণিয়া বলিতে পারিবে না, এ বড় আশ্চর্য্যের কথা। তা বাবা, তুমি গঙ্গার ঢেউ গণিতে পার বা না পার, আপনার হৃদয়ের তরঙ্গগুলির প্রতি লক্ষ রাখিও। বলিতেছিলাম কি কুটীরের মধ্যে

এক পাত্র বরফি আনিয়া রাখিয়াছি; কিছু খাবে কি?”

উমাশঙ্কর বলিলেন,—“আমরা আশ্রমে দিনান্তে একবার মাত্র ভিক্ষান্ন পাক করিয়া খাই। তবে অসময়ে বরফি কিরূপে খাওয়া হইতে পারে?”

যোগেশ্বরী হা! হা! শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—“এরূপ ভোজনে কি ধর্ম্ম যাইবে?”

উমাশঙ্কর বলিলেন,—“জানি না মা কি হইবে। কিন্তু ধর্ম্ম-হানির আশঙ্কা না থাকিলে এরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে কেন?”

যোগেশ্বরী বলিলেন,—“ব্যবস্থা নানা প্রকার, ব্যবস্থার কর্ত্তাও অনেক; কিন্তু এ সকলই সামাজিক ব্যবস্থা। সামাজিক ব্যবস্থা পরিপালনও ধর্ম্ম। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্ম সামাজিক ব্যবস্থার বশবর্ত্তী নহে; বরং তদপেক্ষা অনেক দূরে অবস্থিত। ভোজনাদি বিষয়ের অনেক ব্যবস্থাই সামাজিক ধর্ম্ম-সঙ্গত। সুতরাং প্রকৃত ধর্ম্মের সহিত তাহার বিশেষ সম্বন্ধ নাই।”

উমাশঙ্কর বলিলেন,—“আমরা সন্ন্যাসী—সামাজিক নিয়মের বহির্ভূত। তবে কেন মা! আমাদের সম্বন্ধেও ভোজনাদি বিষয়ক অবধারিত নিয়ম প্রচারিত আছে?”

যোগেশ্বরী বলিলেন,—“না বাবা! আমরা সমাজবহির্ভূত নহি। সন্ন্যাসীরাও মনুষ্য-সমাজের অংশ। সাধারণের সহিত আহার ব্যবহার, আদান প্রদান না থাকিলেও, সন্ন্যাসীরা বহু প্রকারে সমাজের সহিত সংবদ্ধ; সুতরাং সামাজিক নিয়মের অধীন। সন্ন্যাসীদিগেরও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সমাজ আছে। সন্ন্যাসিগণ আপন আপন সমাজ প্রচলিত নিয়ম পরিপালনে বাধ্য। এই জন্যই তুমি সন্ন্যাসাশ্রমের মধ্যে, সামাজিক মনুষ্যের ন্যায়, বিশেষ বিশেষ নিয়ম দেখিতে পাও।”

উমাশঙ্কর জিজ্ঞাসিলেন,—“এ সকল নিয়মের কোনই সার্থকতা নাই কি মা?”

যোগেশ্বরী উত্তর দিলেন,—“বিশেষ সার্থকতা আছে বাবা! কি গৃহস্থাশ্রমের সামাজিক নিয়ম, কি সন্ন্যাসাশ্রমের ব্যবস্থা, সকলই নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও সার্থক। এই জন্য প্রত্যেক আশ্রমেই আশ্রমোচিত নিয়ম পরিপালনই ধর্ম্ম নামে অভিহিত। কোথাও স্বাস্থ্যের অনুরোধে, কোথাও সমাজ-সংস্থিতির অনুরোধে, কোথাও শান্তির অনুরোধে, কোথাও জ্ঞান লাভের অনুরোধে, কোথাও যোগ-শক্তি প্রাপ্তির অনুরোধে, কোথাও ভক্তি সাধনের অনুরোধে, বিশেষ বিশেষ নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সেই সকল নিয়ম দৈব-শক্তি সম্পন্ন মনীষিগণ বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক অবধারিত করিয়াছেন সুতরাং তাহার পরিবর্ত্তন, বা অপরিপালন কোন আশ্রমের পক্ষেই বৈধ ব্যবস্থা নহে।”

উমাশঙ্কর বলিলেন,—“তবে মা! এ অসময়ে আপনি আমাকে এ অবৈধ ভোজন করিতে আজ্ঞা করিতেছেন কেন?”

যোগেশ্বরী বলিলেন,—“তুমি রাজা হইবে। যে আশ্রমে তুমি এক্ষণে অধিষ্ঠিত, তাহা তোমার বয়স, অবস্থা কিছুরই অনুরূপ নহে। তোমার জন্য বিধাতা আপাততঃ স্বতন্ত্র ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন; অতএব সন্ন্যাসাশ্রমের নিয়ম অপরিপালন তোমার পক্ষে দোষাবহ নহে।”

উমাশঙ্কর বলিলেন,—“মা! আপনার এ রহস্য-পূর্ণ বাক্যের তাৎপর্য্য আমি কোন রূপেই প্রণিধান করিতে পারিতেছি না।”

যোগেশ্বরী বলিলেন,—কেহ পাঁচ বৎসর বয়সে মরে, কেহ একশত বৎসর বাঁচিয়া থাকে, কেহ দীনহীন ভিক্ষুক হয়, কেহ বিপুল ধনশালী হয় কেন তুমি জান? যাহা যখন হইবে, তাহাই হইতে দেও। প্রতিকূল চেষ্টা করিও না। দৈহিক কঠোরতা, ত্যাগ স্বীকার, শাস্ত্রালোচনা প্রভৃতির অনুষ্ঠান দ্বারা তোমার হৃদয় জ্ঞানবান্ ও বলবান্ হইয়াছে। তুমি যখন রাজা হইবে, তখন জ্ঞানের সহিত বিষয়-সম্মিলনে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটিবে।"

সবিস্ময়ে উমাশঙ্কর আবার বলিলেন,—"জননি! আপনি এ প্রহেলিকা পরিত্যাগ করুন। কেন আপনি এ ভিক্ষুক বালককে রাজ-পদাভিষিক্ত করিবার কল্পনা করিতেছেন? বিড়ম্বিত বিষয় ব্যাপারে সন্ন্যাসীর প্রয়োজন কি মা?"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"প্রয়োজন কি তাহা আমি জানি না। তুমি আমগাছে কখনও তেঁতুল ফলাইতে পার কি? তোমার অদৃষ্টে রাজভোগ অপরিহার্য্য দেখিতেছি। তবে তুমি রাজ-ভোগ খাইবে না কেন বাবা?"

এই বলিয়া যোগেশ্বরী তাঁহার হস্তধারণ করিয়া বলিলেন,—"আইস।"

উমাশঙ্কর নীরবে দেবীর সহিত গমন করিলেন। কুটীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, বাস্তবিকই তথায় একথালা অত্যুৎকৃষ্ট বরফি রহিয়াছে।

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"খাও বাবা।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"নিয়ম অনিয়ম কিছুই জানি না মা। আপনি স্বর্গের দেবতা—আমার জননী। আপনার আজ্ঞাই আমার সকল নিয়মের সার। আপনি যখন আজ্ঞা করিতেছেন, তখন ভোজ্য গ্রহণে আমার আর কোনই ইতস্ততঃ নাই। কিন্তু মা! অপরিসীম পুণ্য না থাকিলে জননীর প্রসাদ ভোজন সন্তানের অদৃষ্টে ঘটে না। মাতৃহীন অভাগা আবার মাতৃ-স্নেহ লাভ করিয়াছে। কিন্তু মাতার প্রসাদ ভোজনরূপ সৌভাগ্য তাহার অদৃষ্টে ঘটিতে পারে না কি?"

যোগেশ্বরী উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন,—"সন্তানের বাসনা পূরণ করিতে জননী বাধ্য।"

এই বলিয়া সেই দেবী পাত্রস্থ এক খণ্ড বরফি তুলিয়া লইলেন, এবং স্বকীয় কুন্দ-কুসুম বিনিন্দিত দন্তে তাহার কিয়দংশ কাটিয়া লইয়া অবশিষ্ট ভাগ থালায় রাখিয়া দিলেন এবং বলিলেন,—"এখন খাও বাবা!"

তখন উমাশঙ্কর গললগ্নীকৃতবাসে কৃতাঞ্জলি-পুটে বলিলেন,—"আজ অভাগা ধন্য হইল! জীবন সার্থক হইল, দেহ মন পবিত্র হইল।"

ভক্তিভাবে যোগেশ্বরীকে প্রণাম করিয়া উমাশঙ্কর উচ্ছিষ্ট বরফি খণ্ড, প্রথমে মস্তকে, তদনন্তর বক্ষে স্থাপন করিয়া, মুখে প্রদান করিলেন।

কিন্তু কোথায় যোগেশ্বরী! উমাশঙ্কর চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, যোগেশ্বরী কোথাও নাই।

অলঙ্কার রাশির কি হইবে? উমাশঙ্কর কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, গুরুদেবের আগমন প্রতীক্ষায়, আশ্রম-বেদিকার পার্শ্বে, অলঙ্কার-সমূহের সন্নিকটে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

পঞ্চম খণ্ড—।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গাঢ়তা।

সোণাপুরে, শ্যামলাল বাবুর অন্তঃপুর মধ্যে অপরাহ্নকালে বিধুমুখী ক্লিওপেটরা কৌচের উপর অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় পড়িয়া আছেন। তাঁহার সূক্ষ্ম বস্ত্রের কিয়দংশ কার্পেটের উপর লুটাইতেছে। শরীর নিতান্ত অলসিত ও অবসিত, নেত্রদ্বয় মুকুলিত, বেশ ভূষা বিস্রস্ত, কেশ-পাশ বিমুক্ত, বেণী বিগলিত এইরূপ সময়ে সারদা তথায় প্রবেশ করিল। সারদার সম্পত্তি কিছু বাড়িয়াছে; রূপার গোট, সোণার বালা তাহার পূর্ব্বেই ছিল। এবার তাহার বাহুতে সোণার তাগা ও কাণে সোণার মাকড়ি শোভা পাইতেছে। প্রভু-পত্নী পরিতুষ্ট হওয়ায়, তাহার সুখসম্পদ অনেক বাড়িয়াছে। সারদা আসিয়াই বলিল,—"তুমি যে রমক ভাবে শুইয়া আছ বউ দিদি, তা যদি হরিচরণ বাবু একবার এসময়ে দেখ্‌তে পেতেন তা হলে বোধ হয় পাগল হয়ে যেতেন!"

বিধুমুখী অবসিতভাবে ঈষৎ হাসির সহিত মিশাইয়া বলিলেন,—"এই সে হতভাগা এখান থেকে যাচ্ছে। সেই ত আমাকে এ রকম করে ফেলে রেখে গিয়েছে। পাগল সে হয়েছে বটে; দুদিন থেকে বল্‌তে আরম্ভ করেছে, 'আমাদের এ প্রেমের ব্যাপার লোক জানাজানি হয়েছে। একটু আধটু কথা বাবুর কাণেও ঢুকেছে।' হরিচরণ কৌশল ক'রে বাবুকে তা মনে ভাবতেও দেয় নি।"

সারদা সভয়ে বলিল,—"এটা তো বাস্তবিকই বড় ভয়ের কথা! তা হলে কি হবে?"

বিধুমুখী ঘৃণাসূচক হাস্যের সহিত বলিলেন,—"হরিচরণ ভয়ে পাগল হয়েছে; তুইও ক্ষেপলি দেখছি। জেনে থাকে জেনেছে; তার অত ভয় কি?"

সারদা বলিল,—"না বউ দিদি! একটু সাবধান থাকা ভাল। দিন নেই, রাত নেই, সকল সময়েই হরিচরণ বাবু যাওয়া আশা কচ্ছেন। আমরা আপনার লোক—সকল কথা ঢেকে রাখছি; কিন্তু সকলে তো সমান নয়? অনেকে একথা নিয়ে অনেক রঙ্গও কচ্ছে। কাজেই ক্রমে ঢাকে কাঠি পড়ছে তাই বল্‌ছি একটু সাবধান হওয়া ভাল।"

বিধুমুখী সরোষে জিজ্ঞাসিলেন,—"কি রকম সাবধান?"

সারদা বলিল,—"সাবধান আর কি, দিনে দুপুরে যখন তখন যাওয়া আসা না করে, হরিচরণ বাবু যদি একটু বেশী রাত্রে, সময় মত আসেন, তা হলেই দেখ্‌তে শুন্‌তে ভাল হয়, লোকও বড় টের পায় না; বড় গোলও হয় না।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"বিলক্ষণ! হরিচরণ সারাদিন আমার কাছে থাকিলেও বোধ হয় আমার আশা মিটে না; সে যে কাজ কর্ম্মের জন্য অনেক ক্ষণ কাছারিতে থাকে, আমি আর তা সহ্য কত্তে পারি না। 'এখনই আসব' বলে গিয়েছে। কিন্তু বড়ই দেরি কচ্ছে।"

সারদা বলিল,—"এই গিয়েছেন, আবার এখনই আসবেন? তিনি এখন দেওয়ান। বাবু আর কোন বিষয়ে কিছু দেখেন না, হরিচরণ বাবুর হাতেই সকল বিষয় কর্ম্মের

সকল ভার। তা তাঁকে বিষয়-কর্ম্ম দেখ্‌তে হবে তো!"

বিধুমুখী বলিলেন,—"বিষয়-কর্ম্মে ছাই পড়ুক। যদি আমার কাছে বসে কাছারীর কাজ কত্তে পারে, তবেইতো তার দেওয়ানী করা হবে, নইলে তার দেওয়ানী ঘুচিয়ে দিব।"

সারদা বলিল,—"বউ দিদি! বাড়াবাড়ি কর না। সবই বেশ চল্‌ছে। বলতে গেলে হরিচরণ বাবুই এখন বিষয় আশয়ের সর্ব্বময় কর্ত্তা। বাবু তোমাদের হাতের একটা কলের পুতুল; হরিচরণ বাবু তোমার পায়ের ছুঁচ; সুতরাং তুমিই সর্ব্বময়ী। এই সুখের অবস্থা যেন নষ্ট না হয়।"

বিধুমুখী বলিলেন,—হরিচরণকে পাইয়া আমার জীবনের শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হয়েছে, প্রাণে সুখের ফোয়ারা ছুটিয়াছে, আমোদে হৃদয় ভোর হয়েছে, জগতের কোন বিপদই এখন আমাকে এ আনন্দ হইতে নিরস্ত করিতে পারিবে না। কোন ভয়ে আমি পশ্চাৎপদ হইব না, কোন কথাই আমি কাণে শুনিব না। বিষয় আশয় সকলই আমাদের হাতে; হতভাগা বাবু প্রতিবাদী হইলে নিজেই কষ্ট পাইবে।"

সারদা বলিল—"তা এক রকম ঠিক কথা। তোমরা ইচ্ছা করিলে যে, বাবুর সর্ব্বনাশ করিতে পার, তাহার ভুল নাই। যাতে ভাল হয় তাই কর। আমরা তোমার ভাল দেখলেই সুখী। তা আমি এখন আসি বউ দিদি! আমার সেই তাবিজের কথা দয়া করে মনে রাখ্‌বেন।

বিধুমুখী বলিলেন,—তা মনে আছে। যাবার সময় কাছারীতে গিয়ে হরিচরণকে দর আসতে বলে যাস্‌।"

সারদা প্রস্থান করিল। বিধুমুখী অলসিত ভাবে সেই কোচে পড়িয়া রহিলেন।

এইরূপ সময়ে হরিচরণ তথায় আগমন করিল। হরিচরণের চুলের পারিপাট্য অনেক বাড়িয়াছে, পোষাক পরিচ্ছদ ভদ্রলোকের ন্যায় হইয়াছে, চেহারা একটু চক্‌চকে দেখাইতেছে; কিন্তু জ্ঞান, পবিত্রতা ও শিক্ষা প্রভাবে কুৎসিত আকৃতিও যেরূপ উজ্জলতা ধারণ করে, তাহার দেহের কোথাও তাহা হয় নাই। হরিচরণ বিষন্ন; যেন একটু উৎকণ্ঠিত। তাহাকে আসিতে দেখিয়াই বিধুমুখী উঠিয়া বসিলেন এবং কৃত্রিম রোষ সহকারে বলিলেন,—এই বুঝি তোমার এখনই আসা?"

হরিচরণ বলিলেন,—বেশী দেরী হইয়াছে কি? না। এইতো যাচ্ছি। তা যাই হউক, রকমটা বড় ভাল বোধ হচ্ছে না।

সাগ্রহে বিধুমুখী জিজ্ঞাসা করিলেন,—রকম?"

হরিচরণ বলিলেন,—বাবুর রকম আর কি! তিনি যেন সব বুঝতে পাচ্ছেন বলে বোধ হচ্ছে।"

বিধুমুখী বলিলেন,—পাল্লেই বা। সে আমাদের হাতে, না আমরা তার হাতে? চুপ করে সব সয়ে থাকতে পারে ভালই, না পারে তারই অমঙ্গল।"

হরিচরণ বলিলেন,—তা ঠিক। বিষয় আশয় এখন সব এক রকম আমাদেরই; কিন্তু তবুওতো তিনি মালিক। দরওয়ান লাঠিয়াল, লোক লস্কর সবই তাঁর হুকুমের তলে। তিনি একবার রেগে হুকুম করিলে গর্দ্দান বাঁচান ভার হইবে।

বিধুমুখী বলিলেন,—"তুমি তাহাদের হাত কত্তে পার না? টাকা কড়ি, বহাল বরতরপ,

মাইনা পত্র সকলই তোমার হাত। তুমি ইচ্ছা করলে অনায়াসেই সব লোক জনকে এমন বশ কত্তে পার যে, তোমার হুকুম পেলে তারা সকলে ঐ জাম্বুবান্ বাবুটার মাথা এনে তোমার পায়ে ফেলে দিতে পারে।"

হরিচরণ একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"তা পারা যায় না এমন নয়, কিন্তু তাতে হেঙ্গামা ঢের। তার চেয়ে একটা সোজা মতলব আমি ঠিক করেছি। তোমার হুকুম পেলেই তার উদ্যোগ করি।

বিধুমুখী বলিলেন, -"আমাদের সুখের পথ সোজা করবার জন্য যে মতলব করবে, তাতেই আমি খুব রাজি। বল কি মতলব!"

হরিচরণ বলিলেন,—"বিষয়-সম্পত্তি, তোমারই পরামর্শ মতে, অধিকাংশই বাকী খাজনার নীলাম ঘটাইয়া, আমি নিজ নামে বা তোমার নামে খরিদ করিয়া ফেলি। কতক কতক সম্পত্তি, টাকার অপ্রতুল বলে, বেনামি করে বন্ধক দিয়া ফেলি, নগদ টাকা কড়ি, দামি জিনিষ পত্র অনেকই সরাইয়া ফেলা যাউক। গয়না প্রভৃতি আর অন্দরের জিনিষপত্র সে সকল তো তোমারই হাতে আছে। তাহার পর আমরা যদি এখান থেকে সরে পড়ি, তা হলে মন্দ হয় না। তুমি কি বল?"

বিধুমুখী কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন,—মন্দ হয় না বটে; কিন্তু দরকার কি তাতে? আমাদের এখানে কোন সুখেরই ব্যাঘাত নাই। তবে কেন আমরা পাতান ঘরকন্না ছেড়ে দূরে যাই?"

হরিচরণ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"আমি তখনই জানি আমার বামন হয়ে চাঁদ ধরবার সাধ। তুমি রাজরাজেশ্বরী, আমার মত ক্ষুদ্র কীটকে তুমি যে ভাল বাসবে, এ কখনই সম্ভব নয়। হাজার হউক বাবু তোমার আপনার; সে টান কোথায় যাবে? কিন্তু ভাই এরূপ ভয়ে ভয়ে প্রাণ হাতে করে প্রেম করা আমার আর পোষাচ্ছে না। তাই ভাবছিলাম যে, দূরে গিয়ে দুজনে নিষ্কণ্টকে স্বামী স্ত্রীর মত সুখে থাকব। অভাগার সে সাধ পূরিবে কেন?

পুনরায় দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া হরিচরণ নীরব হইল। বিধুমুখীর মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি কাতর ভাবে হরিচরণের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,—হরিচরণ! প্রাণেশ্বর! তোমাকে আমি কত ভালবাসি তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারি না এক তিল তুমি কাছ ছাড়া হইলে আমার সংসার শূন্য বোধ হয়। তথাপি তুমি আমার ভালবাসায় সন্দেহ কর। এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কিছুই নাই। দিন রাত্রি নিষ্কণ্টকে তোমার কাছে থাকিব, তার অপেক্ষা বেশী সুখ আর কি হইতে পারে? তুমি এখনই তার ব্যবস্থা কর। তুমি যেখানে যেতে বলবে আমি ছায়ার মত সঙ্গে যাইব। আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করবার দরকার নাই। তুমি যা ভাল বুঝ কর।"

এক মুখ হাসি হাসিয়া, ঘৃণিত কুক্কুরাধম হরিচরণ সেই সুন্দরী পাপীয়সীকে আলিঙ্গন করিল। এ পাপ চিত্রের অন্যান্য অংশ প্রদর্শনে আমরা অক্ষম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মধুকর।

বাস্তবিক মূর্খ ও কাণ্ডজ্ঞানহীন হরিচরণ বিষয়-কর্ম্মের বিস্তর অব্যবস্থা করিয়া ফেলিয়াছে। এই বিপুল সম্পত্তির পরিচালনা করা কি তাহার স্থায় অযোগ্য ব্যক্তির সাধ্য? দুই এক জন বহুদর্শী কর্ম্মচারী, স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া, তাহাকে কর্ম্মের উপদেশ দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন: কেহ কেহ তাহাকে কোন্ মোকদ্দমার কিরূপ তদ্বির করা উচিত, কোন্ বিষয়ে কিরূপ হুকুম দেওয়া উচিত, কাহার সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করা উচিত ইত্যাদি বিষয়ের পরামর্শ দিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন; কিন্তু মূর্খ হরিচরণ সে সকল কথায় কর্ণপাত করে নাই। পরের পরামর্শ লইয়া কাজ করা, বিশেষতঃ অধীনস্থ লোকের মন্ত্রণা গ্রহণ করা, নিতান্ত মূর্খতা বোধে, সে কাহারও কোন কথাই শ্রবণ করে নাই। বাড়ার ভাগ তাহার সময়ও নিতান্ত অল্প। বিধুমুখীর নিকট সে দিবারাত্রি কাটায়, মদে সে অনেক সময় বেহুঁৰ হয়; সুতরাং কাজ-কর্ম্ম ভাল করিয়া দেখিয়া ও বুঝিয়া ক্রমে শিখিয়া লইবার সুযোগও তাহার হইল না। সে যাহা মনে আইসে তাহাতেই হুকুম দেয়, যে কাগজ পায় তাহাতেই সহি করে। মাতাল অবস্থায় কি করিতে কি করিয়া বইসে, তাহার ঠিক থাকে না; পূর্ব্বকৃত কার্য্যের বৃত্তান্ত পরে মনে পড়ে না।

অতি অল্পকালের মধ্যেই বিষয়-কর্ম্মের বড়ই বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া উঠিল। লাটের খাজনা যায় না, কর্ম্মচারিরা বেতন পায় না, হাতী ঘোড়া দানা পায় না, মফস্বলে গোমস্তা নায়েবের উপর রীতিমত তাগাদা হয় না, চারিদিকে বিভ্রাট বাধিয়া উঠিল। অনেক দেনা হইতে লাগিল, পত্তনী মহালের খাজনার জন্ম নালিশ হইতে থাকিল, চাকর বাকর কর্ম্মে অমনোযোগী হইয়া পড়িল, অনেক গোল উপস্থিত হইতে লাগিল।

একটা বিষয় হরিচরণ কিন্তু ঠিক চালাইতে লাগিল। শ্যামলাল বাবুর সুরা, রঙ্গরসের অন্যান্য উপকরণ, মোসাহেবের খরচ, হরিচরণ অব্যাঘাতে সুন্দররূপ যোগাইতে থাকিল। বরং প্রয়োজনের পূর্ব্বে, আবশ্যকের অনেক আগে, শ্যামলালের পদার্থপুঞ্জ সংগৃহীত ও সমানীত হইতে লাগিল।

চারি দিকে যাহাই হউক, শ্যামলাল কিন্তু হরিচরণের কার্য্য তৎপরতায় নিতান্ত সন্তুষ্ট। বৃদ্ধ হরকুমারের পরিবর্ত্তে, এই বুদ্ধিমান ও কর্ম্মজ্ঞান সম্পন্ন যোগ্যতর ব্যক্তি কর্ম্মভার গ্রহণ করার পর হইতে, শ্যামলাল সর্ব্বতোভাবে সুখী হইয়াছেন। হরিচরণ যাহা বলিয়াছিল, তাহা প্রায় সমাপিত করিয়াছে। সে নিত্য অনেক দুলে-বাগ্‌দির কন্যা নানা স্থান হইতে আনাইয়া শ্যামলালের নিকট হাজির করিতেছে!

বিধুমুখীর সহিত হরিচরণের ঘনিষ্ঠতার এক আধটু কথা শ্যামলাল শুনিয়াছিল সত্য; কিন্তু সে তাহা বিশ্বাস করে নাই। হরিচরণ তাহাকে বুঝাইয়াছে, বাবুর কাজ তাহার দ্বারা ভাল চলিতেছে এবং বাবু তাহার উপর বিশেষ দয়া করিয়া থাকেন, এই হিংসায় অনেকে তাহার শত্রু হওয়া সম্ভব এবং অনেকে বাবুর মন ভারি করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ ঘটাইবার নিমিত্ত নানা প্রকার মিথ্যা কুৎসা প্রচার করাও সম্ভব। আর বিষয়-কর্ম্ম রীতিমত চালাইতে

হইলে, অনেকেরই সহিত পদে পদে শত্রুতা ঘটে। সে সকল লোক নানা প্রকারে তাহাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিবেই করিবে। সুতরাং বাবুর কর্ণে তাহার সম্বন্ধে নিতান্ত ক্রোধজনক নিন্দার অনেক কথাই প্রবেশ করিবে। বাবু বুদ্ধিমানের চূড়ামণি; স্বার্থপর ধূর্ত্তেরা যে তাঁহার কাছে আপনাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া হরিচরণের সর্ব্বনাশ ঘটাইতে পারিবে, এ বিশ্বাস নাই। তবে তাহার অদৃষ্ট। শ্যামলাল এ সকল কথা বড়ই সঙ্গত বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং দৈবাৎ যে ব্যক্তি হরিচরণের বিপক্ষে কোন কথা বলিয়াছে, তাহাকেই দণ্ড দিয়াছেন। সুতরাং হরিচরণ নিষ্কণ্টক।

হরিচরণ নিরন্তর শ্যামলালের চারিদিকে আপনার মনোনীত ও পক্ষপাতী মোসাহেব লাগাইয়া রাখিয়াছে। তাহারা নিরন্তর হরিচরণের অসংখ্য গুণেরই কীর্ত্তন করে; দোষমাত্রই দেখিতে পায় না, বা দেখাইবার সুযোগও উপস্থিত হইতে দেয় না। সেই সুকৌশলী পারিষদগণ শ্যামলালকে সর্ব্বতোভাবে হরিচরণের গুণমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

একটা কাজ হরিচরণ এখনও করিয়া উঠিতে পারে নাই। সুহাসিনী যেখানেই থাকুক, সে ধরিয়া আনিবে বলিয়াছিল; কিন্তু এখনও তাহা ঘটে নাই। শ্যামলালের সর্ব্বদা সে কথা মনে পড়ে না; কখন মনে পড়িলে হরিচরণ শীঘ্রই বাসনা সিদ্ধ করিবে, সে কথা সর্ব্বদা তাহার মনে জাগিতেছে, ইত্যাদিরূপ আশ্বাস দিয়া শ্যামলালকে নিরস্ত করিয়া থাকে।

প্রভুর পরম বিশ্বাসভাজন, প্রভুপত্নীর হৃদয়বল্লভ হরিচরণ মধ্যাহ্ন কালে, বিধুমুখীর মহলে প্রবেশ করিলেন। বিধুমুখী তখন পর্য্যঙ্কের উপর শয়ন করিয়া গাঢ় প্রায় নিমগ্না। হরিচরণ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ না করাইয়া, ধীরে ধীরে, নিঃশব্দে, বারন্দায় আগমন করিল। সে তথায় দাঁড়াইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল,—"যে ব্যক্তি একবার সুহাসিনীকে দেখিয়াছে, সেই মরিয়াছে। মেয়ে মানুষ তো বলি তাকেই। তাহাকে হস্তগত করিতে পারি, তবেই জীবন সার্থক। সন্ধান করিয়াছি, লোক লাগাইয়াছি; কৌশলে কাজ শেষ করিতে হইবে। কোনই ত্রুটি হইবে না। দোষ সকলই শ্যামলালের ঘাড়ে চাপাইব। কিন্তু সে জিনিস হস্তগত হইলে, শ্যামলালকে কখনই দিব না। এখন বাসনা সিদ্ধ হইলে হয়।" কিয়ৎকাল পরে সে আবার বলিল,—"বিধুমুখী সুন্দরী বটে, কিন্তু আর ভাল লাগে না! হাতে থাকায় সর্ব্বপ্রকার সুবিধা আছে সন্দেহ নাই; সুতরাং হাতে রাখিতে হইবে। কিন্তু এমন করিয়া এক জনের গোলাম হইয়া থাকা, আমার অসাধ্য। ধন, পদ, ক্ষমতা সকলই এখন আমার যথেষ্ট। ইহার যদি ইচ্ছামত ভোগ না হইল, তবে সকলই বৃথা।"

হরিচরণ-পশু যখন এইরূপ চিন্তামগ্ন, তখন হাসিতে হাসিতে সারদা তথায় আসিয়া বলিল,—"একি দেওয়ানজি মহাশয় যে? এখানে একা দাঁড়াইয়া?"

দেওয়ানজি বলিলেন,—"সারদা, তোকে দেখিয় দেখিয়া আমি আর পারি না। তুই কি মানুষ খুন করিয়া ফাঁসি যাইবি?"

সারদা হাসির সহিত মিশাইয়া বলিল,—"আমরা গরিব দুঃখী চাকরাণী। বাবুর চক্ষু এদিকে আসে কেন? আমি বউ দিদিকে সব বলে দিব।"

হরিচরণ বলিলেন,—"তা যা হয় হবে। এখন তোর জ্বালায় কি বিবাগী হব ?"

সারদা বলিল,—"বালাই! সাধের পাতান হাট কে লুটে নেবে। তা গরিবকে এত ঠাট্টা কেন ? না হয় আমিই আর এদেশে থাকিব না।"

সারদা, এক কটাক্ষ শরে হরিচরণকে বিদ্ধ করিয়া চলিয়া গেল। হরিচরণও তাহার অনুসরণ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জাল।

সন্ধ্যার পর, শ্যামলাল বাবু, স্বকীয় সৌধের দক্ষিণপ্রবাহী বারান্দায় বসিয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখে কিঞ্চিৎ দূরে অন্যান্য চেয়ারে আরও দুই তিন জন পারিষদ বসিয়া, তাঁহার সেই বিকট দর্শন কলেবর কন্দর্প-কান্তির আরোপ করিতেছে, তাঁহার সেই কর্কশ কণ্ঠে কোকিল ঝঙ্কারের আবির্ভাব করাইতেছে, তাঁহার সেই কাণ্ডজ্ঞান-হীন মস্তিষ্কে শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধির সমাবেশ করাইতেছে, তাঁহার সেই হৃদয়হীন কার্য্যাবলীতে যুধিষ্ঠিরের ব্যবহার সন্দর্শন করিতেছে এবং তাঁহাকে সর্ব্ব প্রকারে আদর্শ পুরুষরূপে পরিকীর্ত্তিত করিতেছে। শ্যামলাল আনন্দের অট্টহাসি হাসিতেছেন এবং প্রীত মনে সেই চরিত্র-হীন স্তাবকগণের বাক্য-সুধা পান করিতে করিতে তাহাদিগকে বিচক্ষণগণের অগ্রগণ্য মনে করিয়া, আপনাকে পরম ভাগ্যবান্ বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন।

রামা এ ক্ষেত্রে উপস্থিত আছে এবং সোডাওয়াটার বিমিশ্রিত হুইস্কি ঘন ঘন সরবরাহ করিতেছে। সুরা স্বকীয় কার্য্য সাধনে আলস্যশূন্য। দেহ, মস্তিষ্ক, বাক্য সকলই তাহার প্রভাবে জড়তা পূর্ণ হইয়া আসিতেছে।

এইরূপ সময়ে মণি-কাঞ্চন সংযোগ সংঘটিত হইল ; কারণ শ্যামলাল বাবুর দেওয়ান হরিচরণ তথায় দর্শন দিলেন। শ্যামলাল তাঁহাকে দেখিবা মাত্র বলিয়া উঠিলেন,—"কাজের কোন কথা যদি বলিতে আসিয়া থাক, তাহা হইলে এখন তাহা থাকিতে দেও। এখন আমার সে সকল কিছু ভাবিবার সময় নাই। যদি কিঞ্চিৎ হুইস্কি সেবন করিয়া আমোদ করিতে চাও, তাহা হইলে আইস।"

একজন পারিষদ বলিয়া উঠিল, "হুজুরকে কার্য্যের জন্য যখন তখন ত্যক্ত করিবার কোনই দরকার নাই। আপনার ন্যায় উপযুক্ত লোকের হস্তে যখন তিনি সমস্ত ভার দিয়া রাখিয়াছেন, তখন সে জন্য বার বার হুজুরকে বিরক্ত করিবার প্রয়োজনই বা কি ?"

সাধু হরিচরণ বলিলেন,—"আমার প্রতি হুজুরের দয়ার সীমা নাই ; আমিও সাধ্যমত হুজুরের কাজে অবহেলা করি না। সরকারি কাজের জন্য, প্রাণ দিতে হইলেও আমি তাতেও প্রস্তুত। তবে কি জান, হাজার হউক আমি চাকর। কোন কোন বিষয়ে বাবুর পরামর্শ লওয়া আমার পক্ষে নিতান্তই দরকার হইয়া পড়ে। সেই জন্যই সময়ে সময়ে বাবুকে ত্যক্ত না করিলে চলে না।"

আর একজন পারিষদ কহিল,—"তাতো বটেই। হুজুরের যেরূপ সূক্ষ্ম বুদ্ধি, এরূপ আর দ্বিতীয় নাই ; সুতরাং গোলমালের ব্যাপার উপস্থিত হইলে, হাজার উপযুক্ত লোক হই-

সেও দেওয়ানজিকে হুজুরের সহিত পরামর্শ করিতে হয়।"

উভয় প্রকার বাদানুবাদ শ্রবণ করিয়া শ্যামলাল আনন্দিত হইলেন। বলিলেন,—"এখন তুমি কি জানিতে চাহ বল। বেশীক্ষণ বিষয়-কর্ম্ম ভাবিবার আমার সময় নাই, একথা আমি আগেই বলিয়া রাখিতেছি।"

হরিচরণ বলিলেন,—"বড় কঠিন বিষয়ে হুজুরের পরামর্শ লইতে আসিয়াছি। সংবাদ বড় মন্দ; হাইকোর্টের আপিলে সোণার চরের মোকর্দ্দমায় আমাদের হারি হইয়াছে। সুদে, ওয়াসিলাতে, দাবীতে এবং খরচায় আমরা প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার দায়ী হইয়া পড়িয়াছি।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"কুছ পরওয়া নাই; ফের আপিল কর।"

হরিচরণ বলিলেন,—"তাঁহার উপায় নাই। আমি উকিলদের সহিত পরামর্শে জানিয়াছি, এ মোকর্দ্দমা বিলাত আপীল চলিবে না।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"তা হইলে ডাকাহত লাগাইয়া বাদী বেটাদের খুন করিয়া ফেল।"

হরিচরণ বলিলেন,—"তাতেই বা উপকার কি? দুই চারি জনকে খুন করিলেও তো সব শেষ হইবে না। যে কেহ উত্তরাধিকারী খাড়া হইবে, সেই ডিগ্রিজারি করিয়া সব টাকা আদায় করিবে।"

শ্যামলাল বলিলেন—"তখন দেখা যাইবে।"

হরিচরণ বলিলেন,—"আমার কিন্তু ইচ্ছা বেটাদের কখন কিছু না দেওয়া। বেটারা যাহাতে কোন মতেই এক পয়সাও না পায় তাহাই আমার মতলব।"

শ্যামলাল সমুৎসাহে বলিলেন,—"বটে! এমন কোন উপায় হইতে পারে কি? তাহা হইলে তো বড় ভাল হয়। এ মতলবে আমাকে যাহা করিতে বলিবে; আমি তাহাতেই রাজি আছি।"

হরিচরণ বলিলেন,—"মতলব যে নাই, এমন নহে। তবে হুজুরের বুদ্ধির কাছে কেহই কক্ষে পান না। হুজুর যদি বুঝিয়া শুনিয়া সে মন্ত্রণা ভাল বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে করা যাইতে পারে।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"বল দেখি, কি তোমার পরামর্শ।"

হরিচরণ বলিলেন,—"আর কিছুই নয়, সমস্ত বিষয়টা এই সময়ে বেনামী করিয়া রাখা। তাহা হইলে ডিগ্রিদার একদম ফাঁকে পড়িলেন।"

একজন পারিষদ বলিল,—"সাবাস্ সাবাস্! আচ্ছা মতলব এঁটেছ।"

আর একজন বলিল,—"যেমন রাজা তাঁর তেমনই মন্ত্রী, নহিলে কি রাজ্য চলে দাদা?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"মন্ত্রণাটা করেছ মন্দ নয় কিন্তু কার নামেই বা বেনামী করা যায়?"

হরিচরণ বলিলেন,—"কেন? আপনার স্ত্রী। এতে কোন দিকেই কোন গোল হওয়ার সম্ভাবনা নাই। আপনার ধনে তাঁর অধিকার, তাঁর ধনেও আপনার অধিকার। লোকেও কোন কথা বলতে পারবে না। স্ত্রীর হাতে স্বামির ধন থাকাই সুব্যবস্থা। তাতে ঘরের বিষয় ঘরেই থাকল, অথচ ডিগ্রিদার বেটাদের সকল আশায় ছাই পড়্ল।"

একজন পারিষদ বলিল,—মন্ত্রণা যাকে বল্‌তে হয় স্ত্রীর নামে বিষয় হলে, সম্পূর্ণরূপে স্বামিরই থাক্‌ল। স্বামী কর্ত্তা, মালিক; তাঁর উপর স্ত্রীর কোন জোর খাটবে না। স্বামীর যা ইচ্ছা তাই হবে; মাঝামাঝি বিষয়টা পাকা

হয়ে থাকুন। কেহ কখন আর কোন প্রকারে অনিষ্ট কর্ত্তে পারবে না।”

হরিচরণ বলিলেন,—“এই ডিগ্রিটা বলেই যে কেবল কথা এমনও নহে তো। বিষয়ী লোকের পাঁচটা ঝঞ্ঝাট পাঁচ সময়ে জুটেও থাকে, জুটতেও পারে। এই এক চাউল চেলে রাখলে সকল দায় থেকেই নিশ্চিন্ত।”

একজন পারিষদ বলিল,—“ঠিক্ ঠিক্! খুব মতলব দওয়ানজি মহাশয়।”

শ্যামলাল বলিলেন,—“তা কথাটা বলেছ মন্দ নয়। কিন্তু আমার স্ত্রী এ বিষয়ে রাজি হবে তো?”

হরিচরণ বলিলেন,—“কেন হবেন না? এতে তাঁর তো কোনই ক্ষতি নাই। বরং হুজুরের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে এ উপলক্ষে দেখা সাক্ষাৎ কথাবার্ত্তা হবে; এও তাঁর একটা প্রকাণ্ড লাভ।”

একজন পারিষদ বলিলেন,—“গিন্নি ঠাকরুণ যেরূপ সতীসাবিত্রী তাতে স্বামীর বিষয় কর্ম্মে মিশলে এক এক বার স্বামীর চরণ দেখ্‌তে পাবেন, এও তাঁর কম সৌভাগ্য নয়।”

শ্যামলাল বলিলেন,—“কিন্তু দেখো ভাই, পুনঃপুনঃ গিন্নির সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়ে, শেষটা আমার আমোদ আহ্লাদের পথটা যেন বন্ধ না হয়।”

হরিচরণ বলিলেন,—“রাধাকৃষ্ণ! তা কেন হবে? তা বন্ধ করতে তাঁর এক্তার কি?”

একজন পারিষদ বলিলেন,—“হুজুর রসের সাগর, রসিকের চূড়ামণি। এরূপ গুণবান্ স্বামীর পত্নী হওয়া অনেক পুণ্য-সাপেক্ষ। গিন্নি মা ঠাকরুণ হুজুরের নানা ফুলে ভ্রমণ কখনই বন্ধ করিতে পারবেন না, করবেনও না।”

শ্যামলাল বলিলেন,—“তবে তো দেখছি, তার সঙ্গে আলাপ করতে হবে। শুনেছি যে নাকি সুন্দরী। তা হউক, তা বলে যেন তোমরা দশজনে মিলে আমাকে শেষে ঘরের কোণে বেঁধে দিও না।”

একজন পারিষদ বলিল,—“তা আমরা কখনই হতে দিব না। আরে ছিঃ! সে রকম কুণো বেঙ হওয়া কি হুজুরের মত লোকের শোভা পায়!”

শ্যামলাল বলিলেন,—“তবে যা হয় কর হরিচরণ; এর জন্য আর আমাকে জিজ্ঞাসা কেন? যা ভাল হয় করবে—বলা কওয়ার কোন অপেক্ষা নাই। এখন যাও, তোমার কাজ দেখগে—আমাদের একটু আয়েশ করতে দেও।”

যে “আজ্ঞা” বলিয়া হরিচরণ প্রস্থান করিল।

পরদিন প্রাতে, রীতিমত ষ্ট্যাম্পের উপর লিখিত এক দলিল আনিয়া, হরিচরণ উল্লিখিত পারিষদগণের সমক্ষে, শ্যামলাল বাবুর সহি করাইয়া লইল। পারিষদগণ তাহাতে সাক্ষীরূপে স্বাক্ষর করিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই দলিল রেজিষ্টারি হইয়া গেল। শ্যামলাল বাবুর প্রভৃত সম্পত্তি অতঃপর তাঁহার পত্নীর হইল।

ষষ্ঠ খণ্ড—ক্রমোৎকর্ষ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পাথার।

বিলাসপুরের প্রায় তিন ক্রোশ দক্ষিণে চণ্ডীতলা গণ্ডগ্রাম। গ্রামখানি নিতান্ত সামান্য,

মোটে পঁচিশ ত্রিশ ঘর লোকের বাস। দুই ঘর ব্রাহ্মণ, অবশিষ্ট গৃহস্থেরা নানা জাতিতে বিভক্ত। সকলেরই কৃষিকার্য্য প্রধান অবলম্বন এবং দুই একটী ধানের গোলা ও গোশালা প্রভৃতি গৃহেই বর্ত্তমান। গ্রামে এক খানিও পাকা বাড়ী নাই; সকলই খড়ের ঘর; কিন্তু বড়ই পরিচ্ছন্ন। প্রত্যেকেরই প্রশস্ত অঙ্গন অতীব পরিষ্কার ভাবে সংরক্ষিত। গৃহস্থগণের বাসভবন পরস্পর ঘেঁসাঘেঁসি নয়।

এই গ্রামের এক পার্শ্বে রামহরি কৈবর্ত্তের বাস। রামহরির তিনখানি খড়ের ঘর, একটু বাগান, দুইটী গোলা, দুইখানি লাঙ্গল, পাঁচটী বলদ এবং দুগ্ধবতী গাভী আছে। তাহার ক্ষেত সকল বাটী হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নহে। সে প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়াই লাঙ্গল গরু লইয়া ক্ষেতে যায়; বেলা দুই-তিনটার সময় ফিরিয়া আসিয়া স্নানাহার করে। আবশ্যক থাকিলে, আবার ক্ষেতে গিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাটাইয়া আইসে, নচেৎ বাটিতে থাকিয়া বাগানের বেড়া বাঁধে, পাটের দড়ি কাটে, ইত্যাকার গৃহ-কর্ম্ম লইয়া ব্যাপৃত থাকে।

রামহরির বাসবাটীর প্রান্তবর্ত্তী একখানি ঘর হইতে, বেলা দ্বিপ্রহর কালে, এক সুন্দরী কামিনী নির্গত হইলেন এবং অঙ্গনের এক পার্শ্বে আসিয়া হস্ত-মুখাদি প্রক্ষালন করিতে লাগিলেন। অপর একখানি ঘর হইতে আর এক নারী, একবাটী দুধ লইয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিল এবং সুন্দরীকে মুখ-প্রক্ষালনে নিযুক্ত দেখিয়া বলিল,—"কি আক্কেল তোমার গঙ্গা ঠাকরুণ। আমি তোমার জন্তে দুধ আনতে গিয়েছি, এরি মধ্যে উঠে পড়েছ?"

গঙ্গা ঠাকরুণ মুখ ধৌত করিয়া বলিলেন, —"এ জন্মে দুধই চাও, আর জলই চাও, সকলই সমান কথা। তা কেন ভাই যমুনা! দুধটুকু নষ্ট করবে?"

বলাবাহুল্য এই দুই রমণী আমাদের পূর্ব্বপরিচিতা সুহাসিনী ও দাসী। প্রথম সাক্ষাতের দিন হইতেই ইহারা গঙ্গা-যমুনা সম্বন্ধ করিয়াছেন এবং তদবধি এ পর্য্যন্ত প-স্পর পরস্পরকে সেই সম্ভাষণই করিয়া আসিতেছেন। কৈবর্ত্ত-কামিনী দাসী, ব্রাহ্মণ-নন্দিনী সুহাসিনীকে স্বকীয় আবাসে আনয়ন করিয়া, বড়ই যত্নে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। সুহাসিনীর জন্য স্বতন্ত্র ঘর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। সুহাসিনী তথায় স্ব-হস্তে পাক করিয়া আহার করেন; দাসী সমস্ত আয়োজন করিয়া দেয় এবং সহোদরার ন্যায় যত্নে তাহাকে সুখী করিবার চেষ্টা করে। দাসী রাত্রিতে সুহাসিনীর গৃহে শয়ন করে এবং তাহাকে বিনোদিত করিবার জন্য সাধ্য-মত চেষ্টা করে। দাসীর স্বামী রামহরি কৈবর্ত্ত কদাপি লজ্জাশীলা সুহাসিনীর ঘরের দিকেও আইসে না। প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায়, দূর হইতে উচ্চ শব্দ করিয়া, সুহাসিনীকে প্রণাম করে এবং সুহাসিনীর প্রয়োজনে, আপনার শতকর্ম্ম ক্ষতি করিয়াও, সময় ও অর্থ ব্যয়িত করে। সুহাসিনী দৈবাৎ কোন কঠোর গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন করিতেছেন বুঝিতে পারিলে রামহরি আপনার স্ত্রীকে অনুযোগ করে এবং সেই ব্রাহ্মণকন্যার পদধূলি প্রাপ্তি হেতু আপনাদিগকে ধন্য ও চরিতার্থ বলিয়া জ্ঞান করে।

যদি চিত্ত-প্রসন্নতার কোনই সম্ভাবনা থাকিত তাহা হইলে, সুহাসিনী তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থায় অবশ্যই প্রসন্না হইতেন। কিন্তু হায়! যাহার গৃহে ফিরিবার আশা নাই, পতি-পদ সেবার সম্ভাবনা নাই, সমাজে স্থান

পাইবার উপায় নাই, লোকাপবাদের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের পন্থা নাই, তাহার জীবনে আর আছে কি? নিরপরাধা হইলেও সুহাসিনী অপরাধা, নিষ্পাপা হইলেও পাপীয়সী, পুণ্যময়ী হইলেও অপবিত্রা, সতীত্বস্বরূপা হইলেও কুলটা। কি ভয়ানক! কি বিসদৃশ অবস্থা! তাই সুহাসিনীর অধর-প্রান্ত হইতে সেই ভুবনমোহন হাসি শুকাইয়া গিয়াছে, সেই কোমলতাময় বদনে চিন্তার কালিমা পড়িয়াছে, সেই লাবণ্যোজ্জ্বল কলেবর বিশুষ্ক হইয়াছে।

সুহাসিনীর প্রকৃত অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া, রামহরি স্বয়ং সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকটে গমন করিয়াছিল, এবং সমস্ত কথা তাঁহাকে নিবেদন করিয়া পুত্র-বধূর বিহিত ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিয়াছিল। নিরীহ সমাজ-ভীত সার্ব্বভৌম, পুত্র-বধূকে নিরপরাধা বলিয়া স্বীকার করিতে সাহস করেন নাই এবং তাঁহার সম্বন্ধে কোন বিহিত উপায়ও অবধারণ করিতে পারেন নাই। তিনি বুঝিয়াছেন, হইতে পারে সুহাসিনী নিরপরাধা সতী; হইতে পারে শ্যামলালের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিবার বাসনায়, গদার সাহায্যে, সুহাসিনী স্থানান্তরে পলায়ন করিয়াছেন। কিন্তু বস্তুতঃ শ্যামলালের আক্রমণ, অথবা গদার সহিত পলায়ন এতদুভয়ই লোকতঃ তুল্য। এই পলায়ন-ব্যাপার প্রচার করিলে, শত্রু-মিত্র কেহই তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে না; কেবল অধিকতর অপবাদ ঘটিবে। এইরূপ অনেক যুক্তির বশবর্ত্তী হইয়া, সার্ব্বভৌম, পুত্র-বধূর পুনর্গ্রহণ সম্বন্ধে কিছুই অবধারণ করিতে পারেন নাই এবং তদ্বিষয়ে কোনই আশ্বাস-বাক্যও বলিতে পারেন নাই।

রামহরি প্রত্যাবৃত্ত হইয়া এই সকল সংবাদ সুহাসিনীর গো' র করিয়াছে এবং ইহাও বলিয়াছে যে, এখনও সে হতাশ হয় নাই! অদ্য আব'র এক নূতন কল্পনায় অতি প্রত্যূষে সে গৃহত্যাগ করিয়াছে।

সুহাসিনীর আহারের আয়োজন হইয়াছে দেখিয়া, দাসী দুধ আনিতে গিয়াছিল। সুহাসিনী নাম মাত্র আহার করেন; সুতরাং বসিতে বসিতেই ভোজন সমাপ্তি হইয়া গেল। দুধের বাটী হাতেই রহিল দাসীর।

এস্থলে সুন্দরী পাঠিকা-কুল ও কবিতা-গত-প্রাণ পাঠকগণ বড়ই বিরক্ত হইয়া, এই গ্রন্থকে কু-বাক্য বিবেচনায় দূরে নিক্ষেপ করিতে পারেন। তাঁহারা বলিতে পারেন যে, সুহাসিনীর ন্যায় কুন্দ-কলিকা কাব্য-নায়িকার অন্ন-ব্যঞ্জন স্বহস্তে পাক করিয়া, বদন-ব্যাদান পূর্ব্বক দন্তে দন্তে চর্ব্বণ করিতে করিতে, তৎসমস্ত পদার্থ উদরস্থ করণরূপ বীভৎস ব্যাপার নিরতিশয় ঘৃণাজনক, ধিক্কারজনক এবং গ্রন্থকারের একান্ত কু-রুচির পরিচায়ক। সুহাসিনীর আহার! অহো! কি ঘৃণিত! কি নিন্দনীয় কল্পনা! যাহার এত রূপ, এমন মধুর হাসি, এমন কোমলতা, সে আবার পাক করে! শুধু পাক করে না, পাক করিয়া আবার খায়! ছিঃ! ছিঃ!! ভোজন ব্যাপারটাই একটা বীভৎস কাণ্ড। সুহাসিনীর ন্যায় কোমল-প্রাণা কামিনীর উপর সেই বীভৎস কাণ্ডের আরোপ নিরতিশয় হৃদয়হীন ব্যবহার। সুহাসিনীর না খাইয়াই বাঁচিয়া থাকা সম্পূর্ণরূপ সুসঙ্গত ও কবি-কল্পনায় অনুমোদিত। আরও অনেক কাব্য, উপন্যাস আছে! বল দেখি কোথায় কোন্ নায়িকা ভোজন করিয়াছে? কাব্যে কোমলপ্রাণা নায়িকার ভোজন করিতে নাই। তিনি আদৌ আহার না করিয়া স্বচ্ছন্দরূপে প্রেমালাপ, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ, প্রেমিকার চিন্তা, উদ্যান-বিহার

সরসী জলে সন্তরণ, উপন্যাস পাঠ, স্বপ্ন-দর্শন, রোদন সকলই করিতে পারেন ; আবশ্যক হইলে অশ্বারোহণ বা অসিধারণ করিয়া দেশোদ্ধার করিলেও করিতে পারেন ; কিন্তু কুত্রাপি আহারের কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই। তবে যদি নিতান্তই নায়িকাকে কিছু না কিছু আহার করাইতেই হয় ; তাহা হইলে একটু একটু মধুর মধুর মলয় মারুত মাখান পূর্ণিমার চাঁদের জ্যোৎস্না দেওয়া যাইতে পারে ; অথবা মল্লিকা ফুলের গন্ধে ভাজিয়া, বসন্ত কোকিলের একটু পঞ্চম তান আহারের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে ; অথবা প্রাতঃ-সূর্য্যের মধুর আলোক-সিক্ত দূরাগত বংশী-ধ্বনি ভোজন করিতে দেওয়াতেও হানি নাই। কিন্তু অন্ন ব্যঞ্জন —আবার দুধ—নায়িকাকে আহার করিতে ! রাধা কৃষ্ণ !

বাস্তবিক কবি-জনোচিত ব্যবহার পরিভ্রষ্ট হইয়া আমরা অপরাধী হইয়াছি সত্য ; কিন্তু যাহা ঘটিয়া গিয়াছে তাহার আর হাত নাই।

সুহাসিনী আপনার ঘরে প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দাসী দুধের বাটী লইয়া তাঁহার অনুসরণ করিল এবং বলিল,—"এখন এই দুধটুকু খাও দেখি দিদি !"

গঙ্গা বলিলেন,—"যাহা খাইয়াছি,তাহারই দাম নাই। আবার দুধ কেন ? এই টুকু যমুনার জলে ঢেলে দেও।"

যমুনা বলিলেন,—"যমুনার কালো জলে সাদা দুধ মিশ খাবে না ; গঙ্গায় ঢাল দিদি, দুধে দুধ মিশবে ভাল।"

গঙ্গা বলিলেন,—"এ কলিকালের গঙ্গায় কিছুই মিশে না বহিন্। মিশ খাওয়া জিনিষও তফাত হয়ে যায়, নূতন জিনিষের তো কথাই নাই।"

যমুনা বলিলেন,—"যে মিশিয়াছে সে আপনাকে হারিয়েছে। সে কি আর আলাহিদা হয় বহিন্ ?"

গঙ্গা বলিলেন,—"তবে আমার প্রাণের মেশা সামগ্রীকে পাই না কেন ?"

যমুনা বলিলেন,—"কোথায় পাও না ? প্রাণে, না বাহিরে ?"

গঙ্গা বলিলেন,—"বাহিরে।"

যমুনা বলিলেন—"প্রাণে পাও ত ?"

গঙ্গা বলিলেন,—"সর্ব্বদা।"

যমুনা বলিলেন,—"তবে তো তুমি রাজ-রাজেশ্বরী ! কাজ কি ছার বাহির খুঁজিয়া। এখন এই দুধটুকু খাও দেখি সোণামণি !"

অগত্যা সুহাসিনী, দাসীর হস্ত হইতে দুধের বাটী লইয়া, ধীরে ধীরে পান করিতে লাগিলেন।

আরে ছ্যাঃ ! ছুড়ীটার কোন কাণ্ডজ্ঞান নাই ! অনায়াসে ঢক্ ঢক্ করিয়া এক খোরা দুধ গিল্‌লে গা !

দাসী, সুহাসিনীকে উঠিতে না দিয়া, তাঁহার ভোজনাবশেষ সমস্ত তুলিয়া লইয়া, স্থানটী গোময়াদি সহযোগে পরিষ্কার করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"রামে রাম—রাম, রামে রাম—রাম, রামে রাম—দুই, দুইয়ে রাম—দুই, দুইয়ে রাম—তিন, দুইয়েরাম—তিন, তিনে, রাম—চারি "ইত্যাদি ক্রমে রামহরি ধান মাপিতেছে। তাহার সুবিস্তৃত অঙ্গনের একদেশে স্তূপাকার ধানঢালা রহিয়াছে ; রামহরি তাহা গোলাজাত করিবার পূর্ব্বে মাপ করিয়া দেখিতেছে।

রামহরি লোকটা বড় লম্বা চওড়া নহে। কৃষ্ণকায়—বলিষ্ঠ গঠন—দেহটি নাতিস্থূল, নাতি কৃশ। বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ। দেহের বর্ণ ঘনকৃষ্ণ। মাথার চুলগুলি ছোট করিয়া কাটা, ওষ্ঠের উপর প্রকাণ্ড একযোড়া গোঁপ, দাড়ি কামান। তাহার পরিধান বস্ত্র জানু প্রদেশ ছাড়াইয়া নামে না, মাথায় একখানা গামছা জড়ান।

রামহরি চাষা বিপুল পরিশ্রম সহকারে সেই রাশীকৃত ধান্য মাপিয়া ফেলিল এবং তদধিক পরিশ্রম সহকারে তাহা ধামায় করিয়া গোলায় তুলিল। তাহার পর মাথার গামছা খুলিয়া দেহের ধুলা ঝাড়িল এবং ঘরের দাবায় উঠিয়া চক্‌মকি ঠুকিয়া কয়লা ধরাইল এবং তামাক সাজিয়া তদ্গতচিত্তে ভড়র ভড়র শব্দে ধূমপান করিতে লাগিল।

রামহরি চাষা; সে নাড়া চাড়া করে ধান। এরূপ লোকের ও এরূপ ব্যবসায়ের প্রসঙ্গ-বর্ণন করিতে গ্রন্থের স্থান ব্যয় করা উচিত কি না ইহা বাস্তবিক বিবেচ্য বিষয়। প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে—রামহরি উলঙ্গ, তাহার পরিধান বস্ত্র নিতান্ত সঙ্কীর্ণ, গায়ে জামা নাই, পায়ে জুতা নাই; এরূপ লোককে উলঙ্গ ভিন্ন আর ক বলা যাইতে পারে? তারপর সে ব্যক্তি কৃষিজীবী অর্থাৎ চাষা। সুতরাং স্বহস্তে লাঙ্গল ঠেলে, বলীবর্দ্দের পুচ্ছ-মর্দ্দন করে, কঠোর শারীরিক পরিশ্রম সম্পাদন করে এবং শীত-বাতাতপ সহ্য করে; অতএব ছোটলোক। তারপর সে ব্যক্তি অসভ্য; কারণ সে উলঙ্গ; অপিচ সে পরোপকারী। অধিকন্তু সে আত্মসুখে অমনোযোগী। তারপর সে মূর্খ,— সে ইংরাজী জানে না, খবরের কাগজ পড়ে না, ঔপন্যাসিক প্রণয়ের ধার ধারে না, বক্তৃতা করিতে বা শুনিতেও জানে না। বাস্তবিক রূপ অধম জনের বিষয় গ্রন্থের বর্ণনীয় না হওয়াই উচিত। তাহাও যাহা হউক, সঙ্গে আবার ধানের কথা। ধান যদিও, রূপান্তরিত হইয়া ভদ্রলোকের উদরস্থ হয় বটে, কিন্তু তাহার জন্মপ্রণালী কখনই ভদ্রের জ্ঞাতব্য নহে। শুনা যায় ধান্য-লতিকা ভূ-পৃষ্ঠ বিদার করিয়া উত্থিত হয় এবং সেই লতিকা হইতে যে ফল জন্মে, তাহাই রূপান্তরিত হইয়া তণ্ডুলাকারে পরিণত হয়। সেই তণ্ডুল ভারতবর্ষের প্রধান ভক্ষ্য সামগ্রী। কিন্তু তাই বলিয়া ধান্যের প্রসঙ্গ ভদ্রলোকের আলোচনা করিবার কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না। জগদীশ্বর তাহা ভাবিবার জন্য, কৃষক নামক নিকৃষ্ট শ্রেণীর এক প্রকার জীব সৃষ্টি করিয়াছেন; এ কার্য্যে তাহারাই নিযুক্ত আছে। সুতরাং রামহরি বা তাহার অবলম্বিত ধান্যের প্রসঙ্গ গ্রন্থ-মধ্যে এরূপভাবে আলোচিত হওয়া কখনই উচিত নহে। এ স্থলে কেহ কেহ এরূপ আপত্তি করিতে পারেন যে, ধান্য বা কৃষক নিতান্ত ঘৃণিত পদার্থ বোধে উপেক্ষিত হইবার যোগ্য নহে। কেন না যদি কোন বৎসর কৃষকের চেষ্টা নিষ্ফল হয় এবং ধান্য না জন্মে, তাহা হইলে অন্নাভাবে দেশে হাহাকার উত্থিত হয় এবং অনেকেই যমালয়ে গমন করে। কংগ্রেসের অনেক চেষ্টাই ক্রমাগত নিষ্ফল হইতেছে, তাহাতে দেশের বিশেষ কোন সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে বলিয়া বোধ হয় না। সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড বিফল-প্রযত্ন হইয়া একদিনে উঠিয়া গেলেও ভারতের বিশেষ অসুবিধা হইবে এরূপ অনুমান হয় না। যাহা যাহা হিতানুষ্ঠান ও শুভানুষ্ঠান বলিয়া পরিগণিত তাহার ভূরি ভাগই বিফল। সেই সকল

অনুষ্ঠান যদি উঠিয়া যায়, তাহা হইলে কাল্পনিক ক্ষতি ভিন্ন, প্রকৃত কোন ক্ষতিই উপলব্ধি হয় না। কিন্তু কৃষকের যত্ন, উদ্যম, অধ্যবসায় সহিষ্ণুতা যদি ফল-প্রসূ না হয়, তাহা হইলে দেশের প্রত্যক্ষ ও পরিদৃশ্যমান দুর্দ্দশার সীমা থাকে না; নিদারুণ দুর্ভিক্ষ বদন-ব্যাদান করিয়া সকলকেই গ্রাস করিতে আইসে; হাহাকার রবে দিঙ্‌মণ্ডল পরিপূরিত হয়; এবং যমদূতেরা রাশি রাশি মানবকে গ্রহণ করিয়া পলায়ন করে। অতএব ধান্য ও কৃষক উপেক্ষার বিষয় নহে। এই আপত্তির উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, দুর্ভিক্ষ হয় বলিয়া ইতর ব্যবসায় ও অসভ্য কৃষককে আমরা কখনও সম্মানের চক্ষে দর্শন করিতে বাধ্য নহি। সত্য বটে দুর্ভিক্ষ হইলে দেশ হিতৈষিতার অনুরোধে আমরা চীৎকার ধ্বনিতে বসুন্ধরা বিদারিত করিয়া থাকি, কিন্তু সে দেশ হিতৈষিতা আমাদিগের মুখের কথা মাত্র, প্রাণে সে পাপপ্রবৃত্তির অঙ্ক মাত্রও আমরা প্রলিপ্ত হইতে দিই না। গবর্ণমেণ্ট স্বার্থানুরোধে সে জন্য ব্যাকুল হন এবং নানা উপায়ে তাহার প্রতিকার করিবার প্রযত্ন করিয়াও থাকেন বটে, কিন্তু আমরা যে সে জন্য চীৎকার করি, সে কেবল কিঞ্চিৎ সম্মানের আশায়। আমরা সেজন্য দুচারি টাকা খরচ করি বটে, সে কেবল গবর্ণমেন্ট প্রদত্ত টাইটেলের লোভে। একপক্ষে বিবেচনা করিতে গেলে দুর্ভিক্ষ অনেকেরই সম্মানলাভ, উপাধিপ্রাপ্তি, নাম জাহির করা ও রাজ-পুরুষগণের সহিত মেশা-মেশির একটা প্রকৃষ্ট উপায়। সুতরাং এই হিসাবে দুর্ভিক্ষ বড় অমঙ্গলজনকও নহে। অতএব ধান্য ও ধান্য উৎপাদক কৃষক উভয়কেই ভারত উদ্ধারের শত্রু বলিয়া জ্ঞান করা যাইতে পারে। তাহারা যদি যত্ন করিয়া ধান্য উৎপাদন না করে, তাহা-হইলে নিরন্তর দেশহিতৈষী মহাত্মগণের সমক্ষে উল্লিখিতরূপ শুভ সুযোগ সমূহ উপস্থিত হয়। সুতরাং এরূপ নিন্দিত প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া গ্রন্থকলেবর বর্দ্ধিত না করাই বিধেয়। কথাটা যে সম্পূর্ণরূপ সত্য তাহার আর কোনই ভুল নাই। কিন্তু আমাদের কপাল মন্দ, তাই, পেটের দায়ে উপন্যাস লিখিতে হয়। উপন্যাস লিখিতে হইলে ছোট বড় সকলই লাগে। কাজেই এই অপরিহার্য্য অপরাধ।

রামহরি বিহিত বিধানে অনন্য মনে তামাকু সেবন করিল; ঠোঁটের পাশ দিয়া খোঁফের পাশ দিয়া, নাক মুখের ছিদ্র দিয়া অনেক ধূম সে ত্যাগ করিল। পটমধ্যস্থ চিত্রিত মেঘের ন্যায় চারিদিক দিয়া রাশি রাশি তাল বাঁধা ধূম শূন্য-পথে ভাসিতে ভাসিতে মিশিতে লাগিল। ক্রমে ধূমের মাত্রা কমিয়া আসিল; তখন রামহরি বুঝিল যে, তামাকুর পরমায়ু শেষ হইয়াছে। সে অগত্যা হুঁকা রাখিয়া দিল।

এইরূপ সময়ে দাসী তাহার নিকটস্থ হইয়া বলিল,—কালি হইতে তোমাকে গোঁফ কামাইয়া, সাড়ী পড়িয়া, বাড়ীর সব কাজ করিতে হইবে, আর বাহিরের যত কাজ সে সব আমি করিব।

রামহরি বলিল,—"আমার মত ছোট কাপড় পড়িয়া, খালি গায়ে, মাথায় গামছা জড়াইয়া, পুরুষ সাজিতে হইবে কিন্তু!"

দাসী বলিল,—"ছিঃ! তা কেন?"

রামহরি বলিল,—"তবে আমি বা মেয়ে সাজিব কেন? আর সাজিই যদি, তাহা হইলে তোমার গঙ্গা ঠাকুরাণী, আমাকে যমুনা ভাবিয়া কখনই কাছে ঘেসিতে দিবেন না।

সুতরাং ব্রাহ্মণকন্যার শতেক জ্বালার উপর, আবার ঘরের কাজকর্ম্ম পর্য্যন্ত নিজের করিতে হইবে।”

দাসী বলিল,—“এই ব্রাহ্মণ-কন্যার কষ্ট ভাবিয়াই তো তোমাকে মেয়ে সাজাতে চাহি। কয় দিন খোঁজ করিয়া গদা চাঁড়ালের সন্ধান করিতে পারিলে না, তবে তুমি কিসের পুরুষ?”

রামহরি বলিল,—“আজ সন্ধ্যার মধ্যেও যদি গদা না আসে, তাহা হইলে তিন দিন তুমি আমার সঙ্গে আর কথা কহিও না।”

দাসী হাসিয়া বলিল,—“তবে তো তোমার বড়ই ক্ষতি!”

রামহরি বলিল,—“তবে না হয় আমিই কথা কহিব না।”

দাসী বলিল,—“থাকিতে পারিলে তো?”

রামহরি বলিল,—“কপালে যাহা থাকে হইবে। এখন সে কথা যাক্; ব্রাহ্মণ-কন্যার জন্য তোমার এত ভাবনা কিসের? তোমাকে বলি শুন। এই সতী লক্ষ্মীর যাতে ভাল হয় তা আমাকে করতেই হবে। এর জন্যে খরচ পত্র, পরিশ্রম কিছুতেই আমি পিছ পা হইব না। বাস্তু ভিটা, জমি, জমা, গরু, লাঙ্গল, ধান সব বেচিয়া যদি এজন্য তোমার হাত ধরিয়া পথে দাঁড়াইতে হয় সেও স্বীকার।”

দাসী বলিল,—“আচ্ছা আচ্ছা! তোমার এই ধর্ম্মের কথা শুনে বড়ই খুসী হইয়াছি; তাই আপাততঃ তোমাকে চারটি মুড়ি আর একটু গুড় বক্‌সিস দিচ্ছি—তুমি খেয়ে জল খাও।”

দাসী প্রস্থান করিল এবং অবিলম্বে প্রায় এক কাঠা মুড়ি, খানিকটা গুড় ও এক ঘটি জল আনিয়া রামহরির সম্মুখে রাখিয়া দিল। রামহরি মুখে হাতে একটু জল দিয়া পরমানন্দে মুড়ি ও গুড় চর্ব্বণ করিতে লাগিল। আমরাও আপাততঃ এই সকল ইতর লোকের বর্ণনায় ক্ষান্ত হইলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আবার।

রামহরি যাহা বলিয়াছিল, তাহা করিয়াছে। গদা চাঁড়াল আসিয়াছে। রামহরি, দাসী ও সুহাসিনী তিন জনে স্থির করিয়াছিলেন যে, সুহাসিনীর সম্বন্ধে তাঁহার শ্বশুর ও স্বামীর মনে যে বিরুদ্ধ সন্দেহ জন্মিয়াছে, তাহা অমূলক হইলেও দৃশ্যতঃ অসঙ্গত নহে। এই ভ্রম-বিদূরিত করিবার উপায় গদা চাঁড়ালের কথা। গদা চাঁড়াল যদি সমস্ত কথা ব্যক্ত করে ও সকল ঘটনা যথাযথরূপে বুঝাইয়া দেয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সার্ব্বভৌম ও তাঁহার পুত্রের মন হইতে সকল সন্দেহ তিরোহিত হইয়া যাইবে। যে তিন ব্যক্তি মিলিত হইয়া এই মীমাংসা করিয়াছেন, সেই তিন জনই নিতান্ত সাধুস্বভাব ও সরল প্রকৃতি। গদার ন্যায় হীনজনের সাক্ষ্যে যে এতাদৃশ কলঙ্ক প্রক্ষালিত হওয়া সম্ভাবিত নহে; ইহা একবারও তাঁহাদিগের মনে হয় নাই। বিশেষতঃ গদা যখন এই ব্যাপারে সংলিপ্ত এবং অপরাধীরূপে পরিগণিত, তখন তাহার সমর্থন বাক্যের যে কোনই মূল্য থাকিতে পারে না, ইহা তাহারা একবারও ভাবে নাই। রামহরি বহু আয়াসে গদার সন্ধান করিয়াছে ও তাহাকে আপন গৃহে আনয়ন করিয়াছে। গদা লোকটা অতীব ভয়ানক! অর্থলাভই তাহার জীবনের মূলমন্ত্র। অর্থ লাভে সে

করিতে না পারে এমন কর্ম্মই নাই। তাহার প্রার্থনা মত অর্থ প্রদানে সম্মত হইলে, সে অনায়াসে কল্পনাতীত দুষ্ক্রিয়াও সম্পাদিত করিতে প্রস্তুত। কার্য্যের পরিণাম বা বৈধতা বিষয়ে সে সর্ব্বতোভাবে উদাসীন। প্রার্থনারূপ অর্থপ্রাপ্তি ও তাহার বিনিময়ে আদেশানুরূপ কার্য্য সম্পাদন মাত্র তাহার সম্বন্ধ। তদনন্তর কার্য্যের ফলাফলের সহিত সে সম্বন্ধশূন্য।

সুহাসিনীকে শ্যামলালের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া গ্রামান্তরে নিরাপদ স্থানে আনয়ন করায়, গদার প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব না থাকাই সঙ্গত। কারণ তাহার এ কাজটা ভাল কাজ বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। গদা কিন্তু ভাল মন্দ কিছুই বিবেচনা না করিয়া এই কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে। শ্যামলাল তাহাকে সার্ব্বভৌমের পুত্র-বধূ হরণের নিমিত্ত নিয়োজিত করিয়াছিলেন, সেই কার্য্য সম্পন্ন করিলে গদা নিশ্চয়ই শ্যামলালের নিকট হইতে পুরস্কারস্বরূপ অর্থলাভ করিত। সে পুরস্কারের মাত্রা কুড়ি টাকা ছাড়াইয়া যাইত না, ইহা তাহার বেশ জানা ছিল। দুরাত্মা গদা, এই সামান্য অর্থের লোভে অনায়াসে এই ভয়ানক কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইল এবং বাস্তবিকই সুহাসিনীকে আয়ত্তাধীন করিল। তাহার পর সুহাসিনী যখন অন্যূন হাজার টাকার অলঙ্কার পুরস্কার দিতে সম্মত হইলেন, তখন গদা আবার অনায়াসে শ্যামলালের আদেশ উপেক্ষা করিয়া সুহাসিনীর বাসনানুরূপ কার্য্য সম্পাদন করিল। প্রথমটী পাপ কার্য্য, দ্বিতীয়টী পুণ্য কর্ম্ম এইরূপ বিবেচনা গদার কখনই মনে হয় নাই; এবং সেরূপ বিচার করিয়া গদা কখনও কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়ও না।

শ্যামলালের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য না করিয়া, সুহাসিনীকে লইয়া স্থানান্তরে আগমন করায়, গদাকে বিলক্ষণ বিপন্ন হইতে হইয়াছে। সে জানে শ্যামলাল ভদ্রবংশ-সম্ভূত হইলেও দুর্বৃত্ততায় তাহার বড় ভাই! গদার প্রযত্নে এই ব্যাপারে বিফল মনোরথ হওয়ায় তিনি যে গদার সর্ব্বনাশের কিছুই বাকী রাখিবেন না, তাহা সে ভাল রকমই বুঝিয়াছে। সুতরাং এই ঘটনার পর সে আর গ্রামে ফিরিয়া যায় নাই; স্থানান্তরে প্রচ্ছন্নভাবে সে বাস করিতেছে।

এই মহাপুরুষ গদা চাঁড়ালকে, সরলপ্রাণ রামহরি, দুইটী সরলা নারীর পরামর্শ ক্রমে, প্রধান অবলম্বন বলিয়া মনে করিয়াছে এবং অতীব সমাদরে তাহাকে বাটীতে স্থান দিয়াছে। রামহরির মুখে সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া, গদা বলিয়াছে যে, বামুন ঠাকুরদের কাছে তাঁহাদের বউ ঠাকরুণকে সঙ্গে লইয়া যাইতে এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত কথা বিশেষ রূপে বুঝাইয়া বলিতে তাহার কোন আপত্তি নাই; কিন্তু তাহার হাতে কাজ অনেক— ঝঞ্ঝাট ঢের। বিশেষ লাভ না হইলে, সে সকল ক্ষতি স্বীকার করিয়া গদা কখনই এই গোলে সময় নষ্ট করিতে পারিবে না।

তাহার সহিত বাদানুবাদ করিয়া রামহরি বুঝিয়াছে একশত টাকা না পাইলে, গদা এ বিষয়ে সাহায্য করিবে না। গদাও জানে এবং রামহরিও বুঝিয়াছে যে, সুহাসিনীর হাতে সিকি পয়সাও নাই। সুতরাং ১০০৲ একশত টাকা দেওয়া কোন মতেই সম্ভব নহে। কিন্তু গদা কোন যুক্তিতেই কর্ণপাত করে না। অগত্যা রামহরি তাহাতেই স্বীকার হইয়াছে।

দাসীর নিকটে আসিয়া রামহরি সমস্ত কথা জানাইল। শুনিয়া দাসী বলিল,—

তা ত সব বুঝিলাম; এখন এত টাকার যোগাড় হইবে কিরূপে?

রামহরি বলিল,—ঠাকরুণের কিছু নাই; তাঁহাকে কোন কথা বলিবারও দরকার নাই। কালি সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া দুগোলা ধান মজুত করিয়াছি। আমি মহাজন ডাকিতে যাইতেছি, এখনই তাহা বিক্রয় করিব।

দাসী বলিল,—কত ধান বেচিলে একশ টাকা হইবে?"

রামহরি বলিল,—যেরূপ গরজ তাহাতে দর হইবে বোধ হয় না। যাহা মজুত আছে তাহা সকলই বেচিতে হইবে।

দাসী বলিল ধান যাহা মজুত হইয়াছে তাহাতে লোকজনকে দেওয়া থোওয়া, অথিত পত্তিত লইয়া সংবৎসরের খোরাক আর বীজ ধান হইত। তাহার কিছুই থাকিবে না। কি রকমে দিন কাটিবে?"

রামহরি বলিল,—"দিন কাটাইবার কর্ত্তা ভগবান্। সে ভাবনা পরে ভাবিলে ক্ষতি হইবে না। আপাততঃ ব্রাহ্মণ-কন্যার ভবনাই ভাবিতে হইতেছে। এখন সমস্ত ধান গুলি বেচিয়া একশ টাকা হইলে বাঁচি।"

রামহরি চলিয়া গেল এবং অবিলম্বে মহাজন সঙ্গে ফিরিয়া আসিয়া, সমস্ত ধান বেচিয়া ফেলিল। ধানের মূল্য একশ ছয় টাকা আট আনা হইল। গোলা হইতে ধান বাহির করিয়া ও মাপিয়া বস্তাবন্দি করিয়া দিতে দিনের অবশিষ্ট ভাগ তাহাকে ভূতের ন্যায় পরিশ্রম করিতে হইল। যখন হিসাব করিয়া ধান্যের মূল্য ১০০ এক শত টাকা ছাড়াইয়া গেল, তখন রামহরি আপনাকে মহা দায় মুক্ত বলিয়া পরমানন্দিত হইল।

সুহাসিনী এইরূপে ধান বাহির করিতে দেখিয়া দাসীকে জিজ্ঞাসিলেন,—"কালি কর্ত্তা সারাদিন পরিশ্রম করিয়া ধান গোলাজাত করিয়াছেন; আজ আবার বাহির করিতেছেন কেন?"

দাসী উত্তর দিল,—"কাহাকে ধার দিবেন বুঝি।"

সুহাসিনী বুঝিতে পারিল না যে, তাঁহারই জন্য এই কৃষক-দম্পতি আপনাদিগের সংবৎসরের সম্বল আধা কড়িতে বেচিয়া ফেলিল। গদা আপনার টাকা অগ্রেই বুঝিয়া লইল। পরদিন প্রাতে আপনার গরুর গাড়ী জুতিয়া উত্তমরূপে ছই আঁটিয়া দিল এবং তাহার মধ্যে অনেক খড় বিছাইয়া বিছানা পাতিল। বাটীতে তাহার অনুপস্থিতি কালে থাকিবার লোকের ব্যবস্থা করা হইলে সে আপনার পত্নীকে ডাকিয়া গঙ্গা ঠাকুরাণীকে সঙ্গে লইয়া গাড়ীতে উঠিতে বলিল। প্র ১৫ ক্রোশ পথ যাইতে হইবে, সুতরাং আর বিলম্ব করা উচিত নহে। রামহরি এইরূপ তাগাদা করিলে, অগত্যা গঙ্গা যমুনা গাড়ীতে উঠিলেন। রামহরি সম্মুখে বসিয়া গরু তাড়াইতে লাগিল, গদা গাড়ীর পার্শ্বে পার্শ্বে হাঁটিয়া চলিতে লাগিল।

অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, গ্রাম, প্রান্তর ও জলাশয় অতিক্রম করিয়া, মধ্যাহ্ন কালে তাহারা একটী সামান্য দোকানে জলযোগ করিল এবং পুনরায় চলিতে থাকিল।

বেলা অপরাহ্ন হইয়া আসিল। যাত্রিগণ এক অরণ্য মধ্যস্থ পথ দিয়া চলিতে লাগিল। নিকটে কোন দিকেই এক ক্রোশের মধ্যে গ্রাম নাই। পথে বা মাঠে কোথাও মনুষ্য নাই। সহসা দড়াম করিয়া এক পিস্তলের আওয়াজ হইল। সঙ্গে সঙ্গে 'বাবা গো'

শব্দে রামহরি গাড়ীর উপর হইতে মাটিতে পড়িয়া গেল। গরু দুইটী বিচলিত হইয়া উঠিল। শকট মধ্যস্থ নারীদ্বয় কাঁদিয়া উঠিল এবং গদা বেগে পলায়ন করিল।

তৎক্ষণাৎ প্রকাণ্ড পাগড়ি আঁটা দাড়িওয়ালা এক পুরুষ, শকটের আচ্ছাদন বস্ত্রের কিয়দংশ উত্তোলন পূর্ব্বক কর্কশ কণ্ঠে বলিল,—"যদি প্রাণের মায়া থাকে তবে চুপ করিয়া থাক; নতুবা দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না।"

সুহাসিনী বলিলেন,—"কখনও না। দুর্দ্দশা আমাদের যথেষ্ট হইয়াছে ইহার উপর যাহা হয় হউক, তোমার কথা আমরা কখনই শুনিব না।"

বিপদে পড়িয়া সুহাসিনীর সাহস বিপুল পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে এবং লজ্জা ও কোমলতা হেতু বাক্য কথনের সঙ্কোচ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। রমণীদ্বয় উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ ও সেই শ্মশ্রুধারী পুরুষের সহিত বিতণ্ডা করিতে লাগিলেন এবং শকট হইতে অবতরণ করিয়া রামহরির নিকটে ধূলায় পড়িয়া কাতর কণ্ঠে রোদন করিতে থাকিলেন। বন্দুকধারী পুরুষ উচ্চৈঃস্বরে বলিল,—"আইস।"

তৎক্ষণাৎ পার্শ্বস্থ বৃক্ষের অন্তরাল হইতে চারিজন ভয়ানক পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইল। বন্দুকধারী পুরুষ আদেশ করিল,—"কাপড় দিয়া এই দুই স্ত্রীলোকের মুখ বন্ধ করিয়া দেও এবং হাত পা বাঁধিয়া গাড়ীতে উঠাইয়া দেও।"

*

আদেশ প্রচারিত হইবা মাত্র অনুরূপ কার্য্য সম্পন্ন হইল। বন্দুকধারী ব্যক্তি গাড়ীর সম্মুখে বসিয়া হাঁকাইতে আরম্ভ করিল। আর দুইজন রামহরির দেহ উঠাইয়া লইয়া পার্শ্বস্থ জঙ্গলে ফেলিয়া দিল। এই সকল ভয়ানক ব্যাপার অতি অল্পকালের মধ্যেই শেষ হইয়া গেল। বনভূমি নিস্তব্ধ হইল, গাড়ী অনেক দূর অগ্রগামী হইতে লাগিল।

সপ্তম খণ্ড — অমৃত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অবনতি।

যোগানন্দ ও উমাশঙ্কর অপরাহ্ন কালে বারাণসী ধামে আপনাদের কুটীরের বহির্ভাগে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। উমাশঙ্কর জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনি বলিতেছিলেন, বর্ত্তমান কালে যাহা হিন্দু ধর্ম্ম নামে পরিচিত, তাহা এক নূতন ধর্ম্ম, শাস্ত্রাদিতে তাহার মূল নাই এবং বেদবেদান্তে তাহার উল্লেখ নাই। তবে এ অভিনব ধর্ম্মের উৎপত্তি কিরূপে হইল?"

যোগানন্দ বলিলেন,—"উৎপত্তি কিরূপে হইল তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। তোমাকে এই পর্য্যন্ত আমি বলিতে পারি, তুমিও স্বয়ং তাহা দেখিয়াছ যে, বর্ত্তমান কালের হিন্দুগণ যে সকল গ্রন্থকে আপনাদের ধর্ম্মশাস্ত্ররূপে উল্লেখ করেন, তাহার কোথায় হিন্দু শব্দের উল্লেখ নাই এবং হিন্দু জাতি বা হিন্দু ধর্ম্ম নামক কোন জাতি বা ধর্ম্মেরও বৃত্তান্ত নাই। আমাদের এই জাতি গ্রন্থাদির কোন কোন স্থানে আর্য্যজাতি নামে অভিহিত হইয়াছেন এবং একমাত্র ধর্ম্ম-শব্দ দ্বারা আমাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ-বিধায়ক সমস্ত ব্যবস্থাই লক্ষিত হইয়াছে। এই উভয় শব্দ মিলাইয়া আমরা আমাদের ধর্ম্মকে আর্য্যধর্ম্ম

বলিতে পারি বটে, কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম বলিবার কোনই কারণ দেখা যায় না। বস্তুতঃ হিন্দু শব্দটা শাস্ত্রবহির্ভূত একটা নূতন শব্দ। এই শাস্ত্র-বহির্ভূত নূতন শব্দ যেমন এখন আমাদের ধর্ম্মের পরিচায়ক হইয়াছে, তেমনই বর্ত্তমান কালের ধর্ম্মও এক শাস্ত্র-বিরুদ্ধ অত্যাশ্চর্য্য বেশ ধারণ করিয়াছে। আর্য্যের সার ধন ষড়ঙ্গ বেদ। তাহার আলোচনা এখন হিন্দুদের নাই বলিলেই হয়। আর্য্যের লক্ষ্য ব্রহ্মজ্ঞান, হিন্দুর লক্ষ্য অপ্সর-সংবলিত স্বর্গভোগ। আর্য্যের অবলম্বন সনাতন পরম পুরুষের বদন-বিগলিত অপৌরুষের শাস্ত্র, হিন্দুর অবলম্বন ঋষিবিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষ প্রণীত গ্রন্থ। আর্য্যের লক্ষ্য আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সকলের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন, হিন্দুর লক্ষ্য অত্র ও পরত্র আত্মসুখ। আর্য্যের কামনা সগুণের পথ দিয়া নির্গুণের উপলব্ধি, হিন্দুর কামনা কেবল সগুণ। আর্য্যর বিশ্বাস মৃত্যু নাই, হিন্দু মৃত্যুর ভয়েই অবসন্ন। আর্য্য সকলের হিত কামনাই সার বলিয়া জানিতেন, হিন্দু নিজের সুখই সার লক্ষ্য মনে করেন। আর্য্য অন্তর্নিহিত এবং অনুশীলন দ্বারা উন্নতিসাধিত হৃদবৃত্তিকে ধর্ম্ম বলিয়া জানিতেন, হিন্দু কতকগুলি অনুষ্ঠান মাত্রকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন। এইরূপ দেখিলেই তুমি বুঝিবে যে, হিন্দু-ধর্ম্মের সহিত আর্য্য-ধর্ম্মের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। ইহা এক অভিনব কাণ্ড।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"বুঝিতেছি, বর্ত্তমান কাল প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম প্রত্যুত এক নূতন কাণ্ড। কিন্তু ইহার কি কোন শাস্ত্রীয় মূল্য নাই?"

যোগানন্দ বলিলেন,—"আছে বই কি! প্রথম কালের পর ক্রমশঃ লোকের প্রবৃত্তি ও অনুরাগের পরিবর্ত্ত হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে অনুকূল শাস্ত্রও প্রণীত হইতে থাকে। এই সকল নবীন শাস্ত্রের বাসনায়, কতক বা তাহার ব্যাখ্যায়, কতক বা লোকের অনুরাগানুসারে কাল সহকারে মূলের এতই পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে যে, ইহা এক নূতন কাণ্ডরূপেই পরিণত হইয়াছে।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"যে সকল আধুনিক শাস্ত্রকারের অভিপ্রায়ানুসারে বর্ত্তমান হিন্দু ধর্ম্ম এই আকার ধারণ করিয়াছে, তাঁহাদের যুক্তি ও প্রণালী কি সম্পূর্ণরূপ মূল-বহির্ভূত?"

যোগানন্দ বলিলেন,—"না বৎস! সম্পূর্ণ বহির্ভূত নহে। প্রথম প্রথম যে সকল মহাত্মা লেখনী ধারণ করেন, তাঁহার মূলের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া কল্পনাকে মিশ্রিত করেন; কিন্তু কালে টীকাকারকগণের ও ব্যাখ্যা কারকগণের কৃপায়, ক্রমশঃ মূল সঙ্গতি ঢাকিয়া আইসে এবং উত্তরোত্তর ব্যক্তি-সাধারণ মূলের আলোচনা ত্যাগ করার ও ভুলিয়া যাওয়ার পর নূতন-নূতন শাস্ত্রকার আবির্ভূত হইতে থাকেন এবং মূল শাস্ত্র এককালে পরিত্যাগ করিয়া কেবল স্ব স্ব কল্পনারই প্রশ্রয় দেন। এইরূপে বর্ত্তমান কালের ধর্ম্মের সহিত মূল আর্য্য ধর্ম্মের আকাশ পাতাল তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"এই সকল নূতন শাস্ত্রকার কি কোন প্রকার অসদভিসন্ধির বশবর্ত্তী হইয়া এই সকল অভিপ্রায় প্রচার করিয়াছিলেন?"

যোগানন্দ বলিলেন,—"না বৎস! প্রথম প্রথম অতীব শুভ-সংকল্প সহকারে শাস্ত্রকারগণ স্ব স্ব অভিপ্রায় প্রচার করিয়াছিলেন। মনুষ্যের প্রবৃত্তি, রুচি ও অধিকারির আলোচনা করিয়া তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যাপার অপেক্ষাকৃত সরল ও সহজসাধ্য না হইলে

সাধারণে তাহা গ্রহণ করিতে পারিবে না। তদর্থে তাঁহারা মূল শাস্ত্র সমূহের অভিপ্রায় সমূহ অপেক্ষাকৃত বিশদ ও সর্ব্বজন প্রণিধান-যোগ্য করিবার অভিপ্রায়ে, অতীব শুভ সংকল্পের বশবর্ত্তী হইয়াই লেখনী ধারণ করেন। কালে অনন্ত শাস্ত্রকারের আবির্ভূত হওয়ায় মূলবিলুপ্ত—বিস্মৃতি-সলিলে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল এবং ধর্ম্মাকাশ, বর্ষার মেঘের ন্যায় কাল্পনিক ধর্ম্ম মতে সমাচ্ছন্ন হইয়া সারধর্ম্মরূপ দিবাকরকে ছাইয়া ফেলিল।"

উমাশঙ্কর জিজ্ঞাসিলেন,—"এ দারুণ দুর্দ্দৈব কি আর অপগত হইবে না? আবার কি আশ্চর্য্য ধর্ম্মের বিমল জ্যোতিঃ এই ছিন্নধর্ম্মরূপ কুহেলিকা ভেদ করিয়া, প্রদীপ্ত হইবে না?"

যোগানন্দ বলিলেন,—"বড় সুকঠিন, বড় ঘনান্ধকার ভারতের ধর্ম্মাকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। এখন সকলেই ধর্ম্ম-ব্যাখ্যাতা। সকলেই মনে করে তাহারা দ্বিতীয় বেদব্যাস! সকলেই জানে, যে যাহা বুঝিয়াছে তাহাই অভ্রান্ত। এ অবস্থায় কে বা কাহাকে বুঝায়, কেই বা কাহার কথা শুনে। বাড়ার ভাগ এক নূতন বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। ইহারা এই বিকৃত ও কুৎসিত ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনাদের সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে, এ কথা যদি ইহাদিগকে বুঝাইতে কেহ অগ্রসর হয়, তাহা হইলে ইহারা সেই পরমহিতৈষী মহাত্মগণকে ধর্ম্মবিদ্বেষী আচার-ভ্রষ্ট, অসাধু বলিয়া লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিতে থাকিবে। তাঁহার কথা শ্রবণ করা দূরে থাকুক, তিরস্কার-স্রোতে তাঁহাকে হয়তো ভাসাইয়া দিবে।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"তবে উপায়?"

যোগানন্দ বলিলেন,—"উপায়ের যিনি কর্ত্তা তাঁহার কৃপা না হইলে আর উপায় নাই। এইরূপ দুরবস্থা আলোচনা করিয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ একবার ধর্ম্মব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বসুন্ধরার অধর্ম্মান্ধকার বিদূরিত করিয়া, বিমল ধর্ম্মের সুস্নিগ্ধ আলোক বিকীর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে অর্জ্জুনের সারথ্যভার গ্রহণ করিয়া তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ পরম দিবাকর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই গীতা অভ্রান্তরূপে সনাতন ধর্ম্মের পথ নিয়তই প্রদর্শন করিতেছে।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"সেই গীতা তো এখনও আছে এবং এখনও লোক-সমাজে তাঁহার বিশেষ আলোচনা চলিতেছে। তথাপি লোকের ভ্রমান্ধকার যায় না কেন?"

যোগানন্দ বলিলেন,—"গীতার আলোচনা চলিতেছে বটে, কিন্তু তাহা সম্যক্ নহে। বহুলোক সমাকীর্ণ ভারতে কয়জন গীতা পড়ে? কয়জনই বা গীতার মতানুসারে জীবনকে গঠিত করিতে প্রয়াসী হয়? কেবল শ্লোকাবৃত্তি হয়তো অনেকেই করে, কিন্তু মর্ম্ম হয়তো অনেকেই প্রণিধান করে না। আবার মর্ম্ম প্রণিধান করিলেও হয়তো অনেকেই তাহার অভিপ্রায়ানুসারে স্বকীয় কার্য্যকলাপ পরিচালিত করে না। সুতরাং গীতার যে আলোচনার কথা তুমি বলিতেছ, তাহা আলোচনাই নহে। গীতার সম্বন্ধে আরও ভয়ানক দুর্দ্দৈব দেখিতেছি। সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যাজালে গীতা ঢাকা পড়িয়াছে। দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, বিশেষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি সম্প্রদায়ী মহাত্মারা স্ব স্ব মতানুসারে গীতার অর্থ করিয়া থাকেন। ইহাতে শাস্ত্রের সত্যাভিপ্রায় নির্ণয়ের সমূহ ব্যাঘাত ঘটে। যাহা প্রকৃত সত্য তাহার অবস্থান্তর বা অর্থান্তর অসম্ভব। গীতাকে যদি সত্য ও ভগবদুক্তি

বলিয়া স্বীকার করা যায়; তাহা হইলে তাহার বহুবিধ অর্থ কখনই হইতে পারে না। তবে যে নানা সম্প্রদায় তাহার নানারূপ অর্থ করিয়া থাকেন সে কেবল স্ব স্ব মতের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনার্থ পাণ্ডিত্য প্রকাশ মাত্র। তাহাতে শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে এবং অল্পবুদ্ধি মানব কোন্‌টি যথার্থ অর্থ এবং কোন্‌টাই বা গ্রহণীয় তাহা স্থির করিতে না পারিয়া বিব্রত হইয়া উঠিতেছে। তথাপি গীতার আলোচনাই এই দুর্দ্দিনে আমাদের প্রধান ভরসা। কারণ সত্য স্বপ্রকাশ। নিরন্তর সত্যান্বেষণ করিতে থাকিলে, একান্ত মনে সত্যপ্রাপ্তির কামনা করিলে, অবশ্যই সত্য লাভ ঘটে। গীতার মধ্যে সত্য নিহিত আছে সন্দেহ নাই। সেই সত্য নির্ণয় অভিলাষে গীতার শরণাগত হইলে, অনন্য মনে গীতার ভজনা করিলে, অবশ্যই কালে স্বপ্রকাশ সত্যের দর্শন লাভ ঘটিতে পারে।

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"তাহা হইলে এ দারুণ দুঃসময়ে আপনি কি মনুষ্যগণকে গীতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পরামর্শ প্রদান করেন?"

যোগানন্দ বলিলেন,—তৎপক্ষে কোনই সন্দেহ নাই। অনন্য মনে গীতার আলোচনায় প্রবৃত্ত থাকিলে, অবশ্যই মানবকুল সৎপথ দেখিতে পাইবে এবং চরমে সদ্‌গতি লাভ করিবে ইহাই আমার ধ্রুব বিশ্বাস।

এইরূপ সময়ে হরকুমার বাবু তাহাদের সম্মুখাগত হইলেন এবং ভক্তি সহকারে যোগানন্দকে প্রণাম করিলেন। যোগানন্দ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন।

তিনি উমাশঙ্করকে বলিলেন,—"তিন দিন আপনাকে দেখিতে পাই নাই কেন? শরীর ভাল আছে তো?"

উমাশঙ্কর উত্তর দিলেন,—"প্রভুর কৃপায় শরীর তো কখনই অসুস্থ বলিয়া অনুভব করি না। গুরুদেব যে সকল নিয়ম পালন করিতে উপদেশ দিয়াছেন, যত দিন তাহা পালন করিতে অবহেলা না করিব, ততদিন শারীরিক অসুস্থতা কাহাকে বলে, তাহা জানিতে পারিব না। অন্যান্য কার্য্যানুরোধে কয়দিন আপনাদের ওদিকে যাওয়া হয় নাই।"

তাহার পর নতমুখে জিজ্ঞাসিলেন,—আপনাদের উভয় বাটীর কুশল?"

হরকুমার উত্তর দিলেন,—"হাঁ কুশল বটে। তবে আজি প্রাতঃকাল হইতে অন্নপূর্ণা একটু অসুস্থ হইয়াছেন।"

একি সন্ন্যাসীর মন! অন্নপূর্ণার অসুস্থতার সংবাদ শুনিয়া উমাশঙ্করের চিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। কিন্তু তিনি বাক্য ও ব্যবহারে তাহা ব্যক্ত করিলেন না। অন্নপূর্ণার কি অসুখ, কেমন অবস্থা ইত্যাদি সংবাদ জানিবার নিমিত্ত তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা হইল। কিন্তু তাহাও তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন না।

যোগানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"নীলরতন বাবুর কন্যার কি অসুখ হইয়াছে? এখন তিনি কেমন আছেন দেখিয়া আসিয়াছেন?"

হরকুমার বাবু বলিলেন,—"সামান্য জর হইয়াছে। বিশেষ কাতরতা ঘটে নাই। আমি তাঁহাকে বসিয়া মহাভারত পড়িতে দেখিয়া আসিয়াছি।"

উমাশঙ্করকে লক্ষ্য করিয়া যোগানন্দ বলিলেন,—"তুমি কয়দিন নীলরতন বাবুর বাড়ী যাও নাই কেন? আজি এখনই যাও এবং

অন্নপূর্ণার পীড়ার বৃত্তান্ত সবিশেষ জানিয়া আইস।"

উমাশঙ্কর সবিনয়ে গুরুদেবের পদ-ধূলি মস্তকে গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি প্রস্থান করিলে ঘনানন্দ বলিলেন,—"এই সন্ন্যাসী বালক নীলরতন তনয়াকে বড়ই ভালবাসে। ইহার এই প্রণয় কোন্ দিকে প্রধাবিত হইবে, তাহা আমি জানি না। কেবল ভালবাসা বড় সুমিষ্ট সামগ্রী; কিন্তু তাহার সহিত ইন্দ্রিয়-লালসা কালে মিশিতে পারে। তখন শত প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়া ইহার নিদারুণ মনস্তাপের কারণ ঘটিতে পারে, অথবা তদপেক্ষাও দুর্দৈব সমস্ত উপস্থিত হইয়া ইহার জীবন ও শিক্ষা সকলই অনর্থক করিয়া দিতে পারে।"

হরকুমার বলিলেন,—"নীলরতনের বালিকাও এই সাধু যুবাকে বড়ই ভাল বাসে। এই দুইটির এই আন্তরিক আকর্ষণ দেখিয়া ইহাদের মিলন বাঞ্ছনীয় মনে হয় বটে, কিন্তু বহু ব্যাপারই সে কল্পনার বিরোধী। প্রথমতঃ বালকটি সন্ন্যাসী, দ্বিতীয়তঃ অজ্ঞাত-কুল-শীল। মহাশয়ও ইহার পিতৃমাতৃ পরিচয় জানেন না।"

যোগানন্দ বলিলেন,—"সন্ন্যাসীর শিষ্য হইলেও উমাশঙ্কর স্বয়ং সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। অতি অল্প বয়স হইতে এই বালক আমার নিকট প্রতিপালিত; সুতরাং সন্ন্যাসীর আচার-পরতন্ত্র। তাই বলিয়া ইনি সন্ন্যাসী নহেন। ইহার অদৃষ্টে প্রভূত বিষয়ৈশ্বর্য্য উপভোগ হইবার সম্ভাবনা আছে। জানি না কোন্ অলক্ষিত সূত্রে তাহা উপস্থিত হইবে। আমি কিন্তু সেই কারণে, ইহাকে অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, সাংসারিক বিষয় ব্যাপারেরও উপদেশ প্রদান করিয়া আসিতেছি। ইনি ব্রাহ্মণ তাহা আমি শ্রবণ করিয়াছি।"

হরকুমার বলিলেন,—আপনি বলিয়াছিলেন ইহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত আপনি বেশী কিছু জানেন না। কিছু বিশেষ বৃত্তান্ত জানিবার প্রয়োজন হইলে, এক উপায়ে সন্ধান হইতে পারে বলিয়াছিলেন। সে উপায় আমার নিকট একদিন ব্যক্ত করিবেন ভরসা দিয়াছিলেন।"

যোগানন্দ বলিলেন,—"সে অতি অল্প কথা। সোণামণি নাম্নী এক বৃদ্ধা বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যা কাশী-বাস করিত। সে আমাকে বড় ভক্তি করিত ও সর্ব্বদা এই বালকটীকে ক্রোড়ে লইয়া আমার আশ্রমে আসিত; আমিও কখন কখন তাহার বাটীতে গিয়া এই শিশুটীকে দেখিয়া আসিতাম। শিশুটী সর্ব্ব-সুলক্ষণাক্রান্ত দেখিয়া আমি গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছিলাম যে, ভবিষ্যতে এই বালক বহুবিধ সম্পত্তিশালী ও পরম ধার্ম্মিক হইবে। অনতিকাল মধ্যে সোণামণির কঠিন পীড়া উপস্থিত হইল এবং আসন্ন কাল নিকটস্থ বুঝিয়া, সে আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইল। তথায় সে আমাকে বুঝাইল যে, এই শিশুর এক বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণবংশে জন্ম। শিশু মাতৃহীন। ইহার পরিচয় যদি কখন জানিবার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে বঙ্গদেশের রামনগরে গঙ্গামণি নাম্নী এক বিধবার নিকট সন্ধান করিতে হইবে। তাঁহার নিকট কতকগুলি কাগজপত্র আছে; তাহা দেখিলেই বালকের পিতৃমাতৃ ঘটিত সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারা যাইবে। এক্ষণে তাহার অন্তকাল উপস্থিত। এখানে তাহার আর কেহ আত্মীয় নাই। সুতরাং সে আমার স্কন্ধে এই শিশু পালনের ভার প্রদান করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। তদবধি গৃহীজনোচিত এই কর্ত্তব্যের দায়িত্ব আমাকেই গ্রহণ করিতে হইল। এই গুণবান্ বালক সেই সময় হইতে আমার নিকটেই আছেন। আমি বিহিত যত্নে

ইহাঁকে শাস্ত্রাদির শিক্ষা প্রদান করিয়াছি এবং বিবিধ প্রযত্নে ইহার চরিত্র গঠনের সহায়তা করিয়াছি। কিন্তু ইহাঁর পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জানিবার কোন চেষ্টা আমি করি নাই; এ পর্য্যন্ত তাহার কোন প্রয়োজন বা সুযোগও আমার সমক্ষে উপস্থিত হয় নাই। বালকের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুইটী বিশ্বাস ছিল। এক ইহার ধর্ম্ম-ময়তা। তৎসম্বন্ধে আমার আর সন্দেহ নাই। অপর ইহাঁর বিষয়ৈশ্বর্য্য উপভোগ। তাহার কোন সূচনা আমি এখনও দেখিতেছি না।"

হরকুমার বলিলেন,—"বালক যে অসাধারণ ভাগ্যবান্, আপনার ন্যায় মহাপুরুষের আশ্রয়লাভই তাহার নিদর্শন। আপনি বলিতেছেন, রামনগর নামক গ্রামে গঙ্গামণি নাম্নী এক নারী নিকট কতকগুলি কাগজপত্র আছে, তাহাতেই এই বালকের পিতৃ-মাতৃবৃত্তান্ত পাওয়া যাইবে। সে স্ত্রীলোকের আর কোন পরিচয় আপনি জানেন?"

যোগানন্দ বলিলেন,—"কিছু না। আমি কখন তাহার সন্ধান করি নাই। অদ্যাপি সে নারী জীবিত আছে কি না, তাহাও আমি জানি না।"

হরকুমার অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, তাহার পর বলিলেন,—"জানি না এই ভাগ্যবান্ শিশুর জীবন কি দুর্জ্ঞেয় রহস্য-জালে বিজড়িত। যাহাই হউক অনুসন্ধান অবশ্যই করিতে হইবে। আমি অতঃপর তাহাই আমার প্রধান কর্ত্তব্যরূপে অবলম্বন করিব। আশীর্ব্বাদ করিবেন যেন কৃতকার্য্য হই।"

যোগানন্দ বলিলেন,—"আপনার প্রযত্ন যে সফলিত হইবে, তৎসম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। বালকের ভাগ্যসূত্র নিশ্চয়ই একটী উপলক্ষ ধরিয়া সকল ঘটনাই অনুকূল করিয়া লইবে।"

হরকুমার জিজ্ঞাসিলেন,—"এই রামনগরটা কোথায়, তাহাও কি প্রভু জানেন না?"

যোগানন্দ বলিলেন,—"না।"

হরকুমার বলিলেন,—"রামনগর অনেক আছে। তাহা হউক, সকল রামনগরই সন্ধান করিব। অবশ্যই প্রভুর আশীর্ব্বাদে বাসনা সফল হইবে।"

অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর হরকুমার বাবু যথারীতি বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্মানন্দ।

কুটীর মধ্যে যোগানন্দ একাকী ধ্যানমগ্ন। উমাশঙ্কর ভিক্ষার্থ বা অন্য কোন প্রয়োজনে স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন। ধ্যানাবস্থায় সন্ন্যাসীর সমুজ্জ্বল কলেবর অধিকতর জ্যোতিষ্মান্ হইয়া উঠিয়াছে এবং তাঁহার বদনমণ্ডল অপার্থিব আনন্দ-জ্যোতিতে প্রদীপ্ত দেখাইতেছে। বাহ্যজ্ঞান বিরহিত ভাবে, স্তম্ভিত নয়নে, পদ্মাসনাসীন সাধু ধ্যান-নিরত।

ধীরে ও নিঃশব্দে যোগেশ্বরী তথায় প্রবেশ করিলেন। শোভা ও জ্যোতিঃ যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সেই কুটীরে সমুদিত হইল। যোগেশ্বরী প্রবেশ করিয়া ভক্তিভাবে ভূতলে ললাট সংলগ্ন করিয়া প্রণাম করিলেন, তদনন্তর তত্রত্য ধূলি গ্রহণ করিয়া মস্তকে, রসনায় ও বক্ষে স্থাপন করিলেন। তাহার

পর করদ্বয় মুক্ত করিয়া নির্ব্বাক্ ও নিস্পন্দ ভাবে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বহুক্ষণ ধ্যান-মগ্ন থাকার পর যোগানন্দ নয়ন উন্মীলন করিলেন এবং যোগেশ্বরীর সেই দেবকান্তি সম্মুখে দর্শন করিয়া সানন্দে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ কি! দেবী যোগেশ্বরী? তুমি কতক্ষণ?"

যোগেশ্বরী হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"এখান থেকে বিশ্বেশ্বরের মন্দির যতদূর ততক্ষণ।"

যোগানন্দ বলিলেন,—"দূরের সহিত সময়ের পরিমাণ কিরূপে হইবে?"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"সময়ের পরিমাণ আপনার কাছে কিছুতেই হয় না। আপনি অনন্ত, সময়ও অনন্ত। তাহার পরিমাণ কে করিবে? আমরা খুব ছোট—অতিশয় ক্ষুদ্র—"তাই আমাদের সময়ের মাপ চাই। তা দূরের সহিত সময়ের পরিমাণ হয় না কেন? সেখানে যাইতে যতটা সময় লাগে, তাহাই তাহার পরিমাণ।"

যোগানন্দ বলিলেন,—"তাহাতে ঠিক পরিমাণ হয় না; কারণ তুমি যতক্ষণে এখান হইতে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে যাইতে পার, আর একজন হয়ত তাহার অপেক্ষা অনেক কম সময়ে যাইতে পারে; আবার কেহ হয়ত অনেক বেশী সময় না হইলে যাইতে পারে না; সুতরাং এই দূরত্বের অনুসারে পরিমাণ সকলের পক্ষে কখনই সমান হইতে পারে না। বিশেষতঃ এক ব্যক্তি হয়ত এক সময়ে প্রয়োজনানুরোধে বিশেষ দ্রুত যাইতে পারে, সুতরাং সময় অল্প লাগিতে পারে; আবার অন্য কোন সময়ে হয়ত, কোন প্রয়োজন না থাকায়, ধীরে ধীরে গমন করিতে পারে, সুতরাং সময় বেশী লাগিতে পারে। অতএব এক ব্যক্তির সম্বন্ধেও দূরত্বানুসারে সময়ের পরিমাণ সকল সময়ে ঠিক হইতে পারে না।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"স্বামিন্! হৃদয়দেবতা! এত কথা আমি বুঝি না তো। জানি আপনাকে—দেখি সর্ব্বত্র আপনাকে—প্রাণমন সকলই আপনি; তথাপি আপনি অনেক—অনেক দূর। কত কাল—কত যুগ আপনাকে পাইবার জন্য দৌড়িতেছি; তথাপি আপনি এখনও অনেক দূর। পাই পাই, ধরি ধরি করিয়াও ধরা ঘটে না—পাওয়া ঘটে না। দূর—দূর—ঐ দেখিতেছি, তথাপি দূর—অনেক দূর। দয়াময়! প্রাণবল্লভ! আর কতদিন দুঃখিনী চরণাশ্রিতা দাসীকে এমন করিয়া কষ্ট দিবে? কত কাল, প্রাণেশ্বর! সেবিকাকে এমন করিয়া বঞ্চনা করিবে? তোমাকে সম্মুখে রাখিয়া আমি কেবল দূরত্ব আর সময়েরই সম্বন্ধ দেখিতেছি। এ দূরত্ব, দয়াময়! কমাইয়া দেও। প্রাণের বন্ধু প্রাণে মিশিয়া কালের চিন্তা দূর করিয়া দেও!"

যোগানন্দ মনে মনে বুঝিলেন,—"যোগেশ্বরীর জ্ঞাননিষ্ঠা ও ব্রহ্মজ্ঞান সার্থক। তাঁহারা আজীবন ধ্যানাদি সহকারে, বিষয়-বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া, প্রাণায়ামাদি উপায় প্রভাবে, নির্গুণ ব্রহ্মসাধনার পথে বিশেষ অগ্রসর হইতে পারেন নাই এবং ব্রহ্মোপলব্ধি জনিত আলোক দ্বারা হৃদয়ের অন্ধকার নির্মূলিত করিয়া উঠিতে সক্ষম হন নাই। অথচ এই নারী, এই নবীনা অলোক-সামান্যা নারী, সগুণ সাধনার পথ দিয়া, ভোগ প্রবৃত্তিসূচক ও প্রবর্দ্ধক সম্বন্ধ অবলম্বন করিয়া, নিরতিশয় একাগ্রতা ও দৃঢ়তা হেতু, স্বচ্ছন্দে ব্রহ্মোপলব্ধিরূপ অসুলভ সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইয়াছেন। সার্থক ইঁহার সাধনা! ধন্য

ইহার জীবন। বলিলেন,—"এখনও কি দেবি! তোমায় আমাকে পাইতে বাকী আছে? এখনও কি তোমায় আমাকে ধরা হয় নাই? এখনও কি তোমার আমাকে প্রাণে মিশান হয় নাই?"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"না—না—প্রাণেশ্বর! এখনও অনেক বাকী। এখনও অনেক দেরি। এখনও তো আমি যে দিকে চাহিয়া দেখি, সে দিকে কেবল তোমাকে দেখিতে পাই না; এখনও তো আমার শরীরের সর্ব্বভাগ তোমাতেই ছাইয়া যায় নাই; এখনও তো ভাষায়, তোমার নাম ছাড়া, আর সকল শব্দ আমি ভুলিয়া যাই নাই; এখনও তো এক একবার তোমাকে এই মাটির চক্ষু দিয়া দেখিতে হয়; তবেই তো এখনও অনেক দূর।"

যোগানন্দ বলিলেন,—"আমি কিন্তু দেখিতেছি, তোমার আর দূর নাই; তুমি স্বামীর সহিত অভিন্ন ও তন্ময় হইয়াছ।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"তুমি বড় শঠ, বড় ধূর্ত্ত, বড় প্রবঞ্চক, তাই এ কথা বলিতেছ। তোমার কথা যদি সত্য হইবে, তবে এক একবার আমার প্রাণ শূন্য হয় কেন? এক একবার তোমাকে হারাই কেন? কিন্তু তা হউক, আমি তোমাকে ধরিয়া নিশ্চয় এই প্রাণের ভিতর বাঁধিয়া ফেলিব। আমি তোমাকে এই হৃদয়-মন্দির হইতে আর এক পাও নড়িতে দিব না। তুমি যতই দূরে থাক, আমি যুগ যুগ—জন্মে জন্মে ছুটিয়া ছুটিয়া তোমাকে ধরিবই ধরিব। কত দিন তুমি আমাকে ফাঁকি দিয়া কাটাইবে? আমার এ সাধনার অন্ত নাই; তোমারও অন্ত নাই। দেখিব আমি, তোমার চাতুরীর কত দূর সীমা।"

যোগানন্দ বলিলেন,—"তোমাকে ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব; তোমার নিকট হইতে দূরে থাকা অসাধ্য। তোমার দৃঢ়তা তোমার পতিময়তা, তোমার ভক্তি, তোমার প্রেম সকলই অদ্ভুত! তাহার হাত ছাড়ায় কাহার সাধ্য?"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিয়া দুষ্ট তুমি চিরদিন অনেকেরই সর্ব্বনাশ করিয়া আসিতেছ। আমি তোমার কথায় ভুলি না! তুমি যাদুকর। এই তোমার এক ভাব, আবার এখনই অন্যরূপ। এই তুমি কাছে, এই তুমি দূরে। এই তোমার হাসি, এই তোমার কান্না। তোমাকে বিশ্বাস নাই। তোমার ভাল মন্দ বুঝিয়া উঠা অসম্ভব। আমি তোমার কথায় কখনই ভুলিব না। অনেকে তোমার আশ্বাস বাক্যে ভুলিয়া শেষে কাঁদিয়া মরিয়াছে। আমি সেরূপ কাঁদিয়া মরিব না। তোমাকে হৃদয়ে বাঁধিয়া অনন্তে গা ঢালিব এবং অনন্তের সহিত মিশিয়া অনন্ত আমোদে মজিয়া রহিব, ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা। আমি তোমার কথা শুনিব কেন? তা হউক—আমি এখন আসি—তোমার জন্য চাঁপাফুলের মালা গাঁথিতে হইবে।"

যোগানন্দ বলিলেন,—"ছেলের সঙ্গে দেখা করিবে না? ছেলে যে তোমায় মা মা বলিয়া সারা হয়।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"ছেলে—হাঁ ঠিক কথা। তুমি আমার ঘাড়ে আবার ছেলে চাপাইয়াছ বটে—আবার পুত্র-বধূ; সংসার ধর্ম্ম সবই চাপাইয়া আমাকে পাকা গৃহস্থ করিয়া তুলিবে মনে করিয়াছ। তা চাপাও, তোমার যত মনে আছে! আমি কোন ভাবেই নারাজ হইব না। কিন্তু মনে করিও না তুমি যে, আমি এই সকল ভার লইয়া, এই সকল আমোদে মত্ত হইয়া,

তোমাকে ছাড়িব বা ক্ষণেকের নিমিত্তও তোমার সঙ্গ-শূন্য হইব। আমার কাছে তোমার আর ফাঁকি চলিবে না। হাঁ—ছেলের কথা বলিতেছিলে—ছেলের সঙ্গে দেখা করিতে হইলে দেরি হইবে—আমার চাঁপাফুল শুকাইয়া যাইবে। ছেলে এখন বড় ব্যস্ত—বাছা এখন বড়ই সুখে একটি মেয়ের মুখপানে চাহিয়া আছে

যোগানন্দ জিজ্ঞাসিলেন,—"কে সে মেয়ে? কোথায় সে মেয়ে?"

যোগেশ্বরী হাসিয়া বলিলেন,—"এত প্রতারণাও তুমি জান! কেন জান না তুমি সে মেয়ে কে? নীলরতনের কন্যা অন্নপূর্ণা, তোমার ভাবী পুত্র-বধূ।"

যোগানন্দ বলিলেন,—তোমার বাক্য কখনই মিথ্যা হইবে না। তুমি যখন অন্নপূর্ণাকে পুত্র-বধূ বলিয়া উল্লেখ করিলে, তখন নিশ্চয়ই তাহাই হইবে; কিন্তু সম্ভাবনা কিছুই দেখা যাইতেছে না।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"তোমার কথা কখনই মিথ্যা হইবে না। তুমি যখন উমাশঙ্কর রাজরাজেশ্বর হইবে বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাক, তখন নিশ্চয়ই তাহা হইবে। কিন্তু আপাততঃ সম্ভাবনা কিছুই দেখা যাইতেছে না।"

যোগানন্দ কহিলেন,—"তোমার কি এই অভিপ্রায় যে, এমন শাস্ত্রজ্ঞ ধর্ম্মনিষ্ঠ বালক, সন্ন্যাসের পথে থাকিয়াও আবার ইহা ছাড়িয়া স্ত্রী-পরিবার সমন্বিত হইয়া বিষয়সুখে মত্ত হউক।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"আমাকে ফাঁকি দেও কেন ঠাকুর? যাহাকে যাহা তুমি করাইবে সে তাহাই হইবে তোমার ইচ্ছা সংসারের সর্ব্ব সুখৈশ্বর্য্য সংবেষ্টিত সন্ন্যাসীর দৃষ্টান্ত দেখাইবে। এই পরম ভাগ্যবান্ বালক তাহার উপলক্ষ। নহিলে বাল্যকাল হইতে তোমার ন্যায় পরমগুরুর আশ্রয় লাভ কাহারও অদৃষ্টে ঘটে কি? তা শিষ্য গুরুর নাম রাখিতে পারিবে। তোমার সংকল্প সিদ্ধ হইবে। তা আমি এখন আসি—অহো কি মধুর! কি রমণীয়—তোমার ঐ অঙ্গ-স্পর্শ। আমার দেহ পুলকে পূর্ণ হইল, নয়ন জলতারাকীর্ণ হইল। এইরূপ সঙ্গ যেন অবিশ্রান্ত থাকে। প্রভো! আবার চুম্বন, আবার আলিঙ্গন! কি সুখ! কি আনন্দ!"

যোগেশ্বরী মুকুলিত নয়নে, শিথিল শরীরে অবসিত ভাবে তথায় বসিয়া পড়িলেন, সর্ব্ব শরীর কণ্টকিত ও বিকম্পিত হইয়া উঠিল! অতি স্নিগ্ধ ঈষদ্ধাস্য ওষ্ঠ-প্রান্তে লাগিয়া রহিল। ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস হেতু হৃদয় বেপিত হইতে থাকিল। মস্তক বক্রভাবে স্কন্ধের উপর ঢলিয়া পড়িল। যোগানন্দ নীরবে সেই প্রেমময়ীর অলৌকিক প্রেমের অদ্ভুত লীলা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। মনে ভাবিলেন, যতক্ষণ মানবের এই ভাবে ভগবানের সহিত সম্পর্কানুরূপ সঙ্গ না ঘটে, ততক্ষণ সকলই বৃথা। হায় কবে আমাদের এরূপ সৌভাগ্যোদয় হইবে? এরূপ ভগবদ্ ভক্ত দর্শন করাও ভগবদ্ দর্শনের তুল্য ফলপ্রদ। আমার কি শুভাদৃষ্ট! এই মূর্ত্তিমযী জীবন্মুক্তা দেবীর দর্শন লাভ আমার ঘটিতেছে। যোগানন্দ ভক্তি সহকারে তত্রত্য ধূলিতে মস্তক স্থাপন করিয়া যোগেশ্বরীকে প্রণাম করিলেন। তাঁহার লোচন অশ্রুভারা ক্রান্ত হইল।

তিনি প্রণামান্তে যখন মস্তকোত্তোলন করিলেন, তখন দেখিলেন, কুটির দ্বারে হরকুমার বাবু দণ্ডায়মান। হরকুমার বলিলেন, —"কি সৌভাগ্য আমি এক সঙ্গে মাকে ও

বাবাকে উভয়কেই দেখিতে পাইলাম।" তিনি ভক্তি সহকারে সেই পুণ্য-প্রদীপ্ত অলৌকিক দম্পতীকে প্রণাম করিলেন।

যোগেশ্বরী ব্যস্ততা সহ গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন, হরকুমার! বলিলেন,—"হাঁ বাবা! তোমার সংকল্প সিদ্ধ হইবে, কিন্তু অনেক বিলম্ব, অনেক বাধা।"

হরকুমার বলিলেন,—"হউক বাধা, হউক বিলম্ব মা, তাহাতে ক্ষতি বোধ করি না। কিন্তু আপনার দয়ায় যত্ন সফল হইলেই হয়।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"যাহার কর্ম্ম তিনিই সব করাইবেন।" যোগানন্দের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"এই যে মহাপুরুষটী দেখিতেছেন, ইনি বড় শক্ত ঠাকুর। করেন সব, করান সব, জানেন সব, বুঝেন সব, তথাচ যেন কিছুই নহেন, কেহই নহেন। উঁহার ছেলে উমাশঙ্কর। মহাপুরুষের ছেলে মহাপুরুষই হইবে। আপনার পরিশ্রম নিষ্ফল হইবে না। উনি ছেলেকে রাজা করিবেন ইচ্ছা করিয়াছেন। কাহার সাধ্য তাহার অন্যথা করে?"

কেহ কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই, যোগেশ্বরী বেগে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। যোগানন্দ ও হরকুমার অবাক্ হইয়া তাঁহার পরিগৃহীত পন্থার দিকে চাহিয়া রহিলেন। অচিরে যোগেশ্বরী তাঁহাদের দৃষ্টি সীমা অতিক্রম করিলেন। হরকুমার বলিলেন,—"উঁহার অনুসরণ করিব কি?"

যোগানন্দ বলিলেন,—"নিষ্প্রয়োজন।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বাঙ্‌নিষ্ঠা।

অন্নপূর্ণার অসুখ হইয়াছিল; এখন ভাল হইয়াছে। শরীরের একটু দুর্ব্বলতা, একটু পাণ্ডুতা মাত্র আছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মূর্ত্তির কি শোভাই হইয়া উঠিতেছে। এখনও অন্নপূর্ণা বালিকা—এখনও অপ্রাপ্তযৌবনা। এখনই এত শোভা—এতই পূর্ণতা। আর অল্পকাল মধ্যেই এই কিশোরী যৌবনের-মোহময় রাজ্যে প্রবেশ করিবেন। না জানি কি স্বাভাবিক অপরূপ সৌন্দর্য্য ইহাকে আশ্রয় করিবে।

মধ্যাহ্নকালে অন্নপূর্ণা একাকী বসিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের একখানি বঙ্গানুবাদ পাঠ করিতেছেন। প্রথম স্কন্ধের শেষ ভাগে রাজা পরীক্ষিতের মৃগয়াগমন, শমীকের গলে মৃত সর্প প্রদান, তদনন্তর ঋষিতনয় শৃঙ্গীর নিদারুণ অভিশাপ ব্যাপার পাঠ করিলেন এবং সেই শাপের প্রভাবে পরীক্ষিতের পরিণাম-ফলও মনে মনে আলোচনা করিলেন। অনেক কথা ভাবিতে লাগিলেন বালক শৃঙ্গীর তেজস্বিতা, পিতার অপমান দর্শনে জ্বলন্ত ক্রোধ, স্বকীয় ক্ষমতায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস ইত্যাদি অনেক কথা তিনি মনে মনে আন্দোলন করিলেন। তাহার পর মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"ধন্য এই মুনি বালক! ধন্য তাঁহার তেজ ও বাঙ্‌নিষ্ঠা। শমীক ঋষি পুত্রের এই ব্যবহারে নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবিকই রাজা পরীক্ষিত বড়ই অন্যায় কাজ করিয়াছিলেন। তিনি বিজ্ঞ, প্রবীণ ধার্ম্মিকবর; বৃদ্ধ ঋষির প্রতি তাঁহার

এ ব্যবহার ভাল হয় নাই। এরূপ অন্যায় ব্যবহারের শাস্তি না হইলে, ন্যায়ময় ভগবানের সুবিচারে কলঙ্ক হইবে যে। শৃঙ্গীর অভিসম্পাতে রাজার দুষ্কর্ম্মের সমুচিত শাস্তি হইয়াছে। শৃঙ্গীকে নিমিত্ত কারণ করিয়া ভগবান্ রাজাকে বিহিত শাস্তি প্রদান করিয়াছেন। শৃঙ্গী এরূপ রাগ না করিলে ভাল হইত বটে, কিন্তু তাঁহার ক্রোধ অন্যায় বা অসঙ্গত বলা যায় না, সার্থক তেজ এই ঋষি-বালকের। কোথায় প্রবল-প্রতাপ মহারাজ চক্রবর্ত্তী পরীক্ষিত, আর কোথায় আশ্রম-পালিত দরিদ্র-মুনি-নন্দন শৃঙ্গী। অথচ বিশ্বাস, রাজার প্রভূত বলবিক্রমে যাহা না হইবে, বালকের মুখের কথায় তাহা হইবেই হইবে। বালকের অবিচলিত বিশ্বাস ছিল যে, তাহার বাক্য কখনই বিফল হইবে না। বালক জানিতেন, রাজার হয়-হস্তী সৈন্য-সেনাপতি, অস্ত্র-শস্ত্র কিছুই তাঁহাকে বালকের ক্রোধাগ্নির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। বাক্য সকলেই সারাদিন ব্যয় করে, তাহার কয়টা ফলে? রাগ করিয়া লোক লোককে নিরন্তর গালি দেয়, তাহার কয়টা গালি সফল হয়? কিন্তু এই শৃঙ্গীর বিশ্বাসও যেমন অটল, তাঁহার বাক্যও তেমনই সফল। কি করিলে এরূপ বাঙ্‌নিষ্ঠা জন্মে? বাক্য কথনের ক্ষমতা লাভ করিয়া যদি তাহা এরূপ ফলবান্ করিতে না পারা যায়, তবে বৃথা বাক্য-কথনের শক্তি। বাক্য সত্য ভিন্ন যেন কদাপি মিথ্যা না হয়, ইহাই আমার প্রার্থনা। কিন্তু শৃঙ্গীর ন্যায় ক্রোধ-ভরে কাহারও অনিষ্ট সাধনোদ্দেশে যেন তাহার কখন অপব্যবহার করিতে না হয়।"

তিনি যখন এইরূপ আলোচনা করিতেছেন, সেই সময়ে নীলরতন বাবু তথায় প্রবেশ করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—"বই পড়িতেছ বুঝি? সারাদিন পড়া ভাল নয়। এখনও শরীর ঠিক্ সারে নাই, আবার মাথা ধরিয়া অসুখ হইতে পারে।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"পড়িতেছিলাম বটে কিন্তু এখন আর পড়িতেছি না বাবা। একটা কথা ভাবিতেছি। তুমি আমাকে বলিয়া দেও, কি করিলে কোন কথাই মিথ্যা না হয়, কি করিলে যাহা বলা যায় সকলই সফল হয়।"

নীলরতন হাসিয়া বলিলেন,—"বড় শক্ত কথা। এ কালে তা আর বড় দেখা যায় না। এ কালের মানুষের সকল কথাই নিষ্ফল, যদি এক আধটা কখন সত্য হয়, সে জানিবে দৈবাৎ।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"কেন বাবা, এ কালটার কি দোষ? আগেও চন্দ্র-সূর্য্য ছিলেন, এখনও আছেন, আগেও দেবতা বামুন ছিলেন, এখনও আছেন। এখন তবে মানুষের কথার শক্তি লোপ হইল কেন?"

নীলরতন বলিলেন,—"মানুষ এখন বড় পাপী, বড় অধার্ম্মিক হইয়াছে। যে ব্যক্তি জীবনে কখন পাপ করে না, পরের উপকার ভিন্ন অপকার করে না, ভ্রমেও কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করে না, স্বার্থের ভাবনা ভাবে না, ভুলিয়া বা পরিহাসেও মিথ্যা কথা কহে না, নিয়ত বাক্যসংযম অভ্যাস করে, সত্য ছাড়া কথা নাই বলিয়া জানে, কথা মুখ হইতে বাহির হইলেই সত্যই হইবে বলিয়া বিশ্বাস করে, সর্ব্ব বিষয়েই যে লোক নিষ্ঠাবান্, তাঁহারই বাঙ্‌নিষ্ঠা হওয়া সম্ভব। এ কালে সে রকম লোকও নাই, কথায় সফলতাও নাই।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"তুমি যাহা বলিলে

বাবা, তাহা তো এখনও করা যাইতে পারে। তাহার একটাও তো অসাধ্য কার্য্য নহে। তবে বাবা, এখন সেরূপ বাঙ্‌নিষ্ঠ লোক দেখা যায় না কেন?”

নীলরতন বলিলেন,—“দেখা যে নিতান্ত যায় না, এমন নহে। দৈবাৎ দুই একজন সংসার-ত্যাগী সাধু মহাত্মা এখনও দেখা যায়, তাঁহাদের বাঙ্‌নিষ্ঠা অদ্ভুত। তোমার যে দিন কঠিন পীড়া হইয়াছিল, সে দিন কে তোমাকে বাঁচাইয়াছিলেন জান? উমাশঙ্কর ঠাকুর সে দিন তোমার যোগশান্তি করিয়া আমাদের সকলের জীবন দান করিয়াছিলেন। তোমার অজ্ঞানের ও বিকারের ভাব দেখিয়া আমরা সকলেই ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইয়া ছিলাম। এমন সময় উমাশঙ্কর আসিয়া আমাদের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন এবং তোমাকে নিজেও দর্শন করিলেন। তাহার পর আমাদের বলিলেন,—“আপনারা স্থির হউন; ভয়—চিন্তা ত্যাগ করুন।” তিনি এক আসনে উপবেশন করিলেন এবং কিয়ৎকাল ধ্যানে মগ্ন থাকিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। তদনন্তর এক অঞ্জলি গঙ্গাজল মন্ত্রপূত করিয়া তোমার সকল শরীরে সেচন করিয়া দিলেন। তখনই তিনি চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন,—“কালি প্রাতে অন্নপূর্ণা সুস্থ হইবেন। ঔষধাদির প্রয়োজন নাই।” তাহাই ঠিক হইল। পরদিন প্রাতে তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া শয্যায় উঠিয়া বসিলে। আমরা আনন্দে স্বর্গ হাতে পাইলাম। এরূপ বাঙ্‌নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত এখন বড় বিরল।”

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—“ঐ—ঐ সন্ন্যাসী—

অন্নপূর্ণা বুঝিলেন, উমাশঙ্করের নাম উচ্চারণ করিতে তাঁহার রসনা অশক্ত। তিনি চেষ্টা করিয়া সে নাম বলিয়া উঠিতে পারিলেন না। মনে মনে বড় লজ্জা হইল। কেন সহসা এ পরিবর্ত্তন ঘটিল? আবার বলিলেন,—“ঐ সন্ন্যাসী বাস্তবিকই মহাপুরুষ।” অন্নপূর্ণা আরও কি বলিতেন, কিন্তু বলা হইল না। বদন নত করিলেন।

একি লজ্জা! কোন অপরাধ নহে, কোন দুষ্কর্ম্ম নহে, তথাপি একি লজ্জা! একটা নাম উচ্চারণ করিতে, একজন শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তির প্রসঙ্গ ব্যক্ত করিতে, একি সঙ্কোচ! সঙ্কোচ অমূলক ও অকারণ হইলেও, ইহার কার্য্য বড়ই নিশ্চিত ও মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন-পরিচায়ক। এক জনকে এক জন ভালবাসে; তাহাতে লজ্জার কোন কারণ নাই সত্য। যদুকে হরি বড় ভালবাসে; যদু কাদম্বিনীকে বড় ভালবাসে; কাদম্বিনী রামলালকে বড় ভালবাসে; এরূপ ঘটনা নিত্য ঘটিয়া থাকে এবং তাহা ব্যক্ত করিতে কেহই কুণ্ঠিত, সঙ্কুচিত ও লজ্জিত হয় না। কিন্তু যদি সেই ভালবাসার মধ্যে এমন কোন আকর্ষণ থাকে, যাহা লোকে জানে না, বা, লোককে না জানানই দরকার সেখানেই লজ্জা ও সঙ্কোচ দেখা দেয়। যেখানে আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা একটু অধিক দূর যায় বা যাইতে চাহে, সেখানেই লজ্জা ও সঙ্কোচ দেখা দেয়। যেখানে প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতা না থাকিলেও তাদৃশ অবস্থা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়, সেই খানেই লজ্জা ও সঙ্কোচ দেখা দেয়। যেখানে অনুরাগ অননুভূত-পূর্ব্ব ও অকল্পিতপূর্ব্ব মিষ্টতা উপলব্ধি করে সেখানেই লজ্জা ও সঙ্কোচ দেখা দেয়। অন্নপূর্ণে। লজ্জা ও সঙ্কোচ তোমাকে অধিকার করিয়াছে। সুতরাং তোমার হৃদয়-ভাব, যেমন করিয়াই তুমি প্রচ্ছন্ন কর না কেন, আর তাহা কাহারও

বুঝিতে বাকী থাকিতেছে, না। যাহাকে তুমি সহায় জ্ঞান করিতেছ, তাহাই এখন তোমার বিরুদ্ধাচারী। যে লজ্জা ও সঙ্কোচকে তুমি হৃদয়ভাবের সংগোপক মনে করিতেছ, বস্তুতঃ তাহারাই সেই হৃদয়ভাবের প্রকাশক।

আমরা দেখিয়াছি, উমাশঙ্করও স্বয়ং এই রূপ লজ্জা ও সঙ্কোচের অধীন হইয়া পড়িয়াছেন। সন্ন্যাসিন্! তোমার হৃদয়ে এ অননুভূত-পূর্ব্ব অনুরাগ কেন জন্মিল? ইহা কি তোমার পরিগৃহিত জীবনের অনুকূল? অন্নপূর্ণে! তোমার হৃদয়ে এ অননুভূত-পূর্ব্ব অনুরাগ কেন জন্মিল? তুমি বিত্তবশালী গৃহস্থ-তনয়া। সন্ন্যাসীর সহিত তোমার মিলন কখনও সম্ভবপর কি? তোমাদের উভয়েরই অনুরাগের ক্রমোন্নতি দেখিতেছি বটে, কিন্তু জানি না ইহার পরিণাম কিরূপ হইবে। আমরা কার্য্যের লিপিকারক মাত্র। বর্ত্তমান দেখিয়া ভবিষ্যতের অনুমান করিতে আমাদের অধিকার নাই। সুতরাং আমরা কি বলিব? কিন্তু বর্ত্তমান ব্যাপার সমূহ তোমাদের ভবিষ্যৎ আশার বড়ই বিরোধী।

কন্যার এইরূপ সঙ্কোচ দেখিয়া নীলরতন কিছু অনুমান করিতে পারিলেন কি? তিনি চতুর, বুদ্ধিমান্। এ অনুমান তিনি আরও পূর্ব্বেই করিয়াছেন। কিন্তু কন্যার হৃদয়-জাত এই প্রবৃত্তির বেগ নিরুদ্ধ করিতে তাঁহার ইচ্ছা নাই। এই অনুরাগ প্রবর্দ্ধিত হইতে না দেওয়াই তাঁহার পক্ষে বিধেয় হইলেও, তিনি তাহা করিতেছেন না। অঙ্কুরেই এই মনোবৃত্তিকে দলিত করিয়া দেওয়াই তাঁহার কর্ত্তব্য হইলেও, তিনি তাহা করে নাই।

হৃদয়-ভাব সম্পূর্ণরূপে পরিব্যক্ত করিতে না পারিয়া অন্নপূর্ণা নিরস্ত হইলেন এবং বদন বিনত করিলেন। নীলরতন বলিলেন,—"বাস্তবিকই মা, ঐ সন্ন্যাসী উমাশঙ্কর প্রকৃত মহাপুরুষ। বাক্‌সিদ্ধি লাভের সদুপায় তিনি সম্যক্ পরিজ্ঞাত আছেন; অতএব তাঁহার নিকট এ সম্বন্ধের কথা উত্থাপন করিলে, তুমি অনেক সদুপদেশ লাভ করিতে পারিবে।"

অন্নপূর্ণা নীরব। ঘটনাক্রমে এই সময়ে স্বয়ং উমাশঙ্কর, একটি কাগজের পুরিয়া হাতে করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং নীলরতন বাবুর হস্তে তাহা প্রদান করিয়া বলিলেন,—"আপনি অকৃত্রিম মুক্তা ভস্ম সংগ্রহ করিতে বলিয়াছিলেন। ইহা যে ব্যক্তির নিকট পাইয়াছি, তাহাতে অকৃত্রিম বলিয়া মান করা যাইতে পারে।"

নীলরতন তাহা গ্রহণ করিলেন। উমাশঙ্কর অন্নপূর্ণার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—শরীর ক্রমে সবল বোধ হইতেছে?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"হাঁ।"

নীলরতন বলিলেন,—"আমরা এখনই তোমার কথা বলিতেছিলাম। অন্নপূর্ণা জানিতে চাহেন, কি করিলে বাক্‌সিদ্ধ লাভ করা যায়। আমার যাহা ধারণা তাহা আমি বলিয়াছি। কিন্তু এ সকল বিষয়ে তোমার অভিপ্রায়ই বিশেষ সমাদরণীয়। এই জন্য আমি তোমার নিকট হইতেই এ বিষয়ক উপদেশ লইতে বলিয়াছি।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"বড় শক্ত কথা আপনারা উত্থাপন করিয়াছেন এবং বড় কঠিন বিষয়েই আমাকে অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে আজ্ঞা করিতেছেন।"

উমাশঙ্কর একবার অন্নপূর্ণার মুখের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, সেই সুন্দর বদন, প্রীতিপূর্ণ ভাবে তাঁহারই মুখের দিকে চাহিয়া,

সাগ্রহে তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিতেছে। তিনি চাহিবামাত্র, সে বদন একটু লজ্জা সহকৃত সঙ্কুচিত ভাবে নত হইয়া পড়িল।

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আমার বিশ্বাস সংকল্পই ইহার প্রধান সাধন। সংকল্প হইলেই মনের দৃঢ়তা জন্মে; মনের দৃঢ়তা হইলে, অসাধ্য সাধন হওয়াও অসম্ভব নহে। কখন অলীক বাক্য বলিব না, ইহাই যাহার আন্তরিক সংকল্প, তাহার মুখ দিয়া কখনই অলীক বাক্য নির্গত হয় না। যাহার বাক্যের বন্ধন নাই, বিচার নাই, এবং কোন গুরুত্ব নাই, তাহার বাক্য অসার ও নিস্ফল। বাক্য ব্রহ্মস্বরূপ। বেদ বাঙ্ময়, শাস্ত্র বাঙ্ময়, মন্ত্র বাঙ্ময়, স্তব-স্তুতি বাঙ্ময়। সংসার বাক্য-সূত্রে গ্রথিত; সুতরাং এই বাক্য নিতান্ত পবিত্র সামগ্রী। ইহাকে সামান্য কার্য্য জ্ঞান করিয়া অসতর্ক ভাবে ইহার ব্যবহার করিলে মানবের কোনই আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে পারে না; অতএব বাক্‌শক্তি সম্পন্ন হইলেও, বাক্‌যন্ত্রের অপব্যবহারকারী মানব চিরদিন পশুরই সমতুল্য থাকিয়া যায়। জীবনের মধ্যে বাক্-সংযম বড়ই শুভলক্ষণ ও প্রধান সাধনা। মৌনী ও নিরুদ্ধ-বাক্ তপস্বী সত্বর জ্ঞানের অধিকারী হইয়া থাকেন। শিথিল-ভাষীরা চিন্তাহীন ও গাম্ভীর্য্য-হীন হইয়া থাকেন। তাদৃশ অবস্থায় কখনই হৃদয়ের বল বা একাগ্রতা লাভ করা যায় না। অতএব বাক্য বড়ই সাবধানতার সহিত ব্যবহৃত হওয়া বিধেয়। যিনি বাগ্‌যন্ত্রের ব্যবহারে সম্পূর্ণ সাবধান, তাঁহার বাঙ্‌নিষ্ঠা লাভ করা সম্ভব। আমি সংক্ষেপে এতদ্বিষয়ক প্রধান সাধনের বিষয় বলিলাম মাত্র। ইহার সহকারী আরও অনেক উপায় আছে। কিন্তু সহসা এ সিদ্ধি লাভের জন্য অন্নপূর্ণার এত আগ্রহ কেন জন্মিল?"

নীলরতন বলিলেন,—"বল মা, হঠাৎ তোমার মনে এ বিষয়-জ্ঞানের বাসনা কেন জন্মিল?"

লজ্জায় অন্নপূর্ণার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি অধোমুখে উত্তর দিলেন,—"ভাগবত পাঠ করিতে করিতে একটা ভাবের উদয় হইয়াছে। কিছু নয়।"

সে স্থানে বসিয়া থাকা অন্নপূর্ণার পক্ষে বড়ই কঠিন হইয়া পড়িল। উঠিয়া যাইতে—উমাশঙ্কর কথা বলেন, তাহা শুনিবার লোভ ত্যাগ করিয়া উঠিয়া যাইতেও ইচ্ছা নাই। কিন্তু বড় লজ্জা—আর বসিয়া থাকা যায় না, অন্নপূর্ণা উঠিলেন। নীলরতন বলিলেন,—"কোথা যাও মা?"

"পিসিমার কাছে।"

দুই পদ অগ্রসর হইলেন। লজ্জায় ও সঙ্কোচে পায় পায় জড়াইয়া যাইতে লাগিল। একবার ফিরিয়া উমাশঙ্করের মুখের পানে চাহিয়া দেখিবার নিমিত্ত প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তথাপি দেখিতে ভরসা হইল না। বইখানি লইয়া যাইবেন ইচ্ছা ছিল। দুই চারি পা যাওয়ার পর তাহা মনে পড়িল। কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া বই লইতে সাধ্য হইল না, এ অবস্থা সুখময় কি দুঃখময়? অন্নপূর্ণা বাহিরে আসিয়া বেগে প্রস্থান করিলেন।

একবার সেই দেবী প্রতিমার প্রতি চাহিয়া দেখিতে উমাশঙ্করের ইচ্ছা ছিল। যতক্ষণ তিনি দৃষ্টি সীমার মধ্যে ছিলেন, ততক্ষণ তাঁহার সে সাহস হইল না। যখন সাহসে ভর করিয়া দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন সে দেবী দৃষ্টি সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছেন। একটী অস্ফুট দীর্ঘ নিশ্বাস তাঁহার হৃদয় ভেদ করিয়া নিঃসৃত হইল। মুখখানি একটু নিষ্প্রভ হইল।

এই সময়ে হরকুমার বাবু বাহির হইতে বলিলেন, "দাদা কোথায় গো ?"

নীলরতন বলিলেন,—"এস ভায়া।"

হরকুমার বাবু তথায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"দেশ হইতে দুইটি পূর্ব্ব পরিচিত আত্মীয় আসিয়াছেন। তাঁহারা আপাততঃ কাশীবাস করিবেন মনস্থ করিয়াছেন। তাঁহাদের জন্য সমস্ত দিন বড়ই ব্যস্ত ছিলাম। এজন্য এদিকে আসা হয় নাই। মা কোথায় ? আর কোন অসুখ নাই তো ?"

নীলরতন বলিলেন,—অন্নপূর্ণা এখানেই ছিলেন, এই চলিয়া যাইতেছেন। ভালই আছেন।"

হরকুমার বলিলেন,—"বাবাজি ! যোগেশ্বরী দেবীর সহিত আজি আপনার সাক্ষাৎ হইয়াছিল কি ?"

উমাশঙ্কর উত্তর দিলেন,—"না"

হরকুমার আবার বলিলেন,—"আপনাকে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন আছে। আজিই দরকার। ছেলেবেলার কোন কথা আপনার মনে পড়ে কি ?"

"কি রকম কথা ?"

কোন লোকের কথা ? কাহারও চেহারা? কাহারও মুখের ভাব ?"

উমাশঙ্কর চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"একটী সুন্দরী নারীর কাতর মুখ আমার মনে পড়ে। তিনি আমার কে, বা তাঁহার কি হইল, অথবা কেনই তাঁহাকে আর দেখিতে পাই না, তাহা আমার মনে নাই। ভাবিলেও সে কথা আমার মনে পড়িবে না। ইহা ছাড়া আর কোন কথা আমার মনে হয় না।"

হরকুমার আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"আচ্ছা, সেই যে মুখ মনে পড়ে, তাহার অনুরূপ মুখ আর কোথায় আপনি কখন দেখিয়াছেন ?"

"না।"

"সে মুখখানি কেমন তাহা আপনি বুঝাইয়া দিতে পারেন ?"

উমাশঙ্কর কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না। তবে ইদানীং যদি কখন দৈবাৎ আমি আমার প্রতিরূপ দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমার চক্ষু দেখিয়া সেই মুখখানি, সেই চক্ষু দুটী মনে পড়ে।"

হরকুমার অনেকক্ষণ চিন্তা করিতে থাকিলেন। তাহার পর বলিলেন,—"আমি আগামী কল্য হইতে কিছু দিনের জন্য এ দেশে থাকিব না। আপনাদের নিকট আপাততঃ বিদায় লইতেছি।"

উমাশঙ্কর জিজ্ঞাসিলেন,—"কতদিন আপনার বিলম্ব হইতে পারে বোধ করেন ?"

হরকুমার বাবু বলিলেন,—"ঠিক বলা যায় না। একমাস ছাড়াইবে বোধ হয় না।"

নীলরতন জিজ্ঞাসিলেন,—"যে দুইজন আত্মীয় আসিয়াছেন, তাঁহাদের থাকিবার স্থানাদি সব ঠিক হইয়াছে ?"

হরকুমার বলিলেন,—"আপাততঃ একরকম বন্দোবস্ত হইয়াছে। যদি কোন অসুবিধা হয় তাহা হইলে তুমি ব্যবস্থা করিয়া দিবে। সন্ধ্যার পরে তাঁহারা তোমার সহিত আলাপ করিতে আসিবেন। তাঁহারা বিশিষ্ট ব্যক্তি। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাদের দেশের প্রধান অধ্যাপক—অতি সুপণ্ডিত। সঙ্গে তাঁহার ছেলে; তাঁহারা আমার প্রভু-পুত্রের দৌরাত্ম্যে উৎপীড়িত হইয়া দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

পুত্র নবীনকৃষ্ণের সহধর্ম্মিণীকে আমার পূর্ব্ব-প্রভু শ্যামলাল হরণ করিবার চেষ্টা করেন। পুত্র-বধূটী কোথায় পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন, বা অপর কোন দুষ্টের হাতে পড়েন, তাহার ঠিক নাই। তাহার পর শ্যামলাল নিরীহ পিতা-পুত্রের উপর অযথা অত্যাচার করিতে থাকেন। ইহঁরা সমাজ-ভ্রষ্ট কলঙ্কিত, গৃহ-শূন্য হইয়া অবশেষে কাশী আসিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের বিপদের সবিশেষ বৃত্তান্ত তাঁহাদের মুখেই ক্রমশঃ শুনিতে পাইবে।”

নীলরতন বলিলেন,—“তবে ত বড় ভয়ানক অবস্থাতেই ইহারা পড়িয়াছেন।”

হরকুমার বলিলেন,—“যতদূর হইতে হয়। আপাততঃ আমার উদ্দেশ্য বিষয়ের কোন কোন সংবাদ সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট জানিতে পারিয়াছি। সংবাদ আমাদের অনুকূল নহে। বাধা অনেক। কিন্তু আমি হতাশ হই নাই।”

উমাশঙ্কর বলিলেন,—“আমি এক্ষণে বিদায় হই।”

নীলরতন বলিলেন,—“এস বাবা।”

তাহার পর হরকুমারের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—“চল ভায়া, আমরাও একবার মা গঙ্গার কাছে যাই।”

তাঁহারা নিক্রান্ত হইলেন।

—*—

অষ্টম খণ্ড—হলাহল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পরিবর্ত্তন।

শ্যামলাল বাবুর সেই সুবিস্তৃত বৈঠকখানার শোভা ও সমৃদ্ধি যেন অনেক কমিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে তাহার যে যে সরঞ্জাম দেখা গিয়াছিল, এখন তাহার অনেক নাই। সেই পূর্ব্বস্থানে পূর্ব্বকালের ব্র্যাকেট রহিয়াছে কিন্তু তাহার উপর যে মেকেব ক্লকটী বসান ছিল, সেটি আর এখন নাই; তাহার স্থানে একটী বাজারে টাইমপিস্ বসিয়াছে। ঘরের কোণগুলিতে ব্রঞ্জ পেডাষ্টেলের উপর মারবেল পাথরের ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গীর অনেকগুলি অতি সুন্দর নারী মূর্ত্তি বসান ছিল। আধারগুলি এখনও আছে, কিন্তু সে ছবিগুলি আর সেখানে নাই। ঘরের মধ্যস্থলে একখানি লেজারসের ওভাল মারবেল টেবিল ছিল; সে স্থানে এখন একখানি কাপড় ঢাকা কাঠের টেবিল বসিয়াছে। ইত্যাদি রূপ অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। শ্যামলাল বাবু যে শয্যায় বসিয়া আছেন, তাহারও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে। একখানি রূপার পায়া ও দাণ্ডা-যুক্ত প্রকাণ্ড খাটে, মুর কোম্পানীর আইরণ ম্যাট্রেস লাগান ছিল। সেই গদির উপর কিংখাপের চাদর মোড়া ও চারিদিকে মকমলের বালিশ দেওয়া একটী বিছানা ছিল। সেই স্থানে এখনও বিছানা আছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বভাব কিছুই নাই। সেগুণ কাঠের একখানা খাটের উপর খেরোর গদি ও বালিশ দেওয়া, একটী বিছানা সেই স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

শ্যামলাল বাবু বেলা তিনটার সময় একাকী সেই শয্যায় বসিয়া আছেন। তাঁহার আকৃতিরও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাঁহার দেহের কুত্রাপি সৌন্দর্য্যের সমাবেশ ছিল না; তথাপি নিশ্চিন্ততা ও স্বকীয় প্রাধান্যবোধ-সম্ভূত যে একটু সতেজ ভাব ছিল, এক্ষণে তাহার এক বিন্দুও নাই। দারুণ চিন্তার ভার তাঁহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। তাঁহার লোচন যুগল প্রভাশূন্য হইয়াছে, মুখমণ্ডল উদ্বেগময় হইয়াছে, ললাটে চিন্তার রেখাপাত হইয়াছে, শরীরে স্থূলতা প্রভৃত পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে, দৃষ্টি কেমন উদাস ও সন্দিগ্ধ হইয়াছে। এখন হঠাৎ তাঁহাকে দেখিলে নূতন লোক বলিয়াই মনে হয়। শ্যামলালের পার্শ্বে এখন সে রূপার সরপোস ও জিঞ্জিরযুক্ত, রজত কলিকা ও সোণার মুখনল বিশিষ্ট প্রকাণ্ড রূপার গুড়‌গুড়ি নাই। এখন একটী বাজারে সামান্য গড়গড়া তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। আর পূর্ব্বকালে নিরন্তর তাঁহার কলিকা হইতে যে সুরভিময় ধূমরাশি উদ্গত হইত, এখন তাহার কিছুই নাই। তিনি কখন তামাক টানিবেন মনে করিয়া ভৃত্যগণ যে আয়োজন সতত করিয়া রাখিত, এখন প্রয়োজনেও তাহা আর পাওয়া যায় না। শ্যামলাল কলিকায় হাত দিয়া দেখিলেন, তাহা শীতল। ডাকিলেন,—"রামা, রামা!" কেহ উত্তর দিল না, কেহও আসিল না। শ্যামলালের কণ্ঠস্বরেরও ভয়ানক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সে অত্যুচ্চ সতেজ, রাসভ-নাদ-বিস্তারী কণ্ঠ হইতে এখন ক্ষীণ, ভীত, ও কাতর ধ্বনি নিঃসৃত হইতেছে। রামা আসিল না কেহ উত্তর দিল না। যাঁহার আজ্ঞা ব্যক্ত হইবামাত্র, অসাধ্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইলেও, লোকের অভাব হইত না, আজি তাঁহার তামাক সাজিয়া দিবার জন্যও একটা লোক অগ্রসর হইল না।

কেহ আসিল না দেখিয়া, শ্যামলাল সেই অগ্নিশূন্য হুকাই দুই চারিবার টানিলেন। তাহার পর একটু চিন্তা করিয়া আবার ডাকিলেন,—"রামা—রামা—রামা!" এবারও কোন উত্তর নাই। শ্যামলাল আবার কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। তাহার পর শয্যা ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং ধীরে ধীরে দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। শ্যামলালের কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন! শ্যামলালের আর সে উচ্চ দেহ নাই। মাজা ভাঙ্গা বৃদ্ধের ন্যায়, তাঁহার দেহের ঊর্দ্ধভাগ সম্মুখে নত হইয়া পড়িয়াছে। দ্বার-সন্নিধানে গমন করিয়া, শ্যামলাল আবার ডাকিলেন, "রামা—রামা!"

এবার রামা উত্তর দিল। বলিল,—"কি? যাচ্ছি।"

শ্যামলালের মনে বড় ক্রোধের উদয় হইল। কিন্তু তিনি সে ক্রোধ সংবরণ করিয়া বলিলেন,—"একটু তামাক চাই।

রামা উত্তর দিল না। শ্যামলাল ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব্ব শয্যায় উপবেশন করিলেন। মনে অনেক চিন্তার উদয় হইল। তিনি স্বকীয় এই দশা-বিপর্য্যয় ঘটিত অনেক আলোচনা করিলেন। মনে মনে স্থির করিলেন, অদ্য তিনি তাঁহার পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এবং তাঁহার নিকট সকল কথা জানাইয়া প্রতীকারের উপায় করিবেন।

একমাস হইল শ্যামলাল স্বকীয় সমস্ত সম্পত্তি পত্নীর নামে লিখিয়া দিয়াছেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহাকে নানারূপ ক্লেশের অধীন হইতে হইয়াছে। জীবনে যে স্ত্রীর তিনি কখন মুখ দর্শন করেন

নাই, সেই স্ত্রীর নিকট তিনি দুই দিন গিয়া আপনার দুঃখের কথা জানাইয়াছেন। কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই। প্রথম প্রথম তিনি ক্রোধ ভরে হরিচরণের সর্ব্বনাশ করিবার সংকল্প করিয়াছেন; কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। হরিচরণ তাঁহার ভাব দেখিয়া আর তাঁহার নিকটে আইসেন না। দ্বারবান্ ভৃত্য, সহিস, কোচম্যান্ কেহই আর তাঁহার কথা শুনে না। অগত্যা তাঁহাকে এখন অনেক অনুসন্ধান করিয়া হরিচরণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয়। সাক্ষাতে হরিচরণ বলিয়াছেন,—"আপনি যদি আমার সহিত রাগারাগি করেন, তাহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই। আমি আপনার ভালর জন্যই দান পত্র লেখাইয়া দিয়াছি। আপনি তাহা ভাল মনে না করিলে আমি নাচার। এক্ষণে গিন্নি আমার নিকট কাগজ পত্র বুঝিয়া লইয়া আমাকে বিদায় দিলে আমি চলিয়া যাই।'

শ্যামলাল বুঝিয়াছেন, তাহাকে কোন কথা বলায় ফল নাই। তখন তিনি নিতান্ত কাতর ভাবে, তাহার নিকট, আর কিছু না হউক, দিনান্তে এক বোতল মদের দাম ভিক্ষা করিয়াছেন। উত্তরে হরিচরণ বলিয়াছে যে, গিন্নীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহার কোন কাজই করিবার ক্ষমতা নাই, একটি পয়সাও ব্যয় করিতে অধিকার নাই। কাজেই গিন্নীর কাছে দরবার না করিলে, বা তাঁহার হুকুম বাহির করিতে না পারিলে, শ্যামলালের আর কোন ভরসাই নাই।

শ্যামলাল অনন্তরজাত সকল ঘটনাই মনে মনে আন্দোলন করিলেন। স্থির করিলেন, আর একবার গিন্নীর সহিত দেখা করিয়া, তাহার পর এদিক ওদিক যাহা হয় করিয়া ফেলিবেন।

সুখের কোন পারাবতই আর শ্যামলালের সমীপাগত হয় না। যাহারা নিরতিশয় সৎপরামর্শ মনে করিয়া শ্যামলালকে দানপত্র প্রদান বিষয়ে প্রণোদিত করিয়াছিল, তাহারা আর কেহই দেখা দেয় না। যাহারা নূতন নূতন নারীর সন্ধান দিয়া ও সর্ব্বনাশ ঘটাইয়া শ্যামলালের অনুগ্রহ উপভোগ করিত, তাহারাও আর আইসে না। শ্যামলালের এই দশা বিপর্য্যয়ে দেশের লোক কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছে। কুলবালাগণ কতকটা ভরসা পাইয়াছে।

স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শ্যামলাল বুঝিয়াছেন, বিধুমুখী সুন্দরী বটেন। সে যে সকল নারী লইয়া মত্ত থাকে, তাহাদের তুলনায় বিধুমুখী বিম্বাধরী। স্ত্রীর সহিত আলাপ পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করিতে তাহার বড়ই বাসনা হইয়াছিল, কিন্তু কোনই সুযোগ হয় নাই। বিধুমুখী তাহাকে নিকটস্থ হইতে দেন নাই। দাসীর দ্বারা দূর হইতে দুই একটী কথা বলিয়াই বিদায় করিয়াছেন।

রামা অনেক বিলম্বে, ছোট কলিকা করিয়া একটু তামাক সাজিয়া আনিল। শ্যামলাল দুই চারিবার তাহা টানিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং ধীরে ধীরে স্বকীয় অন্তঃপুরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

অন্তঃপুর দ্বারে যে ভোজপুরী পাহারাওয়ালা ছিল, সে শ্যামলালকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল বটে, কিন্তু কোন সম্মান প্রকাশ করিল না। হতভাগ্য শ্যামলাল তাহাতে লক্ষ্য না করিয়া, দ্বার অতিক্রম করিবার উপক্রম করিলে, সে বাধা দিয়া কহিল,—"বাবু কোথা যাইতে চাহেন।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"অন্দর।"

পাহারাওয়ালা বলিল,—হুকুম নাই।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"আমার অন্দরে আমি যাইব, কাহার সাধ্য বারণ করে। কে তোমাকে এরূপ হুকুম দিয়াছে?"

পাহারা। দেওয়ানজি সাহেব।

শ্যামলাল। অন্য লোক সম্বন্ধে হুকুম দিয়া থাকিবে। আমার সম্বন্ধে কখনই সে এরূপ হুকুম দেয় নাই।

পাহারা। আপনারই সম্বন্ধে!

শ্যাম। আমার সম্বন্ধে!

পাহারা। আজ্ঞে হাঁ।

দুর্ব্বল, হীন-প্রকৃতি, চরিত্রবলবিহীন শ্যামলাল সাহস করিয়া আর কোন কথা বলিতে পারিল না। অহো কি দুর্ভাগ্য!

ঘটনাক্রমে সেই সময়ে সারদা দাসী সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সে গিন্নির কোন বার্ত্তা লইয়া হরিচরণের নিকট গমন করিয়াছিল। সে বোঝা হরিচরণের কাছে নামাইয়া, তাঁহার প্রদত্ত বোঝা লইয়া এক্ষণে আবার গিন্নির কাছে ফিরিতেছে। তাহার রকম সকম চিরদিনই বেয়াড়া, আজি কালি তাহার মাত্রা বড়ই বাড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার প্রভুতাও সর্ব্বত্র অযথা বর্দ্ধিত হইয়াছে। সে সর্ব্বেশ্বরী গিন্নির দক্ষিণ হস্ত স্বরূপা; তাঁহার সকল কার্য্যই সারদার মন্ত্রণা সাপেক্ষ। এই বৃহৎ সংসারের এক প্রকার মালিক স্বরূপ হরিচরণ বাবুও সারদার সহিত প্রণয়-সূচক ব্যবহার করেন এবং নিরতিশয় আত্মীয়বৎ সম্ভাষণাদি দ্বারা তাহাকে পরিতৃপ্ত করেন। তাঁহাদের আত্মীয়তা বড়ই প্রগাঢ় হইয়াছে বলিয়া অনেকেই বিশ্বাস করে। সুতরাং সারদার মান ও অহঙ্কার বড়ই বাড়িয়া উঠিয়াছে। মান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সারদার চালি চলনও বাড়িয়া উঠিয়াছে। সে হাল্কা প্রাণের লোক হইলেও, বাহিরে সে এখন খুব ভারি হইয়াছে। সামান্য চাকর বাকরদের সঙ্গে সে এখন কথাই কহে না। সাহস করিয়া অন্যান্য দাস-দাসী তাহার সহিত কথা কহিতে অগ্রসরও হয় না। নিতান্ত দায়গ্রস্ত হইলে, দায়মুক্তির জন্য, বিপদে সহায়তার জন্য, সকলে সারদার শরণাগত হয় বটে; কিন্তু লোকে বড়ই সাবধান ভাবে তাহার সহিত কথা কহে; নিতান্ত ভীত ও সঙ্কুচিত ভাবে তাহার করুণা উদ্রেক করে।

সারদাকে দর্শনমাত্র সেই ভোজপুরী দ্বারবান্ সসম্ভ্রমে সেলাম করিল এবং শ্যামলাল বাবুকে, সারদার পথ ছাড়িয়া, একটু সরিয়া দাঁড়াইতে ইঙ্গিত করিল। গর্ব্বিতা বিলাসিনী সারদা, হেলিতে হেলিতে, দুলিতে দুলিতে, শ্যামলালের নিকটস্থ হইয়া বলিল,—"কে গা বাবু যে! তা এখানে কেন?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"সারদা, একবার গিন্নির সহিত দেখা করিবার দরকার হইয়াছে। তা এ হতভাগা দ্বারবান্ বেটা আমাকে যাইতে দিতে চায় না। দেখ দেখি এর আক্কেল।

সারদা একটু বক্র হাসি হাসিয়া বলিল,— "তা বাবু গিন্নির হুকুম না পাইলে ও যেতে দিতে পারে কি?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"আমার বাড়ী-ঘর, আমার বিষয়, আমার স্ত্রী; আমি যেখানে খুসি যাইব, এজন্য কাহারও হুকুম লইবার দরকার কি?"

সারদা এবার মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল,— জন্মে কখন যার মুখ খানাও দেখিতে না, বাবু, এখন তার কাছে ঘন ঘন যাওয়া আসার দরকার পড়েছে। কিন্তু সে তোমার এ শুক্‌না আদর ভালবাসে না, তোমার যখন তখন যাওয়া আসাও পছন্দ করে না। কাজেই হুকুম না পেলে দ্বারবান্ যেতে দেবে কেন?"

শ্যামলাল দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"হায়! কাল দানপত্র লিখে দিয়েই আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মেরেছি। গিন্নির তো মনে করা উচিত যে এ সকলই আমার। আমার কৃপায় তিনি আজি এই ঐশ্বর্য্যের মালিক হইয়াছেন।"

সারদা বলিল,—"গিন্নি তা মনে করেন না। তিনি মনে করেন, তাঁর অদৃষ্টে এই ঐশ্বর্য্য লাভ ছিল, তাই আপনার এমন মতি হইয়াছিল। এজন্য আপনার কাছে কৃতজ্ঞ হওয়ার কোন দরকারও তিনি দেখিতে পান না। হরিচরণ বাবুর যত্নে এ সকল কাজ ঘটিয়াছে। সে জন্ত তিনি হরিচরণ বাবুর নিকট সমূহ কৃতজ্ঞ। হরিচরণ বাবু দিন রাত্রি সকল সময়েই অন্দরে যাওয়া আসা করেন; সে বিষয়ে কোন বারণ নাই; কাহারও হুকুমেরও প্রয়োজন নাই।"

শ্যামলাল আবার দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"হরিচরণের যে অধিকার আছে, আমার নিজ বাড়ীতে সে অধিকার নাই!"

সঙ্গে সঙ্গে সারদা বলিল,—"তাতো নাইই বাবু। হরিচরণ বাবু গিন্নী ঠাকৃরুণের প্রাণের বন্ধু।"

শ্যামলাল সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিলেন,—"প্রাণের বন্ধু—হরিচরণ—যখন তখন যাওয়া আসা করে। এ সকল কি কথা সারদা?"

সারদা বলিল,—"কথা যাহাই হউক, তাতে আপনার আর ক্ষতি বৃদ্ধি কি? আপনি তো কখনই গিন্নীকে ভালবাসিতেন না, কখন একটা মুখের কথাও কহিতেন না। সে লোকের যেই বন্ধু হউক, আর যার সঙ্গেই তার মনের মিল হউক, তাতে আপনার কি?"

শ্যামলাল এ সকল সংবাদই শুনিয়াছেন, জানিয়াছেন, বুঝিয়াছেন। তথাপি কথাটা তাঁহার মুখের উপর এরূপ প্রকাশ্য ভাবে বলায় তিনি একটু ব্যথিত হইলেন। শ্যামলাল অনেকক্ষণ অধোবদনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সারদা বলিল,—"গিন্নির সঙ্গে দেখা করা যদি নিতান্তই আপনার দরকার হয়ে থাকে, তা হলে এখন আপনি ফিরে যান। আমি তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা ঠিক করে সময় মত আপনার কাছে খবর পাঠাইয়া দিব।"

শ্যামলাল জিজ্ঞাসিলেন,—"এখন দেখা হবে না তবে? কেন এখন দেখা হওয়ায় কি দোষ ছিল?"

সারদা বলিল,—"দোষ কিছু নয়—তবে এখন ঘণ্টা খানিকের মধ্যে হরিচরণ বাবুর আসিবার কথা আছে। সুতরাং এখন কোন মতেই আপনার যাওয়া হতে পারে না।"

শ্যামলাল বলিল,—"কেন হইতে পারে না? আইসে হরিচরণ আমার সম্মুখেই আসিবে। তাহার কথা আমার সম্মুখেই সে বলিবে। হরিচরণ কখন আসিবে তাহার ঠিক নাই; সে চাকর আমি মুনিব। তাহার জন্য আমি স্বামী দরজা হইতে ফিরিয়া যাইব।"

সারদা বলিল,—"হরিচরণ বাবুর আগমন আপনার সম্মুখে হইতে পারে না। তাঁহার কথাবার্ত্তা অনেক রকম; লোকের সামনেও তাহা হয় না। চাকর তিনি ছিলেন বটে, কিন্তু গিন্নী তাঁহাকে এখন প্রাণের প্রভু বলিয়া জ্ঞান করেন। সুতরাং আপনার এখন চলিয়া যাওয়া ভিন্ন উপায় নাই। তা আপনি যান এখন, আমি আপনাকে একবার দেখা করার সুযোগ করিয়া সংবাদ দিব।"

সারদা চলিয়া গেল। অধোবদনে কাপুরুষ, নরাধম শ্যামলাল এই সকল বাক্য

শ্রবণ করিল। সে কখনই মনুষ্য ছিল না; সুতরাং মনুষ্যোচিত কোন ভাবই তাহার হৃদয়ে স্থান পাইল না। কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কাপুরুষ।

নিঃসহায় ও নিরুপায় শ্যামলাল ধীরে ধীরে ও অধোবদনে বাহিরের বৈঠকখানায় ফিরিয়া আসিবার সময় একবার আস্তাবলের নিকটস্থ হইলেন এবং জরিফ কোচম্যানকে দেখিতে পাইয়া, তাহাকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। কোচম্যান সাহেব তাঁহার পাকা কাঁচা দাড়ি গুলি তখন আয়না ধরিয়া দেখিতে ছিলেন এবং একখানি কাঠের চিরুণি লইয়া আঁচড়াইতে ছিলেন। শ্যামলাল বাবু ডাকিতেছেন দেখিয়াও, কোচম্যান হাতের কাজ ফেলিয়া উঠিয়া আসিল না। শ্যামলাল অনেকক্ষণ তাহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া পুনরায় তাহাকে ডাকিলেন। এবার কোচম্যান হাতের আয়না ও চিরুণি ফেলিয়া, শ্যামলাল বাবুর নিকটে আসিল এবং জিজ্ঞাসিল, —"বাবু, কি খবর?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"এক খানা গাড়ি জোতাও পাল্কী গাড়ী হইলেই চলিবে। থানার দারোগা উমেশ বাবুকে, একবার আমার নাম করিয়া, ডাকিয়া আনিতে হইবে।"

কোচম্যান ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল, —"তা আমি পারি না তো বাবু। দেওয়ান বাবুর হুকুম ছাড়া গাড়ি জুতিবার উপায় নাই —গাড়ি কোথায় পাঠাইবার উপায় নাই।"

শ্যামলাল বলিলেন,—বটে! আমি যদি নিজে চড়িয়া কোথায়ও যাই।"

কোচম্যান বলিল,—"দেওয়ান বাবুর কাছে দরবার না করিয়া আপনাকেও গাড়ি দিতে আমাদের এক্তিয়ার নাই।"

শ্যামলাল দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"জরিফ! তুমি অনেক দিনের চাকর। আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি। সাবেক লোকের মধ্যে কেবল তুমিই আছ। তুমি ঐ বিপদে আমার একটু সাহায্য না করিলে আমি প্রাণে মারা যাই।"

জরিফ কোচম্যানও ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিল,—"আমি এসংসারের অনেক দিনের চাকর। কর্ত্তার আমলেও আমি এ সংসারে চাকরী করিয়াছি। তখন আপনি হন নাই। আপনাকে ছেলেবেলায় আমি অনেক কোলে পিঠে করিয়াছি, ধরিয়া ধরিয়া ঘোড়ায় চড়িতে, গাড়ি হাঁকাইতে শিখাইয়াছি। বাবু, ইদানীং আপনার এ সকল দুর্দ্দশা দেখিয়া আমারও বড় কষ্ট হয় বটে। কিন্তু কি করা যাইবে, সকলই নসিবের ফল।"

একমাসের মধ্যে এই বৃহৎ পুরীতে শ্যামলাল আর এক দিনও কাহার সহানুভূতি পান নাই। আজি এই বৃদ্ধ কোচম্যানের মুখে কতকটা সমবেদনার আভাষ পাইয়া তাঁহার চিত্ত যেন অনেকটা আশ্বস্ত হইল। বলিলেন, —"আমার নসিব চিরদিনই বড় ভাল ছিল। হঠাৎ এমন হইল কেন?"

জরিফ বলিল,—"আপনার নসিব খুবই ভাল ছিল। লোকে এঁটোকুড়ের পাত স্বর্গে যাওয়া বলে, তাহাই আপনার হইয়াছিল।

সে অনেক কথা—আপনি তাহার কিছুই জানেন না, জানিবার এখন কোন দরকারও দেখিতেছি না। এক লোক সব কথা জানিতেন—আপনার সাবেক দেওয়ান হরকুমার বাবু। আপনি তাঁহাকে তাড়াইয়াছেন। আর জানি আমি—আমি এখনও আছি। কিন্তু সে কথা যাউক। আপনার মত নসিব দুনিয়ায় আর কখন কাহারও ঘটে নাই। কিন্তু আপনি বড় পাপী। খোদা হক বিচারের মালিক। এত পাপ যে করে তাহার কি কখন ভাল হয়?"

এ কথা শ্যামলাল আর কখন শুনেন নাই। একদিন হরকুমার বাবু তাঁহাকে ধীরে ধীরে, অতীব কোমল ভাবে, তাঁহার পাপের কথা বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া, শ্যামলাল, নিরতিশয় বিরক্তির সহিত, তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন। সেই অবধি সেই অকৃত্রিম হিতৈষীর আর সন্ধান নাই। আর আজি সেইরূপ কথা; জরিফ কোচম্যান, সুস্পষ্টরূপে তাঁহার মুখের উপর ব্যক্ত করিল। সে দিন দেওয়ান হরকুমার বাবুর উপর বড় রাগ হইয়াছিল। কিন্তু আজি জরিফের কথা শুনিয়া বড় চিন্তার উদয় হইল। বলিলেন,—আমি কি বড়ই পাপী? আমি কি অনেক পাপ করিয়াছি জরিফ? হাঁ, করিয়াছি বটে। কিন্তু তুমি কি মনে কর, সেই পাপের জন্যই আমার এত সাজা হইতেছে?"

জরিফ বলিল,—"তার আর ভুল নাই। সাজা আপনার ঢের হইয়াছে, আর এর চেয়ে বেশী সাজা হইতে পারে না। আপনাকে বলাই ভাল। দুনিয়ার সকল লোকই জানে, আপনি অবশ্য কতক জানেন; এ সকল কথা এখন বুঝাইয়া বলায় দোষ নাই। আপনি পরম ধার্ম্মিক হরকুমার বাবুকে তাড়াইয়া, ছোটলোক সয়তান হরিচরণের উপর কাজের ভার দিলেন। সে ছোটলোক আপনার সকল কাজেরই ভার লইল। আপনি বিবাহ করিয়াছিলেন, অথচ সে স্ত্রীর এক দিন মুখ দেখিতেন না, দুটো মুখের কথাও তাহার সঙ্গে কখন কহিতেন না। আপনার পেয়ারের হরিচরণ আপনার স্ত্রীর সহিত প্রসক্তি ঘটাইল। দিন রাত্রি তাহারা অমোদ আহ্লাদ চালাইতে লাগিল। আপনি অনেক সতীলক্ষ্মীর সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, সেই পাপে আপনার ঘরের লক্ষ্মী ভ্রষ্টা হইল। আপনি বাহিরে হয়ত একটা কদাকার কৈবর্ত্তমাগীর সঙ্গে বসিয়া মদ খাইতেছেন, এ দিকে আপনার ঘরের মধ্যে পদ্মীর মত খপ্সুরত বিবিকে কুকুরে ভোগ করিতে লাগিল।—"

শ্যামলাল হা করিয়া, জরিফের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সমস্ত কথা শুনিয়া, সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন,—"বুঝিয়াছি জরিফ, আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

জরিফ বলিল,—"সর্ব্বনাশ আপনার যত দূর হইতে হয় তাহাই হইয়াছে। হরিচরণ আর আপনার পরিবার এক মন, এক প্রাণ। তাহারা কৌশল করিয়া আপনার নিকট বিষয়-পত্র এমনই করিয়া লিখাইয়া লইয়াছে যে বাড়ীতে পেটের দুটা ভাত, আর পরিবার একখানা কাপড়েরও আপনার আর দাওয়া নাই।"

বিধুমুখীর সহিত হরিচরণের অবৈধ প্রণয় সম্বন্ধে শ্যামলাল অনেক দিন হইতে অনেক প্রকার সংবাদ পাইয়া আসিতেছিল। ইদানীং তৎসম্বন্ধে তাহার আর কোনই সন্দেহ ছিল না। কিন্তু নরাধম শ্যামলাল সে বিষয়ে কখনই মনোযোগী হয় নাই, দেখিয়াও তাহা

দেখে নাই এবং তাহার প্রতিবিধান করিবার কোন আবশ্যকতা সে অনুভব করে নাই। আজ এ সকল কথা শুনিয়া তাহার মনে কোন ক্লেশোদয় হইল না; কিন্তু স্বকীয় অবস্থা চিন্তা করিয়া তাহার মনে বড়ই কষ্ট হইল। বলিল,—"যে ভুল হইয়াছে, তাহার তো আর হাত নাই। এখন কি উপায়ে আমার বিষয় আশয় আবার আমার হাতে আইসে, তাহার কোন পরামর্শ দিতে পার?"

জরিফ বলিল,—"বিষয় আশয় হাতে আনিবার কোনই উপায় দেখিতেছি না। আপনার স্ত্রীর মৃত্যু না হইলে, এ বিষয় আপনার হাতে আসিতে পারে না। তাঁহার মৃত্যু হইলে, আপনি হকদার হইয়া সব ফেরৎ পাইতে পারেন।

শ্যামলাল বলিল,—"তা সে তো সুস্থ, সবল, বেশ আছে। মরিবার কোন লক্ষণই তো তাহার দেখা যাইতেছে না।"

জরিফ বলিল,—"আমরা হইলে কখনই যমের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতাম না। নিজেই যম হইয়া তাহার সকল কাজ চুকাইয়া দিতাম।"

শ্যামলাল ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল,—"কোন সুযোগ নাই। অন্দরে কোন লোক যাইতে পায় না। কি রূপে কাজ শেষ করা যায়? বিশেষ আমার আর লোক নাই। আমার হুকুম কেহ শুনে না। হাতে পয়সা নাই, আমি কি করিতে পারি।

জরিফ একটু বিরক্তির সহিত বলিল,—আপনি সবই করিতে পারেন। কিন্তু আপনি নিতান্ত বদবক্ত; কাজেই আপনাকে দিয়া কিছুই হইবে না। আপনি এত বড় শরীর লইয়া গোস্তের বোঝা টানিয়া বেড়াইতে পারেন, আর নিজের স্ত্রী ঘরে বসিয়া ব্যভিচার করিবে, বুকে বসিয়া দাড়ি উপড়াইবে, আপনার বিষয় লইয়া কুত্তার সহিত ইয়ারকি দিবে, আপনাকে পথের ভিখারী করিয়া রাখিবে, আপনি সে সকল বসিয়া দেখিতে ভুগিতে, সহিতে পারিবেন, তবু তার প্রতিকার করিতে পারিবেন না? ধিক্ আপনাকে! বাবু, একটা স্ত্রীলোক আর একটা ভেড়ুয়া এই কাণ্ড করিতেছে, আর আপনি উপায় কি ভাবিয়া অন্ধকার দেখিতেছেন। কিছু যদি না পায়েন, তাহা হইলে গলায় দড়ি দিয়া মরুন না কেন, সে তো সোজা কাজ।"

জরিফ চলিয়া গেল। শ্যামলালের কোন উত্তর শুনিবার নিমিত্ত সে আর অপেক্ষা করিল না। বড় তীব্র তিরস্কার। এমন স্পষ্ট কথা' এমন সহজ উপদেশ শ্যামলাল জীবনে আর কখন শুনেন নাই। তাঁহাকে কেহ কখন কোন হিত-কথা বলিতে সাহস করে নাই; সাহস করিয়া কেহ কিছু বলিবার উপক্রম করিলেও, শ্যামলালের বিরক্তি দেখিয়া, সে সঙ্কুচিত ও নিরস্ত হইয়াছে এবং হয়ত তাহার সেই চেষ্টা হেতু তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছে। আজি ক্ষুদ্র কোচম্যান, সামান্য দাস, তাঁহাকে উচিত কথা শুনাইয়া দিল। দুঃখের ও দুরবস্থায়, বিপদে ও যাতনায় শ্যামলালের অনেক প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সেই শ্যামলাল ও এই শ্যামলালে কতই প্রভেদ। তিনি সমস্ত কথা শ্রবণ করিলেন ও তৎসমস্ত উক্তির যাথার্থ্য অনুভব করিলেন।

ধীরে ধীরে, ভাবিতে ভাবিতে, শ্যামলাল বৈঠকখানার দিকে অগ্রসর হইলেন। জরিফ যাহা বলিল, মনে মনে তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। বিধুমুখী আর হরিচরণ দুই জনকে মারিয়া ফেলিবার উপায় করিব কি? তাহারা ব্যভিচার-নিরত তাহাতে ক্ষতি কি?

সে জন্ত শ্যামলাল তাহাদের নিপাত করিবার আবশ্যকতা অনুভব করিলেন না। বিধুমুখী না মরিলে পুনরায় তাহার সম্পত্তি হস্তগত হইবে না। এটা ঠিক কথা এবং এজন্য তাহাকে মারিয়া ফেলা উচিত বটে। তাহারই চেষ্টা দেখিব কি? স্বয়ং তাহা পারিব কি? কাহাকেও বলিব কি? থাক না কেন আর দুই দিন—যদি তাহাদের দয়া হয়—যদিই দয়া করিয়া বিধুমুখী আমার সম্বন্ধে কোন সুবিচার বা কোন সদ্ব্যবস্থা করে। আর একবার যেমন করিয়া হউক দেখা করিতে হইবে।

জরিফ যে আর একটা কথা বলিল, তাহার অর্থ কি? এ'টোকুড়ের পাত স্বর্গে যাওয়া কি? বলিল, সে অনেক কথা—আমি তাহার কিছুই জানি না। হরকুমার বাবু জানিতেন, আর জরিফ জানে। এ সকল কি কথা? আর একদিন হরকুমার বাবুও এইরূপ একটা কি কথা বলিয়াছিলেন। তিনি যেন বলিয়াছিলেন, এরূপ না ঘটিলে; এই সম্পত্তি হয়ত আমার হাতে নাও থাকিতে পারিত। অবশ্যই এ সকল কথার কোন অর্থ আছে। কি সে অর্থ?

হতভাগা শ্যামলাল সেই স্থানে বসিয়া আপনার জীবনের সকল কথাই ভাবিতে লাগিল। এত অল্প সময়ের মধ্যে এত পরিবর্ত্তন ও এরূপ দুর্দ্দশা কখন কাহারও ঘটে কি না সন্দেহ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পশু।

রাত্রি ৮টা। বিরাজমোহিনী, সেই প্রকোষ্ঠে একখানি সোফার উপর উপুর হইয়া শুইয়া, বিদ্যাসুন্দর পাঠ করিতেছেন। ঘরের কড়ি হইতে বিলম্বিত দুইটী শেজোময় আলোকাধার হইতে অতি সুনির্ম্মল আলোকরাশি নিঃসৃত হইতেছে। ঘরের চারিদিকে রমণীয় তৈলচিত্র সমূহ বিলম্বিত। অনেক চেয়ার-ড্রয়ার, অনেক টেবিল, অনেক হোয়াট-নট ইত্যাদি ঘরের চারিদিকে যথাযথ স্থানে নিপতিত। অতি উৎকৃষ্ট কার্পেট দ্বারা ঘরের মেজে সমাচ্ছন্ন।

চিত্রগুলি বিলাতী এবং শিল্পোন্নতি ও শিল্প-কৌশল প্রদর্শনের ওজরে নিরতিশয় অশ্লীলতা ও কুরুচিপূর্ণ। কুরুচি শব্দের আজি কালি যেরূপ অপব্যবহার হইয়াছে, তাহাতে অনেক সুরুচিসঙ্গত সদ্ব্যাপারও কুরুচির মধ্যে পড়ে। আমরা কুরুচি শব্দের এই দুর্গতি দেখিয়া ইহার প্রকৃত অর্থ বিনির্ণয়ে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছি। এখন কাজ অপেক্ষা কথায় দোষ বেশী; ভিতর অপেক্ষা বাহিরই বিচার্য্য বেশী। রাম নামক এক ব্যক্তি শ্যামের ভগ্নীপতির খুড়তুতো ভাই; রাম, এই সম্পর্ক ধরিয়া, শ্যামকে দেখিতে পাইলেই, শ্যামের ভগ্নী যিনি যেখানে থাকুন না কেন, তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া অনেক গ্রাম্য রসিকতা করে; যাহা মনে ভাবিলেও রুচির দোষ হয়। এমন কথাও স্পষ্ট করিয়া বলে এবং এমন সকল রহস্য ব্যক্ত করে, যাহা শুনিলে স্পষ্টই উপলব্ধ হয় যে, শ্যামের ভগ্নিবর্গের সহিত রামের নিশ্চয়ই অবৈধ আত্মীয়তা ঘটিয়াছে। কিন্তু রামও জানেন, শ্যামও জানেন, পাড়ার দশজন লোকও জানেন যে, রামের সহিত শ্যামের ভগ্নিগণের প্রণয়ের অঙ্কুরও নাই; তাঁহাদের এই প্রণয় লীলা মুখের সীমা কখন ছাড়ায় না এবং এইরূপ মৌখিক রসিকতায় কখন কোন গুরুতর

অনিষ্টও ঘটে না। হয়ত অনেক সময়ে এমনও ঘটে যে, শ্যামের যে এক ভগ্নী ছিলেন তিনিও অনেক দিন যমালয়ে গমন করিয়াছেন; তাঁহার আর ভগ্নী নাই ও ছিল না। তথাপি রাম তাঁহার ভগ্নীদের আক্রমণ করিতে ছাড়িবে না এবং সেই সকল কাল্পনিক কুলবালাকে স্বকীয় শয্যায় আনিয়া, তাঁহাদের সহিত রঙ্গ-রসের বিরাম দিবে না। বর্ত্তমান কালের আইন অনুসারে রামের এই ব্যবহার নিতান্ত কুরুচি মাখা; রাম অসভ্যের এক শেষ, রাম ভদ্রসমাজের নিতান্ত অযোগ্য। রাম এরূপ না হইয়া যদি শ্যামের ভগ্নীগণকে নিজের সহোদরার সমান বলিয়া ব্যক্ত করিত, অথচ সুযোগ পাইলে তাঁহাদের মনচুরি করিয়া নৈশ-লীলায় প্রমত্ত হইত বা তাঁহাদের সহিত সংগোপনে প্রেমের রহস্যালাপ করিত, অথবা তাঁহাদের মধ্যে যিনি যিনি বিধবা তাঁহাদের ক্লেশে উৎ-কণ্ঠিত হইয়া, অশ্রুপাত করিতে থাকিত, কিংবা তাঁহাদের সন্তান-মুখ সন্দর্শনের উপায় করিয়া দিয়া, শেষে ভ্রূণহত্যা বা আত্মহত্যার পথ দেখাইয়া দিত, তাহা হইলেও রামকে নিন্দা করিবার কোনই কারণ ছিল না, রামের তাদৃশ অনুষ্ঠান সমূহ কখনই সুরুচি বিগর্হিত বলিয়া পরিগণিত হইত না; এবং ভদ্র সমাজও কদাপি রামকে দুরাত্মা বলিয়া মনে করিতে পারিত না। সুতরাং এই রুচি বড়ই গোলমেলে জিনিস এবং ইহার সু ও কু নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে নিতান্ত সুকঠিন। আমরা কিন্তু সকলে রামকে পূজনীয় ও ভক্তিভাজন ব্যক্তি বলিয়াই মনে করি এবং একেলে রামকে নরকের কীট ও অস্পৃশ্য বলিয়াই বোধ করি।

বিধুমুখীর ঘরের ছবিগুলি কুরুচিপূর্ণ বলিয়া আমরা উল্লেখ করিয়াছি। শিব, দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতির ছবি আমরা বুঝি ভাল এবং তাহার কোন স্থানেই আমরা কুরুচি দেখি না। কিন্তু হাল আইনে ঐ সকল ছবি নিতান্ত কুরুচি মাখা; কেন না শিবের গায়ে জামা নাই। কালী রমণী মূর্ত্তি, অথচ উলঙ্গ; অহো কি ভয়ানক! কি ঘৃণিত! কি বিভীষিকাময়! কিন্তু ভিনসের যে নগ্নমূর্ত্তি, আদম এবং হবার যে উলঙ্গ প্রতিকৃতি, নেডস্গণের যে বারিসিক্ত বস্ত্রবিহীন আলেখ্য, নিদ্রিতা বিউটির যে অবসাদময় বিস্রস্ত ভাব, প্রমোদ কাননের সুন্দরীগণের যে বিলাসময়ী ভঙ্গী, স্নানার্থিনী দেবীর যে অপরূপ বেশ, মজ্জমানা বিলাসিনীর সাগরবক্ষে পুরুষ-স্কন্ধাশ্রয়ে যে মনোহর অবস্থান, সে সকলই সুরুচি সঙ্গত; কারণ তৎসমস্ত চিত্রকরের অত্যদ্ভুত নিপুণতার ও চিত্র-শিল্পের চরমোৎকর্ষের পরিচায়ক। হায় বিদ্যা! তোমার দোহাই দিয়া কত সময়ে কত বীভৎসকাণ্ডই জগতে ঘটিয়া থাকে। তাহাই হউক।

বিধুমুখী উপুড় হইয়া পুস্তক পাঠ করিতেছেন। আমাদের একজন পূর্ব্বপরিচিত সুরুচিসম্পন্ন সাম্যবাদী সুহৃদ আছেন। তিনি বিধুমুখীর এই অবস্থা আলোচনা করিয়া বলেন, পুস্তক পাঠ করিতেছেন, ভালই করিতেছেন; কিন্তু পুস্তকখানি বিদ্যাসুন্দর না হইয়া ব্রাহ্ম-সঙ্গীত হইলেই ভাল হইত। আমরা বলি, যে নারী পাপের পঙ্কিলহ্রদে গা ভাসাইয়াছে, যে রমণী নারীজাতির সার ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া নারকীয় আমোদে প্রমত্ত হইয়াছে, যে স্বেচ্ছায় সমাজের ও কুলের মস্তকে পদাঘাত করিয়া অধর্ম্মের পথ আশ্রয় করিয়াছে, তাহার অধীত পুস্তকের আর ভাল মন্দ কি? যাহার সকলি মন্দ, তাহার নিকট কিছুই ভাল প্রত্যাশা করা অসঙ্গত। আমরা দেখিতে পাইতেছি, আমাদের এই সাম্যবাদী বন্ধু, এই স্থানে রোষ-কষা-

য়িত লোচনে, আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, বলিতেছেন, "কেন বিধুমুখীর অপরাধ কি? তাঁহার এই বয়স, এই রূপরাশি, এ সকল বিধাতৃ-দত্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার তিনি কেন করিবেন না? এক প্রেতের সহিত তাঁহার সামাজিক বিবাহ হইয়াছে। সে বিকট বানর এই সুন্দরীশিরোমণির মুখও দেখে না, দেখিলেও সে এই রূপসী যুবতীর কখনই উপযুক্ত নায়ক বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য নহে। তোমাদের নিন্দিত সমাজের মস্তকে বাম চরণাঘাত করিয়া, তিনি যদি স্বেচ্ছামত বিহার করিতে থাকেন, তিনি যদি তোমাদের ঘৃণিত নিয়মে বদ্ধ না থাকিয়া, স্বাধীনভাবে প্রাকৃতিক সুখে ভাসিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সেজন্য কখনই দোষী করিতে পার না। বরং বিধুমুখী একজন নারী রিফরমর রূপে আদৃত, পূজিত ও গৌরবান্বিত হইবারই উপযুক্ত। আমরা কি বলিব? এ উৎকট বিপদে আমাদের চুপ করিয়া থাকা ছাড়া আর কি সৎপরামর্শ আছে?

বিধুমুখী যে ভঙ্গীতে শয়ন করিয়া গ্রন্থপাঠ করিতেছেন তাহা বর্ণনীয় নহে; কিন্তু আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত সাম্যবাদী বন্ধু, শ্মশ্রুরাশি দুলাইতে দুলাইতে, হস্তদ্বয় উত্তোলন করিয়া বলিতেছেন, "ছাড়িও না, ছাড়িও না, ভাই হে! এ অতুলনীয় সৌন্দর্য্য সন্দর্শনের সুযোগ ত্যাগ করিও না। ঘৃণিত লালসা পরিবর্জ্জন করিয়া, কুৎসিত চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়া মনকে পবিত্রতায় পরিপূর্ণ করিয়া কল্পনা-নয়ন উন্মীলন কর, এবং কেবল সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিতে করিতে, বিধাতৃ-প্রদত্ত নয়ন-যুগলের সার্থকতা ও সদ্ব্যবহার কর। ঐ দেখ, বিগলিত-বসনা বিধুমুখী বাম চরণের উপর দক্ষিণ চরণ দুলাইতে দুলাইতে, ঈষৎ হাস্য জনিত প্রস্ফুরিত অধরোষ্ঠ ও আরক্তিম গণ্ড সমন্বিত ভাবে, কেমন অপার্থিব শোভা বিস্তার করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কর্ণের হীরক দুল কেমন ভুবনমোহন ভাবে দুলিতেছে এবং তাঁহার চরণের মল, পরস্পর আহত হইয়া, কেমন মধুর ধ্বনি সমুৎপাদন করিতেছে। আর দেখ নবীনার———।" আমরা কুরুচি সম্পন্ন দুরাত্মা; আমাদের সুরুচি সম্পন্ন বন্ধু মহাত্মা আরও যে সকল শোভা সন্দর্শনের প্রস্তাব করিতেছিলেন, তাহা দর্শন করা আমাদের অসাধ্য; সুতরাং আমাদের ভাগ্যের নিন্দা করিতে করিতে, বন্ধুবরকে একাকী সৌন্দর্য্য পর্য্যালোচনা করিবার ভার দিয়া, আমরা নিরস্ত হইতেছি।

অতি সুস্নিগ্ধ দক্ষিণানিল আসিয়া বিধুমুখীর কলেবরকে শীতল করিতেছে। পার্শ্বস্থিত রজত পাত্র হইতে সময়ে সময়ে এক একটি তাম্বুল লইয়া তিনি চর্ব্বণ করিতেছেন। আতর ও এসেন্সের গন্ধে ঘর আমোদিত। বিধুমুখী একাকিনী, নিকটে কোন দাসীও নাই।

ধীরে ধীরে নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে, এক কৃষ্ণকায়, কুৎসিতদর্শন ও স্থূলকলেবর পুরুষ তথায় প্রবেশ করিল এবং নীরবে দূরে দাঁড়াইয়া সেই অধ্যয়ন-নিরতা সুন্দরীর শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে, এই পুরুষ শ্যামলাল। শ্যামলাল অতৃপ্ত নয়নে স্বকীয় পত্নীর রূপরাশি দর্শনে বিস্মিত হইতে থাকিল। আরও দুই চারি বার শ্যামলাল পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিয়াছে, এবং প্রত্যেক বারই সে অনুমান করিয়াছে, তাহার স্ত্রী বাস্তবিকই সুন্দরী। আজি সে বুঝিতেছে, তাহার পত্নীর ন্যায় সুন্দরী সে আর কখন কোথায়ও প্রত্যক্ষ করে

নাই। তাহার স্ত্রী নারী-জাতির রাণী হইবার যোগ্যা; তাহার স্ত্রী ভুবনমোহিনী। এই রূপসীর সহিত সে কখন আলাপ করে নাই, এই ভুবনমোহিনীর প্রতি সে কখন ফিরিয়াও চাহে নাই এবং এই পূর্ণাঙ্গী নবীনাকে আপনার সামগ্রী বলিয়া সে কখন মনেও করে নাই। এই দুর্লভ রত্ন উপেক্ষা করিয়া সে ইতর জাতীয়া, মলিনবেশা, এ নারীর দাসীরও অযোগ্যা, নারীগণের সহিত কালপাত করিয়া আসিয়াছে। তাহাদের চরণে প্রভূত অর্থোপহার প্রদান করিয়াছে, তাহাদিগকে আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত অনেক সময়ে অনেক দুষ্কৃতি সম্পাদন করিয়াছে এবং তাহাদের জন্য অনেক অধর্ম্ম ও অখ্যাতির ভার স্কন্ধে করিয়া বহন করিতেছে।

দারিদ্র্য ও দুঃখে কঠোর হৃদয়ও কোমল হইয়া যায়। উচ্চ হইতে সহসা নিম্ন প্রদেশে নীত হইলে, মানব সহজেই পরিবর্ত্তনের প্রকৃতি উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়। সহসা ভাগ্য পরিবর্ত্তন ঘটিলে, আপনার পূর্ব্বাপরাধ সমস্তই এতাদৃশ দশা বিপর্য্যয়ের মূলীভূত জ্ঞান করিয়া মনুষ্য তদ্বিষয়ক সমালোচনায় সূক্ষ্ম দর্শন লাভ করে। শ্যামলালেরও সম্প্রতি এই অবস্থা ঘটিয়াছে। বদ্ধ বাহু ও বদ্ধ পদ দুর্দ্দান্ত দস্যুও যেমন কিয়ৎ কালাবসানে, আপনার সকল চেষ্টাই অনর্থক জানিয়া, স্বকীয় অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে, আপনার পূর্ব্বকৃত অসৎ কার্য্য সমূহ স্মরণ করে; তদ্রূপ শ্যামলালও আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতাবিহীন এবং পরকীয় আয়ত্তাধীন দেখিয়া, আপনার যাবতীয় উদ্যমের নিষ্ফলতা উপলব্ধি করিয়াছে এবং ক্রমশঃ বুঝিতেছে যে, সে তাহার কর্ম্মফলেই এই দুর্দ্দশায় নিপতিত হইয়াছে। ইহার উপর জমিদের তীব্র বাক্যাবলীও তাহার প্রাণে বিঁধিয়াছে। তাহার হৃদয় কোমল, প্রকৃতিস্থ ও দীনহীন হইয়া আসিতেছে। এই অবস্থায়, এইরূপ সময়ে নানাবিধ বিলাসসামগ্রী পরিবেষ্টিতা সুন্দরী শিরোমণি পত্নীকে দেখিয়া, সে সকল কথাই ভুলিয়া গেল। সে কাপুরুষ, পশুতুল্য নির্ব্বোধ; সুতরাং তেজস্বিতা ও সৎসাহস বিবর্জ্জিত। পত্নীর ব্যভিচার ও ধর্ম্মহীনতার কথা তাহার আর মনে হইল না; রূপের প্রখর উজ্জ্বলতায়, তাহার সামান্য জ্ঞানশক্তি ঝলসিয়া গেল; শোভার ভাণ্ডার সম্মুখে উন্মুক্ত দেখিয়া তাহার প্রাণ-মন বিমোহিত হইয়া উঠিল। ক্রোধ নাই, প্রতিহিংসা নাই, অনিষ্টসাধন বাসনা নাই। রূপোন্মত্ত শ্যামলাল, স্বকীয় অপরাধের নিমিত্ত পত্নীর চরণে সবিনয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে এখন কৃতসংকল্প। হায় রূপ! তোমার কি বিমোহিনী শক্তি!

শ্যামলাল, নীরবে অগ্রসর হইয়া, পত্নীর নিকটস্থ হইল এবং তাঁহার অলক্ত-রাগরঞ্জিত মোহন-মল পরিবেষ্টিত চরণযুগলে হস্তার্পণ করিল। সুন্দরী, সভয়ে ব্যস্ততা সহ, চরণদ্বয় অপসারিত করিয়া, উঠিয়া বসিলেন এবং ভীত অথচ উত্তেজিত ভাবে বলিলেন,—"একি! তুমি এখানে কেন? কে তোমাকে আসিতে দিল?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"আমি তোমার স্বামী, আমি দ্বারবানকে বলিয়া কহিয়া, সারদাকে জানাইয়া, তোমার নিকট আসিয়াছি। এজন্য তুমি এমন করিতেছ কেন?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"এখানে এরূপে আসিতে তোমার কোনই অধিকার নাই। যে তোমাকে আসিতে দিয়াছে, তাহার নিশ্চয়ই দণ্ড হইবে। তোমার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছিল সত্য; কিন্তু আমি তোমাকে

একবারও স্বামী বলিয়া মনে করি না। তুমি এখনই এখান হইতে দূর হও।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"বিধু! আমি তোমার নিকট অনেক অপরাধ করিয়াছি সত্য। যাহা হইবার হইয়াছে; আর আমি কদাপি কোন-রূপ অন্যায় ব্যবহার করিব না। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"তোমার অপরাধের জন্য আমি কাতর নহি, তোমাকে ক্ষমা করিবারও আমার কোন প্রয়োজন নাই। তোমার সহিত পূর্ব্বেও আমার কোন সম্পর্ক ছিল না, এখনও নাই। তুমি কেন আমাকে ত্যক্ত করিতেছ। তুমি দূর হও।"

হতভাগ্য শ্যামলাল বলিলেন,—"তোমার এত রূপ এত শোভা, ইহা আমি কখন জানিতাম না। বিধুমুখী, আমি তোমার পায়ে ধরিতেছি, আমাকে চরণে স্থান দেও; আমি ক্রীতদাসের ন্যায় তোমার নিকটে থাকিব, প্রাণপণে তোমার মনের মত হইয়া চলিব, তোমার অনুমতি ছাড়া কোন কর্ম্মই করিব না, তুমি আমাকে কৃপা কর। আমার বিষয় আশয় সমস্তই তোমাকে দিয়াছি, প্রাণ-মন-দেহও তোমাকে দিতেছি। আমি আর কিছুই চাহি না, তুমি আমাকে কৃপা কর। তোমার রূপে আমার হৃদয় ভরিয়া গিয়াছে, তোমার শোভায় আমার প্রাণ উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে! বিধুমুখী! তুমি ছাড়া আর আমার কোন গতি নাই। এ চরণের দাসকে তুমি এমন করিয়া দূর করিও না।"

ধুমুখী বলিলেন,—"তোমার সহিত কথা কহিতেও আমি ঘৃণা করি। তুমি আমার সম্মুখ হইতে এখনই দূর হও। তোমাকে মনুষ্য বলিয়া আমি কখনই জ্ঞান করি না। তোমার ন্যায় ভল্লুকের সহিত প্রেমের কল্পনা করিতেও আমার শরীর শিহরিয়া উঠে। রামী বাগ্দিনী, দুগী জেলেনী, নিতী ধোপানী প্রভৃতি অপ্সরোগণ তোমার যোগ্যা প্রেয়সী। তুমি আমার সম্মুখ হইতে দূর হও। তোমার কুৎসিত আকার দেখিয়া আমার হাসি পাইতেছে; তোমার দেহের দুর্গন্ধে আমার বমি আসিতেছে; তোমার কথা শুনিয়া আমার গায়ে জ্বর আসিতেছে। তোমার সহিত প্রেমালাপ অসম্ভব। এক্ষণে তুমি কি চাও বল, দুইটা টাকা পাইলে তুমি বিদায় হইবে কি?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"না না বিধু! আমি টাকা চাহি না, সুখ সম্পদ কিছুই চাহি না, কেবল চাহি তোমার কৃপা। তুমি আমাকে দয়া না করিলে, আমি আত্মহত্যা করিব।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"তাহাতে বিশেষ ক্ষতি দেখিতেছি না। তোমার জীবনে আমার কখনই কোনই প্রয়োজন নাই; সুতরাং তুমি আত্মহত্যাই কর, আর রোগেই মর, তাহাতে আমার ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছুই নাই। এক্ষণে কি করিলে তুমি দূর হইবে তাহাই আমি জানিতে চাহি।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"তোমার ঐ চন্দ্রবদন একবার চুম্বন করিতে দাও, তাহা হইলে আমি আপাততঃ তোমার সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিব। আমি আর তোমাকে ত্যক্ত করিব না। আবার তোমার আদেশ মত সময়ে আসিয়া, তোমার রূপ দর্শনে চরিতার্থ হইব।"

বিধুমুখী প্রথমতঃ হাঃ হাঃ শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। তাহার পর ক্রোধ সহকারে বলিলেন,—আশ্চর্য্য স্পর্দ্ধা! তুমি নরকের প্রেত, তুমি মেথরাণীর নাগর। তুমি আমার মুখচুম্বন করিবে! দূর হও আমার সম্মুখ হইতে। যদি সহজে না যাও, আমি লোক দিয়া তোমাকে এখনই তাড়াইয়া দিব।"

যাহারা রূপোন্মত্ত হয়, তাহাদের মানাপমান, হিতাহিত কোন বোধই থাকে না পাপীয়সী পত্নীকৃত এই অপমান শ্যামলালের কর্ণে স্থান পাইল না। সে চিরদিন প্রেম বা হৃদয়ের কোন কারবার কখনই করে নাই। ইন্দ্রিয়ভোগ সে করিয়া আসিয়াছে এবং ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত সে কাণ্ডজ্ঞান পরিশূন্য হইয়াছে। এরূপ ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তির উত্তেজনা পরতন্ত্র পশু কোন চিন্তাকেই মনে স্থান দিতে পারে না। শ্যামলাল কোন অপমানের কথা শুনিয়াও শুনিল না। সে বেগে গিয়া আপনার স্ত্রীকে বেষ্টন করিয়া ধরিল এবং বিধুমুখী কোনরূপ প্রতিবন্ধকাচরণ করিবার পূর্ব্বে, সে তাহার বদনমণ্ডল পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে লাগিল।

অনেক কষ্টে বিধুমুখী আপনাকে শ্যামলালের বাহুমধ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন এবং বেগে দূরে আসিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন,—"সারদা! রামমতি! নিস্তারিণী!"

তখনই অনেক দাসী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিধুমুখী ক্রোধ-বিকম্পিত কণ্ঠে, উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"এই হতভাগা শূকরটাকে এখনই আমার সম্মুখ হইতে দূর করিয়া দাও। যদি তোমরা না পার, তাহা হইলে দরওয়ান ডাকিয়া, মারিতে মারিতে ইহাকে তাড়াইয়া দিতে বল। যাও নরাধম! এখনও মানে মানে প্রস্থান কর। তোমার অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। আমি তোমাকে লাথি মারিয়া দূর করিতাম; কিন্তু অনেক ধৈর্য্য ধরিয়া ক্ষমা করিলাম।"

তৎক্ষণাৎ দাসীরা শ্যামলালের উভয় হস্ত ধারণ করিয়া টানিয়া আনিল। শ্যামলাল কহিলেন,— বধুমুখী, ভাবিয়া দেখ, আমি তোমার স্বামী।"

নিদারুণ ক্রোধের সহিত বিধুমুখী বলিলেন,—"তুই হতভাগ্য কুকুর! তুই আমার দাসের দাস হইবার যোগ্য নহিস্। আমার স্বামী তুই? আমার স্বামী আমি স্বয়ং স্থির করিয়া লইয়াছি। তাহার কাছে মনে বা ব্যবহারে আমি কদাপি অবিশ্বাসিনী নহি।"

শ্যামলাল একটা কথা কহিবার উদ্যোগ করিতেছিল; কিন্তু দাসীরা "চুপ চুপ আর কথায় কাজ নাই" বলিয়া তাহাকে লইয়া গেল।

আমাদিগের পূর্ব্ব পরিচিত সেই সাম্যবাদী বন্ধু মহাশয় বিধুমুখীর এই ব্যবহারে আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন, three cheers for this heroic lady! এই বীর নারী রমণী জাতির অলঙ্কার। ইহার সুনীতি, সত্যবাদিতা, মরাল করেজ অর্থাৎ সৎসাহস, তেজস্বিতা, প্রেমময়তা সকলই অতুলনীয়। কবে এ অধঃপতিত দেশের ঘরে ঘরে এইরূপ রমণী রত্নের আবির্ভাব হইবে?" আমরা উত্তরে বলিয়াছি, তাহার আর ব দেরী নাই; তাঁহারা যেরূপ আড়ে হাতে লাগিয়া সুনীতি প্রচার করিতেছেন, তাহাতে এ পুণ্যভূমি অচিরে এইরূপ মরাল-করেজ-শালিনী রমণীতে ছাইয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। তিনি আরও বলেন,"তোমাদের সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি কোন কাল্পনিক চরিত্রই এই বাস্তব নারীচরিত্রের নিকটস্থ হইতেও পারে না। এই নীরব কার্য্যকলাপ ভবিষ্যতে ভারতীয় সভ্যা ললনার আদর্শ হইবে।" আমরা ভাবিতেছি, ভগবানের যাহা মনে আছে, তাহা তো হবেই; তবে ভূমিকম্পটা আর একটু বেশী রকমের হইলেই ভাল হইত না কি? তিনি আরও বলেন, That stupid beast is rightly served সে বিশ্বাস-ঘাতক

নরাধমের বামন হইয়া চাঁদ ধরার আশা করা উচিত হয় নাই। তবে বিধুমুখী লাথি না মারিয়া কেবল লাথি মারিতাম বলিয়াছেন, সে কাজটাও তার মত বীর নারীর পক্ষে ভাল হয় নাই। লাথি মারাই উচিত ছিল। "He should have been kicked then and there."

প্লেগ, কলেরা, ম্যালেরিয়া, দুর্ভিক্ষ এতেতেও কিছু হয় না তো!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গাত্রদাহ।

শ্যামলালকে দাসীরা তাড়াইয়া দিয়া আসিল। বিধুমুখী নিতান্ত উত্তেজিত ভাবে একখানি কৌচের উপর বসিয়া পড়িলেন। হায় নারায়ণ! কেন তুমি সর্ব্বত্র পাপকে কুৎসিত করিয়া সাজাও না? কেন তোমার সৃষ্টিতে পাপের মূর্ত্তি অনেক সময়েই শোভাময়ী দেখিতে পাই? বিধুমুখী কৌচে বসিলেন; কিন্তু কি শোভা! ক্রোধ হেতু তাঁহার গণ্ড যুগলের আরক্তিম ভাব, লোচনদ্বয়ের প্রদীপ্ত ও উত্তেজিত শ্রী, শিথিল বন্ধন কবরীভ্রষ্ট বেণীর অনায়াস-পাত-জনিত শোভা, বসন ভূষণের বিশৃঙ্খলতা জনিত অপরূপ বিন্যাস, বিপুল বক্ষঃস্থলের ঘন শ্বাসজনিত অবনতি, অঙ্গ সকলের আবেগ জনিত ঈষচ্চাঞ্চল্য, সকলই অপূর্ব্ব—সকলই পরম শোভাময়। যে নারী কুট্টিনীর ন্যায় অস্পৃশ্য, যাহার হৃদয় বিষধরের ন্যায় কালকূটে ভরা, যাহার আচরণ, স্মরণ ও চিন্তনেও পাপ হয়, সে কেন এমন শোভাময়ী হইল? সে কেন এমন অলৌকিক শ্রীর আধার হইল?

বিধুমুখী উপবেশন করিলে, একজন দাসী পার্শ্বে দাঁড়াইয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিল; স্বয়ং সারদা গোলাপজল আনিয়া তাহার মাথায় ও মুখে সিঞ্চন করিতে লাগিল এবং আর একজন দাসীকে স্মেলিংসল্টের সিসি আনিয়া তাঁহার নিকটে স্থাপন করিতে বলিল। সে তাহার পর একখানি আতর মাখা তোয়ালে লইয়া সন্তর্পণে সুন্দরীর পৃষ্ঠদেশ, বাহুলতা, বদনকমল, বক্ষঃস্থল প্রভৃতি মুছাইয়া দিতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে বিধুমুখী কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন,—"জল দেও, মুখহাত ধুইব।"

তখনই দাসী চিলমচি ও রূপার ঘটিতে করিয়া জল ও সাবান আনিল। সুন্দরী সেখানে বসিয়াই মুখহাত ধৌত করিলেন। তাহার পর দর্পণের দিকে ফিরিয়া দেখিয়া বলিলেন,—"আমার চুলগুলা ঠিক করিয়া দেও।"

একজন তাহা করিতে লাগিল। বিধুমুখী আর এক জনকে আদেশ করিলেন,—"বরফ লেমনেড আন।"

সে তাহা আনিয়া উপস্থিত করিল। বিধুমুখী ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া লেমনেড পান করিতে লাগিলেন।

এইরূপ সময়ে হরিচরণ তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র উল্লাসে বিধুমুখীর মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি দাসীগণকে প্রস্থান করিতে ইঙ্গিত করিলেন; তাহারা চলিয়া গেল।

হরিচরণ কিন্তু বিষণ্ণ; মুখখানা যেন মেঘে ঢাকা, কেমন ভার ভার। হরিচরণ নীরবে উপবেশন করলেন,—বিধুমুখীর নিকট হইতে

একটু দূরে—স্বতন্ত্র আসনে। বিধুমুখীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি হরিচরণের এই ভাব দেখিয়া উদ্বেগ সহকারে তাঁহার নিকটস্থ হইলেন, এবং এক হস্ত তাঁহার কোলে স্থাপন করিয়া ও অপর হস্তে তাঁহার চিবুক ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"কাঁচা সোণা আজ কাল কেন? পুকুরের জল আজি তোলপাড় কেন? আমার প্রাণের বঁধুয়া আজি কাতর কেন?"

হরিচরণ, ধীরে ধীরে বিধুমুখীর হাত দুই খানি সরাইয়া দিয়া, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন এবং বলিলেন,—"আমি আপনার নিকট আজি বিদায় লইতে আসিয়াছি। আমাকে আপনি আজি হইতে জন্মের মত বিদায় দেন।"

এ কি কথা! এ কি বজ্রাঘাত! বিধুমুখীর প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইল। সবিস্ময়ে সোদ্বেগে জিজ্ঞাসিলেন,—"সে কি কথা হরিচরণ! তোমাকে বিদায়! প্রাণ থাকিতে! আমার মাথা খাও, বল বল, বল—কি হইয়াছে!"

হরিচরণ বলিলেন,—"বিশেষ কিছুই হয় নাই। আমি কুঁজো, চিৎ হইয়া শুইবার সাধ করিয়াছিলাম; আমি খোঁড়া, পাহাড়ে উঠিতে চাহিয়াছিলাম; আমি বামন, চাঁদ ধরিতে হাত বাড়াইয়াছিলাম। আমার কোন সাধই মিটিল না। যাহা হইবার নহে তাহা হইবে কেন?"

বিধুমুখী বড়ই ব্যাকুলিতা হইয়া পড়িলেন। হরিচরণের এরূপ অসন্তোষ, এত বিষণ্ণভাব, ইহাও কি ছাই প্রাণ ধরিয়া সহিতে পারা যায়। সুন্দরীর উৎকণ্ঠা সীমা শূন্য হইয়া পড়িল। তিনি কাতর ভাবে হরিচরণের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"বল হরিচরণ! তোমার মনে কি দুঃখ হইয়াছে? যদি আমার জীবন দিলে, সর্ব্বস্ব ব্যয় করিলে, তোমার মুখে আবার হাসি দেখিতে পাই, তাহা হইলে এখনই আমি তাহা করিব। বল, বল কি হইয়াছে?"

হরিচরণ বলিলেন,—"হবে আর কি? যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে। বাবুর ঘন ঘন যাওয়া আসা হইয়াছে—সন্ধ্যার পরেও আমাকে লুকাইয়া তাঁহাকে আসিতে দেওয়া হইয়াছে, অবশ্যই মনে মনে এক হইয়া গিয়াছে যাহা যাহা হইবার কথা তাহাই হইয়াছে—"

বিধুমুখী খল্ খল্ হাসিয়া বলিলেন,—"এই কথা, তবু রক্ষা। আমার মাথা হইতে যেন একটা প্রকাণ্ড বোঝা নামিয়া গেল। এতক্ষণ তোমার ভাব দেখিয়া আমার প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল। সে বামনটা এখনই আসিয়াছিল, বটে, তাতে কি হয়েছে।"

হরিচরণ বলিলেন,—"না, তাতে আর তোমার কি হইবে? এই হতভাগারই সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইয়াছে। সন্ধ্যার পর সাজ গোজ বেশভূষা করিয়া, বাবুকে যখন লুকাইয়া আনা হইয়াছে, তখন এ ক্ষুদ্র হতভাগার সকল সাধেই ছাই পড়িয়াছে সন্দেহ নাই।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"ছি হরিচরণ! এমন সন্দেহ মনে করাও তোমার অন্যায়। আমি তোমার কাছে মনে মনেও অবিশ্বাসিনী হইতে পারি, এরূপ সন্দেহকে মনে স্থান দিলেও, আমার প্রতি বড় অত্যাচার করা হয়।"

বিধুমুখী একটু অভিমান সহকারে মুখ নত করিলেন। হরিচরণ বলিলেন,—আমার অন্যায় এখন অনেকই হইবে। অনেকই দেখিতে পাইবে। আমার হুকুম ছাড়া বাবু কোন দিনও এখানে আসিতে

পাইবেন না, এ কথা তোমার সহিত পাকা রকম স্থির ছিল। সে নিয়ম ভঙ্গ করিয়া, তুমি অনায়াসে, নিজের ইচ্ছামতে, তাঁহাকে লুকাইয়া ঘরে আনিলে ইহাতে তোমার অন্যায় কিছু হইল না; কেবল আমার মনে ভাবাই অন্যায়। তা ভাই বেশ কথা। আমি আজি বিদায় হইতেছি। দুঃখী লোকের এত স্পর্দ্ধায় দরকার কি?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"সে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু কিরূপে কেমন করিয়া আসিয়াছিল তাহা আমি জানি না। তাঁহাকে আমি আসিতে বলি নাই।"

হরিচরণ বলিলেন,—"তুমি মুনিব, আমি চাকর। এরূপ লোকের মধ্যে প্রণয় হওয়া কি শোভা পায় ভাই? তোমার ইচ্ছামত কাজ তুমি করিবে, তাহাতে আমার কথা কহিবার কোনই অধিকার নাই। আমি স্বচক্ষে বাবুকে এখান হইতে চলিয়া যাইতে দেখিয়াছি। দ্বারওয়ানকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি যে, সারদা তাঁহাকে আসিতে বলিয়াছিল। সারদা, তোমার কথা না পাইলে, কখনই বলিতে সাহস করে নাই। অথচ তুমি তাহা স্বীকার করিতেছ না। এস্থলে তোমাকে আর আমি কি বলিব। আজি হইতে, ভাই, এ গরিব বিদায় লইতেছে। প্রার্থনা করি তোমার সুখ হউক। তোমার কাছছাড়া হইলে এ অভাগা প্রাণে মারা যাইবে সত্য; কিন্তু তোমার সুখের পথে কণ্টক হইয়া, সে আর একদিনও এখানে থাকিবে না।"

বড়ই অভিমানের কথা! বড়ই মনস্তাপের কথা! বিধুমুখী বলিলেন,—"কি বৃথা সন্দেহে হরিচরণ, তুমি নিজেও কষ্ট পাইতেছ, আমাকেও কষ্ট দিতেছ। সে কোন উপায়ে আসিয়াছিল বটে; কিরূপে আসিয়াছিল, তাহা আমি জানি না। তারপর সে তো মনুষ্যরূপে ভল্লুক। স্বয়ং স্বর্গ হইতে কন্দর্প-দেব আসিলেও, হরিচরণ, তোমার স্থান অধিকার করিতে পারে না। আমার প্রাণ-মন হরিচরণময় হইয়া গিয়াছে। তুমি এক্ষণে আমার জীবন মরণের মন্ত্র। আমাকে অবিশ্বাস করিতে হয় কর, কিন্তু ধর্ম্ম জানেন আমার কোনই অপরাধ নাই।"

বিধুমুখী সকল কথা সাহস করিয়া বলিতে পারিলেন না। শ্যামলালের আগমন সংবাদেই যখন হরিচরণের এই অন্তর্দাহ, তখন তাহার চুম্বনালিঙ্গনাদি ব্যাপার প্রচার হইলে, না জানি কি অনর্থপাতই হইবে। সুতরাং তাঁহাকে সে সকল বিবরণ প্রচ্ছন্ন করিতে হইল। হরিচরণ বলিলেন,—"হইতে পারে তোমার কোন অপরাধ নাই। কিন্তু তিনি তোমার বিবাহিত স্বামী, লোকতঃ ধর্ম্মতঃ তুমি তাঁহারই। তিনি জোর করিয়া তোমাকে নিজের করিয়া রাখিলে রাখিতে পারেন; আইন অনুসারেও তোমাকে বাধ্য করিতে পারেন। সকলই তাঁহার অনুকূল। আমার এ জোরের প্রণয় বইত না; তোমার দয়ার ভালবাসা বইত না। তুমি রাখিলে রাখিতে পার, পদাঘাতে দূর করিয়া দিলে দূর করিতে পার। সুতরাং তাঁহার যাওয়া আসা যখন আরম্ভ হইয়াছে, তখন আমার মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছে। তাই বলিতেছি, বসিয়া সে সকল দুরবস্থা ভোগ করার অপেক্ষা, চক্ষের উপর নিজের সর্ব্বনাশ করিয়া দেখার অপেক্ষা, দূরে গিয়া মরাই ভাল। বিধুমুখী, প্রাণেশ্বরী, তোমাকে দেখিতে না পাইলেই আমার মৃত্যু হইবে। তা হউক, তথাপি আমি আর এখানে থাকিব না। আজি এ অধম দাসকে তুমি জন্মের মত বিদায় দেও।"

হরচরণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বিধুমুখী তখন যম-যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—"বেশ, যাও তুমি। কিন্তু ধর্ম্ম সাক্ষী। তোমাকে নিশ্চয়ই এই অন্যায় অত্যাচারের প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে। হরিচরণ! আমি শয়নে স্বপনে কেবল তোমাকেই দেখি, তোমাকেই জানি। সেই তুমি, আমাকে অবিশ্বাস করিয়া ত্যাগ করিতেছ। আচ্ছা, যাও তুমি, এ পুরীর বাহিরে যাইতে না যাইতে তুমি শুনিতে পাইবে, বিধুমুখী আর নাই।"

বিধুমুখী কাঁদিয়া ফেলিলেন। হরিচরণ বলিলেন,—"কেন ভাই? তোমার কিসের অভাব? তুমি কেন আত্মহত্যা করিবে? যে অভাগা তোমার প্রেমের আশ্রয়ে স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া আসিতেছে, সে এখন সর্ব্বস্বান্ত হইল; সুতরাং তাহারই আর না থাকা আবশ্যক।"

বিধুমুখী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"যাহা হইবার হইয়াছে। হরিচরণ, আমি তোমার পায়ে হাত দিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, ইহজীবনে আর কখন তাহার মুখ দেখিব না। তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি সদয় হও।"

এই বলিয়া সুন্দরী হরিচরণের পদদ্বয় ধারণ করিলেন। হরিচরণ তখনই তাঁহাকে উঠাইয়া তাঁহার বদন চুম্বন করিলেন ও তাঁহার নেত্র মার্জ্জনা করিয়া দিলেন। আনন্দে বিধুমুখীর হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। হরিচরণ, আলিঙ্গনবদ্ধা সুন্দরীকে লইয়া, সেই কোচে আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং বলিলেন,—"এখান হইতে কিছুদিন স্থানান্তরিত হওয়াই আমার ইচ্ছা। এখানে থাকিলে তোমার স্বামী হয়ত কোন না কোন সুযোগে, আবার তোমার সম্মুখে আসিবে। আমি তাহা আর সহ্য করিতে পারিব না আমি শীঘ্রই তোমাকে লইয়া পশ্চিম যাইব।

বিধুমুখী বলিলেন,—"স্বচ্ছন্দে। কিছুদিন তোমার সঙ্গে নানা দেশ ভ্রমণ করিতে আমারও বড় সাধ হইয়াছে।"

হরিচরণের আদেশ ক্রমে, একজন দাসী গোলাপজল ভরা সোণার গুড়গুড়িতে, রূপার কলিকায়, লক্ষ্ণৌয়ের সুরভিগন্ধপূর্ণ তামাক সাজিয়া আনিল। তামাক খাইতে খাইতে তাঁহারা দেশ-ভ্রমণের পরামর্শ আঁটিতে লাগিলেন। পরামর্শ স্থির হইলে, হরিচরণ বলিলেন,—"বিলু!" (আমাদের বলিতে ভুল হইয়াছে যে, হরিচরণ বিধুমুখীকে, আদর করিয়া, বিলু বলিয়া ডাকিয়া থাকেন) বলিলেন,—"বিলু! একটু রোজলিকর খাবে কি? শ্যাম্পেন খেলে তোমার অম্বল হয়, রোজলিকর তো তুমি ভাল বাস।"

বিলোল কটাক্ষ সহকারে সোহাগিনী বিলু বলিলেন,—বড় মাথা ঘুরে—তা একটু বরফ মিশাইয়া দেও তো দেও।"

তখনই রোজলিকর আসিল এবং বরফ সংমিশ্রণে সুশীতল হইয়া, বিলু সুন্দরীর রসনা-সিক্ত করিতে থাকিল। হরিচরণ বাবু—বাবু না বলিলে আর চলে না। এই সুন্দরী যাহার চরণাশ্রিত, অতুল সম্পত্তি যাহার ইচ্ছাধীন, বিলাসের সর্ব্বোপকরণে যে পরিবেষ্টিত, তাহাকে বাবু না বলিয়া আর কি বলিব? হরিচরণ বাবু কিন্তু সোডা মিশাইয়া ইনকমপেয়ারেবল বুল হুইস্কি সেবন করিতে লাগিলেন।

দুই তিন বার সুরাপানের পর, বিলু সুন্দরীর চক্ষু অবসিত, মস্তিষ্ক অলসিত, মুখমণ্ডল উচ্ছ্বসিত, হৃদয় বিলসিত হইয়া আসিল। তিনি, আদর বিমিশ্রিত গদগদ স্বরে, সুরাজনিত অস্পষ্ট ভাষায়, বলিলেন—"চন্—আমার প্রাণের চন্, তোকে বুকের মধ্যে পুরিয়া রাখিলেও আমার সাধ মেটে না।"

বলিয়া দেওয়া আবশ্যক বিধুমুখী আদর করিয়া হরিচরণকে 'চন্' বলিয়াই ডাকিয়া থাকেন।

সেই অর্দ্ধ বিবসনা, সুরাকৃত অবসিত কলেবর যুবতী উভয় হস্তে হরিচরণকে বক্ষে পেষণ করিয়া ধরিল।

এই অবৈধ প্রণয়ের পবিত্র লীলা দর্শনের ভার অতঃপর আমাদের সেই সুনীতি-সম্পন্ন সাম্যবাদী বন্ধু গ্রহণ করিলেন; সুতরাং আমরা এই স্থলেই ক্ষান্ত হইলাম।

নবম খণ্ড জ্যোতিঃ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সঞ্জীবনী।

সনাতনপুর একখানি সামান্য গ্রাম। জলাঙ্গী নদীর ধারে উচ্চ ভূমির উপর গ্রামখানি অবস্থিত। গ্রামের পার্শ্বেই পারঘাটা। একদিন প্রাতঃকালে পারঘাটায় বড় জনতা। তত্রত্য বালুকাচড়ার একস্থানে, বহুলোক ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া, মধ্যস্থিত পদার্থ বিশেষ দর্শন করিতে করিতে, নানারূপ জল্পনা করিতেছে।

সেই নদী সৈকতে, সেই বালুকা শয্যায়, সিক্ত-বসনা, আলুলায়িতকেশা, ভুবনমোহিনী সুন্দরী। সুন্দরী মৃতা। বহু পুরুষের তীব্র দৃষ্টি তাঁহার প্রতি নিপতিত। তাঁহার বস্ত্রাদির সমাবেশও অসবদ্ধ। যে সংজ্ঞা ও অভিমান মানুষকে লজ্জা ও সঙ্কোচ প্রদান করে, তাহা তাঁহার নাই। মৃত্যু তাঁহার সকল ভয় ও ভাবনা বিদূরিত করিয়া দিয়াছে। লোকের কটূক্তি, দর্শকগণের সন্দেহ বাক্য, অনেকের নিন্দাবাদ কিছুই তাঁহাকে আর বিচলিত করিতেছে না।

সমবেত লোকের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসিল,—"মানুষটা কে হে?"

আর একজন বলিল,—"চেনা যায় না। এ গাঁয়ের তো নয়ই—কোথা থেকে ভেসে এসেছে বলা যায় না।"

আর একজন বলিল,—"ভদ্র ঘরের মেয়ে নিশ্চয়। দেখছ না রূপ?"

অপর একজন বলিল,—"ঐরূপেই সর্ব্বনাশ হয়েছে। বোধ হয় খুন করে জলে ফেলে দিয়েছে।"

অপর এক ব্যক্তি বলিল,—"নষ্ট দুষ্ট মেয়ে মানুষের এই গতি।"

আর এক সুবিচক্ষণ লোক গম্ভীরভাবে বলিল,—"ধরা পড়ে জলে ডুবে মরেছে।"

এই সময়ে ওপার হইতে খেয়ার নৌকা এপারের ঘাটে আসিয়া লাগিল। আবার সেই মৃতা সুন্দরীর চারি পাশে, ভিড়ের ভিতর আর চারি পাঁচ জন লোক বাড়িয়া গেল। তাহার মধ্যে এক ব্যক্তির মাথায় চাদর বাঁধা, গায়ে জামা, হাতে গামছা জড়ান একটা ব্যাগ, অপর হাতে ছড়ি, বগলে ছাতা, পায়ে জুতা। লোকটি লম্বা চেওড়া পক্ক কেশ অথচ বলিষ্ঠ-গঠন প্রিয়-দর্শন এবং ভদ্রাকার। ইনি আমাদের সুপরিচিত হরকুমার বাবু। কাশী হইতে নানা অভিপ্রায়ে চলিয়া আসিয়া, ইনি নানা স্থান ঘুরিতে ঘুরিতে, আজি এই স্থানে উপস্থিত। তাঁহার এখানে আগমনের উদ্দেশ্য কি, তাহা পরে জানিতে চেষ্টা করা যাইবে। আপাততঃ তিনিও ভিড়ের দিকে অগ্রসর হইয়া, এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্যাপারটা কি হে?

লোকে উত্তর দিল,—"আজ্ঞে, দেখ না কেন মশাই ?

হরকুমার বাবু আর একটু অগ্রসর হইলেন। তখনই সেই অসামান্যা সুন্দরীর শোভাময়ী কান্তি তাঁহার নয়নে পড়িল। তিনি বহু বিষয়ে অভিজ্ঞ ও অনেক শাস্ত্রার্থবিৎ। সুন্দরীর বিগতজীব কলেবর দর্শনমাত্র, চিরস্মরণীয় মহামনস্বী ডাক্তার মার্সাল হল (Dr. Marshall Hall) ও ডাক্তার সিলভেষ্টরের (Dr. Sylvester উদ্ভাবিত প্রণালীর এবং রয়াল নেশনাল লাইফ বোট ইনষ্টিটিউসনের (Ro ıl National Life Boat Institution) ধাবিত সমস্ত ব্যবস্থার বৃত্তান্ত তাহার মনে পড়িল। তিনি মৃতার নিকটে গমন করিয়া বিশেষরূপে তাঁহার অঙ্গাদির পরীক্ষা করিলেন। তাহার পর সমবেত লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"বিশেষরূপ চেষ্টা করিলে হয়ত স্ত্রীলোকটি এখনও বাঁচিতে পারে। তোমরা কেহ আমার সাহায্য করিতে পার কি ?"

এই অপরিচিত আগন্তুকের বাক্য শুনিয়া লোকগুলা পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল এবং হরকুমার বাবুর দৃষ্টি হইতে আপনাদের মুখ ফিরাইতে লাগিল। কেহ কেহ প্রস্থান করিল। কেহ কেহ একটু সরিয়া দাঁড়াইল। এক দৃঢ়কায় সুস্থ যুবা অগ্রসর হইয়া বলিল, "যদি আমার দ্বারা কোন সাহায্য হওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে আজ্ঞা করুন।"

হরকুমার বলিলেন,—"তোমার দ্বারা বেশ কাজ হইবে। তুমি বড় ভাল ছেলে। আপাততঃ কয়েক আটী খড় আন দেখি। দাম লাগে যদি, আমি দিতেছি লও। একটু শীঘ্র।"

দাম গ্রহণ না করিয়াই যুবা প্রস্থান করিল। নিকটেই মাজিদের ঘর। তাহারা খড় পাতিয়া শয়ন করে এবং তাহাদের ঘরে খড় থাকে, এ কথা যুবার জানা ছিল। সে কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, কাহারও বিধি নিষেধের অপেক্ষা না করিয়া, সেখানকার সমস্ত খড় উঠাইয়া লইয়া আসিল।

যুবা যখন খড় আনিতে গিয়াছিল, তখন হরকুমার বাবু সেই মৃতা সুন্দরীকে উপুড় করিয়া শোয়াইয়াছিলেন এবং বালিশের পরিবর্তে মৃতার একখানি বাহু কপালের নীচে স্থাপন করিয়াছিলেন। এইরূপে দেহ স্থাপন করার অনতিকাল পরে, মৃতার মুখ-গহ্বর হইতে জল বাহির হইতে লাগিল। হরকুমার সযত্নে তাহা মুছাইয়া দিতে দিতে, সেই সাহায্য প্রবৃত্ত যুবাকে বলিলেন,—"তুমি খড়গুলা ঐখানে রাখিয়া শীঘ্র আমার নিকট আইস।"

যুবা তৎক্ষণাৎ নিকটস্থ হইলে, হরকুমার বলিলেন,—"যুবতীর পরিধানের কাপড় কটিদেশে আলগা করিয়া বাঁধ, আর হাঁটুর কাছেও বাঁধিয়া দেও, যেন খসিয়া না যায়।"

উভয়ে অতীব সাবধানতা সহকারে মৃতা যুবতীর বস্ত্র বাঁধিয়া দিলেন। তাহার পর দর্শকগণের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"এই নারী তোমাদেরও কেহ নহেন, আমারও কেহ নহেন। তোমরাও ইহাকে জান না, আমিও জানি না। কিন্তু ভাই সব, ধর্ম্ম মাথার উপর আছেন। আমরা ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া ইহাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিতেছি। যদি এই নারীকে দেখিয়া, ইহার প্রায় উলঙ্গ শরীর দেখিয়া, কাহারও মনে মা বা কন্যা ছাড়া আর কোন ভাবের উদয় হয়, তাহার বড়ই অধর্ম্ম হইবে। তেমন লোক এখান হইতে সরিয়া যাওয়াই ভাল।"

এক বৃদ্ধ বলিল,—"উনি যেই হউন, উনি

আমাদের মা। এই অবস্থায় তা ছাড়া আর কিছু যার মনে উদয় হয় সে বেটার নরকেও স্থান হইবে না। মহাশয় চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু মরা কি কখন বাঁচে? আপনার নিকট যে ছেলেটি সাহায্য করিতেছে, উহার নাম হরিশ কামার। বড় ভাল লোক।"

হরকুমার বাবু কথা কহিতেছেন ও শুনিতেছেন বটে, কিন্তু কার্য্যে বিরাম নাই। তিনি মৃতাকে পাশ ফিরাইয়া শয়ন করাইলেন এবং হরিশকে যুবতীর মাথা ধরিয়া থাকিতে বলিলেন। হরিশ সেইরূপ করিলে, হরকুমার সেই বৃদ্ধের কথার উত্তরে বলিলেন,—"সত্যই হরিশ বড় ভাল লোক। ঈশ্বর উহার মঙ্গল করিবেন। বাঁচা মরা ঈশ্বরের হাত। আমরা চেষ্টা করিতেছি মাত্র। ভাল কাজ বই মন্দ কাজ নয় তো।"

বৃদ্ধ বলিল,—"আরও লোকের দরকার হইবে কি? আমি প্রাচীন, তথাপি কিছু সাহায্য করিতে পারি বোধ হয়। যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি যাই।"

হরকুমার বলিলেন,—"আইস! অনেক লোকেরই তো এ কাজ। তোমার দ্বারা বিশেষ উপকার হইবে।"

বৃদ্ধ নিকটস্থ হইল, হরকুমার মৃতার জিহ্বা অতীব সন্তর্পণতার সহিত আকর্ষণ করিলেন। সুন্দরীর রসনা কিয়ৎপরিমাণে মুখ মধ্য হইতে বাহির হইয়া পড়িল। তাহার পর পকেট হইতে নস্যের কৌটা বাহির করিলেন এবং তন্মধ্য হইতে খানিকটা নস্য বাহির করিয়া ধীরে ধীরে যুবতীর নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। তাহাতে কোন কার্য্য হইল না দেখিয়া একটা খড়ের অগ্রভাগ লইয়া তাহার নাসাপথে প্রেরণ করিলেন। তাহাতেও মৃতার হাঁচির উদ্রেক হইল দেখিয়া বৃদ্ধকে বলিলেন—"তুমি ভাই! অনবরত মৃতার বুকে ও পাঁজরে হাত বুলাইতে থাক, হরিশ তুমি এক হাতে মাথা ধরিয়া থাক, আর এক হাত দিয়া কেবল শবের গালে ও মুখে হাত বুলাও।"

তাহারা উপদেশানুরূপ কার্য্য করিতে লাগিল। তাহার পর নিজের ব্যাগ হইতে একটা গ্লাস বাহির করিয়া এক ব্যক্তিকে বলিলেন,—"ভাই! নদী হইতে শীঘ্র এক গ্লাস জল আন তো?"

সে উত্তর দিল,—"তোমরা মরা ছুঁইয়াছ। তোমাদের আমি ছোঁব কেন?"

আর এক ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া জল আনিয়া দিল। হরকুমার জোরে যুবতীর মুখে ও বুকে জলের ঝাপটা দিতে লাগিলেন। জল ফুরাইয়া গেল। শেষোক্ত ব্যক্তি আবার জল আনিয়া দিল। তখনই দিয়াশলাই জ্বালা এক আটি খড় ধরাইয়া হরকুমার বাবু সেই আগুনে গ্লাস বসাইয়া দিলেন। অনতিকাল মধ্যে জল গরম হইয়া উঠিল। জোরে যুবতীর মুখে ও বুকে সেই গরম জলের ঝাপটা দেওয়া হইল। আবার শীতল জল, আবার গরম জল এইরূপ বারংবার জল প্রয়োগ করা হইতে লাগিল। তাহার পর হরকুমার একবার ধীর ভাবে যুবতীর নাসাগ্রে ও বক্ষঃস্থলের বাম ভাগে হস্তার্পণ করিলেন এবং উৎকণ্ঠিত ভাবে মৃতার মুখের ভাব পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। সেই বৃদ্ধ বলিল,—"কিছুই তো বুঝা যায় না মশাই।"

হরকুমার বলিলেন,—"এখনই? এখনও অনেক পরিশ্রম করিতে হইবে। তোমরা হতাশ হইও না।"

তাহার পর আপনার মাথার চাদর খুলিয়া একটা ক্ষুদ্র বালিশের মত করিয়া জড়াইলেন।

তদনন্তর মৃতাকে উপুড় করিয়া শোয়াইয়া, তাঁহার ঠিক বক্ষঃস্থলের নিম্নে, সেইটি প্রবেশ করাইয়া দিলেন। চারি গণিতে যতটুকু সময় লাগে প্রায় ততটুকু সময় পরেই আবার মৃতাকে পাশ ফিরাইয়া শয়ন করাইলেন, আবার সেইরূপ সময় পরে, বুকের নীচে সেইরূপ বালিশ দিয়া, তাঁহাকে উপুড় করিয়া শোয়াইলেন। আবার সেইরূপ সময় পরে আর এক দিকে পাশ ফিরাইয়া দিলেন। বারংবার এইরূপ চলিতে লাগিল। হরিশ মাথা ধরিয়া থাকিল, বৃদ্ধ পায়ের দিক ধরিয়া ফিরাইয়া দিতে লাগিল এবং হরকুমার স্বয়ং মৃতার মধ্যভাগ ধরিয়া ফিরাইতে ফিরাইতে, যখন যেদিকে ফিরাইতে হইবে তাহার উপদেশ দিতে থাকিলেন। যত বার মৃতাকে উপুড় করিয়া শোয়ান হইতে লাগিল, ততবারই হরকুমার বাবু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পৃষ্ঠদেশে, বাহুমূলের অব্যবহিত নিম্নে, চাপ দিতে লাগিলেন।

প্রায় ৫।৬ মিনিট কাল এইরূপ প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইলেও বিশেষ কোন ফল হইল না দেখিয়া, হরকুমার বাবু মৃতাকে, হরিশ ও বৃদ্ধের সাহায্যে, একটা ঢালু স্থানে আনিয়া চিত করিয়া শোয়াইলেন, এবং কয়েক আটি খড় আপনার চাদরের দ্বারা ঢাকিয়া, মৃতার স্কন্ধদেশের নিম্নে স্থাপন করিলেন। যে স্থানে মৃতার পা পড়িল, শরীরের ঊর্দ্ধভাগ তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চতর স্থানে স্থাপিত হইল।

তদনন্তর হরকুমার বাবু মৃতার জিহ্বা টানিয়া ধরিলেন এবং ক্রমশঃ বল প্রয়োগ সহকারে মুখ-গহ্বর হইতে অনেকখানি বাহির করিয়া আনিলেন। তাহার পর স্বকীয় পরিধেয় বস্ত্রের এক প্রান্ত হইতে কিয়দংশ ছিন্ন করিয়া, তদ্দ্বারা মৃতার থুতুনির সহিত মুখ নিঃসৃত জিহ্বা বাঁধিয়া ফেলিলেন। জিহ্বা আর মুখের মধ্যে প্রবেশ করিতে পাইল না।

সন্নিহিত লোকেরা, হরকুমার বাবুর এই সকল উন্মাদ চেষ্টা দেখিয়া, তাঁহাকে পাগল বিবেচনা করিতে লাগিল; এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলিল,—"এ লোকটা নেহাত পাগল।"

আর এক ব্যক্তি বলিল,—"না হে, বোধ হয় কিছু গুণ আছে।"

আর একজন বলিল,—না, বোধ হয় লোকটা ডাক্তার হইতে পারে।

অপর এক ব্যক্তি বলিল,—খানিক পরে হয়ত মরাটা কাটবে।"

আর একজন বলিল,—তারপর হয়ত খাবে।"

এক ব্যক্তি বলিল,—চল, এখান থেকে সরা যাক্!"

আর এক ব্যক্তি বলিল,—"সেই ভাল।"

সরিবার পরামর্শ অনেকেই করিল বটে; কিন্তু কেহই সরিল না। ক্রমেই জনতার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এ দিকে, হরকুমার বাবু, মৃতার মস্তক সন্নিধানে দাঁড়াইয়া তাঁহার উভয় হস্ত কনুয়ের নিকটে [illegible] চাপিয়া ধরিলেন। তদনন্তর সেই বাহু[illegible]ক প্রসারিত করিয়া, উভয় পার্শ্বে কর্ণদ্বয়ে মূল দিয়া, ঊর্দ্ধদিকে উঠাইয়া লইলেন। দুই সেকেণ্ড মাত্র কাল হস্তদ্বয়কে তদবস্থায় রাখিয়া, পুনরায় তাহা নীচের দিকে ঘুরাইয়া আনিলেন এবং বক্ষঃস্থলের উভয় পার্শ্বে বাহুদ্বয়কে চাপিয়া ধরিলেন পুনরায় হস্তদ্বয় পূর্ব্ববৎ ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া এবং দুই সেকেণ্ড পরে নিম্নে আবর্ত্তিত করিয়া, তদ্দ্বারা বক্ষঃস্থলের উভয় পার্শ্ব পেষণ করিলেন। এইরূপ অনুষ্ঠান পুনঃ পুনঃ চলিতে লাগিল। বহুক্ষণ এইরূপ প্রক্রিয়া চলার পর, হরকুমার বাবু সানন্দে দেখিলেন সুন্দরীর বক্ষঃস্থল যেন

স্পন্দিত হইতেছে, ন্যাসারন্ধ্রদ্বয় যেন ঈষৎ স্ফীত হইয়াছে। তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিল না; তিনি চীৎকারস্বরে বলিলেন,—"শ্রীহরির কৃপায় এই স্ত্রীলোক বাঁচিবে, তোমরা সকলে একবার হরি হরি বল।"

চারিদিক হইতে হরিনামের উচ্চরোল উঠিল। হরকুমার বাবু পকেট হইতে দিয়াশলাই বাহির করিয়া দিয়া, বলিলেন,—"খড় জ্বালাইয়া আগুন কর। তোমাদের যত্ন ও পরিশ্রম সফল হইবে! ভগবান্ অবশ্যই এই সৎ কর্ম্মের জন্য তোমাদিগের প্রতি দয়া করিবেন।"

তাহারা আগুন জ্বালিল। এদিকে হরকুমার বাবু, পীড়িতার নাসা সন্নিধানে হস্ত স্থাপন করিয়া, শ্বাস-প্রশ্বাসের সূচনা বুঝিতে পারিলেন। তখন সকলকে বলিলেন,—"ঐ আগুন দিয়া পীড়িতার হাত পা সেকিতে থাক; তাত লাগিবে বলিয়া ভয় করিও না।"

হরিশ ও বৃদ্ধ সেকিতে লাগিল। হরকুমার বলিলেন, "তোমরা পা সেকিতে লাগিলে, হাত সেকিবার জন্যও দুই জন লোকের দরকার।"

সৎকর্ম্মের বড়ই মোহকর আকর্ষণ। দুই ব্যক্তি কোমরে গামছা বাঁধিয়া হরকুমার বাবুর নিকটস্থ হইল; তিনি তাহাদিগকে পীড়িতার বাহুদ্বয়ে তাপ দিতে উপদেশ দিলেন। এক প্রবীণ ব্যক্তি জিজ্ঞাসিল,—"আর লোক চাই কি মশাই?"

হরকুমার বাবু বলিলেন,—"চাই বই কি? অনেক লোকেরইত এ কাজ; এস না তোমরা।"

আরও দুইব্যক্তি অগ্রসর হইল; তাহারা সুন্দরীর তলপেটে ও পাঁজরে তাপ দিতে থাকিল। হরকুমার বাবুর প্রদর্শিত প্রণালীক্রমে হাত, গামছা, বা বস্ত্রাদি গরম করিয়া পীড়িতা দেহের নিম্নদিক্ হইতে ঊর্দ্ধদিকে সকলে ঘর্ষণ করিয়া আনিতে লাগিল। কিয়ৎকাল এইরূপ চলার পর যুবতীর গণ্ডদ্বয় ঈষৎ রক্তাভ হইয়া উঠিল এবং তাঁহার মৃতবৎ আকার বিদূরিত হইয়া যেন স্বাভাবিক বর্ণ ও ভাব আবির্ভূত হইতে থাকিল। হরকুমার বাবু যুবতীর রসনার বন্ধন খুলিয়া দিলেন এবং বলিলেন,—"ভাই সব, তোমাদের যত্ন সফল হইবার সূচনা হইয়াছে। ঈশ্বরের জীব যেই কেন হউক না, তোমরা রক্ষা করিয়া বড়ই পুণ্য করিলে। সেক ও তাপ বন্ধ করিও না ভাই।" সুন্দরীর জিহ্বা ধীরে ধীরে বদনের মধ্যগত হইল। চারিদিকেই আগুণ জ্বলিতেছিল। হরকুমার গ্লাসে জল গরম করিয়া ফেলিলেন এবং উষ্ণ জল কিয়ৎ পরিমাণে হস্তে গ্রহণ করিয়া, ধীরে ধীরে ফোঁটায় ফোঁটায় যুবতীর মুখের মধ্যে দিতে থাকিলেন। জল অল্পে অল্পে যুবতীর উদরস্থ হইতে থাকিল। তখন হরকুমার বাবু আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া বাহুদ্বয় উত্তোলন করিয়া বলিলেন,—"ভাই সব! হরি নামই সত্য—হরিরই জয়; তোমরা সকলে একবার হরি হরি বল।"

আবার চারিদিক হইতে উচ্চরোলে হরিধ্বনি হইতে লাগিল। এই সময়ে একজনের প্রদত্ত তাপ, যুবতীর বাম চরণে অধিক পরিমাণে লাগায়, তিনি পা সরাইয়া লইলেন।

আবার চারিদিক হইতে হরিধ্বনি সংঘোষিত হইল। সেই চির প্রীতিপ্রদ মধুময় হরিধ্বনি সাঙ্গ হইতে না হইতেই, যুবতী নয়ন মেলিয়া চাহিলেন এবং আপনাকে এই অবস্থায়, অপরিচিত ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে সংস্থাপিত দেখিয়া, লজ্জায় সঙ্কুচিতা হইয়া, আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন এবং বস্ত্র দ্বারা দেহ সমাচ্ছন্ন করিবার

অভিপ্রায়ে, হাত বাড়াইয়া কাপড় টানিতে লাগিলেন।

হরকুমার বাবু বলিলেন,—"ভয় কি মা, আমি তোমার বুড়া ছেলে। ছেলের কাছে মায়ের লজ্জা কি? কাপড় দিই মা। কিছু ভয় নাই।"

হরকুমার ব্যাগ খুলিয়া একখানি কাপড় বাহির করিলেন এবং তাহা দুই ভাঁজ করিয়া সুন্দরীর সকল শরীর ঢাকিয়া দিলেন।

যুবতী ক্ষীণস্বরে বলিলেন,—"আমি ডুবিয়া গিয়াছিলাম; আপনি আমায় বাঁচাইলেন কেন?;'

হরকুমার বলিলেন,—"আমরা বাঁচাই নাই মা—ঈশ্বর বাঁচাইয়াছেন। মরা বাঁচান কি আমাদের সাধ্য? যাঁহার কাজ তিনিই করিয়াছেন।"

তাহার পর উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"তোমরা বড়ই সৎকর্ম করিয়াছ। কিন্তু ভাই কাজের এখনও শেষ হয় নাই। যেমন করিয়া হউক একখানি পাল্কী আনিতে হইবে; আর এই সুন্দরীকে রাখিতে পারা যায়, গ্রামের মধ্যে, এরূপ একটা স্থান স্থির করিয়া দিতে হইবে। এখনও ১০। ১২ দিনের কমে, এই রমণী সুস্থ হইতে পারিবেন না। পয়সা যাহা খরচ হয়, তাহা আমি দিব। অগ্রিম লাগে ত এখনই লও।"

হরকুমার পকেট হইতে ৫৲ টি টাকা বাহির করিলেন। হরিশ কামার বলিল,—"যদি বাবু মত করেন, তাহা হইলে আমার বাড়ীতে জায়গা হইতে পারে। আমার বাড়ীতে আমি, আমার মা, এক বিধবা ভগ্নী আর আমার স্ত্রী আছেন। শুশ্রূষার লোকের অভাব হইবে না। আমার বাড়ীতে একখানি বেশী ঘরও আছে। আমি জাতিতে কামার—বড় গরিব; কিন্তু এজন্য টাকা কড়ি কিছুই লইব না ঠাকুর।"

অনেকেই বলিল,—"হরিশ কামার লোকও ভাল, তাহার বাড়ীও ভাল। এই পরামর্শই বেশ।"

হরকুমার বলিলেন,—"হরিশ তুমি বড়ই ধার্ম্মিক। তাই হইবে—তোমার বাড়ীতেই যাওয়া স্থির। কিন্তু ভাই, লইয়া যাওয়ার উপায়?"

হরিশ বলিল,—"আজ্ঞে পাল্কী বড় সহজে মিলিবে না। পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু অনেক কষ্টে ও অনেক বিলম্বে। আপনি যদি মত করেন, তাহা হইলে আমরা মাকে ধরাধরি করিয়া লইয়া যাইতে পারি। এই মাঝিদের ঝাপ আছে, তাহার উপর মা ঠাকরুণকে শোয়াইয়া সহজেই লইয়া যাইতে পারা যায়।"

হরকুমার বাবু বলিলেন,—"তাহাতে ক্ষতি কি? কিন্তু তাহার উপর একটা কিছু না পাতিলে মায়ের গায়ে লাগিবে।"

হরিশ বলিল,—"তাহারও ব্যবস্থা করিতেছি।"

তিন ব্যক্তি প্রস্থান করিল। ক্ষীণস্বরে সুন্দরী আবার বলিলেন,—"আপনি কে?"

হরকুমার বলিলেন,—"আমাকে চিনিতে পারিবার আপনার কোনই সম্ভাবনা দেখিতেছি না। তথাপি আমার পরিচয় আপনাকে ক্রমে জানাইব। আপনি কে তাহা জানিবার জন্য আমার কোন কৌতূহল নাই। আপনার উপকারের জন্য যদি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে আমি পরে তাহা জানিবার চেষ্টা করিব। আপাততঃ এই জানিয়া রাখুন, আমি আপনার পেটের ছেলে। আমার দ্বারা আপনার ইষ্ট ভিন্ন কোনই অনিষ্ট হইবে না মা।"

আবার ক্ষীণস্বরে সুন্দরী বলিলেন,—"আমার জন্য খরচ পত্র করিবেন না। আমি বড় দুঃখিনী।"

হরকুমার বলিলেন,—"কিন্তু মা, তোমার আকারে দেখিতেছি তুমি ভদ্রকন্যা, তোমার কথাবার্ত্তায় বুঝিতেছি তুমি সতী লক্ষ্মী! তোমার জন্য যত্ন, খরচ কখনই নিষ্ফল হইবে না মা। তুমি এখন দুঃখিনী হইতে পার, কিন্তু দুঃখ তো চিরদিন থাকে না মা। অবশ্যই দুঃখ দূর হইবে। সে দুঃখের কথা বুঝিয়া যদি তাহা দূর করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত হয়, তাহা হইলে সে জন্যও আমরা যত্ন করিব। অবশ্যই ভগবান্ মুখ তুলিয়া চাহিবেন। ভয় করিও না মা। সকলই ভাল হইবে।"

সুন্দরী, বলিলেন,..."আপনি মহাশয় লোক। ঈশ্বর আপনার ভাল করুন। আমার এখনও বাঁচিতে সাধ আছে।"

ঝাঁপ ও কম্বল আসিয়া উপস্থিত হইল। ঝাঁপের উপর কম্বল বিছাইয়া, বালিশের স্থলে হরকুমারের ব্যাগ স্থাপন করা হইল। তাহার পর সুন্দরীকে সেই শয্যায় শুয়াইয়া চারিজনে চারিপ্রান্ত ধরিয়া, ধীরে ধীরে লইয়া চলিল। যুবতীর সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাচ্ছাদিত। তিনি নয়ন মুদ্রিত করিয়া ও সূক্ষ্মবস্ত্রে বদন আচ্ছন্ন করিয়া সেই শয্যায় পড়িয়া রহিলেন।

কৌতূহল পরবশ অনেক লোক সঙ্গে চলিতে লগিল। তাহারা এরূপ অদ্ভুতকাণ্ড কখনও দর্শন করে নাই। এতাদৃশ বিস্ময়জনক ব্যাপার সম্ভবপর বলিয়াও তাহাদের জ্ঞান ছিল না; সুতরাং, তাহারা হরকুমার বাবুকে দৈবশক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়া মনে করিতে লাগিল। তিনি কে, কোথা হইতে এ গ্রামে সহসা আসিলেন, কেনই বা তাঁহার আগমন ঘটিল, এ সকল বৃত্তান্ত জানিবার জন্য তাহাদের নিরতিশয় আগ্রহ জন্মিল।

আর ঐ সুন্দরী? ঐ কুসুম-সুকুমারী লজ্জাশীলা যুবতী—কে উনি? কোন কুলটা কামিনী কি? অসম্ভব। দুঃখিনী? কিসের দুঃখ? কে জানে! কত দুঃখই সম্ভব। ঐ পুরুষ কি ঐ নারীকে পূর্ব্বে জানিতেন? না।

এই সকল রহস্যের কিছুই তাহারা উদ্ভেদ করিতে পারিল না; কিন্তু বিশেষ ভক্তি ও সম্ভ্রম পূর্ণভাবে তাহারা ঐ মৃতকল্প নারী ও ঐ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষকে লক্ষ্য করিতে করিতে, তাঁহাদের অনুসরণ করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরিচয়।

সন্ন্যাসী উমাশঙ্করের পিতৃমাতৃ ঘটিত বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে, হরকুমার বাবু, নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া, এই স্থানে আসিয়াছেন। এ স্থানে থাকিবার তাঁহার

[মন্তব্য]—বঙ্গ ভাষায় আরও কোন উপন্যাসে জলনিমগ্না এক নারীর পুনর্জ্জীবন প্রাপ্তির প্রসঙ্গ আছে। এতদ্বিষয়ক জ্ঞান নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং ইহার প্রণালী তাহাতেই পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক সুতরাং এই ব্যাপারের আমূল ব্যবস্থা বিস্তারিত রূপে বিবৃত হওয়াই বিধেয়। বিচক্ষণ হরকুমার বাবু উপস্থিত ঘটনার প্রথম হইতে যে যে প্রণালীর অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহাই সমীচীন ও শাস্ত্রসম্মত। এই জন্যই মূল ঘটনার পরিপুষ্টির নিমিত্ত, বর্ত্তমান ব্যাপারের বর্ণনা বিশেষ আবশ্যক না হইলেও, আমরা ইহার পরিবর্জ্জন করিলাম না।

প্রয়োজন ছিল না। এই সনাতনপুরের কিছু দূরে রামনগর নামে এক গ্রাম আছে। সেই রামনগরে গমন করাই হরকুমারের অভিপ্রায়। পথিমধ্যে অপরিজ্ঞাত যুবতীর এই দুরবস্থা দেখিয়া, তাঁহাকে অগত্যা এখানে থাকিতে হইয়াছে।

বাস্তবিকই হরিশ কামার বড় ভাল লোক। সে সানন্দে পীড়িতা কামিনী ও হরকুমার বাবুর যথাবিহিত সাহায্য করিয়াছে এবং আপনার বাটীতে তাহাদের অবস্থানের বড়ই সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। হরিশের মা, ভগ্নী, স্ত্রী সকলেই পীড়িতাকে গুরুকন্যার ন্যায় সমাদর করিতেছে ও তাঁহার সেবা শুশ্রূষা প্রভৃতি সকল কর্ম্ম পরমানন্দে সম্পাদন করিতেছে। যেখানে পীড়িতা সুন্দরী থাকেন, হরিশ সে দিকেও যায় না। বাটীর বাহিরে এক খানি ক্ষুদ্র ঘর আছে; হরকুমার তথায় অবস্থান করেন। পীড়িতা সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে তাঁহাকে কোন নিরাপদ স্থানে পাঠাইয়া না দিয়া, হরকুমার স্থানান্তরে যাইতে অক্ষম।

হরকুমার বাবুর সেদিনকার কার্য্য ও তাহার পরবর্ত্তী অন্যান্য ব্যবহারাদি আলোচনা করিয়া, হরিশ কামার এবং গ্রামের লোকেরা, হরকুমার বাবুকে একটা দেবতুল্য মহাত্মা বলিয়াই মনে করিয়াছে।

পীড়িতা ক্রমশঃ সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার লাবণ্যজ্যোতিঃ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই শোভাময়ী সুন্দরীর পরিচয় জানিবার নিমিত্ত বৃদ্ধ হরকুমার বাবু অনেক চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু স্বকীয় বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপনে নবীনার নিতান্ত অনিচ্ছা দেখিয়া, অগত্যা ক্ষান্ত হইয়াছেন। এই সুন্দরীর জন্য হরকুমার বাবুর অনেক অর্থব্যয় হইতেছে; কিন্তু তিনি সে জন্য একটুও কাতর বা অসুখী নহেন।

একদিন বৈকালে হরকুমার বাবু হরিশ কর্ম্মকারের বাটীতে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন,—"মা, কোথায় গো?"

তৎক্ষণাৎ একখানি ঘরের মধ্য হইতে, লজ্জাবনতবদনা সেই পুনর্জ্জীবিতা সুন্দরী আগমন করিয়া, ভক্তি সহকারে হরকুমার বাবুকে প্রণাম করিলেন এবং একখানি কাঠের পিঁড়ি পাতিয়া তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিলেন। হরকুমার বাবু আসন গ্রহণ করিলে, সুন্দরী সঙ্কুচিতভাবে অনতিদূরে ভূ-পৃষ্ঠে উপবেশন করিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে স্বকীয় বস্ত্রের এক প্রান্তদেশ অন্যমনস্ক ভাবে অঙ্গুলিতে জড়াইতে জড়াইতে ও খুলিতে খুলিতে বলিতে লাগিলেন,—"বাবা, কয়দিন হইতে আপনাকে একটা কথা বলিব মনে করিয়াছি, কিন্তু আপনার স্নেহ ও দয়া দেখিয়া বলি বলি করিয়াও বলিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আজ কিন্তু যেমন করিয়া হউক কথাটী বলিয়া ফেলিব মনে করিয়াছি।

হরকুমার বাবু সস্নেহে বলিলেন,—"আমাকে কোন কথা বলিতে এত সঙ্কোচ কেন মা? বল কি কথা?

সুন্দরী কিয়ৎকাল অধোমুখে চিন্তা করিলেন; তাহার পর সাহসে ভর করিয়া বলিলেন,—"আমার বোঝা আপনি আর এমন করিয়া কতদিন বহিবেন?"

হরকুমার বাবু বলিলেন,—"মায় বোঝা ছেলে তো, চিরদিনই বহিয়া থাকে। কোন ছেলেই তো সে জন্য কাতর হয় না এবং বোঝা বলিয়া মনেও করে না। তুমি মা; যতদিন আবশ্যক হইবে, আমাকে অবশ্যই

আনন্দের সহিত ততদিন তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে।"

সুন্দরী আবার বলিলেন,—"আপনার যত্ন ও অনুগ্রহের সীমা নাই। কিন্তু আমারও নানাস্থানে অনেক আত্মীয় লোক আছেন; তাঁহাদের সংবাদাদি না পাইয়া আমি বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছি। তাই বলিতেছিলাম আপনি অনুমতি দিলে, আমি কোন আত্মীয় লোকের নিকট চলিয়া যাই।"

হরকুমার বাবু এই সুন্দরীর পরিচয় জানিবার নিমিত্ত নিতান্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। ভাবিলেন, নবীনা যখন স্বেচ্ছায় পরিচয় প্রদান করিবেন না, তখন কৌশল দ্বারা তাহা জানিতে চেষ্টা করা অপরামর্শ নহে। বলিলেন,—"বেশ কথা আমার তাহাতে কোনই আপত্তি নাই, তুমি কোথায়, কোন্ আত্মীয়ের নিকট যাইবে বল। আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া রাখিয়া আসিব।"

সুন্দরী জানিতেন যে, তাঁহার প্রস্তাবের এইরূপ উত্তরই হইবে। কোন আত্মীয়ের নাম উল্লেখ করিলেই তাঁহার পরিচয় প্রকাশ হইয়া পড়িবে একথা তিনি বুঝিতেন; অথচ এরূপ ভাবে থাকিতেও তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। তিনি অনেকক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন,—"আমাকে একাকিনী চলিয়া যাইতে দিন।"

হরকুমার বাবু ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিলেন,—"তাও কি হয় না মা? আমি এমন অজ্ঞানের মত কাজ করিতে পারি কি? কিন্তু কেন মা তুমি আমার নিকট নিজের পরিচয় গোপন করিতেছ? আমাকে তোমার [illegible]চয় জানাইলে, ইষ্ট ভিন্ন কখনই অনিষ্ট হইবে না। আমি বেশ বুঝিতেছি, তুমি বংশের ভদ্র-ঘরের মেয়ে। তোমার স্বভাব চরিত্র খুব ভাল; নিশ্চয়ই কোন দৈব দুর্বিপাকে পড়ায় তোমার এই দশা ঘটিয়াছে। বল মা তুমি কে? আমি যত্ন করিয়া অবশ্যই তোমার যাহাতে ভাল হয়, তাহার উপায় করিব।"

সুন্দরী বলিলেন,—"আমার কথা কেহই বিশ্বাস করে না। আপনিও আমার বৃত্তান্ত শুনিলে, হয়ত বিশ্বাস করিবেন না। আমি জীবনে কোন মন্দ কাজ করি নাই; কিন্তু আমার অদৃষ্টের দোষে, বা বুদ্ধির দোষে সকলই মন্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে সুখের আশায় এখনও আমি জীবন রাখিতে চাহি, তাহা যে আমার অদৃষ্টে আবার ঘটিবে এরূপ বিশ্বাস আমার আর নাই; এরূপ অবস্থায় আমার মরাই মঙ্গল। কিন্তু আমার যাহাই হউক, আমার জন্য আর এক দুঃখী পরিবার বড়ই বিপদাপন্ন হইয়াছে। আমার নিজের ভাবনা আমি এখন ছাড়িয়া দিয়াছি; একবার তাহাদের সংবাদ লইবার জন্য আমি অস্থির। আর আমার কোন কামনা নাই। তাহাদের, ভাল হউক মন্দ হউক, একটা সংবাদ লইয়া আমি হয়ত প্রাণত্যাগ করিব। অতএব আপনি আমাকে বিদায় দেন।"

হরকুমার বাবু বলিলেন,—"ছিঃ মা! আত্ম-হত্যার কথা মনে আনিতে নাই। তুমি কাহার সংবাদের জন্য ব্যাকুল, বল? আমি এখনই তাহা জানিবার উপায় করিব। আমার লোকজন আছে; এ গ্রামের সবাতেই আমার বাধ্য; এ প্রদেশের অনেকেই আমার পরিচিত, আত্মীয় ও বন্ধু আছেন; কুটুম্ব সাক্ষাৎও এ অঞ্চলে আমার অনেক; টাকা কড়িরও আমার হাতে অপ্রতুল নাই। এ অবস্থায় তুমি আমাকে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিলে, আমার দ্বারা প্রতিকার হওয়াই সম্ভব।"

সুন্দরী নীরবে অধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন। হরকুমার বাবু আবার বলিলেন—"দেখ মা! আমি তোমার ছেলে। মা কখনও ছেলেকে অবিশ্বাস করে না এবং ছেলেও কখনও মাকে অবিশ্বাস করিতে পারে না। অন্যে তোমার কথা বিশ্বাস করুক বা না করুক, আমি যে তোমার কথা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিব, তাহার কোনই সন্দেহ নাই। তোমার আকৃতি, তোমার ব্যবহার, তোমার কথা-বার্ত্তা এ কয়দিন আমি আলোচনা করিতেছি এবং বুঝিতেছি যে, তোমার ন্যায় সতী লক্ষ্মী, সুশীলা নারী এ সংসারে বড়ই দুর্লভ। তবে মা, কেন তুমি আমাকে অকারণ সন্দেহ করিয়া কষ্টভোগ করিতেছ?"

তথাপি সুন্দরী নীরব। হরকুমার বলিলেন,—"কিন্তু মা, তোমার এ চেষ্টা নিষ্ফল হইবে। আজ হউক, কাল হউক, বা দশদিন পরেই হউক, আমি তোমার পরিচয় জানিতে পারিবই পারিব। তোমার ন্যায় অল্প বয়সের মেয়েকে, একাকিনী নিঃসহায় অবস্থায় ফেলিয়া আমি যাইতে পারিব না। সুতরাং হয় তোমাকে সঙ্গে করিয়া কাশীতে লইয়া যাইব এবং আমার পরিবারবর্গের নিকট রাখিয়া দিব না হয় এ দেশে তোমার কোন আত্মীয়ের সন্ধান পাইলে, তাঁহাদের নিকট তোমার থাকিবার ব্যবস্থা করিব। যেরূপেই হউক তোমার পরিচয় অধিক দিন আমার নিকট প্রচ্ছন্ন থাকিবে বোধ হয় না। এ অবস্থায় তুমি তাহা জানাইলে, সুবিধা ভিন্ন অসুবিধা কিছুই হইত না। তবে যদি তাহাতে তোমার নিতান্তই অনিচ্ছা হয়, তাহা হইলে, আমি বার বার সেজন্য জেদ করিতে চাহি না।"

হরকুমার বাবু নীরব হইলেন। সুন্দরী বলিলেন,—"আপনি আমাকে মা বলিয়া ডাকিয়াছেন; পিতার ন্যায় যত্নে আমার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন; আমার জন্য অনেক ক্লেশ স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। আপনি মহাশয় লোক। আপনার নিকট সকল কথা বলিব। বিশ্বাস করুন বা না করুন, অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, আমি কিছুই আপনার নিকট লুকাইব না। আপনি সোণাপুরের সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নাম শুনিয়াছেন কি?"

হরকুমার চমকিত হইলেন এবং সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিলেন,—"মা! তবে তুমি সার্ব্বভৌম মহাশয়ের পুত্রবধূ, নবীনকৃষ্ণের সহধর্ম্মিণী?"

যুবতী অঞ্চলে বদনাবৃত করিয়া রোদন বিজড়িত স্বরে বলিলেন,—"আপনি কেমন করিয়া জানিলেন? এ অভাগিনীর একদিন সেই গৌরবের পরিচয়ই ছিল বটে; এখন শ্বশুর আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু আপনি কেমন করিয়া বুঝিলেন?"

হরকুমার বলিলেন,—"শ্যামলালের দৌরাত্ম্য ও নির্য্যাতনের কথা, সকলই আমি জানি মা। তোমার শ্বশুর ও স্বামী এক্ষণে কাশীধামে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহারা ভাল আছেন। তুমি আমার নিতান্ত আপনার লোক। কোন ভয় করিও না, নিঃসঙ্কোচে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সকল কথা বল মা? নিশ্চয়ই আমি সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিব।"

তখন সুহাসিনী একে একে আমূল সমস্ত ঘটনা হরকুমার বাবুর গোচর করিলেন। শ্যামলালের প্রেরিত দূতের আগমন, শ্বশুর ও স্বামীর রক্ষা করিতে অক্ষমতা, গদা চণ্ডালের অলঙ্কার লোভে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বিলাসপুরের কুটুম্ব বাড়ীতে আনয়ন, কুটুম্বগণের বিরাগ, দাসীর সহিত পরিচয় হওয়ায় চণ্ডীতলা

গ্রামে কৈবর্ত্ত বাটীতে আশ্রয় লাভ, পুনরায় গদার সাহায্যে শ্বশুরের নিকটস্থ হইবার চেষ্টা, পথিমধ্যে অপরিচিত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক আক্রমণ, দাসীর স্বামী রামহরির গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত ও পতন, অপরিচিত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক তাঁহাকে ও দাসীকে নৌকায় আনয়ন, নৌকার নিমজ্জন, অসম্ভাবিত উপায়ে তাঁহার জীবন রক্ষা ইত্যাদি সকল কথাই তিনি বলিলেন। এই সকল বৃত্তান্ত শেষ হইলে, তিনি বলিতে লাগিলেন,—"আমার যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে; কিন্তু আমার জন্য রামহরি ও দাসী হয় ত মারা পড়িয়াছে। তাহারা বড়ই সৎ ও নিতান্ত ধার্ম্মিক। তাহাদের জন্য ভাবনাতেই আমি এক্ষণে যার-পর-নাই অস্থির।"

হরকুমার বলিলেন,—তোমাকে দেখিয়া ও তোমার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া আমার আজ যে আনন্দোদয় হইল, সমস্ত জীবনে এরূপ আনন্দ আর কখন হইয়াছে কিনা সন্দেহ। তোমার শ্বশুর ও আমি অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু। আমার নাম শুনিয়া তুমি হয় ত আমাকে মনে করিতে পারিতেছ না; কিন্তু আমার পরিচয় শুনিলে, তুমি নিশ্চয়ই আমাকে চিনিতে পারিবে। আমি পূর্ব্বে শ্যামলাল বাবুর দেওয়ান ছিলাম।

সুহাসিনী মাথার কাপড় আর একটু টানিয়া দিয়া বলিলেন,—"বাস্তবিকই আপনি আমার শ্বশুর। আমি জানি, আপনি আমার শ্বশুরের পরম আত্মীয়। আমি, আগে না জানিয়া, আপনার সহিত কথা কহিয়া বড়ই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি।"

হরকুমার বলিলেন,—"বড়ই ভালকর্ম্ম করিয়াছ। তোমাকে দেখিতে পাইলাম, তোমার মুখে সকল কথা শুনিতে পাইলাম বলিয়াই তো সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা করিবার ভরসা করিতেছি। তোমার কোন চিন্তা নাই মা। আমি শীঘ্রই কৈবর্ত্তদিগের সংবাদ আনাইয়া দিতেছি এবং যাহাতে তোমার শ্বশুর মহাশয় তোমাকে নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করেন, তাহার সুব্যবস্থা করিতেছি। তোমার ন্যায় পুত্রবধূ অনেক ভাগ্য-ফলেই মিলে। জগতে ভাল হইলেই অনেক কষ্ট সহিতে হয়। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী সকলকেই কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। অশেষ কষ্টের মধ্যেও ধর্ম্ম বজায় রাখিতে পারাই মহত্ত্ব। তুমি বালিকা হইলেও অতীব যত্নে ধর্ম্ম-ধনকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মহত্ত্বের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছ। তোমার কষ্টের শেষ হইয়াছে মা। কাহারও কষ্ট কখনই চিরদিন থাকে না।

সুহাসিনী অধোমুখে রোদন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বাহির হইতে এক ব্যক্তি চীৎকার করিয়া ডাকিল,—হুজুর বাড়ী আছেন কি?

হরকুমার উত্তর দিলেন,—কেও? জরিফ দাঁড়াও যাই।"

তাহার পর সুহাসিনীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—আমাকে যে ব্যক্তি ডাকিতেছে, সে শ্যামলাল বাবুর কোচম্যান ছিল। এ সম্বন্ধে অনেক কথাই তোমাকে জানাইবার আছে, অন্য সময়ে তাহা বলিব।"

হরকুমার প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সংবাদ।

হরকুমার বাহিরে আসিলে, প্রাচীন জরিফ কোচম্যান তাঁহাকে সবিনয় সেলাম

করিয়া বলিল,—"ধর্ম্মাবতার, চেষ্টার কোনই ত্রুটি করি নাই, কিন্তু ফল ত কিছুই হইল না।"

হরকুমার বলিলেন,—"তুমি বড়ই পরিশ্রম করিয়াছ দেখিতেছি। সমস্ত দিন বুঝি খাওয়া হয় নাই? চেহারা বড়ই খারাপ দেখাইতেছে। আগে তুমি বিশ্রাম কর, কিছু খাওয়া দাওয়া কর, তাহার পর সকল কথা শুনিব।"

হরিশ কর্ম্মকারের বাহির বাটীতে একখানি দোচালা ঘর ছিল; হরিশের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হওয়ার পর এবং এ প্রদেশে এখন কিছুকাল থাকিতে হইবে জানিয়া হরকুমার বাবু সেই সামান্য ঘরখানি আপনার বৈঠকখানা করিয়া লইয়াছেন। তিনি সেই ঘরে শয্যার উপর উপবেশন করিলে, জরিফ কোচম্যান, একখানি কম্বল লইয়া, তাহার অনতিদূরে ঘরের বাহিরে উপবেশন করিল। তাহার পর বলিল,—"লোকটা গুলিখোর। অতি অসভ্য, নিতান্ত নির্ব্বোধ। তাহার দ্বারা কোন কাজ আদায় করা আমার ত সাধ্য নহে, হুজুর যদি পারেন।"

হরকুমার বলিলেন,—"তবে তুমি তাহার সন্ধান পাইয়াছ, তাহার সহিত দেখাও করিয়াছ। ভাল এও একটা সুসংবাদ বটে; গঙ্গামণির সে বাস্তবিকই বোনপো কি না, তাহা ঠিক করিতে পারিয়াছ কি?"

জরিফ বলিল,—"তাহার মুখে সে পরিচয় পাই নাই বটে; কিন্তু বিশেষ সন্ধানে জানিতে পারিয়াছি যে, সে লোকটা গঙ্গামণির বোনপো বটে। গঙ্গামণি পাঁচ বৎসর আগে ফৌত হইয়াছে। এই বোনপো তাহার কাছেই থাকিত; মাসী মরার পর, বোনপো রামনগর ছাড়িয়া রাধানগরে আসিয়া বাস করিতেছে। গঙ্গামণির একটি ঘর, কিছু পিতল কাঁসার বাসন, দুই চারিখানা সোণা রূপার অলঙ্কার এবং যৎসামান্য নগদ টাকা ছিল। এই বোনপো সে সমস্ত দখল করিয়াছিল এবং বাড়ী ঘর ও জিনিস পত্র বেচিয়া, রামনগর হইতে চলিয়া আসিয়াছিল। এক্ষণে তাহার আর কিছু নাই, নেশা করিয়া ও অপব্যয় করিয়া সকলই নষ্ট করিয়াছে।"

হরকুমার জিজ্ঞাসিলেন,—"এখানে তাহার একটা থাকিবার স্থানও নাই কি?"

জরিফ বলিল,—"কিছুই নাই। সমস্ত দিন সে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায় ও গুলির আড্ডায় কাটায়। রাত্রে এক ভদ্রলোকের বাটীর বাহিরের বারান্দায় পড়িয়া থাকে। গঙ্গামণির নিকট যে কাগজ পত্র ছিল বলিতেছেন, এ হতভাগা নিশ্চয়ই তাহা পায় নাই এবং পাইলেও রাখে নাই।"

হরকুমার জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি কাগজ পত্রের কথা তাহার নিকট তুলিয়াছিলে কি?"

জরিফ বলিল,—"আজ্ঞে না। আমি তাহার সহিত কোনই কথা কহি নাই। পাছে ভয় পাইয়া সে পলাইয়া যায়, এই আশঙ্কায় আমি তাহার সহিত কথা কহিবার চেষ্টা করি নাই। হুজুর তাহাকে দেখিয়া যেরূপ মনে বুঝেন, তাহাই করিবেন ভাবিয়া, আমি তাহাকে ঘাঁটাই নাই। কিন্তু আমার বোধ হয়, যদিই কাগজ পত্র সে পাইয়া থাকে, তাহা হইলে সে সকলই নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।"

হরকুমার জিজ্ঞাসিলেন,—"তাহার ভয়ের কারণ কি, তাহা অনুমান করিতে পারিয়াছ?"

জরিফ বলিল,—"তাহাও এক রকম বুঝিয়াছি। গঙ্গামণির আর এক ভগ্নীর আর এক ছেলে আছে। তাহার নাম রামচন্দ্র। সে বর্দ্ধমানে থাকে, ভাল কাজ করে—তাহার অবস্থা মন্দ নয়। মাসীর সামান্য সম্পত্তির জন্য তাহার কখনও লোভ হয় নাই। অথবা তাহার

মাসী হয়ত তাহাকে সে সকল কিছু দেয় নাই। ফলতঃ সে তাহার অংশ লইবার জন্ত কখনও চেষ্টা করে নাই। গঙ্গামণি যতদিন জীবিতা ছিল, ততদিন রামচন্দ্র মধ্যে মধ্যে মাসীর খবর লইয়াছে এবং কখন কখন গঙ্গামণিকে সামান্ত অর্থ সাহায্যও করিয়াছে। চণ্ডী অচেনা লোক দেখিলেই মনে করে যে, হয়ত সে তাহার সেই মাসতত ভাইয়ের লোক এবং হয় ত এতদিন পরে গঙ্গামণির সম্পত্তির অংশ লইবার লোভ হওয়ায়, তাহার ভাই তাহাকে তাহার নিকট পাঠাইয়াছেন।”

হরকুমার একটু হাস্ত করিলেন; বলিলেন—“জরিফ তোমার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। তুমি অনেক প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছ। এমন গুরুতর বিষয়ের অতি সহজেই মীমাংসা হইয়া যাইবে এরূপ আশা আমি কখনই করি নাই। এক গঙ্গামণি ও রামনগর এই দুইটী মাত্র নাম লইয়া আমি এ প্রদেশে আসিয়াছি। কোন্ রামনগরে আমার প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে তাহাও আমি জানিতাম না। এক্ষণে বুঝা যাইতেছে, এই রামনগরই ঠিক। গঙ্গামণিরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এ সকলই বিশেষ শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। আমাদিগের হতাশ হইবার কোনও কারণ নাই।”

জরিফ বলিল,—“আমি কিন্তু হুজুর কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এমন দিন কি খোদা করিবেন? আমার মনে কোনই ভরসা নাই। তবে হুজুরের মত বুদ্ধি আর কাহারও নাই। হুজুর যখন ভাল বুঝিতেছেন, তখন কাজেই সকল বিষয় ভাল বলিয়াই মনে করিতে হইবে।”

হরকুমার বলিলেন,—“ভাল যে হইবে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। সেই বালক আকারে প্রকারে [illegible] মত; তাহার অদৃষ্টে অনেক [illegible] [illegible] ভোগ আছে। নিশ্চয়ই তাহার বংশাবলীর বৃত্তান্ত আমি প্রকাশ করিতে পারিব। এ বিষয়ে মহাপুরুষ আমাকে আশীর্ব্বাদও করিয়াছেন। আশায় বুক বাঁধিয়া কাজ কর, অবশ্যই আমরা সফলতা লাভ করিব। তোমার পুরাণ মুর্শিবের কোন খবর পাইয়াছ কি?”

জরিফ বলিল,—“আমার জবাব হওয়ার পর হইতে আর কোন খবর পাই নাই—পাইতেও ইচ্ছা নাই। তবে এই মাত্র শুনিতেছি যে গিন্নি আর হরিচরণ বাবু পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়াছেন। শ্যামলাল বাবু একা বাড়ীতে বড় দুরবস্থায় পড়িয়াছেন। তাঁহার খরচের নিমিত্ত ১৫৲ টাকা করিয়া ধার্য্য হইয়াছে, তাহাও তাঁহার হাতে দেওয়া হয় না—রামা খানসামার কাছে থাকে। গাড়ী, ঘোড়া, হাতী সমস্তই বিক্রী হইয়াছে। দামি দামি জিনিষপত্র গিন্নি সকলই সঙ্গে করিয়া লইয়াছেন—কতক বিক্রয়ও করিয়াছেন। সামান্ত কাঠ কাঠরা, বাসন কোসন বাড়ীতে পড়িয়া আছে। চাকর বাকর সকলেরই জবাব হইয়াছে, কেবল কাছারীতে কয়েক জন মুহুরি ও একজন নায়েব আছেন। বাড়ী আগ্‌লাইবার জন্ত চারিজন দারওয়ান আছে। সোণার সংসার ছাই হইয়া গিয়াছে। শ্যামলাল বাবুর দুর্দ্দশার সীমা নাই।”

হরকুমার বাবু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—“যাহা হওয়া উচিত তাহাই হইয়াছে। সে জন্ত দুঃখ করিবার কোনই দরকার নাই। আমি আপাততঃ তোমার আহারের উদ্যোগ করিয়া দিই।”

জরিফের আহারাদি সমাপ্ত হইলে হর-কুমার বাবু তাহাকে নিকটে ডাকিয়া পীড়িতা সুন্দরীর পরিচয় এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য অনেক বৃত্তান্ত জানাইয়া বলিলেন,—"এক্ষণে যেমন করিয়া হউক, অবিলম্বে গদা চাঁড়ালের সন্ধান করিতে হইবে। তোমার উপর আমি এই ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতেছি।

জরিফ আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিল,—এ কাজ আমি সহজেই শেষ করিতে পারিব। গদা যেখানে থাকে তাহা আমি জানি। শীঘ্রই তাহাকে ধরিয়া হুজুরের কাছে আনিতে পারিব।

জরিফ প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়া, হরকুমার জিজ্ঞাসিলেন—"কোথা যাও?"

জরিফ বলিল—"গদার সন্ধানে।"

হরকুমার। এখনই?

জরিফ। দেরি করায় লাভ কি? হাতে তো কাজ কম নাই। কালি প্রাতে ফিরিব। গদাকে ধরিয়া আনিতে পারিব আশা আছে।

হরকুমার। আজি বড় ক্লান্ত আছ। আজি থাকুক না কেন?

জরিফ। হুজুরের হুকুম তামিল করিতে শরীরের মায়া হয় না। আমি এখন আসি।

সসম্মান সেলাম করিয়া জরিফ প্রস্থান করিল। হরকুমার মনে মনে তাহার বিস্তর প্রশংসা করিলেন।

জরিফ যাহা বলিয়াছিল, তাহা ঠিক। সহজেই সে গদার সন্ধান পাইল বটে; কিন্তু গদা বড় বিপদাপন্ন। দারোগা, জমাদার, পাহারাওয়ালা অনেকে গদাকে ঘেরাও করিয়াছে। সুহাসিনী প্রদত্ত অলঙ্কার রাশি গদার সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে। অলঙ্কারগুলি গদা নানা স্থানে বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। যে যে লোকের নিকট সে চোরাও মাল বিক্রয় করে, তাহারা একশত টাকার বেশী দাম দিতে চাহে না। এত সামান্য মূল্যে এ সমগ্রী বিক্রয় করা উচিত নয়, ইহা গদা বেশ বুঝিত। বিশেষতঃ এ সকল চুরির মাল নহে। গদা, ভয়শূন্য হইয়া, ক্রমে কোন কোন গৃহস্থ বাটীতে তাহা বিক্রয়ের চেষ্টা করে। কথা প্রচার হইয়া উঠে। গদার হাতে এই মাল দেখিয়া, কেহই চুরির জিনিষ ছাড়া আর কিছুই মনে করে নাই। থানার লোক সংবাদ পাইয়া গদাকে ধরিয়াছে। গদা বুঝাইতেছে, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্রবধূ তাহাকে এ সকল অলঙ্কার দান করিয়াছেন। রাজকর্ম্মচারী ও সাধারণ লোক সকলেই স্থির করিয়াছেন, অলঙ্কারগুলি সার্ব্বভৌম মহাশয়ের পুত্রবধূর হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু তিনি যে এত অলঙ্কার ইহাকে দিয়াছেন, এ কথা বিশ্বাস্য নহে। বিশেষতঃ তিনি আছেন কি নাই তাহাও সন্দেহ। এরূপ অবস্থায় গদাকে চালান দেওয়াই সদুপায়। কেহ দান করিয়াছেন, এ কথা প্রমাণ করিতে পারিলে, গদাকে এখনই ছাড়া যায়; না হয় পরে হাকিমের নিকটেও সেই কথা বুঝাইলে গদা খালাস হইয়া আসিতে পারে। বড়ই বিপদের কথা; কেন না গদা জানে, বামুনের বউ ঠাকরুণ জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছেন। হরিচরণবাবু সন্ধান করিয়া গদাকে সুহাসিনীর খবর আনিতে বলিয়াছিলেন। সেই কথায় গদা তাঁহার সন্ধান করিতে থাকে। সেই সময় রামহরি চাষাও, গদার সন্ধানে ব্যাপৃত হয়। গদার সহিত রামহরির সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা ধার্য্য হইলে, গদা সমস্ত পরামর্শ হরিচরণকে জানাইল। সুহাসিনীকে ধরিয়া আনিবার

জন্য পথি মধ্যে হরিচরণের নিয়োজিত লোক থাকিল। তাহারা যে যে কাণ্ড ঘটাইল তাহা পাঠকগণ জানেন। হরিচরণের দূতেরা সুহাসিনীকে ও দাসীকে নদী তীর পর্য্যন্ত আনিয়া নৌকায় উঠাইল। গভীর রাত্রে নৌকা ডুবি হইল। গদা স্বচক্ষে সুহাসিনীকে জলে ডুবিতে দেখিয়াছে—উঠিতে দেখে নাই। সুতরাং তিনি মারা গিয়াছেন বলিয়াই গদা জানে। তবে গদা এখন কেমন করিয়া প্রমাণ করিবে যে, অলঙ্কার সমস্ত তিনি দান করিয়াছেন। তিনি থাকিলেও যে দানের কথা স্বীকার করিতেন, ইহারই বা নিশ্চয়তা কি? এ সম্বন্ধে কোনই সাক্ষী নাই। সুতরাং গদা বুঝিতেছে, এ যাত্রা তাহার আর অব্যাহতি নাই।

এইরূপ সময়ে জরিফ কোচম্যান সেই ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। সে সমস্ত কথা বুঝিয়া, থানার লোকদিগকে, গদাকে অলঙ্কার সমেত, তাহার সঙ্গে আসিতে বলিল। জরিফ সকলেরই পরিচিত। সে যখন ঠিক সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দিতে পারে বলিতেছে, তখন তাহার সহিত যাওয়ার হানি নাই বিবেচনায়, একজন জমাদার ও দুইজন পাহারাওয়ালা অলঙ্কার সমস্ত ও গদাকে সঙ্গে লইয়া, সনাতনপুরে হরিশ কর্ম্মকারের বাটীতে উপস্থিত হইল। সেখানে হরকুমার বাবুকে দেখিয়া থানার লোক ও গদা সকলেই সসম্ভ্রমে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।

হরকুমারের মুখে সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করিয়া ও অলঙ্কারগুলি দর্শন করিয়া সুহাসিনী তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিলেন যে তৎসমস্ত তিনি গদা চণ্ডালকে দান করিয়াছেন। গদা সে দিন তাঁহার অসীম উপকার করিয়াছে। সে উপকারের তুলনায় এ অলঙ্কার দান নিতান্ত তুচ্ছ কার্য্য। থানার লোক নিরুপায়। অগত্যা তাহারা গদাকে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল।

হরকুমার এই অলঙ্কার গুলি ক্রয় করিতে চাহিলেন। গদা কোথায়ও একশত টাকার বেশী দাম পায় না; হরকুমার দুই শত টাকা দিতে চাহিলেন। গদা সানন্দে অলঙ্কারের বদলে দুই শত টাকা গ্রহণ করিল।

গদা প্রস্থান করিল; কিন্তু যখন তাহাকে প্রয়োজন হইবে, তখনই সে আসিবে, এরূপ ব্যবস্থা থাকিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মহদাশ্রয়।

আকাশে মেঘ হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে একবার জোরে বৃষ্টি আসিতেছে; কিয়ৎকাল পরেই আবার ছাড়িয়া যাইতেছে। পল্লীগ্রামের পথ ঘাট কর্দ্দমাকীর্ণ। ডোবা ও পুষ্করিণীতে জল বাধিয়াছে। বর্ষাকালের পূর্ণ লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইতেছে।

রামনগর অতি সামান্য গ্রাম। সপ্তাহে দুই দিন করিয়া এই গ্রামে একটি হাট বইসে। সন্নিহিত অনেকগুলি ক্ষুদ্রগ্রামের লোক সেই হাটের দিন, স্ব স্ব প্রয়োজনীয় পদার্থ সংগ্রহ করিয়া লয়। হাটে নানারূপ সামগ্রী আমদানী হয়। হাট বসিবার জন্য, গ্রামের প্রান্তভাগে, অনেক বৃক্ষ সমাকীর্ণ, একটি মাঠ নির্দ্ধারিত আছে; তথায় তিন খানি অতি সামান্য আকারের চালা ঘরও আছে।

অদ্য হাটবার। কিন্তু হাট জমিতে এখনও

অনেক বিলম্ব আছে। বেলা ১০ টার পর হইতে হাটে লোক আসিতে আরম্ভ হয় এবং বেলা ১২টার সময় হাট পূর্ণভাবে জমিয়া উঠে। এখন বেলা ৮।।০। এখনও কেহ আইসে নাই; কেবল উল্লিখিত চালা ঘর কয়খানি এক খানিতে একটী কদাকার পুরুষ বসিয়া, একটা খুঁটি হেলান দিয়া, ঝিমাইতেছে। লোকটার পরিধানে যে বস্ত্র আছে, তাহা না থাকারই সমান; গায়ে একখানা ছেঁড়া ও নিতান্ত মলিন কাপড় আছে। ঝিমাইতে ঝিমাইতে এক একবার লোকটা পড়িয়া যাই-বার মত হইতেছে, আবার তখনই সাবধান হইয়া আপনার পূর্ব্বস্থান স্থির করিয়া লইতেছে। মাছি ও মশা এ ব্যক্তির কম শত্রুতা করিতেছে না। অনেক মাছি তাহার ছিন্ন বস্ত্রের উপর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহার মাথার উপর ঘুরিতেছে। অনেক মশা তাহার কাণের নিকট উড়িতেছে এবং তাহার কৃষ্ণ কলেবরে আপনাদের দেহ মিশাইয়া বসিয়া আছে। লোকটা ক্রমেই নিতান্ত বিব্রত হইয়া পড়িল। বুঝিল এ সুখের নিদ্রায় অনেক ব্যাঘাত; অবশেষে মশক ও মক্ষিকা কুল নির্ব্বংশ করিতে তাহার সংকল্প হইল এবং সে তাহাদের বিরুদ্ধে বিষম যুদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু সে চক্ষু মেলিয়া চাহিতে পারিল না। একবার চক্ষু মেলিবার চেষ্টা করিল বটে; কিন্তু সেই মেঘ ঢাকা ঘোলা ঘোলা আলো তাহার চক্ষুতে কিঞ্চিন্মাত্র প্রবেশ করিতে না করিতেই সে নয়ন মুদিয়া ফেলিল। চক্ষু বুজিয়া সে বলিল,—"শালার মাছি! শ্রাদ্ধ করি দাঁড়াও না!"

তাহার পর লোকটা নিজের মুখের সম্মুখে আপনার পোড়া কাঠের মতায় স্থায় হাতদুইটা তফাত করিয়া ধরিল এবং ক্রমশঃ নিকটস্থ করিতে লাগিল। খুব নিকটস্থ হইলে সে বেগে দুই হাত যুক্ত করিল। তাহার পর অতি সাবধানে একখানি হাত তুলিয়া লইল এবং আর একখানি হাত সম্মুখে ধরিয়া বলিতে লাগিল,—কেমন শালার মাছি, কেমন জব্দ!"

হাতে কিন্তু মাছির নামও নাই। থাকুক বা নাই থাকুক সে কিন্তু এইরূপে অনেকক্ষণ মাছির শ্রাদ্ধ করিতে ও তাহাদের জব্দ করিতে লাগিল। ইহাতে আপাততঃ তাহার একটু উপকার হইল। তাহার মৃতবৎ নিশ্চল দেহে যত মাছি বসিতে ছিল এক্ষণে তত মাছি আর তাহার গায়ে বসিতে পারিল না। এইরূপে মক্ষিকা বধ কাণ্ড সমাধা করিয়া, সে আবার বলিল,—"জাননা শালারা আমি কে?'

আবার সর্ব্ব সন্তাপনাশিনী নিদ্রা তাহাকে অধিকার করিল। ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লাগায় সে আবার জড়সড় হইয়া ঝিমাইতে লাগিল।

এইরূপ সময়ে দুইটি লোক তাহার নিকটস্থ হইল এবং একজন সসম্ভ্রমে ডাকিল—"বাবু! বাবু মহাশয়!"

মলিনবেশী কৃশকায়, লম্বোদর, কোটরনেত্র পুরুষ ঝিমাইতে ছিল। এ সম্বোধন বাক্য তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল; কিন্তু আহ্বানকারী যে তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া কথা কহিতেছে, ইহা তাহার প্রথমে মনে হইল না। সুতরাং সে নীরবে এই নিদ্রার ব্যাঘাতকারী আগন্তুককে, মনে মনে গালি দিতে থাকিল।

আগন্তুকদ্বয় আমাদের পরিচিত হরকুমার বাবু ও জরিফ কোচম্যান। আহ্বানকারী স্বয়ং হরকুমার। জরিফ পশ্চাতে ঈষদ্বাস্যমুখে দণ্ডায়মান। হরকুমার আবার ডাকিলেন,—"বাবু মহাশয়! ঘুমাইতেছেন নাকি? বড় একটা দরকারের কথা জিজ্ঞাসা করিব মনে করিয়া আসিয়াছিলাম, তা বাবুর নিদ্রা ভঙ্গ করা তো সম্ভব নয়!"

এবার সেই তন্দ্রামগ্ন পুরুষ বুঝিল যে, এই অপরিচিত কণ্ঠস্বর তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই বাক্য উচ্চারণ করিতেছে। সে তখন বুঝিল যে বাবু সে চিরকালই ছিল, চিরকালই আছে এবং চিরকালই থাকিবে। সুতরাং তাহাকে বাবু বলিয়া আগন্তুক ভালই করিয়াছে। কিন্তু এত বড় বাবু লোকটার হঠাৎ কথা কহিয়া ছোট হওয়া অনুচিত বোধে, সে নীরব রহিল।

হরকুমার বলিলেন—কাঁচা পাকা সব রকম মালই একটু একটু সঙ্গে আছে; চাটের রকম রকম জিনিষও কিছু কিছু আছে। এখন একটু জায়গা, আর সাজ সরঞ্জাম পাইলে মৌতাতটা সারিয়া লইতাম ইচ্ছা ছিল। বিদেশী লোক কাহাকেও জানাশুনা নাই; একজনকে জিজ্ঞাসিয়া জানিলাম, এ গ্রামে ভদ্রলোক কেহই নাই; মানুষের মতন মানুষ এক চণ্ডী বাবু আছেন, তাঁহার জন্যই এখনও গ্রামের শ্রী আছে। তাই সন্ধান করিয়া মহাশয়ের কাছে এসেছি।"

হরকুমারের এই কথাগুলি, ভেকদেহে তাড়িত প্রয়োগের ন্যায় চণ্ডে গুলিখোরের মনের ও দেহের অনেক পরিবর্তন ঘটাইল। কাঁচা পাকা মালের কথা শুনিয়া তাহার জড়-ভাবাপন্ন দেহ বিচলিত হইয়া উঠিল। চাটের বৃত্তান্ত শুনিয়া তাহার তন্দ্রাবিষ্ট আলোক-ভীত নয়ন সহসা ফাঁক হইয়া গেল এবং সে সাগ্রহে এই দেবতুল্য আগন্তুক মহাত্মাকে দেখিতে লাগিল। চণ্ডে গুলিখোর নামে সর্ব্বত্র পরিচিত হইলেও, সে আপনাকে চণ্ডী বাবু বলিয়াই ভাবে ও বিশ্বাস করে। সুতরাং গা ঝাড়া দিয়া একটু সোজা ভাবে বসিয়া স্থির করিল, আগন্তুক যথার্থ গুণগ্রাহী ভদ্রলোক বটেন। তাহার পর ভাঙ্গা গলায়, চাপা আওয়াজে বলিল,—"মহাশয় বিশিষ্ট ভদ্রলোক! নিবাস?"

হরকুমার বলিলেন,—"নিবাস অনেকদূর। একটু কাজে এদেশে এসেছি। সে সব কথা ক্রমে বাবুকে জানাইব। বাবু যে রকম মহাশয় লোক, তাহ'তে বোধ হয় কাঁচা পাকা দুই রকমই বাবুর অভ্যাস আছে। এ সকল কাজে মতি না থাকিলে বড় লোকই মিথ্যা। আমার আবার একটু বেশীও অভ্যাস ঘটিয়াছে। এক আধ ছিলিম পাকা তামাকও মাঝে মাঝে খেয়ে থাকি।"

চণ্ডী সমুৎসাহে বলিলেন,—"আমিও, আমিও।" সে নিশ্চয় স্থির করিল এ লোকটা দেবতা না হইয়া যায় না। বুঝিল আজি সুপ্রভাতই বটে। আবার বলিল,—"বসুন—বসুন।"

চণ্ডী বসিতে বলিল বটে, কিন্তু সেখানে বসিবার কোনই স্থান নাই; তথাপি হরকুমার নিঃসঙ্কোচে তত্রত্য ধূলার উপর উপবেশন করিয়া বলিলেন,—"বসিলাম বটে, কিন্তু এটা হাটের ঘর; এখনই অনেক লোক জমিয়া যাইবে। একটু তফাতে যাইলে হয় না বাবু?"

চণ্ডী তখনই গাত্রোত্থান করিয়া বলিল,—"তাই ভাল, আসুন আমার সঙ্গে।"

মন্থর পদবিক্ষেপে বক্রদেহ বহন করিয়া চণ্ডী অগ্রসর হইল। হরকুমার ও জরিফ তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে চণ্ডী বহু দূরে, জঙ্গলের মধ্যে এক বটবৃক্ষমূলে আগমন করিয়া বলিল,—"এই বেশ জায়গা। এখানে কোন গোল নাই।"

হরকুমার বলিলেন,—"খুব ভাল। বাবুর পছন্দকে বলিহারি। এমন জায়গা নহিলে কি আয়েস হয়?"

হরকুমার তথায় উপবেশন করিলেন এবং নিকট হইতে ব্যাগ লইয়া একে একে অনেক সামগ্রী বাহির করিলেন। আফিং, গুলি, গাঁজা, তামাক, টিকে, গুলির বাতি, সকল রকমের কলিকা, হুঁকো ইত্যাদি অনেক সামগ্রী তাঁহার ব্যাগ হইতে বাহির হইল। আর বাহির হইল বার্লির কৌটার এক কৌটা রসগোল্লা, এক কৌটা পানতুয়া এবং এক কৌটা উৎকৃষ্ট সন্দেশ।

লর্ড ফকল্যাণ্ড (Viscount Falkland) যখন বম্বে প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তখন তাঁহার পত্নী গুণবতী লেডি ফকল্যাণ্ডও এদেশে ছিলেন। সেই মহিলা ভারতাবস্থান সংক্রান্ত কতকগুলি কথা লিপিবদ্ধ করিয়া, "চৌ চৌ" নামে দুই খণ্ড পুস্তক প্রণয়ন করেন। দাক্ষিণাত্যে এক সম্প্রদায় ফেরিওয়ালা আছে, তাহারা আপনাদের পণ্য সামগ্রী ঝুড়ি বাক্স প্রভৃতির মধ্যে লইয়া, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পর্য্যটন করিয়া বেড়ায়। তাহাদের সঙ্গে একটা ঝুড়ি থাকে, তাহাকে তাহারা "চৌ চৌ" বলে। সেই ঝুড়িতে সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজন উপযোগী অনেক প্রকার সামগ্রী সংগৃহীত থাকে। গ্রন্থকর্ত্রী, সেই পণ্যজীবিগণের অনুকরণে, আপনার গ্রন্থের নাম "চৌ চৌ" রাখিয়াছেন।

আমাদের হরকুমার বাবুর ব্যাগটীও একটী "চৌ চৌ"। তাহার বিপুলোদর হইতে যে সকল সামগ্রী বাহির হইয়াছে, তাহাতেই সেই ব্যাগ সুন্দরী শূন্যোদরী হন নাই। তিনি এখনও প্রসব করিতেছেন এবং আরও প্রসব করিবেন এরূপ সম্ভাবনা দেখাইতেছেন। তিনি আবার প্রসব করিলেন একটা পিতলের ঘটি, তার পর একটা এনামেল গ্ল্যাস ইত্যাদি।

সমস্ত জিনিষ সম্মুখে বিস্তৃত হইলে, চণ্ডে গুলিখোর মুগ্ধ হইয়া গেল, এবং হরকুমারের আয়োজন দেখিয়া অবধারণ করিল, লোকটা যথার্থ আমীর বটে। বলিল,—"তা মহাশয়! কি মনে করে এ দেশে আগমন?"

হরকুমার বলিলেন,—"আমার আগমন ঠিক এ গ্রামে নহে। আমি রামনগর যাইব। এই গ্রামের মধ্য দিয়া পথ বলিয়া এখানে আসিয়াছি। পথে মহাশয়ের ন্যায় বড় লোকের সহিত আলাপ পরিচয় ঘটিল, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। তা বাবু, যা ইচ্ছা হয় আরম্ভ করুন।"

চণ্ডী, সামগ্রী সমূহের নিকটে বসিয়া, মহোল্লাসে নেশার উপকরণ গুলিতে হস্তার্পণ করিয়া দেখিতে লাগিল। তাহার পর বলিল,—"সবই ভাল জিনিষ। মহাশয়ের মাল চেনা আছে বেশ। হাঁ—রামনগর যাইবেন বলিতেছেন বুঝি? তা সে তো এখান থেকে অনেক পথ। পাকা চারি ক্রোশ!"

হরকুমার বলিলেন,—"শুনিয়াছি আরও ৪।৫ ক্রোশ পথ যাইতে হইবে। তা কি করি বাবু, দরকারে সবই করিতে হয়। আমাকে সেখানে যাইতেই হইবে। বাবু! জিনিষ সবই ভাল বোধ হয়। আপনি হলেন জহুরি! পরখ করে দেখুন সব।"

চণ্ডী প্রথমেই এক দলা আফিং গলাধঃকরণ করিয়া বলিল "বেশ জিনিষই বটে, ক্রমে সবই দেখা যাউক। রামনগরে এমন কি দরকার শুনিতে পাই না? সেখানে আমার মাসীর বাড়ী। সেখানকার অনেকের সঙ্গেই আমার আলাপ আছে। আমাকে মহাশয় গোলাম বলিয়া জানিবেন। তা এ ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালীর দ্বারা যদি কোন সাহায্য হইতে পারে তাহা হইলে হুকুম করিবেন। কাহার কাছে দরকার?"

হরকুমার বলিলেন,—"শ্রীমতী গঙ্গামণি দেবী নামে এক বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যার নিকট আমার একটু সামান্য কাজ আছে। সেই জন্যই রামনগর যাওয়া। বাবু এ প্রদেশের বড় লোক। আপনার কৃপা থাকিলে সবই সম্ভব।"

এই সময় আবার বৃষ্টি আসিল এবং তাহার সহিত একটু হাওয়া উঠিল। গুলিখোর চণ্ডী গায়ের ছেঁড়া কাপড়খানি ক্ষীণ দেহের সহিত ভাল করিয়া আঁটিতে লাগিল। হরকুমার বলিলেন,—"বড় ঠাণ্ডা হাওয়া। বাবু একটা জামা গায়ে দেন।"

আবার "চৌ চৌ" ব্যাগের ভিতর হইতে একটী জিনের জামা বাহির হইল। জামা চণ্ডীর হাতে দিয়া হরকুমার বলিলেন,—"গায়ে দেন, দোষ কি? আমার থাকলে আপনি লইবেন, আপনার থাকিলে আমি লইব। নহিলে বন্ধুত্ব কিসের?"

চণ্ডী, কথাটীও না কহিয়া স্বচ্ছন্দে জামা গায়ে দিয়া বাঁচিল। তাহার পর বলিল,—"গঙ্গা-মণি দেবী? সে তো আমার মাসীর নাম; তাঁর কাছে কি দরকার? তিনি তো মারা গিয়া-ছেন। হরকুমার বলিলেন,—"তিনি আপনার মাসী ছিলেন? কি আশ্চর্য্য ঘটনা! আপ-নাকে পাওয়ায় আমার অনেক উপকার হইল দেখ্‌ছি। তিনি মারা গিয়াছেন! ভাল, মহাশয় তো আছেন। আপনার দ্বারা আমার সাহায্য হওয়া অসম্ভব নহে।"

চণ্ডী, এক ছিলিম গাঁজা টিপিতে, টিপিতে বলিল,—"বলুন দেখি কি দরকার।"

হরকুমার বলিলেন,—"শুনিয়াছি তাঁহার কাছে কতকগুলি কাগজপত্র ছিল। সেগুলি দ্বারা একটি ভদ্র লোকের বিশেষ উপকার হওয়া সম্ভব। তাই সেগুলি একবার দেখিবার অভিপ্রায়ে যাইতেছিলাম।"

চণ্ডী কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিল,—"অসম্ভব। যদি থাকে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সে বাটী আমি বেচিয়া ফেলিয়াছি। যাহারা কিনিয়াছে তাহারা নিশ্চয়ই কাগজ পত্রের কোনই যত্ন করে নাই। সে কি আর পাওয়া যায়?"

হরকুমার বলিলেন,—"তথাপি একবার সেখানে যাইব। যদি কোন সন্ধান হয় তাহা হইলে বড় উপকার হইবে। মহাশয়কে যখন পাইয়াছি তখন আর ভাবনা কি? আপনা-কেও সঙ্গে যাইতে হইবে, এখানে গরুর গাড়ী পাওয়া যায় না? একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া যাওয়া যাউক চলুন।

এরূপ মহদাশ্রয় ত্যাগ করিতে চণ্ডীর কোনই মত ছিল না। সে বলিল,—স্বচ্ছন্দে। আপনার কাজে আপনার সঙ্গে যাইব, তার আর কথা কি?

হরকুমার, সন্ধান করিয়া, একখানি গরুর গাড়ী ঠিক করিতে, জরিফকে পাঠাইয়া দিলেন। চণ্ডীকে বলিলেন,—মহাশয় কিছু জল টল খান। সকলই তো উপস্থিত।

চণ্ডী বলিল,—গোটা কতক ছিটা টানিয়া লইতে ইচ্ছা করিয়াছি। মহাশয় খাবেন কি?

হরকুমার বলিলেন,—"এত কি কথা? খাব না! আমি একটু পরে অন্যান্য দুই একটা কাজ সারিয়া, ক্রমে খাইতেছি। আপনি চালান না ততক্ষণ।"

চণ্ডী যথেষ্ট গুলি খাইয়া লইল। সঙ্গে সঙ্গে সে যথেষ্ট সন্দেশ রসগোল্লা উদরস্থ করিল।

অনতিকাল মধ্যে গাড়ী লইয়া জরিফ ফিরিয়া আসিল। হরকুমার অতি সমাদরে চণ্ডীকে গাড়ীতে উঠাইলেন। চণ্ডী, এই

মহৎ ব্যক্তির স ঙ ঘনিষ্ঠতা বাড়াইবার অভিলাষে, ও তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ না করিবার অভিপ্রায়ে, সানন্দে গাড়ীতে উঠিল। হর-কুমারও গাড়ীতে স্থান লইলেন; জরিফ গাড়ীর পশ্চাতে পশ্চাতে চলিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পরিত্যক্ত ভবন।

অপরাহ্নকালে হরকুমার বাবু, চণ্ডী গুলি-খোর এবং জরিফ কোচম্যান রামনগরে আসিয়া পৌছিলেন। পরলোকাগতা গঙ্গা-মণির যে পল্লীতে বাস ছিল, তাহারই নিকট ভবসুন্দরী নাম্নী এক বিধবা কায়স্থ কামিনীর বাস। এই কায়স্থ নারী, গ্রাম সম্পর্কে গঙ্গা-মণিকে দিদি বলিত। সেই সূত্রে চণ্ডী গুলি-খোর তাহাকে কায়েত মাসী বলিয়া ডাকে। অন্ত চণ্ডীচরণ, সঙ্গিগণকে সঙ্গে লইয়া, সেই মাসীর ভবনে উপস্থিত হইল।

হরকুমার বাবুর "চৌ চৌ" ব্যাগ চণ্ডীর মূর্ত্তি ফিরাইয়া দিয়াছে; ব্যাগের কৃপায় চণ্ডীর গায়ে জামা উঠিয়াছে, ইহা পাঠকগণ পূর্ব্বেই দেখিয়াছেন। পথিমধ্যে ব্রহ্মাণ্ডোদরী কার্পেট-কায়া ব্যাগ-সুন্দরী চণ্ডীর নিমিত্ত ধুতি, চাদর এবং জুতা প্রসব করিয়াছেন। যদি পরিচ্ছদ ভদ্রত্বের পরিচায়ক হয়, তাহা হইলে চণ্ডীকে আধুনা নিতান্ত অভদ্র বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না; কিন্তু চণ্ডীর দুরদৃষ্ট ক্রমে তাহার এই পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনও অন্ত তাহার সম্মান-বৃদ্ধির সহায় হইল না। ভবসুন্দরীর দ্বারে আসিয়া চণ্ডীচরণ "মাসী, মাসী" শব্দে বারং-বার চীৎকার করিলে, ভব বাহিরে আসিল এবং চণ্ডীকে দেখিয়া বিরক্তির লক্ষণই প্রকাশ করিল। সে নেশাখোর; অপব্যয় করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। জীবিকাপাতের উপায়া-ভাবে তস্করবৃত্তিও অবলম্বন করিয়াছে; প্রথমতঃ আত্মীয় ও পরিচিত ব্যক্তিবর্গের সাহায্য গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদিগকে অশেষ দুর্ব্যবহারে উৎপীড়িত করিয়াছে; তদনন্তর আশ্রয়হীন, অন্নহীন ও বস্ত্রহীন হইয়া পথের ভিক্ষুকরূপে পরিণত হইয়াছে। এরূপ ভগ্নী-পুত্রের মিষ্ট সম্ভাষণ ভবসুন্দরীর প্রীতি উৎপাদন করিল না। তথাপি অন্ত তাহার ভদ্রবেশ দর্শনে, বিশেষতঃ তাহার সঙ্গে একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক রহিয়াছেন দেখিয়া, ভব মুখে কোন কর্কশ শব্দ প্রয়োগ করিল না। চণ্ডী গুলিখোর, পরিচিত, অপরিচিত তাবৎ লোকের নিকট হইতে এতদপেক্ষা বহুগুণে অধিক রূঢ় ব্যবহার সহ্য করিয়া আসিতেছে; সুতরাং তাহার মাসীর অভ্যর্থনা বিহীনতা তাহাকে একটুও হতাশ বা নিরুৎসাহ করিল না। সে মাসীর নিকটস্থ হইয়া বলিল—"মাসী মা! আজ আমরা তোমার বাটীতেই থাকিব; এখানেই পাক সাক করিয়া খাইব। আমার সঙ্গে এই যে বাবু দেখিতেছ, ইনি অতি মহাশয় লোক।"

ভব বলিল,—"তা তো দেখিতেছি। আমার এখানে স্থান কোথায়? কেন ভদ্র লোককে সঙ্গে করিয়া এখানে আসিয়াছ? এখানে উঁহার বড়ই কষ্ট হইবে। অন্যস্থানের চেষ্টা দেখগে।"

এই বলিয়া ভবসুন্দরী পুনরায় বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিল। তখন হরকুমার বাবু, অপেক্ষাকৃত নিকটে আসিয়া বলিলেন,—"ভদ্রলোকের মেয়ের আকার প্রকারই কেমন চৎকার।" সঙ্গে

সঙ্গে পকেট হইতে দুইটী টাকা বাহির করিয়া ভবসুন্দরীর সমীপ দেশে ফেলিয়া দিলেন এবং বলিলেন,—ভদ্রলোকের আশ্রয় ছাড়িয়া আমি তো আর কোথাও যাইব না। আপনি টাকা দুইটা তুলিয়া লউন; তিন জনের মত যাহা হয় খাওয়ার যোগাড় করিয়া রাখিবেন। আমরা আপাততঃ একটু ঘুরিয়া আসিতেছি। যদি খরচ বেশী হয়, সে জন্য কোন চিন্তা করিবেন না; আমি ফিরিয়া আসিয়া তাহাও দিব।"

সঙ্গে সঙ্গে ভবর মুখ।করিয়া গেল। সে, ঈষদ্ধাস্য সহকারে হরকুমার বাবুর মুখের প্রতি চাহিয়া, বলিল,—"আপনার মত লোক আমার বাড়ীতে পায়ের ধূলা দিয়াছেন, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। বাড়ীতে জায়গা একটু কম; তা হউক, বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপ আছে। সেখানে মহাশয় স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবেন। কষ্ট যাহাতে না হয় তাহার ব্যবস্থা আমি করিব। আপনি ফিরিয়া আসিয়া নিজে পাক করিবেন কি?"

হরকুমার বলিলেন,—"কাজেই। আমি ব্রাহ্মণ; যদি একজন ব্রাহ্মণ যোগাড় করিতে পারেন তাহা হইলে ভালই হয়, নচেৎ আমাকে স্বয়ং কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। আমার সঙ্গে একজন মুসলমান আছে; সে চিড়া, দধি, বা দুধ খাইয়া থাকিবে। আর নিকটে যদি মুসলমানের বাড়ী থাকে, আপনি বন্দোবস্ত করিয়া দিলে, সেখানে গিয়া এ ব্যক্তি ভাতও খাইয়া আসিতে পারে। খরচের জন্য চিন্তা করিবেন না, বরং আরও এক টাকা আপনি রাখিয়া দেন।"

আবার একটা টাকা, হরকুমার বাবুর পকেট হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, ভবসুন্দরীর করতলগত হইল। ভব এক মুখ হাসিয়া বলিল,—"ও মা তাও কি হয়? আপনার মত লোক রাঁধিয়া খাইবেন, এও কি কথা? আমি এখনই ভট্টাচার্য্যিদের মেঝো ছেলে লক্ষ্মীকান্তকে ডাকিয়া আনিতেছি। কিছু পয়সার জন্য, আপনার এ কষ্ট কখনই করিতে হইবে না। মুগের ডাউল, মাগুর মাছ, সরু চাউল সকলই আমি সংগ্রহ করিয়া রাখিতেছি। চণ্ডীমণ্ডপে চৌকী পাতা আছে, তাহার উপর বিছানাও ঠিক করিয়া রাখিতেছি। সঙ্গের মুসলমান লোকটীর জন্যও কোন ভাবনা নাই। এখনই রহমত মণ্ডলের বাড়ীতে খবর পাঠাইয়া, যাহাতে উহার খাওয়া দাওয়ার কষ্ট না হয়, তাহার উপায় করিতেছি।"

হরকুমার বলিলেন,—"আমি চেহারা দেখেই মানুষ চিনতে পেরেছি। আপনার আশ্রয়ে আমাদিগের কাহারও যে কোন কষ্ট হইবে না, আপনাকে দেখিয়াই আমি তাহা বুঝিয়াছি। তবে আমরা এখন আসি?"

ভব বলিল,—"আচ্ছা। শীঘ্রই ফিরিবেন; আমি গোয়ালা বউকে ডাকিয়া একটু দুধের যোগাড় আগে করি।"

ভবসুন্দরী বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। হরকুমার ও রফিক, চণ্ডীর সঙ্গে, গঙ্গামণির পরিত্যক্ত ভবনোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। চণ্ডী গুলিখোর যাহার নিকট গঙ্গামণির বাটী বিক্রয় করিয়াছে, সে ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত তাহার জীর্ণ সংস্কার বা কোন উন্নতি সাধন করে নাই। ক্রেতা কর্ম্ম-সূত্রে সপরিবারে বিদেশে অবস্থান করে। এই ক্ষুদ্র ভবন, তাঁহার পৈত্রিক ভদ্রাসনের নিকটস্থ বলিয়াই সে ইহা ক্রয় করিয়া রাখিয়াছে মাত্র। কুকুরাদি জন্তুর গমন ও প্রবেশ করায় কোনই অসুবিধা হইত না। অতি সামান্য বাটী। একটী একতলা

ঘর; তাহার পার্শ্বে একখানি খড়ের চালা। ঘরটী পতনোন্মুখ। চালা খানির ছাউনি পচিয়া, খসিয়া, গলিয়া গিয়াছে; বাঁশ, বাখারি এখনও খাড়া আছে। বাটীর ভূমিভাগ বনে পুরিয়া গিয়াছে। ক্রেতা বৎসরান্তে একবার করিয়া বাটী আইসেন। সেই সময় কতক গাছপালা কাটিয়া পরিষ্কার করা হয়। তথাপি তৃণ, গুল্ম, বৃক্ষলতাদির শ্রীবৃদ্ধি যথেষ্ট।

চণ্ডী এ পর্য্যন্ত অগ্রেই ছিল। এক্ষণে বাটীর সন্নিধানে আসিয়া, সে হরকুমার বাবুকে অগ্রগামী হইতে অনুরোধ করিল। ভীত গুলিখোর, এ বনাকীর্ণ পরিত্যক্ত ভবন মধ্যে, অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না।

হরকুমার বাবু অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া জরিফ কোচম্যান, ব্যস্ততাসহ সম্মুখে আসিয়া বলিল,—"হুজুর, গোলামের অপরাধ মাপ করিবেন। আমি আগে যাই।"

অগ্রে জরিফ, তৎপশ্চাতে হরকুমার সর্ব্বশেষে চণ্ডী সেই ভবন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনেক গাছপালা সরাইয়া পথ করিতে করিতে অগ্রে জরিফ চলিল। ঘরের নিকটস্থ হইয়া তাঁহারা দেখিলেন, দ্বারের কপাট ক্ষয়িত হইয়াছে এবং চৌকাঠের কাঠগুলি নিতান্ত জীর্ণ হইয়াছে। সেই দ্বার একটী শিকলদ্বারা আটকান রহিয়াছে এবং সেই শিকল তালা দ্বারা বদ্ধ। হরকুমার বাবু, জরিফকে বলিলেন,—"তালা খুলিবার কোন উপায় নাই কি?"

জরিফের নিকট একটা চাবি ছিল; সে তাহা লাগাইয়া দেখিল, তাহাতে সেই মর্চ্চা ধরা বেকল তালা খুলিল না। হরকুমার বাবুর একটা রিংএ দুইটা চাবি ছিল, তাহাও তিনি জরিফের হাতে দিলেন, তাহাতেও কিছু হইল না। তখন জরিফ বলিল,—"ভাঙ্গিয়া ফেলি না কেন হুজুর?"

হর। পারিবে কি?

জরিফ। স্বচ্ছন্দে।

হর। তবে তাই কর।

তখন জরিফ, গোটা কতক নাড়া চাড়া দিয়া শেষে একখানি ইটের ঘা মারিয়া, তালা ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

আইনের চক্ষে হরকুমার বাবুর এই সকল কার্য্য নিতান্ত গর্হিতরূপে প্রতীত হইতে পারে। অনধিকার প্রবেশ, তালা ভঙ্গ প্রভৃতি অনেক অপরাধে অভিযুক্ত করিয়া, সুনীতি সম্পন্ন পুলিশ কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে সহজেই শ্রী-ঘরে প্রেরণ করিবার সুব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন। সুচতুর, সুশিক্ষিত ও বহুদর্শী হরকুমার বাবু এ সকল কথা জানেন না, বা বুঝেন না এমন নহে। তথাপি তিনি এই দুষ্কর্ম্মে পশ্চাৎপদ হইলেন না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাস, সাধারণ ব্যবস্থার অপেক্ষা, কোন কোন স্থলে বিশেষ বিভিন্ন। উদ্দেশ্য মন্দ না হইলে, কাহারও অনিষ্ট সাধনের বাসনা না থাকিলে, অনর্থক স্বার্থের বশীভূত হইয়া অপরের সর্ব্বনাশ করিবার সঙ্কল্প না থাকিলে এবং পরের হিতসাধন ব্যতীত অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা মনে উদিত না হইলে, মনুষ্যের কার্য্য ধর্ম্ম বিগর্হিত বা দোষাবহ হয় না বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন। সময়ে সময়ে সমাজ এরূপ ব্যবহারের বিরোধী হইতে পারে এবং রাজকীয় বিধিব্যবস্থা বহুস্থলে এতাদৃশ কার্য্যের প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে পারে; কিন্তু সমাজ বা রাজ-শাসন যাহার অনুমোদন করিবে তাহাই ধর্ম্ম-কর্ম্ম এবং যাহার প্রতিকূলতাচরণ করিবে তাহাই অধর্ম্ম-কর্ম্ম, এরূপ বিশ্বাস হরকুমার বাবুর মনে কখনই স্থান পায় না। কিন্তু তাই বলিয়া সামাজিক ও রাজকীয় ব্যবস্থার মস্তকে পদাঘাত করিতে

তাহার কখনই প্রবৃত্তি নাই। তবে যে স্থলে এরূপ কার্য্য সমাজ ও রাজ-শাসনের প্রতিকূল হইলেও, বিশেষ নিন্দিত বা দোষাবহ হইবে না, তথায় তিনি অবলীলা ক্রমে উভয়বিধ শাসনকেই উপেক্ষা করিতে প্রস্তুত।

তালা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। শিকল খোলা হইল। দরজা ঠেলিতে আরম্ভ করিয়া জরিফ দেখিল, তাহা খোলা যায় না। ভিতর হইতে কোন গুরুতর পদার্থ বিশেষে তাহা আটকাইয়া আছে। অনেক বলপ্রয়োগ করিতে করিতে একটু ফাঁক হইল। সেই রন্ধ্র পথে জরিফ দেখিতে পাইল, উপর হইতে নিপতিত কতকগুলি ইষ্টকাদিতে দরজা প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে। হরকুমার বাবু, হস্তস্থিত যষ্টি জরিফকে দিলে, সে দরজার ফাঁকের ভিতর দিয়া যষ্টি দ্বারা অনেক ইট সরাইয়া ফেলিল; তাহার পর বলপ্রয়োগ করিলে দরজা অনেক খানি খুলিয়া গেল। তখন ঘরের অবস্থা পরিদৃষ্ট হইল। সে ঘরে প্রবেশ করা নিতান্ত কঠিন ব্যাপার; ছাতের কোন কোন স্থান খসিয়া পড়িয়াছে এবং এখনই খসিতে পারে! ঘরের মধ্যেও দুই একটা ছোট ছোট গাছ জন্মিয়াছে। দেওয়াল ছেতলায় আকীর্ণ হইয়াছে। তথাপি জোর করিয়া জরিফ ও হরকুমার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। চণ্ডী বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল কোন পদার্থই হরকুমার বাবু দেখিতে পাইলেন না। তিনি ভাবিয়াছিলেন, হয় তো একটা ভাঙ্গা বাক্স, না হয় তো একটা পচা সিন্দুক, না হয় তো ডালাহীন পেটরা, অথবা দুই একটা হাঁড়ি কলসি এইরূপ পরিত্যক্ত বাটীতে পড়িয়া থাকিলেও থাকিতে পারে এবং তাহার মধ্যে অনাবশ্যক বোধে উপেক্ষিত, দুই চারিখানা কাগজ পত্র পড়িয়া থাকিলেও থাকিতে পারে। অন্যের অনাবশ্যক হইলেও সেই কাগজ হয় তো তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির বিশেষ সহায় হইতে পারে। তাঁহার আশা ফলবতী হইল না। গৃহে তাদৃশ কোন সামগ্রী নাই; তথাপি সকল স্থান তন্ন তন্ন করিয়া দেখা হইল। তখন অগত্যা তাঁহারা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পুনরায় দ্বার বন্ধ করিয়া শিকল আঁটিয়া দেওয়া হইল।

হরকুমার বাবু বলিলেন,—"আজ যদি পার ভালই, নচেত কল্য প্রত্যুষে এখানকার বাজার হইতে একটী তালা কিনিয়া এই দরজায় লাগাইয়া যাইবে। তাহার চাবিটী যাহাতে গৃহ-স্বামীর হস্তগত হয় তাহার ব্যবস্থা করিবে।"

চণ্ডী একাকী বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল। সে জিজ্ঞাসিল,—"কিছু পাইলেন কি দাদা মহাশয়?"

হর। না।

চণ্ডী। আমি তখনই বলিয়াছি, কাগজ পত্র কখনই কিছু দেখি নাই।

হরকুমার ও জরিফ অতি কষ্টে সেই জীর্ণ এক চালায় প্রবেশ করিলেন। সেখানেও সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া ফল কিছু হইল না। তখন হতাশ-হৃদয় হরকুমার ফিরিয়া আসিবার নিমিত্ত চিত্তকে প্রস্তুত করিলেন। গৃহের পশ্চাদ্ভাগে একটা আবর্জ্জনার স্তূপের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তাহার মধ্য হইতে ছেঁড়া নেকড়া, দুই একখানি ভাঙ্গা সরা, একগাছা মুড়া ঝাটা, হাঁড়ি কলসির ভাঙ্গা খোলা এবং ধূলা মাটি তাঁহার চক্ষে পড়িল। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া, হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা, সেই আবর্জ্জনা সরাইয়া দেখিতে লাগিলেন। বহুদিনের স্তূপীকৃত আবর্জ্জনা, জল ও রৌদ্রের প্রভাবে কঠিন হইয়া জমিয়া গিয়াছে। সেই

ভগ্ন চালা হইতে একখণ্ড ভাঙ্গা বাঁশ আনিয়া, জরিফ সেই আবর্জনা রাশি ঘাঁটিতে আরম্ভ করিল।

হরকুমার বলিলেন,—"ওটা কি? কাগজ না?"

জরিফ বলিল,—"আজ্ঞে হাঁ।"

হরকুমার বড় ঔৎসুক্য সহকারে বলিলেন, —"দেও দেও, দেখি।"

অতি জীর্ণ একখণ্ড হলদে কাগজ তুলিয়া, জরিফ হরকুমারের হস্তে দিল। হরকুমার, চসমা লাগাইয়া বিশেষ যত্ন সহকারে, তাহা পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। লেখা অতি কদর্য্য। তাহারও আবার কালী উঠিয়া গিয়াছে এবং কাগজও গলিয়া পড়িতেছে। সুতরাং অনেক চেষ্টা করিয়াও পড়িয়া উঠিতে পারিলেন না। তবে একটা কথা তিনি যেন ঠিক করিতে পারিলেন বলিয়া মনে করিলেন কথাটা—"মৃত্যু হইয়াছে।" কে কোথা হইতে কাহাকে লিখিতেছে কিছু বুঝা গেল না। তথাপি অতীব যত্নে কাগজ খানিকে হরকুমার রুমালে জড়াইয়া লইলেন। বলিলেন,— "জরিফ! দেখ, দেখ; হতাশ হইও না।"

উভয়ে বিশেষ যত্নে আবার সেই আবর্জনা রাশি অন্বেষণ করিতে করিতে আবার এক খানা কাগজ পাইলেন। কাগজখানি অপেক্ষাকৃত নূতন এবং তাহার সকল ভাগ হরকুমার পড়িতে পারিলেন। তাহাতে লিখিত ছিল,

প্রণামা শত সহস্র নিবেদনঞ্চ বিশেষ। আপনার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে এ দাসের প্রাণগতিক সমস্ত মঙ্গল! সংপ্রতি আপনার খরচের নিমিত্ত ডাকযোগে পাঁচ টাকা পাঠাই। প্রাপ্তি সমাচার লিখিতে আজ্ঞা হয়। শ্রীমতী খুড়ীমাতা ঠাকুরাণী ৺কাশীধাম হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সে বিষয়ের কোন সন্ধানই তিনি পান নাই। পরে যেরূপ হয় জানিতে পারিবেন। আপনার সে সকল সামগ্রী আমি যত্নে রাখিয়াছি। পত্রোত্তরে শ্রীচরণের কুশল সমাচার দানে সেবকের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন ইতি।

সেবক

শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মা।"

হরকুমার সযত্নে এ পত্রও রুমালের মধ্যে গ্রহণ করিলেন। জরিফ আরও অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করিল, কিন্তু আর কিছুই পাওয়া গেল না। তাঁহারা ধীরে ধীরে ভবসুন্দরীর ভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ভবসুন্দরী।

পথে আসিয়াই চণ্ডী বলিল,—"এতক্ষণে ধড়ে প্রাণ এলো বাবা! ভূতে খেয়ে ফেলে নাই যে এই ভাগ্য!"

হরকুমার বলিলেন,—"বাড়ীটা ভয়ানক রকমই হইয়া রহিয়াছে বটে; কিন্তু ভূতে খেয়ে ফেলিবার কোন লক্ষণই দেখিলাম না তো।"

চণ্ডী বলিল, "সে আপনার ভাগ্য! আমার কিন্তু বড়ই ভয় হইয়াছিল। কাগজ পত্র কিছুই পাওয়া গেল না—যা দু'খানা পাওয়া গিয়াছে, তাহা আপনার কোন দরকারে লাগিবে কি দাদা?"

হরকুমার বলিলেন,—"বোধ হয় কিছু কাজেই লাগিবে না।"

মুখে এ কথা বলিলেও, হরকুমার বাবু সেই কাগজ দুইখানি মহামূল্য সামগ্রী বলিয়া জ্ঞান করিয়াছেন এবং স্থির করিয়াছেন যে, বিশেষ রূপ যত্ন ও চেষ্টা করিলে সেই বাঙ্গালা কাগজে লেখা গলিত পত্র খানিও পাঠ করা যাইবে। অন্ততঃ তাহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যাইবে এবং রামচন্দ্র শর্ম্মা স্বাক্ষরিত পত্রখানিও হয়ত তাঁহার অভীষ্ট-সিদ্ধির অনেক সহায়তা করিবে। তন্মধ্যস্থ খুড়ী মাতার কাশী হইতে প্রত্যাগমন, সে বিষয়ের সন্ধান না পাওয়া এবং সামগ্রী যত্নে রাখা ইত্যাকার কয়েকটী কথা তাঁহার বড়ই প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইল। তিনি বিবেচনা করিতে লাগিলেন, হয়ত এই সকল সূত্রাবলম্বনে তাঁহার গন্তব্য পথ নির্ণয় করার অনেক সুবিধা হইবে।

ভব সুন্দরী অতিথিগণের সৎকারার্থ বড়ই ব্যস্ত। সত্য সত্যই ব্রাহ্মণ ডাকাইয়া সে তাহার দ্বারা মুগের ডাল চাপাইয়াছে; মাগুর মৎস্য আনিতে লোক গিয়াছে; দুধ সংগ্রহ হইয়াছে। বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে তক্তপোষের উপর পরিষ্কার বিছানা করিয়া রাখিয়াছে এবং মুসলমান জরিফের জন্য বারান্দায় একখানি কম্বল রাখিয়া দিয়াছে। জরিফের খাওয়ারও সুব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। অনাদৃত চণ্ডীর কথাও বিস্মৃত হয় নাই। তাহার জন্যও ঐ চণ্ডীমণ্ডপে একটি সামান্য রকম শয্যা সংরক্ষিত হইয়াছে।

চণ্ডীর সহিত হরকুমারের ঘনিষ্ঠতা খুব বাড়িয়া উঠিয়াছে। সে বুঝিয়াছে, হরকুমার বাবু নেশা করেন না, করিতে জানেনও না। সামান্য এক তামাক ছাড়া কোন ভদ্র রকম নেশায় তাঁহার দখল নাই। ইহাতে হরকুমারকে নিতান্ত অপদার্থ মনে করিয়া, তাঁহার সহিত বাক্যালাপ ত্যাগ করাই চণ্ডীর উচিত ছিল; কিন্তু সে তাহা করে নাই। কেন না সে বুঝিয়াছে, হরকুমার নেশা না করিলেও নেশার পক্ষপাতী, নেশার মাহাত্ম্য সকলই জানেন, নেশার সামগ্রী সবই ভাল রকম চিনেন, কিসে কি হয় তাহা জানেন এবং যে ব্যক্তি নেশা করে তাহাকে ভাল বাসেন। এমন একটা লোকই কি কম নাকি? তাঁহার অদৃষ্ট মন্দ তাই তিনি স্বয়ং নেশা করিতে পারেন না; না পারিলেও নেশা ও নেশাখোরের সহিত তাঁহার যেরূপ সহানুভূতি, তাহাতে তাঁহাকে মহাপুরুষ না বলিয়া থাকা যায় না। সুতরাং হরকুমার নেশা না করিয়াও, চণ্ডীর ন্যায় মহাত্মার নিকট শ্রদ্ধাভজন হইয়াছেন, ইহা তাঁহার অপরিসীম সৌভাগ্য। চণ্ডীর বেশভূষা বদলাইয়াছে, নির্ভাবনায় নেশা চলিতেছে, খাওয়া দাওয়ার কষ্ট নাই। চণ্ডী বেশ আছে। নেশাখোরের আশ্রয়দাতার জয় হউক!

চণ্ডী মাসীমার নিকটস্থ হইল এবং কোন্ বিষয়ের কি হইতেছে তাহার সন্ধান করিয়া আসিল। এবার মাসী তাহার সহিত ভাল করিয়া কথা এবং একটু আদরের সুরে স্নেহও প্রকাশ করিল। হরকুমার লোকটা কে জানিবার জন্য ভব কৌতূহল প্রকাশ করিল। চণ্ডী বলিল,—"হাঁ বাবা মাসী মা! তুমি আমাকে কেবলই ছোটলোক মনে কর বুঝি। দেখ বাবা, আমার পাল্লায় কেমন কেমন লোক! এ লোকটা একটা ভারি জমিদার। কিন্তু লোকটা পাগল—নিতান্ত পাগল!"

ভব সবিস্ময়ে বলিল,—"ওমা সে কি গো! হঠাৎ চেঁচিয়ে মেচিয়ে ক্ষেপে উঠে নাকি?"

চণ্ডী বলিল,—"তা নয়, তা নয়। আমার মাসীর কাছে কি কাগজ ছিল; তাতেই নাকি ওর ভারি দরকার। তাই খুঁজতে এ দেশে এসেছেন। তা মাসী মা, কাগজে তো মসলা

বাঁধে। তাতে আর কি এমন দরকার হতে পারে বাবা, যে তার জন্ম খরচ পত্র করে দেশ বিদেশে ছুটাছুটী করিতে হয় ?"

ভব বলিল,—তোমার মাসীর কাছে কাগজ ছিল, তারই সন্ধান করিতে এসেছেন ? হবে। কাগজ কি এখনও সেখানে পড়ে আছে ? তোমার মাসীর কাছে কত কাগজই থাকত, কত কাগজই ছিল বটে। তা কি আর আছে ?"

ভব খুব চিন্তাকুল হইল। চণ্ডী চলিয়া আসিল। হরকুমার, নূতন জল পোড়া হুঁকায়, অতীব মনঃসংযোগ সহকারে তামাক খাইতেছেন। চণ্ডী তাঁহার নিকটস্থ হইয়া বলিল,—"বাবা, দুনিয়ায় পাগল আছে বত্রিশ রকম। তার মধ্যে একরকম কাগজ-খোঁজা পাগল। তুমি দাদা তাই। কাগজের যদি দরকার থাকে, তবে বেণের দোকানে যাও, জুতার দোকানে যাও, ছাপাখানায় যাও, আড্ডায় যাও। এ কি বাবা, ভাঙ্গা বাড়ীতে কাগজ! ছি দাদা, তুমি নেহাত পাগল!"

হরকুমার বলিলেন,—"চণ্ডী বাবু, বইস, তামাক খাও! আমার যে কাগজে দরকার, তা কি দোকানে মিলে ভাই ? তা হলে এত কষ্ট করিব কেন ? তা যাহা হউক, এই সূত্রে তোমার সহিত আলাপ হলো, এই কি ভাই কম লাভ ?"

চণ্ডী বলিল,—তা দাদা, আমি তোমার চরণের দাস। আমি তো আর তোমাকে ছাড়িব না। আর কাগজের কথা, তার জন্ম ভাবনা কি ? আমি বুঝেছি দাদা, তোমার একটু বাইয়ের ছিট আছে। তুমি কাগজ কাগজ করে ক্ষেপেছ। সে জন্ম ভাবনা কি তোমার ? আজি থেকে যেখানে যত কাগজ দেখিব, তা এনে তোমার কাছে হাজির করিব। কাগজে তোমাকে ডুবিয়ে দেব ভয় কি তোমার দাদা। ছাপার কাগজ, খবরের কাগজ, বই, হাতে লেখা কাগজ, দলিলের কাগজ, যাহা চক্ষুর সামনে পড়িবে আমি কিছুই ছাড়িব না। তুমি এত কাগজ ভালবাস, তা আমাকে আগে বল্‌তে হয়। তা হলে এত দূরই বা আসতে হবে কেন ? আমি তোমাকে রাধানগরেই জমিদারের দপ্তরখানা থেকে, পাঠশালার ছেলেদের কাছ থেকে, মোক্তার মহাশয়ের বাসা থেকে, চেয়ে, ভিক্ষে করে, নিদেন চুরি করে গাদা গাদা কাগজ এনে ফেলে দিতেম। তা যাহা হইবার হইয়াছে। এখন তুমি নিশ্চিন্ত থাক দাদা। তোমাকে কাগজ আনিয়া দেওয়ার ভার আমার থাকিল।"

হরকুমার বলিলেন,—"কাগজই এখন আমার নেশা দাঁড়াইয়াছে বটে। তা তুমি এখন মৌতাত চড়াইবে না ?"

চণ্ডী বলিল,—"তা আর বলতে ?"

সে নেশার উদ্যোগে ব্যাপৃত হইল। এদিকে আহারের স্থান প্রস্তুত করিবার সংবাদ আসিলে, চণ্ডী বলিল,—"আমার জন্য জায়গা চাহি না। এ আমার ঘর, আমি যেখানে সেখানে খাব এখন। আপাততঃ বাবুর জন্ম জায়গা হউক, আমার একটু দেরি আছে।"

তাহাই হইল। চণ্ডী নেশায় ব্যাপৃত থাকিল। হরকুমার বাবু, তাহার অনুমতি লইয়া, আহার করিতে গেলেন। ভবর কার্য্য তৎপরতায় আহারের উদ্যোগ মন্দ হয় নাই। ব্রাহ্মণ-বালক সমস্ত সামগ্রী দিয়া বাহিরে গেল। হরকুমার আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন ভব, গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, দূর হইতে বলিল,—"আমাদের এ নিতান্ত পাড়া গাঁ, আপনার মত লোকের খাবার যোগাড় এখান থেকে হওয়াই ভার।"

হর মার বলিলন,—"যে যোগাড় আপনি করিয়াছেন, এরূপ আহার আমার নিত্য ঘটিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। আপনাকে বড়ই কষ্ট দেওয়া হইল। আপনি দয়া করিয়া এ কষ্ট ভোগ স্বীকার না করিলে, আমাদের দুর্গতির সীমা থাকিত না।"

ভব বলিল,—"ঘর হইতে বাহির হইলেই কষ্ট। তা যা হউক, রান্না নিতান্ত মন্দ হয় নাই তো? ছেলে মানুষ, জানে না। আমি আবার তফাৎথেকে বলে দিয়ে, দেখিয়ে দিয়ে কোন রকমে সিদ্ধ করাইয়া লইয়াছি।"

হরকুমার বলিলেন,—"তাতেই এত ভাল হইয়াছে। আমি ভাবিতেছিলাম, এত পরিপাটি পাক ব্রাহ্মণের ছেলে করিল কিরূপে? এখন বুঝিলাম ব্রাহ্মণ কেবল উপলক্ষ মাত্র; কাজ সব, বলিতে গেলে, আপনিই করিয়াছেন। এত ভাল রান্না আমি আর কখন খাইয়াছি বলিয়া মনে পড়িতেছে না।"

ভব পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিল, বাবুটি বড়ই সুজন। এক্ষণে স্থির করিল, বাবুটি খুব শিষ্ট। ভব বুদ্ধিমতী ও চতুরা। তাহার বয়স চল্লিশের কম নহে। দেখিতে শুনিতে তাহার চেহারা মন্দ নহে। অল্প বয়সে একটী কন্যা সন্তান লইয়া সে বিধবা হইয়াছে। জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার সঙ্গতি কিছু ছিল না। তথাপি ভব কাহারও দ্বারে ভিক্ষার্থিনী না হইয়া বা কাহারও গলগ্রহ না হইয়া, জীবিকাপাত করিয়া আসিতেছে। কন্যাটির ভাল ঘরে বিবাহ দিয়াছে; ঘর দুয়ার বজায় রাখিয়াছে; দৌহিত্র দৌহিত্রকে অন্নপ্রাশনে গহনা দিয়াছে; লোক-লৌকিকতা তত্ত্বাদি করিয়া সাংসারিক শিষ্টতা পালন করিয়াছে এবং দশ টাকার সংস্থানও করিয়াছে। নিঃসহায় স্ত্রীলোক এত করিয়াছে বটে, কিন্তু পাপের পথে সে কখন পা দেয় নাই এবং দেহ বিক্রয় করিয়া একটি পয়সাও সংগ্রহ করে নাই। গরু পুষিয়া গোয়ালার নিকট ভব দুধ বেচিয়াছে, পাট কাটিয়া দড়ি বিক্রয় করিয়াছে, লোকের গহনা প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছে, কাহারও জিনিষ রাখিয়া টাকা লওয়ার দরকার হইলে, ভব স্থানান্তর হইতে আনিয়া দিয়াছে, কাহারও টাকা ধার দিবার দরকার হইলে, ভব তাহার লোক ঠিক করিয়া দিয়াছে এবং প্রাণপণে সকলের উপকার করিয়া আসিয়াছে। কাহারও হিসাবে গোল হয় নাই; লোকের সহিত কাজ কারবারে কেহই কখন তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হয় নাই। সকল কাজেই সে কিছু কিছু লাভ পাইয়াছে। মহাজন, খাতক, স্বর্ণকার, ব্যবসাদার সকলেই তাহাকে সন্তুষ্ট হইয়া কিছু কিছু দিয়াছে। গ্রামের সকল লোকই ভবকে ভালবাসে। যাহার যে দরকার সেই তাহা ভবকে বলে। কাহারও কাপড় চাহি, কাহারও চাউল চাহি, কাহারও ঘির দরকার, কাহারও অলঙ্কার, কাহারও সাংসারিক অন্য কোন সামগ্রী। সকলেই ভবকে বলিয়া নিশ্চিন্ত। কাহারও ছেলের অন্নপ্রাশন, ভব তাহার ব্যবস্থা করিবে। কাহারও পীড়া, ভব তাহার পরামর্শ দিবে, ডাক্তারের ব্যবস্থা করিবে এবং আবশ্যক হইলে সেখানে দিবারাত্রি থাকিবে। কাহাকেও তীর্থস্থ করিতে হইবে, ভবর বন্দোবস্ত ভিন্ন তাহা অসম্ভব। সকলের সকল কাজেই ভব আছে। বালক ও বৃদ্ধ, নর ও নারী, হিন্দু ও মুসলমান সকলেই ভবকে ভালবাসে। ভব কাহারও দিদি, কাহারও খুড়ী, কাহারও মা বা মাসী, কাহারও নাতিনী, কাহারও ঠাকরুণ দিদি। ভব, ব্যবসাদার হইলেও পরোপকারিণী। সে যে কেবল

লাভের উদ্দেশেই কাজ করে এমন নহে লাভের সম্ভাবনা না থাকিলেও, পরের হিতার্থে সে অনেক কাজ করে। তাহার কপালক্রমে সকল কাজেই তাহার কিছু না কিছু লাভ হয় হরকুমার বাবু আশ্রয়প্রার্থী হইয়া আসিলে, সে যে তাঁহাকে আশ্রয় দিত না, বা তাঁহার স্বচ্ছন্দতার নিমিত্ত যত্ন করিত না, এমন নহে চণ্ডীর উপর ভব বড় বিরক্ত। চণ্ডীর জন্য সে অনেক সময় অনেক যত্ন করিয়াছে; কিন্তু চণ্ডী বড়ই দুর্ব্যবহার করিয়া তাহাকে জ্বালাতন করিয়াছে। দুই দিন খাওয়া দাওয়া করিয়া চণ্ডী ঘটী থালা কাপড় লইয়া পলাইয়াছে। একটা কাজ করিতে বলিলে চণ্ডী কখন করে নাই, কিন্তু দৌরাত্ম্য অনেক করিয়াছে। এই সকল কারণে চণ্ডীকে কোনরূপ প্রশ্রয় দিতে ভবর ইচ্ছা ছিল না এবং তাহাকে আশ্রয় দেওয়া দূরে থাকুক, তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেও তাহার প্রবৃত্তি ছিল না। এই জন্যই ভব, চণ্ডী ও তাহার সংভিব্যাহারী লোকদিগকে আশ্রয় দিতে সম্মত হয় নাই।

এক্ষণে ভব সেই স্থানে বসিয়া বলিল,—"শুনিলাম কি কাগজের জন্য বাবুর আসা হইয়াছিল। তাহার কোন উপায় হইল কি?"

হরকুমার বলিলেন,—"কিছু না।"

ভব বলিল,—"গঙ্গামণি দিদি বড় ভাল লোক ছিলেন। তাঁহার আমার প্রতি বড়ই দয়া ছিল। আমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি কোনই কাজই করিতেন না। তাঁর কাছে কাগজ অনেক ছিল জানি। কিন্তু কোথায় গেল, কি হইল তাহা বলিতে পারি না।"

হরকুমার, চণ্ডীর মুখে, ভবর অনেক বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি বিষয়ে ভবর দ্বারা সহায়তা হওয়া অসম্ভব নহে। তিনি বলিলেন,—"কাগজ অনেক ছিল, আপনি জানেন কি?"

ভব বলিল—"অনেক কাগজ ছিল; গঙ্গা দিদি সে গুলিকে বড় যত্ন করিতেন এ কথা আমি বেশ জানি। সে কাগজগুলি থাকিলে একজন ভদ্রলোকের সকল মান-সম্ভ্রম বজায় হইবে এবং হয়ত সেগুলি আবশ্যক মত সময়ে দিতে পারিলে দশ টাকা পাওয়াও যাইবে, এমন কথাও তাঁহার মুখে আমি অনেকবার শুনিয়াছি।"

হরকুমার জিজ্ঞাসিলেন,—"তার পর? কাগজ সব গেল কোথায়?"

"জানি না কাগজের কি হইল। গঙ্গা দিদির কাছে সময়ে সময়ে ডাকে চিঠি আসিত। কাশী হইতে একজন চিঠি লিখিতেন। দিদির মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে কাশীর চিঠি আসা বন্ধ হয়। ইহাতে দিদি মনে করেন, যে জন্য কাগজ পত্র এত যত্নে রাখা হইয়াছে তাহা বোধ হয় বৃথা হইয়া গেল। যাহাদের দরকারে লাগিবার সম্ভাবনা ছিল, তাদের যখন আর সন্ধান নাই, তখন বোধ হয় এ সকল কাগজ আর কাহারও আবশ্যক হইবে না। তাহার পর কাগজের কি হইল, আমি তাহার কোনই কথা বলিতে পারি না।"

হরকুমার এই সকল কথা যেন গিলিতে লাগিলেন। তাহার পক্ষে এ সকল সংবাদ বড়ই প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইল। তিনি আবার জিজ্ঞাসিলেন,—কাশী হইতে গঙ্গামণি ঠাকুরাণীকে যিনি পত্র লিখিতেন, তাঁহার নাম কি পরিচয় কিছু আপনি শুনিয়াছিলেন কি?

ভব বলিল,—"পরিচয়ের কথা বলিতে পারি না। নামটা একবার তাঁহারই মুখে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু এখন মনে করিতে পারিতেছি না। একজন বামুনের মেয়ে।"

হরকুমার বলিলেন,—সোণামণি নয় কি ?"

ভব বলিল,—"ঠিক, সোণামণি বটে। তা সোণামণি অনেক দিন হইতে খোঁজ খবর বন্ধ করিয়াছেন কেন ?"

হরকুমার বলিলেন,—"গঙ্গামণি মারা যাওয়ার অনেক পূর্ব্বেই সোণামণির মৃত্যু হইয়াছে ; সুতরাং খোঁজ খবর বন্ধ হইয়া গিয়াছে।"

ভব বলিল,—ঠিক কথা। তা সোণামণিই যদি মারা গিয়া থাকেন, তবে আর সে কাগজে দরকার কি ?"

হরকুমার বলিলেন,—"কাগজে সোণামণির কোনই দরকার ছিল না। একটী পিতৃ-মাতৃহীন বালকের পরিচয় সেই কাগজে আছে বলিয়া আশা করা যায়। যেরূপ আশা করা যায়, কাগজে যদি তাহা পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই মহাত্মার উপকার হইবে। এই জন্যই কাগজের সন্ধান।"

বুঝিয়াছি। তা সে বালক এখন আছে কোথায় ?

হরকুমার বলিলেন,—"বালক কাশীতে সন্ন্যাসীদের কাছে সন্ন্যাসী হইয়া আছে।"

ভব বলিল,—"বুঝিয়াছি। তা আজি রাত্রি আপনি থাকুক। আমি এ বিষয়ে ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখি, যদি কোন কথা মনে পড়ে। আমি এ সম্বন্ধে অনেক চেষ্টা করিব। বোধ হয় যত্ন করিলে কাগজের কোন না কোন সন্ধান পাওয়া যাইবে।"

বড় আশার কথা। এই বুদ্ধিমতী, পরোপকারিণী, স্বাধীন-প্রকৃতি-সম্পন্না নারীর সহায়তা লাভ করা বড় কম কথা নহে। হরকুমার বলিলেন,—"আপনি মনে করিলে যে এ সম্বন্ধে অনেক সন্ধান হইতে পারিবে তাহার ভুল নাই। এ কার্য্যে ধর্ম্ম-অর্থ দুইই ঘটিবে, তাহা আপনি বুঝিতেছেন।"

আহার সমাধা হইল। হরকুমার গাত্রোত্থান করিলেন। ভব বলিল,—"আমি এ বিষয়ে চেষ্টার ত্রুটি করিব না। যাহা হয় কল্য বলিব। আজি আপনি বিশ্রাম করুন।"

হরকুমার হস্ত-মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া বাহিরে আসিলেন। মুসলমান বাটী হইতে লোক আসিয়া জরিফকে ডাকিয়া লইয়া গেল এবং সে পরিতোষ সহকারে ভোজন করিয়া ফিরিয়া আসিল। চণ্ডী অনেকক্ষণ পরে আহার করিতে গেল এবং অনেক বিলম্বে ভোজন শেষ করিয়া বাহিরে আসিল।

চণ্ডীর অনুপস্থিতি কালে হরকুমার, জরিফকে বলিয়া রাখিলেন যে, এই গুলিখোর যখন সঙ্গে আছে, তখন রাত্রিটা একটু সাবধান থাকিতে হইবে। জরিফ হাসিয়া বলিল,—"সেজন্য কোন চিন্তা নাই হুজুর।"

রাত্রি নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সূত্র।

বেলা প্রায় এক প্রহর কালে হরকুমার বাবু, ভবসুন্দরীর চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে এক খানি জল চৌকির উপর বসিয়া, মুখ ধুইতে-ছেন। জরিফ ভাঙ্গা বাড়ীতে তালা লাগাইতে গিয়াছে। চণ্ডী, গায়ে চাদর ঢাকা দিয়া, নিদ্রার সেবা করিতেছেন।

একটি নিতান্ত কাতর ও দুর্ব্বল পুরুষ, ধীরে ধীরে আসিয়া, হরকুমারের সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং দূর হইতে সবিনয়ে প্রণাম

করিয়া, সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মাথায় এক খানি কাপড় জড়ান, হাতে একগাছি বাঁশের লাঠি, শরীর বড় কৃশ। হরকুমার জিজ্ঞাসিলেন,—"কে তুমি? কি চাও?"

ভীত ও কাতর ভাবে আগন্তুক বলিল,—"আজ্ঞে আমি যে কে তাহার পরিচয় দেওয়ায় ফল নাই। আপাততঃ আমি বড় কাতর, বড়ই দুর্দ্দশায় পড়িয়াছি। মহাশয় যদি দয়া করিয়া কিছু সাহায্য করেন।"

হরকুমার বলিলেন,—"দাঁড়াইতে তোমার কষ্ট হইতেছে দেখিতেছি, তুমি বইস ঐ খানে। সাহায্য কিছু করিতেছি। তোমাকে পীড়িত দেখিতেছি। তোমার পীড়া কি?"

আগন্তুক বলিল,—"দুর্ব্বলতা আর অনাহারই আমার পীড়া। তা ছাড়া আর কোন পীড়া আমি দেখি না।"

হরকুমার বলিলেন,—"দুর্ব্বলতা কি আপনি হইয়াছে, না আর কোন পীড়া হইয়া এইরূপ দুর্ব্বলতা দাঁড়াইয়াছে?"

তখন সে ব্যক্তি বলিল,—"আজ্ঞে সে অনেক কথা। এই মাথাটায় একটা আঘাত লাগায় অজ্ঞান হইয়াছিলাম। তাহার পর হইতে এই দুর্ব্বলতা চলিতেছে।"

"মাথায় কি রকমে আঘাত লাগিয়াছিল? বড় গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল কি?"

আগন্তুক বলিল,—"কি রকমে লাগিয়াছিল জানি না; কিন্তু বড় গুরুতর আঘাতই লাগিয়াছিল। অনেকক্ষণ অজ্ঞান থাকিতে হইয়াছিল।"

"কিসে লাগিয়াছিল? কেহ মারিয়াছিল, কি অন্য প্রকারে আঘাত লাগিয়াছিল?"

ভিক্ষুক বলিল,—"তা কি করে কি কল্‌ব? আমি গরিব মানুষ—আমার সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। এখন আমার মত দুঃখী দুনিয়ায় আর কেহ নাই।"

বটে! তোমার কথা শুনিয়া বড়ই কষ্ট হইতেছে। তোমার সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম! হাঁ, তা হলে অন্য লোক তোমার এই সকল বিপদ ঘটাইয়াছে এবং পরেই তোমাকে প্রহার করিয়াছে।"

আগন্তুক নীরব। হরকুমার আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভাল কি জন্য তোমার এই সকল দুর্দ্দৈব ঘটিল?"

ভিক্ষুক বলিল,—"পরের ভাল করিতে গিয়া নিজের মুখে কি বলিব? কলিকালে ভাল করিলে মন্দ হয়। এক ব্রাহ্মণ-কন্যার উপকার করিতে গিয়া, সর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়াছি; প্রাণও যায় যায় হইয়াছিল, যাইলেই ভাল হইত। স্ত্রী বোধ হয় মারা গিয়াছে। আমি দেশে দেশে তাহার সন্ধান করিতেছি। আর কি বলিব বাবু?"

ভিক্ষুক কাঁদিয়া ফেলিল। হরকুমার বলিলেন,—"তুমি বড় ভাল কাজ করিয়াছ, তোমার শেষ ভাল হইবেই হইবে। তোমার নিবাস কোন্ গ্রামে?"

ভিক্ষুক বলিল,—এখান থেকে অনেক দূর—চণ্ডীতলা।"

হরকুমার জিজ্ঞাসিলেন,—"তোমারই নাম কি রামহরি দাস?"

ভিক্ষুক সবিস্ময়ে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বলিল,—"বাবু আমি গরিব, আমার সর্ব্বনাশ করিবেন না।"

হরকুমার বলিলেন,—"তুমি অতি ভদ্রলোক। আমি তোমার সমস্ত কথা শুনিয়াছি। তুমি যে ব্রাহ্মণ-কন্যার উপকার করিতে গিয়া নিজের সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছ, তিনি আমার পরম আত্মীয়। তোমাকে দেখিতে পাওয়ায়

আমার বড়ই আনন্দ জন্মিল। আমি তোমার অনুসন্ধানে তোমার গ্রামে লোক পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু তোমার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তোমার স্ত্রী ও সেই ব্রাহ্মণ-কন্যা নৌকা ডুবিতে জলে ডুবিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ-কন্যার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। অনেক কষ্টে তাঁহার জীবন রক্ষা হইয়াছে। তোমার স্ত্রীর এখনও সন্ধান হয় নাই। নানা স্থানে তাঁহার সন্ধানে লোক পাঠাইয়াছি। তিনি মারা যান নাই, এ সংবাদ আমি পাইয়াছি। স্বরায় তাঁহার সংবাদ জানিতে পাইব সন্দেহ নাই। আপাততঃ তোমাকে দেখিয়া বড়ই তুষ্ট হইলাম। সে ব্রাহ্মণ-কন্যাও তোমাদের ভাবনায় নিতান্ত অস্থির আছেন। তুমি আমাদের পরম আত্মীয়।"

এই সময়ে জরিফ আসিয়া উপস্থিত হইল। হরকুমার বলিলেন,—"এই দরিদ্র ব্যক্তি বড় ভদ্র লোক এবং আমার উপকারী বন্ধু। ইহাকে যত্ন করিয়া বসিতে দেও এবং তামাক টামাক খাইতে দেও।"

জরিফ পরম সমাদরে রামহরিকে সঙ্গে লইয়া গিয়া ঘরের মধ্যে কম্বল পাতিয়া বসিতে দিল এবং তামাক খাইতে দিল। হরকুমারও উঠিয়া চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

রামহরি বলিল,—"বাবু আপনি যে সকল খবর দিলেন, তাহা শুনিয়া আমার প্রাণ বাঁচিয়া উঠিল। সেই সতী-লক্ষ্মী ব্রাহ্মণ-কন্যা যে নির্ব্বিঘ্ন হইয়াছেন, ইহা আমার বড় আহ্লাদের কথা। আমার স্ত্রী যে বাঁচিয়া আছে, এ বিশ্বাস আমার নাই। তবে মহাশয়ের ন্যায় লোক তাহার সন্ধান করিতেছেন, এও একটা ভাগ্য।"

হরকুমার বলিলেন,—"তোমার স্ত্রীর জন্য তুমি ভাবিত হইও না, আমি যে সকল লোকের হাতে তাঁহার সন্ধানের ভার দিয়াছি, তাঁহারা নিশ্চয়ই শুভ সংবাদ আনিতে পারিবেন। সেজন্য তুমি যতদূর চিন্তিত, আমাদের চিন্তা তাহার অপেক্ষা বিশেষ কম নহে।"

রামহরি বলিল,—"আমার পরম সৌভাগ্য যে আমি এদিকে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিলাম। মহাশয়ের সহিত দেখা না হইলে, কোন সংবাদই জানিতে পারিতাম না। এক্ষণে দিদিঠাকুরাণী কোথায় আছেন? কেমন আছেন?"

হরকুমার বলিলেন,—"তিনি এক্ষণে ভালই আছেন। তোমাকেও আজই তাঁহার নিকট লইয়া যাইব। তোমার শরীর দুর্ব্বল—আপাততঃ কিছু জলটল খাও; পরে যথাকালে অন্নাহার করিবে।"

হরকুমার বাবুর ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী ব্যাগ আসিল এবং তাহার মধ্য হইতে একখানি ধুতি বাহির হইল। হরকুমার, রামহরির হাতে ধুতি প্রদান করিয়া বলিলেন,—"ও ছেঁড়া কাপড় ফেলিয়া দিয়া এই খানি পর।"

এইরূপ সময়ে চণ্ডীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সে দেখিল, মাথায় কাপড় জড়ান, জীর্ণ শীর্ণ, কৃষ্ণকায় আর এক মহাপুরুষ উপস্থিত। সে দেখিয়াই স্থির করিল, এ লোকটাও একটা পাকা গুলিখোর না হইয়া যায় না। বলিল,—"কে হে জুড়িদার! কোথা থেকে উড়ে এসে জুটলে ভায়া?"

সভয়ে রামহরি বলিল,—"আজ্ঞে—আজ্ঞে আমি পথের ভিক্ষুক।"

চণ্ডী বলিল,—"বেশ ভাই। এ বাদশাহি কাজ করিতে হইলে পথের ভিক্ষুক হইতেই হয়। কুছ পরোয়া নাই বাবা। কিন্তু দাদা, মালের সংগ্রহ বড় বেশী নাই। এক দিনে

ফুলাইয়া দিলে চলিবে না। তেমন মাল জন্মে টান নাই দাদা।"

রামহরি বলিল,—"আজ্ঞে হাঁ, অনেক দিন আমার খাওয়া হয় নাই। আমি বড় দুঃখী।"

চণ্ডী বলিল,—"কিছু চিন্তা নাই জুড়িদার ভাই। দুঃখ আর থাকবে না দাদা। কল্পতরুর আশ্রয়ে এসে পড়েছ যাদু। আর ভয় নাই।"

তাহার পর হরকুমার বাবুর দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"তোমার অক্ষয় স্বর্গ হবে দাদা। এমন পুণ্য আর কেহ কখন করিয়া উঠিতে পারেন নাই; তা রামচন্দ্রই হউন, কি তার ব্যাটা মন্দোদরী হউন। এমনি সৎসঙ্গ—সাধু সেবা আর কাহারও দ্বারা কখন ঘটে নাই। তুমি যে কীর্ত্তি রাখলে তার আর কখন ক্ষয় হবে না। আশীর্ব্বাদ করি চিরজীবী হয়ে তুমি এইরূপ গুলিখোর প্রতিপালন করিতে থাক। সার্থক তোমার জন্ম দাদা।"

হরকুমার বলিলেন,—চণ্ডী বাবু, তুমি একবার উঠ। এ লোকটী আমার আত্মীয়। ইহার একটু বিশেষ যত্ন করিতে হইবে।"

চণ্ডী বলিলেন,—"অবশ্য অবশ্য। তা তামাকে চরস মিশাইয়া দিতেছি। পাঁচ কলিকায় গাঁজা সাজিয়া দিতেছি, খাবার জলে আফিং গুলিয়া দিতেছি, আর গুলির ধুঁয়ায় অন্ধকার করিয়া দিতেছি। এস দাদা, এ তোমারই ঘরকন্না জানিবে।"

চণ্ডী উঠিয়া আসিয়া রামহরিকে আলিঙ্গন করিল। রামহরি বড়ই কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। হরকুমার বলিলেন,—ছাড়িয়া দেও। ওরকমে উঁহার যত্ন করিতে হইবে না। আপাততঃ তোমার মাসীর নিকট হইতে যা হয় কিছু খাবার আনিয়া উঁহাকে খাইতে দাও দেখি।"

চণ্ডী বলিল,—"শুদ্ধ জলখাবার?" দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিতান্ত সন্দিগ্ধ ভাবে আবার জিজ্ঞাসিল,—আর কিছু নয়—শুদ্ধ জলখাবার?"

তাহার পর একবার হরকুমারের ও একবার রামহরির মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সে প্রস্থান করিল।

রামহরি বস্ত্র ত্যাগ করিল। অনতিকাল মধ্যে চণ্ডী তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গেল।

এ দিকে ভবসুন্দরী আসিয়া বলিল,—"দেখুন বাবু ২০ বৎসর পূর্ব্বে আমার স্বামী কাশী গিয়াছিলেন। তিনি সেখান হইতে প্রায় প্রতিদিনই আমাকে পত্র লিখিতেন। কালি রাত্রে আপনার কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমার স্বামীর লিখিত একখানি পত্রের কথা আমার মনে পড়িয়া গেল। সেই পত্রে একটী সুন্দরী যুবতীর মৃত সংবাদ লিখিত ছিল। সে স্ত্রীলোক কে, তাহার কোন পরিচয় আমার স্বামী তখনও জানিতেন না, পরেও জানিতে পারেন নাই। তাঁহার একটী ২।৩ বৎসরের ছেলে ছিল। আপনার লোক কেহই ছিল না। একটি পরিচিতা প্রাচীনা স্ত্রীলোক তাঁহার যত্ন করিতেন। সেই স্ত্রীলোক ও ছেলেকে রাখিয়া সুন্দরী স্বর্গলাভ করেন। আমার স্বামী সৎকারের সহায়তা করিয়া ছিলেন এবং তৎকালে শুনিয়াছিলেন যে, স্ত্রীলোক সপত্নীর ভয়ে লুকাইয়া জীবনপাত করিতেছিলেন। তিনি এক জন প্রধান ধনবান্ ব্যক্তির স্ত্রী। তাঁহার এই পুত্রটি যদি ভগবানের কৃপায় বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে হয়ত কালে অনেক সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিবে। ঘটনাটি বড় আশ্চর্য্য, অসাধারণ ও দুঃখজনক। এই

জন্তই আমার স্বামী মহাশয় এই সংবাদগুলি তৎকালে আমাকে লিখিয়াছিলেন। কালি আপনার কথা শুনিয়াই, এই সংবাদ ছায়ার মত আমার মনে পড়িল। রাত্রিতে অনেকক্ষণ পত্রের সন্ধান করিয়াছিলাম; কিন্তু পাই নাই। আমি স্বামীর কোন পত্রই হারাই নাই। এজন্ত ভরসা ছিল নিশ্চয়ই তাহা পাওয়া যাইবে। আজি প্রাতে অনেক পত্র পড়িতে পড়িতে সে পত্রখানি পাইয়াছি।"

হরকুমার বলিলেন, "বড়ই দরকারী পত্র —বড়ই শুভসংবাদ। আমার যেন বোধ হয় আপনার স্বামী যে বালকের কথা লিখিয়াছেন, সেই বালকের বিষয়ই আমি সন্ধান করিতেছি। এ পত্র দ্বারা আমার সন্ধানের বিশেষ সাহায্য হইবে। সে পত্রখানি আমাকে দেখিতে দিবেন কি?

ভব বলিল—দেখিতে কেন, সে পত্র একবারেই আপনাকে দিব। তাহাতে আপনার অনুসন্ধানের বিশেষ উপকার হইবে বলিয়া আমারও মনে হইতেছে। আপনি যে দুই খানি কাগজ কল্য পাইয়াছেন, তাহার মর্ম্ম কি?"

হরকুমার বাবু প্রথমে রামচন্দ্র শর্ম্মা স্বাক্ষরিত পত্র পাঠ করিয়া শুনাইলেন এবং অপর পত্রের মধ্যে মৃত্যু হইয়াছে এই কথাটি মাত্র পড়িতে পারিয়াছেন, ইহাও বলিলেন।

ভবসুন্দরী বলিল—এই রামচন্দ্র শর্ম্মা গঙ্গামণি দিদির বোনপো, চণ্ডের মাসতুত ভাই। এ ব্যক্তি বর্দ্ধমানে কি কাজ করে—অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। লোকটা বড় চালাক, বড়ধূর্ত্ত। চণ্ড নেশাখোর ও দুর্বৃত্ত। তাহার হাতে কাগজগুলি পড়িলে নষ্ট হইয়া যাইবে, মনে করিয়া, গঙ্গা দিদি, মৃত্যুর পূর্ব্বে রামচন্দ্রের হাতে তাহা দিয়া গিয়াছেন, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। কাশীতে তাহার খুড়ীর সে বিষয়ের সংবাদ না পাওয়া এবং সে সকল সামগ্রী যত্ন করিয়া রাখা, এ দুইটা কথার সহিত এ বিষয়ের সম্বন্ধ থাকা সম্ভব। রামচন্দ্রের নিকট যদি কাগজ পত্র থাকে, তাহা হইলে হস্তগত করা কঠিন হইবে বোধ হয় না। কোন না কোন সময়ে এই সকল কাগজ পত্র দ্বারা বিশেষ লাভ হইবে বুঝিয়াই সে তাহা হস্তগত করিয়াছিল। সুতরাং তাহাকে কিছু দিলেই সেগুলি পাওয়া যাইতে পারিবে।"

হরকুমার বলিলেন,—"আপনি যেরূপ অনুমান করিতেছেন, আমিও সেইরূপ মনে করিয়াছিলাম। তবে রামচন্দ্র কে, কোথায় থাকে ইত্যাদি কোন সংবাদই আমি জানিতাম না।"

ভব বলিল—"আর যে পত্রখানি পড়া যাইতেছে না, তাহা আপনি আর একবার পড়িবার চেষ্টা করুন। তাহার মধ্যেও দরকারী কথা থাকা সম্ভব। পত্রখানি একবার রৌদ্রে দিউন, না হয় আগুনে তাতাইয়া দেখুন, হয়ত তাহাতে কালী ফুটিয়া উঠিবে, তখন পড়া যাইবে। সমস্ত পড়া না গেলেও, এখানে ওখানে দুই একটা কথা পড়িতে পারিলেও অনেক উপকার হওয়া সম্ভব।"

হরকুমার, ভবসুন্দরীর এইরূপ বুদ্ধি-বিবেচনা, পরোপকারে এইরূপ উৎসাহ, ইত্যাদি আলোচনা করিয়া, বিমোহিত হইলেন। বলিলেন,—"আপনার ন্যায় বুদ্ধিমতীর পরামর্শ লইয়া কাজ করিলে, এ বালকের পরিচয় প্রকাশ করিবার উপায় করিতে পারিব সন্দেহ নাই। আপাততঃ চিঠিখানি তাতাইয়া দেখি।"

ভবসুন্দরী এক আটী খড় আনিয়া দিল। উঠানের একপাশে গিয়া, অম্বিক তাহার কিয়দংশ লইয়া দিয়াশলাই দ্বারা জ্বালাইয়া দিল।

হরকুমার অতীব সাবধানতা সহ পত্রখানি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সেই আগুনে তাতাইতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ তাত দেওয়া হইল। কালীর দাগ একটু একটু বুঝা যাইতে লাগিল বটে, কিন্তু তখনও কিছু পড়া যায় না। তথাপি হরকুমার অনেক কষ্টে আর একটা কথা পড়িতে পারিলেন। সে কথা—"সন্ন্যাসীর দল।"

ভব বলিল,—"চালসে ধরা চক্ষের কাজ নহে। দাঁড়ান, আমি এ জন ছেলে ডাকিয়া আনি"

ভব চলিয়া গেল এবং অবিলম্বে একটী সভ্যভব্য যুবাকে ডাকি। আনিয়া পত্রখানি পড়িতে বলিল। এই যুবা ইংরাজি, বাঙ্গালা, সংস্কৃত অনেক বিদ্যা শিখিয়াছেন এবং গ্রামের শ্রেষ্ঠ বালক। যুবা পত্রখানি লইয়া অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করিয়া বলিলেন,—"এক আধটা কথা পড়া যায়। সমস্ত পত্র পড়িয়া উঠা অসম্ভব। তবে আমার নিকট মেগ্নিফায়ার আছে, যদি বলেন তাহা হইলে তাহার দ্বারাও চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি।"

ভব বলিল,—"লক্ষ্মী যাদু, তাই আনিয়া দেখ বাবা। বড় দরকারী কাজ।"

যুবা প্রস্থান করিলেন এবং অবিলম্বে মেগ্নিফায়ার হস্তে পুনরাগমন করিয়া পত্র পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। বলিলেন,—"এবার অনেক কথা পড়া যাইতেছে বটে, কিন্তু সমস্ত কথা বুঝিতে পারিতেছি না।"

হরকুমার বলিলেন,—"যাহা পড়িতে পারিতেছেন, তাহাই বলুন দেখি, আমি পেনসিল দিয়া নোট বহিতে লিখিয়া লই।"

যুবক বলিতে লাগিলেন এবং হরকুমার তাহা লিখিতে লাগিলেন। নোটের উপর সে পত্র এইরূপ দাঁড়াইল।

"যখন * * ঠাকুরাণী * * কাগজপত্র আপনাকে * * মৃত্যু হইয়াছে * * আপনি * * দেখিয়াছেন * * জন্মাদি * * আছে * * সোণামণি * * যে আপনি * * যেন * * সন্ন্যাসীর দল * * বড় হইলে * * আসিতে পারে * * পরিচয় * * তাঁহার * এই পত্র * * ইতি তা *

শ্রী * দাস * বর্ত্তী।

গণেশমহল্লা, কাশী।"

বিনীত যুবা প্রস্থান করিল। হরকুমার ভবসুন্দরীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"পত্রে বিশেষ কিছুই বুঝা না গেলেও, ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে, যে বালকের বিষয় আমি অনুসন্ধান করিতেছি, সোণামণি তাহারই সংক্রান্ত কাগজ পত্র গঙ্গামণির নিকট রাখিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি এ পত্রের লেখক তাহার নাম জানিতে না পারিলেও, ইহা বুঝা যাইতেছে যে, তাহার উপাধি চক্রবর্ত্তী এবং কাশীর গণেশমহল্লায় তাহার বাস। সুতরাং কাশীতে সন্ধান করিবা একটা নির্দ্দিষ্ট ঠিকানাও পাওয়া যাইতেছে এবং উপাধি ধরিয়া সন্ধান করিবার একটা লোক পাওয়া যাইতেছে। ইহাতে অনেক উপকার সম্ভাবিত।"

ভব বলিল,—"এই বালকের মাতামহের বাড়ী কোথায় তাহা কেহ জানেন না?"

হরকুমার বলিলেন,—"আমি জানি শিশুর মাতা পিতৃ-মাতৃহীন অবস্থায় এক দূর জ্ঞাতির বাটীতে ছিলেন; সেই অবস্থায় তাঁহার বিবাহ হয়। যে জ্ঞাতির বাটীতে ছিলেন, তাঁহারাও কেহ এখন নাই। সেই কামিনীর গর্ভে এই শিশুর জন্ম হইয়াছে, ইহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিলে আমাদের সংকল্প অনেকটা সিদ্ধ হয়। এই বালক যে তাঁহারই সন্তান ইহা জানা আবশ্যক। সোণামণি কে ইহা

জানিতে পারিলেও অনেকটা সন্ধানের উপায় হয়।"

ভব বলিল,—"এখন রামচন্দ্রের নিকট যাওয়াই বোধ হয় এ সম্বন্ধে প্রধান দরকার। সেই কাগজ পত্র দেখিতে পাইলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে।"

হরকুমার বলিলেন,—"সম্ভব। আপাততঃ আজি আমরা যাত্রা করিব। আপনার বুদ্ধি ও সততা প্রভৃতি দেখিয়া আমি বড়ই আনন্দলাভ করিয়াছি। আমাকে আপনি একজন প্রধান আত্মীয় বলিয়া জ্ঞান করিবেন। আমার সময় থাকিলে আমি আরও দুই এক দিন আপনার বাটীতে থাকিতাম। যাহা হউক উপস্থিত বিষয়ে হয় ত অনেক সময় আপনার সাহায্য দরকার হইবে। আমার নাম ঠিকানা সকলই আপনাকে বলিয়া দিয়াছি। আপনারও সকল কথা আমার জানা থাকিল আবশ্যক হইলে আপনাকে পত্র লিখিলে দয়া করিয়া উত্তর দিবেন এবং প্রয়োজন হইলে সাধ্যমত সাহায্য করিবেন।"

ভব সকলই স্বীকার করিল এবং প্রয়োজন হইলে কাশী বা অন্য স্থানে যাইতে হইলেও সে যাইবে, ইহাও অঙ্গীকার করিল।

আহারাদি, সমাপ্তির পর চণ্ডী রামহরি, জরিফ ও হরকুমার যাত্রা করিলেন যাত্রাকালে হরকুমার ভবকে দশটী টাকা লইবার জন্য অনেক জেদ করিলেন কিন্তু সে কোন ক্রমেই তাহা স্পর্শ করিল না। বলিল,—"আপনার কৃপা থাকিলে অনেক লাভ হইবে।" ইহাও সে বলিল যে, কোন দায় উপস্থিত হইলে সে ভিক্ষা চাহিয়া লইবে। আসিবার সময় ভব, তাহার স্বামীর লিখিত পত্র খানি হরকুমার বাবুর হস্তে দিতে ভুলিল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মিলন।

যথাকালে হরকুমার, চণ্ডী, রামহরি ও জরিফ সনাতনপুরের হরিশ কর্ম্মকারের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। হরকুমার, বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সুহাসিনী এক কৃষ্ণকায়া সুন্দরীর কেশ বন্ধন করিয়া দিতেছেন। হরকুমারের অপরিচিতা এই কামিনী, তাঁহাকে দর্শন মাত্র, অঞ্চল দ্বারা স্বকীয় বদন আবৃত করিল। সুহাসিনী দেহের বস্ত্রাদি সুবিন্যস্ত করিয়া উঠিয়া আসিলেন এবং হরকুমারকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"বাবা, আমি আজ হারা-নিধি পাইয়াছি। এই সেই দাসী। ইহারা স্বামী-স্ত্রী আমার নিমিত্ত সর্ব্বস্বান্ত হইয়া শেষে জীবনপাত করিতেও বসিয়াছিল। ঈশ্বরের কৃপায় দাসীকে পাইয়াছি; কিন্তু ইহার স্বামী রামহরিকে এখনও পাই নাই। তবে দাসীর মুখে শুনিতেছি, রামহরি বাঁচিয়া উঠিয়াছে। বাবা, হরিশের কৃপায় দাসীকে পাওয়া গিয়াছে। দাসী অনেক কষ্ট পাইয়াছে, অনেক বিপদ কাটাইয়া অনেক কষ্টে নিজের বাড়ীতে গিয়াছিল। দাসী যাওয়ার আগে রামহরিও বাটীতে ফিরিয়াছিল; কিন্তু আমাদের চিন্তায় অস্থির হইয়া বাটী ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে। কোথায় আছে কি করিতেছে, কিছুই জানিতে না পারায় দাসীর উদ্বেগের সীমা নাই।"

হরকুমার বলিলেন—"তুমি যদি আমাকে সন্দেশ খাওয়াও তাহা হইলে দাসীর উদ্বেগ দূর করিয়া দিবার চেষ্টা করিতে পারি।"

সুহাসিনী বলিলেন,—"তুমি না পার কি বাবা? যে লোক মরা বাঁচাইতে পারে,

তাঁহার অসাধ্য কি আছে? যে দিন তুমি বলিয়াছ রামহরির আর দাসীর ভাল খবর আনিয়া দিবে, সেই দিনই আমি বুঝিয়াছি তাহারা ভাল আছে। কারণ তুমি দেবতা। দেবতার কথা কি কখনও মিথ্যা হয়?"

হরকুমার বলিলেন,—"তবে মা তুমি অদিতি। তোমার সন্তান কখন কি মন্দ হয়?"

সুহাসিনী বলিলেন,—"এখন রামহরির খবর কি বল।"

হরকুমার জিজ্ঞাসিলেন,—"কি খবর পাইলে তুমি খুসী হ বল!"

সুহাসিনী বলিলেন,—"রামহরি কোথায় আছে? কেমন আছে? কোন কষ্ট পাইতেছে কি না? বাড়ী ফিরিতেছে না কেন? কিরূপে খাওয়া দাওয়া চলিতেছে? এই সকল সংবাদ পাইলে আমি খুসী হইব।"

হরকুমার বলিলেন,—"এত খবর আমি বলিতে পারি না। আমি রামহরির সম্বন্ধে এক ছোট খবর দিতে পারি।"

সুহাসিনী বলিলেন,—"ভাল, তাই বল।"

হরকুমার বলিলেন,—"দাঁড়াও তবে।"

তিনি বাহিরে চলিয়া আসিলেন এবং রামহরিকে সঙ্গে লইয়া ভিতরে গিয়া বলিলেন,—"আমার খবর এই দেখ।"

আহ্লাদের সীমা থাকিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে দাসী আসিয়া হরকুমারকে প্রণাম করিল। তাহার পর রামহরির নিকটস্থ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বসিয়া পড়িল। রামহরি অবাক্! এ কি স্বপ্ন! দাসীকে সে আর এ জন্মে দেখিতে পাইবে না বলিয়াই মনে করিয়াছিল। প্রাতে যখন হরকুমার বাবুর সহিত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তখনও তিনি দাসীর সংবাদ কিছু বলিতে পারেন নাই। অথচ সহসা এই অপ্রত্যাশিত স্থানে সেই দাসীকে স্বচক্ষে সম্মুখে দেখিয়া সে নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইল এবং তখন কি করা উচিত স্থির করিতে না পারিয়া, প্রথমে হরকুমার বাবুর, তদনন্তর সুহাসিনীর চরণে এক একটা প্রণাম করিল।

হরকুমার বলিলেন,—"সন্দেশ পাইবার কাজ করিয়াছি এখন সন্দেশ দেও মা।"

সুহাসিনী। অবশ্য। এত সন্তোষের কাজ যে ছেলে করিতে পারে, তাহার মার বড় অহঙ্কার বাড়িয়া উঠে। দাঁড়াও আগে সন্দেশ আনি

হরকুমার বলিলেন,—"আমরা অনেকগুলি। দুইটা চারিটা সন্দেশ আনিলে চলিবে না মা।"

সুহাসিনী হাসিয়া বলিলেন,—"দেবতার মা কি কখনও গরীব হয়? অনেক সন্দেশই দিব বাবা।"

সুহাসিনী গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং প্রকাণ্ড এক হাঁড়ি সন্দেশ কক্ষে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

হরকুমার সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিলেন,—"এত সন্দেশ কোথায় পাইলে মা?"

সুহাসিনী বলিলেন,—"হরিশকে দিয়া আনাইয়া রাখিয়াছি।"

হরকুমার বাবু বাহিরে আসিয়া দেখিলেন চণ্ডী, বাহিরের সেই চালা ঘরে বসিয়া তামাক খাইতেছে।

হরকুমার জিজ্ঞাসিলেন,—"তারা কিছু জল খাইতে হইবে না?"

চণ্ডী বলিলেন,—"তা বেশ। তবে দুটা একটা ছিটা টানিয়া লইবার জায়গা দেখাইয়া দেও।"

হরকুমার বলিলেন,—"ঐ জায়গা, ঐ তোমার ঘর, ঐ খানেই যা হয় কর। আমি জলখাবার আনি।"

হরকুমার পুনরায় বাটীর মাধ্য প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন একটী মাছুরের উপর রামহরি বসিয়াছে; তাহার সম্মুখে মাটিতে বসিয়া দাসী হাত নাড়িতে নাড়িতে অনেক গল্প করিতেছে। দাসী তাঁহাকে দেখিয়া বড়ই লজ্জিত হইল। রামহরি হাসিতে হাসিতে তাহাকে বলিল,—"দূর মাগী, তোর কিছু বুদ্ধি নাই। দেখছিস না, উনি দিদিঠাকুরুণের বাবা। বাবার কাছে ছেলেদের লজ্জা আছে কি?"

দাসী আর কিছু উত্তর দিতে পারল না। আবার উঠিয়া আসিয়া, গলায় কাপড় দিয়া হরকুমারের চরণ সমীপে ঢুপ করিয়া একটী প্রণাম করিয়া গেল। হরকুমার বলিলেন,—"কতবার প্রণাম করিতে হয় মা। আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমাদের সুখ সৌভাগ্য কখন ক্ষয় হইবে না।"

তাহার পর কতক গুলা সন্দেশ লইয়া বাহিরে আসিলেন। আসিবার সময় তিনি বলিয়া আসিলেন,—"মা কোথায়? রামহরিকে জল খাইতে দেও না।"

বাহিরে আসিয়া চণ্ডী আর জরিফের হস্তে কতকগুলা সন্দেশ দিয়া উভয়কে জল খাইতে বলিলেন।

চণ্ডীর নেশা সমাপ্ত করিতে অনেক সময় গেল। তাহার পর সে জলযোগ সমাধা করিয়া নিশ্চিন্ত ও স্ফুর্ত্তিযুক্ত হইল। তখন হরকুমার বলিলেন,—"চল ভায়া, দুই চারিদিনের মধ্যে দেশ ভ্রমণে যাওয়া যাউক।"

চণ্ডী বলিল,—"কতদূর?"

হরকুমার বলিলেন,—"অধিক দূর নয়। এই বর্দ্ধমান।"

চণ্ডী বলিল,—"সীতাভোগের চাট হইবে, ভাল। আর একটা বিদ্যাও না জুটিতে পারে এমন কোন কথা নাই। চল দাদা, তোমার সঙ্গে যাব তার আর ভাবনা কি?"

তাহার পর হরকুমার জরিফের সঙ্গে অনেকক্ষণ নানা বিষয়ের কথোপকথন করিলেন। অনেক বিষয়ের ভার জরিফের উপর দিলেন। অনেক বিষয়ের অনেক ব্যবস্থা করিলেন। অনেক রাত্রিতে আহারাদি সম্পন্ন হইয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ।

ব্যবহারজ্ঞ বী।

বর্দ্ধমানের রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ফৌজদারী আদালতের মোক্তার। ব্যবসায়ে বিশেষ জুত নাই; কোন ক্রমে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হয় মাত্র। বাসা ভাল নহে। মোক্তার মহাশয়ের চাকর বাকর নাই। একটি ঝি আছে; সে কোন প্রকারে গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন করে। রামচন্দ্র এ ভাবে সপরিবারে অবস্থান করেন। তাঁহার দুইটি ছেলে, একটী মেয়ে। ছেলে দুইটী স্কুলে পড়ে। মেয়েটী দশ ছাড়ায় প্রায়। বিবাহের কি হইবে ভাবিয়া মোক্তার মহাশয় ও তাঁহার স্ত্রী বড়ই অসুখী।

মোক্তার মহাশয়ের পরিগৃহীত ব্যবসায়ে একটুও অমনোযোগ নাই। শরীর বিশেষরূপ অসুস্থ না হইলে, তিনি কোন দিন কাছারি যাওয়া বন্ধ করেন না এবং যে মক্কেল যাহা দেয় তাহাই গ্রহণ করিয়া, যত্ন সহকারে তাহার কার্য্য সম্পন্ন করিতে ত্রুটী করেন না। প্রতিদিন অন্য আমলা বা উকীল-মোক্তার কাছারি যাওয়ার পূর্ব্বেই ছেঁড়া পায়জামা পরিয়া, মোজা বিহীন পদে পাঁচসিকা দামের জুতা

লাগাইয়া, বন্ধ আঁটা মলিন চাপকান গায়ে দিয়া, শত ছিন্ন পাকান চাদর কাঁধের উপর ফেলিয়া, কাণে কলম গুঁজিয়া, হাতে একটা দপ্তর লইয়া এবং মাথায় পরামাণিকের মত পাগড়ি বাঁধিয়া রামচন্দ্র কাছারিতে হাজির হন। কাছারিতে উপস্থিত হইয়া, রামচন্দ্র চুপ করিয়া এক স্থানে বসিয়া থাকেন না। কাজ থাকুক বা না থাকুক, তিনি, চারিদিকে অতীব ব্যস্ততা সহ ঘুরিয়া বেড়ান এবং ছুটাছুটী করিয়া ব্যস্ততা প্রকাশ করিবার সুযোগ না ঘটিলে তিনি প্রায়ই দপ্তরের মধ্য হইতে শত সহস্র বার অধীত একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া, আবার বিশেষ মনঃসংযোগ সহকারে পড়িতে থাকেন। তিনি যখন ছুটাছুটি করেন, তখন তাঁহার সহিত কেহ কথা কহিতে আসিলে, তিনি বলেন,—"একটু অপেক্ষা কর, বড় জরুরি কাজ, এখনই ঘুরিয়া আসিতেছি।" যখন তিনি মনোযোগ সহকারে কাগজ পাঠ করেন, তখন তাঁহার সহিত কেহ কথা কহিতে আসিলে, তিনি ঘাড় নাড়িয়া, অথবা কেবল হাঁ হুঁ করিয়া, উত্তর সমাধা করেন। স্বাধীন ভাবে মোকদ্দমা চালাইবার ভার প্রায় তাঁহার ভাগ্যে ঘটে না; কোন না কোন উকীল বা মোক্তারের সহকারী রূপেই তাঁহাকে প্রায় কার্য্য করিতে হয়। দরখাস্ত লেখা, দলিল দাখিল করা, সাক্ষীর জবানবন্দী টুকিয়া লওয়া, দলিল বাহির করা, সাক্ষীর রোজ দাখিল করা, জেরার সময়ে বা বক্তৃতার সময়ে তৎকার্য্যে নিযুক্ত উকীল বা মোক্তারের কাণের কাছে অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিয়া বিরক্ত করা ইত্যাদি গুরুতর কার্য্যেই তাঁহাকে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। কদাচিৎ তাঁহার উপরওয়ালা উকীল বা মোক্তার উপস্থিত না থাকিলে, রামচন্দ্রকে সাক্ষীর জেরা বা কখন কখন বক্তৃতা চালাইতে হয়। বলা বাহুল্য সে সময়ে হাকিম, আমলা, অপর পক্ষের উকীল মোক্তার সকলেই নিতান্ত জ্বালাতন হইয়া উঠেন। আমাদের মোক্তার মহাশয়ের সংস্কার এই যে, সাক্ষীকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করাই বুদ্ধিমান মোক্তারের কাজ; প্রাসঙ্গিক হউক বা না হউক, অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলে হয়ত একটা না একটা অনুকূল কথা বাহির হইতে পারে এবং মক্কেলও খুসী হয়। কিন্তু অনেক জ্বালাতন করিলে, বা অনেকক্ষণ বলিতে হইলে, অসাবধান সাক্ষী যে প্রতিকূল কথাও বলিয়া ফেলিতে পারে, এ কথা তাঁহার মনে একবারও উদিত হয় না। বক্তৃতা করিতে হইলেও তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সকল কথাই উপস্থিত করিয়া থাকেন। রামায়ণ, মহাভারত, মহিষাসুর বধ সকল কেচ্ছাই তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে আবির্ভূত হওয়া সম্ভব। তিন মিনিটের কাজে তিনি তিন ঘণ্টা না লাগাইয়া ক্ষান্ত হন না। ইহাতে তাঁহার মূর্খ মক্কেল খুসী হইলেও হইতে পারে, কিন্তু ফল বড়ই মন্দ হয়; কারণ হাকিম প্রায়ই বিরক্ত ও অপ্রকৃতিস্থ হইয়া শেষে যাহা মনে আইসে তাহাই করিয়া ফেলেন। তিনি সাক্ষীর জেরা করিতে বা বক্তৃতা করিতে উঠিলে, সে দিন হাকিম দুর্গা নাম স্মরণ করিতে করিতে হাত পা ছাড়িয়া দেন। হাকিম তাঁহাকে বিনয় করিয়া, ধমক দিয়া, বিদ্রূপ করিয়া কোন প্রকারেই থামাইতে পারেন না। একদিন এক হাকিম তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—"রাম বাবু কিছুই ছাড়িতে চাহেন না। চাপকান, পায়জামা, পাগড়ি, জুতা অব্যবহার্য্য হইলেও রাম বাবু ছাড়েন না; মোকদ্দমাও সেইরূপ ছিঁড়িয়া গিয়াছে দেখিলেও, রাম বাবু তাহা ছাড়েন না।" কথাটি রাম বাবু বিশেষ

সুখ্যাতির বিষয় বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং তাহার পর হইতে অধিকতর নাছোড়বান্দা হইয়া মোকদ্দমা চালাইতেছেন।

রামচন্দ্রের মাথায় একটি অতি ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ টিকি আছে। অনেক সময়েই তিনি তাহা চুলের সহিত মিশাইয়া রাখেন; হঠাৎ ধরা যায় না। তিনি প্রতিদিন পূজা পাঠ করেন কিনা বলা যায় না; কিন্তু স্নানাহার সমাপ্ত করিয়া, কাছারির কাপড় পরিয়া, যখন তিনি বাহিরে আইসেন, তখন ললাটে এক দীর্ঘ ফোঁটা দেখিতে পাওয়া যায়। কাছারি পর্য্যন্ত সে ফোঁটা সঙ্গে থাকে। কাছারি যাওয়ার পর কোন সুযোগে, সে ফোঁটা কোথায় পলাইয়া যায়, তাহার আর সন্ধান হয় না।

রামচন্দ্রের বাসায় বাহিরের ঘরে একখানি চৌকির উপর কম্বল পাতা আছে। দুই এক খানি টুল, একখানি আম কাঠের বেঞ্চও সে ঘরে পড়িয়া আছে। তামাক টীকার একটা বাক্স, দুই চারিটা ডাবা হুঁকাও সেখানে আছে।

বেলা প্রায় ৭টা। রামচন্দ্র সেই বাহিরের ঘরে বসিয়া আছেন। সম্মুখে তাঁহার প্রতিদিন বাহিত দপ্তর ও দোয়াত কলম রহিয়াছে। রামচন্দ্র লেখা পড়া কিছুই করিতেছেন না। চুপ করিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছেন। এমন সময়ে তিনি দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখস্থ পথ দিয়া দুইটি ভদ্রলোক তাঁহারই গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি, ব্যস্ততা সহ দপ্তর হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া, মনঃসংযোগ সহকারে পাঠ করিতে লাগিলেন। লোকেরা গৃহপ্রবেশ করিলে, রামচন্দ্র কাগজ হইতে দৃষ্টি অপসারিত না করিয়াই বলিলেন, —"আসুন, বসুন।"

আগন্তুক আমাদের সুপরিচিত হরকুমার ও চণ্ডী। রামচন্দ্র দূর হইতে তাঁহাদের দেখিয়াছিলেন এবং হরকুমার বাবুর চেহারা ও রকম সকম দেখিয়া স্থির করিয়াছিলেন, একটা বড় মামলা না হইয়া যায় না। বিলক্ষণ দশ টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা।

হরকুমার বাবু তক্তপোষের এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন, কিন্তু চণ্ডী না বসিয়া বলিল,—"কি দাদা, চিনতে পাচ্ছ না?"

এই বলিয়া সে রামচন্দ্রের চরণে একটা প্রণাম করিল এবং উভয় পদের ধূলি লইয়া মাথায় দিল। অগত্যা রামচন্দ্রকে, বিশেষ দরকারী কাগজ পাঠ ত্যাগ করিয়া, এই সুবিনীত মক্কেলের প্রতি নেত্রপাত করিতে হইল। চণ্ডীকে দেখিয়াই তিনি চিনিতে পারিলেন এবং মনে করিলেন—এই যে এতদিন পরে এই গুলিখোর হতভাগা জ্বালাতন করিতে আসিল। ইহাকে ভাগাইবার ফিকির করা আবশ্যক। তাহার পর মনে করিলেন, ইহার সঙ্গে একটা ঝাঁকাল লোক দেখিতেছি; সুতরাং একটা লাভালাভের কথা থাকা সম্ভব। শেষ দেখিয়া তাড়াইবার ব্যবস্থা করা যাইবে। প্রকাশ্যে বলিলেন,—"চণ্ডী ভায়া যে! কোথা থেকে আসছ?"

চণ্ডী বলিল,—"বাড়ী থেকে দাদা। ছেলে পিলে ভাল আছে? বউ-ঠাকরুণ ভাল আছেন"

রামচন্দ্র সমর্থন সূচক মস্তকান্দোলন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"তোমার সব কুশল?"

চণ্ডী সবিনয়ে বলিল,—"আপনার আশীর্ব্বাদে প্রাণগতিক সমস্ত মঙ্গল। একবার তামাক খাইতে হইবে। চাকর বাকর আছে কি?"

রামচন্দ্র মাথা চুলকাইতে লাগিলেন। চণ্ডী বলিল,—"আমার সঙ্গে এই যে বাবু

আসিয়াছেন,ইনি একজন মহাত্মা লোক দাদা। ওঁরই দরকারে আসা হইয়াছে। চাকরেরা বাজার হাটে গিয়াছে বোধ হয়। দরকার কি? সবই তো আছে। আমিই সাজিয়া খাই।"

চণ্ডী তামাক সাজিতে লাগিল। রামচন্দ্র মনে করিলেন, এতদিনে বোধ হয় আমার বক্তা-বুদ্ধির সৌরভ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাই মহাত্মা লোকেরাও দেশ-বিদেশ হইতে, আমার আত্মীয় কুটুম্ব সঙ্গে লইয়া, এখানে আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। জানি আমি আমার নাম এক দিন না একদিন সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবে। জিজ্ঞাসিলেন,—"মহাশয়ের নিবাস?"

হরকুমার বলিলেন,—"নিবাস আমার এ জেলায় নহে।"

রামচন্দ্র বলিলেন,—যে জেলাতেই হউক, না কেন, মোকদ্দমা আমার হাতে দিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, এরূপ যত্ন আর কাহারও দ্বারা হইবার সম্ভাবনা নাই। আইনের ফাঁকি বাহির করা, জেরায় সাক্ষীর সর্ব্বনাশ করা, বক্তৃতায় হাকিমের মত ফিরাইয়া দেওয়া ইত্যাদি কার্য্যে আমার বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। বলিতে কি, আজি কালি আদালতে লোক নাই বলিলেই হয়। এখানকার যে সকল উকীল মোক্তার, তাহারা লেখাপড়াও শিখে না, আইনও বুঝে না, জেরা করিতে জানে না এবং বক্তৃতায় দুই দশ কথার বেশী বলিতে পারে না। আমার মত সাবেক প্রবীণ লোক আর নাই। যে দুই একজন আছেন, তাঁহারা গেলেই মামলা মোকদ্দমা হাকিমদের নিজ ইচ্ছামতেই চলিতে থাকিবে আর কি। তা মহাশয় বুঝি বাদী? বাদীর পক্ষে আমি যে আরজি লিখি, তাহাতে আর কাহারও কলম চালিবার সাধ্য থাকে না।"

হরকুমার বলিলেন,—"আজ্ঞে, আমি বাদী নহি।"

রামচন্দ্র বলিলেন,—"ওঃ তবে আপনি প্রতিবাদ! কিছু চিন্তা নাই। সাক্ষী ভাঙ্গাইয়া, তর্ক বাহির করিয়া, প্রতিবাদীর ডুবা মোকদ্দমাও আমি তুলিয়া থাকি! নিজের কথা নিজে আর কি বলিব? এ পক্ষে আমার সিদ্ধবিদ্যা। বলিব কি মহাশয়, সেদিন আমার এক মোকদ্দমায় জজ আদালতের একজন উকীল আসিয়াছিলেন। আমরা প্রতিবাদী। উকীল মহাশয় মোকদ্দমা চালাইতে লাগিলেন। তাঁহাকে সকল কথা বেশ করিয়া শিখাইয়া দিয়া আমাকে অন্য এজলাসে যাইতে হইল। আমার ত এক জায়গায় অনেকক্ষণ থাকা ভার। সকল এজলাসেই মোকদ্দমা। যাহা হউক ফিরিয়া আসিয়া দেখি উকীল মহাশয় মোকদ্দমাটির গায়ে জল দিয়াছেন আর কি। হাকিম বলিতেছেন, 'ইহ'কে ৬ মাস মেয়াদ দেওয়া উচিত।" আমি বলিলাম, 'ধর্ম্মাবতার! আমি অনুপস্থিত থাকায় উকীল মহাশয় হুজুরকে মোকদ্দমা ঠিক বুঝাইতে পারেন নাই। আমি ইহার সমস্ত বৃত্তান্ত বুঝাইয়া দিতেছি। ধর্ম্মাবতার দেখিতে পাইবেন, আসামী নিতান্ত নির্দ্দোষ। হাকিম মাত্রই আমাকে বড় শ্রদ্ধা করেন। আমার কথা হাকিম শুনিতে লাগিলেন। আমি, কৌশলে সেই মোকদ্দমা ফিরাইয়া আসামীকে বেকসুর খাস করিয়া আনিলাম। কথাটা কি জানেন বাবু, সকলই পয়সার কর্ম্ম। যেমন পরিশ্রম তেমন পয়সা না পাইলে খাটিতে ইচ্ছা হয় না, কাজেই উৎসাহ হয় না। তা মহাশয় প্রতিবাদী বলিয়া ভয়ের কারণ কিছুই নাই।"

হরকুমার বলিলেন,—"আজ্ঞে আমি প্রতিবাদীও নহি।"

রামচন্দ্র পরিত্যক্ত কাগজখানি তুলিয়া লইলেন। জিজ্ঞাসিলেন,—"তবে আপনার কি মোকদ্দমা ?"

হরকুমার বলিলেন,—"আমার কোন মোকদ্দমা ন ।"

রামচন্দ্র কাগজ পাঠে মনঃসংযোগ করিলেন। হরকুমার বলিলেন,—"আমার কাজ অন্য রকম। তাহাতেও কিছু ল ভের সম্ভাবনা নাই এমন নহে।"

রামচন্দ্রের হাত হইতে কাগজ পড়িয়া গেল। বলিলেন,—"আদালত সংক্রান্ত কত রকম কাজই আছে। মোকদ্দমাই থাকিতে হইবে এমন কি কথা। মহাশয়ের কাজ বোধ হয় রোডশেষ সংক্রান্ত। সে কার্য্য আমার দ্বারা স্বচ্ছন্দে শেষ হইবে। আপনি ভাল লোকের কাছেই এ জন্য আসিয়াছেন। কারণ রোডশেষ আফিসের সমস্ত আমলাই আমার হাত ধরা।"

হরকুমার বলিলেন—"আজ্ঞে রোডশেষ আফিসে আমার কোন কাজ নাই।"

রামচন্দ্র বলিলেন,—তবে মহাফেজখানায় বুঝি ? তা বেশ তো। জমির চৌহদ্দি চাহি বুঝি ? তা তায়দাদের নকল লইলেই হইবে। কিছু জলখেতে দিতে হবে; আমলা বেটারা যেন রাঘব বোয়াল। তা সে জন্য আটকাইবে না। আজই দরখাস্ত করিয়া দিব এখন। আপনার নম্বরটী জানা আছে তো ?

হরকুমার বলিলেন,—আজ্ঞে না কোন জমির তায়দাদ বা চৌহদ্দির দরকার নাই।

আবার সহস্রবার অধীত কাগজ রামচন্দ্রের হাতে উঠিল। তিনি সেই দিকে নেত্রপাত করিয়া জিজ্ঞাসিলেন—তবে কি ?

হরকুমার বলিলেন—আপনার নিকট কতকগুলি কাগজ আছে।"

রামচন্দ্র বলিলেন—কোন্ মোকদ্দমার কাগজ ? আপনাকে চিনি না, আপনার নিকট সে কাগজ ছাড়িয়া দিব কেন ? আর মোকদ্দমার দরুণ যদি আমার ফিসের টাকা কিছু বাকী থাকে তাহা হইলেই বা কাগজ ছাড়িব কেন ?

হরকুমার বলিলেন—কোন মোকদ্দমার কাগজ নহে।

তবে কিসের ?

আপনার মাসী পরলোকগতা গঙ্গামণি দেবী আপনার নিকট কতকগুলি কাগজ রাখিয়াছিলেন ; তাহাতেই আমার দরকার।

রামচন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন। বহুদিবসাবধি সেই কাগজের তাড়া তাঁহার নিকট পড়িয়া আছে। কোন না কোন সময়ে তাহাতে কিছু না কিছু লাভ হইবে মনে করিয়া তিনি সে গুলি মাসীর নিকট হইতে হস্তগত করিয়াছিলেন। মাসী যখন বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইতে অধিক বিলম্ব নাই, তখন তিনি ঐ প্রয়োজনীয় কাগজগুলির কি ব্যবস্থা করিবেন, ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়াছিলেন। চণ্ডী দরিদ্র তাহাকেই তিনি তাঁহার সম্পত্তি দিবেন স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি জানিতেন, কাগজ রাখিতে বা তাহার সদ্ব্যবহার করিতে চণ্ডী কখনই পারিবে না। এই সময়ে রামচন্দ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলে তিনি তাঁহাকেই কাগজ রাখিবার অতি উপযুক্ত পাত্র বলিয়া মনে করিলেন। ব্যক্তি নির্ণয় করিতে না পারিলেও, রামচন্দ্র কাগজ পাঠ করিয়া বুঝিলেন তাহা রহস্যপূর্ণ। কখন কাহারও ইহাতে দরকার উপস্থিত হইলে বিল ক্ষণ দুই পয়সা লাভ

করিতে পারিবেন। সেই কাগজের সম্বন্ধে রামচন্দ্র অনেক আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন আশাই সফল হয় নাই; এ পর্য্যন্ত কোন লোক কাগজের খোঁজ করিতেও আইসে নাই। ব্যাপারটা কাশী সংক্রান্ত বুঝিয়া, তিনি স্বতঃ পরতঃ এ সম্বন্ধে কাশীতে অনেক সন্ধান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে কাগজের লক্ষিত কোন ব্যক্তিরই সন্ধান হয় নাই। অবশেষে তিনি হতাশ হইয়াছেন এবং তাহাতে কিছুই হইবে না বুঝিয়া, কাগজগুলির যত্ন ত্যাগ করিয়াছেন। তথাপি কাগজগুলি যে এখনও তাঁহার একটি ভাঙ্গা বাক্সতে পড়িয়া আছে, ইহা তাঁহার অবিদিত নাই। এতদিন পরে সেই কাগজের সন্ধানে লোক আসিয়াছে। অবশ্য বেশ দশটাকা পাওয়া যাইবে। তাঁহার শরীর দিয়া যেন বিদ্যুৎ-স্রোত চলিয়া গেল। তিনি বলিলেন,—"থাকিতে পারে। মাসীমার অনেক কাগজ পত্র আমার নিকট ছিল, অনেক নষ্ট হইয়া গিয়াছে।"

হরকুমার বলিলেন,—"আমার যে কাগজে দরকার তাহা আপনার নিকট আছে। সেগুলি আমাকে দিলে আপনাকে ৫০৲ টাকা পুরস্কার দিব।"

রামচন্দ্র মনে ভাবিলেন,—প্রথমেই নিজমুখে যখন পঞ্চাশ টাকা স্বীকার করিল, তখন অবশ্য অনেক বেশী তাক আছে। বলিলেন—আছে কি না তাহাই সন্দেহ। যদি থাকে তাহা হইলে অনেক খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। এতদিন যত্ন করিয়া রাখিয়াছি কিছু লাভেরই জন্য। পাঁচশত টাকা দেওয়ার যদি মত হয়, তাহা হইলে কাগজ পাওয়া যায় কি না একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।"

হরকুমার বলিলেন—কাগজের যাহা কাজ তাহা আমি অন্য প্রকারে সারিয়া লইয়াছি। সে সম্বন্ধে যে কিছু সংবাদ সকলই আমি সন্ধান করিয়াছি। সুতরাং কাগজ না পাইলেও আমার কাজের ক্ষতি হইবে না। তথাপি যদি তাহাতে আরও কোন নূতন সংবাদ পাই, এই আশায় কাগজগুলা একবার দেখিতে চাহি মাত্র। হয় ত যে পঞ্চাশ টাকা দিব, তাহা কেবল নষ্ট করাই হইবে। জলে ফেলা মনে করিয়াই, পঞ্চাশ টাকা দিতে চাহিতেছি।"

রামচন্দ্র বলিলেন, কাগজ যে দরকারী তাহার ভুল নাই। পাঁচশত টাকা না পাইলে আমি তাহার সন্ধান করিব না।"

হরকুমার বলিলেন—পঞ্চাশ টাকার বেশী এক পয়সাও আমি দিব না। আপনি তাহা রাখিয়া দিউন। তবে চণ্ডী বাবু, তুমি এখানে থাকিবে কি? আমি যাই, রাত্রের ট্রেণে আমি কাশী যাত্রা করিব। বৈকালে একবার দেখা হইবে কি?

চণ্ডী বলিল—সে কি দাদা? আমি তোমার সঙ্গে কাশী যাইব; আমাকে এরূপ ভাবে ফেলিয়া যাইও না। তবে এ বেলাটা আমার এখানে থাকাই ইচ্ছা। বহুদিন পরে দাদার বাসায় এসেছি। একবার ছেলেপিলেদের দেখে, বউ ঠাক্রুণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যেতে ইচ্ছা করি। আপনি যান—আমি এখনই আপনার কাছে হাজির হব।"

রামচন্দ্র বলিলেন,—"তবে কাগজগুলিতে মহাশয়ের বিশেষ দরকার নাই? সেগুলা আর পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ, যদিই পাওয়া যায়, তাহা হইলে আর সে ভূতের বোঝা বহিয়া লাভ কি? সেগুলাকে উনান ধরাইবার কাজে লাগাইব।"

হরকুমার বলিলেন—"স্বচ্ছন্দে।"

তিনি প্রস্থান করিলেন। রামচন্দ্র মনে মনে স্থির করিলেন, যখন দরকার পড়িয়াছে

তখন অবশ্যই আমার নিকট আসিতে হইবে। মেয়ের বিবাহের টাকাটা সংগ্রহ করিবার উপায় এতদিনে ভগবান্ উপস্থিত করিয়া দিয়াছেন।

চণ্ডী বলিল—দাদা ঠকিয়া গেলেন। পঞ্চাশটা টাকা হাতছাড়া হইয়া গেল। বাবুটির সঙ্গে সদ্‌ভাব থাকিলে অনেক কাজ হইত দাদা। তা হউক, আমি কেন ঐ বাবুর সঙ্গে যাই না।"

রামচন্দ্র বলিলেন—"তাও কি হয়? তুমি এ বেলা এখানে খাওয়া দাওয়া কর, তার পর যাওয়ার কথা হইবে।"

রামচন্দ্র স্থির করিলেন, চণ্ডীর নিকট হইতে সকল বৃত্তান্ত জানিতে পারিলে বুঝা যাইবে কাগজের দাম কিরূপ আদায় হওয়া সম্ভব। বিশেষ লোকটার সহিত চণ্ডীর যথেষ্ট আলাপ। লোকটা হাতছড়া হইলেও চণ্ডীকে হাতছাড়া করা হইবে না। সমস্ত বুঝিয়া বৈকালে যাহা হয় করা যাইবে। এ বেলা চণ্ডীকে আট্‌কাইয়া রাখিতেই হইবে। এইরূপ স্বার্থসিদ্ধির বাসনায় রামচন্দ্র চণ্ডীকে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। নচেৎ অন্ন দিয়া আত্মীয়তা প্রকাশ করিবার লোক রাম মোক্তার নহেন।

চণ্ডী তামাক সাজিল এবং দাদাকে খাইতে দিল। দাদা, তামাক খাইতে খাইতে, হরকুমার বাবুর সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসিলেন। চণ্ডীও সত্য মিথ্যা মিশাইয়া, তাহার অনেক উত্তর দিল। সমস্ত শুনিয়া রামচন্দ্র মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। বুঝিলেন, লোকটাকে একেবারে হাত ছাড়া করা ভাল হয় নাই। ইহাও তিনি বুঝিলেন, চণ্ডী মনে করিলে এখনও, পাঁচশত না হউক, আড়াই শত টাকা আদায় করিয়া দিতে পারে। অতএব এখন চণ্ডীকে বড়ই যত্ন করা এবং যাহাতে সে তাঁহার পক্ষে চেষ্টা করে, তাহার উপায় করা আবশ্যক।

এদিকে ক্রমে রামচন্দ্রের স্নানের সময় উপস্থিত হইল। রামচন্দ্র বলিলেন,—"এস ভায়া, বাড়ীর মধ্যে যাই।"

চণ্ডী বলিল,—"যে আজ্ঞে।"

উভয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

কার্য্যোদ্ধার।

রামচন্দ্র নিতান্ত উদ্বিগ্ন। কাজটা ভাল হইল কি? এতকাল কেহ কখন কাগজের খোঁজ করে নাই, এখন যদি বা দৈবাৎ একজন খোঁজ করিতে আসিয়াছিল, তাহাকে এরূপে বিদায় করিয়া দেওয়া ভাল হয় নাই। বাবুটি এখনও ষ্টেশনে আছেন; রাত্রি পর্য্যন্ত থাকিবেন। ষ্টেশনে গিয়া দেখা করিব কি? কোন কার্য্যের ওজরে, কাছারির ফেরতা, ষ্টেশনের দিকে যাইব কি? এত ভারী হওয়া ভাল হয় নাই। লোকটার সহিত ভাল করিয়া আলাপ পরিচয় না করাও উচিত কাজ হয় নাই। একটু আদর অপেক্ষা না করা ভদ্রতা সম্মত হয় নাই। এক কাগজের জন্ত এতটা অহঙ্কার প্রকাশ করায় সকলই মাটী হইল। আর সে আসিবে বোধ হয় না; কাগজে আর দরকার পড়িবে এমন বোধ হয় না। কিবা সে কাগজে আছে? আমি একটা পাকা মোক্তার-আইনের ঘুণ। দশবার সে কাগজ পত্র দেখিয়াছি। তাহাতে ছাই ভস্ম কিছুই নাই—পড়িয়া কিছুই বুঝা যায় না। মাসীমা স্ত্রীলোক।

তাঁহাকে কে বলিয়া থাকিবে 'ক জগুলা বড় দরকারী।' তাই তিনি যত্ন করিয়া সে ভূতের বোঝা বহিয়া ছিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া আমিও বুঝিয়াছিলাম, হইবেও বা দরকারী কাগজ; হয় ত কিছু লাভও হইবে। এতকাল কেহ তাহার সন্ধান করিল না; আমিও বৃথা বোঝা বহিয়া মরিলাম। যদি অন্য একজন সন্ধানে আসিল, আমি তাহাকে অনাদর করিয়া হাতের লক্ষ্মী পা দিয়া ঠেলিলাম।

লোভী ক্ষুদ্রচেতা রামচন্দ্র মনে মনে বড়ই অনুতপ্ত হইলেন এবং আপনার বিদ্যা-বুদ্ধিকে শত সহস্র ধিক্কার দিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে জানিতেন, তাঁহার মত বুদ্ধিমান মনুষ্য আর জন্মে নাই। বুদ্ধির অপ্রতুলতা হেতু কখনই তাঁহার ক্ষোভ হয় নাই। আজি হইল। অদ্যকার ব্যাপারে তিনি আপনাকে মূর্খের অগ্রগণ্য বলিয়া স্থির করিলেন।

এক্ষণে ভরসা চণ্ডী। চণ্ডীর সহিত বাবুটির আলাপ পরিচয় আছে। উভয়ে একসঙ্গে আসিয়াছে, একসঙ্গে কাশী যাইবে। চণ্ডী যদি কোন উপায় করিয়া এ বিষয়ের কিনারা করিতে পারে। যে চণ্ডীকে গুলিখোর বলিয়া তিনি চিরদিন হতাদর করিয়াছেন, যে চণ্ডীকে একবেলা খাইতে দিতে, কখন দুই আনা পয়সা দিয়া সাহায্য করিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না, সেই চণ্ডীকে আজি তাঁহার ভরসা স্থল, পরম সহায় ও নিতান্ত আত্মীয় বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

রামচন্দ্র আবার চণ্ডীকে জিজ্ঞাসিলেন,—"হাঁ ভায়া, বন্ধুটি তোমায় ফেলিয়া চলিয়া যাইবেন না তো।"

চণ্ডী বলিল,—"সম্ভব তো নয়। তবে তাঁহার কাজ হইল না, এজন্য যদি না থাকেন।"

রামচন্দ্র বলিলেন,—"তা তাঁহাকে একবার ডাকিয়া আন না কেন? আমি পাঁচশত বলিয়াছি বলিয়াই যে তাহাই লইব এমন তো কথা নয়। দেখ, আহারাদির পর তুমি ষ্টেশনে যাও। আমিও কাছারির পর ঐদিকে যাইব। আমিও যেন তোমাদের দেখিয়াও দেখিব না। তুমি আমাকে দেখিয়া 'দাদা, দাদা' বলিয়া ডাকিবে। তার পর আমি জিজ্ঞাসিব, কিহে তোমাদের এখনও যাওয়া হয় নাই?' তুমি পাঁচটা বাজে কথার পর ক্রমে কাগজের কথা তুলিয়া একটা মাঝামাঝি রকম রফা করিয়া দিতে পারিবে না?"

চণ্ডী বলিল—"বেশ পরামর্শ। এই জন্যই দাদা তোমার এত পসার। এ মতলবে নিশ্চয়ই কাজ হইবে। সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙ্গবে না।"

ভায়ার এই আশ্বাস বাক্যে দাদা বড়ই পরিতুষ্ট হইলেন। বাটীর মধ্যে উপস্থিত হইয়া, রামচন্দ্র গৃহিণীকে ডাকিয়া, বলিলেন, —বলি দেখিয়াছ, কে আসিয়াছে?"

গৃহিণী তখন মাথায় ঝুটি বাঁধিয়া রান্নাঘরে হাতা হস্তে মহা সমরে নিযুক্ত ছিলেন। সেই অবস্থায় এদিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলে, চণ্ডীর ভব্যযুক্ত বেশ তাহার চক্ষে পড়িল। তিনি কে একটা লোক মনে করিয়া, মাথায় কাপড় উঠাইয়া দিলেন।

তখন চণ্ডী বলিল,—"বউ ঠাকরুণ, চিন্‌তে পারিলে না? আমি যে চণ্ডী।"

বউ ঠাকরুণ বড়ই বিরক্ত হইলেন। এ পাপ কেন আসিল? একবেলা কাহাকেও অন্ন দেওয়া তাঁহার নিয়মের বহির্ভূত। এখন এ হতভাগা যদি একবেলা খাইয়াই না যায়। বলিলেন,—"উনি আবার এখানে কেন? আমরা তফাতে থাকি, কারও ভালোতেও নাই; মন্দতেও নাই। এখানে আবার আসা কেন?"

তখন হরকুমারের উপদিষ্ট চণ্ডী, টেক হইতে দুইটি চকচকে টাকা বাহির করিল এবং রান্নাঘরের নিকটস্থ হইয়া বউ ঠাকরুণের চরণোদ্দেশে, দণ্ডবৎ করিয়া টাকা দুইটা ফেলিয়া দিয়া, প্রণাম করিল।

গৃহিণী অবাক্। তাঁহার সেই ঠাকুরপো, যাহার অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, আশ্রয় নাই, সে টাকা দিয়া প্রণাম করিল। তাহার পায়ে জুতা, গায়ে ভাল জামা, কাপড় চাদর সবই ভাল। মনে করিলেন, চণ্ডী নিশ্চয়ই কোথায় পড়ো টাকা পাইয়াছে। তাড়াতাড়ি হাতা ছাড়িয়া তরকারি পুড়িতে দিয়া, তিনি টাকা দুইটি তুলিয়া লইয়া, অঞ্চলে বাঁধিলেন। চণ্ডী কিন্তু ইহাতেই ক্ষান্ত হইল না। জিজ্ঞাসিল,—"ছেলে মেয়েরা কোথায়? তাহাদের এই তিন টাকা সন্দেশ খাইতে দিও বউ ঠাকরুণ।"

আবার তিন টাকা! আবার গৃহিণীর অঞ্চলাশ্রয়ে তাহাদেরও স্থান হইল। তখন গৃহিণী বলিলেন,—"তা ঠাকুরপো যে আমাদের কথা মনে পড়েছে, এও একটা ভাগ্য। আপনার লোক দেখেও বাঁচলেম।"

কর্ত্তাও অবাক্ হইয়া চণ্ডীর কারখানা দেখিতে ছিলেন। তিনি এক্ষণে বলিলেন,—"চণ্ডী চিরদিনই ভাল। আমার চিরদিনই ইচ্ছা ভায়ার উপর সংসারের ভার দিয়া আমি নিশ্চিন্ত হই।"

গৃহিণী বলিলেন,—"কতদিন পরে ঠাকুরপোর দেখা পাওয়া গেল। আমাদের তো রান্নাবাড়ার আজি কিছুই জুত নাই। একটু ভাল মাছ টাছ আনতে দেও।"

চণ্ডী বলিল—"না বউ ঠাকরুণ, আমার জন্য কিছুই দরকার নাই। আমি কাশী যাইতেছি, তোমাদের সঙ্গে দেখা করিয়া যাইবার জন্যই নামিয়াছি। দাদা [illegible] লেন না বলিয়া এ বেলা থাকিতে হইল। যা হয়েছে তাই দুটা দেও, আমি খেয়ে এখনই চলিয়া যাইব।"

গৃহিণী চক্ষু বিস্তৃত করিয়া বলিলেন,—"ওমা তাও কি হয়? এলে যদি এতদিন পরে, পাঁচ দিন থাক, ছেলে পিলে নিয়ে আমোদ আহ্লাদ কর, তার পর যা হয় করিও। আজি তো কোন মতেই যাওয়া হবে না।"

মেয়ে ও ছেলে দুইটি কোথায় ছিল; এই সময়ে ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—"মা ভাত হয়েছে?"

জননী সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন,—"তোমাদের কাকা এসেছেন, দেখেছ? যাও আগে কাকাকে প্রণাম করিয়া এস।"

কাকা কাহাকে বলে তাহা তাহারা জানে না, কাকার নামও কখন শুনে নাই; সুতরাং সবিস্ময়ে চণ্ডীর দিকে চাহিয়া রহিল। চণ্ডী তাহাদিগকে আদর করিলেন, ছোটটীকে কোলে লইলেন। বড়টির হাত ধরিলেন, মেয়েটীর কিরূপ শাশুড়ী হইবে তাহা বুঝাইয়া দিলেন। তাহার পর দাদার নিকট চলিয়া আসিলেন।

দাদার তখন স্নান হইয়া গিয়াছে। তিনি আঙ্গুলে পইতা জড়াইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। চণ্ডী নিকটস্থ হইলে তিনি বলিলেন,—"ভায়া ষ্টেশনের পরামর্শটা মনে থাকে যেন। যদি পারা যায় তাহা হইলে বাবুটিকে আজি আটকাইয়া রাখিতে হইবে। লোকটার সঙ্গে একটু ভাল ব্যবহার করিলে যদি দশ টাকা পাওয়া যায়, তাহার চেষ্টা দেখিতে হইবে।"

অবশ্য পইতা হাতে সমানই জড়ান থাকিল। চণ্ডী বলিল,—"কোন চিন্তা নাই দাদা। তোমার ঘরে যাহাতে দুপয়সা আসে তাহাতে কি আমার অনিচ্ছা।"

চণ্ডী স্নানে বড় নারাজ। যে যে সামগ্রী সে সেবা করে তাহার সহিত স্নানের আন্তরিক শত্রুতা। সুতরাং সে আর স্নান করিল না। আহারের স্থান হইলে গৃহিণী ডাকিলেন,—"ঠাকুরপো এস, তোমার দাদাকেও ডেকে নিয়ে এস।"

দুই ভাই এক স্থানে বসিয়া আহার করিলেন। জীবনে এ সৌভাগ্য উভয়ের অদৃষ্টে আর কখন ঘটে নাই। আহারের বন্দোবস্ত বড়ই মন্দ। গৃহিণী সে জন্য নানারূপ কারণ প্রদর্শন করিলেন, অনেক শিষ্টাচার প্রকাশ করিলেন এবং ঠাকুরপোর মোটেই খাওয়া হইল না বলিয়া নিতান্ত কুণ্ঠিত হইলেন। সে সকল ব্যাপারের বিস্তারিত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন।

আহারান্তে বিলক্ষণরূপ তামাক সেবা করিয়া, রামচন্দ্র, ধড়াচূড়া বাঁধিয়া, কাছারি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন,—"ভায়া! আমি কাছারির ফেরতা তাহা হইলে ষ্টেশনের দিকেই যাইব। কথা সব মনে থাকে যেন—কোন গোল না হয়। তবে তুমি কখন ষ্টেশনে যাইবে?"

চণ্ডী বলিল,—"এই একটু গা গড়াইয়া আমিও ধীরে ধীরে ষ্টেশনের দিকে যাইব। কাগজ লইতে সে এখানে আসিয়াছে। কাগজ তাহাকে লওয়াইয়া তবে ছাড়িব। সে জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই দাদা।"

দাদা নিশ্চিন্ত মনে দুর্গা দুর্গা বলিয়া কাছারি যাত্রা করিলেন। চণ্ডী কিন্তু গা গড়াইল না, এবং বিশ্রাম করিবার কোন চেষ্টাও করিল না। দাদা প্রস্থান করার কিয়ৎকাল পরে, সে বাটীর মধ্যে আসিয়া ডাকিল,—"বউ ঠাকুরুণ, খাওয়া হলো কি?"

বউ ঠাকুরুণ বলিলেন,—"হাঁ ঠাকুরপো, এই দুটা ভাত মুখে দিলাম। আর একটা পান দিব কি?"

চণ্ডী বলিল,—"ইচ্ছা তোমার আমি অতিথি, তোমাদের যাহা দয়া হইবে, তাহাই আমার যথেষ্ট।"

গৃহিণী বলিলেন,—"এমন কথা বলো না ঠাকুরপো, তুমি আবার অতিথি কিসের। তোমার বাড়ী ঘর, তোমার সংসার। তুমি কেন অতিথি হতে যাবে?"

চণ্ডী বলিল,—"আমার প্রতি তোমার যে অপার স্নেহ তা কি আমি জানি না বউ ঠাকরুণ। বল্‌ছিলেম কি এতদিন তো বিদেশে ঘুরলে, দাদাও তো এতদিন রোজগার করলেন, তা তোমার হাতে দশ টাকার সংস্থান হয়েছে তো? সময় আছে, অসময় আছে, মেয়ে মানুষের হাতে দশ টাকা থাকায় সংসারের অনেক উপকার।

বউ ঠাকরুণ বলিলেন,—সে দুঃখের কথা আর কি বলিব ঠাকুরপো। তোমার দাদা লোকটি কেমন তা কি তুমি জান না? টাকা তো দূরে থাকুক, একটা পয়সা কখন হাতে তুলে দেন না। সিকিপয়সাটি তোমার দাদার কাছ থেকে পাবার প্রত্যাশা নাই। সারাদিন মুখে রক্ত তুলে খাট, আর তাঁর বকুনি খাও এই পর্য্যন্ত।"

চণ্ডী বলিল,—"দাদার এটা বড় অবিবেচনার কাজ বলিতে হইবে। তুমি হলে ঘরের লক্ষ্মী—তাই কি যেমন তেমন, লাখের মধ্যেও এমন স্ত্রী একটা মিলে না। তোমার অদিনের বিলি না করা তাঁহার বড়ই অন্যায়। সত্যি বটে, দাদার বুদ্ধিটা যেন কেমন এক রকম। তিনি যে কি বুঝেন, তা তিনিই বলিতে পারেন।"

গৃহিণী বলিলেন,—"বুদ্ধির কথা বল কেন।

কি গুণে যে উনি মোক্তারি করেন, তা উনিই বলিতে পারেন। এক কড়ার বুদ্ধি ঘটে নাই, একটা কাজের হিসাব নাই। কেবল মুখ সর্ব্বস্ব।”

চণ্ডী বলিল,—“ঠিক বলেছ বউ। আজিই যে আমি তার পরিচয় পেলেম। তোমাদের কাছে রামনগরের মাসী মা কি কতকগুলা কাগজ রাখিতে দিয়াছিলেন। সেই কাগজ গুলাতে এতদিন পরে একটি বাবুর দরকার পড়িয়াছে; তাই তিনি সন্ধান করে দাদার কাছে তাই লইতে আসিয়াছিলেন। দাদাকে কুড়ি টাকা পর্য্যন্ত সে লোকটি দিতে চাহিলেন; তবু দাদা তাহা দিতে চাহিলেন না। লোকটা চলিয়া গেল। দেখ দেখি বুদ্ধিখানা। পচা ছেড়া কাগজ, ঘরে পড়ে নষ্ট হইতেছে। তাই দিয়ে কুড়ি কুড়িটা টাকা পাওয়া, সোজা কথা কি? সে চলিয়া গেল, এখন দাদা ভাবিয়া আকুল। এখন আমাকে অনুরোধ, তুমি কোন রকমে লোকটাকে ফিরাইয়া আনিয়া যাহাতে টাকা দিয়া কাগজ লয়, তাহার উপায় করিয়া দাও।”

গৃহিনী গালে হাত দিয়া বলিলেন,—“ও মা এমন হতভাগা মিন্‌সে—এমন হতশ্রী বুদ্ধি! ছিঃ! ছিঃ! সে কাগজগুলা একটা ভাঙ্গা টিনের বাক্‌সতে দপ্তর বাঁধা কতকাল ধরে পড়িয়া আছে। আমি তাহা অনেক দিন দেখিয়াছি। দাঁড়াও ঠাকুরপো, একটা, মতলব করলে হয় না? আমি তোমাকে সে কাগজগুলা এখনই দিতে পারি। তুমি সে লোকটার কাছে থেকে আমাকে কুড়ি টাকা আনিয়া দিতে পার না?”

চণ্ডী বলিল,—“তা পারিব না কেন? সে লোকটা তো কুড়ি টাকা দিতে সম্মতই আছে। ভয় হয়, দাদা যদি রাগ করেন।”

“কিসের রাগ? তিনি তো জানতে পারবেন না।”

“যদি জানতে পারেন? কাছারি থেকে এসেই যদি তিনি কাগজের খোঁজ করেন, তা হলে কি হবে?”

“হবে আবার কি? জানতে পারেন পারবেন। কেন আমি কি সংসারের কেহ নহি? কোনও উপায়ে আমার কি দুপয়সা পেতে নাই? তোমাকে এ কাজ করিতেই হইবে। আমাকে এ কুড়ি টাকা যেমন করিয়া পার আনিয়া দিতে হইবে।”

চণ্ডী বলিল,—“তার আর তো আশ্চর্য্য নাই। লোকটা কুড়ি টাকা দিতে তো রাজি আছে? যেখানে থাকিবে তাও আমি জানি। রাত্রের গাড়িতে সে চলিয়া যাইবে। এ অবস্থায় টাকা আনিয়া দিব তাহার আর বিচিত্র কি? আর আনিয়াই বা দিতে হইবে কেন? আমার নিকটই কুড়ি টাকা আছে। তাহাই আমি তোমাকে আপাততঃ দিয়া, পরে সে লোকটির কাছ থেকে আদায় করিয়া লইতে পারিব।”

গৃহিনী বলিলেন,—“ঠাকুরপো, এতদিনে বুঝিলাম তুমি আমাদের যথার্থ আত্মীয় লোক। তবে এস তুমি, আমি তোমাকে এখনই কাগজ বাহির করিয়া দিব।”

চণ্ডী বলিল,—“বউ ঠাকরুণ, তোমার জন্য আমি সকলই করিতে পারি। তুমি দু টাকা পাইবে, ইহাতে আমি উদ্যোগী হইব, এ কথা আর আশ্চর্য্য কি? তবে দাদা পাছে রাগ করেন, কিছু বলেন, সে জন্য আমার বড় ভয় হইতেছে।”

বউ ঠাকরুণ বলিলেন,—“তুমি বড় ছেলে মানুষ। বলেন তিনি কিছু আমাকেই বলবেন, রাগ করতে হয়, আমার উপরই রাগ করবেন। তুমি তো আর চুরি করিয়া কাগজ লইতেছ

না। আমি তোমার হাতে তুলিয়া দিতেছি। ইহাতে তোমার দোষ কি? তিনি একগুণ রাগ করেন, আমি দশগুণ শুনিয়ে দেব। সে জন্য তোমার কোন ভাবনা নাই।”

চণ্ডী বলিল,—“তবে চল।”

বউ ঠাকরুণ কক্ষান্তরে প্রবেশ করিয়া একটা ভাঙ্গা টিনের বাক্‌স খুলিয়া, একটি ছোট নেকড়া বাঁধা কাগজের দপ্তর বাহির করিলেন এবং নেকড়ার আবরণ খুলিয়া সেই কাগজের দপ্তর চণ্ডীর হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন,—“পড়িয়া দেখ, সেই কাগজ কি না।”

চণ্ডী কষ্টে স্পষ্টে পাঠ করিল,—“কাশী ধামের এক বিধবার পুত্র সংক্রান্ত কাগজ। শ্রীমতী গঙ্গামণি দেব্যা মাসীমাতা ঠাকুরণীর প্রদত্ত।”

সে যেন হাতে স্বর্গ পাইল! তাহার হরকুমার দাদা যে কাগজের জন্য পাগল, এত দিনের, এত চেষ্টার পর তাহা তাহার হস্তগত হইল। সে আপনাকে বড়ই ভাগ্যবান্ বলিয়া জ্ঞান করিল। আনন্দে তাহার দেহ কাঁপিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি পকেট হইতে দুইখানি ১০ টাকার নোট বাহির করিয়া, তাহার বউ ঠাকুরুণের হাতে দিয়া বলিল,—“এই লও, আমি তবে এখন আসি। কি জানি দাদা যদি এসে পড়েন।”

বউ ঠাকুরাণী বলিলেন,—“তিনি এখন আসিবেন না। তা আচ্ছা তুমি এস তবে।”

চণ্ডী অতি ব্যস্ততা সহ প্রস্থান করিল এবং গমনকালে কেবল ভাবিতে লাগিল, ঠাকুরের কৃপায় কাগজগুলি ঠিক হইলে হয়।

বধূঠাকুরাণী, এক সঙ্গে ২০৲ টাকা পাইয়া মহোল্লাসে আপনার এক কৌটার মধ্যে তাহা রাখিয়া দিলেন এবং সাবধানতার অনুরোধে, সে কৌটা একটা ছেঁড়া বালিশের মধ্যে পুরিয়া তাহার মুখ সেলাই করিয়া ফেলিলেন।

একটু তাড়াতাড়ি কাছারির কাজ শেষ করিয়া রামচন্দ্র ব্যগ্রভাবে ষ্টেশনের দিকে ধাবিত হইলেন। কিন্তু ষ্টেশনে চণ্ডী বা বাবুটি কেহই নাই। বাহিরে আসিলেন, সেখানেও কেহ নাই। চারিদিকে অনুসন্ধান করিলেন, কোথাও তাহারা নাই। তখন তিনি কপালে করাঘাত করিয়া আপনার অদৃষ্টকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। তথাপি তিনি অনুসন্ধান ত্যাগ করিলেন না। প্রতি দোকানে সন্ধান করিতে লাগিলেন। অবশেষে একজন দোকান-দার বলিল,—“একটি বড় গোছের বাবু আমার দোকানে বসিয়া জল খাইয়াছিলেন; অনেক-ক্ষণ বসিয়াছিলেন। তাহার পর আর একটি লোক আসিয়া জুটিলে, তাঁহারা দুইজনে মিলিয়া ষ্টেশনে গিয়াছেন। আর ফিরিয়া আইসেন নাই। বোধ হয় চলিয়া গিয়াছেন।”

দশম খণ্ড—স্বর্গ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অসাবধানতা।

অদ্য জন্মাষ্টমী। যে পুণ্যস্বরূপ নারায়ণ এই পাপতাপপূর্ণ বসুন্ধরায় অবতীর্ণ হইয়া পূর্ণ ভাবে লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন; যাঁহার অনুমান সমূহ অদ্ভুত, নির্দ্দোষ ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর; যিনি মানবকুলকে প্রকৃষ্ট ধর্ম্মমার্গ দেখাইয়া দিবার নিমিত্ত, স্বয়ং মানবের ন্যায় ব্যবহারের অধীন হইয়া জগতে সৎপথের জলন্ত দৃষ্টান্ত সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন; যাঁহার লীলা চির নূতন, অনন্ত রসময়, অজস্র প্রেম-

পূর্ণ; যিনি জগতে পাপী ভিন্ন আর কাহাকেও অবজ্ঞা করিতে জানিতেন না; স্ত্রী ও পুত্র সকলকেই যিনি তুল্যরূপে মুক্তিরূপ পরম পথ দেখাইয়া দিয়াছেন; যিনি অনেকের হিত মাত্র লক্ষ্য করিয়া সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন; যাঁহার স্বার্থজ্ঞান কেবল পরার্থেই পর্য্যবসিত হইয়াছে; ক্ষুদ্র নৈতিক মানদণ্ড বা মানবের সামান্য জ্ঞানরূপ তুলা-যন্ত্র যাঁহার মহামহিমময় কীর্ত্তিশৈলের সমীপস্থ হইবার সম্ভাবনাও নাই; যিনি নিন্দা বা সুখ্যাতি, তিরস্কার বা পুরস্কার উভয়েই অবিচলিত থাকিয়া নিরন্তর স্বকীয় শুভেচ্ছা পূর্ণ সৎকর্ম্ম সমূহ সম্পন্ন করিয়াছেন; যাঁহাকে প্রণিধান করিতে পারিলে অথবা যাঁহার মাহাত্ম্য ভূধরের এক দেশ মাত্র দর্শন করিতে পাইলেও, মানব চিরধন্য ও কৃতকৃতার্থ হয়; সেই ব্রজ-কিশোর, শ্যামনটবর, রাধিকা-হৃদয়-রঞ্জন নারায়ণ দ্বাপরের অবসানে, কলির প্রারম্ভে এই পুণ্য তিথিতে কংস-কারাগারে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেই পবিত্র তিথি, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে মহোৎসবের দিন। বালক ও বৃদ্ধ, নর ও নারী, শাক্ত ও বৈষ্ণব সকলেই আজি উৎসবে মত্ত। নৃত্য ও গীত, বাদ্য ও উৎসব, হরিদ্রাম্রক্ষণ ও দধিলেপন, ভূ-লুণ্ঠন ও কর্দ্দম মর্দ্দন, ভোজন ও উপবাস, ব্রত-কথা শ্রবণ ও ভগবদ্ পূজা, ইত্যাদি বহু ব্যাপারে অদ্য ভারতভূমি উৎসবময়। ধন্য আমরা, যে নন্দ-নন্দন, বংশিবদন, মধুসূদনের নাম উচ্চারণ করিতে সক্ষম হইয়াছি, যে দেশে তাঁহার পবিত্র লীলা প্রকটিত হইয়াছে, সেই দেশে আমরা মানবাকারে জন্মলাভ করিয়াছি, যে দেশের ধূলি কর্দ্দমে তাঁহার ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ চিহ্নিত পাদপদ্ম সংলিপ্ত হইয়াছিল, সেই দেশের পবিত্ররজঃ আমাদের দেহে সম্পৃক্ত জয় জগন্নাথ জনার্দ্দন। জয় জয় সচ্চিদানন্দ পুরুষোত্তম।

অদ্য নীলরতন বাবুর বাটীতে পূজা, রাত্রি-জাগরণ, কাহারও ভোজন, কাহারও উপবাস, ভিক্ষা দান, বস্ত্রদান ইত্যাদি ব্যাপার হইবে। সন্ধ্যার পর হইতে উমাশঙ্করও সকলের সহিত মিলিত হইয়া উৎসবাদির সহায়তা ও হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনাদি করিবেন কথা আছে। তিনি অনেক কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং পূর্ণভাবে এই পবিত্র ব্রত পালনের নিমিত্ত ও নীলরতন বাবুর অনুষ্ঠান সমূহের সহায়তা করিবার নিমিত্ত, ঘনানন্দ স্বামীর অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অতি প্রত্যূষে নীলরতন বাবু, তাঁহার পত্নী ও ভগ্নী গঙ্গাস্নানে গিয়াছেন। অন্নপূর্ণা একাকিনী বাটীতে আছেন। তিনি একটি ঘরে বসিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তির একখানি পট সন্নিধানে গললগ্নীকৃতবাসে, সজল নয়নে, কৃতাঞ্জলিপুটে বসিয়া আছেন।

এতদুপলক্ষে কয়েক জন পরমহংস ভোজন করাইতে নীলরতন বাবুর বাসনা ছিল এবং তিনি তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত উমাশঙ্করকে ভার দিয়াছিলেন। আট জন দণ্ডী, অদ্য মধ্যাহ্নে নীলরতনের আলয়ে, ভিক্ষা গ্রহণে সম্মত হইয়াছেন। এই সংবাদ এখনই গৃহস্থকে জানান আবশ্যক মনে করিয়া উমাশঙ্কর প্রত্যূষেই নীলরতন বাবুর আলয়ে আগমন করিলেন। তাঁহার প্রবেশাধিকার অবাধ; সুতরাং দাস-দাসী ভক্তি সহকারে প্রণাম করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল; কেহই কিছু বলিল না। "মা কোথায় গো?" "পিসী মা কৈ" বলিয়া উমাশঙ্কর ডাকিলেন। কোথায় কেহ নাই; কেহ উত্তর দিল না। অন্নপূর্ণা হয় ত কোন কথা শুনিতে পাইলেন না।

উমাশঙ্কর, ধীরে ধীরে প্রকোষ্ঠ হইতে প্রকোষ্ঠান্তরে গমন করিতে করিতে, ক্রমশঃ যেখানে অন্নপূর্ণা একাগ্রচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের যুগল রূপ সন্দর্শন করিতেছিলেন, তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বারদেশ হইতে, সেই কিশোরী কামিনীর ভক্তি-সম্পৃক্ত অলৌকিক শোভা সংযুক্ত রূপরাশি সন্দর্শনে তাঁহার মনে হইল, যেন শিবমনোমোহিনী শঙ্করী তপস্তায় নিয়োজিতা রহিয়াছেন। তিনি নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে অপেক্ষাকৃত নিকটস্থ হইয়া আশ্চর্য্য জ্ঞানে সেই ভক্তিময়ী দেবীকে দর্শন করিতে লাগিলেন। যোগনিমগ্না অন্নপূর্ণার ভাব যতই তিনি আলোচনা করিতে থাকিলেন, ততই তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, অপরিসীম পুণ্যফলে অদ্য তাঁহার সাক্ষাৎ দেবী দর্শন সঙ্ঘটিত হইল; প্রেম ও ভক্তিতে তাঁহার কলেবর কণ্টকিত হইল, এবং নয়নে আনন্দাশ্রুর আবির্ভাব হইল। তিনি নির্ব্বাক্ ও নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সহসা অন্নপূর্ণার দৃষ্টি বিচলিত হইল এবং পটাভিমুখ হইতে অপসৃত হইয়া, অন্যাভিমুখী হইতে না হইতেই, উমাশঙ্করের দেব-কান্তি তাঁহার লোচন-পথবর্ত্তী হইল। তখন তিনি চমকিত ও বিস্রস্তভাবে ভূতলে মস্তক সংলগ্ন করিয়া, সেই দেবতার চরণোদ্দেশে প্রণাম করিলেন; এবং নিতান্ত অসাবধানভাবে বলিয়া ফেলিলেন,—"আমার দেবতা এমনই সদয় বটেন। ধন্য আমার সাধনা যে, সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধি! যে দেবতার চরণ-চিন্তা করিতে করিতে সহসা সাক্ষাৎ লাভ ঘটিল, তাঁহার দয়ায় যেন কখনও বঞ্চিত না হই।"

কথা বলিয়া ফেলিলেন, হাতের ঢিল ছোড়া হইল! কিন্তু বড়ই বেশী কথা বলা হইয়াছে; এত কথা অন্য সময়ে বালিকা বলিয়া উঠিতে পারিতেন না ত। ভক্তি ও প্রেমে হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল, আকাঙ্ক্ষা ও আশায় অন্তঃকরণ উদ্বেলিত হইয়াছিল। সেই অবস্থায় প্রার্থিত দেবতার সহসা সন্দর্শন লাভ ঘটিল; প্রাণ যাহাকে চাহে, পটে বা দেবমূর্ত্তিতে সর্ব্বত্র যাঁহাকে দেখে, তাঁহাকে সম্মুখে পাইয়া মুখ হইতে অজ্ঞাতসারে অনেক কথা বাহির হইয়া পড়িল। হৃদয় তখন লৌকিক শাসনের অধীন ছিল না, বাক্য সংযমের ক্ষমতা তখন ছিল না, অগ্রপশ্চাৎ ভাবনার তখন সময় ছিল না, সঙ্কোচ ও সঙ্কীর্ণতা তখন ছিল না; তাই এত কথা তখন বলিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তার পর? তাহার পর দারুণ লজ্জা আসিয়া হৃদয় ও মন অধিকার করিল, বদনমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, শরীর ঈষৎ কম্পিত হইতে থাকিল, লজ্জায় ভূগর্ভে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা হইতে লাগিল, স্থূল ঘর্ম্মবিন্দু সকল ললাটে মুক্তাফলের ন্যায় আবিভূত হইল। সুন্দরী মৃতকল্প হইয়া অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

আর উমাশঙ্কর! তিনি ভাবিতেছেন, এ কি কথা শুনিলাম? সত্যই কি এই রাজ-তনয়া সুন্দরী-শিরোমণি নবীনার চিন্তার বিষয় আমি? সত্যই কি আমি তাঁহার দেবতা? না—না, এ অধম তাঁহার দাস হইবারও অনুপযুক্ত। আপনাকে আপনি শত ধিক্কার দিয়া, তিনি স্বকীয় স্পর্দ্ধিত হৃদয়কে নিন্দা করিতে লাগিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, 'সন্ন্যাসী-পালিত, আশ্রয়-বিহীন, ভিক্ষোপজীবী, পিতৃ-মাতৃহীন সন্ন্যাসীর এ চিন্তা নিতান্ত লজ্জাজনক ও অসঙ্গত। নিশ্চয়ই আমার ভুল হইয়াছে। সুন্দরী অভীষ্ট দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া যে কথা বলিয়াছেন, আমি তাহা আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে মনে করিতেছি কেন? ধিক্ আমাকে!'

উমাশঙ্কর, তুমি মহাপুরুষের শিষ্য ও সাধুগণের সংসর্গ-পালিত, সুতরাং তোমার জ্ঞান-গৌরব অপরিসীম হইলেও, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তুমি বড়ই ভ্রমে নিপতিত হইয়াছ। তোমার ন্যায় নির্ম্মল স্বভাব শাস্ত্রার্থবিৎ সংযত-চিত্ত জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষের এইরূপ ভ্রান্তি দেখিয়া আমরা হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেছি না। তুমি স্বয়ং ঐ নবীনার প্রেম-নীরে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়াছ; এবং ঐ সুন্দরীও তোমার প্রেম শৈলের অত্যুচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছেন। এই পরিদৃশ্যমান সত্য তুমি দেখিয়াও দেখিতেছ না, বুঝিয়াও বুঝিতেছ না, ইহা বস্তুতই নিয়তিশয় কৌতুকাবহ। তুমি যতই এই প্রেম-লতার বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিতে প্রয়াস করিতেছ, ততই তাহা তোমাকে অধিকতর বেড়িয়া ধরিতেছে। যতই তুমি ইহা অস্বীকার করিতেছ, ততই ইহা অধিকতর স্থায়ীরূপে তোমার হৃদয়ে স্থান গ্রহণ করিতেছে। পঙ্কে নিপতিত ব্যক্তি উদ্ধার লাভের নিমিত্ত যতই বল প্রয়োগ করে, ততই তাহার পদদ্বয় অধিকতর নিমগ্ন হয়। তোমার বর্ত্তমান দশাও সেইরূপ। আমরা বুঝিতেছি, তুমি যে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছ, তাহাতে তোমাকে ডুবিতেই হইবে।

অন্নপূর্ণা এই ঘরে আছেন দেখিয়া, উমাশঙ্করের মনে হইয়াছিল যে, দণ্ডীদিগের ভোজনের কথা তাঁহাকেই বলিয়া যাইবেন; কিন্তু এখন তো আর কিছুই মনে হয় না। অথচ এরূপ নির্ব্বাক্‌ভাবে, সুন্দরীর সমক্ষে দাঁড়াইয়া থাকাও যায় না। কি বলিবেন জানেন না। ভাষায় কি শব্দ নাই? অতি কষ্টে সাহসে ভর করিয়া বলিলেন,—"আপনি স্বর্গ-কন্যা। আপনাকে নিরন্তর চিন্তা করিলে যদি স্বর্গ-লাভ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার তাহা হইবে।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"আমি এখন যাই। অনেক কাজের ভার আছে। আপনি বসুন।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"না—আমিও যাই। আবার আসিতে হইবে।"

ধীরে ধীরে অন্নপূর্ণা চলিয়া গেলেন। উমাশঙ্করের চক্ষে বিশ্ব-সংসার অন্ধকার হইয়া গেল। তিনি একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, সে স্থান হইতে প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। তখন দণ্ডী ভোজনের কথা তাঁহার মনে পড়িল। নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথা; সুতরাং অন্নপূর্ণাকে তাহা বলিয়া যাওয়া আবশ্যক বলিয়া তাঁহার মনে হইল। তখন অন্নপূর্ণা তাঁহার দৃষ্টি-সীমা অতিক্রম করিয়াছেন। উমাশঙ্কর ব্যস্ততা সহকারে বাহিরে আসিলেন; আবার অন্নপূর্ণার স্বর্গ-কান্তি তাঁহার চক্ষে পড়িল। অন্নপূর্ণা প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করিয়া অধিকদূর আইসেন নাই। প্রস্থানকালে আর একবার উমাশঙ্করকে দেখিতে পাইবার লোভ তিনি সংবরণ করিতে পারেন নাই। এই জন্য প্রকোষ্ঠের বাহিরে আসিয়া, তিনি মন্থর গতিতে চলিতেছেন।

তাঁহাকে দর্শনমাত্র উমাশঙ্কর কিয়ৎকাল নির্নিমেষ লোচনে সেই সৌন্দর্য্য-সুধা পান করিতে লাগিলেন। অন্নপূর্ণা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সুতরাং উমাশঙ্করকে লোচন বিনত করিতে হইল। বলিলেন,—"আপনাকে দেখিয়া—না—হাঁ একটা বড় দরকারী কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম; আপনি দয়া করিয়া বাবুকে বলিবেন।"

অন্নপূর্ণা অধোবদনে সম্মতিসূচক মস্তকান্দোলন করিলেন। উমাশঙ্কর দণ্ডী ভোজনের বিষয় জানাইয়া প্রস্থান করিলেন। পাছে

চক্ষুতে চক্ষুতে সম্মিলন হয়, এই ভয়ে কেহ কাহাকেও ফিরিয়া দেখিতে ভরসা করিলেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জগন্মাতা।

নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ভাবে উমাশঙ্কর ধীরে ধীরে আশ্রমে আসিলেন। গুরুদেব ঘনানন্দ তৎকালে ধ্যান-নিমগ্ন; দূর হইতে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উমাশঙ্কর ভিক্ষা-যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, ঝুলি ও মস্তক বন্ধনের নামাবলী গ্রহণ করিলেন।

সহসা তাঁহার কর্ণে বীণার ন্যায় মধুর নিক্বণে শব্দ প্রবেশ করিল,—"বাবা এ সংসারে সকলই সম্ভব; তোমার বাসনা সিদ্ধ হইবে।"

সবিস্ময়ে উমাশঙ্কর ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে সৌদামিনী-বিনির্ম্মিতা দেবী-প্রতিমা! সেই প্রতিমা যোগেশ্বরীর। অপার আনন্দে উমাশঙ্করের হৃদয়-মন পরিপূর্ণ হইল। তিনি ভক্তি সহকারে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"অনেক দিন পরে অধম সন্তানকে দেখা দিলে মা! এমন নিষ্ঠুর জননী আর কখন দেখি নাই।"

যোগেশ্বরী অগ্রসর হইয়া, সস্নেহে উমাশঙ্করের মস্তকে হস্ত প্রদান করিলেন এবং তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে বলিলেন,—"না বাবা, নিষ্ঠুর মা হইলে এমন দেব-সন্তান হয় কি?"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"সংসারে আমার আর কেহই নাই। তোমাকে পাইয়া আমি মা বলিতে পাইয়াছি। মাতৃ-ভক্তি শিখিয়াছি এবং মাতৃ-স্নেহ ভোগ করিতেছি। যখন যেখানে যেরূপে যে কষ্টই পাই না কেন, তখনই মা, তোমাকে মনে পড়ে। মনে হয় তোমার ক্রোড়ে উপস্থিত হইলেই সকল ক্লেশের শান্তি হইবে। এমন মা তুমি, তবে তোমাকে সর্ব্বদা পাই না কেন মা?"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"আজ তোমার মনে অনেক ভাবনা হইয়াছে। তাই আমি আসিয়াছি। যখন তোমার কোনরূপ দুঃখ বা চিন্তা উপস্থিত হয়, তখনই আমি আসি ত বাবা।"

উমাশঙ্কর কিয়ৎকাল সবিস্ময়ে এই দেবীর অলৌকিক শক্তির বিষয় আলোচনা করিলেন। মনে মনে বুঝিয়া দেখিলেন, বাস্তবিকই আজ তাঁহার গুরুতর চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে। বলিলেন,—"না মা, আজ আর নূতন চিন্তা কিছু হয় নাই। জানি না কোন পাপে, কিছু দিন হইতে একটা অসঙ্গত চিন্তা আমাকে অসুস্থ করিতেছে। সেই চিন্তা আজিও আমাকে ত্যাগ করে নাই।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"সেই চিন্তা, আরও একটী স্বর্গ-কন্যাকে প্রপীড়িত করিতেছে। চিন্তার অংশ গ্রহণ করিবার লোক থাকিলে, তাহার কঠোরতা নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং তোমার চিন্তা অসহনীয় নহে।"

তত্রত্য মৃগচর্ম্মে উমাশঙ্কর বসিয়া পড়িলেন বলিলেন,—"মা আপনার বাক্য কখনই মিথ্যা হ'তে পারে না। আমি অনুমান করিয়াছিলাম আর এক বালিকা আমার ন্যায় চিন্তায় ব্যথিতা হইতেছেন। এক্ষণে বুঝিলাম, আমার সে অনুমান সত্য। কিন্তু মা! আমি কঠোর হৃদয় সন্ন্যাসী; এ অসঙ্গত চিন্তার আক্রমণ হইতে হয় তো মুক্ত হইলেও হইতে পারিব। কিন্তু সেই কোমল-প্রাণা

স্বর্গ-কন্যা, এই অসঙ্গত চিন্তার প্রশ্রয় দিয়া, হয় ত ভবিষ্যতে অপরিসীম যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকিবেন। এ কল্পনাও আমাকে নিতান্ত ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। মা—মা! আমার যাহা হয় হউক। তাঁহার হৃদয় হইতে এ চিন্তা অন্তরিত করিবার কোন উপায় নাই কি?"

তখন উমাশঙ্করের পার্শ্বে আসিয়া যোগেশ্বরী দেবী সেই মৃগচর্ম্মে উপবেশন করিলেন এবং তাঁহার মস্তক আপনার বক্ষমধ্যে গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—"না বাবা! এ চিন্তা ত্যাগ করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। যে যাহা কায়মনোবাক্যে চিন্তা করে, তাহার তাহাই হয়। তোমাদের কোনই ভয় নাই। আমি এবার তোমাদের চিন্তার সফলতা না দেখিয়া, আর সুরদেশে যাইব না।"

তখন উমাশঙ্কর, ভক্তিসহকারে দেবীর পদরজঃ মস্তকে গ্রহণ করিয়া, বলিলেন,—"তবে মা, আমি এখন ভিক্ষায় যাই।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"না, আজ তোর ভিক্ষায় যাইতে হইবে না। তুই ত আজ ব্রত গ্রহণ করিয়াছিস্? আহার করিবি না। তোর পিতা ব্রত মানেন না, তাঁহার কিছু আহারের প্রয়োজন বটে, তাহা আমি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি। আর আমি, যে যে স্থান দিয়া তোর পিতা গমনাগমন করিবেন, প্রাণ ভরিয়া তত্রত্য ধূলি ভোজন করিব। তুই আমার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া শয়ন কর। আমি সন্তান কোলে করার সুখ অনুভব করি।"

তখন উমাশঙ্কর সেই দেবীর অঙ্কে মস্তক স্থাপন করিয়া শয়ন করিলেন। যোগেশ্বরী, নয়ন মুদিয়া, প্রেমাবেশ সহকারে, সন্তানের বক্ষে হস্তাবমর্ষণ করিতে লাগিলেন। অহো! কি অলৌকিক শোভা! কি অপার্থিব অভিনয়! তখন সেই পীনোন্নত-পয়োধরা দেবীর বক্ষদেশের বসনসিক্ত হইয়া গেল এবং অবিরল ধারায় ক্ষীররাশি বিগলিত হইয়া, তাহার বসন ও তত্রত্য মৃত্তিকা আর্দ্র করিতে থাকিল।

এইরূপ সময়ে ঘনানন্দ স্বামী, সেই কুটিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, এই অমানুষী লীলা দেখিতে দেখিতে বস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ভক্তি, প্রেম, স্নেহ প্রভৃতির প্রাবল্যে ঘনানন্দের দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া ভক্তি গদ্‌গদ কণ্ঠে স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন।

"আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা মহীস্বরূপেণ
যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতদা পায্যতে
কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যা॥
ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা বিশ্বস্য বীজং
পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্ত মেতত্ত্বং বৈ প্রসন্না
ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥
বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ
সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ কা তে স্তুতি
স্তব্যপরা পরোক্তিঃ॥

সর্ব্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তি প্রদায়িনী।
ত্বং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ॥
সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণাম-প্রদায়িনি।
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
শরণাগত-দীনার্ত্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

(মার্কণ্ডেয় চণ্ডী)

তাঁহার স্তব পাঠ সমাপ্ত হইলে, যোগেশ্বরী দেবী নয়নোন্মীলন করিয়া বলিলেন,—"নারায়ণ সম্মুখে! আমি এতক্ষণ তোমার হইয়া সংসার পালন করিতে ছিলাম। তা এ কি আমার কাজ? তোমার কার্য্য তুমি কর। আমি তোমার লীলা দেখিয়া ধন্য হই।"

তাহার পর উমাশঙ্করকে বলিলেন,—"যাও বাবা! এই বিশ্ব সংসার যাঁহার আশ্রিত; তুমি, আমি সকলেই পরমাণুর ন্যায় যাঁহার চরণ-তলে অধিষ্ঠিত, যাঁহার স্ত্রী ও পুত্র, জনক ও জননী সকলই সমান, সেই সনাতন পরমপুরুষ সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। তুমি তাহার কাছে যাও বাবা!"

উমাশঙ্কর উঠিয়া বসিলেন। যোগেশ্বরী তত্রত্য ধূলায় দণ্ডবৎ লুণ্ঠিত হইয়া, ঘনানন্দকে প্রণাম করিলেন। উমাশঙ্কর বলিলেন,—"বাবা! আমি এতক্ষণ বিশ্ব জননী পরমা শক্তির ক্রোড়ে স্থান পাইয়াছিলাম। ইহা কল্পনার কথা নহে, অনুমান নহে, প্রত্যুত জগৎ-প্রসবিত্রী দেবী আমাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছেন। আমি ধন্য হইয়াছি, আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা অপগত হইয়াছে, আকাঙ্ক্ষা ও বাসনা বিগত হইয়াছে। অলৌকিক শান্তিতে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়াছে।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"বৎস! তোমার কথা একটুও মিথ্যা নহে। অপরিসীম পুণ্য-ফলে আমরা পরমেশ্বরীর সাক্ষাৎ পাইয়াছি। ইনি কখন স্ত্রী, কখনও বা পুরুষ, কখন জনক, কখনও বা জননী, কখন সোদর, কখনও বা সহধর্ম্মিণী, কখন ব্রাহ্মণ, কখনও বা চণ্ডাল, কখন হস্তী, কখনও বা মশক, কখন হিমালয়, কখনও বা ক্ষুদ্র বালুকাকণা, কখন সরিৎপতি, কখনও বা ঘটবারি রূপে পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিরাজিত। আমরা সেই সনাতনী প্রকৃতিরূপা জড়াতীতা জড়ময়ী চিন্ময়ী দেবীর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি। আইস বৎস! গুরু ও শিষ্য সমস্বরে শ্রৌত মন্ত্রে সেই দেবীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া জীবন পবিত্র করি।"

তখন গুরু ও শিষ্য উভয়েই মনোহর সমস্বরে বেদমন্ত্র গীত করিতে লাগিলেন।

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্॥
পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি॥
সর্ব্বতঃ পণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং বৃহৎ॥
য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥
তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ॥
ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতো মুখঃ

(শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ)

সেই পবিত্র সঙ্গীত-ধ্বনি দুলিতে দুলিতে ব্যোম-পথে সমুত্থিত হইল, পুণ্য-সলিলা ভাগীরথীর বক্ষে ভাসিতে লাগিল, বায়ু-মণ্ডল ছাইয়া ফেলিল, এবং পবিত্রতায় বসুন্ধরা পূর্ণ করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

লম্পটরাজ।

গভীর রাত্রিতে নীলরতন বাবুর বাটীতে সংকীর্ত্তনাদির পর, উমাশঙ্কর শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের দুজ্ঞেয় তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতেছেন। সমস্ত দিন দান, ভোজন, সংকীর্ত্তন, পূজা, পাঠ ইত্যাদি ব্যাপারে ভবন পরিপূর্ণ ছিল। এক্ষণে আগন্তুকেরা সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। স্বয়ং নীলরতন, তাঁহার স্ত্রী, ভগ্নী ও কন্যা উমাশঙ্করের মধুময় বাক্য শ্রবণ করিতেছেন, ও সময়ে সময়ে এক একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া, আপনাদিগের জ্ঞাতব্য ব্যক্ত করিতেছেন।

অন্যান্য অনেক কথার পর, নীলরতন জিজ্ঞাসিলেন,—সাধারণতঃ লোকে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে লাম্পট্য প্রভৃতি কতকগুলি গুরুতর দোষের আরোপ করে। আমি মনে মনে তৎ সম্বন্ধে একরূপ মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছি। তথাপি তোমার ন্যায় পরম ভক্ত সে বিষয়ের কি মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা জানিতে বাসনা হয়। যদি এখানে তাহা বলিতে আপত্তি বা অসুবিধা বোধ না কর, তাহা হইলে তুমি তাহা ব্যক্ত করিলে সন্তুষ্ট হইব।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আমি অতি দীন ও অভাজন। আমার দ্বারা সেই পরম পুরুষের চরিত্রে কোন অংশ ব্যাখ্যাত হওয়া সম্ভবপর নহে। তথাপি আপনাদের আজ্ঞা-ক্রমে আমি যাহা বুঝি, তাহা বলিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের কুত্রাপি এমন কোন ঘটনা নাই, যাহা মাতা বা ভগ্নীর নিকট নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করা না যায়। সুতরাং আপনাদের সমক্ষে তাহার কোন কথাই বলিতে আপত্তি নাই। শ্রীকৃষ্ণের লম্পট অপবাদ বড়ই গুরুতর এবং বহুব্যাপী। বাস্তবিকই তিনি লম্পট। কিন্তু সে লাম্পট্য মনে হইলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, হৃদয় ভক্তি-ভরে অবনত হইয়া পড়ে; সেই লাম্পট্যের লীলা-স্থলের ধূলি-রাশিতে লুণ্ঠিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইতে হয় এবং সেই লম্পটরাজের কথা ছাড়িয়া দিউন, যে সকল দেবী তাঁহার প্রেমের পাত্রী ছিলেন, তাঁহাদিগের চরণের রেণুমাত্র প্রাপ্ত হইলে, কৃতার্থম্মন্য হইতে হয়। তাঁহার সেই পরদারাসক্তির সমস্ত বিবরণ বলিতে হইলে, এ অসময়ে আপনাদের বিরক্তিকর হইতে পারে, এবং সমস্ত দিনের ক্লান্তির পর, আমার অপটু রসনা হয় ত তাহার প্রকৃষ্ট ব্যাখ্যা না করিতেও পারে। সুতরাং সংক্ষেপে অদ্য দুই একটি কথা মাত্র বলি; সময়ান্তরে এ প্রসঙ্গ বাহুল্যরূপে আলোচনা করিব। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক শাস্ত্রাদি দেখিলে উপলব্ধি হয় যে, তিনি একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বৃন্দাবনে লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই বয়সে তাঁহার বৃন্দাবন লীলা সাঙ্গ হয় ও তিনি, তত্রত্য নর-নারীগণের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া, প্রথমতঃ মথুরা, তদনন্তর দ্বারকা প্রভৃতি স্থানে গমন করেন।"

নীলরতন বলিলেন,—"এরূপ বাল্যাবস্থায় লাম্পট্য অসম্ভব। অতএব এ যুক্তির বলেই তাঁহার এ অপবাদ খণ্ডিত হইতে পারে।"

উমাশঙ্কর সবিনয়ে বলিলেন,—"আজ্ঞা না। এ যুক্তির আশ্রয় লইলে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক অনভিজ্ঞতারই পরিচয় দেওয়া হয়। ইদানীন্তন কালের অনেক লোক, এইরূপ অনভিজ্ঞতা সহকারে, শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের আলোচনা করিয়া

থাকেন। তাঁহারা সেই পরম পুরুষের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গত ও অসঙ্গত, সম্ভব ও অসম্ভব বিচার করিয়া, কিয়দংশ গ্রহণ করেন, কতক বা পরিত্যাগ করেন। আপনাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান, ক্ষুদ্র বিদ্যা-বুদ্ধির অনুরূপ মানদণ্ড লইয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-রূপ অতল জলধির পরিমাণ করিতে প্রবৃত্ত হন। তাহার ফল বড়ই বিষময়। প্রত্যুত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আজন্ম পূর্ণ। যিনি জন্ম মাত্র সূতিকাগারে মাতার সহিত কথা কহিয়াছেন, যিনি জন্ম দিনে পিতার অঙ্ক হইতে যমুনার জলে ঝাঁপ দিয়াছেন, যিনি ব্যাকুল পিতার শান্তির নিমিত্ত আবার হাসিতে হাসিতে তাঁহার ক্রোড়ে উত্থিত হইয়াছেন, যিনি শৈশবে পূতনা-বধ করিয়াছেন, যমলার্জ্জুন ভঞ্জন করিয়াছেন, সেই দামোদর সকল বয়সেই, সকল অবস্থাতেই পরিপূর্ণ। যে ভাবেই তাঁহার মনুষ্যোচিত লীলা অনুষ্ঠিত হউক না কেন, তাঁহার পূর্ণতা কখনও তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই। এই জন্যই তাঁহার কোন বয়সের কোন কথাই অবিশ্বাস্য বা অসঙ্গত নহে। সুতরাং তাঁহার পক্ষে একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের মধ্যে লাম্পট্য অসম্ভব হইতে পারে না। বাস্তবিক গোপাঙ্গনাগণ জার ভাবেই শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাদিগের হৃদয়গত দৃঢ়তার সবিশেষ পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া, তাহাদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ ও গোপাঙ্গনাগণ মনুষ্য-বিচারে নিন্দনীয় হইতে পারেন বটে; কিন্তু যখন তাঁহাদিগের সেই প্রেমের প্রগাঢ়তা, রহস্য, ভাব প্রভৃতি প্রণিধান করা যায়, তখনই বুঝিতে পারা যায় যে, সে প্রেম অলৌকিক, সে প্রেমের পাত্রপাত্রী সকলই অলৌকিক এবং তাহার ঘটনাও অলৌকিক।"

নীলরতন বলিলেন,—"কিসে তাহা বুঝা যায়?"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"তাহাই বলিতেছি। গভীর নিশীথে শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে, শ্রীকৃষ্ণ একাকী আসীন। রজনী শুভ্রা, বসুন্ধরা জ্যোৎস্না-স্নাতা, সুস্নিগ্ধ অনিল-হিল্লোলে প্রকম্পিতা। এইরূপ অনুকূল সময়ে গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের সমীপাগতা হইয়া, তাঁহার প্রণয় প্রার্থিনী হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে এ নিন্দনীয় সংকল্প পরিত্যাগ করিতে অনুযোগ সহকৃত পরামর্শ প্রদান করিলেন। কিন্তু গোপাঙ্গনারা বলিলেন,—"আমাদিগের গৃহ, পতি, পুত্র, সংসার, ধর্ম্ম কিছুই মনে নাই। ধর্ম্ম, সমাজ ও লজ্জা, ভয় আমরা পরিত্যাগ করিয়াছি। একমাত্র তুমিই আমাদিগের শরণ্য ও বরেণ্য। তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলে, আমরা তোমার সমক্ষে আত্মহত্যা করিব। তুমি বিশ্বপতি, বিশ্বময় ও বিশ্বনাথ। অতএব তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পার না; আর তুমি পরিত্যাগ করিলেও, আমরা তোমার ঐ ভক্তবৎসল চরণত্যাগ করিব না।" শ্রীকৃষ্ণ তথাপি তাঁহাদিগকে এ অধ্যবসায় পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। তথাপি তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া, নারায়ণ বলিলেন,—"তোমরা অদ্য গৃহে ফিরিয়া যাও, সংসারধর্ম্মে চিত্ত নিবেশ কর, যাহাতে পূর্ব্বাপর কুলধর্ম্ম রক্ষিত হয় তাহারও ব্যবস্থা কর, তাহার পর কল্য মনের ভাব বুঝিয়া আমাকে যেরূপ হয় বলিও।' এইরূপে পুনঃপুনঃ প্রত্যাখ্যান করিলেও যখন গোপিকারা একান্ত ভাবে তাঁহার চরণাশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন জীবন রক্ষার উপায়ান্তর নাই বলিয়া বুঝাইয়াছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের সহিত রাসলীলায় প্রমত্ত হইতে সম্মত হইয়াছেন। কোন কোন গোপিকা কৃষ্ণ-

প্রেমে এতই বিহ্বল হইয়া উঠিলেন যে, তাঁহাকে ধ্যান করিতে করিতে তখনই জীব-মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বা সেই জগতের আদিকারণ পরব্রহ্মকে নিমীলিত নয়নে চিন্তা করিতে করিতে রুদ্ধশ্বাস হইয়া বিগত-জীব ও সদ্য মুক্ত হইয়াছিলেন। এ সকলই ঐকান্তিকী ভক্তির দৃষ্টান্ত। এইরূপ ঘটনা ও পরীক্ষার পর, শ্রীকৃষ্ণ গোপিকা-দিগকে চরণ-সেবার অধিকার প্রদান করিয়া ধন্য ও চরিতার্থ করিয়াছিলেন। মনুষ্যের চরিত্রে আলোচনা করিলে, এরূপ ঘটনা কখনই পরিদৃষ্ট হয় না। স্থান, কাল ও সুযোগ বিবেচনা করিলে, কোন মনুষ্যই সেই দেব-যোগ্যা অপ্সর-সদৃশী কামিনীদিগকে কদাপি প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন না; বরং তাদৃশী সুন্দরীকুলের সমাগম হেতু, আপনাকে পরম ভাগ্যবান্ জ্ঞান করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদের সহিত নিন্দিত আচরণে প্রবৃত্ত হইতেন। শ্রীকৃষ্ণের লাম্পট্য তাঁহার দেবত্বের পরিচায়ক। তাহার পর সেই ভক্তগণের শিরোমণিস্বরূপা কামিনীগণের কৃষ্ণময়তাও অলৌকিক। সেই কৃষ্ণ-গত-প্রাণা গোপিকারা আপনাদিগের নারীভাব এককালে বিস্মৃত হইয়া প্রত্যেকেই আপনাকে কৃষ্ণ বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন এবং বস্তুতই তাঁহাদের কেহ বা গোবর্দ্ধন ধারণ করিতেছি মনে করিয়া ব্রজবাসিগণকে অভয় প্রদান করিতে লাগিলেন, কেহবা তর্জ্জন-গর্জ্জন সহকারে কালীয় দমনে প্রবৃত্ত হইলেন, কেহ বা তাড়নি হস্তে গোচারণে উদ্যত হইলেন, কেহবা বাহু আস্ফালন পূর্ব্বক ব্রজধামের শত্রুনাশে নিযুক্তা হইলেন। কি আশ্চর্য্য তন্ময়তা! কি ঐকান্তিকী ভক্তি! কি সুমধুর প্রেম! ইহার কোথায় বা কাম গন্ধ? কোথায় বা গ্রাম্য আচরণ? কিন্তু তাহাও ছিল; সেরূপ ব্যবহারও ঘটিয়াছিল সন্দেহ নাই। তাহাতেই বা দোষ কি? যখন প্রাণে প্রাণ মিশিয়াছে, হৃদয়ে হৃদয় প্রবেশ করিয়াছে, অঙ্গ যখন আর নিজের নয়, চক্ষু যখন আর কিছুই দেখে না, আপনার দেহকেই যখন সেই পুরুষ-রত্নের দেহ বলিয়া বোধ হইয়াছে, তখন—এইরূপ কল্পনাতীত সম্মিলন স্থলে, ব্যভিচার না হইলেও ব্যভিচার হইয়াছে এবং ব্যভিচার হইলেও হয় নাই। দৈহিক সংস্পর্শই কি একটা বড় কথা? যে আপনার দেহ হারাইয়া প্রেমময়ের দেহকে আপন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, সে পূজনীয় প্রেমিকার আবার দৈহিক সংস্পর্শে নূতনত্ব কি? তাহার পর এই প্রেম-লীলার অত্যদ্ভুত পরাকাষ্ঠা পর্য্যালোচনা করুন। এই প্রেমে শ্রীনিবাস উন্মাদ-প্রায় হইয়াছিলেন। প্রেম-ময়ীর মধুর প্রেম তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, সেই বংশীবাদন নিপুণ দেবতার বংশী সকল রাগ-রাগিণী পরিত্যাগ করিয়া কেবল মধুময়ী রাধা নাম ভিন্ন, আর সকলই উচ্চারণ করিতে ভুলিয়া গেল; ক্ষণমাত্র সেই মানময়ীকে ম্লানমুখী দেখিলে জগদীশ্বর বিশ্ব-সংসার শূন্য বোধ করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধিকার শ্রীচরণ-পঙ্কজ পুরুষ-চূড়ামণি শ্রীহরি মস্তকে ধারণ করিয়া চরিতার্থ হইলেন। তিল মাত্র বৃষভানু-নন্দিনীর অসাক্ষাৎ নারায়ণের অসহনীয় হইয়া উঠিল। কদাচিৎ শ্রীরাধিকা, স্বকীয় কুঞ্জ হইতে ক্রোধ ভরে জগন্নাথকে বিতাড়িত করিয়া দিলে, সেই বিশ্বরূপ বিবিধ ছদ্ম-বেশ ধারণ করিয়া প্রাণ-প্রিয়াকে দর্শন না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তাঁহাদিগের প্রেমে যমুনা উজান বহিয়াছে, পশু পক্ষী ভোজনাদি ভুলিয়া নীরবে সেই প্রেম-লীলা দর্শন করিয়াছে। বসন্ত, চিরবিরাজিত হইয়া সেই প্রেমলীলার উত্তর সাধকতা করিয়াছে।

ভ্রমর, নিয়ত গুঞ্জন করিতে করিতে তাহাদিগকে বিনোদিত করিয়াছে। কোকিল সকল ঋতুতেই সেই পুণ্যক্ষেত্রে ঝঙ্কার করিয়াছে, শিখি-শিখিনী পুচ্ছ বিস্তার করিয়া সেই লীলা-স্থলের চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিয়াছে। বৃক্ষ-লতা অবনত মস্তকে সেই স্থলের রজঃ শিরে ধারণ করিয়াছে। কোন কবি-কল্পনা, কোন প্রেমের অভিনয় এই ঐশ্বরিক লীলার নিকটস্থ হইতেও পারে না। তাহার পর সেই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ভগবানের নিকটে অক্রুর সমাগত হইয়া কংসের নিমন্ত্রণ বার্ত্তা নিবেদন করিলেন। অমনই ভূ-ভার হরণেচ্ছু লীলাময় ভগবানের মনে গুরুতর কর্ত্তব্যের কথা জাগরূক হইল। তখন কোথায় বা সেই প্রেম-বন্ধন, কোথায় বা সেই আকর্ষণ,' কোথায় বা সেই মধুর লীলা! সকলই উপেক্ষা করিয়া কংসারি মথুরা যাত্রা করিলেন। সুন্দরীগণের নয়ন-নীর, প্রেমিকার হাহাকার, সকলের নিষেধ বাক্য কিছুই তাঁহাকে, কর্ত্তব্যের পথ হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না। ক্ষুদ্র মনুষ্যের মানদণ্ডে এ প্রেমের পরিমাণ হইতে পারে কি? মনুষ্য সামান্য বেশ্যার সহিত ইন্দ্রিয়-বিকার-জনিত আসক্তিতে অভিভূত হইলে, সমাজের নিন্দা, প্রভূত বিত্তনাশ বন্ধু-বর্গের নিষেধ বাক্য, পিতা মাতার রোদন, ধর্ম্মপত্নীর আত্ম-হত্যা প্রভৃতি কোন কারণেই সে কুলটার সংসর্গ পরিত্যাগ করিতে পারে না। আর এ স্থলে গোবিন্দ, এ অলৌকিক প্রেম বন্ধন, গুরুতর কর্ত্তব্য-পালনের অনুরোধে হাসিতে হাসিতে ছিন্ন করিলেন। এরূপ অমানুষী ব্যাপার কেবল সেই সচ্চিদানন্দ পুরুষোত্তমেরই সম্ভবে। এই ব্যভিচারনিরত পুরুষ ও নারীগণের চরণে যেন আমাদের অবিচলিত মতি থাকে।"

নীলরতন বলিলেন,—"বৎস, শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তুমিই শ্রীকৃষ্ণকে যথার্থ প্রণিধান করিয়াছ। আজ আমরা তোমার এই অমৃতোপম বাক্য শ্রবণে পরমানন্দভোগ করিলাম।"

উমাশঙ্কর সবিনয়ে বলিলেন,—"আমি আপনাদিগের নিকট সেই প্রেমময়ের প্রেম-লীলার কোন কথাই ব্যক্ত করিতে পারি নাই। কথা অনন্ত। আমি ক্ষুদ্র কীটমাত্র। অদ্য রাত্রি প্রভাত হইল প্রায়; আমি এক্ষণে বিদাই হই। যদি ভাগ্যে থাকে, তাহা হইলে সময়ান্তরে কৃষ্ণ-কথা কহিয়া জীবন সার্থক করিব।"

আনন্দময়ী বলিলেন,—"রাত্রি অবসান হইল সত্য; সুতরাং তোমাকে আপাততঃ বিদায় দিতেই হইবে। কিন্তু তোমার এ মধুমাখা কথা, আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, দিবা-রাত্রি বসিয়া শুনিলেও, আকাঙ্ক্ষার শেষ হয় না।"

অন্নপূর্ণা অস্ফুটস্বরে কালীতারাকে বলিলেন,—"জিজ্ঞাসা কর, মা যোগেশ্বরীর সহিত সাক্ষাৎ অদৃষ্টে আর ঘটিবে না কি?

কালীতারা বলিলেন, "তুমি কি উমা-শঙ্করের সহিত কথা কহ না? তুমিই জিজ্ঞাসা কর না কেন?"

তথাপি অন্নপূর্ণা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। অদ্যকার প্রাতের কথা স্মরণ করিয়া, তিনি লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিলেন। বড়ই ধরা পড়িলেন কিন্তু! আর সেখানে বসিয়া থাকা বিধেয় নহে বোধে, তিনি প্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন।

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আমি উহার কথা শুনিয়াছি। মাকে উহার প্রার্থনা জানাইয়াছি। তিনি করুণাময়ী; অবশ্যই উহার প্রার্থনা পূরণ করিবেন।"

তাহার পর উমাশঙ্কর, সকলকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন, তিনি কর্ত্তব্যনিষ্ঠ; কর্ত্তব্যসাধনের প্ররোচনায় তাঁহাকে প্রস্থান করিতে হইল বটে; কিন্তু তাঁহার জ্ঞানের সহিত অন্তঃকরণের একটুও বিরোধ উপস্থিত হইল না কি?

একাদশ খণ্ড—নরক।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রূপান্তর।

সৌধমালা-সমাকীর্ণা কাশীর পাঁড়ে ঘাটের নিকট, গঙ্গার ধারে, এক প্রকাণ্ড ভবনে বহুলোকের সমাগম হইয়াছে। দ্বারে দৌবারিকগণ খাড়া আছে, দাস-দাসীগণ ছুটা-ছুটি করিতেছে, সরকার বাজার হইতে ঝাঁকা বোঝাই সামগ্রী লইয়া বাটীতে প্রবেশ করিতেছে, মহাজনেরা বেনারসী চেলী, জড়াও গহনা প্রভৃতি লইয়া দ্বারে অপেক্ষা করিতেছে। চারিদিকে সমৃদ্ধির চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইতেছে। সকলেই বলিতেছে, বাঙ্গালা মুলুকের এক রাণী আসিয়াছেন।

রাণীই হউন, বা রাজ-কন্যাই হউন; দ্বারে সঙ্গীন চড়ান বন্দুকওয়ালা খাড়া থাকুক, বা ঢাল তলওয়ারই ঘুরিতে থাকুক, পুরমধ্যে কাহারও প্রবেশের অধিকার থাকুক বা নাই থাকুক; মা সরস্বতীর বরে কালী-কলমের ব্যবসাদার দরিদ্র গ্রন্থকার, যেখানে মাছিটাও ঢুকিতে পায় না, সেখানেও স্বচ্ছন্দে ও নির্ভাবনায় প্রবেশ করিতে পারেন। পুণ্যবানের পবিত্র নিকেতন, পাপের পঙ্কিল পূতিগন্ধময় নরক, বিলাসীর রম্য কানন, দীনের হাহাকার রব পরিপূর্ণ পর্ণ-কুটীর সর্ব্বত্র উপন্যাস-লেখকের অব্যাহত গতি। কল্পনার সর্ব্বসাধন-ক্ষম পক্ষ-পুট তাঁহাকে লোকলোচনের অন্তরালে রাখিয়া দেয় এবং প্রতিকূল আক্রমণের হস্ত হইতে, তাঁহাকে রক্ষা করে। মা সরস্বতীর সেই বরপ্রভাবে আমরা এই নবাগতা রাণীর মন্দিরে একবার প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিতেছি।

ভবনের চারিদিকেই নবাগমনের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। নীচে একটা ঘরে দুই জন ঝি শিলা-খণ্ডে মসলা পিষিতেছে, একজন তরকারি কুটিতেছে, একজন মাছ কুটিতেছে, দুই জন চাকর জল তুলিয়া আনিতেছে এবং দুই জন ব্রাহ্মণ পাক করিতেছে; সুতরাং নীচে কলরব যথেষ্ট। দ্বিতলে কোন বিশেষ গোলযোগ নাই; কিন্তু বড় বিশৃঙ্খল। বারান্দায় কতকগুলা সতরঞ্চি ও কম্বলের মোট, একটা ঘরে কতকগুলা বিলাতী ট্রঙ্ক ও কয়েকটা দেবদারুকাঠের বাক্স, আর একটা ঘরে কতকগুলা বিছানা, অন্যত্র কতকগুলি পুটুলি ও বস্তা ইত্যাদিরূপ নানাস্থানে নানা সামগ্রী নিতান্ত বিশৃঙ্খলভাবে নিপতিত। ত্রিতলে এত বিশৃঙ্খলতা নাই। তথায় গঙ্গার দিকে একটি প্রকোষ্ঠে একটি পরিষ্কার বিছানা পাতা রহিয়াছে। এবং যাহাকে লোকে রাণী বলিয়া ব্যস্ত হইতেছে, তিনি স্বয়ং তথায় বসিয়া, নিতান্ত অন্যমনস্ক ভাবে, জানালার ফাঁক দিয়া, গঙ্গার দিকে চাহিয়া আছেন।

রাণী আর কেহ নহেন—শ্যামলালের বিবাহিতা বনিতা হরিচরণের প্রণয়িনী, পাপীয়সী বিধুমুখী। সম্পত্তি ধরিয়া বিচার করিলে বিধুমুখীকে আজি-কালিকার অনেক রাজ-

রাণীর অপেক্ষা বড় বলিতে হইবে সন্দেহ নাই।

প্রাণের বন্ধু হরিচরণের সমভিব্যাহারে সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম সঙ্গে লইয়া, বিধুমুখী পশ্চিমে হাওয়া খাইতে আসিয়াছিলেন। ওদিকে লাহোর পর্য্যন্ত যাওয়া হইয়াছিল, সুতরাং অনেক হাওয়াই খাওয়া হইয়াছে। এক্ষণে এই পুণ্যবতী কামিনী পুণ্যতীর্থ কাশী-ধামে আসিয়া অধিষ্ঠান করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে কাশীর উদারতা অপরিসীম। পাপের আশ্রয় দিতে এবং পাপ-পঙ্ক গায়ে মাখিতে বারাণসীর কোনই সঙ্কোচ বা অপ্রবৃত্তি নাই। এই জন্যই এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পাপের পৈশাচ নর্ত্তন পরিদৃষ্ট হয়। এবং অপবিত্রতার উৎকট উল্লম্ফন দেখিতে পাওয়া যায়। সতী-শিরোমণি ভবানীর প্রিয় নিকেতনে যোগীশ্বর মহেশ্বরের এই সনাতনী পুরীতে এ কি রাক্ষসী ও আসুরী লীলার অবিধেয় অভিনয়। হায় কাল! তোমারই মাহাত্ম্য প্রবল

বিধুমুখী আসিয়াছেন; কিন্তু তাহার সে সৌন্দর্য্য, সে শোভা, সে উজ্জ্বলতা এবং সে প্রফুল্লতা তিনি হারাইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার স্বর্ণ-বর্ণ যেন কেমন সাদা মত হইয়াছে, তাঁহার সে উজ্জ্বল লোচন যেন কোটরগত ও প্রভা-শূন্য হইয়াছে, তাঁহার সজীবতা ও প্রফুল্লতা অপগত হইয়াছে, তাঁহার সে বিলাস-প্রিয়তা ও বেশ-ভূষার পারিপাট্য আর নাই। তাহার রুক্ষ অবেণী-সম্বদ্ধ কেশরাশি বিছানার উপর লুটাইতেছে, একখানি সামান্য বস্ত্র সামান্য ভাবে তাঁহার দেহ আবরণ করিয়া রহিয়াছে এবং অঙ্গে ভূষণ নাই বলিলেই হয়। কেহ বলিয়া না দিলে, এখন আর বিধুমুখীকে চেনা যায় না। তাঁহার এরূপ পরিবর্ত্তন কেন হইল? পথের বিবিধ অনিয়ম, অসুবিধা ও কষ্ট হেতুই কি তাঁহার এই সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে? না! নিদারুণ মানসিক কষ্টই সুন্দরীর এই সকল পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে।

যাঁহার সুখের পথ নিষ্কণ্টক ও অব্যাহত, যাঁহার জীবনের গতি স্বাধীন ও অবাধ, যাঁহার বাসনা সঙ্কলিত হওয়ার সর্ব্বোপকরণ আয়ত্তাধীন, যাঁহার তৃপ্তি ও সন্তোষ সংসাধন করিতে কর্ম্মবিচারের প্রয়োজন হয় না, যাঁহার অনুষ্ঠান সমূহ সদসৎ পাপপুণ্য বিচারের অধীন নহে, তাঁহার মানসিক পীড়ায় প্রপীড়িত হইবার কোনই কারণ দেখা যায় না। অতুল সম্পত্তির যিনি সর্ব্বেশ্বরী, প্রাণের বন্ধু হরিচরণ যাঁহার নিত্য সঙ্গী, তাঁহার কেন এ কষ্ট? কথা সকলই সত্য, তথাপি কষ্ট। জানি না বিধাতা কি দুজ্ঞেয় সূত্রে সুখ-দুঃখ বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। যাহাতে সুখ হইবার কথা তাহাতেও দুঃখ হয়, যাহাতে দুঃখ হইবার কথা তাহাতেও সুখ হয়। যাহাতে একের দুঃখ, তাহাতেই অপরের সুখ; যাহাতে একের সুখ, তাহাতেই অপরের দুঃখ। এই জন্যই জ্ঞানীরা সুখ-দুঃখের অতীত এবং এই জন্যই সুখ-দুঃখ-রাহিত্য ভাবই স্থিরপ্রজ্ঞের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

বিধুমুখী মায়াবিনী। যে হরিচরণ তাঁহার সকল সুখের কেন্দ্র, সেই হরিচরণ অধুনা তাঁহার বিজাতীয় ক্লেশের কারণ। তিনি প্রাণ ভরিয়া হরিচরণকে ভাল বাসেন। হরিচরণের জন্য তিনি ধর্ম্ম-ধনে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, সমাজের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছেন; হরিচরণের সুখ-সম্ভোগের নিমিত্ত অতুল সম্পত্তি রাশি তাঁহার চরণে ঢালিয়া দিয়াছেন, মনে বা কার্য্যে অবিশ্বাসিনী হওয়া দূরে থাকুক, পাছে সেরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হয় বলিয়া, স্বামীকে পর্য্যন্ত পদাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। সেই হরিচরণ—তাঁহার জীবনের জীবন সেই হরিচরণ

তাঁহাকে ভাল বাসেন না। ইহাই সুন্দরীর হৃদ্‌গত হইয়াছে, তিনি ইহার অনেক প্রমাণ দেখিয়াছেন এবং বিভিন্ন প্রকারে ইহার পরীক্ষা করিয়াছেন। দুঃখের কথা বটে।

প্রথমতঃ সুহাসিনী নাম্নী এক সুন্দরী স্ত্রীলোককে হস্তগত করিবার নিমিত্ত হরিচরণ অনেক যত্ন, ব্যয় ও নরহত্যা পর্য্যন্ত করিয়াছেন। ঐ সুহাসিনী প্রথমে শ্যামলালের মন আকর্ষণ করে; কিন্তু সে সতী আপনার ধর্ম্ম বজায় রাখিবার জন্য পলাইয়া স্থানান্তরে লুকাইয়া থাকে। হরিচরণ তাহার নিমিত্ত উন্মাদপ্রায় হইয়া তাহার সন্ধান করেন এবং বিশেষ কৌশল সহকারে তাহাকে হস্ত-গত করিবার আয়োজন করিয়াও, শেষে অকৃতকার্য্য হন। দ্বিতীয়তঃ হরিচরণ পশ্চিম প্রদেশে বেড়াইতে আসিবার সময় আপনার ভগ্নী-সম্পর্কিতা পরিচয় দিয়া একটা উপপত্নী সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন। শেষে বিধুমুখী সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারায়, তনি তাহাকে স্বতন্ত্র একটা বাসায় রাখিয়াছেন। তৃতীয়তঃ, হরিচরণ, সুযোগ পাইলে একটা চাকরাণীর সহিত আমোদ প্রমোদ করিতেন। সে দাসী আর কেহ নহে, সারদা। বিধুমুখী একদিন স্বচক্ষে হরিচরণ ও সারদাকে পরস্পরের মুখচুম্বন করিতে দেখিয়াছেন। বলা বাহুল্য সারদা তাড়িত হইয়াছে। সম্ভবতঃ হরিচরণ তাহাকে তখন স্থানান্তরে রাখিয়াছেন। চতুর্থতঃ হরিচরণ কাশীতে আসিয়া দিলজান নাম্নী একটা যবনী বেশ্যার প্রেমে নিতান্ত উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছেন এবং দিবারাত্রি তথায় সুরাপান করিয়া কাটাইতেছেন। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

হরিচরণ এখন প্রভূত অর্থের অধীশ্বর। বিধুমুখীর কৃপায় তিনি অনেক অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। যাহা তিনি সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস যে, জীবনে তাঁহাকে আর অর্থাভাবে কষ্ট পাইতে হইবে না; সুতরাং তাহার ন্যায় রসিক ভ্রমর এক বিধুমুখীকমলে আবদ্ধ হইয়া থাকিবার কোনই প্রয়োজন দেখেন না। হরিচরণ এখন আর বিধুমুখীর কৃপার ভিখারী নহেন। বাটীতে অবস্থান কালেই হরিচণের হৃদয়-হীনতার অনেক সংবাদ বিধুমুখী জানিতে পারেন। কিন্তু তখন নানা কারণে হরিচরণ অনেক সাবধান ছিলেন। দেশ পর্য্যটনে বাহির হইয়া হরিচরণ একবারে সকল আবরণ ফেলিয়া দিয়াছেন এবং বিধুমুখীকে সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষা করিয়াই, নিঃসঙ্কোচে স্বকীয় রসরঙ্গ চালাইতে আরম্ভ করিয়াছেন।

বিধুমুখী প্রথমে রাগ, তাহার পর তিরস্কার, তাহার পর অভিমান, তাহার পর রোদন, তাহার পর বিনয়, শেষে হরিচরণের পদ ধারণ পর্য্যন্ত করিয়া দেখিয়াছেন। হরিচরণ কিন্তু এই সকল ব্যবহারের পরিবর্ত্তে কখন বিধুমুখীকে একটা আদরের কথাও বলে নাই; বিদ্রূপ ও অবজ্ঞা ছাড়া আর কিছু জানায় নাই, এবং কদাপি একটু লজ্জার ভাবও দেখায় নাই। বিধুমুখী বুঝিয়াছেন, হরিচরণ তাঁহার নহেন, তাঁহার হইয়া থাকিবেনও না। তাহার পর সুন্দরী ক্রমে শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন।

হরিচরণ আর বড় আসে না; আসিলেও বিধুমুখীর সঙ্গে বড় দেখা করে না; দেখা হইলেও একটা কথা কহে না; কথা কহিলেও বিধুমুখী বড় জবাব দেন না, জবাব দিলেও বিধুমুখী তাহাকে এককালে যাওয়া আসা ত্যাগ করার কথা ছাড়া আর কিছু বলেন না। হরিচরণ এখন বিধুমুখীর চক্ষুশূল। তাহার আকার-প্রকার কথাবার্ত্তা সকলই এখন

সুন্দরীর পক্ষে অপরিসীম জ্বালাকর। ভালবাসার কি ভয়ানক অত্যাচার !

বিধুমুখীর একটু একটু জ্বর হয়, নিদ্রা হয় না, আহারে নিতান্ত অপ্রবৃত্তি, খাওয়া নাই বলিলেই হয়। বড় দুর্ব্বল, শরীরে একটুও রক্ত নাই।

সংসারে আপনার লোক কেহই নাই; সুতরাং যত্ন করে কে? যাহাকে জগতে একমাত্র আপনার জ্ঞান করিয়া তিনি সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছিলেন, সে এখন তাঁহার পর। বরং পরও ভাল; কারণ পর দেখিলে কষ্ট হয় না; কিন্তু তাহাকে দেখিলে রাগ হয়। সে এখন শত্রু।

দাসীরা পরামর্শ করিয়া, কর্ম্মচারীদের বলিয়া কহিয়া ডাক্তার কবিরাজ আনাইয়াছিল। তাহারা একবেলা টনিক, আর একবেলা বলকারক ঔষধ দিয়াছেন। কিন্তু দাসীরা অনেক চেষ্টা করিয়াও বিধুমুখীকে ঔষধ খাওয়াইতে পারে নাই। তাহারা পর; সুতরাং এজন্য আর বেশী কিছু করিবার আবশ্যক অনুভব করে নাই।

অনেক দাস-দাসীর মধ্যে কালিদাসী নামে একটী চাকরাণী ছিল। সে একটু প্রবীণা, একটু ধর্ম্মভীতা ও একটু সাদাসিদা লোক ছিল। বিধুমুখীর এই অবস্থা দেখিয়া সে লোকটার যেন একটু আন্তরিক কষ্ট হইত বলিয়া বোধ হয়। সে, অন্য দাস-দাসীর মত একটা মুখের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, চুপ করিত না; দুইবার মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত হইত না; অকারণ অনর্থক দুঃখ প্রকাশ করিয়া নীরব হইত না; কষ্টে মুখের হাসি লুকাইয়া গম্ভীর স্বরে একটা শিষ্টাচার প্রকাশ করিতে পারিত না। এইরূপ স্বভাব বলিয়াই হউক, অথবা বাস্তবিকই বিধুমুখীকে ভালবাসে বলিয়াই হউক, সে কিন্তু সতত নানাপ্রকারে পীড়িতার শুশ্রূষা করিবার চেষ্টা করিত।

অনেকক্ষণ জানালার ফাঁক দিয়া গঙ্গা দেখিতে দেখিতে বিধুমুখী ক্লান্ত হইয়া তত্রত্য শয্যায় শুইয়া পড়িলেন। এই সময় কালিদাসী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"মা, একটু দুধ খাবে কি? উঠ।"

বিধুমুখী সেই অবস্থাতেই বলিলেন,—"না মা; কিছু খাইতে ইচ্ছা নাই। উঠিতে আর পারি না।"

কালিদাসী বলিল,—"তা বলিলে হবে কেন মা? চেষ্টা করে একটু খেতে হয়। উঠ তুমি, আমি দুধের বাটী মুখে ধরি। প্রাণটা ত রাখ্‌তে হবে।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"কেন?"

কালিদাসী বলিল,—"ওমা! সে কি কথা! কেন আবার কি গা? তোমার এই বয়স, এত রূপ, এত ধনদৌলত, সকলই আছে। তবে আর কেন কি গা?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"সবই সত্য; কিন্তু বল দেখি কালিদাসী, কি হইলে মেয়েমানুষের সকল সুখ পূর্ণ হয়?"

কালিদাসী বলিল,—"তোমার যা যা আছে তাই সব সুখের সার। এর উপর একটি ছেলে হইলেই ভাল হয়। তা কপালে থাকে তো অবশ্য হবে।"

বিধুমুখী বলিলেন—"আর কিছুই কি চাহি না?"

কালিদাসী বলিল,—"মানুষের অদৃষ্টে যত সুখ হওয়া সম্ভব সকলই তুমি পেয়েছ, আর চা হবার কিছুই নাই।"

বিধুমুখী একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া

বলিলেন,—"স্বামী—স্বামী না থাকিলে নারীর থাকে কি?"

কালিদাসী অনেক দিন বিধবা হইয়াছে। তথাপি গলার আওয়াজ একটু ভারি করিয়া বলিল,—"তা সত্য; কিন্তু তোমার সে দুঃখও নাই। তুমি জিজ্ঞাসা না করে, কোন কথা না বলে চলে এসেছ, তবু তোমার স্বামী, তোমার ভাবনায় বাড়ী ছেড়ে, এখানেও এসেছেন।"

তখন সেই ব্যাধি-ক্লিষ্টা শক্তিহীনা নারী ব্যস্ততা সহ উঠিয়া বসিলেন এবং সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আসিয়াছেন? কোথায় তিনি?"

কালিদাসী বলিল,—"আসিয়াছেন, কিন্তু দ্বারওয়ানেরা আসিতে না দেওয়ায়, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া, কোথায় চলিয়া গিয়াছেন।"

বিধুমুখী দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুনরায় শুইয়া পড়িলেন। বলিলেন,—"এত দূরে আসিয়াছেন—আমার সহিত দেখা করিবার জন্য এত দূরে আসিয়াছেন! হয়ত বড় কষ্টে পড়িয়াছেন। আর তো দেখা হইবে না। একবার দেখা—না, একবারও আর দেখায় কাজ নাই।"

কালিদাসী বলিল,—"যখন তিনি এখানে আসিয়াছেন, তখন অবশ্যই আবার আসিবেন; তোমার সহিত নিশ্চয়ই দেখা করিবেন।"

বিধুমুখী কোন উত্তর দিলেন না। তিনি সেই শয্যায় পড়িয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, —"যে ভ্রম হইয়াছে, আর তাহা সংশোধন করিবার উপায় নাই। যে পতন হইয়াছে, আর তাহা হইতে উদ্ধারের আশা নাই। ভগবান্ আমাকে দয়া করিতে ত্রুটি করেন নাই। প্রভূত রাজ-ঐশ্বর্য্য আমার পদতলে ছিল; অপরিসীম রূপরাশি আমার দেহ ঢাকিয়াছিল, শরীর সতত নীরোগ ও সুস্থ ছিল। তথাপি ঘোর মনস্তাপে, নিতান্ত ক্লেশে আজি আমি মরিতে বসিয়াছি। কেন এমন হইল? পাপে মত্ত হইয়াই আমি সকল সুখ নষ্ট করিলাম। বুদ্ধির দোষে আমি সকলই হারাইলাম। ইন্দ্রিয় ভোগ-লালসায় আমি সকলই বিসর্জ্জন দিলাম। যাহা সুখ ভ বিয়া মত্ত হইয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি, তাহা কেবলই অসুখ—সে সকলই অসার। পাপ—পাপ। আমার শরীরমন পাপে অপবিত্র হইয়াছে। হেলায় আমি সুখের পথ নষ্ট করিয়াছি। সুখের সকল উপায় আমি পায়ে ঠেলিয়াছি। স্বামীর প্রেমই রম র সার ধন। আমি সে ধন লাভের যত্ন করি নাই। সত্য বটে স্বামী আমাকে কখন আদর করেন নাই; নাই করিলেন। তাঁহার প্রতি আমার অবিচলিত মতি থাকিলেই আমার সকল সুখ হইত। তিনি অনেক নারীর সহিত আমোদে কাল কাটাইতেন। তাহাতে আমার ক্ষতি কি ছিল? যদি ইন্দ্রিয়-লালসা ত্যাগ করিয়া তাঁহাকেই সর্ব্বস্ব বলিয়া জ্ঞান করিতে পারিতাম, তাহা হইলে অবশ্য কোন না কোন দিন তাঁহাকে আমি পাইতাম। না পাইলেও, চিত্তের সুখ নষ্ট হইত না; ধর্ম্ম নষ্ট হইত না; পাপের তাড়নায় কষ্ট পাইতে হইত না। পরের অবজ্ঞায় অন্তর্দ্দাহ ভোগ করিতে হইত না; এমন সর্ব্বনাশ কখনও ঘটিত না। সে দিন—সে দিনও যখন তিনি, আমার রূপে মোহিত হইয়া, আমার চরণ ধরিয়াছিলেন, তখনই মনে করিলে, আমি তাঁহাকে প্রেম-শৃঙ্খলে বাঁধিয়া ফেলিতে পারিতাম। এখন সব গিয়াছে। অন্ধকার! চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার! আর উপায় নাই। মৃত্যু উপ-

স্থিত। মৃত্যুই এখন প্রার্থনীয়। তাঁহার সহিত আর দেখা করিব না; আর এ পাপ মুখ তাঁহাকে দেখাইব না। তিনি আসিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। তাঁহার বিষয় আশয় তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে হইবে। এখনই কর্ম্মচারী ডাকিয়া দলিল লেখাইব।" আবার ভাবিলেন,—'নিষ্প্রয়োজন। আমার মৃত্যুর পর তাঁহার বিষয় তাঁহারই হইবে; যেরূপেই হউক, বিষয় তাঁহারই হাতে যাইবে। দেখা —তাঁহার সহিত আর কখন দেখা করিব না। যে অন্যায় করিয়াছি, তাহার পর তিনি ক্ষমা করিলেও, আমি সে ক্ষমায় সন্তোষ লাভ করিব না। ক্ষমা চাই না। আমি ক্ষমার অতীত পাপ করিয়াছি। আপন তেজে আপনি মরিয়াছি। সেই তেজেই পরকালে পাপের মত সাজা ভোগ করিব। ক্ষমায় কাজ নাই।'

এই সময়ে সিঁড়িতে ধপাস্ ধপাস্ করিয়া জুতা সংযুক্ত পদাঘাত-শব্দ হইতে লাগিল। অবিলম্বে মাথায় চাদর জড়ান, দেহ পঞ্জাবী জামায় ঢাকা, রক্ত-চক্ষু, অস্থির-গতি হরিচরণের মূর্ত্তি বারান্দায় দেখা গেল। হরিচরণ টলিতে টলিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল,—"কি শুয়ে যে। কালি অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত হুইস্কি চলেছে বুঝি? তা বেশ তো, এখন উঠে খোঁয়ারি কাটাও বাবা। কিন্তু এখানে সুবিধা হইবে না। এস আমার সঙ্গে, চল দিলজানের বাড়ী যাওয়া যাউক। সেখানে যোগাড় সব ঠিক আছে। আমি সেখান থেকেই আসছি। তুমি যদি তার বাড়ীর নিকট বাসা করিতে, তাহা হইলে আমার যাওয়া আসার বেশ সুবিধা হইত।"

বিধুমুখী কোন উত্তর দিলেন না; হরিচরণ বলিল,—"কি কথা কহিতেছ না যে। যাবে না? তা যাবে কেন? তার সঙ্গে আলাপ হলে, কেতা কায়দা শিখে, তুমি একটা নামজাদা মেয়ে মানুষ হতে পারতে। তোমার কপালে তা হবে কেন?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"কালিদাসী, দুইজন দ্বারবানকে ডাকিয়া আন তো। একটু দরকার আছে।"

কালিদাসী প্রস্থান করিল; হরিচরণ আবার বলিল,—"কি বিবি, আজি কালি দরওয়ানের সঙ্গে ইয়ারকি চলেছে না কি? তা কাজেই।" বিধুমুখী এখনও নীরব। কালিদাসীর সঙ্গে দুই জন দ্বারবান্ আসিয়া স্ফীত বক্ষে বারান্দায় দণ্ডায়মান হইল। তখন বিধুমুখী, সহসা প্রভূত শক্তি সহকারে, উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—"তোমরা এখনই এই হতভাগাকে, নাগরা জুতা মারিতে মারিতে, আমার বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেও, একটা কথা কহিবার সময়ও দিও না। আর এই বেইমান যেন কখন আমার বাটীর নিকটেও আসিতে না পায়। আসিলে তোমাদের সাজা হইবে।"

তৎক্ষণাৎ দুই ভোজপুরী আসিয়া হরিচরণের দুই বাহু ধারণ করিয়া বলিল,—"চল বে কুত্তা"

তখন হরিচরণ অবাক্। সে দানীং বিধুমুখীকে যার-পর নাই অবজ্ঞা করিয়া আসিতেছে; কিন্তু বিধুমুখী তাহার নিকট অনুনয় বিনয়ই প্রকাশ করিতেছে; সুতরাং হরিচরণ সাবধান হইয়া কথা কহার আবশ্যকতা কখনই অনুভব করে নাই। তাহার অসাবধানতার ফল যে এই রূপ দাঁড়াইবে, ইহা সে একবারও মনে করে নাই। এক্ষণে সে আপনার বিপদের পরিমাণ বুঝিতে পারিল। বলিল,— "তুমি কি পাগল হইয়াছ বিধু? ইহার পর আমার সহিত আর সম্পর্ক থাকিবে না জানিবে।"

বিধুমুখী ক্রোধসহকৃত স্বরে বলিলেন,—"তোর সহিত সম্পর্ক। তুই আমার চাকর ছিলি, আমি তোকে দূর করিয়া দিতেছি। তোমরা কি দেখিতেছ? ঐ ছুচার মুখে লাথি মারিতে মারিতে সিঁড়ি হইতে ফেলিয়া দেও।"

একটা কথা হরিচণের মনে হইল। সে বুঝিল এরূপ গুরুতর কাণ্ড যখন ঘটিতেছে, তখন এখানকার সম্পর্ক নিশ্চয়ই শেষ হইতেছে। এখন যদি নিকাশ প্রকাশের জন্য টানাটানি করে, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ। বলিল,—"তা আচ্ছা আমি যাইতেছি; কিন্তু কাগজ পত্র সব সদর কাছারিতে।"

আবার বিধুমুখী বলিলেন,—"দূর হ ছুচো। তোর হিসাব নিকাশ লইতে চাহি না। আমি জানি তুই আমার সর্ব্বস্ব চুরি করিয়াছিস্। এ সম্পত্তি অতঃপর যাহার হাতে পড়িবে, তিনি তাহার যেরূপ ইচ্ছা ব্যবস্থা করিবেন। আমাকে যেন জীবনে আর তোর মুখ দেখিতে বা তোর নাম শুনিতে না হয়। শূয়ারকে এখনই দূর কর। আর কথা কহিতে না পায়।"

দ্বারবানদ্বয় হরিচরণকে জোরে আকর্ষণ করিয়া বাহিরে আনিল। হরিচরণ সেখান হইতে বলিল,—"বিনু—',

ভোজপুরীরা বাধা দিয়া বলিল,—"চুপ রহ বেইমান্। ফের বাত কহনেসে তেরা হড্ডি তোড় ডালেঙ্গে হারামজাদ।"

হরিচরণকে সঙ্গে লইয়া দ্বারবানেরা প্রস্থান করিল।

নিরতিশয় উত্তেজনা ও পরিশ্রমে বিধুমুখী নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি কাতরভাবে শয্যায় পড়িয়া গেলেন। উভয় হস্তে কপাল চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন,—"জানি না নরক কিরূপ। কিন্তু আমারি এ দুরবস্থার অপেক্ষা নরক কখনই ভয়ানক হইতে পারে না। অদৃষ্ট, অদৃষ্ট, অদৃষ্ট!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দীক্ষা।

বিধুমুখীর অবস্থা আরও মন্দ। গত কল্য হরিচরণকে তাড়াইয়া দিয়া মূর্চ্ছিতপ্রায় হওয়ার পর হইতে বিধুমুখী আর শয্যা হইতে উঠিতে পারেন নাই। দুর্ব্বলতা বড়ই বাড়িয়া গিয়াছে।

বেলা ৮টা হইবে। বিধুমুখী সেই শয্যায় পড়িয়া আছেন। কালিদাসী নিকটে বসিয়া তাঁহার বিশৃঙ্খল কেশগুলি গুছাইতেছে ও একবার উঠিয়া বসিবার নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছে।

বিধুমুখী ভাবিতেছেন—"কালি এমন সময় আসিয়াছিলেন, আজিও হয় ত আসিতে পারেন। আসেন, আসুন। আমি কিন্তু তাঁহার সহিত দেখা করিব না। তাঁহার বিষয়, তাঁহারই বাসা, তাঁহারই দ্রব্য-সামগ্রী, তাঁহারই টাকা কড়ি। তিনি আসিবেন না কেন? আজি তিনি আসিলে, তাঁহাকে কর্ম্মচারিগণ সমাদর করিবে। যত্ন করিয়া তাঁহার সকল কথা শুনিবে ও তাঁহাকে সকল কথা বলিবে। তাঁহার সম্পত্তি তিনি গ্রহণ করিবেন। কিন্তু আমি তাঁহার সহিত আর দেখা করিব না। কেন দেখা করিব? আমি তাঁহার পত্নী নহি, তাঁহার দাসী নহি, তাঁহার প্রণয়িনী নহি। আমি কেন তাঁহার সহিত দেখা করিব? এখন তাঁহার সহিত মিষ্ট আলাপ করিতে যাওয়া কেবল বিদ্রূপ করা হইবে। যতদূর সম্ভব অত্যাচার করিয়া শিষ্টাচার করা বাতুলতা। হত্যা

করিয়া ক্ষত স্থানে তৈল দেওয়া বড়ই মূর্খতা। পাপেই ভাসিয়াছি, পাপেই মজিয়াছি, পাপের বোঝা কাঁধে লইয়াই মরিব। এ পাপ ধৌত হইবার নহে। এ পাপ পূর্ণ ভাবে আমার সঙ্গে চলুক। এখন ইহার আর এক বিন্দুও ত্যাগ করিব না।”

এই সময়ে ভবনের নিম্নদেশ হইতে কোকিল-বিনিন্দিত কণ্ঠে সঙ্গীত-ধ্বনি সমুত্থিত হইয়া বিধুমুখীর কর্ণে প্রবেশ করিল। তাঁহার হৃদয়ে সেই সঙ্গীত-ধ্বনি যেন অমৃত ঢালিয়া দিল। সেই ব্যাধি-ক্লিষ্ট, চিন্তা-প্রপীড়িত বদনে আনন্দের চিহ্ন প্রকটিত হইল। ভাল করিয়া গান শুনিতে পাইবেন বলিয়া, তিনি উঠিয়া বসিলেন; তাহার পর মাটিতে বসিয়া বসিয়া ধীরে ধীরে বাহিরের বারান্দায় আসিলেন।

পাশের ঘরে একজন ঝি বসিয়াছিল। বিধুমুখীকে বারান্দায় আসিতে দেখিয়া সে ব্যস্ততা সহকারে তাঁহার নিকটস্থ হইল। বিধুমুখী তাহাকে আদেশ করিলেন,—“কে গান করিতেছে? তাহাকে ডাকিয়া আন।”

দাসী চলিয়া গেল এবং অবিলম্বে প্রত্যাগত হইয়া নিবেদন করিল,—“সাক্ষাৎ কার্ত্তিকের ন্যায় শ্রীমান্ এক নবীন সন্ন্যাসী গান করিতেছেন। অন্তঃপুরে আসিতে তাঁহার নিষেধ; তিনি এখানে আসিবেন না।”

বিধুমুখী দুঃখিত স্বরে বলিলেন,—“তিনি গান করেন কেন? ভিক্ষার জন্য গান করেন কি?”

দাসী বলিল,—হাঁ।”

বিধুমুখী বলিলেন,—“বল গিয়া, তাঁহাকে আশার অধিক ভিক্ষা দিব। তিনি কৃপা করিয়া আমাকে দর্শন দেন।”

দাসী বলিল,—“আমি সে কথা বলিয়াছি। তাঁহার আশা অতি সামান্য। আধ সের চাউলের বেশী তাঁহাকে দিলেও তিনি গ্রহণ করিবেন না।”

বিধুমুখী বলিলেন,—“তিনি মহাপুরুষ। তাঁহাকে কৃপা করিয়া একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া আইস। তাহার পর তোমরা দুই জনে আমাকে লইয়া ধীরে ধীরে ধীরে লইয়া যাও। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিব।”

দাসী বলিল,—“এ কথাটা তাঁহাকে বলা হয় নাই। আপনি নিতান্ত দুর্ব্বল, অথচ তাঁহাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, ইহা জানাইলে, হয় ত তিনি দয়া করিলেও করিতে পারেন।”

দাসী আবার প্রস্থান করিল এবং কিছুকাল পরে দেবোজ্জ্বল-কান্তি-সম্পন্ন এক নবীন সন্ন্যাসীকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। সেই সন্ন্যাসী উমাশঙ্কর। তাঁহাকে দর্শন করিয়া বিধুমুখীর মনে হইল যে, এই সন্ন্যাসী কখনই প্রাকৃত মানুষ নহেন! তথায় কালিদাসী এবং আর একজন ঝি উপস্থিত হইয়াছিল। বিধুমুখী তাহাদিগকে সন্ন্যাসীর নিমিত্ত আসন পাতিয়া দিতে আদেশ করিলেন।

তখন উমাশঙ্কর বলিলেন,—“গৃহীর আশ্রমে আসন গ্রহণ করিতে, বা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে, আমার অনুমতি নাই। আপনার অনুরোধে মা, বিশেষ আপনার পীড়ার কথা শুনিয়া, আমি একটি নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছি। ভরসা আছে, গুরুদেব এজন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন। কিন্তু মা! আমাকে আর একটি নিয়ম ভঙ্গ করাইয়া অপরাধী করিবেন না।”

বিধুমুখী বলিলেন,—“আপনি দাঁড়াইয়া থাকিবেন; কিন্তু আমার দাঁড়ান দূরে থাকুক,

এরূপ ভাবে বসিয়া থাকিবারও আবশ্যক নাই।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আপনার বসিয়া কাজ নাই। আপনাকে বড়ই দুর্ব্বল ও কাতর দেখিতেছি। আপনি শয্যায় শয়ন করুন। আমি স্বচ্ছন্দে আপনার সহিত দাঁড়াইয়া কথা-বার্ত্তা কহিতেছি। সমস্ত দিন দাঁড়াইয়া থাকিলেও, ভিক্ষুক সন্ন্যাসীদিগের কোনই কষ্ট হয় না।"

উমাশঙ্কর তাঁহাকে শয়ন করিতে বারংবার অনুরোধ করিলে, বিধুমুখী অগত্যা শয্যায় গিয়া পতিতা হইলেন। পীড়িতা তাঁহাকে দেখিতে পান এরূপ স্থানে উমাশঙ্কর দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি বুঝিলেন, নিতান্ত কঠিন পীড়ায় অধুনা বিগত-শ্রী হইলেও, এই নারী অসামান্যা সুন্দরী। জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনার কি পীড়া মা!"

বিধুমুখী বলিলেন,—"আমার কঠিন পীড়া হইয়াছিল, এখন সারিয়াছে। আপনি দেবতা; আপনি না জানিতেছেন কি? পাপের আক্রমণে আমার এই দশা হইয়াছে। স্ত্রীলোকের যে পাপ ঘটিলে সর্ব্বনাশ হয়, এই পাপীয়সীর তাহাই ঘটিয়াছে। সেই পাপের প্রাবল্যে আমি সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি। তন্মধ্যে নারীজীবনের সার দেবতা স্বামীর সহিত কল্পনাতীত অসদ্ব্যবহার অন্যতম। আমার পাপের পরিমাণ আমি পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই এবং পাপানুষ্ঠানকে অপ্রিয় বলিয়া কখনও জ্ঞান করি নাই। কিছু দিন হইতে সহসা উক্তয় বোধই আমার জন্মিয়াছে। কোন প্রায়শ্চিত্তেই আমার এ পাপরাশি ধৌত হইবে না, তাহা আমি বুঝিয়াছি। আমার কালও পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। আপনি দেবতা। এ অবস্থায় আমার কি কর্ত্তব্য যদি কৃপা করিয়া বলিয়া দেন, তাহা হইলে এখনও তাহা করিবার চেষ্টা করি।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আপনার কথা শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। কিন্তু মা প্রায়শ্চিত্তের জন্য আপনি ব্যাকুল হইবেন না। আপনার হৃদয় যখন অনুতাপে দগ্ধ হইতেছে, তখন ভগবানের ব্যবস্থ[illegible] চরম প্রায়শ্চিত্তেরই অনুষ্ঠান হইতেছে জানিবেন। আপাততঃ আপনাকে অন্য সকল চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, ত্রিভঙ্গ মুরলিধর শ্যামসুন্দরকে চিন্তা করিতেই পরামর্শ প্রদান করিতেছি। আপনার তাহাতে দৈহিক রোগের যাতনা বিদূরিত হইবে এবং অন্তঃকরণও শান্তি লাভ করিয়া প্রসন্ন হইবে। তাঁহার কৃপা হইলে সর্ব্বপ্রকার পাপের মলিনতা তৎক্ষণাৎ বিধৌত হইতে পারে; অতএব আপনি কায়-মনোবাক্যে কেবল তাঁহারই চিন্তা করিতে থাকুন।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"যে আজ্ঞা। আমি কখনও দীক্ষিত হই নাই, আজ আমার দীক্ষা হইল। আপনি আমার গুরুদেব। আপনাকে প্রণাম করি।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"ভগবান্‌কে প্রণাম করুন; তিনি আপনার সকল কামনা পূর্ণ করিয়া দিবেন। শুনিয়াছি আপনি প্রভূত বিত্তশালিনী। আপনার সঙ্গে আপনার স্ব-সম্পর্কীয় লোক কে আছেন?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"এ সম্পত্তি আমার নহে। আমার স্বামীর সম্পত্তি, আমি বঞ্চনা করিয়া হস্তগত করিয়াছি। জগতে আমার স্বামী ছাড়া সম্পর্কীয় লোক আর কেহ নাই। তাঁহাকে আমি স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়াছি। শুনিতেছি অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট-ভো

করিয়া তিনি বোধ হয় সাহায্য প্রার্থনায়, এখান পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। কিন্তু আমার দ্বারবানগণ, আমার পূর্ব্ব প্রকৃতি জানিত বলিয়া, তাঁহাকে অবমাননা করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। তাঁহার সহিত আমার আর সাক্ষাৎ হইবে না; যেরূপ দুর্ব্যবহার করিয়াছি, তাহার পর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা। সে ইচ্ছা আমার আর নাই। কিন্তু তিনি কোথায় আছেন সন্ধান করিয়া তাঁহার সম্পত্তি তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে।

উমাশঙ্কর জিজ্ঞাসিলেন,—"বঙ্গদেশের কোন্ স্থানে আপনার নিবাস ?

বিধুমুখী বলিলেন,—"সোণাপুর।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আপনি চিন্তিত হইবেন না। আমি আপনার স্বামীর সন্ধান করিব এবং আবার অগুই বৈকালে আপনার সন্ধান লইতে আসিব। পাপের পথে স্খলিত-পদ হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে; কিন্তু যে ব্যক্তি, ত্বরায় আপনার ভ্রান্তি অনুভব করিয়া পাপ পরিহার করে, ও তজ্জন্য আন্তরিক অনুতপ্ত হয়, সে ব্যক্তি ইহ লোক ও পর-লোক উভয় স্থানেই ক্ষমা প্রাপ্তির যোগ্য। আপনি সরল ভাবে পাপ স্বীকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহা নিতান্ত শুভ লক্ষণ। এক্ষণে পাপ আপনার অধীন হইয়াছে, আপনি আর পাপের অধীন নহেন। আপনাকে দর্শন করিয়া আনন্দিত হইলাম। প্রার্থনা করি ভগবানের কৃপায় আপনি অচিরে সকল প্রকার শান্তির অধিকারিণী হইবেন। আমি এক্ষণে বিদায় হই মা ?"

বিধুমুখী সাশ্রুনয়নে বলিলেন,—"এমন মধুমাখা কথা জীবনে কখন শুনি নাই, এমন সদয় ব্যবহার জীবনে কখন দেখি নাই। আমার হৃদয় এখনই অনেক প্রসন্ন হইয়াছে। আজ আমার সুপ্রভাত। আবার কখন দেব-দর্শন ঘটিবে ?"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"বৈকালেই আমি আসিব মা! আপাততঃ আপনি শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তা পরিত্যাগ করিবেন না।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"না। আমার যেমন পাপের সীমা নাই, আপনার সেইরূপ দয়ার সীমা নাই। এই জন্যই সাহস করিয়া আবার দর্শনের প্রার্থনা করিতেছি।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আপনি সে জন্য চিন্তা করিবেন না। আমি আপনার স্বামীর সন্ধান করিব এবং বৈকালে আসিয়া আপনাকে সংবাদ দিব।"

বিধুমুখী প্রণাম করিলেন। উমাশঙ্কর প্রস্থান করিলেন।

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলে বিধুমুখী ভাবিতে লাগিলেন,—"এমন রূপ কখন দেখি নাই, এমন কথা কখন শুনি নাই। হৃদয়ের ভার যেন অনেক কমিয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করিব কি ? না। ধর্ম্মে আমার কাজ কি ? পাপী-য়সীর আবার ধর্ম্ম কি ? কেবল পাপ লইয়া আসিয়াছি, পাপ লইয়াই যাইব। পাপের বোঝা একটুও কমাইব না। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমময়, শান্তিময়, সুখময়। আমি প্রেমহীনা, শান্তি-হীনা, সুখহীনা। আমি তাঁহাকে ডাকিব না, আমি তাঁহাকে ভাবিব না। প্রেম, শান্তি-সুখের সহিত আমার জীবনে ও মরণে চির-বিচ্ছেদ। সন্ন্যাসীর নিকট স্বীকার করিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করিব। তাঁহার নিকট মিথ্যা-বাদিনী হইব। ক্ষতি কি ? জীবনে কখন মিথ্যা ব্যবহার করি নাই ? এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু করিয়াছি, সকলই মিথ্যা, সকলই কপ-টতা, সকলই অসার। তবে আর একটা

মিথ্যার ভয় কি? মিথ্যার সমুদ্রে একটা মিথ্যা বাড়িলই বা।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

উমাশঙ্কর নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে বিধুমুখীর ভবন হইতে বহির্গত হইলেন। পাপ ও পুণ্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ইত্যাদি বিষয়ক নানা চিন্তা তাঁহার চিত্তকে অধিকার করিল। তিনি মনে করিলেন, মনুষ্য-সমাজ পুরুষের শত শত উৎকট অপরাধ সহজেই ক্ষমা করে; কিন্তু নারীর একটি অপরাধও ক্ষমা করিতে চাহে না। শিক্ষা ও ধর্ম্মের বলে চরিত্রের বল হয়। নারী স্বভাবতঃ দুর্ব্বল-চিত্ত, তাহাতে আবার মনুষ্য-সমাজ তাহাদের সুশিক্ষা ও সুনীতি লাভের বিশেষ সুযোগ করিয়া দেয় না। অথচ তাহাদের নিকট প্রত্যাশা করে অনেক; তাহাদের স্কন্ধে দায়িত্ব প্রদান করিয়াছে বড়ই কঠিন ও ভয়ানক। ইহার অন্য কোন সদুপায় নির্দ্ধারণে উদাসীন থাকিয়া; কেবল এক কঠোর অবরোধ পদ্ধতির উপর নির্ভর করিয়া, সমাজপতিরা নিশ্চিন্ত আছেন। আর কিছু উপায় চিন্তা করা উচিত নহে কি? বড়ই বিষম সমস্যা।

তাহার পর তাঁহার মনে হইল, 'এই নারীর জীবনের কোন ঘটনাই আমি জানি না। দেখিতেছি ইনি ধনশালিনী ও যুবতী। জানি না কেন ইহার সর্ব্বনাশ ঘটিল। হইতে পারে স্বামীর উপেক্ষা এইরূপ পতনের কারণ। কিন্তু সেই স্বামী সহস্র পাপ করিয়াও স্বচ্ছন্দে সমাজে সমাদৃত হইয়া কাল কাটাইতে পারিবেন; কিন্তু মনুষ্য-সমাজে এ সুন্দরীর আর স্থান নাই। যে কারণেই সর্ব্বনাশ ঘটুক আপাততঃ এ নারী নিশ্চয়ই দয়ার পাত্র। একে তো এই নারীর রোগের অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় না যে, ইহার জীবন অধিক দিন স্থায়ী হইবে। তাহার পর ইহার চিত্তের ভাবান্তর ও অনুতাপ ইহাকে বাস্তবিকই দয়ার পাত্রই করিয়া তুলিয়াছে। দয়া সকলকেই করা ধর্ম্ম। এ দুঃখিনী কেন দয়ায় বঞ্চিত হইবে? আমি ইহার স্বামীকে অন্বেষণ করিব এবং সাধ্যমত জ্ঞানোপদেশ দিয়া ইহাকে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ করিবার চেষ্টা করিব।'

তাহার পর তাঁহার মনে হইল 'যদি কোন উপায়ে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ ঘটাইতে পারি তাহাতে পুণ্য ভিন্ন পাপ নাই। কিন্তু কাশী তো একটা লোকারণ্য বিশেষ; এ স্থানে তাঁহাকে সন্ধান করিয়া বাহির করা সহজ নয়; তথাপি চেষ্টা করিব। নীলরতন বাবুকে ও অন্যান্য অনেককে বলিব। অবশ্য সন্ধান হইবে। এই সময় হরকুমার বাবু এখানে থাকিলে অনেক উপায় হইত। বৈকালে আবার আসিব। ইহার স্বামীর বৃত্তান্ত আর একটু ভাল করিয়া জানিব।

এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা করিতে করিতে উমাশঙ্কর ধীরে ধীরে ও অবনত মস্তকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথের মধ্যে একস্থানে বহুলোকের জনতা। কেহ ধর ধর! কেহ কর কি?' ইত্যাদি শব্দে চীৎকার করিতেছে। কেহ বলিতেছে, 'আহা বড় মারিয়াছে।' কেহ বলিতেছে, না—বড় মারে নাই, দুই ঘা জুতা মারিয়াছে।' কেহ বলিতেছে, আহা, কেন মারিল? অন্যেরা বলিতেছে,

'চোর হইবে হয়ত।' আর একজন বলিল,—'মার শালাকে।'

উমাশঙ্কর বুঝিলেন, কে কাহাকে মারিতেছে। অমনই মনে হইল, যদি রক্ষা করিতে পারা যায়, তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক। তিনি জন-সমাগমের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কাশীতে অনেকেই তাঁহাকে চিনিত এবং অনেকেই তাঁহাকে সম্মান করিত। এজন্ত অনেকেই সরিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে পথ করিয়া দিল।

তিনি দেখিতে পাইলেন, একটা অতি কুৎসিতদর্শন স্থূলাকার কৃষ্ণবর্ণ লোক হেট মুণ্ডে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার গায়ের দুই এক জায়গায় ধূলার দাগ লাগিয়া রহিয়াছে। আর একটা নিতান্ত বিলাসী খোস-পোষাক বাবু গোছ লোক, এক পায়ের জুতা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং হুঙ্কার সহকারে ঐ কৃষ্ণকায় ব্যক্তির প্রতি মধ্যে মধ্যে বিকট দৃষ্টিপাত করিতেছে। এ ব্যক্তির ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া তাহাকে উন্মাদ বলিয়াই উমা-শঙ্করের বোধ হইল।

উমাশঙ্কর সন্নিহিত একটা লোককে জিজ্ঞাসিলেন,—"ব্যাপার কি?"

সে বুঝাইয়া দিল,—"এই বাবু লোকটা ঐ ছোটলোকটাকে কয়েক ঘা জুতা মারিল। কেন জানি না। বেশী কথা কিছু শুনি নাই। কেবল শুনিয়াছি, বাবুটা বলিতেছে; আবার কাশী আসিয়াছিস্ পাজি? তুই এখানে আসায় আমার সর্ব্বনাশ হইল। আমি তোর হাড় এক ঠাঁই, মাস এক ঠাঁই করিব জানিস্। ছোট লোকটাও ইহার উত্তর দিয়াছে। সে বলিয়াছে, মানুষের যতদূর সর্ব্বনাশ করিতে পারা যায়, তুমি আমার তাহাই করিয়াছ। আমি কখন তোমার কোনই অনিষ্ট করি নাই, করিতে আমার সাধ্যও নাই। এইরূপ দুই চারি কথার পর বাবুটা এই লোকটাকে জুতা মারিয়াছে।"

উমাশঙ্করের মনে কৃষ্ণবর্ণ লোকটার ভাব দেখিয়া, কিছু কষ্ট হইল। সে ব্যক্তি অপমানিত হইয়া নীরবে অধোমুখে দাঁড়াইয়া যেন কতই চিন্তা করিতেছে। উমাশঙ্কর নিকটস্থ হইয়া বাবুকে জিজ্ঞাসিলেন,—"মহাশয়! এ ব্যক্তি আপনার কি ক্ষতি করিয়াছেন?"

বাবু বলিলেন,—"তুমি কে হে বাবু মাথায় নামাবলি বেঁধে, ঝুলি কাঁধে করে মধ্যস্থ কর্‌তে হাজির হলে? কে তোমাকে ডাক্‌ছে বাবা? লাট সাহেব না কি? যাও আপনার পথ দেখ।"

উমাশঙ্কর বুঝিলেন লোকটা সুরাপান করিয়াছে। বলিলেন,—আমি আপনাকে অন্যায় কথা কিছুই জিজ্ঞাসা করি নাই। এ ব্যক্তিকে যখন আপনি প্রহার করিয়াছেন তখন ইনি নিশ্চয় আপনার কোন ক্ষতি করিয়াছেন। সেই কথাটা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি মাত্র। আপনি তাহাতে রাগ করিতেছেন কেন?"

বাবু বলিলেন—"তুমি কি দিনদুনিয়ার মালিক না কি যে তোমাকে সকল কথা জানাইতে হইবে? আমার খুসি আমি মারিয়াছি। তোর তা কি রে চাষাজাদা?

উমাশঙ্কর সবিনয়ে বলিলেন—"আমার কিছু নহে সত্য। কিন্তু মহাশয় অন্যায় পূর্ব্বক কেহ কাহারও উপর অত্যাচার করা নিয়ম-বিরুদ্ধ। আপনি আমাকে দুটা গালি দিলে আমার গা পচিয়া যাইবে না, কিন্তু এরূপ ব্যবহার ভাল নহে।"

বাবু বলিলেন—"তুই বেটা তো বড়ই বেয়াদব দেখিতেছি। তোর অদৃষ্টেও মারি

আছে! আমার কাজের ভাল মন্দ বিচার করিবার তুই কেরে বেট।।"

এই বলিয়া বাবু হস্তস্থিত জুতা লইয়া উমাশঙ্করকে তাড়া করিলেন। তৎক্ষণাৎ বহুলোক আসিয়া বাবুকে আক্রমণ করিল এবং দেখিতে দেখিতে বাবুর উপর জুতা, কিল, চড়, চাপড়, ধাক্কা বর্ষণ হইতে লাগিল। তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার কোঁচান চাদর লোকের পায়ে পায়ে কোথায় চলিয়া গেল, উত্তম জামা ছিঁড়িয়া গেল, দেহ ধূলিমাখা হইল, মাথার টেরি ভাঙ্গিয়া চুল উচ্ছৃঙ্খল হইয়া গেল। উমাশঙ্কর সকল লোকের হাতে পায়ে ধরিয়া তাহাদিগকে এই প্রহার কার্য্য হইতে বিরত করিতে লাগিলেন।

বাবু বুঝিলেন, তাঁহার ক্রোধ বা প্রতাপ তাঁহাকে এ স্থানে রক্ষা করিতে পারিবে না। তখন তিনি ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে প্রস্থান করিলেন।

তখন উমাশঙ্কর সেই কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তির নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—আপনি কে। কেন উনি আপনাকে প্রহার করিলেন।

কৃষ্ণকায় ব্যক্তি বলিল—আমি কে তাহা বলিয়া কোন ফল নাই। বলিতে ইচ্ছাও নাই। আমি হতভাগা। উনি এক সময়ে আমার ক্ষুদ্র চাকর ছিলেন। তাহার পর আমার সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বনাশ করিয়া ক্রমে আমাকে পথের ফকির করিয়া দিয়াছেন। সম্প্রতি বিনা কারণে নিরপরাধে আমাকে জুতাও মারিলেন। আমার অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ। দুর্গতির চূড়ান্ত হইয়াছে, আরও কি হইবে জানি না।

উমাশঙ্কর জিজ্ঞাসিলেন—আপনি এখানে কোথায় থাকেন।

হতভাগা পুরুষ বলিল—ভিক্ষা করিয়া খাই যেখানে সেখানে থাকি।

উমাশঙ্কর বলিলেন—আপনি আমার সঙ্গে আসুন। আপনার আহারাদির আমি সুব্যবস্থা করিয়া দিতেছি।

উভয়ে প্রস্থান করিলেন।

পাঠকগণ বুঝিতে পারিয়াছেন বোধ হয় ঐ বাবু লোকটি হরিচরণ আর সেই কৃষ্ণকায় কুৎসিত লোকটি শ্যামলাল। শ্যামলালের দুর্গতির বোধ হয় চূড়ান্তই হইয়াছে। শ্যামলাল এখন ভিক্ষুক হইয়া পড়িয়াছেন। বিধুমুখী ও হরিচরণ পশ্চিমে চলিয়া আসার পর ক্রমশঃ শ্যামলালের কষ্ট পূর্ণমাত্রায় বাড়িয়া উঠিয়াছে। ক্রমে তিনি আহারাদির কষ্টও ভোগ করিয়াছেন। একটি পয়সাও কোন উপায়ে আর হস্তগত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। বিধুমুখী ও হরিচরণের ধর্ম্ম জ্ঞান নিতান্ত কম বলিতে পারি না; কারণ তাঁহারা আসিবার সময় বাটীর সকল জিনিস পত্র চাবি দিয়া ও চারি জন দ্বারবান্ ব্যতীত আর সকল লোককে জবাব দিয়া আসিলেও শ্যামলালের আহারের ব্যবস্থা করিতে ভুলেন নাই। এক ব্রাহ্মণের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া শ্যামলালকে দুই বেলা চারিটি চারিটি ভাত দিবার ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছিলেন। কখন মন্দ ভোজন অভ্যাস না থাকায় সেই ব্রাহ্মণ প্রদত্ত কুৎসিত অন্ন শ্যামলালকে বড়ই কষ্ট দিতে লাগিল।

কিন্তু তাহাও ক্রমে বন্ধ হইয়া গেল। যে লোকের উপর শ্যামলালকে খাইতে দিবার ভার দিয়া হরিচরণ ও বিধুমুখী চলিয়া আসিয়াছিলেন, সে, টাকা ফুরাইয়া গিয়াছে বলিয়া, এবং গরিব মানুষ কোথায় পাইবে জানাইয়া শ্যামলালকে অন্ন দেওয়া বন্ধ করিল। তখন হতভাগা শ্যামলাল, নিরুপায় হইয়া, হরিচরণকে পত্র

লিখিলেন ; বিধুমুখীর নিকট ভিক্ষা চাহিলেন। সে পত্র তাঁহাদের হস্তগত হইল কি না ভগবান্ জানেন ; কিন্তু কোনই উত্তর শ্যামলাল পাইলেন না এবং তাঁহার সম্বন্ধে আর কোন ব্যবস্থাও হইল না। শ্যামলাল জামা বিক্রয় করিলেন, জুতা বিক্রয় করিলেন—অতীব কষ্টে দিন কাটাইতে লাগিলেন। শেষে এই নরাধম কাপুরুষ, শয্যা বিক্রয় করিয়া, দশ টাকা সংগ্রহ করিলেন এবং হরিচরণ ও বিধুমুখী কাশী আসিয়াছেন শুনিয়া, কাশীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এখানে আসিয়া ভিক্ষাই তাঁহার অবলম্বন হইয়াছে। বিধুমুখীর সহিত দেখা করিবার তিনি চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু দ্বারবানেরা জানিত বিধুমুখীর অন্দরে শ্যামলালের প্রবেশাধিকার নাই ; এজন্য তাহারা তাঁহাকে অন্তঃপুরে যাইতে দেয় নাই, অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। কল্য এই ঘটনা হইয়া গিয়াছে। তথাপি অদ্য হতভাগা নিস্তেজ ধিকৃত শ্যামলাল আবার বিধুমুখীর ভবনে যাত্রা করিতেছে। যদি কোনরূপে একটা সংবাদ পাঠাইয়া, বা কোন প্রকারে সাক্ষাৎ করিয়া স্ত্রীর দয়া আকর্ষণ করিতে পারে, ইহাই হতভাগ্যের কামনা। সে তদুদ্দেশে গমন করিতেছিল। পথি-মধ্যে হরিচণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। হরিচরণকে দেখিয়া, নরপ্রেত শ্যামলালের বড়ই আহ্লাদ হইল। সে মনে করিল আর কিছু হউক বা না হউক, আপাততঃ হরিচরণ নিশ্চয়ই তাহাকে কিছু অর্থ-সাহায্য করিবে। সে হরিচরণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। তাহার পর যাহা যাহা ঘটিল, তাহা পাঠকগণের অবিদিত নাই। হরিচরণের জুতা খাওয়া পর্য্যন্ত তাহার অদৃষ্টে ছিল। তাহাই হইল।

হরিচরণ কল্য বিধুমুখীর নিকট বড়ই অনাদর ও অপমান ভোগ করিয়াছে। সে ইদানীং অনেক অপমান ও অনাদর ভুগিতেছে বটে, কিন্তু তাহা বড় গ্রাহ্য করে নাই। কল্যকার ব্যাপার সে বড়ই গুরুতর বলিয়া মনে করিয়াছে এবং বুঝিয়াছে, বিধুমুখীর নিকট তাহার সমাদরের একবারেই শেষ হইয়াছে এবং বিধুমুখী সম্পূর্ণ রূপে তাহার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু বিধুমুখীর সহিত একবারে সম্পর্কটা শেষ হয় ইহা তাহার বাঞ্ছনীয় নহে। সত্য বটে সে বিলক্ষণ দশ টাকা সংস্থান করিয়া লইয়াছে ; কিন্তু তাহার ব্যয় অনেক। বিধুমুখী হাতে থাকিলে খরচের ভাবনাটা থাকে না, বাবুগিরি চলে ভাল, সর্ব্বপ্রকারেই সুখে থাকা যায়। বিধুমুখীর এ পরিবর্ত্তন সহসা ঘটে নাই। অনেক দিন হইতে বিধুমুখী ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছে; অনেক দিন হইতে তাহার মনের ভাব কেমন বদলাইয়া গিয়াছে ; অনেক দিন হইতেই সে সময়ে সময়ে স্বামীর কথা ও স্বামীর প্রতি অত্যাচারের কথা বলিতেছে ; অনেক দিন হইতেই হরিচরণকে ছোটলোক বলিয়া জ্ঞান করিতেছে এবং অনেক দিন হইতেই সে হরিচরণের দুর্ব্যবহারের জন্য অনুযোগ করিয়া আসিতেছে। ইহাতে হরিচরণ বুঝিয়াছে যে, বিধুমুখীর মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বিধুমুখীকে সে বিদ্রূপ করিয়াছে, বৈষ্ণবী হইবার পরামর্শ দিয়াছে, হরিনাম সার করিতে বলিয়া তামাসা করিয়াছে। সে মনভাঙ্গা যে এত দূরে দাঁড়াইবে, ইহা সে কখন মনে করে নাই। এখন সে বুঝিয়াছে, বিধুমুখী রূপ সোণার পাখী শিকল কাটিয়াছে। এ পরিবর্ত্তন কেন ঘটিল ? যাহাই হউক, আশা কে সহজে ত্যাগ করে ? হরিচরণ মনে করিল, একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না, দেখিতে হইবে বিধুমুখীর মন ফিরে কি না। হয়ত রাগের বশেই

বিধুমুখী তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। রাগ ক্রমে পড়িয়া যাইতে পারে। ক্রমে যেমন চলিতেছিল সেইরূপ দাঁড়াইতে পারে। সে এইরূপ ভরসায় বুক বাঁধিয়া, আজি প্রাতে আবার বিধুমুখীর বাটীতে প্রবেশ করিতে গিয়াছিল; কিন্তু দ্বারবানেরা তাহাকে প্রবেশ করিতে দেয় নাই, সেখানে অপেক্ষা করিতে দেয় নাই, অপমানের কথা কহিয়াছে, তখনই প্রস্থান না করিলে, প্রহার করিবে বলিয়া ভয় দেখাইয়াছে। হরিচরণ বুঝিয়াছে, সর্ব্বনাশ যতদূর হইতে হয় তাহাই হইয়াছে। সকল আশারই শেষ হইয়াছে। সে তখন শ্যামলালের উপর, বিধুমুখীর উপর, দ্বারবানের উপর মর্ম্মান্তিক রাগ করিয়া ফিরিতে বাধ্য হইয়াছে। পথে সহসা শ্যামলালের সহিত অসম্ভাবিত সাক্ষাৎ। তখনই সেই সুরাপায়ী বর্ব্বরের মনে উদয় হইয়াছে যে, এই শ্যামলালের এখানে আগমনই তাহার সর্ব্বনাশের কারণ। তাহার পর শ্যামলাল সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে। সে কথাটা মর্ম্মাহত হরিচরণ বিদ্রূপ বলিয়াই মনে করিয়াছে। সে, ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া পায়ের জুতা খুলিয়া শ্যামলালকে প্রহার করিয়াছে। হায়! এক দিন প্রভুর সন্তোষের নিমিত্ত যে ব্যক্তি কোন হীন কর্ম্ম সম্পাদনে পশ্চাৎপদ হয় নাই, সে আজি স্বচ্ছন্দে সেই প্রভুকে প্রহার করিল! যাঁহার অনুগ্রহই এক সময়ে যে ব্যক্তির জীবনের প্রধান প্রার্থনীয় ছিল, আজি তাঁহাকে জনাকীর্ণ রাজপথে সে অনায়াসে পাদুকা প্রহার করিল।

দোষ কাহার? শ্যামলাল, বিধুমুখী ও হরিচরণ তিনি জনের মধ্যে অধিক অপরাধী কে? অপরাধ যাহারই অধিক হউক, কিন্তু শ্যামলাল! ন্যায়ময় ভগবান্ তোমার অত্যাচার ও অবিবেচনা সমূহের যথেষ্ট সমুচিত শাস্তি হাতে হাতেই ঘটাইয়াছেন সন্দেহ নাই। কেন তুমি হতভাগা, পরনারীর সর্ব্বনাশ করিতে ব্যস্ত থাকিয়া, আপনার বিবাহিতা বনিতার দিকে একবারও দৃষ্টিপাত কর নাই? কেন তুমি কখন তাহার সহিত একটি সুখের কথাও কহ নাই? কখনও তাহাকে একটুও আদর কর নাই! তোমার পাপ অপরিসীম তাহার শাস্তিও ভয়ানক। কিন্তু এই কি তোমার শাস্তির শেষ? কে বলিতে পারে?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নিরুদ্দেশ।

অপরাহ্ন কালে বিধুমুখী, পাঁড়ে ঘাটের সেই আবাসে, সেই প্রকোষ্ঠের সেই শয্যায় অধোমুখে শয়ন করিয়া, উপাধানে মুখ লুকাইয়া, কাঁদিতেছেন। পাপের তাড়নায়, অথবা অনুতাপের প্রাবল্যে, অন্য কোন কারণে, সুন্দরীর হৃদয় বিগলিত হইয়াছে, এবং নয়ন হইতে অশ্রুধারা নিঃসৃত হইয়া উপাধান সিক্ত করিতেছে। নিকটে আর কেহ নাই। অনেকক্ষণ সুন্দরী এইরূপে রোদন করিলেন। সহসা বারান্দায় মনুষ্যাগমন সূচক পদ-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, তিনি নয়ন মার্জ্জন করিলেন এবং সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই দেখিতে পাইলেন, সম্মুখে শান্তিপূর্ণ, আনন্দপূর্ণ ও তেজঃপূর্ণ উমাশঙ্করের দেব-মূর্ত্তি। অতিকষ্টে সুন্দরী উঠিয়া বসিলেন এবং উমাশঙ্করকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—আমার পরম ভাগ্য যে, এখনই আপনার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"এ কি মা! আপনি কাঁদিতেছিলেন? আপনাকে কাতর দেখিতেছি কেন?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"কাতর! কৈ নূতন করিয়া কিরূপ কাতর হইয়াছি তাহা তো জানি না। আমার শরীর, মন সকলই অপবিত্র—পাপ-তাপে পরিপূর্ণ; সুতরাং কাতরতা আমার সঙ্গের সাথী। আর রোদনের কথা! রোদনই তো এখন আমার সম্বল। যে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়াছে, স্বেচ্ছায় চরণে কুঠারাঘাত করিয়াছে, পাপে প্রমত্ত হইয়া স্বর্গ-সুখকে পদাঘাত করিয়াছে, সে যদি না কাঁদিবে তবে কাঁদিবে কে?"

আবার বিধুমুখীর চক্ষু জল-ভরাকুল হইল। আবার তিনি নয়ন মার্জ্জন করিয়া বলিলেন,—"আমার রোদন আপনি গণনায় আনিবেন না। একদিন, দুইদিন বা দশদিনের রোদনে আমার সমাপ্তি হইবে না। অনন্ত—অনন্তকাল আমাকে কাঁদিয়াই কাটাইতে হইবে।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"রোদন বড়ই শুভ-লক্ষণ মা! হৃদয়ের নিরতিশয় কোমলতা ও দীনতা উপস্থিত না হইলে রোদন দেখা দেয় না; সুতরাং অশ্রু বারি বড়ই কোমলতাব্যঞ্জক। অহঙ্কার, তেজ, পাপের প্রাবল্য, অধর্ম্মের কাঠিন্য প্রভৃতি থাকিলে, হৃদয় কখনই একান্ত কোমল ও নিতান্ত দীন হয় না। হিতপরিবর্ত্তনের সূচনা উপস্থিত হইলেই নয়নের জল, আপনিই বিগলিত হইয়া, অন্তরে প্রেম, ধর্ম্ম ও পুণ্য-প্রবৃত্তির আবির্ভাব বিষয়ক পরিচয় প্রদান করে। অতএব মা, রোদন বড়ই মঙ্গল-জনক। ভরসা করি এই অশ্রু-বারি আপনার অন্তর-প্রদেশ হইতে পাপ পঙ্ক প্রক্ষালিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে।"

বিধুমুখীর সেই লাবণ্য-বিহীন ব্যাধি-প্রপীড়িত বদনে বিষাদের হাস্য প্রকটিত হইল। তিনি বলিলেন,—"আমার এ রোদন কোন হিত-পরিবর্ত্তনের সূচনা কি না, তাহা আমি জানি না। কিন্তু ইহা আমি জানি যে, জীবনে ও মরণে অতঃপর আমাকে নিরন্তর রোদনই করিতে হইবে। আমার জীবন আর দুই-দশ দিনের অধিক থাকিবে না, ইহাই আমার বিশ্বাস। এই দুই দশ-দিনের রোদনেই আমার রোদনের সমাপ্তি হইবে না। মরণের পরও কত যুগ, কত সংখ্যাতীত কাল আমাকে নিরন্তর রোদনই করিতে হইবে। আপনি আমার গুরু, আপনার নিকট মিথ্যা কহিব না। আমি স্বর্গ ও নরক, পাপ ও পুণ্য, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম কিছুই মানিতাম না। শরীরের মধ্যে দেহাতীত কোন স্থায়ী পদার্থ আছে, ইহাও আমি কখন স্বীকার করিতাম না। বর্ত্তমানের সুখ ব্যতীত আর কিছুতেই আমার লক্ষ্য ছিল না। সেই বর্ত্তমানের সুখ আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত, আমি সকলই করিতে প্রস্তুত ছিলাম। সহসা আপনাকে দর্শন করার পর হইতে ক্রমশঃ আমার চিত্তের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই আমি আমার ভ্রম প্রণিধান করিতে পারিয়াছি; বুঝিয়াছি, এই দেহের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ নিতান্ত অস্থায়ী ও ক্ষণিক; আর বুঝিয়াছি, এই জীবনই আমাদিগের শেষ নহে এবং ইহাও বুঝিয়াছি, হিতাহিত কর্ম্মজনিত ফল আমাদিগকে কখনই ত্যাগ করে না। এইরূপ বুঝিয়াছি বলিয়াই রোদন করিতেছি এবং অনন্ত কাল রোদনই করিতে হইবে স্থির করিয়াছি।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"শ্রীহরির জয় যে জ্ঞান মুক্তির পূর্ব্ব সূচনা, তাহাই আপনার উপস্থিত হইতেছে। জ্ঞানের উদয় হইলে, তৎক্ষণাৎ চির-সঞ্চিত পাপরাশি ভস্মীভূত

হইয়া যায়। আপনার হৃদয়ে জ্ঞানের উন্মেষ হইয়াছে। এই জ্ঞানের সম্যক্ সঞ্চার হইবামাত্র, আপনি পরম পুণ্যবতী হইয়া দেবত্ব লাভ করিবেন। আর আপনার সহিত পাপের সংস্পর্শও থাকিবে না। আপনি আমার কথামত শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তা করিয়াছিলেন কি?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"না। কেন করিব? আপনাকেই আমি পূর্ণ পুরুষ বলিয়া মনে করিয়াছি। সুতরাং আর শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তার প্রয়োজন হয় নাই। আমি কায়-মনোবাক্যে পূর্ণব্রহ্ম-জ্ঞানে আপনাকেই চিন্তা করিয়াছি।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আমি ক্ষুদ্র মনুষ্য দেবত্ব সংস্থাপনের কোন অধিকারই আমার নাই। তথাপি যদি আপনি আমাকে পূর্ণব্রহ্ম মনে করিয়াই চিন্তা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনার ফলপ্রাপ্তি সম্বন্ধে কোনই ব্যাঘাত হইবে না। এই বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ ব্রহ্মময়; মনুষ্য ও দেবতা, স্থাবর ও জঙ্গম সর্ব্বত্রই সেই মহাপুরুষ বিরাজমান। অতএব ব্রহ্মাববোধের নিমিত্ত প্রথম অধিকারীর পক্ষে, যে কোন পদার্থ অবলম্বন করায় হানি নাই।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"আপনি ক্ষুদ্র মনুষ্য হইলেও, আমি আপনাকে পূর্ণপুরুষ রূপেই বুঝিয়াছি। আপনি স্বপ্নে বিশ্বাস করেন কি? বোধ হয় করেন না। আমি আজি মধ্যাহ্নে বড়ই অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছি। মধ্যাহ্নে আমার তন্দ্রাকালে, দেখিলাম ছয় জন দুরন্ত দস্যু একত্রিত হইয়া আমাকে এক ঘোর কৃষ্ণবর্ণ সমুদ্র জলে ফেলিয়া দিল।।।আমি ক্রমে সেই জল মধ্যে ডুবিয়া পড়িলাম। সেই জল সুগভীর। বহুক্ষণে আমি তাহার তলদেশ প্রাপ্ত হইলাম। বিজাতীয় অসহনীয় যাতনায় আমার সংজ্ঞা তিরোহিত প্রায় হইল এবং সেই নিদারুণ অবক্তব্য দারুণ যন্ত্রণার প্রাবল্যে আমি অস্থির ও মৃত-কল্প হইয়া পড়িলাম। তখন মৃত্যুই আমার একমাত্র প্রার্থনীয় হইল এবং আমি একান্ত মনে কেবল মৃত্যুর নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। বুঝিলাম এই নিদারুণ যাতনার হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করা অসম্ভব ও আমার সাধ্যাতীত। এইরূপ অবস্থায় দেখিলাম, এক পরম শোভাময় তেজঃপুঞ্জ কলেবর, প্রসন্ন-বদন মহাপুরুষ সেই জলরাশি ভেদ করিয়া সমাগত হইলেন এবং আমার মস্তকে চরণ সংস্থাপিত করিয়া ও স্বকীয় দক্ষিণ হস্ত বিস্তৃত করিয়া আমাকে নিষ্কৃতির পথ দেখাইয়া দিতেছেন। তখনই আনন্দ ও সন্তোষে আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল, যন্ত্রণার দাবদাহ প্রশমিত হইল এবং অননুভূতপূর্ব্ব শান্তিতে আমার হৃদয় ভরিয়া গেল। তাহার পর তাঁহার প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইবামাত্র, আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। তখন যে যাতনা ও পরিতাপ আমার নিত্য-সঙ্গী তাহারা আসিয়া আমাকে অধিকার করিল। তখন স্বপ্ন-দৃষ্ট ক্ষণিক সুখ স্মরণ করিয়া আমি নিরন্তর রোদন করিতে লাগিলাম এবং বুঝিলাম, অতঃপর রোদনের সহিত আমার অপরিহার্য্য সম্বন্ধ। কিন্তু সে কথা যাউক। আপনি বলিতে পারেন কি আমি স্বপ্নে যে মহাপুরুষকে দর্শন করিয়াছি তিনি কে?"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আমার বোধ হয় তিনি দেবতা।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"তবে সে দেবতা আপনি। আমি স্বপ্নে আপনাকেই দর্শন করিয়াছি। তবে এ প্রত্যক্ষ দেবতা পরিত্যাগ করিয়া আমার অন্য দেবতা চিন্তা করিবার প্রয়োজন কি? আমি অতঃপর নিরন্তর আপ-

নাকেই ধ্যান করিব এবং অন্তরের দুঃখ-শান্তির নিমিত্ত আপনার চরণোদ্দেশেই কাঁদিব।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"ভগবান্ নিশ্চয়ই আপনার শান্তি বিধান করিবেন। আপাততঃ আমি আপনার স্বামীর সন্ধান পাইয়াছি এবং তাঁহাকে, উপযুক্ত স্থানে, আহারাদির সুব্যবস্থা করিয়া রাখিয়া দিয়াছি। আপনি অনুমতি করিলেই আমি তাঁহাকে আপনার নিকট উপস্থিত করিতে পারি।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"তাঁহার সহিত সাক্ষাতে আমার আর প্রয়োজন নাই। আপনি কৃপা করিয়া তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করিবেন। তিনি বিষয়-বুদ্ধি-হীন বিলাসী ব্যক্তি! আপনি তাঁহার প্রতি দয়া রাখিবেন। যখন আপনার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছে, তখন তাঁহার বাহ্য ও আন্তরিক কোন কষ্টই আর থাকিবে না। আপনি তাঁহাকে বলিবেন, তাঁহার পাপীয়সী পত্নী আর তাঁহাকে মুখ দেখাইবে না। আমি পূর্ব্বে যত দুর্ব্বল ছিলাম, এক্ষণে তত নহি। আমার জীবন সহসা যদি না যায়, তাহা হইলে তাঁহার সম্পত্তির প্রত্যর্পণ সূচক যে দলিল আমি লেখা-পড়া করিয়াছি, তাহা যখন ইচ্ছা রেজিষ্ট্রী করিয়া দিলেই চলিবে। বিষয়-সম্পত্তি সমস্তই তাঁহার। তাঁহার অন্ন-বস্ত্র গ্রহণ করিতে, বা তাঁহার অর্থের ব্যবহার করিতে আমার কোনই অধিকার নাই। অতএব আমি আর সে সকল কিছু করিব না। অতঃপর, যদি অধিক-দিন জীবিত থাকিতে হয়, তাহা হইলে আপনার চরণ চিন্তা করিতে করিতে ভিক্ষা করিয়া খাইব। স্বামী দেবতার নিকট আমার আর কোন প্রার্থনা নাই। আপনার কৃপায় আমার শরীর ও মানসিক অসুখ ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে; প্রভুর এ কৃপায় যেন বঞ্চিত না হই। আপনি আমাকে চরণ-ধূলা প্রদান করিয়া ধন্য করুন।"

তখন সেই ব্যাধি-ক্লিষ্টা নারী স্বচ্ছন্দে আসিয়া উমাশঙ্করের চরণ-ধূলা গ্রহণ করিয়া মস্তকে ও বক্ষে প্রলিপ্ত করিলেন। উমাশঙ্কর বলিলেন,—"ভগবানের কৃপায় আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। আমি এক্ষণে প্রস্থান করি; আপনার স্বামী যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন তাহা আমি আপনাকে অবিলম্বে জানাইব।"

উমাশঙ্কর প্রস্থান করিলেন। পরদিন প্রাতে, শ্যামলাকে সঙ্গে লইয়া, তিনি সেই ভবনদ্বারে পুনরায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তথায় পুলিশের ও অন্যান্য লোকের ভয়ানক জনতা। পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, ইন্‌স্পেক্‌টর, কোতোয়াল, জমাদার প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারী এবং আগন্তুক, দর্শন ও কৌতূহল-প্রিয় লোক-সমাগমে সেই স্থান তখন লোকারণ্য বিশেষ। উমাশঙ্কর একজন অভিজ্ঞ দর্শকের মুখ হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। গত রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর হইতে বিধুমুখী অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন। কালিদাসী নাম্নী ঝি, দ্বিপ্রহর কালে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, বিধুমুখীর শয্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পায়, তথায় কেহ নাই; সে বাহিরে অন্বেষণ করিয়াও, বিধুমুখীকে দেখিতে না পাইয়া, অন্যান্য দাসীদিগের নিদ্রা-ভঙ্গ করে। তাহারা সকলে মিলিয়া নানা স্থানে বৃথা অন্বেষণ করিয়া, শেষে আমলা ও দ্বারওয়ানগণের ঘুম ভাঙ্গাইয়া, সকল কথা বলে। কেহই কোনরূপ সন্ধান করিতে না পারায়, অগত্যা আমলারা পুলিশে সংবাদ প্রদান করে; পুলিশও বিধিমতে অনুসন্ধান করিয়াছেন, তথাপি বাঙ্গালা মুলুকের এই রাণীর সন্ধান করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এক্ষণে স্বয়ং সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব মূলস্থানে

উপস্থিত হইয়া ঘটনার যথাযথ বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতেছেন।

উমাশঙ্কর ও শ্যামলাল এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন। তখন কি কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া, উমাশঙ্কর অনেক চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে সাহেবের কার্য্য শেষ হইলে, তিনি দল-বল সহ প্রস্থান করিলেন। তখন উমাশঙ্কর, শ্যামলালকে সঙ্গে লইয়া, ধীরে ধীরে ও অবনত বদনে, সেই ভবন-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভবন-দ্বারে একজন উচ্চশ্রেণীর কর্ম্মচারী দাঁড়াইয়া ছিলেন; তিনি শ্যামলাল ও উমাশঙ্করকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং শ্যামলালকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"মা ঠাকুরাণী সমস্ত সম্পত্তি মহাশয়ের নামে এক দানপত্র দ্বারা লিখিয়া গিয়াছেন। আপনি আপাততঃ এখানকার জিনিষপত্রের যেরূপ হয় ব্যবস্থা করুন।"

শ্যামলাল এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। উমাশঙ্কর সেই কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার পর তিনি স্বয়ং সেই ভবনে নানা প্রকার সন্ধান করিলেন; কিন্তু ফল কিছুই হইল না। বিধুমুখীর এই অত্যাশ্চর্য্য নিরুদ্দেশ ব্যাপার আলোচনা করিয়া উমাশঙ্কর কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না। কেহ কি তাঁহাকে খুন করিল? তবে লাস কোথায় গেল? তিনি স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগ করিলেন? গৃহত্যাগ করিলেই বা কোন স্থান দিয়া প্রস্থান করিলেন। যে এক দ্বার দিয়া গমনাগমন সম্ভব, তাহা দৌবারিকগণ দ্বারা সুরক্ষিত। দৌবারিকগণ বলিতেছে,—তাঁহার পলায়ন-জনিত গোলমালের পর তাহারা দরজা খুলিয়াছে; তাহার পূর্ব্বে সেই প্রকাণ্ড দরজা লৌহ অর্গল দ্বারা নিরুদ্ধ ছিল।' সেরূপ নারীর পক্ষে ছাতে ছাতে কোথাও চলিয়া যাওয়া অসম্ভব। তবে তিনি কিরূপে কোথায় গেলেন? কোন দস্যু ও দুষ্ক্রিয়াশালী লোক কোন মন্দ অভিসন্ধিতে তাঁহাকে হরণ করিল কি? কিরূপে কোথা দিয়া লইয়া গেল? ভবনের জিনিষ পত্র কিছুই অপহৃত হয় নাই; কেবল বিধুমুখীর অন্তর্দ্ধান। বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার!

দ্বাদশ খণ্ড—শেষ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

১ স্বপ্ন।

হরকুমার বাবু কাশীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, সঙ্গে অনেক লোকজন আসিয়াছে। স্ত্রী ও পুরুষ এতই লোক তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে যে, তাঁহার বাসার স্থানের সঙ্কুলান হইতে পারে না। এজন্য পার্শ্বের আর একটি বাড়ীও তাঁহাকে ভাড়া লইতে হইয়াছে। তিনি নবাগত লোকজন লইয়া এতই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে, আত্মীয় বন্ধু কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া তাঁহার ঘটিয়া উঠে নাই। কত আত্মীয়বর্গ অনেকেই তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেছেন।

অপরাহ্নকালে বৃদ্ধ সার্ব্বভৌম মহাশয় আসিলেন। হরকুমার তাঁহাকে ভক্তিসহকারে প্রণামাদি করিলেন। তখন সার্ব্বভৌম জিজ্ঞাসিলেন,—"তবে ভায়া এত দেরি হইল কেন? আমরা সকলে ভাবিয়া আকুল। শরীর ভাল ছিল তো?"

হরকুমার বলিলেন,—"আপনার আশীর্ব্বাদে শরীর ভালই ছিল। অনেক কাজের ভার লইয়া গিয়াছিলাম। কাজেই বিলম্ব ঘটিয়া পড়িল।"

সার্ব্বভৌম, মুণ্ডিত মস্তকে একবার হাত বুলাইয়া, বাম স্কন্ধস্থিত উত্তরীয় দক্ষিণ স্কন্ধে স্থাপন করিয়া, টেঁক হইতে নস্যের শামুক বাহির করিলেন এবং অনেকখানি তাম্রকূট-চূর্ণ নাসারন্ধ্রদ্বয়ে প্রেরণ করিয়া বলিলেন,—"কি তোমার কর্ম্ম তুমিই জান। যাহাই হউক, তবে ভায়া যে যে কর্ম্মে গিয়াছিলে তাহা সিদ্ধ হইয়াছে তো?"

হরকুমার বলিলেন,—"আপনার কৃপায় উদ্দেশ্য সবই আশার অধিক সিদ্ধ হইয়াছে।"

সার্ব্বভৌম ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন,—"ভাল! ভাল! যে ভাল তাহার সকলই ভাল। এখন তোমার অপেক্ষায় একটা বড় দরকারী কাজ আটকাইয়া রহিয়াছে। তা আজি বোধ হয় তুমি বড়ই ব্যস্ত। আজি সে কথা থাকুক। কল্যই হইবে। বড়ই দরকারী বিষয়।"

হরকুমার বলিলেন,—আমি ব্যস্ত আছি বটে, কিন্তু আপনার দরকারী কাজের কথা শুনিবার সময় হইবে না, এমন ব্যস্ততা এ জগতে আমার কিছুই হইতে পারে না।"

তখন তত্রত্য আসন বিশেষে চাপিয়া বসিয়া, সার্ব্বভৌম আবার নস্যের শামুক বাহির করিলেন এবং তাহাতে টোকা দিতে দিতে বলিলেন,—"কথাটা কি জান ভায়া, নবীনের তো একটা বিবাহ না দিলেই নয়।"

হরকুমার বলিলেন,—"আজ্ঞে। তা আবার বিবাহ কেন? সে বউমার কোন অশুভ সংবাদ পাইয়াছেন না কি?"

সার্ব্বভৌম অতিশয় বিরক্তির সহিত, এক টিপ নস্য নাসিকায় গুঁজিয়া, বলিলেন,—আরে রাধাকৃষ্ণ! তার শুভাশুভ কোন খবর পাই নাই, পাইতে ইচ্ছাও করি না; সে কথা যাইতে দেও। সেটা ব্যভিচারিণী, চণ্ডালের সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। ছিঃ ছিঃ! তার কথা আলোচনা করিলেও পাপ হয়!"

হরকুমার বলিলেন,—"আজ্ঞে।"

সার্ব্বভৌম বলিতে লাগিলেন,—"ছেলে উপযুক্ত, শিষ্ট, শান্ত, কতকটা পণ্ডিতও বটে। এরূপ পুত্র গৃহশূন্য ভাবে থাকা ভাল হয় না।"

হরকুমার বলিলেন,—"আজ্ঞে।"

সার্ব্বভৌম বলিতে লাগিলেন,—"সত্বর পুত্রের বিবাহটা সম্পন্ন করা আবশ্যক। এখানে একটি পাত্রী উপস্থিত হইয়াছে। ঘরও উত্তম, পাত্রীও সুন্দরী, কিছু প্রাপ্যও হইবে।"

হরকুমার বলিলেন,—"আজ্ঞে।"

সার্ব্বভৌম বলিতে লাগিলেন,—"এক্ষণে তুমি দেখিয়া মত করিলেই শুভকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি। তোমার মতামতের উপরই সমস্ত নির্ভর করিতেছে।"

হরকুমার বলিলেন,—"কাশী স্থানে কন্যা গ্রহণ করা বড়ই বিবেচনা সাপেক্ষ। কারণ এখানে অনেক বেশ্যা-কন্যা ভদ্রলোকের মেয়ে বলিয়া, দশ টাকা খরচ করিয়া সাধুলোকের ঘাড়ে চাপাইয়া দেয়।"

সার্ব্বভৌম বলিলেন,—"বল কি? রাধাকৃষ্ণ। এ সকল নারকী কাণ্ড দেখিতেছি। বেশ্যাকন্যা ভদ্রলোকের সহিত বিবাহ! জাতিকুল নাশ! ক ভয়ানক!"

হরকুমার বলিলেন,—"আজ্ঞে এরূপ ভয়ানক কাণ্ড এখানে প্রতিনিয়তই ঘটিয়া থাকে। আমার চক্ষের উপরই এমন কাজ অনেক ঘটিয়াছে। শেষে জাতি কুল হারাইয়া, অনেককে সমাজচ্যুত হইয়া থাকিতে হইয়াছে।"

সার্ব্বভৌম বলিলেন,—"কি সর্ব্বনাশ! কিন্তু ভায়া, এ ক্ষেত্রে সেরূপ কোন আশঙ্কা নাই বলিয়াই বোধ হয়।"

হরকুমার বলিলেন,—"তাহা না থাকিলেই মঙ্গল। তবে আমি এখানকার কোন ক্ষেত্রই সহসা বিশ্বাস করি না। প্রথমটা এমনই দেখা যায় যে, কোন দিকে কোন গোলের অঙ্কুরও নাই। তাহার পর সহসা ই সর্ব্বনাশ বাহির হইয়া পড়ে।"

সার্ব্বভৌম কহিলেন,—"এক্ষণে উপায়?"

হরকুমার বলিলেন,—"বাবাজির যে বিবাহ দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে, তাহা আমিও বুঝিয়াছি। দেশে গিয়াও আমি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম না। আমি একটি পাত্রীর সন্ধান করিয়াছি। কুলে শীলে রূপে গুণে সেই পাত্রী সর্ব্বাংশেই মহাশয়ের পুত্রবধূ হওয়ার উপযুক্ত। বিলক্ষণ দশটাকা লাভ হওয়ারও সম্ভাবনা আছে।"

সার্ব্বভৌম উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সাগ্রহে বলিলেন,—"বল কি? তুমি আমার পরম শুভানুধ্যায়ী। তোমার স্বতঃ পরতঃ কেবল আমার হিত চেষ্টা। কিরূপ প্রাপ্তির সম্ভাবনা?"

হরকুমার বলিলেন,—"আপাততঃ বেশী কিছু নয়, তবে কমও নয়। অন্ততঃ এক হাজার কাটার অলঙ্কার পাওয়া যাইবে। পরে বিলক্ষণ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। পাত্রীর সহিত বঙ্গদেশের একজন প্রধান লোকের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সে সম্বন্ধে উপকার প্রাপ্তির আশা যথেষ্ট থাকিবে। পাত্রীর এক বিধবা মা ছাড়া আর কেহ নাই। তাঁহার কিঞ্চিৎ সম্পত্তি আছে। তাহাও পরে এই কন্যা পাইবেন।"

সার্ব্বভৌম বলিলেন,—"সাধু সাধু! তোমার বুদ্ধি বিবেচনার তুলনা নাই। বড় উত্তম সম্বন্ধ তুমি স্থির করিয়াছ। এক্ষণে কতদিনে কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিবে?"

হরকুমার বলিলেন,—"কার্য্য সম্পন্ন হইতে অধিক বিলম্ব না করিলেও করা যাইতে পারে। তবে এই সময়ে আপনাকে জানাইয়া রাখা আবশ্যক, পাত্রীর বয়স কিছু বেশী হইয়াছে। কুলীন কন্যা; ঠিক ঘর না মিলিলে অঘরে তো বিবাহ দিতে পারে না। আপনিই তাহাদের ঠিক পাল্‌টী।"

সার্ব্বভৌম বলিলেন,—"উত্তম! উত্তম! ঘর কুল তোমার সকলই জানা আছে। তুমি কি সকল দিক না বিবেচনা করিয়া সম্বন্ধ স্থির করিয়াছ? বেশী বয়সের কথা বলিতেছ? সে তো ভালই কথা। এ অবস্থায় আমাদের একটু বয়স্কা পাত্রীরই প্রয়োজন।"

হরকুমার বলিলেন,—"ঘর নির্দ্দোষ। সে বিষয়ে বেশ করিয়া না জানিয়া কি আমি কথা উত্থাপন করিয়াছি। আপনার যখন মত হইল, তখন আমি অন্যান্য আয়োজনে প্রবৃত্ত হই?"

সার্ব্বভৌম বলিলেন,—"অবিলম্বে। কিন্তু ভায়া, দেশে গিয়া পুত্রের বিবাহ দিতে আমার ইচ্ছা নাই। আপাততঃ সেখানে যাওয়াও ঘটিবে না।"

হরকুমার বলিলেন,—"প্রয়োজন কি? আপনার আশীর্ব্বাদে আমি এখানে বসিয়াই ছেলের বিবাহ দিব।"

সার্ব্বভৌম বলিলেন,—"বটে, বটে! তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। তুমি মনে করিলে না পার কি? কিন্তু ভায়া, পাত্রীকে তাহা হইলে এখানে আনাইতে হইবে তো। যাহাতে বিলম্ব না হয় তাহার ব্যবস্থা কর। আজি বোধ হয় আর ডাকে পত্র পাঠাইবার সময় নাই।"

হরকুমার বলিলেন,—"আপনি যেরূপ ইচ্ছা করেন, তাহাই করিয়া দিব। অদ্য রাত্রে পুত্রের বিবাহ দিতে যদি ইচ্ছা করেন, তাহাও হইতে পারে।"

সার্ব্বভৌম সবিস্ময়ে হরকুমারের পৃষ্ঠে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন,—"বল কি? তবে কি পাত্রী এখানেই আছেন?"

হরকুমার বলিলেন,—"আপনি আজি পাত্রী দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে ইচ্ছা করেন কি?"

সার্ব্বভৌম বলিলেন,—"তবে কি পাত্রী তোমার সঙ্গেই আছেন ভায়া?"

হরকুমার বলিলেন,—"আপনার আশী-র্ব্বাদে আমি কাঁচা কাজ করিয়া আসি নাই। যখন দেখিলাম পাত্রী পরমা সুন্দরী, একটু বয়স্কা, কিছু লাভালাভ আছে, ঘরও নিখুঁত, তখনই মনে করিলাম, এ পাত্রীর সহিত নবীন-কৃষ্ণের বিবাহ দেয়াই চাহি। দেশে আসিয়া বিবাহ করা যে সুবিধা হইবে না, তাহা কি আমি বুঝি নাই দাদা! কাজেই, এমন সর্ব্বাংশে সুপাত্রী যদি হাত ছাড়া হইয়া যায় এই ভয়ে, একেবারে পাত্রী ও পাত্রীর মাতাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি। এক্ষণে বিবাহের দিন স্থির করুন। বিশেষ আড়ম্বরে প্রয়োজন নাই। কোন রকমে দুই হাত এক হইলেই

সার্ব্বভৌম বলিলেন,—"তা বই কি, তা বই কি? ধন্য তোমার বুদ্ধি! ধন্য তোমার বিবে-চনা! তুমি যে দিন স্থির করিবে, সেই দিনই বিবাহ হইবে। তবে শুভ কর্ম্ম যত শীঘ্র শেষ হয় ততই মঙ্গল।"

হরকুমার বলিলেন,—"সে সব আমি স্থির করিব। দুই তিন দিনের মধ্যেই কার্য্য বোধ হয় শেষ হইবে। আপাততঃ মহাশয়, যখন আসিয়াছেন, তখন একবার স্বচক্ষে পাত্রী দেখিয়া গেলে হয় না?"

সার্ব্বভৌম বলিলেন,—"প্রয়োজনাভাব। ভায়া, তুমি দেখিয়া মনোনীত করিয়াছ, ইহাই যথেষ্ট। তবে তুমি যদি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে না হয় একবার দেখি।"

হরকুমার বাবু, সার্ব্বভৌম মহাশয়কে বাহিরে বসাইয়া, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, এবং অনতিকাল মধ্যে পুনরাগমন করিয়া, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় বিস্তৃত গালিচার উপর সার্ব্বভৌম মহাশয় উপবেশন করিলেন।। তাহার পর একটি নতমুখী ঈষদবগুণ্ঠনাবৃত-বদনা, পরমা সুন্দরী যুবতী, একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে ধীরে ধীরে আসিয়া, অতীব কোমলভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিল। সেই লাবণ্যময়ীর গতি ও কোমলতাপূর্ণ ভাবভঙ্গী, দেহের চম্পক সদৃশ বর্ণ, গঠনাদির পারিপাট্য দেখিয়া সার্ব্ব-ভৌম অবাক্ হইলেন। সুন্দরীর মুখে অল্প অবগুণ্ঠন ছিল এবং তিনি নিতান্ত নত বদনে দাঁড়াইয়াছিলেন। এজন্য সার্ব্বভৌম ভাল করিয়া পাত্রীর মুখখানি দেখিতে পাইলেন না। তাহা না হউক, যাহা দেখিলেন, তাহাতেই তিনি পরম পরিতুষ্ট হইলেন। একটা কথা না জিজ্ঞাসা করা পাত্রী দেখার নিয়ম বিরুদ্ধ মনে করিয়া, তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—"তোমার নাম কি মা লক্ষ্মী?"

মা লক্ষ্মীর তখন চক্ষে জল; কণ্ঠস্বর বিকৃত। তিনি সেইরূপ বিকৃত স্বরে উত্তর দিলেন,—"সতী।"

সার্ব্বভৌম বলিলেন,—"আহা কি মধুর! সাক্ষাৎ সতীর মত আকার প্রকারই বটে। তা এখন এস মা। আমার বড়ই মনের মত হইয়াছে।"

সতী সেই স্ত্রীলোকের সঙ্গে, ধীরে ধীরে প্রস্থান, করিলেন। সেই সময়ে বাটীর মধ্য হইতে শঙ্খ-বাদন শব্দ ও হুলুধ্বনি হইল।

সার্ব্বভৌম বলিলেন,—“সে অভাগীও এমনই সুন্দরী ছিল।”

সার্ব্বভৌম মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া বাহিরে আসিতে আসিতে হরকুমার বলিলেন,—“কোন চিন্তা করিবেন না দাদা; আমার উপর নির্ভর করুন, আমি আপনার যাহা ছিল অবিকল সেইরূপ করিয়া ঘর বজায় করিয়া দিব।”

“আমার সকল বিষয়ে তোমার উপরই একান্ত নির্ভর। এ বিষয়েও তুমি যাহা করিবে তাহাই হইবে। ইহার কথা কি?”

সার্ব্বভৌম সানন্দ প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মর্ম্মান্তিক।

পরদিন প্রাতঃকালে নীলরতন বাবুর প্রকাণ্ড বৈঠকখানায় অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে। নীলরতন বাবু, হরকুমার বাবু, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, তাঁহার পুত্র নবীনকৃষ্ণ, উমাশঙ্কর, প্রতিবেশী দুই চারি জন প্রবীণ ভদ্রলোক, চণ্ডী গুলিখোর, জরিফ কোচম্যান প্রভৃতি অনেকে তথায় উপস্থিত। আর উপস্থিত শ্যামলাল। ভৃত্য অনবরত তামাক দিতেছে। চণ্ডীচরণ, চক্ষু মুদিয়া ধীরে ধীরে, এক পার্শ্বে বসিয়া অতি সন্তর্পণে, তামাকু টানিতেছে। হরকুমার বাবু, শুষ্ক শালপাতার নলযুক্ত হুকা টানিয়া, যথেষ্ট ধূম উদ্গিরণ করিতেছেন। তাঁহার পার্শ্বে অনেক কাগজ পত্র খাতা প্রভৃতি। হরকুমার বাবু বলিলেন,—“শ্যামলাল বাবু, আপনি কাশী আসিয়াছেন এ সংবাদ আমি বাটীতেই জানিয়া আসিয়াছি! আপনার নিকট আজ আমি একটি গুরুতর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছি। আপনি, মনোযোগ সহকারে তাহা শ্রবণ করিয়া, উচিত ব্যবস্থা করিলেই ভাল হয়।”

শ্যামলাল বলিলেন,—“আপনার অনেক কথা শুনিয়া কাণ ঝালাপালা হইয়াছে। বিস্তর জ্বালায় পড়িয়া অতি দুঃখে কাশী আসিয়াছি। এখানে আপনি আমাকে আর উপদেশ দিয়া জ্বালাতন করিবেন না। আপনার সহিত দেখা হইবে জানিলে আমি এখানে আসিতাম না। আপনার সহিত আমার সকল সম্পর্কই শেষ হইয়াছে। তবে কেন আপনি আমাকে ত্যক্ত করেন?”

হরকুমার বলিলেন,—“আপনাকে উপদেশ দিবার আমার কোনই প্রয়োজন নাই। যে কথা আমি এখন বলিব, তাহা আপনি শুনিতে বাধ্য। সহজে না শুনেন, আইন আদালতের দ্বারা তাহা আপনাকে শুনাইব।”

শ্যামলাল বলিলেন,—“যদি সহজে কথা শেষ করিতে পারেন, ত বলুন। আইন আদালতের আমি কোন ধার ধারি না। শুনিবার মত কথা হয় আমি শুনিব, নচেৎ কোন আইন আদালত আমাকে তাহা শুনাইতে পারিবে না।”

হরকুমার বলিলেন,—“আপনি যেরূপ ভাবেই গ্রহণ করুন, আমার কার্য্য আমি করি। শুনুন শ্যামলাল বাবু, আপনি স্বর্গীয় রাধাবিনোদ বাবুর পুত্র নহেন; যে সম্পত্তি এতদিন আপনি ভোগ করিয়া আসিতেছেন, তাহা আপনার নহে। এই নবীন সন্ন্যাসী উমাশঙ্কর ৺ রাধাবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ঔরসজাত পুত্র এবং পিতৃ-পরিত্যক্ত সম্পত্তির যথার্থ উত্তরাধিকারী।”

শ্যামলাল ক্রোধ সহকারে বলিলেন,—"জুয়াচুরি মতলবটা বাহির করিয়াছ মন্দ নহে। চাকরি হইতে তাড়াইয়া দিয়াছি বলিয়া, আমাকে ভয় দেখাইবার বেশ ফন্দি বাহির করিয়াছ দেখিতেছি। তোমার একার মতলবে এ কাজ হয় নাই—আমার পরম শত্রু ঐ ভট্টাচার্য্যি ঠাকুর আর উঁহার ছেলে নবীনও ইহার মধ্যে আছে। আমি তোমাদিগকে বিলক্ষণ রকম শিক্ষা দিব। আমার স্ত্রী গতকল্য হইতে নিরুদ্দেশ হইয়াছে। আছে কি না সন্দেহ। তাহার পীড়াও খুব কঠিন। আপাততঃ বুদ্ধির ভুলে সম্পত্তি আমার স্ত্রীর হাতে গিয়া পড়িয়াছে বটে; কিন্তু ভগবান্ দয়া করিয়া সে কণ্টক দুর করিয়া দিতেছেন। তোমরা, বুঝি তাই জানিতে পারিয়া, আমাকে দম দিয়া কিছু মারিয়া লইতে চাহ।"

চণ্ডী বলিল,—"কে মহাপ্রভু আপনি! বুদ্ধিটা ত বড়ই সরু দেখতেছি। বাবার জন্মেও কখন একটান গুলি খাও নাই। তা হইলে বুদ্ধিটা কখনই এত নিরেট থাকৃত না।"

হরকুমার বলিলেন,—"আপনার নিকট কিছুই মারিয়া লইবার ইচ্ছা নাই; আপনাকে জব্দ করিবার কোনই ফন্দি নাই। শৃগাল, কুক্কুর পর্য্যন্ত এখন আপনার দুঃখে কাঁদে বুদ্ধির দোষে আপনি নিজের পায়ে নিজে কুঠার মারিয়াছেন। আপনি এখন দয়ার পাত্র। আমাদিগকে আপনি যেরূপ শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন দিবেন, তাহাতে আমরা একটুও ভীত নহি। এক্ষণে আপনি আমার কথা শুনিয়া যাউন। সমস্ত শুনিয়া আপনার যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপ কার্য্য করিবেন; আমি কোন অনুরোধও করিব না, কোনও ভয়ও দেখাইব না।"

শ্যামলাল নীরবে বসিয়া রহিলেন। হরকুমার বাবু বলিতে লাগিলেন,—"আপনার পিতার দুই বিবাহ তাহা আপনি জানেন। জ্যেষ্ঠা স্ত্রী মাতঙ্গিনী দেবীর অনেক বয়সেও সন্তান না হওয়ায়, রাধাবিনোদ বাবু শ্যামনগরের ৺নিধিরাম চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা জগত্তারিণী দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। জগত্তারিণী পরমা সুন্দরী ও গুণবতী ছিলেন; সরলতা, ভয় ও সঙ্কোচে তাঁহার দেহ পরিপূর্ণ ছিল। স্বামী-ভবনে আসার পর এক বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত মাতঙ্গিনী দেবীর বিশেষ মনান্তর ঘটে নাই। এক বৎসর পরে, জগত্তারিণীর গর্ভ-সঞ্চারের পর হইতেই, তিনি মাতঙ্গিনীর চক্ষু-শূল হইয়া উঠেন। রাধাবিনোদ বাবু, দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে বংশধরের আবির্ভাব হইতেছে জানিয়া, স্বভাবতঃ তাঁহার প্রতি একটু বিশেষ যত্ন-পরায়ণ হন। ক্রুর-হৃদয়া মাতঙ্গিনীও সঙ্গে সঙ্গে নিজের গর্ভ-সঞ্চার হইয়াছে বলিয়া মিথ্যা সংবাদ প্রচার করেন এবং গর্ভোদয় হইলে যেরূপ বমনেচ্ছা. অরুচি প্রভৃতি হইয়া থাকে, তৎসমস্তেরও ভাণ করিতে থাকেন। স-পত্নীরূপ কণ্টককে দুর করিবার জন্য তিনি এক অদ্ভুত উপায়ও অবলম্বন করেন। গঙ্গাস্নানের ছলনায় জগত্তারিণীকে সঙ্গে লইয়া, তিনি কলিকাতায় আইসেন। তথায় কালীঘাটে, পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদের নিমিত্ত এক বাসা স্থির ছিল। সে বাসায় অবস্থান কালে তিনি জগত্তারিণীকে বলেন যে, 'আমি তোমাকে এই স্থানে লোকের দ্বারা হত্যা করিয়া গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিব বলিয়াই সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি। এখানে তোমার স্বামী নাই; বেশী লোকজনও আমাদিগের সঙ্গে নাই। তুমি জান, আমার হাতে অনেক টাকা

আছে। সেই টাকার বলে, আমাদিগের সঙ্গে যে পাঁচ-সাতজন লোক আছে, তাহাদিগকে আমি সহজেই বাধ্য করিয়া ফেলিব এবং যাহা বলিতে বলিব, তাহারা বাটী ফিরিয়া তাহাই বলিবে।' অতি সরলা, নিতান্ত ভীতা জগত্তারিণী তাঁহার পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, আমার গর্ভে সন্তান আছে দিদি। তুমি আমাকে মারিলে, আমার সন্তান মারা যাইবে। আর যাহা করিলে তোমার সুবিধা হয় বল; কিন্তু আমাকে প্রাণে মারিও না।' অনেক বিবেচনা করিয়া মাতঙ্গিনী বলেন যে, 'তুই কাশী চলিয়া যা। তোর যাহা অলঙ্কার প্রতি-কার আছে এবং যে বাক্স সঙ্গে লইয়া আনিয়া-ছিস্ তাহাই তুই সঙ্গে লইতে পাইবি। আর কখন স্বামীর সহিত পত্র লেখালেখী করিতে পাইবি না; কোন খোজ-খবরও রাখিবি না; আমি প্রচার করিব, কালীঘাটে ওলাউঠা রোগে তুই মারা গিয়াছিস্ এবং এখানকার গঙ্গাতীরে তোর যথারীতি সৎকার হইয়াছে। যদি তুই কখন স্বামীর সহিত আলাপ পরি-চয়ের চেষ্টা করিস্ বা নিজের সংবাদ প্রকাশ করিস, তাহা হইলে আমি তখনই প্রমাণ করা-ইয়া দিব যে, তুই কালীঘাটে আমাদের সঙ্গ-ছাড়িয়া এক মাড়ওয়ারির সহিত পলাইয়া গিয়া-ছিস্। বৃদ্ধ স্বামীকে ত্যাগ করিবার চেষ্টায় তুই অনেকদিন ফিকির খুঁজিতে ছিলি। কালীঘাটে গিয়া, সুযোগ পাইয়া, তুই কুলে কালীদিয়া চলিয়া গিয়াছিস্। কলঙ্কের ভয়ে আমি সে কথা এতকাল বলি নাই। সঙ্গের লোকজনও এইরূপ সাক্ষ্য দিবে। সে কথা শুনিলে, তোকে গ্রহণ করা দূরে থাকুক, স্বামী তোর ছায়াও স্পর্শ করিবেন না। বাড়ীর ভাগ তোর গর্ভের সন্তান যদি জীবিত থাকে, সেও বেশ্যার পুত্ররূপে কলঙ্কিত হইয়া কোন সমাজেই স্থান পাইবে না।'

কোথায় কাশী? কেমন করিয়া সেখানে যাইব? কোথায় থাকিব? এই সকল ভাবিয়া জগত্তারিণী আকুল ভাবে রোদন করিতে লাগিলেন; কিন্তু প্রাণে মারা যাওয়া বা কোন রূপে কলঙ্কিত হওয়ার অপেক্ষা, কাশী গমনই তাঁহার শ্রেয়ঃ মনে হইল। তাঁহা-দের সঙ্গে সোণামণি নাম্নী এক প্রবীণা পাচিকা ব্রাহ্মণী ছিলেন। তিনি জগত্তারিণীর অবস্থা অনুভব করিয়া, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া কাশী যাইতে ইচ্ছা করিলেন এবং মাতঙ্গিনীর নিকট করযোড়ে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। বলিলেন, "তাঁহার বৃদ্ধকাল, সন্তানাদি নাই, দেশে ফিরিয়া আসি-বারও কোন প্রয়োজন নাই। এ অবস্থায় কাশীবাসই তাঁহার প্রার্থনীয়। অনেক বিবেচনা করিয়া মাতঙ্গিনী বলিলেন, 'যাইতে ইচ্ছা কর, যাইতে পার, কিন্তু যদি তুমি কখন এই সকল কথা প্রকাশ করিবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে তোমার ও জগত্তারিণীর উভয়েরই সর্ব্বনাশ না করিয়া আমি ছাড়িব না। তুমিই যে টাকা খাইয়া জগত্তারিণীকে কুপথে লইয়া গিয়াছ, ইহা আমি উত্তমরূপে প্রমাণ করিব। তাহা হইলে, তোমাকে ফাটক খাটিতে হইবে।' জগত্তারিণী, সোণামণির সহিত, কাশী চলিয়া আসিলেন এবং তাঁহারা দুই জনে একটী ক্ষুদ্র বাটিতে, অতি দীন ভাবে মনের দুঃখে কাল কাটাইতে লাগিলেন। গায়ে কয়েক খানি গহনা ছিল, সঙ্গের বাক্সেও দুই একখানি গহনা ও কতকগুলি প্রয়োজনীয় জিনিস ছিল। মাতঙ্গিনী দয়া করিয়া নগদ ২৫০৲ টাকা দিয়া ছিলেন। সুতরাং সামান্য ভাবে গ্রাসাচ্ছাদন চলার কোনই অসুবিধা হইল না। কাশীতে

যথাকালে জগত্তারিণী এক ভুবনমোহন সন্তান প্রসব করেন। সেই সন্তান এই মহাপুরুষ উমাশঙ্কর। সন্তানের বয়স দুইবৎসর ছাড়াইলে, জগত্তারিণীর কাশীলাভ ঘটে। তখন সোণামণি অগত্যা উমাশঙ্করকে লালন পালন করিতে থাকেন। শরীর রোগজীর্ণ হওয়ায় ক্রমে সোণামণির আসন্নকাল উপস্থিত হয়। পূর্ব্ব হইতেই মানবরূপী দেবতা যোগানন্দ স্বামীর সহিত সোণামণির পরিচয় ছিল। আসন্নকালে সোণামণি, সেই মহাপুরুষকে ডাকিয়া, তাঁহার হস্তে এই দেবশিশুকে সমর্পণ করেন। পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে তিনি ঘনানন্দের নিকট শিশুর কোনই পরিচয় প্রকাশ না করিয়া, কেবল এই মাত্র বলেন যে, এই বালক ব্রাহ্মণ-সন্তান এবং যদি কখন কাহারও এই বালকের পরিচয় জানিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তিনি বঙ্গদেশে রামনগর নামক গ্রামে গঙ্গামণি নাম্নী এক ব্রাহ্মণীর হস্তস্থিত কতকগুলি কাগজ দেখিলেই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন। সোণামণি স্বর্গলাভ করার পর হইতে, ঘনানন্দ স্বামী এ পর্য্যন্ত উমাশঙ্করকে পুত্রাধিক যত্নে শিক্ষাদি প্রদান করিতে করিতে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আসিতেছেন।

এদিকে মাতঙ্গিনী গৃহাগতা হইয়া জগত্তারিণীর ওলাউঠা রোগে মৃত্যুর সংবাদ ঘোষণা করিয়া দিলেন। রাধাবিনোদ বাবুর দুঃখের সীমা থাকিল না। কথাটা তৎকালেই আমার একটু সন্দেহজনক বোধ হইয়াছিল। বাটীতে সেই সময়ে সৌরভী নামে তন্তুবায় জাতীয়া এক বিধবা ব্যভিচারিণী ঝি ছিল। একজন দারবানের সহিত তাহার বিশেষ প্রণয় ঘটে। এই সময়ে তাহার গর্ভোদয় হয়। মাতঙ্গিনী বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে নিরাপদ স্থানে রক্ষা করেন। তাহার যে মুহূর্ত্তে প্রসববেদনা উপস্থিত হয়, মাতঙ্গিনীও সেই সময়ে প্রসববেদনা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া সূতিকাগারে প্রবেশ করেন এবং সমুচিত সময়ে ধাত্রী ডাকাইব বলিয়া, উৎকণ্ঠিত স্বামীকে নিরস্ত করিয়া রাখেন। যথাকালে সৌরভী এক পুত্র সন্তান প্রসব করিল। সেই পুত্র, ধাত্রীর কৌশলে মাতঙ্গিনীর সূতিকাগারে আনীত হইয়া, রাধাবিনোদ বাবুর সন্তান রূপে পরিচিত হইল। সেই সন্তান এই শ্যামলাল।”

হরকুমার বাবু নিরস্ত হইলেন। চণ্ডী গুলিখোর বলিল,—“দাদা, এ বেচ্ছার কাছে মহাভারত রামায়ণ কেউ লাগে না। শ্যামলাল ভায়া, বাপ মার সকল পরিচয়ই তো শুনলে; তা এখন তুমি কি বলতে চাও বল!”

শ্যামলাল বলিল,—“যে দুরাত্মা এইরূপে আমার পিতৃ-মাতৃ নামে কলঙ্ক আরোপ করিতে চাহে, তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটা আবশ্যক। এই নরাধম হরকুমার চিরকাল আমার পিতার অন্নে পালিত হইয়া এক্ষণে বৃদ্ধ বয়সে আমার পিতামাতার দুর্নাম করিতে বসিয়াছে। কি বলব, আমি এক্ষণে অক্ষম আর তোমাদের হাতে পড়িয়াছি; নচেৎ এখনই ইহার প্রতিফল দিয়া তবে কথা কহিতাম।”

হরকুমার বলিলেন,—“তোমার কোন প্রতিফল দিবার সাধ্য এখনও নাই, পরেও হইবে না। তোমার কথায় আমি রাগ করিব না। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তুমি দয়ার পাত্র। রাধাবিনোদ বাবু আমার ভাই বল, বন্ধু বল, প্রভু বল সকলই ছিলেন। তিনি তোমাকে পুত্র বলিয়াই জানিয়া গিয়াছেন। অনেক সময়ে তোমার ইতরাচরণ দেখিয়া তোমাকে বিজাতক বলিয়া তিনিও সন্দেহ না

করিয়াছেন এমন নহে। সে যাহাই হউক তিনি তোমাকে পুত্র মনে করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। সেই খাতিরে, শ্যামলাল, আমরা এখনও তোমার সহিত বাক্যালাপ করিতেছি ও তোমাকে বিছানায় বসিতে দিয়াছি। তুমি এ সকল কথা বিশ্বাস না করিলেও কোন ক্ষতি নাই। কারণ ইহার প্রত্যেক কথার অখণ্ডনীয় প্রমাণ আমার হাতে রহিয়াছে। রাজবিচারে বা দশের সমক্ষে সে প্রমাণ উত্থাপিত করিলে, তোমার কথা কহিবার কোনই উপায় থাকিবে না এবং যে পথের ভিখারী তুমি এখন হইয়াছ, তোমাকে চিরদিনই তাহাই থাকিতে হইবে। তোমার এই জন্ম-বৃত্তান্ত আমি, আর এই জরিফ কোচম্যান, পূর্ব্ব হইতেই জানি। জগত্তারিণী তখন যে মারা যান নাই, এ সন্দেহ আমাদের চিরদিনই মনে ছিল। কিন্তু তিনি কোথায় আছেন, তাঁহার কি সন্তান হইয়াছে, সে সন্তান জীবিত আছে কি না, এই সকল কোন সন্ধানই করিবার আমার সুযোগ হয় নাই। শুভক্ষণে তুমি আমাকে কর্ম্ম হইতে অবসর দিলে, তাই এই সকল সন্ধান করিবার সুযোগ উপস্থিত হইল। এদিকের সন্ধান না হইলে তোমার জন্ম-বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া এত বড় বিষটা সরকার বাহাদুরের হাতে তুলিয়া দেওয়ার অপেক্ষা যে সে একজন ভোগ করাও ভাল বিবেচনায়, আমি এত দিন নিরস্ত ছিলাম। এক্ষণে আমার সকল প্রমাণ ঠিক হইয়াছে। কোন স্থানে আর একটুও সন্দেহ নাই। ভগবানের কৃপায় প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা রাধাবিনোদের ঔরসজাত পুত্রের সন্ধান পাইয়াছি, ইহা আমার পরমানন্দের বিষয়। তাঁহার অন্নে আমার শরীর; কথঞ্চিৎ প্রত্যুপকার এ অধমের দ্বারা সাধিত হইল, ইহা আমার পরম ভাগ্য।

বলিল—"দাদা, হেলায় সব মাটি করিয়াছ! তোমার এমন সুন্দর কথার জুত, এমন পাকা বন্দোবস্ত, এর উপর যদি তুমি দুই এক টান গুলি টানিতে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই একটা অতি বড়লোক হইতে। এখনও সময় আছে; কাল হইতে ছোট ভাইয়ের পরামর্শ শুনিয়া দুই একটি করিয়া ছিটা টানিতে অভ্যাস কর দাদা।"

শ্যামলাল বলিল,—"লোকটা বলিতেছে মন্দ নয়। হরকুমারের এ গল্প গুলিখোরেরই কথা বটে। আগে ত গুলি খাইতে না তুমি? চাকরি যাওয়ার পর হইতে এই বিদ্যা শিখিয়াছ বুঝি?"

হরকুমার বলিলেন,—"ভাল দেখুন প্রমাণ"।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রমাণ।

হরকুমার বলিলেন,—"আমি এমন কোন কথাই বলিব না, যাহার অখণ্ডনীয় প্রমাণ আমার হস্তে নাই। এই প্রমাণ সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত আমি পরিশ্রম, যত্ন ও ব্যয়ের কোন ক্রটী করি নাই। স্বর্গীয় রাধাবিনোদ বাবুর সহিত আমার যেরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহাতে কর্ত্তব্যানুরোধে তাঁহার ঔরসজাত পুত্রকে অন্বেষণ করিয়া তদীয় বিষয় সম্পত্তির অধিকার প্রদান করিতে আমি বাধ্য। এত দিন আমি এই কর্ত্তব্য পালন করিতে পারি নাই; এজন্য আমি অতিশয় অপরাধী হইয়াছি সত্য। কিন্তু ভগবান্ যাহা করেন, সকলই ভালর জন্য। রাধাবিনোদ বাবুর পুত্র উমা-

শঙ্কর অধুনা যেরূপ দেব-তুল্য চরিত্র সম্পন্ন হইয়াছেন, যেরূপ শিক্ষা ও জ্ঞানে বিভূষিত হইয়াছেন, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাকে তাঁহার বর্ত্তমান সংসর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে কখনই এরূপ ঘটিতে পারিত না। এক্ষণে আমি যেরূপ পরিশ্রম করিয়া যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা আপনারা সকলে দেখুন শুনুন; তাহার পর ইচ্ছা হয় শ্যামলাল তাহা মানিয়া লইবেন, না লন রাজ-বিচারে তাঁহাকে যে পরাভূত হইতে হইবে, সে বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নাই।"

নীলরতন বলিলেন,—"তুমি যেরূপ কাণ্ডের কথা বলিতেছ, কোন উপন্যাস লেখকের কল্পনাও এরূপ ব্যাপারের অবতারণা করিতে পারে না। এক্ষণে তুমি প্রথম হইতে সব কথা বল।"

হরকুমার বলিতে লাগিলেন,—"জগত্তারিণীর বিবাহের অনতিকাল পরেই তাঁহার দরিদ্র পিতামাতা লোকান্তরিত হন। একমাত্র বিধবা জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ভিন্ন, তাঁহার আর কেহ ছিলেন না। সে জ্যেষ্ঠা ভগ্নী শ্বশুরালয়ে বাস করিতেন। জগত্তারিণীর পিতামাতার সহিত সেই কন্যা জামাতার অতিশয় মনান্তর ছিল। বিতাড়িত হইয়া কাশী আসিবার সময়, জগত্তারিণীর সহিত একটি বাক্সে কয়েকখানা অলঙ্কার ও নগদ ২৫০৲ টাকা ছিল, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেই অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া ও নগদ টাকা ব্যয় করিয়া তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের কোন বিশেষ কষ্ট হয় নাই। তাঁহার লোকান্তরের পরও ধর্ম্মপরায়ণা সোণামণির কৃপায় বালক উমাশঙ্করকে বিশেষ কোন কষ্ট পাইতে হয় নাই। উমাশঙ্করের জন্ম হইলে, কাশীধামের প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ্ শ্রীযুক্ত অদ্বৈতচরণ আচার্য্য মহাশয় বালকের এক জন্মপত্র প্রস্তুত করেন। সেই জন্ম-পত্র দেখিলে বুঝা যাইবে যে, এই বালক উমাশঙ্কর যথাসময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং জগত্তারিণীর গর্ভে ও রাধাবিনোদের ঔরসে ইহার জন্ম হইয়াছে। যিনি এই কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়াছেন, তিনি এখনও জীবিত আছেন এবং আমি ডাকিবামাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে এখানে উপস্থিত হইবেন এরূপ ব্যবস্থা আমি করিয়া রাখিয়াছি। তিনি জগত্তারিণীকে দেখিয়াছেন এবং তাঁহার বয়স আকৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধীয় সকল কথাই জানেন। আপাততঃ আপনারা সেই কোষ্ঠী দর্শন করুন।"

এই বলিয়া হরকুমার একখানি হরিদ্রা বর্ণ কাগজে লিখিত জন্ম-পত্রিকা ফেলিয়া দিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহা দেখিতে দেখিতে সবিস্ময়ে এক একবার উমাশঙ্করের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। হরকুমার বলিতে লাগিলেন,—"উমাশঙ্করের জননীকে উক্ত জ্যোতির্ব্বিদ বলিয়াছেন, 'মা! কালে তোমার এই সন্তান দেব-তুল্য ব্যক্তি হইবে। তুমি কেন এরূপ অল্প বয়স্বে এমন করিয়া আছ বলিতে পারি না; কিন্তু ভবিষ্যতে সন্তানের জন্য সুব্যবস্থা করিতে ভুলিও না।' জগত্তারিণী যখন বুঝিলেন যে তাঁহার মৃত্যুকাল নিকটস্থ তখন পাছে পিতৃ-পরিচয়ের অভাবে সন্তানকে অপমানিত হইতে হয়, ইহা মনে করিয়া এবং উক্ত জ্যোতির্ব্বিদ মহাত্মার বাক্য স্মরণ করিয়া স্বকীয় বিবাহ হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত ধারাবাহিক রূপে লিখাইয়াছিলেন। অত্রত্য গণেশমহল্লার শ্রীরামনদাস চক্রবর্ত্তী তাহার লেখক। জগত্তারিণী সামান্য লেখা পড়া জানিতেন; তিনি স্বয়ং সেই বৃত্তান্তে স্বাক্ষর করিয়াছেন। দুইজন ভদ্রলোক তাহার সাক্ষী ছিল। তন্মধ্যে

উক্ত লেখক বামনদাস চক্রবর্ত্তী, হরিপদ ভট্টাচার্য্য এবং দুর্গাপতি রায় এই তিন ব্যক্তি এখনও জীবিত আছেন এবং এক্ষণে এমন স্থানে অপেক্ষা করিতেছেন যে, আমি ডাকিবা-মাত্রই এস্থানে উপস্থিত হইতে পারিবেন। আপাততঃ আপনারা সেই লিখিত বৃত্তান্ত পাঠ করুন। ইহাতে যাহা লিখিত আছে তাহার সমস্ত মর্ম্ম পূর্ব্বেই আপনাদিগকে জানাই-য়াছি।”

হরকুমার বাবু একতাড়া কাগজ ফেলিয়া দিলেন; নীলরতন বাবু তাহা হস্তে তুলিয়া লইলেন। হরকুমার বাবু বলিতে লাগিলেন,—বিবাহের পর রাধাবিনোদ বাবু এই পরমা রূপবতী ও গুণবতী ভার্য্যা জগত্তারিণীর প্রতি সাতিশয় অনুরাগী হইয়া উঠেন। একদিন তিনি সেই অনুরাগের প্রাবল্যে জগত্তারিণীর সহিত স্বকীয় বিবাহ ও প্রেমের পরিচায়ক, একটী সুললিত সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া-ছিলেন এবং স্বকীয় প্রেমের অখণ্ডনীয় নিদর্শন স্বরূপে তাহা স্বহস্তে অতি উৎকৃষ্ট কাগজে লিখিয়া জগত্তারিণীকে উপহার প্রদান করিয়া-ছিলেন। বিবাহের অনতিকাল পরে পিতার মৃত্যুর সময়ে জগত্তারিণী একবার পিত্রালয়ে আসিয়াছিলেন। সেই সময়ে রাধাবিনোদ তাঁহাকে প্রতিদিন একখানি করিয়া পত্র লিখিতেন। প্রথম গর্ভোদয় হইলে নিরতিশয় আনন্দিত হইয়া রাধাবিনোদ বাবু জগত্তারিণীর নাম সংযোগে স্বকীয় সন্তানের আবির্ভাব সূচক এক শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। সে শ্লোক তৎকালে আমরা সকলেই দেখিয়াছিলাম এবং গণ্য মান্য অনেক ব্যক্তি তাহা পাঠ করিয়াছিলেন। বোধ হয় এই সার্ব্বভৌম মহাশয়ও তাহা অবগত আছেন”।

সার্ব্বভৌম বলিলেন,“—আমার তাহা বেশ মনে আছে। বোধ হয় আমি একটু চেষ্টা করিলে তাহা আবৃত্তি করিলেও করিতে পারি।”

হরকুমার বলিতে লাগিলেন,—“জগত্তারি-ণীর বাক্সে ঐ সকল চিঠি ও শ্লোক অমূল্য সম্পত্তির ন্যায় যত্ন সহকারে রক্ষিত ছিল। আপনারা রাধাবিনোদ বাবুর স্ব-হস্ত-লিখিত সেই সকল পত্র ও শ্লোক পাঠ করুন।”

এই বলিয়া হরকুমার বাবু আরও কতক-গুলি কাগজ ফেলিয়া দিলেন। সার্ব্বভৌম মহাশয় তৎসমস্ত গ্রহণ করিলেন।

হরকুমার বাবু বলিতে লাগিলেন,—“রাধা-বিনোদ বাবুর হস্তাক্ষর লক্ষ স্থানে এখনও বিদ্যমান আছে এবং সুন্দররূপ চিনিতে পারেন এমন অনেক লোকও বর্ত্তমান আছেন। সুতরাং সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নাই। জগত্তারিণী, এই সকল পত্রাদি ও স্বলিখিত বৃত্তান্ত পুত্রের পিতৃ-পরিচয় বিষয়ে যথেষ্ট হইবে জ্ঞান করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বে তৎ সমস্ত করুণ-হৃদয়া সোণামণির হস্তে সমর্পণ করেন। সোণামণি কিছুদিন পরে আপনার শরীর অধিক দিন থাকিবে না বুঝিয়া, বঙ্গ-দেশের রামনগর নিবাসিনী সহোদরা গঙ্গামণি দেবীর হস্তে সেই সকল কাগজ সযত্নে রক্ষা করিবার ভার প্রদান করেন। কাগজগুলির প্রয়োজনীয়তা ও মূল্য গঙ্গামণিকে বুঝাইয়া দিতে তিনি ত্রুটি করেন নাই। গঙ্গামণির সন্তান ছিল না। অন্য দুই সহোদরার দুই পুত্র আছেন। তাঁহার মধ্যে এই চণ্ডীচরণ একজন; আর একজন বর্দ্ধমানের আদালতে মোক্তারি কর্ম্ম করেন। গঙ্গামণি, মৃত্যুর পূর্ব্বে আপ-নার যে সকল সম্পত্তি ছিল, তাহা চণ্ডীচরণকে দান করিয়াছিলেন। আর সেই কাগজপত্র-গুলির দ্বারা কোন না কোন সময়ে কিছু

আর্থিক লাভ হইবে মনে করিয়া উক্ত মোক্তারকে দিয়া গিয়াছিলেন। আমি গঙ্গামণি দেবীর বাটী তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াছি। সোণামণি মরিবার পূর্ব্বে জগত্তারিণীর বৃত্তান্ত-লেখক অত্রত্য বামনদাস চক্রবর্ত্তীর দ্বারা সেই কাগজগুলি ভাল করিয়া রাখিবার নিমিত্ত গঙ্গামণিকে এক পত্র লেখাইয়াছিলেন; সেই পত্রের ছিন্ন কিয়দংশ আমি সোণামণির বাটীর জঞ্জালের মধ্য হইতে প্রাপ্ত হই। সেই ছিন্ন অংশ মিলাইয়া অনেক যত্নে আমি প্রকৃত পত্র প্রস্তুত করিয়াছি; উভয়ই আপনারা দেখুন।"

হরকুমার একখানি গলিত ও একখানি ভাল কাগজ ফেলিয়া দিলেন। তাহার পর আবার বলিতে লাগিলেন,—"তাহার পর গঙ্গামণির বাটীর উক্ত জঞ্জালের মধ্য হইতে আর একখানি পত্র পাই। সে পত্র উক্ত বর্দ্ধমানের মোক্তারের লিখিত। সেই মোক্তারের পত্র না পাইলে, এ কাগজ সকল যে তাহার হস্তগত হইয়াছে, ইহা জানিতে পারা আমার পক্ষে অসম্ভব হইত। সে পত্র এই, আপনারা দেখুন। সেই পত্রের সাহায্যে সন্ধান করিয়া মোক্তার রামচন্দ্রের নিকট হইতে, চণ্ডীচরণের কৌশলে, কাগজগুলি হস্তগত করিতে পারিয়াছি। আমি জগত্তারিণীর পিত্রালয়ে গিয়াছিলাম এবং তাঁহার বিধবা জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর বাটীতেও গমন করিয়াছিলাম। উক্ত জ্যেষ্ঠা ভগ্নীকে আমি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি; তিনি এখানেই আছেন। এতক্ষণে আপনারা বুঝিয়া থাকিবেন বোধ হয় যে, জগত্তারিণীর রাধাবিনোদ বাবুর সহিত বিবাহ, তাঁহার গর্ভ-সঞ্চার, কাশীবাস এবং এই পুত্র উমাশঙ্করকে রাখিয়া মৃত্যু, এ সকল বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণের কোনই অভাব নাই। তথাপি আর এক বিষয়ে আপনাদিগের মনে সন্দেহ হইলেও হইতে পারে। জগত্তারিণী কালীঘাটে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন, ইহাই সর্ব্বত্র প্রচার। ১২৬২ সালে রাধাবিনোদ বাবুর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১২৭৪ সালে তাঁহার গর্ভ-সঞ্চার হয়; যখন চারি মাসের গর্ভ, তখন তিনি কালীঘাটে আইসেন। সরকারী জমা খরচের খাতায় সে সম্বন্ধে অনেক খরচ পড়িয়াছে। আমি সেই সালের জমা খরচের খাতা সংগ্রহ করিয়াছি। আপনারা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, উক্ত সালের চৈত্র মাসে তাঁহারা কালীঘাট আসিয়াছেন এবং দশ দিন তথায় ছিলেন। উক্ত সালের ৭ই চৈত্র বিশেষ যোগ উপস্থিত ছিল; সেই যোগ উপলক্ষেই তাঁহারা গঙ্গা-স্নানে আসিয়াছিলেন। আমি সেই সনের পঞ্জিকা সংগ্রহ করিয়াছি। এই পঞ্জিকার সহিত জমা খরচের ঐক্য করিয়া দেখিলে, সময় সম্বন্ধে আপনাদের আর কোন গোল থাকিবে না।"

হরকুমার বাবু একখানি জীর্ণ জমা খরচের খাতা ও একখানি জীর্ণ পঞ্জিকা ফেলিয়া দিলেন। তাহার পর আবার বলিতে লাগিলেন,—"কালীঘাটে জন্ম-মৃত্যুর রেজিষ্টারী আছে। আমি সেই রেজিষ্টারী বাহির হইতে ১২৬৪ সালে ফাল্গুন, চৈত্র এবং ৬৫ সালের বৈশাখ এই তিন মাসের মৃত্যু-তালিকার সহি-মোহরযুক্ত নকল সংগ্রহ করিয়াছি। তাহাতে জগত্তারিণীর মৃত্যুর কোনই উল্লেখ নাই। সুতরাং এটা যে মিথ্যা কথা তাহার কোনই সন্দেহ থাকিতেছে না। আপনারা সেই মৃত্যু-তালিকার নকল দেখিতে পারেন।"

এই বলিয়া হরকুমার আর একটা মোহর করা কাগজ ফেলিয়া দিলেন।

চণ্ডী বলিল,—"দাদা তুমি হেলায় হারাইয়াছ। এত বুদ্ধি তোমার; যদি সকালে বিকালে বেশী না হউক দশটা করিয়াও ছিটা টানিতে, তাহা হইলে তুমি মানুষের শেরা হইতে পারিতে।"

হরকুমার বলিলেন,—"এই ঘটনার ঠিক ছয় মাস পরে—১২৫৫ সালের কার্ত্তিক মাসের ১৭ই তারিখে উমাশঙ্করের জন্ম হয়; সুতরাং কাল বিষয়ে আর কোনই গোল থাকিতেছে না। জগত্তারিণীর যখন মৃত্যু হয়, তখন রামনগরের এক কায়স্থ কাশী আসিয়াছিলেন। তিনি জগত্তারিণীর মৃত্যু সময়ে উপস্থিত ছিলেন এবং সৎকারের সহায়তা করিয়াছিলেন। বালক উমাশঙ্করকে তিনি দেখিয়াছিলেন, এবং এই বালকের ভবিষ্যৎ যে বড়ই শুভ, তাহার মাতা যে সপত্নীর শাসনে পলাতকা, তাঁহার পিতা যে বঙ্গদেশের একজন প্রধান ধনবান্ ব্যক্তি এবং কালে এই বালকেরই যে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়া সম্ভব, এ সকল সংবাদই তিনি তৎকালে শুনিয়াছিলেন ও দেশে আপনার পত্নীর নিকট সেই সংবাদ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। পত্র-লেখক মহাশয় এখন জীবিত নাই; কিন্তু তাঁহার পত্নী এখনও জীবিতা আছেন। আমি তাঁহার নিকট হইতে, অনুকূল প্রমাণ বোধে, সেই পত্রখানি সংগ্রহ করিয়াছি। তাহাও আপনারা দেখিতে পারেন।"

হরকুমার আর এক খানি পত্র ফেলিয়া দিলেন। বলিলেন,—"এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য প্রায় শেষ হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, প্রমাণ আবশ্যকের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছে। আপনারা যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমি যে যে ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিলাম, তাহাদিগকে ডাকাইয়া, বাচনিক প্রমাণও গ্রহণ করিতে পারেন।"

নীলরতন বলিলেন,—"আমরা যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে তোমার যুক্তি ও প্রমাণ আমাদিগের যথেষ্ট বলিয়াই মনে হইয়াছে। কিন্তু আমরা বুঝিলে এ বিষয়ে ফল কি?"

সার্ব্বভৌম বলিলেন,—"অদ্ভুত পরিশ্রম, অপরিসীম ধৈর্য্য ও অত্যাশ্চর্য্য কৌশল সহকারে তুমি সত্য ঘটনা প্রকাশ করিয়াছ। স্বর্গীয় কর্ত্তার দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহের বিষয় আমাদিগের ভালই জানা আছে। সে পত্নীর গর্ভোদয়ের পর কালীঘাটে মৃত্যুর কথা, সে দিনকার ঘটনা বলিয়া আমাদিগের মনে হইতেছে। সে সকল বৃত্তান্ত যে অলীক, তাহা বুঝিতে পারিয়া আজি আমাদের হৃদয় সুস্থ হইল। এ সকল বিষয়ে আমাদিগের আর কোন সংশয় নাই। কিন্তু আমাদিগের বিশ্বাসে কি যায় আইসে?"

হরকুমার বলিলেন,"—আপনাদের বিশ্বাসই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমি এজন্য মামলা মোকদ্দমা করিব না; অদ্যই অথবা কল্যই, উমাশঙ্করের নামে, রাধাবিনোদ বাবুর পরিত্যক্ত যাবতীয় সম্পত্তিতে রীতিমত দখল লইবার নিমিত্ত, লোকযাত্রা করিবে। এই মুহূর্ত্ত হইতেই সেই সম্পত্তিতে শ্যামলাল বা তাহার পত্নী বিধুমুখীর কোন দখল আমি থাকিতে দিব না। আপনারা দশজন বিজ্ঞ ভদ্রলোক সমস্ত ঘটনা শুনিয়া, আমি কোনরূপ অন্যায় বা অত্যাচার করিতেছি কি না, তদ্বিষয়ে অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেই যথেষ্ট জ্ঞান করিব। মানুষ ভ্রমশীল; হইতে পারে আমারও ভ্রম হইয়াছে। যদি তাহা হইয়া থাকে, অবশ্য বুদ্ধিমান লোকের বিবেচনায় তাহা ধরা পড়িবে। এই জন্যই আপনাদিগকে সমস্ত কথা জানাইয়া, আপনাদিগের অভিপ্রায় জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছি।

আপনারা যখন কোনও সংশয় নাই বলিতেছেন, তখনই উমাশঙ্করের বিষয় প্রাপ্তি হইয়া গিয়াছে। আমি আজন্ম বিপুল বিত্তবের দেওয়ানী করিয়া আসিয়াছি; আইন আদালত জানিতে আমার বাকী নাই; সুতরাং আমি এ জন্য একটুও ভীত নহি। উমাশঙ্কর অদ্য হইতে পিতৃ-সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। মোকদ্দমা করিতে হয় শ্যামলাল করিবেন, আমি তখন তাহার জবাব দিব।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"আমিই বা তাহা করিব কেন? দুই দিন মাত্র ঐ সন্ন্যাসী ঠাকুরের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে। আমি ঐ দেবতার গুণে মোহিত হইয়াছি। বিষয় যদি উঁহার হয়, তাহাতে আমার দুঃখ নাই। আপনি যেরূপ বলিতেছেন, ও যে সকল কাগজ পত্র দেখাইতেছেন, তাহাতে বুঝিতেছি উমাশঙ্কর জগত্তারিণী দেবীর সন্তান বটে, কিন্তু আমার যে মাতঙ্গিনী দেবীর গর্ভে জন্ম হয় নাই; তাহার বিশেষ প্রমাণ আপনি কিছু বলেন নাই।"

হরকুমার বলিলেন,—"ঠিক কথা। তাহারও প্রমাণ আমার নিকট আছে। এই জরিফ কোচম্যান এবং আমি তাহার বিশেষ প্রমাণ জানি। যখন দারবানের সহিত তোমার জননীর প্রসক্তি হয়, তখনই আমি এ সংবাদ জানিতে পারি। তাহার পর সে অন্তঃসত্বা হইলে, বাটীতে গর্ভপাতাদি পাপ ঘটিবে ভাবিয়া, আমি তাহাকে তাড়াইয়া দিতে ইচ্ছা করি। সেই সময়ে সে মাতঙ্গিনী দেবীর এক পরওয়ানা লইয়া আমাকে দেয়। মাতঙ্গিনী দেবী, সেই পরওয়ানা দ্বারা, আমাকে উক্ত দাসীর কর্ম রাখিয়া দিবার নিমিত্ত আদেশ করেন। সে পরওয়ানা আমার নিকট আছে; ইচ্ছা হয় এই দেখ। কিন্তু তদবধি উক্ত দাসীর আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। অতীব গোপনে, রাধাকিশোর জিউর মন্দিরের পশ্চাতে, ভাণ্ডা বাটীতে মাতঙ্গিনী তাহাকে রাখিয়া দেন। সে বাটীতে অন্য লোকের প্রবেশাধিকার ছিল না। তথায় লোকও কখন কেহ যাতায়াত করিত না। এক দিন এই জরিফ কোচম্যান রাত্রিকালে, বিশেষ প্রয়োজনে সেই বাটির পশ্চাদ্ভাগে গমন করিয়া, মনুষ্যের যন্ত্রণাসূচক ধ্বনি শুনিতে পায়। সাহসী জরিফ, কৌতুহল পরবশ হইয়া, ভগ্ন প্রাচীর অতিক্রম করিয়া, বাটীর মধ্যে প্রবেশ করে। সে তথায় দেখিতে পায় যে, সেই সৌরভী চাকরাণী এক সন্তান প্রসব করিয়াছে এবং বামা ধাত্রী তাহার শুশ্রূষা করিতেছে। প্রসূতি প্রকৃতিস্থ হইলে, বামা গায়ের কাপড় ঢাকিয়া, সেই সন্তান লইয়া প্রস্থান করিল। জরিফও লুকাইত স্থান হইতে নিক্রান্ত হইয়া বামার অনুগমন করিল। দেখিল বামা সন্তান সহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। অনতিকাল মধ্যে প্রচার হইল, 'বড় ঠাকুরাণী পুত্র প্রসব করিয়াছেন।' তোমার মনে পড়ে বোধ হয়, কর্তার মৃত্যুর পর এক দিন তুমি মাতঙ্গিনী দেবীকে প্রহার করিয়াছিলে। মাতঙ্গিনী দেবী তাহার প্রতিকারের জন্য আমাকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সেখানে তখন তুমিও উপস্থিত ছিলে। মাতঙ্গিনী সে সময় ক্রোধভরে কি বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহা তোমার মনে আছে কি? তিনি বলিয়াছিলেন 'ইতরের পুত্র কখন ভদ্র হইতে পারে কি? আমি নিজেই শ্বশুরবংশের সর্ব্বনাশ করিয়াছি।'

শ্যামলাল বলিলেন,—"এ কথা আমার মনে আছে। আপনি যে দিন কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন, সে দিনও এরূপ একটা

কথাবলিয়াছিলেন, তাহাও আমি ভুলি নাই। আর এক দিন জরিফ কোচম্যান আমাকে বলিয়াছিল,—'এ টুকুড়ের পাত কখন স্বর্গে যায় না।" সে কথাও আমার বেশ মনে আছে। এ সকল কথা ঐক্য করিয়া আমি সময়ে সময়ে অনেক ভাবিয়াছি।"

হরকুমার বলিতে লাগিলেন,—"জরিফ তোমার জন্মবৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়ার পর, নির্জ্জনে আমার নিকট সকল কথা জানাইয়াছিল। ব্যাপারটা ঘোর কলঙ্কজনক এবং কর্ত্তার নিতান্ত মনস্তাপজনক হইবে বুঝিয়া, বিশেষতঃ যখন পোষ্য পুত্র গ্রহণ ব্যতীত সম্পত্তির অন্ত উত্তরাধিকারী পাইবার উপায় নাই দেখা যাইতেছে, তখন অনর্থক গোল করা অনাবশুক ভাবিয়া, জরিফ ও আমি পরামর্শ করিয়া এ বিষয়ের কোনই গোল করি নাই। তাহার পর এ সম্বন্ধে আরও অবিসংবাদিত প্রমাণ আছে। স্বর্গীয় কর্ত্তার মৃত্যুর পর তুমি মাতঙ্গিনী দেবীর সহিত বড়ই অসদ্ব্যবহার করিতে। মাতঙ্গিনী দেবীর নিজের কিঞ্চিৎ বিষয়-সম্পত্তি ছিল। তিনি স্বয়ং তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন, ইহা তুমি জান। সেই সম্পত্তি একণে সরকারী বিষয়ের সামিল হইয়া গিয়াছে। তাঁহার সেই সম্পত্তির জন্ত তাঁহাকে অনেক কাগজ-পত্রে নাম সহি করিতে হইত। তিনি সহি করিয়া তাহার নীচে,একটা মোহরের ছাপ দিয়া দিতেন। তাঁহার সেই সহি ও মোহরের ছাপ সহস্র সহস্র স্থানে আছে; সুতরাং মিলাইয়া দেখিবার কোনই অসুবিধা নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর,আমি তাঁহার যাবতীয় স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি এক তালিকা প্রস্তুত করি। সেই তালিকা প্রস্তুত কালে, আমি তাঁহার বাক্স হইতে সহি-মোহর-যুক্ত একখণ্ড কাগজ পাই। তাহাতে এই কয়টি মাত্র কথা লিখিত আছে,-'আমার স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির যে ব্যক্তি এখন ভোগ করিতেছে, সে ইহার প্রকৃত অধিকারী নহে। প্রকৃত অধিকারী জীবিত আছে কি না সন্দেহ। যদি জীবিত থাকে এবং কখনও বিষয়ের দখল লইতে আইসে, তাহা হইলে সেই ইহা পাইবে।' সে কাগজ এই দেখুন। তিনি স্ত্রীলোক কিরূপ ভাবে লিখিলে, ইহা সুসঙ্গত হইত তাহা না জানায় এবং নিজের অপরাধের বৃত্তান্ত সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করিতে সাহস না করায়, কেবল অনুতাপের তাড়নায়, সত্য কথা ব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে, এইটুকু লিখিয়া রাখিয়াছেন। তদবধি এই কাগজ আমার নিকটেই আছে। এ সম্বন্ধে প্রমাণের এখনও শেষ হয় নাই। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তোমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু মাতা জীবিতা আছেন; বাম্না ধাইও বাঁচিয়া আছে। উভয়েই আমার সঙ্গে আসিয়াছে। এখানে ডাকিব কি?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"প্রমাণ যথেষ্ট হইয়াছে। যাহা হওয়া উচিত, তাহাই হউক। ব্যভিচারিণীর সন্তান, ব্যভিচারিণীর স্বামী, সতী স্ত্রীর ধর্ম্ম নাশক, ব্রাহ্মণের অপমানকারী, ঘোর দুরাত্মার হস্তে সম্পত্তি ও প্রতাপ কখনই থাকিতে পারে না। একণে আসুন সন্ন্যাসী ঠাকুর, চরণের ধূলা দিয়া এ অধম দুরাত্মাকে বিদায় দেন এবং আপনার পিতৃ-সম্পত্তি আপনি স্বচ্ছন্দে ভোগ করুন।"

এই বলিয়া শ্যামলাল উমাশঙ্করের নিকটস্থ হইয়া তাঁহার চরণ ধারণ করিলেন। উমাশঙ্কর তাঁহাকে সাদরে তুলিয়া বলিলেন,—"আপনাকে আমার বিমাতা সন্তান বলিয়াই লালন পালন করিয়াছেন এবং আমার পিতা আপনাকে সন্তান জানিয়াই স্বর্গলাভ করিয়াছেন; সুতরাং আপনি আমার জ্যেষ্ঠ। কেন আপনি

বিদায় হইবেন ? আমি চিরদিন আপনার অনুগত কনিষ্ঠ ভাবেই থাকিব।"

শ্যামলালের চক্ষু জল-ভারাক্রান্ত হইল। জীবনে হতভাগ্য পাষণ্ডের হৃদয় আর কখনই এরূপ কোমল হয় নাই। সে বলিল,—"কি মধুর! কি স্নেহময়! আপনার অঙ্গের বায়ু লাগায়, কল্য হইতে আমি ধর্ম্ম ও সুনীতির দ্বারা পবিত্র হইতেছি। রে অধম বেশ্যাপুত্র! সাধু-সংস্পর্শে তুই আজ ধন্য হইলি।"

তাহার পর, হরকুমার বাবুর চরণ ধারণ করিয়া, শ্যামলাল বলিল,—আপনি পিতার ন্যায় গুরুজন। অনেক দুর্ব্ব্যবহার করিয়া অনেক দুর্ব্বাক্য বলিয়া আপনাকে কষ্ট দিয়াছি। আমি অধম বেশ্যাপুত্র। কৃপা করিয়া আমার অপরাধ আপনি ক্ষমা করিবেন কি ?"

হরকুমার বলিলেন,—"তুমি যেই হও, আমি তোমাকে লালন পালন করিয়াছি। সুতরাং তোমার অপরাধ আমি কখনই গ্রহণ করিতে পারি না। আর তুমি আপনাকে বেশ্যাপুত্র বলিয়া কেন ঘৃণা করিতেছ? তুমি বেশ্যাপুত্র হইলেও, সে অপরাধ তোমার নহে। তুমি চিত্তকে স্থির কর; আমি সকল বিষয়েই তোমার সুব্যবস্থা করিয়া দি।"

শ্যামলাল অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল —"সন্ন্যাসী উমাশঙ্কর ঠাকুরের কৃপা ছাড়া আর কোন সুব্যবস্থার আমি প্রার্থী নহি। আপাততঃ আমি মাতৃ-চরণে প্রণাম করিব। তাহার পর যে ব্রাহ্মণ-কন্যা এতদিন আমার পত্নী পরিচয়ে জীবন কাটাইয়াছেন, আমি তাঁহার সন্ধান করিব। আমার বিশ্বাস, যে দুরাত্মা সহায়তা করিয়া আমাকে অশেষ পাপে মজাইয়াছে, সেই পাষণ্ডই বিধুমুখীর সর্ব্বনাশ করিয়া, এক্ষণে তাঁহাকে হয় ত ঘোর দুরবস্থায় ফেলিয়াছে। তাহার অপরাধের অনুরূপ শাস্তির ব্যবস্থা করিতে আমি বাধ্য। যদি সেই বিশ্বাসঘাতক নরাধমের সন্ধান পাই, তাহা হইলে আপনাদের নিকট সংবাদ দিব। যদি কৃতকার্য্য না হই, তাহা হইলেও আপনাদের শরণাগত হইয়া, কর্ত্তব্য বিষয়ের উপদেশ গ্রহণ করিব।'

সৎসঙ্গের মাহাত্ম্যে অধম, ভীরু ও কাপুরুষের হৃদয়েও কর্ত্তব্য-বোধের আবির্ভাব হইতেছে এবং তেজস্বিতা ও সাহসের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। হরকুমার বলিলেন, "বিধুমুখীর সম্বন্ধে তুমি, যেরূপ আশঙ্কা করিতেছ, আমারও সেইরূপ মনে হইতেছে বটে। কোন দুষ্ট লোক তাঁহাকে মন্দ অভিপ্রায়ে, কোথায় লইয়া গিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু সে সম্বন্ধে তোমার অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই। পুলিশের লোক ও অন্যান্য অনেকেই সে কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তাঁহাদের অপেক্ষা তুমি যে বেশী কার্য্য করিতে পারিবে, এরূপ আমার বোধ হয় না।"

শ্যামলাল বলিল, "সে কথা ঠিক, কিন্তু আমি বিধুমুখীর নিকট জ্ঞানতঃ ও অজ্ঞানতঃ অনেক অপরাধী। আমি তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু কদাপি তাহার সহিত একটা মুখের কথাও কহি নাই। আমি অধম বেশ্যাপুত্র, তিনি ব্রাহ্মণের কন্যা। আমার এখন মনে হয়, তাঁহার সকল অপরাধই ক্ষমার যোগ্য; কিন্তু আমার অপরাধ সমূহ নিতান্ত গুরুতর ও ক্ষমার অতীত। এইরূপ বিবেচনায় আমার এখন মনে হইতেছে, আমি যথাসাধ্য যত্নে তাঁহার যাবতীয় ক্লেশ দূর করিবার নিমিত্ত দায়ী। কিন্তু সে পরামর্শ পরে হইবে;

আপাততঃ আপনি কৃপা করিয়া আমাকে আমার জননীর নিকট লইয়া চলুন।"

সকলেই গাত্রোত্থান করিলেন। শ্যামলাল ও হরকুমার প্রস্থান করিলেন। মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া, অনেকক্ষণ পরে, শ্যামলাল বাহিরে আসিল। তাহার পর কিয়ৎকাল নির্ব্বাক্ ভাবে বাহিরে বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ, "এখনই আসিতেছি" বলিয়া কোথায় চলিয়া গেল; কিন্তু অনেক রাত্রি হইল, তথাপি ফিরিল না। সেই রাত্রিতে এবং পরদিন প্রাতেও উমাশঙ্কর, নীলরতন, হরকুমার এবং তাঁহাদিগের নিয়োজিত অন্যান্য লোক তাহার জন্য বিস্তর অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু কুত্রাপি তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

একে দুই

পরদিন সন্ধ্যার পর সার্ব্বভৌম-পুত্র নবীনকৃষ্ণের সহিত সতীর বিবাহ হইয়া গেল। হরকুমার বাবুর বাটীতে পাত্রী ছিলেন; সেই স্থানেই পাত্রীর মাতা কন্যা সম্প্রদান করিলেন। সম্প্রদান কালে চতুর চূড়ামণি হরকুমারের নিয়োজিত এক পুরোহিত ছিলেন। বিবাহ উপলক্ষে অনেকেই আহার করিলেন। নীলরতন, উমাশঙ্কর, স্বয়ং সার্ব্বভৌম এবং আরও অনেকে বিবাহ-রাত্রিতে বিবাহ বাটীতে জলপান করিলেন। উমাশঙ্করের বেশ এখনও পূর্ব্ববৎ। গুরু পিতা ও গুরু-মাতার অনুমতি ক্রমে, তিনি জীবন মধ্যে অদ্য প্রথমে সামাজিক মনুষ্যের ন্যায় পঙ্‌ক্তি ভোজন করিলেন।

বিবাহের পর হরকুমার বাবুর পত্নী কর্ত্তৃক নবীনকৃষ্ণ ও সতী, মঙ্গলাচরণ সহ, বাসর ঘরে আনীত হইলেন। বর স্বভাবতই সুপুরুষ; বিশেষতঃ অদ্য চন্দন-চর্চ্চিত কলেবরে মল্লিকা-মালা ও পীতাম্বর সংযোগে তাঁহাকে বড়ই ভাল দেখাইতেছে। কিন্তু তিনি নিতান্ত বিষণ্ণ ও কাতর। তাঁহার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, আনন্দ ও উৎসাহ তাঁহাকে যেন চিরদিনের মত ত্যাগ করিয়েছে।

যথাস্থানে বর উপবেশন করিলে, কন্যা সতী অদূরে উপবেশন করিলেন। বাসরে অন্য লোক কেহ থাকিল না।

সহসা সতী, অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া বলিলেন,—"দাসী চরণে প্রণাম করিতেছে।"

নব বধূর কণ্ঠস্বর শুনিয়া ও রূপরাশি দেখিয়া নবীনকৃষ্ণ চমকিত হইলেন। এ যে সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর! ঐ যে হৃদয়াঙ্কিত সেই চিরনবীন রূপ-রাশি! সবিস্ময়ে নবীনকৃষ্ণ বলিলেন,—"এ কি সুহাস! তুমি? ধন্য পরমেশ্বর!"

ঈষৎ হাস্যের সহিত সতী বলিলেন,—"অবিশ্বাসিনী সুহাসিনী মরিয়া গিয়াছে—এ সতী!"

নবীনকৃষ্ণ বলিলেন,—"আমার সুহাস চিরদিনই সতী। আমি সতী চাহি না—সুহাসে আমার মন-প্রাণ ভরিয়া আছে।"

সতী বলিলেন,—"এ কথা সত্য হইলে আবার নূতন করিয়া টোপর মাথায় দিয়া বর সাজিতে না। ভাগ্যে সুহাস মরিয়াছিল। তাই ত আমার অদৃষ্টে ঐ দেব-দুর্লভ চরণে স্থান হইল!"

নবীনকৃষ্ণ বলিলেন,—"সংসারের সকল লোকের চক্ষেই সুহাস মরিয়াছিল বটে কিন্তু আমার হৃদয়ের তুমি সজীব মূর্ত্তিতেই জাগরূক

ছিলে। লোকে কি বুঝিয়াছিল জানি না; কিন্তু আমি জানি আমার সুহাস শিবমোহিনীর ন্যায় সতী। বড়ই শুভাদৃষ্ট আমার, তাই সে হারানিধি সুহাস, আজি সতীরূপে আবার আমার হইলেন।"

সুহাসিনী, তাঁহার সেই মধুমাখা হাস্যের সহিত মিশাইয়া, বলিলেন—"কিন্তু যাই বল, মনে নিশ্চয়ই বড় রাগ ও দুঃখ হইতেছে। বড় আশা করিয়া আসিয়াছিলে, আজ নূতন নারী লাভ করিবে। কিন্তু বড়ই মন্দকপাল তোমার; তাহা না হইয়া সেই পোড়ারমুখী হতভাগিনী সুহাসিনীই আবার জুটিল।'

নবীনকৃষ্ণ বলিলেন—"আমি এ অনুযোগের পাত্র হইয়াছি বটে। কিন্তু আমি বড় আশা করিয়া আসিয়া ছিলাম, আজি আমার মাথায় বজ্রাঘাত হইবে; অথবা সর্পাঘাত হইবে, অথবা কোন দৈব্য দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়া এ ব্যাপারে প্রতিবন্ধক ঘটাইবে। বড়ই ভাগ্যবান্ আমি যে সেরূপ কোন ঘটনাই ঘটিল না। যিনি আমার অন্তরে ও বাহিরে—ঈশ্বর জানেন যাহার চিন্তা আমার অন্তরে ও বাহিরে, যাঁহার মূর্ত্তি আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিতে পারি নাই, সেই দেবীকে আজি অসম্ভাবিত উপায়ে পুনরায় প্রাপ্ত হইলাম। জান তুমি আমরা আর্য্য সন্তান। স্বামী যেমন তোমাদের প্রত্যক্ষ দেবতা, আমাদের জনকজননী সেইরূপ প্রত্যক্ষ দেবতা, স্বামীর সেবা ও তাঁহার প্রসন্নতা সাধন যেমন তোমাদের অত্র ও পরত্র সকল কল্যাণের হেতুভূত, সেইরূপ জনক জননীর প্রসাদন ও প্রিয়ানুষ্ঠান আমাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল মঙ্গলের নিদান স্বরূপ। জান তুমি ভগবান্ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন মাতৃ-আজ্ঞায় এই ধরণীকে শোণিত-স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন এবং পৃথিবীকে একবিংশবার নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। জান তুমি, স্বয়ং রামচন্দ্র, পিতৃবাক্য পালনের জন্য, সুদীর্ঘকাল দুঃসহ বনবাস ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন। জান তুমি, পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সানন্দে নন্দের বাধা বহন করিয়াছিলেন ও যশোমতী দেবীর বন্ধনও অকাতরে সহ্য করিয়াছিলেন। সেই আর্য্যবংশে আমাদিগের জন্ম। সহস্র দুষ্কর্ম্ম হইলেও, জনক-জননীর আজ্ঞা পালনে আমরা বাধ্য। সেই প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ পিতার একান্ত অনুরোধ এবং মাতার অশ্রুবারি উপেক্ষা করিতে, আমার কখনই সাধ্য নাই। এতদিন সুহাস, তুমি ত নিরুদ্দেশ ছিলে। এরূপ না হইয়া যদি তুমি পূর্ব্বের মত গৃহেই থাকিতে, অথচ আমার পিতা মাতা, স্বারতঃ বা অন্যায়তঃ, আমাকে আবার বিবাহ করিবার নিমিত্ত আদেশ করিতেন, তাহা হইলে আমাকে কি করিতে হইত সুহাস? আমি দুইবার অনিচ্ছা প্রকাশ, একটু অসন্তোষ ব্যক্ত করিতাম মাত্র। কিন্তু তাঁহারা আমার সেই অনিচ্ছা ও অসন্তোষ উপেক্ষা করিয়া যদি আপনাদের আদেশ বলবান্ রাখিতেন; তাহা হইলে, হৃদয় ফাটিয়া গেলেও, আমাকে অবশ্যই সেই আদেশ পালন করিতে হইত। তুমি আর্য্যকুলবালা। তুমি কি জান না সুহাস, আর্য্য-সন্তান অবিচলিত-চিত্তে পিতামাতার আদেশ পালন করিতে বাধ্য। সেই জনক-জননীর একান্ত অনুরোধেই জানিয়া শুনিয়াও, এই দুষ্কর্ম্মে আমি প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।"

সুহাসিনী বলিলেন,—"ভালই করিয়াছিলে। ভাগ্যে কোন আপত্তি কর নাই, কোন প্রতিবন্ধক ঘটাও নাই, তাই ত দাসীর অদৃষ্টে চরণে স্থান লাভ হইল! তা না হয় সুহাসিনী নামে একটা সতীন কোথায় পড়িয়া আছে।

এমন দুটা পাঁচটা সতীন ত থেকেই থাকে।”

নবীনকৃষ্ণ বলিলেন,—“সে কথাই বা মন্দ কি সুহাসিনী। তুমি ত আধুনিক কুৎসিত শিক্ষায় বিকল-চিত্ত হও নাই। স্বামী এক-মাত্র পত্নীতেই আবদ্ধ থাকা আবশ্যক। আধুনিক সভ্যতায় এই নীতি কিছু দিন হইতে আমাদিগের দেশের রুচি বিকৃত করিয়া দিতেছে। তুমি জান এ নীতি বড়ই নিন্দনীয়া। পতি-দেবতা, যদি ইচ্ছা করিয়া বা প্রয়োজনানুরোধে, বহু বিবাহ করেন, সতী-পত্নী তাহাতে দুঃখের কারণ কিছুই দেখিতে পান না। কেন না পতি তাঁহার চক্ষে দেবতা ভিন্ন আর কিছুই নহেন। তিনি অযুত মহিলা-বেষ্টিত হইলেও, সতী পত্নীর চক্ষে তাহার দেবত্ব কখনই অপচিত হয় না। স্বামীর সহিত কেবল ইন্দ্রিয়-ব্যাপারের সম্বন্ধ মনে করিলেই অশেষ অনর্থের উদ্ভব হইয়া থাকে। ইহলোক ও পরলোক তাঁহার কৃপাসূত্রে গ্রথিত আছে, ইহা যে নারী জ্ঞান করেন, তিনি কখনই স্বামীকে মনুষ্য বলিয়া মনে করিতে পারে না এবং তুচ্ছ ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে তাঁহাকে অভিভূত বা বিচলিত করিতে পারে না। অবশ্য যে স্বামী পত্নীকে কষ্ট দিবার বাসনায়, বা কেবল ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি কামনায়, দারান্তর গ্রহণ করে, সে নরাধম পশুরই রূপান্তর মাত্র। তাদৃশ হতভাগার কথা বিচার্য্য নহে। কিন্তু যাহারা প্রকৃত প্রয়োজনে বা উচ্চাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া দারান্তর গ্রহণ করেন, তাঁহাদের, পত্নীগণের দৃষ্টিতে স্বামীর দেবত্ব কখনই কণামাত্র অপগত হয় না। সুহাসিনী তোমাকে আমি চিরদিন দেবী বলিয়াই বিশ্বাস করি। আমি যদি আর একটা বিবাহ করিয়া দুষ্কর্ম্ম সাধন করিতাম, তাহা হইলেও তোমার ন্যায় কামিনীর চক্ষে আমার মর্য্যাদা ও সম্মান একটুও কমিত না। তাই বলিতেছি, সোহাগের সুহাসিনীর না হয় আর একটা সতী সতীন জুটিল, তাহাতে ক্ষতিই বা কি?”

সুহাসিনী বলিলেন,—“তা জুটুক না কেন হাজারটা, আমার দেবতা আমার প্রাণ জুড়িয়াই আছেন। আমি এখন নূতন হইয়া আজ একবার প্রত্যক্ষ দেবতার চরণে প্রাণ ভরিয়া প্রণাম করি।”

সুহাসিনী, অশ্রুপূর্ণ নয়নে গলায় কাপড় দিয়া, স্বামী দেবতাকে প্রণাম করিলেন। নবীনকৃষ্ণ অতীব আদরে তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন,—“প্রার্থনা করি, জীবনে ও মরণে কখনই যেন আর এক মুহূর্ত্তের জন্যও তোমার সঙ্গশূন্য হইতে না হয়। যে যন্ত্রণা আমি এতদিন সহ্য করিয়াছি তাহা বলিয়া শেষ করিবার নহে। যে মহাপুরুষের কৃপায় ও কৌশলে আমার সেই বিষম যাতনার অবসান হইল, আমি এক্ষণে সেই হরকুমার কাকার চরণোদ্দেশে বার বার প্রণাম করি।”

সুহাসিনী বলিলেন,—“আমিও, স্বামী দেবতার সহিত এক প্রাণে, সেই পরম হিতৈষী মহাত্মাকে অন্তরের সহিত প্রণাম করি।”

তাহার পর তাঁহারা সুখের দুঃখের কথায় ব্যাপৃত হইলেন। সুহাসিনীর সমস্ত দুরবস্থা ও বহুবিধ ক্লেশের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে করিতে নবীনকৃষ্ণ অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে বাহিরে সার্ব্বভৌম মহাশয়, ভোজনাদি সমাপ্তির পর, হরকুমার বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“ভায়া, বিবাহ ত হইয়া গেল। তুমি যে বলিয়াছিলে, এই বিবাহে বঙ্গদেশের একজন প্রধান লোকের সহিত কুটুম্বিতা হইবে,’ সে ব্যাপারটা কি এখন বুঝাইয়া দাও।”

হরকুমার বলিলেন,—"এই উমাশঙ্কর বাবু বঙ্গদেশের একজন প্রধান ধনবান, বিদ্বান্ এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তি, একথা আপনি স্বীকার করেন কি না?"

সার্ব্বভৌম বলিলেন,—"তাহা আর বলিতে? এ সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি অসম্ভব।"

হরকুমার বলিলেন,—"এই উমাশঙ্কর আপনার পুত্রবধূর সাক্ষাৎ মাসতুত ভাই।"

সার্ব্বভৌম বলিলেন,—"বল কি? বড়ই শুভ সংবাদ! তাহা হইলে, যে জগত্তারিণীর সহিত স্বর্গীয় রাধাবিনোদ বাবুর বিবাহ হইয়াছিল, তিনি আমার পুত্র-বধূর মাতৃস্বসা।"

হরকুমার বলিলেন,—"আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু এ সম্বন্ধ আজ নূতন করিয়া হয় নাই—অনেক দিনই হইয়াছে। আপনারা কেহই তাহা জানিতেন না। উমাশঙ্করের জননীর বিবাহের বহুকাল পরে, গোপালপুর নিবাসী ৺ জগবন্ধু ভট্টাচার্য্যের কন্যার সহিত আপনার পুত্রের বিবাহ হয়। সেই জগবন্ধুর স্ত্রী ও রাধাবিনোদ বাবুর পত্নী জগত্তারিণী সহোদরা ভগ্নী।"

সার্ব্বভৌম সবিস্ময়ে বলিলেন,—"তুমি গত কল্য শ্যামদাসের জন্মাদি ঘটিত বৃত্তান্ত যখন ব্যক্ত করিয়াছিলে তখনই আমার এইরূপ একটা কথা মনে হইয়াছিল। কিন্তু সেত আমার সেই ভ্রষ্টা পুত্র-বধূর কথা। এ বিবাহের সহিত সে কথার কি সম্পর্ক বল!"

হরকুমার বলিলেন,—"সেই সম্পর্কই এ বিবাহে নূতন করিয়া বজায় হইল দাদা। জগত্তারিণীর জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর সহিত পিতামাতার মনান্তর থাকায় এবং জগত্তারিণী ও রাধাবিনোদ বাবুর মৃত্যুর অনেক পরে নবীনকৃষ্ণের বিবাহ হওয়ায়, তৎকালে এ সম্পর্কের বিশেষ আন্দোলন হয় নাই। আপনার সেই পুত্র-বধূই আজি আবার নূতন হইয়া আপনার ঘর বজায় করিলেন।"

তখন সার্ব্বভৌম, ক্রোধে কম্পিত-কলেবর হইয়া, গাত্রোত্থান করিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"হরকুমার! দুর্বৃত্ত পাষণ্ড, বেল্লিক, নরাধম, হরকুমার! তুই আমার সর্ব্বনাশ করিলি। তুই হতভাগ্য, আমার জাতি, কুল, ধর্ম্ম সকলই ঘুচাইয়া দিলি!"

হরকুমার বাবু, সবিনয়ে সার্ব্বভৌমের পদ-দ্বয় ধারণ করিয়া, বলিলেন,—"আপনার লজ্জা বা কলঙ্ক হইলে, সে কি আমার লজ্জা ও কলঙ্ক নহে? আপনি ধীরভাবে আমার সকল কথা শ্রবণ করুন দাদা; তাহার পর আমার অপরাধ হইয়া থাকিলে, যে দণ্ড আপনার ইচ্ছা হয় তাহাই আমাকে প্রদান করুন; আমি অবনত মস্তকে তাহা গ্রহণ করিব। আমি চিরকাল আপনার অনুগত আত্মীয়; আমি আপনার ইষ্ট ভিন্ন কোন অনিষ্ট করিতে পারি কি দাদা? আপনি দেশ-মান্য ব্যক্তি; আপনার মান ও গৌরবে আমাদের সম্মান ও গৌরব।"

সার্ব্বভৌম কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলে, হরকুমার আদ্যোপান্ত ঘটনা সমূহ একে একে বিবৃত করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কথিত বৃত্তান্ত সমূহের সমর্থন সূচক প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রদর্শনেরও তিনি ত্রুটি করিলেন না। সুহাসিনী যে নিতান্ত নিরপরাধা, অশেষ বিপদে পড়িয়াও তিনি যে আপনার সতী ধর্ম্ম আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কাহারও কোন সংশয় থাকিল না। সকলেই তাঁহাকে নারী জাতির আদর্শ বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার অসম্ভাবিত বিপদ্ মুক্তির ও জীবন প্রাপ্তির বৃত্তান্ত শ্রবণে ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে থাকিলেন। সমস্ত শুনিয়া

সার্ব্বভৌম হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"আরে ভাই বল! এত কথা আমি জানিব কিরূপে? বিষয়ী লোকের এইরূপ বুদ্ধিচাতুর্য্যের মধ্যে প্রবেশ করা আমাদিগের ন্যায় আতপ ও কদলী ভোজী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব ব্যাপার। চিরদিনই জানি হরকুমার ভায়া একটা দেবতুল্য মনুষ্য। বড় শুভ সংঘটনই তুমি ঘটাইয়াছ ভায়া। নূতন করিয়া বিবাহ ব্যাপার ঘটাইয়া তুমি বস্তুতঃ বড় আমোদ করিয়াছ। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সুখে থাক। উমাশঙ্কর বাবু, আর তুমি আমাদিগের পর নহ। এখন তুমি আমাদিগের অতি নিকট কুটুম্ব। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি এই কুটুম্বদিগের সহিত প্রীতি সহকারে, পরম সুখে দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত কর।"

হায়! ধন-সম্পত্তি! তোমার কি মহীয়সী ক্ষমতা! সন্ন্যাসীর শিষ্য, আজন্ম ভিক্ষোপজীবী, এখনও সন্ন্যাসীবেশধারী উমাশঙ্করের সহিত যেমন আসিয়া তুমি মিলিয়াছ, অমনই তিনি সকলেরই নিকট বাবু সম্ভাষণে সম্ভাষিত হইতেছেন। আর কেহই তাঁহাকে সন্ন্যাসী বলিয়া ডাকিতে ইচ্ছা করিতেছেন না!

উমাশঙ্কর আসিয়া সার্ব্বভৌম মহাশয়ের চরণে প্রণাম করিলেন। বলিলেন,—"আমার কি সৌভাগ্য! অতঃপর আপনার ন্যায় দেশবিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তিকে কুটুম্ব বলিয়া গৌরব অনুভব করিতে পাইব।

উমাশঙ্কর, তদনন্তর হরকুমার বাবুর চরণ স্পর্শ করিয়া, বললেন,—"আপনাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিব তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আপনাকে পিতা বলিতেই আমার ইচ্ছা হইতেছে। আপনার—"

সার্ব্বভৌম বাধা দিয়া বলিলেন,—"আর যা হয় একটা বল বাবাজি। সংসার সুদ্ধ লোককে বাবা বলাটা কিন্তু ভাল নয়।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আপনার কৃপায় আমি মাসী পাইলাম এবং পরম গুণবতী ভগ্নী পাইলাম। আপনি বলিয়াছেন, মাসী মা আপনার সঙ্গে এখানে আসিয়াছেন। কৃপা করিয়া আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া চলুন; আমি তাঁহার চরণ-বন্দনা করিয়া এবং ভগ্নীকে দর্শন করিয়া জীবনকে আনন্দময় করি।"

সার্ব্বভৌম বলিলেন, "বাবাজি, তোমার মাসী মা যে কেবল হরকুমার ভায়ার সঙ্গেই চলিয়া আসিয়াছেন এমন নহে। এমন চলিয়া তিনি অনেকের সঙ্গেই গিয়াছিলেন এবং এখনও মাঝে মাঝে গিয়া থাকেন। চল ভায়া আমাকেও একবার বিহাইনের কাছে লইয়া চল। আমি সে মাগীর গালে খানিকটা চূণ-কালী দিয়া আসি।"

হরকুমারের সঙ্গে সার্ব্বভৌম ও উমাশঙ্কর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। সকলই আনন্দময়, সকলই শান্তিময় ও সকলই ধর্ম্মময় হইয়া গেল।

বলা বাহুল্য যে এই সার্ব্বভৌমটা বর্ত্তমান কাল প্রচলিত সভ্যতা বিষয়ে একান্ত অনভিজ্ঞ। এরূপ অসভ্য জীবকে পণ্ডিত না বলিয়া বর্ব্বর বলাই বিধেয়। এমন লোকের কথা বহিতে লিখিতে আছে কি? স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এ ব্যক্তি আপনার পুত্র-বধূর জননীকে ব্যভিচারিণী বলিয়া বিশ্বাস করে, অথচ সেজন্য জাতি কুলের কোন ক্ষতি হইতেছে বলিয়া মনে করে না; কিন্তু সতী পুত্র-বধূর চরিত্র সম্বন্ধে মিথ্যা আশঙ্কা করিয়া, তাঁহাকে চিরদিনের জন্য বর্জ্জন করিতে চাহে। লজিক অর্থাৎ তর্কশাস্ত্রের ফেলাসি অর্থাৎ ভ্রম পরিচ্ছেদ ইহার কস্মিন্ কালেও দেখা নাই। লোকটা দয়ার অযোগ্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আত্মতুষ্টি।

বেলা দশটার সময় উমাশঙ্কর, ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইয়া, আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন। ঘনানন্দ স্বামী তৎকালে চর্ম্মাসনে উপবেশন করিয়া একখানি গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন। উমাশঙ্করের ভিক্ষার ঝুলি যথাস্থানে রাখিয়া গুরুদেবের নিকটস্থ হইলেন এবং ভক্তি সহকারে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ঘনানন্দ, গ্রন্থ হইতে নয়ন অপসারিত করিয়া, নিতান্ত করুণ ভাবে, উমাশঙ্করের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিলেন,—"এক ক্ষেত্রে দুইটী বিরোধী ধর্ম্মের সম্মিলন অসঙ্গত। রৌদ্র ও ছায়া যেমন সমসময়ে একস্থানে থাকিতে পারে না, তদ্রূপ ধন-সম্পত্তি ও দারিদ্র্য উভয়ই কখন এক ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে না। বৎস উমাশঙ্কর! তুমি প্রভূত বিত্তের অধিকারী হইয়াছ; সুতরাং তোমার পক্ষে ভিক্ষাবৃত্তি অতঃপর শোভা পায় না।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"প্রভুর কি ইচ্ছা তাহা জানি না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, ভিক্ষাই আমার চিরদিন শোভা পাইয়াছে এবং চিরদিনই শোভা পাইবে। জ্ঞানোদয় হইতে এ কাল পর্য্যন্ত আমি গুরুসেবা, শাস্ত্রালোচনা, ধর্ম্ম-শিক্ষা, একান্ত মনে গুরুর আদেশ পালন, জ্ঞানোন্নতির উপায় অন্বেষণ এবং ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াই আসিতেছি। এই সকল কার্য্যই আমার নিরতিশয় প্রীতিজনক এবং সম্পূর্ণ সুসঙ্গত বলিয়া হৃদগত হইয়াছে। এইরূপ কার্য্য সমূহ আমার যেরূপ শোভা পায়, অন্য কিছুই তাহার অনুরূপ হইতে পারে না। তবে প্রভু, যদি নিগ্রহ পরবশ হইয়া, এক্ষণে এই সকল কর্ম্ম আমার শোভাজনক নহে বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে অগত্যা আমাকেও সেইরূপ মনে করিতে হইবে। কিন্তু কোন প্রকার অবস্থান্তর ঘটিলে এদীন সেবকের চিত্ত বড়ই অপ্রসন্ন হইবে বলিয়া বোধ হয়। আর প্রভু যে বিত্তের কথা বলিতেছেন, তাহা আমাকে আশ্রয় করে নাই এবং তাহাকে আশ্রয় দিতেও আমার ইচ্ছা নাই। এই রুদ্রাক্ষ, এই নামাবলী, এই গৈরিক রঞ্জিত বস্ত্র, এই ভস্মরাশি এবং ভিক্ষার ঝুলি আমার শ্রেষ্ঠ বিষয় ও পরম ঐশ্বর্য্য। আর প্রভুর ঐ পাদপদ্ম আমার অনন্ত বিত্তের অক্ষয় ভাণ্ডার। এতদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বিত্ত-জগতে আর কিছুই নাই; সুতরাং তৎপ্রাপ্তির কামনাও আমার নাই।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"বৎস! তোমার শিক্ষা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তোমার হৃদয় সর্ব্বাবস্থার সম্মুখীন হইবার উপযুক্ত হইয়াছে। তুমি প্রার্থনা না করিলেও, প্রভূত বিত্ত তোমাকে অন্বেষণ করিয়া আশ্রয় করিয়াছে। তাহার প্রকৃষ্ট ব্যবহার করিতে তুমি বাধ্য। আর বৎস, বিষয়-ভোগে হানিও কিছু নাই। কেননা বিষয়ও বিষয় নহে এবং ভোগও ভোগ নহে। কর্ত্তব্য সাধন মাত্র লক্ষ্য রাখিয়া, বিষয় ভোগে নিমগ্ন থাকিলে আত্মা এবং জগৎ উভয়ই উপকৃত হয়। বিষয়-ভোগেই জ্ঞানের পরীক্ষা হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি আজন্ম লালসা বর্দ্ধক পদার্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা বিরহিত হইয়া ভোগ বর্জ্জিত ভাবে কালপাত করে তাহার সেই ভোগ-রাহিত্যে জ্ঞানোন্নতির কোনই পরিচয় পাওয়া যায় না। হয় ত তাহার চিত্ত সাধুতার দিক দিয়াও যায় না এবং তাহার জ্ঞানও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ঘৃণিত জীবগণের জ্ঞানকে অতিক্রম করে না। নিরন্তরদর্শন বলীবর্দ্দ স্বভা-

ষতঃ সুস্থির এ মীমাংসা সুসঙ্গত নহে। যাঁহার শাকান্ন ব্যতীত ভোজ্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই, সে ব্যক্তি নিতান্ত মিতাহারী বলিয়া স্থির করিবার কোনই কারণ নাই। সর্ব্বভোগোপকরণ সংবেষ্টিত হইয়াও যিনি স্পৃহাশূন্য এবং নির্লিপ্ত ভাবে তৎসমস্ত ভোগ করিতে সমর্থ, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী এবং তিনিই প্রকৃষ্ট তত্ত্বদর্শী। তাদৃশ ব্যক্তির বিষয়-ভোগ অশেষ কল্যাণের হেতুভূত। প্রত্যুত জলে ভাসমান পদ্মপত্রের ন্যায়, বিষয়রূপ জলের প্রলেপ গায়ে না লাগিয়া বিষয় সাগরে নিমগ্ন থাকিলে, ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট সম্ভাবনা কিছুই নাই; অতএব তোমার যে বিষয় সম্ভোগের সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে, তুমি তাহা সমুচিত রূপে ভোগ করিয়া জগতে ভোগ-নির্লিপ্ততার অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন কর ইহাই আমার ইচ্ছা।”

উমাশঙ্কর বলিলেন,—“প্রভুর যাহা ইচ্ছা অবিচলিতচিত্তে তাহা পালন করিতে এ সেবক বাধ্য। ভাল মন্দ, ন্যায়-অন্যায়; উচিতানুচিত কিছুই জানি না; জানি কেবল আপনার অনুমতি। আপনি যাহা আদেশ করিবেন, অতি দুষ্কর হইলেও বিরুক্তি না করিয়া তাহাই পালন করিতে আমি বাধ্য। প্রভুর বাক্যের প্রতিবাদ করিবার কল্পনা করিতেও আমার সামর্থ নাই। প্রভু যদি আমাকে সঙ্গ হইতে বঞ্চিত করিতে বাসনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার অন্যথা করিতে আমার বা অপর কাহারও সাধ্য নাই। প্রভুর সঙ্গ-শূন্য হইলে, আমার অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে; সে ভাবনা অনাবশ্যক। কিন্তু আমি যে সকল সামান্য সামান্য কার্য্য দ্বারা প্রভুর পরিচর্য্যা করিয়া আসিতেছি, তদভাবে আপনার হয়ত অনেক কষ্ট হইবে বলিয়া আমার আশঙ্কা হইতেছে।”

ঘনানন্দ হাসিয়া বলিলেন,—“অদ্য এই মুহূর্ত্তেই তোমার মৃত্যু হইতে পারে; তাহার পর আমার পরিচর্য্যার বিহিত ব্যবস্থা করিতে তোমার কোনই অধিকার থাকিবে না। আমরা কর্ত্তৃত্বাভিমান সহকারে কার্য্য করি বলিয়াই আমাদিগকে অশেষ ভাবনা ও অসুবিধা ভোগ করিতে হয়; কিন্তু বৎস! যাবতীয় কর্ত্তৃত্ব একান্ত ভাবে পরম কর্ত্তার হস্তে সমর্পণ করিলে সকল অসুবিধা ও যাবতীয় চিন্তা তিরোহিত হইয়া যায়। পরিণাম চিন্তায় মনুষ্যকে নিতান্ত বিব্রত করে। কল্য কি হইবে? মৃত্যু হইলে স্ত্রী-পুত্রের কি হইবে? কি কার্য্য করিলে সম্মান বৃদ্ধি হইবে? কিসে পরে সুখ হইবে? কি উপায়ে শরীর সুস্থ থাকিবে? ইত্যাকার ভবিষ্যৎ ভাবনাই মানবকে প্রতিনিয়ত অবসন্ন করে। কিন্তু সেই উদ্বিগ্ন-ভ্রান্ত মানবগণ একবারও ভাবে না যে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতে তাহাদের কোনই অধিকার নাই। কেন না মৃত্যু প্রতি মুহূর্ত্তেই উপস্থিত হইয়া তাহাদের সকল ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করিতে পারে এবং অচিন্তিত-পূর্ব্ব প্রতিকূল ঘটনা উপস্থিত হইয়া, তাহাদের সাবধানতা সংকৃত যাবতীয় সতর্ক আয়োজনের উচ্ছেদ করিয়া দিতে পারে। কার্য্য আমরা করি বটে; কিন্তু কর্ত্তৃত্ব আমাদিগের হাতে নাই। যিনি বিশ্বের কর্ত্তা, যিনি কার্য্যাকার্য্যের কর্ত্তা, যিনি তোমার আমার সকলেরই রক্ষক ও পালক তিনিই আমার পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন এবং প্রতিনিয়তই করিবেন। অতএব সে চিন্তা নিতান্ত অনাবশ্যক।”

উমাশঙ্কর নীরব। তিনি বুঝিয়া দেখিলেন বাস্তবিকই গুরুদেবের ভাবী ব্যবস্থার বিষয় কল্পনা করিয়া তিনি নিতান্ত অজ্ঞের ন্যায় ব্যবহারই করিয়াছেন। যদি পরম ভক্তিভাজন

আশীর্ব্বাদস্বরূপ গুরুদেব তাঁহার জন্য অন্যরূপ নূতন ব্যবস্থা করিবার আবশ্যকতা অনুভব করেন, তাহা হইলে সেজন্য কোনরূপ ভবিষ্যৎ ইষ্টানিষ্ট চিন্তা না করিয়া অবিচলিত চিত্তে তাহা পালন করাই তাঁহার ধর্ম্ম। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন,—"ভগবন্! আমার সম্বন্ধে মাতৃদেবীরও কি এইরূপই ইচ্ছা?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"তাঁহার কি ইচ্ছা আমি তাহা জানি না। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা না হইলে এরূপ সংঘটন হইবে কেন? তিনি ইচ্ছাময়ী তাঁহার ইচ্ছাতেই আমরা কর্ম্মের অবধারণ করিয়া থাকি।"

তৎক্ষণাৎ সেই কুটীর-দ্বারে, যোগেশ্বরী দেবীর সমুজ্জ্বল প্রতিমার ন্যায় মূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হইল। ঘনানন্দ বলিলেন,—"যাঁহার ইচ্ছা জানিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়াছিলে, দেখ বৎস! সেই ইচ্ছাময়ী, তোমার ইচ্ছা জানিতে পারি য়াই সম্মুখে উপস্থিত।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"আমার সময় বড় কম। পুত্র, পুত্র-বধূর জন্য ঘর পাতাইতে হইবে। সংসারে আর কেহ নাই; আমি না শিখাইলে কে শিখাইবে? তোমাকে প্রণাম করিয়া যাই ঠাকুর; আশীর্ব্বাদ করিও, আমার ছেলে যেন পূর্ণমনোরথ হয়।"

যোগেশ্বরী ভক্তিসহকারে ঘনানন্দকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার চিরন্তন প্রণালী অনুসারে তত্রত্য ধূলি মস্তকে ললাটে ও রসনায় সমর্পণ করিলেন। তখন উমাশঙ্কর তাঁহার নিকটস্থ হইয়া সাগ্রহে হস্তধারণ করত কহিলেন,—"মা—মা! বাবা আমাকে ত্যাগ করিতেছেন। তুমিও কি আমাকে ত্যাগ করিবে? তবে আমি কি করিব?"

যোগেশ্বরী সবিস্ময়ে বলিলেন,—"ত্যাগ! ত্যাগ এই সংসারে নাই ত বাবা। এ প্রেমের রাজ্য ভক্তির সংসার, আকর্ষণের ব্রহ্মাণ্ড; ইহাতে ত্যাগ কোথায়? একটী পরমাণুকেও যিনি ত্যাগ করেন না, কীট-পতঙ্গও যাঁহার কৃপা দৃষ্টির বহির্ভূত নহে, যাঁহার বিশ্বে স্থাবর ও জঙ্গম প্রত্যেকেই অপরের উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছে—তিনি তোমাকে ত্যাগ করিতেছেন, ইহাও কি সম্ভব? এ সংসারে ত্যাগের স্থান নাই বাবা। ঠাকুর তোমাকে ত্যাগ করিতেছেন, ইহা তুমি ভ্রমেও কল্পনা করিও না। তিনি দয়াময়। তোমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিবার এই এক অভিনব উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন জানিবে। আর আমি! আমি ত ঐ চরণের দাসী! প্রভু যাহা বলিবেন, তাহাই পালন করিতে আমি বাধ্য। আর তুমি কি করিবে? তা সে ভাবনা তুমি ভাবিতেছ কেন বাবা? যাঁহার ভাবনা তাঁহার ঘাড়ে সকল বোঝা চাপাইয়া দিয়া তুমি কেন নিশ্চিন্ত হও না? আমি এখন আসি। বড় ব্যস্ত—অনেক কাজ। একটা ঘর পাতান সহজ কি গা?"

ঘনানন্দ বলিলেন—"তোমার কাজ অনন্ত—তুমিও অনন্ত। তোমার আসা যাওয়া বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার সন্দেহ নাই। তুমি যাও বা কোথায়? আস বা কোথায়? তাহার তত্ত্ব বুঝে কাহার সাধ্য? তুমি নিরন্তর ব্যস্ত অথচ তোমার কার্য্য ইচ্ছায় সম্পন্ন হয়। সংসারের সর্ব্বত্র তোমার পুত্র, পুত্র-বধূ। তুমি সকলের জন্যই ঘর পাতাইয়া দিতে ব্যস্ত। এ সংসারে তুমি ছাড়া আর কাহারও কিছু নাই। জনক ও জননী, কন্যা ও পুত্র, ভাই ও ভগ্নী সকলই মিথ্যা, সকলই ক্ষণিক সম্বন্ধ। কেবল তুমি সার, তুমিই নিত্য; তুমিই অক্ষয়। চন্দ্র সূর্য্য নিভিয়া যাইবে, বিশ্ব, সংসার ধ্বংস হইবে, সৃষ্টির সকলই বিলুপ্ত

হইবে, কিন্তু তুমি থাকিবে। তোমাকে চিনিতে পারা বড়ই দুঃসাধ্য। যে তোমাকে চিনিয়াছে, সে অনন্ত কালের নিমিত্ত ধন্য হইয়াছে। জরা ও মরণ, রোগ ও শোক, সুখ ও দুঃখ তাহার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছে। তোমার কার্য্য অন্যের দুরবগম্য এবং কল্পনাতীত কাণ্ড! তোমার কার্য্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে কেবল বিস্ময়ে নিমগ্ন হইতে হয়। কিন্তু তুমি সেই অনন্ত কার্য্য রাশি হেলায় সম্পন্ন করিতেছ। উমাশঙ্করকে পূর্ণমনোরথ করিবার নিমিত্ত আমার আশীর্ব্বাদ নিতান্ত অনাবশ্যক। কেন না সৌভাগ্যবান্ উমাশঙ্কর তোমাকে মা বলিয়া চিনিয়াছেন এবং দুঃখ সুখ তোমার চরণে নিবেদন করিয়া নিরস্ত হইতে অভ্যাস করিয়াছেন। ধন্য উমাশঙ্কর। আশ্চর্য্য তাহার অদৃষ্ট ও সাধনা।”

আর কোন কথা না বলিয়াই যোগেশ্বরী প্রস্থান করিলেন। উমাশঙ্কর কাতরভাবে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন; কিন্তু ঘনানন্দ মৃদুস্বরে হাস্য করিয়া বলিলেন,—“বৎস! তোমার দৃষ্টি কাতরতাপূর্ণ কেন? যোগেশ্বরী দেবী তোমার নর-নয়নের অন্তরালে প্রস্থান করিলেন বলিয়া তুমি ব্যাকুলিত হইতেছ? কিন্তু তুমি কি জান না যে, মরণধর্ম্মশীল এই দেহের ইন্দ্রিয়গ্রাম আমাদের চিরসঙ্গী নহে? এই সকল বাহ্যেন্দ্রিয়ের হ্রাস, বৃদ্ধি, বিনাশ ও উৎপত্তি আছে; কিন্তু আমাদের অন্তরে যে ইন্দ্রিয় আছে, তাহা আমাদের সঙ্গী এবং কোন বাহ্য কারণে তাহার উৎপত্তি ও ক্ষয় হয় না; অতএব বৎস! এ বাহ্যেন্দ্রিয়ের উপর আর নির্ভর করিও না; তুমি সেই অন্তরেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যোগেশ্বরী দেবীকে দর্শন করিতে প্রবৃত্ত হও। তাহা হইলে আর তাঁহার অদর্শন হেতু তোমাকে ক্লিষ্ট হইতে হইবে না। সেইরূপ নির্ভর করিতে শিখিলে, কোন বাহ্য বিষয়ই তোমাকে আর অভিভূত করিতে পারিবে না এবং সাগর কানন ও পর্ব্বত কিছুই আর তোমাকে তোমার প্রার্থিত পদার্থ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে পারিবে না। আর বৎস! দেবী যোগেশ্বরী আপাততঃ তোমার সম্মুখে না থাকিলেও, তোমার সঙ্গেই আছেন সন্দেহ নাই। ‘যে ব্যক্তি সাধনা বলে তাঁহার কৃপাভাজন হইয়াছে, সে আর কদাপি তাঁহার কৃপায় বঞ্চিত হয় না।’ তোমার জননী করুণাময়ী। তুমি সকলই জান, অথচ যোগেশ্বরীর অদর্শনে কাতর হইতেছ, ইহা বাস্তবিকই হাস্যজনক। এই জন্যই আমি হাস্য করিতেছি।”

উমাশঙ্কর স্বকীয় অপূর্ণতা ও অজ্ঞতা আলোচনা করিয়া বদন বিনত করিলেন।

ঘনানন্দ বলিলেন,—“বৎস! তুমি শাস্ত্রার্থবিৎ ও জ্ঞানী হইলেও, বয়সের অল্পতাজনিত বহুদর্শিতার অভাব হেতু, এখনও সম্পূর্ণরূপে সাংসারিক মোহাদি অতিক্রম করিয়া উঠিতে পার নাই। এই জন্যই তোমার জ্ঞান-প্রদীপ সমুজ্জ্বল করিবার অভিপ্রায়ে সময়ে সময়ে উত্তেজিত করিয়া দিতে হয়। নচেৎ তোমার ন্যায় ভাগ্যবান্ ও তত্ত্বদর্শী সাধুকে কোন শিক্ষা দিবার প্রয়োজনীয়তা নাই। তুমি পথ দেখিতে পাইয়াছ এবং যে যে উপায়ে সে পথে নির্ব্বিঘ্ন ভাবে পর্য্যটন করিয়া, শেষ সীমায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে, তাহাও বিলক্ষণ হৃদগত করিয়াছ; সুতরাং আমার আর বক্তব্য কিছুই নাই। তথাপি অদ্য তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। নীলরতন-তনয়া অন্নপূর্ণার প্রতি তুমি নিরতিশয় অনুরাগী হইয়াছ, ইহা তুমি না বলিলেও

আমি বিশেষরূপ জ্ঞাত আছি। সেই কুমারীও তোমার প্রণয়িনী হইবার সম্পূর্ণ যোগ্যা বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। সেই কিশোরী কামিনীর সহিত তোমার বিবাহ হইলেও হইতে পারে, না হইলেও না হইতে পারে। বোধ হয় সম্প্রতি আমার সম্মতি ও অনুকূল অভিপ্রায়ের উপরেই সমস্ত নির্ভর করিতেছে। মনে কর, যদি নানা কারণে, ঐ কুমারীর সহিত তোমার বিবাহ আমি যুক্তি-বিরুদ্ধ বোধে ঘটিতে না দিই, তাহা হইলে তোমার চিত্তের অবস্থা কিরূপ হইবে?"

উমাশঙ্কর সবিনয়ে বলিলেন,—"বাস্তবিকই আমি সেই কুমারীর প্রতি নিরতিশয় অনুরাগী। আমার সে অনুরাগের পরিমাণ স্থির করা অসম্ভব। আমার বোধ হয়, আমার মন-প্রাণ সমস্তই সেই কুমারী অধিকার করিয়াছেন এবং আমি যেন সেই কুমারীকে মানব-জীবনের সারসর্ব্বস্ব বলিয়া জ্ঞান করিয়াছি। কিন্তু আমার আকর্ষণ এত সুকঠিন এবং অনুরাগ এত প্রবল হইলেও, আমি কর্ত্তব্য-পালনে বিমুখ হই নাই, এবং আমার জ্ঞান একটুও বিলুপ্ত বা বিচলিত হয় নাই। সুতরাং প্রভুর প্রশ্নের উত্তর প্রদানার্থ আমাকে একটুও ইতস্ততঃ করিতে বা চিন্তান্বিত হইতে হইবে না। হে ভগবন্! আমি আপনাকে সর্ব্বজ্ঞান সম্পন্ন পরম পুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করি; এবং আপনার বিচার ও কার্য্য সকলই ভ্রান্তিশূন্য বলিয়া জানি। সুতরাং যাহা আপনার ইচ্ছার বিরোধী তাহা কদাপি কাহারও পক্ষে শ্রেয়স্কর হইতে পারে না। অতএব আপনি দয়া করিয়া এ অধম জনের জন্য যে ব্যবস্থা করিবেন, নিরতিশয় ক্লেশকর হইলেও, আমি বুঝিব তাহা নিশ্চয়ই আমার অশেষ কল্যাণের হেতুভূত চিত্তের অবস্থা যেরূপই হউক না কেন, আপনার আজ্ঞা প্রতিপালনে যদি কোন দিন আমার বিরাগ জন্মে, জানিবেন সে দিন অধম উমাশঙ্করের মৃত্যু হইয়াছে।

ঘনানন্দ বলিলেন,—"তোমার এ উত্তর আমার সন্তোষ জনক হইলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে আমার মনের মত হয় নাই। ঐ সম্বন্ধে তোমার আর কোন কথা বলিবার আছে কি?

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আছে—অনেক কথা বলিবার আছে। যদি প্রভু অন্নপূর্ণার সহিত বিবাহ সংঘটনের অনুকূল অভিপ্রায় প্রদান না করেন, তাহা হইলে কখনই সে বিবাহ ঘটিবে না। কিন্তু আমি সেজন্য একটুও দুঃখিত বা কাতর হইব না। কারণ অন্নপূর্ণার সহিত বিবাহ জনিত সম্বন্ধই আমার প্রার্থনীয় নহে। যদি প্রভু তাঁহাকে মনে মনেও ভাল বাসিতে নিষেধ করেন, তাহা হইলেই আমার কঠোর পরীক্ষা উপস্থিত হইবে। বোধ হয় অন্নপূর্ণাকে মনে মনেও ভাল না বাসিয়া থাকা আমার পক্ষে নিতান্ত সুকঠিন হইবে।"

ঘনানন্দ জিজ্ঞাসিলেন,—"বিবাহ না ঘটিলে তোমার তাদৃশ ক্লেশ হইবে না; কিন্তু মনে মনেও ভালবাসিতে না পাইলে তুমি নিতান্ত অবসন্ন হইবে, তোমার এরূপ ভাবের তাৎপর্য্য কি, আমাকে বুঝাইয়া দেও।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—অন্নপূর্ণা ধনী গৃহস্থ-তনয়া। আমি ভিক্ষুক সন্ন্যাসী। আমার সহিত তাঁহার বিবাহ সম্ভব নহে। তাহার পর, বিবাহ না হইলেও, বিশেষ ক্ষতির কথা আমি কিছু দেখিতেছি না। আমি অন্নপূর্ণাকে ভালবাসি। বিবাহ না হইলেও সে ভালবাসার বিশেষ তারতম্য ঘটিবার কোন কারণ নাই এবং সে ভালবাসার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে আপনি ভিন্ন এ জগতে আর কাহারও

শাখ্য নাই। সত্য বটে বিবাহ ঘটিলে ভাল-বাসা একটু ভাবান্তর গ্রহণ করিবে। কিন্তু সে ভাবান্তর পরিহার করিয়াও যদি পুন নারীকে আমি ভালবাসিতে সক্ষম হইয়া থাকি, তাহা হইলে বৃথা স্থূল গুরুদেবের উপদেশ শ্রবণ লাম এবং বৃথা এত দিন জগন্মাতা যোগেশ্বরী দেবীর মর্ম্ম প্রণিধান করিবার প্রযত্ন লাম। অন্নপূর্ণার সহিত আমার বিবাহ এ আশা আমার কখন ছিল না, কখনও নাই। সে আশা ত্যাগ করিয়াও আমি তাঁহাকে ভাল বাসিয়াছি এবং আজীবন এইরূপে ভালবাসিয়াই আমি পরম পরিতুষ্ট হইব স্থির করিয়াছি। সত্য বটে বিবাহ ঘটিলে ইন্দ্রিয় সংঘটিত অধিকার বিশেষের উদ্ভব হয়। গুরুদেবের মুখে শুনিয়াছি, ইন্দ্রিয়-বৃত্তির বৈধ ব্যবহার, অবস্থাবিশেষের অপ্রাপ্তি কাল পর্য্যন্ত, বিধেয়। আমার বয়স ও জ্ঞানোন্নতির অবস্থা ইন্দ্রিয়চর্চ্চার অনুকূল হইলেও, আমি তাদৃশ কল্পনা বর্জ্জন করিয়াই অন্নপূর্ণাকে ভালবাসিতে অভ্যাস করিয়াছি।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"যদি অন্নপূর্ণার সহিত তোমার বিবাহ ঘটে, তাহা হইলে,—তোমার সঙ্কল্প পূর্ণ হইবে কি?

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"প্রভু অন্তর্যামী; আপনি কখন যোগানন্দরূপে ক্রিয়াশীল এবং কখন ঘনানন্দরূপে নিষ্ক্রিয়। আপনি যোগানন্দ বলিয়াই ঘনানন্দ এবং ঘনানন্দ বলিয়াই যোগানন্দ। আপনার তত্ত্ব যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে হৃদগত করিয়াছে, সে অনন্ত সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছে। আমি অধম ও অপূর্ণ সাধক। আপনাকে প্রণিধান করিবার শক্তি আমার না থাকিলেও আমি অসীম ভাগ্যবলে আপনার মহিমা, অনন্ত শক্তি ও অপরিমেয় প্রভাবের বৃত্তান্ত কিয়ৎপরিমাণে অবগত হইয়াছি। সুতরাং আপনার নিকট হৃদয়-ভাব প্রচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা। প্রার্থনা করি, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, সামান্য লজ্জা বা সঙ্কোচের বশবর্ত্তী হইয়া, পরমারাধ্য গুরুদেবের নিকট কোন মনোবৃত্তি প্রচ্ছন্ন করিবার বাসনাও যেন কখন না জন্মে। অন্নপূর্ণার সহিত বিবাহ সংঘটন হইলে আমি বাস্তবিকই নিরতিশয় সুখী হইব।"

তখন সাধকের যোগানন্দ এবং সিদ্ধের ঘনানন্দ প্রীতিপূর্ণ হাস্য সহকারে বলিলেন,—"বৎস। তোমার সহিত শীঘ্রই অন্নপূর্ণার বিবাহ ঘটিবে। এখনই তদ্বিষয়ক সমস্ত কথা সুস্থির হইবে। আমি তোমার কথায় পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি। কেবল রূপ ও ইন্দ্রিয়-তৃষ্ণায় প্রবল ভালবাসার উৎপাদন করে বটে, কিন্তু সে ভালবাসা, সেই তৃষ্ণা, নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই, নিবৃত্ত হইয়া যায়। যে ভালবাসা কামনা শূন্য, যে ভালবাসা কেবল ভালবাসিতেই জানে, এবং ভাল বাসিয়াই পূর্ণ পরিতৃপ্তি উপভোগ করে, তাহাই স্থায়ী, তাহাই সার, তাহাই ধর্ম্ম এবং তাহাই চরমে ব্রহ্মাববোধক। আশীর্ব্বাদ করি তোমার মনোরথ সফল হউক। আমার শিক্ষাপ্রদান সার্থক হইয়াছে। আশা করি তোমার গৌরবে আমি গৌরবান্বিত হইব।"

এই সময়ে নীলরতন বাবু ও হরকুমার বাবু সেই কুটীর দ্বারে দর্শন দিলেন। তাঁহাদিগকে দর্শন মাত্র ঘনানন্দ বলিলেন,—"বিষয়ী ব্যক্তিগণের ব্যবহারে অনভিজ্ঞ হইলেও, আজি আমি আপনাদিগকে সংসারী লোকের ন্যায় আদর ও অভ্যর্থনা করিতেছি। আমি অনুমান করিতেছি, আপনারা আমার পুত্র উমা-

শঙ্করের সহিত নীলতরন বাবুর কন্যা অন্নপূর্ণার বিবাহ বিষয়ক অনুমতি গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন।"

নীলরতন ও হরকুমার বিস্ময় সহকারে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিলেন। হরকুমার বলিলেন,—"ভগবান্ অন্তর্যামী। বিশ্বের সর্ব্বত্র সকলেই আপনার পুত্র-কন্যা। তত্ত্বাবতের সংযোগ ও বিয়োগ, বন্ধন ও মোক্ষ আপনার কৃপা প্রভাবেই সম্পন্ন হয়। আপনার অনুমতি ও আদেশ ব্যতীত কোন যোগই অসম্ভব; এই জন্যই আপনি যোগানন্দ। আপনার অনুকম্পা না হইলে সংসারে এক বিন্দুও আনন্দের উদ্ভব হইতে পারে না; এই জন্যই আপনি ঘনানন্দ। কৃপা করিয়া অধমগণের মনোভীষ্ট পূরণ করুন।

সে কথায় মনঃসংযোগ না করিয়া, ঘনানন্দ বলিলেন,—"এই বিবাহ আমার সম্পূর্ণ অনুমোদিত জানিবেন এবং আমি অনুরোধ করিতেছি, যত শীঘ্র সম্ভব আপনারা এ কার্য্য সমাধা করুন। আমি সংসারত্যাগী ভিক্ষাজীবী হইলেও, আপনারা অতঃপর আমার কুটুম্ব। কৃপা সহকারে কুটীর মধ্যে আসিয়া, আপনারা এই আসনে উপবেশন করুন।"

নীলরতন বলিলেন,—"অপরিসীম পুণ্যফলে আপনি আমাদিগের ন্যায় অধম জনকেও কুটুম্ব বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছেন। আমরা আপনার ন্যায় মহাপুরুষের চরণধূলার প্রার্থী।"

যোগানন্দ হাস্য সহকারে বলিলেন,—"আপনারা বৈবাহিক। সামাজিক লোকেরা বৈবাহিককে ধূলা-কাদা দিয়াই তামাসা করিয়া থাকে। সে যাহা হউক, উমাশঙ্কর আমার একার সামগ্রী নহেন। সনাতনী যোগেশ্বরী দেবী উঁহার জননী। এই বিবাহ ব্যাপারে কেবল যে আমারই সম্মিত আছে এমন নহে; যোগেশ্বরীরও এই সম্বন্ধ অতিশয় অনুমোদিত।"

হরকুমার বলিলেন,—"আমাদিগের অশেষ সৌভাগ্য। আমরা কেমন করিয়া প্রভুর সমক্ষে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিব তাহাই ভাবিতেছিলাম। দয়াময় প্রথমেই স্বয়ং আমাদিগের উদ্বেগ দূর করিয়া দিয়াছেন। যোগানন্দ ও যোগেশ্বরী এবং যোগেশ্বরী ও ঘনানন্দ অভিন্ন বলিয়াই আমরা জ্ঞান করি; সকল বিষয়েই একের অনুমোদন প্রত্যেকের অনুমোদন বলিয়াই আমরা জানি এবং প্রত্যেক কার্য্যেই এক জনের আদেশ সকলেরই আদেশ বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি; অতএব যখন প্রভুর অনুমোদন পরিব্যক্ত হইয়াছে তখনই যোগেশ্বরী দেবীর অনুমোদনও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে বলিয়া আমরা স্থির করিয়াছি। আমরা বিস্ময়-কূপে নিমগ্ন পাপাত্মা; সম্মুখে দেখিতে না পাইলেও, ইহা আমরা সম্যক্ জ্ঞাত আছি যে, সেই প্রকৃতিরূপা সনাতনী যোগেশ্বরী দেবী পরম পুরুষ স্বরূপ যোগানন্দের নিত্যসঙ্গিনী এবং তুষারূপ সর্ব্বান্তর নিহিত ঘনানন্দের অবিচ্ছিন্ন সহচরী। আমরা সেই পরমেশ্বরীকে ভক্তি সহকারে প্রণাম করি।"

নীলরতন ও হরকুমার তথায় উপবেশন করিলেন এবং উমাশঙ্করের সম্বন্ধে নানা কথা সন্ন্যাসীর গোচর করিতে লাগিলেন। অনেক বিষয়ে তাঁহারা ঘনানন্দের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসু হইলেন। যোগানন্দও তাঁহাদিগকে নানা-বিষয়ে সমুচিত পরামর্শ প্রদান করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অবরোধ

কাশীর অন্নপূর্ণা দেবীর মন্দির সন্নিধানে কালিকা গলির মধ্যে, এক অপরিষ্কৃত ও জীর্ণ ভবন পরিদৃষ্ট হয়। ভবনের কুত্রাপি জন-সমাগমের চিহ্ন নাই। তাহার প্রবেশদ্বার বহির্দ্দিক হইতে তালা দ্বারা বদ্ধ। এই জীর্ণ বাটীর সকল ঘরই মনুষ্য-বাসের অযোগ্য। ভবন বাহ্যতঃ দ্বিতল হইলেও বস্তুতঃ ত্রিতল। তাহার নিম্নতল, হয় কাল সহকারে, না হয় মূল নির্ম্মাণকারকের ইচ্ছানুসারে, ভূগর্ভপ্রবিষ্ট। ভূগর্ভস্থিত প্রকোষ্ঠেও গমনাগমনের উপায় আছে। বাটীর সকল ভাগই অব্যবহার্য্য ও জনশূন্য হইলেও, ভূগর্ভস্থিত প্রকোষ্ঠে এক ক্ষীণকায়া নারী ভূ-শয্যায় পড়িয়া আছেন। সেই কামিনী বিধুমুখী।

রাত্রি প্রায় এক প্রহর। ভূগর্ভস্থ সেই স্বভাবতঃ অন্ধকার প্রকোষ্ঠে সম্প্রতি নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন। সেই অন্ধকারের মধ্যে একাকিনী বিধুমুখী চেতনাহীন শবের ন্যায় পড়িয়া আছেন। সহসা উচ্চতলে মনুষ্যের পদ-শব্দ শ্রুত হইল। বিধুমুখী সে শব্দে একটুও বিচলিত হইলেন না। তিনি যে প্রকোষ্ঠে অবস্থিত ছিলেন, তাহার দ্বার বাহির হইতে তালা দ্বারা আবদ্ধ ছিল। সেই দ্বার-সন্নিধানে দুইজন মনুষ্যের কথোপকথন শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল; তাহাতেও তিনি বিচলিত হইলেন না। ক্রমশঃ ঘরের তালা খোলার শব্দ বিধুমুখীর কর্ণগোচর হইল; তথাপি তিনি অবিচলিত। এক পুরুষ ও নারী গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং দিয়াশলাই ও বাতি বাহির করিয়া আলোক জ্বালিল; তথাপি বিধুমুখী অবিচলিত। সেই পুরুষ হরিচরণ ও নারী সারদা। সারদা বলিল,—"একি! নড়ে না চড়ে না যে! মরে নাই ত?"

হরিচরণ,—"মরিবার জন্য উঁহার দায় পড়িয়াছে। এও এক রকম ছলনা। মনে ভাবিয়াছে এরূপ দেখিলে ছাড়িয়া দিবে। দাঁড়াও, দেখি আমি।"

হরিচরণ এই বলিয়া বিধুমুখীর নিকটস্থ হইল এবং তাহার পৃষ্ঠদেশে পাদুকা সমেত পদাঘাত করিতে করিতে বলিল—"বড় আরাম করিয়া ঘুমান হচ্ছে যে। আমি যে কথা বলিয়া গিয়াছিলাম তাহার কি হইল?"

বিধুমুখী, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন,—"আমি ঘুমাই নাই। তোমার মুখ দেখিতে হইবে বলিয়া আমি চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া ছিলাম। এ জীবনে তোমার মুখ আর দেখিতে না হয় ইহাই আমার কামনা। তাই বা কেন করি? বাস্তবিক তোমার দোষ কিছুই নাই। আমি নিজেই পাপে মজিয়া আপনার অশেষ কষ্টের সৃষ্টি করিয়াছি। তোমাকে দোষী করিয়া আমি অপরাধী হইতেছি। বরং তুমি প্রকারান্তরে আমার বড়ই উপকার করিয়াছ। তুমি যদি আমাকে ঘৃণা না করিতে, যদি তোমার অনাদরে আমার মনে ক্লেশের উদ্ভব না হইত, তাহা হইলে আমার মতিগতি কখনই এরূপ পরিবর্ত্তিত হইত না এবং পাপের সাগরে আমাকে চিরদিনই ডুবিয়াই থাকিতে হইত। তোমার ঘৃণায় আমার অন্তরে আলোকের আবির্ভাব হইয়াছে। তুমি আমার বড় উপকার করিয়াছ। তোমাকে প্রণাম করি। তুমি আমাকে কি কথা বলিয়াছিলে? বিষয়-

সম্পত্তি সমস্ত তোমার নামে লিখিয়া দিবার নিমিত্ত দলীলে নাম সহি করিতে বলিয়াছিলে তো! তা সে কাজ আমা দ্বারা কখন হইবে না। আমি সে কথা তোমাকে পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি। এ কাজের জন্য তুমি, আমাকে গভীর রাত্রে, মুখে কাপড় বাঁধিয়া, লোকজন দ্বারা অনর্থক ধরিয়া আনিয়া, বৃথা আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ। এ কার্য্য আমি কদাচ করিব না, ইহা তুমি স্থির জানিবে "

হরিচরণ ক্রোধ সহকারে বলিল,—"বটে! করবি না? তোর অদৃষ্টে অনেক দুঃখ আছে। আমি তোকে ভয়ানক সাজা দিব জানিস্?"

বিধুমুখী ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিলেন,—"আমার অদৃষ্টে অনেক দুঃখ আছে, তাহা আমি জানি। যে দিন সারদার পরামর্শে তোমার সহিত ঘৃণিত পরিচয় ঘটাইয়াছি, সেই দিন হইতেই আমার দুঃখের আরম্ভ হইয়াছে; কোথায় গিয়া এ দুঃখের শেষ হইবে তাহা ভাবিয়া ঠিক্ করা ভার। আমি নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করিয়াছি। তুমি আমাকে বিশেষ সাজা দিবে? যে সাজা ভগবান্ আমাকে দিয়াছেন ও দিতেছেন, তাহা কল্পনা করিলেও ভয় হয়। তুমি দশটা লাথি মারিবে? তাহাতে আমার গা পচিয়া যাইবে না। যতক্ষণ দেহ সহিতে পারে, ততক্ষণ সহ্য করিব। সহ্য করিতে না পারি, দেহ হইতে প্রাণ চলিয়া যাইবে। সে সকল কিছুই আমার পক্ষে আর সাজা বলিয়া গণ্য নহে।"

হরিচরণ বলিল,—"জানিস্ তুই, এই সারদা এক সময়ে তোর দাসী ছিল?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"জানি।"

হরিচরণ বলিল,—"এক্ষণে এই সারদা আমার প্রাণেশ্বরী হইয়াছে।"

সেই নরপ্রেত হরিচরণ এই বলিয়া সারদারে কণ্ঠালিঙ্গন করিল এবং পুনঃ পুনঃ তাহার বদন চুম্বন করিতে লাগিল। বলিল,—"তোকে অতঃপর এই সারদার পদসেবা করিতে হইবে। সারদা তোর সেবায় পরিতুষ্ট হইলে, তবে তুই ভাত-কাপড় পাইবি।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"ভাত-কাপড় পাই না পাই তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। সারদা তোমারই প্রাণেশ্বরীই হউক, অথবা আর যাহাকেই তুমি মন-প্রাণ সমর্পণ কর, আমার তাহা জানিবার কোনই প্রয়োজন নাই। তোমার সংস্রবে আসিয়া আমার সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। তোমার সম্বন্ধে ইহা ছাড়া আর কিছুই আমার মনে নাই। সারদার পদসেবার কথা বলিতেছ? পৃথিবীর কীট-পতঙ্গ সকলেরই অপেক্ষা আমি এখন ঘৃণিত ও অধম; সুতরাং সারদার পদসেবা করায় আমার কোনই অপমান নাই। আইস সারদা, আমি ইচ্ছা করিয়া তোমার পদসেবা করি।"

হরিচরণ,—বলিল, "কিন্তু সেই দলীলে নাম সহি করিলে তোর কিছুই করিতে হয় না। বল্ তুই এখনও তাহাতে নাম সহি করবি কি না?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"কেন তুমি বার বার আমাকে এ কথা বলিতেছ? তোমার চক্রান্তে একবার বিষয়-সম্পত্তি নিজ নামে লেখাইয়া লইয়া অশেষ সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছি; আবার আমি সে সম্বন্ধে কোন কাগজেই নাম সহি করিব না। বিষয় আমার নহে। যাঁহার বিষয় তাঁহাকে তাহা ফিরাইয়া দিয়াছি। সে সম্বন্ধে আর কোন ব্যবস্থা করিতে আমার অধিকার নাই। তুমি আমাকে মার, কাট, অথবা যত ইচ্ছা যন্ত্রণা দেও, আমি আর কিছুতে নাম সহি করিয়া অপরের ক্ষতি করিব না, ইহা তুমি স্থির জানিবে।"

হরিচরণ বলিল,—"কি! এত বড় স্পর্দ্ধা!

আমার কথার উপর তোমার জেদ? আমি দেখি, তোর অহঙ্কার কোথায় থাকে?”

তখন সেই বর্ব্বর সেই মরণাপন্না সুন্দরীকে হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা এক বার প্রহার করিবা মাত্র, সারদা অগ্রসর হইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং বলিল,—“তুমি যাও—বাহিরে বইস গিয়া। আমি বউ দিদিকে বুঝাইয়া সকল বিষয় ঠিক করিতেছি। রাগারাগির কর্ম্ম নয়।”

সারদা, হাত ধরিয়া, হরিচরণকে বাহিরে টানিয়া আনিল এবং উপরের একটি ঘরে তাহাকে বসাইয়া রাখিয়া, স্বয়ং পুনরায় বিধুমুখীর নিকট আগমন করিল। তাহার পর তাঁহার কাণের কাছে মুখ আনিয়া অস্ফুট-স্বরে বলিল,—“তোমার স্বামী তোমার সন্ধানে ফিরিতেছেন। অনেক কষ্টে অনেক সন্ধানে তিনি আমার নিকট আসিয়াছিলেন। তুমি তাঁহার সহিত দেখা করিবে কি? তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে, হয় ত তোমার মুক্তির উপায় হইতে পারে।”

বিধুমুখী বলিলেন,—“মুক্তি বা অবরোধ আমার দুইই সমান। তথাপি আমি এখন তাঁহার সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা করি। দুই দিন আগে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের প্রয়োজন ছিল না; এখন হইয়াছে। তুমি যদি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ঘটাইয়া দিতে পার, তাহা হইলে আমি সুখী হইব।”

সারদা বলিল,—“আমি তাহার চেষ্টা করিব। পারি যদি, তাহা হইলে দুই ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া এখানে আবার আনিব। আপাততঃ আমি কৌশল করিয়া হরিচরণকে লইয়া যাইতেছি। মনে করিও না বউ দিদি, এ বিষয়ে আমার কোন দোষ আছে। আমি তোমাকে দলিলে নাম সহি করিতে বারণ করিতেছি। হরিচরণের সম্মুখে তাহার মনের কথা না কহিলে, আমার দ্বারা যদি কোন উপকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহাও হইবে না; হয়ত উভয়েরই সমান বিপদ ঘটিবে। আমি তোমার দাসী। তোমার অনেক খাইয়াছি। হরিচরণের সহিত প্রণয় দেখিয়া মনে করিও না, আমি তাহার প্রতি আসক্ত। সে তো জানোয়ার। তাহার অসংখ্য উপপত্নী। স্ত্রীলোককে সে খেলার জিনিস ছাড়া আর কিছুই মনে করে না। কাহাকেও সে ভাল বাসে না; ভালবাসিতে সে জানেও না। তবে যে আমি তাহার সহিত মিশিয়া রহিয়াছি, সে কেবল কিঞ্চিৎ অর্থলাভ ও তাহাকে হাতে রাখার প্রত্যাশায়। অনেক কথা আছে, সময় পাই তো বলিব। এখন যাই, বিলম্ব হইলে সকল দিকে ক্ষতি হইবে।”

সারদা চলিয়া গেল। আবার সেই দ্বার নিরুদ্ধ হইল ও চাবি বন্ধ হইল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে ধীরে ধীরে সেই দ্বার আবার খুলিয়া গেল। সারদা একব্যক্তিকে ঘরে প্রবেশ করিতে বলিল। সেই আগন্তুক শ্যামলাল।

বিধুমুখীর নিকটস্থ হইয়া শ্যামলাল বলিলেন,—“আমিই তোমার সকল ক্লেশের মূল। তোমার সমস্ত অবস্থাই আমি জানিয়াছি। আমার সহায় সম্পত্তির অভাব নাই; আমি সহজেই তোমাকে মুক্ত করিব। আর আমি রূপের মোহে মুগ্ধ হইয়া তোমার শরণাগত নহি; আর আমি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেজনায় তোমার চরণাশ্রিত নহি। এখন আমি তোমার নিকট ক্ষমার ভিখারী। আমার অনেক অপরাধ। তোমাকে দয়া করিয়া সকলই ক্ষমা করিতে হইবে। আমি তোমার স্বামী; তোমাকে বিপদে ও সম্পদে রক্ষা করিতে আমি

বাধ্য। যেমন করিয়া পারি এখনই তোমার কষ্টের অবসান করিব।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"আমি বিশেষ কোন কষ্ট ভোগ করিতেছি না। তুমি মহাত্মা, তাই যাহাকে চরণে দলিত করা উচিত, তাহার জন্য এত ভাবিতেছ। তোমাকে স্বামী বলিয়া সম্বোধন করিতে আমার অধিকার নাই। তথাপি জীবনে ও মরণে তোমার সহিত আমার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। এক দিন তুমি আমার রূপে মোহিত হইয়া আমার চরণ ধারণ করিয়াছিলে! আমি তোমার ক্রীতদাসী হইলেও, তখন তোমার বাসনা পূরণ করি নাই। আমার অপরাধ অসীম ও ক্ষমার অযোগ্য। আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি না; কেন না সে স্পর্দ্ধা ও সাহস আমার নাই। চাহিতেছি কেবল তোমার একটু পদধূলি। তুমি দাসীকে তাহা মস্তকে ধারণ করিতে দিবে না কি?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"তুমি এমন কথা বলিও না বিধুমুখী। তুমি পাপ পথে পড়িয়াছিলে সত্য, কিন্তু আমিই তাহার কারণ; আমার অনাদর ও অযত্ন না ঘটিলে, হয়ত বিধুমুখী, তুমি সংসারে দেবতা হইতে। যে দেবতার নিকট তুমি ধর্ম্মশিক্ষা করিয়াছ, আমার কপাল ক্রমে সেই দেবতা আমাকেও চরণে আশ্রয় দিয়াছেন। এখন বুঝিয়াছি, আমার অপরাধের সীমা নাই। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তোমার প্রসন্নতা লাভ করিবার জন্য, প্রাণপাত করিবার প্রয়োজন হইলে, তাহাও করিব।"

সহসা প্রকাণ্ড লাঠি লইয়া টলিতে টলিতে হরিচরণ তথায় প্রবেশ করিল এবং বলিল,—"আবার তুই সন্ধান করিয়া এখানেও আসিয়া জুটিয়াছিস? আজি তোর মাথা কাটাইয়া তবে অন্য কাজ। দেখি তোকে কে রক্ষা করে।"

হরিচরণ শ্যামলালের মস্তক লক্ষ্য করিয়া লাঠি তুলিল। তৎক্ষণাৎ বিধুমুখী উভয়ের মধ্যগত হইয়া বলিলেন,—"মারিতে হয় আমাকে মার, উনি নিরপরাধ।"

হরিচরণ বলিল,—"মারিব—আজ তোরও প্রাণ থাকিবে না। কিন্তু আগে এই হতভাগার জীবন শেষ করিব।"

শ্যামলাল ত্বরিত আসিয়া হরিচরণের যষ্টি ধারণ করিলেন এবং বলিলেন,—"আমি ইচ্ছা করিলে এখনই তোমাকে নিপাত করিতে পারি। কিন্তু তাহা করিব না। অনেক পাপ করিয়াছি, আবার নর-হত্যার বোঝা ঘাড়ে চাপাইব না। তোমার অপেক্ষা আমার শরীরের শক্তি অনেক বেশী। বিশেষতঃ তুমি এক্ষণে মাতাল। সুতরাং তোমাকে এখন মারিয়া ফেলা আমার পক্ষে বিশেষ কঠিন কাজ নহে। তথাপি তোমাকে আমি মারিব না। কারণ তাহা আমার উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধ। আজ তুমিই এখানে অবরুদ্ধ থাকিবে। বিধুমুখী ও আমি তোমাকে বদ্ধ করিয়া এখনই প্রস্থান করিব। সারদারও এই দশা হইত, কেবল আমাকে এই স্থানে আসিবার উপায় করিয়া দিয়াছে বলিয়া, আমি তাহাকে ক্ষমা করিলাম।"

শ্যামলাল তখনই হরিচরণকে ভূতলে ফেলিয়া দিলেন এবং তাহার উড়ানি লইয়া তদ্দ্বারা তাহার হস্ত ও পদ একত্র করিয়া বাঁধিয়া ফেলিলেন। হরিচরণ, শারীরিক শক্তি নিষ্ফল দেখিয়া, চীৎকার করিতে লাগিল। শ্যামলাল তাহাতে একটুও মনোযোগ না করিয়া, তাহাকে ঘরের মধ্যে ফেলিয়া রাখিলেন এবং বিধুমুখীর হাত ধরিয়া বাহিরে আসিয়া দরজায়

তালা লাগাইয়া দিলেন। সারদা সেখানে অপেক্ষা করিতেছিল। তিন জনে সেই গভীর রাত্রিকালে সেই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে অন্তর্দ্ধান হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সংসারী।

সোণাপুরে ৺ রাধাবিনোদ বাবুর বিশাল-ভবনে বড়ই সমারোহ। কিছুদিন হইতে সেই বাটী পরিত্যক্ত ও জনশূন্য ছিল; সুতরাং শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছিল। অধুনা তাহার সর্ব্বত্র লোক পূর্ণ হইয়াছে এবং চতুর্দ্দিকেই অশেষ সমৃদ্ধির চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইতেছে। দ্বারে সুরঞ্জিত পরিচ্ছদধারী প্রহরিগণ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া অপেক্ষা করিতেছে; অশ্বশালায় নানাপ্রকার অশ্ব নিবদ্ধ রহিয়াছে; অন্যত্র বহু হস্তী শুণ্ড আন্দোলন করিতে করিতে দুলিতেছে; স্থানান্তরে নানাবিধ অশ্বযান রহিয়াছে; সিংহদ্বারের সন্নিকটে অশ্ব চতুষ্টয় সংযুক্ত একখানি ল্যাণ্ড অপেক্ষা করিতেছে; জরিক কোচম্যান উত্তম বেশভূষা করিয়া লাগাম হস্তে সানন্দ মনে কোচবাক্সে বসিয়া আছে।

ভবন মধ্যেও উৎসাহের সীমা নাই। এক স্থানে অনেক পরিচারিকা, প্রকাণ্ড বটি লইয়া, রাশীকৃত মাছ কুটিতেছে; স্থানান্তরে স্তুপাকার তরকারী কোটা হইতেছে, কোথাও বা অনেক শিল পাতিয়া অনেকে মসলা পিসিতে পিসিতে মেঘগর্জ্জনের শব্দ সমুৎপাদন করিতেছে; কোথাও বা সারি সারি উনানে বড় বড় হাঁড়ি, কড়া প্রভৃতি চাপাইয়া পাচকেরা পাক করিতেছে। অন্যদিকে দুই একজন রসিক ভৃত্য, চারিদিকে চাহিয়া এবং সমুচিত সুযোগ বুঝিয়া, কোন যুবতী পরিচারিকাকে দুইটা মনের কথা কহিয়া লইতেছে; কোথাও বা দুইজন পরিচারিকা মসলা চুরি করিয়া নাতিনীর বাটীতে তত্ত্ব পাঠাইবার উপায় করিয়া রাখিতেছে; কোথাও বা কোন পরিচারিকা ঝুড়িতে করিয়া মাছ ধুইবার ওজরে বাহিরে আসিয়া, তাহার অর্দ্ধেক ভাগ, তথায় অপেক্ষিত ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা, বাড়ীতে চালান করিয়া আসিতেছে। ইত্যাদি রূপ ব্যাপারে এ অংশের সকলেই ব্যস্ত ও উৎসাহময়।

ভবনের বৈঠকখানা ভাগের কোন স্থানে কয়েকজন পক্ককেশ বৃদ্ধ বসিয়া, তামাকের শ্রাদ্ধ করিতে করিতে, সেকালের কীর্ত্তিকাহিনীর আলোচনা করিতেছেন। আর একদিকে কয়েকজন গুম্ফ ও শ্মশ্রুবিহীন অধ্যাপক বসিয়া পুরাণাদি শাস্ত্রের এক বর্ণও যে মিথ্যা নহে, তাহার মধ্যে কুত্রাপি যে কল্পনার সমবেশ নাই এবং তৎসমস্তই যে সাক্ষাৎ বেদোক্তি, তাহাই সপ্রমাণিত করিতেছেন। অবশ্য প্রত্যেকের টিকিগুলি ক্ষণকালও একস্থানে স্থির থাকিতে পাইতেছে না এবং পরিধান বস্ত্রের কাছাগুলিও যেখানে থাকা উচিত সেখানে থাকিতেছে না। আর এক দিকে কতকগুলি নব্য, সভ্য যুবা বসিয়া ভারতোদ্ধারের বাসনায় অনেক মৌখিক আক্ষেপ ব্যক্ত করিতেছেন; বলা বাহুল্য তাঁহাদিগের সেই বাদবিতণ্ডার মধ্যে মাতৃভাষা ষোল আনা রকম পরিত্যক্ত হইয়া, মাতৃভূমির হিতৈষিতা সংঘোষিত করিতেছে। ইত্যাদি রূপে নানা স্থানে নানারূপ জটলা চলিতেছে।

হরকুমার বাবু সপরিবার সার্ব্বভৌম মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া, কয়েক দিন হইল কাশী

হইতে এ স্থানে আগমন করিয়াছেন এবং এখানকার ভবনাদির সুব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। অদ্য এই ভবন ও এতৎসংস্থষ্ট বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী এখানে আগমন করিবেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত, হরকুমার বাবুর আহ্বান অনুসারে, সন্নিহিত, সমস্ত জনপদের বহুতর ভদ্রাভদ্র ব্যক্তি অদ্য এখানে সমবেত হইয়াছেন। সমাগত ব্যক্তিবৃন্দের জন্য অদ্য এই বাটীতে ভূরি ভোজের আয়োজন হইয়াছে।

হরকুমার বাবু আজি বড় ব্যস্ত। তিনি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই এক একবার উপস্থিত হইতেছেন এবং অনেকের সহিত দুই একটি কথা কহিয়া, স্থানান্তরে চলিয়া যাইতেছেন। সনাতনপুরের হরিশ কামার এবং চণ্ডীতলার রামহরি কৈবর্ত্ত পরমানন্দে তাঁহার আদেশ বহন করিয়া ফিরিতেছে। তাহাদের বেশভূষা অবস্থার বিশেষ উন্নতি ও আন্তরিক সন্তোষের পরিচয় প্রদান করিতেছে। অনেক কর্ম্মচারী নানা প্রয়োজনে চারিদিকে ঘুরিতেছে; তাহারা মধ্যে মধ্যে হরকুমার বাবুর নিকটস্থ হইয়া কৃত-কর্ম্মের বিবরণ জানাইতেছে এবং তাঁহার নূতন আদেশ শুনিয়া লইতেছে।

চণ্ডী গুলিখোর, বৈঠকখানা বাটীর এক বারান্দায় দাঁড়াইয়া হাত ও মাথা নাড়িতে নাড়িতে, রামহরির নিকট একটা ভয়ানক কথা ব্যক্ত করিতেছে। উত্তম ঢাকাই ধুতি সে পরিয়াছে, উত্তম গরদের জামা তাহার গায়ে, উত্তম সোণার চেন তাহার বুকে, উত্তম বার্ণিস করা জুতা তাহার পায়ে, উত্তম রূপাবাঁধা সুরভি ধূমোদ্গারী হুঁকা তাহার বাম হাতে। চণ্ডী বলিতেছে,—"শীঘ্রই যে সংসারের প্রলয় ঘটিবে তাহার সন্দেহ নাই। শাস্ত্রে স্পষ্টই বলিয়াছে, কলিতে সকলই বিপরীত হইবে, আর তাহার পরেই পৃথিবী উল্টাইয়া যাইবে। এখন তো লক্ষণ দেখিয়া বোধ হয়, তাহার দেরী নাই।"

রামহরি জিজ্ঞাসিল,—"কি লক্ষণ দেখিয়া আপনি এরূপ মনে করিতেছেন বাবাঠাকুর?"

চণ্ডী বলিল,—"দেখ না কেন,দেবের দেব মহাদেব গাঁজা, গুলি, চরস, সিদ্ধি প্রভৃতি সকল নেশাতেই সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। ব্রহ্মাও নলমেরু লইয়া গুলি খাইতেন, বেদে এমন প্রমাণ আছে; আর তাঁহার সৃষ্টির সকল জায়গায়—যেমন লাউ গাছের ফল আর বট গাছের ফল—যেরূপ সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি গুলি খাইতেন। আর বিষ্ণু ঠাকুর যে গুলি খাইতেন, এ কথা অনেক পুরাণে লেখা আছে। তার সাক্ষী তাঁর অবতারেই দেখ, কখন মাছ, কখন কাছিম, কখন শূয়ার, কখন সিংহ সাজিয়া তাঁহাকে ভূমণ্ডল রক্ষা করিতে হইয়াছে। লোকে বলে, তিনি ইচ্ছাময় স্বয়ং এত কষ্ট না করিয়া ইচ্ছা করিলে সকলই হইতে পারিত। তবে এত করেন কেন? এই ত বাবা অবুঝের কথা! আরে তাহা হইলে গুলির মাহাত্ম্য প্রকাশিত হয় কই? যিনি ভগবান্ তিনি যদি অদ্ভুত কার্য্য করিয়া গুলির মাহাত্ম্য প্রচার না করেন, তবে এ মহৎ কার্য্য করে কে? আমি তোমাকে দেখাইতে পারি, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, যম, কুবের, নল, নীল, গয়, গবাক্ষ, হনুমান, মর্কট সকল দেবতাই চিরদিন গুলি খাইয়াছেন; এবং এখনও স্বর্গের আড্ডা গুলজার করিয়া গুলি খাইতেছেন। অই মেঘগুলা কি বল দেখি? ও গুলা দেবতাদের গুলির ধোঁয়া ছাড়া আর কিছুই নহে। এ হেন গুলি সামগ্রী পৃথিবী হইতে উঠিয়া গেল।

ইহাতে সৃষ্টি রসাতলে যাইবে না? অবশ্য যাইবে।”

রামহরি বলিল,—“উঠিয়া যাইতেছে বুঝিলেন কিসে? এই আপনি খান, আরও কত লোক খায়। আপনাদের পুণ্যে সৃষ্টি বজায় থাকিবে।”

চণ্ডী বলিল,—“উঁহুঁ। আমার খাওয়ায় আর কিছু হয় না। হরকুমার দাদার এত বুদ্ধি, তিনি একটা ছিটাও টানেন না; উমাশঙ্কর বাবু এত পণ্ডিত, এমন জ্ঞানী, কখন গুলি খান না; ঘনানন্দ ঠাকুর, পরম সন্ন্যাসী, অথচ গুলি বর্জ্জিত। নেশা না করিয়া কখন সন্ন্যাসী হয় শুনিয়াছ কি? কলিতে এ সকলই আশ্চর্য্য কাণ্ড। মনে করিয়াছিলাম, তুমি লোকটা নিশ্চয়ই আমার জুড়িদার। আরে ছ্যাঃ। কেবল গুড়ুক তামাক!”

রামহরি বলিল,—“আপনি তামাক খান; আমি একটু কাজ সারিয়া শীঘ্র ফিরিতেছি। তা আপনি একাই ত একশ।”

চণ্ডী বলিল,—“একটা কথা শুনিয়া যাও। দেখ, ঐ একা কথাটায় প্রাণে যেন ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেয়। চৌদ্দ বেদ আর ছত্রিশ শাস্ত্রের সর্ব্বত্র লিখিয়াছে, সঙ্গদোষে মানুষ নষ্ট হইয়া যায়। আমি বড়ই কুসংসর্গে পড়িয়াছি। এখন ঘোর কলির প্রতাপে আর কুসংসর্গের দোষে আমারই সময়ে সময়ে ইচ্ছা হয়, যে, দাদাকে আমার গুলির বন্দোবস্তটা উঠাইয়া দিতে বলি। অদৃষ্টে হয়ত সে দুর্দ্দশাও শেষে ঘটে বা! দাদাকে ছাড়িতে পারিব না—মরিলেও না। তিনি দাতাকর্ণ। তিনি সবই বুঝেন, কেবল গুলির মাহাত্ম্য বুঝেন না। তা একটা দোষের জন্ত মানুষের উপর রাগ করা অন্তায়। তিনি যদি বলেন, আমি গুলি ছাড়িলে সৃষ্টি রসাতলে যাইবে না, তাহা হইলে না হয়—তা থাক সে কথা এখন—পরে ভাবা যাইবে। চল, যাই একবার দাদার কাছে।”

অন্তঃপুর মধ্যে এক অংশে সুহাসিনী, রামহরির পত্নী দাসীকে সঙ্গে লইয়া একটি ঘরে অপূর্ব্ব বিছানা পাতাইতেছেন। আর তাঁহার মা ও শাশুড়ী অন্ত স্থানে রূপার থালায় নানা প্রকার জলখাবার সাজাইতেছেন। দাসীর দেহের যথাযথ স্থানে স্বর্ণালঙ্কার শোভা পাইতেছে। অঙ্গনের মধ্যস্থলে কয়েকজন পুরন্ধ্রী বরণের আয়োজন করিয়া রাখিতেছেন। তথায় রজত কলসে আম্রশাখা বিন্যস্ত হইয়াছে এবং আলপোনার দ্বারা সন্নিহিত স্থান সুশোভিত হইয়াছে। রামনগরের কায়স্থ-কন্যা বিধবা ভবসুন্দরী, কয়েকজন পরিচারিকা সঙ্গে লইয়া, ভাণ্ডারের সামগ্রী গুছাইয়া রাখিতেছেন এবং যাঁহাকে যাহা দিবার প্রয়োজন হইতেছে, তাঁহাকে তাহা দিতেছেন।

হরকুমার বাবু ঘড়ির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া একজন কর্ম্মচারীকে আর দুইখানি জুড়ি জুতিয়া আনিবার আদেশ করিলেন। কর্ম্মচারী প্রস্থান করিলে হরকুমার বাবু, অধ্যাপকমণ্ডলীর মধ্য হইতে সার্ব্বভৌম মহাশয়কে ডাকিয়া আনিলেন। কর্ম্মচারী গাড়ী তৈয়ার হইয়া আসার সংবাদ দিল। সার্ব্বভৌম মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া হরকুমার একখানি গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন এবং কোচম্যানকে নদীর ঘাটে গাড়ী চালাইতে আদেশ করিলেন। গাড়ী অগ্রসর হইল; অরিফচালিত চৌঘুড়ি এবং আর এক খানি জুড়িও তাঁহাদের সঙ্গে চলিল।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে, সকল গাড়ী আরোহী পরিপূর্ণ হইয়া সেই ভবনের সিংহ দ্বারে পুনরাগত হইল। গাড়ী পৌছিবা মাত্র হরকুমার বাবুর আদেশ ক্রমে এক সঙ্গে

অনেক বোমা ও বন্দুকের আওয়াজ হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে নহবৎখানা হইতে নাগরা বাজিয়া উঠিল এবং দ্বারের পার্শ্বদেশ হইতে রোসনচৌকি বাজিতে লাগিল। তখনই অন্তঃপুর হইতে শতাধিক নারী-রসনা সম্ভূত হলুধ্বনি দিঙ্‌মণ্ডল প্রকম্পিত করিয়া তুলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খ সমূহের গুরুগম্ভীর রব সমুত্থিত হইল। দ্বার-সন্নিধানে গাড়ী থামিবা-মাত্র, হরকুমার বাবু লাফাইয়া পড়িলেন এবং ল্যাণ্ডো গাড়ির নিকটস্থ হইয়া পরম সমাদরে এক ভুবনমোহন বর এবং এক সুন্দরী শিরোমণি কন্যাকে হাত ধরিয়া নামাইলেন। সমুচিত মঙ্গলাচরণ সহকারে বর-কন্যা অন্তঃপুরে নীত হইলেন। হরকুমার, সার্ব্বভৌম, নবীনকৃষ্ণ প্রভৃতি বিশিষ্ট আত্মীয়গণ অন্তঃপুর পর্য্যন্ত সঙ্গে চলিলেন। বর-কন্যাকে বরণ করিবার নিমিত্ত যথাস্থানে লইয়া যাওয়া হইল। বর-কন্যা নির্দ্দিষ্ট স্থানে দণ্ডায়মান হইলে, সুহাসিনী বরণ করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন এবং নানা প্রকার মাঙ্গলিক আচার সম্পন্ন করিয়া, দম্পতীকে গৃহ মধ্যে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এমন সময়, সহসা দশ দিক আলোকিত করিয়া পরম শোভাময়ী, বিচিত্র-বসন-ভূষণধারিণী এক দেবী মূর্ত্তি, যেন নভস্তল হইতে অবতীর্ণ হইয়া, হাসিতে হাসিতে বর-কন্যার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। সমাগত তাবৎ লোক এই অলৌকিক শোভা সম্পন্না দেবীকে দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। বর, তখনই অগ্রসর হইয়া, সেই দেবীর চরণে প্রণাম করিলেন এবং আনন্দ-জনিত গদ্‌গদ স্বরে বলিলেন,—"মা, এই বিষম ঐশ্বর্য্যের আবিলতা পূর্ণ সংসারে তোমাকে দেখিতে পাইলাম, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। তোমার কৃপা থাকিলে, আমি এই বিষম পরীক্ষাতেও নিশ্চয়ই উত্তীর্ণ হইতে পারিব। মা যোগেশ্বরী, এ অধম সন্তান যেন কখনই তোমার কৃপায় বঞ্চিত না হয়।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"বাবা উমাশঙ্কর, এ সংসারে ছেলে মাকে ত্যাগ করার অনেক বৃত্তান্ত শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাবা! মা ছেলেকে ত্যাগ করিয়াছে, এমন কথা কেহ কখন শুনিয়াছে কি? আশীর্ব্বাদ করি, তোমার সকল মনোরথ সফল হউক।"

এ দিকে কন্যা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া, সেই দেবীর চরণযুগল ধারণ করিলেন এবং অস্ফুট স্বরে বলিলেন,—"আপনার ছেলের আদর সবাই করে; কিন্তু পরের মেয়ের খোঁজ এমন মাও করেন না। আমার প্রতি মা, তোমার একটুও দয়া নাই। কতকদিন পরে আজি কপালক্রমে আবার তোমাকে দেখিতে পাইলাম।"

তখন যোগেশ্বরী কন্যাকে সস্নেহে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া বলিলেন,—"অন্নপূর্ণা! তোমার প্রতি আমার অসীম স্নেহ মা; তুমি আমার বড়ই আদরের পুত্রবধূ। আশীর্ব্বাদ করি, মা অন্নপূর্ণা, মা অন্নপূর্ণার ন্যায়, তুমি উমাশঙ্করের অনুগামিনী হও এবং স্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগ করিয়া একান্ত ভাবে উমাশঙ্করের পর্য্যবসিত হও।"

সুহাসিনী উমাশঙ্করকে জিজ্ঞাসিলেন,—"দাদা, কে এই দেবী?"

উমাশঙ্কর উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"ইনিই মা যোগেশ্বরী।"

তখন চারিদিক হইতে সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া সেই দেবীকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। তখন যোগেশ্বরী দেবী, সুহাসিনীর হস্ত ধারণ করিয়া, বলিলেন,—"তুমি আমার মেয়ে যে মা! বড় ভাল মেয়ে তুমি। আশীর্ব্বাদ

করিতেছি; তোমার সকল দিকেই মঙ্গল হইবে।”

হরকুমার বাবু সেই দেবীর সম্মুখীন হইয়া বলিলেন,—“এখনে এ সময়ে যে আপনাকে দেখিতে পাওয়া গেল ইহা আমাদের সকলেরই পরম সৌভাগ্য। আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি।”

যোগেশ্বরী বলিলেন,—“আমার পুত্র,পুত্র-বধূ, কন্যা, জামাতা, সংসার ধর্ম্ম সকলই। আমি যদি এখানে না আসিব তবে আসিবে কে? তুমি যে বিহাই। কি লজ্জা! বিহাই-য়ের সঙ্গে এত কথা কহিতেছি। কিন্তু বিহাই! তুমিই যথার্থ সাধু; তুমিই প্রকৃত জ্ঞানী এবং বিষয়ী হইলেও বস্তুতঃ সন্ন্যাসী। আমি যাঁহার চরণের দাসী সেই পরমেশ্বর ঘনানন্দরূপী যোগানন্দ তোমার সহায়; সুতরাং আমি আর বলিব কি? তা আমি বিহাইয়ের সঙ্গে এত কথা কহিতে পারি না—লজ্জা করে! আমার অনেক কাজ। ছেলে-বৌ লইয়া আমি এখন ঘরে যাই।”

হুলুধ্বনি-শঙ্খধ্বনি, ও বাদ্যধ্বনিতে দিঙ্-মণ্ডল প্রকম্পিত হইয়া উঠিল! তখন যোগে-শ্বরী দেবী, বর-কন্যা সঙ্গে লইয়া, হাসিতে হাসিতে, গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সমাপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

—•—

"দুর্গেশ-নন্দিনীর" অনুসরণ ক্রমে কেন "নবাব-নন্দিনী" লিখিত হইল, এ সম্বন্ধে অনেক বলিবার কথা ছিল; কিন্তু বলি বলি করিয়াও এবার তাহা বলিয়া উঠিতে পারিলাম না। যদি কখন এই পুস্তক পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তখন মনের কথা বলিতে চেষ্টা করিলেও করিতে পারি।

যদি কেহ কৃপা-পরবশ হইয়া এই সামান্য পুস্তক মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন, তাহা হইলে তিনি হয়তো এই পুস্তক রচনা সম্বন্ধে আমার উদ্দেশ্য কি, তাহার কতকটা আভাষ বুঝিলেও বুঝিতে পারিবেন।

"নবাব-নন্দিনীর" গল্পাংশ পরিপুষ্ট ও পরিস্ফুট করিবার নিমিত্ত আমাকে "দুর্গেশ-নন্দিনী" বর্ণিত পাত্র-পাত্রী ব্যতীত বিশেষ প্রয়োজনীয় কোন নূতন নর-নারীর আবির্ভাব করাইতে হয় নাই। পাঠকগণ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সেই চিরপরিচিত আয়েষা, তিলোত্তমা, বিমলা, ওসমান, জগৎসিংহ, অভিরাম স্বামী প্রভৃতি ব্যক্তিগণেরই অনুষ্ঠান পরিণাম দেখিতে পাইবেন।

"দুর্গেশ নন্দিনী" বর্ণিত ইতিহাসের পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক ব্যাপার এই গ্রন্থে বিন্যস্ত হইয়াছে। এই জন্যই এ গ্রন্থ "দুর্গেশ-নন্দিনীর" অনুসরণ নামে অভিহিত হইল।

ইতিহাসাংশ যথাযথ রাখিবার নিমিত্ত আমাকে স্থানে স্থানে "দুর্গেশ-নন্দিনী" লিখিত কোন কোন ঘটনায় একটু রূপান্তর বা পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। ইতি

অগ্রহায়ণ, ১৩০৮ সাল।

শ্রীদামোদর দেবশর্ম্মা।

নবাব-নন্দিনী।

তিলোত্তমা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিষাদের ছায়া।

গড় মান্দারণে বীরেন্দ্র সিংহের সেই দুর্গ সমান ভাবে আকাশপথে মস্তকোত্তলন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে; দুর্গ-পার্শ্বস্থ সেই আম্র-কানন সমভাবে শাখা-প্রশাখা দুলাইতে দুলাইতে, বায়ুর সহিত খেলা করিতেছে; সেই ক্ষুদ্র-কায়া দামোদর নদী পূর্ব্ববৎ মৃদু-মধুর ধ্বনি করিতে করিতে, দুর্গমূল প্রধৌত করিয়া প্রধাবিত হইতেছে। সেই বসন্তের মন্দানিল, চূতমুকুলের গন্ধাপহরণ করিয়া, সমানভাবে সকলের গায়ে ছড়াইয়া পড়িতেছে; সেই কবি-প্রসিদ্ধ বসন্তের অবিচ্ছিন্ন অনুচর কোকিল বৃক্ষ-পল্লবের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন দেহ হইয়া, ক্রমে উচ্চ কণ্ঠে তান ছাড়িতেছে; সুনীল গগনাঙ্গনে সেই চন্দ্র-তারকা সমভাবে নাচিতে নাচিতে মেঘ-মধ্যে লুকাচুরি খেলিতেছে।

সকলই সমান আছে; কিন্তু কি অল্পকালের মধ্যে কত কাণ্ডই ঘটিয়া গিয়াছে। সেই শৈলেশ্বর-মন্দিরে যুবরাজ জগৎসিংহের সহিত বিমলা ও দুর্গেশনন্দিনী তিলোত্তমার প্রথম সাক্ষাৎ, আর পাঠান দুর্গে বিমলার অস্ত্রাঘাতে নবাব কতলু খাঁর মৃত্যু—এই স্বল্প সময়ের মধ্যে কত কাণ্ডই না ঘটিয়াছে! সেই কাল-রাত্রি—যে রাত্রিতে বিমলার অসাবধানতায় পাঠানগণ দুর্গজয় করিয়া, দুর্গস্বামী বীরেন্দ্র সিংহ ও জগৎসিংহকে বন্দী করিয়াছিলেন, সে কালরাত্রির কোন চিহ্নই এখন আর বিদ্যমান নাই। যে শোণিতস্রোতে সেদিন দুর্গের নানা-স্থান কলঙ্কিত হইয়াছিল, তাহার অণুমাত্র অঙ্কও এক্ষণে পরিদৃষ্ট হইতেছে না। যে হাহা-কার রবে সেদিন দুর্গ প্রকম্পিত হইয়াছিল, তাহার ক্ষীণ প্রতিধ্বনিও এক্ষণে শ্রবণগোচর হইতেছে না। দুর্গের সর্ব্বত্র শোভা ও সমৃদ্ধির বিবিধ লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতেছে। সুশৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছে। সকলই সমভাবে রহিয়াছে সত্য; কিন্তু সে বীরকেশরী বীরেন্দ্র সিংহ আর নাই। এই স্বল্প কালের মধ্যে বিমলা বিধবা হইয়াছেন, তিলোত্তমা পিতৃহীনা হইয়াছেন। দুর্গের সকলই আছে, সকলেই ফিরিয়াছে; কেবল সেই বীরেন্দ্র সিংহ আর নাই—তিনি আর ফিরেন নাই! যে যমের হস্তে আত্মসমর্পণ করে, তাহাকে কেহ কখন আর ফিরিতে দেখিল না।

কত লোকই যমালয়ে গিয়াছে, কত লোকই নিত্য সেই স্থির নিবাসে প্রস্থান করিতেছে; কেহই কখন সেস্থান হইতে ফিরে নাই এবং ফিরিতেছে না। তাহাতে সংসারের বিশেষ ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছুই কখন ঘটিতেছে না; অথবা সেজন্য বসুন্ধরার সুখ-দুঃখস্রোতের কোন হ্রাস-বৃদ্ধিও দেখা যাইতেছে না।

গড় মান্দারণের অধীশ্বর বীরেন্দ্রসিংহ ফিরেন নাই; সেজন্য দুর্গের বিশেষ কোন অপচয় হইয়াছে বলিয়া উপলব্ধ হইতেছে না। রোদন যায়, হাস্য তাহার স্থান অধিকার করে; হাস্য যায়, রোদন তাহার স্থান গ্রহণ করে। হাসি কান্না, বোধ হয়, সমসূত্রেই গ্রথিত; উভয়েই বোধ হয় সমান গতিতে অবিরত বিশ্ব প্রদক্ষিণ করিতেছে'

বিমলা—সেই বিলাসময়ী, লাবণ্যময়ী, হাস্য কৌতুক-নিরতা বিমলা বিধবা হইয়াছেন। যে প্রণয়াস্পদ পুরুষকে লাভ করিবার জন্য তাঁহাকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে; সহধর্ম্মিণী রূপ গৌরবের পরিচয় প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, যাহাকে চিরদিন স্বামীর দাসী পরিচয়ে কালপাত করিতে হইয়াছে; তাঁহার সেই হৃদয়-দেবতা তাঁহাকে চিরদিনের নিমিত্ত ছাড়িয়া গিয়াছেন। বড়ই অসহনীয় যাতনা! কিন্তু এত যাতনার মধ্যেও সন্তোষের ঘটনা কিছুই নাই কি? আছে। তাঁহার বীর-পতি, বীরের ন্যায় তেজস্বিতা সহকারে, অকাতরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইহা বীর-পত্নীর বড়ই গৌরবের কথা। আর গৌরবের কথা,—বিমলা স্বহস্তে পতি-হন্তা হৃদয়-হীন শত্রু নবাব কতলু খাঁর বক্ষোদেশে শাণিত ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া, তাঁহাকে শমন-মন্দিরে প্রেরণ করিয়াছেন। আরও বিশেষ আহ্লাদের কথা,—তাঁহার বড় আদরের কন্যা, যত্ন-পালিতা তিলোত্তমার মনোভীষ্ট পূর্ণ হইয়াছে; সেই সুশীলা সুর-সুন্দরী এক্ষণে পরম গৌরবান্বিত মহারাজ মানসিংহের পুত্রবধূ হইয়াছেন; তাঁহার গর্ভজাত পুত্র ভবিষ্যতে অম্বরেশ্বর হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। বড়ই অতুলনীয় আনন্দ!

তিলোত্তমা—পিতৃহীনা—দুঃখিনী তিলোত্তমা, প্রেমময় পিতার স্নেহধনে বঞ্চিত হইয়া, বড়ই মর্ম্মব্যথা পাইয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই মর্ম্ম-ব্যথার মধ্যে আনন্দ-প্রদ ঘটনা কিছুই নাই কি? যথেষ্ট আছে। তিনি পাপ-পঙ্কিল নবাব অন্তঃপুরে বন্দিনী হইয়াছিলেন; সে স্থান হইতে কেহ কখন আপনার পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ও ধর্ম্ম-ধন সঙ্গে লইয়া, ফিরিতে পারে না। তিলোত্তমা তাহা পারিয়াছেন। তাঁহার পিতৃহন্তা নিহত হইয়াছে। তাঁহার জীবনের সার রত্ন জগৎসিংহ, শত্রুর অস্ত্রাঘাতে মৃতকল্প হইয়াও, পুনর্জ্জীবিত হইয়াছেন। সেই একান্ত প্রেমমুগ্ধ, সৌন্দর্য্য-সম্পদ্-সৌভাগ্যশালী বীরপুরুষ বিবাহরূপ পুণ্যময় বন্ধনে বদ্ধ হইয়া, সর্ব্বতোভাবে তিলোত্তমারই হইয়াছেন। বড়ই অতুলনীয় আনন্দ!

মহারাজ মানসিংহের বাসনানুসারে গড় মান্দারণ স্বর্গীয় বীরেন্দ্র সিংহের পত্নী ও কন্যার হস্তে অর্পিত হইয়াছে। কিছুদিনের জন্য এই দুর্গ পাঠানদিগের হস্তগত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু এক্ষণে কোথায়ও সে পরাধীনতার কোনই নিদর্শন নাই।

অপরাহ্ণ কালে, এই দুর্গমধ্যস্থ অন্তঃপুর-সংলগ্ন ছাদের উপর, কুমার জগৎসিংহ একাকী পরিভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহার মুখমণ্ডল দেখিলে তাঁহাকে যেন উৎকণ্ঠিত বলিয়া অনুমিত হয়। সুস্নিগ্ধ বায়ু ও দিগন্ত-ব্যাপী রমণীয় দৃশ্য কিছুই যেন তাঁহাকে এখন বিনোদিত করিতেছে না। এখনও একমাস অতীত হয় নাই, তিনি আপনার প্রাণ-মন-বিনোদন-কারিণী সুন্দরীর সহিত উদ্বাহ-সূত্রে বদ্ধ হইয়াছেন তাঁহার সেই নবোঢ়া কামিনী এক্ষণে তাঁহার অবিচ্ছিন্ন সহচরী বলিলেও হয়; তথাপি তিনি চিন্তিত কেন?

দারুকেশ্বর নদীতীরে মহারাজ মানসিংহ

আপনার সৈন্যাদি সহ শিবির স্থাপন করিয়া বাস করিতেছিলেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ আপাততঃ ক্ষান্ত হইয়াছে। সুতরাং তিনি ছাউনী উঠাইয়া অনুচরগণ সহ পাটনায় চলিয়া গিয়াছেন। জগৎসিংহ যথা সময়ে তাঁহার সহিত মিলিত হইতে পারেন নাই। এক্ষণে বিশেষ কোন কর্ত্তব্যের ভার কুমার জগৎসিংহের হস্তে অর্পিত ছিল না; যুবরাজ স্বাধীন ভাবে ইচ্ছামত স্থানে কালপাত করিতেছেন। তাঁহার অধিকাংশ সময়ই গড় মান্দারণে প্রেমময়ী প্রণয়িনীর সঙ্গসুখে কাটিয়া যাইতেছে, একথা বলাই বাহুল্য। তাঁহার সৈন্যাদিও, বিশেষ কর্ম্মাভাবে, দারুকেশ্বর-তীরে আলস্যে কাল কাটাইতে লাগিল।

যে ছাদের উপর জগৎসিংহ পরিক্রমণ করিতেছেন, তাহার একদিকে মহার্হ-শয্যা রচিত রহিয়াছে। যুবরাজ তাহাতে আসীন না হইয়া ছাদের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বার বার পরিক্রমণ করিতেছেন।

সেই ছাদে সহসা এক ভুবনমোহিনী সুন্দরী উপস্থিত হইলেন। অস্তোন্মুখ ভাস্করের স্বর্ণ-বর্ণ-রশ্মি-মালা-সমাচ্ছন্না সুষমাময়ী প্রকৃতিও সেই লাবণ্যময়ী ললনার সমাগমে সমুজ্জ্বল ও শোভাময় হইয়া উঠিল। সেই সৌন্দর্য্য-সম্পদ্ সম্পন্না যুবতী ধীর ও সলজ্জ-পদে জগৎসিংহের সমীপগত হইয়া মধুরস্বরে বলিলেন,—"যুবরাজ, আমার অধিক বিলম্ব হইয়াছে কি?"

জগৎসিংহ বলিলেন,—"বোধ হয় অধিক বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু প্রাণাধিকে, যাহার তিলমাত্র অদর্শনও অসহ্য, তাহার অত্যল্প বিলম্বও অনেক বলিয়া মনে হয়।"

সেই লজ্জাশীলা সুন্দরী ঈষৎ হাস্য সহকারে বদন বিনত করিলেন। যুবরাজ, সুন্দরীর পৃষ্ঠদেশে বাম হস্ত প্রদান করিয়া, দক্ষিণ হস্তে তাঁহার বদন-কমল উত্তোলন করিলেন এবং কোনরূপ নিমন্ত্রণ বা আহ্বানের অপেক্ষা না করিয়া, নবীনার সুধাস্নিগ্ধ বিম্বাধরে প্রেমপূর্ণ চুম্বন করিলেন। লজ্জায় ও অনুরাগে, সঙ্কোচে ও আদরে যুবতীর মুখ মণ্ডল রক্তাভ হইয়া উঠিল।

এই সুন্দরী দুর্গেশনন্দিনী তিলোত্তমা। যুবক-যুবতীর পরিণয় সম্বন্ধ বড় অধিকদিন সংঘটিত হয় নাই; তাঁহাদের পূর্ব্ব-পরিচয়ও অধিকদিনব্যাপী নহে। সুতরাং স্বভাবতঃ সুশীলা সুন্দরীর সঙ্কোচ ও লজ্জাশীলতা এখনও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। তিলোত্তমা বদন-কমল আরও বিনত করিলেন। আনন্দ ও অনুরাগ-সংমিশ্রিত ব্রীড়া তাঁহার মুখ-মণ্ডলের অপূর্ব্ব শোভা সংবিধান করিল। মুগ্ধ জগৎসিংহ অতৃপ্ত নয়নে সেই শোভা দেখিতে দেখিতে বলিলেন,—"বলিতে পার সুন্দরি, কোন পুণ্যবলে আমাদের এই শুভ সম্মিলন ঘটিয়াছে?"

তিলোত্তমা বলিলেন,—"কাহার পুণ্য-বলে? তোমার না আমার?"

জগৎসিংহ বলিলেন,—"আমার। তুমি ভুবনের সাররত্ন—এ অতুলনীয় রত্ন দেবকণ্ঠে স্থান প্রাপ্ত হইলেই যথোপযুক্ত হইত; আমি তো ছার ক্ষুদ্র মনুষ্য। এ মিলন যদি কোন পুণ্যের ফল হয়, তাহা হইলে সে পুণ্য জন্মান্তরে নিশ্চয়ই আমি সঞ্চয় করিয়াছিলাম।"

তিলোত্তমা বলিলেন,—"মিথ্যা কথা গোপন করিতে হইলে ঐরূপ মিষ্ট কথা বলিতে হয় বটে। কিন্তু জান না কি দেবতা, তুমি কে, আর আমি কে? তুমি ভুবন-বিখ্যাত অম্বরেশ্বরের পুত্র; রূপে, গুণে, সাহসে, বীরত্বে যুদ্ধে অতুলনীয়। আর আমি?

আমি ক্ষুদ্র গড় মান্দারণের ক্ষুদ্র নায়কের কন্যা—তোমার দাসীর দাসী হইবারও অযোগ্যা। তুমি যে দয়া করিয়া আমাকে চরণে স্থান দিয়াছ, সত্য করিয়া বল দেখি, ইহা কি আমার কোটী কোটী জন্মের পুণ্য-ফল নহে ?"

জগৎসিংহ বলিলেন,—"পুণ্য তোমারই হউক, আর আমারই হউক সে বিবাদে আর প্রয়োজন নাই। কিন্তু হৃদয়েশ্বরি, এ বসুন্ধরায় , স্বর্গের অপেক্ষা মধুরতর স্থান বিরচিত হইতে পারে, এ নশ্বর জগতে হীন মানবও যে নন্দন-কাননচারী দেবগণের অপেক্ষা অধিকতর সুখভোগ করিতে পারে, তাহা আমি তোমাকে লাভ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি। তুমি আমাকে ভাগ্যবানগণের অগ্রগণ্য করিয়াছ। আমি তোমার নিকট চিরঋণে বদ্ধ।"

ঈষৎ হাসি মিশাইয়া তিলোত্তমা বলিলেন,—"কঠোর-হৃদয় অসি-সাধক বীরের রসনায় এত মধু সঞ্চিত থাকিতে পারে, ইহা আমার জানা ছিল না। ঋণের কথা বলিতেছ গুণময়; কিন্তু কে কাহার নিকট চির ঋণে বদ্ধ তাহা কি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ ? মনে করিয়া দেখ দেখি, তুমি আমার নিমিত্ত কি না করিয়াছ। বীরপুত্র, স্বয়ং বীরশ্রেষ্ঠ হইয়াও, তুমি গভীর নিশীথে পরকীয় দুর্গে তস্করের ন্যায় প্রবেশ করিয়াছ; কি জন্য ? একবার এই সামান্যা নারীকে দর্শন করিবার আশায়। তুমি পুণ্যময় ও পরম ধার্ম্মিক হইয়াও, স্বল্প পরিচিতা এক অবিবাহিতা কুল-কামিনীর কক্ষে প্রবেশ করিয়াছ; কি জন্য ? একবার এই ভাগ্যবতীর সহিত দুইটা কথা কহিবার অভিপ্রায়ে। তুমি শত্রুর অবিরল অস্ত্রাঘাতে শরীরের অমূল্য-শোণিত-পরিশূন্য হইয়া, মরণদ্বারে উপনীত হইয়াছিলে; কি জন্য ? এই অধমা নারীর ক্ষুদ্র জীবন রক্ষা করিবার বাসনায়। তুমি দুরন্ত শত্রুর হস্তে সুদীর্ঘ কাল বন্দী ভাবে যাপন করিয়াছ; কি জন্য ? এই হীনা নারীর প্রতি প্রেমাকর্ষণই তাহার কারণ। তুমি তোমার চরণসেবায় অযোগ্যা এই নারীকে গ্রহণ করিয়া প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ পিতার বিরাগভাজন হইয়াছ; কি জন্য ? এই অধম নারীর প্রতি একান্ত অনুকম্পাই তাহার হেতু। তবে বল দেখি, যুবরাজ, কে কাহার নিকট চিরঋণী ?"

তিলোত্তমার কথার শেষভাগ জগৎসিংহকে নিতান্ত বিচলিত করিয়া তুলিল। তিনি সুন্দরীর অন্য কথার আলোচনা ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"জানি না প্রাণেশ্বরি, আমাদের অদৃষ্টে কি আছে। কিন্তু তুমি যে প্রসঙ্গতঃ পিতার বিরাগের কথা উল্লেখ করিয়াছ, তাহাতে আমি নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িতেছি। সে চিন্তায় উদাসীন থাকা আর আমাদের উচিত নহে। আইস, আমরা এই আসনে বসিয়া, অতঃপর আমাদের কি কর্ত্তব্য তাহারই বিবেচনা করি।'

তিলোত্তমা নীরব। তাঁহার সেই প্রফুল্ল কমল-তুল্য মুখ শুখাইয়া গেল। তিনি জানিতেন, মহারাজা মানসিংহের অগোচরে বিবাহ হইল বটে; কিন্তু ইহার পরিণাম হয় ত ভয়ানক হইবে। অধুনা যুবরাজের মুখেও সেইরূপ আশঙ্কার কথা শুনিয়া, তিলোত্তমার প্রাণ উড়িয়া গেল। তিনি সভয়ে ধীরে ধীরে স্বামীর অনুগমন করিলেন এবং নিঃশব্দে সেই আসনের এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন।

জগৎসিংহ সরিয়া গিয়া তিলোত্তমার নিকটস্থ হইলেন এবং বাম বাহু দ্বারা তাঁহার কণ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়া, সেই উৎকণ্ঠিত

নিশাবসানকালীন শরচ্চন্দ্রের ন্যায় ম্লান মুখমণ্ডল স্বকীয় বিশাল বক্ষের উপর বিন্যস্ত করিলেন। তিলোত্তমা সভয়ে ও সকাতরে দেবোপম স্বামীর বদনের প্রতি স্থির নয়নে চাহিয়া রহিলেন।

জগৎসিংহ বলিতে লাগিলেন,—"বাস্তবিকই আমার পিতা আমার উপর নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছেন। তিনি মুখে কোন বিরাগের কথা ব্যক্ত করেন নাই, অথবা কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির দ্বারাও আমাকে হৃদয়-ভাব জানিতে দেন নাই; তথাপি শত সহস্র লক্ষণ দ্বারা আমি তাঁহার বিরক্তির প্রমাণ পাইয়াছি।"

তিলোত্তমা মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসিলেন,—"তথাপি তুমি সাবধান হও নাই কেন?"

জগৎসিংহ সেই সরলার মুখচুম্বন করিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন,—"সাবধান! সরলে, তোমার এই মুখ যে দেখিয়াছে, তোমার প্রেম-সাগরে যে ভাসিয়াছে, তোমাকে যে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, সে কি কখন কোন বিপদের ভয়ে, বা কোন সর্ব্বনাশ সম্মুখে দেখিয়া, সাবধান হইতে পারে? সাবধানতার কথা বলিও না। আমি সাবধানতার কথা একবারও ভাবি নাই।"

তিলোত্তমা জিজ্ঞাসিলেন,—"তবে এখন ভাবিতেছ কেন?"

জগৎসিংহ বলিলেন,—"ভাবিতেছি দুই কারণে। আমার পিতা রাজপুত বীর। তাঁহার মনে যে ভাব উদয় হইবে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে বিলম্ব হইবে না। তাঁহার ইচ্ছার বিরোধে কথা কহিবার লোক সংসারে কেহ নাই। স্বয়ং বাদশাহ আকবরও তাঁহার ইচ্ছার অধীন বলিলেও অসঙ্গত হয় না। পিতা যদি অযোগ্য অবাধ্য সন্তান বোধে, আমার প্রাণদণ্ড করেন, তাহাতেও কোন বিচিত্রতা নাই।"

তিলোত্তমা চমকিয়া উঠিলেন। জগৎসিংহ বলিলেন,—"ভয় করিও না; রাজপুত বীর মরিতে কখনই ভয় পায় না। জীবনে কখন মরণের ভয় ছিল না, কিন্তু এখন হইয়াছে। এখন মরিলে তোমার সঙ্গশূন্য হইতে হইবে, এ চিন্তা অসহ্য।"

তিলোত্তমা সজল-নয়নে বলিলেন,—"প্রেমময়, সঙ্গশূন্য হওয়ার আশঙ্কা আমার নাই। তুমি বীরশ্রেষ্ঠ—অকাতরে মরিতে জান; বীরপত্নীরাও হাসিতে হাসিতে মরিতে পারে।"

জগৎসিংহ বলিলেন,—"কিন্তু সে আশঙ্কা এখন করিবার প্রয়োজন নাই; কেন না, স্বাভাবিক অপত্য-স্নেহ হয় ত পিতাকে সহসা ঈদৃশ কঠোর কার্য্যে প্রবৃত্ত না করিলেও না করিতে পারে। কিন্তু তিনি তাহার অপেক্ষাও বহুগুণে কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করিতে পারেন। সহজে প্রাণনাশ করিয়া সকল যন্ত্রণার অবসান না করাইয়া, তিনি হয় ত ধীরে ধীরে অতি ভয়ানকরূপে আমাকে মরণের পথে ফেলিয়া দিতে পারেন।"

তিলোত্তমা নিতান্ত কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে কিরূপ?"

জগৎসিংহ বলিলেন,—"তিনি হয় ত তোমাকে গ্রহণ বিষয়ে অসম্মত হইতে পারেন। তিনি হয় ত যাহাতে তোমার সহিত আমার আর কখন সাক্ষাৎ না হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিতে পারেন।"

তিলোত্তমার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি রোদন-বিজড়িত রুদ্ধ স্বরে বলিলেন,—"আমার বিমাতা, ধর্ম্মপত্নী হইয়াও আপন স্বামীর গৃহে দাসীরূপে জীবন

কাটাইয়াছেন। শ্বশুর গৃহে সে ভাবেও কি আমার স্থান হইবে না ?”

জগৎসিংহ স্বকীয় বস্ত্রে তিলোত্তমার নয়নমার্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন,—“ভয় করিও না, ব্যাকুল হইও না। মনুষ্যবাসের বাহিরে, দূর সমুদ্র-তীরে তোমাকে লইয়া আমি বৃক্ষ-তলে বাস করিতে পাইলেও ধন্য হইব। কিন্তু আমার পিতা অসীম শক্তিশালী পুরুষ; তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারী হইয়া কোথাও তিষ্ঠিতে পারে, এমন লোক কে আছে ? যাহাতে সকলই শুভ হয়, আমি তাহার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করিব। তাহার পর ভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে।”

তিলোত্তমা তখন নীরব ! তাঁহার চক্ষুতে আর জল নাই, মুখে বিষাদ নাই। জগৎসিংহ সাদরে জিজ্ঞাসিলেন,—“কি ভাবিতেছ তিলোত্তমা ?”

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিলোত্তমা বলিলেন,—“ভাবিতেছি, মরণের পথ সর্ব্বদাই খোলা আছে। তবে চিন্তা কিসের ?”

নবপরিণীত প্রেমোন্মত্ত দম্পতির কি বিষম যন্ত্রণা !

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ছায়া শরীরী।

জগৎসিংহ পরদিন প্রাতঃকালে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, একাকী ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। তখন উষার সম্মোহন মধুরালোকে প্রকৃতি পরম রমণীয় বেশ ধারণ করিয়াছে; তখন পূর্ব্বদিগঙ্গনা রক্তাম্বরী প্রগল্‌ভা নারীর ন্যায় অবগুণ্ঠন ভেদ করিয়া হাস্য করিতেছে; তখন দহিয়াল পক্ষী নাত্যুচ্চ বৃক্ষের ঘন বল্লরীর অন্তরালে অবস্থিত থাকিয়া, মধুর গীতধ্বনিতে শ্রোতৃ-মন মুগ্ধ করিতেছে; তখন পিককুলের কুহুস্বর, পাপিয়ার ‘উহু উহু, উহু, উহু, চোক গেল’ ধ্বনির সহিত মিশিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত আনন্দধারা ছড়াইয়া দিতেছে; তখন শান্তি ও পবিত্রতা, মাধুর্য্য ও শোভা, প্রীতি ও আনন্দ যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে। সেই সময় জগৎসিংহ স্বকীয় শ্বেত অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া একাকী দুর্গতোরণ মধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সেই শান্তিপূর্ণকালে সেই শান্তিপূর্ণ দৃশ্যাবলীর মধ্যে, চিরাভ্যস্ত অশ্ব যেন সেই চিরপরিচিত ভার পৃষ্ঠে লইয়া, নাচিতে নাচিতে অগ্রসর হইতে লাগিল।

সমস্ত রাত্রি জগৎসিংহ ও তিলোত্তমা নিদ্রার সন্তাপনাশক আশ্রয়লাভ করিয়া একবারও সুখী হন নাই। বায়ু-প্রবাহে কিয়ৎকাল পরিভ্রমণ করিলে মস্তিষ্ক অপেক্ষাকৃত শীতল হইবে, চিন্তার ভার কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব হইবে মনে করিয়া, যুবরাজ দুর্গের তাবৎ ব্যক্তি জাগ্রৎ হইবার পূর্ব্বেই শয্যাত্যাগ করিয়াছেন। যখন তিনি শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন, তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই তিলোত্তমার একটু তন্দ্রা আসিয়াছে। জগৎসিংহ অতি সন্তর্পণে তাঁহার জীবনস্বরূপা সেই নিদ্রিতা সুন্দরীর বাহু-পাশ হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিলেন এবং অতৃপ্ত নয়নে কিয়ৎকাল সেই নিদ্রাভিভূতা মাধুরীরাশির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, বড়ই আদরের সহিত তাঁহার কপোল চুম্বন করিলেন। তাহার পর সেই স্বভাব-সুন্দরীর শোভাময় শরীর সন্দর্শন করিতে করিতে, তিনি দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে, সেই সাধের কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

দুর্গ হইতে কিয়দ্দূর মাত্র অগ্রসর হওয়ার পর, জগৎসিংহের কি মনে হইল; দুর্গের যে অংশে তিলোত্তমার শয়ন-মন্দির সেই দিকে নেত্র সঞ্চালন করিলেন। যাহা দেখিলেন তাহাতে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে অশ্ব-বল্‌গা সংযত করিতে হইল এবং নির্ণিমেষ নয়নে সেই বস্তুর অভিমুখে চাহিয়া রহিতে হইল। দেখিলেন, সেই শয়ন-কক্ষের বাতায়ন মুখে আলুলায়িত-বেশা, বিগলিত-কুন্তলা, বিস্রস্ত-বসনা তিলোত্তমা দণ্ডায়মানা। জগৎসিংহ কত সময়ে কত ভাবেই সেই শোভাময়ীকে দর্শন করিয়া বিমোহিত হইয়াছেন; কিন্তু অধুনা এই মধুর সময়ে, মধুর ক্ষেত্রে, মধুর নৈসর্গিক শোভা মধ্যে, যেন মাধুরী মূর্ত্তিময়ী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন বলিয়া তাঁহার মনে হইল

জগৎসিংহ শয্যাত্যাগ করার অনতিকাল পরে তিলোত্তমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে এবং তিনি মন্দুরায় অশ্ব সজ্জিত হইতেছে বুঝিতে পারিয়া, ব্যস্ততা সহ সেই প্রেমময় হৃদয়-রত্নকে দেখিবার আশায়, সেই বাতায়নে অপেক্ষা করিতেছেন।

জগৎসিংহ বক্ষে উভয় হস্ত প্রদান করিয়া তিলোত্তমার প্রতি প্রণয় জ্ঞাপন করিলেন; উষ্ণীষ বস্ত্র আন্দোলিত করিয়া সুন্দরীকে প্রস্থান করিতে ইঙ্গিত করিলেন ও আপনি বিদায় গ্রহণ করিলেন; এবং হস্ত চালনা করিয়া তিনি অচিরে প্রত্যাগমন করিবেন তাহারই সঙ্কেত করিলেন। অশ্ব আবার ধীরে অগ্রসর হইল। জগৎসিংহ আবার মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, সুন্দরী সমভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। জগৎসিংহের দৃষ্টি সেই দিকে নিবদ্ধ হইবামাত্র, তিলোত্তমা গললগ্নীকৃতবাসা হইলেন এবং ভূতলে মস্তক স্থাপন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। জগৎসিংহ উভয় কর-পল্লব প্রসারণ করিয়া শুভেচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং সুন্দরীকে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিবার সঙ্কেত করিলেন। অশ্ব ধীরে অগ্রসর হইল। জগৎসিংহ আবার মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, সেই বাতায়ন-সমীপে তিলোত্তমা রোদন করিতে করিতে বস্ত্রাঞ্চলে নয়ন-মার্জ্জন করিতেছেন। মন নিতান্ত অস্থির হইল; অগ্রসর হইতে আর মন সরে না। অল্পমাত্র পর্য্যটনের পর অচিরে প্রত্যাগমন করিবেন স্থির করিয়া, অশ্বদেহে মৃদু কষাঘাত করিবামাত্র সে বেগে প্রধাবিত হইল। জগৎসিংহ আবার ফিরিয়া দেখিলেন—সে বাতায়ন আর দেখা যায় না। অশ্বারোহী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, বাহক সমান চালাতে লাগিল।

যে পথ অবলম্বনে বিমলার সহিত যুবরাজ প্রথমে রাত্রিকালে গড় মান্দারণ আসিয়াছিলেন, সেই পথ ধরিয়া জগৎসিংহ চলিতে লাগিলেন। সেই আম্রকানন—যাহার মধ্যস্থ বৃক্ষবিশেষে লুক্কায়িত পাঠান, বিমলার প্রদত্ত বর্ষা-বিদ্ধ হইয়া, জগৎসিংহের হস্তে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল; সে উদ্যান অতিক্রম করিলেন। এই স্থলে এক অদ্ভুত বেশধর পুরুষের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সে ব্যক্তি বিসদৃশ দীর্ঘকায় ও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ! নরসুন্দরের অস্ত্র সাহায্যে তাহার মস্তক কেশ-শূন্য, কেবল যথাস্থানে এক গুচ্ছ শিখা; বদন শ্মশ্রু ও গুম্ফ বিরহিত। তাহার দেহের অধোভাগ পায়জামা দ্বারা আবৃত, ঊর্দ্ধভাগ চাপকান সমাচ্ছন্ন; সেই চাপকানের উপর কণ্ঠদেশে এক স্থূল রুদ্রাক্ষমালা; চরণদ্বয় নগ্ন; সুদীর্ঘ নাসিকার উপরে তিলকের পরিবর্ত্তে একরাশি মৃত্তিকা সংলগ্ন। জগৎসিংহকে দর্শন মাত্র এব্যক্তি উভয় বাহু প্রসারণ করিয়া বলিলেন,—

"খোদা নারায়ণ মহারাজের মেজাজ সরিফ করুন।"

জগৎসিংহ হাস্য সংবরণ করিয়া বলিলেন,—"আপনারই নাম না গজপতি বিদ্যা-দিগ্‌গজ?"

চাপকান ও রুদ্রাক্ষধারী পুরুষ বলিলেন,—"আজ্ঞা হাঁ। ব্যাকরণাদি শেষ করিয়া সম্প্রতি স্মৃতি অভ্যাস করিতেছিলাম; ইহাতেই দেখিতেছি আমার নাম জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে। এক্ষণে কিঞ্চিৎ উর্দ্দুও শিক্ষা করা হইয়াছে। বোধ হয় এবার আমার খ্যাতি ব্রাহ্মণ্ড ব্যাপিত হইবে।"

জগৎসিংহ বলিলেন,—"আপনার এ বেশ কেন?"

গজপতি কহিলেন,—"যবন-সংসর্গে যাবনিক বেশই ছিল। পাঠানেরা আমার জাতি মারিয়া, আমার বেশ বদলাইয়া প্রস্থান করিল। আরও অনেকে তাহাদের সংস্রবে গিয়াছিল; কাহারও জাতি গেল না; সকলেই দেশের মানুষ দেশে রহিল। আমিও অধ্যাপক স্বামী ঠাকুরের সম্মুখে আসিয়া সেলাম করিলাম। তিনি কহিলেন, 'এ বেশে তুমি আমার আশ্রমে আসিতে পাইবে না; বিশেষ তোমার জাতি নাই; তোমাকে আর সনাতন শাস্ত্রের পাঠ দিতে ইচ্ছা করি না।" তখন "বালানাং রোদনং বলং"অর্থাৎ আমি কাঁদিতে লাগিলাম। কিন্তু 'অমৃতং বালভাষিতং'; সুতরাং অধ্যাপক মহাশয় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'তুমি তিন দিন গঙ্গাতীরে বাস ও গঙ্গাস্নান, মস্তকাদি মুণ্ডন এবং কেবল একবার মাত্র হবিষ্য-ভোজন করিয়া আমার নিকট আসিলে, আমি তোমাকে পাঠ দিব।"—গুরু-আজ্ঞা পালন করিয়া এত দিন পরে আবার আশ্রমে ফিরিতেছি।"

জগৎ। কিন্তু এখনও আপনার এরূপ পরিচ্ছদের কারণ কি?

গজ। বস্ত্রাভাব। যবনেরা আমার বস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া এই সকল বস্ত্র আমাকে প্রদান-করিয়াছিল। সম্প্রতি এই গুলির ব্যবহার ব্যতীত আমার আর উপায় নাই।

জগৎসিংহ অঙ্গরক্ষকের মধ্য হইতে একটী টাকা বহির করিয়া দিগ্‌গজের সমীপে ফেলিয়া দিলেন এবং বলিলেন,—"আপনি দুর্গে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, আপনার সমস্ত কথা শুনিব।"

গজপতি টাকা তুলিয়া লইয়া বলিলেন,—"স্বস্তি শ্রীভোজরাজ। আপনি কি এক্ষণে বীরেন্দ্র সিংহের স্থান পাইয়াছেন?"

জগৎসিংহ কহিলেন,—"আপনি কি আমাকে জানেন না? পাঠান-শিবিরে আপনার সহিত আমার একদিন পরিচয় হইয়াছিল। আপনি কি জানেন না, আমি স্বর্গীয় বীরেন্দ্র সিংহের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছি?"

দিগ্‌গজ বলিলেন,—"বটে বটে! তা পত্নী আর কন্যা একই কথা। উভয়কেই তো রক্ষা করিতে হইবে। উপযুক্ত পাত্রের হস্তেই পত্নী কন্যা রক্ষার ভার দিয়া বীরেন্দ্র সিংহ স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।"

এ ব্যক্তির বাক্য শ্রবণে সময় নষ্ট না করিয়া, জগৎসিংহ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আর কিয়দ্দূর মাত্র অগ্রসর হইলেই শৈলেশ্বর-মন্দির দেখা যায়। সেই পর্য্যন্ত গমন করাই জগৎসিংহের অভিপ্রায়। এই কাতর চিত্তের শান্তি কামনায়, দেবাদিদেবের করুণা লাভ করিবার আশায় তাঁহার চরণে ভক্তিসহ প্রণাম করিয়া দুর্গে প্রত্যাগমন করিবেন, ইহাই যুবরাজের অন্তরের বাসনা। আর অল্পমাত্র অগ্রসর হইলেই মন্দির দৃষ্টিগোচর হইবে।

জগৎসিংহ দেব-দর্শন ও দেব-চরণে দুঃখ নিবেদনের নিমিত্ত চিত্তকে সংযত ও সমাহিত করিতে লাগিলেন।

সহসা দূরাগত বহুসংখ্যক অশ্ব-পদ-ধ্বনি যুবরাজের চিত্তের শান্তি বিধ্বংস করিয়া দিল। তিনি দেখিলেন, দূরে মণ্ডলাকার মেঘ-খণ্ডের ন্যায় ধূলিরাশি আকাশ-মণ্ডলে উত্থিত হইতেছে; সঙ্গে সঙ্গে অশ্ব সমূহের পদ-ধ্বনি নিকটস্থ হইতেছে। তিনি আরও দেখিলেন, নিকটে স্বজাতি-সমাগম অনুভব করিয়া, তাঁহার অশ্ব পুচ্ছ আন্দোলিত করিতেছে, কর্ণদ্বয় ঋজু করিয়াছে এবং এক প্রকার বিশেষ কণ্ঠশব্দ সহকারে স্বকীয় বিদ্যমানতা ব্যক্ত করিতেছে। অবিলম্বে জগৎসিংহ দেখিতে পাইলেন, অদূরে বহুসংখ্যক বীর তাঁহার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।

জগৎসিংহ বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। শত্রু সমাগম সম্ভাবিত নহে। পাঠানগণ যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া উড়িষ্যায় চলিয়া গিয়াছে। দেশ-মধ্যে বাদশাহ পক্ষীয় সৈন্য ভিন্ন অন্য সৈনিক নাই। তাহারা গড় মান্দারণের শত্রু নহে। স্বয়ং মহারাজ মানসিংহ গড়মান্দারণের অধিকার বীরেন্দ্র সিংহের উত্তরাধিকারীদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। তবে ইহারা কে? আগন্তুকগণ আরও নিকটস্থ হইল। তখন জগৎসিংহ দেখিতে পাইলেন, তাহারা মহারাজ মানসিংহের অধীনস্থ সৈনিক। সহসা তাঁহার হৃৎকম্প হইল; চিত্ত নিতান্ত অবসন্ন হইয়া উঠিল।

সৈনিকগণ নিকটস্থ হইল। তাহার সংখ্যায় পঞ্চাশ জন; সকলেই অস্ত্রধারী, সকলেই বলিষ্ঠ ও পরিপুষ্ট-কলেবর। এক ব্যক্তি স্বতন্ত্রভাবে একটু অগ্রে অশ্বারোহণে আসিতেছিল। বোধ হয় সেই ব্যক্তিই এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের নেতা। আর একটু অগ্রসর হইলে সৈনিকেরা সেই নেতার আদেশক্রমে অশ্ববল্গা সংযত করিল; তাহার পর সকলে সমভাবে স্ব স্ব অসি বক্ষের উপর ধারণ করিয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিল,—"জয়, বাদশাহ আকবরের জয়! জয়, মহারাজ মানসিংহের জয়।"

জগৎসিংহ তৎক্ষণাৎ স্বকীয় অসি সৈনিকগণের ন্যায় বক্ষোদেশে ধারণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"জয়, বাদশাহ আকবরের জয় জয়, মাহারাজ মানসিংহের জয়।" তাহার পর সম্মুখস্থ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"এ কি মথুরা সিংহ! সংবাদ কি? সাহানসাহের খবরভাল তো? মহারাজ কুশলে আছেন?"

মথুরাসিংহ অশ্ব হইতে অবতরণ করিল। এবং বলিল;—"ভগবানের বাসনায় কোন দিকেই অমঙ্গলের সূচনা নাই।"

পশ্চাতের একজন সৈনিক মথুরা সিংহের অশ্ব-বল্গা ধারণ করিল। যুবরাজের নিকটস্থ হইয়া মথুরা সিংহ সসম্ভ্রমে তাঁহাকে অভিবাদন করিল। তাহার পর স্বকীয় উষ্ণীষ উন্মোচন করিয়া, তাহার মধ্য হইতে একখানি পঞ্জা বাহির করিল। অতীব বিনীত ভাবে, সে সেই নিদর্শন খানি যুবরাজের হস্তে প্রদান করিল।

যুবরাজ পঞ্জা সহ সৈনিক সমাগম দেখিয়াই বুঝিলেন, তাঁহার সুখের ও আনন্দের দিনের বুঝি এই স্থানেই শেষ। জিজ্ঞাসিলেন,—"আমার প্রতি মহারাজের কি হুকুম?"

মথুরাসিংহ বলিল,—যুবরাজ! আমি আপনার অনুগত ব্যক্তি; আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনি যেখানে যে অবস্থায় আছেন, সেখান হইতে সেই অবস্থায় আপনাকে আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবে।"

"কোথায় যাইতে হইবে?"

"পাটনায়—মহারাজের নিকট।"

"যদি একটু বিলম্ব করিয়া—আজিকার দিন মাত্র এখানে থাকিয়া—যাইবার উপযোগী সমস্ত সুব্যবস্থা করিয়া যাইতে ইচ্ছা করি, তাহাতে আপত্তি আছে কি ?"

মথুরাসিংহ কর যোড়ে কহিল,—"যুবরাজ, একটু বিলম্ব বা ইতস্ততঃ করিলে আপনাকে বন্দীর স্বরূপ ধরিয়া লইয়া যাইতে আমরা হুকুম পাইয়াছি।"

জগৎসিংহ বলিলেন,—"এখানে আমার আত্মীয়বৃন্দ আছেন। তাঁহাদের সহিত একবার শেষ দেখা করিয়া বিদায় লইবার সময়ও আমি পাইব না কি ?"

মথুরাসিংহ পূর্ব্ববৎ করযোড়ে কহিল,—"আমি দাস। দাসের অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আপনাকে তিলার্দ্ধ সময় দিতেও আমার প্রতি আদেশ নাই।"

জগৎসিংহ বুঝিলেন, বিরুক্তি বা প্রতিবাদের সময় নাই। ভাবিলেন, তাঁহার প্রতি রাজ-বিদ্রোহীর ন্যায় আদেশ সমূহ প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহার অপরাধও যে রাজ-বিদ্রোহীর অনুরূপ হইয়াছে, সে বিষয়েও তাঁহার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। বলিলেন, "মহারাজের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে সাহস করে, এরূপ ব্যক্তি ভারতে কেহ নাই ; আমি তো তাঁহার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সেবক। তথাপি মথুরা সিংহ, আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। যদি আমি স্বেচ্ছায় না যাই, তাহা হইলে আমাকে বন্দীর ন্যায় বন্ধন করিয়া লইয়া যাইবে, একথা তুমি বলিয়াছ। যদি আমি তোমাদের সহিত যুদ্ধ করি, তাহা হইলে, তোমার প্রতি কিরূপ আদেশ প্রচারিত হইয়াছে, জানিতে ইচ্ছা করি।"

মথুরাসিংহ বলিল,—"এ গোলামদিগের মুখে সে কথা ভাল শুনায় না। যুবরাজকে মৃত বা জীবিত যে কোন অবস্থায় হউক, মহারাজের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে, ইহাই আমাদের প্রতি আদেশ।"

সুতরাং জগৎসিংহের প্রতি চূড়ান্ত আদেশই প্রচারিত হইয়াছে। ক্ষণকালের নিমিত্ত প্রতিবাদ করিতে আর তাঁহার সাধ্য ও সাহস নাই। মহারাজের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তাঁহার প্রতি অতি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হওয়াই সম্ভব, কিন্তু সে বিচারে এখন কি প্রয়োজন ? হয় তো ভগবদ্বাক্যের পরিপালনে কালব্যাজ সম্ভব, কিন্তু মহারাজ মানসিংহের আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপাল্য। জগৎসিংহ বলিলেন,—"চল মথুরাসিংহ, আর অনর্থক বিলম্বে কি ফল ? আমার সৈন্য ও অনুচরগণ জাহানাবাদে দারুকেশ্বরতীরে পড়িয়া আছে। তাহার কি ব্যবস্থা হইবে ?"

মথুরাসিংহ বলিল,—"আমি তাহার উপায় করিতেছি।"

সৈনিকগণের মধ্যে এক ব্যক্তিকে হাতে ডাকিয়া মথুরাসিংহ যথোপযুক্ত আদেশ দিল। সে দল ছাড়িয়া গড়মান্দারণের দিকে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া, যুবরাজ বলিলেন,—"তুমি যদি গড়মান্দারণ হইয়া যাও, তাহা হইলে সেখানে যাহাকে হউক বলিবে, জগৎসিংহ পিতার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া পিতৃদর্শনে পাটনা গিয়াছেন।" তাহার পর মথুরাসিংহকে বলিলেন,—"তবে সৈন্যগণকে দুই ভাগ হইতে বল আমাকে বোধ হয় উভয় দলের মধ্যে যাইতে হইবে, আর তুমিও বোধ হয় আমার পার্শ্বে যাইবে।"

মথুরাসিংহ বলিল,—"যুবরাজ এ অধম মহারাজের দাস মাত্র। আদেশ পালন করাই আমাদের কার্য্য।"

তৎক্ষণাৎ মথুরাসিংহের আদেশমতে সৈন্যগণ দুইভাগে বিভক্ত হইল এবং একভাগ জগৎ-

সিংহের অগ্রে ও অপর ভাগ পশ্চাতে গমন করিল। মথুরাসিংহ স্বীয় অশ্বে আরোহণ করিয়া জগৎসিংহের পার্শ্বে দাঁড়াইল। সকলে ধীরে অগ্রসর হইল।

কোথায় তিলোত্তমা? গতকল্য সায়ংকালে তোমার হৃদয়দেবতা যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, এত শীঘ্রই যে তাহা কার্য্যে পরিণত হইবে ইহা কে জানিত? জগৎসিংহ! অচিরকাল পূর্ব্বে, বাতায়নমুখে, সেই শিশির-সিক্ত কমলিনীর ন্যায়, মেঘাচ্ছন্ন শশধরের ন্যায়, বৃন্তচ্যুত কুসুমের ন্যায়, রবি-কর-ক্লিষ্ট কিসলয়ের ন্যায়, সেই যে ম্লান বিশুষ্ক মুখখানি দর্শন করিয়াছ, সেই সাক্ষাৎই কি তোমাদের শেষ সাক্ষাৎ! সেই বিগলিত-বেশা নবীনার বালারুণ-প্রদীপ্ত সেই শোভা-সন্দর্শন, সেই রোদন, সেই বিদায়, সেই প্রণাম, হায়! তাহাই কি তোমাদের প্রেম লীলার শেষ অভিনয়?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অপরাধ।

শশক বিপদে পড়িয়া যখন পলাইবার উপায় না দেখে, তখন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া এক স্থানে স্থির হইয়া থাকে। নয়ন মুদিলে সে কিছুই দেখিতে পায় না; মনে করে অপরেও তাহাকে দেখিতে পাইতেছেন না। কুমার জগৎসিংহ যখন বুঝিলেন, পিতা কখনই এ বিবাহে মত দিবেন না, সুতরাং পিতাকে জানাইয়া বিবাহ করিতে হইলে, কখনই বিবাহ ঘটিবে না; অথচ এ বিবাহ না ঘটিলে তাঁহার জীবনের সুখশান্তি চিরদিনের মত নষ্ট হইয়া যাইবে, তখন তিনি গোপনে পরিণয়-ব্যাপার সম্পন্ন করিলেন। ভাবিলেন, এ বৃত্তান্ত তাঁহার পিতা কখনই জানিতে পারিবেন না। ক্ষুদ্র শশকের ন্যায় জগৎসিংহ চক্ষু বুঁজিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। মনে মনে ভাবিয়া স্থির করিলেন, সমুচিত সময় উপস্থিত হইলে, বিশেষ সুযোগ পাইলে, তিনি সমস্ত ঘটনা পিতৃচরণে নিবেদন করিবেন। অপত্য-স্নেহের প্রাবল্যে, যে ঘটনা হইয়া গিয়াছে, তাহা আর ফিরিবে না বুঝিয়া, পুত্রের কাতর আবেদনে নিশ্চয়ই পিতা সদয় কর্ণপাত করিবেন এবং নিশ্চয়ই সকল আশঙ্কা তিরোহিত হইবে।

জগৎসিংহ, তিলোত্তমা, বিমলা, অভিরাম স্বামী যিনি যাহাই মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকুন না কেন, কোন ব্যাপারই মহারাজ মানসিংহের অবিদিত রহিল না। যখন জগৎসিংহ গড়-মান্দারণে বীরেন্দ্রসিংহের দুর্গ-মধ্যে পাঠান-হস্তে বন্দী হইলেন, তখনই সে সংবাদ মানসিংহ জানিতে পারিলেন। পুত্রের প্রণয়-লীলা, অসময়ে দুর্গস্বামীর বিনানুমতিতে দুর্গ-মধ্যে প্রবেশ, নিতান্ত অসাবধানতা প্রভৃতি সমস্ত বৃত্তান্তই মহারাজ সম্যগ্‌রূপে অবগত হইলেন। পুত্রের উপর তাঁহার বিরক্তির সীমা রহিল না। মহারাজ মানসিংহ পূর্ব্ব হইতেই বীরেন্দ্র সিংহ ও তাঁহার আত্মীয়-গণের বৃত্তান্ত জ্ঞাত ছিলেন। তাঁহাদের সকলকেই তিনি নিতান্ত হীন ব্যক্তি বলিয়া মনে করিতেন। তাদৃশ ব্যক্তিগণের সহিত মৌখিক আত্মীয়তা রক্ষা করাও মানসিংহের অভিপ্রেত নহে; পুত্রবধূরূপে সেই ঘৃণিত পরিবারের কন্যা গ্রহণ করা, কখনই মহারাজের অনুমোদিত হইতে পারে না।

বহু বীরের সমক্ষে জগৎসিংহ পিতার নিকট সগর্ব্বে চাহিয়াছিলেন যে, পাঁচ সহস্র মাত্র

সেনা লইয়া তিনি পাঠানদিগকে সুবর্ণরেখা পার করিয়া দিলেন। মানসিংহ পুত্রের এই স্পর্দ্ধা ও সাহস দেখিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বাসনানুরূপ সৈন্যাদি প্রদান করিয়া, পাঠানদিগকে দূর করিবার ভার দিয়াছিলেন। পুত্র, সেই গুরুতর ভার স্কন্ধে লইয়া স্বচ্ছন্দে যুবতী-অন্বেষণে ব্যাপৃত রহিয়াছেন এবং তস্করের ন্যায় পরকীয় দুর্গে প্রবেশ করিয়া, দুর্গ স্বামীর দুহিতার সহিত প্রণয়-লীলায় প্রমত্ত হইয়াছেন, এ সকল সংবাদ তাঁহাকে নিতান্ত বিরক্ত করিয়া তুলিল। যখন তিনি জ্ঞাত হইলেন যে, বীরেন্দ্রসিংহের তনয়ার সহিত আমোদ-নিরত জগৎসিংহ পাঠান-হস্তে বন্দী হইয়াছেন, তখন পুত্রের উপর তাঁহার ক্রোধ অপরিসীম হইয়া উঠিল। এই জন্য তিনি পাঠান-কুলকে তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করিবার নিমিত্ত উদ্যোগী হইলেন না। তিনি তখন এরূপ অধম ও অযোগ্য সন্তানের কল্যাণ-কামনা অবৈধ বলিয়া মনে করিলেন।

বিমলার অস্ত্রাঘাতে কতলু খাঁর মৃত্যু হইল। মরণ-কালে তিনি জগৎসিংহের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিলেন; জগৎসিংহ মুক্ত হইলেন। মুক্তির পর তিনি পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং পাঠানদিগের প্রার্থনামত সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। মানসিংহ জানিতেন, তাঁহাকে হয় তো অচিরকাল মধ্যে দিল্লী যাত্রা করিতে হইবে এবং তাঁহার সহকারী সৈয়দ খাঁও বর্ষা শেষ না হইলে যথেষ্ট সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন না। সুতরাং সম্প্রতি যুদ্ধ-বিগ্রহ রীতিমত চলিবার সম্ভাবনা নাই। নানারূপ বিবেচনা করিয়া তিনি আপাততঃ সন্ধি-বন্ধনে সম্মত হইলেন। বিপুল উপহার-আদি লইয়া পাঠান-মন্ত্রী খাজা ইশা ও নবীন নবাব সুলেমান খাঁ ও ওসমান খাঁ মহারাজ মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মহারাজ তাঁহাদিগকে যথোপযুক্ত সম্মানাদি প্রদর্শন করিয়া বিদায় করিলেন। মানসিংহের আদেশে রাজপুত-সেনাগণ পাটনা যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে লাগিল। জগৎসিংহের উপর মহারাজ বিশেষ কোন কর্ম্মের ভার প্রদান করিলেন না। তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করাই মহারাজের অভিপ্রায়।

জগৎসিংহ পিতার বিরাগভাব অনুমান করিতে পারিলেন না, এমন নহে। তথাপি তিনি শিবির ত্যাগ করিয়া, তাঁহার অশ্ববল্গা-সংলগ্ন ব্রাহ্মণলিখিত লিপির অনুরোধপালনে যাত্রা করিলেন। পিতার আদেশ না লইয়া, তাঁহার চরণে কোন সংবাদ নিবেদন না করিয়া, তিনি সেই যাত্রায় গড় মান্দারণে তিলোত্তমার পাণিগ্রহণ করিলেন। বিবাহে তাঁহার অনেক বন্ধু বান্ধব নিমন্ত্রিত হইয়া আসিলেন, আয়েষা ও তাঁহার অনুগত লোকেরা উপস্থিত হইলেন; উৎসব ও আনন্দ যথেষ্টই হইল। কিন্তু প্রধান কর্ত্তব্যপালনে জগৎসিংহ উদাসীন হইলেন। মহারাজ মানসিংহকে বিবাহস্থলে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করা হইল না, তাঁহার অনুমতি বা আশীর্ব্বাদ গ্রহণের কোন উদ্যোগ করা হইল না। পিতার অজ্ঞাতসারে শুভ কর্ম্ম শেষ করা হইল বটে, কিন্তু কোন সংবাদই মহারাজের অগোচর রহিল না। তাঁহার বিরক্তির পরিমাণ অতিশয় বর্দ্ধিত হইল। তিনি বাক্যে তাহা ব্যক্ত করিলেন না; কিন্তু পুত্রকে রাজকীয় কোন কার্য্যের মন্ত্রণায় আহ্বান করিতে ক্ষান্ত হইলেন; তাঁহার প্রতি কোন সামান্য কার্য্য সম্পাদনেরও ভার প্রদানে বিরত হইলেন; তাঁহার গতিবিধি ও কার্য্যাকার্য্য পর্য্যালোচনা পরিত্যাগ করিলেন। মহারাজ মান-

সিংহ হৃদয়চুল্লীতে পুত্রের সম্বন্ধে বিজাতীয় অসন্তোষ-বহ্নি প্রজ্বলিত করিয়া রাখিলেন। সেই অনল যে যথাকালে ক্ষুদ্র জগৎসিংহকে ভস্মসাৎ করিতে সক্ষম, ইহা সেই প্রেমমুগ্ধ, সৌন্দর্য্য-সন্দর্শন-নিরত যুবরাজের মনে উদয় হইল না।

দারুকেশ্বর-তীর হইতে মহারাজের শিবির উঠিয়া পাটনায় চলিল কুমার জগৎসিংহ সে ব্যবস্থা জ্ঞাত না ছিলেন, এমন নহে। তথাপি তিনি যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া পিতা বা সৈন্যগণের সহিত মিলিত হইলেন না; রাজকার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মচারী হইয়াও, তিনি কোন কর্ম্মের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন না। তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যাদি দারুকেশ্বর-তীরে পড়িয়া রহিল। জগৎসিংহ ও তাঁহার সৈন্যাদি ব্যতীত আর সকলেই পাটনায় গমন করিল। মহারাজ মানসিংহের ক্রোধ অপরিসীম হইয়া উঠিল। এরূপ অবাধ্য ও রাজকর্ম্মে উদাসীন সৈনিক, পুত্র হইলেও, নিশ্চয়ই রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবার যোগ্য বলিয়া তিনি অবধারণ করিলেন।

জগৎসিংহের চিত্ত পিতার বিরাগ-ভয়ে একবারও অবসন্ন বা আকুল হয় নাই কি? একবারও হয় নাই, এ কথা কেমন করিয়া বলিব? বহু সময়েই জগৎসিংহ পিতার বিরক্তির ভাব অনুমান করিয়া চিন্তিত হইয়াছেন। বহু সময়েই এই বিরক্তির পরিণাম তাঁহার পক্ষে ভয়াবহ হইবে বলিয়া তিনি আলোচনা করিয়াছেন। জগৎসিংহের অপরাধ নিশ্চয়ই গুরুতর হইয়াছে; কিন্তু এরূপ অবস্থায় পড়িলে কাহারও অপরাধ ইহার অপেক্ষা লঘু হইতে পারে কি? যখন শিবির উঠিয়া যায়, তখন সেই অরণ্যমধ্যে ভগ্ন অট্টালিকায় তিলোত্তমা মাদশাপন্না। তাহা ফেলিয়া, সেই প্রাণাধিকা সুন্দরীর পরিচর্য্যা পরিত্যাগ করিয়া, কেহই সহজে অন্য কর্ত্তব্যের সেবায় নিবিষ্ট-চিত্ত হইতে পারে না। তাহার পর বিবাহ পিতার অনভিমতে, বিশেষতঃ বীরেন্দ্রসিংহের বংশের সহিত, বিবাহবন্ধন বিষয়ে মহারাজ কখনই সম্মতি দিবেন না জানিয়া, গোপনে উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করা নিতান্ত গুরুতর অপরাধ হইয়াছে। কিন্তু যে সুন্দরীর জন্য হৃদয় উন্মত্ত হইয়াছে, যাঁহাকে লাভ করিতে না পারিলে জীবন-ধারণের প্রয়োজন পর্য্যবসিত হইয়া যাইবে, যাঁহার চিন্তা ব্যতীত কার্য্যান্তরের ধারণা করিতে চিত্ত ভুলিয়া গিয়াছে, সেই ভালবাসার সামগ্রী লাভ করিবার উৎসাহে প্রাণ যখন প্রমত্ত, তখন যে পথে চলিলে বাসনা সিদ্ধির ব্যাঘাত হইবে, কে ইচ্ছায় সে পথ পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বিরোধ পথে গমন করিতে না চাহে?

প্রত্যুত জগৎসিংহ একদিনও সুন্দরী-সন্দর্শন-বাসনায় আপনার কার্য্য-প্রণালী পরিচালিত করেন নাই। দারুণ ঝঞ্ঝাবাতে আক্রান্ত হইয়া আশ্রয়লাভ-বাসনায় সন্নিহিত শৈলেশ্বর-মন্দিরে তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন। তথায় যে তৎকালে তাঁহার ভবিষ্যৎ মনোমোহিনী অবস্থিতি করিতেছেন, একথা তিনি জানিতেন না। তাহার পর দর্শন এবং দর্শনমাত্র মত্ততা। জগৎসিংহ সে মত্ততা পরিহার করিবার নিমিত্ত নানা প্রযত্ন পাইয়াছেন; সে চিন্তা—সে কল্পনা তিনি ত্যাগ করিতে সমর্থ হন নাই। কে কবে এরূপ ঘটনার পর, হৃদয়ের প্রবল অনুরাগ সহজে হাসিয়া উড়াইতে পারিয়াছে এবং চিত্ত ক্ষেত্র হইতে সেই প্রবল আকর্ষণের সমস্ত রেখা মুছিয়া ফেলিতে পারিয়াছে? তাহার পর জগৎসিংহ সেই মনোমোহিনীর পরিচয়-

জিজ্ঞাসু হইয়া পশ্চাতে সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে পুনরায় উপনীত হইয়াছেন। পরিচয় শুনিয়া তাঁহার হৃদয় মথিত হইয়া গিয়াছে। তিনি তখনই বুঝিয়াছেন, সে সুন্দরীর সঙ্গ-লাভ তাঁহার অদৃষ্টে কখনই ঘটিবে না। বীরেন্দ্র সিংহের তনয়ার সহিত মানসিংহ-নন্দনের বিবাহ অসম্ভব। এই স্থলে জগৎ-সিংহের একটা বিষম ভ্রম হইল। তিনি একবার—জীবনের মত শেষ একবার মাত্র সেই সুন্দরীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া চিরবিদায় গ্রহণের ইচ্ছা করিলেন। ইহা তাঁহার অনভিজ্ঞতা জনিত ভয়ানক ভ্রম। এরূপ সাক্ষাতে প্রণয় যে শতগুণে বাড়িয়া উঠে, হতাশ প্রেমিকেরা ইহা বুঝিতে পারে না। অদর্শনে কালক্রমে প্রণয়-লালসা মন্দীভূত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু দর্শনরূপ ইন্ধন সংযোগে প্রেমানল সতেজ হইয়া জ্বলিয়া উঠে। ইহা না বুঝিয়াই অনভিজ্ঞ প্রেমিক একবার শেষ দর্শনের নিমিত্ত উন্মত্ত হয়। এই শেষ দর্শনই অনেকস্থলে সর্ব্বনাশের হেতুভূত হইয়া থাকে। জগৎসিংহের অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিল।

জগৎসিংহ আহূত হইয়া বিমলার সহিত গড় মান্দারণ গিয়াছিলেন। দুর্গস্বামীর বিনানুমতিতে দুর্গে প্রবেশ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হয় নাই। বিমলা তাঁহার কাণে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিলে, তিনি দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। তবে কথা-প্রসঙ্গে এই সময়ে বিমলা যে দুই একটী বাক্যের ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া জগৎসিংহের ক্রোধ বা চিত্তবিকার হওয়া উচিত ছিল। বিমলাকে তিনি সুচরিত্রা নামে সম্বোধন করিলে, বিমলা বাধা দিয়া, আপনাকে কুচরিত্রা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। স্ত্রীলোক কুচরিত্রা বলিলে বড় ঘৃণিত অর্থই ব্যক্ত হয়। যখন দুর্গ-প্রবেশের গুপ্ত-দ্বারের কথা উঠে তখন বিমলা বলিয়াছিলেন, 'যেখানে চোর, সেখানেই সিঁধ।' এ কথায় রাজপুত্রের বিরাগ হওয়া উচিত ছিল; কেন না 'চোর' ও 'সিঁধ' কথায় গুপ্ত প্রণয়ের গুপ্ত উপায়ই সূচিত হইয়া থাকে। কুলনারীর পক্ষে এরূপ উক্তি সমূহ উচিত নহে বলিয়া রাজপুত্রের মনে হইলেই ভাল হইত। তিনি এ সকল বাক্য রহস্য-প্রবণা বিমলার সরল উক্তি বোধে মনের মধ্যে স্থান দেন নাই। বস্তুতঃ তাহাই সত্য

শেষ সাক্ষাৎ ঘটিল। এরূপ শেষ দর্শনে যাহা হইয়া থাকে, এস্থলেও তাহাই হইল। উভয়েই উভয়ের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিয়া চিরদিনের নিমিত্ত অচ্ছেদ্য প্রণয়-পাশে বদ্ধ হইয়া পড়িলেন। এই তো তাঁহার প্রণয়-ব্যাপারের ইতিহাস। জগৎসিংহ বীর, সৈনিক পুরুষ ও সম্রাট কর্ম্মচারী; সুতরাং অসময়ে তাঁহার এরূপ প্রণয়রঙ্গে প্রমত্ত হওয়া উচিত হয় নাই। কিন্তু ঘটনা সকলই তাঁহার প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রণয়-রঙ্গ-ক্ষেত্রে অভিনেতৃরূপে দণ্ডায়মান হইবার নিমিত্ত তিনি প্রার্থী ছিলেন না; ঘটনাপুঞ্জ তাঁহাকে অসম্ভাবিত উপায়ে সেই মঞ্চে উপস্থাপিত করিয়াছিল। সেই মদিরার মোহন আবেশ একবার আক্রমণ করিলে, কোন্ বীর তাহার শাসন অতিক্রম করিতে পারেন?

মানসিংহ এত কথা জানিতেন কি? বোধ হয় কোন ব্যাপারই তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না; তথাপি তিনি পুত্রের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, অগ্রে প্রভুর কার্য্য-সাধন, তাহার পর স্বকীয় সুখ, আমোদ বা স্বার্থের চিন্তা; এইরূপই কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ বীরের

লক্ষ্য হওয়া উচিত। ন্যায়-পরায়ণ, কর্ত্তব্য-সেবক অম্বরেশ্বর এইরূপ মনে করিয়াই জগৎ-সিংহের উপর সাতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন। ক্রমশঃ নানাপ্রকারে সেই বিরাগ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, এ কথা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে।

তাহার পর প্রভুর বিনানুমতিতে প্রায় মাসাবধি কাল শিবির হইতে সুদূরে অবস্থান, জগৎসিংহের পক্ষে মানসিংহের চক্ষুতে, ক্ষমার অতীত অপরাধ বলিয়া অবধারিত হইল। বিরাগের চরম সীমায় উপনীত মহারাজ মান-সিংহ এই অপরাধীকে সজীব অবস্থায় এবং তাহা অসম্ভব হইলে, মৃতাবস্থায় তাঁহার সমীপে উপস্থিত করিতে আদেশ করিলেন। পার্শ্বচর পদস্থ ব্যক্তিগণ, মহারাজের ক্রোধের গুরুতা অনুভব করিয়া, শিহরিয়া উঠিলেন। জগৎসিংহ শৈলেশ্বর মহাদেবের মন্দির সন্নিকটে বন্দী হইলেন। যে স্থানে তাঁহার প্রণয়াভিনয়ের প্রারম্ভ, সেই স্থানেই তাহার যবনিকাপাত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রেমের পুরস্কার।

পাটনা নগরে মহারাজ মানসিংহ বাহাদুরের দরবার-গৃহে অদ্য ভয়ানক জনতা। অদ্য যথা-সময়ে তথায় এক কল্পনাতীত কাণ্ডের অভিনয় হইবে। অচিরকাল মধ্যে তথায় এক বিশেষ সম্ভ্রান্ত ও পদমর্য্যাদাসম্পন্ন রাজকর্ম্মচারীর অপরাধের বিচার হইবে। অস্ত্রধারী রক্ষিগণ চারিদিকে যথাস্থানে দণ্ডায়মান হইয়াছে। যাবতীয় অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য ইচ্ছা করিলে এই বিচারসভায় উপস্থিত থাকিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, সহস্র সহস্র সৈনিক-পুরুষ সেই সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছে। নগর-বাসী ভদ্রাভদ্র জনসমূহেরও, অদ্য এই সভায় দর্শকরূপে উপস্থিত থাকিবার নিষেধ ছিল না; সুতরাং বিচার-কার্য্য আরব্ধ হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই জন-সমাগমে সেই বিশাল দরবার-গৃহের সকল স্থান পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

যথাসময়ে নাগারা বাদিত হইল; বাদ্য-ধ্বনি ক্ষান্ত হইবামাত্র, স্তুতিগায়কেরা মঙ্গল গান সমাপন করিল। তাহার পর নকিব ফুকরাইয়া উঠিল। সমাগত দর্শকেরা উদ্‌গ্রীব হইয়া মহারাজের আগমন-পথ চাহিয়া রহিল। তৎক্ষণাৎ অম্বরেশ্বর মহারাজ মানসিংহ ধীর ও গম্ভীর পাদ নিক্ষেপে, স্বতন্ত্র দ্বার দিয়া সেই সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনুচর সেনাপতিগণ, সভাসদ্ ও পারিষদ্‌গণ তাঁহার অনুসরণ ক্রমে সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। সকলেরই বদন উৎকণ্ঠায় সমাচ্ছন্ন; সকলেই যেন, অদ্য না জানি কি ভয়ানক ব্যাপার সংঘটিত হইবে ভাবিয়া, ভয়াকুল। মহারাজ মানসিংহ সমুচ্চ মঞ্চোপরি স্বকীয় নির্দ্দিষ্ট আসনে সমাসীন হইলেন; সেনাপতিগণ, সভাসদগণ তাঁহার উভয়পার্শ্বে অপেক্ষাকৃত নিম্নাসনে উপবেশন করিলেন। সমাগত লোকেরা সভয়ে দেখিল, মহারাজের বদনে স্থিরতা ও ধীরতাব্যঞ্জক লক্ষণ সমূহ প্রকটিত।

জন-সমাগমে সভার সকল স্থান পরিপূর্ণ হইলেও, তথায় অসাধারণ শান্তি ও নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। কাহারও মুখে বাক্য নাই, সন্নিহিত ব্যক্তির সহিত একটা কথা কহিতেও কাহারও প্রবৃত্তি নাই, সকলে

নিশ্বাস ফেলিতেও কাহারও সাহস নাই। সকলেই চিন্তাকুল, সকলেই ম্রিয়মাণ।

মহারাজ আসন গ্রহণ করিয়া অকম্পিত গুরু-গম্ভীর-কণ্ঠে আদেশ করিলেন,—"বন্দীকে আনয়ন কর।"

সভার ভাবতেই বিচলিত হইয়া উঠিল। সকলেরই বিষণ্ণ মুখ আর একটু কালিমাগ্রস্ত হইল। সকলেই উৎসুক ভাবে প্রবেশদ্বারের অভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। পরিমিত পদ-সঞ্চালন করিতে করিতে, প্রহরি-পরিবেষ্টিত বন্দী অবনতমস্তকে সেই সভাকুট্টিমে প্রবেশ করিলেন। তাবৎ লোক করুণ-নয়নে সেই বন্দীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। সেই বন্দী কুমার জগৎসিংহ।

বন্দী সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবামাত্র, মহারাজ মানসিংহ পূর্ব্ববৎ দৃঢ়স্বরে বলিলেন —"বন্দী জগৎসিংহ! তুমি বহুবিধ অপরাধে অপরাধী হইয়াছ। তোমার অপরাধ আমি দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছি। কতকগুলি অপরাধ পারিবারিক, আর কতকগুলি রাজকীয়। অদ্য তোমার সেই সমুদায় অপরাধের যথাবিহিত বিচার করিয়া তোমার উপর সমুচিত দণ্ডের ব্যবস্থা করা হইবে। তোমার রাজকীয় অপরাধ সমূহ নিতান্ত গুরুতর হইলেও, বিচার-কার্য্যের সুবিধা হইবে ভাবিয়া, অগ্রে তোমার পারিবারিক অপরাধ সমূহের বিচার আরম্ভ করা যাইতেছে।"

অবনতমস্তক জগৎসিংহ আরও অবনত হইলেন। একজন প্রাচীন মোগল পারিষদ্ আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং মহারাজকে বিহিত বিনয় সহকারে অভিবাদন করিয়া বলিলেন,—"অধীনের অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আমি সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি, পারিবারিক অপরাধের আলোচনা সকলের শুনিবার প্রয়োজন কি? আমরা সকলে কেন এ সময়ে স্থানান্তরে যাই না"?

মানসিংহ বলিলেন,—"না—কাহারও এ স্থান ত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ বন্দীর পারিবারিক অপরাধের সহিত তাহার রাজকীয় অপরাধের বিশেষ সংস্রব আছে এবং একের বিচারের উপর অন্যের বিচার নির্ভর করিতেছে।"

মোগল পুনরায় আসন গ্রহণ করিলেন। সকলেই পাষাণ মূর্ত্তির ন্যায় স্ব স্ব স্থানে স্থির থাকিয়া, মহারাজের আদেশ শুনিবার নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

মহারাজ বলিলেন,—"শুন বন্দী! অতঃপর তোমাকে যে যে কথা জিজ্ঞাসা করা হইবে, তুমি তাহার সত্য উত্তর প্রদান না করিলে, তোমার অপরাধ আরও গুরুতর বলিয়া বিবেচিত হইবে।"

জগৎসিংহ সগর্ব্বে উত্তর দিলেন,—এ শাসন নিতান্ত অনাবশ্যক। জগৎসিংহ মিথ্যা কহিতে জানে না—প্রাণের ভয়েও সে মিথ্যা কহিতে অশক্ত।"

মানসিংহ জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি পাঠানগণ কর্ত্তৃক, বীরেন্দ্র সিংহের অন্তঃপুর-মধ্যে, রমণীগণের সহিত এক কক্ষে, ধৃত ও অবরুদ্ধ হইয়াছিলে কি না?"

জগৎসিংহ উত্তর দিলেন,—"হাঁ।"

মানসিংহ জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি পাঠানগণের হস্তে অবরোধকালে, নবাব কতলু খাঁর পালিতা কন্যা আয়েষার হৃদয়ে প্রেমলালসা উত্তেজিত করিয়াছিলে কি না?"

জগৎসিংহ বলিলেন,—"মহারাজ, এ প্রশ্নের উত্তর একটু দীর্ঘ হইবে—ক্ষমা করিবেন। নবাব-পুত্রী আয়েষা আমার পরম-

হিতৈষিণী। এ অভাগা যে শত অপরাধে অপরাধী হইয়াও, অদ্য আপনার ন্যায়-বিচারের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইয়াছে, সে কেবল সেই নবাব-পুত্রী আয়েষার গুণে। আমি যখন অস্ত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত-কলেবর ও জ্বর-বিকারে অজ্ঞান, তখন নবাব নন্দিনী আয়েষা মাতার ন্যায়, ভগ্নীর ন্যায়, পত্নীর ন্যায় ও সখীর ন্যায় যত্নে অবিরত পরিচর্য্যা করিয়া, আমার আরোগ্য সাধন করিয়াছেন। সেই দেবীকে আমি ভক্তি করি, অন্তরের সহিত তাঁহাকে আমি শ্রদ্ধা করি, এবং তাঁহাকে অকপট আত্মীয় বলিয়া আমি জ্ঞান করি। তাঁহার ন্যায় দেববালার প্রতি প্রেমের চক্ষুতে দৃষ্টিপাত করিতেও কখন এ অধমজনের সাহসে কুলায় না তাঁহাকে পূজার পাত্র ভিন্ন অন্য কোন ভাবে চিন্তা করিতেও আমার কখন প্রবৃত্তি হয় নাই। কিন্তু বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনায় আমি সহসা জানিতে পারিয়াছি, সেই গুণবতী নবাব-নন্দিনী এই অযোগ্য ব্যক্তির প্রতি প্রেমাসক্ত। সেই সদয়-হৃদয়া নবাব-তনয়ার হৃদয় না জানি কি অসীম যাতনার আবাসস্থল হইয়াছে মনে করিয়া, আমি তদবধি অসীম কষ্ট ভোগ করিতেছি। তাঁহাকে প্রণয়োন্মত্ত করা দূরে থাকুক, যদি আমি তাঁহার অসীম প্রণয়ের একটুও প্রতিদান করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমার সুখ, আনন্দ ও সৌভাগ্যের সীমা থাকিত না। তাঁহার হৃদয়ে প্রেমের উত্তেজনা করা দূরে থাকুক, যদি তাঁহার হৃদয় হইতে প্রেমাকর্ষণের চিহ্ন মাত্রও প্রক্ষালিতকরিবার নিমিত্ত আমাকে অসাধ্য সাধনও করিতে হইত, আমি তাহাতেও কদাপি পশ্চাৎপদ হইতাম না।"

মানসিংহ আবার জিজ্ঞাসিলেন, —"বর্ত্তমান পাঠান নবাব ওসমান খাঁর সহিত তোমার কোন দিন দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইয়াছিল কি না?"

জগৎসিংহ বলিলেন,—"হাঁ মহারাজ। আয়েষার প্রণয়ই তাহার কারণ। নবাব বলেন, 'এ সংসারে আয়েষার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী দুই ব্যক্তির স্থান হইতে পারে না; অতএব অদ্য যুদ্ধে হয় তুমি মর, না হয় আমি মরি।' আমি তাঁহাকে স্পষ্টরূপে বলি, আমি আয়েষার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী নহি; সুতরাং যুদ্ধের প্রয়োজন নাই। তিনি বলেন, 'তুমি না হইলেও, আয়েষা তোমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী, অতএব তুমি বধ্য।' এ সকল কথা নবাব কখনই অস্বীকার করিবেন না। তিনি আমাকে পদাঘাত না করিলে, আমি কখনই তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতাম না।"

মানসিংহ জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি নবাব-পুত্রীকে পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়া থাক কি না?"

জগৎসিংহ বলিলেন,—"পুনঃ পুনঃ লিখি না, একবার লিখিয়াছিলাম।"

মানসিংহ জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি অকারণে আয়েষার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলে কি না?"

জগৎসিংহ বলিলেন,—"গিয়াছিলাম। এদেশ হইতে বিদায় কালে, তাঁহার সহিত শেষ সাক্ষাতের প্রার্থী হইয়াছিলাম।"

মানসিংহ জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি কখন তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছ কি না?"

জগৎসিংহ বলিলেন,—একবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম।"

মানসিংহ বলিলেন,—"তুমি সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষী হইলে, তোমার সহিত সাক্ষাৎ করা উচিত নহে বলিয়া, আয়েষা তোমাকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন কি না?"

জগৎসিংহ বলিলেন,—"ঐরূপ একটা

কারণেই তিনি আমার সহিত সাক্ষাতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন বটে।”

মানসিংহ ঘৃণার হাসি হাসিয়া বলিলেন,—“এখনও বলিতে চাহ, তুমি নবাব-পুত্রীর প্রতি আসক্ত নহ? তুমি কখন তাঁহাকে প্রেমের উৎসাহ দেও নাই? তিনিই তোমার প্রতি অনুরাগিণী?”

জগৎসিংহ বলিলেন,—“হাঁ মহারাজ! ঐ কথা আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি। বিশ্বাস করা না করা মহারাজের ইচ্ছাধীন।”

মানসিংহ দৃঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“বীরেন্দ্রসিংহের তনয়া তোমার উপপত্নী কি না?”

জগৎসিংহ বিচলিত হইয়া উঠিলেন; তাঁহার শরীর দিয়া যেন বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছুটিতে লাগিল। তিনি স্থির স্বরে বলিলেন,—“মহারাজ! আপনি ভূপাল, শাসন-পালনের কর্ত্তা, প্রভু এবং আমার পিতা; সুতরাং প্রত্যক্ষ ধর্ম্মস্বরূপ। আপনি যে প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহার সমুচিত উত্তর দিতে আমি অশক্ত। কিন্তু অন্য কেহ ভ্রমে বা পরিহাসেও এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, আমি এতক্ষণ তাহার সর্ব্বনাশ না করিয়া ক্ষান্ত হইতাম না। বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা আমার সহধর্ম্মিণী—পবিত্র মন্ত্রানুষ্ঠান সহকারে পরিগৃহীতা ধর্ম্মপত্নী।”

মানসিংহ ভয়ানক উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—“নরাধম, রাজপুত-কুল-কলঙ্ক, ঘৃণিত কীট! এই পাপ কথা আমার সমক্ষে স্বীকার করিতে তোর রসনা খসিয়া পড়িল না; ক্ষোভে ও লজ্জায় তোর প্রাণ আলোড়িত হইল না? বীরেন্দ্র সিংহের কন্যা তোমার ধর্ম্ম-পত্নী! যে বীরেন্দ্র, বারি-বাহকরূপে আমার পবিত্র অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, এক পরিচারিকার সর্ব্বনাশ সাধনের চেষ্টা করিয়াছিল, যে বীরেন্দ্র, আমার তাড়নায়, এক ব্যভিচারিণী শূদ্রীর বিমলা নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল, সেই পাপাত্মা তোর শ্বশুর; আর সেই শূদ্রী-তনয়া বিমলা তোর ধর্ম্ম-পত্নীর বিমাতা। কাহার কথা বলিব? তোর এই ধর্ম্ম-পত্নী এক জারজা নারীর গর্ভ-সম্ভবা। আর সেই পরম সন্ন্যাসী, যিনি শশিশেখর রূপে সংসারে অশেষ অনর্থ উৎপাদন করিয়া এখন অভিরাম সাজিয়াছেন, তিনি তোমার ধর্ম্ম পত্নীর মাতামহ। তিনি প্রবাসগত—প্রতিবেশী-পত্নীর গর্ভোৎপাদন করিয়া পলাতক হইয়াছিলেন; কাশীতে বহুশাস্ত্রাদির আলোচনা করিয়াও, তিনি সাহায্য-কারিণী শূদ্র কন্যার ধর্ম্মনাশ করিয়াছেন। সেই মহাপুরুষ এক্ষণে পরম জ্ঞানী। ধিক্ তোর বিবেচনায়! তুই এই সকল হীন ও জঘন্য লোককে আত্মীয় জ্ঞান করিয়া, এক সামান্য জমিদারের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিস্। তুই তাহাকে উপপত্নী বলিয়া স্বীকার করিলে হয় তো তোর অপরাধ ক্ষমা করিতে পারিতাম। পিতার অমতে, পিতার আশীর্ব্বাদ বা অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া, যে পুত্র এরূপ নিকৃষ্ট বংশের সহিত কুটুম্বিতার বন্ধন সংঘটিত করিতে পারে, সে পিতার পরিত্যাজ্য। আজি হইতে জগৎসিংহ আমার পুত্র নহে। তুই কোন স্থানে আপনাকে মানসিংহের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিলে নিশ্চয়ই তোর জীবন দণ্ড হইবে।”

সভাস্থ তাবতে নির্ব্বাক্ অবস্থায় সভয়ে মহারাজার এই আদেশ শ্রবণ করিল। মহারাজ বলিতে লাগিলেন,—“অতঃপর তোর রাজকীয় অপরাধের কথা। তুই বাদশাহের এরূপ চিহ্নিত কর্ম্মচারী ও ভার-প্রাপ্ত সেনাপতি

হইয়াও, অনায়াসে তস্করের ন্যায় নিশাকালে, দুর্গস্বামীর অজ্ঞাতসারে, অপরের দুর্গে প্রবেশ করিয়াছিলি ?”

জগৎসিংহ নিরুত্তর—অধোমুখ। মানসিংহ বলিলেন,—“পঞ্চসহস্র সৈন্য সঙ্গে লইয়া এবং পাঠানগণকে দূর করিবার ভার লইয়া, তুই কেন সে কার্য্যে অবহেলা করিয়া, স্বকীয় সুখের চেষ্টায়, নারী-লাভের প্রত্যাশায় ফিরিয়াছিলি ?”

জগৎসিংহ নিরুত্তর। মানসিংহ আবার জিজ্ঞাসিলেন,—“পাঠানদিগের হস্ত হইতে মুক্ত হওয়ার পর তুই কেন আপনার সৈন্য সঙ্গে মিলিত হইয়া, আমার আদেশের প্রতীক্ষা করিস নাই ?”

জগৎসিংহ নিরুত্তর। মানসিংহ আবার বলিলেন,—“সৈন্য ও সেনাপতিগণ যখন শিবির তুলিয়া যাত্রা করিয়াছেন, তুই কেন আমার আদেশানুসারে সে সময়েও সে সঙ্গে মিলিত হইস নাই ?”

জগৎসিংহ নিরুত্তর। মানসিংহ আবার বলিলেন,—“কোনরূপ বিদায় গ্রহণ না করিয়া এবং বাদশাহের কোন কার্য্যে লিপ্ত না থাকিয়া তুই স্বাধীন ভাবে কেন কালপাত করিতেছিলি ?”

জগৎসিংহ নিরুত্তর। মানসিংহ বলিলেন,—“বল দুরাত্মা, এরূপ কর্ত্তব্য-জ্ঞান-হীন ব্যক্তির পক্ষে কোন্ শাস্তি বিহিত। প্রাণদণ্ডই তোর উপযুক্ত শাস্তি।”

সেই মোগল পারিষদ্ আবার দণ্ডায়মান হইয়া, অতীব বিনয় সহকারে মহারাজকে সেলাম করিয়া বলিলেন,—“হুজুর, অভয়, দেন, একটা কথা নিবেদন করি—যুবরাজ আপনার পুত্র—”

মানসিংহ বজ্র-গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—“কে বলে ঐ হতভাগ্য কুক্কুর আমার পুত্র ? আমার পুত্র হইলে কখন এমন রাজদ্রোহী, প্রভু-অবমাননাকারী কর্ত্তব্যে অনাসক্ত হইত না। পুত্রত্ব সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিবার জন্যই আমি অগ্রে পারিবারিক অপরাধের বিচার করিয়াছি ; সেই বিচারের সঙ্গে সঙ্গে ঐ হতভাগ্যের সহিত পুত্রত্বের শেষ হইয়াছে।”

মোগল বলিলেন,—“ভাল, আপনি ধর্ম্মাবতার, ভাবিয়া দেখুন, যুবরাজ নিতান্ত তরুণ-বয়স্ক।”

মহারাজ কিয়ৎকাল অধোমুখে চিন্তা করিলেন। তাহার পর বলিলেন,—“শোন্ দুরাত্মন্, প্রাণদণ্ড ব্যতীত তোর অপরাধের সমুচিত শাস্তি আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। তথাপি তোর তরুণ বয়সের অনুরোধে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড মাত্র অন্ত ব্যবস্থা করা হইল। রক্ষিগণ, এই হতভাগ্যের বেশভূষা খুলিয়া লও, ইহাকে আমার সম্মুখে ও এই সভার সমক্ষে শৃঙ্খলাবদ্ধ কর, তাহার পর এই নরাধমকে সর্ব্বসমক্ষে কারাবাসে লইয়া যাও।”

আজ্ঞা তৎক্ষণাৎ পালিত হইল। জগৎসিংহ স্বণিত বন্দীর বেশ ধারণ করিলেন। লৌহ-শৃঙ্খলে তাঁহার হস্ত-পদ নিবদ্ধ হইল। চারিদিকে অস্ফুট হাহাকার ও দীর্ঘনিশ্বাস শব্দ উঠিল। সেনাপতিগণ অধোমুখ হইলেন। বৃদ্ধগণের চক্ষুতে জল আসিল। রক্ষিগণ বন্দীসহ প্রস্থান করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বার্ত্তাবহ।

যে সৈনিক দারুকেশ্বর-তীরে যাইবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং মথুরাসিংহের সম্প্রদায় ত্যাগ করিয়া, একাকী গড় মান্দারণ অভিমুখে অশ্ব চালিত করিয়াছিল, সে কিয়দ্দূর অগ্রসর হওয়ার পর, সম্মুখে বিকট বেশধর গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজকে দেখিতে পাইল। গজপতি, কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে অশ্বারোহী জগৎসিংহের সহিত আলাপ করিয়া, একটী রৌপ্যমুদ্রা লাভ করিয়াছিলেন। পুনরায় অন্য এক অশ্বারোহী বীর দেখিয়া, তাঁহার সহজেই মনে হইল, অদ্য তাঁহার সুপ্রভাত; এ ব্যক্তির সহিত কিঞ্চিৎ আলাপ করিলে নিশ্চয়ই কিছু লাভ হইবে। তিনি অশ্বারোহীর অভিমুখে ফিরিয়া হস্তদ্বয় ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া বলিল,—"আল্লা মহাদেব হুজুরের ভবিষ্যৎ ঠিক রাখুন।"

অশ্বারোহী সৈনিক এই আশ্চর্য্য বেশধর ব্যক্তির মুখে আশ্চর্য্য ভাষায়, আশ্চর্য্য আশীর্ব্বাদ শুনিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইল। সে, এই ব্যক্তির সহিত আলাপ করিবার অভিপ্রায়ে, অশ্বকে ধীরে চালাইল; দিগ্‌গজ পাশে পাশে চলিতে লাগিলেন। অশ্বারোহী জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি কি জাতি?"

দিগ্‌গজ চিন্তিত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে উত্তর দিলেন,—"স্বামীজিকে না জিজ্ঞাসা করিয়া এ কথার যথার্থ উত্তর দিতে পারতেছি না।"

অশ্বারোহী জিজ্ঞাসা করিল,—"সে কি কথা? জাতির কথা আর একজনকে না জিজ্ঞাসা করিয়া কেন বলিতে পারিবেন না?"

দিগ্‌গজ বলিলেন,—"আমি ঠিকই আছি বটে, কিন্তু আমার জাতির কথাটা এখনও ঠিক হয় নাই।"

সৈনিক মনে করিল, লোকটা পাগল। ইহার সহিত কথায় সময় কাটিলে মন্দ নয়। বলি ,—"বড় আশ্চার্য্য কথা। কিসে কি হইল?"

দিগ্‌গজ বলিলেন,—'আমি হিন্দু—ব্রাহ্মণ ছিলাম; তাহার পর শুনিতেছি, আমি মুসলমান হইয়াছিলাম। তাহার পর হিন্দু হইবার জন্য যাহা করিতে হয় সব করিয়াছি। এখন জাতি সম্বন্ধে আমাকে কি বলিতে হইবে, তাহা স্বামীজি ঠিক করিয়া না দিলে বলিতে পারিব না।"

সৈনিক কথাটা বুঝিতে পারিল। জিজ্ঞাসিল,—"স্বামীজি কে?"

"আমার অধ্যাপক"

সৈনিক আবার বিস্ময় সহ জিজ্ঞাসিল,—"আপনার অধ্যাপক! বয়স তো আপনার কম বুঝিতেছি না। এখনও কি আপনি ছাত্র?"

দিগ্‌গজ বলিলেন,—"বয়স আমার অতি অল্প। আসমানি বলিয়াছে, আমি এখনও বালক। সে কথা কখনই মিথ্যা হইবার নহে।"

সৈনিক আবার জিজ্ঞাসিল,—"আসমানি কে?"

দিগ্‌গজ একটু চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চিন্তা করিলেন। তাহার পর বলিলেন,—"জানি না কে?"

"আসমানি স্ত্রীলোক না পুরুষ?"

দিগ্‌গজ আবার একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"ঠিক বলিতে পারি না। বোধ হয় স্ত্রীলোক।"

সৈনিক বুঝিল লোকটার বুদ্ধি কিছু কম। এরূপ লোক পাইলে সকলেরই রহস্য করিতে

ইচ্ছা হয়। সে আবার জিজ্ঞাসিল,—"কিসে আপনি স্থির করিলেন, আসমানি স্ত্রীলোক?"

দিগ্‌গজ বলিলেন,—"সে মেয়ে মানুষের মত কাপড় পরে, মাথায় খোঁপা বাঁধে, গায়ে গহনাও পরে। এই সব লক্ষণ দেখিয়া আমি ঠিক করিয়াছি, সে স্ত্রীলোক।"

সৈনিক জিজ্ঞাসিল,—তাহার মুখে দাড়ি গোঁপ আছে কি?"

"না।"

"ইহাতেও বুঝা যায় আসমানি স্ত্রীলোক।"

দিগ্‌গজ একটু ভাবিয়া বলিল,—"তা ঠিক বুঝা যায় না। বাঙ্গলা দেশের অধ্যাপক মাত্রের দাড়ি গোঁফ নাই। এই উড়ের দেশে পুরুষের দাড়ি গোঁফ তো নাই, বাড়ার ভাগ মাথায় খোঁপা বাঁধার মত মস্ত চুল।"

"আপনি বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন, আসমানি কোন অধ্যাপক নহেন তো?"

দিগ্‌গজ বলিলেন,—"মহাশয় কথাটা বলিয়াছেন মন্দ নয়। আমার পূর্ব্ব অধ্যাপক মহাশয়ের সহিত আসমানির চেহারা কতকটা মিলে। তা ছাড়া, আসমানির ব্যবহারাদি অধ্যাপকের মত।"

সৈনিক কৌতূহল সহকারে জিজ্ঞাসিল,—'কিরূপ?"

"তিনি আমাকে সর্ব্বদা তাড়না করেন; আবার বড়ই ভাল বাসেন। আর কি করিব না করিব, তাহার ব্যবস্থা তিনিই দেন। আমাকে দিয়া অনেক কাজ করাইয়া লন। আমার সহিত সুখ দুঃখের অনেক কথা কহেন।

"আপনাকে পাঠ বলিয়া দেন না।"

"না। সে বোধ হয় আমারই দোষ। আমি তাঁহাকে দেখিলেই সব ভুলিয়া যাই, পড়াশুনার কথা মনে পড়ে না। পাঠ চাহিবার সময় পাই না।"

সৈনিক বলিল,—"আমি বুঝিয়াছি, আসমানি স্ত্রীলোক। আপনি আমার সহিত এতক্ষণ রহস্য করিতেছিলেন। এই আসমানি আপনার প্রণয়িনী।"

দিগ্‌গজ লাফাইয়া উঠিলেন। এত জোরে, এত উর্দ্ধে তিনি উঠিয়া পড়িলেন যে, তাঁহার গলায় রুদ্রাক্ষ-মালা স্থান-ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়া-গেল। তিনি তাহা কুড়াইয়া না লইয়াই সৈনিকের নিকটস্থ হইলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন,—"বলেন কি আমি ঐ কথাই মনে করি; কিন্তু অন্য লোকেও কি মনে করে যে, তিনি আমার ভাল বাসার মেয়ে মানুষ?"

"সৈনিক একটু হাসিয়া উত্তর করিল,—নিশ্চয়ই লোকে ঐরূপ মনে করে। তাহা না হইলে আমি একটু কথা শুনিবামাত্র বুঝিলাম কেন যে, তিনি আপনার প্রণয়িনী?"

দিগ্‌গজ ব্যস্ততা সহ মালা তুলিয়া আনিয়া সৈনিকের নিকটস্থ হইলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনি কি দৈবজ্ঞ? আপনি এ কথা ঠিক বলিতেছেন তো? আমি এবার দুর্গে গিয়া অনায়াসে তাঁহাকে প্রণয়িনী বলিয়া ডাকিতে পারিব তো?"

সৈনিক বলিল,—"আমি ঠিক বলিতেছি তিনি আপনার প্রণয়িনী। আপনি স্বচ্ছন্দে তাঁহাকে প্রিয়তমা বলিয়া আদর করিবেন। আমি অনেক দিন গুরুর নিকট সামুদ্রিক শাস্ত্র অভ্যাস করিয়াছি। আপনার মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি, আপনার এক মনোমোহিনী আছেন। তাঁহার নামের প্রথম অক্ষর 'আ', আর শেষ অক্ষর এতক্ষণ ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না, কিন্তু আপনি এক্ষণে

কাছে আনায় আমি স্পষ্ট দেখিতেছি, আপনার প্রণয়িনীর নামের শেষ অক্ষর "নি"।"

দিগ্‌গজ পরমানন্দে কহিল,—"এতদিনে ভগবান্ আমার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। আপনার ন্যায় দৈবজ্ঞ মহাশয়ের মুখে শুনিয়া আমার নিশ্চয় বিশ্বাস হইল, আসমানি আমার প্রণয়িনী সন্দেহ নাই। আচ্ছা আপনি একটু ভাল করিয়া আমার কপালের পানে চাহিয়া দেখুন দেখি, যেখানে আমার প্রণয়িনীর নামের অক্ষর লেখা আছে, তাহার এদিক ওদিকে আর কোন অক্ষর আছে কি না—দেখুন দেখি ভাল করিয়া।"

গজপতি কপালটা একবার ভাল করিয়া মুছিয়া ফেলিল। সৈনিক বলিল,—"আছে; কিন্তু "আ" আর "নি" যেমন স্পষ্ট তেমন আর কিছুই নহে। সে গুলা গায়ে পড়া।"

গজপতি বলিলেন,—"আপনি আমার বিশেষ উপকার করিলেন। আপনি কোথায় চলিয়াছেন?"

"আপাততঃ আমি গড় মান্দারণ যাইব। তাহার পর অন্য দিকে যাইবার প্রয়োজন আছে।"

গড় মান্দারণ তো আসিয়াছেন। এই বাগানের ওপারেই গড়। এখানে কাহার কাছে দরকার?"

সৈনিক বলিল,—"দরকার বিশেষ কিছু নয়; কেবল দুর্গে একটা খবর দেওয়া মাত্র।"

গজপতি বলিলেন,—"তা আসুন, আমার সঙ্গে। আমি প্রথমেই দুর্গে যাইব। সেখানেই আমার আসমানি থাকেন। তাঁহার সহিত দেখা না করিয়া কোথায়ও যাইব না।"

সৈনিক বলিল,—"দুর্গের সকলের সঙ্গেই কি আপনার আলাপ আছে?"

গজপতি সগর্ব্বে বলিলেন,—"বিশেষ। দুর্গের যিনি এখন কর্ত্তা, তিনি আমার অধ্যাপক অভিরাম স্বামী; দুর্গের মধ্যে যিনি সর্ব্বময়ী, তিনি আমার স্নেহভাণ্ড; আর দুর্গে যাঁহার তুলনা নাই, তিনি আমার গোড়ায় 'আ' শেষে 'ন'।"

সৈনিক বলিল,—"তাহা হইলে, আপনি একটা সামান্য সংবাদ দয়া করিয়া দুর্গে জানাইলে আমার বিশেষ উপকার হইবে। আপনার গোড়ায় "আ" আর শেষে "নির" দ্বারা সংবাদ পাঠাইলেই চলিবে।"

গজপতি বলিল, —"স্বচ্ছন্দে। আপনার জন্য আমি প্রাণ দিতে পারি। আপনি যখন বলিয়া দিয়াছেন, আসমানি আমার প্রণয়িনী তখন হইতে আমার সাহস-ভরসা কত বাড়িয়া গিয়াছে তাহা আর কি বলিব" আমি এখনই গিয়া খবর দিব। কথাটা কি আপনি বলুন।"

সৈনিক বলিল,—"আপনি দয়া করিয়া বলিবেন যে, কুমার জগৎসিংহ বন্দী হইয়াছেন।"

গজপতি কাঁপিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"কেন বন্দী হইলেন? কে বন্দী করিল?"

সৈনিক বলিল,—"কেন বন্দী হইলেন তাহা আমরা জানি না। মহারাজ মানসিংহ বাহাদুরের আজ্ঞায়, আমরাই বন্দী করিয়াছি।"

দিগ্‌গজ একটু চিন্তা করিল। ভাবিল যুবরাজ যখন বন্দী হইয়াছেন, তখন আর সকলেরও যে সে দশা হইবে না, এমন কথা কে বলিতে পারে? বীরেন্দ্র সিংহ যখন বন্দী হইয়াছিলেন, তখনও ক্রমে দুর্গের সমস্ত লোক বন্দী হইয়াছিল। বৃথা গঙ্গাস্নান, গঙ্গাতীরে বাস, তীর্থ-দর্শন করিয়া আসিলাম। আবার হয়তো মুসলমান হইতে হইবে। যাহারা যুবরাজকে বন্দী করিয়াছে, এই ব্যক্তিও তাহা-

দের একজন। এ অগ্রে আসিয়াছে; আর সকলে পরে আসিতেছে। এক্ষণে ইহার সঙ্গ ছাড়িয়া পলায়ন করাই সৎপরামর্শ। প্রকাশ্যে বলিলেন,—"আপনার সংবাদ আমি দুর্গে জানাইব। আপনি এখন যেখানে যে কার্য্যে যাইতেছেন সেখানে যাইতে পারেন।"

দিগ্‌গজ ক্রমেই সরিয়া পড়িতে লাগিল। সৈনিক তাহাকে আটকাইয়া রাখিবার জন্য কোন আগ্রহ প্রকাশ করিল না। কিয়দ্দূর সরিয়া যাওয়ার পর, দিগ্‌গজ দৌড়িতে আরম্ভ করিল—এক একবার পশ্চাতে চাহে, আবার দৌড়ায়। পদ-চালনায় তাহার বিশেষ নিপুণতা আছে। আর একদিন বিমলার সহিত রাত্রি-কালে আসিতে আসিতে ভূতের ভয়ে গজপতি এইরূপে পলাতক হইয়াছিল।

সৈনিক এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য করিল না। যাহার যখন পড়তা মন্দ হয়, তখন সকলেই তাহাকে অবজ্ঞা করে। জগৎসিংহ বন্দী, সুতরাং তাঁহার আজ্ঞা পালন না করিলে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই, এ কথা সৈনিক বুঝিত। সুতরাং তাঁহার খবর বলিবার জন্য দুর্গে যাইয়া সময় নষ্ট করিবার বিশেষ প্রয়োজন সে অনুভব করিল না। আর এরূপ অবস্থায় যুবরাজের সংবাদ গড় মন্দারণে দেওয়া উচিত কি না, তাহাও সে ঠিক বুঝিতে পারিল না। হয় তো এই সংবাদ বহন করিয়া আনার জন্য মহা-রাজের বিচারে সে অপরাধী ও দণ্ডার্হ হইতে পারে। সাত পাঁচ ভাবিয়া, সে বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া সংবাদ দিতে যাইবার আবশ্য-কতা অনুভব করিল না। গজপতি বিদ্যা-দিগ্‌গজকে সংবাদ-বাহক করিয়া ও দুর্গস্থ লোকদিগকে জানাইতে বলিয়া, সে ধর্ম্মের দায়ে খালাস হইল।

গড়ের সীমায় পথ চারিদিকে বিস্তৃত হই-য়াছে। এক পথ গড়ের মধ্যে গিয়াছে, আর একটী শৈলেশ্বর মন্দিরের দিকে গিয়াছে, আর একটী বর্দ্ধমানের দিকে এবং চতুর্থটী পুরীর অভিমুখে গিয়াছে। সৈনিক পুরুষ, গড়ের ভিতরে যে পথ গিয়াছে, সে দিকে অগ্রসর না হইয়া, যে পথ পুরীর অভিমুখে গিয়াছে, তাহাই অবলম্বন করিল। তাহার অশ্ব কষাঘাতে উত্তেজিত হইয়া বেগে ধাবিত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রেমের মদিরা।

গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে দৌড়িতে দুর্গে আসিয়া উপনীত হইল এবং আর কোন দিকে না গিয়া, আসমানির সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে, অন্তঃপুরদ্বারে আসিয়া হাঁপ ছাড়িল। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার সাহস ও অধিকার থাকিলে, সে হয় তো তাহাও করিত। সেই অদ্ভুত পরিচ্ছদে ও নিতান্ত ব্যস্তভাবে, সহসা তাহাকে এই স্থানে সমাগত দেখিয়া, দ্বার-রক্ষক নিতান্ত বিরক্ত হইল এবং তাহাকে সে স্থান হইতে দূর হইয়া যাইতে বলিল।

দিগ্‌গজ বলিলেন,—"ভাই রাগ করিতেছ কেন? আমার নিকট অতি নিগূঢ় সংবাদ আছে। সেই সংবাদ এখনই জানান আবশ্যক।"

দ্বার-পাল বলিল,—"জরুরি খবর থাকে, তুমি আমাকে বল না কেন?"

"তোমাকে সে কথা বলিবার নহে। একই লোকের কাণে সে কথা বলিব।

তোমার গোঁফ আছে, দাড়ি আছে, তুমি কাছাদিয়া কাপড় পর, তোমার পে াপা নাই। তুমি কি আমার অধ্যাপক যে তোমাকে সংবাদ বলিব ?”

“তবে কি তোমাকে অন্দরে লইয়া যাইলে তুমি কর্ত্রী ঠাকুরাণীর কাছে বসিয়া তোমার খবর বলিবে ? তুমি এখান হইতে সরিয়া পড়।”

গজ। আমাকে চিনিতে পারিতেছ না ? আমি যে এখানকার লোক, তাহা তুমি ভুলিয়া গিয়াছ ?

দ্বার। তুমি কখনই এখানকার লোক নহ। এখানকার কোন্ লোককে আমি চিনি না ? আর এখানকার কোন লোক হইলে, সে কখনই অন্দরের দরজায় আসিয়া গোল করিতে সাহস করিত না। তুমি নিশ্চয়ই কষ্কিন্ধ্যার লোক।

গজ। তুমি নিশ্চয়ই আমাকে জান না; গড় মান্দারণে আমাকে জানে না এমন লোক আছে, এ বড় আশ্চর্য্য কথা। তুমি অভিরাম স্বামীকে জান না ?

দ্বার। তাঁহাকে জানি না ? তুমি কি পাগল ? তাঁহার সহিত তোমার কি সম্বন্ধ ?

গজ। তিনি আমার অধ্যাপক। আমি তাঁহার প্রধান ছাত্র।

দ্বার-পাল চিন্তা করিয়া বলিল,—“তা তোমার এরূপ বেশ কেন ?”

গজ। সে অনেক কথা ভাই। আর একদিন তোমাকে বলিব। এখন এই পুরের মধ্যে আমার আসমানি আছেন। আমার নিকট যে জরুরি খবর আছে, তাহা আমি তাহাকেই বলিব।

দ্বার। আসমানি আছে বটে, কিন্তু সে তোমার কি রকম ?

গজ। সে অনেক কথা, এখন বলিবার সময় নাই। হয় তুমি তাঁহাকে ডাকিয়া দেও, না হয় আমাকে তাঁহার নিকট যাইতে দেও; আর না হয় আমাকে এই স্থান হইতে প্রাণপণ চীৎকার করিয়া তাঁহাকে ডাকিতে দেও।

দ্বার। দাঁড়াও, আমি কোন লোকের দ্বারা আসমানীর নিকট খবর পাঠাইবার চেষ্টা করিতেছি।

দিগ্‌গজ বলিল,—“আমি দাঁড়াইতে পারিব না। যাহা হয় শীঘ্র কর। আমার সংবাদ বড়ই জরুরি; বিলম্বে বড়ই বিপদ।”

দ্বার-পাল একটু চিন্তা করিল। বুঝিল, এটা গড়মান্দারণের লোক বটে। ইহাকে হঠাৎ তাড়াইয়া দেওয়া উচিত নহে। বলিল,—“একটু অপেক্ষা কর, আমি চেষ্টা দেখিতেছি।”

যখন দ্বার পালের সহিত গজপতির এই সকল বাদ-বিতণ্ডা চলিতেছিল, তখন অন্তঃপুরের এক প্রচ্ছন্ন বাতায়ন-পার্শ্বে যবনিকার অন্তরালে এক প্রৌঢ়া বিধবা নারী দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহাকে কেহ দেখিতে না পাইলেও, তিনি দ্বার সমীপে নবাগত ব্যক্তি হাত মুখ নাড়িতে নাড়িতে যে ভঙ্গী করিতেছিল, তাহা দেখিতে পাইতেছিলেন।

সেই বিধবা নারী বিমলা। বিমলার দেহের সে উজ্জ্বলতা ও কোমলতা নাই; বর্ণের সে চম্পকতুল্য মনোহারিত্ব নাই, ওষ্ঠাধরে সে তাম্বুলরাগ নাই, লোচনে পূর্ব্বের ন্যায় কজ্জলরেখা নাই, তাহাতে মন্মথশররূপী সে কটাক্ষ নাই, কেশের সে নিবিড় কৃষ্ণতা নাই, তাহাতে বেণী বা কবরী নাই, দেহের কুত্রাপি কোন ভূষণ নাই, স্বর্ণ-সূত্র সমন্বিত বস্ত্রে তাঁহার শরীর সংবৃত

নাই, বক্ষে মুক্তা খচিত কাঁচলি নাই; বিমলার পূর্ব্ব শোভা ও সমৃদ্ধির কিছুই নাই। বয়সে না হইলেও, বাহ্যতঃ বিমলা বৃদ্ধা হইয়াছেন। তাঁহার যে অলৌকিক লাবণ্য ও শোভাময় যৌবনসম্পদ্ কালবিজয়ী বলিয়া লোকের মনে হইত, তাহা এক্ষণে শ্রীভ্রষ্ট, বিশুষ্ক ও বিমলিন হইয়া গিয়াছে। তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্ষীণ, দেহ কাতর ও অবসন্ন, গতি কম্পিত ও বিচলিত, ভাব ভঙ্গী সংযত ও সাবধান। বিলাসময়ী বিমলা এখন শুভ্র-বেশ-ধারিণী; হাস্য ও কৌতুকময়ী বিমলার ওষ্ঠাধর এখন রবি-কর-প্রতপ্ত কুসুমকলিকার ন্যায় ম্লান। হাস্য ও আনন্দ সে প্রিয়নিবাস হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিয়াছে; রহস্য রসিকতা ও বিদ্রূপ চিরদিনের জন্য তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছে। হায় শোক! এ সংসারে তুমি কি অচিন্তিত-পূর্ব্ব পরিবর্ত্তনই সতত না ঘটাইতেছ!

বিমলা প্রথমে দ্বার-সমীপে সমাগত সেই ব্যক্তিকে তাঁহার সুপরিচিত রসিকরাজ বলিয়া চিনিতে পারেন নাই। অল্পক্ষণ পরেই তিনি বুঝিতে পারিলেন, যাঁহার সহিত তিনি গৃহত্যাগ করিয়া ভিন্ন দেশে স্বামী স্ত্রীরূপে বাস করিবেন মনে করিয়াছিলেন, যে রসিক-শ্রেষ্ঠ তাঁহাকে ঘৃতভাণ্ড নাম দিয়া রসজ্ঞতার চমৎকার পরিচয় প্রদান করিয়াছিল, এবং যে ভুবনমোহন পুরুষের সহিত প্রণয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হেতু, আসমানির সহিত তাঁহার সময়ে সময়ে ঈর্ষা-কলহ ঘটিত, সম্মুখস্থ অসঙ্গত পরিচ্ছদধারী পুরুষ নিশ্চয়ই সেই নটবর গজপতি বিদ্যাদিগ্গজ। বিমলা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। মনে হইল হায়! সে নির্দ্দোষ আনন্দের দিন আর ফিরিবে না!

এই সময়ে আর এক শ্যামবর্ণা, ঈষৎ স্থূলকলেবরা, প্রৌঢ় বয়স্কা কামিনী বিমলার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই নারী আসমানি।

আসমানি বলিল,—"আর মথুরার পথপানে চাহিয়া কেন মরিতেছ সখি? সে শঠ নটবর গজপতি আর ফিরিবে না।"

বিমলা বলিলেন,—"এ প্রণয়ের বাঁধন ছিঁড়িয়া আটকাইয়া রাখা কি কুব্জার কাজ? আমার শ্যামসুন্দর মদনমোহন আবার আসিয়াছেন।"

আসমানি বলিল,—"সত্য না কি? আহা! এমন দিন কি আর হবে?"

বিমলা বলিলেন,—"দেখ আসিয়া।"

আসমানিকে টানিয়া বিমলা আপনার স্থানে আনিলেন এবং স্বয়ং একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর বলিলেন,—"দেখ দেখি; ঐ সেই মনচোরা নাগর কি না?"

আসমানি একটু দেখিয়াই হাসিতে হাসিতে বলিল,—"ও মা সেই বিট্‌লে বামুনই বটে। এতদিন পরে ও কোথা হইতে আসিল? ও মা ও কি সাজ?"

বিমলা হাসিতে হাসিতে আসমানির চিবুক ধরিয়া কহিলেন,—"বিরহ-বিহ্বলে রাধে, সকল কথাই কি ভুলিয়াছ? গোপিকার প্রাণধন যে এখন মথুরার রাজা। ও সে রাজবেশ।"

আসমানি বলিল,—"সে কথা যাউক; ও হতভাগা এতদিন পরে কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল?"

বিমলা বলিলেন,—"সে কথা জানা আবশ্যক। তুমি কোন উপায়ে জানিয়া আইস, গজপতি কেন আসিয়াছে, কেনই বা দ্বারবানের সহিত গোল করিতেছে।"

আসমানি প্রস্থান করিল এবং নিম্নতলে অবতরণ করিয়া লচ্‌মনি নাম্নী দাসীকে ডাকিয়া

লইল। তাহার পর তাহাকে সঙ্গে লইয়া দ্বারের পার্শ্বস্থ একটা শূন্য কক্ষে প্রবেশ করিল। কক্ষটা অন্ধকার, সেখানে বসিবারও কোন স্থান নাই। আসমানি সেই খানে দাঁড়াইয়া লচ্‌মনিকে বলিল,—"দরজায় যে একটা লম্বা নেড়া মাথা লোক দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছে, তুমি জানিয়া আইস, সে কি চাহে।"

লচ্‌মনি বলিল,—"তুমি নিজে যাও না কেন?"

আসমানি বলিল,—"ও যে আমার নাগর; আমি যে এখন মানে আছি; হঠাৎ যাইব কেন?"

লচ্‌মনি অনেক দিন দুর্গে আছে। সে বিমলার অনেক কথাবার্ত্তা শুনিয়া আসিতেছে; রসিকতা ও রহস্য-শাস্ত্রে সেও নিতান্ত অপ ণ্ডিতা নহে। ভাবিল, মন্দ রঙ্গ নহে। বলিল,—"মরণ আর কি? যদি তোমার নাগর আমি কাড়িয়া লই?"

আসমানি বলিল,—"সাধ্য কি? তুই তো তুই, স্বয়ং গিন্নী ঠাকুরাণী আসিয়াও আমার কিছু করিতে পারেন নাই। দয়া করিয়া আমি তাঁহাকে একদিন চন্দ্রাবলী হইতে দিয়াছিলাম। মানময়ী রাধিকা আমিই আছি, আমিই থাকিব।"

লচ্‌মনির বয়স বেশী নয়; বোধ হয় আসমানির অপেক্ষা দুই এক বৎসর কম হইতে পারে। গায়ের বর্ণটাও আসমানির অপেক্ষা ফরসা। সুতরাং সে একবার আপনার দেহের দিকে চাহিয়া, সহজেই আসমানির সর্ব্বনাশ করিতে পারিবে, এরূপ ভরসা করিল। বলিল,—"এত গরব ভাল নয়; শেষে কাঁদিয়া মাটী ভাসাইতে হইবে। আমি যাইতেছি।"

লচ্‌মনি যখন দ্বার সন্নিধানে আসিল, তখন গজপতি কাতরভাবে দ্বারপালকে বলিতেছেন,—"ভাই, কেন তুমি আমাকে কষ্ট দিতেছ? যদি আমাকে আসমানির সহিত দেখা করিতে না দেও, তাহা হইলে আমি এই স্থানে গলায় দড়ি দিব। তোমার তাহাতে গোহত্যা, ব্রহ্ম-হত্যা, স্ত্রীহত্যা, ভ্রূণহত্যা সকল পাপই হইবে।"

দ্বারবান্ জিজ্ঞাসিল,—"এত পাপ হইবে কেন?"

দিগ্‌গজ বলিল,—"দেখ, বাল্যকাল হই-তেই আমার অধ্যাপকেরা আমাকে গরু বলিয়া আসিতেছেন; সুতরাং গোহত্যা বুঝিলে? আমি ব্রাহ্মণকুলের প্রদীপ; সুতরাং ব্রহ্মহত্যা তো সহজেই বুঝিতেছ? আর আমার বড় ভয়; এই জন্য আমার এক সহাধ্যায়ী ছাত্র বলে, ও মেয়ে মানুষ, উহার কোন সাহস নাই। আর আমি সহজেই কাঁদিয়া ফেলি, এ জন্যও লোকে আমাকে স্ত্রীলোক বলে; সুতরাং স্ত্রীহত্যা বুঝিলে? একবার মাছ কিনিতে বাজারে গিয়াছিলাম, মেছুনী পাটার উপর মাছের ভাগ সাজাইয়া বসিয়া আছে; পাটায় দশ বারো ভাগ মাছ আছে। আমি জিজ্ঞাসিলাম কয় পয়সা? সে বলিল, পয়সা পয়সা। আমি একটী পয়সা ফেলিয়া দিয়া সকল ভাগই গমছায় তুলিতেছি দেখিয়া, সে বলিল কর কি ঠাকুর? আমি বলিলাম, কেন মাছ লইতেছি! সে বলিল, এক পয়সা দিয়াছ, একভাগ লও, বেশী তুলিতেছ কেন? আমি বলিলাম, কেন এক পয়সায় সব ভাগগুলা নয়? মেছুনী আমার গায়ে একটু জল ছিটাইয়া দিয়া, মাছ কড়িয়া লইল, আর বলিল, আহা কিছু জানেন না, মায়ের পেটে আছেন। তাহা হইলে ভ্রূণহত্যাও বুঝিলে?"

এইরূপ সময়ে লচ্‌মনি সেই স্থানে দর্শন

দিয়া বলিল,—"কে হে রসিক পুরুষ, চিনিতে পার ?"

দিগ্‌গজ মাথা চুলকাইতে লাগিলেন, এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন। এ সুন্দরীর সহিত তাঁহার কোন পরিচয় ছিল, এরূপ কথা মনে পড়িল না। কিন্তু একটা স্ত্রীলোক তাঁহাকে রসিক পুরুষ বলিয়া সম্বোধন করিল, অথচ তিনি তাহাকে চিনিতেও পারিলেন না, ইহা নিতান্ত অরসিকের ব্যবহার। বলিলেন,—"তোমায় চিনি চিনি করি, চিনিতে না পারি, সুন্দরী, তুমি কে বট হে ?"

তখন লচ্‌মনি মুখখানা নিতান্ত ভার করিয়া বলিল,—"আচ্ছা, এ কথা মনে থাকিল। জানি আমি, অবিশ্বাসী পুরুষ জাতিকে না বুঝিয়া মন-প্রাণ দিলেই শেষে কাঁদিতে হয়। আমার মন-প্রাণ চুরি করিয়া শেষে তোমার এই কথা ?

দিগ্‌গজ অনেক ভাবিয়াও মন প্রাণ চুরির কথা কোন মতেই মনে করিতে পারিলেন না। বলিলেন,—"আমি জীবনে কখন কাহারও একটা ভাঙ্গা পাথরের বাটীও চুরি করি নাই। আমি চোর নহি, এ কথা গড়-মান্দারণের সকল লোকই জানে। তুমি অন্যায় করিয়া আমাকে চোর বলিলে হইবে কেন ? তুমি সন্ধান করিয়া দেখ, তোমার মন-প্রাণ আর কোথায় পড়িয়া আছে—আমি কখনই লই নাই।"

লচ্‌মনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, —"শেষে ঐ কথা সকলেই বলে। তা বেশ ভাই, আমি এখন যাই।"

দিগ্‌গজ বলিলেন,—যাইও না, সুন্দরী, যাইও না। আমি তোমাকে চিনি বই কি ? তুমি চিনাইয়া দিলেই আমি চিনিতে পারিব। যদি আমাকে চোর বলিলে তোমার সন্তোষ হয়, তবে আমি চোরই বটি। এখন তুমি কৃপা করিয়া আমার একটু উপকার কর।"

লচ্। বল কি করিব ?

দিগ্‌গজ যুক্তকরে বলিলেন,—"আসমানিকে একটা জরুরি কথা বলিবার আবশ্যক আছে। যদি তুমি ভাই দয়া করিয়া তাহার উপায় করিয়া দেও।"

লচ্‌মনি বলিল,—"বড় দায় পড়িয়াছে। তুমি আসমানিকেই ভাল বাস, আমাদের ভুলিয়া গিয়াছ, চিনিতেও পারিলে না ; আমি এখন সেই আসমানিকে ডাকিয়া তোমার কাছে আনিয়া দিব ! পোড়া কপাল !"

লচ্‌মনি চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া গজপতি কাতর ভাবে তাহার বস্ত্রাগ্র ধারণ করিলেন এবং বলিলেন,—"দোহাই তোমার, তুমি রাগ করিয়া আমার গলায় পা দিয়া মারিও না। একবার দয়া করিয়া আসমানিকে ডাকিয়া দেও। আমি তোমারই দাস। চিরদিন তোমার কেনা গোলাম হইয়া থাকিব।"

লচ্‌মনি বলিল,—"এ কথা তোমার মনে থাকিবে কি ? চিরদিন আমার দাস হইয়া থাকিবে, আমি যাহা বলিব তাহাই করিবে, কখন আমার কথার অন্যথা করিতে পাইবে না, প্রতিজ্ঞা কর, তবে আমি আসমানিকে ডাকিয়া দিতেছি।"

তখন দিগ্‌গজ বলিলেন,—"আমি আমার এই শিখায় হাত দিয়া, রুদ্রাক্ষ মালায় হাত দিয়া, অধিক কি, তোমার ঐ রাঙ্গা পায়ে হাত দিয়া, দিব্য করিতেছি, আমি তোমার আজ্ঞাধীন দাস, এ কথার কখনও অন্যথা হইবে না।"

তখন লচ্‌মনি হাসিয়া বলিল,—"তবে আইস।"

লচ্‌মনির সহিত দিগ্‌গজ ঠাকুর মধ্যে

প্রবেশ করিলেন। দ্বারবান্ এবার কোন আপত্তি করিল না। সেই অন্ধকার ঘরের নিকটস্থ হইয়া, লচমনি দেখাইয়া দিল,—"এই ঘরে আসমানি আছে।"

গজপতি ঘরের মধ্যে মস্তক প্রবিষ্ট করিয়া বলিলেন,—"এঃ! এ যে বড় অন্ধকার।"

লচমনি বলিল,—"ভিতরে যাও, তুমি গেলেই ঘর আলো হইবে।"

দিগ্‌গজ আর একটু প্রবেশ করিয়া আসমানিকে দেখিতে পাইল। আনন্দে সে লাফাইয়া উঠিল। হাসিতে তাহার মুখ-গহ্বর এক কর্ণ হইতে অপর কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িল। আসমানি বলিল,—"ভূত যে! এত দিন কোথায় ছিলে ভূত?"

গজপতির কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য আসমানিকে দেখিলেই উথলিয়া উঠে! এত দিন পরে প্রণয়িণীকে দেখিতে পাইয়া একটা শ্লোকের দ্বারা সম্ভাষণ না করা উচিত নহে বিবেচনায় বলিলেন,—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।"

ব্রাহ্মণ আসমানিকে একটা প্রণাম করিলেন। আসমানি বলিল,—"পোড়া কপাল! আমাকে বুঝি প্রণাম করিতে হয়?"

রসিকরাজ বলিলেন,—"হয় বই কি? যখন পায়ে মাথা ঘসিতে হয়, তখন প্রণাম কি বড় কথা।"

আসমানি বলিল,—"তোমাকে এত রসিক করিয়া ছাড়িয়াছে কে? এতদিন ছিলে কোথা?"

দিগ্‌গজ বলিলেন,—"সে কথা পরে হইবে। এখন তুমি আমার সঙ্গে আইস; এখানে অনেক বিপদ।"

আসমানি বলিল,—"কিসের বিপদ? তুমি আমাকে সঙ্গে লইয়া কোথায় যাইবে?"

দিগ্‌গজ বলিলেন,—আমি যেখানে খুসি সেখানে তোমাকে লইয়া যাইব। তুমি আমার প্রণয়িনী কি না বল।"

আসমানি বলিল,—"সে কথা কি বার বার মুখে বলিতে হয়? আমি যে তোমার কি তাহা সকলেই জানে।"

গজপতি বলিলেন,—"ঠিক বলিয়াছ। সে কথা সকলেই জানে। এক দেশ-বিখ্যাত পণ্ডিত জ্যোতির্বীর সহিত আমার দেখা হইয়াছিল। তিনিও এ কথা জানেন। তবে তুমি কেন না আমার সঙ্গে যাইবে?"

আসমানি বলিল,—"কে বলিতেছে সঙ্গে যাইব না? আমি তোমাকে যেমন ভাল বাসি, তুমি আমাকে কখনই তেমন ভাল বাস না।"

গজপতি বলিলেন,—"কে এ কথা বলিল? যে এ কথা বলিয়াছে সে মিথ্যাবাদী। আমাদের মন ভাঙ্গাভাঙ্গি করাইবার জন্য সে নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা রটাইয়াছে। আমি যে তোমাকে ভালবাসি তাহার প্রমাণ শরীরে লেখা আছে। জ্যোতিষী মহাশয় আমার কপাল দেখিয়া বলিয়াছেন, তাহাতে তোমার নামের প্রথম অক্ষর 'আ' আর শেষ অক্ষর 'নি' লেখা আছে। এমন ভালবাসা কেহ কখন কোথায় দেখিয়াছে কি?"

আসমানি বলিল,—"এ সকল মিথ্যা কথা। তুমি যদি আমাকে একটুও ভাল বাসিতে, তাহা হইলে এতদিন আমাকে ছাড়িয়া কখনই বিদেশে থাকিতে না।"

গজপতি বলিলেন,—"আসমানি, প্রাণেশ্বরী, কপালে আমার তোমার নাম লেখা রহিয়াছে। এ কথা অবিশ্বাস কর যদি, তবে তুমি দেখ, নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে।"

দিগ্‌গজ অনেক খানি নত হইয়া, আসমানির চক্ষু সমক্ষে আপনার কপাল স্থাপন

করিলেন। জিজ্ঞাসিলেন,—"দেখিতে পাই-তেছ?"

আসমানি বলিল,—"হাঁ, দেখিতেছি বটে; কিন্তু যে অক্ষর তুমি বলিতেছ তাহা দেখিতেছি না। আমি দেখিতেছি তোমার কপালে স্পষ্টরূপে লেখা রহিয়াছে 'গাধা'।"

গজপতি বলিলেন,—"তাহাও থাকিতে পারে; কেন না আমি তোমার গাধা বটে। তুমি আমাকে চড়াও, ফেরাও, মোট বহাও, আমাকে লইয়া যাহা খুসি তাহাই কর। এক্ষণে আর বিলম্বে কাজ নাই; শীঘ্র আমার সঙ্গে চল। এখানে ভয়ানক বিপদ।"

"কি বিপদ?"

"বীরেন্দ্র সিংহের ব্যাপার আবার উপস্থিত।"

"সে কি?"

"যুবরাজ বন্দী হইয়াছেন।"

আসমানি চমকিতা হইল। সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল,—"কে বলিল?"

দিগ্‌গজ বলিলেন,—"যাহারা বন্দী করিয়াছে তাহারাই বলিয়াছে।"

"কাহারা বন্দী করিয়াছে?"

"মহারাজ মানসিংহের লোক।"

"কোথা বন্দী করিয়াছে?"

"পথে।"

আসমানি বড়ই চিন্তাকুল হইল। এ কথা যে অসম্ভব নহে তাহা সে অনুমান করিল। তথাপি আবার জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি সত্য বলিতেছ তো?"

দিগ্‌গজ বুকে হাত দিয়া বলিলেন,—"তোমার নিকট মিথ্যা বলিলে আমার নরকেও স্থান হইবে না। আমি এ কথা ভাল রকম জানিয়াছি। এক্ষণে তুমি ভাবিতেছ কি? যখন যুবরাজ বন্দী হইয়াছেন, তখন সেবারকার মত এবারও দুর্গের সকলেই বন্দী হইবে। আমি তোমার জন্যই ভাবিতেছি। আইস, এই বেলা আমরা পলাইয়া যাই।"

আসমানির মন তখন বড়ই অস্থির হইয়াছে। বিমলাকে এ সংবাদ জানাইবার জন্য সে নিতান্তই ব্যাকুল হইয়াছে। গজপতিকে তখন বিদায় করা তাহার আবশ্যক। বলিল,—"বেশ কথা। পলাইয়া যাওয়াই সৎপরামর্শ। তুমি এখন যাও, জিনিষপত্র গুছাইয়া লইয়া, ঠিক সন্ধ্যার পর আমরা পলাইয়া যাইব।"

দিগ্‌গজ বলিলেন,—"প্রাণেশ্বরি! অত বিলম্ব করিতে সাহস হয় না। যদি ইহারই মধ্যে বিপদ ঘটিয়া যায়?"

আসমানি বলিল,—"তাহার উপায় আমি করিব, তুমি এখন যাও। তোমার আশ্রমে থাকিও। আমি শুনিয়াছি বেলা দেড় প্রহরের সময় মহারাজের লোকেরা এই দুর্গ ঘেরাও করিবে।"

দিগ্‌গজ কাঁপিতে কাঁপিতে দ্বারের নিকট আসিয়া বলিলেন,—"বল কি? তবে—তবে তুমি যাহা হয় করিও। আমি এখন যাই।"

আসমানি বলিল,—"তুমি পালাও, আমি ঠিক সময়ে তোমার সহিত জুটিব।"

গজপতি এক লাফে ঘরের বাহিরে আসিলেন। সেখানে লচ্‌মনি দাঁড়াইয়া ছিল। সে বলিল,—"তবে বঁধু, আমাকে ফেলিয়া কোথা যাও?"

সে গজপতির চাপকানের প্রান্ত চাপিয়া ধরিল।

দিগ্‌গজ বলিলেন,—"ফেলিয়া যাইতেছি না, এখনই আসিব। তুমি এখন ছাড়—ছাড়—"

চাপকানের অনেক খানি শচ্‌ মনির হাতে রহিয়া গেল। গজপতি পলায়ন করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অবিবেচনা।

গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ-বাহিত দুঃসংবাদ অচিরে দুর্গের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। জগৎ-সিংহের এই বিপদ-বার্ত্তা শ্রবণে আত্মীয়গণের উৎকণ্ঠার সীমা থাকিল না। দিগ্‌গজকে নিকটে ডাকাইয়া অভিরাম স্বামী নানাপ্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু সে বেশী কথা কিছুই বলিতে পারিল না। অবশেষে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য, অভিরাম স্বামীর আদেশে, একজন বিশ্বস্ত ও সাহসী সৈন্য অশ্বারোহণে পাটনার পথে যাত্রা করিল। ইত্যবসরে আত্মীয়গণ কর্ত্তব্য-অবধারণে ব্যাপৃত হইলেন।

সন্ধ্যার পর অভিরাম স্বামীর কুটীর মধ্যে দুইটী স্ত্রীলোক উপস্থিত হইলেন। স্বামী তখন মৃগ-চর্ম্মে উপবিষ্ট। নারীদ্বয় বিমলা ও আসমানি। তাঁহারা উভয়েই ভূ-পৃষ্ঠে উপবেশন করিলেন। সকলেরই মুখ বিমর্ষ ও চিন্তার কালিমায় সমাচ্ছন্ন। সকলেই নীরব।

প্রথমে বিমলা কথা কহিলেন। জিজ্ঞাসিলেন,—"একণে উপায়?"

অভিরাম স্বামী অনেকক্ষণ অধোমুখে চিন্তা করিলেন। তাহার পর বলিয়া উঠিলেন,—"তোমার মনে পড়ে বিমলা, শৈলেশ্বরমন্দিরে যুবরাজের সহিত তোমাদের প্রথম সাক্ষাতের পর, যখন তুমি আমার সহিত পরামর্শ করিতে আসিয়াছিলে, সে দিনকার সকল কথা তোমার এখন মনে পড়ে কি? অধিক দিনের কথা নয়; এই কুটীরে, এই স্থানে দাঁড়াইয়া, তুমি আমার সহিত পরামর্শ করিয়াছিলে।"

বিমলা বলিলেন,—"মনে পড়ে। সে দিনকার সকল কথাই মনে পড়িতেছে।"

"আমি তখন বলিয়াছিলাম, এ বিবাহে মানসিংহ সম্মত হইবেন কেন? তুমি তাহার উত্তরে বলিয়াছিলে, 'যুবরাজ স্বাধীন।' এ কথা তোমার মনে আছে?"

বিমলা অধোমুখে বলিলেন,—"আছে।"

অভিরাম স্বামী কহিলেন,—"সেই স্বাধীনতার এই ফল। যুবরাজ কখনই স্বাধীন নহেন। তাঁহার পিতা ধনে, মানে, পদে, প্রতিষ্ঠায়, বলে ও ক্ষমতায় অদ্বিতীয় ব্যক্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পিতার বিরুদ্ধে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে জগৎসিংহের কোনই সামর্থ্য নাই। তাহার পরে, মানসিংহের সহিত যুবরাজের প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ। সুতরাং তিনি স্বাধীন নহেন। আরও দেখ, তিনি সম্রাটের কার্য্যে নিযুক্ত। সে কার্য্যে অবস্থান কালে তাঁহার কোন বিষয়েই স্বাধীনতা থাকিতে পারে না।"

বিমলা বলিলেন,—"সে কথা এখন বুঝিতেছি। কিন্তু তখন এ কথা বুঝিলেই বা কি হইত? এ প্রেমের স্রোত নিরুদ্ধ করিতে আমাদের সাধ্য ছিল না।"

অভিরাম স্বামী একটু ঘৃণার হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"বিমলা, তুমি বালিকাও নহ, এরূপ ব্যাপারে অনভিজ্ঞাও নহ। সময় থাকিতে সাবধান হওয়া তোমার উচিত ছিল। আমি বুঝাইয়া দিয়াছিলাম যে, অঙ্কুরেই এ বাসনা ছিন্ন করা আবশ্যক। তুমি আমার সে কথা গ্রাহ্য কর নাই; তাহারই পরিণাম একণে

ভয়ানক হইয়া উঠিতেছে। জানি না অতঃপর কতদূর কি হইবে।”

বিমলা বলিলেন,—“আপনি সর্ব্বদা তিলোত্তমাকে দেখিতে পান না। আমি নিয়ত তাহার নিকট অবস্থান করি। আমি তখন বেশ বুঝিয়াছিলাম, এরূপ সম্বন্ধ ও মিলন না ঘটিলে, তিলোত্তমা চির-দুঃখিনী হইবে।”

অভিরাম স্বামী বলিলেন,—“আমি ইহা তখনও বুঝিতে পারি নাই, এখনও বুঝিতে পারিতেছি না এবং পরেও যে বুঝিতে পারিব, এরূপ সম্ভাবনা দেখিতেছি না। প্রথম দর্শনে—ঘটনাক্রমে পথিমধ্যে একবার মাত্র সহসা দর্শনে যে প্রেম জন্মে, তাহা কখনই প্রগাঢ় হইতে পারে না। তাহা কেবল লালসা-জনিত ক্ষণিক মোহ মাত্র। তাহার উত্তেজনা বড়ই প্রবল হয় এবং তাহা মনুষ্যকে দিগ্বিদিক জ্ঞান-শূন্য করিয়া ফেলে বটে ; কিন্তু উপযুক্ত কর্ণধার সেই সময়ে নৌকা-পরিচালনের ভার গ্রহণ করিলে, সকল বিপদ ও আশঙ্কা কাটিয়া যায়। অসঙ্গত ও অসম্ভব প্রবৃত্তির স্রোত সঙ্গে সঙ্গে নিরুদ্ধ না করিলেই তাহা বর্দ্ধিতায়তন হইয়া উঠে এবং ক্রমে কূল অতিক্রম করিয়া সকলই ভাসাইয়া লইয়া যায়। তুমি এ সকল ব্যাপারে অভিজ্ঞা, এজন্য আমি তোমার উপর সুব্যবস্থার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম।”

বিমলা অধোমুখে উত্তর দিলেন,—“আমি সাধ্যমত সুব্যবস্থাই করিয়াছি। যাহাতে সকলই সুখময় ও আনন্দময় হয়, তাহারই উপায় করিয়াছি।”

অভিরাম স্বামী বলিলেন,—“আমাদের এখন ঘোরতর বিষাদের ও উৎকণ্ঠার সময়। এ সময় অপ্রিয় অতীত প্রসঙ্গের আলোচনা না করাই উচিত। তথাপি যখন কথাটা পড়িয়াছে, তখন এ সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিলে বিশেষ হানি হইবে না। তুমি এই ব্যাপারের মূল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত যে যে সুব্যবস্থা করিয়াছ, তাহার কোন অংশই আমার অবিদিত নাই। আমি তাহার সর্ব্বত্র তোমার দারুণ অবিবেচনা, অসাবধানতা ও নির্ব্বুদ্ধিতারই পরিচয় দেখিতে পাইতেছি।”

বিমলা অধোমুখ ও নীরব। স্বামী বলিতে লাগিলেন,—“সত্য চিরদিনই অপ্রিয়। এই দুঃখের সময়ে তোমাকে অপ্রিয় সত্য কথা বলিয়া বেদনা দিতে আমি ইচ্ছা করি না। যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা যদি ফিরিবার উপায় থাকিত, তাহা হইলে সে আলোচনায় ফল ছিল ; কিন্তু এক্ষণে সে অতীত ব্যাপারের বিচার কেবল কষ্টেরই কারণ।”

বিমলা বলিলেন,—“আমি প্রাণপণে তিলোত্তমার হিতসাধন করিয়া আসিতেছি। তিলোত্তমা আমার দ্বিতীয় জীবন। আমার জীবনের সকল সুখই এখন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এ জীবন আর এক দিনও রাখিবার প্রয়োজন নাই। তথাপি যে এখনও বাঁচিয়া আছি, সে কেবল তিলোত্তমার মুখ চাহিয়া। তিলোত্তমাকে সুখী দেখিয়া সংসার ত্যাগ করিব, ইহাই আমার সংকল্প। আমার অদৃষ্টের দোষে তিলোত্তমা সকল প্রার্থনীয় সুখের অধিকারিণী হইয়াও, আবার অকূল-পাথারে ভাসিয়াছে, আবার শোকে ও চিন্তায় মৃত-কল্প হইয়াছে। আমার এ দুঃখ কে বুঝিবে? কাহাকেই বা আমার প্রাণের অবস্থা জানাইব? আমি যাহার চিন্তায় এত ব্যাকুল, আমার অবিবেচনায় ও বুদ্ধির দোষে তাহার অশুভ কেমন করিয়া ঘটিল, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। অপ্রিয় হইলেও, এ কথা শুনিবার জন্য আমি ব্যাকুল হইয়াছি। আপনি দেখাইয়া

দেন, আমি কোথায় কি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি।"

অভিরামস্বামী বলিলেন,—"পূর্ব্বাপর ঘটনা সমূহ তোমার অবিদিত ছিল না; তোমার জানা ছিল, মানসিংহ-পুত্রের সহিত বীরেন্দ্র-তনয়ার বিবাহ-ব্যাপার কখনই ঘটিতে পারে না। ইহা জানিয়া, তিলোত্তমাকে স্পষ্টভাবে ও সরল কথায়, এ আশা নির্ম্মূল করিবার উপদেশ দেওয়া তোমার উচিত ছিল। সে উপদেশ কোন সুফল প্রসব না করিলেও,—তুমি তিলোত্তমার বিমাতা, এক মাত্র রক্ষয়িত্রী,—তোমার কর্ত্তব্য পালন করাই তোমার পক্ষে বিধেয় ছিল। তুমি তোমার সে কর্ত্তব্য একবারও পালন কর নাই। পনর দিন পরে, পুনরায় যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার সময় একবার প্রসঙ্গ-ক্রমে তিলোত্তমাকে এ কথা বলিয়াছিলে বটে; কিন্তু তাহাও দৃঢ়তার সহিত বল নাই। প্রথম দিন হইতেই এ কথা পুনঃ পুনঃ তিলোত্তমাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া উচিত ছিল। তুমি তাহা কর নাই। এ কথা সত্য নয় কি?"

বিমলা নিরুত্তর। অভিরাম স্বামী বলিতে লাগিলেন,—"যুবরাজ শৈলেশ্বর-মন্দিরে তোমা দেরপরিচয় না পাইয়াই চলিয়া যাইতেন। কিন্তু পক্ষান্ত পরে পুনরায় সেই স্থানে সাক্ষাৎ করিয়া পরিচয় প্রদানের ব্যবস্থা করা তোমার উচিত হয় নাই। সেই প্রথম সাক্ষাৎই শেষ সাক্ষাৎ হইলে শ্রেয়ঃ হইত; ইচ্ছাপূর্ব্বক দ্বিতীয় সাক্ষাতের প্রতিজ্ঞা করা তোমার পক্ষে উচিত কার্য্য হয় নাই। আমি জানি, তুমি ও আসমানি আমার শিষ্য গজপতির সহিত মৌখিক রহস্যাদি করিয়া থাক; কিন্তু সে বর্ব্বর সেই সকল রহস্য নিতান্ত মৌখিক বলিয়া মনে করে না। সেই গজপতিকে সঙ্গে লইয়া নিশীথে শৈলেশ্বর-মন্দিরে গমন করা তোমার উচিত হয় নাই সে কাণ্ড-জ্ঞানহীন ব্যক্তি তোমার প্রতি অনুরক্ত। সে দিন তোমরা বিবিধ প্রকার বাক্যে ও ব্যবহারে তাহার অনুরাগ বর্দ্ধিত করিয়াছিলে; পথে সঙ্গীতাদি লালসাবর্দ্ধক ব্যাপারেরও অভাব হয় নাই। সে পশু তুল্য নির্ব্বোধ পুরুষ সহজেই তোমার প্রতি কোন না কোন অত্যাচার করিলেই করিতে পারিত। এ সকল আচরণ কুল-কামিনীর পক্ষে নিতান্ত নিন্দনীয়। কেমন এ সকল কথা সত্য নয় কি?"

বিমলা নিরতিশয় লজ্জা পাইলেন। তিনি নিরুত্তর। স্বামী বলিতে লাগিলেন,—"মন্দিরে যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎকালে যখন জানিতে পারিলে, তিনি তিলোত্তমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছেন, তখন তাঁহার কাতর প্রার্থনা শুনিয়া, তিলোত্তমার সহিত তাঁহার শেষ সাক্ষাৎ করাইতে সম্মত হওয়া তোমার উচিত হয় নাই। সেই স্থানেই এ ব্যাপারের উপসংহার করিলেই ভাল হইত। তাহা না করিয়া তুমি সেই রাজপুত্রকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছ এবং তোমার ক্ষমতা ও অধিকারের কথা বিস্মৃত হইয়া, অনেক গর্হিত ব্যবহার করিয়াছ। দুর্গস্বামীর অজ্ঞাতসারে, তুমি এই যুদ্ধ বিগ্রহের কালে, একজন যুবা মোগল সেনাপতিকে অনায়াসে দুর্গমধ্যে লইয়া গিয়াছ। তুমি দুর্গস্বামীর পরিণীতা পত্নী সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া এরূপ আচরণের অধিকার তোমার কখনই থাকিতে পারে না। স্ত্রীলোকের এ স্বাধীনতা কখনই শোভা পায় না এবং তাহা অশেষ অনর্থের হেতু-ভূত হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছে। এ বিষয়ে তোমার কোন উত্তর আছে কি?"

বিমলা পূর্ব্ববৎ নীরব। অভিরাম স্বামী বলিলেন,—"তাহার পর তুমি যাহা করিয়াছ

তাহা কোন জননী, কোন বিমাতা; কোন পরিচারিকা, কোন পরিচিতা স্ত্রীলোক, অধিক কি কোন গণিকাও করিতে সাহস করে না। তুমি অনায়াসে অবিবাহিতা কন্যার সুসজ্জিত ও সুবাসিত অন্তঃপুর কক্ষে, তাহার প্রতি অত্যাসক্ত, তরুণ-বয়স্ক রাজপুত্রকে প্রবেশ করাইয়াছ। এ অপরাধের—এ স্বাধীনতার—এ অবিবেচনার কথা মনে হইলেও হৃৎকম্প হয়। তোমারই অসাবধানতায় সেই দিন দুর্গ পাঠানের হস্তগত হইল এবং তাহারই ফলে তোমার বৈধব্য ঘটিল; সঙ্গে সঙ্গে অবশেষে অনর্থের উদ্ভব হইল। বিমলা আমি তোমাকে তিরস্কার করিতেছি না। তিরস্কার বা অনুযোগের এ সময় নহে। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, এই ব্যাপারে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তোমার কোন আচরণই সঙ্গত হয় নাই।"

তখন বিমলা কাঁদিতে কাঁদিতে পিতৃচরণে নিপতিত হইয়া বলিলেন,—"আমি বুঝিতেছি, আমি অতিশয় গর্হিত ব্যবহার করিয়াছি। এক্ষণে তাহার কোন প্রতীকার সম্ভব নহে। অধুনা আমাদের উপায় কি, তাহার ব্যবস্থা করিয়া আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন।"

অভিরাম স্বামী বিমলাকে হাত ধরিয়া উঠাইলেন এবং বলিলেন,—"উপায়ের চিন্তা আমি সমস্ত দিনই করিতেছি। আমি যে দূত প্রেরণ করিয়াছি, তাহার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত বিশেষ কোন উপায় অবধারণ করা অসম্ভব। একমাত্র নির্বোধ গজপতির মুখে সামান্য মাত্র সংবাদ শুনিয়া কোন বিষয় বুঝা যাইতেছে না। মহারাজের ক্রোধ কতদূর পর্য্যন্ত প্রবল হইয়াছে, তাহা জানিতে পারিলে, কি উপায় আমাদের অবলম্বনীয় তাহা স্থির করিতে পারিব।"

বিম। দূত কয় দিনে ফিরিতে পারে?

অভি। কল্যও আসিতে পারে। যদি পাটনা পর্য্যন্ত তাহাকে যাইতে হয়, তাহা হইলে আট দশ দিন বিলম্বও হইতে পারে।

বিম। আট দশ দিন বিলম্ব করিতে হইলে না জানি কি বিপদ ঘটিবে। তিলোত্তমা আজই মৃত্যু-কল্প হইয়াছে; আট দশ দিন এ যাতনা সহিয়া সে বাঁচিবে কি?

অভি। তুমি তিলোত্তমাকে বিশেষ সাহস ও ভরসা দিবে। আমি কল্য প্রাতে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিব।

বিম। মহারাজার সহিত যুবরাজের পিতা-পুত্র সম্বন্ধ। পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্রকে বন্দী করিয়াছেন সত্য; কিন্তু সাক্ষাৎ হইলে, পুত্রের মুখে বিনীত বাক্য শ্রবণ করিয়া তিনি তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন না কি?

অভি। কেমন করিয়া সে আশা করিব? বীরের ক্রোধ পুত্র বা আত্মীয় বোধে নিরস্ত না হইতেও পারে।

বিম। এ ক্রোধের পরিণাম কি হইতে পারে বলিয়া আপনি আশঙ্কা করেন?

অভিরাম স্বামী কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন,—"তোমরা নারী—সব কথা জানিবার বা বুঝিবার চেষ্টা না করিলেই তোমাদের ভাল হয়।"

বিম। যদি বিশেষ অনিষ্ট সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বে প্রতীকারের চেষ্টা করাই উচিত। মহারাজ মানসিংহ আপনাকে বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। আপনি এই সময়েই পিতা-পুত্রের মনান্তর দূর করিবার নিমিত্ত মধ্যস্থরূপে উপস্থিত হইলে হয় না?

অভি। আমার মধ্যস্থতায় এ ব্যাপারে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট হইবে না। তোমরা মনে কর বটে, মহারাজ মানসিংহ আমাকে বিশেষ

ভক্তি-শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন; কিন্তু আমি জানি, ভক্তি-শ্রদ্ধা দূরে থাকুক, তিনি আমাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন। আমাদিগের কাহারও উপর তাঁহার শ্রদ্ধা নাই। এ বিষয়ের জন্য স্বতন্ত্রভাবে অন্য লোকের দ্বারা চেষ্টা করিতে হইবে এবং সে চেষ্টা মানসিংহ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তির নিকট করিতে হইবে। অদ্য রাত্রি অধিক হইয়া পড়িল,তোমরা দুর্গে যাও। কল্য প্রাতে আবার আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।

বিমলা ও আসমানি গাত্রোত্থান করিলেন এবং ভক্তিভাবে অভিরাম স্বামীর চরণে প্রণাম করিয়া, সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিরহিণী।

দূত ফিরিয়া আসিয়াছে। পাটনা পর্য্যন্ত গমন করিয়া যুবরাজের দুর্দ্দশার সমস্ত বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া, দূত ফিরিয়া আসিয়াছে। দুর্গ-মধ্যস্থ তাবৎ লোক শোকে ও দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়াছে।

যে দিন দূত এই বার্ত্তা বহন করিয়া প্রত্যাগত হইয়াছে, সেই দিন তাহার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শ্রবণ করিয়া, অভিরাম স্বামী দুর্গ-সংক্রান্ত বৈষয়িক ব্যবস্থায় নিবিষ্ট-চিত্ত হইলেন। তাঁহার অনুপস্থিতির কালে বিষয়-ব্যাপার যাহাতে সুনির্ব্বাহিত হয়, তাহার সুব্যবস্থা করিয়া, সেই দিনই তিনি তীর্থযাত্রা করিলেন। লোক সমক্ষে তিনি তীর্থযাত্রার কথাই প্রচার করিলেন; সুতরাং সাধারণে তাহাই বুঝিল। কিন্তু বিমলা অন্যরূপ বুঝিলেন। তিনি জানিলেন, অভিরাম স্বামী উপস্থিত শোচনীয় কাণ্ডের কোন প্রতীকার-চেষ্টায় দুর্গ ত্যাগ করিলেন।

তিলোত্তমা—দুঃখিনী, মর্ম্মপীড়িতা, তিলোত্তমা! এ দারুণ শেল বুক পাতিয়া ধরিবার ক্ষমতা তোমার নাই কি? এ কঠোর যাতনা ধীরতার সহিত সহ্য করিবার সামর্থ্য তোমার নাই কি? এ বিপদ-বাত্যা-সংক্ষুব্ধ সমুদ্র তুমি শান্তভাবে অতিক্রম করিতে পারিবে না কি? না। তিলোত্তমা এ আঘাতে একান্ত অবসন্ন হইয়াছেন; এই তীব্র যাতনা তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে ব্যথিত ও কাতর করিয়াছে; এ দুস্তর সমুদ্র অতিক্রম করিবার শক্তি, সাহস ও অধ্যবসায় তাঁহার নাই। বিচ্ছেদ-বিধুরা দুঃখিনী অধোবদনে ভূ-শয্যায় পতিতা।

সেই প্রকোষ্ঠ। যে প্রকোষ্ঠে হৃদয়েশ্বরের সহিত অচিন্তিতপূর্ব্ব উপায়ে, হিতৈষিণী বিমলার অনুকম্পায়, তিলোত্তমার প্রথম মিলন হয়, যে প্রকোষ্ঠে সেই সরল-হৃদয়া সুরসুন্দরী চিরদিনের নিমিত্ত জগৎসিংহের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করেন; যে প্রকোষ্ঠে তাঁহার প্রাণেশ্বর অনবরত অসি-চালনার পর, শত্রুর অস্ত্রাঘাতে সংজ্ঞাশূন্য ও রুধিরাক্ত-কলেবরে ধরাশায়ী হন; যে প্রকোষ্ঠে তিলোত্তমা ও বিমলা কালোপম পাঠানগণের হস্তে বন্দিনী হন; সেই বহুবিধ সুখ ও দুঃখের স্মৃতি-উদ্দীপক সেই প্রকোষ্ঠে তিলোত্তমা শয়ানা। নিকটে সেই পর্য্যঙ্ক। যে পালঙ্কের পার্শ্বস্থ কাষ্ঠে একদিন অসাবধান ভাবে নানা বিষয় লিখিতে লিখিতে তিনি কুমার জগৎসিংহের নাম লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন, এবং আপনার এই অসাবধানতা উপ-

লজ্জিজনিত লজ্জায় অধোমুখ হইয়া বার বার খট্টার সেই কাষ্ঠাংশ প্রক্ষালিত ও পরিমার্জ্জিত করিয়াও মনে করিয়াছিলেন, তখনও তাঁহার হৃদয়-সর্ব্বস্বের নাম সুস্পষ্টরূপে লিখিত রহিয়াছে, সেই পর্য্যঙ্ক। যে পর্য্যঙ্কে প্রাণেশ্বর জগৎসিংহের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া কত সুখের কল্পনায় তিলোত্তমা প্রমত্ত হইয়াছেন, কত আনন্দসাগরে ভাসিতেছেন, তাঁহার পার্শ্বে সেই পর্য্যঙ্ক। যে পর্য্যঙ্কে দশদিন পূর্ব্বে জীবিতনাথের পার্শ্বে শয়ন করিয়া উৎকণ্ঠায় রজনী অতিবাহিত করিয়াছেন এবং উষার শীতল সমীর সংস্পর্শে ঈষৎ নিদ্রার আবেশ আসিলে, তাঁহার হৃদয়-রত্ন তাঁহার বাহু-পাশ ছিন্ন করিয়া প্রাতরটনে প্রস্থান করিয়াছেন, সেই সাধের শয্যাচ্ছাদিত সুখময় পর্য্যঙ্ক-পার্শ্বে তিলোত্তমা ভূ-শয্যায় নিপতিতা।

বাতায়ন হইতে অশ্বারূঢ় বীরপতির সহিত সেই সাক্ষাৎ, সেই বিদায়, সেই রোদন, সেই প্রণাম। দশদিন হইয়া গেল তিনি ফিরেন নাই। কেবলই কি ফিরেন নাই? ফিরিবার আর সম্ভাবনা নাই। তিনি শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দী—যাবজ্জীবন তাঁহাকে এই দশায় কারাগারে অতিবাহিত করিতে হইবে। মহারাজ মানসিংহের এই আদেশ—পিতার আজ্ঞায় পুত্রের এই কঠোর শাস্তি। কে এ ব্যবস্থার অন্যথা করিতে পারে? ভারতবর্ষে এমন ক্ষমতা কাহার আছে যে, মানসিংহের বিরুদ্ধে কথা কহে?

হায়! কয়দিনের সুখ! তিলোত্তমা, সেই শৈলেশ্বর-মন্দিরে জগৎসিংহের মোহনরূপ প্রথম দর্শন। তাহার পর কেবল চিন্তা—পক্ষব্যাপী নিদারুণ দুশ্চিন্তা। পক্ষপরে কিয়ৎকালের নিমিত্ত সেই হৃদয়-বল্লভের সহিত আলাপ; সঙ্গে সঙ্গে অচিন্তনীয় বিপদ। পাঠান-গৃহে বাস—সতীত্ব, ধর্ম্ম, জীবন ও পবিত্রতা নাশের নিরন্তর আশঙ্কা। অসম্ভাবিত উপায়ে ওসমানের অঙ্গুরীর সাহায্যে মুক্তিলাভ। কারাগারে যুবরাজের সেই শেলোপম কঠোর বাক্য—'বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা! এখানে কেন?' অযেষার কৃপায় মুক্তি; সঙ্গে সঙ্গে বিজাতীয় মনস্তাপ হেতু ভয়ানক পীড়া—মরণাপন্ন দশা। আবার অভিরাম স্বামীর আহ্বানে জগৎসিংহের দয়া—অনুগ্রহ—চরণে স্থানদান। এত কষ্ট—এত অসহনীয় যাতনাপরম্পরা ভোগের পর, সেই প্রার্থিত পুরুষ-রত্নের সহিত পবিত্র চির-সম্মিলন। কিন্তু হায়! কয়দিনের সুখ! সুখের প্রথম সোপানেই এই বাধা! বহু যত্নার্জ্জিত, আয়াসলব্ধ রত্ন বক্ষে ধারণ করিতে না করিতেই এই ভয়ানক দুর্গতি। সে সাধের সৌধ সহসা ভস্মীভূত হইল। নিরীহ তিলোত্তমা বাণ-বিদ্ধা হরিণীর ন্যায় যন্ত্রণায় কাতর। হায়! কয়দিনের সুখ!

তিলোত্তমার আহার নাই, নিদ্রা নাই। অবেণী-সংবদ্ধ নিবিড় কৃষ্ণ কেশরাশি ধূলায় লুঠাইতেছে; সেই স্বর্ণ-কান্তি ভূতলে গড়াগড়ি যাইতেছে; দেহে মলা, অঙ্গ ভূষণ-হীন, মুখে বাক্য নাই, চক্ষুতেও জল নাই। তিলোত্তমা অধোমুখে ভূ-শয্যায় শয়ানা।

তিলোত্তমা ভাবিতেছেন, বিপদ সংসারে অনেক হয়; কিন্তু অনেক বিপদেরই প্রতীকারও তো সম্ভব। এ ঘোর বিপদের কি কোন প্রতীকার নাই? বসিয়া রোদন করা, ভাবিয়া দিন কাটান, শুইয়া শোকের যন্ত্রণা ভোগ, ইহাতে কাহার কি উপকার! আমার জীবনের জীবন লৌহ-শৃঙ্খল-নিবদ্ধ হইয়া কারাগারে; আর আমি ঘরে শুইয়া কষ্ট পাইতেছি; তাঁহার ক্লেশের অপেক্ষা বহুগুণ অধিক কষ্ট ভোগ করিতেছি। কিন্তু তাহাতে কাজ কি হইতেছে?

এরূপ উদ্বেগে ফল কি? যথাসাধ্য প্রতীকারের উপায় চিন্তা করাই উচিত। অতঃপর তাহাই করিব।

তিলোত্তমা উঠিয়া বসিলেন। ডাকিলেন,—"কে আছ এখানে?"

একজন দাসী তৎক্ষণাৎ সম্মুখে আসিল। তিলোত্তমা বলিলেন,—"যে পেটীতে আমার দোয়াত, কলম, কাগজ থাকে, তাহাই আন।"

দাসী লেখ্য-সামগ্রী-পূর্ণ একটী পেটিকা আনিয়া তিলোত্তমার সম্মুখে স্থাপন করিল এবং জিজ্ঞাসিল,—"গা মুছাইয়া দিব কি? চুলগুলা গুছাইয়া দিব কি? চিলমচি, ডাবোর, জল আনিব কি? কাপড় ছাড়িবেন কি?"

তিলোত্তমা বলিলেন,—"এখন কোন দরকার নাই। মা কোথায়?"

তিলোত্তমা 'মা' বলিলে বিমলাকে বুঝায়। বীরেন্দ্র সিংহের স্বর্গ-লাভের পর বিমলার প্রকৃত পরিচয় সকলে জানিতে পারিয়াছে। পরিচারিকা পরিচয়ে বাস করিলেও, তিনি যে বীরেন্দ্র সিংহের পরিণীতা মহিষী, এ কথা প্রচার হইয়া গিয়াছে। কতলু খাঁর হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া গড়মান্দারণে ফিরিয়া আসার পর, সকলেই তাঁহাকে মা ঠাকুরাণী, কর্ত্রী ঠাকুরাণী, রাণী মাতা প্রভৃতি বাক্যে সম্বোধন করিতেছে। বিমলা বলিয়া তাঁহাকে আর কেহই ডাকিতে সাহস করে না। স্বয়ং তিলোত্তমাও তাঁহাকে মা ভিন্ন আর কোন বাক্যে সম্বোধন করেন না। তিলোত্তমা জিজ্ঞাসিলেন,—"মা কোথায়?"

দাসী উত্তর দিল,—"তিনি উত্তরের বারান্দায় বসিয়া আসমানির সহিত কি পরামর্শ করিতেছেন। তাঁহাকে ডাকিয়া দিব কি?"

তিলোত্তমা বলিলেন,—"না। তুমি এখন যাও, মাকে বলিও, এখন তাঁহার আসিবার প্রয়োজন নাই। অল্পকাল পরেই আমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইব।"

দাসী আনন্দে প্রস্থান করিল। চারিদিন পরে তিলোত্তমা আজি উঠিয়া বসিয়াছেন, কথা কহিয়াছেন, লেখার সরঞ্জাম লইয়াছেন, হয় তো লেখা-পড়াও কিছু করিবেন। বড়ই শুভ সংবাদ। বিমলাকে এই আনন্দ-বার্ত্তা জানাইবার নিমিত্ত সে ধাবিতা হইল।

তিলোত্তমা কাগজ, কলম ও দোয়াত লইয়া পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন। বহুক্ষণে পত্র সমাপ্ত হইল। তিনি তাহা পাঠ করিলেন,—

"নবাব-নন্দিনি—

বড়ই কঠোর সংবাদ দিবার জন্য তোমাকে এই পত্র লিখিতেছি। মনে পড়ে তোমার? সেই সে দিন, বিবাহ-রাত্রিতে তুমি বসুন্ধরার যে পুরুষশ্রেষ্ঠকে হৃদয়মধ্যে রাখিতে উপদেশ দিয়াছিলে, আমার কপাল-দোষে, তিনি আজি বন্দী—লৌহ শৃঙ্খলে নিবদ্ধ—কারাগারবাসী। মহারাজ মানসিংহ নানা কারণে বিরক্ত হইয়া সেই গুণময়কে যাবজ্জীবনের নিমিত্ত কারাবদ্ধ করিয়াছেন।

বিপদে পড়িলে লোকে আত্মীয়-স্বজনের কথা আগে মনে করে। তোমার সহিত আমার দুই দিনের পরিচয়। কিন্তু তাহাতেই বুঝিতেছি, তুমি আমাদের পরমাত্মীয়। তাই বুঝিয়াছি বলিয়াই এই দুঃখের সংবাদ তোমার নিকট পাঠাইতেছি।

সন্ধি সংস্থাপিত হওয়ার অত্যল্পকাল পরেই তুমি যুবরাজকে এক পত্র লিখিয়াছিলে। সে পত্র রাজপুত্র অতি মূল্যবান্ সম্পত্তি বোধে, সাবধানে ও সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তিনি বার বার সে পত্র আমাকে পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন। এখনও সে পত্র বস্ত্র-পেটিকার মধ্যগত হইয়া আমার নিকট রহিয়াছে।

সেই পত্রের এক স্থানে লিখিত আছে, 'যদি কখন অন্তঃকরণে ক্লেশ পাও, তাহা হইলে কি আয়েষাকে স্মরণ করিবে?' রাজপুত্র এক্ষণে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইতেছেন, সন্দেহ নাই। সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে বার বার আয়েষাকে স্মরণ করিতেছেন তাহারও সন্দেহ নাই।

যুবরাজ তোমার প্রেমাস্পদ, এ কথা বোধ হয় তুমি আর এখন কাহারও নিকট লুকাইতে চাহিবে না; কত লতিকাই সহকারকে আশ্রয় করে; কে কাহাকে তাড়ায়? এক আশ্রয়ে অনেকেই গলা জড়াজড়ি করিয়া নাচে, খেলে, সুখের বাসা পাতিয়া লয়।

আমি বুঝিয়াছি তুমি রমণীরত্ন—এ সংসারে তোমার তুলনা নাই। আমার ভাগ্য যে তোমার স্থায় দেবীর সহিত আমার আলাপ হইয়াছে। তুমি নিষ্কাম প্রেমের জীবন্ত মূর্ত্তি।

যখন ইচ্ছা হইবে, তখনই তোমাকে পত্র লিখিবার নিমিত্ত যুবরাজকে তুমি অনুমতি দিয়াছ। বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহার সুযোগ ও স্বাধীনতা থাকিলে, তিনি যে নিশ্চয়ই তোমাকে পত্র লিখিতেন তাহার কোন ভুল নাই।

বর্ত্তমান বিপদে তুমি কি করিবে, বা করিতে পারিবে তাহা আমি জানি না; সে সম্বন্ধে তোমাকে কোন কথা আমি বলিতেছি না। এ জগতে যাঁহারা রাজপুত্রের কল্যাণ কামনা করেন, তুমি বোধ হয় তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। এই জন্য তোমার নিকট এ সংবাদ প্রেরণ করা আমার কর্ত্তব্য। আমি সেই কর্ত্তব্য পালনের জন্যই এ পত্র লিখিলাম।

অন্য কোন সুখ-দুঃখের সংবাদ জানাইবার সময় এ নহে। যদি আবশ্যক মনে কর, তাহা হইলে যখন ইচ্ছা আমাকে পত্র লিখিও। সাক্ষাতের প্রয়োজন হওয়াও আশ্চর্য্য নহে। সে সম্বন্ধে তুমি যাহা ব্যবস্থা করিবে, আমি তাহারই সুযোগ করিয়া লইব। ইতি

দুঃখিনী
তিলোত্তমা।

পত্র পাঠ করিয়া তিলোত্তমা তাহার উপর শিরোনামা লিখিলেন, "নবাব-নন্দিনী আয়েষা।" আর এক পার্শ্বে লিখিলেন, "গড়মান্দারণ হইতে।" যথানিয়মে পত্র মোহরাঙ্কিত ও সূত্রনিবদ্ধ করিলেন। তাহার পর সেই পত্র হস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং কক্ষ-মধ্যে দুইবার পরিক্রমণ করিলেন। সহসা একবার স্থির হইয়া আপন মনে বলিলেন,—"কর্ত্তব্য স্থির হইয়াছে। কল্যই অনুষ্ঠান আরম্ভ হইবে।"

যাহারা চিরদিন শান্ত, সুশীল, নিরীহ ও পরাজ্ঞাবহ তাহারা কখন কখন অবস্থা বিশেষে পড়িয়া সহসা বড়ই স্বাধীনতা, স্বতন্ত্রতা, তেজস্বিতা, কর্ম্মময়তা, একাগ্রতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার পরিচয় প্রদান করে। ইতিহাসে ও লোক-সমাজে এতাদৃশ অদ্ভুত দৃষ্টান্ত অনেক দেখা যায়। কেন সহসা মানব-চরিত্রের এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, তাহা মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রবিদ্‌গণের বিচার্য্য। ধীরা, বিনম্রস্বভাবা, সতত পরমুখাপেক্ষিণী তিলোত্তমা সহসা দৃঢ়-সঙ্কল্পবদ্ধা হইলেন।

পত্রিকা হস্তে তিলোত্তমা কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

নূতন নবাব।

উড়িষ্যার স্বর্ণগড়ের দুর্গে পাঠানগণ এখন রাজধানী স্থাপন করিয়াছেন। খাজা সোলেমান খাঁ ও খাজা ওসমান খাঁ পরলোকগত নবাব কতলু খাঁর এই পুত্রদ্বয় এবং পালিতা কন্যা আয়েষা প্রভৃতি পুরমহিলাগণ এখন নিশ্চিন্ত ভাবে স্বর্ণগড়ে অবস্থান করিতেছেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ আপাততঃ সকলই শেষ হইয়া গিয়াছে।

পরলোকগত নবাব কতলু খাঁর দুই পুত্র ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সোলেমান ও ওসমান উভয়ের মধ্যে রাজ্য সম্বন্ধে পাছে কোন বিবাদ উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কায় মহারাজ মানসিংহকৃত সন্ধি-অনুসারে, বৃদ্ধ মন্ত্রী খাজা ইষার হস্তে রাজ্য পরিচালনার ভার অর্পিত হইয়াছে। প্রবীণ ও অভিজ্ঞ মন্ত্রী স্বকীয় কর্ত্তব্য অতীব সাবধানতার সহিত নির্ব্বাহিত করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার দক্ষতা হেতু, কোন দিকেই অসন্তোষ প্রকাশের কোনই অবসর থাকিতেছে না; সকলই সুনির্ব্বাহিত হইতেছে।

সকলই ভাল চলিলেও, মনুষ্য-হৃদয় দুরাকাঙ্ক্ষার দুর্দ্দমনীয় আঘাতে অনেক সময়েই বিষম যন্ত্রণা ভোগ করে এবং ইচ্ছাপূর্ব্বক অসন্তোষের উৎপাদন করিয়া, অনেক অনাগত যাতনাকে ডাকিয়া আনে। নবাব কতলু খাঁর দুই পুত্রের প্রকৃতি একান্ত বিভিন্নভাবাপন্ন। নির্ব্বিবাদে উৎকৃষ্ট সুরা সেবন ও সুন্দরী-কুলের সংসর্গে কালপাত করিতে পারিলেই, সোলেমান জীবনের সকল প্রয়োজন সফল হইল বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তিনি, আপনার বাসনাস্বরূপ পদার্থ-সমূহে পরিবৃত হইয়া, নিশ্চিন্ত মনে কালপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার অনুজ ওসমান এই সকল ইন্দ্রিয়-সুখের অন্বেষণ নিতান্ত নীচ কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। মনুষ্য-জীবন লাভ করিয়া, বীরের হৃদয় প্রাপ্ত হইয়া এবং পাঠান নরপতির বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, অসি চালনায় নিপুণতা লাভ করিয়া, নারীগণের মধ্যে সুরাপহৃত-চেতনাবস্থায় জীবন অতিবাহিত করা নিতান্ত হীনতা বলিয়া তিনি মনে করিতেন।

ওসমান নিতান্ত মানসিক ক্লেশে কালপাত করিতেছিলেন। মোগলগণ এখন ভারতের সম্রাট; কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতে ওসমানের হৃদয় ব্যথিত হইত। তিনি বিবেচনা করিতেন, দিল্লীর সিংহাসনে পাঠানগণই সুলতান ছিলেন; কুতবউদ্দীন স্বীয় বহুবলে হিন্দুগণের হস্ত হইতে রাজ্য গ্রহণ করেন এবং অমিত-প্রতাপে ভারতে পাঠান-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। মোগল বাবর, বাহুবলে পাঠান ভূপতিকে বিচ্যুত করিয়া, দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু তাই বলিয়া সেই মোগলেরাই যে ভারতবর্ষের ন্যায়সঙ্গত ও অবিসংবাদিত ভূপতি এরূপ বিবেচনা করিবার কোনই কারণ নাই। পাঠানগণের স্বত্ব মোগলগণের পূর্ব্বাগত। ভাগ্যদোষে পাঠানগণ এখন হীনদশাপন্ন হইলেও, পুনরায় ভাগ্য-চক্রের আবর্ত্তনে তাহাদের উন্নত অবস্থা না ঘটিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। হীনাবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা বা তাহার প্রতিকারের কোন উপায় না করা, নিতান্ত কাপুরুষের কার্য্য বলিয়া ওসমান মনে করিতেন।

বর্ত্তমান সন্ধির ব্যবস্থায় এই বীরের হৃদয় একদিনও প্রসন্ন ছিল না। মহারাজ

মানসিংহের দ্বারা সম্প্রতি যে সন্ধি-বন্ধন হইয়াছে, তাহা অখণ্ডনীয় বলিয়া ওসমান মনে করিতেন না; তিনি মনে করিতেন, কোথায় ক'বে সন্ধি-বন্ধন চিরস্থায়ী হয়? বর্ত্তমান সন্ধির নিয়ম, পাঠানের দোষেই হউক, আর মোগলের দোষেই হউক, নিশ্চয়ই অচিরে ভাঙ্গিয়া যাইবে, ইহাই ওসমানের স্থির বিশ্বাস ছিল। নবাব কতলু খাঁর মৃত্যু, চারিদিকের নিতান্ত বিশৃঙ্খল ভাব, যুদ্ধার্থ মানসিংহের প্রভূত আয়োজন, ইত্যাদি বহুবিধ কারণে সন্ধি করিতে হইয়াছে। কিন্তু সে সকল কারণ অন্তরিত হইলেও, সন্ধি অক্ষুণ্ণ থাকিবে, এরূপ কখনই সম্ভাবিত নহে।

ওসমানের অন্তরে যে অসন্তোষ বাসস্থান স্থাপন করিয়াছিল, এ সম্বন্ধে কোনই সন্দে নাই। তাঁহার হৃদয়ে নিরন্তর অশান্তির আর এক প্রবল কারণ আয়েষা। সেই লাবণ্য-প্রতিমা তাঁহার জীবনের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছেন, তাঁহার জীবনের সুখ-শান্তি সেই সুন্দরীর কৃপার অধীন হইয়াছে; কিন্তু সেই ভূর্লোক-দুর্ল্লভ নারী তাঁহার নহেন, তিনি প্রতিদানে তাঁহাকে আপন হৃদয়ে স্বল্পমাত্র স্থান দানে অশক্ত। যে দুরাকাঙ্ক্ষার প্রবল শাসনে ওসমানের হৃদয় নিয়ত উন্মত্ত হইয়া রহিয়াছে, যে দুরাশার অদম্য উত্তেজনায়, তিনি ভারতের সিংহাসন লাভের কল্পনায় প্রমত্ত হইতেও কুণ্ঠিত হন না, সে সকল বাসনাই আয়েষার অনুমাত্র অনুগ্রহের সহিত অবিলম্বে বিনিময় করিতে তিনি প্রস্তুত। তথাপি সে সুন্দরী তাঁহাকে প্রাণে স্থান দিতে অক্ষম। হতাশ প্রেমিকের এ অন্তর্জ্জ্বালা অসহনীয়!

কে সে আয়েষা? কতলু খাঁর পালিতা কন্যা। আয়েষা নবাব সাহেবের কাশ্মীরী বেগম সাহেবার ভ্রাতুষ্পুত্রী। আয়েষার ছয় মাস বয়সের সময়, তাঁহার জননী সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। পত্নী-বিয়োগ-বিধুর স্বামী সেই শিশু কন্যাকে আপনার সহোদরার নিকট প্রেরণ করেন। অল্পকাল পরে আয়েষার পিতাও শমন-সদনে গমন করেন। কিন্তু পিতৃ-মাতৃ-হীনা আয়েষার কোন অভাবই থাকিল না। নবাব কতলু খাঁ এই অসামান্যা রূপ-লাবণ্যবতী কন্যাকে বড়ই স্নেহের নয়নে দর্শন করিলেন। বেগম সাহেবার আর সন্তান ছিল না। তিনি এই সুকুমারীকে আপন কন্যা জ্ঞানে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। নবাব সাহেবের আরও অনেক পুত্র-কন্যা থাকিলেও, আয়েষার প্রতি তাঁহার মমতা এতই বাড়িতে লাগিল যে, আয়েষা তাঁহার ঔরস সন্তানদিগের অপেক্ষা অধিক কৃপা ও অনুগ্রহ লাভ করিতে থাকিলেন। আয়েষাকে সাধারণে নবাবপুত্রী বলিয়াই জানিল। স্বয়ং আয়েষাও আপনাকে কাশ্মীরী বেগম সাহেবার গর্ভোৎপন্না নবাব-নন্দিনী বলিয়াই জানিলেন।

ওসমান ও আয়েষা প্রায় সমবয়স্ক। নবাব-অবরোধে এই বালক বালিকা একত্র আমোদ প্রমোদ, ক্রীড়া কৌতুক করিতে করিতে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আয়েষার রূপ অতুলনীয়, শিক্ষা ও সাহস সুবিখ্যাত, বুদ্ধি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি অসাধারণ হইয়া উঠিল। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সহিত ওসমান সেই সুন্দরীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। বাল্যকালের সেই অনুরাগ যৌবনের সমাগমে আর এক মূর্ত্তি ধারণ করিল। ওসমান ধীরে ধীরে ও অজ্ঞাতসারে আয়েষার দাস হইয়া উঠিলেন।

নবাব কতলু খাঁ মৃত্যুর বহু পূর্ব্বে স্বচ্ছন্দে

জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে, আয়েষাকে এরূপ ধন-সম্পত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। আয়েষা যেরূপ ধনশালিনী হইয়াছিলেন; কতলু খাঁর আর কোন ঔরস-কন্যার তাহার অনুরূপ বিত্ত ছিল না। কতলু খাঁ জীবিতকালে জানিতে পারিয়াছিলেন এবং কাশ্মীরী বেগম সাহেবা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে,ওসমান এই সুন্দরীর প্রতি একান্ত প্রণয়ানুরাগী। আয়েষার কথা-বার্ত্তা ও ব্যবহারাদির আলোচনায় তাঁহাদের ধারণা জন্মিয়াছিল যে, নবীনাও ওসমানের প্রতি আসক্ত। প্রত্যুত আয়েষা সর্ব্বান্তঃকরণে ওসমানের যেরূপ হিতচেষ্টা করিতেন, নিয়ত তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনের সুযোগ পাইলে যেরূপ সুখী হইতেন এবং সতত ওসমানের সুখ-দুঃখে যেরূপ আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন, তাহাতে সহজেই মনে হইত, ওসমানের হৃদয়-হারিণী এই মোহিনীও ওসমানকে প্রাণ-মন সমর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু আয়েষার অনুরাগ যে ভ্রাতৃস্নেহের সীমা অতিক্রম করে নাই, ওসমানকে স্নেহময় অগ্রজ জ্ঞান করিয়া, আয়েষা যে অবিচলিত চিত্তে তাঁহাকে ভাল বাসিতেন, এ কথা কেহই বুঝিতে পারেন নাই। নবাব ও বেগম মনে করিয়াছিলেন, আয়েষার স্বাধীন বিত্ত যথেষ্ট রহিল, অতঃপর যদি ওসমান তাঁহার পাণি-গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আয়েষার সুখ-সৌভাগ্য সম্পূর্ণ হইবে। এইরূপ সময়ে নবাব সাহেবের লোকান্তরে গতি হইল।

আয়েষার প্রণয় কতদূর প্রগাঢ় তাহা ওসমান জানিতেন। ওসমান আপনার আন্তরিক প্রেমের কথা কিঞ্চিন্মাত্র ব্যক্ত করিতে না করিতে, আয়েষা সুস্পষ্ট ভাষায় ও নিঃসন্দিগ্ধভাবে তাঁহার প্রতি স্বকীয় হৃদয়ভাব বুঝাইয়া দিতেন। আয়েষার মুখের সেই সকল বাক্য, শেলের ন্যায় ওসমানের হৃদয় বিদ্ধ করিত। তিনি নীরবে সেই দুঃসহ যাতনা সহ্য করিতেন।

এইরূপ যাতনা-ক্লিষ্ট ওসমান একাকী অপরাহ্ণকালে, স্বর্ণগড়ের দুর্গমধ্যস্থ এক বিস্তৃত কক্ষে বসিয়া আছেন। একদিকে দুরাকাঙ্ক্ষার প্রবল দংশন, আর এক দিকে নিষ্ফল প্রণয়ের তীব্র যাতনা। ওসমান নিদারুণ ক্লেশে জীবনকে ভারভূত বলিয়া মনে করিতেছেন। সহসা নকিব ফুকরাইয়া উঠিল। ওসমান উঠিয়া কক্ষের প্রবেশ দ্বারে গমন করিলেন। সুদীর্ঘ শ্বেতবর্ণ শ্মশ্রু-সংযুক্ত-বদন, সুবৃহৎ উষ্ণীষ-ধারী মন্ত্রী ইষা খাঁ সেই কক্ষে সমাগত হইলেন। ওসমান তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিলেন। বৃদ্ধ ইষা খাঁও বিহিত-বিধানে ওসমানকে প্রভুর ন্যায় সম্মান জ্ঞাপন করিলেন। উভয়ে আসনে উপবিষ্ট হইলে ওসমান জিজ্ঞাসিলেন।—"কি অভিপ্রায়ে আপনার আগমন হইল? নূতন সংবাদ কি?"

মন্ত্রী বলিলেন,—"জগৎসিংহের কারাদণ্ডের সংবাদ বোধ হয় নবাব সাহেবের অবিদিত নাই?"

ওসমান বলিলেন,—"সে সংবাদ আমি পাইয়াছি; কিন্তু তাহাতে আমাদের ক্ষতি-বৃদ্ধি কি আছে?"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"একটু আছে বলিয়া আমার মনে হয়। সম্প্রতি মহারাজ মানসিংহ আমাদের সহিত যে সন্ধি করিয়াছেন এবং যে সন্ধি অনুসারে এখনও উভয় পক্ষ কার্য্য করিতেছেন, আমি জ্ঞাত আছি, ইহা আকবর সাহেবের অনুমোদিত নহে। মানসিংহের এই সন্ধি আকবর অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না সত্য; কিন্তু ইহা যখন তাঁহার সন্তোষজনক হয় নাই, তখন তিনি ইহার

অন্যথা করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিবেন না, এমন নহে।"

ওসমান বলিলেন, "জগৎসিংহের অবরোধের সহিত এ ব্যাপারের কি সম্বন্ধ আপনি অনুমান করিতেছেন?"

মন্ত্রী বলিলেন,—একটু আছে বলিয়া আমি অনুমান করি। জগৎসিংহ যখন আমাদের হস্তে বন্দী ছিলেন, তখন বোধ হয় আমাদের ব্যবহারে তাঁহার বিশেষ অসন্তোষের কোন কারণ ঘটে নাই। আমি মনে করি, তিনি আমাদিগের উপর বিরক্ত না থাকাই সম্ভব। সকল কথা আমি বলিতে ইচ্ছা করি না; কিন্তু আমার মনে হয়, আমাদিগের সহিত শত্রুতা ঘটাইতে তাঁহার ইচ্ছা না হইবার আরও কারণ থাকিতে পারে।"

কি মনে করিয়া বৃদ্ধ মন্ত্রী কথার শেষভাগ মুখ হইতে বাহির করিলেন, ওসমান তাহা বুঝিতে পারিলেন। জগৎসিংহের প্রতি আয়েষার আসক্তি স্মরণ করিয়াই যে ইষা খাঁ এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, তাহা ওসমানের বুঝিতে বাকী থাকিল না। তাঁহার হৃদয়ে এককালে শত বৃশ্চিক দংশন করিল। অতি কষ্টে হৃদয়ভাব সংযত করিয়া, ওসমান কহিলেন,—"আপনার অভিপ্রায়, জগৎসিংহ আমাদের অনুকূল থাকিলে এবং আকবরের নিকট আমাদের সম্বন্ধে হিতজনক মতামত প্রকাশ করিবার অবসর পাইলে, এই সন্ধি ঠিক থাকিতে পারে। জগৎসিংহ কারাগারে থাকিলে আমাদের হিতচেষ্টা করিবার সুযোগ পাইবে না। কেমন, ইহাই কি আপনার অভিপ্রায় নহে?"

বৃদ্ধ সঙ্কুচিত ভাবে উত্তর দিলেন,—'অধীন এইরূপই মনে করে।"

ওসমান কহিলেন,—"আপনি প্রবীণ, অভিজ্ঞ ও আমাদের পিতৃতুল্য সম্মান-ভাজন। সুতরাং আপনাকে কোন তিরস্কার করিতে আমাদের অধিকার নাই। কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, এই সন্ধির দ্বারা আমাদের কি লাভ হইয়াছে? আমরা বাহুবলে, দেহের শোণিত ও রাজকোষের অর্থ ব্যয় করিয়া, প্রায় সমস্ত বঙ্গদেশ অধিকার করিয়াছিলাম। সে দিনও ধারপুরের যুদ্ধে জয়লাভের পর সমগ্র মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমানের সীমা পর্য্যন্ত আমাদের অধিকার হইয়াছিল। সন্ধির বলে, সেই নব-বিজিত রাজ্য আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। অধিকন্তু জগন্নাথের মন্দির ও সমস্ত পুরী জেলা মোগলদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। এরূপ সন্ধি নিতান্ত লজ্জা ও ঘৃণার বিষয়। আকবর যদি ইহা আজই ভাঙ্গিয়া ফেলে, তাহাতে আমি ক্ষোভের কোন কারণ দেখিতেছি না তো।"

বৃদ্ধ একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন,—"আমি সে সম্বন্ধে নবাব সাহেবের সহিত কোন তর্ক করিব না। কিন্তু আমি নিবেদন করিতেছি, সম্প্রতি আমরা দুর্ব্বল।"

ওসমান বলিলেন,—"সত্য কথা, আমরা সম্প্রতি মানসিংহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার উপযুক্ত বলশালী নহি। আপনি সে অভাব দূর করিবার কোন চেষ্টা করিতেছেন কি?"

মন্ত্রী বলিলেন,—"আপনার অবিদিত নাই, আভ্যন্তরিক রাজকার্য্যের নানাপ্রকার সুব্যবস্থায় আমাকে এতই মনঃসংযোগ করিতে হইয়াছে যে, অন্য কোন চিন্তার আমার এখন অবসর নাই।"

ওসমান বলিলেন,—"আপনি রাজকার্য্য লইয়াই ব্যস্ত থাকুন। এ প্রবীণ বয়সে যুদ্ধবিগ্রহ আপনার আর ভাল না লাগিবারই কথা সন্ধি ও শান্তি এ সময়ে আপনার প্রধান প্রার্থিত অবস্থা হওয়াই সম্ভব।

আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন; আমি বর্ত্তমান সন্ধি-কেবল অপমানজনক বলিয়া মনে করিতেছি। সুযোগ পাইলে, এই ঘৃণাজনক সন্ধি-বন্ধন পদদলিত করিয়া, মোগলের বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে আমি ক্ষান্ত হইব না। সে জন্য যে কিছু আয়োজন আবশ্যক, আমি অতঃপর তাহার ব্যবস্থা করিব এবং সমস্ত ব্যবস্থা স্থির হইলে, আপনার নিকট সমস্ত অবস্থা জানাইব।"

ইষা খাঁ বলিলেন,—"সে সম্বন্ধে কোন কথাই আমি এক্ষণে বলিব না। আমার আপাততঃ আরও বক্তব্য আছে। মহারাজ মানসিংহ শীঘ্র পুরী আগমন করিবেন।"

"উত্তম। কাফেরগণ কুৎসিত দর্শন কাষ্ঠ-খণ্ডকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করে। মোগল শ্যালক মানসিংহও কি ঈশ্বর-পূজার অভিপ্রায়ে পুরী আসিতেছেন?"

মন্ত্রী। সম্ভব। তিনি বিশেষ সমারোহে আসিবেন।"

ওস। ইচ্ছা তাঁহার। যখন সন্ধি-সূত্রে আমরা পুরী ছাড়িয়া দিয়াছি, তখন সেখানে বাঙ্গালার সুবেদার মানসিংহই সমারোহে আসুন, অথবা বাঁকুড়ার দরিদ্র প্রজা ভিক্ষা করিতে করিতেই আসুক, আমাদিগের তাহাতে কি?

মন্ত্রী। আমাদের তাহার সহিত একটু সম্বন্ধ আছে। মহারাজকে পুরী যাইতে হইলে অনেকদূর পর্য্যন্ত আমাদের অধিকারের মধ্য দিয়াই যাইতে হইবে।

ওস। তিনি স্বচ্ছন্দে যাইবেন, রাজপথ অবধি। তিনি কেন, সকলেই সে পথ দিয়া অনায়াসে যাইতে পারেন।

মন্ত্রী। সে সময়ে আমাদের একটু কর্ত্তব্য আছে।

ওস। কি?

মন্ত্রী। তিনি আমাদের অধিকারে আসিলে তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতে আমরা বাধ্য।

ওসমানের মুখ যেন একটু মেঘাচ্ছন্ন হইল। জিজ্ঞাসিলেন,—"কেন?"

মন্ত্রী। আমরা তাঁহার সহিত সন্ধিসূত্রে বদ্ধ। তাঁহাকে সম্মান না করিলে বাদশাহের অপমান হইবে। মানসিংহ বাদশাহের প্রতিনিধি।

ওস। কিরূপ সম্মান দেখাইতে হইবে?

মন্ত্রী। আমাদের অধিকারের সীমা পর্য্যন্ত আপনাকে তাঁহার সঙ্গে থাকিতে হইবে।

ওসমান আসন ত্যাগ করিয়া কিয়ৎকাল কক্ষমধ্যে পদচারণা করিলেন। তাহার পর সহসা বৃদ্ধ মন্ত্রীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন,—"এ অপমান বহন করা আমার পক্ষে অসাধ্য। সত্য বটে মানসিংহ একজন জগদ্বিখ্যাত বীর; সত্য বটে মানসিংহের বাহুবলে আকবরের এত গৌরব; সত্য বটে মানসিংহ আকবরের কুটুম্ব; সত্য বটে মানসিংহ স্বয়ং একজন করপ্রদ রাজা; তথাপি সে আকবরের দাস। আমরা অদ্য হীনবল হইলেও, স্বাধীন নরপ —আকবরের সমকক্ষ। আমরা ঘটনাচক্রে দুর্ব্বল হইয়াছি বটে; তথাপি একাল পর্য্যন্ত আকবরের সহিত যুদ্ধ করিয়াই আসিতেছি। জয় পরাজয়ের কথা ছাড়িয়া দিউন; কিন্তু কোন কারণেই আমরা কখনই কাহারও পদানত হই নাই। এখনও উড়িষ্যায় আমরা স্বাধীন রাজা। এ অবস্থায় আকবরের একজন প্রতিনিধির পাদুকা বহন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতে আমরা কখনই প্রস্তুত নহি।"

মন্ত্রী কহিলেন,—"এ সম্বন্ধে মহারাজার এক পত্র আছে।"

তিনি কাবার মধ্য হইতে এক পত্র বাহির

করিয়া ওসমানের হস্তে প্রদান করিলেন। পত্রের মর্ম্ম এই—'মহারাজ মানসিংহ স্বধর্ম্ম-পালনের নিমিত্ত পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যাত্রা করিবেন। তিনি ভরসা করেন, উড়িষ্যায় নবাবদিগের অধিকারে প্রবেশ করিলে, নবীন নবাব দ্বয় তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন।' পত্র ইষা খাঁর উদ্দেশে লিখিত।

ওসমান পত্রপাঠ করিয়া তাহা মন্ত্রীর হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন। বলিলেন,—"এ পত্রের যেরূপ উত্তর প্রদান আমি সঙ্গত বলিয়া মনে করি, তাহা আপনাকে কল্য জানাইব। মানসিংহের এ সাহস বড়ই বিরক্তিজনক।"

খাজা ইষা খাঁ বলিলেন,—"আমি এক্ষণে বিদায় হইতেছি। বিদায়কালে একটা কথা আমি নবাব সাহেবকে স্মরণ করাইয়া দিতে ইচ্ছা করি।"

"বলুন।"

"মহারাজ মানসিংহ মোগল-পাঠানে যে সন্ধি স্থাপন করিয়াছেন তাহা জগৎসিংহের উদ্যোগেই হইয়াছিল। এ কথা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। আর এক কথা, সম্প্রতি সে সন্ধির বলে আমরা উৎকলে স্বাধীন অধিকার লাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু আমাদিগকে বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করিতে হইয়াছে; মহারাজ মানসিংহের শিবিরে গিয়া তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতে হইয়াছে; যথেষ্ট উপঢৌকনাদি প্রদান করিয়া তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিতে হইয়াছে; এবং তাঁহার প্রদত্ত খেলোয়াৎ অঙ্গে ধারণ করিয়া আমাদিগকে সম্মানিত হইতে হইয়াছে। আমরা বিধিমতে মহারাজ মানসিংহের নিকট আনুগত্য প্রকাশ করিয়া এবং সম্পূর্ণরূপে বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করিয়া, উড়িষ্যার স্বাধীন অধিকার ভোগ করিতে পাইয়াছি। এ সকল কথা এত শীঘ্র না ভুলিলেই ভাল হয়।"

ওসমান বলিলেন,—"সে কথা আমি একবারও ভুলি নাই; সে কলঙ্কের কথা আমার প্রাণে বিঁধিয়া রহিয়াছে। কিন্তু এ কুকীর্ত্তি শীঘ্রই লুপ্ত হইবে।"

খাজা ইষা গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন,—"যতদিন অন্যরূপ অবস্থান্তর না ঘটিতেছে, ততদিন মহারাজ মানসিংহকে বাদশাহের প্রতিনিধি জ্ঞান করিয়া সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে আমরা বাধ্য। তাহার অন্যথা হইলে আবার বাদশাহের সহিত বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। আমরা এখন কোনরূপ বিরোধ করিতে অক্ষম। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করিবেন, ইহাই আমার নিবেদন। আমার দেহের অবস্থা ভাল নহে। বার্দ্ধক্য ও পীড়া, উভয় কারণেই আমি কাতর। বোধ হয় আর অধিক দিন আমি থাকিব না। যতদিন আছি, তাহার মধ্যে নবাবদিগের অবস্থান্তর দেখিতে না হইলেই সুখী হইব। আমি এক্ষণে বিদায় হই।"

সমুচিত শিষ্টাচারাদির পর, ধীরে ধীরে বৃদ্ধ মন্ত্রী প্রস্থান করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বকথা।

ধীরে ধীরে চিন্তাক্লিষ্ট ওসমান সে কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। মানসিংহের লিপি—আদেশসূচক পরোয়াণা বলিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল। তিনি বিবেচনা করিলেন,

পাঠানগণ বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে সত্য; কিন্তু তাহাতে কি কেবল পাঠানদিগের ইষ্ট সাধিত হইয়াছে। মোগলগণ কি এই সন্ধির দ্বারা একটুও উপকৃত হন নাই? আমাদের সহিত যুদ্ধে মানসিংহের কি ক্ষতি হইতেছিল না? স্বর্গীয় নবাব ধারপুরের যুদ্ধে মানসিংহকে পরাজিত করিয়া, তাঁহার পুত্র জগৎসিংহকে বন্দী করিয়া ছিলেন এবং বঙ্গদেশের বিষ্ণুপুর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। আমরা জগৎসিংহকে হাতে পাইয়া নিপাত করিলেও করিতে পারিতাম। পুনরায় যুদ্ধের আয়োজন করিতে মানসিংহের অনেক সময় নষ্ট হইত। সেই সময়ের মধ্যে আবার তাঁহাকে আক্রমণ করিলে, আমরা সমস্ত বঙ্গদেশ অধিকার করিতে না পারিতাম, এমন কথা কে বলিতে পারে? সহসা নবাব বাহাদুরের মৃত্যু হইল। আমরা সহসা-সংঘটিত এই বিপদে নিতান্ত কাতর ও অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। সে সময় যুদ্ধ উচিত নহে বলিয়াই, সন্ধি করা হইল। পাঠানগণ ভীত হইয়া কখনই সন্ধি-বন্ধনে সম্মত হয় নাই। রণে তাহারা কখনই অক্ষমতা প্রদর্শন করে নাই; মোগলদিগের সৈন্যনাশে তাহারা কখনই ক্ষান্ত হয় নাই। মানসিংহের পুত্রকে নির্ব্বিঘ্নে পিতৃ-শিবিরে যাইতে দিয়া তাহারা ভদ্রতার পরকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে। এরূপ স্থলে তাহাদের প্রতি কঠোর আদেশ প্রচার করিয়া এবং তাহাদের বশ্যতা অবলম্বনে তাহাদের প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার প্রদর্শন করিয়া মানসিংহ ভাল করেন নাই। এরূপ পত্র না লিখিয়া, তিনি যদি লিখিতেন 'নবীন নবাবেরা আমাদিগের আত্মীয় মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। উড়িষ্যার অবস্থান কালে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সুখী হইব।' তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা উপঢৌকনাদি সহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতাম এবং তাঁহার সহিত প্রীতি-বর্দ্ধনের প্রয়াস করিতাম।

এইরূপ বিবিধ চিন্তায় প্রপীড়িত ওসমানের চরণদ্বয়, যেন তাঁহার অজ্ঞাতসারে, তাঁহাকে বহন করিয়া অন্তঃপুরের একদেশে লইয়া চলিল। ওসমান ভাবিতে লাগিলেন,—"না তাহা হবে না; আমার অগ্রজ তো বিষয়-ব্যাপারে উদাসীন। তিনি কোথাও যাইবেন না; আমিও যাইব না। এ পক্ষ হইতে কোন একজন পদস্থ কর্ম্মচারী আমাদের অধিকারে প্রবেশ স্থলে, মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিবে; আবশ্যক হইলে তাঁহার খাদ্য-দ্রব্যাদির সংকুলান করিয়া দিবে। উপঢৌকনাদি কিছুই দেওয়া হইবে না।"

অন্যমনস্ক ওসমান চিন্তা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কোন্‌দিকে, কোথায়, ও কি অভিপ্রায়ে তিনি গমন করিতে-ছেন, তাহা তাঁহার মনে নাই। গর্ব্বিত মানসিংহের পুত্রকে হাতে পাইয়া বিনাশ না করায় অন্যায় হইয়াছে। আয়েষা তাহার প্রতি অনুরাগিণী। সত্য বটে সে আয়েষার প্রতি আসক্ত নহে; কিন্তু তাহাতে আমার লাভ কি? তাহার জীবন থাকিতে আয়েষা কখনই তাহাকে ভুলিবে না। সে মরিলে আয়েষা তাহাকে ভুলিতে পারে এবং তখন সেই সুন্দরীর হৃদয়ে আমার স্থান হইতে পারে। জগৎসিংহ আমার শত্রু। তাহাকে বন্দী করিয়াও সজীব ছাড়িয়া দিয়াছি; দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে ঘটনা ক্রমে তাহার নিকট পরাজিত হইয়াছি, কিন্তু তাই বলিয়া তাহার সহিত শত্রুতা ত্যাগ করিয়াছি কি? না—না—কখন না। জগৎ-সিংহ আমার পরম শত্রু। সে নয়নে না পড়িলে, আয়েষা কখনই তাহার প্রতি অনুরাগিণী

হইত না। সে না মরিলে আয়েষার অনুরাগ কখনই হ্রাস হইবে না। ছলে হউক, বলে হউক, জগৎসিংহকে বিনাশ করাই আমার ব্রত.

"ওসমান!"—সহসা পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে রমণী-কণ্ঠে শব্দ হইল,—"ওসমান!"

ওসমানের সমস্ত চিন্তা-গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। তিনি শব্দাগমের অভিমুখে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন. তাঁহার অনতিদূরে এক প্রৌঢ়-বয়স্কা সজীব দেবী প্রতিমা। তিনিই কতলু খাঁর কাশ্মীরী বেগম—ওসমানের বিমাতা—আয়েষার মাতা। দর্শনমাত্র অতীব ভক্তির সহিত ওসমান তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। বেগম সাহেবা কহিলেন,—"তোমারই কথা আমি এখন ভাবিতেছি। অদ্য তোমার নিকট সংবাদ পাঠাইব স্থির করিয়াছিলাম। তুমি অন্দরে আসিলে, তোমাকে আমার নিকট পাঠাইবার জন্য, তোমার জননীকে বলিয়া রাখিয়াছি!"

ওসমান সবিনয়ে জিজ্ঞাসিলেন,—"আমার প্রতি কি আজ্ঞা?"

বেগম সাহেবা উদ্বিগ্ন ভাবে কহিলেন,—"এমন করিয়া দাঁড়াইয়া কথা বলিব কিরূপে? বড় কঠিন বিষয়; তোমাকে ধীরভাবে শুনিতে হইবে। গর্ভজাত সন্তান ব্যতীত আর কেহই কোন বেগমের কক্ষে প্রবেশ করিতে পায় না, ইহাই নবাব অন্দরের নিয়ম। তোমাকে আমি গর্ভের সন্তান বলিয়াই জ্ঞান করি। আমার কক্ষে বসিয়া কয়টী প্রয়োজনীয় কথা শুনিতে তোমার আপত্তি আছে কি?"

ওসমান একটু চিন্তিত ভাবে কহিলেন,—"আপনি আমার বিমাতা হইলেও, চিরদিনই আমি আপনাকে গর্ভধারিণী জ্ঞানে ভক্তি-শ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছি। আপনি আয়েষার মাতা; সে জন্য আমারও পূজার পাত্র। মহলের মধ্যে প্রবেশ করা নিয়ম-বিরুদ্ধ। কিন্তু আপনার আজ্ঞালঙ্ঘন করিতে আমার সাধ্য নাই। আপনি আজ্ঞা করিলে, আমাকে কক্ষের মধ্যেও প্রবেশ করিতে হইবে।"

বেগম সাহেবা বলিলেন,—"আইস পুত্র। আমি অনুমতি করিতেছি; ইহাতে নিয়ম লঙ্ঘনের দোষ হইবে না। আর বাবা, নিয়মাদির এখন তুমিই কর্ত্তা। আইস।"

অবনত মস্তকে ওসমান কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া আসনগ্রহণ করিলেন। বেগম সাহেবা অদূরে এক গালিচার উপর উপবেশন করিয়া বলিলেন,—"আয়েষার সম্বন্ধে একটা কথা বলিব।"

ওসমানের হৃদয় একটু দ্রুতভাবে স্পন্দিত হইতে লাগিল। বলিলেন,—"বলুন।"

বেগম সাহেবা কহিলেন,—"তোমার স্মরণ হয় কি না বলিতে পারি না, আয়েষা পিতৃব্য-পরিত্যক্ত প্রভূত বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়াছে। সে একটা রাজার দৌলৎ।"

ওস। বহুকাল পূর্ব্বে এইরূপ একটা কথা শুনিয়াছিলাম; এখন তাহা ভাল মনে হয় না।

বেগ। বহুকাল পূর্ব্বেই বটে। দশ বৎসর পূর্ব্বে আয়েষার পিতৃব্য মহাশয়ের পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। আয়েষাকে তাঁহার পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী স্থির করিয়া, পঞ্জাবের সুবেদার তোমার পিতার নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন এবং আয়েষার পক্ষ হইতে তত্তাবৎ দখল লইবার ব্যবস্থা করিতে বলেন। স্বর্গীয় নবাব সাহেব আয়েষাকে ছাড়িয়া একদিনও থাকিতে পারিতেন না; তিনি এখান হইতে

লোক পাঠাইয়া সেই সমস্ত বিষয় বিভবের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমাদের পক্ষের যে লোক সেই সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, তিনি বলিতেছেন, আয়েষা এখন প্রাপ্তবয়স্কা। এখন তিনি মালিকরূপে হাজির না হইলে, সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। এক্ষণে ব্যবস্থার কর্ত্তা তুমি। এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য স্থির কর।

ওস। এ সকল সংবাদ আপনি কেমন করিয়া পাইলেন?

বেগ। উজীর সাহেবের নিকট দূত আসিয়াছে।

ওস। আমি জানি আয়েষা মহদ্বংশের কন্যা। আপনার ভাই কি কাজ করিতেন?

বেগ। আমার ভাই পঞ্জাবের সেনাপতি ছিলেন। আর যে ভ্রাতার সম্পত্তি আয়েষা পাইয়াছে, তিনি জায়গীরদার ছিলেন। আয়েষার মাতা সুবেদারের কন্যা।

ওস। তাহা হইলে বুঝিতে হইতেছে, আয়েষার জননী মোগল ও পিতা পাঠান ছিলেন। এরূপ বিরুদ্ধ ঘটনা কিরূপে ঘটিয়াছিল মা?

বেগ। এক কথায় ইহার উত্তর দেওয়া যায়। বড় লজ্জার কথা; ছেলের কাছে আপনাদের প্রণয়ের কথা বলিতে মাথা কাটা যায়। তোমার পিতা পাঠান, আর আমি মোগল-কন্যা; এরূপ ঘটনা কিরূপে ঘটিল বাবা?

ওস। সে কথা বুঝিলাম; কিন্তু আয়েষা এখন স্বর্গীয় কতলু খাঁর কন্যা হইয়াছেন। পাঠান-তনয়াকে, বিশেষতঃ কতলু খাঁর কন্যাকে, মোগল সুবেদার বিষয় দখল করিতে দিবে কেন?

বেগ। সে বিষয়ের কোন ব্যাঘাত হইবে না। আয়েষার পিতা আকবর বাদশাহের পরম প্রেমপাত্র ছিলেন, তিনি এ সম্বন্ধে বাদশাহের ফারমান লিখাইয়া লইয়াছিলেন। তাহার অন্যথা করিতে কাহারও সাধ্য নাই। আয়েষা প্রকারান্তরে আকবরেরও পরিচিতা। বাদসাহ-দরবারে ও অন্দরে অনেকেই পরোক্ষ ভাবে আয়েষাকে জানেন।

ওস। এক্ষণে আপনি কি করিতে ইচ্ছা করেন?

বেগ। আমি কিছু ইচ্ছা করি না; তুমি যাহা ব্যবস্থা করিবে, তাহাই হইবে। তবে তোমাকে বলা উচিত, আয়েষা পঞ্জাব যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে।

ওস। কেন?

বেগ। তাহার শরীর ইদানীং ভাল যাইতেছে না। এবার বাঙ্গালা দেশ হইতে আসার পর, পিতার মৃত্যুহেতু শোকেই হউক, বা অন্য কারণেই হউক, আয়েষা সতত চিন্তাকুল। দেখিতেছি আয়েষার আহারে অপ্রবৃত্তি, বসন-ভূষণের পরিপাট্যে অমনোযোগ, সদা অপ্রফুল্ল ভাব। তাহার শরীরও শুষ্ক—মলিন হইতেছে! আয়েষা বলিতেছে, কিছুদিনের জন্য পঞ্জাবে যাইবার অনুমতি পাইলে সে এখন সুখী হয়। বোধ হয় স্থান-পরিবর্ত্তনে তাহার শরীরের উপকার হইতে পারে।

ওস। বড়ই চিন্তার কথা। আয়েষার বিষয়-বিভবের ব্যবস্থা যেরূপে হউক, করিলেও করা যাইতে পারিত। কিন্তু আয়েষা স্বয়ং এ স্থান ত্যাগের অভিলাষিণী। মা, আয়েষা এ পুরী হইতে স্থানান্তরে গমন করিলে, সকলই অন্ধকার হইয়া যাইবে।

বেগ। তুমি আয়েষাকে বড় ভাল বাস। স্বর্গীয় নবাব সাহেব আর আমি কতদিনই

সাধ করিয়াছি, তোমাদের শুভমিলন দেখিয়া নয়ন জুড়াইব। নবাব স্বর্গে গিয়াছেন, অভাগী এখনও আছে। সে সাধ এখনও মিটিল না। কিসে কি হইল জানি না; দেখিতেছি, আয়েষার এই ভাব, তুমিও সর্ব্বদা চিন্তাযুক্ত—অন্যমনস্ক। তুমি আর মহলের মধ্যে প্রবেশ কর না; যে আয়েষাকে সতত দেখিতে চাহিতে, তাহারও কোন সন্ধান লও না। তোমাদের এই ভাব, আমার প্রাণে বড়ই কষ্ট দিতেছে।

ওস। মা, আমার কোন অপরাধ নাই; আমি আয়েষার জন্য জীবন-পাত করিতে সতত প্রস্তুত। কিন্তু মা, বলিব কি, আয়েষা হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়াছে। সে আগুনে সে আপনি পুড়িবে, আমাকে পোড়াইবে, আর আপনাকেও সে জ্বালা ভোগ করিতে হইবে। সে কথা এখন থাকুক। আয়েষার অসুস্থতার কথায় আমি বড়ই চিন্তিত হইলাম। কোথায় আয়েষা,? আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি।

বেগ। এক ঘড়ি পূর্ব্বে এখানেই ছিল। বোধ হয় এখন বাগানের ঘরে গিয়াছে। পঞ্জাব গমন সম্বন্ধে তোমার যেরূপ অভিপ্রায় হয়, তাহা আমাকে কখন বলিবে?

ওস। আমি আয়েষার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার মনের ভাব জানিয়া, আপনার নিকট আমার অভিপ্রায় নিবেদন করিব। এক্ষণে আমি বিদায় হই।

ওসমান উত্থিত হইয়া এবং বিমাতার চরণে যথারীতি সম্মান বর্ষণ করিয়া, ধীরে ধীরে বৃক্ষবাটিকার অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

কালসর্প।

উদ্বেগ-বিষ-জর্জ্জরিত ম্রিয়মাণ ওসমান ধীরে ধীরে বৃক্ষবাটিকায় প্রবেশ করিলেন। কোথায় আয়েষা? বাপীতটে সোপানাবলীর উপর তাঁহার প্রিয় বিশ্রাম স্থান। কিন্তু সেখানে তো আয়েষা নাই। লতা-কুঞ্জে শিলাসনে আয়েষা অনেক সময় একাকিনী বসিয়া থাকেন। কিন্তু কই সেখানেও তো সে রূপের লতিকা এখন নাই। চম্পক বৃক্ষ মূলে পাষাণ-আসনে উপবেশন করিয়া, আয়েষা অনেক সময় বিশ্রাম করেন। কিন্তু কই সেখানেও তো সে চম্পকবর্ণা নবীনা শোভা ছড়াইতেছেন না। বিশাল বকুলপাদপ সমীপে অনেক সময় আয়েষা একাকিনী অবস্থান করেন। কিন্তু কই সেখানেও তো সে সজীব অতুল ফুল ফুটে নাই। গোলাপ-কাননে কখন কখন আয়েষা গমন করিয়া পুষ্প-চয়ন করেন। কিন্তু কই সেখানেও তো সেই সকল কুসুমের শোভা-হারিণী সুন্দরী এখন নাই। তবে কোথায় আয়েষা?

কোন দিকেই কোন লোক নাই। চিন্তিত চিত্তে ওসমান উদ্যান-মধ্যস্থ প্রাসাদাভি-মুখে অগ্রসর হইলেন। একজন বাঁদী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং অতীব সম্মান সহকারে কুর্ণিস করিয়া, নিবে-দন করিল,—"নবাব-কন্যা এই ঘরে আছেন।"

ওসমান অতি সাবধানে ভূ-পৃষ্ঠে পদ-স্থাপন করিতে করিতে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু দ্বার পর্য্যন্ত গমন করিয়াই তিনি মুখ ফিরাইয়া দুই পা পশ্চাতে সরিয়া আসিলেন। আয়েষা একাকিনী—শিথিল-বসনা—নিদ্রিতা।

এরূপ অবস্থায় সে কক্ষে প্রবেশ করা অবৈধ বোধে, ওসমান হটিয়া আসিলেন। কিন্তু কি শোভা! সেই মর্ম্মর প্রস্তর-সমাচ্ছন্ন সুবিস্তৃত কক্ষে, একটী মকমলের উপাধানে মস্তক স্থাপন করিয়া, ভূ-শয্যায় আয়েষা নিদ্রিতা রহিয়াছেন। বিশ্বের সকল শোভা, সৃষ্টির যাবতীয় রমণীয়তা, বিধাতার অপরূপ নির্ম্মাণ-কৌশল সকলই যেন নিদ্রিতা সুন্দরীর দেহে মিলিত হইয়া রহিয়াছে। সুন্দরী একটু ম্লান—কথঞ্চিৎ বিশুষ্ক। তাহাতে কি আয়েষার সৌন্দর্য্যের কিছু লাঘব হইয়াছে? না। দিবাকরের প্রখর আলোকের অপেক্ষা, সুধাংশুর ম্লান সুস্নিগ্ধ রশ্মি যেমন অধিকতর রমণীয়; নাতি স্বচ্ছ আচ্ছাদনের অন্তরালে অবস্থিত সমুজ্জ্বল প্রদীপ্ত আলোক যেমন অতিশয় নয়ন-বিনোদন; আয়েষার রূপরাশিও সেইরূপ একটু ম্লানতার এবং একটু শুষ্কতার আবরণে অধিকতর শোভা বিকাশ করিতেছে। সুষুপ্তা সুন্দরীর কি মোহিনী ভঙ্গিমা!

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে না করিতেই, ওসমান বিগলিত-বেশা শোভাময়ীকে দর্শনমাত্র প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। আর একবার মাত্র সেই হৃদয়-রাজ্ঞীর মাধুর্য্যরাশি না দেখিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া আসিতে তাঁহার সাধ্য হইল না। তিনি দ্বারের বাহিরে থাকিয়াই আয়েষার নিদ্রাচ্ছন্ন ভুবনমোহন কলেবর দর্শন করিবার নিমিত্ত নয়ন-সঞ্চালন করিলেন।

ও কি? আয়েষার বুকের উপর ও কি? নবীনার ঘনকৃষ্ণ-কেশ-রচিত বেণীর ন্যায় সূক্ষ্মাগ্র ও কি পদার্থ আয়েষার দেহের একদিক হইতে অপর দিক পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে? ওসমান সেই পদার্থের একদিক মাত্র দেখিতে পাইলেন। সে দিকের কিয়দংশ শ্বেত পাষাণের উপর নিপতিত; পদার্থ ভূ-পৃষ্ঠ হইতে উঠিয়া, ক্রমে সুন্দরীর বক্ষ-দেশের উপর দিয়া, দেহের অপর দিকে গিয়াছে। অপর দিক ওসমানের চক্ষুতে পড়িল না। পদার্থ সূক্ষ্মাগ্র হইলেও, ক্রমশঃ স্থূলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এ কি সামগ্রী? রজ্জু—কেশরজ্জু কি? এমন ভাবে আয়েষার বক্ষের উপর রজ্জু কেন বিন্যস্ত রহিয়াছে? ওসমান বড়ই চিন্তাকুল হইলেন। শোভা ও সৌন্দর্য্য-দর্শন-স্পৃহা তিরোহিত হইয়া গেল। আশঙ্কায় তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। ত্বরিত দূরে চলিয়া আসিলেন। বাঁদী অদূরে দাঁড়াইয়াছিল। ওসমান তাহাকে নিকটে আসিতে সঙ্কেত করিলেন।

বাঁদী নিকটে আসিলে ওসমান কহিলেন,—"নবাব-কন্যা নিদ্রিতা; আমি ঘরের মধ্যে যাইতে পারিলাম না। তুমি সাবধানে ঘরের মধ্যে যাও, কোন শব্দ না হয়। দেখিয়া আইস, নবাব-কন্যার বুকের উপর কি আছে। শীঘ্র আসিবে, আমি বড় চিন্তিত রহিয়াছি।"

বাঁদী নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিল এবং তৎক্ষণাৎ সভয়ে প্রত্যাগত হইয়া বলিল,—"জাঁহাপনা! কি হইবে। নবাব-কন্যা একটু নড়িলেই সর্ব্বনাশ ঘটিবে! তাঁহার বুকের উপর ভয়ানক কালসর্প।"

ওসমান ক্ষণেক বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তাহার পর পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাইয়া কর যোড়ে ভগবানের করুণা ভিক্ষা করিলেন। তাহার পর চরণের পাদুকা খুলিয়া বাঁদিকে বলিলেন;—তুমি স্থির হইয়া থাক; কোনও শব্দ করিও না।"

নিঃশব্দে ওসমান গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সাক্ষাৎ যমোপম ভয়ানক সর্প আয়েষার পৃষ্ঠ, বাম পার্শ্ব ও বক্ষোদেশ অধিকার করিয়া সুখে বিশ্রাম করিতেছে। আয়েষার হাত পা একটু বিচলিত হইলে, তিনি

একবার পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিলে, তখনই সেই কৃতান্ত ফণা বিস্তার করিয়া আয়েষার সুকোমল কলেবরে দংশন করিবে। কি ভয়ানক!

এখনও ওসমান স্থির বুদ্ধি। তিনি স্থির করিলেন, সর্পদংশনে আয়েষার জীবনের শেষ হইবে! বিষের জ্বালায় ছটফট করিতে করিতে ভুবনের সাররত্ন মহাপ্রস্থান করিবে! বিধাতার এই অতুলনীয় বস্তুর এইরূপে জীবনাবসান হইবে। ওসমান তাহা নীরবে দাঁড়াইয়া দেখিবে। অসম্ভব—অসম্ভব। যদি এই অস্বাভাবিক উপায়ে জীব লীলার পরিসমাপ্তি বিধাতার বাঞ্ছনীয় হয়, তাহা হইলে অগ্রে ওসমানের কঠোর প্রাণ, প্রস্থান করুক। তাহার পর যাহা হয় হইবে।

অতি সতর্কতার সহিত ওসমান সেই কালোপম ভুজঙ্গমের পুচ্ছদেশে হস্ত প্রদান করিলেন এবং চক্ষুর নিমিষে হস্তোত্তোলন করিয়া পিছাইয়া আসিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই কালসর্প যেন বৈদ্যুতিক শক্তি বলে বিচলিত হইয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ফণা বিস্তার করিয়া আবর্ত্তিত হইল। ওসমান আর একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন। সর্প ফণা তুলিয়া ওসমানকে দংশন করিবার অভিপ্রায়ে ধাবিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখ হইতে ভয়ানক শব্দ এবং সূচিকার ন্যায় সূক্ষ্ম যুগল জিহ্বা বার বার নিঃসারিত হইতে লাগিল। ওসমান দেখিলেন, সর্প আয়েষার নিকট হইতে কিছু দূরে সরিয়া আসিয়াছে। তখন তিনি সুশিক্ষিত অহিতুণ্ডিকের ন্যায় কৌশল সহকারে, দংশন সম্ভাবনা বিরহিত দূর স্থানে থাকিয়া, হাত নাড়িতে নাড়িতে সাপকে আরও দূরে সরাইয়া আনিলেন। তার পর সমুচিত সুযোগ বুঝিয়া অত্যদ্ভুত নিপুণতার সহিত সহসা সর্পের মুণ্ড আপনার দক্ষিণ হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরিলেন। এই কথা গুলি বলিতে যত সময় গেল, কার্য্যে তাহার দশ ভাগের এক ভাগ সময়ও লাগিল না। সর্প আপন শরীর দ্বারা ওসমানের দক্ষিণ বাহু সবলে বেষ্টন করিতে লাগিল। অঙ্গুলি সন্নিহিত স্থান হইতে বাহুমূল পর্য্যন্ত সমস্ত হস্ত বহু বেষ্টনে সর্প-দেহাচ্ছন্ন হইয়া গেল।

ওসমান সেই অবস্থায় তথায় জানু পাতিয়া উপবেশন করিলেন এবং সর্প-বেষ্টিত দক্ষিণ বাহু সঙ্গে সঙ্গে বামবাহু ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া বলিলেন,—"খোদা, তোমার মহিমা কে জানে! তুমি আমার ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের দ্বারা আয়েষার ন্যায় ভুবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবের জীবন-রক্ষার উপায় করিয়া দিলে, ইহা তোমার অপার করুণা।"

সর্পের পেষণে ওসমানের বাহুতে যন্ত্রণা হইতে লাগিল। তিনি ধীরে ধীরে নিঃশব্দে বাহিরে আসিলেন।

দ্বার সমীপে এই বাঁদী দাঁড়াইয়া এই সকল ভয়ানক কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিতেছিল। সে, ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে সরিয়া দাঁড়াইয়া, বলিল,—"জাঁহাপনা! ধন্য আপনি! কিন্তু এখন উপায়? সাপ কিরূপে হাত হইতে ছাড়াইতে হইবে?

ওসমান কহিলেন,—"ছাড়াইবার উপায় নাই। এখন ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে না পারিলে ছাড়ান যাইবে না?"

বাঁদী বলিল,—"কাহাকে ডাকিব? আপনি কেমন করিয়া ছাড়াইবেন? আপনার ডাহিন হাত যে বন্ধ।"

ওসমান কহিলেন,—"তা হউক, বোধ হয় আমি বাম হস্তেই ছুরি দিয়া সাপ কাটিয়া ফেলিতে পারিব। কাহাকে ডাকিতে হইবে

না। আর এখানে কেই বা আসিবে? বেগমেরা এ কাণ্ড দেখিলে ভয়ে অস্থির হইয়া পড়িবেন। তুমি আমাকে সাবধানে একখানি ছুরি আনিয়া দিতে পার? কেহই যেন জানিতে না পারে। খুব হুঁসিয়ার। শীঘ্র যাও!"

বাঁদী "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিল। সর্পের পেষণ বড়ই যন্ত্রণা-দায়ক হইয়া উঠিতে লাগিল।

ছুরি লইয়া বাঁদী ফিরিয়া আসিল। ওসমান বলিলেন,—"এ কাণ্ড তোমার দেখিয়া কাজ নাই। তুমি ঘরের মধ্যে নবাব-কন্যার নিকটে যাও। তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিলেও যেন তিনি এ সকল কথা জানিতে না পারেন।"

বাঁদী বলিলেন,—"যে আজ্ঞে। কিন্তু আমি আর একটু জাহাপনার নিকট থাকিলে হইত না? আমার দ্বারা আর কোন কাজের দরকার হইবে না কি?"

ওসমান কহিলেন,—"বোধ হয় আর কোন দরকার হইবে না। যদি কোন প্রয়োজন হয়, আমি তোমাকে ডাকিব। তুমি নবাব-কন্যার নিকট যাও। তাঁহার যেন শীঘ্র ঘুম না ভাঙ্গে। ঘুম ভাঙ্গিলেও তিনি যেন এ সকল ব্যাপারের কোন সংবাদ জানিতে না পান।"

বাঁদী গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল, কিন্তু নবাব সাহেব কি প্রকারে বাহুকে নাগ-পাশ মুক্ত করেন, তাহা দেখিবার কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে পারিল না। সে দ্বারের ভিতর দিয়া সাবধানে ওসমানের কার্য্য দর্শন করিতে লাগিল।

সবিশেষ দক্ষতার সহিত, বাম হস্তে ছুরিকা ধারণ করিয়া, ওসমান সর্পদেহ কর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সে অতি ভয়ানক লোম-হর্ষণ ব্যাপার। তাহার বিস্তারিত বিবরণে প্রয়োজন নাই। সর্প-শরীর বহুস্থানে বিচ্ছিন্ন হইল; কিন্তু কোন খণ্ডই দেহের সহিত নির্লিপ্ত ও স্বতন্ত্র হইল না। পাছে জামার আস্তিন ভেদ করিয়া ছুরিকার তীক্ষ্ণাগ্র তাঁহার দেহে সংলগ্ন হয়, এই ভয়ে ওসমান কোনও কর্ত্তন স্থান সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলেন না। সর্পের রুধিরে তাঁহার পরিচ্ছদের কোন কোন স্থান রঞ্জিত হইল। খণ্ড খণ্ড সর্পদেহ পরস্পর সংলগ্ন থাকিয়া, মালার ন্যায় ঝুলিতে লাগিল। তখনও সেই সকল খণ্ডের কোন কোনটা ভয়ানক ভাবে নড়িতে লাগিল। ওসমান দাঁড়াইয়া ছিলেন। সর্প-দেহ দুলিতে দুলিতে ক্রমে ভূমি স্পর্শ করিল। সকল অংশ কাটা হইল, কেবল মুখের নিকটে কিয়দংশ বাকী রহিল। ওসমান হাতের ছুরি নিঃশব্দে ভূতলে রক্ষা করিয়া, বাম হস্ত দ্বারা সর্পের দোদুল্যমান ছিন্ন বিচ্ছিন্ন দেহ ধারণ করিলেন। তাহার পর বহু দূরস্থিত একটা স্থান লক্ষ্য করিয়া, বিপুল শক্তি সহকারে উভয় হস্তস্থিত সর্প তথায় নিক্ষেপ করিলেন। সেই স্থানে নিপতিত দেহ-সংলগ্ন সর্প-মুণ্ড ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল এবং বার বার বদন-ব্যাদান করিতে থাকিল। অহিরাজের এই দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করিয়া এবং তাহার জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা আপাততঃ অনাবশ্যক বুঝিয়া ওসমান উত্তমরূপে হস্তাদি প্রক্ষালন করিবার বাসনায়, সরোবরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

তিরস্কার।

নবাব-কন্যা আয়েষার নিদ্রাভঙ্গ হইল। বাঁদী তাঁহার সম্মুখে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল এবং তাঁহার ইঙ্গিত ক্রমে অঙ্গের বসনাদি যথাবিন্যস্ত করিয়া দিতে লাগিল। সমস্ত স্থির হইলে, গোলাপসিক্ত আঙ্গোছা লইয়া আসিল। আয়েষা তাহাতে মুখ মুছিলেন; তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মতিয়া, তুমি এখানে কতক্ষণ আছ?"

মতিয়া বলিল,—"যতক্ষণ হুজুর এখানে আছেন, আমি ততক্ষণই এখানে আছি?

আয়েষা বলিতে লাগিলেন,—"আমি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, কে যেন আমাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছিল। তাহার দেহ কি শীতল? তুমি কি আমার গায়ে হাত দিয়াছিলে মতিয়া?"

"আজ্ঞা না।"

"এ ঘরে আর কেহ আসিয়াছিলেন কি?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

"কে আসিয়াছিলেন?"

"নবাব সাহেব।"

আয়েষা কুপিতা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"কি, নবাব সাহেব আসিয়াছিলেন? আমি নিদ্রিত ছিলাম, আমার দেহ ভাল করিয়া আচ্ছন্ন ছিল না। এ অবস্থায় কেন তিনি এখানে আসিলেন? কোথায় তিনি?"

মতিয়া সভয়ে বলিল,—"সকল কথা বলিতে আমাকে নিষেধ আছে। জাঁহাপনা বোধ হয় এখনও বারান্দায় থাকিতে পারেন।"

আয়েষা দাঁড়াইয়া উঠিলেন। সেই ঈষৎ বামহেলিত গ্রীবা ক্রোধ হেতু বড়ই সুন্দর দেখাইতে লাগিল। বিস্তৃত চক্ষুর্দ্বয় আশু নিদ্রাভঙ্গ এবং ক্রোধজন্য একটু রক্তাভ দেখাইতে লাগিল। ঈষৎ দীর্ঘ দেহ যেন একটু চঞ্চল বোধ হইতে থাকিল। রাজ-রাজমোহিনীর কি অপরূপ শ্রী হইল! তিনি বলিলেন,—"সকল কথা বলিতে নিষেধ আছে! তবে কি তিনি ইতর ব্যক্তির ন্যায়, ঘৃণিত অভিপ্রায়ে, নিদ্রাকালে আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন? তবে তিনিই কি আমার অজ্ঞান অবস্থায় আমাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছিলেন? আইস তুমি, চল,— কোথায় তিনি?"

কুপিতা অভিমানিনী আয়েষা চঞ্চল চরণে বাহিরে আসিলেন। মতিয়া তাঁহার অনুসরণ করিল। বারান্দায় ওসমান নাই। আয়েষা বলিলেন,—"এখানে নবাব সাহেব নাই। মতিয়া, দেখ তুমি, কোথায় তিনি।"

মতিয়া একটু অগ্রসর হইয়াই দেখিতে পাইল, ওসমান হস্তাদি প্রক্ষালন করিয়া সরোবরের চত্বরে উপবেশন করিয়াছেন। সে দেখাইয়া দিয়া বলিল,—"জাঁহাপনা সরোবর তীরে।"

আয়েষা সেই দিকে চলিলেন। হয় তো একটা বিষম ব্যাপার ঘটিবে, এ সময়ে তাহার উপস্থিত থাকা অনুচিত বোধে, মতিয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল।

ওসমান, দূর হইতেই আয়েষার অলঙ্কার-শিঞ্জিত শ্রবণ করিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং নবাব-নন্দিনী আর একটু নিকটে আসিলে, প্রথমে কি বলিয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ করিবেন, মনে মনে তাহা স্থির করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার কোন কথাই

বলিতে হইল না। আয়েষা, আর একটু নিকটস্থ হইয়া, ক্রোধ-বিকম্পিত ও উত্তেজিত স্বরে বলিলেন,—"নবাব সাহেব, তোমার এই কাজ? আমি নিদ্রিতা, শিথিল-বসনা, একাকিনী। তুমি এ অবস্থায় কেন আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছ? আমি তোমাকে চিরদিন মহচ্চেতা, হীন-কার্য্যে অশক্ত, মহাপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করি। তুমি কেন আজি আমার বিনানুমতিতে কক্ষে প্রবেশ করিয়া নীচতার পরিচয় প্রদান করিলে?"

ওসমান অধোমুখে ধীর স্বরে বলিলেন,—"আমাকে নিতান্ত দায়গ্রস্ত হইয়া তোমার কক্ষে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক কখনই সেখানে যাই নাই।"

আয়েষা পূর্ব্ববৎ ক্রোধের সহিত বলিলেন,—"তোমার এ ব্যবহার উত্তম। কোনরূপ দায়ে পড়িয়াও, অন্তঃপুরে নিদ্রিতা নারীর কক্ষে, একাকী প্রবেশ করিতে তোমার অধিকার নাই। কেবল প্রবেশ করিয়াই তুমি ক্ষান্ত হও নাই; তুমি আমার অঙ্গস্পর্শ করিয়াছ। ধিক্ তোমাকে!"

ওসমান বলিলেন,—"আয়েষা, তুমি আমাকে অকারণ অসঙ্গত তিরস্কার করিতেছ। তুমি যে সকল গর্হিত আচরণের কথা বলিতেছ, তাহা সম্পাদন করিতে ওসমান চিরদিনই অশক্ত।"

আয়েষা বলিলেন,—"এখনও মিথ্যা কথা কহিতে তোমার লজ্জা হইতেছে না? এখন তুমি স্বয়ং নবাব—পুরীর মধ্যে তোমার ক্ষমতা অসীম। কিন্তু তাই বলিয়া তুমি পুরমহিলাগণের উপর এইরূপ অত্যাচার করিবে, ইহাই যদি স্থির করিয়া থাক, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবে, নবাব সাহেব, তোমার পাপে এই রাজ-সম্পদ্ সকলই রসাতলে যাইবে।"

ওসমান অধোমুখ। বলিলেন,—"আয়েষা, তুমি আমাকে অকারণ তীব্র তিরস্কার করিয়া নিদারুণ মর্ম্ম-ব্যথা দিতেছ। আমি তোমাকে নিদ্রিত ও অসাবধান দেখিয়া, তোমার কক্ষে প্রবেশ করিতে ক্ষান্ত ছিলাম। তোমার বাঁদী দ্বারে ছিল। সে সমস্ত কথা জানে। কিন্তু পরে নিতান্ত দায়-গ্রস্ত ও নিরুপায় হইয়াই আমাকে তোমার কক্ষে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। তখন তোমার অঙ্গস্পর্শ করা দূরে থাকুক, তোমার প্রতি চাহিয়া দেখিতেও আমার সুযোগ ও সুবিধা ছিল না। তোমার তিরস্কারে আমার অন্তর দগ্ধ হউক, অথবা তোমার অবিশ্বাসে আমার জীবন যন্ত্রণার আলয়ই হউক, যে দায়ে পড়িয়া আমাকে তোমার কক্ষে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল, তাহা আমি কখন ব্যক্ত করিব না; তোমার বাঁদীকে তাহা বলিতে বার বার নিষেধ করিয়াছি। আয়েষা, তুমি আমাকে অবিশ্বাস করিয়া এবং নীচ কার্য্যে সক্ষম মনে করিয়া যৎপরোনাস্তি মনস্তাপ দিয়াছ। প্রার্থনা করি ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। কিন্তু তোমার এই অবিশ্বাসে ও দুর্ব্বাক্যে আমার মর্ম্ম-গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে; কবরের মৃত্তিকায় না মিশিলে, এ হৃদয়-জ্বালা বোধ হয় আর কখনও শীতল হইবে না।"

ওসমান, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন।

আয়েষা বলিলেন,—"ওসমান, আমার বাক্যে তুমি অন্তরে বেদনা অনুভব করিতেছ, তাহা আমি বুঝিতেছি। কিন্তু আমার হৃদয়ে, তোমার অদ্যকার এই ব্যবহারে, বড়ই ক্লেশের উদয় হইয়াছে। এ রহস্য ব্যক্ত না করিলে তোমাকে চিরদিন কষ্ট পাইতে হইবে এবং তোমার ন্যায় নির্ম্মল চরিত্র পুরুষকে অবিশ্বাসী

জ্ঞান করিতে হইল বলিয়া, আমারও যাবজ্জীবন অশেষ যাতনা ভোগ করিতে হইবে। ওসমান, কেন তুমি আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলে, এ কথা এখনই তোমার ব্যক্ত করা আবশ্যক।"

ওসমান অনেকক্ষণ অধোমুখে চিন্তা করিলেন। তাহার পর বলিলেন,—"যাহা জীবনে ব্যক্ত করিব না মনে ছিল, তোমার উৎপীড়নে, অনিচ্ছায় তাহা ব্যক্ত করিতেই হইতেছে। তবে আইস আয়েষা, আমার সঙ্গে আইস।"

ওসমান অগ্রসর হইলেন, আয়েষা তাহার সঙ্গে চলিলেন। যেখানে সেই খণ্ডীকৃত সর্প নিপতিত ছিল, তথায় উপস্থিত হইয়া, ওসমান বলিলেন,—"দেখিতেছ আয়েষা, ইহা কি?"

আয়েষা শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"এ যে ভয়ানক কালসর্প! কে ইহাকে ধরিয়া এরূপে কাটিল? এখনও মাথাটা নড়িতেছে যে! ওঃ কি ভয়ানক!"

ওসমান বলিলেন,—"আমি, তোমার মাতার মুখে তোমার অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া, তোমাকে দেখিবার জন্য, আর কোন কোন বিষয়ে তোমার সহিত পরামর্শ-করিবার অভিপ্রায়ে, এখানে আসিয়াছিলাম। কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিবার সময় তোমাকে একাকিনী ও নিদ্রিত দেখিয়াই আমি দ্বার হইতে ফিরিয়া আসি। তোমার দেহের উপর এই সর্প শয়ন করিয়া ছিল। আমি ভাল করিয়া দেখি নাই. এজন্য ইহা সর্প কি অন্য পদার্থ স্থির করিতে না পারায়, তোমার বাঁদীকে ভাল করিয়া দেখিতে বলি। যখন তাহার মুখে কালসর্পের কথা শুনি, তখন আমি হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য হইয়া পড়ি। তুমি একটু অসাবধান হইলেই সর্পাঘাত ঘটিবে, এ চিন্তায় আমি তখন উন্মাদ-প্রায় হই। তখন আমি নিরুপায় হইয়া তোমার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলাম। তাহার পর আমাকে এই সর্প ধারণ করিয়া তাহার এই দশা করিতে হইয়াছে। তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য নিজের জীবনকে বিপন্ন করিতে হইয়াছিল, ইহা অতি তুচ্ছ বিষয়; এজন্য একথা কখন তোমাকে জানাইতে বাসনা ছিল না। কিন্তু তোমার অবিশ্বাস রূপ তীক্ষ্ণ বিষের জ্বালায় সকল কথা বলিতে হইল। আয়েষা, যে তোমাকে ভাল বাসে, সে কখনই ইতর হইতে পারে না।"

তখন আয়েষা আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কাতর স্বরে বলিলেন,—"ধন্য ভগবান্! তোমার করুণার সীমা নাই। তুমি যে আজি ভয়ানক বিপদ হইতে ওসমানের মহামূল্য জীবন রক্ষা করিয়াছ, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য।" তাহার পর সজল নয়নে ওসমানের নিকট আসিয়া, তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন,—"ওসমান, ভাই, তুমি এই সামান্যা নারীর জন্য আপনার এই কর্ম্মময় জীবনকে বিপন্ন করিয়াছিলে? বড়ই অন্যায় কাজ করিয়াছ। এখন বুঝিতেছি, এই সর্পই আমার দেহ বেষ্টন করিয়াছিল; আমি নিদ্রার আবেশে মনে করিয়াছি, কেহ হয় তো আমার দেহ স্পর্শ করিয়াছে। ওসমান, আমার প্রতি চিরদিনই তোমার দয়ার সীমা নাই। আমি না বুঝিয়া তোমাকে অনেক দুর্ব্বাক্য বলিয়াছি। ভাই, দয়া করিয়া আমার সে অপরাধ ক্ষমা করিবে কি?"

আয়েষা সাশ্রুনয়নে ওসমানের চরণে পড়িলেন। অতি যত্নে ওসমান সেই সুন্দরীকে হাত ধরিয়া উঠাইলেন। তাহার পর বলিলেন,—"তোমাকে ক্ষমা! তোমার দুর্ব্বাক্যও

যাহার কর্ণে মধুবর্ষণ করে, সে তোমার তিরস্কার শুনিয়াও রাগ করিতে অশক্ত। সুতরাং ক্ষমার কথা তুমি কেন বলিতেছ? কিন্তু আয়েষা, তুমি যে আমাকে ভ্রমেও অবিশ্বাসী, চরিত্র-হীন, নীচস্বভাব বলিয়া মনে করিয়াছ, আজি আমি মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রতিবাদ করিব।”

আয়েষা নীরবে অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ওসমান বলিতে লাগিলেন,—“তুমি একদিন—মনে পড়ে আয়েষা, বঙ্গদেশে, আমাদের স্কন্ধাবারে, কারাগারের মধ্যে জগৎ-সিংহের প্রতি তোমার হৃদয়-নিহিত প্রবল প্রেমের কথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলে। আমি নীরবে তোমার সেই শেলোপম বাক্য বুক পাতিয়া সহিয়াছিলাম; আজিও নীরবে সেই জ্বালা সহিয়া আসিতেছি। আয়েষা, আজি আমি মুক্তকণ্ঠে, তোমার দুর্ব্বাক্য সমূহের প্রতিবাদ ছলে, আমার প্রেমের কথা ঘোষণা করিব। সমস্ত কথা শুনিয়া, হয় তুমি আমাকে নিদারুণ ঘৃণার নয়নে দর্শন কর, না হয় আমাকে ভাগ্যবান্ মানবগণের অগ্রগণ্য কর। তোমার হস্তে আমার জীবন ও মরণ, সুখ ও দুঃখ ন্যস্ত রহিয়াছে।”

আয়েষা নীরব—অধোমুখ। ওসমান বলিতে লাগিলেন,—“শুন আয়েষা, আমি যদি অত্যাচারী, অবিশ্বাসী; কলুষিতস্বভাব হইতাম, তাহা হইলে তোমার এ তিরস্কার আমাকে কখনই শুনিতে হইত না। আমি ছলে হউক, বলে হউক, তোমাকে কোন্ দিন আমার ভোগের সামগ্রী করিয়া লইতাম। পিতা তোমার সহিত আমার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন, তোমার মাতা তোমার সহিত অদ্যাপি আমার বিবাহ না হওয়ায় দুঃখিতা; সুতরাং তোমাকে বল-পূর্ব্বক আমি গ্রহণ করিলে, কোন ব্যক্তিই আমার নিন্দা করিত না। কিন্তু আমি সে পথে একদিনও চলিবার ইচ্ছা করি নাই কেন? আমি তোমাকে বড় ভালবাসি। এত ভালবাসি যে, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, তোমার চিত্তের অপ্রসন্ন ভাব থাকিতে, তোমাকে মহিষী করিতেও আমার সাধ্য নাই।”

আয়েষা অস্ফুট স্বরে বলিলেন,—“তুমি চিরদিনই আমার প্রতি একান্ত কৃপাবান্।”

ওসমান বলিলেন,—“আমার কথা এখনও শেষ হয় নাই; এক্ষণে তোমার কোন উত্তর শুনিবার আমার প্রয়োজন নাই। তুমি আমার কথা শুনিয়া যাও। আমি এখন নবাব; এই পুরমধ্যে আমার আজ্ঞা অখণ্ড-নীয়, আমার বাক্য প্রতিবাদসম্ভাবনা-বির-হিত। যদি তোমার দেহমাত্রে আমার প্রয়োজন হইত, যদি তোমাকে আলিঙ্গন করিতে পাইলেই আমি চরিতার্থ হইতাম, তাহা হইলে আয়েষা, সে জন্য আমাকে ঘৃণিত চোরের ন্যায় সুযোগ ও অবসর খুঁজিয়া, তোমার দেহ স্পর্শ করিতে হইবে কেন? আমি ইচ্ছা করিবামাত্র, বলপূর্ব্বক, সর্ব্বজনের জ্ঞাতসারে, তোমার দেহ লইয়া ইচ্ছামত ক্রীড়া করিতে পারিতাম। আমি ভ্রমেও সেরূপ কল্পনা করি নাই কেন? আমি তোমাকে বড় ভালবাসি। ভালবাসায় অত্যাচার সম্ভবে কি? তোমার হৃদয় হীন দেহে, প্রণয়-হীন সঙ্গ-সুখে, আসক্তি হীন সাহচর্য্যে আমার কোনই প্রয়োজন নাই। আমার ভালবাসা গভীর—প্রগাঢ়—অনন্ত।”

আয়েষা বলিলেন,—“—“তুমি দেব-স্বভাব, একথা অন্যে যত জানুক বা না জানুক, আমি তাহা বিশেষরূপে জানি। আমি তাহা জানি বলিয়াই, আজি তাহার ব্যভিচার অনুভব করিয়া, মর্ম্মান্তিক ক্লেশ অনুভব করিয়াছিলাম।”

ওসমান বলিতে লাগিলেন,—"কথার এখনও শেষ হয় নাই। আমার পিতার কত মহিষী, তাহার উপর আবার অসংখ্যা উপপত্নী। নবাব বাদশাহদিগের পক্ষে এরূপ সঙ্গিনীর প্রাচুর্য্য গৌরব ভিন্ন নিন্দার কথা নহে। আমার বিবাহ-যোগ্য বয়স অনেক দিন ছাড়াইয়া গিয়াছে। তথাপি আমি বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হই নাই কেন? কেবল তোমাকে লাভ করিবার আশায় ওসমান এ বয়সেও কুমার। যদি তোমাকে না পাই, বুঝিব চির কৌমার্য্য আমার অদৃষ্টের বিধি নিয়োজিত ব্যবস্থা। জগতে রূপসী ও গুণবতী নারীর অভাব নাই। কিন্তু আয়েষা, আর কোন মহিলাকে মহিষী করিবার কল্পনা করা দূরে থাকুক, কাহারও প্রতি নেত্রপাত করিতেও আমার বাসনা হয় না। তোমার রূপে আমার নয়ন ঝলসিয়া গিয়াছে, তোমার গুণে আমি মাতোয়ারা হইয়াছি, তোমার প্রতি ভালবাসায় আমি পাগল হইয়া পড়িয়াছি?"

আয়েষার নয়ন হইতে মুক্তাফল সদৃশ অশ্রু ঝরিয়া ধরণী সিক্ত করিতে লাগিল। ওসমান বলিতে লাগিলেন,—"আরও শুন। আমার জ্যেষ্ঠ বিলাস-সাগরে ভাসমান। রূপসী রমণীগণ মধ্যে তারকা-বেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় তিনি বসিয়া আছেন। সুরা তাঁহার অদম্য ভোগলালসানলে ঘৃত সংযোগ করিতেছে। তাহাতে বিষয়-ব্যাপারে ঔদাসীন্য প্রকাশিত হইলেও, তাঁহার অন্য কোন কলঙ্ক নাই। তোমার নিষ্ফল প্রেমপিপাসায় জীবনকে অসার মরুভূমিতে পরিণত না করিয়া, আমার অনেক শুভানুধ্যায়ী বন্ধু, আমাকে জ্যেষ্ঠের পদানুসরণ করিতে পরামর্শ প্রদান করেন। কি ঘৃণিত মন্ত্রণা! যে তোমাকে দেখিয়াছে, তোমার ঐ মাধুর্য্যময়ী রূপরাশি যাহার হৃদয়ে অঙ্কপাত করিয়াছে, যে তোমাকে বিধাতার শুভ সময়-জাত অসাধারণ সৃষ্টি বলিয়া বুঝিয়াছে, তোমার পুণ্যময়, সর্ব্ব গুণের আধার স্বরূপ মূর্ত্তি যাহার অন্তরে অনপমেয়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে কি কখন পাপে প্রমত্ত হইতে পারে? নীচ-সংসর্গে, ঘৃণিত ভোগে নিমজ্জিত হইয়া, সে কি কখন তোমাকে ভুলিবার কল্পনা করিতে পারে?"

আয়েষা নীরব—অধোমুখে। তাঁহার লোচন-নিঃসৃত বারি তখনও ভূপৃষ্ঠ আর্দ্র করিতেছে। ওসমান তখন জানু পাতিয়া আয়েষার সম্মুখে উপবেশন করিলেন। একদিকে সেই জীবন-বিহীন উৎকট দর্শন সর্পের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন কলেবর, অন্য দিকে নারী-কুলের রাজ্ঞী, সুন্দরীগণের শিরোমণি আয়েষা দণ্ডায়মানা। মধ্যস্থলে পরম শোভাময়, বিশাল বৃক্ষ, বীর-শ্রেষ্ঠ, ওসমান অবনত দেহে অবস্থিত। সেই অবস্থায় বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ওসমান কহিলেন,—"আয়েষা, প্রাণেশ্বরি, হৃদয়দেবি, আমার জীবন-সর্ব্বস্ব, বল—বল—কৃপা করিয়া বল, আমার এই কর্ম্মময়, উৎসাহময় জীবনকে দগ্ধ করা কি তোমার উচিত? আমাকে চিরদিনের নিমিত্ত এইরূপ মর্ম্মপীড়ায় প্রপীড়িত করা কি তোমার ধর্ম্ম? সুন্দরি, এ সংসারে, প্রেমের কি পুরস্কার নাই? ভালবাসার কি প্রতিদান নাই? জীবনের সর্ব্বস্ব দানেরও কি কোন মূল্য নাই?"

তখন আয়েষা অতি সমাদরে ওসমানের হস্ত ধারণ করিলেন। বলিলেন,—"ওসমান তোমার ভালবাসা অতুলনীয়। এ সংসারে যে নারী তোমার ভালবাসা ভোগ করিয়াছে, সে ধন্যা হইয়াছে। যদি এ জগতে প্রেমের পুরস্কার থাকে, তাহা হইলে তাহা তোমারই প্রাপ্য। তুমি দেবতা, আমি অতি সামান্যা

নারী। আমার প্রতি তোমার এ প্রেম নিতান্ত অপাত্র-ন্যস্ত।"

আয়েষা নীরব হইলেন। ওসমান বলিলেন,—"বল, বল, প্রাণেশ্বরি, তোমার কথায় আমার হৃদয়ে অমৃতের উৎস ছুটিতেছে। চুপ করিও না; যাহা বলিতেছ তাহা শেষ কর।"

আয়েষা বলিতে লাগিলেন,—"যদি আমার আত্মদান করিবার সাধ্য থাকিত, তাহা হইলে ওসমান আমি তোমার চরণে বিক্রীতা হইয়া থাকিতাম। কিন্তু হায়! কেন আমি মরি নাই কেন ওসমান তুমি এ অভাগিনীকে সর্পের মুখ হইতে রক্ষা করিলে?

আর কথা আয়েষা বলিতে পারিলেন না। বস্ত্র দ্বারা নয়ন-জল মার্জ্জন করিতে করিতে, তিনি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

ওসমান সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন। তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আপনা আপনি বলিলেন,—"সেই কথা। চিরদিনই সেই এক কঠোর বাক্য। আত্মহত্যা করিব না। রণক্ষেত্রে এ আশার নিবৃত্তি করিব।"

অবনত মস্তকে, কাতর ভাবে, হতাশ ওসমান সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

রাজলক্ষ্মী।

মহারাজ মানসিংহ বহুলোক বেষ্টিত হইয়া পুণ্য-তীর্থ পুরীধামে পুরুষোত্তম দর্শনে আগমন করিয়াছেন। সমুদ্রোপকূলে এক বিস্তীর্ণ-ভূখণ্ডে তাঁহার অবস্থানোপযোগী বহুসংখ্যক পটমণ্ডপাদি সংস্থাপিত হইয়াছে। বস্ত্রাবাস সমূহ নানাবর্ণে সুরঞ্জিত এবং রমণীয় দর্শন। মহারাজ ও তাঁহার পরিজনবর্গের অবস্থানের নিমিত্ত যে সকল বস্ত্রাবাস বিরচিত হইয়াছে, তৎসমস্তের শোভা অতুলনীয়। সেই সকল মণ্ডপ বহুমূল্য বনাতে আবৃত, তাহার উপরিভাগ বিচিত্র স্বর্ণ-কলস এবং কেতন-মালায় সুশোভিত। দাস-দাসী, শরীর-রক্ষক, অশ্বারোহী, হস্তিপ, গোলন্দাজ প্রভৃতি অনুচরগণের নিমিত্ত চারিদিকে বহুসংখ্যক বস্ত্র-গৃহ বিরচিত হইয়াছে। অশ্ব, হস্তী, উষ্ট্র ও বলীবর্দ্ধ প্রভৃতি অসংখ্য পশুর অবস্থানের নিমিত্ত, যথাস্থানে যথাযোগ্য আবাসস্থান নির্ম্মিত হইয়াছে। নানা স্থানে নানারূপ ভাণ্ডার ও পাকশালা স্থাপিত হইয়াছে। প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ পরিমিত ভূখণ্ড অধিকার করিয়া মহারাজার স্কন্ধাবার সংস্থাপিত হইয়াছে। বিন্যাস-কৌশলে তাহা হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মিত অট্টালিকা-সম্পন্ন একটী সুসমৃদ্ধ নগরের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে।

মহারাজের সহিত তিন জন রাণী আসিয়াছেন। তাহারই এক জন যোধ-পুর-সম্ভূতা উর্ম্মিলা! উর্ম্মিলা মহারাজ মানসিংহের প্রধানা মহিষী না হইলেও, প্রধানা প্রণয়-ভাগিনী ছিলেন। মহারাজ মানসিংহের বহুসংখ্যা মহিষী। মহারাজকে বাদশাহের কার্য্যে নানা সময়ে নানা স্থানে গমন ও ভ্রমণ করিতে হইত। মহিষী-মণ্ডলীকে সর্ব্বত্র সঙ্গে লইয়া গমন করা সম্ভবপর হইত না; হইলেও মহারাজ সকলকে সঙ্গে লইতেন না। কিন্তু উর্ম্মিলা তাঁহার নিত্য-সঙ্গিনী! রণক্ষেত্র ও ক্ষণিক স্থানান্তর বাস ব্যতীত, উর্ম্মিলা আর সর্ব্বত্র ছায়ার ন্যায় মহারাজার অবিচ্ছিন্না সহচরী ছিলেন। রাজ্ঞীগণের মধ্যে জগৎ-সিংহের জননী, পদে, মর্য্যাদায় ও গৌরবে সর্ব্ব প্রধানা ছিলেন। কিন্তু তিনি মহারাজার

সহিত সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে ভাল বাসিতেন না; মহারাজাও তাঁহাকে প্রণয় অপেক্ষা সম্মান, আদর অপেক্ষা ভয় করিয়া চলিতেন; এজন্য মহারাজা বঙ্গদেশের সুবেদার হইয়া আসিলে, জগৎসিংহের জননী তাঁহার সঙ্গে আইসেন নাই। পুরুষোত্তমে মহারাজার সহিত আর যে দুই মহিষী শুভাগমন করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত এ উপন্যাসের কোন সম্বন্ধ নাই।

এক সপ্তাহকাল মহারাজ শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান করিবেন স্থির হইয়াছে। দুই দিন অতীত হইয়া গিয়াছে। প্রতিদিন প্রাতে মহিষীগণের সহিত মহারাজ মানসিংহ দেবমন্দিরে গমন করেন। তথায় স্নানাহ্নিক, পূজা, পাঠ প্রভৃতি সমাধা করিতে প্রায় দেড় প্রহর বেলা হইয়া যায়। তাহার পর সহস্র সহস্র মুদ্রা ছড়াইতে ছড়াইতে, মহারাজ ও তাঁহার আনুষাত্রিকগণ বস্ত্রাবাসে প্রত্যাগত হন। প্রতিদিনই মহারাজার নামে সঙ্কল্প করিয়া, বিশেষ সমারোহে জগন্নাথ দেবের পূজা হয়। প্রতিদিন নানা দিগ্‌দেশাগত দরিদ্র ব্যক্তি মহারাজার ব্যয়ে উদর পূরিয়া প্রসাদ ভোজন করে।

পাঠানদিগের সহিত সন্ধি অনুসারে পুরীর অধিকার বাদশাহের হস্তগত হইয়াছে। উড়িষ্যার অন্যান্য ভাগে পাঠানগণ নির্ব্বিবাদে স্বাধীনতা ভোগ করিতেছেন। পাঠানদিগের দ্বারা উড়িষ্যা বিজয়ের পূর্ব্বে, দেব-বংশীয় হিন্দু রাজগণ এই দেশের নরপতি ছিলেন। সেই বংশীয় রামচন্দ্র দেব এক্ষণে বর্ত্তমান আছেন। পুরীর অধিকার হস্তগত হইবামাত্র মহারাজ মানসিংহ, উড়িষ্যার ভূতপূর্ব্ব ভূপালবংশীয় রামচন্দ্র মহারাজ দেবের হস্তে, পুরীর শাসন ও কর্ত্তৃত্ব ভার প্রদান করিয়াছেন। সেই রাজা রামচন্দ্র সম্প্রতি মহারাজার সুখ-সৌকার্য্য ও সর্ব্ব প্রকার প্রয়োজন সাধনে এতই মনোযোগী হইয়াছেন যে, মহারাজার কোন বিষয়েই কোন অসুবিধা ঘটিতেছে না এবং তিনি রাজা রামচন্দ্রের গুণে মোহিত ও তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইয়াছেন।

নবাব সোলেমান বা নবাব ওসমান, তাঁহাদের অধিকার মধ্যে প্রবেশ কালে দূরে থাকুক, মহারাজার পুরী আগমনের পরও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। খাজা ইষা খাঁও আইসেন নাই। তাঁহার নিকট হইতে পত্র লইয়া একজন নবাব কুটুম্ব আসিয়াছিলেন। যে পত্র আসিয়াছিল, তাহার মর্ম্ম এইরূপ,—'উড়িষ্যার নবাবেরা মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারায় দুঃখিত। মহারাজ যে কয় দিন পুরীধামে অবস্থান করিবেন, তাহার মধ্যে কোন না কোন দিন নবাব ওসমান খাঁ, নিজ প্রয়োজনে মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেও করিতে পারেন। মহারাজার যদি কোন পদার্থের অভাব বা প্রয়োজন হয়, নবাবগণ জানিতে পারিলেই তাহার সংকুলান করিয়া দিবেন।' পত্র পাঠ করিয়া মহারাজ সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁহার পত্র পাঠ করিয়াও ওসমান সন্তুষ্ট হন নাই। এ পত্র ওসমানের অভিপ্রায়ানুসারে লিখিত। আগত নবাব কুটুম্বের মুখে মহারাজ শ্রুত হইলেন যে, খাজা ইষা খাঁ কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত। একে প্রাচীন বয়স, তাহাতে কঠিন পীড়া; সুতরাং তাঁহার জীবনের বিশেষ আশা নাই।

পাঠানদিগের পত্র ও ব্যবহার কিঞ্চিৎ অসন্তোষজনক হইলেও, মহারাজ মানসিংহ পুরীধামে পরমানন্দে কালপাত করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মের প্রবল-প্রবাহে তাঁহার হৃদয়ের

অনেক আবিলতা ভাসিয়া গেল। প্রেম ও ভক্তি, দয়া ও শান্তি, অনুরাগ ও আকর্ষণ তাঁহার চিত্তক্ষেত্র নির্ম্মল করিয়া দিল। পাঠানদিগের পত্রের কথা স্মরণ করিয়া মহারাজ সম্প্রতি বিচলিত হইলেন না।

পুরী অবস্থানের তৃতীয় দিবসে, সন্ধ্যার পূর্ব্বে, জগন্নাথ দেবের আরতি দর্শন করিয়া, মহারাজ শিবিরে প্রত্যাগত হইলেন এবং ধীরে ধীরে উর্ম্মিলা দেবীর বস্ত্রাবাসে প্রবেশ করিলেন। বৃহৎ মণ্ডপ, বিবিধ কারু-কার্য্য-খচিত চন্দন কাষ্ঠের আবরণে পরিবেষ্টিত। মণ্ডপের ঊর্দ্ধভাগ স্বর্ণ-সূত্র-সমন্বিত বিচিত্র সূক্ষ্ম চিত্রাদি যুক্ত বস্ত্রে আবৃত। তলদেশ কাষ্ঠাচ্ছাদিত; তাহার উপর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অতি মনোহর গালিচা বিস্তৃত। এই অপূর্ব্ব বস্ত্র-গৃহের মধ্যে রজত-পর্য্যঙ্কে দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যা বিরচিত। যথোপযুক্ত স্থান সমূহে নানাপ্রকার আসন ও শোভন সামগ্রী বিন্যস্ত। গৃহের নানা স্থানে অত্যুত্তম স্ফাটিক সামাদানে বাতি জ্বলিতেছে। বিবিধ সুগন্ধে সমস্ত ঘর আমোদিত। মণ্ডপ জন-শূন্য।

মহারাজ কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্যজনকারিণী ব্যজনী লইয়া আসিল এবং আর এক কিঙ্করী বারিপূর্ণ হৈম ঘট লইয়া উপস্থিত হইল; স্বতন্ত্র এক দাসী তাম্বুল লইয়া আগমন করিল।

মহারাজ ক্লান্তভাবে শয্যায় পড়িয়া গেলেন। জিজ্ঞাসিলেন,—"মহারাণী কোথায়?"

একজন দাসী উত্তর দিল,—"সূপকারিণীর নিকট মহারাজার ভোজনের ব্যবস্থা করিতেছেন। এখনই আসিবেন।"

মহারাজ বলিলেন,—"জল বা পানের এখন প্রয়োজন নাই। তোমরা যাইতে পার একটু জোরে পাখা কর।"

তাম্বুল ও জলবাহিকা প্রস্থান করিল। ব্যজনকারিণী জোরে হাওয়া করিতে লাগিল।

মহারাণী উর্ম্মিলা সেই মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রৌঢ়-বয়স্কা; কিন্তু দেখিলে তাঁহার বয়স ত্রিশ অতিক্রম করিয়াছে বলিয়া কোন মতেই মনে হয় না। মহারাণী একটু খর্ব্বকায়া, কিন্তু বোধ হয় দৈর্ঘ্য আর বেশী হইলে, তাঁহার শোভার হানি হইত। দেহ স্থূল নহে, কিন্তু কোথাও অস্থির বিদ্যমানতা উপলব্ধি হয় না। শরীরের সর্ব্বত্র লাবণ্য ঢল ঢল করিতেছে। পঞ্চবিংশবর্ষ দেশীয়া যুবতীর দেহে যে লাবণ্য পরিদৃষ্ট হয়, মহারাণীর দেহ সেই লাবণ্যে সমুজ্জ্বল। শরীরের বর্ণ স্বর্ণের ন্যায়; হাত পা দিয়া রক্ত ফুটিয়া পড়িতেছে। চক্ষু এখনও যুবতীর ন্যায় উজ্জ্বল। ললাটে রেখা মাত্র নাই। কেশরাশি কবরী বদ্ধ ও ঘনকৃষ্ণ। ভগবৎ-প্রদত্ত এই রূপরাশি সংবর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত, মহারাণীর আর কোন কৃত্রিম আয়াস অবলম্বন না করিলেও ক্ষতি হইত না; কিন্তু উর্ম্মিলা দেবী তৎসম্বন্ধেও যথেষ্ট যত্নবতী ছিলেন। তাঁহার কবরীর সহিত মুক্তমালা বিজড়িত। কবরীর উর্দ্ধভাগ হইতে বাম ললাটে হীরক-খচিত ঝাপটা বিলম্বিত। কর্ণদ্বয়ে চুণী পান্না ও মুক্তা সমন্বিত দুল, কণ্ঠে মহার্ঘ মুক্ত মালা, প্রকোষ্ঠে মণিমালা সমাবৃত ছন্দ, বাহুতে মনোহর বিজোটা, দেহের অন্যান্য স্থানে যথোপযুক্ত ভূষণ, চরণে শব্দায়মান মঞ্জীর। তাঁহার পরিধান অতি সূক্ষ্ম সৌবর্ণ তাসের ঘাঘরা, উর্দ্ধ দেহে মৌক্তিক মণ্ডিত পীতবর্ণ কাঁচলী, তাহার উপর বিরল বিনিবিষ্ট কৃত্রিম হৈম কুসুম সমাবৃত সুচিক্কণ ওড়না। উর্ম্মিলা দেবী হাস্যময়ী, প্রসন্ন-বদনা ও পরিহাস-নিপুণা।

শোভা ও সৌন্দর্য্য ছড়াইতে ছড়াইতে

মহারাণী উর্ম্মিলা সেই মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু তিনি একাকিনী নহেন। তাঁহার পশ্চাতে আর এক পরমাসুন্দরী যুবতী। যুবতী অবনতবদনা, ধীরা ও গতি-মন্থরা।

পশ্চাতের নম্র-বদনা নবীনাকে মহারাজ দেখিতে পাইলেন না। তিনি বলিলেন,—"কিয়ৎকাল এই ভুবনমোহিনীকে দেখিতে না পাওয়ায় যে ক্লেশ, বোধ হয় একরাত্রি উপবাস করিয়া থাকা তাহার অপেক্ষা অনেক ভাল।"

মহারাণী বলিলেন,—"যে দুষ্ট খাওয়া-দাওয়া ভুলিয়া কেবল খেলা করিতেই চাহে, তাহাকে সাজা দেওয়াই উচিত। সেই সাজা দিবার জন্যই এত দেরী করিয়া আসিয়াছি।"

মহারাজ বলিলেন,—"কিন্তু সুন্দরি, যে ভাগ্যবান্ তোমার অধরসুধা পান করিয়া অমর হইয়াছে, তাহাকে অন্য খাদ্য দিবার প্রয়োজন কি?"

উর্ম্মিলা বলিলেন,—"যত বুড়া হইতেছ, ততই যে রস বাড়িয়া উঠিতেছে।"

মানসিংহ বলিলেন,—"তাহারও হেতু আছে। তোমার যত বয়স বাড়িতেছে, ততই তুমি বুড়ী না হইয়া কুঁড়ী হইতেছ। কাজেই এ বয়সে এমন রসবতী কুঁড়ী দেখিয়া, রস আপনি কাণায় কাণায় হইয়া উঠে।"

মহারাণী দেখিলেন মহারাজ ক্রমেই কথা বড় গাঢ় করিয়া তুলিতেছেন, তাই একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন। মহারাণীর পশ্চাদ্বর্ত্তিনী নবীনা মহারাজার নয়নপথ-বর্ত্তিনী হইলেন। মহারাজ সাগ্রহে জিজ্ঞাসিলেন,—"এ বালিকা কে?"

মহারাণী বলিলেন,—"ইনি আমার বহুদিনের পরিচিতা এক বয়স্যার কন্যা। মহারাজকে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন।"

নবীনা গলায় কাপড় দিয়া মহারাজের চরণে প্রণাম করিলেন; তাঁহার পদ-ধূলি লইয়া মাথায় দিলেন। চক্ষু একটু জলভারাকুল হইল; কেহ তাহা লক্ষ্য করিতে পারিল না। তিনি আবার নিতান্ত নতমুখে মহারাণীর নিকট সরিয়া আসিলেন।

মহারাজ কহিলেন,—"বড় লক্ষ্মী মেয়ে। আকার প্রকার সকলই অতি সুন্দর। তুমি ইহাকে কোথায় পাইলে?"

মহারাণী বলিলেন—"মাতার সহিত ইনিও পুরুষোত্তম দর্শনে আসিয়াছিলেন। আজি মধ্যাহ্নে আমার বয়স্যা, কন্যা সঙ্গে লইয়া, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। মাতা বিদায় লইয়া প্রস্থান করিয়াছেন। কন্যাকে আমি যাইতে দিই নাই! কিছু দিন সঙ্গে রাখিব স্থির করিয়াছি।"

মহারাজ বলিলেন,—"বেশ স্থির করিয়াছ। বড় সুশীলা কন্যা। নিতান্ত কোমল-স্বভাবা। বড় ভাগ্যবতীর ন্যায় লক্ষণযুক্তা। এ কন্যার বিবাহ হইয়াছে?"

উর্ম্মিলা বলিলেন,—"হইয়াছে। সে সম্বন্ধে আমি মহারাজের নিকট একটা নালিস করিব; কিন্তু আজি থাক, আর একদিন সে কথা হইবে।"

মহারাজ বলিলেন,—"তোমার যেরূপ অভিরুচি। কন্যাকে যত্নে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছ তো?"

উর্ম্মিলা বলিলেন,—"করিয়াছি।"

মহারাজ শয্যায় পড়িয়া বলিলেন,—"ওঃ বড় গরম।"

উর্ম্মিলা আর একজন ব্যজনকারিণী ডাকিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইলেন। সেই পর্য্যঙ্ক-পার্শ্বে আর এক খানি পাখা পড়িয়াছিল। নবীনা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া,

সেই পাখা লইয়া মহারাজকে বাতাস করিতে লাগিলেন। মহারাজ বলিলেন,—"তুমি কেন মা, দাসীরা আসিতেছে। হাতে বেদনা হইবে।"

নবীনা অতি মধুর স্বরে বলিলেন,—"আপনার সেবা করিতে পাওয়া আমার ভাগ্য।"

মহারাজ উর্ম্মিলাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"এ কন্যার নাম কি?"

মহারাণী বলিলেন,—"রাজলক্ষ্মী।"

মানসিংহ বলিলেন,—বেশ নাম। বাস্তবিকই ইনি রাজলক্ষ্মী। এ লক্ষ্মী যাহার ঘরে গিয়াছেন, সে লক্ষ্মীযুক্ত রাজা হইবে সন্দেহ নাই।"

দুইজন দাসী আসিল। মহারাজ বলিলেন,—"মা, তুমি পাখা দেও, উহারা বাতাস করুক। তোমার কষ্ট হইবে।"

রাজলক্ষ্মী বলিলেন,—"কষ্ট হইতেছে না। আপনার অসন্তোষভয়ে পাখা ছাড়িয়া দিতেছি।"

রাজলক্ষ্মী আবার ধীরে ধীরে আসিয়া উর্ম্মিলার পশ্চাতে দাঁড়াইলেন।

মহারাণী জিজ্ঞাসিলেন,—"এক্ষণে আহারের উদ্যোগ করা হইবে কি? রাত্রি হইয়াছে।"

মানসিংহ বলিলেন,—"তোমার ইচ্ছা।"

উর্ম্মিলা দেবীর হাত ধরিয়া রাজলক্ষ্মী অস্ফুটস্বরে বলিলেন,—"মা, আজ্ঞা দিউন—আমি আহারের উদ্যোগ করিতে যাই।"

উর্ম্মিলা মহারাজার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা, যাও তুমি। আমিও এখনই যাইতেছি।"

রাজলক্ষ্মী প্রস্থান করিলেন। কিয়ৎকাল পরে উর্ম্মিলার সহিত মহারাজ মানসিংহও ভোজন-মণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, রাজলক্ষ্মী সমস্ত বিষয়েরই অতিশয় সুব্যবস্থা করিয়াছেন। মহারাজ অত্যন্ত প্রীত হইলেন।

সেই দিন অবধি রাজলক্ষ্মী বিবিধ-বিধানে মহারাজের সেবা ও পরিচর্য্যায় নিযুক্তা হইলেন। মহারাজ পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়াই রাজলক্ষ্মীর সন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজলক্ষ্মী যে কার্য্য করিতেন তাহাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত ও মহারাজের সম্পূর্ণ সন্তোষ-জনক হইত। সুতরাং সকল শুশ্রূষার জন্য মহারাজ রাজলক্ষ্মীর উপরই নির্ভরই করিতে লাগিলেন। তিন দিন পরে এমন হইয়া উঠিল যে, রাজলক্ষ্মী যে কর্ম্ম সম্পাদন না করিতেন, মহারাজ তাহাতে প্রীত হইতেন না এবং তাঁহার প্রয়োজনীয় যে কার্য্য রাজলক্ষ্মী সম্পন্ন করিয়াছেন শুনিতেন, মহারাজ তাহাই উত্তম ও সুসম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়া লইতেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

ন্যায়পরতা।

বৃদ্ধ, সুবিজ্ঞ, পাঠান-মন্ত্রী খাজা ইষা খাঁ কালগ্রাসে পতিত হইলেন। সামান্য জ্বর ও তৎসহ উদরাময় রোগে অতি অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার জীবনান্ত ঘটিল। সোলেমান ও ওসমান নবাব-দ্বয় খাজা ইষাকে যথেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন। অতিশয় সমারোহে প্রবীণ মন্ত্রীর সমাধি সম্পন্ন হইয়া গেল। তাঁহার স্থানে খিজর খাঁ মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত হইলেন।

নূতন মন্ত্রীর বয়স চল্লিশ অতিক্রম করে নাই; তিনি সাহসী ও সময়প্রিয়। খিজর খাঁ নবাব ওসমান খাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার সহিত ওসমানের অনেক বিষয়েই মতের ঐক্য হইত; এই জন্যই ওসমান তাঁহাকে এই সম্মানিত পদ প্রদান করিলেন।

সোলেমান ও ওসমান পরস্পর বিভিন্ন-ভাবাপন্ন ছিলেন, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। খাজা ইসার পরলোক গমনের পর দুই নবাব পরামর্শ করিয়া অবধারণ করিলেন যে, অতঃপর রাজকার্য্যের ভার মন্ত্রীর হস্তে ন্যস্ত রাখিবার প্রয়োজন নাই; ওসমান স্বয়ং সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। সোলেমান বিষয় কর্ম্মে অনভিজ্ঞ এবং তিনি তাহার ভার গ্রহণে অনিচ্ছুক। ভোগবিলাসে প্রমত্ত থাকিতে পাইলে এবং তাহার উপকরণ সমস্ত অব্যাঘাতে প্রাপ্ত হইলেই তিনি চরিতার্থ হইবেন। ওসমান রাজকীয় ব্যাপারের যে ব্যবস্থা করিবেন, তাহার বিরুদ্ধে তিনি কোন কথা কহিবেন না।

এই ব্যবস্থানুসারে কার্য্য চলিতে আরম্ভ হইল। নবাব ওসমান খাঁর নামে রাজ্যের বিধি, ব্যবস্থা, শাসন পালন নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। তাঁহার সহী ও নাম সংযোগে রাজাজ্ঞা সমূহ প্রচারিত হইতে থাকিল।

এই সকল বার্ত্তা মহারাজ মানসিংহের গোচর করা হইল। পুরুষোত্তমে নবাব দূত আসিয়া এই সকল সংবাদ বঙ্গ-বিহারের সুবেদারের গোচর করিয়া গেল। নবাব ওসমানের প্রেরিত এক পত্রও সে মানসিংহকে প্রদান করিল। এই সকল পরিবর্ত্তনের সংবাদ মানসিংহ অবিলম্বে দিল্লীতে বাদশাহের নিকট প্রেরণ করিলেন।

মানসিংহ পুরুষোত্তমে এক সপ্তাহ মাত্র থাকিবেন স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু দশদিন অতীত হইয়া গেল, এখনও তাঁহার শিবির উঠাইবার আদেশ প্রচারিত হইল না; অথবা সে সম্বন্ধে তাঁহাকে কাহারও নিকট কোন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে শুনা গেল না।

রামচন্দ্রের সহিত মানসিংহের এ কয়দিন পুনঃ পুনঃ উড়িষ্যার শাসনাদি বিষয়ের নানা কথায় আলোচনা হইতেছে। তাঁহারা নির্জ্জনে আলাপ করিয়া স্থির করিয়াছেন, ওসমান খাঁ বর্ত্তমান সন্ধির নিয়ম যে অধিক দিন পালন করিবেন, এরূপ বোধ হয় না। এক তো নবাবের প্রকৃতি নিতান্ত দুর্দ্দমনীয়, তাহাতে আবার তিনি অতিশয় তেজস্বী; সুতরাং এরূপ ব্যক্তির পক্ষে ধীরভাবে আপনার অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা কখনই সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ মহারাজ মানসিংহের সহিত তিনি সম্প্রতি যে সকল উদ্ধত ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে ভাবী বিসংবাদের লক্ষণ সূচিত হইতেছে। তিনি মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই; মানসিংহের প্রেরিত পত্রের বাঞ্ছনীয় সদুত্তর দেন নাই; মানসিংহের সুবিধা-অসুবিধার কোন সন্ধান করেন নাই এবং মানসিংহ ও তাঁহার সঙ্গিগণের অভাব ও প্রয়োজন সম্বন্ধে কোনই অনুসন্ধান করেন নাই। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, বাদশাহের প্রীতি ও অনুরাগ তিনি প্রার্থনা করেন না, মানসিংহের বিরাগ তিনি গ্রাহ্য করেন না এবং আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় করিতে তিনি ইচ্ছা করেন না। বর্ত্তমান সন্ধির পূর্ব্বে মানসিংহ যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত ছিলেন না; কিন্তু এখন তিনি যুদ্ধার্থ সম্যক্ প্রস্তুত আছেন। তবে সন্ধি ভঙ্গ না করিয়া যুদ্ধের প্রবর্ত্তক তিনি হইবেন না। পাঠানগণ সন্ধি

ভঙ্গ না করিলে, মানসিংহ কদাপি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না, ইহাই তাঁহার সংকল্প।

অদ্য নবাব ওসমান খাঁ পুরী আগমন করিবেন এবং মহারাজ মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। সম্মান প্রদর্শনার্থ সাক্ষাৎ করিতে তিনি মহারাজার নিকট আসিতেছেন না। সেরূপ অভিপ্রায় হইলে তিনি পূর্ব্বেই আসিতেন এবং তাহার ব্যবস্থা অন্যরূপ হইত। নবাব সাহেব সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন, স্বকীয় বিবিধ প্রয়োজনে, তিনি অদ্য মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

অপরাহ্নকালে মহারাজ মানসিংহ দরবার মণ্ডপে উপবিষ্ট। পাত্র-মিত্র ব্যতীত, মহারাজ রামচন্দ্র দেবও তথায় উপস্থিত। এখনই নবাব ওসমান তথায় আগমন করিবেন।

নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইবামাত্র দামামা বাজিল, তূর্য্যধ্বনি হইল। মহারাজ মানসিংহ স্বগণ সহ মণ্ডপ-দ্বারে উপনীত হইলেন। নকিব ফুকরাইল। তৎক্ষণাৎ নবাব ওসমান খাঁ সকলের সম্মুখীন হইলেন। মহারাজ তাঁহাকে বিহিত শিষ্টাচারাদি সহ অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার নিমিত্ত বিচিত্র সিংহাসন স্থাপিত ছিল। নবাব সাহেব তাহাতে উপবেশন করিলেন।

কি সুন্দর ও সৌম্য মূর্ত্তি! একটু চিন্তিত, একটু সন্দিগ্ধ, সুতরাং একটু ম্লান ভাব হইলেও, ওসমানের মূর্ত্তি কি শোভাময়। অতি সুন্দর পরিচ্ছদে নবীন নবাবের দেহ-সমাচ্ছন্ন। বামপার্শ্বে মুক্তা ও হীরক খচিত কোষমধ্যে অসি ভূপৃষ্ঠ স্পর্শ করিতে করিতে দুলিতেছে। মস্তকে অতি শোভাময় উষ্ণীষ।

নবাব-পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাস্থ্য ও কুশল-বিষয়ক প্রশ্নাদির পর, মহারাজ মানসিংহ পরলোকগত ঈষা খাঁর পীড়া, মৃত্যু ও সমাধি প্রভৃতি বিষয়ে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার পর লোকান্তরগত মন্ত্রীর নানাপ্রকার সুখ্যাতি করিয়া কহিলেন,—"আমার মনে ছিল না যে, উড়িষ্যায় আসিয়া উড়িষ্যার নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইব। নবাবের এ আগমন আমার অশেষ সৌভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে।"

মহারাজের এ শ্লেষপূর্ণ বাক্য ওসমানের হৃদয়ে বিদ্ধ হইল। তিনি একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন,—"মহারাজ প্রকৃত কথাই বলিয়াছেন। আমাদিগের প্রতি কৃপা থাকিলে, বা আমাদের দর্শনার্থ আগ্রহ থাকিলে, মহারাজ নিশ্চয়ই দর্শন দিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করিতেন; আত্মীয় ব্যক্তির দর্শন লাভ সৌভাগ্যের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। আত্মীয় মধ্যে পরিগণিত হইবার স্পর্দ্ধা আমাদের নাই। তাহা থাকিলে, আমরা হাজির থাকিবার জন্ত হুকুম পাইতাম না। যাহারা হুকুমের দাস, তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ সৌভাগ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।"

মানসিংহের উক্তির পূরা—পূরার অপেক্ষাও একটু বেশী, উত্তর হইয়া গেল। উত্তর অস্পষ্ট নহে, শ্লেষপূর্ণ বা দ্ব্যর্থ নহে। মানসিংহ একটু বিরক্ত হইলেন; স্পষ্ট কথাই বলিবেন স্থির করিলেন। বলিলেন,—"হুকুমের দাসও কখন কখন পরমাত্মীয় হইয়া থাকে। সে তাহার গুণ ও দক্ষতা। নবাব অধীনতা স্বীকার করিয়াছেন; এক্ষণে আত্মীয় হওয়া না হওয়া তাঁহার ইচ্ছাধীন।"

ওসমান বড়ই দুঃখিত হইলেন। তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। স্পষ্টই তাঁহাকে মুখের উপরই হুকুমের দাস বলা হইল। তিনি অনেক ক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইলেন। তাঁহার সহিষ্ণুতা অসীম; তেজস্বিতা, সাহস,

বীরত্বও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। এ সকল মহদ্‌-গুণের সহিত সহিষ্ণুতার চিরবিরোধিতা হওয়াই সম্ভব। কিন্তু ওসমানের হৃদয়ক্ষেত্রে বিরোধী গুণনিচয়ও স্বচ্ছন্দে বর্ত্তমান হইত। আয়েষার সহিত প্রেম-ব্যাপারে ওসমান অসাধারণ-সহিষ্ণুতার পরিচয় নিয়তই দিয়া আসিতেছেন। এস্থলে অসাধারণ ধৈর্য্য সহকারে ওসমান স্থির হইয়া রহিলেন। অনেক ক্ষণ পরে তিনি উত্তর দিলেন,—"বঙ্গের সুবেদার মানসিংহ বাহাদুর, আমি আপনার সহিত বিবাদ করিতে আসি নাই। আপনার ন্যায় ব্যক্তির সহিত আমার বাগ্‌বিতণ্ডা শোভা পায় না। অনেকগুলি গুরুতর বিষয়ে আপনার সহিত পরামর্শ করিতে আমার বাসনা ছিল। তাহাতে উভয় পক্ষেরই ইষ্টানিষ্টের সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আপনি আজি যেরূপ ভাবে কথাবার্ত্তার সূত্রপাত করিয়াছেন, তাহাতে আপনার সহিত সে সকল পরামর্শ [illegible]রা আমি আর যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া মনে করিতছি না। আমি এখনই আপনার শিবির [illegible]ইতে চলিয়া যাইতে পারিতাম; কিন্তু বিদায়-গ্রহণ করার পূর্ব্বে একটী কথা আপনাকে জানাইতে আমি বাধ্য। বিষয়টী আমাদের পারিবারিক, তাহা ব্যক্ত করা আমাদের পক্ষে লজ্জাজনক। কিন্তু ধর্ম্ম, বিবেক, ন্যায়পরতা, সকলই আমাকে শতমুখে তাহা আপনাকে জানাইবার নিমিত্ত উত্তেজিত করিতেছে। এই জন্যই তাহা ব্যক্ত করা আমার প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। আপনি তাহা এক্ষণে শ্রবণ করিতে প্রস্তুত আছেন কি?"

মহারাজ কহিলেন,—"আপনি যাহা ব্যক্ত করিবেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার আপত্তি নাই; আপনার সহিত কোনরূপ বিরোধ করাও আমার অভিপ্রেত নহে। আমি আপনাকে বুঝাইয়া দিতে পারি যে, আপনি আমার সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিলে বুদ্ধিমানের কার্য্য করিতেন।"

ওসমান বলিলেন,—"সে সকল কথা এখন থাকুক। আমি আর সে সকল অপ্রীতিকর বাক্যের আলোচনায় ইচ্ছুক নহি। আমি আপাততঃ আপনাকে একটী বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি। আপনি আপনার পুত্র জগৎসিংহকে যাবজ্জীবনের নিমিত্ত বন্দী করিয়াছেন। যে সকল কারণে সেই বীরকে আপনি দণ্ড প্রদান করিয়াছেন, আমি শুনিয়াছি, নবাব-নন্দিনী আয়েষার প্রতি প্রণয়-প্রকাশ তাহার মধ্যে অন্যতম হেতু। একথা কি সত্য?"

মানসিংহ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন,—"নবাব-কন্যা আয়েষার প্রতি অনুরাগ ও তাঁহার হৃদয়ে প্রেম উৎপাদন জগৎসিংহের একটা গুরুতর অপরাধ বটে। কিন্তু সে জন্যই তাঁহার দণ্ড হয় নাই। তিনি অবাধ্য, রাজকর্ম্মে অমনোযোগী এবং বিরোধিগণের সহিত আত্মীয়তা-সূত্রে বদ্ধ। এই সকল গুরুতর অপরাধ হেতু তাঁহার প্রতি দণ্ড প্রয়োগ করা হইয়াছে।"

ওসমান বলিলেন,—"তাঁহার প্রতি দণ্ডের যৌক্তিকতা বা তাঁহার কৃত কর্ম্মের বৈধতা ইত্যাদি কোন বিষয়ে কোন কথাই বলিতে আমার অধিকার নাই। সে সকল বিষয় আমি জ্ঞাত নহি; সুতরাং সে সকল প্রসঙ্গ শুনিবার বা তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলিবার আমার প্রয়োজন নাই। জগৎসিংহ আমার শত্রু। নানা কারণে আমি তাঁহার হিতৈষী নহি। কিন্তু আমি নীচ ব্যক্তির ন্যায় অকারণ শত্রুর অধঃপতন দেখিতে ইচ্ছা করি না, বা নিরপরাধে কাহাকেও লাঞ্ছিত দেখিয়া সুখী

হই না। এই জন্যই আপনার নিকট পারিবারিক রহস্য ব্যক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছি।”

মানসিংহ বলিলেন,—“আপনার অভিপ্রায় কি, স্পষ্টরূপে প্রকাশ করুন।”

ওসমান বলিলেন,—“আয়েষার প্রণয় সম্বন্ধে জগৎসিংহ সম্পূর্ণ নিরপরাধ। আমি নিশ্চয় জ্ঞাত আছি, জগৎসিংহ বাক্যে বা ব্যবহারে, ছলে বা কৌশলে, কোন দিন আয়েষার প্রতি প্রণয় প্রকাশ করেন নাই। আয়েষা স্বতই তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী। জগৎসিংহ সে কথা আয়েষার মুখ হইতে শ্রবণ করিয়াও, কোন দিন সে অনুরাগের প্রশ্রয় দেন নাই; কোন দিন একটা প্রণয়-সূচক বাক্যে আয়েষার উৎসাহ বর্দ্ধন করেন নাই। জগৎসিংহ আমার পরম শত্রু হইলেও, সত্যের অনুরোধে, ন্যায়ের অনুরোধে, ধর্ম্মের অনুরোধে, আমি এ কথা, আপনাকে জানাইতে বাধ্য। সেই কর্ত্তব্য পালন করিয়া অদ্য আমি হৃদয়ের ভার লঘু করিলাম।”

মানসিংহ কহিলেন,—“তবে আপনি দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে জগৎসিংহকে আহ্বান করিয়াছিলেন কেন?”

ওসমান একটু লজ্জার হাসি হাসিয়া বলিলেন,—“সে সংবাদও আপনি জ্ঞাত আছেন? উত্তম। আয়েষা আমার জীবনের ধ্রুবতারা! আয়েষাকে লক্ষ্য করিয়াই আমি বাঁচিয়া আছি। কিন্তু আয়েষার হৃদয় জগৎসিংহে পূর্ণ; সে হৃদয়ে এ অভাগার জন্য একটুও স্থান নাই। সুতরাং জগৎসিংহ আমার বধ্য—পরম শত্রু। জগৎসিংহের নাম জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইলে হয় তো আয়েষার শূন্য হৃদয়ে আমার একটু স্থান হইবে, ইহাই আমার শেষ আশা। সেই আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আমি জীবিত আছি। জগৎসিংহকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাভূত করিতে পারি নাই। অন্য সুযোগে তাঁহাকে বিনাশ করাই আমার সঙ্কল্প। জগৎসিংহের যাবজ্জীবন কারাবাসেও আমার বাসনা সিদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই। তিনি জীবিত থাকিলে, আয়েষা তাঁহাকে ভুলিবেন বলিয়া কোন আশা করা যায় না। জগৎসিংহের মৃত্যুই আমার বাঞ্ছনীয়।”

মানসিংহ বলিলেন,—“আপনার শত্রুতা বড়ই অদ্ভুত। আপনি শত্রুর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ প্রক্ষালিত করিয়া, তাঁহার নির্দ্দোষতা সপ্রমাণ করিতে চাহেন; অথচ তাঁহার মরণ দেখিবার নিমিত্ত সতত ব্যাকুল।”

ওসমান বলিলেন,—“ধর্ম্মের শাসন ও স্বার্থের প্রয়োজন এই প্রবৃত্তির বশবর্ত্তীতায় আমি আপনার বিচারে অদ্ভুত রূপে প্রতীত হইতেছি। কিন্তু সে কথায় আর কাজ নাই। আমার বক্তব্যের শেষ হইয়াছে। আমি এক্ষণে বিদায় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি।”

মানসিংহ বলিলেন,—“রাজকীয় ব্যাপারের দুই একটা কথা বলিবার ও বুঝিবার আবশ্যক ছিল; আপনাকে আতিথ্য সৎকারে সৎকৃত করিবার বাসনা ছিল।”

ওসমান খাঁ আসন ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—“রাজকীয় ব্যাপারের মীমাংসা পত্র ও দূত প্রেরণের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারিবে। আর আতিথ্যের কথা; যাহারা হুকুমের দাস তাহাদের সহিত সে শিষ্টাচার প্রকাশ না করিলেও বিশেষ ক্ষতি হইবে না। আমি এক্ষণে বিদায় হইতেছি।”

সকলকে সেলাম ও আপ্যায়িত করিয়া নবাব ওসমান খাঁ মণ্ডপ হইতে নিক্রান্ত হইলেন।

মহারাজ মানসিংহ, রাজা রামচন্দ্র ও অন্যান্য পাত্রমিত্রগণকে বলিলেন,—মোগল

পাঠানের সন্ধির অবসান হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই।"

মানসিংহ একটু উদ্বিগ্ন চিত্তে সভা ভঙ্গ করিয়া জগন্নাথ দেবের আরতি দর্শনার্থ যাত্রার উদ্যোগে ব্যাপৃত হইলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

মানসিংহ উড়িষ্যা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। স্বর্ণগড় দুর্গে নবাব ওসমান খাঁর নিকট সকল সংবাদ আসিয়াছে। নবাব-বাদশাহদিগের গুপ্তচর বোধ হয় বৃক্ষ-প্রস্তরের মধ্যেও বাস করে।

নবাব একদিন মহারাজ মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সাক্ষাতের ফল বোধ হয় কোন পক্ষেরই সন্তোষজনক হয় নাই। পাঠানগণ মনে করেন, নবাব যখন মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পুরী গমন করিয়াছিলেন, তখন মহারাজেরও উড়িষ্যা ত্যাগের পূর্ব্বে নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করা উচিত ছিল; মহারাজ তাহা করেন নাই; সুতরাং পাঠানগণ যে মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন, এ কথা বলাই বাহুল্য।

নবাব ওসমান খাঁ স্থির করিয়াছিলেন, অচিরে সন্ধি ভঙ্গ করিতে হইবে। এরূপ অপমানজনক ব্যবহার সহ্য করিয়া সন্ধি রক্ষা করা অসম্ভব। তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন, সহজ দৃষ্টিতে সাধারণে পাঠানগণকেই সন্ধি-ভঙ্গকারী বলিয়া ঘোষণা করিবে; কিন্তু তাঁহারা জানেন, প্রকৃত প্রস্তাবে মহারাজ মানসিংহই সন্ধি উচ্ছেদকারী।

নবাব যুদ্ধের নিমিত্ত আয়োজনে ব্যাপৃত হইয়াছেন। যুদ্ধে জয় হউক বা না হউক, তিনি যুদ্ধ না করিয়া মোগলদিগের এই প্রাধান্য নীরবে সহ্য করিবেন না। নবাব ওসমান এই ব্যাপারে বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার নূতন মন্ত্রী খিজর খাঁ এই উদ্দেশ্য-সাধনের নিমিত্ত প্রভূত পরিশ্রম করিতেছেন।

দুর্গের এক নিভৃত কক্ষে বসিয়া ওসমান একাকী চিন্তা করিতেছেন। সহসা সেই কক্ষের অন্তঃপুর-সংলগ্ন একটী দ্বার খুলিয়া গেল। দ্বারের অপর পার্শ্ব হইতে শব্দ হইল,—"নবাব এখন একাকী আছেন। আমি একবার অতি সামান্য সময়ের নিমিত্ত নবাবের নিকট যাইতে পারি কি?"

কণ্ঠস্বর আয়েষার। অন্দরের সীমা অতিক্রম করিয়া যিনি কখন কোথাও পাদ-চরণ করেন না, যাঁহাকে প্রতিনিয়ত মনে মনে ধ্যান করিলেও, ওসমান কখন সাক্ষাৎ করিয়া বিরক্ত করিতে সাহস করেন না, সেই আয়েষা আজি উপযাচিকা ভাবে সাক্ষাতের অভিলাষিণী। কণ্ঠস্বর শ্রবণমাত্র ওসমান চমকিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"আয়েষা, সাক্ষাতের অনুমতি চাহিতেছ? একি লজ্জা? যদি সাক্ষাতের কোন প্রয়োজন ছিল, তাহা হইলে স্মরণ করিব মাত্র আমি তোমার নিকটস্থ হইতাম। আইস—এখানে কেহ নাই।"

নবাব উঠিয়া দ্বার সন্নিকটে গমন করিলেন। অবনত মুখে, আয়েষা ধীরে ধীরে সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। নবাব কক্ষের সম্মুখ দ্বার সমূহ স্বহস্তে রুদ্ধ করিয়া, আয়েষার সমীপস্থ হইলেন। বলিলেন,—"একি সৌভাগ্য আয়েষা! সহসা আমাকে তোমার মনে পড়িল কেন? যাহাকে ডাকিয়া

পাঠাইলে পরমানন্দে তোমার নিকট উপস্থিত হইত, কষ্ট করিয়া তাহার নিকট আসিবার প্রয়োজন কি?"

আয়েষার বদন বিষাদ মাখা। একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, নতমুখে বলিলেন,—"তোমাকে ডাকিয়া পাঠাইলে ক্ষতি ছিল না জানি; কিন্তু অনেক কথা ভাবিয়াই না ডাকিয়া স্বয়ং তোমার নিকট আসিয়াছি। তুমি যদি মনে করিয়া থাক আমি কখন তোমাকে মনে করি না, তাহা হইলে ওসমান, তোমার বিষম ভ্রম হইয়াছে। কিন্তু সে কথার এখন আর প্রয়োজন নাই। আমি তোমাকে একটী কথা বলিতে আসিয়াছি।"

ওসমান বলিলেন'—"বল, তোমার কথা শুনিতে পাওয়া আমার পরমানন্দ। দাঁড়াইয়া রহিলে কেন? এই আসনে উপবেশন করিয়া কি বলিতে চাহ বল।"

আয়েষা আসন গ্রহণ করিলেন। আসন গ্রহণ না করিলে, তিনি হয় তো মস্তিষ্ক প্রকৃতিস্থ রাখিয়া দণ্ডায়মান থাকিতে ও কথা কহিতে সক্ষম হইবেন না ভাবিয়া, উপবেশন করিলেন। আসনে বসিয়া আয়েষা অধোমুখ, নীরব রহিলেন এবং উভয় হস্তে ওড়নার অগ্রভাগ ধরিয়া সূত্রাকারে পাক দিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া, ওসমান আবার বলিলেন,—"বল আয়েষা, যাহা বলিবে মনে করিয়া আসিয়াছ, তাহা ব্যক্ত কর।"

আয়েষা ওড়না ছাড়িয়া দিলেন। বলিলেন,—"তুমি আজি কালি যুদ্ধায়োজনে বড় ব্যস্ত, তোমার হয় তো এখন অনর্থক কথা শুনিবার সময় নাই। আমি আর এক সময় যাহা বলিতে হয় বলিব। এখন যাই।"

ওসমান বলিলেন,—"আয়েষা, তাহা হইলে আমার প্রতি নিতান্ত নিষ্ঠুরতা প্রকাশিত হইবে। তোমার কথা সম্পূর্ণ অনর্থক হইলেও, আমার পক্ষে অতিশয় সার্থক। আর আয়েষা, সকল কর্ম্ম রসাতলে দিয়াও, যে ব্যক্তি তোমার কথা শুনিতে অভিলাষী, তাহাকে ব্যস্ত মনে করিয়া মনের কথা বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছ কেন?"

আবার আয়েষা বাম হস্তে ওড়নার প্রান্ত ধরিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীতে জড়াইতে লাগিলেন। কথা যেন মুখে বাধিতে লাগিল। ওসমান বলিলেন,—"বল আয়েষা, কি বলিবে বল। তোমার কথা শুভই হউক, আর অশুভই হউক, আমি তাহা শুনিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছি।"

আয়েষা ওড়না ছাড়িয়া দিলেন। বলিলেন,—"তুমি আমাকে যে অনুগ্রহ কর, তাহার তুলনা নাই। কিন্তু আমি তোমার কোনই উপকার করিতে পারি না।"

আয়েষা নীরব হইলেন। ওসমান বলিলেন,—"আমি তোমাকে কি অনুগ্রহ করি জানি না; তথাপি যদি তুমি মনে কর যে, আমি তোমার হিতৈষী, তাহা হইলে আমার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু সে জন্ত কোন কৃতজ্ঞতার কথা তোমার মুখে শুনিতে ভাল লাগিবে না। তুমি আমার পরম হিতৈষিণী; তুমি এ নবাব-পুরীর অলঙ্কার। তুমি সকলেরই উপকার করিয়া থাক। তবে আজি এ কথা বলিতেছ কেন আয়েষা?"

আয়েষা অধোমুখে বলিলেন,—"আমি এ অকৃতজ্ঞ দেহপ্রাণ লইয়া এখানে আর থাকিব না মনে করিয়াছি।"

ওসমান উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আর্ত্ত-স্বরে বলিলেন,—"তুমি এখানে থাকিবে না মনে করিলে, তোমাকে জোর করিয়া কে রাখিতে পারে? আমি ইচ্ছা করিলে নিশ্চয়ই তোমায়

কার্য্যে বাধা দিতে পারি; কিন্তু তোমার কার্য্যে বাধা দেওয়া দূরে থাকুক, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিতে আমার কখনই প্রবৃত্তি নাই। আয়েষা, একি কথা আজি তুমি আমাকে বলিতেছ? তুমি এখানে না থাকিলে থাকিবে কে? তুমি আছ বলিয়া অধম ওসমান এখনও বাঁচিয়া আছে। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তোমাকে আমি লাভ করিতে পারিলাম না; কিন্তু ওসমান আশা ত্যাগ করে নাই, যতক্ষণ দেহে জীবন থাকিবে, ততক্ষণ সে তোমার করুণা লাভের আশা করিবে। সেই আশাই তাহার পক্ষে এখন পরম সুখের কেন্দ্র। ওসমানের সে সাধের আশা-লতা নির্ম্মূল করিয়া তোমার কি আনন্দ হইবে আয়েষা? কেন তাহার বজ্র-হৃদয় এরূপে চূর্ণ করিবার কল্পনা করিতেছ আয়েষা? আমাদের ছাড়িয়া তুমি কোথায় যাইতে চাহ আয়েষা?"

আয়েষা উত্তর দিতে আরম্ভ করিয়া বলিলেন,—"ওসমান!"—কণ্ঠস্বর একটু বিকৃত, একটু সংক্ষুব্ধ। ক্ষণেক নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"ওসমান! তোমার হৃদয় অতি উচ্চ, একান্ত উদার। তোমার ভালবাসা তুলনারহিত—মনুষ্য লোকে তাহা দুর্লভ। কিন্তু"—আবার আয়েষা নীরব।

ওসমান সাগ্রহে জিজ্ঞাসিলেন,—"কিন্তু কি আয়েষা?"

আয়েষা বলিতে লাগিলেন,—"কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তুমি আমাকে ভালবাসিয়া কেবল মনস্তাপ ভোগ করিতেছ। এই পাষাণীকে ভালবাসিয়া তুমি নিরন্তর যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছ। আমার বোধ হয়, এই অভাগিনী তোমার সম্মুখ হইতে অন্তরিত হইলে, উভয়েরই মঙ্গল হইবে।"

আয়েষা নীরব। ওসমান ধীরভাবে এই হৃদয়-ভেদী বাক্য শ্রবণ করিলেন। অনেক-ক্ষণ পরে বলিলেন,—"আয়েষা, এ কাতর ব্যক্তিকে প্রাণে মারিয়া তোমার কি লাভ হইবে? যে ভবনে আয়েষা বাস করেন, সেই ভবনে এ অধমও বাস করে; ইহাও আমার একটা পরম আনন্দের বিষয়। আমার এই আনন্দ হরণ করিয়া তোমার কি লাভ হইবে আয়েষা? ইচ্ছা করিলে, আমি দূর হইতেও আয়েষাকে দেখিতে পাই, অথবা আয়েষার মধুর কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাই, ইহাও আমার পরম সুখ। আমাকে সে সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়া তোমার কি উপকার হইবে আয়েষা?"

আয়েষা বলিলেন,—"ওসমান, তুমি সুধীর ও সুবুদ্ধিমান। ধীর ভাবে ভাবিয়া দেখ, ইহাতে উপকার হইবে। অদর্শনে ও দূরাবস্থানে তুমি হয় তো যন্ত্রণার কারণকে ভুলিতে পারিবে।"

ওসমান শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"কি ভ্রান্তি! আয়েষা, অদর্শনে বা দূরাবস্থানে প্রণয়াস্পদকে কখন ভুলিতে পারা যায় কি? এই পুর মধ্যে অবস্থান করিলেও, আমি কদাপি তোমার নিকটস্থ হই না; বঙ্গদেশ হইতে প্রত্যাগমনের পর, তোমার সহিত একদিন মাত্র দেখা করিয়াছি। এই সুদীর্ঘ অদর্শনেও চিত্তের কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি আয়েষা? তাহা যদি হইত, তাহা হইলে তুমি যাঁহাকে ভালবাস, তাঁহার সহিত বহুকাল তোমার সাক্ষাৎ নাই; তথাপি তুমি তাঁহাকে ভুলিতে পারিতেছ না কেন, আয়েষা?"

আয়েষা বলিলেন,—"পুরুষের অনেক অবলম্বন, অনেক উপলক্ষ এবং অনেক আকাঙ্ক্ষা আছে। নারীর সহিত প্রেম তাঁহাদের একটা ক্রীড়ার সামগ্রী। তাঁহারা

অনায়াসেই প্রেমের বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারেন। আমি ভরসা করি, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তুমি এ পাষাণীর কথা সহজেই ভুলিতে পারিবে।"

ওসমান কহিলেন,—"দুরাশা—আয়েষা, দারুণ দুরাশা। কবরের মাটীতে যদি এ আকাঙ্ক্ষা মিশিয়া যায় তো বলিতে পারি না; কিন্তু শরীরে নিশ্বাস বহমান থাকিতে, তোমাকে ভুলিবার কোন আশা নাই। বসিয়াছি তোমাকে, আশাই আমার সম্বল। আমি আশা করিয়া আছি, নিদারুণ তাপে পাষাণও গলিয়া যায়, ঈশ্বরের বাসনা হইলে মরুভূমিতেও সমুদ্রের উদ্ভব হয়। আয়েষা, বাঁচিয়া থাকিলে কখন না কখন তুমি ওসমানের ভালবাসার প্রগাঢ়তা প্রণিধান করিতে পারিবে, ওসমানকে হয় তো ভাল বাসিতে ইচ্ছা করিবে। সেই দিন এ অভাগা ধন্য হইবে।"

আয়েষা বলিলেন,—"তোমার ভালবাসা অতি মহৎ, অতি উদার, অতি প্রগাঢ়; এ কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমি তাহা প্রণিধান করি না মনে করিলে, আমার প্রতি নিতান্ত অবিচার করা হয়। আমি তোমার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত; তোমার হিতার্থে দুষ্কর কর্ম্ম করিতেও সক্ষম। কিন্তু হায়! কি বলিব? আমার প্রাণ উৎসর্গীকৃত হইয়াছে; এ নিবেদিত বস্তু আর কাহাকেও দান করিবার অধিকার নাই। যাহা দিয়াছি তাহা আর পুনর্গ্রহণ করিতে আমার সাধ্য নাই; সুখই হউক বা দুঃখই হউক, আমি মনে মনেও দ্বিচারিণী হইতে পারিব না। তুমি আমাকে চিরদিন ক্ষমা করিয়া আসিতেছ। এখনও আমাকে ক্ষমা কর ওসমান; আমি সানুনয়ে নিবেদন করিতেছি, বৃথা এ অভাগিনীর আশায় আপনার সুখ নষ্ট করিও না। আমি কাতর ভাবে তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তুমি ইচ্ছামত সঙ্গিনী নির্ব্বাচন করিয়া জীবনকে সুখময় কর। অনর্থক এ সাপিনীর আশায় মুগ্ধ থাকিয়া, ওসমান, তোমার কর্ম্মময় প্রয়োজনীয় জীবনকে ধ্বংস করিও না।"

ওসমান কহিলেন,—"আয়েষা, আমার জীবন ও মরণে তুমিই আমার আরাধ্যা। তোমাকে না পাই, যেরূপে এত দিন নীরবে বেদনা সহ্য করিয়াছি, এখনও তাহাই করিব। তবে এক শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিব। তুমি যাহাকে ভালবাস, সেই ভাগ্যবানকে আমি স্বহস্তে বধ করিব। তাহার পর হয় তো তুমি স্বাধীনা হইবে। তখন হয় তো তোমার অনুগ্রহ লাভ করিলেও করিতে পারিব। তখনও যদি মনোভীষ্ট সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলেও পাঠান ওসমান প্রতিদ্বন্দ্বী নাশ জনিত সন্তোষ লাভ করিয়া সুখী হইবে।"

আয়েষা বলিলেন,—"সংসারে অমঙ্গল-স্রোত বৃদ্ধি করিতেই হয় তো আয়েষার জন্ম হইয়াছিল। তোমাকে আমি বড় ভালবাসি। তোমাকে সুখী দেখিতে পাওয়াই আমার প্রাণের আকিঞ্চন। বোধ করি, বিধাতা অভাগী আয়েষার অদৃষ্টে সে সৌভাগ্য লিখেন নাই। আমার বক্তব্য শেষ হইয়াছে। এক্ষণে আমি বিদায় হই। জীবনে হয় তো তোমার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না। যদি তোমার কোন বিপদে আমার দ্বারা উপকার হইতে পারে, তখন আমি যেখানে থাকি উপস্থিত হইব। তাই ওসমান, আমাকে দুঃখিনী ভগিনী বলিয়া মনে রাখিও। না—না, আমাকে সর্ব্বপ্রকার যত্নে ভুলিতে চেষ্টা করিও।"

ওসমান অধোমুখে আয়েষার হৃদয়-বিদারক কথা শুনিতে ছিলেন। তিনি তখন নানাবিধ ভয়ানক কল্পনায় প্রমত্ত। যখন তিনি মস্তকোত্তোলন করিলেন, তখন দেখিলেন, আয়েষা তথায় নাই। দীর্ঘ নিশ্বাস সহ উভয় হস্তে মস্তকের কেশ সমূহ ধারণ করিয়া, নবাব বলিলেন,—"ওঃ!"

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কারাগার।

কোথায় জগৎসিংহ? পাটনার লৌহ-কারাগারে শৃঙ্খলিত অবস্থায় পতিত বীর প্রেমের স্বপ্ন দেখিতেছেন। কারাগার অন্ধকার। শৃঙ্খল-নিবদ্ধ বীর একখানি চারিপায়ার উপর উপবিষ্ট। এ দুর্দ্দশার কি শেষ হইবে না? আর কি চন্দ্র-সূর্য্যের মুখ তিনি দেখিতে পাইবেন না? আর কি সেই জীবন-সর্ব্বস্ব তিলোত্তমার সহিত একবারও মিলন হইবে না? এই কারাগারের অন্ধকার মধ্যেই কি জীবন সমাপ্ত হইবে? সকল আশারই কি এই শেষ।

মধুরভাষিণী আশা বলিতেছে,—'ধীরতার সহিত অপেক্ষা কর, এ দুর্দ্দিন নিশ্চয়ই কাটিয়া যাইবে। জগতে কবে, কোথায়, কাহার দুর্দ্দিন চিরস্থায়ী হইয়াছে?' জগৎসিংহ স্বকীয় জীবনের অতীত কাহিনী স্মরণ করিয়া দেখিতেছেন। অতি অল্প কাল মধ্যে তাঁহার কত দশা বিপর্য্যয়ই ঘটিয়াছে! তিনি সকলই অতিক্রম করিয়া আবার সুখের মুখ দেখিয়াছেন। এবারও কি সেরূপ ঘটিবে না?

কেহ কি তাঁহার দুঃখের জন্য চিন্তা করিতেছে? কেহ কি তাঁহার ক্লেশের গুরুতা প্রণিধান করিয়া হৃদয়ে বেদনা অনুভব করিতেছে? জগৎসিংহ বুঝিলেন, তাঁহার এই বিপদ্‌বার্ত্তা শ্রবণে তিলোত্তমা নিশ্চয়ই মর্ম্মাহত হইয়াছেন। সেই সুশীলা বালা না জানি কতই যাতনা ভোগ করিতেছেন; না জানি এই নিদারুণ দুশ্চিন্তায় তাঁহার দেহ-মন কতই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে! এ দুরবস্থায় স্বকীয় ক্লেশের অপেক্ষা তিলোত্তমার চিন্তাই জগৎসিংহকে অধিকতর প্রপীড়িত করিতেছিল। যদি কোন উপায়ে তিলোত্তমাকে একটা সংবাদ দেওয়া যাইত, যদি কাহারও দ্বারা তাঁহার নিকট জগৎসিংহের একটা কুশল-সংবাদ প্রেরণ করার উপায় হইত, তাহা হইলেও তিনি কিয়ৎপরিমাণে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন, একটু শান্তি লাভ করিতেন। কিন্তু তাহার উপায় কোথায়?

জগৎসিংহ এইরূপ ক্লেশে ও চিন্তায় দিন কাটাইতেছেন। দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু কোন আশাই তো সফল হইতেছে না। তথাপি আশা যায় না। অনিদ্রায়—দুশ্চিন্তায় রাত্রি চলিয়া যাইতেছে; অতি ক্লেশে—কর্ম্মহীনতায় দিন কাটিয়া যাইতেছে; কিন্তু আশা তো যাইতেছে না।

এক দিন প্রাতে জগৎসিংহের একটু নিদ্রা আসিয়াছে। সমস্ত রাত্রি তিলোত্তমার জন্য ভয়ানক চিন্তার পর, একটু তন্দ্রা আসিয়াছে। সে অবস্থাতেও তিনি নিশ্চিন্ততার সুখ অনুভব করিতে পারিতেছেন না। তখনও তিলোত্তমা সম্বন্ধীয় অস্পষ্ট উদ্বেগ তাঁহার হৃদয়ে ক্ষীণভাবে যাতায়াত করিতেছে।

সহসা সেই লৌহ-কারাগারের লৌহ-দ্বার ঘর্ঘর শব্দে খুলিয়া গেল। সে শব্দ জগৎসিংহের কর্ণে প্রবেশ করিল; কিন্তু স্বতন্ত্র ভাবে। সেই কঠোর কর্কশ শব্দ তাঁহার কর্ণে তিলোত্তমার সুমধুর মঞ্জীর-ধ্বনি বলিয়া উপলব্ধ হইল। তিনি, নিদ্রাবশে মুদ্রিত নয়ন দিয়া, দেখিতে লাগিলেন, সেই প্রেমিকা পত্নী কুসুম-মালিকা হস্তে লইয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। যুবরাজ কহিলেন,—"অসি ফেলিয়া দিয়াছি, তোমার কথা পালন করিয়াছি; আর মালা ছিন্ন হইবার কোনই আশঙ্কা নাই।"

উন্মুক্ত দ্বার দিয়া কারারক্ষক কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিল এবং রাজপুত্রের শয্যা-সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া মৃদুস্বরে সসম্ভ্রমে আহ্বান করিল,—"যুবরাজ!"

স্বর জগৎসিংহের কর্ণে প্রবেশ করিল; কিন্তু স্বতন্ত্র ভাবে। তিনি শুনিলেন, তিলোত্তমা বলিতেছেন,—"প্রাণেশ্বর!"

রাজপুত্র উত্তর দিলেন,—"হৃদয়েশ্বরি!"

কারারক্ষক আবার ডাকিল,—'যুবরাজ!'

রাজপুত্র বলিয়া উঠিলেন,—"যাই, যাই, ভয় কি?"

জগৎসিংহ উদ্বেগের সহিত শয্যা ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে কারারক্ষকের অপ্রিয়-দর্শন পরুষ মূর্ত্তি। কোথায় তিলোত্তমা? যে সুন্দরীর বিপদ হইয়াছে মনে করিয়া তিনি ধাবমান হইতেছিলেন, সে তিলোত্তমা কোথায়? জগৎসিংহ প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে করিলেন, হায়! স্বপ্নে সুখভোগ করাও অভাগার অদৃষ্ট নাই। তিনি কাতর ভাবে তথায় বসিয়া পড়িলেন। কারারক্ষক বিনীত ভাবে তাঁহাকে অভিবাদন করিল।

জগৎসিংহ হস্ত দ্বারা চক্ষুদ্বয় মার্জ্জনা করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, প্রাতঃকালে তোমার কি সংবাদ কারারক্ষক?"

কারারক্ষক সবিনয়ে বলিল,—"একজন সন্ন্যাসী; যুবরাজ কারাগারে প্রবেশ করার কিঞ্চিৎকাল পর হইতে, নিয়ত রাজপুত্রের সহিত সাক্ষাতের চেষ্টা করিতেছেন।"

জগৎসিংহ বলিলেন,—"তাহার পর?"

কারারক্ষক বলিল,—"আমরা সাহস করিয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ করিতে দিতে পারিতেছি না।"

জগৎসিংহ বলিলেন,—"তবে সে কথা আমাকে জানাইতেছ কেন?"

কারারক্ষক বলিল,—"এক্ষণে সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিতেছেন, যদি তাহাকে সাক্ষাৎ করিতে না দেওয়া হয়, তাহা হইলে মহারাজ জানিতে পারিলে বিশেষ বিরক্ত হইবেন এবং রাজকার্য্যেরও বিশেষ অনিষ্ট হইবে।"

যুবরাজ জিজ্ঞাসিলেন,—"তোমরা কি স্থির করিয়াছ?"

কারারক্ষক বলিল,—"আমরা তাঁহাকে যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়াই উচিত বলিয়া মনে করিয়াছি।"

জগৎসিংহ বলিলেন,—তবে এ সকল কথা আমাকে শুনাইতেছ কেন?"

কারারক্ষক বলিল,—"সেই সন্ন্যাসিকে আসিতে দেওয়ায় হয় তো যুবরাজ অসন্তুষ্ট হইতে পারেন এবং যুবরাজের মঙ্গল-জনক জানিয়া আমরা যে কার্য্য করিতেছি, তাহা হয় তো মঙ্গলজনকও হইতে পারে।"

রাজপুত্র একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"আমার যে অমঙ্গল চলিতেছে তাহার

অপেক্ষা গুরুতর অমঙ্গল আর কিছু দেখিতেছি না। যে কোন লোক আমার সহিত দেখা করিতে অসুক, তাহাতে আমার ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছুই নাই। তোমাদের আপত্তি না থাকিলে, তোমরা যাহাকে ইচ্ছা আসিতে দিতে পার। আমার তাহাতে সন্তোষ ভিন্ন অসন্তোষের কোন কারণ নাই।”

কারারক্ষক প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল। জগৎসিংহ একাকী বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—মুক্তির কোন আশা নাই। মহারাজ যখন যাবজ্জীবন কারাবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তখন সে বাক্যের অন্যথা আর কে করিবে? শত সহস্র কারণ উপস্থিত হইলেও, মহারাজ স্বয়ং কখনই স্বীয় বাক্যের অন্যথা করিতে পারিবেন না। ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ তিনি তাহা করিতে পারেন না। যদি তাহা করেন, তাহা হইলে তাঁহার পদ-গৌরব ও শাসন-শক্তি সকলই ধিক্কৃত হইবে; তাঁহার প্রতাপ রসাতলে যাইবে; তাঁহার ন্যায়পরতা ও কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা বিদ্রূপের বিষয় হইবে।

তবে মুক্তির কি কোন উপায় নাই? তবে কি তাঁহাকে চিরদিন এইরূপে কারাগারে জীবন পাত করিতে হইবে? এক উপায় আছে। বাদশাহ কৃপা করিলে সকলই হইতে পারে। তিনি যদি কৃপা করিয়া জগৎসিংহের সম্বন্ধে অনুকূল আদেশ প্রদান করেন, তাহা হইলে মহারাজ মানসিংহ, ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, তাহার প্রতিবাদ করিবেন না। কিন্তু সে কার্য্য কে করিবে? দিল্লীতে বাদশাহ-দরবারে জগৎসিংহের আবেদন লইয়া কে যাইবে? কাহার কথাই বা সেখানে কে শুনিবে? সে দরবারে উপস্থিত হইয়া জগৎসিংহের উপকার করিতে কে অগ্রসর হইবে?

কাতর ও অপ্রসন্ন-বদন এক সন্ন্যাসী-বেশধারী পুরুষ অবনত মস্তকে ধীরে ধীরে সেই কারাগারে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দর্শন মাত্র জগৎসিংহ চিনিতে পারিলেন এবং প্রণাম করিয়া বলিলেন,—“একি! আপনি এখানে কেমন করিয়া আসিলেন?”

আগন্তুক আমাদের সুপরিচিত অভিরাম স্বামী। তিনি বলিলেন,—“আমার এখানে অধিকক্ষণ থাকিবার সুবিধা হইবে না; সুতরাং সংক্ষেপে সকল কথা বলিতেছি। তোমার এই দণ্ডের কথা যে দিন শুনিয়াছি, তাহার পর দিনই আমি গড় মান্দারণ ত্যাগ করিয়াছি। সেই অবধি আমি এইখানেই আছি।”

জগৎসিংহ জিজ্ঞাসিলেন,—“গড় মান্দারণের সংবাদ আপনি কিছু জানেন?”

অভিরাম বলিলেন,—“জানি। সকলেই কুশলে আছেন; তোমার জন্য সকলেই কাতর। তিলোত্তমার ক্লেশের সীমা নাই।”

জগৎসিংহ জিজ্ঞাসিলেন,—“এখানে চলিয়া আসার পর আপনি আর গড় মান্দারণের কোন সংবাদ পান নাই?”

অভিরাম স্বামী বলিলেন,—“জানি। একমাস পূর্ব্বে আমার আশ্রিত গজপতি এখানে আসিয়াছে। তাহার নিকট বিমলার এক পত্র ছিল। সে পত্রে আমি সকলের শোকাকুল কাতরাবস্থার সংবাদ পাইয়াছি! তিলোত্তমা জীবিত আছে; কিন্তু বড়ই কষ্টে সে জীবনপাত করিতেছে, এ সংবাদও পাইয়াছি। আমার চেষ্টায় অবশ্যই তোমার মুক্তি হইবে, এই আশায় সে প্রাণ ধরিয়া আছে।”

জগৎসিংহ কিয়ৎকাল অধোবদনে চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—“আপনি এতদিন এখানে আছেন কেন?”

“তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশায়—তোমার মুক্তির উপায় চিন্তায়।”

জগৎসিংহ বলিলেন,—"প্রথম আশা সফল হইল কিরূপে ?"

অভিরাম বলিলেন,—"প্রভূত পুরস্কারের দ্বারা কারারক্ষককে বশীভূত করিয়া, অতি অল্প সময়ের নিমিত্ত সাক্ষাতের অনুমতি পাইয়াছি।"

জগৎসিংহ বলিলেন,—"দ্বিতীয় চেষ্টা সফল হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। আপনি সে জন্ম বৃথা ক্লেশ স্বীকার করিবেন না।"

অভিরাম স্বামী ঝুলির মধ্য হইতে এক খণ্ড কাগজ বাহির করিয়া ব লেন,—"হতাশ হইও না, নিশ্চয়ই আমার দ্বিতীয় আশাও সফল হইবে। তুমি এই কাগজে সহী করিয়া দেও, আমি কালী কলম দিতেছি। বাদশাহ-দরবারে আমাদের চেষ্টা নিষ্ফল হইবে না।"

জগৎসিংহ বলিলেন,—"সে স্থানে চেষ্টা হইলে সফলতার আশা করা যাইতে পারে বটে। কিন্তু সে কার্য্য কাহার দ্বারা সম্পন্ন হইবে ? আপনি কাহার সহায়তা লাভ করিয়াছেন ?"

অভিরাম বলিলেন,—"যিনি এ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহার উদ্যমে ও উৎসাহে আমরা কার্য্য করিতেছি, যাঁহার অর্থব্যয় ও আগ্রহে আমরা সকল বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতেছি, তিনি সকলই করিতে পারিবেন বলিয়া আমি বিশ্বাস করি।"

"কে তিনি ?"

অভিরাম বলিলেন, — "নবাব-নন্দিনী আয়েষা।"

জগৎসিংহ বিস্ময় সহকারে বলিলেন,—"আয়েষা! তাঁহার সাহায্য আপনি কিরূপে সংগ্রহ করিলেন ?"

অভিরাম বলিলেন,—"আমাকে সংগ্রহ করিতে হয় নাই। তিনি তোমার মুক্তির জন্ম জীবনান্ত করিতেও প্রস্তুত। তিনিই আমাদের নেত্রী; তিনি এখন পাটনায় আছেন। তোমার আবেদন লইয়া তিনি হয় তো স্বয়ং দিল্লী গমন করিবেন। সেখানে সকল ব্যবস্থাই স্থির আছে। তোমার আবেদন প্রাপ্তিমাত্র মুক্তির আদেশ হইবে, সন্দেহ নাই।"

জগৎসিংহ মনে মনে বলিলেন,—"আয়েষা—চিরহিতৈষিণী আয়েষা! তোমার আয়াস নিশ্চয়ই সফল হইবে। তুমি এই অকৃতজ্ঞ নরাধমের জন্ম এখানে আসিয়াছ, অশেষ কষ্ট স্বীকার করিতেছ। এ ঋণ জন্মজন্মান্তরেও শোধ করিতে আমার সাধ্য নাই।" প্রকাশ্যে বলিলেন,—"প্রভো, আয়েষার সহিত এ অধমের সাক্ষাতের কোন উপায় হয় না কি ?"

অভিরাম বলিলেন,—"উপায় হইলেও, নবাব-নন্দিনী তোমার সহিত সাক্ষাতের অভিলাষিণী নহেন। সাক্ষাৎ উভয় পক্ষেরই ক্লেশের হেতু বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন। তোমার জন্ম জীবন দিতে তিনি প্রস্তুত ; কিন্তু সাক্ষাতে তাঁহার সম্পূর্ণ অপ্রবৃত্তি। অন্যান্য কথা সময়ান্তরে বলিব। এক্ষণে আর বিলম্ব না করিয়া এই কাগজে নাম স্বাক্ষর কর।"

স্বামীর প্রদত্ত কালী কলম লইয়া জগৎসিংহ কাগজে নাম স্বাক্ষর করিলেন। স্বামী সেই কাগজ খণ্ড সযত্নে ঝুলির মধ্যে স্থাপন করিলেন।

প্রহরী ডাকিল,—"সন্ন্যাসী ঠাকুর, বড় দেরী হইতেছে। এতক্ষণ থাকিবার কথা ছিল না।"

স্বামী বলিলেন,—"যাই। যুবরাজ, আমাকে এখন বিদায় দাও। ভরসা করি ভগবানের কৃপায়, শীঘ্রই শুভ সংবাদ বহন করিয়া পুনরায় সাক্ষাৎ করিব।"

জগৎসিংহ প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী বিদায় হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পুত্রবধূ।

মহারাজ মানসিংহ স্বগণ সহ শ্রীক্ষেত্র হইতে পাটনায় প্রত্যাগত হইয়া নিয়মিত কর্ত্তব্য-পালনে নিবিষ্ট-চিত্ত হইয়াছেন। যত লোক মহারাজের সহিত তীর্থ-দর্শনে যাত্রা করিয়াছেন, সকলেই প্রত্যাগত হইয়াছেন, অধিকন্তু আর একজন তাঁহাদের সংখ্যা বাড়াইয়াছেন। তিনি মহারাজার বড়ই আদর ও স্নেহভাজন রাজলক্ষ্মী।

মহারাজ আসিয়াছেন বটে; কিন্তু কেন বলা যায় না, তিনি চিত্তের অনেকখানি প্রসন্নতা উড়িষ্যার সমুদ্রে ফেলিয়া আসিয়াছেন, অথবা জগন্নাথ দেবের চরণে উৎসর্গ করিয়া আসিয়াছেন।

মোগল-পাঠানে যে সন্ধি বন্ধন করিয়া তিনি আপাততঃ কিছুদিনের জন্য নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, সে বন্ধন যে শীঘ্র ছিন্ন হইবে তদ্বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু দোষ কাহার? মানসিংহ ও ওসমান এতদুভয়ের মধ্যে সন্ধি-অবহেলন সম্বন্ধে প্রয়োজক কে? পাঠানগণই নিমিত্ত কারণ হইবেন, সে বিষয়ে কোন ভুল নাই। পাঠানেরা বড়ই উদ্ধত ও অস্থির-মতি; সুতরাং তাহারা সন্ধির বন্ধনে দীর্ঘকাল বাধ্য থাকিবে না, এ কথা সকলেই সহজে বুঝিতে পারে। বিশেষতঃ ওসমান খাঁর সাহস ও ভরসা যেমন অতুলনীয়, বীরত্ব ও দৃঢ়তাও সেইরূপ অদ্ভুত। এরূপ পুরুষ যে সম্প্রদায়ের নেতা, সে সম্প্রদায় কখনই এক অবস্থায় সন্তুষ্ট হইয়া স্থির থাকিতে পারে কি? মানসিংহ অর্থাৎ মোগল পক্ষ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সন্ধির নিয়ম পদ-দলিত করিয়া কলঙ্ক অর্জ্জন করিবেন না, ইহা স্থির; সুতরাং দোষ থাকুক না থাকুক, সন্ধি অবহেলন সম্বন্ধে ইতিহাসে পাঠানরাই অপরাধী হইয়া থাকিবেন।

তথাপি একটা কথা এ সময়ে মনে হয় না কি? মহারাজ মানসিংহ যে পত্র লিখিয়া উদ্ধত ওসমা-কে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় রাজ্যের সীমান্তে অপেক্ষা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা সমীচীন হইয়াছিল কি? পুরীতে সাক্ষাতের পর, তিনি ওসমানের সহিত যে ভাবে আলাপে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা সুসঙ্গত হইয়াছিল কি? মহারাজ মানসিংহ আপন চিত্তে ইত্যাকার নানা প্রশ্নের পুনঃ পুনঃ আন্দোলন করিতে লাগিলেন। সুতরাং তাঁহার মন প্রসন্ন নহে।

কুমার জগৎসিংহকে যাবজ্জীবনের নিমিত্ত তিনি কারাগারে প্রেরণ করিয়াছেন। কর্ত্তব্যের অনুরোধে তিনি বীরের ন্যায় সুব্যবস্থাই করিয়াছেন সন্দেহ নাই। তাঁহার এ অনুষ্ঠানে সমস্ত সৈন্য, নায়ক, সেনাপতি ও অধীনস্থ তাবৎ ব্যক্তির সমক্ষে তাঁহার কর্ত্তব্য-পরায়ণতা বিষয়ক গৌরব সাতিশয় সংবর্দ্ধিত হইয়াছে; স্বয়ং বাদশাহ আকবরও তাঁহার এই বীরোচিত কার্য্য দেখিয়া মনে মনে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। সকলই উত্তম হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার প্রাণ কি প্রসন্ন হইয়াছে? উপযুক্ত বীর পুত্রকে, যৌবনের অবশ্যম্ভাবী প্রবৃত্তি-বশবর্ত্তিতায় অনুষ্ঠিত অপরাধ সমূহ অবলম্বনে, যাবজ্জীবনের নিমিত্ত কারাদণ্ড বিধান করিয়া পিতার উচিত কর্ম্ম তিনি করিয়াছেন কি? তাঁহার হৃদয় সেই কঠিন আজ্ঞা প্রচার করার পর হইতেই কাতর হইয়াছে। কিন্তু বাক্যে বা ব্যবহারে কাহারও নিকট সে কথা তিনি

ব্যক্ত করেন নাই। মহারাণী উর্ম্মিলা একদিন সাহসে ভর করিয়া সাশ্রুনয়নে মহারাজার নিকট জগৎসিংহের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন; মহারাজ তাঁহাকেও সন্তুষ্ট করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সুতরাং জগৎসিংহের কথা চাপা পড়িয়া রহিয়াছে।

কয়েকদিনপূর্ব্বে পুরীধামে নবাব ওসমান এই প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়াছিলেন। বিশেষ উদারতা সহকারে তিনি, সকল বিষয়ে হউক না হউক, অন্ততঃ একটা বিষয়ে জগৎসিংহের নির্দ্দোষতা সুস্পষ্টরূপ সমর্থন করিয়াছেন। জগৎসিংহ জ্ঞানতঃ না হইলেও, বস্তুতঃ ওসমান খাঁর প্রণয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী। এরূপ শত্রু ব্যক্তিও যে বিষয়ে দোষী নহেন, তাহা প্রকাশ করিবার জন্য আয়াস স্বীকার করা, নবাবের পক্ষে মহত্বের পরাকাষ্ঠা। মহারাজ বুঝিয়াছিলেন, ওসমান এ সম্বন্ধে বিশেষ মহানুভবতার পরিচয় দিয়াছেন।

নবাব-কন্যার সহিত প্রণয়-ব্যাপারে জগৎসিংহ যেরূপ নিরপরাধ, অন্যান্য অনেক বিষয়েও সেরূপ হওয়া অসম্ভব নহে। জগৎসিংহ ধৃত ও কারাগারে প্রেরিত হইয়াছে। তাঁহাকে কোন বিষয়েই কোন প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া আপনার নির্দ্দোষতা প্রতিপাদন করিবার সুযোগ দেওয়া হয় নাই। সেরূপ সুযোগ দিলে, যে যে রাজকীয় ব্যাপারে তাঁহাকে দোষী মনে করা হইয়াছে, হয় তো তাহার অনেকগুলির সঙ্গত মীমাংসা হইলেও হইতে পারিত।

এক দোষ অমার্জ্জনীয়। তিনি পিতার অজ্ঞাতসারে বীরেন্দ্রসিংহের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। কার্য্য অতিশয় গর্হিত হইলেও, এ অপরাধে কারাদণ্ড কখনই বিহিত হইতে পারে না। এইরূপ চিন্তার কালে, মহারাজের যৌবন-প্রান্তের এক প্রণয়-কাহিনী মনে উদিত হইল। মনে মনে একটু লজ্জা হইল।

চিন্তিত ও অসুস্থ-হৃদয় মানসিংহ উর্ম্মিলা দেবীর মন্দিরে গমন করিলেন। তিনি অন্তঃপুর-দ্বারে উপনীত হইবামাত্র, উর্ম্মিলা হাসিভরা মুখে তাঁহার সম্মুখে দর্শন দিলেন। মহারাজ বলিলেন,—"একাকিনী বসিয়া আছ মহারাণী? তোমার রাজলক্ষ্মী কোথায়?"

মহারাণী বলিলেন,—"আমার রাজলক্ষ্মী! মনে থাকে যেন, রাজলক্ষ্মী তবে তোমার কেহ নহে।"

মহারাজ বলিলেন,—"সে কথা বলিতে পারিব না। রাজলক্ষ্মী আমার বড় আদরের সামগ্রী? আমি তাহাকে বড়ই স্নেহ করি। কোথায় রাজলক্ষ্মী?"

মহারাজ পর্য্যঙ্কের উপর প্রথমে বসিয়া পড়িলেন; তাহার পর শুইয়া পড়িলেন।

উর্ম্মিলা বলিলেন,—"তুমি আসিতেছ, জানিতে পারিয়াই রাজলক্ষ্মী তোমার জন্য জল আনিতে গিয়াছে। মুখ-হাত ধোয়ার জল সে ঠিক করিয়া না দিলে, তুমি যে রাগ কর।"

মান। কাজেই। দাসীগুলা জলে কতকগুলা গোলাপ আর কর্পূর মিশাইয়া একেবারে তিত করিয়া ফেলে। খাইবার জলে এত কেওয়া দেয় যে, তাহা খায় কাহার সাধ্য। রাজলক্ষ্মী সব ঠিক করিয়া দেয়; সে অন্তরের ভক্তির সহিত আমার যত্ন ও সেবা করে। আমি মেয়েটিকে বড় ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছি।"

মহারাজার কথা শেষ হইবার একটু পূর্ব্বে, রাজলক্ষ্মী জল লইয়া তথায় প্রবেশ করিলেন। কথার শেষভাগ শ্রবণ করিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহারই কথা হইতেছে। লজ্জা

ও আনন্দ মিশিয়া তাঁহার মুখের বড় শোভা করিয়া দিল।

মহারাণী বলিলেন,—"মহারাজ রাজলক্ষ্মীকে ভাল-বাসিয়াছেন, ইহা তাহার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু আমি যে কি করিব তাঁহা বুঝিতে পারিতেছি না। আমি নিঃসন্তান; মহারাজের অনেক সন্তান আছে; তাহারা সকলেই আমাকে মা বলিয়া ভক্তি করে সত্য। কিন্তু রাজলক্ষ্মী আমাকে মা বলার পর হইতে, তাহার ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রাণের মমতা দেখিয়া, তাহাকে গর্ভের সন্তান বলিয়াই জ্ঞান করিয়াছি। এমন মা হওয়ার সুখ আমি ইহার পূর্ব্বে আর কখন বুঝিতে পারি নাই।"

মহারাণীর নয়ন জল-ভারাকুল; কণ্ঠস্বর সংক্ষুব্ধ। মহারাজা বলিলেন,—"রাজলক্ষ্মী বাস্তবিকই বড় স্নেহের সামগ্রী। তুমি যখন তাহাকে সন্তান জ্ঞান করিয়া সুখী হইয়াছ, তখন সর্ব্ব প্রকার সমাদরে তাহাকে আমাদের পরিবারভুক্ত করিয়া লওয়াই উচিত। আমি এখনই এবিষয়ের সুব্যবস্থা করিব।"

উর্ম্মিলা বলিলেন,—"কিরূপে তাহা হইবে মহারাজ?"

মহারাজ বলিলেন,—"কেন, রাজলক্ষ্মীর পিতা-মাতা কন্যাকে যাহাতে আমাদের নিকট থাকিতে দেন, তাহাই ব্যবস্থা করিব।"

মহারাণী বলিলেন,—"আমার কথায় রাজলক্ষ্মীর আত্মীয়গণ সে বিষয়ে কোন আপত্তি করিবেন বলিয়া আমার বোধ হয় না।"

মহারাজ বলিলেন,—"তবে আর উদ্বেগের বিষয় কি আছে?"

মহারাণী বলিলেন,—"রাজলক্ষ্মীকে কাছে রাখাও যেমন দরকার, তাহাকে সর্ব্বপ্রকারে সুখী করাও সেইরূপ আবশ্যক। রাজলক্ষ্মী রূপে গুণে এমন অতুলনীয়া হইলেও, এক বিষয়ে বড়ই অভাগিনী। উহার স্বামী উহাকে গ্রহণ করে না।"

"কেন?"

উর্ম্মিলা বলিলেন,—"স্বামী উহাকে আদর করিয়া বিবাহ করিয়াছেন, যত্ন করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু এখন বলেন, পত্নী নীচবংশীয়া, সুতরাং গ্রহণের অযোগ্যা।"

মানসিংহ বলেন,—"কেন, বংশগত কোন দোষ আছে না কি?"

উর্ম্মিলা বলিলেন,—"আমি যতদূর জানি, তাহাতে বিশেষ কোন দোষ আছে বলিয়া মনে করি না। কিন্তু যদিই কোন দোষ থাকে, তাহাতে এ কন্যার অপরাধ কি? রাজলক্ষ্মী যে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-স্বরূপা তাহাতে সন্দেহ নাই। দোষের কথা তুলিয়া এখন এই গুণবতী পত্নীকে পরিত্যাগ করা, স্বামীর পক্ষে অধর্ম্ম হইতেছে না কি?"

মানসিংহ বলিলেন,—"নিশ্চয়ই স্বামীর এখন এ বিবেচনা অতি গর্হিত ও অধর্ম্মজনক। কোন কারণেই এমন এ গুণবতী পত্নীকে কষ্ট দেওয়া স্বামীর ও তাঁহার আত্মীয়গণের উচিত কার্য্য হইতেছে না। রাজলক্ষ্মীর স্বামী কে? সে কি করে?"

উর্ম্মিলা বলিলেন,—"সে মহারাজার অধীনস্থ একজন সৈনিক। মহারাজ কৃপা করিলে রাজলক্ষ্মীর এই কষ্ট অনায়াসেই দূর করিতে পারেন।"

মানসিংহ বলিলেন,—"আমার অধীনস্থ সৈনিক। তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই ইহার সুব্যবস্থা করিব। সে যাহাতে সমাদরে পত্নীকে গ্রহণ করে, তাহার আত্মীয়-বন্ধুগণ যাহাতে রাজলক্ষ্মীকে সম্মান করে, আমি তাহার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করিব। তুমি এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাক। কিন্তু তাহার পর

আমাদের কি হইবে? রাজলক্ষ্মীকে উঁহার স্বামী গ্রহণ করিলে তোমার নিকট সে তো আর থাকিবে না; তোমার মা হওয়ার সুখ তো ঘুচিয়া যাইবে।"

উর্ম্মিলা বলিলেন,—"কেন মহারাজ! তোমার কৃপায় সকল সুখময় হইবে। সে সৈনিক আমাদের নিকটেই থাকিবে, কন্যাও আমার কাছে থাকিবে। কন্যার মুখে আমি হাসি দেখিব; যাহাকে ভালবাসি তাহার সুখে সুখী হইব; সমস্ত দিন রাজলক্ষ্মী মহারাজের পরিচর্য্যা করিবে; আমার আনন্দের সীমা থাকিবে না। মহারাজ, তুমি ন্যায়বান, পরম ধার্ম্মিক। তুমি দয়া করিয়া রাজলক্ষ্মীর এই দুঃখ দূর করিবে না কি? তোমার চরণাশ্রিতা দাসীর এই করুণ প্রার্থনায় কর্ণপাত করিবে না কি?"

মহারাণীর চক্ষু দিয়া জল পড়িল। মানসিংহ অতীব আদরে উর্ম্মিলার হস্ত ধারণ করিলেন। বলিলেন,—"মহারাণী, আমি নিশ্চয়ই তোমার অনুরোধ রক্ষা করিব। কোন প্রকার আপত্তি বা প্রতিবাদ আমি শুনিব না। তোমার অনুরোধে রাজলক্ষ্মীকে সুখী করিবার নিমিত্ত, আমি কোন কর্ম্মই অকর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিব না। ইহাতে যদি লোক-সমাজে বা সাধারণের চক্ষুতে আমাকে হীন বা ঘৃণিত হইতে হয়, তাহাতেও আমি পশ্চাৎ-পদ হইব না।"

তখন মহারাণী উর্ম্মিলা গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া, মহারাজের চরণে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন,—"তবে মহারাজ তোমার পুত্রবধূ গ্রহণ করিয়া প্রতিজ্ঞার সম্মান রক্ষা কর।"

তৎক্ষণাৎ গলদশ্রুনয়নে রাজলক্ষ্মী আসিয়া মহারাজার চরণসমীপে নিপতিত হইয়া অশ্রু-বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

মানসিংহ সবিস্ময়ে কহিলেন,—"আমার পুত্রবধূ! সে কি কথা মহারাণী?"

উর্ম্মিলা করযোড়ে কহিলেন,—"হাঁ মহারাজ, রাজলক্ষ্মী যুবরাজ জগৎসিংহের বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নী।"

মহারাজ বলিলেন,—"রাজলক্ষ্মী তবে কি বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা? না, না,—সে কন্যার নাম যে তিলোত্তমা।"

উর্ম্মিলা বলিলেন,—'এই রাজ-কুল-বধূর নামই তিলোত্তমা।"

মহারাজ অনেকক্ষণ অধোমুখে চিন্তা করিলেন। তাহার পর বলিলেন,—"শুন মহিষি! তোমার কাতর প্রার্থনায় আমি অবমাননা করিব না। আমার বাক্যের আমি অন্যথা করিব না। তিলোত্তমা পুত্রবধূ হইবার যোগ্য-পাত্রী সন্দেহ নাই। আমি তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিলাম। তুমি তিলোত্তমার নিমিত্ত আজি হইতে রাজমহিষীর ন্যায় সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দেও। অতঃপর নববধূ তোমার নিত্যসঙ্গিনী হইলেন।"

কাঁদিতে কাঁদিতে তিলোত্তমা মহারাজের পদধূলি গ্রহণ করিয়া মস্তকে স্থাপন করিলেন এবং একটু দূরে আসিয়া মুখে কাপড় দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মহারাণী উর্ম্মিলাও মহারাজের চরণ-সান্নিধ্য হইতে দূরে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং কহিলেন,—"দাসী চিরদিনই মহারাজের করুণা লাভ করিয়া চরিতার্থ হইতেছে। অদ্যকার এই অনুগ্রহ দাসীর জীবনের চিরস্মরণীয় ঘটনা।"

মানসিংহ বলিলেন,—"মা রাজলক্ষ্মী, এখন তুমি সত্যই আমার মা। মার কাজ কর; আমাকে ক্ষুধার সময় খাইতে দেও মা।"

তিলোত্তমা আহার্য্যের ব্যবস্থা করিতে প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আয়েষা।

পাটনায় প্রত্যাগমনের কয়েকদিন পরে, মহারাজ গুপ্তচরের নিকট সংবাদ পাইলেন, পাটনায় এক সমৃদ্ধিশালী পাঠানের ভবনে; নবাব কতলু খাঁর কন্যা আয়েষা অতিথি ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। মহারাজ নানা ভাবে এ সংবাদ আলোচনা করিলেন; কিন্তু ইহাতে কোন বিপদের সম্ভাবনা আছে, বা এজন্য কোন সাবধানতার প্রয়োজন আছে বলিয়া তাঁহার মনে হইল না। উড়িষ্যার পাঠানদিগের সহিত তাঁহারা সন্ধি-বদ্ধ; সুতরাং সেখানকার সামান্য বা অসামান্য যে কোন লোক পাটনায় কেন, দিল্লীতেও স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করিতে পারে। ইহাতে আপত্তির কোন কারণ নাই। তবে যদি নবাব-তনয়া প্রকাশ্যরূপে সুবেদারকে সংবাদাদি প্রদান করিয়া আসিতেন, তাহা হইলে মানসিংহকে তাঁহার যথারীতি অভ্যর্থনা, তাঁহার সুবিধা অসুবিধার দিকে দৃষ্টি, তাঁহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রাপ্তির ব্যবস্থা এবং তাঁহার কুশল-বার্ত্তা গ্রহণাদি করিতে হইত। কিন্তু তিনি যখন সে ভাবে আইসেন নাই, তখন সে সম্বন্ধেও মানসিংহের কোন কর্ত্তব্য নাই।

অনেক পাঠান কার্য্য-সূত্রে পাটনায় বাস করেন। অনেকেরই অবস্থা উন্নত এবং অনেকেই বিশেষ সম্ভ্রমশালী। ভারতে মোগল-পাঠানের বিবাদ অনেক দিন শেষ হইয়া গিয়াছে। ইব্রাহিম লোদীর সহিত দিল্লীর সিংহাসন পাঠানদিগের হস্তভ্রষ্ট হইয়াছে। দাউদ খাঁ বাঙ্গালা দেশের সিংহাসন হারাইয়া উড়িষ্যায় পলাতক হইয়াছিলেন। উড়িষ্যার পাঠানগণ এখনও স্বাধীনতার নিমিত্ত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত রহিয়াছেন; কিন্তু বাঙ্গালা দেশের পাঠানেরা অনেক দিন আপনাদের অপ্রতিবিধেয় নিয়তির অধীনতায় ঘাড় পাতিয়া দিয়াছে। বঙ্গদেশের পাঠানগণ মনের মধ্যে যাহাই হউক, বাহে মনের অসন্তোষাগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া, জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। সুতরাং আয়েষার গুপ্ত আগমন, বা তাঁহার পাঠানগৃহে অবস্থানে মানসিংহ সন্দেহের কোন কারণ দেখিতে পাইলেন না।

সপ্তাহ পরে এক ভয়ানক সংবাদ উপস্থিত হইয়া মানসিংহের সমস্ত শান্তি ধ্বংস করিয়া দিল। নবাব ওসমান খাঁ ও সোলেমান খাঁ পুরী আক্রমণ করিয়াছেন; মহারাজ রামচন্দ্র দেব পলাতক হইয়াছেন।

সংবাদ সত্য। ওসমান খাঁ যে সন্ধি-বন্ধনে প্রথম হইতেই সন্তুষ্ট ছিলেন না, এ কথা আমরা জানি। মানসিংহের কোন কোন ব্যবহারে যে তিনি নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন, ইহাও আমরা জানি। তিনি কতলুর সোলেমানের সহিত পরামর্শ করিলেন। সেই বিলাস-প্রান্ত ও ভোগ-সুখ-নিরত যুবাও আমূল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া নিতান্ত উত্তেজিত হইলেন। সন্ধিভঙ্গ করাই তাঁহাদের অভিপ্রায় হইল। মানসিংহ চলিয়া আসার অত্যল্প কাল পরেই তাঁহারা পুরী আক্রমণ করিলেন।

ওসমানের উদ্ধত ভাব মানসিংহকে বড়ই বিরক্ত করিয়াছিল। একবারে পাঠানগণকে

পদদলিত ও নিষ্পেষিত করিতে তাঁহার সঙ্কল্প হইল। তিনি স্বয়ং যুদ্ধার্থে উড়িষ্যা যাত্রা করিবেন স্থির করিলেন। সৈন্য ও সেনাপতি-গণকে অবিলম্বে প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত আদেশ প্রচার করিলেন।

পাঠানদিগকে, বিশেষতঃ ওসমানকে নিগৃহীত ও মর্ম্মপীড়িত করিবার এক সহজ উপায় মানসিংহের মনে পড়িল। তিনি স্থির করিলেন, নবাব-তনয়া আয়েষা সমস্ত নবাব-পুরীর অতিশয় আদরের সমগ্রী। বিশেষতঃ তিনি নবাব ওসমান খাঁর প্রণয়পাত্রী। তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিতে পারিলে, নিশ্চয়ই ওসমান খাঁ নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িবেন। সমরে তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতেই হইবে, অধিকন্তু তাঁহাকে নির্য্যাতন করিবার এরূপ সহজ ও করতলগত উপায় ত্যাগ করিতে মহারাজের ইচ্ছা হইল না।

আয়েষা যাঁহার ভবনে প্রচ্ছন্ন ভাবে বাস করিতেছিলেন, তাঁহার নাম তাজ খাঁ। তাজ খাঁ, কতলু খাঁর কাশ্মীরী বেগমের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত ব্যক্তি। সেই সম্পর্কে তাজ খাঁ ও তাঁহার পত্নী কখন কখন নবাব কতলু খাঁর ভবনে যাতায়াত করিতেন; এই সূত্রে আয়েষার সহিত তাঁহাদের সাতিশয় আত্মীয়তা ঘটিয়াছিল। যাহাতে আয়েষা কখন না কখন পাটনায় তাঁহাদের ভবনে আগমন করেন, এজন্য তাজ খাঁর স্ত্রী অনেক চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। বহু দিনের চেষ্টার পর, এবার সাহসা আয়েষা স্বয়ং পত্র লিখিয়া এবং সমস্ত ব্যবস্থা স্থির করিয়া পাটনায় আসিয়াছেন। অতি সমাদরে তাজ খাঁ ও তাহার পত্নী নবাব-নন্দিনীকে গৃহে আনিয়াছেন। বড় আনন্দে তাঁহাদের দিন কাটিতেছে।

সহসা সন্ধ্যার পর মোগল সৈন্যেরা তাজ খাঁর ভবন ঘিরিয়া ফেলিল। তিনি কোনই সংবাদ জানিতেন না; সুতরাং এরূপ নিগ্রহের কোনই কারণ স্থির করিতে পারিলেন না। অবরোধকারী সৈনিকগণ এতদ্বিষয়ক প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিতে পারিল না। তখন তাজ খাঁ কাতর ভাবে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রক্ষিগণ সে প্রার্থনা পূরণে সম্মত হইল।

পরদিন প্রাতে প্রহরি-বেষ্টিত তাজ খাঁ বঙ্গ-বিহারের সুবেদারের সম্মুখীন হইয়া জানিতে পারিলেন, তাঁহার ভবনে কতলু খাঁর কন্যা অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাকে অবরুদ্ধ করাই মোগলদিগের প্রয়োজন। যদি তাজ খাঁ নবাব-নন্দিনীকে মোগলদিগের হস্তে সমর্পণ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার ভবন প্রহরি-মুক্ত হইবে। পাঠান তাজ খাঁ এ প্রস্তাব নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন। তিনি ব্যবসায়ী ব্যক্তি; সতত তাহার ভবনে বহুলোকের যাতায়াত হইয়া থাকে। তাহা বন্ধ হইলে তাঁহার এবং অন্যান্য অনেকের যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি হইবে, এ কথা মহারাজের গোচর করা হইল। আয়েষাকে হাতে না পাইলে, মহারাজ কোন কথাই শুনিতে সম্মত হইলেন না। এ কথা মহারাজ বুঝাইয়া দিলেন। নবাব তনয়ার প্রতি কোন প্রকার অসম্মান প্রদর্শন করা হইবে না, তাঁহার পদ-মর্য্যাদার অনুরূপ ভাবে তাঁহাকে অবরুদ্ধ রাখা হইবে। তাজ খাঁ প্রাণ ছাড়িতে কবুল; তথাপি তাঁহার গৃহাগত নবাব-নন্দিনীকে ছাড়িয়া দিতে অনিচ্ছুক হইলেন। অগত্যা প্রহরি-বেষ্টিত হইয়া তাজ খাঁ গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

আয়েষা সকল সংবাদ জানিতে পারিলেন।

তিনি তাজ খাঁর সঙ্গে আসিয়া মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনা করিলেন। সময় ও স্থান স্থির হইল। যথাসময়ে দুইজন বাঁদী ও তাজ খাঁ সহ আয়েষার প্রহরি-বেষ্টিত শিবিকা, নির্দ্দিষ্ট ভবনে প্রবেশ করিল। নির্ভীক ও অসঙ্কুচিত ভাবে আয়েষা মানসিংহের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন

মানসিংহ দেখিলেন, সজীব দেবী-মূর্ত্তি সগৌরবে আপনার শোভা ও মহিমা বিলাইতে বিলাইতে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি নিকটস্থ হইলে মানসিংহ বলিলেন,—"মা, তুমি আমার কন্যা। আমি তোমাকে রাজনৈতিক প্রয়োজনে কষ্ট দিতে বাধ্য হইতেছি। আমি তোমাকে কন্যা বলিয়াছি, অতএব যাহা তোমার বলিবার থাকে তুমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পার।"

আয়েষা বলিলেন,—"পিতা, আপনি আমাকে অবরুদ্ধ করিবেন স্থির করিয়াছেন। পিতার অবরোধে কন্যা কিয়ৎকাল বাস করিলে অসঙ্গত হয় না। আমি সন্তুষ্ট চিত্তে আপনার অবরোধে বাস করিব। এ সম্বন্ধে আমার বলিবার কোন কথাই নাই।"

মানসিংহ বলিলেন,—"তোমার বলিবার কোন কথা না থাকিতে পারে; কিন্তু আমার জিজ্ঞাসা করিবার অনেক কথা আছে। তুমি তাহার সত্য উত্তর প্রদান করিলে সুখী হইব।"

আয়েষা বলিলেন,—"আয়েষার জীবনে প্রচ্ছন্ন করিবার ঘটনা কিছুই নাই। সুতরাং মিথ্যা বলিবার কোন প্রয়োজন হয় না। আপনি যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।"

মানসিংহ বলিলেন,—"তুমি আত্মীয়স্বজনের সংসর্গ ত্যাগ করিয়া উড়িষ্যা হইতে পাটনায় কেন আসিয়াছ ?"

আয়েষা একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"সত্য কথাই বলিব। আপনার পুত্র কুমার জগৎসিংহকে কারামুক্ত করিবার বাসনায় আমি এখানে আসিয়াছি।"

মানসিংহ পুত্রের মুক্তির জন্য একটু ব্যাকুল হইয়াছেন। বাহ্যে তাহা ব্যক্ত না করিলেও, অন্তরে তিনি তাহার উপায় চিন্তা করিতেছেন; কিন্তু কোন উপায়ই তিনি স্থির করিতে পারিতেছেন না। এক্ষণে সহজে সদুপায় উপস্থিত হইতেছে জানিয়া তিনি মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন,—"তাহার জন্য কি উপায় তুমি অবলম্বন করিয়াছ ?"

আয়ে। বাদশাহের নিকট যুবরাজের পক্ষ হইতে আবেদন প্রেরণ।

মান। আমি সুবেদার; আমাকে না জানাইয়া বাদশাহের নিকট তুমি কেন আবেদন প্রেরণ করিবার চেষ্টা করিতেছ ?

"আপনার দ্বারা এ সম্বন্ধে কোন উপকার হইতে পারে না। আপনি স্বয়ং প্রকাশ্য দরবারে অপরাধী স্থির করিয়া যুবরাজের প্রতি যে দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন, আজি তাহা লঙ্ঘন করিতে আপনার ইচ্ছা হইবে না। যদি সেরূপ ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, অম্বরেশ্বরের সর্ব্বত্র সমাদৃত নাম নিতান্ত অবজ্ঞার বস্তু। মহারাজের প্রকৃত মর্য্যাদা আমরা জানি বলিয়াই, রাজপুত্রের আবেদন, তাঁহার পিতার নিকট উপস্থিত না করিয়া, পিতার অপেক্ষা উচ্চপদস্থ ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছি।"

এ উত্তরে মহারাজ পরিতুষ্ট হইলেন। জিজ্ঞাসিলেন,—"আবেদন প্রস্তুত ও প্রেরিত হইতে বিলম্ব কি ?"

আয়েষা বলিলেন,—"আবেদন প্রস্তুত ও স্বাক্ষরিত হইয়া প্রেরিত হইয়াছে। বোধ হয় আবেদন এতদিনে প্রয়াগ ছাড়াইয়া গিয়াছে।"

মান। আবেদনে কারাবদ্ধ জগৎসিংহের স্বাক্ষর জাল করা হইয়াছে কি ?

আয়ে। না মহারাজ, কারাবদ্ধ জগৎসিং স্বয়ং সমস্ত মর্ম্ম বুঝিয়া সে আবেদনে নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন।

মান। কারাগারে তাঁহার নিকট আবেদন পৌঁছিল কিরূপে ?

আয়ে। সে জন্য আমাকে একটু কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কারারক্ষকদিগকে অনেক ঐশ্বর্য্য প্রদানের লোভ দেখাইয়া হস্তগত করিতে হইয়াছে।

মান। বুঝিলাম তুমি অতি বুদ্ধিমতী ও কার্য্যকুশলা ; কিন্তু প্রধান ব্যাপারের তুমি কি ব্যবস্থা করিয়াছ ? বাদশাহ-দরবারে এ আবেদন উপস্থিত হইবে কি না সন্দেহ।

আয়েষা বলিলেন,—"মহারাজ, সে বিষয়ের যথেষ্ট সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। আবেদন যেমন উপস্থিত হইবে, তেমনই বাদশাহের হস্তগত হইবে এবং অনুকূল আদেশ প্রদত্ত হইবে, তদ্বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নাই।"

মানসিংহ বলিলেন,—"তোমার উদ্দেশ্য কি ? কেন তুমি এই অসমসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছ, তাহা জানিতে পারা আমার আবশ্যক।"

আয়েষা অবনত মস্তকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এ কথার কোন উত্তর তাঁহার মুখে আসিল না।

মহারাজ বলিলেন,—"বুঝিতেছি এ প্রশ্নের উত্তর তুমি সহসা দিতে ইচ্ছা করিতেছ না। আমি তোমাকে এসম্বন্ধে আর প্রশ্ন করিব না। তুমি কোন দিন কারাগারে জগৎসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছ কি ?"

"না।"

"তোমার কোন সংবাদ তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছ কি ?"

"না।"

"তোমার যত্নে জগৎসিংহ মুক্ত হওয়ার পর নিশ্চয়ই তাঁহার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে ?"

"না।"

আয়েষার প্রণয়-ঘটিত কোন ব্যাপারই মহারাজের অবিদিত ছিল না। এক্ষণে তিনি বুঝিলেন, এই অসামান্যা নারী বাস্তবিকই জগৎসিংহের প্রতি অসামান্যা প্রণয়ানুরাগিণী। কিন্তু ইনি জ্ঞাত আছেন, জগৎসিংহের অন্তরে ইঁহার সম্বন্ধে অনুরূপ অনুরাগ নাই। এই জন্যই এই নবীনা এ পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই, তাঁহার মুক্তির পরও সাক্ষাৎ করিতে বাসনা করেন না। এই অলোক-সামান্যা নারী নিতান্ত মনঃপীড়া ভোগ করিতেছেন বলিয়া মানসিংহের মনে হইল। পুত্রের মুক্তির পর এই নারীর মানসিক ক্লেশ বিদূরিত করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে তিনি সংকল্প বদ্ধ হইলেন।

কথাটা আর একটু পরিস্ফুট করিবার অভিপ্রায়ে মানসিংহ বলিলেন,—"জগৎসিংহ অকৃতজ্ঞ ও নরাধম। তুমি তাহার জন্য এত আয়াস স্বীকার কেন করিতেছ ?"

আয়েষা নীরব অধোমুখ—চিন্তাকুল। মানসিংহ জিজ্ঞাসিলেন,—"কেন মা, তুমি আমার এ সামান্য প্রশ্নের উত্তর দিতে কুণ্ঠিত হইতেছ ?"

আয়েষা বলিলেন,—"মহারাজ, কাষ্ঠখণ্ডকে জিজ্ঞাসা করুন, সে কেন, পরের প্রয়োজনে আপনি পুড়িয়া মরে। জগৎসিংহ অকৃতজ্ঞ নহেন—নরাধমও নহেন। তিনি একান্ত ধর্ম্ম-পরায়ণ মহাপুরুষ।"

মানসিংহ বলিলেন,—"মা আয়েষা, তুমি রমণীরত্ন; তোমাকে সুখী করিবার জন্য আমি বিশেষ চেষ্টা করিব।"

আয়েষা বলিলেন,—"অতি প্রগল্‌ভার ন্যায় আমাকে মহারাজের ন্যায় ব্যক্তির সমক্ষে অনেক কথা কহিতে হইয়াছে; কিন্তু আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক এত কথা কহি নাই। দায়গ্রস্ত হইয়া মহারাজের আজ্ঞায় এবং পাছে প্রশ্নের উত্তর না দিলে আপনি বিরক্ত হন, এই ভয়ে, আমার রসনা লজ্জাহীনার ন্যায় অনেক কথা বলিয়া ফেলিয়াছে। আমি মহারাজের চরণে এজন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।"

মানসিংহ বলিলেন,—"আয়েষা, রাজনৈতিক প্রয়োজনে, নিতান্ত দুঃখের সহিত তোমাকে আমি কিছু দিন আবদ্ধ রাখিব, ইহাই আমার প্রথম সংকল্প ছিল, কিন্তু মা, তোমাকে দেখিয়া তোমার সহিত কথা কহিয়া, আমার মনে আরও অনেক সাধ হইয়াছে। সে কথা এখন থাকুক। পাঠানদিগের সহিত উড়িষ্যায় যুদ্ধ উপস্থিত। আমাকে কল্যই উড়িষ্যায় যাইতে হইবে। যুদ্ধের অবসান-কাল পর্য্যন্ত তোমাকে আমাদিগের নিকট থাকিতে হইবে। এ যুদ্ধ সম্বন্ধে তোমার কোন বক্তব্য আছে?"

"কিছু না। যুদ্ধ, সন্ধি, শাসন, পালন রাজার কার্য্য। আমরা স্ত্রীজাতি, তাহার কিছুই জানি না; আমরা সে সম্বন্ধে কথা কহিব কেন?"

মান। নবাব ওসমানকে এ সম্বন্ধে তুমি কোন কথা জানাইতে চাহ?

"না। নবাব একজন তেজস্বী, সাহসী, বীর। তিনি যে বুদ্ধির বশে যে কার্য্যে উদ্যত হইয়াছেন, তাহাতে কোন পরামর্শ প্রদান করিতে অগ্রসর হওয়া, আমার লোকের পক্ষে নিতান্ত গর্হিত সাহস। তাঁহার কার্য্যের পরিণাম ও ফলাফল তিনি অবশ্যই বুঝিয়াছেন এবং সেজন্য প্রস্তুত হইয়াছেন।"

মানসিংহ কহিলেন,—"আপাততঃ তোমাকে এই ভবনেই থাকিতে হইবে। আমার মহিষী উর্ম্মিলা দেবী তোমার সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার সুব্যবস্থা করিবেন; কোন বিষয়েই তোমার কোন অসুবিধা হইবে না। আমি যুদ্ধান্তে আসিয়া পুনরায় তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব। অদ্য আমি বড় ব্যস্ত; এক্ষণে বিদায় হই। তুমি তাজ খাঁকে গৃহে প্রেরণ কর।"

মহারাজ প্রস্থান করিলেন। তাজ খাঁ গৃহে ফিরিলেন। তাঁহার ভবন প্রহরিমুক্ত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরাজয়।

উড়িষ্যায় বিষম সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। পাঠানগণ সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করিয়া পুরী আক্রমণ করিয়াছেন। রাজা রামদেব যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত ছিলেন না; সুতরাং সহজেই পুরী পাঠানদিগের করকবলিত হইয়াছে। রামচন্দ্র পুরী ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন এবং মহারাজ মানসিংহের নিকট সমস্ত সংবাদ প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।

মহারাজ মানসিংহ বিশেষ আয়োজন সহকারে উড়িষ্যায় যাত্রা করিলেন। বর্দ্ধমান হইতে সৈয়দ খাঁ ও যথেষ্ট সৈন্যাদি লইয়া উড়িষ্যার দিকে ধাবিত হইলেন। একে সন্ধি-অবহেলন জনিত ক্রোধ, তাহার পর হিন্দুর প্রধান তীর্থ পুরুষোত্তম আক্রমণ; অধিকন্তু

ওসমানের নিতান্ত উদ্ধত ব্যবহার। মানসিংহ পাঠানকুলের সর্ব্বনাশ করিতে সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়াছেন।

পাঠানগণও উদ্যোগের কোন ক্রটি করেন নাই। ধারপুরের যুদ্ধে বিজয়ী নবাব ওসমান খাঁ জানিতেন যে, সন্ধি ভঙ্গ হইবামাত্র যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং তিনি অনেক দিন হইতেই যুদ্ধের আয়োজন করিয়া আসিতেছিলেন এবং যুদ্ধার্থ সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত ছিলেন

যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ ইতিহাসে বর্ণনীয়; তাহার বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা আমাদের পক্ষে অনাবশ্যক। এস্থলে সংক্ষেপে কয়েকটী প্রয়োজনীয় বাক্য মাত্র বিন্যস্ত হইতেছে।

বনপুরের নিকট মোগল-পাঠানের প্রথম সংঘর্ষণ উপস্থিত হইলে তুমুল যুদ্ধের সূত্রপাত হইল। পাঠানগণ যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক হস্তী লইয়া গিয়াছিলেন। সেই হস্তিসমূহকে তাঁহারা সম্মুখে স্থাপন করিলেন। মোগলেরা অনেক কামান লইয়া আসিয়াছিলেন। কামানের ঘোর গর্জ্জন শুনিয়া এবং কোন কোন হস্তী কামানের গোলা দ্বারা আহত হইয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া পড়িল এবং নিতান্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। রক্ষকেরা করিকুলকে কোন ক্রমেই স্থির রাখিতে পারিল না। তাহারা অবাধ্য ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পশ্চাতের সৈন্য-সমূহকে দলন করিতে করিতে চারিদিকে ধাবিত হইল। সমরক্ষেত্রের পুরোভাগে হস্তি-স্থাপনরূপ নির্ব্বুদ্ধিতা হেতু, পাঠান সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল এবং অনেকে হস্তিপদতলে প্রাণত্যাগ করিল।

তথাপি দুর্দ্ধর্ষ পাঠানগণ পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু প্রথমেই উদ্যমহীন হওয়ায়, তাহারা হতোৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল। বিষম যুদ্ধ হইল বটে, কিন্তু শেষে পাঠানদিগকে পরাজিত হইতে হইল।

বনপুরে এই যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধের নিমিত্ত বনপুর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হইয়াছে। বনপুরের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মোগল-পক্ষনেতা মহারাজ মানসিংহ সহজে ক্ষান্ত হইলেন না। উড়িষ্যা হইতে পাঠান-প্রাধান্য তিরোহিত করাই তাঁহার সঙ্কল্প। তিনি দুর্গের পর দুর্গ এবং নগরের পর নগর আক্রমণ করিতে লাগিলেন। জলেশ্বর ও কটক মোগলদিগের অধীন হইল। জল দুর্গেও মোগল-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইতে লাগিল।

মোগলগণ স্বর্ণগড় দুর্গও আক্রমণ করিলেন। এই স্থানে পাঠানগণ ভীষণ রণরঙ্গে প্রমত্ত হইলেন; কিন্তু শেষ রক্ষা করিতে পারিলেন না। কোন যুদ্ধেই তাঁহাদের সুবিধা হইল না। স্বর্ণগড় মোগলদিগের হস্তগত হইল।

অগত্যা ওসমানকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। নবাব সোলেমান ও নবাব ওসমান সর্ব্বতোভাবে আকবরের অধীনতা স্বীকার করিলেন এবং করদরূপে পরিগণিত হইলেন। উড়িষ্যা সম্পূর্ণরূপে মোগল-সাম্রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া গেল।

যথাসময়ে উড়িষ্যা-বিজয়ের সংবাদ বাদশাহের গোচর করা হইল। এই শস্য-শালিনী প্রদেশ বহুদিন হইতে মোগলদিগের নানাপ্রকার উদ্বেগ ও অশান্তির কারণ হইয়াছিল। এক্ষণে ইহা সর্ব্বতোভাবে মোগলদিগের অধীনতা পাশে বদ্ধ হওয়ায়, সম্রাট আকবরের আনন্দের সীমা থাকিল না মহারাজ মানসিংহ অতঃপর বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদার নামে পরিচিত হইলেন। রামচন্দ্র দেব প্রভৃতি উড়িষ্যার নিরীহ পূর্ব্ব ভূপতিগণ, অবিচলিত চিত্তে মোগলদিগের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া, সম্রাট তাঁহাদের পদ-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিলেন

হতাশ ওসমান মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। এত অবনতি ঘটিবে, ইহা তিনি একবারও মনে করেন নাই। এই যুদ্ধোদ্যমের প্রারম্ভ হইতে তাঁহার চিত্ত নানাবিধ দুশ্চিন্তায় ও যন্ত্রণায় অসন্তোষের নিকেতন হইয়াছিল। যুদ্ধারম্ভের কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে আয়েষা নবাব-পুরী হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। ওসমানকে আয়েষা যে ভাবেই দেখুন না কেন, তিনি যে ওসমানের সকল আনন্দের, সকল উৎসাহের এবং সকল অধ্যবসায়ের উৎস, তাহার সন্দেহ নাই। সেই আয়েষার সহিত ওসমান বাল্যকাল হইতে একত্র ক্রীড়া-কৌতুক করিয়া আসিতেছেন এবং এক সঙ্গে লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়া আসিয়াছেন। আয়েষার প্রতি তাঁহার ভালবাসা সীমাশূন্য ও অমেয়। সেই আয়েষা পুরী পরিত্যাগ করিয়াছেন; সঙ্গে সঙ্গে ওসমানের উৎসাহ ও ভরসা বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। এরূপ অসন্তুষ্ট, হতাশ ও চিন্তাকুল চিত্ত লইয়া ওসমান যাহা করিলেন, তাহাতেই বিরুদ্ধ ফল ফলিল। ওসমান অবসন্ন হইয়া পড়িলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অগ্নিকাণ্ড।

অভিরাম স্বামী কারাবাসী রাজপুত্রের মুক্তির নিমিত্ত আবেদনাদি লইয়া দিল্লীযাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার সহিত আর পাঁচ জন সঙ্গী গিয়াছে। সকলেই অশ্বারোহণে গমন করিয়াছেন। নানা স্থানে নানা ব্যক্তিকে উৎকোচ দিবার প্রয়োজন হইবে; বাদশাহ দরবারে আবেদন স্থাপন করিবার উপায় করিতে হইলে, বহু অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে। আয়েষা সে জন্য অভিরাম স্বামীর হস্তে প্রভূত ধন-রত্ন প্রদান করিয়াছেন।

নবাব-নন্দিনী আয়েষা আরও অনেক সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। বাদশাহ-দরবারে ও অন্তঃপুরে অনেকের সহিত আয়েষার পরিচিত হইবার উপায় ছিল। অনেক অতীত কথা স্মরণ করাইয়া, অনেককে তিনি লিপি লিখিয়াছেন। অধিকন্তু মানসিংহের ভগ্নী, সুতরাং জগৎসিংহের পিতৃস্বসার নিকটও এক খানি বিনীত পত্র লিখিয়া, তাঁহার কৃপালাভের নিমিত্ত প্রার্থী হইয়াছেন। যত পত্র আয়েষা লিখিয়াছেন, তত্তাবৎই যথাস্থানে উপনীত হইলে, অভীষ্ট ফল-প্রাপ্তি সহজ হইবে তদ্বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ নাই। উদ্যোগ ও অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি হয় নাই।

কয়েক দিন মাত্র বিলম্ব করিয়া আয়েষা স্বয়ং দিল্লী যাত্রা করিবেন, এরূপও স্থির থাকিল। সম্ভবতঃ তাঁহার দিল্লীগমনের পূর্ব্বেই অভিরাম স্বামী কার্য্যোদ্ধার করিয়া প্রত্যাগত হইবেন, অনেকের মনেই এইরূপ ভরসা হইল। সহসা মহারাজ মানসিংহের ব্যবস্থায় আয়েষাকে পাটনায় বন্দিনী হইয়া থাকিতে হইল। মানসিংহ যুদ্ধ-বিগ্রহ লইয়া বিব্রত; সুতরাং আয়েষার মুক্তির সম্প্রতি কোন আশা নাই। কিন্তু ইহাতেও আয়েষার অসন্তোষ বা উদ্বেগ নাই; কেন না তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির অনুকূল অনুষ্ঠান সমূহ সম্পন্ন হওয়ার পর, তিনি অবরুদ্ধ হইয়াছেন। তিনি আজীবন বন্দিনী থাকিতেও কাতর নহেন। জগৎসিংহের কর্ম্মময়, উৎসাহময় ও আনন্দময় জীবন অন্ধকার কারাগারে নষ্ট হইতেছে; যদি সে বীরকে মুক্ত করিবার জন্য আয়েষাকে চিরদিন তাঁহার

স্থানে থাকিতে হয়, তাহা হইলে আয়েষা হাসিতে হাসিতে এখনই তাহাতে প্রস্তুত।

পঞ্চম দিনে অভিরাম স্বামী ও তাঁহার সঙ্গী বীরপঞ্চকে বহন করিয়া অশ্ব সমূহ কাণপুরে উপনীত হইল। তথায় যাইয়া অভিরাম জ্ঞাত হইলেন, বাদশাহ বাহাদুর তখন আগরায় আছেন। এ সংবাদে তিনি তুষ্ট হইলেন। আর দুই দিনে তিনি আগরায় উপনীত হইতে পারিবেন বলিয়া ভরসা করিলেন। বিধাতা অনুকূল হইয়াছেন; সকল বিষয়েই সুবিধা হইয়া আসিতেছে বুঝিয়া, তিনি হৃষ্ট হইলেন।

এই সম্প্রদায় যখন কাণপুরে উপনীত হইলেন, তখন অপরাহ্ণ কাল। অশ্বসমূহ নিতান্ত পরিশ্রান্ত এবং অশ্বারোহিগণও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর। অভিরাম স্বামী বাজারের পার্শ্বে প্রান্তর-মধ্যে এক বৃহৎ বটবৃক্ষমূলে সে দিনকার মত আশ্রম সন্নিবেশ করিবেন স্থির করিলেন। অশ্বারোহিগণ অবতরণ করিয়া দূরে আর এক বৃক্ষমূলে পশুদিগকে বন্ধন করিল। অভিরাম স্বামী, আপনার স্কন্ধস্থিত চর্ম্ম খুলিয়া বৃক্ষতলে একদিকে পাতিয়া বসিলেন। জগৎসিংহের আবেদন, আয়েষার লিখিত পত্রসমূহ এবং তাঁহার প্রদত্ত ধন-রত্ন এক স্থূল উত্তরীয় বস্ত্রে সুন্দররূপে বাঁধিয়া তিনি বক্ষদেশে জড়াইয়া রাখিয়াছিলেন। অতি সাবধানতার সহিত তিনি সেই সকল পদার্থ লইয়া আসিতেছেন। এক্ষণে এই স্থানে স্থির হইয়া বসিয়া তিনি বক্ষোদেশস্থ সেই উত্তরীয় উন্মোচন করিলেন এবং চর্ম্মাসনের, নিম্নে এক প্রান্তে তাহা পরিস্থাপিত করিয়া তাহার উপর মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক শয়ন করিলেন।

রক্ষিগণ আপন আপন লোটা ও রশি বাহির করিয়া পার্শ্বস্থিত কূপ হইতে জল তুলিতে লাগিল এবং তাহার পর পা হাত মুখ ধুইতে থাকিল। পথে পালা করিয়া রক্ষিগণ অশ্বগুলির সেবা করিয়া আসিতেছে। এখন যাহাদের পালা, তাহারা দুইজন বাজারে ঘোড়ার দানা কিনিতে গেল। তাহারা সকলেই এক জাতি; এক চৌকায় সকলেরই আহার চলে। হাত মুখ ধোওয়া শেষ হইলে, একজন বাজারে ডাইল, আটা, ঘৃত, লবণ প্রভৃতি আনিতে গেল। আর একজন, একটা স্থান নির্ব্বাচন করিয়া, চৌকা বানাইতে লাগিল। পঞ্চমব্যক্তি অভিরাম স্বামীর নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসিল,— প্রভুর সেবার কি আয়োজন করিব?"

অভিরাম স্বামী বলিলেন,—"আমি একটু ঘৃত চিনি মিশাইয়া কাঁচা আটা খাইব। সে জন্য কোন আয়োজনের আবশ্যক নাই। তোমাদের জন্য যাহা আসিতেছে, তাহা হইতে একটু লইলেই হইবে।"

জিজ্ঞাসাকারী, যে ব্যক্তি চৌকা বানাইতেছে তাহার সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল। যাহাদের উপর অশ্বসেবার ভার, তাহারা প্রচুর দানা লইয়া ফিরিয়া আসিল এবং একখানি বড় কাপড়ে দানা সমস্ত বাঁধিয়া তাহার উপর জল ঢালিয়া দিল। সঙ্গীদিগকে সেই দানার উপর মধ্যে মধ্যে জল ঢালিতে বলিয়া, তাহারা ঘোড়াগুলি লইয়া জলাশয়ের অন্বেষণে চলিল।

যথেষ্ট খাদ্য দ্রব্য লইয়া একজন রক্ষী ফিরিয়া আসিল। চৌকার নিকট হইতে একজন উঠিয়া আসিয়া সাবধানে আগন্তুকের হস্ত হইতে সমস্ত সামগ্রী নামাইয়া লইল। তাহার পর স্বামীজির নিমিত্ত আটা, চিনি, ঘৃত স্বতন্ত্রস্থানে রাখিয়া, অবশিষ্ট সামগ্রী উভয়ে গুছাইয়া রাখিল।

পাক আরম্ভ হইল। অশ্বপালেরা ফিরিয়া

আসিল এবং অশ্বদিগকে দানা খাইতে দিয়া, আপনারা হাত মুখ ধুইতে লাগিল।

সন্ধ্যা হইয়া গেল। রক্ষিগণ বাজার হইতে মশাল প্রস্তুত করিয়া আনিল। মশালের আলোকে অন্ধকার দূর করা হইল। খাদ্যাদি প্রস্তুত হইল।

রাত্রি প্রায় এক প্রহর। সহসা বাজারের মধ্যে তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল। "গেল রে,—গেল রে,—জল—জল—বাহির কর—টান—টান—ধর" ইত্যাদি শব্দে বিষম গোল হইতে লাগিল। সকলেরই দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। সকলেই দেখিলেন, ভয়ানক কাণ্ড! বাজারে আগুন লাগিয়াছে! আঃ! কি হইল!—হায় সব গেল!" ইত্যাকার বিবিধ হৃদয়বিদারক শব্দ পথিকের কর্ণে নিরন্তর প্রবেশ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে অগ্নি অতি ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। অন্ধকারে সেই অগ্নিকাণ্ড যেন বহ্নিময় শৈল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; তাহার উপর হইতে যে সকল অগ্নি-শিখা ঊর্দ্ধে উঠিয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল, তৎসমস্ত যেন অগ্নি শৈল হইতে উড্ডীয়মান বহ্নি-বিহঙ্গম বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকিল। ভগবান্ সর্ব্বভুক্ লেলিহান্ রসনা বিস্তার করিয়া সর্ব্বগ্রাসের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। দারুণ চীৎকারে ও আর্ত্তনাদে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

অভিরাম স্বামী বলিলেন,—"ভাই সব, দেখিয়া কি ফল? যাও, যদি বিপন্নের কোন সাহায্য করিতে পার, তাহার চেষ্টা করিতে অগ্রসর হও।"

বাক্য শেষ হইবামাত্র রক্ষিগণ আপনাদের উপস্থিত খাদ্য ফেলিয়া, সেই অগ্নিকাণ্ডের অভিমুখে ধাবিত হইল। অভিরাম স্বামী তথায় দাঁড়াইয়া সেই হৃদয়-বিদারক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন।

সহসা সকল কোলাহল অতিক্রম করিয়া, যাবতীয় বিলাপধ্বনি ও আর্ত্তনাদ পরাভূত করিয়া, নারীকণ্ঠে হৃদয়ভেদী শব্দ উঠিল,—"আমার ছেলে,—দুঃখিনীর সর্ব্বস্ব ধন—রক্ষা কর—রক্ষা কর। আমি তোমার দাসী হইয়া থাকিব। রক্ষা কর—না কর—দোহাই তোমাদের—আমাকে আগুনে ফেলিয়া দেও।"

অভিরাম স্বামী দিগ্বিদিক্-জ্ঞান-শূন্য হইয়া পড়িলেন। তিনি বেগে সেই শব্দাভিমুখে ধাবিত হইলেন। অসীম সাহসের সহিত উন্মত্ত প্রায় অভিরাম স্বামী সেই অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিলেন। দুঃখিনীর শিশু সন্তান রক্ষা পাইল। সেই নিদ্রিত শিশু বুকের ভিতর লইয়া অভিরাম নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার দেহের নানা স্থান দগ্ধ হইয়াছিল। তিনি তাহা গ্রাহ্যও করিলেন না।

রাত্রি দ্বিপ্রহর কালে অগ্নি নির্ব্বাণ হইল। রক্ষিগণ তখন অভিরাম স্বামীর সহিত মিলিত হইল। সকলে ভস্মমাখা, কাতর, ও দগ্ধ প্রায় দেহ লইয়া প্রান্তরে বটবৃক্ষ সমীপে প্রত্যাগত হইলেন। কিন্তু কি ভয়ানক! অশ্বগুলি সে স্থানে নাই! অগ্নিভয়ে তাহারা কি বন্ধন-রজ্জু ছিন্ন করিয়া পলায়ন করিয়াছে? রক্ষিগণের ডাউল, রুটী, তরকারী কিছুই নাই। কুকুর শৃগালে হয় তো খাইয়া গিয়াছে। লোটা একটীও নাই! তবে তো চোর আসিয়াছিল। অভিরাম স্বামী ব্যগ্রতা সহ চর্ম্মাসন তুলিয়া দেখিলেন, সে উত্তরীয় বস্ত্র নাই, সে আবেদন নাই, সে সকল পত্র নাই—সে ধন রত্ন কিছুই নাই। হায়, কি হইল বলিয়া অভিরাম স্বামী সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সুবিচার।

জগৎসিংহ সেই অন্ধকার কারাগারে পড়িয়া অচিরে মুক্তিলাভ করিবার সুখ স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। আয়েষা সেই সুখের পিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়া, হৃদয়ের সেই প্রিয় দেবতার সুখ ও আনন্দ প্রাপ্তির কল্পনা করিতে লাগিলেন। মহারাজ মানসিংহ দারুণ যুদ্ধবিগ্রহে নিযুক্ত থাকিয়াও, অপরের প্রযত্নে পুত্রের স্বাধীনতার আশা করিতে লাগিলেন। কেহই জানিতে পারিলেন না যে সকলের সকল বাসনা ব্যর্থ হইয়াছে; অচিন্তিতপূর্ব্ব ঘটনা উপস্থিত হইয়া, সকলের সকল আশা নির্ম্মূল করিয়া দিয়াছে।

অভিরাম স্বামী ও তাঁহার সম্প্রদায় সেই রাত্রিতে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অনাহারে, পরিশ্রমে, উৎকণ্ঠায় নিতান্ত অবসন্ন হৃদয়ে তাঁহারা সেই বৃক্ষ-মূলে পড়িয়া রাত্রি কাটাইলেন। লুণ্ঠনাবশিষ্ট যে যৎসামান্য সামগ্রী তথায় পতিত ছিল, পরদিন প্রাতে তাহা সংগ্রহ করিয়া, এই ছয় পথিক সহর কোতোয়ালের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

কোতোয়াল মহাশয় যমদূতের ন্যায় আশঙ্কার বস্তু। তাঁহার নিকট অগ্রসর হইয়া কথা কহিতে সাহস করে, এমন লোক অতি বিরল। অভিরাম স্বামী অনেক বাদশাহ নবাবের দরবার দেখিয়াছেন; কোতোয়ালের দরবার যে তাহার অপেক্ষা ভয়ানক স্থান, ইহা তাঁহার অবিদিত ছিল না। কোতোয়ালগণের অধিকাংশই, কারণে অকারণে প্রভুতা বিস্তার করিতে এবং সম্মুখাগত ব্যক্তি মাত্রকেই শাসন করিতে পারিলে, কর্ত্তব্যের শেষ হইল মনে করিয়া সন্তুষ্ট হইতেন। এই শ্রেণীর এক অদ্ভুত কোতোয়ালের নিকট অভিরাম স্বামীকে দল সহ উপনীত হইতে হইল।

সমস্ত অভিযোগের মর্ম্ম শ্রবণ করিয়া বিচক্ষণ কোতোয়াল মহাশয় স্থির করিলেন, ইহারা নিশ্চয়ই বিদেশী চোর; এই সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই একটা দাগী লোক, এ কারণ সন্ন্যাসী সাজিয়া বেশ বদলাইয়াছে। এখানে আসিয়া ইহারা চুরী করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পাছে ধরা পড়ে, এই ভয়ে একটা মিথ্যা অছিলা করিয়া, আগেই কোতোয়ালের নিকট সাফাই করিয়া রাখিতেছে। এরূপ সুন্দর মীমাংসা করিয়া সেই সুদক্ষ কোতোয়াল মহাশয় অভিরাম স্বামী ও তাঁহার লোকপঞ্চকে কোতে পুরিবার হুকুম দিলেন।

অভিরাম স্বামী ঘোর বিপদে পড়িলেন। চুরির কিনারা হউক না হউক এবং অপহৃত পদার্থ সমূহ পাওয়া যাউক না যাউক, অবকাশ পাইলে তিনি আবার পাটনায় ফিরিয়া যাইতে পারিতেন এবং নবাব-নন্দিনীর নিকট সমস্ত অবস্থা জানাইয়া যথাবিহিত ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। না হয় আর খানিকটা সময় নষ্ট হইত। এত সময় গিয়াছে, আর দশ দিন বিলম্বে কি ক্ষতি হইত? তাঁহাদের অনর্থক পরিশ্রম হইত। তাহাতে কি আইসে যায়?

অভিরাম স্বামী একটা যুক্তির কথা বুঝাইবার প্রয়াস করিলেন। কিন্তু কথা শুনে কে? মুখের কথা সামান্য মাত্র বাহির হইতে না হইতেই, কোতোয়াল সাহেব এই চোরদিগকে কোতে লইয়া যাইবার জন্য কর্কশ ভাবে আদেশ করিলেন। সুতরাং বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপন্ন হইলেও, অভিরাম স্বামী ও তাঁহাদের সঙ্গীদের বিনা অপরাধে, কোতে থাকিতে হইল।

সেই আবর্জনা-পূর্ণ, দুর্গন্ধময়, অন্ধকারাচ্ছন্ন কোতঘরের মধ্যে পড়িয়া তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন, ইহার পরে তাঁহাদিগকে হয় তো কাজির নিকট পাঠাইবে। কাজি সাহেব হয় তো কোতোয়ালেরই মত সূক্ষ্মদর্শী; তিনি হয় তো তাঁহাদের কারাবাস ব্যবস্থা করিবেন। অতএব এ স্থান হইতে পলায়ন করাই আবশ্যক। কিন্তু তাহারই বা উপায় কি?

পলায়নের উপায় স্থির হইল। একজন রক্ষী দেখাইয়া দিল, বিশেষ চেষ্টা করিলে দ্বারের একটা লৌহদণ্ড খোলা যাইতে পারে। দেওয়ালের উপরে আলোক আসিবার জন্য কয়েকটা ছিদ্র আছে! এক জনের কাঁধের উপর আর একজন দাঁড়াইয়া সেই লৌহদণ্ডের দ্বারা একটা ছিদ্র একটু বড় করিলেও করা যাইতে পারে। তাহার পর সেই ছিদ্র দিয়া এক এক জন করিয়া পলায়ন করা অসম্ভব নহে।

সকলেই এ কার্য্য সম্ভব বলিয়া মনে করিলেন। প্রস্তাবকারী রক্ষী গরাদে খুলিবার চেষ্টায় থাকিল। গত কল্য ভয়ানক পরিশ্রমে, অনাহারে, শেষে অগ্নিদাহে ও তাপে সকলেই কাতর ছিলেন; অদ্যও অনাহারে দিন কাটিল।

রক্ষী যাহা বলিয়াছিল, তাহা ঠিক হইল। এক জনের কাঁধের উপর আর একজন উঠিয়া পর্য্যায়-ক্রমে, সাবধানতার সহিত পরিশ্রম করিয়া, দেওয়ালের রন্ধ্র-পথ বিস্তৃত করিয়া ফেলা হইল। যদি নির্ব্বিঘ্নে তাঁহারা পলায়ন করিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে তিন জনকে পাটনার দিকে ফিরিয়া গিয়া নবাব-নন্দিনীর নিকট সমস্ত অবস্থা নিবেদন করিতে হইবে। তিনি অবস্থা বুঝিয়া যেরূপ ব্যবস্থা করিবেন তদনুযায়ী কার্য্য হইবে। অভিরাম স্বামী পাটনার দিকে যাইবেন না। দুইজন রক্ষীকে সঙ্গে লইয়া তিনি আগরার দিকে যাইবেন। যদি সেখানে কোন উপায় করিতে বা বাদশাহ দরবারে প্রসঙ্গটা উপস্থিত করিয়া রাখিতে পারেন, আগরায় থাকিয়া তিনি তাহারই উপায় দেখিবেন এবং নবাব-নন্দিনীর আদেশানুযায়ী কার্য্য করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন। এইরূপ পরামর্শ স্থির রহিল।

গভীর নিশীথে সেই রন্ধ্র-পথ দিয়া একে একে কয় ব্যক্তিই নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং সেই অন্ধকারে প্রচ্ছন্নদেহ হইয়া সকলে পলায়ন করিলেন।

সমস্ত রাত্রি তাঁহারা সহরের অনেক দূরে এক বনের মধ্যে অবস্থান করিলেন। শেষ রাত্রিতে তাঁহারা দুই ভাগে বিভক্ত হইলেন। তিনি জন পাটনার দিকে এবং অভিরাম প্রমুখ তিনজন আগ্রার দিকে যাত্রা করিলেন। ভিক্ষা-বৃত্তি সকলেরই অবলম্বন হইল।

যে সম্প্রদায় পাটনার দিকে যাত্রা করিল, তাহারা যথা সময়ে অভীষ্ট স্থানে উপনীত হইল বটে; কিন্তু কোন কার্য্যই করিতে পারিল না। তাজ-খাঁর বাটী আসিয়া তাহারা জানিল, নবাবনন্দিনী বন্দিনী হইয়া মহারাজার প্রাসাদবিশেষে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাতের কোনই উপায় হইল না। কারাবাসী যুবরাজ জগৎসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করাও তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইল না। সুতরাং তাহারা এ সকল চেষ্টা ত্যাগ করিয়া, কর্ম্মান্তর অবলম্বনে জীবিকা পাত করিতে লাগিল।

এদিকে অভিরাম-প্রমুখ যাত্রিগণ আরণ্য পথ অবলম্বন করিয়া আগ্রার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যথাকালে ভিক্ষালব্ধ ভুট্টা ও নদীর জল কথঞ্চিৎ রূপে তাঁহাদের ক্ষুৎ-পিপাসা নিবারণ করিতে লাগিল। বৃক্ষের

উপরিভাগে উঠিয়া, শাখার সহিত দেহ বন্ধন করিয়া, তাঁহারা রাত্রি কাটাইতে লাগিলেন। দুই দিন এইরূপে চলিয়া গেল।

তৃতীয় দিনের প্রাতঃকালে যাত্রিগণ আগ্রার নিম্নবাহিনী যমুনার উত্তর-পূর্ব্ব অংশস্থিত ঘনারণ্যে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে উত্তর দিক্ হইতে আর একটী আরণ্য পথ আসিয়া তাঁহাদের অবলম্বিত সংকীর্ণ আরণ্য পথের সহিত মিলিত হইয়াছে। তাঁহারা দেখিলেন, অচির পূর্ব্বে অনেক অশ্বারোহী পার্শ্বস্থ পথাবলম্বনে তাঁহাদের পরিগৃহীত পথে প্রবেশ করিয়াছে এবং তাঁহাদের অগ্রে চলিয়া গিয়াছে। পদ-চিহ্ন সমূহ দেখিলেই বোধ হয়, ক্ষণ পূর্ব্বে অশ্বগণ এই পথ দিয়া গমন করিয়াছে।

এরূপ আরণ্য পথে অশ্বারোহী কেন চলিয়াছে ইহা জানিতে অভিরাম স্বামীর একটু কৌতূহল জন্মিল। তিনি সঙ্গীদ্বয় সহ একটু দ্রুত চলিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমনের পর স্বামী দেখিতে পাইলেন, অশ্ব সমূহ দক্ষিণ দিকের একটী সঙ্কীর্ণ পথ অবলম্বনে গমন করিয়াছে। সে দিকে গমন করা অভিরাম স্বামীর অভিপ্রেত না হইলেও, কৌতূহল-নিবৃত্তির নিমিত্ত তিনি সঙ্গীদ্বয় সহ সেই পথে প্রবেশ করিলেন।

অশ্বপদাঙ্ক আর পরিদৃষ্ট হয় না। পার্শ্বস্থ ঘন বনের এক স্থানের গুল্ম-লতা দলিত এবং শাখা-প্রশাখা ভগ্ন বলিয়া বোধ হইল। পত্রাদিতে দলনচিহ্ন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অভিরাম স্বামী তৎসমস্ত মনুষ্য ও অশ্ব-চরণ-পেষণ জনিত বলিয়া অনুমান করিলেন। কৌতূহলের মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল। তিনি একজন রক্ষীকে বলিলেন,—"বিশেষ সাবধানে ব্যাপারটা কি জানিয়া আসিতে পার?"

অভিরাম ও সঙ্গী একটা স্থান নিরূপণ করিয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিত রহিলেন। অপর রক্ষী প্রস্থান করিল। প্রায় এক ঘণ্টা কাল তাঁহাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইল। শেষে রক্ষীর জন্য তাঁহারা একটু চিন্তাকুল হইলেন। রক্ষী ফিরিয়া আসিল।

অভিরাম স্বামী সাগ্রহে জিজ্ঞাসিলেন,—"কি দেখিলে?"

রক্ষী বলিল,—"বড় শুভ সংবাদ!"

অভি। কিরূপ?

রক্ষী। আমাদেরই সেই ছয় ঘোড়া।

অভিরাম সবিস্ময়ে বলিলেন,—"বল কি?"

রক্ষী বলিল,—"আমি ঠিক দেখিয়াছি, আমাদের সেই ছয় ঘোড়া, তাহার কোন ভুল নাই।"

অভি। সঙ্গে লোক কত জন?

রক্ষী। দশ জন। আমাদের লোটাগুলিও তাহাদের সঙ্গে আছে; আমি ভাল করিয়া দেখিয়াছি।

"অস্ত্র শস্ত্র কিছু আছে?"

"সকলেরই তলোয়ার, ছোরা, আর বর্শা আছে।"

অভিরাম বলিলেন,—"এক্ষণে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, ইহারাই আমাদের সর্ব্বস্ব চুরি করিয়াছে। ইহাদের গ্রেপ্তার করিতে পারিলে সকলই পাওয়া যাইবে।"

যে রক্ষী অভিরামের কাছে ছিল, সে বলিল,—"তাহার কোন ভুল নাই। কিন্তু উপায় কি?"

অভিরাম বলিলেন,—"তোমরা দুই জনে এই বনে থাকিয়া দস্যুদের উপর লক্ষ্য রাখিতে পারিবে?"

১ম রক্ষী বলিল,—"তাহা কেন পারিব না? কিন্তু আপনি কি করিতে চাহেন?"

অভিরাম বলিলেন,—"এই বন পার হইয়া আর একটু পশ্চিম দিকে যাওয়ার পর, যমুনা পার হইলেই আগ্রায় পৌছিতে পারা যাইবে। আমি আগ্রায় গিয়া সরকারী সিপাহী আনিতে চাহি।"

২য় রক্ষী বলিল,—"আবার কোতোয়ালের কাছে এতেলা করিতে হইবে তো?"

অভিরাম বলিলেন,—"তাহা হইবে। কিন্তু সকল কোতোয়ালই যে কাণপুরের মহাত্মার মত কার্য্যদক্ষ ও বিচক্ষণ হইবেন এরূপ বিবেচনা করা ভুল। আগরা রাজধানী; এখানে অবশ্যই বুদ্ধিমান লোক আছেন। কোতোয়ালের দ্বারা কার্য্যসিদ্ধির উপায় না হইলে, এখানে অন্য উপায়ও না হইতে পারিবে এমন নহে।"

২য় রক্ষী বলিল,—"যতক্ষণ আপনি না ফিরিয়া আইসেন, বা আপনার কোন খবর না পাওয়া যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা দস্যুদের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া এখানে থাকিতে পারিব। কিন্তু দস্যুরা যদি এস্থান হইতে চলিয়া যায়, তাহা হইলে আমরা কি করিব?"

অভিরাম বলিলেন,—"বেশ বলিয়াছ। একজন দূরে থাকিয়া দস্যুদের পিছু লইবে। একজন এই স্থানে স্থির থাকিবে। দস্যুরা সময়ে সময়ে নিশ্চয়ই এক এক স্থানে আহার ও বিশ্রামের জন্য আড্ডা স্থাপন করিবে। যে ব্যক্তি তাহাদের অনুসরণ করিবে, তাহাকে সেই সময় চলিয়া আসিয়া এই স্থানের সঙ্গীকে দস্যুদের অবস্থান স্থানে যাইবার দিক, পথ এবং অন্যান্য সঙ্কেত সবিশেষ বলিয়া যাইতে হইবে।"

১ম রক্ষী বলিল,—"আমরা আপনার উদ্দেশ্য বুঝিয়াছি এবং তদনুরূপ কার্য্যও করিতে পারিব বুঝিতেছি। কিন্তু দস্যুরা যদি অধিক-দূর চলিয়া যায়, তাহা হইলে যাওয়া আসার সুবিধা হইবে কি? হয় তো শেষে আর দস্যুদের সন্ধান হইবে না।"

অভিরাম বলিলেন,—"এ কথা অসঙ্গত নহে। এখন বেলা দেড় প্রহর। আমার আগরা পৌছিতে দুই প্রহর বেলা হইবে। যোগাযোগ করিতে তৃতীয় প্রহর কাটিয়া যাইতে পারে। নাগাইদ সন্ধ্যা আমি এখানে আসিতে পারিব বলিয়া আশা করিতেছি।"

২য় রক্ষী বলিল,—"তাহা যদি পারেন, তাহা হইলে কোনই আশঙ্কা নাই। কারণ দস্যুগণ তিন দিন পরে এই আড্ডা লইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে। তাহারা সকলেই অতিশয় কাতর। আজি তাহারা এখানেই থাকিবে বলিয়া অনুমান হয়।"

অভিরাম বলিলেন,—"আমার আরও বোধ হয়, তাহারা এ স্থান হইতে আর কোথাও যাইবে না। এই বনে থাকিয়া তাহারা এক এক জন করিয়া আগ্রায় গিয়া, ক্রমে ঘোড়া ও বস্ত্রাদি বিক্রয় করিবে। এইরূপ উদ্দেশ্য না হইলে তাহারা আগরার ন্যায় রাজধানীর দিকে আসিবে কেন?"

১ম রক্ষী বলিল,—"প্রভুর এ অনুমান সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।"

অভিরাম বলিলেন,—"আর কথায় কাজ নাই। আমি এক্ষণে প্রস্থান করি। যদি আমি সন্ধ্যার মধ্যে কোন মতেই না আসিতে পারি, তাহা হইলে কল্য প্রাতে যে ফিরিব, অন্ততঃ একাকীও ফিরিয়া আসিব, তাহার সন্দেহ নাই। তোমরা সাবধান থাকিবে।"

অভিরামস্বামী প্রস্থান করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পাটনায় মহারাজ মানসিংহ-নির্দ্দিষ্ট ভবনে, আয়েষা সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দে আছেন। মহারাণী উর্ম্মিলা বিবিধ বিধানে তাঁহার সর্ব্বপ্রকার সুখ ও আনন্দের সুব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং বহুবার আয়েষার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছেন। এ সংসারে আয়েষার সহিত আলাপ করিয়া কে না প্রীত হয়? কে তাঁহাকে পরিচয়ের পর দেবী বলিয়া শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারে? স্বয়ং আয়েষার হৃদয়ের মহৎ-ভাব সকলের পরিচয় পাইয়া উর্ম্মিলা দেবী নিতান্ত মোহিত হইয়াছেন।

দুই মাস কাটিয়া গেল। সুখ-দুঃখে সময় সমভাবেই চলিয়া যাইতে লাগিল। পাঠানদিগের পরাজয়-কাহিনীর নিত্য নূতন নূতন সংবাদ আয়েষার কর্ণগোচর হইতেছে। সেই স্বচ্ছন্দতাময় কারাগারে থাকিলেও সতত মোগলদিগের বিজয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নবাব ওসমান খাঁর ভয়ানক পরাজয়ের সংবাদ শুনিয়া আয়েষার হৃদয় অবসন্ন হইতে থাকিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, ওসমানের এমন বিপদের সময়, হৃদয়ের এরূপ অবসাদের সময়, উড়িষ্যা হইতে চলিয়া আসা আয়েষার ভাল হয় নাই; এরূপ অসময়ে পিতৃভবন ত্যাগ করা তাঁহার শ্রেয়ঃ হয় নাই, নবাব ওসমান খাঁর সান্নিধ্য হইতে দূরাগমন তাঁহার উচিত কার্য্য হয় নাই। এ সময়ে তিনি নিকটে থাকিলে ওসমান হয় তো উৎসাহ-শূন্য হইতেন না; হয় তো বিবেচনার ভুল করিতেন না, হয় তো জয়-পরাজয় সমজ্ঞান করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। আয়েষা আপনাকেই পাঠানদিগের এই পরাজয়ের নিমিত্ত কারণ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। ওসমান তাঁহার প্রতি একান্ত করুণাময় ও অবিচলিত প্রেমময়। সেই সুহৃদয়ের এই দুঃসময়ে দূরে চলিয়া আসা নিতান্ত অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক।

আবার সংবাদ আসিল, মানসিংহের উড়িষ্যা-বিজয় শেষ হইয়াছে। ওসমান সর্ব্বতোভাবে বাদশাহের অধীনতা-পাশে বদ্ধ হইয়াছেন। আয়েষা বুঝিলেন, নবাবের জীবন আছে। সেই তেজস্বী সাহসী বীরের জীবন থাকিলে সকলই আছে। আয়েষা শুনিতে পাইলেন, উৎকল-বিজেতা মহারাজ মানসিংহ পাটনার দিকে ফিরিতে আরম্ভ করিয়াছেন; শীঘ্র আসিয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইবেন।

যে রাজনৈতিক প্রয়োজনে আয়েষা অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। মহারাজ মনে করিয়াছিলেন, আয়েষার অবরোধ-সংবাদ শ্রবণে ওসমান যুদ্ধ-বিগ্রহ না করিয়াই অধীনতা স্বীকার করিবেন। প্রকারান্তরে আয়েষার অবরোধ মহারাজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়তা করিয়াছে। আয়েষার অনুপস্থিতি, তদনন্তর তাঁহার অবরোধ-সংবাদ নবাবকে এতই বিচলিত করিয়াছিল যে, তিনি কাণ্ড-জ্ঞান-শূন্য হইয়া ও হিতাহিত-বোধ-বিরহিত হইয়া কার্য্য পরিচালিত করিয়াছিলেন; ফল মহারাজের অনুকূল হইয়াছে। যাহাই হউক, সে রাজনৈতিক প্রয়োজন, বোধ হয় এক্ষণে শেষ হইয়াছে। সম্ভবতঃ মহারাজ পাটনায় প্রত্যাগত হইয়াই আয়েষাকে মুক্তি প্রদান করিবেন।

এইরূপ চিন্তায় ও আশায় ভাসিতে ভাসিতে আয়েষা দিন কাটাইতেছেন। বেলা তৃতীয় প্রহর। একাকিনী এক সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া নবাব-নন্দিনী আপনার অতীত ও বর্ত্তমান

জীবনের অনেক কথা আলোচনা করিতেছেন। সহসা দূরে পার্শ্বস্থ দ্বার-সন্নিধানে একটী পরম-সুন্দরী নারীমূর্ত্তি তাঁহার নয়নগোচর হইল। নারী গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অতি ব্যস্ততা সহ আয়েষা আসন ত্যাগ করিয়া তাঁহার অভিমুখে ধাবিতা হইলেন। নবাগতা নারী বেগে অগ্রসর হইয়া আয়েষার বক্ষের উপর পড়িলেন। বহুক্ষণ উভয় সুন্দরী পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া নীরবে রহিলেন। উভয়েরই নয়নে জল। নবাগতা সুন্দরী তিলোত্তমা।

প্রথমে আয়েষা কথা কহিলেন। বলিলেন,—"আর যে কখন তোমাকে দেখিতে পাইব, এমন মনে করি নাই। তোমার অদৃষ্ট প্রসন্ন হইয়াছে। তুমি শ্বশুর-গৃহে স্থান পাইয়াছ, এ সকল শুভ সংবাদ আমি শুনিয়াছি।"

আয়েষার বক্ষোদেশ হইতে তিলোত্তমা মস্তক উত্তোলন করিলেন। একবার আয়েষার সেই অসীম বুদ্ধি ও তেজস্বিতা-দ্যোতক মুখ-মণ্ডলের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। তাহার পর বলিলেন,—"অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল কই? তিনি তো বন্ধনে।"

বালিকার ন্যায় বসনে বদনাবৃত করিয়া তিলোত্তমা কাঁদিয়া ফেলিলেন। অতি যত্নে আয়েষা তাঁহার হাত ধরিয়া চক্ষু ও মুখ মুছাইয়া দিলেন। তাহার পর সন্নিহিত আসনে তাঁহাকে উপবেশন করাইয়া আপনি পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। বলিলেন,—"কাঁদিও না, দুঃখ করিও না। বীরের রমণীকে অনেক দুঃখ-দুর্দ্দশা ভোগ করিবার নিমিত্ত বুক পাতিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। এই সামান্য বিপদে কাতর হইলে তোমার কলঙ্ক হইবে।"

তিলোত্তমা বলিলেন,—"এরূপ ক্লেশে কাল কাটাই কিরূপে? এ দুঃখের কথা প্রাণ খুলিয়া বলিবার লোকও সংসারে নাই; তাই তোমার নিকট কাঁদিতে আসিয়াছি।"

আয়েষা বলিলেন,—"বেশ করিয়াছ ভাই, তোমাকে দেখিয়া আমি বড় সুখী হইয়াছি। তোমার এ দুঃখের দিন শীঘ্রই শেষ হইবে। রাজপুত্র অচিরে কারামুক্ত হইবেন।"

তিলোত্তমা বলিলেন,—"কিসে এরূপ অনুমান করিতেছ?"

আয়েষা বলিলেন,—"অভিরাম স্বামী আবেদন লইয়া দিল্লী গমন করিয়াছেন। সে আবেদন ব্যর্থ হইবে না।"

তিলোত্তমা জিজ্ঞাসিলেন,—"কত দিন গিয়াছেন?"

"দুই মাস অতীত হইয়াছে।"

"এত বিলম্ব কেন হইতেছে? কোন ব্যাঘাত ঘটিল কি?"

"ব্যাঘাত ঘটিবার কোন সম্ভাবনা নাই। বাদশাহ-দরবার হইতে হুকুম বাহির করিতে হইলে অনেক বিলম্বই হইয়া থাকে। যদিই ভাই দুই মাসের স্থলে চারি মাস বিলম্ব হয়, তাহাতে এখন ক্ষতি কি?"

তিলোত্তমা মনে মনে একটু বিস্মিত হইলেন। এ কি প্রকার ভালবাসার কথা! যাহাকে ভাল বাসি, সে লৌহ-শৃঙ্খলাবদ্ধ কারাবাসী। সে অবস্থা স্মরণ করিলে ক্লেশে বুক ফাটিয়া যায়। এক মুহূর্ত্ত মাত্র অগ্রে যদি সে অবস্থা হইতে মুক্তির উপায় করা যাইতে পারে, তাহা হইলে প্রণয়ীর তাহাও পরম লাভ বলিয়া জ্ঞান করা উচিত। নবাব-নন্দিনী দুই মাসের স্থানে চারি মাস কোন গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতেছেন না। বলিলেন,—"ভাই, যদি সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া এই মুহূর্ত্তেই যুবরাজকে মুক্ত করা যায়, তাহাও আমার বিবেচনায়

শ্রেয়ঃ, আর দুই মাস পরে যদি যুবরাজ সর্ব্বৈশ্বর্য্য বেষ্টিত হইয়া মুক্তিলাভ করেন, তাহাও বোধ হয় প্রার্থনীয় নহে।”

আয়েষা একটু হাসিয়া বলিলেন,—“প্রণয়ে এইরূপই মনে হয় বটে।”

“তবে তুমি অন্যরূপ মনে করিতেছ কেন?”

আয়েষা একটু অধোমুখে চিন্তা করিলেন। তাহার পর বলিলেন,—“আমি জানি রাজপুত্র বীরশ্রেষ্ঠ। বীরেরা দেহে শাণিত অসি বিদ্ধ হইলেও একটুও যন্ত্রণা বোধ করেন না; শত্রুর অসি দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিতে আসিতেছে দেখিয়াও, একটুও বিচলিত হন না। তাঁহাদের পক্ষে সামান্য লৌহ-শৃঙ্খল, বা অন্ধকার কারাগার বিশেষ ভয়ানক নহে। সুতরাং এ অবস্থায় যদি তাঁহার দুই দিন বেশী কাটিয়া যায়, তাহাতে বিশেষ ক্লেশের কথা কিছু নাই। তবে তোমার আমার মত অবুঝ আত্মীয় লোকেরা ইহাতে বড় কষ্ট অনুভব করে বটে। সে কষ্টের কারণ কেবল স্বার্থপরতা। আমরা অনেক সময়ে প্রেমাস্পদের হৃদয় অপেক্ষা দেহকে অধিক ভাল বাসি, সুতরাং তাঁহাকে দেখিতে না পাইলে বা তিনি নিকটে না থাকিলে বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়ি। এরূপ উদ্বেগের কোন প্রয়োজন আমি বুঝিতে পারি না।”

তিলোত্তমা বলিলেন,—“তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই ঠিক। বাস্তবিকই রাজপুত্রের সহিত ক্ষণেকের বিচ্ছেদও, আমার অসহ্য। ইহা যদি স্বার্থপরতার ফল হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি অতিশয় স্বার্থপর। সাহস করিয়া তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ভাই। তুমিও তো যুবরাজকে যথেষ্ট ভাল বাস। তবে তুমি কেন তাঁহার জন্য আমার মত ব্যাকুল হইতেছ না?”

আয়েষা নতমুখে তিলোত্তমার হাত ধরিলেন। তাহার পর অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—“তোমার এ কথায় আমি সন্তুষ্ট হইলাম না। আমি যুবরাজকে ভালবাসি সত্য। সে ভালবাসা অনন্ত, অসীম ও গভীর। কিন্তু এ জগতে তাহার কথা কেহই জানিতে পারিবার সম্ভাবনা ছিল না। দৈবাৎ মনের একটু বিচলিত অবস্থায়, আমি যুবরাজের সমক্ষে তাহা ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছি। সে জন্য আমি সাতিশয় লজ্জিত আছি। আমার অনুরোধ, তুমি এ কথা আর কখনও কাহাকে বলিও না; নিজেও, এ কথা কখনও মনে করিও না। তুমি এ কথা ভুলিয়া যাও, ইহাই আমার প্রার্থনা।”

তিলোত্তমা বলিলেন,—“কেন ভাই এ কথা ভুলিয়া যাইব? কেন এ কথা কাহাকেও বলিব না? ভালবাসা দোষের কথা নহে; ভালবাসিলে পাপ হয় না তো। তবে কেন তুমি এজন্য লজ্জিত আছ?”

আয়েষা বলিলেন,—“আমি মনে করি, ভালবাসা প্রাণের বস্তু; প্রাণের মধ্যে অতি সাবধানে ও সযত্নে তাহা লুকাইয়া রাখিবার পদার্থ। তাহার কথা আস্ফালন করিয়া জগতে প্রকাশ করিলে, তাহার অসারতা প্রকাশ পায় এবং তাহা লজ্জার কারণ হইয়া পড়ে।”

তিলোত্তমা বলিলেন,—“ভালবাসা প্রাণের সামগ্রী বটে, কিন্তু যাঁহাকে ভালবাসি তাঁহাকে সে কথা জানিতে দেওয়ায় দোষ কি? তিনি যদি তাহা জানিতে না পাইলেন, তাহা হইলে ভালবাসিয়া সুখ কি?”

আয়েষা বলিলেন,—“তাহা হইলেই ভালবাসার ব্যবসা আরম্ভ হইল। আমি যাহাকে ভালবাসি তাঁহাকে তাহা বুঝিতে

দিলেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভালবাসা পাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা হয়; তাহা হইলেই ভালবাসার দোকানদারী চলিতে থাক। আমি তোমাকে এক বস্তু দিই, তুমিও তাহার বদলে আমাকে কিছু দেও; ইহাই দোকানদারী। এমন পবিত্র ভালবাসার দোকানদারী করা আমি লজ্জার কথা বলিয়াই মনে করি।"

তিলোত্তমা একটু চিন্তা করিয়া বুঝিলেন, ভালবাসার এ ভাব বড়ই মধুর ও অত্যুচ্চ সন্দেহ নাই। বলিলেন,—"যাঁহাকে ভালবাসি তাঁহার সুখের জন্যও তো তাঁহাকে এ কথা জানিতে দেওয়া উচিত।"

আয়েষা বলিলেন,—"উচিত বটে। যখন দেখা যায়, আমি যাঁহাকে ভালবাসি তিনি সে ভালবাসা ভোগ করিবার জন্য ব্যাকুল, ভালবাসার অভাবে তিনি দীন, তখন তাঁহাকে প্রাণের সমস্ত ভালবাসা ঢালিয়া দেওয়াই উচিত।"

তিলোত্তমা বলিলেন,—"কিন্তু ভাই, আমরা নারী; ভালবাসাই আমাদের কাজ। যাঁহাকে ভালবাসি তিনি ভালবাসার দরিদ্র না হইলেও, আমরা কেন তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিব না? কেন নিরন্তর ভালবাসা ঢালিয়া তাঁহাকে ভাসাইয়া দিব না?"

আয়েষা বলিলেন,—"ভালবাসিব না, এমন কথা আমি বলিতেছি না। প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে আমাদের সতত অধিকার আছে। কিন্তু যাঁহাকে ভালবাসি তাঁহাকে অকারণে সে কথা জানাইব না।"

তিলোত্তমা বলিলেন,—"কেন ভগ্নি, তুমি এরূপ মনে করিতেছ? পুরুষ-হৃদয় সমুদ্রস্বরূপ। সে সমুদ্রে কেন ভালবাসার কলসী ঢালিব না, বা তাহা হইতে আবশ্যকমত ভালবাসা তুলিয়া লইব না। ভালবাসা মনুষ্যজীবনের সর্ব্বপ্রধান সুখের বিষয়। ভালবাসিতে পাওয়া এবং ভালবাসা পাওয়া উভয়ই মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার। ভগ্নি আয়েষা, তুমি রাজপুত্রকে প্রাণের সহিত ভালবাস, এ কথা সত্য; তবে কেন তুমি তাঁহাকে প্রকাশ্যে ভালবাসিয়া সুখী হইবে না? তুমি যদি মনে করিয়া থাক, রাজপুত্রকে আর কেহ ভালবাসিলে তিলোত্তমা দুঃখিনী হইবে, তাহা হইলে নবাব-নন্দিনী, আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, এ সম্বন্ধে তোমার বড়ই বিবেচনার ভ্রম হইয়াছে। তোমার ন্যায় হিতৈষিণী তোমার ন্যায় গুণবতী মহিলা যুবরাজের প্রেমিকা, ইহা স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় পুলকে পূর্ণ হয়। এক বৃন্তে তোমাতে আমাতে যুগল প্রসূনরূপে প্রস্ফুটিত থাকি, ইহাই আমার অন্তরের বাসনা। এক শোভাময় কাননে কত প্রকার কুসুমই প্রস্ফুটিত হয়; এক গিরি-বক্ষ বিদার করিয়া কতই নির্ঝরিণী নাচিয়া বেড়ায়; এক সাগরে কতই নদী দেহ ঢালিয়া দেয়। যাঁহাকে তুমি ভালবাস তাঁহাকেই আমি ভাল বাসি। অতঃপর আমাদের মধ্যে অসীম এক-প্রাণতা ও সহানুভূতি হওয়া উচিত। তবে কেন ভগ্নি, তুমিও যুবরাজের বক্ষে কোহিনুরের ন্যায় শোভা পাইবে না?"

তিলোত্তমা আদরে আয়েষার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া ধরিলেন। আয়েষা আদরে তিলোত্তমার চিবুকে হাত দিয়া বলিলেন,—"তোমার ন্যায় সরলা, সহৃদয়া মহিলার মুখে এইরূপ কথাই শোভা পায় বটে। আমার বিশ্বাস এরূপ গুণবতী সহধর্ম্মিণী পার্শ্বে থাকিলে, রাজপুত্রকে জীবনে কখনও একটী বিষাদের দীর্ঘনিশ্বাসও ত্যাগ করিতে হইবে না। কিন্তু ভগ্নি, তোমার বিষম ভুল হইয়াছে। আমার ভাল-

যাহাকে এক স্বতন্ত্র পথে চালিত করিয়া পরম সুখ লাভ করি। আমি ভালবাসিতেই জানি, ভাল বাসিয়াই অশেষ আনন্দ লাভ করি। ভালবাসা লাভ করিতে বা ভালবাসা লইয়া আড়ম্বর করিতে আমার কোন আকিঞ্চন নাই। ভগ্নি, আমার কথা তুমি আর কখন ভাবিও না; আমি ক্লেশ পাইতেছি মনে করিয়া কখন ক্লেশ পাইও না।"

তিলোত্তমা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"বুঝিতে পারি না, তুমি কেমন করিয়া প্রাণকে এরূপ সংযত করিতে পারিয়াছ। বুঝি এ জগতে তোমার আর তুলনা নাই।"

আয়েষা বিষাদের হাসি মিশাইয়া বলিলেন,—"আমি পাষাণী। এ শুষ্ক,নীরস পাষাণ-হৃদয়ে তোমাদের স্থায় কোমলতার স্থান নাই। সে কথা যাউক। আমরা অনেকক্ষণ আপনাদের কথাই কহিতেছি। রাজপুত্রের মুক্তি-সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি; অনুরোধ করি তুমিও এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক।"

তিলোত্তমা বলিলেন,—"তুমি যখন তাঁহার মুক্তির সম্বন্ধে সন্দেহ করিতেছ না, তখন আমিই বা সে জন্ত আর চিন্তা করিব কেন?"

তাহার পর অয়েষা সস্নেহে তিলোত্তমার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া বলিলেন,—"আমার সহিত জীবনে আর সাক্ষাৎ হইবে, এরূপ সম্ভাবনা নাই। আমার ভ্রাতা যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছেন। আমি মহারাজার কৃপায় মুক্তি লাভ করিয়াই উড়িষ্যায় ভ্রাতার নিকট চলিয়া যাইব। ঘটনা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে পাঠানদিগের সহিত মোগলদিগের ভবিষ্যতে আত্মীয়তা ঘটিবার কোন আশা নাই। সম্ভবতঃ পাঠানগণ বিলুপ্ত হইবে। সুতরাং হয় তো সেই সঙ্গে আয়েষার নামও ডুবিয়া যাইবে। আমার মৃত্যু হইলেও তোমরা সংবাদ পাইবে কি না সন্দেহ। সম্প্রতি এই সাক্ষাৎই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ বলিয়া জ্ঞান করিবে।"

তিলোত্তমা কাতর ভাবে জিজ্ঞাসিলেন,—"কেন দিদি, তুমি এমন কথা বলিতেছ? তোমার সহিত চিরদিনই আমি সাক্ষাতের প্রত্যাশা করিতেছি। হৃদয়ের কত সুখ-দুঃখের কথা চিরদিন তোমাকে জানাইব, কত বিপদে তোমার সহায়তা গ্রহণ করিব, কত সম্পদে তোমার সহিত ভাগাভাগি করিয়া আনন্দ ভোগ করিব। তবে কেন এরূপ কঠোর বাক্যে তুমি আমার সকল সাধ ছিঁড়িয়া দিতেছ?"

আয়েষা বলিলেন,—"ভগ্নি, মনুষ্য-হৃদয়ে আশা ও আকাঙ্ক্ষা যত কমিয়া যায়, ততই মঙ্গল। আমার প্রাণকে আমি বাসনা ত্যাগ করিতে শিখাইয়াছি। এই জন্তই আমি আর কোন কারণে কাতর নহি। প্রার্থনা করি, আমার জন্ত তোমরাও কাতর হইবে না।"

একজন দাসী আসিয়া সংবাদ দিল—"বধূমাতাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত মহারাণী ঠাকুরাণী আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন।"

তিলোত্তমা তৎক্ষণাৎ আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং আয়েষাকে বলিলেন,—"আমার আর অপেক্ষা করিবার উপায় নাই। শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর কৃপায় তোমার সহিত দেখা হইল, ইহা আমার ভাগ্য। কিন্তু ভগ্নি, এ সাক্ষাতে আমি অন্তরে সুখী হইলাম না। তুমি এ দেশ হইতে প্রস্থান করার পূর্ব্বে, আর একদিন তোমার সহিত দেখা করিব। ভরসা করি সে দিন তোমার চিত্তের অনুরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া সুখী হইতে পারিব। আপাততঃ আমি বিদায় হই।"

আয়েষা বলিলেন,—"বিদায়ের পূর্ব্বে আর একদিন সাক্ষাৎ হইলে আমিও সুখী হইব। আমার চিত্তের পরিবর্ত্তন এ জীবনে দেখিবার

আশা করিও না। প্রার্থনা করি, তুমি সর্ব্ব-সুখের অধিকারিণী হও। মহারাণী মাতাকে আমার অসংখ্য প্রণাম জানাইও। এ দেশ হইতে প্রস্থানের পূর্ব্বে তাঁহার সহিত আর একদিন সাক্ষাৎ হইলে চরিতার্থ হইব।"

তিলোত্তমা, বিষণ্ণভাবে বিদায় গ্রহণ করিয়া, প্রস্থান করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সহানুভূতি।

উড়িষ্যা বিজয়ী মহারাজ মানসিংহ পাটনায় প্রত্যাগত হইয়াছেন। তিনি আয়েষাকে এখনও সম্পূর্ণ মুক্তি প্রদান করেন নাই ; কিন্তু তাঁহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন এবং অচিরে তাঁহাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিবেন, এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর, আয়েষা পাটনাস্থিত আত্মীয়-স্বজনের সংবাদ লইয়াছেন।

তাজ খাঁর পরিবারবর্গ আসিয়া আয়েষার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তাঁহাদের মুখে আয়েষা জানিতে পারিয়াছেন যে, অভিরাম স্বামীর দৌত্য নিষ্ফল হইয়াছে। কাণপুরে তস্করে তাঁহার হস্তস্থিত ধন-রত্ন,পত্র ও আবেদন সকলই হরণ করিয়াছে। তাঁহার তিন জন সঙ্গী পাটনায় ফিরিয়া আসিয়াছে এবং অভি-রাম স্বামী দুই জন সঙ্গী সহ দিল্লী গমন করি-য়াছেন। এই সংবাদ প্রাপ্তির পর, আয়েষা মুক্তিলাভের নিমিত্ত ব্যাকুলা হইয়াছেন এবং অবিলম্বে স্বয়ং দিল্লী গমন করিতে সংকল্প করি-য়াছেন।

মধ্যাহ্ন কালে নবাবনন্দিনী একাকিনী বসিয়া এক খানি পত্র লিখিতেছেন। এতদিন কোথায় কোন পত্র প্রেরণ বা কাহারও পত্র গ্রহণ করিতে তাঁহার অধিকার ছিল না। এক্ষণে তাঁহার স্বাধীনতা হইয়াছে। বহুক্ষণে পত্রিকা সমাপ্ত [illegible]ল। পত্র নবাব ওসমান খাঁর উদ্দেশে লি[illegible]। আয়েষা একবার পত্র পাঠ করিলেন।

"ভাই ওসমান,

"আমি সংবাদ পাইয়াছি, অনেক যুদ্ধেই তোমার পরাজয় হইয়াছে। কিন্তু এ সংবাদে আমি বিশেষ বিচলিত হই নাই। কারণ তোমার হৃদয়-বলের উপর আমার প্রভূত বিশ্বাস আছে। যুদ্ধে পরাজয় হইলেও, তোমার হৃদয়কে পরাজিত করিতে পারে, এমন বীর এ জগতে কে আছে ?

"আমি তোমার নিকট হইতে দূরে চলিয়া আসিয়া নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছি। তোমার স্নেহময় আশ্রয় ত্যাগ করিতে আমার কখন অধিকার ছিল না এবং সে ক্ষমতাও আমার এখনও নাই।

"দূরে আসিয়া আমি বুঝিতে পারিয়াছি, আমার অপরাধ কত গুরুতর হইয়াছে। আমি মনে মনে সে জন্য অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করি-তেছি এবং আপনাকে আপনি শত তিরস্কার করিতেছি।

"আমার এই স্বাধীনতায় বোধ হয় তোমার অন্তরে সাতিশয় ক্লেশ হইয়াছে এবং বোধ হয় তুমি এজন্য চিত্তের প্রসন্নতা বিহীন হই-য়াছ। তুমি চিরদিন আমার প্রতি একান্ত করুণাময়। আমার অপরাধ ক্ষমার অতীত সন্দেহ নাই। তথাপি তুমি আমাকে ক্ষমা করিবে বলিয়া ভরসা করিতেছি। আমার এই ভরসা কি বিফল হইবে ?

"যে প্রয়োজনে আমি তোমার নিকট হইতে চলিয়া আসিয়াছি, তাহা তোমার জানিয়া কাজ নাই। তুমি আমার মাতার মুখে শুনিয়া থাকিবে, বিষয়-সম্পত্তির সুব্যবস্থা করিবার জন্য আমি তোমার করুণাময় আশ্রয় ত্যাগ করিয়াছি। তুচ্ছ ধন-সম্পত্তির লোভে আয়েষা কখনই তোমার স্নেহের সান্নিধ্য হইতে দূরে আসিতে পারে না। তোমার দয়ার সহিত সংসারের সকল সম্পদেরই বিনিময় করা আয়েষার পক্ষে অসম্ভব নহে।

"যে কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমি তোমার ভবন হইতে আসিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, সে কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই। বোধ হয় আর অল্পকাল পরেই সে কর্ত্তব্যের সমাপ্তি হইবে।

"আমি শীঘ্র তোমার নিকট গমন করিব। কবে, কি প্রকারে আমি যাত্রা করিব, তাহার সংবাদ তোমাকে লিখিব।

"তোমার যে অসীম স্নেহ, কৃপা ও আদরে আমার মন-প্রাণ নিয়ত সিক্ত হইয়া আছে, আমার দারুণ অপরাধ জনিত ক্রোধে তুমি কি তাহা শুষ্ক করিয়া ফেলিতে পারিয়াছ? তাহা কি তুমি পারিবে?

"তোমার দশা-বিপর্য্যয় হেতু আমি বিশেষ চিন্তিত হই নাই। কারণ আমি জানি পার্থিব গৌরব চিরস্থায়ী হয় না; তাহার আসিতে যাইতে অধিক সময় লাগে না। কিন্তু হৃদয়ের উচ্চতা, এবং মহত্ত্ব কেহই সহজে পায় না। যে তাহা লাভ করিয়াছে মনুষ্য মধ্যে সেই ধন্য হইয়াছে। আমি জানি, তোমার হৃদয় অসাধারণ সদ্গুণ সমূহের আলয়; সুতরাং ঐহিক ঐশ্বর্য্যের হ্রাস-বৃদ্ধিতে তোমার ক্ষতি বৃদ্ধি কি হইবে?

জানি না এই গুরুতর অবস্থান্তর জনিত যাতনা তুমি কিরূপ ধীরতার সহিত বহন করিতে ক্ষম হইয়াছ। তোমার ধীরতা ও সহিষ্ণুতা অসাধারণ। বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন হেতু ক্লেশের তুলনায় অপরিসীম হৃদয়জ্বালা তুমি অত্যাশ্চর্য্য ধীরতার সহিত নীরবে সহ্য করিয়া আসিতেছ ইহা আমি জানি। সুতরাং এ ক্ষুদ্র অবস্থান্তর কখনই তোমাকে অবসন্ন করিতে পারিবে না, ইহাই আমার একান্ত বিশ্বাস।

"এই দুঃসময়ে তোমার নিকট উপস্থিত হইবার নিমিত্ত, এই দশান্তরে তোমার হৃদয় অটল গিরির ন্যায় কিরূপ স্থির আছে, তাহা দেখিবার নিমিত্ত এবং আবশ্যক হইলে, সাধ্যমতে তোমার সহায়তা বা তোমাকে বিনোদিত করিবার নিমিত্ত, আমি নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছি।

"স্থানান্তরে আসিয়া আমাকে একটু বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। তুমি হয় তো তাহা শুনিয়া থাকিবে; এ জন্য পত্রে তাহা লিখিলাম না। কিন্তু সে বিপদে আমার কোন ক্ষতি হয় নাই।

"আর অধিক কথা বলিব না। যাহার শত অপরাধ চিরদিন ক্ষমা করিয়া আসিতেছ, সে আবার সবিনয়ে তোমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া পত্রের পরিসমাপ্তি করিতেছে। ইতি

অভাগিনী

"আয়েষা"

এই পত্রিকা যথাস্থানে প্রেরণ করিবার সম্বন্ধে আবশ্যক মত উপদেশ দিয়া, আয়েষা ইহা তাজ খাঁর নিকট প্রেরণ করিলেন। অন্যান্য অনেক বিষয়ের অনেক কথাও তিনি তাজ খাঁকে জানাইলেন। বিশ্বস্ত ও চতুর ব্যক্তি এই সকল বার্ত্তা ও পত্রিকা লইয়া তাজ খাঁর নিকট প্রস্থান করিল।

আয়েষা সেই স্থানে একাকিনী বসিয়া অনেক চিন্তা করিতে লাগিলেন। স্বরায় মুক্তিলাভ করা এক্ষণে তাঁহার প্রধান কামনা হইলেও, তিনি সে জন্ত মানসিংহের করুণা-ভিক্ষা করিবার আবশ্যকতা অনুভব করিতে পারিলেন না।

নবম পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

যে দিন মধ্যাহ্নে আয়েষা ওসমানকে পত্র লিখিলেন, সেই দিন সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরে, মহারাণী উর্ম্মিলা ও মহারাজ মানসিংহ তাঁহাকে রাজান্তঃপুরে আসিবার নিমন্ত্রণ করিলেন। হৃষ্টচিত্তে আয়েষা তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন।

আয়েষা রাজপুরীতে উপস্থিত হইলে, উর্ম্মিলা সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র দ্বারদেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। মহারাণীর সঙ্গে আয়েষা এক সুবিস্তৃত ও সুসজ্জিত কক্ষে উপস্থিত হইলেন। সেই কক্ষমধ্যে মহারাজ মানসিংহ এক রত্নাসনে উপবিষ্ট।

আয়েষা গৃহাগত হইবামাত্র মহারাজ আসন ত্যাগ করিয়া একটু অগ্রসর হইলেন এবং নবাব-নন্দিনীকে উপবেশন করিবার নিমিত্ত একখানি আসন দেখাইয়া দিলেন। আয়েষা উপবেশন না করিয়া, মহারাণীর পার্শ্বে অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন মহারাণী সাদরে আয়েষার হস্ত ধারণ করিয়া এক আসন সমীপে গমন করিলেন এবং আপনি তাহার একাংশে আসীন হইয়া, আয়েষাকে অপরাংশে উপবেশন করাইলেন।

মহারাজ আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—"বৎসে, তোমাকে এতদিন অনর্থক কষ্ট দিয়া আমি নিতান্ত লজ্জিত হইয়াছি। এই মুহূর্ত্ত হইতেই তুমি স্বাধীনা। যে রাজনৈতিক প্রয়োজনে তোমাকে আমি কষ্ট দিয়াছি, তাহার জন্ত এরূপ উপায় অবলম্বন করা আমার ভ্রম হইয়াছে। তোমার স্বাধীনতার কথা আমি স্বয়ং তোমার নিকট গমন করিয়া ব্যক্ত করিব ইচ্ছা ছিল; কিন্তু মহারাণী তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনা প্রকাশ করায়, তাঁহারই ইচ্ছায়, তোমাকে কষ্ট করিয়া এখানে আসিতে অনুরোধ করিয়াছি।"

আয়েষা বলিলেন,—"মহারাণী মাতা আমাকে স্মরণ করিয়াছেন, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। মুক্তিলাভের নিমিত্ত আমি মহারাজের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।"

মহারাজ জিজ্ঞাসিলেন,—"অতঃপর তুমি কি করিবে স্থির করিয়াছ মা? কোথায় যাওয়া, বা কোথায় থাকা তোমার এখন অভিপ্রায়?"

আয়েষা বলিলেন,—"আমি আপাততঃ দিল্লী যাইব।"

"অতঃপর কি দিল্লীতেই থাকিবে মনে করিয়াছ?"

আয়েষা। কেন মহারাজ এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন?

মান। আমি জানি দিল্লীতে তুমি অনেকের নিকট পরিচিতা। বোধ হয় বাদশাহও তোমার কথা জানেন। আর আমি যতদূর জানি, তাহাতে বোধ হয় তুমি মোগলদিগের সহিত অধিকতর ঘনিষ্ঠতা সূত্রে বদ্ধ।

আয়েষা। এই কারণেই কি অতঃপর

আমার দিল্লীতে বাস করা শ্রেয়ঃ বলিয়া মহারাজের মনে হইতেছে ?

মান। আরও মনে হয়, সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে পাঠানগণের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়াছে। উড়িষ্যায় যে পাঠানগণের সহিত তোমার ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাহারা এক্ষণে নিতান্ত হীন হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এক্ষণে তোমার সে সংস্রব ত্যাগ করাই বিধেয়।

আয়েষা একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"মহারাজ যে যে কথা বলিলেন, তাহা শুনিয়া বুঝিতেছি, এক্ষণে পাঠান সংস্রব ত্যাগ না করাই আমার বিধেয়। যাহারা আমার আশ্রয়-দাতা, যাহারা আমার প্রতিপালক, আমার প্রতি যাহাদের স্নেহের ও করুণার শেষ নাই, যাহারা আমার সুখ-দুঃখে আন্তরিক ক্লিষ্ট বা হৃষ্ট হয়, তাহারা ঘটনা-চক্রে আজি হীন হইয়াছে বলিয়া আমি তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিব কেন ? বরং পাঠানদিগের হীনতা হেতু অতঃপর তাহাদের অবিচ্ছিন্ন সঙ্গিনী হইয়া থাকাই আমার আবশ্যক।"

এ কথায় মহারাজ একটু অপ্রতিভ হইলেন। তিনি একটা সমুচিত উত্তর স্থির করিতে পারিলেন না। মহারাণী উর্ম্মিলা, স্বামীর এই দুর্গতি উপলব্ধি করিয়া, বলিলেন,—"তোমার কোথায়ও গিয়া কাজ নাই। তুমি আমাদের সামগ্রী, আমাদের কাছেই কেন থাক না মা ?"

আয়েষা বলিলেন,—"আমার প্রতি মহারাণী মাতার অনুগ্রহের সীমা নাই। কিন্তু আমার প্রাণের আকর্ষণ এবং কর্ত্তব্যবুদ্ধি আমাকে ভিন্ন পথে চলিবার উপদেশ দিতেছে।"

মানসিংহ বলিলেন,—"যদি তুমি উড়িষ্যায় গমন করাই শ্রেয়ঃ বুঝিয়া থাক, তবে এক্ষণে দিল্লী যাইতেছ কেন ?"

আয়েষা বলিলেন, "কুমার জগৎসিংহের মুক্তির ব্যবস্থা করিতে।"

মান। সে জন্য পূর্ব্বে আবেদন প্রেরিত হইয়াছে শুনিয়াছি; তবে তুমি আবার যাইতেছ কেন ?

আয়েষা। দুর্ভাগ্যক্রমে সে আবেদনাদি সমস্তই হারাইয়া গিয়াছে।

মান। আবার নূতন আবেদন স্বাক্ষরিত হইয়াছে কি ?

আয়েষা। না। আমার বিশ্বাস আছে, আমি স্বয়ং দরবারে এ কথা উত্থাপন করিলে বিনা আবেদনেও অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে।

মানসিংহ বুঝিলেন, এরূপ হওয়া অসম্ভব নহে। বলিলেন, "রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির এরূপ সহায়তা করিয়া তুমি নিতান্ত গর্হিত কার্য্য করিতেছ। তুমি স্ত্রীলোক বলিয়া একবার তোমার অপরাধ ক্ষমা করিয়াছি। কিন্তু বার বার এরূপ অপরাধ ক্ষমা করা অসম্ভব। তুমি এ প্রযত্ন ত্যাগ কর; নচেৎ আমি তোমাকে দণ্ড প্রদান করিতে বাধ্য হইব।"

আয়েষা বলিলেন,—"আমাকে দণ্ড প্রদান করিতে নিশ্চয়ই মহারাজের যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, আপনি কখনই তাহা করিবেন না।"

"কেন ?"

আয়েষা। হিতকারীকে এ সংসারে কেহ কখন শাস্তি দেয় না।

মান। তুমি আমার শক্তির বিরোধিতা করিতেছ, তুমি আমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়াই রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির সহায়তা করিতেছ। তবে তোমাকে হিতকারী বলিয়া বোধ করিব কেন ?

আয়েষা। মহারাজ মুখে যাহা বলিতেছেন, সত্যই কি আপনার মনেরও সেই ভাব ? সত্য

কথা বলিতে হইলে আপনি বলিবেন না কি, যুবরাজকে দণ্ডিত করা আপনার অসীম কূট-রাজনীতির অন্যতম কৌশল মাত্র? জগতের সমক্ষ, বিশেষতঃ বাদশাহ আকবরের সমক্ষে আপনার রাজ-ভক্তি, ন্যায়-নিষ্ঠা ও কর্ত্তব্য-পরায়ণতার পরিচয় দিবার জন্যই সামান্য কারণে আপনি প্রিয়পুত্রকে বন্দী করেন নাই কি? এক্ষণে কতদিনে, কি উপায়ে যুবরাজ মুক্তিলাভ করিবেন এ চিন্তায় আপনার হৃদয় নিরন্তর ব্যাকুল নাই কি? তবে মহারাজ সত্য করিয়া বলুন দেখি, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যে ব্যক্তি আপনার এ উপকার করিতে উদ্যত হইয়াছে, সে আপনার যথার্থ হিতকারী কি না?

মান। তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্য কি না সে বিচারে এখন প্রয়োজন নাই। তুমি আমার ইষ্টানিষ্ট ভাবিয়া এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও নাই। তুমি স্বার্থের জন্য রাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ। তবে কেন না তুমি দণ্ড গ্রহণ করিবে?

আয়েষা। হইতে পারে আমি স্বার্থের নিমিত্ত রাজপুত্রের মুক্তির চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমার স্বার্থ ও মহারাজের স্বার্থ সমান। সুতরাং আমার চেষ্টা মহারাজেরও হিতকর হইতেছে। এরূপ স্থলে আমাকে দণ্ড দিলে মহারাজের হৃদয় কখনই সন্তোষ লাভ করিবে না।

মানসিংহ কথায় পারিয়া উঠিলেন না; সুতরাং নীরব হইলেন। মহারাণী উর্ম্মিলা বলিলেন,—"তোমার ন্যায় গুণবতী কন্যাকে আমি ছাড়িয়া দিব না। আমি তোমাকে পুত্রবধূ করিয়া সংসার করিব।"

আয়েষা লজ্জায় অধোমুখ হইলেন। উর্ম্মিলা আবার বলিলেন,—"তুমি যবন-কন্যা বলিয়া কোন আপত্তি হইবে না। মহারাজ পূর্ব্বেই মুসলমানের সহিত কুটুম্বিতা করিয়াছেন। আবার যদি তিনি সেই সম্পর্কের বৃদ্ধি করেন, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই।"

আয়েষা অধোমুখ। উর্ম্মিলা আবার বলিলেন,—"কথা কহিতেছ না কেন? তোমার রূপ, গুণ ও বুদ্ধি অতুলনীয়। তোমাকে যাঁহারা আপনার লোক জ্ঞান করে তাহারাই সুখী। আমি সে সুখের আশা ত্যাগ করিতে পারিব না।"

আয়েষা বলিলেন,—"আমার প্রতি আপনাদের দয়ার সীমা নাই। আমি আপনাদের দাসী। কিন্তু,—

আয়েষা নীরব। উর্ম্মিলা জিজ্ঞাসিলেন,—"কিন্তু কি মা?"

আয়েষা বলিলেন,—"কিন্তু মা, আমি এরূপ অনুগ্রহের যোগ্যা নহি। আমার কর্ত্তব্য ও জীবনের গতি পূর্ব্ব হইতেই স্থির হইয়া আছে।"

মানসিংহ বলিলেন,—"তুমি দিল্লী যাত্রার পূর্ব্বে জগৎসিংহের সহিত দেখা করিতে চাহ না কি? আমি তোমাকে এখনই কারাগার প্রবেশের অনুমতি দিতেছি।"

আয়েষা বলিলেন,—"কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না। আমাকে এক্ষণে আপনারা দয়া করিয়া বিদায় দিউন। কল্য প্রত্যূষেই আমি যাত্রা করিব; সুতরাং আমার এক্ষণে অনেক কাজ।"

উর্ম্মিলা বলিলেন,—"আজি তোমাকে এখানেই থাকিতে হইবে। আইস, তোমাকে বধূমাতার নিকট লইয়া যাই। সেখানে তাঁহার নিকট তুমি আজি থাকিবে। তোমার সহিত সেখানেই আমি কথা কহিব, চল।"

সসম্ভ্রমে মহারাজকে অভিবাদন করিয়া,

আয়েষা আসন ত্যাগ করিলেন। মহারাণী তাঁহার বামহস্ত স্বীয় দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন।

মানসিংহ সেই গমনশীলা মহীয়সী নবাব-নন্দিনীকে দেখিতে দেখিতে মনে করিলেন,—কি আশ্চর্য্য! দেববালার ন্যায় আকৃতি, কি সাহস, কি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, কি বাক্‌পটুতা, কি নির্ভীকতা, অথচ কি কোমলতা, কি সরলতা, কি মধুরতা, কি শালীনতা, কি লজ্জাশীলতা! এ কুমারী যে কুলের বধূ হইবে, সে কুল ধন্য হইবে। আমার কি এরূপ ভাগ্যোদয় হইবে?

দশম পরিচ্ছেদ।

লুপ্তোদ্ধার।

অভিরাম স্বামী পরদিন প্রাতে সহর কোতোয়াল ও সৈনিকগণকে সঙ্গে লইয়া যমুনার পর-পারে নির্দ্দিষ্ট বনমধ্যে উপস্থিত হইলেন। দস্যুগণ তখনও সে স্থান ত্যাগ করে নাই। তাহারা সহজেই ধরা পড়িল। আবেদন, অন্যান্য পত্র, ধন-রত্ন প্রভৃতি যাবতীয় সামগ্রীই তাহাদের নিকটে ছিল। সে সকল পদার্থ, অধিকন্তু অশ্ব, লোটা ও বস্ত্রাদি সকলই কোতোয়ালের হস্তগত হইল। সমস্ত সামগ্রী সহ দস্যুগণকে বাঁধিয়া লইয়া কোতোয়াল সহরে প্রত্যাগত হইলেন। অভিরাম স্বামী ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয় কোতোয়ালের অনুসরণ করিয়া সহরে প্রবেশ করিলেন।

সকলই হইল বটে, কিন্তু অভিরাম স্বামীর ইষ্ট কিছুই হইল না। তিনি কোতোয়ালের নিকট সবিনয়ে দ্রব্য সামগ্রী পুনঃ প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। কোতোয়াল বুঝাইয়া দিলেন, বমাল সমেত দস্যুদিগকে বিচারের নিমিত্ত কাজির নিকট পাঠাইতে হইবে। বিচারের পর যাহার এ সকল সামগ্রী তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া যাইবে বটে; কিন্তু সকলই যে তাঁহার সামগ্রী এ সম্বন্ধে তাহাকে সন্তোষজনক প্রমাণ দিতে হইবে; বোধ হয় তাঁহাকে এ জন্য উপযুক্ত জামিনও দিতে হইবে। সুতরাং অভিরাম স্বামীকে বিশ হাত জলের নীচে পড়িতে হইল।

অভিরাম স্বামী কপর্দ্দক মাত্র বিহীন। কিন্তু সন্ন্যাসীর বেশ অনেক সময়েই মনুষ্যের বিশেষ সহায়তা করে। তিনি ক্ষুৎপিপাসা নিবারণের নিমিত্ত ভিক্ষা করিতে সংকল্প করিলেন। একজন উচ্চ পদস্থ রাজপুত সৈনিক পুরুষের নিকট তিনি উপস্থিত হইলেন এবং সমস্ত অবস্থা ও যাবতীয় ঘটনা তাঁহাকে জানাইয়া, আর্থিক সাহায্য এবং উপস্থিত বিপদে সৎপরামর্শ ভিক্ষা করিলেন। সৈনিক পুরুষ সমস্ত অবস্থা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ অভিরাম স্বামীর হস্তে একটী রজত মুদ্রা প্রদান করিলেন এবং অপহৃত দ্রব্যাদির পুনঃ প্রাপ্তি সম্বন্ধে যথাবিহিত উপায় করিতে সম্মত হইলেন।

নগরের বাহিরে, যমুনা-তীরে এক বৃক্ষ-মূলে উপস্থিত হইয়া অভিরাম স্বামী ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয় কথঞ্চিৎ রূপে জঠর-জ্বালা নিবারণ করিলেন। সেই স্থলই নির্দ্দিষ্ট আবাস স্বরূপে স্থির করিয়া এবং সঙ্গীদ্বয়কে তথায় থাকিবার উপদেশ দিয়া অভিরাম স্বামী আবার নগরে ফিরিয়া আসিলেন। নগরে ভদ্রলোক দেখি-লেই তিনি আপনার বিষাদের কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন। হিন্দু বা মুসলমান বিচার না করিয়াই তিনি সর্ব্ব সমক্ষে মানসিংহতনয়

জগৎসিংহের অবরোধ, মুক্তির নিমিত্ত আবেদন, নবাব-নন্দিনী আয়েষার পত্র ও সহায়তা, ধন রত্ন প্রদান, কাণপুরের অগ্নিকাণ্ড, সর্ব্বনাশ, অসম্ভাবিত উপায়ে দস্যু-দলের সন্ধান, কোতোয়াল কর্ত্তৃক তাহাদের বন্ধন, এবং শেষে তাঁহার দ্রব্যাদি তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতে কোতোয়ালের অনিচ্ছা প্রকাশ ইত্যাদি সকল কথাই তিনি জানাইতে থাকিলেন। অচিরে তাঁহার এই সকল প্রসঙ্গ সহরে বিশেষ প্রচার হইয়া পড়িল। অতি অল্পকাল মধ্যে পদস্থ রাজপুরুষেরাও ইহা জানিতে পারিলেন। যে সৈনিক পুরুষ প্রথম দিন তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত অভিরাম স্বামী প্রতিদিনই সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন। তিনিও শীঘ্র অভীষ্ট-সিদ্ধি সম্বন্ধে অভিরাম স্বামীকে ভরসা দিতে লাগিলেন।

প্রতিদিন দুইবার করিয়া স্বামীজী কোতোয়ালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ক্ষান্ত হইলেন না। তিনিও শীঘ্র তাঁহার সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করিবেন বলিয়া ভরসা দিতে লাগিলেন। তাঁহার চিন্তাকুল মস্তকের উপর ভরসা, সহানুভূতি প্রভৃতির যথেষ্ট ধার বর্ষিত হইতে থাকিল; কিন্তু কার্য্য কিছুই হইল না। প্রায় তিন মাস কাটিয়া গেল। এইরূপ সময়ে অভিরাম স্বামী শুনিতে পাইলেন, নবাব-নন্দিনী আয়েষা আগ্রায় আসিয়াছেন। অভিরাম বুঝিলেন, এতদিনে তাঁহার মনোরথ সফল হইবার উপায় হইল।

অভিরাম স্বামী অনেক সন্ধান করিয়া আয়েষার অবস্থান স্থানের অন্বেষণ করিলেন। স্থান ঠিক করিতে পারিলেন বটে; কিন্তু নবাব-নন্দিনীর সহিত সাক্ষাতের কোন সুযোগ হইল না। আয়েষা আগ্রায় আসিয়া একজন বিশিষ্ট ওমরাহের ভবনে অবস্থিতি করিতেছেন। তথায় স্বামীজির প্রবেশ করিবার কোন সুবিধা হইল না। বহু চেষ্টায় একজন পরিচারিকা তাঁহার সংবাদ নবাব-নন্দিনীর নিকট বহন করিতে সম্মত হইল। সে সংবাদ লইয়া প্রস্থান করিল; কিন্তু আর ফিরিয়া আসিল না; আয়েষার মন্ত্রণা ও ব্যবস্থার কথা অপর কেহই তাঁহাকে জানাইল না। অগত্যা অভিরাম স্বামী ক্ষুণ্ণ মনে প্রত্যাগত হইলেন।

আয়েষার সহিত সাক্ষাৎ না হইলেও, অথবা তিনি কোন সংবাদ না পাঠাইলেও, অভিরাম স্বামীর উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল ঘটনা সহজেই উপস্থিত হইতে লাগিল। পরদিন প্রাতে কোতোয়ালের নিকট সাক্ষাতের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়া অভিরাম দেখিলেন, অন্যান্য দিনের অপেক্ষা সেদিন কোতোয়াল সাহেব তাঁহাকে একটু বেশী সমাদর করিলেন এবং বলিলেন,—"দস্যুদিগের নিকট যে সকল কাগজ-পত্র ছিল, আম দরবার হইতে তলব হওয়ায়, তৎসমস্ত চালান দেওয়া হইয়াছে। ধন-রত্ন এখনও আমার নিকটেই আছে। সে সম্বন্ধে এখনও কোন হুকুম পাওয়া যায় নাই।"

অভিরাম ফিরিয়া আসিলেন। বুঝিলেন এ সকল কাণ্ড আয়েষার প্রযত্নেই ঘটিতেছে। তিনি এতদিন দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়াও যাহা করিয়া উঠিতে পারেন নাই, আজি সহসা তাহা ঘটিতেছে কেন? এতদিনে যুবরাজের আবেদন যথাস্থানে উপস্থিত হইয়াছে বুঝিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন।

পরদিন তিনি আবার কোতোয়ালের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সে দিন শুনিয়া আসিলেন, স্বামিজীর আর আগরায় থাকিবার প্রয়োজন নাই। তিনি ইচ্ছা করিলে স্বদেশে চলিয়া যাইতে পারেন। যে উদ্দেশে তিনি আগরায় আসিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে

হুকুম যথাসময়ে প্রচার হইবে এবং সে হুকুম হরকরার দ্বারা যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

অভিরাম স্বামী সে স্থান হইতে ফিরিয়া আসিলেন। আবার আয়েষার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় জানিবার নিমিত্ত তিনি চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় এবারেও ফল কিছুই হইল না। সাক্ষাৎ বা সংবাদ প্রেরণের কোন সদুপায় না হওয়ায়, বিফল-মনোরথ অভিরাম সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

পরদিন প্রাতে আবার তিনি কোতোয়ালের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। শুনিলেন, তিনি তাঁহার সঙ্গী পাঁচজনকে বিভাগ করিয়া দিবার নিমিত্ত এবং তাঁহাদের পাথেয়াদি ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার, নিমিত্ত, কোতোয়াল স্বামীজীর হস্তে তিন সহস্র মুদ্রা প্রদান করিতে প্রস্তুত আছেন। তাঁহার আর কষ্ট করিয়া আগরায় থাকিবার কোনই প্রয়োজন নাই। দস্যুগণের বিশেষ দণ্ড হইবে সন্দেহ নাই। দস্যুদিগের বিচারের সময় অভিরাম স্বামীর কোন সহায়তার প্রয়োজন হইবে না। আবশ্যক হইলে অভিরাম স্বামী অশ্ব ছয়টীও লইয়া যাইতে পারেন। তিনি সেগুলিকে সঙ্গে লইয়া স্বদেশ গমন করিতে পারেন, অথবা এখানেই বিক্রয় করিয়া যাইতে পারেন।

অভিরাম সে দিন স্থির করিয়া কোন কথা বলিতে পারিলেন না। পরদিন আবার সেই কর্ম্মচারীর সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিলেন। বুঝিলেন, তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধি সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। ধন-রত্ন সম্বন্ধে কোন সন্ধান করিবার তাঁহার আবশ্যক নাই। তাঁহার সহিত এ বিষয়ের সমস্ত সম্বন্ধ শেষ হইয়াছে।

যুবরাজের সম্বন্ধে কি আদেশ প্রচারিত হইবে তাহার আভাষমাত্রও জানিতে পারিলে অভিরাম স্বামী পরম পরিতুষ্ট হইতে পারিতেন। কিন্তু কোন মতেই তাহার বিন্দু-বিসর্গও তিনি জানিতে পারিলেন না। কিন্তু ইহা তিনি বুঝিলেন যে, নিশ্চয়ই তাঁহাদের উদ্দেশ্যের অনুকূল আদেশ অচিরে পরিব্যক্ত হইবে।

কিসে কি হইল, তাহা অভিরাম স্বামী জানিতে পারিলেন না। তাঁহার এতদিনের প্রাণপণ চেষ্টায় তিনি কাহাকেও তাঁহার সম্বন্ধে একটুও আকৃষ্ট-চিত্ত করিতে পারেন নাই; কিন্তু আয়েষার আগরায় আগমনের পর, সহসা তাঁহার বিষয়ে সকলেই মনোযোগী হইয়া পড়িল এবং তাঁহার সম্বন্ধে অনেক সুব্যবস্থা হইয়া গেল। আয়েষা কি প্রণালীতে, কাহাকে অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিতেছেন, তাহা অভিরাম জানিতে পারিলেন না। কিন্তু এ সকল অনুকূল ব্যবস্থা যে নবাব-নন্দিনীর দ্বারা সাধিত হইল, তদ্বিষয়ে তাঁহার কোনই সন্দেহ থাকিল না।

আয়েষার সহিত বিদায়কালীন সাক্ষাতের প্রার্থী হইয়া তিনি আর একবার ওমরাহ মহাশয়ের দ্বারে উপনীত হইলেন। সাক্ষাৎ হইল না, অধিকন্তু একটা হৃদয়ভেদী সংবাদ আসিল। অভিরাম স্বামীকে প্রণাম জানাইয়া আয়েষা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, "বোধ হয় এ জীবনে আর আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। যুবরাজ জগৎসিংহ আত্মীয়গণ সহ কুশলে থাকুন, ইহাই আমার কামনা। যুবরাজ বা তাঁহার স্বজনবর্গের সহিত সাক্ষাতের বোধ হয় আর কোন প্রয়োজন নাই। আমার সংবাদ লইবার জন্য আপনারা কেহই ব্যাকুল হইবেন না। বোধ হয় আমার সংবাদ আপনারা আর পাইবেন না। আমাকে চিরদিনের মত বিদায় দিন।"

অভিরাম স্বামীর চক্ষুতে জল আসিল। কিন্তু তিনি নিরুপায়। পরদিন যথাসময়ে কোতোয়ালের নিকট অর্থ ও অশ্ব লইয়া, সঙ্গীদ্বয় সহ তিনি আগরা হইতে অপ্রসন্ন মনে প্রস্থান করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নদী-বক্ষে।

উড়িষ্যায় কটক নগর নানা কারণে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। শিল্প ও কারুকার্য্যের পরাকাষ্ঠা হেতু এ নগর জনসমাজে সুপরিচির; শোভা ও সমৃদ্ধির নিমিত্ত এক সময়ে এ নগরের প্রতিপত্তি অল্প ছিল না। এই নগর নানা সময়ে নানা প্রকার ঐতিহাসিক কাণ্ডের রঙ্গভূমি হইয়াছে। আর্য্য, পাঠান, মোগল ও মহারাষ্ট্র প্রাধান্যের বিবিধ নিদর্শন অদ্যাপি এই নগরের বক্ষে বিরাজ করিতেছে।

এই নগরের পার্শ্ব-প্রবাহিত মহানদী বিশালতায় পদ্মা বা মেঘনার সমতুল্য না হইলেও, নিতান্ত সঙ্কীর্ণ বা শুষ্ক-কলেবর নহে। মহানদীর সুনির্ম্মল স্রোত ধীর ও মৃদুভাবে প্রতিনিয়ত বহিতেছে এবং তাঁহার মধুর কল্লোলধ্বনি অবিরত শ্রোতৃমন মুগ্ধ করিতেছে। তাহার বক্ষের উপর নগরনিম্নে নানা দেশাগত নৌকা অপেক্ষা করিতেছে। নৌকা হইতে বাহকেরা পণ্য দ্রব্য বহন করিয়া তীরে স্থাপন করিতেছে; কোন নৌকায় তাহারা অশেষ আয়াসে বিবিধ সামগ্রী স্তূপ করিতেছে। কোন নৌকা হইতে ব্যস্ততা সহ আরোহিগণ কূলে অবতরণ করিতেছে; কোন নৌকায় বা স্থানান্তর গমনাভিলাষী মনুষ্যগণ আরোহণ করিতেছে। কোন স্থানে সুদীর্ঘ অদর্শনের পর মিলন হেতু পরমানন্দের অভিনয় চলিতেছে; কোথায় বা প্রিয়-জন-বিদায়-কালীন অবশ্যম্ভাবী বিষণ্ণতার লীলা পরিদৃষ্ট হইতেছে। কোন নৌকা কূল ত্যাগ করিয়া দূর জলে গা ভাসাইতেছে; কোন নৌকা বা বহুকাল নদীবক্ষে নৃত্য করিয়া, এক্ষণে কূলে আসিয়া হাঁফ ছাড়িতেছে।

নগর হইতে অর্দ্ধ ক্রোশাধিক দূরে নদীতীরে নবাব ওসমান খাঁ পাদ-চারণা করিতেছেন। দুই জন মাত্র সশস্ত্র অনুচর একটু দূরে অপেক্ষা করিতেছে। সে স্থান জনশূন্য। নবাবের মূর্ত্তি বিষণ্ণ এবং পরাজয় ও হীনতা হেতু যেন কালিমাগ্রস্ত। নবাব পরিক্রমণ করিতেছেন এবং এক একবার এক স্থানে স্থির হইয়া নদীর দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত করিতেছেন। নবাবের পরিচ্ছদ অতি সামান্য। তাঁহার দেহের নিম্নভাগে ঢিলা পায়জামা এবং উর্দ্ধভাগে এক শিথিল পঞ্জাবী, মস্তকে একটী সামান্য টুপী, সকলই শ্বেতবর্ণ ও সুপরিষ্কৃত। চরণে জরির জুতা। কটিদেশে অসি ঝুলিতেছে না, পৃষ্ঠে ঢাল নাই, হস্তে বর্শা নাই। নবাব ওসমান নিরস্ত্র ও সামান্য-বেশধর। যে ব্যক্তি স্বভাবতঃ সুন্দর, তাহাকে সকল ভাবেই সুন্দর দেখায়। ওসমানকে এই বেশে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছে।

ভাদ্রমাস। অপরাহ্ণ হইলেও এখনও সূর্য্যকিরণের তেজ মন্দীভূত হয় নাই। ওসমান যে স্থানে পরিক্রমণ করিতেছেন, তথায় নানা জাতীয় অনেক সমুন্নত বৃক্ষ ছিল। তাহারই শীতল ছায়াতলে নবাব পরিভ্রমণ

করিতেছিলেন। নদী প্রবাহিত। বায়ু-হিল্লোল তাঁহার দেহকে সুশীতল করিতেছিল। সহসা ওসমান স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। যতদূর পর্যান্ত দৃষ্টি চলিতে পারে, আগ্রহ সহকারে ততদূর পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। আবার সে দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া, উৎকণ্ঠিত ভাবে পদ-চারণা করিতে লাগিলেন।

সংবাদ আসিয়াছে, অদ্য আয়েষা বজরা যোগে কটকে আসিবেন। কোন ব্যাঘাত উপস্থিত না হইলে, বজরা যে সময়ে কটকে আসিয়া পৌছিবার সম্ভাবনা, তাহা অনুমান করিয়া, ওসমান নদী-তীরে সেই সময়ে উপ-স্থিত হইয়াছেন এবং সেই হৃদয়দেবীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। আনুমানিক কাল অতীত হইল; কিন্তু এখনও তো বজরা দেখা যাইতেছে না। ওসমান উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলেন।

সুদূরে নদী-বক্ষে অনেক নৌকা ভাসিয়া আসিতেছে দেখা গেল। দূর হইতে সেই সকল নৌকা যেন জলে ভাষমান পক্ষী সমূহের ন্যায় দেখাইতে লাগিল। ওসমান স্থির দৃষ্টিতে নৌকা সকলের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নৌকা আরও নিকটস্থ হইতে লাগিল। ওস-মান বুঝিতে পারিলেন, তিনখানি বজরা ও পাঁচখানি বৃহৎ নৌকা কাছাকাছি থাকিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। ওসমান এক দৃষ্টিতে নৌকার অভিমুখে চাহিয়া রহিলেন। জল-যান সমূহ আরও নিকটস্থ হইল। ওসমান বুঝিতে পারিলেন, একখানি বজরা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও অতিশয় শোভাময়। তিনি স্থির করিলেন, সেই বজরাতেই নবাবনন্দিনী আছেন। ওসমান মাথার টুপি খুলিয়া দুলাইতে লাগিলেন। সেই বৃহৎ বজরার একটি জানালা খুলিয়া গেল। সেই জানা-লার মধ্য দিয়া স্বর্ণ-সূত্র-বিরচিত এক-খানি ওড়না বাহির হইল এবং একখানি অতুলনীয় হস্ত মধ্যস্থিত থাকিয়া তাহা ধীরে আন্দোলিত হইতে লাগিল।

ওসমান আনন্দজনিত চঞ্চল পদে তীরে তীরে নৌকার অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। দেখিলেন সকল নৌকা প্রহরী, শরীর-রক্ষক, দাস-দাসী ও দ্রব্য-সামগ্রী পরিপূর্ণ। যে বৃহৎ বজরায় আয়েষা আছেন, তাহাতে অন্য কোন লোক আছে বলিয়া নবাবের বোধ হইল না।

জানালা দিয়া ওসমান সুস্পষ্টরূপে আয়েষার প্রফুল্ল কমলসদৃশ মুখ-মণ্ডল দেখিতে পাইলেন। উভয়েই উভয়কে অভিবাদন করিলেন। আনন্দ-জ্যোতিতে উভয়েরই বদন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

বহুক্ষণ হইতেই আয়েষার আদেশে মাঝিরা প্রাণপণে দাঁড় টানিতেছিল। নৌকা ও বজরা সকল বেগে অগ্রসর হইতেছিল। সহসা যে বজরায় আয়েষা ছিলেন, তাহার গতি মন্দ হইয়া আসিল। অন্যান্য নৌকা ও বজরা অগ্রগামী হইল; আয়েষার বজরা পিছাইয়া পড়িল। সে বজরার মাঝিরা, আপনাদের অকর্ম্মণ্যতা হেতু লজ্জিত হইয়া, সাধ্যাতীত পরিশ্রম করিতে লাগিল। তথাপি বিশেষ ফল হইল না। কেন এরূপ ঘটিতেছে তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত তাহারা ব্যস্ত হইল।

মাঝিরা বজরার এই দুর্গতির কারণ নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে ওসমান দেখিলেন, বজরার যতটুকু জলের উপর জাগিয়া থাকা উচিত, ততটুকু জাগিয়া নাই। তিনি আরও দেখিলেন, বজরা ক্রমেই জলের মধ্যে বসিয়া যাইতেছে। এবং তাহার যে অংশ জাগিয়া ছিল, তাহা

ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। মাঝিরাও তখন এ ব্যাপার বুঝিতে পারিল। তাহারা জানিত বজরার তলভাগ একটু কম মজবুত ছিল; তাহারই একস্থান এখন ফাঁসিয়া গিয়াছে। তলভাগ সুদৃঢ় ছিল না বটে; কিন্তু সহসা তাহা ফাঁসিয়া যাইবে, এ আশঙ্কা তাহাদের কখনই ছিল না। নবাব-নন্দিনীর আদেশে সাতিশয় শক্তি সহকারে বজরা চালিত করায় অত্যন্ত বেগজনিত জলের প্রতিঘাতে এবং অতিশয় বল প্রয়োগ হেতু বিষম আন্দোলনে বজরার এই দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে।

নবাব ওসমান খাঁ তখন ব্যাকুলভাবে জলমধ্যে নামিয়া পড়িয়াছেন। আয়েষা জানালা হইতে ওসমানের এই কার্য্য দেখিয়া উদ্বেগে ও বিস্ময়ে অবরুদ্ধ হইতেছিলেন। সহসা ওসমান চীৎকার করিয়া বলিলেন,—'নবাবনন্দিনি, শীঘ্র কামরা হইতে বাহিরে আইস, একটুও বিলম্ব করিও না। কামরায় আর কে আছ? এখনই নবাব-কন্যাকে কামরার বাহিরে লইয়া আইস।"

ওসমান তখন একগলা জলে দণ্ডায়মান। বজরার কামরায় আয়েষার একমাত্র সঙ্গিনী ছিল। কোন কারণ বুঝিতে না পারিলেও, আয়েষা তৎক্ষণাৎ সঙ্গিনীসহ কামরার বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার বজরা ডুবিতে আর বিলম্ব নাই। মাঝিরা বুঝিয়াছে, এ বজরা ডুবিলে নবাব তাহাদের জান রাখিবেন না। অথচ বজরা রক্ষা করারও কোন উপায় নাই। সুতরাং তাহারা তখন উদাসীন।

নবাবের দিকে চাহিয়া আয়েষা যুক্ত করে কহিলেন,—"তুমি কি করিতেছ? জলে কেন নামিয়াছ? আমি কাতরভাবে প্রার্থনা করিতেছি, ওসমান, তুমি তীরে উঠ।"

ওসমান তখন সাঁতার দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বলিলেন,—"তোমাকে লইয়া উঠিতে পারি, তবে নিশ্চয়ই তীরে উঠিব—নতুবা তোমার সঙ্গে—"

কথা শেষ হইল না! মাঝিরা গোল করিয়া উঠিল, সঙ্গিনী কাঁদিয়া উঠিল, আয়েষা হাত নাড়িয়া ওসমানকে ফিরিয়া যাইবার সঙ্কেত করিতে লাগিলেন, বজরা ডুবিয়া গেল!

যেখানে বজরা ডুবিল সেখানে ভয়ানক আবর্ত্ত উপস্থিত হইল। এই ঘূর্ণায়মান বারিরাশির মধ্যে আর এক ব্যক্তি ডুবিয়া গেলেন। নবাব ওসমান আর নদী-বক্ষে সন্তরণ-নিরত নহেন।

বজরার মাঝিরা সাঁতরাইয়া কূলে উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অন্যান্য অগ্রগামী বজরা ও নৌকা ঘুরিয়া বিপদের স্থান সন্নিধানে আসিল। আর এক বজরার উপর হইতে কয়েক ব্যক্তি গায়ের জামা প্রভৃতি খুলিয়া জলে লাফাইয়া পড়িল।

নবাব ওসমান ভাসিয়া উঠিলেন; কিন্তু তিনি বড় কাতর; জীবনান্ত সময়ে মনুষ্য মুখ-গহ্বর যেরূপ বিস্তৃত করিয়া নিশ্বাস ফেলে ওসমান সেইরূপে শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কথা কহিতে সামর্থ্য নাই। কোন গুরুভার পদার্থ যেন তাঁহার দেহের সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ একখানি বজরা নবাব সাহেবের নিকটস্থ হইল। তখন জলের উপর ভাসিয়া থাকা ওসমানের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। তিনি একবার ডুবিতে ও একবার ভাসিতে থাকিলেন। বজরা হইতে লোকেরা একখানি সুদীর্ঘ বস্ত্র ফেলিয়া দিল। ওসমান এক হস্তে তাহা ধারণ করিলেন। বহুলোকে সাবধানে সেই বস্ত্র টানিয়া তাঁহাকে বজরার নিকটে লইয়া আসিল। তখন

কয়েক ব্যক্তি অতিশয় নত হইয়া তাঁহার হাত ধরিল।

ওসমানের সংজ্ঞাশূন্য-প্রায় দেহ বজরার লোকেরা টানিয়া উপরে উঠাইতে গিয়া বুঝিল, নবাব একা ভাসিয়া উঠেন নাই। তাঁহার কটিদেশে ওড়নার এক প্রান্ত নিবদ্ধ; অপর প্রান্তে আর এক গুরুভার পদার্থ সংলগ্ন। নবাবকে অল্পমাত্র তুলিয়াই তাহারা দেখিতে পাইল, ওড়নার অপর প্রান্তে আলুলাইত-কেশা নবাব-নন্দিনীর অচেতন-প্রায় কলেবর। অতি সাবধানে লোকেরা উভয়ের দেহ বজরার উপর উঠাইল।

ওসমান বলিলেন,—"যে ব্যক্তি বাঁদীকে বাঁচাইতে পারিবে, সে অনেক পুরস্কার পাইবে।

এক ব্যক্তি বলিল,—"খোদাবন্দ, ঐ সিপাহী বাঁদীকে লইয়া ভাসিয়াছে।"

সত্যই এক ব্যক্তি বাঁদীকে লইয়া ভাসিয়া উঠিল। তখনই অন্য এক নৌকার লোকেরা তাহাদিগকে উপরে তুলিয়া ফেলিল।

আয়েষার বস্ত্রাদি কিছুই স্থান-ভ্রষ্ট হয় নাই। লোকেরা অতি সন্তর্পণে মর্ম্মর প্রস্তর বিনির্ম্মিত সুসজ্জিত ও সুগঠিত প্রতিমার ন্যায় তাঁহার সেই অচেতন কলেবর বজরার উপর স্থাপন করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রণা।

নবাব-নন্দিনীর অবস্থা বড় মন্দ। ওসমানের পরিশ্রমে ও অধ্যবসায়ে আয়েষা সলিল-সমাধি হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছেন বটে; কিন্তু সেই দুর্ঘটনার পরিণাম স্বরূপ ভয়ানক জ্বররোগে তিনি আক্রান্ত হইয়াছেন। অনেক সুবিজ্ঞ হকিম ও আয়ুর্ব্বেদ সম্মত চিকিৎসক অশেষ কৌশলে তাঁহার চিকিৎসা করিতেছেন। নবাব-বাটীতে উদ্বেগের সীমা নাই। কতলু খাঁর অনেক মহিষী। আয়েষা সকলেরই পরম আদরের ধন; সুতরাং তাঁহারা সকলেই ব্যাকুলিতা হইয়াছেন। কাশ্মীরী বেগম আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া এবং নিয়ত আয়েষার শয্যা-পার্শ্বে অবস্থিত থাকিয়া, প্রাণপণে পীড়িতার শুশ্রূষা করিতেছেন। আয়েষা নবাবপুরীর শোভা, সকলেরই লোচনানন্দদায়িনী ও সর্ব্বজনপ্রসাদন-কারিণী। এজন্য নবাব-ভবনের দাসদাসী প্রভৃতি সকলেই নবাব নন্দিনীর পীড়ার অবস্থা কঠিন হইয়াছে বুঝিয়া কাতর হইয়া পড়িয়াছে।

নবাব সোলেমান সতত বিলাস সমুদ্রে ভাসমান এবং সাংসারিক অন্যান্য ব্যাপারে একান্ত উদাসীন হইলেও, আয়েষার কঠিন পীড়ার সংবাদ তাঁহাকেও নিতান্ত বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। তিনি সুরা-পাত্র ত্যাগ করিয়া এবং রূপসী সঙ্গিনী-গণের সংসর্গ পরিহার করিয়া, প্রতিদিন পুনঃ পুনঃ স্বয়ং আসিয়া আয়েষার সংবাদ লইতেছেন।

আর নবাব ওসমান খাঁ! তাঁহার কি অবস্থা? তাঁহার চিত্তের অবস্থা বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা। তিনি পীড়িতার পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে অবিরত আসীন। কোথায় রাজ্য, কোথায় যুদ্ধ, কোথায় সন্ধি, কোথায় উৎসাহ, কোথায় বা দুরাকাঙ্ক্ষা। সংসারের সকল ব্যাপারই তিনি ভুলিয়াছেন। আপনার দেহে বা দৈহিক কোন প্রয়োজনেই তাঁহার মন নাই। হকিম ও বৈদ্যদিগের মুখে পীড়িতার অবস্থা মুহুর্মুহু শুনিবার নিমিত্ত অধীর-ভাবে তিনি পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে উপবিষ্ট।

দিন যাইতে লাগিল। বিধাতা মুখ তুলিয়া চাহিলেন। পীড়িতার অবস্থা ক্রমে ভাল বোধ হইতে লাগিল। চিকিৎসকেরা ভরসাযুক্ত হইলেন। সমস্ত নবাবপুরী যেন প্রাণ পাইল। হকিম ও বৈদ্যগণ অনেকের নিকট প্রভূত শিরোপা পাইলেন। মসজিদে অনেক প্রকার ব্যয় হইল। অনেক দান, দরিদ্রভোজন ও পুণ্যানুষ্ঠান সম্পন্ন হইল। নবাবপুরীর তাবতে অনেক আনন্দজনক কার্য্যে মত্ত হইলেন। ক্রমে পীড়িতা সুস্থ হইয়া উঠিলেন। পথ্যাদি সেবন করিয়া ক্রমে তাঁহার শরীরে শক্তি সঞ্চারিত হইতে লাগিল এবং রোগ-জনিত অপগত শ্রীর পুনরাবির্ভাব হইতে লাগিল।

ওসমান আর সতত পীড়িতার পার্শ্বস্থ কক্ষে অপেক্ষা করেন না। প্রথম প্রথম প্রতিদিন পুনঃ পুনঃ তিনি স্বয়ং আসিয়া রোগ-মুক্তা সুন্দরীর সংবাদ লইতে লাগিলেন, যতই তাঁহার স্বাস্থ্য পুনরাগত হইতে লাগিল, ততই ওসমানের আগমন কমিয়া আসিতে থাকিল। শেষে দুই একদিন ব্যবধান দিয়া তিনি পীড়িতার কক্ষে দর্শন দিতে থাকিলেন।

আয়েষার মাতাও এখন আর অনবরত হইয়া নিয়ত কন্যার পার্শ্বে বসিয়া থাকেন না। আয়েষা উঠিয়া এদিক ওদিক বেড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন; অনবরত তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিবার এখন কোন প্রয়োজন নাই।

মধ্যাহ্নকালে আয়েষা একাকিনী পর্য্যঙ্কে আসীনা। নিকটে কোন দাসীও নাই। নবাব-নন্দিনী অনেক চিন্তায় মগ্ন। কেন এমন হইল? তিনিই কি পাঠানদিগের অবনতির একমাত্র কারণ? যত্ন করিলে, যাহা ঘটিয়াছে এখন তাহার কি অন্যথা করা যায় না? আয়েষার অশেষ চিন্তা।

সহসা ওসমান কক্ষদ্বার হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আয়েষা কেমন আছ?"

আয়েষা উত্তর দিলেন,—"ভাল আছি। তুমি ঘরের ভিতর আইস ওসমান!"

ওসমান একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, —"তুমি একলা বসিয়া আছ কেন আয়েষা? থাক—এখন আর যাইব না। অন্য সময়ে আসিয়া তোমার সহিত দেখা করিব।"

আয়েষা বুঝিলেন, তিনি একাকিনী আছেন বলিয়াই ওসমান কক্ষমধ্যে আসিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। আয়েষা দ্বার-সন্নিধানে গমন করিয়া বলিলেন,—"ভিতরে আইস, তোমার সহিত অনেক কথা আছে।"

ওসমান কোন প্রতিবাদ না করিয়া কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আয়েষা বলিলেন, —"দাঁড়াইয়া রহিলে কেন? এই স্থানে উপবেশন কর।"

সেই পর্য্যঙ্ক ভিন্ন তথায় আর বসিবার স্থান নাই। ওসমান বলিলেন,—"তুমি বইস, আমি দাঁড়াইয়া থাকিতে কষ্ট বোধ করিব না।"

আয়েষা বলিলেন,—"কুণ্ঠিত হইবার কোন প্রয়োজন নাই। আমি বলিতেছি, তুমি নিঃসঙ্কোচে আসন গ্রহণ কর।"

ওসমান সেই পর্য্যঙ্কের এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন এবং সবিস্ময়ে দেখিলেন, আয়েষাও সেই আসনের অন্য প্রান্তে উপবেশন করিলেন। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, —"আমি কিছুকাল তোমার নিকট হইতে দূরে ছিলাম। ফিরিয়া আসিয়াও পীড়ার জন্য তোমার সহিত বিশেষ কোন কথা কহিতে সময় পাই নাই; আমি স্ত্রীলোক; তোমার শাসনা-ধীনে থাকাই আমার কর্ত্তব্য। তাহার অন্যথা করিয়া বিশেষ অপরাধ করিয়াছি। সেজন্য ক্ষমা চাহিতেছি ভাই।"

ওসমান বলিলেন,—"কেন ক্ষমা চাহিতেছ? আমি কি কোন দিন তোমার উপর অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছি? তুমি কৃপা করিয়া আমার এ নবাব-পুরীতে তোমার শুভাগমনে আমার মৃতদেহে জীবন আসিয়াছে। তোমার কোনও অপরাধ হইয়াছে বলিয়া আমি একদিনও মনে করি নাই। তবে কেন আয়েষা, তুমি ক্ষমা চাহিতেছ?"

আয়েষা বলিলেন,—"আমার অনুপস্থিতি কালের মধ্যে আমাদের অনেক ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সে জন্য তুমি কি অবসন্ন হৃদয় হইয়াছ ভাই?"

ওসমান বলিলেন,—"বিষম ভাগ্য-পরিবর্ত্তন হইয়াছে সত্য। তাহাতে আমার হৃদয় একটুও অবসন্ন হয় নাই, এ কথা বলিতে পারি না। তুমি অপরাধের কথা বলিতেছিলে আয়েষা; আমার এই ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের জন্য তুমি সত্যই অপরাধী। তুমি ওসমানের বাহুতে বল, হৃদয়ে সাহস, মনে বুদ্ধি, কর্ম্মে উৎসাহ। ওসমানের এ সকলই হরণ করিয়া তুমি চলিয়া গিয়াছিলে। এরূপ অবস্থায় ভাগ্যপরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য।"

আয়েষা বলিলেন,—"যাহা হইবার হইয়াছে; কিন্তু প্রতিকারের আর কোন উপায় নাই কি?"

ওসমান বলিলেন,—"যথেষ্ট উপায় আছে; কিন্তু সে উপায় তোমারই হস্তগত। তুমি এ নবাবপুরীর মঙ্গলময়ী অধিষ্ঠাত্রী। তুমি যদি আমার মঙ্গল চিন্তায় ক্ষান্ত না হও, তাহা হইলে সকলই শুভ হইবে।"

আয়েষা বলিলেন,—"ওসমান! এরূপ কথা তুমি কেন বলিতেছ ভাই? তোমার ইষ্টানিষ্টের সহিত আমার সুখ-দুঃখ জড়িত, ইহা কি তুমি জান না?"

ওসমান বলিলেন,—"তাহা আমি জানি, এবং তাহা জানি বলিয়াই অদ্যাপি আমি বাঁচিয়া আছি। কিন্তু একটা কথা আজি জিজ্ঞাসা করাই শ্রেয়ঃ। আমার একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়াও, কেন আয়েষা, আমার দুঃসময়ে তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলে? আমার এই দারুণ দুর্দ্দশার দিনে, তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া কোথায় গিয়াছিলে আয়েষা?"

আয়েষা অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। তাহার পর বলিলেন,—"যাহার নিকট জীবনের কোন ঘটনাই প্রচ্ছন্ন নাই, তাহার নিকট এ কথাও প্রচ্ছন্ন রাখিব না। কথা হয় তো তোমার কষ্টকর হইবে। কিন্তু তুমি জিজ্ঞাসা না করিলে আমি কখনই এ কথা তোমার নিকট ব্যক্ত করিতাম না। আমি যুবরাজ জগৎসিংহকে কারামুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমে পাটনায়, পরে আগরা গিয়াছিলাম।

ওসমান বলিলেন,—"এ সংবাদ আমার অবিদিত নাই; ভাগ্যবান্ জগৎসিংহ তোমার হৃদয় রাজ্যের রাজা, এ কথা তুমি তো গোপন কর না। সুতরাং তাঁহাকে মুক্ত করিতে তোমার বাসনা হওয়া অসঙ্গত নহে। প্রকারান্তরে তুমি এ কার্য্যে আমার ইষ্টই করিয়াছ।"

আয়েষা জিজ্ঞাসিলেন,—"কিরূপে?"

ওসমান বলিলেন,—"জগৎসিংহ আমার বধ্য। তাহাকে বধ করিবার জন্যই আমি জীবন রাখিয়াছি। সে কারাগারে থাকিলে, আমি হয় তো তাহাকে সহজে বিনাশ করিবার সুযোগ পাইতাম না। তুমি তাহাকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করায় আমার উপকার হইয়াছে।"

আয়েষা অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। ওসমান বলিলেন,—"কথা

কহিতেছ না কেন? আমার কথায় কি ক্লেশ পাইলে আয়েষা?"

আয়েষা বলিলেন,—"না।"

ওসমান জিজ্ঞাসিলেন,—"তবে কি ভাবিতেছ?"

আয়েষা বলিলেন,—"ভাবিতেছি, আমার ন্যায় অভাগিনীকে সৃষ্টি করিয়া স্রষ্টার কি লাভ হইল? আমি সংসারের কোন উপকারে আসিলাম না; কাহারও কোন হিত আমার দ্বারা সাধিত হইল না। আমার জন্য কেবল কলহ-বিদ্বেষের স্রোত অব্যাঘাতে বহিতে থাকিল; তোমার ন্যায় মহাপুরুষকেও আমার নিমিত্ত নিরন্তর অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ হইতে হইল।"

ওসমান বলিলেন,—অনন্ত জ্বালা ভোগ করিতেও ওসমান পশ্চাৎপদ নহে। সকল জ্বালাই আমি বুক পাতিয়া সহিতে সক্ষম এবং নিরন্তর সহিয়া আসিতেছি। আয়েষা, বুঝি ভাল বাসার এই জ্বালাতেও সুখের সীমা নাই। নহিলে এ জ্বালা জুড়াইবার কোন চেষ্টা করি না কেন? নহিলে যাহার জন্য এই জ্বালা, সেই তুমি নয়নান্তরালে গমন করিলে সংসার-শূন্য বোধ করি কেন? নহিলে তোমাকে ভুলিবার নিমিত্ত দয়াময় ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিতেও মন হয় না কেন? নহিলে যে ভবনে আমার জ্বালার কারণ বিদ্যমান, সেই ভবনের এক প্রান্তে বাস করিতে পাইলেও সুখের পরাকাষ্ঠা অনুভব করি কেন? নহিলে তোমার হৃদয়ে আমার স্থান নাই জানিয়াও, তোমার চিন্তায় আমার চিত্ত অহর্নিশ নিযুক্ত থাকে কেন? নহিলে সংসারে সকল বস্তুর অপেক্ষা এই জ্বালার বস্তুকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করি কেন?"

আয়েষা বলিলেন,—"এখন বুঝিতেছি ওসমান, এই জ্বালা ভোগই তোমার নিয়তি। অভাগিনীই তোমার ন্যায় সর্ব্বগুণাধার মহাত্মার চির-যন্ত্রণার হেতু। এ পিশাচীকে, ওসমান, কেন তুমি বার বার মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিতেছ?"

ওসমান বলিলেন,—"আয়েষা, তুমি ভাল বাসা কাহাকে বলে তাহা বেশ জান। জগৎসিংহ কারাগারে, এ সংবাদে বিচলিত হইয়া এবং পিতৃ ভবন ত্যাগ করিয়া কেন তুমি দেশান্তরে ধাবিত হইয়াছিলে? তুমি যাহাকে ভালবাস তাহার সামান্য কারাবাসও যদি তোমার সহ্য না হয়, তাহা হইলে তোমার মৃত্যু-সম্ভাবনায় আমি উন্মাদ না, হইব কেন?"

আয়েষা বলিলেন,—"আমি কাতর ভাবে প্রার্থনা করিতেছি, ওসমান, তুমি হৃদয়কে প্রকৃতিস্থ কর। তুমি বীর, সাহসী, যোদ্ধা। রণক্ষেত্রে কীর্ত্তি-অর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষায়, সাম্রাজ্য লাভের আশায় তুমি মত্ত হও। যাহার এত সুখ ও সৌভাগ্যের দ্বার সম্মুখে উন্মুক্ত রহিয়াছে, ক্ষুদ্র এক নারীর চিন্তায়, এক অযোগ্যা অভাগিনীর প্রেম-পিপাসায়, সকল আকাঙ্ক্ষা শেষ করা কি তাহার কর্ত্তব্য?'

ওসমান বলিলেন,—"আমি হৃদয়কে প্রকৃতিস্থ করিয়াছি—এত প্রকৃতিস্থ করিয়াছি যে, তুমি তাহা শুনিলে অবাক্ হইবে। আমার প্রাণ এখন তোমাকে পাইবে না জানিয়াও বাঁচিয়া থাকিতে শিখিয়াছে; আমার হৃদয় এখন তোমাকে লাভ করিবে না বুঝিয়াও কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছে; তোমার সহিত সমপ্রাণতা হইবে বুঝিয়াও, আমার অন্তর এখন জয়পরাজয়ে সুখ দুঃখ অনুভব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহার অপেক্ষা আশ্চর্য্য কথা আর কি হইতে পারে আয়েষা? রণ-রঙ্গে প্রমত্ত হইতে বলিতেছ; আকাঙ্ক্ষার সমুদ্রে ভাসিয়া যাইতে উপদেশ দিতেছ? এ অবস্থায়

ক ... তো আমার একমাত্র কর্ত্তব্য; সেই ধ... এক্ষণে আমার প্রধান অবলম্বনীয়। কিন্তু ...য়েষা, আমার এক নিবেদন আছে। হৃদয়কে আমি সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিয়াছি সত্য, কিন্তু এক বিষয়ে আমার এখনও অতিশয় দুর্ব্বলতা রহিয়া গিয়াছে। তোমাকে না পাইলেও, আর আমি কাতর নহি; তুমি যাহারই হও, সে চিন্তাতেও আর আমি ব্যাকুল নহি। আমি কেবল কখন কখন তোমাকে দূর হইতে দেখিবার বাসনা এখনও ত্যাগ করিতে পারি নাই; কখন কখন তোমার এক একটী বাক্য শ্রবণের অভিলাষ এখনও বিসর্জ্জন দিতে পারি নাই; যে ভবনে তুমি বাস কর, সে ভবনে অবস্থিতিরূপ গৌরব আমি এখনও পরিত্যাগ করিতে পারি নাই; তোমার কুশলে সুখী ও অকুশলে উদ্বিগ্ন হইবার অধিকার আমি এখনও পরিহার করিতে পারি নাই। আয়েষা, এ দীনহীন অভাগা সকল সাধই বিসর্জ্জন দিয়াছে। তাহার এই ক্ষুদ্র বাসনাগুলিও কি তুমি অসঙ্গত বলিয়া মনে কর? ভিক্ষুকের রত্ন স্বরূপ তাহার এই আদরের অভিলাষগুলি চূর্ণ করাই কি তোমার অভিপ্রায়?"

আয়েষা বলিলেন,—"না। ওসমান, জীবনে ও মরণে আমি তোমার সঙ্গিনী। বিবাহরূপ অচ্ছেদ্য বন্ধন আমাদের অদৃষ্টে নাই। কিন্তু এ দেহ যদি তোমার চরণে উৎসর্গ করিতে আমার সাধ্য না হয়, যদি বিধাতার বিড়ম্বনায় তোমার সেবায় আমি আত্মনিয়োজন করিতে অধিকারিণী না হই, তাহা হইলেই বা ক্ষতি কি ভাই? কেন আমরা সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে সমপ্রাণ না হইব? কেন আমরা এক মনে, এক মন্ত্রণায়, এক প্রাণে কার্য্য-সাগরে ভাসিয়া জীবনকে কর্ম্মময় না করিব? ওসমান, অতঃপর আমি জীবনে ও মরণে তোমার অবিচ্ছিন্ন সঙ্গিনী হইয়াই রহিব; তোমার সন্তোষ সাধনই অতঃপর আমার ব্রত হইবে।"

তখন ওসমান বলিলেন,—"আয়েষা, আজি তুমি এ হতভাগার জীবনকে সুখময় ও আনন্দময় করিয়া দিলে। তোমার এই অনুগ্রহ আমাকে ধন্য করিল। এ ভিক্ষুক আর কিছুই প্রার্থী নহে। আয়েষা আমার অবিচলিত হিতৈষিণী, আয়েষা আমার উন্নতি-অবনতির জন্য চিন্তিতা, আয়েষার মন্ত্রণাচালিত হইয়া আমি কার্য্য সম্পাদনে নিযুক্ত, ইহা আমার পরম গৌরব, এবং অপরিসীম আনন্দ। ইহার অধিক আমার আর কোন প্রার্থনা নাই।"

আয়েষা বলিলেন,—"এ কথায় আর প্রয়োজন নাই। এক্ষণে কি উপায়ে আমাদের অপহৃত রাজ্য আমারা পুনরায় হস্তগত করিতে পারি, তাহার পরামর্শ করা আবশ্যক হইয়াছে।"

ওসমান বলিলেন,—"সে জন্য আর কোন চিন্তা নাই; অতঃপর যুদ্ধে আমার বীরত্ব দেখিয়া মানব সমাজ বিস্ময়াবিষ্ট হইবে এবং জয়ের পর জয় আসিয়া আমাকে সাদরে আলিঙ্গন করিবে। আমার মঙ্গলময়ী আয়েষার প্রসন্নতায়, সফলতা আমার কার্য্যসূত্রের সহিত নিত্য সংবদ্ধ হইবে।"

আয়েষার মাতা দ্বার হইতে জিজ্ঞাসিলেন,—"ঔষধ খাইবার সময় হইয়াছে মা।",

আয়েষা বলিলেন,—"আইস মা, ভিতরে আইস; ঔষধ আর না খাইলেও ক্ষতি হইবে না বোধ হয়।"

আয়েষা ও ওসমান আসন হইতে উত্থিত হইলেন। বেগম সাহেবা কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ

করিয়া যুবক যুবতীর মুখে অপরিসীম প্রসন্নতার লক্ষণ দেখিতে পাইলেন। তাঁহার বড়ই আনন্দ হইল। তাঁহাদের এ ভাব নিতান্ত শুভ সূচনা বলিয়া তিনি বিবেচনা করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মুক্তি।

জগৎসিংহ সেই অন্ধকার কারাগারে লৌহ-শৃঙ্খলে নিবদ্ধ হইয়া অতি ক্লেশে কাল-পাত করিতেছেন। হায়! এ দারুণ দুঃখের দিন কি ফুরাইবে না? আর কি কখন স্বাধীন মনুষ্য-সমাজে মিশিয়া তিনি সুখ-দুঃখের মর্ম্মে জীবনকে নিয়োজিত করিতে পারিবেন না? তাঁহার সকল আশা, সকল আনন্দই কি এই কারাগৃহে দীর্ঘ নিশ্বাসে পর্য্যবসিত হইয়া যাইবে?

অভিরাম স্বামী স্বয়ং কারাগারে প্রবেশ করিয়া আবেদনে তাঁহার স্বাক্ষর করাইয়া লইয়া গিয়াছেন। নবাব-নন্দিনী আয়েষা তাঁহার মুক্তির জন্য ব্যাকুলা হইয়াছেন। তিনি আত্মীয়গণের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া পাটনায় আসিয়াছেন। এ সকল ব্যক্তির চেষ্টা কখনই ব্যর্থ হইতে পারে না। কিন্তু বহুদিন অতীত হইয়া গেল, এখনও কোন শুভ-পরিবর্ত্তন ঘটিল না তো। তবে কি সকল ভরসাই শেষ হইল?

জগৎসিংহ নিভৃত কারাগারে বসিয়া আয়েষার সম্বন্ধে কত চিন্তাই করিতেছেন। এমন হিতৈষিণী, এমন সুহৃদ ও সহায় যে লাভ করে, সে মানবের মধ্যে ধন্য। আয়েষাকে মানবী বলিয়া মনে করিলেও অন্যায় করা হয়। স্বর্গেও এরূপ দেবী নাই। কিন্তু হায়! এই মহীয়সী মহিলা অপাত্রে অলৌকিক প্রণয় ন্যস্ত করিয়া চির বিষাদময়ী। এই হতভাগ্যই সেই দেবীর যন্ত্রণার একমাত্র কারণ। এ অভাগা তাঁহার নয়নপথবর্ত্তী না হইলে, নিশ্চয়ই সে দেববালা সর্ব্বসুখের অধিকারিণী হইতে পারিতেন। নিশ্চয়ই সেই অতুলনীয় রত্ন কোন প্রেমমুগ্ধ পুরুষশ্রেষ্ঠ সমাদরে বক্ষে ধারণ করিয়া অনন্ত সুখভোগ করিতেন। নিশ্চয়ই সেই শোভাময় প্রসূন হতাদরে মলিন ও বিশুষ্ক হইত না। এ অকৃতজ্ঞ নরাধম সে দেবদুর্লভ প্রণয়ের প্রতিদান করিতেও অশক্ত। এরূপ ব্যক্তির প্রতিও সেই করুণাময়ীর দয়া। হায়! আর কি জীবনে জগৎসিংহ তাঁহাকে একবারও দেখিতে পাইবে না? আর তাঁহার নিকট হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার সুযোগও উপস্থিত হইবে না?

অভিরাম স্বামী বলিয়া গিয়াছিলেন, তিলোত্তমা বড় ক্লেশে, নিতান্ত কাতরভাবে কাল কাটাইতেছেন। এতদিন এই অপরিসীম যাতনা ভোগ করিয়া সেই কোমল-প্রাণা সুর-সুন্দরী জীবিতা আছেন কি? আর কি জগৎসিংহ সেই প্রেমময়ীকে সজীব অবস্থায় দেখিতে পাইবেন? আর কি তিনি কখন তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিতে পাইবেন? আর কি কখন তাঁহার সহিত প্রাণের কথা কহিবার সুযোগ হইবে?

কর্ত্তব্যানুরোধে তাঁহার স্নেহময় পিতৃদেব তাঁহাকে কারাগারে প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু পুত্রের এই দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া পিতার হৃদয় কি একটুও বিচলিত হইতেছে না? তাঁহার কোন কোন বিমাতা পাটনায় আছেন। তাঁহারাও জগৎসিংহের মুক্তির জন্য ব্যাকুল হইতেছেন না কি? এত আত্মীয়-স্বজন থাকিতেও কি

জগৎসিংহকে চিরদিন এই ভাবেই কালপাত করিতে হইবে?

এ কষ্ট অসহনীয়। লৌহশৃঙ্খলে কষ্ট নাই, অন্ধকারে কষ্ট নাই, বন্ধনে কষ্ট নাই! একবার —একবার মাত্র দূর হইতে প্রাণের পরম প্রিয় পদার্থকে দেখিতে পাইলেই এ কষ্ট বোধ হয় সহনীয় হইতে পারে। দূর হইতে একবার মাত্র তিলোত্তমাকে দেখিবার কোন উপায় হইতে পারে না কি?

জগৎসিংহের ইচ্ছা হইল, এই লৌহ-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া, লৌহ দ্বার ভগ্ন করিয়া তিনি এখনই গড়মান্দারণের অভিমুখে ধাবিত হইবেন।

বিকট ঘর্ঘর শব্দে কারাগারের লৌহদ্বার খুলিয়া গেল। সেই মুক্ত-পথ দিয়া বায়ু ও আলোক প্রবেশ করিয়া জগৎসিংহকে কথঞ্চিৎ বিনোদিত করিল। জগৎসিংহ দেখিলেন, দ্বার মধ্য দিয়া কারারক্ষক ও আর একজন অনুচর কারাগারে প্রবেশ করিল। অনুচরের হস্তে বিবিধ বস্ত্রালঙ্কার।

কারারক্ষক সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অতীব সম্মান সহকারে যুবরাজকে প্রণাম করিল।

যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার কি সংবাদ?"

কারারক্ষক সবিনয়ে নিবেদন করিল,— "যুবরাজ মুক্ত হইয়াছেন। এই রাজ-পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া এখনই কারাগার হইতে নিষ্ক্রান্ত হউন।"

যুবরাজ বিশেষ ধীরতার সহিত এই শুভ সংবাদ শ্রবণ করিলেন। বলিলেন,—"তোমার কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি, এরূপ নিদর্শন কি আছে? হয় তো কারাগার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে, আমাকে রাজদ্রোহী বলিয়া পরিগণিত হইতে হইবে।"

কারারক্ষক বলিল,—"আমার নিকট বিশেষ কোন নিদর্শন নাই; আগরা হইতে খোদ সাহাল সাহার নাম মোহর যুক্ত পরওয়ানা মহারাজের উপর সিপাহী দ্বারা জারি হইয়াছে। মহারাজের খাস সিপাহীরা আমার উপর হুকুম জারি করিয়াছে। সে সিপাহীরা যুবরাজকে সঙ্গে লইয়া যাইবার নিমিত্ত, এখন দ্বারে অপেক্ষা করিতেছে।"

জগৎসিংহ বলিলেন,—"আমি তোমার কোন কথা অবিশ্বাস করিতেছি না। কিন্তু তুমি কাজ ঠিক কর নাই। সিপাহীদিগের সহিত মহারাজার পাঞ্জা অথবা তাঁহার নাম মোহর যুক্ত হুকুমনামা থাকা উচিত ছিল। তাহা দেখাইয়া আমাকে মুক্তি দিতে আসিলে, তোমার কর্ত্তব্য পালন করা হইত।"

কারারক্ষক একটু চিন্তা করিয়া বলিল,— "যুবরাজ উচিত আজ্ঞা করিয়াছেন। আনন্দে আমি সকল সাবধানতার কথা ভুলিয়া গিয়াছি। এক্ষণে যুবরাজের কি হুকুম?"

জগৎসিংহ বলিলেন,—"সিপাহীদিগের প্রধান ব্যক্তিকে তুমি বলিয়া আইস যে, মহারাজ বাদশাহের আদেশ না পাইলে, যুবরাজ কারাগার ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না। প্রধান সিপাহীকে আম-কাছারি হইতে সেইরূপ কোন নিদর্শন আনিতে বলিয়া তুমি আমার নিকট ফিরিয়া আইস। যতক্ষণ সেরূপ কোন আদেশ না আইসে, ততক্ষণ আমার শৃঙ্খল মোচন বা বেশ পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন নাই।"

কারারক্ষক যুবরাজের সাবধানতা ও স্থিরবুদ্ধি দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইল। আর কোন প্রতিবাদ করিতে সাহস না করিয়া, সে আজ্ঞা পালনে প্রস্থান করিল। যাইবার সময় সে আর কারাগারের দ্বার নিরুদ্ধ করিল না; কারণ

এ আদেশের সত্যতা সম্বন্ধে তাহার কোনই সন্দেহ ছিল না।

অবিলম্বে কারারক্ষকের সহিত মথুরাসিংহ কারাগারে প্রবেশ করিল এবং সসম্মানে নিবেদন করিল,—"যুবরাজ, যে পাঞ্জা দেখাইয়া এ অধীন রাজপুত্রকে গড়মান্দারণের নিকট মহারাজার আজ্ঞা জানাইয়াছিল, সেই পাঞ্জাই অদ্য তাহার নিকট রহিয়াছে। রাজপুত্রের মুক্তি-জন্য আনন্দে, এ দাস তাহা দেখাইতে ভুলিয়া গিয়াছিল। গোলামের কসুর মাফ করিতে আজ্ঞা হয়।"

মথুরাসিংহ উষ্ণীষ মধ্য হইতে পাঞ্জা বাহির করিয়া যুবরাজের সম্মুখে ধারণ করিল। যুবরাজ পাঞ্জার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া বলিলেন,—"কারারক্ষক, আমার শৃঙ্খল মোচন কর।"

তখন পরমানন্দে কারারক্ষক যুবরাজের হস্ত-পদের বন্ধন মোচন করিল। অনুচরের হস্ত হইতে পরিচ্ছদাদি গ্রহণ করিয়া, মথুরাসিংহ তাহাকে যুবরাজের হস্ত মুখাদি প্রক্ষালনার্থ জল আনিতে আদেশ করিলেন। জল আসিলে জগৎসিংহ হস্ত-মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া কারাবাসীর ঘৃণিত পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিলেন এবং রাজপরিচ্ছদে দেহ সমাচ্ছন্ন করিলেন। মস্তকে হীরক-খচিত শিরপেচ যুক্ত উষ্ণীষ, কর্ণে রত্নকুণ্ডল, কণ্ঠে মুক্তামালা শোভা পাইতে লাগিল। কটিদেশে অসি বিলম্বিত হইল। রত্ন-খচিত পাদুকা চরণ আবৃত করিল। বহুদিন অন্ধকার কারাবাস, দারুণ দুশ্চিন্তা প্রভৃতি কারণে জগৎসিংহের মূর্ত্তি মলিন হইয়াছিল। তথাপি তাঁহার স্বভাব-সুন্দর কান্তি উপযুক্ত পরিচ্ছদ-সমাবৃত হওয়ায় বড়ই শোভাময় হইল।

জগৎসিংহ সেই যন্ত্রণার নিকেতন স্বরূপ কারাগার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নানাপ্রকার বিভীষিকাময়ী দুশ্চিন্তায় প্রপীড়িত হইয়া তিনি যে স্থানে বহুদিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সে স্থানের সহিত তাঁহার আজি সম্বন্ধের শেষ হইল। প্রথমে মথুরাসিংহ, তৎপশ্চাৎ জগৎসিংহ, তৎপশ্চাৎ কারারক্ষক ও অনুচর নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বাহিরের আলোকরাজ্যে ও অব্যাহত বায়ুসমুদ্রে আসিয়া জগৎসিংহ যেন নূতন জীবন লাভ করিলেন ও নূতন বিশ্বে আনীত হইলেন।

যে পঞ্চাশজন অশ্বারোহী মথুরাসিংহের আজ্ঞাধীনতায় জগৎসিংহকে বন্দী করিতে গমন করিয়াছিল, তাহারাই এক্ষণে কারাগার সান্নিহিত প্রান্তরে অশ্বপৃষ্ঠে অপেক্ষা করিতেছে। জগৎসিংহের সেই শ্বেত অশ্ব-সুসজ্জিত হইয়া বহুদিন পরে প্রভুকে বহন করিবার নিমিত্ত উপস্থিত রহিয়াছে। অশ্ব-সন্নিধানে ছত্রধর কারুকার্য্য খচিত ও মুক্তাঝালর সমন্বিত বিশাল ছত্র হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কার-চোপে সমাচ্ছাদিত সুবৃহৎ ব্যজনী লইয়া অন্য ব্যক্তি ছত্রধরের পার্শ্বে অপেক্ষা করিতেছে।

যুবরাজকে দর্শন মাত্র সেই পঞ্চাশৎ সৈনিক অসি তুলিয়া প্রণাম করিল এবং সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"জয়, যুবরাজ জগৎসিংহের জয়!"

যুবরাজ জগৎসিংহ অসি দ্বারা তাহাদিগকে তদ্রূপ নমস্কার করিয়া বলিলেন,—"জয়, বাদশাহ আকবরের জয়! জয়, মহারাজ মানসিংহের জয়!"

জগৎসিংহ অশ্বারোহণ করিলেন। বহুকাল পরে প্রভুর দর্শন পাইয়া অশ্ব আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। কারারক্ষক সম্মান সহকারে যুবরাজকে প্রণাম করিল। জগৎসিংহ বলিলেন,—"তুমি আমার কারাবন্ধন কালে সতত

আমার সহিত সাতিশয় সদ্ব্যবহার করিয়াছ। তোমার ব্যবহারে আমি বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়াছি। তুমি অন্য কোন সময়ে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও; আমি তোমাকে যথেষ্ট পুরস্কৃত করিব।

কারারক্ষক আবার যুবরাজকে প্রণাম করিল। পঞ্চবিংশ জন সৈনিক রাজপুত্রের অগ্রবর্তী এবং পঞ্চবিংশ জন পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। যুবরাজ সেই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থান পাইলেন। মথুরাসিংহ এবার যুবরাজের পার্শ্বে স্থান গ্রহণ না করিয়া, সম্প্রদায়ের অগ্রবর্তী হইলেন। ব্যজক ও ছত্রধর যুবরাজের উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। তখন প্রথমে মথুরা সিংহ উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"জয়, যুবরাজ জগৎসিংহের জয়!"

সম্মুখস্থ পঞ্চবিংশ অশ্বারোহী সানন্দ চীৎকার করিয়া উঠিল,—"জয়, যুবরাজ জগৎ সিংহের জয়!"

পশ্চাতের পঞ্চবিংশ সৈনিক তাহারই প্রতিধ্বনি স্বরূপে বলিয়া উঠিল,—জয়, যুবরাজ জগৎসিংহের জয়!"

সেই স্বর ব্যোমপথ নাচিতে নাচিতে বহুদূর ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ক্রমে সম্প্রদায় ধীরে ধীরে চলিতে চলিতে নগরে প্রবেশ করিল। নগরের রাজপথ সমূহ কৃত্রিম তোরণ, ধ্বজা, পতাকা, ও পত্র-পুষ্পে সুসজ্জিত। পথিপার্শ্বে, অট্টালিকার উপর, বারান্দায়, বাতায়নে, সর্ব্বত্র ঔৎসুক্য পূর্ণ নর-নারী দণ্ডায়মান। সকল অট্টালিকাই রঞ্জিত বস্ত্র, পুষ্পমালিকা ও কেতন পরিশোভিত; দীনের পতনোম্মুখ কুটীরেও যথাসম্ভব সজ্জার অভাব নাই। প্রত্যেক ভবনের প্রবেশ-দ্বারে বারি-পূর্ণ কলস ও কদলী বৃক্ষ স্থাপিত।

সম্প্রদায় নগর সীমায় প্রবেশ করিবামাত্র অগণ্য কণ্ঠে শব্দ হইল,—"জয়, যুবরাজ জগৎ সিংহের জয়!"

সেই শব্দ কণ্ঠপরম্পরায় শব্দিত হইতে হইতে সমস্ত পটনা নগরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সম্প্রদায় ধীরে ধীরে রাজপথ দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। কুলকামিনীগণ গবাক্ষ হইতে জগৎসিংহের মস্তকে লাজ, কপর্দ্দক, ও প্রসূন বর্ষণ করিতে লাগিলেন। শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন হইল। জগৎ সিংহ অবনত মস্তকে সকলের শুভাশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

ক্রমে সম্প্রদায় মহারাজ মানসিংহের দরবার-গৃহের সমীপদেশে উপনীত হইল। বিচারান্তে এই দরবার হইতে কুমারের কারদণ্ড হইয়াছিল। দরবার তোরণে যুবরাজ অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ দ্বাদশজন মোগল ও রাজপুত সেনাপতি এবং সভাসদ্ আসিয়া তাঁহাকে অবনতমস্তকে সম্মান প্রদর্শন করিলেন এবং সমাদরে সঙ্গে লইয়া দরবারে প্রবেশ করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

নবীন সুবেদার।

যে সভায় সর্ব্বসমক্ষে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া, এবং ঘৃণিত কারাবাসীর পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া জগৎসিংহ দণ্ডিত হইয়াছিলেন, আজি বহু দিনের পর তিনি সেই সভায় বহু সম্মানে ভূষিত হইয়া এবং রাজপরিচ্ছদাদি ধারণ করিয়া পুনরায় প্রবেশ করিলেন। সেই উচ্চ মঞ্চের উপর মহারাজ মানসিংহ গম্ভীরভাবে বসিয়া

আছেন; সেই পারিষদ্ ও সভাসদ্গণ তাঁহার উভয় পার্শ্বস্থ অপেক্ষাকৃত নিম্ন আসন সমূহ অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছেন। সৈনিক, রাজ-কর্ম্মচারী ও সাধারণ জনসমাগমে সভার তাবৎ স্থান পরিপূর্ণ। এখনও জনসমাগম নিরুদ্ধ হয় নাই। যে সকল মানব পথ-পার্শ্বে জগৎ-সিংহের শুভাগমন দর্শনার্থ অপেক্ষা করিতেছিল, তাহারা এক্ষণে দলে দলে আসিয়া সভা মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল।

সভা-মধ্যে জগৎসিংহ প্রবেশ করিবামাত্র সেই অগণিত-প্রায় কণ্ঠ হইতে শব্দ হইল,—"জয়, যুবরাজ জগৎসিংহের জয়!"

সঙ্গে সঙ্গে জগৎসিংহ বলিলেন,—"জয় বাদশাহ আকবরের জয়! জয়, মহারাজ মানসিংহের জয়!"

জগৎসিংহ অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমে মহারাজ মানসিংহের সিংহাসন সমীপে উপস্থিত হইলেন। সিংহাসন উচ্চ মঞ্চে সংস্থিত। জগৎসিংহ নিম্নে দণ্ডায়মান হইয়া, আপনার উষ্ণীষ উন্মোচন করিলেন, এবং তাহা মহা-রাজের চরণে স্থাপন করিয়া করযোড়ে কহি-লেন,—"অপরাধী পুত্র কাতর ভাবে মহারাজের ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছে।"

মহারাজ গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"পুত্র! তোমার সকল অপরাধের মার্জ্জনা হইয়া গিয়াছে। স্বয়ং বাদশাহ বাহাদুর কৃপা করিয়া তোমার অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন এবং তোমাকে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন।"

অগণ্য কণ্ঠে শব্দ হইল,—"জয়, বাদশাহ আকবরের জয়।"

জগৎসিংহ বলিলেন,—"বাদশাহের এ অনুগ্রহ আমার শিরোধার্য্য। কিন্তু পিতঃ, যিনি এ জগতে আমার পরম গুরু, যিনি আমার ইহ পরকালের দেবতা, সেই পিতৃদেবের প্রস-ন্নতা লাভ করিতে না পারিলে আমার সকল সাধনাই বৃথা। পিতার মনের ভাব জানিবার নিমিত্ত, অধম পুত্র কাতর ভাবে অপেক্ষা করিতেছে।"

মানসিংহ বলিলেন,—"পুত্র, আমি সরল মনে তোমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়াছি। তুমি উষ্ণীষ উঠাইয়া শিরে ধারণ কর। আশী-র্ব্বাদ করিতেছি, তুমি কর্ত্তব্য-পরায়ণ হইয়া যশস্বী হও।"

অগণ্য কণ্ঠে আবার শব্দ হইল,—"জয়, মহারাজ মানসিংহের জয়!"

জগৎসিংহ পিতৃচরণ হইতে উষ্ণীষ গ্রহণ করিয়া মস্তকে ধারণ করিলেন। তাহার পর বলিলেন,—'আজি আমার জীবন ধারণ সার্থক হইল। পিতার অসন্তোষের ভার মস্তকে ধারণ করিয়া জীবিত থাকার অপেক্ষা মরণই মঙ্গল। আমি এতদিন মৃতকল্প হইয়াই জীবিত ছিলাম। করুণাময় পিতৃদেব, আমার অপরাধ অনেক; আমার কোন্ কোন্ অপরাধের ক্ষমা হইয়াছে, কোন্ কোন্ বিষয়ে আমি এখনও অপরাধী আছি, ইহা জানিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে আমার কোন অধিকার আছে কি?

মানসিংহ বলিলেন,—স্নেহ ভাজন কুমার, তোমার পারিবারিক ও রাজনৈতিক সকল অপরাধেরই ক্ষমা হইয়াছে। আমি জানিতে পারিয়াছি, তুমি নবাব-নন্দিনী আয়েষার হৃদয়ে প্রেমানল প্রজ্বলিত করিবার কোন প্রযত্ন কর নাই; সেজন্য কোন সহায়তাও তুমি কর নাই। একথা নবাব ওসমান খাঁ আমার নিকট নিজ মুখে ব্যক্ত করিয়াছে। সুতরাং সেজন্য তোমাকে অপরাধী করা অসঙ্গত!"

জগৎসিংহ অবনত মস্তকে বলিলেন,—"আমার আরও অনেক অপরাধ আছে।"

মানসিংহ বলিলেন,—বীরেন্দ্রসিংহের কন্যার সহিত তোমার বিবাহ বড়ই গুরুতর অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। কিন্তু আমি জ্ঞাত হইয়াছি, বীরেন্দ্র-নন্দিনী রূপে গুণে অতুলনীয়া। সেই তিলোত্তমা যথার্থ রাজলক্ষ্মী স্বরূপা। সুতরাং তাঁহার সহিত বিবাহ হেতু তোমার অপরাধও মার্জ্জনীয়।"

জগৎসিংহের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। মহারাজ মানসিংহ বলিলেন,—"তোমার রাজনৈতিক অপরাধ দুনিয়ার মালিক স্বয়ং ক্ষমা করিয়াছেন; তৎসম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইলে আমার গুরুতর অপরাধ হয়। তুমি সম্প্রতি বাদশাহের বিচারে এবং আমার বিচারে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।"

সেই অগণ্য কণ্ঠে সমস্বরে শব্দ হইল,—"জয়, যুবরাজ জগৎসিংহের জয়!"

জগৎসিংহ জিজ্ঞাসিলেন,—"আমার প্রতি এক্ষণে মহারাজের কি আদেশ? কোন্ কর্ত্তব্য সাধন করিয়া আমি এক্ষণে মহারাজের প্রসন্নতা অর্জ্জনের প্রয়াসী হইব?"

মহারাজ একজন পারিষদ্‌কে ইঙ্গিত করিলে, তিনি জগৎসিংহের হস্তে একখানি সনন্দ প্রদান করিলেন। মানসিংহ বলিলেন,—"যুবরাজ জগৎসিংহ, বাদশাহের কৃপায় তুমি বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদার নিযুক্ত হইয়াছ। তোমার যেরূপ সৌভাগ্য ঘটিয়াছে, মনুষ্যের অদৃষ্টে সেইরূপ সৌভাগ্য প্রায় ঘটিতে দেখা যায় না। আশীর্ব্বাদ করি, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, ন্যায়নিষ্ঠা, সততা, সাহস ও সুবিচার হেতু চিরস্থায়ী কীর্ত্তি ও যশ অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইবে।"

সভাস্থ তাবৎ লোক উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"জয়, বাদশাহ আকবরের জয়! জয়, মহারাজ মানসিংহের জয়! জয়, যুবরাজ জগৎসিংহের জয়!"

সভাস্থ তাবৎ সভাসদ্ ও পারিষদ্ আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং সসম্ভ্রমে জগৎসিংহকে অভিবাদন করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন একটু অগ্রসর হইয়া, সবিনয়ে নিবেদন করিলেন,—"আমরা নবীন সুবেদারের নিকট আমাদের একান্ত বশ্যতা ও অধীনতা স্বীকার করিতেছি। আমরা অবিচলিত চিত্তে তাঁহার আজ্ঞা পালনে সম্মত হইতেছি। আমরা অন্তরের সহিত তাঁহার শুভ কামনা করিতেছি। আমরা তাঁহার এই পদোন্নতি হেতু হৃদয়ে আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। আমরা কায়মনোবাক্যে তাঁহাকে অবিচলিত সম্মান জ্ঞাপন করিতেছি। আমরা উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার জয় ঘোষণা করিতেছি।"

জগৎসিংহ বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। কোথায় অন্ধকার কারাগারে লৌহশৃঙ্খলনিবদ্ধ দশা, আর কোথায় বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদার পদ প্রাপ্তি। উভয়ের প্রভেদ কল্পনাতীত। উভয় অবস্থার পার্থক্য আলোচনা করিলে শিহরিতে হয়। এই পরিবর্ত্তন এত সহসা, এত অতর্কিতভাবে, এত অপ্রত্যাশিত রূপে উপস্থিত হইল যে, জগৎসিংহ যেন তাহার মর্ম্ম প্রণিধান করিতে অক্ষমতা হেতু কিয়ৎকাল মুগ্ধ হইয়া রহিলেন।

মহারাজ মানসিংহ কহিলেন,—"কুমার জগৎসিংহ তোমাকে অদ্যই কার্য্যভার গ্রহণ করিতে হইবে। কল্য হইতে আমি অবসর গ্রহণ করিব।"

জগৎসিংহ জিজ্ঞাসিলেন,—"কেন?"

মহারাজ বলিলেন,—"ইহাই বাদশাহের আদেশ। তিনি আমাকে হুকুম প্রাপ্তি মাত্র পাটনা ছাড়িয়া যাইতে আদেশ করিয়াছেন।

বিশেষ প্রয়োজনে সম্প্রতি অবিলম্বে আগরায় উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আমার প্রতি আদেশ হইয়াছে; সে স্থান হইতে আমাকে দিল্লী, পরে আজমীর যাইতে হইবে, জানিতে পারিয়াছি। তাহার পর আর কোথায় কোন প্রয়োজনে যাইতে হইবে কি না তাহা এখনও আমি জানিতে পারি নাই। আমার অনুপস্থিতকালে বাদশাহ তোমাকে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদার নিযুক্ত করিয়াছেন। এ সকলই দুনিয়ার মালিক বাদশাহ বাহাদুরের ব্যবস্থা। ইহার মধ্যে আমার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই।"

এতক্ষণে জগৎসিংহ প্রকৃত অবস্থা প্রণিধান করিলেন। তখন ভূতলে জানু সংলগ্ন করিয়া বলিলেন,—"সাহান সাহের আদেশ পালনে এ সেবক চির বাধ্য। মহারাজের আজ্ঞা-পালন এ দাসের পরম ধর্ম্ম। আমার প্রতি এই অনুগ্রহ প্রদর্শন করায় আমি বাদশাহের সমীপে ও মহারাজের চরণে অবিচলিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।"

তখন মানসিংহ আসন ত্যাগ করিয়া জগৎসিংহের সমীপে আগমন করিলেন এবং তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,—"তবে আইস বৎস, মসনদে উপবেশন কর। আমি তোমার পিতা হইলেও অধুনা তোমার শাসনাধীন প্রজা মাত্র। যে মুহূর্ত্তে বাদশাহের সনন্দ তোমার হস্তগত হইয়াছে, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তুমি বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদার হইয়াছ। তোমাকে সুবেদারের আসনে স্থাপিত করা আমারই কর্ত্তব্য।"

জগৎসিংহ পিতার চরণে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার চরণ-ধূলা মস্তকে স্থাপন করিলেন। মানসিংহ পুত্রের হস্তধারণ করিয়া সিংহাসনের সমীপবর্ত্তী হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"আমি সাহান সাহের আজ্ঞাক্রমে সর্ব্বসমক্ষে এই সভামধ্যে যুবরাজ জগৎসিংহকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদারের সিংহাসনে সমাসীন করিতেছি। ভরসা করি, নবীন সুবেদারের শাসনকালে অধীনস্থ প্রদেশ সমূহে শান্তি বিরাজ করিবে; প্রজাগণ সর্ব্বপ্রকারে নিরুপদ্রব থাকিবে; যুদ্ধ-বিগ্রহ হেতু অকারণ শোণিত ক্ষয় হইবে না।"

নবীন সুবেদার কহিলেন,—"আমি প্রাণপণে বাদশাহের ইষ্টসাধনে নিযুক্ত থাকিব, শাসন বিষয়ে পূজনীয় পিতৃদেবের পরিগৃহীত পদ্ধতির অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিব এবং সর্ব্বপ্রকারে প্রকৃতি-পুঞ্জের ও অধীনস্থ ব্যক্তিবৃন্দের অনুরঞ্জন করিব।"

তখন মহারাজ মানসিংহ বলিলেন,—"জয়, নবীন সুবেদারের জয়!"

সভাসদ্ ও পারিষদগণ সেই বাক্যের অনুকরণ করিয়া কহিলেন,—"জয়, নবীন সুবেদারের জয়!"

সভাস্থ অগণ্য প্রায় সৈনিক ও দর্শক সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"জয়, নবীন সুবেদারের জয়।"

সে দিন সভা ভঙ্গ হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

মিলন।

বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদার যুবরাজ জগৎসিংহ, পিতার সহিত মিলিত হইয়া, সভা হইতে প্রস্থান করিলেন। পিতা পুত্রে এক সঙ্গে অন্তঃপুরে গমন করিলেন। তথায় যুবরাজকে মাতৃকাগণের সহিত সাক্ষাৎ

করিতে আদেশ করিয়া মহারাজ অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

যুবরাজ প্রথমে উর্ম্মিলা দেবীর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। তথায় তাঁহার তিন বিমাতাই উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদিগের চরণে জগৎসিংহ ভক্তিসহকারে প্রণাম করিলেন। তাঁহারা যুবরাজকে বিবিধ শুভাশীর্ব্বাদ জানাইলেন এবং তাঁহার বিগত ক্লেশ সমূহের উল্লেখ করিয়া আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

উর্ম্মিলা বলিলেন,—"তুমি ক্ষুৎপিপাসায় কাতর আছ; বোধ হয় বিশ্রামেরও প্রয়োজন হইয়াছে। তোমার সহিত সুখ-দুঃখের অনেক কথা আছে। সময়ান্তরে তাহার ব্যবস্থা হইবে। এক্ষণে তুমি আমার সহিত আইস।"

জগৎসিংহ নীরবে উর্ম্মিলা দেবীর অনুসরণ করিলেন।" কিঞ্চিদ্দূরে সুসজ্জিত এক কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইয়া উর্ম্মিলা দেবী কহিলেন.—"এই কক্ষমধ্যে তুমি বিশ্রাম কর; আমি তোমার আহার্য্যের ব্যবস্থা করিতে যাই।"

জগৎসিংহ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎক্ষণাৎ পার্শ্বদেশ হইতে এক সাশ্রু নয়না সুন্দরী বেগে আসিয়া তাঁহার বক্ষের উপর নিপতিত হইলেন। সেই সুন্দরী তিলোত্তমা।

যুবরাজ অবাক্! একি স্বপ্ন, না সত্য ঘটনা! অদ্য কি প্রেতাবিষ্ট মানবের ন্যায় তাঁহার সকল কার্য্যেই ভ্রান্তি উপস্থিত হইতেছে? সহসা উন্মাদরোগাক্রমণে বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিতেছে বলিয়া তাঁহার আশঙ্কা হইল। কিন্তু সত্যই তো সেই সাশ্রু-নয়না সুন্দরী তাঁহার প্রাণের প্রাণ-স্বরূপা তিলোত্তমা ভিন্ন আর কেহই নহেন। সত্যই তো সেই হৃদয়-বিনোদিনী তাঁহার বক্ষের উপর নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিতেছেন। মানুষের সহসা এরূপ একদিনে ভাগ্য-পরিবর্ত্তন হইতে পারে কি? অশেষ যন্ত্রণা ও দুশ্চিন্তার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া সহসা এরূপ অচিন্তিত-পূর্ব্ব সর্ব্ব সুখৈশ্বর্য্যের সম্মিলন ঘটিতে পারে কি? অসম্ভব হইলেও এ ব্যাপার যে ঘটিয়াছে তাহার সন্দেহ নাই।

তিলোত্তমার নয়নে জল, অধরে হাসি। বড়ই অদ্ভুত দৃশ্যের সমাবেশ! জগৎসিংহ সেই প্রেম-পুত্তলীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিলেন,—"তিলোত্তমা, তুমি যে এখানে?"

তিলোত্তমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"আমাকে তিলোত্তমা বলিয়া ডাকিলে তোমার অন্যায় কার্য্য হইবে। ভুবন-বিখ্যাত অম্বরেশ্বরের পুত্রবধূ, বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার নবীন সুবেদারের পত্নীকে কেহই তো নাম ধরিয়া ডাকিতে সাহস করে না।"

জগৎসিংহ বলিলেন,—"এ কথা ঠিক। এ অপরাধের নিমিত্ত পরে সমুচিত শাস্তি গ্রহণ করিব। এক্ষণে কৃপা করিয়া বল, এখানে তুমি কিরূপে আসিলে?"

তিলোত্তমা আবার হাসি মিশাইয়া বলিলেন,—'শ্বশুরের গৃহে, স্বামীর আশ্রয়ে আমি কিরূপে আসিলাম, এ কথা তুমি কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমি আপনি আসিয়া আমার স্থান অধিকার করিয়াছি।"

তখন জগৎসিংহ সেই সুশীলার বদন চুম্বন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"সত্য করিয়া বল, কিরূপে কি হইল।"

তিলোত্তমা হাসিতে হাসিতে জগৎসিংহকে তত্রত্য সিংহাসনে বসাইয়া বলিলেন,—"তুমি অতিশয় পরিশ্রান্ত আছ। অগ্রে আহারাদি করিয়া, বিশ্রাম করিয়া স্থির হও, তাহার পর সকল কথা বলিব।"

যুবরাজ বলিলেন,—"আজি এত অসম্ভব কাণ্ড ঘটিতে দেখিতেছি যে, তাহা স্মরণ করিয়া অবাক্‌ হইতেছি। এ সকলের মীমাংসা না হইলে আমি স্থির হইতে পারিব না।"

তিলোত্তমা ব্যজনী লইয়া যুবরাজের দেহে বায়ু সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। যুবরাজ তাহার হস্ত হইতে ব্যজনী লইয়া বলিলেন,—"অম্বরেশ্বরের পুত্রবধূর নিশ্চয় অনেক দাসী আছে। তাহারাই পাখা করিবে। আমি বুঝিতেছি সকল রহস্যই তোমার জানা আছে। কৃপা করিয়া অগ্রে আমার কৌতূহল নিবারণ করিয়া সুস্থির করিয়া দেও।"

জগৎসিংহ অতি আদরে তিলোত্তমাকে আকর্ষণ করিয়া আপনার অঙ্কে ধারণ করিলেন। অবরোধের পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার পর গড় মান্দারণে ছাতের উপর তিলোত্তমা যে ভাবে জগৎসিংহের বক্ষে মস্তক স্থাপন করিয়াছিলেন, আজি বহুদিন পরে আবার সেই সুখের উপাধানে সেইরূপে মস্তক বিন্যস্ত করিলেন। কিন্তু সে দিন আর এ দিনে কি প্রভেদ! সে দিনের কি ভয়ানক আশঙ্কা, কি বিভীষিকাপূর্ণ বিষাদের ছায়া; এ দিনের কি অতুলনীয় আনন্দ; কি প্রত্যক্ষ স্থায়ী সুখ!

এইরূপ অবস্থায় উপবিষ্ট হইয়া তিলোত্তমা একে একে সমস্ত কথাই যুবরাজের গোচর করিতে লাগিলেন। মহারাজ মানসিংহের শ্রীক্ষেত্র যাত্রা, তথায় বিমাতা বিমলার সহিত মহারাণী উর্ম্মিলার নিকট গমন, সেই করুণাময়ী মহারাণীর সহায়তা লাভ, তাঁহারই কৃপায় মহারাজের সহিত পরিচয়, তিলোত্তমার সেবায় মহারাজের সন্তোষ, মহারাণীর কৌশলে মহারাজের ক্ষমা ও পুত্রবধূরূপে গ্রহণ ইত্যাদি সকল কথাই তিলোত্তমা ধীরে, সংক্ষেপে ও মধুর ভাষায় জগৎসিংহকে জানাইলেন।

সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া জগৎসিংহ বলিলেন,—"বুঝিয়াছি তিলোত্তমা, তোমারই বুদ্ধিতে, তোমারই কৌশলে আমার সকল শুভ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তোমার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া যে ব্যক্তি তোমার দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে, সে আর তোমাকে কেমন করিয়া মনের ভাব বুঝাইবে? কি বলিয়া সে আর তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে? আমার মুক্তি বোধ হয় তোমারই কৌশলে সাধিত হইয়াছে?"

তিলোত্তমা বলিলেন,—"তুমি প্রেমান্ধ, তাই প্রকৃত ব্যাপার দেখিতে পাইতেছ না। আমি চেষ্টা করিয়া নিজের স্থান অধিকার করিয়াছি, অবজ্ঞাত হীনভাবে জীবন পাত না করিয়া, আপনার ন্যায় সঙ্গত স্থান আমি গ্রহণ করিয়াছি মাত্র। ইহাতে গৌরবের কথা কিছুই নাই। তোমার মুক্তির নিমিত্ত আমি কিছুই করি নাই; করিতে আমার সাধ্য কি আছে? নবাব-নন্দিনী আয়েষা শক্তি, বুদ্ধি, কৌশল সকল বিষয়েই অদ্বিতীয়া। তিনিই আগরা গমন করিয়া তোমার মুক্তি ঘটাইয়াছেন। বোধ হয় তোমার এই পদোন্নতি তাঁহারই চেষ্টার ফল। তুমি শুনিয়াছ কি না জানি না, বাদশাহের আদেশ আসিয়াছে, আমার নিমিত্ত লক্ষ মুদ্রা আয়ের জায়গীর প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা নিশ্চয়ই সেই নবাব-নন্দিনী ঘটাইয়াছেন। আমাদের এই যে সকল কল্পনাতীত সুখোদয় উপস্থিত হইয়াছে, এ সকলই আয়েষার অনুগ্রহের ফল। যদি এ সকলের নিমিত্ত কাহারও নিকট আমাদিগকে কৃতজ্ঞ হইতে হয়, তাহা হইলে আজীবন সেই শক্তিময়ী আয়েষার নিকট

আমাদিগকে চির-বিক্রীত হইয়া থাকিতে হইবে।"

জগৎসিংহ বলিলেন,—"তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। জানি না কিরূপে সেই দেবীর ঋণ কথঞ্চিৎ পরিশোধ করিতে পারিব।"

তিলোত্তমা তখন সাদরে জগৎসিংহের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া বলিলেন,—"আমি জানি। তুমি এ দাসীর কথা শুনিবে বল?"

জগৎসিংহ বলিলেন,—"এরূপ কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ তিলোত্তমা? তোমার বাক্য অন্যথা করিব, ইহাও কি সম্ভব? তোমার ন্যায়-সঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিতে হইলে যদি অসাধ্য সাধন করিতে হয়, তাহাতেও আমি কখনও পশ্চাৎপদ হইব না।"

তখন তিলোত্তমা উভয় হস্তে জগৎসিংহের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,—"তুমি আয়েষাকে পত্নীভাবে গ্রহণ কর।"

যুবরাজ জিজ্ঞাসিলেন,—"প্রাণেশ্বরি, এই প্রস্তাব শুনিয়া আমি তোমার সরলতা, ঔদারতা ও সহৃদয়তার বার বার প্রশংসা করিতেছি; কিন্তু দুঃখের বিষয় এ কথায় তোমার বুদ্ধির কোনই প্রশংসা করিতে পারিতেছি না। যে নারী কেবল কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিমিত্ত, প্রাপ্ত উপকারের প্রতিশোধ স্বরূপে, ঋণ মুক্ত হইবার বাসনায়, অন্য নারীকে সপত্নীর আসন প্রদান করিতে পারে, তাহার হৃদয় যে অতি উচ্চ, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। আমি তোমার হৃদয়ের মহত্ত্ব প্রণিধান করিয়া সানন্দে বার বার তোমার প্রশংসা করিতেছি।"

তিলোত্তমা বলিলেন,—"প্রশংসা কর বা না কর, আমার নিন্দা করিতেছ কি জন্য?"

জগৎসিংহ কহিলেন,—"নিন্দা কিছুই করিতেছি না। আয়েষাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করার সম্বন্ধে তুমি যে প্রস্তাব করিয়াছ, তাহাতে আমি তোমার বুদ্ধির কোনই প্রশংসা করিতে পারিতেছি না।"

"কেন? মহারাজের, মহারাণীর এবং অপর সকলেরই এই বাসনা। আয়েষাকে মহারাজ ও মহারাণী এজন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি সম্মত হন নাই; কিন্তু আমাদের বিশ্বাস তুমি মনে করিলেই তাঁহার মত পরিবর্ত্তন হইবে।"

"বড় ভুল বিশ্বাসকে তোমরা মনে স্থান দিয়াছ। তোমরা আয়েষার হৃদয়-সিন্ধুর একটি তরঙ্গও দেখিতে পাও নাই। মহারাজ জানেন মহারাণী জানেন, বিবাহ করিলেই স্ত্রী হয়, এবং ভাল বাসিলেই ভালবাসা হয়। কিন্তু প্রেমময়ী আয়েষা তাহা জানেন না। আয়েষা জানেন, যেখানে হৃদয়ের বিনিময় নাই, সেখানে শত সহস্র পুরোহিত বা মোল্লা একত্র হইয়া অশেষ মন্ত্র পাঠের পর, বিবাহ ঘটাইয়া দিলেও সে বিবাহ বিবাহ হয় না। যে ভাল বাসা আপনি জন্মিয়া, আপন মনে বৃদ্ধি পাইয়া প্রাণকে ভাসাইয়া না রাখে, সে ভালবাসা ভালবাসা নহে। আয়েষার সহিত বিবাহ হইতে পারে না; কেননা এক্ষেত্রে হৃদয়ের বিনিময় হইবার কোন ভরসা নাই। আয়েষা আমার নিমিত্ত হৃদয়ে অগাধ ভালবাসা পোষণ করিতেছেন জানি; কিন্তু আমার হৃদয়ের বীণা সে ভালবাসার সুরে বাজিতে জানে না। আমি আয়েষাকে যথেষ্ট ভাল বাসি সত্য; কিন্তু সে ভালবাসা আয়েষার ভালবাসার অনুরূপ নহে। সুতরাং আমি তাঁহাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিতে পারি না; তিনিও আমার পত্নী হইতে কখনই সম্মত হইতে পারেন না।"

তিলোত্তমা বলিলেন—"কেন তুমি আয়েষাকে হৃদয় দিতে পারিবে না? কেন তুমি

তাঁহাকে তাঁহার মত ভালবাসিতে পারিবে না?"

জগৎসিংহ বলিলেন,—"বড় বালিকার ন্যায় প্রশ্ন! তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার, কেন দিনে রাত্রি হয় না, কেন রাত্রিতে দিন হয় না? কেন জলে আগুন থাকে না, কেন আগুনে জল থাকে না? সবলে, যাহা হইবার তাহাই হয়; যে জন্য যাহার সৃষ্টি সে সেই কাজ করে।"

তিলোত্তমা বলিলেন,—"তাহা হইলেও যত্নে, চেষ্টায়, প্রবল বাসনায় অনেক বিষয়ের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারা যায়। তুমি চেষ্টা করিলে অবশ্যই আয়েষাকে হৃদয় দিতে পার, নিশ্চয়ই তাহার সুরে তুমি হৃদয়ের বীণা বাঁধিয়া লইতে পার।"

জগৎসিংহ বলিলেন,—"হৃদয় একটা, যখন ইচ্ছা তখনই তাহা যাহাকে তাহাকে দেওয়া যায় না। যে হৃদয়ে একমাত্র তোমারই পূর্ণ অধিকার, তাহাতে আর কাহারও স্থান হইতে পারে না। এক আকাশে অগণ্য তারকা থাকিতে পারে, কিন্তু দুইটী সূর্য্য বা দুইটী চন্দ্রের স্থান হয় না। তোমার ভালবাসার সুরেই আমার হৃদয় তন্ত্রী বাজিতে শিখিয়াছে; আর কোন সুর ইহাতে আসিবে কেন? আয়েষা ক্ষুদ্র তারকার মত আকাশের একপার্শ্বে জ্বলিবার সামগ্রী নহেন। যে সুরে আয়েষার ভালবাসার গান বাজিতে পারে, আমার বীণায় সে সুর নাই।"

তিলোত্তমা অনেকক্ষণ অধোমুখে চিন্তা করিলেন। রাজপুত্রের বাক্যের মর্ম্ম তিনি প্রণিধান করিলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"তাহা হইলে তুমি কি মনে করিতেছ, সেই শোভার ফুল আপনি শুখাইয়া যাইবে? অপাত্র-ন্যস্ত প্রণয়ের তীব্র জ্বালা ভোগ করিতে করিতে সেই অতুল আলোক আপনি নিবিয়া যাইবে?"

জগৎসিংহ বলিলেন,—"জানি না বিধাতার কি বাঞ্ছা। কিন্তু বোধ হয় তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই আয়েষার নিয়তি। আমি তাঁহাকে বড় ভালবাসি; তাঁহার গুণে আমি একান্ত মুগ্ধ; তাঁহার রূপ অতুলনীয় বলিয়াই আমার মনে হয়; আমি তাঁহার নিকট অশেষ ঋণে বদ্ধ। তাঁহার প্রয়োজনে আমি অকাতরে প্রাণ দিতে পারি; তথাপি তিনি যাহা পাইলে সুখী হইবেন, তাহা তাঁহাকে প্রদান করিতে আমার সাধ্য নাই; কেন না তাহা আমার নাই। যে ভালবাসায় নরকেও স্বর্গ হয়, যে ভালবাসায় সংসারের সকল দুঃখ-জ্বালা দূর হইয়া যায়, যে ভালবাসায় মনুষ্য অমরত্ব লাভ করে; সে ভালবাসা আমি আমার অঙ্কস্থিতা এই সু[illegible]-সুন্দরীকে নিঃশেষরূপে দিয়া ফেলিয়াছি; আয়েষা সেই ভালবাসার প্রার্থী। সে ভালবাসার সকলই এই দেবীর চরণে সমর্পিত হইয়া[illegible]ছে; সুতরাং সে দেবীকে দিবার উপযুক্ত কোন সামগ্রী আমার নাই।"

তিলোত্তমা নীরব। বড়ই প্রগাঢ় প্রেমের কথা। আয়েষা পূর্ণ[illegible] দয়ের পূর্ণ প্রেম ব্যতীত কখনই পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না। ক্ষুদ্রা নারীর ন্যায়, মাহারা[illegible] মানসিংহের অগণ্য মহিষীর ন্যায় প্রণয়া[illegible]দকে স্বামী বলিবার অধিকার মাত্র লাভ ক[illegible]লেই আয়েষা কখনই সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। সুতরাং তাঁহার এ ক্লেশ নিবারণের বুঝি[illegible] আর উপায় নাই।

জগৎসিংহ বলিলেন,—"কৃতজ্ঞতার কথা বলিতেছিলে! আয়েষার নিকট কৃতজ্ঞতার জন্য চিন্তা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যাঁহার হৃদয়ে আমাদের সম্বন্ধে অগাধ প্রেম, তিনি কি কৃতজ্ঞতার প্রত্য[illegible]শায়, অথবা বাধ্য-

বাধকতা ঘটাইয়া প্রেম উদ্দীপন করিবার বাসনায় আমাদের বিবিধ উপকার করিতেছেন? তাহা যদি হইত, তাহা হইলে তিনি একবারও আমার সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা করিতেন, অন্ততঃ একবারও আমার সহিত প্রণয়ের প্রসঙ্গ লইয়া আলাপ করিতেন। সে দেবীর হৃদয় অগাধ সিন্ধু স্বরূপ। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তোমরা তাহার তরঙ্গমালার একটীও দেখিতে পাও নাই।"

দ্বারের অপর পার্শ্ব হইতে মহারাণী উর্ম্মিলা বলিলেন,—"কুমার!"

তিলোত্তমা অপর দ্বার দিয়া বেগে পলায়ন করিলেন। যুবরাজ বলিলেন,—"আসুন মা!"

যুবরাজ আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তৎক্ষণাৎ মহারাণী উর্ম্মিলা বিবিধ খাদ্য সামগ্রী পূর্ণ স্বর্ণ পাত্র হস্তে লইয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

আশার শেষ।

মহারাজ মানসিংহ মহিষী ও আনুযাত্রিকগণ সহ আগরায় গমন করিয়াছেন। যুবরাজ জগৎসিংহ স্বাধীনভাবে দক্ষতার সহিত শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। যাত্রাকালে মহারাজ মানসিংহ পুত্রকে রাজকার্য্য সম্বন্ধে বিবিধ সদুপদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং আন্তরিক আশীর্ব্বাদ রাশি তাহার প্রণত শিরের উপর বর্ষণ করিয়াছেন।

মহারাণী উর্ম্মিলা গমনকালে রাজলক্ষ্মী তিলোত্তমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং মহারাজও তিলোত্তমার অভাবে অনেক কষ্ট পাইবেন বলিয়া কাতরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্বশুর ও শ্বশ্রূদিগের সন্তোষ-সাধনার্থ, মনের বাসনা অনুরূপ হইলেও, তিলোত্তমা তাহাদের সহিত গমন করিতেই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু যুবরাজ জগৎসিংহ একাকী থাকিলে নানা প্রকারে কষ্ট পাইবেন বিবেচনায়, মহারাজ ও মহারাণী আপাততঃ তিলোত্তমাকে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া অবিধেয় বলিয়া মনে করিয়াছেন। যে দিন মহারাজা ও মহারাণীরা প্রস্থান করেন, সে দিনের সে বিদায়ের দৃশ্য আমরা এস্থলে উপস্থিত করিব না। সংক্ষেপে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, রোরুদ্যমানা তিলোত্তমার প্রণামের পর আশীর্ব্বাদের সময় কঠোর-হৃদয় বীরশ্রেষ্ঠ মহারাজের গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা নিপতিত হইয়াছিল এবং মহারাণী উর্ম্মিলা বধূমাতার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া যেরূপ রোদন করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া অনেককেই সাতিশয় ব্যথিত হইতে হইয়াছিল।

একাকী জগৎসিংহের বিশেষ কষ্ট হইবে বিবেচনায়, মহারাজা অন্যতম পুত্র কুমার মহাসিংহকে পাটনায় রাখিয়া গিয়াছিলেন। মহাসিংহ একজন সুদক্ষ সেনাপতি, সাহসী যোদ্ধা, এবং যশস্বী সম্রাট কর্ম্মচারী। জগৎসিংহ অপেক্ষা মহাসিংহ বয়সে দুই বৎসরের কনিষ্ঠ।

যুবরাজ জগৎসিংহের অনেক আত্মীয় প্রস্থান করিলেন; কিন্তু তিলোত্তমার প্রায় সকল আত্মীয় পাটনায় আগমন করিলেন। বিগত দীর্ঘকাল ব্যাপী দুর্দ্দৈবের পর, যুবরাজকে দর্শন করিবার নিমিত্ত বিমলা বড়ই ব্যাকুলা হইলেন। কিন্তু সে সময় পাটনা ত্যাগ করিয়া গড় মান্দারণের দিকে গমন করা যুবরাজ জগৎ-

সিংহের পক্ষে অসম্ভব হওয়ায়, অগত্যা কন্যা-জামাতাকে দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে বিমলা পাটনায় আসিলেন। সুতরাং আসমানিও আসিল; আর আসমান আসিতেছে দেখিয়া লচমণিও পেটরা গুছাইয়া সঙ্গে লইল। কাজেই এই সকলকে সঙ্গে লইয়া অভিরাম স্বামীকে পাটনায় আসিতে হইল; সুতরাং গজপতি বিদ্যাদিগ্গজও আবার পাটনায় আসিবার লোভ ছাড়িতে পারিলেন না। এতদ্ব্যতীত অনেক দাস-দাসী লোকজন তাহাদের সঙ্গে আসিল।

বিমলা জামাতৃ-ভবনে বাস করিবেন না; সুতরাং গঙ্গাতীরে এক মনোহর অট্টালিকা তাঁহার আবাস স্থান নিরূপিত হইল। তাঁহার পুরুষ সঙ্গী সকলেই স্বতন্ত্র ভবনে অধিষ্ঠিত হইলেন। যুবরাজের অনুমতি লইয়া তিলোত্তমাও বিমাতার নিকট অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কাণ টানিলেই মাথা আইসে; যুবরাজ জগৎসিংহও স্বকীয় প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরস্থ এই আবাসে অনেক সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। বড়ই আনন্দে কাল কাটিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে এক মাস অতীত হইয়া গেল।

প্রাতে সেই ভবনের এক কক্ষে অভিরাম স্বামী ও বিমলা বসিয়া কথাবার্তা কহিতেছেন। বিমলা বলিতেছেন,—"যাহা হইবার সকলই হইয়া গিয়াছে। যে অসহনীয় দুঃখের জ্বালা এতদিন নীরবে সহিয়া আসিতেছি, তাহা আর সহ্য করিবার প্রয়োজন দেখিতেছি না। তিলোত্তমা সর্ব্বপ্রকারেই পূর্ণ সুখের অধিকারিণী হইয়াছে। মহারাজ তাহাকে পুত্রের দাসী বলিয়া স্বীকার করিবেন, এরূপ সম্ভাবনাও ছিল না। আমাদের অদৃষ্ট ক্রমে এক্ষণে তিনি তাহাকে পরম সমাদরে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার স্বামী ধনে, মানে ও পদে অতি শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছেন।"

অভিরাম স্বামী বলিলেন,—"তোমার অবিবেচনায় যাবতীয় দুর্ঘটনা ও দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে বলিয়া একদিন তোমাকে তিরস্কার করিয়াছিলাম। আজি আবার আমি তোমার বুদ্ধি ও সদ্বিবেচনার যথেষ্ট প্রশংসা করিতেছি। মহারাণী উর্ম্মিলা তোমার প্রতি চিরদিন কৃপাময়ী। তাঁহারই আশ্রয়ে তুমি জীবনের বহুদিন পরম সুখে অতিবাহিত করিয়াছ; তাঁহারই কৃপায় তোমার স্বামী, মানসিংহের রোষাগ্নি হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন এবং তাঁহারই মধ্যস্থতায় তুমি মনোমত ব্যক্তিকে পতিরূপে লাভ করিয়াছিলে। সেই মহারাণী পুরুষোত্তমে আসিয়াছেন জানিয়া তুমি যে তিলোত্তমাকে লইয়া তাঁহার শরণাগত হইয়াছিলে, ইহাতে তোমার প্রভূত সদ্বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। সেই করুণাময়ী মহারাণীর কৌশলে আজি তিলোত্তমার এই সম্ভবাতীত ভাগ্যোদয়।"

বিমলা বলিলেন;—"মহারাণী উর্ম্মিলা দেবীর চরণে আমি বার বার প্রণাম করিতেছি। ভগবান্ তাঁহাকে সকল সুখের অধিকারিণী করুন। এক্ষণে মহারাণীর দয়ায় আমাদের বাঞ্ছনীয় সকল ফলই লাভ করা হইয়াছে। অতঃপর পিতঃ আমি আর সংসারে থাকি কেন?"

অভিরাম স্বামী জিজ্ঞাসিলেন,—"কি করিবে মনস্থ করিতেছ?"

বিমলা বলিলেন,—"যাঁহার জন্য এ জীবন, তিনি যখন এ জগতে আর নাই, তখন আমি আর এ জীবন রাখিব কেন?"

অভিরাম স্বামী বলিলেন,—"জীবন ত্যাগ করায় পাপ যথেষ্ট, ইষ্ট কিছুই নাই। বৎসে,

আমার উপদেশ গ্রহণ কর—তুমি জীবন্মুক্তা হও; তাহাতে সকলই শুভ ও আনন্দময় হইবে। সমস্ত বাসনা বর্জ্জন করিয়া তুমি অতঃপর পূর্ণানন্দের অধিকারিণী হইতে অভ্যাস কর, ইহাই আমার পরামর্শ।”

বিমলা বলিলেন,—“আপনার উপদেশ আমার শিরোধার্য্য। কিন্তু পিতঃ, এ বিষম হৃদয়-জ্বালার নিবৃত্তি আর কিছুতেই আছে কি?”

অভিরাম স্বামী বলিলেন,—“আছে বই কি। সুখ-দুঃখে সমজ্ঞান হইলেই সকল যন্ত্রণার শেষ হইবে।”

বিমলা বলিলেন,—“সে জ্ঞান হয় কই? বুঝিতেছি, সেরূপ বোধ হইলেই কষ্টের সমাপ্তি হইতে পারে বটে; কিন্তু সে জ্ঞানলাভের উপায় কোথায়?”

অভিরাম বলিলেন,—“মা, তাহা উপদেশ ও সাধনা সাপেক্ষ। আমি যে যে কারণে এত দিন এখানে বদ্ধ ছিলাম, তাহার শেষ হইয়া গিয়াছে। আমি তোমাকে অতঃপর এই সাধনা বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়া বিদায় গ্রহণ করিব। বোধ হয় আমাদের আর পাটনায় থাকিবার প্রয়োজন নাই। প্রায় একমাসকাল কন্যা-জামাতা লইয়া তুমি আনন্দ করিয়াছ; বোধ হয় এই সুদীর্ঘ লৌকিক আনন্দে তুমি বুঝিয়া থাকিবে যে, এরূপ আনন্দেও সুখ নাই। আর এ বৃথা নিরানন্দময় আনন্দে কাজ কি মা? এক্ষণে অক্ষয়, অনন্ত আনন্দের পথ আমি তোমাকে দেখাইয়া দিবার চেষ্টা করিব। অধুনা এ স্থান হইতে বিদায় হইবার ব্যবস্থা করিলে হয় না?”

বিমলা বলিলেন,—“যে আজ্ঞা, অদ্যই তাহার ব্যবস্থা করিব। প্রথমে তিলোত্তমার নিকট, তাহার পর রাজপুত্রের নিকট এ কথা অদ্যই উত্থাপন করিব। রাজপুত্র এখনই এ বাটী হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের আশা নাই। ততক্ষণ তিলোত্তমার সহিত কথা শেষ করিয়া রাখিব।”

যখন বিমলা ও অভিরাম স্বামী ভবন-মধ্যে এই সকল কথা কহিতেছিলেন, তখন ভবনের বাহিরে এক কৌতুকাবহ দৃশ্যের অভিনয় হইতেছিল। গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ ভবনের তোরণ পার্শ্বস্থিত এক বৃক্ষানিমে লচমণির পা ধরিয়া কাঁদিতেছিলেন। কেমন করিয়া কি হইল বুঝাইবার জন্য একটু পূর্ব্ব কথা কহিতে হইবে।

গজপতি বড়ই মর্ম্মপীড়া পাইয়াছেন। তিনি জানিতেন, “যাহার গোড়ায় ‘আ’ শেষে ‘নি’, তিনিই আমার প্রণয়িনী।” ইহা জ্যোতিষের বচন এবং তাঁহার ললাট-লিপি; সুতরাং এ কথা মিথ্যা হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। অভিরাম স্বামীর নিকট বিমলার পত্র লইয়া গজপতি আর একবার পাটনায় আসিয়াছিলেন, এ কথা পাঠকদিগের স্মরণ থাকিতে পারে। সেই সময় মথুরাসিংহের দলভুক্ত পূর্ব্বপরিচিত সেই রহস্যপ্রিয় জ্যোতির্ব্বিদ্ সৈনিকের সহিত গজপতির দৈবাৎ সাক্ষাৎ হয়। গজপতি তাহাকে চিনিতে না পারিলেও, সেই সৈনিক সহজেই গজপতিকে চিনিয়া ফেলে। বিশেষ আমোদ হইবে মনে করিয়া, সৈনিক আর একজন সৈন্যকে আপনার গুরু খাড়া করিয়া গজপতিকে তাঁহার নিকট লইয়া যায়। গুরুদেব গজপতির কপাল দেখিয়া বলেন যে, তথায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে, “যার গোড়ায় ‘আ’ শেষে ‘নি’, সেই তোমার প্রণয়িনী।” এরূপ ললাট-লিপি যখন নিঃসন্দেহ, তখন গজপতির বড়ই জোর বাড়িয়া গেল। কিন্তু হইলে কি হয়, ঘটনা বড়ই প্রতিকূল হইতে লাগিল।

অভিরাম স্বামী কথাচ্ছলে গজপতির সহিত রঙ্গরস উপলক্ষে বিমলাকে বিশেষ ভৎর্সনা করিয়াছিলেন। আসমানিও তখন সেখানে উপস্থিত ছিল। সেই ঘটনার পর হইতে বিমলা ও আসমানি এ সম্বন্ধে বড়ই সাবধান হইয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আসমানি আর গজপতির সম্মুখে আইসে না, আসিলেও কোন কথা কহে না; সাবধানে অন্তদিকে সরিয়া পড়ে। চন্দ্র সূর্য্য যে শাস্ত্রের সাক্ষী সে শাস্ত্রও কি তবে মিথ্যা?

গজপতি স্থির করিয়াছেন, আসমানির এই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে তাঁহার অধিকার আছে। সমস্ত মুলুকের যিনি সর্ব্বময় কর্ত্তা, সেই যুবরাজ জগৎসিংহের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় আছে; সুতরাং তাঁহারই নিকট নালিশ করা আবশ্যক। জগৎসিংহ যে সময়ে গঙ্গাতীরস্থ ভবনে আগমন করেন, গজপতিও সে সময়ে আসিয়া তোরণ-পার্শ্বে অপেক্ষা করেন। যুবরাজের আগম ও নির্গম তিনি দেখিতে পান, কিন্তু কোন কথা বলিতে—রাজপুত্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেও তাঁহার সাহস হয় না। রাজপুত্রের সঙ্গে খোলা তলোয়ার লইয়া সম্মুখে ও পশ্চাতে যে সকল রক্ষী থাকে তাহাদিগকে দেখিয়া, গজপতির হাত-পা পেটের মধ্যে প্রবেশ করে; সুতরাং মাথা বাঁচাইবার ভাবনায় নালিশের ভাবনা উড়িয়া যায়।

এইরূপ সময়ে একদিন তিনি লচমণির চক্ষুতে পড়িয়া গেলেন। যুবরাজ আসিতেছেন দেখিয়া দিগ্গজ একটা গাছের আড়ালে লুকাইয়াছিলেন। রাজপুত্র ভবন হইতে নিক্রান্ত হওয়ার পর, দিগ্গজ প্রচ্ছন্ন স্থল হইতে নিক্রান্ত হইলেন। তৎক্ষণাৎ অন্যদিক হইতে লচমণি আসিয়া তাঁহার হাত ধরিল। গজপতির সহিত এরূপ আমোদ যে অভিরাম স্বামীর বিরাগজনক ইহা লচমণি জানিত না; সুতরাং এ সম্বন্ধে সাবধান হইবার কোন প্রয়োজনীয়তা সে অনুভব করে নাই। এক্ষণে সহসা গজপতির সাক্ষাৎ পাইয়া একটু আমোদ করিবার লোভ সে সংবরণ করিতে পারিল না। মুখভার করিয়া, একটু রাগের ভাব দেখাইয়া সে গজপতির হাত ধরিয়া ফেলিল।

দিগ্গজের আর পূর্ব্ব বেশ নাই। এখন সে ধুতি পরিয়া গায়ের উপর নামাবলী দিয়াছে, গলায় তুলসীর মালা পরিয়াছে, ললাটে ও নাসাগ্রে তিলক ধারণ করিয়াছে। এই বিশুদ্ধ বেশবান্ নাগরের হাত ধরিয়া লচমণি বলিল,—"তবে হে চোর! অনেক সন্ধানে তোমাকে আবার আমি ধরিয়া ফেলিয়াছি।"

হঠাৎ লচমণির সাক্ষাৎ পাইয়াও গজপতি সুখী হইল। মনে করিল "ধূমাৎ বহ্নিঃ"; যখন লচমণি রূপ মেঘ দেখা দিয়াছে, তখন আসমানি রূপ বৃষ্টিও ঝরিতে পারে। সেবারেও এইরূপ ঘটিয়াছিল। লচমণি তাহার তৃষ্ণার মেঘ—জল নহে; আগত প্রায় গাড়ির আওয়াজ—গাড়ি নহে; শ্রীরাধিকার শ্রীচরণের নূপুর ধ্বনি—শ্রীরাধিকা নহে; দূরবর্ত্তী সুরভি কুসুমের গন্ধ—কুসুম নহে; আগমনশীল নরপতির সমৃদ্ধি-জনিত ধূলা—নরপতি নহে; সুতরাং লচমণিকে দেখিয়া, পূর্ণানন্দ না হইলেও, গজপতির অনেক ভরসা হইল, যথেষ্ট আনন্দ হইল। বলিল,—"তুমি—লচমণি—তুমি! তা তোমার আসমানি কোথায়?"

লচমণি বলিল,—"আসমানি কোথায়, তাহা আমি কি জানি? কেন, আমাকে তোমার মনে ধরে না? যদি এমন করিয়া

পায়ে ঠেলিবে মনে ছিল; তবে আমাকে মজাইলে কেন? আমি যে তোমার জন্ম পাগল হইয়া বেড়াইতেছি, এ কথা কি তোমার একবারও মনে হয় না?"

দিগ্‌গজ বলিল,—"খুব মনে হয়। আমিও তোমার জন্ম প্রায় পাগল। তবে কথা কি জান, আসমানিকে আমার একটু বিশেষ দরকার আছে। তাহার সহিত অনেক দিনের প্রণয়। তাহাকে হঠাৎ একেবারে ছাড়িয়া দিতে পারা যায় না। তুমি একবার দয়া করিয়া তাহাকে ডাকিয়া দিতে পার?"

লচমণি বলিল,—"আমার কি দায় পড়িয়াছে। আপনার শত্রুকে কে কোথায় ডাকিয়া দুধের বাটী খাইতে দেয়? আমি তাহাকে কখনই ডাকিব না। আমি তোমাকে এবার আর ছাড়িব না। তুমি এখন আমার হইয়া থাকিবে কি না বল

দিগ্‌গজ বলিল,—"নিশ্চয় থাকিব। সুন্দরি, আসমানির সহিত একেবারে ছাড়াছাড়ি করিয়া, তোমার হইয়া থাকিবার আগে একবার তাহার নিকট শেষ বিদায় লওয়া উচিত নয় কি? দোহাই তোমার। তুমি তাহার উপায় করিয়া দেও।"

লচমণি বলিল,—"কখন না। আমি তোমাকে আসমানির সহিত একটা কথা কহিতেও দিব না; দূরে দাঁড়াইয়া একবার তাহাকে দেখিতেও দিব না। আসমানকে কখন যদি তোমার কাছে দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমি দুজনকেই ঝাটা পেটা করিব।"

বিষম সমস্যা। দিগ্‌গজ অনেকক্ষণ চিন্তার পর বলিল,—"তবে কি আসমানির সহিত এ জন্মে আমাকে আর একবারও সাক্ষাৎ করিতে দিবে না?"

লচমণি বলিল,—"কখন না।"

তখন গজপতি কাঁদিতে কাঁদিতে লচমণির চরণ ধারণ করিয়া বলিল,—"সুন্দরি! তাহা হইলে আমি মরিয়া যাইব। আমাকে মারিয়া ফেলিলে তোমার কি লাভ হইবে?"

লচমণি অতি কষ্টে হাস্য সংবরণ করিয়া বলিল,—"তুমি মরিয়া যাও, সেও ভাল; তোমাকে যমের বাড়ী পাঠাইতে পারিব, তবু আসমানির হইতে দিব না।"

যখন দিগ্‌গজ কাতরভাবে লচমণির চরণতলে রোরুদ্যমান, তখন অভিরাম স্বামী তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র লচমণি বেগে পলায়ন করিল। পলায়নের ইচ্ছা ও ক্ষমতা থাকিলেও, দিগ্‌গজ পলাইতে পারিলেন না। তিনি অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অভিরাম বলিলেন,—"মূর্খ! এই স্ত্রীলোকেরা তোমাকে লইয়া তামাসা করে, এ সামান্ত কথাটা বুঝিবার মত বুদ্ধিও কি তোমার নাই? আমি শুনিয়াছি, কোন ব্যক্তি তোমাকে বুঝাইয়াছে, তোমার কপালে এই প্রণয়ের কথা লিখিত আছে। মিথ্যা কথা! আমি জ্যোতিষের সকল অংশই রীতিমত আলোচনা করিয়াছি। তোমার ললাটে এরূপ কোন কথাই লিখিত নাই, ইহা আমি বিশেষ জানি। যদি আমার অনুগ্রহ তোমার প্রার্থনীয় হয়, তাহা হইলে অতঃপর এই সকল কুৎসিত ব্যবহার তোমাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। এক্ষণে আমার সঙ্গে আইস।"

অগত্যা গজপতি অধোমুখে গুরুর অনুসরণ করিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অশান্তি।

জগৎসিংহের শাসনকালের প্রারম্ভে এই সুবিশাল প্রদেশে কোনই অশান্তি পরিদৃষ্ট হইল না। সর্ব্বত্র প্রকৃতিপুঞ্জ নিরুপদ্রব ও নিশ্চিন্ত ভাবে কালপাত করিতে থাকিল। বিভিন্ন প্রদেশত্রয়ের কুত্রাপি অসন্তোষ রহিল না। কোথাও বিদ্রোহ-বহ্নি প্রধূমিত হইতেছে বলিয়া কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। স্বাধীনভাবে প্রেমময়ী পত্নীর সঙ্গসুখে ও নবার্জ্জিত পদ-প্রতিষ্ঠার গৌরব ভোগ করিতে করিতে যুবরাজ জগৎসিংহ পরমানন্দে কাল কাটাইতে থাকিলেন।

কিন্তু বোধ হয় এ সংসারে চিরানন্দের ব্যবস্থা নাই। যেখানে আনন্দের কুসুম ফুটিয়া উঠে, সেখানেই দুষ্ট নিরানন্দ কীট অলক্ষিত ভাবে আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে এবং শোভা ও সৌন্দর্য্য বিকৃত ও বিরূপ করিয়া দেয়। সহসা উড়িষ্যা হইতে রাজা রামচন্দ্র দেব সংবাদ পাঠাইলেন, নবাব ওসমান খাঁ বহু সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন, এবং যুদ্ধের অন্যান্য আয়োজনও যথেষ্ট চালাইতেছেন। বোধ হয় শীঘ্রই উড়িষ্যায় বিষম অশান্তির উদয় হইবে।

এই সংবাদ নবীন সুবেদারকে নিতান্ত বিচলিত করিল। কুমার মহাসিংহের সহিত তিনি এতদ্বিষয়ক পরামর্শ স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধের নিমিত্ত সকল ব্যবস্থা স্থির রাখিয়া সতত প্রস্তুত থাকাই আবশ্যক বলিয়া উভয় ভ্রাতা মনে করিলেন। মোগল পক্ষে প্রভূত আয়োজন আরম্ভ হইল।

অচিরে পুনরায় সংবাদ আসিল, উড়িষ্যার পাঠানগণ নবাব ওসমান খাঁর কর্ত্তৃত্বাধীনে চালিত হইয়া, বিষম ব্যাপার ঘটাইয়াছেন। পুরী পুনরাক্রান্ত ও পাঠানগণের অধিকৃত হইয়াছে। রাজা রামচন্দ্র দুর্গান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু আশঙ্কা হইতেছে যে, সে দুর্গও অবিলম্বে আক্রান্ত হইবে।

পাঠানদিগকে দমন করিবার অভিপ্রায়ে কুমার মহাসিংহ প্রভূত আয়োজন সহকারে উড়িষ্যায় যাত্রা করিলেন। ভদ্রকের সন্নিহিত প্রদেশে বিপক্ষগণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল এবং তথায় তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নবাব ওসমান স্বয়ং সৈন্য চালনা করিলেন এবং উৎসাহ সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধে বিজয় লক্ষ্মী ওসমানকে আশ্রয় করিলেন। মোগলপক্ষের অতি লজ্জাজনক পরাজয় হইল। মহাসিংহের বিস্তর সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হইল; যাহারা জীবিত থাকিল, তাহারাও প্রাণের ভয়ে পলায়ন করিল। স্বয়ং মহাসিংহকেও শেষে রণক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিতে হইল।

বিজয়ী পাঠানগণ সমস্ত উড়িষ্যা অধিকার করিলেন। কিন্তু অদম্য উৎসাহশীল ও নববলে বলীয়ান্ ওসমান কেবল উড়িষ্যায় আধিপত্য অর্জ্জন করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। বঙ্গদেশের অভিমুখেও তিনি সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মহাসিংহ নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়াও তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিলেন না।

যুবরাজ জগৎসিংহও সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। তখন পাঠানগণ বঙ্গদেশের ভূরিভাগ অধিকার করিয়াছেন। অতি অল্পকালের মধ্যে সমগ্র মেদিনীপুর, সমগ্র মল্লভূমি, সমগ্র কোলহান এবং এবং বীরভূম, বাঁকুড়া ও বর্দ্ধ-

মানের বহু অংশ পাঠানগণের করতলগত হইল। প্রত্যেক যুদ্ধেই ওসমানের জয় হইতে লাগিল। তাঁহার সাহস ও ক্ষমতা দেখিয়া শত্রু-পক্ষীয়েরাও মুগ্ধ হইতে লাগিল। তাঁহার বাহুতে যেন অনৈসর্গিক শক্তি, তাঁহার হৃদয়ে যেন অনন্ত উদ্যম, বিজয়-শ্রী যেন তাহার নিত্য-সঙ্গিনী। সকলেই বুঝিল, উড়িষ্যার অধিকার মোগলদিগের হস্তভ্রষ্ট হইয়াছে, বুঝি বা বাঙ্গালা বিহারও অচিরে নবাব ওসমানের অধীনতা পাশে বদ্ধ হইবার নিমিত্ত অবনত শিরে অপেক্ষা করিতেছে।

ওসমানের এই জয়োল্লাসে আয়েষার আনন্দের সীমা রহিল না। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হইলেও তিনি এই সমর ব্যাপারের প্রধান নায়িকা ছিলেন। অনেক যুদ্ধে তিনি আপনার দাস দাসী সঙ্গে লইয়া ওসমানের অনুগমন করিতেন। অনেক যুদ্ধে রণ-বিরতিকালে ওসমান আয়েষার শিবিরে আসিয়া তাহার সহিত পরামর্শ করিতেন। আয়েষার মন্ত্রণা ও বুদ্ধি-কৌশলে অতি সহজেই ওসমান জয়লাভ করিতে লাগিলেন। আয়েষার রোগ-মুক্তির পর ওসমান তাঁহার নিকট ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে সম্পূর্ণ সফল হইল। ওসমানের উৎসাহ অপরিসীম। জগৎসিংহ আসিয়াও ওসমানের জয়-শ্রীর অনুমাত্র অপচয় করিতে পারিলেন না। অবশেষে জগৎসিংহ সম্মুখ যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া কৌশলে ওসমানকে বিনাশ করিবার উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অচিরে সুযোগ উপস্থিত হইল।

ওসমান বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন, বর্দ্ধমান জয় করিতে পারিলেই বাঙ্গালার আধিপত্য সম্পূর্ণরূপে তাঁহার করতলগত হইবে। এই অভিপ্রায়ে তিনি প্রথমে গড় মান্দারণ আক্রমণ করিবার ইচ্ছা করিলেন। গড় মান্দারণ পাঠানদিগের হস্তগত হইলে এবং তথায় সৈন্যাদি সমাবেশ করিতে পারিলে, বর্দ্ধমান জয় করার কোনই অসুবিধা থাকিবে না! এইরূপ অভিপ্রায় স্থির করিয়া নবাব ওসমান একদল উৎকৃষ্ট যোদ্ধা গড় মান্দারণের অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। জগৎসিংহ তখন বর্দ্ধমানে ছিলেন, এ সংবাদ ওসমানের অবিদিত ছিল না। সে স্থান হইতে কখন একবার শ্বশুরালয়ে আগমন করাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে। এইরূপ অনুমান করিয়া নবাব সৈন্যদিগকে গড়মান্দারণ সন্নিহিত অরণ্যাদি প্রচ্ছন্ন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া অবস্থান করিতে উপদেশ দিলেন। তাহারা সহসা কোন যুদ্ধাদি না করিয়া জগৎ-সিংহ সে দিকে আইসেন কি না, লক্ষ্য রাখিবে। যদি সুযোগ হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে সজীব অবস্থায় বন্দী করিতে হইবে এবং তাহা সম্ভব না হইলে, তাঁহাকে বধ করিতে হইবে। তাহার পর সমুচিত সময়ে ওসমান স্বয়ং আসিয়া স্বর্গীয় বীরেন্দ্রসিংহের দুর্গ আক্রমণ ও যুদ্ধের ব্যবস্থা করিবেন।

পাঠানসৈন্যগণ উপদেশ অনুসারে গড় মান্দারণ সন্নিহিত প্রদেশে জগৎসিংহকে লুক্কায়িত ভাবে আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে অবস্থিতি করিতে লাগিল। জগৎসিংহ কিন্তু একবারও গড় মান্দারণের দিকে আসিলেন না। তিনি বর্দ্ধমান হইতে অল্প সংখ্যক নির্ব্বাচিত সৈন্য সঙ্গে লইয়া, উড়িষ্যার অভি-মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রকাশ্য রাজপথ তিনি অবলম্বন করিলেন না। সঙ্কীর্ণ স্বল্প-ব্যবহৃত পথ ধরিয়া, সহসা ওসমানকে আক্রমণ করাই তাহার অভিপ্রায়। নবাব

ওসমানও সহসা জগৎসিংহকে আক্রমণ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। উভয় যোদ্ধাই প্রায় সমান বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া চলিতে লাগিলেন। উভয় বীরই প্রায় সমসময়ে স্বল্প মাত্র নির্ব্বাচিত সৈন্য সঙ্গে লইয়া প্রচ্ছন্নভাবে যাত্রা করিলেন।

সুবর্ণরেখা নদীতীরে জগৎসিংহ সংবাদ পাইলেন, ওসমানের সম্প্রদায় অদূরে শিবির স্থাপন করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। ওসমানকে আক্রমণ করিবার ইহাই সমুচিত সুযোগ বলিয়া যুবরাজ মনে করিলেন। তদর্থে প্রস্তুত হইয়া তিনি ধাবিত হইবেন, এমন সময় ওসমান, শত্রুর অভিপ্রায় অনুভব করিতে পারিয়া, যুদ্ধবিরতি-সূচক পতাকা হস্তে দিয়া এক দূতকে জগৎসিংহের নিকট প্রেরণ করিলেন।

যুবরাজের সম্মুখাগত হইয়া দূত সসম্মান নিবেদন করিল,—"অস্তকার যুদ্ধে বোধ হয় উভয় পক্ষের একই লক্ষ্য। নবাবকে নিপাত করাই বোধ হয় যুবরাজের বাসনা এবং যুবরাজকে বিনাশ করাই বোধ হয় নবাবের অভিপ্রায়। এরূপ খণ্ড যুদ্ধের অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকা সম্ভব নহে। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে অকারণ সঙ্গে সঙ্গে আর কতকগুলি নরহত্যা না ঘটাইয়া, নবাব ও যুবরাজ দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিলেই সহজে এক পক্ষের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। এ সম্বন্ধে যুবরাজের কি অভিপ্রায়?"

যুবরাজ যুদ্ধোত্তম নিরস্ত করিতে আদেশ করিয়া বলিলেন,—"আমি এ প্রস্তাবে অসম্মত নহি। তুমি নবাবকে বলিবে, আমি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া আছি। নবাবের যদি বিলম্ব থাকে, তাহা হইলে আমি সংবাদ প্রাপ্তির প্রার্থনা করি।"

দূত অভিবাদন করিয়া বিদায় হইল। জগৎসিংহ ও তাঁহার অনুচরগণ দূর হইতে দেখিতে পাইলেন, ওসমানের শিবিরে দূত প্রবেশ করিল। অবিলম্বে শিবির হইতে সশস্ত্র ওসমান নির্গত হইয়া জগৎসিংহের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নিকটেই যুবরাজের অশ্ব সজ্জিত ছিল; কিন্তু ওসমান পদব্রজে আগমন করিতেছেন দেখিয়া, জগৎসিংহ অশ্বারোহণ করিলেন না। তিনিও সমুৎসাহে ওসমানের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

উভয় বীর নিকটস্থ হইলে, জগৎসিংহ বলিলেন,—"আপনার সহিত সেই দেখা আর এই দেখা। ভরসা করি, এই সাক্ষাৎই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ হইবে। কারণ অস্ত এ স্থান হইতে একজন মাত্রই ফিরিবার সম্ভাবনা।"

ওসমান কহিলেন,—"আপনার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধেই আমার শেষ সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এবারও আবার আমরা দ্বন্দ্বযুদ্ধে মিলিত হইয়াছি। আপনি আমার পরম শত্রু। আমি স্বহস্তে শত্রু নিপাত করিবার বাসনায় দ্বন্দ্বযুদ্ধের আয়োজন করিয়াছি। ভরসা করি এবার আমার বাসনা সিদ্ধ হইবে।"

জগৎসিংহ বলিলেন,—"আমরা বৃথা বাক্য ব্যয় করিবার নিমিত্ত এ স্থানে মিলিত হই নাই। আপনি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হউন।"

ওসমান সগর্ব্বে বলিলেন,—"আমি প্রস্তুত; আপনি জীবন রক্ষার উপায় করুন।"

তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। দূরে থাকিয়া উভয়পক্ষীয় বীরেরা চিন্তাকুল ভাবে এই ভয়ানক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল। উভয়েরই নিপুণতা ও ক্ষিপ্রকারিতা দেখিয়া দর্শকগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইতে লাগিল। সহসা ওসমানের অসি রাজপুত্রের অসিঘাতেচূর্ণ হইয়া গেল

ওসমান তৎক্ষণাৎ বর্ষা লইয়া রাজপুত্রকে বিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জগৎসিংহও অসি ত্যাগ করিয়া বর্ষা গ্রহণ করিলেন।

ওসমানের পরিত্যক্ত বর্ষা যুবরাজের গ্রীবাদেশের কিঞ্চিৎ ত্বক্ ছিন্ন করিয়া দূরে চলিয়া গেল। আশ্চর্য্য শিক্ষা-কৌশলে ওসমান নক্ষত্রবেগে ঘুরিয়া গিয়া সেই বর্ষা উঠাইয়া লইলেন। রাজপুত্রের পরিত্যক্ত বর্ষা ওসমানের মস্তকে লাগিল। উষ্ণীষ উড়িয়া গেল, কিন্তু মস্তকে বিশেষ আঘাত লাগিল না। বিচিত্র দক্ষতা সহকারে জগৎসিংহ পুনরায় বর্ষা গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তিনি তাহা ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই ওসমানের হস্ত-ত্যক্ত বর্ষা আসিয়া তাঁহার ঢালে লাগিল। জগৎসিংহ সেই বর্ষা ওসমানকে পুনর্গ্রহণ করিবার সুযোগ দিলেন না। তিনি তাহা স্বয়ং গ্রহণ করিলেন এবং ওসমানের মস্তক লক্ষ্য করিয়া প্রচণ্ড বেগে তাহা পরিত্যাগ করিলেন। বর্ষা ওসমানের মস্তকে লাগিল। অস্থি ভিন্ন হইল না বটে, কিন্তু চর্ম্ম ছিন্ন হইল এবং মস্তিষ্কে গুরুতর আঘাত লাগিল। কিয়ৎকাল ওসমান চতুর্দ্দিকে ধূমাকার দেখিতে লাগিলেন এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

জগৎসিংহ এই সুযোগে একটু দূরে সরিয়া আসিলেন এবং ওসমানের বক্ষ লক্ষ্য করিয়া অতিশয় শক্তি সহকারে বর্ষা প্রক্ষেপ করিলেন। ওসমান তৎকালে কোনরূপ আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিতে অশক্ত। সুতরাং পার্শ্বস্থ দর্শকগণ বুঝিল রাজপুত্র-পরিত্যক্ত বর্ষাঘাতে এবার নিশ্চয়ই নবাবকে গতাসু হইতে হইবে। জগৎসিংহ বিপুল শক্তি সহকারে বর্ষা প্রক্ষেপ করিলেন। তৎক্ষণাৎ যেন ভূ-পৃষ্ঠ বিদার করিয়া সেই ক্ষেত্রে এক সুন্দরীর আবির্ভাব হইল। সুন্দরী চিন্তার ন্যায় সূক্ষ্মগামিনী হইয়া যেন নিমিষ মধ্যে সেই নিক্ষিপ্ত বর্ষা ও ওসমানের মধ্যবর্ত্তী হইলেন। সকলের বদন হইতেই অজ্ঞাতসারে যন্ত্রণা ব্যঞ্জক 'উহু' শব্দ বাহির হইয়া পড়িল। ওসমানের ক্ষণিক অবসন্নতা তখন অপগত হইয়াছে। জগৎসিংহ শিহরিয়া উঠিলেন এবং আর্ত্তভাবে উভয় হস্ত ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিলেন। তাঁহার হস্তত্যক্ত বর্ষা তখন সুন্দরীর পৃষ্ঠদেশ ভেদ করিয়া দেহ বিদ্ধ করিয়া ফেলিল। তৎক্ষণাৎ সেই সুন্দরী ওসমানের বক্ষের উপর পড়িয়া মুক্তকণ্ঠে বলিলেন,—"ওসমান, গুণময় ভাই, আমি এ জীবনে তোমার অশেষ যন্ত্রণার হেতু হইয়াছি; প্রার্থনা করি, জন্মান্তরে যেন আমাকে তোমার ক্লেশের কারণ না হইতে হয়।"

সেই সুন্দরী আয়েষা। তখন যুদ্ধ-বিগ্রহ কাহারও মনে থাকিল না। ওসমান সেই সুন্দরীকে বক্ষে ধারণ করিয়া বর্ষা নিষ্কাশন করিলেন। জগৎসিংহ কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন,—"হায়! আমার বর্ষায় বিদ্ধ হইয়া আজি জগতের সাররত্ন—আমার পরম হিতৈষিণী দেবী মহাপ্রস্থান করিতেছেন। কেন নবাবের অস্ত্রাঘাতে পূর্ব্বেই আমার এ অকৃতজ্ঞ প্রাণ বিনষ্ট হয় নাই?"

আয়েষা বলিলেন,—"রাজপুত্র, নিকটে আসুন। ওসমান প্রেমময় ভাই, আমার আর সময় নাই। বলিবার বিশেষ কোন কথাও নাই। রাজপুত্র ইচ্ছা পূর্ব্বক আমার দেহে অস্ত্রাঘাত করেন নাই; সুতরাং এজন্য তাঁহাকে দোষী করিও না। অদৃষ্টের বশে আমি চিত্তের উপর প্রভুত্ব হারাইয়া নিজে আজীবন দুঃখ পাইলাম, তোমাকেও দুঃখের

সাগরে ভাসাইলাম। অভিন্নহৃদয় ভ্রাতঃ, তুমি প্রেমময়; তোমার প্রেমের কণিকা পাইলেও লোক ধন্য হয়। বোধ করি স্বর্গেও এমন প্রেম নাই। আশীর্ব্বাদ কর, যেন জন্মান্তরে তোমার এই অলৌকিক প্রেম ভোগের অধিকারে আমি বঞ্চিত না হই।"

শিবিরের হকিম তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আয়েষা বলিলেন,—"হকিমের কোন প্রয়োজন নাই। এ আঘাতের কোন প্রতিকার নাই। রাজপুত্র, আমি আপনাকে বড় ভাল বাসিয়াছিলাম; কোন প্রতিদানের আশা না করিয়াই আমার প্রাণের সকল ভালবাসা আপনার চরণে অর্পণ করিয়াছিলাম। যাহা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা ফিরাইয়া লইতে আমার সাধ্য ছিল না। আর এক দিকে আমার নিমিত্ত যে অগাধ ভালবাসার সমুদ্র পড়িয়া ছিল, তাহা আমি দেখিয়াও দেখি নাই। সেই অবিবেচনায়, সেই অন্ধতায়, আমি সংসারে অনেকের হৃদয় শোকে আচ্ছন্ন করিয়া আজি চিরবিদায় গ্রহণ করিতেছি। রাজপুত্র, আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনার সহিত জীবনে আর সাক্ষাৎ হইবে না জানিতাম। কিন্তু আমার জীবনের জীবন ওসমানের বক্ষে বর্শা বিদ্ধ হইবে আশঙ্কায়, আজি আমাকে দেখা দিতে হইল। আয়েষার জন্য দুঃখ করিবেন না। আয়েষা অভাগিনী। তাহার জীবন শীঘ্র যাইলেই পরম মঙ্গল।"

জগৎসিংহ বলিলেন,—"যাহার নিকট জীবন অসংখ্য উপকারে বদ্ধ, যাহার তুলনা এ সংসারে নাই, যাহার নিকট কৃতজ্ঞতা কখনই শেষ হইবার নহে, আজি আমার হস্তে সেই আয়েষার প্রাণান্ত হইতেছে, এ অসহনীয় দুঃখ অতঃপর আমার চিরদিনের সঙ্গী"

আয়েষা বলিলেন,—"যুবরাজ, ভুলিয়া যান, আয়েষার বিষাদময় জীবনের সকল কথা ভুলিয়া যান। তিলোত্তমা ভগ্নীকে এ অভাগিনীর কথা আর বলিয়া কাজ নাই। আমাকে চিরদিনের নিমিত্ত বিদায় দেন।"

রাজপুত্র অধোমুখে রোদন করিতে লাগিলেন। আয়েষার ক্ষতমুখ হইতে প্রবলবেগে রুধিরপাত হইতে লাগিল। তাঁহার কণ্ঠস্বর বড়ই সংক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল তিনি কষ্টে বলিতে লাগিলেন,— "ওসমান—প্রেমময়— তোমার মুখ আর ভাল দেখিতে পাইতেছি না। বুঝি আর বিলম্ব নাই। জীবনে তোমাকে অশেষ কষ্ট দিয়াছি। এইবার তোমাকে চরম কষ্ট দিয়া প্রস্থান করিতেছি। ওসমান, ভাই, এই অন্তিম সময়ে আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাকে চির বিদায় দেও।"

ওসমানের চক্ষুতে জল নাই, মুখে শব্দ নাই, হৃদয়ে দীর্ঘশ্বাস নাই। সেই যোদ্ধৃ-সজ্জায় সজ্জিত বীর যেন পাষাণ-পুত্তলীর ন্যায় নিশ্চল ভাবে উপবিষ্ট। তাহার অঙ্কে সেই শোণিত-নিষিক্তা মরণ-কবলিতা ভুবনমোহিনী

জগৎসিংহ কাতরভাবে বলেন,—নবাব সাহেব! নবাব-নন্দিনী আপনার নিকট বিদায় চাহিতেছেন।"

ওসমানের সংজ্ঞা হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"প্রাণেশ্বরি, তুমি বিদায় চাহিতেছ? যাহাকে এক মুহূর্ত্ত না দেখিলে আমি বিশ্ব অন্ধকার দেখিতাম, যাহার প্রসন্নতা লক্ষ্য করিয়া জীবনের সকল কর্ম্ম সম্পাদন করিতাম, তাহাকে বিদায়! জীবন-সঙ্গিনী, কিছু অগ্রে যাইতে বাসনা করিয়াছ? যাও। তোমার ওসমান শীঘ্রই তোমার অনুসরণ করিবে।"

আয়েষা বলিলেন,—"কথা কহিতে পারি না—কথা শেষ হইয়াছে। আমার মা—আমা

দুঃখিনী মাকে শান্ত করিও ওসমান। তুমি আমার প্রতি চিরকরুণাময় জানিয়া তোমার কোলে মৃত্যু—বড় সুখ। ওসমান! কি শোভা! তোমাতে আমাতে—স্বর্ণরথে—বিমানে—ভাই-ভগ্নী—কি মধুর—আহা! যাই—ওসমান—”

আর কথা আয়েষার মুখ হইতে বাহির হইল না। সকলেই দেখিল, সেই সমুজ্জ্বল বর্ত্তিকা সহসা নিবিয়া গেল। সকলেই বুঝিল, সেই শোভার ফুল অকালে ঝরিয়া পড়িল।

(শেষ)

অতি রমণীয় প্রদেশে এক নিভৃত স্থানে আয়েষার বরবপু সমাধিস্থ করা হইল। অনেকে দেখিতে পাইত, এক বিষাদাচ্ছন্ন পুরুষ প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে সেই সমাধি-সন্নিধানে আসিয়া এবং কবরের উপর মস্তক স্থাপন করিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেন। সেই পুরুষ ওসমান।

এই দুর্ঘটনার পর, উৎসাহ ও উদ্যম ওসমানকে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিল। যে বলে ওসমান বলীয়ান্ ছিলেন, তাহা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে; আরও দুই একটী যুদ্ধ হইল বটে, কিন্তু সকল যুদ্ধেই ওসমান সহজেই পরাজিত হইলেন। পাঠানদিগের সমস্ত অধিকারই মোগলদিগের হস্তগত হইল। ওসমান সে জন্য একটী দীর্ঘনিশ্বাসও ত্যাগ করিলেন না। উড়িষ্যায় পাঠান আধিপত্যের সমাপ্তি হইল। সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে পাঠান-প্রাধান্য নির্ম্মূল হইয়া গেল।

ওসমানের জীবনান্ত হইলে, তাঁহার বাসনানুসারে, আয়েষার সমাধিপার্শ্বে তাঁহার নশ্বর কলেবর সংরক্ষিত হইল।

সমাপ্ত।

গ্রন্থোপহার।

পরমার্চ্চনীয়

শ্রীযুক্ত লোহারাম শিরোরত্ন

মাতুল মহাশয়ের

শ্রীচরণে

তদীয়

একান্ত স্নেহাস্পদ ও অনুগ্রহভাজন

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

এই গ্রন্থ

অতীব ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে

সমর্পিত হইল।

(ইতি)

বিজ্ঞাপন।

গ্রন্থ সাধারণ সমীপে প্রচারিত হইবামাত্র গ্রন্থকারের মনে কিয়ৎ পরিমাণে আনন্দ জন্মে; কিন্তু এই গ্রন্থকারের হৃদয় তৎপরিবর্ত্তে দারুণ ভয়ে অবসন্ন হইতেছে। গ্রন্থ-রচনা পক্ষে নিতান্ত অনুপযুক্ততাই ইহার কারণ। গ্রন্থ প্রচারিত হইল বটে, কিন্তু কে জানে অদৃষ্টে কি আছে! হয় তো এই অবিমৃষ্যকারিতা নিবন্ধন আমার ইহকালের সমস্ত আশা-ভরসা নির্ম্মূল হইবে, হয় তো ইহা আমার দারুণ লজ্জা ও ক্ষোভের কারণ হইবে, এবং হয় তো এই ঘটনায় আমার ভাবী উন্নতির পথ রুদ্ধ হইবে। যাহা হউক, এক্ষণে সে বিবেচনা বৃথা। মনুষ্যমাত্রকেই স্বীয় দুষ্কৃতির ফল ভোগ করা কর্ত্তব্য। আমাকেও অবশ্যই এই দুষ্কৃতির ফলভোগ করিতে হইবে।

আমি সাধ্যানুসারে গ্রন্থমধ্যে অস্বাভাবিকতা, অশ্লীলতা, রূঢ়তা, গ্রাম্যতা প্রভৃতি দোষ নিবিষ্ট করি নাই। আমার দৃষ্টিতে যদিও গ্রন্থ সে সমস্ত দোষ বর্জ্জিত হইয়া থাকে, তথাপি ভিন্নদৃষ্টিতে হয় তো রাশি রাশি সেরূপ দোষ নির্ব্বাচিত হইবে; সুতরাং সে কথার উল্লেখ অনাবশ্যক।

আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক অপর গ্রন্থের কোন ভাব এই গ্রন্থ-মধ্যে নিবেশিত করি নাই। সকল গ্রন্থের সংবাদ কিছু আমার আয়ত্ত নহে; সুতরাং অজ্ঞাত গ্রন্থের কোন ভাব ইহার মধ্যে যদি আসিয়া থাকে, তজ্জন্য আমি দোষী নহি।

আমার এই সামান্য পুস্তকখানি প্রচারিত হওয়াতেই আমি সঙ্কুচিত হইতেছি। অপিচ বঙ্গীয় কাব্য-লেখক চূড়ামণি শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের রসময়ী লেখনী-প্রসূত সুবিখ্যাত পুস্তক কপালকুণ্ডলাকে এতদ্দ্বারা হয় তো বিকৃত-দশাপন্ন করিলাম ভাবিয়া, আমি আরও সঙ্কুচিত হইতেছি। আমি এই অসমসাহসিকতার নিমিত্ত তাঁহার নিকট সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

আমার এই গ্রন্থপাঠে সহৃদয় পাঠকের আনন্দ জন্মিবে, আমি এমন ভরসা করি না; তবে যদি ইহার বিপরীত ঘটে, তাহা হইলে আমি আশাতিরিক্ত ফল পাইব।

যে সকল মহাত্মা এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া সন্তোষ সহকারে ইহা মুদ্রিত করিতে আদেশ দেন, তাঁহাদিগের নাম এস্থলে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। আমার সহিত তাঁহারা গালি খাইয়া মরিবেন কেন?

এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্বন্ধে আর একটী কথা নিতান্ত আবশ্যক বোধে, এ স্থলে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতেছি। মৃন্ময়ী কপালকুণ্ডলার উপসংহারভাগ মাত্র। ইহা মুদ্রিত করিতে হইলে, কপালকুণ্ডলার গ্রন্থকার বিখ্যাত নামা শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুমতি গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। বহরমপুর নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন মহাশয় সেই অনুমতি দেওয়াইবার জন্য সবিশেষ যত্ন করিয়াছেন।

এই আমার প্রথম উদ্যম। নিতান্ত নিরুৎসাহ ও সাধারণের বিরাগভাজন হইলে, ইহাই আমার শেষ উদ্যম হইবে। ইতি।

শ্রীদামোদর দেবশর্ম্মা।

গ্রন্থ-প্রসঙ্গে।

"নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ ॥"

—মেঘদূতম্।

চৈত্র-বায়ু-বিতাড়িত বিশাল গঙ্গা-তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া, এক খণ্ড তট-মৃত্তিকা, তদুপরিস্থ কপালকুণ্ডলা সহ, নদী-নীর মধ্যে নিপতিত হইল। সন্নিহিত নবকুমার, পত্নীর এতাদৃশ অচিন্ত্যপূর্ব্ব বিপদে কাতর হইয়া, গঙ্গাপ্রবাহে ঝম্প প্রদান করিলেন। সেই ভাগীরথীর পবিত্র সলিল-মধ্যে নিমজ্জিত যুবক-যুবতীর অদৃষ্টে অতঃপর কি ঘটিল তাহা কপালকুণ্ডলার পাঠক-পাঠিকা জ্ঞাত নহেন। আমরা অনুসন্ধানে প্রমাণ পাইয়াছি যে, ভীষণ বামাচারী কাপালিক, কিয়ৎকাল তাঁহাদের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিয়া, অবশেষে স্বয়ং গঙ্গাপ্রবাহে ঝম্পপ্রদান করিল এবং অনতিকাল মধ্যে নবকুমারের মৃতপ্রায় দেহ তীরে উঠাইয়া আনিল। বহুদ্রব্য-গুণজ্ঞ কাপালিকের যত্নে নবকুমারের দেহে পুনরায় জীবন সঞ্চারিত হইল। কিন্তু তৎকালে কপালকুণ্ডলার আর কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। সেই শোকাবহ ঘটনাই বনবিহারিণী, সুখবোধবিহীনা, কপালিনীর জীবনের শেষ মনে করিয়া, সকলেই ক্ষুণ্ণমনে ক্ষান্ত আছেন। কিন্তু আমরা তৎপরে সবিশেষ অনুসন্ধানে কপালকুণ্ডলার বিষয়ে আরও অনেক কথা জানিতে পারিয়াছি। কৌতূহল পরবশ পাঠকগণ এই গ্রন্থ-মধ্যে প্রবেশ করিলে তাহা জানিতে পারিবেন।

মৃন্ময়ী।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

তটিনী-তটে।

"বিনা সীতাদেব্যা কিমিব হি ন দুঃখং রঘুপতেঃ।
প্রিয়নাশে কৃৎস্নং কিল জগদরণ্যং হি ভবতি॥
—ভবভূতি (উত্তর রামচরিত)।

বঙ্গীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমে, সুবিখ্যাত নীতিকুশল সম্রাট্ আকবরের উত্তরাধিকারী বাদশাহ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে, ফাল্গুন মাসে, একদিন সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, সপ্তগ্রাম-নিম্ন-প্রবাহিণী তটিনী-তটে একটী যুবক কর-কপোল-সংলগ্ন হইয়া চিন্তিতাবস্থায় উপবিষ্ট ছিলেন। সূর্য্যদেব সমস্ত দিন দুঃসহকর প্রসারণে বিশ্ব-সংসারকে কাতর করিয়া, এক্ষণে বিশ্রাম লাভাশয়ে পশ্চিম গৃহে গমন করিতেছেন। সায়ংকাল সমাগত প্রায়। যে স্থানে যুবক বসিয়া চিন্তামগ্ন ছিলেন, সপ্তগ্রামের সে অংশ নিবিড় বনাচ্ছন্ন; তথায় মনুষ্যের বড় যাতায়াত নাই। যুবক একমনে একান্তে উপবিষ্ট রহিয়াছেন; তাঁহার দৃষ্টি সমভাবে এক দিকে নিপতিত রহিয়াছে। এরূপ স্থানে, এমন সময়ে, যুবক বসিয়া কি ভাবিতেছেন? সায়ংকাল সমুপস্থিত বোধে সন্নিহিত কাননে বিহঙ্গমগণ কূজন-সহকারে যে সুস্বর বৃষ্টি করিতেছে, যুবকের শ্রুতি কি তৎপ্রতি নিবিষ্ট ছিল?—না। পদ-প্রান্তে শৈল-সুতা ভাগীরথী তরঙ্গ-হিল্লোল সহকারে উচ্ছলিতা হইতেছেন, যুবক কি তন্মন হইয়া তাহাই নিরীক্ষণ করিতেছেন?—তাহা নহে। অদূরে তমসাকাঙ্ক্ষী শৃগাল-দল, সন্ধ্যাসমাগম দর্শনে, স্ব স্ব গুহা-বিনির্গত হইয়া, উল্লম্ফন ও পরস্পর গাত্রলেহন করিতেছে, তিনি কি সেই দৃশ্য দর্শন করিতেছিলেন?—তাহাও নহে। নদী-নীর-নিপতিত ব্রততিসমূহ, ব্রীড়া-বিপন্না নবোঢ়া বঙ্গাঙ্গনার স্বামী-সমাগমে ক্ষণাগ্রে ক্ষণপশ্চাৎ গতির ন্যায়, গঙ্গা-প্রবাহে একবার দূরগত এবং পরক্ষণেই প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিকাশ করিতেছে, তিনি কি তাহাই দেখিতেছেন?—তাহাও নহে। ভীতি-সমাকুল কচ্ছপাদি জল-জন্তু সকল সান্ধ্য সমীর সেবনাশয়ে, ক্ষণে ক্ষণে জলোপরি ভাসমান হইয়া পরক্ষণেই ব্যগ্রতা সহকারে অতলজলে অদৃশ্য হইতেছে, তিনি কি তদ্দর্শনে দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন?—না, এ সকল কিছুই নহে। যুবক দারুণ চিন্তা-সাগরে ভাসিতেছেন। তাঁহার এত যে কিসের চিন্তা তাহা তিনি ভিন্ন অন্যে বলিতে অক্ষম। যুবকের সুপ্রশস্ত

ললাট দিয়া স্বেদ-বারি বিগলিত হইতেছে এবং উজ্জ্বল লোচন দিয়া অজ্ঞাতসারে দুই এক বিন্দু অশ্রু নিপতিত হইতেছে। তিনি স্বভাবজাত তৃণাসনে সমভাবে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। চক্ষুর নিমেষ নাই। তাঁহার বামহস্তে গণ্ডদেশ সংস্থাপিত, দক্ষিণ হস্ত জানু সংলগ্ন। সর্ব্বশরীর স্পন্দহীন। সময়ে সময়ে এক একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস তাঁহার সজীবত্বের সমর্থন করিতেছে। তাঁহাকে তদবস্থায় দর্শন করিলে বোধ হইত, যেন কোন সুগঠিত দেব-মূর্ত্তি নদীতটে সংস্থাপিত রহিয়াছে।

সহসা বৃক্ষান্তরাল হইতে একটী মোহিনী রমণীমূর্ত্তি নিক্রান্ত হইয়া ধীরে ধীরে যুবকের দিকে আগমন করিতে লাগিলেন। এ বিজন বনে সেরূপ অনায়াত্তা সুন্দরীসমাগম দর্শনে তাঁহাকে বন-দেবী ভিন্ন অন্য কিছু বিবেচনা করা অসম্ভব। সুন্দরী মন্দ মন্দ পাদ-বিক্ষেপে যুবক-সন্নিহিত হইয়া তৎপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। যুবকের দৃষ্টি যুবতীর প্রতি সঞ্চালিত হইল। তাঁহার দৃষ্টিতে বিরক্তি ও ঘৃণা ব্যক্ত হইল। সুন্দরী যুবতী নিঃশব্দে থাকিলেন। অনেকক্ষণ পরে যুবক কহিলেন,—"পদ্মাবতি! এখানে কেন?"

যুবতী কহিলেন,—"নবকুমার! দুর্ভাগিনী পদ্মাকে আর কত দিন কষ্ট দিবে?"

নবকুমার উত্তর করিলেন,—"তুমি আমাকে বারংবার এ কথা বলিয়া বিরক্ত করিও না। আমি তোমাকে কি কষ্ট দিতেছি?"

পদ্মা। নাথ! তুমি আমাকে কষ্ট দিতেছ না? আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী—তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়াছ; ইহা কি আমার কষ্টের সমূহ কারণ নহে?

নবকুমার বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"তাহা আমি জানি না। তুমি কেন এখানে আমার অনুসরণ করিলে?"

পদ্মা। তুমি প্রত্যহ এই স্থানে আসিয়া থাক, এই স্থানটী আমাদের কথাবার্ত্তার সম্পূর্ণ উপযোগী বিবেচনায়, আমি অনেক অনুসন্ধানে ও অতি কষ্টে এখানে আসিয়াছি। আমাকে আর কষ্ট দিও না।

এই কথা বলিতে বলিতে যুবতীর নয়নোপান্তে অশ্রু বিন্দুর সমাবেশ হইল। যুবক তাহা দেখিতে পাইলেন না। তিনি কহিলেন,—"আমার বিবাহিতা পত্নী, এ কথা আমি স্বীকার করি। কিন্তু তোমাকে আর আমি গ্রহণ করিতে পারি না। তুমি যবনী তাহা কে না জানে?"

এই কথায় যুবতী বস্ত্রাঞ্চলে নয়নাবৃত করিলেন। তিনি কাঁদিলেন। নবকুমার তাহা বুঝিতে পারিলেন। যুবতী অনেকক্ষণ পরে নয়ন-বারি নিবারণ করিয়া উত্তর করিলেন,—প্রাণেশ্বর! আমি যবনী সত্য। কিন্তু আমি যবনী হই, আর যাহাই হই, আমি তোমারই পত্নী, তোমারই দাসী। রমণীর স্বামীই গতি, স্বামীই মুক্তি, স্বামীই পালক এবং স্বামীই শিক্ষক। নাথ! স্বামী-সহবাস যে স্ত্রীর সকল সুখের মূল, এ হতভাগিনী তো সে শিক্ষা পায় নাই। তোমার নিকট হইতে সে সকল ধর্ম্মনীতি শিক্ষা লাভ করিবার পূর্ব্বেই, হতবিধাতা আমাকে তোমার পবিত্র সংসর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন। আমার আর সে জ্ঞান লাভ হইল না। অজ্ঞান অবলার যত কিছু অপরাধ হওয়া সম্ভব, প্রাণেশ্বর! আমি সে সকল অপরাধেই অপরাধিনী; যদি সে সকল অজ্ঞান-কৃত পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত না থাকে, তবে আমি তোমার চরণ-তলে জীবন ত্যাগ করিয়া এ পাপ-পঙ্কিল দেহ বিসর্জ্জন দিব।

আমি এক্ষণে স্বামী সুখ জানিয়াছি। আর তাহা ত্যাগ করিব না। অজ্ঞান- অন্ধকারে দিগ্‌ভ্রান্তা হইয়া আমি নানাবিধ পাপ-মার্গে পরিভ্রমণ করিয়াছি সত্য; কিন্তু হৃদয়েশ। সহসা আমার হৃদয়ে জ্ঞানালোক প্রবেশ করিয়াছে; আমার চিত্ত অনুতাপে দগ্ধ হই-তেছে। এক্ষণে যদি তুমি আমাকে পুনরায় সরল অন্তঃকরণে পত্নীভাবে গ্রহণ কর, তাহা হইলে আমি কিয়ৎ পরিমাণে চিত্ত-প্রসাদ লাভ করিতে পারি; জীবিতেশ! তোমার চরণ ভিন্ন আমার আর গতি নাই। আমি তোমার চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া এ কলুষিত দেহ পবিত্র করিব।”

পদ্মাবতী এই বলিয়া পুনরায় নয়নাবৃত করিলেন। নবকুমার সমস্ত কথা শুনিলেন। তিনি বাক্‌রহিত হইয়া রহিলেন। পরে উচ্ছ্বসিত মনোবেগ অপেক্ষাকৃত সংযত করিয়া কহিলেন,—“পদ্মাবতি! আমি নরাধম। আমি সংসারে যেরূপ পাপ করিয়াছি কিছুতেই তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে না। আমি নিরপরাধা, সংসারবোধবিহীনা সাধ্বী পত্নী মৃন্ময়ীর অকাল মৃত্যুর প্রধান কারণ। সে দুঃখ আমার হৃদয় হইতে কখনই অপনীত হইবে না। এই অকিঞ্চিৎকর পাপ জীবনের শেষ পর্য্যন্ত সেই নিদারুণ শোকের সহিত আমার সম্বন্ধ থাকিবে। আমি অন্য সুখ প্রার্থনা করি না; মৃন্ময়ীরূপ ধ্যান করিতে করিতে প্রাণবায়ু এ নর-কুল কলঙ্কের দেহাশ্রয় ত্যাগ করে, ইহাই আমার প্রার্থনা। মাত-র্গঙ্গে! তুমি ভবিষ্যৎ জ্ঞান-বিহীনা নিরপরাধা মৃন্ময়ীকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়াছ; এ হত-ভাগ্যকে আর কেন কষ্ট দেও? আমাকেও চরণে স্থান দিয়া, সংসার-যন্ত্রণা হইতে নিস্তার কর মা।”

এই কথা বলিতে বলিতে নবকুমারের চক্ষু দিয়া অনর্গল অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন,—“পদ্মাবতি! সংসার আমার এক্ষণে বিষ স্বরূপ হইয়াছে। আর আমার কিছুতেই স্পৃহা নাই। একমাত্র মৃন্ময়ী বিহনে আমার সংসার অন্ধকার এবং আমার কায়মন শূন্য হইয়াছে। পদ্মাবতি! তুমি আর অনর্থক আমার জন্য কষ্ট ভোগ করিও না। তুমি যে অবস্থায় ছিলে, সেই অবস্থায় সুখে অবস্থান কর। কেন বৃথা আশার অনুসরণ করিয়া ক্লেশভোগ করিতেছ? তুমি যবনী বলিয়া আমার তাদৃশ আপত্তি নাই। কিন্তু আমি আর সংসারী হইব না। আমি এইরূপেই জীবন পাত করিব স্থির করিয়াছি। আমি আর কোন রমণীকে আমার ঘৃণিত জীবনের সহচরী করিয়া কষ্ট দিতে ইচ্ছা করি না। পদ্মাবতি! তুমি আমার সংসর্গে কেবল কষ্ট পাইবে, আমার আশা ত্যাগ কর।”

এই বাক্য শুনিতে শুনিতে পদ্মাবতীর মুখ বিবর্ণ হইল। তিনি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—“নাথ! তুমি আমাকে অন্যায় প্রবোধ দিতেছ। আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার তোমার সংসর্গে অসুখী হই তাহাও স্বীকার, তথাপি আমি তোমারই, তুমি আমাকে ত্যাগ করিলেও আমি তোমাকে ত্যাগ করিব না।

নবকুমার এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। তিনি কিছু চিন্তিত হইয়া কহিলেন,—“পদ্মা-বতি! অন্ধকার হইয়াছে। গৃহে যাও। এ বিষয়ের বিবেচনা পরে হইবে।”

এই বলিয়া স্বয়ং দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে গাত্রোত্থান করিলেন। পদ্মা কহিলেন,—“প্রাণেশ্বর! অধীনার একটি কথা রাখ। কল্য একবার আমার আবাসে পদার্পণ করিও।”

নয়। সে জন্য আমি এক্ষণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে পারি না।

এতক্ষণ উভয়ে বাহ্য-জ্ঞান-বিরহিত হইয়া কথা বার্ত্তায় অন্যমনস্ক ছিলেন। সুতরাং বন-ভূমি যে ঘোরান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, তাহা তাঁহারা দেখিতে পান নাই। সহসা চৈতন্য হইল।

পদ্মা কহিলেন,—"নাথ! আমাকে ভুলিও না, এই মাত্র শ্রীচরণে প্রার্থনা।"

এই কথার পর উভয়েই আবাসোদ্দেশে অগ্রসর হইলেন এবং ক্ষণবিলম্বেই ঘোর তম-সাচ্ছন্ন বন মধ্যে অদৃশ্য হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কৃতনিশ্চিতে।

"lucky joys
And golden times, and happy news of price"

—Shakespeari.

পূর্ব্বোল্লিখিত অরণ্য অতিক্রম করিলেই একটি পুরাতন দ্বিতল গৃহ দৃষ্ট হয়। এইটি নবকুমারের বাসগৃহ। গৃহটি অরণ্য-সংলগ্ন। অন্তঃপুরের অঙ্গন অতি প্রশস্ত। তাহার মধ্যে একটি বৃহৎ আম্রবৃক্ষ। বেলা দ্বিপ্রহর সময়ে সেই বৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন করিয়া দুইটি নারী কথোপকথন করিতেছেন। রমণী-দ্বয়ের একটি রূপ-যৌবনসম্পন্না বঙ্গাঙ্গনা। তাঁহার পরিচ্ছদ-প্রণালী দেশীয়া রমণীর ন্যায়। দ্বিতীয়ার পরিচ্ছদাদি দেখিয়া তাহাকে যবনী বলিয়া বোধ হয়। তাহার বয়স অপেক্ষাকৃত অধিক। যুবতী নবকুমারের ভগ্নী; তাঁহার নাম শ্যামাসুন্দরী। দ্বিতীয়ার নাম পেযমন্—পদ্মাবতীর পরিচারিকা। শ্যামা জিজ্ঞাসিলেন,—"পেযমন্! তুমি সত্য বলিতেছ? পদ্মাবতী সত্যই এখানে আছেন? তাহা তো আমরা এতদিন জানি না।"

পেযমন্ কহিল,—"দিদি ঠাকুরাণি! আমি তো সেই সংবাদ দিতেই আসিয়াছি। তিনি আজ সাত মাস এখানে আছেন।"

শ্যামা একটি দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বলিলেন,—"তাহা তো আমাকে কেহই বলে নাই। আহা! তাঁহাকে কত দিন দেখি নাই! পেযমন্ তিনি এখন কি তেমনই আছেন? তা তুমিই বা জানিবে কেমন করিয়া? তাঁহার সঙ্গে দেখা হওয়ার কি কোন উপায় হয় না?"

পেযমন্ যে উদ্দেশে আসিয়াছিল সহজেই তৎসিদ্ধির সূত্র দেখিল। সানন্দে কহিল,—আমি আপনাকে তাহাই জিজ্ঞাসিতে আসি-য়াছি। তাঁহার বড় সাধ যে আপনার সহিত একবার সাক্ষাৎ করেন। আপনি যদি আজ্ঞা করেন, তবে তিনি এখানেই আইসেন। তিনি সর্ব্বদা আমার নিকট আপনার কথা বলেন, আর কত দুঃখ করেন।"

শ্যামা আনন্দে সব ভুলিয়া গেলেন। পদ্মা-বতী যে যবনী হইয়াছেন, তাহা তিনি জানি-তেন। তাঁহার গৃহাগমনে যে লোকাপবাদ হইতে পারে, অথবা তাঁহার অগ্রজের বিরক্তি জন্মিতে পারে, তাহা তাঁহার মনে হইল না। তিনি আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন,-"তিনি আসিবেন ইহার আর আজ্ঞা কি পেযমন্? ইহা আবার জিজ্ঞাসা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমি স্বয়ং যাইতে ইচ্ছা করি, কিন্তু সে কার্য্য নিতান্ত অসম্ভব। তাঁহাকে বলিবে, তিনি যখন সুবিধা বুঝিবেন, যখন তাহার ইচ্ছা হইবে তখনই যেন আইসেন।"

পেযমন, "যে আজ্ঞা" বলিয়া, প্রস্থান করিল।

শ্যামাসুন্দরী গৃহ-প্রবেশ করিলেন। তিনি তথায় একটু স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার মুখ-কান্তি গম্ভীর হইল। পরক্ষণেই তাহা বিমর্ষভাবাপন্ন হইল। দেখিতে দেখিতে তাঁহার আয়ত ইন্দীবর নয়নদ্বয় হইতে মুক্তাফল স্থূল অশ্রু-বিন্দু সকল অজ্ঞাতসারে নিপতিত হইয়া ধরা সিক্ত করিতে লাগিল। শ্যামা তাঁহার ভ্রাতৃ-জায়া মৃন্ময়ীকে বড়ই ভাল বাসিতেন; তিনি তাঁহাকে স্বীয় প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর জ্ঞান করিতেন। তিনিই আদর করিয়া তাঁহার মৃন্ময়ী নাম রাখেন; সুতরাং সেই প্রাণাধিকা মৃন্ময়ীর অকাল মৃত্যুতে তিনি যৎপরোনাস্তি শোক-সন্তপ্তা আছেন। অদ্যকার ঘটনার সকল কথা মনে পড়িল। এই ঘটনায় তাঁহার মৃনোর মুখ মনে পড়িল; তাঁহার জীবনান্ত ঘটনা মনে পড়িল। তিনি সেই সকল ভাবিতে ভাবিতে অনেকক্ষণ কাঁদিলেন! ক্রমে তাঁহার মনের পরিবর্তন হইতে লাগিল। এখন তাঁহার মুখ দেখ, এখন তথায় হর্ষের জ্যোতিঃ প্রতিভাত হইয়েছে! একি! যুবতী শ্যামা কি উন্মাদিনী? তাহা নহে। তাঁহার মানস-সরোবরে এখন আবার বিভিন্ন প্রকার ভাব-প্রবাহ প্রবাহিত। এখন তাঁহার অগ্রজের প্রথমা স্ত্রীকে স্মরণ হইল। বিবাহের পর, একবার মাত্র, তিন মাসের জন্য, পদ্মা শ্বশুরবাটী আসিয়াছিলেন; তখন তাঁহার বয়ঃ-সন্ধি; তখন বয়স দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বর্ষ মাত্র। সে আজ কত দিনের কথা তাহার পর তাঁহার জীবন কত পরিবর্ত্ত পরিগ্রহ করিয়াছে! পদ্মা একণে যৌবনের উদীচ্য সীমায় অবতীর্ণা। পদ্মার পিতা রামগোবিন্দ ঘোষাল সপরিবারে মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হন; সুতরাং পদ্মাও মুসলমানী হইয়াছিলেন। তদবধি আর পদ্মার সংবাদ লওয়া হয় নাই। পদ্মার সহিত সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে। সে কত দিনের কথা! এত কালের পর আবার পদ্মা এই দেশে! তিনি যাহাই কেন হউন না—শ্যামাসুন্দরীর ভ্রাতৃজায়া, সুতরাং তাঁহার স্নেহ ও শ্রদ্ধার পাত্র। এত দিনের পর আবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, ইহা কি অতুল আনন্দের বিষয় নহে? শ্যামা এই সকল ভাবিতে ভাবিতে আনন্দে উচ্ছলিত হইতে লাগিলেন; হৃদয়স্থিত আনন্দালোক তাঁহার বদনেও রশ্মি বিকীর্ণ করিল। তিনি টিপি টিপি হাসিতে লাগিলেন। আনন্দের কাজই এই। আনন্দে বৃদ্ধকে যুবক এবং নিরানন্দ যুবককে বৃদ্ধ করিয়া তুলে যুবতী শ্যামাও একণে আনন্দভরে বালিকা-ভাবাপন্ন। তিনি আপন মনে পা দুলাইতেছেন, হাত নাড়িতেছেন ও হাসিতেছেন। যাঁহাদের হৃদয় সময়ে সময়ে এরূপ আনন্দোন্মত্ত হইয়া থাকে, তাঁহারা বুঝিবেন, শ্যামাসুন্দরী প্রকৃত বাতুলের কর্ম্ম করিতেছেন না।

যখন পদ্মা শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছিলেন, তখন তিনি কাহারও সহিত কথা কহিতেন না। তাঁহার মাতা তাঁহাকে শ্বশ্রূ প্রভৃতি গুরুজনদিগের সহিত কথা কহিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। পদ্মাও সেই আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ননন্দা শ্যামা ভিন্ন আর কাহারও সহিত কথা কহিতেন না। বাল-সহচরী শ্যামা ও পদ্মার হৃদয়-মধ্যে, সম্বন্ধ-বন্ধন ব্যতীত, একটী স্বতন্ত্র বন্ধন জন্মিয়াছিল; সে বন্ধন প্রণয়। পার্থক্য, ধর্ম্মান্তর, নিরুদ্দেশ প্রভৃতি কারণে সে বন্ধনটী কথঞ্চিৎ শিথিল হইয়া আসিয়াছিল। অদ্য সমস্ত কথা মনে হইল। দর্শন-লালসায় প্রণয়-রজ্জু আকৃষ্ট হইল। শিথিল বন্ধন দৃঢ় সংলগ্ন হইয়া আসিল। তিনি কতক্ষণে সাক্ষাৎ সময়

সমাগত হইবে, প্রীতিপ্রফুল্ল মনে, তাহারই প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

শ্যামা এইরূপ আনন্দ রসে পরিপ্লুতা রহিয়াছেন, এমন সময় তথায় নবকুমার প্রবেশ করিলেন। নব কুমারকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার আনন্দবেগ সংবর্দ্ধিত হইল। তিনি ভাবিলেন, দাদা পদ্মার এদেশে আগমনবার্ত্তা কিছুই অবগত নহেন। তাঁহাকে এই সংবাদ দিই। আবার ভাবিলেন, না,—তাহা বলিয়া কাজ নাই। যদি দাদা আপত্তি করেন, তাহা হইলে আমাদের সাক্ষাতের ব্যাঘাত জন্মিবে। আবার ভাবিলেন, ইহাতে দাদার কি ক্ষতি? ভাল, বলিয়া দেখি। এই ভাবিয়া বলিলেন,—"দাদা! আমাদের বড়বউ এখানে আছেন!"

নবকুমার এ কথায় বিস্মিত না হইয়া কহিলেন,—"শ্যামা! এ ত নূতন নহে।"

শ্যামা। তুমি তবে জান। আমরা কিন্তু তা এত দিন জানিতে পারি নাই, আজ জানিলাম।

নব। কে বলিল?

শ্যা। তাঁহার দাসী।

নব। কেন?

শ্যা। তিনি আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন। তাই জিজ্ঞাসা করিতে পাঠাইয়া ছিলেন। আমি তাঁহাকে আসিতে বলিয়া দিয়াছি।

নবকুমার কিছু বলিলেন না। এ মৌন সম্মতির লক্ষণ নহে, ইহা বিরক্তি-ব্যঞ্জক। তিনি ধীরে ধীরে বাহিরে গমন করিলেন।

নবকুমারের মনের ভাব শ্যামা বুঝিতে পারিলেন না, সুতরাং নবকুমারের মৌনভাব সম্মতিসূচক বিবেচনায় পরম আহ্লাদিত হইলেন। মৃন্ময়ীর গঙ্গাজলে নিপাতপ্রাপ্তির পর হইতে নবকুমার কোন কার্য্যে উৎসাহ প্রদর্শন করেন না। শ্যামা এ ঘটনাতেও তাহাই মনে করিলেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত কি অন্যায়? কখন নহে। যাহাদের হৃদয়ে চাতুরী নাই, জগতে তাহারাই সুখী।

শ্যামা মনের সুখে গৃহ-কর্ম্মে ব্যাপৃতা হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিগত-চিন্তনে।

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু আগুণে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলই গরল ভেল॥
সখিরে! কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া চাঁদ সেবিনু ভানুর কিরণ দেখি॥
উচল বলিয়া অচলে চড়িনু, পড়িনু অতল জলে।
লছিমি চাহিতে দারিদ্র বেঢ়ল, মাণিক হারানু হেলে॥

—জ্ঞানদাস।

সপ্তগ্রামের বাজারের প্রান্তভাগে, সুপ্রশস্ত রাজমার্গ-পার্শ্বে, একটী সুদৃশ্য ত্রিতল গৃহ দৃষ্ট হয়। তাহারই ঊর্দ্ধতন একটী প্রকোষ্ঠে দুইটী রমণী উপবিষ্টা। উভয়েরই যাবনিক পরিচ্ছদ। তাঁহাদের গৃহ-সজ্জাও যাবনিক রুচির পরিচয় দিতেছে। পাঠক মহাশয় উভয় রমণীকেই অবগত আছেন। গঙ্গাতীরে নবকুমারের সন্নিহিতা পদ্মাবতীকে দেখিয়াছেন—এ সুন্দরী সেই পদ্মাবতী। পদ্মা এক্ষণে তাঁহার অত্যন্ত যাবনিক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন। তাঁহার বদন দিয়া তেজোগর্ব্ব ফাটিয়া পড়িতেছে। রূপের সীমা নাই। তিনি এক্ষণে প্রসন্ন। আনন্দ তাঁহার দেহের প্রত্যেক অংশে আধিপত্য করিতেছে। সে দিন যে বলিলা,

ভূষণহীনা, রোরুদ্যমানা পদ্মাবতীকে দেখিয়াছেন, অদ্য তাঁহাকে দেখুন, চিনিতে পারিবেন না। যুবতী পদ্মার শরীরে অলঙ্কার বড় শোভা পায়; এজন্য তিনি অদ্য শরীরের যেখানে যাহা সাজে সেখানে তাহাই পরিয়াছেন। পদ্মা তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছেন, ও সময়ে সময়ে ঘর্ম্ম দূর করিবার নিমিত্ত, একখানি রুমালে মুখ মুছিতেছেন। তাঁহার পার্শ্বে কিঙ্করী পেষমন্ উপবিষ্টা।

পদ্মা, সপ্তগ্রামে আসিয়া, ঐ বাটীতে আবাস গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে আসার পর, তাঁহার স্বামী নবকুমার অনুরোধ-পরতন্ত্র হইয়া দুই এক দিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। কিন্তু তাহাতে পদ্মার মনোরথ অনুমাত্রও পূর্ণ হয় নাই। পতি-প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী পদ্মাবতীকে পাঠক মহাশয়েরা গঙ্গাতীরে পতি-পার্শ্ববর্ত্তিনী দেখিয়াছেন; এবং সে মিলনে পদ্মাবতীর মনস্কামনা কতদূর সিদ্ধ হইয়াছে, তাহাও জ্ঞাত আছেন। পতির অপরিস্ফুট প্রণয়-রত্ন উদ্ধারার্থে পদ্মা বিবিধ যত্ন করিয়াছেন ও করিতেছেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অদ্য তিনি আবার সেই উদ্দেশ্য সাধনোদ্দেশে নূতন কল পাতিয়াছেন। এই কল কিরূপ ফলোপদায়ক হয়, তাহা ক্রমশঃ জানিতে পারা যাইবে। তাঁহার লক্ষ্য এবার অব্যর্থ হইবে, এই বিবেচনায় পদ্মা অদ্য এত হৃষ্টা।

পেষমন্ অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক ছিল। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি সপ্তগ্রামে আর কত দিন থাকিবে? আগ্রার কথা সকল মনে করিয়া দেখ; তুমি সেখানে কি সুখে ছিলে! এখানে কি সুখে আছ।"

পদ্মাবতী একটু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "পেষমন্! জীবনের অবশিষ্ট কাল সপ্তগ্রামেই অতিবাহিত করিব। এখানে আমি প্রতি মুহূর্ত্তে যে সুখসম্ভোগ করি, আগ্রার বাদশাহ অন্তঃপুরে বিবিধ দাস দাসী পরিবেষ্টিত হইয়া, অগাধ সমৃদ্ধি মধ্যে তাহার এক কণিকাও লাভ করিতে পারি নাই। পেষমন্! ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগের যতদূর চরিতার্থতা সম্ভবে, আমার তাহা কিছুই বাকী নাই। পাপ-সাগরে যতদূর অবগাহন করিলে তাহার তলস্পর্শ করা যায়, আমি ততদূরই করিয়াছি। আর এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই; এ পাপ হইতে আর নিস্তারের উপায় নাই। তুমি বুঝিতেছ না পেষমন্! আমার হৃদয়ে এককালে শত শত বৃশ্চিকে দংশন করিতেছে। অনুতাপানলে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। যাহা হইবার হইয়াছে, আমি এক্ষণে শান্তির কাঙ্গালিনী। অবিশ্রান্ত পাপে আমার মন, বুদ্ধি, দেহ, প্রাণ, অসাড় হইয়াছে। আমি তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি। স্বামী কি পরম পদার্থ তুমি জান না; আমিও এত দিন জানিতাম না। দরিদ্র পতির চরণসেবাও যে পৃথ্বীপতি বাদশাহের ইন্দ্রিয়-বৃত্তি-নিবৃত্তির উপকরণ মাত্র হওয়ার অপেক্ষা কত ভাল, পেষমন্, তাহা আমি এতদিনে বুঝিয়াছি। অবলা-কুল-ভূষণ সতীত্ব-রত্নকে পঙ্কিল হ্রদ-গর্ভে নিক্ষিপ্ত করিয়া ভূর্লোক-দুর্লভ] সম্পত্তি-সুখ-সম্ভোগ করার অপেক্ষা, উক্ত রত্ন হৃদয়ে ধারণ করিয়া কাঙ্গালিনীবেশে কুটীরে বাস করাও যে কত শ্রেয়ঃ, তাহা আমি এখন জানিতে পারিয়াছি। হায়! এতদিন সে জ্ঞান হয় নাই। মেদিনীপুরে সেই চটী—মনে পড়ে পেষমন্? আহা সেই দিন আমার জীবনের প্রধান দিন! মেদিনীপুরের সেই চটীতে সহসা এই পাপোন্মত্তার মনে জ্ঞানের রশ্মি ও পবিত্র সুখের রস প্রবেশ করিয়াছে। আর কি ইহা ছাড়া যায়? ইহার তুলনায় অন্য যাবতীয় সুখ অতীব হেয়।

পেষমন্! তুমি কি না জান! আমি মনে করিলে সমগ্র ভারতবর্ষ আমার করতলস্থ করিতে পারিতাম। এই সুখের লোভে আমি তাহা অকাতরে ত্যাগ করিয়াছি। রূপ-যৌবন-সম্পন্ন জগদারাধ্য বাদশাহ জাহাঙ্গীরকে আমি পদানত করিয়াছিলাম। এই সুখের আশায় আমি তাহা সন্তুষ্টচিত্তে ত্যাগ করিয়াছি। যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, আর না, ও সকল কথ আর মনে করিও না। জীবন ত্যাগ করিব, তথাপি এ সুখের আশা ত্যাগ করিব না, পেষমন্।"

পদ্মাবতী বিদুষী। বিদ্যার বিমল জ্যোতিঃ তাঁহার হৃদয়-কন্দরে প্রবেশ করিয়াছিল। বাল্যাবস্থা হইতে কুসংসর্গ ও ইন্দ্রিয়-ভোগ-লালসা তাঁহার বিদ্যাজনিত জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। এত দিনের পর সেই জ্ঞান পরিস্ফুট হইয়াছে। আর তাহাকে কে আবরণ করে? পেষমন্ সর্ব্বদা তাঁহার সহিত অবস্থান বশতঃ অনেক পুস্তকাদির আস্বাদ পাইয়াছিল সত্য; কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান কখনই তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে নাই। ভ্রম-কূপে পতিত হইয়া অজ্ঞানান্ধকারে বাস করা যাহাদের স্বভাব তাহারা এ সুখের আস্বাদ কি প্রকারে জানিবে? পেষমন্ আর কিছু বলিতে সাহস করিল না। সহসা পদ্মাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন পেষমন্! ঠাকুরঝির সহিত দেখা করিতে যাইবার সময় হয় নাই?"

পেষমন্ কহিল,—"হইয়াছে—এখন যাওয়া যাউক।"

পদ্মা উঠিলেন। কি মনে হইল; একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"পেষমন্! এক খানি শাড়ী আন।"

পেষমন্ আজ্ঞা প্রতিপালন করিল। রূপসী পদ্মাবতী, বিজাতীয় পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া, বাঙ্গালিনী সাজিলেন। পেষমন্‌কে জিজ্ঞাসিলেন,—"পেষমন্! দেখ দেখি, আমাকে কেমন দেখাচ্ছে?"

পেষমন্ কহিল,—"বাঙ্গালীর পোষাক কি ভাল দেখায়? ও ছাই দেখাচ্ছে।"

পদ্মা পেষমনের কথায় বিশ্বাস করিলেন না। তিনি দর্পণ সন্নিহিত হইয়া আপনার মুখ আপনিই দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ-কান্তি গম্ভীর হইল। নিদারুণ চিন্তা তাঁহার মস্তিষ্ক আশ্রয় করিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"চল, সন্ধ্যা হইয়াছে।"

উভয়ে উঠিলেন। পেষমন্ কহিল,—"জুতা পায়ে দিলে না, চলিতে পারিবে কেন?"

পদ্মা হাসিয়া বলিলেন,—"আর সেকাল নাই পেষমন্! এখন সব পারিব।"

উভয়ে ভবন হইতে নিক্রান্ত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সাক্ষাতে।

"রোগ-শোক-পরিতাপ-বন্ধন-ব্যসনানি চ।
আত্মাপরাধ-বৃক্ষস্য ফলান্যেতানি দেহিনাম্।"
—হিতোপদেশ।

শ্যামা, সন্ধ্যা-সময়ে ছাতের উপর বেড়াইতে বেড়াইতে, প্রীতিপ্রদ বাসন্তীয় বায়ু সেবন করিতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, দুইটী রমণী তাঁহাদের বাটীতে প্রবেশ করিল। অমনই তাঁহার পদ্মাবতীর কথা মনে পড়িল। অতি দ্রুত ছাত হইতে নামিলেন। আসিয়া দেখিলেন, সত্য সত্যই পদ্মাবতী উপস্থিত।

প্রথম দর্শন মাত্র উভয়ের হৃদয় আনন্দরসে পরিপ্লুত হইয়া উঠিল। আনন্দের আতিশর্য্য হেতু উভয়েই নীরব। কাহারও মুখে কথাটি নাই। নয়ন মনের অস্থিরতা প্রকাশ করিতেছে। উভয়েরই চক্ষু দিয়া অশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল।

রোদন শোকের চিহ্ন একথা সকলেই বলেন। কিন্তু এ রোদন তাহা নহে। এ রোদন আনন্দ-ব্যঞ্জক; এ রোদনের প্রত্যেক অশ্রু-বিন্দুর মধ্যে আনন্দের লহরী-লীলা লক্ষিত হইতেছে; ইহার সর্ব্বত্রই আনন্দ বিরাজমান।

ক্রমে মনের বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিল। উভয়ে উপবেশন করিলেন। শ্যামা মনোনিবেশ করিয়া দেখিলেন পদ্মাবতীর অতুল সৌন্দর্য্যের কণামাত্রেরও অপচয় হয় নাই। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহার দেহায়তন বৰ্দ্ধিত হইয়াছে মাত্র। দেহ সম্পূর্ণ হওয়ায়, তাঁহার অনুপম রূপরাশি আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

ক্রমশঃ আনন্দোল্লাস করিয়া আসিল। তখন পদ্মার ভাবান্তর জন্মিল। তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে আনন্দ-রশ্মি অপনীত হইল। তিনি পুনরায় কাঁদিতে লাগিলেন। এ রোদন আনন্দের রোদন নহে। ইহা হৃজ্জাত দুঃসহ যন্ত্রণার রোদন। পদ্মাবতী দীর্ঘকাল পরে তাঁহার স্বামিভবন পুনরায় দেখিলেন। অদৃষ্ট তাঁহার প্রতি বক্র না হইলে, এই স্বামি-ভবনে তিনি সমাদরে থাকিতেন। তাঁহার গৌরবের সীমা থাকিত না। তাঁহার সহিত কথা কহিতে তাঁহার স্বামী, ননন্দা, অথবা তৎসম্পর্কীয় অন্য কেহই সঙ্কুচিত হইতেন না। স্বামি-সেবায় ও স্বধর্ম্মে থাকিলে তাঁহার অন্তরে যত সুখ জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল, সে সমস্ত অদ্য তাঁহার মনে পড়িল। সে সকল সুখের পরিবর্ত্তে তিনি যে সকল আপাত মনোহর সুখসম্ভোগ করিয়াছেন, তাহাও মনে উদিত হইল। উভয়ের তারতম্য তিনি অনেক দিন বুঝিয়াছিলেন—অদ্য এই উপলক্ষে আবার তাহা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেন। তখন তিনি অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন। সেই যন্ত্রণা কিয়ৎ পরিমাণে উপশমিত করিবার নিমিত্ত, পদ্মাবতী বস্ত্রাঞ্চল বদনে দিয়া অবনত-মুখে অনেকক্ষণ কাঁদিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে উভয়ে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। সে কত কথা, তাহার সংখ্যা নাই। শ্যামা, পদ্মার নিরুদ্দেশের পর, স্বকীয় অগ্রজের যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। পদ্মাবতীও দুই একটী স্থান ব্যতীত, তাঁহার জীবনের সমস্ত ইতিহাস বর্ণন করিলেন। শ্যামাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি এখানে এতদিন আছ, সে সংবাদটীও কি আমাদের দিতে নাই?"

পদ্মাবতী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"আমার কি তোমাকে দেখিতে বা সংবাদ দিতে অনিচ্ছা! কিন্তু আমি কি আমার সে মুখ রাখিয়াছি? আমার মত দুর্ভাগা পৃথিবীতে দুটী নাই। পাছে আমার জন্য তোমরা লোকের কাছে গঞ্জনা পাও, এই ভয়ে এত দিন দেখা করি নাই, সংবাদও দিই নাই। কিন্তু এক স্থানে আর কত দিন এমন করিয়া থাকা যায়, তা বল? তাই ভাবিলাম, অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে, তোমাকে বলিয়া পাঠাই, তুমি যাহা ভাল বুঝ তাহাই, করিবে।"

শ্যামা একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পদ্মা আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"সংবাদ না দিবার আরও একটী বিশেষ কারণ ছিল। যদি তোমাদের কাছে সংবাদ দিলে, তোমরা আমাকে উপেক্ষা কর, যদি তোমাদের

কাছে আসিলে কথা না কও, যদি তোমরা আমার আগমনে লজ্জা পাও, এই সকল ভয়েই এত দিন সংবাদ দিতে ক্ষান্ত ছিলাম। তার পর ভাবিলাম, আমার সংবাদ দেওয়ায় দোষ কি? যদি তাঁহারা ঘৃণা করেন, কথা না কন, তবে তো পাপীয়সীর সংখ্যাতীত পাপের সমুচিত শাস্তিই হইবে। আর ভাবিতাম কি জান, যদি তোমাদের কাছে গিয়া আগেকার মত আদর না পাইলাম, যদি স্বামিগৃহে স্বামীর সঙ্গে কথাটীও কহিতে না পাইলাম, যদি তথায় আমাকে অস্পৃশ্যা রূপে থাকিতে হইল, তবে তথায় যাওয়ায় ফল কি? এক্ষণে মনে মনে স্থির করিয়াছি, এ পাপ প্রাণ আর রাখিব না। জীবনের যে সুখ, তা সব দেখিলাম। স্বামীর চরণ-সেবা ভিন্ন রমণীর আর কোন সুখ নাই, ইহা আমি বিশেষরূপে বুঝিয়াছি। যখন সে আশায় ছাই পড়িয়াছে, তখন আর বাঁচিয়া থাকায় লাভ কি? ভাবিলাম, মরিবার আগে একবার তোমাদের সঙ্গে দেখা করিয়া মরিব। তোমাকে বড় ভাল বাসি। তোমাকে একবার দেখিব বলিয়া বড় সাধ ছিল, আজ তাহা সফল হইল। এখন আমার মরিবার আর বাধা নাই। আর একটী ইচ্ছা আছে—মরিবার পূর্ব্বে একবার স্বামীর চরণ বক্ষে ধারণ করিব। কিন্তু সে আশা দুরাশা—"

যাহা বলিতেন, তাহা বলিতে পারিলেন না। পদ্মার হৃদয়ভেদী কথা সকল শুনিতে শুনিতে, শ্যামার নয়ন-প্রান্তে অশ্রু দেখা দিল। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে কহিলেন,—"যাহা হইবার হইয়াছে; অদৃষ্টে যাহা ছিল ঘটিয়াছে। বড় বউ! সেজন্ত আর অনুতাপ করিও না। মরিতেই বা যাইবে কেন? মরিলেই কি পাপমুক্তা হইবে? আত্মহত্যা তো আরও পাপের কার্য্য। বিধাতা তোমায় যেমন মতি দিয়াছিলেন, তেমনই কার্য্য করিয়াছ। তাহাতে যে পাপ হইবার হইয়াছে। যাহা হইয়াছে, তাহা তো আর ঘুচিবে না। তবে কেন জীবন ত্যাগ করিবে? যাহাতে জীবনের অবশিষ্ট কাল ভাল যায়, আর পাপস্পর্শ না হয়, তাহাই কর। আমার ইচ্ছা যে তুমি এক্ষণে যেমন সপ্তগ্রামে আছ তেমনই থাক, আর আগ্রায় বা স্থানান্তরে যাইও না। ইহাতে আর কিছু হউক না হউক, এক একবার দেখা সাক্ষাৎ করিয়াও তো মন জুড়াইতে পারা যাইবে।"

পদ্মাবতী অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন,—"ঠাকুরঝি! অগত্যা তাহাই করিব বই আর কি? ইহার অপেক্ষা ভাল আমার অদৃষ্টে আর কি হইতে পারে?"

ইত্যবসরে পেষমন্ নিবেদন করিল,—"রাত্রি অনেক হইয়াছে।"

পদ্মা এই কথা শুনিয়া শ্যামার প্রতি নেত্রপাত করিলেন। শ্যামা কহিলেন,—"রাত্রি অনেক হইয়াছে সত্য, কিন্তু তোমাকে যে ছাড়িতে ইচ্ছা করে না।"

পদ্মা। তোমার পরামর্শই গ্রহণ করিলাম। সপ্তগ্রাম আর ছাড়িব না। এখন হইতে প্রত্যহই দেখা করিব। দেখিতে দেখিতে জীবন কাটাইব।

পদ্মা নয়ন-জলে ভাসিতে ভাসিতে বিদায় প্রার্থনা করিলেন। শ্যামা অগত্যা সম্মত হইলেন।

পেষমন্ ভিন্ন পদ্মার সঙ্গে আর কোন পরিচারিকা আইসে নাই। এজন্ত শ্যামা তাঁহার একজন দাসীকে সঙ্গে যাইতে আজ্ঞা করিলেন।

পদ্মা মনে করিলে, দাস দাসী বাহক যানাদি সঙ্গে লইয়া আসিতে পারিতেন

কিন্তু সে সকল বাহাড়ম্বরে আর তাঁহার প্রবৃত্তি নাই। তিনি এক্ষণে আপনাকে সামান্যা গৃহস্থ-পত্নী মনে করিয়া তদুপযোগী থাকিতে অভ্যাস করিতেছেন।

রাত্রি প্রায় দশটা—পূর্ণকৌমুদীময়ী। প্রকৃতি শান্ত ও নিস্তব্ধ। সর্ব্বত্র গাম্ভীর্য্য বিরাজ করিতেছে। এইরূপ সময়ে পদ্মাবতী খাদি-ভবন হইতে নিক্রান্তা হইলেন। যতক্ষণ তাঁহাকে দেখা গেল, ততক্ষণ শ্যামা এক দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। তিনি অদৃশ্যা হইলে শ্যামা কি ভাবিতে ভাবিতে গৃহ-প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

তর্ক-বিতর্কে।

"je la plains, je la blame, et je suis sou appui.*"

—Voltaire.

সপ্তগ্রামের পণ্য-বীথিকার অনতিদূরে, একটী প্রশস্ত প্রান্তর দৃষ্ট হয়। প্রান্তর কেবল মাত্র শ্যামল তৃণাবৃত। মধ্যে মধ্যে এক একটী বৃহৎ তিন্তিড়ী, অশ্বথ ও বট বৃক্ষ। এই প্রান্তরের এক সীমায় দুইটী যুবা পরিভ্রমণ করিতেছেন। যুবকদ্বয়ের একটী আমাদের পরিচিত—নবকুমার; অপর নবকুমারের পরমাত্মীয়—উমাপতি চক্রবর্ত্তী। নবকুমার, বিপদ্ সম্পদ্ সকল সময়েই উমাপতির পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকেন। উমাপতির সহিত তাঁহার প্রণয় দৃঢ়সম্বদ্ধ। উভয়েরই স্বভাব একরূপ, উভয়েই একবিধ গুণের পক্ষপাতী, উভয়েই সরল, উভয়েই বিবিধ গুণ-সম্পন্ন ও বিদ্বান্; সুতরাং তাঁহাদের প্রণয় যে দৃঢ় হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি? উমাপতির নিবাস সপ্তগ্রাম। শৈশবে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তাহার যে পৈতৃক সম্পত্তি ছিল, তাহাতে সুখে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। বাল্যকাল হাইতে বিদ্যার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ আছে। এই জন্য পিতার অভাবেও তাঁহার শিক্ষার ব্যাঘাত হয় নাই। উমাপতির বয়স অন্যূন পঞ্চবিংশ বর্ষ হইবে। এই অল্প বয়সে তিনি যথেষ্ট জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছেন। নবকুমারের সহিত তাঁহার পঠদ্দশার মিত্রতা।

উমাপতি দেখিতে অতি সুপুরুষ। তাঁহার সুকৃষ্ণ কেশগুচ্ছ, সুন্দর বদন শোভা, আয়ত লোচন, চম্পকবর্ণ এবং সুললিত ও পরিণত দেহ মনোহর সৌন্দর্য্যের পরিচায়ক।

নবকুমারের সাগর-যাত্রীর নৌকা হইতে বালিয়াড়ির চরে অবস্থিতি—তথায় কাপালিক-সংমিলন—কপালকুণ্ডলা কর্ত্তৃক জীবনোদ্ধার—কপালকুণ্ডলার সহিত বিবাহ ও সস্ত্রীক দেশে আগমন সময়ে, চটিতে অপরিচিতা লুৎফউন্নিসার সহিত সাক্ষাৎ—লুৎফউন্নিসার সপ্তগ্রামে আগমন ও তাঁহার নবকুমারের সহিত আত্মসম্বন্ধ প্রকাশ—কাপালিকের আগমন ও তাঁহার প্ররোচনায় এবং পদ্মাবতীর কৌশলে কপালকুণ্ডলার চরিত্র বিষয়ে নবকুমারের সন্দেহ—সে সন্দেহ ভঞ্জন হইবামাত্র সহসা জাহ্নবী-গর্ভে পতিত হইয়া কপালকুণ্ডলার অকাল মৃত্যু প্রভৃতি সমস্ত কথাই উমাপতি জ্ঞাত ছিলেন। তিনি নবকুমারের অবস্থা চিন্তা করিয়া অতিশয়

---

*I pity her, I blame her, and am her support.

দুঃখিত ছিলেন। নবকুমারের শোক-বিহ্বল-চিত্তকে প্রকৃতিস্থ করিবার নিমিত্ত, তিনি সর্ব্বদা বিস্তর প্রবোধ দিতেন। কিন্তু তাঁহার প্রবোধ সমস্ত ব্যর্থ হইত। নবকুমারের হৃদয় মৃন্ময়ীর সহিত গঙ্গা-গর্ভে বিসর্জ্জিত হইয়াছে। শুষ্ক-দেহ অবশিষ্ট আছে মাত্র। তাহাতে উপদেশ-বীজ বপন করিলে অঙ্কুরের প্রত্যাশা বৃথা। এ কথা উমাপতি বুঝিতেন; তথাপি দীর্ঘকাল প্রবোধ দিলে যদি উপকার সম্ভব, এই বিবেচনায় তিনি কখনই উপদেশ দিতে ক্ষান্ত থাকিতেন না। পুনরায় বিবাহ করিয়া সংসারী হইবার জন্য তিনি নবকুমারকে সবিশেষ অনুরোধ ও বিবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহার সকল প্রযত্নই বিফল হইয়াছে।

গঙ্গাতীরে পদ্মাবতীর সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হওয়ার বিবরণ নবকুমার অদ্য উমাপতিকে বলিলেন। তথায় তাহাদের উভয়ের যে সমস্ত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহাও তাহাকে যথাযথ জানাইলেন। পদ্মাবতীর আগমন ও তাঁহাদের সমস্ত কথোপকথন এবং পদ্মাবতীর সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় প্রভৃতি যে সমস্ত কথা নবকুমারকে শ্যামা বিদিত করিয়াছিলেন, নবকুমার সে সকলও প্রিয় বয়স্যকে জানাইলেন। উমাপতি অনেকক্ষণ চিন্তার পর কহিলেন,—"ভাই নবকুমার পদ্মাবতীর মনের ভাব বুঝিতেছ কি? পদ্মাবতী পূর্ব্বে সম্পূর্ণ অসতী থাকিলেও, তাঁহার মন যে এক্ষণে বিশুদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে আর আমার সন্দেহ নাই।"

নবকুমার বলিলেন,—"আমার মনেও অবিকল ঐ সিদ্ধান্ত হইয়াছে। পদ্মার এক্ষণে মনের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, গত কার্য্য সকলের নিমিত্ত তাহার যথেষ্ট অনুতাপ জন্মিয়াছে। পূর্ব্বকৃত পাপকার্য্য সমূহের জঘন্যতা অনুভব করিয়াছে; পদ্মা সে সকলের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত। পদ্মা এক্ষণে ধর্ম্মের কাঙালিনী—পতিপদ ভিখারিণী। এই জন্য সে আগ্রার রাজভোগ ত্যাগ করিয়াছে। তাঁহার মানসিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে দয়া হয় সত্য, কিন্তু একটী কারণে পদ্মা আমার চক্ষু-শূল হইয়াছে। পদ্মাই তো মৃন্ময়ীর অকাল মৃত্যুর কারণ। সে, ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করিয়া, মৃন্ময়ীর সতীত্বপক্ষে ভ্রমপূর্ণ সন্দেহ সমুৎপাদন করিয়া দিল। সে যদি সেরূপ না করিত, তাহা হইলে এ সকল দুর্ঘটনা কিছুই ঘটিত না। সেই তো, কাপালিকের সহিত মন্ত্রণা করিয়া, এই অশুভ ঘটাইল। ভ্রাতঃ! তুমি তো সকলই জান। আমার হৃদয়ে সে ঘটনাটী শেল স্বরূপে বিদ্ধ রহিয়াছে।"

উমাপতি কহিলেন,—"নবকুমার! তুমি যাহা কহিলে তাহা সত্য। পদ্মাবতী সে বিষয়ে কিয়ৎপরিমাণে অপরাধিনী, তাহা স্বীকার করি। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি—কাহার অপরাধ অধিক? তোমার বুদ্ধিভ্রংশ হওয়াই সে দুর্ঘটনার প্রধানতম কারণ নয় কি? কাপালিক প্রদত্ত তীব্র সুরা-সেবনে, তুমি অজ্ঞানান্ধ হইলে, তোমার হিতাহিত বিবেচনা রহিত হইয়া গেল, কাপালিককে তুমি ইষ্টদেবতা জ্ঞান করিতে লাগিলে; তাহার কথা তোমার দেব-বাক্য বলিয়া বিশ্বাস হইল; সে তোমাকে যাহা বলিল, তুমি তাহাই শুনিলে। সে বলিল,—'মৃন্ময়ী দুশ্চরিত্রা,—ঐ ব্রাহ্মণ তাহার প্রণয়ী', তুমি তাহাই বিশ্বাস করিলে। সে বলিল—'মৃন্ময়ীকে আর তুমি গৃহে লইও না', তুমি তাহাতেই সম্মত হইলে। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি, কাহার অপরাধ অধিক?

কাপালিক ও ব্রাহ্মণবেশী পদ্মাবতী, এতদুভয়ের অধিক দোষী কে? তুমি একটী কথাও মৃন্ময়ীকে জিজ্ঞাসা করিলে না। মৃন্ময়ীর দোষ সত্য, কি না, জানিলে না। যখন জিজ্ঞাসা করিলে ও যখন তোমার সন্দেহ তিরোহিত হইল, তখন বিধাতা মৃন্ময়ীকে আজন্ম ক্লেশ, দারুণ অপবাদ প্রভৃতি হইতে নিস্তার করিবার নিমিত্ত, সাদরে স্বক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন। মৃন্ময়ী বিধি-বিপাকে গঙ্গাজলে নিপতিতা হইলেন। কাপালিক-প্রদত্ত সুরার তেজ তখন তোমাকে কিয়ৎপরিমাণে ত্যাগ করিয়াছিল; তোমার জ্ঞানোদয় হইল। তুমি 'হা মৃন্ময়ী!' বলিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলে। কিন্তু অকালে জাগরূক হওয়ায় যে ফলোদয় সম্ভাবিত, তোমার তাহাই হইল। তুমি আর মৃন্ময়ীকে পাইলে না। স্রোতস্বিনীর গভীর গর্ভ-নিপতিতা অবলাকে উদ্ধার করা কি কখন সম্ভব? কাপালিক যত্ন করিয়া, তোমাকে জল হইতে উত্তোলন করিল। তুমি তখন মৃন্ময়ী! মৃন্ময়ী! মৃন্ময়ী! শব্দে রোদন করিতে লাগিলে। সে রোদনের ফল কি? বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি, মৃন্ময়ীর শোচনীয় মৃত্যু-সম্বন্ধে পদ্মাবতীর অপরাধ কত অল্প! পদ্মাবতী পুনরায় স্বামী-লাভ করিবার পথ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে ছিল,—সে পথের প্রধান কণ্টক মৃন্ময়ী। কোনরূপে মৃন্ময়ীকে স্বামি-প্রেম বঞ্চিতা করিতে পারিলে, তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেও হইতে পারে। এই সময়ে সে দেখিল, মৃন্ময়ী আরও এক ব্যাধের লক্ষ্য। সে ব্যক্তি কাপালিক। পদ্মা তাহার সহিত যোগ দিল। পদ্মা ঘোরতর দুশ্চরিত্রা বটে, তথাপি তাহার মন অবলার মন। এককালে মৃন্ময়ীর জীবনহানি করা তাহার অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয় না। মৃন্ময়ীকে স্বামি-প্রেম-বিমুক্তা করাই তাহার উদ্দেশ্য, ইহা আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। কেমন তোমার কি ইহা বোধ হয় না?"

নবকুমার সমস্ত কথা মনোযোগ দিয়া শুনিলেন। কথা শুনিতে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। ভ্রান্তি-মূলক সংস্কার অন্তর্হিত হইল। তিনি একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"উমাপতি! তুমি যাহা বলিলে তাহাই বটে। এ বিষয়ে পদ্মার দোষ অতি অল্প; এমন কি নাই বলিলেও হয়। আমি তাহার প্রতি অন্যায় দোষারোপ করিয়াছিলাম। আমিই পাপী—পদ্মা নহে। পদ্মা আপনার উদ্দেশ্য-সাধান চেষ্টা করিয়াছিল—সংসারে স্বীয় উদ্দেশ্য-সাধনে কে না চেষ্টা করে? আমার পাপ অতি গুরুতর; কি করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে? আমার যে নরকেও স্থান হইবে না।"

উমাপতি দেখিলেন নবকুমারের অত্যন্ত শোক উপস্থিত; এজন্য তাঁহাকে তদ্বিষয়ে অধিক আলোচনা করিতে না দিয়া কহিলেন,—"নবকুমার! পদ্মাবতী প্রকৃত অপরাধী নহে, তাহা তুমি বুঝিয়াছ। বিধাতা এক্ষণে তাহাকে অনুতাপানলে দগ্ধ করিতেছেন। তাহার অন্তরে বিষধর ভুজঙ্গম সকল দংশন করিতেছে; যন্ত্রণার সীমা নাই। তাহার ইহ জন্মে যে কিছু শান্তি, তুমিই তাহার একমাত্র উপায়। পতিলাভ লালসাই তাহার প্রধান আকাঙ্ক্ষা; অতএব তাহার অবস্থা একটু বিবেচনা করা উচিত। যদি কোন উপায়ে তাহার বিপুল ক্লেশ-ভারের কিয়ৎপরিমাণে লাঘব করিতে পার, তাহা কি তোমার কর্ত্তব্য নয়?"

নবকুমার উত্তর করিলেন,—"ভাই উমাপতি! আমি তাহা বুঝিতেছি; কিন্তু তৎপ্রতিকারের কোন উপায়ই দেখিতেছি না।

আমি তাহার সমস্ত পাপ ক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছি। তুমিও না হয় তাহার সে সকল কার্য্য বিস্মৃত হইলে; কিন্তু লোকে তাহাকে ক্ষমা করিবে কেন? সে যবনী ম্লেচ্ছা, আচারভ্রষ্টা, দুশ্চরিত্রা, তাহাকে অন্যে ক্ষমা করিবে কেন? তুমি কাহার মুখে হাত দিবে? পদ্মাবতীর জন্য আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব এবং জাতীয় সমাজ ত্যাগ করা কি শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে?"

উমাপতি কহিলেন—"তাহা বটে। কিন্তু আমার পরামর্শ মন্দ নয়। তুমি পদ্মাবতীকে পত্নী বলিয়া শ্রদ্ধা করিলে এবং তোমাকে সময়ে সময়ে দেখিতে পাইলেই পদ্মাবতী চরিতার্থ হইবে। কেমন এই কি তাহার চরম আশা বলিয়া বোধ হয় না? যদি ইহাই হয় তাহা হইলে আমার পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিলে সকল দিক্ বজায় থাকিবে। পদ্মাবতী যেমন স্বতন্ত্র বাটিতে রহিয়াছেন, তেমনই থাকুন।"

নবকুমার অনেকক্ষণ স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া কহিলেন,—"বিবেচনা করিয়া যাহা ভাল হয় তাহা করিলেই চলিবে। আপাততঃ বেলা অধিক হইল। চল গৃহাভিমুখে যাওয়া যাউক।"

এই বলিয়া উভয়ে ঐ সম্বন্ধে বিবিধ কথা-বার্ত্তার আন্দোলন করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সিদ্ধ-সঙ্কল্পে।

Live while ye may,
yet happy pair; enjoy
Short pleasures, for long
woes are to succeed."

—Milton.

সম্মুখে যে সুন্দর সৌধটী দেখা যাইতেছে। পাঠক মহাশয়েরা অবগত আছেন, উহাই পদ্মাবতীর আবাস। ইহারই একতম প্রকোষ্ঠে এক্ষণে একটী যুবক একখানি পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট রহিয়াছেন; একটি সুন্দরী যুবতী, যুবকের পদদ্বয়ে স্বীয় বদনকমল রক্ষা করিয়া, নয়ন-জলে তাহা সিক্ত করিতেছেন। যুবক ও যুবতী নবকুমার ও পদ্মাবতী, ইহা আর বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই।

নবকুমার পদ্মাবতীর হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে পার্শ্বে বসাইলেন। পদ্মার রোদন তখনও থামে নাই। পদ্মা কর-পল্লবে বদন আবৃত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার মৃণালবিনিন্দিত বাহুবল্লী বহিয়া মুক্তাফলের ন্যায় অশ্রুবিন্দু সকল নিঃসৃত হইতে লাগিল। নবকুমার বলিলেন,—"পদ্মা! বৃথা রোদনে প্রয়োজন কি? সময় অতীত হইলে বিবেচনা অনর্থক। এক্ষণে উপস্থিত মত সদুপায় চিন্তা কর। যাহাতে পরিণাম সুখে অতিবাহিত হয়, তাহার উপায় চেষ্টা কর।"

পদ্মা রোদন-সংবরণ করিয়া কহিলেন,—"নাথ! উপায়, অনুপায় সমস্তই তোমার হাত। দাসীর জীবন তোমারই পদ-তলে

নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ইচ্ছা হয় রাখ, না হয় মার। তাহাতে আর আমার দুঃখ নাই। আশা ছিল, এ পাপ জীবনে একদিন পতি পদ চুম্বন করিয়া সুখী হইব, অদ্য তাহা সফল হইয়াছে। আর জীবনের মায়া নাই। আর মৃত্যুতে কাতরা নই। এখন মৃত্যু হইলে অপেক্ষাকৃত সুখে মরিতে পারিব। যদি বল তবে কাঁদিতেছ কেন? তাহার উত্তর এই ;—নাথ! অদ্য তোমার চরণ-তলে স্থান পাইয়া আমি যে পরিমাণে সুখ লাভ করিলাম, সমস্ত জীবন মধ্যে একদিনও সেরূপ সুখ সম্ভোগে সমর্থ হই নাই। আপাততঃ যাহা সর্ব্বসুখাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়, আমি সেই সুখের অনুসরণে ক্রমেই অধিকতর পাপ-পঙ্কে পরিলিপ্ত হইয়াছিলাম। এক্ষণে দেখিতেছি, পতি-পদে স্থান প্রাপ্তা সতীর সুখের তুলনায় সে সুখ কি ঘৃণিত! কি অকিঞ্চিৎকর! জীবিতেশ! আমি সেই ঘৃণিত সুখের লালসায় জীবনের প্রধান সময় অতিবাহিত করিয়াছি। তাহাতে ইহলোক পরলোক উভয় লোকেই সুখের আশা তিরোহিত হইয়াছে। নাথ! আমি তাই ভাবিয়া কাঁদিতেছি! আমি এত দিন এ পাপ জীবন কোন কালে ত্যাগ করিতাম। যে আশায় এত দিন তাহা করি নাই, তাহা অদ্য সফল হইল। আমার অপর আশা নাই। আমি অদ্য তোমার নিকট যে অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি, তাহাই যথেষ্ট, অধিক অনুগ্রহ আকাঙ্ক্ষা করি না।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া পদ্মা আর বলিতে পারিলেন না। আহ্লাদে, শোকে, ক্ষোভে, মনস্তাপে ও অনুতাপে তাঁহার মনে এক অভিনব অসহনীয় ভাব-ঝটিকা প্রবাহিত হইতে লাগিল। এক কালে এত বিভিন্ন ভাব তাঁহার মনে প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল যে, তাহাদের প্রকোপ সহ্য করা নিতান্ত ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরও অসাধ্য। সামান্যা রমণী তাহা কি প্রকারে সহ্য করিবে? পদ্মাবতীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, মাথা ঘুরিতে লাগিল। তিনি স্থির হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু পারিলেন না। তাঁহার চৈতন্য তিরোহিত হইয়া আসিল। ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে পদ্মাবতীর চৈতন্যহীন জড় দেহ নবকুমারের পদপ্রান্তে নিপতিত হইল। নবকুমার পদ্মাবতীকে উত্তোলন করিবার নিমিত্ত হস্ত প্রসারণ করিলেন; দেখিলেন পদ্মাবতী চেতনশূন্যা। সহসা এবংবিধ বিপৎসমাগম দর্শনে নবকুমার ব্যস্ত হইয়া দাসীদিগকে আহ্বান করিলেন। তাহারা তৎক্ষণাৎ জল ও তালবৃন্তাদি আনয়ন করিয়া মূর্চ্ছিতার শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করিল। নবকুমার স্বয়ং যথাসাধ্য যত্নে পদ্মার মূর্চ্ছাপনোদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অনেক চেষ্টাতেও পদ্মার চৈতন্য-লক্ষণ দৃষ্ট হইল না। নবকুমারের চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল, ক্রমে গণ্ডদেশ বহিয়া অশ্রু পতিত হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে পদ্মাবতী একটী নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। নবকুমারের বদন প্রফুল্ল হইল। ক্রমে পদ্মার চৈতন্য হইতে লাগিল, তাঁহার শিরা সকলে রক্তের গতি দেখা গেল, গণ্ড আরক্ত হইল ক্রমে চক্ষু উন্মীলন করিলেন। নবকুমার পদ্মাবতীকে পুনরায় চেতন দেখিয়া আনন্দে পূর্ব্বাপর বিস্মৃত হইলেন। পদ্মাবতীর উপর যে বিদ্বেষ ছিল, তাহা এই ঘটনায় তিরোহিত হইয়া গেল। তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া মুক্তকণ্ঠে কহিলেন,—"প্রাণেশ্বরি! তোমার সহস্র অপরাধ থাকিলেও আমি ক্ষমা করিলাম। প্রিয়ে তুমি রমণী-রত্ন! তোমাকে আমি বিস্তর ক্লেশ দিয়াছি। সংসার যায়,

থাকুক; লোকসমাজে অপমানিত হই, হইব; অদৃষ্টে যাহা থাকে, হউক; অদ্য প্রকাশ্যে বলিতেছি,—পদ্মাবতি! তুমি আমার পত্নী। তোমাকে আর কষ্ট দিব না।”

পদ্মাবতী তীব্রবেগে উঠিয়া দাসীগণকে অপসৃত হইতে আজ্ঞা করিলেন এবং স্বীয় সুগোল নবনীতনিভ ভুজযুগল দ্বারা নবকুমারের গলদেশ বেষ্টন করিয়া, তাঁহার বক্ষ মধ্যে মস্তক বিন্যস্ত করতঃ কহিলেন,—নাথ! এ অভাগিনীর কপালে এত সুখ আছে, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই! আমি কি স্বর্গে না সংসারে? আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি, মায়ার মোহিনী ক্ষমতা কি আমার চক্ষুকে আবরণ করিয়াছে?”

অপরাধ করিয়া অপরাধী যদি সরলতা সহকারে স্বীকার না করে এবং তজ্জন্য লজ্জিত হইয়া বিনীত ও ভদ্র ব্যবহার না করে, তাহা হইলে সংসারে তাহার দুর্দ্দশার ইয়ত্তা থাকে না। এক জনের দোষ দেখিলে, ক্ষতিবৃদ্ধি হউক বা না হউক, সকলেই তাহার উপর কুপিত ও বিরক্ত হয় সত্য, কিন্তু দোষী ব্যক্তি যদি ব্যক্তিসাধারণকৃত ঘৃণা ও অপমানাদি সহ্য করিয়া থাকিতে পারে, যদি পুনরায় স্বীয় সততার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারে, এবং যদি স্বীয় অপরাধ স্বীকার করিয়া বিনীত-ভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহা হইলে কুপিত ও বিরক্ত ব্যক্তিরাও দয়া করে। লোকে আর তাহাকে ঘৃণা করে না। তাহার অপরাধ ক্রমে বিস্মৃতিসাগরে ডুবিয়া যায়। তাহার গুণে কলঙ্ক ঢাকা পড়ে।

পদ্মাবতীর ঘটনাই ইহার সুন্দর দৃষ্টান্ত-স্থল। পদ্মাবতীর সহিত সাক্ষাৎ করাও নবকুমার দারুণ লজ্জার বিষয় মনে করিতেন। তিনি তাহাকে ঘৃণা করিতেন, কখন তাহার সহিত সম্পর্ক ছিল, ইহা মনে করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন। কিন্তু পদ্মার একান্ত পতি-পদচিন্তা, পূর্ব্বকৃত পাপসমূহের নিমিত্ত বিলক্ষণ অনুতাপ, সতীধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত সমস্ত ভোগসুখ ত্যাগ প্রভৃতি দর্শনে নবকুমারের চিত্ত ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইল। তাহার প্রতি দয়া জন্মিল। পদ্মাবতী যে নবকুমারকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, তাহার সন্দেহ নাই। প্রেমের বিনিময়ে প্রেম আবশ্যক। পদ্মাবতী যদি নবকুমারকে ভাল বাসিতেন, তাহা হইলে নবকুমার অবশ্যই তাহার বিনিময় করিতেন। কই তাহা ত তিনি করেন নাই। —অবশ্যই নবকুমার তাহার বিনিময় করিয়াছিলেন; কিন্তু সেটি প্রকারান্তরে; তাঁহার অন্তরে অন্তরে পদ্মার প্রতি যে ঘৃণা, দ্বেষ, অভিমান প্রভৃতি হইয়াছিল, তাহা প্রণয়েরই রূপান্তর মাত্র! প্রণয়ই উহার বীজ। যাহার সহিত মনুষ্যের কোন সংস্রব নাই, তাহার দোষ গুণে কে আস্থা করে? নবকুমারের প্রণয় তাঁহার প্রাণেই ছিল, অন্যে জানিতে পারে নাই।

প্রণয়ী স্বয়ং সকল সময়ে প্রণয়াস্পদের প্রতি তাঁহার প্রণয়ের পরিণাম বুঝিতে পারেন না। দিন দিন তিল তিল করিয়া প্রণয় বর্দ্ধিত হয়। প্রণয়ী প্রথমে এইমাত্র বুঝিতে পারেন যে, আমি উঁহাকে ভালবাসি। কিন্তু সে ভালবাসার পরিণাম কি, তাহা তিনি তখন জানিতে পারেন না। যদি সহসা প্রণয়াস্পদের সহিত বিরহ হয়, যদি সহসা তাহার কোন বিপদ উপস্থিত হয়, তখনই হৃদয় শোকাকুল হইয়া তাহার প্রতি প্রণয়ের পরিমাণ প্রকাশ করিয়া দেয়। এই নিয়ম অনুসারে পদ্মাবতীকে নবকুমার কি পরিমাণে ভাল বাসিতেন, পূর্ব্বে তাহা জানিতে পারেন

নাই। অন্ত পদ্মাবতীর পীড়ায় তাহা প্রকাশ করিয়া দিল।

যে নবকুমার কিছুদিন পূর্ব্বে পদ্মাবতীকে যতদূর সম্ভব ঘৃণা করিতেন, ক্রমে পরিবর্ত্ত-বিলাসী কাল তাঁহারই হৃদয় আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত করিল। তিনি ক্রমে ঘৃণা করুণায় এবং অশ্রদ্ধা শ্রদ্ধায় পরিণত করিলেন; ক্রমে তাঁহার অজ্ঞাতসারে হৃদয় তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইল। আবার—এখন সেই নবকুমার সেই পদ্মাবতীর জন্য কাঁদিতেছেন; তাহার জন্য আত্মীয়, সমাজ, জাতি, কুটুম্ব, বন্ধু, বান্ধব সমস্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন; তাঁহাকে সানন্দে আলিঙ্গন করিতেছেন। কাল তুমিই ধন্য!

কপালকুণ্ডলা (মৃন্ময়ী) এসময় কোথায় তুমি? অতলজলে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছ,—দেখিতে পাইতেছ না! এক দিন কাপালিকের ভয়ানক খড়্গ মুখ হইতে যাহাকে রক্ষা করিয়াছিলে, সেই অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি একবার তোমাকে মন দিয়া, আবার কাড়িয়া লইয়া অপরকে অবাধে তাহা দান করিতেছে। সত্যই কি নবকুমার পদ্মাবতীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া কপাল-কুণ্ডলাকে বিস্মৃত হইলেন? না, তাহা নহে। পূর্ণ-চন্দ্র-বিরাজিত নভোমণ্ডলে সহসা একখানি মেঘ উদিত হইয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত বিশ্বসংসারকে তমসাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। সংসার কি তাই বলিয়া চিরকাল অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে? তাহা থাকে না। যতক্ষণ মেঘ থাকে, সংসারে ততক্ষণ অন্ধকার থাকে। মেঘও সরিয়া যায়, আবার সংসারে দিব্য আলোক ও প্রকাশ পায়; আবার চন্দ্র ও তারাগণ কিরণ বর্ষণ করে। যতক্ষণ মেঘ থাকে ততক্ষণই কি চন্দ্র-তারার কার্য্য বন্ধ থাকে? তাহাও থাকে না। তাহারা অদৃশ্য থাকে মাত্র। নবকুমারের হৃদয়াকাশের অবস্থাও সেইরূপ। তথায় মৃন্ময়ীর প্রণয়-চন্দ্রিকা পূর্ণ দীপ্তি বিকীর্ণ করিতেছিল; সহসা পদ্মাবতীর প্রণয় মেঘ স্বরূপে উপস্থিত হইয়া তাহাকে আবরণ করিল। যতক্ষণ ইহা থাকিবে ততক্ষণ তাহা আবরিত থাকিবে মাত্র, তাহার কার্য্য বন্ধ হইবে না। তাহা মেঘাবৃত চন্দ্রের ন্যায় অদৃশ্য ভাবে স্বীয় কার্য্য সাধন করিবে।

নবকুমার ও পদ্মাবতী বাহ্যজ্ঞান বিরহিত হইয়া ভাবসাগরে ভাসিতেছেন, এমন সময়ে একটি অভাবনীয় ঘটনা, তাঁহাদের আনন্দের বাধা জন্মাইল। নবকুমার শুনিতে পাইলেন, প্রকোষ্ঠান্তর হইতে উমাপতি তাঁহাকে ডাকিতেছেন। কথা কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র পদ্মাবতী ব্যস্ততা সহকারে নবকুমারের গলদেশ হইতে হস্ত গ্রহণ করিলেন। এমন সময়ে পেষমন্ আসিয়া বলিল,—"বিশেষ প্রয়োজনের নিমিত্ত একটী লোক আপনাকে ডাকিতেছেন।'

নবকুমার, অগত্যা ব্যস্ত হইয়া, গাত্রোত্থান করিলেন, এবং পদ্মাবতীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। পদ্মাবতী, অন্য উপায়াভাবে, অনিচ্ছায় বিদায় দিলেন এবং কহিলেন, —"নাথ! দাসীকে ভুলিও না। ইহাই শ্রীচরণে প্রার্থনা।"

নবকুমার পদ্মাবতীকে বুঝাইয়া এবং অবিলম্বে আহ্বানের কারণ জানাইতে প্রতিশ্রুত হইয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

পদ্মাবতীর সুখ-সূর্য্য উদয় হইতে না হইতেই, অকাল জলদজালে আচ্ছন্ন হইল। তিনি অতি কষ্টে মালা রচিত করিয়া গলদেশে ধারণ করিবেন, এমন সময় তাহা ছিন্ন হইয়া গেল! তিনি বিপুল পরিশ্রমে যে যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া-

ছিলেন, তাহা কর্ম্মক্ষম হইবার সময়েই, অভিনব বাধা সমুৎপন্ন হওয়ায় তাহার কার্য্য বন্ধ হইয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নব-বিপদে।

—"deep troubles toss'
Loud sorrows howl, envenom'd passons bite
Ravenous cayamities our vitals seize,
And threatening fate wide opens to —devour"
—Young.

নবকুমার বাহিরে আসিয়া দেখিলেন তথায় উমাপতি নাই। জিজ্ঞাসায় জানিলেন তিনি অগ্রসর হইয়াছেন। নবকুমার ব্যস্ত হইয়া বাটী আসিলেন। তথায় উমাপতিকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে বিমর্ষ ভাবাপন্ন দেখিয়া নবকুমার সোদ্বেগে জিজ্ঞাসা করিলেন, —"ভ্রাতঃ! কি হইয়াছে? আমাকে কেন ডাকিতে গিয়াছিলে। তুমি বিমর্ষ কেন?"

উমাপতি কহিলেন,—"তোমাকে ডাকিয়াছি—কারণ আছে। বলিতেছি চল।"

উভয়ে গৃহ প্রবিষ্ট হইয়া উপবেশন করিলে উমাপতি কহিলেন,—"ক্ষণপূর্ব্বে নবদ্বীপ হইতে সংবাদ আসিয়াছে, তোমার ভগ্নীপতি মথুরানাথ অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছেন। তাঁহার লিখিত পত্র এই রহিয়াছে, দেখিলেই জানিতে পারিবে। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণের নিমিত্ত তোমাকে ডাকিয়াছিলাম।"

এই বলিয়া উমাপতি নবকুমারের হস্তে একখানি পত্র দিলেন। নবকুমার তাহা খুলিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন,—

"প্রণামান্তে নিবেদনমেতৎ,

সম্প্রতি আমি শঙ্কটাপন্ন পীড়িত হইয়াছি। এ ব্যাধির হস্ত হইতে নিস্তারের আশা দুরাশা। একবার অন্তিম সময়ে আপনাকে ও আপনার ভগ্নীকে দেখিতে ইচ্ছা করি। অতএব যদি বিশেষ অসুবিধা না হয়, তাহা হইলে পত্র পাঠ মাত্র আপনারা উভয়ে আসিয়া একবার দেখা দিয়া সন্তুষ্ট করিবেন। আর কি বলিব? অতি কষ্টে লিপি সমাধা করিলাম। ইতি তারিখ ২৭শে চৈত্র।

পত্র পড়িয়া নবকুমারের চক্ষুতে জল থামিল না। যখন পত্র অধীত হয়, শ্যামা অন্তরাল হইতে সমস্ত শুনিলেন। কিন্তু তিনি এক্ষণে কাঁদিতেছেন না। তাঁহার অন্তরের এখন যে অবস্থা, সে অবস্থায় রোদন আইসে না। যখন অসহ্য মানসিক ক্লেশ ঈষৎ শিথিল হয়, তখনই রোদনের সময়। শ্যামার হৃদয়ে এখন যে যন্ত্রণা হইতেছে তাহা কাঁদাইবার নহে। ইতিপূর্ব্বে প্রথমে উমাপতির মুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া, তিনি একবার কাঁদিয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহার চক্ষু এক্ষণে প্রস্ফুটিত জবাকুসুমের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে।

উমাপতি কহিলেন,—"ভাই কাতর হইও না। স্থির হইয়া কর্ত্তব্য অবধারণ কর।"

নবকুমার কহিলেন,—"যাওয়া স্থির করিতে হইতেছে।"

উমা। আমি বলি অদ্য আহারাদির পরই তোমরা নবদ্বীপ যাত্রা কর।

নব। হাঁ, সেই ভাল। এক্ষণে নৌকা আবশ্যক।

উমা। আমি নৌকা স্থির করিয়া আসিতেছি। তোমরা অবিলম্বে আহারাদি শেষ করিয়া লও।

উমাপতি প্রস্থান করিলেন। নবকুমার ও শ্যামা সত্বর প্রস্তুত হইলেন! অনতিবিলম্বে উমাপতি নৌকা স্থির করিয়া আসিলেন। নবকুমার ও শ্যামা যাত্রা করিলেন। উমাপতি নৌকা পর্য্যন্ত তাঁহাদের সঙ্গে গেলেন। উমাপতি কহিলেন,—"নবকুমার! শীঘ্র সংবাদ পাই যেন!"

"তাহা পাইবে।" এই বলিয়া নবকুমার উমাপতির নিকটস্থ হইয়া তাঁহার কাণে কাণে কহিলেন,—"যদি পায় তবে পদ্মাবতীকে এ সংবাদটী দিও।"

উমাপতি স্বীকার করিলেন। নবকুমার, শ্যামা, একজন চাকর, নবদ্বীপ হইতে আগত ব্যক্তি এবং এক জন দাসী নৌকায় উঠিলেন; নৌকা সপ্তগ্রাম ত্যাগ করিল।

আমরা এই সময়ে পাঠক মহাশয়কে শ্যামাসুন্দরীর শ্বশুরালয় সম্বন্ধীয় দুই একটী কথা বলিয়া রাখি। শ্যামার যখন নয় বৎসর বয়ঃক্রম তখন নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীযুক্ত মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। মথুরানাথ তৎকালে চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়স্ক মাত্র। মথুরানাথের পিতা অত্যন্ত কুলাভিমানী। তিনি শ্যামার সহিত বিবাহের পর মথুরানাথের ক্রমান্বয়ে আবার দুইটী বিবাহ দিয়াছিলেন। শ্যামা সম্পন্ন লোকের দুহিতা, তাঁহার অন্ন বস্ত্রের কষ্ট হইবে না, একথা মথুরানাথের পিতা জানিতেন। সুতরাং তিনি শ্যামাকে স্বগৃহে আনেন নাই। মধ্যে মধ্যে মথুরানাথ সপ্তগ্রামে শ্বশুরগৃহে আসিতেন। মথুরানাথের অপর দুই পত্নী তাঁহার গৃহেই থাকিতেন। এই দুই রমণীর স্বভাব সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাবাপন্ন ছিল; তাহাতে আবার সপত্নী সম্পর্ক; সুতরাং তাঁহারা যে সর্ব্বদা কলহ বিদ্বেষে কাল যাপন করিতেন তাহা বলা বাহুল্য। প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল, মথুরানাথের মধ্যমা স্ত্রী পরলোকগতা হইয়া সপত্নী যন্ত্রণা হইতে নিস্তার লাভ করিয়াছেন। মথুরানাথের তৃতীয়া স্ত্রীর নাম কুমুদিনী। কুমুদিনী দেখিতে অতি সুন্দরী। এক্ষণে তাঁহার বয়স ষোড়শ বর্ষ হইবে। তাঁহার অনেকগুলি গুণ ছিল। কিন্তু যে সকল গুণে শ্যামার অন্তর শোভিত ছিল, তাহাদের সহিত তুলনায় কুমুদিনীর গুণ সকল নিকৃষ্ট বলিয়া প্রতীত হইবে। মথুরানাথ শ্যামার সৌন্দর্য্য কখন বিস্মৃত হন নাই। তিনি তাদৃশ ধনী ছিলেন না এবং পিতার অমতেও কোন কর্ম্ম করিতেন না; এজন্য তিনি সর্ব্বদা শ্যামাকে দেখিতে পাইতেন না। যে বৎসরে তাঁহার মধ্যমা স্ত্রীর বিয়োগ হয়, সেই বৎসরেই তাঁহার পিতা গঙ্গালাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার পরই মথুরানাথের এমন কতকগুলি বিপৎপাত হয় যে, তাঁহাকে এপর্য্যন্ত শ্যামার দর্শনলাভে বঞ্চিত থাকিতে হইয়াছিল। সম্প্রতি রুগ্ন-শয্যায় পতিত হইয়া তিনি শ্যামাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন।

এতদ্ভিন্ন মথুরানাথের সংসারে তাঁহার বিধবা মাতা ছিলেন। তিনি একবার মাত্র প্রথমা পুত্রবধূ শ্যামাকে দেখিয়াছিলেন, তখন শ্যামা বালিকা। নবকুমার সময়ে সময়ে দুই একবার নবদ্বীপ গমন করিয়াছিলেন। মথুরানাথের মাতা তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। মথুরানাথ স্বয়ং অতি সুপুরুষ ছিলেন। তিনি বিদ্যার সুমিষ্ট আস্বাদ বিশেষরূপে জানিতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি অতি মিষ্টভাষী ও সুরসিক ছিলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিজন-বনে।

—"হেরিনু সুন্দরী
বামারে, মলিন-মুখী, শরদের শশী,
রাহুর তরাসে যেন! সে বিরলে বসি,
মৃদু কাঁদে সুবদনা; ঝর ঝর ঝরি,
গলে অশ্রু-বিন্দু, যেন মুক্তাফল খসি।"
মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

যে সময়ের ঘটনা সকল এই আখ্যায়িকায় বর্ণিত হইতেছে সে সময়ে সপ্তগ্রামের প্রায় তিন ক্রোশ দক্ষিণে গোপালপুর নামে একটী গ্রাম ছিল। গ্রামটীতে অত্যন্ত বন। তথায় লোকের বাস অতি অল্প। পথ ঘাট ভাল নয়। গোপালপুরের প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ উত্তরে একটী নিবিড় বন ছিল। সে বনে দিবসেও মনুষ্য প্রবেশ করিতে শঙ্কিত হইত। এই বনের পার্শ্ব দিয়া গ্রামে গমনাগমনের একটী পথ ছিল সেই দস্যু, হিংস্র জন্তু প্রভৃতি নানাবিধ ভয়-সঙ্কুল পথে পান্থগণ সহজে পদার্পণ করিত না। নিতান্ত প্রয়োজন হইলে, অথবা অনেকে একত্র দল-বদ্ধ থাকিলে, সে পথ দিয়া যাতায়াত করিত।

বেলা নাই। সূর্য্যদেব পাটে বসিবার অনুষ্ঠান করিতেছেন। পক্ষিগণ নানা দেশ হইতে উদরপূর্ণ করিয়া আসিয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কুলায়ে আশ্রয় লইতেছে। হঠাৎ গ্রামমধ্যে কতকগুলি কুক্কুর এককালে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া উঠিল। তাহাদের রব, প্রতিধ্বনিত হইতে হইতে, অরণ্য পর্য্যন্ত আসিল। এক জন নিশ্চিন্ত ও সানন্দ কৃষক, স্বীয় গাভী সকল বাটী লইয়া যাইতে যাইতে, মনের সুখে রাধা-শ্যামের প্রেম-ব্যঞ্জক গীত গাইতেছে। তাহার সেই উচ্চরবে বন প্রমোদিত হইতেছে। বনের অনতিদূরে একটী পথহারা দলভ্রষ্টা গাভী শঙ্কিত নয়নে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিতেছে। যাহার গাভী হারাইয়াছে সে অরণ্যের পথে অনেক দূরে অগ্রসর হইয়া, "শুকি! শুকি!" বলিয়া চীৎকার করিল। পালক-কণ্ঠ-নিঃসৃত পরিচিত স্বর শুকির কর্ণে প্রবেশ করিল; সে হম্বারবে সেই দিকে ছুটিল, একটী ঝোপের পার্শ্বে একটা শৃগাল বসিয়া সোৎসুক দৃষ্টিতে চারি দিক্ দেখিতেছে এবং সময়ে সময়ে মক্ষিকা ও মশার দংশন নিবারণ জন্য পুচ্ছ নাড়িতেছে, পদ দ্বারা গাত্র কণ্ডুয়ন করিতেছে, অথবা দংষ্ট্রা দ্বারা স্বীয় শরীরের স্থান বিশেষে দংশন করিতেছে। সহসা একটী নকুল ডাকিতে ডাকিতে পথের এক সীমা হইতে অপর সীমায় গমন করিল। ফলতঃ এই সময়ে এই বনের প্রকৃতি দর্শন করিলে মনে প্রীতি ও ভয় এই দুইটী নিতান্ত বিরোধী ভাব এককালে সঞ্চারিত হয়।

এইরূপ সময়ে এই পথে একটী যুবক গমন করিতেছেন দেখা গেল। এমন সময়ে এই বিপদ-সঙ্কুল পথে একাকী যুবক কেন যাইতেছেন? যে পথ মনুষ্য-সমাগম-বিরহে প্রায়শঃ বনাধিকৃত হইয়াছে, সে পথে সন্ধ্যা সময়ে একাকী মনুষ্য! যুবক সত্বর পদ-বিক্ষেপে গ্রামাভিমুখে গমন করিতেছেন। কিছুতেই তাঁহার লক্ষ্য নাই। সহসা তিনি স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার কর্ণে একটী শব্দ প্রবেশ করিয়াছিল; সেই শব্দ পুনরায় শ্রবণ করিবার নিমিত্ত তিনি উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন। অনতি বিলম্বে, ভীত-সংবলিত রোদন-ধ্বনি তাঁহার

কর্ণ-বিবরে প্রবেশ করিল। শব্দ রমণী-কণ্ঠ নিঃসৃত বলিয়া বোধ হইল। যুবক আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। এই ভয়াবহ বিপজ্জনক ঘোর বনে, অবলা বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া রোদন করিতেছে—কে তাহা শুনিয়া স্থির থাকিতে পারে? যুবক শব্দ লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে ধাবমান হইলেন এবং যতই নিকটস্থ হইতে লাগিলেন, ততই সেই অগোচরা রমণীর হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। যুবক বেগে চলিতে লাগিলেন। লতিকায় তাঁহার চরণ বদ্ধ হইতে লাগিল, তিনি তাহা সবলে ছিন্ন করিতে লাগিলেন; কণ্টকে তাঁহার শরীর ক্ষত-বিক্ষত হইতে লাগিল, তাহাতে তিনি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। ক্ষণ-বিলম্বে যুবক নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন। তথায় যে ভয়ানক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহাতে তাঁহার রোমাঞ্চ হইল। তিনি দেখিলেন—এক ভীষণ-দর্শন মনুষ্য ভয়চকিতা ও রোরুদ্যমানা এক সুন্দরী যুবতীর করাকর্ষণ করিয়া, বল প্রয়োগ করিতেছে। তরুণী কাঁদিতে কাঁদিতে উক্ত পিশাচের পদতলে পতিত হইতেছে এবং মধ্যে মধ্যে উচ্চ রোদনে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে। পামর, তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া, যুবতীকে যেরূপ শব্দে সম্বোধন করিতেছে এবং যেরূপ জঘন্য প্রস্তাবে যুবতীর সম্মতি পাইবার নিমিত্ত বিবিধ লোভজনক কথা বলিতেছে, তাহা শুনিলে নিতান্ত স্নিগ্ধ শোণিতও উত্তপ্ত হইয়া উঠে। রমণীর বিবিধ কাকুতি মিনতি কিছুই পাষণ্ডের হৃদয়ে স্থান পাইল না। নরাধম দেখিল তরুণীর চীৎকার পথ বন্ধ করিতে না পারিলে, তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব। এই বিবেচনায় দুর্বৃত্ত সুন্দরীর মুখ বাঁধিতে চেষ্টা করিল। যুবক আর থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার হস্তে এক যষ্টি ছিল। এই প্রহরণ মাত্র সম্বলে তিনি নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং দুরাত্মা সতর্ক হইতে না হইতেই তাহার শির লক্ষ্য করিয়া, যষ্টি দ্বারা ভীষণ প্রহার করিলেন। যষ্টি খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। পামর অত্যন্ত আঘাত পাইল। সে বাঙ্‌রহিত হইয়া বসিয়া পড়িল। যুবক তাহাকে চিন্তা করিতে সময় না দিয়া, তাহার দীর্ঘ কেশগুচ্ছ ধারণ করিয়া, তাহাকে ভূ-তলে শায়িত করিলেন ও তাহার বক্ষে জানু দিয়া উপবেশন করিলেন। পামর স্বীয় রক্তবর্ণ চক্ষু ঘূর্ণিত করিয়া যুবকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সে দৃষ্টির প্রত্যেক কণিকায় প্রবল বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা-কামনা প্রকাশিত হইতেছে! যুবক তাহাতে কাতর হইলেন না। ভীতা, সঙ্কুচিতা, সুন্দরীকে বিপন্মুক্ত করা হইল, ইহাতেই তাঁহার অপার আনন্দ জন্মিল।

সুন্দরী তরুণী এখনও অশ্বত্থ পত্রের ন্যায় কাঁপিতেছেন। যুবক তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। যুবতী অমনই মস্তক অবনত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। যুবক দেখিলেন রমণী অসামান্যা সুন্দরী, যৌবনোন্মুখী বালিকা। যুবতীর অসামান্য সৌন্দর্য্য যুবক-হৃদয়ে আঘাত করিল। তিনি বলিলেন,—"তোমার আর ভয় কি? এখনও কাঁপিতেছ কেন? যদি আপত্তি না থাকে আমাকে তোমার পরিচয় দেও; আমি তোমাকে নিরাপদে গৃহে রাখিয়া আসিতেছি।"

এই সময় সুসময় বোধে, যুবকের ভীষণ আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি লাভের নিমিত্ত, দুরাত্মা চেষ্টা করিতে লাগিল। যুবক বজ্র-গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—"দুর্বৃত্ত, স্থির থাক্, নচেৎ এখনই তোর জঘন্য জীবন যমালয়ে পাঠাইয়া জগতের পাপভার লাঘব করিতে সঙ্কোচ করিব না।"

এই বলিয়া যুবক প্রথমে তাহার পদদ্বয় দৃঢ় বদ্ধ করিলেন; পরে তাহার হস্তদ্বয় বাঁধিয়া নিকটস্থ একটী বৃক্ষ তাহার শরীর দ্বারা বেষ্টিত করিলেন এবং সেই বদ্ধ হস্ত-পদ এক স্থানে করিয়া অতি কঠিনরূপে বন্ধন করিলেন। তিনি বলিলেন,—"আমি তোর অপকৃষ্ট জীবন বধ করিয়া আমার আত্মাকে কলুষিত করিতে চাহি না। অন্য উপায়ে তোর ঘৃণিত প্রাণের শেষ হয়, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। তোকে আমি যে অবস্থায় রাখিয়া চলিলাম, বিধাতা যদি তোর প্রতি নিতান্ত অনুকূল হন, তবেই নিস্তার পাইবি। নচেৎ এই তোর জীবনের তুই শেষ মনে কর।"

তরুণী এই সময়ে যুবকের মনোহর, সম্পূর্ণ সুগঠিত কান্তি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। উপকারকের ছায়া হৃদয়পটে সুন্দর রূপে গ্রহণ করিবার নিমিত্তই হউক, সেরূপ রূপ কখন নয়ন-গোচর করেন নাই বলিয়াই হউক, অথবা উপকারকের প্রতি স্বভাবতঃ অত্যন্ত ভক্তি জন্মে বলিয়াই হউক, সেই যুবতী সেই নয়নানন্দ মূর্ত্তি হইতে দৃষ্টি অপসৃত করিতে ইচ্ছা করিলেন না। এই সময় যুবক পাপিষ্ঠকে বন্ধন করিয়া নিশ্চিন্ত ও আনন্দিতমনে যুবতীর নিকট আগমন করিলেন। অমনই রমণী লজ্জায় মস্তক অবনত করিলেন। আবার তাহার চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। আবার তিনি শিহরিতে লাগিলেন।

যুবক কহিলেন,—"ভয়ের কারণ সম্পূর্ণরূপে গিয়াছে। আর ভয় কি?"

যুবতী উত্তর করিলেন না। যুবক পুনরপি যুবতীর পরিচয় ও এতৎ ঘটনার পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিলেন। যুবতী অতি সংক্ষেপে, ধীরে ধীরে, মধুর, কম্পিত ও ভয়-বিকলিত স্বরে এতদ্‌ঘটনার বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিলেন

যুবক শিহরিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"এক্ষণে কোথায় রাখিয়া আসিলে তুমি নির্ভয় হইবে?"

যুবতী বলিলেন,—"গোপালপুরে আমাদের বাটী।"

যুবক। গোপালপুরে! সেখানে তো আমি সর্ব্বদা আসিয়া থাকি। তোমার পিতার নাম শুনিতে পাই কি?

যুবতী। কালিদাস ভট্টাচার্য্য।

যুবক শিহরিয়া উঠিলেন এবং সবিস্ময়ে কহিলেন,—"বিধাতাকে ধন্যবাদ! ভাগ্যে আমি সময় মত উপস্থিত হইয়াছিলাম; ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে আমি বিশেষ জ্ঞাত আছি। তুমি তাঁহার কন্যা? তোমাকে তো কখন দেখি নাই।"

আকাশমার্গ ভেদ করিয়া দ্বিজরাজ এক্ষণে স্বীয় হৈমরথ চালনা করিতেছেন। তারাগণ, যেন পতিবিরহে নিদারুণ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে ভাবিয়া, 'তুমি কোথা যাও'—'তুমি কোথা যাও' বলিয়া রথের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতেছে। পৃথিবী হাস্যময়ী; সর্ব্বত্র আলোকময়। বিহঙ্গমগণ সমস্বরে সমস্বরে ঝঙ্কার দিতেছে। বোধ হয় রজনীর এতাদৃশ শুভ্রতা দর্শনে তাহাদের দিবাভ্রম জন্মিতেছে, তদ্ধেতু সন্ধ্যা সহ উষা সমাগতা বোধে, উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছে।

যুবক কহিলেন,—"আর বিলম্বে আবশ্যক নাই। ক্রমে অধিক রাত্রি হইতেছে। চল তোমাকে তোমার পিত্রালয়ে পৌঁছিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হই।"

যুবতী এ প্রস্তাবে নীরবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। যুবক অগ্রসর হইলেন। যুবতী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। অনতিবিলম্বে তাঁহারা নিবিড় বনে লুকাইয়া গেলেন

এ যুবা কে, পাঠক মহাশয়েরা তাহা বুঝিয়াছেন কি ? এ যুবা আমাদের পরিচিত উমাপতি। গোপালপুরে উমাপতির মাতুলালয়, এজন্য তিনি সর্ব্বদা তথায় যাইতেন। কোন বিশেষ কার্য্যে তাঁহার অন্ত এই অসময়ে এই অপথ দিয়া ব্যস্ত হইয়া যাইতে হইতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আলয়ে।

আপন ঘরে আপনি গেলা।
পিতা মাতা জনু পরাণ পাইলা॥"
—চণ্ডীদাস।

গোপালপুর নিস্তব্ধ। মানবগণ নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভের চেষ্টা দেখিতেছে। সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছে। গ্রামের মধ্যস্থলে একটী গৃহের লোকসকল কেবল ঘুমায় নাই। গৃহটী দেখিলে তাহা সম্পন্ন লোকের আবাস বলিয়া অনুমিত হওয়া অসম্ভব। জীর্ণ আলয় কিন্তু পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। ভবনে চারিটি মাত্র প্রকোষ্ঠ; সম্মুখে অঙ্গন। অঙ্গন নিতান্ত বিস্তৃত নহে, তাহার অপর পার্শ্বে একখানি তৃণাচ্ছাদিত গৃহ। ভবনের এক প্রকোষ্ঠে একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে। সেই দীপালোকে বসিয়া দুই জন লোক কথা কহিতেছে ও কাঁদিতেছে। ইঁহার এক জন পুরুষ ও অপরা নারী। পুরুষের বয়স অন্যূন পঞ্চাশৎবর্ষ হইবে। দ্বিতীয়া তাঁহারই স্ত্রী। তাঁহার বয়স চল্লিশ বর্ষের ন্যূন নহে।

পুরুষ কহিলেন,—"আমি আর কি করিব বল ? যথাসাধ্য সন্ধানের ত্রুটী করিলাম না। এখন বিধাতার ইচ্ছা। একে রাত্রি কাল, তাহাতে দারুণ অন্ধকার, আমি এখন যাই কোথায় ? গিয়াই বা করিব কি ? নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিই বা কেমন করিয়া ? হরিহরের কত লোক সন্ধানে বাহির হইয়াছে। তাহাদের অপেক্ষা আমি কি অধিক সন্ধান করিতে পারিব ? তা বলিয়া তো নিশ্চিন্ত থাকিতেও পারি না। ভগবান্, আমার কপালে এত দুঃখ লিখিয়াছিলেন। যাই, আবার যাই।"

নারী কহিলেন,—"না। তুমি গিয়া আর কি করিবে ? আমি এখন ভাবিতেছি যে, যাহা অদৃষ্টে ছিল তাতো হইল। এখন কালি সকালে লোকের কাছে মুখ দেখাইব কেমন করিয়া ?"

পুরুষ কহিলেন,—"ভগবন্! সকলই তোমার ইচ্ছা! সমাজচ্যুত হইলাম, পৈতৃক স্থান-ভ্রষ্ট হইলাম, একটী কন্যাহীন হইলাম। সকল সহিয়া, একটীমাত্র কন্যা লইয়া এই স্থানে লুক্কায়িত ভাবে বাস করিতেছি, এও ভগবান্, তোমার প্রাণে সহিল না ? এ চিরদুঃখীকে কষ্ট দিতে তোমার এত আনন্দ। দেও, তাতে ক্ষতি নাই। আমাকে কষ্ট দেও, আমি অনেক সহিয়াছি, অনেক সহিতে পারি; কিন্তু যাহা আমার কখন ক্লেশের বার্ত্তা জানে না, তাহাকে এত ক্লেশ দেওয়া, দয়াময়! তোমার কি উচিত ? তোমার কার্য্য তুমিই জান! আহা! সে না জানি কি বিপদেই পড়িয়াছে।"

এই সময় তাঁহাদের গৃহের পশ্চাতে মনুষ্যের পদশব্দ হইল। উভয়ে সতৃষ্ণ নয়নে অঙ্গনদ্বারাভিমুখে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন এবং রজনীর অন্ধকার ভেদ করিয়া দুইটী অস্পষ্ট মনুষ্য-মূর্ত্তি প্রবেশ করিতেছে দেখিলেন। উভয়ে দ্রুতপদ-বিক্ষেপে সে দিকে ধাবিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"কেও। মুক্তকেশী ?"

এ প্রশ্নের উত্তর বাক্যে হইল না। মুক্তকেশী, মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া, মাতৃগলদেশ জড়াইয়া ধরিয়া ইহার উত্তর সমাধা করিলেন। হারাকন্যা পুনঃ প্রাপ্তি হওয়ায় যে অপার আনন্দ জন্মিল, তাহা বাক্যে বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহারা সকলে কতক্ষণ সেই স্থানে থাকিয়া পর্য্যায়ক্রমে শোকাশ্রু ও আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

পরিশেষে মুক্তকেশী কহিলেন,—"বাবা! ইনিই আজ আমাকে রক্ষা করিয়াছেন।"

এই বলিয়া উমাপতিকে দেখাইয়া দিলেন।

উমাপতিকে দেখিয়া কালিদাস ভট্টাচার্য্য সহজেই চিনিতে পারিলেন এবং সানন্দে কহিলেন, কেও, উমাপতি না?"

উমাপতি "আজ্ঞে হাঁ" বলিয়া উত্তর দিলেন।

ভট্টাচার্য্য কহিলেন,—"উমাপতি! এতক্ষণ অন্যমনস্ক ছিলাম, তোমাকে লক্ষ্যই করি নাই। তুমি কিছু মনে করিও না বাবা।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণীর দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"তুমি ইঁহাকে জান না। ইনি আমাদের পর নহেন। ইনি হরিহরের ভাগিনেয়।"

উমাপতি কহিলেন,—"আমি এক্ষণে বিদায় হই। রাত্রি অধিক হইয়াছে। মাতুল মহাশয়ের নিকট বিশেষ আবশ্যক আছে।"

ভট্টাচার্য্য কহিলেন,—"উমাপতি রাত্রি অনেক হইয়াছে, আজ এখানে থাকিলে ক্ষতি কি? আমাদের অদ্য যে আনন্দ জন্মিয়াছে, তুমিই তাহার কারণ। অতএব তোমার সহিত অধিক ক্ষণ থাকিয়া এই বিষয়ের কথোপকথন করিলে এই আনন্দ আরও বাড়িবে।"

উমাপতি একটু চিন্তিত হইলেন। কিয়ৎকাল তুষ্ণীভূত হইয়া রহিলেন। তিনি একটী বিশেষ প্রয়োজনে মাতুল সমীপে আসিতেছিলেন—পথে এই বিপদ। বিশেষ আবশ্যক না হইলে তিনি কখন একাকী, অসময়ে, সেই জনহীন পথে আসিতেন না। সুতরাং তাঁহার এখানে রাত্রি যাপন করিয়া কার্য্য হানি করা অবিধেয়, ইহা উমাপতি বুঝিলেন। আবার ভাবিলেন, সুন্দরী মুক্তকেশীকে দর্শনে অথবা তাঁহার সন্নিধ্যে থাকিয়া যতটুকু সময় অতিবাহিত হয়, সে টুকু পরম সুখময়। সে সুখের আশা ত্যাগ করিতেও তাঁহার ইচ্ছা হইল না। উমাপতি এইরূপ আন্দোলন করিতে করিতে, মুক্তকেশীর বদনের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন মুক্তকেশী একদৃষ্টিতে তাঁহাকেই দেখিতেছেন। উমাপতির বোধ হইল যেন সে দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা, আনন্দ ও মায়া মাখা রহিয়াছে। উমাপতি সকল কথা ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন, এখন অতি সামান্য বোধ হইতে লাগিল। সে স্থানের পরিবর্ত্তে যদি কেহ তাঁহাকে তখন স্বর্গ-রাজ্যের অক্ষয় সিংহাসন দিতে প্রস্তুত হয়, তাহাও উমাপতি গ্রহণ করেন কি না সন্দেহ।

স্থিরনিশ্চয় করিয়া উমাপতি কহিলেন,—তাহাই হইবে। অদ্য এখানেই থাকিলাম।"

উমাপতি আবার মুক্তকেশীর নিষ্কলঙ্ক মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিলেন। তাঁহার বোধ হইল যেন তাহা আনন্দে হাসিতেছে। তাঁহার মনশ্চক্ষু কল্পনাবলে মুক্তকেশীর বদনের নানাবিধ ভাব পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। ভ্রান্ত উমাপতি কল্পনাদৃষ্ট অবাস্তব ও অপ্রকৃত ঘটনা বাস্তব ও প্রকৃত মনে করিয়া সুখী হইলেন।

ভট্টাচার্য্য সানন্দে উমাপতির হস্ত ধারণ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে লইয়া আসিলেন। মুক্তকেশী ও তাঁহার মাতা অনুসরণ করিলেন। দীপালোকে সকলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উপবেশন

করিলেন। মুক্তা ও তাঁহার জননী একত্র উপবেশন করিলেন। বালিকা মাতৃস্কন্ধে মস্তক রক্ষা করিলেন। এখনও সময়ে সময়ে মুক্তকেশী চমকিতা ও কম্পমানা হইতে লাগিলেন। তাঁহার মাতা বস্ত্রাঞ্চলে দুহিতার নয়ন-মার্জ্জন করিয়া, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাঁহার কটি-বেষ্টন করিয়া বসিলেন।

ভট্টাচার্য্য কহিলেন,—"আর ভয় কি মা? বল দেখি কি হইয়াছিল।"

উমাপতি কহিলেন,—"সে সমস্ত আমি সংক্ষেপে শুনিয়াছি, বিশেষ বৃত্তান্ত জানিবার জন্য আমারও কৌতূহল জন্মিয়াছে।"

মুক্তকেশী উমাপতির প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন, অমনই তিনি অবনতমুখী হইয়া রোদন ও ভয়-বিকম্পিতস্বরে সমস্ত বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। সে অনেক কথা। আমরা সংক্ষেপে তাহা পাঠক মহাশয়কে জ্ঞাত করাইব।

বৈকালে প্রত্যহ যেরূপ মুক্তকেশী গাত্র-ধৌত করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের আলয়সন্নিহিত সরোবরে গিয়া থাকেন, অদ্যও সেইরূপ গিয়াছিলেন। অন্য দিন তাঁহার মাতা সঙ্গে থাকেন। অদ্য বিশেষ কার্য্য হেতু তিনি যাইতে পারেন নাই। প্রতিবেশী কেহ না কেহ তথায় প্রায়ই উপস্থিত থাকে। অদ্য কেহই ছিল না। মুক্তকেশী একা ব্যস্ততা সহকারে গাত্রধৌত করিতেছিলেন। অবিলম্বে কার্য্য সমাপ্ত করতঃ সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া তীরে উঠিলেন। এমন সময় সহসা সন্নিহিত ক্ষুদ্র বন হইতে এক ব্যক্তি, অলক্ষিত ভাবে আসিয়া, একেবারে মুক্তকেশীর হস্ত ধারণ করিল। বালিকা তাহাকে দেখিয়া অবাক্ হইলেন। তাহার কৃষ্ণকায়, পরুষভাব, রক্ত চক্ষু, তাম্রবর্ণ কেশ এবং বীভৎস আকৃতি দর্শনে মুক্তা প্রায় জ্ঞানহীনা হইলেন। পলায়ন করা অসাধ্য। তাহার বজ্রমুষ্টি হইতে হস্ত মুক্ত করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করা কখনই তাঁহার ন্যায় কোমলাঙ্গী বালিকার সাধ্য নহে। তিনি রোদন করিবেন কি চীৎকার করিবেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না; তাঁহাকে তজ্জন্য ব্যস্ত হইতেও হইল না। অবিলম্বে দুর্বৃত্ত তাঁহার মুখ বাঁধিয়া বাক্যকথনের শক্তি হরণ করিল। মুক্তকেশী অজ্ঞান হইলেন। পরে দুরাচার তাঁহাকে পূর্ব্ব কথিত অরণ্যে বহন করিয়া লইয়া গেল। তথায় গিয়া মুক্তার বন্ধন মোচন করিল। তিনি তখনও অজ্ঞান। অনেকক্ষণ পরে তাঁহার জ্ঞানের সঞ্চার হইল। তাঁহাকে তদবস্থায় রাখিয়া সে ব্যক্তি দূরে বসিয়াছিল। অধুনা তাঁহার জ্ঞানোদয় দেখিয়া হাসিতে লাগিল। মুক্তকেশী কাঁদিতে লাগিলেন, সে আরও হাসিতে লাগিল।

মুক্তকেশী বলিলেন,—"আমার মা-বাপ আমাকে এতক্ষণ না দেখিয়া কত কাঁদিতেছেন, আমার জন্য তাঁহারা কত খুঁজিতেছেন। আমি তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে ছাড়িয়া দেও। আমাকে পথ দেখাইয়া দেও, আমি বাড়ী যাই; আমার বাপ মার আর কেহ নাই।"

সে এ সকল কোন কথা কাণে করিল না। বরং এ কথায় উপহাস করিতে লাগিল। সে কিছুই লক্ষ্য বা কিছুতেই কর্ণপাত না করিয়া, মুক্তকেশীকে কত লোভ দেখাইতে লাগিল এবং কিছুতেই কৃতকার্য্য না হইয়া, বল—প্রয়োগের উদ্যম করিল। মুক্তকেশী অনন্যো-পায় হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। দুষ্ট দেখিল, রোদনের পথ বন্ধ না করিলে তাহার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির বিঘ্ন জন্মিতে পারে। এই বিবেচনায়, সে রোদন নিবারণ করিবার নিমিত্ত পুনরায় মুক্তকেশীর মুখ বাঁধিবার চেষ্টা করিতে

লাগিল। এমন সময় বিধাতা মুক্তকেশীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া এবং তাঁহার পবিত্র চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করিবার নিমিত্তই যেন তথায় উমাপতিকে উপস্থিত করিলেন। অবশিষ্ট ঘটনা পাঠক মহাশয় জ্ঞাত আছেন।

ভট্টাচার্য্য কহিলেন,—"জগদম্বে! তুমি সকলই করিতে পার! উমাপতি! আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। কমলার কৃপায় তোমার কিছুরই অভাব নাই। প্রার্থনা করি, তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া সুখ-স্বচ্ছন্দে জীবন নির্ব্বাহ কর। অদ্য তুমি আমার যে উপকার করিয়াছ, ইহা জন্মান্তরেও শুধিবার নহে। আমি তোমার মাতুলের আশ্রিত। সুতরাং আমি তোমার পর নহি। তার পর কি হইল তুমি তাহা জ্ঞাত আছ—বল।"

উমাপতি মুক্তকেশী কথিত ঘটনার অবশিষ্টাংশ যাহা জানিতেন তৎসমস্ত বলিলেন।

এই সকল কথাবার্ত্তা সমাপ্ত হইলে সকলে বিবিধ আনন্দজনক বাক্যালাপ করিলেন এবং আহারাদি সম্পন্ন করিয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট শয্যায় শয়ন করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সুখ-স্বপ্নে।

"Among the many pretended arts of divination, there is none which so universally amuses as that by dreams.
—Spectator.

উমাপতি দক্ষিণস্থ একটী প্রকোষ্ঠে শয়ন করিয়াছেন। তাঁহার শয্যার অনতিদূরে একটী ক্ষীণালোক জ্বলিতেছিল। নিদ্রাদেবী এখনও তাঁহার হৃদয়ে জয়-স্তম্ভ প্রোথিত করেন নাই। উমাপতি নয়ন নিমীলিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা নিদ্রার আধিপত্যে নহে। তিনি নানা বিষয়িণী চিন্তায় নিবিষ্টমনা ছিলেন। একটীর পর একটী সুখময়ী চিন্তা তাঁহার অন্তরালয়ে প্রবেশ করিতেছে এবং অতি অল্পক্ষণ তথায় অবস্থান করত, আর একটীর জন্য পথ মুক্ত রাখিয়া, স্বয়ং প্রস্থান করিতেছে। সৎকার্য্য সম্পাদন করিলে মনে স্বভাবতঃ বিমল আনন্দ জন্মে। আনন্দই সুখের মূল। উমাপতি অদ্য যে সৎকার্য্য করিয়াছেন, তৎপ্রভাবে তাঁহার হৃদয় এক্ষণে আনন্দে ভাসিতেছে। আনন্দের প্রভাবে মনের স্থিরতা থাকে না। নিরানন্দে একটী চিন্তা হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়; কিন্তু আনন্দে সেরূপ হয় না। আনন্দে তৎসংসৃষ্ট নানাবিধ সুখময়ী চিন্তা হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়।

উমাপতি শয্যায় শয়ান হইয়া এইরূপ অসংলগ্ন যুগপৎ সমাগত চিন্তার তরঙ্গে ভাসিতেছেন। নানা বিষয়িণী চিন্তার সহিত একটী মুগ্ধকরী চিন্তা তাঁহার অন্তরালয়ে প্রগাঢ়রূপে সমাসীন হইল। সে চিন্তাকে অন্তর হইতে অন্তরিত করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। তিনি সেই চিন্তাকে হৃদয়ে স্থান দিয়া অপার আনন্দ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার উৎসাহ, আনন্দ, আশা, অসীম হইয়া উঠিল। একটী রমণীর চিন্তায়, তাহারই রূপধ্যানে, তাহারই মনোহর স্বভাব সন্দর্শনে, উমাপতির জ্ঞান, বিদ্যা, বিবেচনা, মান, সম্ভ্রম প্রভৃতি প্রহরী-পরিবেষ্টিত চিত্ত পরাভূত হইয়াছিল। সে রমণী মুক্তকেশী। উমাপতি মুক্তকেশীর রূপ-গুণাদির বিষয় যত আন্দোলন, যত আলোচনা করিতে লাগিলেন, ততই তিনি অধিকতর

আনন্দলাভ করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মন প্রবলতর বেগে ক্রমশঃ সেই দিকে পরিধাবিত হইতে লাগিল। তাদৃশ ভূর্লোকদুর্লভ রমণীচরিত্রে যে নিদারুণ অনপনেয় কলঙ্ক-অঙ্ক সংলিপ্ত হইতেছিল, তিনিই তাহা মোচন করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া, তাঁহার আহ্লাদের সীমা থাকিল না। সে জন্য তাঁহার নিরহংকৃত মনে গর্ব্বের উদয় হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, মুক্তকেশীর মন কি উন্নত! তিনি দয়াময়ী দেবী! যে নরাধম তাঁহার প্রতি তাদৃশ অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহার উপরও মুক্তকেশীর দয়া! মুক্তকেশীর সংসারের সার তাঁহার মন মূল্যবান্ রত্ন-খনি। তাঁহার দেহ সৌন্দর্য্যের নিকেতন। তিনি কামিনীকুলকমলিনী। এত শোভা, একাধারে এত গুণ, এত পবিত্রতা—উমাপতি আর কখন দেখেন নাই। মুক্তকেশীর সমস্তই তিনি আশ্চর্য্য ভাবিতে লাগিলেন। যে মনুষ্য-জন্ম গ্রহণ করিয়া মুক্তকেশী-রত্নকে দর্শন করে নাই, তাহার জন্মই বৃথা। সে সংসারের কি দেখিয়াছে? কিছুই না। সংসারে কি আর রূপবতী রমণী নাই? থাকিতে পারে। কিন্তু মুক্তার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা রমণী আছে কি না, এ বিষয়ে উমাপতির সন্দেহ জন্মিল।

উমাপতি এই চিন্তায় এতই উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন যে, তিনি দেখিতে লাগিলেন—মুক্তকেশী ব্রীড়াবনত বদনে তাঁহার সমীপে দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন। তিনি যেন শুনিতে লাগিলেন—মুক্তকেশী, তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া, মধুর হাস্য সহকারে, তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন। ইত্যাদি বিবিধ বিষয় ধ্যান করিতে করিতে উমাপতি নিদ্রার কোমল আশ্রয়ে স্থান প্রাপ্ত হইলেন।

নিদ্রাগমে তিনি মুক্তকেশীর চিন্তা হইতে বিরত হইতে পারিলেন না। উমাপতি নিদ্রিতাবস্থায় মুক্তকেশী সংক্রান্ত সুখময়স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। যেন তিনি কোন পরম রমণীয় গিরি-কন্দরে উপবিষ্ট আছেন। তথায় সুস্বনে মলয় মারুত প্রবাহিত হইতেছে। অদূরে নির্ঝরিণী সকল, প্রপাত-পরম্পরায় নিপতিত হইয়া, ঘোর গম্ভীর শব্দ সমুৎপন্ন করিতে করিতে, নিম্নাভিমুখে গমন করিতেছে এবং বায়ুকে বারি-কণিকা-সম্পৃক্ত করিয়া শীতলতা প্রদান করিতেছে। যথায় তিনি উপবেশন করিয়াছিলেন সে স্থান শ্যামল, সমশীর্ষ, নবদূর্ব্বাদল সমাচ্ছন্ন। সম্মুখে একটী গিরি-নিঃসৃতা সঙ্কীর্ণা প্রবাহিণী পন্নগ সদৃশ বক্র গতিতে গমন করিতেছে। তাঁহার দক্ষিণ দিকে গগনস্পর্শী নগরাজ, অভ্রভেদী মস্তক উন্নত করিয়া, বিশ্ব পরিদর্শন করিতেছে। তাঁহার অপর পার্শ্বে বিবিধ বৃক্ষ-লতাদি সমাবৃত অরণ্য। অরণ্যের স্থানে স্থানে লতা-বল্লরী দ্বারা বদ্ধ বৃক্ষনিচয় পরস্পর সংযত হইয়া অপূর্ব্ব মণ্ডপ সকল সৃজন করিয়াছে। তথায় নানা-বর্ণ-বিভূষিত কলনাদী বিহঙ্গমগণ সতত সুস্বর বর্ষণ করিতেছে। পশ্চাতে একটি ক্ষুদ্র অরণ্য। বহুযত্নে উদ্যানে রোপিত হইয়া যে সকল বৃক্ষ পুষ্প প্রসব করে না, তাহারাও তথায় অকাতরে বিবিধ রাগরঞ্জিত, গন্ধময় পুষ্প উৎপাদন করিতেছে। লক্ষ লক্ষ শিলীমুখ এই সকল পুষ্পজাত মধুপানাশয়ে গুঞ্জন সহকারে তথায় বিচরণ করিতেছে। সে স্থানটী অতি রমণীয়! উমাপতির বোধ হইল, সেটী স্বভাবের রমণীয়তার ভাণ্ডার। তিনি একান্তচিত্ত হইয়া স্বভাবের সেই পরম রমণীয় শোভা সন্দর্শনে বিপুল আনন্দ-পয়োধিনীরে অভিষিক্ত হইয়াছেন এবং বাহ্যজ্ঞান বিরহিত হইয়া স্রষ্টার নৈপুণ্য ও কৌশলের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন। এই সময়ে

তাঁহার অলক্ষিতভাবে পশ্চাতের বন হইতে বনাধিষ্ঠাত্রী মোহিনী দেবী, কুসুম-সজ্জায় সজ্জিতা হইয়া নিষ্ক্রান্তা হইলেন। তিনি মৃদু-মন্দ পাদ-বিক্ষেপে উমাপতি-সন্নিধানে আসিয়া এককালে দুই হস্তে উমাপতির দুই চক্ষু আবরণ করিলেন। উমাপতি বিস্ময়াঙ্কিত হইয়া বলিলেন—"কে তুমি?"

দেবী তাঁহার চক্ষু হইতে হস্ত গ্রহণ করিয়া বলিলেন—"কি—তুমি আমায় চিনিতে পারিলে না?"

উমাপতি সানন্দে দেখিলেন, দেবী অন্য কেহ নহেন—মুক্তকেশী। তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন,—"মুক্তকেশী! তুমি যে এখানে?"

উমা। আমি এখানকার শোভা দেখিতে আসিয়াছি।

মুক্ত। তুমি এখানে আসিয়াছ, আমি তাহাই দেখিতে আসিয়াছি।

উমা। আমি এখানে আসিয়াছি, তোমাকে কে বলিল?

মুক্ত। যে বলিবার সেই বলিয়াছে।

এই বলিয়া সুন্দরী স্ব স্ব হৃদয় লক্ষ্য করতঃ অঙ্গুলি সঞ্চালন করিলেন।

উমা। মুক্তকেশী! তোমার এ বেশ কেন?

মুক্ত। কোন্ বেশ?

উমা। এই মনোহর পুষ্পবেশ।

মুক্ত। কেন—এ বেশ তুমি ভালবাস না?

উমা। ভালবাসি না? আমি এ বেশ বড় ভালবাসি।

মুক্ত। সত্য?

উমা। আমি তোমার নিকট মিথ্যা কহিব, ইহাও কি সম্ভব?

"তবে তুমি থাক। তোমারও এ বেশ হইবে—আমি তোমাকে সাজাইব।"

এই বলিয়া মুক্তকেশী আবার সেই পুষ্পবনে অন্তর্হিতা হইলেন। উমাপতি মুক্তকেশীর চমৎকার ভাব ও অসাধারণ সরলতা পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। এমন সময় মুক্তকেশী, বস্ত্রাঞ্চল বিবিধ মনোহর পুষ্পভারে পরিপূর্ণ করিয়া, তথায় প্রত্যাগত হইলেন; এবং দূর্ব্বোপরি পুষ্প সকল রক্ষা করত কয়েকটী দ্বারা একটী উষ্ণীষ প্রস্তুত করিলেন। সেই উষ্ণীষ উমাপতির মস্তকে দিয়া দেখিলেন যে, অতি সুন্দর হইয়াছে। মুক্তকেশী আহ্লাদে দ্বিগুণ উৎসাহান্বিতা হইয়া পুষ্প দ্বারা অবশিষ্ট সমস্ত ভূষণ প্রস্তুত করিলেন এবং একে একে সেইগুলি উমাপতিকে পরাইতে লাগিলেন। উমাপতি, নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নদেবীর অনুগ্রহে, স্বর্গসুখানুভব করিতে লাগিলেন। মুক্তকেশী, উমাপতিকে সমস্ত পুষ্পাভরণ পরিধান করাইয়া, কহিলেন, —"দাঁড়াও দেখি—কেমন হইয়াছে, দেখি।"

উমাপতি দাঁড়াইলেন। মুক্তকেশী দেখিলেন, তাঁহার আর ফুল নাই। কহিলেন, —"আর চারিটী রাঙ্গা ফুল আনিলে বেশ হইত। সাদা মালা দুগাছির মধ্যে এক গাছি রাঙ্গা মালা দিলে খাসা দেখাইত।"

ক্ষণপরে আবার কহিলেন,—"ও দুঃখ রাখিব না। সাধ মিটাইব।"

এই বলিয়া নিজকণ্ঠ হইতে একগাছি রাঙ্গা মালা উন্মোচন করিয়া তাহা উমাপতির গলদেশে অর্পণ করিলেন। উমাপতি তাঁহার এই ব্যবহারে চমৎকৃত হইলেন।

মুক্তকেশী কহিলেন,—"ছি! কি করিলাম! তোমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়াই তোমার কণ্ঠে মালা দিলাম। তুমি হয় তো আমাকে চঞ্চলা মনে করিতেছ।"

উমাপতি, বাক্যে উত্তর না দিয়া, একটী

প্রেম-পবিত্র আলিঙ্গন দ্বারা ইহার উত্তর সমাধান করিবেন মনস্থ করিলেন। তিনি যেমন তদর্থে উঠিবেন, অমনই তাঁহার সুখ-স্বপ্নেরও অবসান হইল।

উমাপতি যে প্রকোষ্ঠে শয়ন করিয়াছিলেন, তাহার দক্ষিণ দিকের বাতায়ন সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। প্রাতঃকালের যে অংশে দিবারাত্রি উভয়ই সমভাগে মিশ্রিত থাকে, এক্ষণে সেই সময়। সূর্য্য আকাশে আবির্ভূত হন নাই; কিন্তু তিনি এক্ষণে যে স্থানে অধিষ্ঠিত আছেন, তথা হইতে তাঁহার তেজের প্রতিবিম্ব আসিয়া পূর্ব্বাকাশের নিম্নদেশকে রঞ্জিত করিতেছে। দুই একটী বায়স কুলায় ত্যাগ করিয়া প্রাচীর মস্তকে বসিয়াছে এবং এদিক ওদিক তাকাইতে তাকাইতে এক একবার ডাকিতেছে। রন্ধন-গৃহের পার্শ্বস্থ ভস্ম-স্তূপে একটী কুকুর নিদ্রিত ছিল; সে এক্ষণে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ফট্‌ফট্ শব্দে স্বীয় কাণ ঝাড়িতে লাগিল; দুই একটী পতঙ্গ তাহাকে বড় ত্যক্ত করিতেছিল, সে তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত বদন-ব্যাদান করিতে লাগিল। একটী পেচক রন্ধনশালার মস্তকে উপবিষ্ট থাকিয়া ভীত মনে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেছিল। কি মনে হইল—সে আসন ত্যাগ করিয়া, সন্নিহিত আম্রবৃক্ষের শিরে গিয়া ঝুপ করিয়া উপবিষ্ট হইল। বৃক্ষের যে শাখায় সে উপবেশন করিল, সেটী তাহার ভরে দুলিতে লাগিল।

মুক্ত বাতায়ন-পথে ঝির্ ঝির্ করিয়া বায়ু প্রবিষ্ট হইয়া উমাপতির দেহ শীতল করিতেছিল; তথাপি উমাপতি ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছিলেন। এই অবস্থায়, এইরূপ সময়ে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি বিস্ময় সহকারে নয়ন উন্মীলন করিলেন। নয়ন উন্মীলন করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বিস্ময় আরও সংবর্দ্ধিত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আশা-সুখে।

"হৃদয়ং ত্বেব জানাতি প্রীতিযোগং পরস্পরম্।"
—উত্তররামচরিতম্॥

উমাপতি নিদ্রাভঙ্গ সহকারে নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, সুন্দরী মুক্তকেশী, মুক্ত-বাতায়নের অপর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, উমাপতিকে দেখিতেছেন। তিনি যেই চক্ষু মেলিলেন অমনই মুক্তকেশীর চারু বদন দেখিতে পাইলেন। তিনি সে দর্শনকে প্রকৃত বিবেচনা করিতে সাহস করিলেন না। ভাবিলেন যে এখনও তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন। অবিলম্বে সন্দেহ তিরোহিত হইল। দর্শন অপ্রকৃত নয় স্থির করিলেন; তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না।

তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া কহিলেন,—"মুক্তকেশী!"

এই বাক্যটী উমাপতির বদন বিনির্গত হইবামাত্র, মুক্তকেশী লজ্জা সহকারে অন্তর্হিতা হইলেন। মুক্তকেশী রজনীতে শয়ন করিয়া নিদ্রাগমের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার নিদ্রা আসিল না। নিদ্রার পরিবর্ত্তে উমাপতির সহিত একত্র অবস্থান, তাঁহার সহিত সতত সদালাপ কামনা, তাঁহার মনকে বিচলিত করিল। যে শুভক্ষণে উমাপতি বিজন অরণ্যে উপস্থিত হইয়া, বিপন্না মুক্তকেশীর লুপ্তপ্রায় সতীত্ব-রত্ন উদ্ধার করিয়া তাঁহার

হস্তে পুনরায় অর্পণ করিয়াছেন, সেইক্ষণ হইতে মুক্তকেশীর সরল মনে চিন্তার অঙ্ক পতিত হইয়াছে। তিনি সেই অবধি উমাপতি-গত-চিন্তা, হইয়াছেন। সরলা বালিকা সেই অবধি উমাপতিকৃত উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপ তাঁহাকে নিজ হৃদয় দান করিয়াছেন। মুক্তকেশী ইতিপূর্ব্বে অনেক যুবক—অনেক সুন্দর সুকান্তি যুবক দর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে তো কাহারও ছায়া নাই। তাহাদের দর্শন করিবার নিমিত্ত তিনি তো কখন ব্যাকুলা হন নাই। উমাপতির সৌন্দর্য্য অতীব রমণীয় বলিয়া কি তিনি তাহা ভুলিতে পারিতেছেন না? তাহা নহে। তদপেক্ষা অনেক সুন্দর বদন তাঁহার দৃষ্টিপথে কতবার পতিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু উমাপতির বদনমধ্যে যে একটী অত্যাশ্চর্য্য সরলতা, আহ্লাদ, উৎসাহ, সহৃদয়তা, সুধীরতা ও প্রেমব্যঞ্জক রমণীয় ভাব বিরাজিত আছে তাহার দ্বিতীয় উদাহরণ দুর্লভ। কিশোরী তাহা আর কোথায় দেখেন নাই। এই কারণেই তিনি অযাচিত স্থলে জীবনের সার ধন হৃদয় দান করিয়াছেন।

জগতে সকলের হৃদয়ে প্রায় সমভাবে একটী নৈসর্গিক নিয়ম বর্ত্তমান আছে। তুমি যদি কাহারও উপকার কর, সে ব্যক্তি সেই স্বতঃসঞ্জাত নিয়ম-প্রভাবে তোমাকে একটু না একটু ভাল বাসিবে, তোমার নিকট অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণেও কৃতজ্ঞ থাকিবে। এ কারণেও তাঁহার মন উমাপতির প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হইয়া থাকিবে। এতদ্ভিন্ন মুক্তকেশীর সরল মনে সর্ব্বদা উমাপতির বদনেন্দু আবির্ভূত হওয়ার অন্য কোন কারণ ছিল কি না, তাহা যে বিধাতা মানসিক বৃত্তি সকলের স্রষ্টা তিনিই বলিতে পারেন। ফলতঃ কতক্ষণে উমাপতির নিদ্রাভঙ্গ হইবে, কতক্ষণে তাহার মধুমাখা কথা শ্রবণে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিবেন, কতক্ষণে তাঁহার দর্শন লাভে আত্মাকে চরিতার্থ করিবেন, এই সকল চিন্তা করিতে করিতে সে রাত্রিতে মুক্তকেশীর নিদ্রা আইসে নাই। অনেক রাত্রিতে ক্ষণকালের নিমিত্ত নিদ্রা তাঁহাকে অচেতন করিয়াছিল! যখন সে নিদ্রা শেষ হইল, তখন তিনি দেখিলেন, অধিক রাত্রি নাই। এক্ষণে নিদ্রা অনাবশ্যক ও অসম্ভব। শয়ন করিয়া না থাকিয়া, মুক্তকেশী গৃহ-বহির্ভূতা হইলেন এবং অলিন্দে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি যে সীমাদ্বয়ের মধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তাহার পরই উমাপতির প্রকোষ্ঠের মুক্ত-বাতায়ন। মুক্তকেশী মনে ভাবেন নাই যে, ভ্রমণের সীমা অতিক্রম করিয়া পদদ্বয় অগ্রসর হইলেই, নির্ব্বিরোধে উমাপতির মোহন মূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন। সুতরাং তিনি সে চেষ্টাও করেন নাই। অন্যমনস্ক হইয়াও ভ্রমণ করিতে করিতে একবার সীমা অতিক্রম করিয়া অনেক দূর গিয়া পড়িলেন। গমন কালে তিনি কিছুই লক্ষ্য করেন নাই। প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে তিনি মুক্তবাতায়ন পথে দৃষ্টি করিলেন। সে পথে যাহা দেখিলেন, তাহাতে আর তাঁহার সে স্থান হইতে নড়িতে ইচ্ছা হইল না। তিনি নড়িলেনও না। ধীরে ধীরে বাতায়ন-সন্নিহিত হইয়া, তাহার লৌহদণ্ড ধারণ করিয়া, একচিত্তে উমাপতির কমনীয় কান্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। ক্ষণপরে উমাপতির নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং যে মধুমাখা স্বর শুনিতে মুক্তকেশী এত ব্যাকুলা ছিলেন, সেই মধুমাখা স্বর তাঁহারই নাম উচ্চারণ করিল। অমনই মুক্তকেশী অদৃশ্যা হইলেন। তিনি ইচ্ছা পূর্ব্বক সে সুখ ত্যাগ করিয়া তখনই সে স্থান হইতে অন্তর্হিতা

হইতেন না, কিন্তু তাঁহার সহচরী লজ্জা আসিয়া সজোরে তাঁহাকে আকর্ষণ করিল। তিনি অগত্যা তাহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিলেন।

উমাপতি মুক্তকেশীর অদর্শনের পর চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, সত্যই কি মুক্তকেশী এখানে আসিয়াছিলেন? এমন সময়ে শয্যা ত্যাগ করিয়া মুক্তকেশী কেন এখানে আসিয়াছিলেন? তিনি স্থির হইয়া এখানে দাঁড়াইয়াছিলেন—তাঁহার অধর-প্রান্তে আনন্দ-ভাসিতেছিল। মুক্তকেশী তাঁহাকে দেখিতেছিলেন। কেন দেখিতেছিলেন? তিনি যেমন সর্ব্বদা মুক্তাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, মুক্তাও কি সেইরূপ সর্ব্বদা তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন? তাহাই হইবে! পরে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"স্বপ্ন যদি সত্য হইত, তাহা হইলে আমি অদ্য কি সুখী!"

এই বলিয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরে গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিদায়ে।

"গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য॥"
—অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

উমাপতি ক্ষণপরে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া মাতুলালয়াভিমুখে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় তাঁহার একবার মুক্তকেশীকে দেখিতে ইচ্ছা হইল। তিনি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি-সঞ্চালন করিলেন—তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। দেখিতে পাইলেই কি তিনি মুক্তার সহিত সর্ব্বসমক্ষে সরলভাবে কথা কহিতে পারিতেন? না, তাহা পারিতেন না। তাঁহার সহিত নির্দ্দোষ আলাপ করিবেন, তাহাতে কুণ্ঠিত হইবার কারণ কি? কারণ যাহাই হউক, দুই তিন দিন পূর্ব্বে হইলে এরূপ হইত না। পূর্ব্বে যে উমাপতি ও মুক্তকেশী ছিলেন, তাঁহারা তো তাহাই রহিয়াছেন, তবে এরূপ হয় কেন? আমরা বলি, তাঁহারা তাহাই নাই। হৃদয় লইয়া মনুষ্য; বাহ্য আকারে মনুষ্য নহে। তাঁহাদের হৃদয় বিভিন্ন প্রকার হইয়াছে, সুতরাং তাঁহারা এক্ষণে আর পূর্ব্বকার তাঁহারা নহেন।

যাহা হউক, মুক্তকেশীকে দেখিতে না পাইয়া উমাপতি ক্ষুণ্ণ মনে প্রস্থান করিলেন। তিনি দ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াই, দেখিলেন, মুক্তকেশী আসিতেছেন। উমাপতি সানন্দে কহিলেন,—"মুক্তকেশী! কোথায় গিয়াছিলে?"

মুক্তা এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহার ইচ্ছা হইল উত্তর দেন, কিন্তু তাহা পারিলেন না। তিনি একবার উমাপতির কমনীয় কান্তি দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। সে বাসনা সফল করিবার নিমিত্ত নয়ন উন্নত করিলেন, কিন্তু লজ্জা তাঁহার হাত ধরিয়া চক্ষু নত করিয়া দিল। উমাপতির বদনের কিয়দংশের ছায়া তাঁহার নয়ন-প্রান্তে নিপতিত হইয়াছিল মাত্র, এমন সময় তাঁহার দৃষ্টি ভঙ্গ হইল।

উমাপতি পুনরপি কহিলেন,—"মুক্তকেশি! আমি এখন যাইতেছি।"

মুক্তকেশী ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসিলেন,—"কখন আসিবেন?"

উমাপতি কহিলেন,—"বোধ করি বৈকালে একবার আসিব।"

"আসিবেন?"

"আসিব। তবে যাই।"

মুক্তকেশী কোন উত্তর দিলেন না। উমাপতি আবার বলিলেন,—"মুক্তকেশি! তবে এখন আসি।"

এই বলিয়া এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মুক্তকেশী ধীরে ধীরে সেই দিকে ফিরিলেন।

উমাপতি একবার পশ্চাতে তাকাইলেন। অমনই মুক্তকেশীর চক্ষু অবনত হইল।

দেখিতে দেখিতে উমাপতি মুক্তার দৃষ্টি-সীমা বহির্ভূত হইলেন। মুক্তা অনেকক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া কি ভাবিলেন, পরে ক্ষুণ্ণ মনে আলয়ে প্রবেশ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মনোরথে।

"এত বড় আইবুড় ঝি।
বিবাহ না দিলে পরে লোকে কবে কি?"
—গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়।

বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। মুক্তকেশী, একটী নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে একখানি পিঁড়ির উপর উপবিষ্ট হইয়া, আপন মনে এক গুচ্ছ কেশরজ্জু বিনাইতেছেন। দুই একটী বিনন ঠিক হইতেছে, পরে আবার ফাঁস ভুলিয়া যাইতেছেন, বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে। তিনি আপন মনে কহিতে লাগিলেন,—"দূর হউক, আজ আর ইহা হইবে না। বৈকাল তো হইল। তিনি আসিবেন বলিয়াছিলেন এখনও আসিলেন না কেন? হয়তো আসিবেন না। কেনই বা আসিবেন?"

সরলা মুক্তকেশী এইরূপে সময়ে সময়ে কেশরজ্জু বিনাইতেছেন, সময়ে সময়ে তাহা ত্যাগ করিয়া আপন মনে পাগলিনীর ন্যায় বকিতেছেন। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী অপর ঘরের ভিতর বসিয়া কি কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, তাহারই কিয়দংশ পাঠক মহাশয়কে শুনিতে হইবে।

ব্রাহ্মণী কহিলেন,—"আহা। খাসা ছেলে। ছেলে তো নয় যেন কার্ত্তিক! কথাগুলিই বা কেমন মিষ্ট। আমার ইচ্ছা করে উমাপতির সঙ্গে মুক্তকেশীর বিবাহ দিই।"

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—"নির্দ্দোষ, রূপবান্, বিদ্বান্, বেশ সঙ্গতি আছে; ফলতঃ যা কিছু দেখিয়া বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য, সে সমস্তই উমাপতিতে বিদ্যমান।"

"তুমি সে আশা ছাড়িয়া দেও। তেমন কপাল নয়। এত দিন দেখিলে তো, কিছু জানিতে পারিলে? আর তা ভাবিয়া বসিয়া কাজ হারাইলে কি হইবে? এ পাত্রটী হাত-ছাড়া করিও না। মুক্তকেশী অনেকদিন বিবাহের বয়স ছাড়াইয়াছে।"

মুক্তকেশী, অপর প্রকোষ্ঠে বসিয়া, আপন কার্য্য করিতেছেন। তিনি ইচ্ছা করিলে তাঁহার জনক-জননীর সমস্ত কথা শুনিতে পাইতেন, কিন্তু তাঁহার সে দিকে মন ছিল না। "মুক্তকেশী" এই কথাটী কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি বুঝিলেন, তাঁহার পিতা-মাতা তাঁহারই কথা কহিতেছেন।

তাঁহার সম্বন্ধে কি কথা হইতেছে, জানিতে তাঁহার কৌতূহল জন্মিল। তিনি উৎকর্ণা হইয়া সে সকল কথা শুনিতে লাগিলেন।

ভট্টাচার্য্য বলিতেছেন,—"সে আশা তো ছাড়িয়া দিয়াছি। তাহার জন্য নয়। কথা কি জান, আমি সমাজ-ভ্রষ্ট হইয়া স্বস্থান ত্যাগ করিয়া এ বিদেশে বাস করিতেছি। এখানে আমার জ্ঞাতি, কুটুম্ব কেহ নাই। যে আমার কন্যা গ্রহণ করিবে, সে অবশ্যই আমার সম্বন্ধে সমস্ত সন্ধান করিবে; তবেই গোল। এক আত্মীয় হরি-হর। তাঁহার ভরসাতেই ও তাঁহার আশ্রয়েই এখানে বাস। তিনি সজ্জন। বিশেষতঃ তিনি ভালরূপে জ্ঞাত আছেন যে, আমি নির্দ্দোষ; শত্রুচক্রে পতিত হইয়া এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি। যে সকল নানা কারণে অদ্যাপি মুক্তার বিবাহ দেওয়া হয় নাই, তাহা হরিহর জ্ঞাত আছেন এবং তাঁহার সম্মতি অনুসারেই এইরূপ হইতেছে। মুক্ত বিবাহের বয়স অতিক্রম করিয়াছে, তাহা কি আমি জানিতেছি না? অন্য লোকের হইলে কত কথা হইত। কেবল হরিহরের ভয়ে আমার বিষয়ে কেহ কোন কথা কহে না। তাহা হইলে কি হয়? বয়স্থা কন্যা পাত্রস্থা না করিলে মহা-পাপ হয়। কৌলিন্যের অনুরোধে দেশে মুক্তার অপেক্ষাও অধিক বয়স্কা অবিবাহিতা কন্যা অনেক আছে। সেই কারণে আমি অদ্যাপি লোকের নিকট বিশেষ নিন্দাভাজন হইতেছি না। যাহা হউক, মুক্তার বিবাহ যতদূর সম্ভব শীঘ্র দেওয়াই আবশ্যক হইয়াছে।"

ব্রাহ্মণী। তুমি যে কারণ বলিলে, সে কারণে হরিহরও তো উমাপতির সহিত তোমার কন্যার বিবাহে অমত করিতে পারেন?

ব্রাহ্মণ। না, সে বিষয়ে আমার সাহস আছে। হরিহর অস্বীকৃত হইবেন না, আমি বেশ জানি। দুর্ভাগ্য বশতঃ এত দিন আমার মনে হয় নাই যে, হরিহরের এমন উপযুক্ত অবিবাহিত ভাগিনেয় আছে।

ব্রাহ্মণী। অবিবাহিত জানিলে কি প্রকারে?

ব্রাহ্মণ। তা আমি প্রথম হইতেই জানিতাম। তাহার পরে বিবাহ হইলে কখনই আমার অজ্ঞাতসারে হইত না।

ব্রাহ্মণী। যাহা হউক, যাহাতে এই শুভ সংঘটন হয়, তাহার যত্ন কর।

সে দিন ব্রাহ্মণ-দম্পতি কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া রাখিলেন। মুক্তকেশী সমস্ত কথা শুনিলেন। তাঁহার অধর-প্রান্তে একটু হাসি দেখা দিল এবং চারুচন্দ্রাননে এককালে হর্ষ ও লজ্জার বিভা প্রকটিত হইল। লজ্জা কেন? তাহা তিনিই জানেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন যে, উমাপতির সহিত বিবাহ দেওয়া তাঁহার জনক-জননীর অভিপ্রায়। তাঁহারা এই পরামর্শই করিলেন। আবার ভাবিলেন, তাহা নহে; তাঁহারা আর কি বলিতেছেন, আমি তাহা শুনিতে পাই নাই, অথবা তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। না; তাঁহাদের সমস্ত কথা আমি পরিষ্কাররূপে শুনিয়াছি। তাহাতে তো সন্দেহ নাই। আবার বালিকা ঈষৎ হাসিলেন। তাঁহার আনন্দ-তরঙ্গে পূর্ব্বজাত সন্দেহ-বালুকা কোথায় ভাসিয়া গেল। তাঁহার মন হইতে সমস্ত চিন্তা বিদায় গ্রহণ করিল। কেবল আনন্দ, সুখময় আশা ও ভবিষ্যৎ কল্পনা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া থাকিল। বালিকার দৃষ্টিতে তখন সংসার সুখের আলয় বলিয়া প্রতীত হইল। সংসার-বোধ-বিহীনা বালা সকল কার্য্যে ও

সকল দিকে আনন্দ ও সরলতার রশ্মি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

মুক্তকেশী পুনরায় রজ্জু বিনাইতে মনঃসংযোগ করিলেন, কিন্তু তাহা হইল না। তাঁহার চিত্ত এখন যে অপূর্ব্ব চিন্তায় নিযুক্ত আছে, তাহা হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া এবংবিধ কার্য্যে সংলগ্ন করা কি তাঁহার ন্যায় অস্থির-প্রকৃতি বালিকার কর্ম্ম? তিনি সে কার্য্য ত্যাগ করিয়া কার্য্যান্তরে গৃহপ্রবেশ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সৌকুমার্য্যে।

"কবরী ভয়ে চামর গিরিকন্দরে
মুখ-ভয়ে চান্দ আকাশ।
হরিণী নয়ন-ভয়ে, স্বর-ভয়ে কোকিল,
গতি-ভয়ে গজ বন বাস।
—বিদ্যাপতি।

আমরা ইতিপূর্ব্বে একাধিকস্থলে মুক্তকেশীকে সুন্দরী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। তিনি কিরূপ সুন্দরী জানিতে সকলের মনে স্বতঃ কৌতূহল জন্মিতে পারে। সেই কৌতূহল যথাসাধ্য চরিতার্থ করাই এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য। কিন্তু সৌন্দর্য্যের প্রকৃত পরিচয় প্রদান নিতান্ত কঠিন কার্য্য। দেশভেদে, জাতিভেদে, মনুষ্যভেদে, সৌন্দর্য্যের রুচি ভিন্নবিধ। জগতের বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন জাতিসমূহে বিভিন্ন প্রকার সৌন্দর্য্য লক্ষণ প্রচলিত। কোন জাতি হয় তো তুষার-ধবলাঙ্গী, তাম্রকেশী, বিড়ালাক্ষীর সৌন্দর্য্যে মোহিত হন। কোন জাতি হয় তো ক্ষুদ্র-পদশালিনী, নখর-কুলিশ প্রহারিণী, সর্ষপ-সমলোচনা যোষার গৌরব করেন। অপর কোন জাতি হয় তো কৃষ্ণাঙ্গী, স্থূল-চর্ম্মা, স্থূলাধর-সম্পন্না অঙ্গনার লাবণ্য অর্চ্চনা করেন। কোন জাতি বা স্বর্ণ-বর্ণা, স্থির-নয়না, কৃষ্ণ-কেশী রমণীর রূপে মুগ্ধ হন। কোন জাতি বা চঞ্চল-লোচনা, দ্রুত-সজোর-পাদ-বিক্ষেপণী, শুক-পক্ষি-তুল্য-নাসাধারিণী কামিনীর দেহে সমধিক সৌন্দর্য্য দর্শন করেন। ফলতঃ এ বিষয়ে কুত্রাপি মতের একতা দৃষ্ট হয় না। সৌন্দর্য্যবোধ সম্বন্ধে জগৎ দারুণ বৈষম্য-পূর্ণ। সৌন্দর্য্য বিষয়ক রুচির ভিন্নতা সহ, সৌন্দর্য্য-সাধক অলঙ্কারেরও ভিন্ন ভিন্ন রুচি দৃষ্ট হয়। কোন দেশে পুষ্প-বেষ্টিত ঝুঁটি নিতান্ত সৌন্দর্য্যের পরিচায়ক। কোথায় পক্ষি-পক্ষ চমৎকার ভূষণ বলিয়া গণ্য। কোথায় বা উল্কি দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। রুচি ভিন্ন বলিয়াই অলঙ্কার পদ্ধতিও ভিন্ন হইয়াছে। যাহা হউক ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এত জাতি আছে; ইহারা সাংসারিক বিবিধ বিষয়ে একমত; কিন্তু এই সম্বন্ধে ইহাদের অধিক ঐক্য দৃষ্ট হয় না। দেশভেদের ও জাতিভেদের কথা দূরে থাকুক, দুই জন মনুষ্যের এ বিষয়ে প্রায়ই এক মত দেখা যায় না। যে কারণে গ্রন্থকার মুক্তকেশীকে সুন্দরী মনে করিয়াছেন, হয় তো সেই কারণেই কোন পাঠক মহাশয় তাঁহাকে সামান্যা ও কুৎসিতা মনে করিবেন। সুতরাং মুক্তকেশীর দেহ সাধারণ সমীপে উপস্থিত করা নিতান্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। যদি সে সম্বন্ধে আর কিছু না বলি, তাহা হইলেও হয় ত কোন পাঠক বলিবেন, 'মুক্তকেশী বিশেষ সুন্দরী নহেন; সেই জন্য গ্রন্থকার তাহা চাপিয়া রাখিলেন।' কি বিপদ! সহৃদয় পাঠক মহাশয় গ্রন্থকারের বিপদ দেখিয়া দুঃখিত হইতেছেন,

না হাসিতেছেন? যদি হাসিয়া থাকেন তবে আর হাসিবেন না। সংসারে কেবল অদ্য এই সামান্য গ্রন্থকার এরূপ বিপদাপন্ন হইয়াছেন এমন নহে। পরের সন্তোষ সমুৎপাদনের জন্য যাঁহারা যখন যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই তখন এরূপ বিপদে পড়িয়াছেন। ঈশ্বরানুগ্রহশালী, মহামহোপাধ্যায়, অসামান্য কবি সকলও এইরূপ বিপদের হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারেন নাই। "অন্যে পরে কা কথা"—কবি-কুল-চূড়ামণি কালিদাস গৌরী-রূপ-বর্ণন-প্রসঙ্গে নানা কথা বলিয়া এবং বিবিধ প্রকারে সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিয়াও তৃপ্ত হন নাই। সে বর্ণনা সকলের সন্তোষপ্রদ হইবে কি না হইবে, তৎপক্ষে সন্দিহান হইয়া উপসংহার কালে—

"সর্ব্বোপমাদ্রব্যসমুচ্চয়েন যথাপ্রদেশং বিনিবেশিতেন।
সা নির্ম্মিতা বিশ্বসৃজা প্রযত্নাদেকস্থসৌন্দর্য্য-দিদৃক্ষয়েব॥"

এই কথা বলিয়া প্রসঙ্গের শেষ করিয়াছেন। বিচারক্ষম বিবেচক পাঠকগণ স্থির চিত্তে দেখিবেন, তখন উক্ত কবির মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল। এই জন্যই ইংলণ্ডীয় কবি-চক্রবর্ত্তী সেক্সপীয়র লিখিয়াছেন,—

"Beauty is bought by judgment
of the eye Not uttered by base
sale of chapmen's tongue."

যাহা হউক আমরা এই বিপদময় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু প্রবৃত্ত হইয়া কি বলিব? কোন্ সর্ব্বজনদৃষ্ট সামগ্রীর সহিত এ সুন্দরীর তুলনা করিব? এক জন বর্ত্তমান যশস্বী কবি কোন সুন্দরীকে পাঠকগণের গৃহিণীর ন্যায় এবং পাঠিকাগণের দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এ অতি সহজ ও সুন্দর উপায়; আমরাও তাহা করিতে পারিতাম, কিন্তু তাহাতে এক বিষম দোষ জন্মিতেছে,—পাঠক পাঠিকা ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন। কারণ পাঠকগণের বিবেচনায় তাঁহাদের গৃহিণীগণের এবং পাঠিকাগণের বিবেচনায় তাঁহাদের তুল্য সুন্দরী জগতে আর নাই। অধুনা বৎসর কয়েক মধ্যে দুই জন তদ্বৎ সুন্দরী প্রদর্শিত হইলে তাঁহাদের সেই চির-সঞ্চিত সংস্কারের অন্যথা করা হয়, তজ্জন্য তাঁহাদের ক্ষোভ উদ্দীপন করা হয় এবং হয় তো অভিমানিনী পাঠিকাগণের বিশেষ বিরাগ-ভাজন হইতে হয়। সুতরাং তাহাতে কাজ নাই। অন্য উপায় অনুসন্ধান করি।

কৃষ্ণনগরের রাজসভা উজ্জ্বলকারী ভারতচন্দ্র "রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী" বলিয়া বর্ণনার চরম করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা কখন লক্ষ্মী বা সরস্বতী কিছুই দেখিতে পাইলাম না। পাঠক মহাশয়েরা কেহ কি দেখিয়াছেন? অসুর-নাশিনী, মহিষ-মর্দ্দিনী দশ-ভুজার প্রতিমা-পার্শ্বে লক্ষ্মী-সরস্বতীর প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়াছি। যদি তাহাই লক্ষ্মী সরস্বতীর প্রতিমূর্ত্তি হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের উদ্দেশে নমস্কার করি, কিন্তু তাঁহাদের সহিত সুন্দরীর তুলনা করিতে পারি না। অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

অন্য উপায়াভাবে আমরা এক্ষণে সোজা কথায় মুক্তকেশীর মূর্ত্তি পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিব।

মুক্তকেশীর বয়স অনুমান ষোড়শ বৎসর হইবে। যে বয়সে রমণীগণ, বালিকা কালের সীমা অতিক্রম করিয়া, যৌবনে পদার্পণ করত জগতের আনন্দ বিধান করেন, মুক্তার এক্ষণে সেই সময় উপস্থিত। তাঁহাকে এখনও সম্পূর্ণা-বয়বা, সুঘটিতা, সংবর্দ্ধিত-দেহ-সম্পন্না বালিকা,

বলিলেও বলা যায়। তাঁহার সৌন্দর্য্য মুগ্ধকরী; প্রীতি ও আনন্দ পরিপূর্ণ। তাঁহাকে দেখিবামাত্র নয়ন, মন, প্রাণ, দেহ, সমস্তই তাঁহাকে দিতে ইচ্ছা করে, তথাপি এই সম্মোহিনী সৌন্দর্য্য মধ্যে এমত নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র, স্বর্গীয় কমনীয়তা বিরাজ করিতেছে যে, তাহা দর্শন করিবামাত্র যাবতীয় দুষ্প্রবৃত্তি যেন কোথায় লয় পাইয়া যায়, তাঁহাকে স্নেহ করিতে ইচ্ছা করে এবং তাঁহার হিতার্থে কোন কার্য্যই দুরূহ বিবেচিত হয় না; তাঁহার সন্তোষ সাধনার্থে জ্বলন্ত বহ্নিতে ঝাঁপ দিতে কষ্ট হয় না।

মুক্তার অবয়ব লজ্জায় মাখা; তাঁহার শরীরের সর্ব্বত্র দীপ্তিমতী রহিয়াছে। প্রীতি এবং পবিত্রতা সতত যেন তাঁহার বদন-কমলে রশ্মি বিকীর্ণ করিতেছে। আপনি তাঁহাকে দর্শন করুন, তাঁহাকে আদর ও যত্নের সামগ্রী ভিন্ন অন্য কোনরূপ বিবেচনা করিতে সাহস করিবেন না। সর্ব্বদা তাঁহারই নিকটে থাকিতে ইচ্ছা করিবেন এবং সতত তাঁহারই কার্য্যে জীবনপাত করিতে ইচ্ছা করিবেন। কিন্তু ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, কখন আপনার মনে কোন ঘৃণিত অভিলাষের উদ্রেক হইবে না।

এমন সৌন্দর্য্য আছে যাহা দর্শকের চিত্তকে একবারে আক্রমণ করে ও যন্ত্রণা দেয়; দর্শনমাত্র মন উন্মত্ত হইয়া উঠে ও অদর্শনে দর্শক অপার আনন্দ অনুভব করেন এবং এই সৌন্দর্য্য তাঁহার হৃদয়ে চিত্রিত হইয়া রহে। তিনি যেখানে থাকেন, যখন তাঁহার মনে ইহা সমুদিত হয়, তখনই তাঁহার আনন্দ জন্মে। ক্রমে ক্রমে সৌন্দর্য্যরাশি অন্তস্তসারে দর্শকের চিত্তে প্রবেশ করে, তথাপি তাঁহার কষ্ট হয় না; তিনি সুখে থাকেন। মুক্তকেশীকে দর্শন করিবামাত্র সকলেরই হৃদয়ে একটী আনন্দ জন্মে। সে আনন্দ কেন জন্মে, অথবা তাঁহার শরীরের কোন স্থানের বিশেষ সৌন্দর্য্য দেখিয়া জন্মে, তাহা বলা দুঃসাধ্য। তাঁহার শরীরের সর্ব্বাংশই সুকুমার। প্রতিভা ও সরলতা সমল ভগ্নী-দ্বয়ের ক্রীড়া-ভূমি স্বরূপ, সুচারু ললাট, ঘনকৃষ্ণ বর্ণ বিভাসিত অংস নিপতিত চিকুর দাম, কুপিতা হংসীসম সুচারু চমৎকার গ্রীবা, তাঁহার অতীব শোভা সম্পাদন করি-তেছে। অমল ধবল লোচনে নিবিড় কৃষ্ণ তারা শোভা পাইতেছে; যেন বিমল জলে নীল শতদল ভাসিতেছে। চক্ষুর্দ্বয় বৃহৎ ও সমুজ্জ্বল। তাহাতে মুক্তকেশীর পবিত্র ভাব প্রতিভাত হইতেছে।

মুক্তকেশীর ভ্রূযুগ আকর্ণ বিস্তৃত, সুবক্র এবং কেশাপেক্ষাও সমধিক কৃষ্ণ। নাসিকা সরল ও বদনোপযোগী। ওষ্ঠাধর সদা পরস্পর সংমিলিত, হাস্যময়, আনন্দোদ্দীপক; যেন নির্দ্দোষ যুগল বিম্ব। যখন মধুমাখা হাস্য আসিয়া উহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিত, তখন তন্মধ্য দিয়া কুন্দ-বিনিন্দিত সমাগ্র ও নির্ম্মল দুই শ্রেণী দন্ত দেখা দিত। তাঁহার বাহুযুগল অতীব সুকুমার; যেন নবনীত বিনির্ম্মিত। মনুষ্য শরীরে অস্থি থাকে, কিন্তু মুক্তকেশীর বাহু দেখিলে এমনই বোধ হইত যে, তাহা অস্থি-বিহীন। যখন মুক্তকেশী গৃহকর্ম্ম সম্পাদনার্থ হস্ত চালনা করিতেন, তখন তাহা ছিন্ন হইবে বলিয়া শঙ্কা জন্মিত, অথবা যদি তাঁহার হস্তে কোনরূপ একটু চাপ পড়িত, তাহা হইলে তাহা কাটিয়া বসিবে, অথবা এককালে দলা হইয়া যাইবে বোধ হইত। মুক্তকেশীর শরীরের আয়তন কিছু দীর্ঘ ছিল। কিন্তু সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি তদুপযোগী সংবর্দ্ধিত হওয়ায়, তাঁহার দৈর্ঘ্য শোভারই কারণ হইয়াছিল। তাঁহার শরীর এরূপ পরিণত, এরূপ প্রফুল্ল,

বসন্তজাত নব লতিকার ন্যায়, এরূপ সতেজ যে, মুক্তকেশী তৎপ্রভাবে এই বয়সেই পূর্ণ যুবতী।

মুক্তার কণ্ঠস্বর অতীব সুমিষ্ট। তাহা একবার শুনিলে নিরন্তর তাহাই শুনিতে ইচ্ছা জন্মিত; তাহাতেই কর্ণকে আবদ্ধ রাখিতে বাসনা হইত। যখন নিদারুণ শোক-শেল হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া ভয়ানক যাতনা দেয়, যখন হিংস্র প্রতিবেশীর হিংসা নিবন্ধন মানস-মন নিতান্ত বিচলিত থাকে, যখন দুরাকাঙ্ক্ষা, কখন রাজ-সিংহাসন, কখন কুবের-ভাণ্ডার দেখাইয়া মনুষ্যকে নিতান্ত অস্থির করে, যখন নানাবিধ পার্থিব যাতনা সমবেত হইয়া, মনুষ্যকে আত্ম হত্যারূপ মহাপাপাচরণে পরামর্শ দেয়, তখন এমন কোন স্বর আছে কি, যাহা শ্রবণে হৃদয়ের যাবতীয় যাতনা অপনীত হইয়া যায়, এক মুহূর্ত্তে সংসার সুখের আলয় বলিয়া প্রতীত হয়, আর সংসার ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না, সেই স্বর পুনরায় শ্রবণের নিমিত্ত মন উদাস হয়? এমন স্বর আছে কি? যদি মনুষ্য স্বরে সেরূপ ক্ষমতা থাকা সম্ভব হয়, তবে মুক্তকেশীর স্বর সেই অমানুষী ক্ষমতা সম্পন্ন। বিদুষী না হইয়াও মুক্তকেশীর মন অনেকাংশে সমুন্নত ছিল। তাঁহার হৃদয়ে প্রতিভা ছিল, তৎ-প্রভাবে তিনি সহজেই অনেক জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। প্রত্যূষে শয্যোত্থিত হইয়া এবং সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে, জীব, জন্তু, চন্দ্র, সূর্য্য, বৃক্ষ, লতাদির পরিবর্ত্তনও প্রকৃতির শোভা দর্শনে তাঁহার আনন্দ জন্মিত। তাঁহার হৃদয় অভিমানে পূর্ণ ছিল; কখন কেহ তাঁহার উপর একটু কুপিত দৃষ্টি অর্পণ করিলে অমনই তাঁহার লোচন বিস্ফারিত হইয়া জলধারাকুল হইত। এই জন্য মুক্তকেশী জীবন মধ্যে কখন কোন গর্হিত কর্ম্ম করেন নাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বাতায়নে।

'Two of the fairest stars
in all the heaven,
Having some business
do entreat her eye,
To twinkle in their
spheres till they return.
—Shakespeare (Romeo & Juliet.)

উমাপতির মাতুল হরিহর রায় দেখিতে শ্যামবর্ণ ও দোহারা ছিলেন। তাঁহার বয়স পঞ্চাশৎ বর্ষের কিঞ্চিদধিক হইবে। তাঁহার মাথার চুলগুলি গোল করিয়া কাটা; বয়সধর্ম্মে অধিকাংশই সাদা, তন্মধ্য হইতে একটী সুদীর্ঘ শিখা বিনির্গত ছিল।

তিনি বড় সাদা প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার স্বভাবের গুণে সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। গ্রামে তাঁহার বিলক্ষণ প্রভুত্ব ছিল; কেহই তাঁহার অমত, অথবা তাঁহার অসন্তোষ-জনক কোন কার্য্য করিত না। হরিহর সঙ্গতি-শালী ছিলেন।

তিনি নিঃসন্তান। তাঁহার সন্তান হয় নাই এমন নহে। তাহার দুইটী পুত্রসন্তান ছিল। বড় সন্তানটীর বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহের কিছু কাল পরে কোন কার্য্যোপলক্ষে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বিদেশ গমন করেন। সেই অবধি আর তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তাঁহাকে পুনঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত অনুসন্ধানের ত্রুটি হয় নাই; কিন্তু কুত্রাপি তাঁহার দর্শন পাওয়া যায় নাই। দারুণ শোকের চিহ্ন স্বরূপ তাঁহার বড় পুত্রবধূ সংসারেই ছিলেন। হরিহর অগত্যা

মনের বেগ সংবরণ করিয়া কনিষ্ঠ পুত্রটী লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন; কিন্তু দুরন্ত কাল তাঁহার সে সৌভাগ্যও সহ্য করিতে পারিল না। নির্ম্মম হইয়া তাঁহার অঙ্কস্থিত পুত্রকে অকালে হরণ করিল। ইহার পরে হরিহর সংসার ত্যাগী বিরাগী প্রায় হইয়াছিলেন। সকলে তাঁহাকে বড় ভালবাসিত বলিয়া এবং উমাপতির বিবিধ অনুরোধে, তিনি আবার সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। এক্ষণে উমাপতিই তাঁহার সর্ব্বস্ব। উমাপতিকে তিনি বড় ভালবাসিতেন। তাঁহারই মুখ তাকাইয়া হরিহর সংসারে থাকিতেন; উমাপতিও শোকাতুর মাতুলকে অসাধারণ ভক্তি করিতেন। মাসের মধ্যে পনর দিন মাতুলালয়ে এবং পনর দিন বাটীতে থাকিতেন। তিনি উভয় পরিবার একস্থানে করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু নানা কারণে তাহা অবিধেয় বিবেচনায় সম্পন্ন হয় নাই। সর্ব্বদা গোপালপুরে যাতায়াত হেতু, উমাপতি তথায় উত্তমরূপে পরিচিত ও সাধারণের স্নেহভাজন ছিলেন।

পাঁচ দিন অতীত হইল উমাপতি মাতুলালয়ে আসিয়াছেন। অদ্য মধ্যাহ্ন সময়ে মাতুল ও ভাগিনেয় একত্র আহার করিতে বসিয়াছেন আহার করিতে করিতে নানাবিধ কথা হইতেছে। উমাপতি সে দিন মুক্তকেশীকে বিপন্মুক্তা করিয়া সৎকর্ম্ম করিয়াছেন, তাহার প্রশংসা হইল। ভট্টাচার্য্য অতি নিরীহ ও ভদ্রলোক, এ কথা হইল। এতদিন পর্য্যন্ত কন্যার বিবাহ না দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসায়, উমাপতির মাতুল কহিলেন,—"তাহার বিশেষ কারণ আছে। তাহা তুমি জানিতে পারিবে।"

উমাপতি নীরব রহিলেন। এইরূ কথাবার্ত্তায় আহারাদি শেষ হইয়া গেল।

বৈকালে উমাপতি ভ্রমণে নির্গত হইয়া ভট্টাচার্য্যভবনে গমন করিলেন। তথায় গিয়া দেখিলেন, ভট্টাচার্য্য মহাশয় গৃহে নাই। ব্রাহ্মণপত্নী তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া বসিতে আসন দিলেন। তিনি বসিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন স্থির হইল না। কেন? তিনি যে উদ্দেশে, যাহাকে দেখিবার নিমিত্ত, এখানে আসিয়াছিলেন, তাঁহার সেই হৃদয়েশ্বরী কোথায়? তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তিনি যে প্রকোষ্ঠে সে দিন নিদ্রিত ছিলেন এবং নিদ্রাভঙ্গ সহকারে যে বাতায়নে মুক্তকেশীর চন্দ্রানন তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল, এক্ষণে সেই দিকে তিনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দৃষ্টবস্তু সমুদায়ের ছায়া হৃদয়ে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার বদন শরচ্চন্দ্রের ন্যায় প্রফুল্লবেশ ধারণ করিল। তিনি অর্দ্ধমুক্ত গবাক্ষ দিয়া দুইটী বিশাল সহাস্য নয়ন দেখিতে পাইলেন। সে নয়ন দর্শনে উমাপতি বুঝিলেন যে, তাহা মুক্তকেশীর সম্পত্তি। তিনি তন্ময় হইয়া তাহা দেখিতে লাগিলেন। যত দেখেন, ততই দর্শনেচ্ছা বলবতী হইতে লাগিল। এই সময় উমাপতিকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, ব্রাহ্মণী একটু প্রয়োজন সম্পাদনে গমন করিলেন। উমাপতি বসিয়া রহিলেন। তাঁহার দৃষ্টি বাতায়নের প্রতি স্থির হইয়া থাকিল। নিম্নে একটী কুকুর শয়ন করিয়াছিল। সে এই সময় একবার ডাকিয়া উঠিল। উমাপতি তাহা দেখিতে একবার মুখ ফিরাইলেন। দ্রষ্টব্য দর্শন করিয়া আবার গবাক্ষের দিকে দৃষ্টিসঞ্চালন করিলেন। দেখিলেন বাতায়ন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মুক্ত হইয়াছে। তন্মধ্য দিয়া প্রফুল্ল,

হাস্যময়ী সুন্দরী মুক্তকেশীর সম্পূর্ণ বদন তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। উমাপতি দেখিলেন, বদন উচ্ছ্বাসোন্মুখী প্রব হিণীর ন্যায় হাস্যময়ী। উমাপতি একাচত্তে সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। বদন অবনত হইল; কিন্তু দ্বার রুদ্ধ হইল না।

এই সময় ব্রাহ্মণী উমাপতির নিমিত্ত জলখাবার লইয়া প্রবেশ করিলেন। তিনি উমাপতিকে জলখাবার দিয়া মুক্তকেশীকে সম্বোধন করিয়া জল ও তাম্বূল আনিতে আদেশ করিলেন। অনতিবিলম্বে ব্রীড়া সঙ্কুচিতা মুক্তকেশী মাতৃ-আজ্ঞা সম্পাদনে আগমন করিলেন। তিনি জল ও পান আনিয়া মাতার নিকটে দিলেন। তাঁহার মাতা কহিলেন,—"আমি কি করিব? উমাপতিকে দেও।"

অবনতমুখী মুক্তকেশী উমাপতিকে দিবার নিমিত্ত জল ও পান লইলেন। দারুণ লজ্জাজনিত সংকোচে জলসহ তাম্বূলপাত্র তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া পতিত হইয়া গেল। স্মিতবিকশিতাননা মুক্তাকেশী সে স্থান হইতে পলায়ন করিলেন। তাঁহার মাতা কহিলেন,—"আ পাগলি! এত লজ্জা কি?"

তিনি স্বয়ং উঠিয়া পুনরায় জল ও পান আনিতে গমন করিলেন। উমাপতি মুক্তকেশীর সলজ্জ মধুর ভাবটী ধ্যান করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণী আসিলে, উমাপতি জল খাইয়া অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিলেন। পরে সন্ধ্যা সমাগত প্রায় দেখিয়া বাটী আসিলেন। আসিবার সময় তিনি পুনরায় মুক্তার পবিত্র মুখ দর্শন করিতে পাইলেন না।

নবম পরিচ্ছেদ

বিবাহ-সম্বন্ধ।

"O, two such silver currents, when they join Do glorify the banks that bound them in"

—Shakespeare (King John.)

কালিদাস ভট্টাচার্য্য পরামর্শের সপ্তাহদ্বয় পরে হরিহরের নিকট উমাপতির ও মুক্তকেশীর বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব করেন। উমাপতির মাতুল সাদরে সে প্রস্তাবে অনুমোদন করিয়াছেন। তাঁহারা সেই দিন হইতে প্রত্যেকে অপরকে বৈবাহিক বলিয়া সম্বোধন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিবাহ সংঘটনে কোন পক্ষেই কোন বাধা নাই। যে দিন প্রস্তাব হইয়াছিল, হরিহর সেই দিন সপ্তগ্রামে তাঁহার ভগ্নী, উমাপতির জননীর নিকট, লোক দ্বারা সমস্ত সংবাদ পাঠাইয়া সম্মতি চাহিয়াছিলেন। উমাপতির জননী অতি অংস্বভাবা পুরন্ধ্রী। তিনি জানিতেন যে, তাঁহার স্বামীর অবর্ত্তমানে তাঁহার সহোদরই উমাপতির অভিভাবক। প্রকৃতপক্ষেও হরিহর সর্ব্বাংশেই উমাপতির অভিভাবক ছিলেন। এমন স্থলে উমাপতির মাতা তাঁহার সোদর-প্রস্তাবিত সম্বন্ধে অসম্মতি দিবেন কেন? তিনি আনন্দে অনুমোদন করিয়াছেন। বিবাহ সম্বন্ধে ভাবী পুত্রবধূর স্বভাব ও সৌন্দর্য্য তাঁহার প্রধান কামনা। হরিহর বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, 'যে কন্যার সহিত উমাপতির বিবাহ সম্বন্ধ হইতেছে, বিবাহ হইলে দেখিতে পাইবে, সেটী দেবী কি মানবী নির্ণয় করা কঠিন।' পাত্রীর কিছু বয়স হইয়াছে, তাহা তিনি শুনিয়াছিলেন। কিন্তু

তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট ভিন্ন অসন্তুষ্ট হন নাই। কারণ তাঁহার পুত্রের যেরূপ বয়স হইয়াছে তাহাতে অনুরূপ পুত্রবধূ হওয়াই আবশ্যক। আর তাঁহার ও বার্দ্ধক্য উপস্থিত। এ সময়ে উপযুক্ত পুত্রবধূ হইলে তিনি অনেকাংশে সংসার-চিন্তা হইতে নিস্তারলাভ করিতে পারেন। এই সকল বিবেচনায় তিনি সে সম্বন্ধে অনুমাত্রও আপত্তি উত্থাপন করিলেন না।

বিবাহ স্থির হইয়া রহিল। কোন পক্ষেই কোন গোল থাকিল না। উমাপতি সকল কথা জানিতে পারিলেন। যে মুক্তকেশীকে তিনি আরাধ্যা দেবীর ন্যায় জ্ঞান করেন, যে মুক্তকেশীর মধুরতাপূর্ণ বাক্য-সুধা পানার্থ তিনি পিপাসিত হইয়া আছেন, যে মুক্ত-কেশীর অনুপম সৌন্দর্য্য তাঁহার হৃদয়পটে প্রতিবিম্বিত হইয়া রহিয়াছে, যে মুক্তকেশীর গুণ-মন্ত্রে তিনি মুগ্ধ হইয়া আছেন, সেই মুক্তকেশী—সেই যত্নলব্ধা চারুহাসিনী, পবিত্রা, মুক্তকেশী অনায়াসেই তাঁহার সহ-ধর্ম্মিণী হইয়া পৃথিবীতে স্বর্গ সৃষ্টি করি-বেন, ইহা কি তাঁহার অতুল আনন্দের কারণ নহে? উমাপতির সুখের সীমা রহিল না। কবে সে শুভ দিন সমাগত হইবে, যে দিন তিনি তাঁহার প্রাণেশ্বরী মুক্তাকে নির্ব্বিঘ্নে আপনার বলিয়া জীবন জুড়াইতে পারিবেন; উমাপতি সেই সর্ব্বসুখপ্রদ শুভদিন সমাগমের নিমিত্ত, জলদবিগলিত জলধারাকাঙ্ক্ষী সতৃষ্ণ চাতকের ন্যায়, অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ভ্রান্ত লোকেরা চিন্তা মাত্রকেই ক্লেশের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সেটী নিতান্ত বুঝিবার ভুল। চিন্তা সময়ে সময়ে হিতকারিণী সখীর ন্যায় চিত্তবিনোদের প্রধান সাধন হয়, এই সময় একবার উমাপতির হৃদয়স্থিত চিন্তা পর্য্যালোচনা করিলে তাহা সবিশেষ বুঝিতে পারা যাইবে। উমাপতি নবদ্বীপে নবকুমারের নিকট সমস্ত কথা লিখিয়া পাঠাইলেন। শ্যামা-সুন্দরীকে সমস্ত কথা জানাইতে বলিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

শত্রু-হস্তে।

——"Revenge is now the cud
That I do chew—I'll challenge him."
—Beaumont and Fletcher.

একদিন উমাপতি, সন্ধ্যার অত্যল্পকাল পরে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটী হইতে ব্যস্ত হইয়া মাতুলালয়ে প্রত্যাগমন করিতেছেন। আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়াছে। সময়ে সময়ে চপলা বিদ্যুদ্দেবী, পতির সহিত রঙ্গরস করিতে করিতে, বিজলীর ছটা বাহির করিতে-ছেন। দারুণ অন্ধকারে সম্মুখের মনুষ্যও লক্ষ্য করা যাইতেছে না। পথে জন-প্রাণী নাই; যাহারা বাটী ছাড়িয়া অন্যত্র ছিল, তাহারাও অকালে জলদোদয় লক্ষ্য করিয়া বাটী প্রত্যাগত হইয়াছে। একে দারুণ অন্ধকার, তাহাতে আবার নৈদাঘ ঝটিকা। কাহার সাধ্য পথে চলে? সময়ে সময়ে বিদ্যুদালোক না থাকিলে উমাপতি কোন ক্রমেই পন্থা নির্ব্বাচনে সমর্থ হইতেন না। মেঘের গর্জ্জন এত ভয়ানক যে, প্রতি শব্দেই বোধ হইতেছে যেন এইবার শিরে অশনি-সম্পাত হইল। ফলতঃ ভীষণতার যত কিছু সামগ্রী আছে, সকলই যেন সমবেত হইয়া, এই সময়ে

প্রকৃতিকে রণরঙ্গিণী বেশে সাজাইয়াছে। প্রকৃতি বিদ্যুদালোকে হাসিতেছেন, কিন্তু সে হাসিতে ভয়াকুল জনগণের প্রাণ উড়িয়া যাইতেছে।

যখন উমাপতি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহ ত্যাগ করিয়া আইসেন, তখনও মেঘের এমন অবস্থা হয় নাই। দেখিতে দেখিতে মেঘের এই ভয়ানক বেশ হইল। উমাপতি দৌড়িতেছেন; আর একটী পাক অতিক্রম করিতে পারিলেই তিনি গৃহে পৌঁছিতে পারেন। এই স্থানে একটী ক্ষুদ্র বন ছিল। বনের পরেই একটী প্রকাণ্ড আম্র-কানন। তাহার পরেই তাঁহার মাতুলের আবাস।

উমাপতি অতিশয় দ্রুতপদবিক্ষেপে চলিতেছেন। অন্ধকারে তাঁহার গতিরোধ হইতে লাগিল। বিদ্যুৎ সাহায্যে এককালে অনেক খানি পথ দেখিয়া লইতেছেন ও আবার প্রাণপণে ছুটিতেছেন। এই টুকু পার হইতে পারিলে তিনি আশ্রয় পান ও নিশ্চিন্ত হন। এই সময় একটী ভয়ানক ঘটনা তাঁহার গতিরোধ করিল। তিনি আপন মনে দৌড়িতেছেন, এমন সময় সম্মুখ হইতে কে কহিল, —"আর যাইতে হইবে না, দাঁড়াও।"

বক্তার স্বর অতি প্রচণ্ড ও কর্কশ। উমাপতি সহসা সে স্বর শ্রবণে শিহরিয়া উঠিলেন এবং সভয়ে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন,—"কে তুমি?"

বক্তা পুনরপি পূর্ব্ববৎ ভীষণ স্বরে কহিল, —"সে পরিচয় পরে হইবে, এক্ষণে কথা শুন।"

এই সময় একবার বিদ্যুৎ হইল। উমাপতি দেখিলেন, অরণ্য মধ্যে যে দুরাচারের হস্ত হইতে তিনি মুক্তকেশীকে রক্ষা করেন এবং যাহাকে একেবারে প্রাণে না মারিয়া একটী বৃক্ষে বাঁধিয়া রাখেন—এ সেই দুরাচার। উমাপতি চমকিলেন। তিনি দেখিলেন হতভাগা একক নহে; তাহার সঙ্গে তাহারই ন্যায় আরও পাঁচ জন সহচর আছে। তিনি বিবেচনা করিলেন, তাঁহার উপর পাষণ্ডের নিতান্ত ক্রোধ জন্মিয়াছিল। সুতরাং সে অধুনা প্রতিহিংসাপরবশ হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছে। এক্ষণে পলায়ন ভিন্ন উপায় নাই। এই বিবেচনায় যেমন তিনি পলায়নে প্রবৃত্ত হইবেন, এমন সময়ে এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিল। উমাপতি তাহাকে সবলে দূর করিয়া দিলেন। পরক্ষণেই সকলে আসিয়া উমাপতিকে বেষ্টন করিল। তিনি আর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণে সময় পাইলেন না। দুরাচারেরা তাঁহার মুখ বন্ধ করিল। তিনি বন্দী হইলেন। উমাপতি নিষ্কৃতির নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহা ঘটিল না। তাহারা তাঁহার হস্ত-পদাদি বদ্ধ করিল। উমাপতি সুতরাং নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িলেন। তখন তাহারা তাঁহার দেহ স্কন্ধে লইয়া প্রস্থান করিল।

সংসারের এই গতি। এখানে কখন কি ঘটিবে কে বলিতে পারে? এই মুহূর্ত্তে যে দৃশ্য পরম প্রীতিপদ ও সুন্দর দেখাইতেছে, পরক্ষণেই তাহা এমনই হইতে পারে যে, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও ঘৃণা জন্মে। মনুষ্য এখনই আনন্দ-সাগরে ভাসমান হইয়া আশা-হিল্লোলে নাচিতে নাচিতে উন্নতি-স্রোত বহিয়া চলিতেছে, পরক্ষণেই হয় তো কোন অদৃশ্য বিপদাবর্ত্তে পতিত হইয়া সঙ্কটাপন্ন হইতেছে। সংসারের কিছুই নিত্য নহে। কল্য প্রভাতে রামযৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া রাজকার্য্য স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন ভাবিয়া আহ্লাদে উৎফুল্ল রহিয়াছেন,

সহসা প্রত্যূষে উঠিয়া জানিতে পারিলেন যে, রাজ্য-বিনিময়ে তাঁহার নিমিত্ত চতুর্দ্দশ বর্ষ বন-নির্ব্বাসন স্থির হইয়াছে। রাম রাজা না হইয়া বনবাসী হইলেন। পূর্ণগর্ভা জানকী স্বামীর নয়নানন্দদায়িনী হইয়া পরমানন্দে সময়পাত করিতেছেন, সহসা তাঁহার অদৃষ্টের গতি পরিবর্ত্তিত হইল। রাম তাঁহাকে বনবাসে দিলেন। দিগন্তবিজয়ী ত্রিলোকত্রাস দশানন আপনাকে অমর জ্ঞান করত, অপ্রতিহত প্রভাবে যথেচ্ছাচরণ করিতেছেন, তাঁহার অদৃষ্ট পরিবর্ত্তিত হইল, তিনি স্ববংশে রামের হস্তে বিনষ্ট হইলেন। বাসববিজয়ী মেঘনাদ প্রাণোপমা পত্নী প্রমীলার নিকট হইতে রামবিজয়ার্থ কিয়ৎকালের নিমিত্ত বিদায় গ্রহণ করিলেন। তিনি জানিতেন জগতে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। তাঁহার সংস্কার বৃথা হইল। আর তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে হইল না। বারণাবতস্থ অমোঘ কৌশলসম্পন্ন জতুগৃহে যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবেরা দগ্ধ হইয়াছেন মনে করিয়া দুর্য্যোধনাদি কৌরবেরা মহানন্দে মগ্ন। রাজ্যলাভের নিমিত্ত তাঁহাদের এ সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইল। সেই পাণ্ডবদিগের হস্তেই তাঁহাদের জীবলীলার শেষ হইল। এইরূপ অনিশ্চিত অচিন্তিত-পূর্ব্বঘটনা সংসারে কখনই বিরল নহে। পৌরাণিক বিবরণ পরিত্যাগ করিয়া, ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখ, তাহাতেও এতদ্রূপ ঘটনার ভূরি ভূরি প্রমাণ দৃষ্ট হইবে। লাহোরপতি অনঙ্গপাল অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশ হইতে সাহায্য ও সৈন্য সংগ্রহ করিয়া গজনিপতি দেবদ্বেষী মামুদের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন; যুদ্ধে তাঁহার জয় স্থির নিশ্চিত হইল। অদৃষ্ট তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইলেন না। জয়ের পরিবর্ত্তে অনঙ্গপাল পরাজিত হইলেন। দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ, অসংখ্য সৈন্য-সামন্ত সমবেত করিয়া, দৃষদ্বতী নদীতীরে পটমণ্ডপ সংস্থাপন করত, সগর্ব্বে বিপরীত পার্শ্বস্থিত শত্রু গৌরপতি মহম্মদকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে উপদেশ দিলেন! কিন্তু এ গর্ব্বের পরিণাম কি হইল? গৌরপতি জয়লাভ করিলেন, দিল্লীশ্বর পরাজিত হইলেন। যৎকালে দুর্দ্দান্ত নবাব সিরাজউদ্দৌলা, বিপক্ষ ইংরেজ-পক্ষনায়ক সুচতুর ক্লাইবের সহিত স্বীয় সমর-নায়ক মোহন লালের অসামান্য যুদ্ধচাতুর্য্য দর্শনে পটমণ্ডপ হইতে ভূয়সী প্রশংসা করিতেছিলেন এবং স্বীয় জয়ের সন্দেহ নাই দেখিয়া আনন্দ রাখিবার স্থান পাইতেছিলেন না, তখন সহসা নীচাশয়, নিস্তেজ মিরজাফরের প্ররোচনায় সেনাপতিকে রণে ক্ষান্ত হইতে আদেশ করিলেন; অমনই বিপক্ষেরা সবলে প্রত্যাবৃত্তগণকে আক্রমণ করিল। বঙ্গের সৌভাগ্য-সূর্য্য সেই দিনাবধি সম্পর্কশূন্য সুদূরস্থিত ক্ষুদ্র দ্বীপবাসী ইংরেজজাতির আশ্রিত হইলেন। আর সিরাজউদ্দৌলা এত আশা ভরসা করিয়াছিলেন, তাহা কি হইল? শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। ইতিহাসে এরূপ প্রমাণের অভাব নাই। কেহ কেহ বলেন যে, যে ব্যক্তি অগ্রপশ্চাৎ বুঝিয়া চলিতে পারে, তাহার বিপদ হয় না। আমরা এ কথা স্বীকার করি না। সময়ে সময়ে এমনই দুর্জ্ঞেয় পথ অবলম্বন করিয়া বিপদ অজ্ঞাতসারে আক্রমণ করে যে, তাহার হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করা মনুষ্য-সাধ্যের অতীত।

পার্থিব পদার্থ সম্বন্ধে ভবিষ্যতের উদর-কন্দরে কি ব্যবস্থা আছে তাহা কে জানে? তাহা জানিবার উপায় নাই এবং জানিবার পূর্ব্ব হইতে সতর্কতা অবলম্বন করা নিতান্ত অসম্ভব। এই রূপ ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বে পরিজ্ঞাত হইবার পন্থা থাকিলে সংসারে ভয়ানক

গোলযোগ উপস্থিত হইত। সংসার-বন্ধন শিথিল হইয়া যাবতীয় সুব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইত।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পিত্রালয়ে।

"And yet a father ! think. I am your child ! Turn not your eyes away— look on me kneeling. : Now curse me if you ean, now spurn me off."

—Congreve (Mourning Bride)

পদ্মাবতী যখন শুনিলেন যে সহসা নবকুমার ও শ্যামা বিপদাপন্ন হইয়া নবদ্বীপ গমন করিয়াছেন, তখন তিনি অত্যন্ত কাতর হইলেন। ভাবিয়া দেখিলেন যে, নবকুমারের অবর্ত্তমানে এক্ষণে সপ্তগ্রামে অবস্থান বৃথা। নবকুমারের পুনরায় সপ্তগ্রামে প্রত্যাগমন মধ্যে তিনি আগ্রা হইতে ফিরিয়া আসিতে মনস্থ করিলেন। এজন্য সপ্তগ্রামের ভবনের সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া আগ্রা যাত্রা করিলেন।

আমরা আমাদের পুস্তকের এ অংশে পদ্মাবতীকে তাঁহার যাবনিক নাম—লুৎফউন্নিসা বলিয়াই ডাকিব। লুৎফউন্নিসা পুনরায় যবন-সংসর্গে চলিলেন। তখনকার লুৎফউন্নিসা ও এখনকার পদ্মাবতী এতদুভয়ে প্রভেদ বিস্তর। লুৎফউন্নিসা যে সকল বিদ্যা-প্রভাবে এককালে ভুবনমোহন জাহাঙ্গীরের হৃদয়ে আধিপত্য করিয়াছেন, এক্ষণে সে সকল নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার আর পূর্ব্বের ন্যায় চপলতা নাই। সে সকল ঘৃণিত মনোবৃত্তিকে তিনি স্বেচ্ছায় বিনষ্ট করিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহাকে পূর্ব্বে দেখিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে এক্ষণে দেখিয়া চমৎকৃত হইবেন। তাঁহার মনের সমূহ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে নীতি জ্ঞানাভাবে তাঁহার হৃদয় প্রস্তরাপেক্ষাও নীরস ও শুষ্ক ছিল, এক্ষণে তাহা নীতি-সুধায় অভিষিক্ত হইয়াছে। যে সকল ঘৃণিত অবজ্ঞ মনোবৃত্তি তাঁহাকে রমণীকুলের কলঙ্ক-স্বরূপ করিয়াছিল, সে সকলের পরিবর্ত্তে বিবিধ সদ্‌গুণ এক্ষণে তাঁহাকে পূজনীয়া দেবী স্বরূপা করিয়াছে। তিনি এত দিন অজ্ঞতা ও মোহের কারাগারে বন্দিনী ছিলেন, এক্ষণে জ্ঞান ও বিবেকের রাজ্যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছেন। লুৎফউন্নিসা এতদিন ধর্ম্মবিগর্হিতা সামান্য সুখে প্রমত্তা ছিলেন, এক্ষণে তিনি ধর্ম্ম-সঙ্গত পবিত্র সুখের আস্বাদ পাইয়াছেন। তিনি এতদিন আপনাতে আপনি মোহিত হইতেন, এক্ষণে আপনাকে আপনি বিজাতীয় ঘৃণা করেন। তিনি এতদিন সমগ্র ভারতবর্ষকে পদতলস্থ ও বাদশাহকে কিঙ্কর করিতে অভিলাষিণী ছিলেন, এক্ষণে দরিদ্র ব্রাহ্মণের চরণাশ্রিত হইয়া পর্ণকুটীরে বাসার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন। এই সকল কারণে বলিতেছি, এখন আর সে লুৎফউন্নিসা নাই! তিনি পবিত্র সুখের সন্ধান পাইয়াছেন, তাহার আস্বাদ পাইয়াছেন, এবং তাহা আয়ত্তীকৃত হইয়াছে। নবকুমার তাঁহাকে পত্নীভাবে সম্ভাষণ করিয়াছেন, নবকুমার তাঁহার জন্য কাঁদিয়াছেন, নবকুমার তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়াছেন। জগতে আর তাঁহার কি প্রার্থিত আছে? নবকুমারের বিশুদ্ধ প্রণয় মাত্র তাঁহার প্রার্থনা। তাহা তিনি লাভ করিয়াছেন। সুতরাং লুৎফউন্নিসার আশা সফল হইয়াছে।

তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে। তিনি আর কিছু চাহেন না। তবে লুৎফউন্নিসা আবার আগ্রা যাইতেছেন কেন? আর তথায় তাঁহার কি আবশ্যক? ভোগ-সুখে তিনি তো জলাঞ্জলি দিয়াছেন। তবে কেন? সংসারে স্নেহ-মমতা কে ত্যাগ করিতে পারে? যে তাহা পারে, তাহার অন্তঃকরণে কখনই প্রণয় জন্মিতে পারে না। লুৎফউন্নিসার হৃদয় এক্ষণে প্রণয়-পরিপূর্ণ। সুতরাং তাঁহার হৃদয় স্নেহ-মমতা প্রভৃতি কোমল বৃত্তিতে পূর্ণ। সেই কোমল-বৃত্তি সকল তাঁহাকে এক্ষণে আগ্রার দিকে আকর্ষণ করিল।

লুৎফউন্নিসা আগ্রা গমন করিয়া প্রথমে তাঁহার পিতৃভবনে গমন করিলেন। সে স্থানে পদার্পণ করিতে তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইল। লুৎফউন্নিসার যৎকালে অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম, সেই সময় তাঁহার চরিত্র নিতান্ত দূষিত হইয়া উঠে। এজন্য তাঁহার পিতা বিরক্ত ও লজ্জিত হইয়া তাঁহাকে গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া দেন। লুৎফউন্নিসাও তখন তাহাতে অসন্তুষ্ট হন নাই। অব্যাঘাতে ইন্দ্রিয়তৃষ্ণা নিবারণ করিতে সক্ষম হইব ভাবিয়া, তিনি তাহাতে আনন্দিতা হইয়াছিলেন। কিন্তু মনুষ্যের মন চির দিন সমান থাকে না। মন্দ ভাল হইতে, অথবা ভাল মন্দ হইতে অধিক সময় লাগে না। লুৎফউন্নিসা এখন মন্দ হইতে ভাল হইয়াছেন। পুনরায় পিতা মাতার সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছা জন্মিয়াছে। তাঁহার পিতা তাঁহাকে গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কন্যা কখন কোথায় থাকেন, তিনি তাহার সন্ধান করিতেন। সম্প্রতি বৎসরেক লুৎফউন্নিসা কোথায় আছেন, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। পাঠক মহাশয়েরা অবগত আছেন, তিনি এতদিন সপ্তগ্রামে ছিলেন।

লুৎফউন্নিসা কাঁদিতে কাঁদিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, তথায় তাঁহার পিতা রামগোবিন্দ ঘোষাল মহাশয় বসিয়া স্ত্রীর সহিত কি কথা কহিতেছেন। বহুদিনের পর, প্রিয়তমা দুহিতাকে পুনর্দর্শন করিয়া, তাঁহারা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। স্নেহ লুক্কায়িত হইবার সামগ্রী নহে। স্নেহভাজন যদি দোষী হয়, তাহা হইলে তাহার উপর রাগ হয়, তাহার দোষ সংশোধনের জন্য উপযুক্ত দণ্ডবিধান করিতে প্রবৃত্তি হয়, কিন্তু তাই বলিয়াই অন্তর হইতে স্নেহ লোপ পায় না। চিরদিনের স্নেহ কি এক দিনে লোপ হয়? বিশেষতঃ অপত্য স্নেহের আশ্চর্য্য ক্ষমতা। দোষী সন্তানকে জনক-জননী বিবিধ শাস্তি দেন বটে, কিন্তু মনে মনে সততই তাহার কল্যাণ কামনা করেন। এই স্নেহ-ধর্ম্মে ঘোষাল ও তাঁহার স্ত্রী পরিত্যক্তা দুহিতাকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। কিন্তু কন্যাকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে ভাবিয়া, সে আনন্দ বিশেষরূপে প্রকাশ করিলেন না। লুৎফউন্নিসাও তাঁহাদের অন্য কথা কহিতে না দিয়া, একবারে কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার চরণে পতিত হইলেন এবং তাঁহার পদোপরি বদন রক্ষা করিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতা-মাতা চমৎকৃত হইলেন। লুৎফউন্নিসা প্রায় আট নয় বৎসর পিত্রালয় হইতে বহিষ্কৃতা হইয়াছেন। ইতিমধ্যে তিনি একবারও পিতা-মাতার সহিত সাক্ষাৎ, অথবা তাঁহাদের সহিত সম্মিলন কামনা করেন নাই; অদ্য এত দিনের পর, সেই কন্যার এতাদৃশ ভাবান্তর কেন হইল, তাহা জানিতে না পারিয়া, তাঁহারা বিস্মিত হইলেন। ঘোষাল হাত ধরিয়া লুৎফউন্নিসাকে উঠাইবার চেষ্টা করিলেন। লুৎফউন্নিসা না উঠিয়া সেই অবস্থাতেই কাঁদিতে

কাঁদিতে পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পরে রামগোবিন্দ ঘোষাল জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি এত দিন কোথায় ছিলে?"

লুৎফউন্নিসা উঠিয়া বসিলেন এবং ভূপৃষ্ঠে দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া, এই কালের মধ্যে যাহা ঘটিয়াছিল তৎসমুদয় অবিকল বিবরিত করিলেন। তাঁহার পিতা-মাতা শুনিয়া অবাক্ হইলেন। সেই লুৎফউন্নিসার যে এরূপ মতি হইয়াছে, ইহাতে তাঁহারা যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন।

ঘোষাল কহিলেন—"লুৎফউন্নিসা! এক্ষণে স্নানাহার কর। আমি তোমার কথায় বড় সন্তুষ্ট হইলাম। অদ্য তুমি আমাকে যে পরিমাণে আনন্দিত করিলে তাহা অনির্বচনীয়। ঈশ্বর তোমাকে চিরায়ুষ্মতী করুন।"

লুৎফউন্নিসা তাহার পর মাতার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। রামগোবিন্দ কিয়ৎকাল পরে বাহিরে গমন করিলেন।

দুই দিবস পরে, ঘোষাল স্বীয় স্ত্রী ও দুহিতাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—"পদ্মা! তোমার যে এরূপ প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে এবং তোমাকে যে তোমার স্বামী গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, ইহা আমাদের অতুল আনন্দের বিষয়। নবকুমারের অবস্থা তাদৃশ ভাল নহে। তোমার কখন সামান্য কষ্ট ভোগ করাও অভ্যাস নাই; তুমি অত্যন্ত কষ্ট পাইবে।"

লুৎফউন্নিসা কহিলেন,—"পিতঃ! জীবন অশেষ রাজভোগ-সম্ভোগে অতিবাহিত করিয়াছি সত্য, কিন্তু তাহার অভাবে আর কোন ক্লেশ নাই। সেই সকল অজ্ঞানকৃত কার্য্য স্মরণে এক্ষণে দারুণ যন্ত্রণা পাই মাত্র। পাপের ভার আর সহ্য হয় না। এ জীবন তুষানলে ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।"

কন্যার মনের অবস্থা অনুমান করিয়া, ঘোষাল সন্তপ্ত হইলেন। তিনি কহিলেন,—"তবে এক্ষণে কি স্থির করিতেছ?"

পদ্মা। স্বামি-পদ-সেবায় জীবনত্যাগ করিব।

ঘোষা। তুমি যবনী, তিনি তোমাকে গ্রহণ করিবেন কেন?

পদ্মা। আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আপনার আশীর্ব্বাদে স্বামী অধুনা দাসীর প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। এক্ষণে আমি আপনাদের নিকট হইতে বিদায় প্রার্থনা করি।

ঘোষা। নবকুমার আবার বিবাহ করিয়াছিলেন শুনিয়াছি। সে স্ত্রী কোথায়?

পদ্মা। তিনি জলমগ্না হইয়াছেন।

ঘোষা। ইচ্ছায়?

পদ্মা। না; দৈবাৎ।

ঘোষা। নবকুমারের সংসারে আর কে আছেন?

পদ্মা। কিছুদিন পূর্ব্বে আমার শাশুড়ীর পরলোক হইয়াছে, তাহা আপনি জানেন না বোধ হয়। আমার স্বামীর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী, মাতার মৃত্যুর পর কাশীবাসিনী হইয়াছেন। এক্ষণে আমার স্বামী ও তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নী মাত্র সংসারে আছেন।

ঘোষাল চিন্তিতের ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া থাকিলেন। পদ্মা তাঁহার একমাত্র সন্তান। পদ্মা ছাড়িয়া যাইবে বলিয়া বিদায় চাহিতেছে, ইহা জানিয়া তাঁহার কষ্ট হইল। তিনি অনেকক্ষণ অন্যমনস্কের ন্যায় থাকিয়া বলিলেন,—"লুৎফউন্নিসা! ভাল, আপাততঃ তো কিছুদিন আমাদের নিকট থাক, তার পর যে হয় বিবেচনা হইবে।"

এই বলিয়া রামগোবিন্দ ঘোষাল অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইলেন। লুৎফউন্নিসা ও তাঁহার জননী, বসিয়া নানাবিধ কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জগদালোকে।

"জে নাবএ নুরএ জাহাঁ বাদশাঃ বেগম জার,
বা হুকুমএ জাহাঁগীর সাঃ ইয়াফৎ সাদ জওয়ার।"*

পরদিন প্রত্যূষে লুৎফউন্নিসা বাদশাহের সহিত সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে বিনির্গতা হইলেন। অদ্য তিনি আবার যাবনিক পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন, কিন্তু বেশ-ভূষা করিলেন না। যে উদ্দেশে বেশ-ভূষার প্রয়োজন, সে উদ্দেশ্য তাঁহার মন হইতে এককালে তিরোহিত হইয়াছে।

লুৎফউন্নিসা বাদশাহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। কেহই তাঁহাকে নিষেধ করিল না। বহুদিন পরে তাঁহাকে পুনরাগত দেখিয়া দৌবারিকাদি সভয়ে সেলাম করিতে করিতে, পথ মুক্ত করিয়া দিল। তাহারা তাঁহার ভাবান্তর দেখিয়া বিস্মিত হইতে লাগিল। যে লুৎফউন্নিসা পূর্ব্বে সংসার-জাত সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্ত্র সকলে ভূষিতা থাকিতেন এবং যিনি অত্যুৎকৃষ্ট উজ্জ্বল মূল্যবান্ বস্ত্র সকল পরিধান করিতেন, তাঁহার শরীরে এক্ষণে ভূষণ মাত্র নাই এবং তাঁহার পরিধেয় বসন সামান্য মাত্র। তাহাদের বিস্ময়ের আরও কারণ—পূর্ব্বে যে লুৎফউন্নিসা বাদশাহ জাহাঙ্গীর বাহাদুরের সহিত সংত প্রীতি সহকারে বাক্যালাপ করিয়া তাঁহাকে চরিতার্থ করিতেন না, তিনি অধুনা ভৃত্যদিগের সহিত তাহাদের স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা কহিতেছেন এবং তাহাদের প্রদত্ত সম্মানের প্রতিসম্মান জ্ঞাপন করিতেছেন।

লুৎফউন্নিসা শুনিয়াছিলেন যে, বর্দ্ধমানের সুবাদার সের আফগানের পত্নী মেহেরউন্নিসা এক্ষণে নুরজাহান (জগজ্জ্যোতিঃ) নাম ধারণ করিয়া বাদশাহের প্রধানা মহিষী হইয়াছেন।* এক্ষণে লুৎফউন্নিসা জানিতে পারিলেন যে, মেহেরউন্নিসা কেবল নুরজাহান ও প্রধানা মহিষী এই নামে সন্তুষ্টা হন নাই, তাঁহার সুখ স্বচ্ছন্দের নিমিত্ত যে সকল নিয়ম হইয়াছে, ইতিপূর্ব্বে কোন বাদশাহমহিষী সে সকলের অধিকারিণী হন নাই। তাঁহার প্রশংসায় জগদ্ব্যাপ্ত হইয়াছে। তিনি অদ্বিতীয়া রূপবতী ছিলেন। লুৎফউন্নিসা এক্ষণে শুনিলেন, শুদ্ধ রূপে নয়, গুণেও নুরজাহান অদ্বিতীয়া হইয়াছেন। তাঁহার প্রযত্নে সম্রাট-প্রাসাদে বিবিধ সুচারু পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। পূর্ব্বে সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা বিরাজ করিত, এখন আর তাহা নাই, সকল কার্য্য পরিষ্কার। শুদ্ধ ভবন-মধ্যে নুরজাহানের আধিপত্য ছিল এমত নহে; প্রাসাদের যে প্রকোষ্ঠে তিনি বাস করিতেন,

* হিজরী ১০৩৪ অব্দে, বাদশাহ জাহাঙ্গীরের আজ্ঞাক্রমে, নুরজাহানের নাম সংযুক্ত যে মুদ্রা প্রচারিত হয়, তাহার উপরে উহা খোদিত ছিল। নুরজাহানের আধিপত্য কতদূর প্রবল ছিল, তাহা উহাদ্বারা সপ্রমাণিত হইতেছে। বঙ্গভাষায় উহার অর্থ এইরূপ ;—— "বাদশাহ জাহাঙ্গীরের আজ্ঞায় বেগম নুরজাহানের নাম সংযোগে, মুদ্রার শতগুণ মূল্য বর্দ্ধিত হইল।"

* ভারতের ইতিহাসে জাহাঙ্গীরের রাজত্ব বিবরণ পাঠ করিলে এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ জানিতে পারা যায়।

তথা হইতে মোগলাধিকারের শেষ সীমা পর্য্যন্ত, সমস্ত স্থানে তাঁহার অসীম ক্ষমতাশালী হস্ত প্রকাশ পাইয়াছে। জহাঙ্গীর নামে বাদশাহ মাত্র; রাজ্যশাসন-ভার এক প্রকার নুরজাহানের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে বলিলেও হয়। এক্ষণে নুরজাহানের আজ্ঞা ও সম্মতি ব্যতীত কোন বিধি-ব্যবহার প্রচলিত হইতে পারে না। ফলতঃ তাঁহার ক্ষমতা অসীম। সকলেই তাঁহার মহিমা স্বীকার করে ও মুক্তকণ্ঠে তাঁহার গুণ-কীর্ত্তন করে। লুৎফ-উন্নিসা মেহেরউন্নিসাকে বাল্যাবস্থা হইতে জানিতেন, তাঁহার ভূর্লোক-দুর্লভ রূপও তিনি দেখিয়াছিলেন। সে অসাধারণ রূপ যুবরাজ সেলিমের (অধুনা, বাদশাহ জাহাঙ্গীরের) নয়নাকর্ষণ করিয়াছে,তাহাও তিনি জানিতেন। মেহেরউন্নিসা সর্ব্বথা বাদশাহ-পত্নী হইবার যথার্থ উপযুক্ত পাত্রী,একথাও তিনি বুঝিতেন। এক্ষণে তাঁহার এবংবিধ অমানুষী গুণাদি শ্রবণ করিয়া সবিস্ময়ে বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে, বিধাতা তাঁহাকে যেমন উচ্চ স্থানে সমাসীন করিবার উপযোগী রূপ প্রদান করিয়াছেন, তেমনই গোপনে তাঁহার হৃদয়ও তদুপযোগী মহৎ গুণসমূহে সুসজ্জিত করিয়াছেন। লুৎফউন্নিসা বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তিনি নুরজাহানের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এতদ্ভিন্ন লুৎফউন্নিসা আরও জ্ঞাত হইলেন যে, নুরজাহান স্বামীর উপর অসাধারণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। যে জাহাঙ্গীর প্রত্যহ বেলা এক প্রহরের পূর্ব্বে কথনই শয্যা ত্যাগ করিতেন না, নুরজাহানের অসামান্য শাসনপ্রভাবে তিনি এক্ষণে প্রত্যহ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ করেন। যে জাহাঙ্গীর দিবস রজনী বিলাস-লালসায় ও ভোগ-সুখে রত থাকিতেন, তিনি এক্ষণে একটা নির্দ্দিষ্ট সময় মাত্র আমোদে অতিবাহিত করেন, অবশিষ্ট কাল তাঁহাকে রাজ্য-চিন্তায় ব্যয় করিতে হয়। যে জাহাঙ্গীর দিবা-রাত্রি সুরা-পান-পাত্র সংলগ্ন-বদন থাকিলে সুখী থাকিতেন, পত্নীর প্রখর শাসনে, তিনি এককালে পানদোষ ত্যাগ করিয়াছেন বলিলেই হয়। লুৎফউন্নিসা বিবেচনা করিতে লাগিলেন, জাহাঙ্গীরের এই সমস্ত দোষ যে কস্মিন্ কালে, কাহারও ক্ষমতায়, বা কোন উপায়ে অপনীত হইবে এরূপ সম্ভাবনা ছিল না। যে রমণীর ক্ষমতায় সেই জাহাঙ্গীরের চরিত্র এবংবিধ উন্নত হইয়াছে, সে রমণী মানবী আকারে দেবী।

এতদ্ব্যতীত নুরজাহান নিতান্ত প্রিয়বাদিনী; তাঁহার অত্যন্ত অমায়িক ভাব। উচ্চ পদ-জনিত মনে মনে স্বভাবতঃ যে একটী দুর্দ্দমনীয় রিপুর আবির্ভাব হয়। নুরজাহান এককালে সে দোষ বর্জ্জিতা। সকলের সহিত তাঁহার সমান ভাব। সকলের সুখের প্রতি তিনি সমান দৃষ্টি দিয়া থাকেন। মোগল সাম্রাজ্যে কেহ দীন, দরিদ্র, অসুখী বা মূর্খ থাকে ইহা নুরজাহান ভাল বাসেন না। তাঁহার এই সকল স্বর্গীয় গুণে প্রজাবর্গ সকলেই এক মনে তাঁহার দীর্ঘজীবন ও কুশল কামনা করে এবং মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাঁহাকে দেখুক, আর নাই দেখুক, সকলেই তাঁহাকে ভাল বাসে।

লুৎফউন্নিসা এই সকল শুনিয়া যার-পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, বিধাতা মেহেরউন্নিসাকে যে সমস্ত সদ্গুণে বিভূষিতা করিয়াছেন, তিনি এক্ষণে তদুপযোগী পদ পাইয়াছেন। তাঁহার নুরজাহান নাম সার্থক হইয়াছে।

নিকটস্থ একজন দাসী তাঁহাকে একে একে এই সমস্ত সংবাদ দিতেছিল। লুৎফউন্নিসা তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"এক্ষণে বাদশাহ কোথায় ?"

দাসী উত্তরিল,—"এক্ষণে আর সে নিয়ম নাই। এখন সূর্য্যোদয়ের পর হইতে বেলা এক প্রহর পর্য্যন্ত সভা হয়। বাদশাহ এক্ষণে মসনদে।"

লুৎফউন্নিসা দেখিলেন সভাভঙ্গ পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিলে বাদশাহের দর্শন-প্রাপ্তি অসম্ভব। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন—"নুরজাহান কোথায় ?" দাসী অঙ্গুলি-ভঙ্গি-সহকারে নুরজাহানের প্রাতগৃহ দেখাইয়া দিল।

লুৎফউন্নিসা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে দাসী দ্বারা সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। অবিলম্বে ভারতসাম্রাজ্যাধীশ্বরী অদ্বিতীয়া রূপ-যৌবন-গুণাদি-সম্পন্না নুরজাহান স্বয়ং আসিয়া বাল-সহচরী লুৎফউন্নিসার হস্ত ধারণ করিলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া স্বীয় প্রকোষ্ঠে গমন করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রতিযোগিনী-পার্শ্বে।

"চন্দ্রেণ চারুচরিতেন বিকাসিতং সৎ।
সঙ্কোচিতং ভবতি কিং কুমুদস্তমেভিরিতি ॥"
—বিদগ্ধমুখমণ্ডনম্।

লুৎফউন্নিসা উপবিষ্ট হইলে, নুরজাহান উপবেশন করিলেন। লুৎফউন্নিসা এক সময়ে বাদশাহের প্রধানা মহিষী হইবেন এরূপ সম্ভাবনা ছিল। তাঁহার সেই স্থান এক্ষণে নুরজাহান অধিকার করিয়াছেন। এককালে লুৎফউন্নিসা এমন সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, তাঁহার উন্নতিমুখে তিনি আর প্রতিদ্বন্দ্বী রাখিবেন না। এককালে লুৎফউন্নিসা রাজ্যের গতি ফিরাইবার কল্পনা করিয়াছিলেন—তিনি যুবরাজ সেলিমের পরিবর্ত্তে, তদীয় রাজপুত-পত্নীর গর্ভজাত সন্তান সারিয়রকে মোগল-সাম্রাজ্য-সিংহাসনে সমাসীন করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। এককালে অপরাপর বেগমেরা ভাবিয়াছিলেন যে, হয় তো তাঁহাদিগকে লুৎফউন্নিসার অধীন হইয়া কালযাপন করিতে হইবে। আর এক্ষণে ? এক্ষণে লুৎফউন্নিসা সে সুখকে তৃণজ্ঞান করেন। আর সে সুখ একায়ত্ত করা দূরেথাকুক, তাহার সংস্পর্শেও তাঁহার প্রবৃত্তি নাই। স্বেচ্ছায় তিনি তাঁহার কল্পিত ও আকাঙ্ক্ষিত স্থানে মেহেরউন্নিসাকে বসিতে দিয়াছেন। তাঁহার কল্পনা তিনি মনেই বিলীন করিয়াছেন। রাজকীয় কার্য্য হইতে তিনি আনন্দে অপসৃত হইয়াছেন।

অদ্য লুৎফউন্নিসা ও মেহেরউন্নিসা পরস্পর সম্মুখীন হইয়া বসিলেন। অনেক দিনের পর আবার অদ্য সাক্ষাৎ। এই সময়ের মধ্যে কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে! সের আফগানের পত্নী মেহেরউন্নিসা, বাদশাহ জাহাঙ্গীরের প্রধানা মহিষী নুরজাহান হইয়াছেন। আর যাঁহার নিমিত্ত সকলে সেই আসন স্থির করিয়াছিল, তিনি কি হইয়াছেন ? তিনি, সে সকল ত্যাগ করিয়া, জীবনের অন্তবিধ গতি অন্বেষণ করিতেছেন।

লুৎফউন্নিসার বদনে আনন্দ দেখা যাইতেছে। সংসারের প্রকৃতি অনুসারে সকল ঘটনা দর্শন করিতে হইলে লুৎফ ন্নিসা

আনন্দ দেখিয়া বিস্ময় জন্মিতে পারে; কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে তাহা হইবে না। তাঁহার মনের আশা, ভরসা, আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা প্রভৃতি সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তাঁহার দুর্দ্দমনীয় মনোবৃত্তি সকল এক্ষণে কোথায় লয়-প্রাপ্ত হইয়াছে। অধিক কাল অসৎপথে বিচরণ করায় সৎপ্রবৃত্তি সকল সমূলে নির্ম্মূল হওয়াই সম্ভব। তাঁহারও প্রায় তাহাই হইয়াছিল। কিন্তু সহসা জ্ঞান-বারি, গতপ্রায় সৎপ্রবৃত্তি সমূহের মূল সিক্ত করায়, তাহারা পুনরঙ্কুরিত হইয়াছে। ধাতুকে অগ্নিদগ্ধ করিলে, তাহা গলিত হইয়া পড়ে, তাহার অসার ও অকর্ম্মণ্য অংশ সমুদয় ভস্ম হইয়া উড়িয়া যায় এবং মূল্যবান্ ও প্রয়োজনীয় অংশ অবশিষ্ট থাকে। তদ্রূপ লুৎফউন্নিসার হৃদয়ে অনুতাপানল প্রবেশ করিয়া তাহাকে দ্রবীভূত করিয়াছে এবং তাঁহার অপকৃষ্ট মনোবৃত্তি সকলকে নিস্তেজ করিয়া, সাধু ও শ্রেয়ঃ বৃত্তি সকলকে সমুত্তেজিত করিয়াছে। তাহার প্রকৃতি যদি পূর্ব্বের ন্যায় থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার বাল-সখী মেহেরউন্নিসা ভারতবর্ষের সিংহাসনার্দ্ধাধিকারিণী হইয়াছেন, ইহা তিনি প্রাণ থাকিতে সহ্য করিতে পারিতেন না। কিন্তু আর তাঁহার সিংহাসনের প্রতি লক্ষ্য নাই, আর তাঁহার জাহাঙ্গীরের হৃদয় হরণ করিবার চেষ্টা নাই, আর তাঁহার উচ্চ-পদের প্রতি দৃষ্টি নাই। তাঁহার যাহা লক্ষ্য, যাহা চেষ্টা, যাহা আকাঙ্ক্ষা তাহা তিনি পাইয়াছেন। এখন তিনি মেহেরউন্নিসার অভ্যুদয়ে আনন্দিত হইয়াছেন। যে বিধাতার অনুগ্রহে এ সকল মোহজাল হইতে সহজে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন, তিনি এক্ষণে সেই সর্ব্বনিয়ন্তাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছেন। তিনি মেহেরউন্নিসাকে পূর্ব্বে অবিশুদ্ধ ভাবে দর্শন করিতেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার দৃষ্টি পবিত্র। তাহাতে স্নেহ, মায়া, মঙ্গলেচ্ছা ব্যক্ত হইতেছে। তিনি মেহেরউন্নিসাকে প্রিয় ভগ্নী মনে করিতেছেন। মেহেরউন্নিসাকে তিনি তাঁহার সুখ ও উন্নতির কারণ বিবেচনা করিতেছেন। যদি মেহেরউন্নিসার রূপ যৌবন যুবরাজের নয়ন-পথে পতিত না হইত, এবং যদি তদ্দর্শনে যুবরাজ মেহেরউন্নিসার প্রতি আসক্ত না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার তদানীন্তন আশার পথ সকল অতি সহজ হইত, সুতরাং তিনি ক্রমশঃ অধিকতর মোহে জড়ীভূত হইতেন এবং কদাচ সে সকল প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিতেন না। কিন্তু তাহার বিপরীত ঘটায় তাঁহার সম্রাট্-অন্তঃপুররূপ সুখ-কারাগার পরিত্যাগ করা সহজ হইয়াছে। অতএব মেহেরউন্নিসা তাঁহার পরম উপকারিণী; লুৎফউন্নিসা ইহা বুঝিতেছেন। তিনি সে জন্য মেহেরউন্নিসার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত। বস্তুতঃ লুৎফউন্নিসার হৃদয়ে আর কুটিলতার লেশমাত্র নাই। তাঁহার হৃদয় সরলতায় ও পবিত্রতায় পূর্ণ হইয়াছে। লুৎফউন্নিসার আনন্দিতা হইবার আরও একটি কারণ আছে। তিনি নুরজাহানের অসামান্য গুণাদি শ্রবণে বিমোহিত হইয়াছেন। তিনি বিবেচনা করিতেছেন। নুরজাহানের ন্যায় গুণবতী রমণী বাদশাহের প্রধানা বেগম হইবার উপযুক্ত পাত্রী। নুরজাহান ঐ স্থান প্রাপ্ত হওয়ায় মণিকাঞ্চনে সংযুক্ত হইয়াছে। লুৎফউন্নিসা ভাবিলেন যে, মেহেরউন্নিসার পরিবর্ত্তে তিনি যদি ঐ স্থান লাভ করিতেন, তাহা হইলে কি ভাল হইত? না। নুরজাহানের দ্বারা যে সকল মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে, তাহা তিনি কখন করিতে

পারিতেন না। সুতরাং মেহেরউন্নিসা প্রধানা মহিষী হইয়া ভালই হইয়াছে।

নুরজাহান লুৎফউন্নিসার কায়িক, মানসিক এবং বর্ত্তমান অবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসিয়া সমস্ত সংবাদ জ্ঞাত হইলেন। লুৎফ-উন্নিসাও বালসহচরী মেহেরউন্নিসাকে কত কথা জিজ্ঞাসিলেন। উভয়ে বহুক্ষণ এইরূপ নানাবিধ কথায় সুখ-লাভ করিতে লাগিলেন, এমন সময়ে সংবাদ আসিল বাদশাহ সভাভঙ্গ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছেন। লুৎফ-উন্নিসা, প্রিয়বয়স্যার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, বাদশাহ সহ সাক্ষাতের অভি-প্রায়ে গমন করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সম্রাট্-সকাশে।

"নহি প্রফুল্লং সহকারমেত্য।
বৃক্ষান্তরং কাঙ্ক্ষতি ষট্পদালী॥"
রঘুবংশম্।

লুৎফউন্নিসা বাদশাহ জাহাঙ্গীর সমক্ষে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্মান সহকারে অভি-বাদন করিলেন। বাদশাহ বহুদিন পরে লুৎফ-উন্নিসাকে পুনর্দ্দর্শন করিয়া নিতান্ত প্রীত হইলেন এবং সানন্দে লুৎফউন্নিসার কুশল সম্বন্ধীয় নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

তদুত্তরে লুৎফউন্নিসা কহিলেন,—"বাদ-শাহের অনুগ্রহে এক প্রকার সমস্ত মঙ্গল বটে। বাদশাহ বাহাদুরের অনুমত্যনুসারে হতভাগিনী পুনরায় বিবাহিতা হইয়াছে, সুতরাং সে এক্ষণে কুলস্ত্রী।"

বাদশাহ সবিস্ময়ে কহিলেন,—"একি রহস্য লুৎফউন্নিসা?

লুৎ। রহস্য নহে; সত্য। লুৎফউন্নিসা এক্ষণে বাদশাহের সহিত রহস্যের উপযুক্ত নহে।

বাদ। সত্য! কাহার সহিত বিবাহ হইল?

লুৎ। নূতন বিবাহ নহে। যে বিবাহ পূর্ব্বে হইয়াছিল, হতভাগিনীর দোষে এতদিন তাহা প্রচ্ছন্ন ছিল। এক্ষণে অনেক যত্নে সেই স্বামীই দাসীকে পুনরায় চরণে স্থান দিয়াছেন।

বাদশাহ প্রথমে হাঃ হাঃ শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই গম্ভীর ভাবে কহিলেন, —"তবে লুৎফউন্নিসা, এত দিনের পর আমাকে একেবারে বিস্মৃত হইবে?

লুৎফউন্নিসা নীরব।

বাদ। তোমার স্বামীর আর পত্নী আছেন?

লুৎ। ছিলেন, মানব-লীলা সংবরণ করিয়াছেন।

বাদ। তোমার স্বামীর নাম কি?

লুৎ। নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাদ। সপ্তগ্রামে তাঁহার নিবাস না?

লুৎ। আজ্ঞা হাঁ।

বাদ। তোমার স্বামী দেখিতে কেমন?

লুৎ। স্বামী কুরূপই হউন আর সুরূপই হউন, অধীনীর চক্ষে তিনি এখন অনুপম রূপ-লাবণ্য-সম্পন্ন পুরুষ-রত্ন।

বাদ। তোমার স্বামী ধনবান্?

লুৎ। জাহাপনা! আমার স্বামী ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ দরিদ্রজাতি। তিনি ধনবান্ নহেন;

তাঁহার অতি সামান্য অন্ন বস্ত্রে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার উপযোগী বিষয় আছে।

বাদ। লুৎফউন্নিসা! তবে এত দিনের পর কি একেবারে আমাদের মায়া ত্যাগ করিলে?

লুৎফউন্নিসা দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে কহিলেন,—"বিস্মৃত হওয়া সাধ্যাতীত।"

বাদ। তবে কি লুৎফউন্নিসা? আমি তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছি যে, এতদিনের পরিচয়, এতদিনের প্রণয় সকলই তুমি ভুলিয়েছ? সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া আমাকে ত্যাগ করিতেছ?

লুৎ। জাঁহাপনা! দুঃখিত হইবেন না। এ প্রকার গমন যদি আমার অপরাধ হয়, আপনার চরণে ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছি, আমাকে ক্ষমা করুন। আমার সুখের পথে আমাকে যাইতে দেন।

বাদ। তা হইবে না লুৎফউন্নিসা! প্রাণ থাকিতে তোমাকে ত্যাগ করিতে পারিব না।

লুৎফউন্নিসা সজল নয়নে কহিলেন,—"বাদশাহ! মনকে দৃঢ় করুন। আমাকে লুৎফউন্নিসা বলিয়া বিবেচনা করিবেন না। পূর্ব্বের কথা সমস্ত বিস্মৃতই হউন। মনে করুন কোন পরিচিত পুরুষের সহিত কথা কহিতেছেন। আপনি আমার রক্ষা করুন। পাপের জ্বলন্ত পাবকে আমার হৃদয় অহর্নিশ দগ্ধ হইতেছে! এক্ষণে আমি বাদশাহের চরণ ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমায় রক্ষা করুন, আমায় জীবন দেন। বুদ্ধি-ভ্রষ্ট হইয়া যদি পুনরায় পাপ-সাগরে পতিত হই, আপনার সাহায্য ব্যতীত তাহা হইতে নিস্তারের উপায় নাই। আপনার দুই কথায় আমি যাহা ছিলাম তাহাই হইতে পারি। চিরকাল পাপে মগ্ন থাকায়, পাপ আমার আত্মাকে কলুষিত করিয়াছে। আমি সহস্র উন্নত হইলেও, কখন এরূপ উন্নত হইতে পারি নাই যে, সহজে এ সুখের লোভ ত্যাগ করিতে সক্ষম হইব। আপনি যদি আমাকে প্রলোভন দেখান, আমার কি সাধ্য আমি তাহা ছিন্ন করিতে পারি? অতএব জাঁহাপনা! আমার জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখ আপনার হস্তেই রহিয়াছে। আমাকে চিরকাল ভালবাসেন, তাহা আমি বেশ জানি। সেই ভালবাসার সাহসেই বলিতেছি, এক্ষণে বন্ধুর ন্যায় কার্য্য করুন। চিরপরিচিতা, আশ্রিতা, অবলাকে রক্ষা করুন, তাহার সুখের পথে তাহাকে যাইতে দেন।"

বাদশাহ নীরব। এ কথায় তিনি কি উত্তর দিবেন তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাঁহার বদনে কিঞ্চিৎ ক্লেশের চিহ্ন ব্যক্ত হইল। লুৎফউন্নিসা বাদশাহকে নীরব দেখিয়া কহিলেন,—"জাঁহাপনা! দাসীর কথায় আপনি ক্লেশ পাইতেছেন তাহা আমি বুঝিতেছি। আপনাকে ক্লেশ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নহে। আপনি ক্লেশের সামগ্রী নহেন। তবে লুৎফউন্নিসা এত কথা বলিতেছে কেন? সে বাদশাহের নিকট কিছু ভিক্ষা চাহিতেছে। এক বৎসর পূর্ব্বে হইলে লুৎফউন্নিসা বাদশাহের প্রেম-ভিক্ষা করিত, কিন্তু এক্ষণে তাহার সে কামনা নাই। এক্ষণে সে বাদশাহের নিকট সজল নয়নে প্রার্থনা করিতেছে যে, বাদশাহ যেন তাহার প্রতি পূর্ব্বভাব বিস্মৃত হইয়া তাহাকে বিদায় দেন।"

জাহাঙ্গীর কহিলেন,—"লুৎফউন্নিসা! আমি সকল সহ্য করিতে পারি। আমি অতি কঠিন প্রাণ। তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়াছ তাহা আমি অবশ্যই সহ্য করিব, কারণ তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া অবনতি মুখে পতিত

হও নাই, তুমি ক্রমশঃ উন্নতি-শিরে আরোহণ করিতেছ। কিন্তু তুমি যে আমাকে ত্যাগ করিয়া কষ্টভোগ করিবে তাহা আমি কোন্ প্রাণে সহ্য করিব? লুৎফউন্নিসা! মনে করিয়া দেখ—অপূর্ব্ব দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া তোমার নিদ্রা হয় নাই; তোমার পদতলে ধূলিরেণু স্পর্শ করিয়াছে—আমি স্বয়ং রুমাল দিয়া পরিষ্কার করিয়া দিয়াছি, তাহাও তোমার মনঃপূত হয় নাই; মহামূল্য বস্ত্রালঙ্কার সকল বিভিন্ন দেশ হইতে তোমার নিমিত্ত সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতেও তুমি সন্তুষ্টা হও নাই; বিবিধ দেশ হইতে বিবিধ অত্যুৎকৃষ্ট আহার্য্য সমানীত হইয়াও তোমার রসনার তৃপ্তি সাধন করিতে পারে নাই; নিদাঘে তুষারবৎ হিম-গৃহে অবস্থান করিয়াও তুমি শান্তিলাভ করিতে পার নাই এবং দিল্লীর সম্রাট্ জাহাঙ্গীর তোমার আজ্ঞাধীন ভৃত্য ছিল, তুমি তাহাকেও উপ-যুক্ত নফর বিবেচনা কর নাই। লুৎফউন্নিসা! অধুনা তুমি কদন্ন সেবন, জঘন্য স্থানে বাস, সামান্য বস্ত্র পরিধান প্রভৃতি ভয়ানক ক্লেশ সহ্য করিবে। সে সকল মনে করিতে গাত্র রোমাঞ্চিত হয়। অন্যে যাহা হয় ভাবিতে পারে; কিন্তু আমি তো তোমার এ সকল কথা শুনিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব না।"

এই কথা কয়টী বলিতে বলিতে জাহাঙ্গী-রের ইন্দীবরনয়নে অশ্রুবিন্দুর আবির্ভাব হইল। এক সময়ে তিনি লুৎফউন্নিসাকে প্রাণের ন্যায় ভাল বাসিতেন। এককালে এমন সময় ছিল, যখন তিনি লুৎফউন্নিসাকে এক তিল না দেখিলে স্থির থাকতে পারিতেন না। সেই লুৎফউন্নিসা কষ্ট ভোগ করিবে; এ চিন্তা তাহার হৃদয়কে অধুনা কেন না ভেদ করিবে?

লুৎফউন্নিসা অনেকক্ষণ বাক্যহীনা পুত্তলি-কার ন্যায় নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। প[রে] কহিলেন,—"বাদশাহ! আপনি যাহা কহি[লেন], তাহা সত্য। অধীনার প্রতি আপনা[র] অনুগ্রহ অসীম। আপনি আমার জন্য কা[তর] হইবেন না। বিবেচনা করিয়া দেখুন, অধীন[া] যখন দিল্লীশ্বরের বেগম ছিল, তখন বিধাত[া] তাহার তদনুযায়ী সুখের ইচ্ছা সকল সৃজ[ন] করিয়াছিলেন। এক্ষণে অধীনা দরিদ্র ব্রাহ্মণ পত্নী, অবস্থানুযায়ী কায়িক ক্লেশ সহিতে [সে] এক্ষণে কুণ্ঠিতা নহে।"

বাদশাহ সবিস্ময়ে কহিলেন,—"লুৎফ উন্নিসা! তুমি কি সেই তুমি? কাল তোমাকে প্রশংসনীয়রূপে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। তোমা[র] কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমি বিস্ময়াপন্ন হইতেছি যাবতীয় সৃষ্ট জীবের মধ্যে রমণী যে সর্ব্ব প্রধান, লুৎফউন্নিসা, অদ্য তোমার কথা শুনি[য়া] তাহা আমার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইল। আ[মি] তোমাকে ভূয়সী প্রশংসা করিতেছি। তু[মি] রমণী-কুলের কমলিনী। ইন্দ্রিয়ভোগ-লালসা[র] সহিত মনের লৌহ-চুম্বক সম্বন্ধ। এককা[লে] তোমার মন তাহাতে এত বিমিশ্রিত হইয়া ছিল যে, তোমার অদ্যকার কথা সকল স্ব[প্ন] বোধ হইতেছে। তোমার ন্যায় নারী[তে] এতাদৃশ মত-পরিবর্ত্তন ঘটিবে, তাহা [কে] সহসা বিশ্বাস করিতে পারে? গত কথা সক[ল] মনে হইতেছে,—নারীজাতি-সুলভ চাপল্য [ও] চাতুর্য্যে তোমার হৃদয় পূর্ণ ছিল। কিন্তু তোমা[র] অদ্যকার পবিত্র সরলতায় আমি বিমোহি[ত] হইতেছি। আমি তোমাকে প্রেম-সঙ্গি[নী] করিতাম, কিন্তু অদ্য হইতে আমি তোমাকে স্বর্গীয় দেবী বিবেচনায় ভক্তি ও আরাধ[না] করিব। তোমাকে তোমার অবলম্বিত প[থ] হইতে অতঃপর নিবৃত্ত করিতে ইচ্ছা [করি] না। তুমি যে পথে পদার্পণ করিয়াছ তা[হা]

সর্ব্ব প্রকারে শ্রেয়ঃ ও মঙ্গলময়। আমি সন্তুষ্ট ও সরলচিত্তে বলিতেছি, পূর্ব্বকালীন যে সকল দুশ্চিন্তা হৃদয়ে উপস্থিত হইলে মনে ব্যথা জন্মিতে পারে তাহা তুমি ত্যাগ কর, আমিও ত্যাগ করিতেছি। প্রার্থনা করি, ঈশ্বর তোমার চিত্ত উত্তরোত্তর উন্নত করুন। তোমাকে এরূপে ত্যাগ করিতে যথেষ্ট কষ্ট হইবে; তাহা আমি অকাতরে সহিব। তোমার অন্তরে যে বিমল সুখ জন্মিবে তাহাতেই আমি আনন্দিত থাকিব।"

লুৎফউন্নিসা বাদশাহের কথা শ্রবণে যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়া কহিলেন,—"বাদশাহ! আপনি অদ্য আমাকে সুখের সাগরে ভাসাইলেন। জাঁহাপনা! অধীনা দুর্দ্দমনীয় মনোবৃত্তির প্রভাবে আপনার নিকট হইতে এরূপ বিচ্ছিন্ন হইতেছে। লুৎফউন্নিসার হৃদয় যে এ ঘটনায় কোনরূপ যাতনা পাইতেছে না, তাহা মনে করিবেন না। অপেক্ষাকৃত অধিকতর সুখের আশায় আমি এ যাতনা উপেক্ষা করিতেছি।"

জাহাঙ্গীর কহিলেন,—"লুৎফউন্নিসা! এককালে আমি তোমার কিঙ্কর ছিলাম, এখনও আমি তাহাই থাকিলাম। তোমাকে যখন প্রথম দর্শন করিয়াছিলাম, সেই অবধি আমি তোমারই ছিলাম, এখনও তাহাই রহিলাম। লুৎফউন্নিসা! তুমি অদ্য হইতে আমার সহিত ভিন্ন সম্বন্ধ পরিগ্রহ করিতে চলিলে; তোমাকে তাহা হইতে নিরস্ত করা অন্যায় ও অসম্ভব। তোমার সুখের পথে ব্যাঘাত জন্মাইব না। তোমাকে অবশ্যই বিদায় দিতে হইবে, সে জন্য আমার চিত্তের অবশ্যই সন্তাপ জন্মিবে। হৃদয় এত পাষাণ নহে যে, চিরকালের নিমিত্ত তোমার সহিত সম্বন্ধ বিপর্য্যয় করিতে অশ্রুবারি ত্যাগ করিবে না। তোমাকে বিস্মৃত হওয়া আমার সাধ্যের অতীত। যত দিন জীবন থাকিবে, লুৎফউন্নিসা! তত দিন তাহার সহিত আমার মানস পটে তুমি চিত্রিত থাকিবে।"

লুৎফউন্নিসা কহিলেন,—"জাঁহাপনা! দাসীই কি কখন আপনাকে ভুলিতে পারিবে? দাসী দীর্ঘকাল আপনার প্রসাদ ভোগ করিয়াছে এবং আপনার নিকটে কত অপরাধে অপরাধী হইয়াছে। বাদশাহ! অদ্য তাহার সে সকল অপরাধ ক্ষমা করুন।"

বাদশাহ কহিলেন,—"আমি তোমাকে ক্ষমা করিব, কি তুমি আমাকে ক্ষমা করিবে? সে যাহা হউক লুৎফউন্নিসা, সময়ে সময়ে তোমার সংবাদ পাইব কি?"

লুৎ। দাসী সর্ব্বদা জাহাপনাকে পত্র লিখিবে। জাহাপনা তাহাকে দাসী বিবেচনায় সংবাদ দিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে সে বড় আনন্দিত হইবে।

বাদ। তাহা বলিবার আবশ্যক কি?

"লুৎফউন্নিসা পুনরায় বিদায় চাহিয়া কহিলেন,—"অনেক বেলা হইয়াছে, আপনার কষ্ট হইতেছে; দাসীকে বিদায় দিতে আজ্ঞা হউক।"

বাদশাহ নীরব। লুৎফউন্নিসা বাদশাহের মুখের প্রতি চাহিলেন; দেখিলেন তাঁহার বিশাল নেত্রদ্বয় ছল্ ছল্ করিতেছে। লুৎফউন্নিসার কষ্টবোধ হইল।

জাহাঙ্গীর কহিলেন,—"লুৎফউন্নিসা! তোমাকে কি বলিব? বাহ্যে তোমাকে না দেখিলেও অন্তরে তোমাকে সর্ব্বদা দেখিব। মন সর্ব্বদা তোমার সহিত থাকিবে। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। তোমার সহিত পূর্ব্বে অন্যবিধ পরিচয় ছিল, তাহা যেন কদাচ উভয়ের

মনে না হয়। আমাকে বন্ধু বলিয়া হৃদয়ে স্থান দিবে। তোমার পরিচিত, হিতৈষী, উপকারক মিত্র ভিন্ন অন্য কিছু হইতে চাহি না। আমি তোমার পূর্ব্বে যেরূপ সুখেচ্ছু মিত্র ছিলাম, এখনও তাহাই থাকিব। যদি কখন তোমার কোন উপকার সাধিতে পারি, তাহা আমি সন্তুষ্ট চিত্তে করিব। লুৎফউন্নিসা! অদ্য আমার জীবনের কি ভয়ানক দিন! অদ্য আমি তোমার প্রেমরূপ মহারত্নের স্বত্বশূন্য হইলাম। এখনও আমার একটী সুখের সামগ্রী থাকিল; তোমার হৃদয় হইতে যে একবারে তাড়িত হইব না, এই আশাই সেই সুখ। ভরসা করি তুমি আমাকে সে সুখে বঞ্চিত করিবে না। বিপদে হউক, সম্পদে হউক, কখন জাহাঙ্গীরকে বিস্মৃত হইও না। ঈশ্বর-সমীপে প্রার্থনা করি, তিনি তোমাকে সুখে রাখুন।"

লুৎফউন্নিসা দেখিলেন, বাদশাহের গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা পড়িতেছে। তিনি আর অপেক্ষা করা অবিধেয় বিবেচনা করিলেন। তিনি আরও অনুভব করিলেন, তাঁহার মনও হিল্লোলিত হইতেছে। তাহা একবার এ দিক একবার ওদিক করিতেছে। তিনি বিবেচনা করিলেন, আর না। যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, আর তাহাকে নিবৃত্ত করা যায় না। সমুদ্র-হৃদয়ে তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছে, তাহা কূল-স্পর্শ করিবেই করিবে। জগতের এই নিয়ম। চিরদিন সমান নয়। তবে আর কেন? স্বভাবের গতি কে রুদ্ধ করিবে?

লুৎফউন্নিসা জাহাঙ্গীরকে বিনয় ও সম্মানের সহিত অভিবাদন করিয়া কহিলেন,—"জাঁহাপনা! দাসী শ্রীচরণ হইতে বিদায় হইল। বোধ করি এই সাক্ষাৎই শেষ।"

লুৎফউন্নিসা বাদশাহের উত্তর প্রতীক্ষা না করিয়া প্রস্থান করিলেন।

জাহাঙ্গীর সে স্থানে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিলেন। তিনি অস্ফুটস্বরে কহিলেন,—"শেষ সাক্ষাৎ।"

এই বলিয়া, একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, বিষণ্ণ বদনে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

লেখ্য-লিখনে।

> "ভুল ভূত-পূর্ব্ব কথা, ভুলে লোক যথা
> স্বপ্ন—নিদ্রা অবসানে! এ চির বিচ্ছেদে,
> এই সে ঔষধমাত্র, কহিনু তোমারে।"
> —মাইকেল মধুসূদন দত্ত (বীরাঙ্গনা)।

সেই দিবস দিবা দ্বিপ্রহর কালে, লুৎফউন্নিসা বিশ্রামার্থ পিতৃ-ভবনের একটী নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তিনি স্থিরভাবে উপবেশন করিলেন। সে অবস্থায় বিরক্তি জন্মিল, অবস্থান্তর পরিগ্রহ করিলেন। তাহাতেও সন্তোষ সমুৎপন্ন হইল না, শয়ন করিলেন। তাহাতেও তৃপ্তি জন্মিল না, একখানি পুস্তক পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। পুস্তক পারসী ভাষায় লিখিত। পুস্তকের প্রথম পত্র উন্মোচন করিয়া একটু পাঠ করিলেন। এই রূপে এখানে একটুকু, সেখানে একটুকু পাঠ করিতে করিতে, অবশেষে একটী কবিতা তাঁহার নয়ন-পথে পতিত হইল।

লুৎফউন্নিসা কবিতাটী আর একবার পাঠ করিলেন। পুনরায় পাঠ করিলেন। পরিশেষে

পুস্তকের সেই পৃষ্ঠায় একটী অঙ্গুলি রক্ষা করত, পুস্তক খানি বন্ধ করিয়া হাতে রাখিলেন ও কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তা বিরক্তিজনক হইয়া উঠিল। তিনি পুস্তকখানি যথায় ছিল তথায় রাখিয়া আসিলেন এবং লেখনি, মসী ও কাগজ আনিয়া একখানি পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কাহাকে পত্র? বাদশাহ জাহাঙ্গীরকে! তিনি অনেকক্ষণ পত্র লিখিলেন। সময়ে সময়ে তাঁহার নয়ন অশ্রুজলে সিক্ত হইতে থাকিল, এবং তাঁহার দৃষ্টির ব্যাঘাত জন্মিতে লাগিল। তিনি অঞ্চল দ্বারা নয়ন মার্জ্জন করিতে লাগিলেন। ক্ষণে ক্ষণে তিনি লেখনী স্থগিত করিতে লাগিলেন। অনেক পরে পত্রিকা সমাপ্ত হইল। তিনি তাহা মণ্ডিত করিলেন। আবার কি মনে হইল তাহা খুলিয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। তাহার মর্ম্ম এই;—

"জাঁহাপনা!

"অধীনা শ্রীচরণ হইতে বিদায় গ্রহণ সময়ে আপনার সম্পূর্ণ সম্মতি গ্রহণ করে নাই, তজ্জন্য সে এক্ষণে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে।

"বাদশাহ! একজনের হৃদয় অপরকে দেখাইবার কোন উপায় আছে কি? তাহা হইলে লুৎফউন্নিসার হৃদয়ের কিরূপ অবস্থা সে দেখাইত। তাহা হইলে আপনি দেখিতেন, হতভাগিনীর অন্তরে কি দুর্ব্বিবহ বিষম অগ্নি জ্বলিতেছে। মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে পাপীয়সী এই সকল যাতনার হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিবে বোধ হয় না। কিন্তু পাপ-প্রমত্তা লুৎফউন্নিসার মৃত্যু আছে কি? বোধ করি বিধাতা পাপের সীমা দেখাইবার নিমিত্ত তাহাকে অমর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এক্ষণে মৃত্যু উপস্থিত হইলে তাহাকে ভয় করা দূরে থাকুক, আমি তাহাকে সাদরে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত আছি। জাঁহাপনা! এ পাপজীবন আর একটুকুও রাখিতে ইচ্ছা নাই। যত শীঘ্র জগৎ হইতে লুৎফউন্নিসা'র নাম বিলুপ্ত হইয়া যায় ততই মঙ্গল।

"পাপানলে লুৎফউন্নিসার জীবন হু হু শব্দে জ্বলিতেছে। লুৎফউন্নিসা জ্বলন্ত হৃদয়কে শীতল করিবার নিমিত্ত পাপ হইতে পাপান্তর আশ্রয় করিয়াছে। শীতলতা কোথায়? তাহাতে বহ্নি-তেজ হ্রাস হওয়ার পরিবর্ত্তে, দ্বিগুণ তেজে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। হতভাগিনী জীবনের সমস্ত কথা মনে করিয়া দেখিতেছে;—গতকার্য্য সকল, অসার, নীরস, বহ্নি-চর্ব্বিত মরুভূমির ন্যায় পশ্চাতে পতিত রহিয়াছে।

"এক দিন—কেবল মাত্র একদিন, লুৎফউন্নিসা জীবনের মধ্যে যে পরিমাণ শান্তি ও আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে—আমূল সমস্ত কথা মনে করিয়া দেখিতেছি, আর কোন দিনই তদ্রূপ হয় নাই। যে দিন মন্দভাগিনী স্বামীর চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া তাহা নয়নজলে সিক্ত করিয়াছিল, জাঁহাপনা! হতভাগিনীর জীবনের কেবল সেই দিনই সুখের দিন।

বাদশাহ! যত পারেন আমাকে বিস্মৃত হউন। লুৎফউন্নিসার পাপ নাম হৃদয়ে স্থান দিবেন না। লুৎফউন্নিসা পাপীয়সী, দুশ্চরিত্রা, কুলটা—মোগল-সিংহাসন সমাসীন বাদশাহ জাহাঙ্গীরের হৃদয়ে স্থান পাইবার যোগ্যা নহে। লুৎফউন্নিসাকে জাঁহাপনা যেরূপ অনুগ্রহ করিয়াছেন, সে কেবল ভবদীয় মহৎ মনের পরিচয়। দাসী শ্রীচরণে অনেক দোষে দোষী আছে; তাহার নামের সহিত সে সকলও মানসপট হইতে অপনীত করুন। দাসীর সহিত কখন আলাপ ছিল, তাহা মনেও করি-

বেন না। লুৎফউন্নিসা নামে জগতে কেহ আছে তাহা মনে করিবেন না, তাহার সুখ দুঃখ চিন্তায় নিবিষ্ট হইবেন না।

"আর কাহাকে মনে করিয়া নারীকুলালঙ্কার প্রিয়ভগ্নী নুরজাহানকে অযত্ন করিবেন না। নুরজাহান রমণীমণি, বাদশাহের ন্যায় পুরুষের উপযুক্ত পত্নী। তাঁহার রূপের সীমা নাই, তাঁহার গুণের সীমা নাই। দাসী নুরজাহানের রীতি নীতি দেখিয়া বড়ই বিস্ময়বিষ্ট হইয়াছে। ভগ্নীকে একবার আমার নাম স্মরণ করাইয়া দিয়া, তাঁহার নিকট হইতে আমার শেষ বিদায় প্রার্থনা করিবেন।

"জাঁহাপনা! আমি এক্ষণে পতিপদোদ্দেশে চলিলাম। আর যে কখন এ দেশে আসিব তাহা বোধ হয় না। সুতরাং দাসীর সহিত আর দেখা হওয়া অসম্ভব; অদ্যকার দর্শনই শেষ দর্শন মনে করিবেন।

"অধিক কথা লিখিয়া বাদশাহের বহুমূল্য সময় নষ্ট করা অনাবশ্যক।

"আপনাকে সর্ব্বদা সংবাদাদি দিব বলিয়া আসিয়াছি, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলাম রমণী-হৃদয় দুর্দ্দমনীয়। বিশেষতঃ লুৎফউন্নিসার হৃদয়, পাষাণ অপেক্ষাও নীরস, শুষ্ক ও কঠিন। সেই নীরস হৃদয়ে অল্প পরিমাণে ধর্ম্মরস প্রবেশ করিয়াছে। কঠিন প্রাণ কিয়ৎ পরিমাণে কোমল হইয়াছে। জাঁহাপনা! বিবেচনা করিয়া দেখুন, তাহাকে এই সময় অতিশয় সাবধান ও সতর্ক না রাখিলে, তাহার আবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইতে কতক্ষণ? এই সকল কারণে জাহাপনা অতঃপর দাসীর সংবাদ পাইবেন না। আর একবার আপনাকে দেখিবার ইচ্ছা থাকিল। সে দর্শন কখন ঘটিবে? যখন লুৎফউন্নিসা মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিবে, সেই সময় যদি একবার সে বাদশাহের দর্শন পায়, তাহা হইলে তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে। সে আর কিছু চাহে না। তাহার বাদশাহচরণে ঐ একমাত্র ভিক্ষা থাকিল। লুৎফউন্নিসার জীবন দেহ ত্যাগ করিবার অনতিপূর্ব্বে বাদশাহচরণে সংবাদ আসিবে।

"জাঁহাপনা! পুনরায় বলিতেছি, আমাকে ভুলুন। আমার সহিত পরিচয়, সম্বন্ধ এবং আমার নাম ইত্যাদি সমস্ত স্মৃতি ভূগর্ভে প্রোথিত করুন। এ পাপীয়সীর নাম কখন যেন আপনার মনে সমুদিত না হয়, ইহাই আমার ইচ্ছা।

"প্রিয়ভগ্নী নুরজাহানের সহবাসে, জাহাপনা পরম সুখে অতুল সম্পদ ভোগ করিতে করিতে চিরজীবী হইয়া থাকুন, ইহাই দাসীর প্রার্থনা।"

লুৎফউন্নিসা পত্রিকা পাঠ করিয়া তাহা মণ্ডিত করিলেন। পরে তাহার উপর শিরোনাম লিখিয়া তাহা বাদশাহ বাহাদুরের উদ্দেশে প্রেরণ করিয়া গম্ভীর ভাবে উপবেশন করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অভিজ্ঞান-দর্শনে।

"জই অনহথ গদং ভবে তদা
সচ্চং সো অনীস্সং ভবে।"
—শকুন্তলম্।

প্রায় দেড় মাস কাটিয়া গেল, লুৎফউন্নিসা সপ্তগ্রাম ত্যাগ করিয়াছেন। অতঃপর

আর এখানে থাকিবার আবশ্যক নাই বিবেচনায়, লুৎফউন্নিসা পিতামাতার নিকট সপ্তগ্রাম গমনের প্রস্তাব করিলেন। তাঁহারা তাহাতে অমত করিলেন না।

প্রত্যূষে গমনোপযোগী সমস্ত আয়োজন স্থির হইল। বাহক-যানাদি লোক জন প্রস্তুত হইয়া থাকিল।

পরদিন লুৎফউন্নিসা, পিতৃ-মাতৃ-চরণে প্রণাম করিয়া, শিবিকারোহণ করিলেন। বাহকেরা শিবিকা উঠাইল। লুৎফউন্নিসা আগ্রার মায়া ত্যাগ করিলেন। যে আগ্রায়, তাঁহাকে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা চিনিত ও তাঁহার সহিত পরিচয় শ্লাঘার বিষয় মনে করিত যে আগ্রায় তিনি যখন যাহাকে যাহা বলিতেন, সে তখনই তাহা আনন্দে সম্পন্ন করিয়া কৃতার্থ হইত, যে আগ্রাবাসী জনগণ তাঁহার দর্শন প্রাপ্তি শুভদিনের লক্ষণ মনে করিত এবং যে আগ্রার ওমরাহ যুবকগণ তাঁহার ঘূর্ণিত ভ্রূভঙ্গি দৃষ্টিতে মুগ্ধ হইয়া আছে, অদ্য লুৎফউন্নিসা প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই আগ্রা ত্যাগ করিলেন।

সময়? তুমি ধন্য! তোমার ক্ষমতা অসীম। তুমি নির্জীবকে সজীব করিতে পার এবং সজীবকে নির্জীব করিতে পার, তুমি কুসুমকে পাষাণ এবং পাষাণকে কুসুম করিতে পার, তুমি শুষ্ক তরুকে মুঞ্জরিত করিতে পার। তোমার মোহন মন্ত্র চমৎকার! তুমি যে মন্ত্র প্রভাবে পাষাণী পদ্মাবতীকে মানবী করিয়াছ সে মন্ত্র অদ্ভুত। তোমারই অসামান্য মন্ত্রবলে শুষ্ক পদ্মাবতী লতা প্রস্ফুটিতা হইয়াছে।

কয়েক দিবস পরে একদিন মধ্যাহ্ন সময়ে লুৎফউন্নিসা পাটনায় উপনীত হইলেন। তাঁহার পরিচারকেরা তথায় তাঁহার অবস্থানোপযোগী একটী কক্ষ স্থির করিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া দিল।

লুৎফউন্নিসা নিয়মিত আহারাদির পর একাকিনী সেই কক্ষমধ্যে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তাঁহার দাস-দাসী প্রভৃতি বিভিন্ন কক্ষে থাকিল। দাসীর সেবায় লুৎফউন্নিসা ত্বরায় নিদ্রার ক্রোড়ে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ সহকারে একটী গোলমাল তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি শুনিলেন এক জন লোক অপরকে সম্বোধন করিয়া উদ্ধতস্বরে কহিতেছে,—

"তুই এ কোথায় পাইলি? এ মহামূল্য দ্রব্য। নিশ্চয়ই তুই কোথায় চুরি করিয়াছিস্।

অপর কহিতেছে,—"দোহাই ধর্ম্মের—আমি তোমার পায়ে হাত দিয়া দিব্য করিতেছি, আমি চুরি করি নাই। যাহার দ্রব্য তিনি ইহা আমাকে ভিক্ষা দিয়াছেন।"

ভৎর্সনাকারী কহিতেছে,—"এও কি কথা! এত বড় জিনিষটা তোকে অমনই ভিক্ষা দিল।"

ঘটনাটি জানিতে আমোদ-প্রিয়া লুৎফউন্নিসার নিতান্ত কৌতূহল জন্মিল। যে দিকে গোল হইতেছিল, সেই দিকের গবাক্ষদ্বার মোচন করিয়া দেখিলেন, চটীরক্ষক হস্তে একটি অঙ্গুরীয় ধারণ করিয়া সম্মুখস্থ এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করত পূর্ব্বোক্তরূপ বচসা করিতেছে; চতুর্দ্দিকে অনেক লোক সমবেত হইয়া তামাসা দেখিতেছে। বিষয়টা কি জানিবার নিমিত্ত লুৎফউন্নিসা একজন দাসীকে আহ্বান করিয়া ঐ দুইব্যক্তিকে তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত করিতে আজ্ঞা দিলেন। অবিলম্বে চটী-রক্ষক সম্ভাবিত চোরকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল।

লুৎফউন্নিসা বলিলেন,—"ব্যাপার কি?"

চটি-রক্ষক উত্তর করিল,—"এই ব্যক্তি এই অঙ্গুরীয়টি বিক্রয়ার্থ আনিয়াছে। কিন্তু এটী যেরূপ মহামূল্য দ্রব্য তাহাতে সহজে ইহা

সামান্ত ব্যক্তির হস্তগত হওয়া সম্ভাবিত নহে। বোধ করি ইহার মধ্যে কোন নিগূঢ় কথা আছে।"

লুৎফউন্নিসা কহিলেন,—"অঙ্গুরীয় দেখি।"

চটী রক্ষক তাঁহার হস্তে অঙ্গুরীয় দিল। অঙ্গুরীয় দেখিবামাত্র লুৎফউন্নিসা শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার বদন কালিমা প্রাপ্ত হইল এবং হর্ষ বিলুপ্ত হইল। দারুণ পূর্ব্বস্মৃতি-চিহ্ন বদনে আবির্ভূত হইল। তিনি অঙ্গুরীয় বিক্রেতাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি এ অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলে ?"

সে ব্যক্তি কহিল,—"বিবি ! আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ—৺কাশীধামে থাকি ; ভিক্ষা আমার উপজীবিকা। এরূপ সামান্ত দরিদ্রের হস্তে এমন মহামূল্য দ্রব্য অসম্ভব ঘটনা। ফলতঃ মা ! আমি দরিদ্র বটি, কিন্তু চোর নহি। এ অসামান্ত দ্রব্যও আমার ভিক্ষায় পাওয়া।"

লুৎফউন্নিসা কহিলেন,—"তোমাকে ইহা কে ভিক্ষা দিল ?"

ভিক্ষুক কহিল,—"কতিপয় মাস অতীত হইল পূর্ব্ব অঞ্চল হইতে একটি ধনবান্ ব্যক্তি সপরিবারে উক্ত তীর্থে আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে, সকলেই আমাকে সন্তুষ্ট করেন। তাঁহাদের সহিত একটি অল্পবয়স্কা সুন্দরী ছিলেন ; আমি তাঁহার নিকট ভিক্ষা চাহিলে তিনি কহিলেন 'আমার কিছুই নাই—তোমাকে কি দিব ?' তাঁহার রূপ দর্শনে তাঁহার যে কিছুই নাই, একথা বিশ্বাস হইল না ; এজন্ত সে কথা না শুনিয়া আমি পুনরায় ভিক্ষা কামনা করিলাম। পরিশেষে তিনি একটু চিন্তিত হইয়া তাঁহার কেশরাশির মধ্য হইতে এই অঙ্গুরীয়টি বাহির করিয়া কহিলেন,—'আমার আর কিছু নাই এইটি আছে, তা ইহাতে আমার বিশেষ আবশ্যক নাই। ইহা তুমিই লও।' তাঁহার সঙ্গীরা তখন একটু দূরে ছিল। আমি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বাটী আসিয়া দেখিলাম যে, ইহা অমূল্য সামগ্রী। মনে করিলাম যে সাধ্যসত্ত্বে ইহা অপচয় করিব না ; কন্তার বিবাহের সময় এইটী তাহাকে দিব। কিন্তু আর চলে না ; কাজেই ইহা বিক্রয় করিতে হইতেছে। কিন্তু দরিদ্রের কপাল কোথায় যাইবে ? এখানে বিক্রয়ার্থ অঙ্গুরী প্রদর্শন করায়, ইনি আমাকে চোর বলিয়া অনুমান করিলেন। এক্ষণে আপনাদের ধর্ম্মে যাহা সঙ্গত হয় করুন।"

ব্রাহ্মণ নীরব হইল।

লুৎফউন্নিসা কহিলেন,—"তুমি বলিতে পার সে যাত্রীদের নিবাস কোথায় ?"

দরিদ্র কহিল,—"আজ্ঞা না, আমি তাহা কিরূপে জানিব ?"

বিবি পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—"যিনি তোমাকে এই অলঙ্কার দিয়াছেন, তাঁহার সহিত সঙ্গীদের কোন সম্পর্ক আছে কি না জান ?"

"বিবি ! আমাকে ক্ষমা করিবেন। তাহা আমি কেমন করিয়া বলিব ?"

লুৎ। আচ্ছা তাহা না জান, তিনি দেখিতে কেমন তাহা তো জ্ঞাত আছ ?

ব্রাহ্ম। তিনি দেখিতে পরমা সুন্দরী। তেমন রূপ আর দেখি নাই।

লুৎ। তাঁহার বয়স কত অনুমান করিতে পার ?

ব্রাহ্ম। অনুমান ২২। ২৩ বৎসর হইবে।

লুৎফউন্নিসা। একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। অনেকক্ষণ পরে কহিলেন,—"কত মূল্য পাইলে তুমি অঙ্গুরীয় বিক্রয় করিতে স্বীকৃত আছ ?"

ব্রাহ্ম। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। আপনি যাহা অনুগ্রহ করিয়া দিবেন তাহাই যথেষ্ট।

লুৎ। তোমাকে আমি আর একটী অঙ্গুরী দিতেছি। সেটী তুমি তোমার কন্যাকে দিও, তা ছাড়া তোমার সংসার খরচের নিমিত্ত নগদ ২০০ টাকা, আর এই অঙ্গুরীয় পাওয়ায় আমার যে উপকার হইয়াছে তাহার নিমিত্ত পুরস্কার স্বরূপ ৫০ টাকা দিতেছি। কেমন, ইহাতে তুমি সন্তুষ্ট হইবে?

দরিদ্র ব্রাহ্মণ করে স্বর্গ পাইল। সানন্দে কহিল,—"যথেষ্ট। আমি স্বপ্নেও এত আশা করি নাই। আপনি স্বয়ং কমলা।"

অতঃপর লুৎফউন্নিসা ব্রাহ্মণকে উক্ত মত অর্থাদি দিয়া বিদায় করিলেন।

চটী-রক্ষক তাঁহার এইরূপ ভাব দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইল। সকলে প্রস্থান করিল। লুৎফউন্নিসা আবার একাকিনী হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সন্দেহে।

"If I should meet thee
After long years,
How shall I greet thee."
—Byron,

লুৎফউন্নিসার মনে হইল সপ্তগ্রামের যে অংশে নিবিড় বন, তন্মধ্যে তিনি রাত্রিকালে ব্রাহ্মণ-বেশ ধারণ করিয়া কপালকুণ্ডলাকে কহিয়াছিলেন,—"আমি তোমার সপত্নী। তোমাকে ধন দিতেছি, বস্ত্র দিতেছি, দাস-দাসী দিতেছি, অট্টালিকা দিতেছি, তুমি পতি ত্যাগ কর। তাহা হইলে পতি আমার হইবেন।" সরলা, বিকারশূন্যা, সংসার-বোধ-বিহীনা কপালকুণ্ডলা অনায়াসে কহিয়াছিলেন,—'তাহা হইলে তুমি সুখী হও? তাহাই হইবে। কল্য হইতে তোমার সুখের পথে কণ্টক থাকিবে না।' লুৎফউন্নিসা যুবতী রমণীর বদন হইতে এরূপ কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। এখন মনে হইয়া তাঁহার রোমাঞ্চ হইল। তিনি তখন ভাবিয়াছিলেন, কপালকুণ্ডলা মানবী আকারে দেবী, অদ্য ভাবিলেন কপালকুণ্ডলা পাপীয়সী। লুৎফউন্নিসা সেই সময় কপালকুণ্ডলার সুবিধার্থ ও স্মরণার্থ একটী অঙ্গুরী দিয়াছিলেন। দেখিলেন, এ অঙ্গুরী সেই অঙ্গুরী।

সেই বিরলে বসিয়া অনন্তকর্ম্মা লুৎফউন্নিসার মনে স্বতঃ কতকগুলি প্রশ্ন উদিত হইতে লাগিল। এ ব্যক্তি অঙ্গুরী কোথায় পাইল? ইহা আমি কপালকুণ্ডলাকে দিয়াছিলাম। কপালকুণ্ডলা সেই রাত্রিতেই জলমগ্না হইয়াছেন। তবে এ অঙ্গুরী কেমন করিয়া পাইল? হয় তো কোন ধীবর ইহা জলে পাইয়া থাকিবে। দানকারিণী তাহার নিকট ক্রয় করিয়া থাকিবেন, তদ্ভিন্ন আর কি হইতে পারে? কপালকুণ্ডলা জলমগ্না হইয়াছেন ইহা আমি বেশ জানি, আর এ কথা আমাকে কাপালিক বলিয়াছেন। তিনি কেন মিথ্যা বলিবেন? কপালকুণ্ডলা কি অন্য কোন অসম্ভাবিত উপায়ে জীবন লাভ করিয়াছেন? দরিদ্র ব্রাহ্মণ বলিল, 'দানকারিণী পরমা সুন্দরী, তাঁহার বয়স ২২।২৩ বৎসর।' এ সকল তো কপালকুণ্ডলাতেই সম্ভবে। কিন্তু কপালকুণ্ডলা নাই। তবে দানকারিণী কে? কোথায় যাইলে তাঁহার দর্শন পাইতে পারি? সে প্রবাসী ধনী কে? তাঁহার কোথায় বা

নিবাস ? সে রমণী—সে রমণী কি পুনর্জ্জীবিতা কপালকুণ্ডলা ? অদ্য কপালকুণ্ডলার জীবন সম্বন্ধে লুৎফউন্নিসার হৃদয়ে একটী আশার অঙ্কুর জন্মিল।

এই ভাবিতে ভাবিতে লুৎফউন্নিসার আনন্দোদয় হইল। তিনি তাঁহার আশার সফলতা কামনা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, যদি কপালকুণ্ডলা জীবিতা থাকেন, তাহা হইলে সংসারে পরম সুখের উদয় হয়। তাঁহার এ ভাব হইল কেন ? এক দিন তিনিই না কপালকুণ্ডলাকে বিদূরিত করিবার যত্ন করিয়াছিলেন ? এখন তিনিই সেই কপালকুণ্ডলার জীবন কেন প্রার্থিতেছেন ? ইহার কারণ—লুৎফউন্নিসার স্বামিভক্তি—স্বামীর সুখ কামনা।

বহুক্ষণ একস্থানে বসিয়া এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিতে করিতে লুৎফউন্নিসা একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস সহকারে গাত্রোত্থান করিলেন এবং অঙ্গুরীয়টী সাবধানে রাখিয়া একখানি পুস্তক লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

স্বামি-সঙ্গে।

"ছায়া ন মূর্চ্ছতি মলোপহতপ্রসাদে।
শুদ্ধে তু দর্পণতলে সুলভাবকাশাঃ।"
—অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

পাঠক মহাশয়! বহুদিন নবকুমার ও শ্যামার সংবাদ পাওয়া যায় নাই; অতএব চলুন তাঁহাদের সংবাদ লওয়া যাউক।

সন্ধ্যা আগতপ্রায়; পশ্চিমাকাশের রাঙ্গা রঙ্—যেন কে হিঙুল ঢালিয়া দিয়াছে। যে দিকে যখন ক্ষমতাশালী লোক সহায় থাকেন তখন সেই দিকই প্রবল, উজ্জ্বল ও তেজো-ময়। তাঁহার বিহনে বিমর্ষ, মলিন ও অপদস্থ হয়। মানব-সমাজের এই নিয়ম। প্রকৃতিও কি এই নিয়মের অনুসারিণী ? পূর্ব্বকালে রাজাদের একাধিক রাজ্ঞী থাকিতেন। যে রাণী যখন রাজার সুনয়নে পড়িয়া 'সুয়া' হইতেন, তখন তাঁহার সুখের সীমা থাকিত না। তিনি আনন্দে ভাসিতেন, আর যিনি বিষ-নয়নে পড়িয়া 'দুয়া' হইতেন, তাঁহার ক্লেশের সীমা থাকিত না। তিনি সর্ব্বদাই বিমর্ষ থাকিতেন। সূর্য্যদেব প্রাতঃকালে যখন পূর্ব্বদিক্ সতীর সহিত অবস্থান করেন, তখন তাঁহার শোভা দেখে কে ? আর এখন তিনি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অন্যের সহিত কৌতুক করিতেছেন,—ঐ দেখুন সেই জন্য পূর্ব্বদিক-সতী ক্রমেই মলিনা হইতেছেন, তাঁহার মুখে কালিমা পড়িতেছে। আর সূর্য্যদেব তাঁহাকে ছাড়িয়া যাঁহার প্রতি সদয় হইলেন, তাঁহার হাসি ধরে না। তিনি আনন্দে ঢলিয়া পড়িতেছেন।

এইরূপ সময়ে নবদ্বীপস্থ একটী দ্বিতল গৃহের ছাদে একটী যুবক ও একটী যুবতী বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। ভাগীরথীর পবিত্র সলিল-সুস্নিগ্ধ মন্দানিল ধীরে ধীরে আসিয়া যুবক যুবতীর ললাট স্পর্শ করিতেছে, তাঁহাদের বস্ত্রাদি লইয়া ক্রীড়া করিতেছে ও যুবতীর অংশনিপতিত চিকুরদাম নাচাইতেছে।

যুবতীকে সকলে চিনিয়াছেন বোধ হয়। তিনি নবকুমারের ভগ্নী শ্যামাসুন্দরী। তাঁহার পার্শ্বস্থিত যুবক, তাঁহার স্বামী মথুরানাথ।

শ্যামা বলিলেন,—"এখন আর কোন অসুখ নাই তো ?"

মথুরানাথ। আবারও অসুখ! তুমি যদি না আসিতে, তাহা হইলে হয় তো আমি এ যাত্রা রক্ষা পাইতাম না। তোমার ওসুন্দর মুখের শোভা দেখিলে আর কি রোগ থাকে?

শ্যা। থাকে না?

ম। না।

শ্যা। তবে তো আর ভাবনা নাই। এখন অবধি যত লোকের পীড়া হইবে সকলকে আমার নিকট ডাকিয়া আনিও। আমি তাহাদিগকে মুখ দেখাইব, আর তাহারা ভাল হইয়া যাইবে।

ম। সকলে দেখিলে হয় না। সে দেখার বিশেষ আছে।

শ্যা। কি বিশেষ?

ম। আমি তোমাকে যেরূপে দেখি সেই রূপে দেখা চাই।

শ্যা। তুমি আমাকে যেরূপে দেখ, তাহা তো আমার অবিদিত নাই। তাহাতে যদি তোমার রোগ সারে, তবে সকলের সারিবে।

ম। তবে আমি কি তোমাকে সাধারণের ন্যায় দেখি?

শ্যা। প্রায় তাই বই কি?

ম। না শ্যামা! এ কথাটী তুমি অন্যায় বলিতেছ। আমি এতদিন তোমার সহিত যে রূপ ব্যবহার করিয়াছি,তাহাতে সে কথা বলিতে পার বটে, কিন্তু শ্যামা, তুমি কি জান না— আমি স্বেচ্ছায় সেরূপ ব্যবহার করি নাই। আমার প্রাণ অন্বেষণ করিয়া দেখ শ্যামা, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে—আমি তোমাকে কেমন ভালবাসি।

শ্যা। আমি কি তোমার কথায় ভুলিব? তোমাদের—কথা যেমন, কাজে তেমন নয় কথনই।

তোমরা—মন ছলে, গাছে তুলে বেড়ে নেও মই॥

তোমরা কথার গুণেই জগৎ জেত।

ম। হৃদয় যদি দেখাইবার হইত শ্যামা! তাহা হইলে দেখাইতাম, আমি তোমাকে কত ভালবাসি। আমি যখন তোমার কাছে থাকি তখনও তোমার থাকি, আর তোমার কাছে না থাকিলেও তোমারই থাকি। বলিলে বিশ্বাস কর বা না কর, আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, আমি তোমাকে চিরদিন প্রাণের সহিত সমান ভালবাসি।

এই কথায় শ্যামা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। কতক্ষণ হাসিয়া মথুরানাথের স্কন্ধে মস্তক রক্ষা করিলেন। তখনও হাসিতেছেন। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন,—

"তুমি রাগ করিবে তাহা আমি জানিতাম। আর একটী কথায় তোমাকে কাঁদাইতে পারি। তুমি আমাকে ভালবাস তাহা কি আমি জানি না? তাহা বেশ জানি। এত দিন তোমার বিহনে যে কষ্ট ভোগ করিয়াছি তাহার সীমা নাই। সেই দুঃখেই এত কথা বলিলাম। কিন্তু আমার সে কষ্ট এখন দূর হইয়াছে। আর আমি তাহা মনে করিব না। কষ্ট না হইলে কি সুখ হয়? অত কষ্ট পাইয়াছি বলিয়া এখন এত সুখ পাইতেছি। অতঃপর বল, তুমি আমাকে আর ছাড়িয়া থাকিবে না, আর আমার সঙ্গে পূর্ব্বকার মত প্রতারণা করিবে না। আমি আর সপ্তগ্রাম যাইব না।"

মথুরানাথ শ্যামাকে আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন। কতক্ষণ উভয়ে উভয়ের আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া রহিলেন তাহা কেহই বুঝিলেন না। অনেকক্ষণ পরে মথুরানাথ কহিলেন,—"শ্যামা!

জগতে যাহার পত্নী তোমার মত, সেই সুখী। অবশিষ্টেরা নিতান্ত অসুখী।"

শ্যামা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"তুমি আমাকে ভাল বাস বলিয়া আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল মনে করিতেছ। জগতে সকলেই আপন আপন স্ত্রীকে ভালবাসে, সকলেই সুখী।"

ম। তার জন্য নয়। প্রকৃতই তোমার ন্যায় নারী জগতে দুর্লভ। আমি আজি ইহা নূতন দেখিতেছি না। এতদিন আমি নিতান্ত অনিচ্ছায় মনের কথা, মনেই গোপন করিয়া রাখিয়াছিলাম। এতদিনে বিধাতা অনুকূল হইয়া আমার সুখ অব্যাহত করিয়া দিলেন। যত দিন দেহে প্রাণ থাকিবে, তত দিন আর এ সুখ ছাড়িব না। শ্যামা! আর তোমাকে চক্ষুর অগোচর করিব না।

শ্যামা মথুরানাথের হস্তধারণ করিলেন। মথুরানাথ শ্যামার ললাট চুম্বন করিলেন।

এই সময় বহির্ব্বাটীতে নবকুমার ও আরও কয়েকজন কথাবার্ত্তা কহিতেছেন ও উচ্চকণ্ঠে হাস্য করিতেছেন শুনিতে পাইয়া, মথুরানাথ শ্যামাকে পুনরায় চুম্বন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

শ্যামা অনেকক্ষণ ছাদের উপর একাকিনী বসিয়া থাকিলেন। শ্যামার সুখ এক্ষণে সীমাতীত। তিনি প্রায় দেড় মাস কাল অতীত হইল নবদ্বীপে আসিয়াছেন। তখন মথুরানাথ মুমূর্ষু অবস্থাপন্ন। এই সময়ের মধ্যে তিনি সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, ইহা শ্যামার সুখের এক কারণ। যে স্বামীকে শ্যামা কদাচিৎ দেখিতে পাইতেন, সেই স্বামী এক্ষণে সর্ব্বদা তাঁহার নয়নে রহিয়াছেন, ইহাও তাঁহার সুখের প্রধান কারণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রেম-পত্র।

"Why did you falsely call me your Lavinia,"
And swear I was Horatio's better half
Since now you mourn unkindly by yourself?
And rob me of my partnership of sadness."

—N. Rowe.

নবকুমার ও শ্যামা প্রায় দেড় মাস অতীত হইল নবদ্বীপে আসিয়াছেন। এই সময়ের মধ্যে মথুরানাথ নবকুমারের সম্বন্ধে যে সকল বৃত্তান্ত জানিতেন না, তাহা ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিজ মুখ হইতে শুনিয়াছিলেন। কপালকুণ্ডলা অথবা পদ্মাবতীর সম্বন্ধে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা কিছুই তাঁহার অগোচর ছিল না। নবকুমারের মনের অবস্থাও তিনি সম্যক্ প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। প্রত্যহ সায়ংকালে ভ্রমণের সময়, অথবা যে সময়ে তাঁহারা দুইজন একত্র থাকিতেন, সেই সময়েই ঐ সকল বিষয়ে কথোপকথন করিতেন।

এই সময় একদিন নবকুমার পদ্মাবতীর নিকট হইতে একখানি পত্র পাইলেন। পদ্মাবতী আগ্রা হইতে সপ্তগ্রামে প্রত্যাগত হইয়া নবকুমারকে এই পত্র লিখিয়াছিলেন।

পত্রোন্মোচন করিয়া নবকুমার পাঠ করিলেন,—

"প্রাণেশ্বর!

"বিধাতা আমাকে নিয়ত ক্লেশ-সাগরে

ডুবাইয়া রাখিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। যে ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলে আমি পরম সুখলাভ করি, বিধাতা আমাকে ক্লেশ দিবার নিমিত্ত তাঁহাকেও এরূপই বিপদে নিক্ষেপ করেন যে, সহসা তাঁহার দর্শন-প্রাপ্তি দুর্ঘট হইয়া উঠে। আমাকে ক্লেশ দিবার নিমিত্ত বিধাতা তোমাকে এই বিপদে ফেলিয়াছেন। আমি পাষাণী, আমার হৃদয়ে অনেক সহে। এ সকলও সহিতেছে।

"শুনিয়াছি আমার স্বামী আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। পাপীয়সীর প্রার্থনায় বিধাতা কর্ণপাত করেন না। তথাপি আমি অন্তরের সহিত প্রার্থনা করিতেছি, তিনি নীরোগ হইয়া দীর্ঘজীবন ভোগ করুন।

"তুমি তোমার হৃদয়-সখাকে দিয়া আমার নিকট বলিয়া পাঠাইয়াছিলে যে, অতি শীঘ্র নবদ্বীপ হইতে ফিরিবে। নাথ! ইহারই নাম কি শীঘ্র? আমি দিন গণনা করিয়াছি। এক মাস কুড়িদিন হইল তুমি নবদ্বীপ গিয়াছ। তোমার বিবেচনায় এই সময় অল্প হইলেও, আমার বিবেচনায় ইহা নিতান্ত দীর্ঘ। তুমি কি আমাকে ত্যাগ করিবার অন্য উপায় না দেখিয়া, এইরূপে আমার নিকট হইতে প্রস্থান করিলে? আমি কোন প্রকারেই তোমার প্রেমাস্পদ হইবার উপযুক্ত নহি, তাহা আমি বেশ জানি। তুমি আমাকে যে অনুগ্রহ করিয়াছ তাহা তোমার উদার মনের পরিচয়। কিন্তু হৃদয়েশ! তাই বলিয়া কি আমাকে স্বর্গে তুলিয়া আবার নরকে নিক্ষেপ করা উচিত? তুমি যদি আমাকে এমন করিয়া ত্যাগ করিবে, তবে তখন একেকালে আমাকে এমন করিয়া আশাতীত সুখসাগরে ভাসাইলে কেন? আমি দুঃখিনী, হতভাগিনী, পাপীয়সী—তোমার চরণ ধ্যান করিতে করিতে জীবন কাটাইতাম। সে অবস্থায় তাহাতেই আমার সুখ হইত। কিন্তু প্রাণেশ! তুমি এক্ষণে আমার সুখের ইচ্ছা বাড়াইয়া দিয়াছ; এখন তো আমার চিত্ত তাহাতে সন্তুষ্ট হইবে না। আমাকে সুখে ভাসাইয়া আবার দুঃখে ডুবাইলে আমি এক তিলও বাঁচিব না। মৃত্যু ভিন্ন এ অবস্থায় কদাচ শান্তি জন্মিবে না। তোমার প্রবৃত্তির উপর আমি জোর করিতে ইচ্ছা করি না। তোমার যাহা সঙ্গত বিবেচিত হয়, তাহাই কর।

"ঈশ্বর না করুন, যদি অন্য কিছু দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা বল। পদ্মাবতী কি তোমার কেহ নহে? যাহাকে মন-প্রাণ সমর্পণ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহার নিকট কিছু গোপন রাখিবার আবশ্যক নাই। তোমার বিপদ কি পদ্মাবতীর বিপদ নহে? তোমার ক্লেশ কি পদ্মাবতীর ক্লেশ নহে? তবে প্রিয়তম! আমার নিকট গোপন কেন? আমাকে তোমার ক্লেশের অংশিনী করিতেছ না কেন? আমি অবলা, তোমার বিপদে—তোমার ক্লেশের অংশ গ্রহণে সমর্থ হইব না বলিয়া কি আশঙ্কা করিতেছ? সে আশঙ্কা নাই। আমি অনেক সহিয়াছি, অনেক সহিতে পারি।

"যে দিন অভাগিনী পদ্মাবতী তোমার পদতলে পড়িয়া কাঁদিয়াছিল এবং যে দিন তুমি তাহার আজীবন-কৃত পাপ সকল ক্ষমা করিয়া তাহাকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলে, দাসীর জীবনে সেই দিনটাই দিন! সে দিন আর হইবে না? চিরাপরাধা পদ্মাবতী তাহার পর কি আবার তোমার চরণে অপরাধিনী হইয়াছে? যদি তাহা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি যে মনে তাহার সেই সকল ঘোর দুষ্কর্ম ক্ষমা করিয়াছ, সেই মনে তাহাও ক্ষমা কর।

"আর তোমাকে কি বলিব? কি বলিলে তুমি দাসীর হৃদয়ের অবস্থা অনুমান করিতে পারিবে? হৃদয়ের অবস্থা প্রকাশ করা আমার সাধ্যাতীত। যদি তুমি আমাকে হৃদয়ে স্থান দিয়া থাক, তাহা হইলে আর কিছু না বলিলেও তোমার অদর্শনে আমার হৃদয়ের যে অবস্থা হইয়াছে, তাহা সহজে বুঝিতে পারিবে।

"এক্ষণে বল তুমি আর কতদিন নবদ্বীপে থাকিবে? আমি যেরূপ শুনিয়াছি, ঈশ্বর করুন তাহাই সত্য হউক। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যদি আরোগ্যলাভ করিয়া থাকেন। তবে তথায় বিলম্ব করিবার প্রয়োজন কি?

"শ্যামাকে আমার কথা মনে করাইয়া দিবে। বিধাতা তাঁহাকে সুখে রাখুন।

"তোমার বিহনে যদি অধীনার মঙ্গল হওয়া সম্ভব হয়, তবে তাহার মঙ্গল। তুমি সর্ব্ব প্রকারে বিপদশূন্য ও সুখী হও, ইহাই দাসীর একমাত্র প্রার্থনা।"

নবকুমার পত্রখানি পাঠ করিলেন। পত্রের প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিতে যেন পদ্মাবতীর পবিত্র প্রণয় প্রতিভাত হইতেছে বোধ হইল। তিনি আবার পড়িলেন। পদ্মাবতীর সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে কতক্ষণ বসিয়া কত চিন্তাই করিলেন। পরক্ষণে পদ্মাবতীর প্রণয়-লিপির প্রত্যুত্তর লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি তাহাতে পদ্মাবতীর প্রত্যেক কথার তন্ন তন্ন করিয়া উত্তর লিখিয়া দিলেন। পদ্মাবতীকে যে তিনি বিস্মৃত হন নাই, কখন বিস্মৃত হইবেনও না, তাঁহার সুখের প্রতি তিনি যে বিশেষ মনোযোগী এবং মথুরানাথের অনুরোধে, অনিচ্ছায় অপেক্ষা করিতে হইতেছে, এ সকল কথাও লিখিয়া দিলেন।

নবকুমার এইরূপে পত্র সমাপ্ত করিয়া আবার ভাবনাগ্রস্ত হইলেন। পদ্মাবতীর চিন্তা আবার তাঁহার চিত্তকে গ্রাস করিল। নবকুমারের মন এক্ষণে পদ্মাবতীর প্রতি আরও আকৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহার কারণ কি? পদ্মাবতী তাঁহাকে ভালবাসেন, তাহা তিনি সম্যক্‌রূপে জানিতে পারিয়াছিলেন। উপস্থিত লিপিতেও তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বহন করিতেছে। সেই প্রণয়ই নবকুমারের হৃদয়ে প্রণয়বর্দ্ধনের কারণ। প্রণয়ের একটী অত্যাশ্চর্য্য শক্তি আছে। তুমি এক জনকে ভাল বাস, সেও তোমাকে না বাসিয়া থাকিতে পারিবে না। তোমার সহস্র দোষ থাকিলেও সে তাহা গ্রহণ করিবে না; সে তোমার পক্ষপাতী হইবে। তোমার তিল প্রমাণ গুণকে সে তাল করিয়া তুলিবে। মনুষ্য প্রণয়াবতার। মনুষ্যের সাংসারিক অধিকাংশ কার্য্যই প্রণয়, স্নেহ, লিপ্সা, লালসা, মায়া, শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রভৃতি সমভাবাপন্ন ধর্ম্ম সকলে মাখা। সকল হৃদয়েই অল্প বা অধিক পরিমাণে প্রণয় আছে। একটু প্রণয় হৃদয়ে জন্মগ্রহণ করিলে তাহা অল্পে অল্পে বর্দ্ধিতাকার হইয়া উঠে। যেমন বনমধ্যে একস্থানে অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে ক্রমে ক্রমে সমস্ত অরণ্যে ব্যাপ্ত হইয়া ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত করে, মাধুর্য্যময় প্রভাত-সূর্য্য-রশ্মি আকাশমণ্ডলে বিকীর্ণ হইয়াই অনতিবিলম্বে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করত দিগ্‌বলয়কে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, নিদ্রা অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে আগমন করত নয়ন নিমীলিত করিয়াই অচিরে দেহ, মন প্রভৃতির চৈতন্য হরণ করে, সেইরূপ হৃদয়ক্ষেত্রে প্রেমাঙ্কুর জন্মিলে অল্প সময়ের মধ্যে মহান্‌ মহীরুহের আকার ধারণ করে। নবকুমারের হৃদয় পূর্ব্বেই পদ্মাবতীকে ভাল বাসিতে আরম্ভ করিয়াছে, এক্ষণে সেই ভালবাসা ক্রমশঃ বৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়া, এইরূপ আকার ধারণ করিয়াছে। ইহা কিছু বিচিত্র নহে। প্রণয়ের সর্ব্বত্রই এই নিয়ম। এমন

দেশ নাই যথায় প্রণয়ের শাসন নাই, এমন হৃদয় নাই যাহা প্রণয়ের আধিপত্য স্বীকার করে না। যদি তেমন হৃদয় থাকে, তবে সে হৃদয় নিতান্ত অসার। সে ব্যক্তি পুরীষ অপেক্ষাও অপদার্থ। নবকুমারের হৃদয় সেই মনুষ্য-স্বভাব-সিদ্ধ প্রণয়ে পূর্ণ। সেই পূর্ণ হৃদয়ে নবকুমার পদ্মাবতীকে ভাল বাসিয়াছেন সে ভালবাসা কেই না বদ্ধমূল হইবে ?

তবে কি নবকুমার এতদিনের পর কপালকুণ্ডলাকে ভুলিতে পারিয়াছেন ? না, তিনি অদ্যাপি কপালকুণ্ডলাকে ভুলিতে পারেন নাই। জীবন মধ্যে যে কখন তাঁহাকে ভুলিতে পারিবেন তাহারও সম্ভাবনা নাই। নবকুমারের কপালকুণ্ডলার প্রতি প্রণয় ও পদ্মাবতীর প্রতি প্রণয় এ দুই প্রণয়ে যথেষ্ট বিশেষ আছে। কপালকুণ্ডলার প্রণয় স্নিগ্ধ, নির্ম্মল, উজ্জ্বল ও শান্ত, যেন হীরকনিঃসৃত মনোরম রশ্মি। পদ্মাবতীর প্রণয়, উগ্র, সতেজ, উজ্জ্বল ও প্রদীপ্ত ; যেন তেজঃপ্রতিফলিত দীপ্তিমান্ জ্যোতিঃ। উভয়ই আবশ্যক, কার্য্যকর এবং প্রিয়। কিন্তু অধুনা নবকুমারের হৃদয়ে পদ্মাবতীই প্রবল। কারণ পদ্মাবতী উপস্থিত। কপালকুণ্ডলা অনুপস্থিত এবং আর যে কখন উপস্থিত হইবেন তাহারও সম্ভাবনা নাই। কপালকুণ্ডলার প্রতি প্রণয় এক্ষণে চাপা পড়িয়া রহিয়াছে মাত্র। তাহা কখন বিলীন হইবে না। প্রণয় বিলীন হইবার সামগ্রী নহে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অশুভ-সংবাদে।

"শোকো নাশয়তে ধৈর্য্যং——————"

—রামায়ণম্।

দিবসত্রয় পরে এক দিন নবকুমার ও মথুরানাথ উভয়ে ভ্রমণে নির্গত হইয়াছেন, এমন সময়ে নবকুমারের অনুসন্ধানে গ্রামান্তর হইতে একটী ব্রাহ্মণ আইসেন। ভৃত্য তাঁহাকে যথাবিধি অভ্যর্থনা করিয়া চণ্ডীমণ্ডপে বসাইয়াছে। তিনি বসিয়া আছেন, এমন সময় নবকুমার ও মথুরানাথ প্রত্যাগত হইলেন। ভৃত্য নবকুমারকে ব্রাহ্মণের আগমন-সংবাদ জানাইল। নবকুমার সংবাদপ্রাপ্তি মাত্র তথায় প্রবেশ করিলেন। তথায় তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় শোকে আকুল হইয়া উঠিল ; তাঁহার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইল। কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার, কাপালিকের নিকট হইতে পলাইয়া, যাঁহার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন এবং যিনি কপালকুণ্ডলাকে সম্প্রদান করিয়া নবকুমারকে অতুল সুখ-সাগরে ভাসাইয়াছিলেন,—নবকুমার দেখিলেন, অভ্যাগত পুরুষ হিজলীর ভবানীর সেই অধিকারী। নবকুমারের মুখ দিয়া বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না। যখন অধিকারী জিজ্ঞাসিবেন, "নবকুমার ! কপালকুণ্ডলা কেমন আছে ?" তখন তাঁহাকে কি বলিয়া উত্তর দিব, এই ভাবিয়া নবকুমার ব্যথিত হইলেন।

নবকুমার আসিয়া অধিকারীর চরণে নমস্কার করিলেন। তিনিও তাঁহাকে প্রতি-নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

"নবকুমার! বিষণ্ণ কেন? সংবাদ মঙ্গল ত?"

এই কথায় নবকুমারের চক্ষু দিয়া দরদরিত ধারায় অশ্রু পড়িতে লাগিল। অধিকারী তাঁহার এবংবিধ ভাব দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট ও ব্যাকুল হইলেন। নবকুমার অনেকক্ষণ পরে কহিলেন,—"সমস্ত কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।"

এই বলিয়া নবকুমার কপালকুণ্ডলার সহিত অধিকারীর নিকট হইতে বিদায় হইয়া আসার পর যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং যেরূপে কপালকুণ্ডলার মৃত্যু হইয়াছে সমস্ত বলিলেন। সেই সমস্ত শুনিয়া অধিকারী অবিরল অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

অধিকারী কপালকুণ্ডলাকে বড় ভাল বাসিতেন এবং তাঁহাকে মাতৃ-সম্বোধন করিতেন। কাপালিকের অসদভিপ্রায় হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি নবকুমারের সহিত কপালকুণ্ডলার বিবাহ দেন। আপাততঃ বোধ হয় জগতে অধিকারী ভিন্ন কপালকুণ্ডলার আর কেহই ছিল না। অধিকারীরও যতদূর পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যে তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, পরিবার কেহই নাই। তিনি কপালকুণ্ডলাকে কন্যাবাৎসল্যে লালন পালন করিতেন। কপালকুণ্ডলার প্রতি তাঁহার অপত্যস্নেহ জন্মিয়াছিল। কপালকুণ্ডলা জ্ঞানোদয়াবধি অধিকারী ভিন্ন অন্যকে জানিতেন না। অধিকারী পিতা, অধিকারী মাতা এবং অধিকারীই তাঁহার সর্ব্বস্ব ছিলেন। এরূপ প্রিয় ব্যক্তি-দ্বয়ের মধ্যে, একের অপমৃত্যু হইয়াছে শুনিলে, অপরের হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইবে সন্দেহ কি? অধিকারীর হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি বহুক্ষণ রোদন করিলেন নবকুমার ও মথুরানাথ তাঁহাকে বিস্তর প্রবোধ দিলেন। অনেকক্ষণ পরে তিনি অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া কহিলেন,—

"নবকুমার! কপালকুণ্ডলার অদৃষ্ট বড় মন্দ। ভবানী তাহাকে কখন সুখ দিলেন না। সে শৈশবে পিতৃমাতৃহীনা; কোথায় পিতা, কোথায় মাতা, কোথায় নিবাস, বাছা তাহার কিছুই জানিল না। তোমার সহিত বিবাহ দিলাম। ভাবিলাম, এক দিন না একদিন বাছা সুখের মুখ দেখিতে পাইবে। অদৃষ্টে না থাকিলে কি হইবে বল? সকলই বিপরীত হইল।"

নবকুমার নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। অধিকারী কহিলেন,—

"নবকুমার! আর তাহা ভাবিয়া কি হইবে? তুমি সচ্চরিত্র ও শান্ত ব্যক্তি বিধাতা তোমাকে এত বেদনা দিতেছেন কেন? পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারী হওয়া তোমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।"

নবকুমার নির্ব্বাক্। অধিকারী কহিলেন, —"আহা! তাহার যেমন রূপ, তেমনই গুণ। তাহাকে সহসা দেখিলে দেবী বলিয়া ভ্রম জন্মিত।"

নবকুমার কহিলেন,—"কপালকুণ্ডলার নামতো পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া গেল; তাঁহার বৃত্তান্ত জগতে কেহই জানে না। কপালকুণ্ডলা স্বয়ং নিজ বৃত্তান্ত জানিতেন না। আপনি তাঁহার বিষয় জানেন কি?"

অধিকারী দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে কহিলেন, —"এই সকল যন্ত্রণাভোগ করিতে হইবে বলিয়া ভবানী সকলই আমাকে জানাইয়াছেন। আমি সকলই জানি।"

নবকুমার কহিলেন,—"সে সকল কথা জানিবার নিমিত্ত সময়ে সময়ে মন অত্যন্ত

অস্থির হয়। অত আর সে কথা আলোচনার আবশ্যক নাই। সময়ান্তরে আপনার নিকট সমস্ত শুনিব।”

সে রাত্রি অধিকারী তথায় অবস্থান করিলেন। প্রাতে উঠিয়া তিনি জন্মভূমি দেখিতে যাইবার নিমিত্ত বিদায় চাহিলেন। নবকুমার তাহাতে আপত্তি করিয়া কহিলেন,—“যে দুদিন আপনি এখানে আছেন সে দুদিন আমরা ভাল আছি। আপনি এক্ষণে গিয়া কি করিবেন? তথায় কেহ বা আছেন,—কাহাকে দেখিতেই যাইবেন? আর চারি পাঁচ দিন পরে আমি সপ্তগ্রাম যাইব। আপনি সেই সময় বাটী যাইবেন। আমি মাসেক কাল পরে আবার এখানে আসিব। আপনিও অবশ্যই ইতিমধ্যে ফিরিতে পারিবেন। আবার এখানেই সাক্ষাৎ হইবে?

অধিকারী তাহাতেই স্বীকার হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অন্তিম-সময়ে।

————gone to Pluto's reign,
There with sad ghosts to pine and shadows dun',
—Thomson's Castle of Indolence

বৈকালে নবকুমার মথুরানাথ ও অধিকারী ভ্রমণে নির্গত হইলেন। নবদ্বীপের দক্ষিণাংশে নিবিড় বন। তাঁহারা সেই দিকেই বেড়াইতে গেলেন। উভয়দিকে বন-মধ্য দিয়া গ্রামান্তর যাইবার নিমিত্ত এক পথ ছিল; তাঁহারা সেই পথ বাহিয়া যাইতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিলে পর সন্নিকটে একটী মনুষ্যের যন্ত্রণা-সূচক ধ্বনি এককালে তাঁহাদের তিন জনেরই কর্ণে প্রবেশ করিল। তাঁহারা তিন জনেই চমকিয়া উঠিলেন। ব্যস্ত হইয়া চারিদিকে তাকাইলেন—কিছুই দেখিতে পাইলেন না। যন্ত্রণা-ধ্বনি আরও প্রবল হইল। তাহা সন্নিহিত বন-মধ্য হইতে নিঃসৃত হইতেছে বলিয়া বোধ হইল। তাঁহারা শব্দ লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে চলিলেন। দুই পা অগ্রসর হইয়া বৃক্ষ-লতার মধ্য দিয়া দেখিতে পাইলেন, অদূরে একটী মনুষ্য যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। তাঁহারা বৃক্ষ-লতার মধ্য দিয়া পথ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তথায় যাহা দেখিলেন, তাহাতে অধিকারী ও নবকুমার ত্রস্ত হইলেন! ভয়ানক দৃশ্য! তাঁহারা দেখিলেন,—“সাগর-তীরবাসী, কপালকুণ্ডলা-পালক, ভৈরবী-সেবক, জটাজুট-ধারী, দুরন্ত কাপালিক মৃত্যু-যন্ত্রণায় অধীর হইয়াছে! তাহার চরমকাল উপস্থিত প্রাণবায়ু অনতিবিলম্বে সে দেহ-রাজ্য ত্যাগ করিবে। এতকাল ভৈরবী আরাধনায় কি পুণ্য সঞ্চিত হইল, তাহা কাপালিক আর অল্প-কাল পরেই প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে; নবকুমার ও অধিকারী ভাবিলেন—কাপালিক এখানে কেন আসিল, সহসা উহার মৃত্যুই বা কেন হয়, এ সকল কথা এখন মীমাংসিত হইবার নহে। তাঁহারা কাপালিক সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। কাপালিকের দৃষ্টি তাঁহাদের উপর পড়িল। নবকুমারের শরীর রোমাঞ্চ হইল; রক্তের বেগ বৃদ্ধি হইল; শিরা সকল কাঁপিতে লাগিল।

কাপালিকের মুখ প্রফুল্ল হইল। যন্ত্রণায় অধীর কাপালিক তাঁহাদিগকে দেখিয়া যেন কিঞ্চিৎপরিমাণে শান্তিলাভ করিল। কাপালিক

হস্তদ্বারা তাঁহাদিগকে বসিতে ইঙ্গিত করিল; তাঁহারা বসিলেন। কাপালিক মুখ-ব্যাদান করিল। তাঁহারা বুঝিলেন কাপালিক পানীয় চাহিতেছেন। মথুরানাথ সত্বর জল আনিতে গমন করিলেন এবং অবিলম্বে একটী মৃন্ময় পাত্রে করিয়া এক পাত্র জল আনিয়া অধিকারীর হস্তে দিলেন। অধিকারী কাপালিকের মুখে অল্প অল্প জল দিতে লাগিলেন। জল পান করিয়া কাপালিকের কথা কহিবার ক্ষমতা হইল। অতি অস্পষ্ট কথা কহিতে লাগিল। কাপালিক নবকুমারের হস্তধারণ করিল এবং কহিল,-

"পাপ—ওঃ ঘোর—নরক—অনন্ত। ভবানী ক্ষমা—অসম্ভব। ওঃ—নব—ক্ষমা। কষ্ট—যাই—অনল—ত্রাণ। আ—র—ন। মা—সন্তান। ওঃ—ক্ষমা—তুমি—ক্ষমা। মরি—ই—ই—ই।"

এই বলিয়া কাপালিক নিস্তব্ধ হইল। পুনরায় মুখ ব্যাদান করিলে অধিকারী পানীয় দিলেন। কাপালিক আবার কহিল,—

"জীবন যায়। নরক। উপায়? ওঃ—মরি—যে। এবার না।"

কাপালিক নবকুমারের হস্ত হইতে হস্ত গ্রহণ করিল এবং দুই হস্ত একত্রিত করিয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করত কহিতে লাগিল,—

"মা!—ক্ষমা—কর,—চরণ—দেও। মরি। নরকে—না। স—ন্তা—ন অবোধ আর—না। চ—র—ণ। পাপ—কখন—না মা—আ—আঃ। ওঃ—যাই—যে! মাঃ জানি—তাম—না। এই—বার—ক্ষমা, আর—না। ওঃ!"

কাপালিক যন্ত্রণায় অধীর হইয়া উঠিল। ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। তাহার গভীর চক্ষুমধ্যে অশ্রুজল আবির্ভূত হইল। কাপালিকের কথা কহিবার ক্ষমতা ক্রমে লুপ্ত হইয়া আসিতে লাগিল। কাপালিক আবার মুখ ব্যাদান করিল। অধিকারী পুনরায় জল দিলেন। জল পান করিয়া নবকুমারের হস্ত ধারণ করিয়া কহিল,—

"ভা—ই—মব। মরি—রাগ—না—ক্ষমা।" এই বলিয়া নীরব হইল। কাপালিক অত্যন্ত দুরন্ত, দুর্ম্মতি ও সে নবকুমারের মর্ম্মান্তিক ক্ষতি করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার মৃত্যুযন্ত্রণা ও নরকের বীভৎসমূর্ত্তি দর্শনে তাহার অনুতাপ ও ক্লেশ দেখিয়া নবকুমারের হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি উচ্চস্বরে কহিলেন,-

"আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। প্রার্থনা করি ভবানীও তোমাকে ক্ষমা করিবেন।"

নবকুমার উচ্চ করিয়া বলিয়াছিলেন বলিয়া কাপালিক শুনিতে পাইল। সে আবার কহিল,—

"নব—ওঃ। কপাল—কু—ণ্ড—লা—ল—ক্ষ্মী—ই—ই—স—তী। ওঃ—মরি—যে। মা! আছে—যশি—পু—ণ্ট—উ। রা—ম। ওঃ—যা—ই—ত্রা—ণ। ধন—বা—ন। ভা—ল—আ—আ—আ। ভ—বা—নী—মা—আ—আ।"

নবকুমার ও অধিকারী উভয়েই এই কথাটী পরিষ্কার করিয়া শুনিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইলেন। অধিকারী জিজ্ঞাসিলেন,—

"কপালকুণ্ডলার কথা কি বলিলেন?"

কাপালিক অতি কষ্টে আবার কহিল,—

"আ—ছে—এ—এ—এ। ও-ও—ওঃ। মাঃ—কপা—ল———লা———"

তাহার মুখ হইতে আর কথা বাহির হইল না। কপালকুণ্ডলার অর্দ্ধোচ্চারিত নাম তাহার জীবনের শেষ কথা হইয়া রহিল। অতি কষ্টে পাপী, অনুতাপী, নরক-ক্লেশ-ভীত কাপালিক

তনুত্যাগ করিল। তাহার গতি কি হইবে তাহা সে পূর্ব্ব হইতে বুঝিয়া গেল।

স্বর্গী-ধাম-বিচরণ-শীল কোন মানব সশরীরে, কল্পিত সুখসন্তোষালয় স্বর্গে দেবগণ মধ্যে নীত হইলে; ঐরাবতসমারূঢ়, পারিজাত-স্রক্-শোভিত শচী সহ শচীনাথকে অথবা অন্য কোন দ্যুলোকবাসী দেবাত্মাকে সহসা সম্মুখে সমুপস্থিত দেখিলে; প্রাতঃসূর্য্য পশ্চিমগগণে সমুদিত হইলে অথবা নৈসর্গিক নিয়মের তদ্রূপ কোন পরিবর্ত্তন ঘটিলে যেরূপ বিস্ময়াবিষ্ট হওয়া সম্ভব—কাপালিকের প্রমুখাৎ কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধীয় কথাসকল শুনিয়া অধিকারী ও নবকুমারের তদ্রূপ বিস্ময় জন্মিল। কাপালিকের সমস্ত কথা নিতান্ত অস্পষ্ট ও জড়তাপূর্ণ হইলেও 'কপালকুণ্ডলা আছে' ইহা সে পরিষ্কাররূপে বলিয়াছে। উভয়ে ইহা লইয়া বড়ই আন্দোলন করিলেন। এ কথায় বিশ্বাসস্থাপনে এবং ইহার কোন নিগূঢ়ার্থ নির্ব্বাহনে অক্ষম হইয়া সন্ত্রস্তর প্রতীক্ষায় চিত্রপুত্তলীর ন্যায়, উভয়ে উভয়ের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে নবকুমার কহিলেন,—

"নিতান্ত অসম্ভব কথা। কিরূপে উহা বিশ্বাস করি। আমার বোধ হয় কাপালিক মৃত্যুসময়ে প্রলাপ বলিল।"

অধিকারী বিষণ্ণ ভাবে কহিলেন,—"তাহা ভিন্ন আর কি হইতে পারে?"

তাঁহারা এতৎসম্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের অন্তর ঐ কথাকে সত্য ও অভ্রান্ত ভাবিতে ইচ্ছা করিল। মুখে ও মনে ঐক্য হইল না।

অধিকারী কহিলেন,—"কাপালিক মানবলীলা সংবরণ করিল। ও ব্যক্তির জীবন যত মন্দ হউক না কেন, আমি জানি ও ব্রাহ্মণ; সুতরাং উহার যথাবিধি ও যথাসম্ভব সৎকারাদি করা কর্ত্তব্য।"

এ প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হইলেন এবং অবিলম্বে কাপালিকের মৃতদেহ সুরধুনী-তীরে আনয়ন করিয়া চিতা সজ্জা করত দগ্ধ করিলেন। ঘোর তান্ত্রিক কাপালিকের দেহ ভস্মাবশেষ হইয়া গেল। পৃথিবী হইতে তাহার নাম ও চিহ্ন চিরদিনের নিমিত্ত বিলুপ্ত হইল।

পরদিন নবকুমার সপ্তগ্রাম এবং অধিকারী পলাশী যাত্রা করিলেন। কাপালিকের অন্তিমকালের কথা কেহই বিস্মৃত হইলেন না। তাহা তাঁহাদের হৃদয়ে বিশেষরূপে অঙ্কিত থাকিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রেমিকা-পার্শ্বে।

"Oh woman ; lovely woman ;
nature made thee
To temper man ; we had been brutes
without you ;
Angels are painted fair,
to look like you ;
There's in you all that we believe
of heav'n
Amazing brightness, purity and truth,
Eternal joy, and everlasting love.':
—Ottway.

পাঠক! বহুদিন পরে আবার নবকুমারকে পদ্মাবতীর পার্শ্বে দর্শন করুন। অতঃপর পদ্মাবতীকে লুৎফউন্নিসা বলিবার আবশ্যক নাই। সে নামের সহিত তাঁহার চিরবিচ্ছেদ হইয়াছে।

পদ্মাবতী আপন গৃহে বসিয়া অধ্যয়ন করিতেছেন; বেলা দ্বিপ্রহর। গৃহের সমস্ত দ্বারাদি রুদ্ধ। সুপ্রশস্ত গৃহ, এজন্য বড় অন্ধকার হয় নাই। পদ্মাবতী এক খানি পালঙ্কোপরি উপাধানাবলম্বনে বিশ্রাম করিতেছেন। তাঁহার এক হস্তে পুস্তক, অপর হস্তে এক খানি তাল-বৃন্ত। পদ্মাবতী এক মনে পুস্তক অধ্যয়ন করিতেছেন এবং সময়ে সময়ে তাল-বৃন্ত ব্যজন করিয়া গ্রীষ্ম বিদূরিত করিতেছেন। নিকটে একটী আধারে কতকগুলি সজ্জিত তাম্বূল রহিয়াছে; পদ্মাবতী ইচ্ছানুসারে এক একটী চর্ব্বণ করিতেছেন।

এমন সময় গৃহের একটী দ্বার উন্মোচন হইল। মুক্তদ্বার দিয়া নবকুমার প্রবেশ করিলেন। পদ্মাবতী সহসা তাঁহার আগমন দৃষ্টে পুলকিতা হইলেন, এবং সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, বিদ্যুদ্বেগে তৎসন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে প্রেম-পবিত্র আলিঙ্গন করিলেন ও সেই অবস্থাতে তাঁহাকে পর্য্যঙ্কে বসাইয়া কতক্ষণ পার্থিব সমস্ত পদার্থ বিস্মৃত হইয়া সেইরূপ আলিঙ্গনে বদ্ধা রহিলেন।

অনেকক্ষণ পরে নবকুমার পদ্মাবতীর কুশল জিজ্ঞাসিলেন। পদ্মাবতী এক্ষণে নবকুমারের বক্ষাসন হইতে মস্তকোত্তোলন করিয়া নবকুমার কৃত প্রশ্নের উত্তর দিলেন। নবকুমার দেখিলেন, পদ্মাবতীর নয়ন-নিঃসৃত অশ্রুনীরে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গিয়াছে।

বহুক্ষণ কথ বার্ত্তায় উভয়ে উভয়ের সমস্ত কথা জ্ঞাত হইলেন। পরে পদ্মাবতী কহিলেন,—"শ্যামার সংবাদ কি?"

নবকুমার উত্তর করিলেন,—"আমি যতদূর দেখিলাম, তাহাতে আমার বোধ হইল, শ্যামা আপন অবস্থায় আপনি সন্তুষ্টা আছে।"

পদ্মা। শ্যামা আর কত দিন নবদ্বীপে থাকিবেন?

নব। আমি আর কিছু দিন থাকিলে একবারে শ্যামাকে সঙ্গে লইয়া আসিতাম। কিন্তু তোমাকে দেখিবার জন্য মন ব্যাকুল হইল, এজন্য ব্যস্ত হইয়া চলিয়া আসিলাম। কিছু দিন পরে গিয়া শ্যামাকে আনিব।

পদ্মা। আবার কতদিন পরে যাইতে হইবে? এবারে যখন যাইবে, তখন আমি তোমার সঙ্গে যাইব। তুমি তথায় যাইয়া দেড় মাস, দুই মাস বিলম্ব করিবে, তাহা হইবে না।

নব। এবার আমার নবদ্বীপে অধিক বিলম্ব হইবে না। গমনমাত্র শ্যামাকে সঙ্গে লইয়া আসিব।

পদ্মা। একটু হাসিলেন। মনে এই কথার উত্তর দিবার জন্য যে ভাবে উদিত হইল তাহা না বলিয়া, বলিলেন,—"শ্যামা যদি সেখানে ভাল থাকেন, তবে এত ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে আনিবার প্রয়োজন কি?

নব। শ্যামা যদিও এইক্ষণ ভাল আছে, কিন্তু দীর্ঘকাল সেরূপ থাকা সম্ভাবিত নহে। সপত্নী সহবাসে কতদিন সেরূপ থাকিবে? আরও বিবেচনা করিয়া দেখ, শ্যামা বাটীতে না থাকিলে আমার কত ক্লেশেরই সম্ভাবনা।

নবকুমারের কথা শুনিয়া পদ্মাবতী একটু অন্যমনস্কা হইলেন। তিনি যেন কি ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার বদন গম্ভীর হইল। তিনি কহিলেন,—"নবকুমার! দাসীর একটী কথা শুনিতে হইবে। দাসীর প্রতি তুমি অপ্রাতিরিক্ত অনুগ্রহ করিয়াছ। দাসীর আশার সীমা নাই—তোমার নিকট আবারও প্রার্থনা করিতেছি।"

নব। কি কথা নিঃসঙ্কোচে বল।

পদ্মা। তোমাকে কিন্তু আমায় কথা রাখিতে হইবে।

নব। তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব। বল।

পদ্মা। কথা এই—তোমায় একটি বিবাহ করিতে হইবে। আমার এই কথাটী তোমার রাখিতেই হইবে। তুমি একটী বিবাহ করিলে আমার সুখের সীমা থাকিবে না। মনের সকল বাসনা সফল হইয়াছে; এখন ঐটী সফল হইলেই আমি চরিতার্থ হই। তুমি ইহা স্বীকার কর। ইহাতে অন্যমত করিলে আমি বড় ক্লেশ পাইব।

নবকুমার ইহার কি উত্তর দিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ অবাক্ হইয়া থাকিলেন। পরে সবিস্ময়ে কহিলেন,—

"পদ্মাবতি! তোমার মনে সহসা এ ভাব জন্মিল কেন?"

পদ্মা। এ ভাব সহসা জন্মে নাই; আর ইহা অকারণও নহে। আমি তোমার চরণ-ছায়ার ভিখারিণী ছিলাম,—তোমার নিকট সে ভিক্ষা লাভ করিয়াছি; তাহারও অধিক লাভ করিয়াছি। এ অদৃষ্টে এত হইবে, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। তোমার ক্লেশ নিবারণ চেষ্টাই আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তোমার ক্লেশ আমি কোন্ চক্ষে দেখিব? তুমি একটী বিবাহ করিলে তোমার সাংসারিক সমস্ত ক্লেশ অপনোদিত হয়, তাহা আমি বুঝিতেছি। কোন্ প্রাণে তোমাকে সে জন্য অনুরোধ না করিব?

নবকুমার পদ্মাবতীর কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। যে পদ্মা কিছু দিন পূর্ব্বে স্বামি-প্রেম একায়ত্ত করিবার নিমিত্ত কি না করিয়াছিলেন, তাঁহার মুখে অধুনা এ কথা শুনিয়া কাহার না বিস্ময় জন্মিবে? নবকুমার অনেকক্ষণ পরে বলিলেন,—

"পদ্মাবতি! আমি আর বিবাহ করিব না। আর কাজ কি?"

পদ্মাবতী কহিলেন,—"নাথ! বিবাহ করিলে আমি অসুখী হইব বলিয়া তুমি কি আশঙ্কা করিতেছ?—আমি তাহাতে অসুখী হইব না। বরং তাহাতে আমার সুখ বিপুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে। তুমি আমার চিন্তায় নিজ সুখে কণ্টক দিলে, আমার সুখ না হইয়া দুঃখই বাড়িবে। আমি কি দেখিতেছি না যে নিঃসংসারী হওয়ায় তোমার কত অনিষ্ট ঘটিতেছে? এমন স্থলে তাহাতে অন্যমত করা কর্ত্তব্য নহে। যাহাতে আমি সুখী হইব, অথচ তোমারও মঙ্গল হইবে, সে কার্য্যে আপত্তি কি?

নবকুমার বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ভাবিলেন, কি আশ্চর্য্য! সেই পদ্মাবতী এইরূপ হইয়াছে। বিধাতা সকলই করিতে পারেন। সময়ে সবই হয়। অনেকক্ষণ পরে কহিলেন,—

"পদ্মাবতি! তুমি নারী-কুলের অলঙ্কার। তুমি আমার নিতান্ত হিতৈষিণী। তোমার কথাসকল অমৃতরসে সিঞ্চিত। তোমার বাক্য-পীযূষ পালন করিলে আমার মন এতই অভিভূত হইয়া উঠে যে, অন্য কিছু জ্ঞান থাকে না। এক্ষণে বিবেচনা বা চিন্তার সময় নহে। তোমার ও কথা আমি পরে মীমাংসা করিব।"

পদ্মা। সে যাহা হউক, নবকুমার! তুমি কপালকুণ্ডলা—

'কপালকুণ্ডলা' এই শব্দটী উচ্চারিত হইবা-মাত্র নবকুমার শিহরিয়া উঠিলেন। পদ্মাবতী তাহা লক্ষ্য করিলেন, তথাপি তিনি বলিতে লাগিলেন,—

"নবকুমার! তুমি কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধে কখন কিছু শুনিতে পাও কি?"

নবকুমার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"কপালকুণ্ডলার কথা আর কেমন করিয়া শুনিব? তাহার অকালমৃত্যুর সহিত নামও পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সে সম্বন্ধে আর কে কি বলিবে?"

পদ্মা। সে বিষয়ে কি তোমার মনে কখন কোন সন্দেহও হয় না?

নব। কি আশ্চর্য্য কথা! পদ্মাবতি! কেমন করিয়া সন্দেহ হইবে? আমার কথায় যদি তোমার অবিশ্বাস না থাকে, তাহা হইলে আমি বলিতেছি, কপালকুণ্ডলা আমার সাক্ষাতে —আমার চক্ষের উপর, আমার সহিত একত্রে নদীতীরস্থ এক খণ্ড মৃত্তিকার সহ অতল-জলে নিপতিত হইয়াছে। আমি জলে ডুবিয়াও তাহাকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত অশেষ যত্ন করি। কিন্তু আমার চেষ্টা বিফল হইল। কপালকুণ্ডলা স্রোতবেগে কোথায় ভাসিয়া গেল, আমি তাহার সন্ধান করিতে পারিলাম না। অবশেষে আমার সংজ্ঞাও তিরোহিত হইয়া গেল।

এই কথা বলিতে বলিতে নবকুমারের মনে পূর্ব্বস্মৃতির উদয় হইল। মনে শোক উপস্থিত হইল। তিনি অতিকষ্টে অশ্রু সংবরণ করিয়া কহিলেন,—

"কেন? পদ্মাবতি! অদ্য ও সকল কথা জিজ্ঞাসিতেছ কেন?"

পদ্মাবতী কহিলেন,—"এ সকল কথার আলোচনায় তোমার মনে যাতনা উপস্থিত হইবে তাহা জানি, তথাপি না জিজ্ঞাসিলে নয়। আমি এ সকল কথা আজ কেন জিজ্ঞাসিতেছি শুন।" এই বলিয়া পদ্মাবতী আমূল অঙ্গুরীয়বৃত্তান্ত নবকুমারের নিকট যথাযথ বলিলেন। সে সকল কথা শুনিতে শুনিতে নবকুমারের লোচন-প্রান্তে অশ্রু আবির্ভূত হইল। পদ্মাবতী সমস্ত কথা বলিয়া কহিলেন, —"নাথ! ইহাতে তোমার কি বোধ হয়?"

নব। বোধ কি হইবে? ইহা আমার বুদ্ধির অতীত। কপালকুণ্ডলা নাই এবং থাকাও নিতান্ত অসম্ভব ইহা আমি বেশ জানি। তবে আমার দুরদৃষ্টের ও সমস্ত ক্লেশের এখনও শেষ হয় নাই। এই জন্য সময়ে সময়ে কপালকুণ্ডলার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ছায়ার ন্যায় প্রমাণ সকল জুটিতেছে। ও সকল কিছুই নয়, কেবল সমধিক ব্যাকুলিত হইবার এবং ক্লেশ ও যাতনা পাইবার কারণ।

পদ্মা। কিন্তু তুমি যাই বল আমার যেন বোধ হয় কপালকুণ্ডলা আছেন। বোধ করি, কোন প্রকারে তিনি মুক্তিলাভ করিয়া থাকিবেন।

নব। (দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে) পদ্মাবতি! ও সকল কষ্ট-কল্পনা কেন করিতেছ? আমি নিতান্ত হতভাগা। আমার কষ্টের সীমা নাই। অন্যের হইলে যাহা হয় হইত, আমার অদৃষ্টে কখনই তাহা ঘটিবে না। দুরাশায় আর কেন চিত্তকে বদ্ধ করিতেছ? স্বপ্নে সুখসম্ভোগ করিয়া কি হইবে?

পদ্মা। যাহা হউক, এজন্য অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

নবকুমার শূন্যভাবে কহিলেন,—"কোথায় অনুসন্ধান করিব।"

নবকুমার বলিলেন বটে, 'কোথায় অনুসন্ধান করিব, কিন্তু তখন তাঁহার চিত্তের অবস্থা এমনই ভয়ানক হইয়াছে যে, কপালকুণ্ডলার পুনর্দর্শন প্রাপ্তির নিমিত্ত সর্ব্ব প্রকার দুরূহ কার্য্য সাধনে তিনি অকাতরে প্রস্তুত। তাঁহার মন নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিল।

তিনি সংসার কপালকুণ্ডলাময় দেখিতে লাগিলেন। অন্যান্য পার্থিব সমস্ত ভাবনা তিরোহিত হইয়া গেল। কপালকুণ্ডলা তাঁহার চিত্ত অধিকার করিলেন। নবকুমার হৃদয় অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন, তথায় একটী মূর্ত্তি—একটী মাত্র চারু রমণীমূর্ত্তি অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। সে মূর্ত্তি কপালকুণ্ডলার। কপালকুণ্ডলা তো অনেক দিন পরলোকগতা হইয়াছেন, তবে তাঁহার মূর্ত্তি অদ্যাপি নবকুমারের হৃদয়ে সুচিত্রিত রহিয়াছে কেন? নবকুমার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—সংসার ভুলিবেন, আপনাকে আপনি বিস্মৃত হইবেন, পার্থিব সমস্ত সুখ বিসর্জ্জন দিবেন, তথাপি তিনি কপালকুণ্ডলাকে হৃদয় হইতে কখন অপনীত করিবেন না। নবকুমার সে প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হন নাই—আর কখন যে বিস্মৃত হইবেন তাহাও সম্ভাবিত নহে। যে ব্যক্তি অকৃতজ্ঞ সহচরগণের উপকারার্থ নিঃস্বার্থে কাষ্ঠ-ভার মস্তকে বহন করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তি যে প্রাণদায়িনী হিতৈষিণী সুন্দরীর মূর্ত্তি চিরদিনের নিমিত্ত সহর্ষচিত্তে হৃদয়ে ধারণ করিবেন, ইহাতে বিচিত্র কি? নবকুমারের হৃদয়ে কপালকুণ্ডলার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। কালের কুটিল শাসনে মূর্ত্তি স্থানে স্থানে বিকৃত হইয়াছিল, কিন্তু অধুনা স্মৃতিরঙ্গ সংযোগে বিকৃত অংশ সকল সংস্কৃত ও পুনশ্চ রঞ্জিত হইল। আবার নবকুমারের হৃদয়ে মোহিনী কপালকুণ্ডলা শোভা বিকাশ করিতে লাগিলেন।

ইতিপূর্ব্বে কাপালিকের মরণকালীন কথা শুনি কপালকুণ্ডলার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নবকুমারের হৃদয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ জন্মাইয়া দিয়াছে। অদ্য পদ্মাবতীর শ্রীমুখাৎ এই সমস্ত কথা শুনিয়া তাঁহার সে সন্দেহ অপেক্ষাকৃত দৃঢ় হইল। তিনি আশার প্রভাবে উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠিলেন। যদি সর্ব্বস্ব দান করিলে কেহ তাঁহাকে বলিয়া দেয় কপালকুণ্ডলা আছেন,—তিনি অমুক স্থানে আছেন, নবকুমার তদ্দণ্ডে তাঁহাকে তাহা সন্তুষ্টচিত্তে দিতে সম্মত। যদি আত্মজীবন বদ্ধ রাখিলে একবার মাত্র কপালকুণ্ডলাকে দেখিতে পাওয়া যায়, নবকুমার অবাধে তাহাতেই স্বীকৃত। যদি দক্ষিণ হস্তের বিনিময়ে কপালকুণ্ডলার সংবাদ পাওয়া যায়, নবকুমার হৃষ্টচিত্তে তাহা করিতে প্রস্তুত।

মানুষে মানুষের হৃদয় দেখে। যে ব্যক্তি দেখিতে জানে, সে দেখে, অন্যে দেখিতে পায় না। সকলের চক্ষু আছে। চক্ষু দর্শনযন্ত্র। সকলেই সকলের হৃদয় দেখিতে পায় না কেন? তাহার উত্তর—তাহাতে কৌশল চাই, তাহাতে অভিজ্ঞতা চাই। সে কৌশল উপদেশ দ্বারা শিক্ষা দেওয়া যায় না। কাল ও স্বভাব যাঁহাকে তাহা শেখাইয়াছেন তিনিই শিখিয়াছেন। চক্ষুর ক্ষমতা স্বচ্ছ পদার্থ ব্যতীত অন্য কিছু ভেদ করিতে পারে না। তবে মানুষে মানুষের হৃদয় দেখে কি প্রকারে? দর্পণে যেমন সম্মুখস্থ পদার্থের ছায়া পড়ে তেমনই এক প্রকাশ্য স্থানে হৃদয়েরও ছায়া পড়ে। সে স্থান বদন। তোমার রাগ হউক, দ্বেষ হউক, আনন্দ হউক, মনস্তাপ হউক—যে দেখিতে জানে, সে তোমার বদন দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পারিবে। পদ্মাবতি! কি দেখিতেছ? তোমার হৃদয় কেহ দেখিতেছেন, তাহা তুমি বুঝিতেছ কি? নবকুমার কতক্ষণ একপ্রাণ মনে পদ্মাবতীর মুখের প্রতি তাকাইয়া রহিলেন। পদ্মাবতী যে সকল কথা বলিলেন তাহা তাঁহার অন্তরের কথা কি না, নবকুমার যেন তাই জানিবার নিমিত্ত পদ্মার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন; নবকুমারের মুখ প্রফুল্ল

হইল। তিনি দেখিলেন পদ্মাবতীর দৃষ্টিতে পবিত্র সরলতা প্রকাশ করিতেছে; যে কপট হৃদয়া, তাহার সেরূপ দৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। পদ্মা যখন যাহা বলেন, তাহা তাঁহার অন্তর হইতেই বলেন। তিনি ভাবিলেন "পদ্মাবতী রমণীরত্ন। সহস্র ক্ষতি হয় হউক, তথাপি পদ্মাবতীর সুখ-সাধনে যাহা প্রয়োজন তাহা করিব।" এই জন্যই বলিতেছি, "পদ্মাবতি। তুমি নিঃশঙ্ক-চিত্তে থাক। তোমার ভয় কি? তোমার সুখ নবকুমারের প্রধান লক্ষ্য।"

নবকুমার অনেকক্ষণ পরে কহিলেন,—"প্রিয়ে! বহুদিন উমাপতির সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আবার আসিতেছি।"

এই বলিয়া নবকুমার গাত্রোত্থান করিলেন।

পদ্মাবতী বলিলেন,—"তোমার সহিত এখনও অনেক বিশেষ কথা আছে।"

নবকুমার কহিলেন,—"যদি সময়ান্তরে বলিলে ক্ষতি না হয়, তবে পরে বলিও।"

পদ্মাবতী বলিলেন,—"তাহাই হইবে।"

নবকুমার প্রস্থান করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অশনি-সম্পাতে।

"সম্ভাবেত্মা আপনেষুং মহৎসবেষুং রুজাবেত্মা।
হিমচ্ছিন্না বিজবিহবা বিরহে মিত্তানং ছুম্মনা অম্ভে॥"
—মুদ্রারাক্ষস।

যে বিপদে নিপেশিত হইয়া উমাপতি নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, পাঠক মহাশয় তাহা জ্ঞাত আছেন। উমাপতির মাতুল প্রভৃতি, কেন সহসা এরূপ হইল, জানিতে পারিলেন না। তাঁহারা নানা স্থানে অনুসন্ধান করিলেন, কুত্রাপি তাঁহার সন্ধান পাইলেন না; কেহ কোন সংবাদও দিতে পারিল না। তখন হরিহর ভাবিলেন, 'নিশ্চয়ই উমাপতি সপ্তগ্রাম গিয়াছেন।' এজন্য পরদিন প্রত্যুষে স্বয়ং সপ্তগ্রাম আসিলেন। তথায় উমাপতি আসেন নাই। উমাপতির মাতা সমস্ত শুনিলেন। হরিহর তথায় বিলম্ব না করিয়া উমাপতির সন্ধানে গমন করিলেন। পরদিন বৈকালে নবকুমার উমাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে তথায় গমন করিলেন। উমাপতির সহিত সাক্ষাৎ হইল না। তাঁহার মাতার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার মুখে সমস্ত শুনিলেন। তাঁহার শিরে যেন অশনিসম্পাত হইল। তিনি কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিলেন। বৃদ্ধার রোদন দেখিয়া নবকুমারের হৃদয় গলিয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার সহিত উমাপতির অভিন্ন ভাব ছিল; সেই উমাপতির এতাদৃশ অচিন্ত্য-পূর্ব্ব বিপদ শ্রবণে নবকুমার একান্ত ব্যথিত হইলেন। বিশেষতঃ উমাপতির স্থবিরা জননীর কাতরতা দেখিয়া, তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি কহিলেন—

"মা! তুমি কাঁদিও না। ভয় কি? আমার বেশ বোধ হইতেছে যে, কোন দৈব-বিপাকে পড়িয়া উমাপতি বদ্ধ আছেন। তাঁহার কোন অনিষ্ট হয় নাই, ইহা আমার বেশ মনে লইতেছে। যাহা হউক, আমি কল্য প্রত্যুষে নির্গত হইব। পৃথিবী অনুসন্ধান করিব, প্রাণ দিব, যেমন করিয়া পারি, উমাপতিকে আনিয়া তোমার হস্তে সমর্পণ করিব। কোন চিন্তা করিও না। ভয় কি?"

বৃদ্ধা চক্ষু মুছিয়া কহিলেন,—

"বাবা নবকুমার! তুমি চিরজীবী হও। দাদা অনুসন্ধানের ত্রুটি করিতেছেন না। আহা তাঁহার বড় ভয়, বড় ভাবনা। একটী ছেলে নাকি এমনই করিয়া নিরুদ্দেশ হইল, আর পাওয়া গেল না, সেই জন্য আরও ভাবনা। কপাল মন্দ। নবকুমার! তুমি আর কোথায় যাইবে? তোমাতে উমাপতিতে প্রভেদ নাই। তোমার বিপদেও তো আমার চিন্তা।"

নবকুমার তাঁহার কথায় বাধা দিয়া কহিলেন,—

"মা! আপনি অন্যায় বলিতেছেন। আমি কোন্ প্রাণে নিশ্চিন্ত থাকিব? আপনি আমায় বাধা দিবেন না।"

এই বলিয়া নবকুমার, উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, তাঁহার চরণে প্রণাম করত প্রস্থান করিলেন।

নবকুমার তথা হইতে একেবারে পদ্মাবতীর আলয়ে আগমন করিলেন। পদ্মাবতী পুনরায় নবকুমারকে সমাগত দেখিয়া পুলকিত হইলেন।

নবকুমার কহিলেন,—"পদ্মাবতি! উমাপতির সংবাদ শুনিয়াছ?"

পদ্মা। না, তাহা তো কিছু জানি নাই।

নবকুমার তখন সমস্ত কথা পদ্মাবতীর গোচর করিয়া কহিলেন,—"পদ্মাবতি! কল্য প্রত্যূষে আমি উমাপতির সন্ধানে যাত্রা করিব; কত দিনে ফিরিব, তাহার স্থিরতা নাই। তুমি যে সকল কথা বলিবে বলিয়াছিলে, তাহা যদি বিশেষ আবশ্যক হয়, তবে এই সময় বল।"

পদ্মাবতী দাঁড়াইয়া ছিলেন, সমস্ত কথা শুনিয়া ধীরে ধীরে উপবেশন করিলেন। তাঁহার শিরে যেন সহসা বজ্রাঘাত হইল। তিনি আপন অদৃষ্টকে সহস্রবার ধিক্কার দিয়া কহিলেন,—

"নবকুমার! আমি জানি উমাপতি তোমার প্রাণাধিক প্রিয়। তাঁহার বিপদে তোমারও বিপদ। তাঁহার এ সংবাদে তোমার কখন নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য নয় সত্য,—কিন্তু তুমি কোথায় যাইবে? যদি স্থির নিশ্চিত থাকিত যে, কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবে এবং তাঁহার বিপদ মোচন করিতে পারিবে, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই গমন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যখন সেরূপ কিছুই নিশ্চিত নাই, তখন তুমি কি করিবে? আমি তোমাকে তোমার এই কর্ত্তব্য কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতেছি না, কিন্তু তোমাকে ইহার পরিণাম বিবেচনা করিতে বলিতেছি।"

নবকুমার বলিলেন,—

"তুমি যাহা বলিতেছ তাহা যথার্থ। কিন্তু আমি কি বলিয়া স্থির থাকি? উমাপতির বৃদ্ধা জননীর কাতরতা যদি দেখিতে, তাহা হইলে আমার ন্যায় তুমিও সমস্ত ভবিষ্যৎ জ্ঞানহীনা হইতে। কি করি, অন্য কোন উপায় নাই। কল্য প্রত্যূষে গোপালপুরে উমাপতির মাতুলের নিকট যাইব। তথায় যাইয়া কোন বিহিত বিধান করিতে পারি ভালই, নচেৎ অগত্যা আবার প্রত্যাগমন করিব। ইহা অপেক্ষা অন্য সদুপায় কিছু থাকে বল।"

পদ্মাবতী অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। পরে কহিলেন,—

"তোমার উদ্দেশ্যে বাধা দিব না। তুমি যাও—ঈশ্বর তোমার মানস সফল করুন। এরূপ অবস্থায় নিশ্চেষ্ট থাকিলে মিত্রতার কার্য্য হয় না। সোদরাধিক প্রিয় মিত্রের নিমিত্ত সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াই কর্ত্তব্য। যাও—কিন্তু এক কথা, আমি সংবাদ পাই যেন!"

নবকুমার আবার ভাবিলেন, পদ্মাবতী

অবলম্বন; আর একবার তিনি ঐ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে সে সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন। তিনি অনেকক্ষণ পদ্মাবতীর বদন-পদ্ম নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; দেখিতে দেখিতে তাঁহার দৃষ্টি পদ্মাবতীর অন্তরে প্রবেশ করিল। নবকুমার দেখিলেন, তথায় সরলতা ও পবিত্রতা ক্রীড়া করিতেছে। কে বলে পদ্মাবতী কলঙ্কিনী? নবকুমার তাহার সহিত দ্বন্দ্ব করিতে প্রস্তুত। নবকুমার পদ্মার হৃদয়ে কলঙ্ককণাও দর্শন করিলেন না। ইহা প্রণয়ের ধর্ম্ম— নূতন নহে।

গ্রীশীয়েরা প্রণয়-দেব কিউপিদ্‌কে অন্ধ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। অপর সম্প্রদায়ী কেহ কেহ কহেন, প্রণয়-দর্শন সলোমান্ অভিহিত সুপ্রসিদ্ধ চসমা বিক্রেতাদিগের দর্শনযন্ত্র-জাত দৃষ্টি অপেক্ষাও তীক্ষ্ণ। এই দুই সর্ব্বথা বিভিন্ন মতই সত্য এবং প্রশংসনীয়। প্রণয় এক পক্ষে নিতান্ত অন্ধ, অপর পক্ষে তাহার দিবা দর্শন। প্রণয়ী প্রণয়ীর পর্ব্বত প্রমাণ দোষও সহজে লক্ষ্য করিতে পারেন না, কিন্তু তিল প্রমাণ গুণকে তাল করিয়া দেখেন।

নবকুমার সোৎকণ্ঠায় কহিলেন,—

"পদ্মাবতি! আমাকে কি বলিবে বলিয়াছিলে—বল।"

পদ্মাবতী কহিলেন,—"বলিতেছি।"

এই বলিয়া নিকটস্থ পেটক মধ্য হইতে এক খানি অনুমোচিত লিপি বাহির করিলেন। লিপি নবকুমারের হস্তে দিয়া কহিলেন,—

"অল্প দিন হইল বাদশাহ জাহাঙ্গীর এই পত্র পাঠাইয়াছেন।" নবকুমার ব্যগ্রতা সহকারে লিপি পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নিশাবসানে।

"রাজমার্গো হি শূন্যোঽয়ং রক্ষিণঃ সঞ্চরন্তি চ।
বহুদোষা হি শর্ব্বরী॥"
—মৃচ্ছকটিকনাটকম্।

রাত্রি অনেক। দ্বিপ্রহরের ন্যূন নহে। গ্রাম প্রায় নিঃশব্দ। কেবল সময়ে সময়ে দুই একটা কুকুর, দূরস্থ বৃক্ষপত্র অথবা অন্য কিছুর স্পন্দন লক্ষ্য করিয়া, ঘোর চীৎকারে দিঙ্মণ্ডল বিদারিত করিতেছে, অথবা কদাচিৎ দুই একটী পক্ষী, সহসা কুলায়ভ্রষ্ট হইয়া কিয়ৎকাল স্বীয় রবে প্রকৃতির শান্তি নষ্ট করিতে করিতে, পুনরায় নীড়ান্বেষণ করিয়া লইতেছে; ক্ষণে ক্ষণে দুই একটা পেচকাদি নিশাচর পক্ষী, স্ব স্ব বীভৎস রব বিস্তার করত, মাতৃ-ক্রোড়ে-সুপ্ত বালক বালিকার হৃদয়ে ভীতি সঞ্চারিত করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে স্থানীয় শান্তিরক্ষক প্রহরী, উচ্চরবে তাহার উপস্থিতি জ্ঞাপন করিয়া গ্রামের সতর্কতা বিধান করিতেছে। এতদ্ভিন্ন ঝিল্লিগণের দিগন্তব্যাপী চীৎকার এবং রজনীসম্ভূত একটী অনিয়মবদ্ধ, যুগপৎ ভীতি ও প্রীতিজনক শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে। রাত্রি চম্ চম্ করিতেছে। মানবগণ সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর এক্ষণে নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে বিশ্রাম করিতেছে এবং নানাবিধ সুখ-দুঃখ পূর্ণ স্বপ্নের মোহে অভিভূত হইতেছে। কোন অন্ন বস্ত্র-বিহীন দরিদ্র, হয় ত স্বপ্নদেবীর মোহনমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া ক্ষণিক রাজসুখসম্ভোগ করিতেছে এবং হয় ত কোন অতুল্য রত্নরাজি-পরিবেষ্টিত নরপতি, ছিন্ন-কন্থাবিলম্বিত স্কন্ধ লইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষালব্ধ অন্নে উদর পোষ-

গের ক্লেশানুভব করিতেছে। এইরূপে স্বপ্ন হয়ত কোন পাপী, দুরাচারকে অননুভূতপূর্ব্ব সুখ-সংবেষ্টিত স্বর্গে তুলিতেছেন এবং বিশুদ্ধ পুণ্যাত্মাকে কুম্ভীপাক নরকস্থ পূতি-পরিপূর্ণ হ্রদগর্ভে নিক্ষেপিতেছেন। স্বপ্ন! তোমার মহিমা অসীম! তুমি সৎকে অসৎ এবং অসৎকে সৎ, জ্ঞানীকে মূর্খ এবং মূর্খকে জ্ঞানী, ধনীকে দরিদ্র এবং দরিদ্রকে ধনী, যুবককে বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধকে যুবক করিতেছ। তোমার ক্ষমতা জ্ঞানের অতীত। রজনি! তুমি তোমার চির-সহচরী নিদ্রা এবং তাঁহার কন্যা স্বপ্ন, তোমরা তিন জনে মিলিত হইয়া সংসারে কি রঙ্গই না দেখাইতেছ! রজনীর তমসাবরণে আবরিতকায় হইয়া কত কঠিন হৃদয় দস্যু, নির্দ্দয়তা সহকারে অপরের জীবন সংহার ও সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতেছে; কত দুরাচার উপযুক্ত সময় পাইয়া, হীনপ্রাণা, সহায়হীনা, পতি-ব্রতা সতীর সতীত্ব নষ্ট করিতেছে; ভয়ানক ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুগণ উদরপূর্ত্তির নিমিত্ত এই সময়ে কত শত জীবের জীবন নাশ করিতেছে। রজনি! তোমার আগমনে অনেকে বিমল শান্তি লাভ করে বটে, কিন্তু অনেকের এতাদৃশ পাপ-প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয় কেন?—সংসারে এত অনিষ্ট হয় কেন?

নবকুমার সুখময় শয়নে শায়িত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার নিদ্রা আইসে নাই। উমাপতির নিমিত্ত চিন্তা, কিরূপে কোথায় তাঁহার সন্ধান পাওয়া যাইবে সেই ভাবনায় তাঁহার মন অস্থির। সে অবস্থায় কি ঘুম আইসে? নবকুমার মানস-নেত্রে উমাপতিকে দেখিতে লাগিলেন, ভয়ানক বিপদ হইতে যেন তাঁহাকে মুক্ত করিতে লাগিলেন এবং পুনর্ম্মিলনে যেন সানন্দে তাঁহার সহিত কত কথা কহিতে লাগিলেন।

প্রত্যূষে উমাপতির সন্ধানে যাইতে হইবে বলিয়া তিনি প্রস্তুত হইয়া শয়ন করিয়াছেন; কিন্তু নিদ্রা না আসায় শয্যা বিরক্তিকর হইয়া উঠিল। কি মনে হইল,—শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। দীপালোক-সন্নিহিত হইয়া পদ্মাবতীর প্রদত্ত লিপি পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সে পত্রের সংক্ষেপ মর্ম্ম আমরা পাঠকগণকে জ্ঞাত করাইতেছি।—

"মান্যবরেষু—

সসম্মান নিবেদনম্—

বাদশাহ জাহাঙ্গীর বাহাদুরের আদেশ ক্রমে আপনাকে লিখিত হইতেছে যে, যদিও কখন বাদশাহ বাহাদুরের সহিত মহাশয়ের সাক্ষাৎ নাই, তথাপি তিনি অতঃপর আপনাকে একজন প্রধান মিত্র বলিয়া গণ্য করিবেন। সে বিষয়ে যে কারণ আছে তাহা মহাশয় জানিতে ইচ্ছা করিলে পরে জানিতে পারিবেন।

সম্প্রতি এই প্রণয়ের চিহ্ন স্বরূপ বাদশাহ বাহাদুর মহাশয়কে একটী নিষ্কর জায়গীর প্রদানে অভিলাষ করেন। ঐ জায়গীর মহাশয়কে অন্ততঃ লক্ষ মুদ্রা আয় দিবে। আপনি অকুণ্ঠিত চিত্তে উহা গ্রহণে স্বীকার করিলে তিনি আপ্যায়িত হইবেন।

জাঁহাপনা সর্ব্বদা মহাশয়ের সংবাদ জানিতে ইচ্ছা করেন, এজন্য মহাশয় তাঁহাকে পত্র লিখিবেন। ঈশ্বরেচ্ছায় বাদশাহ বাহাদুরের সমস্ত মঙ্গল। তিনি অবিলম্বে মহাশয়কে স্বয়ং পত্র লিখিবেন। নিবেদন ইতি। তারিখ ২৯শে রমজান।

অনুগত শ্রীগায়াস উদ্দীন।"*

* ভারতেতিহাস পাঠক মাত্রেই জ্ঞাত থাকিতে পারেন যে, গায়াস জাহাঙ্গীর বাদশাহের প্রধান উজির ছিলেন। এই ব্যক্তি বিখ্যাতনাম্নী নূরজাহানের পিতা

নবকুমার যতবার এই লিপি পাঠ করিলেন, তত বারই তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। নবকুমার সামান্য ব্যক্তি—জাহাঙ্গীর ভারত-সিংহাসনে সমারূঢ় বাদশাহ; উভয় পক্ষে এত প্রভেদ। এরূপ ধর্ম্মগত, জাতিগত, আচারগত, মানসম্ভ্রমগত, সম্পত্তিগত, ক্ষমতাগত ভিন্ন ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে মিত্রতা! নবকুমারকে ধনী করিবার এবং তাঁহার সহিত মৈত্রী সংস্থাপনের এত চেষ্টা কেন? নবকুমার বহুক্ষণ এই বিষয়ের আলোচনা করিলেন। তিনি পদ্মাবতীর জীবন-বৃত্তান্ত অনেক জানিয়াছিলেন। বাদশাহের সহিত পদ্মাবতীর পূর্ব্ব সম্বন্ধই ইহার কারণ বিবেচনা করিলেন। সে সিদ্ধান্তে তাঁহার চিত্তে সুখ উপজিল কি না তাহা বলিতে পারি না। অনেকক্ষণ পরে নবকুমার গাত্রোত্থান করিলেন এবং পত্রখানি শয্যা-তলে রাখিয়া পুনরায় শয়ন করিলেন।

শয্যা যেন চিন্তার নিকেতন। যাঁহারা কখনও চিন্তার হস্তে পতিত হইয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে রাক্ষসী চিন্তা, যে সময় নিদ্রা প্রতীক্ষায় মানবগণ নিশীথে শয্যাশায়ী হয়, সেই সময়েই সমধিক দৌরাত্ম্য করে। এক্ষণে সমুচিত সময় উপস্থিত হওয়ায় নিশাচরী দুর্ভাবনা আসিয়া নবকুমারকে আক্রমণ করিল। তিনি নয়ন মুদিয়া আকাশ পাতাল চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবনা, ক্রোধ, হিংসা, শোক প্রভৃতির স্বভাব এই যে, যখন কোন এক কারণে ইহাদের একটী উদ্দীপ্ত হয়, তখন ক্রমে তৎসংসৃষ্ট অন্যান্য যত তাহার উত্তেজক কারণ একাল পর্য্যন্ত ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে সমস্তগুলি মনে উপস্থিত হয়। নবকুমারের পক্ষেও তাহাই হইল। দুর্ভাবনাজনক যত বিষয় সবগুলি মনে হইতে লাগিল।

নবকুমার যখন এইরূপ চিন্তা-সাগরে মগ্ন আছেন, তখন কে যেন তাঁহাকে বাহির হইতে ডাকিল। স্বর নবকুমারের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি পুলকিত হইলেন। ব্যস্ততা সহকারে উঠিয়া বসিলেন। পুনরায় সেই স্বরে আবার তাঁহার নাম উচ্চারিত হইল। স্বর নবকুমারের পরিচিত। আহ্বানকারী কে, তাহা তিনি বুঝিলেন। লম্ফ দিয়া শয্যা হইতে উঠিলেন এবং পরিচিত ব্যক্তির উদ্দেশে ধাবমান হইলেন।

পঞ্চম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কারাগারে।

"জাতঃ সূর্য্যকুলে পিতা দশরথঃ ক্ষৌণীভুজামগ্রণীঃ
সীতা সত্যপরায়ণা প্রণয়িনী যস্যানুজো লক্ষ্মণঃ।
দোর্দ্দণ্ডেন সমো ন চাস্তি ভুবনে প্রত্যক্ষবিষ্ণুঃ স্বয়ম্
রামো যেন বিড়ম্বিতোঽপি বিধিনা চান্যে পরে কা কথা॥"

—মহানাটকম্।

পাঠক! উমাপতি কোথায়? তাঁহার অদৃষ্টে কি হইল?—এসকল কথা জানিবার জন্য কি আপনার অণুমাত্রও ইচ্ছা জন্মে নাই? যদি জন্মিয়া থাকে অগ্রসর হউন।

চরেরা উমাপতিকে বাঁধিয়া লইয়া চলিল। কতক্ষণ তাহারা তাঁহাকে এইরূপে লইয়া চলিল, অথবা তাহারা তাঁহাকে লইয়া কোথায় চলিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন

না। তাঁহার সেই সময়ের মানসিক অবস্থা বর্ণনাতীত। পরিত্রাণের আশা দুরাশা, সুতরাং তিনি চেষ্টা-শূন্য। মন নিতান্ত অস্থির। বিবিধ চিন্তায় হৃদয় আচ্ছন্ন।

সময়ে সময়ে উমাপতির গাত্রে বৃক্ষ লতাদি স্পৃষ্ট হইতে লাগিল, তজ্জন্য তিনি অনুমান করিলেন, তাঁহাকে কোন বন-মধ্য দিয়া লইয়া যাইতেছে। এইরূপে প্রায় সমস্ত রাত্রি উমাপতিকে বহন করিয়া দুরাত্মারা নিশাবশেষে একটী স্থানে উপনীত হইল এবং তথায় তাঁহাকে স্কন্ধ হইতে নামাইল। এই সময়ে সেই কর্কশভাষী পূর্ব্বপরিচিত বক্তা কহিল,—

"শুন, আজ একে সেই ঘরে রাখ। সকালে এর যা হয় করা যাবে। এখন রাত্রি নাই। তোমরা সকলে ঘুমাও। আর দেখ, এখন ওর মুখ বাঁধিয়া রাখায় দরকার নাই। যদি চেঁচাইয়া গোল করে, তবে তখনই কাটিয়া ফেলিলেই চুকিয়া যাইবে।"

কথা-বার্ত্তা শ্রবণে উমাপতি অনুমান করিলেন, সেই ব্যক্তি দলপতি। তাহারা আবার উমাপতিকে আকর্ষণ করিল এবং সন্নিহিত একটী ঘরের চাবি খুলিয়া উমাপতিকে তথায় লইয়া গেল। একণে তাঁহার মুখের কাপড় খুলিয়া দিল। অতিকষ্টে উমাপতির নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছিল, তিনি তজ্জন্য অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন। তিনি সজোরে শ্বাস গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কথা কহিবার ক্ষমতা তিরোহিত হইয়া আসিয়াছিল, ক্রমে ক্রমে তিনি সে ক্ষমতা পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। এই সময় বাহকেরা তাঁহাকে সেই স্থানে রাখিয়া প্রস্থানের উপক্রম করিল। উমাপতি তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"এই স্থানের নাম কি?"

দুরাত্মাদের একজন কঠিন স্বরে কহিল,—"তাহাতে তোমার দরকার কি?"

উমাপতি পুনরপি জিজ্ঞাসিলেন,—আমাকে এরূপে বন্ধন করার কারণ কি?"

উত্তর—যাঁর হুকুমে হইয়াছে তাঁর কাছে জানিও।

উমা। তিনি কে?

উত্তর—আমাদের রাজা।

উমা। তাঁহার নাম কি?

উত্তর—কেন, তাঁকে তুমি জান না? তাঁর নাম কে না জানে? তোমার বাড়ী কোথায়?

উমা। সপ্তগ্রাম।

"সপ্তগ্রামে আমাদের প্রভুর নাম না জানে এমন লোক আছে?"

উমা। তাঁহার নাম কি বলিলে জানি কি না বুঝিতে পারিব।

"বুঝিতে পার বা না পার, তুমি যখন জান না তখন তোমায় বলায় দোষ কি?"

অপরাপর সকলে কহিল,—"তা দোষ কি?"

পূর্ব্ববক্তা তখন সমুৎসাহে কহিল,—"তাঁহার নাম রহীম। এ নাম যে জানে না সে এখনও মায়ের পেটে আছে।"

এই কথা শুনিবামাত্র উমাপতি মাথায় হাত দিলেন।

জীবনের আশা তাঁহাকে ত্যাগ করিল। তিনি মনে ভাবিলেন—"আর নিস্তার নাই। দুরাত্মা রহীম! ওঃ কি ভয়ানক! আমি তাহার নিকট বন্দী হইয়াছি?"

এই কালে দেশ-মধ্যে দস্যুভয় অত্যন্ত প্রবল ছিল। দস্যুগণ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে এই রহীমের দল বিশেষ দুর্দ্ধর্ষ। রহীমের নাম জানিত না, এমন লোক

তখন ছিল না। মাতৃক্রোড়স্থ শিশু হইতে পলিত কেশ স্থবির পর্য্যন্ত, সকলেই রহীমের নাম শ্রবণে কম্পিত ও শঙ্কিত হইত। তখন এমন স্থান ছিল না, যথায় রহীম দৌরাত্ম্য করে নাই। মানবজীবন নাশ, লোকের সর্ব্বস্বাপহরণ প্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম রহীম সম্প্রদায়ের লোকেরা সতত অকাতরে করিত। তাহাদের উপদ্রব শান্তির নিমিত্ত রাজ-শাসন কম ছিল না। শাসন-কর্ত্তার এমন আজ্ঞা ছিল—যে ব্যক্তি রহীমের মস্তক দেখাইতে পারিবে সে তদ্দণ্ডে দশ সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক পাইবে। এই অর্থলোভে বিস্তর লোক রহীমকে ধরিবার নিমিত্ত চেষ্টিত ছিল, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। তাহার কারণ রহীম সম্প্রদায় অধিক কাল একস্থানে থাকিত না। সুতরাং কেহই তাহার সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিত না।

উমাপতি দুরাত্মা রহীমের নাম শ্রবণে শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি সেই প্রসিদ্ধ দুরাত্মা রহীমের কর-কবলিত হইয়াছেন, সুতরাং রক্ষা কোথায়? উমাপতি দস্যুদিগকে আরও দুই একটী কথা জিজ্ঞাসিবেন মনে করিয়া মস্তকোত্তোলন করিলেন, কিন্তু বুঝিলেন তাহারা ইতাবসারে দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

কারাগারের অবস্থা দর্শন করিবার নিমিত্ত তিনি একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিসঞ্চালন করিলেন। কিন্তু দারুণ অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলেন না। বুঝিলেন, তথায় বায়ু গমনাগমনের একটী ভিন্ন অপর পথ নাই। সে পথও দস্যুরা সতর্কতা সহকারে রুদ্ধ করিয়াছে ঘর্ম্মে তাঁহার শরীর প্লাবিত হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ মুখ বদ্ধ থাকার ক্লেশ, অপিচ বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব-জনিত যাতনায় তিনি জীবন্মৃত হইয়া উঠিলেন। বিধাতার নাম স্মরণ করিতে করিতে উমাপতি ভূতলশায়ী হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দস্যু-সমক্ষে।

"He is the rock ;—the oak, not to be windshaken"
—shakespeare (Coriolanus,)

অরণ্যস্থল ঊষা সমাগমে কি মনোহর শোভা ধারণ করিল! বহুশ্রমকাতর কলাধর পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়া বিশ্রাম লভিতে চলিলেন। পূর্ব্বাকাশের নিম্নভাগে সমুজ্জ্বল সহস্রকরধারী, কমলিনী-হৃদয়েশ স্বর্ণবর্ণ ধারণ করিয়া সমাগত হইলেন। নিশার শিশির-সিক্ত পত্রপুঞ্জে সেই আভা প্রদীপ্ত হইয়া, গভীর জলধিতলস্থ শুক্তি-হৃদয় সম্ভূত উজ্জ্বল মুক্তাস্তবের শোভাকে লজ্জা দিতে লাগিল। সরসী-শোভিনী সরোজিনী স্মিত বিকসিতাননে প্রাণেশ্বর প্রভাকরকে দেখিতে লাগিলেন। মন্দ মন্দ সুস্নিগ্ধ নিল হিল্লোলে, বৃক্ষ-প্রশাখা, বনবিভূষিণী লতিকা, বৃন্তসহ কমলিনী, সকলেই বিকম্পিতা হইতে লাগিল। বিহঙ্গেরা, কুলায়াশ্রয় ত্যাগ করিয়া সপ্ত স্বর নিনাদী কূজন করিতে করিতে, ব্যোম পথে উড্ডীয়ন হইল। সর্ব্বত্রই তেজ, উৎসাহ রমণীয়তা বিরাজমান। ঊষাসময়ের স্বভাব শোভা যে দর্শন করে নাই, তাহার চক্ষু বৃথা, তাহার জন্ম বৃথা। প্রকৃতির প্রকাণ্ড পুস্তকের প্রত্যেক পঙক্তিই পরম রমণীয়তায় পূর্ণ। বিশেষতঃ তাহার এই পরিচ্ছেদ অতীব আশ্চর্য্য।

ক্রমে বনভূমি প্রদীপ্ত হইল। দস্যুরা একে একে সুপ্তোত্থিত হইতে লাগিল। ক্রমে রৌদ্র উঠিল। রহীম একটী বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশন করিয়া অনুচরগণকে ডাকিল। তাহারা সকলে আসিয়া রহীমকে বেষ্টন করিল। তাহাদের সংখ্যা বিংশতির ন্যূন নহে। রহীম তখন সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিল.—

"ভাই সব, এখানে আর দেরি করিলে আমাদের বিপদ হইতে পারে। আমি বলি আজই আড্ডা উঠান যাক্। তোমরা-কি বল ?"

সকলে একবাক্যে কহিল,—"সেই ভাল,

তখন রহীম আবার কহিল,—একটা কাজ আছে। কাল রাত্রে যাকে ধরে আনা হয়েছে, তোমাদের সকলকে বলেছি সে আমার কত অপমান করেছে। তাকে কাটতে হবে। সে কাজ এখনই শেষ করা যাউক। তাকে নিয়ে এস।"

সকলেই ইহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিল; তিন ব্যক্তি বিনা বাক্যব্যয়ে উমাপতিকে আনিতে চলিল। কেবল একজন এ প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হইল না। সে ব্যক্তি নির্ব্বাক্ রহিল। রহীম তাহাকে লক্ষ্য করিল—তাহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া কহিল.—

"দেলবর! তুমি কি বল ? তোমার যেন আলাহিদা মত বোঝা যাচ্চে।"

দেলবর কহিল,—"সে কি কথা ? আপনার মতের উপর কি আমার মত ?"

রহীম কহিল,—"কেন দেলবর, আজ এ কথা কেন ? তুমি দলে এসে অবধি চিরকাল তোমার কথা একদিকে, আর সকলের কথা একদিকে।"

দেলবর সবিনয়ে কহিল,—"আমার প্রতি আপনার দয়া অসীম।"

রহীম। তোমার মুখ দেখে বোঝা যাচ্চে যেন তুমি আর কি ঠাহরিয়াছ; তা কি বল ?"

দস্যু সম্প্রদায় মধ্যে দেলবর বিশেষ বুদ্ধিমান বলিয়া পরিচিত; সুতরাং রহীম সকল সময়েই তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিত। এই জন্যই অদ্য দেলবরের সহিত বিশেষ পরামর্শ করিল।

অনতিবিলম্বে দস্যুরা উমাপতিকে তথায় উপস্থিত করিল। উমাপতির মূর্ত্তি গম্ভীর, শান্ত, অকাতর, মনোযোগশূন্য। তাঁহার বিপদের পরিমাণ বিবেচনায় তাঁহার মূর্ত্তি দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। তিনি যেন এ সকল কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিতেছেন না, কিছুতেই যেন তাঁহার লক্ষ্য নাই। তাঁহার বদনে যেন বিরক্তি ব্যক্ত হইতেছে। এরূপ বিপদে কাতর না হইয়া তিনি বিরক্ত হইতেছেন, ইহা আশ্চর্য্য। সাহস তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই, কিন্তু তিনি যে কি ভরসায় সাহসকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন, তাহা তিনিই বলিতে পারেন।

অবরুদ্ধ উমাপতি আসিবামাত্র সকলের দৃষ্টি তৎপ্রতি সঞ্চালিত হইল। তাঁহার কমনীয় নির্ভীক কান্তি দর্শনে দস্যুগণ চমৎকৃত হইল। উমাপতির ভয়হীন দৃষ্টি একে একে সকল দস্যুর উপর নিপতিত হইল। ক্রমে তাঁহার দৃষ্টি দেলবরের প্রতিও নিপতিত হইল। তিনি অনেকক্ষণ পরিচিতের ন্যায় তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। দেলবর তাহাতে সন্তুষ্ট হইল না, এজন্য উমাপতির প্রতি পশ্চাৎ ফিরিয়া, একটী বৃক্ষপত্র ছিন্ন করিতে লাগিল।

এই সময় রহীম তীব্রস্বরে কহিল,—"কাফের! কি ভাবিতেছ, দুর্গানাম জপ করিয়া লও। আর দেরি নাই।"

নির্ভীক উমাপতি অবিকৃত ভাবে উত্তর

লিলেন,—"দেবি নাই তাহা আমি জানি। তা বলিয়া কি করিব? তোমাদের নিকট আমি দয়া প্রার্থনা করিতেছি না। তোমাদের দয়ায় যাহার জীবন তাহার জীবনে ধিক্।"

রহীম কুপিত স্বরে কহিল,—"তুমি ত দয়া প্রার্থনা কর না, কিন্তু তোমাকে দয়া করে কে?"

উমা। তোমরা আমাকে মারিবে তাহা আমি জানি। আমি নিঃসহায়, দুর্ব্বল, সুতরাং পরিত্রাণের আশা নাই। কিন্তু তোমারও পরিত্রাণ নাই। রহীম, তুমি আমাকে মারিয়া জগতে পার পাইবে বটে, কিন্তু ঈশ্বরের নিকট এ অপরাধ ঢাকা থাকিবে না, তখন তো রক্ষা থাকিবে না।

এ কথায় রহীম "হা হা" শব্দে হাসিয়া উঠিল এবং ব্যঙ্গস্বরে কহিল,—"হিঁদুর আবার ঈশ্বর কি? তোমরা পাথর কাটিয়া পূজা কর; আমরা তাহার মাথায় দাঁড়াইয়া পা ধুই।"

উমাপতি বিরক্তির সহিত কহিলেন,—"তুমি মূর্খ! তোমার সহিত এ বিষয়ের তর্ক করা বৃথা। আমাদের ধর্ম্মই যদি মিথ্যা হয়, তোমাদেরও তো ধর্ম্ম আছে; তাহাতেও তো পাপ-পুণ্যের বিচার আছে।"

রহীম আবার হাসিয়া কহিল,—"কাফের! তোমাকে মারায় আমাদের পাপ নাই। আমাদের ধর্ম্মে বলে বিধর্ম্মী যত মারা যায় তত পুণ্য হয়,—তত্ই স্বর্গে সুখ বাড়ে।"

উমাপতি কহিলেন,—"তবে যে কার্য্যে সুখ স্বর্গ দুই লাভই হইবে, তাহাতে দেরি কেন?"

রহীম অনেক ক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল,—"দেখ কোন কারণে আজ তোমার প্রাণ থাকিল। কালি নিশ্চয় তোমার জীবন ফুরাইবে তোমার অদৃষ্টে আর এক দিন পৃথিবীতে বাস আছে। এই সময়ে তুমি ইষ্টমন্ত্র জপ কর।"

এই বলিয়া রহীম চরদিগকে পুনরায় উমাপতিকে সেই গৃহে বাঁধিয়া আসিতে আজ্ঞা করিল এবং এবার সাবধানতা সহকারে তাঁহার হস্ত-পদ বাঁধিতে বলিয়া দিল। চরেরা উমাপতিকে লইয়া গেল। রহীম ও দেলবর অনেক ক্ষণ সেইস্থানে বসিয়া ফুস্ ফুস্ শব্দে অনেক কথা কহিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভগ্ন-গৃহে।

"He is truly valiant that can wisely suffer
The worst that man can breathe."
—Shakespeare (Timon of Athens)

দস্যুরা উমাপতিকে পুনরায় গৃহমধ্যে বাঁধিয়া আনিল। তাঁহার হস্ত-পদ শৃঙ্খল দ্বারা বদ্ধ করিল এবং অতিশয় সতর্কতা সহকারে দ্বার রুদ্ধ করিল। উমাপতি এক্ষণে দেখিলেন যে, তাঁহার কারাগার একটী জীর্ণ দেবমন্দির। মন্দির মধ্যে একটী অত্যুন্নত লিঙ্গমূর্ত্তি শিব সংস্থাপিত। একটী দ্বার ভিন্ন তথায় আলোক অথবা অন্য কিছু যাইবার পথ নাই, সে দ্বারটীও দস্যুরা অতি সতর্কতা সহকারে রুদ্ধ করিয়াছে। মন্দির দারুণ অন্ধকার, নিতান্ত জীর্ণ এবং তথায় সর্ব্বদা জল উঠিতেছে বলিলেই হয়। উমাপতি দেবচরণোদ্দেশে প্রণাম করিলেন এবং ভক্তিভাবে কহিলেন,—

"ভগবন্! আপনার অদৃষ্টে এত কষ্ট! দিনান্তে একটী বিল্বদলও আপনার পূজার্থ প্রদত্ত হয় না,—তোমাদি তো দূরের কথা। দুরন্ত ম্লেচ্ছ-দস্যুরা হয়তো

সর্ব্বদা আপনার মন্দিরে প্রবেশ করিয়া পবিত্রতা ধ্বংস করিতেছে; দেব! আপনি অকাতরে তাহা সহ্য করিতেছেন। এ সকলই কালমাহাত্ম্য, আপনার দোষ নহে। ঘোর কলির শাসনে, দেবদেবী অবনী ত্যাগ করিয়া দিব্যলোকে বিশ্রাম করিতেছেন। এই লিঙ্গমূর্ত্তি প্রস্তর খণ্ডের সহিত আপনার আর অণুমাত্রও সম্পর্ক নাই। আপনি অনেক কাল ইহাকে ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু দেবাদিদেব! আপনিও সামান্য শঙ্কায় শঙ্কিত, ইহা অত্যন্ত শোচনীয় বিষয় সন্দেহ নাই। বসুন্ধরা পাপময়ী এবং পুণ্যভূমি যবনাকীর্ণা হইলেন দেখিয়া আপনারা সংসারের রক্ষণাবেক্ষণে ক্ষান্ত হইলেন। তবে প্রভো! আমাদের উপায় কি হইবে? আপনারা আমাদের ত্যাগ করিলে আমরা কাহার আশ্রয় লইব? ভগবন্! আমাদের তো নিস্তার নাই।"

কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন,—"আপনার উদ্দেশে এ সকল বাক্য বর্ষণ করায় ইষ্ট সম্ভাবনা অতি বিরল। অদৃষ্টে যাহা হইবে তাহা তো পূর্ব্ব হইতে স্থির নিশ্চিত রহিয়াছে;—এক্ষণে সহস্র রোদনেও আপনারা তাহার পরিবর্ত্তন করিবেন না।

"বিধাতৃ-বিহিতং মার্গং ন কশ্চিদতিবর্ত্ততে।"

"তবে আর কেন? অনর্থক দিবারাত্র রোদনেও পরিণাম পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা নাই। কলিকালে মনুষ্যের মুক্তির নিমিত্ত যে উপায় বিহিত হইয়াছে, তাহাই হইবে। তদধিক কোন ক্রমেই ঘটিবে না। সুতরাং স্থির থাকাই শ্রেয়ঃ।"

ক্রমে মধ্যাহ্নকাল সমুপস্থিত। প্রচণ্ড সূর্য্যতাপে বাহিরে যে কি কাণ্ড হইতেছে, উমাপতি তাহা জানিতে পারিতেছেন না। সময়ে সময়ে কোন মনুষ্যের কণ্ঠস্বর অথবা হাস্যধ্বনি তাঁহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিতেছে। সহকার শাখা মধ্যস্থ ছায়াসেবনকারী দাঁড়কাক সময়ে সময়ে গম্ভীর ও অনুচ্চ স্বরে একবার ডাকিতেছে; সে স্বরও উমাপতির কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। মন্দিরের ভিত্তি-গাত্রে দুইটী টিক্‌টিকী পরস্পর সম্মুখীন হইয়া সহসা একটা অপরের প্রতি ধাবমান হইল; উভয়ে ছুটিতে লাগিল। উভয়ে নিকটবর্ত্তী হইলে আক্রমণকারী প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি মুখ ফিরাইয়া পুচ্ছ বক্র করত এককালে টক্ টক্ করিয়া শব্দ করিল। শব্দ উমাপতির শ্রবণে প্রবেশ করিল। কিন্তু এ সকল কিছুই হৃদয়ে প্রবেশ করিল না। কেন? উমাপতি এত অন্যমনস্ক কেন? ইহার একই উত্তর—নিদারুণ চিন্তা। মৃত্যুর ভীষণ ব্যাদিত বদন মস্তকোপরি সন্দর্শন করিয়া কে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব এবং স্বদেশবর্জ্জিত হইয়া এই দুরন্ত পাপাচারী দস্যুগণের হস্তে অজ্ঞাত অরণ্যে মৃত্যু হইবে, তাহা হইতে নিস্তারাশা দুরাশা, ইহা মনে হইলে কাহার হৃদয় না শুষ্ক হয়? কে চিন্তাহীন হইয়া থাকিতে পারে?

উমাপতি সেই নির্জ্জন কারাবাসে বসিয়া স্বীয় অদৃষ্ট চিন্তা করিতে লাগিলেন,—কল্য প্রত্যূষে মৃত্যু অব্যর্থ তাহা ভাবিতে লাগিলেন। সে সময়ের কত বিলম্ব? তজ্জন্য তিনি চিন্তিত হইলেন। উন্মনা হইয়া সেই সময় সমাগমের প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন,—"আর কেন? মৃত্যুর কঠিন আক্রমণ হইতে যখন কোন ক্রমেই নিস্তার নাই, তখন আর বিলম্বে কাজ কি? যত শীঘ্র হয় ততই ভাল। এ অবস্থা নিতান্ত ক্লেশকর, ইহা অপেক্ষা মৃত্যু অবশ্য শ্রেয়ঃ।" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। স্থবিরা, স্নেহময়ী রোরুদ্যমানা জননীর মূর্ত্তি তাঁহার স্মৃতি-পটে

সমাগত হইল। তাঁহার হৃদয় দারুণ ব্যথিত হইল। তিনি নিতান্ত অস্থির হইলেন। উমাপতি স্বীয় জীবনের নিমিত্ত তাদৃশ কুণ্ঠিত নহেন। তাহা হইলে যৎকালে দুরাত্মা রহীম মৃত্যু-আজ্ঞা প্রচার করিয়াছে, সেই সময় হইতে অচেতন থাকিতেন। তিনি এতক্ষণ অপ্রতিবিধেয় মৃত্যুর নিমিত্ত কাতর হন নাই। যাহা হইবেই হইবে, কিছুতেই যাহার পরিবর্ত্তন হইবে না, তজ্জন্য অনর্থক কাতরতা প্রকাশ করেন নাই। অধুনা জননীর কথা মনে হওয়ায় অপেক্ষাকৃত কাতর হইলেন। তাঁহার জননীর তিনি ভিন্ন আর সন্তানাদি নাই, আবার তাহাতে তাঁহার বার্দ্ধক্যাবস্থা। এরূপ সময়ে সেই একমাত্র তনয়চ্যুত হইলে তাঁহার যে ভয়ানক ক্লেশ জন্মিবে, উমাপতি তাই ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার মৃত্যু সংবাদে জননীর কি ভয়ানক অবস্থা ঘটিবে, উমাপতি কল্পনা চক্ষে তাহা পরিস্ফুটরূপে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় জ্বলিতে লাগিল। চক্ষু দিয়া দরবিগলিত ধারায় অশ্রু নিঃসৃত হইতে লাগিল। কতক্ষণ পরে উমাপতি—"বিধাতঃ! সকলই তোমার ইচ্ছা" বলিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ভাবনার প্রকৃতি এই যে, তাহার বিরাম থাকে না। একটি গুরুতর ভাবনার কারণ হইলে, সেই সঙ্গে তেমনই আর একশতটি আসিয়া জুটে। অলক্ষ্যভাবে উমাপতির হৃদয়কন্দরে মুক্তকেশীর মূর্ত্তি আবির্ভূত হইল। এই মূর্ত্তি স্মৃতিরাজ্যে সমুদিত হইবামাত্র উমাপতি বিকলিত চিত্ত হইয়া উঠিলেন। প্রণয়-রত্ন অমূল্য। যাঁহারা প্রণয়ী তাঁহারা জানেন—প্রণয় পার্থিব পদার্থ নহে, ইহা স্বর্গীয় সামগ্রী। এ রত্নের কত মূল্য তাঁহারাই বলিতে সক্ষম। উমাপতির মস্তকোপরি উর্দ্ধদণ্ডে তীক্ষ্ণধার তরবারি ঝুলিতেছে; অদ্যকার নিশাবসানে তাঁহার শরীর দ্বিধা বিভক্ত করিবে;—তথাপি এ অবস্থায় মুক্তাকেশীর চিন্তায় তাঁহার চিত্ত আচ্ছন্ন হইল। মুক্তকেশী সম্বন্ধীয় কত চিন্তা তাঁহার হৃদয়কে ব্যথিত করিতে লাগিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। যে মুক্তার মুখকমল তাঁহাকে আনন্দরসে ভাসাইত, অদ্য সেই মুক্তার মুখ মনে পড়িয়া তাঁহাকে যাতনা দিতে লাগিল। উমাপতি মুক্তার প্রেমের পরিমাণ কল্পনা করিতে লাগিলেন। বুঝিলেন তাহা অসীম। যে মুক্তার প্রণয় এত পবিত্র, এত অধিক, চিরকালের নিমিত্ত তাঁহার সহিত বিরহ হইলে সেই মুক্তার কি ভয়ানক কষ্ট হইবে, ইহা ভাবিয়া তিনি আরও ব্যাকুল হইলেন। কল্য স্বীয় জীবিত দেহ মৃতের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে, ইহা ভাবিয়া তিনি যে পরিমাণ কাতর হইয়াছিলেন—তাঁহার বিহনে মুক্তার কত কষ্ট হইবে, এ চিন্তায় তদপেক্ষা বিস্তর ক্লিষ্ট হইলেন। এই সময় ভাবনা-প্রবাহ অবলম্বন করিয়া প্রিয় বয়স্য নবকুমার উমাপতির চিত্তসাগরে প্রবেশ করিলেন। যদি যথাসর্ব্বস্ব দিলে একবার,—জন্মের শোধ একবার, নবকুমারের সহিত দেখা হইবার সম্ভাবনা থাকে, উমাপতি তাহাতেও প্রস্তুত। কিন্তু তিনি তাঁহার মাতা বা মুক্তকেশী কাহার সহিত দেখা করিতে ইচ্ছুক নহেন। কারণ তাঁহারা অবলা। তাঁহাদের হৃদয় সমুন্নত হইলেও তাহা কখনই তাঁহার অথবা নবকুমারের হৃদয়ের সমান নহে। বিপদসমাগমে যে সম্ভাবনায় সকল রমণী শোকবিহ্বলা হয়, এতাদৃশ দুরপনেয় বিপদ সমুপস্থিত সন্দর্শনে তাঁহাদের অন্তঃকরণে কি তীব্র যাতনাই জন্মিতে পারে।

ক্রমে রজনী বিশ্বসংসারকে আবরণ করিল। উমাপতি তাহা জানিতে পারিলেন না, তাঁহার

সে সকল দিকে লক্ষ্য নাই। লক্ষ্য থাকিলেও তিনি যে গৃহে বদ্ধ আছেন, তথায় দিবা রাত্রি সমান। বিশেষতঃ তিনি চিন্তায় মগ্ন। দেখিতে দেখিতে রাত্রি ক্রমশঃ বৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইল। উমাপতি চিন্তায় ক্লান্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, এ আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে নিস্তারের কোন উপায় নাই, অতএব যতক্ষণ জীবিত থাকা যাইবে, ততক্ষণ অবিশ্রান্ত চিন্তানল হৃদয়কে দহন করিবে। তাহা অসহ্য; সুতরাং যত শীঘ্র মৃত্যু হয় তাহাই মঙ্গল। এই বিবেচনায় উমাপতি মৃত্যুকে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত আহ্বান করিতে লাগিলেন। বাতুল! মৃত্যু কি তোমার আজ্ঞাধীন? তুমি যখন তাহাকে আহ্বান করিবে, তখন তোমার সমক্ষে উপস্থিত হইবে এবং যখন তাহাকে নিষেধ করিবে তখন প্রত্যাবর্ত্তন করিবে? উমাপতি একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন; চিন্তা তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। মৃত্যু আসিল না দেখিয়া হতাশ্বাস হইলেন। অনন্যোপায় হইয়া অবিরত উষা সমাগম প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অদ্য সকলই তাঁহার বিপক্ষ। দুঃখের দিন স্বভাবতঃ কিছু বড় বোধ হয়। উমাপতি উষার নিমিত্ত এত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, তথাপি উষা আসিল না। তাঁহার পক্ষে সে রাত্রি যেন অনন্ত বোধ হইতে লাগিল। ফলতঃ রাত্রি অদ্যও যাহা, কল্যও তাহা; —উমাপতিকে ক্লেশ দিবার নিমিত্ত সে রাত্রি কখনই সংবর্দ্ধিতা হয় নাই। তাঁহার হৃদয় দুঃখ-দণ্ডে মথিত হইতেছে, এই জন্য যেন সে রাত্রির শেষ নাই, বোধ হইতেছে। আবার একজন সুখ-সাগর সন্তরণকারীর নিকট সেই রাত্রিই হয় তো ক্ষণস্থায়ী বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। সংসারের এই গতি। যখন যে, যে অবস্থায় থাকে, সমস্ত পার্থিব পদার্থ—কি ভৌতিক, কি মানুষী সকলেই একবাক্য হইয়া তাহার সেই অবস্থার প্রতিপোষণ করে। উমাপতির পক্ষেও তাহাই ঘটিতেছে।

এই সময়ে ধীরে ধীরে মন্দিরের দ্বার উন্মোচিত হইল। উমাপতি ব্যস্ত হইয়া সে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন—মুক্ত পথ দিয়া একটী মনুষ্য মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিল। তিনি তাহাকে সোৎসুকে কহিলেন;—

"কি ভোর হইয়াছে? আঃ! আমাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছ? ধরিতে হইবে না। চল আপনিই যাইতেছি।"

প্রবেশকারী উমাপতির সন্নিহিত হইয়া মৃদুস্বরে কহিল,—"চুপ কর। ভয় নাই। আমি তোমাকে ধরিতে আসি নাই। তুমি আমার সঙ্গে এস।"

উমাপতি ব্যগ্র হইয়া কহিলেন,—"কোথায় যাইব?"

আগন্তুক কহিল,—"যেখানে আমি বলি, তাহাতে তোমার অনিষ্ট হইবে না।"

উমা। আমার যে অনিষ্ট হইতেছে, তদপেক্ষা অধিক অনিষ্ট অসম্ভব। আমি সে শঙ্কায় শঙ্কিত নহি।

প্রবে। ভাল। আমার সঙ্গে এস,আমি তোমাকে মুক্ত করিব।

উমাপতি বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন ইহা চাতুরী। আবার ভাবিলেন, আমি ইহাদের সম্পূর্ণ ক্ষমতাধীন,—আমার সহিত চাতুরীর প্রয়োজন? তবে এ ব্যক্তির সহিত যাওয়ায় হানি কি? আর কিছু হউক না হউক, আপাততঃ এই বায়ুবিহীন মন্দির হইতে তো বাহির হইব। এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন,—"চল।"

প্রবেশকারী অগ্রসর হইল। উমাপতি তাহার অনুসরণ করিলেন। এ ব্যক্তি দেলবর। যে উমাপতির জীবন রক্ষা করিবে সংকল্প করিয়াছিল, এজন্যই রহীমের কাণে কাণে যাহাতে বন্দীর কল্য মৃত্যু হয়, তদ্বিষয়ক মন্ত্রণা দিয়াছিল। বন্দীকে মুক্ত করায় তাহার কি ইষ্ট তাহা আমরা এক্ষণে বলিতে পারি না।

উমাপতি ও দেলবর অবিশ্রান্ত ভাবে বনভূমি অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ চলিয়া শ্রান্ত হইয়া উঠিলেন। বিশ্রাম লাভের নিমিত্ত এক স্থানে উপবেশন করিলেন। এই সময় প্রাতঃসূর্য্য পূর্ব্বাকাশে দর্শন দিলেন।

দেলবর কহিল,—

"চল তোমাকে বনের পথ ছাড়াইয়া দিয়া আসি।"

উভয়ে আবার চলিলেন। বেলা প্রায় এক প্রহরের সময় তাঁহারা বন অতিক্রম করিয়া একটী প্রান্তরে পতিত হইলেন; প্রান্তরের অপর পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম দৃষ্ট হইল। উমাপতি আহ্লাদে কহিলেন,—

"সম্মুখের ঐ গ্রাম গোপালপুর। ঐ স্থানে আমার মাতুলালয়। আঃ!!!"

দেলবর নিশ্চিন্ত ভাবে কহিল,—"হাঁ ঐ গ্রাম গোপালপুর বটে। এক্ষণে তুমি যাইতে পারিবে। আমি বিদায় হই।"

উমাপতি সকৃতজ্ঞ স্বরে কহিল,—"তুমি—অ্যাঁ আপনি এখন কোথায় যাইবেন?"

দেল। আমি পুনরায় দলে যাইব।

উমা। আপনার ন্যায় সৎ মনুষ্য দস্যুদলে না থাকিলেই ভাল হয়।

দেলবর ঈষৎ হাসির সহিত কহিল,—"তাহা হইলে তুমি সন্তুষ্ট হও।"

উমা। অতিশয় সন্তুষ্ট হই।

দেল। আচ্ছা তাহাই হইবে; আমি আর দস্যুদলে যাইব না।

উমা। তবে এখন কোথায় যাইবেন?

দেল। অন্য স্থানে—প্রয়োজন আছে।

উমা। দুই দিন পরে গেলে হয় না?

দেল। কেন?

উমা। সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রাণরক্ষককে সকলের নিকট দেখাইতাম।

দেল। সে আশা পূর্ণ হইবে।

উমা। কিরূপে?

দেল। আবার দেখা হইবে।

উমা। কোথায়?

দেল। তোমার বাটীতে।

উমা। আমার বাটী আপনি জানেন?

দেল। জানি।

উমা। কবে দেখা হইবে?

দেল। অতি শীঘ্র।

উমাপতির মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল! তিনি কহিলেন,—আপাততঃ আমার জীবন রক্ষকের নামটীও কি শুনিতে বঞ্চিত থাকিব?"

"আমার নাম? আমার নাম শুনিবে? অবশ্য তাহা শুনিতে পাইবে। কেন পাইবে না? আমার নাম দেলবর।"

এই বলিয়া দেলবর আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া কহিলেন,—"তুমি নির্ভয়ে যাও। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। শীঘ্রই সাক্ষাৎ হইবে।" এই কথা বলিতে বলিতে দেলবর অরণ্যান্তরে অদৃশ্য হইলেন। উমাপতি কতক্ষণ সে দিকে লক্ষ্য করিয়া থাকিলেন; আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। অগত্যা দ্রুত-পদে গোপালপুরের উদ্দেশে চলিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রণয়িনী-সমক্ষে।

"অরে আশা আর কি রে হবি ফলবতী ?
আর কি পাইব তারে, সদা প্রাণ চাহে যারে,
পতিহারা রতি কি লো পাবে রতিপতি ?"
—মাইকেল মধুসূদন দত্ত। (ব্রজাঙ্গনা কাব্য)

হরিহর পুনরায় উমাপতিকে পাইয়া যেরূপ আনন্দিত হইলেন তাহা বর্ণনাতীত। উমাপতি তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা জ্ঞাত করিলেন। তিনি সমস্ত শুনিয়া অদ্যই উমাপতিকে বাটী যাইতে আজ্ঞা দিলেন; যাইবার সময় একবার ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতে বলিলেন। মাতুল ভাগিনেয় একত্র বসিয়া আহার করিলেন। আহারান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর উমাপতি মাতুলচরণে প্রণত হইয়া বিদায় হইলেন।

পাঠক! উমাপতি যাইবার পূর্ব্বে, চলুন আমরা একবার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীর অবস্থা দেখিয়া আসি। বেলা পড়িয়াছে। গৃহিণী অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়া আছেন। উমাপতি সেই দিন প্রাতে আসিয়াছেন, তাহা এপর্য্যন্ত তাঁহার কর্ণগোচর হয় নাই। বড়ই চিন্তিত। উমাপতির নিরুদ্দেশ তাঁহার চিন্তার কারণ।

মুক্তকেশী কোথায়? ঐ প্রকোষ্ঠে মলিনা, অধোমুখী, বিষণ্ণা মুক্তকেশী বসিয়া কি ভাবিতেছেন। যৌবনোন্মুখী বালিকা-হৃদয়-সম্ভূত প্রণয় কি আশ্চর্য্য সামগ্রী! যে দিনে, যে দণ্ডে বালিকা প্রণয়কে হৃদয়ে স্থানদান করেন, সেই দিন, সেই দণ্ড হইতেই সংসার তাঁহার চক্ষে নূতনরূপে চিত্রিত হয়। তাঁহার হৃদয় আনন্দে ভাসে। সমস্ত পদার্থেই তিনি নূতন নূতন আমোদ লক্ষ্য করিতে থাকেন। বালিকার চক্ষে সেই দিন হইতে সংসার অবিশ্রান্ত আমোদের স্থল বলিয়া বোধ হয়। মুক্তকেশী সেই প্রণয়-সাগরে পড়িয়াছেন। তিনি মনে মনে উমাপতিকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। লজ্জাশীলা বালিকা মনের এই দুর্দ্দমনীয় ভাব গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। ভাবিতেন হয়তো তাঁহার আশা ফলবতী হইবে না। কিন্তু বিধাতা তাঁহার প্রতি মুখ তুলিয়া তাকাইলেন। উমাপতির সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে স্থির হইল। মুক্তার সুখের সীমা রহিল না। তাঁহার দেহের লাবণ্য আরও বর্দ্ধিত হইল। সুখ-সৌধের যতদূর উপরে উঠা যায় তিনি ততদূর উপরে উঠিলেন। কিন্তু বিধাতা আবার তাঁহার প্রতি বিমুখ হইলেন। তাঁহার হৃদয় যখন আনন্দে উচ্ছলিত হইয়া রহিয়াছে, তখন সহসা উমাপতির নিরুদ্দেশ সংবাদ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সুখ-সৌধ ভগ্ন হইয়া গেল। সুখ-সমুদ্র-বিহারিণী বালিকা সহসা বিষাদ-সাগরে নিপতিত হইলেন। আশা, ভরসা সকলই শিথিলমূল হইল। আবার শুনিলেন যে, উমাপতি সপ্তগ্রামেও যান নাই, তখন তিনি পাগলিনী প্রায় হইয়া উঠিলেন। মনোবেগ যতদূর পারেন গোপন করিতে চেষ্টা করিলেন; লোকে তাঁহার তদ্বিধ ভাব দেখিলে কি মনে করিবে, মাতা জানিতে পারিলে লজ্জাহীনা মনে করিবেন, এই আশঙ্কায় মুক্তকেশী মনের ক্লেশ যথাসাধ্য চাপিয়া রাখিতেন। লোকের সমক্ষে, তাঁহার হৃদয়ে যেন কোন চিন্তাই নাই, এইরূপ ভাণ করিতেন। কিন্তু এক্ষণে তিনি একান্তে উপবিষ্টা হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার সে আশঙ্কায় কোন কারণ নাই। সমুচিত সময়

পাইয়া চিন্তা তাঁহাকে অব্যাঘাতে গ্রাস করিয়াছে। সেই জন্য এক্ষণে মুক্তকেশী এত বিমর্ষ। ভাবনায় যেন তাঁহার মুখখানি ছোট দেখাইতেছে।

এইরূপ সময়ে উমাপতি সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। অবনতমুখী মুক্তকেশী চিন্তায় মগ্ন—তিনি তাহা জানিতেও পারিলেন না। তিনি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—

"প্রাণেশ্বর উমাপতি! তুমি কোথায়? তুমি যেখানে থাক, সুখে থাক, নিরাপদে থাক। দাসীর অদৃষ্টে বিধাতা যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইবে।" এই বলিয়া মুক্তকেশী বদনোত্তোলন করিলেন। যেমন বদনোত্তোলন করিলেন অমনই তাঁহার মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। তথায় আহ্লাদের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইল। তিনি দেখিলেন, সম্মুখে তাঁহার হৃদয়েশ উমাপতি দণ্ডায়মান। তৃষিতা চাতকিনী বারিধারা পাইল। মুক্তকেশীর নির্জ্জীব দেহে জীবনের সঞ্চার হইল। উমাপতি বলিলেন;—

"মুক্তকেশি! তোমার কথা আমি শুনিয়াছি। আমি এতদিন অন্ধকারে ছিলাম। ভাবিতাম, হয় তো তুমি আমাকে ভাল বাস না। অদ্য সে সন্দেহ তিরোহিত হইল। মুক্তকেশি! আমি কি সুখী। তুমি যাহার সুখদুঃখের নিমিত্ত চিন্তিত, তাহারই সার্থক জন্ম। তুমি আর চিন্তা করিও না, আমি তোমারই।"

স্মিতবিকসিতাননা মুক্তকেশী ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসিলেম,—"তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?"

উমাপতি অতি সংক্ষেপে উত্তর জ্ঞাপন করিলেন।

মুক্ত। মার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে।

উমা। হইয়াছে।

মুক্ত। তিনি আমাদের উভয়কে এক স্থানে জানিয়া কি মনে করিতেছেন?

উমা। প্রিয়ে! দুই দিন পরে যাঁহার সহিত কথা না কহিলে লোকে দূষিবে, দুইদিন পূর্ব্বে তাহার সহিত বাক্যালাপে দোষ কি? সে যাহা হউক, আমি অদ্য বাটী যাইতেছি; তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আবার শীঘ্র আসিব।

এই বলিয়া উমাপতি বাহিরে গেলেন এবং ব্রাহ্মণীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ব্যস্ততা সহ প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পরিচয়ে।

"দৈবে যাহা করে তাহা কে খণ্ডিতে পারে"।
—কাশীরাম দাস (মহাভারত)

পরদিন বৈকালে নবকুমার ও উমাপতি বাটীর মধ্যে বসিয়া উমাপতির মাতার সহিত কথোপকথন করিতেছেন। পাঠক মহাশয় জ্ঞাত আছেন, পূর্ব্ব খণ্ডের উপসংহার কালে নবকুমারকে কে আহ্বান করিয়াছিল। সে আহ্বানকারী উমাপতি। উমাপতি রাত্রে বাটী আসিয়া মাতার নিকট জ্ঞাত হইয়াছেন যে, অদ্য নিশাবসানে নবকুমার তাঁহার সন্ধানে যাইবেন; এজন্য উমাপতি তৎক্ষণাৎ নবকুমারকে সংবাদ দিতে গমন করেন। অধুনা তাঁহারা একত্র বসিয়া কত কথা কহিতেছেন, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, কোন ব্যক্তি তাঁহাদের সহিত সাক্ষাতের নিমিত্ত বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন। উভয়ে

বাহিরে আসিলেন। উমাপতি দেখিলেন সম্মুখে দেলবর। তিনি তাঁহাকে দেখিবামাত্র সানন্দে প্রত্যুত্থানে অভিবাদন করিয়া কহিলেন,—"নবকুমার! ইনিই আমার প্রাণরক্ষক; ইহারই নাম দেলবর!"

নবকুমার দেলবরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"মহাশয় যে আমাদের কি পর্য্যন্ত উপকার করিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমরা আপনার নাম চিরদিন ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় ধ্যান করিব।"

দেলবর কহিল,—"সে কথা বলিবেন না। আমি যাহা করিয়াছি তাহা উপকার বলিয়াই গণ্য হইতে পারে না। রক্তমাংসের শরীর ধরিয়া কে তাহা না করিয়া থাকিতে পারে?"

উমাপতি নবকুমারকে দেখাইয়া দেলবরকে কহিলেন,—"মহাশয়! ইঁহাকে জানেন না। ইনি আমার বিশেষ শুভানুধ্যায়ী বন্ধু। ইঁহার নাম নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।"

দেলবর অনেকক্ষণ চিন্তিতের ন্যায় থাকিয়া কহিলেন,—"মহাশয় কখন মেদিনীপুরে গিয়াছিলেন কি?"

নব। অনেক দিন হইল হিজলী হইতে বাটী আসিবার পথে এক রাত্রি মেদিনীপুর চটিতে ছিলাম। কেন বলুন দেখি?

দেল। তখন আপনার সঙ্গে একটী স্ত্রীলোক ছিলেন? বোধ হয় তিনি আপনার স্ত্রী হইবেন।

নব। হাঁ। সে সব আপনি জানিলেন কিরূপে!

দেল। সে অনেক কথা; বলিতেছি শুনুন। মহাশয় অতি ভদ্র ব্যক্তি। আপনার স্ত্রীর চরিত্র আরও প্রশংসনীয়। সেই দিন সন্ধ্যার সময় একখানি পাল্কি যায়; তাহাতে আপনার স্ত্রী ছিলেন, কেমন? আমরা সদলে সেইখানে ছিলাম। দস্যুরা সকলে সে পাল্কি মারিবার উপক্রম করিল। আমি বলিলাম, তোমরা কেন এ পাল্কি মারিবে? দেখিতে পাইতেছ না, উহার সঙ্গে কিছু নাই। বিনা-লাভে মারিয়া কি হইবে? দস্যুরা আমার উপর রাগ করিল। তাহারা কহিল, "তুমি পগেম্বর, তাই উহার নিকট কিছু নাই জানিতে পারিলে? এই বলিয়া সকলে পাল্কি মারিতে উঠিবে, এমন সময়ে আর একখানি বেশ জাঁকজমকের পাল্কি আসিল। এ পাল্কিতেও একটী স্ত্রীলোক কবাট মুক্ত করিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহার সমুজ্জ্বল পরিচ্ছদাদি দেখিয়া দস্যুরা স্থির থাকিতে পারিল না; কাহারই বা সাধ্য তখন নিষেধ করে? তাহারা বিনা বাক্যব্যয়ে সে পাল্কি আক্রমণ করিল এবং পাল্কিতে যাহা কিছু ছিল তাহা গ্রহণ করিল। রমণীকে প্রাণে মারিল না। কিন্তু দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখিল।

নব। (আশ্চর্য্যভাবে) ঠিক কথা। তাহারই ক্ষণপরে আমি তথায় উপস্থিত হই।

দেল। আজ্ঞা হাঁ। আমি আপনার কণ্ঠস্বরে অত্র চিনিতেছি। আপনার স্ত্রীর নাম বুঝি কপালকুণ্ডলা?

নব। হাঁ।

উমা। সে কি রহীমের দল?

দেল। রহীমের দল নয় তো কি? রহীমের দল সর্ব্বব্যাপী। আজ কাল তাহাদের বিরুদ্ধে যেরূপ কঠিন রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে, তখন এত ছিল না; যাহা হউক আরও শুনুন। তার পরদিন প্রাতে পথে আবার কপালকুণ্ডলার পাল্কি দেখা গেল। তখন আপনারা বাটি আসিতেছিলেন। রহীম হুকুম দিল,—"পাল্কি মার।" তখন আপনার

স্ত্রীর হাতে দুই একখানি অলঙ্কার ছিল আমি বলিলাম, যাহা কিছু আছে তাহা যদি আনিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে মারিবার প্রয়োজন কি? তাহারা বলিল, "তাহা যদি পার, তবে মারিব না।" এই কথা শুনিয়া, আমি অতি দরিদ্র ভিক্ষুক সাজিলাম এবং পাল্কির নিকটস্থ হইয়া তাঁহার নিকট কিছু ভিক্ষা চাহিলাম। তিনি কহিলেন "আমার তো কিছুই নাই।" আমি তাঁহার হাতের গহনা দেখাইলাম। উমাপতি শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে, একটি হাতির দাঁতের বাক্সে বহুমূল্য নানাবিধ জড়াও গহনা ছিল; সেগুলি সমস্ত এবং হাতের বালা দুগাছি পর্য্যন্ত খুলিয়া সানন্দে আমাকে দান করিলেন। আমি অবাক্ হইলাম। পরে এক দৌড়ে পলাইয়া আসিলাম। দস্যুরা আমার উপর বড় খুসী হইল। রহীম কহিল, "এ সকল অলঙ্কার দেলবর পাইবে।" কেহ তাহাতে আপত্তি করিল না। সেই দিন হইতে দলে আমার বড় মান বাড়িল। রহীম আমাকে বরাবর ভাল বাসিত—সেই দিন হইতে আমার মন্ত্রণা না লইয়া কোন কাজ করিত না। দস্যুরা বলিত, দেলবর কি জানে! সে যাহা হউক, মহাশয়ের স্ত্রী এখন এ সব কথা শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন। তিনি ভাল আছেন ত?

নবকুমার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—তাঁহার পরলোক হইয়াছে।"

দেলবর মনস্তাপব্যঞ্জক স্বরে কহিল,—"তাঁহার পরলোক হইয়াছে? যদি কখন পুনরায় তাঁহার সাক্ষাৎ পাই, তবে সে গহনাগুলি প্রত্যর্পণ করিব বলিয়া আমি সযত্নে রাখিয়াছিলাম।"

উমাপতি অনেকক্ষণ অবধি এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে দেলবরের মুখের প্রতি তাকাইয়া ছিলেন। দেলবর তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল,—"কি দেখিতেছ?"

উমা। আমার বোধ হইতেছে যেন ইতিপূর্ব্বে মহাশয়ের সহিত পরিচয় ছিল। দাড়ি প্রভৃতিতে আপনি বেশান্তর করিয়াছেন, তথাপি যেন বোধ হইতেছে আপনাকে জানি।

দেলবর একটু হাস্য করিলেন। নবকুমার কহিলেন,—"মহাশয়ের নিকট আমরা অনেক ঋণে বদ্ধ। যাহা হউক, আপনি এরূপ উদার ও সাধুপ্রকৃতির মনুষ্য হইয়া কিরূপে দস্যুদলে মিলিয়াছেন, ইহা বুঝিয়া উঠা ভার।"

উমা। আমার বোধ হয় উনি কখন দস্যু নহেন।

দেল। (হাসিয়া) তবে কি?

উমা। আপনি ভদ্র ব্যক্তি। কি উদ্দেশে দস্যুদলে আছেন তাহা বলিতে পারি না।

নব। মহাশয় জাতিতে কি মুসলমান? আপনার কথার প্রণালীতে তাহা বোধ হয় না।

দেল। আজ্ঞা আমি মুসলমান নহি। আমি হিন্দু ব্রাহ্মণ।

নব। ব্রাহ্মণ! মুসলমান দস্যুদলে অবস্থান?

উমা। মহাশয় তবে আপনার নাম দেলবর নহে, আপনার প্রকৃত নাম কি, বলিতে হইবে। আমি আপনাকে চিনিয়াছি বোধ হইতেছে। কণ্ঠস্বর আমার বেশ পরিচিত। নাম না বলিলেও আমি—

দেলবর সাশ্রুনয়নে উমাপতির কথায় বাধা দিয়া কহিলেন,—"উমাপতি, যদি বুঝিয়া থাক, তবে আর গোপন করিবার চেষ্টা করিব না। কিন্তু সাবধান! যেন কদাপি এ কথা প্রকাশ না হয়। মহাশয়! আমার নাম গোপালকৃষ্ণ রায়। আমি উমাপতির ভ্রাতা। এ কথা এত

নীত্র প্রকাশ করিতাম না। কিন্তু যখন উমাপতির মনে সন্দেহ জন্মিয়াছে তখন সমস্ত কথা বলিয়া সাবধান না করিলে বিশেষ বিপদ সম্ভাবিত।"

উমাপতির চক্ষু দিয়া দরদরিত ধারায় আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল। গোপাল তাঁহার পৃষ্ঠে হাত দিলেন এবং পরক্ষণেই হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,—"ভাই! আর কখন যে এমন দিন হইবে, তাহা ভাবি নাই। কিন্তু ভাই এখন স্থির হও। আমি এখন নির্ব্বিঘ্ন হইতে পারি নাই। চক্ষুর জল মুছ। কেহ কিছু বুঝিতে বা জানিতে না পারে। তাহা হইলে আমাকে আর পাইবে না।"

উমাপতি তাড়াতাড়ি চক্ষু পরিষ্কার করিলেন। তখন গোপাল আবার কহিলেন,—"শুন, আমি আমূল সমস্ত বিবরণ বলিতেছি। শুনিলে জানিবে, কেন এত সাবধান হইতে বলিতেছি। দেখ, কেহ কোন দিকে নাই তো? মহাশয় শুনুন। আমি যে সময়ে নিরুদ্দেশ হই, তাহা জানেন; কিন্তু কিরূপে হই, তাহা জানেন না। আমি সেই স্থান হইতে বলিতেছি। আমি বিশেষ প্রয়োজনে গ্রামান্তর যাইতেছিলাম। নৌকায় পথ। একটি গ্রামের নিকট রাত্রে নৌকা ছিল; আমি প্রাতঃকৃত্য সমাপনার্থ তীরে উঠিলাম। তীরে বড় বন। বন এত গায় গায় যে, তাহার অভ্যন্তরে কি আছে, জানিবার উপায় নাই। আমি যখন বনের পার্শ্বে, তখন বনের মধ্য হইতে মনুষ্যের অস্ফুটধ্বনি আমার কর্ণে আসিল। এই নিবিড়বনে এ সময়ে কে কেমন করিয়া আসিল এবং কি কথা কহিতেছে জানিতে আর বড় কৌতূহল হইল। আমি অপেক্ষাকৃত নিকটস্থ হইয়া শুনিতে লাগিলাম। যাহা শুনিলাম, তাহাতে আমার জ্ঞান চৈতন্য লোপ হইল। সে অনেক কথা; তাহার মর্ম্ম এই যে—কল্য রজনীতে দস্যুরা নিকটস্থ কোন ধনীর সর্ব্বস্বান্ত করিয়া, তাঁহাকে ও তাঁহার স্ত্রীকে জলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ করিয়াছে এবং তাঁহার অপোগণ্ড সন্তানকে ভূমিতে আঘাত করিয়া হত্যা করিয়াছে। এই সম্বন্ধে স্ব স্ব বীরত্ব ও পৌরুষের কথা ব্যক্ত করিয়া, তাহারা অহ্লাদ আমোদ করিতেছে। আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল; বুঝিলাম ইহারা দুরন্ত দস্যু-সম্প্রদায়। আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তথায় বসিয়া ভাবিতেছি ও অবশিষ্ট কথা শুনিতেছি, এমন সময় একজন ভীমাকৃতি দস্যু আসিয়া আমাকে সহসা আক্রমণ করিল এবং কহিল, "তুমি আমাদের সমস্ত কথা শুনিয়াছ? সত্য বল।" আমি বলিলাম "হাঁ।" দ্বিতীয় কথা না কহিয়া সে ব্যক্তি আমাকে টানিয়া লইয়া চলিল। আমিও অগত্যা বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার সহিত চলিলাম। বুঝিলাম, তাহার হস্তস্থিত ছোরায় আঘাত দেওয়া অতি সহজ। দলের মধ্যে আমাকে লইয়া আসিল। একজন জিজ্ঞাসিল,—"একি?" সেই ব্যক্তি রহীম। যে আমাকে আনিয়াছিল, সে সমস্ত বলিল। রহীম বলিল, "উহাকে বধ কর।" এককালে দুই তিন জনের তরবারি আমার মস্তকোপরি উঠিল। আমি সেই সময়ে কাঁদিয়া বলিলাম, আমার একটি কথা শুন, তার পর যা হয় কর। রহীম বলিল, 'বল'। তখন আমি বলিলাম, আমি তোমাদের সমস্ত কথা শুনিয়াছি সত্য। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তাহা কখন প্রকাশ করিব না। রহীম বলিল, "তাহাতে বিশ্বাস করি না।" আমি বলিলাম, আমি আর কখন লোকালয়ে যাইব না। তোমরা যা বলিবে তাই করিব, তোমাদের হইয়া থাকিব। রহীম অনেকক্ষণ পরে কহিল, "তোমাকে আমাদের

সঙ্গে থাকিতে হইবে, আমাদের তল্পী তাগাদা বহিতে হইবে, আমরা যখন যেখানে যাইব, সেখানে যাইতে হইবে, আর আমাদের মত বেশ ভূষা করিতে হইবে, ইহাতে যদি স্বীকার কর তবে তোমার জীবন থাকে।” আমি অগত্যা তাহাই স্বীকার করিলাম। সেই অবধি আমি দস্যু হইলাম। মনে একটি আশা থাকিল যে, শীঘ্র কোন উপায়ে ইহাদের প্রকাশ করিয়া দিতে পারিলেই আমি নিষ্কৃতি পাইব। প্রথম প্রথম তাহারা আমাকে বড় কষ্ট দিত। সমস্ত বোঝা আমার ঘাড়ে চাপাইত, তাহাদের ভাত খাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিত এবং সকলেই আমাকে ঘৃণা করিত। কিন্তু কিছু দিন পরে, বিশেষতঃ যে দিন কপালকুণ্ডলার জিনিষ আমি সহজে আনিলাম, সে দিন হইতে আমার যাতনা অনেক কমিয়া গেল। তাহাদের কাহারও বুদ্ধি প্রখর ছিল না। আমার পরামর্শে তাহারা সহজে অনেক কার্য্যসিদ্ধ করিতে পারিত; এজন্য কালে দস্যুদলে আমার বেশ প্রভুত্ব হইল। আমি এই সময়ের মধ্যে অনায়াসে পলাইয়া বাটী আসিতে পারিতাম। কিন্তু তাহাতে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট নাই। কারণ দস্যুরা জোর করিয়া আমার পরিচয় লইয়াছিল। আমি পলাইয়া আসিলে আমার তো নিস্তার নাই, পরন্তু আমাদের সম্বন্ধীয় কেহই বাঁচিত না। সুতরাং আমি সে চেষ্টাও করি নাই। ক্রমে দস্যুদের রীতি-নীতি সমস্ত বেশ জানিতে পারিলাম। তাহাদের ভাবগতিক সব বুঝিলাম। ভাবিয়া ছিলাম, এই সময় পলাইয়া গিয়া একবারে বিচারালয়ে সংবাদ দিব; তাহাতেও যদি দুই এক দিন বিলম্ব হয়, তাহা হইলেও বিপদ সম্ভাবনা; এজন্য তাহাও করিতে পারিলাম না। এই সময়ে মুক্তির নিমিত্ত আর এক উপায় অবলম্বন করিলাম। কথা প্রসঙ্গে দস্যুদের বুঝাইলাম যে, আমার নিবাস সপ্তগ্রাম সন্নিহিত গোপালপুর নহে, বীরভূমের এক গোপালপুর আছে, সেই গোপালপুর আমার নিবাস। ক্রমে এ কথাতেই তাহাদের বিশ্বাস হইল। আমাকে সকলেই মান্য করিতে লাগিল। এমন সময় উমাপতিকে লইয়া এই গোল। আমি তোমাকে বেশ চিনিলাম। পাছে তুমি আমাকে চিনিতে পার বলিয়া বড় ভয় হইল। তুমি আমাকে চিনিতে পারিলে না। ভাবিলাম, পলাইবার এই ঠিক সময়। তোমাকে মুক্ত করিয়া পলাইলাম বটে, কিন্তু যতদিন তাহাদের ধরাইয়া না দিতে পারি, ততদিন আমরা নিরাপদ নহি। সাবধান, কেহ যেন কিছু জানিতে না পারে। দুই এক দিনের মধ্যেই প্রকাশ করিতে পারিব এমন সাহস আছে। যে কয়দিন প্রকাশ না হয়, সে কয়দিন আমরা নিশ্চিন্ত নহি।”

নবকুমার সবিস্ময়ে কহিলেন,—“প্রকাশ করিতে বিলম্ব হইতেছে কেন?”

গোপা। আমরা পলাইয়া আসার পর দিনই তাহারা কোথায় সরিয়াছে ঠিক নাই। আমি খোঁজ করিয়াছি, তাহারা তথায় নাই। যেখানে থাকুক, আমি শীঘ্র জানিতে পারিব। আমি এত কথা বলিতাম না, কিন্তু আপনারা যখন আমাকে চিনিতে পারিলেন, তখন সমস্ত কথা বলিয়া সাবধান করিয়া না দেওয়া মন্দ হইবে বলিয়া এত বলিলাম। যাহা বলিলাম, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত। ইহার পর যদি বিধাতা দিন দেন, তবে এক এক দিনের কথা বলিব, শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন। উমাপতি! আমি আপাততঃ বিদায় হই মনে কিছুই চিন্তা করিও না। ভয় কি ভাই! শীঘ্র আবার আসিতেছি। কাহাকে কিছু বলিও না। মহাশয়! আমি নমস্কার করি। এক্ষণে

আমি চলিলাম। উমাপতি। "বাটীর সব মঙ্গল ?"

উমাপতি বলিলেন,—"প্রাণগতিক সমস্ত মঙ্গল বটে, কিন্তু আপনার অদর্শনে সকলেই মৃতপ্রায়।"

গোপা। দৈব কাহার আয়ত্ত ভাই ? বিধাতা দুঃখ দিলে কে খণ্ডিতে পারে ? আর না। আমি চলিলাম। পরে সমস্ত কথা বলিব। চিন্তা নাই। অনেক দেরি হইয়াছে। এই বলিয়া গোপাল উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই,উদ্ধশ্বাসে প্রস্থান করিলেন। উমাপতি তাঁহাকে কত কথা জিজ্ঞাসিবেন মনে করিয়াছিলেন, তাহা হইল না। তাঁহারা উভয়ে চিত্রার্পিত-পুত্তলীর ন্যায় বসিয়া রহিলেন।

ষষ্ঠ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রুগ্না-সমীপে।

"Causa latet visest notiisma." *

—ovid,

নবকুমার, উমাপতি, পদ্মাবতী প্রভৃতি সকলেই সুখে সময়পাত করিতে লাগিলেন। গ্রীষ্মের পর বর্ষা গেল, বর্ষার পর শরৎও গেল, শরতের পর হেমন্তও যায়, তাঁহারা সকলেই আনন্দে কাটাইতে লাগিলেন ; যদি সংসারে সুখ থাকে, তবে তাঁহারা সুখেই কাটাইতে লাগিলেন বটে। কিন্তু বিশ্ব-মধ্যে যাহা সুখ বলিয়া পরিচিত, সে সুখ কতক্ষণ স্থায়ী ? কে বলিতে পারেন যে, তিনি চিরসুখী ? যিনি বলিতে পারেন, আমি কখন দুঃখ কাহাকে বলে জানি না, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, তিনি কখন সুখের মুখও দেখেন নাই ; সুখ কাহাকে বলে তাহাও তিনি জানেন না। সুখে তাঁহার সুখ নাই, তিনি দারুণ অসুখী। যে ব্যক্তি জীবন্মধ্যে পলান্ন অথবা তদ্বৎ কোন উপাদেয় দ্রব্য ভিন্ন অন্য কিছু আহার করেন নাই ; তাঁহার রসনা সে আহারে অতঃপর তৃপ্ত হয় না ; তিনি আর তাহার উপাদেয়ত্ব বুঝিতে পারেন না। শাকান্নভোজী ব্যক্তি কখন এক দিন যদি তাহা আহার করিতে পারেন, তবে তিনি তাহার উপাদেয়ত্ব অনুমানে সমর্থ। জগতে সকল কার্য্যেই সুখ আছে, সকল কার্য্যেই সুখ নাই। অদ্য যে কার্য্য পরম সুখময় বলিয়া প্রতীত হইতেছে, উপর্য্যুপরি দশ দিন সেই কার্য্য করিতে হইলে তাহা বিরক্তিজনক ও অসুখের কারণ বলিয়া প্রতীত হইবে। সুখের লক্ষণ স্থির করা, অথবা কিসে সুখ হয় তাহা নির্ণয় করা, আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। জগতে সুখ আছে কি না তাহাও আমরা বলিতে অক্ষম। ইহা আমরা নিশ্চয় জানি, যাহাকে লোকে সুখ বলিয়া গণ্য করেন, তাহা এই আছে এই নাই। মনুষ্য আশা-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া ক্রমশঃ সুখের চেষ্টায় ছুটিতেছে, কিন্তু তাহা হস্তগত হয় হয় হয়—হইতেছে না। মায়াময় মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় সুখ দেখা দেয়, কিন্তু কাছে আইসে না, সুখের এই প্রকৃতি। এই নিদারুণ যন্ত্রণাপূর্ণ সংসারে মনুষ্য সময়ে সময়ে অন্যান্য সমস্ত ক্লেশকর বিষয় বিস্মৃত হইয়া আনন্দে থাকেন। যদি কিছু সুখ থাকে তবে আমরা বলি, সেই আনন্দই

* The cause is secret, but the effect is known,

সুখ। কিন্তু সেই সুখই বা কতক্ষণ স্থায়ী? জগতে কে সদানন্দ, কাহার হৃদয় জগতে এক দিনও দুঃখদণ্ডে মথিত হয় নাই? সংসারবিরাগী পুণ্যাশ্রমী, যতি-তপস্বীরাও সংসারে যন্ত্রণা পাইয়াছেন। মাতৃগর্ভচ্যুত হইয়াই কেহ কখন সন্ন্যাসী হয় না। সাংসারিক বিবিধ অসহনীয় ক্লেশ দর্শনে, তাঁহারা সুখাশায় সংসার ত্যাগ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। অতএব সংসারে কেহ চিরানন্দ নহেন। রোগ, শোক, অভাব, মান, যশ, আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ কারণে মনুষ্য সততই নিরানন্দ। এই সকলের মধ্যে যদি কোনরূপে কখন আনন্দ জন্মে, তাহা ক্ষণিক মাত্র। নবকুমার প্রভৃতি সকলে, সেই ক্ষণিক আনন্দে আনন্দিত ছিলেন। কিন্তু আনন্দ চিরস্থায়ী হইবার নহে। তাঁহাদের আনন্দে বিঘ্ন জন্মিল; পদ্মাবতী পীড়িতা হইলেন। চলুন পাঠক আমরা পদ্মাবতীর কি হইয়াছে দেখিয়া আসি।

পদ্মাবতী পীড়িতা। চারি দিন অতীত হইল, পদ্মাবতী পীড়াক্রান্ত হইয়াছেন। পীড়া সহজ নহে। জ্বর—কিন্তু শক্ত জ্বর। কি কারণে পদ্মাবতীর সহসা এরূপ কঠিন জ্বর উপস্থিত হইল তাহা কেহ জানে না; কোন্ সময়ে কি কারণে পীড়া হয়, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। অবশ্যই কোন শারীরিক নিয়মের উল্লঙ্ঘন হইয়া থাকিবে, নচেৎ এরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা কি? নবকুমার পদ্মাবতীকে জ্বরের কারণ জিজ্ঞাসিয়াছিলেন, কিন্তু কোন সন্তোষজনক উত্তর পান নাই। চিকিৎসক আসিয়া রোগিণীকে দেখিয়া মুখ বিকৃত করিয়াছেন। তিনি যাইবার সময় নবকুমারকে কাণে কাণে বলিয়া গিয়াছেন,—"রোগের গতিক ভাল নহে।" নবকুমার সেই অবধি অত্যন্ত ভাবনাগ্রস্ত ও শুষ্ক হইয়াছেন।

বেলা সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর, পদ্মাবতীর জ্বরত্যাগ হইয়াছে। পদ্মাবতী ছট্‌ফট্ করিতেছেন এবং যন্ত্রণা সূচক ধ্বনি ব্যক্ত করিতেছেন। চারি জন পরিচারিকা তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছে। রৌদ্রের তেজ বিদূরিত করিবার নিমিত্ত গৃহের সমস্ত দ্বারাদি রুদ্ধ। সহসা একটি দ্বার উন্মোচন হইল। তন্মধ্য দিয়া নবকুমার প্রবেশ করিলেন। সকলের দৃষ্টি তৎপ্রতি ধাবিত হইল। পদ্মাবতীও পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন। নবকুমারের চক্ষুর সহিত পদ্মার চক্ষু সংমিলিত হইল, অমনই তাঁহার ওষ্ঠাধরে মধুর হাসি আসিল। তাঁহার মুখের ভাবান্তর হইল। এত যে যন্ত্রণা, এত যে, ক্লেশ, তাহা যেন তৎক্ষণাৎ লয় পাইল। নবকুমার ধীরে ধীরে আসিয়া রুগ্নার শয্যা-পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। তিনি দেখিলেন, পদ্মাবতী এই চারি দিনেই ভয়ানক কৃশা হইয়াছেন, তাঁহার বর্ণ পাণ্ডুত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইন্দীবর নয়ন দুটি ডব ডব করিয়া মুখের উপর ভাসিতেছে। পদ্মাবতী নবকুমারের গাত্রে এক খানি হস্ত প্রক্ষেপ করিলেন। নবকুমার এক হস্ত দ্বারা পদ্মার প্রক্ষিপ্ত হস্ত ধারণ করিলেন, অপর হস্ত পদ্মার ললাটে অর্পণ করিয়া কহিলেন,—

"পদ্মা! তুমি ঘামিতেছ, এক্ষণে তোমার জ্বরত্যাগ হইতেছে বোধ হয়।"

পদ্মা বলিলেন,—"হইবে, কিন্তু বড় কষ্ট হইতেছে।"

নবকুমার বলিলেন,—"আর দুই এক দিন মাত্র কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। কি করিবে বল? তৎপরেই আরোগ্য লাভ করিবে।"

পদ্মা। আবার নবকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন। কহিলেন,—"আরোগ্য লাভ করিব তোমায় কে বলিল?"

নবকুমার কহিলেন,—"কেন পদ্মা, এ তো সামান্য পীড়া ইহাতে ভয় কি ?

পদ্মা কহিলেন,— ভয় নাই নবকুমার। ভয় কিসের ? মৃত্যুকে ভয় ? তাহা আমার নাই। তবে নিজের শরীরের অবস্থা নিজে যত বুঝিতে পারা যায়, পরে সহস্র বিজ্ঞ হইলেও তত পারে না। নবকুমার ! আমার পীড়া কঠিন নহে এবং আমি শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিব, এমন আশাকে যদি হৃদয়ে স্থান দিয়া থাক, তবে তাহা ত্যাগ কর।"

নবকুমার একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

পদ্মাবতী কহিলেন,—"তুমি দুঃখিত হইতেছ ? তাহা তো আমি জানি না। আমি ভাবিলাম তুমি পুরুষ মানুষ, তোমাদের সহিষ্ণুতা গুণ আমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক। সেই সাহসেই আমি এমন কথা বলিয়াছি! তুমি দুঃখিত হইবে জানিলে কখন বলিতাম না। যাহা হইবার তাহা হইবে, তজ্জন্য উদ্বিগ্ন হও কেন ?" পদ্মাবতী নবকুমারের মনের ভাব বুঝিলেন এবং এই মুহূর্ত্ত হইতে অতঃপর রোগ-যাতনা যথাসাধ্য গোপন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পদ্মাবতী নবকুমারের বদনের প্রতি দৃষ্টি করিলেন। দেখিলেন, তাহা বিশুষ্ক ও বিমর্ষ। বাক্যের স্রোত পরিবর্ত্তন করিবার নিমিত্ত কহিলেন,—"স্বামিন্ ! আমার একটি প্রার্থনা আছে।" নবকুমার সোৎসুকে কহিলেন,—"কি বল, নিঃসঙ্কোচে বল।"

পদ্মাবতী কহিলেন,—"আমি জ্ঞানহীনা, জানি না আমি যাহা বলিব তাহা কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য। আমি যাহা বলিতেছি তাহা তোমার বিবেচনা সাপেক্ষ। যদি তাহা কর্ত্তব্য হয়, তবে তাহা কর, নচেৎ প্রয়োজন নাই।"

নবকুমার কহিলেন,—"ভাল তাহাই হইবে কথাটা কি ?"

পদ্মাবতী কহিলেন,—"বাদশাহ জাহাঙ্গীরের নিকট আমি প্রতিশ্রুত ছিলাম, যে, জীবনমধ্যে আর একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। অধুনা সেই ইচ্ছা প্রবল হইয়াছে। যদি তাহাতে তোমার কোন আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে বাদশাহের নিকট সংবাদ প্রেরণ কর।" নবকুমার কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ রহিলেন। যুগপৎ অনেকগুলি চিন্তা-তরঙ্গ তাঁহার হৃদয়-জলধিকে আচ্ছন্ন করিল। তিনি ভাবিলেন,—"পদ্মাবতীর এ ইচ্ছা অসঙ্গত নহে। যাহাকে এক দিন পদ্মা মন দিয়াছিল, তাহার নিকট হইতে একদিনেই বিভিন্ন হওয়া অসম্ভব। পদ্মাবতীর চিত্ত তো আমি জানি। তাহা যদিও এক্ষণে দর্পণের ন্যায় নির্ম্মল, তথাপি পূর্ব্বস্মৃতি কোথায় যাইবে ? স্মৃতি-প্রাবল্যে পদ্মার এ ইচ্ছা অন্যায় নহে। আর এ দর্শনে ক্ষতিই বা কি ? পদ্মার চিত্তে মালিন্য জন্মান অসম্ভব। তবে কেন তাহার বাসনায় ব্যাঘাত দিব ?" এই ভাবিয়া কহিলেন,—

"পদ্মা ! এই কথা ! এ তো উত্তম কথা ! অবশ্যই সংবাদ লইয়া লোক যাইবে। কিন্তু তিনি আসিবেন কি না সন্দেহ।"

পদ্মা। আসিবেন। যাহাতে আসিবেন আমি তাহা বলিতেছি। তুমি যদি পত্র লেখ তবে তাহাতে লিখিয়া দিও, পদ্মাবতী পীড়িতা হইয়াছে। রুগ্নশয্যায় নিপতিতা হইয়া তাহার একবার বাদশাহের সহিত সাক্ষাতের বাসনা জন্মিয়াছে। কিন্তু সে গমনাগমনে অশক্ত। সুতরাং বাদশাহ বাহাদুরের অনুগ্রহ ভিন্ন তাহার বাসনার চরিতার্থ হইবার অন্য উপায় নাই।

নবকুমার বলিলেন,—"তাহাই হইবে। ঐ সকল কথাই লিখিব।"

পদ্মা। নাথ! কার্য্য মাত্রই যত শীঘ্র শেষ হয়, ততই ভাল। আমি বলি যদি এ কার্য্য তোমার অভিপ্রেত হইল, তবে আর বিলম্ব না করাই ভাল।

নবকুমার কহিলেন,—"আমি পত্র লিখিতে চাহিলাম। এখনই ইহা শেষ করিতেছি।"

এই বলিয়া নবকুমার পদ্মার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ব্যাকুলিতান্তরে।

"মরণং প্রকৃতিঃ শরীরিণাং
বিকৃতির্জীবিতমুচ্যতে বুধৈঃ।
ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠতে শ্বসন্
যদি জন্তুর্নু লাভবানসৌ॥
অবগচ্ছতি মূঢ়চেতনঃ
প্রিয়নাশং হৃদি শল্যমর্পিতম্।
স্থিরধীস্তু তদেব মন্যতে
কুশলদ্বারতয়া সমুদ্ধৃতম্॥
—রঘুবংশম্।

কয়েক দিন অতীত হইল পদ্মাবতী রুগ্ন-শয্যায় পতিতা আছেন। তাঁহার পীড়ার অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ লক্ষিত হইতেছে। অদ্য সায়ংকালে পূর্ব্বোল্লিখিত চিকিৎসক পদ্মাবতীকে দর্শন করিয়া গেলেন। অনতিবিলম্বে নবকুমার রুগ্নার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। যে প্রকোষ্ঠ পদ্মাবতীর সুস্থ, এবং সবল অবস্থায় আনন্দের রশ্মিতে সমুজ্জ্বলিত ছিল, যে প্রকোষ্ঠ পদ্মার অধ্যয়ন, রচনা, চিত্র-কার্য্য প্রভৃতি কার্য্যের প্রিয়তম স্থান ছিল, যথায় পদ্মা, স্বীয় প্রকৃত পরিচয় জ্ঞানহীন স্বামীর হৃদয়ে প্রেম সঞ্চারিত করিবার নিমিত্ত, তাঁহাকে বিবিধ বিনয় বাক্যে তোষামোদ করিয়া, অবশেষে তাঁহার চরণ ধারণ করিয়া রোদন করিয়াছিলেন, এবং তাহাতেও অকৃতকার্য্য হইয়া সগর্ব্ববিস্ফারিত নেত্রে দাঁড়াইয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, যে স্থানে রহস্যচ্ছলে পদ্মা, স্বামীর প্রেমহীন বিশুষ্ক হৃদয়কে প্রেমময় ও সরস করিয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গন করত আনন্দাশ্রুতে তাঁহার হৃদয় ভাসাইয়াছিলেন, যে প্রকোষ্ঠে পদ্মা আরাধ্য নবকুমারের সঙ্গ-সুখে কতদিন স্বর্গ সুখ অনুভব করিয়াছেন, অদ্য সেই প্রকোষ্ঠে—সেই আমোদময় প্রকোষ্ঠে নবকুমার বিষণ্ণ-বদনে প্রবেশ করিলেন। সে প্রকোষ্ঠের আর সে জ্যোতিঃ নাই। একের হীনতেজে সকলই যেন তেজহীন হইয়াছে। রুগ্না পালঙ্কে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। পার্শ্বে কাষ্ঠ চৌপায়ায় একটি সামাদান জ্বলিতেছে, কিন্তু সকলই যেন অন্ধকার। নবকুমার যাইয়া আলোকের পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। তাঁহার পদশব্দ রুগ্নার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন। উভয়ের চক্ষু সংমিলিত হইল। পদ্মাবতীর বদনে একটু হাসি দেখা দিল। কিন্তু সে হাসি তাঁহার স্বাভাবিক হাসি নয়। পদ্মাবতী নবকুমারের তৃপ্তিসাধনের জন্য এ অবস্থাতেও জোর করিয়া হাসিলেন। নবকুমার জিজ্ঞাসিলেন,—

"পদ্মাবতি! এখন কেমন আছ?"

অতি ক্ষীণস্বরে পদ্মাবতী উত্তর করিলেন,—"ভাল আছি।"

এস্থলেও পদ্মাবতী প্রকৃত কথা গোপন

করিলেন। পাছে নবকুমারের হৃদয়ে ব্যথা জন্মে, এজন্য রোগ তাঁহার শরীরকে কিরূপ চর্ব্বিত করিতেছে, তাহা পদ্মা ব্যক্ত করিলেন না! নবকুমার সকলই বুঝিলেন। চিকিৎসক যখন পদ্মাবতীকে দর্শন করিয়া গমন করেন, তখন নবকুমারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি নবকুমারকে বলিয়াছেন, "কন্যার অবস্থা বড়ই মন্দ। কল্য সপ্তাহ উত্তীর্ণ হইয়াছে। ভয়ের দিন গিয়াছে। কিন্তু এই সপ্তাহের মধ্যে বিশেষ করিতে না পারিলে পুনরায় বিপদ সম্ভবিতে। শক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছি। কিন্তু কিছুই ভাল বুঝিতেছি না।"

নবকুমার পদ্মার শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। পদ্মা যেন কোন অস্বাভাবিক শক্তিবলে উঠিয়া বসিলেন। নবকুমার তাঁহাকে ধরিলেন। পদ্মা হেলিয়া নবকুমারের বক্ষে মস্তক রক্ষা করিলেন। তাঁহার একচক্ষু আবরণে পড়িল, অপর চক্ষুর দ্বারা তিনি নবকুমারের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। উভয়ে নীরব। উভয়ের হৃদয়েই দারুণ শোকের ঝটিকা প্রবাহিত হইতেছিল। কি কথা কহিবেন? মনে কি তখন কথার স্থির আছে? নবকুমার শোকবিকলিত নেত্রে দেখিতে লাগিলেন, এই সম্মোহিনী মূর্ত্তি যাহা আমার হৃদয় মনকে প্রেম-রজ্জু দ্বারা দৃঢ়বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা চিরকালের নিমিত্ত অন্তর্হিত হইবে। তিনি আরও দেখিলেন, পদ্মার সুগোল নবনীত-বিনিন্দিত কোমল গণ্ডদ্বয়ের সে শোভা অপগত হইয়াছে। তাহাতে গায় গায় অনেক দাগ পড়িয়াছে। এবং তাহা গভীর হইয়াছে। তাঁহার চক্ষুতলে কালিমা পড়িয়াছে। অধরোষ্ঠ গোলাবী বর্ণের বিপর্য্যয়ে শ্বেতবর্ণ হইয়াছে। তাঁহার নারীচরিত্রসুলভ গর্ব্বপূর্ণ সমুজ্জ্বল দেহ শোভা যাহাতে তাঁহার আত্মার অমানুষী শক্তির জ্যোতিঃ দীপ্যমান ছিল, এক্ষণে আর তাহা সেরূপ নাই।

নবকুমারের দেহে সমধিক বেগে রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অতি ব্যগ্রতা সহকারে তিনি পদ্মাবতীকে ধারণ করিয়া তাঁহার বদনে ভূয়োভূয়ঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন। ক্লেশ-সংরক্ষিত মনোবেগ শিথিল হইল, সুতরাং নবকুমারের চক্ষু দিয়া দরদরিত ধারায় অশ্রু পড়িতে লাগিল।

পদ্মাবতী নবকুমারের ব্যগ্রতা দর্শনে কিছু ব্যাকুলিত স্বরে কহিলেন,—"কাঁদিও না। শঙ্কিত হইতেছ কেন? পরিণামে কি হইবে তাহার স্থির কি? তোমার সংস্পর্শে আমার সমস্ত ক্লেশ বিদূরিত হইয়াছে, আমি পবিত্র সুখ ভোগ করিতেছি। তুমি এক্ষণে শোক ত্যাগ কর।"

এই কথা বলিতে বলিতে পদ্মার নয়ননির্গত কয়েক বিন্দু অশ্রু নবকুমারের বক্ষঃস্থল সিক্ত করিল। নবকুমার উন্মত্তের ন্যায় পদ্মার মুখের প্রতি চাহিলেন এবং সবিস্ময়ে দেখিলেন, পদ্মা এখনও হাসিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছেন। পদ্মা নবকুমারের হৃদয় হইতে মস্তকোত্তোলন করিয়া একটি তাকিয়ায় সংস্থাপিত করিলেন। নবকুমার প্রচণ্ড শোকাগ্নিকে নিবাইতে চেষ্টা করিলেন। তাহা কি সহজ? সময়ে সময়ে সুদীর্ঘ নিশ্বাস এবং অঙ্গকম্পন হৃদয়ের প্রচণ্ড শোক-প্রবাহের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল।

অনেক নিস্তব্ধতার পর নবকুমার কহিলেন,—"পদ্মা! মনুষ্যের এই গতি! অদৃষ্টের এই শেষ! এ ঘটনা সাধারণ, সর্ব্বব্যাপী এবং অপ্রতিবিধেয়! যাহা হইবেই হইবে, কাহার

সাধ্য তাহার রোধ করে? তোমার পীড়া এখনও কঠিন হয় নাই। মনের ব্যাকুলতায় এবং অস্থিরতায় আমি যেরূপ উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছি, এখনও তাহার অণুমাত্র চিহ্নও প্রকাশিত হয় নাই। ঈশ্বর করুন, আর পীড়া না বাড়ে। তাহা হইলেই তুমি অবশ্য মুক্তি লাভ করিবে। তোমার এ সহজ পীড়া, ভয় কি?"

নবকুমার মনের কথা বলিলেন না। মনে যাহা বুঝিয়াছিলেন পদ্মাকে সাহস দিবার জন্য তাহা গোপন করিলেন।

পদ্মা কহিলেন,—"ভয় কি? কিছুই না। পীড়া, সহজ হউক, বা কঠিন হউক, তাহাতে ভয় করিলে চলিবে কেন? মৃত্যুকে ভয় করিলেই কি মনুষ্য তাহার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে? কখনই না। তবে কেন?"

পদ্মাবতীর মুখে এইরূপ সাহসের কথা শুনিয়া, নবকুমারের এতাদৃশ চঞ্চল হৃদয়ও একটু সাহসী হইল। প্রিয়জনের ক্লেশ দেখিলে অন্তরে দারুণ বেদনা জন্মে, কিন্তু যদি সেই প্রিয়জন কোন অপ্রতিবিধেয় বিপদে পড়িয়া স্বয়ং কাতর না হয় এবং ধৈর্য্য সহকারে স্থির থাকে, তাহা হইলে তজ্জন্য চিন্তা অবশ্যই কিয়ৎপরিমাণে ন্যূন হয় সন্দেহ কি? বিশেষতঃ বিধাতৃবিহিত একটী সুন্দর নিয়ম সতত সংসারে বিরাজ করিতেছে;—মনুষ্য যতই মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হয়, ততই যেন মৃত্যুর ক্রমানম্র পথ আরও পরিষ্কার ও মসৃণ হইয়া তাহার গতির সুবিধা করিয়া দেয় এবং প্রত্যহ দেহ নশ্বর বলিয়া যতই প্রতীতি জন্মে ততই যেন কৃতান্তের করাল ভীষণ মূর্ত্তি কমনীয়তা ধারণ করে; অবশেষে যেরূপ শ্রান্ত শিশু জননীর অঙ্কে নিদ্রা যায়, তদ্রূপ মানব অকাতরে শমন-সদনে শরণ গ্রহণ করে। এই চির-প্রতিষ্ঠিত নিয়মপ্রভাবে পদ্মাবতীর মুখ হইতে তাদৃশ সাহসসূচক কথা বিনির্গত হইয়াছে। নবকুমার পদ্মাবতীর কথা সকল স্থির মনে আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময় দাসী আসিয়া সংবাদ দিল,—

"অনেক লোক জন সমভিব্যাহারে বাদশাহ আসিয়াছেন।" নবকুমার ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন এবং কহিলেন,—"আসিয়াছেন?"

পদ্মাবতী কহিলেন,—"তুমি যাও।"

নবকুমার ব্যস্ততা সহকারে পদ্মার প্রকোষ্ঠ হইতে নির্গত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

উদ্দীপ্ত-প্রণয় পাবকে।

"I loved, I love you, for this love havs lost
State station, heaven, man kinds my own esteem
And yet cannot regret what it hath cost,
So dear is still the memory of that dream."

বাদশাহ জাহাঙ্গীর পত্রপাঠ মাত্র বুঝিয়াছিলেন যে, পদ্মাবতীর সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছে সন্দেহ নাই। পদ্মাবতী বলিয়াছিলেন, অন্তিম সময়ে তিনি পুনরায় বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। অন্তিম সময় উপস্থিত না হইলে সে কথা তাঁহার মনে পড়িবে কেন? এজন্য বাদশাহ আসিবার সময় অধীনস্থ কয়েকজন প্রসিদ্ধ হাকিম সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা আসিয়াই নবকুমার কর্ত্তৃক নিযুক্ত চিকিৎসকের নিকট রোগের সমস্ত ব্যবস্থা জ্ঞাত হইয়া একমতে পদ্মার চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া দিলেন। কিন্তু

রোগের কিছুই করিতে পারিলেন না। অদ্য দশ দিন অতীত হইল। এ দশ দিনে পীড়া অনুমাত্রও উপশমিত না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। চিকিৎসকেরা পদ্মার জীবনে প্রায় হতাশ হইয়াছেন। এই নিদারুণ কথা প্রিয়জনবর্গের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে। সকলেই ম্রিয়মাণ, শঙ্কিত ও বিশুষ্ক। নবকুমার জাহাঙ্গীর প্রভৃতি সকলেই সর্ব্বদা রোগিণীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, তাঁহারাও ক্রমশঃ নিরাশ হইতেছেন।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বাদশাহ জাহাঙ্গীর বাহাদুর, রুগ্নার পালঙ্ক সন্নিহিত একখানি চৌপায়ায় উপবেশন করিলেন। পদ্মা নিতান্ত দুর্ব্বল ও কৃশ। সম্প্রতি চারি দিন হইতে যে জ্বর আসিয়াছে তাহা কমিতেছে না, বাড়িতেছে না, সমভাবেই রহিয়াছে। চিকিৎসকেরা সন্দেহ করিতেছেন, সেই জ্বর যখন বিরাম হইবে, তখনই পদ্মার মৃত্যু হইবে। বাদশাহ ধীরে ধীরে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পদ্মা বাদশাহের মুখের প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন। বাদশাহ ব্যথিত হইলেন। এক সময়ে যাহার দৃষ্টিতে বাদশাহের হৃদয় নৃত্য করিত, অদ্য তাহার দৃষ্টি ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক হইল। শোকে তাঁহার হৃদয় মথিত হইতে লাগিল। অতি কষ্টে তিনি মনের ভাব গোপন করিলেন। উভয়েই নিস্তব্ধ—নীরব—চিত্রার্পিত পুত্তলী প্রায়। অনেকক্ষণ পরে পদ্মাবতী দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে কহিলেন,—

"বাদশাহ! আমি চলিলাম,—এ জীবনের মত চলিলাম। পাপীয়সী পদ্মাবতীর পাপজীবন নিশ্চয়ই অচিরে অন্ধকারে ডুবিবে। তাহা প্রতিবিধানের চেষ্টা বৃথা। আমি জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছি; জীবনে আমার কোন প্রয়োজনও নাই। সুতরাং আমি আগতপ্রায় মৃত্যুর নিমিত্ত শঙ্কিত নহি। আমার আর ক্ষোভ নাই। মনুষ্য জীবনে যে সকল বাহ্য সুখ সৌভাগ্য ঈপ্সিত, বাদশাহের অনুকম্পায় আমি সে সকল যথেষ্ট সম্ভোগ করিয়াছি। কিন্তু তাহাতে যতদিন নবানুরাগ থাকে, ততদিন সুখ বোধ হয়; ততদিন সে সকল আমোদের সামগ্রী থাকে। অনুরাগ কয় দিন থাকে? অনুরাগও কমে, সুখও যায়। আমি আপনাকে পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি,—সে সকলে বিন্দুমাত্রও সুখ নাই; তাহা হইলে আমার সুখের সীমা থাকিত না। যাহাতে প্রকৃত সুখ আছে, হতভাগিনী তাহা সে সময় জানিতে পারে নাই। যখন জানিতে পারিল ও তাহা হস্তগত হইল, তখন গতকার্য্য সকলের নিমিত্ত নিদারুণ অনুতাপে তাহার হৃদয় মথিত হইতে লাগিল। সুতরাং জগতে অভাগিনী সুখের মুখ দেখিতে পাইল না। সুখের নিমিত্ত আমি কি না করিয়াছি? কোন্ পাপ আমি বাকি রাখিয়াছি? যাহা করিয়াছি তাহা সকলই সুখের চেষ্টায়, অসীম ভোগতৃষ্ণা নিবৃত্তি করিবার চেষ্টায়। কিন্তু বাদশাহ আপনাকে বলিতে কি, পাপে পাপে আমার দেহ, মন, প্রাণ জর্জ্জরিত হইয়াছে মাত্র, সুখী কখনই হই নাই। এখনই কি আমি সুখী? না বাদশাহ আমার বড় যাতনা! কেন পূর্ব্ব হইতে এই পথে থাকি নাই, এই অনুশোচনায় আমার হৃদয় এখন সতত জ্বলিতে থাকে! সে জ্বালা নিবারিত হইবার নহে। তাহা হইলে নিবারিত হইত। তাহাতেই বলিতেছি অভাগিনীর জীবনে কোন প্রয়োজন নাই, তাহার মরণই মঙ্গল। সেই মঙ্গল নিকটবর্ত্তী, তাহার জন্য অধিকদিন অপেক্ষা করিতে

হইল না ইহাই সৌভাগ্য। আর পাপীয়সী পদ্মাবতীর পাপ প্রাণ পৃথিবীতে অধিক দিন থাকিবে না।"

এই পর্য্যন্ত কথা যদিও পদ্মাবতী অতি শয় ধীরে ধীরে ও অতিশয় অস্ফুট স্বরে বলিয়াছিলেন, তথাপি ইহাতেই তাঁহার অত্যন্ত শ্রম হইল। তিনি নিস্তব্ধ হইলেন এবং সজোরে শ্বাসাকর্ষণ করিতে লাগিলেন। বাদশাহ তাঁহার সমস্ত কথা শুনিলেন,—তাঁহার সাবধানতা বিফল হইল। চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল। বিকৃত স্বরে, কহিলেন,—"পদ্মাবতি! তোমার সহিত শেষ সাক্ষাৎ যে এত ভয়ানক হইবে তাহা মনেও স্থান দিতে সাহস করি নাই। তুমি যাহা বলিলে, তাহা ঘটুক, বা নাই ঘটুক, মনে স্থান দিতেও সর্ব্বাঙ্গ শিহরে। আমার দেহ, মন, প্রাণ যে এক সময়ে কেবলমাত্র তোমারই ছিল, তাহা তুমি জান না কি? অতি ক্লেশে হৃদয়কে পাষাণবৎ কঠিন করিয়া তোমাকে তোমার সুখের পথে বিচরণ করিতে দিয়াছিলাম। কিন্তু বল দেখি পদ্মাবতি! কোন্ প্রাণে আমি সুস্থির হইব? পদ্মাবতি! তুমি সহস্র যোজন অন্তরে থাকিলেও আমার অন্তরেই আছ। আমি তোমারই। তোমার চিত্তের অন্য ভাব হইলেও, আমি তোমাকে হৃদয় হইতে অপসারিত করিতে পারি নাই।"

মনস্তাপে, পূর্ব্বস্মৃতিতে বাদশাহের হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। তাঁহার কণ্ঠস্বর বদ্ধ হইল। চক্ষুদিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। অতি ব্যস্তে বাদশাহ পদ্মাবতীর হস্ত ধারণ করিলেন। তাঁহার নয়নজলে পদ্মার ক্ষীণ হস্ত সিক্ত হইতে লাগিল। পদ্মা ব্যাধি-বিকম্পিত-কণ্ঠে কহিলেন,—"বাদশাহ! আপনার কথায় পূর্ব্বকালের সমস্ত কথা মনে পড়িল। যেন সে সকল প্রত্যক্ষ বোধ হইতেছে। বাদশাহ! আমার হৃদয় নিতান্ত পাষাণ;—পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন। অন্তিম সময়ে আমি আপনাকে মনের কথা বলি শুনুন। এ সময়ে আর আমার ভয় কি? যে সংসার অচিরে ত্যাগ করিতে হইবে, তাহাতে আর কাহাকে ভয় করিব? আপনি শুনিয়া কি ভাবিবেন বলিতে পারি না। যাহা ভাবন এই অন্তিম কালে, মৃত্যু শয্যায়, আমি অকপট মুক্তকণ্ঠে আমার পাপ স্বীকার করিব। বাদশাহ! আপনি আমাকে যতদূর প্রেম করিতেন, তাহা আমার অবিদিত নাই! কিন্তু বাদশাহ! মিথ্যা মনে করিবেন না, আমি পাপিনী, তখন আপনার সেই অতুল্য প্রেমের কণিকাও প্রতিদান করিতাম না! আপনি বিস্মিত হইতেছেন? জগতে আমার ন্যায় অসতী, কুলটা, গণিকা, স্বৈরিণীদের এই নিয়ম,—তাহাদের এই কার্য্য, এই ব্যবহার। প্রতারণা তাহাদের ব্যবসায়। আপনি আমার সন্তোষার্থে কি না করিয়াছেন? কিন্তু আমি পাপীয়সী, আপনার সহিত কি ব্যবহার করিয়াছি? আমি স্বয়ং অসীম পাপ করিয়াছি, আবার তাহার সহিত প্রতারণা মিশ্রিত করিয়াছি এবং আপনাকে, আরও কত জনকে নিয়ত প্রতারণা-জালে বদ্ধ করিয়া পাপে ডুবাইয়াছি। বাদশাহ! ভাবিয়া দেখুন দেখি, আমার পাপের কি পরিমাণ আছে? আমার অদৃষ্টের গতি কি হইবে তাহা বুঝিতেছেন?"

এই বলিয়া পদ্মা আবার নীরব হইলেন। অনেকক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পদ্মা বাদশাহের মুখের প্রতি চাহিলেন। পদ্মার চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পদ্মা কহিলেন,—

"বাদশাহ! আপনাকে যাহা বলিব তাহা আপনি বিশ্বাস করিবেন না; আমার কথায় কেন বিশ্বাস করিবেন? বিশ্বাস না করিলেও আমি তাহা বলিব। কারণ, আপনার বিশ্বাসাবিশ্বাসে আমার আর কোন ইষ্টানিষ্টের আশঙ্কা নাই। যে শীঘ্র চিরকালের নিমিত্ত মনুষ্যরাজ্য ত্যাগ করিবে, মনুষ্যের সন্তোষ ও বিশ্বাসে তাহার প্রয়োজন কি? শুনুন বাদশাহ সদিচ্ছারূপে অনলস্পর্শে পাষাণহৃদয় গলে। দাসীর অন্তরে অনেক দিন সদিচ্ছা প্রবেশ করিয়াছে। পাষাণীর হৃদয় সেই সময় হইতে একটু গলিয়া মানবীর ন্যায় হইয়াছে। আমি তখন বুঝিয়াছি—আপনার সহিত পূর্ব্বে কত অসদ্ব্যবহার করিয়াছি; তখন বুঝিয়াছি—আমি পাপীর পাপী; আমার তখনকার হৃদয়ের অবস্থা বুঝাইয়া দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু তখন আমি অনেকদূর আসিয়াছি, আর প্রত্যাবর্ত্তন অসম্ভব এবং আরও নানা কারণে হৃদয়কে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম। এত শীঘ্র মৃত্যু আমাকে নিস্তার করিতে না আসিলে একথা কখন ব্যক্ত করিতাম না। যাহা হৃদয়ে জন্মিয়াছিল, তাহা হৃদয়েই লয় পাইত। অদ্য এ কথা প্রকাশ করায় আর ক্ষতি নাই বলিয়াই করিলাম। যে দিন হইতে হৃদয় কিছু পরিমাণে মানবীর ন্যায় হইল, সেই দিন হইতে তোমাকে ভাল না বাসিয়া থাকা আমার পক্ষে নিতান্ত কঠিন কার্য হইয়া উঠিল। স্বামী আমার আরাধ্য দেবতা। তাঁহার চরণযুগল ধ্যান করিতে করিতে জীবন ত্যাগ করিব ইহাই আমার প্রার্থনা। তাঁহাকে আমি স্বেচ্ছায় মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি। সেই শুভ দিনাবধি, আমি স্বামীর চরণ অন্তরের সহিত ধ্যান করিয়াছি, তাঁহাকে পুণ্যের সোপান মনে করিয়াছি এবং পাপীয়সী পদ্মাবতীর হৃদয়ে যতদূর প্রণয় উদ্দীপ্ত হওয়া সম্ভব, ততদূর প্রণয় করিয়াছি। কিন্তু বাদশাহ! তোমাকেও তো ভুলিতে পারি নাই। ইহাতে যদি আমার অধর্ম্ম হইয়া থাকে, কি করিব, আমি তাহাতে দুঃখিত নহি। সুখের বিষয় যে, পাষাণীর মৃত্যু সময়ে একথা প্রকাশ হইল। আরও সুখের বিষয় এই যে, এক দিনও তোমার সহিত অবস্থান করিতে, অথবা তোমার নিকটস্থ হইতে প্রবৃত্তি হয় নাই। জানিতাম তাহাতে যন্ত্রণা ভিন্ন সুখ নাই। অদ্য সকল কথা প্রকাশ করিলাম; অদ্য তুমি সম্মুখে উপস্থিত; অদ্য চিত্ত বড় দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছে। অদ্য ভাবিতেছি তোমাকে ছাড়িয়াছিলাম কিরূপে।"

পদ্মাবতী বিশ্রামার্থে নিরুদ্ধ হইলেন। তিনি সাধ্যাতীত উচ্চৈঃস্বরে ঐ কথাগুলি বলিয়াছিলেন, এজন্য বিশেষ শ্রম বোধ হইল। অনেকক্ষণ বাদশাহের প্রতি স্থির দৃষ্টিতে থাকিয়া আবার কহিলেন,—

"বাদশাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর। এ পাপীয়সী তোমার নিকট বিস্তর দোষে দোষী। সে সকল দোষ সংখ্যাতীত। তাহার কোন্‌টী বলিব? আর কিই বা বলিব? পাপে হৃদয় লৌহবৎ কঠিন হইয়াছে বলিয়াই তোমার সহিত কথা কহিতে আমার লজ্জা জন্মিতেছে না। হৃদয় কথায় পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু আর কিছু বলিব না। আর বলিতেও পারিতেছি না। এক কথা, বাদশাহ! দাসীর অপরাধ সকল ক্ষমা কর।"

এই বলিয়া পদ্মাবতী জাহাঙ্গীরের হস্ত ধারণ করিলেন; জাহাঙ্গীর বাক্যহীন পুত্তলীপ্রায়, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। পদ্মাও অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। উভয়ে সেই ভাবে অনর্গল রোদন করিতে লাগিলেন।

উভয়েই বাহ্যজ্ঞান রহিত— সংজ্ঞাশূন্য। তাঁহাদের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন সেই প্রকোষ্ঠে নবকুমার প্রবেশ করিলেন। পদ্মাবতী অথবা জাহাঙ্গীর তাহা জানিতে পারিলেন না। নবকুমার তাঁহাদের ভাব লক্ষ্য করিলেন। তিনি ক্ষণার প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করিয়া বাহিরে গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সৌহৃদ্য-সংস্থাপনে।

"I may be your friend, and that perhaps, when you least expect it."
—Vicar of Wakefield.

যে আসন্ন বিপদ বদন ব্যাদান করিয়া নবকুমারকে বিভীষিকা দেখাইতেছে তাহা অতি ভয়ানক সন্দেহ কি? নবকুমার যে শঙ্কায় নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য। পদ্মাবতীর জীবনের কোন ভরসা নাই তাহা তিনি বুঝিয়াছেন, সুতরাং এই আগতপ্রায় অশুভ ঘটনার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। পদ্মার সহবাসে নবকুমার আপাততঃ শান্তি অনুভব করিতেছিলেন। তিনি সকল বিপদ ও সকল ক্লেশকে দলিত করিয়া এই সুখে উন্মত্ত ছিলেন। পদ্মার অপরাধাদির কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। পদ্মা, তাঁহার হৃদয় এতাদৃশ অধিকার করিয়া, তাঁহাকে মোহিত করিয়া, বিরক্তির কারণ হইতে আনন্দের মূলরূপে পরিবর্তিত হইয়া, এত অল্প দিনের মধ্যে অবনীধাম হইতে একেবারে প্রস্থান করিবেন ইহা অপেক্ষা তাঁহার দুঃখের বিষয় আর কি আছে?

নবকুমার, পদ্মাবতী ও বাদশাহকে তদবস্থাপন্ন দর্শন করিয়া অন্য এক প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন এবং নিতান্ত উদাসচিত্তের ন্যায় প্রকোষ্ঠ মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অল্প অল্প শীত পড়িয়াছে। তথাপি নবকুমার বাতায়ন-সন্নিহিত হইয়া ব্যস্ততা সহকারে তাহার দ্বার মোচন করিলেন। শীত-রজনী-স্বভাবসম্ভূত তিমিরাচ্ছন্ন প্রশস্ত রাজপথ সম্মুখীন হইল। তদুত্তরে কয়েকখানি ক্ষুদ্র গৃহ অন্ধকার মধ্যে স্তূপ স্তূপ দেখাইতে লাগিল। তৎপরেই প্রকাণ্ড প্রান্তর। তন্মধ্যস্থ বৃক্ষসকল ও পথপার্শ্বস্থ গৃহসকল শীত নিশান্ধকার হেতু একবিধ পদার্থ বলিয়া অনুমিত হইতেছে। বাতায়নের অতি নিকটে একখানি পালঙ্ক ছিল; নবকুমার বাতায়নের প্রতি মুখ করিয়া তদুপরি উপবেশন করিলেন। গাত্রে যে সমস্ত বস্ত্র ছিল একে একে সে সমস্ত উন্মোচন করিলেন। তাহাতেও দেহ শীতল হইল না। এজন্য বাতায়ন-দ্বারে বক্ষ রক্ষা করিলেন। বাতায়ন-দ্বার দিয়া শীতল বায়ু ঝির ঝির করিয়া তাঁহার বক্ষে লাগিতে লাগিল। কিন্তু তিনি কিছুতেই শীতলতা পাইলেন না। ভ্রান্ত! কি করিতেছ? একি সহজে শীতল হইবে! এ যে উত্তাপ তাহাতে জল দেও, তুষার দেও, অথবা জগতে যাহা কিছু শীতল বস্তু আছে সে সমস্ত দেও, তথাপি একটুও কমিবে না। নবকুমারের সেই সময়ের চিত্তের অবস্থা ভয়ানক। তিনি অনিত্য জগতের অনিত্যতা আলোচনা করিতেছেন। বাতায়ন মধ্য দিয়া এই ঘোরান্ধকার ভেদ করিয়া যতদূর দৃষ্টি চলে, তত দূর যেন রোগ, শোক, মরণ ইত্যাদি নানাবিধ আকারে পরিভ্রমণ করিতেছে, দেখিতে পাইতেছেন। যখন নবকুমার এইরূপে স্বীয় চিত্তের

উপর প্রভুত্ব হারাইয়াছেন," তখন সেই প্রকোষ্ঠে অপর এক ব্যক্তি প্রবেশ করিলেন। নবকুমার তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিলেন না; আগন্তুক ধীরে ধীরে নবকুমারের সন্নিহিত হইয়া তাঁহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিলেন। নবকুমার চমকিলেন। তিনি ব্যগ্রতা সহকারে আগন্তুকের মুখের প্রতি চাহিলেন এবং দেখিলেন—উমাপতি। আগন্তুক উমাপতি কহিলেন,—

"ভ্রাতঃ! কি ভাবিতেছ? অপ্রতিবিধেয় ভাবী ঘটনার নিমিত্ত চিন্তা করা মূঢ়ের কার্য্য।"

নব। না ভাই আমি তাদৃশ মূঢ় নহি। আমি আর এক চিন্তায় নিবিষ্ট ছিলাম। এই সংসার অনিত্য। এখানে কে চিরকাল থাকিবে? আশ্চর্য্য এই, মানুষ এমনই মায়ায় আচ্ছন্ন যে, প্রত্যহ শরীরের নশ্বরতা এবং জগতের অনিশ্চিততা সম্বন্ধে রাশি রাশি প্রমাণ দেখিতেছে, তথাপি তাহাদের হৃদ্বোধ জন্মে না। এই আমি—আমার মনে কতবার ঘটনাক্রমে এই কথা উদিত হইয়াছে, কিন্তু কখনই দুই দিবসের অধিক মনে থাকে নাই।

উমা। ঈশ্বরের ইহা একটী কৌশল। মানবগণ এরূপ মায়ায় আচ্ছন্ন না হইলে, জগতের কি ভয়ানক অবস্থা ঘটিত, তাহা স্থির করা যায় না। সে যাহা হউক, পদ্মাবতী এক্ষণে কেমন আছেন?

নবকুমার বিষণ্ণস্বরে কহিলেন,—"আমি এক্ষণে তাহাকে দেখি নাই। আর কি বা দেখিব ভাই? পদ্মাবতীর জীবনাশা সকলেই ত্যাগ করিয়াছেন।" এই বলিয়া নবকুমার একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

এই সময়ে তৃতীয় এক ব্যক্তি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। উভয়ের দৃষ্টি তৎপ্রতি সঞ্চালিত হইল এবং উভয়েই দণ্ডায়মান হইয়া আগন্তুককে অতীব সম্মান সহকারে অভিবাদন করিলেন। আগন্তুক স্বয়ং বাদশাহ জাহাঙ্গীর। জাহাঙ্গীর নিকটস্থ হইয়া পালঙ্কে উপবেশন করিলেন এবং নবকুমার ও উমাপতিকে সেই আসনে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা অগত্যা সঙ্কুচিত ভাবে এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

জাহাঙ্গীর নবকুমারকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"মহাশয়! আপনার সহিত অদ্য কয়েকটী কথা কহিতে ইচ্ছা করি। ভরসা করি, আপনি আমার কথায় কোন দোষ লইবেন না। লুৎ-পদ্মাবতীর এক্ষণে যে অবস্থা তাহা মহাশয় প্রত্যক্ষ করিতেছেন। এই আগতপ্রায় ঘটনায় আপনার হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হইবে সন্দেহ কি? কিন্তু মনে করিবেন না যে, এ ঘটনায় আমি কোন ক্লেশ পাইব না। আপনি বিজ্ঞ এবং বিবেচক। সরল ভাবে আমার কথা শুনিবেন। লুৎফউন্নিসা,—"আধুনিক পদ্মাবতীর সহিত পূর্ব্বে আমার কিরূপ পরিচয় ছিল, তাহা মহাশয় অবশ্যই কিছু না কিছু জানিয়া থাকিবেন। এরূপ অবস্থায় সে সকল মনে হইলে মহাশয়ের মনে পদ্মাবতীর উপর ঘৃণা জন্মিতে পারে। আপনি উন্নতচিত্ত বলিয়াই তাহার উল্লেখ করিতে সাহস—"

এই সময়ে নবকুমার বাদশাহের কথায় বাধা দিয়া কহিলেন,—"আপনি অলীক আশঙ্কা করিতেছেন। পদ্মাবতীর উপর ঘৃণা, যাহা হইবার তাহা এক সময়ে হইয়া গিয়াছে। এখন আর কিছুতেই পদ্মাবতীর সম্বন্ধে আমার মনোমালিন্য জন্মিবে না, ইহা নিঃসন্দেহ। পদ্মাবতীর সহিত আপনার পূর্ব্বে যে ভাব ছিল, তাহা আমি জানি। তাহার পরে পদ্মাবতীর সহিত আমার মিলন হয়। সে সকল জানিয়া শুনিয়াও যখন আমি পদ্মাবতীর উপর ঘৃণা ত্যাগ

করিয়াছি, তখন আবার সেই কথায় নূতন করিয়া অসন্তোষ জন্মিবে কেন ?"

বাদশাহ সন্তোষ সহকারে কহিলেন,—"উত্তম, আপনার এরূপ সংস্কারে আমি আনন্দিত হইলাম। এক্ষণে বলিতে বাধা নাই—এককালে এ হৃদয় সম্পূর্ণরূপে পদ্মাবতীর অধীনে ছিল। কিন্তু কালে সবই হয়। পদ্মার পাপ-কলুষিত মনেও কালে ধর্ম্মজ্যোতিঃ প্রবেশ করিল। পদ্মা তখন স্বামিসন্দর্শ পবিত্র সুখের অভিলাষিণী হইল। আমি তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিতাম। কিন্তু নানা কারণে আমি তাহার অভিলাষে ব্যাঘাত জন্মাই নাই। পদ্মা যে দিন আমার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করে, সে দিন কি ভয়ানক! তাহার কথা এক্ষণে কি বলিব ? যাহা হউক, অতি কষ্টে পদ্মাকে বিদায় দিলাম বটে, কিন্তু মনকে তো বিদায় দিতে পারিলাম না। যাহার সহিত কিছু দিন মাত্র পূর্ব্বে আমার এতাদৃশ সম্বন্ধ ছিল, তাহার বিয়োগে যে আমি নিতান্ত কাতর হইব তাহা বলা বাহুল্য।"

নব। তাহা বলার অপেক্ষা কি ? তাহা আমরা বেশ অনুমান করিতেছি।

বাদ। যাহা হইবে তাহা এক্ষণে কাহার সাধ্য নিবারণ করে ? মন যতই কেন ধীর ও সহিষ্ণু হউক না, এরূপ অবস্থায় কাতর হইবেই হইবে। এই দারুণ বিপদ ও শোকের মধ্যে এক লাভ এই যে, মহাশয়ের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় হইল। মহাশয়ের সহিত বিশেষ আলাপ থাকে এটী আমার সমূহ ইচ্ছা। ভাবিয়া দেখুন, এ ইচ্ছা অকারণ নয়। আমরা উভয়েই এক পদ্মাবতীর প্রণয়-লতিকায় সম্বন্ধ। আমাদের উভয়ের মধ্যে অন্ততঃ সবিশেষ নৈকট্য থাকা প্রার্থনীয় ও সুখের নয় কি ? আরও দেখুন, পদ্মাবতী সংসার হইতে যায়। তাহার ইতিহাস আমাদের দুই জনের যত মনে থাকিবে, এত আর কাহারও থাকিবে না। আমরা দুই জন আত্মীয় ভাবে থাকিলে অনেক শান্তি জন্মিবে। আমি মহাশয়কে এক পত্র লিখি। বোধ করি আপনি তাহা পাইয়া থাকিবেন।

নবকুমার বিনীতভাবে কহিলেন,—"আজ্ঞে হাঁ। নানাবিধ কারণে, বিশেষতঃ কি বলিয়া তাহার উত্তর দিব এই ভাবিয়া, এপর্য্যন্ত তাহার উত্তর দিতে পারি নাই। সে জন্য আমি অপরাধী আছি।"

বাদ। পত্রের কার্য্য এক্ষণে মুখেই চলিবে। পত্রে মহাশয়কে একটি নির্দ্দিষ্ট জায়গীর দিবার কথা ছিল। মহাশয় তাহাতে স্বীকৃত হইবেন কি না, তাহা না জানিয়া এ প্রস্তাব করা অন্যায়। কিন্তু ইহাতে স্বীকৃত হইলে আমি পরম সুখী হই।

নবকুমার নিতান্ত সঙ্কুচিত স্বরে কহিলেন,—"আমি এ বিষয়ে অনেক বিবেচনা করিয়াছি। ইহাতে অস্বীকার করিবার কোনই কারণ নাই। এ অধীন এরূপ সম্মান পাইবার উপযুক্ত নয়। আপনার অনুগ্রহ অপাত্রে ন্যস্ত হইতেছে ! যাহা হউক, সম্রাট্‌দত্ত উপহার, অস্বীকার করিতে আমার কি সাধ্য !

বাদ। বড় সুখী হইলাম। ভরসা করি, আমাদের আত্মীয়তা উত্তরোত্তর বিশেষ বর্দ্ধিত হইবে। চলুন, এক্ষণে মনেরও স্থিরতা নাই, শরীরও ক্লান্ত আছে—বিশ্রাম আবশ্যক।

এই বলিয়া বাদশাহ গাত্রোত্থান করিলেন। নবকুমার ও উমাপতি তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

স্তিমিত-প্রদীপে।

"পতিরঙ্কনিষণ্ণয়া তয়া
করণাপায় বিভিন্ন বর্ণয়া।
সমলক্ষ্যত বিভ্রদাবিলাং
মৃগলেখামুষসীব চন্দ্রমাঃ।"

রঘুবংশম্।

কৃতান্ত ক্রমশঃ পদ্মার জীবন বিনাশার্থ যে সকল উপায়ালম্বন করিতেছে, তাহার বিস্তারিত বর্ণন নিতান্ত ক্লেশকর। আমরা তাহার উল্লেখ করিব না। এমন দিন নাই, যে দিন নবকুমার দিনমানের অধিকাংশ রুগ্নার শয্যাপার্শ্বে অতিবাহিত না করিতেছেন; কিন্তু কোন দিন অধিকতর নিরাশা ভিন্ন আশার অঙ্কুরও হৃদয়ে স্থান পাইতেছে না।

দেখিতে দেখিতে সপ্তদশ দিন অতীত হইল। পদ্মার অঙ্গের অবস্থা বড় ভয়ানক। চিকিৎসকেরা অদ্যই পদ্মার জীবনের শেষ দিন স্থির করিয়াছেন। বৈকালে যখন নবকুমার রুগ্নার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন, তখন পদ্মা নিদ্রিতা। নবকুমার ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্তন করিয়া পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তথায় এক জন হাকিমের সহিত সাক্ষাৎ হইল। নবকুমার তাঁহাকে কহিলেন,—

"রোগিণী নিদ্রিতা; এই সময় একবার দেখিয়া আসিলে হয় না?"

হাকিম আজ্ঞা পালনে গমন করিলেন এবং অনতিবিলম্বে প্রত্যাগত হইলেন। নবকুমার জিজ্ঞাসিলেন, —"কি দেখিলেন?"

হাকিম। "যেরূপ নাড়ির গতিক, তাহাতে বোধ হয়, রাত্রি এক প্রহর, ছয় দণ্ডের মধ্যে বিবির জীবলীলা ফুরাইবে।"

নবকুমার একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তৎসহ তাঁহার লোচন হইতে দুই বিন্দু অশ্রু বিস্রুত হইল। হাকিম চলিয়া গেলেন। নবকুমার একান্তে বসিয়া স্বীয় অদৃষ্ট আলোচনা করিতে লাগিলেন। পদ্মাবতীর ও স্বীয় অদৃষ্ট আলোচনা করিতে তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তথাপি তাহা হইতে চিত্তকে বিরত করা অসাধ্য। অনেকক্ষণ পরে একজন পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল—"পদ্মাবতীর নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে। নিদ্রা ভঙ্গ সহকারে তাঁহার পীড়াও বাড়িয়াছে।"

নবকুমার তাহাকে বলিলেন,—"তুমি হাকিমের নিকট সংবাদ দেও। আমি চলিলাম।"

নবকুমার সত্বর রুগ্নার গৃহে গমন করিলেন। গমন সময়ে তাঁহার পদ কম্পিত হইতে লাগিল। বক্ষ-বেপন দ্রুত হইল। দারুণ ভীতি তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল।

পদ্মা, প্রণয় ও স্নেহপরিপূরিত হাস্যে নবকুমারের মুখের প্রতি চাহিলেন। নবকুমার নিকটস্থ হইয়া উপবেশন করিলেন, পদ্মা ক্ষণ পরে ধীরে ধীরে কহিলেন,—

"প্রাণেশ্বর"—এই বলিয়া নবকুমারের হস্ত ধারণ করিলেন। অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন,—

"প্রাণেশ্বর! তোমাকে কত কথা বলিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু এখন তো কিছুই মনে পড়িতেছে না। তুমি আমার প্রতি অসীম অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছ। আমি ততদূর অনুগ্রহের পাত্রী নহি। তথাপি তুমি আমাকে অনুগ্রহ করিয়াছ। তজ্জন্য তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অসম্ভব। তাহার প্রয়োজনও নাই। তুমি আমাকে অনুগ্রহ না করিলে কে করিবে? তোমার কর্তব্য কর্ম্ম তুমি করিয়াছ। কিন্তু আমি অভাগী, জীবনে তোমার সন্তোষ-

জনক কি কার্য্য করিয়াছি? আমি কবে তোমার সুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছি? তুমি আমার যে সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়াছ—আমার জ্বলন্ত হৃদয়কে শীতল করিয়াছ। তোমার গুণের সীমা নাই। কিন্তু আমি তো চলিলাম। তোমার অনুগ্রহের কিঞ্চিন্মাত্র প্রতিদান করা আমার সাধ্যাতীত। এ পাপীয়সীর তুমি যে কিছু হিত করিয়াছ, তাহা প্রতিদান প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় কর নাই—আমার তাহা সাধ্যও নহে। কিন্তু আমি পারি বা নাই পারি, ভগবান্ অবশ্যই তোমার গুণের প্রতিদান করিবেন, তিনি অবশ্যই তোমার মঙ্গল করিবেন।"

বলিতে বলিতে কয়েক বিন্দু অশ্রু পদ্মার নয়ন হইতে নিপতিত হইল। নবকুমার দারুণ মানসিক যাতনা প্রভাবে অবনত মস্তকে সমস্ত কথা শুনিতেছিলেন, হঠাৎ মস্তকোত্তোলন করিলেন। উভয়ের চক্ষু সংযত হইল। নবকুমার অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি স্বীয় নয়নোপরি পদ্মাবতীর হস্ত দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

এই সময় চারিজন হাকিম তথায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা রুগ্নার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। কিঞ্চিৎকাল সকলে পরামর্শ করিয়া একজন পার্শ্ব হইতে একটী বাটী লইয়া তাহাতে একটু তরল ঔষধ দিয়া, নবকুমারের কাণে কাণে কহিলেন,—

"শীঘ্র বিবির মোহ হইবার সম্ভাবনা আছে। সেই সময় বিবিকে এই ঔষধ সেবন করাইবেন। আমরা নিকটেই থাকিলাম। যদি তাহাতে উপকার না হয়, সংবাদ দিবেন।"

হাকিমেরা প্রস্থান করিল। নবকুমার প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন,—"প্রিয়ে পদ্মাবতি! আমার অদৃষ্ট বড়ই মন্দ। আমি তোমাকে"—

সে কথা না শুনিয়া অতি ক্লেশে কহিলেন,—"নবকুমার আমার বড় অসুখ হইতেছে। আর অধিকক্ষণ আমাকে ইহলোকে থাকিতে হইবে না বোধ হইতেছে। আমার হাত পা ঝিন্ ঝিন্ করিতেছে।"

নবকুমার চমকিত হইয়া পদ্মাবতীকে বিশেষ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, পদ্মার ভ্রূযুগ বিস্তৃত হইতেছে। লোচনতারা ঊর্দ্ধে উঠিতেছে এবং মস্তক স্পন্দিত হইতেছে। দেখিতে দেখিতে পদ্মা চেতনাহীন হইয়া নবকুমারের দিকে ঢলিয়া পড়িলেন। নবকুমার অতি ব্যস্ততা সহকারে এক হস্তে সেই ঔষধ গ্রহণ করিয়া অল্পে অল্পে পদ্মার মুখে দিতে লাগিলেন। অতি কষ্টে, অতি যত্নে ও অতি বিলম্বে কিঞ্চিৎ ঔষধ উদরস্থ হইল। ক্রমে ক্রমে পদ্মার একটু চেতনা হইতে লাগিল। অনতিবিলম্বে পদ্মার লোচনাদি পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইল। এই সময়ে বাহিরে কতকগুলি পদধ্বনি শ্রুত হইল। তৎক্ষণাৎ বাদশাহ, উমাপতি ও হাকিমেরা তথায় প্রবেশ করিলেন।

চিকিৎসকেরা রুগ্নাকে পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। বিশেষ করিয়া দেখিয়া একটু অন্তরে গিয়া বাদশাহের কাণে কাণে কহিলেন,—

"আর অন্যূন এক ঘণ্টা পরে বিবির আর একবার মোহ হইবে, সে মোহ ভাঙ্গিবে না। তাহাতেই বোধ করি বিবির জীবনান্ত হইবে।"

জাহাঙ্গীর একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রুগ্নার নিকটস্থ হইলেন। পদ্মাবতী কিয়ৎকাল তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। তিনি কহিলেন,—

"বাদশাহ! অন্তিম সময়ে আপনাকে আর কি বলিব? আমার জীবন তো যায়। আমি

চিরদিনের নিমিত্ত আপনাদের নিকট বিদায় লইতেছি। আর আমাকে মনে করিবেন না। আমি মরিব তাহাতে আমি স্বয়ং দুঃখিত নহি, আপনারা দুঃখিত হইবেন কেন? পাপিষ্ঠাকে মনে করিয়া কি সুখ?"

বাদশাহ শোকসন্তপ্ত স্বরে কহিলেন,—"পদ্মাবতি!" আর কথা বাদশাহের মুখ হইতে বাহির হইল না।

পদ্মা। বাদশাহ! আমি কে? আমি জগতের পাপস্রোত বৃদ্ধি করিতে জন্মিয়াছিলাম, যতদূর সম্ভব, তাহা করিয়াছি। আমি পাপিষ্ঠা। পাপিষ্ঠাকে কেন মনে স্থান দিবেন? আমার নাম সংসার হইতে বিলুপ্ত হওয়াই উচিত। কাহার হৃদয়ে তাহার চিহ্ন না থাকে, ইহাই আমার

বাদশাহ কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। সকলেই নীরব। কে কি বলিবেন? অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া পদ্মা আবার বলিলেন,—

"আমার অসুখ ক্রমেই বাড়িতেছে। কথা কহিতে বড় কষ্ট হইতেছে। কত কথা ছিল তাহা এক্ষণে বলিয়া উঠা অসম্ভব। আমার বোধ হইতেছে, মৃত্যু যেন একবার আমাকে গ্রাস করিয়াছে। যাহা হয় করুক। জীবিতেশ নবকুমার! (নিস্তব্ধতার পর) তোমাকে অনেক কথা বলিব। (নিস্তব্ধ) এক্ষণে আর বলিয়া উঠিতে পারি বোধ হয় না। এক কথা বলি—এটী আমার অনুরোধ স্বরূপ জানিবে। তুমি বল যে, ইহার পর কপালকুণ্ডলার নিমিত্ত যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিবে। (নিস্তব্ধ) যদি স্বীকৃত হও, তাহা হইলে আমার তো মৃত্যু উপস্থিত, আমি এ অবস্থাতেও কিয়ৎপরিমাণে শান্তি ও সুখ পাই। আর কিছু বলাও অসাধ্য।"

পদ্মাবতী নিস্তব্ধ হইলেন। তাঁহার নিতান্ত ক্লেশ বোধ হইল। তিনি নিতান্ত কাতর হইলেন। নবকুমার সজল নয়নে কহিলেন,—"প্রিয়ে! তোমার সুখের নিমিত্ত আমি বিষ-পানে প্রস্তুত, এ তো সামান্য কথা।"

এই সময়ে সকলেই লক্ষ্য করিলেন, পদ্মার পূর্ব্বের ন্যায় মোহের লক্ষণ উপস্থিত। পদ্মা অতি কষ্টে বলিলেন,—"আর বিলম্ব নাই। নবকুমার! স্বামিন্! আমাকে বিদায় দেও। ফুরাইল। আমি জন্মের মত"—

পদ্মার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। ব্যথিত-হৃদয় নবকুমার, ভগ্নকণ্ঠে কহিলেন,—"ভয় কি?" এই বলিয়া পদ্মার মস্তক ধারণ করিয়া স্বীয় উরুতে রক্ষা করিলেন। পদ্মার তখন সংজ্ঞা লোপ হইতেছে। তাঁহার নয়ন নিমীলিত হইয়া আসিতে লাগিল। তথাপি তিনি সজোরে নবকুমারের বদনের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণপরেই তাঁহার বাসনা পরাজিত হইল;—নয়ন নিমী-লিত হইয়া আসিল—চরম সময় উপস্থিত হইল। এই সময় পদ্মা একবার কথা কহিতে চেষ্টা করিলেন।

ন—ব" বলিয়া আর বলিতে পারিলেন না। জীবনের শেষ লক্ষণ সকল উপস্থিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ কয়েকবার অঙ্গুলি স্পন্দন করিলেন। তাহার অর্থ কে বলিবে? তিন বার মাত্র তিনি নিশ্বাসের নিমিত্ত বদন ব্যাদান করিলেন। প্রাণ-পক্ষী দেহ-পিঞ্জর ত্যাগ করিল। অবিকৃত পবিত্র ভাবে, পদ্মাবতীর জীবন-নাটকের শেষ অঙ্ক অভিনীত হইল। বহু যত্নপ্রাপ্ত আদরের ধন, নবকুমারের নাম তাহার জীবনের শেষ কথা হইয়া রহিল। জীবনবিহীন মস্তক, সুধময় আধান হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল। সূর্য্যদেব অস্তমিত হই-লেন, বসুন্ধরার আলোক নিবিল। তৎসহ

পদ্মাবতীর জীবনপ্রদীপও নির্ব্বাপিত হইল। জীবনে তাঁহার সুখ ছিল না। সুখের আশায় তিনি কি না করিয়াছেন? বৎসরেক হইতে তিনি কথঞ্চিৎ সুখে ছিলেন। সে সুখের দিন অন্ত ফুরাইল—সকলই ফুরাইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মোহে।

"He turned to the left—is he sure of sight,
There sat a lady youthful and bright.
—Byron.

পদ্মাবতীর মৃত্যুর প্রায় দেড় মাস কাল পরে, কালনার গঞ্জের প্রায় দুই ক্রোশ দক্ষিণে, গঙ্গা-বক্ষে, একখানি নৌকা উজান যাইতেছে দেখা গেল। পৌষ মাস—রাত্রিকাল—দারুণ শীত—দারুণ অন্ধকার। নৌকাবাহকেরা শীতে বড় কাতর হইল, এজন্য তীরে নৌকা লাগাইল, প্রাতে নৌকামধ্য হইতে দুই ব্যক্তি নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এক জন নবকুমার অপর উমাপতি।

উমাপতি কহিলেন,—"কল্য অন্ধকারে কোথায় নৌকা লাগাইয়াছিল, স্থির করিতে পারা যায় নাই। এখন দেখিতেছি, উপরে একখানি বেশ গ্রাম আছে।"

এই কথার পর উভয়ে নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন এবং এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই সময় এক জন স্নাত ব্রাহ্মণকে উমাপতি জিজ্ঞাসিলেন,—"মহাশয়, এ কোন্ গ্রাম?"

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—"যশিপুর।"

"যশিপুর" শুনিবামাত্র নবকুমার কিছু চঞ্চল হইলেন। সে ভাব অধিকক্ষণ থাকিল না। তৎক্ষণাৎ সমস্ত ভুলিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা একটি পথে উপস্থিত হইলেন। এটি গ্রামে প্রবেশ করিবার পথ। পথ পর্য্যন্ত আসায় তাঁহাদের গ্রামের মধ্য দেশ দেখিতেও ইচ্ছা হইল। বিবিধ কথাবার্ত্তায় অন্যমনস্ক হইয়া উভয়ে কতদূর গমন করিলেন। সম্মুখস্থ একটী ভবন তাঁহাদের চিত্তাকর্ষণ করিল। এতাদৃশ সামান্য গ্রামের পক্ষে এ ভবনটী গর্ব্ব-স্বরূপ। তাঁহারা উভয়ে এই আলয়টি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। নবকুমারের দৃষ্টি সৌধের ছাদের উপর সঞ্চালিত হইল। উমাপতির দৃষ্টি সে সময় অন্যদিকে ছিল। নবকুমার দেখিলেন,—আলুলায়িত-কুন্তলা, একটি পরমা সুন্দরী যুবতী রমণী একমনে পার্শ্বস্থ বন-শোভা সন্দর্শন করিতেছেন। তাঁহার বদনের এক পার্শ্ব মাত্র নবকুমারের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সহসা রমণীর মনের কি ভাবান্তর জন্মিল। তিনি সে স্থান ত্যাগ করিলেন। সেই সময়ে তাঁহার সুচারু বদন সম্পূর্ণরূপে নবকুমারের নয়নগোচর হইল। আর ভ্রম রহিল না। হৃদয়ে অগ্নি জ্বলিল। সে অগ্নি তেজ সহ্য করে, মনুষ্যের কি ক্ষমতা। চেতনা-শূন্য নবকুমারের দেহ ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। সহসা তাঁহার এবম্বিধ ভাব দর্শনে উমাপতি নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন। কি কারণে তাঁহার সহসা এরূপ হইল, তাহা তাঁহার চেতনা না হইলে জানিবার উপায় নাই প্রথচ তাহার প্রতীক্ষায় এরূপ অবস্থায় থাকাও বিহিত নহে বিবেচনায়, সত্বর এক ব্যক্তির সাহায্যে বাহক যানাদি সংগ্রহ করিয়া, নবকুমারের অচৈতন্য দেহ লইয়া নৌকায় গেলেন।

সেই দিবস সায়ংকালে নবকুমারের অচৈতন্য দেহ সহিত নৌকা নবদ্বীপের নিম্নে পঁহুছিল। ইতিমধ্যে নবকুমারের একবারও চৈতন্য হয় নাই এমন নহে। ক্ষণে ক্ষণে চেতনা হইয়াছিল। কিন্তু সে চেতনা ক্ষণস্থায়ী। ইতিমধ্যে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, উমাপতি তাহারও মর্ম্ম গ্রহণে সমর্থ হন নাই। নবকুমারের দেহ মথুরানাথের ভবনে নীত হইল। তথায় নানাবিধ চেষ্টায় সেই দিন রাত্রিশেষে নবকুমারের জ্ঞান হইল। তখন তিনি বলিলেন,—

"কপালকুণ্ডলা আছেন, আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি; সে বিষয়ে আমার আর সন্দেহ নাই। বিলম্বে আবশ্যক নাই। তোমরা চল; অদ্যই আমি তথায় যাইব। আমাকে এখানে কেন আনিলে?"

উমাপতি, মথুরানাথ, অধিকারী প্রভৃতি সকলে এতচ্ছ্রবণে অবাক্ হইলেন। অথচ এ কথাকে উপেক্ষা করিতেও সাহস করিলেন না। নবকুমার পুনরায় যশিপুর যাইবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইলেন, কিন্তু তাঁহার শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল থাকায়, আর চারিপাঁচ দিন পরে যাওয়া হইবে স্থির হইল।

অধিকারী প্রায় এক মাস পূর্ব্বে নবদ্বীপ আসিয়াছেন। নবকুমার আজি আসিবেন, কালি আসিবেন করিয়া এত বিলম্ব করিলেন, অধিকারী অগত্যা অপেক্ষায় থাকিলেন। তাঁহার ভবানী সেবার নিমিত্ত তিনি নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। এক্ষণে যে শীঘ্র যাইতে পারিবেন তাহারও সম্ভাবনা নাই। নবকুমারের শরীর সুস্থ না হইলে এবং কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধে যে কথা উঠিয়াছে, তাহা নিতান্ত অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব হইলেও তাহার শেষ না দেখিয়া তাঁহার যাওয়া হয় না। সুতরাং তিনিও এ কয় দিনের নিমিত্ত থাকিয়া গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রহস্যোদ্ভেদে।

"Yet heavensare just, and time
suppresseth wrongs.'
—Shakespeare.

দুই দিবস পরে নবকুমার ও উমাপতি মথুরানাথের আলয়পার্শ্বস্থ পথে দাঁড়াইয়া নানাবিধ কথা-বার্ত্তায় অন্যমনস্ক রহিয়াছেন। পথ বহিয়া নানাবিধ লোক গমন করিতেছে। সহসা উমাপতি বলিলেন,—

"ভট্টাচার্য্য মহাশয় দেখিতেছি! উনি কোথা হইতে আসিলেন?"

নবকুমার বলিলেন,—"কে উনি?"

উমা। মুক্তকেশীর পিতা।

ভট্টাচার্য্য তাঁহাদের নিকটস্থ হইলেন। উমাপতি ও নবকুমার তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। বিস্মিতের ন্যায় উমাপতি জিজ্ঞাসিলেন,—

"আপনি এখানে? মঙ্গল ত?"

ভট্টা। সমস্ত মঙ্গল। একটু প্রয়োজন হেতু আমি এ প্রদেশে আসিয়াছিলাম। সে কার্য্যের শেষ হইল না। এক্ষণে বাটী ফিরিতেছি। তুমি এখানে কেন আসিয়াছ?

উমাপতি নবকুমারকে দেখাইয়া কহিলেন, —"ইনি আমার বিশেষ আত্মীয়। আমাদের এক গ্রামেই বাটী। এখানে ইঁহার ভগ্নীপতির আবাস। তিনিও আমার পরিচিত। দেখা সাক্ষাৎ করিতে আশা হইয়াছিল। আমরা কল্যই বাটী ফিরিব, ভাল হইল, এক সঙ্গে যাওয়া ঘটিবে।

ভট্টাচার্য্য সম্মত হইলেন। সকলে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। ভট্টাচার্য্য ও অধিকারী নিকটস্থ হইলে তাঁহারা উভয়ে ক্ষণেক উভয়ের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। প্রত্যেকে অপরকে পরিচিত বিবেচনা করিতে লাগিলেন। সন্দেহ দূর হইয়া প্রতীতি জন্মিল। অধিকারী উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া ভট্টাচার্য্যের পদতলে পড়িয়া বলিলেন,—

"দাদা। আপনি কেমন আছেন? আপনার সহিত যে আর সাক্ষাৎ হইবে, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই।"

বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য গলদশ্রু লোচনে কহিলেন, —"হরিচরণ—।" এই বলিয়া অধিকারীকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহাদের চক্ষু দিয়া অবিরত আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। বাক্যে তাঁহাদের মনের ভাব বহন করিতে পারিল না। ক্রমে যত অন্তরের শান্তি হইতে লাগিল, ততই তাঁহারা নানাবিধ কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। নবকুমার ও উমাপতি বিস্ময়াবিষ্ট এবং হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহাদের দেখিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বাক্যালাপের মর্ম্মগ্রহণ করিতে না পারিয়া তাঁহারা আশ্চর্য্য হইতে লাগিলেন। অধিকারী কহিলেন,—

"তোমরা আশ্চর্য্য হইতেছ, হইতে পার। আমি তোমাদের সমস্ত কথা বলিব। শুনিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইবে। নবকুমার! আমি এক দিন কপালকুণ্ডলার পরিচয় দিব বলিয়া তোমার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম। বিধাতার অনুগ্রহে অদ্য সে দিন উপস্থিত হইয়াছে। শুনিয়া তোমরাও অবাক্ হইবে,—দাদাও অবাক্ হইবেন। দাদা একটু বিশ্রাম করুন পরে সে কথা বলিব।"

বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য কৌতূহল পরবশ হইয়া তখনই তাঁহাকে তাহা বলিতে অনুরোধ করিলেন। সকলেই এ প্রস্তাবে যোগ দিলেন।

অধিকারী বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

"দাদা! আপনার কন্যাকে আমি জীবিতা পাইয়াছিলাম এবং লালন পালন করিয়া বিবাহ দিয়াছিলাম। অদৃষ্টদোষে সকলই মন্দ হইল। নবকুমার! এই যাঁহাকে দেখিতেছ, ইনি কপালকুণ্ডলার পিতা, আমি উহাঁর খুল্লতাত পুত্র। সুতরাং আমরা উভয়েই তোমার শ্বশুর। নবকুমার ও ভট্টাচার্য্য হতবুদ্ধির ন্যায় সমস্ত কথা শুনিতে লাগিলেন। আমার সহিত তোমার এত নিকট সম্পর্ক তাহা এত দিন ব্যক্ত করি নাই, তাহার অনেক কারণ ছিল। সমস্ত শুনিলে বুঝিতে পারিবে। দাদার যখন প্রথম কন্যা হয় তখন আমি বাটী ছিলাম। সেই কন্যার নাম পূর্ণকেশী। তাহার যখন দুই বৎসর বয়স তখন আমি পলাশী ত্যাগ করিয়া হিজলী আসি। হিজলীর ভবানী চরণে কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে আমি আশ্রয় লইয়াছিলাম। আমি ইহা কাহাকেও বলি নাই।

"আমি হিজলীর ভবানীর সেবা করি এবং তথায় থাকি, এমন সময় একদিন সেই জটাজূটধারী কাপালিক একটী বালিকার হস্ত ধরিয়া আমার নিকট লইয়া আসিলেন। আমি সবিস্ময়ে দেখিলাম সে বালিকা অন্য কেহ নহে, আমারই ভ্রাতুষ্পুত্রী। কাপালিক কহিলেন, 'আমি ইহাকে সমুদ্র-তীরে কুড়াইয়া পাইয়াছি। তুমি ইহাকে যত্ন করিয়া রাখ। ইহা দ্বারা পরিণামে আমার বিস্তর কার্য্য-সিদ্ধ হইবে। আমি কখন কোথায় থাকি, কি করি, স্থির নাই; বিশেষতঃ সাংসারীর ন্যায় সন্তান লালন পালন কার্য্যে আমি নিতান্ত অশক্ত।

এজন্য বলিতেছি, এ বালিকা তোমার নিকট থাকুক। তুমি ইহাতে কি বল?"

"আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে, বালিকা আমার আপনার। আমি ইহার রক্ষণাবেক্ষণে অস্বীকৃত হইলে, কাপালিক ইহাকে সমুদ্র-তীরস্থ বনে লইয়া যাইবে। তথায় ইহার জীবন রক্ষা হওয়া সঙ্কট। আমি যদিও সংসারের প্রতি মমতাশূন্য, তথাপি স্নেহ কোথায় যাইবে? আবার কাপালিক যদি জানিতে পারে যে, এ বালিকার সহিত আমার এত নিকট সম্পর্ক, তাহা হইলে কখন তাহাকে আমার নিকট রাখিবে না। আমার নিকট না থাকিলে তাহার বাঁচিবারও আশা থাকিবে না। এই সকল কারণে সমস্ত কথা গোপন করিয়া কহিলাম, 'আপনার ইচ্ছানুসারেই কার্য্য হইবে। বালিকাকে আমিই রাখিব।' কাপালিক তাহাকে আমার নিকট রাখিয়া প্রস্থান করিল। কিন্তু প্রত্যহ আসিয়া বালিকাকে দর্শন ও তাহার তত্বানুসন্ধান করিত। এই সময় কাপালিক বালিকার কপালকুণ্ডলা এই নাম রক্ষা করিল। কপালকুণ্ডলা আমার যত্নে পালিত ও দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

"কপালকুণ্ডলা সেই বিজন বনে কি প্রকারে আসিল, তাহা জানিবার জন্য তাহাকে প্রথম দর্শনাবধি মন নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছিল। কিন্তু কি করি? সে কথা আমাকে সেখানে কে জানাইবে? কপালকুণ্ডলা বালিকা, তাহাকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা। আমি স্বয়ং যে তদ্বিষয়ে সন্ধান জানিবার জন্য গৃহাগমন করিব, তাহাও দুর্ঘট; কারণ অপোগণ্ড বালিকার জীবন আমার হস্তে ন্যস্ত। ক্রমে কপালকুণ্ডলা কথঞ্চিৎ স্বাধীন হইল। এই সময় যদি আমি কিছু দিনের নিমিত্ত স্থানান্তরে যাই, তাহা হইলে কপালকুণ্ডলার বিশেষ হানি সম্ভাবিত নহে। এজন্য অতঃপর কাপালিক আসিলে তাঁহাকে বলিলাম,—'ভগবন্! আমি দীর্ঘকাল বাটী যাই নাই। যদিও আমার বাটীতে স্ত্রী, পুত্র, পরিবার কেহ নাই সত্য, তথাপি জন্মভূমি সময়ে সময়ে দেখিবার নিমিত্ত সকলেরই অত্যন্ত ইচ্ছা জন্মে। এই কারণে আমি কল্য বাটী যাইব, স্থির করিতেছি। আমি শীঘ্র আসিব। যত দিন না আসি, তত দিন কপালকুণ্ডলাকে রক্ষা করিবেন।' কাপালিক অগত্যা আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ভবানীগৃহে অপর এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহার উপর সমস্ত কর্ম্মের ভার দিয়া আমি যাত্রা করিলাম।

"কত কি ভাবিতে ভাবিতে যে বাটী আসিলাম, তাহা এক্ষণে সবিস্তারে বলিবার আবশ্যক নাই। বাটী আসিয়া দেখিলাম,—চমৎকার! দাদার শূন্যভবন পতিত রহিয়াছে, তথায় কেহ নাই! প্রতিবেশীদিগকে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা কহিল,—তোমার দাদার জাতি গিয়াছে। তিনি সমাজচ্যুত হইয়া এস্থান ত্যাগ করিয়াছেন। অধুনা কোথায় আছেন আমরা জানি না।' আমি পুনরায় জিজ্ঞাসিলাম—'দাদা অতি নিরীহ মানুষ; তিনি এমন কর্ম্ম করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহাকে সমাজচ্যুত হইতে হয়? তদুত্তরে তাহারা কহিল,—'তাঁহার গৃহে ফিরঙ্গী প্রবেশ করিয়াছিল। তিনি ম্লেচ্ছস্পৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ করিয়াছেন। ফিরিঙ্গীরা তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে লইয়া পলাইয়াছে।' আমার মনের অন্ধকার অনেক দূর হইল। জিজ্ঞাসিলাম, 'ভাল, তিনি ম্লেচ্ছস্পৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ করিলেন কি প্রকারে? তাহাতে তাহারা বিরক্ত হইয়া উত্তর দিল—'তাহা আমরা জানি না। যাহা জানি তাহা

বলি শুন। অনেক দিন হইল, একবার ফিরিঙ্গী জাহাজে করিয়া যাইতেছিল। তাহারা আমাদের গ্রামের নীচে নোঙর করিয়া উপরে উঠিল। বিধাতার নির্ব্বন্ধক্রমে দস্যুরা তোমার দাদার গৃহেই প্রবেশ করিল এবং তাঁহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া অবশেষে জ্যেষ্ঠা কন্যাটীকে লইয়া জাহাজে উঠিল। অবিলম্বে জাহাজ ছাড়িল। গ্রামে জনরব উঠিল, ফিরিঙ্গীরা তোমার দাদাকে খৃষ্টান করিয়া গিয়াছে। একথা সত্য মিথ্যা ভগবান্ জানেন। ফলতঃ যাহাই হউক, তোমার দাদা এই কারণে সমাজচ্যুত হইলেন। সকলে তাঁহাকে লইয়া আমোদ করিতে আরম্ভ করিল। এরূপ অবস্থাতেও তিনি অনেক দিন এখানে ছিলেন। কিন্তু অধিক দিন এখানে থাকা বিড়ম্বনা বিবেচনায়, গ্রাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। অধুনা তিনি কোথায় আছেন, বা তাঁহার কি হইয়াছে, তাহা আমরা জানি না।' আমি শুনিয়া অবাক্ হইলাম। জানিতাম দাদা অতি ধীরপ্রকৃতি। তিনি বহুকাল হইতে নবাব সরকারের কর্ম্ম করিতেন। অন্যায় কার্য্যদ্বারা গ্রামস্থ লোকের হিতসাধন করিয়া প্রভুত্ব স্থাপন করা তাঁহার স্বভাবের বিরুদ্ধ ছিল। এজন্য তাবতেই তাঁহার উপর নিতান্ত বিরক্ত ছিল। তাহারা কোনরূপেই তাঁহাকে এ পর্য্যন্ত অপদস্থ করিতে পারে নাই। এক্ষণে একমত হইয়া এই উপায়ে তাহার উপর নির্য্যাতন করিয়াছে। সে যাহা হউক, আমি এক্ষণে দাদার সন্ধান করা নিতান্ত কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলাম। এজন্য বহুদিন নানা স্থানে তাঁহার অনুসন্ধান করিলাম। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলাম না। আমি যে হিজলীতে আছি, তাহা দাদা জানিতেন না; জগতে কেহই জানিত না। জানিলে দাদা অবশ্য আমাকে সংবাদ দিতেন। যাহা হউক, অগত্যা হতাশ হইয়া ভবানীগৃহে প্রত্যাগমন করিলাম।

"আমার আসিতে অনেক দিন বিলম্ব হইল। পুনরাগত হইয়া দেখিলাম, কাপালিক কপালকুণ্ডলাকে সমুদ্রতীরস্থ বনে লইয়া গিয়াছেন। কপালকুণ্ডলা এক্ষণে প্রকৃত যোগিনী বেশ ধারণ করিয়াছে। সেখানে অন্যবিধ পরিচ্ছদ বা ভূষণ দুষ্প্রাপ্য। তখন তাহার বয়স সাতবর্ষ মাত্র। সৌন্দর্য্য সংবর্দ্ধনে যাহা কিছু প্রয়োজনীয়, কপালকুণ্ডলার দেহে তৎসমস্তই ছিল। এই যোগিনীসজ্জায় সজ্জিত হইয়া তাহার যে কত শোভা হইয়াছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বনে বনে বনাধিষ্ঠাত্রী দেবীর ন্যায় ভ্রমণ করা তাঁহার স্বভাব হইয়া উঠিল। সন্নিহিত কাননের কোন স্থান তাহার অগোচর রহিল না। আমার নিকট প্রতিদিন, যে কোন সময়ে হউক, একবার আসিত। আমি তাহাকে দেখিলে কষ্টে মনোবেগ সংবরণ করিতাম। তাহার জন্য আমার ভয়ানক ভাবনা হইত। তন্ত্রমতাচারী দুরন্ত কাপালিক তাহাকে যে অভিপ্রায়ে সযত্নে প্রতিপালন করিতেছেন, তাহা আমার অবিদিত ছিল না। সুতরাং কপালকুণ্ডলাকে তাহার হস্ত হইতে নিস্তারের চেষ্টায় আমি বড় ব্যাকুল হইলাম।

"পিতা কে, মাতা কে, আমি কে, কাপালিক কে, কোথায় বাড়ী, এখানে কেন আসিল, এ সকল বিষয়ে কপালকুণ্ডলার অণুমাত্র জ্ঞান ছিল না। সুতরাং সে তৎসম্বন্ধে আমাকে কখনই কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত না। পাছে কপালকুণ্ডলার মনে তন্নিমিত্ত চঞ্চলতা জন্মে, এইজন্য আমি যথাসাধ্য সে সকল প্রসঙ্গ গোপন রাখিয়াছিলাম। সেও রহস্য উদ্ভাবনে সমর্থ হয় নাই। তাহার জ্ঞানে

সেই বনই সংসার। বিশ্বসংসার সেই সামান্য স্থানটুকুতে আবদ্ধ। সেই সমুদ্রতীরস্থ বন, সেই বেলাভূমি, সেই সকল হিংস্র জন্তু, সেই কাপালিক ইত্যাদি লইয়া পৃথিবী। ইহারই সাধারণ নাম সংসার। সরলা বালিকা আর কিছু জানিত না। সুতরাং সে কখনও চিন্তিত হইত না। কাপালিক মধ্যে মধ্যে দুই এক বিপন্ন ব্যক্তিকে ধরিয়া বলি দিতেন। কপালকুণ্ডলা তাহা জানিতে পারিল এবং তৎসম্বন্ধে স্বয়ংই মীমাংসা করিল যে, আমরা ছাড়া জগতে আরও কতকগুলি মনুষ্য আছে। তাহারা কাপালিকের বধার্থ সৃষ্ট হইয়া কোন স্থানে রক্ষিত হইয়াছে। কাপালিক প্রয়োজনানুসারে তাহাদিগের এক একটিকে লইয়া আইসে ও বলি দেয়। একদিন প্রসঙ্গক্রমে কপালকুণ্ডলা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—'কাপালিকের, বলি দিবার মনুষ্যেরা কোথায় থাকে?' তাহার কথায় আমার হাসি আসিল। আমি তাহাকে সংসারের কিছু কিছু সংবাদ যথাসম্ভব বুঝাইলাম; কাপালিক কেন তাহাকে এত যত্নে প্রতিপালন করিতেছে, তাহা যত দূর তাহার বুদ্ধিতে প্রবেশ করিতে পারে, তদ্দূর বলিলাম। কপালকুণ্ডলা সমস্ত শুনিয়া বিস্ময়-বিশিষ্ট ও ভীত হইল। সতীত্ব রত্ন যে নারী-জাতির প্রধান অলঙ্কার, আমি তাহাকে তাহা জানাইয়াছিলাম। সে নিজের অবস্থার নিমিত্ত চিন্তিত হইল। সোৎকণ্ঠায় কহিল,—'কি হইবে? কিরূপে মুক্ত হইব?' আমি কহিলাম, 'এস্থান হইতে পলায়ন ব্যতীত নিষ্কৃতি লাভ করা সুকঠিন। তাহাতে অনেক বাধা আছে। তুমি ভবানীর আশ্রিতা, চিন্তিত হইও না, ভবানী অবশ্যই তোমাকে রক্ষা করিবেন।'

"এই সময় কপালকুণ্ডলার পলাইবার সুযোগ হইয়াছিল। উত্তর অঞ্চল হইতে সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আমার একটী শিষ্য আসিয়াছিলেন। কপালকুণ্ডলা তাঁহার সহিত পলায়নের ইচ্ছা প্রকাশ করিল। কিন্তু আমার তাহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না। পর-পুরুষের সহিত পাঠাইতে আমার মন সরিল না। ভবানীর যাহা ইচ্ছা তাহা ঘটিবেই ঘটিবে, কাহার সাধ্য তাহার অন্যথা করে; আমি সে সঙ্গে কপালকুণ্ডলাকে পাঠাইলাম না। তখন কপালকুণ্ডলার বয়স বার বৎসর। ক্রমে সে যৌবনে পদার্পণ করিল। বন মধ্যে বনকুসুমের ন্যায় তাহার অতুল্য শোভা আপন মনে বিকসিত হইতে লাগিল। সে আমার বড় ক্লেশের কারণ হইয়া উঠিল। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে প্রতিনিয়ত কপালকুণ্ডলার কল্যাণকামনা ভিন্ন অন্য কিছুই আমার মনে হইত না। আমি তাহাকে লইয়া নিতান্ত বিব্রত হইয়া উঠিলাম। পরিণামে কপাল-কুণ্ডলার অদৃষ্টে কি হইবে ইহা ভাবিলে আমার গায়ে জ্বর আসিত—আমার শোণিত শুষ্ক হইত।

"নারীর মন স্বভাবতই পরের দুঃখ দেখিলে দ্রব হয়। কাপালিক যে সময়ে সময়ে বিপন্ন পথিক ধরিয়া বলি দিত, তাহাতে কপাল-কুণ্ডলা বড়ই ক্লেশ পাইত। কিছুদিন পরে এই নবকুমার ঘটনাক্রমে কাপালিকের চক্রে পড়িয়াছিলেন। কপালকুণ্ডলা সেই সময়ে ইহাঁকে অনেক যত্নে রক্ষা করিয়া আমার নিকট পলাইয়া আইসে। আমি দেখিলাম এ ঘটনায় কাপালিক কপালকুণ্ডলার উপর নিতান্ত বিরক্ত হইবে এবং তাহাতে কপাল-কুণ্ডলার বিলক্ষণ বিপদ সম্ভাবিত। ভাবিলাম, কপালকুণ্ডলা যাঁহার প্রাণরক্ষা করিল, তিনি অবশ্যই ইহাকেও রক্ষা করিবেন। পরিচয়ে জানিলাম নবকুমার সৎব্রাহ্মণ ও কুলীন।

প্রসঙ্গক্রমে বিবাহের কথা উত্থাপন করায়, ইনি কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলেন। আমি মহানন্দে, যথাসম্ভব শাস্ত্রানুসারে, দেবীর আলয়ে, এই নবকুমারকে কপালকুণ্ডলা সম্প্রদান করিলাম। দাদা! এই নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আপনার জামাতা।"

ভট্টাচার্য্য এতক্ষণ সংজ্ঞাশূন্য হইয়া অধিকারীর কথা শুনিতেছিলেন। এক্ষণে তিনি রোরুদ্যমান হইয়া নবকুমারকে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইলেন। অধিকারী তাঁহাকে সুস্থির করিয়া আবার কহিতে লাগিলেন,—

"পরদিন নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে লইয়া চলিয়া আসিলেন। এ সময়ে কপালকুণ্ডলার বয়স সপ্তদশ বৎসর। আমি অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হইলাম। ভাবিয়াছিলাম এক দিন না এক দিন কপালকুণ্ডলা সুখ কাহাকে বলে জানিতে পারিবে। সকলই বিপরীত হইল। মনে যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহার কিছুই হইল না।"

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে অপেক্ষাকৃত শান্তি লাভ করিয়া অধিকারী আবার কহিলেন,—

"প্রায় ছয় মাস হইল ভবানীর আলয় পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। আসিবার প্রায় বৎসরেক পূর্ব্ব হইতে আমি স্বপ্ন দেখিতাম যে, ভবানী মহেশমোহিনী সিংহবাহিনী রূপে আমার শিয়রে দাঁড়াইয়া, কহিতেন, —"বৎস! তোমার হৃদয় পাষাণবৎ কঠিন হইল কেন? তোমার কপালকুণ্ডলা সংসারে কত কষ্ট পাইতেছে, তুমি তাহা দেখিতেছ না কেন! এই মাত্র বলিয়া দেবমাতা অন্তর্হিতা হইতেন। আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইত। আমি থর থর করিয়া কাঁপিতাম। কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় শীঘ্র ভবানীর ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারিলাম না। কার্য্য হইতে অবকাশ প্রাপ্তিমাত্র আমি কপালকুণ্ডলার তত্ত্বে আসিলাম। সপ্তগ্রামে পৌঁছিলাম; তথায় নবকুমার নাই। অনুসন্ধানে জানিলাম, তিনি সপরিবার নবদ্বীপে তাঁহার ভগ্নীপতি মথুরানাথের বাটী গিয়াছেন। আমি নবদ্বীপ আসিলাম। এখানে নবকুমারের মুখে শুনিলাম,—অভাগিনী কপালকুণ্ডলা জলমগ্না হইয়াছেন!"

ভট্টাচার্য্যের মনে নিজ কন্যা সম্বন্ধে একটু নূতনবিধ আশার সঞ্চার হইয়াছিল। অধিকারীর সমস্ত কথা শুনিয়া তাঁহার সে আশা নির্ম্মূল হইয়া গেল। তাঁহার মনে যৎপরোনাস্তি শোক সমুপস্থিত হইল। অনেকক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিয়া ভট্টাচার্য্য কহিলেন,—

"সে নাই বলিয়া তো আমি অনেক দিন জানিয়াছি। মনে এমন ভরসাও করি নাই যে কখন তাহাকে পাইব। কিন্তু বাছা যে এত দিন জীবিত ছিল এবং সজ্জনের সহিত বিবাহিত হইয়া আমার এত নিকটে আসিয়াছিল, অথচ আমি তাহাকে আর একটিবারও দেখিতে পাইলাম না, ইহা বড় দুঃখের কথা; কিন্তু সহস্র দুঃখ হইলেও অদ্য আমার আনন্দের দিন। যেহেতু অদ্য আমি অসম্ভাবিত উপায়ে ভ্রাতা ও জামাতা লাভ করিলাম। বাপু নবকুমার! আমার কন্যা তোমার গৃহিণী হইয়াছিল। তাহার অদৃষ্টে যে এতদূর ঘটিয়াছিল, ইহাই বিস্ময়ের কারণ। আমি অদ্য তোমাকে পাইয়া বিস্তর আনন্দ লাভ করিলাম।"

অধুনা যে প্রকারে ও যে ভাবে নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে দেখিয়াছেন, তাহা অধিকারী ও ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে জানাইলেন। তদ্বিষয়ে অন্যের সহস্র সন্দেহ থাকিলেও নবকুমারের অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। ভট্টাচার্য্য ইহাতে বিশেষ আনন্দিত হইলেন না। তিনি বলিলেন,—"যাহার জীবনে একবিন্দু সুখ ছিল না, সেই অভাগী যে জলে ডুবিয়া আবার অসম্ভাবিত উপায়ে এবং ঈশ্বরানুগ্রহে পুনর্জীবন লাভ করিবে ইহা নিতান্ত দুরাশা। তবে ঐ পথ দিয়া বাটী যাইতে হইবে, তোমার মনে সন্দেহ জন্মিয়াছে, একবার দেখিতে হয় দেখিও।" এই বলিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

কিয়ৎকাল পরে অধিকারী জিজ্ঞাসিলেন,—"স্বস্থান ত্যাগ করার পর অবধি আপনি কোন্ স্থানে, কি ভাবে আছেন, জানিতে বড় ইচ্ছা জন্মিয়াছে।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন,—তুমি যাহা শুনিয়াছ, তাহাই বটে। আমাকে সেই বিপদের উপর গ্রামের লোকেরা সমাজচ্যুত করিল। আর আমাকে লইয়া যে কত আমোদ করিতে লাগিল, তাহা তোমাকে কি বলিব। এই সকল কারণে আমার মনে বড় ঘৃণা জন্মিল। সে স্থানে আর্ এক তিলও থাকিতে ইচ্ছা হইল না। কিন্তু কি করি? কোথাই যাই? কাহার নিকট আশ্রয় লইয়া এ সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করি? সপ্তগ্রাম সন্নিহিত গোপালপুর গ্রামে আমার এক পরম আত্মীয় আছেন। তিনি আমার সাহায্যে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হন এবং ক্রমশঃ স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধি-প্রভাবে অতি উন্নত পদে আরূঢ় হন। তাঁহার নাম হরিহর। তিনি এই উমাপতির মাতুল। যদিও আমি হরিহরের অপেক্ষা বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ নহি এবং যদিও আমি তাঁহার বিশেষ কোন উপকার করি নাই, তথাপি হরিহর স্বীয় সৌজন্য ও মহত্ত্বহেতু আমাকে গুরুদেবের ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করেন। নিজ গ্রাম মধ্যে হরিহর অদ্বিতীয় ধনী, বুদ্ধিমান্ ও বিদ্বান্; এজন্য গ্রামের তাবৎ লোক তাঁহার অধীনতা স্বীকার করে। আমি তাঁহার নিকট যাইয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতে ইচ্ছুক হইলাম। তাঁহারই পরামর্শ ক্রমে আমি গোপালপুরে লুক্কায়িত ভাবে বাস করিতে লাগিলাম। হরিহরের যত্নে এখানে সকলেই আমাকে শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। পলাসীর কোন লোক, সহসা আমি কোথায় গেলাম, অথবা আমার কি হইল, তাহা জানিতে পারিল না।

"আমার উপার্জ্জিত যে অর্থ ছিল, তাহা ফিরিঙ্গিরা লুঠিয়া লইয়াছিল, সুতরাং নিঃস্ব হইলাম। একটু ভূমি সম্পত্তি ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাইলাম, তাহার কিয়দংশ দ্বারা গোপালপুরে বাসোপযোগী একটী সামান্য বাটী হইল। অপর অংশ হরিহর কারবারে খাটাইতে লাগিলেন। তাহার উপস্বত্বে আমাদের চলিতে লাগিল। আমার অনুরোধে হরিহর আমার অপহৃত কন্যার নিমিত্ত নানা স্থানে অনুসন্ধান করিলেন; আমিও যথাসাধ্য অনুসন্ধানে ত্রুটি করিলাম না। কিন্তু কিছুই হইল না। দেশ ত্যাগ করার কিছু দিন পরে আমার একটি কন্যা হইয়াছিল, তাহার নাম মুক্তকেশী।

"ক্রমে মুক্তকেশীর বিবাহের সময় হইল। কিন্তু তাহার বিবাহের পক্ষে বড় বিঘ্ন হইল। আমার বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া কে আমার কন্যাকে গ্রহণ করিবে? বিশেষ অনুসন্ধান করিতে হইলে পলাসীর লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে। তাহারা কখনই ভাল বলিবে না। এই কারণে হরিহরের সম্মতি ও পরামর্শানুসারে

বিবাহের বিশেষ বিলম্ব হইল। সম্প্রতি বিধাতার অনুকম্পায় ও মুক্তকেশীর শুভাদৃষ্ট ক্রমে, এই উমাপতির সহিত তাঁহার বিবাহ স্থির হইয়াছে। মাঘ মাসে বিবাহ দিব সংকল্প করিয়াছি। এ প্রদেশে আমাদের দুই এক জন জ্ঞাতি কুটুম্ব আছেন তাহা তুমি জান। পাছে, গ্রামে সমাজচ্যুত হইয়াছি শুনিয়া, তাঁহারা আমাকে ঘৃণা করেন, এই ভয়ে আমি এতদিন তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎও করি নাই, সংবাদাদিও দিই নাই। এক্ষণে আমার আর সে ভাবনা নাই। কন্যার বিবাহ লইয়া ভাবনা ছিল, সে ভাবনার প্রতিবিধান হইয়াছে, আর আমার ভয় কি? তাঁহাদের সমস্ত বলিয়া বাটী যাইতেছি। বিধাতার ইচ্ছায় পথে এই তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ। মনে যাহা ভাবি নাই, যাহা কখন আশা করি নাই, তাহা অদ্য ঘটিল। অদৃষ্টে যত দুঃখ ছিল, তাহা ঘটিয়াছে, আর ভগবানের মনে কি আছে কি জানি। নবকুমারের মনে যে সন্দেহ হইয়াছে, তাহা যদিও অসম্ভব ও অঘটনীয়, তথাপি বাটী যাইবার ঐ পথ। কল্য তোমরা বাটী যাইবে, সে সন্দেহও ভঞ্জন করিও।"

এইরূপ কথাবার্ত্তায় যুগপৎ আনন্দে ও শোকে সে দিন কাটিয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সুসংবাদে।

"কঃ ঈপ্সিতার্থং স্থিরনিশ্চয়ং মনঃ।"

—কুমারসম্ভবম্।

পরদিন প্রত্যুষে সকলে যাত্রা করিয়া সমুচিত সময়ে যশিপুর পৌছিলেন। অনতিবিলম্বে তাঁহারা জমিদার রামদাস রায়ের ভবনোদ্দেশে গমন করিলেন। তথায় যাইয়া যাহা শুনিলেন, তাহাতে সকলেই হতাশ হইলেন। শুনিলেন, রামদাস সপরিবারে তীর্থভ্রমণে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার বাটীতে কেহ নাই। তাঁহার বৈষয়িক কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ তাঁহার কার্য্যাধ্যক্ষ তথায় অবস্থান করিতেছেন। এ সংবাদে অন্যের যত মনঃপীড়া হউক না হউক, নবকুমার নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। অন্যেরা যাহা বিশ্বাস করে নাই, অথবা যাহা আশা করে নাই, তাহা না হওয়ায় তাহাদের তাদৃশ মনঃপীড়া জন্মিল না। কিন্তু যে ব্যক্তি কোন বিষয়ের সুখের পরিণাম সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয়, তদন্যথায় তাহার নিতান্ত ক্লেশ হইবে সন্দেহ কি? নবকুমার এ সংবাদে নিতান্ত ক্লিষ্ট হইলেন। কপালকুণ্ডলা আছেন এবং তাঁহাকে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইবে, এ আশা কেহই হৃদয়ে স্থান দেন নাই, কেহই ইহা বিশ্বাস করেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের বিশেষ নূতন কোন ক্লেশ হইল না। কিন্তু নবকুমার নিশ্চয় জানিয়াছিলেন যে, কপালকুণ্ডলা আছেন। যদি মনুষ্য স্বকীয় দর্শনকে অপ্রত্যয় না করে, নবকুমার তাহা হইলে কপালকুণ্ডলা আছেন তাহাতে স্থিরনিশ্চয় না হইবেন কেন? সুতরাং এ সংবাদে নবকুমারের ক্লেশ অধিক হইবে, তাহা বলা বাহুল্য।

আর তথায় অনর্থক অপেক্ষা করিয়া কি হইবে বিবেচনায় সকলেই প্রত্যাবর্ত্তনের নিমিত্ত ব্যস্ত হইলেন। নবকুমার এ প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন না। সকলে তাঁহাকে অনর্থক কালক্ষেপ করিতে নিষেধ করিলেন। নবকুমার কহিলেন,—"আমি এ বিষয়ে সবিশেষ সন্ধান না লইয়া যাইব না। আপনাদের

প্রয়োজন থাকে যাইতে পারেন। আমি যাইব না।"

তাঁহারা অতঃপর নবকুমারের কথায় প্রতিবাদ করা অবিধেয় বোধ করিয়া বলিলেন,—"তবে এক্ষণে কি করিবে কর।"

নবকুমার তাঁহাদের সঙ্গে লইয়া রামদাসের কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট গেলেন। কর্ম্মাধ্যক্ষ জাতিতে কায়স্থ, প্রাচীন, বুদ্ধিমান্ এবং বিজ্ঞ। ব্রাহ্মণ দর্শনে কর্ম্মাধ্যক্ষ গাত্রোত্থান করিলেন এবং ভক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া, তাঁহাদের বসিতে বলিলেন। সকলে উপবেশন করিলে, কর্ম্মাধ্যক্ষ এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

নবকুমার তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"মহাশয়ের নাম ?"

কর্ম্মা। আমার নাম শ্রীমধুসূদন বসু।

নব। আপনি এ সংসারের কর্ম্ম করেন ?

মধু। পিতৃপিতামহক্রমে আমরা এই অন্নে পালিত। সম্প্রতি মহাশয়দের কি অভিপ্রায়ে শুভাগমন হইয়াছে ?

নব। ক্রমে জানাইতেছি। আপাততঃ গৃহস্বামী কোথায় ?

মধু। কর্ত্তা মহাশয় দুই দিন অতীত হইল সস্ত্রীক তীর্থপর্য্যটনে যাত্রা করিয়াছেন। সন্তানাদি অভাবে তিনি বিষয় কর্ম্মে বিশেষ মনোযোগী নহেন। প্রায়ই এরূপ গিয়া থাকেন।

নব। তিনি সস্ত্রীক গিয়াছেন, আর কেহ সঙ্গে যায় নাই ?

মধু। আর একটি ব্রাহ্মণ-কন্যা সঙ্গে আছেন। তিনি কর্ত্তা ও কর্ত্রী উভয়ের অত্যন্ত স্নেহের পাত্র। তাঁহারা ইঁহাকে এক মুহূর্ত্ত চক্ষুর অগোচর হইতে দেন না। অন্য সন্তানাদি অভাবে, ইনি তাঁহাদের প্রাণ স্বরূপ। বাস্তবিক তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকা অসম্ভব।

নব। তাঁহার বয়স কত—তাঁহার প্রকৃতি কিরূপ ?

মধু। তাঁহার বয়স অনুমান দ্বাত্রিংশ বর্ষ হইবে। প্রকৃতির কথা কি বলিব ? তেমন ধীর, শান্ত, নির্ম্মল স্বভাব জগতে আর আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু তাঁহার অন্তরে সুখ নাই। তিনি সতত যেরূপ বিমর্ষ ভাবে থাকেন, তাহা দেখিলে দুঃখ হয়। খলতা, কপটতা, কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানেন না। গৃহিণী ঠাকুরাণী আদর করিয়া তাঁহাকে উন্মাদিনী বলিয়া ডাকেন। তিনি এখানে ঐ নামেই পরিচিতা।

নব। তাঁহাকে আপনারা কোথায় পাইলেন ?

মধু। কর্ত্তা তাঁহাকে আনিয়াছিলেন। শুনিয়াছি কর্ত্তা কোন ঘটনাক্রমে নৌকাযোগে আসিতেছিলেন। অতি প্রত্যূষে ত্রিবেণীতে প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিবার নিমিত্ত নৌকা হইতে অবতরণ করেন। তথায় গঙ্গার চড়ায় উন্মাদিনীর মৃতপ্রায় দেহ পতিত দেখিতে পান। তিনি বিস্ময়সহকারে মৃতার অসামান্য সৌন্দর্য্য ও জীবিতের ন্যায় আবিকৃত ভাব দর্শন করিতেছিলেন; এমন সময় তাঁহার বোধ হইল বাস্তবিকই রমণী এখনও জীবিতা আছেন। তিনি সত্বর লোকজন ডাকিয়া, বহু শুশ্রূষায় তাঁহাকে জীবিত করিলেন এবং গৃহে আনিয়া কন্যার ন্যায় যত্ন ও স্নেহে পালন করিতে লাগিলেন।

নব। তাঁহার পূর্ব্ব পরিচয় কিছু জ্ঞাত আছেন ?

মধু। কর্ত্তা, গৃহিণী এবং আমি উন্মাদিনীর পূর্ব্ব পরিচয় জ্ঞাত আছি। অন্যে কিছু জানে না। কিন্তু আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে, আমরা সে কথা প্রকাশ করিব না বলিয়া বিশেষ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি। যাহা বলি-

য়াছি, এতদূর ব্যক্ত করাও উন্মাদিনীর অভিপ্রেত নহে। তথাপি আপনারা ব্রাহ্মণ, বিদেশ হইতে আসিয়াছেন বলিয়া এতদূর বলিলাম। অতঃপর আর কিছু বলিতে পারিব না।

নবকুমার কম্পিতস্বরে কহিলেন,—"আমি আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে চাহি না। আপনি যাহা বলিবেন না, তাহা আমি বলিতেছি। আপনারা যাঁহাকে উন্মাদিনী বলেন, তাঁহার পূর্ব্ব নাম কপালকুণ্ডলা, এ নাম তাঁহার বালরক্ষক কাপালিক প্রদত্ত। সপ্তগ্রাম নিবাসী দুর্ব্বৃত্ত, পাপী নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার স্বামী—"

এই সময় বসুজ তাঁহার কথায় বাধা দিয়া কহিলেন—"মহাশয়ের নাম কি ?"

নবকুমার বিকম্পিত কণ্ঠে উত্তর করিলেন, —"আমার নাম কেন জিজ্ঞাসিতেছেন ? আমার নাম জগতে যত অপ্রকাশিত থাকে ততই মঙ্গল। আমিই সেই ঘোর নারকী নবকুমার। আমি ভদ্রের সহিত একাসনে বসিবার উপযুক্ত পাত্র নহি। কপালকুণ্ডলা আছেন, নিশ্চয় হইল। এক্ষণে আর বিলম্ব সহে না। বসুজ, কোথায় কপালকুণ্ডলা বলুন,—আমি তাঁহার সমক্ষে এ প্রাণ ত্যাগ করিব।"

কেহই রোদন সংবরণ করিতে পারিলেন না। অসম্ভব আশা সফল প্রায় হইল। হৃদয়ে আনন্দ উথলিয়া উঠিল। কাহার সাধ্য নয়নজল নিবারণ করে ?

বসুজ নবকুমারকে কহিলেন,—"মহাশয় ব্যস্ত হইবেন না। কপালকুণ্ডলা আছেন নিশ্চয়। আজ না হয় দশ দিন পরে আপনি তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবেন।"

নবকুমার কহিলেন,—"মহাশয় ! এত দিন কপালকুণ্ডলা নাই বলিয়া জানিতাম, তাহাও প্রাণে সহিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে এক মুহূর্ত্তও সহ্য হইতেছে না। আপনি বলুন, তাঁহারা প্রথমে কোন্ তীর্থে গমন করিবেন। আমি এখনই তাঁহাদের অনুসরণ করিব।

মধু। তাঁহারা প্রথমে ৺ কালীমাতাকে দেখিবার জন্য কালীঘাট যাইবেন, সংকল্প আছে।

নব। আমি চলিলাম। যেমন করিয়া হউক, কপালকুণ্ডলার সহিত পুনঃসাক্ষাৎ না করিয়া আমি অন্ন জল গ্রহণ করিব না। আপনি বসুন। আমি বিদায় হই।

সকলেই এই প্রস্তাবে একমত হইলেন এবং সকলেই গাত্রোত্থান করিলেন।

মধু। মহাশয়েরা শ্রান্ত আছেন। একটু অপেক্ষা করিয়া বিশ্রাম করিলে ভাল হয়।

অধিকারী কহিলেন,—"মহাশয়কে আমরা কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিতেছি। আপনার নিকটে আমরা চিরকাল বদ্ধ রহিলাম। যদি বিধাতা দিন দেন, আপনার সহিত অনেকবার সাক্ষাৎ হইবে। এক্ষণে বাধা দিবেন না।"

মধুসূদন সকলকে প্রণাম করিলেন। সকলে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

গত-চিন্তনে।

"Thou art too good, and I indeed unworthy,
Unworthy of so much virtue.'
—Ottway.

অদ্য পৌষ-সংক্রান্তি—ত্রিবেণী জনাকীর্ণ। অদ্য গঙ্গাস্নানে মুক্তিলাভাশয়ে নানাদেশ হইতে

ব্যক্তিবর্গ সমাগত হইয়া এই স্থান কলরবে পূর্ণ করিয়াছে। সমাগত জনগণের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সংকুলনের নিমিত্ত, সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য বিপণি বসিয়াছে, এবং তাহাদের আশ্রয় স্থানের নিমিত্ত বহুসংখ্যক তৃণাচ্ছাদিত গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। গঙ্গার তট ও বক্ষ নৌকায় আবৃত। কত নৌকা আসিতেছে নির্ণয় কে করে? এই সময়ে নবকুমার প্রভৃতি যে নৌকায় ছিলেন, তাহা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহারা যখন যশিপুর হইতে যাত্রা করেন, তাহা পাঠকগণ জ্ঞাত আছেন। কল্য তাঁহাদের আহার হয় নাই। এজন্য তাঁহারা অদ্য এই স্থানে নামিয়া গঙ্গাস্নান ও আহার করিতে মনস্থ করিলেন। বাজারের প্রান্তদেশে তাঁহারা বাসোপযোগী দুই খানি ঘর স্থির করিলেন। তাহার পার্শ্বে আরও অধিকৃত অনেক ঘর ছিল। মধ্যে পথ। পথের উভয় পার্শ্বে এইরূপ গৃহসমূহ। তাঁহাদের পার্শ্বস্থ কয়েক খানি গৃহ একজন অধিকার করিয়াছে বোধ হইল।

নবকুমারের মনের অবস্থা বড় ভয়ানক আশা, ভীতি, আশঙ্কা, লজ্জা ও আনন্দ তাঁহার হৃদয়ে পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত হইয়া, বিরূপে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাহার বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। সংসার আশার মায়ায় আচ্ছন্ন। মানবহৃদয় মাত্রই আশারাশি পরিপ্লুত। অতি দুঃখের সময়ও আশা আসিয়া সুখের বার্ত্তা কহে, ও সুখ অনায়াসলভ্য বলিয়া বোধ জন্মায়। মনুষ্য দুর্দ্দমনীয় বেগে তৎপ্রতি ধাবিত হয়। কুহকিনী আশা নবকুমারের কর্ণেও মন্ত্র চালিত করিল। আশার দিগন্তব্যাপক ক্ষিপ্র পক্ষে আরোহণ করিয়া, কখন তাঁহার মন কপালকুণ্ডলার নিষ্কলঙ্ক হাস্যময় বদনে চুম্বন করিতে লাগিল, কখন বা তাঁহার চরণতলে পতিত হইয়া দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিতে লাগিল, কখন বা আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া বিগত দুঃখের কথা আলোচনা করিতে লাগিল। পরক্ষণেই আশার কুহক ত্যাগ করিল; অমনই পাছে কপালকুণ্ডলাকে না পাই বলিয়া আশঙ্কায় তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইল। প্রেমময়ী মৃণ্ময়ীর সমক্ষে তিনি কি বলিয়া কথা কহিবেন এবং কিরূপেই বা স্বীয় নিষ্ঠুর নীচদৃষ্টি তদীয় দয়াময় পবিত্র দৃষ্টির সহিত সংমিলিত করিবেন, এ চিন্তা তাঁহাকে দারুণ ম্রিয়মাণ ও লজ্জিত করিতে লাগিল। কখন বা, কপালকুণ্ডলা জীবিতা আছেন, অদ্য হউক, বা দশ দিন পরে হউক, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবেই হইবে, এই অপার আনন্দ তাঁহার মনকে নাচাইতে লাগিল। এই সকল বিষয় আলোচনা করিতে করিতে কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধীয় আমূল কথা তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। সেই নব-জলধর-নিভ নীল-সমুদ্র-তটস্থ বনমধ্যে যে আগুলফলম্বিত কেশরাশি-সমবৃতা রমণীরত্ন দর্শন করিয়া তাঁহার চিত্রিত পুত্তলী অথবা দেবী বলিয়া ভ্রম জন্মিয়াছিল, তাহা মনে পড়িল। "পথিক! তুমি পথ হারাইয়াছ?" বীণা-বিনিন্দিত সুমধুর স্বরে কপালকুণ্ডলা প্রথম সাক্ষাতে, নবকুমারকে এই কথা বলিয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িল। কর্ণের মধ্যে এখন যেন সেই স্বর, সেই কথা আবার বাজিয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে যেন সেই ধ্বনির দ্বিগুণতর প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধে আর কত কথা মনে হইল তাহার সংখ্যা নাই। প্রতি মুহূর্ত্তের কথা মনে পড়িতে লাগিল। দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে অস্ফুট স্বরে নবকুমার কহিলেন,—

"হায়! সেই কপালকুণ্ডলা এক্ষণে কোথায়? আমি কি নরাধম! এতাদৃশ হিতকারিণীর

সুখ সম্বর্দ্ধন করা দূরে থাকুক, আমি তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিয়াছি। কপালকুণ্ডলার জীবন যায় নাই।"

জীবন যায় নাই মনে হইবামাত্র তাঁহার সাক্ষাতে কত কথা বলিতে হইবে বলিয়া মনে হইতে লাগিল। অমনই নিজ অসদ্ব্যবহারজনিত সঙ্কোচ জন্মিল। ভাবিলেন,—"কপালকুণ্ডলার চরিত্র সরলতায় পূর্ণ; রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি কোন হীনবৃত্তি তাঁহার অন্তরে স্থান পায় না। আমি তাঁহার নিকট বিস্তর দোষে দোষী সত্য; তথাপি কপালকুণ্ডলা আমাকে ক্ষমা করিবেন। না করেন—আমি তাঁহার চরণ ধারণ করিব। কিন্তু সে সন্দেহ নিষ্প্রয়োজন। কপালকুণ্ডলা আমাকে ক্ষমা করিবেন না, ইহা অসম্ভব। তাঁহার স্বভাব আমার ন্যায় নীচ নহে। তিনি আমার ন্যায় দুরাচার নহেন। রমণীর হৃদয় দয়ায় পূর্ণ; বিশেষতঃ কপালকুণ্ডলার হৃদয়। আমাতে ও কপালকুণ্ডলাতে লক্ষ যোজন অন্তর। প্রণয় দূরে থাকুক, আমি তাঁহার সহিত কথা কহিবারও উপযুক্ত পাত্র নহি। কপালকুণ্ডলা স্বর্গীয়া দেবী, আমি ঘোর নারকী। আমি কোন্ মুখে তাঁহার সমক্ষে দাঁড়াইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিব? কিই বা বলিব? আমার অপরাধের বাকি আছে কি? আমি কপালকুণ্ডলার চরণ ধরিয়া অকপটে সমস্ত অপরাধ স্বীকার করিব। তাঁহার চরণ নয়ন-জলে সিক্ত করিব। তিনি ক্ষমা না করিলে এ জীবন রাখিব না। কপালকুণ্ডলাকে ধ্যান করিতে করিতে জলন্ত বহ্নিতে জীবন ত্যাগ করিব। কপালকুণ্ডলার ক্ষমা লাভ না করিয়া জীবন ধারণের ফল কি?" নবকুমার একান্তে বসিয়া এইরূপ আলোচনা করিতেছেন, কপালকুণ্ডলাকে বলিবেন বলিয়া কত কথাই মনে করিতেছেন, কত ভাবই মনে জন্মিতেছে। অন্ত তিনি অধিকক্ষণ একস্থানে থাকিতে পারিতেছেন না। আশ্চর্য্য চঞ্চলতা তাঁহার গম্ভীর প্রকৃতিকে অধিকার করিয়াছে। কোন কার্য্যেই তিনি মন নিবিষ্ট করিতে পারিতেছেন না। অত্যন্ত চিত্তগ্রাহী ব্যাপারেও তিনি চিত্তকে বদ্ধ করিতে পারিতেছেন না। মনের এই প্রকৃতি। মন একেবারে দুইটী বিষয়ে নিবিষ্ট হইতে পারে না।

দশম পরিচ্ছেদ।

মিলনে।

"উপরাগান্তে শশিনঃ সমুপগতা রোহিণীযোগম্।"।
—অভিজ্ঞান শকুন্তলম্।"

যে স্থানে বসিয়া নবকুমার তদ্বিধ চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, সে স্থানে আর অধিকক্ষণ থাকিতে ভাল লাগিল না। উমাপতিকে আহ্বান করিলেন। উভয়ে গৃহের বিপরীত দ্বার দিয়া পশ্চাৎ ভাগস্থ আম্র বৃক্ষের ছায়ায় গমন করিলেন। সেখানে আর মনুষ্য নাই। সে স্থানটিকে ঐ গৃহের প্রাঙ্গণ বলিলে বলা যায়। প্রাঙ্গণের তিন দিক বেড়াদ্বারা অবরুদ্ধ; এক দিকে একখানি অপর লোকের গৃহ। এই পতিত ভূমি-খণ্ডের দিকে তাহার পশ্চাৎ। পশ্চাতে একটি বাতায়ন বা ক্ষুদ্র গবাক্ষ। নবকুমার ও উমাপতি সেই গৃহের সন্নিহিত বৃক্ষ-ছায়ায় উপবেশন করিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। নবকুমার কহিলেন,—

"দেখিলে ভাই! আমি অলীক আশাকে হৃদয়ে স্থান দিই নাই! আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম বলিয়াই ও বিষয়ে এতাদৃশ দৃঢ় হইয়াছিলাম।"

উমা। যাহা হইবার নহে তাহা যে হইবে, তাহা আমরা কি প্রকারে জানিব? তুমি দেখিয়াছিলে সত্য, কিন্তু সে কথা আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারি নাই। ভাবিয়াছিলাম সেটি তোমার মনের ভ্রান্তি। ঈশ্বরেচ্ছায় তাহা এক্ষণে সত্যে পরিণত হইল।

নব। যাহা হউক ভাই, অবিলম্বে কপালকুণ্ডলার সাক্ষাৎ পাইব সত্য, কিন্তু আমার মন তাহাতেও শান্ত হইতেছে না। কত প্রকার চিন্তা যে মনে উপস্থিত হইতেছে, তাহা তোমাকে কি বলিব? কপালকুণ্ডলা জীবনে যত কষ্ট পাইয়াছেন, সে সমস্তের মূল আমি। তিনি যখন শৈশবে অরণ্যে ছিলেন, তখন কষ্ট কাহাকে বলে জানিতেন না। বনে বনে আপন মনে সদানন্দে বেড়াইতেন। আমি তাঁহাকে বিবাহ করিয়া সংসারে আনিয়া কষ্টের সাগরে ভাসাইলাম। তখন হইতে তাঁহার কষ্টের সূত্রপাত হইল, আর এক দিনও সুখ কাহাকে বলে জানিতে পারিলেন না। অবশেষে আমার জন্য তাঁহার অপমৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়াছিল। তবে তিনি নাকি নিতান্ত ভবানীপরায়ণা, এজন্য ভবানী অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে পুনর্জ্জীবন দান করিয়াছেন সন্দেহ নাই। ভাবিতেছি কি—হয় তো কপালকুণ্ডলা আপাততঃ একরূপ সুখস্বচ্ছন্দে আছেন, পুনরায় আমার সহিত সম্মিলনে তাঁহার বিপদ ও ক্লেশ ঘটিবে, আমার কপালগুণে তিনি আবার যাতনা পাইবেন।

উমা। কপালকুণ্ডলা যে মনের সুখে নাই, তাহা কি তুমি মধুসূদনের কথায় বুঝ নাই?

নবকুমার আপন মনে করিলেন,—"হায়! কবে সে দিন আসিবে, যে দিন আমি পুনরায় কপালকুণ্ডলার সাক্ষাৎ পাইব।"

উমা। নবকুমার! তুমি দুই দিনাবধি প্রায় আহার কর নাই বলিলেই হয়। তোমার জন্য আমি কিছু খাদ্য আনিব?

নবকুমার কোন উত্তর দিলেন না। উমাপতি চলিয়া গেলেন। নবকুমার দেখিলেন, আম্রবৃক্ষের শাখায় দুইটি শালিক বসিয়া রহিয়াছে। হঠাৎ একটি শালিক উড়িয়া নীচে আসিল, অমনই অপরটি সঙ্গে সঙ্গে নীচে আসিল। একটি আহারান্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। অপরটিও অমনই তাহাই করিতে লাগিল। একটি চঞ্চু ব্যাদান করিয়া শব্দ করিল। প্রতিধ্বনির ন্যায় অপরটিও শব্দ করিল। একটি উড়িয়া বৃক্ষশাখায় উঠিল। অপরটি সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়া সেই স্থানে বসিল। এতদ্দর্শনে নবকুমার একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন! এবংবিধ বিহঙ্গম-চরিত্র দর্শনে কি বিষাদের উদয় হইল, তাহা তিনিই জানেন।

শূন্যদৃষ্টির প্রকৃতি অনুসারে নবকুমার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি-সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার দৃষ্টি-পার্শ্ববর্ত্তী গৃহের ক্ষুদ্র বাতায়নের প্রতি নিপতিত হইল। দেখিলেন—তথায় একটী প্রস্ফুটিত কমল রহিয়াছে। পরক্ষণেই তিনি চমকিত হইয়া দেখিলেন, তাহা রমণীর বদন কমল। সে পদ্মমুখীকে তিনি চিনিলেন। আর দৃষ্টি ফিরিল না। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্ত কম্পিত হইতে লাগিল। সংজ্ঞা লোপ হইল।

"কপাল কুণ্ডলা"

এই নামটি সজোরে উচ্চারিত করিয়া নবকুমার মূর্চ্ছিত হইলেন। অমনই রমণীর বদন গবাক্ষ হইতে অপসৃত হইল। পরক্ষণেই সুন্দরী, যথায় নবকুমারের সংজ্ঞাশূন্য দেহ ধরণীতলে নিপতিত রহিয়াছে, দ্রুতবেগে তথায় উপস্থিত হইয়া নবকুমারের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার লোচন দিয়া অশ্রু নিপতিত হইয়া হতচেতনের বদন আর্দ্র করিতে লাগিল। যেমন ঘোরকৃষ্ণ জলদজাল মধ্যে স্বর্গীয় অগ্নি ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ আলুলায়িত আগুলফলম্বিত নিবিড় কৃষ্ণ চিকুরজালোপরি রমণী স্থির সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি স্বীয় বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা নবকুমারকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। ক্রমে নবকুমারের মুখে চৈতন্যের লক্ষণ দৃষ্ট হইল। তিনি চক্ষু উন্মিলন করিলেন। তখনও সুন্দরীর চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। নবকুমার উন্মত্তের ন্যায় গাত্রোত্থান করিয়া সুন্দরীর চরণে নিপতিত হইয়া বলিলেন,—

"বল, প্রিয়ে কপালকুণ্ডলে! বল আমাকে ক্ষমা করিলে? আমি তোমার নিকট নিতান্ত অপরাধী সত্য; তথাপি আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে। আমি ঘোর নারকী; আমি তোমাকে অশেষ কষ্ট দিয়াছি। আমার স্পর্শে তোমার পবিত্র দেহ কলুষিত হইতেছে। মৃন্ময়ি! তুমি আমাকে ক্ষমা না করিলে আমি এ পাপ জীবন রাখিব না।"

নবকুমার রোদন করিতে লাগিলেন; তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। কপালকুণ্ডলা নবকুমারের হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন,—

"স্বামিন্! তোমার অপরাধ কি? তুমি কাঁদ কেন? ভবানীর মনে যাহা ছিল তাহা ঘটিয়াছে। আমার অদৃষ্টে দুঃখ ছিল, তুমি তাহার কি করিবে? বিধাতার ইচ্ছায় আমরা আবার পুনরায় মিলিত হইলাম। এখন রোদন কেন?

বীণা যেমন মধুর ধ্বনিতে শ্রোতৃমন মুগ্ধ করে, তদ্বৎ এই বাক্য নবকুমারের কর্ণকে মোহিত করিল। তিনি শুনিলেন সেই স্বর। সেই স্বর যেন আজ মধুময় হইয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। তিনি দেখিলেন, সেই কপালকুণ্ডলা! নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন। কতক্ষণ তাঁহারা তদবস্থায় থাকিলেন তাহা কেহই জানিলেন না।

ইত্যবসরে উমাপতি তথায় আসিলেন, কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। উমাপতি কপালকুণ্ডলাকে চিনিলেন; প্রথমে তাঁহার স্বপ্ন বোধ হইল; পরে সন্দেহ অন্তমিত হইল। তিনি সত্বর ভট্টাচার্য্য, অধিকারী ও মথুরানাথকে এই সুখময় সংবাদ দিলেন। সকলে দৌড়িয়া আসিলেন। আনন্দের সীমা রহিল না। অধিকারী ভূয়োভূয়ঃ কপালকুণ্ডলার মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। সকলের চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল। বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য কপালকুণ্ডলাকে দেখিয়া যুগপৎ হাস্য ও রোদন করিতে লাগিলেন। অধিকারী তাঁহাকে চিনাইয়া দিলেন এবং নিজের সহিত কপালকুণ্ডলার কি সম্পর্ক তাহাও প্রকাশ করিলেন। আনন্দাশ্রু বিগলিত নয়নে কপালকুণ্ডলা পিতা ও খুল্লতাত চরণে প্রণতা হইলেন। ক্রমে অধিকারী তাঁহাকে আনুপূর্ব্ব সমস্ত ব্যাপার জানাইলেন। অনতিবিলম্বে রামদাস রায় সংবাদ পাইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন।

তিনি একে একে আমূল ঘটনা জ্ঞাত হইয়া কহিলেন,—

"এই কন্যার ন্যায় সতী লক্ষ্মী ভূমণ্ডলে আর নাই। ইনি আমার দুহিতা স্বরূপা। উন্মাদিনি! তুমি পর হইয়াও আপন হইয়াছিলে, তোমার প্রতি আমার যথেষ্ট মমতা হইয়াছিল। এখন তুমি আমার অপেক্ষাও আত্মীয় ব্যক্তিগণের নিকটস্থ হইলে। ঈশ্বরেচ্ছায় তুমি সুখে স্বচ্ছন্দে থাক, চিরায়ুষ্মতী হও। আমি তোমার সুখ দেখিলে সুখী হইব। অতএব, মা! আমিও তোমার সঙ্গে তোমার শ্বশুরালয় যাইব।"

সকলই আনন্দময় হইল। বিশ্বসংসারে আর যেন কোথাও নিরানন্দ নাই। মহানন্দে সকলে সপ্তগ্রাম যাত্রা করিলেন।

চিরদুঃখিনী কপালকুণ্ডলা এত দিনের পর, এত কষ্টের পর, পতি, পিতা, মাতা, সোদরা প্রভৃতির সহিত সংমিলিত হইলেন। শৈশবে পিতা মাতার পূর্ণকেশী, অরণ্য মধ্যে পালক কাপালিকের কপালকুণ্ডলা, স্বামীর মৃন্ময়ী এবং রক্ষক রামদাসের উন্মাদিনী পুনরায় আনন্দ-মধ্যে নীত হইলেন। গ্রন্থকারও কপাল-কুণ্ডলার এই অজ্ঞাত ইতিহাস-খণ্ড পাঠক মহাশয়দিগকে উপহার দিয়া বিদায় হইলেন।

উপসংহার।

এই সামান্য গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। তথাপি যবনিকা পতনের পূর্ব্বে, গ্রন্থ-সম্ভূত অপরাপর পাত্রগত দুই একটি কথা না বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকা গ্রন্থকারের পক্ষে নিতান্ত অবিধেয়।

বলা বাহুল্য যে অনতি বিলম্বে উমাপতি ও মুক্তকেশী বিবাহিত হইলেন। শ্যামাকে এই সকল সুসংবাদ দিয়া শ্বশুরালয় হইতে আনয়ন করা হইল। মুক্তকেশীর বিবাহের পূর্ব্ব হইতে অনেক দিন পর পর্য্যন্ত, মৃন্ময়ী পিতৃভবনে থাকিলেন।

এই সকল ঘটনার কিছু পূর্ব্বে, দেলবর অথবা গোপালকৃষ্ণ দস্যুদলকে প্রকাশ করত বাটী আসিয়া পিতা মাতা প্রভৃতির সহিত মিলিত হইলেন। রাজাজ্ঞায় রহীম প্রভৃতি দস্যুগণের শিরশ্ছেদ হইল। গোপালকৃষ্ণ কথিত পুরস্কার পাইলেন ও রাজপ্রসাদে অভ্যুন্নত পদ লাভ করিলেন।

অধিকারী অনেক দিন সপ্তগ্রামে থাকিয়া আনন্দ সম্ভোগ করত পুনরায় হিজলী গমন করিলেন।

শ্যামা প্রভৃতি সকলেই, সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়ায়, অপার আনন্দ লাভ করিলেন।

"সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্।
চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।"

সম্পূর্ণ।

প্রত্যক্ষ-দেবতা-স্বরূপা

শ্রী ম তী মা তৃ দে বা র

শ্রীচরণোদ্দেশে,

আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধার নিদর্শন

স্বরূপে,

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

এই গ্রন্থ

উৎসর্গীকৃত ইহল।

(ইতি)

বিজ্ঞাপন।

'কমল-কুমারী' পুস্তকাকারে প্রচারিত হইল। উপন্যাস-লেখকগণের চূড়ামণি সার্ ওয়াল্টর স্কটের ব্রাইড্ অব লামের্ মুর্ অবলম্বনে ইহা বিরচিত। আমাদের দেশে অধিকাংশ স্থলেই, কেবল গল্পের অনুরোধে উপন্যাস অধীত এবং গল্প বৈচিত্র্যের তারতম্যানুসারে সমাদৃত ও অনাদৃত হইয়া থাকে। এরূপ পাঠকের নিকটে এই জগদ্বিখ্যাত কবির অত্যদ্ভুত উপন্যাস বিশেষ আদৃত হইবে বলিয়া বোধ হয় না। কারণ হৃদয় মন-বিহ্বলকারী ও বাহ্যজ্ঞান বিলোপকারী গল্প-রহস্য ইহাতে নাই। যাঁহারা উপন্যাসে কবিজনোচিত বর্ণনা, সুসঙ্গত ঘটনার সমাবেশ ও মানব-হৃদয়ের বিশ্লেষণ দেখিতে অভিলাষ করেন, এ পুস্তক পাঠ করিয়া সম্ভবতঃ, তাঁহারাই প্রীত হইবেন।

যাঁহারা বর্ত্তমান কালের উপন্যাস-সমূহ গল্প ভিন্ন আর কিছু নহে বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারাই উপন্যাসের গল্পাংশের প্রতি অধিক মনঃসংযোগ করেন এবং সময়ে সময়ে উপন্যাস পাঠ নিতান্ত অনাবশ্যক ও সময় হানিকর বলিয়া চীৎকার করেন। বস্তুতঃ মানবচরিত্র পর্য্যবেক্ষণে ও মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনায় যদি মনুষ্য-মন উন্নত হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে উপন্যাস পাঠ অবশ্যই নিতান্ত হিতকর কার্য্য। গল্প উপন্যাসের সহকারী গুণ-বিশেষ; উপন্যাসের প্রকৃত মহিমা চরিত্রবর্ণনে, স্বভাবচিত্রণে এবং নানারূপ দশা-বিপর্য্যয় মধ্যে মানবহৃদয়ের গতি অন্বেষণে, যদি গল্পই উপন্যাসের সার বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে অসাধারণ ক্ষমতাশালী ডিকেন্স ও থ্যাকারের মনোহর উপন্যাস-সমূহ এদেশে কখনই স্থান পাইবে না।

মহামনস্বী স্কট্ বর্ত্তমান উপন্যাসে যেরূপ অসাধারণ গুণপণা প্রকাশ করিয়াছেন, আমার লেখনী ভাবান্তর কালে তাহা রক্ষিত করিতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি না। বঙ্গীয় পাঠকের রুচিকর করিবার অভিপ্রায়ে, আমি স্থানে স্থানে হ্রাস-বৃদ্ধি ও বহু স্থানেই রূপান্তরিত করিতে বাধ্য হইয়াছি। তথাপি যেরূপ করিব বলিয়া বাসনা ছিল, সেরূপ করা হইয়া উঠে নাই। মূলের সহিত সঙ্গত অনুবাদ আমি কুত্রাপি করি নাই। পাঠকগণ ও সমালোচকগণ আমার এবংবিধ স্বাধীনতায় সন্তুষ্ট হইয়াছেন, ইহা আমার পক্ষে অতুল আনন্দের বিষয়। যদি কখন এই পুস্তক পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন হয়; তাহা হইলে যে সকল অপূর্ণতা ও ত্রুটি এখনও ইহাতে রহিয়া গিয়াছে, তৎসমস্ত তৎকালে সংশোধন করিতে চেষ্টা করিব। ইতি

কলিকাতা,
বৈশাখ, ১২৯১।

শ্রীদামোদর দেবশর্ম্মা।

কমলকুমারী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মিবারের রাজধানী উদয়পুরের বহুদূর উত্তরে, পার্ব্বত্য ও আরণ্য প্রদেশে, কমলা নামে একটী ক্ষুদ্র জনপদ আছে। পূর্ব্বকালে এই স্থানে একটি ক্ষুদ্রকায় দুর্গ ছিল এবং সেই দুর্গে মিবারের রাণার অধীন একজন সেনা-নায়ক বাস করিতেন। এই ব্যক্তি নিয়মিত সময়ে রাণার রাজকোষে নিয়মিত কর প্রদান করিতেন এবং সন্নিহিত পাঁচ ছয় খানি গ্রামের উপর আধিপত্য করিতেন। এতদ্ব্যতীত, রাণার প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে যথাসম্ভব লোকজন সঙ্গে লইয়া, উদয়পুরে উপস্থিত হইতে হইত এবং আবশ্যক হইলে, অকাতরে প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে হইত। অধুনা মিবারের প্রাতঃস্মরণীয় রাণাবংশের আর সে তেজ নাই, সে গৌরব নাই, এবং পূর্ব্ব-কালের ন্যায় প্রকৃষ্ট নিয়মাবলীও নাই। ক্রমশঃ কাল সহকারে কমলা নগরীর সে দুর্গ ধ্বংস হইয়াছে এবং বর্ত্তমান কালে তাহার বিশেষ কোন চিহ্নও বিদ্যমান নাই।

বহুকাল হইতে, রাওল নামক মহামাননীয় বংশ বিশেষের পুরুষ পরম্পরা এই দুর্গ ও তদধীন গ্রাম সমস্ত সম্ভোগ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা তৎপ্রদেশে দুর্গ-স্বামী নামে খ্যাত। দুর্গ-স্বামিগণ অত্যন্ত বিচক্ষণ, অসাধারণ বীর, দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা, অপরিসীম সাহসী ও একান্ত রাজানুগত বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত ছিলেন। বহু সময়ে ও বহু ঘটনা উপলক্ষে এই দুর্গ স্বামিগণ রাণার জন্য, সমর-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং অনেকেই প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া, প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। দুর্গ-স্বামিগণ অত্যন্ত দানশীল ও ব্যয়শীল ছিলেন এবং অর্থের প্রতি কখনই বিশেষ আস্থা প্রদর্শন করেন নাই। এজন্য ক্রমে ক্রমে আয়াতিরিক্ত ব্যয় ঘটায় ও বৈষয়িক কার্য্যে শিথিলতা হেতু, তাঁহাদের ভগ্ন দশা উপস্থিত হইল। কালে এমন হইয়া পড়িল যে, তাঁহারা আর আপনাদিগের পদ-মর্য্যাদা ও বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিলেন না। বারংবার রাজ-কর দানে অশক্ত হওয়ায়, তাঁহাদের অধিকার হস্তান্তরিত হইয়া পড়িল। মহারাণা জয়সেনের সময়ে (১৭৪৬ অব্দে) কমলা দুর্গের চিরন্তন অধিকারিগণ তাহা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহারা ক্রোশত্রয় দূরবর্ত্তী পিপলি নামক ক্ষুদ্র গ্রাম-সন্নিধানে পর্ব্বত-নিম্নবর্ত্তী একটী সামান্য ভবনে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের এবংবিধ অবস্থান্তর ঘটিলেও, প্রজাবর্গ ও অন্যান্য লোক সকল তাঁহাদিগকে তখনও দুর্গ-স্বামী বলিয়াই ডাকিত।

বর্ত্তমান দুর্গ-স্বামী রাওল লক্ষ্মণসিংহ সম্পত্তিহীন ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া সামান্য দশা প্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয় এক দিনও

পূর্ব্ব গৌরব, চিরপ্রসিদ্ধ তেজ, ও অসীম বীরত্ব ত্যাগ করিল না। লক্ষ্মণসিংহের মনে ধারণা জন্মিল যে, তাঁহার পরিবর্ত্তে সম্প্রতি যে ব্যক্তি দুর্গ লাভ করিয়াছে, সেই তাঁহার পতনের প্রধান কারণ। সে ব্যক্তি অধিক কর দিতে অগ্রসর না হইলে, অথবা চেষ্টা করিয়া তাঁহাদিগের সম্বন্ধে রাণার মনান্তর না জন্মাইলে, কখনই তাঁহাদের এরূপ অবস্থা ঘটিত না। এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া লক্ষ্মণসিংহ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন ও প্রবল শত্রু বলিয়া মনে করিতেন। নূতন দুর্গ-স্বামী সুকৌশলী, রাজ-নীতি-নিপুণ ও বিশেষ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ধনসম্পত্তি, সাংসারিক প্রাধান্য লাভের অত্যুৎকৃষ্ট উপায় জানে, তৎসংগ্রহে সবিশেষ যত্নবান্ ছিলেন এবং কিয়ৎ-পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। তাঁহার এই সকল চতুরতা হেতু তিনি রাণা জয়সেনের সভায় বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং "কিল্লাদার" এই সম্মান-সূচক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কাজেই সুকৌশলী কিল্লাদার, উগ্র-স্বভাব ও অবিবেচক দুর্গ-স্বামীর পক্ষে বড় উপেক্ষণীয় শত্রু ছিলেন না। কিল্লাদার প্রকৃত প্রস্তাবে দুর্গস্বামীর কোন শত্রুতা করিয়াছিলেন কি না, এ বিষয়ে মতভেদ ছিল। কেহ কেহ বলিত, কিল্লাদার যথার্থ মূল্য দিয়া সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কোনই অন্যায় কার্য্য হয় নাই; দুর্গ-স্বামী কেবল হিংসা ও ক্রোধ হেতু তাঁহার সহিত কলহ করিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ এমনও বলিত, কিল্লাদার বহুদিন পূর্ব্ব হইতে, দুর্গ-স্বামীর সর্ব্বনাশ সাধন করিবার উদ্দেশে, তাঁহাকে ক্রমশঃ নানা ঋণ-জালে জড়িত করিয়া, অবশেষে তাঁহার সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছেন।

তৎসাময়িক ইতিহাসোক্ত বিশৃঙ্খলা সমূহও সাধারণের এবংবিধ সন্দেহ সমস্ত উত্তেজিত করিবার সহায়তা করিয়াছিল। রাণা স্বয়ং অওরঙ্গজেবের সিংহাসন-লোলুপ ভ্রাতৃবর্গের ঘোর যুদ্ধে মিশ্রিত ও তাঁহার চিত্ত বহুদিন সেই চিন্তায় নিয়ত নিবিষ্ট থাকায় এবং বারংবার বৈদেশিক শত্রু প্রভৃতির আক্রমণ হেতু, মিবার নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়াছিল, সুতরাং রাজ্যের প্রকৃষ্ট বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছিল এবং যথারীতি সকল বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিবার সময় ও সুযোগ ছিল না। এতাদৃশ সময়ে কৌশলী ব্যক্তি যে সহজেই অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারিবেন, তাহা বিশেষ আশ্চর্য্যের কথা নহে। উৎকোচ আদান প্রদান তৎকালে বিলক্ষণ চলিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং বিচার কার্য্য নিতান্ত ঘৃণার্হ রূপে সম্পাদিত হইত। এরূপ স্থলে কিল্লাদারের মনোরথ সিদ্ধ হইবার নানা সহজ উপায় ঘটিয়াছিল সন্দেহ কি?

কিল্লাদারের নাম রঘুনাথ রায়। রঘুনাথের অপেক্ষা তাঁহার পত্নী অধিকতর তেজস্বিনী ছিলেন। ঐ কামিনীর নাম যোধ সুন্দরী। কিল্লাদারণী কিল্লাদারের অপেক্ষা উচ্চঘরের মেয়ে; সুবিখ্যাত ও ইতিহাস-প্রথিত শৈলম্বর-রাজবংশের অন্যতম নিম্নতর শাখা হইতে তাঁহার জন্ম। এজন্য তাঁহার মনে মনে বিলক্ষণ অহঙ্কার ছিল এবং তিনি এজন্য সর্ব্বত্র স্বামীর মর্য্যাদা স্থাপন করিতে, ও সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর উপর নিজের আধিপত্য অধিকতর বিস্তার করিতে কখনই ক্ষান্ত থাকিতেন না। এক সময়ে তিনি পরমা সুন্দরী ছিলেন। এখন সে দিন নাই বটে, তথাপি তাঁহার গম্ভীর ও প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া, এখনও সকলেই তাঁহাকে ভীত ভাবে ভক্তি

করিত। কিল্লাদারণীর মানসিক শক্তি যথেষ্ট ছিল এবং ক্রোধাদি প্রবৃত্তিও কম ছিল না। তাঁহার ব্যবহার ও চরিত্র সর্ব্বথা প্রশংসাযোগ্য ছিল। কিন্তু এবংবিধ সদ্গুণ থাকিলেও লোকে যোধসুন্দরীকে হৃদয়গত প্রীতি ও অকৃত্রিম ভক্তি প্রদর্শন করিত না। তাঁহার সকল কার্য্যের ও ব্যবহারের মূলে স্বার্থ-সিদ্ধির বাসনা স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইত। যেখানে লোকে এ ভাব বুঝিতে পারে, সেখানে সহজে ভক্তি করিতে অগ্রসর হইবে কেন? তাঁহার বিশ্রাম্ভালাপের মধ্যেও লোকে তাঁহার স্বার্থ-সাধন বাসনার ছায়া দেখিতে পাইত, এজন্য তাঁহার সমকক্ষেরা তাঁহার সহিত সন্দিগ্ধ ও সঙ্কুচিতভাবে ব্যবহার করিত এবং নিকৃষ্টেরা ভীতভাবে তাঁহার আজ্ঞা পালন করিত।

স্বামীর উপর যোধসুন্দরীর এরূপ অসামান্য প্রভুতা ছিল যে, লোকে সময়ে সময়ে কিল্লাদারকে কিল্লাদারণীর অনুগত দাস বলিয়া মনে করিত। কিল্লাদার নিজের কোন বংশ-মর্য্যাদা না থাকায় এবং পত্নীর সৌন্দর্য্য ও মানসিক ক্ষমতাসমূহের আতিশয্য দেখিয়া, কখন বা তাঁহাকে ভয়, কখন বা ভক্তি করিতেন এবং তাঁহার সহিত নিতান্ত আজ্ঞাধীন অনুগতের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। এ সকলই হৃদয়ের কথা। কিন্তু বাহ্যতঃ স্ত্রী ও স্বামী উভয়েই একজন আপনার প্রাধান্য, অপর আপনার হীনতা প্রচ্ছন্ন রাখিবার নিমিত্ত, যথেষ্ট প্রয়াস পাইতেন; তথাপি সুচতুর ও অভিজ্ঞ লোকেরা সহজেই তাঁহাদের উভয়ের যথার্থ ভাব অনুমান করিতে পারিত। মনের এরূপ ভাব থাকিলেও, স্বার্থের সাম্য হেতু, উভয়েই, বিশেষ একতার সহিত পরামর্শ করিয়া, বিষয়-কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন।

কিল্লাদারের অনেক গুলি সন্তান হইয়াছিল, তন্মধ্যে এক্ষণে তিনটী মাত্র জীবিত আছেন। বড়টী বাদশাহ বাহাদুরের অধীনে সৈনিক বৃত্তি করেন, সুতরাং অধিকাংশ সময় আগ্রায় বাস করেন। ২ য়—একটী সপ্তদশ বর্ষীয়া কন্যা সন্তান এবং ৩ য়—চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালক।

দুর্গ-স্বামী লক্ষ্মণসিংহ বহুদিনাবধি কিল্লাদারকে উচ্ছেদ করিয়া, কমলা দুর্গের অধিকার পুনঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত, নানা প্রকার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অবশেষে মৃত্যু আসিয়া তাঁহার সকল যন্ত্রণার অবসান করিয়া দিল এবং তাঁহার সকল বিবাদ-বিসম্বাদ সর্ব্বদর্শী পরম বিচারকের ধর্ম্মাধিকরণে লইয়া গেল। তাঁহার পুত্র বিজয়, দারিদ্র্যদুঃখ-নিপীড়িত পিতার মৃত্যুকালীন হৃদয়জ্বালা স্বচক্ষে দেখিলেন এবং তাঁহার শত্রুর উদ্দেশে অভিসম্পাত সমূহ স্বয়ং শ্রবণ করিলেন। তিনি স্থির করিলেন, পিতৃভক্তির চিহ্নস্বরূপে, এই প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত, তিনি ধর্ম্মতঃ দায়ী। ইহার পরে যে ঘটনা ঘটিল, তাহাতে এই নিদারুণ প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি আরও উত্তেজিত করিয়া দিল।

সৎকারার্থ বিগতজীব দুর্গ-স্বামীর দেহ যখন শ্মশানোদ্দেশে নীত হয়, তখন সন্নিহিত জনপদ-সমূহের যাবতীয় ভদ্রলোক, আন্তরিক-ভক্তি-প্রদর্শনার্থ, তথায় সমাগত হইল। লক্ষ্মণসিংহের জীবনকালে যে সমারোহ ঘটে নাই, মরণান্তে তাহা ঘটিল। বহুলোক তাঁহার সৎকারার্থ সমারোহে সঙ্গে সঙ্গে চলিল। যথাকালে শব নির্দ্দিষ্ট স্থানে নীত হইলে, চন্দনাদি কাষ্ঠভারে চিতা রচিত হইল এবং যথারীতি সমস্ত কার্য্য সমাপন করিয়া, বিজয়সিংহ সেই চিতায় অগ্নি সংযোগ করিবার

নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। এমন সময় কিল্লাদারের এক দূত সেই ক্ষেত্রে সমাগত হইয়া চিতায় অগ্নি সংযোগ করিতে নিষেধ করিল। রক্তনেত্র বিজয় সিংহ জিজ্ঞাসিলেন,—

"কে তুমি?"

আগন্তুক বলিল,—

"আমি কিল্লাদারের দূত। আপনারা গ্রাম্য দেবতার পূজার অর্ঘ না দিয়া, শবদাহ করিতে পাইবেন না, ইহাই কিল্লাদারের আদেশ।"

এ অপমান বিজয় সিংহের অসহ্য হইল। তিনি অসিতে হস্তার্পণ করিলেন। দূত সভয়ে পিছাইয়া গেল।

রাজপুতানার স্থানে স্থানে নিয়ম আছে, কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, তাহার সৎকারের পূর্ব্বে, গ্রামের শান্তির নিমিত্ত, গ্রাম্য দেবতার পূজা দেওয়া আবশ্যক। কেবল রাজা অথবা রাজবৎ মান্য ব্যক্তিগণ এ নিয়মের অধীন নহেন। কারণ তাদৃশ ব্যক্তির শরীরে দেবাংশ বিদ্যমান আছে, সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে এ অনুষ্ঠান অবশ্য-কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে দুর্গ-স্বামীর দেহ সম্বন্ধে কিল্লাদারের বর্ত্তমান আদেশ, বিজয় সিংহ ও তাঁহার বন্ধুগণ নিতান্ত অপমানজনক বলিয়া মনে করিলেন। বস্তুতঃ একাল পর্য্যন্ত কখন কোন দুর্গ-স্বামী এ নিয়ম প্রতিপালন করেন নাই। অধুনা তাঁহাদের অবস্থা যে নিতান্ত হীন হইয়াছে এবং তাঁহারা যে সাধারণ মনুষ্যাপেক্ষা কোন অংশেই উন্নত নহেন, ইহা স্মরণ করাইয়া দেওয়াই কিল্লাদারের দূতপ্রেরণের প্রধানতম উদ্দেশ্য। বিজয় সিংহের হৃদয় এতদ্ব্যবহারে মথিত হইয়া গেল। কিন্তু তিনি তৎকালে কর্ত্তব্য সমপনার্থ বহু যত্নে ক্রোধোদ্দীপ্ত হৃদয়কে কিয়ৎপরিমাণে প্রশান্ত করিলেন। তাহার পর বিহিত বিধানে সৎকার সমাধা হইল। দূত আর কিছুই বলিতে সাহস করিল না। সে নির্ব্বাক্ ভাবে অদূরে দাঁড়াইয়া সমস্ত প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল।

যখন লক্ষ্মণসিংহের দেহ চিতানলে ভস্মীভূত হইয়া গেল, তখন, তার ভার জল দ্বারা চিতা ধৌত করা হইলে সকলে স্নান করিলেন। তাহার পর আত্মীয়গণ একত্রিত হইলে, বিজয় সিংহ বলিলেন,—

"আত্মীয়গণ! অদ্যকার ব্যাপার আপনারা স্বচক্ষে দৃষ্টি করিলেন। লোকে আত্মীয় স্বজনের সৎকার শোক-সহকারে সম্পন্ন করে, কিন্তু আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, সে পবিত্র কর্ত্তব্য-পালন সময়েও, আমাদিগকে নিরুপায় হইয়া ক্রোধের বশবর্ত্তী হইতে হইল। হউক, আমি জানি, কোন্ তূণ হইতে এ বাণ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। ঈশ্বর সাক্ষী, আপনারা সাক্ষী—আমি যদি জীবিত থাকি তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবেন, আমি অবশ্যই এ অপমানের প্রতিশোধ দিব।"

বিজয় সিংহের এই বাক্য শ্রবণে অনেকেই বিশেষ উৎসাহিত ও সন্তুষ্ট হইল। কিন্তু যাহারা অপেক্ষাকৃত ধীর ও দূরদর্শী লোক, তাহারা এ সকল কথা শুনিয়া দুঃখিত হইল এবং ভাবিল এ সকল কথা ব্যক্ত না হইলেই ভাল হইত। এ সকল কথা হইতে অবশ্যই বিষম ব্যাপার ঘটিবে এবং সেরূপ ঘটিলে দুর্গ-স্বামিগণের অবস্থা যেরূপ হীন, তাহাতে নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে পরাজিত ও ক্লিষ্ট হইতে হইবে। কিন্তু এ আশঙ্কা আপাততঃ অমূলক হইয়া পড়িল, কারণ এতদ্ধেতু আশু কোন অশুভ ফলই উপস্থিত হইল না।

যথাসময়ে যথাসম্ভব সমারোহে শ্রাদ্ধাদি

সম্পন্ন হইল। পিপ্‌লির ভবন জন-কোলাহলে কয়েক দিন পরিপূর্ণ রহিল এবং দুর্গ স্বামীর ভাণ্ডারে যে কিছু আয়োজন ছিল, ভূরিভোজে সকলই নিঃশেষিত হইয়া গেল। তাহার পর আত্মীয় স্বজন ও কুটুম্বগণ গৃহত্যাগ করিলেন।

বিজয় সিংহ একাকী সেই নির্জ্জন ভবনে বসিয়া নানাবিধ চিন্তা করিতে লাগিলেন। আশার অসারতা, অবস্থার বিপর্য্যয়, তাঁহাদের পতনের কারণ স্বরূপ পরিবারের অভ্যুদয় ইত্যাদি নানা বিষয় বিভিন্ন ভঙ্গীতে তাঁহার চিত্ত-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইতে লাগিল। স্বভাবতঃ বিষাদ-সমাচ্ছন্ন বিজয় সিংহ একাকী এই সকল অকূল চিন্তায় ভাসিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কিল্লাদার সুবিস্তৃত কক্ষ-মধ্যে অতি পরিষ্কার গালিচার উপর বসিয়া আছেন। তাঁহার মূর্ত্তি সুদৃশ্য ও গম্ভীর। উজ্জ্বল লোচনদ্বয় বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। বিশেষ রূপ দেখিলে বুঝা যাইত, কিল্লাদারের মতের দৃঢ়তা অল্পই ছিল এবং যাহারা তাঁহার সঙ্গে সতত কথোপকথন করিত, তাহারা জানিত যে, তাঁহার প্রতি কার্য্যে ও প্রতি কথায় স্বার্থপরতার রেখা থাকিত।

একজন দূত কিল্লাদারের সমীপাগত হইল এবং সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিল। এই ব্যক্তি বিগত দুর্গস্বামী লক্ষ্মণসিংহের অন্ত্যেষ্টি কার্য্যের নিষেধ-সূচক আদেশ লইয়া গিয়াছিল। সেখানে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, দূত সমস্তই নিবেদন করিল। কিল্লাদার মনোযোগ সহকারে সমস্ত শ্রবণ করিলেন; তাঁহার স্বভাবতঃ গম্ভীর মুখমণ্ডল আরও গম্ভীর হইল। তিনি মনে মনে বুঝিলেন যে, এখন তিনি ইচ্ছা করিলে দুর্গস্বামীর অবশিষ্ট সম্পত্তিও আত্মসাৎ করিতে সক্ষম। দূত বিদায় হইল।

রঘুনাথ কিল্লাদার কিয়ৎকাল গভীর চিন্তা করিলেন। তাহার পর হঠাৎ উঠিয়া গৃহ-মধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। তাহার পর আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন,—"ক্ষুদ্র বিজয়সিংহ এখন আমার করতলে—আমার বাসনার অধীন। এখন তাহাকে হয় ভাঙ্গিতে হইবে, না হয় নত হইতে হইবে। তাহার পিতা আমার যেরূপ শত্রুতা করিয়াছে, আমাকে ক্রমাগত যেরূপ জ্বালাতন করিয়াছে, প্রতিনিয়ত আমাকে রাণার দরবারে অপদস্থ করিবার নিমিত্ত যেরূপ চেষ্টা করিয়াছে ও নিয়ত আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া এবং আমার সকল প্রকার প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া আমাকে যেরূপ বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে, তাহার একবর্ণও আমি ভুলি নাই। এই বালক—এই উদ্ধত-স্বভাব, স্থূল-বুদ্ধি, উন্মাদ বিজয় সিংহ, পাখা না উঠিতেই উড়িতে চাহিতেছে। আচ্ছা—আচ্ছা—ভাল—ভাল। এখন আমাকে দেখিতে হইবে, কোন সুযোগ পাইয়া সে উড়িতে না পারে। এই যে ঘটনা—এই ঘটনাই তাহার কাল হইয়াছে। হতভাগা এ কার্য্য দ্বারা রাণার অপমান করিয়াছে, ধর্ম্মের অপমান করিয়াছে এবং আপনার পায়ে আপনি কুঠার মারিয়াছে। এ কথা রাণার দরবারে উপস্থিত করিলে, আমি উহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারি। চিরনির্ব্বাসন—চিরাবরোধ—সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত সকলই করা যাইতে পারে। এমন কি, ইহা হইতে উহার জীবন লইয়া টানাটানি পর্য্যন্ত

করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা যেন আমাকে করিতে না হয়। না না, উহার জীবনের প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে আমার বাসনা নাই। কিন্তু ও বাঁচিয়া থাকিলে, কে জানে, উহার দ্বারা কি অনিষ্টই না ঘটিতে পারে। কে জানে, কত ব্যক্তিই উহাকে সাহায্য করিতে পারে এবং হয়ত উহার দ্বারা মহারাণার সিংহাসনও বিপন্ন হইতে পারে।"

রঘুনাথ কিল্লাদার ইত্যাদি সপ্তবিধ আলোচনা করিয়া, মহারাণার নিকট এতদ্‌ঘটনার আমূল বৃত্তান্ত নিবেদন করা শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিলেন। তিনি তদর্থে এক লিপি লিখিতে বসিলেন। এই লিপি যথেষ্ট চতুরতা সহকারে লিখিতে হইবে বলিয়া মনে করিলেন। বিজয় সিংহের দোষটী এমনই ভাবে বর্ণনা করিতে হইবে যে, তাহাতে রাণার ক্রোধ ভয়ানক উদ্দীপ্ত হইবে এবং তাহাকে বিশেষ রূপ শাস্তি দিতে তাঁহার অতিশয় ব্যগ্রতা জন্মিবে; অথচ কিল্লাদার তজ্জন্য যে কোনরূপ অনুরোধ করিতেছেন, অথবা সে জন্য কোন উত্তরসাধকতা করিতেছেন, তাহা একটি কথাতেও ব্যক্ত হইবে না। এইরূপ স্থির করিয়া সুচতুর রঘুনাথ লিপি রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং অতি যত্নে ও কৌশলে লিপির শব্দ-বিন্যাস করিতে লাগিলেন। এমন সময় সহসা তাঁহার দৃষ্টি কক্ষ-মধ্যস্থ বাতায়ন-বিশেষে সঞ্চারিত হইল। সেই বাতায়ন-পার্শ্বে প্রস্তর-ভিত্তিতে অস্ত্রাঘাত হেতু একটী বহুবায়ত চিহ্ন ছিল। সেই অস্ত্র-চিহ্নে তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইলে, সহসা তাঁহার যেন কি মনে পড়িয়া গেল।

তাঁহার মনে হইল, অতি পূর্ব্বকালে আর একবার এই দুর্গ ও এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য সম্পত্তি রাওল বংশীয় দুর্গ-স্বামীদিগের হস্ত হইতে হস্তান্তরিত হইয়াছিল। এক দিন অভি-নব দুর্গস্বামী, বহু বন্ধুবান্ধব সহ সম্মিলিত হইয়া, এই কক্ষে ভোজন ও আহ্লাদ আমোদ করিতেছিলেন। এমন সময় সহসা প্রাচীন দুর্গ-স্বামী আসুরিক শক্তি সহকারে ঐ বাতায়ন ভগ্ন করিয়া, প্রকোষ্ঠ-মধ্যে প্রবেশ এবং একাকী, নব দুর্গস্বামী সহ, উপস্থিত সমস্ত ব্যক্তিকে নিহত করেন। তাঁহার সেই ভীষণ যুদ্ধ কালে, বাতায়ন-পার্শ্বস্থ প্রস্তরে আঘাত লাগিয়াছিল। সেই আঘাতের চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান থাকিয়া, সমস্ত ঘটনা স্মরণ করাইতেছে। উক্ত অঙ্ক সম্বন্ধীয় এই প্রচলিত উপাখ্যান কিল্লাদারের মনের ভাবান্তর জন্মাইয়া দিল। তিনি লেখ্য উপাদান সমস্ত সরাইয়া রাখিলেন এবং, পত্রের লিখিত অংশ একবার পাঠ করিয়া, তাহা যত্নে পেটিকা-বদ্ধ করিলেন। তাহার পর রঘুনাথ রায় সে গৃহ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার মনে তখন নানাবিধ ভাব-প্রবাহ প্রবাহিত। তিনি যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, ইহাতে পরিণামে কি শুভাশুভ ঘটিতে পারে, এই বিষয় তাঁহার চিত্তের প্রধান আলোচ্য হইয়া উঠিল।

পার্শ্বস্থিত প্রকাণ্ড প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিবামাত্র রঘুনাথের কর্ণে তাঁহার কন্যার সংগীত-ধ্বনি প্রবেশ করিল। গায়ক নেত্র-পথের অন্তরালে থাকিলে, দূরাগত সংগীতধ্বনি আমাদিগকে বিস্ময়-সংবলিত আনন্দে অভিভূত করে, এবং হরিৎ পত্রাচ্ছাদিত নিকুঞ্জ-মধ্যস্থ পক্ষি-সমূহের সমবেত সুস্বরবৎ, স্বাভাবিক মধুরালাপ আমাদিগের হৃদয়কে পুলকিত করিয়া তুলে। রঘুনাথ যদিও এতাদৃশ কোমল বৃত্তির সমধিক অনুরাগী ছিলেন না, তথাপি তিনি মানুষ এবং পিতা তো বটেনই। সুতরাং মানবোচিত অনুরাগ এবং জনকোচিত অসীম বাৎসল্য লোপ পাইবে কিরূপে? দুহিতা কল্যাণী অদূরে মধুর স্বর

লহরীতে মধু-বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এবং কিল্লাদার, স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া তাহা শ্রবণ করিতে থাকিলেন। কল্যাণী গাহিতেছেন,—

"সৌন্দর্য্যের মোহে মন, কখনই ভুলো না,
অসার সম্পদ-গর্ব্বে কখনই মজো না,
ধন-লোভ ওরে মন কখনই করো না,
পাপের কণ্টক-পথে কখনই যেও না,
বিলাসের সাধ হৃদে কখনই রেখো না।
নিষ্পাপ নয়ন-মন-হৃদয়ে রাখিয়ে,
যাও মন ধীরে, ধীরে, শান্তি-ধামে চলিয়ে।"

সংগীত সমাপ্ত হইল; কিল্লাদার কন্যার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন।

কল্যাণী যে সংগীতটী গাহিতেছিলেন, তাহা বস্তুতঃ তাঁহার হৃদয়-ভাবের পরিচায়ক। কল্যাণীর পরম সুন্দর, অথচ বালিকার ন্যায় সরলতা পূর্ণ, মুখ খানি দেখিলেই বোধ হইত যে, তিনি সাংসারিক সামান্য আমোদের অনুরাগিণী ছিলেন না এবং তাঁহার মন শান্তি ও পবিত্রতায় পূর্ণ ছিল। তাঁহার সুগোল সমুজ্জ্বল ললাটের উপর হইতে সমস্ত মস্তক ব্যাপিয়া ঘনকৃষ্ণ, নিবিড় চিকুরদাম অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিত। কল্যাণীর কোমল নয়ন কখন অপরিচিত ব্যক্তির দৃষ্টি মাত্রও সহ্য করিতে পারিত না এবং ভীত ও সঙ্কুচিত ভাবে তাদৃশ দৃষ্টির পথ হইতে অপসৃত হইত। যে পরিবারের মধ্যে, কল্যাণীর জন্ম, সে পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির স্বভাব তাঁহার অপেক্ষা কঠিনতাময়, উত্তমপূর্ণ, উৎসাহময় এবং কার্য্যানুরাগী। কল্যাণীর প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবাপন্ন হওয়ায়, তিনি সর্ব্ব বিষয়ে নিতান্ত নিশ্চেষ্ট ও পরবাসনানুবর্ত্তিনী হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া, তাঁহার মন অনুরাগ-শূন্য বা ভাববিহীন হইয়া যায় নাই। তিনি যখন একাকিনী থাকিতেন, তখন তাঁহার চিত্ত পূর্ণ ও স্বাধীন ভাবে স্বেচ্ছামত পথে ক্রীড়া করিত। তিনি রাজস্থানের ইতিবৃত্তোক্ত অপূর্ব্ব কাহিনী সকল তখন আলোচনা করিতেন এবং সেই সকল বিষয় আলোচনা করিতে করিতে, শূন্য-পথে মনোহর রাজ-প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতেন। তিনি যখন নির্জ্জনে থাকিতেন, তখনই কেবল এইরূপ আকাশ-কুসুমের সেবা করিতেন। যখন তিনি একান্তে, স্বীয় প্রকোষ্ঠে অবস্থান করিতেন, অথবা যখন তিনি আপনার পুষ্প-কাননে একাকিনী বিচরণ করিতেন, তখনই তাঁহার চিত্ত স্বাভাবিক সজীবতায় পরিপূর্ণ হইত এবং তখনই তিনি নারী-কুল-কমলিনী পদ্মিনীর ন্যায়, দেশের নিমিত্ত, যশের নিমিত্ত, মানের নিমিত্ত, জ্বলন্ত অনলে প্রাণ পরিত্যাগ করিবার কল্পনা করিতেন; অথবা রাণী কর্ম্মদেবীর পবিত্র আখ্যান স্মরণ করিয়া, কাল্পনিক সমরে অবতীর্ণা হইতেন; কখন বা প্রতাপসিংহের অমানুষ তেজ ও সহিষ্ণুতা চিন্তা করিতে করিতে, কল্পনা-রাজ্যে তাঁহার মূর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়া, ভক্তি ও প্রীতি কুসুম দ্বারা, তাঁহার চরণার্চ্চনা করিতেন; কখন বা বালক বাদলের বীরকীর্ত্তি ভাবিতে ভাবিতে, তাঁহাকে চিরপরিচিত আত্মীয় জ্ঞানে, তাঁহার বিয়োগকাতরতা প্রকাশ করিতেন এবং কখন বা পুত্র-জননীর সহিত একত্র থাকিয়া, বীরবালকের সমর-সজ্জা করিয়া দিতেন।

কল্পনা-রাজ্যে কল্যাণীর হৃদবৃত্তি স্বাধীনভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইত বটে, কিন্তু বাহ্য রাজ্যে তাঁহার মনোবৃত্তি সন্নিহিত আত্মীয় জনের বাসনা দ্বারাই পরিচালিত ও বিকাশিত হইত। পরকীয় বাসনার অনুগামী না হইয়া এবং আত্ম-বাসনার সাহায্য গ্রহণ করিয়া, তিনি কোনই মীমাংসায় উপনীত হইতে পারি-

তেন না, সুতরাং তিনি স্বেচ্ছায় নিজ চিত্তকে আত্মীয় জনের মতানুসারিণী করিয়া পরিচালিত করিতেন। পাঠক অবশ্যই কোন না কোন পরিচিত পরিবার মধ্যে দেখিয়া থাকিবেন, অপেক্ষাকৃত সতেজ-হৃদয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এক একজন স্বভাবতঃ নিতান্ত কোমল, নমনশীল ও শান্ত প্রকৃতির লোক থাকে; স্রোতস্বিনীর গর্ভ-নিক্ষিপ্ত ভাসমান পুষ্প যেরূপ নিশ্চেষ্ট ও অক্ষম ভাবে ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া যায়, তাহারাও তদ্রূপ, বিনা আপত্তিতে, পরকীয় ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হইয়া, জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে। পরিবার মধ্যে যে কোমল ও সরল-স্বভাব ব্যক্তি আপনাকে সর্ব্বতোভাবে পরকীয় কর্ত্তৃত্বের অধীন করিয়া রাখে, প্রায়ই দেখা যায় যে যাহারা তাহার বাসনার পরিচালক, তাহারা তাহাকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিয়া থাকে।

কল্যাণীর সম্বন্ধেও অবিকল এইরূপ ঘটিয়াছিল। তাঁহার অর্থ-প্রিয়, কূটচিন্তাপূর্ণ নানা বিষয়াবিষ্ট পিতা তাঁহাকে এতই স্নেহ করিতেন যে, সময়ে সময়ে তিনি আপনা আপনিই তাঁহার স্নেহের পরিমাণ স্মরণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইতেন। কল্যাণীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাদশাহ-দরবারে উচ্চ গৌরব লাভার্থ লোলুপ —সমরক্ষেত্রে বীরকীর্ত্তি দেখাইয়া, স্বীয় নাম চিরস্মরণীয় করিবার উপায় অন্বেষণে ব্যস্ত— নবীন বয়সে, নবীন উৎসাহে তিনি নিরন্তর ভাসমান—তাঁহার হৃদয়-প্রবাহ কেবল উচ্চ আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রমুখে প্রবাহিত, তথাপি তাঁহার সেই অবসরহীন হৃদয়েও কল্যাণীর জন্য অপরিমেয় স্নেহ সঞ্চিত ছিল এবং তিনি কল্যাণীকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিয়া সুখ লাভ করিতেন। তাঁহার কনিষ্ঠ মুরারি নিতান্ত বালক। তাঁহার বালক জীবনের যাহা কিছু আনন্দ, যাহা কিছু উদ্বেগ তৎসমস্ত ব্যক্ত করিবার একমাত্র স্থল কল্যাণী। বালক, তীর দ্বারা কেমন কুম্ভীকার করিয়াছে, পাথর দিয়া কেমন করিয়া একটা ভয়ানক সাপ মারিয়াছে, গুরু মহাশয়ের সহিত কেমন করিয়া কলহ করিয়াছে, সমস্ত কথাই সে কল্যাণীকে বলিয়া সুখী হইত। এই সকল কথা যতই সামান্য হউক, কল্যাণী অতি ধীর ভাবে ও মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিতেন। মুরারি সে সকল বিষয়ের অনুরাগী, কল্যাণীর কর্ণও, সুতরাং তত্তবিষয়ের অনুরাগী।

কেবল কল্যাণীর জননী, কন্যার এরূপ কোমল স্বভাব, ঘৃণার বিষয় বলিয়া মনে করিতেন; এজন্য তিনি তাঁহাকে অন্যান্য সন্তানের ন্যায় ভাল বাসিতেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, কল্যাণীর শরীরে তাঁহার অপেক্ষাকৃত হীনবংশ-সম্ভূত পিতৃশোণিতেরই প্রাধান্য ছিল। এরূপ নির্ব্বিরোধ শান্ত-স্বভাব দুহিতাকে ভাল না বাসা অসম্ভব, তথাপি বিদ্যাদায়িনী কন্যার অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই অধিকতর প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। জ্যেষ্ঠের হৃদয়ে, জননীর পিতৃকুলানুরূপ, অপরিমেয় পরুষতার সমাবেশ ছিল, এই জন্যই তিনি মাতার আনন্দ-নিকেতন হইয়াছিলেন।

বিদ্যাদায়িনী বলিতেন,—"আমার শম্ভু মাতৃকুলের গৌরব বজায় রাখিবে, পিতৃকুল উজ্জ্বল করিবে ও তাহার গৌরব বাড়াইয়া দিবে। কল্যাণী কোন কুঁড়েঘরে পড়িবার নিতান্ত অনুপযুক্ত। কোন সাম্রাজ্য জমিদারের সহিত উহার বিবাহ হইবে, সে উহার খাওয়া পরা চালাইবে, উহার হীনজনোচিত বাসনা মিটাইবে, কিন্তু ও কখন তাহার কোন কাজে লাগিবে না, তাহার অবস্থার উন্নতি সম্বন্ধেও কোনই সহায়তা করিতে পারিবে না। ঈশ্বর-ইচ্ছায়, উহার অপেক্ষা অনেক অধিক উন্নত

হীন, অথবা এককালে উহারই মত উত্তম-হীন লোকের সহিত যদি উহার বিবাহ হয়, তাহা হইলেই বড় ভাল হয়।"

সন্তানদিগের গুণ ও পারিবারিক সুখ-শান্তির অপেক্ষা, বংশ মর্য্যাদার পক্ষপাতিনী জননী এইরূপ ভাবে কল্যাণীর জীবনের সমালোচনা করিতেন। অনেক জনক-জননী যেমন পূর্ব্বাহ্নে বুঝিতে পারেন না—তিনিও সেইরূপ বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহার কন্যার হৃদয় ক্ষেত্রে এরূপ ভাবের অঙ্কুর নিহিত আছে, যাহা হয়ত এক দিবসেই এমন বৃদ্ধি পাইবে যে, তখন তাহার বল ও ক্ষমতা দেখিয়া, সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়িবে। এতাবৎকাল কল্যাণীর জীবন-প্রবাহ ধীর ও মন্থর গতিতে, সমভূমির উপর দিয়া, সমান ভাবেই চলিয়া যাইতেছে। ইহা কল্যাণীর পক্ষে সুখেরই বিষয় যে, তাঁহার জীবনে এখনও এমন কোন ঘটনাই উপস্থিত হয় নাই, যাহাতে তাঁহার জীবন প্রবাহের গতি, বিভিন্ন পন্থা পরিগ্রহ করিতে পারে।

কল্যাণীর সংগীত সমাপ্তির সমসময়েই কিল্লাদার তথায় উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন,—"মা কল্যাণি! এই বয়সেই সাংসারিক সুখের প্রতি তোমার এত বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে মা! এখনও তো সুখ-দুঃখময় জীবন সবই সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। তুমি সাংসারিক সুখের কি জান—কি দেখিয়াছ যে, তাহা এত ঘৃণার জিনিস বলিয়া বর্ণনা করিতেছ?"

কল্যাণী লজ্জা সহকারে বলিলেন,—"গান আমি ভাবিয়াচিন্তিয়া গাহি নাই তো বাবা, আর আমার নিজের মনের ভাবের সঙ্গেও গানের কোন সম্বন্ধ নাই—যাহা মনে পড়িল তাহাই গাহিলাম।"

তাহার পর কিল্লাদার কন্যাকে বায়ু সেবনার্থ তাঁহার সঙ্গে আসিতে অনুরোধ করিলেন।

দুর্গ-সন্নিহিত পাহাড় ও তাহার পাদদেশাশ্রিত সুবিস্তীর্ণ বনভূমি পরম রমণীয় দৃশ্য। বন-ভূমিতে কেবল অত্যুন্নত আরণ্য বৃক্ষ সকল শোভা পাইতেছে এবং কখন কুঠারাঘাত হেতু প্রতিহত না হওয়ায়, ক্রমশই বর্দ্ধিতায়তন হইয়া গগন স্পর্শ করিতে মস্তক উত্তোলন করিতেছে। নিম্নভূম অধিকাংশ স্থলেই সুপরিস্কৃত এবং কণ্টকা লতাদি পরিশূন্য। বৃক্ষাদির অন্তরাল হইতে, পাহাড়ের প্রাবৃটকালীন নিবিড় কৃষ্ণ মেঘ সদৃশ গম্ভীর শ্রী বড়ই সুন্দর দেখাইতেছে। পিতা ও পুত্রী এইরূপ স্থানে বিচরণ করিতেছেন, এমন সময় একজন ধনুর্ব্বাণধারী ভীল, তাঁহাদিগের নিকটস্থ হইয়া, সসম্মানে অভিবাদন করিল। কিল্লাদার তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন,—

"কি রে রঘুয়া, হরিণ শীকার করিতে বাহির হইয়াছিস্?

"আজ্ঞে হাঁ ধর্ম্মাবতার! আপনি দেখিবেন কি?"

রঘুনাথ কন্যার মুখের প্রতি একবার চাহিয়া বলিলেন,—

"না:—আর কাজ নাই।"

শীকার দেখার কথা উত্থাপিত হইবামাত্র কল্যাণীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। নিরীহ হরিণ যে বাণ-বিদ্ধ ও রুধিরাক্ত হইয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিবে এ দৃশ্য তাঁহার কোমল প্রকৃতির পক্ষে অসহ্য। পিতা শীকার দেখিতে অস্বীকার প্রকাশ করায়, তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু যদি তাঁহার পিতা, অস্বীকার না করিয়া রঘুয়ার সহিত শীকারের তামাসা দেখিতে ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে কল্যাণী

কোন ক্রমেই আপনার অনিচ্ছা ব্যক্ত করিতে পারিতেন না।

রঙ্গুয়া কিছু বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিল,—"কেমন দিন পড়িয়াছে, এখন আর রাজপুতের শীকার ভাল লাগে না! এখন শম্ভু রাজা (কিল্লাদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র) শীঘ্র বাটী না ফিরিলে, এ রাজ্যে আর শীকারের সুখ পাওয়া যাইবে না। মুরারি রাজা (কিল্লাদারের কনিষ্ঠ পুত্র) কতকটা মানুষের মত হইবেন বলিয়া ভরসা ছিল; কিন্তু তাঁহাকে যেরূপ বৃথা পড়া-শুনার জন্য তাগিদ করা হইতেছে, তাহাতে তাঁহারও ভরসা ছাড়িয়া দেওয়া আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। দুর্গ-স্বামীদের সময়ে কিন্তু এরূপ ছিল না। সে সময় হরিণ মারিবার কথা উঠিলে সকল লোক, মায়ের কোলের ছেলেটী পর্য্যন্ত দেখিবার জন্য দৌড়িত। তাহার পর যখন হরিণ মরা পড়িত, তখন দুর্গ-স্বামী শিরোপা দিতেন। এখনকার দুর্গ-স্বামী বিজয়সিংহের মত শীকারী, রাণা সংগ্রামসিংহের পর, আর কখনও হয় নাই। কিন্তু পাহাড়ের এদিকে শীকারে আসিতে এখন আর তাঁহার বড় একটা মন দেখা যায় না।"

রঙ্গুয়ার বক্তৃতা মধ্যে কিল্লাদারের বিরক্তিকর কথা অনেকই ছিল। কিল্লাদার বুঝিলেন যে, তাঁহার এই সামান্য ভৃত্যও, তাঁহার রাজপুতোচিত মৃগয়ায় অনাসক্তি হেতু, তাঁহাকে স্পষ্টই ঘৃণা করে। কিন্তু এই সকল ভীল শীকারী, মৃগয়া-নিপুণতা হেতু, প্রভুদিগের নিতান্ত অনুগ্রহভাজন ছিল। সুতরাং তাহারা কখন কখন প্রভুদিগকে দুই একটা অপ্রিয় কথা বলিলেও, বিরক্তি প্রকাশ করার রীতি ছিল না। কিল্লাদার হাসিতে হাসিতে রঙ্গুয়াকে বুঝাইয়া দিলেন যে, অন্য বিষয়ের আলোচনায় অন্য তাঁহার মন নিবিষ্ট আছে, এজন্যই আজি তিনি শীকারের আমোদ ভোগ করিতে পারিলেন না। তাহার পর বস্ত্র মধ্য হইতে কিছু পয়সা বাহির করিয়া, রঙ্গুয়ার হস্তে প্রদান করিলেন। রঙ্গুয়া অভিবাদন করিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল।

তখন কিল্লাদার, কোন বিশেষ আবশ্যকতা হীন কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইলে যেরূপ ভাব হয়, সেইরূপ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দুর্গ-স্বামীতে যেরূপ উৎকৃষ্ট তীরান্দাজ, শীকারী ও সাহসী বলিয়া লোকে ব্যাখ্যা করে, বাস্তবিকই তিনি কি সেরূপ?"

রঙ্গুয়া বলিল,—"সাহসী—ওঃ সাহসের কথা কি বলিব একবার বাল্যকালে স্বর্গীয় দুর্গ-স্বামী লক্ষ্মণসিংহ, বর্ত্তমান দুর্গ-স্বামী বিজয়সিংহ, আরও অনেক লোক শীকারে গিয়াছিলেন—আমিও সে সঙ্গে ছিলাম। ওরে বাপরে! মহাশয়, একটা বুনো মহিষ সকলকে এমন তাড়া করিল যে, প্রাণ যায় আর কি! আমরা তো প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিলাম। দেখিলাম, বৃদ্ধ লক্ষ্মণসিংহ মারা যান যান হইয়া পড়িয়াছেন। দুর্গস্বামী বিজয়সিংহের বয়স তখন ষোল বৎসর মাত্র। মহাশয়, ষোল বৎসরের ছেলে সেখানে তখন যেরূপ সাহস ও বিক্রম প্রকাশ করিলেন, তাহা আর জীবনে কখন ভুলিব না। বালক সেই দুর্দ্দান্ত মহিষের সম্মুখীন হইয়া তাহাকে তরবারি দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন! ওঃ! এমন বীর— এমন সাহসী আর কি হয়? ঈশ্বর তাঁহাকে সুখে রাখুন।"

কিল্লাদার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অসি চালনায় তাঁহার যেমন নিপুণতা আছে, ধনুর্ব্বাণেরও কি তেমনই পারদর্শিতা আছে?"

রঙ্গুয়া সমুৎসাহে বলিল,—"ধনুর্ব্বাণ তাঁহার

সিদ্ধ-বিদ্যা। অধিক কি বলিব, আমার এই দুই অঙ্গুলির মধ্যে যে পয়সাটী রহিয়াছে, দুর্গ-স্বামী ইচ্ছা করিলে, দুই শত হাত দূর হইতে, ইহা তীর দ্বারা দুই খণ্ড করিয়া দিতে পারেন। আর আপনি কি চান ?"

রঘুনাথ বলিলেন,—"এ আশ্চার্য্য বটে। তবে এখন এস রঙ্গুয়া, অনেকক্ষণ তোমাকে কথাবার্ত্তায় আটকাইয়া রাখিয়াছি।"

রঙ্গুয়া প্রণাম করিয়া, অত্যুচ্চস্বরে গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিল। যতই সে বিপরীত দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই ক্রমে ক্রমে তাহার সংগীত-ধ্বনি মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। রঙ্গুয়ার গীত এক কালে থামিয়া গেলে, কিল্লাদার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কল্যাণি! তুমি তো বাছা এদেশের চাঁদ বর্দ্দাই *। এদেশের যাবতীয় লোকের প্রাচীন বৃত্তান্ত তোমার জানা আছে। তুমি বলিতে পার, এই রঙ্গুয়া কখন দুর্গ-স্বামীদিগের অধীনে কোন কাজ করিয়াছিল কি না। লোকটা তাহা না হইলে, দুর্গ-স্বামীদিগের এত অনুরাগী কি জন্য ?"

কল্যাণী হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"বাবা! চাঁদ বর্দ্দাই রাজ-কাহিনী, যুদ্ধ-কাহিনী প্রভৃতির বর্ণনা করিতেন; আর আমি রঙ্গুয়া ভীলের কাহিনী, না হয় সেইরূপই অপর কোন লোকের কাহিনী বর্ণনা করিয়া—চাঁদ কবির সমকক্ষতা কেমন করিয়া পাইব? সে যাহা হউক, আমার বোধ হয়, রঙ্গুয়া বাল্য-কালে দুর্গ-স্বামীদিগের অধীনে নিযুক্ত ছিল। তাহার পর সে এদেশ ছাড়িয়া হারাবতীতে চলিয়া যায়। সেখান হইতে আপনি তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু বাবা! প্রাচীন দুর্গ-স্বামীদিগের কোন বিবরণ জানিতে যদি আপনার বাসনা থাকে, তাহা হইলে, শান্তা বুড়ীর নিকটে গেলে, সে আপনাকে সব জানা-ইতে পারিবে।"

রঘুনাথ বলিলেন,—"তাহাতে আমার কি দরকার বাছা? তাহাদের ইতিহাস, বা তাহাদের গুণপণার কথা আমি জানিয়া কি করিব কল্যাণি ?"

কল্যাণী বলিলেন,—"তাহা আমি জানি না; আপনি রঙ্গুয়াকে দুর্গ-স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এই জন্যই বলিতেছি।"

কিল্লাদার কহিলেন,—"তুমি বুঝি বাছা এ অঞ্চলের সকল বুড়াদেরই চেন ?"

কল্যাণী বলিলেন,—"তা চিনি বই কি বাবা? না চিনিলে তাহাদের বিপদের সময় সাহায্য করিতে পারিব কেন? কিন্তু শান্তা বুড়ী বুড়ীর বাদশাহ—উপকথার রাণী। রাজা-রাজড়ার যত প্রাচীন-কাহিনী সে সবই শান্তা বুড়ীর কণ্ঠস্থ। শান্তা বুড়ী কাণা হইলেও, সে যখন কথা কহে তখন বোধ হয়, যেন শান্তা কোন উপায়ে শ্রোতার মর্ম্ম-স্থল পর্য্যন্ত দৃষ্টি

* মহাত্মা কর্ণেল টেড্ লিখিয়াছেন,—

"The work of Chund is a universal history of the period in which he wrote. In the sixty-nine books, comprising one hundred thousand stanzas, relating to the exploits of Prithi Raja, every noble family of Rajasthan will find some record of their ancestors &c."

অর্থাৎ চাঁদের গ্রন্থ যে সময়ে লিখিত হইয়াছে, তাহা তৎসাময়িক সুবিস্তৃত ইতিহাস। এই লক্ষ শ্লোকাত্মক, উনসপ্ততি সর্গে বিভক্ত, পৃথিরাজের বীরকীর্ত্তির বর্ণনা-পূর্ণ গ্রন্থে প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ রাজপুত বংশ আপনাদের পূর্ব্ব পুরুষের কোন না কোন বর্ণনা নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবেন।—শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত ইংরাজী রাজস্থান ১ম খণ্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা দেখ।

করিতেছে। যদিও গত বিশ বৎসর শান্তা চক্ষু-রত্ন হারাইয়াছে, তথাপি যখনই আমি তাহার সহিত কথা কহি, তখনই হয় মুখ ফিরাই, অথবা হাত দিয়া মুখ ঢাকি; আমার যেন বোধ হয়, শান্তা আমার মুখের ভাবান্তর পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছে। শান্তার ব্যবহারাদি দেখিয়া আমার বিশ্বাস হয়, সে কোন বড় ঘরের মেয়ে। আসুন বাবা, আপনার শান্তাকে দেখিতেই হইবে। তাহার কুটীর এখান হইতে অধিক দূরে নহে তো।"

রঘুনাথ বলিলেন,—"কল্যাণি! তুমি এত কথা বলিলে বটে, কিন্তু আমার কথার উত্তর হইল না। আমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, এ বুড়ী কে এবং প্রাচীন দুর্গ-স্বামীদের সহিত ইহার কি সম্বন্ধ?"

কল্যাণী বলিলেন,—"বোধ করি, কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। শান্তার দুইটী পৌত্র আপনার অধীনে কি কাজ করিত; সেই জন্য শান্তা এখনও এখানে থাকে। শান্তা সতত সময়ের পরিবর্ত্তন এবং এই কমলাদুর্গ ও তৎ-সংসৃষ্ট বিষয়াদি হস্তান্তর হওয়ায় যেরূপ দুঃখ প্রকাশ করে, তাহাতে বোধ হয় যে, সে নিতান্ত অনিচ্ছায় এখানে থাকে।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"তবেত শান্তা বড় উদার-স্বভাবই বটে। সে আমারই অন্ন খাইয়া উদরপূরণ করে এবং যাহারা তাহার বা অপর কোন লোকেরই কোন উপকারে লাগে না, তাহাদেরই জন্য সতত দুঃখ করে ও তাহাদের অধীনে থাকিতে না পাওয়ায়, কাতরতা প্রকাশ করে,—এ ব্যবহার সদাশয়তার উত্তম পরিচয় সন্দেহ কি?"

কল্যাণী কহিলেন,—"বাবা! শান্তার সম্বন্ধে তোমার অন্যায় বিচার করা হইতেছে। শান্তা পয়সার প্রত্যাশিনী নহে। সে যদি উপবাস করিয়া মারা যায় তথাপি কাহারও নিকট কখন একটী পয়সাও ভিক্ষা করিবে না, ইহা স্থির। বুড়া হইলে সকল মানুষই যেমন আপনাদের সময় কালের গল্প করিতে বড় ভালবাসে, সেও তেমনি গল্প করিতে ভালবাসে মাত্র। শান্তা অনেক দিন দুর্গ-স্বামীদিগের অধীনে কাটাইয়াছে, এই জন্য সে দুর্গ-স্বামীদিগের গল্পই কিছু অধিক করে। ইহা আমার স্থির বিশ্বাস যে, এক্ষণে তুমি তাহার রক্ষক বলিয়া সে তোমার প্রতিও কৃতজ্ঞ এবং তুমি তাহার নিকটস্থ হইলে, সে অপর কাহারও সহিত বাক্যালাপ না করিয়া, সানন্দে তোমারই সহিত কথোপকথন করিবে। এস বাবা, তোমার শান্তাকে দেখিতেই হইবে।

আদরিণী কন্যার ন্যায়, কল্যাণী স্বাধীনতা সহকারে পিতাকে স্বেচ্ছামত পথে টানিয়া লইয়া চলিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কল্যাণী পথ-প্রদর্শিকারূপে পিতাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে লাগিলেন। কিল্লাদারের চিত্ত সর্ব্বদা বহু গুরুতর বিষয়-চিন্তনে ব্যাপৃত থাকিত, এজন্য তিনি তাঁহার সুবিস্তৃত অধিকারের সর্ব্বস্থান সতত সন্দর্শন করিতে সময় পাইতেন না, সুতরাং অধিকাংশ স্থান তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল। কিন্তু কল্যাণীর তাদৃশ কারণ না থাকায়, বিশেষতঃ প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শনে সমধিক আসক্তি হেতু, তিনি সততই সন্নিহিত স্থান সমূহে পরিভ্রমণ করিতেন। তদ্ধেতু তত্রত্য যাবতীয় বন ভূমি, গিরি-সঙ্কট,

আরণ্য পথ, সকলই তাঁহার সুন্দররূপ জ্ঞান-গোচর ছিল। রঘুনাথ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া প্রীত হইতে লাগিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার ক্ষুদ্র-কায়া, স্নেহ-পরায়ণা আদরিণী কন্যা, কখন বা কোন অতিকায় বৃক্ষের প্রতি তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করাইয়া, কখন বা কোন অচিন্তিত-পূর্ব্ব পথ বা প্রান্তর দেখাইয়া, কখন বা কোন উচ্চ স্থান হইতে নিম্নভূমির শোভার উল্লেখ করিয়া এবং কখন বা ঘনারণ্য প্রভৃতির মধ্যবর্ত্তী হইয়া তত্রত্য গম্ভীর ভাবের বর্ণনা করিয়া, কিল্লাদারের প্রীতি শত গুণে সংবর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন।

উক্তরূপ উচ্চ স্থানে একবার উপনীত হইয়া, কল্যাণী পিতাকে বলিলেন যে, তাঁহারা শাস্তা বুড়ীর কুটীর-সমীপস্থ হইয়াছেন। পরক্ষণেই যেমন তাঁহারা তত্রত্য ক্ষুদ্র পাহাড়পার্শ্বস্থ পথ হইতে নিক্রান্ত হইলেন, অমনই গভীর উপত্যকা-মধ্যস্থ, শাস্তা বুড়ীর দুর্দ্দশাপন্ন কুটীর তাঁহাদের নেত্র-পথে নিপতিত হইল। কুটীরের হীনাবস্থা ও আলোকহীনতা তদধিকারিণীর অবস্থার সহিত বিশেষ সমতা স্থাপন করিয়াছে।

বৃদ্ধার কুটীর একটী উচ্চ পাহাড়ের পাদদেশে সংস্থিত; পাহাড়ের ঊর্দ্ধ-ভাগ কুটীরের উপর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। বোধ হইতেছে যেন তাহার অসংলগ্ন অংশ বিশেষ সহসা স্খলিত হইয়া নিম্নস্থ ভঙ্গুর আশ্রয়কে চূর্ণীকৃত করিবে বলিয়া, বিভীষিকা দেখাইতেছে। তৃণাচ্ছাদিত কুটীর খানির নিতান্ত জীর্ণ দশা। কুটীরোর্দ্ধ হইতে নীলাভ বাষ্প উদ্গত হইতেছে—সেই বাষ্প মণ্ডলাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে গিয়া তদূর্দ্ধস্থ ধূসরবর্ণ গিরির সহিত সম্মিলিত হইতেছে এবং তৎসংসৃষ্ট দৃশ্যকে নিরতিশয় নয়ন-বিনোদক করিতেছে। কুটীরের পুরোভাগ কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত নানাবিধ বৃক্ষাদি পরিবৃত। সেই বৃক্ষাদি সন্নিধানে শাস্তা বুড়ী বসিয়া কয়েকটী মেষ-শাবককে, যত্ন সহকারে নবীন তরুপল্লবাদি, খাওয়াইতেছে। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, মেষ-পালনই শাস্তার জীবন যাত্রার উপায়।

এই মেষপালিকার ব্যবসায়, তাহার অদৃষ্টের বক্রতা, তাহার হীন আবাস, সকলই নিতান্ত দুর্দ্দশার পরিচায়ক। কিন্তু দৃষ্টি মাত্রই প্রতীত হয় যে, বৃদ্ধার অত্যধিক বয়স বা দুরদৃষ্ট, বা দৌর্ব্বল্য কিছুই তাহার মানসিক তেজের খর্ব্বতা সাধনে সমর্থ হয় নাই।

একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষ-মূলে বৃদ্ধা উপবিষ্টা। তাহার দেহ সমুন্নত—বয়োধিক্য হেতু কিঞ্চিন্মাত্রও অবনত নহে। তাহার পরিচ্ছদ সামান্য হইলেও, মলিনতা বর্জ্জিত। এই স্ত্রীলোকের মুখের ভাব এরূপ স্বাভাবিক গম্ভীরতায় আচ্ছাদিত যে, দর্শনমাত্রে দর্শক তাহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ হইয়া পড়ে এবং অনেক স্থলেই, আন্তরিক সম্মান সহকারে, তাহার সহিত কথোপকথন করিতে প্রবৃত্ত হয়। বৃদ্ধাও, তাদৃশ ব্যবহার তাহার প্রতি অবশ্যকর্ত্তব্য বোধে, অবিকৃত চিত্তে তাহাতে কর্ণপাত করিতে থাকে। যৌবনকালে বৃদ্ধা সুন্দরী ছিল—এখন তাহার চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট আছে। কিন্তু তাহার বদনে সমশ্রেণীস্থ ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা উচ্চতা-সূচক ভাব স্পষ্টই পরিলক্ষিত হয়। নেত্র-রশ্মি বিহীন বদন এতাদৃশ হৃদয়-ভাব ব্যঞ্জক হইতে পারে, ইহা আশ্চর্য্য বটে! বৃদ্ধার চক্ষু সর্ব্বতোভাবে নিমীলিত ছিল, সুতরাং দৃষ্টিহীন বিকট নয়ন তারকা তাহার বদন-শ্রীর কোন প্রকার অপচয় করিতে পারে নাই।

কল্যাণী, বৃদ্ধার প্রাঙ্গণ-দ্বারের অর্গল উন্মো-

চন করিয়া, বলিলেন,—"শান্তা! আমার পিতা তোমাকে দেখিতে আসিয়াছেন।"

কল্যাণী ও কিল্লাদারের দিকে মুখ ফিরাইয়া বৃদ্ধা, মস্তক নত করিয়া বলিল,—"আসিতে আজ্ঞা হউক—আমার পরম সৌভাগ্য।"

রঘুনাথ কিল্লাদার বৃদ্ধার আকৃতি দেখিয়া কতকটা সমাদর সহকারে বৃদ্ধার সহিত আলাপ করিতে সংকল্প করিলেন। বলিলেন,—"মা, মেষপাল তুমি কেমন করিয়া রক্ষা কর, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। বোধ হয় এজন্য তোমার যথেষ্ট কষ্ট হয়।"

বৃদ্ধা বলিল,—"না, কেন হইবে? যাহার যাহা জীবিকা তাহাতে তাহার কষ্ট হইলে চলিবে কেন? নরপতিগণ প্রতিনিধি দ্বারা যেরূপে প্রজাসমূহ শাসন করেন, সেইরূপে আমিও প্রতিনিধি দ্বারা মেষপালন করিয়া থাকি। সৌভাগ্যক্রমে এ সম্বন্ধে আমার যোগ্য মন্ত্রী আছে।—পার্ব্বতি! এদিকে এস!"

হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে একটী বালিকা তথায় আগমন করিল। সেই বালিকা পার্ব্বতী। শান্তা তাহাকে বলিল,—"পার্ব্বতি! কিল্লাদার মহাশয় এবং কুমারী কল্যাণী আসিয়াছেন। ইঁহারা যেরূপ সম্ভ্রান্ত লোক, আমাদের তদনুরূপ অভ্যর্থনা করা আবশ্যক। অতএব তুমি ইঁহাদিগের অভ্যর্থনার জন্য, গৃহ-মধ্যে যে ফল মূল থাকে তাহা আনিয়া দাও। যেন অপরিষ্কার না হয়।"

পার্ব্বতী আজ্ঞা পালনার্থ গমন করিল। কিল্লাদার এরূপ দরিদ্র ও সামান্য লোকের বাটীতে খাদ্য গ্রহণ করা অবৈধ বলিয়া জানিতেন, কিন্তু বর্ত্তমান স্থলে সে নিয়ম পালন করা আবশ্যক বলিয়া মনে করিলেন না এবং তদ্রূপ করিতে তাঁহার ইচ্ছাও হইল না। পার্ব্বতী বৃক্ষ-পত্র বিস্তৃত করিয়া, তাহাতে কিল্লাদার ও তাঁহার কন্যার নিমিত্ত কয়েকটী ফল-মূল স্থাপন করিল। তাঁহারাও তাহার কিঞ্চিৎ আহার করিলেন। তখন কিল্লাদার জিজ্ঞাসিলেন,—

"তুমি এই স্থানে বহুকালাবধি আছ, বোধ হয়।"

বৃদ্ধার উত্তর প্রত্যুত্তর যদিও যথেষ্ট শিষ্টাচারে পরিপূর্ণ, তথাপি তাহা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত এবং ঠিক যাহা না বলিলে নহে, কেবল তাহাই। কিল্লাদারের বাক্যের উত্তর স্বরূপে বৃদ্ধা বলিল,—"বিগত ষাটী বর্ষ কাল আমি এই কমলায় আছি।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"তোমার কথার ভাবে বোধ হইতেছে, মিবার তোমার আদিম নিবাস নহে।"

বৃদ্ধা বলিল,—"না, মাড়বার আমার জন্মভূমি।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"কিন্তু এদেশের প্রতি তোমার জন্মভূমির মতই অনুরাগ দেখিতেছি।"

তখন বৃদ্ধা বলিল,—"এই প্রদেশেই আমার ভাগ্যচক্র কখন সুখ, কখন বা দুঃখের পথে আবর্ত্তিত হইয়াছে; এই দেশেই আমি উন্নতমনাঃ ও প্রেম-পরায়ণ ব্যক্তির পত্নী রূপে জীবনের বিংশ বর্ষ অতিবাহিত করিয়াছি; এই স্থানেই আমি ছয়টী আনন্দ-নিকেতন পুত্র প্রসব করিয়াছি। এই স্থানেই আবার পরমেশ্বর আমাকে এই সকল সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন; এই স্থানেই একে একে সকলেই কালের করাল-কবলে কবলিত হইয়াছে এবং শ্মশান ভূমিতে ভস্ম হইয়া, পঞ্চভূতে আপনাদের ভূতময় দেহ মিশাইয়াছে! যতদিন তাহারা জীবিত ছিল, ততদিন তাহাদের দেশই আমার দেশ ছিল, এক্ষণে তাহারা নাই, সুতরাং আমারও তাহাদের দেশছাড়া অন্য দেশ নাই।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"তোমার ঘরখানি নিতান্ত জীর্ণ হইয়াছে।"

কল্যাণী লজ্জাসহকৃত আগ্রহ সহকারে, বলিলেন,—"বাবা যদি দোষ মনে না করেন, তাহা হইলে আপনার কর্ম্মচারীদিগকে এই ঘরখানা ভাল করিয়া দিবার আদেশ করিয়া দিলে ভাল হয়।"

বৃদ্ধা বলিল,—"কুমারি! আমার জীবন কাল এই ঘরে বেশ কাটিয়া যাইবে। এই বিষয়ের জন্য কিল্লাদার মহাশয় একটুও কষ্ট করেন, ইহা আমার ইচ্ছা নহে।"

কল্যাণী বলিলেন,—"এককালে তুমি ভাল বাটীতেই বাস করিতে, তোমার যথেষ্ট ধনজনও ছিল। এক্ষণে এই বৃদ্ধ বয়সে, এই কদর্য্য কুটীরে কেমন করিয়া বাস করিবে?"

বৃদ্ধা বলিলেন,—"যে সকল যন্ত্রণা আমি স্বয়ং সহ্য করিতেছি এবং অপরকে সহ্য করিতে দেখিয়াছি, তাহাতে যখন এ হৃদয় ভাঙ্গে নাই, তখন নিশ্চয়ই ইহা নিতান্ত কঠিন। এরূপ কঠিন হৃদয় সামান্য দশা-বিপর্য্যয়ে কেন কাতর হইবে?"

কিল্লাদার বলিলেন,—"আমার বোধ হয়, তুমি জীবন কালে অনেক পরিবর্ত্তন দেখিয়াছ এবং সম্ভবতঃ সে সকল ঘটনা ঘটিবে বলিয়া তুমি পূর্ব্ব হইতে জানিতে।"

শান্তা, প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর না দিয়া, বলিল,—"কেমন করিয়া সে সকল পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে হয়, তাহা আমি জানিয়াছি।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"কাল তাদৃশ পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী তাহা তুমি নিশ্চয়ই জানিতে।"

আবার বৃদ্ধা উত্তর দিলেন,—"ঠিক কথা। যে বৃক্ষমূলে আপনি উপবেশন করিয়াছেন, তাহা সময়ক্রমে হয় আপনিই, না হয় ছেদকের কুঠারাঘাত হেতু ধ্বংস হইবে, ইহা যেমন সুনিশ্চিত, তেমনই বর্ত্তমান পরিবর্ত্তন স্থির নিশ্চয়। কিন্তু ইহা আমার বোধ ছিল না যে, যে বৃক্ষ আমার আবাস ভূমি সমাচ্ছন্ন করিয়া ছিল, তাহার নাশ আমাকে দেখিতে হইবে।"

রঘুনাথ বলিলেন,—"তুমি মনে করিও না যে, আমার বিষয় অংশের বিগত অধিকারীদিগের বৃত্তান্ত, তুমি সবিষাদে স্মরণ করিতেছ বলিয়া, আমি বিন্দুমাত্র বিরক্ত হইব। প্রত্যুত তাহাদিগের প্রতি আসক্ত থাকিবার অবশ্যই তোমার প্রকৃষ্ট কারণ আছে; আমি তোমার এতাদৃশ কৃতজ্ঞতার সম্মান করিতেছি। আমি তোমার কুটীরের জীর্ণসংস্কার করিবার আদেশ দিব এবং ভরসা করি, উত্তরোত্তর পরিচয়ের বৃদ্ধি সহকারে, আমরাও পরস্পর আত্মীয় ভাবে জীবনপাত করিতে সক্ষম হইব।"

বৃদ্ধা বলিল,—"এ বয়সে আর নূতন আত্মীয়তা কেহই করে না, তাহা আপনি জানেন। তথাপি আপনার আন্তরিক সদাশয়তা হেতু, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু আমার যাহা যাহা প্রয়োজন, তৎসমস্তই আমার আছে, সুতরাং আমি মহাশয়ের নিকট হইতে আর কিছুই গ্রহণ করিতে চাহি না।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"তুমি অতি বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক দেখিতেছি। আমি ভরসা করি, তুমি জীবনের অবশিষ্ট কাল আমার এই জমিতে বিনা খাজনায় বাস করিবে।"

বৃদ্ধা কহিল,—"বোধ হয় তাহা করিব। যদিও সামান্য কথা মহাশয়ের মনে না থাকিতে পারে, কিন্তু আমার যেন মনে হইতেছে, কমলা-দুর্গ ও তৎসংক্রান্ত ভূ-সম্পত্তি যখন

মহাশয়ের নিকট বিক্রীতা হয়, তখন সে বিক্রয় পত্রে একটা নিয়ম ছিল যে, আমি যাবজ্জীবন, ঘরের খাজনা না দিয়া, এখানে বাস করিতে পাইব।"

কিল্লাদার কিছু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, —"ঠিক্ ঠিক্—আমার মনে ছিল না বটে। দেখিতেছি, তুমি দুর্গ-স্বামীদিগের এতই অনুরাগিণী যে, আমার নিকট হইতে কোনই উপকার গ্রহণে তোমার মত নাই।"

শান্তা বলিল,—"না মহাশয়—আপনার প্রস্তাবিত উপকার আমি গ্রহণ করিতেছি না বটে, কিন্তু তজ্জন্ত আমি সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞ। ঐ সকল প্রস্তাবের প্রতিশোধ স্বরূপে, আমি অধুনা মহাশয়কে যে সকল কথা জানাইতে বাসনা করিয়াছি, উপকার প্রতিশোধের অপেক্ষা অন্য কোন উৎকৃষ্টতর উপায় জানিলে আমি সুখী হইতাম।"

কিল্লাদার বিস্মিত ও নিস্তব্ধ ভাবে শুনিতে লাগিলেন। শান্তা বলিল,—"কিল্লাদার মহাশয়, আপনি সতর্ক হউন। আপনার এক্ষণে বিষম পতনোন্মুখ অবস্থা।"

রঘুনাথ বলিলেন,—"বটে? কোন গুপ্ত মন্ত্রণা, কি কোন চক্রান্তের সংবাদ তুমি জানিতে পারিয়াছ নাকি?"

বৃদ্ধা বলিল,—"না কিল্লাদার। যাহারা তাদৃশ ব্যবসায়ে নিযুক্ত, তাহারা রুগ্ন, অন্ধ ও দুর্ব্বল ব্যক্তিকে কখনই পক্ষ করে না। আমার সংবাদ অন্তরূপ। আপনি দুর্গ-স্বামীদিগের সহিত নিতান্ত কঠিন ব্যবহার করিয়াছেন। জানিবেন, তাহারা ভয়ানক বংশ; এবং ইহাও জানিবেন যে, মানুষ ক্রোধান্ধ হইলে, হিতাহিত বোধ থাকে না।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"আমি তাহাদের সহিত রাজব্যবস্থা মত কার্য্যই করিয়াছি। তাহারা যদি আমার কার্য্য মন্দ মনে করে, তাহা হইলে অবশ্যই তাহাদের সর্ব্বাগ্রে রাজ-ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি পাত করা আবশ্যক।"

বৃদ্ধা বলিল,—"তাহারা অন্তরূপ মনে করিতে পারে এবং দুঃখ নিবারণের অন্য কোন উপায় না দেখিয়া, হয়ত অবশেষে রাজ ব্যবস্থা স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারে।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"তোমার অভিপ্রায় কি? নবীন দুর্গ-স্বামী আমার দেহের উপর অত্যাচার করিবেন বলিয়া কি তোমার মনে হয়?"

শান্তা বলিল,—"ঈশ্বর করুন আমার মুখ দিয়া কখন যেন তেমন কথা না বাহির হয়। যুবক দুর্গ-স্বামীর চরিত্র কেবল উচ্চাশয়তা, সরলতা, সম্মান-জ্ঞান প্রভৃতি উচ্চগুণ সমূহে পূর্ণ। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি দুর্গ-স্বামীদিগের বংশোদ্ভব। রাঘবেশ রায় ও ভবানীপতি সিংহের পরিণাম স্মরণ আছে কি? তাহাদিগের সে দশাও দুর্গ-স্বামীদিগেরই কার্য্য।"

কিল্লাদার চমকিয়া উঠিলেন। এই ভয়ানক ও লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডদ্বয় তাঁহার আমূল স্মৃতিপথারূঢ় হইল। যেরূপ ঐ দুই উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, দুই বিভিন্ন সময়ে, দুর্গ-স্বামীদিগকে অপমানিত করিয়াছিল এবং প্রতিহিংসা স্বরূপে, যেরূপে দুর্গ-স্বামিগণ তাহাদের ভয়ানক শাস্তি দিয়া অবশেষে প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন, তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত বৃদ্ধা বর্ণন করিল। সমস্ত শ্রবণ করিয়া, কিল্লাদারের হৃদয় বস্তুতই ভয়ে আকুল হইল। তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল, তাঁহার সম্বন্ধেও তাদৃশ ব্যবহার করা বর্ত্তমান দুর্গ-স্বামীর পক্ষে একটু অসম্ভব নহে। তিনি শান্তার নিকট হইতে, আত্ম-হৃদয়ের ভীতি প্রচ্ছন্ন রাখিবার

নিমিত্ত, যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও, কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তাঁহার কণ্ঠস্বর শ্রবণে শান্তা স্পষ্টই বুঝিতে পারিল যে, তাহার বাক্য সমূহ কিল্লাদারের হৃদয়ের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে। কিল্লাদার কয়েকটী সামান্ত কথা মাত্র কহিয়া, উত্তরাপেক্ষা না করিয়া, কন্তা সহ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কিল্লাদার ও কল্যাণী বহুদুর নীরবে গমন করিতে লাগিলেন। শান্তার মুখে পিতার বিপদ্ বার্ত্তা শুনিয়া কল্যাণীর চিত্ত নিতান্ত চিন্তাকুল হইয়াছিল; কিন্তু তাহা ব্যক্ত করিয়া, পিতার চিন্তা-স্রোতের গতি রুদ্ধ করা অবৈধ বলিয়া তিনি মনে করিলেন; সুতরাং নীরবে চলিতে লাগিলেন।

সহসা কিল্লাদার জিজ্ঞাসিলেন,—"কল্যাণি! তোমাকে কাতর দেখিতেছি কেন?"

কল্যাণী প্রকৃত কারণ গোপন করিয়া, অদূরে যে বন্ত গো ও মহিষপাল চরিতেছিল, তদ্দর্শনে ভীত হইয়াছেন বলিয়া, ব্যক্ত করিলেন। বস্তুতঃ এই সকল মহিষ-পাল ভয়ানক জন্তু। যদি তাহারা কোন প্রকারে কোন মানব কর্ত্তৃক উত্যক্ত বা ক্রুদ্ধ, বা অপর কোন কারণে হিংসা-পরবশ হয়, তাহা হইলে তাহারা সেই মানবকে শৃঙ্গ দ্বারা বিদারিত ও খণ্ড খণ্ড করিয়া ক্ষান্ত হয়। তাহাদের দেহে অপারসীম শক্তি—তাহাদের মূর্ত্তি ভয়ানকের একশেষ।

কল্যাণীর বাক্য সমাপ্ত হইলে, কিল্লাদার তাঁহার অমূলক ভয়ের জন্ত পরিহাস করিতে উদ্যত হইবামাত্র, দেখিতে পাইলেন, অদূরে এক বিকট-মূর্ত্তি কৃষ্ণকায় মহিষ অতিবেগে তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। হয় কল্যাণীর রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ দেখিয়া, না হয় স্বাভাবিক হিংসা প্রবৃত্তির চরিতার্থ সাধন বাসনায়, এই মহিষ উত্তেজিত হইয়াছে। মহিষ সজোরে ভূতলে পদাঘাত, শৃঙ্গ দ্বারা সময়ে সময়ে ভূপৃষ্ঠ বিদার এবং বিকট শব্দ করিতে করিতে ধাবিত হইতে লাগিল।

কিল্লাদার মহিষের এবংবিধ ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, ঐ পশু অনিষ্ট-সাধনোদ্দেশে নিবিষ্ট। তখন ভয়ে তিনি চলচ্চিত্ত হইয়া উঠিলেন এবং উভয় হস্তে সজোরে কন্তার বাহু ধারণ করিয়া, বেগে বিপরীত দিকে পালাইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগকে পলায়ন-পর দেখিয়া উত্তেজিত পশু আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল এবং অধিকতর বেগে তাঁহাদিগের অভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল। সেই ক্রোধান্ধ পশুর ভয়ানক অবস্থা নিম্নোদ্ধৃত মাহিষাসুরের বর্ণনা স্মরণ করাইতে লাগিল,—

সোঽপি কোপান্মহাবীর্য্যঃ খুর-ক্ষুণ্ণ-মহীতলঃ।
শৃঙ্গাভ্যাং পর্ব্বতানুচ্চাংশ্চিক্ষেপচ ননাদচ॥
বেগ-ভ্রমণ-বিক্ষুণ্ণা মহী তস্য ব্যশীর্য্যত।
লাঙ্গুলেনাহতশ্চাব্ধিঃ প্লাবয়ামাস সর্ব্বতঃ॥
ধুত শৃঙ্গ বিভিন্নাশ্চ খণ্ডখণ্ডং যযুর্ঘনাঃ।
শ্বাসানিলাস্তাঃ শতশো নিপেতুর্নভসোঽচলাঃ॥ *

কিল্লাদার কন্তার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে প্রাণপণ যত্নে দৌড়িতে লাগিলেন। ভয়ে, পরিশ্রমে ও উৎকণ্ঠায় কল্যাণী নিতান্ত উৎপীড়িতা হইয়াছিলেন—ক্রমে তাঁহার পাদচালনা ক্ষমতা তিরোহিত হইয়া গেল এবং অবশেষে তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন তখন কিল্লাদার কন্তাকে লইয়া, আর

* মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

চেষ্টা অসম্ভব জানিয়া, সেই ভূমি-তলে দুহিতাকে স্থাপন করিলেন এবং স্বয়ং, কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া মূর্চ্ছিতা কন্যা ও ক্রুদ্ধ পশু এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী হইয়া দাঁড়াইলেন। তখন সেই ঘোর উত্ত্যক্ত ও ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর পশু অতি নিকটস্থ হইয়াছে—প্রাণ বাঁচাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। ওঃ! কি ভয়ানক অবস্থা!

●

হয় পিতা, না হয় পুত্রী, অথবা উভয়েরই জীবন অপ্রতিবিধেয় কারণে গতপ্রায়। তৎকালে তাঁহাদের রক্ষাসাধনের কোনই উপায় নাই এবং সেই বিকট পশুর শৃঙ্গবিদারিত হইয়া, কাল-কবলিত হওয়া ব্যতীত, অন্য পরিণাম অসম্ভাবিত। এইরূপ সময়ে, কে জানে কেন, সেই যমোপম দুরন্ত পশু, হঠাৎ বিকট ধ্বনি করিয়া, ভূতলে পতিত হইল এবং মরণাপন্ন হইয়া অঙ্গাদি সঙ্কোচন করিতে লাগিল। মহিষের মেরু-দণ্ড ও মস্তকের সন্ধি-স্থলে এক মাত্র তীর বিদ্ধ। কোথা হইতে, কে এ তীর মারিল, তাহা কিল্লাদার স্থির করিতে পাড়িলেন না। তাঁহার তাদৃশ চিন্তার উপযুক্ত অবস্থাও নহে। তিনি তখন নিতান্ত নিশ্চল ও কাণ্ড-জ্ঞান-হীন অবস্থায় দণ্ডায়মান। এদিকে কল্যাণী চেতনা-হীন অবস্থায় ভূ-পতিতা, মধ্যে কিল্লাদার সংজ্ঞা-হীন অবস্থায় দণ্ডায়মান, অপর দিকে দুরন্ত ভয়ঙ্কর মহিষ সহসা মৃত্যু-কবলিত হইয়া নিপতিত! কেমন করিয়া এত অল্প সময়ের মধ্যে এই কাণ্ড সংঘটিত হইল, এখনই যে ভয়ানক জীবের আক্রমণে তাঁহাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল, সহসা তাঁহার অজ্ঞাতসারে সেই সাক্ষাৎ যমোপম পশু কেমন করিয়া এরূপ অবস্থাপন্ন হইল, একথা কিল্লাদার তো মীমাংসা করিতে পারিলেনই না। অধিকন্তু এ সকল কাণ্ড এত শীঘ্র ও এতাদৃশ অচিন্তিত পূর্ব্ব রূপে সংঘটিত হইয়া গেল যে, কারণ অনুমান করা দূরে থাকুক, কিল্লাদার তৎসমস্ত চিত্তে ধারণা করিতেও সমর্থ হইলেন না। ফলতঃ কিল্লাদার যদি তৎকালে মনে করিতেন যে, ভগবানের সাক্ষাৎ ইচ্ছা-প্রভাবে তাঁহারা সে দিন সে দায় হইতে জীবন লাভ করিয়াছেন, তাহা হইলেও তাঁহার মীমাংসা অসঙ্গত হইত না। এইরূপ সময়ে পার্শ্বস্থ বৃক্ষ-শ্রেণীর মধ্য হইতে, এক ধনুক-ধারী যুবক-মূর্ত্তি তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হইল।

এই যুবক-মূর্ত্তি সন্দর্শনে কিল্লাদারের মনে বাহ্য জগতের সত্তা ও আপনাদের অবস্থা সম্বন্ধীয় জ্ঞান জন্মিল। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, কন্যার সাহায্যার্থ লোকের প্রয়োজন। তিনি মনে করিলেন, ধনুক-ধারী ব্যক্তি হয়ত তাঁহার কোন প্রজা। সে যেই হউক, তিনি তাহাকে সম্বোধন করিলেন এবং যুবক নিকটস্থ হইলে, মূর্চ্ছিতা কন্যাকে সন্নিহিত কোন নির্ঝরিণী সমীপে লইয়া গিয়া তাঁহার যথোচিত শুশ্রূষা করিবার ভার দিয়া, স্বয়ং শাস্তার কুটীর হইতে অন্য প্রকার প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও লোকজন সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে, ধাবিত হইলেন।

যুবক বিহিত যত্নে যুবতীর শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। আরব্ধ সৎকার্য্য অর্দ্ধ-সমাপিত অবস্থায় ত্যাগ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি না হওয়ায়, তিনি যুবতীকে ক্রোড়ে করিয়া, সন্নিহিত এক পরম রমণীয় উৎসাভিমুখে গমন করিলেন। গমনকালে বুঝা গেল, সমীপবর্ত্তী প্রত্যেক স্থানই যেন যুবকের সুপরিচিত। যে উৎস-সমীপে ধনুক-ধারী পুরুষ মূর্চ্ছিতা সুন্দরীকে বহন করিয়া সমাগত হইলেন, এক সময়ে তাহা বিচিত্র শোভার স্থান ছিল এবং

তাহার উপরিভাগে অতি মনোহর ছাদ এবং চতুর্দ্দিক সুরম্য স্তম্ভাবলী বিরচিত ছিল। কালে ও অযত্নে তৎসমস্ত বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে তাহার চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট থাকিয়া, অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে। উৎস-নিঃসৃত সুনির্ম্মল বারিরাশি, পার্শ্বস্থ উন্মুক্ত পথ দিয়া, কুল্ কুল্ শব্দে প্রবাহিত হইয়া, সুদূরে চলিয়া যাইতেছে।

এই মনোহর প্রস্রবণ সম্বন্ধে সন্নিহিত জনপদ-সমূহে এক আশ্চর্য্য কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে, বহুকাল পূর্ব্বে রায়মল নামে একজন দুর্গ-স্বামী মৃগয়াকালে এই প্রস্রবণ সমীপে, এক ভুবনমোহিনী যুবতী কামিনী সন্দর্শন করেন। সুন্দরী-শিরোমণি-স্বরূপা সেই রমণীর রূপরাশি দুর্গ-স্বামী রায়মলের নয়ন-মন যৎপরোনাস্তি আকর্ষণ করিল। অতঃপর সূর্য্যাস্তের অত্যল্প পূর্ব্বে, দুর্গ-স্বামী রায়মল ও সেই অজ্ঞাতনামা সুন্দরী এই নির্দ্দিষ্ট স্থানে সম্মিলিত হইতে লাগিলেন। যুবতী আগমন-কালে ও প্রস্থান-কাল সেই উৎসেরই সমীপদেশ দিয়া অজ্ঞাতসারে গমনাগমন করিতেন; এজন্য প্রেমোন্মত্ত রায়মল সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, সুন্দরীর জীবন-বৃত্তান্ত নিশ্চয়ই কোন অনৈসর্গিক ব্যাপারের সহিত সম্বন্ধ। সুন্দরী তাঁহাদের মিলন সম্বন্ধেও যে কয়েকটী নিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাও সন্দেহজনক ও রহস্য-পূর্ণ। এই রমণী সপ্তাহ-মধ্যে কেবল মাত্র শুক্রবারে প্রেমিক সম্ভাষণে সমাগতা হইতেন, কিন্তু কদাপি অধিকক্ষণ থাকিতেন না; সন্নিহিত গ্রামে দেবারতিসূচক বাদ্যধ্বনি হইবামাত্র তিনি প্রস্থান করিতেন। প্রেম-মগ্ন, রূপোন্মত্ত রায়মলের চিত্তে সুন্দরীর এই সকল আশ্চর্য্য নিয়মাধীনতার কারণ স্থির করা অবসর ছিল না। তিনি, সেই প্রেম-গুণ-গানে ও সেই রূপ-রত্ন চিন্তনে, সতত বিনিবিষ্ট থাকিতেন। সুন্দরীর সাক্ষাৎ কালের নিরতিশয় অল্পতা হেতু, রায়মল নিতান্ত ক্ষুণ্ণ ছিলেন, কিন্তু যুবতীকে বারংবার অনুরোধ করিলেও তিনি মিলন কাল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ করিতে মত করিলেন না। অতএব রায়মল স্থির করিলেন, গ্রামস্থ দেবালয়ে দেবারতি-সূচক বাদ্য-ধ্বনি সুন্দরীর প্রস্থান কালের নিদর্শন; অতএব ঐ আরতি যদি অপেক্ষাকৃত বিলম্বে হয়, তাহা হইলে বাদ্য ধ্বনিও বিলম্বে কর্ণ-গোচর হইবে, সুতরাং যুবতীর অবস্থান-কালও অবশ্যই অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইবে। ভবিষ্যৎ-বিমূঢ়, প্রেমান্ধ প্রণয়ী এই উপায় স্থির করিয়া, গ্রাম্য পূজককে সেই দিন হইতে অন্ততঃ দুইদণ্ড কাল পরে দেবারতি করিতে আদেশ দিলেন। নিয়মিত সময়ের বহু পূর্ব্ব হইতেই রায়মল নির্দ্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করিতেছিলেন; যথা-নির্দ্দিষ্ট সময়ে যুবতী সমাগতা হইলেন। যুবক যুবতী বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া প্রণয়-সাগরে সন্তরণ দিতে লাগিলেন। একের করে অপর বদ্ধ হইয়া, তাঁহারা তৎকালে অপার্থিব সুখ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। যে নিয়মিত সময়ে প্রতিদিন বাদ্য-ধ্বনি হয়, সে সময় বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গেল; যুবতীর তাহা জ্ঞান নাই। যখন বাদ্য-ধ্বনি হইল, তখন যুবতী প্রণয়াস্পদের আলিঙ্গন-পাশ ছিন্ন করিয়া, প্রস্থানার্থ প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু তখনই আপনার দেহের ছায়া দর্শনে বুঝিতে পারিলেন যে, নিয়মিত প্রস্থান কাল বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই কথা বুঝিবামাত্র, যুবতী হৃদয়-ভেদী চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং উন্মাদিনীর ভাবে 'চিরকালের নিমিত্ত বিদায়,' এই কথা ব্যক্ত

করিয়া, সবেগে সেই প্রস্রবণের বারিরাশিতে ঝাঁপ দিলেন। তাঁহার দেহ নিমজ্জন হেতু, অবিলম্বে সেই জলরাশিতে বুদ্বুদ সমূহ সমুত্থিত হইল। মর্ম্মাহত, ব্যথিত, অনুতাপ-দগ্ধ রায়মল সেই সলিল-সমীপে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন কি? দেখিলেন, সেই বুদ্বুদসমূহ শোণিতসংস্পর্শ হেতু রক্তবর্ণ! রায়মল বুঝিলেন যে, তাঁহারই অদূরদর্শিতা ও অবিমৃষ্যকারিতা হেতু এই লোক-ললামভূতা সুন্দরী অদ্য জীবন হীন! কাতর রায়মলকে এই অসহ্য বিরহ-যন্ত্রণা বহুদিন সহ্য করিতে হয় নাই। সুবিখ্যাত হলদিঘাট সমরে, শত্রুর অসি তাঁহাকে সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়া দিল। ইতি পূর্ব্বেই তিনি এই গভীর প্রেমের আশ্রয়-ভূমি এবং তাঁহার প্রণয়িনীর অন্তিম নিকেতন স্বরূপ এই প্রস্রবণের উপরে ছাদ এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে স্তম্ভ ও প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া এই স্মরণীয় ক্ষেত্রে সাধারণ সংস্পর্শ সম্ভাবনা পরিশূন্য করিয়া রাখিয়াছিলেন। কথিত আছে, এই সময় হইতেই দুর্গ-স্বামীবংশের পতনারম্ভ হয়।

এই চিরপ্রচলিত প্রবাদ সম্বন্ধে নানাপ্রকার মতভেদ দৃষ্ট হইত। কেহ কেহ বলিত পুরাণোক্ত পুরুরবাঃ যেরূপ উর্ব্বশী নাম্নী স্বর্গ-কন্যার প্রেমে মত্ত হইয়াছিলেন, বর্ত্তমান ঘটনাও সেইরূপ। রায়মল-প্রণয়িনী কোন শাপ-ভ্রষ্টা স্বর্গ-কন্যা;—নির্দ্দিষ্ট দিনে, নির্দ্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় এবং অলৌকিক উপায়ে সেই শাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গ-রাজ্যে প্রস্থান করিয়াছেন। কেহ কেহ এমনও বলিত যে, ঐ সুন্দরী কামিনী কোন সামান্য গৃহস্থের কন্যা। তাহার পিতা মাতা বংশ-মর্য্যাদায় বা জাত্যংশে এতই হীন যে, দুর্গ-স্বামীর তাহাকে বিবাহ করা কোন ক্রমেই সঙ্গত হইতে পারে না। এজন্য তাঁহারা, গোপনে এই স্থলে সম্মিলিত হইয়া, প্রেমালাপ করিতেন। হয়ত কোন দিন ঐ নীচ-কন্যার স্বভাবদোষ দেখিয়া, ক্রোধ হেতু, দুর্গ-স্বামী তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ঐ জলে নিক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা একবাক্যে সকলেই স্বীকার করিল যে, ঐ উৎসের সমীপাগত হওয়া, বা তাহার জলপান করা দুর্গ-স্বামী বংশীয় ব্যক্তিগণের পক্ষে নিতান্ত অশুভজনক।

এই ভয়ানক প্রবাদের জন্মভূমি স্বরূপ উৎস সমীপে মূর্চ্ছিতা কল্যাণীর চৈতন্যের আবির্ভাব হইল এবং সুশীতল বায়ুরাশি, বহুক্ষণ পরে নিশ্বাস-রূপে, আবার তাঁহার সুকোমল হৃদয়-কন্দরে প্রবেশ করিল। তাঁহার উন্মুক্ত কেশরাশি উচ্ছৃঙ্খল ভাবে পার্শ্বে ও পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে, অর্দ্ধ-মুকুলিত, অলসিত লোচনদ্বয় কেবলমাত্র একই দিকে নিবদ্ধ রহিয়াছে। প্রভূত জল-সিঞ্চন হেতু তাঁহার বক্ষের ও স্কন্ধের আর্দ্র বসন দেহের সহিত সংলগ্ন হইয়া, তত্তৎ স্থলের গঠনের পূর্ণতা ও সুকুমারতা প্রদর্শন করিতেছে। তাঁহাকে এই অবস্থায় উপবিষ্টা এবং অদূরে সেই ধনুক-ধারী যুবককে নির্নিমেষ-নয়নে সুন্দরীর প্রতি চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া, দুর্গ-স্বামী রায়মল ও সেই অজ্ঞাত-নাম্নী কামিনীর বিষাদময় বৃত্তান্ত কাহার না স্মরণে আসিবে?

সংজ্ঞালাভ-সহকারে, প্রথমেই যে ভয়ানক কারণে তাঁহার সংজ্ঞাবিলুপ্ত হয়, সেই চিন্তা কল্যাণীর মনে সমুদিত হইল—পরক্ষণেই পিতার জন্য ভাবনা হইল। তিনি ব্যাকুল-নয়নে চাহিলেন, কিন্তু কুত্রাপি পিতার মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"বাবা! আমার বাবা কই!"

অপরিচিত স্বরে উত্তর হইল,—"কিল্লাদার

রঘুনাথ রায় নিরাপদে আছেন এবং এখনই আপনার সহিত মিলিত হইবেন।"

কল্যাণী উচ্চ স্বরে বলিলেন,—"আপনি নিশ্চয় জানেন কি? মহিষ আমাদের নিতান্ত নিকটে আসিয়াছিল।—আপনি আমাকে থামাইবেন না—আমি এখনই পিতার সন্ধানে গমন করিব।"

তিনি সেই অভিপ্রায়ে গাত্রোত্থান করিলেন, কিন্তু তাঁহার এতাদৃশ বল-ক্ষয় ঘটিয়াছিল যে, বাসনানুযায়ী কার্য্য-সাধন তো দূরের কথা, তিনি কিঞ্চিন্মাত্রও অগ্রসর হইলেই তত্রত্য প্রস্তরোপরি এরূপ বেগে পতিত হইতেন যে, হয় তো তাহাতে গুরুতর আঘাত পাইতেন।

যুবা জন যখন কোন সুন্দরী কামিনার বিপদ নিবারণার্থ অগ্রসর হন, তখন কোন প্রকার অনিচ্ছা নিতান্ত অস্বাভাবিক হইলেও, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে, সেই অপরিচিত ব্যক্তি, অনিচ্ছা-সহকারে, এই পতনোন্মুখী কামিনীকে, আপনার বাহু পাতিয়া ধারণ করিলেন। সেই কৃশাঙ্গী কোমল-কায়া কামিনীর ক্ষুদ্র বপুও যেন এই দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ যুবকের পক্ষে ভারবোধ হইতে লাগিল এবং তিনি কালব্যয় না করিয়া, তাঁহাকে পুনরায় উপল-পার্শ্বে স্থাপন করিলেন ও কয়েক পদ পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া বলিলেন,—"কিল্লাদার মহাশয় কুশলে আছেন এবং এখনই এখানে আসিবেন। নিতান্ত শুভাদৃষ্ট হেতু তিনি রক্ষা পাইয়াছেন। আপনি নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার নিমিত্ত ব্যাকুল হইবেন না এবং যতক্ষণ আমার অপেক্ষা অধিকতর উপযুক্ত ব্যক্তি আপনার সাহায্যার্থ উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ কোন মতেই উঠিবার চেষ্টা করিবেন না।"

কল্যাণী দেখিলেন, এই অপরিচিত যুবার দেহ মৃগয়াকালোচিত পরিচ্ছদে আবৃত। তাঁহার কটি-বন্ধে কিরীচ, পৃষ্ঠে তূণ, স্কন্ধ হইতে পাদমূল পর্য্যন্ত বহুবায়ত ধনু। যুবকের দেহ পূর্ণায়ত ও সর্ব্বাঙ্গই যথেষ্ট শক্তি সমন্বিত। তাঁহার বদনের গম্ভীর অথচ শান্তিময় ভাব দেখিলেই যেন তাঁহাকে কোন উন্নত পুরুষ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বোধ হয় যেন, কোন কঠিন সংকল্প তাঁহার সমস্ত বদন-শ্রী আবৃত করিয়া রহিয়াছে।

কল্যাণীর নয়ন ধনুক-ধারী যুবকের সমুজ্জ্বল আয়ত লোচনের সহিত সম্মিলিত হইবামাত্র, কল্যাণী লজ্জায় বদনাবনত করিলেন। উপস্থিত বীরই তাঁহার এবং তাঁহার পিতার জীবন-রক্ষক বলিয়া কল্যাণী মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন, সুতরাং কর্ত্তব্য-বোধে তাঁহার নিকট ধীরে ধীরে, অস্ফুট ভাষায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেরূপ কৃতজ্ঞতা-সূচক উক্তি ধনুকধারী যুবকের হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চারিত করিতে পারিল না। তিনি যেন একটু বিরক্তি-সহকৃত উচ্চ ও মধুর স্বরে বলিলেন,—"আমি এক্ষণে প্রস্থান করিতেছি। আপনি যাঁহাদের ইষ্টদেবী-স্বরূপা আমি আপনার ভার তাঁহাদেরই হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইতেছি।"

যুবকের বাক্য-শ্রবণে কল্যাণী আন্তরিক দুঃখিত হইলেন—ভাবিলেন, হয় তো তাঁহারই অসম্বদ্ধ বাক্য-মধ্যে যুবকের অসন্তোষ-জনক কোন কথা অজ্ঞাতসারে বাহির হইয়া থাকিবে। তিনি পুনরায় বলিলেন,—"আমার দুরদৃষ্ট ক্রমে আমি হয় তো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে গিয়া কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিয়াছি। আমার মনে হইতেছে না, কি বলিয়াছি; কিন্তু নিশ্চয়ই আমি না বুঝিয়া, না জানিয়া কোন অপ্রীতিকর কথা বলিয়া থাকিব। আপনি দয়া করিয়া, আমার পিতা,

কিল্লাদার মহাশয়ের আগমন কাল পর্য্যন্ত এস্থলে অপেক্ষা করুন। তিনি আসিয়া আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও আপনার পরিচয় গ্রহণ করিবেন। তাঁহাকে এ সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা আপনার কর্ত্তব্য নহে।"

যুবক বলিলেন,—"আমার পরিচয় অনাবশ্যক—আমার পরিচয় জানিয়া কিল্লাদার সুখী হইবেন না।"

কল্যাণী সাগ্রহে বলিলেন,—"না না, বীরবর, আমার পিতা আপনার সহিত পরিচয়ে ও আমাদের মুক্তি হেতু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বড়ই সুখী হইবেন। আপনি আমার পিতাকে জানেন না, অথবা হয়তো আপনি আমার নিকট তাঁহার সম্বন্ধে অলীক কথা বলিয়া, আমাকে আশ্বস্ত করিতেছেন। তিনি হয় তো এতক্ষণ সেই ভয়ানক পশুর আক্রমণে মরণাপন্ন হইয়াছেন, এদিকে আমরা তাঁহারই বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেছি।"

এই চিন্তা কল্যাণীর মনে উদিত হইবামাত্র তিনি সেই ভয়ানক ঘটনা-স্থলে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত, নিতান্ত ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ধনুকধারী যুবক তাঁহাকে সে কল্পনা ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন,—

"ভদ্রে! আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করুন। আমি বলিতেছি আপনার পিতা সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ আছেন।"

কিন্তু কল্যাণী এ কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি পিতার নিকটস্থ হইবার জন্য, অত্যন্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন অগত্যা বীর যুবক বলিলেন,—

"যদি কথা না শুনেন—যদি যাইতেই চাহেন—তাহা হইলে, যদিও আমার ইচ্ছা নাই, তথাপি আপনি আমার স্কন্ধে বা বাহুতে হস্তার্পণ করিয়া চলুন, নচেৎ আপনার পতিত হইয়া আঘাত পাইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।"

ব্যাকুল-চিত্ত কল্যাণী, ধনুকধারী যুবকের বাহু ধারণ করিয়া, বলিলেন,—"চলুন—চলুন—আমাকে ছাড়িয়া যাইবেন না—পিতার নিকট লইয়া চলুন। না জানি তিনি কত কষ্টই পাইতেছেন।"

তখনই সেই কম্পান্বিতা বাহু-আশ্রিতা সুন্দরী সহ ধনুকধারী বীর অগ্রসর হইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে শান্তা বুড়ীর আশ্রিতা পার্ব্বতী-নাম্নী বালিকা ও দুই জন কাষ্ঠছেদক সমভিব্যবহারে রঘুনাথ কিল্লাদার সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। কন্যাকে নিরাপদ দর্শনে কিল্লাদারের আনন্দের সীমা রহিল না। অত্যধিক আনন্দ হেতু তখন তাঁহার মনে হইল না যে, তাঁহার কন্যা একজন পরপুরুষের বাহু ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। কিল্লাদার সানন্দে বলিলেন,—

"কল্যাণি! মা আমার—ভয় কি মা? মহিষ তো মরিয়া গিয়াছে। আর কোন ভয় নাই।"

কল্যাণী তখন, অপরিচিত পুরুষের হস্ত-ত্যাগ করিয়া, ভক্তিভরে ও প্রেমাশ্রু-পূর্ণ লোচনে পিতাকে প্রণাম করিয়া, বলিলেন,—"ঈশ্বরানুগ্রহে আমরা এক্ষণে নির্ব্বিঘ্ন হইয়াছি। আপনাকে যে নিরাপদ দেখিলাম, ইহা আমার পরম আনন্দ। কিন্তু বাবা, এই মহাশয়ই আমাদের অদ্যকার সৌভাগ্যের মূল।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"এই বীর যুবকের যত্ন ও চেষ্টা নিষ্ফল যাইবে না। ইনি অদ্য আমার দুহিতার ও আমার জীবন-রক্ষা করিবার নিমিত্ত যে অসামান্য বীরত্ব ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য আজি হইতে রঘুনাথ কিল্লাদার উঁহার নিকট

কৃতজ্ঞ রহিল। আমি উঁহাকে অনুরোধ করিতেছি—"

ধনুকধারী যুবক, কিল্লাদারের কথায় বাধা দিয়া, গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—"আমাকে কোনই অনুরোধ করিবেন না। আমি দুর্গ—স্বামী বিজয়সিংহ।"

তখন ক্ষণেক সেই স্থানে মরণোপম নীরবতা আবির্ভূত হইল। তখন সেই উদ্ধত বীর, কল্যাণীর নিকট অস্ফুট স্বরে দুই একটী শিষ্টাচার-সূচক বাক্যমাত্র কহিয়া তৎক্ষণাৎ পার্শ্বস্থ বনান্তরালে অন্তর্দ্ধান হইলেন।

বিস্ময়ের অপেক্ষাকৃত হ্রাস হইলে কিল্লাদার বলিলেন,—"দুর্গ-স্বামী বিজয়সিংহ! শীঘ্র তাঁহার অনুসরণ কর—তাঁহাকে একবার ফিরিয়া আসিয়া, দয়া করিয়া আমার সহিত এক মুহূর্ত্ত কথা কহিতে অনুরোধ কর।"

কাষ্ঠচ্ছেদকদ্বয় তখনই দুর্গ-স্বামীর পথানুসরণ করিল এবং অবিলম্বে ফিরিয়া আসিয়া কিছু ভীত ও বিচলিত ভাবে বলিল, তিনি আসিবেন না। কিল্লাদার ঐ দুই ব্যক্তির একজনকে কিছু অন্তরে লইয়া গিয়া দুর্গ-স্বামী ঠিক্ কি কি কথা বলিয়াছিলেন, তাহা বলিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন।

অকারণ অপ্রীতিকর বাক্য ব্যক্ত করায় কাজ কি ভাবিয়া, সে ব্যক্তি বলিল,—"দুর্গস্বামী বলিলেন যে, তিনি আসিবেন না।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"নিশ্চয়ই তিনি আরও কিছু বলিয়াছেন, তোমাকে তাহা বলিতেই হইবে।"

তখন সে ব্যক্তি অধোবদনে বলিল,—তবে কি করিব? তিনি যাহা বলিলেন—কিন্তু আপনি তাহা শুনিয়া সুখী হইবেন না। আমি ঠিক বলিতেছি, দুর্গ-স্বামী কোন মন্দ কথা বলেন নাই।"

"মন্দ হউক, ভাল হউক, তাহার বিচার তোমাকে করিতে হইবে না। তিনি যাহা বলিয়াছেন, সেই সকল কথা আমি শুনিতে চাই।"

কাষ্ঠচ্ছেদক বলিল,—"আচ্ছা। তিনি বলিলেন যে, রঘুনাথ কিল্লাদারকে বল গিয়া, আবার যখন আমাদের সাক্ষাৎ হইবে, তখন তাহা এত সুখের হইবে না।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"ওঃ—আমার বোধ হয়, বিগত রাখী পূর্ণিমার দিন আমরা একটা বাজি রাখিয়াছিলাম, তিনি হয় তো সেই বাজির কথাই স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। আচ্ছা, দেখা যাইবে।"

কন্যার এক্ষণে গমনোপযোগী শক্তি হইয়াছে দেখিয়া, রঘুনাথ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বাটী ফিরিলেন। এই ঘটনা কল্যাণীর শয়নে ও জাগরণে অবিচ্ছেদ্য চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল। জাগ্রৎ-কালে সেই দুরন্ত মহিষ-মূর্ত্তি, মৃত্যুর বিভীষিকা ও দুর্গ-স্বামী বিজয়সিংহের অত্যদ্ভুত ক্ষমতা এবং তাঁহার আশ্চর্য্য ব্যবহার, নিরন্তর মনে উদিত হইত; নিদ্রা-কালেও এই সকল বিষয় স্বপ্নরূপে তাঁহার মানস-মন্দিরে বিচরণ করিত। এইরূপ আলোচনায় ক্রমশঃ একই বিষয় তাঁহার চিত্তের প্রধান আলোচ্য হইয়া উঠিল। সে বিষয় দুর্গ-স্বামী বিজয়সিংহ। দুর্গ-স্বামীর অসীম সাহস, অদ্ভুত প্রকৃতি, তাঁহার বর্ত্তমান দুরবস্থা, তাঁহাদের গৌরব ইত্যাদি বিষয় পুনঃ পুনঃ চিত্ত-ক্ষেত্রে সমাগত হওয়ায়, তিনি ক্রমশঃ দুর্গ-স্বামীর নিতান্ত পক্ষপাতিনী হইয়া পড়িলেন। যুবতী কামিনীর পক্ষে যুবজন সম্বন্ধে এতাদৃশ চিন্তা অবৈধ হইলেও, কল্যাণী ইহা মন হইতে বিসর্জ্জন দিতে পারিলেন না।

কালক্রমে, বিভিন্ন মনোজ্ঞ চিন্তায় চিত্ত

নিবিষ্ট হইলে, স্থান ও কালের পরিবর্ত্তন ঘটিলে এবং আত্মীয়তার অন্য উৎকৃষ্টতর স্থল উপস্থিত হইলে, চিত্তের এই দুর্দ্দমনীয় অনুরাগ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে পারিত। কিন্তু কল্যাণীর পক্ষে সকলই প্রতিকূল হইয়াছিল। কিল্লাদারণী এ সময় দুর্গে ছিলেন না। তিনি কোন প্রয়োজন হেতু অধুনা উদয়পুরে অবস্থান করিতেছিলেন। কল্যাণীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিদেশে রাজ-কর্ম্মে নিযুক্ত, তাঁহার কনিষ্ঠ সর্ব্বদা ক্রীড়া ও মৃগয়া লইয়া ব্যস্ত এবং কিল্লাদার মহাশয় নিরন্তর বৈষয়িক কার্য্যসাগরে নিমগ্ন। কাজেই কল্যাণীকে সর্ব্বদা একাকিনী থাকিতে হইত, এবং একাকিনী থাকিতে হইলে অগত্যা একই চিন্তা পুনঃ পুনঃ মনোরাজ্যে প্রবেশ লাভ করিত।

কল্যাণীর চিত্তের যখন এই অবস্থা তখন তিনি বারংবার শান্তা বুড়ীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। বৃদ্ধার সহিত দুর্গ-স্বামী সংক্রান্ত কথোপকথন করিবেন, ইহাই তাঁহার বাসনা। শান্তা তাঁহার এবংবিধ কথায় কখনই যোগ দিত না, বরং সে যাহা বলিত তাহা নিতান্তই নিরুৎসাহজনক। বর্ত্তমান দুর্গ-স্বামীর দুরবস্থা বিষয়ক কথার উল্লেখ করিয়া সে দুঃখ প্রকাশ করিত এবং তিনি যে অতি দুর্দ্দান্ত ও অক্ষমাবান্ ব্যক্তি সে তাহাও বলিত। ফলতঃ তাঁহার কথা শুনিয়া এবং তাঁহার পিতাকে দুর্গ-স্বামী সম্বন্ধে সাবধান থাকিতে সে যে উপদেশ দিয়াছিল তাহা স্মরণ করিয়া, কল্যাণী নিতান্ত ভীতা হইতেন।

কিন্তু কল্যাণী আবার মনে করিতেন, যদি দুর্গ-স্বামী প্রকৃতই এরূপ প্রতিহিংসা-পরায়ণ হইতেন, তাহা হইলে শান্তার মুখে সেই সকল সন্দেহসূচক কথা শুনিয়া আমরা বাহির হইতে না হইতে, তিনি অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর মুখ হইতে আমার পিতাকে এবং আমাকে রক্ষা করিবেন কেন? যদি তাঁহার মনে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি থাকিত, তাহা হইলে তৎকালে যে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহাকে স্বহস্তে কোনই নিন্দনীয় কার্য্য করিতে হইত না, অথচ তাঁহার প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি সম্পূর্ণরূপ চরিতার্থ হইত। তিনি যদি এক মুহূর্ত্ত মাত্র সাহায্য করিতে বিরত থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার শত্রু তদ্দণ্ডেই উৎকট যন্ত্রণা সহকারে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেন, অথচ সে কলঙ্ক হেতু তাঁহার হস্ত রঞ্জিত হইত না। অতএব বালিকা সিদ্ধান্ত করিলেন, লোকে যাহা ভাবে ও শান্তা যাহা বলে, তাহা ভ্রমাত্মক। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া বালিকা কতই সাধময়, সুখময় ও অনুরাগময় কাল্পনিক রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন।

তাঁহার পিতাও সেই দিনের পর হইতে দুর্গ-স্বামীর কথা বারংবার আলোচনা করিতেন। দুর্গ-স্বামীর বর্ত্তমান ব্যবহারে কিল্লাদারের মন নিতান্ত বিগলিত ও ভাবান্তরিত হইয়া গিয়াছে। যে দুর্গ-স্বামীকে তিনি প্রবল শত্রু বলিয়া মনে করিতেন, এখন আর তাঁহার সম্বন্ধে সেরূপ চিন্তা করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি নাই। তিনি ভবিষ্যতে কোমল ব্যবহার দ্বারা দুর্গ-স্বামীর দুর্দ্দমনীয় চিত্তকে প্রশমিত করিয়া আনিবেন বলিয়া স্থির করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যে দিন কিল্লাদার ও তাঁহার দুহিতা, আজ মৃত্যুর হস্ত হইতে দুর্গ-স্বামীর যত্নে রক্ষা পাইয়াছেন, সেই দিন সন্ধ্যার পর কমলা ও

পিপুলী এতদুভয় স্থানের মধ্যপথে, একটী বৃক্ষ-মূলে, দুইটী লোক বসিয়া কথোপকথন করিতে-ছিলেন ; তাঁহাদের অনতিদূরে অপর এক বৃক্ষে তিনটী অশ্ব নিবদ্ধ ছিল।

ব্যক্তিদ্বয়ের একজনের বয়স অনুমান চল্লিশ বৎসর। তাঁহার দেহ সুদীর্ঘ ও কৃশ, নাসিকা উন্নত, নেত্রদ্বয় কৃষ্ণ এবং ক্রূর বুদ্ধির পরিচায়ক। অপর ব্যক্তির বয়স ত্রিশের কিঞ্চিৎ অধিক, শরীর অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব। তাঁহার মুখের ভাব সাহসিকতা এবং প্রতিজ্ঞাশীলতা-ব্যঞ্জক ; তাঁহার লোচন-যুগল প্রসন্নতায় পূর্ণ এবং আভ্যন্তরিক ভীতিবিরহিত স্বাধীনভাবে উৎ-ফুল্ল। লোকদ্বয়ের সন্দিগ্ধ ও চিন্তাকুল ভাব। অপেক্ষাকৃত নবীন ব্যক্তি বলিলেন,—

"আঃ! এ দুর্গ-স্বামীর ব্যাপারটা কি? কেন তাহার এত বিলম্ব হইতেছে? নিশ্চয়ই তাহার উদ্দেশ্য বিফল হইয়াছে। কেন তুমি আমাকে তাহার সহিত যাইতে বাধা দিলে?"

অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক সঙ্গী বলিল,—"একজন আপনার শত্রু দমন করিবে, তাহার সহিত সাতজন কেন যাইবে? আমরা অনর্থক তাহার জন্য এতদূর আসিয়া আপনাকে বিপন্ন করিয়াছি ইহাই যথেষ্ট।"

সঙ্গী উত্তর দিল,—"শিবরাম, তুমি কিছু মাথাপাগলা, এ কথা সকলেই বলিয়া থাকে।

শিবরাম, কটি-সংলগ্ন অসির কিয়দংশ বাহির করিয়া বলিল,—"কিন্তু কেহই কখন আমার সাক্ষাতে তাহা বলিতে সাহস করে নাই। যদি তোমার মত চঞ্চল লোকদের আমি বদ্ধপাগল বলিয়া মনে না করিতাম, তাহা হইলে—"শিবরাম আর কিছু না বলিয়া উত্ত-রাপেক্ষায় চুপ করিল।

অপর ব্যক্তি ধীর ভাবে বলিল,—"তাহা হইলে কি করিতে? যাহা করিতে, তাহা কর না কেন?

শিবরাম অসি আরও একটু বাহির করিল। তাহার পর সমস্ত অসি সজোরে কোষ-নিবদ্ধ করিয়া বলিল,—"করি না; কারণ তোমার ন্যায় উন্মাদকে হত্যা করা অপেক্ষা অসির আরও গুরুতর উদ্দেশ্য আছে।"

অপর ব্যক্তি বলিল,—"ঠিক্—ঠিক্! আমি যে পাগল, তাহা আমি যখন তোমার কথায় বিশ্বাস করিয়াছি তখনই সপ্রমাণ হই-য়াছে বটে। তুমি আমাকে বাদশাহের অধীনে সেনাপতি করিয়া দিবে, এ লোভ যদি না দেখা-ইতে, তাহা হইলে আজি তোমার সহিত আমার এ বিবাদের কোনই কারণ থাকিত না। আমি ভাই, মিবারবাসী রাজপুত; কাজ কি আমার যবনের অধীনতায়? আমার পিতা পিতামহ কেহই যে কার্য্য কখন করেন নাই, আজি কেন আমি তাহার জন্য লালায়িত? আর ভাই, আমার দিদিমাই বা আর কতদিন বাঁচিবেন?"

শিবরাম বলিল,—"তাহা কে বলিতে পারে? বীরবল! হয়ত তিনি এখনও অনেক দিন বাঁচিতে পারেন। তুমি তোমার পিতার কথা ভুলিয়াছ; তোমার পিতাতে আর তোমাতে অনেক প্রভেদ। তোমার পিতার ভূমি ছিল, জীবিকার উপায় ছিল, তিনি কাহার নিকট ধারও করিতেন না, কর্জ্জও করিতেন না। তিনি আপনার আয়ে আপনি স্বচ্ছন্দে জীবনপাত করিতেন।"

বীরবল বলিলেন,—"আমিও যে পিতার ন্যায় স্বচ্ছন্দভাবে জীবনপাত করিতে পারি না, সে কাহার দোষ ভাই? তুমি এবং তোমার মত আরও দুই একজন সুখের পায়রা আমার ঘাড় চাপায়াই কি আমার সর্ব্বনাশ

ঘটাও নাই? আমার বিষয় আশয় সকলই নষ্ট হইয়া গিয়াছে—এখন আমার দশাও তোমাদেরই মত হইয়া উঠিয়াছে—এখন পথে পথে ঘোরাই আমার ভরসা। এখন মুসলমানের আশ্রয়ে ভরণ পোষণ চালাইবার ভরসায় প্রাণ বাঁচাইতে হইতেছে, ইহা কি সামান্য দুঃখের কথা?"

শিবরাম বলিল,—"তুমি আমার উপর দিয়া অনেক কথা চালাইলে। যাহা হইয়াছে, তাহা হইয়াছে, আপাততঃ আমি যে উপায় স্থির করিয়াছি তাহা কি মন্দ?"

বীরবল বলিলেন,—"জানি না তোমার এ উপায় হইতে কি ফল দাঁড়াইবে। কিন্তু দুর্গ-স্বামীর সহিত তুমি যে যোগ দিয়াছ তাহাতে কোন ফল ফলিবে না, ইহা স্থির। দুর্গ স্বামীর ধন নাই, ভূমি নাই, সুতরাং মান নাই—যে ব্যক্তি আমারই মত লক্ষ্মীছাড়া। এমন লোকের পক্ষাবলম্বন নিতান্ত অনর্থক।"

শিবরাম বলিল,—"স্থির হও ভাই, শিবরাম না বুঝিয়া কোন কাজই করেন না। ঐ যে দুর্গ-স্বামী, উঁহাদের বংশ-গত একটা বড় মান আছে, এবং উঁহার পিতার সম্রাট-দরবারে বিশেষ সম্ভ্রম ছিল। এখন ঐ দুর্গ-স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে যদি আমরাও কর্ম্মের প্রার্থনায় উপস্থিত হই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কেহ আমাদের ছোট লোক মনে করিবেন না, বরং অত বড় একটা মানী লোকের সমকক্ষ হইয়া যাওয়ায়, আমাদেরও সেইরূপই মনে করিবে। আর কি জান, দুর্গ-স্বামী লোকটা তোমার মত নির্ব্বোধ নহে; কেবল শীকার লইয়া, হৈ হৈ করিয়া বেড়ায় না। তাহার জ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে; সুতরাং নিশ্চয়ই তাহার পদোন্নতি ও সম্মান হইবে এবং আমরাও সেই সঙ্গে বিকাইয়া যাইব।

বীরবল বলিলেন,—"শিবরাম, রাগ করিও না ভাই। মধ্যে মধ্যে তরবারে হাত দিতেছ কেন? তুমিও আমার সঙ্গে মারামারি করিবে না, এবং আমিও তোমার সঙ্গে মারামারি করিব না, একথা তুমিও জান, আমিও জানি। এখন সত্য করিয়া বল দেখি, কি কৌশলে তুমি দুর্গ-স্বামীকে তোমার এ পরামর্শে লওয়াইলে?"

শিবরাম বলিল,—"তাহার প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির উত্তেজনা করিয়া। কিল্লাদারের উপর তাহার ভয়ানক রাগ। সময় বুঝিয়া, সেই রাগের সপক্ষতা করিয়া, ক্রমশঃ তাহার আত্মীয় হইয়া উঠিয়াছি। পূর্ব্বে দুর্গ-স্বামী আমাকে আন্তরিক ঘৃণা করিত, কিন্তু এখন আর সে ভাব নাই। আজি দুর্গ-স্বামী প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে গিয়াছে। যদি তাহার সহিত কিল্লাদারের সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলেই তাহার সর্ব্বনাশ। যদি কেহ নাও মরে, তাহা হইলেও বিষম গোলযোগ বাধিবে। মহারাণার দরবারে সংবাদ যাইবে যে, বিজয়সিংহ একজন মহারাণার অনুগত সামন্তের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে। কথা শক্ত হইয়া উঠিবে—এখানে বিজয়সিংহের থাকা ভার হইয়া পড়িবে—কাজেই তাঁহার মিবার ত্যাগ করিয়া আমাদের সঙ্গে আগ্রা অঞ্চলে না পলাইলে উপায় কি?"

বীরবল বলিলেন,—"তোমার অভিপ্রায় বুঝিলাম। বুঝিলাম, দুর্গ-স্বামীর সঙ্গী হইয়া আমরাও সমাদৃত হইব, নচেৎ আমাদের বিস্তাবুদ্ধির কোন সমাদরের সম্ভাবনা নাই। এখন দুর্গ-স্বামী যাইবার পূর্ব্বে যদি কিল্লাদারের মস্তকটা এক তীরে দুই ফাঁক করিয়া আসিতে পারে, তাহা হইলেই ভাল হয়। বৎসর বৎসর এইরূপ নরাধম সামন্ত দুই চারিটাকে মারা

ভাল। তাহা হইলে যাহারা থাকিবে তাহারা আপনাদের চরিত্র সংশোধন করিয়া লইতে পারিবে।"

শিবরাম বলিল,—"কথা ঠিক বটে। কিন্তু ভাই, যদিই কমলা দুর্গে কিছু কাণ্ড ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের প্রাণ লইয়া পলাইবার উপায় অগ্রেই করিয়া রাখা আবশ্যক। ঘোড়াই আমাদের একমাত্র ভরসা। অতএব ভাই, আমি একবার ঘোড়াশুসার অবস্থা দেখিয়া আসি। কিন্তু ভাই, তোমার সাক্ষাতে আমি যে যে কথা বলিয়াছি, তাহাতে আমাকে দোষী হইতে হয়, এমন কোন কথাই নাই, কেমন? আমি দুর্গ-স্বামীর কার্য্যের কোনই সহায়তা করি নাই। কেমন ভাই, আমার কি দোষ?"

বীরবল বলিলেন,—"না, তোমার দোষ কি? তুমি সহায়তা কর নাই, কিন্তু উত্তেজনা করিয়াছ। এ দুই কার্য্যে কতটুকু প্রভেদ তাহা তোমার অবিদিত নাই। একটা গান আছে;—

"আমি জানি না, জানে হাত,
হাত ঘটালে এ উৎপাত।"

শিবরাম উদ্বিগ্নভাবে বলিল,—"কি বলিতেছ?—অ্যাঁ?"

বীরবল বলিলেন,—"একটা গানের দুইটা কথা মনে পড়িল, তাহাই বলিতেছিলাম।"

শিবরাম বলিল,—"তুমি অনেক গান জান; যদি আর কিছু না করিয়া গানের ব্যবসায় করিতে, তাহা হইলে মন্দ হইত না।"

বীরবল কহিলেন,—"আমিও তাহাই মনে করি। তোমার সহিত এই সকল ষড়যন্ত্র চক্রান্তে লিপ্ত না থাকিয়া সে কার্য্য করায় হানি ছিল না। এখন তুমি অশ্ব-রক্ষকের কার্য্যে গমন করিতেছ, যাও।"

শিবরাম প্রস্থান করিল এবং অনতিবিলম্বে পুনরাগত হইয়া অতি উৎকণ্ঠার সহিত বলিল,—"সর্ব্বনাশ হইয়াছে! দুর্গ স্বামীর ঘোড়ার পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আর তো ঘোড়া নাই। কি হইবে?"

বীরবল বলিলেন,—"তাইতো! তবেই তো যাইবার মহা অনুপায়! আচ্ছা, এমন দুর্ঘটনা যখন ঘটিয়াছে তখন দুর্গ-স্বামীর উপকারার্থে তুমি তোমার ঘোড়াটা তাঁহাকে দিলেও তো দিতে পার।"

শিবরাম বলিল,—"বিলক্ষণ, বড় মজার পরামর্শ! আমি আমার ঘোড়াটা দিয়া বসিয়া থাকি, আর আমাকে ধরিয়া লইয়া যাউক।"

বীরবল বলিলেন,—"তাহাতে ক্ষতি কি? আমার বোধ হয় না যে, দুর্গ-স্বামী প্রবীণ ও অস্ত্রহীন কিল্লাদারের দেহে অস্ত্রক্ষেপ করিবেন মনে কর যদিই কমলা দুর্গে কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তাহাতে তোমার ভয় কি? তুমি তো সে সম্বন্ধে কোন সহায়তা কর নাই বলিতেছ।"

শিবরাম কিছু অপ্রতিভ হইয়া বলিল,—"হাঁ—তা, তা বটে, তা বটে। তবে কি জান, আমার নাকি বাদশাহ দরবারে যাইবার বন্দোবস্ত আছে।"

বীরবল হাসিয়া বলিলেন,—"বেশতো, যদি তুমি নাই দেও, তাহা হইলে দুর্গ-স্বামীকে আমি আমার নিজের ঘোড়া দিব।"

"তোমার ঘোড়া?"

"হাঁ, আমার ঘোড়া। লোকে যে বলিবে আমি এক জনের পক্ষাবলম্বন করিয়া কার্য্য কালে তাহার কোন সহায়তাও করি নাই এবং সে বিপন্ন হইলে তাহার মুক্তিরও কোন উপায় করি নাই, একথা আমার যেন শুনিতে না হয়।"

"তোমার ঘোড়া তাহাকে দিবে? তোমার কি ক্ষতি হইবে তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছ?"

"ক্ষতি কি? আমার ঘোড়া দুর্গ-স্বামীর ঘোড়া অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। তাঁহার ঘোড়ার পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা আরাম করিতে কতক্ষণ? নিমের পাতা দিয়া জল গরম করিয়া, ঘোড়ার পা সেই জল দিয়া খানিকক্ষণ ডলিয়া মলিয়া দিতে পারিলে,—"

শিবরাম বাধা দিয়া বলিল,—"তুমি তাই করিতে থাক—এদিকে কিল্লাদারের লোক আসিয়া তোমাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া ফাঁসি দিউক। ব্যাপার শক্ত বীরবল, বুঝিতেছ না—কথা ভয়ানক! আমাদের এ মিলন স্থান আর একটু তফাতে নির্দিষ্ট হইলে ভাল হইত!"

বীরবল বলিলেন,—"তাহা হইলে আমার ঘোড়া দুর্গ-স্বামীর জন্য রাখিয়া, আমার অগ্রেই চলিয়া যাওয়া পরামর্শ। দাঁড়াও ঘোড়ার পদশব্দ শুনিতে পাইতেছি—দুর্গ-স্বামী বুঝি আসিতেছেন।"

শিবরাম বলিল,—"তুমি কি একটা ঘোড়ার শব্দ শুনিলে? না না, তোমার ভুল হইয়াছে; আমি অনেক ঘোড়ার পদশব্দ পাইতেছি।"

বীরবল বলিলেন,—"তোমার এত ভয়, তুমি আবার বাদশাহের অধীনে কর্ম্ম করিবে? ঐ দেখ দুর্গ-স্বামী একাকী আসিতেছেন। ওকি! দুর্গ-স্বামীর মুখের ওরূপ ভাব কেন?

দুর্গ-স্বামী তথায় আসিয়া লম্ফ দিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। তাঁহার মূর্ত্তি গম্ভীর—দারুণ বিষাদ ভাবে অবসন্ন। তিনি, ঘোর চিন্তিত ভাবে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, সেই দূর্ব্বাবৃত ক্ষেত্রে অর্দ্ধ শায়িতাবস্থায় উপবেশন করিলেন।

বীরবল ও শিবরাম উভয়ে এক সঙ্গে জিজ্ঞাসিলেন,—"ব্যাপার কি? কি করিয়াছ?"

দুর্গ-স্বামী, বিরক্ত ভাবে, সংক্ষেপে উত্তর দিলেন,—"কিছু না।"

"কিছু না, অথচ ঐ বৃদ্ধের দ্বারা তোমার, আমার এবং দেশের যে অনিষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রতিশোধ দিবার জন্য আমাদিগকে অনর্থক বসাইয়া রাখিলে? তাহার সহিত দেখা হইয়াছিল?"

"হাঁ।"

বীরবল বলিলেন,—"দেখা হইয়াছিল, অথচ কোন ফল হয় নাই? দুর্গ-স্বামী বংশীয় কোন ব্যক্তির নিকট হইতে এরূপ ব্যবহার আমরা আশা করি নাই।"

দুর্গ-স্বামী বলিলেন,—"তোমরা কি আশা করিয়াছিলে, তাহা আমি জানি না। আমার কার্য্যের জন্য আমি আর কাহারও নিকট দায়ী নহি।"

বীরবল ক্রুদ্ধ হইয়া উপযুক্ত উত্তর প্রদানে উদ্যত হইতেছিলেন কিন্তু শিবরাম বাধা দিয়া বলিল,—স্থির হও। নিশ্চয়ই কোন দুর্ঘটনা দুর্গ-স্বামীর উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত ঘটাইয়াছে। বন্ধুগণের স্বাভাবিক উৎকণ্ঠার কথা স্মরণ করিয়া, দুর্গ-স্বামী নিশ্চয়ই আমাদিগের কৌতূহল হেতু দোষ গ্রহণ করিবেন না।

"দুর্গ-স্বামী উদ্ধত ভাবে বলিলেন,—"বন্ধুগণ! জানি না আমার সহিত কোন্ সৌহৃদ্য-বলে আপনি এই শব্দ ব্যবহার করিতেছেন। আপনাদের সহিত আমার বাধ্যবাধকতা অতি সামান্য। কথা হইয়াছিল যে, আমার পৈত্রিক দুর্গ একবার দেখিয়া ও তাহার বর্ত্তমান দখলিকারের (তাহাকে অধিকারী বলিতে আমার মন নাই) সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া, আপনাদের সহিত একত্র

মিবার ত্যাগ করিয়া আমি আগ্রা গমন করিব।”

বীরবল বলিলেন,—“তাইত। কিন্তু আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, আপনি যাহা করিবেন তাহাতে হয়ত আপনার গর্দ্দান লইয়া টানাটানি পড়িয়া যাইবে; এই ভাবিয়া শিবু এবং আমি আপনার জন্য একটু অপেক্ষা করিতে এবং কাজেই, আমাদের গর্দ্দানকেও কতকটা বিপদে ফেলিতে স্বীকৃত হইয়াছিলাম। শিবুর কথা ছাড়িয়া দিউন; উহার গলায় যে ফাঁস বসিবে তাহা উহাকে দেখিলেই বুঝা যায়। কিন্তু আমি ভদ্র লোকের ছেলে—অকারণ অপরের জন্য সেরূপে আমার পিতৃ-বংশ কলঙ্কিত করিতে আমার কি দরকার?”

দুর্গ-স্বামী বলিলেন,—“আমার জন্য আপনাদের অসুবিধা হইয়াছে জানিয়া দুঃখিত হইলাম। কিন্তু ইহা বোধ হয় আপনারা স্বীকার করিবেন যে, আমার আত্মকার্য্যের উপর সম্পূর্ণ অধিকার আছে। আমি পূর্ব্ব সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছি। এবর্ষ মধ্যে মিবার ত্যাগ করিব না স্থির করিয়াছি।”

শিবরাম বলিল,—“মিবার ত্যাগ করিবেন না? কি সর্ব্বনাশ! আমাদিগকে এই খরচ খরচান্ত করাইয়া, এত কষ্ট দিয়া, এখন যাইবেন না স্থির করিয়াছেন!”

দুর্গ-স্বামী বলিলেন,—“সঙ্কল্প পরিবর্ত্তন করিবার যদি কোন কারণ উপস্থিত হয়, তথাপি আমি যাইব, এমন কথা আমি একবারও বলি নাই। আপনারা যে আমার নিমিত্ত কষ্ট করিয়াছেন, সে জন্য আমি বাস্তবিক দুঃখিত হইয়াছি। খরচের কথায় আর কি উত্তর দিব? আমার এই মুদ্রাধারে যাহা কিছু থাকে আপনি তাহা গ্রহণ করুন।”

এই বলিয়া দুর্গ-স্বামী পরিচ্ছদ-মধ্য হইতে একটী লোহিত বর্ণ ক্ষুদ্র থলিয়া বাহির করিয়া ধরিলেন।

এমন সময়ে বীরবল কহিলেন,—“শিবু, সাবধান। থলিয়া গ্রহণ করিবার জন্য তোমার অঙ্গুলি অস্থির হইয়াছে। কিন্তু নিশ্চয় জানিও, তাহা হইলে তোমার অঙ্গুলি কয়টী আর হাতের সহিত একত্র থাকিতে পাইবে না। যখন দুর্গ-স্বামী মত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তখন আমার মতে আমাদের আর এখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই। কেবল একটী কথা আমি বলিতে ইচ্ছা করি—”

শিবরাম বলিল,—“তোমার যাহা বলিতে হয় তাহা পরে বলিও। আমি দুর্গ-স্বামীকে বলিতেছি যে, আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করায় তাঁহার মহৎ অনিষ্ট ঘটিবে। আমরা আগ্রা অঞ্চলে যাইবার পথ ঘাট জানি, তাহার পর সেখানে আমার অনেক বড়লোকের সহিত পরিচয় আছে, সুতরাং আমাদের সঙ্গে যাইলে আলাপ পরিচয়ের কোন অসুবিধা ঘটিবে না।”

বীরবল বলিলেন,—“আর আমার ন্যায় ব্যক্তির বন্ধুত্ব শূন্য হওয়াও বড় কম কথা নহে।”

দুর্গ স্বামী বলিলেন,—“আমি যখন বাদশাহের অধীনে কর্ম্মার্থিরূপে উপস্থিত হইব, তখন আমাকে কোন কুচক্রীর দ্বারা পরিচিত হইতে হইবে না; এবং কোন উষ্ণ-শোণিত অস্থির-মতি ব্যক্তির বন্ধুত্ব বিশেষ শ্লাঘনীয় বলিয়াও আমার মনে হইতেছে না।”

এই বলিয়া দুর্গ-স্বামী উত্তরাপেক্ষা না করিয়া, অশ্বে আরোহণ করিলেন। তখনই তাঁহার অশ্ব সবেগে ধাবিত হইল। বীরবল

ও শিবরাম, কিয়ৎকাল পরস্পর পরস্পরের মুখের প্রতি চাহিয়া, নির্ব্বাক্ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর বীরবল বলিলেন,—

"আমাকে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছে। আমার একবার দেখা চাহি। শিবু, তুমি ক্ষণেক অপেক্ষা কর, আমি এখনই আসিতেছি।"

এই বলিয়া বীরবল অশ্বে আরোহণ করিয়া, যে দিকে দুর্গ-স্বামী গমন করিয়াছেন, সেই দিকে ধাবিত হইলেন। শিবরাম সেই স্থলে দাঁড়াইয়া রহিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সবেগে ঘোড়া চালাইয়া বহুদূর আসিয়া, বীরবল দুর্গ-স্বামীর দেখা পাইলেন। তিনি সম্মুখে অশ্বারোহী দুর্গ-স্বামীকে দেখিতে পাইবামাত্র চীৎকার শব্দে বলিলেন,—"অপেক্ষা করুন মহাশয়, আমি দাম্ভিক শিবরাম নহি—আমি বীরবল; আজি পর্য্যন্ত কেহই আমাকে কোন প্রকার অপমান করিয়া পার পান নাই, তাহা আপনি জানেন কি?"

দুর্গ-স্বামী স্ববেগ সংযত করিয়া, গম্ভীর অথচ প্রশান্ত ভাবে উত্তর করিলেন,—"জানি বা না জানি, আপনার কথা সর্ব্বাংশেই রাজপুতের অনুরূপ; এজন্য আমি তাহার সমাদর করি। কিন্তু মহাশয়ের সহিত আমার কোনই বিবাদ নাই। আমাদের পরস্পরের গৃহ-গমনের পথ অথবা জীবনের গতি উভয়ই নিতান্ত বিভিন্ন, সুতরাং ভবিষ্যতেও আর আমাদের সাক্ষাৎ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।"

বীরবল বলিলেন,—"তাহা নাই কি! যদিও আপনি আমাদিগকে কুচক্রী বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছেন তথাপি বোধ হয়—"

দুর্গ-স্বামী বাধা দিয়া পুনরায় প্রশান্ত ভাবে বলিলেন,—"আপনি বিগত ঘটনা উত্তম রূপে স্মরণ করিয়া যাহা বলিতে হয় বলিবেন। আপনার সঙ্গী শিবরামকে আমি ঐ শব্দ দ্বারা লক্ষিত করিয়াছিলাম। মহাশয়ও অবশ্যই তাঁহাকে ঐ ভাবে জ্ঞাত আছেন।"

বীরবল বলিলেন,—"তাহা হইলেও সে ব্যক্তি আমার সঙ্গী। আমার সমক্ষে আমার সঙ্গীকে অপমানিত করিতে আপনার কোন অধিকার নাই।"

দুর্গ-স্বামী পুনরায় গম্ভীর-ভাবে বলিলেন,—"এরূপ হইলে মহাশয়ের যত্ন সহকারে সঙ্গী নির্ব্বাচন করা আবশ্যক, নচেৎ তাহাদের মান বজায় রাখিবার নিমিত্ত আপনাকে নিয়তই ব্যস্ত থাকিতে হইবে। এক্ষণে গৃহে গমন করিয়া রাত্রি টুকু নিদ্রায় অতিবাহিত করুন; তাহার পর কল্য বিবেচনা করিয়া রাগ করিবেন।"

"আপনার ভুল হইয়াছে। আপনি যে শান্তভাবে হাত নাড়িয়া, পরিষ্কার কথা কহিয়া আমাকে ভুলাইয়া দিবেন মনে করিয়াছেন, তাহা হইবে না। আর আপনি আমাকেও দুর্ব্বাক্য বলিতেছেন, আমি সে কথার প্রতিশোধ চাহি।"

দুর্গ-স্বামী বলিলেন,—"আমার কথা অন্যায় ইহা যদি আপনি আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে যেরূপে আপনার ইচ্ছা, সেইরূপে আমি ত্রুটি স্বীকার করিতে সম্মত আছি।"

বীরবল বলিলেন,—"তাহা হইলে আমার সহিত বিবাদ করাই আপনার অভিপ্রায়। ভাল, তাহাই হউক, আমার অপমানকারীকে

আমি কখনই নির্ব্বিঘ্নে গৃহে যাইতে দিব না। অতএব অশ্ব হইতে অবতরণ করুন—আমার সহিত যুদ্ধ করুন।"

দুর্গ-স্বামী ক্রোধ-বিরহিত স্বরে বলিলেন,—"ভগবান্ ভবানীপতি জানেন, আপনার সহিত বিবাদে আমার কোনই বাসনা নাই। কিন্তু আমি রাজপুত; আপনি আমাকে সমরাহ্বান করিতেছেন—তাহাতে বিমুখ হইলে আমার বংশ কলঙ্কিত হইবে। ঈশ্বর সাক্ষী, আমি সাধ্যমতে আপনাকে আক্রমণের চেষ্টা করিব না।"

এই বলিয়া দুর্গ-স্বামী অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং আত্মরক্ষার ভাবে অসি পাতিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তখন বীরবল তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিবার যত্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু দুর্গ-স্বামী বিজয়সিংহ, আক্রমণ বা প্রত্যাঘাত চেষ্টা না করিয়া, কেবলই আত্মরক্ষায় নিযুক্ত রহিলেন। স্থানটী তৃণাচ্ছাদিত ও পরিষ্কার। বীরবল ক্রোধান্ধ হইয়া দুর্গ স্বামীকে আঘাত করিবার জন্য, অনবরত লম্ফ ঝম্ফ করিতে করিতে একবার দৈবাৎ স্খলত-পদ হইয়া ভূ-পৃষ্ঠে পড়িয়া গেলেন। তখনই দুর্গ স্বামী বিজয়সিংহ হস্তস্থিত অসি ভূ-তলে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"মূঢ় আমি ইচ্ছা করিলে এই মুহূর্ত্তেই চিরকালের মত তোমার সমর-সাধ মিটাইতে পারিতাম, তাহা বুঝিয়াছ? যাও বীরবল, প্রস্থান কর, তোমাকে আমি ক্ষমা করিলাম।"

বীরবল বুঝিলেন বাস্তবিক দুর্গ-স্বামী ইচ্ছা করিলে, অন্য সময়ে হউক, বা না হউক, এই অবসরে নিশ্চয়ই তাঁহার জীবন সংহার করিতে পারিতেন। বীরবল ধূলা ঝাড়িয়া উঠিয়া বলিলেন,—"আমি আপনার বীরত্বের এবং অসাধারণ সদাশয়তার প্রশংসা করিতেছি। আপনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে বংশের ভূষণ। এক্ষণে আপনার আলিঙ্গন প্রার্থনা করি।"

দুর্গ-স্বামী বলিলেন,—"আলিঙ্গনের পর রাজপুতের আর মনোমালিন্য থাকে না। যদি আপনি মনকে শান্ত করিতে পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে আসুন,—"আলিঙ্গনে আমার কোন আপত্তি নাই।"

উভয়ে সেই স্থানে আলিঙ্গন বদ্ধ হইলেন, সকল বিবাদের অবসান হইয়া গেল। এইরূপ সময় অদূরে একটা লোক আসিতেছে বলিয়া বোধ হইল। বীরবল বলিলেন,—"এ পথে এরূপ সময়ে লোকটা কি জন্য আসিতেছে?"

অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে লোকটা নিকটস্থ হইয়া বলিল,—"মহাশয় গো, ঘোড়া ছুটাইয়া সরিয়া পড়ুন। বড় গোলের কথা। শিবরাম মহাশয়—কি কে জানে কে—আমাদের গ্রামে একটা খোঁড়া ঘোড়া বেচিতে লইয়া গিয়াছিলেন। কোথা হইতে কতকগুলা লোক আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। তাহারা আবার বীরবল মহাশয়কে—কে জানে কে—ধরিবার জন্য ছুটিতেছে। আমি এই পথে যাহাকে দেখিতে পাইব, তাহাকেই এই সব কথা শিবরামের একজন লোক বলিতে বলিল। তা মহাশয়, পালাও—পালাও।"

বীরবল বলিলেন,—"তোমার সংবাদ ঠিক বটে। এই তোমার পুরস্কার।" এই বলিয়া বীরবল তাহাকে একটী রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করিলেন। তিনি আরও বলিলেন,—"এখন আমার কোন্ পথে যাওয়া আবশ্যক, তাহা যদি কেহ আমাকে বলিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দিতে সম্মত আছি।"

দুর্গ-স্বামী বলিলেন,—"সে কথা আমি বলিয়া দিতেছি। আমার আবাসে এমন স্থান

আছে যে, সেখানে লুকাইয়া থাকিলে সহস্র ব্যক্তি অনুসন্ধান করিয়াও বাহির করিতে পারিবে না। অতএব আপনি তথায় চলুন।"

"আপনার এই প্রস্তাবে অনুগৃহীত হইলাম। কিন্তু পাছে আমার জন্য আপনার কোন বিপদ ঘটে, এই আশঙ্কায় আমি মহাশয়ের প্রস্তাবে অনুমোদন করিতে পারিতেছি না।"

দুর্গ-স্বামী বলিলেন,—"সে জন্য কোন চিন্তা নাই। আমার পক্ষে ভীত হইবার কোন কারণই নাই।"

বীরবল বলিলেন,—"তবে নিশ্চিন্ত মনে আপনার সঙ্গেই গমন করি। শিবরাম আপনাকে বাঁচাইবার জন্য, না জানি, কত মিথ্যাই বলিবে, না জানি মহাশয়ের ও আমার স্কন্ধে কত মিথ্যা দোষ চাপাইবে।"

তাঁহারা নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে গমন করিতে লাগিলেন। বীরবল বলিলেন,—"আমার নিজের দোষে যত না হউক, আমি সংসর্গ-দোষে নানাপ্রকার কষ্ট পাইয়া থাকি।"

দুর্গ-স্বামী বলিলেন,—"ইহা যদি আপনি জানিতে পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাদৃশ সঙ্গ আপনার সত্বর পরিত্যাগ করা শ্রেয়ঃ।"

বীরবল বলিলেন,—"আমি তাহাই স্থির করিয়াছি। আমার দিদিমার মৃত্যু পর্য্যন্ত যাহা হয় হউক, তাহার পর হইতে আমি যে আর কোন কুসংসর্গে মিশিব না, তাহা আমার স্থির সংকল্প।"

দুর্গ-স্বামী বলিলেন,—"সৎ সংকল্প শীঘ্রই সফল করা আবশ্যক।"

বীরবল বলিলেন,—"অদ্য হইতেই আমি সংকল্পানুযায়ী কার্য্য করিতে চেষ্টাবান্ হইলাম। এখন রাত্রিটা, মহাশয়ের আবাসে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিয়া, নিরুপদ্রবে কাটাইতে পারিলে বাঁচি।"

দুর্গ-স্বামী কহিলেন,—"নির্ব্বিঘ্নে ও নিরুপদ্রব সম্বন্ধে আমি মহাশয়কে রাজপুতের কথা দ্বারা আশ্বস্ত করিতেছি। তবে স্বচ্ছন্দতা সম্বন্ধে আমি মহাশয়কে কোনই ভরসা দিতে পারি না। কারণ, আমার আবাসে এমন কিছুই নাই, যাহাতে আপনাকে স্বচ্ছন্দে ও সুখে রাখিতে পারি। আমার ভাণ্ডারে যাহা কিছু ছিল তাহা বিগত পিতৃশ্রাদ্ধের সময়ে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আমি ধন-জন-শূন্য; আমার আবাস মাত্র অবশিষ্ট আছে, তাহা আমি সন্তোষসহকারে মহাশয়ের সেবায় নিয়োজিত করিব।"

বীরবল বলিলেন,—"আবাসে কিছুই নাই, এমন কি হইবে?"

দুর্গ-স্বামী বলিলেন,—"আমার সন্দেহ হইতেছে তাহাই ঠিক। কিন্তু আর তর্কে কি কার্য্য—ঐ সম্মুখে আমার আবাস দেখা যাইতেছে। তথায় কি আছে না আছে, আপনি স্বচক্ষেই দেখিতে পাইবেন।"

সম্মুখে দুর্গ-স্বামীর সুবিস্তৃত প্রস্তর নির্ম্মিত আবাস নয়ন-গোচর হইল। এই বৃহৎ ভবনের নিম্নতলস্থ প্রকোষ্ঠ বিশেষে পূর্ব্বকালে কোন সময় শার্দ্দূল যুগল আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এবং তথায় তাহাদের শাবক জন্মিয়াছিল। এই ঘটনার পর হইতে এই বৃহৎ নিকেতন "শার্দ্দূলাবাস" নামে সাধারণ্যে পরিচিত হইয়াছে। লোকে অধুনা, সংক্ষিপ্ততার অনুরোধে 'আবাস' বলিয়াও এই ভবনের উল্লেখ করিয়া থাকে।

রাত্রি এখনও অধিক হয় নাই বটে, তথাপি দুর্গ-স্বামীর আবাস জনশূন্য ও আলোক-বিহীন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কেবল একমাত্র

বাতায়ন ভেদ করিয়া, অতি ক্ষীণ আলোকের আভা প্রকাশিত হইয়া আবাসের নিতান্ত জন-হীনতার বিরোধে সাক্ষ্য দিতেছে বলিয়া অনুমিত হইল।

দুর্গ-স্বামী বলিলেন,—"ঐ যে আলোক দেখিতেছেন, ঐ আলোক সমীপে আমার একমাত্র ভৃত্য উপস্থিত আছে। ও যে এখনও ঐ স্থানে আছে, ইহাই আমার সৌভাগ্য। কারণ উহাকে না পাইলে আলোক বা শয্যা কিছুরই সংস্থান হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

ক্রমে তাঁহারা সেই সুবৃহৎ ভবন-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন সেই বৃহদ্দ্বার অভ্যন্তর হইতে অর্গল-বদ্ধ। তখন দুর্গ স্বামী 'কানাই কানাই' শব্দে চীৎকার করিতে লাগিলেন এবং সজোরে পুনঃ পুনঃ দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার চীৎকার শব্দে ও দ্বারাঘাত ধ্বনিতে সমস্ত ভবন প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল, তথাপি কোন মনুষ্য-কণ্ঠ তাঁহার চীৎকারের উত্তর দিল না। তখন তিনি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"তবে কি কানাই মরিয়াছে? আমার যে চীৎকার তাহাতে সাক্ষাৎ কুম্ভকর্ণেরও নিদ্রাভঙ্গ হইবার কথা!"

অবশেষে ক্ষীণ ও কম্পিত কণ্ঠে উত্তর হইল,—"কে ও? কে—দুর্গ-স্বামী মহাশয় নাকি? তিনিই বটে ত?"

দুর্গ স্বামী উত্তর দিলেন,—"হাঁ কানাই, আমি দুর্গ-স্বামী বিজয় সিংহ।"

আবার প্রশ্ন হইল,—"সত্য বটে তো? আর কিছু নহে তো?"

দুর্গ-স্বামী উত্তর দিলেন,—"ভয় নাই, ভয় নাই, কোন অপ-দেবতা নহে।"

বাতায়ন-পথ দিয়া আলোকের গতি দেখিয়া বুঝা গেল যে, আলোক-বাহক ব্যক্তি ধীরে ধীরে সুবিস্তৃত সিঁড়ি দিয়া অবতরণ করিতেছে। তাহার ধীর পাদবিক্ষেপ হেতু বিজয়সিংহ নিরতিশয় বিরক্ত হইতে লাগিলেন এবং তাঁহার উদ্ধত প্রাকৃতিক সঙ্গী বারংবার অস্ফুটস্বরে গালি দিতে লাগিলেন। অবশেষে কানাইদ্বারের বিপরীত দিকে আসিয়া উপস্থিত হইল বটে কিন্তু দ্বার খুলিল না এবং পুনরায় জানিতে চাহিল, যাঁহারা এত গোল করিতেছেন, তাঁহারা বস্তুতঃ মানুষ কি না, এবং ভিতরে আসিতে চাহেন কি না।

বীরবল বলিলেন,—"আমি যদি এখন তোমার কাছে থাকিতাম তাহা হইলে, ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতাম, আমি মানুষ কি না?"

বিজয়সিংহ এই বর্ষীয়ান ভৃত্যের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করা অবিধেয় মনে করিয়া, এবং উভয়ের মধ্যে লৌহময় দ্বার ব্যবধান থাকিতে, শত সহস্র উক্তি নিষ্ফল জানিয়া, ধীরে ধীরে বলিলেন,—"হাঁ কানাই, তোমার ভয় নাই—দরজা খোল।"

তখন ধীরে ধীরে কম্পিত হস্তে বৃদ্ধ দ্বার খুলিয়া দিল। বৃদ্ধ নিতান্ত কৃশাঙ্গ। তাহার এক হস্তে একটা মশালের ন্যায় আলোক জ্বলিতেছে, অপর হস্ত দ্বারে সংলগ্ন রহিয়াছে। তাহার সেই উজ্জ্বল আলোকোদ্ভাসিত ক্ষীণ মূর্ত্তি, বদনের দারুণ ভীতি ও সন্দিগ্ধ ভাব দেখিবার সামগ্রী বটে। কিন্তু অশ্বারোহীদ্বয় তৎকালে এতাদৃশ কাতর ছিলেন যে, তাঁহারা অন্য কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ না করিয়া, এককালে ভবন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কানাই তাঁহাদের দেখিয়া বলিল,—"একি আমার প্রভু, দুর্গ-স্বামী মহাশয়। কি অন্যায়! নিজের বাটীর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন! কিন্তু কে জানে আপনি এত শীঘ্রই ফিরিবেন! তাহা তো আমরা ভাবি

। ! হাভিয়ার বাঁধা সোয়ায়! বেশ, বেশ।" তাহার পর চীৎকার শব্দে বলিল,—"রামমণি, রামমণি, শীঘ্র—ঘরটর ঠিক্ ঠাক কর। শীঘ্র—খুব খবরদার। আপনি এত শীঘ্র ফিরিবেন তাহা কি ছাই জানি? ঘরেও জিনিষ পত্রের কতকটা বেবন্দোবস্ত হয়ে আছে। তা—আপনাদের কোন কষ্ট হবে না। যেমন ক’রে হউক, আর য’ই হউক—"

বিজয় সিংহ বলিলেন,—"তা যেমন করেই হউক, আর যাহাই হউক, আমাদের ঘোড়া দুইটা রাখিয়া দেও, আর আমাদেরও একটু থাকিবার জায়গা দেও। আমি শীঘ্র ফিরিয়া আসিয়াছি বলিয়া তুমি কি দুঃখিত হইয়াছ?"

কানাই বলিল,—"দুঃখিত? সে কি কথা! আপনি ফিরিয়া আসিলেন—চাকর বাকরেরা বাঁচিয়া গেল। এই তিন শ বছরের মধ্যে কবে কোন দুর্গ-স্বামী বাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছেন। দুর্গ-স্বামীরা আপনার বাড়ীতে লোকজন খাওয়াইয়া, হাসিয়া, খেলিয়া কাল কাটান। তাঁরা বাড়ী ছেড়ে বিদেশে যাবেন কেন—কি দুঃখে? এই শার্দ্দুলাবাস—বাড়ী তো কম বাড়ী নয়—কত ঘর—কত জায়গা মজবুতই বা কেমন! লোকে বলে যে এরূপ প্রাচীন বাড়ী আর দেখা যায় না। এই জন্য দেশ দেশান্তর থেকে লোকে ইহা দেখিতে আইসে। ইহার বাহিরটাই কি সামান্য কাণ্ড! দেখ্‌বার জিনিষ বটে।"

বিজয় সিংহ বুঝিলেন যে, প্রকারান্তরে কানাই তাঁহাদিগকে বিলম্ব করাইতে চাহে। একটু হাসিয়া বলিলেন,—"তুমি তবে বাড়ীর বাহিরটা আমাদিগকে ভাল করিয়া না দেখাইয়া ছাড়িবে না, কেমন?"

বীরবল বলিলেন,—"না বাহির দেখিয়া কাজ নাই। এক্ষণে আমরা ঘরের ভিতর, আর ঘোড়াগুলা আস্তাবলের ভিতর যাওয়াই আবশ্যক।"

কানাই বলিল,—"অবশ্য, অবশ্য, তা আর বলতে? আমাদের বাড়ী মহাশয়, বুঝলেন"

বীরবল বলিলেন,—তুমি এখন ও কথা রাখিয়া দিয়া ঘোড়ার ব্যবস্থা কি বল। ঘোড়া অনেক খাটিয়াছে, এখানে এমনি করিয়া হিমে দাঁড়াইয়া থাকিলে একেবারে অধঃপাতে যাইবে। আমার ঘোড়া অনেক দামী ঘোড়া, এমন করিয়া নষ্ট করা তো চলে না। তাহার যাহা হয় একটা উপায় শীঘ্র কর।"

কানাই বলিল,—"ঠিক্ কথা। রাজপুতের ঘোড়ার যত্ন আগে চাই। দাঁড়ান মহাশয়, আমি সহিসগুলাকে একবার ডাকি।" এ হনুমান—ও জনার্দ্দন—ওরে রামধন—"

কানাই অনেক চীৎকার করিল কিন্তু ফল কিছুই হইল না; কেহই আসিল না। সে নিজেও জানিত যে, আসিবার কেহ নাই—তা আসিবে কে? বলিল,—

মহাশয় কথা আছে যে, 'বামুন গেল ঘর, তো লাঙ্গল তুলে ধর' এটা ঠিক্ কথা। দুর্গ স্বামী বাড়ী নাই কি না—আর লোকজন সব সুবিধা পাইয়া গিয়াছে। দেখুন মহাশয়, এক বেটা সহিসকেও কাজের সময় পাওয়া যায় না। কে যে কোথায় তার ঠিকই নাই। তা যাই হউক ঘোড়ার তদ্বির করিতেছি।"

দুর্গ স্বামী বলিলেন,—"তাই কর কানাই —তাহা না করিলে অন্ন উপায়াভাবে ঘোড়া গুলা মারা পড়িবে।"

কানাই দুর্গ-স্বামীকে জনান্তিকে বলিল,— "ও কি মহাশয়? করেন কি? মান তো বজায় রাখিতে হইবে? দেখিবেন এখন, আমার বুদ্ধিতে যত মিথ্যা যোগায় সে সকল বলিয়াও

আজি রাত্রে যে মান বজায় থাকিবে এমন বোধ হয় না।"

দুর্গ-স্বামী বলিলেন,—"সে জন্ম ভাবনা নাই। আস্তাবলে ঘাস আছে, দানা আছে?"

একবার কানাই বীরবলের কর্ণগোচর হয় এইরূপ উচ্চস্বরে বলিল,—"ঘাস দানা? যথেষ্ট—যথেষ্ট।"

দুর্গ-স্বামী বলিলেন,—"বেশ কথা। তুমি ঐ সকল তদ্বির দেখ। আমি ইহাকে সঙ্গে করিয়া উপরে লইয়া যাইতেছি।"

এই বলিয়া তিনি কানাইয়ের হস্ত হইতে আলোকটা জোর করিয়া গ্রহণ করিলেন।

কানাই বলিল,—"একটু দেরি করুন—এই বাহিরে দাঁড়াইয়া হাওয়া খাউন। দেখুন দেখি, কেমন চাঁদনি রাত্রি! এমন কি আর হয়? একটু দেখুন না। আপনি আলো হাতে করিয়া যাইবেন, সেটা ভাল দেখায় না। একটু দেরি করুন, আমি আলো ধরিয়া যাই-তেছি। উপরের ঝাড়টা একটু বেমেরামত রহিয়াছে; আমি না যাইলে ঠিক্ হইবার উপায় নাই। একটু অপেক্ষা করুন।"

দুর্গ-স্বামী কহিলেন,—"তাহাতে ক্ষতি কি? যতক্ষণ তুমি না আসিতেছ, ততক্ষণ আমাদিগের এই আলোতেই চলিবে। আলোক অভাবে তোমার কোন কষ্ট হইবে না বোধ হয়। কারণ, আমার যেন স্মরণ হইতেছে, প্রায় অর্দ্ধেক আস্তাবলের ছাত ভাঙ্গা—কাজেই যথেষ্ট আলো পাইবে।"

কানাই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল,—"আজ্ঞে হাঁ; শ্রাদ্ধের সময় অনেক ঘোড়া আসিয়াছিল। পাছে এক সঙ্গে এত ঘোড়া থাকিয়া গরম হয়, এই জন্য খানিকটা ছাত খুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল বটে। হতভাগা মিস্ত্রী বেটাকে রোজ সেই টুকু সেরে দিতে বলি, তবু আর তার সময় হয় না।"

কানাইয়ের বাক্যানুবর্ত্তী না হইয়া দুর্গ-স্বামী ও বীরবল উপরে উঠিতে লাগিলেন। দুর্গ-স্বামী যাইতে যাইতে বলিতে লাগিলেন,—"আপনার দুর্ভাগ্য লইয়া আপনি তামাসা করিতে ভাল লাগে না, নচেৎ এখানে সে সুযোগ যথেষ্ট আছে। কানাই বেচারা আমার এই দুরবস্থার কথা প্রাণপণ যত্নে লুকাইতে চেষ্টিত। আমার এই দরিদ্র পুরীর প্রকৃত অবস্থা লোককে জানাইতে কানাইয়ের বড় কষ্ট; আমাদের অবস্থা যেরূপ হইলে ভাল হয় বলিয়া সে মনে করে, প্রাণপণে অবস্থার সেইরূপ চিত্র সে লোক-সমক্ষে উপস্থিত করিতে উৎসুক। নিজের অবস্থা উপলক্ষ করিয়া হাস্য পরিহাস করা বড়ই অপ্রিয়। তথাপি সময়ে সময়ে বৃদ্ধ কানাইয়ের ব্যবহারে আমি আমোদিত না হইয়া থাকিতে পারি না।"

কথা সমাপ্তি সহকারে দুর্গ-স্বামী একটা সুবিস্তীর্ণ প্রকোষ্ঠের দ্বার খুলিলেন। সে প্রকোষ্ঠে বসিবার স্থান নাই। তথায় নানা সামগ্রী নিরতিশয় বিশৃঙ্খল ভাবে নিপতিত। সে প্রকোষ্ঠের অবস্থা দেখিলেই গৃহস্বামীর বর্ত্তমান বৈষয়িক অবস্থার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। ভগ্ন খট্টা, ছিন্ন ভিন্ন গালিচা, জীর্ণ শয্যা প্রভৃতি সামগ্রী প্রকোষ্ঠে স্তূপাকারে পড়িয়া রহিয়াছে। সে প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রকোষ্ঠান্তরে প্রবেশ করিলেন। তথায় বসিবার উপযুক্ত একটু স্থান দেখিতে পাইয়া, দুর্গ-স্বামী সমাদরে সঙ্গী বীরবলকে তথায় লইয়া আসিলেন। বলিলেন,—"দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছেন, সুখ ও শান্তি আমার এ দুর্গ হইতে প্রস্থান করিয়াছে। আপনাকে

আমি তাহা দিতে পারিব না। তবে আপনি যাহাতে সকল প্রকার বিপদের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন, তাহার উপায়, বোধ হয় আমার অসাধ্য নহে।"

বীরবল বলিলেন,—"আমার জন্ত আপনাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না। সামান্ত আহার করিয়া রাত্রি কাটাইতে পারিলেই যথেষ্ট।"

দুর্গ-স্বামী বলিলেন,—"আহারেরও যে বিশেষ সুবিধা হইবে তাহাও আমার বোধ হয় না। কানাইয়ের অশেষ গুণের মধ্যে একটী বিশেষ গুণ—সে একটু কালা। এই জন্তই সময়ে সময়ে যে কথা আর কেহ শুনিতে পাইতেছে না মনে করিয়া সে বলে, তাহা যাহাদের সে লুকাইতে চাহে, তাহাদের কর্ণেই অগ্রে প্রবেশ করে। ঐ শুনুন না কানাই কি বলিতেছে।"

তাঁহারা শুনিতে পাইলেন কানাই রামমণিকে বলিতেছে,—"ঐ ময়দাতেই কাজ সারিতে হইবে ভাল হউক মন্দ হউক, ঐ ভিন্ন উপায় নাই।"

রামমণি বলিল,—"কেমন করিয়া হইবে? এতে কি রুটী হয়? এ যে বড় খারাপ হইয়া গিয়াছে।"

কানাই বলিল,—"তা বলিলে কি হয়—ওতেই কাজ সারিতে হইবে। বলিস্ তোর বেকুবিতে রুটী পুড়িয়া তেত হইয়া গিয়াছে। ময়দা যে মন্দ তাহা বলা হইবে না। যেমন করিয়া হউক মান বজায় রাখা চাই।"

রামমণি বলিল,—"কিন্তু আলো কই? আমাদের মোটে একটা আলো, তাও দুর্গস্বামীর হাতে। আর একটা আলোর যোগাড় না হইলে তো কাজ চলে না।"

কানাই বলিল,—"আচ্ছা দাঁড়া তুই, আমি যোগাড় করিয়া ঐ আলোটাই আনিতেছি।"

যে ঘরে দুর্গ-স্বামী ও তাঁহার সঙ্গী বসিয়া আছেন, কানাই আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। তাহার গুপ্ত পরামর্শ সমস্তই যে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা তাহার জ্ঞান নাই। তাহাকে দুর্গ-স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হাঁ হে কানাই, আজি রাত্রে খাওয়া দাওয়ার কোন যোগাড় হইতে পারিবে কি?"

কানাই নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট ভাবে বলিল, "খাওয়া দাওয়ার যোগাড়! সে কি কথা? এই দুর্গ-স্বামীর বাটীতে যত লোকই কেন আসুন না, ফিরিবার কোন কথা নাই তো। তবে রুটী ছাড়া আর কোন জিনিষই এখন টাটকা তাজা মিলিবার সম্ভাবনা নাই। মেঠাই, পেড়া প্রভৃতি সামগ্রী টাটকা হইবে না; রামমণি বুড়া মানুষ, এখন সে সকল করিয়াও উঠিতে পারিবে না।"

ঈষৎ হাস্তের সহিত দুর্গ-স্বামী বীরবলকে বলিলেন,—"যে রামমণিকে কানাই বুড়ী বলিয়া উল্লেখ করিতেছে সে উহার অপেক্ষা অন্ততঃ ত্রিশ বৎসরের ছোট।"

বীরবল দেখিলেন, বৃদ্ধ কৌলিক মান বজায় রাখিবার নিমিত্ত, নিতান্ত গোলে পড়িয়াছে, তাহাকে কিয়ৎ পরিমাণে নিশ্চিন্ত করিবার আশয়ে বলিলেন,—"মেঠাই, পেড়া আমিত খাই না। মিষ্ট খাইলে আমার বড় অসুখ করে। দুইখানি রুটী পাইলেই আমার যথেষ্ট খাওয়া হইবে।"

কানাই অমনি বলিল,—"হাঁ—বলেন কি? দুখানি রুটী ছাড়া আর কিছুই খাইবেন না। আমরা এত উদ্যোগ আয়োজন করিয়াছি সকলই মাটী।"

দুর্গ-স্বামী বলিলেন,—"কানাই, বৃথা গণ্ডগোলে কাজ নাই। তোমাকে বলি শুন, ইনি রাওল বীরবল। কোন কারণে ইহাকে

লুকাইয়া থাকিতে হইতেছে, তাহারই উপায় চিন্তা কর।”

কানাই বলিল,—“তার আর ভাবনা কি? এখানকার অপেক্ষা লুকাইয়া থাকিবার উত্তম স্থান আর কোথায় আছে?”

কানাই প্রস্থান করিল। কোন প্রকারে রাত্রের আহার সমাপ্ত হইল। তাহার পর ভবন-মধ্যস্থ এক নিভৃত প্রকোষ্ঠে বীরবলের শয্যা করিয়া দেওয়া হইল

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

এইরূপ ভাবে প্রথম চারিদিন কাটিয়া গেল। কানাইয়ের কৌশলে আহারাদি কায়ক্লেশে চলিতে লাগিল।

দুর্গ-স্বামীর চিত্তের অবস্থা বড় ভয়ানক। একদিকে বিল্লাদারের প্রতি প্রবল প্রতিহিংসা—পিতৃপুরুষের অন্তিম সময়ের বাক্যাবলী স্মরণ করিয়া বিজাতীয় বৈরনির্য্যাতন স্পৃহা, আর এক দিকে বিল্লাদারে-কুমারী কল্যাণীর কমনীয়তা এই উভয়ই তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল। এই উভয় ভাবের প্রাবল্যে তাঁহার হৃদয় নিতান্ত বিচলিত। তিনি কি করিবেন, কি করিলে ভাল হয়, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে অক্ষম। একবার তিনি মনে করিতেছেন, ‘এ প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি ত্যাগ করিবার নহে; ইহা ত্যাগ করিলে ধর্ম্মের সমীপে, পিতৃপুরুষগণের সম্মুখে, জগৎসমীপে আত্মীয় সমাজে, ঘোরতর পাতকী বলিয়া পরিগণিত হইতে হইবে। না, ইহা আমার সঙ্গের সাথি। জীবনে ও মরণে এ প্রতিহিংসার সহিত আমার সম্বন্ধ।’ আবার তাঁহার মনে হইতেছে, ‘কিন্তু কল্যাণী—সেই সরলতা-পূর্ণা সুন্দরী শিরোমণি-স্বরূপা রঘুনাথ কন্যা—তাঁহার কি দোষ? তিনি তো আমার সহিত জ্ঞানে বা অজ্ঞানে কখনই কোন অসদ্ব্যবহার করেন নাই। আমি সেই সরলা বালার সহিত সে দিন নিতান্ত বিসদৃশ—যৎপরোনাস্তি পরুষ ব্যবহার করিয়াছি। আমার সে দিনকার ব্যবহার নিতান্ত নিন্দনীয়। কল্যাণীর পিতা আমার পরম শত্রু হইতে পারেন, কিন্তু সে শত্রুতা হেতু তাঁহার তনয়ার সহিত শিষ্টাচার বহির্ভূত ব্যবহার করা কোন ক্রমেই আমাদের সঙ্গত হয় নাই। সে দিনকার ব্যবহার স্মরণ করিয়া আজি আমি নিতান্তই লজ্জিত হইতেছি।”

দুর্গ-স্বামীর হৃদয়ের এরূপ ভাব। একদিকে আকর্ষণ। অপর দিকে বিকর্ষণ। এ বড় বিষম অবস্থা!

এইরূপ অবস্থায় একদিন প্রাতে বীরবল জিজ্ঞাসিলেন—“এক্ষণে কি স্থির করিতেছেন? মিবারে থাকিয়াই রাজপ্রসাদ লাভের চেষ্টা করিবেন, কি এ দেশ ত্যাগ করিয়া দেশান্তরে অদৃষ্ট পরীক্ষার সঙ্কল্প করিতেছেন?”

দুর্গ-স্বামী বলিলেন,—“কি যে করিব তাহা আমি জানি না; আমার এমনই ভাগ্য যে, আমার বন্ধু বান্ধবেরাও তাহা স্থির করিতে অক্ষম। এই পত্র পাঠ করুন।”

এই বলিয়া দুর্গ-স্বামী বীরবলের হস্তে এক খানি পত্র প্রদান করিলেন। বীরবল তাহা পাঠ করিলেন,—

“রাম রাম।

শ্রীযুক্ত বিজয়সিংহ দুর্গ-স্বামী মহাশয়

প্রবল প্রতাপেষু—

"পত্র বহুদিন পাইয়াছি। উত্তর দেওয়া আজ কাল সহজ কথা নহে। কেন, তাহা কি আর বলিতে হইবে? এই রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় লোকের প্রাণ লইয়া টানাটানি। কখন কি হয় তাহার স্থিরতা নাই। আপনার সম্বন্ধে রাণা-দরবারে মূর্খ লোকে মিথ্যা অভিযোগ করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং আপনার সহিত যে লোক ঘনিষ্ঠতা রাখিবে বা দেখাইবে, সেও দোষী হইয়া পড়িবে। কিন্তু নিশ্চয় জানিবেন এমন দিন থাকিবে না। অচিরে সমস্ত বিষয়েরই অন্যথা ঘটিবে। তাহার বিস্তারিত বিবরণ পত্রে লেখা উচিত নহে বলিয়া ক্ষান্ত হইলাম। আপনি ব্যস্ত হইবেন না। বিদেশে যাওয়ার মত ত্যাগ করুন। তাহার কোন প্রয়োজন নাই। ঈশ্বরের ইচ্ছায়, স্বদেশে বসিয়াই, শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবেন। আপনি আমাদের পরমাত্মীয়। তথাপি সর্ব্বদা আপনার সংবাদাদি না লওয়া নিশ্চয়ই আমাদের পক্ষে বিশেষ দোষ। কার্য্য কারণ স্মরণ করিয়া ক্ষমা করিবেন, ইহাই প্রার্থনা। পত্রবাহক বিশ্বাসী লোক বলিয়া এত কথা সাহস করিয়া লেখা গেল। আপনি এ লোকের দ্বারা ইচ্ছা মত উত্তর পাঠাইবেন। ইতি—

নিত্যশুভানুধ্যায়ী
রামরাজা।"

বীরবল পত্র পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, পত্র লেখক কে? রামরাজা অতি বিখ্যাত ও প্রতাপান্বিত প্রদেশপতি—মহারাণার অধীনস্থ একজন প্রধান সামন্ত। মহারাণার দরবারে তিনি বড়ই সম্মানিত। রামরাজার সহিত দুর্গ-স্বামী বংশের অতি নিকট সম্পর্ক হইলেও, দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া, চতুর রামরাজা দুর্গ-স্বামীর সহিত ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ করিতে সম্পূর্ণ বিরত ছিলেন।

বীরবল, দুর্গ স্বামীর হস্তে পত্র ফিরাইয়া দিয়া, বলিলেন—"এ পত্র লেখা না লেখা উভয়ই সমান। ইহার কোনই অর্থ নাই। আপনাকে দেশত্যাগ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, কিন্তু এখানে থাকিলে কি ইষ্ট সম্ভাবনা আছে তাহা ব্যক্ত করা নাই। শীঘ্র বর্ত্তমান ব্যবস্থার অন্যথা হইবে বলা হইয়াছে, কি অন্যথা তাহার আভাস নাই। এমন দিন থাকিবে না, কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তে কেমন দিন ঘটিবে তাহা বলা হয় নাই। ফলতঃ এ পত্র পাঠ করিয়া আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আপনি যদি বুঝিয়া থাকেন, বলিতে পারি না।"

দুর্গ-স্বামী এ কথার উত্তর দিলেন না। তাঁহার মন তখন অন্য প্রকার চিন্তায় মগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন,—"মহাশয় সম্পত্তি না থাকা, এ সংসারে সময়ে সময়ে বড়ই দুঃখের কারণ হইয়া পড়ে—আপনিও তাহা বিশেষ বুঝিয়াছেন সন্দেহ নাই।"

বীরবল বলিলেন,—"তাহা আর বলিতে? সেই জন্যই তো দিদি মা বুড়ী কবে মরিবে ভাবিয়া আপাততঃ আমি তো যাইতেছি।"

"আপনার দিদিমার সম্পত্তি কি অনেক?"

বীরবল বলিলেন,—"আমার পক্ষে যথেষ্ট?"

এমন সময় কানাই আসিয়া বলিল,—"আপনারা কয়দিন স্নান করেন নাই, আজি স্নান করিবেন কি? আমি ফুলেল তেল টেল যথেষ্ট পরিমাণে স্নানের স্থানে রাখিয়া আসিয়াছি, আপনারা আসুন।"

দুর্গ-স্বামী বলিলেন,—"কানাই! এ আবার তোমার কোন রঙ্গ?"

বীরবল বলিলেন,—"চলুন না দেখা যাউক।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কয়েক দিন পরে, এক দিন অতি প্রত্যূষে, বীরবল দুর্গ-স্বামীর গৃহাগত হইয়া উৎসাহ সহকারে বলিলেন,—"উঠুন, উঠুন; আপনি ঘুমাইয়া সব মাটি করিলেন। দেখিতেছেন না, বাহিরে কত ধুম লাগিয়াছে। কত লোক, কত ঘোড়া, কত পালকি চলিতেছে। আপনি কেবল ঘুমাইয়া কাল কাটাইলেন—ছিঃ।"

দুর্গ-স্বামী চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে উঠিয়া বলিলেন,—"ব্যাপারটা কি? কিসের এত ধুম? লোক জন কেন চলিতেছে?"

বীরবল বলিলেন,—"কেন এত ধুম তা আমি কি জানি? আপনি উঠুন—দেখুন ব্যাপারটা কি?"

তখন দুর্গ-স্বামী উঠিয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, বাস্তবিক অনেক লোক জন, অশ্বাদি সহিত, পিপ্‌লি গ্রামাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে; তাহাদের সঙ্গে একখানি শিবিকাও আছে। তদ্দৃষ্টে বোধ হইল কোন মহিলা তাহা অধিকার করিয়া আছেন। দুর্গ-স্বামী দেখিয়া বলিলেন,—"তাইত, ব্যাপারটা কি?"

এমন সময় কানাই পশ্চাৎ দিক্ হইতে বলিল,—"ব্যাপার আর কিছুই নয়—নিশ্চয়ই কোন বড়লোক সপরিবারে ভগবান্ অনাথনাথের পূজা দিতে চলিয়াছেন।"

দুর্গ-স্বামী বলিলেন,—"ঠিক্ বলিয়াছ কানাই। আমাদেরও দেখিতে গেলে হয়। বিশেষতঃ ভগবান্ অনাথনাথের মন্দির আমারই সম্পত্তি। পিপ্‌লি গ্রাম আমার হস্ত-ভ্রষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু দেবালয়ের স্বত্ব কোনক্রমেই তো অন্যের হস্তগত হইতে পারে না; এ জন্য তাহা আমারই আছে। আমার হস্তে দেব-দুর্গতি; এক্ষণে যথারীতি দেবসেবার বন্দোবস্ত, অথবা মন্দিরের জীর্ণ সংস্কার কিছুই করা হয় না। ভগবন্! তোমারই নিগ্রহে এই অশুভ ফলের উদ্ভব। যাহা হউক, বীরবল, দেবদর্শনার্থী যাত্রিগণ সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া বোধ হইতেছে। উঁহারা আমারই অধিকারের মধ্যে, আমারই দেবালয়ে গমন করিতেছেন। আমি উঁহাদের সহিত আলাপ করি বা না করি, ঐ স্থানে কোন ওজরে, উপস্থিত থাকিতে পারিলে, সাধ্যমত উঁহাদের অসুবিধা বিদূরিত করিবার চেষ্টা করিতে পারিব। দেবালয়ের কোন প্রকার সুব্যবস্থাই নাই। এরূপ স্থলে আমার একটু যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য বলিয়াই মনে হইতেছে। আপনার কি মত?"

বীরবল বলিলেন,—"আমার মতে আপনি অতি সুন্দর প্রস্তাব করিয়াছেন। আর অন্য মতে কাজ নাই, আমি অশ্ব প্রস্তুত করিতেছি, আপনি আসুন।"

বাহিরে আসিবার পূর্ব্বে কানাই বলিল,—"দুর্গে থাকিবার যে লোক নাই—আমিও আপনার সহিত যাইতে পারিলে বড়ই ভাল হইত।"

দুর্গ-স্বামী বলিলেন,—"কেন কানাই?"

"কেন? তাহার আর কি বলিব? আমার পোড়া কপাল তাই আজিও বাঁচিয়া আছি! আজি আপনি একাকী অনাথনাথের মন্দিরে চলিতেছেন; কিন্তু এমন দিন এই কানাই দেখিয়াছে, শতাবধি উড়িয়াছে—লোক জনের

তো কথাই নাই। আজি আপনি সেই দুর্গ-স্বামীর বংশধর—আপনি আজি সঙ্গিহীন—একাকী। আমি, যতদূর সাধ্য যত্নে, পূর্ব্ব গৌরব বজায় রাখিবার চেষ্টায়, সঙ্গে যাইতে চাহি।"

দুর্গ-স্বামী গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"তাহাতে কাজ নাই।"

বিনা বাক্যব্যয়ে দুর্গ-স্বামী নিম্নে অবতরণ করিয়া আপনার দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্রকায় অশ্বে আরোহণ করিলেন; বীরবল স্বীয় অপেক্ষাকৃত উন্নত ও বলিষ্ঠ অশ্ব-পৃষ্ঠে স্থান গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা উভয়ে শার্দ্দূলাবাস ত্যাগ করিলেন। অনতিবিলম্বে তাঁহারা ভগবান্ অনাথনাথের মন্দির সম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন।

বীরবল বলিলেন,—"ভিতরে চলুন।"

দুর্গ-স্বামী বলিলেন,—"না; বোধ হয় শিবিকাস্থিতা মহিলা পূজা করিতে গিয়াছেন, এ সময়ে ভিতরে যাওয়া নিতান্ত অন্যায়।"

দুর্গ-স্বামী দেখিলেন যাত্রিগণের অশ্বসমূহ আরোহী-বিহীন এবং শিবিকা অনতি দূরে। সুতরাং সহজেই অনুমান হইল, লোক জন সকলেই মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, পুরোহিত আবশ্যক মত সময়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং যাত্রিগণের এ স্থানে বিশেষ কোন অসুবিধা হয় নাই। তাহার পর দুর্গ-স্বামী দেবতার উদ্দেশে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"ভগবন্ অনাথনাথ! ইহ সংসারে আমার প্রার্থনা করিবার আর কিছুই নাই। এ চির, ভিন্ন,মর্ম্মাহত কাতর সন্তান শান্তির সাক্ষাৎ ইহ জীবনে প্রত্যাশা করে না, সুতরাং সে তাহার প্রার্থী নহে। প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—না তাহাতে কাজ কি? হাঁ—প্রতিহিংসাই একমাত্র প্রার্থনীয়। সে সাধও মিটিবে না কি, দেব?"

দুর্গ-স্বামীর প্রণাম ও প্রার্থনা সমাপ্ত হইল। বীরবল দেখিলেন দুর্গ-স্বামীর স্বভাবতঃ বিষাদ তমসাচ্ছন্ন বদন আরও বিষাদময়, তাঁহার গম্ভীর ও উৎকণ্ঠিত ভাব আরও গাম্ভীর্য্য ও উৎকণ্ঠাপূর্ণ। দুর্গ-স্বামী বলিলেন,—"আর বিলম্বে কি কাজ? চলুন ফিরে যাই।"

বীরবল বলিলেন,—"বিলক্ষণ, দেবমূর্ত্তি না দেখিয়া কেমন করিয়া ফিরিয়া যাইব।"

দুর্গ-স্বামী বলিলেন,—"উত্তম কথা, আপনি দেবদর্শনার্থে অপেক্ষা করুন। আমি ততক্ষণ ধীরে ধীরে অগ্রসর হই।"

বিজয়সিংহ কিয়দ্দূর মাত্র অগ্রসর হইলে একজন বর্ষীয়ান্ অশ্বারোহী আসিয়া তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইল। আগন্তুক যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাহা তাঁহাকে দেখিয়াই সুন্দর রূপে অনুমিত হইতে লাগিল। তাঁহার মস্তকের উষ্ণিষ দ্বারা মুখের বহুলাংশ আবৃত। আগন্তুক নিকটস্থ হইয়া দুর্গ-স্বামীকে জিজ্ঞাসিলেন,—"সম্মুখে যে সুবৃহৎ ভবন পরিদৃষ্ট হইতেছে, উহাই শার্দ্দূলাবাস নহে কি?"

দুর্গ-স্বামী বলিলেন,—"হাঁ মহাশয়, উহাই শার্দ্দূলাবাস বটে।"

আগন্তুক কহিলেন,—ঐ সুবৃহৎ ভবনের ও উহার অধিকারীদিগের সহিত মিবারের উত্থান ও পতন, সুখ ও দুঃখের কতই সম্বন্ধ আছে!"

দুর্গ-স্বামী একথার বিশেষ কোন উত্তর দিলেন না। আগন্তুক পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন,—"এই ভবন অতি প্রাচীন কাল হইতে দুর্গ-স্বামী বংশের অধিকারভুক্ত আছে না?"

বিজয়সিংহ বলিলেন,—"এই ভবনই দুর্গ-স্বামিগণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সম্পত্তি এবং ইহাই তাঁহাদের শেষ সম্পত্তি।"

প্রাচীন অশ্বারোহী একটু সঙ্কুচিত ভাবে

বলিলেন,—"না, না—তাহা কেন হইবে? এই দুর্গ-স্বামী বংশের গুণ-গরিমা কে না জানে? আমি বিশ্বাস করি যদি মহারাণাকে ভাল করিয়া কেহ বুঝাইয়া দেন যে, এই সুপ্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশ ধ্বংস হইয়া যাইতেছে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি ইহার পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করিবেন।"

দুর্গ-স্বামী উদ্ধত ভাবে বলিলেন,—এতদ্বিষয়ক প্রসঙ্গ দ্বারা আমাকে অনুগৃহীত করিবার প্রয়োজন দেখিতেছি না। আমিই ঐ ভবনের একমাত্র উত্তরাধিকারী,—আমারই নাম দুর্গ-স্বামী বিজয়সিংহ। আপনি ভদ্রলোক। ইহা বোধ করি আপনার অবিদিত নাই যে, ভাগ্য-চক্র বিরুদ্ধ পথগামী হইলে, এরূপ অযাচিত হিত-কামনা নিতান্ত অপ্রিয় বলিয়া মনে হয়।"

প্রাচীন অশ্বারোহী বলিলেন,—"আমি বুঝিতে পারি নাই—আমি জানিতাম না—আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন—অন্যায় হইয়াছে—

দুর্গ-স্বামী বলিলেন,—"ক্ষমা প্রার্থনা নিতান্ত অনাবশ্যক। বোধ হয় এই আমাদের পরিচয়ের শেষ; কারণ সম্ভবতঃ সম্মুখস্থ পথ দ্বয়ের ভিন্ন ভিন্ন পথ এক্ষণে আমাদের অবলম্বনীয়। আমি অবিরক্ত চিত্তে মহাশয়ের নিকট হইতে বিদায় হইতেছি জানিবেন।"

এই বলিয়া স্বাধীনচেতা দুর্গ স্বামী অশ্বের মস্তক, শার্দ্দূলাবাসে উপনীত হইবার নিমিত্ত যে সঙ্কীর্ণ পথ আছে তদুদ্দেশে, যেমন ফিরিলেন, অমনি শিবিকাবাহকেরা শিবিকারূঢ়া দেবদর্শনার্থিনী মহিলা সহ সেই স্থানে উপস্থিত হইল। শিবিকার উভয় দিকের আবরণ উন্মুক্ত এবং তন্মধ্যে এক অবগুণ্ঠনবতী কামিনী উপবিষ্টা। প্রাচীন অশ্বারোহী সেই কামিনীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—

"বৎসে! ইনিই দুর্গ-স্বামী।"

এই সময় আকাশ ঘোর ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল এবং কড় কড় নাদে বজ্রধ্বনি হইতে লাগিল। অবিলম্বে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইবে তাহাতে কোনই সন্দেহ রহিল না। শিবিকাস্থিতা যুবতী ও প্রাচীন অশ্বারোহী নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। ইচ্ছা বা অনিচ্ছায়, চেষ্টা বা অচেষ্টায় দুর্গ-স্বামী না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না যে,—"সম্মুখস্থ শার্দ্দূলাবাসে কেবল আশ্রয় স্থান ব্যতীত আর কিছুই নাই। যদি এরূপ সময়ে তাহাতে আপত্তি না থাকে—"

আর কথা দুর্গ-স্বামীর মুখ দিয়া বাহির হইল না। যাহা দুর্গ-স্বামী শেষ করিতে পারেন নাই, তাহা প্রাচীনব্যক্তি শেষ করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন,—"আমার কন্যার শরীর বড়ই দুর্ব্বল। সম্মুখে এই ঝঞ্ঝাবাত। এ সময়ে শিষ্টাচার এককালে অনাবশ্যক। এক্ষণে আমাদের, দুর্গ স্বামীর ভবনে আতিথ্য স্বীকার ভিন্ন, উপায়ান্তর কি আছে?"

আর মতান্তরের সুযোগ নাই। অগত্যা দুর্গ-স্বামীকে সঙ্গিগণের পথ প্রদর্শক হইয়া অগ্রসর হইতে হইল। ভবন সন্নিহিত হইয়া, তিনি 'কানাই কানাই' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন।

কানাই আসিল বটে, কিন্তু তাহার মুখের ভাব ও মনের ভাব বর্ণনার অতীত। তাহার তখন চিন্তার সীমা নাই। মধ্যাহ্ন ভোজনের কালবিলম্ব নাই, এমন সময়ে দুর্গ-স্বামী বহুজন সম্ভ্রান্ত অতিথি সঙ্গে গৃহে ফিরিলেন। কানাই কথা কহিবে কি? সে কেমন করিয়া তাল সাম্লাইবে—মান বজায় রাখিবে ভাবিয়া

অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। যাহাই হউক, সে হঠাৎ অপ্রতিভ না হইয়া বলিল,—

"হায়, হায় কাজটা বড় অন্যায় হইয়েছে। দুর্গ-স্বামী যেমন বাটীর বাহির হইলেন, অমনি চাকর বাকর একত্রিত হইয়া পরামর্শ করিল তিনি আজি শীঘ্র ফিরিবেন না। তাহারা দল বাঁধিয়া শীকার করিতে গেল। উনি যে এত শীঘ্র ফিরিবেন, তাহা তাহারা ভাবে নাই তো। তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন।"

দুর্গ-স্বামী বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"কানাই চুপ কর—এরূপ পাগলামি সকল সময় ভাল লাগে না।" তাহার পর তিনি অতিথিগণের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"এই বৃদ্ধ ও আর একটী স্ত্রীলোক ব্যতীত আমার অন্য দাসদাসী নাই। এই সামান্য লোক জন দ্বারা, এই জীর্ণ ভবন হইতে যেরূপ ভোজ্যাদি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, আমার তাহারও সংস্থান নাই। ফলতঃ যাহা কিছু আছে, তাহা প্রয়োজন মতে আপনারা আপনার ভাবিয়া গ্রহণ করিলে আপ্যায়িত হইব।"

কানাই অবাক্ হইয়া গেল। সে এত মিথ্যা কথার সহায়তায় যে মান বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়েছে, অনায়াসে, অম্লান বদনে দুর্গ-স্বামী এককালে তাহার শেষ করিয়া দিলেন। সে যে কি বলিবে কি করিবে কিয়ৎকাল তাহা আর তাহার মনে পড়িল না। অনেক ক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া কানাই বলিল,—"এখানে দাঁড়াইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। সঙ্গে মহামান্য কুলবালা রহিয়াছেন। এখানে কেন? ঘরে আসুন। ঘরটার সাজ সজ্জা কিছু খারাপ হইয়া রহিয়াছে। দামী দামী জিনিষ পত্র চারি দিকে বেবন্দোবস্ত হইয়া পড়িয়া আছে। তাহা হউক, আসুন তো। খাওয়া দাওয়ার কিরূপ আয়োজন করা হইবে? প্রাতে গোপ মোজর এক মন দুধ দিয়া গিয়াছিল। রাম মণির ধেকুবিতে দুধটা খারাপ হইয়া গিয়াছে। তাহা হউক, আবার যোগাড় করিতেছি।"

দুর্গ-স্বামী নিতান্ত বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"কানাই তোমার জ্বালায় আমি অস্থির হইয়া উঠিয়াছি। তোমার ওরূপ বাতুলতায় কোন ইষ্ট নাই, কেবল লোকের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি হয় মাত্র।"

এই সময়ে বীরবলের উচ্চ কণ্ঠ-ধ্বনি এবং সঙ্গে সঙ্গে বহু অশ্বের পদধ্বনি শুনিতে পাইয়া, কানাই একেবারে চমকিয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিল,—"সর্ব্বনাশ, এ আবার কি দৌরাত্ম্য! ভগবান্, আজ আর কোন ক্রমে মান বজায় থাকে না দেখিতেছি। লোক গুলা ছুটিয়া আসিতেছে; ভাবিয়াছে, এখানে মহানন্দে পূরী কচুরী খাইয়া গোলমাল করিয়া দিন কাটাইবে। আমি সকলকে ভাগাইবার উপায় করিতেছি।"

কানাই প্রস্থান করিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

বীরবল, কিয়ৎকাল অনাথনাথের মন্দিরে অপেক্ষা করিয়া, সমাগত লোকজনের সহিত পরিচয় করিলেন। পূজার জন্য উপকরণ সামগ্রী যথেষ্ট আসিয়াছিল। ঐ সকল সামগ্রীর অধিকাংশ শার্দ্দূলাবাসে আনিয়া ফেলেন, এইটিই তাঁহার প্রাণের বাসনা। তাঁহার উদ্দেশ্য সহজেই সফল হইবার সম্ভাবনা

হইল। বিষম ঝড় জল আসিবার উপক্রম হইল; লোকজন প্রাণ লইয়া পলাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িল, জিনিষ পত্রের ভাবনা তখন কে ভাবে? সেই সময় বীরবল তাহাদিগকে সন্নিহিত শার্দ্দুলাবাসে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তাহারা কৃতার্থ হইয়া গেল। জিনিষ পত্র যে যত পারিল সঙ্গে লইয়া বীরবলের অনুসরণ করিল।

এদিকে কানাই স্থির করিল, যাহারা আসিতেছে, তাহাদিগকে তো প্রবেশ করিতে দেওয়াই হইবে না, বরং এই সুযোগে, বাহক প্রভৃতি যাহারা অগ্রে প্রভু ও প্রভুকন্যার সঙ্গে আসিয়াছে, তাহাদিগকেও তাড়াইয়া দিতে হইবে। এইরূপ অভিপ্রায় করিয়া, কানাই, বাহক প্রভৃতি যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহাদিগকে বলিল,—"তোমাদের সঙ্গীরা পূজার প্রসাদাদি লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া দৌড়িয়া আসিতেছে। চল, আমরা সকলে অগ্রসর হইয়া উঁহাদিগকে আদর করিয়া লইয়া আসি।"

তাহারা এ প্রস্তাব ভালই মনে করিল, সুতরাং সম্মত হইল। সকলে তদভিপ্রায়ে দরজার বাহিরে আসিবামাত্র ঝড়ে দরজার একটা কবাট বন্ধ হইয়া গেল। তখন কানাই তাড়াতাড়ি ভিতরে আসিয়া আর একটা কবাটও বন্ধ করিয়া দিয়া, সজোরে অর্গল আঁটিয়া দিল। লোক জন অবাক্। সর্ব্বোপরি অবাক্ বীরবল। সকলে কানাই কানাই! দরজা খোল, বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। আর কানাই! একবার কানাই গবাক্ষ দ্বার দিয়া মুখ বাহির করিয়া বলিল,—"গোল করিতেছ কেন? চুপ্। আপন আপন বাড়ী চলিয়া যাও, বাবা সকল। এখানে কেন দুঃখ জানাইতেছ?"

বীরবল বলিলেন,—"বড় মজার কথা। শীঘ্র দরজা খোল; দুর্গ-স্বামীর সহিত বিশেষ কথা আছে।"

যাহারা প্রথমে বাড়ীর ভিতর ছিল,—পরে তাড়িত হইয়াছে, তাহারা বলিতে লাগিল,—"আমরা মনিবের সঙ্গে আসিয়াছি—মনিবের সঙ্গেই থাকিব এবং যাইবার সময় মনিবের সঙ্গেই যাইব। আমাদের বাড়ীর ভিতর যাইতে দিতে হইবে।"

বীরবল চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"বিলম্ব হইলে বিশেষ ক্ষতি হইবে। কানাই, তোমার অদৃষ্টে বিস্তর দুঃখ আছে।"

তখন কানাই, বাক্যে কোন উত্তর না দিয়া, গবাক্ষ দ্বার দিয়া দক্ষিণ হস্ত বাহির করিয়া দিল এবং অঙ্গুষ্ঠ উত্তোলন করিয়া, একবার বামে একবার দক্ষিণে আন্দোলন করিল।

বাহকেরা গোলমাল করিতে লাগিল। বীরবল আবার চীৎকার করিতে লাগিলেন। কানাইয়ের কিছুতেই দৃক্‌পাত নাই।

যখন গোলমালটা অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন কানাই আবার গবাক্ষ দিয়া মুখ বাহির করিল এবং অতি রাগত স্বরে বলিল,—"কেন হে, তোমরা গোল করিতেছ? এসময় কোন মতেই দরজা খোলা হইতে পারে না। দুর্গ-স্বামী ও তাঁহার মহামান্য বন্ধুগণ এখন আহার করিতেছেন। আহারের সময় দরজা খুলিয়া বাহিরের লোক আসিতে দেওয়া এ বংশের কস্মিন্ কালে রীতি নাই। আজ কি তোমাদের জন্য চিরকালের নিয়ম বদলাইয়া দিব নাকি? কে তোমরা?"

বীরবল বলিলেন,—"কানাই, আমি রাওল বীরবল—দুর্গ স্বামীর বন্ধু। আমাকে দরজা খুলিয়া দেও। আমি ভিতরে যাইব।"

কানাই বলিল,—“এ সময় ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, আসিলেও শার্দ্দুলাবাসের দরজা খোলা হয় না, তা তুমি তো তুমি। যাও বাবা, অন্য স্থানে চেষ্টা কর গিয়া, এখানকার দরজা আজি খোলা হইবে না।”

তখন বীরবল, নানা প্রকার কটূক্তি করিয়া, কানাইকে গালি দিতে লাগিলেন এবং দুর্গ-স্বামীর সহিত সাক্ষাদাশয়ে বারংবার চীৎকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে কটূক্তি বা চীৎকার কানাইকে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করিতে সক্ষম হইল না। কানাই সে স্থান হইতে চলিয়া আসিল।

এখন বিবাদ বিসংবাদে মত্ত হইয়া, কানাই জানিতে পারে নাই যে, সেই ধনী অতিথির একজন বিশ্বস্ত ও অপেক্ষাকৃত সম্ভ্রান্ত অনুচর বাটীর ভিতর রহিয়া গিয়াছে। তাহা যদি কানাইয়ের গোচরে আসিত, তাহা হইলে সে ব্যক্তিকেও নিশ্চয়ই অপরাপর অনুচরগণের ন্যায়, গৃহ-বহিষ্কৃত হইতে হইত। যাহা হউক, এই ব্যক্তি কানাইয়ের অজ্ঞাতসারে অশ্ব-শালায় দাঁড়াইয়া, সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিল। কেন কানাই এতাদৃশ ব্যবহার দ্বারা, তাহার সঙ্গিগণকে দুর্ব্যবহার করিতেছে তাহা সে সহজেই বুঝিতে পারিল। এই বিশ্বস্ত ব্যক্তি জ্ঞাত ছিল যে, তাহার প্রভু অন্তরে দুর্গ-স্বামীর শুভানুধ্যায়ী। কানাই দ্বার-পার্শ্বস্থ গবাক্ষ ত্যাগ করিবামাত্র এই ব্যক্তি তাহা অধিকার করিল এবং কানাইয়ের স্থলাভিষিক্ত হইয়া, বহিঃস্থ ব্যক্তিগণের অলক্ষিত ভাবে, বলিতে লাগিল,—“আমার প্রভু এবং অভ্যাগত বাবা উভয়েরই ইচ্ছা যে, লোকজন গ্রাম মধ্যে কোন দোকানে গিয়া খাওয়া দাওয়া করে; তাহাদের যে খরচ হইবে সে খরচ আমি দিব।”

সমবেত চীৎকারকারিগণ তখন অগত্যা বারংবার গালি দিতে দিতে প্রস্থান করিল। বীরবলের অন্তরে উচ্চতা সূচক অনেক গুণ ছিল বটে, কিন্তু এক দোষে সকল গুণই বৃথা হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি ঘোর মূর্খ ও কুসংসর্গপরায়ণ ছিলেন। এই জন্য কখনই তাঁহার স্বভাব মার্জ্জিত ও চরিত্র উন্নত হয় নাই। তিনিও অধুনা দুর্গ-স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া, তাঁহার সমভিব্যাহারিগণের ন্যায়, অযথা তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং ভবিষ্যতে দুর্গ-স্বামীর সহিত কোন প্রকার আলাপ পরিচয় রাখিবেন না বলিয়া, সঙ্কল্প করিলেন। এইরূপ ভাবে তাঁহারা শার্দ্দুলাবাস ত্যাগ করিয়া, সন্নিহিত গ্রাম মধ্যে গমন করিলেন এবং একখানি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ মুদিখানার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এই-রূপ সময়ে হঠাৎ বীরবলের একজন পুরাতন বন্ধু সেই স্থানে আসিয়া দেখা দিলেন। এই আগন্তুক শিবরাম। শিবরামের সহিত শেষ সাক্ষাৎ কালে বীরবল বিশেষ বিরক্ত হইয়া বিবাদ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠকের অবিদিত নাই। অধুনা শিবরাম সমাগত হইয়া, বিনা-বাক্যব্যয়ে একেবারে বীরবলকে আলিঙ্গন করিলেন। সরলমনাঃ বীরবল এত দূর আত্মীয়তা দেখিয়া, নিতান্ত বিগলিত হইলেন এবং পূর্ব্বাপর বিস্মৃত হইয়া, তিনিও শিবরামকে আলিঙ্গন করিলেন।

তখন শিবরাম বলিলেন,—“হবে ভাই বীরবল, তোমার সহিত যে এরূপে সাক্ষাৎ ঘটিবে তাহা একবারও মনে করি নাই।”

বীরবল বলিলেন,—“আমার সহিত সাক্ষাৎ হওয়া তো বিচিত্র নহে; তোমাকে যে এরূপ নিশ্চিন্ত ভাবে বেড়াইতে দেখিব, তাহা আমার মনে ছিল না।”

শিবরাম বলিল,—"বিলক্ষণ কথা! কাহার সাধ্য আমার অনিষ্ট করে? আমি নির্ভীক, নিরপরাধ, মিবারবাসী রাজপুত। আমার বিপদের সম্ভাবনা কোথায়?"

বীরবল বলিলেন,—"তুমি যে সকল বিঘ্ন-বিপত্তির হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছ, এ সংবাদ শুনিয়া সুখী হইলাম। তবে শিবরাম! অতঃপর আমরা পূর্ব্বের ন্যায় বন্ধুরূপে জীবনপাত করিব, কি বল?"

শিবরাম বলিলেন,—"তাহা আর বলিতে? পান সুপারি এবং খদির যেমন শেষ পর্য্যন্ত কেহ কাহাকেও ছাড়ে না, তোমার আমার বন্ধুত্ব সেইরূপ জানিবে। জীবন ও মরণে এ বন্ধুত্বের সম্বন্ধ।"

বীরবল জানিতেন, ধূর্ত্ত শিবরাম কখন অর্থাভাবে কষ্ট পাইবার লোক নহে। বলিলেন,—"ভাই, গোটা দুই টাকা দিতে পার? —এই লোকগুলাকে কিছু জল খাওয়াইতে হইবে।"

শিবরাম বলিল,—দুইটা কেন কুড়িটা দিতে পারি!"

বীরবল বলিলেন,—"তাই তো শিবরাম, তুমি যে অবাক্ করিয়া দিলে!"

শিবরাম, তৎক্ষণাৎ থলিয়া হইতে কুড়িটী টাকা বাহির করিয়া বীরবলের হস্তে, প্রদান করিল এবং বলিল,—"দেখিয়া লও,—বাজাইয়া লও- খাঁটি টাকা; ভাবিও না, শিবরাম জুয়াচোর।"

বীরবল টাকা হস্তে লইয়া সঙ্গিগণকে ডাকিলেন এবং সকলে মিলিয়া সেই মুদিখানায় মাদুর ও চেটাই বিছাইয়া বসিয়া গেলেন। সঙ্গিগণের মধ্যে কেহ কেহ তাড়ি খাইতে ভালবাসে, তাহারা তাহার ওদ্বির করিতে লাগিল। কেহ কেহ গাঁজার অনুরাগী. তাহারা তাহার চেষ্টা করিতে লাগিল। বীরবল, এই ইতর সংসর্গে মিশিয়া, দুর্গ-স্বামী ও তাঁহার পিতৃপুরুষগণের নিমিত্ত নরক ব্যবস্থা করিতে করিতে, ও শিবরামের তোষামোদ সূচক বাক্যাবলী শুনিতে শুনিতে, মহানন্দে সময়পাত করিতে লাগিলেন।

শার্দ্দূলাবাসে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাব। দুর্গ-স্বামী, সম্ভ্রান্ত অতিথি মহাশয়কে ও তাঁহার কন্যাকে সঙ্গে লইয়া, উপরিভাগস্থ সুবৃহৎ প্রকোষ্ঠ মধ্যে গমন করিলেন। আমরা পূর্ব্বে তাহার নিতান্ত বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখিয়াছি। অধুনা কানাইয়ের যত্নে, তাহার অবস্থা কতকটা উন্নত হইয়াছে। কানাই অবসর ক্রমে নিতান্ত অব্যবহার্য্য ও ভগ্ন সামগ্রী সমূহ সরাইয়া ফেলিয়াছে এবং যাহা যাহা ব্যবহার করা যাইতে পারে, সে সমস্ত সেই ঘরের মধ্যে ঝাড়িয়া ও যথাসাধ্য পরিষ্কার করিয়া, রাখিয়া দিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? ঘরের চারি দিকে যেরূপ ঝুল জমিয়া গিয়াছে এবং তাহার দেওয়ালগুলি যেরূপ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে সে ঘরে প্রবেশ করিতেই ভয় করে। যাহা হউক, এই ঘরে আগন্তুক ও তাঁহার তনয়াকে দুর্গ-স্বামী সমাদর সহকারে বসাইলেন। তাঁহারা উপবেশন করিলে, দুর্গস্বামী বিনীত ভাবে বলিলেন,—"যাঁহারা একণে আমার এই জীর্ণ ভবনে পদার্পণ করিয়া আমাকে অনুগৃহীত ও সম্মানিত করিলেন, তাঁহাদের পরিচয় জানিতে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি।"

যুবতী নিস্তব্ধ ও নির্ব্বাক্-ভাবে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার পিতা, এ প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, যেন কিয়ৎপরিমাণে ব্যাকুল ও অস্থির হইয়া পড়িলেন। তিনি একবার মাথার পাগড়ী

উঠাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, আবার তাহা ভাল করিয়া বসাইয়া দিলেন। একবার চক্ষু বুজিলেন, আবার তাহা মেলিলেন। একবার কথা কহিবার চেষ্টা করিলেন, আবার তখনই সে চেষ্টা ত্যাগ করিলেন।

দুর্গস্বামীর সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিল। তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"আমি বুঝিয়েছি, কিল্লাদার রঘুনাথ রায় মহাশয় এই শার্দ্দূলাবাসে আসিয়া, আত্ম-পরিচয় দিতে অভিলাষী নহেন।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"আপনি বুঝিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। বিগত মনোমালিন্য স্মরণ করিয়া সহসা আত্মপরিচয় দিতে সহজেই সঙ্কোচ জন্মিতে পারে, এ কথা বলাই বাহুল্য। আপনি এরূপ সঙ্কোচ বিদূরিত করিয়া ভালই করিয়াছেন।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"তবে কি—তবে কি অদ্যকার এই সাক্ষাৎ দৈব কারণে সংঘটিত বলিয়া মনে করিব না?"

কিল্লাদার কহিলেন,—"আর একটু পরিষ্কার ভাবে কথা কহিবার প্রয়োজন হইয়েছে। আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপ্যায়িত হইবার বাসনা বহুদিন হইতে আমার মনে বদ্ধমূল ছিল। কিন্তু অদ্য এই দৈবদুর্যোগ উপস্থিত না হইলে, আমার বাসনা চরিতার্থ করিবার সুযোগ কখন উদিত হইত কি না সন্দেহ। যাহা হউক, যে বীর আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে আমাকে ও আমার দুহিতাকে রক্ষা করিয়াছেন, দৈবানুগ্রহে অদ্য তাঁহার সমীপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার সুন্দর সুযোগ উপস্থিত হওয়ায়, আমি ও আমার তনয়া যার-পর-নাই আনন্দিত হইয়েছি।"

দুর্গ-স্বামী নীরবে সমস্ত কথা শ্রবণ করিলেন। আজি তাঁহার পিতৃশত্রু, তাঁহার এতাদৃশ অবনতি ও দুরবস্থার প্রধান কারণ, তাঁহার সমক্ষে—তাঁহার ভবনে উপস্থিত। অভ্যাগত ব্যক্তি সম্বন্ধে হৃদয়ের পরুষভাব বিসর্জ্জন দেওয়া নিতান্ত ভদ্রতা সম্মত হইলেও এবং বিজয়সিংহ যৎপরোনাস্তি যত্নে হৃদয়কে প্রশান্ত করিতে প্রয়াসী হইলেও, অধুনা তাঁহার হৃদয় এককালে সমস্ত পরুষতা পরিত্যাগ করিয়া প্রশান্ত ভাব অবলম্বনে সমর্থ হইল না। তিনি নিতান্ত বিচলিত ভাব-ব্যঞ্জক দৃষ্টি-সহকারে একবার কিল্লাদার ও আবার তাঁহার কন্যার প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। এমন সময় কিল্লাদার কন্যার সমীপাগত হইলেন এবং তাঁহার বদনের অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত করিয়া দিয়া বলিলেন,—"কল্যাণি! অবগুণ্ঠন খুলিয়া ফেল মা। আইস, আমরা মুক্তকণ্ঠে ও প্রকাশ্য-রূপে দুর্গ-স্বামীর সমীপে আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।"

ধীরে ধীরে, নিতান্ত কোমল কণ্ঠে, কল্যাণী বলিলেন,—"উনি কি অনুগ্রহ করিয়া তাহা গ্রহণ করিবেন?"

কোমল রমণী-কণ্ঠ-নিঃসৃত এই কথা, যে কল্যাণীকে দুর্গ-স্বামী একদিন আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই সরলার এই উক্তি, দুর্গ-স্বামীর হৃদয়ে আঘাত করিল; তাঁহার পরুষতা বিদূরিত হইল। তিনি অদ্যকার অসৌজন্য হেতু লজ্জিত হইয়া উঠিলেন এবং দুই একটী স্বপূর্ণ যুক্তি ও দুই একটা সামান্য কথা বলিয়া এই কথার প্রতিবাদ করিতে চেষ্টা করিলেন। এমন সময় সহসা তীক্ষ্ণ তাড়িতালোকে সমস্ত প্রকোষ্ঠ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সেই আলোক অন্তর্হিত হইতে না হইতে, দারুণ বড় বড় নাদে

বজ্রধ্বনি হইল। সেই বজ্রনির্ঘোষ এতাদৃশ ভয়ঙ্কর রূপে নিনাদিত হইল যে, তদ্ধেতু সমস্ত ভবন বিকম্পিত হইয়া উঠিল এবং ভবন-মধ্যস্থ তাবৎ ব্যক্তিরই মনে হইল, বুঝি বা এই সুবিস্তৃত সৌধ চূর্ণীকৃত হইয়া তাঁহাদিগকে এখনই সমাহিত করিয়া দিবে। ভবন পতিত হইল না বটে, কিন্তু তাহার স্থান বিশেষ হইতে কয়েক খণ্ড প্রস্তর স্খলিত হইয়া, দারুণ শব্দ সহকারে ভূতলে নিপতিত হইল। যেন দুর্গ-স্বামী বংশের আদি পুরুষ, অদ্য তাঁহার বংশধরের সহিত তাঁহার বংশাবলীর বদ্ধ বৈরীর পুনরালাপ দর্শনে, বজ্রনাদে স্বীয় অসন্তোষ ঘোষণা করিতেছেন।

কোমল-প্রাণা কল্যাণী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভয়চকিতা হইয়া উঠিলেন। দারুণ ভয়ে তিনি নিতান্ত অবসন্না হইলেন এবং মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। ব্যস্ততা সহকারে দুর্গ-স্বামী মূর্চ্ছিতা সুন্দরীর চেতনা সংবিধানের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আবার দুর্গ-স্বামীর সেই অবস্থা—তাঁহার সম্মুখে আবার সেই নির্ম্মল-স্বভাবা, মুকুলিত-নয়না, কল্যাণী শায়িতা এবং তিনি তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত। এ অবস্থায় স্বীয় ভবনাশ্রিত ব্যক্তিগণের প্রতি রাগ বা শত্রুতা সম্ভবে কি? দুর্গ-স্বামীর হৃদয়ে যে একটু মালিন্য ছিল, তাহা এই ঘটনায় তিরোহিত হইয়া গেল। কল্যাণীর বিপন্ন ও কাতর পিতাকে আর তাঁহার শত্রু বলিয়া মনে রহিল না। কল্যাণী ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হইলেন।

বাহ্য প্রকৃতির ভাব ও কল্যাণীর শরীরের ভাব কিছুই তৎকালে আশ্রয় স্থান ত্যাগ করার অনুকূল নহে। অগত্যা আরও কিঞ্চিদধিক কাল তাঁহাদের সেই স্থানে অপেক্ষা করা আবশ্যক হইয়া পড়িল। দুর্গ-স্বামীও ইহা বুঝিলেন। তিনিও তাঁহাদিগকে অদ্য তাঁহার ভবনে অবস্থান করিতে অনুরোধ করিলেন এবং স্বকীয় দরিদ্রতা ও হীন আয়োজনের বিষয় শিষ্টতা সহকারে তাঁহাদিগের গোচর করিলেন।

পাছে দরিদ্রতার প্রসঙ্গ পল্লবিত হইয়া ক্রমশঃ বিরুদ্ধ ভাবের উদ্ভব হয়, এই আশঙ্কা করিয়া কিল্লাদার ব্যস্ততা সহ বলিলেন,—"হীন আয়োজনের জন্য সঙ্কোচ করিবেন না। আপনি বিদেশ গমনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া আছেন, সুতরাং আপনার গৃহে কোনই আয়োজন থাকিবার সম্ভাবনা নাই, একথা আমরা সকলেই জানি। এক্ষণে আপনার ভবনে আশ্রয় না পাইলে, আমাদের ক্লেশের পরিসীমা থাকিবে না।"

দুর্গ-স্বামী কথার উত্তর দিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় কানাই সেই প্রকোষ্ঠে শুভাগমন করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

ভয়ঙ্কর বজ্রধ্বনি সকলকেই কিয়ৎপরিমাণে স্তম্ভিত করিল বটে, কিন্তু তাহা ভৃত্য-কুল-তিলক কানাইয়ের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব উত্তেজিত করিয়া দিল। কানাই বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া, সঙ্গে সঙ্গে করযোড়ে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—"ধন্য তোমার দয়া!" কিল্লাদারের যে এক জন অনুচর কানাইয়ের অজ্ঞাতসারে ভবন-মধ্যে ছিল, সে ব্যক্তি দ্বার সমীপস্থ ভৃত্যগণকে বিদায় করিয়া এক্ষণে রন্ধনশালার অভিমুখে অগ্রসর হইল। কানাই তাহাকে দেখিবামাত্র মনে বলিলেন,—"কি উৎপাত! এ বেটা

কেমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া গেল ?" তাহার পর তাড়াতাড়ি রন্ধনশালার দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া রামমণিকে বলিল,—"আরে দেখছিস্ কি ? ভেবে কি হবে ? খুব করে যতদূর পারিস্ চেঁচা—"

বলিতে বলিতে কানাই কতকগুলা বাসন ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী, বিজাতীয় শব্দ করিয়া, ঘরের মধ্যে ছড়াইয়া ফেলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মহা চীৎকার করিতে লাগিল। রামমণি মনে করিল, বুঝি বুড়া কানাই হঠাৎ পাগল হইয়া গেল। বলিল,—"আরে করিলে কি ? কি সর্ব্বনাশ ? একে ঘরে কিছুই নাই—যে একটু দুধ চিনি ছিল তাও ছড়াইয়া নষ্ট করিলে ? হায় হায় ! এখন উপায় কি হইবে ?"

কানাই মহা স্ফূর্ত্তির সহিত বলিল,—"চুপ, খবরদার, খাবার খুব যোগাড় হয়েছে। এক বজ্রাঘাতে বড় উপকার করিয়াছে—আমাদের সকল যোগাড় করিয়া দিয়াছে।"

রামমণি ভয় ও দুঃখ সহকারে কানাইয়ের প্রতি চাহিয়া বলিল,—"হায় হায় ! লোকটা একেবারে গেল গা ? এখন কোন রকমে শীঘ্র শীঘ্র ভাল হলে হয়।"

তখন কানাই ভাবিল, কি মজাই হয়েছে। বলিল,—"সাবধান, যেন ঐ লোকটা রান্নাঘরে না আসিতে পায়। যে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, তাহাকে শপথ করিয়া বলিবি যে, হায় হায় ! দুনিয়ার যত ভাল খাবার জিনিষ আছে, সবই তৈয়ার করিলাম, কিন্তু পোড়া বাজ কোথা হইতে আসিয়া আমাদের রান্নাঘরে পড়িল, আর সমস্ত জিনিষ পত্র একেবারে নষ্ট হইয়া গেল। লোকটা যেন জানিতে না পারে।"

রামমণিকে এইরূপ উপদেশ দিয়া কানাই উপরে চলিল। দুর্গ-স্বামী অতিথিগণ সহ যে প্রকোষ্ঠে ছিলেন তাহার নিকটস্থ হইয়া কানাই বুঝিল যে, সেই নবীনা সুন্দরীর মূর্চ্ছা হইয়াছে ও তাঁহার শুশ্রূষা চলিতেছে। তখন সেখানে যাওয়া ভাল নয় ভাবিয়া, কানাই বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর যখন আয়োজন ও অবস্থানের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইল, তখন কানাই সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া বলিল,—"হায় হায় ! দুর্গ-স্বামী বংশে কখন এমন দুর্ঘটনা ঘটে নাই। আমাকে কত দিন বাঁচিতে হইবে, না জানি কতই দেখিতে হইবে ?"

দুর্গ-স্বামী কিঞ্চিৎ ভীত ভাবে বলিলেন,—"কি কানাই, কি হইয়াছে ? দুর্গের কোন অংশ ভাঙ্গিয়াছে না কি ?"

কানাই বলিল,—"ভাঙ্গিয়াছে ! না না। বাজ—বাজ—বাজ সর্ব্বনাশ করিয়াছে। রান্নাঘরের মধ্যে বাজ পড়িয়া জিনিষ পত্র ছন্নছাড়া হইয়া গিয়াছে। যত খাবার আয়োজন ছিল সকলই নষ্ট করিয়া দিয়াছে। এখন কি দিয়া আপনাদের খাওয়াইব, ঘরে তাহার কোন যোগাড়ই দেখিতেছি না।"

দুর্গ-স্বামী বলিলেন,—"তোমার কথার শেষ ভাগ সম্পূর্ণ বিশ্বাস্য।"

কানাই দুর্গ-স্বামীর কথায় কিছু বিরক্ত হইল। বলিল,—"এখন আবার খাবার তৈয়ার করাও অসম্ভব নয় বটে, কিন্তু সে অনেক আয়োজন হইয়াছিল, এখন কেমন করিয়া তেমন আয়োজন হয়, তাই ভাবিতেছি।"

দুর্গ-স্বামী নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু বেশী কথা বলিলে, পাছে কানাই আরও অধিক পাগলামী করে এই আশঙ্কায় বলিলেন,—"কানাই ! আর প্রেমালাপ করিও না।"

এই সময়ে কিল্লাদারের সেই অনুচর তথায় আগমন করিয়া, স্বীয় প্রভুর সহিত অস্ফুট স্বরে কথা কহিতে লাগিল। কানাইও তাহার অনুকরণে দুর্গ-স্বামীর কর্ণের নিকট ক্ষীণ স্বরে কহিল,—"আপনার পায়ে পড়ি, আপনি একটু চুপ করিয়া থাকুন। এই মহামান্ত বংশের মান বজায় করিবার জন্য আমি আজি প্রাণপণ যত্নে মিথ্যা কথা বলিব, তাহাতে আপনার ক্ষতি কি?"

দুর্গ-স্বামী ভাবিলেন উঁহাকে বাধা দিতে চেষ্টা করা বৃথা, এজন্য তিনি চুপ করিয়া থাকাই সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন। তখন কানাই একে একে অঙ্গুলি গণিতে গণিতে ব্রহ্মাণ্ডের ভাল ভাল খাদ্য সামগ্রীর নাম করিতে লাগিল এবং সে সকলই বজ্রঘাত হেতু নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া, দুঃখ করিতে থাকিল।

কল্যাণী প্রকৃতিস্থ হইয়া, এই ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছিলেন। দুর্গ-স্বামীর নিতান্ত বিরক্তি-সূচক ভাব এবং স্থিরপ্রতিজ্ঞ কানাই, কেশ-হীন মস্তক আন্দোলন করিতে করিতে ও সুদূর-বিস্তৃত ক্ষীণ করাঙ্গুলি গণনা করিতে করিতে, যে রাজভোজের বর্ণনা করিতেছিল তাহার ভাব, এতদুভয়ের বৈষম্য নিতান্তই হাস্যজনক! কল্যাণী অনেক যত্নেও হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না। অবশেষে উচ্চ শব্দে হাসিয়া উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পিতাও সেই হাস্য-তরঙ্গে যোগ দিলেন এবং অবিলম্বে দুর্গস্বামী, আপনিই সে হাস্য তরঙ্গের বিষয় বুঝিয়াও, না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। হাসির ঘটা পড়িয়া গেল এবং হাস্য-ধ্বনিতে ঘর গরম হইয়া উঠিল। কানাই এই হাসির ঘটা দেখিয়া, রাগত ভাবে ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার সেই ভাব হাসির স্রোত আরও বাড়াইয়া দিল।

হাসির তেজ অপেক্ষাকৃত মন্দীভূত হইলে, কানাই রাগত স্বরে বলিল,—"আপনাদের ঘাড়ে ভূত চাপিয়াছে। যে মহাভোজ আজি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার কথা শুনিয়া হাসি আসা অসম্ভব। যদি আপনাদের ঘটে বিন্দু-মাত্র কাণ্ড-জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে একথা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলা আবশ্যক ছিল। কি আর বলিব।"

কল্যাণী, হাসির বেগ বেশ করিয়া থামাইয়া, বলিলেন,—"এই সকল খাদ্য সামগ্রী এমনই নষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, কুড়াইয়া তাহার একটু আধটুও সংগ্রহ করা যাইবে না কি?"

কানাই বলিল,—"সংগ্রহ? দেবি! সেই ছাই, কালি, কাদা, মাটীর মধ্য হইতে কি সংগ্রহ করিবেন? আপনি যদি দয়া করিয়া স্বয়ং একবার রান্নাঘরে নামিয়া আইসেন, তাহা হইলে সকলই দেখিতে পাইবেন, সকলই মাটী হইয়া গিয়াছে, আর রামমণি পার্শ্বে বসিয়া হাপুস নয়নে কাঁদিতেছে। সকলই মাটী—সকলই মাটী। অবশ্য কতক কতক সামগ্রী রামমণি এতক্ষণ কাটাইয়া ফেলিয়া দিয়াছে। সে দুঃখের চিহ্ন আর রাখিয়া কি ফল? আমাদের রূপা ও কাঁসার বাসন গুলি ঝন্ ঝন করিয়া পড়িয়া চুরমার হইয়া গেল। সে শব্দ নিশ্চয়ই ইনি শুনিয়াছেন।"

এই বলিয়া কানাই কিল্লাদারের ভৃত্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল। সে লোকটা দায়ে পড়িয়া সমর্থনসূচক ঘাড় নাড়িল।

কিল্লাদার মনে করিলেন, এরূপ প্রসঙ্গ আর অধিক দূর বিস্তৃত হইলে, দুর্গস্বামীর অপ্রীতিকর হইতে পারে। তিনি বলিলেন,

—"কানাই, তুমি আমার ভৃত্য লোকনাথকে সঙ্গে লইয়া যাও। এ ব্যক্তি অনেক দেশ পর্য্যটন করিয়াছে, সুতরাং অনেক দায়ে ঠেকিয়াছে। তোমরা উভয়ে যুক্তি করিয়া, এক্ষণে যাহা করা আবশ্যক তাহা স্থির কর গিয়া।"

উপাখ্যান-বর্ণিত হস্তী যেমন মরিতেও প্রস্তুত, তথাপি অপর হস্তীর সাহায্য গ্রহণে নিতান্ত অনিচ্ছুক, সেইরূপ কানাইও অপর ভৃত্যের সাহায্য লইয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিল,—"অন্যে কি জানিবে? আমার প্রভু জানেন, প্রভুর বংশের মানাপমান সংক্রান্ত কার্য্যে কানাইয়ের কখন কোন মন্ত্রণাদাতার দরকার হয় না।"

দুর্গা-স্বামী বলিলেন,—"কানাই! তুমি সে লুপ্ত-সম্ভ্রম পুনঃ স্থাপিত করিতে বিশেষ চেষ্টিত, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। কিন্তু কেবল কথায় তো কাজ চলে না। খাদ্য দ্রব্যের যোগাড় করা চাই। তোমার যাহা ছিল না, অথবা সংগ্রহ হইবার সম্ভাবনাও নাই, তাহার গল্প করিয়া কি ফল হইবে? এখন লোকনাথকে সঙ্গে লইয়া যাও, উভয়ের মন্ত্রণায় কার্য্যোদ্ধার হইতে পারিবে।"

কানাই বলিল,—"আপনার এমন ভাব হইল কেন? আমি এখনই পিপ্‌লি গ্রামে যাইলে চাল্লিশ জনের খাদ্য আনিতে পারি। তাহার জন্ত ভাবনা কি?"

দুর্গ-স্বামী বলিলেন,—"যাহা হয় কর। হুইজনে যাও। এই লও আমার মুদ্রাধার। ইহার সাহায্যে কাজ হইবে।"

কানাই বলিল,—"মুদ্রাধার! আপনি কি পাগল? আপনার এলাকা,—আপনার জায়। এখান হইতে জিনিষ আনিয়া দাম দিতে হয়, ইহা আজি নূতন শুনিলাম।" কানাই মহা বিরক্তির সহিত প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করিল। লোকনাথও তাহার অনুসরণ করিল।

কিল্লাদার লোকনাথকে বাজার হইতে খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া আনিবার নিমিত্ত উপদেশ দিয়াছিলেন, সে সেই উদ্দেশে প্রস্থান করিল। কানাইও কোন নূতন মতলব খাটাইয়া খাদ্য সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে পিপ্‌লি গ্রামাভিমুখে গমন করিল। রামমণি ইত্যবসরে গৃহে যে কিছু সামান্য খাদ্য সামগ্রী ছিল, তাহা দ্বারা অতিথিগণের কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্তি সাধন করাইল। বেলা অপরাহ্ন হইয়া আসিল।

রামমণি, কল্যাণীর সহচরীরূপে, অবস্থান করিবে স্থির হইল। তাঁহার নিমিত্ত একটী স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট হইল। যে ঘরে বীরবল রাত্রিযাপন করিতেন, সেই ঘরে কিল্লাদার রাত্রিযাপন করিবেন ব্যবস্থা হইল। দুর্গস্বামী বসিয়া দাঁড়াইয়া রাত্রিপাত করিবেন স্থির করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

এদিকের অবস্থা এইরূপ রাখিয়া, এখন কানাই কি করিতেছে, তাহার সন্ধান লওয়া যাউক। পিপ্‌লি গ্রামের দিকে যাইয়া চেষ্টা করাই সঙ্গত বলিয়া কানাই মনে করিল। কানাইয়ের মনের অবস্থা বড় ভাল নহে। সে তাহার প্রভুকে জানায় নাই যে, বীরবলকে সে কেমন অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে, এটা একটা ভাবনার কথা বটে। তাহার পর ভাবনা, সে জাঁক করিয়া দুর্গ-

স্বামীর মুদ্রাধার গ্রহণ করে নাই, অথচ খাদ্য সংগ্রহ না করিলে চলিবে না, তাহারই বা উপায় কি? আবার ভাবনা পিপ্‌লি গ্রামে বীরবল আছে। যদি দৈবাৎ তাহার সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে সে বিলক্ষণ প্রতিশোধ না দিয়া ছাড়িবে না। অনেক ভাবনার কথা বটে।

এত চিন্তা সত্ত্বেও বীরবর কানাইয়ালাল, প্রভুর বংশ-মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য এবং দরিদ্রতা প্রচ্ছন্ন রাখিবার অভিপ্রায়ে, পিপ্‌লি গ্রামাভিমুখে যাত্রা করিল।

গ্রামবাসিগণ পূর্ব্বকালে দুর্গস্বামী-বংশের অধীন ছিল, সুতরাং তাহারা সে সময়ে দুর্গস্বামীর সমস্ত ক্লেশ ও অসুবিধা আপনাদের ক্লেশ ও অসুবিধা বলিয়াই মনে করিত। দুর্গস্বামিগণ বিষয়হীন হওয়ার পরও তাহারা পূর্ব্ব সম্বন্ধ স্মরণ করিয়া, তাঁহাকে নানা সময়ে সাহায্য করিত। কিন্তু কানাইয়ের প্রার্থনা বড়ই ঘন ঘন। সে অপ্রতুল মিটাইয়া উঠা গ্রামবাসিগণ আপনাদের সাধ্যাতীত বলিয়া মনে করিল। কাজেই ক্রমে ক্রমে তাহারা সকল প্রকার সাহায্য বন্ধ করিয়া দিল। কানাই ক্রমে মহা ভয় দেখাইয়া এবং ইহ কালে ও পরকালে দুর্গতির কথা বলিয়া তাহাদের নিকট জিনিষ পত্র ও অর্থ দাওয়া করিত, কিন্তু তাহারা 'ভাইত, ভাইত' বলিয়া সারিয়া লইত, কোন কাজের উত্তর দিত না। এই রূপ ব্যাপারের বাড়াবাড়ি হইয়া ক্রমে বিবাদে দাঁড়াইল। কানাই গ্রামবাসিগণের সহিত ভয়ানক বিবাদ বাধাইল এবং সেই অবধি পিপ্‌লি গ্রামে যাওয়া আসা বন্ধ করিয়া দিল। কিন্তু আজি কানাইয়ের বিশেষ প্রয়োজন আজি যেমন করিয়া হউক, খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ না করিলেই নহে। কানাইকে অগত্যা আজি আবার সেই গ্রামে যাইতে হইল। গ্রামবাসিগণ যে সাহায্য করিবে না এবং তাহারা যে তাহাকে শেষবারে অপমান করিয়া বিদায় করিয়াছে, একথা কানাই একবারও ভুলে নাই। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? আজি কানাই নিরুপায়। কানাইয়ের সঙ্গে লোকনাথ। কানাই ভাবিল, 'এ পাপটাকে এখনই বিদায় না করিলে নহে। আমি অনেক জাঁক করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু যদি গ্রামবাসিগণ আমাকে আবার অপমানিত করে, তাহা এ লোকটা স্বচক্ষে দেখিতে পাইবে, তখন আমার মুখ কোথায় থাকিবে? এ জেঞ্জালটাকে বিদায় করিয়া দেওয়া চাই।' এই ভাবিয়া কানাই বলিল,—"ভাই, আমার সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মারা যাইবে নাকি? আমি এখন কত জায়গায় যাইব, খাতকদের কাহারও কাছে থেকে খাজনা, কাহারও কাছ থেকে দধি দুগ্ধ, কাহারও কাছ থেকে ঘি ময়দা সংগ্রহ করিব। তুমি আমার সঙ্গে কত ঘুরিবে। তুমি একটা দোকানে এখন বিশ্রাম কর, ইচ্ছামত জিনিষ পত্র লইয়া খাও দাও মজা কর। আমি যাইবার সময় তোমাকে ডাকিয়া লইয়া যাইব। পয়সা কড়ির ভাবনা ভাবিতে হইবে না। আমি ফিরিয়া আসিয়া, দোকান দায়ের সমস্ত পাওনা শোধ করিয়া দিব।"

লোকনাথ প্রকৃত ব্যাপার জানিত। দুর্গ-স্বামীর বর্ত্তমান অবস্থা তাহার অবিদিত ছিল না। সুতরাং সে বাক্যব্যয় না করিয়া, কানাইয়ের নিকট হইতে বিদায় হইয়া, একটা দোকানের দিকে চলিয়া গেল।"

মনোরথ-সিদ্ধির নিমিত্ত কোন্ ব্যক্তিকে আক্রমণ করা আবশ্যক, কানাই এখন তাহা ভাবিয়া আকুল। গ্রামবাসী সকলেই বিরক্ত,

সকলেই তাহাকে সাহায্য করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। কোথায়ও সফল-মনোরথ হইবার সম্ভাবনা নাই; তবে ধরা যায় কাহাকে, করা যায় কি? একে একে কানাই কত লোকের নামই ভাবিল, কিন্তু সে সকল স্থানে কিছুই হইবে না বুঝিয়া, ক্রমশঃ অধিকতর হতাশ হইতে লাগিল।

অবশেষে কানাই হতাশ হইয়া পথ-পার্শ্বস্থ এক কুম্ভকার-ভবনে প্রবেশ করিল। কানাইয়ের সৌভাগ্য ক্রমে কুম্ভকার তখন বাটী ছিল না। তাহার স্ত্রী ও তাহার মাতা বাটী ছিল। কানাই যাহা স্বপ্নেও আশা করে নাই, সেখানে সেই দৃশ্য দেখিতে পাইল। দেখিল, কুম্ভকার পত্নী প্রকাণ্ড একতাল ময়দা মাখিতেছে ও আর একতাল মাখিয়া রাখিয়াছে। আর দেখিল, ঘরে নানা প্রকার মিষ্টান্ন সজ্জিত রহিয়াছে। পুরুষ-সমাজ কানাইয়ের উপর নিতান্ত বিরক্ত হইলেও, স্ত্রী-সমাজ কানাইয়ের উপর কতকটা রাজি ছিল। কানাইকে দেখিবামাত্র কুম্ভকার-মহিলাদ্বয় তাহাকে পরম সমাদর করিল। কানাই বলিল,—"তোমাদের বাটীতে এত আয়োজন দেখিতেছি—ব্যাপারটা কি?"

কুম্ভকারের মাতা ও তাহার পুত্রবধূ কানাইকে বাল্যকাল হইতেই বিলক্ষণ জানে। প্রবীণা বলিল,—"আজি আমার নাতির অন্ন-প্রাশন। তুমি আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে। তুমি আজি না খাইয়া যাইতে পাইবে না।"

কানাই বলিল,—"সে কথা বলিও না। খাওয়ার নামে আমার গায়ে জ্বর আসিতেছে। আজ সমস্ত দিন নানা সামগ্রী খাইয়া খাইয়া মারা যাইবার মত হইয়া পড়িয়াছি।"

উভয় রমণী সোৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন? ব্যাপারটা কি?"

কানাই বলিল,—"তোমরা কোনই খবর রাখ না দেখিতেছি। শার্দ্দূলাবাসে আজি কিল্লাদার ও তাঁহার কন্যা অতিথি! যে রকম কাণ্ড দেখিতেছি, তাহাতে হয় ত ঐ কন্যার সহিত দুর্গস্বামীর বিবাহ ঘটিবে। কিল্লাদার মহাশয় দরবার হইতে হুকুম আনিয়াছেন যে, পিপলি ও আর ২০ খানি গ্রামের উপর দুর্গস্বামীর সকল প্রকার ক্ষমতা থাকিবে। আজি তোমার ছেলে বাটী ফিরিলে বলিও যে, যাহারা তখন দুর্গস্বামীকে কর দিতে স্বীকার করে নাই, এই কানাই এখন তাহাদের জীবন-মরণের কর্ত্তা হইয়া পড়িতেছে।"

স্ত্রীলোকদ্বয় সভয়ে বলিল,—"আমরা চিরকাল দুর্গস্বামীর নিতান্ত অনুগত।"

কানাই বলিল,—"আমি কি তাহা জানি না? জানি বলিয়াই তোমাদের কাছে এই সংবাদ দিবার জন্য আমি স্বয়ং আসিয়াছি। তোমাদের যাহাতে ভাল হয় আমি তাহার যত্ন করিব।"

প্রবীণা বলিল,—"তুমি যে কিছু খাইবে না, তাহা হইবে না। অভাবে কিছু জল না খাইলে আমরা তোমাকে ছাড়িব না।"

কানাই বলিল,—"আমার বিশেষ দরকার আছে; একটুও দেরি করিবার উপায় নাই। যদি তোমরা নিতান্তই না ছাড়, তবে কি জল-খাবার দিবে দেও, আমি তাহা লইয়া যাই, রাত্রে আহার করিব।

কুম্ভকার-পত্নী প্রায় দেড় সের আন্দাজ মিঠাই আনিয়া দিল। কানাই তাহা বস্ত্র সহকারে কাপড়ে বাঁধিয়া লইল। তাহার পর কানাইকে তাহারা পুনরায় বলিল যে, তাহারা চিরকাল দুর্গস্বামীর অনুগত আছে ও থাকিবে। তাঁহাদের প্রতি যেন তাঁহার করুণা থাকে। কানাই তাহাদিগকে সম্পূর্ণ ভরসা দিল।

এমন সময়ে অপর প্রকোষ্ঠ হইতে নিদ্রিত খোঁকা বিকট শব্দ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। শাশুড়ী ও বউ উভয়ে সেই দিকে ছুটিয়া গেল। কানাই এই অবকাশে সেই মাখা ময়দা তালটা আপনার কাপড়ে জড়াইয়া লইল এবং কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া বা কাহারও জন্য অপেক্ষা না করিয়া, সে স্থান হইতে পলায়ন করিল। পথে কানাই কাহারও জন্য একটুকও অপেক্ষা করিল না। কেবল একবার একটা লোকের দ্বারা বীরবলের নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দিল যে, অদ্য রাত্রে শার্দ্দুলাবাসে তাঁহার শয়নের স্থান হইবে না। লোকটা যেরূপ ভাবে এ সংবাদ দিল, তাহাতে বীরবল, বিশেষতঃ তাঁহার বন্ধু শিবরাম, নিতান্ত রাগিয়া উঠিলেন এবং কানাইয়ের সর্ব্বনাশ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। কানাই কিয়দ্দুর অগ্রসর হইলে, লোকনাথ আর দুই জন ভৃত্য সঙ্গে লইয়া, কানাইয়ের সহিত আসিয়া মিলিত হইল। লোকনাথ, পিপ্‌লির বাজারে যেরূপ খাদ্য পাওয়া যাইতে পারে, তাহা সংগ্রহ করিয়াছে।

কানাই প্রস্থান করার অব্যবহিত পরে, কুম্ভকার-বধূ ও জননী সেই স্থানে আসিয়া দেখিল, ময়দার তালটা নাই। এ কার্য্য যে কানাই করিয়াছে তাহা তাহারা বুঝিতে পারিল এবং কুম্ভকার আসিয়া না জানি কতই তিরস্কার করিবে ভাবিয়া, তাহারা নিতান্ত ভীত হইল। অবিলম্বে কুম্ভকার, আর দুই এক জন বন্ধুর সঙ্গে, গৃহাগত হইল, এবং স্ত্রী ও মাতার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া, নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইল ও তাহাদের যৎপরোনাস্তি ভৎ‌সনা করিতে লাগিল। রমণীদ্বয় বুঝাইতে লাগিল যে,—"দুর্গস্বামীর এই প্রকার সৌভাগ্যোদয় হইয়াছে এবং কানাই অতঃপর আর যে সে লোক নহে। কানাই যত্ন করিয়া আমাদের বাটী হইতে কোন খাদ্য সামগ্রী লইয়া গিয়াছে, তাহা আমাদের ভাগ্য বলিয়া মনে করা উচিত।"

এ সকল কথা শুনিয়া কুম্ভকার আরও বিরক্তি প্রকাশ করিল এবং বলিল,—"কোথাকার দুর্গ-স্বামী, কে সে কানাই? আমি আমার জিনিষ পত্র শার্দ্দুলাবাস হইতে ফিরাইয়া আনিব তবে ছাড়িব!" তাহার পর একজন সঙ্গীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"মধু, যাও, শীঘ্র পায়ে দৌড়িয়া যাও। পথে কানাইকে দেখিতে পাও ভালই—না পাও শার্দ্দুলাবাস পর্য্যন্ত যাইবে। আমাদের জিনিষ ফিরাইয়া আনা চাই।"

স্ত্রীলোকদ্বয় বড়ই ভীতা হইল। কিন্তু কুম্ভকার যেরূপ বিরক্ত হইয়াছে, তাহাতে সাহস করিয়া আর কোন কথা বলিতে পারিল না। কুম্ভকার, মধুকে সঙ্গে লইয়া, রন্ধনশালার মধ্যে প্রবেশ করিল। তথায় মধুর সহিত বিশেষ কি কথাবার্ত্তা কহিল। মধু প্রস্থান করিল।

যখন কানাই ও লোকনাথ শার্দ্দুলাবাসের নিকটস্থ হইয়াছে, তখন কানাই শুনিতে পাইল, কে তাহাকে পশ্চাৎ হইতে ডাকিতেছে। কিন্তু যাহার তাহার ডাকে কানাই কি উত্তর দেয়? তাহাতে মন থাকিবে কেন? কানাই উত্তর দিল বটে, কিন্তু সম্বোধনকারীর মূর্ত্তি যখন চক্ষুগোচর হইল, তখন কানাই আর অগ্রসর না হইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। আগন্তুক নিকটস্থ হইয়া বলিল,—"আমি লক্ষ্মণ কুম্ভকারের লোক। শার্দ্দুলাবাসে দরকারে লাগিতে পারে মনে করিয়া, তিনি আমার দ্বারা এক হাঁড়ি বরফ ও এক হাঁড়ি দধি পাঠাইয়া দিয়াছেন। অনুগ্রহ করিয়া ব্যবহারে লাগাইবেন।"

কানাইয়ের হৃদয়ে আহ্লাদের সীমা নাই। কিন্তু কানাই সে ভাব প্রচ্ছন্ন করিয়া, গম্ভীর ভাবে বলিল,—"লক্ষ্মণ কুম্ভকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছে। কিন্তু তুমি এ সকল সামগ্রী আমাকে দিলে কি হইবে, শার্দ্দূলাবাসে পৌঁছাইয়া না দিলে সকলই বৃথা।"

মধু উত্তর করিল,—"আমিই শার্দ্দূলাবাসে সমস্ত দ্রব্য পৌঁছাইয়া দিয়া আসিতেছি।"

কানাই বলিল,—"তোমার ছোকরা বয়স—আমি বুড়া মানুষ; আমার হাতে একটা সামগ্রী রহিয়াছে, এটাও তুমি লইলে ভাল হয়।"

মধু তাহাও স্বীকার করিল। কানাই ময়দা তালটা তাহার উপর চাপাইয়া দিল। কেবল মিঠাই নিজ হস্তে রহিল। সকলে যথাসময়ে শার্দ্দূলাবাসে উপস্থিত হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সে রাত্রে শার্দ্দূলাবাসে, কানাইয়ের যত্নে ভোজনের ব্যাপারটা সমারোহ সহকারে সম্পাদিত হইয়া গেল। কানাইয়ের আহ্লাদের ও গর্ব্বের সীমা নাই। আহার সমাপ্তির পর, অন্যান্য সকলে প্রস্থান করিলে, কিল্লাদার বলিলেন,—"দুর্গ-স্বামিন্! আপনাকে কয়েকটী কথা বলিতে বাসনা আছে। আপনার এখন শুনিবার সময় আছে কি?"

বিজয়সিংহ সংক্ষেপে বলিলেন,—"বলিতে পারেন।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"আপনি যুবক হইলেও, জ্ঞানবান্ সন্দেহ নাই। ইহা আপনার অবিদিত নাই যে, ক্রোধ পরিহার করাই ভদ্রের প্রধান কর্ত্তব্য।"

দুর্গ-স্বামী বলিলেন,—"আমার হৃদয়ে এক্ষণে কোনই ক্রোধ নাই।"

কিল্লাদার কহিলেন,—"এক্ষণে না থাকিতে পারে, কিন্তু আপনার পিতৃদেবের সময় হইতে আমার প্রতি আপনার যে বিরুদ্ধভাব বদ্ধমূল হইয়া আছে, তাহার বৈধতা বিচার করা কি কর্ত্তব্য নহে?"

দুর্গ-স্বামী বলিলেন,—"আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, এ প্রসঙ্গ এক্ষণে পরিত্যাগ করুন।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"এতৎপ্রসঙ্গের সমধিক আলোচনা প্রীতিজনক নহে, তাহা আমি জানি। কিন্তু আমি আমি হৃদয়ের বাসনা ব্যক্ত করিতে কৃত-সংকল্প হইয়াছি। আমি এই মনোমালিন্য হেতু অন্তরে অনেক তীব্র জ্বালা ভোগ করিয়াছি। ইহার মীমাংসা করিবার নিমিত্ত, আমি আপনার পিতার সহিত অনেকবার সাক্ষাতের বাসনা করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার দুরদৃষ্ট ক্রমে তাহা সংঘটিত হয় নাই।"

দুর্গ-স্বামী বলিলেন,—"আমি পিতার নিকট শুনিয়াছি, আপনি তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অভিলাষী ছিলেন।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"অভিলাষী ছিলাম—হাঁ অভিলাষী ছিলাম বটে। কিন্তু তাঁহার নিকট আমার সাক্ষাতের প্রার্থনা—তাঁহার অনুগ্রহ ভিক্ষা করা উচিত ছিল। স্বার্থপর মানবগণ তাঁহার সমক্ষে আমার চরিত্রের যে চিত্র উপস্থিত করিয়াছিল, সেই চিত্র ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া, তাঁহাকে আমার প্রকৃত মূর্ত্তি দেখিতে দেওয়া আবশ্যক ছিল এবং, তাঁহার চিত্তের শান্তি সংস্থাপনার্থ,

আমার ন্যায়-সঙ্গত অধিকারেরও ভূরি-ভাগ পরিত্যাগ করা আবশ্যক ছিল। অদ্য সৌভাগ্য ক্রমে আমি যে পরিমাণ কাল আপনার সংসর্গে অতিবাহিত করিতে পাইলাম, যদি এই পরিমাণ সময় আমি আপনার পিতৃদেবের সহিত একত্র অবস্থান করিতে পাইতাম তাহা হইলে, সম্ভবতঃ মিবার অদ্যাপি সেই সভ্রান্ত সুপ্রাচীন বংশসম্ভূত বীরকে বক্ষে ধারণ করিয়া গৌরবান্বিত থাকিত এবং, আমাকেও সেই মাননীয় ও প্রশংসিত চরিত্র সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে, শত্রুরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে হইত না।"

কিল্লাদার বস্ত্র দ্বারা নয়নাবৃত করিলেন; দুর্গস্বামীর হৃদয়ও বিগলিত হইয়া উঠিল। এতৎ সম্বন্ধীয় অন্যান্য বাক্য শুনিবার নিমিত্ত তিনি নীরবে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

কিল্লাদার বলিতে লাগিলেন,—"আমাদের মধ্যে নানা বিষয় ঘটিত বিসংবাদ ঘটিয়াছিল। রাজ-বিচার দ্বারা ঐ সকল বিষয়ের যথাযথ মীমাংসা করিয়া লওয়া, আমার অভিপ্রায় ছিল; কিন্তু কার্য্যকালে মীমাংসিত অধিকার, ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করিয়া, ব্যবহার করিতে আমার কখনই বাসনা ছিল না।"

আবার দুর্গস্বামী বলিলেন,—"মহাশয়, এ প্রসঙ্গ এক্ষণে ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। রাজ-বিচারে আপনি যে সকল অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা অবশ্যই আপনি ভোগ করিতে থাকিবেন। আমার পিতা বা আমি কখনই অনুগ্রহ স্বরূপে কিছুই গ্রহণ করিতে স্বীকৃত নহি।"

"অনুগ্রহ? না—না—দুর্গস্বামী আপনার বুঝিবার ভুল হইয়াছে। সঙ্গত ও অসঙ্গত অধিকার এবং অনুগ্রহ এতদুভয়ের অনেক প্রভেদ। এখনও আপনার সহিত মীমাংসা করিবার অনেক কথা আছে। আমি প্রাচীন, আপনি নবীন। আপনি আমার ও আমার তনয়ার প্রাণদাতা। আমি অদ্য আপনার ভবনে শান্তি-ভিক্ষায় আসিয়াছি। যেরূপে হউক, শান্তি-সংস্থাপন আমার হৃদয়ের বাসনা। আপনি কি আমার উদ্দেশ্য নিন্দনীয় বলিয়া মনে করিতেছেন? আপনি কি আমার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন না?"

বৃদ্ধ কাতর-ভাবে দুর্গস্বামীর হস্ত ধারণ করিলেন। দুর্গস্বামীর স্থির সঙ্কল্প বিনষ্ট হইয়া গেল। তিনি বৃদ্ধের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাহার পর বিশ্রামের নিমিত্ত, উভয়ে পরস্পরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ধীরে ধীরে, উৎকণ্ঠিত ভাবে পদ-সঞ্চার করিয়া, দুর্গস্বামী নির্দ্দিষ্ট বিশ্রাম স্থানে আগমন করিলেন। তাঁহার চিত্তের অবস্থা ভয়ানক— তাঁহার বদ্ধবৈরী আজি তাঁহার ভবনে। তিনি কি করিবেন, এ অবস্থায় কিরূপ ব্যবহার সঙ্গত, বহুচিন্তা করিয়াও তিনি তাহার কোন মীমাংসা করিতে না পারিয়া, নিতান্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি উন্মত্তের ন্যায়, প্রকোষ্ঠ মধ্যে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন ও আপনাকে আপনি বারংবার তিরস্কার করিতে লাগিলেন। ক্রমে অল্পে অল্পে এই প্রমত্ত ভাব বিদূরিত হইলে, তিনি আলোচনা করিতে লাগিলেন,— "এ ব্যক্তিকে কিসে নিন্দা করিব? রাজ বিচারে যাহা তাহার প্রাপ্য হইয়াছে, তাহাই সে অধিকার করিয়াছে। আমরা সকলেই অবশ্যই রাজকীয় শাসনের অধীন। এ ব্যক্তি সে জন্য অপরাধী হয় কেন? এ ব্যক্তির সম্বন্ধে আমার যে সংস্কার ছিল, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। আর এ ব্যক্তির কন্যা—না—না সে প্রসঙ্গ আর আলোচনা করিব না স্থির করিয়াছি—আবার কেন?"

দুর্গস্বামী নিদ্রাভিভূত হইলেন এবং যতক্ষণ উষার সৌরকররাশি সেই প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত উৎপাদন না করিল, ততক্ষণ নিরন্তর স্বপ্ন-রূপে কল্যাণীর স্বর্ণ কান্তি, তাঁহার নিদ্রিত-নয়ন ভেদ করিয়া, দেখা দিতে লাগিল।

কিল্লাদার রঘুনাথ রায় শয়ন করিয়া নানা বিষয়িণী চিন্তায় ভাসমান হইলেন। তিনি জানিতেন যে, অচিরে মহারাণার দরবারে বিজয়সিংহ বিশেষ প্রতিপন্ন হইবেন সন্দেহ নাই। বিজয়সিংহের হিতকামনায় রামরাজা গুপ্তভাবে নিযুক্ত আছেন এবং তাঁহার চেষ্টা যে নিষ্ফল হইবার নহে, তাহা কিল্লাদারের অবিদিত ছিল না। অতি সম্রান্ত বংশীয়, বলবিক্রমশালী, অধুনা পতিত ও বিপন্ন, বিজয় সিংহের সহায়তাকল্পে আরও অনেক ক্ষমতা-শালী লোক প্রচ্ছন্নভাবে নিযুক্ত আছেন, তাহাও তিনি সন্ধান পাইয়াছিলেন। এমন অবস্থায় দুর্গস্বামীর বিরুদ্ধে তাঁহার চেষ্টা যে নিষ্ফল হইবে তাহা স্থির। তবে অগ্রেই সাবধান হওয়া—শত্রুভাব অন্তরিত করিয়া রাখা শ্রেয়ঃ বলিয়া এই সুকৌশলী রাজনীতিজ্ঞ বৃদ্ধ মীমাংসা করিলেন; এবং কি উপায়ে তাহা সাধিত হইতে পারে তাহা অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অদ্য অনুকূল দেবতা সে সুযোগ ঘটাইয়া দিলেন।

তাঁহার মনে এতদ্ভিন্ন আরও স্বার্থ-সিদ্ধির বাসনা ছিল না এমত নহে। কল্যাণীর সহিত দুর্গস্বামীর বিবাহ ঘটাইতে পারিলে অনেক লাভ। যদিই দুর্গস্বামী অচিরে পদপ্রতিষ্ঠাবান্ হইয়া উঠেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার পৈতৃক বিষয়ের ভূরি-ভাগ পুনর্বার দুর্গস্বামীর হস্তগত হইবে। সেই বিষয়টা পরে ভোগ করা অপেক্ষা, নিজের কন্যা তাহার অধিকারিণী হয় সে ত ভালই। দুর্গস্বামি-বংশও অতিগৌরবান্বিত বংশ। ইত্যাদি নানা প্রকার বাসনা, ধর্ম্মা-বরণে আবৃত করিয়া, অদ্য কিল্লাদার চিরন্তন শত্রু-সমীপে শান্তি সংস্থাপনার্থ সমাগত।

যখন তাঁহারা ভবনমধ্যে প্রবেশ করিলে, কানাই ভৃত্যবর্গকে তাড়িত করিবার নিমিত্ত সজোরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল, সেই ধ্বনি কিল্লাদারের কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল। তাঁহার তখন শাস্ত্র বুড়ির কথা মনে পড়িল। বুঝি আজি শত্রুকে স্বীয় ভবনে পাইয়া, দুর্গস্বামী তাহার প্রাণ সংহার করিবেন বলিয়া আশঙ্কা হইল। কিন্তু ক্রমশঃ যতই অধিক কথাবার্তা হইতে লাগিল, ততই দুর্গস্বামীর ভাব দেখিয়া সে আশঙ্কা তিরোহিত হইয়া গেল।

সকল চিন্তার উপর আর এক চিন্তা,—কিল্লাদারণী না জানি কি মত করিবেন। অদ্য কিল্লাদার যাহা যাহা করিয়াছেন, এ সম্বন্ধে তিনি তাঁহার পত্নীর সহিত পরামর্শ করেন নাই। না জানি এ সকল কথা শুনিয়া তাঁহার কি মত দাঁড়ায়, ইহাও একটা ভাবনার কথা বটে। এই সকল চিন্তা করিতে করিতে কিল্লাদার নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, দুর্গ-স্বামী প্রবীণ অতিথির সহিত সাক্ষাৎ আশয়ে গমন করিলেন। অন্যান্য কথার পর, কিল্লাদার পূর্ব্ব রাত্রের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া আপনার দোষ ক্ষালনার্থ যত্ন করিতে লাগিলেন।

দুর্গ-স্বামী বলিলেন,—"আমাকে ক্ষমা করিবেন। ওকথা এখানে কাজ নাই। যে স্থানে আমার পিতা ভগ্ন ও হতাশ হৃদয় হইয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, আমি তাঁহার পুত্র হইয়া, সেই স্থানে দাঁড়াইয়া, তাঁহার দুঃখের কারণানুসন্ধান করিতে পারি না। পুত্রের কর্ত্তব্য-পালনে হয় ত আমার অধিক অনুরাগ হইতে পারে এবং হয় ত অতিথির প্রতি কর্ত্তব্য আমার মনে স্থান না পাইতে পারে। অন্য স্থানে অন্য লোকজনের সমক্ষে, আমরা এ বিষয়ের আলোচনায় রত হইব; সেরূপ স্থানে আমরা উভয়ে স্বাধীন ভাবে মনের কথা ব্যক্ত করিতে সক্ষম হইব।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"উত্তম কথা। তথাপি আমি একটী কথা না বলিয়া ক্ষান্ত হইতে পারি না। জানিবেন আপনাদের যে সকল ভূমি আমার অধিকারভুক্ত হইয়াছে, তাহা প্রচলিত ব্যবস্থার অনুসারে রাজ-বিচারে হস্তান্তরিত হইয়াছে। অতএব সে জন্য কাহাকেও দোষী করা সঙ্গত নহে।"

দুর্গ-স্বামী কিঞ্চিৎ উদ্ধতভাবে বলিলেন,—"হইতে পারে আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য। আমি জানি আমার পূর্ব্বপুরুষগণ সমরক্ষেত্রে মহারাণার জন্য শোণিতপাত করিয়া পুরস্কার স্বরূপে ভূ সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাহার পর সেই সম্পত্তি কোন্ নিয়মানুসারে হস্তান্তরিত হইল তাহা আমার বুদ্ধির অগম্য। তাঁহারা কাহারও নিকট তাহা বিক্রয় ক[illegible] নাই, কোন স্থানে তাঁহারা সম্পত্তি আবদ্ধ রাখেন নাই, তাঁহাদের ঋণের দায়ে সম্পত্তি বিক্রীত হয় [illegible]ই এবং ভ্রমেও তাঁহারা কখন মহারাণার [illegible] নাই, সুতরাং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবারও কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না। এরূপ স্থলে কেমন করিয়া বলিব যে, ন্যায় বিচারে তাঁহাদের সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইয়াছে? কিন্তু আপনার সরল ব্যবহারে আমি বুঝিতেছি যে, আপনার সম্বন্ধে লোক-মুখে সংবাদ শুনিয়া আমার যে সংস্কার জন্মিয়াছিল তাহা ভ্রমাত্মক। আপনি ব্যবহারজ্ঞ এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি; আপনার যখন বিশ্বাস এ ব্যাপারের মধ্যে কোন অবৈধ কার্য্য ঘটে নাই, তখন আমারই হয় ত বুঝিবার ভুল হইয়াছে।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"প্রিয় সুহৃৎ দুর্গ-স্বামিন্! আপনার সম্বন্ধেও লোকে আমার সমক্ষে যেরূপ বর্ণনা করিয়াছে, এখন আমি দেখিতেছি, আপনার স্বভাব-চরিত্র তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এখন আমরা বুঝিতেছি যে, আমরা পরস্পর পরস্পরের সম্বন্ধে নিতান্ত ভ্রমাত্মক সংস্কারের বশবর্ত্তী ছিলাম। তবে, হে নবীন দুর্গস্বামিন্! কেন আপনি এই প্রবীণ ব্যবহারবিদের বাক্যে কর্ণপাত করিবেন না?"

দুর্গ-স্বামী বলিলেন,—"না তাহা হইবে না। মহারাণার দরবারে—যেখানে রাজ্যের সম্ভ্রান্ত সামন্তবর্গ উপস্থিত থাকিবেন, সেই স্থানে আমাদের এতদ্বিষয়ক কথাবার্ত্তা হইবে। যদি সেই স্থানে সমবেত সামন্তবর্গ বিচার করেন যে, আমার মহা সম্ভ্রান্ত পিতৃপুরুষগণ স্বদেশের হিতার্থে শরীরের শোণিত ব্যয় করিয়া যে সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, এক্ষণে সে কার্য্য সমাধা হইয়া গিয়াছে, সুতরাং সে সম্পত্তি আর তাঁহাদের থাকিবে না, তাহা হইলে কিল্লাদার মহাশয়, আমি তখন অবনত মস্তকে সেই বিচার গ্রহণ করিব। আমার কিসের ভয়? আমার

বীরের হৃদয় আছে, সুতীক্ষ্ণ তরবারি আছে এবং দুর্ভেদ্য বর্ম্ম আছে। যতদিন এই সকল থাকিবে, ততদিন যেখানে যখন রণবাদ্য বাদিত হইবে, আমি তখন সেই স্থানে উপস্থিত থাকিয়া, আমার জীবিকার্জ্জন করিব।"

কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দুর্গ-স্বামী চক্ষু ফিরাইলেন। দেখিলেন, কল্যাণী অদূরে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিতেছেন। তাঁর নেত্র ও বদনের ভাব দেখিয়া, তাঁহার হৃদয়ে যে তৎকালে উৎসাহপূর্ণ অনুরাগ ও প্রশংসার ভাব প্রবল হইয়াছিল তাহা সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধ হইতে লাগিল। উভয়ের নয়নে নয়নে মিলন হইল, উভয়েই যেন কিছু লজ্জিত হইলেন—তাঁহাদের হৃদয়ে যেন বিশেষ কোন গভীর ভাবের আবির্ভাব হইল।

এই সময়ে কানাই নিকটস্থ হইয়া নিবেদন করিল,—বাহিরে একজন লোক দাঁড়াইয়া আছে। সে আপনার সহিত কথা কহিতে চাহে।"

দুর্গ-স্বামী বলিলেন,—"আমার সহিত কথা কহিতে চাহে?"

কানাই বলিল,—"হাঁ, আপনার সহিত কথা কহিতে চাহে। কিন্তু কথা কহিবার আগে আপনি একবার জানালা দিয়া লোকটা কে তাহা দেখিয়া লউন। যে সে আসিবে, আর আমাদের এই মহামান্য দুর্গে প্রবেশ করিবে, ইহা আমি ভাল মনে করি না।"

দুর্গ-স্বামী বলিলেন,—তুমি কি ভাবিয়াছ, সে আমাকে দেনার দায়ে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছে?"

কানাই বলিল,—"দেনার জন্য? আপনাকে? আপনার এই দুর্গে? গ্রেপ্তার? কি ভয়ানক! নিশ্চয় আজ আপনি এ বুড়া চাকরের স , তামাসা করিতেছেন!"

দুর্গ-স্বামী আগত ব্যক্তির সহিত কথা কহিবার উদ্দেশে অগ্রসর হইলেন। কানাই সঙ্গে সঙ্গে যাইতে যাইতে অস্ফুটস্বরে বলিল,—"লোকটা যেই হউক, আমি একবার তাহাকে ভাল করিয়া না দেখিয়া আপনার সহিত কথা কহিতে দিব না।"

দুর্গ-স্বামী দেখিলেন, লোকটা আর কেহ নহে—বীরবলের সঙ্গী শিবরাম। তিনি দরজা খুলিয়া দিতে আদেশ করিলেন। শিবরাম প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলে দুর্গ-স্বামী বলিলেন,—"শিবরাম! বোধ হয় তোমার সংবাদ এই স্থানেই তুমি ব্যক্ত করিতে পারিবে। দুর্গে এক্ষণে সম্ভ্রান্ত অতিথিগণ আছেন। তোমার সহিত সাক্ষাৎ যেরূপ অপ্রীতিপদ ভাবে অসমান হয়, তাহাতে তোমাকে ঐ অতিথিগণের সঙ্গী হইতে বলা অবিধি। অতএব তোমার যাহা বক্তব্য তাহা এই স্থানেই ব্যক্ত কর।"

শিবরাম নিতান্ত দুর্ম্মুখ ও নির্লজ্জ মূর্খ হইলেও এ ক্ষেত্রে দুর্গস্বামীর অচিন্তিতপূর্ব্ব হীন অভ্যর্থনায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। বলিল,—"আমি এক্ষণে একজন বন্ধুর দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত; অন্যথা দুর্গ-স্বামীর গৃহাগত হইয়া আমি তাঁহাকে ত্যক্ত করিতাম না"

দুর্গ-স্বামী বলিলেন,—"তোমার সংবাদ কি, তাহা সংক্ষেপে ব্যক্ত কর। কোন্ ভাগ্যবান ব্যক্তি তোমাকে দূত নিযুক্ত করিয়াছেন?"

শিবরাম গর্ব্বিত ভাবে উত্তর করিল,—"আমার বন্ধু রাওল বীরবল। তিনি আপনাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়াছেন। আপনি রাজপুতোচিত ব্যবহার করিবেন, ইহাই প্রার্থনা। তাঁহাকে আপনি প্রকারান্তরে অপমানিত করিয়াছেন, তিনি যুদ্ধে তাহার

প্রতিশোধ লইতে বাসনা করেন। যে দিন আপনার সুবিধা, সেই দিন উভয়ে সমাস্ত্র লইয়া, যুদ্ধ করেন, ইহাই তাঁহার অনুরোধ। আমি সেই যুদ্ধকালে মধ্যস্থতা করিব।"

দুর্গ-স্বামী অবাক্ হইলেন,—"তিনি তাঁহার বিগত অতিথিকে কোন কারণে বিরক্ত করিয়াছেন বলিয়া মনে পড়িল না; এজন্য বলিলেন,—"প্রতিশোধ- যুদ্ধ—শিবরাম! তোমার কল্পনায় যতদূর সম্ভব মিথ্যা কথা যোগায়, হয় তুমি তাহাই সাজাইয়া বলিতেছ; আর না হয়, অদ্য প্রাতে অধিক পরিমাণে গাঁজায় দম্ দিয়াছ। বীরবল এরূপ সংবাদ আমার নিকট কেন পাঠাইবেন?"

শিবরাম বলিল,—"তাহা যদি জিজ্ঞাসা করিলেন তবে আমাকে বলিতে হইতেছে যে, আমার বন্ধুকে আপনি নিতান্ত অকারণে গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। আপনার সেই অসৌজন্য বর্ত্তমান সংবাদের কারণ।"

দুর্গ-স্বামী বলিলেন,—"বীরবল পাগল নহেন; যাহা না করিলে নহে, তাহাও যে তিনি অপমানজনক বলিয়া মনে করিয়া লইবেন একথা আমার বিশ্বাস হয় না। আর তোমার সম্বন্ধে আমার যে মত তাহা বীরবলের অবিদিত নাই। তোমাকে আমি অতি সামান্য ও অযোগ্য লোক বলিয়া জ্ঞান করি, ইহা জানিয়াও তিনি যে তোমাকে আমার নিকট এই সংবাদ আনিতে ভার দিয়াছেন এবং তোমাকে মধ্যস্থ রাখিয়া কোন ভদ্রলোকই কোন কার্য্য করিতে সম্মত হইতে পারে না, ইহা জানিয়াও তিনি যে তোমাকে মধ্যস্থ স্থির করিয়াছেন, ইহা আমার আদৌ বিশ্বাস হয় না।"

শিবরাম স্বীয় অসিতে হাত দিয়া বলিল,—"আমি সামান্য ও অযোগ্য লোক! কি বলিব আমি বন্ধুর কার্য্যে নিযুক্ত এবং সেই কার্য্যের মীমাংসা করিতে বাধ্য। নতুবা বুঝাইতাম—"

দুর্গ-স্বামী বাধা দিয়া বলিলেন,—"কিছুই বুঝাইয়া কাজ নাই। এক্ষণে তুমি এস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া আমাকে বাধিত কর।"

শিবরাম বলিল,—"আমার সংবাদের উত্তর কি?"

দুর্গ-স্বামী বলিলেন,—"রাওল বীরবলকে বলিও যে, তিনি যদি তাঁহার নিকট হইতে আমার নিকট দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আসিতে পারে এরূপ কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে ভবিষ্যতে পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রার্থনায় আমি কর্ণপাত করিতে পারি।"

শিবরাম বলিল,—"আমার বন্ধুর জিনিষ পত্র আপনার এখানে পড়িয়া আছে। তাহা আমাকে দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিউন।"

দুর্গ-স্বামী বলিলেন,—"বীরবলের যে যে সামগ্রী আমার এখানে পড়িয়া আছে তাহা আমার লোক তাঁহার হস্তে দিয়া আসিবে। তোমার নিকট এমন কোন নিদর্শন নাই, যাহাতে ঐ সকল দ্রব্য বিশ্বাস করিয়া তোমার হস্তে সমর্পণ করিতে পারি।"

তখন নিতান্ত অপমানিত ও ভগ্ন-মনোরথ শিবরাম বলিল,—"দুর্গস্বামিন্! আজি আপনি আমার প্রতি নিতান্ত অসদ্ব্যবহার করিয়াছেন। আপনার এ দুর্গই বটে। এইরূপ দুর্গে দস্যুগণ নিঃসহায় পথিক ধরিয়া আনিয়া তাহার সর্ব্বস্ব লুট পাট করিয়া লয়।"

তখন দুর্গ স্বামী হস্তস্থিত যষ্টি উত্তোলন করিয়া বলিলেন,—"তবে রে হতভাগা! যদি আর একটিও কথা না কহিয়া এখনি চলিয়া না যাও, তাহা হইলে লাঠাইয়া তোমার প্রাণ বাহির করিয়া দিব।"

দুর্গস্বামী যষ্টি উত্তোলন করায়, শিবরামের

অশ্ব নিতান্ত ভীত হইয়া দৌড়িতে লাগিল। অতি কষ্টে শিবরাম পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেল। তাহার পর আর কোন কথা না কহিয়া, অশ্বে কষাঘাত করিয়া প্রস্থান করিল।

দুর্গ-স্বামী ফিরিয়াই দেখিতে পাইলেন, কিল্লাদার সুদূরে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

তিনি বলিলেন,—"ঐ লোকটাকে আমি যেন দেখিয়াছি মনে হইতেছে। কি উঁহার নাম ?"

দুর্গ। "উঁহার নাম শিবরাম।"

কিল্লাদার। "আমি উদয়পুরে উঁহাকে দেখিয়াছি। সেখানকার কাছারিতে উঁহার অনেক দুর্দ্দশা দেখিয়াছি।"

দুর্গ-স্বামী আগ্রহ সহকারে বলিলেন,—"কেন ?"

কিল্লাদার হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"সে অনেক কথা। যদিও তাহা কিছুই নহে, তথাপি তাহা আপনি ব্যতীত আর কাহারও সমক্ষে ব্যক্ত করা বিধেয় নহে; আসুন বলিতেছি।"

এই বলিয়া কিল্লাদার দুর্গ-স্বামীর হস্ত ধারণ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং একটী নির্জ্জন বাতায়ন-মুখে দাঁড়াইয়া গল্প করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

কিল্লাদার এইরূপ ভাবে গল্প আরম্ভ করিলেন, যেন সে কার্য্যে তাঁহার কোন অনুরাগ বা আসক্তি নাই। কিন্তু তাঁহার কথায় দুর্গ-স্বামীর মুখের কিরূপ ভাবান্তর জন্মিতেছে তাহা তিনি বিশেষ সাবধানতা সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। শিবরামের বিষয়ে গল্প শেষ করিয়া, সেই সূত্রানুসরণে কিল্লাদার বলিতে লাগিলেন, "প্রিয় সুহৃৎদুর্গ স্বামিন্! এইরূপ সন্দেহের সুযোগাবলম্বন করিয়া সময়ে সময়ে প্রবঞ্চনা-পরায়ণ দুষ্ট লোকেরা নিতান্ত জ্ঞানী ও সাধু লোককেও বিপজ্জালে জড়ীভূত করিতেছে। যদি আমি সেইরূপ কথায় কর্ণপাত করিতাম, অথবা আপনি আমাকে যেরূপ কুচক্রী রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন, যদি আমি বস্তুতই সেইরূপ হইতাম, তাহা হইলে আপনি কখন এমন স্বাধীনতা উপভোগ করিতে পাইতেন না এবং আমার বিরুদ্ধে আপনার স্বত্ব ঘটিত বিরোধ করিবারও সুযোগ থাকিত না; তাহা হইলে এতদিন হয় আপনাকে উদয়পুরের অবরোধে অথবা আর কোন রাজকারাগারে অবরুদ্ধ থাকিতে হইত; নচেৎ আপনাকে বিদেশে পলায়ন করিয়া কোন প্রকারে সেই কঠিন শাস্তির হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইত।"

দুর্গ-স্বামী বলিলেন,—"কিল্লাদার মহাশয় এরূপ প্রসঙ্গ অবলম্বনে পরিহাস করা বিধেয় নহে; অথচ আপনি প্রকৃত কথা বলিতেছেন, তাহাও তো সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। কিরূপে আমি সন্দেহের বিষয়ীভূত হইয়া ছিলাম তাহা আমার বুদ্ধির অগম্য।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"সন্দেহ? হাঁ দুর্গ-স্বামী, বিষম সন্দেহ। বোধ হয়, আমি তাহার প্রমাণও আপনাকে দেখাইতে পারি। দেখি কাগজ পত্র আমার সঙ্গে আছে কিনা। যদি তাহা দুর্গে না ফেলিয়া আসিয়া থাকি, তাহা হইলে সঙ্গে থাকাই সম্ভব। ভাল দেখাই যাউক। লোকনাথ! এ দিকে।"

লোকনাথ আসিলে কিল্লাদার তাহাকে বাক্স আনিতে আদেশ করিলেন। লোকনাথ বাক্স লইয়া ফিরিয়া আসিল। কিল্লাদার বাক্স খুলিয়া কয়েকখানি কাগজ বাহির করিয়া তাহা দুর্গ-স্বামীকে পাঠ করিতে দিলেন। পিতৃশ্রাদ্ধ কালে দুর্গ-স্বামী যে সকল উদ্ধত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত সুরঞ্জিত হইয়া মহারাণার দরবারে উপস্থিত হয়। তথায় বিজয়সিংহের উপর কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা হইবার উপক্রম হইয়াছিল; কেবল কিল্লাদার রঘুনাথ রায়ের অপরিমেয় যত্নে, বিশেষ আগ্রহে, এবং নিতান্ত অনুরোধে তাহা কার্য্যতঃ পরিণত হইতে পায় নাই। এই কাগজে তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে। কাগজগুলি দুর্গ-স্বামীর হস্তে দিয়া, কিল্লাদার সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন, এবং আপনার কন্যার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। সেখানে কানাই আসিয়া উপস্থিত হইলে, তিনি তাহার সহিত হাস্য পরিহাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার সরল ব্যবহার দেখিয়া, যে কানাই তাঁহাকে দুর্গ-স্বামীর প্রবল শত্রু বলিয়া জানিত, সেও কিয়ৎ পরিমাণে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া পড়িল।

দুর্গ-স্বামী, একবার কাগজগুলি পাঠের পর, কিয়ৎকাল কপোলে করবিন্যাস করিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। তাহার পর ভাবিলেন, হয়ত এ সকল কোন অভিনব কৌশল-জাল। এজন্য বিশেষ মনঃসংযোগ করিয়া তৎসমস্ত আমূল আর একবার পাঠ করিলেন। দ্বিতীয় বার পাঠ সমাপ্তির পর, তিনি ব্যস্ততা সহ যে স্থানে কিল্লাদার ছিলেন, তথায় গমন করিলেন এবং নিতান্ত কাতর ও দীনভাবে তাঁহার অসীম অনুগ্রহ হেতু স্বীয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যে সময় তিনি মহারাণা সমীপে বিবিধ কঠিন অপরাধে অভিযুক্ত, যে সময়ে কিল্লাদার তাঁহার চরিত্র সমর্থনার্থ প্রাণপণ যত্ন ও তাঁহাকে বিবিধ উপায়ে বিপন্মুক্ত করিতেছেন, সেই সময়ে সেই অকৃত্রিম সুহৃৎ কিল্লাদারকে তিনি বদ্ধবৈরী বলিয়া মনে করিতেছেন ও তাঁহার সহিত নিতান্ত বিগর্হিত ব্যবহার করিতেছেন বলিয়া, যারপর নাই লজ্জা প্রকাশ ও বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

এই কোমল দৃশ্য দেখিতে দেখিতে কল্যাণীর চক্ষে অশ্রু আবির্ভূত হইল। যে দুর্গ-স্বামীকে তিনি নিতান্ত উদ্ধত বলিয়া জানিতেন এবং যিনি তাঁহার পিতার দ্বারা অত্যাচারিত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার বোধ ছিল, সেই দুর্গ-স্বামী অদ্য তাঁহার পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থী। এ দৃশ্য তাঁহার পক্ষে বিস্ময়জনক, নূতন এবং হৃদয়-দ্রবকারী।

কিল্লাদার বলিলেন,—"কল্যাণি অশ্রু সম্বরণ কর মা। অদ্য প্রকাশ হইল যে, কূটব্যবহারজীবী হইলেও, তোমার পিতা সরল ও উচ্চমনাঃ ব্যক্তি; তাহাতে কাঁদ কেন মা?" তাহার পর দুর্গ-স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"কেন আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন? আমি আপনার কি করিয়াছি? আমার যদি আপনার ন্যায় অবস্থা ঘটিত, তাহা হইলে আপনিও অবশ্যই আমার প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিতেন। আরও দেখুন, আপনি আমার এই প্রাণাধিক তনয়ার জীবন রক্ষা করিয়া আমাকে কি শতগুণে অধিক ঋণী করেন নাই?"

দুর্গ-স্বামী বলিলেন—"আমি যাহা করিয়াছি, তাহা সেরূপ সময়ে কেহই না করিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু মহাশয় আমাকে

আপনার দারুণ শত্রু জানিয়াও যে রক্ষা করিয়াছেন, তাহা বস্তুতই নিতান্ত সদাশয়তা, জ্ঞানবত্তা ও উচ্চহৃদয়তার পরিচায়ক।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"আমরা উভয়েই স্ব স্ব প্রণালীতে পরস্পরের উপকার করিয়াছি মাত্র আপনি বীর—বীরোচিত কার্য্যে আমার উপকার করিয়াছেন।"

দুর্গ-স্বামী বলিলেন,—"আপনি আমার মহাশয় বন্ধু।"

অদ্য দুর্গ-স্বামী কিল্লাদারকে হৃদয় হইতে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিলেন। অদ্য তাঁহার মনোমালিন্য এককালে তিরোহিত হইয়া গেল। প্রেম ও কৃতজ্ঞতা তাঁহাকে অদ্য বিগলিত করিয়া দিল। কন্যার কোমলতা ও লাবণ্য এবং পিতার সংস্বভাব ও উচ্চাশয়তা তাঁহাকে তাঁহার পিতার অন্ত্যেষ্টিকালকৃত প্রতিজ্ঞা ভুলাইয়া দিল। কিন্তু তিনি ভুলিলে কি হয়; সে প্রতিজ্ঞা জ্বলন্ত অক্ষরে অদৃষ্টের বিশাল পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

তাহার পর দুর্গ-স্বামী, কল্যাণীর সমীপে স্বীয় বিসদৃশ ব্যবহারের নিমিত্ত কতই হৃদয়-নিঃসৃত বাক্যে, ত্রুটি স্বীকার করিতে লাগিলেন। কল্যাণীর নেত্র দিয়া নিরন্তর আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল, তাঁহার অধরোষ্ঠ ভেদ করিয়া সুবিমল হাস্য-জ্যোতিঃ বিভাসিত হইতে লাগিল এবং এই চিরন্তন শত্রুতার তিরোধান হেতু, তিনি অপার আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিল্লাদার, এই যুগলের এতাদৃশ প্রেমময় ভাব দেখিয়া মনে মনে নিরতিশয় আনন্দ উপভোগ করিতে থাকিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন এই বীর, সাহসী, অতি উচ্চ-বংশজাত, সদাশয় যুবকের সহিত কল্যাণীর বিবাহ ঘটিলে কি সুখেরই সম্বন্ধ হয়! অত্যুন্নত পদ-প্রতিষ্ঠাশালী হইবার নানা সুযোগ দুর্গ-স্বামীর সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছে। এমন সৎপাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ পরম প্রার্থনীয়। তখনই আবার কিল্লাদারণীর মতামতের কথা মনে উপস্থিত হইল,—কিল্লাদার কিঞ্চিৎ হতাশ হইলেন,—তাঁহার চিন্তা-গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। এই যুগলের প্রেম-পরিণাম আলোচনা করিয়া বোধ হয়, কিল্লাদার যদি সময় থাকিতে যুবক যুবতীর হৃদয়ে প্রেমের প্রশ্রয় না দিতেন, তাহা হইলে তাঁহার পরিণামদর্শিতা হেতু তিনি প্রশংসিত হইতেন। বর্ত্তমান বিষয়ের পরিণাম আলোচনায় কিল্লাদারের প্রবৃত্তি হয় নাই, অথবা তিনি তাহা দেখিয়াও দেখেন নাই।

তাহার পর কিল্লাদার বলিলেন,—"আমাকে অপেক্ষাকৃত ভদ্রলোক জানিতে পারিয়া, বিস্ময়ের প্রাবল্যে, আপনি আপনার কৌতূহলের প্রধান বিষয় শিবরামের প্রসঙ্গ ভুলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে স্বীয় বৃত্তান্তের সহিত মহাশয়ের নামও লিপ্ত করিয়াছিল।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"হতভাগ্য—দুরাত্মা! তাহার সহিত আমার একবার ক্ষণস্থায়ী পরিচয় ঘটিয়াছিল মাত্র। যাহাই হউক, এতাদৃশ জঘন্য লোকের সহিত পরিচয় নিতান্ত অবৈধ। আমার সম্বন্ধে সে কি বলিয়াছিল?"

"যাহা বলিয়াছিল তাহাতে আপনাকে রাজবিরোধী বলিয়া সহজেই মনে হইতে পারে। কেহ কেহ শিবরামের কথা শুনিয়া আপনি মিবারের অধিকার বিস্তৃত করাইবার বিরোধী বলিয়া মনে করিয়াছিল। সেরূপ বিশ্বাসের পরিণাম কি তাহা আপনার অবিদিত নাই। কেবল দুই ব্যক্তি এরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হয় নাই এবং তাহাদের মতই দরবারে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। সে দুই জনের এক জন আপনার আজন্ম বন্ধু

রামরাজা, আর এক জন আপনার নিতান্ত অনুরক্ত, অথচ পরম শত্রুরূপে পরিগণিত ব্যক্তি।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"আমি বন্ধুর ব্যবহারে অনুগৃহীত হইলাম, আর শত্রুর ব্যবহারে আমি অধিকতর বাধিত হইলাম।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"রাওল বীরবল—এ ব্যক্তি আজি অসম্ভাবিত উপায়ে আমার ও আমার কন্যার নিকট, পরিচিত হইয়াছে। আমরা যখন অনাথনাথের মন্দির-মধ্যে ছিলাম, সেই সময়ে আমার আদেশ ক্রমে একজন সঙ্গী বাহরের দ্বার অর্গল-বদ্ধ করিয়াছিল। তাহার পর আমরা যখন বাহিরে আসিব, তখন আর সে অর্গল কোন মতেই খোলা যায় না। বহুদিন তাহা ব্যবহৃত হয় নাই, সুতরাং কোন স্থানে বিষম আটকাইয়া ছিল। আমরা যখন সেইরূপ বিব্রত, তখন বাহির হইতে শব্দ হইল, 'আপনারা দ্বারের নিকট হইতে সরিয়া যাউন, আমি অর্গল খুলিয়া দিতেছি।' এই বলিয়া সে ব্যক্তি সজোরে দ্বারে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে লাগিল; অবশেষে অর্গল ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার পর আমরা পরিচয়ে জানিলাম যে, তিনি রাওল বীরবল। এবং তাঁহারই মুখে শুনিলাম যে মহাশয়ও দেব-মন্দিরে গিয়াছিলেন কিন্তু একটু পূর্ব্বে চলিয়া আসিয়াছেন। আমি তাহার পর আপনার অনুসরণ করিলাম। সে যাহা হউক, এই বীরবল মারা যাইবে দেখিতেছি। শিবরাম যখন ইহার বন্ধু তখন ইহার ভদ্রস্থতা নাই।"

দুর্গ-স্বামী বলিলেন,—"বীরবল বালক নহেন, তাঁহার এরূপ সংসর্গ ত্যাগ করাই আবশ্যক।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"এই শিবরাম বীরবলের বিরুদ্ধেও এরূপ ভয়ানক কথা বলিয়াছিল যে, আমরা শিবরামকে মিথ্যাবাদী বলিয়া হাসিয়া না উড়াইয়া দিলে, তাঁহারও সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারিত।"

দুর্গাস্বামী বলিলেন,—"শিবরাম যাহাই বলুক, আমার বিশ্বাস যে, বীরবল লজ্জাজনক হীন কার্য্যে অশক্ত।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"অবিলম্বে মৃত্যু তাঁহার নিমিত্ত অতুল সম্পত্তির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবে। বীরবলের দিদিমার বিষয় প্রচুর এবং তাহা আমার ভূসম্পত্তির পার্শ্ববর্ত্তী।

দুর্গ-স্বামী বলিলেন,—"ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যদি বীরবলের বন্ধু-পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তাহা হইলে বড়ই সুখের হইবে।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"এক্ষণে চলুন,—গমনের আয়োজন করিতে হইবে।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

কিল্লাদার ও কল্যাণীর অনুরোধ ক্রমে দুর্গস্বামী তাঁহাদের সহিত কমলা পর্য্যন্ত গমন করিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে কানাইয়ের সহিত একবার পরামর্শ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। তিনি তদভিপ্রায়ে কানাইয়ের ভগ্নপ্রায়, কৃষ্ণকায় প্রকোষ্ঠে সমাগত হইলেন। অতিথিগণ অদ্য প্রস্থান করিবেন জানিয়া কানাই মহানন্দে মগ্ন। যে খাদ্য সামগ্রী এ দিক ও দিক হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহাতে তাহাদের সপ্তাহ কাল সংসার চলিবে, ইহা কানাই স্থির করিয়াছে

এবং তখনও সেই হিসাব করিতেছে। এক একবার কানাই বলিতেছে,—"ভগবানের ইচ্ছায় আমার প্রভু পেটুক পঞ্চানন নহেন।"

দুর্গস্বামী হঠাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হওয়ায়, কানাইয়ের আনন্দস্রোত থামিয়া গেল। দুর্গস্বামী কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিতভাবে কানাইকে জানাইলেন যে, তাঁহাকে কিল্লাদারের সহিত কমলা দুর্গ পর্য্যন্ত গমন করিতে হইবে।

এ কথা শুনিয়া কানাই কম্পিত স্বরে ও নিতান্ত ভীত ভাবে বলিয়া উঠিল,—"না না—ঈশ্বর যেন আপনার এরূপ মতি না করেন।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"কেন কানাই? ইহাতে ক্ষতি কি?"

কানাই বলিল,—"আমি আপনার দাস। আমার কোন কথা বলা ভাল দেখায় না। কিন্তু আমি প্রাচীন দাস। বিজয়সিংহ, দুর্গস্বামী—আপনি বালক। আমি আপনার প্রপিতামহ মহাশয়কে দেখিয়াছি, আপনার পিতামহ ও পিতার দাসত্ব করিয়াছি এবং আপনাকে হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছি।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"তাহা আমি জানি। কিন্তু তাহার সহিত বর্ত্তমান ঘটনার কি সম্বন্ধ আছে?"

কানাই বলিল,—"বিজয়সিংহ, প্রভো! আছে—সম্বন্ধ আছে! ঐ ব্যক্তির সহিত যতই ঘনিষ্ঠতা করুন, অথবা উঁহার কন্যাকে আপনি বিবাহই করুন, উঁহার বাটীতে যাওয়া আপনার—এ দুর্গস্বামীবংশীয়ের শোভা পায় না।"

দুর্গস্বামীর মনে এ কথার যাথার্থ্য উপলব্ধ হইলেও, তিনি হাসিয়া বলিলেন,—"তুমি তো আমার অপেক্ষা অধিক দূর বলিতেছ। যাহার বাটীতে গমন আমার নিতান্ত অবিধেয় বলিয়া তুমি মনে করিতেছ, তাহার কন্যাকে বিবাহ করায় তোমার আপত্তি নাই! কিন্তু তোমাকে এত কাতর দেখিতেছি কেন?"

কানাই বলিল,—"কি বলিব? কি বলিব? দুর্গস্বামিন্! আপনি শুনিয়া হয়ত হাসিবেন। কিন্তু জয়পাল চারণের কথা মিথ্যা হইবার নহে। তিনি এ বংশের যে কথা বলিয়া গিয়াছেন, আজি যদি আপনি কমলায় যান, তাহা হইলে তাহাই ঘটিবে। হায়, হায়! আমাকে বাঁচিয়া থাকিয়া তাহা দেখিতে হইল।"

দুর্গস্বামী,—"তিনি কি বলিয়াছেন?"

কানাই বলিল,—তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা এ পৃথিবীতে আর কেহ জানে না। এই হতভাগাই সেই কথা জানে। হায়, হায়! এত দিন পরে আজি তাহা ঘটিতে আসিল; আমার কপাল!"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"বাজে কথা ছাড়িয়া দিয়া চারণের কথা বল কানাই।"

ভগ্ন-স্বরে নিতান্ত কম্পিত ও ভয়চকিত ভাবে কানাই বলিল,—

"শেষ কমলেশ যবে কমলায় যাবে,
মৃত কুমারীর তরে প্রণয় যাচিবে।
মরুময় সরোবরে পরাণ হারাবে,
তার নাম ধরাধামে আর না রহিবে॥"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"মরুময় সরোবর আমি জানি বটে। মরুভূমির মধ্যে খানিকটা চোরা বালি থাকে, তাহাকে লোকে মরু-সরোবর বলে। কিন্তু কোন জ্ঞানবান্ ব্যক্তি ইচ্ছা পূর্ব্বক সে স্থানে যাইতে পারে না। অতএব তোমার কথা যে মিথ্যা তাহার আর ভুল নাই।"

কানাই বলিল,—"সে কথা বলিবেন না। ভবিষ্যদ্বাণীর বিরুদ্ধে কথা কহিয়া কাজ নাই। আপনার সঙ্গে গিয়া কাজ নাই। যাহারা আসিয়াছে তাহারা চলিয়া যাউক আমরা তাঁহা-

দের জন্য অনেক করিয়াছি, আর কিছু করিয়া কাজ নাই।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"তোমার সদিচ্ছার জন্য আমি তোমাকে প্রশংসা করিতেছি। কিন্তু তোমার আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক। আমি মৃতা বা জীবিতা কোন কুমারীর প্রণয় যজ্ঞা করিতে যাইতেছি না; মরু-সরোবরেও আমার কোন দরকার নাই। সুতরাং চারণের উক্তির সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই।"

এই বলিয়া দুর্গস্বামী কানাইয়ের নিকট হইতে বিদায় হইলেন এবং প্রাঙ্গণে আসিয়া গমনোন্মুখ কিল্লাদারের সহিত মিলিত হইলেন। সকলে অশ্বারোহণ করিলেন; কল্যাণী শিবিকায় আরোহণ করিলেন। বিদায় সময়ে কানাই আসিয়া উপস্থিত হইল। কিল্লাদার ও কল্যাণী নিতান্ত আত্মীয়ভাবে কানাইয়ের হস্তে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুরস্কার প্রদান করিলেন। কল্যাণীর কোমল ভাব দেখিয়া কানাই কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহার প্রতি ভক্তিমান্ হইয়া উঠিল।

তত্রত্য দুর্গম ও বন্ধুর পথ নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত করিবার অভিপ্রায়ে, দুর্গস্বামী কল্যাণীর শিবিকার পার্শ্বে পার্শ্বে চলিলেন। এমন সময় কানাই চীৎকার করিয়া দুর্গস্বামীকে ফিরিয়া আসিবার নিমিত্ত আহ্বান করিতে লাগিল। অগত্যা দুর্গস্বামীকে ফিরিয়া আসিতে হইল। কানাই দুর্গস্বামীর অশ্ব বল্গা ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে দুর্গস্বামীর হস্তে পদার্থ বিশেষ প্রদান করিল এবং বলিল,—"বলিতে পারি নাই—লোক সমক্ষে সুযোগ হয় নাই। তিনটী টাকা দিলাম, লইয়া যাউন। এখনই আমি উহা পুরস্কার পাইয়াছি। উহাতে আমার কোন দরনাই, কিন্তু উহা আপনার মান বজায় রাখিবার জন্য অনেক কাজে লাগিবে, উহা আপনি লইয়া যাউন।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"আত্মীয়-শ্রেষ্ঠ কানাই তুমিতো জান আমার হাতে কয়েকটা টাকা আছে। তুমি উহা রাখিয়া দেও। আমার যথেষ্ট আছে" এই বলিয়া জোর করিয়া টাকা কানাইয়ের হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন এবং বলিলেন,—"কানাই, এক্ষণে আমাকে হৃষ্টচিত্তে বিদায় দেও। আমার জন্য কোনও চিন্তা করিও না।"

কানাই বলিল,—"টাকা লইলেন না। ভাল, এখন না লন সময়ান্তরে এ টাকা আপনারই কাজে লাগিবে। লইলে ভাল হইত; কিল্লাদারের চাকর বাকর অনেক; তাহাদের কাছে মান থাকা চাই।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"কানাই ছাড়িয়া দেও। আমি এখন যাই। ভয় নাই, ভাবনা নাই।"

"দুর্গস্বামী বিজয়সিংহ গমন করিলেন। নিয়তির গতি কে রুদ্ধ করিতে পারে? এ বংশের পতন বিধাতার লিপি। কে তাহার অন্যথা করিবে?" প্রভুভক্ত বর্ষীয়ান্ ভৃত্য এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে যতদূর সম্ভব ততদূর পর্য্যন্ত দুর্গস্বামীর প্রতি নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল। তিনি চক্ষুরগোচর হইলে, কানাই নেত্র নিঃসৃত অশ্রু মার্জ্জন করিয়া পুনরায় কহিল,—"ঐ বালিকা—ঐ কমলাদুর্গের কমলকুমারী আমাদিগের সমস্ত সর্ব্বনাশের মূল। ও যদি না থাকিত—ও যদি বিজয়সিংহের চক্ষে না পড়িত, তাহা হইলে এ বংশের পতনকাল এত শীঘ্র উপস্থিত হইত না। স্ত্রীলোকই সর্ব্বনাশের মূল। কিন্তু ভাবিয়া কি ফল, সকলই অদৃষ্টের কর্ম্ম।"

এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে বিষণ্ণ ভাবে গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া কানাই স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মে মনোনিবেশ করিল। এদিকে

দুর্গস্বামী নিতান্ত হৃষ্টচিত্তে কল্যাণীর সমভিব্যাহারী হইয়া পথাতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কল্যাণীর সহিত নিয়ত বাক্যালাপ করিয়া দুর্গস্বামীর চিত্ত এতই প্রফুল্ল হইয়া উঠিল যে, তাঁহার তদানীন্তন ভাবভঙ্গী দেখিয়া কিল্লাদার বিস্মিত হইতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, দুর্গ-স্বামীর প্রকৃতি অধুনা নিরতিশয় কোমলতাময়। তিনি মনে মনে প্রীতি ও গর্ব্ব সহকারে আলোচনা করিতে লাগিলেন যে, এই পরাক্রান্ত শত্রু এক্ষণে কীদৃশ মিত্ররূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং কালে মহারাণার বিশিষ্টরূপ অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিলে, এই বীর ও সাহসী যুবা কিরূপ উন্নত পদশালী হইয়া উঠিবে। কিন্তু তখনই, না জানি এ সম্বন্ধে কিল্লাদারণী কি মনে করেন, এই আশঙ্কা মনে উপস্থিত হইল। আবার ভাবিলেন, তিনি আর চান কি? এমন বীর, উচ্চবংশজাত, বিদ্বান্ জামাতা আর কোথায় পাইবেন? এরূপ সম্বন্ধে কোন বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকই আপত্তি করিতে পারেন না। কিন্তু—কিল্লাদার মনে মনে বুঝিলেন যে, কিল্লাদারণীর বুদ্ধি কখন কোন্ দিকে যায়, তাহার স্থিরতা নাই। ভাবিলেন,—যদি এই সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া—এই দুর্দ্দান্ত শত্রুর সহিত সদ্ভাব স্থাপনের এমন সুযোগ পরিত্যাগ করিয়া, তিনি অন্য সম্বন্ধ স্থির করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বুঝিব যে তিনি পাগল।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে; এমন সময়ে তাঁহারা কমলাদুর্গের সমীপবর্ত্তী হইলেন। দুর্গ-প্রবাহী সমুন্নত বৃক্ষরাজির মধ্যবর্ত্তী পথ দিয়া তাঁহারা চলিতে লাগিলেন। বৃক্ষনিকর হইতে, বায়ু-প্রবাহ হেতু, মৃদু খাঁ! খাঁ! শব্দ হইতে লাগিল। যেন তাহারা তাহাদের চিরন্তন স্বামীকে, অন্য নবীন স্বামীর সহচরবৎ সমাগত দেখিয়া, বিষাদভরে নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল। এই স্থানে উপস্থিত হইয়া দুর্গস্বামীর মনও ভাবান্তর পরিগ্রহ করিল এবং তিনি ক্রমশঃ নীরবতা অবলম্বন করিলেন। যে সময় তিনি এবং তাঁহার পিতা চিরদিনের নিমিত্ত তাঁহাদের এই চির-নিবাস পরিত্যাগ করিয়াছেন, সে সময়ের কথা এক্ষণে তাঁহার মনে পড়িল। সেই চিরপরিচিত ভবনের পুরোভাগ হইতে, গবাক্ষাদি ভেদ করিয়া, আগতপ্রায় প্রভুর অভ্যর্থনার্থ ভৃত্যবর্গের হস্তস্থিত চলিষ্ণু আলোক ও এক এক স্থানে সমুজ্জ্বল আলোক সমূহ তাঁহার নেত্র-পথে পতিত হইল। যে স্থান দারিদ্র্য হেতু, তাঁহাদের অধিকার কালে মলিন ছিল, অদ্য তাহা আনন্দ ও উৎসাহময়। যে ভবন তাঁহার নিজ সম্পত্তি ছিল অধুনা তাহা পরের। অদ্য তিনি সেই পরের ভবনে উপস্থিত। তাঁহার চিত্ত অবশ্যম্ভাবী যন্ত্রণায় প্রপীড়িত হইয়া উঠিল, তাঁহার মুখমণ্ডল গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। বুদ্ধিমান কিল্লাদার দুর্গস্বামীর মুখ দেখিয়া তাঁহার তদানীন্তন মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন, এবং সাবধানতা সহকারে বিশেষরূপ অভ্যর্থনা কার্য্যে নিরত হইলেন।

তাঁহারা বিশ্রমার্থ একটি প্রকোষ্ঠ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় দুর্গের বর্ত্তমান অধীশ্বরের ধনবত্তার পরিচায়ক নানাবিধ গৃহ-সজ্জা দুর্গস্বামীর নেত্র-পথে নিপতিত হইল। তাঁহাদের সময়ে সেই প্রকোষ্ঠের যে ভাব ছিল তাহাও মনে পড়িল। ভিত্তিগাত্রে যে যে স্থলে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের চিত্র বিলম্বিত ছিল, এক্ষণে কিল্লাদার ও তাঁহার আত্মীয়গণের চিত্র তত্তৎস্থান অধিকার করিয়াছে। এ দৃশ্য তাঁহার হৃদয়কে নিতান্ত ব্যথিত করিল।

কিল্লাদার দুর্গস্বামীর হৃদয়-ভাব অনুমান

করিয়া এবং এবংবিধ ভাব-প্রবাহ প্রতিরুদ্ধ করা বিধেয় ভাবিয়া, তাঁহাকে বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া জলযোগ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু দুর্গস্বামীর চিত্ত তৎকালে তত্রত্য পরিবর্ত্তন সমূহ পর্য্যালোচনায় এতাদৃশ নিবিষ্ট ছিল যে, তিনি কিল্লাদারের অনুরোধ শুনিয়াও শুনিলেন না, সুতরাং কোন উত্তরও দিলেন না। দ্বিতীয়বার কিল্লাদার তথাবিধ অনুরোধ করিলেন। তখন দুর্গস্বামী বুঝিলেন যে, তাঁহার ব্যবহার নিতান্ত দুর্ব্বলহৃদয়তার পরিচায়ক হইয়া পড়িতেছে। তিনি সবলে চিত্তকে সে চিন্তা-স্রোত হইতে ফিরাইলেন এবং কিল্লাদারের সহিত যেন নির্ব্বিকৃত ভাবেই কথা কহিতে লাগিলেন।

বলিলেন,—"কিল্লাদার মহাশয়, প্রকোষ্ঠের আপনি যে শ্রীবর্দ্ধন করিয়াছেন, আমি তদ্দর্শনে কিয়ৎপরিমাণে নিবিষ্টচিত্ত হইয়াছিলাম, একথা বলাই বাহুল্য। আমার পিতার ভাগ্যনেমির নিম্নগতি হইলে, তিনি প্রায়ই জনহীন স্থানে অবস্থান করিতেন, সুতরাং এ প্রকোষ্ঠ প্রায়ই ব্যবহৃত হইত না। কেবল যে দিন কোনও কারণে আমি বাহিরে ক্রীড়া করিতে না যাইতাম, সে দিন এই প্রকোষ্ঠ আমার ক্রীড়াগার হইত। যে স্থানে একণে ঐ সুন্দর রজত-আসন শোভা পাইতেছে, ঐ স্থানে আমার ধনুর্ব্বাণ থাকিত, আর ঐ কোণে আমার নানা প্রকার ক্রীড়া-সামগ্রী সঞ্চিত থাকিত; আর যে স্থানে একণে আপনার এই মণি-মুক্তা খচিত ঝালর ঝুলিতেছে, এই স্থানে আমার সাধের তোতা পাখীর দাঁড় ঝুলিত।"

কিল্লাদার, কথার এবংবিধ গতি ফিরাইয়া দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক মনে করিয়া, বলিলেন—"আমার একটী ছেলে আছে, তাহারও প্রকৃতি ঠিক আপনারই মত—সেও ঐরূপ বাহিরে খেলিতে না পাইলে মহা অসুখী হয়। তাহাতে সে এখনও আসে নাই—আশ্চর্য্য বটে। লোকনাথ! দেখত মুরারি কোথায়! আমার বোধ হয় আর কিছু নয়, সে কল্যাণীর সঙ্গে ঘুরিতেছে। আপনাকে বলিব কি দুর্গ-স্বামী মহাশয়, বাড়ীর সমস্ত লোকই আমার ঐ মেয়েটীর মন যোগাইয়া চলে।"

সুকৌশলে কিল্লাদার প্রসঙ্গতঃ কল্যাণীর কথা উত্থাপন করিলেন, তথাপি দুর্গস্বামীর মন সে কথায় আকৃষ্ট হইল না। তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—"আমরা যৎকালে এই দুর্গ চিরদিনের নিমিত্ত পরিত্যাগ করি, তখন কয়েকখানি প্রতিমূর্ত্তি এবং অস্ত্র এই প্রকোষ্ঠে ফেলিয়া গিয়াছিলাম। সে গুলি একণে কোথায় স্থানান্তরিত হইয়াছে তাহা আপনাকে জিজ্ঞাসা করায় দোষ আছে কি?"

কিল্লাদার কিছু অপ্রতিভ ভাবে বলিলেন,—"অবশ্য—সে গুলি—কি জানেন?—এই প্রকোষ্ঠটা আমার অবর্ত্তমানে সজ্জিত হইয়াছিল। জানেন তো স্বয়ং উপস্থিত না থাকিলে লোকজন কাজে কত অবহেলা করে! আমার বোধ হয়—আমি বিশ্বাস করি, সে গুলি নষ্ট হয় নাই। ঐ সকল সামগ্রী প্রকৃত অবস্থায় যদি আমি মহাশয়কে প্রত্যর্পণ করি, তাহা হইলে মহাশয় তাহা আমার হস্ত হইতে গ্রহণ করিবেন কি?"

দুর্গস্বামী অনুরাগ-ব্যঞ্জক মস্তকান্দোলন সহকারে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন এবং পুনরায় সেই প্রকোষ্ঠ পর্য্যবেক্ষণে নিবিষ্টচিত্ত হইলেন। এমন সময় কিল্লাদার-তনয় মুরারি পিতার নিকট ব্যস্ততা সহকারে উপস্থিত হইয়া বলিল,—"দেখ বাবা, দিদি এবার কেমন এক রকম হইয়া বাটী ফিরিয়াছে। পঞ্জাব হইতে আমার

জন্ম সনাতন যে ঘোড়া কিনিয়া আনিয়াছে, তাহাই দেখিবার জন্য দিদিকে আগ্রহে আসিতে বলিলাম, দিদি কিছুতেই আসিল না।”

কিল্লাদার বলিলেন,—“তোমার দিদিকে এজন্য অনুরোধ করাই ভাল হয় নাই।”

দুরন্ত মুরারি বলিল,—“এঃ তবে দেখিতেছি তুমিও কেমন এক রকম হইয়া উঠিয়াছ। আচ্ছা দাঁড়াও, মা বাড়িতে আসুক আগে, তখন তোমাদের সকল নষ্টামি ভাঙ্গিয়া দিব।”

কিল্লাদার নিতান্ত বিরক্তি সহকারে বলিলেন,—“জ্যেঠা মহাশয় থাম। তোমার গুরুমহাশয় কোথায়?”

“গুরুমহাশয় শৈলশ্বরে বিবাহ দিতে গিয়াছেন।” এই বলিয়া, হুঁ হুঁ করিয়া বালক একটা গান ধরিল।

তাহার পিতা বলিলেন,—“তোমার গুরুমহাশয় বেশ কাজের লোক দেখিতেছি। তিনি তোমাকে কাহার হস্তে রাখিয়া গিয়াছেন?”

বালক সঙ্গে সঙ্গে বলিল,—“কেন রঙ্গুয়া ভীল আছে, জনার্দ্দন সহিস আছে; আর তা ছাড়া আমি এখন বড় হইয়াছি, আমার রক্ষক আমি এখন আপনিই।”

কিল্লাদার বলিলেন,—“বেশ—শিকারী রঙ্গুয়া ভীল, আর সহিস জনার্দ্দন যাহার সঙ্গী তাহার যত বিদ্যা হইবে তাহা বুঝা যাইতেছে।”

মুরারি বাধা দিয়া বলিল,—“বাবা রঙ্গুয়ার কথা যদি তুলিলে তবে বলি শুন। তোমরা বাটী হইতে চলিয়া গেলে রঙ্গুয়া যে এক হরিণ মারিয়াছিল, তাহার মাথায় আটটা পালা। দিদি গল্প করিল, তোমরা নাকি এই কয়দিনের মধ্যে একটা হরিণ মারিয়াছ, তাহার দশটা পালা। হাঁ বাবা, দিদির কথা কি সত্য?”

কিল্লাদার বলিলেন,—“সত্য মিথ্যা জানি না। তোমার যদি হরিণের গল্প শুনিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ বীরের নিকট যাও, উনি দুর্গস্বামী বিজয়সিংহ।”

এই বলিয়া কিল্লাদার দুর্গস্বামীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। দুর্গস্বামী তৎকালে পিতা ও পুত্রের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া নিবিষ্টচিত্তে একখানি চিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। দুরন্ত মুরারি দৌড়িয়া তাঁহার নিকটস্থ হইল এবং তাঁহার কাপড় ধরিয়া বলিল,—“শুনুন মহাশয়—যদি আপনি”—বালকের কথা শেষ হইতে না হইতে, দুর্গস্বামী ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বদন মুরারির নেত্রপথে পতিত হইবামাত্র, সে নিতান্ত সঙ্কুচিত ও ভীত-ভাবে কয়েক পদ পিছাইয়া আসিল, তাহার সজীবতা ও প্রফুল্লতা বিনষ্ট হইয়া উঠিল এবং তাহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল।

দুর্গস্বামী বলিলেন,—“আইস, আইস, আমার নিকট আইস; কি বলিতেছিলে বল।”

কিল্লাদার বলিলেন,—“যাও মুরারি—উঁহার কাছে যাও। একি, তুমি এত মুখচোরা কেন হইলে?”

বালক কোন কথাই শুনিল না। সে ধীরে ধীরে একেবারে পিতার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দুর্গস্বামী সে দিক হইতে নয়ন ফিরাইলেন।

কিল্লাদার বলিলেন,—“দুষ্ট ছেলে! দুর্গস্বামীর সহিত কথা কহিলে না কেন?”

বালক অস্ফুটস্বরে বলিল,—“কথা কহিব কি?—আমার ভয় হইতেছে।”

“ভয় হইতেছে? হতভাগ্য ছেলে! ভয়

কিসের ?" এই বলিয়া কিল্লাদার বালকের গালে একটী ছোট রকম চড় মারিলেন।

বালক সভয়ে বলিল,—"ও লোকটার চেহারা শঙ্করসিংহ দুর্গস্বামীর চেহারার মত কেন ?"

পিতা বলিলেন,—"কাহার চেহারা, বোকা ছেলে ? আমি ভাবিতাম তুই নিতান্ত আহাম্মক, এখন দেখিতেছি তুই নিতান্ত পাগল।"

মুরারি বলিল,—"আমি বলিতেছি, এ লোকটার চেহারা ঠিক সেই শঙ্করসিংহের চেহারার মত। সেই ছবিখানি আজি যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। কেবল তফাতের মধ্যে, এ লোকটার দাড়ি গোঁপ তেমন নয়, আর গায়ের জামারও একটু প্রভেদ আছে—"

কিল্লাদার বলিলেন,—"দুষ্ট ছেলে, শঙ্কর সিংহ এই দুর্গস্বামীর পূর্ব্বপুরুষ। কাজেই উভয়ের চেহারা এক রকম।"

মুরারি বলিল,—"তবেই তো। চেহারা তো এক রকম, এখন কাজেও যদি এক রকম হয়, তাহা হইলেই মহা বিপদ। শুনিয়াছ তো বাবা, সেই শঙ্করসিংহ তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী কিল্লাদারকে কেমন করিয়া বিনাশ করিয়াছিল। এখনও দেওয়ালের গায়ে তাহার চিহ্ন আছে। ইনিও যদি সেইরূপ করেন ?"

কিল্লাদার বালক-প্রদত্ত এই সন্তাবিত চিত্রে প্রীতিলাভ করিলেন না। বলিলেন,—"চুপ কর, বোকা ছেলে ?"

এমন সময় লোকনাথ আসিয়া সংবাদ দিল, খাদ্য প্রস্তুত হইয়াছে।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের অপর এক দ্বার দিয়া ভিন্ন সজ্জায় সজ্জিতা কল্যাণী আগমন করিলেন। তাঁহার এই অভিনব সজ্জায় তাঁহাকে দর্শনমাত্র দুর্গস্বামীর চিত্তে তদানীন্তন পরুষ ভাব সমস্ত তিরোহিত হইয়া গেল। কল্যাণীর কমনীয় কান্তি দুর্গস্বামীর চক্ষে পরম পবিত্রতায় পরিপূর্ণ বলিয়া প্রতীত হইল এবং সেই নিষ্কলঙ্কা নবীনা পিতার ক্রূর বুদ্ধি বা মাতার ঔদ্ধত্য প্রভৃতি দোষ-সংস্পর্শ-পরিশূন্যা বলিয়া স্বতই তাঁহার বোধ হইল। উৎসাহশীল কল্পনাপ্রিয় যুবকহৃদয়ে সৌন্দর্য্যের এমনই মোহমন্ত্র।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

আহারাদি ব্যাপারে সে দিন কাটিয়া গেল। মুরারির ভীতভাব ও সঙ্কোচ ক্রমশঃ অপেক্ষাকৃত বিদূরিত হইয়া আসিল এবং পরদিন সে দুর্গ-স্বামীর সহিত মৃগয়ায় লিপ্ত থাকিবার পরামর্শ স্থির করিল। অনুরোধ-পরতন্ত্র হইয়া দুর্গস্বামী কেবল পর দিন মাত্র কমলায় অবস্থান করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু আর একটী নিতান্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য স্মৃতিপথাগত হওয়ায়, অগত্যা তাঁহাকে আর ও একদিন থাকিতে হইল। তাঁহাদের চিরানুগত ও শুভানুধ্যায়ী শান্তা বুড়ীর সহিত একবার সাক্ষাৎ না করিয়া, এস্থান ত্যাগ করা তিনি নিতান্ত অবিধেয় বলিয়া মনে করিলেন। অতএব শান্তার সহিত সাক্ষাতের নিমিত্ত তাঁহাকে আর এক দিন থাকিতে হইল।

প্রাতে তিনি শান্তার সহিত সাক্ষাদভিপ্রায়ে দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কল্যাণী তাঁহার পথ-প্রদর্শিকা রূপে চলিলেন। মুরারিও তাঁহাদের সঙ্গী হইল। কিন্তু সে দুরন্ত বালকের সঙ্গে থাকা না থাকা সমান হইল। পথে কোথায় একটী নকুল এদিক হইতে ওদিকে

চলিল—সে তাহারই অনুসরণ করিল। কোথায় একটী পাখী ডালে বসিয়া শব্দ করিতেছে—সে তাহাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত, ঢিল লইয়া ছুটিল। কোথায় একটী খরা বনের মধ্যে বেড়াইতেছে দেখিয়া, সে তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত প্রাণপণ যত্ন করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপ নানা ব্যাপারে মুরারি তাঁহাদের সঙ্গে থাকিতে পারিল না। সুতরাং তাঁহারা দুই জনে কথা বার্ত্তা কহিতে কহিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যুবক-যুবতীর কথার তরঙ্গ ক্রমশই গাঢ় হইয়া উঠিল। এই চির-পরিচিত, অধুনা পর-হস্তগত, প্রিয় স্থান সমূহ দর্শনে, দুর্গস্বামীর চিত্তে অবশ্যই যে আবেগ জন্মিতেছে, তদ্বিষয় কল্যাণী এমনই কোমলতা পূর্ণ মধুর ভাবে ব্যক্ত করিলেন যে, তৎশ্রবণে দুর্গস্বামীর হৃদয় যথেষ্ট প্রীতিলাভ করিল এবং তাঁহার সমস্ত ক্লেশ ও সকল যাতনাই যেন সার্থক বলিয়া বোধ হইল। তিনি তদনুরূপ বাক্যের দ্বারা কল্যাণীর কথায় প্রত্যুত্তর দিলেন। কথার ভঙ্গী গাঢ়তর হইতে লাগিল। কল্যাণী তাহাতে প্রীতিলাভ করিলেও, এতাদৃশ বাক্য-স্রোত প্রতিরুদ্ধ করা আবশ্যক বলিয়া মনে করিলেন। দুর্গস্বামীও বুঝিলেন যে, তিনি অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছেন এবং এখনও বাক্য-সংযত করিতে না পারিলে, কাজেই প্রেমের কথা স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত না করিয়া থাকা অসম্ভব হইবে। তিনিও স্বেচ্ছায় তাদৃশ প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন।

দেখিতে দেখিতে তাঁহারা শান্তার কুটীর সমীপে উপনীত হইলেন। কুটীর খানি জীর্ণসংস্কার হেতু অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। নেত্র-রত্ন-বিহীনা শান্তা সেই বৃক্ষমূলে বসিয়াছিল। আগন্তুকেরা নিকটস্থ হইলে, শান্তা বলিয়া উঠিল,—"কল্যাণি দেবি! আমি পদ-ধ্বনি শুনিয়া তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি; কিন্তু তোমার সঙ্গে যে ভদ্র লোকটী আসিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই তোমার পিতা নহেন।"

কল্যাণী বলিলেন,—"কেন শান্তা? এই উন্মুক্ত বায়ু মধ্যে কঠিন মৃত্তিকার উপর পদ-ধ্বনি শুনিয়া তুমি কেমন করিয়া এরূপ স্থির মীমাংসা করিলে?"

শান্তা বলিল,—"বৎসে! দর্শন-শক্তি না থাকায়, আমার শ্রবণ-শক্তি বিশেষ তীক্ষ্ণ হইয়াছে। পূর্ব্বে যে শব্দ আমি তোমাদের ন্যায় লক্ষ্যই করিতাম না, এখন তাহা শুনিয়া বেশ বিচার করিতে পারি। অভাব ইহ জগতে বড় অদ্ভুত শিক্ষক। যে ব্যক্তি দুর্ভাগ্য ক্রমে চক্ষু হারাইয়াছে, তাহাকে অবশ্যই প্রকারান্তরে সংবাদ সংগ্রহ করিতে হইবে।"

কল্যাণী বলিলেন,—"তুমি একজন পুরুষের পদশব্দ শ্রবণ করিয়াছ, তাহা আমি স্বীকার করিলাম। কিন্তু সে শব্দ যে আমার পিতার পদশব্দ নহে, তাহা তুমি কিরূপে বুঝিলে?"

"শুভে! বয়ঃ-প্রবীণের গতি ভীতভাব ও সতর্কতায় পূর্ণ। তাঁহাদের পদ নিতান্ত ধীরভাবে পৃথিবী-পৃষ্ঠ হইতে উত্থিত এবং এবং সশিঙ্কভাবে পুনঃ স্থাপিত হয়। আমি এক্ষণে যে পদ-ধ্বনি শ্রবণ করিলাম তাহা যৌবন-সুলভ দ্রুতভাব ও দৃঢ়তায় পরিপূর্ণ। যদি আমি আমার অসঙ্গত মীমাংসায় বিশ্বাস করিতে সাহস করিতাম, তাহা হইলে বলিতাম যে, ইহা দুর্গস্বামীর পদ-ধ্বনি।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"শ্রুতিশক্তির এতাদৃশ তীক্ষ্ণতা আমি প্রত্যক্ষ না করিলে কখনই

বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। শান্তা, প্রকৃতই আমি দুর্গস্বামী—তোমার পূর্ব্বপ্রভুর পুত্র।”

বিস্ময়-সংবলিত চীৎকার সহকারে শান্তা বলিয়া উঠিল,—“আপনি—দুর্গস্বামী! আপনি—এখানে—এই লোকের সঙ্গে? এ কথা বিশ্বাস হয় না। আমি আমার এই ক্ষীণ হস্তে একবার তোমার বদন স্পর্শ করিয়া দেখি, যাহা শুনিলাম স্পর্শ দ্বারাও তাহাই বুঝা যায় কি না।”

দুর্গস্বামী শান্তার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। তখন বৃদ্ধা ধীরে ধীরে স্বীয় কম্পমান ক্ষীণ হস্ত দুর্গস্বামীর বদনে বুলাইল। তাহার পর বলিল,—“ঠিক বটে। কণ্ঠস্বর ও মুখের ভাব উভয়ই দুর্গস্বামীর বটে। বদনের সেই উচ্চ অহংকৃত ভাব, স্বরের সেই সাহসিক ও তেজঃপূর্ণ ভাব। কিন্তু দুর্গস্বামী, তুমি এখানে কেন? তোমার শত্রুর অধিকারে এবং তাঁহারই কন্যার সঙ্গে তোমার কি কাজ?”

বীরবর মহারাণা প্রতাপসিংহের পুত্র অমরসিংহের সমরানুরাগের অল্পতা ঘটিলে, অনুগত সামন্তগণ যেরূপে তাঁহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকৃত উৎসাহপূর্ণ অনুযোগ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ এই চক্ষুহীনা বর্ষীয়সী এই নবীন প্রভুকে সেইরূপ ভাবে অনুযোগ করিল।

কল্যাণী এবংবিধ অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ সংক্ষিপ্ত করিবার বাসনায় বলিলেন,—“শান্তা, দুর্গস্বামী পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।”

বিস্ময় সহকারে বৃদ্ধা বলিল,—“বটে!”

কল্যাণী বলিলেন,—“আমি জানিতাম, উঁহাকে তোমার কুটীরে আনিলে, উনি আনন্দিত হইবেন।”

দুর্গস্বামী বলিলেন,—আমি কিন্তু এস্থানে এতদপেক্ষা অধিকতর আন্তরিক অভ্যর্থনা লাভ করিব বলিয়া আশা করিয়াছিলাম।”

বৃদ্ধা আপনি বলিতে লাগিল,—“ইহা অতীব আশ্চর্য্য! কিন্তু ভগবানের কার্য্য অনুমেয় নহে এবং তাঁহার শাসন ও দণ্ড যে যে উপায়ে সংঘটিত হয়, তাহাও মনুষ্যজ্ঞানের অতীত। শুন তরুণ পুরুষ, তোমার পিতৃপুরুষেরা অদমনীয় ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা উচ্চাশয় শত্রু ছিলেন; তাঁহারা অতিথির আবরণে আবৃত হইয়া শত্রুর সর্ব্বনাশ সাধনের বাসনা করিতেন না। কুমারী কল্যাণীর সহিত তোমার চরণ কেন ঘুরিতেছে?—তোমার হৃদয় রঘুনাথ-তনয়ার হৃদয়ের সহিত সমতন্ত্রী যন্ত্রের ন্যায় ধ্বনিত হইতেছে কেন? যুবক, যে ব্যক্তি অসদুপায়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার উপায় অন্বেষণ করে—”

নিতান্ত বিরক্তির সহিত রূঢ়ভাবে বিজয়সিংহ বলিয়া উঠিলেন,—“হতভাগিনি, ধিক্ তোমার রসনায়! তোমার স্কন্ধে যেন প্রেতাত্মার আবির্ভাব হইয়াছে। জানিও ইহ জগতে এই নবীনার অনিষ্ট বা অপমান নিবারণার্থ আমার অপেক্ষা প্রস্তুত ও অগ্রগামী বন্ধু আর দ্বিতীয় আছে কি না সন্দেহ।”

বৃদ্ধা বিষণ্ণ স্বরে কহিল,—“কি, এতদূর! তবে ঈশ্বর তোমাদের সহায় হউন।”

কল্যাণী শান্তার কথা ভাল বুঝিতে পারেন নাই, এক্ষণে বলিয়া উঠিলেন,—“শান্তা, তাহাই হউক এবং অনাথনাথ ভগবান্ তোমাকে জ্ঞান ও বুদ্ধি দান করিয়া প্রকৃতিস্থ করুন। কিন্তু তুমি যদি তোমার বন্ধুগণকে সমুচিত অভ্যর্থনা না করিয়া, এরূপ দুর্ব্বোধ্য ভাষায় কথা কহিতে থাক, তাহা হইলে লোকে

তোমার সম্বন্ধে যেরূপ বলিয়া থাকে, তোমার বন্ধুগণও হয়ত তাহাই বলিবেন।"

শান্তার কথাবার্ত্তা অসংলগ্ন বলিয়া দুর্গ-স্বামীর মনেও সন্দেহ জন্মিয়াছিল, এজন্য তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—"লোকে কি বলে?"

এই সময় মুরারি আসিয়া উপস্থিত হইল এবং দুর্গস্বামীর কাণে কাণে ফুস ফুস করিয়া বলিল,—"লোকে বলে ও ডাইন—উহাকে রাজ-বিচারে দণ্ড দেওয়া উচিত।"

তখন শান্তা তাহার ক্রোধ-প্রদীপ্ত অথচ দৃষ্টি-শক্তি-বিহীন বদন মুরারির দিকে ফিরাইয়া বলিল,—"কি—তুমি কি বলিতেছ? আমি ডাইন এবং আমাকে রাজ-বিচারে দণ্ড দেওয়া উচিত, কেমন?"

মুরারি আবার ফুস ফুস করিয়া বলিল,—দেখুন মহাশয় কাণ্ড! আমি এমন আস্তে আস্তে বলিলাম, তথাপি বুড়ী শুনিয়াছে।"

বৃদ্ধা পুনরপি তীব্র স্বরে বলিতে লাগিল,—"যদি অত্যাচারী, পরস্বাপহারী, দীন-হীনের সুখচূর্ণকারী, অতীত কীর্ত্তিবিলোপকারী এবং প্রাচীন বংশ-গৌরব-বিনাশকারী ব্যক্তির সহিত আমাকে এক সঙ্গে ফাঁসি কাষ্ঠে লম্বিত করা হয়, তাহা হইলে আমি হাসিতে হাসিতে মরিতে সম্মত আছি।"

কল্যাণী বলিলেন,—"কি ভয়ানক! আমি এই পরিত্যক্ত বর্ষীয়সীর এতদপেক্ষা মনশ্চাঞ্চল্য আর কখন প্রত্যক্ষ করি নাই; কিন্তু বয়স ও দারিদ্র্যে সকলই ঘটাইয়া থাকে। আইস মুরারি আমরা চলিয়া যাই শান্তা বোধ হয় কেবল, দুর্গস্বামীর স কথা কহিতে বাসনা করিতেছে।" তাহা বিজয়সিংহের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমরা গৃহাভিমুখে চলিলাম; পথিমধ্যে রায়মল উৎসের সমীপে আমরা আপনার জন্য অপেক্ষা করিব।"

তাঁহারা চলিয়া গেলে, শান্তা দুর্গস্বামীকে বলিল—"তোমার ভালর জন্য আমি যাহা বলিলাম, তাহা শুনিয়া তুমিও কি আমার উপর রাগ করিলে? অপরিচিত ব্যক্তির রাগ হওয়া সম্ভব বটে, কিন্তু তুমিও কি রাগত হইলে?"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"আমি বিরক্ত হই নাই। আমি তোমার সদ্বিবেচনার অনেক প্রশংসা শ্রবণ করিয়াছি। সেই তুমি এরূপ বিরক্তিকর ও অমূলক সন্দেহ হৃদয়ে স্থান দেওয়ায় আমি বিস্মিত হইয়াছি মাত্র।"

শান্তা বলিল,—"বিরক্তিকর? হাঁ ঠিক বটে, সত্য চিরকালই বিরক্তিকর, কিন্তু নিশ্চয়ই অমূলক নহে।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"বৃদ্ধে! আমি তোমাকে পুনরায় বলিতেছি, সম্পূর্ণ অমূলক।"

শান্তা বলিল,—"তবে পৃথিবীর প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, দুর্গস্বামিগণ তাঁহাদের কৌলিক স্বভাব পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং বৃদ্ধা শান্তার জ্ঞাননেত্র তাহার বাহ্য নয়নের অপেক্ষাও অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে। প্রতিহিংসার বাসনা ত্যাগ করিয়া কবে কোন্ দুর্গস্বামী শত্রু-ভবনে উপস্থিত হইয়াছেন? দুর্গস্বামী বিজয়সিংহ, হয় মারাত্মক ক্রোধের বশীভূত হইয়া, না হয় অধিকতর অশুভজনক প্রেমে পড়িয়া এই শত্রুর পুরীতে উপস্থিত হইয়াছ।"

"আমি ধর্ম্মতঃ—হাঁ—না—হাঁ সত্য বলিতেছি, তাদৃশ কোন অভিপ্রায়েই আমি এখানে আসি নাই।"

শান্তা দুর্গস্বামীর বদনের লজ্জিত ভাব লক্ষ্য করিতে পারিল না; কিন্তু তিনি যেরূপ স্বীয় বাক্য পরিব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিয়া-

ছিলেন, তাহাতে অশক্তি হেতু, সঙ্কুচিত ভাব শান্তার অগোচর রহিল না।

বৃদ্ধা বলিল,—"তবে তাহাই বটে এবং সেই জন্যই কুমারী রায়মল উৎসের সমীপে অপেক্ষা করিবেন। ঐ স্থান দুর্গস্বামিবংশের সর্ব্বনাশের কারণ বলিয়া কীর্ত্তিত আছে এবং বহুবার বহুঘটনায় তাহা প্রমাণ হইয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি সেই চির-প্রবাদ যেরূপ সফলিত হইবে, আর কখনও সেরূপ ঘটিবে বা ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"শান্তা, দেখিতেছি তুমি বৃদ্ধ কানাইয়ের অপেক্ষাও ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তিনী। রঘুনাথ-পরিবারের সহিত চির-শত্রুতায় নিযুক্ত থাকা এবং পূর্ব্বকালের ন্যায় তাঁহাদের বিরুদ্ধে নিরন্তর যুদ্ধ করাই কি তোমার ন্যায় প্রবীণা ধর্ম্মশীলার উপদেশ? অথবা তুমি কি মনে কর, চিত্তের উপর আমার এতাদৃশ আধিপত্য নাই যে, আমি ঐ নবীনা কামিনীর পার্শ্বে বিচরণ করিতে হইলেই তাহার প্রেম-সাগরে আকণ্ঠ না ডুবিয়া থাকিতে পারিব না?"

শান্তা উত্তর দিল,—"যদিও আমার চর্ম্ম-চক্ষু বর্ত্তমান ঘটনাপুঞ্জ সম্বন্ধে ঘোর তিমিরা-চ্ছাদিত, তথাপি ইহা অসম্ভব নহে যে, ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী সম্বন্ধে আমার প্রণিধান-ক্ষমতা বিশেষ প্রবল। বল দেখি দুর্গস্বামী, তুমি কি একদা তোমার পিতৃপুরুষগণের অধি-কৃত ভবনে, অধুনা তাহার গর্ব্বিত অধিকারীর সহিত একত্র বসিয়া সম্পর্ক স্থাপন ও ঘনিষ্ঠ ভাবে অবনত মস্তকে আহার ব্যবহার করিতে সক্ষম? তুমি কি অধুনা তাঁহার করুণার প্রার্থী হইয়া, তৎপ্রদর্শিত প্রতারণা ও চাতুরীর পথাবলম্বন করিয়া ও তৎপরিত্যক্ত সারশূন্য অস্থিমাত্র লেহন করিয়া জীবনপাত করিতে প্রস্তুত? রঘুনাথ রায়ের কথায় অনুমোদন ও তাঁহার মতানুসরণ করিতে এবং পিতৃহন্তা পরম শত্রুকে ভক্তিভাজন শ্বশুর ও সম্মানাস্পদ হিতৈষী জ্ঞান করিতে তোমার কি প্রবৃত্তি হইবে? দুর্গস্বামী, আমি তোমাদের অতি প্রাচীন ভৃত্য। আমি বরং তোমাকে চিতা-নলে দগ্ধ হইতে দেখিব, তথাপি যেন আমাকে তাদৃশ দৃশ্য দেখিতে না হয়।"

দুর্গস্বামীর চিত্তক্ষেত্রে বিষম ঝটিকা সমুখিত হইল। সে দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি রাক্ষসীকে দুর্গস্বামী বহু যত্নে শান্ত ও নিদ্রিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, অদ্য বৃদ্ধা তাহাকে আঘাত করিয়া জাগরিত করিয়া দিল। তিনি সেই ক্ষুদ্র স্থান টুকুতে বারংবার পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন, অবশেষে সহসা বৃদ্ধার সম্মুখীন হইয়া বলিলেন,—"বৃদ্ধে, তুমি কি তোমার অন্তিম দশায় প্রভু-পুত্রকে যুদ্ধ ও শোণিতক্ষয়-কর কার্য্যে উত্তেজিত করিতে বাসনা করিয়াছ?"

শান্তা বলিল,—"ঈশ্বর যেন আমার সেরূপ মতি না করেন। আমি সেই জন্যই এই সর্ব্বনাশ-জনক স্থান হইতে তোমার প্রস্থান কামনা করিতেছি। এ স্থলে তোমার প্রণয় এবং তোমার বিদ্বেষ উভয়েই নিশ্চিত অনিষ্ট, অথবা তোমার এবং তোমার বন্ধুগণের কলঙ্কের কারণ হইবে। যদি আমার এই অস্থিচর্ম্মাবশেষ ক্ষীণ দেহে শক্তি থাকিত, তাহা হইলে আমি রঘুনাথ রায় ও তাঁহার স্বগণবর্গকে তোমার ক্রোধ হইতে এবং তোমাকে তাঁহা-দের ক্রোধ হইতে নিশ্চয়ই রক্ষা করিতাম। তাঁহাদিগের সহিত তোমার মতের কোনই একতা নাই—এখানে তোমার থাকাও বিধেয় নহে। তুমি তাঁহাদের মধ্য হইতে অন্তরিত হও এবং যদি ভগবান্ অত্যাচারীর দণ্ডের

ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তোমাকে যেন তাহার কারণ না হইতে হয়।"

বিজয়সিংহ ধীরভাবে বলিলেন,—"শান্তা তুমি যাহা বলিলে, তাহা আমি বিবেচনা করিয়া দেখিব। আমি বুঝিতেছি, তুমি প্রবীণ স্নেহগতগণের ন্যায় স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া আমাকে সদুপদেশ দিতেছ। এক্ষণে বিদায় হইব। যদি ঈশ্বর আমাকে দিন দেন, তাহা হইলে আমি তোমার সুখ-স্বচ্ছন্দতা বিধান করিতে বিরত থাকিব না।"

এই বলিয়া দুর্গস্বামী শান্তার হস্তে একটী স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে তাহা গ্রহণে অসম্মত হওয়ায়, মুদ্রাটী হস্ত-ভ্রষ্ট হইয়া, ভূ-পতিত হইল। দুর্গস্বামী তাহা উত্তোলিত করিবার নিমিত্ত অবনত হইলে, শান্তা বলিল,—"না না তুলিও না—ক্ষণেক ঐ মুদ্রা ঐ ভাবে থাকুক। ঐ স্বর্ণ তুমি যে নবীনাকে ভালবাস তাঁহারই অনুরূপ। আমি স্বীকার করিতেছি যে, সে সুন্দরীও ঐ প্রকার মূল্যবান্ সামগ্রী। কিন্তু তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে, তোমাকে অগ্রে অবনত হইতে হইবে। স্বর্ণ বা পৃথিবীর লোভ-মোহ কিছুতেই আমার আর সম্পর্ক নাই। বিজয়সিংহ তাঁহার পিতৃভবন হইতে শত ক্রোশ দূরে প্রস্থান করিয়াছেন এবং সে ভবন পুনর্দর্শন করিবেন না বলিয়া তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, এইরূপ সংবাদ আমি অতঃপর ইহ জগতে সর্বাপেক্ষা সুসংবাদ বলিয়া জ্ঞান করিব।"

শান্তার এবংবিধ আগ্রহাতিশয্য দর্শনে দুর্গস্বামীর মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি মনে করিলেন, তাঁহাকে শান্তা যে এই শত্রু-সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকিতে এতাদৃশ আন্তরিক পরামর্শ দিতেছে, অবশ্যই তাহার কোন গূঢ় কারণ আছে। তিনি বলিলেন,—"শান্তা, আমাকে সত্য করিয়া বল, কেন তুমি আমার জন্য এত আশঙ্কিত হইতেছ? আমি নিজের সম্বন্ধে নিজে যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে দেখিতেছি আমার বিপদ সম্ভাবনা কিছুই নাই। কুমারী কল্যাণীর সম্বন্ধে আমার যেরূপ মনের ভাব তুমি অনুমান করিতেছ, আমি বুঝিতেছি তাহা সম্পূর্ণ অমূলক। কিল্লাদারের নিকট আমার একটু কার্য্য আছে। সেই কার্য্য সমাপ্ত হইলেই আমি চলিয়া যাইব; এবং এই বিষাদ-স্মৃতি-উদ্দীপক স্থানে ইহ জীবনে আর না আসিতে হয়, ইহাই আমার জীবনের লক্ষ্য হইবে।"

শান্তা অনেকক্ষণ অবনত বদনে চিন্তা করিল, তাহার পর মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিল,—"ভাল হউক মন্দ হউক, যে জন্য আমার ভয় তাহা তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি। দুর্গস্বামী, কুমারী কল্যাণী তোমাকে ভালবাসেন।"

"অসম্ভব।"

"সহস্র ঘটনায় আমি তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। আমার বহুদর্শী প্রবীণ জ্ঞান তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া বুঝিয়াছে যে, যে দিন তুমি তাঁহাকে মৃত্যু-মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছ, সেই দিন হইতে তাঁহার চিত্তে তুমি ভিন্ন আর কাহারও স্থান নাই। তোমাকে যাহা বলিবার তাহা বলিলাম। অতঃপর যদি তুমি ভদ্রলোক হও এবং তোমার পিতৃনামে কলঙ্ক-অঙ্ক প্রক্ষেপ করিতে তোমার অভিলাষ না থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বে ঐ কুমারীর সম্মুখ হইতে পলায়ন কর। তুমি উপস্থিত না থাকিলে তাঁহার প্রেম, তৈলহীন দীপমালার ন্যায়, নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি তুমি এখানেই অবস্থান কর, তাহা হইলে

এই অযোগ্য পাত্রে প্রেম স্থাপনের ফল স্বরূপ হয় তাঁহার, না হয় তোমার, না হয় উভয়েরই বিনাশ অপ্রতিবিধেয়। আমি অনিচ্ছায় তোমাকে রহস্য জানাইলাম। এ বৃত্তান্ত অধিক কাল তোমার নিকট প্রচ্ছন্ন থাকিত না—এক্ষণে আমার নিকট জানিতে পারিলে সে ভাল হইল। যাহা জানিবার তাহা জানিতে পারিলে; দুর্গস্বামী, এক্ষণে পলায়ন কর। রঘুনাথ রায়ের কন্যাকে বিবাহ করিবার সংকল্প না থাকিলেও যদি তুমি তাঁহার ভবনে অবস্থান কর, তাহা হইলে তুমি ঘোর পাষণ্ড। আর যদি, তুমি তাঁহার সহিত পরিণীত হইবার অভিপ্রায় করিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি কাণ্ডজ্ঞানহীন এবং উন্মত্ত।"

এই কথা সমাপ্তির পর বৃদ্ধা গাত্রোত্থান করিল এবং স্বীয় যষ্টিতে ভর দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কুটীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। কুটীরের দ্বার-রুদ্ধ হইয়া গেল। দুর্গস্বামী সেই স্থানে দাঁড়াইয়া ভাবনার স্রোতে ভাসিতে লাগিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অনন্তর দুর্গস্বামী ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার চিত্তের অবস্থা দারুণ চিন্তাকুল। তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, কল্যাণীর প্রতি তাঁহার অনুরাগ ক্রমেই গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া উঠিতেছে বটে; কিন্তু এখনও সে অনুরাগ এই পিতৃশত্রুর তনয়ার পাণিগ্রহণে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মাইতে সমর্থ হয় নাই। কিল্লাদার রঘুনাথ রায়ের সহিত চিরশত্রুতা দুর্গস্বামী কিয়ৎ পরিমাণে ত্যাগ করিয়াছেন এবং তৎকৃত অনিষ্ট সকল তিনি অনেক বিস্মৃত হইয়াছেন; কখন কখন বা কিল্লাদারের হিতকামনা-পূর্ণ কথাবার্তা তিনি প্রকৃত বলিয়া মনে করিয়াছেন; তথাপি তাঁহার চিত্তের এমন অবস্থা হয় নাই যে, তিনি রঘুনাথ তনয়াকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত বিশেষ সম্বন্ধে সম্বন্ধ হইবার কল্পনা মনেও স্থান দিতে পারেন। তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, শাস্ত্রার কথা যথা ; অধুনা আত্ম-সম্মানের অনুরোধে, হয় কমলা দুর্গ হইতে তাঁহার অবিলম্বে প্রস্থান করা আবশ্যক, নচেৎ প্রকাশ্যরূপে কল্যাণীর পাণি-প্রার্থী হওয়া বিধেয়। আরও আশঙ্কা, মহাধনবান্ অথচ নিতান্ত হীন বংশীয় রঘুনাথের সমীপে প্রকাশ্যরূপে তাঁহার কন্যার পাণি-প্রার্থনা করিলে, যদি তিনি অস্বীকৃত হন—ওঃ সে আপমান অসহ্য! এইরূপ নানা প্রকার আলোচনা করিয়া তিনি স্থির করিলেন, —"প্রার্থনা করি, কল্যাণী সুখে থাকুন। তাঁহার পিতা আমার যত অনিষ্ট করিয়াছেন তৎসমস্ত আমি তাঁহারই জন্য ক্ষমা করিলাম। কিন্তু আমি ইহ জীবনে আর কখন কল্যাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিব না—না—কখন না।"

তিনি যখন এই ক্লেশকর সংকল্পে উপনীত হইলেন, তখন তিনি গন্তব্য পথের এক সন্ধিস্থলে সমুপস্থিত। এক পথ রায়মল উৎসাভিমুখে গমন করিয়াছে এবং অপর পথ ঘুরিয়া ফিরিয়া কমলা দুর্গে গিয়াছে। রায়মল উৎসে কল্যাণী তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিবেন, তাহা তিনি জানিতেন। তিনি দ্বিতীয় পথাবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া জ্ঞান করিলেন; কিন্তু এই শিষ্টাচার বহির্গত কার্য্যের জন্য তিনি কল্যাণীর সমীপে

কিরূপে দোষ ক্ষালন করিবেন, তাহার একটু আলোচনা করিলেন। ভাবিলেন, যদি বলিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে বলা যাইবে, উদয়পুর হইতে সহসা বিশেষ সংবাদ পাইয়া, অথবা তথাবিধ কোন কারণে আমাকে তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিতে হইয়াছে। ফলতঃ এস্থানে আর অপেক্ষা করিয়া কাজ নাই। এই সময় মুরারি হাঁফাইতে হাঁফাইতে নিকটস্থ হইয়া বলিল,—"দুর্গস্বামী, আমি এখন বাটী যাইতে পারিতেছি না। বন্ধুয়ার সহিত আমার এখনই না যাইলে নহে। অতএব আপনি দয়া করিয়া দিদিকে সঙ্গে লইয়া দুর্গে ফিরিয়া যাউন। দিদি কোন মতেই একা যাইতে পারিবেন না। সেই মহিষের আক্রমণের পর হইতে তাঁহার এ পথে চলিতে বড় ভয়।"

সমভারযুক্ত তুলার একদিকে একটি পালক নিক্ষেপ করিলেও সে দিক নত হইয়া পড়ে। দুর্গস্বামী বিচার করিলেন,—"এই নবীনা কামিনীকে একাকিনী ফেলিয়া যাওয়া অন্যায় ও অসম্ভব। একবার তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে, না হয় আর একবার হইবে, তাহাতে কি ক্ষতি? বিশেষতঃ আমি যে দুর্গ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতেছি, এ সংবাদ তাঁহাকে প্রসঙ্গতঃ না জানাইলে, আমার ভদ্রতার অন্যথা ঘটে।"

এই কার্য্য বিশেষ বিবেচনা-সঙ্গত ও যৎপরোনাস্তি আবশ্যক মনে করিয়া দুর্গস্বামী সেই সর্ব্বনাশকারী উৎসের অভিমুখে গমন করিলেন। তাঁহাকে সেই দিকে যাইতে দেখিবামাত্র, মুরারি বেগে বিপরীত দিকে চলিয়া গেল। দুর্গস্বামী দেখিলেন, কল্যাণী সেই ধ্বংসাবশেষ উৎস সমীপে আসীনা। তিনি একাকিনী তত্রত্য উপলখণ্ড বিশেষে উপবেশন করিয়া জলবুদ্বুদের লীলা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। কল্যাণীর উপবেশন-ভঙ্গী, তাঁহার কমনীয় কান্তি এবং দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া, যদি সে দৃশ্য কোন কুসংস্কার-তিমিরাবৃত ব্যক্তির সমক্ষে পড়িত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ সে তাঁহাকে সেই প্রবাদ-জননী রায়মল-প্রণয়িনী বলিয়াই মনে করিত। কিন্তু দুর্গস্বামীর চিত্তে তাদৃশ ভাবের আবির্ভাব হইল না। তিনি দেখিলেন, উপবিষ্টা কামিনী অসামান্যা সুন্দরী এবং সেই সুন্দরী তাঁহাকেই চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন; এই অভিজ্ঞতা তাঁহার চক্ষে সেই সৌন্দর্য্য আরও সংবর্দ্ধিত করিয়া দিল। তিনি যতই তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, মধুপ যেমন আতপতাপে বিগলিত হয়, তদ্রূপ তাঁহার স্থির সংস্কারও যেন শিথিল হইয়া আসিতেছে। তিনি বৃক্ষান্তরাল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সুন্দরীর সম্মুখীন হইলেন। সুন্দরী তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন,—"আমার ক্ষেপা ভাইটী বুঝি কোথায় খেলায় মাতিয়াছে; সুখের বিষয় কোন কার্য্যেই অধিকক্ষণ তাহার মন থাকে না,—এখনই হয়ত লাফাইতে লাফাইতে ছুটিয়া আসিবে।"

দুর্গস্বামী কোন কথাই না বলিয়া কল্যাণীর নিকট হইতে কিঞ্চিদ্দূরে ঘাসের উপর উপবেশন করিলেন।

এবংবিধ নিস্তব্ধতা নিতান্ত অসুখকর মনে করিয়া, কল্যাণী বলিয়া উঠিলেন,—"এই স্থান আমার বড়ই মনোরম। এই নির্ম্মল উৎসবারির ঝর্ঝর শব্দ, বৃক্ষসমূহের মধুর আন্দোলন এবং এই ধ্বংসাবশেষ মধ্যস্থ ঘাস ও বনফুলের প্রাচুর্য্য, এই স্থানকে আখ্যায়িকা-বর্ণিত স্থানের ন্যায়, মনোরম

করিয়াছে। শুনিয়াছি এই স্থান সম্বন্ধে নানা প্রকার উপাখ্যান প্রচলিত আছে।”

দুর্গস্বামী উত্তর দিলেন,—“লোকের বিশ্বাস এই স্থান আমাদের বংশের বড় প্রতিকূল। আমারও তদ্রূপ বিশ্বাস করিবার কারণ ঘটিয়াছে। কারণ এই স্থানেই কল্যাণী দেবীর সহিত আমি প্রথমে বাক্যালাপ করি এবং এই স্থানেই আমাকে তাঁহার নিকট হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিতে হইতেছে।”

কথার ভাব শুনিয়া কল্যাণীর মুখ শুষ্ক হইয়া পড়িল। তিনি বলিতে লাগিলেন,—“আমাদের নিকট হইতে বিদায়! কি ঘটিয়াছে দুর্গস্বামী, যে আপনাকে এত শীঘ্রই চলিয়া যাইতে হইবে? আমি জানি, শাস্তা আমার পিতাকে ঘৃণা না করুক, দেখিতে পারে না। অত্য তাহার কথ বার্ত্তা এতই রহস্যাচ্ছাদিত বলিয়া বোধ হইয়াছিল যে, আমি তাহা সম্পূর্ণরূপ বুঝিয়া উঠিতেই পারি নাই। কিন্তু ইহা আমার স্থির জ্ঞান যে, আপনি আমাদিগের যে মহদুপকার সাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমার পিতা আপনার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ। অতি কষ্টে আপনার বন্ধুত্ব লাভ করা হইয়াছে, অতি সহজেই যেন তাহা হারাইতে না হয়, ইহাই আমার প্রার্থনা।”

দুর্গস্বামী বিষাদ-ব্যঞ্জক হাস্যের সহিত কহিলেন,—“না কল্যাণী দেবি, সে আশঙ্কা সর্ব্বথা অমূলক। ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে আমি যখন যে ভাবেই পরিস্থাপিত হই না কেন, অথবা বিধাতা আমাকে যতই বিপদভারাবনত করুন না কেন, জানিবে, আমি সর্ব্বাবস্থায় এবং সর্ব্বকালে তোমার সুহৃদ্—অকপট সুহৃদ্ থাকিব; কিন্তু আমাকে প্রস্থান করিতেই হইবে; নচেৎ আমার সহিত অপরকেও বিপন্ন হইতে হইবে।”

“তাহা হউক দুর্গস্বামী, আপনি আমাদের নিকট হইতে যাইবেন না।” এই বলিয়া সরলা কল্যাণী, যেন তাঁহাকে ধরিয়া রাখিবার অভিপ্রায়ে, তাঁহার বস্ত্রাগ্র চাপিয়া ধরিলেন। তাহার পর আবার বলিলেন,—“আমাদের নিকট হইতে আপনার যাওয়া হইবে না। আমার পিতা ক্ষমতাবান্ ব্যক্তি। মহারাণার দরবারে পিতার আরও ক্ষমতাশালী বন্ধু আছেন, পিতা কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপে আপনার কি উপকার করেন, তাহা না দেখিয়া আপনার যাওয়া হইবে না। আমি সত্য বলিতেছি, তিনি আপনার জন্য অনেক চেষ্টা করিতেছেন।”

দুর্গস্বামী গর্ব্বিত ভাবে বলিলেন,—“তোমার কথা সত্য হইতে পারে। কিন্তু তোমার পিতার সাহায্যে উন্নতি আমার প্রার্থনীয় নহে। জীবন যুদ্ধে আত্ম-যত্নেই জয়ী হওয়া আবশ্যক। অসি, বর্ম্ম, ধনুর্ব্বাণ, সাহসী হৃদয়, এবং সবল হস্ত এই কয় সামগ্রীই আমার সহায় ও অবলম্বন।”

কল্যাণী হস্তে বদনাবৃত করিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধ চেষ্টা উপেক্ষা করিয়া, তাঁহার সুগোল অঙ্গুলিমালার মধ্য দিয়া, অশ্রুপুঞ্জ প্রবাহিত হইতে লাগিল। দুর্গস্বামী আগ্রহাতিশয় সহকারে সুন্দরীর দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,—“দেবি, আমাকে ক্ষমা কর। তোমার ন্যায় কোমল-প্রাণা, সৎস্বভাবা কামিনীর সহিত বাক্যালাপ কার্য্যে আমার ন্যায় অসভ্য উগ্র এবং কর্কশ স্বভাবের লোক সম্পূর্ণই অনুপযুক্ত। তোমার জীবনে এই পরুষ-মূর্ত্তি যে কখন দেখা দিয়াছিল, তাহা ভুলিয়া যাও।”

কল্যাণী তখনও বাম হস্তে নয়নাবৃত করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। দুর্গস্বামী কেন সহসা প্রস্থানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহার কারণ ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। এ সম্বন্ধে

তিনি যতই কারণ পরিস্ফুট করিতে লাগিলেন, ততই যেন তাঁহার অবস্থান করিবার ইচ্ছাই প্রকাশিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ তাঁহার বাক্য এমন স্থলে উপনীত হইল যে, তখন আর বিদায়ের কথা তাঁহার মনে নাই। তিনি বিদায়ের বিনিময়ে, তখন সুন্দরীর নিকটে চিরকালের নিমিত্ত আত্ম-সমর্পণ করিলেন এবং সুন্দরীও তাঁহার নিকট তদনুরূপ সত্যবন্ধনে বদ্ধ হইলেন। প্রেমোন্মত্ত হৃদয়ের আবেগে এই সকল কার্য্য এতই সত্বর সম্পন্ন হইল যে, দুর্গস্বামী এ কার্য্যের পরিণাম চিন্তার সময় পাইলেন না; এবং এতদ্বিষয়ক চিন্তা সমুপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই, তাঁহাদের অধরে অধরে ও হস্তে হস্তে মিলন হইয়া, এই নবীন প্রেমের সরলতা, দৃঢ়তা ও পবিত্রতা স্থায়ী রূপে বদ্ধ করিয়া দিল।

তাহার পর মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া দুর্গস্বামী বলিলেন,—"অতঃপর আমাদের এই প্রেমের বৃত্তান্ত কিল্লাদার মহাশয়কে অবগত করান আবশ্যক। দুর্গস্বামী, তাঁহার ভবনে অবস্থান করিয়া, কখনই প্রচ্ছন্নরূপে তাঁহার কন্যায় প্রণয়-প্রার্থনা করিতে পারে না!"

কল্যাণী সন্দিগ্ধ ভাবে বলিলেন,—"পিতাকে এখন একথা বলিবার প্রয়োজন নাই।" পরে অপেক্ষাকৃত দৃঢ়তা সহকারে বলিলেন,—"না পিতাকে বলিও না। অগ্রে তোমার জীবনের গতি নির্ণীত হউক, তোমার অভিপ্রায় ও পদ স্থির হউক, তাহার পর পিতাকে বলিও। আমি জানি পিতা তোমাকে ভাল বাসেন—বোধ হয় তিনি সম্মত হইবেন, কিন্তু মাতা—"

তিনি নীরব হইলেন। মাতার অনভিপ্রায়ে এতাদৃশ ব্যাপার স্থির করিতে পিতার অক্ষমতা সূচক সন্দেহ ব্যক্ত করিতে কল্যাণীর লজ্জা জন্মিল।

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"প্রাণেশ্বরি! তোমার জননী শৈলেশ্বর-সম্ভূতা। এই শৈলেশ্বর বংশের যখন অত্যুন্নত অবস্থা তখনও আমাদের বংশের সহিত আদান-প্রদান হইয়াছে। তবে এ বিবাহে তোমার মাতার কি আপত্তি হইতে পারে?"

কল্যাণী বলিলেন,—আমি আপত্তির কথা বলিতেছি না। তিনি নিতান্ত অহঙ্কৃতা ও অভিমানিনী। এরূপ বিষয়ে অগ্রে তাঁহার মত গৃহীত না হইলে, তিনি হয়তো ক্রোধ হেতু বিপরীতাচরণ করিতে পারেন।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"বেশতো। তিনি এক্ষণে উদয়পুরে আছেন—সেতো অধিক দিনের পথ নয়। কিল্লাদার মহাশয় তাঁহার নিকট পত্র লিখিয়া, তাঁহার সম্মতি আনাইয়া, বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করুন না কেন?"

কল্যাণী সঙ্কুচিতভাবে বলিলেন,—"কিন্তু অপেক্ষা করিলে ভাল হইত নাকি? কয়েক সপ্তাহ মাত্র অপেক্ষা—আমার মাতা যদি তোমাকে দেখিতেন, যদি তোমাকে জানিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি সম্মতি দিতেন। কিন্তু তোমাকে তিনি কখন দেখেন নাই—আর এই উভয় বংশের চির বিবাদ।"

দুর্গস্বামী সমুজ্জ্বল-নয়নে তীক্ষ্ণভাবে কল্যাণীর প্রতি চাহিলেন। যেন তিনি সেই দৃষ্টি দ্বারা কল্যাণীর হৃদ্‌ভাব পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিবার অভিপ্রায় করিলেন। বলিলেন,—কল্যাণি, তোমার ঐ মূর্ত্তির অনুরোধে আমি চিরপোষিত প্রতিহিংসার সাধ, বিষম প্রতিজ্ঞা সমূহ সকলই বিসর্জ্জন দিয়াছি! যে দিন আমার পিতার মৃত্যু হয়, সে দিন আমি তাঁহার সেই অন্তক

চিতায় হস্তার্পণ করিয়া এবং সমস্ত দেবকুলকে স্মরণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, এই অগ্নিদেবের প্রভাবে কাষ্ঠ-রাশি পরিবৃত পবিত্র কলেবর যেমন ভস্মীভূত হইতেছে, ক্রোধের প্রভাবে আমার শত্রুকুলের যদি সেই দশা উপস্থিত না হয়, তবে আমার বৃথা মনুষ্যত্ব।"

কল্যাণীর বদন পাণ্ডু হইয়া গেল। বলিলেন,—"এরূপ ভয়ানক প্রতিজ্ঞা করা মহাপাপ।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"তাহা আমি জানি, এবং ইহাও জানি যে, এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা আরও পাপ। আমার চিত্তের উপর তুমি কীদৃশ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছ, তাহা জানিবার ও বুঝিবার পূর্ব্বে আমি তোমারই কারণে হৃদয়ের এই বিষম প্রতিহিংসার বাসনা বিসর্জ্জন দিয়াছি।"

"তবে দুর্গস্বামী—তবে কেন এখন আমার প্রতি তোমার অনুরাগের বিরোধী—তোমার নিকট আমি যাহা স্বীকার করিয়াছি তাহার বিরোধী, এই ভয়ানক প্রতিজ্ঞার বিষয় উল্লেখ করিতেছ?"

"কারণ আমি তোমাকে বুঝাইতে চাহি, কি মূল্যে আমি তোমার প্রণয় ক্রয় করিলাম এবং তোমার পূর্ণ হৃদয়ের পূর্ণ প্রেমে আমার কতদুর অধিকার। আমার বংশের একমাত্র শেষ সম্পত্তি বংশ-গৌরব; এই প্রেমে তাহাও বিসর্জ্জিত হইতেছে; একথা যদিও আমি না বলি, বা না ভাবি—জগৎ হয়তো তাহা বলিবে ও ভাবিবে।"

"যখন আপনার হৃদয়ের এই ভাব, তখন নিশ্চয়ই আপনি আমার সহিত নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেছেন। এখনও সময় আছে—এখনও সাবধান হওয়া যায়। মানহানি স্বীকার না করিয়া, যখন আপনি আমাকে ভাল বাসিতে বা গ্রহণ করিতে পারেন না, তখন আপনি আপনার সত্য-বন্ধন পুনগ্রহণ করুন। যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা স্বপ্নের ন্যায় বিস্মৃতি-সাগরে বিলীন হউক—আমাকে আপনি বিস্মৃত হউন—আমিও আপনাকে ভুলিতে চেষ্টা করিব।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"আপনি আমার প্রতি অবিচার করিতেছেন। আমি যে আপনার প্রণয়ের নিমিত্তত্যাগ স্বীকারের উল্লেখ করিয়াছি, সে কেবল আপনাকে এই বুঝাইবার জন্য যে, আমার চক্ষে আপনার প্রেম কতই মূল্যবান্ এবং তাহা দৃঢ়তর বন্ধনে বদ্ধ করিতে আমার কতই বাসনা। আর আপনাকে বুঝাইতে চাহি, এত করিয়া যে প্রেম লাভ করিলাম, আপনার দ্বারা তাহার অন্যথা ঘটিলে কতই সন্তাপের কারণ হইবে।"

কল্যাণী বলিলেন,—"কেন আপনি তাহা সম্ভব বলিয়া মনে করিতেছেন? আমি অবিশ্বাসিনী সন্দেহ করিয়া কেন আপনি আমাকে ব্যথা দিতেছেন? পিতার নিকট এ প্রস্তাব করিবার জন্য, কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলাম বলিয়া আপনি কি এরূপ মনে করিয়াছেন? তাহা যদি হয়, তাহা হইলে আপনার যেরূপ ইচ্ছা আপনি সেইরূপ সত্যবন্ধনে আমাকে বদ্ধ করুন। হৃদয়ের বিশ্বাসের তুলনায় সত্যবন্ধন নিতান্ত অনর্থক, তথাপি হয়ত তাহাতে সন্দেহের পথ কিয়ৎ-পরিমাণে রুদ্ধ হইতে পারিবে।"

কল্যাণীর অসন্তোষ বিদূরিত করিবার নিমিত্ত দুর্গস্বামী নানা প্রকারে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। সরলহৃদয়া কল্যাণী সকলই ভুলিয়া গেলেন এবং দুর্গস্বামীর সন্দেহ-জনিত অপরাধ সহজেই ক্ষমা করিলেন। প্রণয়ি-যুগলের

বিবাদের অবসান হইলে, দুর্গস্বামী শাস্তার পরিত্যক্ত সেই স্বর্ণমুদ্রা দ্বিখণ্ডিত করিলেন এবং কল্যাণী তাহার একখণ্ড সূত্রদ্বারা বদ্ধ করিয়া বলিলেন,—"অদ্য হইতে যতদিন পর্য্যন্ত দুর্গস্বামী বিজয়সিংহ ইহা পুনগ্রহণ করিতে না চাহিবেন, ততদিন এই স্মৃতি-চিহ্ন আমার হৃদয়ের উপর বিরাজ করিবে এবং যতদিন আমি ইহা ধারণ করিব, ততদিন এ হৃদয়ে দুর্গস্বামী ভিন্ন অপর কাহারও প্রেম স্থান পাইবে না।"

অনুরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া দুর্গস্বামী বিজয়সিংহ ভগ্ন মুদ্রার অপরাংশ স্বীয় বক্ষে ধারণ করিলেন। এতক্ষণে তাঁহাদের স্মরণ হইল, দেখিতে দেখিতে অনেক সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং দুর্গ হইতে তাঁহাদের এই সুদীর্ঘ অনুপস্থিতি হয়ত ভয়ের কারণ হইয়া পড়িবে। তাঁহারা তাঁহাদের এই প্রেমবন্ধনের সাক্ষীভূত উৎস ত্যাগ করিয়া প্রস্থানাভিপ্রায়ে গাত্রোত্থান করিবামাত্র, তাঁহাদের পার্শ্বদেশ দিয়া একটী তীর শাঁ করিয়া চলিয়া গেল এবং তাঁহাদের উপবেশন স্থানের সমীপবর্ত্তী বৃক্ষশাখায় সমাসীন একটি শঙ্খচিলের দেহে গিয়া বিদ্ধ হইল। প্রাণহীন চিল আসিয়া কল্যাণীর পদ-নিম্নে পতিত হইল এবং তাহার কয়েক-বিন্দু শোণিত কল্যাণীর পরিচ্ছদ রঞ্জিত করিয়া দিল।

কল্যাণী অত্যন্ত ভীতা হইলেন এবং দুর্গস্বামী বিস্ময় ও ক্রোধ সহকারে এই অনীপ্সিত ও অচিন্তিত-পূর্ব্ব তীরনিক্ষেপকারীকে দেখিবার নিমিত্ত ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন। অবিলম্বে ধনুকধারী মুরারি দৌড়িতে দৌড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। দুর্গস্বামী বুঝিলেন, এই দুরন্ত বালকই বর্ত্তমান ব্যাপারের কারণ।

মুরারি বলিল,—"আমি জানিতাম তোমরা বিস্ময়াবিষ্ট হইবে। তোমরা যেরূপ একাগ্রচিত্ত হইয়া কথা কহিতেছিলে তাহাতে আমি ভাবিয়া ছিলাম যে, তোমরা কোনরূপ সন্ধান পাইবার পূর্ব্বেই, মৃত চিল তোমাদের ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে। দিদি, দুর্গস্বামী তোমাকে কি বলিতেছিলেন?"

কল্যাণীর অপ্রতিভ নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে দুর্গস্বামী বলিলেন,—"আমি তোমার ভগ্নীকে বলিতেছিলাম, মুরারি কি দুষ্ট ছেলে; আমাদিগকে অকারণ এতক্ষণ অপেক্ষা করাইয়া রাখিল।"

মুরারি বলিল,—"কি, আমি অপেক্ষা করাইয়া রাখিলাম? কেন, আমি তখনই বলিয়াছি, আমার বিলম্ব হইবে, আপনি দিদিকে সঙ্গে লইয়া বাটী যাউন। তাহা না করিয়া আপনি এখানে বসিয়া বকামি করিতেছেন, সে কি আমার দোষ?"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"আচ্ছা, সে কথা যাউক। এখন তুমি যে শঙ্খচিল মারিয়াছ তাহার কি জবাব দিবে দেও। তুমি জান, শঙ্খচিল দুর্গস্বামিগণের রক্ষিত এবং তাহাদের বধ করা নিতান্ত অশুভ লক্ষণ। যে সেরূপ অন্যায় কর্ম্ম করে তাহাকে বিষম শাস্তি দেওয়াই নিয়ম।"

মুরারি বলিল,—"ঠিক কথা, রঘুনাথও ঐ কথা বলিতেছিল। কিন্তু দেখুন দুর্গস্বামী মহাশয়, আমার নিশানা কেমন বলুন? কোন্ ডালের মধ্যে শঙ্খচিল বসিয়াছিল, আমি তাহাকে কেমন মারিয়াছি দেখুন। বলুন, আমার হাত ঠিক হইয়াছে কি না।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"তোমার নিশানা খুব ভাল হইয়াছে। যদি তুমি অভ্যাস রাখ,

তাহা হইলে কালে তুমি একজন প্রধান তীরন্দাজ হইবে।”

মুরারি বলিল;—“রঙ্গুয়াও ঐ কথা বলে। এখন আমি যদি ঐ অভ্যাস না রাখি সে আমার দোষ। কিন্তু আমার এ কার্য্যে প্রধান বাদী বাবা, আর গুরুমহাশয়। আবার ঐ দিদি ঠাকুরাণীও কম নহেন। আমি সময় নষ্ট করি বলিয়া উনিও রাগ করেন। কিন্তু উনি যে সঙ্গে সুন্দর যুবা পুরুষ থাকিলে সমস্ত দিন কুয়াবার ধারে বসিয়া গল্প করিয়া কাটাইয়া দেন, তাহা একটী বারও ভাবেন না। আমি উঁহাকে কতবার এমন করিতে দেখিয়াছি।”

দুষ্ট বালক বলিতে বলিতে বার বার দিদির মুখের পানে চাহিয়া দেখিতে থাকিল এবং বুঝিল যে, তাহার এই বাক্যে কল্যাণীকে বস্তুতই ক্লেশ দেওয়া হইতেছে। কিন্তু সে ক্লেশের পরিমাণ বা অবস্থা বালক প্রণিধান করিতে পারিল না।

বালক বলিল,—“আইস দিদি, রাগ করিও না। চিল মারা ছাড়া আর যাহা কিছু আমি বলিয়াছি সমস্তই মিথ্যা কথা। আর তোমার যদি অনেক ভাল বাসার লোক থাকেই, তাহাতে দুর্গস্বামীর ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছুই নাই; অতএব সে কথা মনে করিয়া দুঃখ করায় কাজ কি?”

যাহা শ্রবণ করিলেন তৎকালে তাহা দুর্গস্বামীর অসন্তোষ উৎপাদন করিল বটে। তিনি বুঝিলেন যে, সমস্ত কথাই এই মন্দ বালকের কল্পনা এবং তাহার ভগ্নীকে কষ্ট দিবার জন্য উপস্থিতমত অলীক কথা। যদিও দুর্গস্বামীর চিত্তে কোন মত সহজে স্থান পায় না, এবং একবার স্থান পাইলে তাহা সহজে স্থানান্তরিতও হয় না, তথাপি বর্ত্তমান ক্ষেত্রে মুরারির এই অলীক বাক্যসমূহও তাঁহার মনে অতি সামান্য পরিমাণে সন্দেহ জন্মাইয়া দিল। বস্তুতঃ এ স্থলে সন্দেহের কোন কারণ ছিল না, এবং তাঁহার মনেও প্রকৃতরূপ সন্দেহ জন্মে নাই। কল্যাণীর সেই প্রশান্ত স্নিগ্ধোজ্জ্বল নয়নের প্রতি চাহিয়া, কে তাঁহার স্বভাবের সুনির্ম্মলতা সম্বন্ধে অতি সামান্য মাত্র সন্দেহও হৃদয়ে স্থান দিতে পারে? তথাপি দুর্গস্বামীর হৃদয়ের বিবেকসঙ্গত অহ-ঙ্কার এবং তাঁহার সুপরিজ্ঞাত দারিদ্র্য সম্মিলিত হইয়া তাঁহাকে একটু সন্দিহান করিল। কিন্তু ভাগ্যদেবী তাঁহার প্রতিকূল না হইলে এরূপ বা অন্য কোনরূপ হীনতা কখনই তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না।

তাঁহারা দুর্গে উপনীত হইলে, রঘুনাথ রায় বলিলেন,—“কল্যাণী যদি দুর্গস্বামীর সহিত না থাকিয়া অপর কাহারও সহিত থাকিতেন, তাহা হইলে অন্য বিশেষ ভয়ের কারণ হইত ও এত বিলম্ব হেতু লোকজন পাঠাইয়া এতক্ষণ তত্ত্ব লইতে হইত। কিন্তু দুর্গস্বামী যেরূপ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সহিত থাকিলে কিছুই ভয়ের কারণ নাই।”

কল্যাণী তাঁহাদের অত্যধিক বিলম্বের কারণ দেখাইবার নিমিত্ত কথা আরম্ভ করি-লেন, কিন্তু বিবেকের বিরোধিতায় তিনি অনেক গোলমাল ঘটাইয়া ফেলিলেন। দুর্গ-স্বামী কল্যাণীর সহায়তাকল্পে কথা আরম্ভ করিলেন, কিন্তু পঙ্কে নিপতিত ব্যক্তিকে উদ্ধার করিতে গিয়া উদ্ধারকারীও যেমন তাহাতে নিমগ্ন হইয়া পড়ে, তাঁহার অবস্থাও সেইরূপ হইয়া পড়িল। প্রণয়িযুগলের এই ভাব চতুর কিল্লাদারের অগোচর রহিল না। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন লক্ষ্য না করাই তাঁহার

অভিপ্রায়। স্বয়ং সর্ব্বপ্রকারে নির্ব্বিঘ্ন থাকিয়া দুর্গস্বামীকে স্বীয় হস্তে বদ্ধ করিয়া রাখাই তাঁহার বাসনা। কিন্তু এ কথা তাঁহার একবারও মনে হয় নাই যে, কল্যাণী দুর্গস্বামীর হৃদয়ে যে প্রেম-বহ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিবে, যদি স্বীয় হৃদয়েও সেইরূপ অগ্নি জ্বলিতে দেয়, তাহা হইলে তাঁহার সকল বাসনাই বিফল হইয়া যাইবে। কিল্লাদার মনে করিয়াছিলেন, যদি কল্যাণী দুর্গস্বামীর প্রণয়েরই নিতান্ত বশবর্ত্তিনী হইয়া পড়েন, অথচ কিল্লাদারিণী যদি তাহাতে ভয়ানক আপত্তি উত্থাপন করেন, তাহা হইলে কল্যাণীর হৃদয় হইতে সে প্রণয় বিদূরিত করা নিতান্ত কঠিন হইবে না। কোনরূপ উপায়ে কল্যাণীকে উদয়পুরে লইয়া গেলে, তথায় নানা উচ্চ বংশজাত সম্ভ্রান্ত যুবকের সহিত তাহার পরিচয়ের সুযোগ ঘটিবে এবং অপর একজন সহজেই কুমারীর হৃদয়ে দুর্গস্বামীর স্থান অধিকার করিবে। এই জন্যই এরূপ প্রণয়-ব্যাপারে নিরুৎসাহকারি প্রক্ষেপ করিতে তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না।

এই ঘটনার পরদিন প্রাতে উদয়পুর হইতে একজন দূত কিল্লাদারের নিকট কতকগুলি পত্র লইয়া উপস্থিত হইল। কিল্লাদার সম্প্রতি মহারাণার দরবারে কোন বিশিষ্টরূপ চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন। তত্রত্য যে ব্যক্তি চক্রান্তে প্রধান লিপ্ত, তিনিই প্রধান পত্রের লেখক; অপরাপর চক্রান্তকারীও পত্র লিখিয়াছেন। এই সকল পত্রের সহিত দুর্গস্বামীর ঘনিষ্ট সম্পর্কীয় রামরাজাও এক পত্র লিখিয়াছিলেন। রামরাজা দরবারে অসীম ক্ষমতাশালী ব্যক্তি এবং কথিত চক্রান্তের বিষয়েও অভিজ্ঞ। রামরাজাকে কার্য্য-সূত্রে একবার কিল্লাদারের অধিকারে আসিতে হইবে। এ অঞ্চলে থাকিবার বিশেষ সুবিধা না থাকায়, তাঁহাকে কিল্লাদারের ভবনেই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে; তাঁহার পত্রে অন্যান্য কথা ব্যতীত এ কথাও লিখিত ছিল। তাঁহার প্রস্তাবে কিল্লাদার সন্তুষ্ট হইলেন। ভাবিলেন, বিজয়সিংহ তাঁহার দুর্গে থাকিতে থাকিতে রামরাজার আগমন ঘটিলে, দুর্গস্বামীর সহিত আত্মীয়তা আরও দৃঢ় হইবে এবং সম্ভবতঃ রাজার প্ররোচনায় দুর্গস্বামী এককালে শক্রতা পরিত্যাগ করিবেন। বিশেষতঃ এই সময় অহঙ্কৃতা কিল্লাদারিণী বাটী নাই, এই সময়ে রামরাজা আসিলে তাঁহার চক্রান্ত সংক্রান্ত কোন পরামর্শের ব্যাঘাত ঘটিবে না। তিনি যথোপযুক্ত উদ্যোগায়োজনের আদেশ দিলেন।

স্বসম্পর্কীয় মহাসম্ভ্রান্ত রামরাজা আসিবেন; তাঁহার আগমন কালে দুর্গস্বামী থাকিলে ভাল হয়, এই বলিয়া, দুর্গস্বামীকে আরও কিছু দিন থাকিতে অনুরোধ করা হইল। রায়মল উৎসের সমীপে কল্য যে কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে, তাহার পর সহসা এ স্থান ত্যাগ করিতে দুর্গস্বামীর আর বাসনা ছিল না; সুতরাং তিনি সহজেই রামরাজার আগমন কাল পর্য্যন্ত এই স্থানে অবস্থান করিতে সম্মত হইলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

যাহারা আজন্ম বা পুরুষ দুক্রমে ধন-সম্পত্তি সম্ভোগ করে ও গৌরবান্বিত পদে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহাদের তৎসমস্ত সুখস্বরূপ আয়ত্ত হইয়া যায় এবং তাহাদের কার্য্যাদি নিয়ত্তই

উচ্চতায় পরিপূর্ণ হয়। কিন্তু বিল্লাদ'রের পক্ষে সেরূপ ঘটনা না ঘটায়, তাহার ব্যবহারাদিতে অনেক সময়ে তাঁহার আধুনিকতা ও ক্ষুদ্র-হৃদয়তা প্রকাশ হইয়া পড়িত। দুর্গস্বামী তৎসমস্ত ব্যবহার দর্শনে নিরন্তর ব্যথিত হইতেন এবং কখন কখন আন্তরিক ভাব বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করিয়া ফেলিতেন। দুর্গস্বামীর এই ভাব দর্শনে কল্যাণী বড় ব্যথা পাইতেন। কল্যাণী ইহ সংসারে পিতাকে পরম দেবতা জ্ঞানে আরাধনা করিয়া থাকেন, সেই পিতা তাঁহার প্রাণবল্লভ দুর্গস্বামীর ঘৃণার সামগ্রী! এইরূপ কোন কোন বিষয়ে এই প্রণয়িযুগলের মত বৈষম্য ছিল। যতই একত্রাবস্থান হেতু একের চরিত্র অপরের চক্ষে পরিস্ফুট হইতে লাগিল, ততই তাঁহারা উভয়েই বুঝিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের প্রকৃতি পরস্পর বিভিন্ন। কল্যাণী এপর্য্যন্ত যত যুবক দেখিয়াছেন, তন্মধ্যে দুর্গস্বামীর প্রকৃতি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও অহঙ্কৃত ভাবে পূর্ণ—তাঁহার মতসমূহ সতেজ ও স্বাধীন। দুর্গস্বামী বুঝিলেন; কল্যাণীর প্রকৃতি নিতান্ত কোমল ও নমনশীল। এরূপ প্রকৃতি আত্মীয় স্বজনের প্ররোচনায় পরিবর্ত্তিত হওয়া বিচিত্র নহে। তিনি অনুমান করিলেন, তাঁহার পক্ষে অপেক্ষাকৃত স্বাধীনচেতা সঙ্গিনী আবশ্যক। যে কামিনী সংসার-বক্ষে তাঁহার সহিত অবিকৃত ভাবে ভ্রমণ করিতে সক্ষম এবং বিষম বিপদ-বাত্যা বা সৌভাগ্যের সুখনিশ্বাস উভয়েরই সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত, সেইরূপ সুন্দরীই তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইবার উপযুক্ত। কিন্তু কল্যাণীর অপূর্ব্ব মাধুরী, তাঁহার অসামান্য সৌন্দর্য্য, দুর্গস্বামীর প্রতি তাঁহার কোমলতাপূর্ণ অকৃত্রিম প্রেম ইত্যাদি নানা গুণ সম্মিলিত হইয়া তাঁহাকে দুর্গস্বামীর চক্ষে আদরের ধন করিয়া তুলিয়াছিল। অধুনা প্রণয়িযুগল পরস্পরের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিবার যেরূপ সুযোগ পাইয়াছেন, পূর্ব্বে তাঁহাদের সেরূপ কোন সুযোগ উপস্থিত হয় নাই এবং তাহার জন্য অপেক্ষা না করিয়াই তাঁহারা পরস্পরের নিকট সত্যবন্ধনে বদ্ধ হইয়াছেন। এখন তাঁহারা প্রেমপর্ব্বতের উচ্চতম স্থানে সমাসীন; আর প্রত্যাবর্ত্তন করা সহজ নহে। এখন তাঁহারা পরস্পরকে যেরূপ জানিয়াছেন, পূর্ব্বে এরূপ হইলে, একের হৃদয়ে হয়ত অপরের প্রতি অনুরাগ জন্মিত না। অধুনা কল্যাণীর প্রধান আশঙ্কা, পাছে দুর্গস্বামীর এই অহঙ্কৃত ভাব আত্মীয়গণের বিরাগ উৎপাদন করিয়া উঁহাদের বাঞ্ছিত বিবাহের ব্যাঘাত ঘটায়।

কল্যাণীর কোমল প্রকৃতি পাছে কখন পরানুরোধে এই প্রেমে উপেক্ষা করে দুর্গস্বামীর মুখ হইতে একদিন ইত্যাকার আশঙ্কা শ্রবণ করিয়া কল্যাণী বলিলেন,—"সে ভয় করিও না; লৌহ, কাচ বা তদ্রূপ কঠিন সামগ্রীতে যে ছায়াপাত হয়, তাহা তখনই মুছিয়া যায়। কিন্তু কোমল মানব হৃদয়ে যে ছায়া পড়ে, তাহা সমান ভাবে চিরস্থায়ী হয়।"

দুর্গস্বামী হাস্যের সহিত বলিলেন,—"কল্যাণী, এ সকল কবিতার কথা। কবিতার কথা সকল সময়ে সত্য হয় না।"

কল্যাণী বলিলেন,—"তবে কবিতার কথা, ছাড়িয়া দিয়া তোমাকে সহজ কথায় বলিতেছি যে, যদিও পিতা মাতার অমতে আমি কোন ব্যক্তির সহিত বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হইব না, তথাপি তোমাকে আমি যে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি, শত প্ররোচনা বা তিরস্কারেও তাহার অন্যথা করিতে পারিবে না।"

প্রণয়ী যুগলের এবংবিধ কথাবার্ত্তার সুযোগ সততই উপস্থিত হইত। মুরারি

প্রায়ই রঙ্গুয়া ভীলের সংঙ্গই থাকিত এবং কিল্লাদার রাজকীয় কার্য্যের চক্রান্তে এতই লিপ্ত থাকিতেন যে, প্রায়ই তাঁহার অন্য কোন বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য করিবার সময় থাকিত না। নানা কারণে রামরাজার আগমনে বিলম্ব ঘটিতে লাগিল, সুতরাং সেই অপেক্ষায় দুর্গস্বামীর অবস্থান কালও দীর্ঘ হইতে লাগিল। দুর্গস্বামীর সহিত কল্যাণীর বিবাহ ঘটে, ইহাই যে কিল্লাদারের আন্তরিক বাসনা ছিল এমন বোধ হয় না। সংপ্রতি দুর্গস্বামীর কতদূর উন্নতি সম্ভাবিত এবং রাজকীয় পরিবর্ত্তন সহ রামরাজা ও দুর্গস্বামী উভয়েরই কতদূর পরিবর্ত্তন ঘটিবার সম্ভাবনা, উভয়কে সম্মুখে রাখিয়া ইহাই পরীক্ষা করা কিল্লাদারের হৃদয়ের বাসনা, এবং সেই জন্যই যে কোন রূপে আপাততঃ দুর্গস্বামী তাঁহার হাতে থাকেন, ইহাই তাঁহার অভিলাষ। কিন্তু অবিবাহিত যুবক-যুবতীর সুদীর্ঘকাল একত্রাবস্থান, একত্র ভ্রমণ ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া লোকে নিন্দা করিতে আরম্ভ করিল। এই সকল নিন্দাকারীর মধ্যে আমাদের পূর্ব্বপরিচিত বীরবল ও শিবরাম প্রধান।

বীরবল এক্ষণে দিদিমার মৃত্যুহেতু সুবিস্তৃত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছেন এবং শিবরাম পার্শ্বচররূপে তাঁহারই নিকট অবস্থান করিতেছেন। কৌশলে ও প্রতারণায় অর্থ আত্মসাৎ করাই শিবরামের অভিপ্রায়। কিন্তু বীরবল সুদীর্ঘ কাল দারিদ্র্য দুঃখ ভোগ করিয়া অর্থের ব্যবহার বিশেষ জ্ঞাত হইয়াছেন, সুতরাং শিবরামের কৌশলে তিনি সহজে মোহিত হইতেন না—শিবরামের উদ্দেশ্য প্রায়ই সফল হইত না। বীরবল অন্তরের সহিত শিবরামকে ঘৃণা করিলেও, স্বীয় হীন ও কলুষিত রুচির অনুরোধে তাহার সংসর্গ ত্যাগ করিতে পারিতেন না।

দুর্গস্বামীর সমীপে শিবরাম যে লাঞ্ছিত হইয়াছিল, তাহা সে একদিনও বিস্মৃত হয় নাই। সে স্বয়ং অক্ষম। যদি বীরবলকে সে দুর্গস্বামীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে পারে, তাহা হইলে, তাহার প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইবে বিবেচনা করিয়া, সে নিয়ত তদনুরূপ চেষ্টা করিত। সে সুযোগ পাইলেই দুর্গস্বামী তাহাকে যে অপমান করিয়াছেন, সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিত এবং তাহার অপমানে যে বীরবলেরও অপমান হইয়াছে, তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিত। বীরবল কিন্তু এরূপ স্থলে শিবরামের বাক্যে অনাস্থা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া দিতেন।

একদিন এই প্রসঙ্গ শিবরাম কর্ত্তৃক উত্থাপিত হইলে, বীরবল বলিলেন,—"দুর্গস্বামী এ পর্য্যন্ত আমার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন, তাহাতে ভাল মন্দ দুই আছে; সুতরাং এ পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত শত্রুতা করিবার কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই। ভবিষ্যতে সেরূপ ঘটিলে অবশ্যই উচিত মত ব্যবহার করিতে হইবে।"

শিবরাম বলিল,—"বীরত্বে তুমি যে দুর্গস্বামীর অপেক্ষা—"

বীরবল বাধা দিয়া বলিলেন,—"আবার দুর্গস্বামীর কথা কেন?"

শিবরাম বলিল,—"দুর্গস্বামী অন্যায় কার্য্য করিয়াছে, কাজেই তাহার কথা কহিতে হয়। আমি বলিতেছিলাম, সাহসে ও বীরত্বে তুমি দুর্গস্বামীর অপেক্ষা কম নহ।"

বীরবল বলিলেন,—"তবে সাহস ও বীরত্ব কাহাকে বলে তাহা তোমার জানা নাই।"

শিবরাম হাঃ হাঃ শব্দে হাসিয়া বলিল,—

"সাহস—বীরত্ব—আমি জানি না বলিলে লোকে বিশ্বাস করিবে কেন? সে কথা যাউক, দুর্গস্বামীর বরাত ভাল। কিল্লাদার দুর্গস্বামীর পরম বন্ধু, আবার শুনিতেছি না কি তাহার মেয়ের সহিত দুর্গস্বামীর বিবাহ। ছিঃ ছিঃ কিল্লাদার নিশ্চয়ই পাগল হইয়াছে! নচেৎ এমন সুন্দরী কন্যাকে ঐ অহঙ্কারে পোরা অথচ অন্নহীন-পাত্রে সমর্পণ করিতে চাহে।"

বীরবল বলিলেন,—"কথাটা ঠিক কি না জানি না।"

বীরবলের কথার স্বর শুনিয়া শিবরাম বুঝিল, কথাটা নিতান্ত ভাসা কথা নহে। ইহার মধ্যে অবশ্যই বিশেষ অর্থ আছে। ভাবিল দেখা যাউক, এই কথা অবলম্বন করিয়া কোন নূতন লাভের পথ হয় কি না। বলিল,—"আমি জানি বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে, এবং পাত্র পাত্রী সর্ব্বদাই একত্র অবস্থিতি করিতেছে।"

বীরবল বলিলেন,—"সেটা কেবল বৃদ্ধ কিল্লাদারের বোকামী। কুমারীর মনে যদি কোন প্রেমের অঙ্কুর জন্মিয়া থাকে, তাহা সহজেই দূর হইয়া যাইতে পারে; সুতরাং কল্যাণীকে সাবধান না করা কিল্লাদারের উচিত কাজ হইতেছে না। যাহা হউক তোমাকে আজি আমি এক গোপনীয় পরামর্শ জানাইব—বিশেষ চক্রান্ত, বুঝিয়াছ?"

"বিবাহের পরামর্শ বুঝি?' শিবরাম হতাশ্বাস হইয়া এই কথা বলিয়া ফেলিল। গৃহিণীশূন্য বীরবলের সংসারে সে ইচ্ছামত আহারাদি করিয়া রহিয়াছে। বিবাহ হইলে ঘরে গৃহিণী আসিলে, তাহার এ সুখের দিন থাকিবে না ভাবিয়া সে বিমর্ষ হইল।

বীরবল তাহার মনের ভাব অনুমান করিয়া বলিলেন,—"বিবাহের কথাই বটে। কিন্তু তুমি এ সংবাদে এত দুঃখিত কেন? বিবাহই হউক, আর যাহাই হউক, আমার নিকট তোমার যে প্রত্যাশা তাহা চিরদিনই সমান থাকিবে। তোমার খাওয়া দাওয়া যেমন চলিতেছে তেমনই চলিবে, তাহা কি বলিতে হইবে?"

শিবরাম বলিল,—"সকলেই ঐ কথা বলে বটে, কিন্তু কেমন আমার বরাত, স্ত্রীলোক আমাকে দু-চক্ষের বিষ দেখে। তাহারা গৃহের গৃহিণী হইয়াই অগ্রে আমাকে তাড়াইতে চাহে।"

বীরবল বলিলেন,—"তুমি যদি প্রথম ধাক্কা সহিয়া টিকিয়া থাকিতে পার, তাহা হইলে তোমার দলিল হইয়া দাঁড়ায়, এবং তখন আর তোমাকে কেহই জোর করিয়া তাড়াইতে পারে না।"

শিবরাম বলিল,—"তাহা যে ছাই আমি পারি না! দেখ না কেন রাজা শম্ভু আমাকে কত যত্ন করিতেন, নিয়ত আমরা একত্র থাকিতাম, সুখের সীমা ছিল না। রাজার কেমন খেয়াল হইল, 'বিবাহ করিব।' আমি মহাশয় চেষ্টা চরিত্র করিয়া বিবাহ ঘটাইয়া দিলাম। কন্যা আমাকে পূর্ব্ব হইতে জানিত; ভাবিলাম, সে কখনই আমার প্রতি অত্যাচার করিতে পারিবে না। মহাশয় বলিব কি, বিবাহের পর এক পক্ষ যাইতে না যাইতেই সে আমাকে বাড়ী হইতে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিল।"

বীরবল বলিলেন,—"আমি কিংবা কল্যাণী সেরূপ লোক নহি, তাহা তুমি জান। যাহা হউক এ বিবাহ হইবেই; এখন এ ব্যাপারে তুমি কোনরূপ সাহায্য করিতে সম্মত আছ কি না, তাহাই জানিতে চাহি।"

শিবরাম বলিল,—"তুমি জমিদার—তুমি রাজা—তুমি মহাশয় লোক, তোমার জন্য আমি প্রাণ দিতে পারি—তোমার

সাহায্য করিতে সম্মত আছি কি না তাহা কি আর জিজ্ঞাসা করিতে হয়? কি করিতে হইবে বল।”

বীরবর কহিলেন,—“বলি শুন। তুমি জান, মিত্রনগরে আমার এক দূর সম্পর্কীয় খুড়ী আছেন। আমার অবস্থা যখন বড় মন্দ তখন খুড়ী আমায় ডাকিয়া একটা কথাও কহিতেন না। এখন ঈশ্বরেচ্ছায় আমার অবস্থা মন্দ নহে। এখন খুড়ীমা আমার হিতচেষ্টায় নিতান্ত ব্যস্ত। খুড়ীমার সহিত কিল্লাদারণীর অনেক দিনের পরিচয়। কিল্লাদারণী উদয়পুর হইতে ফিরিবার কালে কয়েক দিনাবধি খুড়ীমার বাটীতে বাস করিতেছেন। এখন ইঁহারা কথায় কথায় কল্যাণীর সহিত আমার বিবাহের কথা ঠিক করিয়া বসিয়াছেন। যাহাদের বিবাহ তাহাদের একটা কথাও না জানাইয়া, ইঁহারা কথা বার্তার পাকাপাকি করিয়াছেন। আমি জানি বাড়ীতে কিল্লাদারিণীর যথেষ্ট প্রভুত্ব, সুতরাং তিনি যাহা স্থির করিবেন তাহা সফল হইলেও হইতে পারে। কিন্তু আমার খুড়ীমা যে কোন্ ভরসায় এত আত্মীয়তা করিলেন, তাহা তিনিই বলিতে পারেন। আমার নিকট যখন সংবাদ আসিল, তখন আমি শুনিয়া অবাক্ হইলাম। প্রথমে রাগ হইল, তাহার পর হাসি আসিল, তাহার পর বুঝিলাম খুড়ীমার পরামর্শ মন্দ নহে। একবার ঘটনাক্রমে আমি কল্যাণীকে দেখিয়াছিলাম। মনের মত সামগ্রী বটে। আর বলিব কি, দুর্গস্বামী যে আমাকে দরজা বন্ধ করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল, এ রাগের শোধ লইতেই হইবে, ইহা আমার প্রতিজ্ঞা। এখন উঁহার মুখের এই আহার যদি কাড়িয়া লইতে পারি, তাহা হইলে উঁহার অহঙ্কার চূর্ণ হয়। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া বিবাহে মত দিলাম। অবশ্য দুর্গস্বামী আমার অপেক্ষা উপযুক্ত পুরুষ তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা হউক, আমি যেমন করিয়া পারি এই সুন্দরীকে লাভ করিব। এখন কিল্লাদারিণী খুড়ীমার বাটীতেই আছেন। তাঁহার নিকট আমার পত্র পাঠাইবার কথা আছে। সেই পত্র তোমাকে লইয়া যাইতে হইবে।”

শিবরাম বলিল,—“এখনই—এখনই—মিত্রনগর কেন, সে যদি সোণার লঙ্কা হয়, সেখানেও আমি যাইতে পারি।”

বীরবল বলিলেন,—“তাহা তুমি পার। কেবল পত্রের জন্য হইলে তোমাকে না পাঠাইয়া আর যে কোন ব্যক্তিকে পাঠাইলেও চলিতে পারিত। আরও কথা আছে। তোমাকে প্রসঙ্গতঃ, যেন অমনোযোগের সহিত জানাইতে হইবে যে, দুর্গস্বামী সম্প্রতি কমলাদুর্গেই রহিয়াছেন, কল্যাণীর সহিত দুর্গস্বামীর বড় ভাব, সর্ব্বদা নির্জ্জনে অবস্থান; আর জানাইতে হইবে যে, তাঁহাদের বিবাহের বিষয় স্থির করিবার জন্য রামরাজা শীঘ্রই কমলায় আসিতেছেন। এই সকল কথা কৌশল করিয়া কিল্লাদারিণীকে জানাইতে পারিলে, দুর্গস্বামীর সকল ভরসা শেষ হইয়া যাইবে; ইহা তুমি স্থির জানিও।”

শিবরাম বলিল,—“কোন চিন্তা নাই দুর্গস্বামীকে তাড়াইয়া তবে অন্য কথা।”

বীরবল বলিলেন,—“তবে শিবরাম, প্রস্তুত হও। তোমার পরিচ্ছদাদি ভাল নাই। ভাল পরিচ্ছদের জন্য এই টাকা লও। আমার আস্তাবলে যে ভাল কালো ঘোড়া আছে, সেটী তোমাকে দান করিলাম। তুমি সেইটীতে সোয়ার হইয়া এই শুভকার্য্যে যাত্রা কর। দেখ, তোমার কথা-বার্ত্তা অনেক সময় নীচ লোকের মত হইয়া পড়ে; সাবধান,

সেখানে যেন সেরূপ না হয়। আমি পত্রে তোমার নাম লিখিয়া দিলাম।"

শিবরাম যাত্রার উদ্যোগে গমন করিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

অশ্ব প্রস্তুত হইবামাত্র শিবরাম যাত্রা করিল এবং যথাকালে মিত্রনগরে উপস্থিত হইল। মহিলাদ্বয় তাহাকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন। পক্ষপাতিত্বের এমনই আশ্চর্য্য শক্তি যে, বীরবলের খুড়ীমা এবং কিল্লাদা-রণীর নিকট শিবরামের ন্যায় লোকও অতি উত্তম লোক বলিয়া আদৃত হইল। যাহা হউক, শিবরাম অন্যান্য নানা কথায় সময় কাটাইয়া যখন বুঝিল যে, প্রধান কথা ব্যক্ত করিবার সময় ও সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তখন সে ধীরে ধীরে ও কৌশলে ক্রমে কিল্লাদার ও কল্যাণীর শার্দ্দূলাবাসে আশ্রয় গ্রহণ, দুর্গস্বামীর সহিত আত্মীয়তা স্থাপন, সযত্নে, দুর্গস্বামীকে স্বীয় গৃহে আনয়ন, দুর্গস্বামীর সহিত কল্যাণীর সদ্ভাব, উভয়ের বহুক্ষণ ধরিয়া একত্র অবস্থান, নির্জ্জনে আলাপ, লোকের সন্দেহ ইত্যাদি সমস্ত বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিল। সমস্তই যেন শিবরাম দৈবাৎ ও অনিচ্ছায় বলিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কিল্লা-দারণীর বদন রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং তাঁহার কথা-বার্ত্তা সমস্ত নিতান্ত অন্যমনস্ক ভাবে পরিপূর্ণ হইল। অচিরে আরও প্রমাণ উপস্থিত হইল; কিল্লাদারিণী স্থির করিলেন, তাঁহাকে নানা কারণে অবিলম্বে বাটী ফিরিতে হইতেছে। অদ্যই যাত্রা করিতে হইবে এবং যত শীঘ্র সম্ভব পৌছিবার চেষ্টা করিতে হইবে। শিবরাম বুঝিল, আগুন লাগিয়াছে।

হতভাগ্য কিল্লাদার! যে তুমুল ঝটিকা তোমাকে বিপর্য্যস্ত করিবার জন্য প্রধাবিত হইতেছে, তুমি তাহার কোন সংবাদই রাখ না। অদ্য রামরাজা আসিবেন, স্থির সংবাদ আসিয়াছে। কিল্লাদার, দুর্গস্বামী ও কল্যাণী ছাদের উপর দাঁড়াইয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। সকলেই এই আগত প্রায় রাজ-অতিথির প্রতীক্ষায় ব্যাকুলতা দেখাইতেছেন।

বহু প্রতীক্ষার পর সুদূরে অস্ত্রাদিধারী রক্ষিবর্গ-পরিবেষ্টিত এক অশ্ব-যান তাঁহাদের নেত্রপথে পতিত হইল, এবং তাহাতেই যে রামরাজা আছেন, তাহা তাঁহারা সকলেই অনুমান করিলেন। তাঁহার কীদৃশী অভ্যর্থনা করিতে হইবে এই পরামর্শে কিল্লাদার এতই নিবিষ্টচিত্ত হইলেন যে, তৎকালে বিপরীত পথাবলম্বন করিয়া, অপর একখানি যান যে তাঁহার দুর্গাভিমুখে প্রধাবিত হইতেছে, তাহা তিনি দেখিতে পাইলেন না। বালক মুরারি বার বার জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, দুইই কি রামরাজা?" কোন উত্তর না পাইয়া সে পিতার কাপড় ধরিয়া টানিল এবং অগত্যা কিল্লাদার বালক-প্রদর্শিত পথে দৃষ্টিপাত করি-লেন। যাহা দেখিলেন তাহাতে, অন্যের যাহাই হউক, তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল। তিনি বুঝিলেন যে, এরূপ সময়ে কোন সম্ভ্রান্ত প্রতিবেশীরই আসিবার সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয় যানে কিল্লাদারিণী ভিন্ন আর কেহই নহে। কিল্লাদারণী তাঁহাকে এই অপ্রীতিকর সহচর দুর্গস্বামীর সহিত দেখিলে না জানি কি বিপদ ঘটাইবেন, তাহাই মনে করিয়া তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তখন

আর হাত নাই—আর সাবধান হইবার সময় নাই। প্রকাশ্যে সর্ব্বসমক্ষে তাঁহাকে অপমানিত হইতে না হয়, ইহাই তিনি তখন ঈশ্বর-সমীপে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

কেবল যে কিল্লাদারের চিত্তেই এরূপ ভাবান্তর জন্মিল তাহা নহে। কল্যাণীও, মাতৃদেবী আসিতেছেন জানিতে পারিয়া, নিতান্ত ভয়চকিত ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া দুর্গস্বামীর প্রতি চাহিয়া বলিতে লাগিলেন,—"মা আসিতেছেন—ঐ মা আসিতেছেন।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"ঐ গাড়িতে কিল্লাদারণী আসিতেছেন, তাহাতে তোমাদের এত ভীত ভাব কেন? গৃহের কর্ত্রী গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন, ইহার অপেক্ষা আনন্দের কথা আর কি আছে?"

নিতান্ত ভয়চকিত স্বরে কল্যাণী বলিলেন,—"তুমি আমার মাতাকে জান না। তোমাকে এই স্থানে দেখিয়া না জানি তিনি কি বলিবেন।"

দুর্গস্বামী গর্ব্বিত ভাবে বলিলেন,—"তবে তো আমার এতদিন এখানে থাকাই ভাল হয় নাই।" তাহার পর অপেক্ষাকৃত কোমল ভাবে পুনরায় বলিলেন,—"কেন কল্যাণী, এরূপ অমূলক ভয়ে কাতর হইতেছ? তোমার জননী ভদ্রবংশ-সম্ভূতা—উচ্চ সমাজে পরিচিতা। স্বামীর ও বন্ধুগণের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা বিধেয়, তাহা অবশ্যই তাঁহার অবিদিত নাই।"

কল্যাণী হতাশ ভাবে মস্তকান্দোলন করিলেন। তাঁহার যেন মনে হইল, তিনি যে তৎকালে দুর্গস্বামীর পার্শ্ববর্ত্তিনী রহিয়াছেন, তাঁহার জননী অর্দ্ধক্রোশ পরিমিত অন্তর হইতেও, তাহা সুন্দররূপে দেখিতে পাইতেছেন। ভয়চকিতা বালিকা সে স্থান হইতে সরিয়া মাতুলের নিকট দাঁড়াইলেন। উৎকণ্ঠিত কিল্লাদারও সে স্থান ত্যাগ করিলেন। গমনকালে তিনি দুর্গস্বামীকে সঙ্গে আসিতে আহ্বান করিলেন না। অগত্যা দুর্গস্বামী সেই ছাদের উপর ভবনবাসী জনগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও বিদূরিত ভাবে একাকী দাঁড়াইয়া রহিলেন।

যে হৃদয়ে একদিকে দারিদ্র্য-দুঃখের যেমন আধিক্য, অন্য দিকে অহঙ্কারের সেই পরিমাণে আতিশয্য, সে হৃদয়ে এ ভাব বড় বিরক্তিকর হইয়া উঠিল। তিনি মনে করিলেন, তিনি যে কিল্লাদারের সম্বন্ধে হৃদয়ের বদ্ধমূল ক্রোধ বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করা হইয়াছে, নিজের কোনই উপকার হয় নাই। অস্ফুটস্বরে বলিলেন,—"কল্যাণীর অপরাধ ক্ষমার যোগ্য। সে বালিকা, ভীরুস্বভাবা, এবং মাতার অজ্ঞাতসারে যে গুরুতর সত্যে সে বদ্ধ হইয়াছে, তজ্জন্য তাহার সঙ্কোচ নিতান্ত সম্ভব। তথাপি তাহার মনে থাকা আবশ্যক, কাহার সহিত সে সত্যবন্ধনে বদ্ধ হইয়াছে। বর্ত্তমান নির্ব্বাচন তাহার লজ্জার কারণ হইয়াছে, এরূপ সন্দেহ যাহাতে তাহার মনে উদিত না হয়, তাহার জন্য আমারও চেষ্টিত থাকা আবশ্যক।"

এইরূপ সন্দিগ্ধ ও চিন্তিত ভাবে তিনি ছাদ হইতে নামিয়া অশ্বশালার দিকে গমন করিলেন এবং অশ্ব-রক্ষককে বলিয়া দিলেন যে, তাঁহার অশ্ব যেন প্রস্তুত থাকে; হয়ত তাঁহাকে অবিলম্বে স্থানান্তরে যাইতে হইবে।

কিল্লাদারণী যখন স্বীয় শকট হইতে জানিতে পারিলেন যে, অপর এক অতিথি দুর্গাভিমুখে আসিতেছেন, তখন তিনি অগ্রে দুর্গে পৌঁছিবার আশয়ে শকটচালককে যথাসম্ভব দ্রুতবেগে শকট চালাইতে আদেশ করিয়া দিলেন। রামরাজার শকটচালক ও আর্দ্দালী

যাত্রিকগণ, আপনাদের প্রভুর পদ-গৌরব স্মরণ করিয়া, তাঁহার মানের হীনতা বা অশ্বগণের ক্ষমতা দেখাইতে অনিচ্ছা করিল। তখন প্রাণপণ যত্নে তাহারাও অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। উভয় শকট-চালক সজোরে অশ্ব-পৃষ্ঠে কশাঘাত করিতে লাগিল। কিল্লাদারণীর দূরত্ব হেতু কিল্লাদারের একটু ভাবিবার সময় ছিল; শকটের বেগবৃদ্ধি সহকারে তাহাও অল্প হইয়া আসিল। শকট বায়ুবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। তখন ঐ আগন্তুক প্রায় শকটের পতন ও সঙ্গে সঙ্গে শকটারোহীর মস্তক চূর্ণ না হইলে, তাঁহার আশঙ্কা বিদূরিত হইবার উপায়ান্তর রহিল না। তাদৃশ দৈব দুর্ঘটনা ঘটিলেও কিল্লাদার যে তৎকালে আন্তরিক ব্যথিত হইতেন এমন বোধ হয় না। সে দুরাশাও ঘুচিয়া গেল। কিল্লাদারণী তাঁহারই ভবনে একজন আগন্তুক এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত গাড়ির দৌড় লাগাইয়া দেওয়া অবৈধ মনে করিলেন এবং শকট-চালককে বেগ মন্দীভূত করিতে আজ্ঞা দিলেন।

কাতরচিত্ত কিল্লাদার, মুরারি, কল্যাণী ও বহুসংখ্যক ভৃত্য দুর্গের পুরোভাগে দাঁড়াইয়া আগন্তুকগণের অভ্যর্থনার্থ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

রামরাজার শকট আসিয়া উপস্থিত হইলে, কিল্লাদার তাঁহাকে পরম আদরে ও বিহিত শিষ্টাচার সহকারে পুর-মধ্যে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিলেন। তথায় দুই একটী মাত্র কথাদ্বারা রামরাজা জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার পশ্চাতে যে, অপর এক শকট আসিতেছে, তাহাতে কিল্লাদারণী যোধসুন্দরী আগমন করিতেছেন। রামরাজা, কিল্লাদার মহাশয়কে তাঁহার পথশ্রান্তা পত্নীর সম্ভাষণার্থ গমন করিতে অনুরোধ করিলেন। কিল্লাদার বিনা বাক্যব্যয়ে তদভিপ্রায়ে যাত্রা করিলেন।

কিল্লাদারণী শকট হইতে অবতরণ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে শিবরামও অবতরণ করিল। কিল্লাদারণী কিল্লাদারের বদন দেখিয়াও দেখিলেন না এবং তাঁহার ভাব দেখিয়া কিল্লাদারও কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন না। কিল্লাদারণী দলবলসহ গৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া গৃহিণী দেখিলেন, রামরাজা বিশেষ মনঃসংযোগ সহকারে দুর্গস্বামীর সহিত কথাবার্তা কহিতেছেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র রামরাজা অগ্রসর হইয়া কহিলেন,—"বহুদিন পূর্ব্বে পরিচিত রাম অদ্য আপনার ভবনে অতিথি রূপে উপস্থিত। বহুদিন অসাক্ষাৎ হেতু আপনি হয়ত তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছেন।"

যোধসুন্দরী কথা কহিলেন না, কেবল মস্তক আন্দোলন করিয়া রামরাজার বাক্যের শেষাংশের প্রতিবাদ করিলেন।

রামরাজা আবার বলিলেন,—"দেবি, বিবাদভঞ্জন করাই আমার আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য। আমার ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি এই নবীন দুর্গস্বামীর সহিত আপনাদের চির-বিবাদের অবসান হইয়া সংপ্রীতি সংস্থাপিত হয়, ইহাই আমার বাসনা।"

কিল্লাদারণী ঈষদ্ধাস্য করিলেন মাত্র। তাহার পর কিল্লাদারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"আমার সঙ্গে এই যে ভদ্রলোকটী আসিয়াছেন, ইনি বড় বীর; ইহার নাম শিবরাম।" কিল্লাদারণী আগমন করার পর স্বামীর সহিত এই প্রথম আলাপ করিলেন।

কিল্লাদার শিবরামের সহিত শিষ্টাচারসূচক আলাপ করিতে লাগিলেন। দুর্গস্বামী অগ্রসর হইয়া শিবরামকে বলিলেন,—"আপনার

সহিত আমার অনেক দিনের আলাপ মনে পড়ে কি?"

শিবরাম ভীত ও সঙ্কুচিত ভাবে বলিল,—"তাহা আর পড়ে না? বিলক্ষণ!"

কিল্লাদারণী সকলের সহিত আলাপ করিয়া গৃহান্তরে গমন করিলেন। কিল্লাদারও অপরাধী ব্যক্তির ন্যায় স্ত্রীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে শিবরামের প্রাণ কিছু চঞ্চল হইল। এই দারুণ দু দুর্গস্বামীর সহিত থাকিতে তাহার ভয় হইল। সে একটি কারণ দেখাইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। সুতরাং রামরাজা ও দুর্গস্বামী ভিন্ন তথায় আর কেহ থাকিল না। তাঁহারা অদ্যকার অভ্যর্থনা বিষয়ক প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে লাগিলেন।

এদিকে কিল্লাদার-দম্পতী অপর গৃহে প্রবেশ করিলে কিল্লাদারণী এতক্ষণ বহুযত্নে মনের যে দুর্দ্দমনীয় বেগ সংবরণ করিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া স্বামীকে বলিলেন,—"কিল্লাদার মহাশয়, আমার অনুপস্থিতি কালে আপনি যে সকল আত্মীয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা আপনার বংশ ও সংসর্গের অনুরূপই হইয়াছে। আপনার নিকট হইতে অন্যরূপ প্রত্যাশা করা নিতান্ত ভ্রমের কার্য্য।"

কিল্লাদার উত্তর দিলেন,—"প্রাণেশ্বরি, প্রিয়তমে 'যোধ', মুহূর্ত্তমাত্র তুমি যুক্তিযুক্ত কথায় কর্ণপাত কর। আমি তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি যে, আমার বংশের ইষ্ট ও মর্য্যাদার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আমি সমস্ত কার্য্য করিয়াছি।"

কুপিতা কামিনী কহিলেন,—"আপনার বংশের ইষ্টান্বেষণে—সম্ভবতঃ মর্য্যাদা রক্ষা কার্য্যে আপনি সম্পূর্ণ অক্ষম। কিন্তু আমার বংশ-গৌরব আপনার সহিত অপরিহার্য্য ভাবে সংবদ্ধ। অতএব আমি যদি তৎসম্বন্ধে মনঃসংযোগ করি, তাহা হইলে অবশ্যই আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

রঘুনাথ রায় বলিলেন,—"কিল্লাদারণি, তোমার অভিপ্রায় কি? কেন তুমি এই সুদীর্ঘ অনুপস্থিতির পর আমার উপর এরূপ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলে?"

"আপনার জ্ঞান ও বুদ্ধিকে জিজ্ঞাসা করুন। আপনার যে জ্ঞান ও বুদ্ধি আপনার একমাত্র তনয়াকে, আপনার বংশের চির-শত্রু, ভিক্ষুক, রাজদ্রোহী ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিতে প্রবৃত্তি জন্মাইয়াছে, সেই জ্ঞান ও সেই বুদ্ধি এ সকল প্রশ্নের সদুত্তর দিবে।"

"তুমি আমাকে কি করিতে বল? কল্য যে যুবক আমার এবং আমার তনয়ার জীবন আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিল, তাহাকে কি তুমি গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া দিতে উপদেশ দাও?"

পরিহাসের হাসি হাসিয়া কিল্লাদারণী বলিলেন,—"আপনাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিল—বটে! সে সকল কথা আমি শুনিয়াছি। আপনাকে গরুতে তাড়া করিয়াছিল, আর আপনার ঐ অসীম ক্ষমতাশালী জীবনরক্ষক সেই গরু তাড়াইয়া দিয়াছিল। ধিক্ আপনাকে!"

কিল্লাদার নিরুপায় হইয়া বলিলেন,—"তোমার বাক্য অসহ্য। আর কথায় কাজ নাই। বল, কি করিলে তোমার সন্তোষ জন্মিবে, আমি তাহাতেই প্রস্তুত আছি।"

তখন সেই কুপিতা কামিনী বলিলেন,—"তবে কিল্লাদার, এখনই তোমার অতিথিগণের নিকটে যাও। তোমার জীবনদাতা দুর্গস্বামী

মহাশয়কে গিয়া বল যে, যোদ্ধা শিবরাম ও অন্যান্য বন্ধুর আগমন হেতু এ দুর্গে তাঁহার আর স্থান হইবে না।"

তাঁহার স্বামী বলিলেন,—"বল কি? কি সর্ব্বনাশ! শিবরামের—ইতর, নীচ শিবরামের স্থান। করিবার জন্য দুর্গস্বামীকে প্রস্থান করিতে হইবে! আমি শিবরামকে যদি দুর্গ হইতে বহিষ্কৃত হইতে না বলি, তাহাই যথেষ্ট। তাহাকে তোমার সঙ্গী দেখিয়া আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি।"

"যখন ঐ ভদ্রলোক আমার সঙ্গে ছিলেন, তখনই তোমার বুঝা উচিত যে, উনি উপযুক্ত সঙ্গী। আমি জানি দুর্গস্বামী একজন মান-য় বন্ধু সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, তাহার সম্বন্ধেও অন্য ঠিক সেইরূপ ব্যবহার উপযুক্ত। যাহা বলিলাম, সেইরূপ কার্য্য কর। জানিও, যদি দুর্গস্বামী গৃহত্যাগ না করে, তাহা হইলে, আমি গৃহত্যাগ করিব।"

বলা বাহুল্য যে কিল্লাদার স্ত্রীকে যৎপরোনাস্তি ভয় করিয়া চলিতেন। অধুনা উদ্বেগ, ভয়, লজ্জা এবং ক্রোধ তাঁহাকে নিতান্ত চঞ্চলচিত্ত করিয়া তুলিল; তিনি সেই প্রকোষ্ঠ-মধ্যে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে বলিলেন,—"সুন্দরি! আমি তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি যে, দুর্গাস্বামীর সহিত এরূপ অনুপযুক্ত ব্যবহারে আমি নিতান্ত অক্ষম। যদি তুমি কাণ্ড-জ্ঞান-হীনের ন্যায় স্বকীয় ভবনে একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে অপমান করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া থাক, তাহা হইলে, আমি তোমাকে নিষেধ করিতে চাহি না। কিন্তু তাদৃশ ভয়ানক কার্য্যে আমি কদাচ লিপ্ত থাকিব না।"

স্ত্রী জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি থাকিবে না?"

স্বামী উত্তর দিলেন,—"না—কখন না। আমাকে ভদ্রতা সঙ্গত যে কোন অনুরোধ কর, ধীরে ধীরে তাহার সহিত বন্ধুত্ব ত্যাগ করিতে বল, অথবা তদ্রূপ আর যে কোন কথাই বল, তাহা আমি শুনিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু এরূপ অবৈধ কার্য্যে আমি কখনই সম্মত নহি।"

কিল্লাদারণী বলিলেন,—"পূর্ব্বে যেরূপ বারংবার ঘটিয়াছে, এবারও দেখিতেছি সেইরূপ বংশ-গৌরব রক্ষা করিবার ভার আমাকেই গ্রহণ করিতে হইতেছে।"

এই বলিয়া সেই উগ্রস্বভাবা কামিনী ত্বরিত এক খানি পত্র লিখিলেন। লেখা সমাপ্ত হইলে, তিনি উহা একজন দাসীর হস্তে দিবার নিমিত্ত উদ্যোগী হইলে, তাঁহাকে আর একবার যুক্তি দ্বারা নিরস্ত করিবার অভিপ্রায়ে কিল্লাদার বলিলেন,—"কিল্লাদারণি, ভাবিয়া দেখ কি করিতেছ। তুমি এক ব্যক্তিকে অকারণে প্রবল শত্রু করিয়া তুলিতেছ—এবং সম্ভবতঃ ঐ ব্যক্তির দ্বারা আমাদের অনিষ্ট—"

যোধসুন্দরী বাধা দিয়া ঘৃণার সহিত বলিলেন,—"কোন শৈলম্বর-বংশীয় লোক শত্রুকে ভয় করে, একথা কখন শুনিয়াছ কি?"

"জানিও, এ ব্যক্তি বহু শৈলম্বর-বংশীয়ের ন্যায় অহঙ্কৃত ও প্রতিহিংসক। একথা এক রাত্রি আলোচনা করিয়া দেখিলে ভাল হয়।"

"আর এক মুহূর্ত্তও আলোচনা করিতে হইবে না। কে ও—পান্না? এই পত্রখানি বিজয়সিংহকে দিয়া আইস।" দাসী পত্র লইয়া গেল।

কিল্লাদার বলিলেন,—"আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপরাধ।"

তিনি, সে স্থান হইতে চলিয়া গিয়া, ভবন-সংলগ্ন উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। এই বিসদৃশ

পত্র প্রাপ্তি হেতু দুর্গস্বামীর মনের যে প্রথম উত্তেজনা তাহা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে, তিনি তাঁহাদের সমীপস্থ হইবেন বলিয়া স্থির করিলেন। যথোপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া যখন তিনি গৃহাগত হইলেন, তখন তিনি দেখিলেন, রামরাজা তাঁহার অনুচরকে আদেশ করিতেছেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া, তিনি নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইল। কিল্লাদার আপ্যায়িত-সূচক কথাবিশেষ আরম্ভ করিবামাত্র রাজা বাধা দিয়া বলিলেন, —"আমার বোধ হয় কিল্লাদার মহাশয়, আপনার গৃহিণী আমার জ্ঞাতি দুর্গস্বামীর নিকট এই যে পত্র পাঠাইয়াছেন, ইহার মর্ম্ম আপনার অবিদিত নাই। এরূপ পত্রের পর আমিও যে এস্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করিব, তাহাও বোধ হয় আপনার অগোচর নাই। আমার জ্ঞাতি কাহারও নিকট বিদায় না লইয়া অগ্রেই চলিয়া গিয়াছেন। এরূপ অবৈধ অপমানের পর তাঁহার সহিত যাবতীয় শিষ্টাচারের বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, একথা বলাই বাহুল্য।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"যথার্থ বলিতেছি, আমি এ পত্রের ব্যাপারে লিপ্ত নহি। কিল্লাদারণী উগ্র প্রকৃতির লোক। তাঁহার ব্যবহারে এরূপ অপমান ঘটায় আমি আন্তরিক দুঃখিত হইতেছি। ভরসা করি, মহাশয় বিবেচনা করিবেন যে স্ত্রীলোক—

রামরাজা বলিলেন,—"স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকের ন্যায় থাকিবে।" এই বলিয়া রামরাজা কিল্লাদারের অসমাপিত বাক্য সমাপ্ত করিয়া দিলেন।

কিল্লাদার বলিলেন,—"তাহা যথার্থ। তবে কি না—"

আবার রামরাজা বাধা দিয়া কহিলেন,—"কিন্তু কথায় কি কাজ? ঐ কিল্লাদারণী আসিতেছেন। আমি তাঁহার নিজমুখ হইতেই এই বিসদৃশ ব্যবহারের কারণ জানিতে চাহি।"

তিনি নিকটস্থ হইলে রামরাজা কিল্লাদারণীর লিখিত পত্র খানি হস্তে লইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। তাঁহাকে তদ্রূপ ভাবে সমাগত দেখিয়া কিল্লাদারণী বলিলেন,—আমার অনুমান হইতেছে, আপনি কোন অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবেন। দুঃখের বিষয় মহাশয়ের শুভাগমন কালের মধ্যে এই কাণ্ড সংঘটিত হইল; কিন্তু উপায়ান্তর না থাকাতেই এরূপ করিতে হইয়াছে। বিজয়সিংহ নামক এক ব্যক্তি কিল্লাদারের কোমল প্রকৃতির প্রশ্রয় পাইয়া অত্রত্য আতিথেয়তা সম্বন্ধে নিতান্ত দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছে এবং অবৈধ উপায়ে একটী কুমারীর চিত্ত হরণ করিয়া তাহার পিতা মাতার অজ্ঞাতে ও অনভিপ্রায়ে তাহাকে বিবাহ সম্মত করাইয়াছে।"

রামরাজা বলিলেন,—"আমার জ্ঞাতি এরূপ কার্য্যের উপযুক্ত নহেন।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"আমার স্থির বিশ্বাস, আমার কন্যা কল্যাণী এরূপ কার্য্যের আরও অনুপযুক্ত।"

বোধসুন্দরী বলিলেন,—"রাজা মহাশয়, আপনার জ্ঞাতি (যদি তিনি বস্তুতঃ তাহাই হন) প্রচ্ছন্ন ভাবে এই সরলহৃদয়া বালিকার হৃদয় হরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিল্লাদার মহাশয়, আপনার সরলা কন্যা, এই অনুপযুক্ত ব্যক্তির বাক্যে যেরূপ আস্থা প্রদর্শন করা উচিত, তদপেক্ষা অধিক আস্থা প্রদর্শন করিয়া তাহাকে এই ধৃষ্টতায় উৎসাহিত করিয়াছেন।"

কিল্লাদার একটু বিরক্ত ভাবে বলিলেন,—"তোমার বলিবার যদি এই কথা ভিন্ন আর

কিছু না থাকে, তাহা হইলে একথা লোকের কাছে না বলিয়া ঘরের কথা ঘরে রাখাই উচিত ছিল ”

তাঁহার গৃহিণী বলিলেন,—“যাহাকে রক্তসম্পর্কীয় বলিয়া শ্রদ্ধার ভাজন রামরাজা মহাশয় উল্লেখ করিতেছেন, তাঁহার প্রতি আমি যে ব্যবহার করিয়াছি, তাহার কারণ জানিতে রাজার অবশ্যই অধিকার আছে।”

রামরাজা বলিলেন,—“আপনি যে কারণের কথা বলিলেন, তাহা আমি এই প্রথম শুনিলাম। ভাল, যদি তাহাই হয়, তাহা হইলেও আমার জ্ঞাতি উচ্চবংশজাত এবং পদস্থ ব্যক্তিগণের সহিত নানা প্রকারে সম্বদ্ধ। তাহার বক্তব্য শ্রবণ করা উচিত ছিল ; এবং কিল্লাদার রঘুনাথনন্দিনীর প্রতি প্রেমপূর্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করা যদিও দুর্গস্বামীর পক্ষে আকাঙ্ক্ষা বলিয়া পরিগণিত হয় তথাপি তাহাকে ভদ্রতা সহকারে প্রত্যাখ্যান করা উচিত ছিল।”

যোবনসুন্দরী বলিলেন,—“কিল্লাদার-নন্দিনী ক্যাণীর মাতামহ-কুল কিরূপ তাহা মনে করিয়া দেখিবেন।”

রামরাজা বলিলেন,—“আমি জ্ঞাত আছি, আপনি শৈলস্বর-রাজবংশের একতম নিম্নশাখাতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আমি আপনাকে মনে করাইয়া দিতেছি যে, এই দুর্গস্বামি-শৈলস্বর-রাজবংশের সহিত তিনবার বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইয়াছেন। দেবি, বিগত বৃত্তান্ত বিস্মৃত হউন, মনোমালিন্য ত্যাগ করুন। বৃথা কথায় প্রশ্রয় দিয়া চির-বিবাদ দৃঢ় করিয়া দিতেছেন ? আমার জ্ঞাতি এরূপে অপমানিত ও তাড়িত হইলেন দেখিয়া আমি এস্থানে মুহূর্ত্তমাত্র অবস্থান করিতাম না, কেবল আশা করিয়া বিবাদ ভঞ্জন করিবার আশয়ে আমি এখনও আছি। যদিও কয়েক ক্রোশ দূরে পথিমধ্যে আমি দুর্গস্বামীর সহিত মিলিত হইব স্থির আছে, তথাপি আমি আপনাদের এরূপ ক্রোধান্ধ দেখিয়া গমন করিতে ইচ্ছা করি না। আসুন, ধীরভাবে আমরা উপস্থিত প্রসঙ্গের আলোচনা করি।”

কিল্লাদার বলিলেন,—“আমারও তাহাই আন্তরিক ইচ্ছা। কিল্লাদারণি, মহামান্য রামরাজা মহাশয়কে এরূপ বিরক্ত ভাবে চলিয়া যাইতে দেওয়া হইবে না। বিশেষতঃ ভোজন কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া কোন ক্রমেই তাঁহার যাওয়া হইতে পারে না ?”

কিল্লাদারণী বলিলেন,—“যতক্ষণ রামরাজা মহাশয় দয়া করিয়া এস্থানে অবস্থিতি করিবেন এই দুর্গ এবং এতন্মধ্যস্থ সমস্ত সামগ্রী ততক্ষণ তাঁহার সম্পূর্ণ অধীন থাকিবে। কিন্তু এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গে—”

রামরাজা বাধা দিয়া বলিলেন,—“না—এরূপ প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গে আপনি সহসা মত প্রকাশ করিবেন না। এক্ষণে এ বিষয় থাকুক। অগ্রে অন্যান্য প্রীতিপ্রদ প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়া পরে এই ক্লেশ-কর বিষয়ের অবতারণা করা যাইবে।”

কথাবার্ত্তার যখন এই অবস্থা তখন একজন ভৃত্য রাওল বীরবলের আগমন বার্ত্তা নিবেদন করিল। সকলে সেই দিকে অগ্রসর হইলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

যে ভবন তাঁহার পিতৃ-পুরুষগণের চিরাধিকৃত নিকেতন ছিল, সেই ভবন হইতে অদ্য দুর্গ-স্বামী যেরূপ বিজাতীয় ক্রোধ ও

মনস্তাপের বশবর্ত্তী হইয়া বহির্গত হইলেন তাহা বর্ণনার অতীত। কিল্লাদারণীর পত্র যেরূপ ভাবে লিখিত ছিল, তাহাতে সে স্থানে দুর্গ-স্বামীর আর এক মুহূর্ত্তও থাকা অবিধেয়। তিনি সেই দারুণ অপমান জনক পত্র প্রাপ্তি মাত্র প্রস্থান করিলেন। রামরাজা আপনাকে দুর্গ-স্বামীর সহিত সমাপমানিত মনে করিয়াও, এই চিরবিবাদ ভঞ্জনের বাসনায়, আরও একটু অপেক্ষা না করিয়া যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। স্থির হইল যে, পথিমধ্যে কমলা ও পিপলি গ্রামের মধ্যবর্ত্তী এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে, দুর্গ-স্বামী অপেক্ষা করিবেন এবং রামরাজা তথায় তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন। প্রচণ্ড ক্রোধের প্রবল উত্তেজনায় দুর্গ-স্বামী বলিতে ভুলিয়া গেলেন যে, রামরাজা বা কিল্লাদারের অনুরোধে বিবাদের অবসান হইলেও, দুর্গ-স্বামী সেরূপ সদ্ভাব কদাপি পালন করিতে প্রস্তুত নহেন।

প্রথমতঃ দুর্গ-স্বামী সজোরে অশ্ব চালাইতে লাগিলেন। মনে করিলেন, বুঝি এবংবিধ বেগাতিশয্যে তাঁহার মনের নিদারুণ যন্ত্রণা-ভারও কিয়ৎপরিমাণে প্রশমিত হইবে। ক্রমে পথ-পার্শ্বস্থ বন যতই ঘন হইয়া আসিতে লাগিল, এবং বৃক্ষের অন্তরালে কিল্লাদারের দুর্গ চূড়া যতই অদৃশ্য হইতে লাগিল, ততই তিনি অশ্ববেগ মন্দীভূত করিতে লাগিলেন; আর দুর্দ্দমনীয় মনস্তাপের আতিশয্যে দগ্ধীভূত হইতে লাগিলেন। রায়মল উৎসের সমীপ দেশ দিয়া যে পথ শাস্তার কুটীরাভিমুখে প্রধাবিত, দুর্গ-স্বামী অধুনা সেই পথ দিয়া চলিতেছেন। উক্ত উৎস সম্বন্ধে যে ভয়ানক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে এবং নেত্রহীনা শাস্তা তাঁহাকে যে ভৎর্সনা সহকৃত উপদেশ দিয়াছিল, তদুভয়ই তাঁহার স্মৃতিপথে জাগরিত হইল। তিনি মনে মনে বলিলেন,—"প্রবীণার কথাই সত্য হইল, বস্তুতই রায়মল উৎস দুর্গ-স্বামীর অপরিণাম-দর্শিতার সাক্ষী হইয়া রহিল। বৃদ্ধার কথাই সত্য—আমার অপমানের সীমা রহিল না। আমি আমার পিতৃগণের বিনাশকারীর অনুগত ও অধীন হইতেও পাইলাম না, অধিকন্তু ঐ নিকৃষ্ট পদবী লাভার্থে স্পর্দ্ধিত হইয়াও, ঘৃণা সহকারে লাঞ্ছিত ও বিদূরিত হইলাম।"

কথিত আছে যে, অতঃপর রায়মল উৎস-সমীপে গমন কালে নিম্নলিখিত অদ্ভুত ব্যাপার দুর্গস্বামীর নেত্র-পথে পতিত হইল। তাঁহার অশ্ব সমভাবে গমন করিতেছিল, সহসা সে, বারংবার কর্ণান্দোলন, চীৎকার ও পুচ্ছ বীজন করিতে লাগিল। দুর্গস্বামীর নানা চেষ্টাতেও সে অগ্রসর হইল না—যেন তাহার সম্মুখে কি বিকট পদার্থ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। ইতস্ততঃ দৃষ্টি-সঞ্চালন করিয়া দুর্গস্বামী দেখিতে পাইলেন যে, যে স্থানে অর্দ্ধ-শায়িত ভাবে উপবেশন করিয়া তিনি প্রথমে কল্যাণীর এই বিষম প্রেমপ্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেই স্থানে একটী স্ত্রীমূর্ত্তি বসিয়া আছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে হইল যে, সম্ভবতঃ তিনি কোন্ পথাবলম্বনে গমন করিবেন তাহা অনুমান করিয়া, কল্যাণী, তাঁহার সহিত বিদায়সূচক সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে এবং এরূপ অপ্রীতিকর বিচ্ছেদে দুঃখ প্রকাশ করিবার আশয়ে, ঐ স্থানে অপেক্ষা করিতেছেন। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, তিনি অশ্ব হইতে লম্ফ প্রদান করিলেন এবং সন্নিহিত বৃক্ষ বিশেষে অশ্বকে বদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে ও অস্ফুট স্বরে "কল্যাণি—কুমারি কল্যাণি" বলিতে বলিতে সেই দিকে দ্রুতগতি চলিতে লাগিলেন।

সেই মূর্ত্তি তখন ফিরিল। বিস্ময়াবিষ্ট দুর্গস্বামী দেখিলেন, সে মূর্ত্তি কল্যাণীর নহে, তাহা নয়ন-হীনা শান্তার মূর্ত্তি! সেই মূর্ত্তি শান্তার স্বাভাবিক মুখের অপেক্ষা যেন কিঞ্চিৎ দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইল। দৃষ্টিহীনা বৃদ্ধার পক্ষে এই সুদীর্ঘ পথ পর্য্যটন নিতান্ত আশ্চর্য্যজনক—এমন কি ভীতিজনক বলিয়া বিজয়সিংহ মনে করিলেন। তিনি আরও নিকটস্থ হইলে এ মূর্ত্তি গাত্রোত্থান করিল ও স্বীয় কম্পমান হস্ত উর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া, তাঁহাকে নিকটস্থ হইতে নিষেধ করিতে লাগিল এবং স্বীয় শুষ্ক ওষ্ঠাধর বারংবার আন্দোলন করিতে লাগিল, যেন কি ধ্বনিবিহীন অতি মৃদু বাক্য তাহার ওষ্ঠাধর ভেদ করিয়া বহির হইতে লাগিল। বিজয়সিংহ ক্ষণেক স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। তখনই আবার যেন অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেন, অমনই শান্তার সেই মূর্ত্তি দুর্গস্বামীর দিকে সম্মুখ রাখিয়া ধীরে ধীরে পশ্চাতের বনের দিকে চলিয়া যাইতে লাগিল। অবিলম্বে তত্রত্য বৃক্ষরাজির অন্তরালে সে মূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া গেল! তখন দুর্গস্বামীর মনে হইল, এ মূর্ত্তি ইহজগতের কোন জীব নহে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি যে স্থানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেই স্থানেই চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। অবশেষে সাহসে নির্ভর করিয়া যেস্থানে ঐ মূর্ত্তিকে উপবিষ্ট দেখিয়াছিলেন তথায় গমন করিলেন। কিন্তু ঐ মূর্ত্তিকে শরীরী বলিয়া অনুমান করা যায়, তত্রত্য ঘাসের উপর এরূপ কোন চিহ্ন অথবা লক্ষণ দেখিতে পাইলেন না।

প্রেতাত্মা বা অশরীরী জীব দেখিয়াছি বলিয়া যাহার বিশ্বাস, তাহার যেরূপ মনের ভাব হয় তদ্রূপ ভাবে দুর্গ-স্বামী স্বীয় অশ্বসন্নিধানে গমন করিলেন এবং গমনকালে হয়ত সেই মূর্ত্তি পুনরায় দেখা দিবে ভাবিয়া, তিনি বারংবার পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই বাস্তব অথবা তাঁহার বিচলিত কল্পনা-সম্ভূত মূর্ত্তি আর দেখা দিল না। দুর্গ-স্বামী অশ্বে আরোহণ করিলেন এবং এতদ্ব্যাপারের আরও তথ্যানুসন্ধানের বাসনা করিয়া মনে মনে বলিলেন,—"আমার চক্ষু কি এতক্ষণ ধরিয়া আমাকে প্রতারিত করিল? অথবা বৃদ্ধার অন্ধতা ও অক্ষমতা লোকের চক্ষে ধূলি প্রক্ষেপ করিয়া তাহাদের করুণা উদ্রেক করিবার কৌশল মাত্র? তাহা হইলেও যে মূর্ত্তি দেখিলাম, তাহার গতি কোন সজীব ও বাস্তব লোকের অনুরূপ নহে। তবে কি লোকের ন্যায় আমিও বিশ্বাস করিব যে, ঐ বৃদ্ধা কোন অমানুষী শক্তিসম্পন্ন? না—না সেরূপ অসঙ্গত বিশ্বাসকে কখনই হৃদয়ে স্থান দিব না।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি শান্তার কুটীর-দ্বারে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, সেই বৃক্ষ-নিম্নে কেহই নাই। কুটীরের সমীপস্থ হইয়া তিনি তদভ্যন্তরে তানবের অতি মৃদু রোদন-ধ্বনি শ্রবণ করিলেন। তিনি দ্বারে আঘাত করিলেন, কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না। তখন দ্বারের অর্গল উন্মুক্ত করিয়া তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় নিদারুণ বিষাদ-ব্যঞ্জক দৃশ্য তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইল। তাঁহাদের বংশের শেষ গুণপক্ষপাতিনী অকৃত্রিম হিতৈষিণী শান্তার প্রাণহীন দেহ গৃহমধ্যস্থ সামান্য শয্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। অত্যল্পকাল পূর্ব্বে জীবন এ নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে এবং পার্ব্বতী নাম্নী যে বালিকা শান্তার সেবা শুশ্রূষা করিত, সেই কখন বা ভয়ে, কখন বা দুঃখে,

বিগতপ্রাণা স্বামিনীর পার্শ্বে বসিয়া রোদন করিতেছে।

সহসা দুর্গস্বামীকে সমাগত দেখিয়া বালিকা আশ্বস্ত না হইয়া বরং ভীত হইল। বহু আয়াসে দুর্গস্বামী তাহার অভয় জন্মাইলে সে বলিল,—"হায়! আপনি অসময়ে আসিলেন!" একথার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া দুর্গস্বামী জ্ঞাত হইলেন যে, মৃত্যুর পূর্ব্বে শান্তা একবার দুর্গস্বামীকে দেখিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যস্ত হইয়াছিল এবং তাহাকে অনুগ্রহ করিয়া একবার মরণাপন্না আশ্রিতার কুটীরে পদার্পণ করিতে অনুরোধ করিয়া কমলা দুর্গে একজন দূতও পাঠাইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে লোক যথাসময়ে তথায় গমন করে নাই। ক্রমশঃ মৃতার অন্তিম লক্ষণসমূহ যতই প্রকাশিত হইল এবং মৃত্যু যখন অব্যবহিত হইয়া পড়িল, তখন সে অবিরত আন্তরিক প্রার্থনা করিতে লাগিল,—"যেন মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রভু-পুত্রের সহিত তাহার একবার সাক্ষাৎ হয় এবং সে যেন আর একবার তাঁহাকে সাবধান করিবার সময় পায়।" যে সময়ে সন্নিহিত গ্রামের দেবালয়ে মধ্যাহ্ন আরতির ঘণ্টা-ধ্বনি হয়, ঠিক সেই সময়ে শান্তার মৃত্যু হয়। সবিস্ময়ে ও সভয়ে দুর্গস্বামী মনে করিলেন যে, তিনি যে মূর্ত্তি দেখিয়াছেন তাহা শান্তার প্রেত-মূর্ত্তি এবং সেই মূর্ত্তি দেখিবার অব্যবহিত কাল পূর্ব্বেই তিনি দেবারতির ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণ করিয়াছিলেন।

অতঃপর দুর্গস্বামী এই বিগত-প্রাণা বৃদ্ধার সৎকারের ব্যবস্থা করা বিধেয় বলিয়া মনে করিলেন এবং তদর্থে বালিকার হস্তে আবশ্যক মত অর্থ প্রদান করিয়া তাহাকে লোকজন ডাকিয়া আনিবার নিমিত্ত গ্রাম-মধ্যে পাঠাইয়া দিয়া স্বয়ং মৃতার পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। যদি তাঁহার দৃষ্টি অসম্ভাবিতরূপে তাঁহাকে প্রতারিত না করিয়া থাকে, তাহা হইলে অনতিকাল পূর্ব্বে দুর্গস্বামী যাহার পলায়িত আত্মাকে দর্শন করিয়াছেন, তাহারই চেতনাহীন দেহের সমীপে অধুনা তাঁহাকে একাকী প্রহরীরূপে বসিয়া থাকিতে হইল। তাঁহার প্রচুর স্বাভাবিক সাহস থাকিলেও, এক্ষণে নানা বিস্ময়-জনক ব্যাপার সম্মিলিত হইয়া তাঁহাকে বিচলিত করিয়া তুলিল। তিনি আপন মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"শান্তা অন্তিমকালে কেবল আমার সহিত সাক্ষাৎ কামনা করিয়া নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছে। অন্তিম-যাতনার মধ্যেও মানব-হৃদয়ে যদি কোন প্রবল বাসনা থাকে, তাহা হইলে মানব মৃত্যুরূপ এই মর-জগতের ভয়ানক সীমা অতিক্রম করার পরও, কি জগৎ-বাসীর নয়ন-সমক্ষে জীবন্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আবির্ভূত হয়? কিন্তু বাক্য দ্বারা স্বীয় বক্তব্য ব্যক্ত করিতে যখন তাহার সামর্থ্য নাই, তখন সে চক্ষু সমক্ষে উপস্থিত হইল? আর এ ক্ষেত্রে প্রকৃতির চিরন্তন নিয়মের কেনই ব্যভিচার ঘটিতেছে, অথচ তাহার কারণ অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে? যখনকাল আমাকেও এই সম্মুখস্থ প্রাণহীন দেহের ন্যায় শুষ্ক ও মলিন করিবে, তখন ভিন্ন এই সকল প্রশ্নের প্রকৃষ্ট মীমাংসার আর উপায়ান্তর নাই।

দুর্গস্বামী কিয়ৎকাল এইরূপ চিন্তামগ্ন অবস্থায় অতিবাহিত করার পর, বালিকা আবশ্যকমত লোকজন সঙ্গে লইয়া ফিরিল। তখন দুর্গস্বামী তাহাদের হস্তে আবশ্যকমত অর্থ এবং যথাবিহিত কার্য্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত উপদেশ দিয়া বিষণ্ণ মনে কুটীর হইতে বহির্গত হইলেন এবং ধীরে ধীরে গমন করিতে করিতে নির্দ্ধারিত স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

নিরূপত স্থানে কিয়ৎকাল রামরাজার জন্য অপেক্ষা করার পর, একজন দূত আসিয়া সংবাদ দিল যে, অপ্রতিবিধেয় কারণে রামরাজা অদ্য কমলা-দুর্গ ত্যাগ করিতে পারিবেন না। তিনি কল্য প্রত্যূষে আসিয়া দুর্গস্বামীর সহিত এই স্থানে সাক্ষাৎ করিবেন। অগত্যা দুর্গস্বামীকে সে রাত্রি তত্রত্য পান্থ-নিবাসে অতিবাহিত করিতে হইল। যেরূপ জঘন্য শয্যায় শয়ন করিয়া দুর্গস্বামীকে রাত্রিপাত করিতে হইল তাহা সর্ব্বথা অব্যবহার্য্য। কিন্তু দুর্গস্বামীর চিত্তের তৎকালে যে ভয়ানক অবস্থা তাহাতে শয্যার বিচার বা শারীরিক স্বচ্ছন্দতার প্রতি লক্ষ্য থাকা সম্ভাবিত নহে। নানাবিধ হৃদয়-বিদারক চিন্তায় তিনি রাত্রিপাত করিলেন। যে অত্যল্প কাল নিদ্রা তাঁহাকে আশ্রয় দিতে অগ্রসর হইলেন, সে সময়েও দারুণ বিভীষিকাপূর্ণ দুঃস্বপ্ন সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ব্যথিত করিতে লাগিল। প্রাতে দুর্গস্বামী সেই যন্ত্রণা-নিকেতন শয্যা ত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ভ্রমণ কালেও নানা চিন্তা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া রহিল। তিনি একটী বৃক্ষমূলে দাঁড়াইয়া বাহ্যজ্ঞান বিরহিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ এইরূপ ভাবে অতিবাহিত হইল, তাহা তিনি জানিতে পারিলেন না। যখন তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট হইবার বাসনায় সে স্থান হইতে ফিরিলেন, তখনই দেখিলেন সম্মুখে রামরাজা দণ্ডায়মান। নিয়মিত শিষ্টাচার সমাপ্ত হইলে রামরাজা বলিলেন,—"আমার কল্য তোমার সহিতই চলিয়া আসা উচিত ছিল। কিন্তু কয়েকটী অজ্ঞাত ঘটনা আমার গোচর হওয়ায়, আসিবার প্রতিবন্ধক হইল। এই ব্যাপারের মধ্যে প্রেমের কাণ্ড আছে, তাহা তো তুমি আমাকে বল নাই ভাই; তোমার আমাকে তাহা না জানান দোষ হইয়াছে। কারণ বলিতে গেলে, আমিই কতকটা এ বংশের"—

দুর্গস্বামী বাধা দিয়া বলিলেন,—"আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। আপনি আমার হিত-কামনায় যেরূপ নিবিষ্ট তাহাতে আমি আপনার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। কিন্তু রাজা আমার বংশের আমিই মস্তক ও আমিই প্রধান।"

রামরাজা বলিলেন,—"হাঁ তা বটে; আমি তাহা জানি। তুমিই নিশ্চয় আমাদের এ বংশের প্রধান বট। আমার বলিবার উদ্দেশ্য যে, তুমি নাকি কিয়ৎপরিমাণে আমার রক্ষণাবেক্ষণের অধীন"—

আবার দুর্গস্বামী রামরাজার উক্তির প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইলেন কিন্তু সময় ক্রমে এক ভিক্ষুক আসিয়া গোল করিয়া তাঁহার বাক্যের ব্যাঘাত ঘটাইল। দুর্গস্বামী যেরূপ স্বরে প্রতিবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন, সমুচিত সময়ে প্রতিবন্ধক উপস্থিত না হইলে, সেই দিন হইতে তাঁহাদের আত্মীয়তার অবসান হইয়া যাইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল।

ভিক্ষুক চলিয়া গেলে রামরাজা বলিলেন,—"আমি তোমার এই প্রেমের বৃত্তান্ত কল্য জানিলাম। যে কুমারী তোমার চিত্ত অধিকার করিয়াছেন, তাঁহাকে আমি এই প্রথম দেখিলাম। তাঁহার দোষ গুণের কথা বলিতে পারি না, তবে তুমি যে তাঁহার অপেক্ষা সদ্বংশজাতা গৃহিণী আর পাইবে না, তাহা আমার বোধ হয় না।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"এ বিষয়ে আপনার এতদূর আগ্রহান্বিত হইবার আবশ্যক ছিল না। আপনার বুঝিলেই হইত যে, ঐ কুমারীর সহিত বিবাহ-বন্ধন স্থির করিবার পূর্ব্বেই আমি অবশ্যই তদ্বংশে বিবাহ করার অবৈধতা বিচার করিয়াছিলাম এবং অবশ্যই বিশিষ্টরূপ কারণে, সে আপত্তি খণ্ডিত হইলে, আমি বর্ত্তমান মীমাংসায় উপনীত হইয়াছি।"

উভয় আত্মীয় সম্মিলিত হইয়া প্রথমতঃ বিবাহ, পরে রাজনীতির সম্ভাবিত পরিবর্ত্তন, সে পরিবর্ত্তনে দুর্গস্বামীর সম্ভাবিত উন্নতি, ইত্যাদি বহু প্রসঙ্গ আলোচনা করিলেন। ক্রমে বেলা অধিক হইয়া উঠিল দেখিয়া রাম রাজার সঙ্গী লোকজন আহারাদির উদ্যোগ করিয়া দিল। অগত্যা সে দিন সেই স্থানে মধ্যাহ্ন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লইলেন। আহার সমাপ্ত হইলে রামরাজা শার্দ্দুলাবাসে যাইবার নিমিত্ত নিতান্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন দুর্গস্বামী স্বীয় আবাসের হীনাবস্থা জানাইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। রামরাজা কোন কথাই কর্ণে স্থান দিলেন না, পুনঃ পুনঃ ঐ অনুরোধই করিতে লাগিলেন। তথায় খাদ্যাভাব, লোকাভাব, শয্যাভাব ইত্যাদি কারণে রামরাজার যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইবে, দুর্গস্বামী তাহা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিলেন। রামরাজা সকল আপত্তি হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন; তখন অগত্যা দুর্গস্বামী বিবেচনা করিলেন, বৃদ্ধ কানাই সহসা আমাদিগকে উপস্থিত দেখিলে নিতান্ত বিব্রত হইয়া পড়িবে; অতএব অগ্রে একজন দূত প্রেরণ করা বিশেষ আবশ্যক। অনন্তর রামরাজার একজন অশ্বারোহী রক্ষী তদুদ্দেশে প্রেরিত হইল। রক্ষী প্রেরিত হওয়ার বহুক্ষণ পরে রামরাজা ও দুর্গস্বামী অন্যান্য লোকজন সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন। নানাবিধ রাজকীয় প্রসঙ্গের আলোচনা করিতে করিতে তাঁহারা পথাতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি হইয়া পড়িল। সহসা রামরাজা বলিলেন,—"দুর্গস্বামী, তুমি শার্দ্দুলাবাসের হীনাবস্থার কথা বলিয়াছ, এতক্ষণে বুঝিলাম তাহা কেবল শিষ্টাচারের কথা মাত্র। আমি দেখিতে পাইতেছি, যে দিকে শার্দ্দুলাবাস সে দিকে যথেষ্ট আলো জলিতেছে। এত আলো জ্বালা বিশেষ সমারোহের পরিচায়ক। আমার মনে পড়িতেছে, বাল্যকালে একবার মৃগয়ার জন্য শার্দ্দুলাবাসে আসিয়া ছিলাম; তখন তোমার স্বর্গীয় পিতৃদেব স্বীয় দুর্গের দুরবস্থার কথা বলিয়া আমাদিগকে প্রথমেই হতাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্গে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া তাহার সমৃদ্ধি ভিন্ন দুরবস্থা কিছুই দেখিতে পাই নাই। তুমিও বোধ হয়, তোমার পিতৃপুরুষের অনুকরণে আমাকে দুরবস্থার কথা বলিয়া হতাশ্বাস করিতে চেষ্টা করিয়াছ।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"মহাশয়, আপনি অচিরে জানিতে পারিবেন যে, দুর্গস্বামীর অতিথি সৎকারের উপায় নিতান্ত সংকীর্ণ; যদিও ইচ্ছা পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায়ই রহিয়াছে, তথাপি উপায় ও সম্ভাবনায় সম্পূর্ণ অসদ্ভাব ঘটিয়াছে। কিন্তু সংপ্রতি শার্দ্দুলাবাসে এত আলোক দেখিয়া আমিও বিস্ময়াবিষ্ট হইতেছি। সামান্য আলোকে ওদিক এত আলোকিত হওয়া সম্ভব নহে।"

তাঁহারা আর একটু নিকটস্থ হইলে শুনিতে পাইলেন, কানাই চীৎকার করিতেছে,—"কি দুর্ভাগ্য, কি দুরদৃষ্ট! হায় হায় কি হইল! শার্দ্দুলবাসে আগুণ লাগিয়াছে—

চিত্র, বস্ত্র, শয্যা, পরিচ্ছদ, জিনিষপত্র সকলই পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল! ভগবন্, এত কষ্ট আমার, হায় হায়! কপাল!"

এই অভিনব অসম্ভাবিত বিপদ-বার্ত্তা শ্রবণে দুর্গস্বামী প্রথমতঃ স্তম্ভিত হইয়া উঠিলেন। কিঞ্চিৎ কাল চিন্তার পর দুর্গস্বামী লম্ফপ্রদানে শকট হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং সেই উদ্দীপ্ত অগ্নিরাশির অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

রামরাজা চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"দাঁড়াও, দাঁড়াও, দুর্গস্বামী একা যাইও না, আমিও যাইতেছি, আমার লোক জনও সঙ্গে যাউক। হতভাগ্যগণ, দাঁড়াইয়া কি দেখিতেছ? শীঘ্র যাও, দুর্গরক্ষার যে কিছু উপায় থাকে দেখ।"

সকলেই সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কানাই সেই সময় উচ্চ স্বরে বলিতে লাগিল,—"সর্ব্বনাশ, এমন কর্ম্ম কেহ করিও না; আসিওনা—এ দিকে আসিয়া সামান্ত জিনিষ পত্রের জন্য কেহ অমূল্য প্রাণ নষ্ট করিও না। স্বর্গীয় দুর্গস্বামীর সময় হইতে নীচের তলায় ৩০ সিন্দুক পঞ্জাবী বারুদ মজুত আছে। সর্ব্বনাশ! আগুণ সেই দিকে যায় যায় হইয়াছে—আর রক্ষা নাই! বালক সব—পালাও—পালাও—পূর্ব্বদিকে ঐ পাহাড়ের আড়ালে যাও। দুর্গের সামান্য অংশও যদি ভাঙ্গিয়া কাহারও গায়ে পড়ে, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই জানিবে।"

কানাইয়ের এইরূপ উপদেশ শুনিয়া রামরাজা ও তাঁহার অনুচরগণ বিপন্ন দুর্গস্বামীকে লইয়া সেই নির্দ্দিষ্ট পথে গমন করিলেন। দুর্গস্বামী বারুদের ব্যাপার কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, সম্মুখাগত কানাইকে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন,—"বারুদ কি? আমার অগোচরে দুর্গে বারুদ থাকিবে কিরূপে?

রামরাজা বলিলেন,—"কোনই অসম্ভাবনা নাই। বৃদ্ধকে ছাড়িয়া দাও।"

দুর্গস্বামী কানাইকে ছাড়িয়া দিয়া আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"এত গোল হইতেছে, এত আগুণ জ্বলিতেছে, অথচ সন্নিহিত গ্রামের কোন লোক সাহায্য করিতে আইসে নাই কেন?"

কানাই বলিল,—"আসে নাই? অনন্ত আসিয়াছিল, কিন্তু দুর্গ-মধ্যে অনেক দামী জিনিষ পত্র আছে বলিয়া, আমি তাহাদের দুর্গে ঢুকিতে দিই নাই।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"মিথ্যাবাদী, দুর্গে একটীও—"

কানাই বিকট চীৎকারে দুর্গস্বামীর কথা ঢাকিয়া দিয়া বলিল,—"কাপড় চোপড়, কাঠ কাঠড়া ধরিয়া গিয়া আগুণ ভয়ানক হইয়া উঠিল। যাহারা আসিয়াছিল তাহারা বারুদের কথা শুনিয়া যে যেদিকে পাইল, সে সেই দিকে পালাইয়া গেল।"

রামরাজা বলিলেন,—"আমি অনুরোধ করিতেছি, উহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কাজ নাই।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—আর একটী কথা। রামমতির কি হইয়াছে?"

কানাই বলিল,—"তাহা দেখিবার আমার সময় ছিল না। রামমতি দুর্গেই আছে—হয় ত এতক্ষণ তাহার লীলাখেলা ফুরাইয়াছে।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—ভয়ানক! একজন বৃদ্ধা দাসীর জীবন এইরূপ বিপন্ন—আমাকে ধরিয়া রাখিবেন না। আমি যাইয়া দেখি, এই উন্মত্ত বৃদ্ধ যেরূপ বিপদের বর্ণনা করিতেছে তাহা যথার্থ কি না?"

কানাই বলিল,—"তবে বলি শুনুন। রামমতির কোন বিঘ্ন হয় নাই—সে বেশ আছে। আমি বাহির হইবার পূর্ব্বেই সে পালাইয়াছে, তাহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। আহা! এক সঙ্গে চিরকাল চাকুরি করিয়া আসিতেছি, আজি বিপদের সময় তাহাকে ভুলিয়া যাইব, এও কি কথা?"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"তবে কেন তুমি এতক্ষণ সে কথা বল নাই?"

কানাই বলিল,—"অন্যরূপ বলিয়াছিলাম নাকি? তবে হয়ত এতক্ষণ স্বপ্ন দেখিতেছিলাম; নয়ত এই ভয়ানক কাণ্ড আমার মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছে। যাহা হউক, রামমতি আছে ভাল; সে জন্য কোন চিন্তা নাই।"

এই বাক্যে দুর্গস্বামী কিয়ৎপরিমাণে প্রকৃতিস্থ হইলেন। যদিও তাঁহার শেষ সম্পত্তি বাস-ভবনের পতন স্বচক্ষে দাঁড়াইয়া দেখিতে অভিলাষ ছিল' তথাপি রামরাজা প্রভৃতি সে ক্লেশকর দৃশ্য দেখিবার প্রয়োজন নাই মনে করিয়া, তাঁহাকে সন্নিহিত গ্রামের দিকে টানিয়া লইয়া গেলেন। তথায় সমস্তগ্রামবাসীই তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য যথাসাধ্য আয়োজন করিয়াছিল। কিন্তু যে স্থান হইতে অসংখ্য কৌশলে কানাইকে একতাল ময়দা সংগ্রহ করিতে হয় এবং যেখানে তাহাকে দেখিলে লোকে 'মার মার, ধর ধর' করিয়া উঠে, সেখানে অদ্য এত আয়োজন কেন হইতেছে, তাহার কারণ সংক্ষেপে ব্যক্ত করা আবশ্যক।

যখন কিল্লাদার রঘুনাথ রায় ও তাঁহার তনয়া কল্যাণী শার্দ্দূলাবাসে এক রাত্রি অতিথিরূপে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তখন কিল্লাদার দুর্গস্বামীর দারিদ্র্য বিশেষরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সেই দারিদ্র্যের মধ্যে কানাই কিরূপে রাত্রিতে অতি উত্তম আহারের আয়োজন করিয়াছিল, লোকনাথের দ্বারা তাহার সন্ধান করিয়া কিল্লাদার জানিতে পারিয়াছিলেন যে, লক্ষ্মণ কুম্ভকার নামক এক ব্যক্তির অনুগ্রহে সেদিন তাদৃশ উত্তম খাদ্যায়োজন ঘটিয়াছিল। কিল্লাদার তখন দুর্গস্বামীর নিতান্ত অনুকূল বন্ধু। তিনি লক্ষ্মণকে উৎসাহিত ও সঙ্গে সঙ্গে সেই গ্রামবাসিগণকে দুর্গস্বামীর সাহায্য করণে উত্তেজিত করিবার অভিপ্রায়ে চেষ্টা করিয়া, তাহাকে তৎকালে রাজপ্রতিমা গঠকের পদে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণের স্ত্রী ও শাশুড়ী সকলেই বুঝিয়াছিল যে, কানাইকে সে দিবস যে সাহায্য করা হইয়াছে, তাহারই ফলস্বরূপে, এই অজ্ঞাতপূর্ব্ব সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। তাহারা কানাইয়ের প্রতি বিহিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবসর অন্বেষণ করিতেছিল। কানাই কিন্তু, এ সকল বৃত্তান্ত জানিত না। সে যে তাহাদের মাথা ময়দা তাহাদের অসাক্ষাতে চাহিয়া লইয়াছিল, সেই ভয়ে সর্ব্বদাই শঙ্কিত ছিল। একদিন কানাই নিতান্ত প্রয়োজনানুরোধে লক্ষ্মণের দ্বার দিয়া যাইতেছিল। তখন লক্ষ্মণ, তাহার স্ত্রী ও শাশুড়ী সকলেই পথপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাদিগকে দেখিয়া কানাইয়ের প্রাণ উড়িয়া গেল। তাহারা কানাইকে দেখিয়া তিনজনেই এক সঙ্গে কোমল, গম্ভীর ও কড়া সুর মিশাইয়া ডাকিল,—"কানাই, মহাশয়, আমাদের বাড়ীতে পায়ের ধূলা না দিয়া চলিয়া যাইতেছেন—আমরা আপনার নিকট এত কৃতজ্ঞ!"

তাহারা যাহা বলিল তাহা প্রকৃতও হইতে পারে, পরিহাস-সূচকও হইতে পারে। কানাইয়ের মনে শেষ সম্ভাবনাই উদিত

হইল। সে ধীর পদ-বিক্ষেপে, অবনত মস্তকে ত্রাহি ত্রাহি ভাবিতে ভাবিতে, চলিতে লাগিল। সহসা ঐ তিনজনেই আসিয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিল; কানাই মনে ভাবিল,—"সর্ব্বনাশ!"

স্ত্রীলোকেরা মহা আপ্যায়িতের কথা কহিল এবং লক্ষ্মণ কহিল,—"তুমি কি আমাদের উপর রাগ করিয়াছ? নিশ্চয়ই কে তোমার কাণ ভারী করিয়া দিয়াছে। তোমার কৃপায় আমি যে মহারাণার প্রতিমা গঠক হইয়াছি, তাহার জন্য আমি সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞ। যদি কেহ তাহার বিপরীত বলিয়া থাকে, নিশ্চয় জানিও সে মিথ্যা কথা বলিয়াছে।"

কানাই এখনও প্রকৃত ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল না। বলিল,—"এত কথায় কি কাজ? মানুষ কখন গরিব, কখন ধনী হইয়া থাকে। আমি ভাই, দুটা মিষ্ট কথার প্রত্যাশী।"

লক্ষ্মণ বলিল,—"এও কি কথা? তুমি যে উপকার করিয়াছ, তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা কি কেবল মুখের দুইটা কথায় হইতে পারে? অনেক দিনের পর তোমার সাক্ষাৎ পাইয়াছি। আইস, তোমাকে আজি ভাল করিয়া খুসী না করিয়া ছাড়িব না?

লক্ষ্মণের শাশুড়ী বলিল,—"মন্ত্রী মহাশয় আমার জামাইকে যে কথা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা কি তুমি শুন নাই?"

এতক্ষণে কানাই বুঝিতে পারিল ব্যাপারটা কি? তখন কানাই বুক ফুলাইয়া, রাজাই চালে পা চালাইয়া, গোঁফ ও দাড়ি হাত দিয়া আঁচড়াইয়া বলিল,—"আমি শুনি নাই বটে! তবে একাণ্ড ঘটাইল কে?"

লক্ষ্মণের সহধর্ম্মিণী বলিল,—"উনি জানেন না, এমন কি হইতে পারে?"

কানাই বলিল,—"তাই বল। কে বন্ধু এবং কে বন্ধু নয়, তাহা বোধ হয় লক্ষ্মণ তুমি এত দিনে চিনিতে পরিয়াছ। আমার ইচ্ছা ছিল হঠাৎ, যেন কিছুই জানি না এমনি ভাবে, দেখা করিয়া বুঝিব, তোমরা কোন্ ধাতুর লোক। এখন বুঝিলাম, তোমরা লোক ভাল।"

তাহার পর কানাই নিতান্ত গম্ভীর ভাবে অনুগ্রহসূচক হস্তান্দোলন করিয়া বিদায় হইবার উপক্রম করিল। তখন কুম্ভকার সমাদর সহকারে তাহাকে একদিন নিমন্ত্রণ করিল। নিমন্ত্রণ স্থলে গ্রামের আরও অনেক লোক উপস্থিত ছিল। তাহারা সকলে কুম্ভকারের কথা শুনিয়া বুঝিল যে, কানাইয়ের অনুগ্রহে লক্ষ্মণের বর্ত্তমান সৌভাগ্য ঘটিয়াছে। কানাই সেই সভায় বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিল যে, সে তাহার প্রভু দুর্গস্বামীকে যাহা ইচ্ছা করে, তাহাই বুঝিয়া দিতে পারে, দুর্গস্বামী কিল্লাদারকে যাহা ইচ্ছা তাহাই করাইতে পারেন, কিল্লাদার দরবারে যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন এবং দরবার যাহা ইচ্ছা তাহাতে মহারাণাকে লওয়াইতে পারেন। অতএব সংক্ষেপতঃ, কানাই মনে করিলে অনুগ্রহ লাভ করাও বিচিত্র কথা নহে। কানাইয়ের কথা আর হাসিয়া উড়াইলে চলে না। কানাইয়ের চেষ্টায় লক্ষ্মণ কুম্ভকারের আশার অতীত উন্নতি ঘটিয়াছে, ইহা সকলেই জানিতেছে দেখিতেছে ও বুঝিতেছে। যাহা হউক, সেই দিন হইতে গ্রামে কানাইয়ের যার পর নাই পশার জমিয়া গেল। লেখা পড়া জানা ভদ্রলোকেরাও কানাইয়ের নিকট উমেদারি করিতে আরম্ভ করিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ-বর্ণিত বিবরণ পাঠ করিয়া পাঠকগণ অবশ্যই বুঝিয়াছেন যে, কানাই গ্রামের মধ্যে যথেষ্ট আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। অন্ত দুর্গে আগুণ লাগিয়াছে, এই সংবাদ পাইবামাত্র গ্রামবাসী সকলে বিশেষ আগ্রহের সহিত যথাসাধ্য সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল। কিন্তু কানাই তাহাদের বুঝাইল যে, ঘরে বিস্তর বারুদ আছে, সুতরাং আগুণ নির্ব্বাপিত হইবার সম্ভাবনা নাই। তখন তাহারা হতাশ্বাস হইয়া ফিরিবার উপক্রম করিল। কানাই তখন এ বিপদের অপেক্ষা, আগত প্রায় রাজ-অতিথিগণের আহারাদির কি হইবে তাহারই ভাবনায় অস্থিরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। গ্রামবাসীরা শুনিয়া বলিল, —"এও কি কথা! আমরা এখানে থাকিতে এজন্ত ভাবনা। হাজার লোকজন আসুক না কেন, আমরা প্রাণপণ যত্নে তাহার তদ্বির করিব।"

এই বলিয়া গ্রামবাসিগণ স্ব স্ব গৃহে গমন করিয়া যথাসাধ্য আয়োজনে নিযুক্ত হইল। গ্রামে যেন মহোৎসব উপস্থিত হইল। রামরাজা, অনুচরবর্গ, দুর্গস্বামী, কানাই প্রভৃতি গ্রামে উপস্থিত হইলে, গ্রামস্থ সকল লোক মিলিত হইয়া মহাসমাদরে তাঁহাদিগকে সম্মানিত করিল। গ্রাম্য পুরোহিত মহাশয় যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করিয়া রামরাজা ও দুর্গস্বামীকে স্বীয় ভবনে লইয়া গেলেন। অনুচরবর্গ যাহার যেখানে ইচ্ছা, সে সেই স্থানে গেল। সকল গৃহই আনন্দ, উৎসাহ এবং নানা আয়োজন পূর্ণ।

দুর্গস্বামী যখ বুঝিলেন যে, রাজ-অতিথির স্বচ্ছন্দতার যথাসম্ভব ব্যবস্থা হইয়াছে, তখন তিনি কিঞ্চিৎকালের নিমিত্ত বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বীয় ভবনের পতন দেখিবার নিমিত্ত গ্রাম-সন্নিহিত পাহাড়ের উপর আরোহণ করিলেন। তথায় কৌতূহলাক্রান্ত কয়েকটী বালক শার্দ্দূলাবাসের দুরবস্থা দেখিবার নিমিত্ত দাঁড়াইয়া ছিল এবং আনন্দ প্রকাশ করিতেছিল। দুর্গস্বামী বালকদিগের এই ব্যবহার দেখিয়া নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন,—"ইহারা আমার পিতৃপুরুষগণের নিতান্ত অনুগত সেবকগণের সন্তান। এক সময়ে আমার পূর্ব্ব পুরুষগণের আজ্ঞায় ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ অসঙ্কুচিত-চিত্তে রণে বা বনে, জলে বা অগ্নিতে প্রবেশ করিত। আজি তাহাদের বংশধরগণের এই ব্যবহার!"

তিনি যখন এবংবিধ বিষাদজনক চিন্তায় মগ্ন, সেই সময় কে যেন তাঁহার বস্ত্রাগ্র ধরিয়া আকর্ষণ করিল। তিনি তাহাকে জনৈক বালক মনে করিয়া নিতান্ত বিরক্তির সহিত বলিলেন,—"পুত্র! কি চাহ।"

কানাই দুঃসাহসে ভর করিয়া স্বীয় প্রভুর বস্ত্রাগ্র আকর্ষণ করিয়াছিল। বলিল,—"দাস-পুত্র পাঁচ শ বার! কিন্তু এ বাপু দাস নিতান্ত প্রাচীন! ইহাকে মারিয়া তাড়াইয়া দিলে, এ দাসপুত্র আর নূতন প্রভুর সেবা করিতে পারিবে না।"

দুর্গ স্বামী নিরুত্তরে পাহাড়ের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। আগুণ নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে! বলিলেন,—"একি আগুণ তো আর নাই! তবে কি দুর্গ ভূমিসাৎ হইয়াছে? কানাই! তুমি যে বারুদের কথা বলিতেছ, যদি দুর্গে তাহার কিঞ্চিৎ থাকে, তাহা হইলে তাহাতে আগুণ লাগিলে নিশ্চয়ই দুর্গ পড়িয়া যাইবে

এবং সে পতন-শব্দ দশ ক্রোশ পথ দূর হইতেও শুনিতে পাওয়া যাইবে।”

নিতান্ত অবিচলিত ভাবে কানাই বলিল, “আজ্ঞে হাঁ।” দুর্গস্বামী বলিলেন,—“তাহা হইলে, বোধ হইতেছে, নীচের তলায় যেখানে বারুদ ছিল, সে পর্য্যন্ত আগুণ যায় নাই।”

সেইরূপ ভাবে কানাই উত্তর দিল,—“বোধ হয় না।”

দুর্গস্বামী বলিলেন,—“কানাই, আমার ধৈর্য্য আর থাকে না। আমি স্বয়ং গিয়া শার্দ্দূ-লাবাসের অবস্থা না দেখিয়া থাকিতে পারিতেছি না।”

কানাই পূর্ব্বভাবেই বলিল,—“সেটী হইতেছে না।”

দুর্গস্বামী জিজ্ঞাসিলেন,—“কেন? কে, অথবা কিসে আমার গমনের ব্যাঘাত জন্মাইবে?”

সেইরূপ গম্ভীর ভাবে কানাই উত্তর দিল,—“আর কেহ ব্যাঘাত না জন্মাইলেও আমি জন্মাইব।”

দুর্গস্বামী সাবস্ময়ে জিজ্ঞাসিলেন,—“তুমি? কানাই তুমি? নিশ্চয়ই হয় তুমি আপনার পদ ও অবস্থা বিস্মৃত হইয়াছ,নচেৎ পাগল হইয়াছ।”

কানাই বলিল,—“আজ্ঞে না; আমার বোধ হয় আমি সেরূপ কিছুই হই নাই। আপনি সেখানে গিয়া দেখিবেন? সমস্ত সংবাদ আমি এখানে বসিয়া বলিয়া দিতেছি। আপনি কেবল আমার কয়েকটী অনুরোধ-’

দুর্গস্বামী বলিলেন,—“সে পরের কথা। আপাততঃ তুমি দুর্গের সংবাদ শীঘ্র বল।”

কানাই বলিব,—“কি বলিব? আপনি যেমন অবস্থায় দুর্গ ত্যাগ করিয়াছেন, আপনার অন্তঃসার-শূন্য দুর্গ এখনও সেইরূপ নির্ব্বিঘ্ন অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে।'

দুর্গস্বামী বলিলেন,—“বটে—তবে আগুণ কি হইল?”

কানাই বলিল,—“আগুণ কোথায়? রাম-মতি যদি উনন ধরাইয়া থাকে তাহাতেই যদি আগুণ হইয়া থাকে—বলা যায় না।”

দুর্গস্বামী বলিলেন,—“এত অগ্নিশিখা—এত আলোক—কেমন করিয়া হইল?”

কানাই বলিল,—“অন্ধকার রাত্রে অত্যল্প শিখাও অনেক বলিয়া বোধ হয়। ছারপোকার দৌরাত্ম্যে রাত্রে ঘুম হয় না। ছারপোকা বংশ ধ্বংস করিবার জন্য দুর্গের প্রাঙ্গণে কয়েক খানি ভাঙ্গা তক্তা, পচা দরমা, ছেঁড়া মাদুর জ্বালাইয়া দিয়াছিলাম বটে। জানিতাম যে, রাত্রিকালে তাহাতে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডের মতই দেখাইবে। কিন্তু মহাশয়, দোহাই আপনার, আপনি এলো মেলো লোক সঙ্গে লইয়া আর কখন দুর্গে ফিরিবেন না। মান বজায় রাখিবার জন্য আজি যে কষ্ট পাইয়াছি তাহা আমিই জানি। বরং সত্য সত্য দুর্গে আগুণ লাগাইয়া পুড়াইয়া ফেলিব সেও স্বীকার, তবু হতমান হইতে পারিব না।”

দুর্গস্বামী কিছু বিরক্ত হইলেন; কিন্তু সে ভাব প্রকাশ না করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—“কানাই, তুমি যে বারুদের কথা বলিলে সে কি ব্যাপার? রাজার কথার ভাবে বোধ হইল, যেন তিনিও তাহা জানেন? সত্যই কি দুর্গের কোন স্থানে বারুদ আছে? থাকিবেই বা কেন?”

কানাই প্রথমে খানিকটা হাসিল, তাহার পর বলিল,—“সে অনেক কথা। ওঃ কি মতলবই আজি করা গিয়াছে! অতি কষ্টে আজি এই চির-পূজিত বংশের মান রক্ষা [illegible] পাইয়াছে।”

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"এখন বারুদের কথা বল।"

কানাই অস্ফুট স্বরে বলিল,—"স্বর্গীয় দুর্গস্বামীর সময়ে এ অঞ্চলে একবার বিষম বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। সেই সময় অনেক অস্ত্র শস্ত্র ও বারুদ আসিয়া পড়িয়াছিল। রামরাজা তখন বালক হইলেও, সে বৃত্তান্ত নিশ্চয়ই শুনিয়াছিলেন। এই জন্যই বারুদের কথা উঠিতেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন।"

দুর্গস্বামী জিজ্ঞাসিলেন,—"এখন সে অস্ত্র শস্ত্র ও বারুদ গেল কোথায়?"

কানাই বলিল,—"বিদ্রোহের শেষ হইলে যোদ্ধারা চলিয়া গেল। অস্ত্রশস্ত্রও তাহাদের সঙ্গে গেল। যাহা পড়িয়া থাকিল তাহা যে পাইল সেই লইল। বারুদ বদল দিয়া কৌশল করিয়া আমি লোকের নিকট হইতে নানাবিধ খাদ্য আদায় করিতাম। আর আপনি যখন শিকারের ইচ্ছা করিতেন, তখনই আমি সেই লুকান স্থান হইতে বারুদ বাহির করিয়া দিতাম। এইরূপে ক্রমে বারুদ ফুরাইয়া গেল। এখন চলুন; ক্ষুধা লাগিয়াছে—ফিরিয়া যাওয়া হউক।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"চল যাই। এদিকে তো আগুনের নাম গন্ধও নাই। এই দুষ্ট ছেলেগুলো দুর্গ পড়িয়া যাইবে, সেই আমোদ দেখিবার জন্য বসিয়া আছে। তোমার কি ইচ্ছা উহারা সমস্ত রাত্রি ঐরূপে বসিয়া থাকুক।"

কানাই বলিল,—"তাহাতে লাভ ভিন্ন লোকসান নাই। আজি সমস্ত রাত্রি এইরূপে জাগিয়া কাটাইলে কালি উহারা কম দৌরাত্ম্য করিবে এবং রাত্রে ঠাণ্ডা হইয়া ঘুমাইবে। কিন্তু আপনার যদি ইচ্ছা হয়, তবে উহারা না হয় বাটীতেই যাউক।"

তাহার পর কানাই বালকবর্গের নিকটস্থ হইয়া মহা গম্ভীর ভাবে বলিল,—"মহামান্য রামরাজা ও দুর্গস্বামী হুকুম দিয়াছেন যে, দুর্গ কল্য রাত্রে পড়িয়া যাইবে। অতএব বাপু সকল, তোমরা অদ্য বাড়ী যাইতে পার, আবার কালি আসিও।" এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া বালকগণ হতাশ হইয়া বাটী ফিরিল।

প্রত্যাবর্ত্তনকালে কানাই বলিল,—"দেখুন দেখি, এরূপ না করিলে কি চলে? দুর্গে আজি উপবাস ভিন্ন আহারের অন্য কোন উদ্যোগ হইতে পারিত না এবং সমস্ত রাত্রি দাঁড়াইয়া নিদ্রা যাওয়া ভিন্ন শয়নের অন্য কোন ব্যবস্থা হইতে পারিত না। এক আগুনের গোল তুলিয়া চারিদিকে সুবিধা হইয়া গেল।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"তাহা হইল বটে, কিন্তু ইহার পরে তুমি তোমার মান কেমন করিয়া বজায় রাখিবে, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছি না। তোমার কথায় লোকে আর বিশ্বাস করিবে না।"

কানাই হাসিয়া বলিল,—হাজার হউক আপনি ছেলে মানুষ। ছেলে মানুষে বুড়া মানুষে অনেক প্রভেদ। এই আগুনের হেঙ্গাম করিয়া রাখিলাম বলিয়া লোকে আমার কথা আরও বিশ্বাস করিবে। যখন কেহ জিজ্ঞাসা করিবে, দুর্গস্বামীর কোন শয্যা নাই কেন? অমনই তাহার উত্তর, সেই আগুন। কেহ পরিচ্ছদের অভাব বলিলে, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিব, সেই আগুন। গৃহসজ্জা ভাল নাই বলিয়া কেহ নিন্দা করিলে অমনই বলিব, সেই আগুন। অধিক আর কি বলিব, এখন হইতে যত কিছু নিন্দা, যত কিছু অভাব, এবং যত কিছু বেবন্দোবস্ত সমস্তই আগুনের দোষে হইয়াছে বলিয়া কাটাইয়া দিব এবং লোকে তাহা

অবশ্যই সম্ভব বলিয়া মনে করিবে এমন মজা কি আর হয় ?"

তাঁহারা পুরোহিত মহাশয়ের গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। খাদ্যাদি সমস্তই প্রস্তুত করিয়া সকলে দুর্গস্বামীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিলে আহার সমাপ্ত হইল এবং সকলে নিরূপিত স্থানে শয়ন করিলেন। গৃহস্থেরা কি আহার্য্য, কি শয্যা সকলই যতদূর সম্ভব উত্তম ও পরিষ্কৃত করিবার যত্ন করিয়াছিল। এরূপ মহামান্য অতিথি কাহারও ভবনে পদার্পণ করিবার সম্ভাবনা নিতান্ত বিরল। আজি গৃহস্থের গর্ব্ব ও আনন্দের সীমা নাই। প্রাতঃকালে উঠিয়া রামরাজা ও দুর্গস্বামী যাত্রা করিবার আয়োজন করিতে বলিয়া দিলেন। লোকজন তাহার উদ্যোগ করিতে লাগিল। রামরাজা গৃহস্থের সমীপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে বাসনা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার ন্যায় মহামান্য ব্যক্তি ঐ সামান্য গৃহস্থের সামান্য ভবনে আহার ও একরাত্রি বাস করায় গৃহস্থেরা আপনাদিগকে যেরূপ কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন, তাহাতে রামরাজার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আর অবসর হইয়া উঠিল না। সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, রামরাজা, দুর্গস্বামী ও অনুচরগণ যথা সময়ে বিদায় হইলেন। সেই দিন তাবৎ গ্রামের লোক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক সুখময়ী আশাকে হৃদয়ে স্থান দিল।

যাত্রার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে দুর্গস্বামী কানাইয়ের নিকট আপনার সম্ভাবিত উন্নতির বিষয় জানাইয়া এই প্রাচীন ভৃত্যের মনে আনন্দ সঞ্চার করিলেন। পাছে কানাই আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠে, এই আশঙ্কায়, দুর্গস্বামী যথেষ্ট সাবধানতা সহকারে সমস্ত কথা বলিলেন। হস্তে যে সামান্য অর্থ ছিল দুর্গস্বামী তাহার অধিকাংশ কানাইয়ের হস্তে রাখিয়া দিলেন এবং বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহার হস্তে যথেষ্ট অর্থ থাকিল এবং আরও আসিবে। ভবিষ্যতে গ্রামবাসীদিগের উপর কৌশল বিস্তার করিয়া প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিতে কানাইকে তিনি নিষেধ করিলেন। কানাই এ প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বলিল, —"যখন আমাদের স্বচ্ছন্দে থাকিবার উপায় হইবে তখনও লোকের উপর এরূপ অত্যাচার করা লজ্জার কথা। বিশেষ তাহাদের মধ্যে মধ্যে হাঁফ ছাড়িবার সময় না দিলে তাহারা বারোমাস পারিয়া উঠিবে কেন ?"

সমস্ত কথা-বার্ত্তা শেষ হইয়া গেলে, দুর্গস্বামী এই বর্ষীয়ান ভক্ত ভৃত্যের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর রামরাজা ও দুর্গস্বামী উদয়পুর যাত্রা করিলেন। বলা বাহুল্য তথায় দুর্গস্বামী রামরাজার ভবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তাঁহারা যাহা যাহা ঘটিবে ভাবিয়াছিলেন ক্রমশঃ তাহাই ঘটিল। রাজদরবারে রামরাজার অপ্রতিহত আধিপত্য হইল এবং যে সকল লোক দরবারে স্থান পাইবে না বলিয়া তাঁহারা পূর্ব্বে স্থির করিয়াছিলেন, অধুনা ঠিক তাহাই হইল। অনেকেই স্ব স্ব পদ হইতে বঞ্চিত হইলেন। এই সকল পদচ্যুত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কিল্লাদার রঘুনাথ রায়ও একজন। উচ্চ রাজ কার্য্যের যে সকল ভার কিল্লাদারের হস্তে ছিল, তৎসমস্ত হইতে তিনি বঞ্চিত হইলেন। কল্যাণীর প্রেমানুরোধে ও কিল্লাদার তাঁহার সহিত ইদানীং যেরূপ সৌজন্য করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া, দুর্গস্বামী তাঁহার সহিত কোন প্রকার বিরুদ্ধ ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি রঘুনাথ রায়ের নিকট এক পত্র লিখিলেন। তাহাতে তিনি

সরলভাবে কল্যাণীর সহিত স্বীয় অনুরাগ বন্ধনের কথা ব্যক্ত করিলেন এবং উভয়ের শুভোদ্বাহ যাহাতে অচিরে সংঘটিত হয় তাহার প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার সহিত দুর্গস্বামীর যে সকল বৈষয়িক বিবাদ আছে তাহার যেরূপ মীমাংসা কিল্লাদার করিতে ইচ্ছা করিবেন, দুর্গস্বামী তাহাতেই স্বীকৃত হইবেন বলিয়া লিখিয়া দিলেন। সেই পত্র-বাহকের হস্তে দুর্গস্বামী কিল্লাদরণীর নিকটও এক পত্র লিখিলেন। দুর্গস্বামীর অনিচ্ছাকৃত কোন ব্যবহারে যদি কিল্লাদারণী অসন্তুষ্টা হইয়া থাকেন, দুর্গস্বামী তৎসমস্ত বিস্মৃত হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার সহিত কল্যাণীর যেরূপ অনুরাগ জন্মিয়াছে এবং সেই অনুরাগ ক্রমশঃ যেরূপ অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে, পত্রে তাহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়া দিলেন। কিল্লাদারণী শৈল-ম্বর বংশীয়া; সেই মহৎ বংশের প্রকৃত্যনুসারে তিনি যেন সদাশয়তা সহকারে পূর্ব্ব সংস্কার সকল বিস্মৃতি-সলিলে বিসর্জ্জন দেন, তজ্জন্য অনুরোধ করিলেন। দুর্গস্বামী কিল্লাদারের বংশীয়গণের পরম মিত্ররূপে এবং কিল্লাদারণীর সহিত দাসবৎ ব্যবহার করিবেন বলিয়া লিখিয়া দিলেন।

তৃতীয় এক পত্র কল্যাণীর উদ্দেশে লিখিত হইল। পত্রবাহককে বিশেষ করিয়া উপদেশ দেওয়া হইল যে, সে যেন এই পত্র সাবধানতা সহকারে কল্যাণীর নিজহস্তে প্রদান করে। এই পত্রে দুর্গস্বামী স্বীয় প্রেমের দৃঢ়তা ও সজীবতার পরিচয় দিলেন এবং তাঁহার সম্ভাবিত ভাগ্য-পরিবর্ত্তনসহ তাঁহাদের শুভ সম্মিলন যে সহজ ও সর্ব্বানুমোদিত হইবে তাহাও বুঝাইলেন। কল্যাণীর পিতা মাতার, বিশেষ তাঁহার জননীর, বিরুদ্ধ সংস্কার বিদূরিত করিবার নিমিত্ত দুর্গস্বামী যে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন এবং যে সকল উপায় নিষ্ফল হইবে না বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস, তাহাও বিবৃত করিলেন। কল্যাণীর হৃদয়ে অবিচলিত প্রেম থাকিতে শত বিরুদ্ধ চেষ্টাতেও যে সে প্রেমের অন্যথা ঘটাইতে পারিবে না, তাহা তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস। এতদ্ব্যতীত এই প্রেমপত্রে আরও যে কত কথা স্থান পাইয়াছিল, তাহা এস্থলে বলিবার প্রয়োজন নাই। সাধারণের চক্ষে তাহা অনাবশ্যক বলিয়া মনে হইলেও, প্রেমিক দুর্গস্বামী সেই সকল ভাব প্রকাশ করিয়া অপার আনন্দ-লাভ করিলেন। এই তিন পত্রেরই দুর্গস্বামী বিভিন্ন উপায়ে উত্তর পাইলেন।

দুর্গস্বামীর পত্র প্রাপ্তিমাত্র কিল্লাদারণী উত্তর পাঠাইয়া দিলেন।

'শার্দ্দূলাবাসবাসী শ্রীবিজয়সিংহ মহাশয় সমীপে—

"অপরিচিত মহাশয়,

বিজয়সিংহ দুর্গ-স্বামী স্বাক্ষরিত এক পত্র আমার হস্তগত হইয়াছে। আমি জ্ঞাত আছি, ভয়ানক অপরাধ হেতু ৺লক্ষ্মণসিংহ মানহীন ও উপাধি-শূন্য হইয়াছিলেন। অধুনা সেই উপাধি অবলম্বন করিয়া কে পত্র লিখিল তাহা আমি বুঝিতেছি না। যদি আপনি ঐ পত্রের লেখক হন, তাহা হইলে জানিবেন, আমার তনয়া কল্যাণীর উপর আমার অবশ্যই যথেষ্ট সঙ্গত অধিকার আছে, সেই অধিকার বলে আমি তাহাকে কোন যোগ্য ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিবার নিমিত্ত বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছি। এরূপ ব্যবস্থা যদি না করা হইত তাহা হইলেও আমি কদাচ আপনাকে, বা আপনার বংশীয় অপর কোন

ব্যক্তিকে কন্যা সংপ্রদান করিতে পারিতাম না; কারণ আপনারা প্রজার সৌভাগ্য বিনাশকারী ও দেব-দ্বেষী বলিয়া আমার বিশ্বাস। অভ্যুদয়ের ক্ষণস্থায়ী উজ্জ্বলতায় আমার নয়ন মন বিমোহিত হয় না; কারণ এ সংসারে আমি অনেক ভ্রষ্টমনাঃ হীনজনকেও উন্নত পদ-প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন হইতে দেখিয়াছি, এই সকল কথা মনে করিয়া রাখিবেন এবং প্রার্থনা করি, আর কখন আমার কোন সংবাদ লইতে চেষ্টা করিবেন না। ইতি—

আপনার অপরিচিতা—"যোধসুন্দরী।"

উল্লিখিত নিতান্ত বিরক্তিকর পত্র প্রাপ্তির দুই দিন পরে কিল্লাদার প্রেরিত এক পত্র দুর্গ স্বামীর হস্তে আসিল। ঐ পত্রে কিল্লাদার কোন কথাই সরলভাবে লিখিতে পারেন নাই। সময়ে সকলই হইতে পারে, ইহাই তাঁহার প্রধান বক্তব্য। কি বিবাহ, কি বৈষয়িক ব্যবস্থা, কি বিবাদের অবসান, কি রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন সকল বিষয় অবলম্বন করিয়া তিনি লিখিয়াছেন সত্য, কিন্তু কোন বিষয়েই তাঁহার হৃদয়ের কথা কি তাহা জানিবার উপায় নাই। তাঁহার পত্র সুদীর্ঘ হইলেও, নিতান্ত অসরলতা ও সাবধানতায় পূর্ণ। এই পত্র পাঠ করিয়াও দুর্গ-স্বামী কোন প্রকার ভরসা পাইলেন না, বরং তাঁহার চিত্তের অবস্থা আরও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল।

একজন অপরিচিত লোকের দ্বারা দুর্গস্বামী কল্যাণীর নিকট হইতে পত্র পাইলেন। পত্রে কোন নাম নাই এবং তাহা অতি সংক্ষেপে ও সভয়ে লিখিত। ঐ পত্র এই; —"অনেক কষ্টে তোমার পত্র পাইয়াছি। যত দিন পর্য্যন্ত ভগবান্ দিন না দেন, ততদিন আর পত্র লিখিও না। আমি বড় কষ্টে আছি! যতক্ষণ আমার দেহে জ্ঞান থাকিবে, জানিও ততক্ষণ আমার প্রতিজ্ঞা ভুলিব না। আমার জন্য কোন ভয় বা ভাবনা করিও না। তুমি সুখে আছ ও তোমার পদোন্নতি হইয়াছে ইহা আমার অনেক সান্ত্বনা।" পত্রের নিম্নে কেবল একটি 'ক' লিখিত; তাহাতে অন্য প্রকার স্বাক্ষর নাই।

দুর্গস্বামী এই পত্র পাঠ করিয়া ভীত হইলেন এবং কল্যাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার ও তাঁহাকে পুনরায় পত্র লিখিবার নিমিত্ত নানা চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সকলই নিষ্ফল হইল। তিনি জ্ঞাত হইলেন, যে কল্যাণী যাহাতে কাহাকেও পত্র লিখিতে না পারেন, ও কাহারও পত্র প্রাপ্ত না হন, তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে—সাক্ষাৎ তো দূরের কথা। এদিকে রাজকার্য্যের অনুরোধে তাঁহার দিল্লী গমন নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল। তিনি নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। ভগবানের নিকট কল্যাণীর প্রেমের দৃঢ়তা ও তাঁহার নির্ব্বিঘ্নতা সম্বন্ধে প্রার্থনা করিয়া অগত্যা দুর্গস্বামী মহারাণার আদেশ পালনার্থ দিল্লী গমনে বাধ্য হইলেন। যাত্রার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার পরমহিতৈষী রামরাজার হস্তে কিল্লাদারের পত্র প্রদান করিলেন। পত্র পাঠ করিয়া রামরাজা ঈষদ্ধাস্য সহকারে বলিলেন,—"বৃদ্ধ বুঝিয়াছে, তাহার পাশা এখন আর ডাক মানিবে না। তাহার দিন কাল ফুরাইয়াছে।" দুর্গস্বামী রাজাকে অনুরোধ করিলেন যে, যদি কিল্লাদার তাঁহার সহিত কল্যাণীর বিবাহ দিতে স্বীকৃত হন, তাহা হইলে তিনি বৈষয়িক ব্যাপারের যেরূপ ব্যবস্থা করিতে চাহিবেন তাহাতেই আপনি সম্মত হইবেন। রাজা বলিলেন,—"আমি তাহা হইতাম না; কিন্তু এক্ষণে বিশেষ অপমানজনক হইলেও যাহাতে এ বিবাহ ঘটে

আমাকে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। দারুণ অহঙ্কৃতা যোধসুন্দরীর দর্পচূর্ণ করা আমার অন্তরের বাসনা। নচেৎ তোমার বংশ-গৌরবের বিরোধী এই বিবাহে আমি কখনই মত দিতাম না।

তাহার পর দুর্গস্বামী রাজাবারা ত্যাগ করিয়া কিছুকালের নিমিত্ত দেশান্তরে গমন করিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

দেখিতে দেখিতে প্রায় একবৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু দুর্গ-স্বামী যে কার্য্যের জন্য দিল্লী গমন করিয়াছিলেন, তখনও তাহা সমাপ্ত না হওয়ায়, ফিরিয়া আসিতে পারিলেন না। এই সুদীর্ঘকাল মধ্যে কিল্লাদারের সংসারে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বীরবল ও শিবরাম একদিন যে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, তাহা পাঠ করিলে ঐ পরিবর্ত্তনের আভাষ পাওয়া যাইবে।

বীরবল স্বীয় ভবনের একতম প্রকোষ্ঠে বসিয়া আছেন। শিবরামও স্বীয় আশ্রয়দাতা বন্ধুর অনতিদূরে উপবিষ্ট। গৃহে ক্রীড়ার নানাবিধ আয়োজন আছে এবং বিনোদনের অনেক উপায় আছে। কিন্তু বীরবল তৎসমস্ত ব্যাপারে নিবিষ্ট নহেন। তিনি উন্মুক্ত বাতায়ন মধ্য দিয়া প্রাঙ্গণের দিকে লক্ষ্য করিয়া যেন চিন্তাকুলভাবে বসিয়া আছেন। শিবরাম বলিল,—"তোমার ভাব দেখিয়া কে বলিবে যে, তোমার বিবাহ উপস্থিত! বাস্তবিক চারিদিকে আনন্দ, কিন্তু যাহার জন্য এত আনন্দ, তাহার মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন তাহার ফাঁসির হুকুম হইয়াছে!"

বীরবল একটু বিষাদ-ব্যঞ্জক হাসির সহিত বলিলেন,—"তোমার কথা সত্য। বুঝিতেছ, আমার ভাব দেখিয়া আমাকে বড় কাতর বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু কি করিব? আমার মন কাতর, আমি আনন্দ দেখাই কিরূপে?"

শিবরাম বলিল,—"এ দুঃখ কে বুঝিবে গা? তোমার ধ্যান দেখিয়া গায়ে জ্বর আইসে! সমস্ত রাজপুতানা যে বিবাহের সুখ্যাতি করিতেছে এবং তুমি স্বয়ং যে জন্য এত চেষ্টিত ছিলে, সেই দেবদুর্লভ বিবাহ হয় হয় হইয়াছে, আর তুমি কি না কাতর!"

বীরবল কহিলেন,—"কি জানি কেন! কিন্তু অনেক দূর অগ্রসর হওয়া হইয়াছে—এখন আর ফিরিবার উপায় নাই। ফিরিবার উপায় থাকিলে এ শুভ কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে দিতাম কি না সন্দেহ।"

শিবরাম নিতান্ত আশ্চর্য্যভাবে বলিল,—"ফিরিবার উপায়। বল কি? কেন এই নবীনার সহিত যে সম্পত্তি আসিবে তাহা কি তোমার মনের মত নহে?"

বীরবল বলিলেন,—"রাধাকৃষ্ণ! আমি সে জন্য এক বারও ভাবিতেছি না। আমার আপনার যাহা আছে তাহাই খায় কে?"

শিবরাম বলিল,—"তবে আর কি? পাত্রীর জননী তোমাকে সন্তানের ন্যায় ভাল বাসেন।"

বীরবল বলিলেন,—"তাহা ঠিক।"

শিবরাম বলিল,—"কিল্লাদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র শম্ভুসিংহ এই বিবাহের যথেষ্ট পক্ষপাতী।"

বীরবল বলিলেন,—"কারণ তিনি আমার দ্বারা অনেক উপকার আশা করেন।"

শিবরাম বলিল,—"যাহাতে এ শুভ সংঘটন হয় তজ্জন্য কিল্লাদারও উদ্যোগী।"

বীরবল বলিলেন,—"কারণ দুর্গস্বামীর সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া তিনি আপনার বিষয় সম্পত্তি রাজাদেশের হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন বাসনা ছিল। সে বাসনা যখন আর ঘটিল না, তখন কাজেই উপস্থিত সম্বন্ধ ত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে ভাল নয়।"

শিবরাম বলিল,—"সকলই শুনিলাম, সকলই বুঝিলাম। কিন্তু কুমারীর কথা তুমি কি বলিবে? যখন এই নবীনা তোমার উপর নারাজ ছিলেন, তখন তুমি তাঁহার জন্য উন্মাদ ছিলে; এতদিনের পর তিনি দুর্গস্বামীর সহিত স্বীয় সত্যবন্ধন উপেক্ষা করিয়া তোমার সহিত বিবাহে সম্মত হইয়াছেন, আর এখন কি না তুমি অন্যমন করিতেছ। নিশ্চয়ই তোমার ঘাড়ে ভূত চাপিয়াছে!"

তখন বীরবল উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং গৃহ-মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে করিতে বলিলেন,—"তোমাকে মনের কথা স্পষ্ট করিয়া বলি শুন। জানিতে চাহি, কুমারী কল্যাণীর মনের ভাব সহসা এরূপ পরিবর্ত্তিত হইবার কারণ কি?"

শিবরাম বলিল,—"কারণ যাহাই হউক, যখন সে পরিবর্ত্তন তোমারই অনুকূল, তখন কারণ জানিয়া তোমার কাজ ক?"

বীরবল বলিল,—"কাজ আছে বই কি? আমার বোধ হয় কল্যাণীর হঠাৎ এরূপ মত পরিবর্ত্তন নিতান্ত অসম্ভাবিত। আমার বিশ্বাস এ পরিবর্ত্তন স্বেচ্ছায় হয় নাই। ইহার অভ্যন্তরে অবশ্যই কিল্লাদারণীর যথেষ্ট কৌশল ও শাসন আছে।"

শিবরাম বলিল,—"তাহাতেই বা কি ক্ষতি।"

বীরবল বলিলেন,—"ক্ষতি কি? বুঝা যাইতেছে যে এ পরিবর্ত্তন হৃদয়ের নহে—ইহা বাহ্য শাসনের ভয় মাত্র। সে যাহা হউক, তাহাতেই কি নির্ব্বিঘ্ন হওয়া যাইতেছে? তুমি কি মনে কর দুর্গ-স্বামী কল্যাণীর সত্যবন্ধনের কথা সহজে ছাড়িয়া দিবে?"

শিবরাম বলিল,—"তাহা দিবে বই কি? সে যখন অন্য রমণীকে বিবাহ করিতেছে, তখন কল্যাণীও অবশ্যই যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করিবেন, তাহাতে সে কথা কহিবে কেন?"

বীরবল বলিলেন,—"আমরা শুনিয়াছি যে দুর্গ-স্বামী কোন বিদেশিনী রমণীকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে; তুমি কি বিশ্বাস কর যে, একথা যথার্থ?"

শিবরাম বলিল.—ভবানীরাম সেনাপতি সে বিষয়ে যে সকল সংবাদ বলিয়াছে তাহা তো তুমি স্বয়ং শুনিয়াছ।"

বীরবল কহিলেন,—"ভবানীরাম ও তুমি সমানই লোক। উভয়েরই কথা বিশ্বাসের অযোগ্য।"

শিবরাম বলিল,—"ভাল, তাহাই যদি হয়, তাহা হইলেও শম্ভুসিংহের সাক্ষ্য তুমি মান কি না। শম্ভুসিংহ স্বকর্ণে শুনিয়াছেন, রামরাজা বলিয়াছেন যে, দুর্গ-স্বামী এমন নির্ব্বোধ নহেন যে, কিল্লাদারের কন্যার অনুরোধে আপনার পৈতৃক সম্পত্তি পরিত্যাগ করিবেন। বীরবল যদি দুর্গ-স্বামীর পরিত্যক্ত পাদুকা ধারণ করিয়া সুখী হন, তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই।"

একথা শুনিয়া নিতান্ত ক্রুদ্ধভাবে বীরবল বলিলেন,—"বটে! একথা যদি আমার সাক্ষাতে হইত তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি রামরাজার জিহ্বা কাটিয়া ফেলিয়া দিতাম। শম্ভুসিংহ তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করিলেন না কেন?"

শিবরাম বলিল,—"একথা শুনিয়া ধীরভাবে ফিরিয়া আসা অসম্ভব বটে। বোধ হয় রামরাজার বয়স ও অত্যুন্নত পদ স্মরণ

করিয়া শম্ভুসিংহ কোন অত্যাচার করিতে সাহস করেন নাই। যাহা হউক, এক্ষণে যাহাতে কল্যাণীকে হাতে পাইয়া এ অপমানের প্রতিশোধ দিতে পার তাহার চেষ্টা কর। রামরাজার ন্যায় উন্নত ব্যক্তিকে অপমানিত করা তোমার সাধ্যায়ত্ত নহে, তাহা ভাবিয়া কাজ করা ভাল।”

বীরবল বলিলেন,—“আজি যদি না হয়, অবশ্য একদিন আমি রামরাজাকে ও তাঁহার জাতিকে এ অপমানের জন্য সমুচিত শিক্ষা দিব। যাহা হউক, শত্রুপক্ষের এই সকল কথায় কল্যাণীর যাহাতে অপমান না হয় তাহার জন্য আমি বিহিত চেষ্টা করিব। এখন শীঘ্র শীঘ্র এ কার্য্য শেষ হইয়া গেলে বাঁচি, রাত্রি অনেক হইয়া পড়িল। শিবরাম, এখন বিশ্রাম করিলে ভাল হয়।”

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

কিল্লাদারণী বীরবলের সহিতই কল্যাণীর বিবাহ দেওয়া স্থির করিলেন এবং যাহাতে দুর্গ-স্বামীর সহিত তনয়ার কোন ক্রমেই বিবাহ না ঘটে তাহাও তাঁহার প্রতিজ্ঞা হইল। কল্যাণীর মতামতের প্রতি কোন প্রকার লক্ষ্য করাই তিনি প্রয়োজন মনে করিলেন না। এদিকে দুর্গ-স্বামী ব্যতীত আর কাহারও গলে বরমাল্য প্রদান করিতে কল্যাণীর নিতান্ত অনভিমত। এমন কি তিনি ধীরে ধীরে প্রাণত্যাগ করিবেন সেও স্বীকার, তথাপি জ্ঞানতঃ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবেন না, ইহাই তাঁহার সংকল্প। এদিকে যতই কল্যাণীর মনের এবংবিধ ভাব বীরবলের গোচর হইতে লাগিল, ততই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দুর্গ-স্বামীর প্রতি বিদ্বেষ বাড়িতে লাগিল ও যেরূপ কেন হউক না, কল্যাণীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া, দুর্গ-স্বামীকে বিফল মনোরথ করিবার প্রতিজ্ঞা বলবতী হইতে লাগিল। তিনি মনে করিলেন, যোধসুন্দরী যখন তাঁহার সহায়, তখন আশা পূর্ণ হওয়া সুকঠিন নহে। যোধসুন্দরীও ভাবী জামাতার মনের এবম্প্রকার গতি জানিয়া, চিরবৈরী দুর্গ-স্বামীকে অপমানিত ও সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ স্বার্থসিদ্ধির সংকল্প করিলেন। এই স্বার্থ-সিদ্ধির ব্যাপারে রঘুনাথ রায়ের পরামর্শে তিনি আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। রঘুনাথ বুঝিলেন যে, তাঁহার ভাগ্য-প্রবাহ এখন হইতে বিরুদ্ধগতি অবলম্বন করিয়াছে। তাঁহার সম্পত্তির ভূরিভাগ দুর্গ-স্বামী বংশের সম্পত্তি। সংপ্রতি দুর্গ-স্বামী দরবারে যেরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছেন, তাহাতে নিশ্চয়ই তাঁহার সম্পত্তি পুনরায় তাঁহারই হস্তগত হইবে। এজন্য কিল্লাদার মনে মনে দুর্গ-স্বামীর প্রতি নিরতিশয় বিরক্ত এবং যেরূপে হউক দুর্গ-স্বামীকে কষ্ট দেওয়া তাঁহার অভিপ্রায়। কল্যাণীর সহিত দুর্গ-স্বামীর বিবাহ না ঘটিলে দুর্গ-স্বামী মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইবেন জানিয়া, যাহাতে সে বিবাহ না ঘটে তজ্জন্য কিল্লাদার চেষ্টিত হইলেন। তাহার পর, বীরবলের সহিত তনয়ার বিবাহ ঘটিলে আপাততঃ কিল্লাদারের সে সম্পত্তি হস্ত বহির্ভূত হইয়া যাইতেছে, কিয়ৎপরিমাণে তাহা পূরণ হইতে পারে। কারণ রাওল-বীরবলের সুবিস্তৃত সম্পত্তি তাঁহার তনয়ার, সুতরাং প্রকারান্তরে তাঁহারই অধীন হইতেছে। এই সকল বিবেচনা করিয়া, যাহাতে এই বিবাহ সংঘটিত হয়, তৎপক্ষে তাঁহার যথেষ্ট যত্ন। তিনি স্বীয় অভিসন্ধি

পত্নীকে বুঝাইয়া দিলে, যোধসুন্দরী তাহার যৌক্তিকতা হৃদয়ঙ্গম করিলেন। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন এই বিবাহ যাহাতে ঘটে তাহার জন্ম বীরবলেরও প্রাণপণ যত্ন ; এইরূপ অনুরাগের সময় তাহাকে যদৃচ্ছা পথে লইয়া যাওয়া কঠিন নহে। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, বীরবল স্বীয় সম্পত্তি যদি পত্নীর নামে সমর্পণ করেন, তাহা হইলে তাহা প্রকারান্তরে তাঁহাদেরই অধীন থাকিবে। বিবাহের পর কন্যাকে সম্পত্তি সমর্পণ করিবার প্রস্তাব তাদৃশ সুবিধাজনক হইবে না। এই সময়ে—মনের এই উত্তেজিত অবস্থায় বীরবলের দ্বারা এতৎকার্য্য সম্পন্ন করাইয়া লওয়া অবশ্যক। এই ভাবিয়া চতুরা কিল্লাদারণী অশেষ কৌশল সহকারে বীরবলের নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন এবং তাঁহাকে সুন্দররূপ বুঝাইয়া দিলেন যে, প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় তাঁহার অপরিমেয় ইষ্ট সংঘটিত হইবে। বীরবল হৃষ্টচিত্তে এ ব্যবস্থায় সম্মত হইলেন এবং বিবাহের পূর্ব্বেই তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি কল্যাণীর নামে লিখিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু বীরবলও প্রস্তাব করিলেন যে, কল্যাণী যে স্বেচ্ছায় ও আনন্দ সহকারে তাঁহাকে বিবাহ করিবেন ইহা জানিতে না পারিলে, স্বীয় সম্পত্তি কল্যাণীর নামে লিখিয়া দিবেন না। অগ্রে কল্যাণী স্বীয় সম্মতি সূচক অভিপ্রায় তাঁহাকে লিখিয়া দিবেন, তাহার পর বীরবল স্বীয় সম্পত্তি কল্যাণীর নামে উৎসর্গ করিয়া দিবেন। তাঁহার এ আপত্তি নানা কারণে সঙ্গত বলিয়া সকলেই মনে করিলেন। তখন জোর করিয়া কল্যাণীর নিকট হইতে সম্মতি বাহির করিয়া লইতে সকলেরই চেষ্টা হইল।

দুঃখিনী মর্ম্মপীড়িতা বালিকার উপর অনেক কঠোর ব্যবহার চলিতে লাগিল। যতই কিল্লাদারণী বুঝিতে লাগিলেন, কল্যাণী দুর্গস্বামী সমীপে যে প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়াছে, তাহাকে মারিয়া ফেলিলেও, সে প্রতিজ্ঞার অন্যথা করিবে না, ততই তাঁহার ক্রোধ উত্তেজিত হইতে লাগিল ; এবং তাহার উপর নানাবিধ বিসদৃশ ব্যবহার চলিতে লাগিল। প্রথমতঃ, সরলা বালিকা যাহাতে একবারও গৃহবহিষ্কৃত না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইল ; দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করা ক্রমে ক্রমে বাটীর সকলেই পরিত্যাগ করিলেন, এমন কি কল্যাণীর অতি প্রিয় মুরারিও তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বন্ধ করিয়া দিল ; তৃতীয়তঃ এই সকল নানা মর্ম্মান্তিক জ্বালার উপর আবার প্রধান জ্বালা—যে দুর্গস্বামীকে কল্যাণী স্বীয় হৃদয়ের সর্ব্বময় প্রভু বলিয়া জানেন এবং যাঁহার নিকট স্বীয় সত্যবন্ধন তিনি পরম পবিত্র ও অখণ্ডনীয় জ্ঞান করেন, সেই দুর্গস্বামী যে প্রতারক এবং তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়া ও স্বীয় প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া তিনি দিল্লীনগরে মহা সমারোহে অপর এক সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিতেছেন। এই বৃত্তান্ত প্রতিদিন নানা উপায়ে সরলা বালিকার গোচর করা হইতে লাগিল। বালিকা সকল ক্লেশ, সকল যাতনা ধীর ভাবে সহ্য করিতে লাগিল। শরীর অবসন্ন, মন কাতর হইয়া পড়িল কিন্তু প্রতিজ্ঞা টলিল না। যন্ত্রণার সীমা নাই, ক্লেশের শেষ নাই, কিন্তু প্রতিজ্ঞা অটল রহিল। দুর্গস্বামী যে প্রতারক নহেন এবং তাঁহার পাণিগ্রহণ বৃত্তান্ত যে অমূলক তাহা বালিকা বুঝিল। বুঝিলে কি হয়—তাহার নিত্য নব নব প্রমাণ —সতত নানা ভঙ্গীতে সেই আলোচনা কল্যাণীর সমক্ষে উত্থাপিত হইতে লাগিল। সরলহৃদয়া বালিকা এ বিষম ক্ষেত্রে কতদিন হৃদয়ের

স্থৈর্য্য রক্ষা করিতে পারে? অনাহারে, অনিদ্রায়, নিয়মাভাবে, মনস্তাপে, সন্দেহে, চিন্তায় এবং আত্মীয়জনের ঘৃণায় কল্যাণীর কোমল চিত্ত নিতান্ত প্রপীড়িত হইয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে শরীরও কাতর এবং অবসন্ন হইল। কিল্লাদারণীর শাসনের ক্রটি নাই, বীরবলের যাতায়াত ও প্রেম-প্রস্তাবের বিরাম নাই। তখন নিরুপায়া বালিকা দুর্গস্বামীর সমীপে সকলের সম্মতিক্রমে এক পত্র লিখিলেন। যদি দুর্গস্বামী স্বীয় প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া থাকেন, তাহা হইলে কল্যাণী নিরপরাধিনী। কল্যাণী বিপন্না, আর অপেক্ষা করিতে তাঁহার ক্ষমতা নাই। ত্বরায় দুর্গস্বামী পত্রোত্তর প্রদান করেন ইহাই প্রার্থনা।

দিনের পর দিন চলিতে লাগিল—উত্তর আসিল না; দুর্গ-স্বামীও আসিলেন না। কিন্তু যোধসুন্দরীকে বুঝায় কাহার সাধ্য? তিনি আর কোন কথাই শুনিতে অনিচ্ছুক—আর তিলমাত্র অপেক্ষা করিতে তাঁহার মত নাই। বালিকা কাঁদিতে কাঁদিতে জননীর পায়ে ধরিয়া বলিল,—"মা, আর এক পক্ষ—আগামী পূর্ণিমার দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর! যদি ইহার মধ্যে দুর্গস্বামীর উত্তর পাই ভালই, নচেৎ—"

কল্যাণী নীরব, কথার শেষাংশ তাহার মুখ হইতে বাহির হইল না। কুপিতা যোধসুন্দরী কথার শেষাংশ শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিয়াও, যখন কল্যাণীর মুখ হইতে আর কোন কথা শুনিলেন না, তখন নিতান্ত ক্রোধ সহকারে বলিলেন,—"নচেৎ কি? নচেৎ তুমি আমাদের পরামর্শমত কার্য্য করিবে বল?"

বালিকা নীরব। কুপিতা জননীর বদনের প্রতি ক্ষণেক চাহিয়া বলিল,—"করিব।"

যোধসুন্দরী বলিলেন,—"জানিও পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উদয় হইলেও রাজপুত জাতির কথার অন্যথা হয় না। স্বীকার করিলাম, আমরা আগামী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিব। তাহার পর আর কোন আপত্তি শুনিব না। প্রতিপদের দিন নিশ্চয়ই তোমাকে সম্মতিসূচক পত্রে স্বাক্ষর করিতে হইবে।"

ধীরে ধীরে বালিকা বলিল,—"স্বাক্ষর করিতে হইবে।" মনে মনে ভাবিল,—"তাহাতে কি? মরিতে কে বারণ করিয়াছে?"

কল্যাণী এক হস্ত দ্বারা অপর একহস্ত সবলে ধারণ করিয়া, সন্নিহিত শয্যায় মূর্চ্ছিত-প্রায় অবস্থায় পড়িয়া গেলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

দিন তো কোন কারণেই অপেক্ষা করে না—দিন অপেক্ষা করিল না। কাল পূর্ণিমা আসিয়া উপস্থিত হইল—চলিয়াও গেল; কিন্তু দুর্গ-স্বামী আসিলেন না, তাঁহার কোন পত্রও আসিল না।

পরদিন প্রাতেই বীরবল ও শিবরাম আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। বিষয়-কুশল কিল্লাদার যেমন যেমন বলিয়াছিলেন ঠিক তদনুরূপ করিয়া বীরবল সম্পত্তির হস্তান্তর পত্র লিখিয়া আনিয়াছেন। কল্যাণী তাঁহাকে যে সম্মতিসূচক পত্র দিবেন, কিল্লাদার তাহাও লিখাইয়া রাখিয়াছেন; কেবল তাহাতে কল্যাণীর স্বাক্ষর বাকী। মধ্যাহ্নকালে সকল আত্মীয়-জনের সম্মুখে কল্যাণী তাহাতে স্বেচ্ছায় স্বাক্ষর করিবেন স্থির হইয়াছে

আরও স্থির হইয়াছে. অন্য হইতে চারিদিন পরে এই যুগলের বিবাহ হইবে।

এখন কল্যাণীর অবস্থা দারুণ নিরাশায় পূর্ণ। বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত কল্যাণীর চিত্তে এ সকল কথা ভাবিবার স্থান নাই, আপত্তি করিবার ক্ষমতা নাই। যে সকল কথা তিনি শুনিতেছেন, তাহা হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছে কি না সন্দেহ।

মধ্যাহ্নকালে দাসীগণ তাঁহার বেশভূষা করিয়া দিতে গেলে তিনি কোনই আপত্তি করিলেন না। হীরক, মুক্তা ও স্বর্ণ ভূষণে এবং সমুজ্জ্বল পরিচ্ছদে তাঁহার দেহ সমাচ্ছন্ন করিয়া দিল। তাঁহার অবসাদগ্রস্ত দেহের পাণ্ডু বর্ণের উপর তৎসমস্ত ভূষণ নিতান্ত কুদৃশ্য হইল।

তাঁহার সজ্জা শেষ হইবার পূর্ব্বেই মুরারি তথায় আগমন করিয়া বলিল,—"আইস দিদি, সকলে তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তোমার কি স্বাক্ষর করিতে হইবে বলিতেছে। কেন দিদি, বিবাহে কি সহি করিতে হয়, এ কথা তো কখন শুনি নাই। যাহা হউক দুর্গস্বামীর সহিত যে তোমার বিবাহ হইল না, আমি তো বাঁচিলাম। লোকটাকে দেখিলে আমার ভয়ে প্রাণ উড়িয়া যায়। ছিঃ—অমন অসুরকে কি কেহ ইচ্ছা করিয়া বিবাহ করে। কেমন দিদি, বিজয়সিংহের চেয়ে বীরবল খুব লোক ভাল। তুমি খুব খুসি হইয়াছ, না?"

অভাগিনী কল্যাণী বলিলেন,—"না ভাই, আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না; এখন সংসারে আমাকে কাতর বা আনন্দিত করিতে পারে এমন কোন বিষয়ই আর নাই।"

মুরারি বলিল,—"আমি জানি বিবাহের সময় লজ্জায় সকল লোকেই ঐরূপ বলে। কিন্তু এক বৎসর ঘুরিয়া গেলে তোমার আর ও সুর থাকিবে না। তোমার বিবাহের দিন আমার একটী নূতন পোষাক হইবে। আজি রাত্রে উদয়পুর হইতে আমার জন্য অনেক জিনিষপত্র আসিবে। আসিলে আমি আনিয়া তোমাকে দেখাইব।"

এই সময়ে কিল্লাদারণী প্রকোষ্ঠ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং বিনা বাক্যব্যয়ে কল্যাণীর হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে সঙ্গে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। যন্ত্র-পুত্তলীর ন্যায় কল্যাণী মাতার সহিত চলিতে লাগিলেন।

তাঁহারা যে প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন তথায় কিল্লাদার রঘুনাথ রায়, তাঁহার পুত্র সেনাপতি শম্ভুসিংহ রায়, রাওল বীরবল এবং তাঁহার পার্শ্বচর শিবরাম উপস্থিত। কিল্লাদারণী ও কল্যাণী আসিয়া এক পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিলেন। সেই পর্য্যঙ্কে কল্যাণীর স্বাক্ষর-পত্র মসী ও লেখনী প্রস্তুত রহিয়াছে। উপবেশনান্তর যোধসুন্দরী ধীরে ধীরে কল্যাণীকে পত্র পাঠ করিয়া শুনাইলেন। তাহাতে অন্য কথা লেখা ছিল না। নিয়মিত দিবসে কল্যাণী স্বেচ্ছায় বীরবলকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন, ইহাই সেই পত্রের সার কথা।

পত্রপাঠ সমাপ্ত হইলে, কিল্লাদারণী কল্যাণীকে তাহাতে স্বাক্ষর করিতে আদেশ করিলেন। তখন কল্যাণীর হস্ত লেখনীর সহিত মিলিত হইল। জননী স্বাক্ষরের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। কম্পান্বিতা, বাহ্যজ্ঞান-বিরহিতা, বিপন্না বালিকা শুষ্ক লেখনী লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্বাক্ষর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। জননী তাঁহার অসাবধানতা বুঝাইয়া দিয়া তাঁহার হস্তে অপর এক মসীপূর্ণ লেখনী তুলিয়া দিলেন। কাল সময়ে, কাল পত্রে, কাল

স্বাক্ষর হইয়া গেল। স্বাক্ষরের পরিসমাপ্তি সময়ে অদূরে অশ্ব-পদধ্বনি, অচিরে পুরদ্বারে সজোরে কণ্ঠ-ধ্বনি এবং পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে মনুষ্যের পদ-ধ্বনি কল্যাণীর কর্ণে প্রবেশ করিল। তাঁহার হস্ত হইতে লেখনী খসিয়া পড়িল, বদন হইতে অস্ফুট ধ্বনি বাহিরিল,—"তিনি আসিয়াছেন—তিনি আসিয়াছেন।"

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

কল্যাণীর হস্ত হইতে লেখনী স্খলিত হইতে না হইতে, সজোরে প্রকোষ্ঠ-দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে পথ-শ্রান্ত, ধূলি-ধূসরিত, উন্মাদ প্রায় দুর্গস্বামী সেই প্রকোষ্ঠে ব্যস্তভাসহ প্রবেশ করিলেন। প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থলে তিনি স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দর্শন মাত্র শম্ভুসিংহ ও বীরবল মহা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। কল্যাণী সংজ্ঞাহীনা পাষাণস্তূপের ন্যায় নিশ্চল—আর আর সকলেই, এমন কি কিল্লাদারণী পর্য্যন্ত, ভীতা হইয়া উঠিলেন।

দুর্গস্বামী স্থির—নিস্পন্দ—নিশ্চল। তিনি নীরবে সমান ভাবে, যেন প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তির ন্যায়, সেই স্থলে দণ্ডায়মান। গৃহস্থ সকলেই স্তম্ভিত—সকলেই নির্ব্বাক্। প্রথমে কিল্লাদারণী কথা কহিলেন। তিনি দুর্গস্বামীকে এরূপ অকারণ অত্যাচারের কারণ জিজ্ঞাসিলেন।

শম্ভুসিংহ বলিলেন,—"দেবি। এ প্রশ্ন আমার জিজ্ঞাসা করাই সঙ্গত। আমি দুর্গস্বামীকে অনুরোধ করিতেছি, তিনি আমার সঙ্গে বাহিরে আসিয়া রাজপুতোচিত যুদ্ধ দ্বারা আমার প্রশ্নের উত্তর দান করুন।"

বীরবল বলিলেন,—"সে কথা হইবে না। আমার অনেক দিনের রাগ আছে। দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে অগ্রে আমি সন্তুষ্ট হইতে চাহি। শিবরাম অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া কেন? ভূত না প্রেত, কি দেখিতেছ? যাও, শীঘ্র আমার অসি আনিয়া দেও।

শম্ভুসিংহ বলিলেন,—"আমার পরিবারগণের মধ্যে যে ব্যক্তি এরূপ ধৃষ্টতা সহকারে অকারণ প্রবেশ করিয়াছে, তাহার সহিত উপযুক্ত ব্যবহার আমি অবশ্যই স্বয়ং করিব।"

দুর্গস্বামী উভয়েরই প্রতি উগ্র দৃষ্টিপাত করিয়া হস্তান্দোলন দ্বারা নিরস্ত হইবার ইঙ্গিত করিতে করিতে কহিলেন,—"সেজন্য চিন্তা কি? আমার জীবন যেরূপ ভারভূত, যদি আপনাদেরও তাহাই হয়, তাহা হইলে, অবিলম্বে উপযুক্ত স্থানে আপনাদের একজনের বিরুদ্ধে, অথবা এককালে উভয়েরই বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আমি স্বীকৃত হইলাম। আপাততঃ আপনাদের ন্যায় সামান্য লোকের সহিত বৃথা বাক্য-ব্যয় করিতে আমার সময় নাই।"

স্বীয় অসি অর্দ্ধ নিষ্কোষিত করিয়া শম্ভুসিংহ কহিলেন,—"কি সামান্য লোক?" সঙ্গে সঙ্গে বীরবল ও শিবরাম স্ব স্ব অসিতে হস্ত সংলগ্ন করিলেন। তখন কিল্লাদার, পুত্রের জীবনের আশঙ্কায়, উভয়ের মধ্যগত হইয়া কহিলেন,—"শম্ভু, আমি আদেশ করিতেছি, এরূপে শান্তি-ভঙ্গ করিয়া এই শুভ সময়ে আমার ভবন কলঙ্কিত এবং রাজ-নিয়মের অন্যথাচরণ করিও না।"

শম্ভু বলিলেন,—"এও কি কথা? এরূপ অপমান সহ্য করে কাহার সাধ্য? এখনই যুদ্ধ হয় হউক, নচেৎ উহাকে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া বিনাশ করিব।"

বীরবল বলিলেন,—"না—কখনই না।

আমি একবার ঐ ব্যক্তির সাহায্যে জীবন লাভ করিয়াছি। অবশ্যই উঁহার সহিত আমায় যুদ্ধ করিতে হইবে।”

নিতান্ত পরুষ স্বরে দুর্গস্বামী বলিলেন,—“সেজন্য আপনাদের কোন চিন্তা করিতে হইবে না। বিপদকে আমিই ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্বেষণ করিতেছি। অবিলম্বেই আপনাদের যুদ্ধ-সাধ মিটাইব।” তাহার পর অপেক্ষাকৃত কোমল স্বরে কল্যাণীর লিখিত পত্র খানি তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলেন,—দেবি! ইহা কি আপনার হস্তাক্ষর?”

যেন অজ্ঞাতসারে, অনিচ্ছায়, অস্ফুটভাবে কল্যাণীর অধরোষ্ঠ ভেদ করিয়া উত্তর বাহিরিল,—“হাঁ।”

তাহার পর সত্যবন্ধন কালীন কল্যাণীর বক্ষস্থ সেই চিহ্নের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন,—“আর দেবি! উহাও কি আপনারই হস্তকৃত?”

কল্যাণী নীরব। তাঁহার চিত্তের তৎকালে যেরূপ বিচলিত, জ্ঞানহীন অবস্থা তাহাতে হয়ত এ প্রশ্নের মর্ম্মই তিনি প্রণিধান করিতে পারিলেন না।

কিল্লাদার বলিলেন,—“আপনি কি এই সকল চিহ্ন দ্বারা আপনার অধিকার প্রমাণ করাইতে চাহেন?”

দুর্গ-স্বামী বলিলেন,—“কিল্লাদার রঘুনাথ রায়, এবং অপর যে যে ব্যক্তি আমার কথায় কর্ণপাত করিতেছেন, তাঁহাদের সকলের সমীপে আমার প্রার্থনা যে, তাঁহারা যেন আমার অভিপ্রায়ের বিপরীতার্থ গ্রহণ না করেন। যদি কুমারী স্বাধীন ইচ্ছার বশবর্ত্তিনী হইয়া এই সত্য-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিতে বাসনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার চক্ষে উনি ঐ পুর-প্রাঙ্গণস্থ বায়ু-বিতাড়িত অসংখ্য শুষ্ক বৃক্ষ পত্রাপেক্ষাও মূল্যবিহীন সামগ্রী। কিন্তু আমি প্রকৃত বিবরণ যুবতীর নিজ মুখ হইতে শ্রবণ করিব এবং তাহা না শুনিয়া কোন ক্রমেই এ স্থান ত্যাগ করিব না। আপনারা বহু লোক মিলিত হইয়া আমার প্রাণ সংহার করিতে পারেন, কিন্তু আমিও মৃত্যুভয়-শূন্য—অস্ত্রধারী পুরুষ জানিবেন যথেষ্ট প্রতিশোধ না লইয়া আমি মরিব না, ইহা স্থির। আমি সুন্দরীর অভিপ্রায় অন্যান্য সকলের অসাক্ষাতে তাঁহার নিজ মুখ হইতে শুনিব. এই আমার সংকল্প।” এই বলিয়া দুর্গ-স্বামী স্বীয় অসি উন্মুক্ত করিয়া দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিলেন এবং বাম হস্তে এক তীক্ষ্ণাগ্র ছোরা লইয়া বলিতে লাগিলেন,—“অতঃপর আপনাদের অভিপ্রায় কি? হয় এই প্রকোষ্ঠ রক্ত-রাগে রঞ্জিত হইয়া যাউক, না হয় আমার নিকট সত্যবদ্ধা এই কুমারীকে আমার প্রয়োজনীয় প্রশ্ন সমূহের উত্তর দিতে দিউন।”

দুর্গ-স্বামীর এই অসীম সাহসিকতাপূর্ণ অহংকৃত বাক্যে সকলেই স্তম্ভিত হইলেন এবং কিয়ৎকাল সেই গৃহে দারুণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। তাহার পর কিল্লাদারণী বলিয়া উঠিলেন,—“কখন না। কখনই এই বাগ্‌দত্তা কন্যার সহিত নির্জ্জনে আলাপ করিতে পাইবে না। তোমাদের যাহার ইচ্ছা হয় চলিয়া যাও—আমি এস্থান কখনই ত্যাগ করিব না। আমি উঁহার অস্ত্রের ভয়ে কখনই কাতর নহি।”

দুর্গস্বামী বলিলেন,—“যদি কিল্লাদারণী এস্থলে থাকিতে চাহেন তাহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু আর সকলকেই চলিয়া যাইতে হইবে।”

শম্ভুসিংহ গৃহ-নিষ্ক্রান্ত হইবার সময়ে বলিয়া

গেলেন,—"দুর্গস্বামী, জানিও এজন্য তোমার ফলভোগ করিতে হইবে।"

বীরবল বলিয়া গেলেন,—"আমিই কি ছাড়িব মনে করিয়াছ ?"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"তোমাদের যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিও, কেবল অদ্য আমাকে মার্জ্জনা কর; তাহার পর ইহ জগতে আমার আর কোনই প্রিয়কার্য্য থাকিবে না। তখন তোমরা আমাকে যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"দুর্গ-স্বামী, আপনি যে আমার বাটীতে এরূপ অত্যাচার করিবেন তাহা আমি কখনও মনে করি নাই এবং আপনার সহিত আমি কখন সেরূপ ব্যবহারও করি নাই। যদি আপনি অসি কোষবদ্ধ করিয়া আমার সহিত প্রকোষ্ঠান্তরে গমন করেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে যুক্তির দ্বারা, আপনার এরূপ ব্যবহারের অবৈধতা, বুঝাইয়া দিব এবং—"

দুর্গস্বামী বাধা দিয়া বলিলেন,—"কল্য— কল্য আপনার যুক্তি শ্রবণ করিব। আমার অদ্যকার কার্য্য অতি পবিত্র এবং অপ্রতিবিধেয়।"

এই বলিয়া দুর্গস্বামী কিল্লাদারকে অঙ্গুলি-সঙ্কেত দ্বারা গৃহ-ত্যাগ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। তিনি বিনা বাক্য ব্যয়ে প্রস্থান করিলেন।

তদনন্তর দুর্গ-স্বামী অসি কোষবদ্ধ করিলেন, ছোরা যথাস্থানে রক্ষিত করিলেন এবং দ্বার-সন্নিধানে গমন করিয়া তাহা অর্গলবদ্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। বদনের ঘর্ম্মবারি বিমুক্ত করিয়া এবং ললাটগত সুদীর্ঘ কেশরাশি পশ্চাতে সরাইয়া, দুর্গ-স্বামী কল্যাণীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং অতি কোমল স্বরে বলিলেন,—"দেবি! আমাকে চিনিতে পারিতেছ কি? আমি সেই দুর্গ-স্বামী বিজয়সিংহ।" সুন্দরী নীরব। দুর্গ-স্বামী অপেক্ষাকৃত উত্তেজিত স্বরে, আবার বলিতে লাগিলেন,—"যে ব্যক্তি তোমার প্রেমের অনুরোধে চিরশত্রুতা,—"অবশ্যপালনীয় প্রতিহিংসার সংকল্প হৃদয় হইতে বিসর্জ্জন দিয়াছে, আমি সেই বিজয়সিংহ। যে ব্যক্তি তোমার জন্য তাহার পিতৃহন্তা, তাহার বংশের অবনতির কারণ স্বরূপ পরম শত্রুকেও প্রেমালিঙ্গন প্রদান করিয়াছে, সুন্দরি, আমি সেই বিজয়সিংহ।"

যোগসুন্দরী বাধা দিয়া বলিলেন,— "তোমার আত্মপরিচয় বিষয়ক আলাপে আমার কন্যার এক্ষণে কোনই আবশ্যক নাই। তোমার বিষাক্ত বাক্য শুনিয়াই আমার কন্যা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছেন যে, তুমি তাঁহার পিতার ভয়ানক শত্রু।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"প্রার্থনা করিতেছি আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। আমার প্রশ্নের উত্তর কল্যাণী দেবীর বদন হইতেই বিনির্গত হওয়া আবশ্যক। আবার বলিতেছি, কুমারি! যাহার নিকট তুমি পবিত্র সত্য-বন্ধনে বদ্ধ আছ এবং যে সত্য-বন্ধন তুমি এক্ষণে বিচ্ছিন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছ, আমি সেই বিজয়সিংহ।"

কল্যাণীর শোণিত-শূন্য ওষ্ঠাধর ভেদ করিয়া অস্ফুট শব্দ হইল,—"মাতৃদেবীর জন্য।"

কিল্লাদারণী বলিলেন,—"কল্যাণী ঠিক কথা বলিয়াছে। এরূপ বিষয় পিতামাতার পরামর্শেই সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক; আমি কল্যাণীর গর্ভধারিণী। আমিই, অন্যায় বোধে, এ সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়াছি।"

দুর্গ-স্বামী বলিলেন,—কল্যাণী দেবি,

তবে কি এই কথাই ঠিক? পরানুরোধে তুমি কি তোমার হৃদয়ের ইচ্ছা, তোমার প্রতিজ্ঞা, তোমার সত্যবন্ধন, উভয় পক্ষের এত প্রেম, সকলই ভুলিতে উদ্যত হইয়াছ?"

কল্যাণী নীরব। আবার দুর্গস্বামী বলিতে লাগিলেন,—"শুন তবে তোমার জন্য আমি কত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছি। আমার সুপ্রতিষ্ঠিত বংশ-গৌরব, আমার অকৃত্রিম সুহৃদ্গণের বিশেষ অনুরোধ, কিছুই আমার স্থির প্রতিজ্ঞা বিচলিত করিতে সমর্থ হয় নাই। জ্ঞানের যুক্তি বা ভ্রান্ত-সংস্কারের শাসন কিছুই আমার দৃঢ়তা শিথিল করিতে পারে নাই। প্রকৃতই মৃত ব্যক্তির আত্মা আমাকে সাবধান করিতে আবির্ভূত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতেও আমি কর্ণপাত করি নাই। স্বীয় সত্য-ভঙ্গ করিয়া, এরূপ সত্যনিষ্ঠ হৃদয়কে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিতে তোমার কি প্রবৃত্তি হইবে?"

কিল্লাদারণী বলিলেন,—"দুর্গস্বামী বিজয়-সিংহ, তুমি আমার কন্যাকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করা সঙ্গত বলিয়া মনে করিয়াছ, সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলে। তুমি দেখিতেছ—আমার কন্যা তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে সম্পূর্ণ অশক্ত। অতএব আমাকেই তোমার প্রশ্নের যথাবিহিত সদুত্তর দিতে হইতেছে। তুমি জানিতে ইচ্ছা কর, কল্যাণী স্বেচ্ছায় স্বীয় প্রতিজ্ঞা-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিতেছেন কি না। তোমারই হস্তে কল্যাণীর স্বহস্ত-লিখিত প্রতিজ্ঞার অন্যথা সূচক পত্র রহিয়াছে। তুমি যদি তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রমাণ দেখিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে এই পত্র দেখ। কল্যাণী, সর্ব্ব সমক্ষে বুঝিয়া ও পাঠ করিয়া, এই পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। ইহা রাওল বীরবলের উদ্দেশে লিখিত।"

দুর্গস্বামী পত্রিকা পাঠ করিয়া দেখিলেন, কল্যাণী বীরবলের সহিত বিবাহের অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। একবার সন্দেহ হইল, হয়ত স্বাক্ষর কল্যাণীর না হইবে; কিন্তু কল্যাণীর সম্মুখস্থ লেখ্য সামগ্রী দেখিয়া এবং কিল্লাদারণীর তৎসম্বন্ধীয় সমর্থনোক্তি শ্রবণ করিয়া, তাঁহার প্রতীতি হইল স্বাক্ষর প্রকৃতই কল্যাণীর কৃত। তিনি তখন সজীব প্রস্তর-খণ্ডবৎ হইয়া পড়িলেন। উগ্রস্বরে বলিলেন,—"দেবি, বস্তুতই ইহা অকাট্য প্রমাণ। অতঃপর তিরস্কার বা ভৎসনা-সূচক কোন বাক্য-ব্যয় করা সর্ব্বথা নিষ্প্রয়োজন ও অনাবশ্যক।" তাহার পর কল্যাণীর স্বাক্ষরিত সেই প্রতিজ্ঞা পত্র ও সেই ভগ্নার্দ্ধ স্বর্ণমুদ্রা কল্যাণীর সমীপদেশে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন.—"লও কুমারি তোমার প্রথম প্রেম-বন্ধনের চিহ্ন সমস্ত গ্রহণ কর। ভরসা করি তুমি আপাততঃ যে প্রেম-বন্ধনে লিপ্ত হইলে, তৎ-সম্বন্ধে প্রথম বারের ন্যায় বিশ্বাস-ঘাতকতা করিবে না। এক্ষণে একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া, আমার এই অপাত্র-ন্যস্ত বিশ্বাসের—আমার এই ঘোর মূর্খতার পরিচায়ক প্রেম-চিহ্নগুলি প্রত্যর্পণ কর, ইহাই আমার অনুরোধ।"

কল্যাণী যেরূপ ভাবে দুর্গস্বামীর দিকে চাহিলেন, তাহাতে সে দৃষ্টিতে সংজ্ঞা আছে বলিয়া বোধ হইল না। তথাপি তাঁহার হস্ত যেন তাঁহার অজ্ঞাতসারে, বার বার গলদেশের দিকে উত্থিত হইতে লাগিল; এবং তাঁহার কণ্ঠে যে প্রেম-নিদর্শন বিলতি ছিল, তাহাই উন্মুক্ত করিতে চেষ্টিত হইতে লাগিল। কিন্তু কল্যাণীকে উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য্য-সাধনে অশক্ত বুঝিয়া, কিল্লাদারণী কন্যার কণ্ঠে যে ভগ্ন স্বর্ণমুদ্রা ছিল, তাহা ছিঁড়িয়া লইলেন এবং নিতান্ত গর্ব্বিত ভাবে সেই প্রেমের

নিদর্শন দুর্গ-স্বামীর হস্তে প্রদান করিলেন। এই প্রেম-বন্ধনের নিদর্শন পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া, দুর্গস্বামী কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন।

তখন তিনি আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন,—"এখন পর্য্যন্ত—এই বিপরীত কার্য্য সাধনের সময় পর্য্যন্ত, এই চিহ্ন কল্যাণী হৃদয়ের উপর ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে অনু-যোগে কি কাজ?" তিনি অশ্রুসমাকুল নয়ন-মার্জ্জন করিয়া এক বাতায়ন-সন্নিধানে গমন করিলেন। ঐ বাতায়ন-নিম্নে এক গভীর কূপ ছিল। দুর্গ-স্বামী সেই প্রেম-চিহ্ন ঐ কূপ-বারিতে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"যাউক—যাউক এই নিদর্শন চিরকাল লোক-লোচনের অন্তরালে অবস্থান করুক।" তাহার পর তিনি কিল্লাদারণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—আর এক মুহূর্ত্তও আপনাদের ত্যক্ত করিতে চাহি না। প্রার্থনা করি, আপনি আপনার কন্যার শান্তি ও সম্মান বিনাশকারী এতাদৃশ চক্রান্ত ও জঘন্য ব্যব-হার আর কখন করিবেন না।" কল্যাণীর দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"কিল্লাদার-তনয়া' আপনাকে আর আমার কিছুই বলিবার নাই। ভগবৎ-সমীপে প্রার্থনা করি, যেন আপনার এই ইচ্ছাকৃত ভয়ানক প্রতারণা হেতু, লোকে আপনাকে সৃষ্টির অন্যতম বিস্ময়-কর সামগ্রী বলিয়া মনে না করে।" বাক্য সমাপ্তি মাত্র তিনি সে প্রকোষ্ঠ হইতে প্রস্থান করিলেন।

দুর্গ-স্বামীর সহিত পুনঃ সাক্ষাৎ সম্ভাবনা দূর করিবার নিমিত্ত, রঘুনাথ রায়, শম্ভুসিংহ ও বীরবলকে দুর্গের অপর একদিকে থাকিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। এক্ষণে দুর্গ-স্বামী বাহিরে আসিবামাত্র, লোকনাথ তাঁহার সমী-পস্থ হইয়া বলিল,—"শম্ভুসিংহ জানিতে চাহেন, আপনার সহিত তিন চারি দিনের মধ্যে কোথায় সাক্ষাৎ হইবে। তাঁহার বিশেষ আবশ্যক আছে।"

দুর্গ-স্বামী ধীরভাবে উত্তর দিলেন,—"তাঁহাকে বলিও আমার সহিত শার্দ্দূলাবাসে সাক্ষাৎ হইতে পারে।"

তিনি বাহিরে আসিবার উপক্রম করিলে, শিবরাম তাঁহার সমীপস্থ হইয়া জানাইল যে, অচিরে দুর্গ-স্বামীর সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে বীরবল অভিপ্রায় করিয়াছেন।

দুর্গ-স্বামী বলিলেন,—"তোমার প্রভুকে বলিও, তাঁহার যখন ইচ্ছা আমি তখনই তাঁহার সমর-সাধ মিটাইতে প্রস্তুত আছি।"

শিবরাম বলিল,—"কি আমার প্রভু? ইহ জগতে আমার কেহই প্রভু নাই এবং আমাকে এমন কথা বলিয়া পার পাইয়া যায়, এমন কোন লোকও নাই।

"তবে নরকে যাও, সেখানে তোমার প্রভুকে দেখিতে পাইবে,—"এই বলিয়া দুর্গ-স্বামী এমন সজোরে তাহাকে ঠেলিয়া দিলেন যে, সে গড়াইতে গড়াইতে বহুদূরে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া গেল। তখনই দুর্গ-স্বামী বলি-লেন,—"এরূপ কাণ্ডজ্ঞানহীন অযোগ্য ব্যক্তির উপর ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কাজ ভাল করি নাই।"

তাহার পর দুর্গ-স্বামী অশ্বারোহণ করিয়া ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন। দুর্গের সীমা অতিক্রম করিয়া তিনি একবার অশ্ব ফিরাইলেন এবং নির্নিমেষ নয়নে একবার কমলা-দুর্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহার পর অশ্ব আবার ফিরাইয়া, তাহাকে কশাঘাত করিলেন এবং আসুরিক বেগে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

এই লোমহর্ষণ ব্যাপারের পর বাহ্যজ্ঞান-বিরহিতা কল্যাণীকে তাঁহার নিজ প্রকোষ্ঠে লইয়া যাওয়া হইল। সমস্ত দিন কল্যাণী নিতান্ত উদাস ভাবে অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু সন্ধ্যার পর হইতে তাঁহার সে ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল। তিনি কোন কোন কার্য্যে ও ব্যবহারে নিতান্ত প্রফুল্ল চিত্ততা দেখাইতে লাগিলেন। কিন্তু সেই প্রফুল্লতার মধ্যে মধ্যে নিতান্ত বিষণ্ণতা এবং নীরবতা উপস্থিত হইতে লাগিল। অন্যে যাহাই মনে করুক, বুদ্ধিমতী কিল্লাদারণী এরূপ পরিবর্ত্তন নিতান্ত অশুভ লক্ষণ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। তিনি কবিরাজ আনায়ন করিয়া কল্যাণীর জন্য ঔষধ ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। কিন্তু বৈদ্যরাজ বিশেষ কোন অসুস্থতা বুঝিতে পারিলেন না, সুতরাং বিশেষ কোন ব্যবস্থাও হইল না। এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল। সে দিন প্রাতে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে কল্যাণী কোন কথাই বলিলেন না, এমন কি সে ঘটনা তাঁহার মনে ছিল কি না সন্দেহ। কারণ প্রায়ই তিনি স্বীয় গলদেশে হস্তার্পণ করিয়া সেই প্রেম-নিদর্শন অন্বেষণ করিতে থাকিলেন, কিন্তু তাহা না পাইয়া হতাশ ভাবে বলিতে লাগিলেন,—"আমার জীবন-গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।"

কন্যার বিবাহ আর অধিককাল অসম্পন্ন রাখা কিল্লাদারণী অপরামর্শ বলিয়া মনে করিলেন। তিনি বুঝিলেন, কন্যার এইরূপ অনিচ্ছার বিষয় যদি বীরবল জানীতে পারেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি এ বিবাহে অস্বীকৃত হইবেন এবং সেরূপ হইলে শত্রুপক্ষ, বিশেষতঃ রামরাজা ও তদধীনস্থ ব্যক্তিগণ, বড়ই উপহাস করিবে। রঘুনাথ রায়, শম্ভুসিংহ, বীরবল সকলেই যত শীঘ্র বিবাহ সম্পন্ন হয়, তাহার নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কল্যাণীর শরীরের ও মনের অবস্থা বীরবলের নিকট নিতান্ত কৌশল সহকারে প্রচ্ছন্ন রাখা হইয়াছিল এবং সেরূপ না করিলে সম্ভবতঃ এ পরিণয় কার্য্য কখনই সংঘটিত হইত না। বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল এবং ক্রমশঃ সে দিন আসিয়া উপস্থিত হইল।

বিবাহের দিন কল্যাণীর সজীবতা ও প্রফুল্লতা দেখিয়া অনেকেই অবাক্ হইতে লাগিল। কল্যাণী বালিকার ন্যায় সরলতা-সহকারে তাঁহার নিমিত্ত যে নানা প্রকার মহামূল্য বসন-ভূষণ সমানীত হইয়াছিল, তৎসমস্ত দেখিতে লাগিলেন।

নানাস্থানীয় জ্ঞাতি-কুটুম্বে দুর্গ পরিপূর্ণ। লোকের হলহলায় চতুর্দ্দিক্ ধ্বনিত। খাদ্যভারে ভাণ্ডার পরিপূর্ণ। জাঁকজমক ও সমৃদ্ধির সীমা নাই। এই জনতা ও কোলাহলের মধ্যে মুরারি নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া মহানন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহার কটিবন্ধে একখানি প্রকাণ্ড অসি বিলম্বিত দেখিয়া, একবার কিল্লাদার বলিলেন,—"একি মুরারি! তোমার নিজের তরবারি কোথায়? এ কাহার তরবারি লইয়াছ? যাহাকে যেমন মানায় তাহার তেমনই পরিচ্ছদ করা আবশ্যক। তুমি যে তরবারি বাঁধিয়াছ, উহা সংগ্রামসিংহের শোভা পাইত।"

মুরারি বলিল,—"কি করিব বাবা, আমার ভাল ছোট তরবারি খানি হারাইয়া গিয়াছে। কাজেই আমি দাদার তরবারি বাঁধিয়াছি।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"যাহা হউক, তোমার দিদির কাছ ছাড়া হইও না।"

মুরারি কল্যাণীকে বড়ই ভাল বাসিত। সে বিনা বাক্যে দিদির সমীপাগত হইল এবং তাঁহার সহিত নানা প্রকার ক্রীড়া-কৌতুক করিতে লাগিল। বিবাহের কিঞ্চিৎ কালপূর্ব্বে, দৈবাৎ একবার কল্যাণীর হস্ত বালকের দেহে লাগিয়াছিল। মুরারি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বলিত যে,মানুষের হাত সেরূপ ঘর্ম্মাক্ত ও শীতল হইতে সে আর কখন দেখে নাই।

যথাসময়ে যথারীতি বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। পাত্র ও পাত্রী নির্দ্দিষ্ট গৃহে মঙ্গলাচার সহ প্রবেশ করিলেন। দলে দলে দরিদ্র ভিক্ষুকগণ আশানুরূপ দান পাইল। চারিদিকে ভূরিভোজের আয়োজন। যাহার যেরূপ সাধ্য সে সেরূপ নানা উপচারে আহার করিল। নানাপ্রকার বাদ্য-ধ্বনি, হাস্য ও আনন্দের উচ্চরব, সমবেত নিমন্ত্রিত লোকের কোলাহল, নর্ত্তকীর নর্ত্তন, গায়কের গীত ইত্যাদি নানাবিধ আনন্দ-কলরবে ও উৎসব ব্যাপারে আজি কমলাদুর্গ পরিপূরিত। কিল্লাদারণী সাহঙ্কারে হাসিতে হাসিতে লোকের সহিত আলাপ করিতেছেন। এবং চারিদিকে ব্যস্ততাসহ ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছেন। সহসা এই সমস্ত কোলাহল পরাভূত করিয়া, এক বিকট হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইল। সকলেই স্তম্ভিত হইয়া উঠিল। পুনরায় সেই আর্ত্তনাদ। তখন শম্ভুসিংহ, বাক্যব্যয় না করিয়া, সন্নিহিত আলোকাধার হইতে এক দীপ হস্তে লইয়া, পাত্র-পাত্রীর গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। কিল্লাদার, কিল্লাদারণী ও আরও দুই এক ব্যক্তি তাঁহার অনুসরণ করিল। অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ দারুণ বিস্ময়-সমাকুল চিত্তে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া, শম্ভুসিংহ দ্বারে আঘাত করিয়া দ্বার খুলিতে বলিলেন; কিন্তু মানবের যন্ত্রণা-ধ্বনি ব্যতীত অন্য কোন উত্তর পাইলেন না। তখন আর কালব্যাজ অনাবশ্যক মনে করিয়া, তিনি বাহির হইতে কৌশল করিয়া অর্গল খুলিয়া ফেলিলেন, কিন্তু দ্বার ঠেলিয়া বুঝিলেন যে, তাহা ভূপতিত কোন পদার্থে বাধা পাইতেছে। যখন চেষ্টা করিয়া তিনি দ্বার খুলিতে পারিলেন, তখন দেখিলেন—ভয়ানক দৃশ্য! দেখিলেন বরের মৃতপ্রায় দেহ দ্বার-সমীপে পতিত এবং চতুর্দ্দিকে রক্ত-স্রোত প্রবাহিত। উপস্থিত সকলেই ভীতভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং সেই শব্দে আকৃষ্ট হইয়া বহুসংখ্যক ব্যক্তি সেই প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত ব্যস্ততা প্রকাশ করিতে লাগিল। শম্ভুসিংহ অনুচ্চ স্বরে মাতার কর্ণের নিকট বলিলেন,—"দেখিতেছ কি? কল্যাণী ইহাকে খুন করিয়াছে। এখন শীঘ্র তাহার সন্ধান কর।" তাহার পর তিনি তরবারি খুলিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"আবশ্যক মত লোক ভিন্ন আর কাহাকেও এ গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিতে দিব না।" যে কয়েক ব্যক্তি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সযত্নে বীরবলের দেহ উঠাইয়া প্রকোষ্ঠান্তরে লইয়া আসিলেন। তথায় তাঁহার যথাবিহিত চিকিৎসা ও শুশ্রূষার আয়োজন হইতে লাগিল।

এদিকে কিল্লাদারণী ও আত্মীয়গণ বহু অনুসন্ধানেও কল্যাণীকে দেখিতে পাইলেন না। সে ঘরের অন্য দ্বার ছিল না। সকলেই আশঙ্কা করিতে লাগিলেন, হয়ত কল্যাণী বাতায়ন দিয়া বাহিরে পড়িয়া গিয়াছেন। সহসা তত্রত্য যবনিকার অন্তরালে শ্বেতবর্ণ পদার্থ-বিশেষ এক ব্যক্তির নয়ন-গোচর হইল। সকলে তথায় সমাগত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, সেই স্থানে মৃত্তিকার উপর, কল্যাণী কুণ্ড

লিত ভাবে উপবিষ্টা। তাঁহার পরিচ্ছদ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ও শোণিত-লিপ্ত ; চক্ষু উজ্জ্বল, রক্তবর্ণ এবং উন্মাদের ন্যায় অস্থির। তিনি যখন বুঝিলেন যে, লোকে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছে, তখন তিনি বিকট মুখভঙ্গী করিতে লাগিলেন এবং সগর্ব্বে স্বীয় রুধির-রাগ-রঞ্জিত হস্ত প্রদর্শন করিয়া সকলকে ভয় দেখাইতে লাগিলেন।

বহু আয়াসে আত্মীয়জনেরা তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইলেন। তাহার পর বিহিত সাবধানতা সহকারে সকলে তাঁহাকে প্রকোষ্ঠান্তরে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন। দ্বার সমীপস্থ হইয়া তিনি একবার নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অহঙ্কৃত ভাবে বলিলেন,—"তবে, রাঙ্গা কনের সাধ মিটিয়াছে ?" তাঁহাকে অন্য গৃহে লইয়া গিয়া যথাসম্ভব যত্ন ও চিকিৎসার আয়োজন করা হইল। কিল্লাদার ও তাঁহার পত্নীর যৎপরোনাস্তি মনস্তাপ, সমবেত ব্যক্তিবৃন্দের ভয়-চকিত ব্যাকুলভাব, বরপক্ষীয়গণের কখন কাতর, কখন বা ক্রুদ্ধভাব ইত্যাদি নানা প্রকার বর্ণনাতীত ভাবে লোক-সমূহের হৃদয় পরিপূর্ণ।

কে কাহার কথা শুনে, অথবা কে কাহাকে কি বলে, তাহার স্থিরতা নাই। অবশেষে চিকিৎসকের কথাই বলবান্ হইল। তিনি বলিলেন,—"বীরবলের আঘাত কোন ক্রমেই সাংঘাতিক নহে। কিন্তু তাঁহাকে স্থিরভাবে না থাকিতে দিলে, অথবা সহসা স্থানান্তরিত করিলে নিশ্চয়ই বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। ইতিপূর্ব্বে বীরবলের বন্ধুগণ তাঁহাকে আর এ দুর্গে রাখা হইবে না স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে সে মত না করিয়া কয়েক জন বীরবলের নিকট থাকিয়া, অবশিষ্টেরা সেই রাত্রেই প্রস্থান করিবেন স্থির করিলেন।

কবিরাজগণ কল্যাণীর অবস্থা নিতান্ত মন্দ বলিয়া ব্যক্ত করিলেন। শেষ রাত্রে কল্যাণী ঘোরতর অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। পরদিন রাত্রে তাঁহার চূড়ান্ত অবস্থা হইবে বলিয়া চিকিৎসকেরা অনুমান করিলেন। তাঁহাদের অনুমান যথার্থ হইল। পরদিন রাত্রে কল্যাণীর পুনরায় চৈতন্য হইল এবং তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ বলিয়া মনে হইল। কিন্তু সহসা সেই কণ্ঠলগ্ন প্রেম-নিদর্শন অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত, তিনি যেমন তথায় হস্তার্পণ করিলেন, অমনই তাঁহার চিত্তে যেন আমূল পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগ্রৎ হইয়া উঠিল এবং ক্রমাগত সঙ্গে সঙ্গে মূর্চ্ছার পর মূর্চ্ছা হইতে হইতে অবশেষে মৃত্যু আসিয়া সকল যন্ত্রণার শেষ করিয়া দিল। তিনি এই লোমহর্ষণ কাণ্ডের কোনই কারণ ব্যক্ত করিতে সক্ষম হইলেন না। ইহ সংসারে কল্যাণীর জীব-লীলার অবসান হইয়া গেল !

একজন সম্ভ্রান্ত-রাজকর্ম্মচারী এই সকল ব্যাপারের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে আসিলেন। উন্মত্তাবস্থায় কিল্লাদারের কন্যা বিবাহ-রাত্রে অস্ত্র দ্বারা স্বামীকে আঘাত করিয়াছে এবং পরে আপনিও মরিয়া গিয়াছে। কর্ম্মচারী এতদ্ভিন্ন আরও কোন সন্ধান জানিতে পারিলেন না। মুরারি যে তরবারি বিবাহের দিন হারাইয়াছিল বলিয়া, সে অন্য তরবারি গ্রহণ করিয়াছিল, সেই তরবারির দ্বারাই এই ভয়ানক কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল। রক্তাক্ত অবস্থায় উক্ত তরবারি সেই প্রকোষ্ঠ মধ্যেই প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল।

বীরবলের বন্ধুগণ মনে করিয়াছিলেন যে, তিনি আরোগ্য হইয়া উঠিলে, এতৎসম্বন্ধীয় সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পরা যাইবে। তিনি আরোগ্য হইলেন, কিন্তু এ প্রশ্ন উত্থাপিত হইলেই, তিনি শারীরিক দুর্ব্বলতার কারণ দেখাইয়া বিহিত উত্তর প্রদানে বিরত থাকি-

ছেন। তিনি সুন্দররূপ রোগমুক্ত হইলে, গৃহাগত হইয়া, যে সকল বন্ধুবান্ধব তাঁহার বিপদ্‌কালে আশাতিরিক্ত উপকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে একত্রিত করিয়া বলিলেন,—"আপনাদের নিকটে আমি অসীম কৃতজ্ঞতায় বদ্ধ। কিন্তু সে কথা স্মরণ করিয়াও আমি আপনাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে অক্ষম। যদি কোন আত্মীয়া স্ত্রীলোক আমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আর কি বলিব, বুঝিব আমার সহিত আত্মীয়তা রক্ষা করা তাঁহার বাঞ্ছা নহে। যদি কোন পুরুষ বন্ধু এ কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে বুঝিব, আমার সহিত বিবাদ করা তাঁহার অভিপ্রায়। আমিও তাঁহার সহিত তদনুরূপ ব্যবহার করিব।" এরূপ স্থির সংকল্প-মূলক কথার পর আর কে এ প্রসঙ্গ তাঁহার সমক্ষে উত্থাপন করিতে সাহসী হইবে? বন্ধুবান্ধবেরা লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, এই ঘটনার পর হইতে বীরবলের জীবন অপেক্ষাকৃত বিষণ্ণ ও বিজ্ঞভাব ধারণ করিয়াছিল। তিনি এই ব্যাপারের পর হইতে সামান্য ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহের সংস্থান করিয়া দিয়া, শিবরামকে স্বীয় সংসর্গ হইতে অপসৃত করিয়া দিলেন। কথিত আছে, বীরবল ইহ জীবনে আর কখনই এই ভয়ানক বিবাহের প্রসঙ্গ কোথাও উত্থাপন করেন নাই।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতে বিহিত সৎকারার্থ কল্যাণীর দেহ শ্মশান-স্থলে সমানীত হইল। যে দেহ একদা রূপের আধার, সজীবতা হেতু প্রফুল্লতাময়, এবং সকলের নয়নবিনোদক ও আনন্দনিকেতন ছিল, অদ্য তাহা শুষ্ক শ্রী-হীন, প্রাণশূন্য। আত্মীয়গণের বিবেচনার দোষে, হৃদয়হীন অত্যাচারের পরুষ আঘাতে, অদ্য তাহার এই শোচনীয় দশা। এই হৃদয়-বিদারক শেষ কর্ত্তব্য সমাপনার্থ শম্ভুসিংহ ও আর কয়েকজন অনুচর মাত্র সঙ্গে ছিলেন।

ধীরে ধীরে, বিহিত কার্য্য-সমূহ সম্পন্ন হইলে, নবীনার কুসুম-কোমল কায়া চিতায় স্থাপিত হইল। ধীরে ধীরে তাহাতে সর্ব্বসংহারক অগ্নি সমর্পিত হইল। দেখিতে দেখিতে বিষম চিতা ঘোরঘটায় প্রজ্বলিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণীর ভূতময় পবিত্র বপুঃ ভস্মরাশিতে পরিণত হইয়া গেল। সে স্বর্ণ-কান্তির গঠন জগতীতল হইতে অনন্তকালের নিমিত্ত বিলীন হইল।

যখন এই অচিন্তনীয় ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছিল, তখন সেই শ্মশানক্ষেত্রের অনতিদূরে বৃক্ষ-মূলে এক যুবা পুরুষ অজ্ঞানবৎ অবস্থায় দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহার আরক্ত লোচনযুগল স্থির—শূন্যদৃষ্টি শূন্যাভিমুখে লক্ষিত। বদন দারুণ বিষাদ-কালিমায় সমাচ্ছন্ন। অন্যমনস্ক ছিলেন বলিয়া, সৎকারে ব্যাপৃত ব্যক্তিগণ কেহই এই ব্যক্তির উপস্থিতি লক্ষ্য করেন নাই। এক্ষণে শম্ভুসিংহের দৃষ্টি সেই দিকে সঞ্চালিত হইল। তিনি সমভিব্যাহারী লোকদিগকে কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিতে বলিয়া, সেই যুবা পুরুষের নিকটস্থ হইলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন,—"আমার সম্মুখস্থ ব্যক্তি নিশ্চয়ই দুর্গস্বামী বিজয়সিংহ।" তাঁহার কথার কোনই উত্তর পাইলেন না। তখন ক্রোধ-বিকম্পিত কণ্ঠে আবার বলিলেন,—"নিশ্চয়ই আমার সম্মুখস্থ ব্যক্তি আমার ভগ্নীহন্তা বিজয়সিংহ।"

নির্জীব ও ভগ্নস্বরে দুর্গস্বামী বলিলেন,—"আপনি যে ব্যক্তির নাম করিয়াছিলেন আমি সেই ব্যক্তিই বটি।"

শম্ভুসিংহ বলিলেন,—"আপনার দ্বারা যে দুষ্কৃতি সংঘটিত হইয়াছে, তজ্জন্য যদি আপনার অনুতাপ উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঈশ্বর আপনাকে ক্ষমা করিলেও করিতে পারেন, কিন্তু জানিবেন আমার নিকট কোন মতেই ক্ষমা নাই। আপনাকে আমি ক্ষত্রিয়জনোচিত যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি। কল্য প্রাতে, শার্দ্দূলাবাসের পশ্চিম প্রদেশে, বালুকাময় স্থানে যুদ্ধ হইবে—ভুলিবেন না।"

চঞ্চলচিত্ত দুর্গস্বামী বলিলেন,—"এ উন্মত্তচিত্ত ব্যক্তিকে আর অধিক উত্তেজিত করিবেন না। যতক্ষণ সম্ভব আপনি সুখে আপনার জীবন সম্ভোগ করুন এবং আমাকে উপায়ান্তর দ্বারা মৃত্যু-কবলিত হইতে দিউন।"

শম্ভুসিংহ বলিলেন,—"কদাচ তাহা হইবে না। আমার হস্তেই আপনার মরণ হইবে, না হয় আপনি আমাকে বিনাশ করিয়া আমার বংশের সম্পূর্ণ পতন ঘটাইবেন, ইহাই আমার স্থির সংকল্প। যদি আপনি আমার প্রস্তাবে সম্মত না হন, তাহা হইলে জানিবেন, যে কিছু উপায় অবলম্বন করিলে আপনি উত্তেজিত হইবেন আমি তৎসমস্তই করিব; আপনাকে বিধি-মতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিতে ত্রুটি করিব না, এবং অবশেষে এমনই করিয়া তুলিব যে, দুর্গস্বামীর নাম দেশ-মধ্যে মহা অপমানজনক ও ঘৃণাজনক হইয়া উঠিবে।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"তাহা কখনই হইতে পারিবে না। যদিও যে বংশে আমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছি আমিই তাহার শেষ, তথাপি পূর্ব্বগত মহাত্মগণের অনুরোধে, আমি সে নামে কখনই কলঙ্ক সংযুক্ত হইতে দিব না। আমি আপনার আহ্বানে স্বীকৃত হইলাম। যুদ্ধ একাকী হইবে, কি আর লোক থাকিবে?"

"একাকী আমরা যুদ্ধ-ক্ষেত্রে সমাগত হইব এবং এক ব্যক্তি মাত্র সে স্থান হইতে ফিরিয়া আসিব।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"উত্তম কথা। কল্য প্রাতে যথাস্থানে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।"

তিনি চলিয়া গেলেন। দিনমান তিনি কিরূপে অতিবাহিত করিলেন তাহার স্থিরতা নাই। গভীর রাত্রে তিনি শার্দ্দূলাবাসে উপস্থিত হইলেন এবং বৃদ্ধ কানাইকে জাগ্রৎ করিলেন। যে যে রূপ কারণে এবং যে যে রূপ ভাবে কল্যাণীর জীবনান্ত ঘটিয়াছে, তাহার সংবাদ কানাইয়ের কর্ণেও প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এতদ্ধেতু দুর্গস্বামীর চিত্তের অবস্থা কিরূপ ভয়ানক হইবে তাহা ভাবিয়া কানাই নিতান্ত উৎকুণ্ঠিত ছিল।

সমাগত দুর্গস্বামীর ভাব দেখিয়া কানাই আরও ভীত হইল। ভীতিকম্পিত কানাই, দুর্গস্বামীকে কিছু আহার করাইবার নিমিত্ত অনেক নিষ্ফল সাধনা করিল। সে চেষ্টায় হতাশ হইয়া, নিদ্রায় উপকার হইবে ভাবিয়া তাহার প্রস্তাব করিল, কিন্তু কোন উত্তর পাইল না। অবশেষে বাংবার অনুরোধের পর, দুর্গস্বামী ইঙ্গিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলে, ইদানীং দুর্গস্বামীর অবস্থোন্নতি সহকারে যে প্রকোষ্ঠটী সজ্জীভূত হইয়াছিল, কানাই সেই প্রকোষ্ঠে তাঁহাকে আলোক ধরিয়া সঙ্গে লইয়া চলিল। দ্বার-সমীপস্থ হইয়া দুর্গস্বামী স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন এবং নিতান্ত উগ্রভাবে বলিলেন,—"এখানে কেন? যে দিন

তাঁহারা এই দুর্গে আসিয়াছিলেন, সে দিন তিনি যে প্রকোষ্ঠে শয়ন করিয়াছিলেন, আমাকে সেই প্রকোষ্ঠে লইয়া য'ও।"

ভয়-বিচলিত-জ্ঞান কানাই মহোদ্বিগ্ন ভাবে জিজ্ঞাসিল,—"আজ্ঞে কে ?"

"তিনি—কল্যাণী দেবী !—আঃ আমাকে পুনরায় তাঁহার নামোচ্চারণ করাইয়া প্রাণান্ত না করিলে কি তোমার সুখ হয় না ?"

সেই গৃহের নিতান্ত অসংস্কৃত অবস্থার উল্লেখ করিয়া কানাই প্রভুকে নিরস্ত করিবে ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু দুর্গস্বামীর মুখের নিতান্ত অধীর ও বিরক্ত ভাব দেখিয়া কোন কথা বলিতে তাহার সাহস হইল না। কম্পিত হস্তে আলোক ধারণ করিয়া বৃদ্ধ নবীন প্রভুকে লইয়া সেই পরিত্যক্ত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। আলোক ভূতলে রক্ষা করিয়া কানাই শয্যার আয়োজন করিতে উদ্যত হইল। তখন দুর্গস্বামী তাহাকে এরূপ ভাবে নিক্রান্ত হইতে আদেশ করিলেন যে, আর তাহার বিলম্ব করিতে সাহস হইল না। কানাই প্রস্থান করিয়া রোদন ও ভগবৎ-সমীপে দুর্গ-স্বামীর মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিল। সময়ে সময়ে দুর্গস্বামীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস, যন্ত্রণাসূচক ধ্বনি এবং বিজাতীয় মনস্তাপের প্রাবল্যে ভূপৃষ্ঠে পদাঘাতধ্বনি, চিন্তিত ব্যথিত ও মর্ম্মাহত কানাইয়ের কর্ণে প্রবেশ লাভ করিতে লাগিল। বুঝি বা উষা অদ্য দেখা দিবে না ভাবিয়া, কানাই ব্যস্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু কালস্রোত মানব-বুদ্ধিতে মন্থর-গতি বা দ্রুত বেগ বলিয়াই অনুমিত হউক, উহা অবিরত অপ্রতিহত প্রবাহেই প্রবাহিত। ক্রমশঃ প্রভাত-সূর্য্যের স্নিগ্ধোজ্জ্বল কররাশি পূর্ব্বাকাশের নিম্নদেশে প্রকটিত হইল। উষার আলোক আবির্ভূত হইলে, কানাই দ্বারের একটি ছিদ্র মধ্য দিয়া দুর্গস্বামীর ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিল। দেখিল, দুর্গস্বামী কয়েক খানি অসি লইয়া পরীক্ষা করিতেছেন। অসি সমূহের মধ্য হইতে ক্ষুদ্রতম একখানি অসি হস্তে লইয়া বলিলেন,—"এখানি ক্ষুদ্র—তাহাতে ক্ষতি কি ? ইহাতে তাহারই সুবিধা হইবে—হউক।"

প্রভুর অভিপ্রায় কি তাহা কানাই বুঝিতে পারিল এবং এ সম্বন্ধে তাহার বিরুদ্ধ চেষ্টা যে সর্ব্বথা নিষ্ফল হইবে তাহাও সে স্থির করিল। অবিলম্বে দুর্গস্বামী ব্যস্ততা সহ গৃহদ্বার উন্মুক্ত করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং অশ্ব-শালায় গমন করিয়া স্বহস্তে অশ্বে পর্য্যাণ আরোপ করিতে লাগিলেন। সভয়ে কম্পিত কানাই প্রভুর সহায়তা করে অগ্রসর হইল, কিন্তু তিনি ইঙ্গিত দ্বারা তাহাকে নিবৃত্ত হইতে আদেশ করিলেন। প্রভু-গতপ্রাণ কানাইয়ের তৎকালে হৃদয়ের ভাব অবর্ণনীয়। দুর্গস্বামী অশ্বারোহণে উদ্যত হইলে, কানাই আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে বেগে প্রভুর সমীপাগত হইয়া তাঁহার পদ-নিম্নে পড়িয়া গেল এবং উভয় হস্তে তাঁহার চরণ বেষ্টন করিয়া বলিল,—"প্রভো! দুর্গস্বামিন্! এ বৃদ্ধ, অনুগত সেবককে বধ করিতে ইচ্ছা হয় করুন। কিন্তু আপনি যে ভয়ানক কার্য্যের জন্য সজ্জিত হইয়াছেন তাহা করিবেন না। আপনি আমার আরাধ্য প্রভু। আপনি দয়া করিয়া আর একদিন অপেক্ষা করুন। কল্য রামরাজা আসিবেন, তিনি আসিলেই সকল বিষয়েরই প্রতিকার হইবে।"

তখন দুর্গস্বামী সযত্নে স্বীয় পদ কানাই-য়ের হস্ত-মুক্ত করিয়া বলিলেন,—"কানাই, ইহ জগতে তোমার আর প্রভু নাই। কেন বৃদ্ধ, এই পতনোন্মুখ বৃক্ষকে জড়াইয়া ধরিতেছ ?"

পুনরায় দুর্গস্বামীর পদযুগল ধারণ করিয়া গলদশ্রু লোচনে কানাই বলিল,—"যতক্ষণ দুর্গস্বামি-বংশের বংশধর জীবিত আছেন, ততক্ষণ অবশ্যই আমার প্রভু আছেন। আমি দাস বটি, কিন্তু আমি নূতন দাস নহি; আমি আপনার পিতৃদাস, আপনার পিতামহের দাস। এই বংশের সেবার জন্য আমার জন্ম, এই বংশের সেবাতেই আমার জীবন নিযুক্ত এবং এই বংশের সেবাতেই আমার জীবন নির্গত হইবে। আপনি গৃহে থাকুন—সমস্তই ঠিক হইবে।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"ঠিক! মূঢ়! ইহ জীবনে আমার আর কিছুই ঠিক হইবে না। জীবন এক্ষণে ভারভূত। যত শীঘ্র এ জীবন যায় ততই মঙ্গল।"

দুর্গস্বামী কানাইয়ের বাহুপাশ হইতে পদদ্বয় মুক্ত করিলেন এবং অশ্বারোহণ করিয়া বেগে অশ্ব চালিত করিলেন; তখনই আবার অশ্ব ফিরাইয়া, স্বীয় মুদ্রাধার কানাইয়ের নিকট ফেলিয়া দিয়া, বিকট হাস্য সহকারে বলিলেন,—"কানাই, এই লও। তোমাকে আমি আমার সম্পত্তির অছি করিলাম।" আবার অশ্ব চালিত হইল।

মুদ্রাধারের প্রতি কানাই লক্ষ্যও করিল না। কোন্ দিকে প্রভু অশ্ব চালিত করিলেন, তাহাই দেখিতে কানাই ব্যগ্র হইল। দেখিল দুর্গস্বামী দুর্গ-সীমান্তবর্ত্তী বালুকা-প্রান্তরাভিমুখে অশ্ব চালিত করিলেন। তখনই সেই চারণের ভবিষ্যদ্বাণী মনে পড়িল। এ বালুকাপ্রান্তর মরুভূমির অংশ বিশেষ। কানাই থর থর কাঁপিতে লাগিল এবং তদভিমুখে ধাবিত হইল।

প্রতিহিংসা-দষ্ট-হৃদয় শম্ভুসিংহ বহুক্ষণ পূর্ব্ব হইতেই নির্দিষ্ট স্থানে শত্রুর নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি ব্যগ্রতার সহিত দুর্গাভিমুখে চাহিয়া ছিলেন। এমন সময়ে বেগবান্ অশ্বারূঢ় দুর্গস্বামীর মূর্ত্তি তাঁহার নয়ন-পথে নিপতিত হইল। কিন্তু সহসা দুর্গস্বামীর সে মূর্ত্তি তাঁহার চক্ষে অদৃশ্য হইয়া গেল; যেন সেই মূর্ত্তি সহসা বায়ুতে বিলীন হইল; অশ্ব অশ্বারোহীর কোনই নিদর্শন রহিল না। শম্ভুসিংহ, কোন অলৌকিক মূর্ত্তি দেখিয়াছেন মনে করিয়া, নয়ন-মার্জ্জনা করিলেন এবং সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বিপরীত পথাগত কানাই ভিন্ন আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন উভয়ে অনুমান করিলেন যে, তত্রত্য বালুকাপুঞ্জে যে এক বিপুল গহ্বর ছিল, অসাবধান দুর্গস্বামী অশ্বসহ তাহাতেই নিপতিত ও বালুকারাশিতে আবৃত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার উষ্ণীষ উপরিস্থ একটী ভগ্ন পালকমাত্র তথায় পতিত আছে—অন্য কোন প্রকার নিদর্শন নাই। সেই কিরীটাংশ কানাই যত্ন সহকারে বক্ষে স্থাপন করিল।

পিপলি গ্রামবাসী ও অন্যান্য নানা ব্যক্তি দুর্গস্বামীকে সন্ধান করিবার নিমিত্ত, নানা চেষ্টা করিল, কিন্তু সে সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হইল। তাহারা বালুকাস্তূপ সরাইতে না সরাইতে আবার নূতন বালুকাস্তূপ সে স্থান অধিকার করিতে লাগিল। এইরূপে তাহাদের যাবতীয় চেষ্টা বিফল হইয়া গেল। পরদিন রামরাজা শার্দ্দূলাবাসে আগমন করিয়া এই বিষাদকাহিনী অবগত হইলেন এবং নিতান্ত শোক-সন্তপ্ত হইলেন। তিনি হতাশ ও ভগ্নহৃদয় হইয়া প্রস্থান করিলেন।

কানাইয়ের অবস্থা নিতান্ত মন্দ। সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাহার জীবন তাহাকে ত্যাগ করিল। তাহার আশা ভরসা ছিন্ন হইয়া

গেল। তাহার উত্তম আকাঙ্ক্ষা নিবিয়া গেল। যে বিস্তৃত পাদপকে সে আশ্রয় করিয়াছিল, সে পাদপ আজি ভগ্ন হইল; কাতর, মর্ম্মাহত, সন্তপ্ত কানাই আহার ত্যাগ করিল, নিদ্রা ত্যাগ করিল, লোকের সহিত বাক্যালাপ ত্যাগ করিল এবং অনতি-কাল মধ্যে প্রভু-পরায়ণ কানাই, প্রভুর নাম স্মরণ করিতে করিতে ভব-রঙ্গ ভূমি হইতে অনন্তকালের নিমিত্ত অবসর গ্রহণ করিল।

কিল্লাদার বংশও দুর্ঘটনার পর দুর্ঘটনায় প্রপীড়িত হইয়া অবসন্ন হইয়া আসিল। যুদ্ধ বিশেষে শম্ভু সিংহ নিহত হইলেন। কিল্লাদার তাহার পরে কিছুদিন মাত্র জীবিত ছিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী মুরারি অবিবাহিত ও নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগত হইল। সকল বিপদ ও সকল অনিষ্টের মূল-স্বরূপা কিল্লাদারণী কিন্তু সুদীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। অন্তরে যাই হউক, বাহ্যতঃ তাঁহার ভাব অন্তিম কাল পর্য্যন্ত পূর্ণমাত্রায় অহঙ্কার ও তেজে পূর্ণ ছিল। বিষাদ-বা অনুতাপের যাতনা কখন তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল বলিয়া অনুমান হয় না।

সম্পূর্ণ।

অন্নপূর্ণা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ঐহিক ঐশ্বর্য্য।

পাঁচ বৎসর অতীত হইল, অন্নপূর্ণার সহিত বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া, উমাশঙ্কর সস্ত্রীক আসিয়া সোণাপুরে স্বকীয় পিতৃ-ভবনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। সুবিচক্ষণ হরকুমার বাবু তাঁহাদের সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন এবং বিষয়-কর্ম্মে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ উমাশঙ্করের বৈষয়িক ব্যাপারে সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া, অচিরে কাশীতে ফিরিয়া যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। হরকুমার বাবুর সহিত সম্পর্ক-শূন্য হওয়ার পর হইতে, শ্যামলাল, বিধুমুখী ও হরিচরণ বিষয়-ব্যাপারের এতই বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়াছিলেন যে, হরকুমার বাবুকে অশেষ আয়াস স্বীকার করিয়া, সুদীর্ঘকালে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিতে হইল। হরকুমার বাবুর ন্যায় সুদক্ষ ব্যক্তি এ ব্যাপারে সর্ব্বতোভাবে সংলিপ্ত না থাকিলে, উমাশঙ্করের বিষয় সম্পত্তির উদ্ধার-সাধন হইত কি না সন্দেহ। প্রায় সমস্ত মোকদ্দমাতেই উমাশঙ্কর জয়ী হইয়াছেন, সমস্ত সম্পত্তি সর্ব্বপ্রকার দায় হইতে মুক্ত হইয়াছে, বিস্তর নূতন সম্পত্তি ক্রয় করা হইয়াছে, তহবিলে বিস্তর নগদ টাকা মজুত হইয়াছে, ঐশ্বর্য্যের অনুরূপ দ্রব্য-সামগ্রী বহুল পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছে এবং সর্ব্বত্র শোভা ও সমৃদ্ধির চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইতেছে। শীঘ্র কাশীধামে প্রস্থান করিবেন সংকল্প থাকিলেও, পরিগৃহীত কর্ত্তব্যের বাঞ্ছনীয়রূপ সুসমাপ্তি না হওয়ায়, হরকুমার বাবু অদ্যাপি যাইতে পারেন নাই।

উমাশঙ্করের বিপুল ভূ-সম্পত্তি বঙ্গের বহু জেলায় বিস্তৃত। তাঁহার জমিদারীর প্রায় সকল গ্রামে ও নগরে বিদ্যালয় এবং চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। তত্তাবতের ব্যয়-ভার তাঁহার কোষ নিয়মিত রূপে বহন করিতেছে। বহু স্থানেই সুবিস্তৃত জলাশয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং যেখানে যেরূপ প্রয়োজন, তথায় তদনুরূপ হিতানুষ্ঠানসমূহ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বাসগ্রাম সোণাপুরে একটী কলেজ, সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়নার্থ একটী চতুষ্পাঠী, বাঙ্গালা বিদ্যালয়, সাধারণ পুস্তকালয়, একটী সুবিস্তৃত চিকিৎসালয় প্রভৃতি বহুবিধ হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে। সকল স্থানের সকল অনুষ্ঠানই সুদক্ষ ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে।

বিগত নববর্ষ উপলক্ষে বঙ্গের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা উমাশঙ্করকে রাজাবাহাদুর এবং হরকুমারকে রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। আজন্ম সন্ন্যাসীবেশ-ধর, ভিক্ষোপজীবী, বিভূতি-বিলেপিত কলেবর, চর্ম্মাসনাসীন উমাশঙ্কর, অধুনা সর্ব্ববিধ ভোগৈশ্বর্য্য-পরিবৃত হইয়া, চিরাভ্যস্ত জীবন-

প্রণালীর সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থায় পরিস্থাপিত হইয়াছেন। যে যে পদার্থ লোকে ঐহিক সুখের পরাকাষ্ঠা বলিয়া মনে করে, তৎসমস্তই তাঁহার প্রচুর পরিমাণে কর-তল-গত হইয়াছে। সে পর্ণ-কুটীর নাই, সে ভিক্ষাবৃত্তি নাই, কোন গৃহকর্ম্ম সম্পাদনের প্রয়োজন নাই, সে মিতাহার নাই, সে উপবাস ও আয়াস নাই। অগণ্য প্রকোষ্ঠ-মালা পরিবৃত সুরম্য হর্ম্যে তাঁহার বাস, প্রয়োজনাধিক দাস-দাসী তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত, দেব-ভোগ্য বিবিধ সুখাদ্য তাঁহার রসনার তৃপ্তি-সাধনে প্রস্তুত, নানাবিধ যান-বাহন তাঁহার ব্যবহারার্থ উপস্থিত, স্বর্ণ ও মণিমুক্তা এবং নানাবিধ বহুমূল্য বসন তাঁহার দৈহিক শোভা-সম্পাদনে বিনিযুক্ত। সর্ব্বোপরি সুখ—তাঁহার অন্তঃপুরে স্বর্গবালার ন্যায় রূপসী ও একান্ত পতি-পরায়ণা পত্নী অন্নপূর্ণা। কেবল তাহাই নহে; দুই বৎসর অতীত হইল সেই দেবী এক সর্ব্ব-সুলক্ষণাক্রান্ত সুকুমার-কলেবর পুত্র প্রসব করিয়া উমাশঙ্করের সর্ব্ব-সুখময় সংসারকে পূর্ণানন্দের নিকেতন করিয়া দিয়াছেন। রাজা উমাশঙ্কর বাহাদুর সর্ব্বপ্রকারে লৌকিক সুখের অধিকারী হইয়াছেন।

উমাশঙ্কর পূর্ব্বেই সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াছিলেন। বেদ, উপনিষৎ, দর্শন, পুরাণ ও কাব্যাদি তিনি প্রকৃষ্টরূপে আলোচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু ইংরাজি ভাষায় তাঁহার কোনই অধিকার ছিল না। জীবনের গতি বিভিন্ন পন্থা পরিগ্রহ করিলে, তিনি বুঝিলেন, বর্ত্তমান কালে ইংরাজি ভাষায় অভিজ্ঞতা মনুষ্য মাত্রেরই একান্ত আবশ্যক। পাঁচ বৎসর অবিচলিত অধ্যবসায় সহকারে ইংরাজির আলোচনা করিয়া, তিনি তদ্বিষয়ে যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করিলেন। সাহিত্য ও ইতিহাস বিজ্ঞান ও দর্শন-শাস্ত্র-ঘটিত বহুবিধ ইংরাজি গ্রন্থ তিনি অধ্যয়ন করিলেন। ইংরাজি ভাষায় তাঁহার সুন্দর ব্যুৎপত্তি জন্মিল এবং সেই ভাষায় নির্দ্দোষ প্রবন্ধ রচনায় ও কথোপকথনে তাঁহার সক্ষমতা হইল। ইংরাজি ভাষায় প্রভৃত আলোচনায় তাঁহার জ্ঞানের প্রসার বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইল এবং তজ্জন্য তিনি সাতিশয় আনন্দলাভ করিলেন। কিন্তু ধর্ম্ম ও সদাচার সম্বন্ধে তাঁহার চিত্তক্ষেত্রে যে বদ্ধ-মূল সংস্কার ও বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, প্রভূত ইংরাজির আলোচনাতেও তাহার তিলমাত্র বিচলিত বা স্থান-ভ্রষ্ট হইল না। আর্য্যধর্ম্মের প্রণালী এবং তৎসম্বদ্ধ শিক্ষা ও উপদেশ তাঁহার বিবেচনায় অতুলনীয় বলিয়াই স্থায়ীরূপে অবধারিত রহিল।

অধুনা রাজা উমাশঙ্করের বয়স পঞ্চবিংশ বর্ষ; সুতরাং তিনি এক্ষণে পূর্ণ যৌবনে অধিষ্ঠিত। তাঁহার দেহ সুপরিণত ও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর; বর্ণ সুগৌর ও জ্যোতির্ম্ময়; লোচন-যুগল সমুজ্জ্বল ও প্রতিভা-প্রদীপ্ত; মস্তকের ঘনকৃষ্ণ কেশরাশির মধ্যস্থলে যথাস্থানে সুদীর্ঘ ও স্থূল শিখা; বদন শ্মশ্রু-বিরহিত; ওষ্ঠোপরি ভ্রমর-কৃষ্ণ শোভাময় গুল্ফ।

বৈশাখ মাসে একদিন সন্ধ্যার পর, স্বকীয় প্রাসাদ মধ্যস্থ পুস্তকাগারে বসিয়া, রাজা মনোযোগ সহকারে Haggard প্রণীত "She" নামক উপন্যাস পাঠ করিতেছেন। নিকটে কোন লোক নাই; কিন্তু বাহিরের বারান্দায় তাঁহার আজ্ঞার প্রতীক্ষায়, দুই জন সেবক অপেক্ষা করিতেছে। মকমল মণ্ডিত মনোহর চেয়ারে রাজা সমাসীন; তাঁহার সম্মুখে মার্বেল প্রস্তর-নির্ম্মিত একখানি সুন্দর টেবিল। গৃহের চতুর্দ্দিকে অনেক সুরম্য আলমারি;

সকলগুলিই রাশি রাশি শোভাময় পুস্তকে পরিপূর্ণ। টেবিলের চারিদিকে চেয়ার সংস্থাপিত এবং তাহার উপরিস্থিত এক রমণীয় স্ফটিকাধার হইতে অত্যুজ্জ্বল আলোক নিঃসৃত হইতেছে। রাজার পরিধান জরির পাইড়যুক্ত এক সূক্ষ্ম ঢাকাই ধুতি, পায়ে বার্ণিস করা বিলাতী চটি, গায়ে জামা না থাকায়, বিশাল ও গৌর বক্ষের উপর শুভ্র যজ্ঞ-সূত্র বড়ই শোভাময় দেখাইতেছে। তাঁহার মাথার উপর একখানি সুদৃশ্য পাখা ধীরে ধীরে দুলিতেছে। রাজা অধ্যয়নে একান্ত নিবিষ্ট-চিত্ত।

এক পূর্ণবয়স্ক, পূর্ণায়ত-কলেবর পুরুষ সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মস্তকের কেশ, বহুদিন কৃষ্ণকায় থাকিয়া, সম্প্রতি লজ্জায় শ্বেতবর্ণ ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তাঁহার ললাট—প্রদেশ অনিচ্ছায় কালের অঙ্ক বুক পাতিয়া বহন করিতে উদ্যত হইয়াছে। বয়সের আধিক্য হইলেও, আগন্তুক যুবার ন্যায় কর্ম্মঠ ও ক্ষিপ্রকারী এবং তাঁহার গতি-বিধি ও অঙ্গ-সঞ্চালনাদি যুবজনোচিত। ইনি রায় হরকুমার চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর। রায় বাহাদুরের পরিধান একখানি সামান্য থানের কাপড়, কাঁধে একখানি গামছা, পায়ে একযোড়া ঠনঠনের চটী এবং বক্ষের উপর দিয়া সুস্থূল উপবীত বিলম্বিত।

রায় বাহাদুর গৃহাগত হইয়া বলিলেন,—"বাবাজী, একটা দরকারী কথার জন্য তোমাকে অসময়ে বিরক্ত করিতে আসিয়াছি।"

তাঁহার কণ্ঠস্বর শ্রবণমাত্র, রাজা সসম্ভ্রমে আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং নিকটস্থ হইয়া তাঁহার চরণে প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন,—"নিশ্চয়ই আমি অজ্ঞানতঃ আপনার নিকট অপরাধী হইয়াছি; নচেৎ যে ব্যক্তি আজ্ঞার পাত্র তাহার সহিত আপনি কুণ্ঠিত ভাবে কথা কহিতেছেন কেন? আপনার আগমনের সময় অসময় নাই—থাকিতেও পারে না। আর যে দিন আপনাকে দেখিয়া, বা আপনার কথা শুনিয়া বিরক্ত জন্মিবে সে দিন অধম উমাশঙ্কর মনুষ্যত্ব-বিহীন হইয়া পশুত্ব অবলম্বন করিবে।"

রায় বাহাদুর তত্রত্য একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া উপবেশন করিলেন এবং একবার মাথার চুলগুলা উভয় হস্তে নাড়িয়া বলিলেন,—"বড় গরম। কে আছ বাহিরে? পাখাটা একটু জোরে টানিতে বলিয়া দেও তো।"

বাহির হইতে উত্তর হইল,—"যে আজ্ঞা।"

তাহার পর রাজাকে লক্ষ্য করিয়া হরকুমার, বলিলেন,—"বইস বাবাজি; একটু দরকারী কথা আছে, তোমাকে শুনিতে হইবে।"

উমাশঙ্কর আসন গ্রহণ করিলেন। হরকুমার বলিলেন,—"তোমার তহবিলে এখন নগদ টাকা কত মজুত আছে জান?"

রাজা বলিলেন,—"বোধ হয় পাঁচ লক্ষ।"

রায় বাহাদুর বলিলেন,—"পাঁচ লক্ষ ছিল বটে; কিন্তু আজি ছয় লক্ষ হইয়াছে। কোম্পানির কাগজে তোমার কত টাকা আছে জান?"

রাজা বলিলেন,—"চারি লক্ষ।"

রায় বাহাদুর বলিলেন,—"সাড়ে চারি লক্ষ হইয়াছে। তোমার জমিদারীর আয় কত টাকা জান?"

রাজা উত্তর দিলেন,—"সাত লক্ষ টাকা।"

রায় বাহাদুর বলিলেন—"ঐরূপই হইবে।"

রাজা জিজ্ঞাসিলেন,—"কিন্তু আপনি এখন ঐ সকল কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন?"

রায় বাহাদুর বলিলেন,—"আমি কালি হইতে আর কোন বিষয়-কর্ম্ম দেখিব না স্থির

করিয়াছি। অতঃপর তোমার কার্য্য তোমাকে স্বয়ং করিতে হইবে।"

রাজা একটু উৎকণ্ঠার সহিত বলিলেন,—"কেন এরূপ কঠোর কথা বলিতেছেন?"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও চরিত্রবান্ পুরুষ। তোমার কার্য্য যখন তোমাকেই করিতে হইবে, তখন আর অনর্থক সময় নষ্ট না করাই শ্রেয়ঃ। বিষয়-কার্য্যে বড়ই গোলযোগ ঘটিয়াছিল এবং তুমিও এ সকল কার্য্য জানিতে না; এজন্যই আমি এতদিন তোমার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি। অতঃপর তোমার কার্য্য তুমি কর, ইহাই আমার ইচ্ছা।"

রাজা বলিলেন,—"আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা কহিতে,বা আপনার সহিত কোন রূপ বাদানুবাদ করিতে আমার সাধ্য নাই। যাহা আপনার ইচ্ছা তাহাই পালন করিতে আমি বাধ্য।"

রায় বাহাদুর বলিলেন,—"বেশ কথা। আমি তোমার কার্য্য সম্পাদন না করিলেও, এস্থান এখনই ত্যাগ করিব না, আবশ্যক হইলে তুমি আমার পরামর্শ ও সহায়তা প্রাপ্ত হইবে।"

রাজা বলিলেন,—"তাহার পর আপনি কি করিবেন মনে করিয়াছেন?"

রায় বাহাদুর বলিলেন,—"যখন বুঝিব তুমি কাহারও উপদেশ না লইয়াও বিষয়-ব্যাপার সুনির্ব্বাহিত করিতেছ, তখন আমি এ স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া কাশী যাইব।"

উমাশঙ্কর কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"আপনি যে বিষয়ে যাহা ব্যবস্থা করিবেন, তাহাই আমার শিরোধার্য্য। কিন্তু আপনি কি বিশ্বাস করেন, আপনার সহায়তা-শূন্য হইয়াও, আমি সাংসারিক ব্যাপার চালাইতে পারিব?"

হরকুমার একটু হাস্য করিয়া বলিলেন,—"তুমি যদি না পার তবে কে পারিবে? এখানে উপস্থিত থাকিলেও, তোমার কার্য্য ও ব্যবহারাদির কোন বিষয়ে আমি কোনই পরামর্শ বা উপদেশ প্রদান করিব না। তুমি যেরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছ এবং যে প্রণালীতে তোমার জীবন গঠিত হইয়াছে, তাহাতে তোমার কার্য্য ও ব্যবহার আমাদের দর্শন এবং আলোচনা করিবার বিষয় হইবে। যে বিষয়ে তোমার অনভিজ্ঞতা ছিল, সে সম্বন্ধে আমি এ পর্য্যন্ত তোমার সহায়তা করিয়াছি। এক্ষণে বিষয়-কর্ম্মে তুমি সম্পূর্ণরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছ বলিয়া আমার বিশ্বাস। সুতরাং নির্লিপ্তভাবে দূরে দাঁড়াইয়া তোমার কার্য্য সন্দর্শন করা ব্যতীত অতঃপর আমার আর কর্ত্তব্য নাই।"

রাজা বলিলেন,—"এ সংসার কর্ম্মক্ষেত্র এবং মানবের পরীক্ষাস্থল। কর্ম্ম-সাধন করিয়া পরীক্ষা প্রদান করিতে আমরা বাধ্য। পরীক্ষার ফল কিরূপ হইবে৷তাহার আলোচনা এক্ষণে নিষ্প্রয়োজন। আপনার আজ্ঞাই আমার নিয়ামক।"

তদনন্তর অন্যান্য নানা বিষয়ক কথা-বার্ত্তার পর রায় বাহাদুর সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। রাজা বহুক্ষণ সেই স্থানে বসিয়া একাকী নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অন্তঃপুর।

মধ্যাহ্ন কালে, রাজা উমাশঙ্করের অন্তঃপুর মধ্যে, একটী সুবিস্তৃত কক্ষে, দুই অতুলনীয়া

সুন্দরী মর্ম্মর প্রস্তর বিনির্ম্মিত এক আসনে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। গৃহে কোনই শোভন পদার্থ নাই। প্রশস্ত প্রকোষ্ঠের সীমাস্থলে স্থানে স্থানে শ্বেত ও কৃষ্ণ প্রস্তর-নির্ম্মিত আসন নিপতিত রহিয়াছে এবং এক খানি প্রশস্ত আসনের উপর কয়েক খানি রজত ও স্বর্ণময় ভোজন ও পান-পাত্র রহিয়াছে; আর এক দিকে পাষাণ আধারে, পানীয় জল সংরক্ষিত হইয়াছে। গৃহের তলদেশ, ঊর্দ্ধভাগ ও পার্শ্বসমূহ সর্ব্বাংশে শ্বেত প্রস্তর-সমাচ্ছন্ন।

আমরা উপবিষ্টা নারীদ্বয়কে অতুলনীয়া সুন্দরী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। বাস্তবিকই উভয়েই তুলনা-রহিত। উভয়েই প্রায় সমবয়স্কা; এক জনের বয়স প্রায় দ্বাবিংশ বর্ষ এবং অপরের প্রায় অষ্টাদশবর্ষ। উভয়েই পূর্ণ যৌবনের প্রদীপ্ত জ্যোতিতে শোভাময়ী, উভয়েই লাবণ্য-স্নাতা এবং পরিণতাবয়বা। বয়োধিকা রাজার ভগ্নী-সুহাসিনী; অপরা রাজার পত্নী—অন্নপূর্ণা।

উভয়েই অচির-পূর্ব্ব-স্নাতা; সুতরাং উভয়েরই কেশরাশি অবেণী-সংবদ্ধ; সুহাসিনীর পরিধানে একখানি সুন্দর কৌষেয় বসন, হাতে সোনার বালা, কণ্ঠে সোণার হার এবং কর্ণে মনোহর দুল। অন্নপূর্ণার পরিধানে অতি পরিষ্কার দেশী কার্পাস সাটী; হাতে হীরক-খচিত বালা এবং তাঁহার মস্তক বেষ্টন করিয়া সমানাকার, সুবর্ত্তুল, সুস্থূল দুই গুচ্ছ মুক্তমালা বিজড়িত। দেহের আর কোথায় কোন ভূষণ নাই।

এস্থলে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, দুই বর্ষ পূর্ব্বে সুহাসিনীর শ্বশুর সার্ব্বভৌম মহাশয় স্বর্গ লাভ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের সংসারে দাস দাসীর কথা ছাড়িয়া দিলে, সুহাসিনী ও তাঁহার স্বামী ভিন্ন অন্য কোন আপনার লোক নাই। রাজা ইচ্ছা করিলে নবীনকৃষ্ণকে রাজসভার পণ্ডিত অথবা চতুষ্পাঠীর অন্যতম অধ্যাপক নিযুক্ত করিলেও করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা করেন নাই; কেন না তাঁহার বিশ্বাস, ভগ্নীপতি অতীব সম্মানের পাত্র; নিয়মিত বেতনে কর্ম্ম-বিশেষে নিযুক্ত করিয়া, অশেষ সম্মান প্রদর্শন করিলেও, একটা প্রভু-ভৃত্য ভাব অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে। এরূপ স্থলে সেরূপ ভাব উভয় পক্ষেরই নিতান্ত অগৌরবের বিষয়। সুতরাং নবীনকৃষ্ণ রাজবাটীর কোন নিয়মিত কর্ম্মচারী হইতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু তিনি উমাশঙ্করের একজন প্রধান সহায়, প্রকৃষ্ট মন্ত্রী এবং রাজবাটীর সকল ব্যাপারেই একজন প্রধান অধ্যক্ষ। নবীনকৃষ্ণের সংসারে আর্থিক অস্বচ্ছলতা নাই। স্বর্গীয় সার্ব্বভৌম মহাশয় যথেষ্ট বিত্তশালী পুরুষ ছিলেন; তাঁহার সেই ধন অপচিত হয় নাই; নবীনকৃষ্ণও উপার্জ্জন-ক্ষম ব্যক্তি। অদ্য বিশেষ প্রয়োজনানুরোধে নবীনকৃষ্ণ গৃহত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন। তাঁহার প্রস্থানের পর, সুহাসিনী ভ্রাতৃ-ভবনে আগমন করিয়াছেন। বহু দাস-দাসী ও পাচক-পাচিকা থাকিলেও, অন্নপূর্ণা প্রতিদিন স্বহস্তে রাজার ভোজ্য পদার্থ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। অদ্য সুহাসিনী আসিয়া ভ্রাতৃজায়ার সেই প্রিয়কার্য্য কাড়িয়া লইয়াছেন এবং স্বয়ং অশেষ যত্নে ভ্রাতার নিমিত্ত বিবিধ খাদ্য পাক করিয়াছেন। ভোজ্য পদার্থ সমূহ পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে রক্ষিত হইয়াছে। রাজার আগমন প্রতীক্ষায় ভ্রাতৃজায়া ও ননন্দা এই ভোজনাগারে অপেক্ষা করিতেছেন।

রাজার আগমনে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া, সুহাসিনী বলিলেন,—"রাণী, দাদার আসিতে বড় দেরী হইতেছে; লোক পাঠাইলে হয় না?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"তুমি ভাই রাজার আপনার লোক; তুমি যা ইচ্ছা তাই করিতে পার। আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কাজ কি ঠাকুর-ঝি?"

সুহাসিনী বলিলেন,—"জিনিষ-পত্রগুলা ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে। খাওয়ার কষ্ট হইবে। কোন্ সময়ে তিনি খাইয়া থাকেন, তাহার কি ঠিক নাই?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"না—দু' ঘণ্টা কি তিন ঘণ্টা এদিক ওদিক অনেক দিনই হয়। খাওয়ার কষ্ট কেন হইবে? রাজা হইলেও তিনি ভিক্ষুক-সন্ন্যাসী, তাঁহার মূল অভ্যাস ঘুচিয়া যাইবে কেন? একটু ঠাণ্ডা হইলেই কি একেবারে অখাদ্য হইয়া যাইবে? অন্য দিন যাহা হউক, আজি তো খাদ্য সামগ্রী পচিয়া-গলিয়া যাইলেও খারাপ হইবে না। আজি হাতের গুণে সকলই অপূর্ব্ব—চমৎকার থাকিবে।"

একজন পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল, রাজা আসিতেছেন। দাসী চলিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ অন্নপূর্ণা একখানি কারচোপের কাজে ঢাকা পাখা এবং বারি-পূর্ণ স্বর্ণ-ভৃঙ্গার হস্তে লইয়া দণ্ডায়মান হইলেন: সুহাসিনী আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; অন্নপূর্ণা, একজন দাসীকে ডাকিয়া, খোঁকা রাজাকে আনিতে আদেশ করিলেন।

রাজা উমাশঙ্কর বাহাদুর নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পরিধান এক অতি মহার্হ বেনারসী ধুতি এবং বক্ষের উপর যজ্ঞ-সূত্রাকারে তাহারই এক উত্তরীয় বিলম্বিত। চরণে মুক্তামালা বিজড়িত, চর্ম্মমাত্র-বিবর্জ্জিত মকমলের জুতা। তিনি গৃহাগত হইয়া বলিলেন,—"একি সুহাস, তুমি কতক্ষণ আসিয়াছ দিদি?"

সুহাসিনী ভূতলে মস্তক স্থাপন করিয়া রাজাকে প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন,—"ভোরবেলা আসিয়াছি দাদা।"

রাজা কহিলেন,—"আমাকে সংবাদ দাও নাই কেন? আমি আসিয়া তোমার সহিত আগেই দেখা করিতাম।"

অন্নপূর্ণা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রাজার দেহে বাতাস দিতেছিলেন। এক্ষণে বলিলেন,—"আগে আসিতে যখন পার নাই, তখন না হয় পরে আরও একটু থাকিয়া, ভগ্নীর সহিত আলাপ করিও।"

অন্নপূর্ণার দিকে সানুরাগ দৃষ্টিপাত করিয়া, রাজা একটু হাস্য করিলেন। তাহার পর সুহাসিনীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"তিন চারি দিন তোমার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। আজি তুমি না আসিলে, নিশ্চয়ই কোন না কোন সময়ে আমি তোমার সহিত দেখা করিতে যাইতাম।

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"তাহা হইলে ভাল হইত। কেন না, ঠাকুর-জামাই মহাশয় আজ বাটীতে নাই; বড়ই নির্ব্বিঘ্নে আজি তোমাদের দেখা-শুনা হইত।"

রাজা আবার অন্নপূর্ণার প্রতি করুণাপূর্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"আজি ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাটী থাকিবেন না শুনিয়াছিলাম। তোমার শরীর ভাল আছে, সুহাসিনি?"

অবনত মস্তকে সুহাসিনী বলিলেন,—হাঁ।"

একজন দাসী খোঁকা রাজাকে কোলে

লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল। সুহাসিনী, বেগে সেই দিকে ধাবিতা হইয়া, আদরে খোঁকাকে কোলে লইতে অগ্রসর হইলেন। খোঁকা তাঁহাকে দর্শনমাত্র "পিটি মা, পিটি মা" বলিতে বলিতে লাফাইয়া তাঁহার ক্রোড়ে আসিয়া পড়িল এবং উভয় বাহুদ্বারা তাঁহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিল। সুহাসিনী বার বার তাহার বদন চুম্বন করিতে লাগিলেন।

রাজা তত্রত্য আসন বিশেষে উপবেশন করিলেন, অন্নপূর্ণা ত্বরিত একখানি প্রকাণ্ড সোণার থালা আনয়ন করিলেন এবং রাজার নিকটস্থ হইয়া তাঁহার চরণ সমীপে উপবেশন করিলেন। তাহার পর বস্ত্রাঞ্চলে স্বকীয় গলদেশ বেষ্টন করিয়া, ভূতলে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক রাজাকে প্রণাম করিলেন। তদনন্তর সযত্নে স্বহস্তে রাজার পাদুকা মোচন করিয়া তাঁহার চরণ-যুগল সেই স্বর্ণ-পাত্রের উপর সংস্থাপন করিলেন। তাহার পর সেই ভৃঙ্গার বাম হস্তে নত করিয়া তন্নিস্থত জলে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা রাজার চরণদ্বয় সাবধানে ধৌত করিতে লাগিলেন। পাদ-প্রক্ষালন সমাপ্ত হইলে, অন্নপূর্ণা ভক্তি সহকারে রাজার পদ দ্বয় আপনার উরুদেশে স্থাপন করিলেন। স্বকীয় পৃষ্ঠদেশ অতিক্রম করিয়া যে কেশরাশি ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছিল, তাহার দ্বারা রাজার চরণ ভক্তি সহকারে বারি-মুক্ত করিলেন। তদনন্তর স্বকীয় বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা পদদ্বয় উত্তম রূপে জল-শূন্য করিয়া তিনি একে একে তাহা পাদুকা মধ্যে বিন্যস্ত করিলেন। তাহার পর সেই পাত্রস্থ চরণ-প্রক্ষালন-বারির কিয়দংশ অঞ্জলি মধ্যে গ্রহণ করিয়া আগ্রহ সহকারে পান করিলেন এবং পীতাবশেষ মস্তকে ও বক্ষে প্রলিপ্ত করিয়া, পুনরায় গললগ্নী-কৃত-বাসে স্বামী দেবতাকে প্রণাম করিলেন।

প্রেমপূর্ণ ঈষৎ হাস্যের সহিত রাজা বলিলেন,—"অন্নপূর্ণা, তোমাকে কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিব তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। তোমার এই নিত্য ক্রিয়ার নূতন নূতন আশীর্ব্বাদ সংগ্রহ করিতে আমার বিদ্যা-বুদ্ধি অশক্ত।"

যে দাসী খোঁকাকে লইয়া আসিয়াছিল সে দাঁড়াইয়াছিল। অন্নপূর্ণা তাহাকে চরণ-মার্জ্জন-বারি-পূর্ণ পাত্র স্থানান্তরিত করিতে আদেশ করিলে, সে তাহা লইয়া প্রস্থান করিল। অন্নপূর্ণা তখন ব্যজনী হস্তে লইয়া রাজাকে ব্যজনে নিযুক্তা। তিনি উত্তর করিলেন,—"নূতন আশীর্ব্বাদে আমার আবশ্যক নাই; একই আশীর্ব্বাদ আমি প্রার্থনা করি। যেন অক্ষয় স্বর্গ-ভোগের লোভে বা ব্রহ্ম-জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষাতেও ঐ সর্ব্ব সিদ্ধি-ফল-প্রদ চরণ হইতে আমার চিত্ত একটুও বিচ্যুত না হয়, ইহাই আমার একমাত্র কামনা।"

রাজা বলিলেন,—"ভগবান্ তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করুন।"

সুহাসিনীর তখন চক্ষুতে জল। তিনি বিকৃত স্বরে বলিলেন,—"আহারের স্থান করিব কি দাদা?"

রাজা বলিলেন,—"করিতে পার।"

খোঁকা রাজা বলিয়া উঠিল,—"বাবা যাব।"

সুহাসিনী তাহাকে রাজার অঙ্কে দিয়া প্রস্থান করিলেন। রাজা স্নেহ-কণ্টকিত-কলেবরে সেই ভুবন-মোহন শিশুকে বক্ষে ধারণ করিলেন এবং অশেষ আদরে তাহাকে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। খোঁকা কিয়ৎকাল পিতার অঙ্কে ক্রীড়া করিয়া বলিল,—"মা যাব।"

রাজা বলিলেন,—"অন্নপূর্ণা, পাখা আমাকে দেও, খোঁকাকে লও।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"তোমার কষ্ট হইবে।"

রাজা একটু হাসিয়া বলিলেন,—"সময়ে সময়ে তোমার বড় ভুল হয়। আমার ভয় হয়, যাহার এত ভোলামন সে হয় তো কোন দিন আমাকেই বা ভুলিয়া যাইবে। তুমি ভুলিয়া যাইতেছ যে, আমি ভিক্ষুক-সন্ন্যাসী এবং সর্ব্বপ্রকার ক্লেশে অভ্যস্ত। আমার এ রাজা-গিরি কেবল জাগ্রৎ স্বপ্ন মাত্র।"

অন্নপূর্ণা, রাজার হাতে পাখা দিয়া, সাদরে খোঁকাকে কোলে লইলেন।

এদিকে সুহাসিনী স্বহস্তে স্থান মার্জ্জনা করিয়া অতি শোভাময় আসন বিস্তৃত করিলেন এবং তৎসম্মুখে বিবিধ অত্যুপাদেয় ভোজ্য-পানীয়-পূর্ণ অনেক প্রকার স্বর্ণ ও স্ফাটিক পাত্র স্থাপন করিলেন। তাহার পর তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ কোমল স্বরে বলিলেন,—"দাদা, উঠিয়া আইস।"

রাজা আসনে উপবেশন করিলে, সুহাসিনী, তাঁহার পরিত্যক্ত ব্যজনী লইয়া, তাঁহাকে বাতাস দিতে লাগিলেন। রাজা যথারীতি শ্রীবিষ্ণু দেবতাকে ভক্ষ্য পদার্থ সমূহ নিবেদন করিয়া দিয়া, যথারীতি গণ্ডূষাদির পর, আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। খোঁকাও জোর করিয়া মাতৃ-অঙ্ক হইতে অবতরণ করিল এবং পিতার নিক-টস্থ হইয়া, তাঁহার অঙ্কে বসিল। অন্নভুক্ত হইলেও, সেই সুপরিণত কলেবর শিশু পিতার ভোজ্যের কিয়দংশ স্বচ্ছন্দে তুলিয়া লইয়া নিজ বদনে প্রদান করিল। পুত্রের এই ব্যবহার দেখিয়া রাণী বলিলেন,—"উহাকে ছাড়িয়া দেও, আমি স্বতন্ত্র পাত্রে খাবার আনিয়া উহাকে খাওয়াইয়া দিতেছি। এখনই সব নষ্ট করিয়া দিবে।"

রাজা বলিলেন,—"না, আমার সঙ্গেই খোঁকা নিত্য খায়; আজিও খাইবে।"

পিতা-পুত্রে পরমানন্দে অতি উপাদেয় খাদ্য ভোজন করিতে লাগিলেন। রাজা বলি-লেন,—"আজিকার সকল দ্রব্যই বড় সুমিষ্ট লাগিতেছে।"

রাণী বলিলেন,—"অন্য দিন যাহা খাও, সে সকল কি তিক্ত লাগে?"

রাজা বলিলেন,—"অন্য দিনও খুব ভাল হয়; আজি যেন আরও ভাল লাগিতেছে।"

রাণী বলিলেন,—"লাগিবার কথা বটে, অন্য দিনের অপেক্ষা আজি আরও খুব ভাল হাতের গুণে সকলই আরও খুব অতিশয় ভাল হইয়াছে। আজিকার সমস্ত দ্রব্যই তোমার ঐ সুন্দরী-শিরোমণি ভগ্নী স্বহস্তে প্রস্তুত করি-য়াছেন।"

রাজা বলিলেন,—"বটে! কেন সুহাস তুমি এ বাটীতে আসিয়া এত পরিশ্রম কর?"

সুহাসিনী বলিলেন,—"ভাইয়ের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করা কি ভগ্নীর পক্ষে পরিশ্রমের কাজ দাদা? তোমার মত দেবতা দাদার খাদ্য প্রস্তুত করা বড়ই সৌভাগ্যের কথা। পরিশ্রম তো আমি নিত্যই করি; বিশেষ পাক করা তো নারীজাতির প্রধান কাজ। আর আদরের বউ যদি রোজ এ কাজ করিতে পারেন, আমি একদিন কেন তাহা না পারিব?"

রাজা বলিলেন,—"বড়ই উত্তম খাদ্য তুমি আজি প্রস্তুত করিয়াছ। অনেক প্রকার নূতন জিনিষ খাইয়া আমি আজি বড়ই তৃপ্ত হইয়াছি।"

খোঁকা বলিয়া উঠিল,—"পিটি মা বাব—হাম।"

তৎক্ষণাৎ সুহাসিনী, ব্যজনী রাণীর হস্তে প্রদান করিয়া, সাদরে খোঁকা-রাজাকে ক্রোড়ে লইলেন, এবং বলিলেন,—"আর খায় না দুষ্ট ছেলে; অনেক খা অসুখ হইবে।"

কিন্তু খোঁকা সে উপদেশ শুনিল না। সে দুষ্ট অপবাদ বহন করিয়াও, আহার-ত্যাগে স্বীকৃত হইল না। বলিতে লাগিল,—"ঐ কাব —ঐ হাম—পিটি মা কাব।"

সুহাসিনী বলিলেন,—"দাদা, ঐ খালি বাটীটায় একটু পায়স দেও, আমি খোঁকাকে খাওয়াইয়া দিই।"

রাজা তাহাই করিলেন। খোঁকা পিসি-মার হস্তে সানন্দে পায়স খাইতে লাগিল।

ভোজন সমাপ্ত হইলে রাজা গৃহের এক সীমান্তস্থিত পয়ঃপ্রণালীর সন্নিধানে গমন করি-লেন। অন্নপূর্ণা তাঁহার হস্তে জল ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। তিনি ময়দা ও বেশম দ্বারা উত্তম-রূপে হস্ত ও মুখ প্রক্ষালন করিয়া শুভ্র শুষ্ক বসনে বদন-মার্জ্জন করিলেন। অন্নপূর্ণা ব্যস্ততা-সহ হস্ত ধৌত করিয়া, তাম্বূলপাত্র হস্তে রাজার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে বলিলেন,—"সুহাস, আজি বোধ হয় তোমার বাটী না যাইলে বিশেষ ক্ষতি হইবে না। আজ আর গিয়া কাজ নাই।"

সুহাসিনী বলিলেন,—"আজি যাইব না। খোঁকাকে লইয়া আমি এ বাটীতেই আজি থাকিব।"

তাহার পর রাণীকে লক্ষ্য করিয়া রাজা বলিলেন,—"যাহাকে রাজগিরি করিতে হয়, তাহার ভগ্নী বা স্ত্রীর সহিত আলাপ করিবার সময় না থাকাই উচিত। আমি এখন যাই। তোমাদের সহিত আবার ওবেলা সাক্ষাৎ হইবে।"

রাজা প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সমবেদনা।

বেলা প্রায় তিনটা। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে রাজার নামের যাবতীয় পত্রাদি ডাকঘর হইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। পত্র-গুলি পাঠ করিয়া, যাহার সম্বন্ধে যেরূপ আদেশ দেওয়া বিধেয় তাহা প্রদান করিয়া, এবং সেগুলি যথাযথ ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করিয়া, রাজা এক্ষণে সংবাদ পত্র পাঠে নিবিষ্টচিত্ত হইয়াছেন। তাঁহার নিকট কয়েকখানি সংবাদ পত্র ও একটী দোয়াত কলম মাত্র পতিত রহিয়াছে।

যে কক্ষে রাজা এখন উপবেশন করিয়া আছেন, তাহা অন্তঃপুর-সংলগ্ন। ইচ্ছা করিলে বা আবশ্যক হইলে অন্তঃপুরিকারা তথায় আসিতে পারেন। ঘর কার্পেট দ্বারা আচ্ছা-দিত। এক প্রান্তে একটী মকমলের গদী। তাহার উপর একখানি অতি সুক্ষ্ম মছলন্দ বিস্তৃত। তাহার উপর কয়েকটি মকমলের বালিস। রাজা সেই শয্যায় উপবিষ্ট।

সেই বর্ষে সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া ভীষণ দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা উপস্থিত হইয়াছিল এবং রাজপুরুষেরা ও অন্যান্য মহাত্মারা তাহার নিবারণার্থ বিশেষ চেষ্টাশীল হইয়াছিলেন। কলিকাতায় দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডার সংস্থাপনার্থ এক সভা হইয়াছিল এবং একজন উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারী সেই সভার সম্পাদক হইয়া-ছিলেন। কয়েকদিন পূর্ব্বে, কলিকাতায় টাউন হলে সেই সভার এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। বঙ্গদেশের এক প্রভূত ধনশালী

মহারাজা বাহাদুর সেই সভার সভাপতি হইয়াছিলেন। রাজা উমাশঙ্কর বাহাদুরকে সেই সভায় উপস্থিত হইবার নিমিত্ত সম্পাদক মহাশয় যথাসময়ে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা এরূপ সভায় উপস্থিত থাকিয়া অনর্থক বক্তৃতা-স্রোত প্রবর্দ্ধিত করিতে বাসনা করেন না বলিয়া সভায় যোগ দেন নাই। এ সম্বন্ধে যে কোন অনুষ্ঠান তাঁহার বিবেচনায় সুসঙ্গত ও সাধ্যায়ত্ত হইবে, তাহাই তিনি বিনানুরোধে ও অকুণ্ঠিত চিত্তে সম্পাদন করিবেন। রাজা এই মর্ম্মে সেই উচ্চপদাভিষিক্ত রাজ-কর্ম্মচারী মহোদয়ের নিমন্ত্রণ-লিপির উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। অদ্য যে সকল ইংরাজী দৈনিক সংবাদ পত্র আসিয়াছে, তাহাতে সভার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। রাজা এক্ষণে আগ্রহ সহকারে সেই বিবরণ পাঠ করিতেছেন। সময়ে সময়ে কোন কোন উক্তি ও বর্ণনা পাঠ করিয়া তিনি চিন্তাকুল হইতেছেন; তখন তাঁহার ললাটে চিন্তার রেখা স্পষ্টতঃ পরিদৃষ্ট হইতেছে; আবার কখন কখন অন্তঃসারশূন্য গৌরবলোলুপ মহাত্মা বিশেষের উক্তি পাঠে তিনি হাস্য-সংবরণ করিতে পারিতেছেন না।

নিঃশব্দে সেই প্রকোষ্ঠের অপর এক দ্বার দিয়া এক ভুবন-মোহিনী যুবতী তথায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের যথাযথ স্থানে মণি-মুক্তা-খচিত নানাবিধ স্বর্ণালঙ্কার শোভা পাইতেছে। স্বর্ণসূত্র-খচিত সূক্ষ্মবস্ত্র তাঁহার দেহ আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া নিঃশব্দে সেই সুন্দরী পশ্চাদিক্‌ হইতে উভয় হস্তে রাজার নেত্রদ্বয় আবরণ করিয়া ধরিলেন।

রাজা বলিলেন,—"রাণী, ছাড়িয়া দেও; মন যাহাকে নিয়ত দর্শন করে, বাহ্য চক্ষুকে সে সুখ ভোগের সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিতেছ কেন?"

সুন্দরী হাসিয়া বলিলেন,—"তুমি ঠিক করিয়া না বলিতে পারিলে আমি চক্ষু ছাড়িয়া দিব না।"

রাজা বলিলেন,—"যাঁহার অঙ্গের বায়ু গায়ে লাগিলে প্রাণ নাচিয়া উঠে, তাঁহার অঙ্গ দেহের সহিত সম্মিলিত হইলেও চিনিতে পারিব না, ইহাও কি সম্ভব? তুমি যে রাণী তাহার আর সন্দেহ কি?"

সুন্দরী বলিলেন,—"এখনও ঠিক করিয়া বলিতে পারিলে না! ছিঃ!"

রাজা বলিলেন,—"ঠিক করিয়া বলিতে পারিলাম না? বল কি? আমি কি তবে পাগল হইয়াছি?"

সুন্দরী রাজার চক্ষু হইতে হস্ত অপসারিত করিয়া বলিলেন,—"বোধ হয় পাগলই হইয়াছ, নহিলে রাজার দাসীকে তুমি রাণী বলিতেছ কেন?"

উমাশঙ্কর প্রেম-পূর্ণ নয়নে সেই সুন্দরীর বদনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"বাস্তবিকই অন্নপূর্ণা, প্রেমে মানুষকে কতকটা পাগলই করে বটে। এইরূপ মত্ততা ঘটে বলিয়াই যিনি সর্ব্বেশ্বরী তিনিও কখন কখন আপনাকে দাসী বলিয়া পরিচিত করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু দেখ, এ ক্ষেত্রে কে কাহার দাস তাহা সহজে নির্ণয় করা ভার। এ অধম আপনাকে এই দেবীর ক্রীতদাস ভাবিয়াই পরম সুখ সম্ভোগ করে।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"এটা বড়ই দয়ার কথা—নিতান্তই আদরের বাক্য। বস্তুতঃ আমিই লোকতঃ ধর্ম্মতঃ এবং ন্যায়তঃ শ্রীচরণের চিরদাসী। তুমি সোহাগ করিয়া যাহা বল

না কেন, আমার দাসত্ব আমার ভাগ্য-লব্ধ পরম ধন।”

রাজা বলিলেন,—“লোকতঃ তুমি স্বীকার করিলেও, দাসত্বে আমাদেরই চিরন্তন অধিকার। পরমেশ্বর জগতের স্রষ্টা, পাতা, রক্ষক ইত্যাদি বহু বিশেষণে পরিচিত হইলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে শক্তির সহায়তা ভিন্ন তাঁহার কোন কার্য্যই হয় না এবং তখন তিনি নিগুর্ণ ভাবে বিদ্যমান থাকেন মাত্র। সুতরাং বলিতে গেলে তাঁহাকে শক্তির অধীন বলিয়াই নির্দ্দেশ করাই সুসঙ্গত। যে দেবতা সগুণ ভাবে বিষ্ণুরূপে পরিচিত, সকল ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবী এবং সকল বিদ্যার উৎস-স্বরূপা সরস্বতী দেবী তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছেন বলিয়াই তাঁহার মাহাত্ম্য। যে পরম যোগী জরা-মরণাতীত মহেশ্বর নামে কীর্ত্তিত, তাঁহার নর্ত্তনশীলা নায়িকা তাঁহার বক্ষ-প্রদেশে বিরাজমানা; অথবা দ্রবময়ীরূপে তদীয় শিরোদেশে বিচরণ-শীলা। যে পূর্ণাদর্শ পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রেমের অলৌকিক লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন, প্রেমময়ী শ্রীরাধিকার দাসরূপে তিনি আপনাকে পরিচিত করিয়াছেন এবং সেই দেবীর পদ-পঙ্কজ মস্তকে ধারণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। বাস্তবিকই অন্নপূর্ণা, আমরা তোমাদের দাস; এ দাসত্বে আমাদের সনাতন স্বত্ব।”

রাণী অন্নপূর্ণা বলিলেন,—“তোমাদের ভালবাসাই সার্থক; তোমরাই যথার্থ ভাল বাসিতে জান, তাই যাহারা চরণ-ধূলারও যোগ্য নহে, তাহাদিগকে তোমরা আদর করিয়া মাথায় তুলিয়াছ। সে কথা যাউক তুমি এ সময়ে আজি একলা বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছ কেন? এমন সময় তো তুমি পুস্তকালয়ে বসিয়া কেবল ইংরাজি পুস্তকই পাঠ করিয়া থাক, আজি তাহার অন্যথা কেন?”

রাজা উমাশঙ্কর বলিলেন,—“জান তো তুমি, আমি সন্ন্যাসীর শিষ্য, আশ্রম-পালিত; সুতরাং ইংরাজি শিখিবার কোনই সুযোগ আমার হয় নাই। বিষয় ব্যাপারে প্রবেশ করিয়াই বুঝিয়াছি, বর্ত্তমান কালে ইংরাজি শিক্ষা, নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এই জন্যই প্রতিদিন অনন্য মনে চারি পাঁচ ঘণ্টা ইংরাজি ভাষা অভ্যাস করিয়া আসিতেছি। পাঁচ বৎসর এইরূপ পরিশ্রম করিয়া, ইংরাজি ভাষায় যেরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে পরম সন্তোষ এবং পরিতৃপ্তি জন্মিয়াছে। আমি ইংরাজিতে কাব্য, প্রবন্ধ, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, আইন, চিকিৎসা প্রভৃতি বহুতর বিষয়ের অনেক গ্রন্থ সাগ্রহে অধ্যয়ন করিয়াছি। অতঃপর ইংরাজি শিক্ষার জন্য বিশেষ পরিশ্রম না করিলেও, কোন কার্য্যের ব্যাঘাত হইবে না। স্থির করিয়াছি, সেই সময় অন্য কোন হিতকর কার্য্যে ব্যয় করিব।”

রাণী জিজ্ঞাসিলেন,—“প্রাতের সেই সময়ে অতঃপর কি করিবে স্থির করিতেছ?”

রাজা বলিলেন,—“আমি মনে করিতেছি, প্রতিদিন সেই সময়ের মধ্যে একবার করিয়া আমাদের স্কুল, টোল, চিকিৎসালয়, অতিথি-শালা, অনাথাশ্রম প্রভৃতির কার্য্য-প্রণালী স্বচক্ষে দর্শন করিব। অতীব যোগ্য ব্যক্তিগণের হস্তেই তত্ত্বাবতের ভার অর্পিত আছে; তথাপি অনেক সময়েই আমার মনে হয়, স্বয়ং সে সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান না করিলে কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সম্পাদন করা হয় না। মনের এই অসন্তোষ আমি অতঃপর নিবৃত্ত করিব।”

রাণী বলিলেন,—“আর আমি প্রতিদিন যে অনাথা, বৃদ্ধা, রুগ্নাদিগকে স্বহস্তে ভোজন

করাই, তাহাদের অবস্থাটা একবার করিয়া দেখিবার সময় হইবে না বুঝি?"

রাজা বলিলেন,—"না; কেন না তাহা স্বয়ং দেখিবার প্রয়োজন নাই। যাহা তুমি স্বয়ং সম্পাদন কর, সে কার্য্য সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইয়া থাকে, এবং আমার কৃতকার্য্যের অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে, তাহার কোনই সন্দেহ নাই। অতএব তাহা দেখিয়া সময় নষ্ট করিব কেন?"

রাণী বলিলেন,—"বইস তুমি, আমি এখন আসি?"

রাজা বলিলেন,—"এত শীঘ্র কেন?"

রাণী বলিলেন,—"ভোজনের সময় মধ্যাহ্নে কিয়ৎকাল, আর গভীর রাত্রিতে কিয়ৎকাল তোমার চরণ দর্শনে এ দাসীর অধিকার। যে মহাপুরুষ কৃপা করিয়া দাসীর প্রিয়াকর্ষ্য দেখিতে হইলেও সময় নষ্ট হইবে বলিয়া আশঙ্কা করেন, অসময়ে আসিয়া তাঁহার মহামূল্য সময় নষ্ট করিতে দাসীর সাহসে কুলাইবে কেন?"

রাজা বলিলেন,—"ঠিক কথা। তোমার ন্যায় গুণবতী মহিলার মুখে এইরূপ গভীর ভাবপূর্ণ পরিহাস বাক্যই শোভা পায় বটে। বাস্তবিকই তুমিও আছ, আমিও আছি; প্রেমও আছে, অনুরাগও আছে; কিন্তু সময় ও কার্য্য তো নিরন্তর সমভাবে প্রধাবিত হইতেছে। যেটী ছাড়িয়া দেওয়া যায়, সেটী তো আর পাওয়া যায় না। মানব কর্ত্তব্য-সম্পাদনের গুরুভার মস্তকে লইয়া কর্ম্মাধীন হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। সে কর্ত্তব্য-পালনে অবহেলা করিলে, কর্ম্ম-সম্পাদনে ঔদাস্য করিলে তাহার আর গতি কি? এ সংসারে কর্ম্মই একমাত্র আকর্ষণ, কর্ত্তব্য-পালনই একমাত্র আনন্দ। আমরা ভাগ্যক্রমে জীবন-সূত্রকে একই গ্রন্থিতে নিবদ্ধ করিয়া উভয়ে এক হইয়াছি। এখন কর্ম্মই আমাদের উভয়ের একমাত্র প্রিয়ব্রত হইয়াছে। অতএব সময় নষ্ট করিতেছি বুঝিয়া, তুমি আমাকে প্রকারান্তরে তাহা স্মরণ করাইয়া, যথার্থ সহধর্ম্মিণীর কার্য্যই করিয়াছ। কিন্তু তুমি আর একটু অপেক্ষা কর। বিশেষ প্রয়োজন হেতু আমি তোমাকেই এখন ভাবিতেছিলাম। তাই তুমি দয়া করিয়া এ সময়ে আমাকে দর্শন দিয়াছ। তুমি শুনিয়াছ কি অন্নপূর্ণা, এবার ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত?"

রাণী বলিলেন,—"অনেক কথা শুনিয়াছি। সেদিন কয়েকখানা ছবি দেখিয়া প্রাণ ফাটিয়া গিয়াছে।"

রাজা বলিলেন,—"এক্ষণে তাহার প্রতিকারের জন্য তুমি কি করিতে চাহ?"

রাণী বলিলেন,—"যাহা চাহি তাহা হইবার নহে।"

রাজা বলিলেন,—"কি, বল না।"

রাণী বলিলেন,—"প্রত্যহ অন্নহীনের দ্বারে গিয়া অন্ন বিলাইতে চাহি।"

উমাশঙ্কর কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"অন্নপূর্ণার অনুরূপ বাসনাই বটে; কিন্তু তাহা তো সম্ভব নহে। তাহা হইলে কি করিবে?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"তুমি কি স্থির করিয়াছ বল।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"না, তুমি আগে বল।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"যে সম্পত্তি ভগবান্ আমাদের হাতে দিয়াছেন, তাহা ব্যয় করিলে সমস্ত বাঙ্গালা দেশের অন্নহীন ব্যক্তিগণ ছয়মাস গ্রাসাচ্ছাদন পাইতে

পারে। সমস্ত সম্পত্তি ব্যয় করিয়া এই দুঃখিগণকে রক্ষা করাই আমার বাসনা।"

তখন সাশ্রুনয়নে উমাশঙ্কর সেই সুরসুন্দরীকে আলিঙ্গন করিলেন এবং প্রেমপূর্ণ গদ্‌গদ স্বরে বলিলেন,—"আমি ধন্য। এমন দেবী যাহার চিরসঙ্গিনী সে ব্যক্তি ভাগ্যবান্‌গণের অগ্রগণ্য। তাহাই হইবে। তোমার বাসনামত কার্য্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থাই আমি করিব।"

রাণী বলিলেন,—"আমি এখন যাই। খোঁকা হয় তো এতক্ষণে ফিরিয়াছে।"

উমাশঙ্কর বাহুমধ্য হইতে অন্নপূর্ণাকে মুক্ত করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"খোঁকা এতক্ষণ কোথায় ছিল?"

অন্নপূর্ণা দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"ঝি ও দারবানের সঙ্গে ঠেল। গাড়ি চড়িয়া বেড়াইতে গিয়াছিল। এতক্ষণে আসিয়া থাকিবে।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আচ্ছা, এখন আইস। যেরূপ স্থির হয় তাহা তোমাকে পরে জানাইব।"

অন্নপূর্ণা গলায় কাপড় দিয়া উমাশঙ্করের চরণে মস্তক বিন্যস্ত করিলেন এবং উভয় হস্তে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া মস্তকে ও বক্ষে স্থাপন করিলেন। তাহার পর গাত্রোত্থান বেগে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড—কঠোর।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সতর্কতা।

হুগলী জেলায় রামনগরে কায়স্থ-কন্যা ভবসুন্দরীর বাটীর পার্শ্বে, একখানি ক্ষুদ্র বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে। এ বাটী পূর্ব্বে ছিল না; পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এই ভবনের নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে। একটী একতলা প্রশস্ত কুঠারী, তাহার পার্শ্বে রন্ধনের নিমিত্ত একখানি ক্ষুদ্র ঘর, সম্মুখে একটী বারান্দা, তাহার পর প্রশস্ত অঙ্গন, তন্মধ্যে একটী সুন্দর তুলসী-বেদী, কিয়দ্দূরে একটী কূপ, এবং তাহার পার্শ্বে প্রাচীর-বেষ্টিত প্রচ্ছন্ন স্থান, তাহার পর চারিদিকে করবী, কলিকা, সেফালিকা, স্থলপদ্ম, চম্পক প্রভৃতি বিবিধ পুষ্পের নাতি বৃহৎ বৃক্ষ ধারাবাহিকরূপে সজ্জিত। তাহার পর চারি দিকে উচ্চ প্রাচীর। প্রাচীর ও ঘরের ভিতর বাহির সকল স্থানই চূর্ণ-বালির দ্বারা আবৃত। ভবনের সকল অংশই সুপরিষ্কৃত। অঙ্গনের কোথাও একটু আবর্জ্জনা নাই, সকল স্থানই পরিচ্ছন্ন। বাটীর মধ্যে প্রবেশের নিমিত্ত দক্ষিণ দিকে একটী প্রশস্ত দ্বার আছে; কিন্তু তাহা সর্ব্বদাই রুদ্ধ থাকে।

জ্যৈষ্ঠ মাস। বেলা প্রায় চারিটা, তথাপি উত্তাপের প্রকোপ একটুও কমে নাই। একটী পরমাসুন্দরী নারী এই বাটীর বারান্দায় একটী মাদুরের উপর বসিয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাঠ করিতেছেন। তাঁহার বাম হস্তে একখানি তালবৃন্ত এবং দক্ষিণ হস্তে পাঠ্য গ্রন্থ। সেই অলসিত

ও অবসিত-কলেবরা ধীরে ধীরে পাখা-নাড়িতেছেন এবং মনে মনে গ্রন্থ-অধ্যয়ন করিতেছেন। এই সুন্দরী বিধুমুখী। বিধুমুখীর বয়স একণে চতুর্ব্বিংশ বর্ষ হইবে। দেহ পূর্ণায়ত ও প্রদীপ্ত যৌবন-শ্রীতে উদ্ভাসিত। যে বিলাসসাগরে তিনি নিয়ত ভাসমানা ছিলেন, তাহা এখন শুকাইয়া গিয়াছে; স্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার উপযোগী সামগ্রী ভিন্ন আর কিছুই একণে তাঁহার আয়ত্ত নাই। যে ঘৃণিত ভোগ ও লিপ্সাকে তিনি জীবনের একমাত্র অবলম্বনীয় বলিয়া জানিতেন, তাহাতে আর তাঁহার প্রবৃত্তি নাই। বিলাস ও ভোগ-বিবর্জ্জিতা বিধুমুখীর স্বভাব-সুন্দররূপ—এখন যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। তাঁহার দেহে কোন অলঙ্কার নাই। হাতে বেলওয়ারি চুড়ি, বামহস্তে তদ্ব্যতীত একগাছি লোহা, সীমন্তে সিন্দুরবিন্দু, এবং পরিধান লালপেড়ে সাটী, সেই সর্ব্ব-ভোগৈশ্বর্য্য-সংস্থিতা নারীর বর্ত্তমান বেশ-ভূষা সমাধান করিয়াছে।

বিধুমুখী এই বাটীতে একাকিনী থাকেন না। বিন্দুর মা নামে পরিচিতা, অথচ পুত্র-কন্যা-বিহীনা এক প্রৌঢ়া নারী বিধুমুখীর কাজকর্ম্ম করে ও সর্ব্বদা সঙ্গে থাকে। এখন সে বাটীতে নাই; বিধুমুখী কোন প্রয়োজনে তাহাকে স্থানান্তরে প্রেরণ করিয়াছেন। বিন্দুর মা ছাড়া বিধুমুখীর আর একজন প্রধান সহায় ও আত্মীয় আছেন। তিনি হরকুমার বাহাদুরের পরিচিতা, চণ্ডী গুলিখোরের কায়েত মাসী ভবসুন্দরী। ভব সর্ব্বপ্রকারেই বিধুমুখীর হিতৈষিণী। সে তাঁহার সকল কার্য্যে সৎপরামর্শ প্রদান করে, গৃহ-কর্ম্মে সহায়তা করে, যখন যে পদার্থের প্রয়োজন হয়, তাহার সন্ধান করে, সতত তাঁহার সংবাদ লয় এবং অনেক সময় তাঁহার নিকটে থাকে।

সাংসারিক কোন বিষয়েই বিধুমুখীর কোন অভাব নাই। নিয়মিতরূপে ও যথাসময়ে তিনি প্রয়োজনানুরূপ অর্থ ও দ্রব্য-সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সর্ব্ব প্রকার সুখ-বিধায়ক পদার্থ-পরিশূন্য হইয়া, নিতান্ত দীনভাবে পর্ণকুটীরা-শ্রমে কায়ক্লেশ সহ্য করিয়া, জীবনপাত করাই বিধুমুখীর একান্ত বাসনা। কিন্তু যে সুহৃদ্গণ তাঁহার তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থান স্থানাদির অপেক্ষা হীনতর ব্যবস্থা করিতে অশক্ত ও অনিচ্ছুক। সুতরাং বিধুমুখীকে এই ভাবে এই স্থানেই থাকিতে হইয়াছে।

বহুক্ষণ রামায়ণ পাঠ করিতে করিতে বিধুমুখীর মনে হইল, যে জাতির মধ্যে সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতির দৃষ্টান্ত প্রচারিত আছে, তাহাদের কোন কোন হতভাগিনী নারী পতিদেবতাকে অবজ্ঞা করিয়া পাপের স্রোতে দেহ ভাসাইতে পারে কিরূপে? যাহারা স্বামীর রূপ, যৌবন, অনুরাগ অন্বেষণ করে, সে নারীরা, কার্য্যতঃ না হইলেও, বস্তুতঃ ব্যভিচারিণী; তাহারা নারী নামের কলঙ্ক। আর যে নারী পতির প্রতি বিমুখ হইয়া পাপে মজিয়া নরকের আমোদ ভোগ করিতে মত্ত হয়, তাহার তো কোথাও ক্ষমা নাই; সে যাতনার ভীষণ অনলে চিরদিন—অনন্তকাল পুড়িতে থাকিবে। তাহাই তাহার পক্ষে সমুচিত ব্যবস্থা। মনুষ্য বড়ই দয়াবান্, বড়ই সহৃদয়। মনুষ্য তাহাকে ক্ষমা করিলেও করিতে পারে; ভগবান্ করুণ সিন্ধু; তিনিও তাহাকে ক্ষমা করিলেও করিতে পারেন; কিন্তু সে আপনাকে আপনি কখনই ক্ষমা করিতে পারে না। তাহার শাস্তি সে স্বয়ং প্রদান করে ও ভোগ করে।

এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মনে হইল, একদিন—বহুকাল অতীত হইল একদিন, আমার পরম দেবতা, আমার এই তুচ্ছ রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন; এই পাপ-পঙ্কিল কলেবর আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তাঁহার চরণ স্থাপনের অযোগ্য এই শরীরে তাঁহার সর্ব্বপ্রকার অধিকার থাকিলেও, এ পাপীয়সী তাঁহার বাসনা বিনিবৃত্তির প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই; তাঁহাকে পদাঘাত করিয়া দূর করিবার কথা নিজমুখে ব্যক্ত করিতেও সে কুণ্ঠিত হয় নাই। তথাপি তাহার এ মুখ এখনও খসিয়া যায় নাই। তাহার এ ঘৃণিতরূপ এখনও অপগত হয় নাই; ভীষণ কুষ্ঠরোগে তাহার দেহ এখনও আচ্ছন্ন হয় নাই। এখনও সে সুস্থ শরীরে রূপের বোঝা মাথায় করিয়া বসিয়া আছে। বোধ হয় এ সংসারে বিচার নাই; বোধ হয় বিধাতার ন্যায়-দণ্ড যথাস্থানে উপস্থিত হইতে কখন কখন ভুলিয়া যায়।

সহসা বাহিরের দ্বারে শিকল নাড়ার শব্দ হইল। বিধুমুখী পুস্তক রাখিয়া দ্বার-সন্নিধানে গমন করিলেন এবং মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসিলেন,—"কে?"

দ্বারের অপর দিক হইতে উত্তর হইল,—"আমি বিন্দুর মা।"

বিধুমুখী দ্বার খুলিয়া দিলেন। বিন্দুর মা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল বিধুমুখী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিছু সন্ধান পাইয়াছ কি?"

বিন্দুর মা বলিল,—"বিশেষ কিছু নয়; ঘরে চল বলিতেছি।"

বিন্দুর মা বালতি হইতে ঘটি করিয়া জল তুলিয়া হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিল। বিধুমুখী তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর বিন্দুর মা অগ্রসর হইয়া বারান্দায় উঠিল। বিধুমুখী তাহার পশ্চাতে গমন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"কি সন্ধান পাইলে, বিন্দুর মা?"

বিন্দুর মা বলিল,—"আর সংবাদের জন্য আমাদের ভাবনা চিন্তার দরকার নাই। সকল সংবাদের যিনি মূল তোমার সেই বাবা আসিয়াছেন। তিনি ভব দিদির চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া রহিয়াছেন। এখনই এখানে আসিবেন।"

রায় হরকুমার বাহাদুর বিধুমুখীর পিতা নাম পাইয়াছেন। বিধুমুখী সবিস্ময়ে বলিলেন, "বাবা আসিয়াছেন! কতক্ষণ আসিয়াছেন? কেন আসিয়াছেন? কেমন আছেন দেখিলে?"

বিন্দুর মা সম্পর্কে বিধুমুখীর কন্যা; সুতরাং মাতার পিতা তাহার তামাসার জিনিষ। সে সেই জন্য বলিল,—"তা আছেন তো মন্দ নয়; পাকা গোঁফ সমানই পাকা, কথায় সমান রস, আমাকে কত তামাসাই করিলেন। শুনিলাম, তোমাদের দেখিবার জন্য তোমার সুবিধা-অসুবিধার কথা নিজে জানিয়া যাইবার জন্যই আসিয়াছেন। এক ঘণ্টা হইল আসিয়াছেন।"

বিধুমুখী মনে মনে ভাবিলেন, বাবা আসিয়াছেন, কর্ম্ম-কাজ ক্ষতি করিয়া, কত কষ্ট ও অসুবিধা স্বীকার করিয়া আমার খবর লইতে আসিয়াছেন। যাহাকে প্রাণের সহিত ঘৃণা করা উচিত, যাহার নাম শুনিলে রাগ হওয়া উচিত, যাহার ছায়াও স্পর্শ করা উচিত নহে, তাহার প্রতি এরূপ দয়া! বড়ই লজ্জার কথা! এ পোড়ামুখ তাঁহাকে আবার দেখাইব কিরূপে?

আবার সেই প্রবেশ-দ্বারে শিকল নাড়ার শব্দ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে বামা-কণ্ঠে শব্দ হইল—"দিদি! দিদি!"

কণ্ঠস্বর ভবসুন্দরীর। বিধুমুখী বেগে দ্বার খুলিয়া দিতে ধাবিত হইলেন। দ্বার খুলিবামাত্র প্রথমে ভবসুন্দরীর, পশ্চাতে হর-কুমার বাহাদুরের মূর্ত্তি বিধুমুখীর চক্ষুতে পড়িল। বিধুমুখী মাথার কাপড় একটু টানিয়া দিয়া সঙ্কোচ সহকারে এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলেন। প্রথমে ভব, পরে হরকুমার বাহাদুর বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিধুমুখী ভক্তি সহকারে হরকুমারকে প্রণাম করিলেন। হর-কুমার বলিলেন,—"আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হউক।"

রায় বাহাদুরের মাথায় এক বিলাতী গুঁড়ামী জড়ান, এক খোলা লাংক্লথের লম্বা জামা গায়ে, পরিধান এক থানের কাপড়, পায়ে দেড় টাকা দামের এক জুতা, হাতে বিলক্ষণ স্থূল এক পিচের লাঠি। তাঁহার অন্য সরঞ্জামের মধ্যে এক প্রকাণ্ড কেম্বিসের ব্যাগ ছিল; তাহা এক্ষণে ভবর বাটীতে রাখিয়া আসিয়াছেন। তিনি একাকী আইসেন নাই; তাঁহার সঙ্গে শ্রীমান গৌরীচরণ চট্টো-পাধ্যায় মহাশয় আসিয়াছেন। তিনি এখন ভবসুন্দরীর চণ্ডী-মণ্ডপে বসিয়া তামাক খাইতেছেন।

হরকুমার বারান্দায় উঠিলেন। বিন্দুর মা ঘরের মধ্য হইতে একখানি জল-চৌকি বাহির করিয়া আনিল এবং তাহার উপর এক খানি ভাঁজ করা কম্বল পাতিয়া দিয়া, রায় বাহাদুরকে বসিতে বলিল। হরকুমার বলিলেন,—"তবু ভাল, তুমি যে আমাকে বসিতে বলিবে, সে ভরসাও আমার ছিল না। আমার এই পাকা গোঁফগুলা আমার পরম শত্রু। ইহার জন্যই বিন্দুর মা আমাকে দেখিতে পারে না।"

বিন্দুর মা বলিল—"পাকা গোঁফেও আমার আপত্তি ছিল না; কিন্তু তুমি ঠাকুর যে অনেকের। আমি ভাগাভাগির মধ্যে থাকিতে পারিব না।"

হরকুমার বলিলেন,—"সে কথার উত্তর এখন থাকুক। এখনকার হতশ্রী ছোঁড়ারা মা-মাসীর খবর না লইয়া, আগেই আপনার প্রণয়িনীকে লইয়া ব্যস্ত হয়। এখানে আমার বিধু মা, আর ভব মাসী, দুইই উপস্থিত। আমি তাঁহাদের সহিত কথা না কহিয়া, তোমার কোন কথার জবাব দিতে পারিব না।" তাহার পর বিধুমুখীর দিকে মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"মা, কেমন আছ বল। কোন বিষয়ে কোন অসুবিধা নাই তো?"

বিধুমুখীর চক্ষু জল-ভারাক্রান্ত; তিনি অধোমুখ—নিরুত্তর। হরকুমার আবার বলি-লেন,—"কেন মা কথা কহিতেছ না? আমার উপর রাগ করিয়াছ কি? ছেলের উপর কি মায়ের রাগ সাজে? পাঁচ বৎসর আসিতে পারি নাই; কাজ খুব অন্যায় হইয়াছে বটে; কিন্তু প্রতিদিন তোমার সংবাদ লই-য়াছি। লোক পাঠাইয়া, ভবকে সোনাপুর লইয়া গিয়া, ডাকে পত্র লিখিয়া সর্ব্বদা তোমার সংবাদ না লইয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম না। তথাপি এতদিন স্বয়ং না আসাটা বড়ই দোষের কথা হইয়াছে। কিন্তু মা তুমি বুদ্ধিমতী; ভাবিয়া দেখ, রাজার বিষয়-কর্ম্মের কিরূপ অবস্থা ঘটিয়া-ছিল। তাঁহার উদ্ধার করিতে বসিয়া এত দিনের মধ্যে আমার একবারও অন্য কোন কাজ করিবার সময় ও সুযোগ হয় নাই। এই জন্যই নিজে আসিতে পারি নাই।"

বিধুমুখী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, আমি সে জন্য কোন দুঃখ বা অভিমান করি-তেছি না। আপনাদের দয়ার কথা মনে করিয়া আমার চক্ষুতে জল আসিতেছে। যাহার নাম কখন মনে করা উচিত নয়, যাহাকে

দেখিলে ঘৃণায় মুখ ফিরান উচিত, দয়া করিয়া, কাজ ক্ষতি করিয়া. কষ্ট স্বীকার করিয়া তাহাকে দেখিতে আসিয়াছেন বলিয়া লজ্জায় আমি কথা কহিতে পারিতেছি না।”

হরকুমার বলিলেন, “ছেলের কাছে মা কি কখন লজ্জা পায়? তুমি কি আমাদের ঘৃণা করিয়া মুখ ফিরাইবার জিনিষ মা? তুমি কি ভুলিবার সামগ্রী মা? তোমার লজ্জার কোন কারণই তো আমরা দেখিতেছি না। মানুষ কত সময় কত অবুঝের মত বেহিসাবী কাজ করে; কিন্তু তাই বলিয়া, সংশোধনের পরও তাহাকে ত্যাগ করা উচিত কি? এক জনের দোষে তোমার অধঃপতন হইয়াছিল, সে ভ্রম তোমার ঘুচিয়া গিয়াছে; সুতরাং এখনও তোমাকে ত্যাগ করিব কেন?”

বিধুমুখী বলিলেন, “এ দয়ার সীমা নাই; এ সকল বাক্যের তুলনা নাই। যাঁহাদের স্বভাবই দয়া প্রকাশ, তাঁহারা নরকের কীটকেও দয়া না করিয়া থাকিতে পারেন না। সে কথা এখন যাউক। রাজা, রাণী, খোকা রাজা, রাজার ভগ্নী প্রভৃতি সকলে ভাল আছেন তো?”

হরকুমার বলিলেন,—“সকলেই ভাল আছেন। কিন্তু মা তুমি যেরূপে তাঁহাদের উল্লেখ করিয়াছ, তাহা যদি রাজা শুনিতে পান, তাহা হইলে বড়ই দুঃখিত হইবেন। রাজা শ্যামলালকে জ্যেষ্ঠ সহোদর বলিয়া জ্ঞান করেন। সুতরাং তুমি সেই সম্পর্ক অনুসারে তাঁহাদের উল্লেখ না করিলে, তিনি স্পষ্টই বুঝিবেন, তুমি তাঁহাকে পর বলিয়া মনে কর। ইহাতে তাঁহার কষ্ট হইবারই কথা।”

বিধুমুখী বলিলেন,—“আপনার কথার উপর কথা কহিতে আমার সাধ্য নাই বলুন আপনি, কেমন করিয়া এই ঘৃণিত পদার্থ সেই স্বর্গের দেবতার সহিত সম্বন্ধ রাখিতে সাহসী হইবে?”

হরকুমার বলিলেন,—“তর্কের অনুরোধে আমি মানিয়া লইলাম, তিনি স্বর্গের দেবতা, আর তুমি নরকের ঘৃণিত পদার্থ। দেবতার সহিত কাহার সম্পর্ক নাই মা? কোন পাপাত্মা মহাদেবকে বাবা বলে না? দেবতার চক্ষুতে সকলেই সমান। কুব্জাও যাহা, রুক্মিণীও তাহা। মা, রাজার সহিত তোমার পাতান সম্পর্ক নহে; তুমি রাজার বিশেষ আপনার লোক।”

বিধুমুখী বলিলেন,—“পাপীয়সীর এমন সৌভাগ্যের কথা আর কেহ কখন শুনে নাই।”

হরকুমার বলিলেন,—“সে কথা যাউক, আমি তোমাকে দুইটী প্রয়োজনীয় সংবাদ জানাইতে আসিয়াছি। হরিচরণ, আমাদের সহিত যে কদ্দমায় জাল ও জুয়াচুরি করিয়া, তিন বৎসরের জন্য জেলে গিয়াছিল জান?”

বিধুমুখী অধোমুখে বলিলেন,—“হাঁ।”

হরকুমার বলিলেন,—“আজ আট দিন হইল সে জেল হইতে খালাস হইয়া আসিয়াছে। আমরা সংবাদ পাইয়াছি, এখন সে কলিকাতায় আছে।”

বিধুমুখী বলিলেন,—“সে তো এখানেও আসিতে পারে এবং আমার উপর দৌরাত্ম্য করিতে পারে।”

হরকুমার কহিলেন,—“অসম্ভব নহে। তবে মোকদ্দমায় তাহার টাকা কড়ি প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। এখনও তাহার কিছু নাই, এমন নহে। সে বুঝিয়াছে, তোমাকে জড়াইয়া একটা মোকদ্দমা করিতে পারিলে কিছু সুবিধা হইলেও হইতে পারে। কিন্তু তাহাতেও যে রাজার কোন অনিষ্ট হইবে না,

তাহা আমরা জানি। তথাপি সে একবার চেষ্টা না করিয়া ছাড়িবে, এরূপ বোধ হয় না।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"কিন্তু ইহাও তো সে বুঝিয়াছে যে, আমি ভাল বা মন্দ কোন বিষয়েই তাহার সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিব না।"

"তাহা সত্য। কিন্তু মরিবার সময়ও সাপ কামড়াইবার চেষ্টা না করিয়া ছাড়ে কি? সে ভাল ভাবে, মন্দ ভাবে সকল প্রকারেই তোমাকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে পারে।"

বিধুমুখী সভয়ে বলিলেন,—"বড়ই ভয়ানক কথা। তাহার নাম হইলেই আমার হৃৎকম্প হয়। এখন উপায়?"

হরকুমার বলিলেন,—"উপায়ের ব্যবস্থা পরে করিব। এখন দ্বিতীয় সংবাদের কথা বলি। শ্যামলাল বাবুর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।"

বিধুমুখী ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞাসিলেন,—"কোথা আছেন তিনি?"

"তিনি এতদিন নানাস্থানে পর্য্যটন করিয়া সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছেন।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"নানাস্থান পর্য্যটন করিলেন কিরূপে? তাঁহার হাতে তো পয়সা ছিল না।"

"ভিক্ষা করিয়া।"

বিধুমুখী মনে মনে ভাবিলেন, 'এক সময়ে যাঁহার বাসনায় লক্ষ লক্ষ মুদ্রাও অপব্যয় হইত, আজি তাঁহাকে নিজের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য ভিক্ষা করিতে হইতেছে! আর আমি এক স্থানে বসিয়া সুখ-স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইতেছি।' প্রকাশ্যে বলিলেন,—"এখন কিরূপে চলিতেছে?"

"তিনি কলিকাতায় আছেন শুনিবামাত্র আমরা অবশ্যকমত অর্থ ও লোক পাঠাইয়া দিয়াছি। সম্ভবতঃ সত্বরই আমরা তাঁহাকে সোণাপুর আনিতে পারিব।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"বাবা, আমি আপনার সঙ্গে সোণাপুর যাইব।"

হরকুমার বলিলেন,—"বহু চেষ্টাতেও এ পর্য্যন্ত তোমার সোণাপুর যাইবার মত করাইতে পারি নাই। আর আজি তুমি ইচ্ছা পূর্ব্বক সোণাপুর যাইতে চাহিতেছ, ইহা আমাদের সৌভাগ্য। ভাল, কল্য ভাবিয়া চিন্তিয়া যথাকর্ত্তব্য স্থির করিব। সে কথা যাউক। প্রথমে মাসীর বাটীতে বসিলাম। মাসী চারিটী মুড়ী খাইতে দিয়াছেন। তাহার পর মার কাছে আসিলাম। মা তো কিছুই খাইতে বলেন না। যাহা কিছু ঘরে থাকে, বুড়া ছেলেকে খাইতে দেও মা।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"আমি তাহা বার বার ভাবিতেছি বটে, কিন্তু আমার সাহসে কুলায় না।"

হরকুমার বলিলেন,—"কেন আমি অনেক খাই বলিয়া ভয় পাইতেছ?"

বিন্দুর মা বলিল,—"শেষে মাথায় ছুটী দিয়া দিলেই হইবে।"

বিধুমুখী আহারের আয়োজনে গমন করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভয়।

হরকুমার ও চণ্ডী পর দিন প্রাতে জয়সুন্দরীর চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া আছেন। চণ্ডী এখন আর গুলি খায় না; কিন্তু দুই বেলা

প্রকাণ্ড দুই তাল আফিং উদরস্থ করিয়া থাকে। কোন অভাব-অপ্রতুলের জ্বালা তাহাকে আর ভোগ করিতে হয় না। তাহার অকৃত্রিম বন্ধু হরকুমার দাদার কৃপায় সে বড়ই সুখ-স্বচ্ছন্দে আছে। বাস করিবার নিমিত্ত সোণাপুরে রাজবাটীর আমলাদিগের বাস-ভবনে, সে উত্তম দ্বিতল ঘর পাইয়াছে; দুই বেলা তাহার নিমিত্ত সন্দেশাদি জল খাবার আসিয়া থাকে। দিনমানে তাহার ভোজনার্থ নানা ব্যঞ্জন সংস্কৃত অন্ন আসিয়া উপস্থিত হয়; রাত্রিতে তাহার নিমিত্ত ঠাকুরবাটী হইতে লুচী ও মিষ্টান্ন আইসে। তা ছাড়া, গোপাঙ্গনা তাহার নিমিত্ত প্রতিদিন জ্বাল দেওয়া ঘন দুধ পৌঁছাইয়া দেয়। তাহার তামাক টীকার ভাণ্ডার নিয়ত অক্ষয়। দেশী ভাল ভাল ধুতি সে পরিধান করে; রকম রকম জামা-কোট সে গায় দেয়, চীনা বাড়ীর ভাল ভাল জুতা সে পায় পরে। গড়-গড়ায় সে তামাক খায়; রাজবাটীর একদাসী আসিয়া তাহার বিছানা পরিষ্কার করিয়া কাপড় কাচিয়া, হুকায় জল ফিরাইয়া, অন্যান্য আবশ্যক কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া যায়। সুতরাং চণ্ডী সর্ব্ব-প্রকারে নিশ্চিন্ত ও স্বচ্ছন্দ ভাবেই কাল কাটাইতেছে। তাহার আকৃতিরও বিলক্ষণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যাহারা তাহাকে পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে দেখিয়াছে, তাহারা এখন তাহাকে দেখিলে চিনিতে পারে কি না সন্দেহ। তাহার দেহে অস্থি চর্ম্মের মধ্যে মাংসের ব্যবধান ছিল না; কিন্তু এখন বেশ স্থূল হইয়াছে। গায়ের বর্ণ এখন আর পূর্ব্ববৎ কালীর মত নাই; একটু লাবণ্য-সংযোগে রঙটা উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে। মাথার সে রুক্ষ কেশ নাই; তেল চুক-চুকে কালো কেশ-রাশিতে মাথাটী ঢাকিয়া আছে।

নয়ন মুদিয়া তামাক খাইতে খাইতে, চণ্ডী জিজ্ঞাসিল,—"দাদা, এ বেলা সোণাপুর ফিরিয়া যাওয়া হইবে না কি?"

হরকুমার বলিলেন,—"না ভায়া, আজি তো কোন মতেই যাওয়া হইবে না। এখানে অনেক কার্য্যের জন্য আসা হইয়াছে। সে সকল কাজ শেষ না করিয়া যাওয়া হয় কি?"

চণ্ডী বলিল,—"তোমার কাজ যে কি তাহা তুমিই জান। আবার তোমাকে কাগজের সেই রোগে ধরিয়াছে কি?"

"না ভায়া, এবার কাগজের সন্ধানে এ দেশে আমি আসি নাই।"

চণ্ডী বলিল—"এত দেশ থাকিতে ফের আমাকে টানিয়া লইয়া যখন এই দেশে আসিয়াছ, তখন কাগজপত্র ছাড়া আর কোন মতলব তোমার আছে বলিয়া বোধ হয় না। যদি কাগজই তোমার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে সময় নষ্ট করিয়া ফল হইবে না। এদেশে আর কাগজ-পত্র নাই। চল তবে বর্দ্ধমান যাওয়া যাউক।"

হরকুমার বলিলেন,—কাগজের কাজ তোমার কল্যাণে শেষ হইয়াছে। এবার অন্য মতলব আছে।"

চণ্ডী বলিল,—"তা যে মতলবই থাকুক, রাজবাটীতে পরম সুখে ছিলাম। আমাকে এত কষ্ট দিবার জন্য এ পোড়া দেশে আনিলে কেন দাদা?"

হরকুমার বলিলেন,—"কেন ভায়া, তোমার কি বিশেষ কষ্ট হইতেছে?"

চণ্ডী বলিলেন,—"কষ্ট যথেষ্ট হইতেছে বই কি? আর কষ্ট যতই হউক, তাহা বলিয়া কোন ফল নাই। কিন্তু এখনই যে কষ্ট পূর্ণমাত্রায় আরম্ভ হইবে। দুপর বেলা

দুইটা ভাত চাই তো। তাহার ব্যবস্থা তো ছাইও দেখিতেছি না।”

তখনই ভব পার্শ্বের দ্বার-প্রান্তে আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—“বাবা, খাওয়া দাওয়ার কি হইবে?”

হরকুমার বলিলেন,—“মধ্যাহ্নে দুইটা ভাত খাইতে হইবে মাসী। তুমি যেমন করিয়া পার, তাহার উপায় কর। চণ্ডী ভায়ার জন্ম সের খানিক ঘন দুধ চাই। তোমরা মা-মাসী এখানে থাকিতে আমাদের খাওয়ার বিনা কি?”

ভব বলিলেন,—“তা সবই ঠিক হইবে। সেই লক্ষ্মীকান্ত বাটীতেই আছে। সন্দেশ, রসগোল্লা তো তোমরাই অনেক আনিয়াছ; মাছ, দুধ, সবই পাওয়া যাইবে। আমি তাহার উদ্যোগে যাই।”

হরকুমার বলিলেন—“দাঁড়াও মাসী, দুইটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি। তোমাকে আর মাকে সোণাপুর যাইতে হইবে। পারিবে না কি?”

ভব বলিলেন,—“কেন পারিব না? তোমার মায় মত করাই কঠিন। তিনি বলেন, এ পোড়ামুখ সে দেবতাদের কাছে দেখাইতে পারিব না।”

হরকুমার বলিলেন,—সে তর্ক পরে হইবে; আপাততঃ কথা বড় ভয়ানক। এখানে কেবল তোমাকে মাত্র সহায় করিয়া থাকায় তাঁহার অনেক বিপদ ও কষ্টের সম্ভাবনা।”

ভব বলিলেন,—“তাহা তো কালি তোমার মুখে সেই হতভাগার জেল খালাস হওয়ার খবর শুনিয়াই বুঝিয়াছি।”

হরকুমার বলিলেন,—“তুমি আমার মত জানাইয়া তাঁহাকেও এ বিষয়ে সম্মত হইতে বলিবে। আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অন্য কোন সৎপরামর্শ স্থির করিতে পারিতেছি না।”

ভব বলিলেন,—“যখন তুমি বলিতেছ, অন্য সদুপায় হইতেছে না, তখন কাজেই দিদিকে মত করিতে হইবে। সোণাপুরের কথা শুনিলে আমার তো আনন্দ ধরে না। সত্যই সে দেবলোক। তা যাই হউক, যদি যাওয়া হয়, তাহা হইলে কবে যাইতে হইবে?”

“কালিই।”

চণ্ডী বলিলেন,—“হাঁ মাসী কালিই। তুমি এখানে যতই যত্ন কর, রাজবাড়ীর মত সুখ আর ব্রহ্মাণ্ডে কোথাও নাই।”

ভব বলিলেন,—“তা আর বলিতে? কিন্তু বাবা, আমার হাতে তো অনেক লোকের টাকা-কড়ি ঘটিত কাজ আছে। সেখানে গিয়া দুই চারি দিনে কখনই আসিতে পারিব না। কাজেই গোল মিটাইয়া যাইতে হইবে; তাহা হইলে দুই একদিন বিলম্ব হইতে পারে।”

হরকুমার বলিলেন,—“যত শীঘ্র পার হাতের কাজ মিটাইয়া ফেল।”

ভব প্রস্থান করিল। হরকুমার জিজ্ঞাসিলেন,—“ভায়া, এই রামনগর তোমার পূর্ব্ব নিবাস, এই স্থানেই তোমার মাসীর বাড়ী, পরে সে বাড়ী তোমারই হইয়াছিল; তুমি সে বাড়ী বেচিয়া ফেলিয়াছ। এক্ষণে যদি সে বাড়ী আবার তোমার হয়, তাহা হইলে তুমি এখানে বাস করিতে সম্মত আছ কি?”

চণ্ডী বলিলেন,—“সে বাড়ী কেন? আমাকে এই সমস্ত দেশটার রাজা করিয়া দিলেও, আমি এখানে থাকিতে চাহি না। রাজবাড়ী ছাড়িয়া স্বর্গে পাঠাইলেও আমি যাইব না।”

"তোমার সেই বাটী পুনরায় খরিদ করা হইতেছে জান ?"

চণ্ডী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন ? তখনই সে ঘরটী পড় পড় হইয়াছিল। এতদিনে হয়তো পড়িয়া গিয়াছে। পয়সা দিয়া সেই ভূতের বাসা কিনিতেছ কেন ?"

"তোমাদের জিনিস্‌টা হাত ছাড়া হওয়া কি ভাল ?"

তোমার গুণ সকলই; কিন্তু দোষের মধ্যে তোমার ঘাড়ে সময়ে সময়ে ভূত চাপে। সেই ভাঙ্গা বাড়ীতে দুখানা ছেঁড়া কাগজ পাওয়া গিয়াছিল। সেই মায়ায় সেই পচা ইঁট কয়খানা গলায় বাঁধিয়া ডুবিয়া মরাটা সুবোধের কাজ নয় দাদা।"

হরকুমার বলিলেন;—"ঠিক কথা। কিন্তু মনে কর, ঐ বাড়ী যদি ভাল করিয়া মেরামত করা হয়, উত্তম পাকশালা, বসিবার ঘর প্রভৃতি যদি প্রস্তুত করা হয়, আর তোমার দাদা রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যদি স্ত্রী পরিবার লইয়া সেখানে আসিয়া বাস করেন, তাহা হইলে ভাল হয় না কি ?"

চণ্ডী বলিলেন,—"তা দাদা আইসেন, আসুন। আমাকে আসিতে না বলিলেই হইল। ভাল, দাদা তো বর্দ্ধমানে মোক্তারি করেন; তিনি সেখান হইতে এখানে আসিবেন কেন ?"

হরকুমার বলিলেন,—"বর্দ্ধমানে তিনি মোক্তারি করেন বটে, কিন্তু তাঁহার তো সেখানে বাসা। একটা নিজের বাসস্থান থাকা উচিত নয় কি ? ছেলে-মেয়ে আছে, দিন-অদিন আছে।"

চণ্ডী বলিলেন,—"উচিত বটে। তাঁহার ঘাড়ে এ ভূতের বাড়ী চাপাইতে যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তুমি অনায়াসে তাহার ব্যবস্থা করিতে পার।"

"তোমার সেই বউ দিদির সঙ্গে, ভাইপো ভাইঝির সঙ্গে দেখা করিতে ইচ্ছা হয় না কি ?"

চণ্ডী বলিলেন,—"সত্যই বলিতেছি, দাদা, তাঁহাদের সকলকেই দেখিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু বউ ঠাকরুণের নিকট হইতে আমি সেই যে কাগজ লইয়া পলাইয়া আসিয়াছি, তাহার পর হইতে দাদার নাম মনে হইলেই আমার ভয় হয়। আমি স্বপ্নে দেখি, যেন দাদা মুগুর লইয়া আমাকে তাড়া করিতেছেন।"

হরকুমার বলিলেন,—"আজি তাঁহারা সকলেই এখানে আসিবেন।"

চণ্ডী চক্ষু মেলিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"বল কি দাদা! তাহা হইলে আমি কোথায় যাইব ?"

হরকুমার বলিলেন,—"কোথায় যাইবে তুমি ? এজন্য তোমার কোন ভয় নাই।"

চণ্ডী নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া নীরবে বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে বলিল,—"তাঁহাদের এখানে আসার কোন সম্ভাবনা নাই; কিন্তু তোমার মুখ দিয়া মিথ্যা কথা বাহির হয় না। আর তুমি, রামায়ণ মহাভারতকে হার মানাইয়া, অনেক আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটাইতে পার। কাজেই তোমার কথা সত্য বলিয়া মা'নয়া লইতে হইতেছে। তাহা হইলে দাদা, আমি কেন আজিই সোণাপুর চলিয়া যাই না ?"

হরকুমার বলিলেন,—"তোমার কোন ভয় নাই। আমি এখানে থাকিতে তোমাকে কেহ কোন কথা বলিতে পারে কি ?"

চণ্ডী বলিল,—"তা তুমি যাই বল, আমার সে দাদা বড়ই ভয়ানক লোক। ছেলেবেলায় বিনা দোষে তিনি আমার উপর যেরূপ লাঠিবাজি করিতেন, তাহা মনে হইলে, এখনও

আমার হাড়ের ভিতর কন্ কন্ করিয়া উঠে। আমি আজিই প্রস্থান করিব দাদা।"

"কেমন করিয়া যাইবে?"

"আমি হাঁটিয়া যাইব। গাড়ি লোক কিছুই চাহি না, আমি অনায়াসে হাঁটিয়া চলিয়া যাইব।"

হরকুমার বলিলেন,—"আচ্ছা সে পরামর্শ পরে হইবে। তুমি আপাততঃ আর একবার ভবকে ডাকিয়া আন।"

চণ্ডী বলিলেন,—"তা ডাকিতেছি। কিন্তু দাদা যদি আইসেন, তাহা হইলে আমাকে আগেই পলাইতে হইবে, এ কথা তোমাকে এখনই বলিয়া রাখিতেছি।"

চণ্ডী বড় কাতর ভাবে উঠিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মিলন।

সেই দিন বেলা নয়টা কি দশটার সময়, গঙ্গামণির পরিত্যক্ত এবং তাঁহার বোনপো চণ্ডীচরণ কর্তৃক বিক্রীত বাটী, রায় বাহাদুর হরকুমার বর্দ্ধমানের মোক্তার রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নামে ক্রয় করিলেন। দলীল লেখাপড়া শেষ হইয়া গেল; টাকা দেওয়া লওয়াও মিটিয়া গেল; স্থানীয় অনেক লোকই সাক্ষী রহিলেন। কেবল দলীল রেজেষ্টারী করা বাকী থাকিল। পত্র দ্বারা হরকুমার খরিদ-বিক্রয় সংক্রান্ত সমস্ত কথাই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। সুতরাং এ কার্য্যে কোন বিলম্ব বা অসুবিধা ঘটিল না।

যথাসময়ে ভব সুন্দরীর সুব্যবস্থায় হরকুমার ও চণ্ডীচরণ পরিতোষ সহকারে ভোজন করিলেন। উত্তমরূপে তামাক সেবন করিতে করিতে চণ্ডীচরণ নিদ্রাগ্রস্ত হইলেন। ক্রমে সেই নিদ্রায় গাঢ়তা উপস্থিত হইল এবং চণ্ডীচরণের নাসারন্ধ্র হইতে উৎকট শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল।

হরকুমার, কাগজ-কলম প্রভৃতি বাহির করিয়া, কয়েক খানি পত্র লিখিলেন। একটা লম্বা হিসাবের কাগজ বাহির করিয়া অনেক দেখা-শুনা করিলেন। বেলা তিনটা বাজিয়া গেল।

ভব সুন্দরীর চণ্ডীমণ্ডপ সমক্ষে দুইখানি গরুর গাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। হরকুমার গাড়ীর আরোহিগণকে সাদরে আহ্বান করিবার নিমিত্ত উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাঁহাদিগকে "আসুন আসুন" বলিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। তাহার পর পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া ভবকে বলিলেন,—"তাঁহারা আসিয়াছেন। তুমি মেয়ে ছেলেদের আদর করিয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া আইস, মিষ্টান্ন আছে, জল খাইতে দেও।"

ভব তৎক্ষণাৎ বাহিরে গাড়ির নিকট আসিলেন। গাড়ি হইতে প্রথমে এক পুরুষ অবতরণ করিলেন। তিনি মোক্তার শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। তিনি নামিয়াই বলিলেন,—"এ কে! কায়েত মাসি না? আর মাসি মা, আর যে কখন এদেশে আসা হইবে, কি তোমাদের সহিত দেখা হইবে তাহা মনে ছিল না।"

ভব তাঁহাকে বলিল,—"বাবা, আমি চিরদিনই জানি, তোমার ভাল হইবে। কতকাল যে তোমাদের দেখি নাই তাহা বলিতে পারি না। যাও, এখন চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া বইস।

আমি বউ মা আর ছেলেদের লইয়া বাটীর মধ্যে যাই।"

রামচন্দ্র চণ্ডীমণ্ডপে উঠিতে গিয়াই প্রথমে হরকুমার বাহাদুরের সুদীর্ঘ মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। তৎক্ষণাৎ সসম্ভ্রমে নমস্কার করিয়া তাঁহার নিকটস্থ হইলেন এবং বলিলেন,—"ছয় বৎসর পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের বাসায় যে মহাত্মাকে দেখিয়াছিলাম, আজি আবার তাঁহাকে দেখিয়া চরিতার্থ হইলাম।"

হরকুমার সাদরে তাঁহার হাত ধরিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া আসিলেন এবং তাঁহাকে তক্তাপোষের উপর বসাইয়া বলিলেন,—"আপনি আমাদের যে উপকার করিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ হইবার নহে। আমরা আপনাকে পরমাত্মীয় বলিয়া জ্ঞান করি।"

রামচন্দ্র বলিলেন,—"সে কাগজগুলায় কাহারও এত কাজ হইবে তাহা কখনও মনে ভাবি নাই। আর সে গুলার জন্য আমারও যে এত উপকার হইবে, তাহা আমি জানিতাম না।"

হরকুমার বলিলেন,—"আপনার উপকার অতি সামান্য; আমরা সেগুলির দ্বারা অসীম উপকার পাইয়াছি এবং সেজন্য আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। আপনি সে গুলি ফেলিয়া না দিয়া যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন, ইহাই আমাদের পরম সৌভাগ্য।"

রামচন্দ্র মনে মনে উত্তমরূপে বুঝিয়াছেন যে, তাঁহার সম্মুখস্থ এই ব্যক্তি ধনে, মানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে সকল গুণেই শ্রেষ্ঠ; সুতরাং তাঁহার নিকট অনর্থক বাগাড়ম্বর করিয়া প্রতিপত্তি বাড়াইবার আর প্রয়োজন নাই। তথাপি কাগজ ফেলিয়া না দেওয়ার কথায় নিজের একটু বিজ্ঞতার পরিচয় না দিয়া থাকা, তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইল। তিনি বলিলেন,—"কাগজ কি কখন ফেলিতে পারি মহাশয়? এক টুকরা কাগজের জোরে কত সময় কত ডুবা মোকদ্দমার আমরা উদ্ধার করিয়াছি। কাজেই কাগজের কি দরকার, আমরা তাহা বেশ বুঝি।"

পার্শ্বস্থ নিদ্রাগত ব্যক্তিকে দেখিয়া, রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ইনি কে?"

হরকুমার বলিলেন,—"চিনিতে পারিতেছেন না? উনি যে আপনার ভায়া চণ্ডীচরণ।"

রামচন্দ্র বলিলেন,—"চণ্ডী! বলেন কি? চণ্ডী এমন হইয়াছে? আপনাদের হাওয়া গায়ে লাগিলেই মানুষের আকার-প্রকার বদলাইয়া যায়।"

চণ্ডীচরণ নিদ্রাবেশে স্বপ্ন দেখিতে ছিলেন। সহসা সেই নিদ্রিতাবস্থাতেই চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "দোহাই দাদা, আপনি আমাকে আর মারিবেন না। দোষ আমার নয়—বউ-ঠাকরুণ না বলিলে আমি কখনই কাগজগুলি লইয়া যাইতাম না।"

হরকুমার হাসিতে হাসিতে চণ্ডীচরণের গায়ে হাত দিয়া নিদ্রা ভঙ্গ করাইবার চেষ্টা করিলেন। চণ্ডী, নিদ্রা ভঙ্গ সহকারে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়াই দেখিল, তাহার দাদা রামচন্দ্র সশরীরে সম্মুখে উপস্থিত। সে তখন বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিল এবং রামচন্দ্রের পায়ের নীচে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"দোহাই দাদা, আপনি আমাকে আর মারিবেন না। অনেকক্ষণ মারিয়া আমার হাড় ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। আর মারিলে আমি মারিয়া যাইব।"

তখন মোক্তার রামচন্দ্র সাদরে চণ্ডীচরণকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। চণ্ডী বলিল,—"ঐ রে! ধরিয়া মারিবার কোনই

দরকার নাই দাদা। আমার আর পলাইবার সাধ্য নাই। হায়! কেন আমি তখনই পলাই নাই! হরকুমার দাদা, তুমি যে সে সময় দশবার বলিয়াছিলে, কোন ভয় নাই। এখন যে আমার প্রাণ যায় দাদা, কই তুমি তো কোন কথাই বলিতেছ না।"

রামচন্দ্র বলিলেন,—"ভাই চণ্ডী, তুমি আমার যে উপকার করিয়াছ, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তুমি কষ্ট স্বীকার করিয়া রায় বাহাদুর মহাশয়কে আমার বাসায় লইয়া না গেলে, আর কাগজগুলি তাঁহার হাতে না দিলে, আমার আজি এত উপকার হইত না। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরজীবী হও।"

চণ্ডীচরণ অবাক্ হইল। সে অজ্ঞানের ন্যায় একবার হরকুমার এবং আর একবার রামচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। হরকুমার বলিলেন,—"তোমার কোনই ভয় নাই ভায়া, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি। তোমার দাদা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। তোমার বউ ঠাকুরুণ, ভাই-পো, ভাইঝিরা আসিয়াছেন। তুমি বাটীর মধ্যে গিয়া তাঁহাদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া আইস; তাঁহাদের জল খাওয়া হইল কি না খোঁজ করিয়া আইস।"

রামচন্দ্রের বাহু-পাশ-মুক্ত হইয়া, চণ্ডীচরণ জিজ্ঞাসা করিল,—"তবে দাদা, তুমি আমার উপর রাগ কর নাই? আমাকে মার নাই? আমি যে এতক্ষণ ঘুমাইতে ঘুমাইতে কেবলই তোমার হাতের মারি খাইয়াছি।"

রামচন্দ্র বলিলেন,—"না ভাই, তোমাকে মারিব কেন? তুমি আমার অশেষ উপকার করিয়াছ। তোমারই জন্য বড় মেয়েটীর ভাল বিবাহ হইয়াছে; আর নানা বিষয়ে নানা প্রকার সুবিধা হইয়াছে। তুমি সুখে থাক।"

চণ্ডীচরণ অনেক ভাবিয়া দেখিল, কিন্তু তাহার দ্বারা কন্যার বিবাহ বা অন্যান্য সুবিধার কোন কথাই তাহার মনে পড়িল না। সে কেবল লুকাইয়া বউ-ঠাকুরাণীর হাতে কুড়িটী টাকা দিয়াছিল; বউ ঠাকুরাণী যেরূপ পাকা লোক, তাহাতে সে টাকা যে তিনি সহজে স্বামীর হাতে দিবেন, সে সম্ভাবনাও কিছু ছিল না। আর সেই কুড়ি টাকা মাত্র পাইয়াই মেয়ের ভাল বিবাহ ও অন্যান্য সুবিধা হইতে পারে কি? কথাটা যেরূপ ভাবে তাহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, তাহাতে বিদ্রূপ বা তিরস্কারের ভাবে ইহা গ্রহণ করিতে তাহার মন চাহিতেছে না। সে অনেক ভাবিয়া স্থির করিল, অবশ্যই একটা কিছু ঘটিয়াছে। যখন হরকুমার দাদা ইহার মধ্যে আছেন, তখন অনেক আশ্চর্য্য কাণ্ডই ঘটিতে পারে। তিনি না পারেন এমন কর্ম্মই নাই; অতএব বোধ হয় আর ভয়ের কারণ নাই এবং নিজের ওজন কমাইবারও আর দরকার নাই। প্রকাশ্যে বলিল,—"দাদা, আমি আর কি করিয়াছি? আমি যে সকল লোকের সহিত চলাফেরা করি, তাঁহারা দুনিয়ার মানুষের সেরা। তাঁহাদের কৃপায় সবই হইতে পারে।"

হরকুমার বলিলেন,—"তা বেশ। তুমি এখন বাড়ীর মধ্যে যাও।"

চণ্ডী বলিলেন,—"যাই; দাদাকে একবার তামাক দিয়া যাই।"

সে তামাক সাজিতে বসিল। দুই কলিকা তামাক তৈয়ার করিয়া, একটি গড়গড়ার উপর বসাইয়া রামচন্দ্রকে খাইতে দিল। অপরটী

একটী থেলো হুকার উপর লাগাইয়া, হাতে করিয়া প্রস্থান করিল।

বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া চণ্ডী দেখিলেন, তাঁহার সেই বউ ঠাকুরাণী মাটীর উপর বসিয়া, হাত মুখ নাড়িতে নাড়িতে ভব সুন্দরীর সহিত কথা কহিতেছেন। বড় মেয়েটী এখন প্রায় ষোল বছরের। সে মাতার নিকটে বসিয়া তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিতেছে ও ভাবভঙ্গী পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। ছেলে দুইটী কিছু দূরে দাঁড়াইয়া, দাঁড়ের উপর ভবর যে টিয়া পাখী দুলিতেছিল, তদ্গত চিত্তে তাহাই দেখিতেছিল। চণ্ডী নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—"বউ ঠাকরুণ, চিন্‌তে পার?" সঙ্গে সঙ্গে প্রণাম করিতেও চণ্ডীর ভুল হইল না। কিন্তু এবার শুষ্ক প্রণাম। এবার প্রণামের সঙ্গে রাজরাজেশ্বরীর শ্রীমুখাঙ্কিত চক্রবৎ রজত খণ্ড যুগল বধূ ঠাকুরাণীর চরণসরসিজ সমীপে মোহন শব্দ সহকারে নিপতিত হইল না। তা না হউক, বধূ ঠাকুরাণী চণ্ডীর উপর অপ্রসন্নতা প্রকাশ করিলেন না।

সসম্ভ্রমে উঠিয়া বউ ঠাকুরুণ বলিলেন,—"ওমা ঠাকুর পো যে! কি ভাগ্য আবার দেখা হইল! সেই দেখা আর এই দেখা? ভাল আছ তো ঠাকুর পো?"

চণ্ডী বলিলেন,—"তোমাদের কৃপায় এক রকম ভাল আছি বউ ঠাকরুণ। তোমরা সকলে ভাল আছ? পুটীর বিবাহ হইয়াছে, তা বউ আমাকে একবার জানালেও না।"

বউ ঠাকরুণ বলিলেন,—"জানাইব কি গো! তুমিই বিবাহ দিলে, তোমারই দয়ায় চারি হাত এক হইয়া গেল; আবার তোমাকে আমরা জানাইব কি?"

চণ্ডী আবার চিন্তিত হইল। সে তো বিবাহ বিষয়ে কোনই সাহায্য করে নাই তবে বউ ঠাকরুণ তাহাকেই সকল কর্ম্মের মূল বলিতেছেন কেন? চণ্ডীর মনে হইল, হঠাৎ কি তাহার মাথা বিগড়াইয়া গেল? সহসা সে কি বুদ্ধি হারাইয়া ফেলিল? অকস্মাৎ সে কি পাগল হইল? এই সময়ে ভব সুন্দরীর একটা কথা তাহার অন্ধকারাচ্ছন্ন বুদ্ধিকে একটু আলোক প্রদান করিল।

ভব বলিল,—"তা চণ্ডী চিরকালই লোক ভাল। আপনার লোকের উপকার তো করিতেই পারে, পরের কোন উপকার করিতেও চণ্ডী কখন পিছ পা নহে।"

চণ্ডী কখনই জানিত না যে, সে এত গুণবান্, এত পরোপকারী। ভাবিল, হয় সে পাগল হইয়াছে, না হয় সে ঠিক আছে, কিন্তু কিরূপ একটা হাওয়া লাগায় এক সঙ্গে দুনিয়ার সকল লোকই বেঠিক হইয়া পড়িয়াছে। ভবর কথার উপরে বউ ঠাকুরাণী বলিলেন,—"উপকার ব'লে উপকার। মেয়ের বিবাহের জন্য আমাদের আহার-নিদ্রা বন্ধ হইয়াছিল। সম্বন্ধ ঠিক, কথাবার্ত্তা পাকা, কিন্তু আমাদের হাতে একটিও পয়সা নাই। সর্ব্বনাশ উপস্থিত। তিনটী শ টাকার কমে আর জাতি থাকে না। হঠাৎ ঠাকুর-পোর নিকট হইতে এক রেজিষ্টারী চিঠি গিয়া উপস্থিত। দু টাকা নয়, দশ টাকা নয়, মাসি মা! ঠিক মন জানিয়া ঠাকুর-পো তিন শ টাকাই পাঠাইয়াছেন। আমরা তো মরা দেহে প্রাণ পাইলাম। তাই তো পুটীর বিবাহ হইল; তা বেশ বিয়ে দিয়াছে ঠাকুর-পো। পাঁচটার ঘর, ভাত-কাপড়ের দুঃখ নাই—ছেলে চাকরী করে। তোমার কৃপায় পুঁটী বেশ পড়িয়াছে ঠাকুর-পো।"

ঠাকুর-পো ভাবিয়া স্থির করিলেন, এ সকলই ঐ বুড়া রায় বাহাদুরের খেলা। রায়

বাহাদুরই যথা সময়ে চণ্ডীর নাম দিয়া, বিবাহের নিমিত্ত টাকা পাঠাইয়াছেন। হরকুমারের উপর চণ্ডীর ভক্তি ও শ্রদ্ধার সীমা ছিল না। আজি আবার তাহার মাত্রা আর একটু বাড়িয়া গেল। চণ্ডী সে সব কিছু না বলিয়া পুঁটীর নিকটস্থ হইয়া বলিল,—"মা-লক্ষ্মী শাশুড়ী কেমন হইয়াছে বল।"

পুঁটী মাথা হেঁট করিল। বউ-ঠাকুরাণী বলিলেন,—"প্রণাম কর মা, কাকাকে প্রণাম কর। ওরে তোরা পাখী দেখ্‌ছিস বুঝি। এদিকে আসিয়া আগে কাকার পায়ের ধূলা নে।"

তখন চণ্ডীর চরণে অনেক প্রণাম পড়িয়া গেল। চণ্ডী বাবাজীদের হাত ধরিয়া, মাথায় হাত দিয়া, গায়ে হাত বুলাইয়া অনেক আদর আপ্যায়িত করিলেন। তাহার পর ভবকে বলিলেন,—মাসী, ছেলেদের জলখাইতে দেওয়া হইয়াছে? বউ ঠাকুরাণী জল খাইয়াছেন?"

ভব বলিল,—"ছেলেরা জল খাইয়াছে, কিন্তু তোমার বউ ঠাকুরুণ কিছুই খান নাই। বলিতেছেন, হুগলীতে অবেলায় খাইয়া, এখন আর খাইতে ইচ্ছা নাই।"

চণ্ডী বলিল,—"ছি বউ ঠাকরুণ! তোমার মুখে এমন অবিচারের কথা। তুমি জল না খাইলে আমি বড়ই দুঃখিত হইব।

বউ বলিলেন,—"ঠাকুর-পোর কথা, ঠেলিবার যো নাই। দেও মাসি মা, অল্প যাহা হয় কিছু দেও।"

মাসী জল খাবার দিলেন, বউ মা খাইলেন। চণ্ডী বলিলেন,—এখন বাহিরে যাই বউ দিদি, আবার শীঘ্র আসিতেছি।"

চণ্ডী প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কৃতজ্ঞতা।

চণ্ডীচরণ বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, অনেক লোক একত্র হইয়া রায় হরকুমার বাহাদুরের সহিত কথোপকথন করিতেছে। হরকুমার একখানি ষ্ট্যাম্পকাগজে লিখিত দলীল বাহির করিলেন ও সমবেত লোক সকলের সম্মুখে, রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হস্তে তাহা প্রদান করিয়া, বলিলেন,—"আপনার মাসী মার যে বাটী চণ্ডীচরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং পরে এই গ্রামের যদুনন্দন ঘোষের নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন, সেই বাটী বিক্রেতার ইচ্ছানুরূপ টাকা দিয়া, আপনার নামে খরিদ করা হইয়াছে। এই ষ্ট্যাম্প তাহার দলীল। দলীলের অন্যান্য সকল বিষয়ই নির্দ্দোষ হইয়াছে, কেবল এখনও ইহা রেজেষ্টরী করা হয় নাই। সে কার্য্যের এখনও অনেক সময় আছে; আপনি নিয়মিত কালের মধ্যে তাহা শেষ করিয়া লইবেন। সকলের সমক্ষে টাকা দেওয়া ও সহি করা হইয়াছে। আমার অনুরোধ, আপনি অদ্যই বাটী দখল করুন এবং তাহার মেরামত প্রভৃতি কার্য্য কল্য হইতেই আরম্ভ করুন।"

রামচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, —"আপনার নিকট কিরূপ কথায় মনের ভাব প্রকাশ করিতে হইবে, তাহা আমি জানি না। আমি এতকাল পরিশ্রম করিতেছি সত্য, কিন্তু তাহাতে পেটের ভাতই স্বচ্ছন্দরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারি না। এ পর্য্যন্ত মাথা দিবার

একটা নিজের স্থান করিয়া উঠিতে পারি নাই। আপনার কৃপায় আজি আমার আপনার বলিয়া দাঁড়াইবার একটা বাটী হইল। ভায়া চণ্ডীচরণ! তোমাকে আমি চিরদিন বড়ই ঘৃণা করিয়া আসিয়াছি। তুমি কোথায় থাক, কি কর, কখনও তাহার কোন সংবাদও লই নাই। তুমি আহার অভাবে কষ্ট পাইয়াছ, হাটের ঘরে শুইয়া কাল কাটাইয়াছ, শীতে হিমে দুঃখ ভোগ করিয়াছ, ইহা জানিয়াও আমি কখন একটা প্রতীকারের চেষ্টা করি নাই; মুখের কথা বলিয়াও একটা আপ্যায়িত করি নাই। সেই তুমি, এই নরাধমের যে উপকার করিলে তাহা বলিয়া ব্যক্ত করিবার নহে। তোমার ঋণ এ জন্মে শোধিতে পারিব না।”

চণ্ডী বলিলেন,—“দাদা, আমার দ্বারা যদি কোন উপকার পাইয়া থাক, আর সে জন্য যদি আপনাকে ঋণী বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে এখনই শোধ হইয়া গেল। তোমার যে উপকার হইয়াছে বলিতেছ, তাহাতে তো আমারই উপকার হইল। আমার আর কে আছে দাদা? তোমার দুইটা ছেলে-মেয়ে আর তোমরাই আমার এ জগতে আপনার। তোমার মেয়ের বিবাহের চিন্তা তোমারও যেমন হওয়া উচিত, আমারও তেমনই হওয়া উচিত। আর ছেলে দুইটা আমাদের অবর্ত্তমানে পথে না দাঁড়ায়, সে চিন্তা তোমারও যেমন হওয়া উচিত, আমারও তেমনই হওয়া উচিত। সুতরাং দাদা, তোমার যাহা উপকার, আমারও তাহাই উপকার। আর দাদা তুমি কখন আমার কোন খবর লও নাই বলিতেছ; তা সে দোষটা তোমার, না আমার? যে নিয়ত চুরি করিত, ছেঁড়া কাপড় খানাও সম্মুখে পাইলে যে লইয়া পলাইত, যাহার সকল ব্যবহারই নিতান্ত ছোট লোকের মত ছিল, ইতর লোকের সহিত মিশিয়া মন্দ কাজেই যে ডুবিয়া থাকিত, সারাদিন নেশা করাই যাহার ব্যবসায় ছিল, তাহার সহিত কোন আত্মীয় লোক সম্বন্ধ রাখিতে পারে কি? দোষ আমারই দাদা। তাহার পর কথাটা সত্য বলাই ভাল। দেখ দাদা তোমার কোন উপকার করিতেছি ভাবিয়া আমি কোন কাজ করি নাই। ঐ যে হরকুমার দাদা দেখিতেছ, উনি একজন সাধারণ মনুষ্য নহেন। যদি মানুষে দেবতা হওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে উনিই সেই দেবতা। উঁহারই উপকারের জন্য আমি উঁহাকে সঙ্গে লইয়া তোমার কাছে কাগজের চেষ্টায় গিয়াছিলাম; তার পর তোমার কাছে সহজে কার্য্য সিদ্ধ হইল না দেখিয়া, বউ ঠাকুরুণের নিকট হইতে তাহা হস্তগত করিয়াছিলাম। আমি ইহা ঠিক জানিতাম, যদি যথার্থ দরকারী কাগজ পাওয়া যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তুমি আশাতিরিক্ত পুরস্কার পাইবে। তবেই বুঝিয়া দেখ দাদা, আমার নিকট তোমার ঋণী থাকিবার কোনই কারণ নাই। এখন সে কথা যাউক। যে বাটী খরিদ করা হইল, তাহাতে তোমার তো কোনরূপ সংকুলান হইবে না দাদা।

রামচন্দ্র বলিলেন,—“সে বিবেচনা পরে হইবে ভাই, আপাততঃ যাহার কিছুই নাই, তাহার যাহা হইল তাহাই যথেষ্ট।”

হরকুমার বলিলেন,—“আমিও তাহা বুঝিয়াছি। বাস্তবিক ঐ ক্ষুদ্র বাটীতে রামচন্দ্র বাবুর বিশেষ কোন কাজ হইবে না। আমি মনে করিয়াছি, উঁহাতে আর দুইটী কুঠারি ও দুইখানা খড়ের ঘর যোগ না করিলে কিছুতেই সংকুলান হইবে না। তাহাতে

অনুমান হাজার টাকা ব্যয় পড়িবে। সে হাজার টাকা রামচন্দ্র বাবু আমার নিকটেই পাইবেন। এখনই লইতে ইচ্ছা করেন, লইতে পারেন।

হরকুমার বাহাদুরের জামার ভিতর দিকে দুই একটা বড় বড় পকেট থাকে। একটা পকেট হইতে দশখানি একশত টাকার নোট বাহির করিয়া সর্ব্ব-সমক্ষে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন,—"আপনি হাজার টাকা গণিয়া লউন। আরও একটা কথা এই সময়ে আপনাকে বলিয়া রাখি। যদি কাজ-কর্ম্মে কোন কারণে আপনি অশক্ত হন, অথবা উপার্জ্জন করিতে অক্ষম হন, অথবা ঈশ্বর না করুন, আপনার স্বর্গলাভ হয়, তাহা হইলে আপনি অথবা আপনার পুত্রগণ কার্য্য-ক্ষম না হওয়া পর্য্যন্ত, রাজ-সংসার হইতে মাসিক কুড়ি টাকা সাহায্য পাইবেন।"

চণ্ডীচরণ বলিল,—"রায় বাহাদুর দাদা, তোমার জয় জয়কার হউক। এত গুণ না দেখিলে, তুমি এমন দয়ার সাগর না বুঝিলে কি আমি তোমার গোলাম হইয়াছি। দাদা, অতঃপর ছেলে দুইটার সম্পূর্ণ বিলি হইল।"

আনন্দে চণ্ডীচরণের চক্ষু-জল-ভারাকুল হইল। রামচন্দ্র বলিলেন,—"এত অনুগ্রহ আমি লাভ করিব, ইহা স্বপ্নেও মনে করি নাই। এমন কার্য্যও আমি কিছু করি নাই, যাহাতে এত দয়া লাভে আমার অধিকার হয়। আমার ন্যায় অধম ব্যক্তি আপনার এতাদৃশ কৃপা-ভাজন হইবার কোনই হেতু নাই। হয় আমার পিতৃপুরুষদিগের পুণ্যে, না হয় আমার পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত কোন সুকৃতিবলে এই সৌভাগ্য উপস্থিত হইয়াছে।"

হরকুমার বলিলেন,—"আপনার নিজ পুণ্যবলে এবং বর্ত্তমান জন্মার্জ্জিত সুকৃতি-বলেই আপনি আমাদিগের বন্ধুরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। আপনি জানেন, সমস্ত সংবাদ-পত্রে রাজা উমাশঙ্করের বৃত্তান্ত ঘোষিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রকৃত জন্ম-সংক্রান্ত অনেক প্রমাণ আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু প্রকৃষ্ট ও অবি-সংবাদিত প্রমাণ আপনার নিকট যে কাগজ ছিল, তাহা হইতেই পাওয়া গিয়াছে। আপনার সেই কাগজ না পাইলে রাজার সম্পত্তি লাভে অনেক বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হইত এবং হয় তো আমাকে সে জন্য ভয়ানক কষ্ট পাইতে হইত। আপনি ঐ কাগজগুলি এত কাল যত্ন করিয়া রাখায়, কোন উপকারে লাগিতেছে না এবং কেহই সন্ধান করিতেছে না দেখি-য়াও, আপনি কাগজগুলি নষ্ট না করায় আমাদের সাতিশয় উপকার হইয়াছে। সে উপকারের তুলনায় আমরা আপনার জন্য যাহা করিতেছি, তাহা অতিশয় তুচ্ছ বলিয়া মনে হওয়া উচিত। সে যাহা হউক, আপনি এক্ষণে নূতন বাটী দেখিতে যান এবং তাহার কোথায় কি করিতে হইবে তাহার ব্যবস্থা করিয়া আসুন। বেলা প্রায় শেষ হয়।"

চণ্ডীচরণ বলিল,—"রায় বাহাদুর দাদা, তোমাকেও সঙ্গে যাইতে হইবে। তুমি দেখিয়া যে বিষয়ে যাহা করিতে বলিবে, তাহাই হইবে। তুমি দয়ার সাগর, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, আর আমাদের ভাগ্য-বিধাতা। তোমাকে ছাড়িয়া আমাদের কোন কাজই হইতে পারে না।"

হরকুমার বলিলেন,—"তবে চল, সকলেই যাই।"

সকলে প্রস্তুত হইয়া এবং সমবেত স্থানীয় লোকদিগকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন। ভবন-সংক্রান্ত ব্যবস্থা করিতে সন্ধ্যা হইয়া

গেল। সন্ধ্যার সময় হরকুমার, রামচন্দ্র ও চণ্ডীচরণ ভবকুমার চণ্ডীমণ্ডপে প্রত্যাগত হইলেন।

রাত্রির আহারের নিমিত্ত ভব অনেক আয়োজন করিয়াছে। লক্ষ্মীকান্ত ও রামচন্দ্রের গৃহিণী উভয়ে পাক করিতেছেন। একটা ক্রিয়া বাড়ীর মত ঘটা পড়িয়া গিয়াছে। বিধুমুখীর বাটীতে আহারের আয়োজন বন্ধকরা হইয়াছে। ভবর বাটী হইতে বিধুমুখীর ও বিন্দুর মার আহার্য্য প্রেরিত হইবে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে।

আহারাদির অনেক বিলম্ব আছে বুঝিয়া হরকুমার আবার বিধুমুখীর বাটীতে গমন করিলেন, সেখানে তাঁহাকে অনেক সাবধানতার পরামর্শ ও অনেক উপদেশ দিয়া তিনি ভবর বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। সকলের আহারাদি শেষ হইতে প্রায় রাত্রি এগারটা বাজিয়া গেল। সকলে শয্যা গ্রহণ করিলেন এবং নিদ্রামগ্ন হইলেন। হরকুমার ও চণ্ডীচরণ চণ্ডীমণ্ডপে শয়ন করিয়াছিলেন। চণ্ডী গুড়গুড়ার নল মুখে দিয়া ঝিমাইতে লাগিলেন হরকুমারের অসংখ্য কার্য্যভার মাথায়; সুতরাং শীঘ্র নিদ্রা আসিল না।

রাত্রি প্রায় একটার সময় সহসা নারীকণ্ঠ-নিঃসৃত আর্ত্তনাদ হরকুমারের কর্ণে প্রবেশ করিল। কে যেন সন্নিহিত কোন স্থান হইতে "বাবাগো, মাগো" শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। স্বর হরকুমারের কর্ণে প্রবেশ করিবা মাত্র তিনি ব্যস্ততা সহ উঠিয়া বসিলেন। বহুক্ষণ হরকুমার উৎকর্ণ হইয়া পুনরায় কোনরূপ শব্দ শুনিবার আশায় অপেক্ষা করিলেন। কিন্তু কোন দিক হইতে সন্দেহজনক কোন প্রকার শব্দই তাঁহার কর্ণগোচর হইল না। তাঁহার এক একবার মনে হইল যে, যে কাতর-ধ্বনি তিনি শ্রবণ করিয়াছেন, তাহা বিধুমুখীর কণ্ঠোত্থিত। আর স্থির ভাবে শয্যায় শয়ন করিয়া থাকা অবিধেয় বলিয়া তাঁহার মনে হইল। তিনি ডাকিলেন,—"চণ্ডীচরণ, চণ্ডী ভায়া।"

চণ্ডী নিদ্রাবেশে উত্তর দিল,—"আমার আফিং চুরি করিতে আসিয়াছ? এমন কাজ করিও না বাবা!—ইহাতে বিপদ ঘটিবে।"

হরকুমার বলিলেন,—"চণ্ডীভায়া, একটু সাবধান থাকিও, আমি একবার বিধুমুখীর বাটীতে যাইতেছি।"

চণ্ডীর কাণে হরকুমারের বাক্য কতক প্রবেশ করিল। সে বলিল,—"খুব সাবধান থাকিব; আফিং চোরে দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। বিধুমুখী আফিং ধরিয়াছে।"

হরকুমার আপনার প্রকাণ্ড পীচের লাঠি গাছটি হাতে লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

কিয়ৎকাল পরে চণ্ডীচরণ তামাক খাইবার আবশ্যকতা অনুভব করিল। সে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আন্দাজেই তামাক টীকার পাত্র আকর্ষণ করিতে লাগিল। তাহার নিকটেই তৈলাদিযুক্ত একটা প্রদীপ থাকে। দিয়াশলাই দ্বারা সেইটা জ্বালাইয়া তাহাতে চণ্ডীচরণ টীকা ধরাইয়া থাকে। এক্ষণে যথাস্থান হইতে দিয়াশলাই লইয়া চণ্ডী তাহার মধ্য হইতে একটা কাটি বাহির করিল এবং দিয়াশলাইয়ের বাক্সে জ্বালিতে লাগিল, কিন্তু যে দুই পার্শ্বে ঘর্ষণ করিলে কাটি জ্বলিতে পারে, তাহার দিকে ঘর্ষণ না করিয়া, চণ্ডী বার বার আশপাশে বাক্সের যে দিকে কাগজ মোড়া থাকে, সেই দিকে ঘষিতে লাগিল। কাটি জ্বলিল না। চণ্ডী সেটা ফেলিয়া দিয়া বলিল,—"ছাই কাটী সকলই ভেজা।" আবার আর একটা কাটি বাহির করিল; কিন্তু তাহার যে মুখে মশলা

দেওয়া আছে, সে দিকটা না ঘষিয়া, যে দিকটা খালি কাঠি, তাহাই বার বার বাক্সের গায়ে ঘষিল। দেশলাই জ্বলিল না। চণ্ডী বলিল,—"কেবল জুয়াচুরি, সব ফাঁকি।" সে কাঠিটা ফেলিয়া দিয়া আর একটা বাহির করিল; কিন্তু তখন নিদ্রার আবল্য নিতান্ত প্রবল; এজন্য বাক্স পর্য্যন্ত কাঠি পৌঁছিল না; সে আপনার বাম হস্তের উপর দক্ষিণ হস্তস্থিত কাঠি অতি ধীরে ও মৃদুভাবে ঘষিতে লাগিল। তখনই দারুণ নিদ্রার ঘোরে সে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল—দেশলাইয়ের কাঠি ও বাক্স তাহার হাত হইতে পড়িয়া গেল। কিয়ৎকাল নিদ্রাভিভূত থাকার পর, তাহার নাসিকা হইতে বিকট শব্দ উত্থিত হইল এবং সে নিজেই সে শব্দে চমকিয়া উঠিল। তাহার ঘুমের ঘোর কতকটা ছাড়িয়া গেল। সে তখন গড়গড়ার নল মুখে লাগাইয়া দুই চারিবার টানিতে লাগিল। কিন্তু সে অগ্নি ও তামাক শূন্য হুঁকা হইতে একটুও ধূম বহির্গত হইয়া তাহাকে বিনোদিত করিল না। তখন সে আবার তামাক সাজিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিল। এবার তাহার দেশলাই সহজেই জ্বলিয়া উঠিল এবং তৎসাহায্যে চণ্ডীচরণ প্রদীপ জ্বালিয়া লইল। তাহার পর টীকা লইয়া প্রদীপ সংলগ্ন করিল। দুই একবার চক্ষু উন্মীলিত করিল; কিন্তু আবার তাহা বুজিয়া গেল। হস্ত যথাস্থানে না থাকিয়া একটু স্থান-ভ্রষ্ট হইতে লাগিল এবং কিয়ৎকাল পরে হঠাৎ তাহার হাত জ্বলন্ত প্রদীপের উপর পড়িয়া গেল; সুতরাং হাতে ভয়ানক উত্তাপ লাগিল। চণ্ডী "উহু উহু" করিয়া বলিয়া উঠিল,—"পোড়া প্রদীপগুলাও যেন ঠিক আগুণের মত।" এবার তাহার ঘুম ভাল রকম ভাঙ্গিয়া গেল। সে তাহার পর সহজেই তামাক সাজিয়া ফেলিল। তাহার পর বিপন্ন-বান্ধব, সর্ব্ব সন্তাপনাশক, চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রদ, গড়গড়ার নল মুখে দিয়া সে ধীরে ও সন্তর্পণে টানিতে টানিতে স্বর্গ-সুখ অনুভব করিতে লাগিল।

সহসা কতকগুলি মনুষ্যের দ্রুত গমন-জনিত পদ-শব্দ চণ্ডীর কর্ণে প্রবেশ করিল। সে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"কেও? কে যায়?"

কোন উত্তর নাই। তাহার মনটা বড়ই ভীত ও সন্দেহাকুল হইয়া উঠিল। সে ডাকিতে লাগিল,—"দাদা, রায় বাহাদুর দাদা, কে আমার আফিং চুরি করিতে আসিয়াছিল। আমি যে জাগিয়া আছি, তাহা বুঝি জানে না।"

হরকুমার দাদার কোন উত্তর না পাইয়া চণ্ডীচরণ উঠিয়া বসিল। প্রদীপ জ্বলিতেছিল। ভাল করিয়া চক্ষু মেলিয়া চণ্ডী দেখিল, শয্যায় তাহার রায় বাহাদুর দাদা নাই। তখন সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং একটা হাই তুলিয়া তিনটা তুড়ি দিল।

দাঁড়াইয়া চণ্ডীচরণ একটু চিন্তা করিল। তাহার দাদা বিছানায় নাই, অনেক লোকের পদশব্দ শুনা গেল, একবার বাহিরে গিয়া দেখা উচিত বলিয়া তাহার মনে হইল। সে বাহিরে আসিল। কিন্তু কোন দিকে রায় বাহাদুর বা অন্য কোন লোক সে দেখিতে পাইল না। তখন তাহার দুইটা কথা মনে পড়িল। নিদ্রাবেশে একবার রায় বাহাদুর দাদার কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিল। তিনি একবার বিধুমুখীর নাম করিয়াছিলেন ও সাবধান থাকিতে বলিয়াছিলেন। এই কথা মনে পড়ার পর, সে একবার পার্শ্বস্থ বিধুমুখীর বাটীর দ্বার পর্য্যন্ত গমন করিয়া, হরকুমারের সন্ধান করা আবশ্যক বলিয়া স্থির করিল।

জ্যোৎস্নালোকে তখন বসুন্ধরা সমুজ্জ্ব-

সিত। ধীরে ধীরে ও সাবধানতা সহকারে, চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, চণ্ডীচরণ অগ্রসর হইল। বিধুমুখীর দ্বার-সন্নিধানে গমন করিয়া চণ্ডীচরণ যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। সে দেখিল, তাহার হরকুমার দাদা রক্তাক্ত কলেবরে অজ্ঞান অবস্থায় ভূ-শয্যায় নিপতিত। এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া চণ্ডীচরণ "দাদা গো,—তোমার এ দশা কে করিল ?" শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং সেই সংজ্ঞাহীন ভূ-পতিত রুধিরাক্ত পুরুষের চরণতলে পতিত হইল।

চণ্ডীর কাতর চীৎকার ধ্বনি ভবসুন্দরীর কর্ণগোচর হইল। সে ব্যস্ততাসহ চীৎকার শব্দ লক্ষ্য করিয়া, বিধুমুখীর বাটীর দিকে আসিল এবং এই দৃশ্য দেখিয়া নিতান্ত অভিভূত হইল। তখন ভব, চুপ করিয়া রোদন করা অবৈধ বোধে, বাটী হইতে লণ্ঠন লইয়া রামচন্দ্রকে ডাকিয়া আনিল। রামচন্দ্র ও ভব লণ্ঠন লইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। বিধুমুখীর ঘরের দরজা খোলা; জিনিষ-পত্র সকলই যথাস্থানে পতিত আছে; কিছুই স্থান-ভ্রষ্ট বা অপহৃত হয় নাই; কিন্তু বিধুমুখী কোথাও নাই। ঘরে বা অঙ্গনে কোথায়ও সে সুন্দরীকে দেখিতে পাওয়া গেল না। দূরে, অঙ্গনের পার্শ্বে একটা চাঁপা গাছ-তলায় বিন্দুর মার অচৈতন্য দেহ দেখিতে পাওয়া গেল। তাহার হাত পা বাঁধা এবং তাহার মুখ-গহ্বরে অনেক কাপড় প্রবিষ্ট। সেও মৃতকল্প। তাহার বন্ধন মোচন করা হইল।

হরকুমারের সংজ্ঞাশূন্য দেহ সন্তর্পণে সকলে বহন করিয়া ভবর চণ্ডীমণ্ডপে আনয়ন করিল। তৎক্ষণাৎ ভব পল্লীবাসী অনেক লোক ডাকিয়া জমা করিল। সকলে স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে হরকুমারের শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইল। সেই গভীর রাত্রিতে ভবসুন্দরী সমস্ত ব্যাপার জানাইবার জন্য, রাজা উমা-শঙ্করের নিকট একজন বিশ্বস্ত লোক প্রেরণ করিল।

তৃতীয় খণ্ড—দেবলোক।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রমালা।

বীরভূম জেলা বঙ্গদেশের শেষ গৌরবস্থল। এই প্রদেশের নরপতিগণ বহুকালাবধি মুসলমানগণের সহিত যুদ্ধ ও বিসংবাদ করিয়া আপনাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন এবং লাক্ষ্মণেয় সেন কর্ত্তৃক হিন্দুরাজ-সিংহাসন যবনদিগের হস্তে নির্ব্বিবাদে সমর্পিত হইলেও বীরভূমের নরপতিগণ বহুকালাবধি আপনাদিগকে মুসলমানদিগের অধীন বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের স্বাধীনতা সংরক্ষণার্থ অশেষ প্রযত্ন ও অধ্যবসায় ইতিহাসের অতি সমাদৃত প্রসঙ্গ। এই জেলার রাজনগর, সংক্ষেপতঃ নগর, হিন্দু-স্বাধীনতার শেষ লীলাস্থল। এখন সে নগরের অস্তিত্ব নাই। চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত ও বহুদূর পর্য্যন্ত সমাকীর্ণ ইষ্টক ও প্রস্তর-রাশি সেই অতীত গৌরব-স্থলের নিদর্শন স্বরূপে নিপতিত রহিয়াছে।

এই জেলার নাম বীরভূমি ও ইহার বর্ত্তমান প্রধান নগরের নাম শুরি; ইত্যাকার অনেক নাম, এই স্থানে যে এক সময়ে বিক্রমশালী মহাপুরুষগণের নিবাসস্থল ছিল, তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

বীরভূম অন্যান্য নানা কারণেও আদরণীয় স্থান। ইহার পশ্চিম ও উত্তরাংশ অতি রমণীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য সমূহের নিকেতন। কোথায় শোভাময় তরুলতা সমাচ্ছন্ন অপূর্ব্ব গিরিমালা, কোথায় শাল, পলাশ প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষরাজি পরিবৃত ঘনারণ্য, কোথায় সঙ্কীর্ণ কলেবরা খরস্রোতা, স্বল্পতোয়া, স্বচ্ছসলিলা নির্ঝরিণী ইত্যাদি নৈসর্গিক শোভায় এই প্রদেশ অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। উন্নতাবনতা ভূমি, রক্তাভ মৃত্তিকাকীর্ণ ভূতল ও স্থানে স্থানে সুদূরব্যাপী সুশ্যামল ক্ষেত্র এই প্রদেশের পরম রমণীয়তা সংবিধান করিয়াছে।

বিজ্ঞানবিৎ বা বিজ্ঞানতত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের পক্ষেও এ প্রদেশ অশেষ উপযোগী উপকরণের ভাণ্ডার। এখানে ভূপৃষ্ঠ বিদার করিয়া যে সকল রমণীয় নৈসর্গিক উৎস সমুত্থিত হইয়াছে, তত্তাবতের অপূর্ব্ব রমণীয়তার প্রসঙ্গ বিচার্য্যরূপে গ্রহণ না করিলেও, জ্ঞানার্থীর পক্ষে তৎসমস্ত যে অপরিসীম আলোচনা ও বিচারের বিষয়ীভূত তাহার আর সন্দেহ নাই। এই প্রদেশে নানাবিধ জীবের পঞ্জর, কাষ্ঠ ও অন্যান্য সামগ্রীর পাষাণাকারে রূপান্তর প্রাপ্তির ভূরি ভূরি নিদর্শন নিয়ত পরিদৃষ্ট হয়। সেই সকল রূপান্তর নিদর্শন নিরতিশয় কৌতুকাবহ ও অনেক শিক্ষার সহায়। এ প্রদেশের কোন কোন গিরির গঠন ও উপাদান বিষয়ে অনেক অসাধারণত্ববিশিষ্ট; সুতরাং আলোচনার বিষয়ীভূত। এখানকার ভূগর্ভও ভূতত্ত্ববিদ্‌মনীষিগণের সমক্ষে বিবিধ আলোচ্য বিষয় সমুপস্থিত করিয়াছে। সৃষ্টির অনেক পারম্পর্য্য এখান হইতে সুন্দররূপে মীমাংসিত হইবার প্রকৃষ্ট অবসর আছে। কোন কোন বৈজ্ঞানিক মীমাংসা করিয়াছেন, একদা হিমালয়ের শিখরে সমুদ্র বিস্তৃত ছিল; বহুবিধ নৈসর্গিক ব্যাপার সংঘটিত হওয়ার পর ভারতের এই রূপান্তর হইয়াছে। সে সকল গুরুতত্ত্বের অবতারণা করা, আমাদের উদ্দেশ্য নহে; বিজ্ঞানপ্রিয় পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন, যাঁহারা তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ তাঁহাদিগকে এই সকল মনোহর প্রসঙ্গ অধ্যয়ন ও আলোচনা করিতে পরামর্শ প্রদান করি। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বলেন, সে দিনও বীরভূমের শুষ্ক ভূভাগ ও উন্নত শৈলসমূহ সমুদ্রজলে আচ্ছন্ন ছিল এবং যেখানে অধুনা মানবকুল পরম সুখে বাস করিতেছে, তরক্ষু ও গজসমূহ বিচরণ করিতেছে, দেবালয় ও তীর্থক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তথায় মকর ও তিমিঙ্গিল ক্রীড়া করিত এবং সাগরের বারিরাশি তাহার উপর লহরীলীলা বিস্তার করিত। কিন্তু সে সকল বিজ্ঞানের কথা—উপন্যাসে তাহার স্থান হইতে পারে না।

যাঁহার কোমলাকান্ত-পদাবলীর সুমধুর বিন্যাসে শ্রোতৃবৃন্দের মনপ্রাণ আনন্দে নৃত্য করিতেছে, যাঁহার অলৌকিক প্রেমলীলার সুপবিত্র সঙ্গীতধ্বনি বসুন্ধরাকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছে, যাঁহার কমনীয় কবিত্বের অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাসে ভারতভূমি গৌরবান্বিত হইয়া রহিয়াছে, কবিকুলের পিকস্বরূপ সেই জয়দেব কবি এই প্রদেশেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার চরণাঙ্কিত কেন্দুবিল্ব পরম তীর্থরূপে পরিগণিত রহিয়াছে।

ইতিহাস, বিজ্ঞান ও কবিত্বের কথা ছাড়িয়া দিলেও বীরভূমের প্রা ন্ত সম্বন্ধে অন্ত বিশিষ্ট কারণ আছে। বীরভূম সাধনার ক্ষেত্র ও সাধকের প্রিয় স্থান। এই প্রদেশের বহু স্থানে এখনও শাস্ত্রার্থবিৎ ও ক্রিয়াশীল তান্ত্রিক এবং হঠযোগীর অবস্থান দৃষ্ট হয়। পুরাকালে যে এখানে নানা স্থানে যোগসিদ্ধ মহাপুরুষগণের আসন ও আশ্রম ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। যাঁহারা যোগশাস্ত্রের ও কর্ম্মমার্গের অনুরাগী তাঁহারা এ প্রদেশের ভাব ও প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়াই অনুমান করিতে পারেন যে, এক সময়ে এই স্থান সাধনা ও সিদ্ধির সর্ব্বথা অনুকূল ও উপযোগী ক্ষেত্র ছিল। অধুনা এস্থানের পূর্ব্ব মাহাত্ম্য অপচিত হইয়াছে, কালসহকারে ভূমির নৈসর্গিক শক্তি অপগত হইয়াছে সন্দেহ নাই; তথাপি এ প্রদেশ বঙ্গদেশের মধ্যে যোগার্থীর যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রম্য নিকেতন তাহার কোন সন্দেহ নাই। যোগশাস্ত্রের পরম গুরু মহর্ষি অষ্টাবক্র এই স্থানেই সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন এবং তাঁহার সেই কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গরূপী মহেশ্বর বক্রেশ্বর নাম ধারণ করিয়া অদ্যাপি বিবিধ বিধানে পূজিত হইতেছেন। সেই অলৌকিক শক্তিশালী মহাপুরুষের তিরোধানের পর, তাঁহার সাধনাস্থলে একাল পর্য্যন্ত বহু সিদ্ধ ও সাধক তপশ্চর্য্যা ও যোগানুষ্ঠান করিয়াছেন এবং এখনও বহু পুণ্যবান্ মহাপুরুষের সমাগমে সেই পুণ্যক্ষেত্রের তেজঃপুঞ্জ ভূতল পবিত্রীকৃত হইতেছে। এই জেলার অনেক স্থানে অনেক সাধু পুরুষের সাধনাক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং এখনও অনেক মহাত্মা স্থান বিশেষে প্রচ্ছন্নভাবে স্বকার্য্য সাধনে রত থাকিয়া কালযাপন করিতেছেন।

ঐতিহাসিক রহস্যের এই লীলাক্ষেত্রে, প্রকৃতির এই রম্য-নিকেতনে চন্দ্রমালা নামে এক সমৃদ্ধিশালী নগর আছে। সেই জনপদে অতি পূর্ব্বকালাবধি প্রবল প্রতাপান্বিত এক ভূস্বামীবংশ বাস করিয়া আসিতেছেন। এক সময়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ প্রতাপের সহিত স্বাধীন নরপতির ন্যায় রাজকার্য্য পরিচালন করিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু একণে তাঁহাদের সে ক্ষমতা ও প্রতাপ বিলুপ্ত হইয়াছে। স্বাধীনভাবে রাজদণ্ড পরিচালন করিবার অধিকার তাঁহাদের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহাদের সম্পত্তি ও সমৃদ্ধির বিশেষ অপচয় হয় নাই। এখনও তাঁহাদের ভবনের চতুর্দ্দিকে গড় আছে; এখনও তাঁহাদের সৈন্য ও সেনাপতি আছে; এখনও তাঁহাদের কামান ও বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র আছে; এখনও তাঁহাদের হস্তিশালায় বহুসংখ্যক হস্তী আছে; মন্দুরায় নানাবর্ণের অশ্ব আছে; এখনও তাঁহাদের কাছারি বাটী কর্ম্মচারী, বিচারক ও বিচারার্থীর সমাগমে জনাকীর্ণ; এখনও তাঁহাদের ধনাগার অবিরত রজত ও কাঞ্চনধ্বনিতে শব্দিত; এখনও তাঁহাদের অতিথিশালা বিবিধ দেশাগত ব্যক্তিবৃন্দে পরিপূর্ণ; এখনও তাঁহাদের প্রাসাদ নবীনতার আবরণে পরিশোভিত; এখনও সেই রাজবংশ প্রদেশ মধ্যে সর্ব্বপ্রকারে শীর্ষস্থানীয়।

এই রাজগণ ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত এবং ইহাদের আদিম ইতিহাস পৌরাণিক ইতিবৃত্তের সহিত বিজড়িত। এই সিংহাসনে যে সকল মহাপুরুষ একাল পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা তাবতেই ধর্ম্মপরায়ণতা ও বীরত্বের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ। তাঁহাদের অনেকেরই নাম দেবতার ন্যায় সমাদরে উক্ত ও স্মৃত হইয়া থাকে এবং এতদ্দেশের প্রাকৃতপুঞ্জ এখনও

সমবেত হইয়া এই রাজবংশাগত অনেক মহাপুরুষের কীর্ত্তিকাহিনী রামায়ণ মহাভারতাদিতে বর্ণিত বিবরণের ন্যায় ভক্তি ও প্রীতিসহকারে আলোচনা করিয়া থাকে। এ সকল বৃত্ত তাহাদের পক্ষে চিরনবীন ও পরম সমাদৃত এবং তাহার আলোচনা ও পরিচিন্তন তাহাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের সাধন বলিয়া সকলে বিশ্বাস করে।

ফলতঃ চন্দ্রমালার রাজবংশের মহাপুরুষগণ দেবপ্রভাব সম্পন্ন এবং দৈববলে বলয়ীন ইহাই সর্ব্বসাধারণের অবিচলিত ধারণা। এতদ্বংশীয় স্বর্গগত মহাত্মগণের জীবন-বৃত্তান্ত-সংক্রান্ত ও অতীত ইতিহাসের আলোচনা করিলে অনেক বিস্ময়জনক অমানুষী শৌর্য্য ও বীর্য্যের বিবরণ শ্রবণ করিয়া পুলকিত হইতে হয় এবং অনেক কঠোর ধর্ম্মনিষ্ঠা, অলৌকিক ত্যাগস্বীকার ও বিষম হৃদয়বলের পরিচয় শ্রবণে ভক্তি ও প্রেমার্দ্র হৃদয়ে তাঁহাদের চরণোদ্দেশে প্রণাম করিবার নিমিত্ত মনের বাসনা জন্মে।

বিগত অর্দ্ধশতাব্দীকাল এই রাজসিংহাসন এক পিতৃমাতৃহীনা মহীয়সী মহিলা কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে এরূপ ঘটনা আর কখন সংঘটিত হয় নাই। এই মহিলার নাম করুণাময়ী। করুণাময়ীর পিতা একমাত্র তনয়া রাখিয়া জীবলীলা সংবরণ করেন; অগত্যা সেই নন্দিনীকেই পিতৃপরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইতে হইয়াছে। কন্যা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেই জননী সূতিকাগারেই জীবলীলা সংবরণ করেন। যখন স্বর্গীয় মহারাজা স্বর্গারোহণ করেন, তখন করুণাময়ীর বয়স প্রায় ত্রয়োদশ বর্ষ। পঞ্চদশ বর্ষের ন্যূন বয়স্কা কন্যাকে উদ্বাহবন্ধনে বদ্ধ করা এ রাজবংশের নিয়ম ছিল না; এ কন্যা পিতার পরলোক প্রাপ্তির সময়ে অনূঢ়া ছিলেন। করুণাময়ীর শিক্ষা ও চরিত্রবল সেই অল্প বয়সেই অতুলনীয় হইয়াছিল এবং যে মহদ্বংশে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহার হৃদয় ও মন, শিক্ষা ও ব্যবহার, অনুষ্ঠান ও আচার সর্ব্বথা তাহার অনুরূপ হইয়াছিল। এক সংসারবিরাগী, সর্ব্বত্যাগী পূর্ণ প্রজ্ঞ মহাপুরুষ করুণাময়ীর শিক্ষক ছিলেন। সেই সুধী মহাত্মার কৃপায় করুণাময়ী আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্র প্রকৃষ্টরূপে আলোচনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, এবং অসাধারণ প্রতিভাসাহায্যে শাস্ত্রোপদেশলব্ধ উপদেশসমূহ হৃদ্গত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রাজকুমারীর রূপ অলোকসামান্য ছিল। অলৌকিক দেবকান্তি তাঁহার দেহ আচ্ছন্ন করিয়াছিল এবং তাঁহাকে দর্শন করিলে সহসা দেবী বলিয়াই মনে হইত। নিতান্ত কলুষিত-স্বভাব হীনচরিত্র পুরুষও তাঁহার অপরূপ শ্রী সন্দর্শন করিলে ঘৃণিত মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করিত এবং ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি ও ভোগবাসনা পরিহার করিয়া অন্তর হইতে আন্তরিক ভক্তি-সহকারে তাঁহাকে প্রণাম করিত। করুণাময়ীর জনক কন্যাকে শাপভ্রষ্টা দেবকুমারী বলিয়াই জ্ঞান করিতেন।

যথাকালে কন্যার বিবাহ দিবার অভিপ্রায়ে স্বর্গীয় মহারাজা পূর্ব্ব হইতেই পাত্র অনুসন্ধান করিতেছিলেন এবং অনেক আয়াসে এক সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত যুবককে রাজবাটীতে আনয়ন করিয়া ভাবী জামাতারূপে প্রতিপালন করি[illegible]তেছিলেন। পাত্র ও পাত্রীর পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ বা কথোপকথনের কোনই সুযোগ হইত না; উভয়েই আপন আপন শিক্ষা ও সদনুষ্ঠান লইয়াই ব্যাপৃত থাকিতেন। পাত্রের নাম দেবরাজ। কেবল রাজসংসারে

শ্রয় লাভ করিয়া পুত্রাধিক যত্নে ও সমাদরে তিপালিত হইতেছেন, তাহা দেবরাজ ানিতেন না। তিনি অন্ন-বস্ত্রবিহীন পিতৃ-াতৃহীন দুঃখী বালক। মনে করিতেন াহাকে নিরতিশয় দুরবস্থাপন্ন দেখিয়াই করু-র্দ্র হৃদয় মহারাজা কৃপাপরতন্ত্র হইয়া আশ্রয় অন্নদান করিতেছেন।

অতি অল্পকাল মধ্যেই দেবরাজ সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। সর্ব্বজ্ঞ গুরু, ষ্যের হৃদয়াকর্ষণ অনুধাবন করিয়া, হঠ-যাগাদির ক্রিয়াসমূহে তাঁহাকে দীক্ষিত করিতে াগিলেন। কালক্রমে যুবক দেবরাজ যোগের কজন অবিচলিত সাধক হইয়া উঠিলেন।

দেবরাজ, মহারাজার উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় ম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাকিলেও, করুণাময়ী পিতার হৃদয়ভাব বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন। করুণাময়ীকে কখন দর্শন করার সুযোগ দেবরাজের সমক্ষে উপস্থিত না হইলেও বহু সময়েই দূর হইতে প্রচ্ছন্ন স্থানে থাকিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে পাইতেন। সেই পরম রমণীয় রূপ ও অশেষ বিদ্যাসম্পন্ন পিতৃনির্ব্বা-চিত পাত্রের চরণে আত্মসমর্পণ করা ভাগ্যের কথা বলিয়াই করুণাময়ী জ্ঞান করিতেন এবং যখনই যেস্থান হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাই-তেন, তখনই তাঁহাকে পতিদেবতা জ্ঞানে তিনি প্রণাম করিতেন। আর বর্ষদ্বয় পরে ঐ চরণের দাসী হইয়া তিনি নারীজন্ম সফল করিবেন বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, এবং আপনাকে সর্ব্বপ্রকারে তাহার উপযোগিনী করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেন। শিষ্যার ভাবী পরিণাম-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ-গুরুদেব এই সময়ে গিরি-গুহায় স্বকীয় আশ্রমে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপ সময়ে মহারাজের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়া আসিল এবং তিনি অখণ্ডনীয় শাসনের অধীন হইয়া দেহত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। দেবরাজ সেই পিতৃতুল্য স্নেহপরায়ণ, দেবতুল্য শক্তিসম্পন্ন, মহাপুরুষের বিগতজীবদেহ, অন্যান্য অনুচরের সহিত বহন করিয়া, পুণ্য-তীর্থে আনয়ন করিলেন এবং যথাবিধি সৎকা-রাদি সমাপ্ত করিলেন। তাঁহার আনুষঙ্গিক ব্যক্তিগণ তাবতেই রাজবাটীতে প্রত্যাগত হইল; কিন্তু দেবরাজকে কেহই দেখিতে পাইল না। সেই মহাপুরুষের পুণ্যপ্রদীপ্ত রাজকলেবর অগুরুকাষ্ঠ ও ঘৃতাদিসহ ভস্মী-ভূত হইল; কিন্তু তদেকাশ্রিত অনুগত ও ভক্তবৎসল দেবরাজকে কেহই দেখিল না। নানা জনে নানাপ্রকার কল্পনা করিতে লাগিল। অনেকে মনে করিল, সেই একান্ত রাজভক্ত শোকোন্মত্ত যুবা হয় ত আত্মহত্যা করিয়াছেন, কেহ বা মনে করিল, তিনি জ্ঞানী, সংসারে বাস করা তাঁহার পক্ষে কখনই সম্ভবপর হইত না; কেবল রাজার স্নেহ-শৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন করিতে অক্ষমতা হেতু তিনি সংসার-কারায় আবদ্ধ ছিলেন; এক্ষণে সে শৃঙ্খল ছিন্ন হই-য়াছে; দেবরাজও পলায়ন করিয়াছেন। কেহ মনে করিল, যে স্থানে পুত্রের ন্যায় তিনি লালিত পালিত হইয়াছেন, অতঃপর সেই স্থানে তাঁহাকে যুবতী রাজনন্দিনীর ও সম্ভবতঃ তাঁহার ভাবী পতির অধীনতায় জীবন যাপন করা বাঞ্ছনীয় মনে না হওয়ায় তিনি সমুচিত সময়ে প্রস্থান করিয়াছেন। ইত্যাকার নানাবিধ কল্পনা নানা স্থানে নানা ভঙ্গীতে উপস্থিত হইতে লাগিল। দেবরাজের কোন বিরোধী বা প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না; রাজবাটীতে বা অন্যস্থানেও কুত্রাপি তাঁহার কোন শত্রু ছিল না। তাবতেই তাঁহার অলৌকিক রূপ ও অসাধারণ গুণগ্রামের পক্ষপাতী ছিল;

সুতরাং তাঁহার একপ্রকার অচিন্তিতপূর্ব্ব তিরোধানে সকলেই নিরতিশয় দুঃখিত হইল। দেবরাজ কাহাকেও কোন কথা বলেন নাই; কোন লোকের নিকটেই স্বকীয় অভিসন্ধি পরিব্যক্ত করেন নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

করুণাময়ী।

যথাসময়ে স্বর্গগত মহারাজার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াকলাপ যথানিয়মে সুসম্পন্ন হইল। করুণাময়ী পিতৃপরিত্যক্ত বিষয় সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেন এবং পুরুষের ন্যায় স্বাধীনভাবে বৈষয়িক ক্রিয়াকাণ্ড নির্ব্বাহিত করিতে থাকিলেন। দেবরাজের কোনই সন্ধান হইল না। বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইতে লাগিল; কিন্তু দেবরাজের কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না। করুণাময়ী স্বতঃপরতঃ নানাস্থানে দেবরাজের সন্ধান করিলেন; কিন্তু কোনই ফল হইল না।

মন্ত্রিগণ, আত্মীয়গণ ও উচ্চশ্রেণীর কর্ম্মচারিগণ করুণাময়ীকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলেন; নানাস্থানে নানা সৎপাত্রের অনুসন্ধান করিলেন; নানারূপ যুক্তি ও প্রলোভন প্রদর্শন করিলেন; কিন্তু করুণাময়ী কোন বাক্যেই কর্ণপাত করিলেন না। যখন আত্মীয়স্বজন ও রাজকুটুম্বগণ তাঁহাকে বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইবার নিমিত্ত জ্বালাতন করিতে লাগিলেন, যখন তাঁহাদের মনোরঞ্জনার্থ হৃদয়গত অভিপ্রায় ব্যক্ত না করিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইল, তখন তিনি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন যে, লৌকিক বিবাহ না হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার ধর্ম্মসঙ্গত বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পিতা তাঁহার নিমিত্ত যে পাত্র নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন, যাঁহাকে জামাতা জ্ঞান করিয়া তিনি নিজালয়ে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, যাঁহাকে করুণাময়ী পতিজ্ঞানে দর্শন করিয়াছেন, যাঁহার চরণচিন্তা করুণাময়ী কর্ত্তব্য বলিয়া অবলম্বন করিয়াছেন, লোকতঃ তাঁহার সহিত বিবাহ না হইলেও ধর্ম্মতঃ করুণাময়ীর তাঁহারই সহিত বিবাহ হইয়াছে। যদি তিনি দয়া করিয়া কখন করুণাময়ীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে সম্মত হন, তাহা হইলে তিনি অণুমাত্র আপত্তি না করিয়া তাঁহারই শ্রীচরণে বিক্রীত হইবেন। যদি তাঁহাকে না পাওয়া যায় বা তিনি বিবাহে অসম্মত হন, তাহা হইলে করুণাময়ীকে সন্তুষ্ট মনে এই অবস্থায় জীবনযাপন করিতে হইবে।

তাঁহার এই কঠোর সংকল্প শ্রবণ করার পর আত্মীয়গণকে অগত্যা নিরস্ত হইতে হইল। তখন তাঁহারা আর একবার নবীভূত যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে দেবরাজের অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় এবারও আত্মীয়গণের সর্ব্বপ্রকার প্রযত্ন নিষ্ফল হইল। দেবরাজের কোনই সন্ধান হইল না। বহু অর্থ ব্যয়িত হইল, হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত নানা স্থানে বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ বিচরণ করিল, সকলেই হতাশ হইয়া গৃহাগত হইল; দেবরাজের কোনই সন্ধান হইল না।

দেবরাজের সন্ধান না পাইলেও, করুণাময়ীর হৃদয় একটুও অবসন্ন বা বিচলিত হইল না। তিনি আন্তরিক অনুরাগ ও প্রসন্নতার সহিত স্বকীয় বিষয়-কর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ

করিতে লাগিলেন। প্রতিদিন নিয়মিতরূপে শাস্ত্রচর্চ্চা ও অভ্যস্ত অনুষ্ঠানসমূহ সম্পাদন করিয়া অবশিষ্টকাল বৈষয়িক শ্রীবৃদ্ধিসাধনে ব্যয়িত করিতে থাকিলেন। আহার ও ভোগবিলাসে তাঁহার কোনই আসক্তি ছিল না। দেহধারণার্থ যে যৎসামান্ত আহারের প্রয়োজন, তদতিরিক্ত কোন বস্তু ইচ্ছায় বা কাহারও অনুরোধে তিনি ভোজন করিতেন না। প্রকৃষ্টরূপে লজ্জানিবারণ ও শালীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত যেরূপ পরিচ্ছদের প্রয়োজন, তিনি তদ্ব্যতীত কোন অতিরিক্ত বস্ত্রালঙ্কার দেহে ধারণ করিতেন না। কাহারও অনুরোধে বা স্বকীয় বাসনার প্রাবল্যে তিনি কখনই বিলাসিতায় প্রমত্ত হইতেন না। অনেক সময় তাঁহাকে বিষয়কর্ম্মানুরোধে পুরুষের সমক্ষে প্রকাশ্যরূপে উপস্থিত হইতে হইত; কখন কখন তাদৃশ ব্যক্তিবৃন্দের সহিত বাদানুবাদ করিতে হইত; কখন কখন তিনি পূর্ণাঙ্গা যুবতী হইলেও, যুবাপুরুষ ও সম্মানিত ব্যক্তিগণকে তাঁহার নানা বিষয়ে নানা প্রকার আদেশ করিতে হইত। এ সকল ক্ষেত্রেই তাঁহার ব্যবহার, দৃষ্টি, ভাষা ও ভঙ্গী ভাবুকের বিস্ময় উৎপাদন করিত এবং কাহারও হৃদয়ে কোন প্রকার কলুষিত চিন্তার আবির্ভাব হওয়া দূরে থাকুক, সকলেই জননী জ্ঞানে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে অবনত মস্তকে তাঁহার আদেশ শ্রবণ ও পালন করিত। তাঁহার বিপুল ভূসম্পত্তির প্রজাগণ, তাঁহাকে আবশ্যক হইলেই দেখিতে পাইত এবং নর ও নারী, বালক ও বৃদ্ধ স্ব স্ব আবেদন ও অভিযোগ তাঁহার সমক্ষে নিবেদন করিবার সুযোগ পাইত, প্রত্যেকের বিবাদ ও অভিযোগ সঙ্গে সঙ্গে মীমাংসিত হইত এবং প্রত্যেকের অভাব করুণাময়ীর সুব্যবস্থায় সম্ভবমত পরিপূরিত হইত। করুণাময়ীর অধীন প্রজাগণ, কর্ম্মচারিগণ এবং আশ্রিত ও অনুগত ব্যক্তিগণ সর্ব্ব প্রকারে সুখী ও নিরুপদ্রব ছিল। সকলেরই জীবনযাত্রা নির্ব্বিবাদে নির্ব্বাহিত হইত।

করুণাময়ীর পিতৃপুরুষগণ কর্ত্তৃক বিশাল ভূসম্পত্তির নানা স্থানে নানা প্রকার সাধারণ-হিতকর ও ধর্ম্মসঙ্গত হিতানুষ্ঠান ছিল। বহুস্থানে বহু দেবালয়, বিস্তর অতিথিশালা, পান্থনিবাস, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, ধর্ম্মভবন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত ছিল। করুণাময়ী তত্তাবতের সংখ্যা বহুল পরিমাণে বৰ্দ্ধিত করিলেন এবং সেই সমস্ত শুভানুষ্ঠানের কার্য্য-প্রণালী সময়ে সময়ে স্বয়ং সন্দর্শন ও পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিশাল সম্পত্তির দূরতম স্থানেও তিনি সময়ে সময়ে স্বয়ং উপস্থিত হইতেন এবং যথাসাধ্য লোকের দুঃখ ও অভাব দূর করিবার চেষ্টা করিতেন। যে স্থানে বিপদ ও নির্য্যাতন, ক্লেশ ও উৎপীড়ন, সেইখানে করুণাময়ী আহূত না হইয়াও স্বয়ং উপস্থিত হইতেন, প্রজাগণ তাঁহাকে দেবতা বলিয়াই জ্ঞান করিত; সকলেই জানিত তিনি আদ্যাশক্তি ভগবতী —কোন উদ্দেশ্য-সাধনের অভিপ্রায়েই ভূতলে অবতীর্ণা। লোকেরা তাঁহাকে মহারাণী বা তাদৃশ কোন নামে ডাকিত না। সকলেই তাঁহাকে "মা করুণাময়ী" বলিয়া সম্বোধন করিত। পিতা ও পুত্র, স্ত্রী ও স্বামী, মা ও মেয়ে সকলেই তাঁহাকে "মা করুণাময়ী" নামে ডাকিয়া পরিতৃপ্তি অনুভব করিত এবং যেখানে তাঁহার উল্লেখ করিবার আবশ্যকতা উপস্থিত হইত, সেখানেই তাহারা তাঁহাকে "মা করুণাময়ী" বলিয়াই উল্লেখ করিত। ভগবান্ মহাদেব যেমন

সকলেরই "বাবা", ভগবতী যেমন সকলেরই "মা", করুণাময়ীও সেইরূপ সকলেরই "মা"।

রাজ-সংসারে করুণাময়ীর একমাত্র পরিচারিকা ছিল। রাজ-বাটীর অগণ্য দাস দাসী সকলেই স্ব স্ব নিয়মিত কর্ম্মসম্পাদন করিত; করুণাময়ী স্বকীয় কার্য্যাদি প্রায় সমস্তই স্বয়ং স্বহস্তে সম্পন্ন করিতেন। দাসদাসীর সাহায্য তাঁহার কখনই আবশ্যক হইত না। যদি কখন দৈবাৎ কোন কর্ম্মের জন্য কিঞ্চিন্মাত্র সহায়তার প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে উক্ত পরিচারিকা তাহা সম্পাদন করিত। করুণাময়ী সেই বিশাল পুরীর মধ্যে একাকিনী বাস করিতেন। তাঁহার দেবচরিত্রে কখনই কোন কলঙ্ক প্রসঙ্গ কেহই শ্রবণ করে নাই বা তৎসম্বন্ধে কোনই সন্দেহ কখনও কাহারও মনে সমুদিত হয় নাই।

দশ বৎসর এই রূপে অতিবাহিত হইয়া গেল। দেবরাজের কোনই সন্ধান হইল না এবং করুণাময়ীও বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হইলেন না। অনূঢ়া করুণাময়ী আপনাকে বিবাহিতা বলিয়াই বোধ করিতেন এবং সধবা নারীর লক্ষণাদি ধারণ ও তদনুরূপ নিয়মাদি পালন করিতেন।

করুণাময়ী একবার স্বয়ং দেবরাজের সন্ধানে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে কোন সঙ্গী রহিল না। তিন মাস পরে তিনি গৃহাগতা হইলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ও তৎসিদ্ধি সম্বন্ধে লোকে কোন সংবাদই জানিত না; সুতরাং কেহই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে তদ্বিষয়ক কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিল না। তিনমাস পরে তিনি পুনরায় গৃহত্যাগ করিলেন এবং দুই মাস পরে প্রত্যাগমন করিলেন। পুনঃ পুনঃ নানা সময়েই তিনি নানা-কারণে আপনার বিশাল সম্পত্তির নানা স্থানে পর্য্যটন করিতেন; সুতরাং তাঁহার যাতয়াত সম্বন্ধে লোকের কোন কৌতূহল জন্মিবার কারণ ছিল না। কখন কখন এক সঙ্গে পাঁচ ছয় মাস কাল তিনি স্বকীয় প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে গমন করিতেন। তিনি কখন কোথায় যান ও কি করেন তাঁহার অধীনস্থ ও অনুগত ব্যক্তিগণ তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারিত না এবং তৎসম্বন্ধে কোনরূপ সন্দিহান হইয়া তাঁহার গমনাগমনের স্থান বা কারণ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইত না।

দশ বৎসর নিরন্তর পরিশ্রম করিয়া করুণাময়ী বিষয়-কর্ম্ম সম্বন্ধে যে প্রণালী গঠিত করিয়াছিলেন, হিতকর অনুষ্ঠান সমূহ সুরক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এবং সর্ব্ব বিষয় প্রকৃষ্টরূপে পরিচালিত করিবার নিমিত্ত যে শৃঙ্খলবিধান করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অনুপস্থিতি হেতু তত্তাবৎ সুনির্ব্বাহিত হইবার পক্ষে কোনই ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না।

এইরূপে করুণাময়ীর জীবনের পঞ্চাশৎ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তাঁহাকে দর্শন করিলে কখনই তাঁহার বয়স বিংশবর্ষাপেক্ষা অধিক বলিয়া কেহই অনুমান করিত না এবং যদি কেহ তাঁহার বয়সের আধিক্য সমর্থন করিত, তাহা হইলে দর্শক সমর্থকের উক্তি ভ্রম-প্রমাদ-পরিপূর্ণ অবিশ্বাস্য বলিয়াই বোধ করিত। কোন কোন স্থানে এতদুপলক্ষে বিবাদ বিসংবাদেরও উদ্ভব হইত। কেহ করুণাময়ীর বয়স ত্রিশ বৎসর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিল। একজন নবীন দর্শক এ কথা তাহার প্রতি বিদ্রূপ বিবেচনা করিয়া প্রথমোক্ত ব্যক্তির প্রতি তীব্র কটূক্তি প্রয়োগ করিয়াছিল। ক্রমে সেই

বাগ্‌বিতণ্ডা বিষমবিবাদে পরিণত হইয়া উঠিয়াছিল। আশ্চর্য্য সংযম ও নিয়মাধীনতা হেতু এই অলৌকিক চরিত্রবলসম্পন্না ও অমানুষী শক্তিশালিনী নারীর দৈহিক অপার্থিব শোভা, ও যৌবনের পরিপূর্ণতা বয়ঃপ্রভাবে বিন্দুমাত্র অপরিচিত হয় নাই। বরং বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার কলেবর অধিকতর জ্যোতিষ্মান ও সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কালের অখণ্ডনীয় নিয়ম এই দেবপ্রকৃতিসম্পন্না মহিলার নিকট পরাভূত হইয়াছে এবং লজ্জায় সে স্থান ত্যাগ করিয়া যেন চিরদিনের নিমিত্ত চরিত্রহীন নরনারীগণের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জীবনকৃষ্ণ।

বৈশাখমাস; মধ্যাহ্নকালে চন্দ্রমালার রাজপ্রাসাদের এক সজ্জিত প্রকোষ্ঠে বসিয়া মহারাণী করুণাময়ী একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক পাঠ করিতেছেন। তাঁহার ললাটে স্থূল সিন্দূররেখা, হস্তে স্বর্ণ বলয়, পরিধান স্থূল লালপেড়ে তসর কাপড় এবং তাঁহার মুখ, করপল্লব ও চরণদ্বয় ব্যতীত অন্যান্য সর্ব্বাবয়ব এক স্থূল শ্বেতবর্ণ বস্ত্রে আচ্ছাদিত। তাঁহার ঘনকৃষ্ণ সুদীর্ঘ কেশরাশি কবরীবদ্ধ। তিনি একখানি শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত চৌকীর উপর আসীনা। দূর হইতে এই অধ্যয়ননিরতা লাবণ্যময়ী, প্রতিভাজনিত জ্যোতির্ম্ময় নেত্রশালিনী, যৌবনশ্রীবিভূষিতা দেবীকে দর্শন করিলেই মনে হয় যেন স্বয়ং ভগবতী ভারতীদেবী সশরীরে অবতীর্ণা হইয়াছেন।

একজন উজ্জ্বল পরিচ্ছদধারী ভৃত্য আসিয়া নিবেদন করিল যে, দেওয়ানজি সাক্ষাৎ অভিপ্রায়ে অপেক্ষা করিতেছেন। করুণাময়ী তাঁহাকে আসিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। অবিলম্বে দেওয়ান জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দূর হইতে ভূতলে মস্তক স্থাপন করিয়া মহারাণীকে প্রণাম করিলেন। মহারাণী তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন।

দেওয়ানজি জীবনকৃষ্ণ এম, এ, বিএল পরীক্ষোত্তীর্ণ, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। তাঁহার বয়স চল্লিশ বৎসর; দেহ ক্ষীণ ও সুদীর্ঘ উর্দ্ধভাগ সম্মুখদিকে ঈষৎ অবনত। বর্ণ সুগৌর; মস্তকের কেশ অনেকগুলি শ্বেতবর্ণ।

দেওয়ানজি আসন গ্রহণ করিলে, করুণাময়ী হস্তস্থিত পুস্তক পার্শ্বস্থিত পেটিকার উপরে স্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"জীবনকৃষ্ণ, সংবাদ কি?"

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন,—"বর্দ্ধমান জজ আদালতে আমাদের নামে একটা নালিশ উপস্থিত হইয়াছে।"

করুণাময়ী জিজ্ঞাসিলেন,—"কে করিয়াছে? কিসের নালিশ।"

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন,—"স্বত্বের মোকদ্দমা, সোণাপুরের রাজা উমাশঙ্কর বাহাদুর নালিশ করিয়াছেন।"

করুণাময়ী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"বর্দ্ধমান জেলার যে তিনটা মহাল জামদারের পত্নী বিধুমুখী আমাদের নিকট বিক্রয় করিয়াছিল, তাহার জন্য উমাশঙ্কর নালিশ করিতেছেন কি?"

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন,—"আজ্ঞা হাঁ। কথাটা খুব সহজ। তাঁহারা বলিতেছেন, বিধুমুখীর কোন সম্পত্তি বিক্রয় করিতে অধিকার ছিল না; সুতরাং তাঁহার বিক্রয় অসিদ্ধ।"

করুণাময়ী বলিলেন,—"আর আমরা বলিতেছি, শ্যামলাল বাবু ঐ সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি রীতিমত দলিল লিখিয়া তাঁহার স্ত্রীকে সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন; সুতরাং সমস্ত সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশ দান বা বিক্রয় করিতে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার ছিল,—এবং তাঁহার কৃত বিক্রয় সিদ্ধ।"

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন,—"আজ্ঞা হাঁ। এ সম্বন্ধে তাঁহাদের সহিত আমাদের কথাবার্ত্তা হইয়াছে। তাঁহারা আমাদের কথার উত্তরে বলিতেছেন পরের দ্রব্য যদি পরে আসিয়া পরকে বিক্রয় করে তাহা কখন সিদ্ধ বিক্রয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।"

করুণাময়ী বলিলেন,—"এ সম্বন্ধে আইন কাহাদের পক্ষে অনুকূল ?"

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন,—"বোধ হয় আইন আমাদের পক্ষে অনুকূল হইতে পারে। যুক্তি যাহা দেখা যাইতেছে, আমরা উচিত মূল্যে আইনসঙ্গত প্রণালী ক্রমে যথানিয়মে ঐ সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছি। আমাদের মনে বা কার্য্যে কোন অসৎ অভিসন্ধি ছিল না। সে সম্পত্তি যে বিধুমুখীর নহে, এরূপ বিবেচনা করিবার কোন অধিকার বা কারণ ছিল না। পিতার অজ্ঞাবিত উপায়ে তাহা রাজা উমাশঙ্করের হস্তগত হইয়াছে। যখন সেই বিপুল সম্পত্তি শ্যামলাল বাবুর ও তাহার পর বিধুমুখীর ছিল, তখন নানা ব্যক্তির সহিত নানাপ্রকার কাজ কর্ম্ম হইয়াছে, অনেক দেনা পাওনা হইয়াছে, অনেক বিষয় খরিদ বিক্রয় হইয়াছে। এ সকলই যদি এখন অসিদ্ধ দাঁড়ায়, তাহা হইলে বহু লোকের বহু প্রকার ক্ষতি হওয়ার সম্ভব। শ্যামলাল বাবুর সম্পত্তি প্রায় আমাদের মত; সুতরাং তৎসংক্রান্ত নানাপ্রকার লেন দেন, খরিদ বিক্রয় প্রভৃতি কাজ হওয়াই সম্ভব। এখন সে সম্পত্তি শ্যামলালের নহে, এই প্রমাণে তৎসময়ের কৃত সকল কাজকর্ম্ম উড়াইয়া দেওয়া বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত নহে। তাঁহারা যাহা বলেন, আইনের তাহাই মর্ম্ম বটে; কিন্তু মোকদ্দমা কেবল আইন ধরিয়াই হয় না; যুক্তি ও বৈধতাও বিশেষরূপে বিচারকালে আলোচিত হয়।"

করুণাময়ী বলিলেন,—"ঠিক কথা। তোমার কথা অসঙ্গত নহে। আমি জ্ঞাত আছি, রাজা উমাশঙ্কর বাহাদুর একজন পরম ধার্ম্মিক মহাত্মা। তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া সকল কথা স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিলে ভাল হয়।"

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন,—"রাজাবাহাদুরের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই, কিন্তু তাঁহার প্রধান আত্মীয় রায় হরকুমার বাহাদুরের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।"

মহারাণী বলিলেন,—"আমি জ্ঞাত আছি, তিনিও একজন মহাশয় লোক। তাঁহাকে তুমি সমস্ত কথা বলিয়াছিলে কি ?"

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন,—"আজ্ঞা হাঁ। তিনি সমস্ত কথা শুনিয়াও সম্পত্তি ছাড়িতে চাহেন না।"

করুণাময়ী বলিলেন,—"রায় হরকুমার বাহাদুর বিষয়কর্ম্মে একজন প্রবীণ ব্যক্তি। তিনি যাহা ব্যবস্থা করিবেন, রাজা উমাশঙ্কর বাহাদুর তাহাই স্বীকার করিবেন। রায় বাহাদুর যদি সমস্ত কথা শুনিয়াও, সম্পত্তি ছাড়িতে সম্মত না হন, তাহা হইলে সে জন্ত

রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না। আমি বুঝিতে পারিতেছি না কেন তাঁহারা এরূপমত করিতেছেন। কেহ যুক্তিবিরুদ্ধ, ন্যায়বিরুদ্ধ ও আইনবিরুদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেই তাহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিতে হয়। আইন যদি অনুকূল হয়, কিন্তু যুক্তি ও ন্যায় যদি প্রতিকূল থাকে, তাহা হইলেও মোকদ্দমা করিবার আবশ্যকতা নাই। কারণ আইন সকল স্থলেই অবলম্বনীয় হইতে পারে না; অনেক ক্ষেত্রেই আইনের বলে অবিচারই হইয়া যায়। যুক্তি, ন্যায় ও আইন সকলই যে ক্ষেত্রে অনুকূল, সেই স্থলেই মোকদ্দমার প্রকৃষ্ট কারণ থাকে। আইন হয় ত রাজা উমাশঙ্কর বাহাদুরের পক্ষে বর্ত্তমান বিষয়ে অনুকূল হইতে পারে; কিন্তু যুক্তি ও ন্যায় নিশ্চয়ই তাঁহার বিরোধী। তথাপি রায় বাহাদুর হরকুমার কেন মোকদ্দমা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা আমি স্থির করিতে পারিতেছি না। তিনি সদ্বিবেচক ও সূক্ষ্মদর্শী। কেন তিনি ন্যায় ও যুক্তির সম্মান করিতে চাহিতেছেন না, তাহা ভাবিয়া স্থির করা সুকঠিন। যাহাই হউক, আমি এস্থলে রীতিমত আয়োজন করিয়া মোকদ্দমা চালাইতেই তোমাকে পরামর্শ দিতেছি। বোধ হয়, তোমারও তাহাই অভিপ্রায়।"

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন,—"নিশ্চয়ই মামলা চালান উচিত। আইন যে ঠিক এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিকূল, তাহাও বলিতে পারি না। দুই একটা নজীর আমাদের বিশেষ অনুকূল আছে; আর আইনেও এরূপ বিক্রয় অসিদ্ধ করিবার কোন ব্যবস্থা নাই।"

মহারাণী বলিলেন,—"সাধারণতঃ মোকদ্দমা করিতে আমার বিশেষ প্রবৃত্তি নাই। আমাদের বিষয়-ব্যাপারে কখনই প্রায় কোন মোকদ্দমা করিতে হয় না। কিন্তু এবার আমাদিগকে একটা প্রধান মোকদ্দমায় লিপ্ত হইতে হইতেছে। মোকদ্দমা কাজটা ভাল না হইলেও, যে স্থলে পক্ষগণ একমত হইতেও অশক্ত, সেখানে অগত্যা রাজদ্বারে দণ্ডায়মান হওয়াই সুব্যবস্থা। রাজার নিয়োজিত ও বেতনপ্রাপ্ত বিচারক যে অসাধারণ বুদ্ধি ও বিজ্ঞতাবিশিষ্ট মহাত্মা, এরূপ অনুমান করিবার কোনই কারণ নাই; বরং কোন কোন স্থলে তাঁহাদের হাস্যজনক নির্বুদ্ধিতারই পরিচয় দেখা; যায় সুতরাং অকারণ বহু অর্থব্যয় ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া তাঁহার ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হওয়ার অপেক্ষা আপনারা একমত হইয়া মোকদ্দমার কারণ মিটাইয়া ফেলাই উচিত পরামর্শ। এ স্থলে আমাদের পক্ষে যে সকল ন্যায়সঙ্গত যুক্তি রহিয়াছে, তাহা শুনিয়াও যখন রায় হরকুমার বাহাদুর মোকদ্দমা রুজু করিয়াছেন, তখন আমরা ইহার সমুচিত তদ্বির করিতেই বাধ্য। দানে বা পরোপকারার্থে, দৈব কারণে বা কোন বিপদহেতু সর্ব্বস্ব নষ্ট হইলেও একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু ন্যায় ও যুক্তির বিরোধে একটী কপর্দ্দকও নষ্ট হইতে দেওয়া কখনই বিধেয় নহে। তুমি এ সম্বন্ধে সমুচিত জবাব দাখিল করিয়া দেও এবং আমাদের নিয়মিত যে উকীল মহাশয় আছেন, আবশ্যক বুঝিলে তাঁহার সাহায্যার্থ আরও, উকীল নিযুক্ত করিয়া দেও।"

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন,—"যে আজ্ঞা।"

মহারাণী বলিলেন,—"তোমার তহবিলে এক্ষণে কত টাকা মজুত আছে?"

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন,—"কালি পর্য্যন্ত মহারাণীর ধনাগারে নোটে ও টাকায় নগদ আশী লক্ষ টাকা মজুত আছে।"

মহারাণী জিজ্ঞাসিলেন,—"ধনাগারে যে সকল অলঙ্কার ও সোণারূপার বাসন প্রভৃতি মজুত আছে, এক দিনে বিক্রয় করিলে তাহার মূল্য কত টাকা হইতে পারে?"

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন,—"খুব যদি কমও হয়, তাহা হইলে দশ লক্ষ টাকার কম হইবে না।"

করুণাময়ী ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিলেন, "তাহা হইলে তোমার মজুদ টাকা এক কোটীরও কম। এই সামান্য সম্পত্তির তুমি অধ্যক্ষ!"

জীবনকৃষ্ণ হাসিয়া বলিলেন,—"মা ঠাকুরাণী, কি অভিপ্রায়ে এ কথা উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা জানি না; কিন্তু আমাদের সম্পত্তি সামান্য বলিয়া আপনি যে উল্লেখ করিতেছেন, তাহাতে আমি সবিনয়ে প্রতিবাদ করি। আমাদের সম্পত্তির মূল্য প্রায় চারি কোটী টাকা এবং রাজবাটীর যানবাহন, সাজ-সরঞ্জাম প্রভৃতির মূল্যও দুই কোটী টাকা হইবে।"

করুণাময়ী বলিলেন,—"স্বীকার করিলাম তোমাদের সর্ব্বস্ব একত্র করিতে পারিলে সাত কোটী টাকা হইবে। তাহা হইলেও এ সম্পত্তি নিতান্তই সামান্য বলিয়া মনে করিতে হইবে না কি? অথচ এই সামান্য সম্পত্তির অধ্যক্ষতা করিয়া তুমি প্রশংসাভাজন হইয়াছ, ইহা বড়ই বিস্ময়ের বিষয় নহে কি?"

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন,—"প্রশংসা! জানি না মা, কিসের জন্য কে আমার প্রশংসা করে। প্রশংসা ও নিন্দা উভয়ই যদি তুল্য বোধ করিতে সক্ষম না হইয়া থাকি, তাহা হইলে মা বৃথা এতদিন আপনার শ্রীচরণ ধ্যান করিলাম।"

করুণাময়ী বলিলেন,—"তুমি একজন উচ্চ শিক্ষিত—বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি-প্রাপ্ত ব্যক্তি। এই সামান্য সম্পত্তির অধ্যক্ষতা করিয়া প্রশংসা লাভ না করিতে পারিলে, তোমার পক্ষে বড়ই লজ্জার কথা হইত।"

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন,—"উচ্চশিক্ষা—বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি—বড়ই ঘৃণিত পরিচয়। জীবনের বহুমূল্য সময় বড়ই বৃথা কার্য্যে পর্য্যবসিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি ও পরীক্ষার শিক্ষা কিছুই হয় নাই; কেবল পণ্ডশ্রম হইয়াছে মাত্র। শুভক্ষণে পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত অশেষ পুণ্যফলে আপনার ন্যায় কৃপাময়ী মার চরণে স্থান লাভ করিয়াছি। শিক্ষা যদি কিছু হইয়া থাকে, তাহা আপনারই কৃপায় লাভ করিয়াছি। জ্ঞান যদি কিছু অর্জ্জন করিয়া থাকি, তাহা আপনারই অমূল্য উপদেশে প্রাপ্ত হইয়াছি। উচ্চশিক্ষা, উচ্চাভিমান রসাতলে যাউক, প্রশংসা বা নিন্দা চারিদিকে যাহা হয় ঘোষিত হউক, কিছুতেই আর ক্ষতি বৃদ্ধি অনুভব করি না। আপনার কৃপা—আপনার উপদেশ—আপনার প্রদত্ত জ্ঞান যেন আমার আজীবন সঙ্গ ত্যাগ না করে।"

করুণাময়ী বলিলেন,—"তথাপি যে কার্য্য অবলম্বন করা যায়, তাহাতে প্রশংসালাভ করা জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হওয়া উচিত। প্রশংসালাভ করিয়া স্ফীত বা বিচলিত হওয়া মূঢ়ের কার্য্য, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাই বলিয়া অনুষ্ঠিত কার্য্যে প্রশংসালাভ করিতে না পারা গৌরবের কথা নহে। প্রশংসা বা নিন্দা উভয়কেই তুল্য জ্ঞান করিয়া এবং প্রশংসালাভের আকাঙ্ক্ষা মাত্র পরিশূন্য হইয়া কার্য্য সম্পাদন করা উচিত। কিন্তু পরিণামে সে কার্য্যের ফল

প্রশংসালাভ করিতে না পারাও বড় লজ্জার কথা। এমন কার্য্যও হইতে পারে, যাহার উদ্দেশ্য ও মর্ম্ম সর্ব্বসাধারণে প্রণিধান করিতে অক্ষম। তাদৃশ কার্য্যবিশেষে হয় ত ভয়ানক নিন্দাই কর্ম্মের পুরস্কার হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে বিচলিত হইবার কোন কারণ নাই; কেন না তখন না হইলেও হয় ত অচিরে বা বহুকাল পরে অবশ্যই লোকে সে কার্য্যের মর্ম্ম ও লক্ষ্য প্রণিধান করিতে সক্ষম হইবে এবং নিশ্চয়ই প্রশংসার বৃষ্টিধারা কর্ম্মকর্ত্তার শিরে বর্ষণ করিতে থাকিবে। ফলতঃ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সাধু হইলে কার্য্যের পুরস্কার প্রশংসা হইবে। সম্প্রতি এই পুস্তকে তোমার কার্য্যের যথেষ্ট প্রশংসা প্রচারিত হইয়াছে; তুমি তাহা পাঠ কর।"

মহারাণী করুণাময়ী সেই প্রকাণ্ড ইংরাজি পুস্তকখানি জীবনকৃষ্ণের হস্তে প্রদান করিলেন। সেখানি বঙ্গদেশীয় শাসন-বিবরণী (Administration Report of Bengal) যে স্থান অধ্যয়ন করিতে হইবে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া মহারাণী পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন। জীবনকৃষ্ণ নির্দ্দিষ্ট স্থান পাঠ করিতে লাগিলেন। সে স্থানে যে যে কথা লিখিত আছে, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ :—বঙ্গদেশের ভূস্বামিগণের মধ্যে চন্দ্রমালার রাজবংশই প্রধান ও প্রথম উল্লেখযোগ্য। এই বিস্তীর্ণ সম্পত্তির অধীশ্বরী মহারাণী করুণাময়ী দেবী পৃথিবীর মধ্যে স্মরণীয়া মহিলা। দান ও পরোপকার তাঁহার অবিরত ব্রত। তাঁহার আয় অন্যূন দশ লক্ষ টাকা। এই টাকার প্রায় সকলই পরোপকারে, সাধারণের হিতকর কার্য্যে দরিদ্রসেবায় ব্যয়িত হয়। মহারাণী ইংরাজী, সংস্কৃত প্রভৃতি অনেক ভাষায় বিদ্যাবতী এবং একান্ত ধর্ম্মশীলা। দুঃখের বিষয় তিনি অবিবাহিতা; কিন্তু এখনও তিনি বিবাহযোগ্য বয়স অতিক্রম করেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিধারী ও আইনজ্ঞ জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁহার দেওয়ান। জীবনকৃষ্ণ বাবু কর্ম্মিষ্ঠ, বিচক্ষণ ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। এই রাজবংশের প্রধান ও বিশেষত্ব এই যে, দেওয়ানী ও ফৌজদারী কোনরূপ মোকদ্দমাতেই ইহাদিগকে লিপ্ত হইতে হয় না; অথচ বিনা অত্যাচারে সুশৃঙ্খলার সহিত ইহাদের সমস্ত কার্য্য সুনির্ব্বাহিত হয়। এই সম্পত্তির মূল্য প্রায় পাঁচ কোটী টাকা হইবে।"

পাঠ করিয়া জীবনকৃষ্ণ হাসিয়া বলিলেন, —"অনেক কথাই ভুল। সম্পত্তির মূল্যাবধারণা বড়ই হাস্য-জনক।"

করুণাময়ী বলিলেন, "তাহার পরের অংশটুকুও পাঠ কর।"

জীবনকৃষ্ণ পাঠ করিতে লাগিলেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—"ইহার পরেই সোণাপুর সম্পত্তির প্রসঙ্গ উল্লেখ যোগ্য। এই সম্পত্তির বর্ত্তমান অধিকারী রাজা উমাশঙ্কর বাহাদুরের অতীত ইতিহাস বড়ই বিস্ময়াবহ। ইনি একজন সুশীল বুদ্ধিমান ও ধর্ম্মপরায়ণ পুরুষ। রায় হরকুমার বাহাদুর পূর্ব্বেও এই সম্পত্তির অধ্যক্ষতা করিতেন, মধ্যে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া কার্য্য ত্যাগ করিতে হইয়াছিল; এক্ষণে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া পুনরায় কার্য্যভার গ্রহণ করিতে হইতেছে। তিনি এরূপ বিষয়কর্ম্ম পরিচালনা কার্য্যে বোধ হয় অদ্বিতীয় ব্যক্তি। যেরূপে এই বিষয় বর্ত্তমান অধিকারীর হস্তগত হইয়াছে তাহা উপন্যাসে বর্ণনোপযোগী। হস্তান্তরিত হওয়ায় এই বিষয়ের অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। সুদক্ষ অধিকারী ও কার্য্যাধ্যক্ষ বিশেষ যত্নে প্রায় সমস্ত বিষয় সুস্থির করিয়া ফেলিয়াছেন।

এই সম্পত্তির মূল্য প্রায় চারিকোটী টাকা, উল্লিখিত দুই ষ্টেট বঙ্গদেশে আদর্শ।”

পাঠ করিয়া জীবনকৃষ্ণ পুস্তকখানি যথা-স্থানে স্থাপন করিলেন এবং বলিলেন,—“এই দুই আদর্শ ষ্টেটে মোকদ্দমা হওয়া আর কথা। কিন্তু উপায় কি?”

করুণাময়ী বলিলেন,—“আমি তোমাকে এই কথার জন্যই এ পুস্তক পাঠ করিতে দিয়াছিলাম। হরকুমার বাহাদুরের ন্যায় বিচক্ষণ লোক ন্যায় ও যুক্তির কেন অবমাননা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।”

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন,—“আমার প্রতি মহারাণী মাতার আর কোন আদেশ আছে কি?”

করুণাময়ী বলিলেন,—“না।”

বিনীতভাবে প্রণাম করিয়া জীবন বাবু প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গঙ্গাস্নান।

মহারাণী করুণাময়ী গঙ্গাস্নানে যাইবেন। চন্দ্রমালা নগর হইতে আজিমগঞ্জের গঙ্গার ঘাট প্রায় কুড়ি ক্রোশ দূরবর্ত্তী। সেই ঘাটেই মহারাণী স্নান করিতেন। যে দিন গঙ্গাস্নানে যাইতেন, সে দিন এই সুদীর্ঘ পথের উভয় পার্শ্ব দীন ও দরিদ্র ব্যক্তিগণে পরিপূর্ণ হইত। মহারাণী জমকালো ও বৃহৎকায় অশ্বচতুষ্টয়বাহিত বহুমূল্য যানে আসীনা থাকিতেন; সঙ্গে প্রায়ই তাঁহার পরম প্রিয় দেওয়ান জীবনকৃষ্ণ ও অন্যান্য লোকেরা স্বতন্ত্র যানে গমন করিতেন। মহারাণীর সঙ্গে এক যানে তাঁহার পরিচারিকা থাকিত। আর এক যানের চতুর্দ্দিকে অশ্বপৃষ্ঠে অস্ত্রধারী চারিজন রক্ষী যাইত; তাহাতে এক জন বিশ্বস্ত রাজ-কর্ম্মচারী রাশি রাশি সিকি, দুয়ানি, আধুলি ও টাকা লইয়া বসিয়া থাকিত এবং গন্তব্য পথের উভয় পার্শ্বে—উভয় হস্তে সেই ধন-রাশি অনবরত বিতরণ করিত; অনেকক্ষণ ধন-বিতরণ করিয়া সেই কর্ম্মচারীরা কাতর হইয়া পড়িলে, স্বতন্ত্র যান হইতে আর এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার স্থান অধিকার করিত। মহারাণী দুই তিন দিন গঙ্গাতীরে বাস করিতেন। কখন কখন বহরমপুর হইতে মুরশিদাবাদের মাজিষ্ট্রেট সেই স্থানে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। পুলিস প্রহরিগণ ও একজন উচ্চ কর্ম্মচারী শান্তিরক্ষার নিমিত্ত গঙ্গার ঘাটের নিকট ছাউনি করিত। ঘাটের ধারে যে কয় দিন মহারাণী অবস্থান করিতেন, সে কয় দিন নিরন্তর অন্ন বিতরণ করা হইত। নানা দিগেশাগত ব্যক্তিগণ উদর পূরিয়া বিবিধ উপচারে আহার করিত। তাহার পর শীতকাল হইতে সমাগত দুঃখিগণকে এক একখানি কম্বল প্রদত্ত হইত; অন্য ঋতুতে সকলকে এক এক খণ্ড বস্ত্র প্রদত্ত হইত। মহারাণী গঙ্গাতীরে একটী ক্ষুদ্র বস্ত্রাবাসে অবস্থান করিতেন। আরও কয়েকটী নাতি-বৃহৎ বস্ত্রাবাসে মহারাণীর সঙ্গী ও অনুযাত্রিকগণ বাস করিতেন।

গঙ্গাস্নান যাত্রার তিন চারি দিবস পূর্ব্বে ঢোল বাজাইয়া এই সংবাদ চারিদিকে ঘোষিত হইত। বহু দূরের পথ অতিক্রম করিয়াও কাতর, রুগ্ন, অন্নহীন ব্যক্তিগণ

পথপার্শ্বে অপেক্ষা করিত। বীরভূম ও মুরশিদাবাদ উভয় জেলার মধ্য দিয়াই মহারাণীকে যাইতে হইত! উভয় জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়েরা পথের শান্তিরক্ষার সুব্যবস্থা করিতেন। দুই জেলাতেই সে সময়ে একটা ভয়ানক জনতা ও উৎসাহ উপস্থিত হইত। কখন কখন স্থানে স্থানে পথের ও গঙ্গাতীরে লোক-সমাগমের ফটোগ্রাফ লইবার জন্য কলিকাতার প্রসিদ্ধ ফটোব্যবসায়ীরা যন্ত্রাদিসহ লোক প্রেরণ করিতেন। প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার সাহেব কখন কখন এই ব্যাপার দেখিবার নিমিত্ত মুর্শিদাবাদের সীমায় অপেক্ষা করিতেন এবং মহারাণীর যানাদি উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে আন্তরিক সম্মান বিজ্ঞাপিত করিয়া স্বকীয় শকট মহারাণীর শকটাদিসহিত চালাইতেন। একবার বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত সাঁইথিয়া ষ্টেশনে অপেক্ষা করিয়াছিলেন। যথাকালে মহারাণী লোকজন যানাদি সহ তাঁহার নিকটস্থ পথে উপস্থিত হইলে তিনি স্বয়ং মহারাণীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নানা প্রকারে ঐ অতুলনীয়া মহিলাকে সম্মান জ্ঞাপন করেন এবং সানুনয়ে তাঁহাকে কিয়ৎকাল মাত্র অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করেন। মহারাণীর আজ্ঞায় গমন নিরুদ্ধ হইলে, বঙ্গের শাসনকর্ত্তা তাঁহার সহিত অতি অল্পকাল মাত্র বাক্যালাপ করিবার অবসর প্রাপ্ত হন। সেই স্বল্পকালে বিচক্ষণ গবর্ণর সাহেব করুণাময়ীর অলোক-সামান্য রূপ, অসীম জ্ঞান ও বুদ্ধি এবং ইংরাজি ভাষায় বাক্য কথনে তাঁহার অত্যদ্ভুত নিপুণতা প্রভৃতি দর্শনে বিমোহিত হন। তিনি স্বকীয় শাসনলিপিতে এই ব্যাপার বিশেষরূপে লিখিয়া রাখেন। তদবধি প্রত্যেক লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর আপনার শাসনকালে অন্ততঃ একবার চক্রমালায় আসিয়া এই মহীয়সী মহিলার সহিত পরিচয় ও কথোপকথন করিতেন। বিভাগীয় কমিশনার বর্ষে একবার করিয়া এই মহিমান্বিতা মহারাণীকে দর্শন ও তাঁহার সহিত নানা বিষয় কথোপকথন করিয়া এবং বিষয় বিশেষে তাঁহার পরামর্শ ও অভিপ্রায় জানিয়া পরমানন্দ অনুভব করিতেন।

নিয়মিত ব্যবস্থা সমস্ত সুস্থির হইলে মহারাণী করুণাময়ী গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিলেন। রাজপথের উভয় পার্শ্ব লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। পাছে কাহারও আঘাত লাগে ও কোন বিপদ ঘটে, এই আশঙ্কায় মহারাণীর যানসমূহ ধীরে ও সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে লাগিল। যথাস্থান হইতে বর্ষার বারিধারার ন্যায় ভারতেশ্বরীর মূর্ত্তি নামাঙ্কিত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রজতখণ্ডসমূহ বর্ষিত হইতে লাগিল। উভয় পার্শ্বের লোকেরা "জয় মহারাণীর জয়, জয় মা করুণাময়ীর জয়!" ইত্যাদি রবে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মহারাণীকে দেবী বলিয়াই অনেকের ধারণা ছিল। এজন্য বহু লোক তাঁহাকে দর্শন করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিবার মানসে পথিপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। তাঁহারা তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র পুলকিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল এবং এই মরদেহে সাক্ষাৎ দেবদর্শন ও তজ্জনিত অশেষ পুণ্য সঞ্চিত হইল ভাবিয়া পরম আনন্দ লাভ করিল।

জনতায় ও লোকের ব্যস্ততায় কোন দুর্ঘটনা না ঘটে, এই জন্য পুলিশকর্ম্মচারী বিশেষ সতর্কতাসহকারে নানারূপ সুব্যবস্থা করিল। মহারাণীর যান ও লোকজন সেই দিন সন্ধ্যাকালে আজিমগঞ্জে উপনীত হইল।

মহারাণীর সঙ্গের লোকজন এবং যান অশ্বাদি থাকিবার উপযুক্ত পটমণ্ডপাদি পূর্ব্বেই সংস্থাপিত হইয়াছিল। রাত্রি স্বচ্ছন্দে কাটিয়া গেল। পরদিন প্রাতে ভূরি ভোজনের ও বস্ত্র বিতরণের আয়োজন আরব্ধ হইল। বেলা এগারটার পর হইতে ভোজন ব্যাপার চলিতে লাগিল। প্রায় একশত বিঘা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন ভূমি চন্দ্রাতপ দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। তাহারই মধ্যে দলে দলে লোক আসিয়া উত্তম অন্ন, বিবিধ ব্যঞ্জন, মিষ্টান্ন, পায়স ও পিষ্টকাদি ভোজন করিয়া এবং ভোজনান্তে বস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিতে লাগিল। প্রথম দিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ সহস্র লোক পরিতোষপূর্ব্বক আহার করিল ও বস্ত্র পাইল। দ্বিতীয় দিবসে ভোজনার্থীর সংখ্যা লক্ষের নিকটস্থ হইল; তৃতীয় দিবস লক্ষ লোকপূর্ণ হইল। তিন দিনে দুই লক্ষাধিক লোক ভোজন করিল ও বস্ত্র পাইল। স্বয়ং জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ও পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একজন ইনস্পেক্টর, দুইজন সবইনস্পেক্টর, দশ জন জমাদার ও পঞ্চাশজন কনষ্টেবল শান্তিরক্ষার নিমিত্ত, সেই ক্ষেত্রে তিনদিন উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু শাসনবিভাগের এই সকল সুব্যবস্থার কোনই আবশ্যকতা ছিল না। কেন না, মহারাণী ও তাঁহার দেওয়ান জীবনকৃষ্ণ এই কাণ্ড সুনির্ব্বাহিত করিবার নিমিত্ত এতই সাবধানতা অবলম্বন করিতেন এবং এরূপ লোকবল প্রয়োগ করিতেন যে, ইহাতে কখনই কোন দুর্ঘটনা ঘটিত না বা কোন ভোজনার্থীরই অনুমাত্র ক্লেশ বা অসুবিধা ভোগ করিতে হইত না।

এই ব্যাপারের দ্বিতীয় দিবসে, সমস্ত দিনের ভয়ানক পরিশ্রমের পর, রাত্রি আটটার সময় নিতান্ত ক্লান্তশরীরে দেওয়ান জীবনকৃষ্ণ আপন তাম্বুতে একখানি খাটিয়ার উপর পড়িয়া আছেন, এমন সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, একটী লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে। জীবনকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"লোকটীর কি উদ্দেশ্য ?"

ভৃত্য উত্তর দিল,—"তাহা সে বলে নাই; তাহার বক্তব্য অনেক ও প্রয়োজনীয়। সে তাহা স্বয়ং মহারাণীর নিকট ব্যক্ত করিতে চাহে। মহারাণী মার সহিত আজি দেখা হওয়ার কোন উপায় নাই বুঝিয়া সে আপনার সহিত দেখা করিবার প্রার্থনা করিতেছে।"

জীবনকৃষ্ণ একটু চিন্তার পর বলিলেন—"তাহাকে লইয়া আইস।"

ভৃত্য প্রস্থান করিল এবং অবিলম্বে মাথায় চাদরবাঁধা, পাতলা মলমলের পাঞ্জাবী জামায় আবৃত দেহ, সূক্ষ্ম বস্ত্রধারী, এক পুরুষকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। জীবনকৃষ্ণ তাহাকে আসন গ্রহণ করিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার প্রয়োজন কি প্রকাশ করুন। আমরা আজি নিতান্ত ক্লান্ত আছি।"

আগন্তুক আর একখানি খাটিয়ার উপর উপবেশন করিয়া বলিল,—আমার নাম হরিচরণ দাস। আমি পূর্ব্বে শ্যামলাল বাবুর পরে বিধুমুখীর দেওয়ান ছিলাম।"

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন,—"খবরের কাগজ পড়িয়া আমরা আপনার সহিত রাজা উমাশঙ্করের মোকদ্দমা এবং শ্যামলাল ও বিধুমুখীর বৃত্তান্ত অনেক জানিয়াছি। পূর্ব্বেও বিষয়কর্ম্মসূত্রে আপনাকে জানিতাম। আপনাকে রাজদণ্ডভোগ করিতে হইয়াছিল না ?"

হরিচরণ বলিল,—"আজ্ঞা হাঁ। অন্যায় বিচারে আমার তিন বৎসর জেল হইয়াছিল। আমি দুই সপ্তাহ হইল খালাস হইয়াছি।"

জীবনকৃষ্ণ জিজ্ঞাসিলেন,—"আমার নিকট আপনার কি প্রয়োজন ?

হরিচরণ বলিল,—"উমাশঙ্করের সহিত আপনাদের মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। সেই মোকদ্দমায় যাহাতে আপনারা জয়ী হন, আমি তাহার উপায় করিয়া দিতে পারি।"

"কিরূপে ?"

"বিধুমুখী যদি আপনাদের পক্ষে যোগ দেয়, তাহা হইলে মোকদ্দমায় কেহই আপনাদের হারাইতে পারিবে না।"

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন,—"বিধুমুখী আমাদের পক্ষে যোগ দিবে কেন ?"

হরিচরণ বলিল,—"আমি মনে করিলে তাহাকে যোগ দেওয়াইতে পারি।"

"তবে আপনার মোকদ্দমার সময় সে আপনার বিপক্ষে সাক্ষী দিয়াছিল কেন ?"

হরিচরণ বলিল,—"তখন যে অবস্থা ছিল, এখন সে অবস্থা নাই।"

"এখন কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে ?"

"এখন বিধুমুখী আমার হাতে। আমি তাহার দ্বারা যাহা ইচ্ছা তাহাই বলাইতে পারি।"

জীবনকৃষ্ণ জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি কোথায় থাকেন ?"

হরিচরণ বলিল,—"আমি সম্প্রতি বালুচরে আছি।"

"বিধুমুখী কোথায় আছেন ?"

"সেও বালুচরেই আছে।"

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন,—"আপনার প্রস্তাবের কোন উত্তরই আমি এখন দিতে পারি না। মহারাণী মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কল্য এই সময়ে আপনার কথার উত্তর দিতে পারি। আপাততঃ আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আমাদের এরূপ সাহায্য করায় আপনার লাভ কি ?"

হরিচরণ বলিল,—"আমার লাভ অনেক, অনেক লাভের সম্ভাবনা আছে বলিয়াই আমি আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি।"

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন,—"যে বিষয় লইয়া মোকদ্দমা, তাহা হয় আমাদের হইবে, না হয় রাজা উমাশঙ্করের হইবে। বিধুমুখীর সাহায্যে যদি তাহা আমরা পাই, তাহা হইলে আপনার বা বিধুমুখীর কি লাভ হইবে তাহা তো আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।"

হরিচরণ বলিল,—"প্রথম লাভ উমাশঙ্করের ক্ষতি হইবে; দ্বিতীয় লাভ, হরকুমারের দর্পচূর্ণ হইবে। সে যাহা ধরে আর যাহা করে তাহাতেই জিতিয়া ফিরে ও বাহবা পায়, ইহা আমার অসহ্য। তৃতীয় লাভ আপনারা পরমধার্ম্মিক, আপনারা কি এত বড় বিষয়টা হাত ছাড়া না হওয়ার দরুণ আমাকে কিছু দিবেন না ?"

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন,—"আপনার অভিপ্রায় কতকটা বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু মহারাণী মা যে আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন, তাহা আমার কিছুতেই মনে হয় না। সুতরাং আপনাকে আমি এখনই জবাব দিতে পারি। কিন্তু যদি আপনি মহারাণী মার অভিপ্রায় জানিতে বাসনা করেন, তাহা হইলে আপনাকে কল্য একবার ঠিক এইরূপ সময়ে আসিতে হইবে।"

হরিচরণ বলিল,—"তাহাই হইবে। মহারাণীর অভিপ্রায় জানাই আমার আবশ্যক। মহারাণী একথা শুনিলে ঠিক বুঝিতে পারিবেন। আপনি মনে করিতেছেন, ইহার মধ্যে কোন অধর্ম্ম আছে। এত বড় ষ্টেটের আপনি দেওয়ান—আমরাও প্রায় এইরূপ ষ্টেটের দেওয়ানি করিয়াছি। দেওয়ানি করিতে হইলে অনেক বুদ্ধিখরচ করিতে

হয়। যাহার বিষয়, সে ঠিক বুঝিবে—চাকর বাকর গোল কমাইতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হয়। যাই হউক, আমি আজি যাই। কালি ঠিক এই সময়ে আসিব। আপনি মহারাণীর অভিপ্রায় জানিয়া রাখিবেন। সম্ভব হইলে আমার সহিত একবার তাঁহার সাক্ষাৎ করাইয়া দিবেন।"

হরিচরণ প্রস্থান করিল। অনতিকাল মধ্যে জীবনকৃষ্ণ গাত্রোত্থান করিয়া মহারাণীর বস্ত্রাবাসে প্রবেশ করিলেন এবং হরিচরণের সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন। করুণাময়ী অতিশয় মনোযোগের সহিত সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—"হরিচরণ পুনরায় তোমার নিকট না আসিতেও পারে। যদি সে আইসে, তাহা হইলে কল্য তাহাকে আমার নিকট লইয়া আসিবে। সে কোথায় থাকে, জানিতে পারা আমার বিশেষ প্রয়োজন। অতএব কল্য প্রাতে এই বিষয়ের সন্ধান করিবার নিমিত্ত একজন উপযুক্ত লোককে ভার দিবে।"

অন্যান্য নানা কথার পর জীবনকৃষ্ণ ভক্তি সহকারে মহারাণীকে প্রণাম করিয়া সে স্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

চতুর্থ খণ্ড—মহাপুরুষ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মরণাপন্ন।

হরকুমারের অবস্থা বড়ই মন্দ। তাঁহার দেহের নানা স্থান ... রির আঘাতে ক্ষত বিক্ষত এবং লাঠির আঘাতে বিচূর্ণ। তিনি মরণাপন্ন।

বিধুমুখীর সেই শূন্য ভবন এখন জনপূর্ণ; ভবসুন্দরীর সেই ক্ষুদ্র ভবন, সপরিবার রামচন্দ্রের আগমনে পরিপূর্ণ হইয়াছিল; এখন তথায় পা বাড়াইবারও স্থান নাই বলিলে হয়। রাজা উমাশঙ্কর বাহাদুর ভবসুন্দরীর প্রেরিত লোকমুখে রায় বাহাদুর সম্বন্ধে এই দুঃসংবাদ শুনিবামাত্র পরদিন প্রাতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে রাণী অন্নপূর্ণা, রাজভগ্নী সুহাসিনীও আসিয়াছেন। সুতরাং খোকারাজাকেও আসিতে হইয়াছে। আর আসিয়াছিলেন, দুইজন বিচক্ষণ ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার, এবং বহুসংখ্যক দাসদাসী, শরীররক্ষক ও অনুযাত্রিক লোকজন।

রায় হরকুমার বাহাদুরের দেহ, বিধুমুখীর ভবনে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। ঘরটী প্রশস্ত ও শুষ্ক এবং পাকা; এই জন্য সেই স্থানই রোগীর জন্য প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। অন্নপূর্ণা ও সুহাসিনী পীড়িতের উভয় পার্শ্বে নিরন্তর বসিয়া আছেন; এবং রাজা তাঁহার শয্যানিম্নে অদূরে ভূতলে উপবিষ্ট।

ডাক্তারেরা বার বার রোগীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন; যখন যে ঔষধের প্রয়োজন তখনই তাহা প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে; ক্ষতসমূহ যথাসময়ে পরিষ্কৃত করিয়া ঔষধাদি সহ বাঁধিয়া দেওয়া হইতেছে; রাণী ও সুহাসিনী রোগীকে যথারীতি পথ্য ও ঔষধ সন্তর্পণে সেবন করাইতেছেন। রাণী ও রাজভগ্নী লোকসমক্ষে অন্তরালে গমনের প্রয়োজন ভুলিয়া গিয়াছেন; লজ্জাজনিত স্বভাবসিদ্ধ সঙ্কোচ তাঁহাদিগকে এখন ত্যাগ করিয়াছে। সকলেরই লোচন জলভারাকুল; সকলেরই বদন নিদারুণ চিন্তায় অবসন্ন।

খোকারাজাকে রাণী আর বড় দেখিতে পান না; তাহার পিসীমাও তাহাকে আর কোলে লইয়া আদর করিবার সময় পান না; রাজাও তাহাকে প্রিয়সম্ভাষণ করিবার অবসর খুঁজিয়া পান না। সকলেই সম্মুখস্থ মৃতকল্প সুহৃদের যথাসাধ্য শুশ্রূষা ব্যতীত, আর কোন বিষয়েই মনঃসংযোগ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন।

বিধুমুখীর বাটীতে গভীর রাত্রিতে ডাকাইত পড়িয়াছিল, ইহাই চারিদিকে প্রচার। কিন্তু ডাকাইত তো মানুষ লইয়া পলায় না; এ ডাকাইতরাই বিধুমুখীকে পত্র পাইয়া লইয়া গেল কেন? স্বয়ং পুলিশ সাহেব বাহাদুর এই বিষয়ে অনুসন্ধানে আসিয়াছিলেন। দারোগা জমাদার অনেকে আসিয়াছিলেন। বিধুমুখীর কি হইল, তাঁহাকে মারিয়া ফেলিল, কি কোন স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছে, পুলিশ সবিশেষ যত্নে তাহার সন্ধান করিতেছেন এবং এই ঘোর অত্যাচারের কর্তৃগণকে ধরিবার নিমিত্ত অপরিসীম আয়াস স্বীকার করিতেছেন।

কিরূপে কি হইল, তাহার সংবাদও ভাল করিয়া পাওয়া গেল না। বিধুর মার জবানবন্দী পুলিশ লিখিয়া লইয়াছে। তাহারই কথায় মোটামুটী একটা বুঝা যায় মাত্র। তাহার কথায় প্রকাশ পায় যে; ঘটনার রাত্রিতে প্রায় দশটা পর্যন্ত রায় বাহাদুর দাদা, তাহার সহিত ও তাহার মা ঠাকুরাণী অর্থাৎ বিধুমুখীর সহিত নানা বিষয়ের নানা প্রকার কথাবার্তা কহেন তাহার পর তিনি চলিয়া গেলে, সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া সে ও বিধুমুখী শয়নের উদ্যোগ করে। বড় গ্রীষ্ম, এজন্য তাহারা ঘরের মধ্যে না শুইয়া বারান্দাতেই শয়ন করিয়াছিল। তাহার ঘুম আসিয়াছিল; তাহার মা ঠাকুরাণীও কথা কহিতে কহিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহার মা ঠাকুরাণীর একটা কাতর চীৎকার শব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হয়। সে চক্ষু মেলিবামাত্র কয়েক-জন বিকটপুরুষ তাহার মুখ চাপিয়া ধরে ও তাহার মুখে কাপড় গুঁজিয়া দেয়। তাহার নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হইয়া যায় এবং সে বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়ে। তাহার চক্ষু খোলা ছিল। সে দেখিতে পায়, দশজন ভয়ানক আকারের লোক, বারান্দার উপরে আছে; তিনজন তাহার নিকট তাহাকে ধরিয়া আছে; দুইজন দুইটা জ্বলন্ত মশাল লইয়া দাঁড়াইয়া আছে; আর বাকী কয়জন মা ঠাকুরাণীর কাছে উপস্থিত। তাহাদের সঙ্গে জামা গায়ে দেওয়া, জুতা পায়ে দেওয়া, বাবুমত একটা লোক ছিল। সে লোকটা একটা শিশি হাতে করিয়া বিধুমুখীর নাকের কাছে ধরিয়াছিল। বিধুমুখী ধনুষ্টঙ্কার রোগীর মত চাড়া দিয়া উঠিতেছিলেন; আর যেন অজ্ঞান হই। পড়িয়াছিলেন।

এরূপ সময়ে বাহির হইতে রায় বাহাদুর দাদার আওয়াজ সে শুনিতে পায়। রায় বাহাদুর বলিতেছেন,—"বিধুর মা, এত আলো কেন? কি হইয়াছে?" কিন্তু তাঁহাকে উত্তর দেয় কে? বিধুর মা সেই কথা শুনিয়া একবার উঠিবার চেষ্টা করে। তাহাতে ডাকাইতেরা তাহাকে ভয়ানক প্রহার করে। তাহার পর সেই বাবুটার হুকুমে চারিজন লোক দরজা খুলিয়া ফেলে। সেখানে রায় বাহাদুরের সহিত তাহাদের খুব মারামারি হইতেছে, লাঠির শব্দে তাহার এইরূপ মনে হয়। তাহার পর সে চারিজন লোক ফিরিয়া আসিয়া বলে,—"বাহাকে

জব্দ করা তোমার দরকার, তাহাকে একবারে নিকাশ করিয়া দিয়াছি।" বাবুটা বলে, "বেশ করিয়াছ। এখন এই মেয়েমানুষটাকে জুৎ করিয়া লইয়া চল।" ঘরের মধ্য হইতে একখানি কম্বল আনিয়া তাহাতেই বিধুমুখীকে জড়াইয়া লয় এবং তাঁহাকে চারিজনে হাতে ঝুলাইয়া লইয়া যায়। যাইবার সময় বাকী লোক গুলা বিধুর মায় পা ধরিয়া টানিতে টানিতে প্রাচীরের নিকট ফুল-তলায় ফেলিয়া যায়।

এইবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ও পূর্ব্ববৃত্ত জ্ঞাত হইয়া পুলিশ, সাহেব অনুমান করিয়াছেন, সেই বাবুটী হরিচরণ হওয়াই সম্ভব। সে নিশ্চয়ই ক্লোরোফর্ম্ম দিয়া বিধুমুখীকে অজ্ঞান করিয়াছে। তাহারা বিধুমুখীকে লইয়া নিশ্চয়ই নৌকাপথে চলিয়া গিয়াছে এ ব্যাপারের সহজেই কিনারা হইবে এবং বিধুমুখী যদি জীবিত থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাকে পাওয়া যাইবে। কেন না, হরিচরণ কখনই লুকাইয়া থাকিতে পারিবে না। সে যে যে স্থানে ঘুরিবে ফিরিবে পুলিশ তাহার সন্ধান রাখিতে বাধ্য।"

পুলিশের লোকেরা কর্ত্তব্য সমাপনের চেষ্টায় ফিরিতেছে। তাহাদের প্রদত্ত রিপোর্ট মতে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের ইচ্ছানুসারে, সদর হইতে ডাক্তার সাহেব হরকুমার বাহাদুরকে চতুর্থ দিবসে দেখিতে আসিলেন। তিনি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া ও যে দুই ডাক্তার চিকিৎসা করিতেছেন, তাঁহাদের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া স্থির করিলেন, রোগীর জীবনের কোন আশাই নাই। তিনি সদরে ফিরিয়া গিয়া সেই মর্ম্মে রিপোর্ট করিলে, পরদিন প্রাতে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আহত রায়বাহাদুরের মরণকালীন জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

চিকিৎসকেরা আজি হরকুমার বাহাদুরের জীবনের আশা এককালেই ত্যাগ করিয়াছেন, এ পাঁচ দিন তাঁহাদের মনে একটু একটু আশা ছিল; কিন্তু আজি প্রাতঃকালে তাঁহাদের আর কোনই আশা নাই এবং আজিই অপরাহ্নে এই মহদ্ব্যক্তির জীবলীলা চিরদিনের নিমিত্ত সাঙ্গ হইবে, ইহা তাঁহারা নিশ্চয়রূপে অবধারণ করিয়াছেন। ভিতরের ভাব যাহাই হউক, রোগীর বাহিরের ভাব আজি অনেক ভাল। তিনি কয়দিন সংজ্ঞাশূন্য ও নির্ব্বাক্ ছিলেন। গত শেষরাত্রি হইতেই তাঁহার সংজ্ঞা হইয়াছে; এবং তিনি ধীরে ধীরে কথা কহিতেছেন। তাঁহার এই ভাব দেখিয়া সুহাসিনী ও অন্নপূর্ণা মনে মনে প্রসন্ন হইয়াছেন এবং তাঁহার আরোগ্য সম্বন্ধে অনেক আশা করিতেছেন। ডাক্তারেরা এ সকল লক্ষণ শুভ বলিয়া মনে করিতেছেন না এবং যতই বেলা বাড়িতেছে, ততই রোগীর শেষকাল নিকটস্থ হইতেছে বলিয়া স্থির করিতেছেন।

বেলা ৮॥ টার সময় ম্যাজিষ্ট্রেট রোগীর জবানবন্দী স্বহস্তে লিখিয়া লইলেন। রায়-বাহাদুরের সে উক্তি হইতে সে রাত্রির অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘটনা আলোকিত করিবার কোনই সূত্র পাওয়া গেল না। নারীকণ্ঠের আর্ত্তনাদ ধ্বনি শুনিয়া তিনি ভবর চণ্ডীমণ্ডপ হইতে একাকী লাঠিহস্তে বিধুমুখীর দ্বারে উপস্থিত হন। দেখিতে পান বাটীর ভিতরে অনেক আলো জ্বলিতেছে। সদর দরজা বন্ধ, এজন্য ভিতরে যাইতে না পাইয়া তিনি বাহির হইতে চীৎকার করিতে থাকেন। কিয়ৎকাল পরে, কয়েকজন বিকটকায় লোক দরজা খুলিয়া বাহির হয় এবং কোন প্রকার কথাবার্ত্তার পূর্ব্বেই তাঁহার মস্তকে প্রচণ্ড লাঠির আঘাত করে। সেই আঘাতেই তিনি প্রায় অজ্ঞান

হন; তথাপি নিজের হস্তস্থিত লাঠির দ্বারা দুই এক ঘা মারিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু অনেক লাঠি ও ছুরির আঘাতে অবসন্ন হইয়া তিনি ধরাশায়ী হন ও তাঁহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়া যায়। লোকগুলার কাহাকেও তিনি চিনিতে পারেন নাই; কাহারও নাম তিনি জানেন না। তাহার পর কি হইল, তাহাও তিনি বলিতে পারেন না।

রায় বাহাদুরের যখন এই অবস্থা এবং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব যখন তাঁহার জবানবন্দী লিখিয়া লইতেছেন, সেই সময়ে ভবসুন্দরীর বাটীর মধ্যে অঙ্গনে দাঁড়াইয়া একটী পুরুষ ও নারী কথোপকথন করিতেছেন। উভয়েই আমাদের পরিচিত। পুরুষ রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং নারী তাঁহারই পত্নী।

রামচন্দ্র বলিলেন,—"ভাগ্যে হাজার টাকাটা সেই দিনই লওয়া হইয়াছিল, তাই ত রক্ষা। নহিলে আজি তো লোকটা মরিতে বসিয়াছে, আমাদের আর কে টাকা দিত।"

গৃহিণী বলিলেন,—"কিন্তু আসল কাজের যে কিছুই করিয়া লইতে পার নাই ভেরাকান্ত। মাসে মাসে কুড়ি টাকা দিবে বলিয়াছিল, সেটা যদি সেই সময়ে পাকা করিয়া লইতে পারিতে, তবেই তো কাজ হইত।"

রামচন্দ্র বলিলেন,—"তা আমি কি জানি যে, সেই রাত্রিতেই লোকটার এত দুর্গতি হইবে, তাহা হইলে তখনই যাহা হয় করিয়া লইতাম।"

গৃহিণী বলিলেন,—"তুমি নিতান্ত আহাম্মুক তাই একথা বলিতেছ। মানুষের শরীর, কখন কি হয়, তাহা কে বলিতে পারে? কোন্ বুদ্ধিতে যে তুমি মোক্তারি কর তাহা আমি বলিতে পারি না। শুভ কাজ সঙ্গে সঙ্গে শেষ করিতে হয়। এখন দেখ দেখি, তোমার বেকুবিতে আসল কাজটাই নষ্ট হইয়া গেল।"

অনেককেই এরূপ ক্ষেত্রে যাহা করিতে হয়, আমাদের মোক্তার রামচন্দ্রকেও তাহাই করিতে হইল। অর্থাৎ তিনি প্রাণপণে মাথা চুলকাইতে লাগিলেন। সংসারে যতই কৃতিত্ব থাকুক না কেন, পত্নীর নিকট অনেককেই বোকা বনিয়া যাইতে হয় এবং হারি মানিয়া মাথা চুলকাইতে হয়। নিতান্ত অধোবদনে নিরুত্তর না থাকিয়া রামচন্দ্র বলিলেন,—"তা পাকা করিয়া লইলেই বা কি হইত? আমি যদি কর্ম্মে অপারগ হই বা মরিয়া যাই, তবেই তো মাসে কুড়ি টাকা হিসাবে দিবে বলিয়াছিল। তা আমিতো এখন কর্ম্মে অক্ষম হই নাই; আর এখনই মরিয়া যাইব, এমন সম্ভাবনাও কিছু দেখিতেছি না।"

গৃহিণী বলিলেন,—"কে বলিতে পারে তুমি যে কালিই মরিয়া যাইবে না, এমন কথা ঠিক করিয়া কেহই বলিতে পারে না। তখন আমাদের ভাঁড় হাতে করিয়া ভিক্ষা করিতে হইবে। আর তোমার কাজ করা—তার কপালে আগুন। সমস্ত মাস হাঁটাহাঁটী করিয়াও কুড়ি টাকা ঘরে আনিতে পার না। আমি যেই মেয়ে, তাই তোমার সংসার চলে,—"দু'বেলা দু মুঠা ভাত খাইয়া সকলে বাঁচিয়া আছে।"

রামচন্দ্রের সকল কৃতিত্ব এক কথায় উড়িয়া গেল। অনেক সবজজ, অনেক উকীল, অনেক রাজার ন্যায় উপার্জ্জনক্ষম ব্যবসাদার, অনেক দেশবিজয়ী গ্রন্থকার প্রভৃতি অনেকেরই কৃতিত্ব এইরূপ স্থানে এইরূপ এক কথায় উড়িয়া গিয়া থাকে। ক্ষুদ্র রামচন্দ্রের উড়িয়া যাইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? রামচন্দ্র বলিলেন,—"তা তুমি যে লক্ষ্মী তাকি আমি জানি না। এখন মতলব কি বল? লোকটা

তো মরে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার শেষ জবানবন্দী লিখিয়া লইতেছেন। বোধ হয় আর বড় দেরী নাই। এখন তুমি কি করিতে বল?"

গৃহিণী বলিলেন,—"এখন তোমার সেই গুলিখোর ভাইকে গিয়া ধর। এই কথাটা হর কুমারের মুখ হইতে রাজার সম্মুখে যদি কোন উপায়ে সে বাহির করিয়া লইতে পারে, তাহা হইলেও কতকটা উপায় হয়।"

রামচন্দ্র বলিলেন,—"চণ্ডী তো ভোর হইতে কেমন পাগলের মত হইয়া বসিয়া আছে। তাহাকে বলিয়া কোন কাজ হইবে এরূপ বোধ হয় না। তথাপি তাহাকে বলিয়া দেখিতেছি।"

গৃহিণী বলিলেন,—"একটু ভাল করিয়া বলিও। নিজে না পার, আমার নিকট তাহাকে ডাকিয়া আন। যাও, আর দেরী করিও না। যদি লোকটা এখনই মরিয়া যায়। এক তিলও যেন দেরী না হয়।"

রামচন্দ্র প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরলোকাগত।

জবানবন্দী লওয়া শেষ হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রস্থান করিলেন। ডাক্তারেরা আবার রোগীর অবস্থা পরীক্ষা করিয়া রাজাকে একটু অন্তরে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—"রায়বাহাদুর মহাশয়ের জীবন যে আর অধিকক্ষণ থাকিবে, এরূপ আশা নাই। অনুমান অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে সকলই ফুরাইবে।"

রাজা বলিলেন,—"উত্তম। ইহসংসারে খুড়ামহাশয় আমার পরম আত্মীয়। উঁহার তিরোধানের পর যে কয়দিন আমাকে সংসারে থাকিতে হইবে, সে কয়দিন আমার অনেক অসুবিধা হইবে; কিন্তু সুবিধা অসুবিধা উভয়ই তুল্য কথা। আর আমই বা কত-দিন? অনন্ত কালের তুলনায় দীর্ঘায়ু ব্যক্তির জীবনও ক্ষণিক বলিয়াই মনে হয়। সে কথা যাউক, আপনাদের বিদ্যায় ও শাস্ত্রে এরূপ রোগের প্রতিকারার্থ যত ব্যবস্থা আছে, তাহার কোনই ক্রটী হয় নাই তো?"

ডাক্তার বলিলেন,—"কিছু না। অর্থ দ্বারা, বিদ্যাবুদ্ধি দ্বারা প্রতিকারের যত চেষ্টা করা যাইতে পারে, সকলই করা হইয়াছে।"

রাজা বলিলেন,—"বেশ কথা। আমরা কর্ত্তব্যের দাস। ফলাফল চিন্তা না করিয়া কর্ত্তব্যসাধন করাই আমাদের ধর্ম্ম।"

এই সময়ে হরকুমার ডাকিলেন,—"রাজা কোথায়?"

রাজা ব্যস্ততাসহ পাড়তের শয্যা-সমীপে আসিয়া দাঁড়াইলেন। হরকুমার বলিলেন,—"আমি এতক্ষণে বুঝিয়াছি, আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত। একটা অননুভূতপূর্ব্ব ব্যাপার আমি অনুভব করিতেছি। বোধ হইতেছে, তাহাই মৃত্যু। তুমি আমার অপেক্ষাও জ্ঞানী ও ধর্ম্মজ্ঞ। তোমাকে আমার আর বলিবার ও শিখাইবার কিছুই নাই। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সুখে থাক। মা সুহাস, মা অন্নপূর্ণা আমাকে বিদায় দেও।"

বাক্য শেষ হইয়া গেল। অন্নপূর্ণা ও সুহাসিনী মুখে কাপড় দিয়া আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। সকলেই বুঝিলেন, রায় হরকুমার বাহাদুরের জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাণ প্রায়। তবও রোদনধ্বনিতে যোগ দিয়া

কোলাহল বাড়াইয়া ফেলিল; বিমুখ মাও কসুর করিল না। আর একটা স্ত্রীলোক কোথা হইতে আসিয়া রোগীর পদতলে আছড়াইয়া পড়িয়া "বাবাগো" শব্দে কাঁদিয়া উঠিল সেই নারী দাসী।

তবর চণ্ডীমণ্ডপে, তক্তপোষের উপর নিতান্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে, চণ্ডীচরণ একাকী বসিয়াছিলেন। আজি তাঁহার হাতে হুঁকা নাই; মুখেও গড়গড়ার নল নাই; প্রাতে তিনি যে এক তোলা আফিঙ খাইয়া থাকেন, তাহাও আজি খাওয়া হয় নাই। উচ্চ ক্রন্দনের রোল তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিবার কিছু পূর্ব্বে রামচন্দ্র তাঁহার নিকটস্থ হইলেন এবং বলিলেন —"ভায়া যেরূপ শুনা যাইতেছে, তাহাতে বুঝা যাইতেছে, রায়বাহাদুর শীঘ্রই মারা পড়িবেন।"

চণ্ডী কোন উত্তর দিলেন না। নীরবে সেই হৃদয়বিদারক সংবাদ শ্রবণ করিলেন। রামচন্দ্র আবার বলিলেন,—"তাই বলিতেছিলাম কি, আমার বিষয়টা এই সময়ে তুমি যদি একটু পাকা করিয়া লইতে—

চণ্ডী তাঁহার কথা শুনিতেছেন না ও তাঁহার দিকে ফিরিয়াও চাহিতেছেন না দেখিয়া রামচন্দ্র আবার বলিলেন,—"ভায়া তোমাকে বড় অন্যমনস্ক দেখিতেছি। আমার বড় দরকারী কথাটা তুমি একটু মনোযোগ দিয়া শুনিলে ভাল হয়।"

তথাপি চণ্ডীচরণ নিরুত্তর। এই সময়ে বিধুমুখীর ঘর হইতে উচ্চ ক্রন্দনধ্বনি আসিয়া চণ্ডীচরণের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি ক্ষণমে বাণবিদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় চমকিয়া উঠিলেন। তাহার পর সহসা চলিয়া যাইতে যাইতে বলিলেন,—"দাদা রাজবাটীর খাজাঞ্চির নিকট আমার আড়াইশ টাকা জমা আছে; তাহা লইয়া আপনার ছেলেদের দিবেন। আর রাজবাটীতে যে ঘরে আমার বাসা তাহাতে একটা ট্রাঙ্কে শাল পয়দ প্রভৃতি কয়েকখানি কাপড় আছে; তাহা আপনি লইয়া ব্যবহার করিবেন। আপনার অভাগা ভাই জন্মের মত আপনাকে শেষ প্রণাম করিতেছে। বউদিদিকে আমার প্রণাম জানাইবেন, ছেলে মেয়েদের আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি।"

চণ্ডী প্রস্থান করিতেছেন দেখিয়া, রামচন্দ্র বলিলেন,—"তুমি যাও কোথা?"

চণ্ডী বলিল,—"যাই কোথা? এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ দাদা? হরকুমার দাদার মৃত্যুর পর আমি কি আর মুহূর্ত্তও থাকিতে পারি দাদা?"

রামচন্দ্র উঠিয়া চণ্ডীচরণকে উভয় বাহুদ্বারা বেষ্টন করিয়া ধরিলেন। তিনি মনে করিলেন, হতভাগা চণ্ডীচরণ মরিয়া গেলে, বিশেষ ক্ষতি নাই; বরং আপাততঃ আড়াইশ টাকা ও কিছু শালরুমাল লাভ হয়; কিন্তু সে বিষয়ের তো কোনই সাক্ষী নাই। চণ্ডীচরণ যে আমাকে সব দিয়া গিয়াছে, তাহার প্রমাণ কোথায়? এ কথাটা লিখাইয়া লইতে হইবে। বোধ হয়, চণ্ডী বাঁচিয়া থাকায় লাভ বেশী।

রাজার আদেশক্রমে ডাক্তারেরা পুনর্ব্বার পীড়িতের নিকটস্থ হইলেন এবং পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—"হৃদ্‌যন্ত্রের কার্য্য বন্ধ হইয়াছে।"

সুহাসিনী ও অন্নপূর্ণাকে সে স্থান হইতে স্থানান্তরিত করিবার অভিপ্রায়ে রাজা দুই জন পরিচারিকাকে আহ্বান করিলেন, তাঁহারা আসিয়া উভয়কে উঠাইয়া লইল। সহসা এই প্রকোষ্ঠ—যেন দিব্যালোকে পরিপূর্ণ হইয়া পড়িল। পার্শ্বস্থ দ্বারবিশেষের মধ্য দিয়া দ্রুতবেগে এক ব্যক্তি প্রবেশ করিল। সকলে দেখিলেন, তাঁহাদের সকলের সম্মুখে, পীড়িতের

মস্তক সন্নিধানে দীর্ঘকায় জ্যোতির্ম্ময় এক মহাপুরুষ দণ্ডায়মান। তাঁহার মস্তকে বিশাল জটাভার, পৃষ্ঠে এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রচর্ম্ম, বাহুমূলে এক ক্ষুদ্র ঝোলা, হস্তে এক কমণ্ডলু ও লোহার চিম্‌টা, সর্ব্বাঙ্গ ভস্মাচ্ছাদিত, পরিধান কৌপীন ও বহির্ব্বাস।

রাজা উমাশঙ্কর কিয়ৎকালমাত্র সেই তেজঃপুঞ্জ-সন্ন্যাসীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার চরণ-সমীপে নিপতিত হইয়া বলিলেন,—"বাবা, এত দিন পরে এ অধম সন্তানকে আপনার মনে পড়িয়াছে? আজি আমাদের একান্ত শুভানুধ্যায়ী খুড়া মহাশয়ের সহিত পার্থিব সম্বন্ধ শূন্য হইয়াছি। বড় অসময়েই আপনি আমাদিগকে দর্শনদানে চরিতার্থ করিয়াছেন।

এই সন্ন্যাসী উমাশঙ্করের গুরু, আশ্রয়দাতা ও প্রতিপালক, মহাপুরুষ ঘনানন্দ ঘনানন্দের অন্য কোন দিকে দৃষ্টি নাই; অন্য কোন বাক্যও তাঁহার কর্ণগোচর হইতেছে কি না সন্দেহ, তিনি অনন্যমনে সেই মৃত ব্যক্তির বদনের প্রতি চাহিয়া আছেন। কিয়ৎকাল পরে সেই তেজঃদীপ্ত মহাপুরুষ, কমণ্ডলু হইতে কিঞ্চিৎ বারি লইয়া মৃত ব্যক্তির সর্ব্বশরীরে সিঞ্চন করিলেন, এবং ঝোলা হইতে একটা শ্বেতবর্ণ চূর্ণপদার্থ বাহির করিলেন এবং তাঁহার কিয়দংশ মৃতের মুখগহ্বরে সাবধানে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। তাহার পর সেই চূর্ণ কিয়ৎপরিমাণে হৃদয়প্রদেশে মর্দ্দন করিলেন। তাহার পর আর একটু লইয়া মৃত ব্যক্তির ললাটে চরণতলে ও করপল্লবে প্রলিপ্ত করিলেন। রোদন ও দীর্ঘনিশ্বাস স্তব্ধ হইল। সকলেই এই সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের ক্রিয়াকলাপ দেখিবার নিমিত্ত নিরুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

ঘনানন্দ সঙ্কেতে সকলকে নির্ব্বাক্ থাকিতে বলিলেন। স্বয়ং নিঃশব্দে যোগীর পার্শ্বে পৃষ্ঠস্থিত ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিস্তার করিলেন এবং তাহার উপর পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া ধ্যানে মগ্ন হইলেন। তাঁহার লোহার চিম্‌টার এক প্রান্ত মৃতের বক্ষে ও অপর প্রান্ত স্বকীয় চরণে সংলগ্ন করিয়া দিলেন। অতি অল্পক্ষণেই তাঁহার কলেবর এতই জ্যোতিষ্মান হইয়া উঠিল যে, তাহা হইতে যেন অগ্নি নিঃসৃত হইবে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সকলে একাগ্রচিত্তে ও নির্ব্বাক্‌ভাবে এই দৃশ্য দর্শন করিতে লাগিলেন।

রায়বাহাদুরের মৃত দেহের নিরুদ্ধ হৃদ্‌যন্ত্র আবার স্পন্দিত হইতে লাগিল। সকলেই দেখিতে পাইলেন, রায় বাহাদুরের বক্ষস্থিত ও ঘনানন্দ স্বামীর দেহ সংলগ্ন সেই লোহার চিম্‌টা নত ও উন্নত হইতেছে। কিয়ৎকাল পরে হরকুমারের বাম হস্ত স্পন্দিত হইতে লাগিল এবং তিনি ধীরে ধীরে সেই হস্ত দ্বারা সেই লোহার চিম্‌টা ধারণ করিলেন। কিন্তু চিম্‌টা তুলিতে বা নড়াইতে পারিলেন না। তাঁহার নিমীলিত নয়ন সহসা খুলিয়া গেল; তিনি মস্তক ফিরাইয়া উভয় পার্শ্ব দেখিতে লাগিলেন। রাজা, সুহাসিনী, অন্নপূর্ণা, দাসী ভব প্রভৃতি সকলকেই তিনি দেখিতে পাইলেন। তাহার পর সেই দিব্য-জ্যোতি সম্পন্ন ঘনানন্দ স্বামীর মূর্ত্তি তাঁহার নয়নে পড়িল। তিনি উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঘনানন্দ তখনও ধ্যানমগ্ন। হরকুমার একবার চেষ্টা করিলেন—কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। রাজা বা অপর কেহ তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন না। কেন না, ঘনানন্দ স্বামীর আদেশ না পাইলে এ অসাধ্য কর্ম্মে ও অলৌকিক

কার্য্যের মধ্যে কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ করিতে তাঁহাদের সাহসে কুলায় না। হরকুমার আবার উঠিবার চেষ্টা করিলেন। সেবার তাঁহার কামনা পূর্ণ হইল। চিমটা তাঁহার দেহ হইতে সরিয়া পড়িল। হরকুমার উঠিয়া বসিলেন, বসিয়াই তিনি ঘনানন্দের চরণ উভয় হস্তে ধারণ করিলেন এবং বলিলেন—"এত দিন পরে,—এই অসম্ভাবিত স্থানে, মরণের পর আপনাকে দেখিতে পাইলাম।"

সন্ন্যাসী নিরুত্তর। ধীরে ধীরে তাঁহার দেহ যে অত্যধিক জ্যোতিষ্মান্ হইয়াছিল, তাহা অপগত হইতে লাগিল। তাঁহার স্বাভাবিক জ্যোতি তাঁহার দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকিল। তখন তিনি স্বকীয় বাহুদ্বয় একবার ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিলেন, একবার স্বকীয় দেহ সম্মুখে ও পশ্চাতে নত করিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে বহুক্ষণ ধরিয়া নিশ্বাসবায়ু নিঃসৃত হইতে লাগিল। তাহার পর তিনি চক্ষু উন্মীলন করিয়া বলিলেন,—"জয় সচ্চিদানন্দ হরি।"

রাজা উমাশঙ্কর ও অন্যান্য সকলে "জয় সচ্চিদানন্দ হরি।" শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সেই রব অমৃতধারা বর্ষণ করিতে করিতে বহু দূরে প্রধাবিত হইল।

ঘনানন্দ জিজ্ঞাসিলেন,—"বৈবাহিক মহাশয়, কুশলে আছেন ?"

হরকুমার বলিলেন,—"যখন প্রভু সম্মুখে তখন নিশ্চয়ই আমাদের পরম কুশল। কিন্তু এ স্থানে প্রভুর আগমন হইল কি প্রকারে ?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"যোগেশ্বরী দেবীর অনুরোধে, তাঁহার পুত্র পুত্রবধূ প্রভৃতি সকলকে দেখিবার নিমিত্ত, আমি কাশীধাম ত্যাগ করিয়া অদ্যই প্রাতে সোণাপুর আসিয়াছিলাম। সেখানে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"তাহার পর এখানে আপনি যাহা করিয়াছেন, তাহাতে আমার পক্ষে বিস্ময়ের কথা কিছুই নাই। ইহার অপেক্ষা গুরুতর কার্য্য সাধনে যাঁহাকে সক্ষম বলিয়া জ্ঞাত আছি, তাঁহার এ কার্য্য দেখিয়া বিস্মিত কেন হইব ? অন্নপূর্ণা, সুহাসিনি, প্রণাম কর। চরণের ধূলা অঙ্গে প্রলিপ্ত করিয়া পবিত্র হও।" খোকাকে আনিয়া ঐ পদতলে ফেলিয়া দেও।"

অন্নপূর্ণা ও সুহাসিনী আন্তরিক ভক্তির সহিত সেই দেবচরণে প্রণাম করিলেন ও তাঁহার চরণধূলা লইয়া মস্তকে ধারণ করিলেন। দাসীরা খোকারাজাকে আনিয়া উপস্থিত করিল।

ঘনানন্দ বলিলেন,—"নাতি,—নাতি বড়ই প্রিয় সামগ্রী। দেও, আমি সন্তান ক্রোড়ে ধারণের সুখ অনুভব করি।"

তখন সেই সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষ উমাশঙ্করের সেই কুমারকে লইয়া বক্ষে ধারণ করিলেন। শোভার সীমা থাকিল না। ঘনানন্দ খোকারাজাকে বক্ষে রাখিয়া বলিলেন,—"আর এ স্থানে বোধ হয় তোমাদের কোনই প্রয়োজন নাই, তোমরা এখন স্বচ্ছন্দে সোণাপুর গমন কর।"

সন্ন্যাসীর ক্রোড় হইতে শিশুকে গ্রহণ করিয়া রাজা সবিনয়ে বলিলেন,—"খুড়া মহাশয়! খুড়া মহাশয় যাইতে পারিবেন কি ?"

ঘনানন্দ হাসিয়া বলিলেন,—"কেন বাবা তোমার খুড়া মহাশয়ের কি হইয়াছে ? উঁহার দেহে চিরদিনই অসুরের ন্যায় শক্তি, এখনও তাহাই আছে। তবে দেহে কয়েকখানা ক্ষত আছে। তা বৈবাহিক মহাশয় আমার এই

কমণ্ডলুর একটু জল উহাতে মধ্যে মধ্যে প্রলেপ দেও। আশা করি, সচ্চিদানন্দ প্রভুর কৃপায় দুই তিন বার প্রলেপ দিলেই ক্ষত শুকাইয়া যাইবে। আমি এক্ষণে বিদায় হই।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"এত শীঘ্র যাইবেন? আসিলেন যদি, দুই এক দিন আমাদের সহিত অবস্থান করিবেন না কি?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"না। গৃহমধ্যে ও সুখী লোকের সহিত একদিনও অবস্থান করিতে আমার সাধ্য নাই। তোমরা আজি সোণাপুর যাও, কল্য তথায় আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।"

অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসিলেন,—"মা কোথায়? তিনি কি আর দয়া করিয়া আমাদিগকে দর্শন দিবেন না?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"তিনি কোথায় তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না; কারণ তিনি কখন কোথায় থাকেন, তাহা কে ঠিক করিতে পারে? আমি তাঁহাকে আসিবার পূর্ব্বে কাশীধামে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে দেখিয়াছি। আর তাঁহার দর্শনলাভের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? তিনি ইচ্ছাময়ী—ইচ্ছা হইলেই তিনি দর্শন দিবেন। আপাততঃ তাঁহার ইচ্ছায় বাধ্য হইয়া আমি এদেশে আসিয়াছি।"

তাহার পর সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তথায় হরকুমার বাবুর শিয়রে একটী শ্বেতপাথরের গ্লাস ছিল। ঘনানন্দ কমণ্ডলুর সমস্ত বারি সেই গ্লাসে ঢালিয়া রাখিলেন। তাহার পর চারিদিকে হস্ত বিস্তার করিয়া উপস্থিত সকলকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে তিনি ধীরে ধীরে পশ্চাতে হাঁটিয়া দ্বারের অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। বাক্য-রহিত হইয়া, কেহ কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই, সেই মহাপুরুষ অন্তর্দ্ধান হইলেন। যেন তাঁহার সেই কলেবর, কোন অলৌকিক শক্তি-বলে, শূন্যে মিশিয়া গেল।

সুহাসিনী বলিলেন,—"দাদা, দেখ দেখ, ঠাকুর কোথায় গেলেন!"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"নিষ্প্রয়োজন; উনি দেখা না দিলে, দেখা পাওয়া অসম্ভব। কল্য সোণাপুরে নিশ্চয়ই উঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। তোমরা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও। আমি বাহিরে, ডাক্তার ও অন্যান্য লোককে, খুড়া মহাশয়ের আরোগ্য সংবাদ জানাইতে যাই।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কল্পতরু।

হুগলী জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট জেনাকিন্স সাহেব অপরাহ্ণ ৩টার সময় রাজা উমাশঙ্করের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। রাজবাটীর সদর দরজায় কয়েকজন কনেষ্টবল দণ্ডায়মান আছে এবং রাজার একখানি জুড়ি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে পৌঁছাইয়া দিবার নিমিত্ত প্রস্তুত রহিয়াছে।

উপরের সর্ব্বোপকরণে সজ্জিত প্রকাণ্ড বৈঠকখানায় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসন গ্রহণ করিয়াছেন; রাজা উমাশঙ্কর ও রায় বাহাদুর হরকুমার ব্যতীত তথায় অন্য কোন লোক নাই। রায় বাহাদুরকে লক্ষ্য করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন,—"কিন্তু যাই বলুন, আপনার বাঁচিয়া উঠা ব্যাপারটা বড়ই অদ্ভুত। আমি যখন আপনার শেষ জবানবন্দী লই, তখনই বুঝিয়াছি, বড় ঘোর অপরাধ, যিনিই আপনি

বাঁচিয়া থাকিবেন। ডাক্তারেরাও আপনার বাঁচিবার কোন আশা আছে বলিয়া মনে করেন নাই। এরূপ জীবনলাভের কথা আর কখন শুনা যায় না।”

হরকুমার বলিলেন,—“আমাদের দেশে বলিয়া থাকে, যাহার দানা-পানি না ফুরায় কিছুতেই সে মরে না। আমার দানা-পানি এখনও আছে সাহেব।”

সাহেব বলিলেন,—“সে কথা বাদ দিউন। আমি শুনিয়াছি, আপনার মৃত্যুর পর এক সন্ন্যাসী আসিয়া আপনাকে বাঁচাইয়া দিয়াছেন। এ কথা কি সত্য ?”

রায় বাহাদুর বলিলেন,—“আপনার কিরূপ বোধ হয় ?”

সাহেব বলিলেন,—“কেহ মরা বাঁচাইতে পারে, ইহা কখনই জ্ঞানবান্ ও বুদ্ধিমান লোকে বিশ্বাস করিতে পারে না। ঘটনাটা কি, আপনি বলুন।”

রায় বাহাদুর বলিলেন,—“জ্ঞানবান্ ও বুদ্ধিমান লোকে যাহা বিশ্বাস করিতে পারে না, সেরূপ কাণ্ড কখনই হইতে পারে না। অতএব আমি আর বলিব কি ? কিন্তু এখন এ কথা ছাড়িয়া দিয়া, আপনি বলুন দেখি, বিধুমুখীর সন্ধান কি হইল ?”

সাহেব বলিলেন'—“পুলিশ সে জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছে। এখনও কোন কিনারা হয় নাই।”

হরকুমার বলিলেন,—“সাহেব আমাকে ক্ষমা করিবেন; আপনাদের পুলিশের চেষ্টায় কখনও কোন কিনারা হইবে বলিয়া আমার বোধ হয় না। যাহারা চোর ধরিয়া না দিলে, কিছুই করিতে পারে না, দুই টাকা পাইলেই যাহাদের সুর ফিরিয়া যায়, যাহারা অকারণ নিরীহ লোকের উপর অত্যাচার করিবার অধিকার পাইয়াছে বলিয়া উল্লাস করে, তাহারা এরূপ ব্যাপারের কিনারা করিতে পারিবে ইহা বিশ্বাস হয় না।”

সাহেব বলিলেন,—“পুলিশ সম্বন্ধে আমারও কতকটা ঐরূপ ধারণা বটে; কিন্তু তাহারা যে এ ব্যাপারের কিনারা করিতে পারিবে, তাহার ভুল নাই। স্বয়ং কমিশনার সাহেব ও পুলিশের ইনস্পেক্টর জেনেরল এই বিষয়ের জন্য তাগিদ করিতেছেন; আমি নিজেও ইহার তদ্বিরে লাগিয়া আছি। কেবল পুলিশের উপর নির্ভর করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত নহি। আপনি সন্ন্যাসীর কথাটা—আপনার বাঁচার গল্পটা ঠিক করিয়া না বলায় আমি দুঃখিত হইতেছি।”

হরকুমার বলিলেন,—“আবার যখন আপনি সেই কথা তুলিতেছেন, তখন বুঝিতেছি তাহা জানিবার জন্য আপনার বড়ই কৌতূহল জন্মিয়াছে। কিন্তু সাহেব, ঠিক কথা বলিলে, আপনারা বিশ্বাস করিতে পারিবেন কি ? আমরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন অধম পৌত্তলিক। আমরা বিশ্বাস করি, দেবতা দয়া করিলে সবই করিতে পারেন; দেবতার পক্ষে অসাধ্য কিছুই নাই। আমি মরিয়া গিয়াছিলাম সত্য; তাহার পর এক সন্ন্যাসীর কৃপায় আবার জীবন-লাভ করিয়াছি, ইহাও সত্য।”

সাহেব বলিলেন,—“বড়ই বিস্ময়ের কথা! আপনার ন্যায় বিদ্বান্ ও বিচক্ষণ লোকের মুখে এরূপ কথা শুনিয়া বিস্ময়ের পরিমাণ আরও বাড়িয়া যাইতেছে। সন্ন্যাসী তো একটা মানুষ। মানুষ কখন এমন কর্ম্ম করিতে পারে কি ?”

হরকুমার বলিলেন,—“সন্ন্যাসী মানুষ বটেন; কিন্তু মানুষ কখন কখন জ্ঞান-বলে দৈব-শক্তি লাভ করিয়া থাকেন এবং দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আমরা যে সন্ন্যাসীর

কথা বলিতেছি, তিনি এক সময়ে মানুষ ছিলেন ; কিন্তু এখন তিনি দেবতা।"

সাহেব বলিলেন,—"মানুষ ঐশ্বরিক শক্তি লাভ করিতে পারে, ইহা বিশ্বাস করিতে ভয় হয়—বোধ হয় এরূপ কথা মনে করিলে পাপও হয়। আপনি কেন এরূপ কথা বলিতেছেন, তাহা বুঝিতেছি না।"

হরকুমার বলিলেন,—দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজ জাতি এক প্রকার জীব-জন্তু-বিশেষ ছিলেন, এ কথা বোধ হয়, আপনি সহজেই স্বীকার করিবেন। এখন ইংরাজ জাতি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বের একজন ইংরাজ, এখন সহসা সমাধি হইতে উত্থিত হইলে, নিশ্চয়ই বর্ত্তমান ইংরাজ জাতির ক্ষমতা ও সম্পদ্ দেখিয়া তাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়াই মনে করিবেন সন্দেহ নাই। ইংরাজ জাতির এই উন্নতি—এই দেবত্ব কেবল জ্ঞান, বিদ্যা ও বুদ্ধি-বলেই সাধিত হইয়াছে। জ্ঞান-বলে কতদূর উন্নতি হইতে পারে, তাহা ভাবিলে বিস্ময়বিষ্ট হইতে হয়। যখন আপনারা জ্ঞান-বলে এত উন্নতি লাভ করিয়াছেন, তখন উহার অপেক্ষা আর একটু অগ্রসর হইতে পারিলে, আমরা যাহা বলিতেছি তাহাও সম্ভব বলিয়া স্বীকার ও বিশ্বাস করিতে পারিবেন।"

সাহেব বলিলেন—"এ সম্বন্ধে আপনার সহিত অনেক তর্ক ও বিচারের প্রয়োজন আছে। স্থূলতঃ আমি আপনার কথা বুঝিতে পারিয়াছি। আজি আমার আর সময় নাই। সংক্ষেপে একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি। সে সন্ন্যাসীঠাকুর কোথায় থাকেন?"

হরকুমার বলিলেন,—"তাঁহাকে যখন আমরা দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করি, তখন তাঁহার আর থাকিবার স্থান কি? তিনি সর্ব্বব্যাপী—সর্ব্বত্র তাঁহার স্থান। তথাপি তিনি মনুষ্য; এই জন্য মনুষ্যরূপে বাস করিবার তাঁহার একটা নির্দ্ধারিত স্থান আছে। সে স্থান কাশী।"

সাহেব বলিলেন,—"আপনি বিরক্ত হইবেন না; এ সম্বন্ধে অন্য সময়ে আমি আপনাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিব। আপাততঃ আমি যে জন্য রাজার নিকট আসিয়াছি তাহাই ব্যক্ত করিতেছি। রাজা বাহাদুর, আপনি গত বুধবারের কলিকাতা গেজেট পাঠ করিয়াছেন কি?"

রাজা বলিলেন,—"কোন কোন অংশ পাঠ করিয়াছি। মিউনিসিপাল আইনের যে পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহার পাণ্ডুলিপি আমি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছি।"

সাহেব বলিলেন,—"সে সম্বন্ধে আপনার অভিমত জানিতে পারিলে হয়তো গবর্ণমেণ্টের উপকার হইত; কিন্তু এখন তাহার সময় নহে। দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে গেজেটে যে প্রস্তাব প্রচারিত হইয়াছে, তাহা আপনি দেখিয়াছেন কি?"

রাজা বলিলেন,—"জেলায় জেলায় দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ কমিটি গঠনের প্রস্তাব হইয়াছে। প্রত্যেক কমিটির সভ্য, সভাপতি, সম্পাদক প্রভৃতির নাম গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।"

জেনকিন্স বলিলেন,—"এবারকার দুর্ভিক্ষ বড়ই ভয়ানক আকার ধারণ করিবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। মধ্য ভারতে ও দক্ষিণ ভারতের কিয়দংশে বড়ই ভয়ানক কাণ্ড আরম্ভ হইয়াছে। অন্নাভাবে তথায় বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে এবং এক এক পরিবার একই দিনে মরিয়া রহিয়াছে দেখা যাইতেছে। অনেক লোকই কেবল কঙ্কালে পরিণত হইয়াছে এবং বোধ হয় অতি অল্প কালে তাহারা কালগ্রাসে প্রবেশ করিবে।"

রাজা বলিলেন,—"বড়ই শোচনীয় বৃত্তান্ত ; বড়ই চিন্তার বিষয় !"

জেনকিনস্ বলিলেন,—"এক্ষণে বঙ্গদেশে যাহাতে ঐরূপ কাণ্ড না ঘটে, এই সময় হইতেই তাহার উপায় অবলম্বন করা উচিত। প্রত্যেক জেলার ধনবান্ ও পদস্থ ব্যক্তিগণের সময় থাকিতে উপায় চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক।"

রাজা বলিলেন,—"আপনারা এ বিষয়ে কিরূপ অভিপ্রায় স্থির করিয়াছেন ?"

সাহেব বলিলেন,—"ছোট লাট সাহেব স্থির করিয়াছেন যে, প্রত্যেক জেলার প্রধান প্রধান লোক সকল মিলিত হইয়া দুর্ভিক্ষ-সমিতি গঠন করুন এবং সেই সভা সাধ্যমত অর্থ সংগ্রহ করিয়া নিজের জেলার দুঃখী ও অন্নহীন ব্যক্তিগণকে সাহায্য করিতে আরম্ভ করুন। কলিকাতায় সেণ্টাল কমিটি স্থাপিত হইয়াছে। সে কমিটী সম্ভবতঃ অধিক টাকা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন। সেই কমিটী সে টাকাও আবশ্যক বুঝিয়া, জেলার কমিটীর হস্তে অর্পণ করিবেন।"

রাজা বলিলেন,—"এ সকল প্রস্তাব বড়ই উত্তম। এক্ষণে মহাশয় আমাকে কি করিতে বলেন ?"

সাহেব বলিলেন,—"আপনাকে ছোটলাট হুগলী জেলার দুর্ভিক্ষ সমিতির সভাপতি করিয়াছেন, ইহা বোধ হয় আপনি দেখিয়াছেন ঐ সভার উদ্দেশ্য যাহাতে সুসিদ্ধ হয়, আপনাকে কায়মনোবাক্যে তাহার উপায় করিতে হইবে।"

রাজা বলিলেন,—"এ সম্বন্ধে আপনার অনুরোধ নিষ্প্রয়োজন। তথাপি আপনি যে আমাকে আমার এই কর্ত্তব্যকর্ম্ম স্মরণ করাইয়া দিবার নিমিত্ত কষ্ট স্বীকার করিয়া এত দূর আসিয়াছেন, এজন্য আমি আপনাকে বার বার ধন্যবাদ দিতেছি ও আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। আমি সভার কার্য্যে বিশেষ মনোযোগী হইব, এ কথা বলাই বাহুল্য।"

সাহেব বলিলেন,—"আপনার বাক্যে বড়ই পরিতুষ্ট হইলাম। আমরা আপনার নিকট যেরূপ সহায়তার প্রত্যাশা করি, তাহা বলিতেছি। আপনি দুর্ভিক্ষ-নিবারণার্থ পঞ্চাশ হাজার টাকা সাহায্য করিবেন ইহাই আমাদের প্রার্থনা। আমরা স্থির করিয়াছি, লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিলে এ জেলার লোক কোন প্রকারেই দুর্ভিক্ষ জনিত কষ্ট অনুভব করিতে পারিবে না। আপনি তাহার মধ্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিলে, যত্ন করিয়া আর পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে।"

রাজা বলিলেন,—"ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া দুর্ভিক্ষের প্রকোপ দৃষ্ট হইতেছে। আপনি পূর্ব্বেই বলিয়াছেন, মধ্যভারতে ও দক্ষিণ ভারতে কোন কোন স্থানে বড়ই ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। সে সকল স্থানের ক্লিষ্ট ব্যক্তিগণও আমাদের ভাই। কেবল হুগলী জেলায় দুর্ভিক্ষ লইয়া ব্যস্ত থাকিলে চলিবে কেন ?"

সাহেব বলিলেন,—"এইরূপে প্রত্যেক জেলার সমিতি যদি চেষ্টাবান্ হন, তাহা হইলে বঙ্গের কোন স্থানেই দুর্ভিক্ষ হেতু মনুষ্য বিশেষ কষ্ট পাইবে না ; তাহা হইলে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।"

রাজা বলিলেন,—"কিন্তু কেবল বঙ্গদেশ রক্ষা করিলেই ভারত রক্ষা করা হইবে না ; কেবল আপনার জেলা রক্ষা করিলেই বঙ্গদেশ রক্ষা করা হইবে না ; কেবল আপনার

গ্রাম রক্ষা করিলেই আপনার জেলা রক্ষা করা হইবে না; কেবল আপন পরিবার ও আশ্রিতগণকে রক্ষা করিলেই আপনার গ্রাম রক্ষা করা হইবে না। আমার বিবেচনায় দুর্ভিক্ষহইতে দেশকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কার্য্যক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ করা অনুচিত। সমস্ত ভারতবর্ষই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং সমস্ত দেশকেই রক্ষা করিবার চেষ্টা করা উচিত।"

সাহেব বলিলেন,—"আপনার কথা ঠিক। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্র তত দূর বিস্তৃত করিতে আমাদের সামর্থ্য কই? আমরা লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিতে কতই কষ্ট হইবে বলিয়া চিন্তাকুল হইতেছি; কিন্তু সমস্ত ভারতবর্ষের জন্য ব্যবস্থা করিতে হইলে হয়তো কোটী কোটী টাকার প্রয়োজন হইবে। তাহার উপায় কোথায়?"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"তাহার উপায় হইবে না, এ কথা বলা যায় না। এরূপ বিপদে দেশের ধনবান্‌গণ সাহায্য করিলে টাকা সংগ্রহ করা অসম্ভব বলিয়া মনে করিবার কোনই কারণ নাই। সে যাহা হউক, আমি বলিতেছি, আপনারা যেরূপ সমিতি গঠনের প্রস্তাব করিতেছেন তাহা করুন। আমাকে সেই সভার সভাপতি করিয়া আপনারা যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমি সেই সমিতির কার্য্যে যথাসাধ্য পরিশ্রম ও যত্ন করিতে সম্মত আছি। কিন্তু হুগলী জেলায় এখনও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় নাই; বঙ্গদেশেও তাহার ভয়ানক হুহুঙ্কারধ্বনি এখনও উপস্থিত হয় নাই। আচিরে প্রদেশে তাহার আগমন সম্ভাবিত। এই সম্ভাবিত বিপদ নিবারণের জন্য আমরা অর্থ-বল লইয়া বসিয়া থাকিব; অথচ অন্যদিকে আমাদের ভাই ভগ্নীরা দলে দলে দুর্ভিক্ষের আক্রমণে প্রাণ হারাইতেছে এবং দুর্ভিক্ষ অন্যান্য স্থানে ভয়ানক আকার ধারণ করিয়া নৃত্য করিতেছে! আমরা তাহার প্রতীকারের চেষ্টা না করিয়া, বঙ্গদেশের সম্ভাবিত বিপদ নিবারণের নিমিত্ত স্থিরভাবে অপেক্ষা করিব, এবং তাহা হইলেই আমাদের কর্ত্তব্যের শেষ সীমা বোধ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিব, এরূপ সঙ্কীর্ণ নীতির আমি পক্ষপাতী নহি।"

সাহেব জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনি তাহা হইলে কি চাহেন?"

রাজা বলিলেন,—আমি আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, ভারতের দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থান সমূহে সাহায্য-ভাণ্ডার খুলিতে বাসনা করি।"

সাহেব বলিলেন,—"গবর্ণমেণ্ট তাহারই আয়োজন করিতেছেন।"

রাজা বলিলেন,—"উত্তম কথা। আমরাও হয় সেই অনুষ্ঠানের সহায়তা করিব বা স্বাধীন ভাবে স্থানে স্থানে স্বতন্ত্র অন্নসত্র প্রতিষ্ঠা করিব, ইহাই আমার মনের অভিপ্রায়।"

সাহেব বলিলেন,—আপনার মনের ভাব আমি প্রণিধান করিয়াছি। আমি বাঙ্গালার ছোটলাটের নিকট আপনার এই অভিপ্রায় জানাইব মনে করিয়াছি। সে সঙ্গে অবশ্য ইহাও বিজ্ঞাপন করিব যে, জেলার সমিতিতে আপনি হৃদয়ের সহিত কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছেন। অবিলম্বে ভারতের দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানসমূহে গবর্ণমেণ্টের অনুষ্ঠিত সাহায্য-ভাণ্ডারের সহিত একযোগে, অথবা স্বাধীন ভাবে অন্নসত্র প্রতিষ্ঠা করাই আপনার বাসনা। দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ আপনি কত টাকা দিবেন স্থির করিয়াছেন, তাহাও আমার জানিতে পারা আবশ্যক। লাট সাহেবকে আপনার প্রস্তাবের সহিত সে কথাও জানান উচিত।

গবর্ণমেণ্টে আপনার যেরূপ মান এবং আপনি যেরূপ বিস্তারিত ব্যাপারের প্রস্তাব করিতেছেন, তাহাতে পঞ্চাশ হাজার টাকা সাহায্য না করিলে কখনই ভাল দেখাইবে না।"

রাজা একটু চিন্তা করিতে লাগিলেন। সাহেব তাঁহাকে চিন্তাকুল দেখিয়া বলিলেন,—"পঞ্চাশ হাজার টাকা বড় বেশী বলিয়া আপনি মনে করিতেছেন কি? বাস্তবিক একজন মনুষ্য, অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইলেও, একটা কার্য্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করিতে অসুবিধা বোধ করিতে পারেন। যদি এত টাকা দিতে আপনার ঠিক সুবিধা না হয়, তাহা হইলে আপনি যাহা সুবিধা বোধ করেন, তাহাই প্রস্তাব করুন। গবর্ণমেণ্ট সাদরে তাহাই গ্রহণ করিবেন। আমি এজন্য কোন জেদ করিতেছি না জানিবেন।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"পঞ্চাশ হাজার টাকা অনেক এবং তাহা দিতে আমার অসুবিধা হইবে বলিয়া আমি চিন্তা করিতেছি না। আমি ভাবিতেছি এরূপ বৃহদ্ব্যাপারে এত কম টাকা দিলে চলিবে কেন? আমি এজন্য কত টাকা ব্যয় করিব মনে করিয়াছি তাহা মহাশয়কে বলিতেছি। রাজবাটীর তহবিলে সম্প্রতি ছয় লক্ষ টাকা মজুত আছে। সেই টাকা সমস্তই আপাততঃ এই কার্য্যে খরচ হয়, ইহাই আমার ইচ্ছা। যখন তাহার পর আবার টাকার অপ্রতুল হইবে, তখন আমাদের তহবিলে যে সাড়ে চারি লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ আছে, তাহা বিক্রয় করিয়া এই জন্য ব্যয় করিতে হইবে। সুতরাং আপাততঃ সাড়ে দশ লক্ষ টাকা দিবার নিমিত্ত আমি প্রস্তুত হইয়াই রহিয়াছি। কিন্তু এ বিষম বিপদ সাড়ে দশ লক্ষ টাকায় নিবারিত হইবে কি? আপনি যে কার্য্যের জন্য কোটী কোটী টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন, আমার বিবেচনায় তাহাতে বাস্তবিকই অনেক কোটী টাকা লাগিবারই সম্ভাবনা। যদি চেষ্টা করিয়া তত টাকা না পাওয়া যায়, তাহা হইলে সাড়ে দশ লক্ষ টাকা ফুৎকারে উড়িয়া যাইবে, অথচ কার্য্য কিছুই হইবে না। তখন আমার স্ত্রীর অলঙ্কার, রাজবাটীর আসবাব, গাড়ি, ঘোড়া, হাতী সকলই বিক্রয় করিতে হইবে। তাহাতে অন্ততঃ দুই লক্ষ টাকা হইবে। সে টাকাও এ কার্য্যে ব্যয় করিতে হইবে।"

সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া, হস্তদ্বয় বিস্তার করিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন,—"বলেন কি? আপনি দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য প্রথমে ছয়, পরে সাড়ে চারি লক্ষ টাকা সত্যই দান করিবেন?"

রাজা বলিলেন,—"ইহাতে আপনি এত আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতেছেন কেন?"

সাহেব এ কথার কোন উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"আর তাহার পর গাড়ি, ঘোড়া, রাণীর অলঙ্কার প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া আরও দুই লক্ষ টাকা দিবেন?"

রাজা বলিলেন,—"কেন দিব না? সাহেব, ধন রাখিয়া কি ফল? যদি এরূপ সময়ে আপনার লোকের দুঃখ নিবারণের জন্য তাহা ব্যয় না করা যায়, তাহা হইলে কখন তাহা ব্যয় করিব? সে কথা যাউক, যে প্রয়োজনীয় কথা চলিতেছে, তাহা অগ্রে শেষ করা আবশ্যক। যদি এইরূপে প্রায় বারো লক্ষ টাকা খরচ করিয়াও কোন কাজ না হয়, তখন কাজেই আমার জমিদারী বিক্রয় করিতে হইবে। এই সম্পত্তির আয় সাত লক্ষ টাকা। সাত লক্ষ টাকার সম্পত্তি বিক্রয় করিলে অন্ততঃ এক কোটী টাকা হইতে

পারে। সে সমস্ত টাকাই দুর্ভিক্ষ নিবারণের নিমিত্ত ব্যয় করিতে হইবে।'

সাহেব এখনও দণ্ডায়মান; এখনও অতীব বিস্ময় সহকারে রাজার মুখের প্রতি তিনি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছেন। রাজা নিরস্ত হইলে, সাহেব বলিলেন,—"আপনার কথা শুনিয়া, আমার মনে তিনটী কথার উদ্ভব হইয়াছে। হয় নানাপ্রকার চিন্তায় বা অন্য কারণে আপনার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে; না হয় স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের প্রতি আপনি একান্ত মমতা শূন্য; না হয় ধন কি অপরিসীম আদরের বস্তু তাহা আপনি জানেন না।"

রাজা ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিলেন,—"আপনার কোন কথাই ঠিক নহে। আমার মস্তিষ্ক একটুও বিকৃত হয় নাই; এ সকল প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইবার পূর্ব্বে আপনি আমার সহিত অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়াছেন; তন্মধ্যে মস্তিষ্ক বিকারের কোন না কোন লক্ষণ অবশ্যই দেখিতে পাইতেন। আমার স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের প্রতি যথেষ্ট মমতা আছে; কিন্তু সে মমতার প্রাবল্যে পৃথিবীর তাবৎ লোকের চিন্তা বিসর্জ্জন দিতে হইবে, এরূপ স্বার্থময় ভাব কখনই আমার হৃদয়ে নাই। ধন যে অপরিসীম আদরের বস্তু তাহা আমি বিলক্ষণ জানি; কেন না কেবল ধনই অনেক সময়ে দুঃখীর দুঃখ নিবারণে সমর্থ।"

সাহেব বলিলেন,—"আপনি এ সম্বন্ধে আপনার আত্মীয়গণের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা বলিতে হয় বলিবেন।"

রাজা বলিলেন,—"এ সংসারে আমার প্রধান আত্মীয় আমার সম্মুখেই বসিয়া আছেন যদি আমার প্রস্তাবে একটুও অসম্মতি থাকিত, তাহা হইলে খুড়া মহাশয় নিশ্চয়ই আপত্তি করিতেন।"

সাহেব বলিলেন,—"রায় বাহাদুর, আপনিও কি রাজা বাহাদুরের এই অসঙ্গত প্রস্তাবের অনুমোদন করিতেছেন?"

হরকুমার বলিলেন,—"আমি রাজার এ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিবার কোনই কারণ দেখিতেছি না। রাজা যদি নিজ সম্পত্তি এইরূপে দান করিয়া সন্তোষলাভ করেন, কেন আমি তাহাতে বাধা দিব?"

সাহেব বলিলেন,—"রাজা বাহাদুর, আপনি এ বিষয়ে রাণীর সহিত পরামর্শ করিবেন।"

রাজা বলিলেন,—"কয় দিবস পূর্ব্বে তাঁহার সহিত আমার এ সম্বন্ধে কথা হইয়াছিল। তিনি বলেন, যথাসর্ব্বস্ব এই কার্য্যে ব্যয় করিতেই হইবে।"

সাহেব বলিলেন,—"তবে আমি নিরুপায়। আপনি আবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। কয়েক দিন পরে আপনার এই অসাধারণ দান-কাণ্ডের কথা আমি গবর্ণমেণ্টের গোচর করিব।"

রাজা বলিলেন,—"আমার সানুনয় প্রার্থনা, আপনি এ তুচ্ছ কথা গবর্ণমেণ্টের গোচর করিবেন না। আমি এ সামান্য কার্য্যের জন্য গেজেটে ধন্য বাদের প্রার্থী নহি, অধিকতর সম্মান বা উপাধির ভিক্ষুক নহি; সুতরাং গবর্ণমেণ্টের গোচর করিয়া দান করিতে আমি বাসনা করি না। আমি ইচ্ছা করিতেছি, হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত যাবতীয় দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানে অন্নছত্র স্থাপন করিব; সেই সেই স্থানে যতদিন দুর্ভিক্ষ শেষ না হয় এবং যতদিন আমার অর্থ নিঃশেষ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত সেই সকল সত্রে অন্নহীন জনগণ ভোজন করিবে। প্রত্যেক স্থানেই শান্তিরক্ষার নিমিত্ত, আইনের মর্য্যাদা রাখিবার

নিমিত্ত, এবং অন্যান্য নানা কারণে, আমার হয় তো রাজপুরুষগণের সহায়তা আবশ্যক হইবে। আপনি দয়া করিয়া তৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে একটা বিহিত আদেশ প্রচার করিয়া দিলে আমি যার-পর-নাই উপকৃত ও বাধিত হইব।”

সাহেব বলিলেন,—“গবর্ণমেণ্ট অতিশয় সন্তোষের সহিত এ বিষয়ে আপনার সহায়তা করিবেন সন্দেহ নাই। আমি সহজেই তাহার সুব্যবস্থা করিতে পারিব। কিন্তু আপনি এ বিষয়ে আর একবার চিন্তা করিয়া দেখিলে ভাল হয়।”

রাজা বলিলেন,—“আমার চিন্তা সমাপ্ত হইয়াছে। অগ্র হইতেই আমি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব। বৃথা বাক্যে এক দিনও সময় নষ্ট করিতে আমার ইচ্ছা নাই।”

সাহেব বিহিত-বিধানে রাজা বাহাদুর ও রায় বাহাদুরের নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম খণ্ড—রূপান্তর।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অনাসক্তি।

কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে প্রাতঃকাল হইতে স্নানার্থী নর-নারীর সংখ্যা করা ভার। কত ভাবের কত লোকই যে নিরন্তর আসিয়া পুণ্য-সলিলা ভাগীরথীতে দেহ নিমজ্জন করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কত লোক প্রবঞ্চনা বা অত্যাচার দ্বারা পরস্বাপহরণ করিয়া, অভিনব প্রতারণার ক্ষেত্র কল্পনা করিতে করিতে, গঙ্গাস্নান করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছে; কত ব্যক্তি হয়তো সমস্ত রাত্রি পরনারীর সহিত রঙ্গরসে প্রমত্ত থাকার পর, প্রাতে গঙ্গাবগাহন করিয়া সমস্ত পাপ-পঙ্ক প্রক্ষালন করিতেছে। কতজন নূতন নারী দর্শন, বা কোন নবীনার চিত্তাপহরণ করিবার বাসনায়, যথাসময়ে গঙ্গা স্নান উপলক্ষে এস্থানে উপস্থিত হইয়াছে। কত মহাত্মা গঙ্গাস্নান সমাপ্ত করিয়া, পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যের জগদ্বিখ্যাত গঙ্গাস্তব পাঠ করিতে করিতে স্নান নিরতা নারীগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছেন। কতজন ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক ধারণ করিতে করিতে, অথবা উপবীত ধরিয়া জপ করিতে করিতে, কোন লক্ষিতা নারী বিশেষকে কোন সঙ্কেত জ্ঞাপন করিতেছেন। যে নারী ব্যভিচারিণী, যে নারী ভ্রূণহত্যা করিয়া আপনার পাপ-প্রবৃত্তির নিদর্শন প্রক্ষালন করিয়াছে, যে নারী পাপের সাগরে ভাসিয়া দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহারাও গঙ্গাস্নান করিয়া পবিত্রতা সঞ্চয় করিতেছে। কাশীতে গঙ্গাস্নানের বিরাম নাই; বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি দেবদর্শনেরও অভাব নাই; সঙ্গে সঙ্গে কল্পনাতীত পাপ ও দুষ্কর্ম্মেরও অবধি নাই।

পাপাসক্তের সংখ্যা অনেক হইলেও এস্থানে যে নির্ম্মল-স্বভাব লোকের সমাগম হয় না, এমন নহে। কদাচিৎ দুই একটী সাধু পুরুষ ও বর্ষীয়সী নারী প্রকৃত সাত্ত্বিকভাবে ও পবিত্র চিত্তে গঙ্গাস্নান করিতে না আইসেন, এমন নহে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প।

অন্নপূর্ণার পিতা নীলরতন বাবু বেলা সাড়ে

আটটার সময় গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছেন। আধ ঘণ্টায় তাঁহার স্নানাদি কার্য্য শেষ হইল। তিনি গরদ পরিয়া, গায়ে উত্তরীয় দিয়া এবং গামছায় ভিজা কাপড় জড়াইয়া লইয়া গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করিলেন। কিয়দ্দূর মাত্র অগ্রসর হওয়ার পর, এক কৃষ্ণকায় স্থূল-কলেবর ও কুৎসিতদর্শন পুরুষ তাঁহার নেত্রপথবর্ত্তী হইল। নীলরতন বাবু দর্শনমাত্র সেই পুরুষকে চিনিতে পারিলেন এবং আগ্রহ সহকারে ডাকিলেন,—"শ্যামলাল বাবু! দাঁড়ান, দাঁড়ান। আপনার সহিত অনেক কথা আছে, শুনুন!"

সেই পুরুষ শ্যামলাল। তিনি ব্যস্ততা সহ অবনত মস্তকে চলিয়া যাইতেছিলেন। আহূত হইয়া তিনি আহ্বানকারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং নীলরতন বাবুকে চিনিতে পারিলেন। তিনি সসম্ভ্রমে নীলরতন বাবুর নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন,—"মহাশয় আমাকে ডাকিতেছিলেন? আপনি ভাল আছেন? আপনার বাটীর সমস্ত কুশল?"

নীলরতন বাবু বলিলেন।—"হাঁ। আমি আপনাকে অনেক সন্ধান করিতেছি। আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"আমি এতদিন নানা-স্থানে ঘুরিয়াছি। অনেকদিন দেশে দেশে ফিরিয়া সম্প্রতি আমি কাশী আসিয়াছি। মহাশয় আমাকে এত সন্ধান করিতেছিলেন কেন?"

নীলরতন বলিলেন,—"সে অনেক কথা। রাস্তায় দাঁড়াইয়া বলিবার সুবিধা হইবে না বোধ হয়। আপনি কৃপা করিয়া যদি একবার আমার বাটীতে আইসেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়। আমার বাসস্থান তো নিকটেই।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"চলুন।"

নীলরতন বাবুর সেই পূর্ব্বপরিচিত ভবনে উভয়ে প্রবেশ করিলেন। বৈঠকখানার দ্বার খোলা ছিল। শ্যামলালকে আদর করিয়া নীলরতন বাবু সেই স্থানে বসাইলেন। যে স্থানে বিবিধ অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া হরকুমার বাবু শ্যামলালের বিষয়-বিভব তাঁহার হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছেন, যে স্থানে বহু ভদ্রলোকের সমক্ষে তিনি স্পষ্টরূপে শ্যামলালের নিন্দনীয় জন্মকাহিনী কীর্ত্তন করিয়াছেন, বহুদিন পরে শ্যামলাল পুনরায় সেই স্থানে উপবেশন করিলেন।

নীলরতন বাবু স্নানের পর শয্যায় বসিতে ইচ্ছা করিলেন না; অদূরে একখানি কাষ্ঠাসন পড়িয়াছিল, তাহার উপর উপবেশন করিয়া তিনি বলিলেন,—"আপনি কি ভাবে আছেন? কোথায় আছেন? কিরূপে চলিতেছে? এই সকল সংবাদ জানিবার নিমিত্ত আমরা অনেকেই বিশেষ আগ্রহান্বিত আছি।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"আমার জন্য কাহারও ভাবিবার কোন দরকার দেখি না; কেন না আমার ন্যায় ব্যক্তির সহিত সংসারের কোন সম্বন্ধ থাকা উচিত নহে; আমি বাঁচিয়া থাকিলে কাহারও কোন লাভ নাই, মরিয়া গেলেও কাহারও কোন ক্ষতি নাই। আমি ভিক্ষা করিয়া খাই। এতদিন ভিক্ষা করিয়া খাইতে খাইতে বহু দেশ পর্য্যটন করিয়াছি, এখনও ভিক্ষা করিয়া খাইতেছি।

নীলরতন বলিলেন,—"আপনি ভিক্ষা করিয়া খান কেন?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"আর কি করিব? লেখাপড়া শিখি নাই; সুতরাং আমার দ্বারা কোন কাজ-কর্ম্ম হওয়া সম্ভব নহে। দেহ অকর্ম্মণ্য, সুতরাং কোন শ্রমের কাজ করিতেও আমি অক্ষম; কখন অভ্যাস না থাকায় কোন

কঠিন কাজও আমি করিতে পারি না। এরূপ লোকের পক্ষে ভিক্ষা করিয়া খাওয়া ভিন্ন আর উপায় কি আছে ?”

নীলরতন বলিলেন,—“আপনি স্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, এরূপ ব্যবস্থা করিবার জন্য আপনার আত্মীয়গণ ব্যাকুল আছেন। রাজা উমাশঙ্কর আপনার জন্য অনেক সন্ধান করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। তিনি নানাস্থানে আপনার সন্ধানে লোক পাঠাইয়াছিলেন। অনেক স্থানে রাজার লোক এখনও মহাশয়ের সন্ধান করিতেছে; কাশীতে সন্ধান করিবার জন্য আমার উপর ভার ছিল। আমি অনেক চেষ্টা করিয়াছি। এতদিন পরে দৈবাৎ অদ্য আপনার সাক্ষাৎ পাইয়া সুখী হইলাম। আমি অদ্যই রাজাকে সংবাদ পাঠাইতেছি; নিশ্চয়ই সঙ্গে সঙ্গে রাজার লোকজন আসিয়া আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে, অথবা আপনি যেরূপ ইচ্ছা করেন, সেইরূপে আপনার সকল সুব্যবস্থা করিয়া দিবে।”

শ্যামলাল বলিলেন,—“আপনি রাজাকে আমার সংবাদ লিখিতে ইচ্ছা করেন, লিখিতে পারেন। তাঁহাকে আমার অসংখ্য প্রণাম জানাইবেন এবং এ অধমের প্রতি কৃপা রাখিতে বলিবেন।' কিন্তু তাঁহার কোন সাহায্যে আমার প্রয়োজন নাই।”

নীলরতন বলিলেন,—“কেন ? আপনি কষ্টে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। রাজা সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র আপনার স্বচ্ছন্দে ও অনায়াসে জীবিকাপাতের উপায় করিয়া দিবেন। ইহাতে আপনি অসম্মত হইতেছেন কেন ?”

শ্যামলাল বলিলেন,—“আমি এ অবস্থায় সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দে আছি। আমার কোন কষ্টই নাই। সুতরাং রাজার সাহায্য অনাবশ্যক।”

নীলরতন বলিলেন,—“ভিক্ষা করা ক্লেশ ও লজ্জার কর্ম্ম। তাহার অপেক্ষা সাহায্য গ্রহণ অনেক ভাল।”

শ্যামলাল বলিলেন,—“যাহার এ সংসারে কিছুই নাই, অথচ কোন কার্য্য করিয়া জীবনপাত করিতেও যাহার সাধ্য নাই, ভিক্ষা ভিন্ন তাহার আর উপায় কি আছে ? রাজার নিকট সাহায্য লইলেও ভিক্ষা লওয়া হইবে। যখন কোন প্রকারে জীবন চলিয়া যাইতেছে, তখন তাঁহার সাহায্য লইবার আবশ্যক কি ?”

নীলরতন বলিলেন,—“রাজা মনে করেন, তাঁহার সম্পত্তির আয় হইতে স্বচ্ছন্দরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে আপনার অধিকার আছে। আপনি কেন তাঁহার সাহায্য ভিক্ষা বলিয়া মনে করিতেছেন ?

শ্যামলাল বলিলেন,—“তাঁহার সম্পত্তি ভোগ করিতে ধর্ম্মমতে, ন্যায় তে, আমার কোনই অধিকার নাই। রাজা পরম দয়ালু,—মহাত্মা। তিনি কৃপা করিয়া আমাকে নানা প্রকার অনুগ্রহ করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু তাঁহার সাহায্য লইলে যে ভিক্ষা লওয়া হইবে তাহার ভুল নাই। এক প্রকার ভিক্ষায় আমার চলিয়া যাইতেছে। তবে আর তাঁহাকে ত্যক্ত করিব কেন ? যদি আমার কখন অসুবিধা হয়, বা বিশেষ অভাব হয়, তখন আমি নিশ্চয়ই তাঁহার নিকট ভিক্ষা চাহিব। আপাততঃ আমার কোন প্রয়োজন নাই।”

নীলরতন বলিলেন,—“আপনি রাজার সাহায্য লইতে ইচ্ছা না করেন, আমার সাহায্য গ্রহণ করিতে পারেন তো ? কাশীতে যখন আপনি ভিক্ষা করিয়া রহিয়াছেন, তখন আমার নিকট সাহায্য লওয়ায় ক্ষতি কি ”?

শ্যামলাল বলিলেন,—“এখনও কোন

দরকার হয় নাই। কাশীতে থাকিলে হয়তো কোন না কোন দিন মহাশয়ের নিকট ভিক্ষা লইতে হইবে। আমি আবশ্যক হইলে নিশ্চয়ই মহাশয়ের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিব।”

নীলরতন বলিলেন,—“আপনার নিকট আর কে আছে?

শ্যামলাল বলিলেন,—“কেহ না। এ সংসারে আমার কেহ নাই; কাছে কে থাকিবে?

নীলরতন জিজ্ঞাসিলেন,—“ভিক্ষার পর আপনাকেই পাক করিয়া খাইতে হয়?”

“কাজেই।”

“সেও তো একটা বড় কষ্ট। আপনি কৃপা করিয়া প্রতিদিন এই স্থানে আসিলে, বা যেখানে আপনি থাকেন, চিনাইয়া দিলে সেই স্থানেই পাক করা অন্নাদি ভোজন করিতে পান। ইহাও কি আপনি ভাল বলিয়া মনে করেন না?”

শ্যামলাল বলিলেন,—“এ ব্যবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। কিন্তু আমি কাহারও নিয়মিত গলগ্রহ হইতে ইচ্ছা করি না। যদি আমার নিতান্ত অচল হয়, তখন অবশ্যই মহাশয়কে এ কথা জানাইব।”

নীলরতন বলিলেন,—“ভাল, এ ব্যবস্থা যদি আপনার ভাল না লাগে, তাহা হইলে কাশীর নানাস্থানে অনেক সত্র আছে। তাহার যে কোন স্থানে আমি আপনার আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি। তাহাতে তো আপনার মনে কোনই সঙ্কোচ হইতে পারে না; কারণ সেখানে পরকে দিবার নিমিত্তই অন্নাদি প্রস্তুত হয়। আপনি অনুমতি করিলে আমি সহজেই তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি।”

শ্যামলাল বলিলেন,—“এ পরামর্শ মন্দ নহে। কিন্তু এ কথা আমি আপনাকে পরে জানাইব। আপনি অনেকক্ষণ স্নান করিয়াছেন, এক্ষণে আহ্নিকাদি করিতে যান। আমি আর এক দিন আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব।”

নীলরতন বলিলেন,—“আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। এখানে আপনি কোথায় থাকেন?”

শ্যামলাল বলিলেন,—“চক ছাড়াইয়া মুড়াইগ্রামের দিকে যাইতে রাস্তার বাম ধারে একটা ভাঙ্গা বাড়ী আছে। বাড়ীর মালিক একজন হিন্দুস্থানী মহাজন। তিনি দয়া করিয়া আমাকে একটা নীচের ঘরে থাকিতে অনুমতি দিয়াছেন। আমি সেখানেই থাকি।”

নীলরতন বলিলেন,—“বোধ হয় চেষ্টা করিলে সে স্থান আমি ঠিক করিয়া লইতে পারিব। আপাততঃ আমি একটা অনুরোধ করিতেছি। অদ্য বেলাও বেশী হইয়াছে; আপনার ভিক্ষা করাও হয় নাই। আপনি এ বেলা আমার বাটীতে আহার করিলে বড়ই সুখী হইব।”

শ্যামলাল বলিলেন,—“আমার প্রতি আপনার দয়ার সীমা নাই। আজি আমার ভিক্ষা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আহারের জন্যও কোন চিন্তা নাই। গত কল্য আমি না বুঝিতে পারিয়া অনেক ভাত রাঁধিয়াছিলাম। তাহা আমি খাইয়া উঠিতে পারি নাই। এখনও অনেক অন্ন হাঁড়িতে আছে। কাজেই আজি আর কোন প্রয়োজন নাই। আপনি কিছু মনে করিবেন না। আমার যে দিন অভাব হইবে, বা বিশেষ অসুবিধা হইবে, আমি সেদিন আসিয়া প্রথমেই মহাশয়কে জানাইব। আপাততঃ আমি বিদায় হই।”

নীলরতন বলিলেন,—"কাজেই আমি আর কি বলিব? আপনি কোন প্রকারেই আহারাদি করিতে সম্মত হইলেন না। কিছু টাকা পয়সার নিশ্চয়ই আপনার প্রয়োজন আছে। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপাততঃ দুই চারিটী টাকা লইয়া যান।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"কোন দরকার নাই। পয়সায় আমার তো কখনই দরকার হয় না। প্রয়োজন হইলে আমি মহাশয়ের নিকট সকলই চাহিয়া লইব। আপাততঃ বিদায় হই।"

শ্যামলাল প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। নীলরতন বলিলেন,—"বড় দুঃখের সহিত আপনাকে বিদায় দিতেছি। আমি কি করিব? আমার কোন সাহায্যই আপনি গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। সত্রের বিষয়টা চেষ্টা করিব কি না, তাহাও আজি জানিতে পারিলাম না। আপনার সহিত যে আমার দেখা হইল ইহাও সুখের বিষয়। আমি রাজাকে এখনই আপনার সংবাদ লিখিয়া পাঠাইব। তাঁহার নিকট হইতে যে উত্তর আইসে, তাহাও আপনাকে জানাইব। আপনি কৃপা করিয়া সময়ে সময়ে দেখা সাক্ষাৎ করিলে সুখী হইব।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"আমি কোন সাহায্য লইলাম না বলিয়া আপনি দুঃখ করিবেন না। আমার সকল বিপদেই আমি আপনার শরণাগত হইব। সত্রের কথা আমি শীঘ্র আপনাকে জানাইয়া যাইব। রাজার নিকট আমার কথা না লেখাই ভাল। তবে যদি নিতান্ত লিখিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার চরণে আমার কোটী কোটী প্রণাম জানাইতে ভুলিবেন না।"

শ্যামলাল পুনরায় প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন। এই বিস্ময়াবহরূপে পরিবর্ত্তিত ব্যক্তির বিষয় আলোচনা করিতে করিতে নীলরতন বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

৮

শ্যামলালের আবাসে ফিরিয়া আসিতে অনেক বেলা হইয়া গেল। কিন্তু সে জন্ত তাঁহার কোন ক্ষতি হয় নাই। আজি আর তাঁহার ভিক্ষা করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। কল্য তিনি ভিক্ষা করিয়া যে অন্ন পাক করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার আহার হওয়ার পরও হাঁড়িতে যথেষ্ট ভাত রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং আজি আর চাউলের প্রয়োজন নাই; পাক করিবারও প্রয়োজন নাই।

শ্যামলাল যে স্থানে বাস করিতেছেন তাহা অতি কদর্য্য। ঘরটী অন্ধকার, সোঁতা এবং অত্যন্ত মলিন। সেই ঘরের মেজের উপর একখানি দরমা পাতা আছে, তাহাই শ্যামলালের শয্যা। কতকগুলি খড় তাঁহার বালিশ। ঘরের এক প্রান্তে একটী উনান আছে; তাহাতেই শ্যামলাল পাক করেন। একদিকে একটী শিকা আছে; তাহাতেই শ্যামলালের একটী হাঁড়ি ও একখানি সরা ঝুলান থাকে। ঘরের একদিকে একটী মাটির কলসী আছে; তাহাতে জল থাকে। কলসীর নিকটে দুইটী মাটীর ভাড় পড়িয়া আছে। একদিকে একটু দড়ির উপর শ্যামলালের একখানি ছিন্ন মলিন বস্ত্র এক বৃহৎ উড়ানি এবং একখানি গামছা আছে। এক কোণে একটি প্রদীপ

আছে, তাহাতে তৈল বা সলিতা কিছুই নাই। এতদ্ব্যতীত শ্যামলালের ঘরে কোন আসবাব নাই, বা মূল্যবান্ কোন সামগ্রী নাই। এক সময়ে যাঁহার প্রতাপে ও অত্যাচারে লোক কম্পান্বিত ছিল, যাঁহার ভোগ ও বিলাসিতার শেষ ছিল না, শত শত লোক যাঁহার পরিচর্য্যা করিত, আজি সেই শ্যামলাল বাবু এইরূপ হীনাবস্থায় ও দুর্দ্দশায় স্বচ্ছন্দভাবে ও সন্তুষ্ট মনে কালপাত করিতেছেন।

এই কদর্য্য আবাসে অনেক বেলায় শ্যামলাল ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, এক অস্থিচর্ম্মাবশেষ, বিকটদর্শন স্ত্রীলোক তাঁহার সেই গৃহদ্বারে দেওয়াল হেলান দিয়া বসিয়া আছে। শ্যামলাল তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

"তুমি কে? এখানে কেন বসিয়া আছ?

স্ত্রীলোক তখন চক্ষু মুদিয়া ছিল; শ্যামলালের প্রশ্ন শুনিয়া সে নয়ন উন্মীলন করিল এবং কাতরভাবে শ্যামলালকে একটা প্রণাম করিয়া বলিল,—"আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না! চিনিতে পারিবার আর কোন উপায় নাই। আপনার দোষ কি? আমি সারদা—আপনার দাসী।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"সারদা, তোমার এই দশা হইয়াছে? কোথায় থাক তুমি? কেন তোমার এমন অবস্থা হইল?"

সারদা বলিল,—"সকল কথাই বলিতেছি। আমি বড় কাতর। ধীরে ধীরে কথা বলিতে হইবে। আমার পাপের কথা আপনার নিকট লুকাইয়া কি করিব? আপনি কি না জানেন? হরিচরণ আমাকে ছাড়িয়া যায়। তাহার পর আমাকে পাপের ব্যবসা করিয়া থাকিতে হয়। আমি দেশে চলিয়া যাই। সেখানে এক পুরুষের সহিত আমার বড় ভাব হয়। সে আমাকে আবার কাশী লইয়া আইসে। এখানে তিন চারি মাস থাকার পর, আমার কঠিন পীড়া হয়। সেই সময় সেই পুরুষ আমার অলঙ্কার, টাকা-কড়ি যাহা ছিল সকলই লইয়া পলাইয়া যায়। আমার অদৃষ্টে অনেক কষ্ট আছে বলিয়া আমি ভাল হইয়া উঠি। কিন্তু পথ্য করি এমন সম্বলও আমার নাই। যে বাটীতে আমি ছিলাম, সে বাড়ীওয়ালী আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। শুনিয়াছি আপনি এখানে আছেন। অতি কষ্টে আপনার নিকট আসিয়া পড়িয়াছি। আপনি আমাকে রক্ষা করুন।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"তাইতো। তোমার অবস্থা শুনিয়া বড়ই দুঃখ হইল। আমি এখানে ভিক্ষা করিয়া খাই; তুমি ঘরের মধ্যে আসিয়া দেখ, আমার কিছুই নাই। তথাপি আমার দ্বারা যদি তোমার কোন উপকার হয়, আমি তাহা সন্তুষ্ট মনে করিতে প্রস্তুত আছি।"

শ্যামলাল ঘরের দ্বার খুলিলেন। বলিলেন,—"আইস সারদা, ঘরের মধ্যে আইস। তোমার হাত ধরিতে হইবে কি?"

সারদা বলিল,—"না, আমি যাইতে পারিব।"

কষ্টে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সারদা চারিদিকে চাহিয়া দেখিল এবং শ্যামলালের আসবাব দেখিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। বলিল,—"আপনি এখানেই থাকেন? এই ঘরে যাহা আছে, তাহা ছাড়া আপনার আর কিছু নাই?"

শ্যামলাল বলিলেন,—কিছু না। এখানেই আমি স্বচ্ছন্দে থাকি। ভিক্ষা আমার অবলম্বন। আমার মত লোকের দ্বারা তোমার কোন উপকার হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, তুমি অনায়াসে বল। আমি তাহা এখনই করিতে সম্মত আছি।"

সারদা বলিল,—"সে পরামর্শ পরে হইবে। আপাততঃ তিন চারি দিন আমার খাওয়া হয় নাই। কল্য কেবল একটু জল খাইয়া আছি; আমি ক্ষুধায় মারা যাই। আপনি তাহার উপায় করিয়া দিউন।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"আমার ঘরে চাউল নাই; কিন্তু হাঁড়িতে চারিটী ভিজা ভাত আছে; তুমি যদি তাহা খাইতে চাহ, তাহা হইলে আমি তাহা বাড়িয়া দিতে পারি।"

সারদা বলিল,—"আপনি কি খাইবেন?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"আমি কিছু খাইব না। আমার অপেক্ষা তোমার প্রয়োজন গুরুতর। তুমি স্বচ্ছন্দে খাও।"

সারদা বলিল,—"আমি মারা যাইতেছি। কাজেই খাইতে হইবে। আপনি দয়া করিয়া ভাত দিউন।"

তখন শ্যামলাল হাতে পায়ে জল দিয়া হাঁড়ি নামাইলেন; একটা কোণ হইতে একটা ভাঙ্গা পাথর আনিলেন। সেই পাথরে হাঁড়ির সমস্ত ভাত বাড়িয়া ফেলিলেন। তাহার পর একটা স্থান হইতে একটু লবণ ও একটা লঙ্কা বাহির করিয়া ভাতের উপর দিলেন। বলিলেন, —"আমার আর কিছুই নাই সারদা তুমি কষ্ট করিয়া কোনরূপে ইহাই খাও। আইস।"

সারদা উঠিয়া আসিল। পরম আনন্দে লঙ্কা ও লবণ সংযোগে সেই সমস্ত পর্য্যুষিত অন্ন উদরস্থ করিল। খাইবার সময় সে কোন কথা কহিল না। খাওয়া শেষ হইলে একটা ভাণ্ডে করিয়া শ্যামলাল তাহাকে জল দিলেন। সে জল খাইয়া পাথর তুলিতেছে দেখিয়া শ্যামলাল বলিলেন,—"এখনই পাথর ধুইবার কোন আবশ্যক নাই। আজি আর পাথরের কোন দরকার হইবে না। তুমি হাত মুখ ধুইয়া এখন বিশ্রাম কর।"

সে তাহাই করিল। শ্যামলাল তাহাকে দরমার শয্যা দেখাইয়া দিয়া বলিলেন,— "তুমি অতিশয় কাতর আছ; এখন এই স্থানে বিশ্রাম কর।"

সারদা সেই শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল। সে অনেকটা সুস্থবোধ করিল সে শুইয়া বলিল,—"বাবুর কিছু খাওয়ার উপায় হইবে না কি?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"সে জন্য কোন চিন্তা করিও না; এরূপ উপবাস মাসের মধ্যে আমার প্রায় দশ পনর দিন ঘটিয়া থাকে। আমি সুস্থ ব্যক্তি; মাঝে মাঝে উপবাসে আমার কোন ক্ষতি হয় না। তুমি যে যথা-সময়ে যাহা হউক চারিটী খাইতে পাইলে; ইহাই আমার পরম আনন্দ।"

সারদা কহিল,—আপনি এমন করিয়া থাকেন কেন?

শ্যামলাল বলিলেন,—"আমি এ অবস্থায় বড় সুখে আছি। আমি বড় পাপী। যাহাদের বিরুদ্ধে আমি অন্যায় অত্যাচার করিয়াছি, তাহাদের কাহারও নিকট সাহায্য লইয়া, বা তাহাদের সহিত মিশিয়া থাকিতে আমার লজ্জা হয়; ভালও লাগে না। আমার মত লোকের এই প্রকারে থাকাই উচিত। সংসারের সকল সুখই আমি ভোগ করিয়াছি, কিছু না থাকা এবং কোন অভাব না থাকাই বড় সুখ।"

সারদা বলিল,—"আমি ও সকল কথা বুঝিতে পারি না। আপনি জানেন এখন হরিচরণ কোথায়?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"তাহার জেল হইয়াছিল। সে এখন ফাটক হইতে খালাস হইয়া আসিয়াছে শুনিয়াছি।"

সারদা উঠিয়া বসিল। বলিল—"তা

হইলে আমার একটা পরামর্শ আছে। আপনি শুনিবেন কি?”

শ্যামলাল বলিলেন—“বল, যদি শুনিবার উপযুক্ত কথা তুমি বল, তাহা হইলে আমি অবশ্যই শুনিব।”

সারদা সমুৎসাহে বলিল,—“তাহা হইলে আপনি হরিচরণের সঙ্গে যোগ দিউন। রাজার সহিত মোকদ্দমার সময় সে অনবরত অনেক স্থানে আপনার সন্ধান করিয়াছে। বউদিদিরও সে অনেক খোঁজ করিয়াছে। কিন্তু কাহাকেও সে পায় নাই। তাহার মুখে শুনিয়াছি, বউদিদিকে আর আপনাকে পাইলে সে সকল বিষয় রাজার হাত হইতে বাহির করিয়া লইতে পারিত। আপনি এখনও তাহার সহিত যোগ দিলে যাহা ছিল সকলই ঠিক সেইরূপ হইতে পারে। আপনার আর কোন কষ্ট থাকে না।”

শ্যামলাল বলিলেন,—“তুমি উত্তম পরামর্শ বলিয়াছ সারদা। কিন্তু এ উত্তম পরামর্শ শুনিয়া কার্য্য করিতে আমার প্রবৃত্তি নাই। কেন আমি তোমার পরামর্শমত কার্য্য করিতে অক্ষম তাহা বলিয়া কোন লাভ নাই। আমি যদি ইচ্ছা করি, তাহা হইলে কাহারও সহিত যোগ না দিলেও, রাজা স্বয়ং যেরূপ সুখ স্বচ্ছন্দে আছেন, আমাকে এখনই নিশ্চয়ই সেই অবস্থায় রাখিয়া চরিতার্থ হইবেন। তিনি মহাপুরুষ। হরিচরণের সহিত যোগ দিয়া, সেই মহাত্মার সহিত বিরোধ করিতে উদ্যত হইলেও পাপ হয়। তোমার এরূপ পরামর্শে আমার কোন প্রয়োজন নাই। এক্ষণে কি করিলে তোমার উপকার হয়, আমার দ্বারা তোমার কি উপকার হইতে পারে, তাহা তুমি আমাকে বল। আমি যথাসাধ্য যত্নে তোমার উপকার করিতে চেষ্টা করি।”

সারদা বলিল,—“আমি যে কয়দিন সুস্থ না হই, সেই কয়দিন আপনি দয়া করিয়া আমাকে অন্ন আর আশ্রয় দিলে আমি সুখী হইব।”

শ্যামলাল বলিলেন,—“নিশ্চয়ই তাহা হইবে। আমি ভিক্ষা করিয়া তোমাকে খাওয়াইব।”

দিন কাটিয়া গেল। পরদিন প্রাতে শ্যামলাল ভিক্ষায় বাহির হইলেন। অনেক বেলায় তিনি তণ্ডুলাদি লইয়া গৃহাগত হইলেন এবং তাহা পাক করিয়া সারদাকে উদর পুরিয়া খাইতে দিলেন। সারদার খাওয়া হইলে এবং সে পাথর ধুইয়া দিলে, শ্যামলাল আপনার ভাত বাড়িয়া লইলেন।

চারি পাঁচ দিন কাটিয়া গেল। সারদা সুস্থ হইয়া উঠিল, এদিক ওদিক যাইতে সমর্থ হইল এবং তাহার আকার প্রকারও অনেক ভাল হইল। তখন শ্যামলাল বলিলেন,—“এক্ষণে তুমি কি করিতে চাহ সারদা?”

সারদা বলিল,—“আমি আপনার নিকটই পড়িয়া থাকিব, আর কোথায় যাইব? আপনার সুখের শরীর; কাজ কর্ম্মের জন্যও একজন লোক চাহি তো?”

শ্যামলাল বলিলেন,—“আমি ভিখারী, ভিখারীর কাজ-কর্ম্ম করিতে লোক লাগে না।”

সারদা বলিল,—“আপনি একা থাকেন; চিরদিনই আপনার স্ত্রীলোক লইয়া থাকা অভ্যাস। আমি দাসী হইলেও, অনেকেই আমার প্রতি নেকনজরে চাহিয়া থাকেন। না হয়, আপনার পা টিপিবার জন্য আমি কাছে থাকিব।”

শ্যামলাল অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—“আমি অতি মন্দ লোক। এজন্য তুমি মনে করিয়াছ, একটা স্ত্রীলোক না হইলে

আমি থাকিতে পারিব না। তোমার অনুমানের নিন্দা করিতেছি না। কিন্তু সারদা, আমার সে দিন কাটিয়া গিয়াছে। এখন তুমি কেন, কোন অপ্সরাকে লইয়াও ঘর পাতাইতে আমার আর প্রয়োজন নাই! ভিক্ষা করিয়া যে খায়, তাহার সুখের ইচ্ছা না থাকাই উচিত। তোমার আর কোন স্থান না থাকিলে তুমি এই স্থানেই থাকিতে পার; আমি কিন্তু আর এখানে থাকিব না, বা তোমার আর সন্ধান লইব না।"

সেই দিন শ্যামলাল ভিক্ষার্থ গৃহত্যাগ করিলেন; কিন্তু আর ফিরিয়া আসিলেন না। তাঁহার দরমা, ভাঙ্গা পাথর, জলের কলসী, ছেঁড়া কাপড়, মাটীর ভাঁড় প্রভৃতি সামগ্রী ফেলিয়া তিনি সেই যে পলায়ন করিলেন, আর সে আবাসে ফিরিলেন না। সারদার ভয়ে শ্যামলাল আশ্রয়হীন হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ছলনা।

যে একটু আশ্রয় স্থান ছিল, তাহাও শ্যামলাল ছাড়িয়া দিয়াছেন। সে জন্য তাঁহার কোন কষ্ট নাই। তিনি এক্ষণে বৃক্ষতলবাসী। এক গামছা, এক ছিন্ন চাদর ও এক পরিধেয় বস্ত্র ছাড়া তাঁহার আর কিছুই নাই। এ সকল দ্রব্য সঙ্গেই থাকে। সুতরাং গাছতলায় পড়িয়া থাকিতেও শ্যামলালের কোন কষ্ট বা অসুবিধা হয় না।

সারদার নিকট হইতে পলায়ন করার পর দিনই নীলরতন বাবুর সহিত শ্যামলাল সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহার যত্নে একটী সত্রে শ্যামলালের আহারের সুব্যবস্থা হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাকে আর ভিক্ষা করিতে হয় না, আহারের জন্য কোন উদ্যোগও করিতে হয় না।

নীলরতন বাবুর সহিত সাক্ষাৎ কালে শ্যামলাল বলেন নাই যে, তাহাকে বাধ্য হইয়া আশ্রয় স্থান ত্যাগ করিতে হইয়াছে; এবং তিনি আর সে স্থানে থাকেন না। কয়েক দিন পরে, শ্যামলালের সন্ধান করিবার জন্য, নীলরতন বাবু তাঁহার আবাসে গমন করিলেন।

নীলরতন বাবু সেখানে আসিয়াছেন দেখিয়াই সারদা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং অতি সচ্চরিত্রা নারীর ন্যায় বিনীত ভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিল। নীলরতন কখন সারদাকে দেখেন নাই। তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কথাও কাহারও মুখে শুনেন নাই। কাজেই তিনি সারদাকে চিনিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি কে?"

সারদা বলিল,—"আমার নাম সারদা; আমি পূর্ব্বে শ্যামলাল বাবুর সংসারে দাসী ছিলাম। এক্ষণে তাঁহাদের বড় দুর্দ্দশা হইয়াছে। বাবু আজ কষ্টে পড়িয়াছেন। সুখী লোক, দুঃখে পড়িয়া মারা যাইতে বসিয়াছেন। আমি কাশী আসিয়াছিলাম; বাবুর এই দুর্দ্দশা দেখিয়া কয়দিন তাঁহার নিকটে আছি, যথাসাধ্য তাঁহার সেবা যত্ন করিতেছি।"

নীলরতন বাবু একটু বিবেচনা করিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন যে, শ্যামলাল বাবু বড় ইন্দ্রিয়-পরায়ণ পুরুষ। তিনি হয়তো এ অবস্থাতেও এই স্ত্রীলোকটাকে লইয়া ঘরকরনা করিতেছেন এবং ইহাকে ছাড়িয়া থাকা অসম্ভব বলিয়াই হয় তো আমাদের কাহারও

নিকটে বা আমাদের তত্ত্বাবধানের অধীন হইয়া থাকিতে চাহেন না। তিনি যে ভাবেই থাকুন, তাহাতে কিছু যায় আসে না। তাঁহার সম্বন্ধে যথাসম্ভব সুব্যবস্থা করিবার জন্য রাজা বার বার পত্র লিখিতেছেন। অতএব যেমন করিয়া হউক, তাহা করাই আবশ্যক। সে জন্য শ্যামলাল বাবুর স্বভাব-চরিত্রাদির কোন বিষয়েরই বিচার করিবার আবশ্যক নাই।

সারদা জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি কে?"

নীলরতন বাবু বলিলেন,—"আমি রাজা উমাশঙ্করের শ্বশুর; কাশীতেই থাকি। দশাশ্বমেধের নিকট আমার বাটী। শ্যামলাল বাবু কোথায় গিয়াছেন, তুমি জান?"

সারদা বলিল,—"তিনি দিনে আর বড় এখানে থাকেন না। এখানে এ ভাবে থাকিতে লজ্জাও হয়, কষ্টও হয়। সন্ধ্যার পর এখানে আইসেন। আমি যথাসাধ্য যত্নে তাঁহার খাদ্য দ্রব্যাদির আয়োজন করিয়া রাখি; প্রাণপণে তাঁহার যত্ন করি।"

নীলরতন বলিলেন,—"বেশ কর। এজন্য রাজা নিশ্চয়ই তোমাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিবেন। আমি তোমার সমস্ত কথা রাজাকে বলিয়া পাঠাইব। খরচ-পত্র চলে কিরূপে?"

সারদা বলিল,—"সে দুঃখের কথা আর আপনাকে কি বলিব? আমার হাতে একুশটী টাকা ছিল। এক সময়ে বাবুর অনেক খাইয়াছি; এখন বাবুর এই কষ্ট দেখিয়া থাকি কিরূপে? একে একে সেই একুশ টাকাই বাবুর জন্য খরচ করিয়াছি। বাবু কাহারও নিকট চাহিতে পারিবেন না; কাজেই কষ্টের একশেষ। এখন এমন হইয়াছে যে দিন আর কাটে না। বাবু দিনে আর আইসেন না। রাত্রি প্রায় উপবাসে যাইতেছে। আমার হাতে আর কিছু নাই যে বাবুর জন্য খরচ করি। আহা, এক সময়ে হাজার হাজার লোকে যাঁহার ভাত খাইয়াছে, আজি সে ভাতের ভিখারী।"

সারদার চক্ষুতে একটু জল আসিল। নীলরতনেরও বিশেষ কষ্ট হইল। তিনি বলিলেন,—"শ্যামলাল বাবু ইচ্ছাপূর্ব্বক এ কষ্ট ভোগ করিতেছেন। তিনি যে ভাবে থাকিতে ইচ্ছা করেন, রাজা তাঁহাকে সেই ভাবে রাখিবার ইচ্ছুক আছেন, তাঁহার খরচ পত্রাদির জন্যও কোন চিন্তা করিবার আবশ্যক নাই। তিনি একটা মুখের কথা বলিলে আমি এখনই সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি।"

সারদা বলিল,—"আহা,! তাহা কি জানি না—রাজার কত দয়ার শরীর! বিষয় রাজা পাইয়াছেন সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া যাহাতে ভাসিয়া না যান, তাহার ব্যবস্থা না করিয়া কি রাজা স্থির থাকিতে পারেন? আপনারা যে বাবুর জন্য টাকা দিতে, অন্য নানা প্রকারে সাহায্য করিতে চাহেন, এ কথা আমি বার বার তাঁহার মুখে শুনিয়াছি। কিন্তু কি বলিব আপনাকে? বাবু বলেন,—কষ্টে মরিয়া যাইব, সেও স্বীকার, তথাপি কাহারও নিকট হইতে সাহায্য লইতে পারিব না। ইহাতে অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে।"

নীলরতন বাবু আবার একটু চিন্তা করিলেন। বুঝিয়া দেখিলেন কথাটা অসঙ্গত নহে। এইরূপ অভিমান শ্যামলালের মনে না হইতে পারে এমন নহে। তিনি মনে করিলেন, রাজার বাসনা সুসিদ্ধ করিবার পক্ষে সারদা ইহাও এক মন্দ উপায় নহে। শ্যামলালের উপকার করিতে হইলে ও তাঁহাকে একটু ভাল ভাবে রাখিতে হইলে, সারদার দ্বারা সহজে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।

সারদার হস্তে সময়ে সময়ে আবশ্যক মত অর্থ প্রদান করিলেই শ্যামলালের কাজে লাগিবে। অথচ আমরাই দিতেছি ইহা জানিতে না পারায়, শ্যামলাল বাবু কুণ্ঠিত হইবেন না। বলিলেন,—"এ কথা শ্যামলাল বাবুর মনে হওয়া অসম্ভব নহে। তুমি যদি সম্মত হও, তাহা হইলে তোমার হস্তে আমি মধ্যে মধ্যে লুকাইয়া কিছু কিছু টাকা দিতে পারি। তুমি আমাদের নিকট টাকা পাইতেছ, এ কথা না বলিয়া, শ্যামলাল বাবুর জন্য আবশ্যক মত খরচ করিতে পারিবে।"

সারদা বলিল,—"আহা বাবুর জন্য আমি চুরি ডাকাইতি করিতে পারি, এ সামান্য কথা আপনি কি বলিতেছেন! বাবু যে কষ্টে আছেন তাহা দেখিলে বুক ফাটিয়া যায়। আপনি দয়া করিয়া আর একটু সরিয়া আসুন।"

নীলরতন বাবু আর একটু অগ্রসর হইয়া পূর্ব্বে শ্যামলাল কর্ত্তৃক অধিকৃত, অধুনা সারদার অবস্থান স্থানের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। সারদা দেখাইয়া বলিল,—"ঐ দরমায়—ঐ খড়ের বালিশ মাথায় দিয়া বাবু শুইয়া থাকেন। এক সময়ে মকমলের বিছানায় যিনি শুইয়া থাকিতেন, দশজন লোকে যাঁহার সেবা করিত, আজি তাঁহার এই দুর্দ্দশা। একখানি ছেঁড়া কাপড় আর একটী ভাঙ্গা পাথর তাঁহার সম্বল। মহাশয়, দুঃখী লোকেও এমন দুঃখ সহিতে পারে না। রাজরাজেশ্বরের এ কষ্টের কথা ভাবিলেও প্রাণ ফাটিয়া যায়। কি করিব? আমি বড় অসময়ে আসিয়া পড়িয়াছি, এ অবস্থায় তাঁহাকে ফেলিয়াও যাইতে পারি না। হাতে যাহা ছিল সকলই গিয়াছে; এখানে কেবল কষ্টই দেখিতেছি।"

সারদার কথায় হাতে হাতে ফল ফলিল। নিরীহ সাধু নীলরতন বাবু এ সকল কথা সম্ভব ও সত্য বলিয়াই মনে করিলেন। তিনি বলিলেন,—"সারদা, আমি রাজার নিকট এ সংবাদ অদ্যই লিখিয়া পাঠাইব। তোমার বিশেষ পুরস্কার হইবে, সে বিষয়ে কোন ভুল নাই। তুমি যাহাতে খাওয়া পরা ছাড়া কিছু কিছু করিয়া মাসহারা পাও তাহার ব্যবস্থা আমি নিশ্চয়ই করিয়া দিব। আর শ্যামলাল বাবুর খরচের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহাও আমি আনাইয়া দিব। তুমি এ অবস্থায় বাবুকে ছাড়িয়া যাইও না। তোমার এই গুণে রাজা তোমার নিকট চিরদিন উপকৃত থাকিবেন।"

সারদা বলিল,—"ছাড়িয়া যদি যাইবার হইত, তাহা হইলে এত দুঃখ সহিয়া এখানে পড়িয়া থাকিতাম না। সেই মনিবের এই কষ্ট, ইহা দেখিয়া কোথাও যাইতে ইচ্ছা করে কি? ভিক্ষা করিয়া খাওয়াইতে হইলেও আমি এখানে থাকিব; সাধ্যমতে বাবুর দুঃখ দূর করিব।"

নীলরতন বাবু বলিলেন,—"আমার হাতে আপাততঃ দশ টাকা আছে, ইহা তুমি লও; রাত্রিতে শ্যামলাল বাবু আসিলে, তাঁহার যত্ন করিও। কোথা হইতে জিনিষ-পত্র বা পয়সা কড়ি আসিতেছে, তাহা তাঁহাকে বলিয়া কাজ নাই।"

সারদা হাত পাতিয়া নীলরতন বাবুর টাকা হাতে লইল এবং বলিল,—"আমাকে তাহা শিখাইতে হইবে না। আমি বলিব, আমার মাসী সাত আট দিন হইল কাশী আসিয়াছেন। তাঁহার অনেক টাকা-কড়ি আছে; সকলই তিনি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন, আমার প্রতি তাঁহার যথেষ্ট দয়া।

আমি অতি কষ্টে আছি দেখিয়া তিনি আমাকে কিছু টাকা দিয়াছেন, আবশ্যক হইলে আরও দিবেন।”

নীলরতন, বলিলেন,—“উত্তম পরামর্শ। এ কথায় শ্যামলাল বাবুর কোন আপত্তি, বা সঙ্কোচ হইবে না। তুমি আপাততঃ তৈল, ভাল একটা আলো, একখানা কম্বল কোন উপায়ে আনাইয়া ফেল; আর রাত্রির জন্য কিছু ভাল খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ কর। তাহার পর কল্য প্রাতে তুমি আমার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে পারিবে না কি?”

সারদা বলিল,—“কেন পারিব না? প্রাতে কি করিতে হইবে?

নীলরতন বলিলেন,—“প্রাতে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে আমি তোমাকে আর এক শত টাকা দিব। তুমি তাহার দ্বারা শ্যামলাল বাবুর জন্য ভাল বিছানা ও অন্যান্য জিনিষ-পত্র খরিদ করিও। টাকা মাসীর নিকট পাইতেছ ছাড়া আর কিছুই বলিও না। এ স্থানটা অতি কদর্য্য, এখানে থাকিলে শ্যামলাল বাবুর কঠিন পীড়া হওয়াও অসম্ভব নহে। একটা ভাল বাসায় তাঁহাকে লইয়া যাইতে হইবে। যদি কাশীর ভিতরে থাকিতে তাঁহার ভাল না লাগে, তাহা হইলে সিকরোলের দিকেও কোন বাড়ীতে তিনি স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন। খরচপত্রের কোন চিন্তা করিও না। আবশ্যক মত সমস্ত টাকাই রাজা দিবেন। আজি রাত্রিতে এ সকল ব্যবস্থা স্থির করিয়া রাখিবে।”

সারদা বলিল,—“যে আজ্ঞা! এ সকল কার্য্যই আমি ঠিক করিতে পারিব। মাসীর নিকট টাকা পাইতেছি, টাকার সহিত রাজার কোন সম্বন্ধ নাই, আর টাকা অন্য কোন লোকের নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া আনাও নহে, ইহা বলিলে কোন বিষয়েই তিনি কোন আপত্তি করিবেন না; সকল কথাতেই খুসী হইয়া রাজি হইবেন।”

নীলরতন বাবু বলিলেন,—“তোমার সহিত দেখা হওয়ায় আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম। শ্যামলাল বাবুর জন্য আমাদের সকলেরই বড়ই উদ্বেগ ছিল। দেখিতেছি, তোমার সাহায্যে সে উদ্বেগ নিবারণের উপায় সহজেই হইবে। আমি এক্ষণে বিদায় হই। তুমি কল্য প্রাতে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ভুলিও না।”

সারদা বলিল,—“রাধাকৃষ্ণ! বাবুর হিতার্থে কাজ করিতে আমার কি ভুল হয়? আমি নিশ্চয়ই প্রাতে মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইব।”

সারদা আবার প্রণাম করিল। নীলরতন বাবু প্রস্থান করিলেন।

সারদা মনে মনে ভাবিল,—“অনায়াসে জীবনপাত করিবার অতি উত্তম উপায় হইয়াছে। রাজার শ্বশুরের নিকট হইতে সহজেই মাসে মাসে অনেক টাকা আদায় হইবে; অথচ মাসীর নিকট পাইতেছি বলিয়া চাপিয়া রাখিব। বেশ উপায় বটে; কিন্তু সে হতভাগা শ্যামলাল যে আমার হাতছাড়া হইল। আমার নিকট থাকিলে তাহার সকল দিকেই ভাল হইত।”

তাহার পর আবার ভাবিল,—“কথা তো চাপা থাকিবে না। শীঘ্রই শ্যামলাল জানিতে পারিবে—রাজা তাহাকে টাকা দেন। তখন নিশ্চয়ই বড় গোল বাধিবে। না, এত গোলে কাজ কি? একশ টাকা, আর এই দশ টাকা—মন্দ কি? ইহাই এখন যথেষ্ট।”

পরদিন প্রাতে নীলরতন বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সারদা কথামত একশত টা

গ্রহণ করিল। কিন্তু সে আর সে বাসায় ফিরিল না, কাহাকেও কোন কথা জানাইল না। কাশীতে সারদা আর কাহারও চক্ষুতে পড়িল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দেবদর্শন।

যে দিন প্রাতে নীলরতন বাবুর নিকট হইতে টাকা লইয়া সারদা প্রস্থান করে, তাহার পর দিন প্রত্যুষে তিনি বারাণসীর দক্ষিণ-পশ্চিম-সীমান্তস্থিত এক ক্ষুদ্র অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই অরণ্য মধ্যে একটু মনোহর পরিষ্কৃত স্থানে মহাত্মা ঘনানন্দ অবস্থান করেন।

দুইজন শিষ্য ঘনানন্দের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই আশ্রমের আবশ্যক কর্ম্মসমূহ নির্ব্বাহ করিয়া, এক্ষণে গুরুদেবের সমীপে বসিয়া, পাতঞ্জল দর্শনের পাঠ গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহাদের উভয়েরই সম্মুখে হস্তলিখিত পুঁথি খোলা রহিয়াছে। ঘনানন্দের পুঁথির প্রয়োজন হয় না; তিনি মুখে মুখেই সূত্র সমূহের আবৃত্তি ও তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন। সমাধি-পাদের ২য় সূত্রের ব্যাখ্যা চলিতেছে। সূত্রটী এই :—"প্রমাণ-বিপর্য্যয়-বিকল্প-নিদ্রা স্মৃতয়ঃ" মহাত্মা ঘনানন্দ উৎসাহ সহকারে বুদ্ধিমান ও উপযুক্ত শিষ্যদ্বয়কে তন্ন তন্ন করিয়া শাস্ত্রার্থ বুঝাইতেছেন। এইরূপ সময়ে নীলরতন বাবু সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, দূর হইতে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন।

ঘনানন্দ বলিলেন,—"বৈবাহিক মহাশয়, কয়দিন আপনার সাক্ষাৎ পাই নাই। বাটীর সমস্ত কুশল।"

নীলরতন বলিলেন,—"আপনার কৃপায় অকুশলের কোনই কারণ দেখিতেছি না।"

তাহার পর ঘনানন্দ শিষ্যদ্বয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"বোধ হয় এক্ষণে আর পাঠের সুবিধা হইবে না। তোমরা কর্ম্মান্তরে গমন করিতে পার, অথবা আপনারা পাঠ্যবিষয়ের আলোচনা করিতে পার।"

নীলরতন বাবু বলিলেন,—"আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য। যে স্থানের এক্ষণে আলোচনা চলিতেছিল, তাহার মর্ম্ম আমরা একরূপ পরিজ্ঞাত আছি। আজি যোগসিদ্ধ মহাপুরুষের মুখে তাহার তাৎপর্য্য শুনিতে পাইয়া ধন্য হইবার আশা করিয়াছিলাম।

ঘনানন্দ বলিলেন,—"আপনি নাকি বড় প্রতারিত হইয়াছেন?"

নীলরতন সবিস্ময়ে বলিলেন,—"সে কি কথা! এরূপ আজ্ঞা কেন করিতেছেন?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"কথা সত্য। কল্য সারদা নাম্নী এক ব্যভিচারিণী নারী শ্যামলাল বাবুর হিতার্থ আপনার নিকট একশত টাকা এবং পূর্ব্বদিন বৈকালে দশ টাকা লয় নাই কি?"

নীলরতন বাবু বলিলেন,—"আজ্ঞা হাঁ, টাকা লইয়াছে সত্য; কিন্তু তাহাতে প্রতারণার কথা কি ঘটিয়াছে?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"ঐ নারীর সহিত শ্যামলালের কোনই সম্বন্ধ নাই। শ্যামলাল তাহারই ভয়ে আশ্রয় ছাড়িয়া পলাইয়াছেন এবং দুর্গাবাটীর নিকট গাছতলায় পড়িয়া থাকিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সারদা সে টাকা লইয়া এস্থান হইতে পলায়ন করিয়াছে।"

নীলরতন সবিস্ময়ে বলিলেন,—"বলেন কি প্রভো!"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"ঐ দেখুন, দূরে শ্যামলাল আসিতেছেন। আমার আর কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই।"

নীলরতন দেখিতে পাইলেন, অদূরে অতীব বিনীতভাবে শ্যামলাল দণ্ডায়মান। তিনি আর একটু অগ্রসর হইয়া ভূপৃষ্ঠে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন এবং বহুক্ষণ তদবস্থায় থাকিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। মহাপুরুষ তাঁহাকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলে, তিনি আর একটু অগ্রসর হইলেন। অন্য কোন দিকে তাঁহার দৃষ্টি না থাকায়, তিনি এতক্ষণ নীলরতন বাবুকে দেখিতে পান নাই। এক্ষণে তাঁহাকে দেখিবামাত্র প্রণাম করিলেন।

ঘনানন্দ জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনি কে? আমার নিকট কি অভিপ্রায়ে আগমন করিয়াছেন?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"আমি কে, তাহা বলিতে আমার সাধ্য নাই; কারণ আমার কোন পরিচয় নাই, আমি জানি, আপনি আমার গুরুর গুরু; আপনাকে দূর হইতে দর্শন করাই আমার অভিপ্রায়।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"ঐ স্থানে উপবেশন করুন।"

শ্যামলাল, ছিন্ন বস্ত্রে আপনার চরণ ঢাকিয়া, সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন। নীলরতন জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনি কি আর মরুয়াডির নিকট সে ঘরে থাকেন না?"

"আজ্ঞে না। যে দিন সত্রে আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিবার প্রার্থনায় মহাশয়ের নিকট আসিয়া ছিলাম, তাহার পূর্ব্ব দিন হইতে সে আবাস আমি পরিত্যাগ করিয়াছি।"

নীলরতন বলিলেন,—"ছয় সাত দিন আপনার কোন সন্ধান না পাইয়া, আমি পরশ্ব বৈকালে সেই স্থানে গিয়াছিলাম। আপনাকে দেখিতে পাইলাম না; সারদা নাম্নী একটী স্ত্রীলোককে সেখানে দেখিতে পাইলাম।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"সে এতদিন সেখানে রহিয়াছে। ভাবিয়াছিলাম, আমি চলিয়া আসিলে, সেও সেস্থান হইতে প্রস্থান করিবে!"

নীলরতন বলিলেন,—"সে আপনার সম্বন্ধে অনেক আত্মীয়তার কথা বলিল। আমি তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া, আপনার খরচের জন্য তখনই তাহার হাতে দশ টাকা এবং পরদিন প্রাতে এক শত টাকা দিয়াছি।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"সাত দিনের মধ্যে তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ নাই, তাহার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই। সে নিশ্চয়ই টাকা ঠকাইয়া লইয়াছে। আমার কোন প্রয়োজন হইলে আমি মহাশয়ের নিকট স্বয়ং চাহিয়া লইতাম। এক সঙ্গে এক শত টাকা দূরের কথা, দশ টাকারও প্রয়োজন আমার এ জীবনে উপস্থিত হইবে এরূপ কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না। যদি টাকা নষ্ট হওয়ায় মহাশয়ের কষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বে সারদার সন্ধান করা উচিত।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"সে চেষ্টা অনাবশ্যক। টাকা নষ্ট হইয়াছে মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকাই এ অবস্থায় সৎপরামর্শ।" শ্যামলালকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনি এখন কোথায় থাকেন?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"কোথায়ও থাকি না বলিলেই হয়। রাত্রিতে প্রায়ই দুর্গাবাড়ীর নিকট এক গাছতলায় পড়িয়া থাকি। দিনমান এদিক ওদিক করিয়া কাটিয়া যায়।"

নীলরতন বলিলেন,—"এরূপে বাস বড়ই কষ্টকর ও অসুবিধাজনক। একটা নির্দ্ধারিত ঘরের মধ্যে বাস করা আবশ্যক।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"কেন এরূপ মনে করিতেছেন? আমার দেহে এই যে গামছা ও এই ছেঁড়া কাপড় দেখিতেছেন, ইহা ছাড়া এ সংসারে আমার আর কোন পদার্থ নাই। সুতরাং জিনিষ-পত্র রাখিবার জন্য একটা স্থানের কোন প্রয়োজন দেখি না। তাহার পর আশ্রয় থাকিলেই উপসর্গ যুটিতে আইসে। আমি এ অবস্থায় আরও সুখী হইয়াছি।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"সংসারে আপনার কে আছেন?"

শ্যামলাল অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"যে যে লোককে মনুষ্য আপনার লোক বলিয়া উল্লেখ করে, আমার সেরূপ কোন আত্মীয় এ সংসারে নাই। তবে অনেক মনুষ্য যাহাকে সকলের অপেক্ষা আপনার লোক বলিয়া জ্ঞান করে, আমার সে স্ত্রী আছেন।"

ঘনানন্দ জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া এরূপ ভাবে একাকী কাল কাটাইতেছেন কেন?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"আমি তাঁহাকে ত্যাগ করি নাই। তিনিই আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন বলিলে অসঙ্গত হয় না।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"সেই দুঃখেই কি আপনি সংসার ত্যাগ করিয়াছেন?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"আজ্ঞে না। সে জন্য দুঃখ করিবার কোনই কারণ নাই। তিনি আমাকে অন্যায়রূপে বা অকারণ ত্যাগ করেন নাই। আমি কাহারও দয়ার যোগ্য পাত্র নহি।"

ঘনানন্দ জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনার নাম কি?"

"শ্যামলাল।"

"আপনিই কি পূর্ব্বে সোণাপুরের জমিদার ছিলেন?"

"না জানিয়া, অকারণ অনেক দিন আমি সেই পদ অধিকার করিয়াছিলাম বটে।"

"আপনার স্ত্রী বিধুমুখীর আপনি কোন সংবাদ রাখেন কি?"

না। "শুনিয়াছি রাজার আশ্রয়ে তিনি সুখ-স্বচ্ছন্দে আছেন।"

"তিনি সম্প্রতি বড়ই বিপদে পড়িয়াছেন। রাজার আশ্রয়ে তিনি স্বচ্ছন্দে ছিলেন সত্য, কিন্তু সহসা কোন দুষ্ট লোক সে স্থান হইতে তাঁহাকে হরণ করিয়াছে।"

"নিশ্চয়ই ইহা সেই হরিচরণের কার্য্য। সে আর একবার কাশীতে এইরূপ কাণ্ড করিয়াছিল। যে স্ত্রীলোক এক শত দশ টাকা ফাঁকি দিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহার সাহায্যে সেবার সন্ধান পাইয়া আমি বিধুমুখীর উদ্ধার করিয়াছিলাম।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—এবারও বিধুমুখীর উদ্ধারের জন্য আপনার চেষ্টা করা উচিত নহে কি?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না। আমি সংসারের একটা অতি সামান্য কীট। আমার সাহায্যে কাহারও কোন উপকার হওয়া সম্ভব নহে। বিশেষ বিধুমুখী যাঁহাদের আশ্রয়ে আছেন, তাঁহারা সকলেই মহাত্মা। তাঁহারা নিশ্চয়ই এজন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। আমি তাঁহাদের অপেক্ষা বেশী কি উপায় করিব?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"আমি জ্ঞাত আছি, বিধুমুখী আপনার দর্শন কামনায় নিতান্ত ব্যাকুলা। সে কারণেও তাঁহার সন্ধান করা আপনার উচিত নহে কি?"

শ্যামলাল বলিলেন,—তাঁহার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না। আমি যখন পাপের সাগরে গা ভাসাইয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছি, তখন তাঁহার সহিত কোন পরামর্শ করি নাই। তিনি যখন পাপে মজিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন তখন সে সম্বন্ধে আমার সহিত কোন মন্ত্রণা করেন নাই। আমরা উভয়ে উভয়কে ইচ্ছায় ত্যাগ করিয়াছি। এখন আর তাঁহার জন্য আমার ব্যাকুলতা, বা আমার জন্য তাঁহার ব্যাকুলতা অনাবশ্যক।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"ভরসা করি আপনার সহিত আরও অনেকবার সাক্ষাৎ হইবে। তখন এ বিষয়ে আবার কথাবার্ত্তা হইবে। এক্ষণে আমি আপনার ও নীলরতন বাবুর কথা শুনিয়া যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে আমার ধারণা হইয়াছে, আপনি সংপ্রতি যে অবস্থায় আছেন, তাহা আপনার পক্ষে নিতান্ত ক্লেশকর। আপনাকে অনেকেই সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। আপনি কেন একটু ভালভাবে কাল কাটাইতে আরম্ভ করুন না?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"ভগবান্ কি বুঝিয়াছেন, তাহা আমি জানি না। আমি কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় পরম সুখে আছি। এত সুখ জীবনে আর কখন ভোগ করিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না। এরূপ স্বচ্ছন্দতা, এরূপ নিশ্চিন্ততা, এরূপ সদানন্দ ভাব আমার জীবনে কখন ছিল না। কেবল একটি মাত্র কষ্ট আমাকে এখনও সময় সময় ব্যথিত করে। আমি তাহারই প্রতিকারের জন্য ব্যাকুল আছি। সেই অসুখ পরিহার করিতে পারিলে, আমি নিষ্কণ্টক হইয়া সুখ ভোগ করিতে পারিব সন্দেহ নাই।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"কি অসুখ?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"আমি পূর্ব্বে অনেক পাপ করিয়াছি; তাহার তালিকা প্রদান করা অসম্ভব। কোন প্রকার পাপেই আমি পশ্চাৎপদ হই নাই। অল্পমাত্র কারণে, অথবা অকারণে আমি লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছি। ক্ষণিক সুখের জন্য আমি সংসারে হাহাকার শব্দ উঠাইয়া দিয়াছি। সংসারের সকল সুখ-দুঃখই আমাকে এখন ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু সেই পূর্ব্বকৃত পাপের স্মৃতি আমাকে এখনও ছাড়ে নাই। এখনও সেই সকল পাপের কথা যখন তখন আমার মনে হয় এবং আমাকে বড়ই জ্বালাতন করে। এই একমাত্র অসুখে আমি কাতর আছি। আর সর্ব্বপ্রকারেই আমি পূর্ণ সুখী।"

নীলরতনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঘনানন্দ বলিলেন,—"আমাদের যে বিষয়ের পাঠ চলিতেছিল, শ্যামলাল বাবু সেই বিষয়ের কথাই উত্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু আজি বেলা অধিক হইল; আপনাদের সকলেরই এ সময়ে অসুবিধা উপস্থিত হইবে; সুতরাং সে শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গের বিস্তারিত আলোচনা এক্ষণে সম্ভবপর নহে। আমি সংক্ষেপে শ্যামলাল বাবুকে কয়েকটী মাত্র কথা বলিতেছি। মানুষের চিত্তে অনেক প্রকার বৃত্তি আছে। তৎসমূহকে সম্পূর্ণরূপে নিরোধ করিতে পারাই সুখের পূর্ণ অবস্থা। সেই সকল বৃত্তিই একটী স্মৃতি। এই সকল বৃত্তি-নিরোধ করা অনেক প্রক্রিয়া, অনেক প্রণালী ও অনুশীলন সাপেক্ষ। তাহার উপদেশ আপনি জানিতে বাসনা করিলে, আমি ধারাবাহিকরূপে তাহা আপনাকে বলিব। আপাততঃ সংক্ষেপে একটী সহজ ও শ্রেষ্ঠ উপায় আপনাকে বলিয়া দিতেছি। আপনি ভগবানে বিশ্বাস করেন কি?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"তাঁহার কথা আমি

কখন ভাবিয়া দেখি নাই; কোন আবশ্যকও বোধ করি নাই।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"উমাশঙ্কর আপনার গুরু, আমি তাঁহারও গুরু। আমাদিগের উপর আপনার কিরূপ বিশ্বাস আছে?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"আমি জানি আপনারা মানুষ। সাধনা, চেষ্টা, শিক্ষা প্রভৃতি উপায়ে আপনারা অন্যান্য মানুষের অপেক্ষা প্রভূত জ্ঞান লাভ করিয়াছেন।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"ইহা কি আপনার মনে হয়, জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা আমরা লাভ করিয়াছি? আমরা যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তাহার উপর আর জ্ঞান নাই?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"তাহা আমার মনে হয় না। আমার মনে হয়, জ্ঞান অশেষ; আপনারা তাহার অনেক লাভ করিয়াছেন।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"তাহা হইলে ইহা আপনি জানেন, অশেষ হইলেও, কোন না কোন স্থানে সেই জ্ঞানের অবশ্যই শেষ আছে এবং আমি, বা রাজা, বা আপনি, বা নীলরতন বাবু, বা আমার এই শিষ্যদ্বয় অশক্ত হইলেও, কোন না কোন ব্যক্তি সেই জ্ঞানের পূর্ণাধিকার লাভ করিয়াছেন?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"ইহা অসম্ভব নহে। কোথায় কেহ পূর্ণজ্ঞানী থাকিলেও থাকিতে পারেন।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"তাহাই আছেন। ঘটনাসূত্রে আপনি রাজাকে জানিতে পারিয়াছেন। আবার সেই সূত্র অবলম্বনে আমাকে জানিতে পারিয়াছেন। আরও চেষ্টা করুন, ক্রমে সেই পূর্ণজ্ঞানীরও সন্ধান পাইবেন। সেই পূর্ণজ্ঞানী পুরুষই ভগবান্। তিনি দয়াময়, শান্তিময়, কার্য্যময় এবং সর্ব্বময়। আপনি তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করুন। আপাততঃ আপনি এই বারাণসী পুরাধীপ বিশ্বেশ্বর অথবা বৃন্দাবন-বিহারী গোপীনাথের রূপ চিন্তা করিয়া, তাঁহাকে হৃদ্‌গত করিতে অভ্যাস করুন। তাহা হইলেই আপনি ক্রমে বুঝিতে পারিবেন, এ সংসারে আমরা কিছুই করি না। আমরা কর্ত্তা বলিয়া অহঙ্কারে ফাটিয়া মরি বটে, কিন্তু কোন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে আমাদের শক্তি নাই। সকল কার্য্যই সেই সর্ব্বশক্তিময়, সর্ব্বকার্য্যময়, ভগবানের বাসনায় সম্পন্ন হয়। ক্রমে এই বোধ হৃদয়ে উপজাত হওয়ার পর, আপনি বুঝিতে পারিবেন, কোন পুণ্যের গৌরবেও আপনার অধিকার নাই, কোন পাপের আক্রমণেও আপনার আশঙ্কা নাই। যে কিছু পাপ বা পুণ্য সকলই তাঁহার ইচ্ছায় ঘটিয়াছে। আপনি পাপ করেন নাই।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"মহাপুরুষের প্রদর্শিত উপায়ে আমি অদ্য হইতেই ভগবানকে সন্ধান ও বিশ্বাস করিতে চেষ্টা এবং অভ্যাস করিব। ফল যেরূপ হয়, তাহা আপনার চরণে নিবেদন করিব।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"আপনার যখন ইচ্ছা তখনই আমার নিকট আসিবেন। আমি তাহাতে সুখী হইব। আপনার মনে যে সামান্য ক্লেশ আছে, তাহা অচিরে তিরোহিত হইবে।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"আমি ভগবানের কৃপায় অনুগৃহীত হইলাম। প্রার্থনা করি, এ কৃপায় যেন আমাকে বঞ্চিত হইতে না হয়।"

নীলরতন বলিলেন,—"একণে বেলা অধিক হইল; আমি বিদায় প্রার্থনা করি। শ্যামলাল বাবুর সহিত কথা উপলক্ষে অনেক তত্ত্বকথা শুনিয়া আমি চরিতার্থ হইলাম। পাতঞ্জলের ঐ অংশ কখন আলোচিত হইবে

জানিতে পারিলে, সেই সময় শ্রীচরণ সমীপে আগমন করিতাম।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"শিষ্যগণ হয় তো অদ্যই ঐ অংশের পাঠ সমাপ্ত করিবে। কিন্তু সে জন্য ক্ষতি কি? আপনি যে সময় আগমন করিবেন, তখনই উহার পুনরালোচনা হইবে।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"এ অধমও এক্ষণে বিদায় প্রার্থনা করিতেছে।"

কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শ্যামলাল ভূপৃষ্ঠে পূর্ব্ববৎ দণ্ডবৎ নিপতিত হইলেন।

মহাপুরুষ বলিলেন,—"যাও বৎস! আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার চিত্ত-চাঞ্চল্য অচিরে বিনষ্ট হইবে।"

নীলরতন বাবু ভক্তিভাবে ঘনানন্দকে প্রণাম করিলেন। শ্যামলাল ও নীলরতন এক সঙ্গে প্রস্থান করিলেন।

ষষ্ঠ খণ্ড—জ্যোতিঃ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

চতুর।

আজিমগঞ্জে ভাগীরথী তীরে মহারাণী যে বস্ত্র দান ও দরিদ্রভোজন ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহার কার্য্য শেষ হইয়াছে। তিন দিনে প্রায় দুই লক্ষ লোক বিবিধ উপকরণসহ অন্নাদি ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছে এবং বস্ত্রাদি প্রাপ্ত হইয়া পরিতুষ্ট হইয়াছে। চতুর্থ দিবসে মণ্ডপাদি উঠাইতে আরম্ভ করা হইল। বাঁশ, দরমা প্রভৃতি সামগ্রী নিলামে বিক্রীত হইল এবং অন্যান্য সামগ্রী শকটযোগে চন্দ্রশালায় প্রেরিত হইল। এই কাণ্ডে যাহাতে কোনরূপ বিঘ্ন বা দুর্ঘটনা উপস্থিত না হয়, তাহার সুব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সাহেব অন্যান্য কর্ম্মচারীসহ, ক্রিয়াস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা তৃতীয় দিবসে সন্ধ্যার পর মহারাণীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

চতুর্থ দিবস সন্ধ্যার সময় সে স্থানে দুইটী মাত্র ক্ষুদ্র মণ্ডপ ব্যতীত আর সকলই উঠাইয়া ফেলা হইল। যে দুইটী মণ্ডপ এখনও দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহার একটীতে মহারাণী করুণাময়ী এবং তাঁহার সেবিকাগণ, এবং অপরটীতে দেওয়ান জীবনকৃষ্ণ বাবু, পরিচারিকাগণ, রক্ষিগণ প্রভৃতি অবস্থান করিতেছেন।

সন্ধ্যার পর একখানি গাড়ির চারি পাইয়ের উপর জীবনকৃষ্ণ বাবু একাকী বসিয়া আছেন; তাঁহার নিকটে আর কোন লোক নাই। দারবান আসিয়া সংবাদ দিল, যে বাবু পরশ্ব সন্ধ্যার সময় আসিয়াছিলেন, তিনি এখন দেখা করিতে আসিয়াছেন। জীবন বাবু তাহাকে আনিবার অনুমতি প্রদান করিলেন।

মাথায় চাদর বাঁধা, গায়ে পাঞ্জাবী জামাধারী হরিচরণ তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মুখ হইতে সুরার গন্ধ বাহির হইতেছে, তাঁহার চরণদ্বয় একটু চঞ্চল। তিনি আসিয়াই বলিলেন,—"কথাটা মনে আছে তো? সেই—সেই মোকদ্দমার কথা? ভুলিয়া গিয়াছেন বুঝি? সেই যে বিধুমুখীর সাক্ষী দেওয়ার কথা।"

জীবন বাবু বলিলেন,—"না মহাশয়,

আমি কোন কথাই ভুলি নাই। বিধুমুখীর সম্বন্ধে আপনি আমাদিগকে কি করিতে বলিতেছেন ?"

হরিচরণ বলিল,—"তবেই তো আপনি সবই ভুলিয়া গিয়াছেন। যে মোকদ্দমা সম্প্রতি চলিতেছে, তাহার জন্য যদি বিধুমুখীকে হাতে করিতে পারেন, তাহা হইলে জয়ের পক্ষে কোনই সন্দেহ থাকে না।"

জীবন জিজ্ঞাসিলেন,—"বিধুমুখী কোথায় আছেন ?"

হরিচরণ বলিলেন,—"তাহা আমি আগেই আপনাকে বলিব কেন ? ধরুন বিধুমুখী আমার হাতেই আছে।"

জীবন বলিলেন,—"মোকদ্দমায় জয়লাভ করা আমাদের উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু তাহাতে বিধুমুখীর লাভ কি ?"

হরিচরণ বলিল,—"আপনি এত বড় ষ্টেটের দেওয়ানী করেন, আর এই তুচ্ছ কথাটা বুঝিতে পারিলেন না! বিধুমুখীর এখন কিছুই নাই—আপনারা তাহাকে কিছু সাহায্য করিবেন। আর রাজা উমাশঙ্কর, বুঝিয়া দেখুন না কেন, আমাদের প্রবল শত্রু; তাঁহাকে জব্দ করাও আমাদের একটা দরকার।"

জীবন বলিলেন,—"তাহা আমি বুঝিলাম। কিন্তু কাহাকেও ঘুষ দিয়া বা কাহারও সহিত শত্রুতা সাধিবার সহায়তা করিয়া, মোকদ্দমা করা বোধ হয় আমাদের অভিপ্রেত নহে। বিধুমুখী কোথায় আছেন, এ সংবাদ আপনি জানাইলে, আমরা তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় স্থির করিতে পারিতাম।"

হরিচরণ বলিল,—"আপনার কিছু মতলব আছে কি ? বড় সুন্দরী মেয়ে মানুষ বটে। আমি অনেক দিন হইতে রাখিয়াছি। এখন আর বড় ভাল লাগে না। তা আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে না পাইতে পারেন এমন নহে; কিন্তু টাকার কর্ম্ম দাদা। সে নিজে টাকা চাহিবে না। আমার হাতে টাকা দিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

এই পাষণ্ডের এই সকল ঘৃণাজনক বাক্য শ্রবণ করিয়া জীবন বাবুর মনে অতিশয় ক্রোধ হইতে লাগিল। কিন্তু অতি কষ্টে ক্রোধ সংবরণ করিয়া তিনি এই নরাধমের সহিত কথা কহিতে থাকিলেন। বলিলেন,—"বিধুমুখী তো ছিলেন রাজা উমাশঙ্করের আশ্রয়ে। আপনি তাঁহাকে পাইলেন কোথা ? শেষে পাছে বিধুমুখী লইয়া মোকদ্দমা করিতে গিয়া আমরা সকল দিক নষ্ট করিয়া ফেলি, এই জন্যই ভয় হয়।"

হরিচরণ বলিল,—"আপনি এবারে একটা দেওয়ানী চাইলের কথা কহিয়াছেন বটে। আমি একবার জালের মোকদ্দমায় পড়িয়া সাজা পাইয়াছি, কাজেই আপনি সন্দেহ করিতেছেন। তা দাদা, বড় বড় মোকদ্দমা করিতে গেলেই এক আধটা গোলমাল হইয়া পড়ে। সেটা কিছু নয়। একটা দলিল জাল হইয়াছিল বলিয়া যে একটা মানুষ জাল হইবে এমন কোন কথা হইতে পারে না। আপনি বলিতেছেন বিধুমুখী উমাশঙ্করের কাছে ছিল আমি তাহাকে পাইলাম কোথা ? কথাটা ঠিক। কিন্তু কি জানেন, অনেক দিনের ভাব। তা যাহাই হউক, সে কথায় আর কাজ নাই। অনেক কাণ্ডের পর বিধুমুখী আমার হাতে পড়িয়াছে। আপনি কি তাহাকে দেখিতে চাহেন ?"

জীবন বলিলেন,—"আমি দেখিতে চাহি না। তবে আমি জানিতে চাহি, যাহার কথা আপনি বলিতেছেন, তিনিই প্রকৃত

বিধুমুখী কি না। তিনি যদি প্রকৃত হন, তাহা হইলে আপনার সহিত অন্যান্য বন্দোবস্ত স্থির করিয়া, তাঁহাকে হস্তগত করার আপত্তি নাই।"

হরিচরণ বলিল,—"আপনি যদি দেখিতে না চাহেন, তবে বুঝিবেন কিরূপে, তিনি আসল কি নকল?'

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন,—"তাহার অতি সহজ উপায় আছে। বিধুমুখী ইচ্ছা করিলে অনায়াসে মহারাণী মাতার সহিত দেখা করিতে পারেন। মহারাণী মাতা বুঝিলেই সব ঠিক হইবে। তিনি আজ্ঞা করিলেই আমি মহাশয়কে টাকা-কড়ি দিয়া আবশ্যকমত বন্দোবস্ত শেষ করিব।"

হরিচরণ বলিল,—"আরে ছ্যাঃ। আপনি বুঝি এই রকমের দেওয়ানী করেন? সকল কাজই বুঝি আপনাকে মুনিবের হুকুম লইয়া করিতে হয়? আমরাও দেওয়ানী করিয়াছি। রেষ্টেট এত বড় না হইলেও প্রায় ইহারই মত। তা মহাশয়, আমি যাহা করিতাম তাহার উপর কথা কহে কাহার সাধ্য! আমার হুকুমই বলবান্ ছিল। প্রতি কথায় মুনিবের মত জানিয়া কাজ করিতে হইলে চলে কি?"

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন,—"সকল মানুষ সমান কাজের লোক হয় না। আপনি অতি যোগ্য লোক বলিয়া হয় তো আপনাকে মুনিব স্বাধীন ভাবেই কাজ করিতে দিতেন। আমাদের তত সাহস হয় না। আপনি শেষ সাক্ষাতের দিন বলিয়া গিয়াছিলেন, আমার মতামত আপনি শুনিতে চাহেন না; আমার মুনিবের মতামত জানাই আপনার দরকার। তবে এ বিষয়ে আপনি আমাকে আবার স্বাধীনভাবে মত দিতে বলিতেছেন কেন? সে যাহা হউক, এখন বিধুমুখীর সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?"

হরিচরণ একটু চিন্তা করিয়া বলিল,—"বিধুমুখী আমার হাতেই আছে। আমি আপনাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া বিধুমুখীকে একবার দেখাইয়া দিতে পারি। কিন্তু আপনাদের মহারাণীর কাছে তাহাকে আসিতে দিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না।

"কেন?"

"তাহাকে হাতছাড়া করিতে আমার সাহস হয় না। অনেক কষ্টে এবার আমি তাহাকে হাতে পাইয়াছি। এক কথায় যে তাহাকে আবার হাতছাড়া করা, সেটা আমি ভাল বুঝি না।"

জীবন বাবু বলিলেন,—"তা আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন। এ সম্বন্ধে যে টাকার আপনি প্রস্তাব করিতেন, তাহা দিতে আমরা নারাজ হইতাম না। কিন্তু আসল কি নকল মানুষ তাহা ঠিক না করিয়া, আমরা টাকার কথা কহিতে পারি না। আপনার যেরূপ বিবেচনা, তাহাই করুন।"

হরিচরণ বলিল—"তবে মহারাণীর কাছে বিধুমুখী আসিয়া আলাপ না করিলে আপনারা এ বিষয়ে কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না, কেমন? ভাল, আমি এ বিষয়টা একবার ভাবিয়া দেখি, তাহার পর আপনাকে সংবাদ দিব। সংবাদই বা দিব কখন? আপনারা তো কালি প্রাতেই চলিয়া যাইতেছেন?"

জীবন বাবু বলিলেন—"কালি প্রাতেই আমাদের যাইবার কথা ছিল বটে, কিন্তু বোধ হয় যাওয়া ঘটিবে না। এখানে দুই একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ উপস্থিত হওয়ায়, আমাদিগকে কালি থাকিয়া যাইতে হইবে।"

হরিচরণ গাত্রোত্থান করিয়া বলিল,—"তাহা হইলে যেরূপ স্থির করি কালি প্রাতেই

আপনি তাহার সংবাদ পাইবেন। এখন আসি দাদা।"

হরিচরণ প্রস্থান করিলেন, জীবনকৃষ্ণ সংবাদ পাঠাইয়া মহারাণী করুণাময়ীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মহারাণী তখন একখানি মৃগচর্ম্মের উপর সমাসীনা। জীবনকৃষ্ণ দূর হইতে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

করুণাময়ী বলিলেন,—"সেই দুর্ব্বৃত্ত হরিচরণ আসিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল?"

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন,—হাঁ মা। সে পাষণ্ডের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া আমার বড়ই লজ্জা হইতেছে!"

মহারাণী বলিলেন,—"তা হউক, বিধুমুখীর সম্বন্ধে কি জানিতে পারিয়াছ বল?"

জীবন বলিলেন,—"বিধুমুখীকে এই নরাধম লইয়া আসিয়াছে; নিকটেই কোন স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছে। কালি প্রাতে হরিচরণ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। আমি টাকার লোভ দেখাইয়াছি। হয় তো বিধুমুখীকে মহারাণী মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিলেও দিতে পারে।"

করুণাময়ী বলিলেন,—"তাহার কথায় নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। যেমন করিয়া হউক, বিধুমুখীকে হস্তগত করা চাই। তুমি এজন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখ—লোক নিযুক্ত কর। কালি আর আমাদের যাওয়া হইবে না।"

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন,—"আমি তাহা পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছি এবং তদনুরূপ ব্যবস্থা করিয়াছি।"

মহারাণী বলিলেন,—"সমস্ত দিনের পরিশ্রমে অতিশয় ক্লান্ত আছ; এক্ষণে যাও, আহারাদি করিয়া বিশ্রাম কর গিয়া।"

জীবনকৃষ্ণ পুনরায় প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

উদ্ধার।

বালুচরের এক জঘন্য পল্লীতে একখানি অতি সামান্য ঘরের মধ্যে এক সুন্দরী নতবদনে বসিয়া আছেন। সুন্দরী একাকিনী নহেন; তাঁহার নিকটে আর এক নারী বসিয়া রহিয়াছে; সুন্দরী আমাদের সুপরিচিতা বিধুমুখী; যে নারী তাহার নিকট বসিয়া আছে সে সেই বাড়ীর অধিকারিণী—গোলাপ। গোলাপ এক সময়ে কি ছিল তাহা আমরা জানি না; কিন্তু এখন সে ঘেঁটু ফুলও নহে। তাহার বয়স এখন পঁয়ত্রিশ হইবে। যাহার রূপ থাকে, বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার সে রূপের অপচয় হয় না; বয়সের সহিত রূপ ভাবান্তর ধারণ করে এবং ক্রমেই গাম্ভীর্য্য ও ধীরতা সহকৃত অপূর্ব্ব শোভায় পরিণত হয়। গোলাপের দেহে রূপের কোন লক্ষণই নাই, কখন ছিল বলিয়া অনুমান করিবার কোনই নিদর্শন নাই। গোলাপ হীনবৃত্তি দ্বারা জীবিকাপাত করে; চরিত্রহীনা স্ত্রীলোকদের আশ্রয় প্রদান করে; অল্পবয়স্কা বালিকাদিগকে কন্যারূপে পালন করে ইত্যাদি বিবিধ সদুপায়ে সে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

এই গোলাপ অনেকক্ষণ বিধুমুখীর নিকট বসিয়া আছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া সে অনেক কথা বলিতেছে। সে বলিতেছে,—"তোমার যে রূপ আছে তাহার সিকি আমাদের থাকিলে

আমরা দেশ তোলপাড় করিয়া দিতাম। এত রূপের পসরা থাকিতে চুপচাপ বসিয়া থাকা কি ভাল ?"

বিধুমুখী কোন উত্তর দিলেন না। এ কথার কোন উত্তর দিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। গোলাপ আবার বলিল,—"ঐ রূপের জোরে সংসারের অর্দ্ধেক লোককে তো গোলাম করিয়া রাখা যায়, আর টাকা লইয়া খেলা করিতে পারা যায়। কেন তুমি ইচ্ছা করিয়া হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিতেছ ?"

বিধুমুখী কোন কথা কহিলেন না।

গোলাপ বলিল,—"কথা কহিতেছ না কেন ? আমি তো ভাল কথাই বলিতেছি।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"সকল ভাল কথা সকল সময়ে লোকে ভাল বলিয়া বুঝিতে পারে না। তোমার কথা ভাল হইতে পারে, কিন্তু আমি তাহা ভাল বলিয়া বুঝিতেছি না।"

গোলাপ বলিল,—"ইহার আর বোঝাবুঝি কি ? অনেক মানুষ বাধ্য থাকা, অনেকের উপর জুলুম করিতে পাওয়া, অনেকের সহিত আলাপ থাকা ভাগ্যের কথা,—এ কথা তুমি কেন, একটা পাঁচ বছরের মেয়েও বুঝিতে পারে। আর টাকা ? টাকা তো আপনি আসিয়া তোমার পায়ে গড়াইয়া পড়িবে। টাকা রোজগার করিতে পারা যে একটা সৌভাগ্য, এ কথা বলিয়া বুঝাইতে হয় কি ?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"তোমার সহিত এ বিষয়ের কোন বাদানুবাদ করিতে আমার প্রয়োজন নাই। তথাপি তুমি বলিতেছ বলিয়া আমি তোমার কথার জবাব দিতেছি। টাকায় আমার কোন দরকার নাই ; কেন না আমার কোন অভাব নাই। আমি অনেক টাকা নাড়া চাড়া করিয়াছি, অনেক টাকা হাতে করিয়া খরচ করিয়াছি। কাজেই টাকার সুখ-দুঃখ আমার জানা আছে। টাকার জন্ত আমার লোভ হইতে পারে না। তুমি কি কটা টাকার কথা বলিতেছ ? লক্ষ লক্ষ টাকা আমি কথায় কথায় খরচ করিয়াছি। তত টাকা তোমরা কখন দেখ নাই, তত টাকাওয়ালা কোন লোকের সহিত তোমরা কখনও কথাও কহ নাই। তাহার পর তুমি বলিতেছ, অনেক লোককে বাধ্য করা একটা ভাগ্য। লোক বাধ্য করিতে তো নারীর জন্ম নয়। একজনকে ইষ্টদেবতারূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার চরণের দাসী হইয়া থাকা, সংসারধর্ম্ম করা, সন্তান পালন করা, এইরূপ কাজই নারীর ধর্ম্ম। ধর্ম্মদ্বারা এইরূপে লোককে বাধ্য করিতে পারিলে, নারীর গৌরব হয়, সুখ হয় বটে। অনেক লোককে আমি বাধ্য করিতে চাহি না।"

গোলাপ বলিল,—"তা তুমি যে সকল বলিতেছ, সে সব ধর্ম্মের কথা বটে ; বুঝিলাম তুমি খুব টাকার মানুষ ছিলে, টাকায় তোমার আর লোভ নাই। কিন্তু তুমি যে একজনের দাসী হইতে চাহিতেছ, তাহার আর উপায় কি ? আমি শুনিয়াছি তোমার স্বামী আর তোমাকে লইবেন না। তবে কেন বৃথা আশায় বসিয়া রহিয়াছ ?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"তিনি আমাকে লইবেন না—লইতে পারেনও না। কিন্তু তাঁহার দাসী হইয়া থাকিতে কেহই তো আমাকে বারণ করিতে পারে না। তিনি আমাকে লউন বা না লউন, আমি মনে প্রাণে তাঁহার দাসী হইয়া থাকিব। তাহাই আমার ধর্ম্ম, তাহাই আমি করিব।"

গোলাপ বলিল,—"এত ধর্ম্মের পটপটানি তোমার মুখে আর ভাল শুনায় না। সে একজনকে ছাড়িয়া যখন আর এক জনকে ভজিয়াছ, তখন আর সে বড়াই কেন করিতেছ ?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"ঠিক বলিয়াছ। আমি যে পাপ করিয়াছি, তাহার পর ধর্ম্মের কথা বলিতে গেলে লোকের হাসি আসিতে পারে বটে। কিন্তু একদিন মানুষ চুরি করিলে তাহাকে চিরকালই চুরি করিতে হইবে, এমন কোন কথা আছে কি? আমি পাপীয়সী। পাপের জ্বালায় আমি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি। আর পাপের মাত্রা বাড়াইয়া কাজ নাই।"

গোলাপ বলিল—"আমরা এত কথা জানি না। আমরা জানি একবার পাপও যা দশ-বারও তা।"

এই সময় কোথা হইতে হরিচরণ ব্যস্ত-ভাবে আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল।

বিধুমুখীর হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তিনি মুখ ফিরাইয়া নত বদনে বসিয়া রহিলেন। গোলাপ বলিল—"তুমি আসিয়াছ দাদা? লও ভাই, তোমার মানুষ; যাহা বলিতে হয় তুমি বল। আমি ভাই, হারি মানিয়াছি।"

হরিচরণ বলিল,—"কথা শুনিতে চাহে না বুঝি? সোজা কথায় ওকি কথা শুনিবে? ঝাটা আনিয়া ঘা কতক দিতে পার নাই?"

গোলাপ বলিল,—"তা কি ভাই, আমরা পারি? তোমার মানুষ, তুমি যা ভাল বুঝ কর।"

হরিচরণ বলিল,—"আমাকেও আর চাহে না, আমিও উঁহাকে চাহি না। সে জন্য কোন গোলের কথা নাই। আমি উঁহাকে ভাল কথাই বলিতেছি। তোমার এখনও রূপ আছে, আমি ভাল লোক আনিয়া দিতেছি, তাহাতে তোমার ভাল হইবে, সঙ্গে সঙ্গে আমারও উপকার হইবে। এমন কথাও শুনে না কেন, বল তো গোলাপ দিদি?

গোলাপ বলিল,—"জানি না ভাই। এ পথে নামিয়া আবার ধর্ম্মের ছড়াছড়ি শুনিলে গা জ্বলিয়া যায়। উনি ভাই সতী-সাবিত্রী, আমরা বেশ্যা। আমরা আর কি বলিব?"

তখন হরিচরণ বিধুমুখীর নিকটে গিয়া বলিল,—"তুমি আমাদের কথা শুনিবে কি না বল?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"না।"

হরিচরণ বলিল,—"কি স্পর্দ্ধা। আমার কথার উপর সমান জবাব। জানিস্ তোর অদৃষ্টে অনেক দুর্গতি আছে!"

বিধুমুখী বলিলেন,—"জানি। যাহা হইবা গিয়াছে তাহার অপেক্ষা দুর্গতি আর হইতে পারে না। তাহাও আমি জানি।"

হরিচরণ বলিল,—"মারিয়া তোর হাড় ভাঙ্গিয়া দিব, জানিস্?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"তাহাতে ক্ষতি বোধ করি না। যাহাই কর হরিচরণ, পাপের পথে আমাকে কোন মতেই তুমি আর লইয়া যাইতে পারিবে না।"

হরিচরণ বলিল,—"আচ্ছা, তোরই এক দিন কি আমারই এক দিন। দেখিব তোর এই অহঙ্কার চূর্ণ হয় কি না।"

দারুণ ক্রোধের সহিত হরিচরণ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। গোলাপও সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া আসিল।

বাহিরে একটি হিন্দুস্থানী পুরুষ অপেক্ষা করিতেছিল। তাহার মাথায় একটী তাজ, গায়ে জরির বেলদার আবরোঁয়ার পাঞ্জাবী, গলায় সোণার চেন হার, পরিধান কালাপেড়ে ধুতি, পায়ে বার্ণিষ করা পম্প-সু, বাম স্কন্ধের উপর হইতে যজ্ঞসূত্রাকারে এক বেনারসী ওড়না বিলম্বিত।

এই ব্যক্তির নিকটে আসিয়া হরিচরণ অনেকক্ষণ কথা কহিল। তাহার পর তাহাকে সঙ্গে লইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল এবং যে ঘরে বিধুমুখী আছেন, সেই ঘরে তাহাকে প্রবেশ করিতে বলিয়া আপনি বাহিরে বসিয়া রহিল। তখন রাত্রি প্রায় আটটা।

হিন্দুস্থানী যুবা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। হরিচরণ বাহির হইতে শুনিতে পাইল, হিন্দুস্থানী যুবা নানাপ্রকার কথা কহিতেছে। বিধুমুখীর কোন কথাই তাহার কর্ণগোচর হইল না। তাহার পর দুই তিন মিনিট কোন কথাই হরিচরণ আর শুনিতে পাইল না। তাহার পর হরিচরণ শুনিতে পাইল, বিধুমুখী উচ্চ শব্দে হিন্দুস্থানী পুরুষকে অনেক গালি দিতেছেন, তাহার পর সহসা হিন্দুস্থানী পুরুষ কাতর ভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"সয়তানী, মেরা জান লিয়া।"

সঙ্গে সঙ্গে বিকট আর্ত্তনাদ। বাটীর চারিদিকে অনেক লোক জমিয়া গেল। হরিচরণ ও গোলাপী দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং দেখিল হিন্দুস্থানীর বাম পার্শ্বে এক ছুরিকা বিদ্ধ রহিয়াছে, তাহার দেহ হইতে রক্ত বাহির হইয়া বহিয়া যাইতেছে, এবং সে অতিশয় যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। আর বিধুমুখী উন্মাদিনীর ন্যায় ভয়ঙ্কর ভাবে ঘরের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া আছেন।

হরিচরণ বলিল,—"রাক্ষসী, সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্‌! আমি তোকে খুন করিব।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"সাবধান! আমার গায়ে হাত দিতে আসিয়া ঐ পাষণ্ডের এই দুর্গতি হইয়াছে! তোমার অদৃষ্টেও ঐরূপ ঘটিবে।"

তখন হরিচরণ ব্যস্তভাবে বাহিরে আসিয়া একখানি মোটা কাঠ লইয়া গেল এবং বিধুমুখীর মাথা লক্ষ্য করিয়া তাহা মারিতে উঠাইল। গোলাপী তৎক্ষণাৎ পশ্চাদ্দিক হইতে সেই কাষ্ঠখণ্ড চাপিয়া ধরিল এবং বলিল,—"আমার বাড়ীতে একি কাণ্ড বাবু! যাহা হইয়াছে তাহার দায়ে এখনই হাতে দড়ী পড়িবে। আবার কেন হেঙ্গাম বাধাইতেছ? ভাল লোক ভাবিয়া তোমাদের জায়গা দিয়াছিলাম। এখন কি সর্ব্বনাশ তোমরা ঘটাইলে দেখ দেখি।"

তখনই বাহিরে তুমুল কোলাহল উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বহু লোক বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। সর্ব্বাগ্রে পুলিশের ইনিস্পেক্টর, তাঁহার পশ্চাতে দারোগা, জমাদার, কনেষ্টবল, জীবনকৃষ্ণ বাবু এবং অন্যান্য অনেক লোক।

ইনিস্পেক্টর বলিলেন,—"হরিচরণ কাহার নাম?"

জীবনকৃষ্ণ বাবু হরিচরণকে দেখাইয়া দিলেন। ইনিস্পেক্টর তাহাকে হাতকড়ি দিতে আদেশ করিলেন। তখনও হরিচরণের হাতে সেই কাঠ রহিয়াছে। ইনিস্পেক্টর বলিলেন,—"এখানে মরণাপন্ন অবস্থায় পড়িয়া একে? এ যে ধরমচাঁদ বাবু। ইনি এদেশের একজন প্রধান ধনী? এ স্থানে ইনি কেন আসিলেন? ইহার এ অবস্থা কে ঘটাইল? বোধ হয় হরিচরণ কৌশলে ইহাকে এখানে আনিয়া খুন করিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহার পর ঐ স্ত্রীলোককে মারিতে যাইতেছিল।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"না মহাশয়, ঐ হিন্দুস্থানী পুরুষ বলপূর্ব্বক আমাকে ধরিতে আসিয়াছিলেন। আমি আত্ম-রক্ষার আর কোন উপায় না পাইয়া উঁহার দেহে ছুরি মারিয়াছি।"

ইনিস্পেক্টর জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনারই নাম কি বিধুমুখী?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"হাঁ।"

ইনিস্পেক্টর ধরমচাঁদ বাবুর নিকটস্থ হইলেন। ধরমচাঁদ বাবুর আঘাত গুরুতর হইয়াছে, কিন্তু সাংঘাতিক হয় নাই। ইনিস্পেক্টর ছুরি খুলিয়া লইলেন। পঞ্জরাস্থির উপর দিয়া চর্ম্মমাত্র ভেদ করিয়া ছুরি চলিয়া গিয়াছে। সহজেই তিনি সারিয়া উঠিবেন বলিয়া সকলের বোধ হইল। অতি সাবধানে ইনিস্পেক্টর ও

জীবন বাবু তাঁহার ক্ষতস্থানে কাপড় বাঁধিয়া দিলেন। ধরমচাঁদ বাবু একটু সুস্থ বোধ করিলেন। ইনিস্পেক্টর জিজ্ঞাসিলেন,—"কিসে কি হইল আপনি ঠিক করিয়া বলুন।"

ধরমচাঁদ বলিলেন,—"বড় লজ্জার কথা। আজি আমার সুশিক্ষা হইয়াছে। আমার যে শাস্তি হইয়াছে, তাহার জন্য আমি দুঃখিত নহি। এ জন্য আমি কাহারও নামে কোনও নালিসও করিতেছি না। ঘটনা যাহা ঘটিয়াছে তাহা আমি আপনাদের নিকট অকপটে বলিতেছি। এই হরিচরণ আমাকে এক প্রভূত ধনশালিনী সুন্দরী নারীর কথা বলে। ইহাও বলে যে, সে কোথাও যাইবে না, আপাততঃ সে কুস্থানে আছে, সেখানে আসিয়াই তাহার সহিত আলাপ করিতে হইবে। সহজে স্ত্রীলোক আমার কথায় সম্মত হইবে না। একটু ছলে কলে কৌশলে ও বলে তাহাকে হস্তগত করিতে হইবে। আমার এরূপ অখ্যাতি আপনাদের অবিদিত না থাকিতে পারে। আমি বড় পাপী, হরিচরণের কথায় আমি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া এই কুস্থানে পড়িয়াছি।"

ধরমচাঁদ নীরব হইলেন। ইনিস্পেক্টর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাহার পর কি হইল?"

ধরমচাঁদ একটু বিশ্রামের পর বলিলেন,—"তাহার পর এই শাস্তি। আমি অনেক পাপ করিয়াছি, একথা স্বীকার করিয়াছি। কখনই পাপ কার্য্যে আমার আশা নিষ্ফল হয় নাই। মনে করিয়াছিলাম এবারও তাহাই হইবে। আমি হরিচরণের মুখে শুনিয়াছিলাম ঐ নারী কুলটা। আমি সেই সাহসে, টাকার বলে, দেহের শক্তিতে উঁহার গায়ে হাত দিতে গিয়াছিলাম। তাহার পর যাহা হওয়া উচিত তাহাই হইয়াছে। উনি আমার মা, উঁহার নিকট পরম শিক্ষালাভ করিয়াছি। উঁহাকে আমি প্রণাম করিতেছি। উনি পরমা সতী তাহার সন্দেহ নাই।"

ইনিস্পেক্টর বলিলেন,—"এক্ষণে আপনার কি অভিপ্রায়?"

ধরমচাঁদ বলিলেন,—"এক্ষণে আপনারা দয়া করিয়া কোন উপায়ে আমাকে আমার বাটীতে পাঠাইয়া দিউন। আমি তথায় উপযুক্ত ডাক্তারাদি ডাকাইয়া চিকিৎসা করি। আমি মা ঠাকুরাণীর বিরুদ্ধে নালিশ করিতে চাহি না। উ নি উচিত কাজ করিয়াছেন।"

তখনই ইনিস্পেক্টরের আদেশে কনষ্টেবল পাল্কী আনিতে ছুটিল। ইনিস্পেক্টর জিজ্ঞাসিলেন —"দেওয়ানজি মহাশয়, এক্ষণে বিধুমুখীর কি কর্ত্তব্য?

জীবন বাবু বলিলেন,—উনি মহারাণী করুণাময়ীর নিকটে থাকিবেন, তাঁহারই ব্যবস্থায় হরিচরণ ধরা পড়িল; বিধুমুখীর উদ্ধার হইল। যদি পুলিশের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে মহারাণীর কাছে উপস্থিত হইলেই বিধুমুখীকে পাওয়া যাইবে। মহারাণী উঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন। যদি সাক্ষাতের পর উ নি সেখানে থাকিতে ইচ্ছা না করেন, তাহা হইলে উ হার ইচ্ছামত স্থানে উ হাকে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে এবং যথাসময়ে সে সংবাদ পুলিশের গোচর করা হইবে।"

ইনিস্পেক্টর বিধুমুখীর দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"আপনি কি ইচ্ছা করেন?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"আমি মহারাণীর নাম শুনিয়াছি; তাঁহার অনেক অলৌকিক গুণের কথাও শুনিয়াছি। কথাবার্ত্তায় বুঝিতেছি তাঁহারই ব্যবস্থায় আমার উদ্ধার হইল। নদীর অপর পারে তাঁহার দানকাণ্ড চলিতেছে এবং তিনিও এখানে আছেন, এ সংবাদও আমি এখানে আসিয়া জানিতে পারিয়াছি। এরূপ সুযোগ আমার অদৃষ্টে আর ঘটিবে কি না

বলিতে পারি না, তাঁহার চরণে প্রণাম করিতে আমার বাসনা হইয়াছে। কিন্তু সেখানে আমার থাকা ঘটিবে কি না, এখন তাহা বলিতে পারি না।"

ইনিস্পেক্টর জিজ্ঞাসিলেন,—"দেওয়ানজি মহাশয়, আপনি কিরূপ ব্যবস্থায় বিধুমুখীকে লইয়া যাইতে চাহেন?"

জীবন বাবু বলিলেন,—"সমস্ত ব্যবস্থাই স্থির আছে। আমাদের দ্বারবানেরা এক্ষণই পাল্কী লইয়া আসিবে। দুইজন দাসী ও চারি জন বরকন্দাজ পাল্কীর সঙ্গে যাইবে। বোধ হয়, কোনই অসুবিধা হইবে না।"

তাহার পর ইনিস্পেক্টর বলিলেন,—"এই হতভাগী গোলাপী মাগীকেও চালান দিতে হইবে। এ পলাইয়া যাইতে পারে। আমরা শুনিয়াছি, ইহার এই বাটীতে অনেক কুলবালা ধর্ম্ম হারাইয়াছে। এ অনেক নারীকে ফুস্‌লাইয়া পাপ-পথে আনিয়াছে। অনেক দুষ্ট পুরুষ সতী নারীকে আনিয়া ইহার নিকট আশ্রয় পাইয়াছে। ইহাকে হঠাৎ ছাড়িয়া দেওয়া আমি উচিত মনে করি না। হরিচরণের সহিত ইহাকেও আজি থানায় চালান দেওয়া হউক। তাহার পর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের যেরূপ ইচ্ছা হয়, তাহাই হইবে।"

হাতকড়ি-নিবদ্ধ হরিচরণ ঠিক দাঁড়াইয়া রহিল; কিন্তু গোলাপী কাঁদিয়া ফেলিল।

কনষ্টবল পাল্কী লইয়া আসিল। অনেকে ধরাধরি করিয়া ধরমচাঁদকে পাল্কীতে উঠাইয়া দিল। তিনি গৃহে গমন করিলেন।

জীবনকৃষ্ণ বাবু বলিলেন,—"মা লক্ষ্মী আপনি পাল্কীতে উঠুন। ঐ ঝিরা পাল্কীর পাশে দাঁড়াইয়া আছে। দ্বারবানেরা সঙ্গে যাইবে। আপনার কোন চিন্তা নাই।"

বিধুমুখী ইনিস্পেক্টরের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি যাইতে পারি কি।"

ইনিস্পেক্টর বলিলেন,—"আপনাকে যে লোক লইয়া যাইতেছেন, তাঁহার ব্যবস্থার উপর জেলার ম্যাজিষ্টেট সাহেবও কোন কথা কহিবেন না। আপনি স্বচ্ছন্দে গমন করুন। কিন্তু দুই এক দিনের মধ্যেই আপনার জোবানবন্দীর দরকার হইবে। এই হতভাগার বিরুদ্ধে যে সঙ্গীন মোকদ্দমা এবার খাড়া হইয়াছে, তাহার প্রধান সাক্ষীই আপনি।"

জীবন বাবু বলিলেন,—"জোবানবন্দী দেওয়ার কোন অসুবিধা হইবে না। বোধ হয় মহারাণী মাতা কমিসনে সাক্ষী দেওয়াইতে ইচ্ছা করিবেন। যথাসময়ে তাহার ব্যবস্থা করিলেই হইবে।"

ধীরে, নম্রভাবে রাজ-রাজমোহিনীর ন্যায় পাদবিক্ষেপে বিধুমুখী সে পাপপুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, পাল্কীসহ বাহকগণ, দ্বারবানগণ এবং ঝি দুইজন প্রস্থান করিল।

ইনিস্পেক্টর বলিলেন,—"এক্ষণে জমাদার এবং আট জন কনষ্টবল এই আসামী হরিচরণ এবং গোলাপীকে থানায় লইয়া যাউক। কল্য প্রাতে ইহাদিগকে হাকিমের নিকট পাঠাইতে হইবে।"

জীবন বাবু বিহিত শিষ্টাচারাদির পর ইনিস্পেক্টরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। আসামীদের লইয়া পুলিশের লোকেরা চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মিলন।

সকল গোলই মিটিয়া গিয়াছে। মহারাণী করুণাময়ী দেবী আজিমগঞ্জ হইতে বীরভূমিতে

আপনার রাজধানী চন্দ্রমালায় প্রস্থান করিয়াছেন। বিধুমুখীর কমিসনে জোবানবন্দী লওয়া হইয়াছে। হরিচরণ দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছে। বিধুর মা নিম্ন আদালতে সাক্ষ্য দিয়াছে। যে দস্যুদল বিধুমুখীর বাটীতে পড়িয়া বিধুমুখীকে হরণ করিয়াছে, রায় বাহাদুরকে জখম করিয়াছে, বিধুর মাকে মরণাপন্ন অবস্থায় ফেলিয়াছে, আরও অনেক সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে নিম্ন আদালতে বিধুর মা হরিচরণকে তাহার কর্ত্তা বলিয়া চিনিয়া দিয়াছে। বিধুমুখীও সুস্পষ্টরূপে হরিচরণকে চিনিতে পারিয়াছেন এবং যে যে উপায়ে সে তাঁহাকে অজ্ঞান করিয়া লইয়া আসিয়াছে এবং তাহার পর তাঁহার যে যে দুরবস্থা ঘটাইয়াছে, সকলই তিনি পরিষ্কাররূপে বলিয়াছেন। জীবনকৃষ্ণ বাবুকেও সাক্ষ্য দিতে হইয়াছে। তিনি আদালতে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বলিয়াছেন যে, হরিচরণ বিধুমুখীকে নানাভাবে মহারাণীর নিকট বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল এবং বিধুমুখী যে তাহার হস্তে আছে, এ কথা হরিচরণ বার বার বলিয়াছিল, আর তাঁহার রূপ যৌবনের প্রলোভন দেখাইয়া ঘৃণিত প্রস্তাব করিতেও সে কুণ্ঠিত হয় নাই। রায় বাহাদুর হরকুমারকেও সাক্ষ্য দিতে হইয়াছে। চণ্ডী, ভবসুন্দরী প্রভৃতি আরও অনেক লোককে সাক্ষ্য দিতে হইয়াছে।

মোকদ্দমার সময় আদালতে রায় হরকুমার বাহাদুরের সহিত জীবন বাবুর সাক্ষাৎ হয়। দেওয়ানজির মারফৎ বিধুমুখী দুই খানি পত্র পাঠাইয়াছিলেন। একখানি রায় বাহাদুর ও আর একখানি রাজার নামে লিখিত। উভয় পত্রেই অসংখ্য প্রণাম ও অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইয়া, বিধুমুখী কিছুদিন চন্দ্রমালায় মহারাণী করুণাময়ী দেবীর নিকট অবস্থান করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, রাজা বা রায়বাহাদুর সে প্রস্তাবে কোন আপত্তি করেন নাই। বিধুমুখী দুই পক্ষ কাল চন্দ্রমালায় বাস করিতেছেন।

চন্দ্রমালায় বিধুমুখী অনেক সময় মহারাণীর নিকট অবস্থান করার অধিকার লাভ করিয়াছেন। করুণাময়ীর আকার প্রকার, শিক্ষা, ক্ষমতা, ত্যাগ স্বীকার, অনাসক্তি, উদারতা, মহত্ত্ব প্রভৃতি দেখিয়া বিধুমুখী বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছেন। মানুষের, বিশেষতঃ ধনশালিনী স্বাধীনা স্ত্রীলোকের, এরূপ অত্যাশ্চর্য্য দেবভাব জন্মিতে পারে, বিধুমুখী না দেখিলে কখনই বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। এই দেবীর সান্নিধ্যে অবস্থিতি করিবার অধিকার লাভ করিয়া বিধুমুখী আপনাকে পরম ভাগ্যবতী বলিয়া জ্ঞান করিয়াছেন।

একদিন সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরে, আহ্নিকাদি সমাপ্ত হইলে মহারাণী দাসীর দ্বারা বিধুমুখীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তৎক্ষণাৎ বিধুমুখী আসিয়া দূর হইতে মহারাণীকে প্রণাম করিয়া অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মহারাণী বলিলেন,—"আজি সমস্ত দিন তোমার সহিত কথা কহিবার সময় পাই নাই। অনেক বৈষয়িক কার্য্যে আজিকার দিন কাটিয়া গিয়াছে। তুমি বইস। এখন সময় পাইয়া তোমাকে ডাকিয়াছি। তুমি স্বচ্ছন্দে আছ তো?"

বিধুমুখী সেইস্থানে উপবেশন করিয়া বলিলেন,—"মহারাণী মাতার দেহের বায়ু ক্রপাল ক্রমে যাহার গায়ে লাগিতেছে, তাহার আর কি অস্বচ্ছন্দতার কারণ থাকিতে পারে? আমি বড়ই আনন্দে আছি। আমার এই আনন্দ দেখিয়া আমি নিজেই নিরন্তর আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতেছি।

মহারাণী বলিলেন,—"কেন মা?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"আমি যে পাপ করিয়াছি, তাহা শুনিলেও নারীর পাপ হয়। এই পাপে সংসারের সকলের ঘৃণাভাজন হইয়া

হীনভাবে কালপাত করাই আমার পক্ষে সমুচিত ব্যবস্থা। পরকালে অনন্ত নরক, ইহকালে অবিশ্রান্ত যন্ত্রণা আমার অদৃষ্টের একমাত্র নিয়তি হওয়া উচিত। তাহার পরিবর্ত্তে পাপীয়সীর একি সৌভাগ্য। এই জন্মেই সজীব শরীরে দেবতার অনুগ্রহ ও আশ্রয় লাভ, নিরন্তর সন্তোষ ও আনন্দভোগ কেন ঘটিতেছে ইহা ভাবিয়া আমি বিস্ময়াবিষ্ট হই। রাজা উমাশঙ্কর প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়াই আমার মনে হয়। আর মহারাণী মাতার কথা কি বলিব? বোধ করি দেবলোকেও এমন দেবী নাই। এই সকল দেবচরণের আশ্রয় লাভ পরম পুণ্যশীল সাধুগণের অদৃষ্টেও ঘটে কিনা সন্দেহ। আমার মত অভাগিনীর এ সৌভাগ্য কেন হয় মা?"

মহারাণী বলিলেন,—"তোমার চিত্ত সন্তোষ ও আনন্দে পূর্ণ হইয়াছে শুনিয়া পরিতোষলাভ করিলাম। আশীর্ব্বাদ করি ক্রমে তুমি পূর্ণানন্দের অধিকারিণী হইবে। বুদ্ধির ভ্রমে মনুষ্যের পদস্খলন নিয়তই হইয়া থাকে; দেবতাদেরও অনেক সময়ে সেরূপ ঘটে। যে ব্যক্তি আপনার দুষ্কৃতি আপনি বুঝিয়া জীবনের গতি ফিরাইয়া লইতে পারে, এবং আপনার অতীত কুকার্য্যে আন্তরিক সন্তপ্ত হয়, তাহার চিত্ত ক্রমেই নির্ম্মলতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। চিত্তের নির্ম্মলতা হইলেই পাপের তাড়না, অতীতের যন্ত্রণা, তাহাকে আর কাতর করিতে পারে না। আর মা, তুমি যে ঘৃণার কথা বলিতেছ, আমি তাহার কোন কারণ দেখিতে পাই না। এ সংসারে কোন পদার্থই ঘৃণাজনক নহে। ঘৃণা একটা সংস্কার মাত্র। পাপ একটা ঘৃণার বস্তু বটে, কিন্তু মা তাহারও সার্থকতা আছে। পাপ আছে বলিয়াই, পুণ্যের মহিমা গৌরব আমরা প্রণিধান করিতে পারি। পাপ পাশাপাশি চলে বলিয়াই পুণ্যের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠে। পুণ্যের কমনীয় কান্তি দেখিতে পাই বলিয়া আমরা পাপকে ঘৃণা করিতে পারি। পাপ নিশ্চয়ই ঘৃণিত পদার্থ; সুতরাং পাপীও ঘৃণিত। কিন্তু মা, কিরূপ পাপী ঘৃণার সামগ্রী? পাপেই যাহার উল্লাস, পাপকে যে প্রাণের সঙ্গী করিয়া লইয়াছে; পাপের অনুষ্ঠানে যে গৌরব ও আনন্দ অনুভব করে, পাপকে যে পুণ্যের অপেক্ষা প্রিয় বলিয়া জ্ঞান করে সেই পাপী নিশ্চয়ই ঘৃণার আস্পদ। যে পাপী পাপানুষ্ঠান করিয়া তাহার জ্বালায় অস্থির হয়, যে পাপী পাপকে স্মরণ করিয়া লজ্জায় অধোমুখ হইয়া থাকে, যে পাপী পাপাচরণের পর প্রাণের কলুষরাশি ধৌত করিবার জন্য পাগল হইয়া বেড়ায়, যে পাপী অতীত পাপের কথা চিন্তা করিয়া শিহরিতে থাকে ও মরণাপন্ন হয়; তাহাকে ঘৃণা করিবার কোনই কারণ নাই। আমি বিশ্বাস করি অচিরে তোমার পূর্ণ সন্তোষ জন্মিবে।"

বিধুমুখী অধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন। মহারাণী বলিলেন,—"কি ভাবিতেছ মা?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"একই কারণে আমার পূর্ণ সন্তোষ কখন জন্মিবে না।"

"কি কারণ?

"আমার স্বামী—আমি তাঁহার সম্বন্ধে যেরূপ অত্যাচার করিয়াছি, তাহা কল্পনাতীত। সুতরাং তাঁহার ক্ষমা বা কৃপালাভের প্রার্থনা আমার নাই। আমি যদি দূর হইতে তাঁহাকে একবার করিয়া দেখিতে পাই, তিনি যে স্থানে অবস্থান করেন, অন্ততঃ সে স্থানের নিকটস্থ হইতে অধিকার পাই, তাহা হইলেই বোধ হয় আমার সন্তোষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে।"

মহারাণী বলিলেন,—"তাহাই হইবে। নিশ্চয়ই মা, অচিরে তুমি তোমার স্বামীকে যাহাতে দেখিতে পাও, তাহার ব্যবস্থা করিব।"

বিধুমুখী সজলনয়নে বলিলেন,—

"ভগবতীর এই আশ্বাস বাক্যে দাসী চরিতার্থ হইল।"

মহারাণী জিজ্ঞাসিলেন,—"রাজা উমাশঙ্করের সহিত তুমি কতদিন আলাপ করিয়াছ?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"আমি জীবনে সাত আট দিন তাঁহার সহিত অল্পাধিক কথা কহিয়া ধন্য হইয়াছি।"

মহারাণী জিজ্ঞাসিলেন,—"রাজাকে কেমন লোক বলিয়া তুমি বুঝিয়াছ?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"রাজাকে লোক বলিয়া উল্লেখ করিতে আমার সাহস হয় না। আহা! যে দিন কাশীতে প্রথমে সেই দেবতা ভিক্ষার নিমিত্ত দয়া করিয়া আমাকে দর্শন দিলেন, সে দিন আমার জীবনের কি শুভ দিন। তাঁহার চরণধূলার কৃপায় আমার জীবনের গতি ফিরিয়া গেল। তিনিই আমার গুরু।"

"আর রায়বাহাদুরের সহিত তোমার পরিচয় আছে?"

"তিনি যে আমার পিতা। এমন মিষ্টভাষী, এমন সদাশয়, এমন সুব্যবস্থাপক, এমন সর্ব্বজনরঞ্জন লোক আমি আর কখন দেখি নাই।"

করুণাময়ী জিজ্ঞাসিলেন, "আর রাণীর সহিত তোমার পরিচয় আছে?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"না মা, আমি একদিন দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়াছি, তিনি আমাকে দেখিতে পান নাই। তাঁহার ন্যায় পুণ্যবতীর সম্মুখে এ পাপ মুখ দেখাইতে আমার ভরসা হয় নাই। রাণীর অনেক সদ্‌গুণের কথা লোকমুখে শুনিয়াছি, রাজার ভগ্নীরও অনেক প্রশংসা শুনিয়াছি, কিন্তু লজ্জায় ও ঘৃণায় তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে পারি নাই।"

করুণাময়ী বলিলেন, "তুমি শুনিয়াছ কি, তোমাদের রাজা এ দেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য সমস্ত বিষয় সম্পত্তি, বাড়ী ঘর, গাড়ী অলঙ্কার প্রভৃতি সর্ব্বস্ব দান করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"না মা, আমি এ কথা শুনি নাই। তাঁহার পক্ষে এ কার্য্য অসম্ভব নহে। কিন্তু মা, সর্ব্বস্বই এ কার্য্যে লাগিবে কি?"

করুণাময়ী বলিলেন,—"আমি যত দূর জানি ও বুঝি, তাহাতে আমার বোধ হয়, তাঁহার সকলই একার্য্যে নিঃশেষ হইবে। বোধ হয় তাঁহাকে স্ত্রীপুত্র লইয়া গাছতলায় দাঁড়াইতে হইবে।"

বিধুমুখী অধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন। মহারাণী বলিলেন,—"এজন্য চিন্তা করিতেছ কি মা? চিন্তা নিষ্প্রয়োজন। আমি যতদূর জানি তাহাতে আমার বিশ্বাস, অবস্থান্তর হেতু রাজা উমাশঙ্কর কখনই বিচলিত হইবেন না।" বিধুমুখী বলিলেন,—"তাহা না হইলেও, রাণীর ও রাজকুমারের নিশ্চয়ই বিশেষ কষ্ট হইবে।"

মহারাণী বলিলেন,—"যদিই হয়, কে তাহার অন্যথা করিবে? তুমি এক সময়ে আমার নিকট যে বিষয় বিক্রয় করিয়াছিলে তাহার দখল দিতে রায় বাহাদুর আপত্তি করায় রাজার সহিত আমাদের মোকদ্দমা হয়। সে মোকদ্দমায় রাজাকে আমার নিকট প্রায় এক লক্ষ টাকার দায়ী হইতে হইবে।"

বিধুমুখী বলিলেন—"তিনি একে সর্ব্বস্ব দান করিতে বসিয়াছেন, তাহার উপর এই দায়। আপনি কি টাকা আদায় করিবেন?"

মহারাণী বলিলেন,—"নিশ্চয় আদায় করিব। ন্যায়-সঙ্গত প্রাপ্য ছাড়িয়া দিবার কোন কারণ নাই?

বিধুমুখী বলিলেন,—"এই টাকার জন্য ধর্ম্মতঃ আমি দায়ী। আমি অনর্থক এই সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া রাজাকে দায়গ্রস্ত করিলাম। মা, আপনি দেবী। আমার প্রতি আপনার কৃপার সীমা নাই। আমি কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিতেছি, আপনি দয়া করিয়া রাজাকে এই দায় হইতে মুক্ত করিতে পারেন না কি ?"

মহারাণী বলিলেন,—"না মা, কেন তাহা পারিব ? সত্য বটে, তোমার জন্য রাজার এ দায় উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু রাজা যখন বিষয়ের অধিকারী হইলেন, তখন প্রথমেই যে সম্পত্তি লইয়া বিরোধ, তাহার দাবী ছাড়িয়া দিলেই পারিতেন। তিনি বিষয় পাইবেন বলিয়া কখন ভাবেন নাই। যে অবস্থায় যে বিষয় তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল, তাহাই যথেষ্ট জ্ঞান করিয়া তুষ্ট থাকা তাঁহার উচিত ছিল। এ সম্বন্ধে তোমারও কোন দোষ আমি দেখিতেছি না। তুমি যখন বিষয় নিজের বলিয়া জানিতে এবং কালে বিষয়ের এরূপ পরিণাম দাঁড়াইবে ইহা যখন তুমি স্বপ্নেও মনে কর নাই, তখন তুমি তাহার ইচ্ছামত ব্যবহার করিয়াছ। ইহাতে তোমার কোন দোষ হইতে পারে না।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"দোষ যাহারই হউক, রাজার সর্ব্বস্ব যাইতে বসিয়াছে, এ সময়ে আপনি ক্ষান্ত থাকিলে হইত না ?"

মহারাণী বলিলেন,—"না মা, তাহা তো সঙ্গত ব্যবস্থা নহে। যখন তাঁহার সমস্ত বিষয়ই যাইতেছে, তখন আমি ছাড়িয়া দিলেও তাঁহার বিষয় থাকিবে না বুঝিতেছি, তখন আমি কেন আমার ন্যায্য প্রাপ্য ত্যাগ করিব ? এজন্য দুঃখিত বা চিন্তিত হইবার কোন কারণ দেখিতেছি না। তুমি এজন্য চিন্তাত্যাগ কর।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"যে আজ্ঞা। আপনি যখন ইহা চিন্তাজনক নহে বলিয়া মনে করিতেছেন, তখন আমি এজন্য কেন চিন্তিত হইব ?"

মহারাণী বলিলেন,—"আমি শীঘ্র তীর্থ দর্শনে যাইব। ইচ্ছা করিলে তুমিও আমায় সঙ্গে যাইতে পার।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"আমাকে কৃপা করিয়া সঙ্গে লইলে চরিতার্থ হইব।"

মহারাণী বলিলেন,—"তোমার আহারের কাল উত্তীর্ণ হইয়াছে। কল্য তোমার সহিত ইহার পরামর্শ করিব।"

বিধুমুখী প্রণাম করিয়া নিতান্ত চিন্তিতভাবে প্রস্থান করিলেন। পরম্পরাগত বিবিধ দুর্ঘটনাপাতে বিধুমুখীর হৃদয় ও মন অতিশয় অবসন্ন হইয়াছিল। তাহার পর জিয়াগঞ্জে সহসা উন্মাদ ভাবে ধরমচাঁদ বাবুর দেহে অস্ত্রাঘাত করার পর, তাঁহার অন্তর নিতান্ত বিচলিত হইয়াছিল। অদ্য মহারাণীর মুখে পরম পুণ্যশীল রাজা উমাশঙ্করের এই দশা বিপর্য্যয়ের বার্ত্তা শ্রবণে তিনি বড়ই ব্যথিতা হইলেন। এই সকল বিবিধ কারণে বিধুমুখীর হৃদয় ও মন ক্রমেই বিকৃত হইতে লাগিল।

সপ্তম খণ্ড—ছায়া।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পূজা।

রাণী অন্নপূর্ণা দেবী অদ্য রাজার প্রতিষ্ঠিত শঙ্করনাথ মহাদেবের পূজা করিতে গমন করিয়াছেন। সঙ্গে ভবসুন্দরী এবং দাসী

ব্যতীত আরও দুই জন পরিচারিকা আছে। খোঁকারাজাকে ক্রোড়ে লইয়া একজন দাসী সঙ্গে চলিয়াছে। দেবালয় রাজবাটী হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নহে। তথাপি অনেক অস্ত্রধারী রক্ষী ও দৌবারিক রাণীর শিবিকার অগ্রে, পশ্চাতে ও উভয় পার্শ্বে চলিয়াছে। নৈবেদ্য, পূজার বিবিধ সামগ্রী ও পুষ্প-চন্দনাদি লইয়া অনেক ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণকন্যা অগ্রে গমন করিয়াছেন।

বেলা নয়টার সময় রাণী দেবালয়ে উপনীত হইলেন। পুরুষ প্রহরী, অনুচর ও ব্রাহ্মণগণ দূরে চলিয়া আসিলেন। শিবিকা মধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাণী দেবমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। কেবল দেব-পুরোহিত মহাশয় মন্দির মধ্যে থাকিতে পাইলেন, তাঁহাকে মন্ত্রাদি পাঠ করাইয়া যথারীতি পূজা করাইতে হইবে, এজন্য তাঁহার তথায় অবস্থান অপরিহার্য্য। অন্যান্য যাবতীয় পুরুষ মন্দিরের বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিল। ভব, দাসী, অন্যান্য পরিচারিকাগণ ও ব্রাহ্মণ-কন্যাগণ মন্দির মধ্যে রাণীর নিকটে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। খোঁকারাজা মাতার ক্রোড়ে স্থান প্রাপ্ত হইল।

আজি রাণী অন্নপূর্ণা অপূর্ব্ববেশে সজ্জিতা। মকমলের উপর সাঁচ্চা কাজের শোভাময় পাইড়যুক্ত পীতবর্ণের এক চিনের রেশমী কাপড় তিনি পরিধান করিয়াছেন। স্বর্ণবর্ণ ফুলমালা সংযুক্ত জামা তিনি গায়ে দিয়াছেন; আর তাঁহার উপর হরিদ্রা বর্ণের অতি সূক্ষ্ম এক ওড়না তিনি ধারণ করিয়াছেন। অঙ্গে ভূষণের বাহুল্য নাই। প্রকোষ্ঠে হীরকের বলয়, কণ্ঠে মুক্তামালা, কর্ণে অত্যুজ্জ্বল দুলমাত্র তিনি ধারণ করিয়াছেন। এখনই স্নান করিয়া তিনি দেবদর্শনে আগমন করিয়াছেন। এজন্য তাঁহার কেশরাশি এখন অবেণী সংবদ্ধ। এই বেশে সুন্দরী-শিরোমণি অন্নপূর্ণাকে আজি অলৌকিক শোভাময়ী বলিয়া বোধ হইয়াছে। তিনি অচিরস্নাতা; সদ্যঃস্নান জনিত লাবণ্য তাঁহার বদনকে সমুজ্জ্বল করিয়াছে। আর ভক্তি ও নম্রতা তাঁহার বদনের অপূর্ব্ব শ্রী-বিধান করিয়াছে।

যে ব্রাহ্মণ এই দেবালয়ের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত, তিনি বয়সে প্রবীণ না হইলেও, বহু শাস্ত্রার্থবিৎ। তাঁহার নাম ঘনশ্যাম বিদ্যানিধি। তাঁহার বয়স ত্রিশ অতিক্রম করিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। এই বয়সে এই যুবা দর্শনাদি অনেক শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন এবং প্রকৃত পণ্ডিতরূপে পরিচিত হইবার যোগ্য হইয়াছেন। বিবাহাদি করিয়া, সংসার-বন্ধনে বদ্ধ হইতে তাঁহার বাসনা হয় নাই। তাঁহার এরূপ বৈরাগ্যের কোন কারণই কেহ অনুমান করিতে পারেন নাই। রাজার দেবপ্রতিষ্ঠার সমসময়ে ঘনশ্যাম আসিয়া পৌরহিত্যের প্রার্থী হইলেন। রায় হরকুমার বাহাদুর এই শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত যুবার সহিত আলাপ করিয়া নিতান্ত প্রীত হইলেন এবং তাঁহাকে রাজ-সংসারে কোন উপযুক্ত পদ প্রদানের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু বিদ্যানিধি তাহাতে সম্মত হইলেন না। দূরে একান্তে অনন্যমনে শিবপূজাই তাঁহার অতি প্রিয় কার্য্য; তিনি সম্মান বা যশের প্রার্থী নহেন; সুতরাং অন্য পদে তাঁহার প্রয়োজন নাই। রায় বাহাদুর তাঁহার প্রার্থনামত বেতনাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তাঁহাকে দেবসেবার কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। অতীব সন্তোষজনকরূপে দেবসেবা চলিতে লাগিল। রাজা উমাশঙ্কর ও রায় বাহাদুর অনেক সময়েই দেবপূজা করিতে যাইতেন। যখন যাইতেন, তখনই বিদ্যানিধির ব্যবহারে ও তাঁহার সদালাপে তাঁহারা একান্ত প্রীত হইতেন। বিদ্যানিধি মহাশয় দেবালয় ত্যাগ করিয়া কোথাও যাইতেন না, আহূত না হইলে রাজদর্শনেও

আসিতেন না, আপনার কর্ত্তব্য-পালনে অণু-মাত্র অবহেলা করিতেন না।

অন্নপূর্ণাদেবী আরও দুই এক দিন শঙ্কর-নাথের পূজা করিতে আসিয়াছিলেন। ঘনশ্যাম বিদ্যানিধি তত্তৎকালে একান্ত আগ্রহ সহকারে রাণীর পূজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং রাণীর মনোরঞ্জনের নিমিত্ত বহুবিধ আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যবহারে রাণী বিশেষ প্রীত হইয়া তাঁহাকে অনেক পারিতোষিক প্রদানে উদ্যত হইয়াছিলেন। ঘনশ্যাম কোন পারিতোষিকই গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, "অর্থাদি কোন পারিতোষিকে তাঁহার আবশ্যক নাই। যথোপযুক্ত সময় হইলে তিনি ইচ্ছানুরূপ পুরস্কার চাহিয়া লইবেন।" রাণী বুঝিয়াছিলেন, অবশ্যই এ বিপ্র বিশেষ প্রয়োজনে বিশেষ কোন পুরস্কারের প্রার্থনা করিবেন। অসাধ্য না হইলে, নিশ্চয়ই তখন তাহা প্রদান করিতে হইবে।

কোন পুরুষের সহিত বাক্যালাপ করিতে রাণী অন্নপূর্ণার সঙ্কোচ ছিল না এবং রাজা বা রায় বাহাদুরের তাহাতে নিষেধও ছিল না। যে স্থানে বাক্যালাপ করা আবশ্যক বলিয়া রাণী স্থির করিবেন, সে স্থানে তিনি স্বচ্ছন্দে স্বাধীনভাবে অন্য পুরুষের সহিত আলাপ করিবেন, ইহাই রাজা ও রায়বাহাদুরের প্রভিপ্রায়। রাণীর চরিত্রবলের উপর তাঁহাদের এতই বিশ্বাস যে, এ সম্বন্ধে কোন কঠোর ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনা নিতান্ত লজ্জাজনক ও ঘৃণাজনক বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। তথাপি কোথায় যাইতে হইলে রাণীর শিবিকার সহিত বন্দুক ও ঢাল তরবার-ধারী বীরগণ ধাবিত হইত এবং দাসীগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত। সে কেবল ধনশালিগণের ন্যায় লৌকিক আড়ম্বর বজায় রাখিবার জন্য। এরূপ স্বাধীনতা থাকিলেও, রাণী কখনই অকারণ কোন পুরুষান্তরের সমক্ষে উপস্থিত হইতেন না এবং কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেন না। দেবালয়ের পূজকের সহিত কথোপকথন বড়ই আবশ্যক। রাণী যে দুইবার দেবপূজার নিমিত্ত মন্দিরে গিয়াছিলেন, সে দুইবারই ঘনশ্যামের সহিত তিনি কথা কহিয়াছিলেন। বিদ্যানিধির অনেক কথাই প্রহেলিকার ন্যায় দুর্ব্বোধ ও বিবিধ রহস্যজালে জড়িত বলিয়া রাণীর মনে হইয়াছিল। রাণী মনে করিয়াছিলেন, এই ব্যক্তির জীবনে নিশ্চয়ই কোন বিষাদজনক ঘটনা প্রচ্ছন্ন আছে এবং এই দেব-পূজক কোন না কোন দিন তাহা তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিবে এবং তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করিবে।

অদ্য পূজারম্ভের পূর্ব্বে ঘনশ্যাম অনেক ক্ষণ রাণীর বদনের প্রতি নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কি আমাকে কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করেন?"

ঘনশ্যাম বলিলেন,—"বলিতে ইচ্ছা করি বটে; কিন্তু বলিতে পারি কই?"

রাণী বলিলেন,—"কেন বলিতে পারেন না? আপনার কথা অন্য কাহারও কর্ণগোচর না হয়, ইহাই কি আপনার অভিপ্রায়?"

ঘনশ্যাম বলিলেন,—"তাহাই আমার অভিপ্রায় বটে। কিন্তু থাকুক আজি; আর এক দিন আমি মনের কথা দেবীর নিকট নিবেদন করিব।"

রাণী বলিলেন,—"আমার বোধ হয় আপনার জীবনে বিশেষ কোন বিষাদজনক গুপ্ত ব্যাপার আছে। আমার দ্বারা যদি তাহার কোন প্রতিকার সম্ভব হয়, তাহা হইলে আপনি নিঃসঙ্কোচে তাহা ব্যক্ত করিতে পারেন। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, নিতান্ত অসাধ্য না হইলে আপনার উপকারার্থ সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিব।"

ঘনশ্যামের মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল। তিনি বলিলেন,—"আপনার এই আশ্বাস বাক্যে আমি চিরকৃতজ্ঞ হইলাম। আমার ক্লেশ দূর করা আপনারই সাধ্য এবং আপনি বাসনা করিলে অনায়াসেই তাহা সম্পন্ন করিতে পারেন।"

রাণী বলিলেন,—"তাহা হইলে আপনি সে কথা ব্যক্ত করুন। আমি তাহা এখনই সম্পাদন করিয়া নিশ্চিন্ত হই।"

ঘনশ্যাম বলিলেন,—"এখন থাকুক—আজি থাকুক! আমি সুযোগ মতে তাহা আপনাকে জানাইব। আপনার করুণা ব্যতীত আমার জীবনের দুঃখনাশের অন্য কোন উপায় নাই।"

রাণী বলিলেন,—"তবে আপনি সে কথা বলিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন কেন? যদি আর কেহ না শুনিতে পাওয়াই আপনার অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে অনুমতি করুন, আমি এখনই তাহার ব্যবস্থা করিতেছি।"

ব্রাহ্মণ নীরব—অধোমুখ। তিনি অনেক দূরে দাঁড়াইয়া রাণীর সহিত কথা কহিতেছিলেন। রাণী সঙ্গিনীদিগের নিকট হইতে সরিয়া ব্রাহ্মণের নিকটস্থ হইলেন এবং অস্ফুটস্বরে বলিলেন,—"আপনি কি প্রার্থনা করেন?"

অন্নপূর্ণা নিকটস্থ হইলে ব্রাহ্মণ একটু বিচলিত হইলেন। তিনিও অস্ফুটস্বরে বলিলেন,—"আমি যে ধনের প্রার্থনা করি, তাহা অমূল্য; কিন্তু আপনি ইচ্ছা করিলেই তাহা দিতে পারেন। আপনি দয়া করিয়া তাহা দিবেন কি?"

ব্রাহ্মণের ভাবভঙ্গী দেখিয়া ও তাঁহার কথা শুনিয়া অন্নপূর্ণার মন একটু সংশয়াকুল হইল। তিনি আবার সরিয়া সঙ্গিনীগণের নিকটে আসিলেন এবং বলিলেন,—"আপনার যাহা প্রার্থনা থাকে, তাহা আপনি যখন ইচ্ছে আমার নিকট ব্যক্ত করিবেন। আমি আবার বলিতেছি, আমার দ্বারা তাহা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, আপনি কখনই বিফল-মনোরথ হইবেন না। আপাততঃ বেলা অধিক হইয়া উঠিল, আর বিলম্ব করিতে আমার সাধ্য নাই। এক্ষণে পূজার উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইব।"

রাণী পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া সমাহিত চিত্তে তত্রত্য আসনে উপবেশন করিলেন। ব্রাহ্মণ, একটু অগ্রসর হইয়া এবং অপেক্ষাকৃত নিকটে আসিয়া, মন্ত্র পাঠ করাইতে আরম্ভ করিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ঘনশ্যামের সকল মন্ত্র ভাল মনে পড়িল না। নিত্য অভ্যস্ত মন্ত্রাবৃত্তিতে তাঁহার ভ্রান্তি দেখিয়া, অন্নপূর্ণা বিস্ময়াবিষ্ট হইতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ে পূর্ব্বজাত সংশয় বড়ই বাড়িয়া উঠিল। এরূপ প্রমাদ হেতু লজ্জিত না হইয়া ঘনশ্যাম নিরন্তর অতৃপ্ত নয়নে রাণী অন্নপূর্ণার ইন্দীবর বদনের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

শিবপূজার সকল মন্ত্রই রাণীর সুন্দররূপ অভ্যস্ত এবং তাহার যাবতীয় প্রণালী, প্রক্রিয়া ও অনুষ্ঠান সম্বন্ধে তিনি অভিজ্ঞ। সুতরাং ব্রাহ্মণের ভুল হইলেও, রাণীর মন্ত্র পাঠের ব্যাঘাত হইল না। ঘনশ্যাম মন্ত্র ভুলিয়া গেলেও, অন্যান্য অনুষ্ঠান বিষয়ে রাণীকে নানা নির্দেশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও ঘনশ্যামের বড়ই ভ্রম হইল। যখন বিল্বপত্র হাতে লইতে হইবে, তখন ঘনশ্যাম তুলসী লইতে বলিলেন এবং যখন নৈবেদ্য নিবেদন করিতে হইবে, তখন অন্ন নিবেদন করিতে উপদেশ দিলেন। রাণী, একটু বিরক্ত হইয়া, ব্রাহ্মণকে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিলেন এবং তাহার পর আপনার যথাজ্ঞান পূজা ও স্তব পাঠাদি সমাপ্ত করিয়া পুত্রসহ দেবচরণোদ্দেশে প্রণাম করিলেন। তাহার পর দেব-নির্ম্মাল্য

পুষ্প ও বিল্বদল লইয়া খোঁকার মস্তকে প্রদান করিয়া, মন্দির হইতে প্রস্থান করিবার নিমিত্ত পরিচারিকাগণকে ইঙ্গিত করিলেন। খোঁকা রাজার পরিচারিকা আসিয়া তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিল। রাণী দেব-মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। আসিবার সময় ঘনশ্যামের সহিত তিনি কোন কথা কহিলেন না। অগ্য নিতান্ত অতৃপ্ত চিত্তে পূজা সমাপ্ত করিয়া রাণীকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল।

রাজবাটীতে পুনরাগত হইয়া রাণী কোন কক্ষে প্রবেশ না করিয়া, অঙ্গন মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সুহাসিনী আজি রাজার জন্য পাক করিতেছিলেন, এই জন্যই রাণী নিশ্চিন্ত মনে দেব-পূজায় যাত্রা করিতে অবসর পাইয়াছিলেন। রাণী দেবালয় হইতে প্রত্যাগত হইয়া অঙ্গনে দাঁড়াইয়া আছেন, জানিয়া সুহাসিনী তাঁহার হাতের কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিলেন এবং রাণীকে গৃহ-প্রবেশ করিতে বলিলেন। রাণী তদুত্তরে বলিলেন,—"আমার দেব পূজা এখনও শেষ হয় নাই। পূজা করিতে করিতে অন্য কোন কার্য্য নিষিদ্ধ।"

সুহাসিনী বলিলেন,—"কি করিলে তোমার পূজার শেষ হইবে?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"তোমার দাদা না না আসিলে আমার পূজার সমাপ্তি হইবে না।"

রাণীর আদেশে পরিচারিকাগণ তাঁহার নিকটে পুষ্পচন্দনাদি পূজার উপকরণ আনিয়া দিল এবং তাঁহার সম্মুখে এক রজত-সিংহাসন স্থাপন করিল।

সুহাসিনী বলিলেন,—"তবে দাদার নিকট সংবাদ পাঠাইলেই হয়। কতক্ষণ এমন করিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া থাকিবে?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"যতক্ষণ তিনি না আইসেন, ততক্ষণ আমাকে এই স্থানেই থাকিতে হইবে। এজন্য তাঁহাকে ডাকিয়া আনা হইবে না। জুলুম করিয়া তাঁহাকে আনিলে, আমার সঙ্কোচ হইবে, পূজা ভাল হইবে না।"

পরিচারিকাগণ, আত্মীয় নারীগণ, ব্রাহ্মণী-অঙ্গনের চারিদিকে দাঁড়াইয়া রহিল। সুহাসিনীও খোঁকাকে কোলে লইয়া নিকটে দাঁড়াইয়া রহিলেন। খোঁকা সহসা চীৎকার করিয়া উঠিল,—"ঐ বাবা—ঐ বাবা।"

সকলেই খোঁকার প্রদর্শিত পথে নেত্রপাত করিলেন। সত্যই রাজা উমাশঙ্করের দেবমূর্ত্তি সকলের নয়নে পড়িল। রাজার স্নান সমাপ্ত হইয়াছে, তাঁহার পরিধানে কৌষেয় পীতাম্বর, চরণে মুক্তাজড়িত মখমলের জুতা। দূর হইতে রাজাকে দর্শন মাত্র অন্নপূর্ণা ভূতলে মস্তক স্থাপন করিয়া প্রণাম করিলেন।

রাজা নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—"আজি তুমি কি শঙ্করনাথের মন্দিরে গিয়াছিলে রাণী?"

রাণী বলিলেন,—"হাঁ; আমি এতক্ষণ অনর্থক পাথরের ঠাকুর পূজা করিয়া আসিলাম, কিন্তু যে দেবতা আমার প্রাণের প্রত্যক্ষ সঙ্গী, কৃপাময়, প্রেমময় ও নিরন্তর আমার সহিত বাক্যালাপ-নিরত, তাঁহার পূজা না করিলে, পূজা সাঙ্গ হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হইতেছে না; তুমি এই আসন গ্রহণ কর।"

রাজা আসনে উপবেশন করিয়া বলিলেন,—"মনে মনে পূজা করিলে কি তৃপ্তি হয় না? তোমার এ পূজার কি শেষ নাই?"

রাণী বলিলেন,—"আমার পূজার শেষ সর্ব্বদাই হয়। যে দেবতার পূজা ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যই কর্ত্তব্য নহে, তাঁহার পূজা ত্যাগ করিয়া যখন নিয়তই কার্য্যান্তরে লিপ্ত হই, তখন এ পূজার শেষ নিয়তই ঘটিতেছে। আর মনে মনে পূজার কথা বলিতেছ? তোমার মত

জ্ঞানী হইলে আমি এরূপ পূজার উদ্যোগ হয় তো করিতাম না। কিন্তু লৌকিক উপকরণ লইয়া, লৌকিক পূজা না করিলে, আমার মত অজ্ঞ নারীর কখনই হৃদয়ের তৃপ্তি হয় না। কিন্তু আমি পূজা করিতে বসিয়া এত বকাবকি, এত তর্ক করিতে পারি না।"

তখন অন্নপূর্ণা সেই স্থানে উপবেশন করিয়া রাজার চরণে বার বার সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন। চারিদিক হইতে পরিচারিকাগণ শঙ্খ বাদন ও হুলুধ্বনি করিতে থাকিল। পূজা শেষ হইলে রাণী গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া রাজার চরণে প্রণাম করিলেন। প্রণামান্তে যখন তিনি গাত্রোত্থান করিলেন, তখন নয়ন জলে তাঁহার গণ্ডস্থল ভাসিতেছে। সুহাসিনী ও অন্যান্য অনেক নারীর চক্ষুও জলভারাকুল হইল।

সমস্ত কার্য্য শেষ হইলে, রাণী বলিলেন, —"এতক্ষণে আমার চিত্তের শান্তি হইল। আজি শঙ্করনাথের মন্দির হইতে বড় অশান্ত চিত্তে আমি বাটী ফিরিয়াছিলাম।"

রাজা বলিলেন,—"কেন?"

রাণী বলিলেন,—"সে অনেক কথা। তুমি ঘরে চল, আমি সকল কথা বলিতেছি।"

তখন রাজার চরণস্থিত পুষ্পাদি পদার্থ গ্রহণ করিয়া রাণী এক রজতপাত্রে স্থাপন করিলেন। একটী নির্ম্মাল্য কুসুম আপনার কেশ রাশির মধ্যে বিন্যাস করিলেন। যে স্থানে রাজার চরণ ছিল, তত্রত্য কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা লইয়া মুখে দিলেন।

রাজা তখন সুহাসিনীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"আজি বোধ হয় তোমাকেই পাক করিতে হইয়াছে সুহাস! তুমি দুই চারি দিনের জন্য এ বাটীতে আসিয়া কেন এত পরিশ্রম কর, তাহা আমি বলিতে পারি না।"

সুহাসিনী তখন খোকাকে রাজার কোলে দিয়া, ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তখন ভব, দাসী প্রভৃতি বহু নারী চারিদিক হইতে রাজাকে প্রণাম করিতে লাগিল। রাজা বলিলেন,—"আমি সকলকেই, মনস্কামনা পূর্ণ হউক, বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি। আর ব্রাহ্মণ-কন্যাগণকে ভক্তি সহকারে প্রণাম করিতেছি।"

সকলের শুভাশীর্ব্বাদরাশি গ্রহণ করিতে করিতে রাজা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সুহাসিনী ও অন্নপূর্ণা তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

সমুচিত সময়ে অন্নপূর্ণা অদ্য শঙ্করনাথের মন্দিরে যে যে কাণ্ড ঘটিয়াছিল, তাহা রাজা ও সুহাসিনীকে জানাইলেন। তাঁহারা উভয়েই মনে করিলেন, হয় তো সহসা কোন কারণে ব্রাহ্মণের উন্মাদবিকার উপস্থিত হইয়াছে।

৪র্থ পরিচ্ছেদ।

দানবীর।

দুর্ভিক্ষ অতি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এ দেশকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। রাজা উমাশঙ্কর একান্ত নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। জেলায় জেলায় তিনি অন্নসত্র খুলিয়া দিলেন। সকল স্থানে সুদক্ষ ব্যক্তিগণের তত্ত্বাবধানাধীনে কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। নানা স্থান হইতে তণ্ডুল সংগৃহীত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জেলায় প্রেরিত হইতে

লাগিল। সর্ব্বত্র রাজা উমাশঙ্করের জয় ঘোষিত হইতে থাকিল। ভারতের নানা স্থানে অন্নাভাবে হাহাকার শব্দ উঠিল বটে, কিন্তু রাজা উমাশঙ্করের দয়ায় কোন দুঃখী লোকই উপবাসী থাকিতে পাইল না। যে সকল রুগ্ন ও দুর্ব্বল ব্যক্তি সত্রে আগমন করিতে অশক্ত, অথবা মানের দায়ে যাহারা সত্রে আসিয়া অন্ন গ্রহণে অনিচ্ছুক, তাহাদের বাটীতে অন্ন প্রেরিত হইতে লাগিল। রাজা উমাশঙ্কর আদেশ করিয়াছেন, যদি কোথায় অন্নাভাবে কোন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে শুনা যায়, তাহা হইলে তাঁহার ক্লেশের সীমা থাকিবে না। রাজার নিয়োজিত প্রভু-ভক্ত ব্যক্তিবৃন্দ অতিশয় সাবধানতা সহকারে কর্ত্তব্য-পালন করিতে থাকিলেন।

সকল জেলাতেই সত্রের নিমিত্ত বহু স্থান ব্যাপিয়া স্থায়ী মণ্ডপসমূহ নির্ম্মিত হইল। সত্রের সন্নিকটে আতুর, রুগ্ন, শিশু, স্ত্রীলোক প্রভৃতির অবস্থান স্থানও সংস্থাপিত হইল। কেবল অন্নদান করিয়া রাজ-কর্ম্মচারিগণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। সর্ব্বত্র দুঃখি-গণকে আবশ্যক মত বস্ত্রদানেরও ব্যবস্থা হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে রোগকাতর ব্যক্তিগণকে ঔষধ দানেরও আয়োজন হইল। চারিদিকেই দানকাণ্ড সুনির্ব্বাহিত হইতেছে জানিয়া, রাজা পরিতৃপ্তি অনুভব করিতে লাগিলেন।

এইরূপ সময়ে সদর হইতে ডেপুটী ম্যাজি-ষ্ট্রেট বাবু অন্নদাচরণ শীল রাজার সাহত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তিনি রাজাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"আমি জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া মহা-শয়ের নিকট আসিয়াছি।"

রাজা বলিলেন,—"আপনার আগমনে পরম সন্তোষ লাভ করিলাম। আপনি করিয়া আসন গ্রহণ করুন। আমার প্রতি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি আদেশ?"

অন্নদা বাবু বলিলেন,—"আদেশ তিনি কেন করিবেন? তিনি জানিতে ইচ্ছা করেন, কয়েক দিন পূর্ব্বে আপনি তাঁহার নিকট দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে যেরূপ দানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, এখনও সে সম্বন্ধে আপনার সেইরূপ মনের ভাব আছে কি না!"

রাজা বলিলেন,—"মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইবার কোনই কারণ উপস্থিত হয় নাই। আপনি তাঁহাকে আমার সম্মান জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন যে, এ সম্বন্ধে আমার মনের ভাব সমানই আছে এবং আশা করি, ভবিষ্যতেও অবিচলিত থাকিবে। কিন্তু আমি বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তিনি সহসা এ বিষয় জানিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছেন কেন?"

অন্নদা বাবু বলিলেন,—"আপনি তাঁহার সমক্ষে যেরূপ দানের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত বিস্ময়জনক। আমরা তাঁহার মুখে সে বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া উপন্যাসবৎ অসম্ভব বলিয়া মনে করিয়াছি। এরূপ ব্যাপারে মহা-শয়ের মত পরিবর্ত্তন হওয়া অসঙ্গত নহে, বরং সুসঙ্গত বলিয়া আমরা মনে করি। এই জন্যই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব জানিতে ইচ্ছা করেন, এ সম্বন্ধে মহাশয়ের মনের ভাব এখনও স্থির আছে কি না।"

রাজা কিয়ৎকাল অধোমুখে চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"এমন কি আশ্চর্য্য প্রস্তাব আমি উত্থাপন করিয়াছি যে, আপনারা তাহা অস-ম্ভব মনে করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইতেছেন। আমার স্বদেশীয় বহুসংখ্যক লোক অন্না-ভাবে মরণাপন্ন হইয়াছে, অথচ আমার এরূপ অর্থ আছে যে, তদ্দ্বারা আমি তাহাদের দুর্দ্দশা

কিয়ৎপরিমাণে নিবারণ করিতে পারি। আমি তাহারই সংকল্প করিয়াছি এবং তদনুযায়ী প্রস্তাব করিয়াছি। ইহাতে বিস্ময়ের কথা কি আছে তাহা তো আমি এখনও ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না।"

অন্নদা বাবু বলিলেন,—আপনি সর্ব্বস্ব দানের প্রস্তাব করিয়াছেন। আপনি স্বকীয় গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত যৎসামান্য এবং অনুগত ও আশ্রিত জনগণের নিমিত্ত যৎসামান্য মাত্র সম্পত্তি রাখিয়া, সমস্ত নগদ টাকা, সকল সম্পত্তি, রাজ-অট্টালিকা, হাতী-ঘোড়া প্রভৃতি সকলই এ কার্য্যে দান করিবেন শুনিয়াছি। এ প্রস্তাব আমরা অসঙ্গত বলিয়া মনে করি।"

রাজা বলিলেন,—"কেন আপনারা এরূপ মনে করেন, তাহা আমি বলিতে পারি না। আমি নিতান্ত স্বার্থপরের ন্যায় আপনার এবং আপনার অনুগত লোকজনের উদরের চিন্তা করিয়া পরে অন্য লোকের চিন্তা করিয়াছি। ধিক্ আমাকে! আপনি সাহেবকে বলিবেন, আমার গ্রাসাচ্ছাদনের উপযোগী সামান্য আয়ও আমি রাখিব না। আবশ্যক হইলে তাহাও এই নিতান্ত প্রয়োজনীয় কর্ম্মে প্রদত্ত হইবে। আমি দৈহিক শ্রমে সক্ষম। নিশ্চয়ই আবশ্যক হইলে, শ্রমসাধ্য কর্ম্ম দ্বারা আপনার ও স্ত্রী পুত্রাদির ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ করিতে পারিব। আপনি আরও বলিলেন, আমার স্ত্রী-পুত্রের সকল অলঙ্কার এবং রাজ-বাটীর সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম ও তৈজসাদি আবশ্যক হইলে সমস্তই নিঃশেষরূপে এই হিতকর কার্য্যের নিমিত্ত ব্যয়িত হইবে।"

অন্নদা বাবু বলিলেন,—"বড়ই ভয়ানক প্রস্তাব। রাজা মহাশয়, আমি সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি, আপনি আরও কিছু সময় লইয়া এ বিষয়টী উত্তমরূপে বিবেচনা করুন।"

রাজা বলিলেন,—"সময় লইতে বলিতেছেন কেন? আর আপনাদের এ বিষয় জানিবার জন্য এত আগ্রহই বা কেন?"

অন্নদা বাবু বলিলেন,—প্রস্তাবটী প্রথমে ছোট লাট বাহাদুরের নিকট বিজ্ঞাপিত হইবে, এবং তাহার পর গেজেটে ঘোষিত হইবে। এই জন্যই আপনাকে এই বিষয় পুনরায় আলোচনা করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছি।"

রাজা হাসিয়া বলিলেন,—"এ সম্বন্ধে ছোট লাটের ধন্যবাদ বা প্রশংসায় আমার প্রয়োজন নাই। লোকে ক্ষুধার সময় আহার করিয়া, নিদ্রার সময় নিদ্রাগত হইয়া, আপনার স্ত্রী-পুত্রকে অন্নবস্ত্র দিয়া কাহারও প্রশংসা শ্রবণ বা গেজেটে আপনার কীর্ত্তির ঘোষণা দর্শন করিবার প্রত্যাশা করে না। এ কার্য্য কোন মতেই তাহার অপেক্ষা গুরুতর নহে। আপনারা যাহাই মনে করুন, আমি ইহা অতি সামান্য কার্য্য বলিয়া জ্ঞান করিতেছি। এ তুচ্ছ কথা ছোট লাটের গোচর করিবার প্রয়োজন কি? অথবা ইহা গেজেটে ঘোষণা করিবারই বা আবশ্যক কি?"

অন্নদা বাবু অবাক্। তিনি কি বলিবেন তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। রাজা বলিতে লাগিলেন, —"এ কার্য্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এবং আপনারা নিতান্ত অসঙ্গত ও অসম্ভব বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন শুনিয়া, আমি দুঃখিত হইতেছি। আপনারা যাহাই মনে করুন, আমি ঘোষণা বা প্রশংসার লোভে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হই নাই। আপনি আসিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক এ বিষয় জানিবার নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে এবং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ঘোষণার ব্যবস্থা করিবার অগ্রেই কার্য্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে! আপ-

নারা শুনিয়া থাকিবেন এ দেশের জেলায় জেলায় অন্ন, বস্ত্র ও ঔষধাদি বিতরণ হইতেছে। আমার তহবিলে যে নগদ টাকা ছিল, তাহা প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে। এইবার আমাকে অন্যান্য সম্পত্তিতে হস্তার্পণ করিতে হইবে। আমি অনুরোধ করিতেছি, আপনি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বলিবেন, এ তুচ্ছ কার্য্যের জন্য কোনরূপ ঘোষণা নিষ্প্রয়োজন। আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই ক্ষুদ্র ব্যাপারের নিমিত্ত এরূপ আগ্রহযুক্ত হইয়াছেন, এ জন্য আমি আপনাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। এ সম্বন্ধে যখন যেরূপ ব্যবস্থা হয়, আপনারা ইচ্ছা করিলেই তাহা জানিতে পারিবেন।”

অন্নদা বাবু বলিলেন,—“আমার আর বলিবার কোন কথা নাই। আমি এক্ষণে বিদায় প্রার্থনা করি। বিদায় কালে, রাজা বাহাদুর। আমি আবার সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি, আপনি যেরূপ বাহুল্য ভাবে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবার সংকল্প করিয়াছেন, তাহা আর একটু কমাইয়া করিলে সকল দিকেই মঙ্গল হইবে। আমি আপনাকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছি। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব স্বয়ং আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এতদ্বিষয়ক কথাবার্ত্তা কহিবেন স্থির ছিল; কিন্তু হঠাৎ একটা গুরুতর তদারকে লিপ্ত হওয়ায়, তিনি আসিতে পারিলেন না। এজন্য তিনি আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছেন।”

রাজা বলিলেন,—“তাঁহাকে আমার সবিনয় সম্মান জ্ঞাপন করিয়া চরিতার্থ করিবেন। বোধ হয় শীঘ্রই আমার সদরে যাইবার প্রয়োজন উপস্থিত হইতে পারে। আমি সে সময় সাহেবের সহিত এবং আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সুখী হইব।”

অন্নদা বাবু প্রস্থান করিলেন। রাজা হৃষ্ট মনে রায়বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ কামনায় তাঁহার প্রকোষ্ঠাভিমুখে গমন করিলেন।

রাজার তহবিলে যে টাকা ছিল, তাহা প্রায় শেষ হইয়া আসিল; কিন্তু হাতে সর্ব্বদাই পাঁচ সাত লক্ষ টাকা থাকা আবশ্যক। রাজা তদর্থে একটী পরগণা বিক্রয় করিতে মনস্থ করিলেন। মহারাণী করুণাময়ী তাহার খরিদদার হইলেন। সাত লক্ষ টাকা দর স্থির হইল। মহারাণীর পক্ষ হইতে তাঁহার দেওয়ান জীবন বাবু টাকা দিয়া বিষয় খরিদ করিয়া লইলেন।

দান-কার্য্য অব্যাঘাতে চলিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সহধর্ম্মিণী।

রাজা উমাশঙ্করের দরিদ্রসেবা বহুবিস্তৃত ও বিভিন্ন স্থানব্যাপী হইয়া পড়িল। এই কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য প্রতিদিন প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয় হইতে লাগিল। বিভিন্ন স্থানের সত্রের কার্য্যাধ্যক্ষগণ সংবাদ পাঠাইতে লাগিলেন যে, দৈনন্দিন ব্যয়ের পরিমাণ অচিরে আরও বর্দ্ধিত হইবে; যেহেতু ভোজনার্থী দরিদ্রের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে এবং উত্তরোত্তর আরও বর্দ্ধিত হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে। রাজা উমাশঙ্করের উৎসাহের সীমা নাই। তিনি সর্ব্বত্র কার্য্যাধ্যক্ষগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিতেছেন যে, যত দুঃখী লোকের সমাগম হইবে, তাহাদের প্রত্যেকেই যেন নিত্য স্বচ্ছন্দে পরিতোষ

সহকারে আহার করিতে পায়; বস্ত্রহীনগণ যেন প্রত্যেকেই এক এক খণ্ড বস্ত্র পায়; পীড়িত ব্যক্তিগণ যেন রীতিমত ঔষধ ও পথ্য পায়; নর-নারী যেন এক সঙ্গে এক স্থানে বসিয়া আহার না করে; জাতি-বিচার করিয়া সকলের যেন পৃথক্ পৃথক্ আহারের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়; কাহারও যেন কোনরূপ কষ্ট বা অসুবিধা না হয়। অর্থব্যয় হইবে বলিয়া আশঙ্কার কোন প্রয়োজন নাই।

সোণাপুরে প্রায় একলক্ষ মণ চাউল মজুত হইল, আর ভিন্ন ভিন্ন জেলার সত্রে প্রায় লক্ষাধিক মণ চাউল মজুত আছে সংবাদ পাওয়া গেল। কিন্তু হাতের সমস্ত টাকা প্রায় শেষ হইয়াছে। একটা মহাল সাত লক্ষ টাকায় বীরভূমের মহারাণী করুণাময়ী খরিদ করিয়াছেন। আবার আর একটা মহাল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইল। আবার মহারাণী তাহা ক্রয় করিবার প্রস্তাব করিলেন। আবার যথোপযুক্ত মূল্য অবধারণ করিয়া জীবনকৃষ্ণ বাবু তাহা মহারাণীর নামে ক্রয় করিলেন। এ মহালের মূল্য হইল চারি লক্ষ টাকা। চারি লক্ষ টাকায় কয়দিন চলিবে? নিত্যব্যয়ের পরিমাণ প্রায় ত্রিশ হাজার টাকায় দাঁড়াইল। সকলেই বুঝিতে লাগিলেন, শীঘ্র প্রতিদিন পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ পড়িবে তাহার ভুল নাই।

এক উদ্বেগ ব্যতীত রাজার আর কোন চিন্তা নাই। পাছে কোন স্থানে কোন মানব অন্নাভাবে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়, ইহাই তাঁহার বিষম চিন্তা। অর্থ-ব্যয় হইতেছে, সর্ব্বস্ব যায় যায় হইয়া উঠিতেছে, ইহাতে তাঁহার একটুও দৃক্‌পাত নাই। আর চারিমাস অতীত হইলেই নূতন ধান্য জন্মিবে। এবার ফসলের অবস্থা ভাল। দাসীর স্বামী রামহরি বলিয়াছে, এবার ষোল আনা ধান জন্মিবে। তাহা হইলেই ভারতের অন্নাভাব ঘুচিয়া যাইবে। সকল লোক পরিশ্রম করিয়া চাউলের দাম উপার্জ্জন করিতে পারিবে। দেশ আবার আনন্দময় ও সুখময় হইবে। এই আনন্দে রাজা উমাশঙ্কর উন্মাদপ্রায়।

গবর্ণমেণ্ট ও দেশের জন-সাধারণ রাজার এই অদ্ভুত দান-ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইতেছেন। দরিদ্রগণ তাঁহাকে হৃদয়ভেদ করিয়া অজস্র আশীর্ব্বাদ করিতেছে সত্য, কিন্তু কর্তৃপক্ষগণ এবং দেশের বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বুঝিতেছেন, নিশ্চয়ই উমাশঙ্কর শীঘ্রই সর্ব্বস্বান্ত হইবেন। তাঁহার এ দান ব্যাপারের পরিণাম বড়ই ভয়াবহ হইবে। অনেক বন্ধু নানাদেশ হইতে পত্র লিখিয়া তাঁহাকে সাবধান হইতে পরামর্শ দিতে লাগিলেন। অনেকে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে এই ব্যাপার হইতে নিরস্ত হইবার নিমিত্ত উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। অবশেষে জেলার জজ ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এখনও ক্ষান্ত হইবার নিমিত্ত পরামর্শ প্রদান করিলেন। রাজা বিনীত ভাবে সকলের পরামর্শ শ্রবণ করিলেন; সকলেরই নিকট তাঁহাদের হিতৈষিতা হেতু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন এবং ইহাও বলিলেন যে, তাঁহারা এই কাণ্ডের পরিণাম তাঁহার পক্ষে যেরূপ ভয়ানক হইবে বলিয়া কল্পনা করিতেছেন, তিনি স্বয়ং তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। তিনি একজন ধনশালী ব্যক্তিবলিয়া এক্ষণে পরিচিত আছেন, না হয় পরিণামে তিনি একজন দরিদ্র বলিয়া পরিচিত হইবেন। ইহাতে বিশেষ অনিষ্ট বা অশুভ কি হইবে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না। বঙ্গের ছোটলাট বাহাদুর এইরূপ সংবে

একদিন উমাশঙ্করের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহাকে এই অত্যদ্ভুত দানব্যাপারের জন্ত অসংখ্য ধন্তবাদ প্রদান করিয়া, অতঃপর এ কার্য্য হইতে নিরস্ত হইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। সকলকে যাহা বলিয়া আসিতেছেন, রাজা উমাশঙ্কর বিনীতভাবে লাট সাহেবকেও তাহাই বলিলেন। লাট সাহেব বুঝিলেন যে, এই কার্য্য হইতে রাজা এক্ষণে কোনমতেই নিরস্ত হইবেন না।

কেবল এক ব্যক্তি রাজার এই কাণ্ডে কোনই কথা কহিতেছেন না। রায় হরকুমার বাহাদুর ভাল মন্দ সকল কথাতেই নীরব। একদিন রাজা তাঁহার সহিত একাকী মিলিত হইয়া বলিলেন ;—

"খুড়া মহাশয়! আমাকে অনেকেই এই অন্নদান কার্য্য হইতে নিরস্ত হইবার পরামর্শ দিতেছেন। কিন্তু আপনি একদিনও এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতেছেন না কেন ?"

রায়বাহাদুর বলিলেন,—"আমি এ বিষয়ে কোন পরামর্শ প্রদান করিবার আবশ্যকতা অনুভব করিতেছি না। তুমি বিদ্বান্ বুদ্ধিমান ও সাধুচূড়ামণি। তোমার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করাই আমার অভিপ্রায়। তোমাকে চালিত করিতে বাসনা নাই, বোধ হয় সাধ্যও নাই ; তুমি যাহা করিতেছ, তাহার পরিণাম দেখিবার জন্ত আমি উৎসুক রহিয়াছি।"

রাজা বলিলেন,—"অনেকেই অনুমান করিতেছেন, আমি অচিরে সর্ব্বস্বান্ত হইব। আমিও বুঝিতেছি, তাহার আর বিলম্ব নাই। কিন্তু সে অবস্থা কি আপনি বিশেষ ভয়াবহ বলিয়া মনে করেন না ?"

রায়বাহাদুর বলিলেন,—"না বাবা, তাহা কেন মনে করিব। তোমার জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি ও সাধুতা কেহই কাড়িয়া লইবে না। প্রভূত দানেও তাহার ক্ষয় হইবে না। তোমার ধনের নিমিত্ত তুমি আমাদের আদর ভাজন নহ। তোমার হৃদয়ের মহত্ত্ব হেতু তুমি আমাদের শ্লাঘার বস্তু। সে মহত্ত্বের যখন কোনই অপচয় হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন কোন পরিণামেই ভয়াবহ বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ আমি দেখিতে পাইতেছি না।"

রাজা বলিলেন,—"আপনার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।"

রায়বাহাদুর বলিলেন,—"আমার আর এখানে থাকিবার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই। তথাপি আমি তোমার এই সকল অনুষ্ঠান দেখিবার নিমিত্তই এ স্থানে রহিয়াছি। তোমার কোন গর্হিত কার্য্য এ পর্য্যন্ত দেখি নাই ; বুঝিয়াছি ভবিষ্যতেও তাহা দেখিতে পাইব না। সুতরাং কোন কার্য্যেই আপত্তি বা প্রতিবাদ করিবার প্রয়োজন দেখিতে পাই না।"

তাঁহার চরণে ভক্তি সহকারে প্রণাম করিয়া রাজা সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন এবং অতিশয় হৃষ্টচিত্তে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তখন সন্ধ্যা আগত প্রায়।

রাজা আসিয়াছেন, এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র রাণী অন্নপূর্ণা হাসিতে হাসিতে তাঁহার নিকটে আসিলেন এবং হাত তুলিয়া একটি রহস্তের প্রণাম করিয়া বলিলেন,—সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তা এখন প্রাতঃপ্রণাম করাই ভাল। দাসীর প্রাতঃপ্রণাম রাজা মহাশয়! দাসীর ভাগ্যে আজি এ উপরি লাভ কেন সন্ন্যাসী ঠাকুর? এরূপ সময়ে এদিকে তো এক দিনও শুভাগমন ঘটে না।"

রাজা বলিলেন,—"সুহাস কি আজি এখানে আছেন ?"

রাণী বলিলেন,—"ও তুমি ঠাকুরঝির সহিত দেখা করিতে আসিয়াছ। তবে এখন

আমার আসাটা ভাল হয় নাই। আমি এখনই তাঁহাকে ডাকিয়া দিতেছি। তুমি এই বিছানায় একটু বইস।"

রাণী যাইতেছেন দেখিয়া রাজা তাঁহার অঞ্চল চাপিয়া ধরিলেন। বলিলেন, "তুমি যাইও না। সুহাসের সহিত দেখা করাও আমার প্রয়োজন বটে। তুমি তাঁহাকে ডাকিবার জন্য আর কাহাকেও পাঠাও।"

তখনই একজন দাসী সুহাসিনীকে ডাকিতে গেল। রাণী বলিলেন,—"স্ত্রী আর ভগ্নী দুই-জনকেই এক সঙ্গে দরকার না হইলেই ভাল হয়। আগে ঠাকুরঝির পালা শেষ হউক না কেন? তাহার পর শ্রীচরণের দাসী আসিয়া চরণধূলা লইয়া চরিতার্থ হইবে।"

রাজা বলিলেন,—"ক্রমেই তোমার দুষ্টামি বাড়িতেছে। তোমাকে একদিন ভারী রকম জব্দ করিব জান?"

তখনই খোকারাজাকে ক্রোড়ে লইয়া সুহাসিনী তথায় উপস্থিত হইলেন, রাজা বলিলেন,—"রাণী শুন, সুহাস শুন, আমি আজি একটা ভয়ানক কথা জানাইবার নিমিত্ত তোমাদের নিকট আসিয়াছি।"

রাজার কথার সুর শুনিয়া ও তাঁহার ভঙ্গী দেখিয়া সুহাসিনী ও রাণী একটু চিন্তাকুল হইলেন এবং উভয়েই প্রায় একস্থানে গম্ভীর-বদনে স্থির হইয়া রহিলেন।

রাজা বলিলেন,—"তোমরা অবশ্যই শুনিতে পাইতেছ, আমার বিষয় সম্পত্তি সকলই প্রায় যায় যায় হইয়াছে।"

সুহাস বলিলেন,—"তাহার কোন কোন কথা শুনিতেছি বটে। কিন্তু সে জন্য কি হইয়াছে?"

রাণী বলিলেন,—"সৎকর্ম্মে ব্যয় করিবার জন্যই ভগবান্ অর্থ প্রদান করেন। যখন সৎকার্য্যে বিষয় যাইতেছে তাহাতে চিন্তার কথা কি আছে?"

রাজা বলিলেন,—"কিন্তু ইহার পরিণাম কি হইতে পারে, তাহা তোমরা কখন চিন্তা করিয়াছ কি? এখন দিন প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ হইয়া যাইতেছে। আর দুই মাস পরে, আমরা সর্ব্বস্বান্ত হইব। আমাদের ঘর বাড়ী কিছুই থাকিবে না।"

সুহাস কোন কথা কহিলেন না। তিনি অধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাণী বলিলেন,—"তাহার পর?"

রাজা বলিলেন,—"তাহার পর আমাদের বড়ই দুরবস্থা হইবে। আমরা কোথায় যাইব কি খাইব, তাহার কোন ঠিকানা থাকিবে না।"

সুহাস এখনও নিরুত্তর। রাণী আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"তাহার পর?"

রাজা বলিলেন,—"তাহার পর আর কি এই রাজৈশ্বর্য্য ভ্রষ্ট হইলে হয় তো তোমাদের বড় কষ্ট হইবে। আমার সুখ দুঃখের সহিত তোমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এই জন্যই তোমাদের নিকট এই কথা আজি উত্থাপন করিতেছি। যদি তোমরা ভবিষ্যতের নিমিত্ত সাবধান হইতে ইচ্ছা কর, যদি তোমরা আগতপ্রায় দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া কাতর হও, যদি তোমরা এই স্বচ্ছন্দতার অবস্থা হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে অনিচ্ছা কর, তাহা হইলে এখনও সাবধান হওয়ার উপায় আছে। এখনও যে সম্পত্তি অবশিষ্ট আছে, তাহাতে আমাদের অনায়াসে প্রায় এইরূপ স্বচ্ছন্দতায় জীবন কাটিয়া যাইতে পারে। তোমাদের কি ইচ্ছা আমি জানিতে চাহি।"

রাণী বলিলেন,—"বড়ই বিষম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ। তোমার কার্য্য সম্বন্ধে আমার কি ইচ্ছা তাহা ব্যক্ত করিতে হইবে

আর আমার ইচ্ছা বুঝিয়া তোমাকে কার্য্যের গতি ফিরাইতে হইবে। শুন সন্ন্যাসী রাজা, আমার কোন স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই। এ সংসারে এই যে অট্টালিকা, এই যে রাজৈশ্বর্য্য, এই যে অলঙ্কার রাশি, এই যে দাসদাসী, তোমার পদরেণুর তুলনায় সে সকল অতি অকিঞ্চিৎকর। তুমিই আমার সুখ, তুমিই আমার আনন্দ। তুমি যদি দারিদ্রদুর্দ্দশায় পতিত হও, তাহাতে আমি তোমার পদধূলি ভোগে বঞ্চিত হইব না। সুতরাং আমার সুখের, আমার আনন্দের একবিন্দুও অপচিত হইবে না। কাজ কি এ অনর্থক ভোগে। ধর্ম্মের নিমিত্ত, পরোপকারের নিমিত্ত তোমার সহিত বৃক্ষতলবাসী হইতে হইবে, ইহার অপেক্ষা গৌরবের কথা কি আছে? তুমি সন্ন্যাসী দেখিয়াই তোমার শ্রীচরণের আমি দাসী হইয়াছি। তোমার ঐশ্বর্য্যের কখন কামনা করি নাই। এখন তাহা ছাড়িতে হইবে বলিয়া দুঃখ করিব কেন? চল সন্ন্যাসী ঠাকুর, তুমি অগ্রসর হও, তোমার চরণাঙ্ক দেখিতে দেখিতে অনুগামিনী দাসী এখনই খোঁকার হাত ধরিয়া বনবাসিনী হইবে। এ কথা কি জিজ্ঞাসা করিতে আছে ঠাকুর? তুমি সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দেও, দাসী দুর্দ্দশায় পড়িয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াও তোমাকে কখন বিরক্ত করিবে না।"

রাণী বসনে বদনাবৃত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রাজার চক্ষুও জলভারাকুল হইল। সুহাসের নেত্র বহিয়া জল পড়িতে লাগিল।

রাজা বলিলেন,—"সুহাস, তুমিতো কোন কথাই বলিলে না। তোমার অভিপ্রায় না বুঝিলে আমি তো কিছুই স্থির করিতে পারি না।"

সুহাস বলিলেন,—"আমি কি বলিব? আমার ভাই সকল অবস্থাতেই রাজরাজেশ্বর। তুচ্ছ অর্থাগম হেতু, এই অট্টালিকার জন্য, কতকগুলা স্বর্ণরজতের জন্য আমার ভাই রাজা নহেন। আমি সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার ভগ্নী হইতে পাইয়াছি। ঘটনাক্রমে যদি তাঁহাকে বনবাসী, সন্ন্যাসী, দরিদ্র হইতে হয়, তাহাতে তাঁহার রাজত্ব লোপ করিতে পারে বসুন্ধরায় এমন শক্তি কিছুরই নাই। তবে কেন দাদা, তোমার বিষয় সম্পত্তি যায় যায় হইয়াছে শুনিয়া কথা কহিব? কেনই বা আমি সে চিন্তায় বিচলিত হইব?"

রাজা বলিলেন,—"তোমাদের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। আমার সুখ দুঃখে তোমাদের সুখ দুঃখ মিশিয়া আছে বলিয়াই আমি তোমাদিগকে আগ্রহ সহকারে এ বিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলাম। ঘটনাক্রমে আমার যে কোন দশাই কেন উপস্থিত হউক না, আমি তাহাতে সুখ-দুঃখ বোধবিরহিতভাবে অবিচলিত থাকিবার উপদেশ বাল্যকাল হইতে লাভ করিয়াছি। তোমাদের স্থিরতাই আমার প্রার্থনীয়।"

তাহার পরে রাজা আদরে খোঁকাকে কোলে লইলেন। খোঁকা পিতার ক্রোড়ে গিয়া সানন্দে তাঁহার চুল ধরিয়া বলিল,—"আমি টোর সঙ্গে গাছটলায় যাব।"

রাজা শিশুর মুখ চুম্বন করিয়া সাদরে বলিলেন,—"আমি যদি গাছতলায় যাই বাবা, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমাকে আমার সঙ্গে গাছতলায় যাইতে হইবে।"

তাহার পর খোঁকাকে রাণীর ক্রোড়ে দিয়া রাজা সায়ংসন্ধ্যা সমাপনের নিমিত্ত কক্ষান্তরে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভণ্ড।

রাজা উমাশঙ্করের বিষয় সম্পত্তি প্রায় সকলই গেল। জমিদারী প্রায় সকলই বিক্রীত হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় মহারাণী করুণাময়ী একাই সমস্ত সম্পত্তি ক্রয় করিলেন। কোন সম্পত্তিই অন্য হস্তে যাইল না। দানকাণ্ড সমানই চলিতে লাগিল। উপর্য্যুপরি দুই বৎসরের অজন্মা হেতু এ দেশে যে প্রকার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষগণ স্থির করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ ও আলোচনা করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কিন্তু রাজা উমাশঙ্করের সুব্যবস্থায় ও অপ্রাকৃত দানশীলতায় সে দায় হইতে এ দেশ রক্ষা পাইল সকলেই বুঝিল, এ অসাধারণ মহাত্মার অসাধারণ ত্যাগ স্বীকারে একটা দেশে সর্ব্বনাশ তিরোহিত হইয়া গেল। এ দেশে একটী মানবও অন্নাভাবে মৃত্যু-মুখে পতিত হইল না। দুর্ভিক্ষরাক্ষস রাজা উমাশঙ্করকে গালি দিতে দিতে এ দেশে প্রবেশের আশা ত্যাগ করিল।

সমস্ত ভারত এবং ইংলণ্ড ব্যাপিয়া রাজা উমাশঙ্করের এই কীর্ত্তিকাহিনী ঘোষিত হইতে লাগিল। সর্ব্বত্র সংবাদপত্রাদিতে এই অদ্ভুত দান ব্যাপারের প্রসঙ্গ আলোচিত হইতে থাকিল। স্বয়ং গবর্ণর জেনারেল ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া স্বহস্তে লিখিত এক পত্রদ্বারা রাজা উমাশঙ্করকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। এদেশের তাবৎ নরনারীর মুখে রাজা উমাশঙ্করের নাম দেবতার ন্যায় সমাদরে সংঘোষিত হইতে লাগিল। দেশের আবালবৃদ্ধ বনিতা তাঁহার নাম স্মরণ ও কীর্ত্তন করা পরম পুণ্যানুষ্ঠান বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিল। এরূপ বিশ্বব্যাপী প্রশংসা ও কীর্ত্তি ইহার পূর্ব্বে আর কেহ কখন অর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না।

রাজার এই সুনামের সঙ্গে সঙ্গে রাণী অন্নপূর্ণার নামও সমস্ত সভ্যজনপদে প্রচারিত হইল। তিনি প্রতিদিন বেলা একটা হইতে দুইটার মধ্যে সহস্র সহস্র নারী ও শিশুকে স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিয়া ভোজন করাইতেন। অন্তঃপুরসংলগ্ন প্রশস্ত প্রান্তরে বিশাল মণ্ডপমধ্যে এই ভোজন ব্যাপার সম্পন্ন হইত। শতাধিক ব্রাহ্মণী ও বহুসংখ্যক পরিচারিকা পাক ও পরিবেশন নির্ব্বাহ করিতেন রাণী স্বয়ং সকল কর্ম্মের তত্ত্বাবধান করিতেন, আগতা দরিদ্রা নারী ও শিশুসমূহ অন্ন ব্যঞ্জনাদি ব্যতীত পায়স পিষ্টকাদিও ভোজন করিত। ভোজনান্তে তাহারা যখন উচ্চকণ্ঠে লক্ষ্মীরূপা রাণী অন্নপূর্ণার কল্যাণ ঘোষণা করিত, তখন রাজা উমাশঙ্কর বহির্বাটী হইতে সেই স্বর শ্রবণ করিয়া পুলকিত হইতেন।

রাণীর এই ব্যাপারে কোনই পুরুষকে সহায়তা করিতে হইত না; এবং কোন পুরুষ সেদিকে যাইতে পাইত না; কেবল স্ত্রীলোক দ্বারা এই বৃহৎ ব্যাপার নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহিত হইত। অনেক ভদ্র ও সম্ভ্রান্তকুলের নারী ঘটনাচক্রে দুরবস্থায় নিপতিত হইয়া রাণী অন্নপূর্ণার এই সত্রে ভোজন করিতে আসিতেন। পুরুষের সম্মুখে পড়িতে অথবা পুরুষের সম্মুখে আহার করিতে তাঁহাদের সাতিশয় সঙ্কোচ হইবে বিবেচনায়, অপিচ রাণী পুরুষান্তরের সম্মুখে দেখা দিবেন না; সুতরাং

তাঁহার তত্ত্বাবধান জনিত পরিতৃপ্তির ব্যাঘাত হইবে মনে করিয়া রাণী এ কার্য্যে পুরুষের কোনই সংস্রব থাকিতে দেন নাই।

অতি প্রত্যূষ হইতে বেলা এক প্রহর পর্য্যন্ত রাণী এই দানকাণ্ডের বিবিধ ব্যবস্থায় নিযুক্ত থাকেন। তাহার পর স্নানাদি শেষ করিয়া রাজার জন্য পাক করিতে প্রবৃত্ত হন। রাজার পাক বড় বাহুল্য ভাবে আর সম্পন্ন হয় না। যাহা হয়, রাজা তাহাই তৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়া স্বকীয় কার্য্যোদ্দেশে প্রস্থান করেন। তাহার পর প্রায় দ্বিপ্রহর কালে রাজার ভোজনাবশিষ্ট অন্নাদি যৎসামান্য ভাবে আহার করিয়া রাণী দানব্যাপারের তত্ত্বাবধানার্থ ধাবমানা হন। তথায় প্রায় বেলা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত তাঁহাকে অশেষ পরিশ্রম করিতে হয়।

অদ্য সুহাসিনী রাজার জন্য পাক করিতেছেন। এজন্য রাণী অনেক বেলা পর্য্যন্ত যজ্ঞস্থলে থাকিতে পাইয়াছেন। তিনি যথাসময়ে আসিয়া রাজার চরণ প্রক্ষালন ও পাদোদক পান ও পরিশেষে তাঁহার পাত্রাবশেষ ভোজন করিয়া পুনরায় দানব্যাপারের পর্য্যবেক্ষণার্থ প্রস্থান করিলেন।

সারি সারি কত নারীই কত স্থান অধিকার করিয়া ভোজন করিতে বসিয়াছে তাহার সীমা নাই। এক স্থানে একটী ঈষৎ দীর্ঘকায়া নারী অবগুণ্ঠনে বদন আবৃত করিয়া বসিয়া আছে। তাহার সম্মুখস্থ পাত্রে অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রদত্ত হইয়াছে; কিন্তু সে তাহার কিছুই ভোজন করিতেছে না। রাণী চারিদিকে দেখিতে দেখিতে এবং যে যাহা চাহে তাহার ব্যবস্থা করিতে করিতে ক্রমে সেই অবগুণ্ঠনবতী নারীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এইরূপ সময়ে সুহাসিনীও সাংসারিক কর্ম্ম এবং আহারাদি শেষ করিয়া অন্নপূর্ণার নিকটে আসিলেন। রাণী যদিও সকল নারীর নাম ও পরিচয় জানেন না, কিন্তু বহুদিন বার বার দর্শন হেতু সকলের আকার প্রকার তাঁহার সুপরিচিত। এই অবগুণ্ঠনবতীকে আর কোন দিন তিনি দেখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার মনে হইল না। নারী আহার করিতেছেন না দেখিয়া অন্নপূর্ণা উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি আহার করিতেছেন না কেন? কোন ব্যাঘাত ঘটিয়াছে কি?"

নারী ঘাড় নাড়িল; কিন্তু কোন কথা কহিল না বা মুখের অবগুণ্ঠন মোচন করিল না। রাণী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি ভাত খাইবেন না—অন্য কোন খাদ্য খাইবেন কি?"

নারী আবার ঘাড় নাড়িল; বাক্যে কোন উত্তর দিল না, কিন্তু তাহার নিশ্বাস শব্দ শুনিয়া এবং তাঁহাকে চক্ষু মার্জ্জনা করিতে দেখিয়া রাণী বড় বিচলিত হইলেন। তিনি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি আমার নিকট অন্য কোনরূপ সাহায্য প্রার্থনা করেন কি?"

নারী এবার সমর্থনসূচক মস্তকান্দোলন করিল; কিন্তু কোন কথা কহিল না। রাণী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কি প্রার্থনা বলুন!"

নারী একবার বামে এবং একবার দক্ষিণে অবনত হইল। রাণী মনে করিলেন, এই নারী সম্ভবতঃ কোন বিশিষ্ট পরিবার-ভুক্ত। অবশ্যই ইহার বিশেষ কোন প্রার্থনা আছে! পাছে মুখ দেখিলে আপনাকে চিনিতে পারে, অথবা তাহার প্রার্থনা পাছে কেহ শুনিতে পায়, এই আশঙ্কায় এ নারী মনের কথা বলিতে পারিতেছে না। তিনি আবার জিজ্ঞাসা

রিলেন,—"আমাকে নির্জ্জনে আপনার প্রার্থনা জানাইতে চাহেন কি?"

নারী ঘাড় নাড়িয়া এই প্রশ্নে সম্মতি ব্যক্ত করিল। রাণী বলিলেন,—"আপনি আসুন, ঐ কক্ষে গিয়া আপনার কথা শুনিব। ঠাকুরঝি, তুমি ভাই ভাল করিয়া সকলের তত্ত্বাবধান কর।"

অন্নপূর্ণা অগ্রসর হইলেন। নারী তাঁহার অনুসরণ করিল। সুহাসিনী কোন তত্ত্বাবধান না করিয়া যে কক্ষে রাণী ও সেই অবগুণ্ঠনবতী প্রবেশ করিলেন, তাহারই দ্বারে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া অবগুণ্ঠনবতী প্রবেশদ্বার বন্ধ করিয়া দিল। সুহাসিনীর চিত্ত নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইল। অনেক কারণে তিনি এই কাণ্ড বিপজ্জনক ও অশুভ বলিয়া মনে করিলেন। তিনি সাবধানে ও উৎকর্ণ-ভাবে দ্বারপার্শ্বে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া নারী অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিল। রাণী সভয়ে দেখিলেন এ ব্যক্তি নারী নহে—পুরুষ; আর কেহ নহে—শঙ্করনাথের সেই পূজারি ঘনশ্যাম বিদ্যানিধি। রাণীর মুখ হইতে একটা অব্যক্ত অস্ফুটভীতি-ব্যঞ্জক শব্দ বাহির হইয়া পড়িল। তিনি ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। বলিলেন,—"আপনি কেন এখানে আসিয়াছেন? আপনি কেন স্ত্রীলোক সাজিয়া এই নারীগণের ভোজন স্থলে প্রবেশ করিয়াছেন?"

ঘনশ্যাম সবিনয়ে বলিলেন,—"আপনি ভয় পাইতেছেন কেন? আমি এখানে আসিয়া অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, সেজন্য আপনার নিকট বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আপনার নিকট আমার এক ভিক্ষা আছে। সে ভিক্ষা চাহিবার আর সুযোগ না পাওয়ায়, অগত্যা স্ত্রীলোক সাজিয়া এখানে আসিতে হইয়াছে।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"এরূপভাবে, আপনার প্রার্থনা আমি শুনিতে পারিব না। আপনার যদি কোন কথা থাকে, আপনি দাসী-দিগের দ্বারা তাহা আমাকে জানাইবেন। পথ ছাড়িয়া দিউন. আমি চলিয়া যাই।"

ঘনশ্যাম সবিনয়ে বলিলেন,—অধীনের একটা কথা শুনিয়া যান। আমি সংক্ষেপে বলিব। আপনি দয়াময়ী। কোন ভিক্ষার্থী আপনার নিকট বিমুখ হয় না। আমার প্রতি কেন বিরক্ত হইতেছেন?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"বলুন আপনার কি কথা! শীঘ্র শেষ করুন।"

ঘনশ্যাম বলিল,—"মনে করিয়া দেখুন, আপনি শঙ্করনাথের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়া-ছিলেন, যাহা আমি প্রার্থনা করিব, তাহাই আপনি পূরণ করিবেন।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"মিথ্যা কথা। এরূপ প্রতিজ্ঞা আমি কখনই করি নাই। যাহা আমার সাধ্য হইবে, তাহা আমি আপনার জন্য করিব, ইহা ব্যতীত অন্য কোন কথা আমি বলি নাই।"

ঘনশ্যাম বলিল,—"তাহাই হইবে, যাহা আমি প্রার্থনা করিব, তাহা আপনার সম্পূর্ণ সাধ্যায়ত্ত।

রাণী বলিলেন,—"বলুন আপনি কি চাহেন!"

ঘনশ্যাম বলিল,—"প্রতিজ্ঞা, বিশেষতঃ দেবসমক্ষে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে চিরদিন নরকস্থ হইতে হয়।"

রাণী বলিলেন,—"আপনার নিকট ধর্ম্ম-নীতি শিক্ষা করিবার আমার এক্ষণে প্রয়োজন নাই। আপনি যাহা বলিতে চাহেন, তাহা শীঘ্র বলিয়া ফেলুন আপনি অকারণ এরূপ

বিলম্ব করিলে আমাকে এ স্থান হইতে চলিয়া যাইতে হইবে।"

সুহাসিনী দ্বারের পার্শ্ব হইতে সকল কথা সুস্পষ্টরূপে শুনিতে না পাইলেও, অনেক কথা বুঝিতে পারিলেন, তিনি বুঝিলেন, যে ব্যক্তি রাণীকে সঙ্গে লইয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, সে নারী নহে—পুরুষ। এ সন্দেহ তাঁহার মনে প্রথমেই উদিত হইয়াছিল; এবং এই জন্যই তিনি কোন কর্ত্তব্যপালনে মনঃসংযোগ না করিয়া দ্বারপার্শ্বে অপেক্ষা করাই প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

রাণীর মুখ হইতে ভীতিব্যঞ্জক অস্ফুট ধ্বনি নির্গত হইবামাত্র, সুহাসিনী ইঙ্গিতে এক দাসীকে নিকটে ডাকিলেন এবং তাহাকে সত্বর দেউড়ি হইতে জমাদার ও পাঁচ সাত জন দ্বারবানকে রাজভগ্নীর নাম করিয়া ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। তাহারা যেন মণ্ডপ দ্বারে অপেক্ষা করে এবং ডাকিবা মাত্র এখানে উপস্থিত হইতে পারে এরূপ আদেশও তিনি প্রদান করিলেন। দাসী বেগে চলিয়া গেল। আর এক দাসীকে ডাকিয়া তিনি বলিয়া দিলেন, দশ বার জন পরিচারিকা যেন সকল কর্ম্ম ফেলিয়া এখনই তাঁহার নিকট আইসে। বার জন দাসী তখনই সুহাসিনীর নিকট আসিল। যে দেউড়ি হইতে জমাদার প্রভৃতিকে ডাকিতে গিয়াছিল, সেও ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, সকলই ঠিক হইয়াছে।

তখন কক্ষ-মধ্যে ঘনশ্যাম বলিতেছে—"আপনি দয়াময়ী—সকলের সকল প্রার্থনা পূরণ করিতেছেন। এ অধমের সামান্য ভিক্ষা আপনি যদি না দেন, তাহা হইলে আজি আপনার সম্মুখে আমি আত্মহত্যা করিব। আপনাকে ব্রহ্মহত্যার পাতকে পড়িতে হইবে।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"আমি তোমার প্রার্থনা শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি না। তুমি দ্বার হইতে সরিয়া যাও। আমি চলিয়া যাইব।"

ঘনশ্যাম বলিল।—"এই কি আপনার দয়া? ভিক্ষার্থীকে এইরূপে বিমুখ করাই কি আপনার ধর্ম্ম। সুন্দরি! আমার সামান্য প্রার্থনা আমি বলিতেছি।"

অন্নপূর্ণা অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কি করিবেন—এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য তাহা তিনি স্থির করিতে পারিলেন না।

ঘনশ্যাম বলিল,—"অন্নপূর্ণা, আমি তোমার রূপ দেখিয়া পাগল হইয়াছি, কাশীতে আমি পাঠ করিতাম। সেই পঠদ্দশায় আমি অনেক বার তোমাকে দেখিয়াছি। তখন হইতে তোমার ঐ রূপের শিখা আমাকে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে। তোমাকে দেখিতে পাইব এবং কখন না কখন তোমার কৃপা লাভ করিতে পারিব বলিয়াই আমি এই ঘৃণিত নীচকর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। তোমাকে না পাইলে আমার মৃত্যু হইবে। তুমি আমাকে রক্ষা কর।"

নরাধম কাতরভাবে অন্নপূর্ণার চরণ সমীপে নিপতিত হইল। লজ্জায় ক্রোধে, ঘৃণায় অন্নপূর্ণার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"নরাধম, ঘৃণিত কীট, আমার নিকট এইরূপ কথা কহিতে তোর সাহসে কুলাইল ইহা বড়ই আশ্চর্য্য! আমি আদেশ করিতেছি, তুই এখনই আমার সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যা, আর তোর একটিও পাপ কথা যেন আমাকে শুনিতে না হয়।"

তখন ঘনশ্যাম উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বস্ত্র মধ্য হইতে এক উজ্জ্বল ছুরিকা বাহির করিয়া বলিল—"দেখ অন্নপূর্ণা যদি তুমি আমার প্রার্থনা পূরণে সম্মত না হও, তাহা হইলে

এখনই তোমার সম্মুখে এই ছুরিকা বক্ষে বিদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।"

ব্রাহ্মণ ছুরিকা উত্তোলন করিল। এমন সময় বিষম শব্দে সেই দ্বার খুলিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে ছয় জন ভোজপুরী এবং বার জন দাসী, সর্ব্বশেষে সুহাসিনী সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দ্বারবানেরা ঘনশ্যামকে ধরিয়া ফেলিল। তাহার পর রাণীমাতাকে প্রণাম জানাইয়া ধাক্কা মারিতে মারিতে ঘনশ্যামকে লইয়া বাহিরে চলিল।

অন্নপূর্ণা তখন নিতান্ত অবসন্নভাবে এক ভিত্তিতে পৃষ্ঠস্থাপন করিয়া দণ্ডায়মানা। সুহাসিনী তখনই তাহার নিকটে গমন করিলেন। দাসীরা তখন জল ও পাখা লইয়া আসিল। সকলে তাঁহাকে গৃহের মধ্যস্থলে আনিয়া নানাপ্রকারে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

এদিকে জমাদার ও দ্বারবানগণ নরাধম ঘনশ্যামকে লইয়া রাজার কাছারীতে উপস্থিত হইল। এই নরাধমের সম্বন্ধে কি দণ্ডবিধান করা উচিত, সকলে তাহার পরামর্শ করিতে লাগিল। জমাদার বলিল,—"দণ্ড আর কি? আমি এ শুয়ারের শির উড়াইয়া দিতে চাহি।"

আর একজন প্রস্তাব করিল, "উহাকে কূয়ায় ফেলিয়া মাটী চাপা দাও।"

আর একজন বলিল,—"ইহাকে টুকরা টুকরা করিয়া কাট।"

সদর নায়েব, মুহুরি, গোমস্তা, আমিন প্রভৃতি বহুলোক সে স্থানে সমবেত হইল। নায়েব বলিলেন,—ব্রাহ্মণ বলিয়া এরূপ নরাধমকে মাপ করা কখনই হইবে না। ইহাকে মারিয়া ফেলিলে কোন ক্ষতি নাই; আমি বলি একবারে এক কোপে ইহাকে মারা হইবে না। ইহাকে ধীরে ধীরে মারিতে হইবে। ডালকুত্তা দিয়া খাওয়ানই সুব্যবস্থা।"

আর একজন বলিল,—"হাতীর পায়ে ফেলিয়া দিলেও হয়।"

আর এক ব্যক্তি বলিল,—"আমি বলি একখানি জুড়ি পূর্ব্বমুখে, আর এক খানি জুড়ি পশ্চিম মুখে জুড়িয়া দুই গাড়ীর মাঝখানে এক গাড়ীতে এই হতভাগার হাত, আর এক গাড়ীতে পা বাঁধিয়া ঘোড়াকে চাবুক মারিলে যাহা হইতে পারে, তাহাই ইহার ঠিক সাজা।"

অনেকে এ প্রস্তাব শুনিয়া সন্তুষ্ট হইল এবং প্রস্তাবকারীর প্রশংসা করিতে লাগিল। রাজার নিকট সংবাদ প্রেরিত হইয়াছে। তাঁহার আগমন না হইলে অথবা তাঁহার কোন আদেশ না পাইলে কিছুই করিতে পারা যাইতেছে না। সকলেই আগ্রহে রাজার প্রতীক্ষা করিতেছেন।

রাজা আসিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে রায় বাহাদুরও আছেন। রাজা আসিয়া দেখিলেন,—"লোকেরা দড়া দিয়া ব্রাহ্মণকে কঠিনরূপে বন্ধন করিয়াছে এবং তাহাকে নানাপ্রকারে নির্যাতন করিতেছে। সকলে সরিয়া দাঁড়াইল। রায় বাহাদুর ও রাজা আসিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন!

জমাদার অগ্রসর হইয়া করযোড়ে বলিল,—"ধর্ম্মাবতার! ইহাকে এই মেয়ে মানুষের সাজে অন্দরের এক ঘরে হাতে এই ছুরি সমেত, রাণীমায়ির সম্মুখে আমরা ধরিয়াছি। আমি ইহার শির উড়াইয়া দিতে চাহি। হুজুরের হুকুমের অপেক্ষায় আছি।"

যে ব্যক্তি দুই গাড়ীর মধ্যে বাঁধিবার কথা বলিয়াছিল তাহার কথাও রাজাকে একজন শুনাইল।

রাজা বলিলেন,—"জমাদার এখনই সর্ব্বাগ্রে এই ব্রাহ্মণের বন্ধন খুলিয়া দাও।"

জমাদার অবাক্ হইল, সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। কিন্তু কেহই প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না। রাজাজ্ঞা অবহেলা করিতে সাহস না হওয়ায় সে অগত্যা বন্ধন খুলিয়া দিল। তখন রাজা বলিলেন,—"বিদ্যানিধি মহাশয় আমি আমার স্ত্রী ও ভগ্নীর নিকট সকল কথাই শুনিয়াছি। আপনি বিজ্ঞ ও সুপণ্ডিত। আপনার এরূপ মতিভ্রম কেন হইল, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি অবশ্যই জানেন, ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তির উত্তেজনা ও প্রেম স্বতন্ত্র পদার্থ। আপনি ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তির প্রাবল্যে নিতান্ত অব্যবস্থিত চিত্তের ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। যে নারী আপনার নহে, তাহাকে লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করা কাহারও উচিত নহে, এ তত্ত্ব অবশ্যই আপনি বুঝেন। তথাপি সহসা আপনার বুদ্ধিভ্রংশ হওয়ায় আমি নিতান্ত দুঃখিত হইতেছি। আমি আপনাকে কোন দণ্ড দিতে চাহি না। আপনি অবশ্যই চিত্তের চাঞ্চল্য দূর করিয়া ভবিষ্যতে সাবধান হইয়া চলিবেন। এখানে অতঃপর কার্য্য করিতে বোধ হয় আপনার লজ্জা হইবে। আপনার যদি বেতন বাকি থাকে খাজাঞ্চির নিকট হইতে লইয়া আপনি চলিয়া যাইতে পারেন। জমাদার! এ ব্রাহ্মণকে ছাড়িয়া দাও।"

সকলের সকল মন্ত্রণাই ব্যর্থ হইল। বিনাশ করা দূরে থাকুক, রাজা ঘনশ্যামকে দুই ঘা প্রহার করিতেও আজ্ঞা করিলেন না। সকলেই দুঃখিত হইল। অনেকে একটু বিরক্তও হইল।

রাজা ও রায় বাহাদুর সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টম খণ্ড মাধুর্য্য।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কর্ম্মফল।

ঘনানন্দ স্বামী কাশীর সেই স্থানে প্রাতঃকালে সমাধিমগ্ন অবস্থায় যোগাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় কলেবর হইতে যেন অধিকতর জ্যোতিঃ নিঃসৃত হইতেছে। যে দুইজন শিষ্য সর্ব্বদা তাঁহার নিকটস্থ থাকেন, তাঁহারা কেহই সেখানে নাই। একজন আশ্রমের নিত্যকর্ম্ম সম্পাদন করিতে ব্যস্ত আছেন। আর একজন ভিক্ষায় গমন করিয়াছেন।

নীলরতন বাবু সেই স্থানে আগমন করিলেন প্রতিদিন কোন না কোন সময়ে এই স্থানে আগমন করা ও সন্ন্যাসীকে প্রণাম করা তাঁহার নিয়মিত কর্ম্ম। তিনি দূর হইতে মহাপুরুষকে সমাধিমগ্ন দেখিয়া নীরবে ও নিঃশব্দে সেই স্থানে স্থির হইয়া রহিলেন। বহুক্ষণ পরে ঘনানন্দের সমাধি ভঙ্গ হইল। তখন তিনি সুপ্তোত্থিতের ন্যায় অবশভাবে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। নীলরতনকে দেখিতে পাইয়া তিনি নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন।

নীলরতন বাবু অগ্রসর হইয়া সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন এবং ভূতলে উপবেশন করিলেন। সন্ন্যাসী আসন ত্যাগ করিয়া একবার গাত্রোত্থান করিলেন। একবার উভয় হস্ত ও পদ বিস্তৃত করিলেন। একবার বামে ও দক্ষিণে হেলিত হইলেন। তাহার পর বলিলেন,—"আপনার সমস্ত কুশল?"

নীলরতন বলিলেন,—"যাহারা ভাগ্যবলে মহাশয়ের কৃপা ভাজন, তাঁহাদের অকুশলের সম্ভাবনা কোথায় ?"

ঘনানন্দ জিজ্ঞাসিলেন,—"সোণাপুরের সংবাদ পাইয়াছেন ?"

নীলরতন বলিলেন,—"আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু যেরূপ সংবাদ পাইতেছি তাহাতে আমাদের একটু চিন্তার কারণ হইয়াছে।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"কেন ? রাজা উমাশঙ্কর সর্ব্বস্ব দান করিতে বসিয়াছেন, ইহাই এক চিন্তার কারণ ?"

নীলরতন বাবু বলিলেন,—"আমরা বিষয়াসক্ত অধম মানব। আমরা বাস্তবিক এ সংবাদে একটু বিচলিত হইয়াছি।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"আপনার জামাতা সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসে তাঁহার যত আনন্দ, বোধ করি আর কিছুতেই সেরূপ নহে। রাজাগিরী তাঁহার বুঝি পোষাইতেছে না।"

নীলরতন বলিলেন,—"তাহা হইতে পারে, একটী পুত্র হইয়াছে, ইহা ভাবিয়া তাঁহার সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"বৈবাহিক মহাশয়, ভাবিয়া আর কি হইবে ? মানুষ ভাবিয়া কতটুকুই বা বুঝে, কতটুকুই বা স্থির করিতে পারে ? যাহা হইবার তাহাই হইবে।"

নীলরতন বলিলেন,—"তাহা যদিও সত্য, তথাপি মানুষকে একটু সাবধান হইয়া চলা মন্দ নয়। আপনার যাহা হইবে ভাবিলেও, সন্তানাদিকে পথে বসাইবার ব্যবস্থা করা উচিত নয়।"

ঘনানন্দ বলিলেন—"বৈবাহিক মহাশয়, আপনি ভুলিয়া যাইতেছেন, আপনার জামাতা এক সময়ে ভিক্ষুক ছিলেন। তাঁহাকে এই অতুল রাজৈশ্বর্য্য দিল কে ? যিনি ভিক্ষুককে রাজৈশ্বর্য্য দিতে পারেন, তিনি ইচ্ছা করিলে রাজার ঐশ্বর্য্য হরণ করিয়া তাঁহাকে ভিক্ষুক করিতে পারেন। তাঁহার ইচ্ছা হইলে নিশ্চয়ই আপনার দৌহিত্রের অমঙ্গলেও মঙ্গল হইবে।"

নীলরতন বলিলেন,—"ভগবানের এ কথায় আর সংশয় নাই, কিন্তু সকল কাজেই আতিশয্য গর্হিত বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"কেবল পুণ্যের বা, সদনুষ্ঠানের সম্বন্ধে তাহা বলা যায় না।"

"কেন ? অতি দানে বলি বদ্ধ হইয়াছিলেন, ইহাও তো শুনা যায়।"

"মানব মাত্রেই যেন সেইরূপ বদ্ধ হইবার জন্য ব্যাকুল হয়। সেরূপ বদ্ধ হওয়া ভাগ্যের কথা নহে কি বৈবাহিক মহাশয় ? আর একটা কথা বলি এবারকার এই দুর্ভিক্ষের প্রকোপে ভারতের নানাস্থানে কত লোকই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। অন্নপূর্ণার নিকেতনস্বরূপ এই কাশীধামেও কি শোচনীয় অন্নাভাব উপস্থিত হইয়াছিল, শুনা যাইতেছে প্রয়াগেও ভয়ানক অন্নাভাব ঘটিয়াছিল, কিন্তু একজন মনুষ্যের দানশীলতায় ও চেষ্টায় সমগ্র ভারতভূমির একটী মানবও অন্নাভাবে মরিতে পারে নাই, ইহা কি সামান্য আনন্দের কথা ? একজনের দুঃখে ও ক্লেশে যদি বহুলোকের দুঃখ ও ক্লেশ বিদূরিত হয়, তাহা কি প্রার্থনীয় নহে ? আরও মনে করিয়া দেখুন, উমাশঙ্কর কিছুই করিতেছেন না, কিছু করিতে তাঁহার সাধ্যও নাই। একটা দেশকে ধ্বংস করা বা রক্ষা করা বিশ্বনিয়ন্তার বাসনাতেই ঘটিয়া থাকে। তিনি এক একটা নিমিত্ত কারণ মাত্র উপলক্ষ করিয়া অনেক স্থলে কার্য্য সম্পাদন করেন। এ স্থলেও উমাশঙ্করকে নিমিত্ত কারণ মাত্র জানিবেন। আপনি এজন্য চিন্তিত বা উদ্বিগ্ন হইবেন না। কার্য্য

স্বকীয় পথ স্থির করিয়া লইবে এবং নিয়মিত স্থানে উপস্থিত হইয়া সমাপ্ত হইবে।”

নীলরতন বাবু নীরব। তিনি সে প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—“কয়দিন শ্যামলাল বাবুর সন্ধান পাই নাই। তাঁহার সংবাদ আপনার অবিদিত না থাকিতে পারে।”

ঘনানন্দ বলিলেন,—“তিনি ভাল আছেন। আপনি এখনই এখানে তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন। ঈশ্বরের অস্তিত্বে তাঁহার কর্তৃত্বে শ্যামলালের বিশ্বাস হইয়াছে। তাঁহার চিত্ত উত্তরোত্তর সুস্থ হইয়া আসিতেছে। এক সময়ে যে ব্যক্তি ঘোর পাপী ছিল, তাহার কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন!”

নীলরতন বলিলেন,—“ইহাতে বিস্ময়ের কথা কিছুই নাই। মহাপুরুষ ও তাঁহার শিষ্যের প্রতি যাহার ভক্তি শ্রদ্ধা জন্মিবে সে যে ভাগ্যবান্ হইবে তাহার সন্দেহ কি?”

দূরে শ্যামলাল বাবুর মূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হইল। তিনি দূর হইতেই ভূতলে দণ্ডবৎ নিপতিত হইয়া মহাপুরুষকে প্রণাম করিলেন। ঘনানন্দ তাঁহাকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। শ্যামলাল অপেক্ষাকৃত নিকটস্থ হইয়া পুনরায় পূর্ব্ববৎ প্রণাম করিলেন এবং সেই স্থানে উপবেশন করিয়া বলিলেন,—“দয়াময়, ভগবানে সর্ব্বকর্ম্মফল নির্ভর করাই একমাত্র ধর্ম্ম। আমি যত গর্হিত বা হিত কার্য্য করিয়াছি, করিতেছি ও করিব সকলই সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের কার্য্য, এই পরম ধর্ম্মে পূর্ণ বিশ্বাস আমাকে সুখী করিয়াছেন।”

ঘনানন্দ বলিলেন,—“এই নিষ্ঠায় তুমি পূর্ণভাবে ও অবিচলিত মনে নির্ভর করিয়া থাক। ইহাই প্রধান ধর্ম্ম নহে; ধর্ম্মের ইহা একটী সোপান। তুমি কামনা ত্যাগ করিতে পারিয়াছ, সুখ দুঃখ তোমার সমান জ্ঞান হইয়াছে এবং সর্ব্ব বিষয়ে আসক্তি শূন্য হইয়াছ। বহু সাধনাতেও মনুষ্য, হৃদয়ের এই উন্নতিলাভ করিতে পারে না। উমাশঙ্কর স্বল্পকালের উপদেশে তোমার এই অসম্ভব চিত্তশুদ্ধি ঘটাইতে পারিয়াছেন, ইহা বাস্তবিকই বিস্ময়াবহ।”

নীলরতন জিজ্ঞাসিলেন,—“প্রভো, এই স্থানে একটা কথা সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করি। যে অবস্থা বহু সাধনা ও বহু আয়াসে লব্ধ হয়, বহুকালের কর্ম্ম ও সাধনার বলে যে চিত্তশুদ্ধি সঞ্জাত হয় তাহা এরূপ সহসা স্বল্পকালে শ্যামলাল বাবুর জন্মিল কেন, তাহা স্থির করিতে আমি অক্ষম। কৃপা সহকারে ইহার মীমাংসা করিয়া আমাকে সুস্থির করুন।”

ঘনানন্দ বলিলেন,—“ইহার মীমাংসা অতি সহজ। শ্রীভগবান স্বয়ং ইহার মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। আপনি এইজন্মে যে কর্ম্ম করিতেছেন, তাহার নষ্ট হইতেছে না, ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে না বা লুপ্ত হইতেছে না। কর্ম্মের ফলে চিত্তশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধির পরিণাম জ্ঞান। এ জন্মে কোন কর্ম্ম না করিয়া কোন কোন মহাত্মা সহসা জ্ঞানের অধিকারী হইয়া থাকেন, ইহার দৃষ্টান্ত যথেষ্ট আছে। জন্মান্তরীণ কর্ম্ম তাদৃশ জ্ঞান প্রাপ্তির হেতু। জন্মান্তরীণ কর্ম্ম দ্বারা যে চিত্ত শুদ্ধি বা জ্ঞান উপজাত হইয়াছে, তাহা সঞ্চিত থাকে। দেহরূপ পিঞ্জরাবদ্ধ মনুষ্য সহসা তাহা স্বয়ং বুঝিতে ও জানিতে পারে না। যে জ্ঞান তাহাদের সহজাত তাহার পরিচয়ও তাহারা আপনারা পায় না। একজন সদ্‌গুরুর সহিত সম্মিলন হইলে, দৈবাৎ কোন দয়াপরবশ মহাত্মার দর্শন পাইলে, সহসা কোন জ্ঞানীজন প্রকৃত পথ প্রদর্শন করিলে জন্মান্তরীণ জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের চিত্তক্ষেত্রে সঞ্চিত জ্ঞানবীজ সহজেই

ঙ্কুরিত এবং অচিরে ফল পুষ্পে সুশোভিত হইয়া উঠে।"

নীলরতন বলিলেন,—"এ কথা এক প্রকার বোধগম্য হইল, কিন্তু শ্যামলাল বাবু জীবনে বিবিধ পাপানুষ্ঠান কেন করিলেন? যাঁহার হৃদয়ে সঞ্চিত জ্ঞানের বীজ ছিল, তিনি কেন বহুবিধ গর্হিত আচরণে প্রবৃত্ত হইলেন?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলজাত জ্ঞানের যখন উন্মেষ হইবে, তখনই মন পুণ্য ও পবিত্রতা এবং ক্রমোন্নতির নিমিত্ত ব্যাকুল হইবে। তাহার পূর্ব্বে অর্থাৎ লব্ধজ্ঞানের উন্মেষ হওয়ার অগ্রে, মনুষ্য মনুষ্যই থাকে। পাপে ও পাপজনিত আপাত মনোহর আনন্দে তাহার স্বতঃ প্রবৃত্ত থাকে। সংসর্গ ও শিক্ষার দোষে সে তাহাতে প্রমত্ত হয়। এইরূপ কারণে শ্যামলাল পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকিতে পারেন। জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলেও তাঁহার পাপভোগ ঘটিতে পারে।"

নীলরতন বলিলেন,—"সে কিরূপ? জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলে চিত্তশুদ্ধি হইবে; পাপপ্রবৃত্তি কেন ঘটিবে?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"অনাসক্ত অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মফলে চিত্তশুদ্ধি সঞ্চিত হইবে এবং আসক্ত বা সকাম কর্ম্মফলে জন্মান্তরে সেই প্রবৃত্তির পরিপোষক পরিণামই লব্ধ হইবে। আপনি দেখুন, ধ্রুব অতি বাল্যকাল হইতেই ভোগার্থী, ইহা তাঁহার পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলজাত অনুরাগ। কিন্তু তাঁহার ভোগাসক্তি ছিল বলিয়া পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হইয়াও তাঁহাকে রাজত্ব ও রাজৈশ্বর্য্য ভোগ করিতে হইল। সাধনা দ্বারা, উপদেশ দ্বারা তাঁহার জ্ঞানের উন্মেষ অতি সহজেই ঘটিল; কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ব জন্মের আসক্তি হেতু তাঁহাকে বিষয় ভোগরূপ পাশে বদ্ধ হইতে হইল। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য অতি অল্প বয়সেই জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বজন্মেই কর্ম্মজনিত লব্ধজ্ঞান হইয়াছিলেন; এজন্য অন্য কোন সাধনায় তাঁহার প্রয়োজন হইল না। শ্যামলাল বাবুর জ্ঞানের পথ সম্ভবতঃ পূর্ব্বজন্মেই স্থির হইয়াছিল; সঙ্গে সঙ্গে ভোগের আসক্তিও ছিল। এজন্য তাঁহার জীবনে এইরূপ ঘটিয়াছে, এরূপ অনুমান অসম্ভব নহে।"

নীলরতন জিজ্ঞাসিলেন,—"তাহা হইলে জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয়ই একসঙ্গে থাকিতে পারে?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"জ্ঞানের পূর্ণতা হইলে অজ্ঞান তাঁহার সমীপেও যাইতে পারে না। তাঁহার পাপরূপ দুঃখজ্বালা কিছুই থাকে না। তিনি তখন পূর্ণানন্দের অধিকারী হইয়া পরম সুখভোগ করেন। তিনি তখন ভগবানের স্বরূপ হইয়া পড়েন। সে অবস্থাপ্রাপ্তি বড়ই সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু জ্ঞানের অল্পমাত্র—একটী কণিকামাত্র উপজাত হইলেও তাহার আর রক্ষা হয় না; তাহা থাকিয়া যায়। সাধনা, সৎসঙ্গ ও সুশিক্ষা দ্বারা তাহা বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে তাঁহাকে পূর্ণতার পথে অগ্রসর করিতে থাকে। এইরূপ সামান্য মাত্র জ্ঞান যখন থাকে, তখন অজ্ঞানেই মনুষ্য পূর্ণ থাকে। তাহার অজ্ঞানের আতিশয্য স্বল্প জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। তাহার পশু প্রকৃতিই তখন বলবান্ থাকে। মনুষ্য সকল বিষয়েই পশুর সহিত সমান। কেবল এক জ্ঞানরূপ অমূল্য ধন তাহাকে পশুর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছে। সেই কণিকামাত্র জ্ঞান যখন আচ্ছন্ন থাকে, তখন মানুষ পশুর ন্যায় কার্য্যানুষ্ঠানেই আসক্ত হয় এবং তাহাই করে। সেই সামান্য জ্ঞানের উন্মেষ হইলেই সে [illegible] লইতে পারে, অতীত

জীবনের পাপ তাহার লজ্জা ও যন্ত্রণার হেতু হইয়া পড়ে। বোধ হয় শ্যামলাল বাবুর জীবনে এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়া থাকিতে পারে।”

নীলরতন জিজ্ঞাসিলেন,—“লব্ধ ও আচ্ছন্ন জ্ঞানের সহসা এরূপ উন্মেষ হয় কিরূপে?”

ঘনানন্দ বলিলেন,—“অতীত জীবনের সামান্য মাত্র জ্ঞানও সহসা ফুটিয়া উঠে; কিন্তু তৎসম্বন্ধে কাহারও সহায়তা আবশ্যক। অপেক্ষাকৃত অধিকতর জ্ঞানীর সামান্য কথায়, অল্প উপদেশ বা তাঁহার কার্য্য-প্রণালীর পর্য্যালোচনায় অতীত জীবনোপার্জ্জিত সামান্য মাত্র জ্ঞানও পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রাদিতে সৎসঙ্গের বিবিধ মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। সৎসঙ্গের প্রভাবে অতীত জ্ঞান পরিস্ফুট হইতে পারে, মহৎ দৃষ্টান্তের আলোচনায় চিত্তে মহৎ ভাবের আবির্ভাব হইতে পারে এবং জ্ঞানরূপ অতুলনীয় ধন লাভের নিমিত্ত আকিঞ্চন হইতে পারে।”

নীলরতন বলিলেন,—“আপনার কথা শুনিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইতেছি।”

শ্যামলাল বলিলেন,—“পাপী অধম শ্যামলালের উপলক্ষে ভগবানের মুখে এই সকল গভীর তত্ত্বের আলোচনা; ইহা শ্যামলালের পরম সৌভাগ্য।”

নীলরতন জিজ্ঞাসিলেন,—“অতঃপর শ্যামলাল বাবুর কি কর্ত্তব্য?”

ঘনানন্দ বলিলেন,—“আপনি এবার কঠিন কথার অবতারণা করিয়াছেন। শ্যামলাল বাবুর হৃদয়ে পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত অত্যল্প সঞ্চিত জ্ঞান ছিল; তাঁহার ভাগ্যক্রমে সহসা তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। অতঃপর সেই জ্ঞানকে বাড়াইয়া ক্রমেই পূর্ণতার অভিমুখে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক।”

নীলরতন জিজ্ঞাসিলেন,—“কি তাহার উপায়?”

ঘনানন্দ বলিলেন,—“তাহার উপায় শিক্ষক দেখাইয়া দিতে পারেন। সাধারণতঃ সেই শিক্ষককে লোকে গুরু বলে। এই গুরু কথাটা এতই নিন্দনীয় ও ঘৃণাজনক হইয়া পড়িয়াছে যে আমি তাহার প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করি না।”

নীলরতন বলিলেন,—“গুরু কথাটা লজ্জাজনক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন কেন?”

ঘনানন্দ বলিলেন,—“লোকসমাজে আজি কালি যাঁহাদের গুরু বলিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে, তাঁহারা প্রায়ই নিতান্ত অজ্ঞান ও নিকৃষ্ট জীব। তাঁহারা শ্মশ্রু গুম্ফ মুণ্ডন করিয়া, অঙ্গের বিবিধ স্থানে তিলক ধারণ করিয়া মানব সমাজের সর্ব্বনাশ সাধনের নিমিত্ত নানা স্থানে পর্য্যটন করেন। জ্ঞান বা শাস্ত্র কাহাকে বলে তাহা তাঁহারা জানেন না, সাধনার কোন তত্ত্বই তাঁহারা বুঝেন না, পরকাল সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার কোন সংবাদ তাঁহারা রাখেন না। তাঁহারা গাঁজা খাইতে জানেন, সুন্দরী বিধবা যুবতী তাঁহাদের বড়ই আদরের বস্তু, ঘন দুগ্ধ ও সন্দেশ তাঁহাদের বড়ই লোভজনক। তাঁহারা শিষ্যের মস্তকে পদস্পর্শ করাইয়া বার্ষিক গ্রহণ করেন, শিষ্যকে জ্ঞান দিতেছি বলিয়া অজ্ঞানের কূপে ফেলিয়া দেন, তাঁহারা বিবিধবিধানে সমাজের সর্ব্বনাশ করেন। এই শ্রেণীর গুরু নিতান্ত নিন্দনীয় এবং ইহাদের কৃপায় দেশে অজ্ঞানান্ধকার বিপুল পরিমাণে বাড়িয়া উঠিতেছে।”

নীলরতন বলিলেন,—“সংসারে যত গুরু দেখা যায়, তাহার অধিকাংশই এইরূপ বটে। ইহাদের সাহায্যে কোনই হিত হয় না কি?”

ঘনানন্দ বলিলেন,—"কেমন করিয়া হইবে? যে পরমপদ শিষ্যকে দেখাইয়া দিবার নিমিত্ত গুরুদেব দায়ী, তিনি স্বয়ং কখন তাহা দেখেন নাই। তাহার আকার, প্রকার, অবস্থান স্থান প্রভৃতি কোন বিষয়েই তাঁহার অভিজ্ঞতা নাই। তিনি কিরূপে অপরকে তাহা দেখাইবেন? অন্ধ কর্ত্তৃক নীয়মান অন্ধ যেমন গর্ত্তে পতিত হয়, এইরূপ গুরুর সাহায্যে শিষ্যের সেই দুর্গতি হয়।"

নীলরতন বলিলেন,—"এরূপ গুরু পরিত্যাগ করিয়া যথার্থ জ্ঞানীর পদাশ্রয় করাই উচিত। কিন্তু এ বিষয়ে অতি প্রবল শাসন দেখিতে পাওয়া যায়। গুরুত্যাগ মহাপাপের কথা শুনিতে পাওয়া যায়।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—এ শাসনও সেই ব্যবসাদার গুরুদিগের কৃত। তাহারা পূর্ব্বেই বসিয়াছে যে, তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধি কালক্রমে লোকের অবজ্ঞার বিষয় হইবে। তখন নর-সমাজ তাহাদিগকে দূর করিয়া দিবে এবং তাহারা নিরন্ন হইয়া পড়িবে। এই জন্যই তাহারা সময় থাকিতে গুরুত্যাগে মহাপাপরূপ মিথ্যা শাসন-বাক্য প্রচার করিয়া রাখিয়াছে। এ সকল কথা ঐ ভণ্ড গুরুদিগের কল্পিত, অসঙ্গত ও অগ্রাহ্য। এই জন্যই এই অধম গুরুগণ শিষ্যাবিত্তাপহারক নামে অভিহিত হইয়াছেন।"

নীলরতন জিজ্ঞাসিলেন,—"তাহা হইলে প্রভুর বিবেচনায় গুরুত্যাগে কোনই দোষ নাই।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"নিশ্চয়ই কোন দোষ নাই। বরং তাহা নিতান্ত আবশ্যক কার্য্য। ছাত্র বাল্যকালে যে গুরু মহাশয়ের নিকট 'ক' 'খ' অভ্যাস করে, এণ্ট্রান্স পাস করিবার সময়ও কি সেই গুরু মহাশয় তাহাকে পাঠ বলিয়া দিতে পারেন? এই লৌকিক শিক্ষাতেও গুরুর পরিবর্ত্তন যেরূপ আবশ্যক, জ্ঞানরূপ পরমধন লাভার্থে গুরুর পরিবর্ত্তন তদধিক আবশ্যক। যে গুরুর নিকট যতটুকু সাধনার উপায় শিক্ষা হওয়া সম্ভব, তাহা লব্ধ হওয়ার পর তাঁহার নিকট আর কি শিক্ষা হইবে? সদাশয় গুরু তখনই স্বয়ং শিষ্যকে অন্য কোন মহাত্মার শরণাগত হইবার নিমিত্ত উপদেশ প্রদান করিবেন। যে শিষ্য সাধনা-পথে পূর্ব্বজন্ম হইতেই অগ্রসর হইয়া আছে, যে শিষ্য বর্ত্তমান জীবনেও অপূর্ব্ব সাধনাশক্তি লাভ করিয়াছে, সে কেমন করিয়া একমাত্র গুরুর অধীনে থাকিয়া আপনার ইহকাল ও পরকালের সমস্ত আশা ভরসা নির্ম্মূল করিবে? যে গুরুর নিকট যতটুকু শিক্ষা লাভের সম্ভাবনা, সেটুকু লাভ করার পরই অন্য কোন মহত্তর ব্যক্তির শরণাগত হওয়া আবশ্যক। জ্ঞানমার্গে অগ্রসর হইতে হইলে গুরুত্যাগ করা সর্ব্বদা আবশ্যক হইয়া থাকে।"

নীলরতন বলিলেন,—"আপনার কথায় অনেক ভ্রম দূর হইল। মূল কথার এখনও শেষ হয় নাই। ভাগ্যবান্ শ্যামলাল বাবু এক্ষণে কি করিবেন?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"তিনি এক্ষণে সদ্‌গুরুর কৃপাভাজন হইয়া ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকুন। শ্যামলাল বাবু বাস্তবিকই ভাগ্যবান্। যাঁহার হৃদয়ে অল্পমাত্র জ্ঞানও থাকে, তিনি মহাত্মা। ভাগ্যক্রমে শ্যামলাল বাবু মহদ্ব্যক্তির আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সাহায্যে অবশ্যই শ্যামলালের ক্রমোন্নতি হইবে।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"দয়াময় সমস্ত কথাই আমি নীরবে শুনিলাম। কিন্তু আমার হৃদয়ে কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞান আছে, একথা

আপনার মুখ দিয়া বাহির না হইলে আমি নিশ্চয়ই পরিহাস বাক্য বলিয়া মনে করিতাম। আমি অধম, আমি হীন, আমি পাপী, আমি বেশ্যাপুত্র, আমার আবার জ্ঞান!"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"তুমি যে আপনাকে তৃণাদপি সুনীচ জ্ঞান করিতে পারিয়াছ, ইহাই তোমার জ্ঞানের ফল। যিনি সন্ন্যাসাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা বলিলেই হয়, সেই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যেরও জন্মঘটিত দুর্নাম ছিল। আর যিনি স্বয়ং সাক্ষাৎ জ্ঞানকল্প সেই ভগবান্ বেদব্যাসের জন্ম-বৃত্তান্তও বিশেষ প্রশংসনীয় নহে। জন্মঘটিত কুৎসিত ইতিহাসে জাতব্যক্তির কোন দোষ হয় না। যাও বৎস, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার শুভ হইবে। তুমি অবিচলিত চিত্তে ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে থাক, ইহাই তোমার প্রথম সাধনা।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"দয়াময়, আপনাকে প্রণাম করিয়া আমি এক্ষণে বিদায় হই। আপনার শ্রীচরণে হস্তার্পণ করিয়া চরণধূলি গ্রহণের অধিকার লাভে এ অধম পাপী সাহস করিতে পারে কি?"

তখন ঘনানন্দ বলিলেন,—"নিশ্চয়ই পার। তুমি আমার শিষ্যের শিষ্য, সুতরাং পরম আদরের বস্তু।"

তখন শ্যামলাল মহাপুরুষের চরণ স্পর্শ করিয়া দণ্ডবৎ ভূতলে পতিত হইলেন। মহাপুরুষ তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে উঠাইলেন এবং সস্নেহে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন; আনন্দে শ্যামলালের দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। মহাপুরুষ তাঁহাকে আলিঙ্গনপাশ হইতে মুক্ত করিয়া দিলে, তিনি অবসিত কলেবরে ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহার নয়ন দিয়া প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল।

নীলরঞ্জন বলিলেন,—"অদ্ভুত ব্যাপার! চিরস্মরণীয় দৃশ্য! আমার সৌভাগ্য, আমি এই প্রেমলীলার অভিনয় দেখিতে পাইলাম।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"বৈবাহিক মহাশয়, আজি এই স্থানেই আমাদের সাক্ষাতের শেষ। শ্যামলাল, আজি তুমি প্রস্থান কর। কল্য প্রাতে শুভয়েই আমার নিকট আসিও আমি আর এক গুরুতর কথার অবতারণা করিব। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমাকে একটা স্থান নিরূপণ করিয়া বাস করিতে বলিয়াছিলাম। তাহার ব্যবস্থা তুমি করিয়াছ?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"আজ্ঞা হাঁ; নীলরঞ্জন বাবুর কৃপায় তাহা স্থির করিয়াছি এবং গত তিন দিন সেখানেই বাস করিতেছি। এ অধম দাসও সাহস করিয়া একটা কথা প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিতেছে। এরূপ ঘর পাতিবার কি প্রয়োজন ছিল?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"দেহ রক্ষা করিবার জন্য ঘরের আবশ্যক। সন্ন্যাসের পূর্ব্বে অনেক দৈহিক সহিষ্ণুতা আবশ্যক, তৎসমস্ত সুদীর্ঘ অভ্যাসসাপেক্ষ। তুমি আজন্ম সুখা ও যত্ন-সেবিত। সহসা এরূপ কঠোরতায় তোমার পীড়া হওয়া সম্ভব।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"হইলেই বা ক্ষতি কি? পীড়া বা মৃত্যু কিছুই ভয়ের কারণ বলিয়া আমার মনে হয় না।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"সে কথা ভুল। এই দেহ রক্ষা করিতে না পারিলে সাধনা করিবে কে? মৃত্যু হইলে সকল সাধনাই শেষ হইল। যতক্ষণ জীবন ততক্ষণই সাধনা। মৃত্যু হইলে লোকান্তরে সুদীর্ঘকাল ফলভোগের পর আবার জন্ম হইবে। আবার তখন যে স্থানে সাধনার শেষ হইয়াছিল, সেই স্থান হইতে

কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে। সে বড় বিষম যন্ত্রণা। সুতরাং জীবনকে দীর্ঘস্থায়ী করিয়া যথাসাধ্য সাধনার পথে অগ্রগামী হইতে চেষ্টা করা আবশ্যক। এজন্য আহারাদি সম্বন্ধে যোগীর অনেক নিয়ম আছে। অনেক অভ্যাস-বলে যোগী দেহকে সর্ব্ব-ক্লেশ-সহিষ্ণু করিতে সক্ষম হন। তুমি অনভ্যস্ত; সুতরাং তোমাকে বিবিধ উপায়ে দেহ রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তোমার গুরুদেবের নিকট তুমি সময়মত সকল শিক্ষাই লাভ করিবে।"

প্রণাম করিয়া নীলরতন ও শ্যামলাল প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আশ্রিতা

কাশীর উত্তর প্রান্তে এক জনশূন্য স্থানে নীলরতন বাবু শ্যামলালের জন্য একটী উত্তম ঘর স্থির করিয়া দিয়াছেন। শ্যামলাল তথায় তিনদিন হইতে বাস করিতেছেন। তথায় কোন দ্রব্য সামগ্রী নাই। নীলরতন বাবু অবশ্য প্রয়োজনীয় কিছু কিছু সামগ্রী আনিয়া দিবার নিমিত্ত অনেক আগ্রহ করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্যামলাল কোন মতেই কোন সামগ্রী লইতে সম্মত হন নাই। তিনি বলেন, তাহা হইলে দ্রব্যরক্ষার জন্য ঘরে তালা দিতে হইবে, তাহা হইলেই একটা চবি রাখিতে হইবে, এবং তাহা হইলেই একটা উদ্বেগের প্রয়োজন হইবে। মহাপুরুষের আজ্ঞায় তিনি ঘরে বাস করিবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু কোন দ্রব্য গ্রহণ করিবেন না। তিনি আপনি কতকগুলি খড় সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহারই উপর তিনি শয়ন করেন, আর যে সময়ে তিনি আহার করেন, সেই স্থান হইতে একটা মৃৎভাণ্ড আনিয়া রাখিয়াছেন। তাহাতেই গঙ্গাজল আনিয়া রাখেন। পিপাসা বোধ হইলে তাহাই সেবন করেন। এই দুই সামগ্রী কেহ লইয়া যাইবে না, সাবধানতার কোন প্রয়োজন হইবে না এবং কোনরূপে নষ্ট হইলেও ক্ষতি হইবে না।

শ্যামলাল কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া দ্রুত পাদবিক্ষেপে আপনার এই আশ্রয়ে ফিরিয়া আসিলেন। গৃহে আসিয়া শ্যামলাল দেখিলেন, এক সুন্দরী নারী তাঁহার সেই ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিতেছেন। সুন্দরী নত-বদনা; সুতরাং শ্যামলাল তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসিলেন,—"কে তুমি? এখানে কেন আসিয়াছ?"

সুন্দরী বাক্যে কোন উত্তর না দিয়া ধীর-ভাবে শ্যামলালের চরণে প্রণাম করিলেন। তাঁহার পদধূলি লইয়া মস্তকে দিলেন। তাহার পর মুখ তুলিয়া শ্যামলালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

সবিস্ময়ে শ্যামলাল কহিলেন,—"বিধুমুখী, তুমি কোথা হইতে এখানে আসিলে?

বিধুমুখী সজল নয়নে বলিলেন,—"অনেক স্থান ঘুরিয়া, অনেক চেষ্টায়, অনেকের সাহায্যে তোমার নিকট আসিতে পারিয়াছি।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"কেন তুমি এখানে আসিয়াছ?

বিধুমুখী বলিলেন,—"তোমাকে দর্শন করিতে আসিয়াছি।"

শ্যামলাল জিজ্ঞাসিলেন,—"এখন তুমি কোথায় থাক?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"আমি আগে এক দেবতার, তাহার পর এক দেবীর আশ্রয়ে ছিলাম। এখন তোমার আশ্রয়ে আসিয়াছি।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"শুনিয়াছি হরিচরণ তোমাকে আবার বিপদে ফেলিয়াছিল।"

"হাঁ। তোমার চরণকৃপায় সে বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়াছি।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"আমার নিকট কেন আসিয়াছ ?"

বিধুমুখী নিরুত্তর। শ্যামলাল আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"আমাকে তোমার কি প্রয়োজন ?"

বিধুমুখী নিরুত্তর। শ্যামলাল আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"আমার দ্বারা তোমার কি উপকার হইতে পারে ?"

বিধুমুখী নিরুত্তর। শ্যামলাল বলিলেন, —"কথা কহিতেছ না কেন ? কি অভিপ্রায়ে আমার নিকট আসিয়াছ বল ?"

তখন বিধুমুখী উঠিয়া শ্যামলালের চরণ-সান্নিধ্য হইতে একটু দূরে দাঁড়াইলেন এবং গলায় কাপড় দিয়া যুক্তকরে কহিলেন,—"কি বলিব ? তোমার এ সকল কঠোর প্রশ্নের কি উত্তর দিব ? আমি তোমার নিকট আসিয়া আর কোথায় যাইব ? আমি শুনিয়াছি, তুমি পরম জ্ঞানী হইয়াছ। তুমি ভাবিয়া দেখ, তোমার চরণ আশ্রয় ভিন্ন আমার আর স্থান কোথায় আছে ? তুমি আমার দেবতা, তুমি আমার গুরু, তুমি আমার রক্ষক, তুমি চরণে স্থান না দিলে আমাকে কে স্থান দিবে ?"

বিধুমুখীর চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় জল পড়িতেছে। কি শোভা ! সেই ঈষৎ সম্মুখনতা, গললগ্নীকৃতবসনা, যুক্তকরা সুন্দরীকে তখন পরম শোভাময়ী দেখাইতে লাগিল।

শ্যামলাল কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে বিধুমুখী বলিলেন,—"আমি পাপীয়সী কল্পনাতীত পাপের পঙ্কে আমি প্রলিপ্তা, কিন্তু তুমি তো জ্ঞানময় মহাত্মা হইয়াছ। পাপীয়সীর পাপ ক্ষমা করিয়া তাহার অন্তরাত্মা ধৌত করিয়া চরণে স্থানদান করাই তো মহাপুরুষের কার্য্য। তুমি যদি এ চরণাশ্রিতা দাসীকে উদ্ধার করিতে না পার, তাহা হইলে তোমার গৌরব হইবে কেন ? দয়াময়, তোমার চরণে আমার স্বত্ব আছে। আমি কদাপি তোমার চরণাশ্রয় ত্যাগ করিব না।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"বিধুমুখী, তুমি ব্রাহ্মণকন্যা—আমি অধম বেশ্যাপুত্র। তুমি আমাকে প্রণাম করিয়া, বার বার আমার দাসী বলিয়া উল্লেখ করিয়া আমাকে বিষম পাতকগ্রস্ত করিতেছ। আমি এজন্য তোমার চরণে প্রণাম করি। তুমি পাপীয়সী কি না তাহা আমি জানি না। শুনিয়াছিলাম, তুমি কিছু দিন পাপের পথে ভ্রমণ করিয়াছ। তাহাতে আমার কোন অনিষ্ট হয় নাই, আমি সে জন্য কোন ক্লেশ বোধ করি নাই, সে কথা আমার আর মনেও নাই। পাপে যদি মনুষ্য বর্জ্জনীয় হইত, তাহা হইলে বিধুমুখী, এ সংসারে আমার তো স্থান হইত না। আমার তুল্য গুরুতর পাপ সংসারে কেহ কখন করিয়াছে কি ? এত পাপের বোঝা স্কন্ধে লইয়াও আমি স্বচ্ছন্দে মনুষ্য সমাজে বিচরণ করিতেছি, আপনাকে মনুষ্য বলিয়া বোধ করিতেছি। তুমি পাপের কথা ভুলিয়া যাও। যে পাপের সাগরে ভাসিতেছে, তাহার নিকট শিশির বিন্দুবৎ পাপের কথায় কাজ কি ?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"এমন কথা তুমি বলিও না। তুমি পুরুষ। তোমার পাপ আর আমার পাপে প্রভেদ বিস্তর। যে পাপ শুনিলে নারীর পাপ হয়, আমি সেই পাপী।"

শ্যামলাল বলিলেন, -"এ কথার কোন অর্থ নাই। ব্যভিচার নর ও নারী উভয়ের পক্ষেই সমান পাপ। অনিষ্ট ও অসুবিধা উভয়ের পাপেই সমান হয়। উভয়ের পাপেই সমাজের সর্ব্বনাশ হয়। কিন্তু সে পাপের কথায় এখন কাজ নাই। আমি সর্ব্বত্যাগী হইয়াছি। আমার স্থান নাই, আশ্রয় নাই, ভক্ষ্য নাই, সংস্থান নাই। আমি তোমাকে আশ্রয় দিব কিরূপে?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"আমি কিছুই চাহি না। আমার জন্য তোমার কোন আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না। আমি আমার সমস্ত অভাব অসুবিধা মিটাইয়া লইব। তোমার সে জন্য কখনও কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"তবে আমার আশ্রয়ে তোমার প্রয়োজন কি?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"আমি তোমাকে দর্শন করিতে চাহি। আমি তোমার নিকটে আসিব না, তোমার সহিত কথা কহিব না, তোমাকে বিরক্ত করিব না। কেবল দূর হইতে তোমাকে দর্শন করিব। দয়াময়, তুমি জ্ঞানী। জীবের দুঃখ দূর করাই তোমার ধর্ম্ম। আর্ত্তের উদ্ধার সাধন তোমার ব্রত, তুমি কৃপা করিয়া আমার এ প্রার্থনায় কর্ণপাত করিবে না কি?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"দেখ বিধুমুখী, তুমি রূপসী। এখনও তোমার রূপ ফাটিয়া পড়িতেছে। এক দিন তোমার এই রূপ দেখিয়া আমি অন্ধ হইয়াছিলাম। তুমি আমাকে উৎসাহ দেও নাই, আদর কর নাই, নিকটে বসিতে দেও নাই। তোমার সেই নিগ্রহ আমার পরমোপকারের হেতু হইয়াছে। আমি জানিয়া দেখিয়াছি, তোমার নিকট আমি অসংখ্য উপকারে বদ্ধ। তুমি আমার পরম হিতৈষিণী। তুমি রূপ দেখাইয়া মত্ত করিয়াছ, কিন্তু তাহা ভোগ করিতে দেও নাই। ইহাতে আমার চিত্তে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইয়াছে। বিষয় সম্পত্তি সমস্ত তোমাকে দিয়াছি, তুমি আমাকে সামান্য অন্ন পর্য্যন্ত দিতেও ইচ্ছা কর নাই, ইহাতে আমার অনেক ক্লেশসহিষ্ণুতা হইয়াছে। তোমার দ্বারবান্ প্রভৃতির নিকট নানাস্থানে নিগ্রহ ভোগ করিয়া আমার হৃদয় হইতে মানাপমানের বোধ বিলুপ্ত হইয়াছে। এই কাশীধামে তুমি আগমন করায় তোমার দর্শন কামনায় আমাকে কাশী আসিতে হইয়াছে। এখানে রাজপথে তোমার বলে বলবান্ হরিচরণের জুতা আমি খাইয়াছি, তাহাতে আমার চিত্ত সুখ দুঃখ সম্বন্ধে উদাসীন হইয়াছে। তাহার পর তোমার জন্য এখানে আসিয়াই আমি মনুষ্য মধ্যে দেবতা, জ্ঞানের সমুদ্র, দয়ার উৎস, পরমপুরুষ উমাশঙ্করের সাক্ষাৎ পাইয়াছি শুনিয়াছি তুমিই তাঁহাকে আমার সন্ধান করিবার ভার দিয়াছিলে। ইহাও তোমার অসীম দয়া। সেই দেবতার সাক্ষাৎ পাইয়া, আমি ধন্য হইয়াছি। পরমানন্দের পথ দেখিতে পাইয়াছি, জীবনে যে সন্তোষ কখন লাভ করি নাই, সে সন্তোষ ও তৃপ্তি আমি লাভ করিয়াছি। বিধুমুখী, তুমি হিতৈষিণী দেবীর ন্যায় কৃপা পরবশ হইয়া আমার এই সকল মহদুপকার করিয়াছ। আমি তোমার চরণে চিরকৃতজ্ঞ। আমি বার বার তোমাকে প্রণাম করিতেছি।"

তখন বিধুমুখী কাঁদিতে কাঁদিতে শ্যামলালের চরণে নিপতিত হইলেন এবং বলিলেন —"তুমিই যথার্থ সাধু। আমার যে সকল পাপ স্মরণ করিলে আত্মহত্যা করিতে হয়, তুমি সেই সকল পাপই তোমার কল্যাণের

হেতুভূত বলিয়া আমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছ। ধন্য তুমি। এ পাপীয়সী কদাচ তোমার চরণাশ্রয়ের যোগ্যা নহে। কিন্তু দয়াময়, তুমি যখন এত দয়া শিখিয়াছ, যখন এত উদারতায় তোমার হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে, যখন এত মহত্ত্বে তোমার অন্তর আচ্ছন্ন হইয়াছে, তখন কেন তুমি আমাকে চরণাশ্রয় দিবে না? এমন দয়াল প্রভু তুমি—তোমার চরণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দাসী কোথাও যাইবে না।”

শ্যামলাল বলিলেন,—“আমাদের ছাড়াছাড়ি অনেক দিন হইয়াছে। তুমিও আমাকে ছাড়িয়াছ, আমিও তোমাকে ছাড়িয়াছি। উভয়ের নিকট হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন এ দূরত্ব ঘুচাইবার কোন উপায় দেখিতেছি না। মিলনের আর কোন প্রয়োজন নাই। আমি আপন অবস্থায় বেশ সুখী আছি। তুমি যদি সুখী হইতে না পারিয়া থাক তাহা হইলে চেষ্টা কর, যত্ন কর, সুখী হইবে।”

বিধুমুখী বলিলেন,—“অনেক চেষ্টা করিয়াছি। তোমার চরণাশ্রয় ব্যতীত আমার আর সুখ নাই। আমাকে তোমার চরণ ধরিয়া থাকিতেই হইবে।”

শ্যামলাল বলিলেন,—“আমি যে ভাবে চিত্তকে দাঁড় করাইয়াছি, তাহাতে কাহারও সঙ্গ আমার আবশ্যক নহে। তুমি আমাকে দর্শন করিয়া যদি তৃপ্তি হও, তাহাতে আমার কোন নিষেধ নাই। কিন্তু আমার নিকট অবস্থান অসম্ভব। আমি অকর্ম্মা তোমাকে লইয়া বিব্রত হইবার আমার সাধ্য নাই। তোমার ন্যায় রূপসী সংসারে অনেকের হৃদয়ে লোভ উদ্দীপন করিবে। তাহাতে তোমার এবং আমার অনেক বিপদ হইবে।”

বিধুমুখী বলিলেন,—“ছাই রূপ—এ পোড়া রূপ আমি এখনই দ্রাবক দিয়া ধ্বংস করিতাম। যাহা একদিনও স্বামীর ভোগে লাগিল না, তাহা এখনই আগুণে পুড়াইয়া ফেলিতাম। কিন্তু তাহা করিব না; তাহা করিতে আমার অধিকার নাই। এ দেহ তোমার বস্তু, এরূপ তোমার সামগ্রী। তুমি জীবিত থাকিতে তোমার বস্তু ধ্বংস করিতে আমার অধিকার নাই। আমি তোমাকে দর্শন করিয়াই চরিতার্থ হইব। আমার জন্য খাদ্যাদি আয়োজন করিতে হইবে না। আমি এই গৃহের এক পার্শ্বে যথাকালে যাহা হয় পাক করিব। তুমি যখন এখানে থাকিবে, আমি প্রাণ ভরিয়া তোমাকে দর্শন করিব, তোমার সহিত একটা কথাও কহিব না। তুমি কৃপা করিয়া এই অনুমতি দিলেই আমি চরিতার্থ হই।”

শ্যামলাল বলিলেন,—“অসম্ভব। বিধুমুখী আমি যে পথে যাইবার চেষ্টা করিতেছি, তাহাতে স্ত্রীর সহিত বাস করা সম্ভবে না। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমি অধম, তোমার নিকট অশেষ উপকারে বাধ্য। তোমার জন্য অসাধ্য কর্ম্ম সম্পাদন করাও আবশ্যক। কিন্তু বিধুমুখী, আমাকে ক্ষমা কর। তোমার সহিত একত্রাবস্থান আমার পক্ষে অসম্ভব।”

তখন বিধুমুখী বলিলেন,—“তুমি জ্ঞানি হইয়া নিষ্ঠুর হইয়াছ, তুমি ধার্ম্মিক হইয়া পাপী হইয়াছ, তুমি মহৎ হইয়া নীচ হইয়াছ। তুমি ত্যাগ করিলেও আমি কখন তোমাকে ত্যাগ করিব না। তোমার চরণে মস্তক স্থাপন করিয়া যতদিন মরিতে না পারিব, ততদিন তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ।”

তখন শ্যামলাল বেগে কক্ষের বাহিরে আসিলেন এবং বলিলেন,—“বিধুমুখী, যেখানে

ছিলে সেখানেই যাও। বৃথা আশা ত্যাগ কর। তোমায় আমায় সাক্ষাতের এই শেষ।"

বিধুমুখী উঠিয়া বলিলেন,—"কখন না। তোমায় আমায় নিত্য সাক্ষাৎ হইবে। তোমার চরণাশ্রয় ত্যাগ করিয়া আমি কোথায়ও যাইব না।"

শ্যামলাল বেগে প্রস্থান করিলেন। শ্যামলাল যে পথ গ্রহণ করিলেন, বিধুমুখী ধীরে ধীরে সেই দিকে চলিলেন।

আমাদের সেই সুরুচি মার্জ্জিত, সাম্যবাদী বন্ধুর কথা বোধ হয় পাঠকগণের স্মরণ আছে। আজি বহুদিন পরে ভাগ্যক্রমে তাঁহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বিধুমুখীর এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া তিনি বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছেন। তিনি বলেন,—"এই মহীয়সী মহিলার কি শোচনীয় অধঃপতন হইয়াছে। অবাধ প্রেমের পবিত্র নীতির অনুসরণ করিয়া আবার পাপপঙ্কিল বন্ধনের পথে আসিতে প্রয়াস করে, এরূপ রমণী বোধ হয় জগতে এই প্রথম। এরূপ কুদৃষ্টান্ত স্থাপনের পূর্ব্বে বিধুমুখীর মৃত্যু হইলে বোধ হয় সংসারের বিশেষ কল্যাণ হইত।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

উৎক্রান্তি।

পরদিন অতি প্রত্যূষে শ্যামলাল আসিয়া নীলরতন বাবুর সহিত মিলিত হইলেন এবং যখন মনানন্দ স্বামী আজি স্বয়ং তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, তখন না জানি কি কথা বলিবেন ভাবিয়া উভয়ে দ্রুতপদে আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

পথে নীলরতন বাবু বলিলেন,—"আপনি ধন্য। আপনি মহাপুরুষের কৃপাভাজন। আমরা আপনার সঙ্গ লাভ করিয়া চরিতার্থ হইতেছি।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"এমন কথা বলিবেন না। মহাপুরুষের কৃপালাভ কিছুই বিচিত্র ব্যাপার নহে। পূতিপদার্থ ও চন্দনে যাঁহার সমজ্ঞান, সাধুত্তম উমাশঙ্কর ও ঘৃণিত পাপী শ্যামলালকে আলিঙ্গন দান তাঁহার পক্ষে সমানই বিষয়।"

নীলরতন জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনি এক্ষণে যে নূতন স্থানে বাস করিতেছেন, সেখানে কোন অসুবিধা ঘটিতেছে না তো?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"অসুবিধা ও সুবিধা সর্ব্বত্র সমান। যখন গাছতলায় থাকিতাম, তখনও বিশেষ কোন অসুবিধা দেখি নাই, এখানেও বিশেষ কোন সুবিধা দেখিতেছি না। কিন্তু যাহাই হউক, কল্য হইতে আমাকে এ আশ্রয় ত্যাগ করিতে হইয়াছে।"

"কেন?"

"বিধুমুখীর নাম আপনি শুনিয়াছেন বোধ হয়?"

"হাঁ, তিনি তো আপনার স্ত্রী।"

"তাঁহার সহিত আমার ঐরূপ সম্বন্ধই ছিল। তিনি গতকল্য আমার আশ্রয়ে উপস্থিত হইয়াছেন এবং আমার আশ্রিতা হইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছেন।"

"তাহার পর?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"সুতরাং আমি পলাতক।"

নীলরতন বলিলেন,—"তাঁহার ব্যবস্থা কি করিলেন?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"ব্যবস্থা করিবার আমি কে? যাঁহার কার্য্য তিনিই করিবেন।"

নীলরতন জিজ্ঞাসিলেন,—"তিনি কোথায় আছেন এখন?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"জানি না। আমার বোধ হয় সে ঘরে তিনি আর এখন নাই।"

নীলরতন বলিলেন,—"তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদন, থাকিবার স্থান ইত্যাদি বিষয়ে একটা ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া আপনার উচিত।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"কেন উচিত? আমি সংসারের কোন্ ব্যবস্থা করিতেছি যে এই ব্যবস্থা না করিলে আমার ত্রুটি হইবে? যিনি বিশ্বের ব্যবস্থা করেন, তিনিই বিধুমুখীর ব্যবস্থা করিবেন। আর আপনি দেখুন, বিধুমুখী রাজার আশ্রিতা। রাজা ধর্ম্মময় দেবতা। তাঁহার আশ্রিত লোকের জন্য কাহারও চিন্তা করা অনাবশ্যক।"

ঘনানন্দের আশ্রম সন্নিধানে তাঁহারা উপস্থিত হইলেন। কথা বন্ধ হইল। শ্যামলাল দূর হইতে ভূপৃষ্ঠে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। নীলরতনও প্রণাম করিলেন। মহাপুরুষ তখন এক বেদীর উপর একাকী বসিয়া আছেন। নিম্নে শিষ্যদ্বয় বসিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতেছেন।

আগন্তুকদ্বয়কে নিকটস্থ হইবার নিমিত্ত ঘনানন্দ আহ্বান করিলেন। উভয়ে নিকটস্থ হইয়া ভূপৃষ্ঠে উপবেশন করিলেন। ঘনানন্দ জিজ্ঞাসিলেন,—"শ্যামলাল, তুমি সে আশ্রম হইতে পলায়ন করিয়াছ? যাহা ইচ্ছা কর, তোমার পত্নী যাবজ্জীবন তোমার অনুসরণ করিবেন। তিনি বুঝিয়াছেন, স্বামীর কৃপা ও চরণসেবা ব্যতীত নারীর আর গতি নাই। তাঁহার মস্তিষ্ক নানাপ্রকার চিন্তায় ক্লেশে ও মনস্তাপে বিকৃত হইবার সম্ভাবনা। এ জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই। বৈবাহিক মহাশয়, আপনার জামাতা শুনিতেছি সর্ব্বস্ব দান করিয়া ফেলিলেন।"

নীলরতন বলিলেন,—"সে জন্যও আমার আর চিন্তা নাই। আপনি যখন অবস্থার পরিবর্ত্তন চিন্তাজনক নহে বলিয়াছেন, তখন সেজন্য চিন্তিত হইবার আর প্রয়োজন কি?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"আমি একটী বিশেষ কথা বলিব বলিয়া আপনাদিগকে আসিতে বলিয়াছি। সেই কথাই এক্ষণে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা আবশ্যক হইয়াছে। আমার শিষ্যদ্বয় এস্থানে আছেন, আপনারাও আছেন। এই সময় কথাটা বলাই ভাল। আমার এই দেহ কার্য্যের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে।"

নীলরতন বলিলেন,—"সে কি! আমরা তো তাহার কিছুই লক্ষ্য করিতে পারি না। আমরা তো আপনার আকার প্রকার সমানই দেখিতেছি। আপনার ঐ পুণ্যপ্রদীপ্ত শরীরে কোন ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া অনুমান করিতেছেন কি?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"না। কোন ব্যাধির লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি না বটে; কিন্তু এই দেহ আমার অবলম্বিত ও অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সমূহের অনুপযোগী হইয়া আসিতেছে।"

নীলরতন বলিলেন,—"মহাত্মন্, কথাটা ভাল বুঝিতে পারিতেছি না।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"আমি ভাল করিয়া আমার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছি, আমি নিত্য যে প্রাণায়াম করি, তাহা আমার পক্ষে পূর্ব্বে অনায়াস-সাধ্য ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহা আমার পক্ষে একটু কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে। আমি কখন কখন সমাধিস্থ হইয়া থাকি। পূর্ব্বে ব্যুত্থানের পর আমার কোনই কষ্ট

হইত না। কিন্তু একণে আমার দেহ কিছু অবসন্ন হয়। আমি সময়ে সময়ে কদাচিৎ চিত্তকে যোগবলে বলীয়ান্ করিয়া কোন বিশেষ কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকি। সেই কার্য্য সমাপ্তির পূর্ব্বে আমার কোনই ক্লেশ বোধ হইত না; কিন্তু একণে তাহার পর আমার দেহ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ইত্যাদি বহুবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কার্য্যে আমি বুঝিয়েছি যে, আমার শরীর কার্য্যের অনুপযোগী হইয়া পড়িতেছে।"

নীলরতন বলিলেন,—"ইহা বাস্তবিকই চিন্তার কথা বটে। প্রতিকারের কোন চিন্তা করা উচিত নহে কি? এ অবস্থায় কি করিলে ইহার শান্তি হইতে পারে, আমাদিগকে আজ্ঞা করিলে আমরা তাহার ব্যবস্থা করি।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"দেহে বিশেষ কোন ব্যাধি থাকিলে অবশ্যই ঔষধ সেবন বা অন্য কোন উপায় দ্বারা প্রতিকারের চেষ্টা করিতাম। কিন্তু দেহে কোন ব্যাধি নাই। দৈহিক কার্য্যকলাপ যে সকল উপায়ে নির্ব্বাহিত হয়, তৎসমস্ত যন্ত্রমাত্র। দীর্ঘকাল ব্যবহারে কলবলের অবশ্যই ক্ষয় হয় এবং তাহাদের শক্তির হ্রাস হয়। আমার বয়স অনেক, এতদিন অব্যাঘাতে একটা দেহযন্ত্রের কার্য্য পরিচালিত হইয়াছে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। এখন ইহা আর চলিতে চাহিতেছে না।"

নীলরতন বলিলেন,—"এ অবস্থায় উপায় কি?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—আমি এ দেহ ত্যাগ করিব।"

সকলেই চমকিত হইলেন। নীলরতন বলিলেন,—"এ কি কঠোর কথা আপনি বলিতেছেন?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"কথা আপনারা যেরূপ কঠোর বলিয়া মনে করিতেছেন, বাস্তবিক সেরূপ কঠোর নহে। মৃত্যুর কথা বলিতে মনুষ্যেরা বড় ভয় পায়, যেন কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত ভাবিয়া তাঁহাদের হৃৎকম্প হয়। কিন্তু বস্তুতঃ মৃত্যু কোন ভয়ানক ব্যাপার নহে। একটা বাটী হইতে বহির্গত হইতে হইলে যে স্থান দিয়া যাইতে হয়, তাহার নাম দ্বার মৃত্যুও সেইরূপ একটা দ্বার মাত্র। মৃত্যু এ সংসারে নাই। রূপান্তর প্রাপ্তি বা স্থানান্তর গমন আছে বটে, কিন্তু নাশ তো নাই। শাস্ত্রকারেরা মৃত্যু শব্দেরই উল্লেখ করেন না; আমরা যাহাকে মৃত্যু বলি, তাঁহারা তাহাকে উৎক্রান্তি বলেন। এই উৎক্রান্তির পর সকল কর্ম্মী মনুষ্য স্বর্গাদি ফলভোগের অন্তে পুনরায় মর্ত্তালোকে প্রবেশ করে। জলোকা যেমন একটা তৃণ লক্ষ্য করিয়া আর একটা তৃণ ত্যাগ করে, জীবও সেইরূপ আর একটা দেহ লক্ষ্য করিয়া দেহ ত্যাগ করে। যাঁহারা সকাম সাধক, তাঁহাদের এই যাতায়াতের বিরাম নাই। সুতরাং মৃত্যু কোথায়? নানা দেশের মনুষ্য তীর্থ দর্শনার্থ কাশী আইসে, গয়া যায়, প্রয়াগ যায়, বৃন্দাবন যায়, আবার বাটীর মানুষ বাটীতে ফিরিয়া যায়। মৃত্যুও তাহাই। মৃত্যুকে অবলম্বন করিয়া মনুষ্য বিবিধ স্থান পর্য্যটন করিয়া পুনরায় যেখানকার মানুষ সেখানেই ফিরিয়া আইসে। ইহাতে চিন্তার কারণ কি আছে?"

শ্যামলাল সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিলেন,—"সকলকেই কি এইরূপ যাতায়াত করিতে হয়?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"না বৎস, যাঁহারা নিষ্কাম কর্ম্মজনিত চিত্তশুদ্ধি-প্রভাবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, সে ভাগ্যবানগণকে আর ফিরিতে হয় না। তিনি ব্রহ্মে লীন হইয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।"

নীলরতন বলিলেন,—"প্রভো! এই-রূপ মৃত্যুর অকর্ম্মণ্যতা সম্বন্ধীয় বিবিধ কথা বহুকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু সে সম্বন্ধে হৃদয়ের দৃঢ়তা হয় না তো। আমরা মায়ামোহাচ্ছন্ন ঘোর অশক্ত ব্যক্তি। আমরা মৃত্যুর নাম শুনিলেই তো শিহরিয়া উঠি।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"সত্য কথা বলিয়াছেন। কিন্তু বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধির পরও ভয় থাকা উচিত নহে। যদি কেহ বলে ঐ মাঠে বাঘ আছে, তাহা হইলে অবশ্যই সে দিকে যাইতে ভয় হয়। কিন্তু যখন অনুসন্ধান দ্বারা জানা যায়, বাস্তবিক সে মাঠে বাঘ নাই, যে বাঘের কথা প্রচার করিয়াছে সে মিথ্যাবাদী, তাহা হইলেও সে দিকে যাইতে লোকে আর ভয় পায় কি? আপনারা বিজ্ঞ, আপনাদের এ সম্বন্ধে ভীত হইবার কোনই কারণ নাই।"

নীলরতন বলিলেন,—"আপনার বাক্য অভ্রান্ত সত্য সন্দেহ নাই। কিন্তু অভ্যাস দোষেই হউক, বা কুশিক্ষা হেতুই হউক, মরণের নামে আমরা বড়ই ভীত হই।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"মনুষ্য যে মরণের নামে ভয় পায়, তাহার কোন ভুল নাই। কিন্তু তত্ত্বানুসন্ধানের পর, প্রকৃত জ্ঞানলাভের পর সে ভয় থাকিতে দেওয়া অন্যায়। সাধারণতঃ ভোগাসক্ত মনুষ্যেরা স্রক্‌চন্দন, কামিনী কাঞ্চন প্রভৃতি যে সমস্ত ভোগ্য পদার্থে পরিবেষ্টিত থাকে, তাহা পরিত্যাগ করিবার কল্পনাও তাহাদের পক্ষে ভয়াবহ। সুতরাং মরণের প্রসঙ্গে তাহারা ভয়ে অবসন্ন হয়। কিন্তু যদি তাহারা বুঝিতে পারে, তাহাদের ভাগ্যে কোন বস্তুই তাহাদিগকে ছাড়িবে না, মৃত্যুর পর লোকান্তরে এবং জন্মান্তরে এই রূপ পদার্থরাশি তাহাদিগকে ঘিরিয়া থাকিবে, তাহা হইলে অবশ্যই তাহারা আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত হইতে পারে। এই জ্ঞানের অভাব হেতু মনুষ্য মৃত্যুর নামে এতই বিচলিত হইয়া থাকে। তাহারা যে সকল পদার্থ পরম স্পৃহণীয় বলিয়া জ্ঞান করে, তৎসমস্তও যে নিতান্ত অসার ও হেয়, ইহাও তাহারা জানে না। ইত্যাকার নানারূপ অজ্ঞতাই মনুষ্যের মৃত্যু বিষয়ে ভীতির কারণ। আপনাদের ন্যায় বিজ্ঞ জনের সেরূপ ভীত হওয়া অসঙ্গত।"

নীলরতন বলিলেন,—"শিক্ষা এখন থাকুক। এক্ষণে আপনি কি অভিপ্রায় করিতেছেন, তাহা আর একবার বলুন। আমরা আপনার দয়া-বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় পরম সুখে বাস করিতেছি। আমরা স্বার্থপর ক্ষুদ্র মানব। এই অমূল্য দয়াধনে বঞ্চিত হইতে হইলে আমাদের বড়ই ক্ষতি হইবে, কেবল স্বার্থসিদ্ধির জন্যেই আপনার প্রস্তাব আমরা বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছি না।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"এ দেহ হইতে আমার আত্মা উৎক্রান্ত হইবে, ইহাই আমি সঙ্কল্প করিয়াছি।"

নীলরতন বলিলেন,—"আমাদের যত ক্ষতিই হউক, আর আমরা যাহাই বলি, আপনি যাহা সংকল্প করিয়াছেন তাহার অন্যথা করিতে পারে এমন সাধ্য কাহার আছে? কিন্তু আজি আমাদের নিতান্ত কুপ্রভাত। প্রভুর মুখে এই নিদারুণ সংবাদ শুনিতে না হইলেই ভাল হইত।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"বৈবাহিক মহাশয়, আপনার কি এ ঘটনা কখনই ঘটিবে না? আমি যে পথে যাইবার প্রস্তাব করিতেছি, আপনাকেও তো আজি হউক বা দশ দিন পরে হউক সেই পথেই যাইতে হইবে।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"কত দিনে দয়াময় দেহ ত্যাগ করিবার সময় উপস্থিত হইবে?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"তাহা এখন স্থির করি নাই। তবে একমাস অতীত হইবে এরূপ বোধ হয় না।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"দয়াময়, আমি এজন্য বিশেষ চিন্তাকুল হইতেছি না। আপনার করুণায়, আপনার উপদেশে প্রাণে বড়ই শীতলতা অনুভব করিতেছিলাম। তাহাতে বঞ্চিত হইব, কিন্তু তাহাই যদি বিধাতার বাঞ্ছা হয়, তাহা হইলে তাহাই হউক।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"তুমি যাঁহার অনুগৃহীত সেই উমাশঙ্করের কৃপায় তুমি বঞ্চিত হইবে না; সুতরাং তোমার চিন্তার কারণ কিছুই নাই।"

নীলরতন বলিলেন,—"দেহ ত্যাগ কিরূপে ঘটিবে? সম্প্রতি দেহে তো কোনই পীড়া নাই। যে সামান্য দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইয়াছে বলিতেছেন, তাহাতে দেহের সহিত প্রাণের বিচ্ছেদ হওয়া সম্ভব নহে।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"না দেহে কোন পীড়া নাই। বিনা কারণে বা বিনা পীড়ায় প্রাণত্যাগ করা না যায় এমন নহে। কিন্তু তাহা আমি করিব না, একটা পীড়া ঘটাইতে হইবে।"

নীলরতন বলিলেন,—"যদি সহজেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়, তাহা হইলে পীড়ার প্রয়োজন কি?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা লোক-শিক্ষার্থ এবং মরণের যে পদ্ধতি মনুষ্য সমাজে চলিয়া আসিতেছে তাহার ব্যতিক্রম করা অবৈধ বোধে একটা বিষম যন্ত্রণা-দায়ক কঠিন পীড়ার উদ্ভব করিতে হইবে।"

তাহার পর নতবদন শিষ্যদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"তোমাদের কোন চিন্তা নাই। আমি উৎক্রান্তির পূর্ব্বে তোমাদিগকে অতি মহৎ ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইব।"

নীলরতন বলিলেন,—"যাহা আপনার মনে আছে, তাহাই ঘটিবে। কিন্তু ভগবন্, যন্ত্রণাদায়ক কঠিন পীড়ার সংঘটন না করিলেই ভাল হয়।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"সে জন্য চিন্তা করিবেন না। পীড়া আমার কোন যন্ত্রণাই ঘটাইবে না। আপনারা এক্ষণে প্রস্থান করুন। যতদিন আমার পীড়ার উদ্ভব না হয়, ততদিন এ সংবাদ প্রচার করিবেন না। শীঘ্রই আমার পীড়া উপস্থিত হইবে। আর এক সপ্তাহ পরে পীড়া দেখা দিবে। যে দিন যে সময়ে আমি দেহ ত্যাগ করিব তাহা আপনাদিগকে পরে জানাইব। সোণাপুরে এ সংবাদ পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। সমুচিত সময়ে তাহার ব্যবস্থা হইবে। শ্যামলাল তুমি আশ্রম ত্যাগ করিয়াছ, তোমাকে দুই এক দিন একটু বিরত থাকিতে হইবে। তাহার পর তুমি আমার নিকট আসিবার সময় পাইবে। আমার উৎক্রান্তির সময় তোমার গুরুদেব এ স্থানে উপস্থিত থাকিবেন। তোমার সকলই ভাল হইবে।"

সহসা অদূরে বিষম কাতর চীৎকারধ্বনি উত্থিত হইল। ঘনানন্দ ব্যতীত সকলেই চমকিত হইয়া উঠিলেন। ঘনানন্দ বলিলেন,—"যাও সকলেই যাও। কে চীৎকার করিতেছে, কেন চীৎকার করিতেছে দেখিয়া আইস।"

নীলরতন, শ্যামলাল ও শিষ্যদ্বয় শব্দাভিমুখে গমন করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া, তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, এক

ধূলিধূসরিতা মলিনবেশা, কর্দ্দম-প্রলিপ্তা উন্মাদিনী। শ্যামলাল চিনিতে পারিলেন, সেই পাগলিনী বিধুমুখী।

নবম খণ্ড—পরীক্ষা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সর্ব্বস্বান্ত।

প্রায় কোটী মুদ্রা ব্যয় করিয়া রাজা অন্নদান ব্যাপার নির্ব্বাহ করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ নিবারিত হইয়াছে; সকল জেলায় অন্ন সত্রের কার্য্য শেষ হইয়াছে। আশুধান্য কাটা হইবার সময়ই সত্র সকলে ভোজনার্থী লোকের সংখ্যা কমিয়া আসিতে আরম্ভ হইয়াছিল। অগ্রহায়ণ মাসে সমাগত দরিদ্রের সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইয়া পড়ে এবং পৌষ মাসের প্রারম্ভে সত্রসমূহের কার্য্য শেষ হইয়া যায়

দুর্ভিক্ষ নিবারিত হইল, চারিদিকে রাজা উমাশঙ্করের স্তুতিগীতি কীর্ত্তিত হইতে লাগিল। সমস্ত দেশের ধনিগণ রাজার এই অসম্ভব দানকাণ্ড দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। অনেকেই তাঁহাকে অদ্বিতীয় দানবীর বলিয়া অবধারণ করিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার অজস্র সুখ্যাতি ও ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ রাজার এই কার্য্য অন্যরূপ চক্ষুতেও দেখিতে লাগিলেন। কোন কোন মহাত্মা এই কার্য্যে রাজার নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা বলিলেন, রাজার এরূপ অসঙ্গত দানে তাঁহাকে উন্মাদ বলিয়া মনে করিতে পারা যায়। কেহ কেহ এমনও বলিলেন, রাজা উপাধি ও যশের লোভে এই কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বস্বান্ত হওয়ার পর উপাধি ও যশ ভোগে কি আনন্দ হইবে? কেহ কেহ বিদ্রূপও করিতে লাগিলেন। অনেক ধনী এমন কথাও বলিতে লাগিলেন যে তাঁহারা সকলেই একার্য্যে সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন। রাজা সকলের নিকট এ প্রস্তাব যথা সময়ে উত্থাপন করিলে আজি তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইত না। অন্য লোকে ইহার উত্তর দিয়াছেন, তাঁহারা বলিয়াছেন, রাজা উমাশঙ্কর কাহাকেও দান করিতে ও দুর্ভিক্ষ দমনে যত্নবান্ হইতে নিষেধ করেন নাই। প্রস্তাব করিবার প্রয়োজন কিছুই ছিল না। রাজা এমন কথা কখন বলেন নাই যে, তিনি ভিন্ন আর কেহ দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ সাহায্য করিতে পাইবে না। যাঁহারা এ দেশে দাতা বলিয়া এত দিন প্রসিদ্ধ ছিলেন, এবং যাঁহারা কোন কার্য্যে সামান্য মাত্র অর্থব্যয় করিয়া সে সংবাদ বিবিধ উপায়ে ঘোষিত করিতেন এবং গবর্ণমেণ্টের গোচর করিতেন, তাঁহারা রাজার এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট সংক্ষুব্ধ ও মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। রাজার বুদ্ধি বিবেচনার নিন্দা এবং তাঁহার অভিসন্ধির সঙ্কীর্ণতাজনিত কুৎসা সেই সকল স্থান হইতেই সঞ্জাত ও প্রচারিত হইতে লাগিল।

রাজা উমাশঙ্কর, নিন্দা ও সুখ্যাতি উভয়ই হাসির সহিত শুনিতে লাগিলেন। তদানীন্তন লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর রাজাকে অজস্র ধন্যবাদ দিয়া এক পত্র লিখিলেন এবং তাহাতে তাঁহাকে নববর্ষ উপলক্ষে মহারাজা বাহাদুর উপাধি প্রদানের শুভ সংবাদ প্রদান করিলেন। রাজা তৎক্ষণাৎ সবিনয়ে সে পত্রের উত্তর

লিখিলেন,—আমি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি, এরূপ দরিদ্র ব্যক্তির কোন উপাধি শোভা পায় না। আমি আপনার হিতৈষিতায় অনুগৃহীত হইলাম। আপনি কৃপা করিয়া উপাধির দায় হইতে আমার অব্যাহতি লাভের ব্যবস্থা করিবেন। "সম সময়েই স্বয়ং গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর এক সুদীর্ঘ লিপি লিখিয়া রাজার নিকট ধন্যবাদ ও সুখ্যাতি বিজ্ঞাপিত করিলেন সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানাইলেন যে, এই নববর্ষ উপলক্ষে তিনি ষ্টার অব ইণ্ডিয়ার নাইট উপাধিতে ভূষিত হইবেন। রাজা নিরতিশয় বিনীত ভাবে তাঁহার সমীপে অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া উপাধির দায় হইতে অব্যাহতি লাভের প্রার্থনা করিলেন।

রাজার সর্ব্বস্ব গিয়াছে। ভূসম্পত্তি সমূহ প্রথমেই বিক্রীত হইয়াছে, তাহার পর গাড়ি, ঘোড়া, হাতী, গাভী এ সকলও গিয়াছে। তাঁহার মূল্যবান্ তৈজসাদি সমস্তই গিয়াছে। শেষে তাঁহার সাধের পুস্তকালয় ও সমস্ত সরঞ্জাম সমেত বাসভবনও বিক্রীত হইয়াছে সমস্ত সম্পত্তিই চন্দ্রমালার মহারাণী করুণাময়ী ক্রয় করিয়াছেন। মহারাণী কৃপা করিয়া অনুমতি দিয়াছেন, যত দিন রাজার অন্যত্র গমনের সুবিধা না হইবে, তত দিন তিনি নিজ বাটী জ্ঞান করিয়া এই বাটীতেই বাস করিতে পারিবেন। ভবন বিক্রীত হওয়ার পর প্রায় এক সপ্তাহ কাল রাজা এই বাটীতেই অবস্থান করিতেছেন।

রাজা সকল লোককেই বিদায় দিতে বাধ্য হইয়াছেন। গদগদশ্রু-লোচনে রাজা উমাশঙ্কর ও রাণী অন্নপূর্ণা দাসদাসী, সহিস কোচমান, মাহুত, পাচক পাচিকা, সিপাহী, বরকন্দাজ, দ্বারবান্, রক্ষী, জমিদারী সংক্রান্ত নায়েব, গোমস্তা, আমিন, মুহুরি প্রভৃতি সকল লোককেই জবাব দিতে বাধ্য হইয়াছেন। প্রায় সকল লোকই রাজার কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইল বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছে। রাজা ও রাণী তাহাদিগকে নানা প্রকারে শান্ত করিয়া বিদায় করিয়াছেন। সে দিনকার সে দৃশ্য নিতান্ত হৃদয় বিদারক। যাহাই হউক, বিদায়প্রাপ্ত লোকদিগের বিশেষ কোন অসুবিধা হয় নাই, প্রায় সকলে সঙ্গে সঙ্গে মহারাণী করুণাময়ীর তরফে কর্ম্ম পাইয়াছে।

নূতন বিষয়সম্পত্তি বুঝিয়া লইয়া কাজ চালাইবার জন্য মহারাণীর দেওয়ান জীবন বাবুকে এখনঅনেক সময় সোণাপুর থাকিতে হইতেছে। তিনি রাজবাটীতে থাকেন না; কাছারি বাটীতেই তাঁহার স্থান হইয়াছে। জমিদারীর কাজ চালাইবার জন্য তিনি নূতন লোক না আনিয়া পুরাতন লোকদিগকেই পূর্ব্ববৎ বাহাল রাখিলেন। ইহাতে কাজকর্ম্ম পরিচালনার বড়ই সুবিধা হইল। আর ভবন ও দ্রব্য সামগ্রী রক্ষার্থ রক্ষী, দ্বারবান্, সিপাহী সকলেরই প্রয়োজন। পুরাতন বিশ্বাসী লোক ছাড়িয়া দিয়া নূতন লোক আনায়ন করা অনাবশ্যক বিবেচনায় জীবন বাবু তাহাদেরই রাখিয়া দিলেন। হাতী ঘোড়া প্রভৃতির জন্যও লোকের দরকার;সুতরাং পুরাতন সহিস, মাহুত প্রভৃতি সেই সেই কাজে বাহাল থাকিল। জীবন বাবুর বিশ্বাস, মহারাণী মাতা সমস্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে ও স্বচক্ষে সমস্ত কার্য্য দেখিতে বহু লোক সঙ্গে লইয়া নিশ্চয়ই এ স্থানে আসিবেন এবং সম্ভবতঃ কিছুদিন করিয়া মধ্যে মধ্যে এখানে বাস করিবেন,সুতরাং পাচক পাচিকা,দাস দাসী প্রভৃতির তখন নিশ্চয়ই প্রয়োজন হইবে। তখন লোকের জন্য বিব্রত হওয়ার অপেক্ষা কিছু দিন

বসাইয়া বেতন দেওয়া মন্দ নহে। সুতরাং তাহারা সকলেই কর্ম্ম পাইল।

জীবন বাবু সবিনয়ে রাজা উমাশঙ্করকে জানাইলেন যে, যতদিন রাজার স্থানান্তর গমন না ঘটে, ততদিন তিনি পূর্ব্ববৎ হাতী, ঘোড়া, গাড়ী প্রভৃতি আপনার কাজে লাগাইতে পারেন, রাজবাটীর সমস্ত সামগ্রী স্বচ্ছন্দে আবশ্যক মত ব্যবহার করিতে পারেন, দাস দাসী, সিপাহী প্রভৃতি লোকদিগের দ্বারা আবশ্যক মত কাজ করাইয়া লইতে পারেন। মহারাণী মাতার যে আদেশ লিপি তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে—রাজা উমাশঙ্কর যতদিন স্থানান্তরে গমন না করেন, ততদিন যেন তাঁহার কোন প্রকার স্বচ্ছন্দতার অভাব না হয় এবং তিনি যেন কোন বিষয়ে কোন অসুবিধা ভোগ না করেন। রাজা উমাশঙ্কর এই প্রস্তাব শ্রবণে মহারাণী মাতার চরণে অসংখ্য প্রণাম জানাইয়া তাঁহার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন, এ স্থানে সম্ভবতঃ আর পাঁচ সাত দিনের অধিক তিনি থাকিবেন না। এই অল্প কালের মধ্যে কাহারও বিশেষ সাহায্য তাঁহার প্রয়োজন হইবে না। যদি হয় তাহা হইলে তিনি অবশ্যই সে সাহায্য গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

রাজার সকল সম্পত্তিই গিয়াছে। কেবল এখনও আছে রাণী অন্নপূর্ণা ও খোঁকা রাজার অলঙ্কার সমূহ। সে অলঙ্কার সমূহ বিক্রয় করিলে ন্যূনকল্পে পঞ্চাশ হাজার টাকা হইতে পারে। সেই অলঙ্কার এক একখানি বিক্রয় করিয়া এখন রাজার দৈনিক খরচ নির্ব্বাহিত হইতেছে।

আর যায় নাই রাজার দেবোত্তর সম্পত্তি সমূহ, তাহার আয় প্রায় কুড়ি হাজার টাকা। কিন্তু সে টাকার খরচ নির্দ্দিষ্ট আছে। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দেবদেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন। তত্তাবতের ভোগ পূজা, বাদ্য, পর্ব্ব, অতিথি-সেবা, পূজক, পরিচারক ইত্যাদির বেতনাদিতে সে কুড়ি হাজার টাকা খরচ হইয়া থাকে।

আর যায় নাই কালেজ, বিদ্যালয়, চতুষ্পাঠী, চিকিৎসালয়, অতিথিশালা প্রভৃতি অনুষ্ঠানসমূহ পরিচালনার্থ সম্পত্তি। তাহার আয় একুনে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা। সে সকল সদনুষ্ঠান সুন্দররূপে পরিচালিত করিবার নিমিত্ত আয়ের টাকা সমস্তই খরচ হইয়া থাকে।

আর যায় নাই চণ্ডীচরণ। তিনি কালীবাটীর প্রসাদ ভোজন করেন, আর রাজবাটীতে আসিয়া পড়িয়া থাকেন। জীবন বাবু তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ আমলাদিগের ঘরের উপরে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি উত্তর দিয়াছেন, মার প্রসাদ খাইব, রাজার অবস্থা মন্দ হইয়াছে, দুধ ছাড়িয়া দিব, আফিং ছাড়িয়া দিব, রাজাকে প্রাণ থাকিতে ছাড়িব না।

আর যায় নাই জফর বলিয়া কোচম্যান। জীবন বাবু তাহাকে আগেকার মত কাজ করিতে অনুরোধ করিলে সে বলিয়াছে, ভিক্ষা করিয়া খাইব, তথাপি রাজার কাছ ছাড়া হইয়া আর কোথায় থাকিতে পারিব না, আর কাহারও চাকরী করিতে পারিব না।

আর যান নাই রায় হরকুমার বাহাদুর। জীবন বাবু তাঁহাকে বলিয়াছেন, আপনি এই বিপুল সম্পত্তির যেমন দেওয়ানী করিতেছিলেন, তাহাই করুন, আমার দিকে অনেক কাজ। আপনি কৃপা করিয়া এ ভার গ্রহণ করিলে মহারাণী মাতা বড়ই নিশ্চিন্ত হইবেন। হরকুমার বাহাদুর বলিয়াছেন,—"আমি অনেক দিন হইতেই দেওয়ানি ত্যাগ করিয়াছি। বেতন

লইয়া কোন কাজ করিবার আমার আর প্রয়োজন নাই। কেবল রাজার প্রেমে বাধ্য হইয়া আমি এখানে আছি। রাজার সঙ্গ ছাড়িয়া আমি বসুন্ধরার সম্রাট্ পদও গ্রহণ করিতে পারিব না।

এই সকল অবস্থা পরিবর্ত্তনের পর রাজা এক দিন রায় বাহাদুরের নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—খুড়া মহাশয়, আপনি বহু দিন পূর্ব্বেই কাশী যাইবেন বলিয়া ছিলেন, এখন কেন যান না?

রায় বাহাদুর বলিলেন,—"কেন বাবা, তুমি অন্ন দিয়া একটা দেশ রক্ষা করিতে পারিলে, আমাকে দুই বেলা দুই মুঠা ভাত দিতে কি তোমার বড় কষ্ট হইবে।"

রাজা বলিলেন,—"এখন হয় ত আপনার বড়ই কষ্ট হইবে।"

রায় বাহাদুর বলিলেন,—"কেন বাবা, তোমার যদি কষ্ট সহে, মা অন্নপূর্ণার যদি কষ্ট সহে, আমার রাজা নাতির যদি কষ্ট সহে, তাহা হইলে এ বুড়ার কষ্ট সহিবে না কি?"

রাজা বলিলেন,—"আমরা অতঃপর কি করিব, কোথায় যাইব তাহার স্থিরতা নাই। আপনি প্রাচীন হইয়াছেন, আমাদের সহিত কষ্ট না পাইয়া আপনার কাশী যাওয়াই উচিত। আপনার এ সময় সেবা শুশ্রূষার আবশ্যক।"

রায় বাহাদুর বলিলেন,—"সেই জন্যই তো বাবা, আমার এসময় তোমাদের কাছ ছাড়া হওয়া উচিত নহে। তোমরা না করিলে আমার সেবা শুশ্রূষা করিবে কে?"

রাজা বলিলেন,—"তাহার আর সন্দেহ কি? আমি সেই জন্যই বলিতেছি, আপনি চণ্ডী খুড়াকে সঙ্গে লইয়া কাশী চলিয়া যান, আমরা শীঘ্রই সেখানে আপনার সহিত মিলিত হইব।"

রায় বাহাদুর বলিলেন,—"তা অল্প কালের জন্য আগে গিয়া কি করিব? এক সঙ্গেই যাওয়া হইবে।

রাজা বলিলেন,—"আমাদের হয়তো এ দিক ওদিক ঘুরিয়া যাইতে একটু বিলম্ব হইতে পারে। আপনি আগে কাশীতে যাইলে সুবিধা হইত।"

রায় বাহাদুর বলিলেন,—"কেন বাবা, বার বার এক কথা বলিতেছ? আমি সম্পদেও তোমার বিপদেও তোমার, তোমাকে এ সময়ে কোন মতেই আমি ছাড়িয়া যাইব না।"

বিরক্তির আশঙ্কায় রাজা আর কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন না। তিনি ধীরে ধীরে সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রণা।

যে দিন হরকুমার বাবুর সহিত কথাবার্ত্তা হইল, তাহার পর দিন অপরাহ্নে রাজা উমাশঙ্কর অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজার কার্য্যজনিত অনবকাশ এখন আর নাই; তিনি বিষয় কর্ম্মের অবিশ্রান্ত উদ্বেগ ও পরিশ্রম হইতে এখন অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ে এখন অন্যান্য বিবিধ বিষয়ের চিন্তা করিবার অবসর হইয়াছে। এই জন্যই এ অসময়ে তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার সময় পাইয়াছেন।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই ভবসুন্দরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তব জিজ্ঞাসিল,—"বিধুমুখী আক কাশী

গিয়াছেন এবং সেখানে শ্যামলাল বাবুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছে ?"

রাজা জিজ্ঞাসিলেন,—"এ সংবাদ তোমায় কে দিল ?"

ভব বলিল,—"রাণীদিদির পিতা এইরূপ সংবাদ লিখিয়াছেন।"

রাজা বলিলেন,—"এইরূপ সংবাদ আমরাও পাইয়াছি। কিন্তু পরিণামে কি হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। ভবদিদি, তোমাকে আমি আর একটা খবর দিতে পারি। রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাটী মেরামত ঠিক হইয়া গিয়াছে। তিনি গৃহ প্রবেশ করিয়াছেন। তোমার বাটীতে কেহই নাই।

ভব বলিল,—"তাহা হইলে আমার বাটী যাওয়া উচিত। রামচন্দ্রের বাটী হয়ত গরিবের সকল জিনিষই গোল করিয়া ফেলিবেন। কিন্তু এখন যত ক্ষতিই হউক, আমার তো বাড়ী যাওয়া হয় না।"

রাজা জিজ্ঞাসিলেন,—"কেন ?"

ভব বলিল,—"সে অনেক কথা; এখন আপনাকে বলিতে পারিব না। কিছুদিন পরে বলিব।"

রাজা বলিলেন,—"এখন বল বা না বল, তোমাকে তো বাড়ী যাইতেই হইবে। আমরা তো এখানে বেশীদিন থাকিব না। পরের বাড়ীতে কতদিন থাকা চলে ?"

ভব বলিল,—"সেই জন্যই আমার বাড়ী যাওয়া হইবে না। রাণীদিদির সঙ্গে থাকিবে কে ?"

রাজা বলিলেন,—"কেহই থাকিবার দরকার হইবে না। রাণী কখন কোথায় থাকিবেন, স্থির নাই। হয় তো বাপের বাড়ীতেও থাকিতে পারেন। একটা জায়গায় স্থির হইয়া বসার পর তোমাকে সংবাদ লেখা হইবে, তখন তুমি যাইবে।"

ভব মাথা নাড়িয়া অসম্মতির উত্তর দিল। রাজা অগ্রসর হইলেন। এক অবগুণ্ঠনবতী কৃষ্ণকায়া নারী তাঁহার চরণে আসিয়া ঢিপ করিয়া এক প্রণাম করিল। রাজা বলিলেন,—"দাসী দিদি, আজি দাসমহাশয় আসিয়াছেন।"

অবগুণ্ঠনবতী মুখ খুলিলেন না। কিন্তু একটু চঞ্চলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন ?"

রাজা বলিলেন,—"বোধ হয় তোমাকে লইতে।"

দাসী বলিল,—"ছি ছি কি লজ্জা! এখানে এখন এই সময়; আর মিন্সে আমাকে লইতে আসিল। একটুও আক্কেল নাই কি ?"

রাজা বলিলেন,—"তিনি আপনি আইসেন নাই; তাঁহাকে পত্র লিখিয়া আনা হইয়াছে, তোমাকে বাটী যাইতে হইবে। দাস মহাশয়ের অসুবিধা হইতেছে।"

দাসী বলিল,—"তা হউক, আমি এখন যাইতে পারিব না।"

রাজা সে স্থান হইতে প্রকোষ্ঠান্তরে প্রবেশ করিলেন। তথায় রাণী সহাস্য মুখে রাজার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। অন্নপূর্ণা একখানি কার্পাস সাটী পরিধান করিয়াছেন। তাঁহার প্রকোষ্ঠে শাঁখা ও লোহা, সীমান্তে স্থূল সিন্দুরবিন্দু। দেহের আর কুত্রাপি স্বর্ণ হীরকাদি নির্ম্মিত কোন ভূষণ নাই। এই স্বভাব সুন্দরীকে এই বেশে রাজরাজমোহিনীর ন্যায় শোভাময়ী দেখাইতেছে।

রাজা সম্মুখে আসিয়াই বলিলেন,—"রাণি, তোমার ভিক্ষুক স্বামী সম্মুখে উপস্থিত।"

রাণী বলিলেন,—"আমার রাজরাজেশ্বর স্বামী তাঁহার ক্রীতদাসীর মনের ভাব বুঝিয়াই এই অসময়ে দর্শনদানে তাহাকে চরিতার্থ করিয়াছেন।"

রাজা বলিলেন,—"সকল অলঙ্কারই তুমি ত্যাগ করিয়াছ দেখিতেছি।"

রাণী বামহস্তস্থিত লৌহ ভূষণে দক্ষিণ হস্ত প্রদান করিয়া বলিলেন,—"যে ভূষণ আমার হস্তে রহিয়াছে, তাহার মূল্য ব্রহ্মাণ্ডে নাই।"

রাজা বলিলেন,—"তোমাকে এই নিরাভরণ অবস্থায় বড়ই সুন্দর দেখাইতেছে।"

রাণী বলিলেন,—"এখন হইতে এইরূপ সুন্দর সাজিয়া তোমাকে ভুলাইতে হইবে বলিয়া, আজি হইতে এই সজ্জায় সাজিতে আরম্ভ করিয়াছি।"

রাজা বলিলেন,—"তোমার অলঙ্কার সমস্তের প্রায় সকলই এখনও আছে তো অন্নপূর্ণা।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"না থাকিলেই মঙ্গল। আমরা এখন যে অবস্থায় পড়িয়াছি, তাহাতে কি ভাবে কোথায় আমাদের জীপনপাত করিতে হইবে, তাহা বোধ হয় তুমি এখনও স্থির করিয়া উঠিতে পার নাই। যেরূপেই হউক এ অলঙ্কারের বোঝা লইয়া আমাদিগকে নিশ্চয়ই বিব্রত হইতে হইবে। সুতরা এ হেঙ্গামার একটা ব্যবস্থা করিতে পারিলেই ভাল হয়।"

রাণী বলিলেন,—"বোধ হয় সেজন্ত চিন্তা করিতে হইবে না। বসিয়া খরচ করিতে হইলে শীঘ্রই উহা শেষ হইয়া যাইবে।"

রাণী জিজ্ঞাসিলেন,—"আমরা এখানে আর বসিয়া থাকি কেন? সত্য বটে মহারাণী করুণাময়ী দয়া করিয়া আমাদিগকে এখানে যতদিন ইচ্ছা থাকিতে অনুমতি দিয়াছেন। কিন্তু এরূপে আমরা পরের বাড়ীতে অনর্থক থাকি কেন?"

রাজা বলিলেন,—"আর থাকিবার প্রয়োজন নাই। এ সম্বন্ধে তোমার অভিপ্রায় জানিবার জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি।"

রাণী বলিলেন,—"আমার অভিপ্রায়! আমার আবার অভিপ্রায় কি? আমি তোমার ইঙ্গিত পাইবামাত্র খোকাকে ক্রোড়ে লইয়া হাসিতে হাসিতে তোমার অনুসরণ করিব। বনে হউক, বৃক্ষতলে হউক, বা জনশূন্য মরুভূমিতে হউক, তোমার পশ্চাতে যেখানে যাইব সেই খানেই আমার পূর্ণানন্দ। ইহার আবার অভিপ্রায় কি?"

রাজা বলিলেন,—"তথাপি এ প্রস্তাব তোমার নিকট উত্থাপন করিতে আমি নিতান্ত কুণ্ঠিত হইতেছিলাম। তুমি স্বয়ং এ প্রসঙ্গের অবতারণা করায় আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।"

রাণী বলিলেন,—"তবে তোমার কোন কথা আমার নিকট ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইতে হয়? এখনও এই সেবিকার তুমি পরীক্ষা করিতেছ? যাহা তোমার কর্তব্য, যাহা তোমার অবলম্বন, তাহাতে আমার অভিমত হইবে মনে করিলেও, আমার প্রতি অবিচার করা হয় না কি?"

রাজা বলিলেন,—"ঠিক বলিয়াছ অন্নপূর্ণা; বাস্তবিক তোমার ন্যায় গুণবতী সহধর্মিণীর কোন বিষয়ে স্বামীর সহিত মতের অন্যথা ঘটিবে, এরূপ আশঙ্কা করাও অন্যায়। আমি সে কারণে একথা তোমার নিকট উত্থাপন করিতে কুণ্ঠিত হই নাই। এই বিপুল রাজৈশ্বর্য্য, এই বিশাল অট্টালিকা, এই দাস দাসী এ সকল পরিত্যাগ করিতে অনেকের হৃদয়ই ব্যথিত হওয়া অসম্ভব নহে। তোমার হৃদয় পরীক্ষিত

এবং আমার সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত। তথাপি আমার আশঙ্কা হয়, হয় তো এ সকল পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিবার সময় তোমার একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস পড়িলেও পড়িতে পারে।"

রাণী বলিলেন,—"কেন পড়িবে? যদি এইরূপ অবস্থান্তরে আমার অন্তর একটুও ব্যথিত হইবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে আমি তোমাকে অনেকদিন পূর্ব্বেই এ কার্য্য হইতে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতাম; তাহা হইলে আমি প্রথমেই এ কার্য্যে নিরস্ত হইবার জন্ত পরামর্শ প্রদান করিতে অগ্রসর হইতাম; তাহা হইলে আমি কোন না কোন দিন, এ সম্বন্ধে কথোপকথন কালে আমার মনের ক্লেশের কথা তোমাকে না জানাইয়া থাকিতে পারিতাম না। তোমার এই কার্য্যে আমার অসীম আনন্দ জন্মিয়াছে। তবে কেন আমি এজন্ত দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিব?"

রাজা বলিলেন,—"আমি জানি তুচ্ছ ধন-সম্পত্তি বা পার্থিব ভোগ তোমার চিত্তকে আসক্ত করিতে অক্ষম। তথাপি এক্ষণে তোমার মুখে মনের কথা শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।"

রাণী বলিলেন,—"আমার তো সৌভাগ্য উপস্থিত। সৌভাগ্য সমাগমে কে কোথায় দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে?"

রাজা জিজ্ঞাসিলেন,—"সৌভাগ্য কিরূপ?"

রাণী বলিলেন,—"সৌভাগ্য কিরূপ, তাহা কি বুঝাইয়া বলিতে হইবে? আমার সৌভাগ্য অসীম। আমি তোমার চরণে বিক্রীতা দাসী; তোমার সেবা করিতে পাওয়াই আমার ভাগ্য; তোমার পরিচর্য্যা আমার ধর্ম্ম। আমি সে ধর্ম্মসাধনের, সে সৌভাগ্য ভোগের সুযোগ পাই কই? অসংখ্য দাসদাসী আমার কর্ত্তব্য কাড়িয়া লইয়া তোমার সেবা করে। তখন দেখি, বেহারা তোমার পাখা টানিতেছে, তখনই আমার মনে হয়, হায়! আমার কার্য্য পরে করিতেছে কেন? যখন দেখি খানসামা তোমাকে তেল মাখাইতেছে, তখনই আমার মনে হয়, হায়! ঐ শ্রী-অঙ্গে যাহার অধিকার সে কেন তাহার ব্রত পালনে বঞ্চিত হয়? যখন দেখি, ভৃত্য তোমার মাথায় জল ঢালিয়া তোমাকে স্নান করাইতেছে তখনই আমার মনে হয়, হায়! আমার কার্য্য পরে করিতেছে কেন? কত বলিব? সকল দিনই কর্ত্তব্য পালনের অবসর না পাইয়া আমার হৃদয় নীরবে অবসন্ন হয় এবং আমার কার্য্য অনর্থক পর্য্যবসিত হইতেছে বলিয়া আমি আপনাকে ধিক্কার দিতে থাকি। দারিদ্র্যে আমার ভাগ্যোদয় হইল। এখন তোমার সকল কার্য্যই আমাকে করিতে হইবে। এখন তোমায় রাজাগিরির খাতিরে পাঁচজনের সেবা লইতে হইবে না। ইহা কি আমার সামান্ত সৌভাগ্য?"

রাজা একটু হাসিয়া বলিলেন,—"জানি না তোমার অদৃষ্ট কি হইবে। কিন্তু যে তোমাকে পত্নীরূপে লাভ করিয়াছে সে যে পরম ভাগ্যবান্ তাহার সন্দেহ নাই।"

রাণী বলিলেন—"এমন কথা বলিও না। যাহাকে দয়া করিয়া তুমি চরণে স্থান দিয়াছ, সেই ভাগ্যবতীর অগ্রগণ্যা আমার; এখন পূর্ণমাত্রায় ভাগ্যোদয় হইতেছে। ছার বিষয় সম্পত্তির জন্ত আমি আমার প্রাণের দেবতাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিতে পাই নাই। বিষয় কার্য্যে তোমার সকল সময় যায়; দাসী তোমাকে কখন দেখিতে পায় বল? এখন বিষয়ের বন্ধন ঘুচিয়া গেল, এখন সমস্ত দিন তোমাকে দেখিতে পাইবার, দিবা রাত্রি তোমার নিকট থাকিতে পাইবার আশা করিতেছি, ইহা কি আমার সামান্ত সৌভাগ্য!

রাজা বলিলেন,—"বুঝিলাম রাণী"—অন্ন-পূর্ণা বাধা দিয়া বলিলেন,—"দাসী বল। এখন হইতে আমার দাসী হওয়ার সার্থক হইল।"

রাজা বলিলেন,—"তুমি রাণীও নহ, দাসীও নহ। তুমি সম্পদে ও বিপদে আমার কল্যাণময়ী হৃদয়দেবী। সে কথা যাউক। এখন কথা হইতেছে, এখান হইতে প্রস্থান করার উপায় কি?"

"কেন?"

"কেন, তোমার ভব, তোমার দাসী, তোমার আরও আশ্রিতা নারীরা তোমার সঙ্গ ছাড়িবে কি?"

রাণী বলিলেন,—"তাহা ছাড়িবে না। কিন্তু তাহাদের কাহাকেও তো আমাদের দুঃসময় জীবনের সঙ্গিনী করা হইবে না। লুকাইয়া প্রস্থান করিতে হইবে।"

"পারিবে কি?"

"বেশ পারিব। আমি তাহার ব্যবস্থা করিব।"

রাজা বলিলেন,—"বেশ, কিন্তু সুহাসকে না জানাইয়া যাওয়া হইবে কি?"

রাণী বলিলেন,—"কেন হইবে না? এখন সকলকেই না জানাইয়া চলিয়া যাইতে হইবে। তাহার পর একটা স্থানে স্থির হইয়া এবং কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া সকলের সহিত সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিলেই হইবে।"

রাজা জিজ্ঞাসিলেন,—"খোঁকা কোথায়?"

রাণী বলিলেন,—"খোঁকার একটু শরীর খারাপ হইয়াছে। ঠাকুরঝির নিকটে রহিয়াছে।"

রাজা। ব্যস্তভাবে বলিলেন,—"শরীর খারাপ হইয়াছে? এ কথা এতক্ষণ বল নাই কেন?"

রাণী বলিলেন,—"বিশেষ চিন্তার কথা কিছুই নাই। সামান্ত গা গরম হইয়াছে মাত্র।"

রাজা বলিলেন,—"চিন্তার কারণ কোন অবস্থাতেই নাই রাণী। তবে কি জান, যথা সময় চিকিৎসা ও আরোগ্য করিবার ব্যবস্থা করিতে আমরা বাধ্য, তাহাতে বিলম্ব বা ঔদাস্থ ঘটিলে আমাদের ক্রটী হয়। সুহাস এখানে কখন আসিয়াছেন?"

রাণী বলিলেন,—"দুপুরের পর।"

রাজা বলিলেন,—"চল খোঁকাকে দেখিতে যাই।"

উভয়ে প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পুত্রনাশ।

খোঁকা রাজার সামান্ত অসুখ সেই রাত্রিতেই বড় বাড়িয়া উঠিল। সেই রাত্রিতেই রাজা চিকিৎসালয়ের ডাক্তার আনিলেন। তিনি ঔষধাদির ব্যবস্থা করিলেন এবং জ্বর যেন বক্রভাব ধারণ করিবে বলিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করিলেন। ঠিক তাহাই হইল। পরদিন প্রাতে সকলেই বুঝিল, খোঁকা রাজার পীড়া বড়ই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

রায় বাহাদুর বার বার অন্দরে যাতায়াত করিতেছেন এবং ডাক্তার মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিতেছেন। ডাক্তার মহাশয় রাজবাটীতেই রহিয়াছেন এবং অনবরত রোগীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। সুহাস ও অন্নপূর্ণা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পীড়িত বালকের উভয় পার্শ্বে বসিয়াছে। ভব দাসী,

আর বহুসংখ্যক দাস দাসী ঘোর উৎকণ্ঠার সহিত সকল আদেশ পালন করিতেছে।

বেলা এক প্রহরের সময় রায় বাহাদুর ব্যস্তভাবে জীবন বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং বলিলেন,—"রাজপুত্রের কঠিন পীড়া। হুগলী হইতে সাহেব ডাক্তার আনাইতে হইবে। হাঁটিয়া লোক যাইতে বিলম্ব হইবে। ঘোড় সোওয়ার যাওয়া আবশ্যক। একটা ভাল জুড়ীও পশ্চাতে যাওয়ার আবশ্যক। সাহেব তাহাতেই আসিবেন। এজন্য আপনার অনুমতি চাহিতেছি।

জীবন বাবু বলিলেন,—"এজন্য আমার অনুমতি নিষ্প্রয়োজন। সমস্ত সামগ্রী ও দাস দাসী আপনার বলিয়াই ব্যবহার করিতেই মহারাণী মাতা আপনাদিগকে অনুমতি দিয়াছেন। এ সামান্য বিষয়ের জন্য আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসায় নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। আপনি শীঘ্র যান; ডাক্তার আনিতে বিলম্ব না হয়। আমার দ্বারা কোন সাহায্যের সম্ভাবনা থাকিলে আজ্ঞা করিবেন; আমি হাজির আছি।"

রায় বাহাদুর বলিলেন,—"আপনাকে শত ধন্যবাদ। আমি যাই।"

জীবন বাবু সঙ্গে যাইতে যাইতে জিজ্ঞাসিলেন,—"টাকা কড়ির কিরূপ হইতেছে? আবশ্যক হইলে আমি দিতে প্রস্তুত আছি।"

রায় বাহাদুর বলিলেন,—"রাজা কাহার নিকট ধার করিবেন বোধ হয় না। রাণীর কিছু অলঙ্কার আছে। তাহাই বিক্রয় করিয়া খরচ নির্ব্বাহ করা হইবে।"

জীবন বাবু বলিলেন,—"তাহাই হউক, আমার নিবেদন অলঙ্কার বিক্রয় করিবার জন্য বাজারে প্রেরণ না করিয়া আমার নিকট পাঠাইবেন। আমি আপাততঃ আবশ্যক মত টাকা দিব, পরে উচিত মূল্য ধার্য্য করিয়া দেনা পাওনা মিটাইলেই হইবে।"

রায় বাহাদুর বলিলেন,—"অতি উত্তম প্রস্তাব। ইহাতে আমাদের সুবিধা ভিন্ন অসুবিধা নাই।"

রায় বাহাদুর বেগে প্রস্থান করিলেন, জীবন বাবু বার বার যাতায়াত করিয়া সন্ধান ও তত্ত্বাবধারণ করিতে লাগিলেন। অনেক সময়ই তিনি রাজবাটীতে উপস্থিত থাকিতে লাগিলেন এবং বিবিধ শারীরিক পরিশ্রম ও হিতচেষ্টা করিয়া বিপন্ন রাজার উপকার করিতে লাগিলেন। তাঁহার ন্যায় সুশিক্ষিত ও সুদক্ষ ব্যক্তির সহায়তা পাইয়া রাজা ও রায় বাহাদুর বিশেষ প্রীত হইলেন। অলঙ্কার রাখিয়া তাঁহার নিকট হইতে পাঁচ শত টাকা লওয়া হইল। রাজবাটীতে উদ্বেগের সীমা রহিল না।

শঙ্করনাথের মস্তকে খোঁকার আরোগ্য কামনায় বিল্বপত্র প্রদত্ত হইতে লাগিল। সংকল্প করিয়া চণ্ডীপাঠ চলিতে লাগিল; শ্রীধরকে তুলসী প্রদত্ত হইতে লাগিল। কালীমাতার মন্দিরে স্তব পাঠ আরম্ভ হইল, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন নানাপ্রকার আরম্ভ হইল। কেবল যে রাণী রাজ-ভর্ত্তার ব্যবস্থায় এই সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান আরব্ধ হইল এমন নহে। স্থানীয় লোকেরা, আত্মীয় ও অনুগত মানবেরা, নানাদেবতারে নানাপ্রকার মানসিক করিতে লাগিল। সর্ব্বত্র উৎকণ্ঠার সীমা নাই।

কেবল এক ব্যক্তি সংবাদ লইয়া ও মধ্যে মধ্যে শিশুকে দর্শন করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন। রাজা উমাশঙ্করের মুখে বা ব্যবহারে কোনই উৎকণ্ঠার লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইল না। বহুলোক, বিশেষতঃ রায় হরকুমার বাহাদুর ও চিকিৎসকগণ উপস্থিত থাকিয়া শিশুর যত্ন ও শুশ্রূষা

করিতেছেন ; সুতরাং তাঁহার ব্যস্ত বা উৎকণ্ঠিত হইবার কোনই প্রয়োজন নাই। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী রাজা এ সম্বন্ধে একটুও বিচলিত নহে।

হুগলী হইতে ডাক্তার সাহেব প্রতিদিন একবার, কোন কোন দিন দুইবার যাতায়াত করিতেছেন। সেখানকার অন্যান্য বিচক্ষণ ডাক্তারগণও আহুত হইয়া যাতায়াত করিতেছেন।

বাটীতেই ডিস্পেন্সারী বসিল গেল। জীবন বাবু বুঝিলেন, বার বার ডাক্তার খানা হইতে ঔষধ আনিতে বিলম্ব হইতেছে। অতএব প্রয়োজনীয় ঔষধ সমস্ত আনিয়া বাড়ীতেই রাখা উচিত। জীবন বাবুর তত্ত্বাবধানে ঔষধ আনিত হইল এবং প্রেস্ক্রিপ্সন অনুসারে ঔষধ প্রস্তুত হইতে লাগিল। জীবন বাবু অনেক সময় স্বয়ং ঔষধ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তাঁহার ন্যায় বহুবিষয়জ্ঞ ব্যক্তির কার্য্যে সকলেই তুষ্ট হইতে লাগিলেন এবং ডাক্তার সাহেবও তাঁহার প্রস্তুতীকৃত ঔষধ দেখিয়া সুখ্যাতি করিলেন।

জীবন বাবুর নিকট হইতে অলঙ্কার রাখিয়া এক সহস্র টাকা লওয়া হইল। যত্ন ও শুশ্রূষা যতদূর সম্ভব সুপ্রণালী ক্রমে সম্পন্ন হইতে লাগিল। কিন্তু হইলে কি হয়? নবম দিবসে শিশুর পীড়া সাতিশয় বাড়িয়া উঠিল। সকলেই বুঝিল শিশুর জীবন রক্ষার আর কোন আশা নাই। বাহিরে অনেক আত্মীয় ও অনুগত লোক উপস্থিত, জীবন বাবুও সে সঙ্গে ছিলেন। সকলেরই মুখ বিষণ্ণ ও কাতর।

ডাক্তার সাহেব ও অন্যান্য চিকিৎসকেরা অন্তঃপুর সংলগ্ন একটী কক্ষে বসিয়াছিলেন এবং বারংবার শিশুর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন।

ডাক্তারেরা রোগীর পার্শ্বে উপস্থিত। এই সময় রাজা একবার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং রোগীর পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠ হইতে সুহাসিনী ও অন্নপূর্ণাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রাজাকে দেখিবা মাত্র সুহাসিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "দাদা, কি হইবে?"

রাজা বলিলেন,—"ভয় কি দিদি? যাহাই কেন হউক না, তাহাই ধীর ভাবে আমাদের সহ্য করিতে হইবে। তুমি ব্যাকুল হইও না। ইহাতে চিন্তার কোন কারণ নাই। জন্ম মৃত্যু ঈশ্বরের ব্যবস্থা ঈশ্বরের ব্যবস্থায় উপর কথা কহিবে কাহারও সাধ্য আছে কি?"

সুহাসিনী নয়নে অঞ্চল দিয়া অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। উমাশঙ্করের চরণে প্রণাম করিয়া রাণী বলিলেন,—"আমার ভগবান্ এই আশীর্ব্বাদ কর যেন, তোমার চরণ চিন্তা করিয়া আমি এই আঘাত সহ্য করিতে পারি।"

রাজা বলিলেন,—"এ জগৎ পরীক্ষাস্থল, এ কথা ভুলিও না অন্নপূর্ণা। সকল আঘাতই সহনীয়। সহ্য করাই মনুষ্যগণের পরীক্ষা। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, এ সামান্য আঘাত তুমি অনায়াসেই সহ্য করিতে পারিবে। এখন যাও তোমরা, কর্ত্তব্য পালনে কোন ত্রুটি না হয়।"

সুহাস ও অন্নপূর্ণা শিশুর নিকট গমন করিলেন। রাজা বাহিরে চলিয়া আসিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তারগণও বাহিরে চলিয়া আসিলেন এবং হরকুমার বাহাদুরকে ও জীবকৃষ্ণ বাবুকে ডাকিয়া বলিলেন, "শিশুর জীবনের আর কোন আশা নাই। আমরা চেষ্টার ত্রুটী করিলাম না। কিন্তু দুঃখের বিষয় সকলই বৃথা হইল। বোধ হয় আর দশ মিনিটের মধ্যেই জীবন শেষ হইবে।"

ডাক্তারেরা বিদায় গ্রহণ করিলেন। তখন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। এই কঠোর সংবাদ জানাইবার নিমিত্ত রায় বাহাদুর নিতান্ত কাতরভাবে রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা তখন একখানি নূতন ইংরাজি পুস্তক লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিলেন। ইংলণ্ডে সম্প্রতি "সেক্সপীয়রের নাটকাবলীর একখানি বহু অত্যুৎকৃষ্ট চিত্র সমন্বিত নূতন সংস্করণ বাহির হইয়াছে। সেই পুস্তকের একখণ্ড কলিকাতার এক দোকান হইতে প্রেরিত হইয়া অদ্য রাজার নিকট আসিয়াছে। রাজা সযত্নে তাহার চিত্রগুলি দেখিতে ছিলেন। এইরূপ সময়ে রায় বাহাদুর তাঁহার নিকটস্থ হইয়া এই কঠোর সংবাদ শুনাইলেন। রাজা ধীরভাবে সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন,—"আপনাকে কাতর বলিয়া বোধ হইতেছে। এ সামান্য ঘটনায় আপনি বিচলিত হইলে আমরা কাহার শরণাগত হইব?"

রায় বাহাদুর বলিলেন,—"কাতরতা অপরিহার্য্য। কিন্তু তাই বলিয়া আমি কার্য্যে অশক্ত নহি। এক্ষণে তুমি আর কিছু বলিতে চাহ কি?"

রাজা বলিলেন,—"মৃত্যুর পরেই যাহাতে শব গৃহ হইতে নির্গত করা হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখুন। শবের মরণান্ত ক্রিয়া যাহারা সম্পন্ন করিতে পারিবে, এরূপ লোক এই সময়ে স্থির করিয়া রাখুন।"

"আর কিছু তুমি বলিবে কি?"

রাজা বলিলেন,—"বোধহয় শব বাহির করিতে আপনাকে একটু কষ্ট পাইতে হইবে। আমি সে সময় উপস্থিত থাকিলে সুহাস ও অন্নপূর্ণা সহজেই ছেলে ছাড়িয়া দিবেন বোধ হয়। আবশ্যক হইলে সে সময় আমাকে সংবাদ দিবেন।"

জীবনকৃষ্ণ বাবু বলিলেন,—"রায় বাহাদুর মহাশয়, আপনি কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। আপনাদের কাহারও কিছুই করিতে হইবে না। আমি সকল কার্য্য সম্পন্ন করিব।"

রায় বাহাদুর বলিলেন,—"জীবন বাবু এ দুঃসময়ে নানাপ্রকারে আমাদের বিস্তর উপকার করিতেছেন।"

রাজা বলিলেন,—"আমি চিরদিন আপনার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।"

রায় বাহাদুর ভবন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাহার অল্পক্ষণ পরেই অন্তঃপুর হইতে তুমুল ক্রন্দন ধ্বনি উত্থিত হইল। জীবনকৃষ্ণ বাবু কাহারও অনুমতি গ্রহণ না করিয়াই পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। নবীনকৃষ্ণ, চণ্ডীচরণ প্রভৃতি আরও কোন কোন লোক অন্তঃপুরাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

সকলেই দেখিলেন,—সকলই শেষ হইয়াছে। সেই ক্ষুদ্র দীপ নিভিয়া গিয়াছে। সেই অপাপ শিশু জীবন বিহীন হইয়াছে। সেই ক্ষুদ্র কোরক শুষ্ক হইয়াছে। তথায় ক্রন্দন কোলাহলের সীমা নাই।

অন্নপূর্ণা ও সুহাসকে ধরিয়া ভব ও দাসী প্রভৃতি স্থানান্তরে লইয়া গিয়াছে। সেই প্রফুল্ল কুসুম তুল্য সুকুমার-কায় জীবনহীন শিশু একাকী শয্যায় নিপতিত। অদূরে হরকুমার বাহাদুর চিত্রার্পিত পুত্তলীর ন্যায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান। বেগে জীবনকৃষ্ণ বাবু সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাহার পর সেই শবশিশু বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া অঙ্কে ধারণ করিলেন। এবং বেগে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আনুরক্তি।

সকলই শেষ হইয়া গিয়াছে। চারিদিন হইল রাজা উমাশঙ্কর একমাত্র পুত্র হারাইয়াছেন। জীবন বাবু মৃত শিশুর মরণান্তর ক্রিয়া শেষ করিয়াছেন। রাজার মুখে একটু বিষাদের চিহ্নও নাই। রায় বাহাদুরের হৃদয় অতিশয় কাতর হইয়াছে, ইহা তাঁহাকে দেখিলেই বুঝা যাইতেছে।

সুহাসিনী শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন। নবীনকৃষ্ণ তাঁহাকে নিজালয়ে লইয়া গিয়াছেন। রাজা প্রতিদিন বার বার তথায় গমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেছেন, তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিতেছেন।

প্রাতে রাজা উমাশঙ্কর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং গম্ভীর অথচ প্রসন্ন বদনে রাণীর সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। রাণী তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"আর কেন? এ বাটীতে আর থাকি কেন? সকলই তো ফুরাইল, এখন চল, আমরা যেখানে খুসি যাই।"

রাজা বলিলেন,—"তাহাই যাইব। তুমি দেবী। তুমি তো জান, মৃত্যু নাই। তোমার শিশুকে তুমি আবার পাইবে।"

রাণী বলিলেন,—"যাহা যায় তাহা আর আইসে না। যাহা গিয়াছে তাহার আশা এ জীবনে আর নাই। আমার সকলই গিয়াছে, সকলই যাউক, তাহাতে ক্ষতিবোধ করি না। সুখে বা দুঃখে, সম্পদে বা বিপদে তোমার চরণ আমার সম্মুখে থাকিলেও আমার সকলই আছে। এক্ষণে এ স্থানে থাকিতে আমার বড়ই যন্ত্রণা বোধ হইতেছে। যখন এখানে আর থাকা হইবে না, তখন আর বিলম্বে কাজ কি?

রাজা বলিলেন,—"আর বিলম্ব করিব না। শীঘ্রই এ স্থান হইতে প্রস্থান করিব। সুহাসিনী বাটী গিয়াছেন, এ একটা সুবিধা হইয়াছে। আর সকলের নিকট হইতে পালাইবার ব্যবস্থা তুমি করিয়া রাখিবে বলিয়াছ।"

রাণী বলিলেন,—"তাহার ব্যবস্থা আমি স্থির করিয়া রাখিয়াছি। তুমি কেবল এই অলঙ্কারের বোঝাগুলোর একটা ব্যবস্থা করিয়া ফেল।"

রাজা বলিলেন,—"তাহারও ব্যবস্থা করিতেছি, এখন আমি যাই আবার শীঘ্র আসিব।"

রাজা প্রস্থান করিলেন। অশ্রুসিক্ত নয়নে সজীব বিষাদমূর্ত্তি রাণী অন্নপূর্ণা তাঁহার সেই দোলনটিকে দর্শন করিতে লাগিলেন। তাহার পর সেই স্থানে বসিয়া পড়িয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন,—"খোকা—সোণার খোকা আমার, আমার এত সুখে কণ্টক দিয়ে তুই কোথা গেলি বাবা?

তখনই দাসী, দাসী এবং আরও অনেকে আসিয়া রাণীকে স্থানান্তরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

রাজা উমাশঙ্কর বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, সে স্থানে অনেক আত্মীয় স্বজন বসিয়া আছেন। নবীনকৃষ্ণ, রায় বাহাদুর, চণ্ডীচরণ, রাম হরি, এবং ঠাকুর বাড়ীর পূজারি রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রভৃতি অনেক লোক তথায় বসিয়া আছেন।

রাজা আসিবামাত্র অনেকেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা সকলকে সবিনয়ে বসিতে বলিয়া স্বয়ং ব্যস্ততাসহ একখানি আসনে উপ-

বেশন করিলেন। সেই সময় রাজার নামের ডাকের চিঠী এবং খবরের কাগজ প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইল। একখানি পত্র বড় এনভেলাপের মধ্যবর্ত্তী এবং গবর্ণমেণ্টের মোহরাঙ্কিত। রাজা সেইখানি অগ্রে পাঠ করিলা ঈষৎ হাস্যের সহিত তাহা রায়বাহাদুরের হস্তে অর্পণ করিলেন।

রাজার বর্ত্তমান অবস্থাঘটিত বিপর্য্যয় আলোচনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহার নিকট দুইটী প্রস্তাব করিয়াছেন। হয় রাজা কোন একটা রাজকর্ম্ম গ্রহণ করুন, না হয় মাসিক আড়াই শত টাকা হিসাবে পেন্সন গ্রহণ করুন। রায় বাহাদুর পত্র পাঠ করিয়া তাহা রাজার হস্তে প্রদান করিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন,—"কি করিবে স্থির করিতেছ?"

রাজা বলিলেন,—"আমি কোন রাজকর্ম্ম করিয়া পুরস্কার ভাজন হই নাই; সুতরাং পেন্সন গ্রহণে আমার কোন অধিকার নাই। রাজকর্ম্ম করিতে আমার সাধ্য নাই। আমার সময়মত নানা প্রকার কর্ত্তব্য সাধন করিবার চেষ্টায় জীবনকে নিয়োজিত রাখিতে হইবে। কোন কর্ম্মের অধীনতায় নিযুক্ত হইলে সে স্বাধীনতা থাকিবে না। সুতরাং চাকরি করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি বিনীত ভাবে অশেষ ধন্যবাদ দিয়া উভয় প্রস্তাবেই অসম্মতি প্রকাশ করিব।"

রায় বাহাদুর বলিলেন,—"তাহা হইলে এখন কি করিবে স্থির করিতেছ?

রাজা বলিলেন,—"অতি উত্তম কথা আপনি উত্থাপন করিয়াছেন। আমি এখন কি করিব, তাহা আপনাদিগের নিকট নিবেদন করা আবশ্যক। এখানে আমার অনেক হিতৈষী আত্মীয় উপস্থিত আছেন। এই সময়েই কথাটা বলা ভাল। আমি আপনাদের সকলের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিতেছি, আপনারা প্রসন্ন মনে আমাকে বিদায় দিউন। আমি এস্থান হইতে প্রস্থান করিব।"

সকলে নীরব। কাহারও কথা কহিতে সাহস নাই। আজি রাজার বাক্য শুনিয়া সকলের হৃদয় যেরূপ শঙ্কিত ও কাতর হইল, রাজপুত্রের মৃত্যুতে অথবা রাজা সর্ব্বস্বান্ত হওয়াতে কাহারও হৃদয় এরূপ ব্যথিত হয় নাই।

এক ব্যক্তি বালকের ন্যায় রোদন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তার পর?" সেই ব্যক্তি চণ্ডীচরণ।

রাজা বলিলেন,—"চণ্ডীখুড়া, আপনি কাতর হইতেছেন কেন? এখানে পরের বাড়ীতে থাকা উচিত নয়। আমাকে কাজেই চলিয়া যাইতে হইবে। আর আমার যে অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে এত বড় বাড়ীতে থাকাও আর ভাল দেখায় না। আরও দেখুন, আমার স্ত্রী বকাপাতের কোন উপায় নাই। এখানে বসিয়া থাকিলে তাহার কি উপায় হইবে। সেজন্য চেষ্টা করিতে হইবে। কাজেই আমার চলিয়া যাওয়া ভিন্ন আর উপায় কি আছে?"

চণ্ডীচরণ জিজ্ঞাসিলেন,—"সঙ্গে থাকিবে কে কে?"

রাজা বলিলেন,—সঙ্গে থাকিবেন না। যাহার আপনার উদরান্নের সংস্থান নাই, তাহার সঙ্গে পাঁচজন লোক থাকিবে কিরূপ? সঙ্গে আমার স্ত্রী থাকিবেন। আর একজন সঙ্গে থাকা আবশ্যক হইত—ভগবান্ তাহাকে আপনার সঙ্গে লইয়া আমার ভার লঘব করিয়াছেন।"

সকলেই অধোমুখে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। নবীনকৃষ্ণ বলিলেন,—"রাজা তুমি জ্ঞানবান্ ও বুদ্ধিমান। আমি তোমার প্রস্তাবের কোন মর্ম্মই বুঝিতে পারিতেছি না।

এ বাটীতে থাকা অসম্ভব হয়, তুমি তোমার ভগ্নীর বাটীতে গিয়া বাস করিবে। সে বাটি কি তোমার নহে ভাই ?”

রাজা বলিলেন, আপনি আমার ভগ্নীপতি, আপনার বাটীতে বাস করায় আমার কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু দাদা, আমাকে স্বাধীন ভাবে জীবিকাপাত করার উপায় করিতে হইবে। এখানে থাকিয়া তাহার সুবিধা হইবে না।

নবানকৃষ্ণ বলিলেন,—“কেন সুবিধা হইবে না ? তুমি যে কাজ করিতে ইচ্ছা কর, এখানেই তাহা কর না কেন ?

রাজা বলিলেন,—“আমি বলিষ্ঠ সুপটু যুবা পুরুষ। আমি কাহারও অনুগ্রহ হইয়া গ্রাসাচ্ছাদন গ্রহণ করিলে অধর্ম্মে পতিত হইব। শারীরিক শ্রম করিয়া আমি জীবিকা অর্জ্জন করিব। কাহারও দাসত্ব আমি করিব না। কিন্তু অর্থ বা পারিশ্রমিক লইয়া আমি লোকের কাজ করিব। আমি কাষ্ঠাহরণ করিয়া বিক্রয় করিব, আমি কৃষকের ভূমি কর্ষণ করিয়া দিব, আমি কাষ্ঠ ছেদন করিব, আমি ক্রিয়া বাড়ীতে পাক করিব, আমি লোকের ভার বহন করিব ইত্যাদি বহুবিধ উপায়ে জীবিকা সংগ্রহ করিব। এখানে থাকিয়া আমি সে সকল কাজ করিবার সুযোগ পাইব না এবং স্বকীয় শ্রমে আপনার পরিবার পালন ও দেহ রক্ষারূপ পুণ্যানুষ্ঠান করিবার সুবিধা আমার হইবে না।”

রামহরি চাষা দূরে মাটির উপরে বসিয়া ছিল। সে অগ্রসর হইয়া রাজার একটু নিকটে আসিল এবং একটা প্রণাম করিয়া রায় বাহাদুরকে বলিল—“বাবা ঠাকুর তোমাদের টাকায় আমি তো বড় মানুষ। আমার বিশ গোলা ধান, আর কতই গরু বাছুর। এ বৎসর আবার পাঁচ গোলা ধান বাড়িবে। রাজা কিনা আমরা থাকিতে পেটের দায়ে জন খাটিবে ? পোড়া কপাল আমাদের। আমরা তা হলে ঘরে দুয়ারে আগুন দিয়া বিবাগী হইব। তোমার পায়ের ধূলা পাইলে লোকের কপাল ফিরিয়া যায়, তুমি কি না মোট বহিয়া খাইবে রাজা। তুমি রাজটার মত বসিয়া থাক। আর আমার গোলায় যে ধান আছে তাহাই খাও।”

অনেকের চক্ষুতে জল আসিল। রাজা বলিলেন,—“রামহরি আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার আরও অনেক ধান হইবে, অনেক গরু বাছুর হইবে। কিন্তু দাদা তুমি বুঝিয়া দেখ, অক্ষম না হইলে কাহাকেও বসিয়া খাইতে নাই। এখন আমার শ্রম করিবার সামর্থ্য আছে, আমি কেন এখন বসিয়া থাকিব ? যখন কোন উপায় না হইবে তখন আমি অবশ্যই তোমার ধান খাইব তাহাতে আমার একটুও লজ্জা বা অপমান নাই। তুমি আজই দাসীদিদিকে লইয়া বাড়ী যাও।”

রামহরি বলিল,—“তোমরা তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য আমাকে খবর পাঠাইয়াছিলে, তাই আমি আসিয়াছি। এখানে আসিয়া তোমাদের এই সকল অবস্থার কথা জানিতে পারিলাম। এখন আমি আমার স্ত্রী লইয়া যাইব কেন ? তোমাদের এখন চাকর চাকরাণী নাই, আর এই শোক তাপের সময়। তোমরা তাড়াইয়া দিলেও সেও যাইবে না, আমিও যাইব না।”

রাজা বলিলেন আমি এখন যাইব বটে, কিন্তু শীঘ্রই তোমাদের সহিত আবার দেখা হইবে। আমার জন্য কোন চিন্তা করিও না।”

একজন ব্রাহ্মণ বলিলেন,—“ধর্ম্মাবতার

আমি সামান্য ব্যক্তি; হুজুরের ঠাকুর বাড়ীর আমি পূজারি। আমি একটা কথা বলি? ঠাকুরবাড়ীতে প্রতিদিন পঞ্চাশ জন লোক খায়। সে তো রাজারই খরচ। আপনি পেটের জন্য পরিশ্রম করিতে যাইবেন, এ কষ্টের কথা শুনিলে প্রাণ ফাটিয়া যায়। ঠাকুরবাড়ীর প্রসাদ হুজুর নিত্য ভোজন করিবেন, তাহাতে ক্ষতি কি আছে?’

রাজা বলিলেন,—“আপনি বড় সৌভাগ্যের কথাই বলিয়াছেন। নিত্য প্রসাদ ভোজন বড়ই পুণ্যের কথা। কিন্তু যে প্রসাদ তথায় প্রস্তুত হয়, তাহা পরে পাইবে মনে করিয়াই প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং তাহা আমরাই গ্রহণ করিলে পরের ভাগ কাড়িয়া লওয়া হয়। ইহাকে দত্তাপহারী বলে। কেন আমার জন্য আপনারা চিন্তাকুল হইতেছেন। শ্রম করিয়া জীবিকা প্রাপ্ত করিতে সকলেই বাধ্য। শ্রমে কোন লজ্জা নাই, কোন অপমান নাই। বরং তাহাতে গৌরব আছে।”

জরিফ কোচমান বাহিরে দাড়াইয়াছিল। সে সেলাম করিয়া বলিল,—হুজুর এ গোলাম ছেলেবেলা হইতে আপনার নিমক খাইয়াছে। আমার শরীরে যথেষ্ট বল আছে। আর কিছু আমার নাই। গোলাম খাটিয়া আনিবে রোজগার করিবে। আমার আর কেহই নাই। যাহা পাইব তাহা হুজুরের চরণে দিব। হুজুরের খরচ বোধ হয় এ গোলাম খাটিয়া করিতে পারিবে।”

রাজা বলিলেন, তুমি বড় ভাল লোক জরিফ। আমি অক্ষম হইলে নিশ্চয়ই আমাকে আর কাহারও সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু এখন আমি সক্ষম, আমাকে মাপ করিবে, এখন তোমাদের পরিশ্রম করাইয়া খাইলে আমার পাপ হইবে।”

চণ্ডী বলিল,—আমি কিছু বুঝিতে পরিতেছি না। রাজা বাহাদুরী এমন সর্ব্বনাশের কল উত্থাপন করিয়াছেন, আর রায়বাহাদুর দাদা, তুমি একটিও কথা কহিতেছ না কেন? তুমি ব্যবস্থা না করিলে আমাদের এ বিপদের কোনই উদ্ধার দেখিতেছি না।”

রায় বাহাদুর বলিলেন,—“আমি বিশেষ গোলের কথা দেখিতেছি না। আমি যাবজ্জীবন এই সংসারের কর্ম্ম করিয়াছি। এই সংসার হইতে প্রায় এক লক্ষ টাকা আমি সঞ্চয় করিয়াছি। রাজা আমার পুত্রাধিক। পিতা সাহায্য পুত্র গ্রহণ করিতে বাধ্য। আমি আমার সেই সমস্ত টাকা রাজাকে দিব। রাজা রাণী লইয়া একস্থানে বাস করুন।”

চণ্ডীচরণ বলিলেন,—“হরি হরি বল ভাই। রায়বাহাদুরের মত সুব্যবস্থা করিতে দুনিয়ার আর কেহ জানে না। রায় বাহাদুর দাদা, তুমি দাদা না হইলে আমি তোমাকে চিরজীবী হও বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতাম। তা দাদা, তুমি আমি আমরা সব রাজার কাছে থাকিতে পাইব তো?”

রায় বাহাদুর বলিলেন অবশ্য পাইব। রাজা যেখানে যে অবস্থায় কেন থাকুন না, আমরা তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিব না।”

চণ্ডী বলিলেন,—“বেশ কথা। একথার পর রাজা মুটিয়ার জামাই হইতেই চাহেন, আর কাঠকুড়ানীকে শাশুড়ী বলিয়া ডাকুন, আমাদের তাহাতে আপত্তি নাই। মা অন্নপূর্ণা আর বাবা উমাশঙ্করের আশ্রয়ে আমরা নিশ্চয়ই থাকিব।”

রাজা বলিলেন,—“খুড়া মহাশয় আপনি যে অর্থ-সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা এই সংসারেরই অর্থ। তাহা গ্রহণ করিলে আমার দত্তাপহারী পাপ হইবে না কি? আমি তাহা

লইতে পারিব না। আপনি বলিতেছেন, পিতার সম্পত্তি পুত্র গ্রহণ করিতে পারে। আপনি যে আমার পিতৃবৎ পূজনীয় তাহার কোনই সন্দেহ নাই? আমি যে আপনার সন্তানাধিক স্নেহাস্পদ তাহারও সন্দেহ নাই। আপনার কৃপার সীমা নাই। কিন্তু খুড়া মহাশয় আপনি বৃদ্ধ পিতা, আমি যুবা পুত্র। এ সময়ে আপনাকে প্রতিপালন করাই আমার ধর্ম্ম। আপনার দ্বারা প্রতিপালিত হইলে আমার অধর্ম্ম হইবে। আমি সবিনয়ে আপনাদের সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমি নানা কার্য্যে নানা সময়ে হয় তো নানা জনের নিকট অপরাধী হইয়াছি। আমাকে সকলে ক্ষমা করিবেন, ইহাই আমার প্রার্থনা। আর আমি কি বলিব? আমার সহিত সকলেরই আবার সাক্ষাৎ হইবে। আমি কোথায় যাইব, কি করিব, তাহা আপনারা অবশ্যই জানিতে পারিবেন। এখনও আমি কিছু স্থির করিতে পারি নাই।

কেহ কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বে বাহিরে একটা তুমুল কলরব উপস্থিত হইল। রাজা রায় বাহাদুর প্রভৃতি তাবতেই এই ব্যাপারের কারণ অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত বাহিরে আসিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ভক্ত।

রাজা প্রভৃতি সকলে বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দেখিলেন, রাজবাটীর সম্মুখস্থ বিশাল অঙ্গন লোক-পূর্ণ। অসংখ্য মানব অঙ্গন সম্মুখস্থ পথ অধিকার করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে এবং অনেক চতুর্দ্দিগাগত পথ বহিয়া জনস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। সেই জনসমূহ অনবরত চীৎকার করিতেছে,—"কই আমাদের রাজা কই?"

বহু কণ্ঠ হইতে এই শব্দ উত্থিত হইয়া তথায় একবিষম কোলাহলের সৃষ্টি করিয়াছে। রাজা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলে সেই অগণ্য কণ্ঠে আবার শব্দ হইল,—"ঐ রাজা—ঐ আমাদের রাজা!"

সকলের মুখে আনন্দ প্রকটিত হইল, সকলেই সাগ্রহে বারান্দার অভিমুখে দৃষ্টিপাত করিল।

রাজা চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"তোমরা কেন আসিয়াছ? আমাকে কি বলিতে চাহ?"

বহু কণ্ঠ হইতে বহু বাক্য নিঃসৃত হইল। কিছুই বোধগম্য হইল না, কেবল একটা বিষম কলরব শ্রুত হইল।

রাজা বলিলেন,—"এরূপ করিয়া বলিলে আমি কিছুই বুঝিতে পারিব না, তোমরা এক জনকে কথা কহিবার ভার দাও।"

বহুক্ষণে বহু যত্নে সেই লোকেরা প্রকৃতিস্থ হইল। তখন এক ব্যক্তি বক্তব্য প্রকাশ করিবার নিমিত্ত একটা লোহার বেঞ্চের উপর দণ্ডায়মান হইল। সে ব্যক্তি প্রবীণ ও বাক্‌পটু। বেঞ্চের উপর উঠিয়া বক্তা বলিল,—"আমাদের রাজা, আমরা আপনার দীন প্রজা। আপনার নিকট আমাদের প্রাণের দুঃখের কথা নিবেদন করিব বলিয়া নানা স্থান হইতে আমরা আজি এখানে মিলিত হইয়াছি।"

রাজা বাধা দিয়া বলিলেন,—"তোমরা শুন নাই কি, আমি এখন সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি।

পূর্ব্বে যে সকল জমিদারী আমার ছিল, তাহা এক্ষণে চন্দ্রমালার প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী করুণময়ী মাতার হইয়াছে। তোমাদের বড়ই সৌভাগ্য যে তোমরা পুণ্যবতী দীনজননী দেবীর প্রজা হইয়াছ। জমিদারী সংক্রান্ত কোন কথা বলিতে হইলে, তোমাদের এখন সেই মহারাণী মাতাকে অথবা তাঁহার সুযোগ্য ও পরম ধার্ম্মিক দেওয়ান জীবনকৃষ্ণ বসুকে জানান উচিত। দেওয়ানজি এখানেই থাকেন, ঐ কাছারি বাটীতে তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে।"

বক্তা বলিল,—"আমাদের কথা আমাদের রাজার চরণেই জানাইতে হইবে। আমরা মাসাবধি কাল অশেষ চেষ্টায় নানা স্থানের লোক একত্রিত হইয়া এক স্থানে মিলিয়াছি। আমরা বলিতে জানি না, মনের কথা কেমন করিয়া প্রকাশ করিলে ভাল হয়, তাহা বুঝি না। তথাপি কৃপা করিয়া আমাদের কথা আপনার শুনিতে হইবে।

রাজা বলিলেন,—"বলুন আপনি। আপনার কথা আমি অবশ্যই শুনিব, আমি অক্ষম দরিদ্র হইলেও, আমার দ্বারা আপনাদের যে বিষয়ের যে উপকার হইতে পারে, সাধ্যমত তাহার ত্রুটি করিব না।"

বক্তা বলিল,—"আমরা জ্ঞাত আছি, আপনার বিষয়-সম্পত্তি হাত ছাড়া হইয়া গিয়াছে। আপনার বাড়ী ঘর, হাতী ঘোড়া সকলই গিয়াছে। কি জন্য আপনার সকল সম্পত্তি গেল তাহাও আমরা জানি। দেশের লোককে বাঁচাইতে গিয়া আমাদের রাজা কাঙ্গাল হইয়াছেন। ইহার উপর ভগবানের নিগ্রহে রাজার এক মাত্র পুত্রও ছাড়িয়া গিয়াছেন। এ দুঃখে আমরা সকলে কিরূপ কষ্ট বোধ করিয়াছি তাহা এক্ষণে প্রকাশ করিতে আমাদের সাধ্য নাই।"

রাজা বলিলেন,—ভাই সব, তোমরা সকলে আমাকে ভাল বাস, এ জন্য আমার কষ্ট হইয়াছে ভাবিয়া তোমরাও কষ্ট বোধ করিয়াছ। কিন্তু ভাই, তোমরা নিশ্চয় জানিবে, যে সকল ঘটনা তোমরা উল্লেখ করিলে তাহার কিছুতেই আমার কষ্ট হয় নাই। বিষয় সম্পত্তির অভাব হইলেই যে মনুষ্যের সর্ব্বনাশ হয়, এরূপ কোন কথা আমি মনে করি না। কতকগুলা বিষয় সম্পত্তি থাকিলেই যে মনুষ্য সুখী হয় তাহাও আমি মনে করি না। এ জগতে সকলেই শ্রম করিয়া খাইবে, ইহাই ভগবানের নিয়ম। তোমরা শ্রম করিয়া জীবন পাত কর। আমারও হাত পা আছে, আমিও শ্রম করিয়া জীবন যাপন করিব, ইহাতে ক্ষতি কি আছে ভাই। আর আমার পুত্রের মৃত্যু স্মরণ করিয়া তোমরা দুঃখ করিও না। আমাদের সকলেরই এক দিন মৃত্যু হইবে। ইহার দশ দিন অগ্র পশ্চাতে কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। যাহাকে আমরা আজি আমার আমার করিয়া মরিতেছি, আমরা এক দিন তাহাকে ছাড়িব, অথবা সে আমাদিগকে ছাড়িবে। ইহাই নিশ্চত ব্যবস্থা। তবে কেন এ জন্য চিন্তাকুল হইয়া মনুষ্য কষ্ট পায়? আমার পুত্রের মৃত্যু হেতু আমি একটুও কাতর হই নাই ভাই।"

বক্তা বলিল,—"আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধি মনুষ্য। আমরা এজন্য বড়ই কষ্ট অনুভব করিয়াছি। কিন্তু আমরা এক্ষণে যে কথা নিবেদন করিব বলিয়া রাজার চরণে উপস্থিত হইয়াছি, তাহা বলিতেছি। আমরা শুনিয়াছি আপনি এ স্থানে আর থাকিবেন না। এ কথা শুনিয়া

আমাদের প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে। আপনি আপনাদের পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু সকলই। আমরা আপনাকে দেবতা বলিয়া ভক্তি করি। আপনি চলিয়া গেলে আমাদের জীবন ধারণ বৃথা হইবে।”

রাজা বলিলেন,—“আমি জানি তোমরা আমাকে বড় ভালবাস। আমার জন্য তোমাদের কষ্ট হইবে সন্দেহ কি? কিন্তু ভাই সব তোমাদের জন্যও আমার বিশেষ কষ্ট হইবে। কিন্তু কি হইবে ভাই, এ অবস্থায় এ স্থানে আমার আর থাকিবার কোনই উপায় নাই।”

বক্তা বলিল,—“কেন উপায় নাই? রাজা আমরা আপনার দাস। এই দাসেরা আপনাকে রাজরাজেশ্বর করিয়া রাখিবে। যে খাজনা আমরা দিয়া থাকি, তাহা আমরা নূতন জমিদারকে দিব। ঠিক সেই খাজনা আবার আমাদের রাজার কাছারিতেও দাখিল করিব। আমাদের রাজা যাহা ছিলেন, তাহাই থাকিবেন। এই পরামর্শ করিয়া আমরা নানা স্থানের লোক মিলিয়া আজি রাজার সম্মুখে আসিয়াছি, এক্ষণে রাজার অনুকূল আদেশ শুনিতে পাইলে আমরা চরিতার্থ হই।”

রাজা একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—“ভাই সব, তোমরা আমাকে এত ভালবাস ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। তোমাদের প্রস্তাব অতি মহৎ ও আমার হিতকর, কিন্তু ভাই সব, তোমরা কিছু মনে করিও না। আমি দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, তোমাদের প্রস্তাবে সম্মত হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নহে। আমি অকারণ তোমাদের অর্থ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না, সেরূপ অর্থ গ্রহণে আমার কোন অধিকার নাই। আমি তোমাদের সকলের জন্য মঙ্গল কামনা করিতেছি। তোমরা ভাগ্যক্রমে যাঁহার প্রজা হইয়াছ তিনি স্বর্গের দেবী। তোমরা তাঁহার অধীনে পরম সুখে থাকিবে সন্দেহ নাই।

বক্তা বলিলেন,—“তাহা আমরা শুনিয়াছি। কিন্তু আমাদের রাজার কাছে আমরা থাকিতে চাহি; আমাদের রাজাকে দেখিতে চাই; আমাদের রাজার আমরা সেবা চাহি। আমাদের এ সকল প্রার্থনা সিদ্ধির উপায় কি?

রাজা বলিলেন,—“অবশ্যই তোমাদের সহিত আমার আবার সাক্ষাৎ হইবে. অবশ্যই তোমাদের নিকটে আমি কখন কখন আসিব, আর যেখানেই থাকিব, নিশ্চয়ই তোমাদের কথা আমি ভাবিব। ভাই সব, এখন বেলা অনেক হইয়াছে, তোমাদিগকে আজি এখানে আহার করিতে হইবে। এখন তোমরা সুস্থির হও, তাহার পর সময়ান্তরে সাক্ষাৎ হইলে ও সুবিধা হইলে, এ সকল পরামর্শ হইবে।”

বক্তা বলিল,—“আমরা যত লোক আসিয়াছি প্রত্যেকে এক টাকা হিসাবে রাজার জন্য নজর আনিয়াছি। আমরা এক্ষণে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক আসিয়াছি, রাজা আজ্ঞা করুন, আমরা সে টাকা রাজ-চরণে সমর্পণ করি।”

সকলেই টাকা বাহির করিল। রাজা বলিল,—“ভাই সব, তোমাদের নিকট নজর লইতে আমার আর অধিকার নাই। আমি আর তোমাদের জমিদার নহি। তোমাদের যিনি জমিদার তিনিই নজর পাইবেন।”

বক্তা বলিল,—“নজর যদি না লন, তাহা হইলে, প্রণামী বলিয়া আমরা টাকা দিব। আপনি ব্রাহ্মণ, পরম ধার্ম্মিক, আমাদের মহোপকারী মহাত্মা। আমরা আপনাকে একটা করিয়া টাকা দিয়া প্রণাম করিব। আমরা অবাধ্য সন্তান, আমরা আপনার

নিষেধ শুনিব না। আমরা টাকা দিয়া প্রণাম করিতেছি। তিন মাস অন্তর আমরা রাজ চরণে এইরূপে প্রণাম করিতে আসিব।”

বক্তা প্রথমেই বিনীত প্রণাম সহকারে নীচের বারান্দায় একটী টাকা ফেলিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে বর্ষার ধারার ন্যায় টাকা সেই স্থানে বর্ষিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বারান্দায় স্তূপাকার টাকা জমিয়া গেল।

রাজা বলিলেন,—“ভাই সব, তোমরা দুঃখিত হইও না। আমি তোমাদের টাকা স্পর্শও করিব না। প্রণামী গ্রহণ আমার ব্যবসা নহে; প্রণামী লইতে আমার অধিকার নাই। প্রণামী দিবার মত কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই। এরূপ প্রণামী ভিক্ষারই নামান্তর। আমি বর্ত্তমান অবস্থায় ভিক্ষা গ্রহণ করিতে অক্ষম। এক্ষণে ভিক্ষা গ্রহণ করিলে আমার অধর্ম্ম হইবে। তোমাদের ঐ টাকা যদি তোমরা ফিরাইয়া না লও, তাহা হইলে, তোমাদের সমক্ষেই তোমাদের কোন হিতকর কার্য্যে আমি এখনই উহা ব্যয় করিব।”

বক্তা বলিল,—“আমরা রায় বাহাদুর মহাশয়ের চরণে কোটী কোটী প্রণাম করি। আপনি দয়া করিয়া এই টাকা রাখিয়া দিলে আমরা সুখী হইব। রায় বাহাদুর মহাশয়, আপনি রাজার পরম আত্মীয়, আপনি দয়া করিয়া টাকা রাখিয়া দিন। তাহার পর যাহা ভাল হয় সেইরূপ ব্যবস্থা করিবেন।”

রায় বাহাদুর বলিলেন,—“আমার তাহাতে আপত্তি নাই। আমি এ টাকা গচ্ছিত রাখিতে পারি, পরে যাহা ভাল হয় তাহাই হইবে। আপাততঃ রাজা টাকা গ্রহণ করিলেন না জানিয়া তোমরা আমার নিকট টাকা রাখিয়া দিতে পার।”

বক্তা বলিল,—“তা হাই বেশ।”

রাজা বলিলেন,—“এক্ষণে তোমাদের আহারাদির ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক।”

বক্তা বলিল,—“আমরা রাজার আশ্রিত দাস। আমাদের খাওয়ার জন্য চিন্তা কি? এত বেলায় এত লোকের জন্য উদ্যোগ করিয়া আহারের ব্যবস্থা করা অসম্ভব। আমরা সকলে বাটীতে ফিরিয়া আহার করিব। যাহাদের দূরে বাস, তাহারা কুটুম্ব বাড়ী যাইবে স্থির আছে। কাহারও কষ্ট হইবে না। বেলা অধিক হইয়াছে, রাজার কষ্ট হইতেছে, আমরা এক্ষণে প্রণাম করিয়া বিদায় হই।”

পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় সেই জন-প্রবাহ ক্রমে ক্রমে চলিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

প্রাতে যে সকল ব্যক্তি রাজার নিকট উপস্থিত ছিলেন, বৈকালে তাঁহারা সকলেই আসিয়াছেন। রাজা মধ্যাহ্নে অন্তঃপুরে ছিলেন। বৈকালে বাহিরে আসিয়া সকলকেই দেখিতে পাইলেন এবং সকলের সহিত সমুচিত সম্ভাষণ করিয়া রায়বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“খুড়া মহাশয়, টাকাগুলি কি করিলেন?”

রায়বাহাদুর বলিলেন,—“টাকা সমস্তই জীবন বাবুর নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছি।”

রাজা বলিলেন,—“বেশ করিয়াছেন। তাহার পর টাকার কি হইবে, স্থির করিয়াছেন?”

রায় বাহাদুর বলিলেন,—"তুমি এ টাকা গ্রহণ করিবে না জানি। তথাপি তোমার অনুরক্ত ব্যক্তিগণ বহু আয়াসে তোমাকে ভক্তি ও অনুরাগ দেখাইবার নিমিত্ত যে আয়োজন করিয়া আসিয়াছে তাহাতে তাহাদিগকে হতাশ করা অকর্ত্তব্য মনে করিয়াই আমি টাকা রাখিয়া দিয়াছি।

রাজা বলিলেন,—"উচিত কার্য্যই করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার পর টাকার কি গতি করিবেন; তাহাই আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

রায় বাহাদুর বলিলেন,—"যাহা হয় হইবে। উচিত বোধ হইলে জীবন বাবুর দ্বারাও প্রজাদের হিতজনক কোন কার্য্যে ঐ টাকা ব্যয় করিলেও চলিবে।"

রাজা বলিলেন,—"জীবন বাবু কি মহাশয় লোক! তাঁহার নিকট আমরা নানাপ্রকারে ঋণী। আমার পুত্র সংক্রান্ত গত বিপদে জীবন বাবু কি পরিশ্রম, কি উপকার ও কি আত্মীয়তা প্রকাশই করিয়াছেন। যেমন মহারাণী মাতার সুনাম, তেমনই তাঁহার কার্য্য নির্ব্বাহক।"

রায়বাহাদুর বলিলেন,—"জীবন বাবু যে মহাশয় ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের সম্পত্তি ক্রয় সম্বন্ধে আমরা যে বিষয়ের যে দাম স্থির করিয়াছি, তাহার কোনটিতে কোন কথা কহেন নাই। তখনই সেই টাকা আনন্দে দিয়াছেন। তা ছাড়া অন্যান্য নানা বিষয়ে আমাদিগের সহিত আশাতিরিক্ত আত্মীয়তা ও সৌজন্য করিয়াছেন। যথার্থ ভদ্রলোক না হইলে এরূপ মহত্ত্ব হয় না। সৌভাগ্যক্রমে জীবন বাবুর সহিত আমাদের যথেষ্ট আত্মীয়তা হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় মহারাণী মাতাকে আমরা একবার দেখিতেও পাইলাম না।"

রাজা বলিলেন,—"অদ্যই কখন না কখন আমরা তাঁহার চরণ দর্শন করিতে পাইব।"

রায়বাহাদুর বলিলেন,—"আমরা যখন এ স্থান ত্যাগ করিতেছি, তখন আর মহারাণীর সহিত সাক্ষাতের আশা কিরূপে করিতে পারি?"

রাজা বলিলেন,—"খুড়া মহাশয়, এই স্থানই কি পৃথিবীর শেষ? এ স্থান ত্যাগ করার পরই কি আমাদের জীবনের সকল আশার শেষ হইবে? যদিই তাহা হয়, তাহা হইলে পুনরায় এ স্থানে আমরা আর কখন আসিব না, এমন কথাই বা কে বলিতে পারে? যাঁহার ইচ্ছায় সকল ঘটনা ঘটিতেছে, তিনি কাহার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিতেছেন তাহা জানিতে আমাদের কোনই ক্ষমতা নাই। সে কথা থাকুক, রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কয়দিন আসিয়াছেন ওবেলাও উনি অনেকক্ষণ বসিয়াছিলেন। নিশ্চয়ই কোন প্রয়োজনে এখানে আসিয়াছেন, আপনি জানিতে পারিয়াছেন কি, উনি কেন আসিয়াছেন?"

রায়বাহাদুর বলিলেন,—"বোধ হয় অন্য কোন প্রয়োজন নাই। আমাদের নানারূপ গোলমালের কথা শুনিয়াই বোধ হয় দেখিতে আসিয়াছেন। অন্য কোন প্রয়োজন থাকিলে চারিদিনের মধ্যে অবশ্যই কোন না কোন সময় আমাকে তাহা বলিতেন, না হয় চণ্ডী ভায়ার দ্বারাও জানাইতেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দেখা শুনা করিতে আসা ছড়া আর কোন প্রয়োজন আছে কি?"

রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মোক্তার মহাশয়, মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন,—"আজ্ঞে হাঁ, দেখা শুনাই অভিপ্রায় বটে। তা একটা কথাও ছিল। বড় গণ্ডগোল

দেখিয়া বলি বলি করিয়াও বলিতে পারি নাই।”

চণ্ডীচরণ একটু উৎকণ্ঠিত ভাবে রামচন্দ্রের নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—“দাদা আবার কথা কি? তুমি কেবল দেখা করিতে আসিয়াছ ইহাই তো আমরা জানি। আর কথা টথায় এ সময়ে কাজ নাই। তুমি এখন বাসায় যাও।”

রাজা বলিলেন,—“সে কি কথা চণ্ডী খুড়া? যদি কোন দরকারী কথা থাকে, তাহা না বলিলে হয়ত ক্ষতি হইতে পারে; বলুন, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, আপনার কি কথা আছে?”

রামচন্দ্র বলিলেন,—“আমি এতদিন রামনগরেই ছিলাম। সেখান হইতে রাজার বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় হইতেছে এ সকল সংবাদ জানিতে পারি। হঠাৎ শুনিলাম, রাজা সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। সেই সংবাদ শুনিয়া আমি তাড়াতাড়ি আসিতেছি। তা রাজা মহাশয়, আপনি সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিলেন; এ গরিব ব্রাহ্মণ অনেক আশা করিয়া রহিয়াছে।”

রাজা বলিলেন,—“কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।”

চণ্ডী বলিলেন,—“করিতে আবার কি হইবে? সমস্ত জীবন খাটিয়াও যাহা করিতে পার নাই, আর এতদিন খাটিলেও যাহা করিতে পারিতে না, তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী তুমি পাইয়াছ। আর কোন্ আশায় তুমি বসিয়া আছ? দোহাই দাদা, এ সময় তুমি আর আশার কথা তুলিয়া জালাতন করিও না।”

রায়বাহাদুর বলিলেন,—“মোক্তার মহাশয়ের যদিই কোন দরকারী কথা থাকে তাহা বলিতে দাও।

রায়বাহাদুরের কথার উপর চণ্ডীচরণ কথা কহিতে পারিলেন না; সুতরাং রামচন্দ্র বলিলেন,—অনেক উপকার আপনারা করিয়াছেন। কিন্তু রায়বাহাদুর মহাশয় আরও কিছুর আশা দিয়াছিলেন। আপনারা চলিয়া যাইতেছেন, গরিবের দরখাস্তটা একবার শুনিলে হইত।”

রায়বাহাদুর বলিলেন,—“কি আশা দিয়াছিলাম বলুন।”

চণ্ডীচরণ বলিলেন,—“বাড়ী পাইয়াছ, বাড়ী বাড়াইবার জন্য নগদ হাজার টাকা পাইয়াছ, মেয়ের বিবাহে তিন শত টাকা পাইয়াছ, আবার আশা কি? আর কোন আশা কেহই দেন নাই।”

রামচন্দ্র বলিলেন,—“দিয়াছিলেন বই কি তুমিও যে সেখানে ছিলে। মাসে কুড়ি টাকা করিয়া সাহায্য করার কথা রায়বাহাদুর মহাশয় বলিয়া ছিলেন; এ কথা কি তোমার মনে নাই ভাই?”

চণ্ডীচরণ বলিলেন,—“সে কখন? যদি তোমার স্বর্গলাভ হয়, যদি তুমি অশক্ত হও, তখন। তোমার স্বর্গলাভ হইয়াছে নাকি? যাও, যাও, অনর্থক কথা লইয়া এ সময় ত্যক্ত করিও না।”

রামচন্দ্র বলিলেন,—“না হ্যক্ত আমি কেন করির? কথাটা হইয়াছিল, তাই মনে করাইয়া দিয়েছি। রাজার সব গেল, কেবল আমিই বাদ পড়িলাম।”

চণ্ডীচরণ বলিলেন,—“তোমার স্বর্গলাভ হইলে, তোমার কথা নিশ্চয়ই রায়বাহাদুরের মনে পড়িত। কেন দাদা, সুবিধা করিয়া কিছু আগে স্বর্গলাভ ঘটাইতে পার নাই? রাজার সব গেল বলিয়া যদি শুনিয়া থাক তবে এখন কি জন্য আসিয়াছ? সব যাওয়ার পরও

তোমার জন্ম আবার সব হইবে না কি? দাদা, তোমার কি কোন ধর্ম্মজ্ঞান নাই, একটু বুদ্ধি বিবেচনা নাই? এখন এই দুঃসময়, এখন তুমি আসিয়াছ, তোমার স্বর্গলাভের পরে ছেলে পিলের কি হইবে তাহারই ব্যবস্থা করিতে? ছিঃ! মনে করিয়া দেখ, কত উপকারই তুমি পাইয়াছ। মরার পর কি হইবে, তাহাই বলিবার কি এই সময়?"

রামহরি কৈবর্ত্ত বলিল,—"আমি একটা কথা বলি শুন। এখান হইতে কোন টাকা কড়ি আর ঠাকুর পাইবে না। আশা অনেকে অনেক করে, সব কি সফল হয়। তোমরা ভদ্রলোক। সময় অসময় বুঝিয়া কথা কহিতে জান না? আমাদের চাষার ঘরে এমন লোক নাই যে মানুষের বিপদ আপদ বুঝে না। তুমি ঠাকুর বাড়ী যাও। তোমার যদি আদন হয় তখন আমি তোমার খরচের মত টাকা মাসে মাসে দিব। তুমি রাজাকে আর কোন কথা বলিও না।"

রাজা বলিলেন,—"চণ্ডী খুড়া আপনার দাদাকে আপনি অকারণ অনুযোগ করিবেন না। তাঁহার সহিত কিছু সাহায্য প্রাপ্তির কথা ছিল বলিয়াই উনি সে কথার উল্লেখ করিতেছেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, আমার সর্ব্বস্ব গিয়াছে, এ সংবাদ আপনি শুনিয়াছেন। আমি এ অবস্থায় আর থাকিব না, তাহাও আপনি জানেন। এ অবস্থায় আপনাকে মাসিক সাহায্য করিবার কোন ব্যবস্থা করাই আমার পক্ষে সম্ভব নহে। যে যে ঘটনা ঘটিলে আপনি সাহায্য পাইবেন কথা ছিল, তাহার কিছুই ঘটে নাই। তথাপি মনে করা উচিত, কল্যই আপনার মৃত্যু হইতে পারে, অথবা আপনি কর্ম্মে অপটু হইতে পারেন। আমি সকল দিক ভাবিয়া, এ সময়ে আপনাকে কিছু নগদ টাকা দিবার ব্যবস্থা করিতে পারি। তাহার সুদ খাটাইয়া আপনি ভবিষ্যতের জন্ম সঞ্চয় করিতে থাকুন।"

রামচন্দ্র হৃষ্টভাবে বলিলেন,—"আপনার জয় জয়কার হউক। কিছু নগদ টাকা পাইলেই আমার ভবিষ্যতের উপায় হইবে।"

চণ্ডীচরণ বলিলেন,—"রাজা বাবাজী, নগদ টাকা এ সময় আসিবে কোথা হইতে, প্রজারা যে টাকা দিয়া গিয়াছে, তাহা তুমি স্পর্শ করিবে না। ঘরে বা অন্য কোথায় কিছুই নাই। তবে টাকার কথা কেন বলিতেছ? টাকা কড়ি কিছুই এখন হইবে না দাদা। তুমি এখন বাড়ী যাও। রাজার যদি সময় ভাল হয়, তখন তোমার ব্যবস্থা হইবে।"

রামচন্দ্রের মুখ শুকাইয়া গেল। রাজা বলিলেন,—"না না যাহা হয় একটা উপায় করিতেই হইবে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কত টাকা হইলে আপনার ভবিষ্যতে ভাবনা ঘুচিয়া যাইবে?"

রামচন্দ্রের মুখ প্রফুল্ল হইল। বলিলেন,—'আজ্ঞে এক হাজার টাকা—এক হাজার হইলেই আমার যথেষ্ট হবে।"

রাজা বলিলেন,—"তাহাই আপনি পাইবেন। আমার স্ত্রীর কতকগুলি অলঙ্কার আছে। তাহার কিছু বিক্রয় করিলে এক হাজার টাকা হইবে। সে অলঙ্কারে আমাদের আর প্রয়োজন নাই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, অদ্যই টাকা আপনার হস্তগত হইবে।"

রামচন্দ্র সানন্দে বলিলেন,—"আপনি কল্পতরু। এখানে আসিয়া কাহাকেও বিমুখ হইতে হয় না। আপনার অশেষ কল্যাণ হইবে।"

বলিল,—"দাদা, আর আশীর্ব্বাদে কাজ নাই। রাণী মার অলঙ্কার বিক্রয়ের টাকা লইয়া ভবিষ্যৎ জীবনের তুমি সংস্থান করিতে লজ্জা বোধ করিতেছ না, তোমার আবার আশীর্ব্বাদ। তোমার আশীর্ব্বাদ না পাইলেও রাজার কোন ক্ষতি হইবে না। এখন যাও তুমি আর এক সময় আসিয়া টাকা লইয়া যাইও।"

রাজা বলিলেন,—"না, যাইবেন কেন? বসুন আপনি; হয় তো এখনই টাকা লইয়া যাইতে পারিবেন। খুড়ামহাশয় একবার এ ঘরে আসিবেন কি? আপনারা সকলে দয়া করিয়া একটু বসুন, আমি এখনই আসিতেছি।"

রাজা ও রায়বাহাদুর পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন।

রামচন্দ্র ধীরে ধীরে রামহরির নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—"দেখিতেছি তুমি বেশ বুদ্ধিমান লোক। দেবতা ব্রাহ্মণেও তোমার ভক্তি যথেষ্ট। তোমার বাড়ী কোথায়?

রামহরি বলিলেন,—"কেন বল দেখি।"

রামচন্দ্র বলিলেন,—"আর কিছু নয়। বলি তোমার বুঝি অনেক ধান আছে?"

"আছে।"

রামচন্দ্র বলিলেন, "বেশ বেশ, আরও হউক। সময় অসময়ে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করিব, তুমি তো সাহায্য করিতে আপনিই স্বীকার হইয়াছ। তোমার কল্যাণ হউক।"

রামহরি বলিল,—"টাকা ছাড়িলে কি ঠাকুর? রাণীর গহনা বেচিয়া টাকা লইয়া যাইতেছ, আবার ধান চাহ কেন? তোমার আশীর্ব্বাদে আমার কাজ নাই।"

রামচন্দ্র বলিলেন,—"সত্যই কি তুমি মনে কর এত বড় রাজাটার আর কিছুই নাই? সত্যই কি তুমি ভাব যে রাণীর হাতে, কিংবা লুকান টাকা নাই? সত্যই কি তুমি মনে কর প্রজাদের টাকা রাজা লইবে না? সত্যই কি তুমি মনে কর রাণীর গহনা বেচিয়া আমাকে হাজার টাকা দিতে হইবে? বুদ্ধিমান চতুর লোকে ঐ রকম করিয়াই বলে, ঐরূপ চাপা চাইলে চলে।"

রামহরি উঠিয়া বলিল,—"ঠাকুর, তুমি আমার কাছ হইতে সরিয়া যাও। তোমার বাতাস গায়ে লাগিলেও পাপ হয়।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রস্থান।

রাজা ও রায়বাহাদুর অল্পক্ষণ পরেই বাহিরে আসিলেন। তাঁহারা আসিয়া বসিবামাত্র জীবনকৃষ্ণ বাবু তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজা সাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন,—"আপনার নিকট অশেষ উপকারে আমি বদ্ধ। কোন প্রত্যুপকার করিবার ক্ষমতা আমার নাই। আপনার উপকার চিরদিন মনে অঙ্কিত থাকিবে।"

জীবন বাবু বলিলেন,—"আপনি ভুবন বিখ্যাত মহাপুরুষ। আপনার উপকার করিতে পারি, এরূপ ক্ষমতা আমার মত ক্ষুদ্র জীবের কি আছে? প্রার্থনা করি, আপনার অনুগ্রহে যেন কখন বঞ্চিত না হইতে হয়।"

রায় বাহাদুর বলিলেন,—আমরা আপনাকে দেখিয়াই মোহিত হইয়াছি। আপনি যাহার আশ্রিত না জানি সেই মহারাণী মাতা

কি অলৌকিক স্বভাবা। তাঁহাকে দর্শন করা আমাদের ভাগ্যে ঘটিল না ”

জীবন বাবু বলিলেন,—“কেন এরূপ আশঙ্কা করিতেছেন? মহারাণী মাতার সহিত আপনাদের অবশ্যই সাক্ষাৎ হইবে। পুণ্যবান্ সাধু ব্যক্তির প্রতি তাঁহার কৃপার সীমা নাই। আমার নিকট যে পঞ্চাশ হাজার টাকা ফেলিয়া আসিয়াছেন তাহার কি হইবে?

রায় বাহাদুর বলিলেন,—“থাকুক এখন।”

জীবন বাবু বলিলেন,—“থাকুক। আমি নিয়তই আপনাদের অপ্রিয় কার্য্য সাধন করিয়া হয়তো বিরাগভাজন হইয়াছি। আজি এক অতি ভয়ানক অপ্রিয় কার্য্য লইয়া আসিয়াছি। কেমন করিয়া কথাটা উত্থাপন করিব তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।”

রাজা বলিলেন,—“আপনি সকল কার্য্যেই আমাদের সহিত অতিশয় সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা আমূল আপনার অশেষ সততারই পরিচয় পাইয়াছি। আপনি মহারাণীর পক্ষ হইতে আমাদের সমস্ত সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। আমরা বিক্রয় করিতে উদ্যত না হইলে আপনি ক্রয় করিতে আইসেন নাই; প্রতারণা বা কৌশল করিয়া অল্পমূল্যে কিছুই ক্রয় করেন নাই; যে বিষয়ের যে মূল্য আমরা প্রস্তাব করিয়াছি, তাহাই আপনি দিয়াছেন; বাড়ী ঘর লইয়াও একদিনও আমাদের সহিত অসৌজন্য করেন নাই; এতদিন দয়া করিয়া এখানে না থাকিতে দিলেও আপনি পারিতেন। আমাদের চাকর লোকজন সকলেই এখন আপনার নিকট আশ্রয় পাইয়াছে; আপনি তাহাদের অনেককে তাড়াইয়া দিলেও পারিতেন। আমার পুত্রের পীড়ার সময় আপনি রাত্রি জাগরণ, পরিশ্রম, ঔষধ প্রস্তুত করণ, শেষে তাহার অন্ত্যেষ্টি পর্য্যন্ত স্বয়ং সম্পন্ন করিয়াছেন। কোথাও তো বিরাগজনক কোন কার্য্যই দেখিতেছি না; যাহা স্মরণ করিতেছি তাহাতেই তো সাতিশয় কৃতজ্ঞ থাকিবার কারণই দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং আপনি এখন যাহা বলিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন, সে সংবাদও কখনই আমাদের বিরাগজনক হইবে না। বলুন, কি সংবাদ?

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন,—“বিধুমুখীর বিক্রয় করা বিষয় লইয়া মহারাণী মাতার সহিত আপনাদের মোকদ্দমা চলিতেছিল।”

রায় বাহাদুর বলিলেন,—“কি হইয়াছে বলুন। গত মঙ্গলবারে সে মোকদ্দমা শেষ হইবার কথা। বিশেষ ব্যস্ততায় তাহার সন্ধান লওয়া হয় নাই।”

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন,—“সে মোকদ্দমায় আমরা জয়ী হইয়াছি।”

রায় বাহাদুর বলিলেন,—“তাহাই হইবার কথা বটে! ন্যায় ও যুক্তিমতে মোকদ্দমায় আমাদের জয়ের কোন আশা ছিল না।”

জীবন বাবু বলিলেন,—“সকল আপনাদিগকে পঞ্চাশ হাজার টাকার দায়ী হইতে হইয়াছে। এই টাকা আদায়ের চেষ্টা করিতে মহারাণী মাতা আমাকে আদেশ করিয়াছেন।”

রাজা বলিলেন,—“অবশ্যই টাকা দিতে হইবে। এক উপায় আছে। আমার স্ত্রীর কতকগুলি অলঙ্কার আছে। তাহা রাখিবার আর কোন আবশ্যক নাই। আমি সেগুলা আনিয়া ফেলি। আপনি দেখুন, তাহাতে এত টাকা হয় কি না।”

রামচন্দ্রের প্রাণ উড়িয়া গেল। গহনা বিক্রয় করিয়া রাজা তাঁহাকে টাকা দিবেন কথা ছিল। এক্ষণে কোথা হইতে জীবন বাবু চীলের মত আসিয়া তাঁহার মুখের খাদ্য কাড়িয়া লইয়া যায়

অতি ভীতভাবে রামচন্দ্র উঠিয়া বলিল,—"আজ্ঞা অলঙ্কার হইতে আমাকে এক হাজার টাকা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।"

রাজা বলিলেন,—"তাহা আমার মনে আছে। আপনাকে সেজন্য চিন্তা করিতে হইবে না। আপনারা সকলে একটু অপেক্ষা করুন। আমি এখনই আসিতেছি।"

রাজা প্রস্থান করিলেন। অনতিকাল পরে রাজা দুই জন দাসী সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে পুনরাগত হইলেন। সকলেরই হাতে এক একটা অতি সুন্দর বাক্স। সেই বাক্স সকল জীবন বাবুর সম্মুখে স্থাপন করিয়া রাজা সকল গুলির চাবি খুলিয়া ফেলিলেন এবং জীবন বাবুকে বলিলেন,—"আপনি দেখুন, এ সকল সামগ্রীর মূল্য কত টাকা হইতে পারে।"

জীবন বাবু বাক্স হইতে নানাবিধ অলঙ্কার বাহির করিতে লাগিলেন। হীরক খচিত, মুক্তা জড়িত, প্রবাল সমন্বিত, চুনী সংস্কৃত, পান্না সম্পন্ন বিবিধপ্রকার পরিপাটী স্বর্ণালঙ্কার সেই সকল বাক্স হইতে বাহির হইতে লাগিল। অলঙ্কার সমূহের শোভা ও নির্ম্মাণ কৌশল দেখিয়া দর্শকগণ বিমোহিত হইতে লাগিলেন।

জীবন বাবু সমস্ত অলঙ্কার দর্শনের পর বলিলেন,—"রায়বাহাদুর মহাশয়, আপনি এসকল বিষয়ে হয়তো অভিজ্ঞ আছেন। আমার পক্ষে ইহার মূল্য অবধারণ করা সহজ নহে। একজন সুদক্ষ জহুরী ব্যতীত, ইহার দাম ঠিক করা কঠিন।"

রায় বাহাদুর বলিলেন,—"আমিও দাম ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। কিন্তু ইহার সমস্ত সামগ্রীই আমি স্বয়ং প্রস্তুত করাইয়াছি। এজন্য কত টাকা খরচ পড়িয়াছে, তাহা আমি জানি।"

জীবন বাবু বলিলেন,—"কত টাকা?"

রায়বাহাদুর বলিলেন,—"একলক্ষ টাকার

জীবন বাবু বলিলেন,—"যাহাই হউক, যদি দাম সুস্থির করিয়া গহনাগুলি বিক্রয় করিতে হয়, তাহা হইলে দুই একদিন সময়ের আবশ্যক।"

রাজা বলিলেন,—"অনর্থক সময় নষ্ট করিয়া কোন ফল নাই। আপনি আন্দাজ করিয়া একটা মূল্য স্থির করুন না।"

জীবন বাবু বলিলেন,—"তাহাতে আপনার ক্ষতি হইতে পারে।"

রাজা বলিলেন,—"আমার ক্ষতিতে কিছু যায় আইসে না। আমার যখন এই সকল সামগ্রীতে আর প্রয়োজন নাই, তখন কিছু টাকা এদিক ওদিক হইলে আমি অনিষ্ট বোধ করিব না।"

জীবন বাবু বলিলেন,—"তাহা হইলে রাজা মহাশয়, আমি এই সকল অলঙ্কার লইয়া আমাদের পাওনা শোধ করিতে পারি?"

রাজা সবিনয়ে বলিলেন,—"বেশ কথা। এ বিষয়ে কিন্তু আমার একটু ভিক্ষা আছে। আপনি আমার যত সামগ্রী ক্রয় করিয়াছেন, কিছুতেই কোন প্রার্থনা করি নাই। কেবল কাতরভাবে এই শেষ সামগ্রীগুলিতে আমি যৎসামান্য বেশী টাকা চাহিতেছি।"

জীবন বাবু বলিলেন,—"কি বেশী চাহেন, আজ্ঞা করুন।"

রাজা বলিলেন,—"দয়া করিয়া এক হাজার টাকা বেশী দিতে হইবে। আপনাদের পাওনা পঞ্চাশ হাজার কাটিয়া লউন, এক হাজার টাকা আমাকে দান করিয়া উপকৃত করুন।"

জীবন বাবু বলিলেন,—"তাহাতে আমার

আপত্তি নাই। আমি অলঙ্কার লইয়া যাই। এখনই একজন লোক দিয়া এক হাজার টাকা পাঠাইয়া দিতেছি।"

রাজা বলিলেন,—"আপনার কষ্ট করিয়া লোক পাঠাইতে হইবে না। আমি আপনার সঙ্গে লোক দিতেছি। রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, আপনি এই বাবুর সঙ্গে যান। এখনই আপনার প্রাপ্য হাজার টাকা এই বাবুর নিকট পাইবেন। নমস্কার হই। আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

চণ্ডীচরণ বলিলেন,—"আমাকেও ক্ষমা করিবেন। আমিও জন্মের মত নমস্কার হই দাদা। আপনি আজি আমার প্রাণে যে শেল বিঁধিয়া চলিলেন, তাহাতে প্রার্থনা করি আর যেন কখন আমাদের দেখা সাক্ষাৎ না হয়।"

দুইজন বেহারা বাক্সগুলি উঠাইয়া লইল। জীবন বাবু ও পশ্চাতে রামচন্দ্র প্রস্থান করিলেন। রাজা বলিলেন,—"গহনাগুলা লইয়া কি করিব, এজন্য বড় ভাবনা হইয়াছিল খুড়া মহাশয়! এক্ষণে সেগুলা ভাল কাজেই লাগিয়া গেল, ইহা আমার সৌভাগ্য। আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। দামী কাপড় চোপড়, শাল রুমাল প্রভৃতি সামগ্রী পূর্ব্বেই বিক্রয় করা হইয়াছে। কেবল এই বোঝাগুলার গতি কি হইবে ভাবিয়া চিন্তিত ছিলাম। আজি ঋণ মুক্তির জন্য ওগুলা লাগায় বড় আনন্দের বিষয় হইল।"

সকল লোক অধোমুখ। কাহারও মুখে কোন কথা নাই। চণ্ডীচরণ উঠিয়া রাজার নিকটস্থ হইলেন, এবং বলিলেন, "বাবাজি, এ পাপ মুখ আর তোমার ন্যায় মহাত্মাকে দেখাইব না। যাহার দাদা এরূপ নির্দ্দয়, অমানুষ, অকৃতজ্ঞ, তাহার বাঁচিয়া কি ফল? লজ্জায় আমার আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা করিতেছে।"

রাজা বলিলেন,—"চণ্ডীখুড়া, কেন আপনি এরূপ মনে করিতেছেন? আপনার দাদা, নিতান্ত অন্যায় কাজ কিছুই করেন নাই। এই সময়ে এরূপ করিয়া না লইলে বাস্তবিক উনি আর কিছুই পাইতেন না। ছেলেপিলে লইয়া ব্রাহ্মণকে হয়তো শেষ জীবনে কষ্ট পাইতে হইত। উনি বুদ্ধিমানের কাজই করিয়াছেন। আপনি এজন্য দুঃখিত হইবেন না।"

চণ্ডীচরণ বলিলেন,—"তুমি দেবতা, তাই এরূপ ব্যবহারের মধ্যেও ভাল দেখিতেছ। আমার কিন্তু লজ্জায় বিশেষ কষ্ট হইতেছে।"

রাজা বলিলেন,—"সে কথা আপনি মনে করিবেন না। এক্ষণে সায়ংসন্ধ্যার সময় হইয়া আসিল। আপনারা সকলে কৃপা করিয়া আমাকে বিদায় দিন। খুড়া মহাশয়, আপনার চরণে প্রণাম করি, চণ্ডীখুড়া প্রণাম করি, নবীনকৃষ্ণ ভাই নমস্কার করিতেছি, রামহরি ভাই আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি সুখে থাকিবে; জরিফ, সেলাম করি। কালিকার কথা আজি বলা যায় না। ঈশ্বর কখন কাহার অদৃষ্টে কি ঘটাইবেন, তাহা কে জানে? তাই তোমাদের সকলের নিকট আমি বিদায় লইয়া সন্ধ্যা বন্দনা করিতে যাইতেছি।"

রাজা প্রস্থান করিলেন। জরিফ রায় বাহাদুরকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"হুজুর, রাজা সাহেবের কথাগুলাতো ভাল নয়।"

রায় বাহাদুর বলিলেন,—"কি করিব বল। জানি না ভগবানের মনে আরও কি আছে।"

চণ্ডীচরণ আপন মনে বলিলেন,—"রাজা এমন করিয়া প্রস্থান করিলেন কেন? বড় প্রাণ কেমন করিতেছে। আজি আর আহার নিদ্রা নাই; এখানেই বসিয়া থাকিব।"

নানারূপ কল্পনা করিতে করিতে কাহারও কোথায় যাওয়া হইল না। ভবানিদীর বিশেষ

মনশ্চাঞ্চল্য ও কাতরতা হেতু কেবল নবীনকৃষ্ণ বাটী গমন করিলেন। কাহারও আহার নিদ্রা হইল না। বড় উৎকণ্ঠায় রাত্রি কাটিয়া গেল। অতি প্রত্যূষে অতি ব্যস্তভাবে ভব এক পত্র হস্তে বাহিরে আসিয়া বলিল,—"বাবা ঠাকুর, কি হইল? রাজা রাণী কোথায়?"

সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রায় বাহাদুর ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসিলেন,—"কোথায়ও দেখিতে পাইতেছ না?"

ভব সজল নয়নে বলিল,—"না। শোবার ঘর খালি, বিছানার উপর এই পত্র। কি হবে বাবা ঠাকুর?

রায় বাহাদুর পত্র লইয়া দেখিলেন, তাঁহারই উদ্দেশে পত্র লিখিত। তিনি সত্বর আবরণ উন্মোচন করিয়া পাঠ করিলেন,—

"শ্রীচরণে অসংখ্য প্রণামান্তে নিবেদনম্—

খুড়া মহাশয়, আমার পত্নীকে লইয়া গভীর রাত্রিতে আমি এ স্থান ত্যাগ করিলাম। আপনার শ্রীচরণে সকল কথা নিবেদন না করিয়া আসায় আমার অপরাধ হইয়াছে! কিন্তু সকল কথা বলিতে হইলে আমার চলিয়া আসা ঘটিত কি না সন্দেহ।

আমার এরূপ আগমন ভিন্ন অন্য কোন উপায় ছিল না। নিতান্ত দরিদ্র অবস্থায় রাজ অট্টালিকায় দাসদাসী বেষ্টিত হইয়া বাস করা অসঙ্গত। এখানে সামান্য ভাবে জীবিকার্জ্জনের চেষ্টা করাও অসম্ভব, সুতরাং আমাকে প্রস্থান করিতে হইল।

আপনি বোধ হয় সত্বর কাশীযাত্রা করিবেন। যদি অসম্ভব না হয়, তাহা হইলে চণ্ডী খুড়াকেও সঙ্গে লইয়া যাইবেন।

ভবদিদি, দাসীদিদি ও রামহরিকে বাটীতে পাঠাইয়া দিবেন।

সুহাসিনী বড়ই শোকাতুরা। তাঁহাকে ও নবীনকৃষ্ণকে শান্ত করিবেন। জরিফ ও অন্যান্য আত্মীয় অনুগত ব্যক্তিগণকে আমার সাদর সম্ভাষণ জানাইবেন।

একটা স্থানে স্থিরভাবে বসিয়া এবং জীবিকার একটা উপায় করিয়া আপনাদের সকলকে সংবাদ দিব।

আমাকে ক্ষমা করিবেন। অন্যান্য সকলকেও ক্ষমা করিতে বলিবেন। চণ্ডীখুড়াকে আমার প্রণাম জানাইবেন। ইতি—

প্রণত সেবক

শ্রীউমাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়।"

রায় হরকুমার বাহাদুরের চক্ষু দিয়া জল পড়িল। চণ্ডী বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। জরিফ কাপড় দিয়া চক্ষু মুছিতে লাগিল। রামহরি কাঁদিয়া ফেলিল। ভব চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাটীর মধ্যে চলিয়া গেল। অন্তঃপুরে একটা ক্রন্দন কোলাহল উপস্থিত হইল।

দশম খণ্ড—নির্ব্বেদ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উন্মাদ।

নীলরতন বাবু কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট সেই ক্ষুদ্র গৃহে শ্যামলাল অবস্থান করিতেছেন। গৃহের সাজ সরঞ্জাম কিছুই বাড়ে নাই; সেই খড়ের বিছানা ও গঙ্গাজল পূর্ণ মৃৎভাণ্ড ব্যতীত, সেখানে আর কিছুই নাই।

বিধুমুখীর ভয়ে এ স্থান হইতে শ্যামলাল সে দিন পলাতক হইয়াছিলেন; সঙ্গে সঙ্গে

বিধুমুখীও গমন করিয়াছিলেন। তাহার পর ঘনানন্দের আশ্রম সন্নিধানে এক দিন বিধুমুখীর সহিত শ্যামলালের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আর সাক্ষাৎ হয় নাই।

বিধুমুখী উন্মাদিনী হইয়াছেন। তাঁহার রোগ অতি বিচিত্র। তাঁহার উন্মাদে লজ্জা আছে, সঙ্কোচ আছে, ধীরতা আছে, বাক্য আছে, রোদন আছে, হাস্য আছে। তাঁহার উন্মাদে অত্যাচার নাই, দৌরাত্ম্য নাই, যুক্তি নাই, বিচার নাই, আহার নাই, নিদ্রা নাই। উন্মাদিনী নবীনার রূপ গিয়াছে, শোভা গিয়াছে, শক্তি গিয়াছে, ধৈর্য্য গিয়াছে; কিন্তু অভাগিনীর স্মৃতি যায় নাই।

শ্যামলাল আপনার ঘরে একাকী বসিয়া চিন্তা করিতেছেন। কেন বিধুমুখীর এমন হইল? পাপ তো অনেকেই করে, কাহারও তো এরূপ দুর্দ্দশা হয় না। আমি তো পাপের শেষ রাখি নাই, আমার তো কোন দুর্দ্দশাই ঘটে নাই। অভাগিনী বিধুমুখীর উপর বিধাতার এ নিগ্রহ কেন?

পাপের জ্বালায় বিধুমুখী যেমন জ্বলিতেছে এমন আর বুঝি কাহারও ঘটে না। বিধুমুখী পাপ করিয়াছিল বটে, কিন্তু পাপে মজিতে পারে নাই; পাপের রঙ্গ বিধুমুখী সর্ব্বাঙ্গে লাগিয়াছিল, কিন্তু তাহার প্রাণে লাগে নাই। বিধুমুখী পাপের সরোবরে ভাসিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে ডুবিতে পারে নাই। সেই জন্যই তাহার এই কষ্ট। যাহারা পূর্ণভাবে পাপী, পাপ যাহাদের অস্থিমজ্জায় মিশিয়াছে, পাপ যাহাদের অবিচ্ছিন্ন সহচর ও জীবন ধারণের উপায় স্বরূপ, তাহাদের পাপজনিত যন্ত্রণাবোধ তিরোহিত হইয়া যায়, পাপে তাহারা তৃপ্তি ও সন্তোষ অনুভব করে, পাপের অনুষ্ঠান তাহারা গৌরব বলিয়া জ্ঞান করে, বিধুমুখীর তাহা হয় নাই; সেই জন্যই বুঝি তাহাকে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হইতেছে।

এই বিষম যাতনার তাড়নায় তাহার মস্তিষ্ক বিচলিত ও বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। এই পাপের কঠোর পেষণে তাহার বুদ্ধি-শক্তি নষ্ট হইয়াছে। অনুতাপের উৎকট শাসনে সে উন্মাদিনী হইয়াছে। তাহার অবস্থা এখন শোচনীয়।

শ্যামলাল ভাবিতেছেন, বিধুমুখী এখন দয়ার পাত্রী। তাহার অপরাধ হেতু কোন দিনই তাহার উপর আমার ক্রোধ ছিল না। সে আমার সম্বন্ধে অত্যাচার করিয়াছে বলিয়া কখনই আমার মনে হয় নাই। আমি তাহার কোন ব্যবহারেই বিরক্ত হই নাই। এখন যে শান্তিতে আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে, যে আকাঙ্ক্ষা বিহীনতা হেতু তৃপ্তি আমি অনুভব করিতেছি, বিধুমুখীই তাহার কারণ। বিরাগ দূরে থাকুক, তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশই আমার কর্ত্তব্য। আমি বিধুমুখীকে ভক্তি করি, পাপীয়সী বলিয়া তাহাকে অবজ্ঞা করিবার কোন কারণই আমি দেখিতে পাই না।

কি করিলে বিধুমুখীর এ যন্ত্রণা বিদূরিত হয়? তাহার এ বিষম দুরবস্থা অপনোদনের কোন ঔষধ আছে কি? বিধুমুখী আমার কৃপা চাহে? আমি তাহাকে কি কৃপা করিব? কি কৃপা আমি করিতে পারি? কোন নারীকে সঙ্গিনী করিবার আমার কোনই প্রয়োজন নাই। কাহারও প্রতি আমার মমতা নাই। কাহারও বিচ্ছেদে আমার কষ্ট নাই। কাহাকেও পাইবার জন্য আমার আকিঞ্চন নাই। তবে আমি তাহাকে কি অনুগ্রহ করিব? আমিতো তাহাকে নিগ্রহ করি না।

তথাপি বিধুমুখীর এই দারুণ দুর্দ্দশা যদি আমার চেষ্টায় অপগত হয়, তাহার উপায়

করা আমার কর্ত্তব্য কি করা উচিত? কি করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে? বিধুমুখীকে আর কোথাও যাইতে দিব না, তাহাকে সময় মত স্নানাহার করাইব, তাহাকে ঔষধ সেবন করাইব, তাহাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিব। এ সকলই তো আমি করিতে পারি। কেন তাহা না করিব? পীড়িতার শুশ্রূষা করাও একটা পরম প্রীতি-জনক ধর্ম্ম। সে ধর্ম্ম কেন না করিব?

আমি তো ঘোর পাপী; আমার পাপের স্মরণেও পাপ হয়; তথাপি পরম পুণ্যাত্মা পুরুষেরাও তো আমাকে দয়া করিয়া থাকেন; সংসারের অনেক লোকই তো আমার প্রতি কৃপাবান্। দয়া ও ক্ষমাই মহত্তের লক্ষণ। বিধুমুখী কেন ক্ষমা লাভ করিবে না? কেন সে দয়া ভোগ করিবে না? বিধুমুখী আমার কোন অপকার করিয়াছে বলিয়া আমি মনে করি না, বরং তাহা দ্বারা আমার প্রকারান্তরে ইষ্টই হইয়াছে। সুতরাং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য, তাহাকে যত্ন করিতে আমি বাধ্য।

শ্যামলাল যখন এইরূপ চিন্তামগ্ন, তখন তাঁহার প্রকোষ্ঠের দ্বারে মধুমাখা কোমল নারী-কণ্ঠে সঙ্গীত উঠিল।

"সে বাঁশী বাজে আর কই?
যমুনার কূলে, কদম্বের মূলে,
যে বাঁশী বেজেছে সই,
সে বাঁশী বাজে আর কই?"

শ্যামলাল ব্যস্তভাবে উঠিয়া বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে মলিন-বেশা, শীর্ণকায়া, রুক্ষকেশা এক রমণী আপন মনে এই মোহময় সংগীত-সুধা বর্ষণ করিতেছেন।

এই কি সেই বিধুমুখী? কে বলিবে যে এই নারী সেই বিলাসময়ী, লাবণ্যোজ্জ্বল-কলেবরা, সুষমাময়ী বিধুমুখী! কিন্তু এই সেই নারীই, সেই ভুবনমোহিনী।

শ্যামলাল ডাকিলেন,—"বিধুমুখী, ভিতরে আইস।"

বিধুমুখী মৃদুস্বরে বলিলেন,—"না না ভিতরে কেন? যত বাহিরে থাকা যায় ততই ভাল। তুমি কে? তুমিই তো সেই শ্যামরায়। তুমি কি এখন বাঁশী বাজাইতে ভুলিয়া গিয়াছ?

সে বাঁশী বাজে আর কই?
শুনি যার গান, আকুল পরাণ, ত্যজি কুলমান
পাগলিনী মোরা হই॥
সে বাঁশী আবার বাজিল কই?"

সেই সুধামাখা কণ্ঠে সংগীতের সুমধুর লহরী-লীলা। এমন সুমধুর সংগীত আর কখন কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া শ্যামলালের মনে হইল না। গীতধ্বনি শেষ হইলে শ্যামলাল বলিলেন,—"বিধুমুখী, ভিতরে আইস। তোমাকে অনেক কথা বলিব।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"কথায় কাজ নাই। কথা শেষ হইয়াছে। চল, ঘরে যাই। তুমি বলিতে পার, কেন বাঁশী থামিয়া গেল?"

বিধুমুখী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। শ্যামলাল তাঁহার পশ্চাতে আসিলেন। বলিলেন,—"বিধুমুখী, বইস।"

বিধুমুখী সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন,—"বসিয়া, শুইয়া, ভাবিয়া, কাঁদিয়া দিন গেল; কিন্তু কাজ কিছুই হইল না। না হয়, না হউক; এখন বাঁশী থামিল কেন, তুমি বলিতে পার?

"শরৎ রজনী প্রফুল্ল মেদিনী, কল প্রবাহিণী,
যমুনা বহিছে অই।
সেই বৃন্দাবন, সেই সে কানন, সখা সখীগণ,
বাঁশী রব তবে কই?

সেই মধুর সংগীত সাঙ্গ হইলে, শ্যামলাল

বলিলেন—"বাঁশী আবার বাজিবে। বিধুমুখী তুমি স্থির হও, বাঁশী আবার বাজিবে।

বিধুমুখী হাঃ হাঃ শব্দে হাসিয়া বলিলেন,—"না না, বাঁশী আর কি বাজে? তুমি বুঝি কিছুই জান না?

মদন-মোহন, মুরলী বাদন, ছাড়া বৃন্দাবন
নাহি তথা রাই রসময়ই।
তাই সেই বাঁশী, বাজিতে উদাসী,
আশাজলে ভাসি,
(শুধু) কাণ পাতি মোরা রই।"

আবার সেই হৃদয়-দ্রব-কর সুমধুর সংগীত ক্ষান্ত হইল। শ্যামলাল বলিলেন,—"তুমি স্থির হও বিধুমুখী, আমি তোমাকে বাঁশী শুনাইব। একটু ধৈর্য্য ধর, আমার কথা শুন, তোমার মঙ্গল হইবে, তুমি যাহা চাও তাহাই পাইবে।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"ধৈর্য্য ধরিতে বলিতেছ—স্থির হইতে বলিতেছ—বৃথা এ প্রবোধ

"বাঁশী বাজিল না আর,
কত কাল হ'ল, সকল তেয়াগি, রাখিনু পরাণ,
শুনিতে বাঁশীর গান।
ফুরাইল আশা, যায় এ জীবন, না পশিল কাণে,
সেই সুধাময় তান॥
বাঁশী বাজিল না আর।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"তুমি হৃদয় বৃন্দাবন অন্বেষণ কর, বিধুমুখী। সেখানেই রাধাশ্যাম বিরাজ করিতেছেন, সেখানে নিয়ত বাঁশী বাজিতেছে। কাণ পাতিয়া শুন।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"না না, মিথ্যা কথা বলিও না। আমার হৃদয়ে কিছু নাই—কেবল ফাঁক—শূন্য। তুমি মিথ্যা কথা বলিয়া ফাঁকি দিতেছ কেন? শ্যামরায় বড় নিষ্ঠুর। নয়নের জল, হাহাকার, প্রাণত্যাগ কিছুতেই তাহার পাষাণ প্রাণ বিগলিত হয় না। সে কেন এমন কঠিন হইল বলিতে পার? কিসে তাহার দয়া হয় জান? যাহার জন্য লোকে মরে, সে কেন দয়া করিতে জানে না? আচ্ছা—আচ্ছা কতদিনে তাহার দয়া হয়, তাহা আমি না দেখিয়া ছাড়িব না। কাঁদিব, ছটফট করিব, তথাপি মরিব না।

"বাঁশী বাজিল না আর।
বাজিবে আশায়, থাকিব বাঁচিয়া, দেখিব কতই
নিঠুর পরাণ তার॥
তবু—বাঁশী বাজিল না আর।"

শ্যামলাল বলিলেন,—বিধুমুখি! ম ভুল বুঝিতেছ। ভক্তি থাকিলে, প্রাণের একাগ্রতা হইলে, মন তদ্গত হইলে, বাঁশীর তান শুনিতে পাওয়া যায়। তুমি প্রাণকে স্থির কর, হতাশ হইও না। নিশ্চয়ই বাঁশী শুনিতে পাইবে।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"সত্য বলিতেছ? সত্যই বলিতেছ বই কি! তবে বাঁশী শুনিতে পাইব? শুনিতে পাইতেছি কই?"

পাগলিনী কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। তখন শ্যামলাল উন্মাদিনীর নিকটে গিয়া বলিলেন,—"বিধুমুখী, স্থির হও! কাঁদিলে যে বাঁশী বাজায় সে দুঃখিত হইয়া চলিয়া যাইবে। তুমি মন স্থির কর, আমি নিশ্চয়ই তোমাকে বাঁশী শুনাইব।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"তবে না হয় আর কাঁদিব না তুমি বাঁশী শুনাও।"

শ্যামলাল বলিলেন,—শুনাইব, তুমি কিছু আহার করিবে কি?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"আহার—অনেক দিন, অনেক আহার করিয়াছি। আহার করিলে বাঁশী শুনিতে পাওয়া যায় না। আহার না করিয়া দেখিব, বাঁশী শুনা যায় কি না।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"না, তোমাকে কিছু আহার করিতে হইবে। আমি তোমাকে স্নান করাইয়া দিব, একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন

করাইয়া দিব, কিছু আহার করাইব, তাহার পর বাঁশী শুনিবার উপায় করিয়া দিব। যে বাঁশী বাজায় সে অপরিষ্কার, মলিন, বেশ-ভূষাহীন, কদাকার লোককে ভাল বাসে না; তাহাদের বাঁশী শুনাইতে চাহে না। তুমি আমার কথা শুন, বাঁশী শুনিতে পাইবে।”

বিধুমুখী বলিলেন,—“এ কথা সম্ভব বটে। তবে। তুমি আমাকে পরিষ্কার করিয়া দাও।”

শ্যামলাল বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন, তিনি বিধুমুখীর শুশ্রূষা করিবার ব্যবস্থা করিলেন বটে, কিন্তু তাহার উপায় কি? তাঁহার তৈল নাই, বস্ত্র নাই, জল নাই, খাদ্য নাই, পয়সা নাই, পীড়িতার শুশ্রূষা করেন কি প্রকারে। হঠাৎ তাঁহার একটা কথা মনে পড়িল। বিধুমুখীর আগমনের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে একদল বঙ্গদেশীয় যাত্রী কাশী পরিভ্রমণ করিতে করিতে, ক্লান্তি দূর করিবার অভিপ্রায়ে, শ্যামলালের আশ্রম সন্নিধানে বসিয়াছিল। শ্যামলালের সহিত তাহাদের অনেক কথা হইয়াছিল এবং তাহারা হয় ভিক্ষুক বা দুঃখী মনে করিয়াই হউক, অথবা জ্ঞানবান্ সন্ন্যাসী মনে করিয়াই হউক, শ্যামলালকে একটী সিকি দিয়া প্রণাম করিয়াছিল। শ্যামলাল সেই সিকি ফিরাইয়া লইবার জন্য বার বার তাহাদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাহারা কোন মতেই তাহা গ্রহণ করে নাই। শ্যামলালও তাহা স্পর্শ করেন নাই; মনে করিয়াছিলেন, কোন ভিক্ষুককে তাহা তুলিয়া লইতে বলিবেন। এক্ষণে দায়ে পড়িয়া তাঁহাকে ভিক্ষুক হইতে হইল। তিনি সেই সিকি তুলিয়া লইলেন। তাহার পর বিধুমুখীকে বলিলেন,—“তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি বাঁশীওয়ালাকে এখনই ডাকিয়া আনিতেছি।”

বিধুমুখী তখন ধীরে ধীরে হাততালি দিতে দিতে মৃদুস্বরে একটা গান গাইতেছিলেন। তিনি শ্যামলালের কথা শুনিলেন না, তাঁহার দিকে চাহিয়াও দেখিলেন না।

শ্যামলাল অত দ্রুত ভাবে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জ্বালা।

অতি অল্পকাল পরে শ্যামলাল এক কলসী জল, এক খুরী তৈল, কিঞ্চিৎ খাদ্য সামগ্রী লইয়া প্রত্যাগত হইলেন। বিধুমুখী তখনও পূর্ব্বাবস্থায় আসীনা, হাস্যমুখী এবং সংগীত নিরতা।

শ্যামলাল আসিয়াই বিধুমুখীর মাথায় খানিকটা তৈল ঢালিয়া দিলেন এবং হাত দিয়া তাহা বেশ করিয়া মাখাইয়া দিলেন। তখন বিধুমুখী মুখ ফিরাইয়া শ্যামলালের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং বলিলেন,—শ্যামলাল নিষ্ঠুর নহেন। যে বলে তিনি নিষ্ঠুর, সে মিথ্যাবাদী। তোমার অতিশয় দয়া। তবে তুমি বাঁশী বাজাও না কেন?”

শ্যামলাল বলিলেন,—“আমি তোমাকে বলিয়াছি, বাঁশী আবার বাজিবে। তুমি কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিলেই বাঁশী শুনিতে পাইবে।”

বিধুমুখী বলিলেন,—চুপ করিয়াই তো আছি। কত কাল চুপ করিয়া থাকিব? আর যে থাকা যায় না। এখন ঝগড়া না করিলে চলিতেছে না।”

শ্যামলাল তৈল মাখাইয়া, বিধুমুখীর মাথায় ভাণ্ড করিয়া ধীরে ধীরে জল ঢালিয়া দিলেন। তাহার পর আপনার গামছা দিয়া বিধুমুখীর গা মুছাইয়া দিলেন। তাহার পর স্বয়ং সেই ভিজা গামছা পরিয়া আপনার কাপড়খানি বিধুমুখীকে [illegible] দিলেন। বিধুমুখী কাপড় [illegible] না।

[illegible]

[illegible] আর আসিবে না। [illegible] আসিয়াছিল, অনেক দূর [illegible] আসিয়াছিল। তুমি কথা শুনলে না [illegible] যাইতেছে।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"না না, তাঁহাকে দাঁড়াইতে বল, আসিতে বল, আমি সব কথা শুনিব।"

বস্ত্র পরিবর্ত্তন হইলে শ্যামলাল বলিলেন,—"একটু খাও—তোমার জন্য খাবার আনিয়াছি—একটু খাও।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"খাব? কেন? অনেক খাইয়াছি। তুমি এখন অমৃত খাইয়াছ কি? তুমি মেয়ে মানুষের পায়ের লাথি খাইয়াছ। ছিঃ ছিঃ! তুমি আবার মানুষ! অমৃত খাওয়া তোমার কপালে ঘটে কি? তুমি যে কিছুই জান না! লাথি মারিলে অমৃত খাইতে পাওয়া যায়, ইহা তুমি জান কি? তাহা জানিলে এতদিন কত লাথি তুমি মারিতে। আর না, লাথিমার না! এঃ, তুমি কিছুই পার না।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"তোমাকে এখন কিছু আহার করিতেই হইবে। কথা না শুনিলে আমি বাঁশীওয়ালাকে তাড়াইয়া দিব।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"না না, তাহাকে তাড়াইয়া দিলে আমি মরিয়া যাইব। ডাক তাহাকে, শীঘ্র ডাক। কই কি খাইতে দিবে দেও।"

শ্যামলাল তখন একখানি বরফি লইয়া বিধুমুখীর হাতে দিলেন। বিধুমুখী বলিলেন,—"সত্যই তুমি কিছুই জান না। অমনই কিছু খাইতে আছে কি? প্রসাদ খাইতে হয়। তুমি প্রসাদ করিয়া দেও, নইলে খাইব কেন? তুমি এত বোকা না হইলে লাথি খাইতে পার, লাথি মারিতে পার না। প্রসাদ করিতে জান না?"

তখন বিধুমুখী একখানি বরফি লইয়া সহসা শ্যামলা[illegible] ধরিলেন। শ্যামলাল অগত্যা [illegible] অংশ [illegible] করিলেন। বিধুমুখী সেই ভুক্ত বরফি খণ্ড আপনার মুখে ফেলিয়া দিলেন এবং অতিশয় উৎসাহ ও আনন্দের সহিত গান ধরিলেন,—

"বাঁশী বাজিল আবার।
সে ধীর সমীরে, যমুনার তীরে, বাঁশী অতি ধীরে
ছাড়িল মধুর তান।
নীরব যমুনা, ধীরে বহে বায়ু, নিস্তব্ধ বিহঙ্গ,
পুলকে পূরিল প্রাণ॥
বাঁশী বাজিল আবার।"

শ্যামলাল দেখিলেন, আনন্দে উন্মাদিনীর শরীর কণ্টকিত হইয়াছে এবং মোহাবেশে তাঁহার নয়ন মুকুলিত হইয়াছে। শ্যামলাল বলিলেন,—"আর কিছু খাও, আর একটু খাইলে আরও ভাল করিয়া বাঁশীর গান শুনিতে পাইবে।"

বিধুমুখী অত্যন্ত বিরক্তভাবে বলিলেন,—"আঃ! কথা কহিতেছ কেন? চুপ করিয়া বাঁশী শুন এখন।"

বাঁশী বাজিল আবার।
শুন স্থির মনে, নড়িও না কেহ, রহ সাবধানে,
বাজিছে শ্যামের বাঁশী।
উথলে যমুনা, হাসিছে চাঁদিমা, বিহ্বল অবনী,
বাঁশী ঢালে সুধারাশি॥

পশুপাখী আদি, বৃক্ষলতা সব অবশ হইয়ে,
শুনিছে বাঁশীর ধ্বনি।
হাসায় কাঁদায়, প্রাণ কাড়ি লয়, সবে ক্ষিপ্ত হয়,
মোহময় বাঁশী শুনি॥
বাঁশী বাজিল আবার।”

শ্যামলাল দেখিলেন বিধুমুখী যেন নিদ্রাবেশে ঢলিয়া পড়িতেছেন। তিনি ডাকিয়া বলিলেন,—“বিধুমুখী, তুমি আর কিছু না খাইলে, বাঁশী-ওয়ালা” চলিয়া যাইবে বলিতেছে। তাহা হইলে এমন সুধাময় বাঁশীর রব তুমি আর শুনিতে পাইবে না।”

তখন সেই উন্মাদিনী অবশ শরীরে শ্যামলালের দেহের উপর ঢলিয়া পড়িলেন। শ্যামলাল জানিতেন, উন্মাদ রোগে, নিদ্রা বড় হিতজনক। অতএব বিধুমুখীর নিদ্রার ব্যাঘাত করা অবিধেয় বোধে, তিনি আর কোন কথা কহিলেন না; একটু নড়িয়া বসিলে, পাছে বিধুমুখীর নিদ্রাভঙ্গ হয় এই আশঙ্কায়, তিনি স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। শ্যামলালের দেহে দেহ স্থাপন করিয়া বিধুমুখী গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইলেন।

এইরূপ সময়ে সেই গৃহ-দ্বারে নীলরতন বাবুর মূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হইল। শ্যামলাল তাঁহাকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। নীলরতন বাবু নিকটে আসিলে, পাছে বিধুমুখীর নিদ্রা-ভঙ্গ হয় এই আশঙ্কায়, শ্যামলাল অতি মৃদুস্বরে সমস্ত ঘটনা বুঝাইয়া দিলেন। সমস্ত শুনিয়া নীলরতন বলিলেন,—“এক্ষণে ইঁহার শুশ্রূষার জন্ত অর্থ চাই, নানা প্রয়োজনীয় সামগ্রী চাই, লোকও চাই। আমাকে অনুমতি করুন, আমি সকলই পাঠাইয়া দিই।”

শ্যামলাল বলিলেন,—“জানি, না, ভগবানের কি বাসনা। তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে,আমাদের সাবধানতা বা ব্যবস্থা অনর্থক। একটা রুগ্না স্ত্রীলোকের সেবায় আমাকে নিযুক্ত হইতে হইবে, ইহা আমি জানিতাম না। নানাপ্রকার দ্রব্য সামগ্রী আমাকে আহরণ করিতে হইবে, ইহা আমি একবারও ভাবি নাই। কাহারও জন্য ব্যাকুল হইতে হইবে, ইহা আমি কখন মনে করি নাই! কিন্তু এই নিঃসহায় নারীর যত্ন করা তো ধর্ম্ম। আমি কর্ত্তব্য বিবেচনায় এই ভার গ্রহণ করিয়াছি। এ ভার আমি ছাড়িতে পারিব না। পুনরায় স্বাস্থ্যলাভ না করা পর্য্যন্ত আমাকে বিধুমুখীর জন্য নানা প্রকারে ব্যস্ত হইতে হইল। ইহাই বোধ হয় ভগবানের বাসনা।”

নীলরতন বলিলেন,—“তাহা হইলে আপাততঃ কি কি পাঠাইব? কোন্ কোন্ সামগ্রীর এখনই প্রয়োজন হইবে?”

শ্যামলাল নানাপ্রকার আশু প্রয়োজনীয় সামগ্রীর নাম করিয়া বলিলেন,—“মহাশয় সবই জানেন। এ অবস্থায় যে যে সামগ্রীর আবশ্যক হইবে, আপনি তাহা বুঝিয়া পাঠাইবেন। আমি আর কি বলিব? আমি বহুদিন আপনার কৃপায় ভিক্ষা করার দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছি। কিন্তু এখন আমাকে এই পীড়িতা নারীর জন্য আবার ভিক্ষা করিতে হইতেছে। আপনি দয়া করিয়া আমার প্রতি কৃপা করিবেন; অধমকে আবশ্যক মত জিনিষ-পত্র ও কিঞ্চিৎ অর্থ ভিক্ষা দিবেন; আর সময়ে সময়ে আমার সন্ধান করিবেন।”

নীলরতন বাবু বলিলেন,—“এজন্ত আপনি এরূপভাবে কথা কহিতেছেন কেন? আপনার সকল প্রয়োজনে সাহায্য করিতে আমরা সদা প্রস্তুত। আপনি কোন উপকারই গ্রহণ করেন না, ইহাই আমাদের দুঃখ। আমি এখনই জিনিষ-পত্র পাঠাইয়া দিতেছি; টাকা লইয়া শীঘ্রই স্বয়ং আসিতেছি। আমি বার বার সংবাদ লইব, এ কথা বলাই বাহুল্য।”

নীলরতন বাবু প্রস্থান করিলেন। অনতি-কাল পরে বিধুমুখীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি শ্যামলালের দেহ হইতে আপনার দেহ উঠাইয়া বলিলেন,—"বাঁশী সমান বাজিতেছে। বাঁশী শুনিতে শুনিতে আমি বিহ্বল হইয়াছি? যে বাঁশী বাজাইতেছে, তাহাকে দেখিবার জন্ম ব্যাকুল হইয়াছি। তাহাকে তুমি কখন দেখি-য়াছ কি? বোধ হয় তাহার মত সুন্দর ত্রিভু-বনে আর কিছুই নাই।

"বাঁশী বাজিল আবার।
যাঁহার বাঁশরী, ছাড়ে এই তান,
না জানি সে জন কি রূপ রূপের নিধি।
চল যাই সখি, হেরিতে তাঁহার,
যদি দিয়াছেন দয়া করি আঁখি বিধি॥
বাঁশী বাজিল আবার॥"

শ্যামলাল বলিলেন,—"তুমি যদি আমার কথা শুন, তাহা হইলে সেই রূপের নিধিকে দেখিতে পাইবে।"

বিধুমুখী সাগ্রহে বলিলেন,—"দেখিতে পাইব? তোমার কথা শুনিব বই কি। তোমার বড় দয়া। তোমার কথা শুনিব না? বল কি, কথা শুনিতে হইবে?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"তুমি আর কিছু আহার কর, তাহা হইলেই যে বাঁশী বাজাই-তেছে তাহাকে দেখিতে পাইবে।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"আবার আহার কেন? আমি দেবতার প্রসাদ খাইয়া অমর হইয়াছি। আবার আহার করিব কেন? আহারে তো আর আয়োজন নাই।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"কথা না শুনিলে, যে বাঁশী বাজায় সে বড় দুঃখ করে, অভিমান করে। তাহাকে দুঃখিত করা উচিত কি?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"তা কি করা যায়? প্রাণ দিতে পারা যায়, কিন্তু তাহার একটু বিরস বদন দেখিতে পারা যায় না। কিন্তু সে দুঃখ করিবে, অভিমান করিবে, এ কথা তুমি জানিলে কিরূপে? তুমি কি তাহাকে চেন? তুমি কি তাহাকে দেখিতে পাও? আমাকে একবার দেখাইয়া দিতে পার?"

"শ্যামলাল বলিলেন,—"পারি। তুমি যদি আমার কথা শুন, তাহা হইলেই দেখাই-বার উপায় করিতে পারি।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"তোমার সহিত তাহার এত ঘনিষ্ঠতা! তুমি যাহা বলিবে তাহাই সে করিবে? তুমি তো খুব সুখী। তোমার সুখের একটু ভাগ দেও না।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"আমার সুখের সমান ভাগ তোমাকে দিব, তুমি আমার কথা শুনিয়া কিছু আহার কর।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"তুমি কেবল আহার আহার বল কেন? তোমার কি আর কোন কথা নাই? তোমার সহিত বাঁশীওয়ালার ভাব হইল কেন? বাঁশীওয়ালাকে প্রতিদিন তুমি দেখিতে পাও? বাঁশীওয়ালা কোথায় থাকে তুমি জান? আমাকে সেখানে সঙ্গে করিয়া লইয়া চল না—দোহাই তোমার।"

বিধুমুখী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, অগত্যা শ্যাম-লালকেও উঠিয়া দাঁড়াইতে হইল। হঠাৎ শ্যামলালের হাত ছাড়িয়া দিয়া বিধুমুখী এক-বার সরিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর বলিলেন,—"সে—সে বাঁশীওয়ালা তুমিই নও তো? তোমার হাতে হাত দিয়া আনন্দে আমার প্রাণ ভরিয়া গেল কেন? সোহাগে হৃদয় পূর্ণ হইল কেন? কি সুগন্ধ! কি দিব্য-কান্তি! তুমিই সেই বাঁশীওয়ালা। তাই তুমি তাঁহাকে যখন ইচ্ছা তখন ডাকিতেছিলে; ইচ্ছায় সরাইয়া দিতেছিলে। তাই তুমি তাহার দুঃখ অভিমানের জমাখরচ রাখিয়া

থাক। সে তবে তুমি? হাঁ, তুমিই বাঁশী-ওয়ালা। আহা আহা কি রূপ! এত রূপ তোমার! আবার বাজাও—আরও বাজাও। আহা কি শুনাইলে! মরি মরি কি দেখাইলে! তোমার বাঁশী শুনিতে—তোমার রূপ দেখিতে যেন কখন বঞ্চিত হইতে না হয়। তোমার চরণে ধরি, আর ফাঁকি দিও না। দিবে? দিবে? তোমার পা ছাড়িব না।'

সহসা পাগলিনী ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় ভূতলে পড়িয়া গেলেন এবং কাতর ভাবে শ্যামলালের চরণদ্বয় জড়াইয়া ধরিলেন। শ্যামলাল তাঁহাকে আগ্রহ সহকারে উঠাইতে গিয়া দেখিলেন, অভাগিনী বিধুমুখীর চৈতন্য নাই।

একাদশ খণ্ড—দারিদ্র্য।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গুরু মহাশয়।

বর্দ্ধমান জেলায় দামোদর নদের তীরে বনপুরনামে একটী নাতিবৃহৎ পল্লীগ্রাম আছে। গ্রামের পথ ঘাট বেশ পরিষ্কার, অধিবাসিগণের বাসগৃহগুলি তৃণাচ্ছাদিত; কেবল জমিদারের পূজার দালান ও বসু বাবুদিগের বাটীর একাংশ পাকা। গ্রামে ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর লোকেরই বাস আছে। বনপুরে, ইতর জাতীয় লোকের অপেক্ষা, ভদ্র অধিবাসীর সংখ্যা অধিক বলিয়া বোধ হয়। গ্রামে বিশেষ ধনশালী লোকের বাস না থাকিলেও অনেকেরই গ্রাসাচ্ছাদন সম্বন্ধে কাহারই কষ্ট নাই। দোল-দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়া-কর্ম্ম অনেকের বাটীতেই হইয়া থাকে। অধিবাসিগণের অনেকেই কৃষি-কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। অনেকে স্বয়ং হলচালন করিয়া কৃষিকর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন, অনেকে কৃষাণের সাহায্যে ভাগে চাষ করেন। প্রায় সকল লোকেরই বাটীতেই দুই চারিটী ধানের গোলা, বিচালীর গাদা, গোশালা, গরুর গাড়ী-বলদ দৃষ্ট হয়।

বনপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। তাঁহার বয়স চল্লিশ ছাড়াইয়াছে, দেহ সুগঠিত ও বলশালী। নরসুন্দরের নিপুণতার সাহায্যে [illegible] করিয়া তাঁহার বদন শ্মশ্রু গুম্ফ পরিশূন্য হইয়া থাকে। তাঁহার [illegible] [illegible] কিছু নাই। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কৃষিকর্ম্ম আছে, কুড়িটা ধান্যপূর্ণ বড় বড় গোলা আছে, ধান কর্জ্জ দেওয়ার কারবার আছে, অল্প জমিদারী আছে। সকলসমেত তাঁহার বার্ষিক আয় প্রায় পাঁচ হাজার টাকা। এ আয় অত্যন্ত সামান্য বলিয়া বিবেচিত হইলেও, বনপুরের জনগণের বিবেচনায় ইহা বিপুল। গ্রামের আর কোন লোকেরই আয় এত অধিক নহে। চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিরহঙ্কার, শিষ্ট ও শান্ত ব্যক্তি। কিন্তু তাঁহার এক ভয়ানক দোষ, তিনি বড় একগুঁয়ে। ভাল হউক, মন্দ হউক, যে কথা তাঁহার মাথায় একবার প্রবেশ করিবে, তাহা তিনি কোন মতেই ছাড়িবেন না এবং সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে বিরত হইবেন না। এরূপ লোক প্রায়ই বড় কাণপাৎলা হইয়া থাকে। কেহ কোন কথা একটু আগে শুনাইয়া বলিয়া রাখিলে, চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রায়ই তাহা অভ্রান্ত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং নিতান্ত একগুঁয়ে-হেতু, পরে তাহাকে

অকাট্য বিরোধী প্রমাণেও কর্ণপাত করিতেন না। গ্রাম মধ্যে মাধব চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রতাপ ও আধিপত্য অসাধারণ। গ্রামের জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, থানা পুলিশ সকলই চক্রবর্ত্তী মহাশয়। সর্ব্বপ্রকার বিরোধই চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দ্বারা মীমাংসিত হয়। চক্রবর্ত্তী মহাশয় দয়ালু ও পরোপকারী। কাহাকেও নিতান্ত অক্ষম বুঝিলে তিনি তাহার নিকট প্রাপ্য ধান ছাড়িয়া দেন; কাহাকেও বিপন্ন বুঝিলে তিনি তাহার বিধিমতে সাহায্য করেন; কাহারও আপদ বিপদ হইলে তিনি তাহার বাটীতে যাতায়াত করিয়া সুব্যবস্থা করেন। তিনি এখনকার হিসাবে লেখা পড়া জানেন না। ইংরাজি পাঠ করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। সামান্য সংস্কৃত তিনি পড়িয়াছিলেন। বাঙ্গালা লেখা পড়াও শিখিয়াছিলেন, তাঁহার হাতের বাঙ্গালা অক্ষর অতি সুন্দর। জমা খরচ বিষয়ে তিনি অদ্বিতীয়, জমিদারী কাগজ পত্রে অতিশয় অভিজ্ঞ। বাঙ্গালা সংবাদ পত্রাদি তিনি পাঠ করিতেন। বাঙ্গালা পরিচিত গ্রন্থকারের পরিচিত পুস্তক মাত্রই তিনি পাঠ করিয়াছেন। বাঙ্গালায় অনুবাদিত অনেক আইনগ্রন্থও তিনি দেখিয়াছেন।

তাঁহার বাটীতে দোল, দুর্গোৎসব, ইত্যাদি অনেক উৎসব হইয়া থাকে। তদুপলক্ষে কোন আড়ম্বর হয় না, কিন্তু অনেক লোক জন আহার করে। চিরাগত সামাজিক নিয়ম পালনে চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিয়ত সচেষ্ট, কিন্তু ইহা তাঁহার জানা ছিল যে, তিনি কোন নিয়মের ব্যভিচার করিলে, সমাজের কোন লোক কোন কথা কহিতে সাহস করিবে না; স্বকীয় প্রভুতার বলে, স্বার্থ সাধনার্থ আবশ্যক হইলে একগুঁয়েমি হেতু কখন কখন তিনি সামাজিক ব্যবস্থারও বিপর্য্যয় করিতে সাহসী হইতেন।

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে কিছুদিন হইতে একটী পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে। গ্রামে একটী এণ্ট্রান্স স্কুল আছে; কিন্তু তাহাতে বেশী বাঙ্গালা পড়া হয় না এবং দেশীয় প্রণালী ক্রমে অঙ্কাদি শিক্ষা হয় না। এজন্য চক্রবর্ত্তী মহাশয় যত্ন করিয়া বাটীতে একটী পাঠশালা বসাইয়াছেন। পাঠশালায় অনেক গুলি ছাত্র জুটিয়াছে। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পূজার বাড়ীতে পাঠশালার স্থান হইয়াছে। দালানটী পাকা; তাহার সম্মুখে তৃণাচ্ছাদিত ও তাল বৃক্ষের খুটির উপর স্থাপিত এক অতি বৃহৎ আটচালা আছে। সেই স্থানেই পাঠশালা বসিয়া থাকে, এক ব্রাহ্মণ যুবা এই পাঠশালায় গুরুমহাশয় হইয়াছেন। গুরুমহাশয় যেমন রূপবান্ তেমনি গুণবান্। তাঁহার শিক্ষাদান পদ্ধতি বড়ই বিচিত্র; গ্রামের লোক তাঁহাকে সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া বিশ্বাস করে। ছাত্রগণ এই গুরুমহাশয়ের একান্ত অনুরাগী, এবং গ্রামের যাবৎ নরনারী তাঁহার পরমভক্ত।

গুরুমহাশয় কাহারও নিকট কোন বেতন গ্রহণ করেন না; ছাত্রদিগকেও কোন নিয়মিত বেতন দিতে হয় না। যে ছাত্র অনায়াসে যখন যাহা দিতে পারে, তিনি তাহাই গ্রহণ করেন। অনেক ছাত্র কখনই কিছু দেয় না। যে কিছু দিতে পারে এবং যে কখনই কিছু দিতে পারে না, উভয়েই সমান আদরে ও সমান যত্নে শিক্ষা লাভ করে। গুরুমহাশয় কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করেন না। প্রাপ্তির তারতম্য অনুসারে তাঁহার ছাত্রগণের প্রতি স্নেহ ও আগ্রহের কোন তারতম্য হয় না। কোন ছাত্র কোন মাসে দুই এক আনার অধিক বেতন দিলে তিনি তাহা গ্রহণ করেন না।

গুরুমহাশয় মিষ্টভাষী, হাস্যবদন ও কর্ত্তব্যপরায়ণ। প্রাতে দুই ঘণ্টা ও বৈকালে তিন

ঘণ্টা কাল তিনি পাঠশালায় ছাত্রদিগকে পাঠ দেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ও পরে, তিনি গ্রামের বাহির হইয়া গ্রামস্থ তাবতের তত্ত্বানুসন্ধান করেন। প্রয়োজন হইলে তিনি অতি প্রাতে আসিয়া কাহারও জন্য ডাক্তার কবিরাজ ডাকিয়া আনেন, মধ্যাহ্নে আসিয়া কাহারও জন্য বাজার হইতে দ্রব্য সামগ্রী কিনিয়া আনিয়া দেন, রাত্রি জাগিয়া কোন পীড়িত ব্যক্তির শুশ্রূষা করেন। এক বাটীতে একটী আত্মীয় স্বজন-শূন্য বৃদ্ধা বাস করেন। কাষ্ঠাভাবে তিনি আজি পাক করিতে পাইবেন না দেখিয়া, গুরুমহাশয়, কুঠার লইয়া তাঁহার কাষ্ঠ ছেদন করিয়া দিলেন। স্থানান্তরে এক ব্যক্তি জলাভাবে কষ্ট পাইতেছে দেখিয়া, গুরুমহাশয় নদী হইতে প্রকাণ্ড এক কলসী জল তুলিয়া আনিলেন। আর এক স্থানে এক দরিদ্র বিমর্ষবদনে বসিয়া আছে দেখিয়া গুরুমহাশয় সহানুভূতিব্যঞ্জক মধুর হাসির সহিত মিশাইয়া গোপনে তাহার হাতে আটটী পয়সা দিয়া প্রস্থান করিলেন। বসুদের বাটীতে ছেলের অন্নপ্রাশন—বড় সমারোহ; গুরুমহাশয় তাহার প্রধান কর্ত্তা—সকল ব্যবস্থাপক। রায়দের গৃহিণীর শেষকাল আগতপ্রায়। তাঁহাকে সজ্ঞানে তীরস্থ করিতে হইবে। আত্মীয়গণ গুরুমহাশয়ের অনুমতি ও ব্যবস্থার প্রতীক্ষা করিতেছেন। অল্প কালের মধ্যে নবাগত গুরুমহাশয় গ্রামের যেন ইষ্ট দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাকে দর্শন করিলে বালকেরা নৃত্য করে, প্রবীণগণ শুভদিন বলিয়া বোধ করে, নবীনাগণ দেবদর্শন হইল বলিয়া জ্ঞান করে, প্রবীণাগণ ভক্তিসহকারে প্রণাম করে। রামা চাঁড়ালের স্ত্রী গুরুমহাশয়ের দিদি, রামী গোয়ালিনী তাঁহার মাসী, হরা কলু তাঁহার খুড়া, সদী কৈবর্ত্তিনী তাঁহার জেঠাই মা, আনন্দ রায় তাঁহার দাদা, ভজহরি বসু তাঁহার বাবা ইত্যাদি ক্রমে গ্রামের ইতর ও মহৎ সকল ব্যক্তির সহিত গুরুমহাশয় কোন না কোন সম্বন্ধে বদ্ধ।

গুরুমহাশয়ের কোথায় বাস, তাহা গ্রামের লোকে জানে না। গুরুমহাশয়কে সে সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আপনার পূর্ব্ববৃত্তান্ত ভাল করিয়া বলিতে ইচ্ছা করেন না। গ্রামের লোকেরা সে সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করা অবৈধ স্থির করিয়াছে। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদের শুভাদৃষ্টক্রমে এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ-যুবা বনপুরে শুভাগমন করিয়াছেন।

গুরুমহাশয় একাকী আইসেন নাই। সঙ্গে তাঁহার রূপে লক্ষ্মী ও গুণে সরস্বতী পত্নী আছেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীর সন্নিকটে গুরুমহাশয় এক সামান্য খড়ের ঘর প্রস্তুত করাইয়াছেন। সেই ঘর তাঁহার বাসস্থান। তিনি ও তাঁহার পত্নী একান্ত নির্লোভ। চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও গ্রামের অন্যান্য অনেক ভদ্রলোক তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র উৎকৃষ্টতর বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা দীনভাবে সামান্য স্থানে বাস করিয়াই পরিতৃপ্ত। সামান্য বস্ত্র ব্যবহারে ও শাকান্নমাত্র ভোজনেই তাঁহাদের পরম সন্তোষ। লোকের বাড়ীতে ক্রিয়াকর্ম্ম হইলে ব্রাহ্মণদ্বারা প্রচুর উৎকৃষ্ট খাদ্য গুরুমহাশয়ের বাটীতে প্রেরিত হয়; কিন্তু গুরুমহাশয় ও তাঁহার পত্নী সেই খাদ্য দুঃখীদিগকে ডাকিয়া বিলাইয়া দেন। সাবিত্রীব্রত সমাপ্তি উপলক্ষে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গৃহিণী গুরুমহাশয়ের পত্নীর নিমিত্ত একখানি চেলীর কাপড় দিয়াছিলেন। গুরুমহাশয়ের পত্নী সাদরে তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু একদিনও তাহা ব্যবহার

করেন নাই। জগা কৈবর্ত্ত বড় গরীব; মেয়ের বিবাহে একখানি চেলী কিনিতে পারে নাই দেখিয়া, গুরুমহাশয়ের পত্নী চেলী-খানি তাহাকে গোপনে দান করিয়াছিলেন, ঘোষালদিগের বাটীতে এয়োসংক্রান্তি ব্রতোপলক্ষে গুরুমহাশয়ের পত্নীকে একযোড়া রূপার বালা দেওয়া হইয়াছিল, তিনি সানন্দে তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু একদিনও তাহা ব্যবহার করেন নাই। শামী মালিনী বড় দুঃখিনী, মেয়ে শ্বশুর বাটী পাঠাইবার সময় সে পূর্ব্ব ব্যবহৃত রং উঠা শাঁখা ছাড়া মেয়ের হাতে একযোড়া চুড়িও কিনিয়া দিতে পারিল না। শামী মেয়ের গলা ধরিয়া কাঁদিতেছে। গুরুমহাশয়ের প্রসন্নবদনা পত্নী তথায় উপস্থিত হইয়া সাদরে রূপার বালা যোড়াটী শামীর মেয়ের হাতে পরাইয়া দিলেন।

বনপুরের লোকেরা গুরুমহাশয়ের নাম জানিত না। তিনি গুরুমহাশয় নামেই সর্ব্বত্র পরিচিত ও সমাদৃত। তাঁহার পত্নীকে নরনারী তাহাতেই ঠাকুরাণী বলিয়া ডাকিত।

গ্রামের লোক অনেক সময়ে একস্থানে দুইচারিজন মিলিত হইয়া গুরুমহাশয় ও তাঁহার পত্নীর অপূর্ব্ব চরিত্রের সমালোচনা করিত। তাহারা বুঝিতে পারিত না, এই নবাগত ব্রাহ্মণদম্পতী মানুষ কি দেবতা? গ্রামের লোক যাহাই বুঝুক, আমরা জানি গুরুমহাশয়ই রাজা উমাশঙ্কর বাহাদুর এবং তাঁহার পত্নী রাণী অন্নপূর্ণা দেবী। কিন্তু তাঁহারা যখন প্রচ্ছন্ন পরিচয়ে বাস করিতেছেন, তখন আমরা তাঁহাদিগকে এই পরিচয়েই উল্লেখ করিব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ঠাকুরাণী।

বৈশাখ মাস। মধ্যাহ্নকালে গুরুমহাশয় পাঠশালার কর্ম্ম, তদনন্তর গ্রামের কোন কোন লোকের সংবাদাদি গ্রহণ করিয়া, আপনার ক্ষুদ্র আবাসে প্রত্যাগত হইলেন। তথায় আসিবার সময় পথে পার্শ্বস্থ এক দোকান হইতে তিনি কিছু চাউল, ডাইল, লবণ ও গুড় কিনিয়া আপনার উত্তরীয়ের স্থানে স্থানে বাঁধিয়া লইলেন। তিনি কুটীরে আসিবামাত্র এক সুরসুন্দরী যুবতী হাস্যমুখে তাঁহার সম্মুখে আসিলেন এবং ব্যস্ততাসহ বিবিধ সামগ্রীসহ তাঁহার উত্তরীয় বস্ত্র গ্রহণ করিলেন। সুন্দরী তাহার পর একখানি গামছা আনিয়া গুরুমহাশয়ের হস্তে দিলেন এবং একখানি তালবৃন্ত লইয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। সেই স্থানেই হস্তমুখাদি প্রক্ষালনার্থ জল এবং বসিবার নিমিত্ত একখানি দরমা পাতা ছিল। গুরুমহাশয় উপবেশন করিলেন, যুবতী মৃৎভাণ্ডস্থিত সেই জল ঢালিয়া গুরুমহাশয়ের চরণ ধৌত করিয়া দিলেন এবং স্বকীয় বস্ত্রাঞ্চলে ও কেশরাশির দ্বারা চরণ মার্জ্জনা করিয়া দিলেন। তাহার পর তজ্জাত্য ভূপতিত পাদোদক কিঞ্চিন্মাত্র পান করিয়া এবং বক্ষে ও মস্তকে স্থাপন করিয়া তিনি বলিলেন,—"একটু জল খাও।"

গুরুমহাশয় বলিলেন,—"কেন? তুমি আজি খুব বড় মানুষ হইয়াছ নাকি?"

ঠাকুরাণী বলিলেন,—"বড় মানুষ আমি চিরদিনই আছি। আজি একটা নূতন জিনিষ ছিল, তাই খাইতে বলিতেছিলাম।"

গুরুমহাশয় বলিলেন,—"কি জিনিষ?"

ঠাকুরাণী বলিলেন,—"আজি রঙ্গিণী দিদি নিজে হাতে তৈয়ার করিয়া খানিকটা ক্ষীর দিয়া গিয়াছেন। ক্ষীর লইয়া তিনি স্বয়ং আসিয়াছেন। বার বার কাতর ভাবে তোমাকে একটু খাওয়াইবার জন্য অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন। একটুও না খাইলে তিনি বড়ই দুঃখিত হইবেন। তুমি ক্ষীর খাইয়াছ কি না জানিবার নিমিত্ত তিনি আবার এখনই আসিবেন, বলিয়া গিয়াছেন।"

গুরুমহাশয় একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"বুঝিতে পারিতেছি না, কি কর্ত্তব্য। এরূপ সময়ে আমি তো অন্ন ভিন্ন আর কিছুই আহার করি না। আমি এখন একবার ক্ষীর আবার কিছুকাল পরে ভাত খাওয়া উচিত কি না বুঝিতে পারিতেছি না। তাহার পর যে সামগ্রী আমাদের নিত্য জুটে না, এবং যাহার কোন প্রয়োজন নাই, তাহা একদিন খাইবার আবশ্যক কি? কিন্তু রঙ্গিণী দেবী আমার আশ্রয়দাতা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এক মাত্র সন্তান। তিনি বিধবা, স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া এবং স্বয়ং বহন করিয়া যে সামগ্রী আমাদের কুটিরে আনিয়া দিয়াছেন, তাহা গ্রহণ না করা নিষ্ঠুরতা, আমি কিঞ্চিৎ ক্ষীর খাইতে সম্মত হইলাম, কিন্তু এখন নহে, আহারের সঙ্গে একটু ক্ষীর খাইব।"

ঠাকুরাণী বলিলেন,—"উত্তম ব্যবস্থা করিয়াছ। যে কোন সময়ে কিঞ্চিৎ আহার করিলেই তাঁহার সন্তোষের সীমা থাকিবে না।"

গুরুমহাশয় বলিলেন,—"কিন্তু তোমার কি বোধ হয় না, রঙ্গিণী দেবী পাঁচ সাত দিন হইতে আমাদের প্রতি একটু বেশী অনুগ্রহ করিতেছেন।"

ঠাকুরাণী বলিলেন,—"হইতে পারে, তিনি আমাদের প্রতি ইদানীং অধিক অনুরাগ দেখাইতেছেন।"

গুরুমহাশয় বলিলেন,—"তাঁহার এত অনুগ্রহ লাভের যোগ্যতা আমাদের কিছুই নাই। তবে এত দয়া কেন? আপাততঃ তোমার পাক করিবার শুষ্ক কাষ্ঠ আছে কি?"

ঠাকুরাণী বলিলেন,—"যাহা আছে তাহাতে এ বেলা কাজ চলিয়া যাইবে বোধ হয়। আর কথা কহিতে আমার সময় নাই, আমি রাঁধিতে যাই।"

সেই ক্ষুদ্র ঘরের পাশে আর একটু চালা বাগান আছে। তাহার চারিদিকে বৃক্ষলতাদির শুষ্ক শাখাপ্রশাখা রচিত বেড়া, গমনাগমনের পথে একখানি ঝাঁপ। চাউলাদি সম্বলিত উত্তরীয় হস্তে লইয়া ঠাকুরাণী সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং আনীত দ্রব্যাদি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখিয়া দিলেন। একটী দড়ির শিকায় দুইটী হাঁড়ি ঝুলিতেছিল, তাহাতেই পাক হয়। ঘরের এক দিকে একটী ক্ষুদ্র উনান আছে, আর এক দিকে একটু উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপের উপরে অতিরিক্ত তণ্ডুলাদি প্রয়োজনীয় পদার্থ রাখিবার নিমিত্ত দুইটী হাঁড়ি এবং তৈল লবণাদি রাখিবার দুইটী ক্ষুদ্র পাত্র, ঘরের আর এক দিকে একটী জলপূর্ণ মাটীর কলসী এবং একটী মাটীর ভাণ্ড।

ঠাকুরাণী অগ্নি আনিয়া রন্ধন আরম্ভ করিলেন। গুরুমহাশয় রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন,—"কেবল অন্ন পাক করিলেই হইবে। যখন ক্ষীর খাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে, তখন তাহারই সাহায্যে অনায়াসে ভাত খাওয়া যাইবে।"

ঠাকুরাণী বলিলেন,—"কেবল লবণ উপলক্ষ করিয়া যদি চলে, তাহা হইলে ক্ষীর পাইলে কেন না চলিবে? দেখি কতদূর কি হয়।"

গুরুমহাশয় পাকশালায় মাটীর কলসী এবং

বাহিরের আর একটা মাটীর কলসী লইয়া নদীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিয়ৎকাল পরে দুই স্কন্ধে দুই কলসী জল লইয়া গৃহাগত হইলেন। যথাস্থানে কলসী রক্ষা করিয়া এবং দেহের ঘর্ম্ম বিদূরিত করিয়া তিনি সন্নিহিত এক ক্ষুদ্র বাগানে প্রবেশ করিয়া শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণ করিতে লাগিলেন। এদিকে আহার্য্য প্রস্তুত হইল। ঠাকুরাণী নিকটে আসিয়া ডাকিলেন,—"ভাত হইয়াছে, শীঘ্র আইস। এত কাঠ কেন সংগ্রহ করিলে? কাঠের ব্যবসা করিবে না কি?"

গুরুমহাশয় বলিলেন,—"বেশী কাঠ ভাঙ্গিয়াছি কি? যদি বেশী হইয়া থাকে, তাহা হইলে হরির মাকে চারিটী দিতে হইবে। কাঠ অভাবে তাঁহার রাঁধার বড় কষ্ট হইতেছে।"

কাঠের বোঝা স্কন্ধে লইয়া গুরুমহাশয় বাটী আসিলেন এবং তৎসমস্ত অঙ্গনে স্থাপন করিয়া হস্ত পদাদি ধৌত করিলেন, গামছা খানি একবার কাচিয়া ফেলিলেন, এক খানি কাচা কাপড় পরিধান করিলেন, তাহার পর পাকশালায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"ক্ষুধিত ভিক্ষুক তোমার দ্বারে উপস্থিত; সুন্দরি! খাইতে দাও।"

তথায় কাঠের একখানি ক্ষুদ্র পিঁড়ি এবং তাহার সম্মুখে একখণ্ড কলার পাতা পাড়া ছিল। গুরু মহাশয় সেই আসনে উপবেশন করিলেন। ঠাকুরাণী পাতার উপর কদর্য্য তণ্ডুলের রক্তবর্ণ অন্ন, খানিকটা কাঁচকলা ভাতে এবং একটু লবণ স্থাপন করিলেন। গুরু মহাশয় যথ রীতি শ্রী-বিষ্ণু দেবতার উদ্দেশে সমস্ত খাদ্য নিবেদনাদি করিয়া আহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ঠাকুরাণী পত্রের এক দেশে খানিকটা ক্ষীর দিয়া গুরু ব্যজন করিতে লাগিলেন। লবণ ও কাঁচকলা ভাতে সহযোগে গুরু মহাশয় প্রচুর অন্ন উদরস্থ করিলেন। ঠাকুরাণী বলিলেন,—ক্ষীর দিয়া ভাত খাইবে না?"

গুরু মহাশয় বলিলেন,—ক্ষীর দিয়া খাইব বলিয়াই সব ভাত খাই নাই। দেখ দেখি, ক্ষীর, ঘৃত, মৎস্য, মাংস, বোধ হয়, কোন জিনিষ অভাবেই জীবন ধারণের ও শরীর রক্ষার অসুবিধা হয় না। আমরা অনেক দিন এই ভাবে কাল কাটাইতেছি কিন্তু সত্য কথা বলিব কি? আমার বড় ভয় হইয়াছিল, বুঝি তোমার স্বাস্থ্য, তোমার অলৌকিক রূপলাবণ্য এই অবস্থান্তরে ধ্বংস হইয়া যাইবে। কিন্তু তোমার স্বাস্থ্য বা শরীর কোনরূপ অভাব হওয়া দূরে থাকুক, আমি দেখিতেছি, তোমার অতুলনীয় সৌন্দর্য্য এই দুঃখ-দুরবস্থায় আরও যেন শোভাময়, আরও অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। আর আমার কথা বলিব কি? আমার দেহ যেন চতুর্গুণ অধিক বলশালী ও কর্ম্মিষ্ঠ হইয়াছে; আর আমার মাংসপেশী যেন আরও দৃঢ় ও কঠিন হইয়া উঠিতেছে।"

ঠাকুরাণী বলিলেন,—"সে সকল কি হইয়াছে তাহা আমি জানি না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা বড় সুখে আছি। আমি জীবনে কখন এত সুখভোগ করিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না। একটী বিষাদ জনক ঘটনা ব্যতীত, গত কালের কোন বিষয়েরই নিমিত্ত দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিবার প্রয়োজন হয় না; বরং যেন বিগত সকল অবস্থার অপেক্ষা আমি বরং এক্ষণে অধিকতর ভাগ্যবতী হইয়াছি বলিয়া আমার মনে হয়।"

একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ঠাকুরাণী বদন বিনত করিলেন। গুরু মহাশয় কোন উত্তর দিবার রঙ্গিণী দেবী সেই ক্ষুদ্র কুটীরে প্রবেশ করিলেন।

রঙ্গিণী বিধবা—ব্রহ্মচারিণী। তাঁহার বয়স এক্ষণে ঊনবিংশ বর্ষ। দশম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাঁহার বিবাহ হয় এবং সেই বিবাহের এক মাস পরেই তাঁহার স্বামী লোকান্তরে গমন করেন। তদবধি রঙ্গিণী ভূষণ ধারণ করেন না, নিরামিষ একাহার করেন, স্থূল বস্ত্র পরিধান করেন, কম্বলশয্যায় শয়ন করেন, এবং পূজা পাঠ ব্রতনিয়মাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন।

রঙ্গিণী সুন্দরী-শিরোমণি; তাঁহার দেহের বর্ণ চাঁপা ফুলের ন্যায়। তাঁহার কলেবর পূর্ণায়ত ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। তিনি যেন একটু কৃষকায়া, কিন্তু তাহাই যেন তাঁহার অধিকতর শোভার কারণ হইয়াছে। তাঁহার দৃষ্টি সদা নত ও কুটিলতা বর্জ্জিত। তিনি দৈহিক পারিপাট্য সাধনে নিতান্ত অমনোযোগী ও বিলাসিতা সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন। তাঁহার মস্তকস্থিত কেশরাশি তৈলহীন, উজ্জ্বলতা-শূন্য ও আলুথালু ভাবে নানা দিকে নিপতিত। কিন্তু কেশের ও দেহের এই বিসদৃশ রুক্ষ ভাব তাঁহার মূর্ত্তির উপর এক অলৌকিক মহিমা ও তেজের জ্যোতিঃ আনয়ন করিয়াছে। তাঁহাকে দেখিলে শোভাময়ী উন্মাদিনী, অথবা জ্যোতির্ম্ময়ী উদাসিনী বলিয়া ভক্তি করিতে ইচ্ছা করে।

রঙ্গিণী দেবী মাধব চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের একমাত্র তনয়া। সন্তান সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অদৃষ্ট বড়ই মন্দ। তাঁহার অন্য সন্তানাদি নাই, একমাত্র কন্যাও বিধবা। এই কন্যার প্রতি জনক জননীর স্নেহের সীমা নাই। বিধবা হইলেও, এই দুহিতা মাত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন এবং তনয়ার বাসনা পূরণ করাই আপনাদের জীবনের প্রধান ব্রত বলিয়া মনে করেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় শান্ত ও পরোপকারী ব্যক্তি; কিন্তু কন্যার প্রতি তাঁহার স্নেহ এতই প্রবল যে, রঙ্গিণী দেবীর বাসনা হইলে তিনি নিতান্ত নিন্দনীয় কার্য্যেও আপনার প্রধান ও পরম কর্ত্তব্য বলিয়া সাধন করিতে প্রস্তুত এবং নন্দিনীর পরিতৃপ্তির নিমিত্ত তিনি অত্যাচার স্রোতে বসুন্ধরা প্লাবিত করিতে সক্ষম।

সৌভাগ্যক্রমে রঙ্গিণী বড়ই ধর্ম্মপরায়ণা। কিন্তু তাঁহার চরিত্রে এক দোষ বড়ই প্রবল। তাঁহার বাসনা অলঙ্ঘনীয়। তিনি যখন যে কার্য্য সম্পাদনের সঙ্কল্প করিতেন, তাহা শেষ না করিলে তিনি ক্ষান্ত হইতেন না। কোন প্রতিবন্ধক, কোন অসুবিধা বাসনা-সিদ্ধি বিষয়ে তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারিত না। কন্যার আগ্রহাতিশয্য বুঝিলে, পিতামাতাও তৎসিদ্ধি বিষয়ে বাধ্য হইয়া সহায়তা করিতেন। যখন বৈধব্যের অল্পকাল পরে রঙ্গিণী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তখন জনক জননী অনেক নিষেধ, অনেক মিনতি, অনেক অশ্রুপাত করিয়া ছিলেন। কিন্তু কিছুকাল মাত্রও কন্যাকে সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করিয়া রাখিতে পারেন নাই। তাঁহাদের বাটীতে এক দূর-সম্পর্কীয়া বৃদ্ধা বাস করিতেন। তাঁহার আর কোন আশ্রয় ও আত্মীয় ছিল না। সম্পর্কে তিনি রঙ্গিণীর ঠাকুরুণদিদি হইতেন, নাতিনীর যৌবনোদ্গম হইলে তিনি এক দিন পরিহাস করিতে করিতে রঙ্গিণীর সহিত একটা কুৎসিত রসিকতা করিয়াছিলেন। ক্রুদ্ধা চক্রবর্ত্তী তনয়ার প্রতাপে সেই বৃদ্ধাকে চিরদিনের মত সে আশ্রয় হইতে নির্ব্বাসিত হইতে হইয়াছিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহাকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য করিবেন মনঃস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু কন্যা তাহাও করিতে দেন নাই। রঙ্গিণীর অভিপ্রায় ও সঙ্কল্প সকল সময় সমান থাকিত না। যে কার্য্য তিনি অদ্য বড় ভাল বলিয়া মনে

করিতেন, কিছুকাল পরে হয় ত তাহা একান্ত নিন্দনীয় বলিয়া জ্ঞান করিতে পারিতেন। তাঁহার সহিত কথা কহিতে হইলে তাঁহার স্বজনগণ বড়ই সঙ্কোচ বোধ করিতেন। মহাভারত পড়িয়া তাঁহার সংস্কার জন্মিয়াছিল, দ্রৌপদী এ ভূমণ্ডলে অতুলনীয়া নারী। আবার কিছুকাল পরে তিনি বলিতেন দ্রৌপদী মহাভারতের কলঙ্ক। যে নারী অনায়াসে পঞ্চপতি গ্রহণ করিয়াছিল, সে তো ব্যভিচারিণী। তাঁহার মতামত সততই এরূপ পরিবর্ত্তন পরিগ্রহ করিত। পিতামাতা একমাত্র কন্যার সকল মতেরই সমর্থন করিতেন এবং সকল সঙ্কল্প-সিদ্ধির সহায়তা দিতেন। এইরূপে রঙ্গিণী প্রভুতা, আধিপত্য ও স্বাধীনতাই শিক্ষা করিয়াছিলেন; বিনয়, নম্রতা ও পরকীয় বাসনানুবর্ত্তিতা শিক্ষা করিবার তাঁহার কোন সুযোগ হয় নাই।

মধ্যাহ্নকালে সৌন্দর্য-প্রদীপ্ত-কায়া এই বিধবা ব্রহ্মচারিণী সেই দিন গুরুমহাশয়ের কুটীরে প্রবেশ করিলেন। ঠাকুরাণী উঠিয়া তাঁহাকে সমাদর করিলেন। রঙ্গিণী সে দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না। ভোজন-নিরত গুরুমহাশয় বলিলেন,—"এ অধমদিগের প্রতি আপনার দয়ার সীমা নাই। আপনি স্বহস্তে ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া আমাদের দিয়া গিয়াছেন, আবার কৃপা করিয়া এই রৌদ্রে আমাদের দেখিতে আসিয়াছেন।"

গুরু মহাশয়ের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রঙ্গিণী হাস্য করিলেন। ঠাকুরাণী বলিলেন,—"দীনের প্রতি দয়া প্রদর্শনই মহতের কার্য্য। আপনি পুণ্যময়ী। আপনাকে দর্শন করিলেও পুণ্য হয়।"

ঠাকুরাণীর দিকে রঙ্গিণী বিরক্তিসূচক তীব্র দৃষ্টিপাত করিলেন। সে দৃষ্টি ঠাকুরাণীর অন্তস্তল বিদ্ধ করিয়া দিল। তিনি সভয়ে অধোমুখ হইলেন। গুরু মহাশয় রঙ্গিণীর সেই দৃষ্টি এবং তজ্জন্য ঠাকুরাণীর ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াছেন।

রঙ্গিণী বলিলেন,—"আপনি ক্ষীর খাইতেছেন দেখিয়া সুখী হইলাম, আপনাকে একটা কথা বলিব বলিয়াই এ অসময়ে আমি এখানে আসিয়াছি।"

গুরুমহাশয় বলিলেন,—"আজ্ঞা করুন।"

রঙ্গিণী বলিলেন,—"কথা বলিতে অনেকক্ষণ সময় লাগিবে। এখানে তাহার সুযোগ হইবে না। আপনি দয়া করিয়া একবার আমাদের বাটীতে যাইবেন কি?"

গুরু মহাশয় বলিলেন,—"কেন যাইব না? কখন্ যাইতে হইবে আজ্ঞা করুন।"

রঙ্গিণী বলিলেন,—"আজি সন্ধ্যার পর।"

গুরুমহাশয় একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"আমি সন্ধ্যার পর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট যাইব। তিনি যদি আমাকে সে সময় সঙ্গে লইয়া আপনার নিকট গমন করেন, তাহা হইলে অবশ্যই সাক্ষাৎ হইবে।"

রঙ্গিণী একটু অধোমুখে চিন্তা করিলেন। তাহার পর গুরু মহাশয়ের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া একটু হাস্য করিলেন। তাহার পর বলিলেন,—"সেই ভাল কথা। ভুলিবেন না যেন। আমি এখন আসি।"

গুরুমহাশয় বলিলেন,—"আচ্ছা।"

রঙ্গিণী যাইতেছেন দেখিয়া ঠাকুরাণী তাঁহার নিকটে গমন করিলেন এবং সাদরে জিজ্ঞাসিলেন,—"আবার কখন আপনার দেখা পাইব?"

অত্যন্ত বিরক্তির সহিত বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া রঙ্গিণী বলিলেন,—"জানি না।"

রঙ্গিণী চলিয়া গেলেন। ঠাকুরাণী নিতান্ত উদ্বিগ্নভাবে গুরুমহাশয়ের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। গুরুমহাশয়

বলিলেন,—"ভয়ের কথা কিছুই নাই। এই নারীর পরিণাম বিষাদজনক হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে।"

এ সম্বন্ধে অধিক কথা কহিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইল না।

গুরুমহাশয়ের কুটীর হইতে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটী পর্য্যন্ত কোন প্রশস্ত পথ নাই। একটা সামান্য সরু পথ আছে; তাহার দুইধারেই বন এবং মনুষ্যের বাসশূন্য। গুরুমহাশয়ের নিকট বিদায় লইয়া রঙ্গিণী দেবী সেই পথ দিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার অনেক চিন্তা। তিনি ভাবিতেছেন, এ সোণার দেহ, এ সুখের যৌবন কেন এরূপে নষ্ট করিব? যদি গুরুমহাশয়, যদি এ রূপগুণের দেবতা চক্ষুতে না পড়িত তাহা হইলে হয় তো এইরূপে জীবন কাটিতে পারিত, কিন্তু আর তো কাটে না। এখন আমি পাগল। যেমন করিয়া হউক এই দেবতার চরণে আমি বিকাইব। অধর্ম্ম হইবে? কে বলিতে পারে? নিন্দা হইবে? বাবার প্রতাপে ঢাকিয়া যাইবে। বাধা কিছু নাই। আজি আট দিন শয়নে স্বপনে এই চিন্তায় মজিয়া আছি। বাসনা মিটিবে না কি? অবশ্য মিটিবে। স্ত্রীর প্রতি আমার দেবতার বড় ভালবাসা। তাহাকে টিপিয়া মারিব। পথের কণ্টক দূর করিয়া ফেলিব।"

সহসা একটা বৃহৎ বৃক্ষের অন্তরাল হইতে এক বলিষ্ঠকায় পুরুষমূর্ত্তি বাহির হইল। তাহাকে দর্শন মাত্র রঙ্গিণী বলিলেন,—"একি এখানে যে?"

পুরুষ বলিল,—"আপনার অপেক্ষায়।"

"কেন?"

পুরুষ বলিল,—"আপনাকে একবার দেখিয়া চক্ষু জুড়াইব বলিয়া।"

রঙ্গিণী একটু হাসিয়া বলিলেন,—"তুমি যাহার জন্য পাগল তাহার উপায় কর।"

পুরুষ বলিল,—"তাহার উপায় শীঘ্রই করিব। আপনার সাহায্যে এবং আজ্ঞায় তাহার কিছুই বাকী থাকিবে না। কিন্তু আমি তাহার জন্য পাগল বলিলে আমার প্রতি অবিচার করা হয়। আমি যাঁহার জন্য পাগল, সে দেবী আমার সম্মুখে।"

রঙ্গিণী বলিলেন,—"সে বিচার পরে হইবে। আপাততঃ সে কার্য্য শেষ করিয়া ফেল। আবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।"

পুরুষ প্রস্থান করিল।

রঙ্গিণী আবার ভাবিতে লাগিলেন,—"বেশ লোক। কিন্তু গুরু মহাশয়ের মত রূপবান্ গুণবান্ নহে। যদি ভোগের পথে চলিতে হয়। তাহা হইলে ইহাকেও চাহি। একের হইয়া কেন থাকিব? দেখি আগে এদিকে কি হয়? এখন গুরু মহাশয় ছাড়া অন্য চিন্তার সময় নাই। এদিকে হতাশ হইলে যাহা হয় হইবে।'

রঙ্গিণী গৃহে ফিরিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রত্যূষে গুরু মহাশয় প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন; এমন সময় ঠাকুরাণী বিষণ্ণ বদনে তাঁহার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—"এ বিষয়ের কিছু স্থির করিলে না?

গুরু মহাশয় বলিলেন,—"কোন্ বিষয়ের ? তোমাকে চিন্তাকুল দেখিতেছি কেন ?"

ঠাকুরাণী বলিলেন,—চিন্তা একটু হইয়াছে সত্য। তুমি রুক্মিণীর সম্বন্ধে সুব্যবস্থা না করিলে চিন্তা দূর হয় কিরূপে ?"

গুরু মহাশয় বলিলেন,—"তাঁহার সম্বন্ধে কিরূপ সুব্যবস্থা করিতে তুমি পরামর্শ দেও। আমি তো কোনই পথ দেখিতেছি না।"

ঠাকুরাণী বলিলেন,—"তুমি তাহাকে বিবাহ করিতে পার না ?"

"না। বিধবা-বিবাহ শাস্ত্র-সঙ্গত হইলেও আমি সকল স্থলে তাহা শ্রেয় বলিয়া মনে করি না। বিশেষতঃ আমার প্রয়োজন ভান ; বিনা প্রয়োজনে পত্নীগ্রহণ বড়ই অধর্ম্ম।"

ঠাকুরাণী বলিলেন,—"তুমি পরের সুখ-সন্তোষের নিমিত্ত অতি দুরূহ কর্ম্ম সাধনেও পশ্চাৎপদ হও না। তোমার চরণ-লুণ্ঠিতা এক নারীর অনুরোধে তুমি তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবে না কেন ?"

গুরু মহাশয় বলিলেন,—"পতি পত্নীর সম্বন্ধ অতি পবিত্র। স্বার্থত্যাগ তাহার ভিত্তি, ধর্ম্মসাধন তাহার অঙ্গ, এবং কামনা ও লালসা-বিহীনতা তাহার চূড়া। এ ক্ষেত্রে তাহার কিছুই নাই। স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত, অধর্ম্ম-সাগরে সাঁতার দিতে দিতে কামনা ও লালসা নিবৃত্তি করাই রুক্মিণীর উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত সে পত্নী হউক, দাসী হউক, সঙ্গিনী হউক, সকল নাম গ্রহণে করিতেই সম্মত। তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার কল্পনা করিলেও পাপ হয়।

ঠাকুরাণী বলিলেন,—"পুরুষেরা উপপত্নী গ্রহণ করিলেও করিতে পারেন।"

গুরু মহাশয় বলিলেন,—"কে এ পাপ কথা বলিয়াছে ? উপপতি গ্রহণে নারীর যে অধর্ম্ম, উপপত্নী গ্রহণে পুরুষেরও সেই অধর্ম্ম। সমাজের যে সকল লোক এ সম্বন্ধে পুরুষের অধিকার আছে বলিয়া ঘোষণা করে তাঁহারা নারকী। এ বিষয়ে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, এ সম্বন্ধে নারীর পাপে সমাজের যত অনিষ্ট হয়, অনেক সময় পুরুষের পাপে সমাজে তাদৃশ অনিষ্ট না হইতে পারে।"

ঠাকুরাণী বলিলেন, "পর নারীকে উপ-পত্নীরূপে গ্রহণ করায় পাপ থাকিলে স্বয়ং ধর্ম্ম-ময় শ্রীকৃষ্ণ তাহা করিতেন না।"

গুরুমহাশয় বলিলেন,—"এ স্থলে সে পুণ্য-ময় পবিত্র প্রসঙ্গের উত্থাপন করিবার প্রয়োজন ছিল না। বস্তুবিক অবস্থা বিশেষে পর-নারীকে উপপত্নীরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে ভগবান স্বয়ং দৃষ্টান্তদ্বারা তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু সে দৃষ্টান্তের অনুরূপ ঘটনা এ জগতে আর কোথায় ঘটে ? সেরূপ হইলে তাদৃশ আচরণে পাপ হয় না। কিন্তু হায় ! এ পাপপূর্ণ বসুন্ধরায় সে দৃষ্টান্ত আর কি কখন ঘটে ? সেই পবিত্র লীলায় অণুমাত্র অনুরূপ আচরণে যাহাদের সামর্থ্য নাই, তাহারা তাহারই দোহাই দিয়া উৎকট পাপের তরঙ্গে ধরণী প্লাবিত করিয়া দিতেছে এবং শ্রীভগবানের পরম রমণীয় চিরনবীন ও পরম শিক্ষাপ্রদ আচরণে অকারণ কলঙ্ককালিমা প্রলিপ্ত করিতেছে।"

ঠাকুরাণী বলিলেন,—"রুক্মিণীর যে সকল ব্যবহারের বিবরণ তোমার মুখে শুনিলাম, তাহাতে বুঝিতেছি তিনিও তোমার নিমিত্ত পেসোয়ারিনী হইয়াছেন, তিনিও তোমার জন্য অসাধ্য সাধনে সক্ষম হইয়াছেন। তিনিও তোমার জন্য সর্ব্বত্যাগে প্রস্তুত হইবেন।"

গুরুমহাশয় বলিলেন,—"তুমি বড় ভুল বুঝিয়াছ। সে পাপনাশের সেই লালসা-বিহীনতা, সে অপার্থিব ত্যাগ স্বীকার, সে সুমধুর ধর্ম্মভাব, সে কল্পনাতীত

সে অতুলনীয় দৃঢ়তা, সে অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা, তাহার কথা কি বলিব? এখানে তাঁহার কিছুই নাই। তাহার পরিবর্ত্তে এখানে আছে কেবল পাপ, আবিলতা, আসক্তি, বাসনা, কুপ্রবৃত্তি ও কদর্য্য লিপ্সা। আহা! রঙ্গিণী দেবী যদি সে অপার্থিব প্রেমের কণিকামাত্র লাভ করিয়া উন্মাদিনী হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে গ্রহণ করার নামে শিহরিয়া উঠা দূরে থাকুক, তাঁহার দাস হইলেও আমার গৌরব বর্দ্ধিত হইত। তাঁহার সে ভাব হইলে আমাকে পাইবার নিমিত্ত তাঁহার কোন আকিঞ্চন করিতে হইত না; আমার সহিত সম্মিলন না হইলেও তিনি হৃদয়-মন্দিরে নিয়ত আমাকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাইতেন এবং আমার সহিত অবিচ্ছিন্ন সম্মিলনজনিত আনন্দ উপভোগ করিতে পাইতেন। আজি বেলা হইয়া গেল, আমার কর্ত্তব্য পালনে বিলম্ব হইতেছে। আমি এখন যাই, তোমার সহিত সময়ান্তরে এতদ্বিষয়ক কথোপকথন করিব।"

ঠাকুরাণী নতবদনে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। কিন্তু গুরুমহাশয়ের গমন করা হইল না, সম্মুখে রঙ্গিণী।

রঙ্গিণী আসিয়াই ঠাকুরাণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"আমি পাগল হইয়াছি, আমি মরিতে বসিয়াছি, আজি আট দিন আমার আহার নিদ্রা নাই। তোমার স্বামীর এই ভুবনমোহনরূপ আমাকে মাতাইয়া তুলিয়াছে। আমি ভাবিয়া স্থির করিয়াছি তোমার দয়া ভিন্ন আমার রক্ষার কোন উপায় নাই। তুমি আমাকে রক্ষা কর, আমি তোমার দাসী হইয়া থাকিব, তুমি আমাকে তোমার স্বামীর চরণ সেবা করিবার অধিকার দেও। তোমার কৃপা না হইলে আমার আর উপায় নাই।

ঠাকুরাণী বলিলেন,—"আপনি আসিবার পূর্ব্বেই আমি স্বামীর সহিত আপনার কথা কহিতে ছিলাম। যাহাতে তিনি কোনরূপে আপনাকে গ্রহণ করেন, আমি তাহারই পরামর্শ দিতেছিলাম। আমার স্বামী দেবতা, দেবতার পূজা সকলেই করিতে পারে। দেবচরণে অনেকেই পুষ্পাঞ্জলি দিতে পারে. স্বামী তোমার পূজা গ্রহণ করিলে আমি তুষ্ট হইব।"

তাহার পর উন্মাদিনী রঙ্গিণী সহসা গুরুমহাশয়ের হস্ত ধারণ করিয়া বলিল,—"তবে ঠাকুর তুমি আমার প্রতি কেন দয়া করিবে না?"

গুরুমহাশয় অতীব বিরক্তির সহিত বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—"ছিঃ ছিঃ! আপনি আমার হাত ছাড়িয়া দিউন। আপনি পর নারী, পরনারীর অঙ্গ স্পর্শ করাও মহাপাপ, আমি আপনাকে কল্য রাত্রিতে স্পষ্ট রূপে বলিয়াছি যে, আমার দ্বারা জ্ঞানতঃ কোন পাপকার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে না। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার হাত ছাড়িয়া দিউন।"

রঙ্গিণী হাত ছাড়িয়া দিল না, বলিল,—"নারীহত্যা কি মহাপাপ নহে? তুমি দয়া করিয়া চরণে স্থান না দিলে নারীহত্যার পাপগ্রস্ত হইবে।

গুরুমহাশয় বলিলেন,—"তুমি যদি ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার না করিয়া আত্মহত্যা কর, আমি সেজন্য কেন দায়ী হইব। কেহ যদি অন্যায় পূর্ব্বক পরের ধন চাহে, আর তাহা না পাইয়া ক্রোধ বা অভিমানে প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে অন্য কেহ তাহার পাপভাগী কেন হইবে?"

রঙ্গিণী হাত ছাড়িয়া দিল,—"তুমি পরের ধন। তুমি আমাকে আপন করিয়া লইতে পার না, ইচ্ছা করিলে তুমি সুব্যবস্থা করিতে পার।'

গুরুমহাশয় বলিলেন,—"তোমাকে বিবাহ করিবার উপায় নাই, তুমি বিধবা।"

রঙ্গিণী বলিল,—"আমাকে দাসী করিবার উপায় নাই কি ?"

গুরুমহাশয় বলিলেন,—"তাহারও উপায় নাই। উপপত্নীরূপে কাহাকেও গ্রহণ করা মহাপাপ ; অমি তাহা কথনই করিব না। আমি দরিদ্র ব্যক্তি, স্বচ্ছন্দে তোমার পিতার আশ্রয়ে জীবনপাত করিতেছিলাম, কেন তুমি কর্ত্তব্য-পথ ভুলিয়া পাপে মজিতেছ, দুই জনকেই ক্লেশ দিতেছ ? তুমি গৃহে যও, চিত্তকে স্থির কর। পাপ-প্রবৃত্তি ধর্ম্মানলে দগ্ধ করিয়া ফেল।"

রঙ্গিণী অধোমুখ, অনেকক্ষণ পরে বলিলেন —"আমি বুঝিয়াছি, আপনার পত্নী আছে বলিয়াই আপনি, আমাকে গ্রহণ করিতে অক্ষম। কিন্তু দেখুন আপনি, আমার রূপ আপনার স্ত্রীর অপেক্ষা কিসে কম ? লোকে আমাকে পরমাসুন্দরী বলিয়াই জ্ঞান করে, আমি লেখাপড়া জানি, আমার পিতার ধন সম্পত্তি আছে, সে সকলই আমার, আমি সমস্তই তোমার চরণে ঢালিয়া দিয়া সেবা করিব, তথাপি তুমি আমার হইবে না ?"

গুরু মহাশয় বলিলেন,—"অসম্ভব, ধন সম্পত্তিতে আমার প্রয়োজন নাই। আমি দরিদ্র, এই অবস্থায় আমি পরম সুখে আছি। তুমি লেখা পড়া জানিতে পার, কিন্তু যে লেখা পড়ায় ধর্ম্মের প্রতি আসক্তি না রাখিতে পারে, তাহা নিতান্ত অসার। আমার স্ত্রীর রূপ আছে কিনা আমি তাহা জানি না, তাঁহার প্রেমানন্দে আমি সতত প্রমত্ত, সুতরাং তাঁহার রূপ দেখিবার আমি অবসর পাই না। তুমি এক্ষণে এস্থান হইতে প্রস্থান কর।"

রঙ্গিণী একটু পশ্চাতে সরিয়া আসিলেন, তাহার পরে বলিলেন,—"শুন ঠাকুর। আমাকে এইরূপ অপমানিত করায় শীঘ্র অতি ভয়ানক ফল জন্মিবে। এ জীবনে কথনই আমার বাসনার অন্যথা হয় নাই, এবারও হইবে না। আমার পিতার প্রভূত বিত্ত আছে, যথেষ্ট ক্ষমতা আছে, আমার বাক্য তাঁহার নিকট বেদবাক্যের ন্যায় অলঙ্ঘনীয়। আপনার এই অহঙ্কারের ফলভোগ করিতে হইবে। এই অহঙ্কারস্ফীতা পত্নী যাঁহার প্রেমে অন্ধ হইয়া আমাকে অবজ্ঞা করিলেন, সেই সাধের প্রণয়িনীর দুর্দ্দশার শেষ থাকিবে না। আপনাকে বাধ্য হইয়া আমার চরণে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে হইবে, চিরদিন আমার ক্রীতদাস হইয়া থাকিতে হইবে,অধিক কথা আমি আর বলিতেছি না, সাবধান গুরু মহাশয়—সাবধান !"

রঙ্গিণী কোন কথা শুনিবার নিমিত্ত অপেক্ষা না করিয়া বেগে প্রস্থান করিল।

প্রত্যাবর্ত্তন কালে পথিমধ্যে সেই সেই পুরুষের সহিত রঙ্গিণীর আবার সাক্ষাৎ হইল। পুরুষ বলিল,—"সব ঠিক হইয়াছে, আজি হুকুম মত কার্য্য শেষ করিব।"

রঙ্গিণী বলিলেন,—"আজি করা চাইই চাই।"

পুরুষ বলিল,—"কিন্তু আমার প্রাণের সাধ কি মিটিবে না ? আমি আপনার জন্ত প্রাণ দিতে প্রস্তুত। আপনি পরীক্ষা করিয়া দেখুন, আমি এখনি আপনার আজ্ঞায় জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারি কি না, আমার এ ভালবাসার কি পুরস্কার হইবে না ?"

রঙ্গিণী হাসিয়া বলিল,—"নিশ্চয় হইবে। তুমি আমার ইচ্ছামত কার্য্য কর। তাহার পর আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও। তুমি বেশ লোক।"

পুরুষ মধুর হাসি হাসিয়া প্রস্থান করিল। রঙ্গিণী ফিরিতে ফিরিতে ভাবিতে লাগিলেন ; এ অহঙ্কৃত গুরু মহাশয়ের দর্প চূর্ণ করিতে হইবে ; তাঁহার সোহাগের স্ত্রীর সর্ব্বনাশ

করিতেই হইবে। ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা। তাহাকে না পাই তাহাতে ক্ষতি নাই, তাহাকে জব্দ করিব। তাহার পর—তাহার পর! এই পুরুষ আছে। এ আমাকে ভালবাসে। ইহার সহিত আমার সুখের মিলন হইবে এ আমার জন্য ব্যাকুল; আর সে আমাকে উপেক্ষা করে। তাহাকে জব্দ করিয়া তাহার মুখে পদাঘাত করিয়া আমি ইহারই হইব!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বন্ধন।

আহূত হইয়া গুরুমহাশয় বৈকালে শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বিশেষ সমাদর ও শিষ্টাচারাদির পর চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন,—"আপনাকে আমি বড়ই শ্রদ্ধা করি। গ্রামশুদ্ধ লোকও আপনার ভক্ত। সম্প্রতি আপনার সম্বন্ধে একটা বড়ই লজ্জা-জনক কথা আমার কর্ণগোচর হইয়াছে, আপ-নাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেও লজ্জা হয়। কথাটা সত্য কি?"

গুরুমহাশয় বলিলেন,—"কি কথা মনে করিয়া মহাশয় আমাকে প্রশ্ন করিতেছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। এজীবনে সকল সময়ে যে ভাল কার্য্যই করিয়াছি এমন বোধ হয় না। অনেক সময়ে হয়তো অনেক অন্যায় কার্য্য করিয়া থাকিতে পারি; কিন্তু কোন লজ্জাজনক কার্য্য করিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না। অজ্ঞাতসারেও কোন লজ্জাজনক কার্য্য যদি করিয়া থাকি, তাহা হইলে বড়ই দুঃখের বিষয় হইয়াছে সন্দেহ নাই। আপনি কৃপা করিয়া বলুন আমার দ্বারা কোন্ লজ্জাজনক কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে?"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—"কথাটা বলিতে মাথা কাটা যায়। আপনি জানিয়া শুনিয়াও যখন কিছুই বুঝিতেছেন না, তখন কাজেই আমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইতেছে। আপনি আমার কন্যা রুক্মিণীর মন হরণ করিয়া-ছেন এবং তাহাকে পাপের পথে চলিবার জন্য মাতাইয়া তুলিয়াছেন।"

গুরুমহাশয় একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"কথাটার কি উত্তর দিব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। অতি দুঃখের সহিত আমি আপনার নিকট নিবেদন করিতেছি যে, আপ-নার কন্যার বাস্তবিকই মতিভ্রম ঘটিয়াছে, কিন্তু আমি তাহার সে প্রবৃত্তির সহায়তা করা দূরে থাকুক, সে জন্য আন্তরিক দুঃখিত ও উদ্বিগ্ন হইয়াছি এবং যাহাতে তিনি সাবধান হইয়া ধর্ম্মপথ হইতে বিচ্যুত না হন, তাহারই চেষ্টা করিতেছি।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটু রুক্ষ স্বরে বলিলেন—"মিথ্যা কথা। তোমার ন্যায় ব্যক্তি পাপে মত্ত হইবে, আর সে কার্য্য ঢাকিবার জন্য মিথ্যা কথা কহিবে, ইহা আমি স্বপ্নেও মনে করি নাই। এ কলিকালে মানুষ চিনিবার উপায় নাই। আমি বিশেষরূপ জ্ঞাত হই-য়াছি, তুমি আমার কন্যাকে পাপের পথে লইয়া গিয়াছ এবং তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছ।"

গুরুমহাশয় অধোমুখ। চক্রবর্ত্তী ক্রোধ হুঙ্কারে বলিলেন,—"চুপ করিয়া রহিলে কেন? কি বলিতে চাহ বল। সত্য কথা বলিলে আমি তোমাকে ক্ষমা করিব এবং সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা করিব; কিন্তু মিথ্যা কথা বলিলে, আমি নিশ্চয়ই তোমার বিশেষ শাস্তির ব্যবস্থা করিব।"

গুরুমহাশয় বলিলেন,—"আপনার সুব্যবস্থার নিমিত্ত আমি আকাঙ্ক্ষিত নহি, আপনার শাস্তির ভয়েও আমি ভীত নহি। আপনি বিশ্বাস করুন, বা না করুন, আমি সত্যকথাই বলিব। মহাশয় আমার পিতৃতুল্য ভক্তি-ভাজন। আপনার কন্যা আমার ভগ্নীর ন্যায় আদরণীয়া, তাঁহাকে কলঙ্কিত দেখিলে আপনার যত কষ্ট হইবে, আমারও প্রায় তত কষ্ট হইবে। আপনার কন্যার কথা কেন বলিতেছেন? কোন সামান্য লোকের কন্যাকেও কুপথে চালিত করিতে আমার কখনই মতি হয় নাই। আপনি অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারিবেন, আমি এ সম্বন্ধে কোনই পাপাচরণ করি নাই।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় অতিশয় ক্রোধের সহিত বলিলেন,—"ভয়ানক মিথ্যা কথা! তুমি গত কল্যও রাত্রিকালে প্রচ্ছন্নভাবে আমার কন্যার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলে এবং তাহার সহিত যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া গভীর রাত্রিতে প্রস্থান করিয়াছ। এ বিষয়ে অনেক প্রমাণ আছে। এ সকল কাণ্ডের এক বর্ণও মিথ্যা নহে। তুমি অস্বীকার করিলে আমি বুঝিব, তুমি কেবল ঘোরতর ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তি নহ, অধিকন্তু অতিশয় মিথ্যাবাদী।"

গুরুমহাশয় একটু চিন্তা করিয়া প্রসন্ন বদনে বলিলেন,—"মহাশয়, বিশ্বাস করুন, বা না করুন, আমি সত্য বলিতে কদাপি বিরত হইব না। আমি গত কল্য রাত্রিকালে আপনার কন্যার গৃহে গমন করিয়াছিলাম সত্য; কিন্তু আমি স্বেচ্ছায় সেখানে যাই নাই। আমাকে যাইবার নিমিত্ত শ্রীমতী রঙ্গিণী দেবী আমার আবাসে গিয়া আহ্বান করিয়া আসিয়াছিলেন। আমি আপনার নিকট আসিয়া এবং আপনার সঙ্গে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইয়াছিলাম। আমি যথাসময়ে এখানে আসিয়া আপনার সাক্ষাৎ না পাওয়ায়, কল্য আর সাক্ষাৎ ঘটিবে না স্থির করি এবং আপনার কন্যার নিকট সেইরূপ সংবাদ প্রেরণ করিয়া প্রস্থান করিবার উপক্রম করি। এমন সময় আপনার একজন দাসী আসিয়া বলে,—"দিদি ঠাকুরাণীর প্রয়োজন অতি গুরুতর। অদ্য সাক্ষাৎ না হইলে তাঁহার ক্ষতি হইবে। কর্ত্তা মহাশয় বাটী থাকিলেও সাক্ষাতের কোন অসুবিধা ঘটিবে না।" মা ঠাকুরাণী এবং সেই দাসী আমাকে সঙ্গে লইয়া রঙ্গিণী দেবীর নিকট গমন করিবেন স্থির হইল। আমি অগত্যা সম্মত হইলাম। দাসীর সহিত আমি পুরমধ্যে প্রবেশ করিলাম। সেখানে মহাশয়ের গৃহিণীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তাহার পর তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া রঙ্গিণীর গৃহে প্রবেশ করিলেন। আপনার কন্যা আমার সহিত নানাপ্রকার ধর্ম্ম কথা কহিতে লাগিলেন। মা ঠাকুরাণী অতি অল্পকাল পরেই স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন। দাসী থাকিল। তাহার সমক্ষেই আপনার কন্যা—আমি কি বলিব?"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—"বল, যাহা বলিয়া যাইতেছ তাহা শেষ কর। তাহার পর আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা বলিব।"

গুরুমহাশয় বলিলেন,—"তাহার পর রঙ্গিণী দেবী ধীরে ধীরে তাঁহার মনের কথা আমার নিকট ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তিনি আমার নিমিত্ত উন্মাদিনী হইয়াছেন এবং সে জন্য ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কার্য্যাকার্য্য বোধশূন্য হইয়াছেন। তাঁহাকে পত্নীরূপে বা উপপত্নীরূপে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আমাকে অনেক বিনয়যুক্ত অনুরোধ করিলেন। আমি তাঁহার

তাব দেখিয়া অবাক্ হইলাম; ক্রমে তাঁহাকে চিত্তস্থির করিবার নিমিত্ত বিবিধ উপদেশ প্রদান করিলাম। তিনি আমার হিতকথায় কাণ দিলেন না। রোদন করিতে করিতে তিনি আমার চরণে ধরিলেন। দাসী তাঁহার পক্ষ গ্রহণ করিয়া আমাকে অনেক কথা বলিল। রাত্রি অনেক হইয়া পড়িল, কিন্তু আমাকে বিদায় দিতে রঙ্গিণী দেবী কোন মতেই সম্মত হইলেন না। অবশেষে কল্য যাহা হয় করিব বলিয়া, অতি কষ্টে গভীর রাত্রিতে আমি সে স্থান হইতে প্রস্থান করি। ইহাই প্রকৃত ঘটনা। আপনি কিরূপ শুনিয়াছেন তাহা জানি না। যদি অন্যরূপ কোন কথা শুনিয়া থাকেন, জানিবেন তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা।”

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—“তোমার কথা যে অবিশ্বাস্য তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। আমি ভাবিয়াছিলাম তুমি নিজমুখে সত্য কথা বলিবে। তোমার মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া আমি উচিত মত ব্যবস্থা করিতেছি। কিন্তু দেখিতেছি, হয় ভয়ে, না হয় লজ্জায়, সত্য কথা তুমি বলিয়া উঠিতে পারিতেছ না। তোমাকে এখনও আবার বলিতেছি, তুমি স্বয়ং সমস্ত কথা স্বীকার কর।”

গুরুমহাশয় বলিলেন,—“আমি যাহা বলিয়াছি তাহার অপেক্ষা সত্য কথা আমি আর জানি না।”

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন,—“তবে তুমি প্রকৃত কথা বলিবে না? দাঁড়াও তুমি, তোমাকে সত্য কথা আমি শুনাইতেছি। রঙ্গিণী, ওঘরে আছ কি? তোমার দাসীকে সঙ্গে লইয়া একবার এদিকে আইস না?”

তখনই দাসীকে সঙ্গে লইয়া মন্থর পাদবিক্ষেপে সুন্দরী রঙ্গিণী দেবী সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং নতবদনে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দাসীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন,—“বল্ তুই এ ব্যাপারের কি জানিস্! প্রথম হইতে সমস্ত কথা বল্—কিছুই গোপন করিস্ না।”

দাসী বলিল,—“আমি কোন কথাই গোপন করিব না। গুরুমহাশয় পরম ধার্ম্মিক আর অনেক শাস্ত্র জানেন; এই জন্য দিদি ঠাকুরাণী তাঁহাকে বড় ভক্তি করিতেন। তাঁহার ধর্ম্ম-কথা শুনিবার ইচ্ছায় দিদি ঠাকুরাণী মাঝে মাঝে তাঁহার বাটীতে যাইতেন। আমি অনেক সময় সঙ্গে থাকিতাম। ঠাকুরাণী কাজকর্ম্মে এদিক ওদিক ঘুরিতেন। গুরুমহাশয় ধর্ম্ম-কথা কহিতে কহিতে ক্রমে প্রেমের কথা কহিতে আরম্ভ করেন। দিদি ঠাকুরাণীর মত সুন্দরী গুণবতী নারী কোন উপযুক্ত পুরুষের স্ত্রী হইলে বড় সুখের বিষয় হয়। তাঁহাকে দেখিলে মুনিরও মন টলে, এইরূপ অনেক কথা বলিতে থাকে। দিদি ঠাকুরাণী প্রথম প্রথম এ সকল কথায় বড় বিরক্ত হইতে থাকেন; শেষে মেয়ে মানুষের নরম প্রাণ একটু একটু ভিজিতে থাকে। শেষে যখন গুরুমহাশয় পাগলের মত একদিন আত্মহত্যার ভয় দেখাইয়া দিদির পায়ে গড়াইয়া পড়েন, সে দিন দিদি তাঁহাকে ভালবাসার আশ্বাস দেন। কিন্তু বিবাহ না হইলে দিদি তাঁহাকে আপনার দেহ স্পর্শ করিতে দিবেন না, এ কথা স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দেন। গুরুমহাশয় অনেক ঠাকুর দেবতার নাম করিয়া বিবাহ করিবেন প্রতিজ্ঞা করেন। তাহার পরে গোপনে আমাদের বাটীতে গুরু মহাশয় যাতায়াত করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে গুরু মহাশয়ের আগ্রহ দেখিয়া দিদি ঠাকুরাণীর সাবধানতার বাঁধ কাজেই ভাঙ্গিয়া যায়। যাহা যাহা এ সকল

ব্যাপারের ব্যবহারে চূড়ান্ত অবস্থা সে সকলই ঘটিয়া গিয়াছে। বাকী কিছুই নাই। দিদি ঠাকুরাণী তখন বিবাহের জন্ত কাঁদাকাটা করিতে থাকেন। গুরু মহাশয় ইতস্তত: করিয়া কাল কাটান, শেষে বলেন, যখন আমাদের স্বামী স্ত্রীর মত আমোদ চলিতেছে, তখন বিবাহ না হইলেই বা ক্ষতি কি? কালি রাত্রিতেও এজন্ত দিদি ঠাকুরাণী অনেক পায়ে ধরিয়াছেন, বিস্তর কাঁদাকাটা করিয়াছেন।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন,—"আর বলিতে হইবে না। শুনিলে গুরু মহাশয়? ইহার উপর তুমি আর কিছু বলিতে চাহ কি?"

গুরুমহাশয় বলিলেন,—"এক কথা বলিতে চাহি। এ সমস্তই অদ্ভুত মিথ্যা কথা।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—"সে কথা কে শুনিবে? রঙ্গিণী মা, কেন তুমি এতকাল ধর্ম্মপথে থাকিয়া এখন আমার সর্ব্বনাশ ঘটাইলে?"

রঙ্গিণী একটু চিন্তা করিয়া সুমধুর স্বরে সুস্পষ্ট ভাষায় বলিলেন,—"বাবা, আমি সর্ব্বনাশ ঘটিবে ভাবিয়া পাপ করি নাই। আপনি বাল্যকাল হইতে নানাবিধ যুক্তি ও তর্ক দ্বারা বুঝাইয়া আসিতেছেন আমার মত বালবিধবার বিবাহ শাস্ত্রসম্মত ধর্ম্মকার্য্য। এই গুরুমহাশয় আমাদের গ্রামে দেবতার ন্যায় সমাদৃত ব্যক্তি। ইনি ধর্ম্মকথার প্রসঙ্গে প্রথমে বিধবা বিবাহের বৈধতা, তাহার পর আমার প্রতি তাঁহার অনুরাগের কথা ব্যক্ত করিতে থাকেন। প্রথমে বিরক্তির সহিত আমি তাঁহার কথার ঘোরতর প্রতিবাদ করি। তাহার পর ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে তাঁহার কথা কাণ পাতিয়া শুনিতে থাকি। বাবা আপনি আমার পরম গুরু, শ্রেষ্ঠ দেবতা— আপনার নিকট আমি মিথ্যা কহিতে পারিব না—আমি গুরুমহাশয়কৃত বিবাহের প্রস্তাবে সম্মত হই। আমি জানিতাম, গুরুমহাশয়ের প্রতি আপনাদের যেরূপ শ্রদ্ধা, তাহাতে তাঁহাকে জামাতা করিতে আপনার কখনই অমত হইবে না। এই জন্যই আপনাকে না জানাইয়া আমি তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হই। গুরুমহাশয় আমাকে বিবাহ করিয়া এই বাটীতে বাস করিবেন এই মর্ম্মে অশেষ প্রতিজ্ঞা করেন।"—তাহার পর—

রঙ্গিণীর স্বর সংক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল। সে কাতরভাবে সেই স্থানে বসিয়া পড়িয়া পিতার চরণ ধারণ করিল। তাহার নয়ন দিয়া জল বহিতে লাগিল। সে বলিল,—"তাহার পর বাবা, তাহার পর স্বামী হইলে গুরুমহাশয়ের আমার উপর যে যে অধিকার হইত, আমি সে সমস্তই উঁহাকে না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। এক্ষণে বুঝিয়াছি উনি বিবাহ করিতে প্রস্তুত নহেন। আমাকে ধিক্!—আমাকে— উপপত্নী—"

আর কথা রঙ্গিণীর মুখ হইতে বাহির হইল না। চক্রবর্ত্তী চরণ হইতে কন্যার হাত ছাড়াইলেন। দাসীকে ডাকিয়া কন্যাকে সাবধানে বাটীর মধ্যে লইয়া যাইতে বলিলেন। তাহার পর গুরু মহাশয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—গুরু মহাশয় আমি তোমার কোন কথাই শুনিতে চাহি না। তুমি যে ভয়ানক অপরাধ করিয়াছ, আমি তাহা ক্ষমা করিতেছি। আমি বিশ্বাস করি, বিধবা-বিবাহ সমাজ-বিরুদ্ধ হইলেও, শাস্ত্রসম্মত। এখানকার সমাজে আমার কৃতকার্য্যের কোন প্রতিবাদ হইবার সম্ভাবনা নাই। আমার যে ধনসম্পত্তি আছে, তাহাতে স্বচ্ছন্দভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইবার কোনই অসুবিধা নাই। সমস্তই

আমার কন্যা জামাতা পাইবেন। আমার কন্যা রূপবতী ও বিদ্যাবতী। তোমার ন্যায় পরম রূপবান্ ও গুণবান্ পুরুষের অযোগ্যা নহে। আমি ব্যবস্থা করিতেছি, রঙ্গিণীকে তোমার পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। অদ্যই যথাশাস্ত্র বিবাহ হইবে। এ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই তোমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে।”

গুরু মহাশয় এতক্ষণ হতবুদ্ধির ন্যায় বসিয়াছিলেন। দাসী ও রঙ্গিণী যে কাল্পনিক কাহিনী বিবৃত করিল, তাহার পর কি করা বা কি বলা উচিত, তাহা তিনি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। এক্ষণে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রশ্নোত্তরে ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—“আজ্ঞে না আমার পত্নী আছেন। বিবাহে আমার কোন প্রয়োজন নাই। আমি কেন বিবাহ করিব?”

চক্রবর্ত্তী মহাশয় ক্রোধকম্পিত দেহে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন,—“ভণ্ড! ভদ্রলোকের সর্ব্বনাশ করিয়া, উপকারীর কূলে কালী দিয়া, এখন তুই সরিয়া পড়িতে চাহিস? তোকে কাটিয়া ফেলিবার হুকুক দিতাম, মাটীতে পুতিবার ব্যবস্থা করিতাম, কিন্তু আমার কন্যা তোর প্রতি অনুরাগিণী। এজন্য সেরূপ কোন ব্যবস্থা না করিয়া এই সম্পত্তির সহিত আমার রূপবতী দুহিতাকে তোর হস্তে সমর্পণ করিতে চাহিতেছি। তুই তাহার সর্ব্বনাশ সাধনে সক্ষম, কিন্তু তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহিস্? ধিক্ তোর বিবেচনায়! জানিস্ তুই এদেশে আমার আদেশের বিরুদ্ধে কথা কহিতে সাহস করে, এমন লোক কেহ নাই। আমি আদেশ করিতেছি অদ্য রাত্রিতে রঙ্গিণীর সহিত তোর বিবাহ হইবে।”

গুরুমহাশয় বলিলেন—“কেন আপনি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া অন্যায় আদেশ করিতেছেন? আমি আপনার কন্যার কোনই অনিষ্ট করি নাই। আমি তাঁহাকে কখনই বিবাহ করিব না।”

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—“বটে! তোমার এত সাহস?” উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন,—“আয়।”

তখনই চারিজন ভীমকায় বাগ্দী তথায় উপস্থিত হইল। চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—“এই গুরুমহাশয় কোথাও যাইতে না পায়—ইহাকে ধরিয়া রাখ। আমি শীঘ্রই আসিতেছি।”

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিবাহের আয়োজন করিবার জন্য ব্যস্তভাবে প্রস্থান করিলেন। এতক্ষণে রঙ্গিণী প্রস্থান করিবার অভিপ্রায়ে দাসীর সঙ্গে উঠিলেন। যাইবার সময়ে তিনি গুরুমহাশয়ের দিকে ঈষৎ কটাক্ষাকারে দৃষ্টিপাত করিয়া অনুচ্চস্বরে বলিলেন,—“কেমন! আরও অনেক বাকী আছে।”

সুন্দরী চলিয়া গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পাষণ্ড।

ঠাকুরাণী একাকিনী। সন্ধ্যা হইয়া গেল, গুরুমহাশয় এখনও ফিরিলেন না, কাহারও বাটীতে হয় ত বিপদ ঘটিয়াছে, কোথায় হয় ত বিশেষ কোন কাজে পড়িয়াছে, তাই বুঝি গুরুমহাশয়ের ফিরিতে বিলম্ব হইতেছে। ঠাকুরাণী চিন্তাকুলা। কাহারও নিকট কোন সন্ধান পাওয়া গেল না তো! বৈকালে কত স্ত্রীলোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল

কিন্তু কেহই গুরুমহাশয়ের কোন সংবাদ বলে নাই। রঙ্গিণী—সেই চরিত্রবলবিহীনা নারী—সেই উন্মাদিনী কামিনী কোন কাণ্ড ঘটাইলেও ঘটাইতে পারে। যে নারী গুরুমহাশয়কে দর্শন করিয়া মজিয়াছে, যে সেই অতুলনীয় রূপসাগরে ভাসিতে মন করিয়াছে, সে কি স্থির থাকিতে পারে? কোন বিপদ ঘটিয়াছে কি? না, তাহা হইলে অবশ্যই কাহারও মুখে কোন সংবাদ পাওয়া যাইত।

ঠাকুরাণী যথাস্থানে গুরুমহাশয়ের পা ধুইবার জল, গামছা, বসিবার আসন ঠিক রাখিলেন। রাত্রির জলযোগের যথাসম্ভব আয়োজন করিয়া রাখিলেন। একটী মাদুর ও বালিস তাঁহাদের শয্যা। ঠাকুরাণী দশবার করিয়া তাহা পরিষ্কার করিলেন।

রাত্রি অনেক হইয়া গেল। গুরুমহাশয় এখনও ফিরিলেন না। ঠাকুরাণী ক্ষুদ্র কুটীরের ক্ষুদ্র দ্বার বন্ধ করিয়া নীরবে ভাবিতে লাগিলেন। আরও অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল।

বাহিরে কাহারও পদশব্দ হইতেছে না? না—হয়ত উঠান দিয়া একটা কুকুর চলিয়া গেল, না—সত্যই কাহার পদশব্দ। ঠাকুরাণী উঠিয়া দাঁড়াইলেন; কিন্তু দ্বার খুলিলেন না। হাঁ—মনুষ্যের ধীর ও সতর্কপদধ্বনি তাহার সন্দেহ নাই। শব্দ ক্রমে নিকটস্থ হইতে লাগিল। ঠাকুরাণী দ্বারের পার্শ্বে খিলে হাত দিয়া দাঁড়াইলেন। বিপরীত দিক হইতে দ্বারে মৃদু করাঘাত হইল। ঠাকুরাণী সভয়ে জিজ্ঞাসিলেন,—"কে?"

বিপরীত দিক হইতে শব্দ হইল,—"অন্নপূর্ণা দরজা খোল।"

ঠাকুরাণী বুঝিলেন, এ কণ্ঠস্বর গুরুমহাশয়ের নহে; পদধ্বনি শুনিয়াও তিনি বুঝিয়াছিলেন, এ চরণপ্রক্ষেপ তাহার হৃদয়-দেবতার নহে। কিন্তু এ ব্যক্তি কে? তাঁহার নাম যে অন্নপূর্ণা তাহা এ দেশের কোন লোকই জানে না। তবে এ কে? তিনি আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনি কে?"

আবার বিপরীত দিক হইতে উত্তর হইল,—"আমি তোমার পরিচিত ব্যক্তি। বড় বিপদে পড়িয়া এখানে আসিয়াছি।"

ঠাকুরাণী বলিলেন,—"আপনি কে? নিশ্চয়ই আপনি আমাকে জানেন; কিন্তু আপনি কে তাহা না বুঝিলে দরজা খুলিতে পারিতেছি না।"

বিপরীত দিক হইতে শব্দ হইল,—"তবে দরজা খুলিবে না? শুনিয়াছিলাম তুমি বড় দয়াবতী। কাতর বিপন্ন লোককেও তুমি একটু আশ্রয় দিতে চাও না। এই কি তোমার দয়া? আচ্ছা, যাই, দেখি আর কোথায় যদি সাহায্য পাই।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ হইল। ঠাকুরাণী বলিলেন,—"আপনি অকারণ আমাকে অনুযোগ করিবেন না। আমি কুলকামিনী, আপনি পুরুষ, আপনি কে জানিতে না পারিলে এই গভীর রাত্রিকালে আপনাকে ঘরে স্থান দেওয়া সুযুক্তি নহে, ইহা অবশ্যই আপনি বুঝিতে পারিতেছেন। যদি আপনার পরিচয় দিতে আপত্তি থাকে, তাহা হইলে দয়া করিয়া ঐ স্থানে একটু অপেক্ষা করুন। এখনই আমার স্বামী ফিরিয়া আসিবেন। তাহার পর আপনার সেবার জন্য কোন যত্নেরই ক্রটী হইবে না।"

বাহির হইতে দ্বারে প্রচণ্ড আঘাত হইল। ঠাকুরাণী দ্বার ধরিয়া বলিলেন,—"একি? আপনি দরজা ভাঙ্গিতেছেন কেন?"

আবার দরজায় প্রচণ্ড আঘাত শব্দ হইল। উত্তর হইল,—"তাহা না হইলে তুমি আমাকে

দেখিতে পাইবে না; আমাকে দেখিতে না পাইলে তুমি চিনিতে পারিবে না।"

বাহির হইতে দ্বারে প্রচণ্ড আঘাত হইল। ঠাকুরাণী উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"একি? আপনি দরজা ভাঙ্গিতেছেন কেন?"

আবার প্রচণ্ড আঘাতজনিত শব্দ হইল। উত্তর হইল,—"তাহা না হইলে তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে না; আমাকে দেখিতে না পাইলে তুমি চিনিতে পারিবে না।"

ঠাকুরাণী, আপনার দেহভারা জোরে দরজা চাপিয়া, বলিলেন,—"আপনি পরিচয় দিলেই চিনিতে পারিব। সে জন্য দরজা ভাঙ্গিবার প্রয়োজন কি?"

আবার প্রচণ্ড আঘাত। উত্তর হইল,—"এত কষ্টে—এত নিকটে আসিয়া দেখা না করিয়া কেবল মুখের পরিচয়ে স্থির থাকা যায় কি?"

আবার আঘাত। দরজা ভাঙ্গিয়া গেল। ঠাকুরাণী একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন। মুক্ত-পথ দিয়া এক পুরুষ-মূর্ত্তি তাঁহার নেত্রপথবর্ত্তী হইল। এই স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে পথিমধ্যে যে পুরুষ দুইবার রঙ্গিণী দেবীর সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করিয়াছিল, এ সেই ব্যক্তি। পুরুষ বলিল,—"রাণী, অন্নপূর্ণা আমাকে চিনিতে পার? আমি তোমার জন্য পাগল হইয়া দেশে দেশে ফিরিতেছি।"

গৃহস্থিত ক্ষীণ দীপালোকে অন্নপূর্ণা দেখি-লেন তাঁহার সম্মুখস্থ পুরুষ, সোণাপুরের শঙ্কর নাথ মহাদেবের পূজারি ঘনশ্যাম। তিনি একটা কাতরধ্বনি ব্যক্ত করিয়া, অধোমুখে ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া গেলেন।

ঘনশ্যাম বলিল,—"সুন্দরি! সার্থক আমি মহাদেবের পূজা করিয়াছিলাম। তিনি কৃপা করিয়া এতদিনে আমার সকল সুবিধা ঘটাইয়া দিয়াছেন। এখানে আর তোমার ধন-সম্পত্তি নাই, দাস দাসী নাই, সিপাহী-পাহারা নাই। এখন তুমি অনায়াসে আমার মনের সাধ মিটাইতে পার। কোন দিকে কোন বাধা নাই; তবে কেন তুমি চিন্তা করিতেছ?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"পরম ধার্ম্মিক মাধব চক্রবর্ত্তী মহাশয় এখানকার জমিদার। তিনি এ সংবাদ জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই তোমার সর্ব্বনাশ ঘটাইবেন।"

বিকট হাস্য করিয়া ঘনশ্যাম বলিল,—"তাঁহার সাহায্য না পাইলে আমি কি তোমার নিকট আসিতে পারিতাম? কত দেশে তোমার সন্ধান করিয়া প্রায় এক মাস হইল আমি এখানে আসিয়াছি। চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও তাঁহার কন্যা রঙ্গিণীর সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে। রঙ্গিণীও সুন্দরী বটে; কিন্তু যাহার রূপে আমার মন ভরিয়া আছে, তাহার মত মিষ্টতা রঙ্গিণীর নাই। তাহার জন্য এখন পাগল হওয়া যায় না। তবে তাহাকেও ছাড়া হইবে না; হাতে রাখিতে হইবে। তাহার টাকা আছে, তোমার এখন কিছুই নাই। কাজেই তাহাকে নহিলে চলিবে না। আমি তাহাকে ফাঁদে ফেলিয়াছি। সে উড়িয়া যাইতে পারিবে না। আগে তোমাকে হাত করিয়া, তাহার পর তাহাকে পাইবার উপায় করিব। তাহার কথা সময়ান্তরে অবসর মত ভাবিব। এখন রঙ্গিণীর দরকার তোমাকে দূর করা; আমার দরকার তোমাকে লাভ করা। রঙ্গিণীর সুতরাং চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সাহায্যে আমি তোমাকে এস্থান হইতে লইয়া যাইব, সকল আয়োজন ঠিক আছে; এক্ষণে তুমি আর বিলম্ব করিও না; শীঘ্র আমার সহিত চলিয়া আইস। রক্ষা করিবে বলিয়া তুমি ভরসা করিতেছ, তাহারাই তোমার

পরম শত্রু হইয়াছে। এদেশে থাকিলে তোমাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে না। নিশ্চয়ই রঙ্গিণী তোমাকে মারিয়া ফেলিবে। অতএব আর বিলম্ব করিও না; শীঘ্র আইস।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"তা হউক, আমার স্বামী সর্ব্বশক্তিমান্। তিনি এখনই আসিবেন এবং তোমার বা রঙ্গিণীর সকল ষড়যন্ত্রই ব্যর্থ করিয়া দিবেন।"

আবার উৎকট হাস্য ও বিকট মুখ-ভঙ্গী করিয়া ঘ শ্যা ম বলিল,—"সে ভরসা ছাড়িয়া দেও। আজি রাত্রি একটার সময় রঙ্গিণীর সহিত তোমার স্বামীর বিবাহ। আর একটু পরেই বিবাহ হইয়া যাইবে। তোমার সেই সর্ব্বশক্তিমান্ রাজা স্বামী এখন চক্রবর্ত্তীর ভবনে বন্দী। এ জীবনে আর তোমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে না। এখন যাহা বলি, তাহা শুন। অনর্থকালবিলম্ব করিয়া ফল নাই। আমার সহিত আইস—অন্য দেশেচলিয়া যাই। এখানে থাকিলে কালি প্রাতে রঙ্গিণী কখনই তোমাকে বাঁচিয়া থাকিতে দিবে না।"

অন্নপূর্ণা বলিল,—"আমি এখানে থাকিয়াই মরিব; কিন্তু কোন ক্রমেই স্থানান্তরে যাইব না।"

ঘনশ্যাম বলিল,—"তোমার সহিত বৃথা তর্কে আমার প্রয়োজন নাই। তোমাকে আমি যেমন করিয়া পারি আপনার করিব, ইহাই আমার সংকল্প। ঈশ্বর সকল সুযোগই ঘটাইয়া দিয়াছেন। তোমার রাজৈশ্বর্য্য ঘুচিয়া গিয়াছে, তোমার রাজা স্বামী পরের হাতে বন্দী—অন্য নারীর স্বামী হইতেছেন। তোমার সপত্নী আমার সহায় হইয়াছেন। আমি দরিদ্র হইলেও, যথেষ্ট অর্থ সাহায্য পাইয়াছি। এ সুযোগে যদি তোমাকে আয়ত্ত করিতে না পারি, তাহা হইলে আমার সাধনাই বৃথা। তুমি ইচ্ছায় আমার কথা না শুনিলে, আমি বলপূর্ব্বক তোমাকে লইয়া যাইব। সুন্দরি! আমার দোষ গ্রহণ করিও না। তোমার ঐ সোণার অঙ্গ আমাকে বন্ধন করিতে হইবে। তোমার ক্রন্দন ও চীৎকার নিবারণের নিমিত্ত আমাকে তোমার মুখ বাঁধিতে হইবে। তাহার পর পাল্কীতে তুলিয়া আমি তোমাকে ইচ্ছামত স্থানে লইয়া চলিব। অধিক বিলম্ব করিবার সময় নাই, তোমার অভিপ্রায় কি, শীঘ্র বল।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"তোমার সহিত আমি কোথাও যাইব না। জীবন থাকিতে আমি এ স্থান ত্যাগ করিব না। আমার স্বামী বিপদে পড়িয়াছেন শুনিয়া আমি ভয় পাইতেছি না। কোন বিপদেই তাঁহার কোন অনিষ্ট হইবে না, ইহা আমি জানি। তাঁহার অপেক্ষায় জীবনের শেষ কাল পর্য্যন্ত আমি এই স্থানে বসিয়া থাকিব।"

ঘনশ্যাম ,—"তবে আমার দোষ নাই। যাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসি, যাহাকে লইয়া পরম সুখে জীবন কাটাইব মনে করিয়াছি, তাহার প্রতি কোন অত্যাচার করিতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু নিরুপায়। সুন্দরি, আমাকে বাধ্য হইয়া তোমাকে বন্ধন করিতে হইতেছে।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন;—"কর—যাহা তোমার ইচ্ছা কর। আমি নিঃসহায়—দুর্ব্বল। কিন্তু ধর্ম্ম আছেন—দেবতা আছেন। আমি বিশ্বাস করি, তুমি আমার কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না।"

ঘনশ্যাম বলিল,—"তবে দেখি প্রাণেশ্বরি, কে তোমাকে রক্ষা করে!"

একটা দড়ির উপর দুইখানি কাপড়, এক-খানি চাদর ও একখানি গামছা ঝুলিতেছিল।

স্বামীকে বাঁধিবার অভিপ্রায়ে ঘনশ্যাম সেই গুল লইয়া অগ্রসর হইল। অন্নপূর্ণা একান্ত-চিত্তে পতিপদ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সহসা সেই কুটীরের ভগ্নদ্বার দিয়া গৃহ-মধ্যে অনেক আলোক প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে শব্দ হইল,—"হুজুর! এই দিকে রাস্তা।"

ঘনশ্যাম কাঁপিয়া উঠিল। কাহারা আসিতেছে? বোধ হয় রঙ্গিণীর লোক। অন্নপূর্ণা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। স্বর যেন তাঁহার শ্রুতপূর্ব্ব। তখনই অন্নপূর্ণার নয়নে এক দীর্ঘ-কায় মহাপুরুষের মূর্ত্তি প্রকটিত হইল। সেই মহাত্মা রায় হরকুমার চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর। তাঁহার পশ্চাতে প্রকাণ্ড এক মশাল লইয়া আর এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান। সে ব্যক্তি জরিফ কোচম্যান। তৎপশ্চাতে চণ্ডীচরণ ও রামহরি।

রায় বাহাদুরকে ঘনশ্যামও দেখিতে পাইল। সে পলায়নের চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাঁহাকে দর্শনমাত্র অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"খুড়া মহাশয়, আমাকে পাষণ্ডের হস্ত হইতে উদ্ধার করুন।"

তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। রায় বাহাদুর অন্য চিন্তা ত্যাগ করিয়া, অন্নপূর্ণার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। সকলেই তখন সেই মূর্চ্ছিতা নারীর চৈতন্য বিধানার্থ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। অন্য কোন দিকে লক্ষ্য করিবার কাহারও অবসর থাকিল না।

এই অবকাশে ঘনশ্যাম সে স্থান হইতে নিঃশব্দে পলায়ন করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পলায়ন।

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে রাত্রি একটার সময় বিবাহ। পাত্রী তাঁহার কন্যা রঙ্গিণী, পাত্র গ্রামের গুরুমহাশয়। বিধবা-বিবাহ হইলেও আশ্চর্য্য-শাস্ত্র-সম্মত প্রণালী ক্রমে কার্য্য সম্পন্ন হইবে; সুতরাং পুরোহিত, ব্রাহ্মণাদি অনেক লোক উপস্থিত আছেন এবং শালগ্রাম শিলা, পুষ্পচন্দনাদিও যথাস্থানে সংস্থাপিত হইয়াছে। উপযুক্ত স্থানে বর-কন্যার আসনাদি নিপাতিত রহিয়াছে। কিন্তু বর বা কন্যা কেহই তথায় নাই। মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী গোঁড়া ব্রাহ্মণ। বিধবা বিবাহ ধর্ম্মসঙ্গত ও শাস্ত্রানুমোদিত, এ কথা তিনি চিরদিন স্বীকার করিতেন কি না এবং অন্য ক্ষেত্রে হইলে এখনও স্বীকার করেন কি না, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু বর্ত্তমান স্থলে স্পষ্টই পরি-দৃষ্ট হইতেছে, তিনি এই কার্য্যে বিশেষ উৎ-সাহযুক্ত এবং ইহার বৈধতাবিষয়ে সন্দেহ শূন্য।

যে নারী কল্যও ব্রহ্মচারিণী ছিলেন, সাদা কাপড় যাঁহার দেহ আচ্ছন্ন করিত, অবেণী-বদ্ধ রুক্ষ কেশের ভার লইয়া যিনি বিব্রত ছিলেন, সিন্দূর ও শাটী যাঁহার নিকট হইতে বহুদিন পূর্ব্বে পলায়ন করিয়াছে, স্বর্ণাদি নির্ম্মিত অলঙ্কার যাঁহার সমীপে আসিতে ভরসা করিত না, তিনি অদ্য মহার্হ বস্ত্রালঙ্কারে আবৃত-কায়া। যে গুরু মহাশয়ের কথা শুনিয়া, যাঁহার রূপ দেখিয়া তিনি পাগল হইয়াছেন, অথচ চরণে অশ্রুপাত করিয়াও যাঁহার চিত্ত তিনি অধিকার করিতে

পারেন নাই, সেই গর্ব্বিত গুরু মহাশয় এখনই সর্ব্ব সমক্ষে, ধর্ম্ম-মতে, দেবতা সাক্ষী করিয়া, তাঁহার হইবেন। বড় আনন্দের কথা বটে। কিন্তু তাহার পর? বিবাহ হইলেই সঙ্গে সঙ্গে বরের হৃদয়ের উপর আধিপত্য জন্মিবে, বা তাঁহার প্রেম লাভ করা যাইবে, এরূপ কোন কথা নাই। কিন্তু সে ভাবনা এখন ভাবিবার সময় নহে। বলে ও কৌশলে রঙ্গিণী যাহার স্কন্ধে গুরুতর পাপের ভার চাপাইয়া পিতার ক্রোধ উদ্রিক্ত করিয়াছেন এবং যাঁহাকে বল-পূর্ব্বক বিবাহের বন্ধনে বদ্ধ হইতে বাধ্য করিতেছেন, নিশ্চয়ই যেমন করিয়া হউক, তাঁহার ভালবাসা তিনি লাভ করিতে পারিবেন। সে সম্বন্ধে তাঁহার কোনই চিন্তা নাই; কেন না তিনি সম্মুখে সুখের অতি প্রশস্ত পথ দেখিতে পাইয়াছেন।

অনেক নারী শঙ্খাদি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। অনেকে বলিতেছে,—"বিধবার বিবাহ, এ আবার কোন দেশী!" কেহ বলিতেছে, "রঙ্গিণীর বিবাহ হইয়াছিল কি না মনে পড়ে না।" আর একজন বলিতেছে, —"এই প্রথম বিবাহ বলিলেই বা ক্ষতি কি? আর একজন বলিল,—"খুব অল্প বয়সে বিধবা হইলে আবার বিবাহ হয়।" আর একজন বলিল,—"এতদিন তো হয় নাই, এখন চক্রবর্ত্তী মহাশয় চালাইলে আর কে কি বলিবে?" এক বৃদ্ধা বলিল,—"আমি কত দিন বিধবা হইয়াছি জানি না; তা মাধবের কল্যাণে আমাদেরও হয় না কি?" এক যুবতী বিধবা বলিল,— "মরণ দেখ, আগে আমাদেরই হউক!"

সময় হইয়া আসিল। সকলই প্রস্তুত, কেবল বরের আগমন বাকী। রঙ্গিণী আপনার ঘরে একাকিনী বসিয়া মনে মনে অনেক চিন্তা করিতেছেন। রঙ্গিণী ভাবিতেছেন, পিতা এখনও গুরুমহাশয়ের মত ফিরাইতে পারেন নাই। এ সামান্য কার্য্য তিনি এখনও শেষ করিতে পারিলেন না কেন? যদি না পারেন, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি কি আছে? তাহার দর্প চূর্ণ হইয়াছে। সে বন্দী হইয়া আছে, মার খাইয়াছে, অপমানিত হইয়াছে। আর এক্ষণে তাহার [illegible] জীবনও সর্ব্ব-নাশ হইয়াছে। তাহার পর? তাহার পর আমি যে ভোগের আশায় মজিয়াছি, তাহা ছাড়িব না। গুরু মহাশয় আমাকে চাহে না; ঘনশ্যাম আমাকে চাহে। যে চাহে সেই ভাল। সে তো হাতে আছে। তবে আর ভাবনা কি? ঠাকুরাণীকে এখান হইতে তফাৎ করার পর, ঘনশ্যাম তাহাকে দূর করিয়া দিবে। কিন্তু পিতা ঘনশ্যামের সহিত আমার বিবাহ দিবেন কি না। কাজ কি বিবাহে? বিধবার বিবাহ একটা কথার কথা। ভোগই সকল সুখের মূল। যেমন করিয়া পারি তাহার উপায় করিব।"

বাস্তবিক চক্রবর্ত্তী মহাশয় কোন মতেই গুরু মহাশয়কে বিবাহে সম্মত করিতে পারিলেন না। বাহির বাটীতে [illegible], একজন প্রবীণ কর্ম্মচারী ও গুরু মহাশয়কে লইয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় বসিয়া আছেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় পাত্রের সম্মতি লাভ বিষয়ে হতাশ হইয়াছেন।

প্রবীণ কর্ম্মচারী গুরু মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"মহাশয় ভাল বুঝিলেন না। এ বিষয়ে সম্মত না হওয়ায়, আপনার বিশেষ অনিষ্ট হইবে। এত বড় লোকের জামাতা হওয়া বড় ভাগ্যের কথা। সকল বিষয়সম্পত্তি আপনারই হইবে, দুঃখ-দুর্দ্দশা ঘুচিয়া যাবে, পরম সুখে জীবন কাটাইতে পারিবেন। একটা নাম মাত্র বিবাহ করিলেই সকল

গণ্ডগোল মিটিয়া যায়। কেন আপনি অমত করিতেছেন? অমত করিয়া কোন লাভ নাই। হয় তো প্রাণ লইয়াও শেষে টানাটানি বাধিবে। কর্ত্তা রাগ করিলে সর্ব্বনাশ ঘটিবে।”

গুরু মহাশয় বলিলেন,—“অকর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করার অপেক্ষা সর্ব্বনাশ আর নাই। ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কোন কার্য্য করিব না। আমার দুঃখ-দুর্দ্দশায় আমি বেশ সুখে আছি। ধন-সম্পত্তিতে আমার কোন প্রয়োজন নাই। কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া, অন্যায় কার্য্য হইতে বিরত হইয়া যদি প্রাণ দিতে হয়, তাহাতে ক্ষতি কি? এ দেহ চিরস্থায়ী নহে। ইহার মমতায় পাপ কেন করিব?”

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—ভণ্ড ধার্ম্মিক! যখন লুকাইয়া রাত্রিকালে আমার কন্যার গৃহে প্রবেশ করিয়াছ, তখন পাপ হয় নাই? যখন আমার ধর্ম্মশীলা কন্যাকে নানারূপ পাপের ও আমোদের লোভ দেখাইয়া পাপের পথে মজাইয়াছ, তখন অধর্ম্ম হয় নাই? যখন আমার সরলা কন্যার মন মাতাইয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছ, তখন পাপ হয় নাই? এখন তাহাকে বিবাহ করিলে তোমার কৃত পাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত হয়, তাহাতে তুমি অনিচ্ছুক। ধিক্ তোমাকে!”

গুরু মহাশয় বলিলেন,—“মহাশয় যে সকল পাপের কথা বলিতেছেন, যদি তাহার কিছু আমি জানিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে ব্যাকুল হইতাম। আমি সে সকল ব্যাপারের কিছুই জানি না।”

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—“আমার কন্যা ও রাণী তোমার মুখের উপর সমস্ত কথা বলিল, তথাপি তুমি তাহা মানিতেছ না? সরলা কুলবালা নিতান্ত মনঃপীড়া না পাইলে এমন লজ্জাকর কথা পিতার সম্মুখে ব্যক্ত করিতে পারে কি? তোমাকে এখনই রঙ্গিণীর পাণি-গ্রহণ করিতে হইবে। আমি এ বিষয়ে কোন আপত্তি শুনিব না।”

গুরু মহাশয় বলিলেন,—“আমি কখনই তাহা করিব না।”

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—“বুঝিলাম, সহজে ও সরলভাবে তুমি সম্মত হইবে না। যাহাকে এখনই জামাতা করিতে হইবে, তাহার প্রতি অত্যাচার করিতে আমার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু দেখিতেছি, লাথির কাঁটাল কিলে পাকে না। বাগদিরা বসিয়া কি দেখিতেছিস্? এই বেটাকে জোর করিয়া বাটীর মধ্যে টানিয়া লইয়া চল্।”

তৎক্ষণাৎ যমদূতোপম সেই চারি ব্যক্তি গুরু মহাশয়ের নিকটস্থ হইল এবং তাহার মধ্যে এক ব্যক্তি বলিল,—“চল ঠাকুর, কেন দুঃখ পাও?”

গুরু মহাশয় বলিলেন,—“আমার যাইতে ইচ্ছা নাই, আমি যাইব না।”

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন,—“মিষ্ট কথায় কাজ হইবার হইলে এতক্ষণ হইয়া যাইত। জোর করিয়া লইয়া যা।”

একব্যক্তি গুরু মহাশয়ের হাত ধরিয়া টানিল, কিন্তু তাঁহাকে একটুও সরাইতে পারিল না। সে আর একজনকে সাহায্য করিতে বলিল; দুই জনে দুই হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল; কিন্তু তাঁহাকে নড়াইতে পারিল না। তখন তৃতীয় এক ব্যক্তি তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল,—“কেবল আধ কাঠা চালের ভাত মারিতে মজবুত। একটা মানুষকে নড়াইতে পারিস্ না?”

সে আর দুজনকে সরিতে বলিয়া, আপনি প্রাণপণ শক্তিতে গুরু মহাশয়ের হস্তাকর্ষণ

করিল, কিন্তু ফল কিছুই হইল না। তখন সে বলিল,—"তাই তো!"

পূর্ব্ব দুই ব্যক্তির একজন বলিল,—"তুই বুঝি পোন কাঠা চালের ভাত গিলিস্, তাই তোর এত জোর?"

গুরুমহাশয় বলিলেন,—"তোমরা কেন কষ্ট করিতেছ ভাই? যাইতে আমার ইচ্ছা নাই।"

এক বাগদি বলিল,—"তোমার তো ইচ্ছা নাই; কিন্তু আমরা মালিকের হুকুম রদ করি কিসে?"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন,—"চারিটা মরদ, একটা মানুষকে ডোলাডোল করিয়া তুলিয়া লইয়া যাইতে পারিলি না?"

তখন অপমানিত বাগদি চতুষ্টয় গুরু মহাশয়ের উভয় বাহু ধারণ করিয়া প্রাণপণে টানিতে লাগিল, গুরু মহাশয় বিচলিত হইলেন না। তিনি আপনার বাহুদ্বয় একটু ঠেসিয়া দিলেন। তৎক্ষণাৎ বাগদিরা "বাপরে" বলিয়া হাত ছাড়িয়া দিল। একজন বলিল,—"কর্ত্তা, এ মানুষ নয়। আমরা নাচ র।"

কর্ত্তা বলিলেন,—"হারামজাদা বেটারা কোন কর্ম্মের নয়। গোয়াল হইতে গরুর দড়া আন। হাত পা বাঁধিয়া ফেল। তাহার পর তোরা তুলিয়া লইয়া যা।"

একজন দড়া আনিয়া ফেলিল। গুরু মহাশয়ের শক্তি দেখিয়া বাগদিরা বিস্মিত হইয়াছে; তাঁহাকে কায়দা করিবার জন্য তাহাদের অতিশয় জেদ হইয়াছে। দড়ার পরামর্শ তাহারা অতি ভাল বলিয়া মনে করিল। দড়া আসিলে তাহারা গুরুমহাশয়কে বাঁধিতে আরম্ভ করিল। তিনি কোনই আপত্তি করিলেন না; কেবল বলিলেন,—"আমি যখন কোন মতেই বিবাহ করিব না, তখন আমাকে বাঁধিয়া বিবাহ স্থানে লইয়া গিয়া কি লাভ হইবে বুঝিতে পারিতেছি না।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—"বিবাহ তোমাকে করিতেই হইবে।"

গুরু মহাশয় বলিলেন,—"কিরূপে? আমি মন্ত্র বলিব না, কোন কার্য্য করিব না। তবে বিবাহ হইবে কিরূপে?"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—"তা হউক, আমি কন্যাকে রীতিমত সম্প্রদান করিব, অন্যান্য অনুষ্ঠানও হইবে। তাহা হইলেই বিবাহ হইবে।"

বেশ করিয়া দড়া বাঁধা হইল। তখন এক বাগদি বলিল,—"এবার ধর ভাই সব, ঠাকুরকে তুলিয়া লইয়া চল।"

গুরু মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং নিবদ্ধ হস্তদ্বয়ে একটু বলপ্রয়োগ করিলেন, পদ দ্বয় একটু ফাঁক করিলেন। হাত পায়ের দড়া সামান্য সূতার মত পট্ পট্ করিয়া ছিঁড়িয়া গেল।

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—"বুঝিয়েছি এ লোকের গায়ে অসাধারণ শক্তি; ইহাকে জব্দ করিতেই হইবে। মারিয়া কাবু কর, তাহার পর যাহা হয় হইবে।"

বাগদিরা বলিল,—"লোকটা মন্ত্র জানে, লাঠি ইহার গায়ে লাগিবে না, মারিলে কোন ফল হইবে না।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—"না হয় না হইবে, মার বেটাকে।"

প্রহারের উদ্যোগ হইল; দুই চারি ঘা লাঠি গুরুমহাশয়ের পৃষ্ঠদেশে পড়িল। তিনি অকাতরে তাহা সহ্য করিতে লাগিলেন। লাঠি থামিল না দেখিয়া, গুরু মহাশয় একজনের লাঠি ধরিয়া ফেলিলেন; তাঁহার হাত হইতে লাঠি ছাড়াইয়া লইতে সাধ্য হইল না। গুরু মহাশয় লাঠি গাছটি কাড়িয়া লইলেন যে

বাগদীর লাঠি সে তাহা রক্ষা করিতে পারিল না। লাঠি পদনিম্নে স্থাপন করিয়া গুরু মহাশয় আর একজনের লাঠি কাড়িয়া লইলেন। ক্রমে চারি ব্যক্তির লাঠিই কাড়িয়া লওয়া হইল, কেহই কিছু করিতে পারিল না। তখন বাগদীরা একটু দূরে আসিয়া গুরু মহাশয়কে প্রণাম করিল এবং তাহাদের একজন বলিল,—"আমাদের কসুর মাপ কর ঠাকুর; নিশ্চয়ই তোমার পিছনে দেবতার দৃষ্টি আছে। তোমার মত ওস্তাদ দল বাঁধিলে মুলুক মারা যায়।"

বাহিরে যখন এই সকল কাণ্ড চলিতেছে, তখন অন্তঃপুরে রঙ্গিণী একাকিনী চিন্তা-মগ্না। সেই সময় তাঁহার সেই দাসী সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার কাণে কাণে কি বলিল। তৎক্ষণাৎ অতি ব্যস্ততা সহ, দাসীর সঙ্গে রঙ্গিণী প্রস্থান করিলেন এবং অন্তঃপুরের দ্বার সান্নিধানে আসিয়া দেখিলেন, ঘর্ম্মাক্ত কলেবর ও নিতান্ত ব্যাকুল ভাবাপন্ন ঘনশ্যাম তথায় দণ্ডায়মান।

রঙ্গিণী সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"খবর কি? কাজ শেষ করিয়াছ তো?"

ঘনশ্যাম অনুচ্চ স্বরে বলিল,—"সর্ব্বনাশ হইয়াছে; কিছুই হইল না। কাজ শেষ করিয়া আনিয়াছিলাম প্রায়; হঠাৎ বড় বাধা উপস্থিত হইয়াছে।"

"বাধা কিসের?"

"সর্ব্বনেশে বাধা। আমাকে এখনই এদেশ হইতে পালাইতে হইবে, তোমাদের অনেক বিপদ ঘটিবে। আর তোমার সহিত কখন দেখা হইবে না। সুন্দরি, তুমি আমাকে বড়ই দয়া কর। এখন আমার পরামর্শ মত চলিবে কি? আইস, আমরা এখনই এখান হইতে পলায়ন করি।"

রঙ্গিণী বলিলেন,—"কি হইয়াছে, বল আগে।"

ঘনশ্যাম বলিল,—"তোমাদের গুরু মহাশয় আর কেহ নহেন, স্বয়ং রাজা উমাশঙ্কর বাহাদুর, সর্ব্বস্ব দান করিয়া এখানে লুকাইয়া আছেন। সর্ব্বস্ব নষ্ট হইলেও, তাঁহার যে মান সম্ভ্রম আছে, লোকের অগাধ টাকায় তাহা হয় না, সাহসে তাহা হয় না, চেষ্টায় তাহা হয় না। কোম্পানি তাঁহার সহায়। অনেক সন্ধান করিয়া তাঁহার বড় বড় আপনার লোকেরা আজি এখানে উপস্থিত হইয়াছে। আমি অনেক কষ্টে তাঁহাদের হাত হইতে উদ্ধার পাইয়াছি; কিন্তু সে উদ্ধার পাওয়ার ফল কিছু নাই। এখনই তাহারা এখানেও আসিয়া পড়িবে, আমাকে তাহারা খুন করিবে, তোমাদেরও অনেক বিপদে ফেলিবে। কিন্তু সুন্দরি, আমার যে বিপদই হউক, তোমাকে না দেখিয়াই প্রাণ লইয়া পলাইতে আমি পারিব না, তাই এখানে ছুটিয়া আসিয়াছি।"

রঙ্গিণী বলিলেন,—"তাহা হইলে এখানে থাকিলে আমাদের কোন আশাই মিটিবে না, আর তোমারও বিপদ ঘটিবে। এ অবস্থায় তুমি যাহা বলিতেছ তাহাই উচিত বোধ করিতেছি। তবে চল যাই, এই সময় বাটীর লোক খুব ব্যস্ত আছে, যাইবার ঠিক সময়ই এই।"

ঘনশ্যাম বলিল,—"কিন্তু প্রাণেশ্বরি, টাকা কড়ি অলঙ্কার পত্র যতদূর পার সংগ্রহ করিয়া লওয়া উচিত নয় কি? নহিলে বিদেশে আমাদের বড় কষ্ট হইবে।"

রঙ্গিণী বলিলেন,—"ঠিক কথা। আমি সব আনিতেছি, তুমি একটু অপেক্ষা কর।"

ঘনশ্যাম বলিল,—"একটু কেন বলিতেছ ভাই? যদি রাজার লোকেরা এখনই আমাকে

কাটিতে আইসে, তথাপি তোমাকে ছাড়িয়া এক পাও আমি সরিয়া যাইব না।" দাসীকে সঙ্গে লইয়া রঙ্গিণী প্রস্থান করিলেন। ঘনশ্যাম মনে করিল, এখন টাকা কড়ি বেশী আনিতে পারিলে হয়; তাহার পরে বিদেশে গিয়া যাহা করিব, তাহা এখন আর ভাবিয়া কাজ কি?

রঙ্গিণী ও তাঁহার ঝি অনেকক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিলেন। দাসীর হাতে প্রকাণ্ড এক গাঁটরি; তাহা টাকা, নোট, সোণা, রূপা দামী কাপড়ে পূর্ণ। রঙ্গিণী আসিয়া বলিলেন,—"সব আনিতে পারিলাম না, সময়ে কুলাইল না, ভাল ভাল অনেক জিনিষ আনিয়াছি, খুচরা কিছু কিছু বাকী আছে।"

গাঁটরি ঘনশ্যাম মাথায় করিয়া লইল এবং বলিল,—"থাক, তুমি যে আনিয়াছ, ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য। তা খুচরা জিনিষগুলা পড়িয়া থাকে কেন? তোমার ঝি বড় বিশ্বাসী, উহাকে তো সঙ্গে রাখিতে হইবে, সে কেন খুচরা জিনিষগুলা লইয়া ধীরে সুস্থে আসুক না।"

রঙ্গিণী বলিলেন,—"সে আবার কোথায় আমাদের সহিত মিলিবে।"

ঘনশ্যাম বলিল,—"পলাশডাঙ্গায়—এখান হইতে আড়াই ক্রোশ তফাৎ, সেখানে আমি ভাল যায়গা ঠিক করিয়া আসিয়াছি।"

ঝি বলিল,—"আমি পলাশডাঙ্গা জানি, আমি সেখানে যাইতে পারিব।"

রঙ্গিণী বলিলেন,—"তবে বাকী জিনিষপত্র যত পারিস্ লইয়া তুই আয়, আমরা আগে যাই।"

ঝি বলিল,—"আচ্ছা।"

তাহার পর সেই গভীর নিশীথে যুবতী সুন্দরী রঙ্গিণী পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া, পাষণ্ড ঘনশ্যামের সহিত অগ্রসর হইল এবং অচিরকাল মধ্যে অন্ধকারে মিশিয়া গেল। ঝি বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

অনেকক্ষণ পরে রঙ্গিণীর জননী কন্যার সন্ধান করিলেন। রঙ্গিণী কোথায়ও নাই। কেহ কোন সংবাদ দিতে পারিল না। রঙ্গিণীর দাসীও কোন কথা বলিল না। বড়ই চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল। ক্রমে সংবাদ বাহিরে আসিয়া পৌঁছিল। গুরু মহাশয়ের নির্য্যাতন বন্ধ হইয়া গেল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় ব্যাকুল ভাবে উন্মাদের মত বাটির মধ্যে ছুটিয়া আসিলেন। লজ্জায়, ঘৃণায়, উদ্বেগে আত্মীয়গণ ব্যথিত হইলেন।

যেখানে বিবাহের উৎসবের আয়োজন হইতেছিল, সেখানে দীর্ঘনিশ্বাস, অশ্রুপাত, আশঙ্কা ও দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইল। আনন্দোচ্ছ্বাস সহসা হাহাকারে রূপান্তরিত হইল। রঙ্গিণীর কোনই সন্ধান হইল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

উদ্ধার।

ঊষা সমাগমের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ভবনে বহুলোক প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের সর্ব্বাগ্রে মহারাণী করুণাময়ী দেবীর দেওয়ান শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। তাঁহার পশ্চাতে নবীনকৃষ্ণ, চণ্ডীচরণ, রামহরি, আরিফ ও অন্যান্য অনেক লোক। গুরু মহাশয় তখন প্রহরী-বেষ্টিত অবস্থায় বসিয়া আছেন। তাঁহাদিগকে দর্শন

যার তিনি নমস্কারাদি করিলেন এবং বলিলেন,—"বোধ হয় আপনাদের সহিত প্রেমালিঙ্গন করিতে আমার অধিকার নাই; কারণ আমি এখানে বন্দীরূপে রহিয়াছি।"

জীবন বাবু বলিলেন,—"আমরা সমস্ত ঘটনাই শুনিয়াছি। রায় বাহাদুর মহাশয়ও এখানে আসিয়াছেন। তিনি এখন আপনার গৃহে রাণী মাতার নিকট রহিয়াছেন।"

গুরু মহাশয় বলিলেন,—"আমি এ গ্রামে আছি, এ সংবাদ আপনারা জানিলেন কিরূপে?"

জীবন বাবু বলিলেন,—"আপনি রাজ-বাটী ত্যাগ করার পর হইতে, আমরা নিরন্তর আপনার সন্ধানে ফিরিয়াছি। কিন্তু আপনি এতই সাবধানে চলাফেরা করিয়াছেন যে আমরা কোন ক্রমেই আপনাকে ধরি ধরি করিয়াও ধরিতে পারি নাই। আমরা সকলেই নানা দিকে আপনার নানারূপ সন্ধান করিয়াছি, কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারি নাই।"

গুরু মহাশয় বলিলেন,—"আপনারা এ অধমের জন্য বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। আত্মীয়গণ এরূপ কষ্ট পাইতেছেন জানিয়া, আমার পূর্ব্বেই সংবাদ দেওয়া উচিত ছিল। আমার বড়ই অপরাধ হইয়াছে। আপনারা কৃপা করিয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন। সম্প্রতি আমি এখানে আছি, আপনারা এ সংবাদ জানিলেন কিরূপে?"

জীবন বাবু বলিলেন,—"এ সংবাদ জানিবার আমাদের কোনই উপায় ছিল না। গত কল্য রাত্রে মহারাণী করুণাময়ী মাতা আমার নিকট এ সংবাদ পাঠাইয়াছেন এবং বহু লোক লইয়া, যেরূপে হউক, সন্ধ্যার মধ্যে এখানে উপস্থিত হইতে আমাদিগের আদেশ করিয়াছেন। আমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বে কোন মতেই এ স্থানে পৌঁছিতে পারি নাই। সৌভাগ্যক্রমে যে সময় আসিতে পারিয়াছি, তাহাতেও অনেক অসুবিধা দূর হইয়াছে। সে অনেক কথা; এখন বলিবার সময় নহে। আপনি আর এখানে বসিয়া কেন? আসুন।"

গুরুমহাশয় বলিলেন,—"আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাকে বন্দী থাকিতে হইয়াছে।"

জীবন বাবু বলিলেন,—"কে আপনাকে বন্দী করিয়াছে? কি দোষে আপনি বন্দী হইয়াছেন? যিনি আপনাকে বন্দী করিয়াছেন, তাঁহার আদেশে বাধ্য হইবার কোন কারণ নাই। আপনি আসুন।"

গুরুমহাশয় বলিলেন,—"তিনি অকারণে অপরাধী করিয়া আমাকে ধরিয়া রাখিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি আমার উপকারক, আশ্রয়-দাতা। তাঁহার অনুমতি না লইয়া প্রস্থান করা অনুচিত নহে কি?"

চণ্ডীচরণ বলিলেন—"বিশেষতঃ তিনি শ্বশুর; সুতরাং বাপ খুড়ার অপেক্ষাও পূজনীয়। তাঁহার পদরজ না লইয়া যাওয়া যায় কি? এস তুমি!"

সকলে হাসিয়া উঠিলেন। গুরুমহাশয় বলিলেন,—"খুড়া মহাশয়, আপনাদের চরণ-ধূলিই আমার সম্বল। আপনারা দয়া করিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে একটা সংবাদ দিন, তাহার পর আমি আপনাদের চরণাশ্রয়ে গমন করি।"

রামহরি সেই বাগদিদিগকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোদের মুনিব কোথায় রে?"

একজন উত্তর দিল,—"বাটীর ভিতর

অধিক বলিল,—"শীঘ্র খবর দে না বেটারা লাট সাহেবের মত বসিয়া আছে। যা—"

কাহাকেও কোন সংবাদ দিতে হইল না। তখনই বিকট স্বরে চীৎকার করিতে করিতে

মাধব চক্রবর্ত্তী সেই স্থানে আগমন করিলেন। তিনি, আর কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই গুরুমহাশয়ের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং উৎকট স্বরে বলিলেন,—"তুই নিশ্চয় সব জানিস। তোরই কৌশলে রঙ্গিনী আমার সর্ব্বস্ব লইয়া পলাইয়াছে। তোর জন্ত সে পাগল হইয়াছে। তুই তাহাকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক, অথচ তাহার দ্বারা যথেষ্ট টাকা-কড়ি হস্তগত করিয়া অবস্থা ভাল করা তোর অভিপ্রায়। তাই তুই বিদেশে গিয়া স্বামী-স্ত্রী রূপে বাস করিবি, এইরূপ পরামর্শ করিয়া তাহাকে স্থানান্তরে পাঠাইয়াছিস্। তোরই একজন লোক তাহাকে লইয়া গিয়াছে। বল্ হতভাগ্য, আমার কন্তা কোথায় আছে? নহিলে আজি তোকে খুন করিব।"

তাহার পর সহসা চতুর্দ্দিকে করিয়া বলিলেন,—"এখানে এত লোক কেন? তোমরা কে? এখানে কেন আসিয়াছ?"

জীবন বাবু বলিলেন,—"আপনি অন্যায় পূর্ব্বক যাঁহার উপর উৎপীড়ন করিতেছেন, আমরা তাঁহার পরম আত্মীয়।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—"তাই তো! এ বেটা সত্যই কি তোর বশ্য জানে? ইহার গায়ে অসুরের বল, বিপদে বা দুঃখে নিশ্চিন্ত, থাকে অতি দীনদরিদ্রের মত; কখন ইহার একটা চেনা লোকও তো দেখি নাই। আজি হঠাৎ কি মন্ত্রবলে বেটা এত আত্মীয় জুটাইয়া ফেলিল! তা হউক, আত্মীয় মহাশয়েরা আপনারা আসিয়াছেন বলিয়াই যে এ বেটা নিষ্কৃতি পাইবে, এরূপ মনে করিবেন না। এ আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। আমার সতী ধর্ম্মশীলা কন্তাকে এ বেটা পাপের পথে লইয়া গিয়াছে। শেষে তাহার দ্বারা আমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করাইয়া, অন্ত লোকের সহিত একণে তাহাকে স্থানান্তরে পাঠাইয়াছে।"

জীবন বাবু বলিলেন,—"মিথ্যা কথা সাবধানে কথা কহ। যে মহাত্মার তুমি এই কুৎসা আরোপ করিতেছ, তিনি দেবতা। লোকে তোমার কথা কখনই বিশ্বাস করিবে না। ঘনশ্যাম নামে এক দুশ্চরিত্র পাষণ্ডের সহিত তোমার কন্তা চলিয়া গিয়াছে। তোমার কন্যা এত দিন মনে মনে ব্যভিচারিণী ছিল, এখন সে কার্য্যতঃ ধর্ম্মহীনা হইয়াছে। সন্ধান করিলে তুমি তাহাদের খুঁজিয়া পাইবে। তোমার শাসনের অভাবে এবং কন্তাকে সর্ব্ববিষয়ে প্রশ্রয় দেওয়ায়, এই দশা ঘটিয়াছে। যাহা হইয়াছে তাহার আর হাত নাই। অকারণ মহাপুরুষের উপর দোষারোপ করিও না।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—"বেশ লোক তো তুমি! ধমকাইয়া কাজ সারিতে চাহ না কি? এই ব্যক্তির কুহকে পড়িয়া আমার কন্তা ধর্ম্মহীনা হইয়াছে। এ ব্যক্তি নিতান্ত দরিদ্র হইলেও, আমি ইহাঁর সহিত কন্তার বিবাহের আয়োজন করিয়াছিলাম। বিধবা বিবাহে বেটা কোন মতেই সম্মত নহে। কিন্তু ধনের তো প্রয়োজন, কাজেই আমার সরলা কন্তাকে উপপত্নীরূপে লইয়া গিয়াছে। সকল কথারই প্রমাণ আছে।"

জীবন বাবু বলিলেন,—"কোন প্রমাণ নাই। তোমার দাসী আগা গোড়া মিথ্যা কথা বলিয়াছে। আমি তোমাকে এখনই তাহা বুঝাইয়া দিতেছি। রামহরি, আমার সঙ্গের জমাদারকে ডাক তো।"

রামহরি বলিল,—"আজ্ঞে তা আজ্ঞে যাই—তা আজ্ঞে জরিক থাকি না কেন?" তুমি যাইতে পারিবে না জরিক? আজ্ঞে বড়

চক্‌চকে তলোয়ার—বড় মস্ত পাগড়ি—আজ্ঞে মস্ত ঢাল। তা জরিফ, যাও না, জমাদারকে ডাক না—কিসের ভয়?"

হাসিয়া জরিফ চলিয়া গেল। চণ্ডীচরণের দিকে রামহরি আর একটু সরিয়া দাঁড়াইল।

জমাদার আসিল; কিন্তু একা নহে। তাহার সহিত রঙ্গিণীর দাসীও আসিল। রঙ্গিণীর দাসীর হাতে প্রকাণ্ড একটা পিতলের ঘড়া।

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—"ইহাকে তোমরা কোথা পাইলে? এ কেন আসিল?"

জীবন বাবু বলিলেন,—"রঙ্গিণী যখন ঘনশ্যামের সঙ্গে পলাইয়া যায়, তখন পথে আমরা তাহাদের ধরিয়াছিলাম। তাহারা যে বুদ্ধিতে যেখানে যাইতেছে, তাহা আমরা জানিতে পারিয়াছি। এখন তাহারা যেখানে আছে, তাহাও বোধ হয় আমরা বলিতে পারি। এই দাসী তাহাদের অনুসরণ করিবে কথা ছিল। তাড়াতাড়িতে যে সকল জিনিষ তাহারা গুছাইয়া লইতে পারে নাই, দাসী তাহা লইয়াছে। এই ঘড়ায় তাহা আছে।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—"এই দাসীই তো আমাকে বলিয়াছে, গুরু মহাশয় আমার কন্যার সর্ব্বনাশ করিয়াছে।"

জীবন বাবু বলিলেন,—"বলুক। যাহা এ বলিতে চাহে, বলুক।"

ঝি বলিল,—"আর মিথ্যা বলিব না; বুঝিয়াছি আর মিথ্যা কথা চলিবে না। আমি দিদি ঠাকুরাণীর মতলবে অনেক মিথ্যা বলিয়াছি। এত শীঘ্র ধরা পড়িতে হইবে, এত সহজে আমাদের সব পরামর্শ ছিঁড়িয়া যাইবে তাহা আমি একবারও জানিতাম না। গুরু মহাশয় যাহা বলিয়া আসিতেছেন, আর এখন এই বাবু যাহা বলিতেছেন, তাহাই সত্য। আমাকে আপনারা যাহা হয় করুন।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন,—তোর কোন্ কথা ঠিক্? আমি তোকে বিলক্ষণ শিক্ষা দিয়া ছাড়িব।"

নবীনকৃষ্ণ বলিলেন,—"আপনি বসিয়া বসিয়া ক্রমে ক্রমে যত পারেন শিক্ষা দিবেন, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু আপাততঃ আপনার গ্রামের যিনি শিক্ষক, তাঁহাকে এখন ছাড়িয়া দিউন।"

জীবন বাবু বলিলেন,—"ছাড়িয়া দেওয়া না ধরিয়া রাখার কর্ত্তা উনি নহেন। আসুন গুরু মহাশয়, আমাদের কাছে আসুন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়, আপনি আমাদের নিকট যাহা শুনিয়াছেন তাহাই সত্য। এখনও চেষ্টা করিলে, পলাশডাঙ্গা গ্রামের চটীতে আপনার কন্যাকে দেখিতে পাইবেন। এখন ঘনশ্যাম আপনার উপজামাতা। আমরা বুঝিতেছি, পরিণামে আপনার কন্যার আরও অমঙ্গল হইবে। আপনার অবস্থা দেখিয়া আমরা আন্তরিক দুঃখিত হইতেছি; কিন্তু আপনি ধীর ভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন, আপনার আদরে, আপনার স্নেহে আপনার বিবেচনার অভাবে এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। আমরা এক্ষণে বিদায় হইব।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—"আপনি কে? গুরু মহাশয়ের সহিত আপনার কি সম্বন্ধ? কেন আপনি ভোর বেলা আসিয়া ইহাকে লইয়া যান? আপনার সহিত সিপাহী কেন? এ সকল কথা না বলিলে আমি গুরু মহাশয়কে ছাড়িব না।"

জীবন বাবু বলিলেন,—"কোন কথাই বলিতে আমরা বাধ্য নহি।"

চণ্ডীচরণ বলিলেন,—"বলিতে আমরা বাধ্য বটে কি! আপনি আমার উপদ্রবে হিক হইবার চেষ্টায় ছিলেন, সুতরাং আপনার

সঙ্গে কি অসৌজন্য করা সাজে? এই যে আপনাদের গুরু মহাশয়, যাঁহাকে উপজামাতা-রূপে পাইলেও আপনি চরিতার্থ হইতেন, ইনি রাজা উমাশঙ্কর বাহাদুর। একি! হা করেন কেন উপবিহাই?"

বাস্তবিক চক্রবর্ত্তী মুখ ব্যাদান করিলেন। একজন বাগদি বলিল,—"মোরা কিছুই জানি না। মোদের কসুর মাপ কর বাবা। তাতেই বলি, এ যে মানুষ নয়—দেবতা।"

চণ্ডীচরণ বলিলেন,—"চুপ কর বেটারা! দূর হ! উপবিহাই মহাশয় কৃপা করিয়া হা টা একটু কমাইয়া ফেলুন। কেন না আবার আরও হা করিতে হইবে; তাহার স্থান কোথায়? আর এই যে মহাশয়টীকে দেখিতেছেন, ইনি চন্দ্রমালার মহারাণী করুণাময়ী দেবীর দেওয়ান জীবন বাবু। একি! আর হা করিবেন না, চোয়াল ফাটিয়া যাইবে।"

জীবন বাবু বলিলেন,—"আপনার সহিত অনেক বাদানুবাদ করিয়াছি। এক্ষণে বেলা অনেক হইয়া উঠিল আমরা প্রস্থান করি।"

রাজা উমাশঙ্কর বলিলেন,—"চক্রবর্ত্তী মহাশয়, আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। আমি এক্ষণে বিদায় হইতেছি। আপনাকে প্রণাম।"

চণ্ডী বলিলেন,—"উপ-শ্বশুরকে ভাল করিয়া প্রণাম কর বাবাজী। উপ-শাশুড়িটী কোথায়? এদেশে বিধবা, সধবা, আসল, নকল সব বিবাহই চলে। আমি তোমার শাশুড়িটীর একটা গতি করিলেও করিতে পারিতাম। যাই হউক, এখন আমরা বিদায় হই উপ-বিহাই। যাইবার সময় তোমার একবার কাণ মলিয়া না দিলে, কুটম্বিতার মত কাজ হয় না।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিরুত্তর। অতি অল্প সময়ের মধ্যে যে সকল বিরোধী ঘটনা তাহা ভাবিয়া তিনি অবাক্। কার্য্য-কারণ কিছুই তিনি নির্ণয় করিতে পারিলেন না। অপমান ও মনস্তাপ যথেষ্ট ঘটিল। তিনি হতবুদ্ধির ন্যায় বসিয়া রহিলেন। রাজা উমাশঙ্কর, জীবন বাবু প্রভৃতি সকলে প্রস্থান করিলেন। তখন বেলা আটটা হইবে।

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীর এই সকল ঘটনা নানারূপ আকার ধারণ করিয়া গ্রামময় প্রচার হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ব্যক্ত হইল যে, বনপুরের গুরু মহাশয় আর কেহ নহেন,—তিনি সাক্ষাৎ দেবতাস্বরূপ পরম দয়াময় রাজা উমাশঙ্কর বাহাদুর। তিনি সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া একটা দেশ রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার বাক্য যেমন সুমিষ্ট, কার্য্য যেমন পবিত্র, দয়া তেমনি অসীম। সেই মহাত্মাকে রাজা বলিয়া না জানিয়াও, গ্রামের লোকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিয়াছে। আজি গুরু মহাশয় রাজা ও ঠাকুরাণী রাণীকে দেখিবার জন্য দলে দলে নরনারী তাঁহাদের সেই ক্ষুদ্র কুটীরাভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল।

রঙ্গিণীর সংবাদ পাওয়া গেল। সে পলাশডাঙ্গায় ঘনশ্যামের সহিত স্ত্রী-পুরুষরূপে বাস করিতেছে। সে স্পষ্টরূপে স্বীকার করিয়াছে যে, গুরু মহাশয় কোন পাপে পাপী নহেন। সে আর ঘরে ফিরিতে চাহিল না; চক্রবর্ত্তীও তাহাকে ঘরে লইতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি বুঝিয়াছেন, স্ত্রীলোকের স্বাধীন ইচ্ছা বাড়িতে দিলে সর্ব্বনাশই হইয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি চিত্তস্থৈর্য্যের সহায়তা করিতে পারে সত্য; কিন্তু বাসনা বিনিবৃত্তি করিবার অভ্যাস হৃদয়ে বদ্ধমূল না হইলে, পতন অপরিহার্য্য। আর্য্যজাতির নারীগণ বাল্যকাল হইতেই লালসা ত্যাগ করিতে শিক্ষা পায়। আবশ্যক হইলে যথাকালে ব্রহ্মচর্য্য

ভূ জক অনুষ্ঠান তাহাদের ভোগ-প্রবৃত্তি নিবৃত্তির সহায়তা করে। তাঁহার কন্যার স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন বাসনানুবর্ত্তিতা সম্বন্ধে তিনি প্রতিঘাত করেন নাই। বরং তনয়ার বাসনা সিদ্ধির পথ হইতে কণ্টক দূর করিয়া তিনি তাহা ক্রমনিম্ন করিয়া দিয়াছেন। তাহার সমুচিত ফল ফলিয়াছে। চক্রবর্ত্তী মহাশয় এজন্য আর দুঃখ ও শোক করিলেন না। অনতিকাল পরে তিনি, এক দত্তক গ্রহণ করিয়া, সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

কয়েকদিন পরে আরও ভয়ানক সংবাদ আসিল। রঙ্গিণীকে হত্যা করিয়া এবং তাহার অলঙ্কারাদি অপহরণ করিয়া ঘনশ্যাম পলায়ন করিয়াছে; অনতিকাল পরে আরও সংবাদ পাওয়া গেল যে, রাজবিচারে সেই দুরাত্মার ফাঁসির ব্যবস্থা হইয়াছে।

দ্বাদশ খণ্ড—সমাপ্তি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অন্তকাল।

উন্মাদিনী বিধুমুখীর অবস্থা বড়ই ভয়ানক হইয়াছে। সে আর এখন গান করে না। একস্থানে স্থির হইয়া থাকে না, মৃদুস্বরে কথা কহে না, কাহারও কোন কথা শুনে না। উন্মাদিনী অঙ্গের বস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া ছুটিয়া বেড়ায়, অতিশয় চীৎকার করিয়া সর্ব্বদা ক্রন্দন কোলাহল করে, কখন কখন বিকট হাস্য করে, এবং এক দণ্ডও একস্থানে স্থির থাকে না। শ্যামলাল তাহাকে লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়াছেন। তাহাকে ধরিয়া ও আটকাইয়া রাখা তাঁহার অসাধ্য হইয়াছে। বিধুমুখীর রূপ গিয়াছে, যৌবন গিয়াছে, শোভা গিয়াছে। তাহার অনিন্দ্য বর্ণ এখন মলিনতায় আচ্ছন্ন, রোগে বিকৃত, অযত্নে বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহার দেহের সুগোল গঠন এখন শীর্ণ, কুৎসিত ও বিরূপ হইয়াছে; তাহার মস্তকের কেশরাশি এখন অনেক উঠিয়া গিয়াছে। যাহা আছে তাহাও রুক্ষকায়, মলিনতাচ্ছন্ন, অপ্রিয় দর্শন হইয়াছে; তাহার কুটিল-কটাক্ষ-পূর্ণ নয়নের সে দৃষ্টি অপগত হইয়াছে; তাহার উজ্জ্বলতা গিয়াছে; প্রখরতা নষ্ট হইয়াছে এবং মোহময়তা ধ্বংস হইয়াছে। তাহার দেহে বস্ত্র নাই বলিলেই হয়; যে সামান্যমাত্র বস্ত্রখণ্ড তাহার কটিদেশ বেষ্টন করিয়া আছে, তাহা খসিয়া পড়িলে সে ব্যাকুল হয় না, সে বস্ত্রের অভাব অনুভব করে না; তাহার লজ্জা নাই, বিলাসিতা নাই, আনন্দ নাই, সুখ নাই; তথাপি সে আছে। হায়! এই কি সেই বিলাসময়ী, লাবণ্যোজ্জ্বলকায়া, সৌন্দর্য্যসম্পদ্সম্পন্না বিধুমুখী!

অতি যত্নে শ্যামলাল তাহাকে আপনার সেই আশ্রমে আটকাইয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু এজন্য তাঁহাকে বড়ই বিব্রত হইতে হইয়াছে। বিধুমুখী কথা শুনে না, ঔষধ খায় না, আহার করে না, একস্থানে থাকিতে চাহে না। তথাপি শ্যামলাল অবিরক্ত চিত্তে নিরন্তর পীড়িতার সেবা করিতেছেন। জোর করিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিতে হয়, অনেক যত্নে তাহার শুশ্রূষা করিতে হয়।

নীলরতন বাবুর যত্নের ত্রুটি নাই। তাঁহার উদ্বেগ ও মানসিক ক্লেশের সীমা নাই সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি শ্যামলাল ও

বিধুমুখীর সংবাদ লইতে কখনই বিরত নহেন। তাঁহার জামাতা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন, গৃহত্যাগ করিয়া সস্ত্রীক কোথায় গিয়াছেন, তাহার সন্ধান নাই। দৌহিত্র বিগতজীব হইয়াছে, ইত্যাকার বিবিধ দুশ্চিন্তার মধ্যেও তিনি চিত্ত-স্থৈর্য্য রাখিয়া অন্যান্য কর্ত্তব্য-পালনে উদাসীন হন নাই। রায় হরকুমার বাহাদুরের বুদ্ধি বিদ্যার উপর তাঁহার প্রবল বিশ্বাস আছে, সে রায় বাহাদুর এখনও কাশী ফিরিয়া আইসেন নাই। ইহা একটা আশ্বাসের কথা। আর তিনি শুনিয়াছেন, তাঁহার জামাতার অনুগত লোকজন এবং মহারাণী করুণাময়ী দেবীর দেওয়ান প্রভৃতি লোকেরা রাজার সন্ধানে আছেন। তিনি এই সকল ব্যক্তির আয়াসের সফলতার আশায় আশান্বিত।

নীলরতন বাবুর নিয়োজিত ডাক্তার আসিয়া নিয়মিত রূপে বিধুমুখীকে দেখিয়া যান, তাঁহার লোক ঔষধ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আনিয়া দেয়, তিনি স্বয়ং সতত সন্ধান লন এবং আবশ্যক মত অর্থাদি প্রদান করেন।

বিধুমুখীর অবস্থা উত্তরোত্তর মন্দ। আহার অভাবে শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল; বিধুমুখী শয্যা গ্রহণ করিল; উঠিয়া চলা ফেরা তাহার অসাধ্য হইল। তথাপি সে উঠিবার ও ছুটিবার চেষ্টা করে; তথাপি সে শুইয়া শুইয়াও অকারণ হাত নাড়ে, পা নাচায়, মাথা দুলায়। দুর্ব্বল হওয়ায় তাহার অনেক অত্যাচার বন্ধ হইল বটে; কিন্তু চীৎকার করা, হাস্য করা, রোদন করা বন্ধ হইল না।

শ্যামলাল বুঝিলেন, তাঁহার এ সেবা-কার্য্যের শেষ হইয়া আসিতেছে। তিনি এক দিন নীলরতন বাবুকে সেই কথা বলিলেন। নীলরতন বাবু বলিলেন, এখনও কোন কথা বলা যায় না। অবস্থা মন্দ হইয়া আসিতেছে বটে; কিন্তু এখনও অন্যদিকে ফিরিতে না পারে এমন নহে। আরও কয়েকদিন কাটিয়া গেল। শ্যামলাল বুঝিলেন, রোগীর অবস্থা আরও মন্দ। তিনি ডাক্তারকে একথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ডাক্তার বলিলেন,—"কি আর বলিব? জীবনের কোন আশা নাই। আর দুই তিন দিনেই সব শেষ হইবে।"

যাহা কখন হয় নাই, তাহা হইল। শ্যামলাল আপনার জন্য কাঁদেন নাই; পরের দুঃখে কখন এক ফোঁটা চক্ষুর জল ফেলেন নাই; তাঁহার চরণ ধরিয়া কত সুন্দরী নয়ন জল ঢালিয়াছে। তাঁহার প্রাণ তাহাতেও গলে নাই। আজি তাঁহার নয়ন জলভারাকুল হইল। পাষাণে অমৃতধারা বহিল; মরুস্থলে সুশীতল সলিল পরিদৃষ্ট হইল। কেন এরূপ হইল? শ্যামলাল জীবনে কাহাকেও আপনার বলিয়া মনে করেন নাই, জীবনে কাহাকেও ভাল বাসেন নাই, কাহার ভালবাসা পান নাই, আপনার তুচ্ছ ভোগসুখ ভিন্ন আর কিছুই বুঝেন নাই। তাই তাঁর প্রাণ কাহারও জন্য কাঁদিতে শিখে নাই। বিধুমুখী ঘাড়ে পড়িয়াছে, দায়গ্রস্ত হইয়া শ্যামলাল তাহার সেবা করিতেছেন, সে তাঁহারই জন্য উন্মাদিনী হইয়াছে। সে তাঁহার নিকট অপরাধ-জনিত অনুতাপে মৃতকল্প হইয়াছে, সে তাঁহার বিবাহিতা পত্নী, সে তাঁহারই অনাদরে ধর্ম্মহীনা, ইত্যাদি চিন্তা হইতে বিধুমুখীর আরোগ্য কামনা জন্মিয়াছে এবং তাহারই ফলে এই কঠোর শিলা একটু বিগলিত হইয়াছে।

ডাক্তার চলিয়া গেলে শ্যামলাল পীড়িতার নিকট বসিলেন এবং অতি কোমলভাবে তাহার দেহে হাত বুলাইতে লাগিলেন। ভাবিলেন,

[illegible]। আত্মসমর্পণ করা মায়ার ধর্ম। তাই আবং

এইরূপ হাত বুলাইয়াই তিনি হয়তো তাহাকে রোগমুক্ত করিতে পারিবেন।

বিধুমুখী চীৎকার করিয়া উঠিল,—"আঃ! তুমি কে? কেন জ্বালাতন কর? বাঃ বাঃ লাথি মার—মার—আবার মার।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"বিধুমুখী, তুমি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না? আমি তোমাকে জ্বালাতন করিতেছি না, তোমার গায়ে হাত বুলাইতেছি।"

বিধুমুখী বাধা দিয়া বলিলেন,—"ওঃ বড় শক্ত তোমার পা! উহু, আর মারিও না—আমার বড় লাগিতেছে—ক্ষমা কর।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"চুপ কর। কেহ তোমাকে মারিতেছে না। তোমাকে মারিব কেন? সকলেই তোমাকে যত্ন করিতেছে, কত আদর করিতেছে।"

পাগলিনী সে কথা শুনিল না। সে ভয়ানক হাস্য করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বলিল,—"তুমি আসিয়াছ? গুরুদেব! প্রণাম করি। নরকে তুমি কেন? নরকের শোভা ফুটিয়া উঠিল। ঐ বাণী, ঐ দেবী, আহা! কি সুগন্ধ।"

উন্মাদিনী চুপ করিল। যেন কি দূরের বস্তু দৃষ্টিসংযত করিয়া মনঃসংযোগ সহকারে দেখিতে লাগিল। এইরূপে পরদিন কাটিয়া গেল। তাহার পরদিন বিধুমুখীর অবস্থা বড় মন্দ হইল। প্রাতঃকাল হইতেই তাহার কণ্ঠস্বর সংরুদ্ধ হইল এবং তাহার অস্থিরতা কমিয়া গেল। শ্যামলাল রোগ শোক বড় দেখেন নাই এবং কখনও পীড়িতের সেবাও করেন নাই। তিনি এ পরিবর্ত্তন বড়ই শুভসূচক বলিয়া মনে করিলেন এবং ডাক্তার আসিলে, তাঁহাকেও সেইরূপ বলিলেন।

ডাক্তার রোগীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া [illegible]—"আজি রোগীর অবস্থা বড় মন্দ নাড়ীর অবস্থা খুব খারাপ। রোগীর কথা বন্ধ হইয়াছে এবং তিনি স্থির হইয়া আছেন। এ দুইটী আপনি শুভলক্ষণ বলিয়া মনে করিতেছেন, কিন্তু এ দুইটী বড় দুর্লক্ষণ; রোগীর অতিশয় দুর্ব্বলতা হইয়াছে, সেই জন্যই স্বরভঙ্গ ঘটিয়াছে এবং অঙ্গ-চালনা বন্ধ হইয়াছে। আজি কি হয় বলা যায় না।"

শ্যামলাল কিছু বলিলেন না। কিন্তু তিনি হৃদয় মধ্যে এক অননুভূতপূর্ব্বক তীব্র যাতনা অনুভব করিতে লাগিলেন। অতি কষ্টে তিনি হৃদয়ের শোক নিবারণ করিয়া রহিলেন এবং মনে করিতে লাগিলেন, হয়তো ডাক্তারের বুঝিবার ভুল হইয়াছে। এমন ভুল তো মানুষের হওয়া অসম্ভব নহে।

বেলা বাড়িতে লাগিল। বেলা যখন প্রায় দ্বিপ্রহর, তখন অনভিজ্ঞ শ্যামলালও বুঝিলেন, পীড়িতার অবস্থা বাস্তবিকই অতিশয় মন্দ হইয়াছে, তাহার আর জীবনের আশা নাই। তখন শ্যামলালের চক্ষু দিয়া জল বহিতেছে। তিনি বলিলেন,—"কেন বিধুমুখী, কেন তুমি আমাদের ছাড়িয়া যাইতেছ? তুমি আমার নিকট যে আদর চাহ, তাহাই আমি দিব; তুমি আমাকে যাহা করিতে বল, তাহাই আমি করিব। তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইও না।"

সহসা বিধুমুখীর আবার ক্ষীণস্বরে বাক্য কথনের শক্তি জন্মিল। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে কোন কোন স্থলে এরূপ ঘটে। বিধুমুখীর বাক্য উন্মাদপ্রলাপ নহে। অতি মধুর-স্বরে সে বলিল,—"মরণে এত সুখ! আমি মরিতে বসিয়াছি, কিন্তু তোমার কোলে আমার মাথা! তুমি আমাকে আদর যত্ন করিতেছ, আমার জন্য তোমার চক্ষুতে জল! বড় লজ্জার কথা! কিন্তু বড় সুখ! হায়! এ সুখভোগ আমার আর অদৃষ্টে নাই।"

তখন শ্যামলালের সেই ক্ষুদ্র আবাসের দ্বারে বড়ই কলরব উত্থিত হইল। চন্দ্রমালার মহারাণী করুণাময়ী দেবী কাশী আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে অনেক লোক আসিয়াছে। কাশীতে সেজন্য একটা ঘটা পড়িয়া গিয়াছে। দানাদি ব্যাপারের বাহুল্য হেতু চারিদিকে মহারাণীর নাম ঘোষিত হইতেছে। মহারাণীর নানাবিধ সমারোহেরও সীমা নাই। সেই মহারাণী বহু অস্ত্রধারী ও অন্যান্য লোক সঙ্গে লইয়া শ্যামলালের দ্বারে উপস্থিত। লোকেরা মহারাণীর আদেশে বাহিরে অপেক্ষা করিয়া রহিল। তিনি গম্ভীর ও ধীরভাবে একাকিনী সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই সামান্য স্থান সহসা যেন সর্ব্বশোভাময় হইল; সেই মলিন ক্ষুদ্র নিকেতন যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

শ্যামলাল সেই দেবীকে দর্শন করিয়া অবাক্ হইলেন। ক্ষণেকের নিমিত্ত হৃদয়ের যাতনা ভুলিয়া গেলেন, তাঁহার অঙ্কস্থিতা মরণাপন্না নারীর কথা তাঁহার মনে হইল না।

বিধুমুখী কিয়ৎকাল মাত্র মহারাণীকে দেখিয়া বলিলেন,—"মা আসিয়াছ? এই মরণকালে তোমার কথা কতবারই ভাবিতেছি। আসিয়াছ যদি কৃপা করিয়া, একটু চরণধূলা দেও মা, আমার আর উঠিবার শক্তি নাই।"

তখন মহারাণী আপনার করে স্বকীয় চরণধূলা উঠাইয়া বিধুমুখীর মস্তকে প্রদান করিলেন। আর বলিলেন,—"মা, পতিপদ চিন্তা কর, তাহাতেই সকল দুঃখ জ্বালার শান্তি হইবে। নারীর আর দেবতা নাই, আর গতি নাই।"

বিধুমুখী বলিল,—"তাহাতেও বুঝি আমার অধিকার নাই। আপনি সকলই জানেন। আর কি বলিব?"

মহারাণী বলিলেন,—"সব জানি; সব শুনিয়াছি। সত্যই মা তোমার পাপের সীমা নাই। নারীর এক ভিন্ন দুই স্বামী হইতে পারে না। নারীর দেহ কেবল স্বামীরই সামগ্রী। তিনি যদি ইহা না লন, লইতে ভুলিয়া যান, তাহা হইলেও, পরকে দিবার কোন অধিকার থাকিতে পারে না। কার্য্যে দূরের কথা; মনে মনেও অন্য কাহাকে স্বামীর স্থানে বসাইবার কল্পনা করিলেও মহাপাপ হয়। তুমি মা, সেই পাপ পূর্ণমাত্রায় অনুষ্ঠান করিয়াছ। তোমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত নাই।"

বিধুমুখী বলিল—"আমি তাহা বুঝিয়াছি মা; এই জন্যই পতিপদ ভাবনায় আমার অধিকার নাই বলিয়াছি। জানি না, বুঝিতে পারিতেছি না; আমার কি হইবে।"

করুণাময়ী বলিলেন,—আমার বোধ হয় তোমার খুবই ভাল হইবে। যাঁহার নিকট তুমি অপরাধী তোমার সেই স্বামী দেবতা দেখিতেছি তোমাকে ক্ষমা করিয়াছেন। ইহা তোমার সৌভাগ্য।"

বিধুমুখী বলিল—"তিনি আমাকে কৃপা করিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাঁহার কৃপাও আমার লজ্জার কারণ হইয়াছে। এত পাপের উপর সদয় ব্যবহার লাভ করিয়া আমি দ্বন্দ্বে মরিয়া যাইতেছি। তিনি আমাকে নির্দ্দয় কৃপা করিলে আমার হয় তো এত যাতনা হইত না। আমার স্বামী পরম করুণাময়—আমি দেখিতেছি তিনি সর্ব্বগুণময়—সর্ব্ব দেবতাময়—সর্ব্ব ধর্ম্মময়—সর্ব্ব পূজনীয় পরম দেবতা। আমার দেহমনপ্রাণ যেন তাঁহার চরণে মিশিয়া যাইতেছে।"

করুণাময়ী বলিলেন,—তোমার অন্তকাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। অন্তকালে পতির পদে আত্মসমর্পণ করা নারীর ধর্ম্ম। তুমি আবি-

চলিত চিত্তে সেই ধর্ম্ম পালন করিতে থাক। তাহা হইলে ভগবান্ তোমাকে দয়া করিতে পারেন।"

বিধুমুখী নয়ন মুদিয়া রহিল। শ্যামলাল বলিলেন,—"মা, আপনি কোন্ দেবতা? ভাগ্যবতী বিধুমুখী আপনাকে জানেন, আপনাকে দেখিয়াছেন; আমি অভাগা জীবনে কখনও আপনাকে দেখি নাই।"

করুণাময়ী বলিলেন,—"বাবা, আমি দেবতা নহি, সামান্য মানুষ। তুমি মহাপুরুষ ঘনানন্দ স্বামীর উপদেশ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছ। তুমি শোক দুঃখ ত্যাগ কর, তোমার পত্নীকে তুমি সরল মনে ক্ষমা কর। পাপের জ্বালায় সে জীবনে নরকভোগ করিয়া অনন্তধামে চলিতেছে। তোমার কৃপা হইলে তাহার পরকালে ভাল হইতে পারে।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"আমার স্ত্রী অপরাধ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু আমিই প্রকারান্তরে তাহার কারণ, আমি মহাপাপী। বিধুমুখীর তুলনায় আমার পাপ অসীম, বিধুমুখী সামান্য পাপে অসহ্য জ্বালা ভোগ করিতেছে। জানি না আমার অদৃষ্টে কি আছে, আমি সরল ও সন্তুষ্ট মনে বিধুমুখীকে ক্ষমা করিতেছি। কিন্তু আমাকে বিধুমুখী ক্ষমা করিবেন কি?"

বিধুমুখী চক্ষু মেলিয়া বলিলেন,—"তোমাকে ক্ষমা! তুমি যে দেবতা। দেবতার কি পাপ হয়, মা, আমি আর কথা কহিতে পারি না। সম্মুখে কি দেখিতেছি? কাহারা ওরা?"

করুণাময়ী বলিলেন,—"কিছুই দেখিয়া কাজ নাই; নয়ন মুদিয়া মনে মনে কেবল স্বামীকেই দেখ, ভয় কি?"

বিধুমুখী নয়ন মুদিল। করুণাময়ী বলিলেন,—"বাবা তুমি রোদন করিও না। তোমার বিধুমুখীকে তুমি আবার দেখিতে পাইবে।"

সহসা বিধুমুখীর সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। সে বলিয়া উঠিল,—"মা, মা, আমি যাই। দেবতা, স্বামী, তুমি জন্মান্তরে চরণে রাখিও,—স্বামী গুরু, আঃ—যাই।"

আর কথা বিধুমুখী বলিল না। করুণাময়ী দেখিলেন, যন্ত্রণা-পীড়িত বিধুমুখীর জীবন শেষ হইল। শ্যামলাল সেই নারীর মস্তক ক্রোড়ে ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মহারাণী বলিলেন,—"আর কাঁদিও না। এ জীবনই আমাদের শেষ নহে। এক্ষণে বিধুমুখীর এই দেহ সম্বন্ধে তোমার অনেক কার্য্য আছে, তাহা স্মরণ করিয়া চিত্ত স্থির কর।"

সাবধানে মৃতার মস্তক ভূতলে স্থাপন করিয়া শ্যামলাল উঠিয়া দাঁড়াইলেন, মহারাণীর আদেশে কয়েক জন লোক আসিয়া তখনকার ব্যবস্থা স্থির করিল। শ্যামলাল কোমরে গামছা বাঁধিয়া তাহাদের সঙ্গ গ্রহণ করিলেন। গঙ্গাতীরে বিধুমুখীর দেহ নীত হইল, যথারীতি সৎকার সমাপ্ত হইল। এ সংসার হইতে তাহার সকল চিহ্ন বিলুপ্ত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গুরুশিষ্য।

ঘনানন্দ স্বামীর কঠিন পীড়া হইয়াছে। এ পীড়ায় তাঁহার জীবন রক্ষা হইবে না বলিয়া সকলেই অনুমান করিয়াছেন, বহুসংখ্যক ইংরাজ, বাঙ্গালী ও পশ্চিম প্রদেশ-

বাসী পদস্থ ব্যক্তি তাঁহাকে সমস্ত দিন দেখিতে আসিতেছেন। তারযোগে সংবাদ নানা স্থানে প্রেরিত হইয়াছে এবং সংবাদ পত্রাদিতে তাঁহার শরীরের অবস্থা প্রতিদিন প্রচারিত হইতেছে। বিদেশের ভক্তগণ সংবাদ পত্রে তাঁহার সংবাদ পাঠ করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে। কাশীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ প্রতিদিন বিদেশস্থ ব্যক্তিগণের নিকট হইতে ঘনানন্দ স্বামীর স্বাস্থ্য বিষয়ক অনেক পত্র ও টেলিগ্রাম পাইতেছেন। কাশীর জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর নিয়ত তাঁহার সংবাদ লইতেছেন। স্বামী এ পীড়ার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিবেন না এবং এই রোগেই তাঁহার দেহান্ত হইবে, ইহা সকলেই বুঝিয়াছেন।

বারাণসী ধামের সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানেই স্বামী শিষ্যদ্বয়সহ বাস করিতেছিলেন, কিন্তু ধনশালী, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের নির্ব্বন্ধাতিশয্য হেতু তাঁহাকে কাশীনরেশের এক প্রকাণ্ড ভবনে আসিতে হইয়াছে। ভবন গঙ্গাতীরে অবস্থিত, বহ্বায়ত এবং অন্য লোকের দ্বারা অনধিকৃত। ডাক্তার সাহেব, কবিরাজ, হকিম সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া যান। যিনি যে ঔষধ দেন, তাহাই তিনি সেবন করেন এবং যে যাহা অনুরোধ করে তিনি তাহাই পালন করেন। কাহাকেও তিনি মনঃ-ক্ষুণ্ণ করিতেছেন না, যে হিতৈষী তাঁহার জন্য যে ব্যবস্থা করিতেছেন, তিনি আপত্তি না করিয়া সেই ব্যবস্থা পালন করিতেছেন। যে তাঁহাকে দেখিতে আসিতেছে তাহাকেই তিনি সম্মুখে অনায়াসে দেখা দিতেছেন; যে তাঁহার সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা করিতেছে, তাহারই সহিত তিনি আলাপ করিতেছেন।

তাঁহার কি পীড়া হইয়াছে, তাহা কেহ জানে না। ডাক্তার কবিরাজ কেহই তাহা নির্ণয় করিতে পারে নাই, ঘনানন্দ স্বামীর শ্বাস-যন্ত্র অতিশয় দুর্ব্বল এবং উত্তরোত্তর অধিকতর দুর্ব্বল হইতেছে। তাঁহার আহারে অতিশয় অপ্রবৃত্তি এবং দেহে শোণিতের অতিশয় অল্পতা ঘটিয়াছে, দেহের সর্ব্বত্র একটা বিজাতীয় জ্বালা উপস্থিত হইয়াছে। ডাক্তার ও কবিরাজ কেহই এ সকল ব্যাধি অসাধ্য বলিয়া মনে করিতেছেন না। নিয়মিত ঔষধ ও পথ্যাদি সেবনে তিনি সহজেই সুস্থ হইবেন বলিয়া তাঁহারা বিশ্বাস করিতেছেন। ঘনানন্দ কাহারও ঔষধ সেবনে বা ব্যবস্থানুরূপ পথ্য গ্রহণে আপত্তি বা ঔদাস্য করিতেছেন না, অনুরাগী ছাত্রগণ যখন যাহা বিধেয় বলিয়া মনে করিতেছেন, সন্ন্যাসী তাহাই পালন করিতেছেন, কিন্তু তিনি মৃদু হাস্য সহকারে মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিতেছেন যে, তাঁহার দেহ ত্যাগ করার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে এবং অচিরে তাঁহার উৎক্রান্তি ঘটিবে। মহাপুরুষের এই বাক্য শত চিকিৎসকের বাক্যাপেক্ষা বলবান্ বলিয়া সকলেই অনুমান করিতেছেন এবং শীঘ্রই যে তিনি মহাপ্রস্থান করিবেন তদ্বিষয়ে অনেকের বিশ্বাস জন্মিয়াছে।

উত্তম ভবনে বাস, যথোপযুক্ত ঔষধ সেবন, নিয়মিত পথ্য গ্রহণ, সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা পালন চলিতে লাগিল, চিকিৎসকেরা বলিতে লাগিলেন, ঠাকুর ভাল হইতেছেন, তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্র সুস্থ হইতেছে, শরীরে রক্ত সঞ্চয় হইতেছে, এবং তিনি শীঘ্র রোগমুক্ত হইবেন, কিন্তু সন্ন্যাসী বলিতেছেন, তাঁহার দেহান্ত ঘটিবার আর বিলম্ব নাই, আগামী বৈশাখ পূর্ণিমার দিন সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর কালে তিনি দেহ

ত্যাগ করিবেন। চিকিৎসকের বিরুদ্ধ বাক্য শুনিয়াও সন্ন্যাসীর বাক্য সকলে বিশ্বাস সহকারে শ্রবণ করিল এবং শিষ্য ও একান্ত আত্মীয়গণ নিতান্ত ভয় চকিতভাবে সেই দুর্দ্দিন গণিতে লাগিল, সেদিনের আর পাঁচটী দিন মাত্র বাকী। দর্শনার্থী, পদরজঃ গ্রহণার্থী এবং ভক্তি-প্রদর্শনার্থী লোকের সংখ্যা দিন দিন ভয়ানক বাড়িতে লাগিল। কাশীনরেশ এবং গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ লোক সমাগম কমাইবার চেষ্টা করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু ঘনানন্দ বুঝাইয়া দিলেন যে তিনি অনুমাত্র উত্ত্যক্ত বা ক্লিষ্ট হইতেছেন না, সুতরাং লোকদিগকে মনঃপীড়া দিবার কোনই আবশ্যকতা নাই।

বহু লোকের মধ্যে দূর হইতে অতি সুশ্রী, বলিষ্ঠ, ও পরিণত কলেবর এক ব্রাহ্মণ যুবা ভূতলে মস্তক স্থাপন করিয়া ঘনানন্দকে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসীর দৃষ্টি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইল। সেই যুবা রাজাবাহাদুর উমাশঙ্কর। মহাপুরুষের দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য অনেকের দৃষ্টি সেই দিকে সঞ্চালিত হইল। কাশীতে উমাশঙ্কর এক সময়ে সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। অনেকেই তাঁহাকে চিনিতে পারিল, যাহারা চিনিতে পারিল, তাহারা সম্ভ্রম স্তম্ভিত ভাবে মস্তক নত করিল। যাহারা চিনিতে পারিল না, তাহারা পার্শ্বস্থ লোকের নিকট এই নবাগত ব্যক্তির পরিচয় জিজ্ঞাসু হইল। তখন সকলেই বুঝিল, এই ব্যক্তি সন্ন্যাসীর প্রিয় শিষ্য। ভাগ্যবলে ইনি বিপুল ধনশালী হইয়া বঙ্গদেশে রাজা হইয়াছিলেন এবং সমস্ত ধন ব্যয় করিয়া ভারতকে দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছেন। এখন আবার ইনি দরিদ্র। তখন সেই লোকসমূহ সরিয়া দাঁড়াইয়া রাজা উমাশঙ্করের নিমিত্ত পথ করিয়া দিল। যতই তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই সমবেত লোক সমূহ "জয় রাজা উমাশঙ্করের জয়।" শব্দে চীৎকার করিতে লাগিল। উমাশঙ্কর নত বদনে করযোড়ে নিতান্ত বিনীত ভাবে অগ্রসর হইয়া ঘনানন্দের সমীপস্থ হইলেন এবং তাহার চরণে মস্তক স্থাপন করিয়া প্রণাম করিলেন।

মহাপুরুষ বলিলেন,—"তুমি কখন আসিয়াছ ?"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"এই আসিতেছি। লোক মুখে শুনিলাম ভগবান্ দেহ রক্ষার আয়োজন করিতেছেন, এ সংবাদে ব্যাকুলতার কোন কারণ না থাকিলেও, পাছে এ সময়ে একবার সাক্ষাৎ না ঘটে, এই ভয়ে বড় ব্যস্ত হইয়া আসিয়া পড়িয়াছি।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"ভাল করিয়াছ। তোমাকে অনেক প্রয়োজনীয় ভার গ্রহণ করিতে হইবে, আপাততঃ মা অন্নপূর্ণা কোথায় ?"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"তিনিও পিত্রালয় গমনের পূর্ব্বেই আপনাকে দেখিবার নিমিত্ত আমার সহিত এখানে আসিয়াছেন, এখানে বড়ই জনতা; সুতরাং নিকটে আসায় সুবিধা না হওয়ায় নীচের এক কক্ষে অপেক্ষা করিতেছেন।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"তাঁহাকে আমার পূর্ণ হৃদয়ের আশীর্ব্বাদ জানাইবে, এ বেলা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া তুমি নীলরতন বাবুর বাটীতে যাও। অদ্য রাত্রি কালে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আসিবে। তখন বিস্তারিত বৃত্তান্ত শুনিব ও বলিব। রায় বাহাদুর প্রভৃতি আত্মীয়গণ কোথায় ?

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"একটু পিছাইয়া পড়িয়াছেন। এখনই আসিবেন। আপনাকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহারা অতিশয় ব্যাকুল

আছেন। বাবা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, মা আসিয়াছেন কি ?”

ঘনানন্দ বলিলেন,—“আসিয়াছেন, শুনিয়াছি, কিন্তু আমার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই।”

উমাশঙ্কর বলিলেন,—“বহু দিন মাতৃ-চরণ দর্শনে বঞ্চিত আছি। অনেক আবির্ভাব পড়িয়াছি। অনেক পঙ্ক গায়ে মাখিয়াছি, অনেক সুখ দুঃখের চিহ্ন দেখিয়াছি, এক্ষণে বাপ মার ছেলে বাপ মার কোলে মাথা রাখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া আসিয়াছে। পিতা ইচ্ছাপূর্ব্বক আমাদের ছাড়িয়া যাইতেছেন, মা কি করিবেন জানি না।”

ঘনানন্দ বলিলেন,—“কি করিবেন তাহা এখন ভাবিয়া কাজ নাই। আমি এই মাত্র বলিতে পারি, তোমার বিষয়-ভোগের এখনও শেষ হয় নাই। তোমাকে পুনরায় বিষয় কর্ম্মে ব্যাপৃত হইতে হইবে।”

উমাশঙ্কর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। বলিলেন,—“আবার যন্ত্রণা! দয়াময়! ইহাই কি ভগবানের ইচ্ছা! তিনি অধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন।”

ঘনানন্দ বলিলেন,—“চিন্তা নিষ্প্রয়োজন। যাহা হওয়া উচিত তাহাই হইবে। সে বিষয়ের চিন্তা কেন? তুমি এখন যাও, নীলরতন বাবু, তাঁহার স্ত্রী ও ভগ্নী তোমাদের জন্য বড়ই চিন্তাকুল আছেন। তুমি অবিলম্বে মা অন্নপূর্ণাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদের নিকট যাও।

উমাশঙ্কর পুনরায় সন্ন্যাসীর চরণে মস্তক-স্থাপন করিলেন। তিনি বলিলেন,—“বৎস! তোমার দৃষ্টান্তে জগৎ ধন্য হউক।”

—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পতি-পত্নী।

আজি সন্ধ্যার পর ঘনানন্দ স্বামীর সেই ভবনে বড় সমারোহ। ভবন আজি আলোকমালায় সজ্জিত, বিবিধ বর্ণের মনোহর পতাকায় সুশোভিত এবং পত্র ও পুষ্পদামে পরিবৃত। ভবনদ্বারে কাশীর সুবিখ্যাত রোসনচৌকী বাজিতেছে এবং অনেক সুসজ্জিত শস্ত্রধারী সশস্ত্র রক্ষা ফিরিতেছে। আজি চন্দ্রমালার মহারাণী করুণাময়ী দেবী ঘনানন্দ স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন। তাঁহার বাসনায় এই সকল আয়োজন হইয়াছে।

কক্ষ-মধ্যে নির্দ্দিষ্ট আসনে ঘনানন্দ অন্নপূর্ণা দেবীর উপর মৃগচর্ম্মে আসীন। তাঁহার উভয় পার্শ্বে আমাদের সুপরিচিত অনেক নরনারী। তাঁহার একদিকে মহারাণীর দেওয়ান জীবন বাবু, রায় হরকুমার চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, রাজা উমাশঙ্কর, নবীনকৃষ্ণ, শ্যামলাল, রামহরি, নীলরতন বাবু, চণ্ডীচরণ, রফিক এবং স্বামীর শিষ্যদ্বয়। অপর দিকে রাণী অন্নপূর্ণা, সুহাসিনী, নীলরতন বাবুর পত্নী ও ভগ্নী, ভব, দাসী প্রভৃতি নারীগণ। সকলেই সেই মহিমাময়ী মহারাণীকে দেখিবার নিমিত্ত আগ্রহান্বিত।

দুই একটী প্রসঙ্গের আলোচনার পর রায় বাহাদুর বলিলেন,—“শ্যামলাল বাবু সম্প্রতি যে মানসিক কষ্টভোগ করিতেছেন, তাহা প্রভুর অবিদিত নাই। এই ঘটনার পর তাঁহার আকার প্রকারের বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং তিনি চিন্তাকুল হইয়াছেন। তাঁহার প্রতি প্রভুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।”

ঘনানন্দ বলিলেন,—"শ্যামলাল বাবুর অনিষ্ট কিছুই হয় নাই। ইচ্ছাময়ের রাজ্যে যাহা ঘটে, তাহাতেই শুভ ফল হয়। শ্যামলাল বাবুর এই ক্লেশ তাঁহার চিত্তশুদ্ধির সহায় হইবে, শোকে তাঁহার হৃদয় নির্ম্মল হইবে এবং সংসারের অনিত্যতা বোধ তাঁহাকে জ্ঞানের পথে লইয়া যাইবে। শ্যামলাল তুমি সুপথে বিচরণ করিতে শিখিয়াছ। রাজা উমাশঙ্কর তোমার গুরু। তিনি সতত বিহিত পথ দেখাইয়া দিয়া তোমার কল্যাণ সাধন করিবেন। তুমি কদাচ তাঁহার উপদেশ অবহেলা করিও না।

গম্ভীর শ্যামলাল ভূলুণ্ঠিত হইয়া ঘনানন্দ, উমাশঙ্কর ও উপস্থিত তাবৎ নরনারীকে প্রণাম করিলেন।

হরকুমার বলিলেন,—শ্যামলাল আমি তোমার অতীত জীবনের সহিত সংসৃষ্ট কোন কোন ব্যক্তির বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াছি। সারদা দাসী এই নীলরতন বাবুর নিকট হইতে প্রবঞ্চনা করিয়া কিছু টাকা লইয়া পলায়ন করে। সেই টাকাই তাহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছে। দেশে কোন লোক তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছে এবং তাহার যথাসর্ব্বস্ব লইয়া পলায়ন করিয়াছে। আর হরিচরণ আমাকে প্রহার করা এবং বিধুমুখীকে হরণ করা অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিল। বিচারে তাহার দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হইয়াছে।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"আমি তাহাদের দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। আর কাহারও কোন কথা শুনিতে বাসনা নাই।"

হরকুমার বলিলেন,—"প্রভুর অবিদিত নাই বোধ হয়, আমাদের সমস্ত সম্পত্তি এমন কি অলঙ্কারাদিও চন্দ্রমালার মহারাণীর পক্ষ হইতে এই জীবন বাবু ক্রয় করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তিনি আমাদের সহিত আশাতীত সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং শেষে রাজা ও রাণীর সাংসারিক কার্য্যে এবং অন্যান্য নানাবিধ পারিবারিক ব্যাপারে ইনি আমাদের সহিত অশেষ সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা চন্দ্রমালার মহারাণীকে কখন দেখি নাই। আজি সেই পুণ্যময়ীকে দেখিয়া চরিতার্থ হইব। দেওয়ানজী, তিনি কত রাত্রিতে আসিবেন কথা আছে?

জীবন বাবু বলিলেন,—"তাঁহার আসিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।"

তখনই প্রবেশদ্বারে দামামা বাদিত হইল। ঘনানন্দ বলিলেন,—"বোধ হয় মহারাণী আসিতেছেন।"

উজ্জ্বল আলোকমালায় আলোকিত কক্ষ আরও আলোকিত হইল। অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সৌরভে কক্ষ পূরিয়া গেল। দূর হইতে বিমানচারী বিহঙ্গগীতির ন্যায় সুমধুর সঙ্গীত ধ্বনি উত্থিত হইল। মহারাণী করুণাময়ী সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হীরকখচিত মহামূল্য অলঙ্কার রাশি সমাচ্ছন্ন। তাঁহার মস্তকে মাণিক্য পরিবৃত মুকুট জ্বলিতেছে। স্বর্ণসূত্রে নির্ম্মিত হীরকমালা গ্রথিত অপূর্ব্ব বস্ত্রে তাঁহার দেহ আচ্ছাদিত। সেই বর্ষীয়সী নবীনা যুবতীর ন্যায় লাবণ্যোজ্জ্বলকায়া এবং তাঁহার গতি ও ভঙ্গী যৌবনের মাধুরিমাময়। করুণাময়ী কক্ষাগত হইলেন; কক্ষ শোভায় পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই সুন্দরী ভূতলে মস্তক স্থাপন করিলেন, এবং তাহার পর তত্রত্য কিঞ্চিৎ ধূলি গ্রহণ করিয়া মস্তকে, রসনায় ও হৃদয়ে স্থাপন করিলেন। সেই চর্ম্মাসীন সন্ন্যাসী ব্যতীত অন্য কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া তিনি ধীর ও মন্থর পাদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি

যুগ্মকরা, প্রেমে তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন আর্দ্র। সন্ন্যাসীর আসনের অনেক নিকটে আসিয়া তিনি আবার একবার পূর্ব্ববৎ প্রণাম করিলেন। তাঁহার পর অঞ্চলাগ্র গলদেশে স্থাপন করিয়া গদগদ স্বরে বলিলেন "দেবরাজ! দেবরাজ, আজ এই আসন্ন মৃত্যুকালে এ নশ্বর জীবনের এই শেষ সময়েও কি তুমি আমাকে চিনিবে না? আমাকে চরণ-প্রান্তে স্থান দিবে না?"

মহারাণীর নয়ন-নিঃসৃত অশ্রুধারায় তাঁহার কুসুম সুকুমার গণ্ডস্থল ভাসিতে লাগিল। ঘনানন্দ বলিলেন,—করুণা, তুমি রাজনন্দিনী হইয়াও কেন এ সন্ন্যাসীর নিমিত্ত সকল সুখ বিসর্জ্জন দিয়া জীবন কাটাইলে?

করুণাময়ী বলিলেন,—"দেবরাজ,দেবরাজ, কেন তুমি স্বর্গের দেবতা হইয়াও ভাগ্যবতীকে চরণপঙ্কজে স্থান দিতে কুণ্ঠিত হইলে? তুমি যাহাই কর, তুমি জীবনে মরণে আমার স্বামী। যে দিন তোমাকে পিতা জামাতৃপদে বরণ করিবার নিমিত্ত গৃহে আনিয়াছিলেন। সেই দিন তুমি আমার স্বামী হইয়াছ; যে দিন অন্তরালে থাকিয়া দূর হইতে তোমাকে দেখিয়া স্বামীজ্ঞানে প্রণাম করিয়াছি, সেই দিন তুমি আমার স্বামী হইয়াছ। নিষ্ঠুর, চিরদিনই তুমি চরণাশ্রিত ভক্তের প্রতি এই রূপ বাম। নির্দ্দয়, চিরকালই তুমি এইরূপে ভক্তের নিকট ধরা দিতে দিতে পলাইয়া যাও। যে তোমাকে কিছুতেই ছাড়ে না, যে তোমার জন্ম জলে বা অগ্নিতে, গহন বনে বা দুর্গম গিরিশৃঙ্গে গমন করিতে ভয় পায় না, সেই তোমাকে ধরিতে পারে। পলাও নিষ্ঠুর দেবতা—নির্দ্দয় মহাপুরুষ পলাও। আর কোথায় পলাইবে?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"যোগেশ্বরী! আমি জানি তুমি বিষয়াবর্ত্তে পড়িয়াও সিদ্ধির পথে আমার অপেক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছ। ধন্য তুমি! যাহারা তোমাকে দেখিতে পায় তাহারাও ধন্য! তোমাকে ফাঁকি দিতে কে পারে? স্বয়ং পরম পুরুষও তোমার প্রেম-রজ্জুতে বদ্ধ, প্রার্থনা করি তোমার কৃপায় যেন বঞ্চিত না হই!"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"দয়াময়! গুণময়, দয়ার কথা বলিও না, এক প্রেমের কথা শুনাইও না। তোমার জয় হউক। তুমি সচ্চিদানন্দ পরম পুরুষ, তোমাকে যদি প্রেমরজ্জুতে বাঁধিয়া থাকি তাহা হইলে বাস্তবিকই আমি ধন্য হইয়াছি। সত্য কথা যদি বলিয়া থাক, যদি চিরাভ্যস্ত বঞ্চনা-স্বভাব ত্যাগ করিয়া থাক, তাহা হইলে দয়াময় হরি, আমাকে আমার কর্ত্তব্য-পালনে অধিকার দেও। জীবনের মধ্যে একবার— একবার মাত্র আমাকে চরণ-সেবা করিতে দাও।"

সন্ন্যাসীর কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া মহারাণী করুণাময়ী সেই আস্তীর্ণ মৃগ-চর্ম্মের উপর ঘনানন্দের বামদেশে উপবেশন করিলেন এবং তাঁহার চরণে মস্তক স্থাপন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহা আপন অঙ্কে উঠাইয়া লইলেন। শোভার আর সীমা থাকিল না। সেই চর্ম্মাসীন বিভূতি-বিলেপিত-কলেবর সন্ন্যাসীর বামে সেই সর্ব্বালঙ্কারা ছায়া সুন্দরী। দর্শকেরা প্রত্যক্ষ হরগৌরী দর্শন করিতেছেন মনে করিয়া পুলকিত কলেবর হইলেন। নারীগণ হুলুধ্বনি দিলেন। বাহিরে দামামা রোসনচৌকী বাজিয়া উঠিল। আনন্দে বসুন্ধরাপূর্ণ হইল।

ঘনানন্দ বলিলেন,—"ভগবতি, তোমার এই নিষ্কাম প্রেম জগতে সুপবিত্র দৃষ্টান্ত স্থাপন করিবে। তোমার এই লালসাশূন্য প্রণয়,

এই আকাঙ্ক্ষাবিহীন একপ্রাণতা, এই দূর হইতে সম্মিলন, প্রেমের এই ভোগবিহীন উপাদেয়তা, হৃদয়ের এই অসাধারণ একাগ্রতা মনের এই প্রবল তেজস্বিতা এ সকলই অলৌকিক। সত্যই আমি ধন্য হইলাম। যাঁহারা তোমার এই প্রেমলীলা দর্শন করিলেন, তাঁহারাও ধন্য হইলেন।"

ধীরে ধীরে উমাশঙ্কর সম্মুখে আসিয়া গলায় কাপড় দিয়া প্রণাম করিলেন এবং অধোবদনে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

ঘনানন্দ বলিলেন,—"দেখ দেবি তোমার পুত্র তোমাকে প্রণাম করিতেছেন।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"বুঝিয়াছি মা, যিনি মা করুণাময়ী তিনিই মা যোগেশ্বরী। এই করুণাসিন্ধু আমার উদ্ভব স্থান, এই দেবদেবী আমার জনকজননী। মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া এমন সৌভাগ্যোদয় কাহার অদৃষ্টে ঘটিয়াছে?"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"বৎস, তুমি দরিদ্র হইয়া গিয়াছ। আমি তোমার সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করিয়া লইয়াছি। আমার কি অবিবেচনা!"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"কেন মা, এমন নিষ্করুণ কথা বলিতেছ? তুমি যোগেশ্বরী রূপে আমাকে ক্রোড়ে স্থান দিয়াছ, করুণাময়ী রূপে আমার সম্পত্তি গ্রহণ করিয়াছ। আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি। সম্পত্তির আবর্জ্জনায় আমাকে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছে সে দায় হইতে তোমার করুণায় আমি উদ্ধার পাইয়াছি।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"উদ্ধার পাইবে কিরূপে? তুমি শুন নাই কি বাবা, ঠাকুর দেহত্যাগ করিতেছেন?"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"সে কঠোর সংবাদ আমি শ্রবণ ক রিয়াছি।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"তাহা হইলে আর তোমার উদ্ধার কোথায়? তোমার বিষয় ভোগ এখনও অসম্পূর্ণ আছে। তোমাকে পুনরায় সংসারে প্রবেশ করিতে হইবে।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"কেন মা, এরূপ নিষ্করুণ আদেশ করিতেছেন?"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, লোকে তাহার উপর অনেক কর্ত্তব্যের ভার প্রদান করে। তুমি সংসারের কঠোর পরীক্ষায় সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছ। প্রভূত ধন তোমার চরণ-তলে ছিল, কিন্তু তুমি তাহা অনর্থক ভোগে ব্যয় কর নাই। স্বার্থ-চিন্তা বিস্মৃত হইয়া তুমি বিষয় ব্যাপার পরিচালন করিয়াছ; ধর্ম্ম-সাধনার্থ তুমি ধন ব্যয় করিয়াছ, উপযুক্ত ক্ষেত্রে অর্থ ব্যয় করিয়া তুমি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছ; ধনমদ তোমাকে নিদ্রাকালেও অভিভূত করিতে পারে নাই; বিষয় ব্যাপারে মত্ত হইয়া তুমি কদাপি ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত হও নাই; অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া পরম শত্রুকেও তুমি দুর্ব্বাক্য দ্বারা মর্ম্ম-পীড়া দেও নাই; কাহারও কপর্দ্দকমাত্র অকারণ গ্রহণ করিতে তোমার প্রবৃত্তি হয় নাই; নিতান্ত দুরবস্থাতেও তুমি একটু মাত্র চলচ্চিত্ত হও নাই; স্বোপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা তুমি অতি দীনভাবে জীবন পাত করিতে কাতর হও নাই; কোন কঠোর বিপদেও তোমাকে একতিলও ব্যথিত করিতে পারে নাই; নিতান্ত দুরবস্থাতেও তুমি পরোপকার সাধনে ক্ষান্ত হও নাই; নিতান্ত দরিদ্র দশায় পরমা সুন্দরী কামিনী রূপযৌবন ও ধন সম্পত্তি লইয়া তোমার চরণতলে লুণ্ঠিতা হইয়াছে; তুমি তাহার দিকে ফিরিয়া চাহ নাই; এবং সম্পদে ও বিপদে কখনই তুমি কর্ত্তব্য পালনে অবহেলা কর । এ সকলই তোমার

অতুল প্রশংসার বিষয় হইয়াছে। তুমি যেরূপ মহাপুরুষের পুত্র, তাহার অনুরূপ ব্যবহার করিয়াছ। তোমার ব্যবহারে তোমার পিতা গৌরবান্বিত হইবেন। বৎস! আশীর্ব্বাদ করি তুমি চিরজীবী হও—সর্ব্ব সুখের অধিকারী হও—সর্ব্বথা পিতার যোগ্য পুত্র হও।"

উমাশঙ্কর সাশ্রুনয়নে বলিলেন,—"মাতার এই আশীর্ব্বাদে ধন্য হইলাম। আমি কখনই জানিতাম না যে, আমি আপনাদের সন্তোষজনক কোন কার্য্য সম্পাদনে সক্ষম হইয়াছি।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"তোমার সহিত আমি আর কথা কহিতে পারি না। ঠাকুর তোমার চরণ ক্ষণেক ছাড়িয়া যাই। রাগ করিও না। আমার পুত্রবধূকে তোমার নিকট লইয়া আসি। মাকে তুমি এতক্ষণ ডাক নাই, তোমার কি অন্যায়!"

তাহার পর সেই লোকাতীতা মহিমাময়ী নারী হাসিতে হাসিতে মহিলা-মণ্ডলীর মধ্যগা হইয়া অন্নপূর্ণা ও সুহাসিনীর হস্ত ধারণ করিলেন এবং সন্ন্যাসীর সমক্ষে তাঁহাদের আনিয়া বলিলেন,—"মা অন্নপূর্ণা, মা সুহাসিনী, ঠাকুরকে প্রণাম কর।"

তাঁহারা গলায় কাপড় দিয়া প্রণাম করিলেন। যোগেশ্বরী বলিলেন,—"মা অন্নপূর্ণা তুমি ভিখারিণী হইয়াছ। বড় গৌরবের পরিচয় দিয়া আসিয়াছ, তোমার ন্যায় সঙ্গিনী না পাইলে উমাশঙ্কর কঠোর সংসার ব্যাপারে এত অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন না। তুমি বড়ই লক্ষ্মী মেয়ে মা, আর মা সুহাস, তোমার সুখ্যাতি সর্ব্বত্র, পরম শত্রুও তোমার নিন্দা করিতে জানে না। তুমি পরম সুখের অধিকারিণী হইবে মা।"

এই সময় শ্যামলাল একটু অগ্রসর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন,—"মা সুহাসিনী, আমি অধম বেশ্যাপুত্র শ্যামলাল; ধনমদে মত্ত হইয়া আপনার চরণে অশেষ অপরাধ করিয়াছি, আমার সে অপরাধ ক্ষমার অতীত। আমি ক্ষমা ভিক্ষা করিতে সাহস করি না, আপনার নিকটে গিয়া চরণধূলা গ্রহণ করিতেও আমার সাহস নাই, আমি দূর হইতে আপনার চরণে বার বার প্রণাম করিতেছি।"

কিয়ৎকাল অধোমুখে চিন্তা করিয়া সুহাসিনী বলিলেন,—"আপনার কৃত কোন অপরাধের কথা আমার আর মনে নাই। কেবল এই মনে আছে, আপনার ভয়ে দেশত্যাগী হইয়া আমি বসুন্ধরার গৌরব স্বরূপ এই ভাই পাইয়াছি; আর লক্ষ্মী স্বরূপা এই গোতাময়ী ভ্রাতৃবধূ পাইয়াছি, আপনার কৃপায় আমার মহোপকার হইয়াছে, আপনার যদি কোন দোষ হইয়া থাকে আমি হৃষ্টচিত্তে তাহা ক্ষমা করিতেছি।"

হরকুমার বাহাদুর বলিলেন,—"শ্যামলাল তোমার হৃদয় বড়ই উন্নত হইয়াছে, দীনতাই হৃদয়োন্নতির পরিচায়ক, এ সম্বন্ধে যদি কিছু বলিতে হয় তুমি নবীনকৃষ্ণকে বল, আমি জানি তাঁহারা উভয়েই তোমার জন্য দুঃখিত, তোমার প্রতি কাহারও বিরাগ নাই।"

যোগেশ্বরী দেবী আদরে অন্নপূর্ণার হস্ত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা এতদিন আনন্দে কাটিয়াছে তো? দুঃখের কোন ছায়াও তো তোমাকে স্পর্শ করে নাই?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"ভাগ্যবলে যে দেবতার আমি দাসী হইয়াছি, তাহাতে দুঃখ দূরে থাকুক অসীম আনন্দ ভিন্ন আর কিছুই বুঝিতে পারি না। কিন্তু মা, এই অনন্ত সুখের মধ্যে একই ঘটনা হৃদয়ে বড় দাগী দিয়া গিয়াছে।"

অন্নপূর্ণা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অধোমুখ

হইলেন, বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে সুহাসিনী বলিলেন,—"মা দাদার এক সোণার পুতুল ছেলে হইয়াছিল, সে আর নাই।"

সুহাসিনী অঞ্চলে নয়নাবৃত করিলেন, অন্নপূর্ণা কাঁদিতে লাগিলেন, সকলের নয়নই অল্পাধিক পরিমাণে জলভারাকুল হইল।

ঘনানন্দ বলিলেন,—"সে ভুবনমোহন শিশুকে আমি ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছিলাম, সে ছেলের এরূপ পরিণাম হইবে, ইহা আমি একবারও মনে করি নাই।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"নাতি কোলে লইবার লোভ সংবরণ করিতে পার নাই, যোগাসন ত্যাগ করিয়া এ জন্ম বঙ্গদেশে ছুটিয়া ছিলে, আমাকে তাহার ভাগ দিতে পার নাই নিষ্ঠুর, তুমি যে শিশুকে কোলে লইয়াছ, তাহার এ দুর্দ্দৈব ঘটে কেন?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"কাহাকে ফাঁকি দিতে চাও? ঘটে কেন, তাহা আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা কর, তুমি ঘটাইলে কে তাহার অন্যথা করিতে পারে?"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"দাঁড়াও তোমরা, আমি এই বুড়া দুষ্টকে জব্দ করিতেছি, আমি এখনই ফিরিয়া আসিব, তোমরা একটু অপেক্ষা কর।"

যোগেশ্বরী দেবী প্রস্থান করিলেন এবং পার্শ্বস্থ এক রুদ্ধ দ্বার প্রকোষ্ঠদ্বারে করাঘাত করিলেন, দ্বার খুলিয়া তিনি কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ বিবিধ অলঙ্কারাদি শোভিত এক সুকুমার শিশু ক্রোড়ে লইয়া সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন, সকলেই অবাক্, শিশু নিকটস্থ হইয়া "পিটি পিটি" "মা মা" "বাবা বাবা" শব্দ করিয়া হাত দুলাইতে দুলাইতে চীৎকার করিতে লাগিলেন, তখনই অন্নপূর্ণা "আমার সেই খোকা" বলিয়া চীৎকার শব্দে যোগেশ্বরীর চরণতলে আছড়াইয়া পড়িলেন। সুহাসিনী আনন্দে কাঁপিতে কাঁপিতে হাত বাড়াইয়া খোকাকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

লুপ্তোদ্ধার।

যাহা কেহ স্বপ্নেও মনে ভাবে নাই, তাহা ঘটিল। যে খোকা সর্ব্বসমক্ষে স্বাভাবিক ভাবে কৃতান্তের কবলগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহাকে আবার পাওয়া গেল, আনন্দের সীমা থাকিল না। খোকা অনেকক্ষণ অনেকের কোলে কোলে আনন্দে ঘুরিয়া বেড়াইল, আনন্দোচ্ছ্বাস মন্দীভূত হইলে, যোগেশ্বরী ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন,—"কেমন ঠাকুর, আমাকে ফাঁকি দিয়া নাতি কোলে করিতে ছুটিয়াছিলে; এবার আমি তোমাকে আর আমার নাতির গায়ে হাত দিতেও দিব না।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"তুমি না পার কি? যমালয়-গত জীবকে যে ফিরাইয়া আনিতে পারে তাহার ক্ষমতা অসাধারণ।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"ছিঃ ছিঃ। ও বয়সে আর নিজের প্রশংসা নিজে করিও না। জ্ঞানী হইয়া অজ্ঞানের কাজ করিও না। মরা বাঁচান তোমারই কাজ। নয় কি বিহাই মহাশয়?"

হরকুমার বলিলেন,—"এ দেব-লীলার মধ্যে আমি কি সাক্ষ্য দিব? তবে এ কথা আমাকে বলিতেই হইবে যে, আমি মরিয়া গিয়াছিলাম, অস্ত্রাঘাতে আমার দেহ ক্ষত-

বিক্ষত হইয়াছিল, প্রভুর যত্নে আমি জীবন লাভ করিয়াছি এবং তাঁহার কমণ্ডলুর জলে আমার ক্ষত সকল সারিয়া গিয়াছে। নিশ্চয়ই তাহা দৈব-শক্তির কার্য্য।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"দেখ ঠাকুর। তোমার এই কার্য্যই যথার্থ অসাধারণ, আমি যাহা করিয়াছি, তাহাতে আশ্চর্য্য কাণ্ড কিছুই নাই। যখন শিশুর মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া সকলে অবধারণ করেন, তখন আমার শিষ্য এই জীবনরক্ষ সৎকারার্থ সেই মৃতদেহ লইয়া প্রস্থান করেন; অদূরে আমার এক ধাত্রী অপেক্ষা করিতেছিল, সে শিশুকে কোলে লইয়া চলিয়া আইসে, দ্রব্য-গুণ-প্রভাবে শিশুর জীবন রক্ষা হইয়াছে। ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"তোমার পক্ষে ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই না থাকিতে পারে, কিন্তু সাধারণের পক্ষে ইহার সকলই আশ্চর্য্য। সে যাহা হউক, এরূপ করিয়া শিশু-হরণ করার উদ্দেশ্য কি?"

যোগেশ্বরী হাসিয়া বলিলেন,—"এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ ঠাকুর? তুমি বলিতেছ উমাশঙ্করের সম্পূর্ণ পরীক্ষা হইবে। তোমার প্রিয় পুত্র পুত্রত্ব পদবী লাভ করিয়া, বালক উমাশঙ্কর কতদূর দৃঢ়তা অভ্যাস করিয়াছেন, তাহার পরীক্ষা গ্রহণ ও জগতে তাহার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা তোমার অভিপ্রায়। একমাত্র প্রিয় পুত্র নাশ না হইলে, সে দৃষ্টান্ত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় কই? এ সকলই তুমি জান; তথাপি কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ, ইহাতে আমার অভিপ্রায় কি?"

ঘনানন্দ একটু হাস্য করিলেন। যোগেশ্বরী বলিলেন,—"কিন্তু তোমার সহিত বাজে কথার আমার সময় নাই। তোমার সহিত আমার বিচ্ছেদের আশঙ্কা নাই; তুমি যেখানে যাইবে, তোমার দাসী ছায়ার ন্যায় সেইখানেই তোমার অনুগামিনী হইবে। কিন্তু যাহাদের সঙ্গ আমাদের আশু ছাড়িতে হইবে, তাহাদের সঙ্গে কথা শেষ করাই এখন প্রয়োজন।"

উমাশঙ্কর সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ কি কথা বলিতেছেন মা? আপনি কৃপা করিয়া এ সকল প্রহেলিকা পরিত্যাগ করুন।"

যোগেশ্বরী হাসিয়া বলিলেন,—"সন্তানের আবদার মা কবে শুনে না বাবা? এ সকল কথা এখন থাকুক। বিহাই মহাশয়, আপনি অগ্রসর হউন। আপনাকে অনেক বিষয় বুঝিয়া লইতে হইবে।"

হরকুমার অগ্রসর হইয়া করযোড়ে বলিলেন,—"বুঝিয়া লইবার দিন আমার ফুরাইয়াছে। এ সময়ে যদি আপনাদের মহিমা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারি, তাহা হইলেই চরিতার্থ হইব! আমাকে কি বুঝিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"দিন ফুরাইয়াছে মনে করিয়া প্রস্তুত হওয়া সকলেরই উচিত। আপনার এখন বুঝাইয়া দিবার দিন নিকট হইয়া আসিতেছে। যে বুঝিয়া লইতে জানে, সেই বুঝাইয়া দিতে জানে। সুতরাং আপনাকে বুঝিয়া লইতে হইবে। রাজা উমাশঙ্করের যে সকল বিষয় আমি ক্রয় করিয়াছিলাম, তাহার কথা বোধ হয় আপনার মনে আছে?"

"আছে।"

"আমার যে সকল স্থাবর সম্পত্তি আছে, তাহার সংবাদ আপনি কিছু কিছু জানেন বোধ হয়?"

রায় বাহাদুর বলিলেন,—"জানি।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"আমি এক দানপত্র দ্বারা আমার স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি

রাজা উমাশঙ্করকে দান করিয়াছি। ইহাতে আমার পৈতৃক, স্বোপার্জ্জিত এবং উমাশঙ্করের দরুণ খরিদা স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পত্তিরই উল্লেখ আছে। দানপত্র রেজিষ্টরী করা হইয়াছে। জীবনকৃষ্ণ, সেই দলিল খানি রায় বাহাদুর মহাশয়ের হস্তে দেও।"

তৎক্ষণাৎ জীবন বাবু পার্শ্বস্থ সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া একটী পেটিকা আনয়ন করিলেন এবং তন্মধ্য হইতে একখানি রেজিষ্টরী করা দলিল বাহির করিয়া, হরকুমার বাহাদুরের হস্তে প্রদান করিলেন।

রাজা উমাশঙ্কর কাতরভাবে মহারাণীর চরণ-সমীপে উপবেশন করিয়া বলিলেন,—"মা তো কখন সন্তানের প্রতি নিষ্ঠুর হন না। আপনি আমার প্রতি নিষ্ঠুরতা করিতেছেন কেন? মা, মা, আমি আপনার চরণে ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমাকে পুনরায় বিষয়-কূপে ডুবাইয়া দিবেন না।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"এজন্য ভয়ের কোন কারণ নাই বাবা। বিষয় তোমার অধীনে থাকিবে, তুমি কখনই বিষয়ের অধীন হইবে না। তোমার দ্বারা বিষয়ের যেরূপ সদ্ব্যবহার হইবে, বোধ করি এজগতে আর কাহারও দ্বারা সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। তুমি বিষয়-সমুদ্রে না ডুবিয়া, তাহার উপর ভাসিয়া বেড়াইতে পারিবে, ইহা আমরা জানি। তোমার হস্তে বিষয় ন্যস্ত হইলে সংসারের অশেষ ইষ্ট সাধিত হইবে, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। বিষয়-ব্যবহার বিষয়ে তুমিই যথোপযুক্ত সৎপাত্র। অতএব বৎস, এ গুরুভার তোমাকেই গ্রহণ করিতে হইবে।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আপনার আদেশ লঙ্ঘন করিতে, বা আপনার সহিত বাদ-প্রতিবাদ করিতে আমার কখনই সাধ্য নাই। কিন্তু দেবি, আপনি ভাবিয়া দেখুন; উপায়ান্তর অবলম্বন করিয়া আমাকে নিষ্কৃতি দিলে, আমি চরিতার্থ হইব।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"তোমার দ্বারা জগতের মহৎ কার্য্য সাধিত হইবে। অনেক কার্য্যই সম্পত্তি-সাধ্য। অতএব বিষয় সম্পত্তি স্বতই তোমাকে আশ্রয় করিবে। কেমন বিহাই মহাশয়, দলিল দেখিয়া লইতেছেন তো? স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পত্তি, উভয় স্থানের বাড়ী, গাড়ি, হাতী, ঘোড়া, আসবাব, তৈজস ইত্যাদি সকল পদার্থ ধরা হইয়াছে, কোন ভুল হয় নাই তো?"

হরকুমার বলিলেন,—"দেখিয়া লইবার কোনই প্রয়োজন নাই। কিন্তু কথা হইতেছে, আমাকে এত করিয়া বুঝিয়া লইতে আজ্ঞা করিতেছেন কেন? আবার কি এই বয়সে আমাকে এই কঠোর কর্ম্মের দায়ে ফেলিবেন স্থির করিয়াছেন?"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"না, আপনাকে নিয়ত এ ভার বহন করিতে হইবে না। তবে একবার মাত্র প্রথমে স্বয়ং গিয়া উভয় স্থানের বিষয়-ব্যাপারের একটা সুব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। এবার জীবনকৃষ্ণ কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। আমি তাঁহাকে অনেক সম্পত্তি দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণে অসম্মত। রাজা উমাশঙ্করের নিকটে থাকিয়া কাজ করাই তাঁহার অভিপ্রায়।"

হরকুমার বলিলেন,—"অতি উত্তম ব্যবস্থা। জীবন বাবু অতি মহাশয় লোক। আমরা তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। তাঁহার কার্য্য-দক্ষতাও অদ্ভুত। আপনার যিনি শিষ্য, তিনি সর্ব্বগুণে গুণবান্ হইবেন, তাহার আর সন্দেহ কি? তাহা হইলে রাজা উমাশঙ্করের আয় প্রায় বার্ষিক ষোল লক্ষ টাকায় দাঁড়াইতেছে।"

মহারাণী বলিলেন,—"ঐ রূপই হইবে আমার এখনও কথার শেষ হয় নাই। মা অন্নপূর্ণা, কর্ত্তব্যানুরোধে, লোকশিক্ষার নিমিত্ত, আমি তোমার সহিত অনেক নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছি। তন্মধ্যে পুত্র-হরণ প্রধান নিষ্ঠুরতা। দ্বিতীয় নিষ্ঠুরতা তোমার সমস্ত অলঙ্কার গ্রহণ। তোমার সন্তান তোমার ক্রোড়ে শোভা পাইতেছে। এখন তোমার অলঙ্কারগুলি লইয়া আবার অঙ্গে দেও না।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"অলঙ্কারের অভাবে একদিনও একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিবার প্রয়োজন হয় নাই। তথাপি মা, আপনি যদি আমাকে অলঙ্কারে সাজাইতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, আমি তাহাতে কি বলিব?"

জীবন বাবু তৎক্ষণাৎ পার্শ্বস্থ রুদ্ধ-দ্বার প্রকোষ্ঠ মধ্য হইতে কয়েকটী সুন্দর বাক্স আনিলেন। রাণীর সেই বাক্স, তন্মধ্যে রাণীর সেই সকল অলঙ্কার। ভব ও দাসী তাহা সরাইয়া আনিল।

যোগেশ্বরী তাহার পর স্বকীয় দেহ হইতে একে একে সমস্ত অলঙ্কার উন্মোচন করিতে লাগিলেন। সমস্ত খোলা হইলে, তিনি বলিলেন,—"জীবনকৃষ্ণ বাক্স আনাও।"

সেই রুদ্ধ দ্বার প্রকোষ্ঠ হইতে জীবনকৃষ্ণ তিনটী উত্তম বাক্স আনিলেন। অলঙ্কার সমস্ত স্বহস্তে তন্মধ্যে স্থাপিত করিয়া, মহারাণী বলিলেন,—"মা সুহাস, আমি তোমাকে আমার এই অলঙ্কার গুলি দান করিতেছি। তুমি আমার কন্যা, সুতরাং আমার দানে ও তোমার গ্রহণে অধিকার আছে, তুমি এ গুলি লও মা।"

সুহাসিনী বলিলেন,—"অলঙ্কারে আমার কোনই প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আপনার আজ্ঞা পালন করিতে আমরা বাধ্য। দাদা, মার এই সকল অলঙ্কার অঙ্গে ধারণ করিলে আমার পাপ হইবে না কি?"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"না। বরং মাতার ব্যবহৃত বস্তু অঙ্গে থাকিলে অশেষ কল্যাণ হইবে। তবে সকল ভূষণই অগ্রে মস্তকে ধারণ করিয়া পরে যথাস্থানে ধারণ করিও।"

তাহার পর যোগেশ্বরী দেবী বলিলেন,—'এক্ষণে জীবনকৃষ্ণ, টাকা লইয়া আইস।'

সেই রুদ্ধ দ্বার প্রকোষ্ঠ হইতে একটী বাক্স আনীত হইল। তাহার মধ্যে নোট বোঝাই। যোগেশ্বরী বলিলেন,—"নবীনকৃষ্ণ, তুমি আমার জামাতা। তোমাকে সম্পত্তি-দানে আমার অধিকার আছে। আমি তোমাকে লক্ষ মুদ্রা দান করিতেছি, তুমি ইহার দ্বারা সম্পত্তি ক্রয় করিয়া ভোগ করিবে, ইহাই আমার অনুরোধ।"

তৎক্ষণাৎ একশত খণ্ড হাজার টাকার নোট প্রদত্ত হইল। নবীনকৃষ্ণ বলিলেন,—"মা আমি যাজক ব্রাহ্মণ; আমার গ্রাসাচ্ছাদনের উপযোগী সম্পত্তি আছে। আর রাজ সংসার হইতেও আমি যথেষ্ট সাহায্য পাই। এত ধনে আমার কোনই প্রয়োজন ছিল না। তবে আপনি স্বেচ্ছায় দিতেছেন, কাজেই আমাকে অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে হইবে।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"ভবসুন্দরীকে পাঁচ হাজার টাকা দেও। ভব, তুমি নানা প্রকারে আমাদের হিত করিয়াছ। এরূপ উপকারী লোক বড়ই দুর্লভ।"

ভব গলায় কাপড় দিয়া মহারাণীকে প্রণাম করিয়া টাকা উঠাইয়া লইল।

তাহার পর দেবী বলিলেন,—"রামহরিকে দশ হাজার টাকা দেও।"

রামহরি অগ্রসর হইয়া বড়ই চীৎকার

করিয়া বলিল,—"না মা, আমাকে টাকা দিও না। আমাকে এখনই লোকে বড় মানুষ বলে; আমার কুড়ি গোলা ধান, এবার আমার পাঁচ গোলা বাড়িবে। আমি টাকা লইয়া কি করিব? তোমার টাকা তুলিয়া রাখ।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"তা হউক, তুমি এই টাকা দিয়া দাসীর অলঙ্কার গড়াইয়া দিও।"

রামহরি বলিল,—"সেকি মাগী এত অলঙ্কার পরিবে কখন? উঠান ঝাঁটাইট দিবে, গোবর চট্‌কাইবে, ধান সিদ্ধ করিবে, ঢে কি পাড়িবে, তবে গহনা পরিবে কখন? না না, ওসব হবে না।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"তুমি টাকা রাখিয়া দেও, যদি কখন আবশ্যক হয়, তখন ব্যবহার করিও।"

রামহরি বলিল,—"কি জ্বালা গা! টাকা লইয়া কি শেষে বিপদে পড়িব। যদি নেহাৎ না ছাড় তবে ঐ বাবাঠাকুরের কাছে জমা দেও।"

রামহরি হাত দিয়া রায় বাহাদুরকে দেখাইয়া দিল। অগত্যা হরকুমার টাকা তুলিয়া লইলেন।

তাহার পর যোগেশ্বরী বলিলেন,—"জরিফ তুমি বড় বিশ্বস্ত ও অনুগত লোক, তোমার মত উপকারী বন্ধু বড় কম পাওয়া যায়। আমি তোমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিতেছি, তুমি গ্রহণ কর।"

জরিফ বলিল,—"আমি মুসলমান, ঠাকুর দেবতা মানিতাম না। কিছু দিন হইতে আমার বিশ্বাস হইয়াছে, হিঁদুর ঠাকুর দেবতা সত্য, আর মানুষও সত্য। রাজাকে দেওয়ান জি সাহেবকে দেখিয়া অনেক সময় মনে ভাবিয়াছি মানুষও হয় তো দেবতা হয়। এখন আপনাদের দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিয়াছি মা, মানুষের মধ্যেই দেবতা আছে। মা, আমার স্ত্রী পুত্র নাই। রাজা আমার ছেলে, রাজা আমার মুনিব। টাকায় আমার কোন দরকার নাই। তবে আপনি বলিতেছেন, কথা না শুনিলে পাপ হইবে। আমাকে একশত টাকা দেন, আমি কাশীতে খয়রাৎ করব।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"তুমি এই পাঁচ হাজার টাকাই ইচ্ছা করিলে খয়রাৎ করিতে পার।"

জরিফ আর কথা কহিল না, টাকা তুলিয়া লইল। যোগেশ্বরী বলিলেন,—"এক্ষণে রাজার চণ্ডী খুড়া, আপনি আমাদের বিদাই; বলুন আপনি কি চাহেন?"

চণ্ডী কাঁদিতে কাঁদিতে অগ্রসর হইয়া যুগ্ম করে বলিলেন,—"ঠাকুরাণি, আমি চরিতার্থ হইয়াছি, আমার সকল খেদ দূর হইয়াছে। রাজা নাতিকে যমে লইয়াছিল, সে দিনকার কথা মনে হইলে এখনও বুক ফাটিয়া যায়। আমার সে দুঃখ আজি দূর হইয়াছে। যে দিন আমার দয়াল রাজা গরিব হইয়া বাড়ী হইতে প্রস্থান করেন, সে দিনকার কথা মনে হইলে পাষাণও ফাটিয়া যায়; আজি আমার সেই রাজা ভাইপো রাজরাজেশ্বর। আপনার দয়ায়, আমার সকল জ্বালা ঘুচিয়াছে। তবে আমি আর চাহিব কি? এখন চাহি, যেন কখন আমাকে হরকুমার দাদার কাছছাড়া হইতে না হয়। আমি আর গুলি খাই না, আফিং খাইতাম, দাদা যে দিন মরিয়াছিলেন, সেই দিন খাইতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম; তাহার পর হইতে আর খাই না, আমি চুরি করিতাম, অনেক দিন আর করি নাই। রাজা বাবাজি, আমাকে

দয়া করেন; দাদা আমাকে ভাল বাসেন। আমি আর এখন বড় মন্দ লোক নহি। আপনারা এইটী করুন, যেন দাদা আমাকে তাড়াইয়া না দেন।"

হরকুমার বলিলেন,—"কেন ভায়া তুমি এ আশঙ্কা করিতেছ? আমি এ জীবনে কখনই তোমাকে ত্যাগ করিব না।"

চণ্ডীচরণ উভয় হস্ত তুলিয়া বলিল,—"দাদা, তোমার কল্যাণ হউক, তুমি সুখে থাক।"

মহারাণী বলিলেন,—"আপনি কিঞ্চিৎ অর্থ গ্রহণ করুন।"

চণ্ডীচরণ ব্যস্ততা সহ বলিলেন,—"না না —খাজাঞ্চিখানায় আমার আড়াই শত টাকা আছে। তাহারই কি করিব, তাহাই ভাবিয়া পাই না। আর টাকায় কাজ নাই।"

করুণাময়ী বলিলেন,—"আপনার ভাইপো ভাইঝি আছে। তাহাদের জন্য টাকার প্রয়োজন হইবে।"

চণ্ডীচরণ বলিল,—"তা হইতে পারে; কিন্তু দাদার ব্যবহার স্মরণ করিলে, আর তাহাদের নাম করিতে ইচ্ছা করে না। তা দাদা, আপনি কি বলেন?"

হরকুমার বলিলেন,—"তোমার দাদা যেমনই কেন হউন না, তোমার ভাইপো-ভাইঝি কি দোষ করিয়াছে? তাহাদের জন্য তুমি অর্থ লইতে পার।"

চণ্ডী বলিল,—"তবে আর কি বলিব? দাদার যখন মত, তখন টাকা লই।"

তাহার পর মহারাণী বলিলেন,—"জীবনকৃষ্ণ! তোমার তহবিলে আর কত টাকা আছে?"

"পঁচিশ হাজার।"

করুণাময়ী বলিলেন,—"বিহাই মহাশয়, আপনার কোন উপকার করিতে বোধ হয় আমার ক্ষমতা নাই। কিন্তু আপনার নিকট একটী উপকার প্রার্থনা করিবার ইচ্ছা আছে। যে দিন ঠাকুর দেহ রক্ষা করিবেন, আপনি সেই দিন এই পঁচিশ হাজার টাকা দান উৎসবাদি ব্যাপারে ব্যয় করিবেন, ইহাই আমার প্রার্থনা।"

রায় বাহাদুর বলিলেন,—"যে আজ্ঞা।"

মহারাণী বলিলেন,—"আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। আমার সকল বিষয়-সম্পত্তি বোধ হয় নিঃশেষ হইয়াছে। এক্ষণে ভিখারিণীর সাজ ধারণ করিব।"

করুণাময়ী প্রস্থান করিয়া সেই রুদ্ধদ্বার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাহার পর এক স্থূল গেরুয়াশাটী পরিধান করিয়া হস্তে শাঁখা পরিয়া, সীমন্তে মোটা সিন্দূর রেখা বিন্যাস করিয়া, তিনি বাহিরে আসিলেন। সে অবস্থায় তাঁহার কি অপূর্ব্ব শোভা হইল! যে মহার্হ বস্ত্র তাঁহার অঙ্গে ছিল, তাহা তিনি অন্নপূর্ণাকে স্মরণ-চিহ্নস্বরূপ রাখিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। তাহার পর বলিলেন, —"এ জগতে আমার কার্য্যের শেষ হইয়াছে। আর আমার কাহাকেও কোন কথা বলিবার নাই। আমি এক্ষণে কায়মনোবাক্যে স্বামী-সেবা করিব। তোমরা সকলে অদ্য স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান কর। যাঁহার ইচ্ছা হইবে, কল্য আসিয়া আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।"

সকলে প্রণাম করিলেন। বিদায়কালে ষনানন্দ বলিলেন,—"উমাশঙ্কর, তোমার সহিত আমার অনেক প্রয়োজনীয় কথা আছে; এখন থাকুক। নীলরতন বাবু, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সকলই সুমঙ্গলে পরিণত হইবে। আপনার চিন্তাকুল পত্নী ও ভগ্নী বোধ হয় এখন নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। শ্যামলাল, তুমি

অর্থের প্রয়াসী নহ। আমাদিগের দ্বারা তোমার কি উপকার হইতে পারে?

শ্যামলাল বলিলেন,—"এক অর্থের আমি প্রয়াসী। আপনারা যুগল মূর্ত্তিতে আসন গ্রহণ করুন। আমি সেই অবস্থা দেখিয়া আপনাদের চরণ রজঃ মস্তকে ধারণ করি।"

তাহাই হইল। ঘনানন্দ ও যোগেশ্বরী দেহে দেহ মিশাইয়া উপবেশন করিলেন। সকলে, "জয় সচ্চিদানন্দ" রবে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। শ্যামলালকে সকলে ধন্যবাদ দিলেন। সেই অবস্থায় প্রণাম করিয়া সকলে বিদায় হইলেন।

বাহিরে বাদ্য বাজিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দেব-যুগল।

ঘনানন্দ স্বামীর অবস্থা ভাল হইয়া আসিয়াছে। চিকিৎসকেরা সাবধানে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্র নির্দ্দোষ হইয়াছে, এবং শরীরে যথেষ্ট রক্ত সঞ্চয় হইয়াছে, গাত্রদাহ দূর হইয়াছে। তাঁহারা নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে ঘোষণা করিয়াছেন যে, এ অবস্থায় মহাপুরুষের তিরোধান ঘটিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ঘনানন্দ স্বামী স্বয়ং ব্যক্ত করিয়াছেন যে, আগামী বৈশাখী পূর্ণিমার দিন, বেলা আড়াই প্রহরের সময় তাঁহার দেহত্যাগ ঘটিবে। এ বাক্যের উপর অনাস্থা প্রকাশ করিতে কাহারও প্রবৃত্তি নাই; সুতরাং দর্শনার্থী নর-নারীর সংখ্যা বরং ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। বিদেশ হইতে রেল যোগেও লোক আসিতে লাগিল।

প্রচার হইয়া গেল যে, চন্দ্রমালার প্রাতঃস্মরণীয়া পুণ্যবতী মহারাণী করুণাময়ী দেবী মহাত্মা ঘনানন্দের সহধর্ম্মিণী। তাঁহাদের জীবনকাল কিরূপভাবে কাটিয়াছে এবং কিরূপ ভাবে তাঁহাদের এই সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, তাহাও লোকের অবিদিত রহিল না। লোকের কৌতূহল বহুগুণে বর্দ্ধিত হইয়া গেল এবং এই পুণ্যব্রত মহাপুরুষ ও ধর্ম্মময়ী মহারাণীকে যুগল মূর্ত্তিতে দেখিবার নিমিত্ত লোকে আরও অগ্রহান্বিত হইল।

যোগেশ্বরী নিরন্তর কায়মনোবাক্যে পতিসেবা করিতেছেন। আহার নাই, নিদ্রা নাই, ঔদাস্য নাই; সেই মহীয়সী মহিলা, অবিরত স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া, তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছেন; যখন যে কার্য্যের প্রয়োজন তাহাই স্বয়ং সম্পাদন করিতেছেন। শিষ্যদ্বয় অদূরে বসিয়া আছে মাত্র। লোকে দূর হইতে এই অলৌকিক যুগলকে দেখিয়া ও প্রণাম করিয়া ধন্য ও চরিতার্থ হইতেছে।

গভীর রাত্রিতে ভবন জনশূন্য হইলে, রাজা উমাশঙ্কর, রায় হরকুমার বাহাদুর ও জীবনকৃষ্ণ বাবু, ঘনানন্দ স্বামী এবং যোগেশ্বরী দেবীর সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দূর হইতে প্রণাম করিলে, ঘনানন্দ তাঁহাদিগকে নিকটে আসিবার নিমিত্ত ইঙ্গিত করিলেন। তাঁহারা নিকটস্থ হইলে, ঘনানন্দ বলিলেন,—"তোমরা তিন জনে আসিয়া ভালই করিয়াছ। তোমাদিগকে কয়েকটী প্রয়োজনীয় কথা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি।"

সকলেই সন্ন্যাসীর বাক্য শ্রবণার্থ অধোমুখে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। ঠাকুর বলিতে লাগিলেন,—"কেন আমি এ দেহ ত্যাগ

করিতে সংকল্প করিয়াছি, তাহা কাহাকেও ভাল করিয়া বলা হয় নাই। অন্ত লোক হয় তো সকল কথা বুঝিতে পারিবে না। আমার এই দেহ অভীষ্ট কর্ম্মের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। চেষ্টা করিলে এই দেহ আরও অনেক দিন রাখিতে পারিতাম, কিন্তু তাহাতে কোনই ইষ্ট নাই; কেননা যে কার্য্য করিতে আমি বাধ্য, এ দেহ দ্বারা তাহার সমাপ্তি হইবে না; কেবল কালক্ষয় ঘটিবে মাত্র।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"তাহার ভুল নাই; কিন্তু আমি নিবেদন করিতেছি, শাস্ত্রীয় বিধান ক্রমে একবার চেষ্টা করিলে হইত না?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"শাস্ত্রীয় প্রণালী ও উপায় সকলই অবলম্বন করিয়াছি, কিন্তু কোনই ফল হয় নাই। আমার অন্ত্রের এক সুদূরাংশে ক্লেদ জমিতে আরম্ভ হইয়াছে। তাহা দূর করিতে অনেক সময়ের প্রয়োজন এবং সে জন্ত চেষ্টা করিবার সময় ক্রিয়ামার্গ পরিত্যাগ করা আবশুক। ক্রিয়া ত্যাগ করা এ অবস্থায় অসম্ভব। আহারাদি ত্যাগ করিয়া দেখিয়াছি; ঔষধির রস সেবন করিয়াছি। ফল পাই নাই। দীর্ঘকাল নিষ্ক্রিয় অবস্থায় যাপন করার অপেক্ষা, দেহত্যাগ করিয়া নূতন দেহ গ্রহণ করাই সৎপরামর্শ বলিয়া বুঝিয়াছি।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আমি যাহা জানি তাহাতে বুঝিয়াছি, আর সামান্ত ক্রিয়া মাত্র আপনার আবশুক।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"তুমি ঠিক বুঝিয়াছ বটে; কিন্তু সে সামান্ত ক্রিয়া সাধন ও দীর্ঘকাল সাপেক্ষ। এই ক্লিষ্ট দেহে দীর্ঘকাল প্রাপ্তির আশা নাই; অথচ সুনিয়মে কার্য্য সম্পাদনেরও সম্ভাবনা নাই। অতএব এ দেহ ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। বিশেষতঃ আমার একবার আমূল ধারাবাহিকরূপে ক্রিয়ানুষ্ঠান আবশুক হইয়াছে। তজ্জন্তও নবীন দেহ আবশুক।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"অতঃপর আমরা কি করিব?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"যাহা করিতেছ তাহাই করিবে। কদাচ ক্রিয়া ত্যাগী হইও না। পর পর অনেক দূর—সীমা পর্য্যন্ত তোমাকে পথ দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তুমি সেই অভ্যাস সমান রাখিবে। এবং পর পর সাধনা চালাইতে থাকিবে। কদাচ তাহা হইতে বিচ্যুত বা বিরত হইবে না।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আবার মা আমার কাঁধে গুরুতর বিষয়-ভার অর্পণ করিলেন। ইহাতে হয়তো সাধনার ব্যাঘাত ঘটিতে পারে।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"না। তোমার মা, এই বিষয়-ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিয়াও, চমৎকার সাধনা করিয়াছেন এবং কোন কোন বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা উচ্চ স্থানে আরোহণ করিয়াছেন। প্রাণ বাসনা থাকিলে কিছুতেই ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে না।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"এক্ষণে কত দিনে কোথায় আবার আপনার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিবে?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"এখনও স্থির করি নাই। তবে তোমার গৃহে, মা অন্নপূর্ণার গর্ভে আসিবার ইচ্ছা আছে।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—কল্যই তো বৈশাখী পূর্ণিমা।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"হাঁ, কল্য আড়াই প্রহরের সময়ই শেষ করিয়া দিব। চিকিৎসকেরা এ সম্বন্ধে বড় হাস্তজনক অজ্ঞতা দেখাইতেছেন। সকল বায়ু প্রাণে মিশাইয়া ব্রহ্মনাড়ীর পথে প্রেরণ করাই মৃত্যু। যান্ত্রিক গুরুতর

বিকার উপস্থিত হইলে তাহা স্বতঃ ঘটে; ইচ্ছাতেও তাহা করা যাইতে পারে। সাধনার দ্বারা পঞ্চ বায়ুর উপর আধিপত্য থাকিলে, যখন ইচ্ছা তখনই তত্ত্বাবতের একীকরণ এবং ইচ্ছামত পথে প্রেরণ করা সহজ ও অনায়াস-সাধ্য। এ কথা তাঁহারা জানেন না; যান্ত্রিক কোন বিশেষ বৈলক্ষণ্য না দেখিয়া তাঁহারা আমার এ প্রস্তাব নিতান্ত অসম্মত ও অসম্ভব বলিয়া মনে করিতেছেন।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"মানব-সমাজ প্রচলিত বিজ্ঞান-শাস্ত্রে এরূপ প্রাণত্যাগের কোন প্রণালী লিখিত নাই; কাজেই প্রচলিত বিজ্ঞানবিদ্‌গণ ইহা অসঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারেন। কিন্তু সে কথা যাউক, তাহার পর এই পবিত্র দেহের কি গতি হইবে?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"যাহা ইচ্ছা করায় কোন ক্ষতি নাই; কিন্তু আমি স্থির করিয়াছি, ইহা আপাততঃ ভূগর্ভে প্রোথিত করাই সৎপরামর্শ। তুমি ইহা পেটিকাবদ্ধ করিবে। যে যে দ্রব্য দেহের সহিত দেওয়া আবশ্যক, তাহা তুমি জান। সুতরাং তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক। আমার যে যে শিষ্য যে যে দেশে আছে, তাহার কেহই তোমার ন্যায় উন্নত নহে। আবশ্যক হইলে তাহাদের তুমি উপদেশ প্রদান করিবে। আমার এই শিষ্যদ্বয়কে তোমার হস্তে সমর্পণ করিতেছি, তুমি ইহাদের ব্যবস্থা করিবে।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—যে আজ্ঞা। মা, একবারও একটীও কথা কহিতেছেন না কেন?"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"দুঃখ করিও না বাবা, ইহসংসারে আমার এক কার্য্য ব্যতীত সকল কার্য্যের সমাপ্তি হইয়াছে। যাহার কার্য্য নাই, তাহার কথাও নাই। এখন ব্রহ্মস্বরূপ এই পতিদেবতার সেবা ভিন্ন আমার আর কার্য্য নাই।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আমার প্রতি আর কি আজ্ঞা করিবেন?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"আর একটা কথা। কাশীর যে স্থানে আমার আসন রহিয়াছে, সে স্থানটি অতি যত্নে তুমি রক্ষা করিবে। সে স্থানের অনেক তেজ ও শক্তি জন্মিয়াছে। লোকে যেন আমার আসন অপবিত্র না করে, কোন প্রকারে যেন তাহা কলুষিত না হয়। আর আমার কোন কথাই নাই। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার সদ্‌গতি হউক। কল্য আড়াই প্রহরের পূর্ব্বে আসিবে। আমি বেলা এক প্রহরের পর বাক্য ত্যাগ করিব। যদি কোন জিজ্ঞাস্য থাকে, তাহা হইলে তাহার পূর্ব্বে আসিবে।"

রায়বাহাদুর বলিলেন,—"আমরা এ সকল গভীর তত্ত্ব বুঝি না। আমাদের কি গতি হইবে ভগবন্?"

ঘনানন্দ হাসিয়া বলিলেন,—"আপনি অগতির গতি। আপনার আবার গতি কি?"

রায়বাহাদুর বলিলেন,—"আমাদের দিন নিকট হইয়া আসিয়াছে। প্রভুর তিরোধান সংবাদে রাজা নির্ব্বিকার। তিনি বলেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি আছে? তিনি আবার আপনার সহিত সাক্ষাতের ভরসা করেন। কিন্তু আমাদের কোন ভরসাই নাই; আমরা কি করিব?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"আপনি পরম সাধু পুণ্যবান্ মহাত্মা। আমরা যে পথ অবলম্বন করিয়া মুক্তির নিমিত্ত ছুটিতেছি, তাহা ছাড়া যে আর পথ নাই, এমন নহে। আপনি সংসারে যে পথে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, তাহাও অতি প্রকৃষ্ট মার্গ। স্বার্থ-চিন্তাবিরহিত

সৎকার্য্য জ্ঞানলাভের পরম উপায়। আপনি যাবজ্জীবন তাহাই করিয়াছেন, সুতরাং জ্ঞান আপনা হইতে আসিয়া মহাশয়কে আশ্রয় করিয়াছে। এই জন্য নই মুক্তির উপায়। আপনি মুক্তির পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন। আপনার কোন চিন্তা নাই। তবে বলিতেছেন, দিন নিকট হইয়া আসিয়াছে। আসিতে পারে; তাহাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। জীবনস্রোত সমান চলিতেছে। এই দেহ লইয়া মাতৃগর্ভ হইতে আবির্ভাব এবং কিছু দিন পরে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া এই দেহের জড়তা ও অকর্ম্মণ্যতা রূপ মৃত্যু এ জীবনের সীমা নহে। এরূপ জন্ম আপনার আমার বহুবার হইয়াছে, আবার বহুবার হইতে পারে। সে জন্য কোন ভয় বা চিন্তার কারণ নাই। দেহের ক্ষয় হয় বলিয়া জীবনেরও যে ক্ষয় হয়, এরূপ মীমাংসা করিবার কোন কারণ নাই। দেহ যায় আত্মা যান না, দেহের ক্ষয় হয়, কিন্তু কর্ম্মের ক্ষয় হয় না। আপনার কর্ম্মফল আবার আপনার নূতন দেহ ঘটাইয়া, নূতন কার্য্য-ক্ষেত্রে আনিয়া নূতন পথ দেখাইয়া নাকে দড়ি দিয়া চালাইতে থাকিবে। জ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্তি পর্য্যন্ত এ বন্ধনের দায় হইতে অব্যাহতি নাই। অর্জ্জিত জ্ঞান ধ্বংস হয় না; তাহা ভগবানের জমা খরচে ঠিক জমা হইয়া থাকে। জন্মান্তরে সেই জ্ঞান অতি সহজেই আপনাকে আশ্রয় করিবে। এ জন্মের অর্জ্জিত জ্ঞান পূর্ব্ব-সঞ্চিত জ্ঞানের সহিত মিলিত হইয়া বর্দ্ধিত হইবে। এইরূপ তাহার ক্রমোন্নতি, পরিপুষ্টি ও পূর্ণতা ঘটিবে। সুতরাং হতাশ হইবার কোনই কারণ নাই। ফলতঃ কামনা-বিহীন কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধির উপায় এবং চিত্তশুদ্ধি জ্ঞান-লাভের উপায়।"

হরকুমার বলিলেন,—"বিষয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া সতত জ্ঞান-চর্চা করি নাই। কর্ম্ম করিয়াছি সত্য, কিন্তু তাহা সকাম কি নিষ্কাম তাহা মনে করিয়াও করি নাই। কর্ম্ম উপস্থিত হইলেই তাহা সম্পন্ন করিয়াছি; জানি না তাহা কি ?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"ইহাই নিষ্কাম ধর্ম্মের একটা লক্ষণ। কর্ম্ম উপস্থিত হইলেই তাহা সম্পাদন করি, ফলাফল চিন্তা করি না। এই ভাবই প্রশস্ত। আর যে বিষয়কার্য্যের কথা বলিতেছেন, লোকে তাহাকে ধর্ম্ম-সাধনার অন্তরায় বলিয়া মনে করে। কিন্তু সকল সময় তাহা ঠিক নহে। যেখানে, সাধক সবল হৃদয় ও জ্ঞানমার্গগামী, সেখানে বিষয় সম্পত্তি তাঁহার জ্ঞানার্জ্জনের সহায় হইয়া থাকে। বিষয় সম্পত্তি অনেক দয়া প্রকাশ, লোকহিতসাধন, সৎবৃত্তির উন্মেষ করিবার অবসর উপস্থিত করে এবং জ্ঞানোন্নতির বিবিধ অভিনব কার্য্য-ক্ষেত্র দেখাইয়া দেয়। কিন্তু দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে সম্পত্তি কেবল অনর্থেরই মূল এবং অধিকতর অধোগতির উপায়। আমার বিশ্বাস উমাশঙ্কর ধনসম্পত্তির পথদিয়া অতি সত্বর জ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবেন। আর এই যোগেশ্বরী দেবী এই ধনসম্পত্তি পরিবৃত থাকিয়াও জ্ঞানমার্গের অতি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। আপনি মহাশয়পুরুষ, আপনার এই ব্যাকুলতাই আপনাকে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানে লইয়া যাইবে।"

হরকুমার বলিলেন,—"জানি না কি হইবে। ভরসা কেবল আপনার চরণ যুগল।"

তিনি ভক্তিভাবে মহাপুরুষকে প্রণাম করিলেন। জীবন বাবু বলিলেন,—"মা যত কথা বলিয়াছেন, যত উপদেশ দিয়াছেন, যত আজ্ঞা করিয়াছেন, সকলই আমি হৃদয়ে

অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছি। আমার প্রতি আর কোন নূতন আদেশ করিবেন কি?”

যোগেশ্বরী বলিলেন,—“না বাবা, সকল কার্য্যের অবসান হইয়াছে; সুতরাং বলিবার কথা আর নাই। কেবল এই মাত্র বলিতেছি, তুমি উমাশঙ্করের সহিত মিলিয়া বিষয় ব্যাপারের সাধনা করিতে করিতে ধর্ম্ম-সাধনায় উদাস্ত করিও না। রাজর্ষি জনক ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট রূপে দেখাইয়াছেন যে, ইচ্ছা থাকিলে, বিষয় সম্পত্তি ধর্ম্মচর্চ্চার প্রতিকূলতা করিতে পারে না, বরং তাহার সহায়তা করে। আমি বিশ্বাস করি তোমাদেরও জীবন সেইরূপ আদর্শ লক্ষ্য করিয়া কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইবে।”

উমাশঙ্কর বলিলেন,—“আমি ইচ্ছা করিতেছি, অতঃপর আর স্থানান্তরে যাইব না। এই স্থানেই আপনাদের পাদপদ্ম দর্শন করিতে করিতে বসিয়া থাকি, ইহাই আমার বাসনা।”

ঘনানন্দ বলিলেন,—“অনাবশ্যক, এ সব নয়নে দর্শন করিয়া কি হইবে বাবা? তৃতীয় চক্ষুর দ্বারা দর্শন কর—দর্শনের বিরাম হইবে না, শক্তির অভাব হইবে না, বিচ্ছেদ বা পার্থক্য উপস্থিত হইবে না, কোন ব্যবধান থাকিবে না। তোমরা সকলেই এক্ষণে প্রস্থান কর; কল্য যথাসময়ে উপস্থিত হইও।”

তখন রাজা, রায় বাহাদুর, জীবন বাবু ও শিষ্যদ্বয় ভক্তি সহকারে সেই দেবদম্পতীকে প্রণাম করিলেন এবং নীরবে সেই পবিত্র স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

তিরোধান।

পরদিন প্রত্যূষে ঘনানন্দ স্বামী ও যোগেশ্বরী দেবী তাঁহাদিগের অধিকৃত রাজভবন হইতে নিক্রান্ত হইয়া দশাশ্বমেধ ঘাটের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অগণ্য নরনারী হরিধ্বনি করিতে করিতে তাঁহাদের অনুগমন করিল। তাঁহাদের সম্মুখে, বহুদূরে থাকিয়া, রাজা উমাশঙ্কর স্বকীয় উত্তরীয় বস্ত্রদ্বারা গন্তব্য পথ মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীর শিষ্যদ্বয় উভয় পার্শ্ব হইতে পুষ্প বর্ষণ করিতেন লাগিলেন এবং রায় হরকুমার বাহাদুর ও জীবনকৃষ্ণ সুদূরে অগ্রে অগ্রে স্বর্ণ ও রজত মুদ্রা, খই ও কড়ি ছড়াইতে ছড়াইতে চলিলেন। ঘনানন্দ প্রসন্নবদনে হাসিতে হাসিতে এবং প্রণত নরনারীকে হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার দেহ লাবণ্যময়, বলশালী, এবং যুবাপুরুষের ন্যায় ক্ষিপ্রকারী। কিন্তু যোগেশ্বরী দেবী যেন পাষাণগঠিত মূর্ত্তি। তাঁহার চরণদ্বয় যেন তাঁহার অজ্ঞানসারে স্বকার্য্য সাধন করিতেছে; তিনি যেন নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয়। তাঁহার মুখে বাক্য নাই, অধরে হাস্য নাই, নয়নে দৃষ্টি নাই এবং তাঁহার দেহে যেন জীবন নাই। তাঁহাদের পশ্চাতে কিয়দ্দূরে শ্যামলাল, নীলরতন বাবু, অম্বিক, রামহরি ও চণ্ডীচরণ চলিতে লাগিলেন। পশ্চাতের লোকেরা গোল করিয়া ও আগ্রহযুক্ত হইয়া একেবারে দেবদম্পতীর গায়ের উপর গিয়া না পড়ে, এই সাবধানতার অনুরোধে তাঁহারা ধীরে ধীরে

চলিতে লাগিলেন। ক্রমে সকলে দশাশ্বমেধে উপনীত হইলেন।

কাশীতে সে দিন যেন একটা যুগপ্রলয় উপস্থিত। লোকে গৃহকার্য্য ত্যাগ করিয়াছে, আহারের ব্যবস্থা করিতে ভুলিয়া গিয়াছে, কর্ত্তব্যপালনে বিস্মৃত হইয়াছে, সামাজিক শিষ্টাচার ত্যাগ করিয়াছে। যেন কোন অনৈসর্গিক কারণে সকলেই ব্যাকুল। সকল দিক হইতে দশাশ্বমেধের অভিমুখে লোক ধাবিত হইতেছে। বেলা এক প্রহরের মধ্যেই সকল পথ, সকল মুক্ত স্থান, সকল ভবনের ছাদ, সকল বৃক্ষ জনপূর্ণ হইয়া গেল। সম্মুখস্থ ভাগীরথী বক্ষ নৌকায় আচ্ছন্ন। প্রত্যেক নৌকা মনুষ্য পরিপূর্ণ। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই অগণ্য নৃমুণ্ড ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া কয়েকজন পদস্থ ইংরাজও সে স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন।

এক নির্দ্দিষ্ট বেদীর উপর ঘনানন্দ আসীন। তাঁহার বামপার্শ্বে শোভাময়ী যোগেশ্বরী আসীনা। উভয়ের দেহে দেহ সংলগ্ন এবং একের বাহু অপরের কণ্ঠে বেষ্টিত। বড়ই অপূর্ব্ব দৃশ্য! সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ ও নারী যেন বিশ্বের সকল শোভা আহরণ করিয়া সেই মঞ্চপৃষ্ঠে সমাসীন। উভয় পার্শ্বে শিষ্যদ্বয় করযোড়ে দণ্ডায়মান। সম্মুখে গললগ্নী কৃতবাস রাজা উমাশঙ্কর যুগ্মকরে দণ্ডায়মান। সমাগত লোকেরা যাহাতে অতি নিকটে আসিতে না পায়, পুলিশ প্রহরীরা তাহার ব্যবস্থায় নিযুক্ত। প্রচণ্ড তপনদেব যেন উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। রবিকরে যেন চারিদিক ঝলসিতে লাগিল। একজন রাজা, সন্ন্যাসী দম্পতীর দেহে সৌরকরপাত নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে মকমলের এক প্রকাণ্ড ছাতা আনিলেন। রাজা উমাশঙ্কর বলিলেন,—"রৌদ্র নিবারণে কোন ক্ষতি নাই; কিন্তু তাহা নিবারণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।" ছাতাধরা হইল না।

রাজা উমাশঙ্করের যাহা জিজ্ঞাস্য ছিল, তাহা তিনি পূর্ব্বেই জানিয়া লইয়াছিলেন। দশাশ্বমেধে আগমনের অনতিকাল পরে সন্ন্যাসী মৌন হইলেন। দেবী যোগেশ্বরী পূর্ব্ব রাত্রিতে দর্শকগণকে বিদায় করার পর হইতে বাক্য ও কার্য্যত্যাগ করিয়াছেন।

বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল। সন্ন্যাসীর দেহ যেন কুঞ্চিত হইতে লাগিল। যোগেশ্বরী দেবী তখন স্পন্দরহিত এবং তাঁহার দেহ যেন চেতনাশূন্য। সন্ন্যাসীর নাসারন্ধ্রদ্বয় স্ফীত হইল। তাঁহার দেহে তখন যে কোন প্রকার বিস্ময়জনক ক্রিয়া চলিতেছে, ইহা সন্নিহিত দর্শকেরা সহজেই বুঝিতে পারিলেন। এইরূপ ক্রিয়া কিয়ৎকাল চলার পর সন্ন্যাসীর মেরুদণ্ড ও গ্রীবা সম্পূর্ণ ঋজু হইয়া উঠিল এবং তাঁহার বক্ষঃস্থল অতি দ্রুতভাবে স্পন্দিত হইতে লাগিল। দেবী যোগেশ্বরী তখনও নিশ্চেষ্ট ও স্পন্দরহিত, এমন কি তাঁহার হৃদয়ও স্পন্দিত হইতেছিল কি না, তাহাও সন্দেহের বিষয়। সহসা তাঁহার সমস্ত শরীর—চরণ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত তাবৎ অঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। অতি অল্পক্ষণ পরে তাঁহার সেই পুণ্যপ্রদীপ্ত কলেবর সন্ন্যাসীর দেহে ঢলিয়া পড়িল; তাঁহার মস্তক সন্ন্যাসীর স্কন্ধের উপর আশ্রয় পাইল।

বেলা আড়াই প্রহর হইয়া আসিল। সহসা রাজা উমাশঙ্কর ব্যস্তভাবে বেদীর উপর উঠিয়া পড়িলেন এবং ঐ দেব দম্পতীকে স্পর্শ না করিয়া, তাঁহাদের অতি নিকটে বসিয়া রহিলেন। তদনন্তর তিনি অবিচলিত ভাবে সন্ন্যাসীর মস্তকের উপর দৃষ্টিসংযত করিয়া

রাখিলেন। তখনই তিনি অত্যুচ্চ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "জয় সচ্চিদানন্দ হরি!"

তখন দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া অগণ্য কণ্ঠে শব্দ উঠিল, "জয় সচ্চিদানন্দ হরি!"

সন্ন্যাসীর দেহ সম্মুখে একটু নত হইতেছে দেখিয়া, রাজা উমাশঙ্কর তৎক্ষণাৎ সতর্কতা ও ব্যাকুলতার সহিত তাহা উভয় বাহুর দ্বারা ধরিয়া ফেলিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"ভাইসব মহাপুরুষ এ দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। আর মা ঠাকুরাণীর তিরোধান কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে ঘটিয়াছে।"

সকল লোক অবাক্‌। রাজা উমাশঙ্কর এবং অন্যান্য কোন কোন লোক দেখিতে পাইয়াছিলেন, উৎক্রান্তির সময় মহাপুরুষের মস্তকের ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া একটী জ্যোতির্ম্ময় শিখা ক্রমে ক্রমে নির্গত হইয়াছিল এবং ধীরে ধীরে সূর্য্যকিরণের সহিত মিশিয়াছিল। সেই শিখা নির্গম নিরুদ্ধ হইবামাত্র সন্ন্যাসীর দেহ সম্মুখে হেলিয়া পড়িতেছিল।

ডাক্তার সাহেব ও অন্যান্য অনেক চিকিৎসক তথায় উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার সাহেব বলিলেন,—"রাজা বাহাদুর বড়ই অদ্ভুত কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিলাম। স্বচক্ষে না দেখিলে ইহা বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। আপনি কৃপা করিয়া মহাত্মার দেহ আমাকে একবার স্পর্শ করিতে দিবেন কি?

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"কোন আপত্তি নাই। আপনি স্বচ্ছন্দে এ দেহ স্পর্শ করিতে পারেন। আর যাঁহার যাঁহার ইচ্ছা সকলেই এক্ষণে মহাপুরুষকে স্পর্শ করিতে পারেন।"

প্রথমে ডাক্তার সাহেব অগ্রসর হইয়া বিবিধ প্রকারে ব্রহ্মানন্দের ও যোগেশ্বরী দেবীর পরিত্যক্ত দেহ পরীক্ষা করিলেন। শেষে সবিস্ময়ে বলিলেন,—"অতি আশ্চর্য্য ভাবে এ দুই দেহ প্রাণহীন হইয়াছে। বিজ্ঞান এ তথ্য অবধারণে অক্ষম। নিশ্চয়ই এ দেহদ্বয়ের সম্পূর্ণ মৃত্যু ঘটিয়াছে।

ডাক্তার সাহেব প্রস্থান করিলেন। যে রাজা ছাতা আনাইয়াছিলেন, উমাশঙ্করের ব্যবস্থা ক্রমে সন্ন্যাসীর একজন শিষ্য এক্ষণে তাহা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন এবং সযত্নে সেই পবিত্র কলেবর যুগলের উপর তাহা ধারণ করিতে বলিলেন। তাহার পর রাজা উমাশঙ্কর সাবধানে সেই দুই শবকে সেই বেদীর উপর পাশাপাশী করিয়া শয়ন করাইলেন। অনবরত চারিদিক হইতে হরিধ্বনি হইতে লাগিল। অনেক লোক বেদীর নিকটস্থ হইয়া এই দেব-যুগলকে প্রণাম করিল এবং অনেকে উত্তরীয় বস্ত্রদ্বারা তাঁহাদের চরণ স্পর্শ করিয়া সেই বস্ত্র মস্তকে ধারণ করিতে লাগিল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে রাজা উমাশঙ্কর, নীলরতন বাবু, হরকুমার বাহাদুর, সন্ন্যাসীর শিষ্যদ্বয় এবং আরও অনেক লোক এই দুই বিগত জীব কলেবর এক মনোহর শয্যাচ্ছাদিত রজত পালঙ্কে স্থাপন করিলেন, এবং সেই পালঙ্ক বহন করিয়া এক নিভৃত স্থানস্থিত ভবনে লইয়া গেলেন। তথায় এক প্রশস্ত কাষ্ঠ-পেটিকার মধ্যে বিবিধ দ্রব্যসহ উভয় দেহ স্থাপিত হইল। পরদিন অপরাহ্নে দানাদি সমারোহ সহকারে এক পবিত্র প্রদেশে সেই পেটিকা ভূগর্ভে প্রোথিত করা হইল। অনতিকাল মধ্যে সেই সমাধিক্ষেত্রের উপর রাজা উমাশঙ্করের ব্যয়ে এক মনোহর মন্দির নির্ম্মিত হইল। এক সপ্তাহ ধরিয়া কাশীতে দান ব্যাপার চলিতে লাগিল। মহারাণীর প্রদত্ত পঁচিশ হাজার টাকা এবং আরও অনেক টাকা খরচ হইয়া গেল।

শেষ।

মহারাজা সার উমাশঙ্কর বাহাদুর জি, সি, এস্, আই আত্মীয়স্বজনগণসহ বঙ্গদেশে প্রত্যাগত হইলেন, তাঁহার পুনরাগমনের দিন বঙ্গে একটা দেশব্যাপী উৎসব পড়িয়া গেল। তাঁহার প্রজা ও অনুরক্ত ভক্তগণ যেন মৃতদেহে জীবন পাইল। মহারাজা একবার স্বজনসহ চন্দ্রমালায় আসিলেন। সেখানে কয়েক দিন থাকার পর রায় হরকুমার বাহাদুর, সকলের নিকট বিদায় লইয়া, কাশী আসিলেন; চণ্ডীচরণ কোন মতেই তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিলেন না, তিনিও রায় বাহাদুর দাদার সহিত কাশীবাসী হইলেন। জরিফ হিন্দুধর্ম্মে বড়ই আস্থাবান্ হইয়াছিল, সেও হরকুমার বাহাদুরের সঙ্গ লইল। জীবন বাবুর সুদক্ষতায় বিষয়-কার্য্য সুনির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। মহারাজা ও মহারাণী কখন বা চন্দ্রমালায় কখন বা সোণাপুরে অবস্থিতি করিতে থাকিলেন। সন্ন্যাসীর শিষ্যদ্বয় মহারাজা বাহাদুরের উপদেশ অনুসারে, কার্য্য সাধনে নিযুক্ত হইলেন। কাশীতে মহাপুরুষের আশ্রম প্রহরীদ্বারা রক্ষিত হইতে লাগিল। শিষ্যদ্বয় সেই আশ্রম-সমীপে বাস করিতে লাগিলেন। রামহরি ক্রমে এক জন ধনশালী লোক হইয়া উঠিল। ভব ও দাসী অনেক দিন মহারাণীর নিকটেই কাটাইতে লাগিল। রাজপুত্রকে লইয়া সুহাসিনী পরমানন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

সম্পূর্ণ।

বিজ্ঞাপন।

সাধ্যমতে স্বার্থসিদ্ধির বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া যথাসম্ভব পরহিত-সাধন-ব্রত-গ্রহণ করিতে পারিলে, মানব স্বকীয় আত্মার এবং সমাজের প্রভূত উন্নতি সংসাধিত করিতে পারেন, এই তত্ত্বকথা বর্ত্তমান সামান্য গ্রন্থের প্রতিপাদ্য।

বহুদিন পূর্ব্বে এই গ্রন্থ অসম্পূর্ণ অবস্থায় প্রচারিত হইয়াছিল এবং তদবস্থায় ইহার বহু সহস্র খণ্ড বিক্রীত হইয়াছিল। নানা কারণে এত দিন এ গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিতে না পারায় অনেকের নিকট বড়ই আমাকে কুণ্ঠিত হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। এক্ষণে এই ক্ষুদ্র পুস্তক সম্পূর্ণ আকারে প্রকাশিত হওয়ায়, আমি নিষ্কৃতি লাভ করিলাম। ইতি

শ্রীদামোদর দেবশর্ম্মা।

অগ্রহায়ণ, ১৩০৮ সাল।

কর্ম্মক্ষেত্র।

প্রথম খণ্ড।

"যততোহ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥"

অর্থ।—হে কৌন্তেয়! যত্নবান্ বিবেকশালী পুরুষেরও মনকে বিলোড়নকারী ইন্দ্রিয়-সমূহ সবলে আয়ত্তগত করে।

তাৎপর্য্য।—ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তির এতই প্রবল প্রতাপ যে, বিশেষ সাবধান ও জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরও তাহার হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করা সুকঠিন।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ২য় অধ্যায়। ৬০ শ্লোক। শ্রীমদ্ভগবদুক্তি।)

কর্ম্মক্ষেত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণনগর হইতে শান্তিপুর যাইবার একটি সরল ও সুন্দর রাজপথ আছে। পথটি ছয় ক্রোশ দীর্ঘ। দুই তিন স্থান ব্যতীত, পথের অব্যবহিত পার্শ্বে, কোথাও লোকালয় নাই। সততই এই পথে গরুর গাড়ি ও মানুষ যাতায়াত করে। কিন্তু দিনমানে যত লোক ও গাড়ি দেখা যায়, রাত্রিতে তত দেখা যায় না। পূর্ব্বে এই পথের কোন কোন স্থানে লগুড়ধারী মহাশয়েরা লুক্কায়িত থাকিতেন; এবং অসাবধান ও সঙ্গিহীন পথিকের মাথা ফাটাইয়া জীবনযাপন করিতেন। ইংরাজরাজের বিষম দণ্ডবিধির প্রতাপে সে ভয় এখন আর বড় নাই। কিন্তু নদীর একদিক ভাঙ্গিতে থাকিলে, অপর দিকে চড়া পড়ে; জগতে চিরদিনই সুখ-দুঃখ পাশাপাশি হইয়া চলে। ইংরাজরাজের প্রভাবে দস্যুভয় কতকটা কমিয়াছে বটে, কিন্তু এ পথের কোন কোন স্থানে বাঘের ভয় বড় বাড়িয়াছে। ইংরাজের সুশাসনে এদেশের মনুষ্যগণ লাফাইতে লাফাইতে সভ্য হইয়া উঠিতেছে; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এদেশের পশুগণের অসভ্যতা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষের বর্ব্বর বন্যপশুপাল নিতান্ত মূর্খ। তাহারা রাজভক্তির ধার ধারে না, আইনের সম্মান করে না, এবং পাদরি সাহেবদিগের পরম পবিত্র উপদেশে কর্ণপাত করে না। ইংরাজের অনুকম্পায় এই বর্ব্বর, চিরাসভ্য এবং গণ্ডমূর্খ ভারতবর্ষবাসীরা প্রায় অর্দ্ধ সভ্য হইয়া উঠিয়াছে। হে দয়াময় পরমেশ্বর! এদেশের পশুগণের এই সুখময় অবস্থায় উপনীত হইতে আর কত বিলম্ব আছে?

আষাঢ় মাস, সুতরাং বর্ষাকাল। অন্য কোন প্রমাণ না থাকিলেও, অন্ততঃ 'শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগের' দলিলে এ কথা সকলকেই অবনত মস্তকে মানিয়া লইতেই হইবে। রাত্রিকাল প্রাগ্বর্ণিত পথের পার্শ্বে মাঝে মাঝে ছোট বড় অনেক গাছ, আর আকাশেও বিলক্ষণ মেঘের ঘটা, সুতরাং ভয়ানক অন্ধকার। যাহারা এ কথা স্বীকার করিতে নারাজ হইবেন, তাঁহারা জয়দেব কবির 'মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামস্তমালদ্রুমৈর্নক্তং' এই শ্লোকাংশ স্মরণ করিলে আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিবেন না।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। টিপ টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে। এইরূপ সময়ে দুই ব্যক্তি সেই পথ দিয়া শান্তিপুর-অভিমুখে গমন করিতেছে। ব্যক্তিদ্বয়ের একের বয়স অনুমান পঞ্চাশ বৎসর। সে ব্যক্তি কৃষ্ণকায়, ঈষৎ স্থূল, ও মধ্যমাকার। তাহার মাথায় বহু-তালিযুক্ত এক ছাতা, পায়ে নয়,—হাতে এক যোড়া জীর্ণ ঠনঠনের চটী, পৃষ্ঠদেশে গামছা বাঁধা এক বুচকি, কোমরে চাদর জড়ান। তাহার সঙ্গী যুবা পুরুষ—বয়স অনুমান বাঁচিশ বৎসর, কৃশকায়, গৌরবর্ণ ও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। তাহারও মাথায় ছাতা, কিন্তু তালিহীন; হাতে

জুতা, কিন্তু জীর্ণ চটি নয়; কোমরে চাদর জড়ান, কিন্তু গা জামায় ঢাকা।

লোক দুইটি যে এই পথ দিয়া সতত যাতায়াত করে, তাহা তাহাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া বেশ বুঝা যাইতেছে। তাহারা কথা কহিতে কহিতে চলিতেছে, যুবক বয়ঃজ্যেষ্ঠকে "শ্যাম খুড়া" বলিয়া ডাকিতেছে; সুতরাং খুড়া মহাশয়ের নাম শ্যামলাল কি, শ্যামচাঁদ, কি শ্যামাচরণ, কি এইরূপ একটা কিছু হওয়া সম্ভব। শ্যামখুড়া সঙ্গী যুবককে 'যদু বাবাজি' বলিয়া ডাকিতেছেন, ; সুতরাং শ্রীমান বাপাজীবনের নাম যদুনাথ, বা যদুপতি বা এইরূপ একটা কিছু হওয়াই সম্ভব। নাম যাহাই হউক, সাহসী খুড়া ভাইপো, অপরিহার্য্য প্রয়োজনের জন্যই হউক, বা অভিজ্ঞতা-হেতু ভীতিবিরহিত হইয়াই হউক, এই নিতান্ত অসময়ে এই পথ দিয়া চলিতেছেন। এক্ষণে কথাবার্ত্তার কিয়দংশ শুনিতে পাইলেই তাঁহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারা যাইবে।

ভাইপো বলিতেছেন,—"তা যাই বল শ্যাম খুড়া, শান্তিপুরের চালানি কাজে যে এত সুবিধা হইবে, তা আগে বুঝা যা নাই।"

শ্যাম কহিলেন,—"ব্যবসায়, কি জান যদু বাবাজি, শরীরে আলস্য থাকিলে চলিবার যো নাই। আমরা ব্যবসায় জন্য যেমন শরীর জল করিয়া লাগিয়াছি, এমন করিলে যে কাজেই লাগা যাইবে, তাতেই বেশ দশ টাকা উপায় হইতেই হইবে।"

যদু বলিলেন,—"তা সত্য—আমাদের খাটনির শেষ নাই। ঝড় বল, বৃষ্টি বল, সাপ বল, বাঘ বল, আমরা কিছুতেই পিছ-পা নই। এখন যে সুবিধার আশায় আজি এই রাত্রে দুর্য্যোগে আমরা বাহির হইয়াছি, মা কালীর ইচ্ছায় সেটা লাগিলে হয়।"

শ্যাম বলিলেন,—"লাগিতেই হইবে। যেরূপ সন্ধান পাইয়াছি, তাহাতে এখনও সে মালের কোন খরিদ্দার উপস্থিত হইয়াছে এমন বোধ হয় না। একবার বায়না করিয়া ফেলিতে পারিলেই পাকা হইয়া যাইবে। নোটগুলা কোমরে ঠিক আছে তো? একবার হাত দিয়া দেখ।"

যদু হস্তদ্বারা কোমরের নোটের তাড়া দেখিয়া বলিল,—"ঠিক আছে। কিন্তু কাকা, সওদাটা নাকি বড়ই লাভের, তাতেই আমার ভয় হইতেছে, পাছে ফস্‌কাইয়া যায়।"

শ্যাম বলিলেন,—"ভয়ের তো কোন কারণ নাই; এখন আমাদের কপাল। আজি বৈকাল পর্য্যন্ত মালের কোন খরিদ্দার উপস্থিত হয় নাই, এ সংবাদ আমরা আজি জানিতে পারিয়াছি। তাহার পরেই আমরা টাকা লইয়া বাহির হইয়াছি। সাপ, বাঘ, মেঘ, বৃষ্টি, ভূত-প্রেত কিছুই আমরা মনে করি নাই। তাতেও যদি ফস্‌কাইয়া যায়, তাহা হইলে আর হাত নাই। ফস্‌কাইবে এমন বোধ তো হয় না! তুমি ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, ব্যবসায়-কার্য্যে বড় যত্নবান্। ভগবান্ সকল বিষয়েই তোমায় সুবিধা করিয়া দিবেন।"

যদু বলিলেন,—"খুড়া, তোমার আশীর্ব্বাদ আমার একমাত্র ভরসা। আমার ব্যবসাই বল, সংসার-ধর্ম্মই বল, সকলই তুমি। তোমার সাহায্য আর উপদেশ না পাইলে আমি কিছুই করিতে পারি না। তোমার প্রতি যতদিন আমার ভক্তি থাকিবে, যতদিন তোমার কথা আমি মাথা পাতিয়া মানিয়া চলিব, যতদিন তোমার উপদেশ সকল ধর্ম্মের সার বলিয়া আমার মনে থাকিবে, ততদিন আমার কোন কষ্ট হইবে না, আমাকে কোন কাজেই ঠকা হইবে না, ইহাই আমার বিশ্বাস।"

শ্যাম খুড়া একটু অন্যমনস্কভাবে বলিলেন,—"জল একটু চাপিয়া আসিল, অন্ধকারটাও একটু জমাট বাঁধিল বোধ হইতেছে। তা হউক, পথ অতি পরিষ্কার ভয় কিছুই নাই। মধ্যে মধ্যে কোমরে হাত দিয়া নোটগুলা দেখিও বাবা! এক সঙ্গে হাজার টাকার নোট না আনিলেই হইত। যা হউক, একটু সাবধান থাকিও।"

যদু বলিল,—"কিছু ভয় নাই খুড়া! কিছু বেশী টাকা সঙ্গে আনাই ভাল হইয়াছে। কি জানি কি দরকার পড়ে, তখন কার কাছে গিয়া হাত পাতিবে, বল। তা ভয় কি খুড়া? পথ খুব খাসা—ভয় কিছুই নাই। আর পথ যেমনই হউক, আমরা দু' দু'টা মরদ—যমকেও ডরাই না। তবে কিসের ভয়?"

শ্যাম খুড়া বলিলেন,—"ভয়? রাধাকৃষ্ণ! ডাকাতই আসুন, কি ভূতই আসুন, কি বাঘই আসুন, আমরা কিছুতেই পিছাইবার পাত্র নহি।"

ঠিক সেই সময়ে পথ-পার্শ্বস্থ বৃক্ষতল হইতে নিতান্ত কোমল ও ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্ন হইল,—"বাবা, শান্তিপুর আর কত দূর?"

যেই এই কথা শুনা, সেই অতি সাহসী খুড়া চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"বাবা গো, পেত্নী গো, তোমরা কে কোথায় আছ, আমাকে ধর গো!"

সঙ্গে সঙ্গে অতি সাহসী ভাইপো চীৎকার করিলেন,—"খুড়া গো, খেলে গো, ওগো পেত্নী গো!"

পুনরায় সেই বৃক্ষতল হইতে কাতর-কণ্ঠে শব্দ হইল,—"তোমরা যেই হও, আমাকে ফেলিয়া যাইও না। আমি তোমাদের সঙ্গ ছাড়িব না।"

তখন শ্যাম বলিলেন,—"ঐ আস্‌ছে গো, ঐ এলো গো, ঐ এসেছে গো, রাতে রাম কর্‌তে নাই গো।"

সঙ্গে সঙ্গে যদু বলিলেন,—"আমায় ধরেছে গো, প্রকাণ্ড পেত্নী গো বাবা!"

তাহার পর সেই কর্দ্দমাক্ত পিচ্ছিল পথে অতি দ্রুত চট্ পট্ থুপ থপাস্, চপ্ চপ্, ছড় ছড় শব্দ হইতে লাগিল। অমিতপ্রতাপ খুল্লতাত শ্যাম এবং বীরবর ভ্রাতুষ্পুত্র যদু ঊর্দ্ধশ্বাসে দশদিকে পলায়ন-পরায়ণ হইলেন। হাত হইতে জুতা পড়িয়া গেল, কাঁধ হইতে ছাতা খসিয়া গেল, ধড় হইতে প্রাণ পলায় পলায় হইল—কাজেই এ সকল সন্ধান তখন করে কে? এইরূপে অন্ধকারে ছুটিতে ছুটিতে একবার শ্যামের গায়ে যদু পড়িয়া গেলেন। তখন শ্যাম চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"আমাকে ধরেছে রে যদু, ধরেছে। দোহাই মা পেত্নী, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দেও।"

যদু বলিল,—"ভয় কি খুড়ো? আমি গো আমি।"

হাঁফাইতে হাঁফাইতে শ্যাম বলিলেন,—"তুমি? তবু রক্ষা! তা ভয় কি বাবা? রাম রাম বল।"

তখন খুড়া-ভাইপো দৌড়ে আধক্রোশের বেশীও ছাড়াইয়া আসিয়াছেন। প্রেতিনী আর অনুসরণ করিতেছে না বুঝিয়া, তাঁহাদের উভয়েরই একটু সাহস হইল, এবং তাঁহারা স্ব স্ব চরণ-চতুষ্টয়ের বেগ একটু কমাইয়া আনিলেন। তখন শ্যাম যদুকে তিরস্কার-স্বরে বলিলেন,—"ছি বাবা, তুমি ছেলে মানুষ; সংসারে কিছুই জান না; এমন ভয় করিতে আছে কি?"

যদু বলিলেন,—"ছি খুড়া মানুষ; সংসারের অনেক জান; ভয় করিতে আছে কি?"

সুতরাং খুড়া মহাশয় নিরুত্তর হইলেন।

তখন এই গলদঘর্ম্মকলেবর, কর্দ্দম-বিলেপিত-কায়, নিরুদ্ধ-নিশ্বাস বীরদ্বয়, বারংবার চারি দিকে সভয় দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া, সন্নিহিত সাঁকোর উপর বসিয়া বিশ্রাম করিবেন স্থির করিলেন। তাঁহারা তদর্থ সাঁকোর উপর উপবিষ্ট হইয়া হাঁকাইতে লাগিলেন। সেই সময়ে একটা শৃগাল পথ বাহিয়া যাইতেছিল। বীরদ্বয় সেই শৃগালের গমনজনিত থপ্ থপ্ শব্দ শুনিয়া সমস্বরে সকাতরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"আবার ঐ এয়েছে গো বাবা!"

কিন্তু উভয়েই শ্রম-কাতর চলচ্ছক্তিহীন, এবং প্রেতিনীর আক্রমণ হইতে অব্যাহতি-লাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব-বোধে, নিরতিশয় ভরসা-শূন্য, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া উভয়েই কাঁপিতে কাঁপিতে পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিলেন, এবং উভয়েই, ভীতিজনিত অঙ্গাদির অস্থিরতা-হেতু, তদবস্থায় সাঁকোর উপর হইতে পড়িয়া গেলেন। সাঁকোর নিম্নে ভেককুল-সমাকুল একটু জল ছিল। বীরদ্বয়ের আপাদমস্তক জলসিক্ত ও কর্দ্দমাক্ত হইয়া গেল—সঙ্গে কোন আঘাত লাগিল কি না, তাহা তখন স্থির হইল না। কোনরূপ অঙ্গ-সঞ্চালনাদি না করিয়া তাঁহারা কিয়ৎকাল তথায় নীরবে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন; তাহার পর নিতান্ত অস্ফুট-স্বরে ভাইপো জিজ্ঞাসিলেন,—"খুড়া, পেত্নী কোথায়?"

খুড়া বলিলেন,—"রাম রাম বল বাবা; ও নাম আর মুখেও আনিও না। আজি বড় অযাত্রা!"

তাহার পর খুড়া ও তাঁহার উপযুক্ত ভাইপো, অপরিসীম সাহসে বুক বাঁধিয়া, অতি কষ্টে গড়খাই রাস্তার উপরে উঠিয়া আসিলেন, এবং দুটিতে এক হইয়া সাঁকো হেলান দিয়া বসিলেন। ভয় ও পরিশ্রমে তাঁহাদের শরীর নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছিল; তাঁহারা অনতিকাল মধ্যে নিদ্রিত হইয়া আপাততঃ সকল যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিলেন।

বলা বাহুল্য যে, এই দুই ব্যক্তি কৃষ্ণনগরের দোকানদার। উন্নতিশীল কৃষ্ণনগরের একজন উন্নতিশীল বালক দেশহিতৈষী, ভলণ্টিয়ার হওয়ার আবশ্যকতা-সম্বন্ধে, অনেক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। হাটে মাঠে ঘাটে তাঁহার অনল্প উন্মাদকারী বক্তৃতা শুনিয়া কৃষ্ণনগরের ছেলে-বুড়ো ভলণ্টিয়ার হইবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। সেই সময়ে অন্যান্য অনেক দোকানদারের সহিত শ্যাম ও যদু যে ভলণ্টিয়ার হইবার জন্য যথেষ্ট ব্যাকুল হইয়াছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ আমরা রাখি। যদি মহামতি ট্যালবয়স্ হুইলার সাহেব বা অন্য কোন ঐতিহাসিক পণ্ডিত তাঁহাদিগের গ্রন্থাদিতে এই চিরস্মরণীয় ঘটনা সন্নিবিষ্ট করিতে বাসনা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা তজ্জন্য আমাদের নিকট আবেদন করিলে, আমরা এতৎসংক্রান্ত যাবতীয় প্রমাণাদি প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়া রাখিতে সম্মত আছি। বলা আবশ্যক, এরূপ ঘটনা উল্লিখিত রূপ ঐতিহাসিকের লেখনীমুখে পরিব্যক্ত হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

খুড়া ও ভাইপো যখন এইরূপে সাঁকো হেলান দিয়া অজ্ঞানাভিভূত ছিলেন, তখনও উষা সমাগম ঘটে নাই। কাজেই তাহার বলিতে

হইলে বলা উচিত ছিল যে, সূর্য্যদেব তখনও রাঙ্গা টোপর মাথায় দিয়া আকাশের পূর্ব্ব দরজা হইতে উঁকি দিতে আরম্ভ করেন নাই। সৌভাগ্য-ক্রমে দুনিয়ার সকল লোক কবি নহে।

ব্যবসায়ীদ্বয় ঘুমাতে ঘুমাতে প্রেতিনীর স্বপ্ন দেখিতেছিলেন কি না, এবং স্বপ্নে তাহার রূপ কল্পনা করিয়া আশঙ্কিত হইতে ছিলেন কি না, তাহার সংবাদ আমরা রাখিতে পারি নাই। সুতরাং এস্থলে ভারত-ইতিহাসের একটী পরিচ্ছেদ নিতান্ত অঙ্গহীন হইয়া থাকিতেছে। আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানবের দ্বারা এ অপূর্ণতা নিরাকৃত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। যে সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিত, অত্যদ্ভুত গবেষণ—সহকারে, ভারতইতিহাসের যাবতীয় অভাব মিটাইয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের কৃপা হইলে, এ অঙ্গহীনতা সংশোধিত হইবে, এরূপ আশা করা অসঙ্গত নহে; কারণ, এবংবিধ অসংখ্য গুরুতর বিষয়ের অত্যাশ্চর্য্য মীমাংসা তাঁহাদের গ্রন্থাদির ছত্রে ছত্রে মণিমুক্তার ন্যায় শোভা পাইতেছে।

এইরূপ সময়ে মাল-বোঝাই ও ত্রিপল ঢাকা এক গরুর গাড়ি 'ক্যা—কোঁ—চ্যা—চোঁ' শব্দে দশদিক বিনাদিত করিতে করিতে কৃষ্ণনগ-রাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে দেখা গেল। তাহার গাড়োয়ান নিধিরাম ঘোষ নিরতিশয় বর্ব্বর, নচেৎ এই ব্রিণ্ডসমুদান-কালে, নিসর্গের নিরুপম শোভা সম্ভোগ না করিয়া, সে গাড়ীর সম্মুখে বসিয়া ঝিমাইতেছে কেন?

প্রেতিনী-নিরাপদ্বয়, অধুনা তন্দ্রাবেশ ব্যক্তিদ্বয়ের কর্ণে সহসা সেই গো-যানের অদ্ভুতকট ধ্বনি প্রবেশ করিবামাত্র, তাঁহাদের প্রতীতি জন্মিল, প্রেতিনী দল বাঁধিয়া আত্মীয়—কুটুম্ব প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া, প্রেতিনীর বাহিরা আসিতেছে; সুতরাং আর নিস্তার নাই। তখন ভাইপো বলিলেন,—"ঐ ধরলে গো! বাই গো!"

খুড়া বলিলেন,—"ঐ ধরেছে রে! বাবা গো!"

তখন খুড়া ভাইপো জড়াজড়ি করিয়াই গড়াইতে গড়াইতে পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এই গোলমালে নিধিরাম গাড়োয়ানের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সম্মুখস্থ ব্যাপার দেখিয়া সে মনে করিল, হয় তো কোন দস্যু পথিকের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে, এবং তজ্জন্য উভয়ে ধবস্তাধবস্তি করিতেছে। সে ভ্রমে খুড়াকে দস্যু এবং বহু বাবাজীকে পথিক বলিয়া মনে করিল। হতভাগা গাড়োয়ান, জগতের পরিত্রাণ কর্ত্তা প্রভু যেশুখৃষ্টের নীতিকথা কখন আলোচনা করে নাই, দার্শনিক-প্রবর জন ইুয়ার্ট মিলের 'ইউটিলিটেরিয়ানিজম' শাস্ত্র কখন অধ্যয়ন করে নাই; সুতরাং তাহার হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা একটুও বিদূরিত হয় নাই। 'সরভাইবাল অফ্ দি ফিটেষ্ট' এই অপূর্ব্ব 'থিয়রিটাও' যদি তাহার জানা থাকিত, তাহা হইলে, কোনরূপে তাহা এই ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া, হতভাগা নিশ্চিন্ত থাকিলেও থাকিতে পারিত। মূর্খ গাড়োয়ান সম্মুখস্থ ব্যাপার সন্দর্শনে বড়ই রাগিয়া উঠিল, এবং গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বেগে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল। যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া সে যদি চুপ করিয়া থাকিতে পারিত, তাহা হইলে অনেক সুপণ্ডিত তাহার চরিত্রের সাম্যভাবের সমর্থন করিতে পারিতেন। অল্প-মতি নিধিরাম বিনা বাক্য ব্যয়িত গাড়ির বাঁশ খুড়া মহাশয়ের উপর তুলিয়া উভয় মস্তক বসাইয়া দিল, এবং অমনি অস্ফুট

সহিত চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—"দাঁড়া শালা ডাকাইত, আজ তোর হাড় এক ঠাঁইয়ে, মাস এক ঠাঁইয়ে করিয়া তবে ছাড়িব। জানিস্ না হারামজাদা, এ কোম্পানির মুলুক ?"

এই বলিয়া ক্রুদ্ধ গাড়োয়ান মহাশয় দ্বিগুণ জোরে পুনর্ব্বার শ্যাম খুড়ার পৃষ্ঠদেশ বেশ করিয়া সাজাইয়া দিলেন। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, আমরা জ্ঞাত আছি, নিধে গাড়োয়ান মহারাণীর এলকা-ভুক্ত কোন স্থানের 'জষ্টিস্ অব দি পিস্' বা অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট নহে, এবং ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বা দারোগাগিরি কর্ম্মও সে করে না ; সুতরাং এরূপ অনধিকার-চর্চ্চা করিয়া দণ্ডবিধির অবমাননা করা তাহার পক্ষে যৎপরোনাস্তি অন্যায় কর্ম্ম সন্দেহ নাই। যে কথা শিক্ষিতমাত্রেই বুঝেন, মূর্খের একজনও তাহা বুঝিতে পারে না, ইহা অতিশয় আশ্চর্য্য ! সে যাহাই হউক, নিধিরামের কথায় যেরূপ রাজ-ভক্তি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা কিন্তু কখনই উপেক্ষিত হইবার যোগ্য নহে। সে বাক্যের দ্বারা যেরূপ রাজ-ভক্তির পরিচয় দিয়াছে, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব যদি তাহা দয়া করিয়া গবর্ণমেণ্টের গোচর করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই শ্রীযুক্ত নিধিরাম গাড়োয়ান মহাশয় রায় বাহাদুর অথবা 'সি, আই, ই,' উপাধিতে বিভূষিত হইতেন। বস্তুতঃ এইরূপ রাজভক্ত লোকই এই রাজ-সম্মানের উপযুক্ত।

কথা হইতেছে, মার বড় শক্ত জিনিস ; কারণ, মারের আগে ভূত পলায় ; সুতরাং প্রেতিনী কোন্ ছার ! অধুনা পেত্নীর উপর মার না পড়িলেও, পেত্নী-পাওয়া লোকের ঘাড়ে বিলক্ষণ সোঁটা পড়িয়াছে। সেই সোঁটার চোটে হয়ত পেত্নী ছাড়িয়া গেল। বহু ঝাঁঝালি আলোকের শব্দ ও ধুলার আওয়াজ

শুনিয়া, সভয়ে খুড়ার বাহুমধ্য হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলেন, এবং কয়েক পদ অন্তরে গিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। এদিকে যাতনাক্লিষ্ট শ্যাম খুড়া কাঁদিতে কাঁদিতে গাড়োয়ানের পা জড়াইয়া বলিলেন,—"দোহাই বাবা,আমি কখন চোরও নহি, ডাকাইতও নহি। আমার সাতপুরুষের মধ্যে চোর-ডাকাইত ছিল না। ঐ বহু সম্পর্কে আমার ভাইপো হয়। কৃষ্ণনগরে আমাদের সবাই জানে ; সেখানে আমাদের দোকান আছে।"

গাড়োয়ান সবিস্ময়ে একবার বহু ও একবার শ্যামের মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল,—"হাঁ—একি কাণ্ড ? এ যে শ্যাম খুড়ো দেখছি—ও যে বদ্-দা। রাম রাম রাম—ছিঃ ছিঃ ছিঃ !"

তখন শ্যাম-খুড়া নয়নের জল মুছিয়া গাড়োয়ানের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং তাহাকে চিনিতে পারিয়া সক্রোধে বলিলেন,—"কেও, নিধে নাকি ? হারামজাদা, মেরে ফেলেছিস্ একেবারে !"

অতিশয় রাগের সহিত বহু বলিলেন,—"নিধে ! তুই হতভাগা কোন্ আক্কেলে খুড়োর গায়ে হাত তুলি বল্ তো। তোর সর্ব্বনাশ করে তবে ছাড়্ব জানিস্ ?"

তখন নিধে গোয়ালা অবশ্যে নিধিরাম ঘোষ বড় দুঃখিত ও উৎকণ্ঠিত হইল। সে যেরূপ ঘটনায় ও যেরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ঘোর দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, তাহা সবিনয়ে বুঝাইয়া দিল, এবং তজ্জন্য বড়ই আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। আজিকার বাজারে চলিত কথায় বলিতে হইলে বলা আবশ্যক যে, নিধে গোয়ালা যথোপযুক্ত 'একপাতি' কাদল ; দুই দশটা রাগ, অভিমান,

তিরস্কার ও শাসন-বাক্যের পর, খুড়া-ভাইপো একযোগে তাহার ক্ষমাভিক্ষা মঞ্জুর অর্থাৎ 'এপলজি একসেপ্ট' করিয়া লইলেন।

এই স্থলে ভদ্রলোকগণ নিধিরামের চরিত্র সমালোচনা করিয়া কয়েকটা অতি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ভবিষ্যৎ ইতিহাস-লেখকের পক্ষে সেগুলা বিশেষ প্রয়োজনে আসিতে পারে বিবেচনায়, তৎসমস্ত এখানে লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক। নিধিরাম ঘোষ মূর্খ; সে গরুর পৃষ্ঠদেশে বিলক্ষণ লাঠ্যৌষধি প্রয়োগ করে; তাহাদের লাঙ্গুল মর্দ্দন করিয়া রসিকতা করে; তাহাদের ভগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া কুৎসিত গালিগালাজ করে; তাহাদের জননীকে উদ্দেশ করিয়া সুরুচি-বিরুদ্ধ অভদ্রতা করে; গাড়ির পেয়ে মারে; ষাড়ে করিয়া গাড়িতে মাল বোঝাই করে; আবার সেইরূপে গাড়ি খালাস করিয়া দেয়। ইত্যাকার কাজ সে জানে, কিন্তু 'এপলজি' করিতে তাহার কখনই জানা সম্ভব নহে। আমাদের একজন সম্মানিত ইংরাজবন্ধু অনেক বিবেচনার পর স্থির করিয়াছেন যে, 'এপলজি করাটা সভ্যতার একটা অঙ্গ।' এদেশে চিরদিন যেরূপ অসভ্য, তাহাতে এখানে 'এপলজি' কখনই প্রচার ছিল না, ইহা স্থির। ইদানীন্তন কালে বিলাত হইতে বস্তা বস্তা বিলাতী কাপড়ের আমদানী হইয়া যেমন দেশীয় আপামর সাধারণের নগ্নতা নিবারণ করিতেছে, সেইরূপ বস্তা বস্তা সভ্যতার আমদানী হওয়ায় নাগাইর নিধিরাম ঘোষ 'এপলজি' করিতে শিখিয়াছে অতএব বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের জয় হউক—তাহাদের অধিকার, বহুদিবার সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হউক। এই বিদ্যায় নিপুণ পণ্ডিত মহাশয় আরও মীমাংসা করিয়াছেন, যাহারা এরূপ 'এপলজি' প্রভৃতি [illegible] [illegible] অবলীলাক্রমে সম্পূর্ণ আয়-ত্তীকৃত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহারাই এতদ্দেশীয় সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি সন্দেহ নাই। এইরূপ লোকেরাই 'ন্যাশনাল কংগ্রেসে ডেলিগেট' হওয়ার উপযুক্ত। শ্রীযুক্ত নিধিরাম ঘোষ গাড়োয়ান মহাশয় বোধ হয় উক্ত মহাসভার এক মেম্বর; যদি এখনও এ সম্মানের তিনি অধিকারী না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে অনতিকাল মধ্যে কোন না কোন উন্নতিশীল স্থান হইতে 'ডেলিগেট' হইয়া ন্যাশনাল 'কংগ্রেস' নামক সভায় তিনি উপস্থিত হইবেন এবং জলদ-গম্ভীরস্বরে বক্তৃতা করিয়া ভারত উদ্ধার সমাধা করিবেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, সমস্ত বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত নিধিরাম নিতান্ত আগ্রহান্বিত হইল। তখন খুড়া ও ভাইপো ভাগাভাগি করিয়া এবং একের অপূর্ণতা অপরে পূরণ করিয়া, অত্যন্ত গম্ভীর-ভাবে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তাহারা পেত্নী দেখিয়াছেন, তাহার মূলার মত দাঁত, তাহার পা উল্টা, অঙ্গে শত শত কৃমি, নাকে কথা ইত্যাদি প্রেতিনীর চিহ্নগুলি বিবরণ তাঁহারা বিবৃত করিলেন। এ সমস্তই তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; সুতরাং অবিশ্বাস করিবার যো নাই। সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া নিধিরাম বড় ভীত হইল এবং শান্তিপুরের রাস্তায় আর কখন রাত্রে গাড়ি চালাইবে না স্থির করিল। হায়! অসভ্য নিধিরাম কি [illegible] কুসংস্কারের দাস!

সমস্ত কথা শুনিয়া নিধিরাম বলিল,—"হাল-দার খুড়ো! পথে যখন ভয় পেয়েছ, তখন আর শান্তিপুর গিয়া কাজ নাই; চল ফিরে যাওয়া যাক।"

খুড়া অধোমুখে রহিলেন। নিধিরামের পরামর্শ [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

লেন না। কিন্তু কর্ম্মানুরক্ত ও ব্যবসায়ানুরাগী ভাইপো এ পরামর্শ ভাল বলিয়া মনে করিলেন না। তিনি বলিলেন,—"বড় বয়রকারী কাজ—ফিরিয়া যাওয়া কোন রকমেই হয় না। বিশেষ শান্তিপুর তো আসাই হয়েছে—আর ক্রোশ দুই পথ বইত না। এত দূর আসিয়া ফিরিয়া গেলে লোকে কি বলিবে? ওঠ খুড়ো! দুর্গা দুর্গা বলে, চল, এ পথটুকু শেষ করে ফেলি।"

তখনও ভাল করিয়া ফরসা হয় নাই। নিধিরাম বলিল,—"যদি যেতেই হয়, তবে রোদ না উঠতে উঠতে এই বেলা ধীরে ধীরে দুর্গা দুর্গা বলে চলতে আরম্ভ কর।"

তখন খুড়া মহাশয় পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং অতি কষ্টে পা বাড়াইতে লাগিলেন। ভাইপোও তাহার অনুসরণ করিতে থাকিলেন।

নিধিরাম গাড়িতে বসিল, এবং গরুর লেজ মলিয়া গাড়ি চালাইয়া দিল।

তারাচরণ হালদার ও যদুনাথ হালদার দূর সম্পর্কে খুড়া-ভাইপো। কৃষ্ণনগরে যদু হালদারের এক আকাল দোকান আছে; তাহাতে অনেক লোক ও টাকা খাটে। পূর্ব্বে যদুর পিতা সেই দোকান চালাইতেন। তাঁহার লোকান্তরের পর যদু সেই দোকান চালাইয়া আসিতেছেন। পিতা অতি সামান্য অবস্থা হইতে ঐ দোকান উপলক্ষ করিয়া ক্রমে বেশ দশ টাকার সংস্থাপন করিয়াছিলেন, এবং উত্তম ঘর বার করিয়া দোল-দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়াকর্ম্মও সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পুত্র পিতার সকলই বজায় রাখিয়াছেন এবং অনেক বাড়াইয়াছেন। যদু ছেলে ভাল। তাহার বাবুগিরি নাই, অহঙ্কার নাই, আলস্য নাই, অপব্যয় নাই; তবে ভূতপ্রেত আছে, দেবতাব্রাহ্মণে ভক্তি আছে, পরকালের ভয় আছে, ইন্দ্রিয়দমন আছে, পরোপকার আছে। সে ময়লা কাপড় পরে, গামছা কাঁধে করিয়া বেড়ায়, মাটীতেও বইসে, মুড়ি খায়, তামাক সাজে, ইত্যাদি অনেক অপকর্ম্ম করে। সে ছোট বড় করিয়া চুল কাটিয়া সিঁতে কাটে না, গায়ে কামিজ দিয়া ফুলিয়া বেড়ায় না, চুরুট মুখে দিয়া ইংরাজী ছড়ায় না, সুরাসেবন করিয়া মাতলামি করে না, ইত্যাদি বহুবিধ সুকর্ম্ম সে করিতে জানে না। এখনকার কালে যাহাকে লেখা-পড়া বলে, তাহাও সে জানে না। স্কুল-কালেজে সে পড়ে নাই। সে খাতা লিখিতে জানে, জমা-খরচ বুঝে ও মুখে সকল প্রকার দর কষিতে জানে। তা'ছাড়া যদু বেচারা আর কিছুই জানে না। এতক্ষণে আমাদের এই উপন্যাস ঘৃণার সহিত পরিত্যক্ত হইবে সন্দেহ নাই। ছিঃ! ছিঃ! এই অপদার্থটার প্রসঙ্গ লইয়া যে উপন্যাসের প্রারম্ভ, তাহা কি মার্জ্জিতরুচি ভদ্রগণের পাঠ্য হইতে পারে? যদি যদুনাথ নিতান্ত পক্ষে বাঙ্গালা খবরের কাগজের এডিটারও হইত, তাহা হইলেও না হয় চক্ষুকর্ণ বুজিয়া তাহার কথা পড়া যাইত। আরে ছিঃ! যদু একটা দোকানদার! তারও উদ্ধারের কোন সাহায্যই তাহার দ্বারা সম্ভব নহে। দূর করিয়া ফেলিয়া দেও—এ উপন্যাস; এই জন্যই বাঙ্গালা উপন্যাস শিক্ষিত বঙ্গবাসীরা পড়িতে চাহে না। এদেশের গ্রন্থকারেরা পাত্র-নির্ব্বাচন করিতে জানে না; কাহার কথা বলা উচিত, কাহার কথা বলা উচিত নয়, তাহা বুঝে না; অদ্ভুত ঘটনাবলী সমাবেশ করিতে পারে না; এবং বিশেষ কোন শিক্ষা বা উপদেশ দিতে জানে না। সুতরাং উচ্চ-শিক্ষায় সুশিক্ষিত, সুরুচিসম্পন্ন, বঙ্গবাসীর যুবকগণ, যদি বা দয়া করিয়া এই

উপন্যাসের এতদূর পড়িয়া থাকেন, অতঃপর আর ইহা পাঠ করিবেন না। আমরা বলি তথাস্তু। যাঁহারা যদুনাথের নামে ভয় না পান, তাঁহারাই দয়া করিয়া আমাদের সঙ্গে আসুন। আর, যাঁহারা যদুনাথের ভারটি সহিতে অক্ষম, তাঁহারা এই সময়ে দয়া করিয়া আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করুন; কারণ, আমরা যদুনাথের প্রসঙ্গ বলিয়াছি, বলিতেছি এবং বলিব।

শ্যামাচরণ যদুর পিতার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। পুত্রও তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর ও সম্মান করিতেন। শ্যাম যদিও যদুর দোকানের প্রধান কর্ম্মচারী, তথাপি যদু তাঁহাকে আপনার খুড়ার মতই মান্য করিত এবং মুরুব্বি-বোধে ভক্তি-শ্রদ্ধা করিত। যদু এ পর্য্যন্ত কোন বিষয়েই শ্যামের অবাধ্য হইয়া চলে নাই। শ্যামও স্বার্থত্যাগী হইয়া সকল বিষয়েই সতত যদুর শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা করিতেন। এই দুই নিরীহ ব্যবসাদার, কোন বিশেষ লাভজনক সওদার প্রত্যাশায়, টাকা কড়ি লইয়া, অদ্য এই অসময়ে শান্তিপুর চলিতেছেন, এ কথা পাঠকগণ পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ক্রমে উষা সমাগম হইল। যদি আপনারা দশ জনে সরল মনে অনুমতি করেন তাহা হইলে আমি এই সময়ে একবার প্রভাত-বর্ণনা করিবার চেষ্টা করি। কাজটা কবিদিগেরই একচেটিয়া। আমি কবি নহি, সুতরাং এ কার্য্যের অধিকারী নহি। কিন্তু বামনের কি কখনও চাঁদ ধরিবার সাধ হয় না? পঙ্গুর কি কখনও পর্ব্বতলঙ্ঘন করিবার বাসনা হয় না? তবে এ স্পর্দ্ধা আমারই বা না হইবে কেন? আমার ক্ষমতা না থাকিলেও অদৃষ্টক্রমে কবি-হৃদয়-সাগর-সমুত্থিত কাব্যসুধা এক আধটু সেবন করিয়া চরিতার্থ হইয়াছি। আমি ইদানীন্তন কালের কীর্ত্তিলোলুপ গ্রন্থকারগণের ন্যায়, সেই কবিগণের ভাবাপহরণ করিয়া এবং তাঁহাদের পরিগৃহীত পন্থায় বিচরণ করিয়া ধন্য হইবার সঙ্কল্প করিয়াছি। ইহাতে কাহারও ক্ষতি আছে কি? যদি কোন পাঠকের এ অদ্ভুত বর্ণনা ভাল লাগে, তাহা হইলে বাহবা পাইবার দাওয়া আমার; আর যদি কাহারও মন্দ লাগে, তাহা হইলে দোষ, কবি মহাশয়গণের; সঙ্কলনকর্ত্তা বোধে আমি ক্ষমার যোগ্য।

সপ্তাশ্ব-সংযোজিত সুরম্য স্যন্দনে সমারূঢ় হইয়া সূর্য্যদেব পূর্ব্বাকাশের প্রান্তপ্রদেশে প্রকটিত হইলেন। তদীয় সমাগম সন্দর্শনে সরোবরে কমলিনীকুল বিলাসভরে বিকশিত হইতে লাগিল। মার্ত্তণ্ডদেবের প্রচণ্ড প্রতাপে অন্ধকার পলায়ন-পরায়ণ হইয়া গিরিগুহা প্রভৃতি দুর্গম প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ময়ূখমালা মণ্ডিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল তমোমুক্ত রম্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে লাগিল। নিশানাথ নিতান্ত নিরুপায় হইয়া নীরবে অদৃশ্য হইতে লাগিলেন; নীরশোভিনী নায়িকা নলিনী নিজ পতির বিচ্ছেদে বিয়োগ-বিধুরা বালিকাবৎ মলিনা শ্রীহীনা ও কাতরা হইতে লাগিলেন। বিহঙ্গমগণ নিজ নিজ নীড় পরিত্যাগ করিয়া নভঃপ্রদেশে উড্ডীয়মান হইবার প্রয়াস করিতে লাগিল, এবং সপ্তস্বর-লহরী-সহকারে সমস্ত প্রদেশ প্রকম্পিত করিতে লাগিল। কুসুমকুল বিকশিত হইয়া সৌরভে সকল

স্থান আমোদিত করিতে লাগিল। মধুলোলুপ মধুপকুল গুণ গুণ শব্দে প্রফুল্লপুষ্পের সন্নিধানে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। আমরাও এই সুযোগে জবাকুসুমসঙ্কাশ সর্ব্বপাপঘ্ন সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিয়া অদ্ভুত প্রভাত-বর্ণনা পরিসমাপ্ত করিলাম।

শ্যামাচরণ ও যদুনাথ এইরূপ সময়ে ধীরে ধীরে ও নীরবে শান্তিপুরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। সহসা পথিপার্শ্ব হইতে যন্ত্রণা-ব্যঞ্জক একটী অস্ফুটধ্বনি তাঁহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। তাঁহারা উভয়েই চমকিয়া উঠিলেন। পেত্নীর ব্যাপার আবার তাঁহাদের মনে পড়িল কি? যেদিক হইতে শব্দ উত্থিত হইল, তাঁহারা উভয়েই সেই দিকে নেত্রপাত করিলেন। দেখিলেন, পথিপার্শ্বস্থ গুল্মাদির অন্তরালে বস্ত্রাবৃত এক মনুষ্য-মূর্ত্তি পড়িয়া রহিয়াছে। তাঁহারা বড়ই ভীত, বড়ই কুসংস্কারাপন্ন। তথাপি তাঁহারা সেই শায়িত মূর্ত্তির সমীপদেশে উপস্থিত না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন, একটি স্ত্রীলোক নিতান্ত কাতরভাবে সেই শিশিরসিক্ত ঘাসের উপর পড়িয়া আছে। অপরিচিত পুরুষদ্বয়কে সমীপস্থ দেখিয়া স্ত্রীলোকটি বড়ই সঙ্কুচিতা হইল এবং সযত্নে আপনার বদন সমাচ্ছন্ন করিবার যত্ন করিতে লাগিল। শ্যামাচরণ বলিল,—"মা ভয় নাই—আমরা তোমার সন্তান।"

রমণী কথঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইল। যদু বলিল,—"কি জন্য তুমি এখানে পড়িয়া রহিয়াছ? রাত্রে তুমি কোথায় ছিলে? এ সময়ে এখানে কোথা হইতে আসিলে? কোথায় তুমি যাইবে?"

রমণী কোন উত্তর দিল না দেখিয়া যদু বলিল,—"আমাদের দ্বারা তোমার প্রাণ ছাড়া মন্দ হইবে না। এখন কি করিলে তোমার উপকার হয়, বল; আমরা যেমন করিয়া পারি, তাহা করিতেছি।"

রমণী উঠিয়া বসিবার প্রযত্ন করিল। অতি কষ্টে উঠিয়া বসিল। ভাব দেখিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে বড় বেদনা বলিয়া বোধ হইল। রমণী ধীরে ধীরে আপনার অবস্থা বিবৃত করিল, যদুর যাবতীয় প্রশ্নের যথাসম্ভব উত্তর দিল। যতদূর তাহার বলা সঙ্গত ও সম্ভব, তাহাই সে বলিল। তাহার কথা শুনিয়া যদু মনে করিল, স্ত্রীলোকের কি অপূর্ব্ব মধুমাখা কণ্ঠস্বর! তাহাকে পুনঃ পুনঃ দেখিয়া যদুর মনে হইল; এই নারী কি অলৌকিক রূপরাশি-সম্পন্না! বস্তুতঃ যদুর কোন মীমাংসাই ভুল হয় নাই। সেই সুন্দরীর কণ্ঠস্বর বড়ই কোমল, বড়ই মধুর, এবং যদিও অধুনা কাতরতা-পূর্ণ, তথাপি স্বভাবতঃ হৃদয়দ্রবকর। আর, তাহার রূপরাশি বাস্তবিকই বড়ই মুগ্ধকর। সে ধূলি-ধূসরিত-কায়া, রুক্ষকেশা, নিরাভরণা, গ্রন্থিযুক্ত মলিন-বস্ত্রাবৃতা, এবং নিরতিশয়-কাতরা। তথাপি সেই অভাগ্য সুন্দরীর নিরুপম শোভা, সেই সকল প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া, ফুটিয়া পড়িতেছে, এবং যেন আপনিই হাসিতেছে। অঙ্গের মলিনতা তাহার সুগৌর বর্ণের ছটা ঢাকিয়া রাখিতে পারিতেছে না। দারিদ্র্য-দুঃখ তাহার সর্ব্বাঙ্গীন সৌকুমার্য্য প্রচ্ছন্ন করিতে পারিতেছে না। হৃদয়ের কাতরতা তাহার আয়ত লোচন-যুগলের উজ্জ্বলতা ঢাকিয়া রাখিতে পারিতেছে না, এবং লজ্জা ও বিরসতা তাহার শোভা-সমূহ লুকাইতে পারিতেছে না।

যদুর কৌশলময় প্রশ্নের উত্তরে সুন্দরী স্বকীয় পরিচয় ও অভিপ্রায়াদি যাহা ব্যক্ত করিলেন, তাহার যে যে অংশ প্রয়োজনীয়,

তৎসহ আমাদের পরিজ্ঞাত অন্যান্য জ্ঞাতব্য-বিবরণ মিশাইয়া, সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

এই সুন্দরী ব্রাহ্মণ-কন্যা—নাম বিরাজ-মোহিনী। নিবাস, কৃষ্ণনগরের উত্তর খড়ে নদীর অপর পারে অতি সামান্য এক পল্লী-গ্রামে। যুবতীর বয়স অনুমান বিশ বৎসর। অতি শৈশবেই বিরাজ মাতৃহীনা। পিতা ভিন্ন সুন্দরীর আশ্রয় স্থান ছিল না। কিন্তু তাঁহার পিতাও তিন মাস হইল, লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। পিতা অতি দুঃখী ছিলেন। কোনরূপ কষ্টে সৃষ্টে তিনি আপনার ও কন্যার ভরণপোষণ চালাইতেন। পিতার পরলোক প্রাপ্তির পর হইতে বিরাজের কষ্টের সীমা নাই। বিরাজের উদরে অন্ন নাই, পরিধার বস্ত্র নাই, অঙ্গে তৈল নাই। ভিক্ষা করিয়া, কি কাহারও বাটীতে দাসীবৃত্তি করিয়াও বিরাজের চলিবার উপায় নাই। ভগবান্ দুঃখিনীকে রূপ-যৌবন প্রদান করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। হতভাগিনী যে দুঃখ করিয়া দিন কাটাইবে, তাহার উপায় নাই। যেদিকে সে গিয়াছে, জীবিকার জন্য যে উপায় সে অবলম্বন করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহাতেই তাহার প্রতিবন্ধক হইয়াছে। হৃদয়হীন পুরুষ-রাক্ষসেরা তাহার সর্ব্বনাশ সাধিবার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করিয়াছে। ঘৃণিত অভিসন্ধি ও কুৎসিত রসিকতার যে যেন লীলাভূমি। সাধ্বী, অতি সন্তর্পণে, অতি সাবধানে, অনন্ত কষ্ট সহ্য করিয়াও এতদিন আপনার ধর্ম্ম বজায় রাখিয়াছে; জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিবে, ইহাই তাহার সঙ্কল্প।

কিন্তু বিরাজমোহিনী তো সধবা। তাহার হাতের লৌহ ও সীমন্তের সিন্দুর-বিন্দু তাহার পতি-বিদ্যমানতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। তবে বিরাজের এত কষ্ট কেন? কেন সে অন্নবস্ত্র ও আশ্রয়-বিহীনা? বিরাজমোহিনী স্বামীত্যক্তা—তাই এ রূপের লতিকা অনাদৃতা মর্ম্মপীড়িতা বিমলিনা ও হতাদৃতা। বিরাজ নিরপরাধা। তাহার স্বামী বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই এক কুলটা কামিনীর প্রেমাসক্ত। বিরাজ সেই পাষাণ্ড স্বামীর উদ্দেশে চরণ-পূজা না করিয়া জলগ্রহণ করে না—শত দুঃখে প্রপীড়িতা হইয়াও এবং আপাত-মনোহর অতুজ্জ্বল সুখসমূহ আয়ত্তগত করিবার শত সহস্র সহজ উপায় উপস্থিত থাকিলেও, সে কদাপি স্বামী ভিন্ন অন্য চিন্তা করে না। কিন্তু স্বামী, ভ্রমেও বিরাজকে মনে করে না, তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের সন্ধান লয় না, এবং বিরাজ আছে কি মরিয়াছে, তাহাও জানে না। শ্বশুরের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়াও, হতভাগা একদিনের জন্য বিরাজের সংবাদ লয় নাই।

অতি সুকৌশলে শ্যাম ও যদু জানিয়া লইল যে বিরাজের স্বামীর নাম, কালিদাস চক্র-বর্ত্তী। শান্তিপুরে তাহার আড্ডা আছে এবং বিশেষ উপার্জ্জন আছে। ঘটনাক্রমে এই কালিদাস চক্রবর্ত্তী শ্যাম ও যদুর বিশেষ পরি-চিত হইয়া দাঁড়াইল। তাহার অবস্থা যে ভাল এবং সে যে শান্তিপুরেই বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বেশ্যা লইয়া বাস করিতেছে তাহাও তাহারা জানে। এই সুন্দরী সেই কালিদাসের পত্নী; ইহার এরূপ কষ্ট দেখিয়া, তাহারা নিতান্ত দুঃখিত হইল। কালিদাসের সহিত তাহাদের কতকটা বাধ্যবাধকতা আছে; সুতরাং বিরাজ-মোহিনীর সম্বন্ধে বিশেষ সুব্যবস্থা করিতে পারিবে বলিয়া তাহারা আশা করিল।

আমরা ব্যারাদিকেই বড় ভাবুক প্রা বলিয়া জ্ঞান করি; কিন্তু সাহেব যে ব্যারাদি

অপেক্ষা কত ভয়ানক, তাহা বড় ভাবিয়া দেখি না। বাঘের সহিত আমাদের খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ, সুতরাং সুযোগ পাইলে তাহারা আমাদের ধরিয়া খায়। কিন্তু মানুষ, অনায়াসে সামান্য লাভের জন্য ভাইকে ভিখারী করে; কিঞ্চিৎ রজত নামক পদার্থের লোভে, নিরীহ মনুষ্যের প্রাণসংহার করে; অসংখ্য প্রকার জাল জুয়াচুরী ও মামলার ফাঁদে ফেলিয়া লোকের সর্ব্বনাশ করে; অকারণে ক্রুদ্ধ হইয়া কত লোককে পুড়াইয়া মারে, সামান্য ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া, ছলে বলে কৌশলে কুল মজাইয়া দেয়; একটু সুখের লোভে সমাজ হাহাকার ও আর্ত্তনাদে পরিপূরিত করিয়া দেয়; এবং কারণে অকারণে বসুন্ধরাকে শোকের পুরী করিয়া তুলে। এই কাতরা দুঃখিনী কামিনীর কথা একবার বিচার করিলেই তো সকল তর্ক মিটিয়া যাইবে। একজন অতি ঘৃণিত পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া সুখ সম্ভোগ করিতেছে, তাহার সেই অবৈধ ব্যবহার-হেতু আর এক নিরপরাধা সুন্দরী দুর্ব্বহ দুঃখভার বহন করিয়া মরণাপন্না হইতেছে। এই সকল বিষয় বিচার করিয়া বল দেখি, মানব নামক শ্রেষ্ঠ জীব এবং ব্যাঘ্রাদি নিকৃষ্ট পশু, ইহার মধ্যে অপরাধী কে বেশী? বিরাজমোহিনী এই বয়সে জগতের যাহা দেখিয়াছে, তাহাতে বুঝিয়াছে, মানুষ-পশুই সকল পশুর অপেক্ষা ভয়ানক। তাই সে দুঃখিনী মানুষ-পশুর চক্ষে না পড়িবার আশায় এবং বাঘের হাতে পড়াও ভাল মনে করিয়া দিনে পথে বাহির হয় নাই। অন্ধকারে আপনার কালরূপ লুকাইয়া অভাগিনী পথ চলিতেছে।

ছয় বৎসর পূর্ব্বে, পিতার সহিত, সে আর একবার শান্তিপুরে স্বামীর নিকট আসিয়াছিল। গুণময় স্বামী তাহার সেই বিকাশোন্মুখ অনুপম রূপরাশি, সেই কোমল-স্বভাব, সেই অতুলনীয় মধুরতা দেখিয়াও, তাহাকে চরণে স্থান দেন নাই; দুইটা মিষ্ট বাক্যেও তাহাকে তুষ্ট করেন নাই। তাহার পোড়া পেট কিরূপে বুঝিবে, তাহারও কোন ব্যবস্থা করেন নাই। দুঃখিনী বালিকা সেই দুর্ব্যবহার-রূপ দারুণ শক্তিশেল বুক পাতিয়া সহ্য করিয়াছিল এবং এখনও করিয়া আসিতেছে। বয়সের পরিপকতার সহিত তাহার সহিষ্ণুতার পরিপকতা হইয়াছে এবং আত্মত্যাগ সংবর্দ্ধিত হইয়াছে। কিন্তু রাগ বা কষ্টে, অভিমানে বা যাতনায়, তাহার মনের বিকৃতি এক দিনও হয় নাই। স্বামী তাহাকে দেখিলে বিরক্ত হন, তাহার ছায়াও তাঁহার বিষ লাগে, এ হৃদয়-বিদারক কথা সে এক দিনও ভুলে নাই; সুতরাং তাঁহার সম্মুখে সে আর আসিবে না এবং তাঁহাকে কোন প্রকার উত্ত্যক্ত করিবে না, ইহাও তাহার স্থির সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু ভগবান্ যখন মারেন, তখন কেহই রাখিতে পারে না। নদীতে যখন ভাঙ্গন ধরে, তখন ভালমন্দ কিছুই বিবেচনা করে না। হতভাগিনীকে বিধাতা চূর্ণীকৃত করিয়া পরীক্ষা করিতে বসিয়াছেন কি না—তাহার একটু ক্ষুদ্র অভিমানও তিনি রাখিবেন কেন? বিশ্বনিয়ন্তা এমনই কাণ্ড ঘটাইলেন যে, ধর্ম্ম যদি বজায় রাখিতে হয়, সৎপথে যদি থাকিতে হয়, তাহা হইলে সেই স্বামীর সাহায্য গ্রহণ ব্যতীত বিরাজমোহিনীর আর উপায়ান্তর থাকিল না। স্বামীর দাসীর দাসী হইয়াও যদি সে জীবিকাপাত করিতে পারে, তাহা হইলেও সে এখন চরিতার্থ হইবে। লোকে [illegible] —পোষে কুকুরকে যেমন দেয়, সেইরূপ স্বামীর ভোজনাবশিষ্ট মুষ্টিমেয় অন্ন খাইয়া থাকিতে পারিলেও, সে

আপনাকে এখন ধন্য জ্ঞান করিবে। যদি তাহাও না জুটে? সদয় স্বামী যদি তৎটুকু অনুগ্রহ করিতে সম্মত না হন? ইহাও কি কখন সম্ভব? স্বামী নিতান্ত হৃদয়হীন হইলেও পরিণীতা পরাশ্রিতা পত্নিকে এতটুকু অনুগ্রহ না করিয়া থাকিতে পারে কি? যদি দুরদৃষ্ট-বশতঃ বিরাজমোহিনী স্বামীর এতটুকু করুণা লাভও না করিতে পারে, তাহা হইলে সে গঙ্গার জলে ডুবিয়া মরিয়া সকল জ্বালার শেষ করিবে স্থির করিয়াছে।

এত পথ চলা বিরাজমোহিনীর কখন অভ্যাস নাই; সুতরাং তাহার বড়ই কষ্ট হইয়াছে। গতরাত্রি হইতে পায়ের বেদনায় ও শরীরের অবসন্নতায় সে নিতান্ত কাতর হইয়া এই স্থানেই পড়িয়া আছে। রাত্রিতে একাকিনী গাছতলায় পড়িয়া থাকিতে তাহার বড় ভয় হইয়াছিল। দুইজন পথিক কথা কহিতে কহিতে শান্তিপুরের দিকে যাইতেছিল, তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাহাদিগের সজ্জন বলিয়া তাহার মনে হইয়াছিল; তাহাদের নিকট বিরাজমোহিনী কিছু অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়াছিল। কিন্তু দয়া করা দূরে থাকুক, বিরাজমোহিনীর দুরদৃষ্টক্রমে তাহারা ভয়ে সে স্থান হইতে পলায়ন করিয়াছিল।

যদু একবার শ্যামের মুখের দিকে চাহিল, শ্যাম একবার যদুর মুখের দিকে চাহিল। এই সজীব সুন্দরী ব্রাহ্মণী যে প্রেতিনী নহেন, ইহা তাহারা বুঝিয়া দেখিল। গত রাত্রির প্রেতিনী-ঘটিত ব্যাপারের এতক্ষণে মীমাংসা হইয়া গেল। তখন শ্যাম হাঁপ ছাড়িয়া বলিল,—"মা! সে আমরাই। না বুঝিতে পারাতেই রাত্রিতে আমরা আপনারাও কষ্ট পাইয়াছি, তোমাকেও কষ্ট দিয়াছি। এখন বেলা হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের শান্তিপুরে বড় দরকারী কাজ আছে। দেরি হইলে বড়ই ক্ষতি হইতে পারে। বল, এখন আমরা তোমার কি করিব?"

যদু বলিল,—"খুড়া! কাজ আমাদের বড়ই দরকারী, বিলম্বে বিশেষ ক্ষতি হইবার কথা। কিন্তু যতই ক্ষতি হউক, আর যত বিলম্বই হউক, এ ব্রাহ্মণ-কন্যাকে এ অবস্থায় ফেলিয়া যাওয়া কোন মতেই হইতে পারে না।"

দারুণ ব্যবসাদার, ঘোর বিষয়ী, নিতান্ত কৃপণ এবং যৎপরোনাস্তি অসভ্য ও অশিক্ষিত যদু, যে ব্যবসায়ের জন্য জীবনকে বিপন্ন করিয়া শান্তিপুরের দিকে ছুটিতেছিল, তাহার কথা ভুলিয়া গেল। বিপন্না কুলকামিনীর যথাসম্ভব সাহায্য করাই তখন তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইল। সে তখন চাদর ভিজাইয়া জল আনিল, এবং বিরাজকে মুখে দিতে বলিল। পরে নানাপ্রকারে তাঁহাকে কথঞ্চিৎ সুস্থ ও আশ্বস্ত করিয়া বলিল,—"এক্ষণে ধীরে ধীরে পায় পায় হাঁটিয়া আপনি আমাদের সঙ্গে শান্তিপুর যাইতে পারিবেন কি? পথ বেশী নহে।"

বিরাজমোহিনী বলিলেন,—"আমার দাঁড়াইবার সামর্থ্য নাই, হাঁটিব কি প্রকারে? তোমাদের দরকারী কাজ আছে, তোমরা যাও। বেলা হইয়া পড়িল। তোমরা কাছে ছিলে বড়ই সাহস ছিল। এখন মধুসূদন আবার কি বিপদে ফেলিবেন, বলিতে পারি না।"

যদু বলিল,—"না না—আমরা আপনাকে এখানে, এ অবস্থায় ফেলিয়া কখনই যাইব না। দেখিতেছি, আপনার শরীর যেরূপ কাতর হইয়াছে, তাহাতে এক পা চলিতেও আপনি পারিয়া উঠিবেন না। দেখি—আর কোন উপায় হয় কি না।"

এই সময়ে দূরে গো-যানের সুলগিত কর্কশ নির্ঘোষ শুনিয়া যদু বলিল,—"একখান গাড়ি আসিতেছে বোধ হয়। দেখি, উহাতে গাড়োয়ানগণ কোন সুবিধা হইতে পারে কি না।"

বিরাজমোহিনী বলিলেন,—"কিন্তু গাড়িতে চড়িতে হইলে তো ভাড়া দিতে হইবে, আমার তো একটিও পয়সা নাই।"

যদু হাসিয়া বলিল,—"সে জন্য চিন্তা নাই। গাড়ির যে ভাড়া লাগিবে, তাহা আমরা আপনার স্বামীর নিকট হইতে আদায় করিয়া লইব।"

বিরাজমোহিনী বলিলেন,—"আমি এক রতি সঙ্কের নিমিত্ত ভিখারিণী হইয়া যাইতেছি, আমি গাড়ি করিয়া গেলে তিনি হয় তো বড়ই রাগ করিবেন।"

যদু উত্তর দিল,—"তিনি রাগ করিতে না পারেন, এমন কৌশল করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পয়সা আদায় করিয়া লইব।"

গাড়ি নিকটস্থ হইল। গাড়িখানি কৃষ্ণনগরে সোয়ারি লইয়া গিয়াছিল। তাহাতে ছত্রির কাঁটা এবং খড় বিছান ছিল। সুতরাং যদু যাহা ভাবিয়াছিল, সৌভাগ্যক্রমে তাহাই হইল। যদু তাহার সহিত ভাড়া চুকাইয়া ফেলিল, এবং বিরাজমোহিনীকে সাবধানে সেই গাড়িতে উঠিতে বলিল। অতি কষ্টে বিরাজ গাড়ির মধ্যে বসিলেন।

গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিল। যদু ও শ্যাম ধীরে ধীরে গাড়ির পিছনে পিছনে চলিতে লাগিলেন।

মূর্খ যদুও একটা বেশ কাজ করিয়া ফেলিল। হায় মূর্খতা! অনেক সময়ে পাণ্ডিত্যের অপেক্ষা তুমিই শ্লাঘনীয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কালিদাস চক্রবর্ত্তী কদাকার পুরুষ। তাঁহার বয়স প্রায় চল্লিশ। লোকটা একহারা লম্বা, কৃষ্ণবর্ণ এবং লাবণ্য বিহীন। তাঁহার দাঁত উঁচু, মুখে বসন্তের দাগ, শূকরের লোমের মত খোঁচা খোঁচা গোঁফ, বিরল কেশ, শিরা-যুক্ত কলেবর, রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র চক্ষু প্রভৃতি অনেক লক্ষণ মিলিয়া তাঁহাকে অত্যদ্ভুত শ্রীযুক্ত করিয়াছে। চক্রবর্ত্তী মহাশয় জাত্যংশেও ভাল নহেন, এজন্য অনেক বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার বিবাহ হয় নাই। বিরাজমোহিনীর পিতা নিতান্ত দরিদ্র; সমান ঘরে কন্যা সম্প্রদান করিতে যে ব্যয়ভূষণের প্রয়োজন হয়, তাহা তাঁহার সাধ্যাতীত; এজন্য নিরুপায় হইয়া তিনি দুহিতারত্নকে এই সৎপাত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

কালিদাসের বিদ্যাসাধ্যও কিছু নাই। কিন্তু তাঁহার সময় ভাল; কারবারে তাঁহার আয় বেশ। এই স্থলে কর্ম্মাভিমানী, বিদ্যাভিমানী ক্ষমতাভিমানী, জ্ঞানাভিমানী, মহাশয়েরা ক্রোধভরে হয় তো আমাকে গলা টিপিয়া মারিতে আসিবেন। তাঁহারা বলিবেন, যাহার বুদ্ধি-বিদ্যা নাই, যাহার কৃতিত্ব বা দক্ষতা নাই, এ জগতে সে কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারে না। কালিদাসের কারবার যখন চলিতেছে ভাল, তখন অবশ্যই তাঁহার যথেষ্ট দক্ষতা আছে সন্দেহ নাই। কথাটা শুনিতে ভাল, কিন্তু বড় কাঁচা। নব্য সভ্য ভব্য লোকের মুখেই এ কথা শোনা যায়। বুড়া পাকা পোক্ত লোকে এরূপ কথা মুখে আনে না এবং তাঁহাতে সায় দেয় না। একটা সোজা দৃষ্টান্ত দেখাই। আধ ঘণ্টার মধ্যে কলাগাছটা হইল

সকল লীলা-খেলার শেষ হইবে কি না, ইহা যাহারা জানে না, সেরূপ পীড়া উপস্থিত হইলে তাহার প্রতিকার করিতে পারে না, এবং তাদৃশ রোগ প্রতিরোধ করিবার কোন ব্যবস্থা জানে না, তাহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমতা ও কৃতিত্বের অহঙ্কার বড়ই হাস্যজনক। মানুষ ছুটাছুটি করে, হাঁপাহাঁপি করে আর অহঙ্কারে গা দুলাইতে দুলাইতে ভাবে আমি সব করিতেছি। কিন্তু যিনি করিবার তিনি যাহা করিতেছেন, মানুষ শত সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাহার এক চুল এদিক ওদিক করিতে পারিতেছে না। তথাপি তার অভিমান তো যায় না। যাহা হউক, আমরা বলিতেছি, মূর্খ অকর্ম্মণ্য কালিদাসের বিষয়-কর্ম্মের বেশ উন্নতি।

কালিদাস যে বাটী প্রস্তুত করিয়াছে, তাহা সুশ্রী, সুদৃঢ় এবং সুবিস্তৃত। তৈজস ও অন্যান্য গৃহসামগ্রী কালিদাস মন্দ করে নাই। কিন্তু কালিদাসের উপপত্নী তরঙ্গিণী তৎসমস্ত নিজের বলিয়া ব্যক্ত করে। কালিদাসের নগদ টাকাকড়ি বড় নাই। তাহার উপপত্নীর অলঙ্কার-প্রতিকার অনেক। কালিদাস তাহা নিজেরই বলিয়া মনে করে। কালিদাসের ব্যবসায়ে বিস্তর টাকা খাটিতেছে। তাঁহার আড়ত বিশেষ বিখ্যাত, এবং সে জন্য তিনিও বিখ্যাত। ধন যাহার আছে, সে যদি সমাজ-কলঙ্ক মানব-প্রেত হয়, তথাপি তাহার সম্ভ্রমের ব্যাঘাত ঘটে না। সেই জন্য কালিদাসের ন্যায় ব্যক্তিরও মান-সম্ভ্রমের অভাব ঘটে নাই। হায়! রজতচক্র! এ সংসারে তুমিই অতুলনীয়। অয়ি অঘটন ঘটন-পটীয়সি মুদ্রে! তুমি যাহার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছ, সে মূর্খ হইলেও পণ্ডিত, অজ্ঞ হইলেও বিজ্ঞ, দারুণ দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইলেও পরম সাধু।

বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। কালিদাস আহারাদি শেষ করিয়া সুবিস্তৃত কক্ষে খাটের উপর বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছেন। কালো কুচকুচে একটি হুঁকা, তাহাতে আমের পাতার একটি নল। কালিদাস তামাকের ধূমের সহিত পান চিবাইতে চিবাইতে অতুল আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। তাঁহার আনন্দের অঙ্গহীন হয় নাই; কারণ সম্মুখে তাঁহার সকল আনন্দের কেন্দ্রস্বরূপা তরঙ্গিণী দাঁড়াইয়া তাঁহাকে কি বলিতেছেন। হায়! পাপীয়সীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া আমাদিগকে লেখনী কলঙ্কিত করিতে হইতেছে। যাহাকে ঘৃণার সহিত সমাজ পরিত্যাগ করিয়াছে, যাহার নাম কেবল লজ্জা ও নিন্দার সহিত সম্বদ্ধ, যাহার পরিচয় কেবল অপরিহার্য্য কলঙ্কই সংজ্ঞাপিত করে, যাহার চরিত্র কেবল অপরিসীম অধঃপতনের পরিচায়ক, তাহার প্রসঙ্গ লিখিতেও কষ্ট ও লজ্জা উপস্থিত হয়। কিন্তু সংসারে কিছুই অনর্থক নহে—পাপেরও সার্থকতা আছে। পাপ নহিলে পুণ্যের মহিমা পরিস্ফুট হয় না, অন্ধকার নহিলে আলোকের গৌরব হয় না, দুঃখ নহিলে সুখের মর্য্যাদা হয় না। সংসারে বিরোধী ব্যাপার সমূহ পাশাপাশি চলে এবং সঙ্ঘর্ষণ ঘটাইয়া যাহা দুর্ব্বল, যাহা নিন্দিত, যাহা ঘৃণার্হ, যাহা অনাদৃত, তাহা হয় ভাঙ্গিয়া যেলে, না হয় তাহা আপনার লঘুতা বুঝিয়া মস্তক নত করে, এবং প্রতিপক্ষের মহিমা ও গৌরব অলক্ষভাবে পরিব্যক্ত করিয়া দেয়। অতএব যে ক্ষেত্রে বিরাজমোহিনী আছেন, সে ক্ষেত্রে তরঙ্গিণীর আবির্ভাব অসম্ভব, অসঙ্গত বা অনর্থক নহে। সুতরাং তরঙ্গিণী যখন দেখা দিয়াছে, তখন

তাহার প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিলে চলিবে কেন?

তরঙ্গিণীর বয়স ত্রিশ ছাড়াইয়াছে। বেশ মোটাসোটা, শ্যামবর্ণা, বিলোল কটাক্ষ-শালিনী, হাসিভরা বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক। বুদ্ধি-হীন কালিদাস যে এরূপ বিলাসিনীর ক্রীড়া-পুত্তলী ও ক্রীতদাস হইয়াই থাকিবে, তাহাতে বিচিত্র কি? কালিদাস জানে, তরঙ্গিণীর মত রূপসী, বুদ্ধিমতী, সাধু-স্বভাবা, উদার হৃদয়া, সর্ব্বগুণে গুণান্বিতা নারী বসুন্ধরায় আর কখন জন্মপরিগ্রহ করেন নাই। বলা বাহুল্য যে কালিদাস তরঙ্গিণীর নিতান্ত অনুগত। তরঙ্গিণী মনে করিলে কালিদাসকে নাচাইতে পারে, হাসাইতে পারে, কাঁদাইতে পারে। কালিদাস তরঙ্গিণীর পোষা বাঁদর। তরঙ্গিণীর মতেই কালিদাসের মত। তরঙ্গিণী যাহা ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করে, বেদব্যাসের অপেক্ষা সার কথা জ্ঞান করিয়া, কালি-দাস সেই মতেই চলে। তরঙ্গিণী যখন হাসে, কালিদাস কোন কারণ বুঝিতে না পারিলেও, তখন হাসিয়া থাকে। সকল বিষয়েই সৌভাগ্যবান্ কালিদাস, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতির অপেক্ষা ধর্ম্মশীলা এই কামিনীর মুখাপেক্ষী হইয়া চলে।

বাস্তবিক তরঙ্গিণী লোকটা কেমন? কালি-দাস রাগই করুন, আর যিনি যাহাই বলুন, আমরা তরঙ্গিণীর প্রশংসা-সূচক কোন কথাই বলিতে পারিব না। আমরা যতদূর জানি-য়াছি, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, তরঙ্গিণী যৎপরোনাস্তি মন্দ লোক। তাহার সম্বন্ধে যাহা যাহা আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, তাহা বলিতেছি। কালিদাস বাটী হইতে বাহির হইয়া আড্ডাতে গেলে হারাধন নামে এক তিলিনন্দন তরঙ্গিণীর নিকট প্রায় প্রতিদিনই আইসে এবং তিন চারি ঘণ্টা তরঙ্গিণীর সহিত একত্র থাকে। কালিদাস এ ব্যক্তির গমনাগমনের কথা জানেন। লোকে বিশ্বাস করে, হারাধন ধর্ম্মশীলা তরঙ্গিণীর প্রেমিক। কালিদাসকে তরঙ্গিণী বলিয়াছে, হারাধন তাঁহার ধর্ম্মভাই। সুতরাং কালি-দাস যত্ন করিয়া তাহার সহিত আলাপ করিয়াছেন এবং তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতাও করিয়াছেন। হারাধনের যাতায়াত, আহার ব্যব-হার প্রকাশ্য-রূপেই চলে। হারাধন তরঙ্গিণীর ধর্ম্মভাই এবং কালিদাসের পরম আত্মীয়। তরঙ্গিণী নানা ছল করিয়া নূতন বাসন, শয্যা, অন্যান্য দ্রব্য খরিদ করায়। কিন্তু ব্যবহার-কালে কালিদাস পুরাতন সামগ্রীই ব্যবহার করেন। লোকে বলে, তরঙ্গিণী দ্রব্য সামগ্রী সততই মাসীর বাটীতে চালান করে। চাল, ডাল, নুন, তেল, ঘি, ময়দা কিছুই বাদ যায় না। কালিদাসের গত কার্ত্তিক মাসে বড় জ্বর হইয়াছিল। তিনি নিরন্তর বমি করিয়া ঘর ভাসাইয়াছিলেন, এবং ক্রমশঃ উত্থান-শক্তি রহিত হইয়াছিলেন। তরঙ্গিণী সে সময় তাঁহার নিকট প্রায়ই আসিত না। যদি বা কখন একবার মুখে কাপড় দিয়া আসিত, তখনই চলিয়া যাইত। বলিত,—'কালিদাসের কষ্ট দেখিয়া বুক ফাটিয়া যায়; সেই জন্যই আমি ও ঘরে যাই না। যদি বা যাই, তবে কান্না আটকাইবার জন্য মুখে কাপড় দিয়া থাকি।' হারাধন সে সময়ে তরঙ্গিণীর সহিত আত্মীয়তা করিতেন। তরঙ্গিণী বলিত,—"এমন বিপদের সময় সাহায্য করে এমন একজন আপনার লোক কাছে না থাকিলে চলে কি?" কালিদাস বেলা বারটার সময় স্নানাহার করেন। তরঙ্গিণী বেলা নয়টার মধ্যে স্নান শেষ করিয়া একপেট

রসগোল্লা খাইয়া বসিয়া থাকে। কিন্তু কালিদাসকে বলে, 'স্নানের পর জল না খাইলে পিত্তি পড়ে বটে, কিন্তু কেমন পোড়া মন তুমি বাড়ী আসিয়া স্নান আহার না করিলে, দুইটা চাউল মুখে দিয়া জল খাইতেও আমার ইচ্ছা হয় না।' তরঙ্গিণী পাঁচ ভরির গহনা করিয়া এগার ভরির দাম আদায় করিত, যোড়ায় যোড়ায় নূতন কাপড় কিনাইয়া দোকানে বিক্রয় করিত, ইত্যাদি নানা তুচ্ছ বিষয়ে বাজে লোকে তরঙ্গিণীর নানাপ্রকার কুৎসা গাহিত। ইহাতেই তরঙ্গিণীর যতদূর যিনি বুঝিতে ইচ্ছা করেন বুঝুন—আমরা কিন্তু আর কোন কথা বলিব না; কারণ তরঙ্গিণী বড় মুখরা—ঝগড়ায় তাহাকে কেহ আঁটিতে পারে না।

কালিদাসের এই বিলাস-মন্দিরে,তরঙ্গিণীর এই লীলাস্থলে আজি চারিদিন হইল, বিরাজমোহিনী আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। যদু ও শ্যাম তাহাকে সঙ্গে আনিয়া এখানে পৌঁছাইয়া দিয়াছে, এবং কালিদাস অনেক বিবেচনার পর অর্থাৎ তরঙ্গিণীর অনুমতি পাওয়ার পর, তাহাকে বাটীতে থাকিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। যদু ও শ্যাম ভাবিয়াছে তাহাদেরই আগ্রহে চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্ত্রীকে গৃহে লইতে স্বীকৃত হইয়াছেন। সুতরাং তাহাদের প্রসন্নতার পরিসীমা নাই। চক্রবর্ত্তী কালিদাস বিবেচনা করিয়াছেন, কাজটা মন্দ হয় নাই। দশজন লোকে এই বিষয়টায় অল্প দোষে বটে; তা থাক না কেন, এক দিকে পড়িয়া—দুইটা ভাত দিলেই সকল গোল চুকিল। কিন্তু বিরাজমোহিনীকে চক্রবর্ত্তীর গৃহে স্থান দেওয়ার মূল কারণ তরঙ্গিণী; সে এ উপলক্ষে খুব বাহাদুরী করিয়াছে। এ কথা তাহার নিকট পড়িতেই সে বলিয়াছে,—'তা আর এতে অত যত করো না—কোন বাদ-বিচার করো না—তাঁকে হাত ধরে গাড়ির ভিতর হইতে উঠাইয়া আন। ছিঃ এও কি ভাল দেখায়?' তরঙ্গিণী সন্তুষ্টমনে সম্মতি দিল—কালিদাস অবাক্ হইলেন। কিন্তু তরঙ্গিণী যখন আজ্ঞা দিয়াছে, তখন তাহার অন্যথা করিতে তাঁহার সাধ্য নাই। বিরাজমোহিনীকে আনিবার জন্য কালিদাসের হাত ধরিতে হইল না। তরঙ্গিণীর দাসী গিয়া বলিল,—"এসো গো ভাল মানুষের মেয়ে, বাড়ীর মধ্যে এসো।" বিরাজমোহিনী হাতে স্বর্গ পাইল। সে এত সহজে স্বামীর গৃহে স্থান পাইবে, ইহা স্বপ্নেও আশা করে নাই। তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। সে স্বামীকে একবার দেখিবার অভিপ্রায়ে মুখ তুলিল, কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাইল না—দেখিল তরঙ্গিণীর ঈষৎ হাস্যময় মুখ—আর তাহার হিংসাব্যঞ্জক বিশাল লোচন। বিরাজ সভয়ে মস্তক নত করিল। সে উদ্দেশে স্বামীর চরণে প্রণাম করিয়া গৃহমধ্যস্থা হইল।

আজন্মদুঃখিনী বিরাজমোহিনী বড় আশা করিয়া আর একবার স্বামীর গৃহে আসিয়া যেরূপ লাঞ্ছিত হইয়াছিল, তাহা তাহার হাড়ে বিঁধিয়া আছে। সুতরাং এবার এত সহজে অভিলাষ পূর্ণ হওয়ায় সে আপনাকে অসামান্যা ভাগ্যবতী এবং বর্ত্তমান ঘটনা অপরিসীম সৌভাগ্যোদয়ের পূর্ব্বসূচনা জ্ঞান করিল। বিধাতঃ! দুঃখিনীকে অধিকতর মনকষ্ট দিয়া তাহার এ সাধের সৌধ বিচূর্ণিত করিও না।

এখন তরঙ্গিণী যে এত বড় উদারতা দেখাইয়া ফেলিল; ইহার কারণ কি? এত বড় মহৎ কার্য্য কুটিলহৃদয় হইলে করিয়া উঠিতে পারিত কি? তরঙ্গিণী বড় চতুরা; সে অনেক

ভাবিয়াই এ কাজ করিয়াছে। আসল কথা এই, দশ কুড়ি দিন হইতে তাহার পা চকা ছাড়িয়া গিয়াছে। এই কয় দিন পাক করিয়া তাহার শরীর অঙ্গ গলিয়া যাইতেছে। সে ভাবিল, এ মাগী তো এখন রাঁধুক, তার পর বুঝিয়া কাজ করিলেই হইবে। মাহিনা লাগিবে না—দু'টা খেতে পেলেই চলিবে। কালিদাসকে যেরূপ মোটা শিকলে সে বাঁধিয়াছে, তাহা কাটিয়া যে কালিদাস হাড়িচাঁচা পলাইবে, তাহার কোনই সম্ভাবনা নাই। তাহার সূত্র মাত্র বুঝিতে পারিলেই সে তখনই সর্ব্বনাশ বাধাইয়া দিবে। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া সে স্থির করিল, ভালমানুষী দেখাইবার—কালিদাসের পায়ের বাঁধন আর একটু কসিয়া আনিবার এমন সুযোগ ছাড়া হইবে না। সুতরাং বিরাজমোহিনী আশ্রয় পাইল। তরঙ্গিণী এক ঢিলে দুই পাখী মারিল।

বিরাজমোহিনী অতি সন্তোষের সহিত হাঁড়ি ধরিয়াছে। দরিদ্রের কন্যা—গৃহকর্ম্মে সে বিশেষ পটু। সে স্বচ্ছন্দে রন্ধনাদি নির্ব্বাহ করিতেছে। স্বামীর গৃহে স্থান পাইয়াও স্বামীর অন্ন খাইতে পাইয়া সে চরিতার্থ হইয়াছে। সে পরমানন্দে গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন করে, নীচের একটা ঘরে শুইয়া হৃষ্টমনে রাত্রি কাটায়, এক একবার যখন স্বামীর কাছে ভাতের থালা পৌঁছিয়া দিতে হয়, তখন সে স্বামীকে দেখিতে পায়। ইহাই তাহার পরম আনন্দ। এই আনন্দে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলে সকল দিকই চলিত ভাল। কিন্তু মানুষের চিত্ত উত্তরোত্তর অধিক সুখের জন্য চির দিন ব্যাকুল! বসিতে পাইলে শুইতে অনেকেই চায়; হাত গিলিতে গিলিতে বহু গেলার চেষ্টা অনেকেই করে। দুঃখিনী বিরাজমোহিনীকেও এইরূপ একটা ভয়ানক লোভের হাতে পড়িতে হইল। স্বামীর সহিত একটা কথা কহার লোভ সে কোন মতেই সংবরণ করিতে পারিল না। কোন্ সুযোগে, কখন কিরূপে স্বামীর সহিত একটা কথা কহিবে ইহারই উপায় সে চিন্তা করিতে লাগিল। তরঙ্গিণীকে সে যমদূতের ন্যায় ডরাইত। তরঙ্গিণী একদিনও তাহাকে একটী দুর্ব্বাক্য বলে নাই, তাহার সহিত একটীও অপ্রিয় ব্যবহার করে নাই। তথাপি বিরাজ তাহাকে দেখিলেই আতঙ্কে জড়সড় হইত, তাহার আওয়াজ শুনিলেই ভয়ে আড়ষ্ট হইত, যে দিকে তরঙ্গিণী আছে, সে দিকে যাইতে হইলে তাহার পা কাঁপিত ও বুক দুড়দুড় করিত। তরঙ্গিণী বাঘ নয়, ভালুক নয়, অথবা বিরাজের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ভয়ের কারণস্বরূপ পুরুষ মানুষও নয়। তবে বিরাজ তাহাকে এত ভয় কেন করিত? ভয় ও ভক্তি, বিরক্তি ও স্নেহ, এ সকল ভাব বোধ হয় সকল সময়ে বাহ্যব্যবহার সাপেক্ষ নহে। হৃদয়ের ভাব অনেক সময়ে এ সকল আকর্ষণ বিকর্ষণ জন্মাইবার কারণ। এই তরঙ্গিণীরূপা ব্যাঘ্রবাঘিনী সর্ব্বদা বিরাজের স্বামীর পাশে পাশে। তরঙ্গিণীর সমক্ষে কথা বলা দূরে থাক্ ভয়েই বিরাজ ঘুরিয়া পড়ে। তবে এমন কড়া পাহারার মধ্যে দুঃখিনী স্বামীর সহিত কথা কহে কখন?

আজি দৈবাৎ বিরাজের কপালক্রমে একটা কথা কহিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। আজি যখন বিরাজ স্বামীর কাছে ভাত দিতে গিয়াছিল, তখন তরঙ্গিণী সেখানে ছিল না; সে ঘৃত আনিবার জন্য ভাঁড়ার ঘরে গিয়াছিল; সুতরাং দুরবস্থাপন্ন কালিদাস তখন পাহারা-পরিশূন্য। এই তো সুন্দর সুযোগ বটে! ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সুযোগ আর ঘটিবে কি? বিরাজ ভাতের থালা রাখিয়া হাত ধুইয়া

ফেলিল। তাহার গা থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। কি বলিবে, তাহা সে জানে না। দুঃখিনী গলায় কাপড় দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে চুপ করিয়া একটী প্রণাম করিয়া বলিল,—"আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি। আমাকে একটু পায়ের ধূলা দিয়া আপনি কৃতার্থ করুন।"

হতভাগ্য কালিদাস কোন উত্তর দিল না। নির্ব্বোধ হইলেও, সে বুঝিতে পারিল, তাহার স্ত্রীর কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছে। সেই কম্পিত কোমল স্বর তাহার হৃদয়ে আঘাত করিল কি? ভগবান্ জানেন। সে একবার মুখ তুলিয়া চাহিল। দেখিল, অশ্রুভারাবনত নয়না সুরসুন্দরী তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মানা। সে কোন কথা বলিল না—বোধ হয় তাহার সাহস হইল না। কিন্তু সে পা বাড়াইয়া দিল। বিরাজ সযত্নে পরিধান বস্ত্রের প্রান্তভাগে সেই চরণ মুছাইয়া লইয়া আপনার মস্তকে সেই বস্ত্রাংশ স্থাপন করিল। তখনই তরঙ্গিণী সেই ঘরে প্রবেশ করিল। বিরাজ সভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে চোরের ন্যায় অন্য দ্বার দিয়া পলায়ন করিল। হায়! সে আপনার ধনে আপনি চোর। কালিদাসও ভয়ে একটু জড় সড় হইল। চরিত্রহীনের সৎসাহস কখনই থাকে না।

এই অতি ক্ষুদ্র ঘটনা টুকুর এক চুলও তরঙ্গিণীর অপ্রত্যক্ষ ছিল না; সে জানলার ফাঁক দিয়া সমস্তই দেখিয়াছে। বিরাজমোহিনীর এই দুষ্কর্ম্মের অতি গুরুতর শাস্তি দিতে সে সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়াছে। বিরাজ, আজন্ম দুঃখিনী, কেন তুমি এ দুরাশা-সাগরে ঝাঁপ দিয়াছিলে? কেন তুমি আপনার পায়ে আপনি কুঠারাঘাত করিলে? ক্ষুদ্র তুমি কেন চাঁদে হাত দিতে চাহিয়াছিলে?

তরঙ্গিণী ঘরে প্রবেশ করিলেন। যেন কিছুই জানেন না, কিছুই বোঝেন না—মাঝের মাছখানি। সে সমান হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিতে লাগিল। কালিদাসকে এটা ওটা খাইবার জন্য সমান পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। ছোট লোকের মত ছোট চালে সে একটুও চলিল না।

কালিদাস একটু সঙ্কোচের সহিত যেন চোর চোরভাবে, আহার সমাধা করিয়া, খাটের উপর বসিলেন। তরঙ্গিণী তাঁহাকে পান দিল, দাসী তাঁহাকে তামাক দিল। কালিদাস তামাক খাইতে খাইতে বলিলেন,—"আজি আমাকে এখনই আড়তে যাইতে হইবে; কয়েকটা বেপারী আসিয়াছে।"

বেপারী আসাটা কতদূর সত্য, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু আজি তিনি যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন, না জানি তাহার জন্য কি তুমুল কাণ্ড বাধিবে ভাবিয়া বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। এজন্য আপাততঃ তরঙ্গিণীর সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইবার জন্য বড়ই ব্যাকুল। যে অপরাধী, সে নিতান্ত জনহীন স্থানে ও সুন্দর সুযোগে চৌর্য্যবৃত্তি সমাধা করিয়াও, সতত মনে করে, কে বুঝি দেখিয়াছে, কে বুঝি আসিতেছে, ঐ বুঝি ধরিল। আজি কালিদাসেরও সেই অবস্থা। কালিদাস লুকাইয়া, পরিণীত সহধর্ম্মিণীকে পদধূলি দিয়া যে দারুণ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহার ভয়ে তিনি নিতান্ত উৎকণ্ঠিত।

তরঙ্গিণী একটু মুখ ভার করিয়া বলিল,—"তা হবে না। কাল তোমার মাথা ধরিয়াছিল, আজি এখনই তোমাকে কোন মতে যাইতে দিব না। আসুক না কেন হাজার বেপারী। তোমার শরীর আগে, না টাকা আগে। এত টাকার ভাবনা ভাবিবার দরকার নাই। আড়ত না চলে না চলিবে। আমাদের দুটো

পেট গাছতলায় থাকিয়া ভিক্ষা করিয়া খাইলেও চলিয়া যাইবে।"

যে ক্ষুদ্র কালিদাস-পতঙ্গ এ উজ্জ্বল সম্মোহন আকর্ষণকারী আলোকে তুই যদি না পড়িবি, তবে আর পড়িবে কে? কিন্তু আগুনে যখন পড়িতেছ, তখন পুড়িয়া মরাই তোমার অপরিহার্য্য ব্যবস্থা। পুড়িয়া মরিবে জানিয়াও, পতঙ্গকুল আগুনের চারিদিকে ঘুরিতে ছাড়ে না। পুড়িয়া মরার পর তবে তাহাদের বহ্নি-তৃষ্ণা নিবারিত হয়। যতক্ষণ পুড়িয়া না মরিতেছ, ততক্ষণ কালিদাস, বহ্নিলোলুপ পতঙ্গের ন্যায় তরঙ্গিণীরূপা পাবকশিখার চারিদিকে মনের সাধে ঘুরিয়া বেড়াও। কিন্তু মৃত্যু এ লোভের অবশ্যম্ভাবী পুরস্কার। তুমি মূর্খ কালিদাস, কত পণ্ডিত, সুবিজ্ঞ, সুবোধ, সুবিচারক কালিদাস-পতঙ্গও এ তৃষ্ণা সংবরণ করিতে পারে নাই; তবে তোমাকে দোষ দিই কেন? ঘুরিয়া বেড়াও কালিদাস—ঐ উজ্জ্বল আলোকের চারিদিকে ঘুড়িয়া বেড়াও —ঐ সুদর্শন পাবকের চারিদিকে ভোঁ ভোঁ করিয়া পরিভ্রমণ কর—ঐ উন্মাদকারী কৃশানুকে পরম সুখের নিকেতন জ্ঞানে উহাতে ঝাঁপ দিবার নিমিত্ত প্রধাবিত হও।

তরঙ্গিণীর কথা শুনিয়া কালিদাস বড়ই আশ্বস্ত হইলেন। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার অমার্জ্জনীয় অপরাধের কথা তরঙ্গিণী কিছুই জানিতে পারে নাই। জানিতে পারিলে এরূপ মধুমাখা, এরূপ প্রেমপূর্ণ, এরূপ আদরময় কথা তাহার মুখ হইতে কখনই বাহির হইত না; তাহার স্বর বদলাইয়া যাইত কালিদাস হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে যে না বুঝিতে পারিয়া বাস্তবিক অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়াছে, তাহাতে তাহার কোনই সংশয় নাই। যাহাতে প্রেমময়ী, আনন্দময়ী ধর্ম্মশীলা, উদার-হৃদয়া তরঙ্গিণীর অন্তরে বেদনা জন্মে এরূপ কর্ম্ম যে মহাপাপ, তাহার আর সন্দেহ কি? বোকা কালিদাস বড়ই ভুল বুঝিয়াছে; কিন্তু এইরূপ ভুল অনেক বুদ্ধিমান কালিদাসও বুঝে। কালিদাস একটা বোকার মত উত্তর দিল,—'তা তোমার মন না হইলে আমি কোথায় যাইব? বেপারী কটাকে বিদায় করা—তা তুমি যখন বলিবে তখনই যাইব।"

তরঙ্গিণীর অব্যর্থ সন্ধানে দ্রুতগতি হরিণ পলাইতে পারিত না, খোঁড়া কালিদাস-সজারুর তো কথাই নাই। তরঙ্গিণী মনে মনে অনেক হাসিল; মুখে সামান্য-মাত্র হাসিয়া বলিল,—"তুমি একটু শোও -আমি তোমাকে বাতাস করি। পাছে কালিকার মত মাথা ধরে, এই ভয়ে আমি অস্থির। একটু বিশ্রাম করার পর, যেখানে যাইতে হয় যাইও, আমি তখন বারণ করিব না।"

কালিদাস হুকা রাখিয়া শয়ন করিল। তরঙ্গিণী পাখা অল্প অল্প নাড়িতে নাড়িতে বলিতে আরম্ভ করিল—"তোমার স্ত্রী বলিয়া যিনি আসিয়াছেন, উঁহার কি বিলি করিবে মনে করিতেছ?"

ঐ যে—স্ত্রীর কথা তুলে কেন? কালিদাসের বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। বলিলেন,—"বিলি—বিলি তুমি যা বল। তুমিই তো তাহাকে এ বাটীতে স্থান দিয়াছ।"

তরঙ্গিণী বলিল,—"স্থান দিয়াছি—দেওয়াই তো উচিত। কিন্তু যা ভাবিয়াছিলাম, তা যে নয়। উহাকে খাওয়া পরার খরচ দিতে তুমি বাধ্য। তা এখানে রাখিয়া দেও, কি উহাকে বাপের বাটীতে পাঠাইয়া সেখানেই দেও।"

সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গিণী অতি মধুর ভাবে কালিদাসের চক্ষুর সহিত আপনার চক্ষু

মিলাইয়া দিল। মূঢ় কালিদাস সভয়ে বলিল "তুমি কি করতে বল ?"

তরঙ্গিণী বলিল,—"আমি কি বলিব ? উনি তোমার স্ত্রী—হাজার হউক আমি পর আমার কি কোন কথা বলা উচিত ? তুমি বুঝিয়া যাহা ভাল হয় কর।"

কালিদাস বড় বিপদে পড়িল। তরঙ্গিণীর অভিপ্রায় কি, তাহা সে স্থির করিতে না পারিয়া বলিল,—"তা উঁহাকে এখানে না রাখাই যদি তোমার মত হয়, তবে ও আজই চলিয়া যাউক।"

তরঙ্গিণী তাহাই চাহে। কিন্তু সাধুতার ভাণ সহজে কেহ ছাড়ে কি ? বলিল,—"রাধা-কৃষ্ণ—তা কি বলিতে পারি। তবে কথাটা তোমাকে বলা উচিত নয় ; আবার না বলিলেও আমার পাপ আছে। উহাঁর রীত চরিত্র যেমন ভাবা গিয়াছিল তেমন নয় দেখিতেছি।"

কালিদাস উঠিয়া বসিল। বলিল,—"কি রকম ? কি রকম ?"

তরঙ্গিণী বলিল,—"সকল কথা তোমার জানিয়া কাজ নাই। উহাঁর স্বভাব ভাল নয়। আমি কু-কুলে জন্মিয়াছি বটে, কিন্তু ভগবানের কৃপায় কুমতি আমার কখনই নাই। তুমিই ধ্যান-জ্ঞান সকলই। কাজেই মন্দ রীতি-প্রকৃতি দেখিলে আমার কষ্ট হয়। আমি সে রকম লোকের সঙ্গে এক দণ্ডও থাকিতে পারি না। তাই বলিতেছি—"

কালিদাস জিজ্ঞাসিল,—"বল কি ? এই কয় দিনেই উহার কুরীত ধরা পড়িয়াছে ; তবে তো ও অতি ভয়ানক লোক। উহাকে তো কোন রকমেই বাড়ীতে রাখা যাইতে পারে না।"

তরঙ্গিণী বলিল—"না না—অত রাগ করিও না। তবে আমি নষ্ট দুষ্ট লোকের সঙ্গে এক জায়গায় থাকিতে পারিব না, তাহারই একটা ব্যবস্থা তুমি করিয়া দাও। উনি যেমন এখানে আসিয়াছেন, এখানেই থাকুন। আমার একটা অন্য স্থান করিয়া দাও। উহাঁর খোর-পোষ না দিলে লোকে তোমাকে দূষিবে। সেও তো আমার একটা কষ্ট।"

কালিদাস বলিল—"বিলক্ষণ! লোকে দূষিবে বলিয়া আমি কি কাল সাপ পুষিয়া তোমার কাছে ছাড়িয়া দিব ? উহাকে এখনই জুতা মারিয়া বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিতেছি।"

পাঠকগণের স্মরণ থাকা আবশ্যক যে, কিরূপ প্রমাণে তরঙ্গিণী বিরাজমোহিনীর এরূপ কলঙ্ক প্রচার করিতেছেন তাহা কালিদাস এখনও জানে নাই—জানিবার ইচ্ছাও করে নাই। তরঙ্গিণী যখন বলিতেছে, তখন অন্য প্রমাণের প্রয়োজন কি ? বুদ্ধিমান কালিদাস লোকের মুখে শুনিয়াই স্ত্রীকে জুতা মারিয়া গৃহ বহিষ্কৃত করিতে উদ্যত। তরঙ্গিণী তাঁহাকে বাধা দিয়া কহিল,—"ছিঃ! ছিঃ! উতলা হইয়া কোন কাজ করিতে নাই। আগে শুন সব কথা, তার পর যা হয় করিও।"

কালিদাস মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। তরঙ্গিণী বলিল,—"হারাধনের সঙ্গে কালাচাঁদ বলিয়া সেই যে একটা বয়াটে ছেলে মধ্যে মধ্যে এখানে আইসে দেখিয়াছ বোধ হয়। আমি তাহার সম্মুখে বাহির হই না—সে বড় মন্দ লোক শুনিয়াছি। সে যখন আইসে, তখন হারাধনের অপেক্ষায় বাহিরে বসিয়া থাকে—আমাদের বাড়ীর মধ্যে আসিতে পায় না। তোমার স্ত্রী সেই কালাচাঁদের সহিত আজি ফুস ফুস করিয়া কথা কহিতেছিলেন। আমি যে পাশের ঘরে ছিলাম, তাহা উঁহারা জানিতে পারেন নাই। যাহা শুনিলাম তাহাতে

আমার পেটের পীলে চমকিয়া গেল। কত কথা তোমাকে আমি লজ্জার মাথা খাইয়া বলিব? কালি সন্ধ্যার পর সে আবার আসিবে, তোমার স্ত্রী দরজা খুলিয়া দিয়া তাহাকে ঘরে লইবেন।"

কালিদাস বলিল,—"বল কি? তবে আর উঁহাকে এক মুহূর্ত্তও বাড়ীতে থাকিতে দিবার দরকার নাই। এখনই উঁহাকে তাড়াইয়া দিয়া তবে অন্য কাজ।"

তরঙ্গিণী বলিল,—"তা হইবে না। আমি মেয়েমানুষ, আমার বুঝিবার ভুল হইতে পারে। তুমি পুরুষ মানুষ, তুমি নিজে না দেখিয়া, না বুঝিয়া কোন কাজ করিতে পাইবে না। কালি রাত্রির কাণ্ড দেখিয়া যা হয় করিতে হইবে। আমরা মেয়েমানুষ অবুঝ, অধীর। তুমি এত অধীর হইলে চলিবে কেন?

কালিদাস নীরবে মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিলেন। তরঙ্গিণী তাঁহাকে ধীরে ধীরে বাতাস দিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

চতুরা তরঙ্গিণী আট ঘাট না বান্ধিয়া কোন কাজ করে কি? সে যাহা করিতে বসিয়াছে, তাহার চূড়ান্ত না করিয়া ছাড়িবার পাত্র নহে। স্পর্দ্ধিতা বিরাজমোহিনী বামন হইয়া চাঁদে হাত দিতে গিয়াছে, তরঙ্গিণীর লাখরাজ জমি সে কাড়িয়া লইবার পথ করিতে গিয়াছে, সুতরাং সে অমার্জ্জনীয়া। মুখে তরঙ্গিণী যতই সৌজন্য প্রকাশ করুক, সে বিরাজমোহিনীর সর্ব্বনাশ সাধিতে সঙ্কল্প করিয়াছে। দশ দিন পরেও যে স্বামী তাহাকে দয়া করিয়া আশ্রয় দিবেন, বা তাহার অপরাধে সন্দেহ করিয়া তাহার প্রতি প্রসন্ন হইবেন, বা স্থানান্তরে রাখিয়া তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের একটা ব্যবস্থা করিয়া দিবেন, ইহার কিছুই তরঙ্গিণী হইতে দিবে না। বিরাজের এক তিল অপরাধে (এখন অপরাধই বলিতে হইতেছে) তরঙ্গিণী অপরিমিত শাস্তি না দিয়া ছাড়িবে না স্থির করিয়াছে।

দুঃখিনী, আজন্ম-সুখবিহীনা বিরাজ—তুমি নিরন্তর নিরপরাধ। স্বর্গের দেবতারা এ কথা অবশ্যই জানিতেছেন। ধর্ম্মের পুস্তকে ইহা নিশ্চয়ই স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। বৎসে! দুঃখের প্রবল পীড়নে যদাপি অবসন্ন হইও না। ইহজগতে বুক পাতিয়া দুঃখ-দারিদ্র্যের আক্রমণ সহ্য করাই মহত্ত্ব; তাদৃশ সহিষ্ণুতা কখনই কোথায় নিষ্ফল হয় না। হৃদয়ের যে বলে, বৎসে! এত দিন অসহনীয় ক্লেশপরম্পরায় প্রপীড়িত হইয়াও, আপনার ধর্ম্ম ও সততা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছ, সেই বল তোমাকে যেন এখনও পরিত্যাগ না করে। সেই বল সহায় থাকিলে জগতের যাবতীয় বিপদ তুমি পিপীলিকা-দংশনবৎ নগণ্য বোধে, অবহেলার সহিত উপেক্ষা করিতে পারিবে। দুঃখিনি মুগ্ধে! বড় বিকট বিপদ বদন ব্যাদান করিয়া তোমাকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত ধাইয়া আসিতেছে—তুমি ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা, ধর্ম্ম ও সততা সম্মুখে রাখিয়া সাহসসহকারে দাঁড়াইয়া থাক। ভয় কি মা? অনাথনাথ বিপদ্বান্ধব নারায়ণ, চিরদিনই ধার্ম্মিকের সহায়। ধর্ম্মরূপ পবিত্র জ্যোতিঃ তোমাকে বেষ্টন করিয়া থাকিলে, যমও তোমার নিকটস্থ হইবে না।

কালিদাস কিয়ৎকাল মাত্র বিশ্রাম করিয়া আড়তে চলিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে হারাধন আসিয়া তাঁহার বাটীতে দেখা দিলেন।

হারাধন নিতান্ত বেলেল্লা বিকটাকার চেহারার লোক। তাহার মাথায় চেরা সিঁথি, গায়ে বেল-লাগান কামিজ। পরিধান কালাপেড়ে ধুতি, পায়ে বার্ণিস করা জুতা, বুকের উপর চেন। বদনে দুর্বৃত্ততা যেন মাখা। হারাধন বিষয়-কর্ম্ম কিছু করে না, কেবল টপ্পা মারিয়া বেড়ায়; অথচ তরঙ্গিণীর ধর্ম্ম ভাই বলিয়া তাহার অন্ন বস্ত্র বা বাবুগিরির কষ্ট নাই। রতনে রতন চিনে। এই তরঙ্গিণীর সহিত হারাধনের এত আত্মীয়তা।

হারাধনের সহিত যেরূপ কথাবার্ত্তা হইতে থাকিল, তাহা লিখিবার অযোগ্য। সে সকল কুৎসিত আলাপ সমাপ্ত হইলে, তরঙ্গিণী বলিল,—"আমি বড় দায়ে পড়িয়াছি, তোমাকে তাহার উপায় করিতে হইবে। নহিলে ক্রমে ছুঁই ফাল হইয়া দাঁড়াইবে। তখন তুমিও যাইবে, আমিও যাইব। সকল সুখ, সকল আমোদ, জন্মের মত হাত-ছাড়া হইবে। বাঁদর যদি একবার দড়ি ছিঁড়িতে পারে, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ।"

এই বলিয়া তরঙ্গিণী একে একে সমস্ত কথা বলিল। তাহার পর সে যেরূপ মন্ত্রণা করিয়াছে, তাহাও বলিল। সমস্ত কথা শুনিয়া হারাধন তাহার মন্ত্রণা ও বুদ্ধির অনেক প্রশংসা করিল এবং বলিল,—'এ জন্য চিন্তা কি? আমি কাল চাঁদকে বাঁধিয়া সকল পরামর্শ ঠিক করিতেছি। ঠিক সময়ে ঠিক কাজ হইবে, তাহার জন্য কোন ভয় নাই।"

হারাধন চলিয়া গেল। তরঙ্গিণী একটু নিশ্চিন্ত হইল। বিরাজমোহিনীর সর্ব্বনাশ সাধনার জন্য জাল পাতা হইল।

পরদিন বৈকালে তরঙ্গিণী একটু সকালে সকালে খাবার তৈয়ার করিবার জন্য হুকুম জারি করিলেন। বাবুর শরীর ভাল নাই। তিনি সন্ধ্যার পর বাটী ফিরিবেন এবং সকালেই আহার করিবেন। তাঁহার আদেশ মত কার্য্য সম্পন্ন হইল, বিরাজ বাবুর খাবার উপরে ঢাকিয়া রাখিয়া আসিল। তাহার পর বিরাজ সন্ধ্যার পর খাওয়া শেষ করিয়া নির্দ্দিষ্ট ঘরে শয়ন করিতে গেল। নয়টার সময় কালিদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয় আড়তের কাজ—শেষ করিয়া বাটী আসিলেন। তিনি আসিলে তরঙ্গিণী তাঁহাকে দরজা খুলিয়া দিল। এ কাজটা চিরকালই তরঙ্গিণী স্বয়ং সম্পন্ন করে। সেই দুটা ভাত মুখে দিয়া বাবু আড়তে গিয়াছেন, এতক্ষণ তাঁহাকে না দেখিয়া তরঙ্গিণীর কষ্টের সীমা নাই। তিনি দারুণ কষ্ট ও পরিশ্রমের পর, ঘরে ফিরিলে, লোকে তাঁহাকে দরজা খুলিয়া দিবে, তাহার পর তিনি উপরে উঠিয়া আসিবেন, তখন তরঙ্গিণী তাঁহাকে দেখিয়া মনপ্রাণ শীতল করিবে। বাপরে, এত বিলম্ব সহে কি? সুতরাং বাবু দরজার শিকলি নাড়িবামাত্র তরঙ্গিণী বেগে গিয়া দরজা না খুলিয়া থাকিতে পারে না। দরজা খুলার পর, বাবু দরজার ভিতরে আসিলে, দরজা বন্ধ করিলে যেমন শব্দ হয়, তরঙ্গিণী সেইরূপ শব্দ করিল; কিন্তু বাস্তবিকই দরজা বন্ধ করিল কি? না।

তরঙ্গিণী কালিদাসের হাত ধরিয়া সোহাগে হাসি হাসিতে হাসিতে উপরে উঠিল। কালিদাস জিজ্ঞাসিলেন,—"কি সংবাদ?"

তরঙ্গিণী যেন কিছুই জানে না, বা কিছুই মনে করিয়া বসিয়া নাই। বলিল,—"কিসের?"

কালিদাস বলিলেন,—বলি "ঐ পাপটার।"

তরঙ্গিণী যেন চমকিয়া বলিল—"ও হাঁ—বলি, ঐ ঠাকরুণটির কথা জিজ্ঞাসা করছো? আমি বলি—কি না জানি। তা কই আর, এখনও তো কি টের পাই নাই। এই জন্যই

তো তাই তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, আমি মেয়ে মানুষ, আমার বুঝিবার ভুল হইতে পারে। তুমি না বুঝিয়া কোন কাজ করিতে পারিবে না। একথা আমি আগেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি।"

যেন দুধের দুধ, জলের জল। কালিদাস জিজ্ঞাসিলেন,—"এখন রাত্রি কত?"

"দশটা হবে বোধ হয়। তা তুমি খাও, দাও, তার পর ওসব ভাবনা হবে। ভাল এক ছেঁড়া কথা তুলে দেখছি, ভাবনায় তোমার শরীর খারাপ হইয়া পড়িল। আগে খাও দাও, নহিলে আমি কোন কথাই শুনিব না—কোন কথার জবাবও দিব না।"

কালিদাস আহার করিতে বসিলেন। তাঁহার আহার সমাপ্তির প্রায় সম সময়েই বাহিরের দরজায় খুট খুট করিয়া অনতি-উচ্চ শব্দ হইল। কালিদাস সোৎসাহে বলিলেন,—"ভয় ভয়! ঐ বুঝি কে দরজা খুলিল!"

তরঙ্গিণী যেন কিছু জানে না, কোন কথাই তাহার মনে নাই। সে বলিল,—"দরজা তো আমি তোমার সামনেই বন্ধ করিয়া আসিলাম। দরজা আবার এত রাত্রিতে কে খুলিবে?"

কালিদাস বলিল,—"কালাচাঁদ বুঝি আসিল। তোমার সখের বামুন ঠাকুরুণ বুঝি খুলিয়া তাঁহার রসিকনাগরকে ঘরে লইলেন।"

তরঙ্গিণী সবিস্ময়ে বলিল,—"হাঁ—তাই তো। না—এই সন্ধ্যার সময়েই কি তা পারিবে? এখনও তোমার খাওয়া হয় নাই—তুমি ঘুমাও নাই। তবে মানুষের মনের কথা বলা যায় না। যদি কিছু হয়, তা কি এখনই হইবে?"

কালিদাস বলিল,—"না, তাই বটে—আর কিছু নয়। আমি মানুষের পায়ের শব্দ পাইয়াছি। তুমি থাক, আমি যাই।"

তরঙ্গিণী সতীপ্রধানা। সে বিস্মিতের ন্যায় বলিল, "ওমা কি ঘেন্না—কি ঘেন্না! না না তোমার ভুল হয়েছে। এও কি কখন হয়? ভাল, দাঁড়াও তুমি, আমি যাই। হাঁ—সত্য বটে, কেউ বাড়ীতে এসেছে—আমিও যেন পায়ের শব্দ পেয়েছি।"

তখন কালিদাস কাণ্ডাকাণ্ডবোধ-শূন্য হইয়া আসন ত্যাগ করিয়া উঠিল এবং ষাণ্ডের ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে বেগে দুপদাপ শব্দে সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল। এরূপ সময়ে অতি সাবধানে ও নিঃশব্দে আসিয়া চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করাই বুদ্ধিমানের ব্যবস্থা। কিন্তু নির্ব্বোধ কালিদাস যাহার বুদ্ধি লইয়া চলেন, সে অন্তর হইলে অবশ্যই কালিদাসকে এ সম্বন্ধে সাবধান করিত; কিন্তু আজি আর সে কোন কথা বলিল না। সুতরাং কালিদাস বিনা আপত্তিতে, চীৎকার ও পদ শব্দে দেশ মাথায় করিতে করিতে, নামিতে লাগিলেন। সঙ্গে তরঙ্গিণী আলোক হস্তে আসিতে লাগিল। কালিদাসের চীৎকার ও পদশব্দের সহিত তরঙ্গিণীর মলের শব্দ মিশিয়া অশ্রুতপূর্ব্ব ধ্বনি উৎপাদন করিতে থাকিল। তরঙ্গিণী, চক্রবর্ত্তীর হাত ধরিয়া, বলিতে লাগিল,—"তোমাকে কখনই ওখানে যাইতে দিব না। যদিই কেহ আসিয়া থাকে, সে এখন উদ্দেশ্যে ব্যাঘাত হইলে সকলই করিতে পারে।"

যাহার চরিত্রের বল নাই, তাহার হৃদয়ের বল নাই। তাদৃশ কাপুরুষেরা শত্রু-পক্ষের সম্মুখীন হইতে প্রায়ই সাহসী হয় না। এখানে কালিদাসেরও সে সাহস হইল না। সে দেখিল বিরাজমোহিনীর ঘরের দ্বার খোলা; সুতরাং

নিশ্চয়ই ঘরে লোক প্রবেশ করিয়াছে। দ্বার খুলিয়াই বিরাজ শয়ন করিয়া থাকে—কোন দিনই বন্ধ করে না ; এ কথা কালিদাস জানিত না। আর দেখিল, জামা গায়ে দেওয়া, মুখ কাপড় দিয়া ঢাকা, এক পুরুষ, সেই ঘর হইতে নিক্রান্ত হইয়া কালিদাসের সম্মুখ দিয়া পলায়ন করিল এবং সদর দরজা পার হইয়া রাস্তায় গিয়া পড়িল। কালিদাস তখন উন্মাদের স্থায় অস্থির হউক এবং বিরাজমোহিনীকে লক্ষ্য করিয়া নানাবিধ অশ্রাব্য ও অবক্তব্য গালি দিতে লাগিল। এই সকল গোলমালে নিদ্রিতা, অপাপবিদ্ধা, বিরাজমোহিনীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল, এবং না জানি বাটীতে কি বিপৎপাত হইয়াছে ভাবিয়া, সে ঘরের বাহিরে আসিল। যাহাকে উপলক্ষ করিয়া এই তুমুল কাণ্ড বাধিয়াছে, সে তাহার কিছুই জানে না। কিন্তু সে কথা আর শুনিবে কে ? কালিদাসের চক্ষুকর্ণের বিবাদ বিশেষরূপে ভঞ্জন হইয়াছে। তিনি বিরাজের বিরুদ্ধে ভয়ানক অপবাদ শুনিয়াছিলেন, অধুনা তদ্বিষয়ে অখণ্ডনীয় প্রমাণ তাঁহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইল। তরঙ্গিণী কি মিছা কহিবার লোক ? রাধাকৃষ্ণ !

বিরাজমোহিনী বাহিরে আসিবামাত্র তাহার স্বামী তাহার বক্ষে সজোরে পাদুকাসহ পদাঘাত করিলেন।

রে মূর্খ হতভাগ্য কালিদাস ! রে হৃদয়হীন ভ্রান্ত পশু ! আজি এই সতী সাবিত্রীর তুই যে অবমাননা করিলি, এ পাপের জন্ত নিশ্চয়ই তোর অতি ভয়ানক প্রায়শ্চিত্ত সমাধান করিতে হইবে। তোর এ দারুণ দুষ্কৃতি রজনীর আবরণে প্রচ্ছন্ন থাকিবে না ; সত্য মিথ্যায় রূপান্তরিত হইবে না ; কোটী কোটী তরঙ্গিণী একত্রিতা হইলেও, তোর রক্ষাসাধন করিতে পারিবে না। তুই কাচকাঞ্চনের বিচার করিস্ নাই ; ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা আলোচনা করিস্ নাই ; অনন্যগতি আশ্রয়হীনা, সারল্য প্রতিমা, ধর্ম্মস্বরূপা, সহধর্ম্মিণীর নিষ্পাপ শরীরে তুই যে পাপ-পঙ্কিল পদাঘাত করিলি এবং যে অশ্রাব্য অনালোচ্য, অচিন্তনীয় অপরাধে তাঁহাকে কলঙ্ক-কালিমালিপ্তা করিলি, তোর এই ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ বিশ্বনিয়ন্তা ন্যায়-পুরুষের হৃদয়ে আঘাত করিয়াছে। তোর ঐ পদাঘাত ধর্ম্মের বক্ষেই পড়িয়াছে। রে মূঢ় ! তোর আর নিস্তার নাই। তোর তরঙ্গিণীর চটুল চাটুবাক্যে তুই সকলই ভুলিবি, তাহার বিলোল কটাক্ষে তোর সকল অন্তর্দ্দাহ বিলীন হইবে, কিন্তু রে হতভাগ্য কাপুরুষ ! ধর্ম্মরূপী ভগবান্ এই অপরাধের এক বর্ণও ভুলিবেন না। সেখানকার জমাখরচে ঠিকে ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই। সেই ধর্ম্মময় যথাসময়ে ন্যায়দণ্ড হস্তে লইয়া তোর দণ্ডবিধানার্থ উপস্থিত হইবেন এবং তোর সর্ব্বনাশ-সাধন করিবেন। তখন তোর দশা কি হইবে ? মূঢ়, ভ্রান্ত, দুর্ভাগা কালিদাস ! এখনও উপদেশ শুনিয়া কাজ কর। ঐ সাধ্বীর—ঐ ধর্ম্মময়ী সুন্দরীর হাত ধরিয়া সাদরে তাঁহাকে স্বগৃহে আনয়ন কর। হতভাগা ! এখনও সময় আছে—এমন সুযোগ আর পাইবি কি ?

বিরাজ দারুণ আঘাতে পড়িয়া গেল, কিন্তু কাঁদিল না বা চীৎকার করিল না। তখনই উঠিয়া দুঃখিনী, ক্রুদ্ধ স্বামীর সম্মুখ হইতে সরিবার অভিপ্রায়ে, প্রকোষ্ঠ মধ্যে যাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তখনই কালিদাস বলিল,—"আমার বুকের উপর বসিয়া তোর এই কাজ রে অভাগী ? বেরো আমার বাড়ী থেকে।"

এই বলিয়া, লাথি, কিল ও ধাক্কা মারিতে মারিতে, সেই নিষ্পাপ সুন্দরীকে বাটীর দরজা

পর্য্যন্ত ঠেলিয়া আনিল। প্রহার যৎপরোনাস্তি হইল—চোর বা দুশ্চরিত্রাকে এমনই করিয়া লোকে মারে বটে, কিন্তু বিরাজ কাঁদিল না, বা একটি কথাও বলিল না।

দরজার কাছ পর্য্যন্ত আসার পর বিরাজ কবাট চাপিয়া ধরিল—মারিয়া ফেলিলেও বাহিরে যাইবে না, ইহাই তাহার সংকল্প। এ আশ্রয় ত্যাগ করিয়া সে কোথায় যাইবে? জগতে আর কোথায় তাহার স্থান নাই তো! কালিদাস সেই স্থানে তাহার চুলের মুটা ধরিয়া অতিশয় বল প্রয়োগে তাহাকে টানিতে টানিতে বাহিরে লইয়া আসিল। অভাগিনীর অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল—নানা স্থান হইতে রক্ত ঝরিতে লাগিল। বিরাজ পথের উপর ধূলি-শয্যায় পড়িয়া রহিল। কিন্তু বিরাজ কাঁদিল না, বা একটি কথাও বলিল না। কালিদাস বড়ই ক্রোধের সহিত বলিল,—"তুই কোন্ সাহসে এখনও আমার বাড়ীতে থাকিতে চাহিস্? জানিস্ না হতভাগী, তোর নাগরের আসা যাওয়া, তোর লীলাখেলা কিছুই আমার জানিতে বাকী নাই। তোকে যে এখনও খুন করি নাই, সেইই ঢের। ও পোড়ামুখ আর কাহাকেও দেখাইস্ না। গঙ্গায় ডুবে মর গিয়া ধিক্‌জীবনী, কালামুখী।"

এতক্ষণে অপরাধের ভাবটা কতক বিরাজ-মোহিনী অনুভব করিতে পারিল। কিন্তু সে ঝগড়া করিল না, এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিল না, অনর্থক আপনার সততা প্রমাণ করিবার প্রযত্ন করিল না, একটি কথাও কহিল না। কালিদাস বলিলেন,—"কালই যেন শুনিতে পাই, তুই মরিয়াছিস্, তোর পোড়ামুখ যেন আর কখন দেখিতে না হয়।"

কালিদাস বেগে ফিরিয়া আসিল। তরঙ্গিণী বিরাজের নিকটস্থ হইয়া তাহার কাণে কাণে বলিল,—"স্বামীর একটু পদধূলির জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিলি—এখন পেট ভরিয়া পায়ের ধূলা পাইয়াছিস্ তো? কুঁজো আবার চিৎ হয়ে শুতে চায়! চিনিস্ না আমাকে সর্ব্বনাশী?"

হায় হায়! পাপীয়সি! তরঙ্গিণী, ইহজীবনেই কর্ম্মাকর্ম্মের শেষ নহে. জীবনান্ত হইলেই সকলই ফুরাইয়া যায় না, এ পরম জ্ঞান, একবার ভ্রমেও তোর ন্যায় কুলটাদের মনে হয় না কি? তাহা যদি হইত, তাহা হইলে ঐ ধূলি-ধূসরিতা, রুধিরাক্তকলেবরা, সতীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়া তাহার এরূপ সর্ব্বনাশ করিতে পারিতিস্ কি? তাহা হইলে তাহার ন্যায় ও ধর্ম্ম-সঙ্গত অধিকার হইতে তাহাকে চিরদিন বঞ্চিত করিয়া তুই তাহা সানন্দচিত্তে সম্ভোগ করিতে পারিতিস্ কি? তাহা হইলে তুই অধুনা তাহার ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে এরূপ কঠোর বাক্যরূপ লবণ দিতে পারিতিস্ কি? কিন্তু তরঙ্গিণী তুমি যাহা ভাবিতেছ, তাহা হইবে না। আলোকের পর অন্ধকার, দিবার পর রাত্রি যেমন অবশ্যম্ভাবী, সুখের পর দুঃখও তেমনই অবশ্যম্ভাবী; তোমার এই সুখময়, আনন্দময়, সন্তোষময় দিন সমান যাইবে বলিয়া তোমার মনে যে বিশ্বাস আছে, তাহা অবশ্যই চূর্ণীকৃত হইবে। তোমার এ অহঙ্কারে ছাই পড়িবে, তোমার সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তমিত হইবে, তোমার পাপ-লীলার পরিসমাপ্ত হইবে। যে অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া তুমি এখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্যা হইয়াছ, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ভুলিয়া গিয়াছ, পরিণাম-চিন্তা পরিত্যাগ করিয়াছ, সেই অহঙ্কারেই তোমাকে ধূলায় লুটাইয়া রোদন করিতে হইবে; যে সাধ্বীকে তুমি পদবিদলিতা করিলে, তাহারই ঐ চরণযুগল নয়ন-জলে ভিজাইতে হইবে একদিন পিতৃক্রোড়ারোহণেচ্ছু দুঃখিনীনন্দন ধ্রুবকে

তাহার বিমাতা অহঙ্কারস্ফীতা! সুরুচি বড় কঠোর মর্ম্মবেদনা দিয়াছিল, বাক্যবাণে তাহার কোমল হৃদয় বড়ই বিদ্ধ করিয়াছিল। মর্ম্মপীড়িত দুঃখী শিশু, অনন্যোপায় হইয়া, তখন দুর্ব্বলের বল, বিপন্নের বান্ধব, আশ্রয়হীনের সহায়, কাতরের বন্ধু, পদ্মপলাশলোচনের শরণাগত হইয়াছিল। শ্রীহরির কৃপায় সেই ধ্রুবের গৌরবগীতি বসুন্ধরা চিরদিন গাহিতেছে, সেই নিপীড়িত শিশু এখন দেবতা। আর সেই গর্ব্বিতা বিমাতা সেই তিরস্কৃত বালকের ক্ষমা ও অনুকম্পা লাভ করিয়া উচ্চস্থানে সমাসীন। অয়ি দুর্ব্বল-হৃদয়ে পাপিনি! ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, তৃণাদপি লঘু,, নীচাদপি হেয় কালিদাসের অনুগ্রহে তুই স্ফীতা ও গর্ব্বিতা; কিন্তু জানিস্ ঐ মলিনা কাতরা কামিনীর সহায় কে? ক্ষুদ্র কালিদাস যাঁহাকে ভাবিতেও অধিকারী নহে, গর্ব্বিতা তুই যাঁহার নাম করিতেও অধিকারী নহিস্,, সেই নয়কান্তকান্ত নারায়ণ ঐ নারীর সহায়। তোর মত, তোর কালিদাসের মত, ক্ষুদ্র কীট ঐ দেবীর—পদবিদলিতা স্বরসুন্দরীর সমীপস্থ হইতে পারিলেও চরিতার্থ হইবি।

তরঙ্গিণীকৃত তীব্র তিরস্কারের বিরাজ কোন প্রতিবাদ করিল না। একটি কথাও সে বলিল না, এক ফোটা চক্ষুর জল সে ফেলিল না। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল—সে চারিদিক শূন্য দেখিতে লাগিল! তখনই তাহার সংজ্ঞা তিরোহিত হইয়া গেল।

কতক্ষণ বিরাজ এ ভাবে থাকিল, তাহা সে জানে না। যখন তাহার জ্ঞানের সঞ্চার হইল, তখন সে উঠিয়া বসিল। অঙ্গ কিছু অবশ—মনে করিল শয়ন করিয়া থাকায় হইয়াছে। রুধিরে পরিধেয় বস্ত্র সিক্ত—মনে করিল কিরূপে জল পড়িয়াছে। দেখিল স্বামীর দরজা বন্ধ। তখন কি করিতে হইবে,—একটুমাত্র সেজন্ত আত্মদুঃখিনী বিরাজমোহিনী চিন্তা করিল। তখনই মনে মনে বলিল,—"পিতার মুখে শুনিয়াছি, এ জগতে স্ত্রীলোকের স্বামীর চেয়ে গুরু আর নাই। স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র দেবতা। স্বামীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে নরকেও স্থান হয় না। আমার স্বামী আমার কপালক্রমে আমাকে কখন কোন আজ্ঞা করেন নাই। আজি ভাগ্যবলে আমার স্বামী আমাকে একটি আজ্ঞা করিয়াছেন; তিনি আমাকে গলায় ডুবিয়া মরিতে বলিয়াছেন। তবে আর আমি কি করিব বলিয়া ভাবিতেছি কেন? সেই আজ্ঞা পালন করাই এখন আমার পরম ধর্ম্ম।"

বিরাজমোহিনী কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইল তাহার পর স্বামী-ভবনের দিকে ফিরিয়া সে একবার ভূম্যবলুণ্ঠিতা হইয়া স্বামীর চরণ উদ্দেশে প্রণাম করিল। তাহার পর কষ্টে উঠিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল।

কোথা যাও, বিরাজমোহিনী, সুশীলে, এ গভীর নিশীথে একাকিনী কোথা যাও? দেখ আকাশে চন্দ্র হাসিতেছে, চন্দ্রের চারি দিকে নক্ষত্র হাসিতেছে, জ্যোৎস্নামণ্ডিত হইয়া জগৎ হাসিতেছে, কুসুমকুল হাসিতে হাসিতে দুলিতেছে, তাহাদের সৌরভ হাসিয়া ছুটাছুটি করিতেছে, আর তুমি সুন্দরী, যুবতী, সাধ্বী, তুমি হাসিতেছ না কেন মা? ভগবান্ তোমাকেই কেবল হাসিতে দেন নাই কেন মা? বৎসে! তাহা বলিয়া সেই সর্ব্বদর্শী ভগবানকে তুমি নিন্দা করিও না। পরম দয়াল অতি মহৎ অভিপ্রায়েই তোমাকে হাসিতে দেন নাই। স্থির হও বাছা, এমন দিন অবশ্যই আসিবে—যখন তোমার হাসিতেই বসুন্ধরা হাসিবে; তোমার হাসির কণিকামাত্র

পাইলেই মানব ধন্ত হইবে। কষ্ট ও সুখ উভয়ের বৈষম্য দেখিতে বড় ভয়ানক হইলেও বস্তুতঃ কিছুই নহে। স্থির হইয়া উভয়ের জন্যই হৃদয়কে সজ্জিত প্রস্তুত করিয়া রাখ। এ সংসারে পতিপদাহতা, তাড়িতা কুলটা কর্ত্তৃক তিরস্কৃতা, বিরাজমোহিনী তুমিই অতি ধন্য। তাই বলিতেছি, কোথা যাইতেছ! শুভে—স্থির হও। এমন দিন কখনই থাকিবে না মা।

আঁকা বাঁকা গলি ঘুঁজি পার হইয়া ধীরে ধীরে কোন দিক লক্ষ্য না করিয়া, বিরাজমোহিনী কতদূরই গেল। ও কিসের শ্‌ শ্‌ শব্দ? ও কিসের কুল কুল ধ্বনি? বিরাজের সম্মুখে সেই কলভাষিণী, পূত-সলিলোদরা, পূর্ণাবয়বা জাহ্নবী। বিরাজ একাকিনী সেই গভীর নিশীথে, সেই ভাগীরথী-সৈকতে দাঁড়াইল। বসুন্ধরা হাস্যময়ী। আকাশে চন্দ্র-তারা হাসিতেছে, তরঙ্গভঙ্গ-রঙ্গিণী গাঙ্গিনী হাসিতে হাসিতে ছুটিতেছেন, আনন্দ ও হাস্য সর্ব্বত্র, কেবল একটি দুঃখিনী অথচ পবিত্রহৃদয়া, সরলা অথচ নিপীড়িতা সাধ্বী নিরানন্দময়ী। তাহার বদনের কোন স্থানেই হাস্যের রেখা নাই। বাহ্য জগতের হাস্য ও আনন্দে সে তখন নির্লিপ্তা; তাহার সম্মুখবর্ত্তিনী, শশাঙ্কশেখর শিরশোভিনী ঐ গঙ্গার বারিরাশি ভিন্ন আর কোন পদার্থেই তাহার দৃষ্টি নাই। জগৎ নিস্তব্ধ—মানব সুষুপ্ত, কেবল দুঃখিনী আশ্রয়হীনা বিরাজমোহিনী একাকিনী এই নিশীথে গঙ্গাতীরে দণ্ডায়মানা।

বিরাজমোহিনী সেই সৈকত-তীরে দাঁড়াইয়া একবার পতিপদ স্মরণ করিয়া ভক্তি সহকারে প্রণাম করিল। তাহার পর করযোড়ে বলিল, —"মা গঙ্গা, কোথাও এ অভাগিনীর স্থান হইল না। দয়াময়ি! তুমি এ দুঃখিনী কন্যাকে চরণে স্থান দিয়া কৃতার্থ কর মা।"

কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী, প্রফুল্লকুসুমবৎ লাবণ্যময়ী যুবতী ধীরে ধীরে সেই গঙ্গাপ্রবাহে অবতরণ করিল, এবং অচিরে সেই সুবিশাল সলিলরাশির মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

তৎক্ষণাৎ সন্নিহিত এক বটবৃক্ষের সমীপদেশ হইতে এক সুগঠিত কলেবর, বলিষ্ঠ, পুরুষ গঙ্গাপ্রবাহে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। কে এ দেবতা? কোথা হইতে এ অসময়ে এ স্থানে ইঁহার আবির্ভাব হইল?

এতক্ষণে আমাদের উপন্যাসের সূচনা সমাপ্ত হইল। অতঃপর প্রকৃত প্রস্তাবে উপন্যাস আরব্ধ হইবে।

দ্বিতীয় খণ্ড।

—০:৹০:—

"যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্‌
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্‌ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ।"

অর্থ।—কিন্তু যাহারা অসূয়া-পরবশ হইয়া আমার এই মতের অনুসরণ না করে, সেই বিবেকবিহীন সর্ব্বজ্ঞান বিমূঢ় জনগণকে বিনষ্ট জানিবে।

তাৎপর্য্য।—যে সকল মোহান্ধ মনুষ্য স্পর্দ্ধা-সহকারে ভগবানের প্রতিষ্ঠিত সুলভ নিয়মানুসারে সৎপথে বিচরণ না করিয়া অবৈধ কর্ম্মে রত হয়, তাদৃশ অধঃপতিত কাণ্ডজ্ঞানশূন্য ব্যক্তিদিগকে বিনষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিবে।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ৩য় অধ্যায়। ৩২ শ্লোক।
শ্রীমদ্ভগবদুক্তি)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শান্তিপুরের ক্রোশ কয়েক পশ্চিমোত্তরে রাজীবপুর নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে বলিয়া কল্পনা করিতে হইবে। এই সামান্য পল্লীগ্রামের প্রান্তভাগে এক ঘর অতি দরিদ্র তিলির বাস। এই গৃহস্থের সংসারে এক বিধবা গৃহিণী, এক বিধবা কন্যা, এক সধবা বধূ এবং দুইটী ক্ষুদ্র শিশু ভিন্ন আর কেহই ছিল না। তরঙ্গিণীর হৃদয়সখা হারাধন নন্দী এই ভবনের অধিকারী। হারাধন শান্তিপুরে দোকান করেন, ইহাই সর্ব্বত্র প্রচার এবং সেই উপলক্ষে তিনি বারোমাস শান্তিপুরেই থাকেন। ফলতঃ শান্তিপুরে তাঁহার এক দোকান আছে বটে, কিন্তু সে দোকান কদাচিৎ খোলা হয়। তিনি সেখানে যাহা করেন, তাহা পাঠকগণের অবিদিত নাই। তরঙ্গিণীর কৃপায় তাঁহার খাওয়া পরা ও বাবুগিরি চলে। কখন কখন তিনি বাটীতে যৎসামান্য খরচও পাঠাইয়া থাকেন। তাহাতে অতি কষ্টে পরিবারবর্গের ভরণপোষণ নির্ব্বাহিত হয়। বারো মাসই তাঁহার দোকানের ঝঞ্ঝাট, এজন্য বারোমাসই তিনি বাটী আসিতে পারেন না। যদি দৈবাৎ কখন আইসেন, তখন তাহার বাবুগিরি ও ধুমধাম দেখিয়া গ্রামস্থ প্রতিবেশীরা অবাক্ হয় এবং তাহাকে একটা জমিদারের তুল্য ব্যক্তি বলিয়া মনে করে। কিন্তু তিনি চলিয়া গেলে, তাঁহার পরিবারগণ, চিরাভ্যস্ত মলিন ও ছিন্ন বস্ত্র পরিয়া ধান ভানিয়া একবেলা মাত্র খাইয়া, তৈল না মাখিয়া, তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া দিন কাটাইতে থাকেন। হারাধনকে বাবু না বলিলে তিনি হাড়ে চটিয়া যান। সৌভাগ্য ক্রমে হারাধনের গৃহাগমন বর্জিত হাস্যজনক হঠাৎ নবাবীর অভিনয় সতত ঘটে না। হারাধন প্রায়ই বাটী আসিতে পান না—তরঙ্গিণী তাঁহাকে ছাড়িয়া একটি দিনও থাকিতে পারে না।

হারাধনের পরিবারের মধ্যে বিধবা গৃহিণী, তিনিই হারাধনের জননী। বিধবা কন্যাটী হারাধনের ভগ্নী—গিরিবালা। যিনি বধূ, তিনি হারাধনের পত্নী। শিশু দুইটী হারাধনের পুত্র কন্যা। গিরিবালা বাল-বিধবা—অধুনা বয়স সপ্তদশ বর্ষ। গিরিবালা পরমা সুন্দরী, তাহার রূপরাশি নির্দ্দোষ ও উজ্জ্বল; এত দুঃখ দারিদ্র্য ও মনস্তাপ সত্ত্বেও গিরিবালার রূপরাশি যেন উছলিয়া পড়িতেছে। মলিন-বসনা, নিরাভরণা ভোজ্য-বিহীনা গিরিবালা যদি সুখসেবিতা, রত্নালঙ্কার-ভূষিতা হইত, তাহা হইলে তাহার শোভা সংবর্দ্ধিত হইত, কি অপচিত হইত, তাহা বিচার্য্য। বৃদ্ধা মাতার পরিচর্য্যা এবং অপোগণ্ড ভ্রাতৃ-সন্তান-দ্বয়ের লালন পালনই গিরিবালার জীবনের প্রধান কার্য্য। সে দিবারাত্রি প্রধানতঃ এই কার্য্য লইয়াই ব্যাপৃত থাকে; সংসারধর্ম্মের অন্যান্য কর্ম্ম হারধনের স্ত্রী নির্ব্বাহ করেন। গিরিবালার চরিত্রগত কোন কলঙ্কের কথা এ পর্য্যন্ত কাহারও মুখে শুনা যায় নাই।

এই গ্রামের প্রান্তভাগে গ্রাম্য জমিদার মহাশয়ের বাস। জমিদার জাতিতে কায়স্থ। তাঁহার আয় অনেক—বার্ষিক বিশ হাজার টাকার কম নহে। পাড়াগেঁয়ে জমিদার; সুতরাং প্রতাপ, শাসন, ধুমধাম অপরিসীম। যে জমিদার এইরূপ প্রতাপবান্ অর্থাৎ নিতান্ত অত্যাচারী ও উৎপীড়নকারী সর্ব্বত্র তাঁহার বড় সুখ্যাতি শুনিতে পাওয়া যায়। এমন কি, তাঁহার পীড়নে ব্যতিব্যস্ত লোকেরাও তাঁহার কথা উঠিলে, তাঁহার রাজকার্য্যবিশৃঙ্খলার ভূয়সী প্রশংসা করে এবং তাঁহাদের কৃতি-

দাবের প্রবল প্রতাপে বাঘে-বকরিতে এক ঘাটে জল খায় বলিয়া গৌরবে উৎফুল্ল হয়। রাজীবপুরের জমিদার বাবুরা এইরূপ প্রবল প্রতাপান্বিত। শুনিতে পাওয়া যায়, গ্রামের বর্ত্তমান জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় লেখাপড়ায় অদ্বিতীয়। লোকে যতটা বলে ততটা অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য নহে। তবে ছুট বাদ দিয়া বিচার করিলেও, বাস্তবিক সুরেন্দ্র বাবুকে পণ্ডিত না বলিয়া থাকিবার যো নাই। সুরেন্দ্র বাবু ইংরাজিতে স্বচ্ছন্দে কথা কহিতে পারেন, তাহার মধ্যে ব্যাকরণ ঘটিত বা অন্য কোন মারাত্মক ভুল প্রায়ই থাকে না। ইংরাজিতে চিঠিপত্র লিখিতেও তাঁহার স্বতন্ত্র কাগজে মুসবিদা করিতে হয় না। ইংরাজি কাব্য উপন্যাসাদি সাহিত্যের কথা উঠিলে তিনি যেরূপভাবে মতামত ব্যক্ত করেন, তাহাতে তৎসম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃতও তিনি মোটামুটি জানেন এবং অনেক শাস্ত্রাদিরও সংবাদ তিনি রাখেন। শাস্ত্রের বিচার উঠিলে, মুখে মুখে বচন বলিতে না পারিলেও, অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের মর্ম্ম তিনি বলিতে পারেন। বাঙ্গালা সাহিত্যও তাঁহার অপরিজ্ঞাত নহে। বাঙ্গালা ভাষায় পাঠোপযোগী পুস্তক প্রায়ই তিনি পাঠ করিয়াছেন। এক আধবার সখ করিয়া বাঙ্গালা মাসিক পত্রাদিতে দুই একটা প্রবন্ধ তিনি লিখিয়াছেন। তাহার সেই প্রবন্ধের ভাষা ও প্রণালী অনেকের নিকট প্রশংসিত। কিন্তু সুরেন্দ্র বাবুর বিশ্বাস যে, বাঙ্গালা ভাষা নিতান্ত অসম্পূর্ণ, তাহাতে সকল প্রকার ভাব ব্যক্ত করা অসম্ভব, এবং তাহার আলোচনা করা, নিতান্ত অনাবশ্যক। যাহা হউক, সকল দিক বিচার করিয়া, বর্ত্তমান কালের হিসাবে, সুরেন্দ্র বাবুকে সুশিক্ষিত ব্যক্তি বলাই সুসঙ্গত।

সুরেন্দ্র বাবুর বেশভূষা বড় লক্ষ্মী রকম। হয় তো সুশিক্ষার ইহা অবশ্যম্ভাবী ফল। তিনি ইংরাজী কথা কহিতেই বেশী ভাল বাসেন। কোথায় যাইতে হইলে, হাপ বুট, হাপ হোজ, টাউজার, প্যান্টালুন, সার্ট, ওয়েসটকোট, কোট কলার এবং হ্যাট প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর পরিচ্ছদে তিনি অঙ্গাবরণ করিয়া থাকেন। তামাক তিনি খান—কিন্তু দেশী হুকা কলিকা ও গুড়ুক তাঁহার চক্ষুশূল। তিনি ম্যানিলা বা হ্যাভানা সিগার সেবন করেন। স্নান তিনি করেন, কিন্তু তেল মাখিয়া কলুর ঘানি হইতে বাহির হওয়া বড়ই লজ্জার বিষয় বলিয়া তিনি মনে করেন। পিয়ার্স বা রিমেলের সোপ মাখিয়া থাকেন। খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে তিনি সামাজিক শাসন বড় গ্রাহ্য করেন না। বাদশাহের জাতি কর্ত্তৃক প্রস্তুতীকৃত গ্রাম্য কুক্কুটের পলাণ্ডু গন্ধামোদিত মাংস তাঁহার বড় প্রিয় খাদ্য। আরও অধিক দূর তিনি অগ্রসর হন কি না, তাহা আমরা বলিব না। আতর গোলাপ তাঁহার বড়ই বিরক্তিজনক; এজন্য তিনি ক্রাউন পারফিউমারি কোম্পানির ল্যাভেণ্ডার এবং ফরাসি ইওডিকলোন প্রভৃতি সামগ্রী ব্যবহার করেন। স্বাস্থ্যের অনুরোধে তিনি একটু একটু হুইস্কি পান করিয়া থাকেন, ইহাও জানি।

সুরেন্দ্র বাবুর ধর্ম্ম-মত কি, তাহা বড় বুঝা যায় না। তিনি ঠাকুর-দেবতার মন্দিরে প্রণাম করেন না; বাটীতে দুর্গোৎসব হয়, সুরেন্দ্র বাবু কিন্তু শান্তির জলও লন না। প্রতিমাকে প্রণামও করেন না। ব্রাহ্মণ-সজ্জনকেও কখন তিনি প্রণাম করিতেছেন, এমন দেখি নাই। রামায়ণ মহাভারতাদিকে তিনি গাঁজাখুরি গল্প বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। শ্রীকৃষ্ণ, শিবদুর্গা প্রভৃতি দেবতাকে তিনি

মূর্খের কল্পিত দেবতা বলিয়া ব্যক্ত করেন এবং তৎসম্বন্ধে অশেষ পরিহাস করেন। বেদ-শাস্ত্রকে তিনি মদ্যপায়িগণের উক্তি বোধে অশ্রদ্ধা করেন। দর্শন শাস্ত্রসমূহকে তিনি অর্থবিহীন ঢেঁকির কচকচি বলিয়া অগ্রাহ্য করেন। লোক, অন্য ধর্ম্মে আস্থাবান্ হইলেও হিন্দুর চক্ষুতে নাস্তিক। কিন্তু ইংরাজী নাস্তিকতার অর্থ অন্যরূপ হিসাবে। যিনি ঈশ্বর নাই বলেন, ইংরাজি-মতে তিনিই নাস্তিক। যাঁহার মতে তৎসম্বন্ধে সন্দেহ আছে, ইংরাজি-মতে তিনি নাস্তিক নহেন—তিনি সন্দেহবাদী (স্কেপটিক)। ইংরাজি দর্শনে এমনও দেখা যায় যে, কেহ কেহ ঈশ্বর স্বীকার করেন কিন্তু তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা স্বীকার করেন না। জ্ঞেয় ও অজ্ঞেয় (নোয়েবল এবং অন্‌নোয়েবেল) ইহারও বিচার ইংরাজিতে আছে। সুতরাং ইংরাজি চিন্তাশীলগণের মতের আলোচনায় আমাদের কাজ নাই। সুরেন্দ্র বাবুকে কেহ কখন গির্জ্জায় যাইতে দেখেন নাই। ব্রাহ্মসমাজে গিয়া তিনি কখন নয়ন মুদ্রিত করিতেন কি না, তৎসম্বন্ধেও কোন প্রমাণ নাই। অতএব বোধ করি, সুরেন্দ্র বাবুকে পূর্ণমাত্রায় নাস্তিক বলিলেও বিশেষ অপরাধ হইবে না।

সুরেন্দ্র বাবুর অন্যান্য মতের আলোচনা করিলে, তাঁহার ধর্ম্মমত কতকটা বুঝা যাইতে পারে। দান-ধ্যান তাঁহার কখন দেখা যাইত না। তিনি দরিদ্রের দুঃখ, পীড়িতের যাতনা প্রভৃতি ব্যাপার দেখিয়া তৎসমস্ত তাহাদের অবিবেচনার ফল বলিয়া উড়াইয়া দিতেন। যাহার আয় অল্প তাহাকে বিবাহ করিতে দেখিলে, ম্যাল্‌থসের থিয়রি শুনাইয়া দিতেন, এবং শ্রীমতী এনিবেসান্টের (এখন এনিবে-থিয়সফিষ্ট অর্থাৎ ইংরাজী যোগী হইয়া-ছেন, ইহা পাঠকেরা স্মরণ রাখিবেন।) মতানুসরণ করিয়া চলিতে উপদেশ দিতেন। তাঁহার সম্মুখে শিশু সন্তান লইয়া ভিখারিণী চক্ষের জল ফেলিতেছে দেখিয়াও তিনি সেদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া আকণ্ঠ পোলাও খাইয়া উদ্গার তুলিতেন; এবং বৃদ্ধ ব্যক্তি একখানি কম্বলের অভাবে শীতে মরিতেছে দেখিয়াও, তিনি সানন্দে ফ্লানেলের টাইট কোর্টের উপর সার্জ্জের অলষ্টর আঁটিয়া ঘাম ছুটাইতেন। বলিতেন, জগতে দুঃখ অনন্ত—অপ্রতিবিধেয়—অপরিহার্য্য। একজনের দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করা, এক কলসী জল তুলিয়া সমুদ্র শুখাইবার চেষ্টা করার ন্যায়, নিতান্ত হাস্যজনক। তিনি আপনাকে আপনি বড় ভাল বাসিতেন। সেল্‌ফ অর্থাৎ আত্ম নামক পদার্থটা তাঁহার বড় প্রিয়। তিনি আত্মসন্তোষ, আত্মতৃপ্তি, এবং আত্মভোগই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর বলিয়া জ্ঞান করিতেন। বলিতেন, জগৎ যে আছে, সে কেবল আমি আছি বলিয়া। বাহ্যজগতের অস্তিত্ব, বাহ্যজগতে নহে—আমার মনে। আমি ভোগ করিতেছি, ভোগ করিয়া আসিয়াছি, এবং ভোগ করিবার আশা করি বলিয়াই প্রত্যেক পদার্থ আমার চক্ষু সমক্ষে বিরাজিত ও বিদ্যমান। আমি না থাকিলে এই সকল পদার্থ এইরূপ ভাবে থাকিবে কি না, কে জানে? থাকে না থাকে, তাহার সহিত আমার সম্বন্ধ কি? এই ভোগটাই যথার্থ, তদ্ভিন্ন সমস্তই অযথার্থ। সুতরাং সুরেন্দ্র বাবু বাসনানুরূপ আত্মভোগে কোন সময়েই পশ্চাৎপদ হইতেন না।

সুরেন্দ্র বাবুর এই অদ্ভুত মত সম্পূর্ণ নূতন বা তাঁহার মনঃকল্পিত ও ভিত্তিবিহীন নহে। বার্ক্লে নামক ইংলণ্ডীয় দার্শনিকের জড়বাদ এবং এপিকিউরিয়াস্ নামক গ্রীকদার্শনিক-

পণের সুখবাদের অত্যাশ্চর্য্য সংমিশ্রণে সুরেন্দ্র বাবুর এই অত্যদ্ভুত মতের উৎপত্তি হইয়াছিল। ইহার সহিত যে আর কোন কোন অপূর্ব্ব মত মিশিয়া যায় নাই, এমন নহে। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের ধর্ম্ম-মত অর্থাৎ তাঁহার 'থি, এসেস্ অন রিলিজিয়ান' এবং তাঁহার 'ইউটীলিটেরিয়ানিজম্' অর্থাৎ হিতবাদের কোন কোন ভাব সুরেন্দ্র বাবুর ধর্ম্মমতের অভ্যন্তর হইতে কখন মাথা বাড়াইতে দেখা যায়। ফলতঃ সুরেন্দ্র বাবুর ধর্ম্মমত 'কেট কেট গরম' বিশেষ ; ইহাতে ঘি আছে, মিছরি আছে, সুজি আছে, মরিচ আছে—জল নাই। নানা স্থান হইতে সংগৃহীত নানাপ্রকার মত ইচ্ছামত কাটিয়া ঝুড়িয়া, ছাটিয়া এবং তাহার সহিত আপনার মত কিছু কিছু মিশাইয়া, সুরেন্দ্র বাবু এই অত্যদ্ভুত খিচুড়ী বানাইয়াছেন। সুরেন্দ্র বাবু যে ইংরাজিতে যথেষ্ট কৃতবিদ্য হইয়াছেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

সুরেন্দ্র বাবু বিবাহিত পুরুষ। তাঁহার একটি পুত্র সন্তান হইয়াছে। ছেলেটি দেড় বছরের—স্ত্রীর বয়স প্রায় কুড়ি। সুরেন্দ্র বাবু কলিকাতায় থাকেন, কদাচ বাটী আসিলে স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। স্ত্রী-পুত্র-সম্বন্ধেও সুরেন্দ্র বাবুর মত অদ্ভুত। তিনি বলেন, তাহারা আমার—এই ভাবটাই সুখের। তাহারা সুখসাধক বস্তু ভিন্ন আর কিছুই নহে ; সুতরাং প্রয়োজন-ব্যতীত তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতার আবশ্যকতা নাই। তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া বা বুকে করিয়া ফিরিবার কোন দরকার নাই। যেহেতু, তাহারা যে ভাবে যেখানেই থাক, আমারই থাকিবে। সংসারে যত বস্তু আমার হইবে, ততই সন্তোষের বৃদ্ধি হইবে। সুরেন্দ্র বাবুর দাম্পত্যপ্রেম ও অপত্য-স্নেহের পরিচয় তাঁহার এই মতেই প্রকাশ। সুরেন্দ্র বাবুর উচ্চশিক্ষা সার্থক।

অধিকার-মাত্রেই শক্তি সম্ভূত ; এই মত সুরেন্দ্র বাবু অনেক স্থলেই প্রয়োগ করেন। তিনি বলেন, আমি যদি ইন্দ্রিয়াসক্ত স্বেচ্ছাচারী হই, তাহাতে আমার স্ত্রীর আপত্তি করিবার কোন কারণ নাই ; কারণ শক্তি, সামর্থ্য পদ ও মানে তাঁহার অপেক্ষা আমি বড়। তিনি ছোট, আমি বড়—তিনি দুর্ব্বল, আমি সবল—তিনি অধীন, আমি প্রভু। তিনি ব্যভিচারিণী হইলে আমি তাঁহার যথোচিত দণ্ড দিব ; যেহেতু, তাঁহার তাদৃশ ব্যবহারে তাঁহার দেহের উপর আমার যে আধিপত্য ছিল, তাহার অন্যথা ঘটিতেছে। তিনি আমার সম্পত্তি—আমি নিজ সম্পত্তি এক মুহূর্ত্তের জন্যও হস্তান্তরিত হইতে দিব কেন? আমি তাঁহার সম্পত্তি নহি—আমি যাহা কেন করি না, তিনি তাহাতে কথা কহিবার কে? বলবান্ দুর্ব্বলকে দখলে রাখাই জগতের নিয়ম। আমাদের ভারতবর্ষ, আমাদের দেশ—চিরদিন আমাদেরই ছিল। কোথা হইতে মাসিডনের অলেক্জণ্ডর ইহা দখল করিতে আসিলেন। তাঁহার দলিল কি? জোর। তাহার পর পাঠানেরা মালিক হইলেন। কেন? জোর। তাহার পর মোগলেরা এ দেশের বুক জুড়িয়া বসিলেন। অপরাধ? জোর। আর এখন ইংরাজেরা এদেশ মারিয়া লইয়া সুখের রাজত্ব বসাইয়াছেন। কারণ কি? জোর। ইতিহাস তো কাহাকেও নিন্দা করে না, বরং এবংবিধ পরস্বাপহারীর বীরত্বেরই পূজা করে। সুতরাং দৈহিক শক্তি বা বল-প্রভাবে দুর্ব্বলকে অধীন করাই সাধুসঙ্গত সুব্যবস্থা। অতএব বলিতে হইবে, তত্ত্বদর্শে

সুরেন্দ্র বাবু হোয়টলে, হেমিল্‌টন, বেন, মিল, জেভনস্‌ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের লজিক শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছিলেন।

সুরেন্দ্র বাবু বিজ্ঞানের বড় ভক্ত। ইংরাজি বিজ্ঞানশাস্ত্রের বহু বিষয় তিনি আলোচনা করিয়াছেন। পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন, চিকিৎসা ও শারীরবিদ্যা, তাপশাস্ত্র ও তাড়িততত্ত্ব তিনি বিশেষ করিয়া আলোচনা করেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-শাস্ত্রকে তিনি জগতের সার সম্পত্তি ও জ্ঞানরাজ্যের পরমধন বলিয়া মনে করেন। কেবল মনোবিজ্ঞান শাস্ত্র অর্থাৎ মেটাফিজিকস্‌ সাইকলজি প্রভৃতি মেণ্টাল সায়ান্সের প্রকার ভেদ—সমূহ তাঁহার মতে অনর্থক বাগাড়ম্বর মাত্র। তৎসমস্ত অধ্যয়নে সময়হানি ভিন্ন কোন লাভ নাই। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য অধ্যাপকগণকে তিনি ভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন। সুতরাং কেবল এই বিষয়েই তাঁহার নিকট পাশ্চাত্য অধ্যাপকেরা হীনপদস্থ। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের অঙ্গীভূত লজিক শাস্ত্রকে তিনি প্রয়োজনীয় বলিয়া জ্ঞান করেন। তিনি বলেন লজিকের গোলকধাঁধায় ফেলিয়া হয়কে নয় করিবার বড় সুবিধা, অতএব লজিক অবশ্য আলোচ্য ও অতি প্রয়োজনীয় শাস্ত্র।

সুরেন্দ্র বাবু বলেন, বিজ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধির সহিত উত্তরোত্তর জগতের কতই শ্রীবৃদ্ধি হইবে তাহা ভাবিয়া শেষ করা যায় না। বিজ্ঞানের অত্যুন্নতি অবশ্যই কালে হইবে। বিজ্ঞান-বলে জগতে জরা-মরণ থাকিবে না, যৌবনটা চিরদিনই বাঁধিয়া রাখা যাইবে, চুল পাকিবে না, দাঁত পড়িবে না, মৃত্যু হইবে না; যদি হয়, তবে ইচ্ছামৃত্যু হইবে, ইচ্ছাগামী রথ হইবে, সত গাছ পুঁতিয়া সত্যই তাহার ফল খাওয়া যাইবে, স্ত্রী-পুরুষে দেখাসাক্ষাৎ না থাকিলেও যন্ত্র-সাহায্যে সন্তান হইবে, মূল পদার্থ অর্থাৎ এলিমেণ্টসের রাসায়নিক সংযোগ-বিয়োগে এরূপ খাদ্য প্রস্তুত হইবে যে তাহাতে কৃষিকর্ম্মের আবশ্যকতা থাকিবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক বিস্ময়জনক ব্যাপার কালে ঘটিবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন। এ সকল আপাততঃ হাস্যজনক বলিয়া কেহ বিবেচনা করিলে, তিনি বলিয়া থাকেন, মনুষ্য চিরদিনই এইরূপ অবিশ্বাসী। প্রত্যক্ষ ব্যাপার ভিন্ন বিজ্ঞান-মূর্খ মানবেরা কিছুই প্রণিধান করিতে পারে না। যখন রেলওয়ে টেলিগ্রাফ প্রভৃতি বিজ্ঞানের সামান্য সামান্য আবিষ্কারের কথা উঠিয়াছে, তখনও মূর্খেরা এইরূপে হাসিয়াছে এবং বিদ্রূপ করিয়াছে। তাহাদের হাস্য-পরিহাস চিরদিনই আছে। বিজ্ঞান বিদ্রূপবাণে মরিয়া যায় নাই—কখনও যাইবে না। প্রাচীন আর্য্যগণের পুষ্পরথ, ইচ্ছামৃত্যু, সহস্র বর্ষ পরমায়ু, প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করিয়া তিনি বলেন, এই সকল বিষয় বিচার করিয়া পূর্ব্বকালে ভারতে অত্যুন্নতি হইয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস হয়, কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই; বিশেষতঃ তাহাদের ধর্ম্ম, এবং বহুবাহু, বহুবদন ও বহুনেত্রযুক্ত দেবতা দেখিয়া, তাহাদিগকে মানসিক উন্নতিবিহীন অতি বর্ব্বর ভিন্ন আর কিছুই মনে করা যায় না। ফলতঃ সুরেন্দ্র বাবুর জ্ঞান সর্ব্বতোমুখী বলিতে হইবে।

সুরেন্দ্র বাবু সতত কলিকাতায় থাকেন। সম্প্রতি তাঁহার পিতার মৃত্যু হওয়ায় শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বাটী আসিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধাদি নির্ব্বাহ করিয়া তিনি পুনরায় কলিকাতায় গিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনিই বিষয়ের মালিক—বিষয়কর্ম্ম স্বয়ং না দেখিলে চলে না। কাজেই তাঁহাকে আবার বাড়ী আসিতে হইয়াছে। দুই মাস কাল নিয়ত তিনি বাটীতেই আছেন।

এই সুরেন্দ্র বাবু প্রায়ই সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে অশ্বারোহণে বায়ু-সেবনার্থ বাহির হন। গ্রাম অতি কদর্য্য, তাহাতে বগিফীটন্ চলিবার পথ নাই। তিনি বাহির হইলে, ছেলে পিলে, মেয়ে-পুরুষ সকলেই তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত, পথের পাশে ধাইয়া আইসে। একে তিনি জমিদার তাহাতে তাঁহার প্রকাণ্ড সাদা ঘোড়া, তাহার উপর তাঁহার অত্যদ্ভুত সাজ-সরঞ্জাম ও বেশ-ভূষা—সকলই তাহাদের বিস্ময়-জনক। আজি সুরেন্দ্র বাবু হারাধন নন্দীর বাটীর পাশ দিয়া অশ্বারোহণে হাওয়া খাইতে চলিয়াছেন। তাঁহার অশ্বের পদধ্বনি শুনিয়া হারাধনের মা ও গিরিবালা বাহিরে আসিল। গিরিবালা গাঁয়ের মেয়ে, সুতরাং একটু লজ্জা কম। গিরিবালার কোলে তাহার ভাইপো। তাড়াতাড়ি আসিতে হইতেছে, এজন্য বড় আলু-থালু বেশে গিরিবালা বাহিরে আসিয়াছে। তাহার আগুল্ফলম্বিত কেশরাশি অবেণীসংবদ্ধ—তাহার বস্ত্র একটু স্থানভ্রষ্ট, অঞ্চলাগ্র ভূলুণ্ঠিত। সমুজ্জ্বল নয়ন উৎসাহ ও কৌতূহল হেতু আয়ত ও প্রদীপ্ত। গিরিবালা কিয়দ্দূর আসিয়াই অশ্ব ও অশ্বারোহীকে দেখিতে পাইয়া আর পা বাড়াইল না। এক পা যেমন বাড়াইয়া ছিল, তাহা তেমনই থাকিল। গিরিবালা তখন ভুবনমোহিনী। এই শোভাময়ী সুন্দরী অশ্বাসীন সুরেন্দ্র বাবুর চক্ষুতে পড়িল। বলা বাহুল্য, তিনি মোহিত হইলেন। অশ্ব চলিতে লাগিল; কিন্তু সুরেন্দ্র বাবুর দৃষ্টি আর কোন দিকে ফিরিল না। অশ্ব অনেক দূরে গেলে, যখন গিরিবালাকে দেখার সম্ভাবনা তিরোহিত হইল, তখন সুরেন্দ্র অশ্ব ফিরাইলেন—পুনর্ব্বার গিরিবালার রূপরাশি তাঁহার নয়নে পড়িল। অশ্ববল্গা সংযত করিয়া ধীরেধীরে গিরিবালার রূপসুধা পান করিতে করিতে সুরেন্দ্রনাথ গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেদিন সুরেন্দ্র বাবুর আর বায়ুসেবন হইল না। তিনি বৈঠকখানায় আসিয়া ডাকিলেন, —"মধু—মধু!"

করযোড়ে ঝটিতি মধু খানসামা বাবুর সম্মুখস্থ হইলে, তিনি আজ্ঞা করিলেন,—"বামা মালিনীকে এখনই ডাকিয়া আন্।"

মধু চলিয়া গেল। সর্ব্বনাশের বীজ রোপিত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তিন দিন কাটিয়া গেল। ইহারই মধ্যে কি করিয়া কি হইল জানি না,—গিরিবালা কিন্তু আজি সুরেন্দ্র বাবুর বৈঠকখানায়। গিরিবালার ভাব দেখিয়া সে যে দায়ে পড়িয়া আসিয়াছে, বা তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া আনা হইয়াছে, এরূপ বুঝা যায় না। মনুর আমলে আট প্রকার বিবাহ চলিত ছিল; তাহার মধ্যে রাক্ষস ও পৈশাচ দুই রকম। সুরেন্দ্র বাবু এই আর্য্যধর্ম্মবিলুপ্ত দেশে, শেষোক্ত দুই রকম বিবাহও চালাইবার জন্য কয়েক বার পথ দেখাইয়াছেন। বর্ত্তমানকালে একদল কৃতবিদ্য, পুরাতন ধর্ম্ম ও আচার-ব্যবহার ইংরাজিমতে মাজিয়া ঘসিয়া পুনরায় বাহাল করিবার চেষ্টায় আছেন—অবশ্য নাম কিনিবার জন্য। তাঁহাদের একদল স্তাবক অর্থাৎ গোঁড়া আছে। স্তাবক নহিলে কাজের জুত বাঁধে না। কবির দলেও এই প্রকার গোঁড়া থাকিত। তাহারা বুঝুক্ না বুঝুক, বাহবা দিয়া বেশ মাথায় করিত। যে দলের গোঁড়া

বেশী থাকিত ও গলাবাজিতে বিশেষ পটু হইত, সেই দলই প্রায়ই জিতিয়া যাইত। কিন্তু শেষ টিকিত কি না সেটা বড় সন্দেহের বিষয়। গোঁড়ারা প্রায়ই কিছু প্রত্যাশী। যে বলিয়াছিল যে, আমি আলুরও চাকর নহি, পটলেরও চাকর নহি, চাকর হুজুরের—সুতরাং হুজুর যাহা ভাল বলিবেন, তাহাই ভাল, সে গোঁড়া বড় বেকুব—কিন্তু কথাটা বড় ঠিক বলিয়াছিল। এখনকার কালের লোকও শক্ত —তাহাদের গোঁড়াও শক্ত। এখনকার গোঁড়ারা, উচিত হউক, অনুচিত হউক, যাহাকে খুব বাড়িতে দেখে এবং বুঝে যে, সে নামিবার যোগ্য হইলেও তাহাকে সহজে নামান যাইবে না, আর তাহার বাক্যে তাহার অনুগ্রহে অনেক উপকার হইবে, তাহারই গোঁড়ামি করিতে আরম্ভ করে। সে গোঁড়ামিও বেশ কায়দা-মাখা। সে গোঁড়ামি এমনই তেল মাখান যে, ধরিতে গেলেই ফস্কাইয়া যাইবে। এ গোঁড়ামির একটা প্রধান সুখ এই যে, যাহার গোঁড়ামি করা যায়, সে আবার গোঁড়াদের মর্য্যাদা বড় বাড়াইয়া দেয়। গোঁড়াদের বড়লোক খাড়া করিতে পারিলে যাহার গোঁড়ামি করা যায়, সে খুব বড় লোক হইয়া পড়ে। গোঁড়ারাও খুব বড়লোকের সুখ্যাতি পাইয়া মনুমেণ্টের মত না হউক, অন্ততঃ লাল গির্জ্জার মত বড় হইয়া উঠে। ইংরাজীতে ইহাকে মিউচুয়াল এডমিরেসন্ বলে। ইহার মূল্য কি, ইংরাজেরা বেশ জানেন। আমরা ইংরাজের নিকট হইতে 'মিউচুয়াল এডমিরেসন্ শিখিয়াছি,' কিন্তু ইহার মূল্য শিখিতে পারিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না। যাগা হউক বর্ত্তমান কালের গিল্টি করা হিন্দু-ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণকে গোঁড়ারা 'রিভাইভালিষ্ট' অর্থাৎ পুনঃপ্রবর্ত্তক নাম দিয়াছেন। সুরেন্দ্র নাথ, মনুর মতে যেরূপভাবে দুইচারিবার আসুর ও পৈশাচ বিবাহ স্বয়ং প্রাকটিকালি অর্থাৎ হাতেকলমে চালাইয়া আসিয়াছেন, তাহাতে তিনি গোঁড়াদের দ্বারা 'রিভাইভালিষ্ট-গণের' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসনে সংস্থাপিত হইবার যোগ্য। সুরেন্দ্র বাবু যেরূপ অর্থশালী ও সুশিক্ষিত লোক, তাহাতে তাঁহার চারিদিকে বিস্তর গোঁড়া লাগিবার সম্ভাবনা ছিল। হায়! ধর্ম্মের সুমর্ম্মজ্ঞ অভাগা সুরেন্দ্রনাথ, কেন তুমি দলে না মিশিয়া হেলায় এই প্রতিপত্তির সুযোগ হারাইলে?

গিরিবালা ইচ্ছার সহিত সুরেন্দ্র বাবুর বৈঠকখানায় আসিয়াছে। তাহার প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার বা তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন প্রকার বল প্রয়োগ করিতে হয় নাই। তাহার ইচ্ছাটি কিন্তু আপনি হয় নাই—এটুকু তৈয়ার করিবার জন্য সুরেন্দ্র বাবুর বামা মালিনীকে একটু বেগ পাইতে হইয়াছে। বামা অনেক সুকৌশলে, আবশ্যকমত অনেক ছিটা-ফোঁটা লাগাইয়া, গিরিবালার মতি ফিরিইয়াছে। সে এ শাস্ত্রে বড় সুপণ্ডিতা।

হায় লোভ! হায় সুখের আশা! তোমরা এ সংসারে নিরন্তর কত অঘটনই না ঘটাইতেছ। তোমাদেরই হাতে পড়িয়া শূর্পণখা নাক কাণ হারাইয়াছেন, রাবণ সবংশে মরিয়াছেন, ইন্দ্র সহস্র-লোচন হইয়াছেন, চন্দ্র কলঙ্কী হইয়াছেন, আকবর বাদশাহ চোরের অধীন হইয়াছেন, বিধবা মেহরুন্নিসা নুরজাহাঁন হইয়াছেন, স্কটের রাণী মেরী মাথা হারাইয়াছেন, রোমের টাকুইন্স মারা পড়িয়াছেন, পৃথিবী জুড়িয়া কত অনর্থই না ঘটিয়াছে। তবে আর বেচারা গিরিবালার এত কি দোষ? সংসারের মহৎ অমহৎ অগণ্য লোকই যদি লোভের হাত না ছা[illegible] পড়িয়া থাকে, যদি এত

লোক অধিক সুখ, অধিক ভোগ এবং অধিক বিলাসের আশায় দিশাহারা হইয়া থাকেন, তবে বালিকা গিরিবালা ঐ সাগরে ঝাপ দিবে, ইহা বড় আশ্চর্য্য কথা নহে।

ফলতঃ ব'মার অব্যর্থ সন্ধানে গিরিবালা-হরিণী বিদ্ধ হইল। তাহার পর সে সুরেন্দ্র বাবুর বৈঠকখানায়। এ পাপ পঙ্কিল ব্যাপারের অন্যান্য অংশ আমরা চিত্রিত করিব না। গিরিবালা বড় আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিল। পাপের পথ বড় ক্রমনিম্ন ও অতিশয় পিচ্ছিল। একবার অসাবধানে নীচের দিকে পা ফলিলে আর রক্ষা নাই। বিশেষ বলবান্ ব্যক্তি, ভিন্ন সে পিচ্ছিল পথ হইতে কেহই উঠিয়া আসিতে পারে না; সকলকেই উত্তরোত্তর অধিকতর অধোগতির পথে নামিয়া অচিরে সমাজকলঙ্ক অতি জঘন্য জীব হইয়া উঠিতে হয়। পাপের পথের প্রথম ভাগটা সুরভিকুসুমাকীর্ণ, অতি মনোহর। সে পথে বেড়াইবার লোভ সংবরণ করা বড়ই কঠিন। লোভের বশবর্ত্তী হইয়া যে একবার সে পথে পা দেয়, সে উজ্জ্বল আনন্দের মদিরায় প্রমত্ত হইয়া উঠে, এবং কোন প্রতিবন্ধক গ্রাহ্য না করিয়া সেই পথে বিচরণ করিতে করিতে শেষ সীমায় উপস্থিত না হইয়া ক্ষান্ত হয় না। শেষে যে জীবনান্ত-কর কণ্টকাকীর্ণ ঘোরারণ্য এবং অনন্ত বিষধরের অগণ্য দংশন, তাহা কেহ একবার ভাবেও না। গিরিবালা এখন অতি লোভে পাপের পথে পদার্পণ করিয়াছে। অতি আনন্দ-বিধায়ক কুসুম-সৌরভে তাহার প্রাণমন পূরিয়া গিয়াছে; অপূর্ব্ব আনন্দে তাহার মস্তিষ্ক প্রমত্ত হইয়াছে, সে এখন অননুভূতপূর্ব্ব সুখোপভোগ করিয়া আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতেছে।

যাও গিরিবালা! হাসিতে হাসিতে পাপীয়সী, এই আপাতমনোহর পথে নামিতে থাক। কিন্তু ওকি!—তুমি অত ব্যস্ত কেন? এই সুখময় আনন্দময় পথে অগ্রসর হইবার জন্য তোমার ব্যস্ততার প্রয়োজন নাই—আপনিই উত্তরোত্তর তোমার সুখসমূহ তোমাকে চেষ্টা করিয়া সবলে টানিয়া লইয়া যাইবে এবং তোমার পরি-গৃহীত পন্থার শেষ সীমায় উপনীত করিয়া দিবে। কিন্তু হায়! তখন কি হইবে, তাহা একবারও তোমার মনে হইতেছে কি? তখন অনন্ত যন্ত্রণা তোমার সহচর, জীবন্ত নরক তোমার নিয়তি হইবে। অবিরত রোদন, নিরন্তর আর্ত্তনাদ, অবিশ্রান্ত চীৎকার, তখন তোমার অপরিহার্য্য অবলম্বন হইবে। আর তোমার ফিরিবার সামর্থ্য নাই। তুমি ক্ষুদ্রহৃদয়া বালিকা—

ফিরিবার মত বল তোমার হৃদয়ে নাই। কিন্তু, তুমি এত ব্যস্ত কেন? অচিরে সকল সুখ আয়ত্ত করিবার জন্য তোমার এত আকিঞ্চন কেন? ধীরে ধীরে, একটু দেখিয়া শুনিয়া, পা বাড়াইলে চলিত না কি? ওকি!—তোমার চক্ষু রক্তবর্ণ কেন, রাক্ষসি? তোমার পা টলিতেছে কেন, অভাগিনি? তোমার বাক্য জড়তাপূর্ণ অসংবদ্ধ কেন, পাপীয়সি? বুঝিয়াছি, তুমি প্রাণনাথ সুরেন্দ্র বাবুর হুইস্কির প্রসাদ পাইতে শিখিয়াছ। ইহারই মধ্যে, এই দশ বারো দিনের মধ্যেই, যখন তুমি এত দূর আসিতে পারিয়াছ, তখন তোমার সর্ব্বনাশ অতি সন্নিকট। যাও মূঢ়ে, জীবন্ত নরকের দাবানলে পুড়িবার জন্য প্রাণকে প্রস্তুত করিয়া রাখ। তোমার সম্মুখে ঐ কাল বিষধর ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে—এখনই দংশন করিয়া অসহ্য যাতনায় তোমার তাবৎ সুখের আলোক নিভাইয়া দিবে, তোমাকে জীবন্মৃত করিবে; কিন্তু মৃত্যু হইবে না—সে অনন্ত অবক্তব্য

অচিন্তনীয় যাতনা ভোগ করার অপেক্ষা মৃত্যুর জন্য তুমি সকাতরভাবে কতই প্রার্থনা করিবে, কিন্তু মৃত্যুও তখন তোমার উদ্ধারার্থ উপস্থিত হইবে না। কেন অভাগিনি! পূর্ব্বে মরিতে পার নাই? কেন গিরিবালা! এই নরকে ডুবিবার পূর্ব্বে তোমার জীবনান্ত হয় নাই?

এইরূপই চলিতে লাগিল গিরিবালা সুরেন্দ্র বাবুর বৈঠকখানায় নিত্য যাতায়াত করিতে লাগিল। পোড়া পরশ্রীকাতর লোকে এ কথা কহিতে লাগিল। কিন্তু গিরিবালার প্রথমে লোকনিন্দার যে ভয় ছিল, এখন আর সে ভয় নাই। এখন লোকে এ কথা কহিতেছে শুনিয়া, গিরিবালা সগৌরবে হাসে। যাহাদের দেখিলে গিরিবালা মুখ হেঁট করিবে ভাবা গিয়াছিল, তাহাদের দেখিলে সে এখন বুক ফুলাইয়া দাঁড়ায়। একদিন, গিরিবালা মদ খাইয়া ঢলাঢলি করিয়াছিল, এবং সম্পর্কিত এক খুড়ার সহিত মুখোমুখি করিয়া বড় ঝগড়া করিয়াছিল। কথাটা নিতান্ত লজ্জাজনক হইলেও গিরিবালা গৌরবাত্মক বলিয়াই স্থির করিয়া লইল। গিরিবালা, সোণার বালা হাতে দিয়া, সিমলার কাপড় পরিয়া, কাণে মাকড়ি ঝুলাইয়া. মদ খাইতে থাকিল ও প্রতিদিন সুরেন্দ্র বাবুর বৈঠকখানায় যাতায়াত করিতে লাগিল। আরও মাস দুই তিন এইরূপে কাটিয়া গেল। সুরেন্দ্র বাবুর প্রবল প্রতাপ। তথাপি লোকে হারাধন নন্দীর পরিবারবর্গের সহিত আহার-ব্যবহার বন্ধ করিল। গ্রামের অধিকাংশ লোকই নিঃস্ব; সুতরাং খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার খুব কম। কাজেই এ কথাটা লইয়া আপাততঃ বড় গোল হইল না। গিরিবালা তখন পূর্ণবেগে পাপের পথে চলিয়াছে। অতএব এ সামাজিক শাসন সে ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিল; কিন্তু স্পর্দ্ধিত লোকগুলার উপর তাহার বড় রাগ হইল। সে তাহাদিগকে দণ্ডিত করিবার অভিপ্রায়ে একদিন সুরেন্দ্র বাবুকে সমস্ত কথা জানাইয়া প্রতিকারের জন্য সাগ্রহে অনুরোধ করিল। সমস্ত কথা শুনিয়া সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন, "তোমার অনুরোধ রক্ষা না করিলে আমার কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু গিরিবালা, প্রাণেশ্বরি, তোমার এই অনুরোধটি নিতান্ত বিধানবিরুদ্ধ। কেন, বুঝাইয়া দিই। ডাক্তার পার্কস্ সাহেবের স্বাস্থ্য-তত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থ 'হাইজিন' অর্থাৎ স্বাস্থ্য শাস্ত্রসম্বন্ধে সর্ব্বপ্রধান পুস্তক—তিনি সেই গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, গুরুভোজনের তুল্য স্বাস্থ্য-বিরোধী কার্য্য আর কিছুই নাই। নিমন্ত্রণে ভোজন করিলে, নানাবিধ আয়োজন হেতু বিশেষতঃ অন্যায় অনুরোধে পড়িয়া লোকের গুরুভোজন ঘটে; তাহাতে সর্ব্বপ্রধান সম্পত্তি শরীরের বিরুদ্ধে অতিশয় অত্যাচার করা হয়। হিন্দুরা বলেন, 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।' অতএব গিরিবালা, যাহাতে শরীর সুরক্ষিত না হয়, সে কর্ম্ম নিতান্ত অন্যায়। এরূপ আহার করিলে অতি ভয়ানক দোষ হয়, তাহা চিকিৎসক-শ্রীযুক্ত সার্জ্জন মেজর ধর্ম্মদাস বসু মহাশয় তাঁহার 'স্বাস্থ্যরক্ষা ও সাধারণ স্বাস্থ্যতত্ত্ব' নামক গ্রন্থে স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গিরিবালা, তোমরা আমার পরমাত্মীয় এবং তোমাদিগের ইষ্টানিষ্টের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এরূপ স্থলে তোমাদের নিমন্ত্রণ খাওয়া বন্ধ করিতে পরামর্শ দেওয়াই আমার কর্ত্তব্য। যখন সমাজ আপনিই তোমাদের এই বিপদ হইতে মুক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন তাহার বিরুদ্ধাচরণ করা আমার পক্ষে কদাচ কর্ত্তব্য নহে।"

হরিবোল হরি! গ্রামের পোড়ারমুখো ও পোড়ারমুখীদের মাথায় জুতা মারিয়া গিরিবালা মনের রাগ মিটাইবে ভাবিয়াছিল, তাহার সফলতা হওয়া দূরে থাকুক, বাবু যে তাহাদের একটা মুখের কথা বলিবেন, সে আশাও থাকিল না। সে সুরেন্দ্র বাবুর শাস্ত্র ও বিজ্ঞান-সঙ্গত বাক্যাবলীর তাৎপর্য্য বুঝিল না—কোন প্রতিবাদও করিতে পারিল না; কিন্তু মনে মনে বড় ক্ষুণ্ণ হইল।

গিরিবালা অনেক আশা করিয়াছিল; বাসনা তাহার সম্মুখে স্বর্গের দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল। প্রথমে গিরিবালা অননুভূত-পূর্ব্ব ইন্দ্রিয়-সুখে এতই মোহিত হইয়াছিল যে, অন্যান্য সুখের প্রসঙ্গ তাহার বড় মনে পড়ে নাই। তাহার বসন-ভূষণ অনেকই হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার অসীম আশার তুলনায় এখনও সকলই অপূর্ণ। গিরিবালা, স্বেচ্ছায় হউক, বা লোকের প্ররোচনায় হউক, একে একে, সুরেন্দ্র বাবুর নিকট আপনার প্রার্থনা জানাইতে লাগিল। অনর্থক বাক্যাড়ম্বর শ্রবণে কর্ণকুহরের পরিতৃপ্তি ভিন্ন, আর কোন লাভ হইল না। গিরিবালার মনস্তাপ বাড়িতে লাগিল। কিন্তু সে তখন নিতান্ত অধঃপতিতা; সুতরাং সুসঙ্গত ক্রোধ ও তেজ তাহার নাই। কেবল ঘৃণিত চিন্তা ও কলঙ্কিত কামনাই তাহার তখন সহচর।

গিরিবালার এই কলঙ্কের ঢাক সজোরে বাজিতে বাজিতে ক্রমে শান্তিপুরে হারাধন নন্দীর কর্ণসমীপে শব্দায়মান হইয়াছে। অপদার্থ হারাধন, কথাটা শুনিয়া মর্ম্মাহত বা লজ্জিত হয় নাই; বরং ব্যাপারটা বিশেষ লাভজনক বলিয়াই সে মনে করিয়াছে। সে স্বয়ং একটা বেশ্যার কৃপায় গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিতেছে, আবার তাহার গুণবতী ভগ্নী একটা লম্পটের অনুগ্রহ ভোগ করিতেছে; সুতরাং সংসারের সকল কষ্টই অতঃপর ঘুচিয়া যাইবে মনে করিয়া, সে বড় আহ্লাদিত হইয়াছে।

ক্রমে তিন চারি মাস কাটিয়া গেল, তথাপি হারাধনের ঘরে চন্দ্র-সূর্য্যের উঁকি দেওয়া বন্ধ হইল না, লক্ষ্মী ঠাকুরাণীও দুই বেলা ভাল করিয়া তাহার পুত্র, কন্যা, জননী ও পত্নীর উদরে প্রবেশ করিলেন না, এবং চারি দিকে অনন্ত লজ্জার রাশি দেখিয়া, লঘু সূতার কাপড় তাহাদের লজ্জা নিবারণ করার আবশ্যকতা অনুভব করিলেন না। হারাধন এ সকল সংবাদ পাইয়া বড়ই চটিয়া উঠিল, এবং ইহার যথাসম্ভব প্রতিকার করিবার বাসনায় সে জন্মভূমিতে আসিয়া দর্শন দিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

হারাধন বাটী আসিয়াছে বলিয়া গিরিবালাকে সঙ্কুচিতা হইতে হইল না; সে সুরেন্দ্র বাবুর বৈঠকখানায় যেরূপ যাতায়াত করিতেছিল, সেইরূপই করিতে থাকিল। সে হারাধনের সম্মুখে হাতের বালা, কাণের মাকড়ি বা পরিধানের কালাপেড়ে ধুতি কিছুই লুকাইল না! ভাইভগ্নী উভয়েই অতুলনীয়। হারাধন প্রতিদিনই গিরিবালার সহিত ফুসফুস গুজগুজ করিয়া অনেক কথা কহিতে লাগিল। তিন চারি দিন পরে, একদিন সন্ধ্যার পর, গিরিবালা সুরেন্দ্র বাবুর বৈঠকখানায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, বাবু সেখানে নাই। এইরূপ ঘটনা আর কোন দিন হয় নাই, এমন নহে। ইদানীং বাবুর অন্তর্দ্ধান সততই ঘটিত, কিন্তু দীর্ঘকালস্থায়ী হইত না।

অন্য বাবুর অদর্শন বহুকালব্যাপী হইল। রাত্রিশেষে বাবু সুরাপহৃতবুদ্ধি হইয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। গিরিবালা তখন রাগের অভিনয় দেখাইবার জন্য সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া, শয়ান রহিয়াছে। সে স্থির জানিত যে, সুরেন্দ্র এই অপরাধের নিমিত্ত কুণ্ঠিত হইবে ও তাহার নিকট মানভিক্ষা চাহিবে। কিন্তু সুরেন্দ্র, তাহার আশানুরূপ কোন ব্যবহারই না করিয়া নীরবে এক সোফার উপর শয়ন করিলেন। অনেকক্ষণ গিরিবালা অপেক্ষা করিল, কিন্তু বাবুর মানভিক্ষার কোন লক্ষণই বুঝিতে পারিল না; বরং তিনি স্বচ্ছন্দে নিদ্রিত হইয়াছেন বলিয়াই তাহার মনে হইল। তখন সে অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেকরূপ জল্পনা করিয়া ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিল এবং সুরেন্দ্র বাবুর সোফার নিকট আসিয়া তাঁহার গায়ে হাত দিল। যে অতি মধুর তেজ স্ত্রীজাতির ভূষণ-স্বরূপ, তাহা গিরিবালার আর নাই। কেন সে মরিল না?

করস্পর্শে সুরেন্দ্র বাবুর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি বলিলেন,—"কে ও গিরিবালা? তুমি ঘুমাইতেছিলে না? তোমাকে ঘুমাইতে দেখিয়া আমি বড় নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম। যাও ঘুমাও গিয়া। রাত্রি আর বড় নাই; শেষ রাত্রিতে জাগরণ বড়ই অনিষ্টকর।"

আর কোন স্ত্রীলোক হইলে অভিমানে মরিয়া যাইত। সে গৌরবের অভিমান অধঃপতিতা গিরিবালা কোথায় পাইবে? সে রাগও করিল না, সুরেন্দ্র বাবুর পরামর্শানুসারে শয়ন করিতেও গেল না। বলিল,—"অসুখ হয় হউক, আমি এখন আর ঘুমাইব না। আমার—"

তাহাকে বাক্য সমাপ্ত করিতে না দিয়া, সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—"তবে আমাকে আর ত্যক্ত করিও না; আমি এখন ঘুমাইব।"

এ উপেক্ষাও হতভাগিনী সহিয়া রহিল। ক্রুদ্ধ ফণিনীর ন্যায় সে তো সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া উঠিল না; উৎপীড়িতা সিংহিনীর ন্যায় সে তো গর্জ্জন করিল না; অপমানিতা নায়িকার ন্যায় সে তো আরক্ত নয়নে গ্রীবা বক্র করিয়া দাঁড়াইল না। সে হাসি হাসি মুখে বলিল,—"তোমাকে আমি কয়টা কথা বলিব; সেই কয়টা কথা শুনিয়া তুমি ঘুমাও বাবু আমি আর ত্যক্ত করিব না।"

সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—"বল—শীঘ্র শীঘ্র কথার শেষ করিয়া ফেল—রাত্রি আর নাই।"

সুরেন্দ্র বাবুর আগমনে বিলম্ব হেতু, বুঝি বা গিরিবালা ঝগড়া করিবে; সুরেন্দ্র বাবু তাহার মান ভাঙ্গেন নাই বলিয়া বুঝি বা সে বড় অভিমান করিবে; তাহার সহিত একটাও কথা না কহিয়া সুরেন্দ্র বাবু নিদ্রাগত হইয়াছে বলিয়া, বুঝি বা সে বকাবকি করিবে; সুরেন্দ্র বাবুর বাক্যে বিস্তর অনাস্থার পরিচয় পাইয়া, বুঝি সে রোদনের হাট বসাইবে। গিরিবালার এত প্রয়োজনীয় কথা কটা কি, শুনিবার জন্য বড়ই আগ্রহ হইতেছে। গিরিবালা বলিল,—"তুমি যে আমাকে বাড়ী করিয়া দিবে কথা ছিল তাহা কবে দিবে?"

সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—"এই কথা, না আরও কিছু আছে?"

গিরিবালা বলিল—"আমাকে এক শ গহনা দিবে বলিয়াছিলে, তা কই! কালই আমাকে সব গহনা দিতে হইবে।"

সুরেন্দ্র বাবু আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"আর কিছু বলিবে কি?"

গিরিবালা বলিল,—"নির্জীবনায় আমার খাওয়া পরা চলে, এমন টাকা আমাকে দিবে,

কথা ছিল, তাহা আমাকে কালই দিতে হইবে।”

সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—“তোমার কথা শেষ হইয়াছে বোধ হয়।”

গিরিবালা বলিল,—“হাঁ। ইহার কি উত্তর, বল।”

সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—“উত্তর কাল ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিব। আজি থাক্।”

গিরিবালা বলিল,—“না, তা থাকিলে চলিবে না। উত্তর আজই দিতে হইবে।”

তখন সুরেন্দ্র হাঃ হাঃ শব্দে হাসিয়া বলিলেন,—“তবে শুন গিরিবালা,—তোমাকে যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহাই আমি যথেষ্ট বলিয়া মনে করিতেছি, তাহার উপর আর একটি পয়সাও দিতে আমার ইচ্ছা নাই, আমি দিবও না।”

এতক্ষণে গিরিবালার ক্রোধ হইল এবং সে ঝগড়া করিতে সঙ্কল্প করিল। বলিল, “দিবে না কেন ? আমাকে মজাইয়া, আমার সর্ব্বনাশ করিয়া, আমাকে এত লোভ দেখাইয়া, এখন তোমার এই কথা ?”

সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—“তোমার মত দুঃখিনী,সামান্যা স্ত্রীলোক আমার এই চমৎকার বৈঠকখানায় আসিতে পাইয়াছে, আমার এই অপূর্ব্ব শয্যায় শয়ন করিয়াছে এবং আমার মত লোকের সহিত তুমি আমি করিয়া কথা কহিয়া আমোদ-আহ্লাদ করিয়াছে, ইহাই তাহার পরম সৌভাগ্য। তুমি যে সর্ব্বনাশের কথা বলিতেছ, তাহার এক বর্ণও আমি বুঝিতে পারিতেছি না। তোমার মত নীচঘরের স্ত্রীলোককে যে আমি গ্রহণ করিয়াছি, ইহাই তোমার অসীম আনন্দের ও গৌরবের কারণ হওয়া উচিত। আর তোমাকে লোভ দেখাইবার কোনই দরকার আমার নাই। যে ইচ্ছা করিলে ঘর জ্বালাইয়া দিতে পারে, মাথা কাটিয়া ফেলিতে পারে, স্বামীর শয্যা হইতে যুবতী স্ত্রীকে উঠাইয়া আনিতে পারে, একটা নিঃসহায় নিরাশ্রয় বিধবাকে আনিবার নিমিত্ত, তাহার কোনই লোভ দেখাইবার প্রয়োজন হইতে পারে কি ?”

গিরিবালার মাথা ঘুরিয়া গেল। হায়! অভাগিনি! এ কলঙ্ক মনস্তাপ ধৌত করিয়া পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিবার জন্য তোর এখন ব্যাকুলতা হইতেছে না কি ? না—না! গিরিবালা যখন পাপের ব্যবসায় করিতে শিখিয়াছে, সে যখন দেহ বিক্রয় করিয়া অর্থ অলঙ্কার ও অট্টালিকার কামনা করিতেছে, তখন তাহার হৃদয়ে অনুতাপের স্থান থাকিতে পারে না; তখন তাহার প্রত্যাবর্ত্তন ও আত্ম-সংশোধনের আশা একান্ত অসম্ভব। সে ইন্দ্রিয়ভোগ লালসায় এই পাপে ডুবিয়াছে, তাহার পাপ প্রবৃত্তি স্বল্প উপভোগেই নূতনত্ব বিহীন হইয়াছে, এখন পাপীয়সী রূপযৌবনের বিনিময়ে অন্য লালসা-সমূহ চরিতার্থ করিবার উপাদান অন্বেষণ করিতেছে। মূঢ়ে! মন্দভাগিনি! তোর এই ঘৃণিত কলঙ্ক-কাহিনীর অল্পাংশই আমাদিগকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে হইল। লোক শিক্ষার অনুরোধে যে সামান্য ভাগ লিপিবদ্ধ করিতে হইতেছে, তাহাই লিখিতে লেখনী কাতর ও অবসন্ন হইতেছে।

গিরিবালা অনেক দিন সুরেন্দ্র বাবুর সহিত এক প্রকার সমান ভাবে কাটাইয়াছে, সুতরাং কতকটা সমান সুরে কথা কহিতে তাহার সাহস হইয়াছে। সে বলিল—সুরেন্দ্র বাবু, তুমি যে খুব বড়লোক, তোমার যে অনেক ক্ষমতা, তা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু তাই বলিয়া তুমি তোমার কথা ঠিক রাখবে না, আমার মত দুঃখিনীকে আশা দিয়া নিরাশ

করিবে, ইহা তোমার উচিত নয়। তুমি আমাকে যতদূর নিঃসহায় মনে করিতেছ, আমি ততদূর নিঃসহায় নহি। আমার দাদা আছেন, তারও কাজ কারবার আত্মীয় বন্ধু আছে। আমি দাদাকে কি বলিব বল দেখি?"

সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন, "তোমার দাদা অবশ্যই অতি বড় লোক। তিনি যখন ভগ্নীর উপার্জ্জনে অক্ষমতার কৈফিয়ৎ চাহিবেন, তখন তাঁহাকে কি বলিয়া তুষ্ট করিতে হইবে, ইহা বাস্তবিকই একটা অতিশয় ভয় ও ভাবনার কথা। আমি তাঁহার ভয়ে কোথায় লুকাইব, ভাবিয়া আকুল হইতেছি। তুমি দয়া করিয়া তোমার ভাইকে বলিও, তিনি যেন রাগের ভরে আসিয়া, হাতে আমার মাথাটা কাটিয়া না ফেলেন?"

গিরিবালা এখন ভিখারিণী, সুতরাং তৃণাদপি লঘু; তাহাতে চরিত্রহীনা। সে আবার মুখ ফিরাইয়া বলিল,—"দেখ বাবু, তোমার অতুল সম্পত্তি। আমার ন্যায় দুঃখিনীকে কিঞ্চিৎ দিলে তোমার কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না, আমাকে তুমি দয়া না করিলে কে দয়া করিবে?"

সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—"দয়া—দয়া কেন করিব? দয়া আমি কাহাকেও করি না। যে দাসীর অযোগ্যা, তাহাকে আমি এত অনুগ্রহ করিয়াছি, আবার দয়া কি? দয়া অতি দুর্ব্বল হৃদয়ের কার্য্য—আমি কাপুরুষ নহি।"

গিরিবালা বলিল,—"ভাল, আমাকেই যদি দয়া করা তোমার অমত হয়, তাহা হইলেও তোমার ঔরসে আমার যে গর্ভসঞ্চার হইয়াছে, এ কথা এখনও আর কেহ না জানিলেও, তুমি তো জান—সেই গর্ভস্থ শিশুর প্রতি দয়া করিতে তুমি বাধ্য। ভাল, তাহারই একটা ব্যবস্থা কর।"

সুরেন্দ্র বাবু আবার হাসিয়া বলিলেন,—"এতকাল বিজ্ঞান শাস্ত্র আলোচনা করিলাম কি জন্য? এইরূপ স্থলে কিরূপ ব্যবহার করা আবশ্যক, বিজ্ঞান পাঠে যদি তাহা না শিখিতে পারিয়া থাকি, তাহা হইলে বৃথাই আমার জ্ঞান ও বিদ্যা। এ শিশু চিরদিন মনুষ্য-সমাজে লজ্জা পাইবে, পিতার নাম বলিতে কুণ্ঠিত হইবে, মাতার কথা উঠিলে, অধোমুখ হইবে, সে যাহাতে ভূমিষ্ঠ হইতে না পায়, তাহার ব্যবস্থা করাই তাহার প্রতি বিশেষ দয়া। বিজ্ঞান আমাকে সেরূপ দয়া প্রকাশের উপায় অনেক দিন শিখাইয়াছে, এবং আরও দুই চারি স্থলে বিজ্ঞানবলে আমি সেরূপ দয়া প্রকাশ করিয়াছি। বর্ত্তমান স্থলেও আমি যে তোমার গর্ভস্থ শিশুর প্রতি সেইরূপ দয়া প্রকাশ করিব, তাহার আর সন্দেহ কি?"

এত বিজ্ঞানের কথা গিরিবালা বুঝিতে পারিল না। সে স্থূলতঃ বুঝিল, সুরেন্দ্র বাবুর কথা বড় শুভসূচক নহে। সে আরও দুই চারি বার দুই চারি প্রকার কথা বলিল, কিন্তু ফল কিছুই হইল না। তখন সে অনর্থক বকাবকি অনাবশ্যক মনে করিয়া, শয্যায় গিয়া শয়ন করিল। সুরেন্দ্র বাবুও হাঁফ ছাড়িয়া অনতিকাল মধ্যে নাক ডাকাইয়া ঘুমাইলেন।

ঘরের প্রান্তভাগে এক মার্ব্বেল টিপয়ের উপর অনুরে এক বাটীর চেম্বর ল্যাম্প দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল, সুতরাং আলোকের অভাব ছিল না। গিরিবালা অনেকক্ষণ শুইয়া শুইয়া কি ভাবিল, তাহার পর ধীরে ধীরে আসিয়া সুরেন্দ্র বাবুর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইল। বুঝিল, বাবু গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন। বাবুর বাক্স, ড্রয়ার, চেষ্ট প্রভৃতির চাবি যেখানে থাকে, তাহা গিরিবালা জানিত। সে ধীরে ধীরে যথাস্থান হইতে চাবি সংগ্রহ করিল। এ

কার্য্যে যে শব্দ হইল, তাহাতে বাবুর নিদ্রার ব্যাঘাত হইল না দেখিয়া সে ধীরে ধীরে বাক্স প্রভৃতি খুলিতে আরম্ভ করিল। মধ্যে মধ্যে বাবুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এবং বারবার নিস্পন্দভাবে স্থির থাকিয়া, সে একে একে বাক্স প্রভৃতি হইতে বাছিয়া বাছিয়া বিস্তর সামগ্রী সংগ্রহ করিল। সংগৃহীত সামগ্রী-সমূহ সে একটি পুঁটুলি করিয়া বাঁধিল। তাহার পর চাবিগুলি যথাস্থানে রাখিয়া, বাবুর নিকটস্থ হইয়া দেখিল, তিনি সমান ভাবেই নিদ্রিত আছেন।

এ দিকে রাত্রি শেষ হইয়া আসিল। তখন গিরিবালা সাবধানে বস্ত্র-মধ্যে পুঁটুলি লইয়া বৈঠকখানা হইতে অবতরণ করিল, এবং ক্রমে নিম্নে সদর দরজার নিকটস্থ হইল। সেখানে রামসিংহ নামক দ্বারবান, কিঞ্চিৎ-কাল পূর্ব্বে নিদ্রোত্থিত হইয়া, পিতল বাঁধান হুঁকায় প্রকাণ্ড নল লাগাইয়া, ভড়র্ ভড়র্ শব্দে সমস্ত দিনে যত তাম্রকূট ভস্মসাৎ করিবেন, তাহার প্রাথমিক অনুষ্ঠান করিতেছিলেন। গিরিবালা তাহাকে দরজা খুলিয়া দিতে বলিল। গিরিবালার আজ্ঞা শ্রবণ মাত্র, রামসিংহ হুঁকা রাখিয়া ব্যস্ততা-সহকারে দ্বার খুলিয়া দিলেন। গিরিবালা ইদানীং বড় মাত্রা চড়াইয়া তুলিয়াছিল—সে আর দ্বারবান-সঙ্গে যাওয়া আসার অপেক্ষা রাখিত না; সুতরাং নিঃসঙ্কোচে একাকিনী চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গিরিবালা বাটী আসিয়া দেখিল, একটি, নূতন স্ত্রীলোক তাহাদের ভাঙ্গা ঘর আলো করিয়া বসিয়া আছেন। সে স্ত্রীলোকটি তরঙ্গিণী। হারাধন তরঙ্গিণীর নিকট দুই দিনের ছুটী লইয়া বাটী আসিয়াছিল; কিন্তু দুই দিনের স্থানে দশ দিন হইয়া গেল, তথাপি হারাধন-দিবাকর শ্রীমতী তরঙ্গিণীর-কুঞ্জাকাশে উদিত হইলেন না দেখিয়া, বিরহ-বিধুরা তরঙ্গিণী হারাধনের অন্বেষণে না আসিয়া থাকিতে পারিলেন না। মূর্খ কালিদাসকে একটা প্রবোধ দিয়া আসা, তরঙ্গিণীর ন্যায় চতুরা স্ত্রীলোকের পক্ষে একটুও কঠিন কাজ নহে। সে সহজেই মূঢ় চক্রবর্ত্তীর চক্ষুতে ধূলি প্রক্ষেপ করিয়া এবং দুই তিন দিনের মধ্যে ফিরিবার আশ্বাস দিয়া, কালিদাস-রূপ আয়ানের নিকট অবসর লাভ করিল এবং হারাধন-রূপ শ্যাম নটবরের নিকটস্থ হইয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিল। তাহার আগমনে হারাধনের অহঙ্কার সীমা ছাড়াইয়া গেল। তরঙ্গিণী যে তাহাকে কত ভাল বাসে, তাহা এই ঘটনায় স্পষ্ট জানা যাইতেছে। এত ভালবাসার পাত্র যে, তাহার অহঙ্কার হইবে না কেন? হারাধন ও তরঙ্গিণী নিঃসঙ্কোচে অনেক ভালবাসা-বাসির অভিনয় করিয়া, সকলের সমক্ষে আপনাদের দেবত্ব সপ্রমাণ করিল। আমরা তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে অক্ষম।

গিরিবালা বাটী আসিয়া, এই অলঙ্কৃতা সুপরিস্কৃতা সুন্দরীকে আপনাদের ভগ্ন কুটীরে দেখিয়া সবিস্ময়ে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসু হইল। গুণবান্ ভ্রাতা গুণবতী ভগ্নীর নিকট তরঙ্গিণীর পরিচয় প্রদান করিলেন। তরঙ্গিণীকে দেখিয়া গিরিবালা মোহিত হইল, এবং দাদার কৃপায় এই দেবীর সহিত পরিচয়, হওয়ায় সে সৌভাগ্যবান্ দাদার নিকট অনেক প্রকারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে থাকিল। তরঙ্গিণীর সহিত গিরিবালা নানাপ্রকার আলাপ করিতে

লাগিল, এবং তাহার পরিগৃহীত পন্থা যে পরম সুখময় ও অতি শ্লাঘনীয়, তাহাতে তাহার আর কোনই সন্দেহ থাকিল না। সে যখন সম্পূর্ণ মনঃসংযোগ সহকারে তরঙ্গিণীর সহিত আলাপে রত আছে, সেই সময় তাহার দাদা অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসিল—"বলি, যা বলিয়াছিলাম, তাহার কি হইল, গিরি?"

গিরিবালা তখন আপনার কুক্ষি-মধ্যস্থ ক্ষুদ্র পুঁটুলিটি বাহির করিয়া দাদার হস্তে দিল এবং বলিল,—"খোসামোদে, ঝগড়ায়, কিছুতে কিছু হয় নাই; শেষে তোমার পরামর্শ-মতে ইহাই সংগ্রহ করিয়াছি।"

হারাধন পুঁটুলির ক্ষুদ্রতা দেখিয়া, ভগ্নীর উপর বড় অসন্তুষ্ট হইতেছিল। শেষে তাহা খুলিয়া ও তদন্তর্গত পদার্থ-সমূহ ভাল করিয়া দেখিয়া তাহার আর আনন্দের সীমা থাকিল না। তখন হারাধন, তরঙ্গিণী ও গিরিবালা তিনজনে সেই পুঁটুলির-মধ্যস্থ সামগ্রী সমূহের পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইল। তাহাতে ঘড়ী, চেন, আঙটি, মোহর, নোট, টাকা প্রভৃতি যে সকল সামগ্রী ছিল, তাহার সকলগুলির দাম নির্ণয় করা তাহাদের সাধ্যাতীত হইলেও ইহা তাহরা স্থির নিশ্চয় করিল যে, গিরিবালা প্রভূত বিত্ত সংগ্রহ করিয়াছে, সন্দেহ নাই।

তরঙ্গিণী বলিল,—"এ সকল দেখিয়া আমোদ করিলে তো চলিবে না। এখান হইতে না পলাইলে কোন মতেই রক্ষা নাই। তাহার ব্যবস্থা আগে কর।"

হারাধন বলিল,—"তা তো বটেই। এখন পরামর্শ কি, বল।"

তরঙ্গিণী বলিল,—গিরিবালাকে লইয়া চল আমরা কৃষ্ণনগরে যাই। এই সকল জিনিস বেচিয়া যে টাকা হইবে, তাহার কিছু ভাঙ্গিয়া গিরিবালার অলঙ্কার গড়াইয়া দেও, আর কিছু তাহার হাতে রাখিয়া দেও। আর বাকী তুমি আপনার কারবারে লাগাও।"

হারাধন বলিল,—"বেশ কথা।"

পরামর্শটা গিরিবালারও বড় মনের মত হইল। এইবার সে তরঙ্গিণীর ন্যায় সুখ-সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবে!

তরঙ্গিণী আবার বলিতে লাগিল,—"গিরিবালার শ্রীছাঁদ ভাল। দশ দিনের মধ্যেই একটা না একটা রাজা কি জমিদারের চখে পড়িয়া যাইবে। তাহার পর রাণীর হালে থাকিবে।

এমন সুন্দর পরামর্শ সুবুদ্ধিমতী তরঙ্গিণী ছাড়া আর কেহ দিতে পারে কি? গিরিবালা তো আহ্লাদে আটখানা। স্থির হইল, অপহৃত দ্রব্য সামাগ্রী আপাততঃ তরঙ্গিণীর হাতেই থাকিবে। কারণ, এমন বিশ্বাস-পাত্র এজগতে আর কে আছে? হারাধন, তরঙ্গিণী ও গিরিবালা স্থির করিল, এ গ্রাম হইতে সরিয়া গেলেই তাহাদের সকল আশঙ্কা কাটিয়া যাইবে। তখন কেহই তাহাদিগের সন্ধানই পাইবে না; সুতরাং ধরিতেও পারিবে না।

যে টিপ, সেই ফোঁড়। যেমন পরামর্শ ধার্য্য হইল, অমনই তদনুযায়ী কার্য্যও হইল। তরঙ্গিণী যে গো-যানে আরোহণ করিয়া আসিয়াছিল, তিন জন তাহাতেই আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিল। হায় পাপ! তুমি মানুষকে কি হৃদয়হীন পশুই করিয়া দেও। অভাগিনী গিরিবালা প্রস্থান-কালে একবার বৃদ্ধা মাতার নিকট বলিয়াও আসিল না। সে কালামুখী বলিবেই বা কি? যে পথে পদার্পণ করিতে সে অগ্রসর হইল, তাহার কথা জগতে কাহাকেও জানাইবার নহে। হারাধনের যে

পুত্র-কন্যাকে গিরিবালা লালন-পালন করিত, গৃহত্যাগের সময় অভাগিনী একবার তাহাদিগকেও দেখিয়া গেল না। কীর্ত্তিচন্দ্রের প্রস্থান করিল। এই যাত্রায় তাহাদের মহাপ্রস্থান না হইল কেন?

গিরিবালা বৈঠকখানা হইতে চলিয়া আসার প্রায় ৫ ঘণ্টা পরে, অর্থাৎ বেলা প্রায় ১১টার সময় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল। এইরূপ সময়েই তিনি প্রায় প্রতিদিন শয্যাত্যাগ করেন। খানসামা বেলা ৫টার সময়, হাওয়া খাইতে যাইবার জন্য বাবুকে সাজাইতে আসিল। তখন সেখানে একটা বড় গোলের কথা উঠিয়া পড়িল। খানসামা চাবি লইয়া বাবুর বাক্স খুলিল; কিন্তু ঘড়ি পায় না, চেন পায় না, আংটী পায় না। একথা বলিতে গেলে হয় তো চিরদিনের জন্য মাথাটি হারাইতে হইবে; সে বেচারা থতমত খাইয়া কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল। এদিকে বাবু সুরেন্দ্রনাথ সাজগোজের বিলম্ব হওয়ায়, চটিয়া লাল হইতে লাগিলেন। কাজেই খানসামা প্রকৃত কথা না বলিয়া থাকিতে পারিল না। তখন একটা বিষম গণ্ডগোল পড়িয়া গেল। গোলমাল শুনিয়া দেওয়ানজী পর্য্যন্ত সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গিরিবালার প্রতি সন্দেহ অনেকেরই হইতে থাকিল; কিন্তু সে কথা বলে কাহার সাধ্য? গিরিবালা বাবুর প্রণয়িনী—সে চুরি করিয়াছে, এ কথা কেহ বলিতে পারে কি? অবশেষে সেই খানসামাটা সাহসে ভর করিয়া, নাম বলিলেও মারিবে, নাম না বলিলেও মারিবে বুঝিয়া, বলিল, "হুজুর, কাহাকেও এ সকল জিনিস্ বক্‌শিস্ দেন নাই তো?"

সুরেন্দ্র বাবু ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন,—"বক্‌শিস্ পারিশ্রমিক, বক্‌শিস্ কেন দিব আমি? সব তুই হাড় বজ্জাত। কেহ দেখে না, আর যেখানে চাবি থাকে তুই জানিস্। আর কেহ যখন জানে না, তখন তুই তো ভাই চুরি করিয়াছিস্। তুই যদি একান্ত মূর্খ না হইতিস্, তাহা হইলে সহজেই বুঝিতে পারিতিস্, এ চুরির দায় তোর ঘাড়ে ভিন্ন আর কাহারও ঘাড়ে পড়িতে পারে না। আমি তোর সর্ব্বনাশ করিয়া তবে ছাড়িব, জানিস্।"

খানসামাটা বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িল। কিন্তু সে তখন মরিয়া। তাহাকে যমে ধরিয়াছে। কাজেই মরণকালে মুখ ফুটিয়া কথা বলা আবশ্যক বোধ করিল। বলিল,—"দেখ্‌ছি তো আমার ঘাড়েই পড়িতেছে বটে কিন্তু হুজুর কোন বিবিকে এসকল জিনিস্ দিতে না পারেন, বা কোন বিবি হুজুরের সহিত তামাসা করিবার জন্য এ সকল জিনিস লইতে পারেন, এমন নহে। ধর্ম্মাবতার! গরিবকে মারিয়া পৌরুষ নাই। আপনি একবার মনে করিয়া দেখুন।"

সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—"আমার সহিত তামাসা করিতে পারে এমন লোক দুনিয়ায় নাই। তোর ও সকল বজ্জাতি রাখিয়া দে! মনে করিয়াছিস্ কি মুখের কথায় অপরাধ ঢাকিয়া দিবি, পাজি?"

সুরেন্দ্র বাবু রাগের ভরে একথা বলিলেন বটে কিন্তু তাঁহার মনে একটা খোঁকা লাগিয়া গেল। গিরিবালার অর্থাদি ভিক্ষা তাহার সহিত কথান্তর, তাহার না বলিয়া চলিয়া যাওয়া ইত্যাদি সমস্ত কথা তাঁহার মনে পড়িল। তখন তিনি অনেকক্ষণ অধোবদনে চিন্তা করিলেন। তাহার পর রামসিংহ দরওয়ানকে ডাকিয়া গিরিবালার সন্ধানে নন্দী-বাড়ী যাইতে আজ্ঞা করিলেন।

রামসিংহ অনতিকাল মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে, গিরিবালা, তাহার ভাই হারাধন, আর শান্তিপুরের একটা স্ত্রীলোক এই তিন জনে আজি বাটী হইতে চলিয়া গিয়াছে।

তখন প্রায় সন্ধ্যা। সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—“ঘোড়া তৈয়া আছে?”

একজন ভৃত্য সভয়ে নিবেদন করিল,—“আজ্ঞে হাঁ।”

তখন সুরেন্দ্র বাবু দ্রুতপাদবিক্ষেপে নিম্নে অবতরণ করিলেন। দরওয়ান মহাশয়রা তাড়াতাড়ি হুকা রাখিয়া, খাটিয়া ছাড়িয়া, গোঁপে তা দিয়া, দাড়ি চুমড়াইয়া, উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং লম্বা লম্বা সেলামে বাবুকে অভিনন্দিত করিলেন। বাবু কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া, লাফ দিয়া ঘোড়ায় উঠিলেন। বলিলেন,—“পাঁচ জন দরওয়ান, ঢাল তলোয়ার লইয়া, আমার সঙ্গে আসুক!”

পাঁচ জন দরওয়ান তখনই মাথায় পাগড়ি জড়াইতে জড়াইতে এবং জামার বন্ধ আঁটিতে আঁটিতে, বাবুর সহিত ধাবিত হইল। সকলেই বুঝিল আজি নিশ্চয়ই একটা বিষম ব্যাপার ঘটিবে।

বিষম ব্যাপারই ঘটিল বটে। হারাধন নন্দীর গৃহসমীপস্থ হইয়া, বাবু সুরেন্দ্রনাথ, তাহার জননীকে ধরিয়া আনিতে হুকুম দিলেন। বৃদ্ধা থর থর কাঁপিতে কাঁপিতে, দরওয়ানের ধক্কা খাইতে খাইতে বাবুর সম্মুখে হাজির হইল। বাবু তাহার পৃষ্ঠদেশে চাবুক মারিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—“বল্ হারামজাদী, তোর ছেলে মেয়ে কোথায় [illegible]?”

বৃদ্ধা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—“দোহাই বাবা, তাহারা কোথায় গিয়াছে আমি তাহার কিছুই জানি না। আমাকে তাহারা কোন কথা বলে নাই।”

বাবু বলিলেন,—“চুলের মুঠা ধরিয়া হারাধনের বউকে আমার সম্মুখে লইয়া আয়।”

নিমকহালাল দরবানগণ, চুলের মুঠা ধরিয়া, লাড়ার ভগ দশা ধক্কা দিয়া, হারাধনের যুবতী ভার্য্যা ভুবনমোহিনীকে সেই নরপ্রেতের সম্মুখে উপস্থিত করিল। তাহার পুত্র কন্যা ক্রন্দনে গগন বিদীর্ণ করিতে থাকিল।

বাবু ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িলেন। হারাধনের মাতা বাবুর পা জড়াইয়া বলিল,—“তুমি মান-অপমানের কর্ত্তা; দোহাই তোমার, তুমি আমার ঘরের বউকে বেএজ্জত করিও না, বাবা।”

সুশিক্ষিত সুরেন্দ্রনাথ পদাঘাতে হারাধনের মাতাকে দূরে ফেলিয়া দিলেন, এবং বজ্রনির্ঘোষে ক্রন্দনশীলা বধূকে জিজ্ঞাসিলেন,—“তুই নিশ্চয় জানিস্—হারাধন আর গিরিবালা কোথায় আছে? যদি ভাল চাহিস্, তাহা হইলে বল্, তাহারা কোথায়?”

ভুবনমোহিনী অধোমুখে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—“আপনি বলিলে বিশ্বাস করিবেন না, তাঁহারা কোথায় গিয়াছেন, আমরা তাহার কিছুই জানি না। আমরা গরিব—নিরুপায়—আপনি আমাদের উপর অত্যাচার করিয়া খুসি হন করুন; কিন্তু মাথার উপর ধর্ম্ম আছেন, তিনি সকলই দেখিতেছেন।”

সুরেন্দ্র বাবু অতি ক্রোধে বলিলেন,—“ছোটমুখে বড় কথা—চুপ রহ হারামজাদী।” তার পর আপনার দরওয়ানদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—“ইহাদের বাটীর [illegible] দেখ্ বেস্। গিরিবালা আমার জিনিসপত্র চুরী করিয়া কোথায় পলাইয়াছে, তাহা ইহারা নিশ্চয়ই জানে। ইহারা

সহজে তাহা বলিবে না। ইহাদের প্রতি দয়া করিবার কোনই দরকার নাই। তোমরা ইহাদের ঘরে আগুন লাগাইয়া দেও।”

হারাধনের মা উচ্চরোলে কাঁদিয়া উঠিল; কিন্তু হারাধনের স্ত্রী এখন আর কাঁদিল না। সে, আপনার শিশু পুত্র ও কন্যার হাত ধরিয়া এবং আকাশের দিকে চাহিয়া, নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল

সত্য সত্যই ঘরে আগুন দেওয়া হইল। জীর্ণ ঘর ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ঘর হইতে ঘটী বাটী, বা কাঁথা বালিস, বা কাপড়খানা মাদুরটা, কিছুই বাহির করা হইল না। কে বাহির করিবে? কেহ এক ফোঁটা জল দিয়া আগুন নিভাইবারও যত্ন করিল না। কাহার ঘাড়ে দুইটা মাথা?

সুশিক্ষিত সুরেন্দ্র বাবু ঘোড়ায় চড়িয়া চলিয়া গেলেন। যাহাদের আশ্রয়হীন করিয়া পথে বসাইয়া গেলেন, যাইবার সময় একবার তাহাদের দিকে চাহিয়াও গেলেন না।

ধন্য সুরেন্দ্রনাথ! ধন্য তোমার বিদ্যা ও পাণ্ডিত্য! গিরিবালার পাপে, হারাধনের পুত্র কন্যা ও পত্নীকে পথের ভিখারী করা যে লজিক শাস্ত্রের অনুমোদিত, তাহা অবশ্যই অত্যদ্ভুত। কেন সুরেন্দ্রনাথ, তুমি মূর্খ হও নাই? কেন সুরেন্দ্রনাথ, তুমি নীচবংশে জন্মগ্রহণ কর নাই? তাহা হইলে তোমার মূর্খতা স্মরণ করিয়া, তোমার হীনজন্ম আলোচনা করিয়া, হয় তো জগৎ তোমার অপরাধ কিয়ৎপরিমাণে ক্ষমা করিলেও করিতে পারিত। কিন্তু তুমি সুপণ্ডিত, তুমি জ্ঞানগর্ব্বে-গর্ব্বিত, তুমি আত্মাভিমানপূর্ণ, তুমি বুদ্ধিমদে অহঙ্কৃত —হায়! তোমার এই ব্যবহার? হায় ধন সম্পত্তি! এ সংসারে তোমার লীলা নিরতিশয় দুর্জ্ঞেয়। পাত্র বিশেষে তুমি অশেষ শুভ সংগঠনের নিদানভূত হইয়া, বসুন্ধরার দুঃখ-স্রোত মন্দীভূত করিতেছ। আবার স্থল-বিশেষে, তোমারই প্রতাপ জগতের হাহাকার-ধ্বনি সংবৰ্দ্ধিত করিয়া, নিদারুণ নরকের বিভীষিকা-পূর্ণ চিত্র নর-নয়নের সম্মুখে পরিস্থাপিত করিতেছে। যাও—বিলাসী, স্বার্থপর, নিষ্ঠুর, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, অবিবেকী সুরেন্দ্রনাথ! বেগগামী অশ্বপৃষ্ঠে দেহ দুলাইতে দুলাইতে, বসুন্ধরাকে তৃণবৎ জ্ঞান করিতে করিতে, মানবগণকে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীটের তুল্য বোধ করিতে করিতে আপনার বিলাস-মন্দিরে গমন কর। আজি যে নিরপরাধ নারী ও শিশুগণকে, অত্যাশ্চর্য্য সুবিচার সহকারে, তুমি বৃক্ষতলাশ্রয়ী করিয়া গেলে, তাহাদের কথা মনে করিয়া তোমার ও পাষাণ হৃদয় এক তিলও কাতর হইবে না। যদি হয়, তাহা হইলে সে কথা স্মরণ করিবার প্রয়োজন কি? কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ!' তোমার এই অমার্জ্জনীয় অপরাধ কোন মতেই প্রক্ষালিত হইবে না। আজি হউক, কালি হউক, বা বহুকাল পরেই হউক, তোমাকে এই দারুণ দুষ্কৃতির ফলভোগ করিতে হইবে। ঐ যে দুঃখিনী পুত্র-কন্যার হাত ধরিয়া—ঐ যে আশ্রয়হীনা যুবতী নীরবে আকাশে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, জান তুমি মূঢ়, ও কাহার নিকট আপনার দুঃখ-কাহিনী জানাইতেছে? কোন্ বিচারালয়ে ঐ কামিনী আপনার অবস্থা দেখাইয়া অভিযোগ উপস্থিত করিতেছে? কাহাকে ঐ অভাগিনী আপনার দুর্দ্দশার সাক্ষী করিয়া রাখিয়াছে? সেই ন্যায় ও ধর্ম্মের স্থাপয়িতা, জ্ঞান ও যুক্তির প্রতিষ্ঠাতা, সত্য ও সততার নিদান, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বদর্শী, বিপন্নবান্ধব, আৰ্ত্তসহায়; নারায়ণের ধর্ম্মাধিকরণে হারাধনের স্ত্রী আজি তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া রাখিল। সেখানে

ধনসম্পত্তির প্রভাবে বিচারের তারতম্য নাই, ধনী দরিদ্রের বৈষম্য নাই, প্রভু-ভৃত্যের ইতর-বিশেষ নাই, রাজা প্রজার বিভিন্নতা নাই। তোমার ধনসম্পত্তি, তোমার অহঙ্কার, তোমার স্বার্থপরতা, তোমার অলৌকিক যুক্তি, তোমার অত্যদ্ভুত জ্ঞান ও বিদ্যা কিছুই তোমার রক্ষা সাধনে সমর্থ হইবে না। সে দিন, সে বিচার-কালে, ঐ পদবিদলিতা নারী তোমার অপেক্ষা অত্যুচ্চ স্থানে সমাসীনা হইবে। আর তুমি? তোমার দুঃখের তখন ইয়ত্তা থাকিবে না। অহঙ্কৃত সুরেন্দ্রনাথ! সেই ভয়ানক দিন আগতপ্রায়।

অগ্নিদেব অতি সত্বরেই সেই সুজীর্ণ সামান্য গৃহ দগ্ধ করিয়া ভস্মাবশেষে পরিণত করিলেন। তখন অনেক রাত্রি হইয়াছে। কোন লোকই, সুরেন্দ্রনাথের ভয়ে, হারাধনের পরিবারবর্গকে আপনাদের বাটীতে আশ্রয় দিবার প্রস্তাব করিতেও সাহসী হইল না। যখন শেষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অদৃশ্য হইল, তখন হারাধনের স্ত্রী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—"আমি যদি সতী সাধ্বী হই, তবে ভগবান্ আমার দুঃখের কথা অবশ্যই বিচার করিবেন। আজি হইতে গাছতলা আমার আশ্রয়। উত্তম।"

কথা সমাপ্তির সম-সময়ে পার্শ্বস্থ বৃক্ষের অন্তরাল হইতে এক ব্যক্তি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া এই বিপন্ন পরিবারের সমীপবর্ত্তী হইল এবং অতি কোমলস্বরে বলিল,—"অবশ্যই ভগবান্ এ অত্যাচারের প্রতিকার করিবেন। কিন্তু গাছতলা তোমার আশ্রয় হইবে কেন মা? আমি কন্যাটি কোলে লই, তুমি পুত্রটিকে কোলে লইয়া, বৃদ্ধা শাশুড়ির হাত ধরিয়া আমার সঙ্গে আইস। আমি তোমার সন্তান। আমি তোমাদিগকে নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইব।"

এই ব্যক্তি কৃষ্ণনগরের দোকানদার আমাদের পূর্ব্বপরিচিত মূর্খ্যি যদু হালদার। সে এই অসময়ে এখানে কেন?—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বড় ভয়ে ভয়ে হারাধন, তরঙ্গিণী ও গিরিবালা রাজীবপুর হইতে প্রস্থান করিল। অনেক ধন রত্ন তখন তাহাদের আয়ত্ত, সুতরাং তাহারা বড়ই আনন্দিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু অতি সহজেই যে তাহারা ধরা পড়িতে পারে, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই যে তাহাদের সকল আনন্দের অবসান হইতে পারে, এ সকল দুশ্চিন্তা তাহাদিগকে নিতান্ত বিমর্ষ করিয়া রাখিয়াছে। গিরিবালা বলিতেছে, সুরেন্দ্র বাবু দুই চারি দিনের মধ্যেই এ সকল অপহৃত সামগ্রীর অনুসন্ধান করিবেন, এরূপ সম্ভাবনা নাই। গিরিবালা অবশ্যই বাবুর রীতি-প্রকৃতি বেশী জানে; সুতরাং তাহার কথা সবিশেষ বিশ্বাসযোগ্য, সন্দেহ নাই। তথাপি তিন জনের কেহই আশঙ্কা বর্জ্জিত নহে। বিধাতঃ! ধন্য তোমার সুব্যবস্থা। অপরাধীর শাস্তি, এইরূপে অবিরত তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিতেছে।

টাকা ছাড়া আর যে যে জিনিষ ছিল, তাহার কতক কৃষ্ণনগরে ও কতক শান্তিপুরে বিক্রয় করিতে তাহারা সঙ্কল্প করিয়াছে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ সমস্ত আপাততঃ তরঙ্গিণীর নিকট গচ্ছিত থাকিবে; পরে আবশ্যক মতে তাহার যথোপযুক্ত ব্যবহার হইবে। কয়েক দিন মাত্র শান্তিপুরে থাকিয়া, তাহারা কৃষ্ণনগরে যাইবে স্থির করিয়াছে। সেখানে গিরিবালার জন্য একটা বড় গোছ মাছ, জালে ফেলিতে হইবে। হারাধন গিরিবালার বড় ভাই, সুতরাং তাহার শুভাশুভ

না ভাবিয়া থাকিতে পারে কি? সৌভাগ্যক্রমে জগতে ঘর ঘর এমন বড় তুই জন্মগ্রহণ করেন না!

এই পরম ধর্ম্ম-জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিত্রয়কে বহন করিয়া গো-যান অতি সত্বর শান্তিপুর সন্নিহিত হইল। নগরের মধ্যে প্রবেশ করার বহুপূর্ব্বে, শকটারূঢ় ব্যক্তিত্রয় দেখিতে পাইল, অদূরে বৃক্ষতলে একখানি পাল্কী রহিয়াছে, আর একটি বাবু, বাহিরে দাঁড়াইয়া, পাল্কীর ছাতে গুড়গুড়ি রাখিয়া তামাকু খাইতেছেন। গাড়ি অপেক্ষাকৃত নিকটস্থ হইল। হারাধন ও গিরিবালা দেখিল, বাবুর বেশভূষা বড় জাঁকাল। তরঙ্গিণী দেখিল, বাবুটি যুবাপুরুষ। হারাধন ও গিরিবালা দেখিল, বাবুর গুড়গুড়ি রূপার, রূপার কলিকায় রূপার সরপোষ জিঞ্জির আঁটা, মুখনলটা সোণার। তরঙ্গিণী দেখিল, বাবু অতি সুপুরুষ, তাঁহার মুখখানি হাসিভরা। হারাধন ও গিরিবালা দেখিল, বাবুর ঘড়ির সোণার চেনটা খুব মোটা, তাহাতে হীরাও আছে। তরঙ্গিণী দেখিল, বাবুর চক্ষু দুটি যেন বিধাতার আঁকা, রঙটি যেন কাঁচা সোণা, গোঁফ যোড়াটি অপরূপ। হারাধন ও গিরিবালা দেখিল, বাবুর গায়ে সিল্কের জামা, পায়ে বার্ণিস করা বিলাতী জুতা। তরঙ্গিণী দেখিল, বাবুর কি চওড়া [illegible] সর্ব্বাঙ্গে কি অদ্ভুত [illegible]। বাবুর তামা- [illegible] হারাধনের [illegible] প্রবেশ করিল। [illegible] তামাক [illegible] হারাধন [illegible] হইয়া [illegible] তামাক একবার [illegible] জোড় অনির্ব্বচনীয় বলিয়া জ্ঞান করিল। তখন হারাধন গাড়ি থামাইয়া নামিয়া পড়িল এবং অতীব বিনীতভাবে বাবুর নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসিল,—"মহাশয় ব্রাহ্মণ?"

বাবু উত্তর দিলেন,—হাঁ।"

হারাধন বিশেষ নম্রতার সহিত প্রণাম করিল।

বাবু হাস্যমুখে অতি মধুর কণ্ঠে বলিলেন,—"কল্যাণ হউক। তুমি তামাক খাইবে কি?"

হারাধন পরমানন্দে হাত যোড় করিয়া বলিল,—"বড়ই ভাল তামাক—আমরা গরিব লোক; এমন তামাক কখনই খাই নাই।"

ধন্য তামাকু দেবী! অতি শুভক্ষণেই তুমি ভূ-ভার হরণ করিতে মর্ত্ত্যলোকে আবির্ভূতা হইয়াছ! তোমার প্রসাদে কত নগণ্য লোক কত গণ্য লোকের আত্মীয় হইয়াছে এবং কত গণ্য লোক কত নগণ্য লোকের আত্মীয় হইয়াছে। যেখানে পরিচয় বা ঘনিষ্ঠতার কোন সম্ভাবনা নাই, সেখানেও তুমি পরিচয় ও সৌহৃদ্য সঙ্ঘটন করিতেছ; নচেৎ এরূপ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ-যুবার সহিত বেশ্যাশ্রমসেবী তিলি হারাধনের কথাবার্ত্তা কিরূপে ঘটিতে পারে?

দূরে অন্য এক বৃক্ষতলে বাবুর আট জন বেহারা, এক জন দ্বারবান্, একজন খানসামা এবং একজন সরকার ছিল। একজন অপরিচিত আগন্তুক বাবুর নিকটস্থ হইতেছে দেখিয়া, তকমা আঁটা, গালপাট্টাধারী, ঢাল তলোয়ার যুক্ত, দ্বারবান্ ছুটিয়া আসিল। বাবু তাহাকে দূরে থাকিতে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন,—"রামা শূদ্রের হুঁকায় জল করিয়া লইয়া আয়।"

হারাধনের গাড়ি নিকটস্থ হইল। গাড়ির মধ্যগতা সুন্দরীরা গাড়ি থামাইতে বলিলেন বোধ হয়। বাবুর দৃষ্টি গাড়ির ভিতরে গেল, এবং একবার তরঙ্গিণী, একবার গিরিবালার সহিত মিলিল। তরঙ্গিণী একটু অতি মধুর অতি মৃদু হাসি হাসিল। গিরিবালা মুগ্ধার ন্যায় চাহিয়া রহিল। এত বড় বাবুর সম্মুখে

খানসামা হারাধনকে হুকা আনিয়া দিবে, এটা বড় লজ্জার কথা বোধ করিয়া, হারাধন স্বয়ং সেই দূরস্থ বৃক্ষতলে গেল এবং সরকারের সহিত আলাপ করিয়া বুঝিল যে, কি সর্ব্বনাশ! যাঁহাকে সে বাবু মনে করিয়াছে, তিনি যে সে লোক নহেন, রামপুরের রাজা, নাম অরবিন্দ [illegible], আয় চারি পাঁচ লক্ষ টাকা, জাতিতে ব্রাহ্মণ, বয়স চব্বিশ পঁচিশ। শান্তিপুরে অসংখ্য বিগ্রহ দেখিবার জন্য তাঁহার আগমন হইয়াছে; তিনি এখন কিছুদিন শান্তিপুরেই থাকিবেন, এস্থান তাঁহার বড় ভাল লাগিয়াছে। এরূপ অসাধারণ লোকের সহিত এমন অসম্ভাবিত উপায়ে পরিচয়ের সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় হারাধন আপনাকে ভাগ্যবান্ বলিয়া বোধ করিল এবং এই সুসংবাদ শকটারূঢ় আত্মীয়গণকে জানাইবার জন্য সে ধাবিত হইল। সে গিয়া দেখিল, যাহা তাহার হৃদয়ের বাসনা তাহারই অনুকূল কার্য্য ভগবান ঘটাইতেছেন। রাজার দিকে চাহিয়া গিরিবালা ঈষৎ হাস্যের সহিত মুখ নত করিতেছে, রাজাও সেই হাসির প্রতিদান না করিতেছেন এমন নহে। তাহাকে শকট-সন্নিহিত দেখিয়া, রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কৈ তুমি তামাক খাইলে না?"

হারাধন বলিল,—"আজ্ঞে যাই।"

হারাধন শকটে প্রবেশ করিয়া রাজার সমস্ত পরিচয় তরঙ্গিণী ও গিরিবালাকে জানাইল। তরঙ্গিণী সমস্ত শুনিয়া মনে করিল, "অদৃষ্ট তো একেই বলি।" সে আবার একবার রাজার দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলিত করিয়া একটু মধুর হাসি হাসিল। রাজা দুই একবার গিরিবালার প্রতি নেত্রপাত করিয়াছেন, ইহা শুভলক্ষণ না হইলেও, তরঙ্গিণী লালসাসূচক নয়নবাণ ছাড়িতে ক্ষান্ত হইল না। সে মনে করিল, একবার দুইটা কথা কহিতে পাইলেই রাজাকে সে বাঁধিয়া ফেলিবে, তাহার আর ভুল নাই। [illegible] জিজ্ঞাসিলেন,—"ইহারা তোমার কে?"

হারাধন বলিল, "একটী [illegible] আর একটি [illegible] আর একটী আমার বড় আত্মীয় লোক।"

রাজা একটু হাস্য করিয়া বলিলেন,—"যাহার বয়স কম, তিনিই বোধ হয় তোমার স্ত্রী। তুমি এ সুন্দরীদের লইয়া কোথায় যাইতেছ?"

রাজার এই কথায় তিন জনের মনে তিন রকম ভাব জন্মিল। তরঙ্গিণী মনে মনে ভাবিল, এত বড় মাছটা কি শেষে গিরিবালার জালেই পড়িবে? পোড়া বয়সই কি সব? গিরিবালা আমার কিসে লাগে? গিরিবালা ভাবিল, রাজা জমিদার মজাইবার মত আমার সবই আছে। আমার ভাল পড়তাই পড়িয়াছে; একটা জমিদার ছাড়িয়া আসিতে না আসিতে একটা রাজা জুটিতেছে, আমাকে ভগবান্ এমনই করিয়াছেন। হারাধন ভাবিল, যা ভাবিয়া বাহির হইয়াছি তাই। এত বড় রাজাটা যদি গিরিবালার ফাঁদে পড়ে, তবে আর চাই কি? হারাধন অপরিসীম আনন্দ সহকারে বলিল,—"আজ্ঞে, আমরা শান্তিপুর যাইতেছি। শান্তিপুরের বড়বাজারে আমার দোকান আছে। আমরা সেখানে আজি থাকিব।"

রাজা জিজ্ঞাসিলেন,—"আজি দোকানে থাকিবে, তার পর?"

"আজ্ঞে তার পর—তার পর মহারাজের যেমন হুকুম হইবে।"

রাজা একটু হাসিয়া ফেলিলেন। লোকটার ইতরতা দেখিয়া কষ্ট হইবে। বলিলেন,—"তা বেশ তো। বেলা বেশী হইতেছে। তোমরা এখানে এখন জলটল খাও না কেন?

পাল্কী-বেহারাদের কাছে তোমাদের গাড়োয়ানকে বসিতে বলিয়া, তোমরা কিছু খাওয়া দাওয়া করিয়া যাও না কেন ? শান্তিপুরে তো আসাই হইয়াছে। ঐ যে মাঠের মধ্যে তাঁবু পড়িয়াছে দেখিতেছ, ও আমারই। তোমাদের ইচ্ছা হয় তো ওখানেও আসিতে পার। আমি এখন ওখানেই যাইতেছি।"

হারাধন বাসনা-সিদ্ধির এমন সহজ পন্থা দেখিয়া চরিতার্থ হইল। সে তরঙ্গিণী ও গিরিবালাকে লইয়া এবং অপহৃত জিনিসের পুঁটুলি লইয়া, রাজার সঙ্গে সঙ্গে চলিল এবং অবিলম্বে সেই সুদৃশ্য পটমণ্ডপে উপস্থিত হইল। সেখানকার শোভা ও ঐশ্বর্য্য দেখিয়া হারাধন ও তাহার সঙ্গিনীরা অবাক্ হইল। গালিচা, পর্দ্দা, খাট, চেয়ার, টেবিল, গদি, বিছানা, বালিস সকলই তাহাদের পক্ষে অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অতি চমৎকার। তাহারা সেখানে গিয়া বসিলে, রাজার আদেশক্রমে ভৃত্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রূপার থালে করিয়া, কতকগুলা লুচি, কচুরি, আলুর দম প্রভৃতি সামগ্রী দিল, রূপার গ্লাসে করিয়া জল দিল। আর রাজা স্বয়ং আলমারীর ভিতর হইতে একটা তার জড়ান বোতল বাহির করিয়া দিলেন। বলিলেন,—"দোষ কি ? যদি অভ্যাস থাকে, তবে ইহাও ইচ্ছামত খাও না কেন ? আমি প্রাতে ওটা খাই না, নতুবা আমিও তোমাদের সঙ্গে যোগ দিতাম।"

বোতলের সহিত আত্মীয়তা তিন জনেরই যথেষ্ট আছে। সুতরাং তিন জনেই বোতল দেখিয়া বড়ই পরিতুষ্ট হইল। হারাধন আনন্দে আটখানা, তরঙ্গিণী কিছু বিমর্ষ, গিরিবালা অহঙ্কৃতা। গিরিবালা এখন মনে ভাবিতেছে, তাহার রূপ-যৌবন অবশ্যই অলৌকিক, নচেৎ ব্রহ্মাণ্ডের বড়লোকেরা তাহাকে দেখিয়া মজে কেন ? তাহার অধঃপতন সম্পূর্ণ হইয়াছে কি ? তরঙ্গিণী যে কিছু বিমর্ষ, একথা রাজা মনে মনে বুঝিতে পারিলেন, এবং অবিলম্বে ইহার প্রতিকার করিতেও সঙ্কল্প করিলেন। দুই চারিবার গ্লাস ঘুরিয়া আসার পর তরঙ্গিণী ছাড়া সকলেরই কথা উঁচু উঁচু হইয়া উঠিল। রাজাকে আর বড় তফাৎ বলিয়া বোধ থাকিল না। গিরিবালাই রাজার সহিত কিছু বেশী কথা কহিতে লাগিল। একথা সে কথার পর, সে বলিল,—"তোমার মত আমারও আংটী আছে। দেখিবে ?"

হতভাগিনী একেবারেই তুমি বলিয়া ফেলিল। রাজা বড়ই হাসিলেন। বলিলেন,—"তা তোমার থাকিবে বই কি ?"

গিরিবালা অপহৃত পুঁটুলি খুলিতে আরম্ভ করিল; হারাধন বলিল,—"থাক্ থাক্—ওসব খুলিয়া কি কাজ ? রেখে দে !"

গিরিবালা, সে কথা শুনিল না। আপন মনে পুঁটুলি খুলিতে থাকিল। রাজা তরঙ্গিণীকে অস্ফুটস্বরে বলিলেন,—"তুমি ভাই আমার সহিত কথা কহিতেছ না কেন ?"

তরঙ্গিণী অগাধ জলের মাছ। রাজা ভাই বলাতেই সে গলিল না। মনের ঝাল মিটাইয়া বলিল,—"আমরা বুড়াহাবড়া মানুষ, আমাদের আবার কথা !"

সঙ্গে সঙ্গে রাজা বলিলেন,—"কুন্তীদেবীর বয়সে কি যৌবন যায়। রসের পরিপাক তো তোমাতেই। মানুষ তো তুমিই।"

কথাটা তরঙ্গিণীর মনের মত হইল। সে ঢুলু ঢুলু নয়নে কটাক্ষ ছাড়িয়া একটু হাসিল। গিরিবালা পাঁচটা আংটী লইয়া রাজার নিকটে আসিল। এত নিকটে আসিল যে, রাজার গায়ে তাহার অঙ্গ স্পর্শ হয় হয় হইল। রাজা অতি সাবধানে আপনার শরীর বক্র করিয়া বলিলেন,—"বাঃ বেশ, বেশ আংটী ! এ আংটী

সকল কাহার বখসিস ? বাঃ এটিতে যে কি লেখা রহিয়াছে—সুরেন্দ্রনাথ মিত্র জমিদার। রাজীবপুরের সুরেন্দ্র বাবু বুঝি! তুমি কি তাঁহারই হিরামন ?”

হারাধন অবসাদগ্রস্ত হইয়াছিল। সুরেন্দ্র বাবুর নামটা কাণে যাওয়ার সে উঠিয়া বলিল,—“কি সুরেন্দ্র বাবুর নাম লেখা—আংটীতে ? ওটা ফেলিয়া দাও—ধরা পড়িতে হবে নাকি ?

রাজা বলিলেন,—“তবে এ সব বখসিস্ নয় ? লইয়া আসা ? তা বেশ তো। সে লোকটা কখন একটি পয়সা কাহাকে দিতে চায় না। তাহার নিকট হইতে এরূপে না লইলে উপায় কি ?”

গিরিবালা বলিল,—“হতভাগার নাম বুঝি খোদা আছে ? তা ভাই তোমার সঙ্গে আমাদের আলাপ হইয়াছে। আমরা গরিব বলিয়া যদি কেহ ধরে, তার উপায় তোমাকে করিতে হবে। তা—তা—আমাকে সে বড় কষ্ট দিয়াছে।”

রাজা সকলই বুঝিলেন। হারাধন আবার তন্দ্রাগ্রস্ত। গিরিবালা বলিতে লাগিল,—“আমার দোষ নাই—আমাকে সে অনেক দিব বলিয়া কিছুই দেয় নাই। তা আমি না ইব কেন ? তা রাজা, আমি সুরেন্দ্রের মুখে ঝাঁটা মারি—তুমিই আমার সব।”

এই বলিয়া সেই উন্মাদিনী কুলটা রাজার গলা জড়াইয়া ধরিতে গেল। রাজা উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন,—“তা তুমি বেশ করিয়াছ। কিন্তু ধরা পড়িতে পার; একটু সাবধান হওয়া উচিত।”

তখন টলিতে টলিতে গিয়া গিরিবালা হারাধনকে উঠাইল। এরূপ মূল্যবান্ সামগ্রী সকল তাহাদের নিকট থাকিলে তাহারা যে সহজেই চোর বলিয়া ধরা পড়িবে, তাহা তাহারা স্থির বুঝিল। তখন তরঙ্গিণী প্রস্তাব করিল,—“এ সকল জিনিষ রাজার নিকট থাক না কেন ? রাজা বড় ভদ্র, অমায়িক, খুব বড় লোক। উঁহার কাছে থাকিলে কার সাধ্য কে কি বলে ?

প্রথমতঃ তাহার বয়সাধিক্য তাহার প্রতি অনুরাগ উৎপাদক বলায়, তাহার পর গিরিবালা অঙ্গস্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে রাজার সাবধানতা দেখিয়া, তরঙ্গিণী স্থির করিয়াছেন মুখে রাজা গিরিবালার সহিত যেমন করিয়া কথা কহুন, প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি তরঙ্গিণীরই অনুরাগী হইয়াছেন। হইবারই কথা। বারনারীর যদি এ গৌরব না থাকে, তবে তাহার থাকে কি ? তরঙ্গিণী স্থির করিয়াছে, দুইটা শত্রু সঙ্গে না থাকিলে রাজা তাহারই গোলামী করিতেন। সুযোগ উপস্থিত হইলে সে সৌভাগ্য অবশ্যই তাহার ঘটিবে। সে রাজার হস্তে সেই অপহৃত পুঁটুলি ন্যস্ত করিতে বলিবে, ইহা বিচিত্র নহে। তাহার মনে আরও লোভ ছিল। রাজার হাতে পড়িলে, এ সকল জিনিষ সে একাই হস্তগত করিতে পারিবে। তা ছাড়া সে বুঝিয়াছিল, এ চোরাই মাল আপাততঃ কাছছাড়া করাই আবশ্যক! নচেৎ তাহাকেও চোর হইতে হইবে। সুতরাং জলে ফেলিয়া দেওয়ার অপেক্ষা, পাওয়া যাইবার আশা থাকে, এমন স্থানে রাখাই ভাল।

রতঙ্গিণীর রায়ে হারাধনও রায় দিল; গিরিবালাও সুতরাং সম্মত হইল। তাহাদের অনুরোধে রাজা নোটবহি বাহির করিয়া জিনিষের ফর্দ্দ করিয়া লইলেন। বলিলেন,—“আমাকে যদি শীঘ্র এদেশ ছাড়িয়া যাইতে হয় তাহা হইলে তোমাদের জিনিষ তখনই ফিরাইয়া লইতে হইবে।”

গিরিবালা বলিল,—“তুমি যদি যাও,

আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। আমার জমির তত্ত্ব ও তোমার সঙ্গেই থাকিবে।"

রাজা বলিলেন,—"তা বেশ কথা। অদ্য-অতঃ প্রায় অপরাহ্ন হইয়াছে। আমার শান্তি-পুরে যাইবার দরকার; তোমরাও চল, শান্তি-পুরে আবার সাক্ষাৎ হইবে। আমার সরকার সঙ্গে যাইয়া তোমাদের বাসস্থান চিনিয়া আসিবে। গঙ্গার ধারে বড় থামওয়ালা বাটীতে আমার বাসা। যাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, সেই আমার বাসা দেখাইয়া দিবে।"

এখান হইতে উঠিতে হারাধনের ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু রাজা যখন থাকিতেছেন না, তখন থাকিতে কাহারও মত হইল না। তাহারা টলিতে টলিতে গাড়িতে উঠিতে চলিল।

রাজা সরকারকে ডাকিয়া বলিলেন—"ইহারা বড়ই মন্দ লোক। ঐ স্ত্রীলোকটা কালিদাস চক্রবর্ত্তীর উপপত্নী তরঙ্গিণী, আর ঐ স্ত্রীলোকটা হারাধনের ভগ্নী গিরিবালা। বোধ হয় গিরিবালা অন্তঃসত্ত্বা। ইহাদের সঙ্গে যাও। দেখিও ইহারা কোথায় যায়, কি করে। আমি অনেক কথা আদায় করিয়াছি। তুমি যতদূর যাহা জানিতে পার, চেষ্টা করিবে।"

রাজা পাল্কীতে উঠিলেন। দ্বারবান্ ও খানসামা পশ্চাতে ধাবিত হইল। গোল করিতে করিতে মাতালের-দল্ গাড়ি ছাড়িয়াছিল। সরকার গাড়ির পশ্চাতে চলিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

হারাধনের দল বড়ই মাতলামি করিতে করিতে বেলা ৩টার সময় শান্তিপুরে পৌছিল। শান্তিপুরে আসিয়া তাহারা কালিদাসের বাটীতে গেল না; হারাধনের যে একটা নাম-মাত্র দোকান ছিল, সেখানেও গেল না। বাজারের নিকট একটা ঘর ভাড়া করিয়া থাকিল। এরূপ থাকিতে তরঙ্গিণীরই বেশী আগ্রহ। তরঙ্গিণী যাহা মনে করিবে, হারাধন তাহাতেই সায় দিবে। কেন তরঙ্গিণী আপনার বাটীতে গেল না? কয়দিন অসাক্ষাতের পর, সে কেন তাড়াতাড়ি বাটী যাইয়া বিরহ-বিধুর কালিদাসকে সুস্থ করিতে ব্যাকুল হইল না? এ সকল প্রশ্নের ঠিক উত্তর আমরা দিতে পারি না, কিন্তু একটা অনুমান করিতে পারি। আমাদের বোধ হয়, রাজাকে দর্শন করার পর হইতে তরঙ্গিণীর হৃদয়ে অনেক দুরাকাঙ্ক্ষা ও দুরভিসন্ধি জন্মিয়াছে। সে একবার এক কিনা সুযোগ মতে রাজার সহিত কথা কহিতে পাইলেই যে তাঁহার হৃদয়েশ্বরী হইতে পারিবে, সে বিষয়ে তাহার কোনই সংশয় নাই। বাটীতে গিয়া সেরূপ সুযোগ ঘটিবার সুবিধা হইবে না। আর রাজার হস্তে যে সকল অপহৃত সামগ্রী গচ্ছিত করা হইয়াছে, রাজার সহিত আত্মীয়তা, ঘনিষ্ঠতা ও প্রণয় স্থাপন করিয়া, সে যে তৎ-সমস্ত হস্তগত করিতে পারিবে, তদ্বিষয়ে তাহার কোনই সন্দেহ নাই। রাজার সহিত আলাপ পরিচয়ের এই অবসর ছাড়িয়া চলিয়া গেলে, এসকল কিছুই হয় না। অনেক ভাবিয়া তরঙ্গিণী ঘর ভাড়া করিয়া থাকিল। গিরিবালার বেশী নেশা হইয়াছিল, সে ঘুমাইয়া পড়িল। হারাধন একবার বমি করিল। তরঙ্গিণী খাড়া ছিল।

সরকার, উহাদিগকে এইরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া, প্রস্থানের উপক্রম করিল, এবং হারাধনের নিকট বিদায় চাহিল। হারাধন তাহাকে বিদায় দিবার সময় বলিল,—"তোমার সঙ্গে

গিয়া রাজবাড়ী একবার দেখিয়া আসিবার ইচ্ছা ছিল—তা এখন শরীর ভাল নাই। একটু পরে যাইব। কি জান ভাই, রাজার কাছে আমাদের সর্ব্বস্ব গচ্ছিত আছে। কে জানে রাজা লোক কেমন? কোন ভয় নাই তো বাবু?"

তরঙ্গিণী বলিল,—"বুড়া হইতে গেলে, মানুষ চিন্‌তে পার না? রাজা লোক কেমন, তা আর জানিতে হয়? তুমি যা অতুল সম্পত্তি ভাবিতেছ, রাজার তাহাতে সম্বৎসরের জুতার কড়িও হয় না। ভাল, তোমার যদি বিশ্বাস না হয়, আমি জামিন থাকিতেছি। টাকায় জিনিষে যা রাজার কাছে আছে, তা আমি দিব।

হারাধন নীরব। সে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। তরঙ্গিণী তখন সরকারকে সঙ্গে আসিতে ইঙ্গিত করিয়া, একটু তফাতে সরিয়া গিয়া তরঙ্গিণী একটু হাসির সহিত মিশাইয়া জিজ্ঞাসিল,—"সরকার মহাশয়! তোমার নামটি কি ভাই?"

সরকার উত্তর দিল,—"আমার নাম শ্রীনীলরতন চৌধুরী।"

"চৌধুরী মহাশয়েরও কি রামপুরে বাড়ী?"

"হাঁ।"

আলাপটা পাকাপাকি করিবার বাসনায়, তরঙ্গিণী অনেক কথা কহিল, এবং অনেক প্রকারে চৌধুরীর মনোরঞ্জন করিতে প্রস্তুত হইল। সকল কথা গ্রন্থে লিখিবার অযোগ্য।

নীলরতন সরকার লোকটা বড়ই গম্ভীর ও সাবধান। কথাবার্ত্তা শুনিলে ও ব্যবহারাদি দেখিলে, সামান্য সরকার অপেক্ষা তাঁহাকে অনেক উচ্চশ্রেণীর লোক বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার বয়স অনুমান পঁয়তাল্লিশ। চৌধুরী মহাশয় লম্বা চওড়া মন্দ ছিলেন না।

তরঙ্গিণীর কথা শুনিয়া চৌধুরী বলিলেন,—"তুমি যেরূপ সুন্দরী ও রসিকা, তাহাতে রাজা তোমাকে পাইলে যে বড়ই আদর করিবেন, তাহার আর সন্দেহ নাই, তা আমি জানিতে পারিয়াছি। তোমার উপর তাঁহার খুব মন পড়িয়াছে। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি; তোমার অবশ্যই একজন আপনার লোক আছে। তুমি রাজার প্রণয়িনী হইলে, সে লোকটা চটিয়া যাইবে এবং হয় তো হাঙ্গামা বাধাইবে। রাজা ওরূপ গোলমালে বড় ভয় করেন।"

তরঙ্গিণী বলিল,—"সে জন্য কোন ভয় নাই আমার প্রতি রাজার মন পড়িয়াছে জানিতে পারিলেই, আমি ঠিক করিয়া লইব। আমার গহনা গাঁটি যা কিছু আছে, হস্তগত করিয়া এমন সরিয়া পড়িব যে, কেহই আমার সন্ধান করিতে পারিবে না; আছি কি মরিয়াছি, তাহাও জানিতে পারিবে না।"

নীলরতন বলিলেন,—"তা বেশ—আটঘাট বাঁধিয়া কাজ করিও—দেখিও শেষে গোল না হয়। আমাকে কোন কথা বলিতে হইবে না। আমি তোমার পক্ষেই আছি—থাকিবও। তবে ভাই আমি গরিব মানুষ। চাকরী করি সত্য, দশ টাকা পাইও সত্য, কিন্তু খরচ অনেক, ডাকিনে আনিতে বাঁয়ে কুলায় না। আমার বিষয় তোমার বিবেচনা করিতে হইবে। রাজার রাণী আছেন বটে, কিন্তু জানই তো তুমি, ওরূপ ইয়ার লোকের রাণীকে কেবল কাঁদিয়াই দিন কাটাইতে হয়। তুমি জুটিয়া গেলে রাণী যে বাঁদী হইবে, তাহার আর ভুল নাই—তখন তুমিই আমার রাণী হইবে।"

বড়ই লোভের কথা। তরঙ্গিণী চতুরা। কিন্তু ধন-রত্ন-সুখ-সৌভাগ্যের লোভ তাহার হৃদয়ে বড়ই প্রবল। কুৎসিত-

দর্শন, সামান্য দোকানদার, অপদার্থ কালিদাসের সেবা সে অনেক দিন করিয়াছে। তাহাতে তাহার অনেক বাসনাই অতৃপ্ত রহিয়াছে। রাজার অপরিসীম রূপ, অতুলনীয় ধনসম্পত্তি, অত্যদ্ভুত বিলাসিতা এবং হৃদয়-মোহকর সরলতা ও রসিকতা তাহার শিরায় শিরায় প্রবেশ করিয়া তাহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে। তরঙ্গিণী বড়ই মজিয়াছে! হিতাহিত জ্ঞান তাহার আর নাই। সম্ভব অসম্ভব বিচার করিবার শক্তি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। সে বলিল,—"তোমার বিষয় বিবেচনা করিব, তাহা আর বলিতে! যদি আমার বাসনা সিদ্ধ হয়—তাহা যে তোমার সাহায্যেই হইবে, তাহা কি আমি বুঝিতেছি না—তোমাকে আমি বিশেষ সন্তুষ্ট করিব। আমার হাতে এখন কিছু নাই, থাকিলে আমি এখনই তোমাকে একশত টাকা দিতাম, ভাই। তা—তা আমার হাতের তাগা তোমাকে খুলিয়া দিতে পারি, তুমি লও না কেন?"

চৌধুরী বলিলেন,—"তা আমি লইব না—রাজা জানিতে পারিলে আমার উপর রাগ করিবেন। যদি কিছু দেওয়া মত হয়, নগদ দিও—জিনিসপত্র লইয়া রাজার হাতে মারা পড়িব নাকি?"

তরঙ্গিণী বলিল,—"তাহাই হইবে। আমি তোমার জন্য নগদ টাকা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছি। আবার কখন তুমি আসিবে? কখন তুমি আমাকে রাজার কাছে লইয়া যাইবে?"

চৌধুরী বলিলেন,—"সন্ধ্যার পর। আমি রাজার সহিত কথাবার্ত্তা ঠিক করিয়া তোমার সহিত দেখা করিব, তুমি তৈয়ার থাকিও। কিন্তু ওরা যে থাকিবে?—হারাধনের সম্মুখে আমার আসাও ভাল নহে, তোমার যাওয়াও ভাল নহে। অত বড় একটা রাজা কি শেষে একটা ছোট লোকের সহিত দাঙ্গা বাধাইবেন? এ কথা তুমি বেশ করিয়া বিবেচনা কর।"

তরঙ্গিণী বলিল,—"সে জন্য ভয় নাই। আমি এমন বন্দোবস্ত করিয়া রাখিব যে কিছুই জানিতে পারিবে না।"

নীলরতন বলিলেন,—"যেন গোল না হয়। আর একটা কথা—গিরিবালা আর হারাধনের ব্যবহারে রাজা অসন্তুষ্ট। এটা নিগূঢ় কথা। গিরিবালার কথা রাজা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন। তিনি ওরূপ লোকের সহিত তোমাকে কথাবার্ত্তা কহিতে দিবেন না, থাকিতেও দিবেন না। রাজার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা হইতেছে, তখন আগেই উহাদের সকল কথা তোমার জানাইয়া রাখা উচিত। তাহা হইলে তুমি যে উহাদের মত নয়, এ বিষয়ে রাজার আর কোন সন্দেহ থাকিবে না।"

তখন তরঙ্গিণী, আপনার সততা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত, গিরিবালা-সুরেন্দ্র-বাবু-ঘটিত সমস্ত কথা—প্রথম আলাপ হইতে গিরিবালার চৌর্য্য ও পলায়ন পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়, ব্যক্ত করিল এবং হারাধন যে অতি সামান্য ও জঘন্য লোক, তাহাও সে বার বার বলিল। সুরেন্দ্র বাবুর স্বভাব ও প্রকৃতি সম্বন্ধীয় কাহিনী, তাঁহার অবিচার ও অত্যাচার সকলই তাহার বাগ্মিনী রসনা ব্যক্ত করিল। গিরিবালার গর্ভসঞ্চার ও সে গর্ভ নষ্ট করিবার সঙ্কল্প পর্য্যন্ত চৌধুরী মহাশয়ের গোচর করা হইল। এ কুৎসিত পরামর্শের সে স্বয়ং প্রধান মন্ত্রণাদাত্রী ও উদ্যোগকর্ত্রী হইলেও অধুনা আপনার সাধুতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার আশয়ে সমস্ত অপরাধ হারাধনের ঘাড়ে চাপাইয়া দিল। হারাধন আপনার ভগ্নীকে লইয়া ব্যবসায় করিতে

বাহির হইয়াছে, ইহাও সে বলিল। সত্যের সহিত সে মিথ্যাও অনেক মিশাইল। গিরিবালার বয়স সম্বন্ধে সে প্রধান মিথ্যা কথা বলিল, সে বলিল গিরিবালার বয়স ত্রিশ বৎসরের কম নহে, ইহা সে ঠিক জানে। তাহার অপেক্ষা গিরিবালা ৫।৭ বৎসরের বড় ইহা সে প্রতিপন্ন করিল। রোগা ও খর্ব্বাকার বলিয়া গিরিবালাকে ছোট দেখায়।

সমস্ত কথা শুনিয়া নীলরতন বলিলেন,—"এখন আসি তবে। সন্ধ্যার পর আসিব। দেখিও, কোন গোল হয় না যেন—হারাধন যেন জানিতে না পারে। রাজাকে ঠিক করিয়া আসিব। কোন ভাবনা নাই। আমার বিষয় যেন মনে থাকে।"

তরঙ্গিণী তাঁহাকে অনেক আশ্বাস দিয়া বিদায় করিল। তরঙ্গিণী গৃহগতা হইয়া দেখিল, হারাধন সুনিদ্রিত। তখন সে যথাবিহিত যত্নে আপনার দৈহিক পারিপাট্য সাধনে ব্যাপৃত হইল। সে জানে, তাহার রূপ তো কম নহে; এ রূপের ফুল রাজার উদ্যানেই ফুটা উচিত। কুৎসিত কালিদাস চক্রবর্ত্তী কি ইহার উপযুক্ত পাত্র? কেবল সুযোগের অভাবে, কেবল অনুকূল ঘটনা না ঘটায়, এ মুক্তমালা এত দিন বানরের গলায় ঝুলিতেছে। সে সুযোগ—সে অনুকূল ঘটনা যখন উপস্থিত হইয়াছে, তখন আর ফস্‌কাইবার যো আছে কি? অনেক আশা করিয়াই তরঙ্গিণী গা ঘসিতে ও চুল আঁচড়াইতে লাগিল।

তরঙ্গিণীর বেশ-ভূষা সাঙ্গ হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে হারাধনের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন সন্ধ্যার বেশী বিলম্ব নাই। বেশের ঘটা হইতেছে দেখিয়া হারাধন বলিল,—"কাণ্ডখানা কি? এ জায়গায় এত রূপের জৌলস কেন বাহির করিতেছ ভাই?"

তরঙ্গিণী বলিল,—"আজি যদি রূপ না ছড়াইব, তবে ছড়াইব কবে? আজি তুমি আমি একা—এমন সুযোগ কবে হইবে? চিরদিনই চক্রবর্ত্তীর ভয়ে লুকোচুরি করিয়া কাটাইতে হয়। তোমাকে লইয়া মন খুলিয়া আমোদ করিতে পাই না। বিধাতা যদি সুযোগ ঘটাইয়া দিয়াছেন তবে ছাড়িব কেন? এই লোভেই আমি বাড়ী যাই নাই। কালিও যাইব না, মনের সকল সাধ মিটাইব।" হারাধন গলিয়া জল হইল। তরঙ্গিণী আবার বলিল,—"বাড়ীতে চক্রবর্ত্তীর জন্ত ভাল করিয়া মদ খাওয়া প্রায়ই হয় না। আজি তোমাতে আমাতে ভাল করিয়া মদ খাইব। তুমি তিনটি টাকা লইয়া যাও। এক টাকার খাবার, দুই টাকার মদ লইয়া আইস। দেরী করিও না।

এরূপ সৎকর্ম্ম ও শুভকার্য্যে দেরী করিবার লোক হারাধন নহে। সে তখনই গামছা কাঁদে ফেলিয়া ও টাকা টেঁকে রাখিয়া প্রস্থান করিল। তরঙ্গিণী সমস্ত কাজ শেষ করিল। তখন প্রায় সন্ধ্যা। হারাধন ফিরিয়া আসিল। তরঙ্গিণী তাহাকে বড় আদর করিয়া ঘরের ভিতর লইয়া গেল। সেখানে গিরিবালা ঘুমাইতেছিল। তাহার ঘুম আপাততঃ যাহাতে না ভাঙ্গে, তজ্জন্ত তরঙ্গিণী সাবধান করিয়া দিল।

অধিক মাত্রায় সুরা প্রয়োগ করিয়া হারাধনকে অচেতন করাই তরঙ্গিণীর অভিপ্রায়। তাহা হইলে, নীলরতন আসিলে কথাবার্ত্তার অসুবিধা বা রাজার ভবনে যাইবার প্রয়োজন হইলে, কোনই ব্যাঘাত ঘটিবে না। সুতরাং কালব্যাজ না করিয়া তরঙ্গিণী একটা প্রদীপ জ্বালিল এবং খাদ্যসামগ্রী, মদ ও গ্লাস লইয়া বসিল। বড় আদর ও যত্ন সহকারে

সে হারাধনকে মদ ঢালিয়া দিল। বিনীত ও আজ্ঞাবহ হারাধন তাহা গলাধঃ করিলেন। হারাধন মধ্যে মধ্যে তরঙ্গিণীর মুখে খাদ্য তুলিয়া দিতে লাগিল এবং তাহাকে মদ খাইতে অনুরোধ করিতে লাগিল। অনুরোধ রক্ষার জন্য খালি গ্লাস মুখে ধরিয়া তরঙ্গিণী মুখ বিকৃত করিতে থাকিল। এক বোতল শেষ হইল, দ্বিতীয় বোতল আরম্ভ হইল। সুরা হারাধনের মস্তিষ্ক ও শোণিত অধিকার করিয়া দেহকে অধীন করিয়া ফেলিল, সে আর মদ গিলিতে পারে না। কিন্তু তরঙ্গিণীর যে আদর, যে মধুমাখা কথা তাহাতে না বলা যায় কি? হারাধন সুখের সাগরে ভাসিতেছে। অনেক ধান্যেশ্বরী তাহার সুবিশাল উদরে প্রবেশ করিল। তখন হারাধন বলিল, "না—না—তরি—আর না।"

তখন তরঙ্গিণী, হারাধনের গলদেশ আপনার সুগোল বাম বাহুদ্বারা বেষ্টন করিয়া, দক্ষিণ হস্তে একপাত্র সুরা লইয়া তাহার মুখের নিকট ধরিল। হারাধন তখন তরঙ্গিণীর চিবুকে হাতদিয়া, অতি বিকৃতিস্বরে একটা কুৎসিত গান ধরিল।

ঠিক এই সময়ে সেই পাপ কুটীরদ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল এবং এক কৃষ্ণকায় পুরুষ চক্ষুর নিমিষ মধ্যে গৃহমধ্যস্থ হইয়া, হস্তস্থিত লগুড়ের দ্বারা হারাধনের মস্তকে প্রচণ্ড আঘাত করিল। হারাধন তৎক্ষণাৎ রুধিরাক্ত ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইল। অতঃপর তরঙ্গিণীর মস্তকে অনুরূপ আঘাত করিবার নিমিত্ত প্রহারকারী সেই লগুড় উত্তোলন করিল; এমন সময়ে, পশ্চাদ্দিক হইতে এক সুদীর্ঘ শ্মশ্রুধারী বিশালোরস্ক ব্রাহ্মণ আসিয়া প্রহারকারীর হস্ত ধারণ করিলেন। প্রহারকারী বহু চেষ্টাতেও সেই ব্রাহ্মণের বজ্রমুষ্টির মধ্য হইতে আপনার বাহু উন্মুক্ত করিতে পারিলেন না। ভয়ঙ্কর কাণ্ডে তরঙ্গিণী দৌঃশ, প্রহারকারী কালিদাস চক্রবর্ত্তী। কিন্তু কে এ ব্রাহ্মণ?

তৃতীয় খণ্ড।

"বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥"

অর্থ।—যিনি আত্মা দ্বারা মনকেও জয় করিয়াছেন, সেই ব্যক্তির আত্মা বন্ধু; কিন্তু অজিতমনা ব্যক্তির আত্মাই শত্রুর ন্যায় অনিষ্ট-সাধনে নিযুক্ত থাকে।

তাৎপর্য্য। যিনি বুদ্ধিবলে বিষয়াসক্ত, ভোগানুরত, কার্য্যকারণ-সংঘাতরূপ মনকে পরাভূত করিয়া আত্মজয়ী হইয়াছেন, এবং আত্মার প্রাধান্য প্রণিধান করিয়াছেন, তাঁহারই আত্মা শুভানুধ্যায়ী বন্ধু-স্বরূপ। আর যে আত্মজয় করিতে সক্ষম নহে তাহার আত্মা চিরদিনই অনিষ্টকারী শত্রু-স্বরূপ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ৬ষ্ঠ অধ্যায়।
৬ষ্ঠ শ্লোক। শ্রীমদ্ভগবদ্বাক্য।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

তুমি জ্ঞানগরিষ্ঠ দার্শনিক মহাশয়! তোমাকে কোটী কোটী নমস্কার করিয়া তোমার মহিমা স্বীকার করিতেছি, কিন্তু তোমার সকল মত গ্রহণ করিতে কদাপি

প্রলম্ভে নহি। তুমি অদৃষ্ট মান না, পূর্ব্বজন্ম [illegible] জন্মান্তরীণ কর্ম্ম ফলাফল গ্রাহ্য কর না [illegible] কথাটা উড়াইয়া দিতে চ[illegible] পরিণ[illegible] নির্দ্দেশ কর [illegible] প্র[illegible] কু[illegible] ঘট[illegible] ফল বলিয়া [illegible] মীমাংসা [illegible] এ [illegible] পান্ প্রত্যক্ষ [illegible] সমূহ [illegible] নিতান্ত বিরুদ্ধ। [illegible] কাণ্ড অনুক্ষণ, পদে পদে, প্রত্যক্ষীভূত হয়, তাহার অধিকাংশস্থলে তোমার এই সারবান্ তত্ত্ব প্রয়োগ করিলে কোনই মীমাংসা হয় না। কেন নিরপরাধা মা, অপরিসীম দুঃখ ভোগ করিয়া, হায় হায় করিতে করিতে দিন কাটাইতেছে? কেন ঘোর দুষ্ক্রিয়ান্বিত মহাপাপী আনন্দে মত্ত হইয়া, কালাতিপাত করিতেছে? কেন সাধু পুণ্য-প্রাণ মহাজন মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য লালায়িত হইতেছে? কেন নরহন্তা দস্যু ভোগের উপর ভোগ্য ভোগ করিয়া স্ফীত হইতেছে? কেন একজন যৎপরোনাস্তি অপরাধ করিয়াও স্বচ্ছন্দে নিষ্কৃতিলাভ করিতেছে? কেন পাপসংস্পর্শশূন্য ব্যক্তি দণ্ডভোগ করিতেছে? কেন হত্যাকারী রক্ত দ্বারে মুক্তিলাভ করিয়া বুক ফুলাইতেছে? কেন পরম অহিংসুক ব্যক্তি হত্যাপরাধে ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলিতেছে? ইত্যাদি যে সকল বিসদৃশ ব্যাপার সংসারের চতুর্দ্দিকে নিরন্তর সঙ্ঘটিত হইতেছে, তাহা আলোচনা করিলে, তোমার ঐ সুমহান্ তত্ত্বে অবশ্যই অশ্রদ্ধা হয়। তখনই মনে হয় এ সংসার এক সুশিক্ষিত কর্ম্মক্ষেত্র মাত্র। জীব এই কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত। কেহবা উৎসাহ সহকারে, কেহবা নিরুৎসাহে, কেহবা স্বেচ্ছায়, কেহবা অনিচ্ছায়, কেহবা দায়ে, কেহবা সখে, কর্ম্ম করিতেছে। ক্রিয়াশীলতাই জগতের ব্যবস্থা—নিষ্ক্রিয় কেহই নাই। যে মুহূর্ত্তে [illegible]ই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিতে হইয়াছে, [illegible] মানবকে এই সীমাশূন্য [illegible] জলবুদ্বুদের ন্যায় ভাসিতে হইতেছে, [illegible] নরুন্ধদর্শন বলীবর্দ্দের ন্যায়, [illegible] কর্ম্মে বাধ্য হইতে হইয়াছে। [illegible] তাহার কর্ম্মের বিরতি নাই। কর্ম্ম [illegible] ও অপরিহার্য্য সহচর। স্নেহময় পিতা [illegible] তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন, প্রিয় সুহৃদ্গণ তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন, নয়ন-বিনোদন নন্দন তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন, প্রাণাধিক প্রণয়িনী তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন, কিন্তু কর্ম্ম তাহাকে কদাপি পরিত্যাগ করিবে না। সে ধনী বা দরিদ্র হউক, ভিক্ষুক, বা রাজ্যেশ্বর হউক, একক বা বহু পরিবারযুক্ত হউক, বিদ্বান্ বা মূর্খ হউক, বুদ্ধিমান্ বা নির্ব্বোধ হউক, সক্ষম বা অক্ষম হউক, কর্ম্ম করিতে সে জন্মিয়াছে, কর্ম্ম করিতে সে বাধ্য; কর্ম্ম তাহাকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে। কর্ম্ম করিতে মনুষ্য এত বাধ্য বটে, কিন্তু ইহার ফলাফল-সম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণ অন্ধ। তাহারা কর্ম্মের দাস, কর্ম্ম তাহাদের দাস নহে। ফলের আকাঙ্ক্ষায় তাহারা কর্ম্ম করে বটে, কিন্তু ফল তাহাদের দুর্জ্ঞেয় অনায়ত্ত ও ইচ্ছাতীত। চিকিৎসক বহু যত্নে রোগীর চিকিৎসা করিতেছেন; কিন্তু বলিতে পারেন কি তিনি, রোগীর পরিণাম কি হইবে? আজি যাহা সহজ জ্বর, কালি তাহা সান্নিপাতিক বিকার হইয়া চিকিৎসকের সকল বিজ্ঞবুদ্ধিকে বিদ্রূপ করিবে। [illegible] হাদ নর পর প্রবাসী, আপনার প্রিয়জনবর্গকে দেখিবার জন্য, বহু আকাঙ্ক্ষায় লইয়া গৃহে ফিরিতেছেন,—আর কয়েক ব্যাম মাত্র অতিক্রম করিলে তাঁহার সুখময় আবাস নয়নগোচর

হয়; কিন্তু হায়! পশ্চাদ্বর্ত্তী তস্করের মুদ্গরা-ঘাতে সেই স্থানে তাঁহার প্রাণান্ত হইল! উপায়ক্ষম যুবক, অনন্ত সুখের আশা করিয়া, সুন্দরী ও গুণবতী ভার্য্যার সহিত বড় আনন্দের গৃহস্থালী পাতিয়াছে; নির্ম্মম যম সেই যুবার প্রাণান্ত করিয়া, সেই আনন্দময়ী যুবতীকে পথের ভিখারিণী করিয়া দিতেছে। এইরূপে পর্য্যালোচনা করিলে, উপলব্ধি হয়, মনুষ্য কর্ম্ম করে বটে, কিন্তু তাহার আকাঙ্ক্ষা-স্বরূপ ফল-প্রাপ্তি-সম্বন্ধে তাহার কোনই ক্ষমতা নাই। অদৃষ্ট তাহার ব্যবস্থাপক—ক্রিয়াশীল মানবের ক্রিয়াফল বিধিনিয়োজিত।

আমাদের পরিচিত রাজীবপুরের জমিদার, শ্রীযুক্ত বাবু বা সাহেব সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় সুবিদ্বান্ ও সুশিক্ষিত হইলেও, অন্যান্য সকল মনুষ্যের ন্যায় কর্ম্মের দাস। ভগবান্ বলিয়াছেন,—'নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্য কর্ম্মকৃৎ।' এ মহাবাক্যের তিনিও একজন দৃষ্টান্তস্থলীভূত, সন্দেহ নাই। কিন্তু ভগবান্ স্থানান্তরে বলিয়াছেন—কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।' এই মহদুক্তির প্রয়োগস্থল তিনি কোন ক্রমেই হইতে পারেন না। কর্ম্মফলে তাঁহার আসক্তি যথেষ্ট, এবং কর্ম্মফল ইচ্ছাধীন ও অবধারিত বলিয়া, তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস। এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী সুরেন্দ্র-বাবু যথেচ্ছাচারের মূর্ত্তিমান অবতার হইয়া উঠিয়াছেন, এবং অনুগত ও অধীনস্থ মানবগণকে যদৃচ্ছাক্রমে পদদলিত করিতেছেন। সতী স্ত্রীর ধর্ম্মনাশ, নিরপরাধ ব্যক্তির নিরতিশয় দণ্ডবিধান, গুণবানের প্রতি অযথা অত্যাচার প্রভৃতি স্বেচ্ছাচরণ, এই সুশিক্ষিত পাষণ্ডের নিত্যব্রত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি নিরঙ্কুশ-ভাবে, ইচ্ছানুরূপ কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেছেন, এবং ইচ্ছানুরূপ ফলভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছেন। কিন্তু তিনি যাহাই মনে করুন, বসুন্ধরা ভগবদ্বিহীনা নহে, এবং ক্রিয়াফল মনুষ্যের প্রতাপ বা ধনসম্পত্তি, বিদ্যা বা কৃতিত্বের অধীন নহে। এ জ্বলন্ত সত্য কখনই মিথ্যা হইবে না।

যে দিন হারাধনের গৃহদাহ করিয়া সুরেন্দ্র বাবু কীর্ত্তি বিস্তার করেন, তাহার কয়েক দিন পরে, তিনি এক সম্ভ্রান্ত প্রজার পৃষ্ঠদেশে বিলক্ষণ বেত্রাঘাত করিয়া আপনার মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। প্রজার অপরাধ, সে অশ্বারোহী সুরেন্দ্র বাবুকে দেখিয়া হস্তস্থিত হুকা ফেলিয়া, উঠিয়া দাঁড়ায় নাই। গ্রামস্থ তাবৎ লোকেই সুরেন্দ্র বাবুকে যথেষ্ট সম্মান জ্ঞাপন করে; এ ব্যক্তিরও তাহা করা উচিত ছিল তথাপি তাহার এ ত্রুটি কেন হইল বলা যায় না। সুরেন্দ্র বাবু মনে করেন যে, এ ব্যক্তি অত্যহঙ্কৃত; সুতরাং ইহার দমন একান্ত আবশ্যক যদিই সুরেন্দ্র বাবুর অনুমান যথার্থ হয়, বাস্তবিকই যদি এ ব্যক্তি অহঙ্কৃত হয়, তাহা হইলেও সুরেন্দ্র বাবুর প্রযুক্ত দণ্ড যে যৎপরোনাস্তি অযথা হইয়াছে, তাহার আর ভুল নাই।

সেই দিন সন্ধ্যার পর, সুরেন্দ্র বাবু আপনার উদ্যানমধ্যস্থ বিলাস-গৃহে বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছেন। চারি পাঁচটি বয়স্ক তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছে। সুরা চলিতেছে না, কুকর্ম্ম হইতেছে না, কুচর্চ্চাও বড় নয়—চলিতেছে কেবল খোস্ গল্প। দিনের কুকীর্ত্তি সুরেন্দ্র বাবুর একটিও মনে আছে, এমন বোধ হয় না। থাকিবার কথা নয়; যে সকল লোমহর্ষণ কার্য্য তিনি সতত অনুষ্ঠান করেন, তাহার তুলনায় আজিকার কাজ এতই কি ভয়ানক যে, সে জন্য হৃদয়ে দাগ পড়িবে? বড়ই হাসির রোল চলিতেছে। সকলেই গল্পে ডুবিয়া আছেন।

সহসা সেই সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠের উন্মুক্ত দ্বারদেশ হইতে শব্দ হইল,—"হর হর বম্ বম্।" সকলেরই দৃষ্টি সেইদিকে পড়িল। কি গম্ভীর ও মিষ্ট, উন্নত ও কোমল, ভীতিজনক ও মধুর কণ্ঠস্বর! সকলে দেখিল—অপূর্ব্ব দর্শন! দেখিল, এক বিভূতি-বিলেপিত-কলেবর, জটা-জুটধারী, বিশালবক্ষ, সুস্থূল, হসন্মুখ, ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিধান, ত্রিশূলধারী, সন্ন্যাসী, সজীব শিবের ন্যায়, সেই প্রকোষ্ঠদ্বারে দণ্ডায়মান। এই দেব-কল্প পরম শোভাময় সন্ন্যাসী-সন্দর্শনে সকলেই বিমুগ্ধ ও বাক্যহীন। হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী সুরেন্দ্র-নাথও প্রথমতঃ কিয়ৎকাল অবাক্ হইয়া, সেই স্থির ও পাষাণ গঠিত প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চল সন্ন্যাসীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সভ্যতার ভাষায় এরূপ অনুরাগ, আগ্রহ বা আবেগ প্রভৃতিকে হৃদয়ের দুর্ব্বলতা বলে। কোন্‌টী হৃদয়ের দুর্ব্বলতা ও কোন্‌টী সবলতা তাহা আমরা ভাল জানি না বলিয়া, সে কথার কোন মীমাংসা করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। আমাদের বিশ্বাস, যে সকল লম্বা লম্বা কথার আবরণে জুয়াচুরীর অঙ্গ ঢাকিয়া এবং তাহাকে ভদ্র সাজাইয়া সভ্যসমাজে চালাইবার সুব্য-বস্থা সভ্যতার শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, হৃদয়ের দুর্ব্বলতা কথাটা তাহারই অন্যতম। যাহাই হউক, সভ্য সুরেন্দ্র বাবু হৃদয়ের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে সবলতাকে ডাকিয়া আনিয়া, বলিলেন,—"কে তুমি? কেন সং সাজিয়া এখানে আসিয়াছ? কে তোমাকে এখানে আসিতে দিল? জান, আমি এখনই তোমার সর্ব্বনাশ করিতে পারি।"

নির্ভীক সন্ন্যাসী, মৃদুতা ও গাম্ভীর্য্য মিশ্রিত অপূর্ব্ব কণ্ঠস্বরে বলিলেন,—"আমি সন্ন্যাসী। সং সাজি নাই, সন্ন্যাসী সাজিয়াই এখানে আসিয়াছি। কেহ আমাকে বলে নাই, আমি আপনি আসিয়াছি। আমি জানি, তুমি আমার সর্ব্বনাশ করিতে পার না, পারি-লেও করিবে না।"

এই বলিয়া, সেই সন্ন্যাসী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং কেহ কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে তত্রত্য সুপরিষ্কৃত বিছানার উপর উপ-বেশন করিলেন। সুরেন্দ্র বাবু, সন্ন্যাসীর সাহস ও ভরসা দেখিয়া, বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। বলিলেন,—"তুমি কি পাগল! এখানে বসি-তেছ কোন্ সাহসে? জান, এখনই আমার দ্বারবান্‌গণ তোমাকে গলাধাক্কা দিতে দিতে তাড়াইয়া দিবে।"

সন্ন্যাসী অপূর্ব্ব স্বরে হাসিয়া উঠিলেন। সে হাস্য-ধ্বনি যেন ঘরের মধ্যে হাসিয়া হাসিয়া দুলিতে লাগিল। বলিলেন,—"আমি পাগল নহি। শুনিয়াছিলাম, তুমি লেখাপড়া জান। আমার সহিত কোন্ শাস্ত্রের বিচার করিতে চাহ, কর। পাগলে কি শাস্ত্র-বিচার করিতে পারে? আমি আপনার সাহসে এখানে বসিতেছি। তোমার অপেক্ষা অনেক বড়লোক ভারতবর্ষে আছেন, তাহা তোমার অবিদিত নাই, বোধ হয়। আমি তোমার অপেক্ষা বহুগুণে বড়লোকদের নিকটে যে সাহসে বসি, সেই সাহসেই এখানে বসিয়াছি। তোমার দ্বারবানগণ কখনই আমাকে গলা ধাক্কা দিয়া তাড়াইতে পারিবে না। তোমার কয়জনই বা দ্বারবান আছে? বড় জোর দশ জন! একটা ফৌজ আসিলেও আমা" নড়াইতে পারে কিনা, সন্দেহ। ইচ্ছা হয়, তোমার দ্বারবানদের ডাকিয়া বিশেষ বখ্‌সিস দিবার লোভ দেখাইয়া, আমাকে ফেলিয়া দিতে হুকুম দেও দেখি। যদি তাহা পারে, তখন ধাক্কা দিয়া তাড়াইবার কথা হইবে। কিন্তু সুরেন্দ্র! আমাকে তাড়াইবার জন্য তুমি কেন এত ব্যস্ত হইতেছ? আমি তোমার

গৃহে আসিয়াছি মাত্র—কোন অনিষ্ট করি নাই তো?"

সুরেন্দ্র বড়ই বিরক্ত হইলেন। তাঁহাকে সুরেন্দ্র বলিয়া কথা কহে, এমন সাধ্য কাহার? কোথা হইতে একটা প্রায় উলঙ্গ, ছাইমাখা, নিতান্ত অসভ্য সন্ন্যাসী আসিয়া, তাঁহাকে নাম ধরিয়া ডাকিল—তাড়াইয়া দিলে উঠিতে চায় না—লম্বা লম্বা কথা কয়—এত অত্যাচার সুরেন্দ্র বাবুর সম্মুখে! তিনি দারুণ ক্রোধের সহিত বলিলেন,—"তুমি এখনই আমার ঘর হইতে উঠিয়া যাইবে কি না শুনিতে চাহি।"

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"এখনই তো দূরের কথা—আজি রাত্রিতে যাইব না—কালি দিবা-রাত্রেও যাহা হয় যাইব না—পরশ্ব হয় তো যাইতে পারি।"

"আমি তোমাকে এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকিতে দিব না! তুমি আপন ইচ্ছায় এখানে থাকিবে?"

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"যতক্ষণ এখানে আমার দরকার, ততক্ষণ আমাকে থাকিতে দিতেই হইবে। আমি আপন ইচ্ছায় এখানে আসিয়াছি, আপন ইচ্ছায় থাকিব, এবং আপন ইচ্ছায় যাইব। কেন তুমি এত বিরক্ত হইতেছ? তোমার বিরক্তি আমার বিরঞ্জন হইতে পারে, কিন্তু আমার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। প্রথমতঃ আমি সন্ন্যাসী, সুতরাং বিপদসম্পদের অধীন নহি। দ্বিতীয়তঃ আমার দেহে যে শক্তি আছে, তাহাতে ইচ্ছা হয় আমি মত্তহস্তীকে ধরিয়া রাখিতে পারি। তৃতীয়তঃ, আমার যে বিদ্যা আছে তাহাতে কোন মতেই পরাভূত হইবার নহি। অতএব সুরেন্দ্রনাথ, তোমাকে ভয় করিবার আমার কোনই কারণ নাই। বরং আমাকে ভয় করিবার তোমার যথেষ্ট কারণ আছে। তোমাকে শাসন করিতেই আমি আসিয়াছি। হয় তোমাকে শাসন করিব, না হয় তোমার সর্ব্বনাশ করিব, ইহাই আমার সঙ্কল্প। বসুন্ধরায় তোমার ন্যায় দুরাত্মার স্থান হইতে পারে না।"

সুরেন্দ্রনাথের এতই ক্রোধ হইল যে, তাঁহার বাক্যকথনের ক্ষমতা তিরোহিত হইল। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে দেরাজ খুলিয়া একটা রিভল্ভার বাহির করিলেন, এবং তাহা ঠিক আছে দেখিয়া বলিলেন—"যে হতভাগা বিনা-হুকুমে আমার বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া শান্তিভঙ্গ করে, আমাকে শাসন করিতে চাহে, আমাকে নাম ধরিয়া ডাকে, আমার সহিত সমানভাবে কথা কহে, তাহাকে মারিয়া ফেলাই আবশ্যক। ভণ্ড সন্ন্যাসী, এই তোমার মৃত্যু উপস্থিত।"

গুড়ুম করিয়া শব্দ হইল, গুলি লাগিয়া একটা গ্লাসকেশ ঝন্ ঝন্ শব্দে বাজিয়া উঠিল, অগ্নি ঝলসিয়া উঠিল, সুরেন্দ্র বাবুর বয়স্যগণ চমকিয়া উঠিল, ধূম ও গন্ধ ছড়াইয়া পড়িল। রুধিরাক্ত মৃত সন্ন্যাসীর দেহ দেখিবার জন্য সকলেই আগ্রহে ও ঔৎকণ্ঠায় সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিল; কিন্তু সেখানে সন্ন্যাসী নাই! সন্ন্যাসী কোথায়? সন্ন্যাসী সুরেন্দ্রনাথের পশ্চাতে দণ্ডায়মান। সুরেন্দ্রনাথ সেই দিকে ফিরিয়া সন্ন্যাসীকে প্রহার করিতে উদ্যত হইবামাত্র, সন্ন্যাসী তাঁহার হস্ত হইতে রিভল্ভর কাড়িয়া লইলেন। তখনই সুরেন্দ্র বুঝিতে পারিলেন, বাস্তবিকই এ সন্ন্যাসীর শরীরে মত্তহস্তীর বল আছে। সন্ন্যাসী রিভল্ভর লইয়া, হেলায় তাহা দুই খণ্ড করিয়া ফেলিয়া দিলেন, এবং বামহস্তে সুরেন্দ্রনাথকে ধরিয়া শূন্যে উত্তোলন করিলেন। বলিলেন,—"মূঢ়, অহঙ্কৃত, দুরাত্মন্, এখন বুঝিয়াছ তুমি, আমার দেহে কত শক্তি? জানিতে

পারিয়াছ তুমি, তোমার দেহ তৃণের ন্যায় লঘু? আমি ইচ্ছা করিলে তোমাকে এখনই বিচূর্ণিত করিতে পারি; কিন্তু তাহা করিলে সকলে তো শেষ হইয়া যাইবে! তোমাকে অন্যরূপ শাস্তি দেওয়াই আমার অভিপ্রায়। সে শাস্তি দিতে যে আমার যথেষ্ট শক্তি আছে, তাহা তুমি বুঝিয়াছ? কি শাস্তি দিব তাহা তুমি ক্রমশঃ জানিতে পারিবে।"

সন্ন্যাসী সুরেন্দ্রনাথকে নামাইয়া দিলেন। সুরেন্দ্র, কিয়ৎকাল কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ের ন্যায় থাকিয়া, বলিলেন,—"মনে করিও না, তোমার দেহে অসুরের ন্যায় বল আছে দেখিয়া, আমি ভীত হইব। দেহে শক্তি থাকিলেই যে লোকের গৃহে জোর করিয়া প্রবেশ করিবে, বা তাহার উপর বিনা কারণে অত্যাচার করিবে, ইহা কখনই ন্যায়-সঙ্গত ব্যবস্থা নয়। তুমি সন্ন্যাসী সাজিয়াছ অথচ এইটুকু কাণ্ড-জ্ঞান তোমার নাই? তুমি ক্ষমার অযোগ্য।"

সন্ন্যাসী উচ্চহাস্য করিলেন। সে অট্টহাসির ধ্বনিতে সুরেন্দ্র ও তাঁহার বয়স্যগণ চমকিয়া উঠিলেন। সন্ন্যাসী ভৈরবস্বরে বলিলেন,—"তুমি মূর্খ, তুমি হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য পশু, তাই তুমি ন্যায়-বিচারে প্রবৃত্ত হইতে চাহিতেছ। আমার দেহে শক্তি আছে বলিয়া যদি অত্যাচার করা অসঙ্গত হয়; তোমার ধন-সম্পত্তি ও প্রভুতা আছে বলিয়া অনবরত উৎপীড়নে ও অবিচারে, নিরীহ প্রজাবৃন্দের সর্ব্বনাশ করা কিরূপে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে? যে মূঢ় রাজ-শাসন উপেক্ষা করিয়া অকাতরভাবে পরের সম্পত্তি লুণ্ঠন করে, যে পাষণ্ড ন্যায় ও ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া একের পাপে অন্যের গুরুতর দণ্ডবিধান করে, যে দুরাত্মা সামাজিক বিধি ব্যবস্থা বিদলিত করিয়া অনবরত কুল-কামিনীর সতীত্ব সম্পত্তি অপহরণ করে, যে দুর্বৃত্ত স্নেহমমতা-বর্জ্জিত হইয়া স্বার্থের অনুরোধে পুনঃ পুনঃ ও সজাত ভ্রূণের সংহার করে, যে নরকুল-কলঙ্ক পিশাচ ষড়যন্ত্রক্রমে নিরপরাধ মানবগণকে আশ্রয়-বিহীন করিয়া দেয়, যে হৃদয়হীন বর্ব্বর, সামান্য ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া ন্যায় অন্যায় বিচার না করিয়া,অতি দুষ্কর নরহত্যা করে, তাহার সহিত যুক্তির কথা কহিতে আমি কদাচ সম্মত নহি। প্রতাপ ও ধন-সম্পত্তির প্রভাবে যে নরাধম এবংবিধ অত্যাচারে বসুন্ধরা পরিপ্লাবিত করিতে পারেও নিরীহ মানবকুলের সর্ব্বনাশ করিয়া হাহাকার-ধ্বনিতে অবনীমণ্ডল পরিপূরিত করিতে পারে, তাহা হইলে আমি দৈহিক বলের প্রভাবে তাদৃশ পিশাচের নিপাত সাধন কেন করিব না? এরূপ পাষণ্ড এ বসুন্ধরায় কদাপি থাকিতে পাইবে না! নরাধম সুরেন্দ্রনাথ, তুই আমার বধ্য। আজি তোর বিধি-নিয়োজিত হন্তা উপস্থিত।"

সেই প্রদীপ্তকায় সন্ন্যাসী, বিকট হুঙ্কার ধ্বনি ত্যাগ করিয়া সুরেন্দ্রনাথের গলদেশ ধারণ করিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ 'বাবা গো' শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন! তাঁহার সহচরগণ কম্পান্বিত কলেবরে পলায়ন করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতে, রাজীবপুরে একটা বড় ভয়ানক জনরব উঠিল,—কৈলাস হইতে হরগৌরী আসিয়া, ত্রিশূলের আঘাতে সুরেন্দ্র বাবুকে বধ করিয়াছেন। কেহ বলিতেছে,—

—'কেবল শিব আসিয়াছিলেন।' কেহ তাহার সহিত ঝগড়া করিয়া বলিতেছে,—'তুই ছাই জানিস্, উমা-মহেশ্বর দুইজনেই ছিলেন, নন্দী-ভৃঙ্গীও সঙ্গে ছিলেন।' একজন বলিতেছে,—'বাবুদের বাড়ীর পিছনে' আমবাগানে ভৃঙ্গী মহাশয় মহাদেবের ষাঁড় বাঁধিয়াছিলেন।' অন্যত্র একজন খুব হাত-মুখ নাড়িয়া বলিতেছেন,—ত্রিশূল দিয়া মারেন নাই; মহাদেব দাঁড়াইবামাত্র তাঁহার কপাল হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়া, একেবারে সুরেন্দ্র বাবুকে ছাই করিয়া ফেলিয়াছে! যেখানে তিনি বসিয়াছিলেন, সেখানে কতকগুলা ছাই পড়িয়া আছে মাত্র।' আর এক যুবা বলিলেন,—'খুড়া মহাশয় যাহা বলিলেন তাহাই বটে, তবে সকল কথা উনি ঠিক করিয়া জানিতে পারেন নাই। আগুনে পোড়া নয়, সাপে খাওয়া। যেই মহাদেব আসা,সেই তাঁহার মাথার সাপটা সুরেন্দ্র বাবুর কপালে কামড়াইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু! লাস এখনও পড়িয়া আছে।' খুড়া মহাশয় বড়ই রাগের সহিত বলিলেন,—'এখানকার ছেলেগুলা বড়ই বেল্লিক হইয়াছে। হতভাগা দেখে আয় সেখানে ছাই—ছাই—ছাই পড়ে আছে। দেখ দেখি মহাশয়, কোথা থেকে সাপের গল্প নিয়ে এসে উপস্থিত! একি গুলির আড্ডা রে হারামজাদা?' ভাইপো থামিয়া গেলেন। আর এক স্থানে একজন বলিতেছেন,—সুরেন্দ্র বাবু মরার পরে বিষ্ণুদূতে ও যমদূতে খুব ঝগড়া বাধিল। মহাপাপী হইলেও, শিবের হাতে মৃত্যু. বড় ভাগ্যের কথা। যমদূতের সাধ্য কি, সে দেহ স্পর্শ করে! বিষ্ণুদূত বাবুকে লইয়া গেল।' একটা ফচ্‌কে ছোঁড়া জিজ্ঞাসিল,—'ঠাকুরদাদা! হেথায় হারাইলে—তুমি কেন সঙ্গে মিশিয়া গোভাগাড়ের হাত এড়াইলে না?' ছোকরা পলাইয়া বাঁচিল, নচেৎ বৃদ্ধের হাতের এক লাঠি তাহার খাইতেই হইত। মৃত সিংহকে গাধাও লাথি মারিয়াছিল; আজি মুখ ফুটিয়া অনেক নিন্দাবাগীশ সুরেন্দ্র বাবুর কুৎসা কীর্ত্তন করিয়া বাঁচিল।

জনরব শতমুখে ইত্যাকার কাহিনী চারিদিকে প্রচার করিতে লাগিল গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে এই প্রসঙ্গ প্রচারিত হইল। রাজীবপুরের ক্রোশ দুই উত্তর পশ্চিমে, কাননমধ্যস্থ এক ক্ষুদ্র কুটীরে এ সংবাদ পৌছিল। বড় ঝর ঝরে ঘরখানি—অতি পরিষ্কার উঠানটুকু—বেশ সমান বেড়াঘেড়া। সেই উঠানে বসিয়া এক যুবতী কাঁথা শেলাই করিতেছে। যুবতী কৃষ্ণবর্ণা। যাহার রঙ কালো তাহাকে সুন্দরী বলিলে অনেকেই হয়তো ভ্রূকুটী করিবেন। সেই ভয়ে, আমরা এ যুবতীকে সুন্দরী বলিব কি না স্থির করিতে পারিতেছি না। কিন্তু কালো হইলে যদি সুন্দরীর শ্রেণীতে স্থান না পাওয়াই নিয়ম হয়, তাহা হইলে দ্রুপদনন্দিনীকে লাভ করিবার জন্য আর্য্যাবর্ত্তের রাজাগুলা দ্বাপরযুগে মারামারি করিয়াছিল কেন, বলিতে পারি না। যাহা হউক, ভয়ে ভয়ে বলিতেছি, যুবতী একে কাঁথা শেলাই করিতেছে, তাহাতে কালো, তথাপি সুন্দরী। অদূরে একটী বৃক্ষমূলে একটী বালক ও একটী বালিকা খেলা করিতেছে। আমরা এ যুবতীকে জানি না কি? এই সুন্দরী হারাধনের স্ত্রী ভুবনমোহিনী। ভুবনমোহিনী মনঃসংযোগ করিয়া কাজ করিতেছে, আর এক একবার ছেলে মেয়ের দিকে চাহিয়া দেখিতেছে, আবার কাজ করিতেছে।

বেলা অপরাহ্ণ হইয়াছে। তিনটা বাজিয়া গিয়াছে—প্রায় চারিটার আমল। ধীরে ধীরে এক প্রবীণা স্ত্রীলোক, ভিজা কাপড় পরিয়া

ও কাঁধের উপর এক বোঝা ভিজা কাপড় লইয়া, সেই কুটীরাঙ্গনে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিমাত্র ভুবনমোহিনী তাড়াতাড়ি হাতের কাজ ফেলিয়া উঠিয়া গেল, এবং তাহার স্কন্ধের বোঝা উঠাইয়া বলিল,—"মা, কাপড়গুলা ভিজিয়া ভারি তো কম হয় নাই। তখনই বলিয়াছিলাম, তোমার বড় কষ্ট হইবে, রাখিয়া দেও, কালি আমি স্নানের সময় কাচিয়া আনিব। আমি থাকিতে এত কষ্ট কেন কর মা তুমি?" ভুবনমোহিনী শীঘ্র একখানি শুষ্ক বস্ত্র আনিয়া দিল। বস্ত্র পরিধান করিয়া বৃদ্ধা বলিল,—"তুমি একা কত করিবে মা? তুমিই কি এক দণ্ড বসিয়া থাক? বাছা! অনেক সাধ করিয়াই তোমাকে ঘরে আনিয়াছিলাম; তোমাকে অনেক সুখে, অনেক আদরে রাখিব ভাবিয়াছিলাম। পোড়া গর্ভের দোষে আমার সকল সাধেই বাদ হইল। এখন এই জন্মের এই কষ্ট! আমার যা হইবার হইয়াছে; আজি বাদে কালি মরিব—সকল জ্বালা জুড়াইব। তোমার এই বয়স—এই সোণারচাঁদ ছেলে-মেয়ে; কাহার আশ্রয়ে তুমি জাতিকুল বাঁচাইয়া দিন কাটাইবে ইহাই আমার ভাবনা। যাহারা আমার পেটে আসিয়াছিল তাহারা আমার মুখে চূণ-কালি দিয়া গিয়াছে। তাহারা বাঁচিয়া থাকা চেয়ে মরাই ভাল। কিন্তু মা, তোমার কি হইবে। যাহা হইবার হইয়াছে, এখন আশীর্ব্বাদ করি যেন তোমার পায়ে আর কাঁটাটিও না ফোটে, ছেলে-মেয়ে নিয়ে তোমার যেন কোন কষ্ট পাইতে না হয়, তুমি যেন রাজার মা হও! কিন্তু আমার মত অভাগিনীর কথা ভগবান্ শুনিবেন কেন? এত পাপী যাহার সন্তান, তাহার অনেক পাপ। সে মহাপাপীর আশীর্ব্বাদ ফলিবে কেন?" বলা বাহুল্য, এই বৃদ্ধা কুলধ্বজ হারাধন ও গিরিবালার জননী। ভুবনমোহিনী সিক্ত বস্ত্র সমূহ বেড়ার গায়ে শুখাইতে দিতেদিতে বলিল,—"তোমার আশীর্ব্বাদেই আমার সব হইবে। যদি তোমার পায়ে আমার মতি থাকে, অবশ্যই তুমি যাহা বলিতেছ, সকলই হইবে।"

এ কথা তখন চাপা পড়িয়া গেল। বৃদ্ধা বলিল—"ওমা, এতক্ষণ বলা হয় নাই—গঙ্গার ঘাটে লোকের মুখে বড় আশ্চর্য্য কথা শুনিলাম। কাল রাত্রিতে নাকি সুরেন্দ্র বাবু মারা পড়িয়াছে।"

ভুবনমোহিনী চমকিয়া উঠিল। বলিল,—"মরিয়া গিয়াছেন? কেন? কি হইয়াছিল।

তখন বৃদ্ধা, কৈলাস পর্ব্বত হইতে শিবের আগমন অবধি আরম্ভ করিয়া, সুরেন্দ্র-বধ-পর্ব্ব সমস্ত বর্ণনা করিল। ভুবন-মোহিনী নীরবে দাঁড়াইয়া সমস্ত শুনিল—শুনিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল—কিন্তু কোন উত্তর দিল না। তাহার হৃদয় তখন সেই অত্যাচারী সেই পীড়নকারী দুরাত্মার জন্য কাঁদিতেছে। সে তখন ভাবিতেছে—সুরেন্দ্র-নাথের এত ধন সম্পত্তি এত সুখ-সম্পদ এত ক্ষমতা ও প্রতাপ ছিল কিন্তু কেন তাহার ধর্ম্ম ছিল না? কেন অনবরত পাপানুষ্ঠান করিয়া সে দেবতার বিরাগভাজন হইল? কেন সে পতঙ্গের ন্যায় পাপের আগুনে পড়িয়া এই নবীন বয়সে প্রাণ হারাইল!"

হারাধনের পুত্র কন্যা আসিয়া, ভাত খাওয়াইয়া দিবার জন্য বৃদ্ধাকে বড় পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল; সুতরাং তাহাকে চলিয়া যাইতে হইল। এ সম্বন্ধে আলোচনা তখন বন্ধ হইল। শিশুদের ভাত মাখিয়া দিয়া হারাধনের মা উপকথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। উপকথা বেশ জমিয়া উঠিল। ছেলেরা হুঁ দিতে দিতে

অত্যন্ত মনঃসংযোগ সহকারে গল্প শুনিতে লাগিল।

"মা কোথায় গো? দাদা-দিদি ভাল আছে তো?"—বলিতে বলিতে একটী লোক বেড়ার দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। আনন্দে ভুবনমোহিনীর মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। ছেলেরা ভাত ফেলিয়া ও উপকথা ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিল। হারাধনের মা ভাতের হাতেই উঠিয়া আসিলেন। এক মুহূর্ত্তমধ্যে এই ক্ষুদ্র সংসার আনন্দ ও উৎসাহে পরিপূর্ণ হইল। আপনাদের অবস্থার কথা কাহারও মনে থাকিল না। ভুবনমোহিনী সেই অঙ্গন মধ্যে একখানি চট পাতিয়া দিয়া বলিল,—"বস বাবা। বাটী হইতে কখন আসিলে? শরীর ভাল আছে তো? মা ভাল আছেন? দাদা ভাল আছেন?"

আগন্তুকের হাতে একটা পুঁটুলি ছিল। সে তাহা ভূমিতলে রক্ষা করিল। কিন্তু আসন গ্রহণ করিয়া, ভুবনমোহিনীর অনুরোধ রক্ষা করিল না, তাঁহার এত প্রশ্নের একটা উত্তর দিল না। "দাদা, দাদা" বলিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া হারাধনের পুত্রকন্যা তাহার নিকটস্থ হইল। সে বড় সোহাগের সহিত দুই কোলে ছেলে-মেয়েকে তুলিয়া লইল। আদরে তাহারা গলিয়া গেল। খোকার চক্ষু ছলছল করিতে লাগিল। আগন্তুকের চক্ষু দিয়া দুই ফোটা জল পড়িয়া গেল।

ভুবনমোহিনী বলিলেন—"উহাদের সকড়ি মুখ বাবা—একবার নামাইয়া দেও—হাত মুখ ধুয়াইয়া দিই। উহারাই তোমার সব—আমরা কি কেহ নহি? আমি এত কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার একটাও উত্তর দিলে না?"

আগন্তুক খোকা-খুকিকে নামাইয়া দিয়া "কেন উত্তর দিব? দিদিমার বাড়ী—তুমি কোথাকার কে? দিদি-মা আমার সঙ্গে একটী কথাও কহিলেন না; তবে আমি এখানে বসিব কেন? এস দাদা দিদি, আমরা রাগ করিয়া চলিয়া যাই।"

হারাধনের মা বলিলেন,—"তা যাবে বই কি? সবে আজ বাড়ী হইতে আসিয়াছ—এখন বুড়ীর কথা ভাল লাগিবে কেন? আমি তাই, ভয়ে ভয়ে কথা কহিতেছি না। যার কথা ভাল লাগিতে পারে, সেই গলা জড়াইয়া ধরিয়া কথা কহুক—আমি তফাতে দাঁড়াইয়া দেখি। রাধী, (হারাধনের কন্যার নাম রাধিকা) তোর দাদাকে ছাড়িস্ না। তোর মন যোগাইতেই তোর দাদা আসে—বুঝিয়াছিস্?"

বড় সেকেলে—বড় অশ্লীল রসিকতা। কিন্তু সেকেলে লোকের হাতে, সেকেলে লোকের মুখে, এরূপ অবৈধ ব্যবহার হইবারই কথা। সুরুচি-মার্জ্জিত সাধু পুরুষেরা দয়া করিয়া ক্ষমা করিবেন। বৃদ্ধা আবার বলিল,—"রাধী, তোর দাদাকে বসিতে বল। আমার কথায় কি তোর দাদা বসিবে? বিশেষ আজি বাড়ী হইতে আসিয়া তোর সতীনের ভাবনায় দাদার মন কেমন করিতেছে।"

আগন্তুক যুবা পুরুষ, তথাপি তাহার রুচি নিতান্ত নিন্দনীয়। সে বলিল,—"সতীন রাধীর কেন হইবে? তোমারই সতীনকে আজি ছাড়িয়া আসিয়াছি। তা তোমার সতীন কিন্তু তোমার মত হিংসুটে নয়। সে তোমার ভাবনায় অস্থির। সেই তো তোমার কাছে আসিবার জন্য দিনরাত্রি আমাকে বলে।"

বৃদ্ধা বলিল,—"তা বলিবে বই কি? তাহার দিনকাল আছে—বুড়ীর কাছে আসিতে তোর তাহার ভয় হইবে কেন? তাহা হউক,

তিন দিন পরে আসিবে বলিয়া, দশ দিনেও যে তাহার হাত ছাড়াইয়া আসিতে পারিয়াছ, ইহাই আমার পরম ভাগ্য। এখন ব'স—বাড়ীর সব খবর বল।"

যুবা এবার বসিল—বিনা নিমন্ত্রণে হারাধনের পুত্র-কন্যা তাহার কোলে আসিয়া বসিল। বালক-বালিকা কোলে বসিতেছে দেখিয়া, ভুবনমোহিনী বলিল—"যাও, তোরা ভাত খাইয়া আইস—ভাত পড়িয়া আছে। তোমাদের দাদা বসিয়া থাকিবেন এখন। বাবাকে একটু জল খাইতে দেও মা! তুমি হাত পা ধোও বাবা, পায়ে কত ধূলা।"

যুবা বলিল,—"দাদা দিদি ভাত খাইতে খাইতে উঠিয়া আসিয়াছ? বেশ করিয়াছ! আমার ভাই-ভগ্নী এখন, ভিজা ভাত কেন খাইবে? আইস, আমরা সন্দেশ খাই।"

এই বলিয়া, যুবা সেই পুঁটুলি খুলিয়া সন্দেশ বাহির করিল। বলিল,—"এই দিদিমার ভাগ, এই মার ভাগ, এই তোমাদের কালি খাইবার ভাগ, আর এই গুলা সব আমরা এখন খাই। কেমন?"

বলা বাহুল্য, খোকা-খুকি বড় আনন্দিত হইল। তখন সেই যুবা ছেলেদের সহিত কাড়াকাড়ি করিয়া বালকের ন্যায় আনন্দে সন্দেশ খাইতে লাগিল। ভুবনমোহিনী জল আনিয়া দিলেন। খাওয়ার ব্যাপার শেষ হইলে, সে, মা ও দিদিমার সহিত নানাপ্রকার সাংসারিক কথাবার্ত্তায় প্রবৃত্ত হইল। ঘরে চাউল, ডাউল, লবণ, তৈল ইত্যাদি সামগ্রী আছে কি না, তাহা সে সন্ধান করিল। কোন্ কোন্ সামগ্রী কালই চাহি, তাহা স্থির করিয়া লইল। নগদ পয়সা ফুরাইয়া গিয়াছে জানিয়া সে একটা টাকা দিল। তাহার পর বলিল,—"আমি আজি যাইব, আবার পাঁচ সাত দিন পরে আসিব। তোমরা বড় সাবধানে থাকিবে। খাওয়া দাওয়ায় কোন কষ্ট করিবে না। যে সকল জিনিষ ফুরাইয়াছে, তাহা কালি প্রাতে আসিয়া পৌঁছিবে। যদি বিশেষ কোন দরকার পড়ে। তাহা হইলে যে জায়গা বলিয়া দিয়াছি খবর দিবে। তাহা হইলেই হয় আমি নিজ, না হয় অন্য কোন আত্মীয় লোক আসিয়া উপস্থিত হইবেন। ঈশ্বর-কৃপায় সকলেরই শরীর নীরোগ থাকিবে। যদি কাহারও পীড়া হয়, তাহা হইলে যে কবিরাজের কথা বলিয়া দিয়াছি, তাঁহার নিকট খবর পাঠাইবামাত্র, তিনি আসিয়া দেখিয়া যাইবেন—ঔষধ দিবেন। কোন বিষয়ে কোন ভয় নাই—ভাবনা নাই। যে স্ত্রীলোক তোমাদের দেখা শুনা করিবে, খবর লইবে, হাট বাজার করিয়া দিবে স্থির করিয়া দিয়াছি, সে সর্ব্বদা আইসে তো? আবশ্যক হইলে তাহাকে দিন রাত্রি বাটীতে রাখিয়া দিবে। তাহার বড় সাহস—রাত্রি দুপরে তাহাকে কোন ভার দিলেও সে তাহাতে নারাজ হইবে না।"

সমস্ত কথা শুনিতে শুনিতে, ভুবনমোহিনীর চক্ষুতে জল আসিল। তিনি বলিলেন,—"আমাদের জন্য এত ভাবনা কেহ কখনও ভাবে নাই। অতি আপনার লোকেও এমন যত্ন করে না। বাবা! তুমি আমাদের কে?"

যুবা বলিল,- "আমি তোমার পেটের ছেলে মা। আর খোকার দাদা, কেমন রাধা?"

রাধা বলিল,—"না, আমাল।"

যুবার গলা জড়াইয়া খোকা বলিল,—"আমাল—আমাল।" যুবা দুইজনকেই আদর করিয়া বলিল,—"আমি তোমারও দাদা, তোমারও দাদা—কেমন? দেখ দেখি মা,

আমি তোমার পেটের ছেলে কি না! মা বোনের যত্ন সবাই করে তো মা!"

ভুবনমোহিনী বলিলেন,—"তুমি দেবতা। তুমি আমার ছেলে হইয়াছ—আমি ভাগ্য-বতী। ভগবান্ তোমাকে নিরাপদে রাখুন।"

যুবা বলিল,—"মার আশীর্ব্বাদ কখনও নিষ্ফল হয় না। অবশ্যই ভগবান্ আমাকে নিরাপদে রাখিবেন।"

বৃদ্ধা বলিলেন—"কিন্তু ভাই, আমাদের জন্য তোমার যে অনেক খরচ হইতেছে! তুমি আপনার সংসার চালাইয়া আবার আমাদের বোঝা কত দিন বহিতে পারিবে দাদা?"

যুবা হাসিয়া বলিল—"দিদি মা, তুমি তো বুড়া হইয়াছ। কয়খানা হাড়ে আর কত বোঝা হইবে? আর এ দুইটি ছেলেও বড় ভারী বোঝা নয়। এক মা! তা মার বোঝা আর যোয়ান ছেলে বহিতে পারিবে না? কেন দিদি, তুমি এত ভাবিতেছ? আমার সংসারে আর তোমাদের সংসারে কি তফাৎ আছে দিদি? যদি সে সংসার চলে তবে এ সংসারও চলিবে। যদি সেখানে না চলে এখানেও চলিবে না! সেখানে আমার গৃহিণী। এখানেও আমার গৃহিণী। জোর দু'জায়গাতেই সমান। কি বল দিদি?"

বৃদ্ধার চক্ষুতেও জল। তিনি নেত্র মার্জ্জন করিয়া বলিলেন—"তুমি কখনই মানুষ নও।"

যুবা বলিলেন—"তবে আমি কি বাঘ, না ভালুক? সরিয়া যাও দিদি—আমি কামড়াই।"

বৃদ্ধা বলিলেন,—"মা যাহা বলিয়াছেন তুমি তাহাই। তুমি দেবতা।"

যুবা বলিলেন,—"তবে দিদি, তোমার সশরীরে স্বর্গ! আমি দেবতা নই, কিন্তু দেবতা আমার সহায় বটেন। পূর্ব্ব জন্মের পুণ্যে ও তোমাদের আশীর্ব্বাদে আমি দেবতার দাস হইয়াছি। সে দেবতার ঘর কন্না আছে, স্ত্রী পুত্র আছে, আহার ব্যবহার লোক-লৌকিকতা আছে। তিনিও তোমার আমার মত মানুষ —তথাপি তিনি দেবতা, তিনি কার্য্যময়। যেখানে বিবাদ- যেখানে দুঃখ সেখানে তিনি। তাঁহাকে ডাকিতে হয় না, সংবাদ দিতে হয় না, তিনি স্বয়ং সর্ব্বত্র উপস্থিত। তিনি কখন দুরাত্মার দণ্ড দিতেছেন, কখন সাধুর সেবা করিতেছেন। কখন দুঃখীর জন্য কাঁদিয়া আকুল হইতেছেন, কখন কখন ইচ্ছা করিয়া কাহাকে দুঃখ দিতেছেন। তিনি রাজা নন, ধনী নন; কিন্তু তাঁহার অভাব নাই, তাঁহার কার্য্যে অর্থের অভাব হয় না। তিনি ভিক্ষা করেন না, অথচ লোকেও তাঁহার চরণে ধন ঢালিয়া দেয়। তাঁহার সঞ্চয় নাই—কেবল ব্যয়। তাঁহার কার্য্যে স্বার্থ নাই —কেবল পরের জন্যই তাঁহার কার্য্য। তাঁহার ভয় নাই—কেহ তাঁহাকে অবসন্ন করিতে পারে না। তাঁহার ভয়ে অনেকে অস্থির। তিনি সাক্ষাৎ ও সাহস ভরসা। তিনি কখন কোথায় থাকেন, স্থির নাই—অথচ যেখানে আবশ্যক সেখানেই তাঁহাকে দেখা যায়। তাঁহার আদালত নাই, তিনি হাকিম নহেন, অথচ সকল স্থানেই তিনি স্বাধীন ভাবে সূক্ষ্ম বিচার করিতেছেন। দিদি মা, তোমাদের আশীর্ব্বাদে, আজি দুই মাস হইল, আমি সেই দেবতার সাক্ষাৎ পাইয়া ধন্য হইয়াছি। সে সময় একটা বিশেষ দরকারের জন্য আমার হাতে হাজার টাকা ছিল! আমি সেই টাকা তাঁহারই কাজে লাগাইয়া দিতেছি। সেই অবধি আমি সেই দেবতার দাস হইয়া আছি। তাঁহার উপদেশে আমার কাজকর্ম্মের কোন অসুবিধা নাই—আমি সর্ব্বপ্রকারে বড় সুখে

আছি। আমি সেই দেবতার হুকুমে দের যত্ন করি। ভাগ্যে থাকিলে তোমরাও অবশ্য সে দেবতার সাক্ষাৎ পাইবে।”

যুবার মা ও দিদি-মা নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। দিদি মা বলিলেন,—“এমন যিনি, তিনি তো দেবতাই বটেন। তোমার ন্যায় পুণ্যবান্ না হইলে অন্যে সে দেবতার সাক্ষাৎ পাইবে কেন? আমি মহাপাপী, আমি কি সে দেবতা দেখিতে পাইব?”

যুবা বলিল,—“অবশ্য পাইবে। কেন আমি দেখিলেই কি তোমার দেখা হয় না? তবে তোমার কিসের ভালবাসা? আমি এখন আসি। রাত্রি হইয়া পড়িল। আমাকে এখন শান্তিপুর যাইতে হইবে। দিদি-মা, তোমার ছেলে মেয়ের জন্য ভয় নাই, তাঁহারা ভাল আছেন।”

দিদি মা বলিলেন,—“তাহাদের নামে কাজ নাই। তাহারা আছে কি মরিয়াছে, তাহাও জানিতে সাধ নাই। তুমি এখনই যাইবে কেন? যদি যাইতে হয়, তবে খাওয়া দাওয়া করিয়া যাইবে।”

যুবা বলিল,—“আমার অনেক কাজ আছে। এখনই না যাইলে নহে।”

ভুবনমোহিনী বলিলেন,—“বাবা, তুমি দেবতার কথা বলিলে বলিয়া মনে হইতেছে। মা শুনিয়া আসিয়াছেন, কৈলাসপর্ব্বত হইতে শিব আসিয়া নাকি সুরেন্দ্র বাবুকে মারিয়া ফেলিয়াছেন। এ কথা কি সত্য, বাবা।”

যুবা বলিল,—“একথা তোমাদের এখানেও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে বুঝি? কৈলাস পর্ব্বত না হউক, কোন বনজঙ্গল হইতে কোন সন্ন্যাসী সুরেন্দ্র বাবুর বৈঠকখানায় গিয়াছিলেন বটে। আমি সব জানি। সুরেন্দ্র বাবুর কোন অনিষ্টই সন্ন্যাসী করেন নাই। তিনি যেমন ছিলেন, তেমনই আছেন। কথাটা এরূপ হইয়া প্রচার হইল কেন, জানি না।”

ভুবনমোহিনী জিজ্ঞাসিলেন,—“কে সে সন্ন্যাসী?”

যুবা উত্তর দিলেন,—“তোমারই কোন বাবা হইবে।”

ভুবনমোহিনী বলিলেন,—“আমার বাবা তো সন্ন্যাসী নহেন।”

যুবা উত্তর দিলেন,—“সন্ন্যাসী যেই হউন, তিনি সুরেন্দ্র বাবুর কোন অনিষ্ট করেন নাই। সুরেন্দ্র বাবু যদি সাবধান হইয়া না চলেন, যদি পাপে বিরত না হন, তাহা হইলে সন্ন্যাসী তাঁহার সর্ব্বনাশ করিবেন।বলিয়াছেন।”

ভুবনমোহিনী জিজ্ঞাসিলেন,—“সন্ন্যাসী এখন কোথা?”

“তাহা জানি না মা। আমি এই সকল গল্প শুনিয়া রাজীবপুরে জানিতে গিয়াছিলাম। শুনিলাম, সন্ন্যাসী এইরূপ শাসন শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। দেখিলাম, সুরেন্দ্র বাবু বারান্দায় বসিয়া মুখ ধুইতেছেন। কিন্তু যাহাই হউক মা, সন্ন্যাসীর এই বৃত্তান্ত শুনিয়া আমার মনে বোধ হইয়াছে, যদি সুরেন্দ্র বাবু সাবধান হইয়া না চলিতে পারেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার গুরুতর বিপদ ঘটিবে। সন্ন্যাসী মহাপুরুষ সন্দেহ নাই। তিনি তোমাদের প্রতি সুরেন্দ্র বাবুর অত্যাচারের খবরও জানেন। সুরেন্দ্র বাবুকে যে যে কথা উল্লেখ করিয়া তিনি শাসন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে এ কথাও ছিল।”

ভুবনমোহিনী বলিলেন,—“তোমার কথা শুনিয়া আমি আপাততঃ নিশ্চিন্ত হইলাম। সুরেন্দ্র বাবুকে মারিয়া ফেলিয়াছে শুনিয়া আমার বড় ভাবনা হইয়াছিল। একদিন না একদিন

তাঁহার মতিগতি অবশ্যই ভাল হইবে। তাঁহার ধন আছে, ক্ষমতা আছে, তখন তাঁহার দ্বারা কত লোকের কত উপকার হইবে। সঙ্গ-দোষে এখন মন্দ বলিয়া, চিরদিন তিনি মন্দ থাকিবেন না। তিনি মারা যান নাই শুনিয়া আমার বড় আহ্লাদ হইল।"

যুবা মনে মনে ভাবিলেন,—"এই জন্য মা তোমাকে দেবী ভাবিয়া তোমার সন্তান হইয়াছি। দেবী যে তুমি, তাহার সন্দেহ কি?"

বলিলেন,—"তবে এখন আমি আসি মা। পাঁচ সাতদিন পরে আবার আসিব।"

যুবা, বালক-বালিকাকে কোলে লইয়া চুম্বন করিলেন, তাহাদের অনেক আদর করিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন।

ভুবনমোহিনী, যুবার নিকটস্থ হইয়া, অবনত বদনে অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসিলেন,—"যাঁহাদের কথা বলিতেছিলে বাবা, তাঁহারা বাস্তবিকই ভাল আছেন কি?"

যুবা বলিলেন,—"হাঁ মা, নন্দী মহাশয় ও তাঁহার ভগ্নী দুইজনেই ভাল আছেন। ভগবানের কৃপা হইলে তাঁহাদের মতিগতি ভাল হইবে। তাঁহারা যাহাতে কষ্ট না পান, সেজন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।"

ভুবনমোহিনী যেন একটু নিশ্চিন্ত হইলেন। যুবা প্রস্থান করিলেন। যত দূর তাঁহাকে দেখা যায়, ভুবনমোহিনী ততদূর তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন,—"মা, আমার ছেলে চলিয়া গেলে সংসার অন্ধকার। এমন যার ছেলে, তার কিসের দুঃখ মা? আমার ছেলে কি সত্যই মানুষ?"

বৃদ্ধা বলিলেন,—তোমার ছেলে যদিই মানুষ হয়, সুজন মানুষ কখনই নয়। দেবতা ব্রাহ্মণকে বলে বাছা?"

কাঁদিতে কাঁদিতে খোকা বলিল,—"মা মা, আমাল ডাডা কই?"

রাধিকা বড়। সে বলিল,—"মা, আমি ডাডার কাছে যাব।"

ভুবনমোহিনী উভয় শিশুকে কোলে লইয়া বলিলেন—"তোমাদের দাদা বাড়ী গিয়াছেন। আবার শিগ্‌গির আসিবেন বাছু।"

বৃদ্ধার নাতি, ভুবনমোহিনীর ছেলে, খোকা-খুকীর দাদা, এ লোকটা কে তাহা পাঠক মহাশয়রা বুঝিতে পারিয়াছেন কি? বলা বাহুল্য, লোকটা আমাদের পূর্ব্বপরিচিত, কৃষ্ণনগরের দোকানদার, সেই মূর্খ যদু হালদার।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

হারাধনকে লাঠি মারিয়া, তরঙ্গিণীকে মারিতে উদ্যত হইলে, অপরিচিত এক ব্রাহ্মণ কর্তৃক প্রতিরুদ্ধ হইয়া, কালিদাস চক্রবর্ত্তী সেস্থান হইতে পলায়ন করা শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিল। সে কাপুরুষ—ভাবী বিপদের বিভীষিকা কল্পনা করিয়া আসন্ন হৃদয়ে পলায়ন করিল। বুক পাতিয়া এরূপ ব্যাপারের সম্মুখীন থাকিতে যে সাহসের প্রয়োজন হয়, তাহা তাহার নাই। সে চলিয়া গেলে অপরিচিত পুরুষ হারাধনের নিকটস্থ হইলেন, এবং সযত্নে আহত ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"মারা যায় নাই, যত্ন করিলে এখনও বাঁচিতে পারে।"

তরঙ্গিণী এতক্ষণ প্রায় অজ্ঞান হইয়াছিল। তাহার সম্মুখে সহসা যে ভয়ানক ব্যাপার

সঙ্ঘটিত হইল, যে লাঠির হাত হইতে এই ব্রাহ্মণের কৃপায় সে অব্যাহতি পাইল, কি ভাবিতে ভাবিতে কিরূপ কার্য্য ঘটিয়া গেল, ইত্যাদি সমস্ত ভয়-ভাবনা মিলিয়া তাহাকে সাতিশয় অবসন্ন করিয়াছিল। সে কি করিবে, কোথায় যাইবে, কেন সেখানে আছে, সকল কথাই এতক্ষণ ভুলিয়া গিয়াছিল। এক্ষণে, ব্রাহ্মণের বাক্য কর্ণগোচর হওয়ায়, তাহার সংজ্ঞা হইল। সে তখন বলিল,—"তবে মারা যায় নাই। কেমন মহাশয় ? এক্ষণে উপায় ?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"যত্ন করিলে বাঁচিতে পারে! আমার সাহায্য কর—বাঁচিয়া উঠিবে।"

তরঙ্গিণী বলিল,—"আমি কি করিব? আমাকে রক্ষা করুন।"

ব্রাহ্মণ দেখিলেন, যত্ন করা দূরে থাকুক, এ স্ত্রীলোকের দ্বারা কোন প্রকার সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। তিনি বলিলেন,—"ওদিকে ঘুমাইতেছে, ও কে ?

তরঙ্গিণী বলিল,—"ও ইহারই ভগ্নী। আপনি উহাকে উঠাইয়া যাহা করিতে হয় বলুন। আমি এখন কোথায় যাই মহাশয় ?'

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"তুমি যাইবে কোথায় ? এখনই থানার লোকেরা তদারক করিতে আসিতে পারে। তুমি যে সঙ্গে ছিলে, তাহা অনেক লোকেই বলিবে। তোমার উপরই তখন সকল ঝোঁক পড়িবে। বিশেষ উহার ঐ ভগ্নী উঠিয়া তোমাকে দেখিতে না পাইলে, বলিবে—তুমি তাহার ভাইকে মারিয়া পলাইয়া গিয়াছ। এ ইংরাজের মুলুক—পলাইয়া কোথায় যাইবে ? সহজেই ধরা পড়িবে এবং এই খুনের দায়ে তোমার সর্ব্বনাশ হইবে।

তরঙ্গিণী কাঁপিতে লাগিল। সে বলিল,—"আপনি আমাকে একবার বাঁচাইয়াছেন। দয়া করিয়া আর একবার আমার সাহায্য করিবেন না কি ? আপনি না থাকিলে এখনই কালিদাসের লাঠিতে আমার প্রাণ যাইত। যখন প্রাণরক্ষা করিয়াছেন, তখন এ দায় হইতে রক্ষা করিবেন না কি ? এখানে থাকিতে আমার বড় ভয় হইতেছে। আমি এখানে কোন মতেই থাকিতে পারিব না। আপনি দয়া করিলে আমি পলাইয়া যাইতে পারি। আপনি একটু সাহায্য করিলে আমি বাঁচিয়া যাই।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"আমাকে কি করিতে বল ?"

তরঙ্গিণী বলিল,—"এখানে গঙ্গার ধারে, মোটা থামওয়ালা বাটীতে একজন রাজা আছেন। তাঁহার সহিত আমার পরিচয় আছে। আমাকে একবার সঙ্গে করিয়া সেখানে পৌঁছাইয়া দিলে আমার আর বিপদ থাকিবে না। আপনি দয়া করিবেন কি ?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"এজন্য সাহায্য করিবার কোনই আবশ্যক দেখিতেছি না। রাত্রি এখনও বেশী হয় নাই। পথে—দোকানে এখনও লোক যথেষ্ট। সে রাজার বাড়ী বেশ সদর জায়গায়। সকলেই সে বাড়ী জানে। অতএব তুমি সহজেই সেখানে একা যাইতে পারিবে। কিন্তু তুমি তোমার সঙ্গীকে এই অবস্থায় ফেলিয়া চলিয়া যাইবে কিরূপে ?"

"কেন যাইব না ? ও তো আমার কেহ নহে ? আমি এখানে আর থাকিতে পারিতেছি না, আমার বড় ভয় করিতেছে।

ব্রাহ্মণ।—আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তুমি ইহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া মদ খাওয়াইয়াছিলে। অবশ্যই ইহার সহিত তোমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে। ইহার এই বিপদ, আর তুমি ফেলিয়া যাইবে ?

তরঙ্গিণী।—উহার সহিত আমার আলাপ ছিল বটে; তেমন আলাপ আমার আর কত লোকের সঙ্গে আছে। কিন্তু এখানে তাই বলিয়া থাকিতে পারি না। যদি আবার কালিদাস চক্রবর্ত্তী আইসে? না মহাশয়, আমি এখানে থাকিব না।

ব্রাহ্মণ।—তুমি মনে করিও না যে, আমি তোমার কোন অনিষ্ট করিব। আমি ইচ্ছা করিলে তোমাকে সকল রকম দায়েই ফেলিয়া দিতে পারি, কিন্তু তাহা করিব না। যদি দারোগা আইসে, আমি তোমার নামটিও করিব না, তোমার কোন সন্ধানও বলিব না; কিন্তু উহার ভগ্নী অবশ্যই সকল কথা বলিবে। তখন কি উপায় করিবে?

তরঙ্গিণী।—আমার সন্ধান করিতে পারিবে না। আমি রাজার নিকট নিশ্চয়ই আশ্রয় লইব। সে আশ্রয় হইতে আমাকে ধরে কাহার সাধ্য?

ব্রাহ্মণ।—আর যদি এই রাত্রিতে রাজার দরওয়ানেরা তোমাকে ভিতরে ঢুকিতে না দেয়, যদি তুমি রাজার সহিত দেখা করিয়া উঠিতে না পার, তাহা হইলে কি হইবে?

তরঙ্গিণী একটু চিন্তা করিল। এ সম্ভাবনা একবারও তাহার মনে হয় নাই। বাস্তবিকই এ বড় ভাবনার কথা! সে একটু ভাবিয়া বলিল,—"তা যা হয় হইবে, আমি এখানে থাকিতে পারিব না। আমি যাই।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন।—"যাইবে যাও—আমি তোমার কোনই অনিষ্ট করিব না, বরং যাহাতে কেহ তোমার সন্ধান না করে তাহারই ব্যবস্থা করিব। কিন্তু তুমি ঐ স্ত্রীলোকটার একটা ব্যবস্থা করিয়া যাও। ও তোমার সঙ্গিনী—উহাকে এ অবস্থায় ফেলিয়া যাওয়া তোমার উচিত নহে।"

তরঙ্গিণী বলিল,—"উহার আমি কি ব্যবস্থা করিব? আমি স্ত্রীলোক, আমার ব্যবস্থা কে করে ঠিক নাই; আমি আবার পরের কি ব্যবস্থা করিব! উহার ভাইয়ের জন্যই উহার সহিত আমার আলাপ। ও আমার কে যে আমি উহার ভাবনা ভাবিয়া মরিব? আমি আর এখানে থাকিতে পারিতেছি না। আমি যাই মহাশয়—যদি চক্রবর্ত্তী আবার আইসে!"

ব্রাহ্মণ।—তোমার ইচ্ছা হয় যাইতে পার। আমি তোমার কোন অনিষ্ট করিব না, কিন্তু ঈশ্বর তোমার ব্যবহারে তুষ্ট থাকিবেন না। অবশ্যই তাঁহার বিচারে তোমার দণ্ডভোগ করিতে হইবে।

তরঙ্গিণী কাঁপিতে কাঁপিতে ঘরের বাহিরে আসিল এবং বারংবার চতুর্দ্দিকে সভয়ে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে বাস্তবিকই পলায়ন করিল।

দেখ হারাধন! তোমার সাধের প্রেমের আজি এই পরিণাম! যাহার প্রেমে তুমি গর্ব্বিত ছিলে, যাহার প্রেম তুমি তুলনা-রহিত বলিয়া মনে করিতে, যাহার প্রেমানুরোধে তোমার সাধ্বী ধর্ম্মপত্নীকে তুমি অবহেলা করিতে, তোমার সেই সাধের কুলটা তরঙ্গিণী, তোমাকে এই দশাপন্ন দেখিয়াও, স্বচ্ছন্দে পলায়ন করিল! আর যে পত্নীকে তুমি কখন ভাল কথা বল নাই, কি খাইবে, না খাইবে ভাব নাই, নিকটস্থ হইলে যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছ, মুখ দেখিতে হইলে বিপদ জ্ঞান করিয়াছ, সেই দেবী আজি এখানে থাকিলে কি করিতেন, জান? তোমার চরণ বক্ষে ধরিয়া, তোমাকে বাঁচাইবার জন্য, প্রাণের প্রাণ লুটাইয়া ভগবানের নিকট কাঁদিতেন। হায়! তথাপি ভ্রান্ত মানব অবৈধ প্রেমের অনুরাগী কেন হয়?

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বুঝি। হারাধন তোমার

কেহ নহে। তাহার সহিত কখন তোমার পরিচয় নাই। কোথা হইতে অতি সুসময়ে অবতীর্ণ হইয়া, তুমি তাহার জীবন রক্ষায় ব্রতী হইয়াছ! কি তোমার শক্তি! কি তোমার কৌশল! কি তোমার অভিজ্ঞতা! তুমি কি চিকিৎসক? সকল বিদ্যাই কি তোমার আয়ত্ত? ধন্য তুমি! তৃণাদপি লঘু হারাধনের জীবন রক্ষার্থ এ আন্তরিক যত্ন নিষ্ফল হইবে না। তোমার কৃপায় হারাধন হয় তো বাঁচিয়া যাইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

তরঙ্গিণী ভয়ে ভয়ে চলিতে লাগিল। প্রতি পাদক্ষেপেই নানা আশঙ্কায় তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিতে থাকিল। সম্মুখ দিয়া একটা বেগে মানুষ চলিয়া যাইতেছে—বুঝি বা কালিদাস! পার্শ্ব হইতে একটা লোক উঁকি দিয়া দেখিতেছে—ঐ বুঝি চক্রবর্ত্তী! পশ্চাৎ হইতে একব্যক্তি ছুটিয়া আসিতেছে—বুঝি কালিদাস ধরিতে আসিল! একটা দোকানদার ঝুপ করিয়া বাক্সের ডালা ফেলিয়া দিল—বুঝি কাহার ঘাড়ে কে লাঠি মারিল! তরঙ্গিণী বড় ভয়ে চলিতে থাকিল। দুই একটা লোক তাহাকে দেখিয়া হাসিল—তরঙ্গিণী ভাবিল, তবে ইহারা হয়ত জানে কোথায় কালিদাস আছে—ধরাইয়া দিবে বা! দুই একজন দোকানের লোক তাহাকে দেখিয়া গাটেপাটিপি করিল—তরঙ্গিণী ভাবিল, তবে হয়তো ইহারা তাহাকে চিনিয়াছে। দুই একটা লোক তাহাকে একাকিনী দেখিয়া দুই চারিটা অতি কুৎসিত রসিকতা করিল। বারনারীর হৃদয় এ সম্বন্ধে চিরাভ্যস্ত, সুতরাং তরঙ্গিণী তাহা গায়ে মাখিল না। এইরূপে চলিতে চলিতে সে গঙ্গার ধারে উপস্থিত হইল। বড় গুঁড়ায় নৌকা বাঁধিবে, ইহাই তাহার কামনা। কালিদাসের নিকট অবিশ্বাসিনী হওয়ায়, সে এখন ক্ষতি বোধ করিতেছে না। কোনরূপে রাজার নিকটস্থ হইতে পারিলেই তাহার মনোরথ সফল হইবে, এ বিষয়ে তাহার সন্দেহ নাই। হারাধন তাহার কে—তাই তাহার জন্য সে ভাবিবে? যাহারা দেহ বিক্রয় করিয়া প্রেমের ব্যবসায় করে, তাহাদের হৃদয় এইরূপই হইয়া থাকে। দোকানদার যেমন বড় খরিদ্দার পাইলে ছোট ক্রেতাকে উপেক্ষা করিয়া, বড়র সংবর্দ্ধনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তরঙ্গিণীও তাহাই করিতেছে। রাজাকে হস্তগত করাই এখন তাহার একমাত্র বাসনা। সে যে কৃতকার্য্য হইবে, তদ্বিষয়ে তাহার কোন সন্দেহ নাই।

তরঙ্গিণী গঙ্গার ধারে উপস্থিত হইল। বড় থামওয়ালা বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিতে তাহাকে বড় কষ্ট পাইতে হইল না। বড় থামওয়ালা বাড়ীর নিকটস্থ হইয়া সে দেখিল, দ্বারে সঙ্গিনসমেত বন্দুকধারী, পোষাক আঁটা এক পাহারাওয়ালা পায়চারি করিতে করিতে দরজায় পাহারা দিতেছে। তাহার নিকটস্থ হইতে প্রথমতঃ তরঙ্গিণী সাহস করিল না। অন্য উপায় থাকিলে সে বন্দুকধারী পাহারাওয়ালাকে দেখিয়াই পলাইয়া যাইত; কিন্তু তাহার তখন আর উপায় নাই। সে তখন সাহসে ভর করিয়া, সেই পাহারাওয়ালার নিকটস্থ হইল। অন্য লোক এত কাছে আসিলে পাহারাওয়ালা চেঁচাইয়া দেশ মাথায় করিত। কিন্তু এই রাত্রিকালে একটা স্ত্রীলোক কাছে আসিতেছে দেখিয়া গল গোল করিল না।

বরং গোঁফ দাড়ি একবার ঠিক করিয়া লইয়া, একটু বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল। স্ত্রীলোক নিকটে আসিলে, পাহারাওয়ালা তত্রত্য আলোকের সাহায্যে দেখিল, স্ত্রীলোক সুন্দরী এবং যুবতী বটে। বলা বাহুল্য, সে বড়ই খুসী হইল। স্ত্রীলোক বলিল,—"পাহারাওয়ালাজী তোমার সহিত আমার দুই একটা কথা আছে।"

পাহারাওয়ালা মনে করিল, আজি তাহার সুপ্রভাত বটে। বলিল,—"বল আমায় কি করিতে হইবে?"

তরঙ্গিণী বলিল,—"করিতে বড় কিছুই হইবে না; কেবল তোমাদের রাজাকে একবার খবর দিতে হইবে।"

একে স্ত্রীলোক, তায় সুন্দরী, সুতরাং সাত খুন মাপ। পাহারাওয়ালা যাহা ভাবিয়াছিল, তাহা হইল না। স্ত্রীলোকটা রাজার সন্ধান করে যে। সে জিজ্ঞাসা করিল,—"রাজাকে তোমার কি দরকার? তিনি তো বাড়ী নাই—খানিকক্ষণ হইল বাহিরে গিয়াছেন। কখন ফিরিবেন ঠিক নাই।"

তরঙ্গিণী একটু দমিয়া গেল। বলিল,—"কোথায় গিয়াছেন জান।"

"রাজারাজড়ার কথা, কেমন করিয়া জানিব! কিন্তু রাজার কাছে তোমার কি দরকার? তুমি কি রাজাকে জান?"

"জানি।"

পাহারাওয়ালা, এ উত্তরের পর, তরঙ্গিণীর সহিত কোন প্রকার আত্মীয়তা স্থাপনের চেষ্টা অসম্ভব বলিয়া মনে করিল। তরঙ্গিণী আবার জিজ্ঞাসিল,—"নীলরতন চৌধুরী মহাশয় বাড়ী আছেন?"

পাহারাওয়ালা এবার বুঝিল, রাজার সহিত এ স্ত্রীলোকের বাস্তবিকই বিশেষ পরিচয় আছে। রাজার পরিচিত স্ত্রীলোক, এমন ভাবে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবে, ইহা একটু অসঙ্গত হইলেও, সে তরঙ্গিণীকে খাতির না করা অন্যায় বলিয়া মনে করিল। বলিল,—"আছেন। তাঁহাকে খবর দিতে হইবে কি?

তরঙ্গিণী বলিল—"যদি দেও, তাহা হইলে আমার বড় উপকার হয়।"

পাহারাওয়ালা তরঙ্গিণীকে সঙ্গে আসিতে বলিল। তরঙ্গিণীকে নীচের একটা ঘরে রাখিয়া সে একটা খানসামার দ্বারা সরকার বাবুর নিকট সংবাদ পাঠাইল। বলা বাহুল্য তৎক্ষণাৎ নীলরতন চৌধুরী তথায় হাজির হইলেন এবং সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিলেন,—"একি? মেঘ না হইতে জল! এই রাজার সঙ্গে এতক্ষণ তোমারই কথা হইতেছিল। তা তুমি কাহার সঙ্গে আসিলে? আমি এখনই তোমার নিকট যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলাম। কিন্তু ওকি! তোমাকে বড় কাতর ও উৎকণ্ঠিত দেখিতেছি কেন?"

তরঙ্গিণী বলিল,—"আমি আর দাঁড়াইতে পারিতেছি না। বসি আগে, তাহার পর সকল কথা বলিতেছি। বড় ভয়ানক কাণ্ড ঘটিয়াছে।" এই বলিয়া, সে তত্রত্য এক চারিপাইয়ে বসিয়া পড়িল এবং আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। যে যে ভয় ও ভাবনায় সে পলাইয়া আসিয়াছে, এ বিপদে রাজার আশ্রয় না লইয়া সে যে থাকিতে পারিতেছে না, ইত্যাদি কথাও সে বলিল।

সমস্ত কথা শুনিয়া চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—ভালই করিয়াছ। তুমি যেমন রাজার জন্য ভাবিতেছ, রাজাও তোমার কথা তার চেয়ে দশগুণ বেশী ভাবিতেছেন। তাঁহাকে আমি বেশ করিয়া ফাঁদে ফেলিয়াছি। আজি তাঁহার এমন একটা নিয়ম আছে যে, কোন

ক্রমে সেখানে না যাইলে চলিবার উপায় নাই। নিতান্ত অনিচ্ছায় তাঁহাকে বাধ্য হইয়া যাইতে হইয়াছে। সেখানে নাচগান আছে, তাঁহাকে যে ছাড়িবে এমন বোধ হয় না। তিনি যাইবার সময়, আমাকে তোমার নিকট যাইতে ও তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে, বিশেষ করিয়া হুকুম দিয়া গিয়াছেন। আমিও যাইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় তুমি আপনি আসিয়া উপস্থিত। তা ভাই, বলিতে গেলে তুমিই তো এখন আমাদের রাণী হইতে বসিল। আর তোমার সহিত সমান ভাবে কথা কহিতেও আমাদের সাহস হইবে না। দেখিও ভাই, গরিবের দরখাস্তটা ভুলিও না।”

ভাল হউক, মন্দ হউক, আশা সফল হইলেই মানুষের অপরিসীম আনন্দ হয়। তরঙ্গিণী বড় আশা করিয়াছিল, বড় সুসংবাদ সে পাইল। আনন্দে বিগত ঘটনাসকল ভুলিয়া গেল। তখন তাহার চিরাভ্যস্ত রূপ-গৌরব মনে উদিত হইল। সে তখন মনে করিল, কালিদাস বানরের হাতে পড়িয়া সোণার রূপ-যৌবন সে প্রায় মাটী করিয়াছে; কিন্তু এখনও যাহা আছে তাহাও পর্ব্বত, তাহাও অবলীলাক্রমে রাজারাজড়ার মাথা ঘুরাইয়া দিতে সক্ষম। এখনই বা কি হইয়াছে। এই রাজাকে মুঠার মধ্যে না করিয়াই কি সে ছাড়িবে? থাকুক না কেন রাজার দশটা রাণী। তরঙ্গিণী তাহাদিগকে বিরাজমোহিনীর মত লাথি মারিয়া তাড়াইয়া দিবে. ইহাই তাহার সঙ্কল্প।

সরকার মহাশয় বলিলেন,—“ইহার পর আর বলিবার সময় ও সুযোগ হইবে কি না সন্দেহ। এই বেলা বলিয়া রাখি ভাই আমাকে দয়া করিয়া নগদ যাহা দিতে ইচ্ছা হয় দিও। আর একটা কথা—শীঘ্রই রাজার দেওয়ানের পদ খালি হইবে। বৃদ্ধ দেওয়ান আর কাজ করিতে পারিতেছে না, রাজা তাহাকে একটা জমিদারী দিয়া বিদায় করিবেন। তোমার কাছে আমি এই সময় হইতে দরখাস্ত করিয়া রাখিতেছি, সে চাকরী আমি ছাড়া আর কেহ যেন না পায়। আমি জানি, কালি হইতে তোমার কথাতেই রাজা উঠিবেন বসিবেন; রাজার বিষয়কর্ম্ম তোমার হুকুমেই চলিবে। সুতরাং ভাই, তুমি কৃপা করিলেই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।”

বড়ই আহ্লাদের কথা! দেখ্ আসিয়া মূঢ় হতভাগা কালিদাস, তরঙ্গিণীর আজি কত সৌভাগ্য উপস্থিত। তোর মত একটা বান্‌বানের আনুগত্য সে এতদিন করিয়াছে, ইহাই তোর কত সৌভাগ্য! একটু অবিশ্বাসিনী হইয়াছিল বলিয়া—না বুঝিতে পারিয়া দৈবাৎ একটু বিপথগামিনী হইয়াছিল বলিয়া, তুই কি না তাহার মাথায় লাঠি মারিতে আসিস্। আশ্চর্য্য তোর স্পর্দ্ধা!

তরঙ্গিণী সে সম্বন্ধে নীলরতনকে বিশেষ ভরসা দিলে, নীলরতন বলিলেন,—“এক্ষণে কি করিবে, মনে করিতেছ?”

তরঙ্গিণী বলিল,—“রাজাই আমার প্রাণ — রাজাই আমার সর্ব্বস্ব। আমি রাজার জন্য সকলই ছাড়িয়াছি—রাজাকে এ জীবনে ছাড়িব না; এখানে আসিয়াছি, এই খানেই থাকিব।”

নীলরতন বলিলেন,—“তাহা তো বটেই। রাজার যে রকম ঝোক তাহাতে তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে তিনিই বা পারিবেন কেন? তোমার নিকট হইতে চলিয়া আসার পর, আর এই পর্য্যন্ত রাজা আমার সঙ্গে কেবল, তোমারই কথা কহিয়াছেন। তোমারই রূপ, গুণ কথাবার্ত্তা স্বভাব

সকলই তাঁহাকে এত মজাইয়াছে যে, এখন তোমাকে না পাইলে, তাঁহার বিষয়কর্ম্ম সংসার ধর্ম্ম সকলই রসাতলে যাইবে। সুতরাং রাজা যে তোমার হইয়াই থাকিবেন, তাহার আর ভুল নাই। কিন্তু তুমি বড় কাঁচা কথা কহিতেছ কেন? তোমার এত বুদ্ধি, অথচ তোমার কথা ছেলে মানুষের মত কেন। যেরূপ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে তোমার এখানে থাকা কোন মতেই যুক্তি সঙ্গত নহে। এরূপ সুযোগ আর কখন উপস্থিত হইবে না। বলি, শুন আগে—তাহার পর যাহা বলিতে হয় বলিও। এখানে তোমার থাকা হইবে না। কালিদাস চক্রবর্ত্তীর যে বাটী, সে বাটী বাস্তবিক তোমারই। সেখানেই তোমাকে যাইতে হইবে—সেখানেই তোমাকে থাকিতে হইবে।"

তরঙ্গিণী বলিল,—"এই ঘটনার পর, সেখানে আমি কোন সাহসে যাইব, কেমন করিয়া থাকিব? আমাকে চক্রবর্ত্তী মারিয়া ফেলিবে যে!"

নীলরতন হাসিয়া বলিল,—"তুমি পাগল। তোমার বয়সও যেমন কাঁচা, বুদ্ধিও তেমনই কাঁচা। কালিদাস চক্রবর্ত্তী তোমাকে মারিয়া ফেলিবে! কাহার ঘাড়ে দুটা মাথা যে, রাজা অরবিন্দকুমার রায় বাহাদুরের প্রণয়িনীকে একটা কথা কহে? চক্রবর্ত্তী তো সামান্য একটা দোকানদার, স্বয়ং লাট সাহেবকেও তোমাকে সেলাম করিয়া কথা কহিতে হইবে। এই সময় এই সুযোগে তোমাকে সেই ঘর বাড়ী জিনিষ পত্র দখল করিয়া বসিতে হইবে। সে বাড়ী, সেখানকার দ্রব্যসামগ্রী, কখনই হাত ছাড়া হইবে না। চক্রবর্ত্তী এখন কোথায়? সে খুন করিয়া পলাতক হইয়াছে। সে কি এই ঘটনার পর চুপ করিয়া বাটীতে গিয়া বসিয়া আছে? সে এখন প্রাণের ভয়ে কোথায় গিয়া লুকাইয়াছে; ছয় মাসের মধ্যে সে এ মুখো হইবে না, ইহা স্থির জানিবে। এই সময় সব দখল করিতে হইবে।"

তরঙ্গিণী বলিল,—"যদিই সে পলাইয়া থাকে, তাহা হইলে দশ দিন পরেও তো আসিবে। তখন আমার দশা কি হইবে?"

নীলরতন আবার হাসিয়া বলিল—"যদিই আইসে, আমরা তাহাকে বাটীতে ঢুকিতে দিব কেন। রাজার সঙ্গীন আঁটা পাহারাওয়ালা তোমার দরজায় পাহারা দিবে জান? কাহার সাধ্য সেখানে প্রবেশ করে? মাথাটী দরজায় রাখিতে হইবে না? তুমি কে, তাহা যে তুমি ভুলিয়া যাইতেছ। যমে তোমাকে ছুঁইতে পারিবে না, তায় চক্রবর্ত্তী কোন্ ছার! তাহার মত লোক তো তখন তোমার রাঁধুনি হইবে। আরও দেখ, একটা আলাহিদা বাটীতে তুমি না থাকিলে, তোমার বা রাজার আমোদ আহ্লাদ হইবে না। এটা আমি অনেক বিবেচনা করিয়া একটা খাঁটি কথা বলিতেছি। রাজা এ পরামর্শের বিন্দুবিসর্গও জানেন না। বিবেচনা কর, তোমাদের আমোদ আহ্লাদের স্থান যেখানে, সেখানেই যদি রাজার কাছারি, বিষয় কর্ম্ম, দেখা সাক্ষাৎ, সকল বিষয়ের স্থান হয়, তাহা হইলে দেখিতে শুনিতেও ভাল হইবে না, তোমাদেরও আমোদ হইবে না, আর রাজার কাজ কর্ম্ম সকলই মাথায় উঠিবে। তিনি নিশ্চয় দিবারাত্রি তোমাকে লইয়া বসিয়া থাকিবেন, ওদিকে বিষয়কর্ম্মের সর্ব্বনাশ হইবে। যখন তুমি সর্ব্বপ্রধান আত্মীয়, তখন যাহাতে রাজার সর্ব্বনাশ না ঘটে, তাহার ভাবনা তুমি না ভাবিলে কে ভাবিবে বল? বুঝিতেছ না তুমি, রাজার বিষয়কর্ম্মের যত

দ্ধি হইবে, তবই তোমার সুবিধা ? রাজা হয় তো তোমাকে এখনে দেখিলে, আর নয়নের আড় করিতে চাহিবেন না।. কিন্তু সেটা তো ভাল নয়।"

তরঙ্গিণী বলিল,—"তা আচ্ছা—কিন্তু রাজা কি আর সেখানে যাইবেন ?"

নীলরতন বলিলেন,—"যাইবেন—তা আর বলিতে ? তুমি যেখানে থাকিবে, সেখানেই তাঁহার মন পড়িয়া থাকিবে। কালি প্রাতে তিনি গিয়া তোমার শ্রীমন্দিরে হাজির হইবেন। আর বিবেচনা করিয়া দেখ, একটু তফাতে থাকিলে পাওয়া নেওয়ার সুবিধা বেশী হয়। এক বাড়ীতে থাকিয়া সকল জিনিস কি স্বতন্ত্র করিয়া লওয়ার সুবিধা হইবে ? রাজার তো বিষয় সহজ নহে। আয়ই তো চার লক্ষ! তা ছাড়া সোণা, রূপা হীরা, মুক্তা নগদ টাকা কত, বলিয়া শেষ হয় না। ইহার যদি যথেষ্ট ভাগ তোমার ঘরে না যায়, তবে রাজার সহিত প্রণয় করিয়া লাভ কি ? কিন্তু ভাই বলিয়া রাখিতেছি আমাকে যেন সুখের সময় ভুলিও না। আমি আজিও যেমন ভাল পরামর্শ দিতেছি, চিরদিনই সেইরূপ দিব। আমি রাজার জন্মের পূর্ব্ব হইতে এই সংসারে আছি। তাঁহার স্বভাব প্রকৃতি আমি যেমন জানি, এমন আর কেহ জানে না। আমি তোমাকে যেমন যেমন পরামর্শ দিব, সেইরূপ চলিলে, চিরদিনই তুমি সর্ব্বেশ্বরী হইয়া থাকিবে।"

তরঙ্গিণী বলিল,—"তোমার মত লোক আমি আর কখন দেখি নাই। তুমি আর জন্মে আমার কে ছিলে! আমার লাভেই তোমার লাভ হইবে, তাহা তুমি নিশ্চয় জানিবে। কিন্তু ভাই, এ রাত্রিতে আমি সে বাটীতে যাইতে পারিব না।"

নীলরতন বলিলেন.—"কেন ? কিসের ভয় ? তুমি একা তো যাইবে না। আমি তোমার সঙ্গে যাইব, দুই জন বরকন্দাজ সঙ্গে যাইবে। তোমাকে সেই বাটীতে রাখিয়া, সকল ব্যবস্থা করিয়া বরকন্দাজ-পাহারা রাখিয়া, তবে আমি বাটী ফিরিব। সে জন্য তোমার কোন ভয় নাই।"

তরঙ্গিণী বলিল,—"তা যাহা ভাল হয় কর। আমি তোমার মন্ত্রণা ছাড়া চলিব না।"

তরঙ্গিণী- নীলরতন, আর দুইজন বরকন্দাজ সেই গভীর রাত্রিকালে সেই রাজভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শান্তিপুরের উত্তর-পশ্চিম কোণে গোপীনাথ পল্লী বা নূতনগ্রাম নামে একটী অতি সামান্য পল্লী আছে। এই পল্লী শান্তিপুর-সংলগ্ন এবং শান্তিপুরমিউনিসিপালিটীর অন্তর্ভুক্ত। এখানে কয়েক ঘর অতি দুস্থ লোকের বাস। পল্লী শ্রীহীন এবং উৎসাহশূন্য। শাকান্নভোজী একাহারী পল্লীবাসিগণের নিকট হইতে মিউনিসিপালিটির কর্ত্তৃপক্ষগণ টেক্স আদায় করিতে কদাপি ক্ষান্ত নহেন এবং তাহাদের ভাঙ্গা ঘটী, ফুটা থালা ক্রোক করিতেও কখনও কুণ্ঠিত নহেন। কিন্তু তাহাদের যাতায়াতের পথ আছে কি না, তাহাদের পানীয় জলের সুবিধা আছে কি না, তাহাদের স্বাস্থ্যরক্ষার সুব্যবস্থা আছে কি না, তাহাতে কাহারও দৃষ্টি নাই। সুতরাং গোপীনাথপল্লীতে ভাল পথ নাই, ভাল জল নাই, গ্রাম ও বন

মলিনতায় পরিপূর্ণ, অধিবাসিগণ স্বাস্থ্যবিহীন। কিন্তু তত্রত্য দরিদ্র, অসুস্থ, কাতর অধিবাসিবর্গের একটি আনন্দজনক, উৎসাহপ্রদ, প্রীতিকর সামগ্রী তথায় আছে। তাহাদের সেখানে জেঠা গোপীনাথ নামে এক শ্রীবিগ্রহ আছেন। সেই শ্রীবিগ্রহ তাহাদের পরমানন্দের উৎস, এবং সর্ব্বপ্রকার প্রীতির নিকেতন স্বরূপ। গোপীনাথ দেবের শ্রীমূর্ত্তি দারুময়; কিন্তু সুবিশাল এবং অলৌকিক শ্রীযুক্ত। এই দেববিগ্রহ কত দিনের, কে ইঁহার আদি-প্রতিষ্ঠাতা, কিরূপে ইনি শান্তিপুরে স্থাপিত হন, ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা যায় না। প্রথমে শান্তিপুরের যে ভাগে ইঁহার শ্রীমন্দির বিরাজিত ছিল, সে স্থানে ভাগীরথীর গর্ভসাৎ হইবার উপক্রম হইলে তদানীন্তন সেবক ইঁহাকে জাহ্নবী-তট হইতে অর্দ্ধক্রোশ দূরবর্ত্তী এই পল্লীমধ্যে স্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাহার পূর্ব্বে এই স্থানে লোকের বসতি ছিল না; এজন্য সেই সময় হইতে এই স্থান নূতন পল্লী বা নূতন গ্রাম নামে অভিহিত হয়। শান্তিপুরে এই শ্রীবিগ্রহের আবির্ভাব ও স্থাপনার সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী ইতিহাস সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন। নানা প্রকার কিংবদন্তী ও জনশ্রুতির সমন্বয় করিয়া যে বিবরণ সংগঠিত হয়, তাহা এই ভগবদ্বিগ্রহের অলৌকিক মহিমা ও অনন্যসাধারণ শক্তির পরিচায়ক। এই শ্রীবিগ্রহের দেবত্ব ও মহিমা এতই অবিসংবাদিত রূপে প্রত্যক্ষ পরীক্ষিত ও পরিজ্ঞাত যে, তৎসম্বন্ধে কোনই প্রমাণ প্রয়োগ সর্ব্বথা অনাবশ্যক। এই দেববিগ্রহ বহু প্রাচীন এবং পিতৃপদবাচ্য অন্যান্য বিগ্রহাপেক্ষা প্রবীণ বলিয়াই, ইঁহার নামের অগ্রে পিতার জ্যেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক জেঠা শব্দ প্রযুক্ত হয়। এই শ্রীবিগ্রহের বর্ত্তমান সেবক দরিদ্র এবং দরিদ্র স্থানে তিনি অধিষ্ঠিত। সুতরাং শ্রীমন্দির শোভাবিহীন, দেবতা বসন-ভূষণ শূন্য এবং দেবালয় আড়ম্বর ও উৎসাহ বর্জ্জিত। কিন্তু এই আড়ম্বর বিহীন দেবালয়, এই বসনভূষণ বিহীন দেববিগ্রহ, দরিদ্র গ্রামবাসিগণের অতীব গৌরবের স্থল, পরম আনন্দের আধার। সম্প্রতি নূতনপাড়াকে অনেকে গোপীনাথ পল্লী বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই পল্লীর প্রান্তভাগে হরিদাস নামে একজন অতি দরিদ্র তন্তুবায়ের বাস। হরিদাসের বয়স অনুমান পঞ্চাশ বৎসর। হরিদাসের স্ত্রী, চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়স্ক একটি পুত্র, দুইটি অবিবাহিতা কন্যা এবং একটি বিধবা ভগ্নী, এইগুলি লোক তাহার পোষ্য। হরিদাসের দুইখানি খড়ের ঘর—দুইখানিই জীর্ণ ও পতনোন্মুখ। তাহার সংসারে কষ্ট মূর্ত্তিমান হইয়া বিরাজ করিতেছে। তাহাদের শত-গ্রন্থিযুক্ত মলিন বসন, শিরা-প্রকটিত শীর্ণ কলেবর রুক্ষ কেশ, সকলই তাহাদের নিরতিশয় দরিদ্র দশার পরিচয় দিতেছে। হরিদাস সমস্ত দিন কাপড় বুনিয়াও পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের সঙ্কুলান করিতে পারে না। সে নিরন্তর যেরূপ পরিশ্রম করে তাহা দেখিলেও দুঃখ হয়; কিন্তু তাদৃশ পরিশ্রমেও তাহার একবার অর্দ্ধাশন ব্যতীত পূর্ণাহার প্রায়ই ঘটে না।

ম্যাঞ্চেষ্টর! তোমার প্রতিযোগিতায় আজি ভারতের বহুলোক অন্নহীন ও জীবন্মৃত হইয়াছে; ভারতের বস্ত্রব্যবসায় বিনষ্ট হইয়াছে এবং ভারতের তন্তুবায়গণ নিতান্ত অবসন্ন ও দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছে। ভারতের অশেষ শিল্পোন্নতির পরিচায়ক কার্পাসবস্ত্র আর বিক্রীত হয় না, তোমার স্থূল কাপড়েই দেশ ছাইয়া

ফেলিয়াছে। যাহারা ভারত উদ্ধারের পাণ্ডা, এ তুচ্ছ বিষয় তাঁহাদের চক্ষুতে লাগে না। সুতরাং এ দারুণ দুর্গতির প্রতিকারের কোন উপায় কেহই ভাবিতেছে না! এরূপ দুঃখ-দারিদ্র্য থাকিলেও, যাঁহারা বক্তৃতা করিতে জানেন, তাঁহাদের রসনা নিরুদ্ধ হইবার কোনই কারণ উপস্থিত নাই; সুতরাং কোলাহল যথেষ্ট চলিতেছে।

আর হরিদাসের স্ত্রী ও ভগ্নী—তাহারাই কি বসিয়া থাকে? তাহারাও যখন সাংসারিক কর্ম্ম হইতে অবসর পায় তখনই অনন্যমনে কাপড়ে ফুল তুলে। এই উপায়ে যে উপার্জ্জন হয়, পরিশ্রমের তুলনায় তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু ইহাই তাহারা যথেষ্ট জ্ঞান করে। যাহা হউক, এই সকল উপায়ে যাহা উপার্জ্জন হয়, তাহাতে সংসার কোন মতে চলে না। বালক-বালিকারা পেট ভরিয়া ভাত খাইতে পায়, হরিদাসেরও কতক হয়, কিন্তু তাহার স্ত্রী ও ভগ্নীর প্রায়ই নামমাত্র আহার হয়।

তথাপি হরিদাস বড়ই সাধু। এত দুঃখ-দারিদ্র্য সত্ত্বেও সে আপনার সততা ত্যাগ করে নাই। হরিদাস কখন কাহার সহিত বিবাদ করে না; পাড়ায় নানা সময়ে নানা গোল উঠে, সে তাহার কিছুতেই মাথা দেয় না। তাহার দ্বারা কাহারও কোন উপকার সম্ভবে না, তথাপি সে পরোপকারের চেষ্টা করে; লোক শুনুক বা না শুনুক, সে সকলকেই সুপরামর্শ দেয়; কাহারও কোন বিপদ উপস্থিত হইলে হরিদাস আন্তরিক উৎকণ্ঠিত হয়, এবং মিথ্যাপ্রবঞ্চনার মধ্যে থাকে না। সুতরাং এ বাজারে হরিদাস পরম সাধু। কেহ কেহ বলিতে পারেন, হরিদাসের এমন কি গুণের কথা বলা হইল যে, তজ্জন্য তাহাকে প্রশংসা করা যাইতে পারে? এ সকল গুণ মনুষ্য মাত্রেরই থাকা উচিত, এবং তাহাতে আশ্চর্য্য বা মহত্ত্ব কিছুই নাই তো। কথা ঠিক। কিন্তু শুনিতে পাও না কি, অমুক বড়লোক বড় মাতৃভক্ত, সুতরাং বড়ই প্রশংসা যোগ্য! কিন্তু অমুক মহাশয় পিতাকে প্রণাম করেন, সুতরাং বড়ই প্রশংসাযোগ্য! কিম্বা অমুক মহাত্মা বিপন্ন সহোদরকে দুই টাকা দিয়া সাহায্য করেন, সুতরাং বিশেষ প্রশংসাযোগ্য! যে কাল পড়িয়াছে, তাহাতে মাতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ প্রভৃতি অবশ্য পালনীয় ধর্ম্মও যখন প্রশংসার কথা হইয়া পড়িয়াছে, তখন ক্ষুদ্র হরিদাসের সাধুতার প্রশংসা না করিবে কেন? হরিদাস কখন সভ্য হয় নাই—হইবার আশাও নাই। তাহার 'গুপ্তচরিত্র' ও 'সদর চরিত্র' নাই। সুতরাং সভ্যতা-সম্মত মার্জ্জনীয় প্রতারণাও সে জানে না। এমন লোককে নিতান্ত বর্ব্বর ভিন্ন আর কিছুই বলিতে তোমরা রাজি নহ।

শান্তিপুরে রামনগরে অদ্বৈত ঘোষ নামে এক মহাজনের বাস। সে জাতিতে কায়স্থ, কিন্তু ব্যবহারে চণ্ডাল। টাকা আদানপ্রদানই অদ্বৈত ঘোষের ব্যবসায় এবং সে এ সম্বন্ধে করুণাকণা বিবর্জ্জিত। নয়ন-জল বা ক্রন্দন-জাল অদ্বৈত ঘোষ কিছুরই বাধ্য নহে। এই হীন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অদ্বৈত বিস্তর অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে। কিন্তু তাহার অর্থ-তৃষ্ণা কোন মতেই নিবারিত হইবার নহে। সে সমান তেজে, নিষ্করুণভাবে, তেজারতি কারবার চালাইতেছে। অদ্বৈতের বয়স প্রায় ষাট, দেহ বড় সুগলিত, ভু ড়িটি সমুন্নত ও সুপরিণত, নতিকুও চিরদিন অনাবৃত, নাকের উপর হইতে ললাট পর্য্যন্ত গোপীচন্দনের তিলক, দেহের নানাস্থানে রাধাকৃষ্ণ নামাঙ্কিত। কণ্ঠে তুলসী-মালা, তাহাতে হরিনামের ঝুলি, মুখে

হরি হরি বোল ও মধুর হাস্য, হৃদয়ে শাণিত খুর। অদ্বৈত পরম বৈষ্ণব! ফলতঃ বৈষ্ণবের অনেক লক্ষণই তাহার আছে। তাহার ক্রোধ নাই। খাতক যদি তাহাকে অন্তরের সহিত যারপর নাই গালি দিয়া যায়, তথাপি সে রাগে না বা তাহার সুদের একটী পয়সা ছাড়ে না! ব্রাহ্মণ দেখিলেই অদ্বৈত অতীব ভক্তির সহিত প্রণাম করে; কাহারও কোন বিপদের কথা শুনিতে না শুনিতেই সে হায় হায় করিয়া দেশ মাথায় করে; খোল-করতাল বাজাইয়া টপ্পা গান গাহিতে শুনিলেও সে চেঁচাইয়া কাঁদিয়া উঠে। অদ্বৈত নিঃসন্তান। তাহার তৃতীয় পক্ষের গৃহিণী ঘরে। গৃহিণী মঞ্জরী দাসী সুন্দরী এবং বয়সও চব্বিশ ছাড়ায় নাই। বলা বাহুল্য যে, এই মঞ্জরী দাসী বৈষ্ণব-চূড়ামণি অদ্বৈত ঘোষের সাত রাজার ধন।

কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে বড় দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। সে সময়ে দ্রব্যসামগ্রী এতই দুর্ম্মূল্য হইয়াছিল যে, কোন মতেই কাহারও চলে না। সন্তনেরা অন্নাভাবে মারা যায় দেখিয়া হরিদাস অদ্বৈতের নিকট ১৫৲ পোনের টাকা ধার করিয়াছিল। হরিদাসের ভিটাটুকু বন্ধক না রাখিয়া, অদ্বৈত টাকা দেন নাই। হরিদাসের আশা ছিল, বড় মেয়েটির বিবাহ দিয়া কিছু পণ পাইবে এবং তাহাতেই এই ঋণ শোধ করিবে। মেয়ের বয়স তখন মোটে চারি বৎসর। তাহাদের ঘরে সে বয়সেও মেয়ের বিবাহ হইয়া থাকে। কিন্তু হরিদাসের দুরদৃষ্টক্রমে মনের মত পাত্র জুটিয়া উঠিল না। হয় ত পাত্রের চাল চুলা কিছুই নাই, নয় তো হরিদাসের অপেক্ষা পাত্র অনেক অধিক বয়স্ক, নয় তো নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল ও অসৎ স্বভাব। ধর্ম্মভীত হরিদাস দেখিয়া শুনিয়া এরূপ অপাত্রে কন্যা দান করা মহাপাপ বলিয়া মনে করিল। কিন্তু মহাজনের টাকা সুদে আসলে বেশ ফাঁপিয়া উঠিতে থাকিল। অদ্বৈত সময় থাকিতে টাকার জন্য একবারও তাগাদা করিল না, খত তামাদি হইবার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে সে হরিদাসের নিকটে আসিয়া পঁয়ত্রিশ টাকার দাবী করিল। হরিদাস ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। পঁয়ত্রিশ টাকা? কি সর্ব্বনাশ! এত টাকা কেমন করিয়া শোধ করিব? তখন সে অদ্বৈতের নিকট হাত যোড় করিয়া বলিল,—"এতদিন গিয়াছে, আর দুইটা মাস অপেক্ষা কর দাদা! আমি এই মাসে, মেয়ের বিবাহ দিয়া তোমার টাকা শোধ করিয়া দিতেছি। জানই তো দাদা. আমার আর কোন উপায় নাই।"

অদ্বৈত ঘোষ বলিলেন,—"কি করিব ভাই, আমার আর অপেক্ষা করিবার কোন উপায় নাই। এত দিন তুমি চেষ্টাচরিত্র কর নাই কেন? হরি হে, তোমার ইচ্ছা!"

হরিদাস অনেক চেষ্টা করিয়াও যে যে কারণে কন্যার বিবাহ দিয়া উঠিতে পারেন নাই, তাহা বিশেষ করিয়া বলিল। সমস্ত কথা শুনিয়া অদ্বৈত বলিল,—"তা দাদা, তুমি মেয়ের বিবাহ দিয়া উঠিতে পারিলে না, এটা কি আমার দোষ? এদিকে খত যে তামাদি হইয়া যায়। এখন তুমি টাকা না দিলে, কাজেই আমাকে নালিশ করিতে হয়।"

হরিদাস চমকিয়া উঠিল। বলিল,—"নালিশ? না দাদা, তোমার পায়ে পড়ি, নালিশ করিও না। নালিশ করিলে তো খরচা লাগিবে?"

অদ্বৈত বলিল,—তা লাগিবে বৈ কি? পঁয়ত্রিশের জায়গায় তখন পঞ্চাশ হইয়া উঠিবে। তা কি করিব ভাই, খত তামাদি হইবার সময় না আসিলে, তাগাদাই করিতাম না।

এখন নালিশ না করিলে আমার যে সকলই পড়িয়া যায়, দাদা!"

হরিদাস আবার বলিল,—আর দুইটা মাস সবুর কর—এত দিন সবুর করিয়াছ, আর দুইটা মাস আমাকে সময় দেও। আমি যেমন করিয়া হউক, টাকার যোগাড় করিয়া দিতেছি।"

অদ্বৈত বলিল,—"তা বেশ—তুমি টাকার যোগাড় কর না কেন? নালিশ করিলে যে টাকা লইয়া মিটমাট হয় না, এমন তো নয়; আর নালিশ করিলে যে সেই দিন টাকা না দিলে চলে না, এমনও নয়। তুমি টাকার যোগাড় কর। মোকদ্দমা চুকিতে কোন্ এক মাস সময় না যাইবে? তার জন্ম এত ভয় কিসের?"

হরিদাস আর কিছু বলিতে পারিল না, কিন্তু তাহার প্রাণে বড় ভয় হইল। অদ্বৈত চলিয়া গেল। হরিদাসও পাড়ার আর দুই জন লোককে সকল কথা জানাইতে গেল। লোকেরা তাহাকে বড়ই ভয় দেখাইল, কিন্তু কেহই কোনরূপ সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইল না। তখন সে জেঠা গোপীনাথ দেবের শ্রীমন্দির সমক্ষে উপস্থিত হইয়া, করযোড়ে সকল কথা জানাইল। ভগবান্ তাহাকে কি বুঝাইলেন জানি না; সে কিন্তু অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া বাটী গমন করিল।

সেই দিন হইতে সে কন্যার বিবাহের নিমিত্ত পাত্র খুঁজিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল। কাজকর্ম্ম অনেকক্ষণ করিয়া বন্ধ থাকিতে লাগিল। আয় আরও কমিয়া গেল আহারও প্রায় বন্ধ হইল।

তিন চারি দিনের মধ্যে অদ্বৈত পেয়াদা সঙ্গে লইয়া হরিদাসের বাটীতে আসিল এবং তাহার হাতে সমন ধরাইয়া গেল। হরিদাস কাঁদিয়া ফেলিল; বলিল,—"দাদা, আমি কিছুই জানি না, আদালত চিনি না, কাহার সহিত আমার আলাপ নাই, লেখা-পড়া বোধ নাই, কেন দাদা তুমি আমাকে সমন দিলে? তোমর পায়ে পড়ি, তুমি সমন ফিরাইয়া লও। আমি মেয়ের সম্বন্ধ করিয়াছি। আর মাঝে একটি মাস, তাহার পরেই বিবাহ দিয়া তোমার টাকা শোধ করিয়া দিব। তুমি সমন ফিরাইয়া লও।"

সমন যে ফিরাইয়া লইবার নহে, তাহা হরিদাস জানে না। সে ভাবিল, ঐ কাগজটুকু তাহার হাতে থাকিলেই সর্ব্বনাশ হইবে, এবং হাত-ছাড়া হইয়া গেলেই সকল বিপদ কাটিয়া যাইবে। অদ্বৈত বলিলেন,—"তোমার এজন্য ভয় কি ভাই? নালিশ না করিলে নহে বলিয়াই করিয়াছি। তাহাতে ক্ষতি কি হইয়াছে? তোমার আদালতে যাইবার কোন দরকার নাই; কাহারও সহিত আলাপেরও প্রয়োজন নাই। তুমি আমার ধার সত্য কি না, বল; আর সে জন্য খত লিখিয়া দিয়াছ কি না, বল।"

হরিদাস বলিল,—"তা আর বলিতে? টাকা যে তোমার ধারি, তার কোনই ভুল নাই। বড় অসময়েই তুমি টাকা দিয়া আমার ছেলেপিলেকে বাঁচাইয়াছ—আমাদের সকলকে রক্ষা করিয়াছ। খত তো কাগজ বই নয়; জেঠা দেখিতেছেন, আমার প্রাণে তোমার টাকার কথা লেখা আছে কি না।"

অদ্বৈত বলিল,—"তবে আর তোমার আদালতে যাইবার দরকার কি? যদি মিথ্যা নালিশ হইত, তাহা হইলে আদালতে যাইয়া সাক্ষী দিয়া নালিশ যে মিথ্যা, তাহা যেরূপে হউক প্রমাণ করা উচিত ছিল। তাহা যখন

নয়, তখন তোমার যাওয়া না যাওয়া একই কথা। আর নালিশ করা হইয়াছে বলিয়া তুমি এত ভয় পাইতেছ কেন? তোমার টাকার যোগাড় হইলে ফেলিয়া দিলেই সকল গোল মিটিয়া যাইবে, সে জন্য ভাবনা কি? আমি সহজে তোমার উপর কোন দৌরাত্ম্য করিব না দাদা!"

হরিদাস এ কথা শুনিয়াও বড় আশ্বাস পাইল না। এদিকে তাহার ভগ্নী আসিয়া অদ্বৈতের পা জড়াইয়া ধরিয়া—"আমাদের রক্ষা কর, দোহাই তোমার দাদা"—বলিয়া, কাতর স্বরে কাঁদিতে লাগিল। একটু দূরে সর স্ত্রীও কাঁদিতে লাগিল। বালিকা দুইটী, অবশ্যই কোন সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে মনে করিয়া অথবা বাপ মা ও পিসীর দেখিয়া, কাঁদিতে লাগিল।

অদ্বৈত দুই চারিটা অক্ষর দিয়া হরিদাসের ভগ্নীকে বুঝাইল, এবং সকলকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া প্রস্থান করিল। হরিদাস সমন খানি হাতে করিয়া ধীরে ধীরে, তাহাদের পরম বন্ধু, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অসহায়ের সহায় জেঠা গোপীনাথের নিকটস্থ হইল, এবং গলদশ্রু-নয়নে আপনার বিপদের বার্ত্তা জানাইল। শ্রীহরি জন্ম তাহাকে কি আশ্বাস দিলেন জানি না। সে কিন্তু কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া গৃহে ফিরিল এবং পরিবারবর্গকেও আশ্বস্ত করিল। অধিকতর যত্ন সহকারে সে কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিতে লাগিল। কিন্তু এত যত্ন করিয়া কোন স্থানে সে পাকাপাকি সম্বন্ধ করিয়া উঠিতে পারিল না। সময় যখন মন্দ হয়, তখন এইরূপই ঘটে। হরিদাস কন্যার বিবাহ হেতু ভাবনায় ব্যস্ত থাকিল। অদ্বৈত দাদা বলিয়াছে, মোকদ্দমা করিতে যাওয়ার কোন দরকার নাই। সেই কথার উপর নির্ভর করিয়া হরিদাস মোকদ্দমায় গেল না। এদিকে অদ্বৈতের মোকদ্দমায় এক-তরফা মায় খরচা একার টাকা আট আনার ডিক্রি হইয়া গেল।

পরিচ্ছেদ

অদ্বৈত ডিক্রি হওয়ার পাঁচ সাত দিন পরে, হরিদাসের বাটীতে আসিল এবং ডিক্রির সংবাদ জানাইয়া টাকা চাহিল। হরিদাস ডিক্রি শুনিয়াই কাঁপিয়া উঠিল, বলিল,—দাদা তুমি তো বলিয়াছিলে, মোকদ্দমা হইতে এক মাস লাগিবে। তা এখনই এক মাস হইল কি?

অদ্বৈত বলিল,—"তা প্রায় হইল বৈ কি? তা আইন আদালতের কথা—তোমার আমার কথায় কি যায় আইসে? সে কথা থাক্। এখন টাকার কি বল ভাই! টাকা তো আমি আর একদিনও ফেলিয়া রাখিতে পারিব না।"

হরিদাস সজল নয়নে বলিল আমি তো বলিয়াছি দাদা অগ্রহায়ণ মাসে মেয়ের বিবাহ দিয়া টাকা দিব। তার আগে আমি কোথায় পাব দাদা?"

অদ্বৈত বলিল,—"তুমি কোথায় পাবে, তা আমি জানি না। তুমি কবে মেয়ের বিবাহ দিবে না দিবে, এত খোঁজে আমার কি দরকার ভাই? তুমি খুব ছেলে-মেয়ের বিবাহ দাও, আমোদ আহ্লাদ কর, আমি কি তাতে বাদী? এখন আমার টাকা কয়টা দুই-চারি দিনের মধ্যে না ফেলিয়া দিলে নয়। কবে আসিব বল। টাকা তো দুটি একটী নয় যে, আমার ফেলিয়া রাখিলে চলিবে।"

হরিদাস জিজ্ঞাসিল,—সব শুদ্ধ কত টাকা হইয়াছে দাদা ?"

"একান্ন টাকা আট আনা।"

হরিদাস চমকিয়া বলিল,—"অ্যা—বল কি ? একান্ন টাকা আট আনা!"

অদ্বৈত বলিল,—হাঁ। আদালতে হাকিম বিচার করিয়া ডিক্রি দিয়াছেন। বিশ্বাস না হয়, ডিক্রির নকল আনাইয়া দেখিও। এখন টাকার জন্ম কবে আসিব বল ?"

হরিদাস বলিল,—"আসিয়া কি করিবে ? এক টাকাই হউক, আর একান্ন টাকাই হউক, মেয়ের বিয়ে না হইলে আমার কিছুই দিবার সামর্থ্য নাই। মেয়ের বিবাহের পূর্ব্বে আমি এক পয়সাও দিতে পারিব না।"

অদ্বৈত বলিল,—"আমি তখনই জানি, তুমি আমাকে অনেক কষ্ট দিবে। আবার খরচা বাড়িবে, তখন ভাল হইবে। আমি যে তোমার মেয়ের বিবাহের জন্য হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিব, তা তুমি মনেও করিও না। যদি টাকা দেওয়া মত হয়, তবে চারি পাঁচ দিনের মধ্যে আমার বাড়ীতে পৌছাইয়া দিও। আমি আর আসিব না। কলিকাল—কেহই সহজ লোক নয়। হরিদাস এমন করিয়া আমাকে কষ্ট দিবে, তাহা আমি একদিনও ভাবি নাই। হরি হে, সকলই তোমার ইচ্ছা!"

হরিদাস অদ্বৈতের পা ধরিয়া বলিল,—"দোহাই দাদা, আমার উপর রাগ করিও না। তুমি রাগ করিলে আমার সর্ব্বনাশ হইবে। আমি বড় গরিব—আমাকে এ আশ্রয়টুকু হইতে তাড়াইও না, তোমার পায়ে পড়ি দাদা।"

অদ্বৈত বলিল,—"লোকের টাকা লইবার সময় এক সুর, দিবার সময় আর এক সুর। তোমাকে তাড়ান না তাড়ানর মালিক আমি নহি। এখন আইন আদালতের কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আর তো ঘরাও কথা নাই! আইন-আদালতে যেরূপ করিবে, এখন তাই হইবে। আমাকে অকারণ দোষের ভাগী করিও না। হরি হরি!"

হরিদাসের ভগ্নী আসিয়া অদ্বৈতের চরণ-সমীপে অনেক কাঁদাকাটা করিল, এবং হরিদাসের স্ত্রীও তাহার পায়ের কাছে পড়িয়া অনেক কাঁদিতে লাগিল। মেয়ে দুইটী অদ্বৈতকে বাঘ-ভালুকের মত ভয়ানক জন্তু মনে করিয়া দূর হইতে তাহার মুখপানে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল। হরিদাসের ছেলেটি তখন বাড়ী ছিল না।

অদ্বৈত এত লোকের এত করুণ প্রার্থনায় একটুও বিচলিত হইল না। একটা আশ্বাসের কথাও বলিল না। চারি পাঁচ দিনের মধ্যে টাকা না দিলে আইন-অনুসারে কার্য্য হইবে, ইহাই তাহার এক কথা। অদ্বৈত প্রস্থান করিল। হরিদাস নিতান্ত কাতরভাবে আপনার অবস্থা বুঝাইতে বুঝাইতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর চলিল। কিন্তু সে পাষাণ একটুও কোমল হইল না। তাহাতে অশ্রুপাত করে কাহার সাধ্য ?

হরিদাস তাহার সঙ্গত্যাগ করিয়া বাটী ফিরিল না। সে সেই বিপদভঞ্জন জেঠা গোপীনাথের শ্রীমন্দিরে আসিল এবং কাতর-কণ্ঠে সকল বার্ত্তা তাঁহাকে জানাইল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে কি আশ্বাস দিলেন জানি না; সে কিন্তু অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থ হইয়া বাটী ফিরিল, এবং বিহিতবিধানে কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইল।

কিছু দিন পরে, একদিন মধ্যাহ্ন কালে অদ্বৈত, একটা পেয়াদা সঙ্গে করিয়া হরিদাসের বাটীর আম গাছে একখানা লম্বা কাগজ

আটিয়া দিয়া গেল। কয়েকদিন পরে এক জন ঢোলওয়ালা আসিয়া, অদ্বৈত ঘোষের পাওনার জন্য হরিদাসের ভদ্রাসন বাটী, অমুক তারিখে নিলাম হইবে, ইহাই ঘোষণা করিয়া গেল। সেদিন হরিদাসের স্ত্রী ও ভগ্নী ধুলায় পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। তাহাদের দুর্দ্দশার ইয়ত্তা নাই—এতদিন পরে তাহাদের আশ্রয়-স্থানটুকুও ঘুচিয়া যায়। হায়! স্ত্রী, ভগ্নী ও সন্তানদের লইয়া হরিদাস অতঃপর কোথায় দাঁড়াইবে? হরিদাস এ সংবাদ শুনিয়া কাহারও সহিত কোন পরামর্শ করিতে গেল না, কাহাকেও কোন কথা বলিল না। যাঁহার চরণে সে সকল বিপদের কথা নিবেদন করে, অদ্যও সেই জেঠা গোপীনাথের নিকটস্থ হইয়া সকল কথা জানাইয়া আসিল।

বাটী নিলাম হইয়া গেল। অদ্বৈত তাহা চব্বিশ টাকায় ডাকিয়া লইল। ডিক্রিজারি, নিলাম ইত্যাদি বাবদে অদ্বৈতের সর্ব্বসমেত পাওনা হইয়াছিল বাষট্টি টাকা। হরিদাসের বাটী লইয়াও তাহার দেনা মিটিল না—এখনও আটত্রিশ টাকা বাকী। অদ্বৈত আবার আসিয়া হরিদাসের সহিত দেখা করিল। তাহাকে বাটী ত্যাগ করিয়া সত্বর উঠিয়া যাইতে বলিল এবং বাকী টাকা মিটাইয়া দিবার জন্য তাগাদা করিল। হরিদাস পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় সপরিবারে বিস্তর কাঁদাকাটা করিল, কিন্তু অদ্বৈত তাহাতে একটুও বিচলিত হইল না। সে চলিয়া গেল; যাইবার সময় বলিয়া গেল,—"আইনআদালতের কাজ। আমি কি করিব বল। তুমি বুঝিলে না হরিদাস, কাজেই আমাকে যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করিতে হইবে।"

আরও এক মাস কাটিয়া গেল। হরিদাসের কন্যার বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইল। অনেক খুঁজিয়া সে মনের মত পাত্র পাইল। আর এক মাস পরে বিবাহ হইবে—দিন স্থির হইয়া গেল। হরিদাসের অনেক ভরসা হইল। যদিও অদ্বৈত বাটী খরিদ করিয়াছে, তথাপি নগদ টাকা পাইলে সে নিশ্চয়ই তাহা ছাড়িয়া দিবে এবং তখন তাহার নিকট হইতে আর একটা কোবলা লিখিয়া লইলেই চলিবে। বড় জোর সে না হয় কিছু ছাড়িয়া দিবে না। না দেয়, না দিবে; কিছু অধিক টাকা যাইবে বই তো আর কিছু নয়। তা কি করা যাইবে? কন্যার বিবাহ দিয়া যাহা পাওয়া যাইবে, তাহার অধিকাংশই অদ্বৈতের পেটে যাইবে। মান তো থাকিবে, আশ্রয়-হীন তো হইতে হইবে না। হরিদাস নিশ্চিন্ত হইল, এবং জেঠা গোপীনাথকে হৃদয়ের ভাব জানাইয়া আসিল।

আর একটা বড় বিপদ উপস্থিত হইল। হরিদাসের পুত্র স্নান-আহার করিয়া হাটে গিয়াছিল। সন্ধ্যার সময় একজন প্রতিবেশীর সঙ্গে সে কাঁপিতে কাঁপিতে বাটী ফিরিল—বড় জ্বর। সে রাত্রিতে তাহার কোন ঔষধ হইল না। একজন প্রতিবেশী হাত দেখিতে জানে; তাহাকে পরদিন প্রাতে ডাকিয়া আনা হইল। সে হাত দেখিয়া বলিল,—"জ্বর খুব। এখন তো ভয়ের কারণ কিছু দেখা যাইতেছে না। কিন্তু জ্বরটা যেন পরে বাঁকা হইবে বোধ হয়। ডাক্তার দেখান উচিত।" সে দিনটাও গোলমালে কাটিয়া গেল। পরদিন সেই প্রতিবেশী হাত দেখিয়া বলিল,—"জ্বর খারাপই বোধ হয়।" সেই প্রতিবেশী উদ্যোগী হইয়া এক জন ইংরাজি-মতের চিকিৎসক ডাকিয়া আনিল। যাঁহাকে ডাকিয়া আনিল, তাঁহার রীতিমত পড়াশুনা নাই; কিন্তু তিনি দেখিয়া শুনিয়া একরকম শিখিয়াছেন মন্দ নয়। লোকটির

শরীরে দয়াও যথেষ্ট। ডাক্তার রোগীর অবস্থা বিশেষরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন,—"রোগ ভাল নহে।—বাঙ্গলায় যাকে বিকার একেই বলে। বিশেষ যত্ন হইলে ২১ দিনের পর সারিলেও সারিতে পারে।"

হরিদাস নিতান্ত কাতর হইয়া বলিল,—"তা বাবু আমি তো বড় গরিব। এখন উপায়? গোপীনাথ কি হইবে জেঠা?"

ডাক্তার বলিলেন,—"তুমি বড় গরিব, আমি তা জানি। বিশেষ, অদ্বৈত ঘোষ তোমার সহিত যে ব্যবহার করিতেছে, তাহাও আমি শুনিয়াছি। তা আমি প্রতিদিন যতবার আবশ্যক আসিয়া দেখিয়া যাইব, সে জন্য তোমার অবশ্য কোন খরচ হইবে না। ঔষধ অনেক লাগিবে, তার দামও অনেক হইবে। আমারও অবস্থা ভাল নয়, তা তোমরা সকলেই জান। তা যাহাই হউক, ঔষধের সিকি দামও তুমি কোন রকমে যোগাড় করিয়া দিতে পারিবে না কি দাদা?"

হরিদাসের অপেক্ষা ডাক্তারের বয়স অনেক কম। হরিদাস পরমানন্দে ডাক্তারের মাথায় হাত দিয়া বলিল,—"তোমার কল্যাণ হউক, ছেলে-পিলে নিয়ে তুমি লক্ষেশ্বর হও ভাই। আমার ছেলে যদি বাঁচে, তোমারই দয়াতেই বাঁচিবে। সিকি দাম আমি যেমন করিয়া পারি অবশ্যই দিব।"

হরিদাস গোপীনাথের শ্রীমন্দিরে গিয়া কাঁদিয়া আসিল। একজন প্রতিবেশী, ডাক্তারের সঙ্গে গিয়া ঔষধ আনিল। ঔষধ খাওয়ান হইতে লাগিল। দশ দিন কাটিয়া গেল। একাদশ দিনে পীড়ার অতিশয় বৃদ্ধি হইল। ডাক্তারের যত্নের ত্রুটি নাই, ঔষধের বিরাম নাই, কিন্তু রোগ ভাল দিকে গেল না, বড়ই মন্দ হইয়া পড়িল। ডাক্তার দেখিয়া, পাঁচ জন প্রতিবেশীকে ডাকাইয়া বলিলেন,—"হরিদাস দাদার ছেলের পীড়া বড়ই কঠিন হইয়াছে। এখনও ভরসাহীন হই নাই; যদি আর না বাড়ে, তাহা হইলে চিকিৎসা চলিবে। কিন্তু আর বাড়িলে, চিকিৎসা করিয়া কোন ফল হইবে বোধ হয় না। যাহা হউক, যতক্ষণ ভরসা আছে, ততক্ষণ রীতিমত চিকিৎসা চালাইতে হইবে। এখনকার চিকিৎসার খরচ পড়িবে বিস্তর, তাহার একটা ব্যবস্থা করা আবশ্যক। আর এখন দিবারাত্রি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রোগীর পাশে বসিয়া শুশ্রূষা করিবার লোক আবশ্যক। সে লোক একটু লেখাপড়া জানা হইলেই তবে ঠিক হয়। ইহার একটা ব্যবস্থা করা আবশ্যক। সকলে মিলিয়া ইহার একটা বিবেচনা কর।"

ডাক্তারের প্রস্তাব দুইটি—দুয়েরই অপ্রতুল। গ্রামে এমন কেহ নাই যে, এইরূপ সময়ে দুই টাকা দিয়া সাহায্য করে। এমনও কেহ নাই যে, দিবারাত্রি কাজ বন্ধ করিয়া রোগীর পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে পারে। সকলকেই প্রতিদিন উপার্জ্জন করিয়া খাইতে ও খাওয়াইতে হয়। বসিয়া থাকিলে কাহার চলিবে? আর লেখাপড়া বা চতুরতা তাহাদের বড় নাই। সুতরাং রোগীর যত্ন করিবে কে? যাহাদের বাটীতে পীড়া, তাহারা এ কয়দিন নিরন্তর পরিশ্রম করিয়া নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। হরিদাস দুই তিন দিন তাঁত বুনে নাই। দুই দিন তাহারা এক মুঠা করিয়া কাঁচা চাউল খাইয়া জল খাইয়াছে মাত্র। আজি একজন প্রতিবেশী, মেয়ে দুইটিকে খাওয়াইবার জন্য আপনার বাড়ীতে লইয়া গেল।

হরিদাস কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"আমার একটা ঘড়া, দুইখান কাঁসার থালা, এক খান পিতলের থালা, একটা কাঁসার ঘটি

দুইটা পিতলের ঘটি আছে। ইহা বিক্রয় করিলে, পাঁচ ছয় টাকা হইতে পারে। জেঠার কৃপায় আমার ছেলে যদি বাঁচে, তখনও দু'খান ফুটা তৈজসের জন্য আটকাইবে না। তোমরা আমার ছেলেকে একটু দেখ, আমি বাসন কয়খানা গুছাইয়া লইয়া হাটে বিক্রয় করিতে যাই।"

আপাততঃ এ পরামর্শ নিতান্ত মন্দ বলিয়া কেহ মনে করিল না। হরিদাস তখনই বাসনগুলা সংগ্রহ করিয়া আনিল এবং তৎসমস্ত ধামা পূরিয়া মাথায় করিল। ঠিক এই সময়ে এক অলৌকিক শোভাময়ী সুন্দরী সেই কুটীরাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন। সুন্দরী যুবতী। তাঁহার হাতে শাঁখা, সীমন্তে সুবিস্তৃত সিন্দুর-রেখা, পরিধান এক অতি চওড়া লালপেড়ে সাটি। বস্ত্রে তাঁহার দেহ সুন্দররূপে সমাবৃত। সুন্দরী হাস্যময়ী অথচ নতনয়না, কোমলতাময়ী অথচ প্রদীপ্তাননা, চারুশীলা অথচ জ্যোতির্ম্ময়ী, যুবতী অথচ ধীরা। তাঁহাকে দর্শন মাত্র ডাক্তার বলিলেন,—"এই যে মা লক্ষ্মী আসিয়াছেন।"

বালক-বৃদ্ধ-নর-নারী সকলেই 'মা মা' করিয়া উঠিল। সে স্থান—সেই নিদারুণ বিপদের লীলাক্ষেত্র, তখন যেন আনন্দের পুরী হইয়া উঠিল। সকলেই বুঝিল যখন মা আসিয়াছেন, তখন আর কোন ভাবনা নাই।

ডাক্তার জিজ্ঞাসিলেন,—অনেক দিন মা লক্ষ্মীকে দেখি নাই কেন?"

মা বলিলেন,—"আমি ছিলাম না বাবা। ভাগ্যে আজি জেঠার কাছে আসিয়াছিলাম, তাই শুনিতে পাইলাম—গোপালের কঠিন পীড়া।"

কি মধুর স্বর! কি কোমলতা! তাহার পর হরিদাসের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"এ কি হইতেছে বাবা? দেখি, তোমার ধামায় কি?"

যুবতীর আগমন-মাত্র হরিদাস বুঝিয়াছে যে, জেঠা কৃপা করিয়া এই বিপত্তিকালে মা-লক্ষ্মীকে আনিয়া দিয়াছেন। যখন মা আসিয়াছেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে সকল ভরসাই আসিয়াছেন। সে ধামা নামাইয়া দিল।

মা বলিলেন,—"এগুলি বেচিতে যাইতেছিলে বুঝি? তা ভালই হইয়াছে, আমার এরূপ কয়েকটা জিনিসের দরকার আছে। এ বাসনগুলার বেশী দাম হইবে না বোধ হয়। হয়ও যদি, আমি তোমার মেয়ে—দশ টাকার, বেশী দিব না। এই লও বাবা দশটাকা তোমার বাসনগুলা কিনিয়া লইলাম।"

এই বলিয়া যুবতী, আপনার বস্ত্রাঞ্চল হইতে একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া হরিদাসের হাতে দিলেন, এবং আর কাহারও সহিত কোন কথা না কহিয়া, বাসনের ধামা কাঁকে করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আনন্দ ও ভরসা, উৎসাহ ও আশা সঙ্গে লইয়া, সুন্দরী সেই যে রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিলেন, নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত আর একবার সে স্থান হইতে উঠিলেন না। নিরন্তর বিহিত-বিধানে রোগীর শুশ্রূষায় তিনি ব্যাপৃত রহিলেন। অথচ বাটীর লোকেরা যাহাতে সময়-মত খাইতে পায়, তাহাদের উদ্বেগ যাহাতে কমিয়া যায়, তাহার সকল উপায় তিনি বসিয়া বসিয়া করিতে থাকিলেন।

চতুর্থ খণ্ড।

"ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতা জ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ।"

অর্থ।—দুষ্কৃতিকারী মূঢ়, নরাধম, মায়াপহৃত-জ্ঞান ব্যক্তিগণ, আসুরিক স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া, আমাকে আরাধনা করে না।

তাৎপর্য্য।—মায়ার প্রভাবে যাহারা জ্ঞানহীন, সেই দুষ্ক্রিয়াসক্ত নরাধমেরা ইন্দ্রিয়-পরবশ হইয়া, অসুরের ন্যায়, ভগবানের বিরুদ্ধাচরণ করে।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ৭ম অধ্যায়। ১৫শ শ্লোক। শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তি।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

তরঙ্গিণী বাড়ী ঘর দখল করিয়াছে। তাহার দ্বারে দরওয়ান হইয়াছে, নূতন পাচিকা ও চাকরাণী হইয়াছে, সাবেক লোকদের সে তাড়াইয়া দিয়াছে, সে আছে ভাল। কালিদাস চক্রবর্ত্তীর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। সে যে কোথায় গিয়াছে, কেমন আছে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। সেজন্য কিন্তু তরঙ্গিণীর বড় ভাবনা আছে। রাজা ও তাঁহার কর্ম্মচারী নীলরতন, সেজন্য তাহাকে নিশ্চিন্ত হইতে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিলেও তরঙ্গিণী সম্পূর্ণরূপ নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছে না। কালিদাস হয় তো কতই দুঃখ পাইতেছে বলিয়া তরঙ্গিণী ভাবে কি? কালিদাস কি বিপদে পড়িয়াছে মনে করিয়া তরঙ্গিণী ভাবে কি? কালিদাস হয় তো খাওয়া-পরার কষ্ট পাইতেছে মনে করিয়া তরঙ্গিণী ভাবে কি? রাধাকৃষ্ণ! এ সকল ভাবনা ভাবিবার জন্য তাহার দায় পড়িয়াছে। সে ভাবে, পাছে চক্রবর্ত্তীর মূর্ত্তি আবার দেখা দেয়, পাছে সে আবার আসিয়া গোল করে, পাছে সে উপস্থিত হইয়া বাড়ীঘর জিনিষপত্র দখল করে। সে মরিয়া গিয়াছে সংবাদ পাইলেই তরঙ্গিণী নিশ্চিন্ত হয়। কালিদাস মরিয়াছে কি না জানি না; কিন্তু লাঠি মারার পর দুই তিন মাস উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তথাপি কালিদাস আর দেখা দেয় নাই, তাহার কোন সংবাদও নাই। সে সম্বন্ধে রাজা এবং নীলরতন তরঙ্গিণীকে অনেক অভয় দিয়াছেন; তথাপি তরঙ্গিণীর ভাল করিয়া ভয় ঘুচিতেছে না। বলা আবশ্যক যে, কালিদাসের আড়ত উঠিয়া গিয়াছে। দুই চারি জন পাওনাদার তরঙ্গিণীর বাড়ীতে আসিয়া গোল করিয়াছিল, কিন্তু দ্বারস্থিত পাঁড়েজি মহারাজ কেঁই মেই করিয়া তাহাদিগকে ভাগাইয়া দিয়াছেন। সেই অবধি সে সম্বন্ধে গোলমাল বন্ধ হইয়াছে।

তরঙ্গিণী আছে ভাল। সেই বাড়ী ঘর সবই আছে, জিনিষ পত্র কিছুই যায় নাই। গিয়াছে কালিদাস—কুৎসিত কালো দোকানদার, অরসিক কালিদাস। তাহার হাত হইতে সে অব্যাহতি পাইয়াছে—বাঁচিয়াছে। তাহার স্থানে এখন কে তাহার প্রণয়প্রার্থী জান? অরবিন্দ রায়—সুন্দর, সুপুরুষ যুবা, অতুল ঐশ্বর্য্যশালী রাজা অরবিন্দ রায় এখন তাহার প্রণয়ের উমেদার। এখনও উমেদার কেন? তরঙ্গিণী তো তাঁহারই জন্য ব্যাকুল? তাঁহাকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য সে তো যথেষ্ট উৎসুক। তবে এখনও রাজার উমেদারি চলিতেছে কেন? কথাটা

ভাল বুঝা যায় না। সুতরাং কোন সদুত্তর দেওয়া যায় না।

রাজা অরবিন্দ রায় এপর্য্যন্ত একদিনও সশরীরে তরঙ্গিণীর ভবনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। এখানে তাঁহার অনেক কাজ; অনেক মামলা মোকদ্দমা লইয়া নিয়ত তাঁহাকে অতিশয় বিব্রত থাকিতে হয়; এজন্য তরঙ্গিণীর শ্রীমন্দিরে আগমন করার সময় হয় না। কিন্তু তিনি যাহাই বলুন, কথাটা দেখিতে শুনিতে ভাল নয় তো। যাহাকে তিনি প্রাণের সহিত ভাল বাসেন তাহাকে দেখিতে আসিবার একবার সময় না পাওয়া বড় কেমন কেমন শুনায় না কি? রাজার আরও বিশেষ আপত্তি আছে। রাজার যেরূপ মান সম্ভ্রম, বিশেষতঃ শান্তিপুরে তাঁহার যেরূপ স্বধর্ম্ম-পরায়ণতা ও নিষ্ঠার সুখ্যাতি তাহাতে এ স্থানে পরনারীর সহিত আমোদে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার অপযশের সীমা থাকিবে না। সুতরাং নিতান্ত দায়গ্রস্ত হইয়া অনিচ্ছায় তাঁহাকে তরঙ্গিণীর সহিত সাক্ষাতে বঞ্চিত হইয়া ক্লেশে দিন কাটাইতে হইতেছে।

এসকল যুক্তি সহসা সুসঙ্গত বলিয়া মনে না হইতে পারে। কবে কোন্ ধনবান্ ব্যক্তি সমাজের ভয়ে বা লোকনিন্দার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বাঞ্ছনীয় সুখভোগে ক্ষান্ত হইয়াছেন? কোথায় কোন্ বিলাসী পুরুষ একটু অখ্যাতির ভয়ে প্রেমিকা সুন্দরীর সঙ্গ-সুখ ত্যাগ করিয়াছে? সুতরাং রাজার এই সকল যুক্তি বড় সুসঙ্গত বলিয়া মনে না হইতে পারে। কিন্তু তোমার আমার কারণগুলি উপযুক্ত ও যথেষ্ট বলিয়া প্রতীত না হইলে কোন ক্ষতি নাই। স্বয়ং তরঙ্গিণী এজন্য অসন্তুষ্ট নহে। সে আত্মাবস্থায় পরিতৃপ্ত ও সুখী আছে। তবে আর কথা কহিবার প্রয়োজন কাহারও নাই।

রাজার সরকার নীলরতন চৌধুরী সতত তরঙ্গিণীর বাটীতে যাতায়াত করিতেছেন। তাঁহার মুখে বিভিন্ন ভঙ্গিতে বিবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া তরঙ্গিণী বেশ বুঝিয়াছে, রাজা তাহার প্রেমে একান্ত উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছেন। অতি সত্বর রাজা এখানকার কাজকর্ম্ম ও কৃষ্ণনগরের মামলা মোকদ্দমা ফেলিয়া দেশে চলিয়া যাইবেন। তরঙ্গিণীকে তিনি সঙ্গে লইয়া যাইবেন। সেখানে তিনি স্বাধীন ও প্রকাশ্যভাবে এই সুন্দরীর সহিত আমোদ প্রমোদে কাল কাটাইবেন। এ সকল কথা তরঙ্গিণীর বেশ হৃদ্গত হইয়াছে। রক্ষার কৌশলে এ সম্বন্ধ তরঙ্গিণীর আর কোনই সন্দেহ নাই।

কথা ছাড়া কাজেও তরঙ্গিণী যথেষ্ট প্রমাণ দ্বারা বুঝিয়াছে যে, রাজা তাহার রূপে গুণে বড়ই মজিয়াছেন। রাজা প্রায় প্রতিদিনই তরঙ্গিণীর নিকট নানাপ্রকার মূল্যবান্ উপহার পাঠাইতেছেন। জড়াও বালা, ইয়ারিং, বেনারসি রুমাল, ঢাকাই কাপড় পার্সী সাড়ী ইত্যাদি অনেক সামগ্রী তরঙ্গিণীর শ্রীচরণ-সরসিজে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বিবিধ অত্যুপাদেয় খাদ্য সামগ্রী প্রায় প্রত্যহই রাজবাটী হইতে তরঙ্গিণীর নিকট প্রেরিত হয়। তদ্ব্যতীত এই কয়েক দিনের মধ্যে রাজা তাহার নিকট দুই শত টাকা পাঠাইয়াছেন। অপরিসীম ভালবাসার বন্ধন না ঘটিলে এরূপ উপহার কেহ কাহাকে দিয়া থাকে কি? তরঙ্গিণী বুঝিয়াছে, রাজা অরবিন্দরূপ প্রকাণ্ড কাতলা মাছ, তাহার রূপগুণের জালে এমন জড়াইয়া পড়িয়াছে যে, আর ছাড়াইয়া পলাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। সুতরাং তরঙ্গিণী বড় সুখে—পরমানন্দে আছে।

আজ তিন দিন হইল হারাধন তাহার

ভবনে আসিয়াছিল।। হারাধন মরে নাই, সে মরিয়া বাঁচিয়া উঠিয়াছে। তরঙ্গিণীর দ্বারবান্ তাহাকে বাটীতে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। এরূপ ব্যবহারে হারাধন বিস্ময়াবিষ্ট হইল এবং গৃহস্বামিনী জানিতে পারিলে দরওয়ানকে নিশ্চয়ই তাড়াইয়া দিবেন বলিয়া সে ভয় দেখাইল। পাঁড়ে ঠাকুর ভয় পাইল না দেখিয়া, সে তাঁহাকে গৃহস্বামিনীর নিকট সমস্ত কথা জানাইতে বলিল। পাঁড়ে ঠাকুর সমস্ত কথা জানাইয়া কর্ত্রীর হুকুম চাহিলেন। তরঙ্গিণী তাহাকে তাড়াইয়া দিতে আজ্ঞা দিলেন।

দরওয়ানের নিকট অর্দ্ধচন্দ্র লাভের সম্ভাবনা দেখিয়া, হারাধন নিতান্ত বিমর্ষ হইল, এবং কেন এরূপ ঘটিল স্থির করিতে না পারিয়া, কিয়ৎকাল অধোমুখে চিন্তা করিল। তাহার পর একবার উপরে দাঁড়াইয়া তাহার একটা কথা শুনিবার জন্য, তরঙ্গিণীকে অনেক কাকুতি মিনতি পূর্ব্বক অনুরোধ করিয়া পাঠাইল। পাছে সে আসিলে, বা তাহার সহিত কথা কহিলে, রাজা শুনিতে পান ও রাগ করেন, এই ভয়ে তরঙ্গিণী উপর হইতে দাঁড়াইয়াও তাহার সহিত একটা কথা কহিল না। দ্বারবান্ কড়ায় গণ্ডায় কর্ত্রীর আজ্ঞাপালন করিল, সুতরাং হারাধনকে চলিয়া যাইতে হইল। হারাধন তখন বড় দুর্ব্বল, বড় কাতর; বিশেষতঃ অনাহারে নিতান্ত অবসন্ন। তরঙ্গিণী যে তাহার সহিত দেখা করিবে না, ইহা সে একবারও ভাবে নাই। সে কাতর ভাবে, দূরে দাঁড়াইয়া, উচ্চৈঃস্বরে অনেক অনুনয়-বিনয় করিল, আপনার অবস্থার কথা বিশেষ করিয়া জানাইল, অবশেষে, দেখা হয় না হয়, তাহাকে দুইটা টাকা দিয়া সাহায্য করিতে বলিল। তরঙ্গিণী সকল কথা শুনিতে পাইল, কিন্তু তাহার কোন অনুরোধই রক্ষা করিল না। সে দূরে দাঁড়াইয়া চিল্লাইতেছে দেখিয়া, দ্বারবান্ সেখান হইতেও ধাক্কা দিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিল। বলা বাহুল্য হারাধন নিতান্ত মনঃক্ষুণ্ণ ও যৎপরোনাস্তি মর্ম্মপীড়িত হইয়া চলিয়া গেল।

পরদিন বেহায়া হারাধন আবার আসিল। দ্বারবান্ তাহাকে তাড়াইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সে নড়িল না, কেবল নিরন্তর মিনতি করিয়া কর্ত্রীর নিকট খবর দিতে অনুরোধ করিতে থাকিল। তাহার উপরোধ ছাড়াইতে না পারিয়া দ্বারবান্ অগত্যা তরঙ্গিণীর নিকট সংবাদ দিল। তরঙ্গিণী অত্যন্ত রাগের সহিত বলিল,—"কে সে? আমি তাহাকে চিনি না। আমি কি যে সে লোকের সহিত কথা কহি? সে ছোট লোক। আমার সহিত কথা কহিতে তাহার স্পর্দ্ধা কেন? তুমি তাহাকে দূর করিয়া দাও।" দ্বারবান্ ফিরিয়া আসিয়া সকল কথাই হারাধনকে বলিল এবং তাহাকে সহমানে যাইতে উপদেশ দিল।

হারাধন সমস্ত কথা শুনিয়া মনে মনে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইল। বলিল,—"আচ্ছা!" হারাধন চলিয়া গেল। তরঙ্গিণী রাজার নিকট এই সংবাদ পাঠাইয়া দিল। রাজা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, আজি সন্ধ্যার পর চৌধুরী মহাশয় আসিয়া বিহিত ব্যবস্থা করিবেন। তরঙ্গিণী মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বেশভূষার পারিপাট্য করিতে লাগিয়াছে। বড় যত্নে, অনেক গুছি লাগাইয়া, সে মোহিনী কবরী বাঁধিয়াছে, গালে রং মাখিয়াছে, ঠোঁট লাল করিয়াছে, হাতে একটু, আলতার ছোপ দিয়াছে, বড় ভাল জামা গায়ে দিয়াছে, রাজদত্ত পার্শী সাড়ী, জড়াও বালা, ইয়ারি পরিয়াছে, তা ছাড়া আরও অনেক অলঙ্কার

তাহার গায়ে উঠিয়াছে। মোটের উপর সে সাজিয়াছে ভাল এবং তাহাকে দেখাইতেছে মন্দ হয়।

এইরূপে সাজিয়া গুজিয়া তরঙ্গিণী অপেক্ষা করিতেছেন এমন সময় নীলরতন সেই ভবনে প্রবেশ করিলেন। চৌধুরী, মহাশয় আগমন করিবামাত্র তরঙ্গিণী উৎকণ্ঠার সহিত নিকটস্থ হইল এবং সাগ্রহে বলিল, —"এস এস, খবর কি? কয় দিন দেখা নাই যে?"

নীলরতন বলিলেন,—"খবর ভাল, খুবই ভাল, আবার তোমার জন্য বিশ ভরির তারা-পাট্যার্ণ হারের ফরমাইস হইয়াছে। তোমারই দিন পরিয়াছে। যাহা বলিয়াছিলাম তাহা হইয়াছে কি না বল।"

তরঙ্গিণী একটু গর্ব্বের হাসি হাসিল। মনে মনে যাহা অনেক দিন বুঝিয়াছে, আজিও তাহাই বুঝিল। তাহার রূপ দেখিয়া কাহার সাধ্য না মজিয়া থাকে। কিন্তু সে কথা তো নীলরতনকে বলা ভাল নয়। বলিল— "তুমি যখন আমার পক্ষে, তখন সকলই হইবার কথা। কিন্তু সে যাহা হউক, "রাজা যদি মোটেই আমার সহিত দেখা সাক্ষাৎ না করেন তাহা হইলে তো আমি আর থাকিতে পারি না। তাঁহার সহিত একবার আমার দেখা হইলে খুব ঝগড়া করিব।"

নীলরতন বলিলেন,—"তা তুমি খুব ঝগড়া করিতে পার। কিন্তু আমি জানি রাজা তোমার জন্য পাগল। তিনি আমার সঙ্গে তোমার কথা ছাড়া অন্য কথা কন না, তোমার কথা উঠিলে রাজকর্ম্ম সংসারধর্ম্ম সকলই ভুলিয়া যান; আর বিশেষ কথা বলি শুন—রাণীর সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা বন্ধ হইয়াছে। রাণী সম্মুখে আসিলে, তিনি রাগিয়া উঠেন। রাণী কেবল কাঁদিয়া দিন কাটাইতেছেন। আমি এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। রাজা বলিয়া-ছেন, কি করিব? তরঙ্গিণী ছাড়া আর কোন স্ত্রীলোকের সহিত মুখের একটা কথা কহিতেও আমার আর প্রবৃত্তি হয় না। কাজেই বলি-তেছি, রাজা যতদূর গোলাম হওয়া সম্ভব, তাহাই হইয়াছেন।"

তরঙ্গিণী আবার হাসিল। যাহা পুনঃ পুনঃ সে ভাবিয়াছে, তাহাই আবার ভাবিল। তাহার এ রূপরাশি নয়নে পড়িলে, কাহার সাধ্য স্থির থাকে? সে তখন এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ও ভীত ভাবে হারাধনের আগমনের কথা বলিতে আরম্ভ করিল। যেন সে এই ঘটনায় যার-পর নাই ভয় পাইয়াছে। সে চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া মুখ ভার করিয়া এই ব্যাপারের বর্ণনা শেষ করিয়া বলিল,—"দেখ ভাই, রাজার কাছে মনে বা মুখেও অবিশ্বাসী হইতে আমার আর সাধ্য নাই। আমি যে কি ক্ষণেই রাজাকে দেখিয়াছি বলিতে পারি না। পাছে সে হতভাগার সহিত একটা কথা কহিলে রাজা কিছু মনে করেন, এই ভয়ে আমি তাহার সহিত একটা কথাও কহি নাই, একবার দেখাও করি নাই। তা ভাই, এখন কি হইবে?"

নীলরতন বলিলেন,—"ইহার জন্য ভাবনার কারণ কি আছে? একটা রাজা যাহার মুঠার মধ্যে, একটা সামান্য তিলির ভয়ে তাহাকে কেন অবসন্ন হইতে হইবে? এজন্য তোমার কোন ভয় নাই। তিনি যাহাতে তোমার বাটীর ত্রিসীমায় না আসিতে পারে, তাহার উপায় আমি আজই করিয়া দিব। এখন একথা থাউক, তুমি আমার বিষয় কি করিলে বল। আমি তোমার জন্য দিবারাত্রি ভাবিতেছি, কিসে তোমার ভাল হয় তাহারই

উপায় করিতেছি; তুমি আমার জন্য কি করিতেছ বল।"

তরঙ্গিণী জানে বাস্তবিকই নীলরতন তাহার পরম শুভানুধ্যায়ী। তাহার রূপ যথেষ্ট থাকিলেও সে জানে ও বুঝে এরূপ একটা লোক মধ্যে না থাকিলে, এ রাজার সহিত সদ্ভাব বজায় থাকিবে না, এবং লাভালাভের সুবিধা হইবে না। নীলরতন যে রাজার প্রধান মন্ত্রী, তাহাও সে জানে। নীলরতনকে হাতে রাখা নিতান্ত আবশ্যক। সে ভাবিয়া ভাবিয়া নীলরতনকে বাধ্য করিবার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায় স্থির করিয়া লইল। নীলরতনের দিকে একটু সরিয়া আসিয়া, কটাক্ষ মিশ্রিত হাসি হাসিয়া সে বলিল,—"তোমাকে আর কি দিব ভাই? তোমাকে আমার অদেয় কি আছে? রাজার ভয়ে তুমি আমার সহিত মন খুলিয়া আমোদ কর না বলিয়া আমার বড় কষ্ট। কেন এত রাজার ভয়? রাজা কি এখানে বসিয়া আছেন? কিসের ভয়? খেলিতে জানিলে সব তাতেই খেলা যায়।"

নীলরতন মনে মনে অনেক হাসিলেন। কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে তরঙ্গিণীর উচ্ছ্বাস দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন। সে হারাধনকে আসিতে দেয় নাই, তাহার সহিত একটা কথাও কহে নাই, এক বার দেখাও করে নাই,—কেন? পাছে রাজার কাছে অবিশ্বাসিনী হইতে হয়, এই ভয়ে। আর এখন সে নীলরতনকে গোপনে দেহ উৎসর্গ করিয়া দিতে চায়, গোপনে আমোদ চলে না বলিয়া দুঃখিত হয়—পাছে রাজা সম্পূর্ণরূপে তাহার হস্তগত না থাকেন এই ভয়ে। সুতরাং তরঙ্গিণী বড়ই সাধ্বী! ঘৃণিত জীবেরা মরে না কেন?

নীলরতন মনে মনে অনেক হাসিয়া বলিলেন,—"সে কথা তো পড়িয়াই আছে। আমি যে তোমরাই তা কি তুমি জান না ভাই? তা যা হউক, তোমাকে আমি আপাততঃ একটা বড় ভয়ানক সংবাদ দিব বলিয়াই আসিয়াছি। রাজা এখনও এ খবর জানেন না। আমি কালিদাস বক্রবর্ত্তীকে দেখিতে পাইয়াছি।

কথা শেষ করিতে না দিয়াই, তরঙ্গিণী বলিল,—"অ্যা—বল কি? কি হইবে তবে?"

নীলরতন বলিলেন,—"শুন আগে—সব বলি আগে—তাহার পর পরামর্শ হইবে। আমার সহিত তাহার দেখা হইয়াছিল। তাহার কথা শুনিয়া বুঝিলাম, সে জোর করিয়া এখানে আসিবে এবং তোমাকে তাড়াইয়া দিয়া, তোমার ঘরবাড়ী জিনিষ-পত্র দখল করিবে, ইহাই তাহার অভিপ্রায়।"

তরঙ্গিণী বলিল,—"এখন উপায়? কোথায় তাহার সহিত তোমার দেখা হইল? সে কি বলিল? এখন উপায়?"

নীলরতন বলিলেন,—"তাহার সহিত অতি কুস্থানে আমার দেখা হইয়াছিল। গাঁজার আড্ডায় সে বসিয়াছিল। আমি পথ দিয়া যাইতেছিলাম দেখিয়াই, সে ছুটিয়া আমার নিকট আসিয়া বলিল,—'আপনিই না রাজার সরকার? আপনারা তরঙ্গিণীকে যে বাড়ীঘর দেওয়াইয়া দিয়াছেন তাহা আমার। আমার নাম কালিদাস চক্রবর্ত্তী। আমি সহজে তাহা ছাড়িব না। আমি একটা মাথা একবার কাটাইয়াছি, আর পাঁচটা কাটাইতে হয় কাটাইব। আমার জিনিষ আমি ছাড়িব কেন? আমারও অনেক লোক আছে জানিবেন। এই আড্ডায় যত লোক যায় আইসে, সকলেই আমার বাধ্য। আমার

জন্য সকলে প্রাণ দিবে। আমি সে মাগীকে তাড়াইয়া দিয়া বাড়ীঘর দখল করিব।' তাহার যেরূপ চেহারা ও যেরূপ দলবল, তাহাতে কিছুই তাহার পক্ষে অসম্ভব নয়।"

তরঙ্গিণী বলিল,—"এখন উপায়?"

নীলরতন বলিলেন,—"আমি তো ভাই তাড়াতাড়ি তোমাকে খবর দিতে আসিয়াছি। উপায় যে আমি স্থির করি নাই, এমন নহে। তোমার জিনিষ-পত্র যাহা আছে তাহার মধ্যে যাহা যাহা দামী, যাহা যাহা ভাল, সকলই কোন বিশ্বাসী স্থানে রাখিয়া দিতে হইবে। আর তোমার বাড়ীখানি কোন আপনার লোকের নামে বেনামী করিয়া রাখিতে হইবে। তাহার পর যদি কালিদাস আইসে, আমাদের বরকন্দাজেরা তাহাকে মারিয়া তাড়াইয়া দিবে। তাহার পর যদিই সে আইন আদালতে যায়, তাহা হইলেও তাহার সকল পথ বন্ধ করিয়া রাখা হইল। বাড়ী তখন তোমার নহে, জিনিষ-পত্র কিছুই নাই। সে লইবে কি? আমি তো ভাই ভাবিয়া চিন্তিয়া এই পরামর্শ স্থির করিয়াছি; এখন তুমি যাহা বিবেচনা কর।"

তরঙ্গিণী কিয়ৎকাল অধোমুখে চিন্তা করিল। তাহার পর বলিল,—"তুমি পরামর্শ করিয়াছ ভাল; কিন্তু তোমরা ছাড়া আমার এমন আপনার লোক আর কেহই নাই। তা রাজা কি এত ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে করিতে চাহিবেন? তিনি যদি স্বীকার করেন, তবেই তো সকল দিক রক্ষা হয়। আর তো আমার কেহই নাই। তুমি ভাই, তাঁহার মত করাইয়া দিতে পারিবে না?"

নীলরতন বলিলেন,—"তোমার বিষয়ে তাঁহার মতামত করাইতে আমার ওকালতী লাগে না। এ প্রস্তাব রাজার নিকট করিলে তিনি হয় তো প্রথমেই ইহাতে অস্বীকৃত হইবেন। অনেক লোক অনেক সন্দেহ করিবে, হয় তো এজন্য আদালতে যাতায়াত করিতে হইবে, হয় তো তোমার সহিত প্রণয়ের কথা হাটে-বাজারে প্রচার হইবে, এই ভয়ে তিনি ইহাতে রাজি হইবেন না। কিন্তু তাঁহাকে সকল কাজেই রাজি করিবার কল তোমার মুখের কথা। তুমি তাঁহাকে হুকুম করিয়া না করাইতে পার কি? এ কাজটা পারিবে না?"

তরঙ্গিণী একটু গৌরবের হাসি হাসিল। নীলরতন বলিলেন,—"তোমাকে সাবধান করিয়া দিলাম। আমি এক্ষণে বিদায় হই। যাহাতে সকল দিক ভাল হয় তাহার উপায় করিও।"

অল্পকাল মধ্যে বিহিত বিধানে বিদায় লইয়া নীলরতন প্রস্থান করিলেন।

নীলরতন চৌধুরী সদর দরজা পর্য্যন্ত আসিলে একটা নিতান্ত দরিদ্র বেশধারী ক্ষীণকলেবর লোক তাঁহার নিকটস্থ হইয়া প্রণাম করিল। আগন্তুককে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"কে তুমি?"

আগন্তুক নিতান্ত কাতর স্বরে উত্তর দিল —"আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না— আমার অদৃষ্ট মন্দ। আমি হারাধন নন্দী।"

চৌধুরী বলিলেন,—"বটে! হারাধন? তোমার এমন অবস্থা কেন?"

দ্বারের অপর পার্শ্ব হইতে তরঙ্গিণী সভয়ে বলিয়া উঠিল,—"ঐ সে হতভাগা আবার আসিয়াছে!"

হারাধন বলিল,—"চৌধুরী মহাশয়, যিনি এখন আমার গলার আওয়াজ শুনিয়া ভয়ে শিহরিতেছেন এক সময়ে আমি তাঁহার প্রাণনাথ ছিলাম। একদিন আমাকে না

দেখিলে তিনি চৌদ্দ ভুবন অন্ধকার দেখিতেন, আমি তাঁহার মরণ কাটী বাঁচন কাটী ছিলাম। তখন তিনি যাহার আশ্রয়ে ছিলেন, সে বামুন বড় বোকা, বড় বেকুব ছিল, কাজেই তাহার চখে ধূলা দেওয়া সহজ ছিল। কিন্তু তাঁহার কপাল ভাল। তিনি এখন আপনাদের আশ্রয় পাইয়াছেন। আমার ভগ্নীর হাত হইতে তিনি রাজাকে কাড়িয়া লইয়াছেন বলিলেই হয়। তা বেশ। তাঁহার ভাল হইয়াছে, তাহাতে আমি হিংসা করি না। কিন্তু অবস্থা ফিরিলেই যে চিরকালের আত্মীয়দিগকে ভুলিয়া যাইতে হয়, এমন কোন শাস্ত্র নাই। আমরা তাঁহার চিরদিনের বন্ধু। তিনি এখন শক্ত লোকের হাতে পড়িয়াছেন। চখে ধূলা দিয়া তাঁর ঘরে যাওয়া আসা যার তার এখন সম্ভব নয়। ভালই কথা। কিন্তু তাই বলিয়া একবার দেখা করা যায় না কি? সাবেক বন্ধুবান্ধবের একটু উপকার করা যায় না, এমন কোন কথা নাই তো। আমার এখন সময় বড় মন্দ, তাঁহার এখন সময় খুব ভাল। ভাল! সেকালের কথা মনে করিয়া আমাকে একটু সাহায্য করিলে ক্ষতি কি?"

চৌধুরী বলিলেন,—"ক্ষতি কি? এ কাজ করাই তো উচিত। কেন তরঙ্গিণী, তুমি ইহার সাহায্য কর না। ইহারা তোমার অনুগত লোক। ইহাদের উপকার করায়, তোমার ধর্ম্ম ভিন্ন অধর্ম্ম নাই।"

তরঙ্গিণী বলিল,—""ও মিথ্যাবাদী, উহার কথা শুনিও না। আমার সহিত উহার প্রণয় ছিল! হতভাগার আস্পর্দ্ধা দেখ। আমি উহাকে চিনতাম বটে। তা চিনিলেই কি প্রণয় থাকিতে হয়? উহাকে আমার দরজা হইতে তাড়াইয়া দেও; ওযেন কখন এদিকে না আসিতে পারে।"

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"শুন হারাধন তরঙ্গিণীর সহিত অনর্থক ঝগড়া করিয়া কোন ফল হইবে না। আমি তরঙ্গিণীর কথা ঠেলিয়া তোমার কথা বিশ্বাস করিব, ইহা তুমি কখন মনেও করিও না। তুমি এ সকল কথা বলিলে তরঙ্গিণী কখনই তোমাকে দয়া করিবে না। ভাল করিয়া বল, মিথ্যা কথা বলিয়া রাগাইও না; যাহাতে উহার দয়া হয় তাহার উপায় কর, অবশ্যই তোমার দুঃসময়ে উপকার করিবে। আমি এখন যাইতেছি। যদি শুনিতে পাই যে তুমি তরঙ্গিণীকে দুর্ব্বাক্য বলিয়াছ, তাহার সহিত ঝগড়া করিয়াছ, তাহা হইলে আমি রাজাকে বলিয়া এমন ব্যবস্থা করিব যে, তুমি আর এবাটীর ত্রিসীমায় আসিতে পাইবে না, এবং যারপর নাই অপমানিত হইবে। যদি তরঙ্গিণী তোমাকে সাহায্য না করে, তুমি আমাদিগকে জানাইও।"

চৌধুরী মহাশয় চলিয়া গেলেন। তরঙ্গিণীর নিকট মিষ্ট কথায় হারাধন সাহায্য প্রার্থনা করিল। তরঙ্গিণী তাহাকে নানাবিধ কুৎসিত তিরস্কার করিয়া, তাঁহার মুখে জুতা মারিবার নিমিত্ত দরওয়ানকে আদেশ করিল। দরওয়ান তৎক্ষণাৎ পায়ের নাগরা হাতে তুলিয়া হারাধনকে তাড়া করিল। সম্মুখ-যুদ্ধ নিষ্ফল জানিয়া হারাধন তখন পলায়ন করাই আবশ্যক মনে করিল। যাইবার সময় সে আবার বলিয়া গেল,—"আচ্ছা।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

হারাধন মর্ম্মাহত হইয়া বাড়ী ফিরিল। পথে সে ভূত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক ভাবিতে লাগিল। এখন তাহার প্রায় পঁচিশ বৎসর

বয়স; এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে সে যে কখন কোন অন্যায় কার্য্য করিয়াছে, এরূপ তাহার মনে হইল না। তাহার জীবন নিষ্কলঙ্ক, পাপ-বিরহিত, পরম শুভ্র বলিয়াই সে বিবেচনা করিল। অতীত জীবনের যত কার্য্য অন্যায় বলিয়া তাহার একবার মনে হইল, তৎক্ষণাৎ অন্য কোন ব্যক্তির স্কন্ধে তাহার দায়িত্ব আরোপ করিয়া, সে তত্তৎসম্বন্ধে আপনার চিত্ত ধৌত করিয়া লইল। সে আপনি আপনাকে সাধুতার নিকেতন বলিয়া স্থির করিল এবং মনুষ্য-সমাজ নিতান্ত অত্যাচারী, অবিচারক ও পক্ষপাতী বলিয়া মীমাংসা করিল। জগৎ তাহার সহিত ভাল ব্যবহার করে নাই, মানবেরা তাহার সহিত ভদ্রোচিত কার্য্য করে নাই, ইহাই তাহার ধারণা হইল। অতীত ঘটনার যতই সে আলোচনা করিতে লাগিল, ততই তাহার এই বিশ্বাস দৃঢ়তর হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য, সে জীবনের একদেশ মাত্র দেখিতে লাগিল, অতীত ঘটনাবলীর এক পার্শ্বমাত্র সে আলোচনা করিতে থাকিল। জগতে অধিকাংশ মনুষ্যই এইরূপ বিচার করিয়া থাকে। একদিকই সকলে দেখে ভাল, দুই দিক বড় একটা কেহই দেখে না। দুই দিক দেখে না বলিয়াই, মানুষ আপনার গণ্ডা বুঝে ভাল, আপনার কথাই কহে বেশী এবং আপনার সকল বিষয়ই নির্দ্দোষ মনে করে। আইন বল, আদালত বল, তর্ক বল, ঝগড়া বল, সকলই এই একদেশদর্শিতার বিচারের জন্য।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে হারাধন সংসারের উপর বড় বিরক্ত হইয়া উঠিল। সুরেন্দ্র বাবু পাপাত্মার একশেষ, সে তাহার ভগ্নীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে, কিন্তু সমুচিত মূল্য দেয় নাই কেন? কালিদাস চক্রবর্ত্তী অতি বড় পাষণ্ড, সে তরঙ্গিণীকে রাজীবপুরে যাইবার জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিল কেন? রাজা লোকটা যারপর নাই মন্দ, সে তাহার হাত হইতে তরঙ্গিণীকে কাড়িয়া লইল কেন? তরঙ্গিণী অতিশয় জঘন্য স্ত্রীলোক, সে তাহার প্রণয়ে ভুলিল কেন? গিরিবালা যত-দূর সম্ভব বেকুব, সে রাজাকে হাত করিতে পারিল না কেন? এইরূপে হারাধন, সংসৃষ্ট তাবৎ লোককে দোষী করিতে করিতে আপনার আবাস-স্থানে ফিরিল।

রাত্রি অনেক; বড় অন্ধকার। একখানি সামান্য খড়ের ঘরের মধ্যে, রুগ্ন-শয্যায় শায়িতা এক স্ত্রীলোক যন্ত্রণাসূচক ধ্বনি ব্যক্ত করিতেছে। ঘরের মেজে বড় সোঁতা, জল উঠিতেছে বলিলে হয়। কোণে একটি মাটীর দীপাধারে মিট্‌মিট্ করিয়া একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। পীড়িতা একখানি চেটাইয়ের উপর খড়ের বালিস মাথায় দিয়া পড়িয়া আছে। তাহার পরিধানবস্ত্র নিতান্ত মলিনা—ছিন্ন ভিন্ন এবং এত ক্ষুদ্র যে তাহা পরিধান করা একপ্রকার অনর্থক। ঘরে তৈজসপত্র কিছুই নাই, পীড়িতার শয্যাপার্শ্বে একটা মৃৎভাণ্ডে জল আছে, সে তাহা সময়ে সময়ে পান করিতেছে। স্ত্রীলোক গর্ভিণী

এই নারী গিরিবালা। কিন্তু হায়! কোথায় তাহার সে রূপরাশি? কোথায় তাহার সে অহঙ্কার ও তেজ? গিরিবালার দেহ, অস্থি-চর্ম্মাবশেষে পরিণত, নিদারুণ ক্ষয়-রোগ তাহাকে গ্রাস করিয়াছে, পথ্যাভাবে ও শুশ্রূষাভাবে পীড়া ক্ষিপ্রগতিতে বাড়িয়া যাইতেছে, সে এখন মরণাপন্না হইয়াছে। ক্ষুধায় সে ছট্‌ফট্ করিতেছে, শীতে সে কাতর হইয়াছে, ভয়ে সে অবসন্না হইয়াছে, মৃত্যুর

বিভীষিকা সে চারিদিকে দর্শন করিতেছে, তাহার দুর্দ্দশার ইয়ত্তা নাই।

তাহাদের কিছুই নাই। ঘটীবাটী থালা সকলই হারাধন বিক্রয় করিয়াছে। কাপড় চোপড়ও সে বেচিয়াছে, কোন সম্বলই সে রাখে নাই। কোন কাজ-কর্ম্মের চেষ্টা হারাধন করে নাই—এখনই কিসে অভাব মিটিয়া যায়, তাহারই সকল ফিকির সে করিয়া বেড়াইয়াছে—অভাব মিটে নাই, আরও বাড়িয়া গিয়াছে। তরঙ্গিণীর দ্বারে সে ভিক্ষা করিতে গিয়াছে, মারি খাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। অন্যত্র ভিক্ষা করিতে গিয়াছে, অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। রাজার নিকট সাহায্য পাইবার অভিপ্রায়ে সে যাতায়াত করিয়াছে, দেখা হয় নাই; দরওয়ান তাহাকে বাটীর নিকটেই যাইতে দেয় নাই। চুরি করা গহনাগুলা রাজার নিকট হইতে পাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই। চুরি করিতে সে চেষ্টা করিয়াছে, সুযোগ অভাবে দুই এক দিন হতাশ হইয়া ফিরিয়াছে—এক দিন ধরা পড়িয়া যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত হইয়া ফিরিয়াছে। এ সকল নীচ চেষ্টা সে করিয়াছে। কিন্তু কাহারও বাড়ীতে চাকরি করিতে কি বাজারে মোট বহিতে, কি লোকের ফরমাইস খাটিতে সে কখন চেষ্টা করে নাই। হারাধন বাবু না বলিলে, চিরদিন সে রাগ করিয়াছে, আজি বাবুত্বের বিরোধী কাজ সে করিবে কেন? সুতরাং তাহার ঘরে অপ্রতুলতা মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া বিরাজ করিতেছে।

হারাধন অনেক আশা করিয়া গিরিবালাকে সঙ্গে আনিয়াছিল। গিরিবালা অসৎপথে যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতে পারিবে ইহা সে স্থির জানিত। গিরিবালা গর্ভবতী, গিরিবালা পীড়িতা, সুতরাং উপার্জ্জন করা দূরে থাকুক, সে এখন হারাধনের গলগ্রহ।

অভাব যেখানে এত, বিবাদ সেখানে অবশ্যম্ভাবী। কুলধ্বজ ভাই ও কুলপাবনী ভগ্নীর মধ্যে কলহ নিরন্তর বিরাজমান। ভাই বলেন, ভগ্নীকে লইয়াই যত জ্বালা, সে কোন কর্ম্মের নহে জানিলে তিনি কখনই তাহার বোঝা ঘাড়ে করিতেন না, সে তাঁহার গলগ্রহ ভগ্নী বলেন, যাহা হউক তিনি ছিলেন ভাল, খাওয়া পরা চলিতেছিল, ভাইয়ের কোন যোগ্যতা নাই, সিকি পয়সা রোজগারের ক্ষমতা নাই, ভাইয়ের সঙ্গে আসিয়াই তাঁহার সর্ব্বনাশ হইল; দুঃখ ও দারিদ্রের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি থাকিলে কষ্টের কঠোরতা থাকে না। এ অভাগাদের সে সৌভাগ্য ঘটে নাই।

গিরিবালা যখন যাতনায় 'আহা উহু' করিতেছে, সেই সময়ে ঘরের ঝাঁপ ঠেলিয়া হারাধন তথায় প্রবেশ করিল। পীড়িতা অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া ছিল। সে কুকুর আসিয়াছে ভাবিয়া বলিয়া উঠিল,—"ছেই—ছেই।"

হারাধন বলিল,—"এখনও তো মর নাই, এরই মধ্যে চখের মাথা খাইয়াছ? তুমি মরিলে কুকুর তোমাকে খাইতে আসিবে বটে তেমন দিন কি হইবে?"

বড় মর্ম্মবিদারক, বড় নিষ্ঠুর, বড় অস্বাভাবিক কথা! গিরিবালা বলিল,—"কে ও—দাদা! আমি দেখিতে পাই নাই। দেখিতে পাইবই বা কিসে? একে এই রোগের জ্বালা, তাহাতে ক্ষুধায় মরিতেছি। কিছু খাবার আনিতে পারিয়াছ কি?"

হারাধন বলিল,—"খাবার লইয়া সব লোক বসিয়া রহিয়াছে কেবল খাই খাই।

আমাকেই না খাইয়া তোর ক্ষুধা মিটিবে না। তাই আমাকে খা না হয়?"

গিরিবালা বলিল,—"আমি তোমাকে খাই না খাই. তুমি সকল রকমেই আমাকে খাইলে। আমার জ্বালা তোমাকে আর বড় বেশী ভোগ করিতে হইবে না। বড় জোর একদিন, না হয় দু'দিন। কিন্তু ভগবান্ দেখিতেছেন. আমার এ কষ্ট—এ অপমৃত্যু সকলই তুমিই ঘটাইলে।"

হারাধন বড় রাগিয়া বলিল,—"আমি ঘটাইলাম কিসে?"

গিরিবালা বলিল,—"তুমি ঘটাইলে না? সুরেন্দ্র বাবুর কাছে আমি এক রকম দিন কাটাইতেছিলাম। সুখে হউক, দুঃখে হউক, আমার খাওয়া-পরা চলিতেছিল। তোমারই পরামর্শে আমি এক রাজার দৌলত চুরী করিয়া আনিলাম। সেগুলা হাতে থাকিলেও আমি চিরদিন নির্ভাবনায় কাটাইতাম। তোমার তরঙ্গিণীর পরামর্শে, তুমি সেগুলা কোথাকার এক রাজার হাতে দিলে।"

হারাধন বলিল,—"আমি দিলাম? আমি কেমন করিয়া দিলাম? তুই তো সেগুলা বাহির করিয়া রাজাকে দেখাইলি।"

গিরিবালা বলিল,—"আমি দেখাইলাম সত্য, কিন্তু তরঙ্গিণীর জেদে তুমি মত না করিলে, সেগুলা কখনই রাজার হাতে পড়িত না। তাহার পর তুমি মদ খাইতে খাইতে মারি খাইয়া মরণাপন্ন হইয়া পড়িলে। তোমার চিকিৎসায়, তোমার পথ্যাদির খরচে, হাতের বালা দু'গাছা, কাণের মাকড়ি কটা, কাপড় চোপড় যাহা ছিল, সকলই গেল। সেগুলা থাকিলেও আমার এই অসময়ে কত উপকার হইত।"

হারাধন বলিল,—এত যদি জান, তবে আমার জন্য এত খরচ করিয়াছিলে কেন? আর খরচই বা কত করিয়াছ যে, চিরদিন তাহার খোঁটা দেও? দু' চারি শিশি ঔষধ—তার জন্যই তোমার সব গেল?"

গিরিবালা বলিল,—"দুই চারি শিশি ঔষধ, কি আর কত, তা তুমি না জানিতে পার, কিন্তু আর অনেকেই জানে। যাহাই হউক, তখন ভাবিয়াছিলাম, তুমি সারিয়া উঠিলেই সকল রক্ষা হইবে। তুমি সারিয়া উঠিলে, কিন্তু উপায় কিছুই করিতে পারিলে না। তরঙ্গিণীর কাছে সাহায্য পাইবে বলিয়া কদিন ঘুরিলে, সে তোমাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিল, একটা মুখের কথাও কহিল না। দুঃখ কষ্ট ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। রাজার নিকট হইতে আমার চুরি করা গহনাগুলা চাহিতে বার বার বলি, কিন্তু ভয়ে সেখানে তুমি যাইতেই পার না, চাহিবে কি? রাজা জানিয়াছেন—কি বুঝিয়াছেন, আমরা সেগুলা চুরি করিয়া আনিয়াছি। যদি চাহিতে গেলেই তিনি ধরাইয়া দেন, ইহাই তোমার ভয়। কেন তিনি ধরাইয়া দিবেন? যেমন করিয়াই আনি, আমরা তাহা তাঁহার নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছি। তিনি তাহা কেন ফিরাইয়া দিবেন না? তুমি পুরুষ মানুষ। তাঁহার সহিত ঝগড়া করিয়া আমাদের জিনিষগুলা চাহিয়া আনিতে তোমার সাহস হয় না। আবার বল, তুমি আমার কি ক্ষতি করিয়াছ? সর্ব্বনাশ যতদূর করিতে পারা যায়, তাহার সকলই তুমি করিয়াছ। আর আমার দিন নাই; কষ্টের শেষ হইয়া আসিয়াছে। এত সহিয়াছি তো আর দুই একদিনও সহিতে পারিব। এ শেষকালে আমি আর তোমার সহিত ঝগড়া করিব না। ঈশ্বর যদি থাকেন তিনিই ইহার বিচার করিবেন।

হারাধন কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিল,—"বেশ বেশ। কালি প্রাতেই আমি রাজার কাছে গিয়া জিনিষ চাহিব। আমাদের এই দুঃসময়, কেন তিনি আমাদের গচ্ছিত জিনিষ দিবেন না।

গিরিবালা কোন উত্তর দিল না। যন্ত্রণায় সে 'আহা উঁহু' করিতে লাগিল। এইরূপ অনাহারে ও কষ্টে সে রাত্রিও কাটিল। প্রাতে উঠিয়া বাস্ত বকই হারাধন রাজবাটীর অভিমুখে যাত্রা করিল। যাইবার সময় সে গিরিবালাকে কোন কথাই বলিল না, তাহার কোন সংবাদও লইল না।

রাজবাটী পৌঁছিয়া, সাহসে ভর করিয়া সে দ্বারের নিকট উপস্থিত হইল, এবং অতি কষ্টে সে খবর পাঠাইল। প্রথমতঃ নীলরতন চৌধুরী আসিয়া তাহার সাহত সাক্ষাৎ করিলেন। সে রাজার সহিত সাক্ষাতের প্রার্থনা করিলে নীলরতন বলিলেন তাহার প্রয়োজন কি জানিতে পারিলে তিনি রাজার সহিত তাহার দেখা করাইয়া দিবেন। তখন হারাধন তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থার বর্ণনা করিয়া, গচ্ছিত জিনিষপত্র রাজার নিকট হইতে ফেরত চাহিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। নীলরতন তাহাকে সঙ্গে করিয়া রাজার সম্মুখে লইয়া গেলেন।

রাজা তাহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা-ঘটিত সকল সংবাদ জ্ঞাত হইলেন। কন্যা তরঙ্গিণী তাহার সহিত যে ব্যবহার করিয়াছে, তাহাও রাজা শুনিলেন। সমস্ত কথা শুনিয়া, রাজা বলিলেন,—"তুমি যাও, আমার লোক এখনই তোমার বাসায় যাইবে এবং তোমার আপাততঃ যে সকল সামগ্রীর দরকার তাহা সংগ্রহ করিয়া দিয়া আসিবে; এজন্ত তোমার কোন চিন্তা নাই। তাহাতে যে ব্যয় হইবে, তাহা আমি করিব। তুমি এত দিন আমার কাছে আইস নাই কেন?"

হারাধন রাজার এইরূপ সদয় ভাব দেখিয়া বড় আশ্বাস পাইল। বলিল,—"আসিয়াছিলাম, দেখা করিয়া উঠিতে পারি নাই। ভাবিয়াছিলাম, তরঙ্গিণী অবশ্যই কিছু সাহায্য করিবে, আপনাকে ত্যক্ত করিতে হইবে না। কিন্তু সে আমার সহিত যতদূর সম্ভব অভদ্র ব্যবহার করিয়াছে। এখন নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই আপনার নিকট আসিয়াছি।"

তাহার পর হারাধন ধীরে ধীরে জিনিষপত্রের কথা উত্থাপন করিল এবং সেগুলা ফেরত চাহিল। তাহার কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন,—"তোমার জিনিষ যেমন তেমনই আছে। আমি তাহার একখানিও নষ্ট করি নাই, ব্যবহার করি নাই, কাহাকেও দিই নাই। কিন্তু হারাধন, আমিও জানি, তুমিও জান, সেগুলি তোমার নহে—পরের। পরের জিনিষ তুমি লইয়া যাইতে কেন ইচ্ছা করিতেছ? তোমার হাতে পড়িলেই তাহা নষ্ট হইবে। যাহার জিনিষ তাহাকে যদি কখন এগুলা ফিরাইয়া দিতে হয়, তাহা হইলে নষ্ট হওয়ার পর আর সে উপায় থাকিবে না। কেন তুমি পরের জিনিষ—চুরি করা সামগ্রী ফেরত লইয়া নষ্ট করিতে চাহিতেছ?"

হারাধন বলিল,—"চুরি করাই হউক, আর যাহাই হউক, আমার বড় অসময়। আমি সেগুলা আপনার নিকট রাখিয়াছি, আপনার নিকট ফেরত চাহিতেছি। সেগুলা দিতেই হইবে।"

রাজা হাসিয়া বলিলেন,—"শুন হারাধন, আমি তোমাকে সেগুলা কোন মতেই ফেরত

দিব না; আমি নিজেও তাহা ব্যবহার বা বিক্রয়, বা অপর কাহাকেও দান করিব না। যাহার জিনিব তাহাকে যদি কখন দিবার দরকার হয় তবে দিব। তোমাকে কদাপি দিব না। তুমি যদি এ সম্বন্ধে পীড়াপীড়ি কর, তাহা হইলে পুলিশ ডাকাইয়া এখনই তোমাকে চোর বলিয়া ধরাইয়া দিব। তোমার উপস্থিত দুঃসময়ে যে কিছু সাহায্য আবশ্যক, তাহা তুমি এখনই পাইবে। সেজন্য কিছু চিন্তা নাই। তুমি বাটী যাও।"

হারাধন আর কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। সে কিয়ৎকাল অধোমুখে অপেক্ষা করিয়া রাজাকে প্রণাম করিল, এবং নীরবে প্রস্থান করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ফিরিয়া আসিবার সময় হতভাগা হারাধন আবার তরঙ্গিণীর ভবনদ্বারে আসিল। দেখিল, কতকগুলা মুটিয়ায় তরঙ্গিণীর বাটী হইতে বাক্স, তোরঙ্গ, সিন্দুক প্রভৃতি বিস্তর সামগ্রী বাহির করিতেছে। নীলরতন চৌধুরী মহাশয়ের সহিত পরামর্শ অনুসারে, তরঙ্গিণী অস্থাবর দ্রব্য-সামগ্রী রাজবাটীতে পাঠাইতেছে। হারাধন এসকল কাণ্ডের কিছুই জানিত না; সুতরাং বিস্ময়াবিষ্ট হইল; ভাবিল, তরঙ্গিণী হয় তো এস্থান ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে উঠিয়া যাইতেছে, তাহা সে স্থির করিতে পারিল না। তখন মুটিয়া ও অন্যান্য লোকের নিকট সন্ধান করিয়া সে বুঝিল, তরঙ্গিণী জিনিষপত্র রাজবাটীতে পাঠাইতেছে। কেন?—সে কি অতঃপর রাজবাটীতেই বাস করিবে? এ প্রশ্নের কোন মীমাংসা হারাধন করিতে পারিল না। হতভাগা হারাধন চীৎকার করিয়া গিরিবালার অবস্থা ও আপনাদের দৈন্যদশার কথা তরঙ্গিণীকে জানাইল, এবং সকাতরে অন্ততঃ দুই চারি আনা পয়সা ভিক্ষা করিল। কোন সাহায্যই সে পাইল না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের অপেক্ষাও অধিকতর অপমানিত হইয়া অভাগাকে বাটী ফিরিতে হইল। আসিবার সময় সে আবার বলিয়া আসিল,—"আচ্ছা।"

গৃহে আসিয়া হারাধন দেখিল, বিপদ আরও গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে—গিরিবালা অসময়ে অষ্টম মাসের শেষে এক পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছে এবং সে নিজে মরণাপন্ন হইয়াছে। হারাধন ভগ্নীর নিকটস্থ হইল এবং বারবার তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল, কিন্তু কোন উত্তর পাইল না। গিরিবালা তখন সংজ্ঞাহীনা। মনে করিল,—"এই অবস্থায় ভগ্নী আমার পুত্র-রত্ন প্রসব করিয়া কুল উজ্জ্বল করিয়াছেন দেখিতেছি, কিন্তু এজন্য আমি আর করিব কি? করিতে সামর্থ্যই বা আমার কি আছে? যে অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে বড় বেশী ভাবনা ভাবিতে হইবে, এমন বোধ হয় না। ভগবানই শীঘ্র সকল কাজ সুবিধা করিয়া দিবেন। এরূপে আর খানিক ক্ষণ থাকিলে, মা ও ছেলেকে অতিশয় পবিত্র দেখিয়া তিনি শীঘ্র আপনার কাছে ডাকিয়া লইবেন। কিন্তু কেন? গিরিবালা কি তরঙ্গিণীর চেয়ে বেশী পাপী? তরঙ্গিণীর সুখের উপর সুখ, আর আমার ভগ্নীর এই কষ্টে মরণ! ভগবানের রাজ্যে কি এমন অবিচার!"

হারাধন আবার ভগ্নীকে ডাকিল, নাম ধরিয়া অনেক ডাকিল। গিরিবালা উত্তর দিল না। তখনও সে অজ্ঞান। হারাধন তাহার পর ভাগিনেয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল, সেই সোঁতা মাটির উপর এক সুরূপ শিশু পড়িয়া মুখে হাত চুষিতেছে। সে কিয়ৎকাল নিশ্চেষ্টভাবে সেই সুকুমার শিশুকে দর্শন করিল। তাহার পর বলিল,—"ভগবান, আমার ভগ্নী যদি অপরাধী হয়, এ সোণার পুতুলী কোন্ পাপে পাপী? ইহাকে এত কষ্ট দিবার আয়োজন কেন করিলে, নারায়ণ?"

স্নেহহীন, হৃদয়হীন, বর্ব্বরের হৃদয়ের কোন্ কোণে হয় তো একটু কোমল প্রবৃত্তি চাপা পড়িয়াছিল। সেই প্রবৃত্তিটুকু এখন বড় সতেজ হইয়া উঠিল। যাহা হইবার নহে, তাহাও হইল—হারাধনের চক্ষুতে জল দেখা দিল।

এই সময়ে গিরিবালা সংজ্ঞালাভ করিয়া বলিয়া উঠিল,—"দাদা আসিয়াছ কি? কোথায় তুমি? আমার আর দেরী নাই, মরণ উপস্থিত। আর তোমায় গলগ্রহ থাকিয়া আমি তোমাকে কষ্ট দিব না। কিন্তু দাদা, তোমার পায়ে ধরিয়া বলিতেছি, আমার এই সন্তানটিকে তুমি যত্ন করিও। পাপের ফল হইলেও, ও নিজে কোন পাপের পাপী নহে। উহাকে যদি বাঁচাইতে পার, তাহার চেষ্টা করিও। আমার যাহা অদৃষ্টে ছিল, হইল। তুমি উহাকে দয়া করিও।"

হারাধন বলিল,—"আমার যত কষ্ট হয়, হউক; তোমার ছেলে কোন কষ্ট পাইবে না। যেমন করিয়া হউক, উহাকে আমি বাঁচাইয়া রাখিব—উহাকে সুখে রাখিব। কিন্তু গিরিবালা, তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইবে কেন? আমি আর কখন তোমার সহিত ঝগড়া করিব না।"

গিরিবালা বলিল,—"আমার যে অবস্থা হইয়াছে, তাহা হইতে কেহ কখন বাঁচে না। তুমি আমার ছেলেটিকে দয়া করিবে জানিয়া, মরিতে আর দুঃখ নাই। আমি বড় পাপী। মাকে বলিও, আমার জন্য যেন না কাঁদেন। আমার পাপজীবন ফুরাইল। আমাকে ভগবান বড় দণ্ড দিবেন। তুমি আমাকে ক্ষমা করিও।"

আর কথা গিরিবালা বলিল না। সে তখনই মুখ বড় বিকৃত করিল। তাহার শেষ নিশ্বাস বাহির হইয়া গেল। অসময়ে অতি কষ্টে গিরিবালার মৃত্যু হইল।

হারাধন নীরবে দাঁড়াইয়া সহোদরার শেষ অবস্থা প্রত্যক্ষ করিল। তাহার পর তাহার শেষজীবনের যাবতীয় কষ্টের কথা একে একে স্মরণ করিল। তাহাকে স্বয়ং যত মন্দ কথা বলিয়াছে ও তাহার সহিত যত দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছে, তৎসমস্ত আলোচনা করিল। তাহার পর বলিল,—"তরঙ্গিণী, তোমারই জন্য আমার এই সহোদরা এই নবীন বয়সে প্রাণ হারাইল! তোমারই পরামর্শে তাহাকে গৃহাশ্রয় হইতে আনিয়াছি, তোমারই পরামর্শে তাহার চুরি জিনিষ রাজার নিকট গচ্ছিত করিয়াছি, তোমারই কুহকে পড়িয়া কালিদাসের লাঠি খাইয়াছি; শেষ জিনিষ পত্র যাহা ছিল, তাহাও পড়িয়া পড়িয়া নষ্ট করিয়াছি। তোমার নিকট অনাহারে কাতর হইয়া দুই চারি আনা পয়সা ভিক্ষা চাহিয়াছি, তুমি তাহাও দাও নাই; যাহাদের এমন সর্ব্বনাশ করিয়াছ, তাহাদের একটা খবরও লও নাই, ভিক্ষুকের মত দ্বারে উপস্থিত হইলেও, মারিয়া তাড়াইয়া দিয়াছ। জগদীশ্বর! এই মরা বহিন সম্মুখে, এই কষ্ট চারিদিকে, সৎকার করিবার উপায় নাই, আর ঐ

সোণার ছেলে মাটীতে পড়িয়া, নাড়ী পর্য্যন্ত কাটা হয় নাই। যে এ সকল কষ্টের মূল, তাহার সমুচিত শাস্তি দিতে পারিব না কি? পারিব, পারিব, পারিব।"

তাহার পর সে, নেত্র-নিঃসৃত দুই ফোটা জল সরাইয়া, ভাগিনেয়ের নিকটস্থ হইল এবং তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল।

এই সময়ে দুইটি স্ত্রীলোক ও পাঁচ জন পুরুষ সেই কুটিরে প্রবেশ করিল। প্রথমাগতা রমণীর রূপরাশিতে সেই ঘর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাঁহার পরিধান অতি শুভ্র লালপেড়ে সাটী, হাতে শাঁখা, সীমন্তে সুস্থূল সিন্দুর রেখা, বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপ সমাচ্ছাদিত। এই দেবীকে আমরা আর একবার দেখিয়াছি। হরিদাসের বাটীতে যে দেবী তাহার পীড়িত পুত্রের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, ইনিই সেই মা লক্ষ্মী। মা-লক্ষ্মীর সঙ্গিনী এক ধাত্রী। তাঁহার হস্তে এক প্রকাণ্ড পুঁটুলি।

হারাধন এই রূপরাশিসম্পন্না রমণীকে দেখিয়া অবাক্ হইল। জিজ্ঞাসিল,—"মা, আমাদের এই দারুণ বিপত্তিকালে কে আসিলে তুমি? তুমি কি দেবতা?"

মা লক্ষ্মী মধুর স্বরে বলিলেন,—"তুমি যা, আমিও তাই বাবা।"

ধাত্রী বলিল,—"উনি মা লক্ষ্মী।"

মা লক্ষ্মী বলিলেন,—"বিপদ আপদ সংসারের সকলেরই হয়, সে জন্য ভাবিতেছ কেন বাবা?"

এই বলিয়া সেই সুন্দরী হারাধনের নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—"দেও, আমার কোলে ছেলে দেও। তুমি পুরুষ, ছেলের যত্ন তুমি কি জান?"

হারাধনের কোল হইতে পুত্র লইয়া সেই তথায় উপবেশন করিলেন। ধাত্রী পুঁটুলির মধ্য হইতে যন্ত্রাদি বাহির করিয়া, তাহার নাড়ী কাটিয়া দিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দিল এবং তৎকালে তাহার জন্য যাহা যাহা আবশ্যক, সমস্তই সে সম্পন্ন করিল।

মা লক্ষ্মী বলিলেন,—"হারাধন, তোমার ভাগনেকে আমি লইয়া যাইব। আমি ইহাকে পরম যত্নে রাখিব, লালন-পালন করিব, তোমার যখন ইচ্ছা তুমি গিয়া দেখিয়া আসিবে।"

হারাধন বলিল,—"মা লক্ষ্মী, আপনার দয়ার সীমা নাই। আমি এই ছেলে লইয়া কি করিব ভাবিয়াই আকুল হইতেছিলাম। মা, আমার এ ভাগনে বাঁচিবে কি? এ যে বড় অসময়ে জন্মিয়াছে।"

মা লক্ষ্মী বলিলেন,—"অবশ্য বাঁচিবে! তুমি জেঠা গোপীনাথের নিকট প্রার্থনা করিও। তিনি অবশ্যই তোমার ভাগিনেয়কে বাঁচাইয়া রাখিবেন।"

হারাধন ভক্তিভাবে জেঠা গোপীনাথের উদ্দেশে ভাগিনের স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া, অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিল। জীবনে এরূপ কার্য্য সে আর কখন করে নাই। তাহার হৃদয় বড় প্রশান্ত হইল, সে যেন নিশ্চিন্ত হইল, তাহার হাত-পা যেন খোলসা হইয়া গেল। মা লক্ষ্মী বলিলেন,—"হারাধন, জন্মিলেই কোন না কোন দিন মরিতে হয়। তোমার ভগ্নীর মৃত্যু হইয়াছে। মরণান্তে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা এখন করিতে হইবে। আমার সঙ্গের এই লোকেরা শব গঙ্গাতীরে লইয়া যাইতেছে। তুমি উহাদের সঙ্গে গিয়া যথা-নিয়মে সৎকার করিয়া আইস।"

হারাধন বলিল,—"মা আমি বড় গরিব। তাহাতে কিছু ব্যয় হইবে। কেমন করিয়া আমি খরচ করিব?"

মা লক্ষ্মী বলিলেন,—"সে জন্ত তোমার কোন ভাবনা নাই। দাদা, হারাধনকে পাঁচটি টাকা দেও। তোমরা সকলে উদ্যোগী হইয়া মড়া চালান কর। বিলম্ব করিও না। ঐ টাকা লইয়া এখানকার কাজ শেষ করিয়া আইস। পরের ব্যবস্থা পরে হইবে।"

এক ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া হারাধনের হস্তে পাঁচটি টাকা দিল। এ লোকটা আমাদের চেনা নয় কি? এ সেই যদু হালদার নয় কি! হাঁ—এ সেই কৃষ্ণনগরের মূর্খ দোকানদার যদু হালদারই বটে। তখনই বাঁশের খাট আসিল। গিরিবালার শবদেহ তাহাতে স্থাপিত হইল এবং হরিধ্বনি করিতে করিতে সকলে তাহা গঙ্গাতীরাভিমুখে লইয়া চলিল। অধোমুখে হারাধন পশ্চাতে চলিল।

গঙ্গাতীরে চিতার অগ্নিতে গিরিবালার পাপ-কায়া ভস্মীভূত হইয়া গেল। তাহার সকল ভাবনা, সকল দুষ্প্রবৃত্তি, চিরদিনের মত শেষ হইয়া গেল। তাহার দেহ ভস্মাবশেষে পরিণত হইলে, হারাধন দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"যাহার জন্ত, যাহার কুপরামর্শে, যাহার নিষ্ঠুরতায় আমার এই সহোদরা প্রাণ হারাইল, তাহাকে অবশ্যই ইহার প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে।"

চিতা নির্ব্বাপিত হইল। শব-বাহকেরা চলিয়া গেল। যদু হালদার হারাধনের নিকটস্থ হইয়া বলিল,—"লক্ষ্মী মহাশয় এখন কোথায় যাইবেন? আপনার মা ঠাকুরাণী ও স্ত্রীপুত্র ভাল আছেন। আপনি তাঁহাদের কাছে যাইবেন কি?"

হারাধন বলিল,—"না, তাঁহাদিগকে এ মুখ আমি আর দেখাইব না। আমার ভাগিনেয় কোথায় থাকিবে? আমি কেবল সময়ে সময়ে তাহাকে দেখিতে চাহি। মা লক্ষ্মী কোথায় থাকেন?"

যদু বলিল,—"জেঠা গোপীনাথের বাটীতে সন্ধান করিলেই আপনি মা লক্ষ্মীর তত্ত্ব পাইবেন। যখন ইচ্ছা হইবে, তখনই আপনি ভাগিনেয়কে দেখিয়া আসিবেন। এখন আপনার হাতে খরচ-পত্র আছে?"

হারাধন বলিল,—"আমার হাতে দেড় টাকা আছে। ইহাই যথেষ্ট। আমি ভিক্ষা করিয়া খাইব, কি মারা পড়িব, কি ফাটকে যাইব, কি ফাঁসিতে ঝুলিব, তাহার ঠিক নাই। সুতরাং খরচ-পত্র অনাবশ্যক। যদি আমি বাঁচিয়া থাকি, তবে মা লক্ষ্মীর চরণে অবশ্যই প্রণাম করিতে যাইব। আমি তাঁহার দাস। আপনারা আমার ভাগিনেয়ের প্রতি দয়া করিবেন। মা লক্ষ্মীর চরণে কোটী কোটী প্রণাম।"

কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া হারাধন চলিয়া গেল। যদু হালদার তাহার অবস্থা দেখিয়া একটু ভীত হইল।

পঞ্চম খণ্ড।

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥"

অর্থ।—সকল ভূতের যাহা রাত্রি, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি তথায় জাগ্রৎ। যথায় ভূতসমূহ জাগিয়া থাকেন, মুনিগণ তথায় রাত্রি দেখেন।

তাৎপর্য্য।—অবিবেকী মানবগণ জ্ঞানোন্নতির অভাববশতঃ তত্ত্ব-বিষয়ক ব্যাপারসমূহ নিশার ন্যায় অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে করে, এবং মায়া-ঘনাচ্ছন্ন বিষয়-ব্যাপার-সমূহ প্রকৃত

মনে করিয়া তাহার উপভোগে ব্যাপৃত হয়। মুনি অর্থাৎ মায়া বিহীন মানবগণ বিষয়-ব্যাপার রাত্রিবৎ জ্ঞান করিয়া তত্ত্বালোচনায় নিবিষ্টচিত্ত থাকেন।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ২য় অধ্যায় ৬৯ শ্লোক। শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তি)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শান্তিপুরের শ্যামবাজারে অদ্বৈত ঘোষের বাড়ী। বাড়ীখানি সামান্য; দুইটী ইটের কুটরী এবং একখানি খড়ের ঘর মাত্র। বাড়ী প্রাচীর-ঘেরা।

বেলা ১১টার সময় অদ্বৈত গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ী ফিরিল। বস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া সে সর্ব্বাঙ্গে আঁকাইয়া তিলক সেবা করিল। গোপীচন্দনের অলকাতিলকায় সে দেহের যথাস্থান-সমূহ, সযত্নে সমাচ্ছন্ন করিল। তাহার পর হরিনামের ঝোলার মধ্যে হাত দিয়া সে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। কিন্তু বাস্তবিকই হরিনাম করিতে লাগিল, কি খাতকদিগের নিকট প্রাপ্য সুদের হিসাব করিতে থাকিল, তাহা, যাঁহার নামের সে মালা, তিনি ভিন্ন আর কেহই বলিতে পারেন না। অদ্বৈতের মালাজপা যখন চলিতেছে, সেই সময়ে তাহার গৃহিণী, একটি পাথরের বাটীতে কতকগুলি ভিজা ছোলা ও একটী সন্দেশ এবং এক ঘটী জল দিয়া গেল। অদ্বৈত ছোলা ও গুড় খাইয়া থাকে, সন্দেশ কোনও দিন খায় না। সুতরাং আজি এ অপব্যয় দেখিয়া গৃহিণীর উপর বড় চটিয়া উঠিল। বলিল,—"একি! সন্দেশ খাওয়াইয়া আমাকে ডুবাইতে বসিয়াছ নাকি! সন্দেশ কিনিয়া আনিলে, এ তোমার কোন্‌দেশী আক্কেল, গৃহিণী?"

গৃহিণী অনঙ্গমঞ্জরী বড় ঝাঁঝাল-স্বরে জবাব দিল,—"মর পোড়ারমুখো! তোমাকে ডুবাইয়া আমার বড় লাভ হইবে কি না? তুমি ঘাটের মরা, বাহাত্তুরে বুড়ো, যমের অরুচি, এখনও সিকি পয়সা খরচ করিতে হইলে চক্ষু দিয়া প্রাণ বাহির হয়। আমার যেমন পোড়া কপাল, তাই ওকে দিয়েছি সন্দেশ খেতে। সন্দেশটা খেতে মুখে ঝাল লাগে, না হয় রেখে দে'। পয়সা কি তোমার সঙ্গে যাবে হতভাগা?"

এত তীব্র গালাগালির কোনই উত্তর অদ্বৈত দিল না,—একটুও রাগ করিল না বরং যতদূর সম্ভব-যত্নে একটু মিষ্ট হাসি হাসিয়া বলিল,—"পাগলী, পয়সা আমার সঙ্গে যাউক না যাউক, যার জন্যে আমার দিনরাত্রি ভাবনা, তার কাজে লাগিবে; আমি বুড়া বলিয়াই তো তোমার জন্যে পয়সা বাঁচাইয়া রাখিতে আমার এত যত্ন। তোমার চিরকাল সমস্তই পড়িয়া রহিয়াছে, আমি তো আর চির-দিনের পাট্টা লইয়া আসি নাই। পয়সা না থাকিলে, তাহার পর তোমার কি দশা হইবে?

অনঙ্গ বলিল,—"আমার জন্য এত ভাবনায় কাজ নাই। মরার পর আমার সুখের ব্যবস্থা না করিয়া শীঘ্র শীঘ্র মরিয়া আমার হাড়ে একটু বাতাস লাগিতে দেও দেখি। আমার যেমন পোড়া কপাল তাই এমন হতভাগা বুড়ার হাতে পড়িয়া প্রাণটা গেল!"

অদ্বৈত এ কথায় কোন জবাব না দিয়া বলিল,—"সন্দেশ কিনিলে কেন? এমন করিয়া অপব্যয় করা কি ভাল? তুমি ছেলে মানুষ, পয়সার মায়া তোমার নাই, তোমার জন্য আমার বড় ভাবনা।"

অনঙ্গ বলিল—"ভয় নাই, সন্দেশ কিনিয়া আনি নাই। তুমি যেমন অনামুখো অযাত্রা, সংসারের কেহ যেমন তোমার মুখ দেখিতে চাহে না, আমার তো আর তেমন নয়; যে যেখানে আপনার লোক আছে, সকলেই তোমার পর, কেবল টাকা-পয়সাই তোমার আপন। কেহই তোমার খোঁজ-খবর লয় না, তোমাকে আপনার লোক বলিয়া মনেও করে না। আমার পাঁচদিকে পাঁচটা আপনার লোক আছে, আমার জন্ত তারা ভাবিয়া থাকে। আমার সেজো খুড়া সন্দেশ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তোমার পয়সা দিয়া কেনা হয় নাই।"

এতক্ষণে অদ্বৈত একটু সুস্থ হইল। বলিল,—"বটে? পাঠাইয়া দিয়াছেন? কত সন্দেশ? চারি পাঁচ সের হইতে পারে? কৈ কোথায় আছে দেখি! তা অত সন্দেশ আমাদের ঘরে নাহাক রাখিয়া কি দরকার? তোমার জন্ত দুইটা রাখ। আমাকে যেটা দিয়াছ, সেটাও তোমার জন্ত থাক্! বাকী সন্দেশ আমাকে দেও, আমি নবা ময়রার দোকানে দিয়া আসি।

অনঙ্গ এ কথা শুনিয়া বড়ই রাগিয়া উঠিল। বলিল,—"পোড়া কপাল তোমার, মুখে আগুন তোমার। হতভাগা মিন্সে, আমার খুড়া পাঠাইয়াছেন সন্দেশ, তাই উনি বেচিয়া পয়সা করিবেন! গলায় দড়ি জুটে না তোমার! যম তোমায় ভুলিয়াছে নাকি?"

অদ্বৈত বলিল,—"রাগ কর কেন? রাগের কথা কি হইল? মন্দ কথাটা কি বলিয়াছি? পচাইয়া পাঁচদিন ধরিয়া কতকগুলা সন্দেশ খাইয়া অসুখ করার চেয়ে, বেচিয়া পয়সা করা কি মন্দ পরামর্শ? কোথায় সন্দেশ, দেখাও আমাকে! যদি পাঁচ সের হয়, তা'হলে অন্ততঃ একটা টাকার কাজ হবে এখন। চল, সন্দেশ দেখি, চল—চল। তুমি ছেলে মানুষ না বুঝিয়া রাগ কর। এ বুড়া পাকা কথা ছাড়া কয় না।"

অনঙ্গ বলিল,—"দাঁড়াও হতভাগা; সন্দেশ দেখাই তোমাকে। মুড়া ঝাঁটাগাছটা কোথায় গেল? খ্যাংরা দিয়া তোমার মুখ না ছিঁড়িয়া দিই তো আমার নাম মিথ্যা!"

অনঙ্গ চলিয়া গেল এবং অবিলম্বে ঝাঁটা-হস্তে রণরঙ্গিণী বেশে তথায় আগমন করিল। তাহাকে দর্শনমাত্র অদ্বৈত বলিল,—"সত্য সত্যই ঝাঁটা লইয়া আসিলে যে। আমি বলি তুমি সন্দেশ আনিতে গেলে। তা যা হউক, এখন তামাসা রাখ। ঝাঁটা ফেলিয়া দিয়া সন্দেশ আন; আমি নবা ময়রার দোকান হইতে ঘুরিয়া আসি। আমাকে এখনই রাণা-ঘাট যাইতে হইবে।"

তখন অনঙ্গ বলিল,—"ঝাঁটা ফেলিয়া দিব"—কেমন! এই যে দিই—তোমাকে আগে একটু সাজাইয়া দিই!

এই বলিয়া সে রণ-রঙ্গিণীর ন্যায় ক্রোধে অদ্বৈতের নিকটস্থ হইল, এবং তাহার শ্রীমুখ-চন্দ্রে উপর্য্যুপরি ঝাঁটা প্রহার করিয়া বলিল,—"হতভাগা! রাণাঘাট যাইবেন! একেবারে গঙ্গার ঘাটে যা না কেন! আমার হাড়টা জুড়াক।"

অদ্বৈত মুখে হাত বুলাইতে লাগিল। বুঝিল, দুই এক স্থান ছিঁড়িয়া রক্ত পড়িতেছে। বলিল,—"যা হইবার, হইয়াছে; ঠিক দুপুর বেলা আর ঘরে ঘরে ঝগড়া করিবার দরকার নাই। তা—তা—সন্দেশগুলা তবে কি হবে?"

অনঙ্গ বলিল—"ওরে সর্ব্বনেশে! এখনও সন্দেশগুলা কি হইবে জিজ্ঞাসা করছিস্? সাজানটা ভালরকম হয় নাই! আবার কাঠাল, কিলে কি পাকে!" এই বলিয়া, সেই সম্মার্জ্জনী-

ধৃতকারিণী পতিপ্রেমমুগ্ধা অনঙ্গমঞ্জরী, শ্রীরাম্ অদ্বৈত ঘোষকে তাড়া করিল। দাঁড়াইয়া মারি খাওয়া অবৈধ বোধে, এবার অদ্বৈত পলায়ন করিবে স্থির করিল। তথাপি তাহার প্রণয়িনী আসিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে দুই চারি ঘা ঝাঁটা মারিতে ছাড়িলেন না। অদ্বৈত ছুটিয়া পলায়ন করিল। কিন্তু তাহার পিঠে ঝাঁটার দাগ বেশ ফুলিয়া উঠিল। সুতরাং এই সমর-প্রত্যাগত বীরের, মধুসূদন বর্ণিত দূতের ন্যায়, 'পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা' এ—গর্বোক্তি করিবার উপায় থাকিল না।

অদ্বৈত পলায়ন করিলে, অনঙ্গ বাটীর দরজা বন্ধ করিয়া আসিল। তাহার পর ঝাঁটা ফেলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। রাগ ও শ্রমে সেই সুন্দরীকে এখন বড়ই সুন্দর দেখাইতে লাগিল। বাস্তবিক অনঙ্গ-মঞ্জরী পরমা সুন্দরী। তাহার অঙ্গের গঠন, দেহের বর্ণ, কেশের বাহুল্য, লোচনের বিস্তার সকলই [illegible] সৌন্দর্য্যের পরিচায়ক। মঞ্জরী এখন [illegible]পিতৃহীনা। তাহার পিতা, ধনলোভে এই কৃপণ বৃদ্ধের হস্তে কন্যারত্ন সমর্পণ করিয়াছিল। অদ্বৈত তৃতীয়-পক্ষে এই সুন্দরীকে পত্নীস্বরূপে লাভ করিয়াছেন অদ্বৈতের বয়স প্রায় ৬০ বৎসর, আর মঞ্জরী দ্বাবিংশবর্ষীয়া। অসামঞ্জস্য অ ত্যন্ত। মঞ্জরীর স্বভাব চিরদিনই এমন ছিল না। সে এগারো বৎসর বয়সে অদ্বৈতের হাতে পড়িয়াছে। পাঁচ বৎসর সে অদ্বৈতের মতানুবর্তিনী হইয়াই চলিয়াছিল, এবং যাবজ্জীবন চলিবে মনে করিয়াছিল। কিন্তু অদ্বৈতের দুর্ব্যবহার সহ্য করা ক্রমে তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। সে সুন্দরী, যুবতী। অদ্বৈত তাহাকে পেট ভরিয়া ভাত খাইতে দেখিলে মারামারি হয়। তাহাকে নিতান্ত জঘন্য কাপড় ছাড়া পরিতে দেয় না। ভাল করিয়া মাথায় তেল মাখিতে দেয় না। একটু ব্যয় করিবার প্রস্তাব করিলে মারিতে আইসে। এই সকল কারণে স্বামী ও স্ত্রীতে বিবাদ আরম্ভ হয়। প্রথম কথা কাটাকাটি, তাহার পর মারামারিতে আসিয়া দাঁড়ায়। মারামারি আরম্ভ হইলে, অদ্বৈত হারি মানিত। একে বৃদ্ধ, তাহাতে রোগা মানুষ, সে এই যুবতীকে আঁটিতে পারিত না। বিশেষতঃ তাহার একজন বন্ধু বলিয়া দিয়াছিল,—"অদ্বৈত, তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর গায়ে খবরদার হাত তুলিও না। তোমার স্ত্রীর উপর পাড়ার অনেক লোকেরই নজর পড়িয়াছে। অনেকে তোমার ন্যায় বানরের গলা হইতে এ মুক্তার-মালা লুফিয়া লইবার চেষ্টায় আছে। যদি তোমার স্ত্রী একবার বাটীর বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে, অত্যাচার করা দূরে থাকুক, অনেক বাবু তাহাকে বুকে তুলিয়া রাখিবার জন্য উমেদার আছে, জানিবে। সাবধান!" বন্ধুপ্রদত্ত এই উপদেশ-বাক্য অদ্বৈতের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে। সে তাহার পর হইতে মারামারি বাধিলে দাঁড়াইয়া সাত চোরের মারি খাইয়া আসিতেছে, তথাপি সুন্দরীর গায়ে একটি টোকা মারিবার চেষ্টাও করিতেছে না। তাহার পর হইতে সে খাওয়া পরারও কতকটা সুব্যবস্থা করিয়াছে এবং যৎকিঞ্চিৎ পয়সা-কড়িও স্ত্রীর হাতে দিতেছে। অদ্বৈত স্ত্রীকে বাধ্য রাখিবার জন্য এত করিয়াছে, কিন্তু তাহার স্ত্রী যে হাত ছুটাইতেছে, তাহা আর ফিরায় নাই—কথান্তর হইবামাত্র, একটু মতবিরোধ ঘটিবা-মাত্র, ঝাঁটা আনিয়া অদ্বৈতকে উত্তম মধ্যম দিতে ছাড়ে না। অদ্বৈতের বিজাতীয় হৃদয়হীনতা-হেতু মঞ্জরীর ভক্তিশ্রদ্ধা এককালেই তিরোহিত হইয়াছে।

সে তাহাকে কটুবাক্য ও সম্মার্জ্জনী পুরস্কার সততই প্রদান করে।

মারি খাইয়া অদ্বৈত ঘোষ পলায়ন করিল বটে ; কিন্তু অবিলম্বে আবার ফিরিয়া আসিয়া দরজায় ঘা দিতে লাগিল। বারংবার আঘাত করার পর অনঙ্গমঞ্জরী দ্বারের নিকট গমন করিল, এবং ফাঁক দিয়া অদ্বৈতকে দেখিতে পাইয়া, বলিল,—"আবার আসিয়াছ পোড়ার-মুখো? এবার বাড়ীতে ঢুক্‌লে, তোমার গায়ের মাংস টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া তবে ছাড়িব।"

অদ্বৈত বলিল,—"আমি রাণাঘাট যাই-তেছি। যদি দুটা ভাত দিতে, তাহা হইলে খাইয়া যাইতাম। তাই বলিতেছি একবার দরজা খুলিয়া দুটা ভাত দেও না কেন?"

মঞ্জরী বলিল—"তোমাকে ভাত দিবে, না উনানের ছাই দিবে। কেনা দাসী পাইয়াছ কি না, তোমার জন্য ভাত তৈয়ার করিয়া বসিয়া আছি।"

অদ্বৈত বলিল,—"তাই তো ভাত তবে হয় নাই? তাই তো! সারাদিনটা শুধু কাটিয়া যাইবে? হয় তো ফিরিতে অনেক রাত্রি হইবে।"

মঞ্জরী বলিল,—"জন্মের মত যাওনা কেন? না ফিরিলেই তো ভাল হয়।"

অদ্বৈত বলিল,—"তাই বলিতেছিলাম, সারাদিনটা উপবাসে কাটাইতে হইবে। তবে আর উপায় কি? তা, তবে আমি আসি। হরি হে! তোমারই ইচ্ছা। বলি, আমার চাদরখানা চাই। একবার দরজাটা খোল না কেন?"

মঞ্জরী বলিল,—"চাদর আমি দিতেছি। দরজা আমি কখনই খুলিব না।"

মঞ্জরী চাদর আনিয়া প্রাচীরের উপর দিয়া ফেলিয়া দিল। অদ্বৈত বলিল,—"তবে রহিলে তুমি? আমি রাণাঘাট চলিলাম। সাবধানে থাকিও। আমি হয় তো অনেক রাত্রে ফিরিব।"

তাহার গুণবতী গৃহিণী বলিল,—"চুলোয় যাও না কেন, আমাকে তাহা বলিবার দরকার কি? কখন ফিরিবে, সেই ভাবনায় আমি প্রায় অস্থির। ঠাকুর করেন যেন আর না ফের।"

মঞ্জরী, উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, গৃহ-প্রবিষ্টা হইল। অদ্বৈত কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া রাণাঘাট অভিমুখে প্রস্থান করিল।

অদ্বৈত চলিয়া যাওয়ার প্রায় দুই ঘণ্টা পরে, তাহার দরজায় আঘাত-শব্দ হইল। মঞ্জরী তখন ঘরের মধ্যে শুইয়াছিল। শব্দ শুনিবা মাত্র, সে বেগে বাহিরে আসিল, এবং দ্বারসন্নিহিত হইয়া পূর্ব্ববৎ রন্ধ্র দিয়া দর্শন করিল। তৎক্ষণাৎ দরজা খুলিয়া দিল।

তখন 'নমো নারায়ণায়' বলিয়া, এক দণ্ডকমণ্ডলুধারী কেশশ্মশ্রু-গুল্ফ-বিহীন এক যোগী তথায় প্রবেশ করিলেন। মঞ্জরী তাঁহাকে দর্শন-মাত্র বড়ই আনন্দিতা হইল, এবং সাদরে তাঁহাকে আনিয়া গৃহ-মধ্যে আসনে বসাইল।

যোগিবেশধর পুরুষ আসন পরিগ্রহ করিয়া, মঞ্জরীর কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। মঞ্জরী তাঁহাকে অদ্যকার সমস্ত ঘটনা জানাইয়া বলিল,—"প্রভো, আমার উপায় কি হইবে! নীচ-সংসর্গে ও ইতর সহবাসে আমি নিতান্ত মন্দলোক হইয়া পড়িয়াছি! আমি বুঝিতেছি যে, তাহার অপেক্ষা আমারই অপরাধ অধিক। কিন্তু কি করিব ঠাকুর, তাহার কথা আর আমি মোটেই সহিতে পারি না, তাহার ভাল কথাও যেন আমার গায়ে আগুন ছিটাইয়া দেয়। তাহাকে অযথা মারিয়াও আমার সন্তোষ হয় না। তাহাকে অনর্থক গালি দিয়াও আমার মনে হয়, গালাগালি ও তিরস্কার কম

হইল। তাহাকে দেখিলে আমার আপাদ মস্তক জ্বলিয়া যায়। সে যে সামান্ত সুদের জন্ত গরিবের জল খাইবার ভাঙ্গা ঘটিটী পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইয়া আইসে, সে যে এক পয়সার জন্ত অনায়াসে মিথ্যার উপর মিথ্যা বলে, সে যে মানুষের সময়-অসময় বিপদ-আপদ কিছুই না বুঝিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিতে ছাড়ে না, সে যে পয়সা খরচ হইবে বলিয়া পেটে খায় না, পায়ে জুতা দেয় না, মাথায় ছাতা দেয় না, শীতে গায়ে কাপড় দেয় না, এই সকল বিষয় যখন আমার মনে হয়, তখন তাহাকে বাঘ ভালুকের চেয়েও অধম বলিয়া আমার জ্ঞান হয়। তাহার সংসর্গে আমার স্বভাব নিতান্ত মন্দ হইয়া গিয়াছে। আমার কি উপায় হইবে, ঠাকুর? তাহাকে স্বামী ভাবা দূরে থাকুক, তাহার সহিত আলাপ আছে মনে হইলেও, আমার গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছা হয়। আমি কি করিব, ঠাকুর?"

যোগী বলিলেন,—"মঞ্জরী, তোমাকে বলিয়াছিলাম, সমুচিত সময় উপস্থিত হইলে, তোমাকে বিহিত উপদেশ দিব। সময় উপস্থিত হইয়াছে। আজি তোমাকে কর্ত্তব্য পথ দেখাইয়া দিতেছি।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

হরিদাসের পুত্র গোপালের পীড়া সমান ভাবেই চলিতেছে। মা-লক্ষ্মী সমান যত্নে রোগীর শুশ্রূষা করিতেছেন। দুই এক দিন তিনি চলিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু আবার যথা সময়ে আসিয়া, রোগীর পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিয়াছেন। তাহারও যত্নের ত্রুটি নাই। তথাপি সপ্তদশ দিনে রোগের আবার আশঙ্কা বৃদ্ধি হইল। সে দিন ডাক্তার দেখিয়া বলিলেন,—"আজি আর ভরসা নাই। এ অবস্থা হইতে রোগী আর বাঁচিতে দেখা যায় না। আমাদের এত পরিশ্রম, এত উদ্বেগ, এত ব্যয়, সকলই বোধ হয় বৃথা হইল। আজিকার দিন যে কাটে, এমন বোধ হয় না।"

বাটীতে ক্রন্দনের রোল উঠিল। হরিদাসের স্ত্রী ও ভগ্নী ধূলায় পড়িয়া আছড়া-পিছড়ি করিয়া কাঁদিতে লাগিল। পাড়ায় হাহাকার পড়িল। অনেকেই জেঠা গোপীনাথের নিকট মাথা খুঁড়িতে লাগিল। হরিদাস, অধোমুখে, হাতের উপর মাথা রাখিয়া, আমগাছতলায় বসিয়া রহিল, এবং হৃদয়ের সহিত সেই বিপত্তির মধুসূদন জেঠা গোপীনাথকে ডাকিতে লাগিল।

এদিকে যখন এইরূপ অবস্থা, তখন অদ্বৈত সেখানে দেখা দিল। অদ্বৈত এবার একা নহে, তাহার সহিত আদালতের নাজির, দুই জন পেয়াদা, এবং আর দুইটা লোক ছিল। নাজির হরিদাসকে বলিল,—"এখনই তোমাদিগকে এ বাটী ছাড়িয়া উঠিয়া যাইতে হইবে। বাটী নিলামে বিক্রী হইয়া গিয়াছে। তুমি পরের বাড়ীতে বাস করিতেছ। যে বাড়ী কিনিয়াছে, সে তোমাকে থাকিতে দিবে কেন?"

কি সর্ব্বনাশ! এমন বিপদের সময় এই বজ্রাঘাত! হরিদাস চিত্রার্পিত পুত্তলির ন্যায় হা করিয়া নাজিরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ক্রমে একে একে সেখানে অনেক লোক জুটিয়া গেল। ডাক্তারও আসিলেন। তখন হরিদাস নাজিরকে বলিল,—"মহাশয়, আমার বড় বিপদ। আমার ছেলেটি মারা যায়—বড় কঠিন পীড়া—বড় খারাপ অবস্থা। এখান হইতে উঠিয়া আমি কোথায় যাইব? যদিই

যাইতে হয়, এ অবস্থায় আমি কেমন করিয়া যাইব ?"

নাজির বলিল,—"কোথায় যাইবে বা কেমন করিয়া যাইবে তাহা আমি জানি না। আমি সরকারী আমলা; আইন মত কাজ করিতে আমি বাধ্য। তোমাকে উঠিয়া যাইতে হইবে।"

হরিদাস তখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"এ অবস্থায় আমি উঠিব কোথায়? আমার আর স্থান নাই। আমার ছেলে মারা যায়! আপনারা এখন যান আমার বড় বিপদ।"

নাজির বলিল,—"তোমার বাড়ী এই অদ্বৈত ঘোষ নিলামে খরিদ করিয়া খাস-দখলের প্রার্থনা করিয়াছে। তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর হইয়াছে। আমি সেই খাস-দখল দেওয়াইতে আসিয়াছি। তুমি সহজে না উঠিলে, আমি জোর করিয়া, তোমাদিগকে তাড়াইয়া দিব, এবং ইহার বাটীতে ইহাকে দখল দেওয়াইব।"

হরিদাস আবার সেই কথাই বলিল—বাড়ার ভাগ নাজিরের পায়ে হাত দিয়া কাঁদিয়া বলিল,—"আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত। বাড়ী-ঘরের জন্ত আমার আর মায়া নাই—আমার ছেলে আজি মারা যাইতেছে—আর কিছুতেই আমার দরকার নাই। স্বচ্ছন্দে অদ্বৈত দাদা ঘর বাড়ী দখল করুন; আমার সর্ব্বস্ব লইয়া যাউন, কিছুতেই আমার আপত্তি নাই। কিন্তু দুটাদিন আমাকে ক্ষমা করুন। যতক্ষণ আমার ছেলেটা আছে, ততক্ষণ আমাকে এখানে থাকিতে দেন। সে মরিয়া গেলেই আমারও শেষ হইবে। তখন আর কোন কথা কহিব না। আপনি দয়া করিয়া আমাকে দুদিন মাপ করুন। এই ডাক্তার বাবু রহিয়াছেন; আপনি জিজ্ঞাসা করুন, আমার ছেলের কিরূপ অবস্থা।"

যোগীর অবস্থা যে নিতান্ত সঙ্কটাপন্ন, ডাক্তার বাবু তাহা বুঝাইয়া দিলেন, এবং এ অবস্থায় যে সে যোগীকে স্থানান্তর করা অসম্ভব, তাহাও বুঝাইয়া দিলেন। এ সময়ে স্থানান্তরিত করিতে গেলে, ছেলেটী যে তৎক্ষণাৎ মারা যাইবে, তাহাও বলিলেন; এবং যাহা করিতে হয়, আর দুই দিন দেখিয়া করিবার জন্ত নাজিরের হস্ত ধরিয়া অনুরোধ করিলেন।

নাজির বলিল,—"আপনার কথা শুনিয়া আমি বুঝিতেছি, কিছু দিন অপেক্ষা করাই নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাকে কোন কথা বলা অনর্থক। অদ্বৈত ঘোষ সম্মত হইলেই আমি ফিরিয়া যাইতে রাজি আছি। অদ্বৈত যদি দরখাস্ত করে যে—নাজির আসিয়াছিল বটে, কিন্তু উপরোধে পড়িয়া বা টাকা খাইয়া অমনই চলিয়া গিয়াছে, আমার কোন কাজ করে নাই; তাহা হইলে আমার চাকুরি লইয়া গোল বাধিবে। অতএব অদ্বৈতের মত না হইলে আমি স্বয়ং কিছুই করিতে পারিব না। আপনারা অদ্বৈত ঘোষকে স্বীকার করাইতে পারিলেই আমার কোন আপত্তি নাই।"

অদ্বৈত বলিল,—"হরি হে! সকলই তোমার ইচ্ছা। সংসার করিতে হইলে আপদ-বিপদ সকলেরই আছে। সকল রোগশোক বাঁচাইয়া বিষয়-কর্ম্ম করিতে গেলে চলে কি মহাশয়? বেয়ারাম হইয়াছে—কৃষ্ণের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। তা বলিয়া বিষয়কর্ম্ম বন্ধ রাখিবার দরকার কিছুই নাই। আমি যে কত যোগাযোগ করিয়া রাণাঘাট হইতে নাজির মহাশয়কে আনাইলাম আজ কি

যাহাক ফিরিয়া যাইবার জন্য? নাজির মহাশয়, আপনার কাজ আপনি করুন। লোকের কথা শুনিতে হইলে কাজকর্ম্ম চলে না।”

নাজির বলিল,—“দেখুন মহাশয়, আমি কি করিব?”

ডাক্তার বলিলেন,—“অদ্বৈত দাদা, তুমি প্রবীণ ও বিবেচক লোক; বিশেষ তুমি বড় কৃষ্ণভক্ত। এ অসময়ে তুমি যদি দয়া না করিবে, তবে দয়া করিবে কে?”

অদ্বৈত বলিল,—“দয়া কি জান, ডাক্তার বাবু, দয়াধর্ম্ম করিতে হইলে বিষয়-কর্ম্ম হয় না। বিষয়-কর্ম্মে দয়াধর্ম্ম করিতেও নাই। আর আমি গরিব—দয়া করা আমার মত লোকের কাজ, দাদা?”

ডাক্তার বলিলেন,—“এমন কথা বলিও না দাদা। দয়া করা তোমারই কাজ। তুমি দয়া করিলেই হরিদাস রক্ষা পায়। আমরা সকলে তোমাকে অনুরোধ করিতেছি এ বিষয়ে তোমার ক্ষান্ত থাকিতেই হইবে।”

অদ্বৈত বলিল,—“বিলক্ষণ কথা! আমি পয়সা খরচ করিয়া বাড়ী খরিদ করিলাম, দখল লইবার জন্য থাণাঘাট হইতে পেয়াদা আনিলাম নাজির আনিলাম। এখন গাঁ শুদ্ধ লোক অনুরোধ করিতেছেন, ক্ষান্ত থাকিতেই হইবে। যখন হরিদাস টাকা ধার করিয়াছিল, যখন তাগাদা করিতে করিতে আমার পায়ের সুতা ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, যখন নালিশ করিবার জন্য রাণাঘাট আর ঘর করিতে হইয়াছিল, যখন খরচের উপর খরচ করিয়া আমার খরচান্ত হইয়াছিল, তখন তোমরা কোথায় ছিলে বাবু? তখন কেহ দয়া করিয়া হরিদাসকে আমার হইয়া দুইটা অনুরোধ করিতে পার নাই, তখন গরিবের টাকাগুলা যাহাতে আদায় হয় তাহার কেহ উপায় করিতে পার নাই? আজি সব পরম ধার্ম্মিক দয়ার-সাগরেরা আমাকে ক্ষান্ত হইতে অনুরোধ করিতে আসিয়াছেন। না বাপু, সে সব হইবে না, আমি বিষয়কর্ম্মে কাহারও অনুরোধ শুনি না। নাজির বাবু, আপনি আপনার কাজ করুন।”

নাজির বলিল,—“মহাশয়েরা আমাকে দোষী করিবেন না। পেয়াদা ইহাদের ঘর হইতে জিনিষপত্র বাহির করিয়া ফেল।”

তখন গ্রামের আর একটী প্রবীণ লোক অদ্বৈতের হাত ধরিয়া বলিল,—“এমন কাজ করিও না দাদা, ইহাতে তোমার ভাল হইবে না। তুমি আমার কথা শুন। নাজির আর পেয়াদা আনিতে যাহা তোমার খরচ হইয়াছে, তাহা আমরা তোমাকে দিতেছি, তুমি এ কাজে ক্ষান্ত হও।”

অদ্বৈত বলিল,—“কি মজার কথা! আজি তোমার কথায় ক্ষান্ত হই, কালি আর একজনের কথায় ক্ষান্ত হই, ইহাই করিয়া আমি বেড়াই, কেমন? তোমাদের আপ্যায়িতে আমার শরীর জল হইয়া গেল। নাজির মহাশয়, এ সকল ভুয়া গোল শুনিতে গেলে কাজ চলিবে না। আপনি যাহা করিতে আসিয়াছেন শীঘ্র তাহা শেষ করিয়া ফেলুন।”

নাজির পেয়াদাদের লক্ষ্য করিয়া বলিল,—“তোরা কি দেখিতেছিস্—হাঁ করিয়া? যা না, শীঘ্র কাজ সারিয়া ফেল।”

সর্ব্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া সকলেই অধোমুখে চিন্তিত। পেয়াদারা হরিদাসের ঘরের দাওয়ায় উঠিল। ডাক্তার রোগীকে ধরাধরি করিয়া একজন প্রতিবেশীর চণ্ডীমণ্ডপে লইয়া যাইবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। সকলেই হায় হায় করিতে লাগিল।

এই সময়ে, পার্শ্বস্থ বনের পার্শ্বদেশ হইতে একটী ভদ্র বেশধারী বৃদ্ধ পুরুষ সেই স্থানে

উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধের বুক জুড়িয়া ধপধপে শাদা দাড়ি, মস্তকে শাদা চুলের রাশি, বর্ণ সুগৌর। বৃদ্ধ দুর্ব্বল বা কাতর নহেন। যুবার ন্যায় তাঁহার শরীর সমুন্নত, গতি ক্ষিপ্র, দন্তরাজি শোভাময়, নয়ন জ্যোতিষ্মান ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সতেজ। এই অপরিচিত বৃদ্ধকে দর্শন করিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। বৃদ্ধ সেই জনতার মধ্যবর্ত্তী হইয়া আদেশব্যঞ্জক ও প্রভুতা বিজ্ঞাপক স্বরে,—বলিলেন কেও হরিদাসের ঘরে উঠিতে যাইতেছ? কে তোমরা? আমি বারণ করিতেছি, এমন কাজ খবরদার করিও না। নামিয়া আইস; যদি ভাল চাও, তবে এখনই নামিয়া আইস।"

পেয়াদারা একটা কথাও বলিতে সাহস করিল না। তাহারা নামিয়া আসিয়া দাঁড়াইল এবং ভীতভাবে এই বর্ষীয়ান্ আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নাজিরও পেয়াদাদের কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। সে একটু চিন্তা করিয়া বলিল,—"মহাশয় কে, তাহা জানি না। কিন্তু আপনি যেই হউন, সরকারি কাজে বাধা দিতে আপনার কোনই অধিকার নাই।

বৃদ্ধ বলিলেন,—"সরকারী কাজের কলঙ্ক করিও না। তুমি মূর্খ, নিতান্ত হৃদয়হীন লোক; তাই সময় অসময় বিবেচনা না করিয়া দায়-অদায় না বুঝিয়া, এইরূপে সরকারি কাজ চালাইতে আসিয়াছ। এরূপ অসময়ে চক্ষের জল না ফেলিয়া যে সরকারি কাজ চালাইয়া লোকের সর্ব্বনাশ করিতে পারে, সে ডাকাইতের অপেক্ষা অধম লোক। তোমার মত অধম আমলার জন্যই রাজার প্রতি প্রজার অশ্রদ্ধা হয় এবং রাজার কলঙ্ক হয়। এমন অবস্থায় প্রজার প্রতি অত্যাচার করিলে কোন রাজাই সন্তুষ্ট হন না। আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি এখনই তোমার দলবল লইয়া প্রস্থান কর। তোমার সরকারি কাজ আর এক সময়ে আসিয়া সম্পন্ন করিও।"

নাজির বলিল,—আমার তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু কি করিব আমি—খরিদদার এখনই দখল না লইয়া ছাড়ে না যে।"

বৃদ্ধ, অদ্বৈতের দিকে ফিরিয়া, বলিলেন,—"কেন হে বাপু অদ্বৈত ঘোষ, আর দুই দিন অপেক্ষা করিলে কি তোমার কৃষ্ণ-নামে কলঙ্ক হইবে নাকি? যাও, এখান হইতে দূর হও ভণ্ড। আজি এ বাড়ী দখল করা কোন মতেই হইবে না।"

বৃদ্ধের ভাবভঙ্গী, তাঁহার বাক্যের তেজ, তাঁহার নির্ভীকতা ইত্যাদি আলোচনা করিয়া, অদ্বৈত ভীত হইল। কিন্তু ভয় করিলে বিষয়-কর্ম্ম চলে না, এ সুনীতি স্মরণ করিয়া, সে বলিল,—"আপনি যেই হউন মহাশয়, আপনার কথাটা বড় অন্যায় হইতেছে। আমি টাকা পাইব, টাকা দিয়া বাড়ী খরিদ করিয়াছি অথচ আমি দখল করিতে পাইব না। আমার টাকাগুলা মাটী হইয়া যাইবে, ইহা আপনার কিরূপ ব্যবস্থা?"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"বটে। টাকা পাইবে? কত টাকা দিয়া বাড়ী খরিদ করিয়াছ? কত টাকা পাইবে তুমি?"

এই বলিয়া বৃদ্ধ, আপনার পকেট হইতে একতাড়া নোট বাহির করিয়া বলিলেন,—"বল, সর্ব্বসমেত তোমার কত টাকা?

অদ্বৈত বলিল,—"আমি বাড়ী খরিদ করিয়াছি চব্বিশ টাকায়। আমার খরচাও পড়িয়াছে আর চারি টাকা। তা ছাড়া আমার এখনও পাওনা আছে আটত্রিশ টাকা"

বৃদ্ধ পকেট হইতে একখানি ষ্ট্যাম্প কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন—"উত্তম। তোমার

সমস্ত টাকা তুমি বুঝিয়া লও। আর এই ষ্ট্যাম্প কাগজে তোমার পক্ষে কবালা লেখা আছে, তুমি ইহাতে সহি করিয়া, খোসকবালা বাবা হরিদাসের নিকট এ বাটী বিক্রয় কর। লইয়া আইস তো একটা দোয়াত কলম।"

একজন দোয়াত কলম সংগ্রহ করিতে গেল। সকলেই এই অপরিচিত বৃদ্ধের ব্যবহার দেখিয়া অবাক্ হইল। অদ্বৈত বলিল,—"তা —তা মহাশয়, আমি এ সম্পত্তি খরিদ করিয়াছি, তা ইহা আমি ছাড়িব কেন?"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"দেখ অদ্বৈত, তুমি যদি দুই দশটাকা বেশী চাহ, তাহাও আমি দিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তোমাকে এই খোস-কবালায় এখনই সহি করিয়া এ বাটী বিক্রয় করিতে হইবে।"

অদ্বৈত ভাবিল, বড়ই শুভ-সুযোগ উপস্থিত। একটু রগড়া রগড়ি করিলে বিলক্ষণ লাভ হইবার সম্ভাবনা। সে বলিল—"এ বাড়ী আমি মোটেই বিক্রয় করিব না। ইহা আমার রাখিবার আবশ্যক আছে।"

বৃদ্ধ রাগে কাঁপিয়া উঠিলেন। তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ হইল। তাঁহার ভাব দেখিয়া সকলেই ভীত হইল। তিনি রাগত স্বরে বলিলেন,—বটে! তুমি এ বাড়ী মোটেই বিক্রয় করিবে না? খোস-কবালায় তুমি সহি করিবে না? তুমি যে তুমি তোমার চৌদ্দ পুরুষ উপস্থিত হইলে, আমার হাত হইতে ছাড়াছাড়ি নাই।"

এই বলিয়া বৃদ্ধ পার্শ্বস্থ আম্রবৃক্ষের একটা শাখা মড় মড় শব্দে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, এবং বলিলেন,—"তোর ন্যায় পাষণ্ডের মরাই উচিত। আজি তোকে মারিয়া ফেলিব। এক ডালের আঘাতে তোর মাথা গুঁড়া করিব।"

বৃদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় লাফাইয়া অদ্বৈতের উপর পড়িলেন। অদ্বৈত কাঁপিতে কাঁপিতে ভূপতিত হইল; বৃদ্ধ তাহার বুকে পা দিয়া বলিলেন,—"কে তোকে রক্ষা করে দেখি। তুই মহাপাপী, তোকে বধ করাই ধর্ম।"

বৃদ্ধ তাহার বক্ষে চরণ পেষণ করিলেন। সে 'বাবাগো মাগো' শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। বৃদ্ধ আবার বলিলেন, "এখনও আমার কথা শোন্ টাকা লইয়া দশ জন লোকের সাক্ষাতে নাম লিখিয়া দে।"

অদ্বৈত বলিল,—"দিতেছি, আমাকে ছাড়িয়া দেন।"

বৃদ্ধ চরণ উঠাইয়া লইলেন। ভয়ে, ভয়ে নাজির বহিল—"আজ্ঞে, যদি অনুমতি করেন; তবে আমরা যাই।"

বৃদ্ধ সম্মতিসূচক মস্তকান্দোলন করিলে, তাহারা 'পড়েতো-উঠে-না-ভাবে' সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল। পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া চাহিতেও তাহাদের সাহস হইল না। অদ্বৈত গায়ের ধুলা ঝাড়িয়া বলিল,—"আজ্ঞে, যদি কুড়িটা টাকা বেশী দিতেন, তাহা হইলেই, আমার সকল দিকে সুবিধা হইত। আমি আর কি বলিব? আপনার দয়া।"

বৃদ্ধ কহিলেন,—"তাহাই পাইবি, কিন্তু আর কথা কহিলে তোকে নিশ্চয় যমালয়ে পাঠাইব।"

এই বলিয়া ডাক্তারকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"আপনি এখানকার ডাক্তার না? আপনি এই টাকা লইয়া এই নরাধমের দাবী মিটাইয়া দিন। কুড়ি টাকা বেশী দিবেন, এই দলিলে উহার নাম সহি করিয়া লইবেন। তিন জন সাক্ষীর নাম লিখাইয়া লইবেন। ইহার বাকী পাওনা মিটাইয়া দিবেন এবং সেজন্য রীতিমত রসিদ লিখাইয়া লইবেন। নোটের মধ্যে একখানি রসিদের

টিকিট আছে। এ সকল বাবেও টাকা কিছু বেশী হইবে। হরিদাসের ছেলের চিকিৎসার জন্ত তাহা আপনার নিকট থাকিবে। আজি রোগীর অবস্থা কেমন ?"

ডাক্তার বলিলেন,—"আজ্ঞে বড় খারাপ।"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"হরিদাস সকল ঔষধের সার ঔষধ তোমার ছেলেকে দিয়াছ কি ? ভক্তি করিয়া জেঠা গোপীনাথের চরণামৃত তোমার ছেলেকে খাওয়াও, তাহার সর্ব্বাঙ্গে দেও, অবশ্যই সে ভাল হইবে। প্রভুর মহিমার অন্ত নাই, জানিবে। ডাক্তার মহাশয়, আপনি এখনি প্রতিবেশীর চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া এই তিলকধারী ভণ্ডটার কাজ শেষ করিয়া আসুন।"

হরিদাস করযোড়ে বলিল,—"আপনি যখন আসিয়াছেন, তখন আমার ছেলে অবশ্যই ভাল হইবে। কিন্তু দয়াময় ! আপনি কে ?"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"সে কথা পরে হইবে। তুমি আগে চরণামৃত আনিয়া রোগীকে খাওয়াও।"

হরিদাস আজ্ঞা-পালনে গমন করিল। অবিলম্বে সে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, সেই তেজস্বী বৃদ্ধ সেখানে নাই। কে তিনি ? কোথায় তিনি ?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সেই দিন সায়ংকালে, অপরিচিত বৃদ্ধের নিকট হইতে হরিদাসের দেনা সমস্ত বুঝিয়া লইয়া, অদ্বৈত বাটী ফিরিল। তাহার স্ত্রী তাহাকে কোন কথাই বলিল না, তাহার সহিত ঝগড়া-বিবাদ কিছুই করিল না। অদ্বৈত স্নান-আহার করিয়া বাজারে যে সকল খাতকের নিকট প্রতিদিন তাগাদা করিয়া টাকা পয়সা আদায় করিতে হয়, তাহাদের সন্ধানে যাত্রা করিল। তাহাদের সহিত ঝগড়া করিয়া হিসাবের ভুল করিয়া, কালিকার আদায় আজি অস্বীকার করিয়া দোকানদারদের নিকট স্থদের স্থদ তস্য স্থদের হিসাবে, পোকায় খাওয়া, ধূলাময় মসলা ও চাউল, পচা পান প্রভৃতি লইয়া তাহাদের নিকট কতক প্রকাশ্য ও কতক অপ্রকাশ্য গালি খাইয়া অদ্বৈত ঘোষ পয়সা কড়ি ও জিনিষ-পত্র সহিত সন্ধ্যার পর আবার বাটী ফিরিল। তাহার ভার্য্যা তাহার সহিত কোন প্রকার কলহ করিল না। অদ্বৈত বলিল,—"জিনিষপত্র-গুলা আনিলাম, দেখিয়া শুনিয়া তুলিয়া রাখ।"

মঞ্জরী তুলিল না—জিনিষ-পত্রের দিকে ফিরিয়াও দেখিল না। অদ্বৈত বলিল,—"বলি, এগুলা কি এখানে পড়িয়া ইন্দুর-বাঁদরের পেটে যাইবে ? যে কষ্টে এ সকল সংগ্রহ করিয়াছি, তা আর কি বলিব ?"

মঞ্জরী হাসিয়া বলিল,—"লোকের নিকট একরকম ভিক্ষা করিয়া, একরকম চুরি করিয়া একরকম ডাকাইতি করিয়া, জিনিষপত্র সংগ্রহ করিয়াছ—কেমন ? লোকে তোমাকে কুকুর বেড়ালের মত দূর-ছেই করিয়াছে, তবু তুমি নড় নাই ; কেহ তোমার হাত হইতে জিনিষ কাড়িয়া লইয়াছে, তবু তুমি ছাড় নাই ; কেহ তোমাকে গালি দিয়াছে, সে কথা মনে করিলে কান্না হয়, এমন তুমি তাহা শুনিয়াও শুন নাই। কেহ তোমাকে দেখিবামাত্র হতভাগাটা আসিতেছে বলিয়া মুখ ফিরাইয়াছে, তবু তুমি সর নাই। কেহ তোমাকে চোর,

কেহ জুয়াচোর বলিয়াছে, কেহ তোমার মৃত্যু কামনা করিয়াছে, কেহ তুমি একটু সরিয়া গেলেই তোমার পিতৃকুলকে উদ্ধার করিয়াছে, তুমি কাহারও দোকান হইতে লুকাইয়া এক থাবা জিনিষ তুলিয়া লইয়াছ, এইরূপ অনেক কাণ্ড তুমি বাজারে করিয়া আসিয়াছ। কিন্তু এ সকল কার্য্য অন্যের পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর হইলেও, তোমার পক্ষে কোনই কষ্টকর হইতে পারে না। কারণ তোমার এ সকল নিত্যকর্ম্ম—ইহাই তোমার ব্যবসায়। তবে তুমি আজি কষ্টের কথা কেন বলিতেছ ?"

অদ্বৈত হাসিয়া বলিল,—"যা বলিতেছ, তা কতকটা ঠিক বটে। সংসার-ধর্ম্ম করিতে গেলে সবই করিতে হয়। কিন্তু আজি একটু বিশেষ আছে। ঐ যে সুপারি গুলা দেখিতেছ, ও জাহাজে নয়—পোকা লাগাও নয়। ভাল জিনিষ। হরে-বেণের দোকানে এগুলা আমদানি হইয়াছে। হরে-বেণে অনেককাল আগে আমার কিছু টাকা ধারিত। সে টাকা আসল ও সুদের সুদ সমেত অনেক দিন হইল আদায় হইয়া গিয়াছে। তবু সুদের ছিট ক' গণ্ডা পয়সা বাকী করিয়া তাহার দোকানে এখনও যাওয়া আসা করি। সে কিন্তু পয়সা বাকীর কথা মানে না, বাড়ায় ভাগ পয়সা-টাকার কথা বারবার বলিলে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিবার ভয় দেখায়। ছোঁড়াটা বড় গোঁয়ার, বড় বেকুব। যাহাই হউক, সে যতই বলুক, আমি পয়সা ক' গণ্ডার কথাও ছাড়ি না, তার দোকানে যাওয়াও বন্ধ করি না। আজি আবার পয়সার কথা বলায় সে বেটা বড়ই চটিয়া উঠিল, আমাকে অপমান করিতে আসিল। শেষে একরকমে তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া আমি বলিলাম, পয়সা যদি নিতান্তই না দিবি, তবে যে আমাকে একসের সুপারি। সে সুপারি না দিয়া আমাকে গলাধাক্কা দিয়া তাড়াইয়া দিল। আমি তাহার সামান্য ধাক্কা খাইয়াই পড়িয়া গেলেম ; সঙ্গে সঙ্গে 'বাবাগো, মাগো, মারিয়া ফেলিল গো' শব্দে চীৎকার করিয়া হাটের লোক জমা করিয়া ফেলিলাম। অনেকেই হরের এ কাজ ভাল হইয়াছে বলিতে লাগিল। দুই একটা লোক বলিল, বাপের বয়সী বুড়া-মানুষটাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া ভাল হয় নাই। যাহা হউক, মোটের উপর হরেই দোষী হইল। তখন পাঁচজনের কথায় হরে কতকটা লজ্জায় পড়িল। অনেকের অনুরোধে সে তখন আমাকে এই এক পোয়া সুপারি দিয়া বিদায় করিল। সুপারিগুলা ভাল। যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখ —ছ'মাস ঐ সুপারিতে কাজ চালাইতে হইবে।

মঞ্জরী বলিল,—"ছ'মাস কেন, তুমি ছ'বৎসর এ সুপারিতে চালাও, আমার তাহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। তোমাকে যদি আমি আপনার লোক বলিয়া মনে করিতাম, তাহা হইলে তোমার এই সকল কথা শুনিয়া আমার বড় কষ্ট হইত। তোমার সুখদুঃখে আমার সম্বন্ধ নাই, কাজেই কোন সুখদুঃখই মনে করি না।"

অদ্বৈত বলিল,—"সে কি কথা ?"

মঞ্জরী বলিল,—"কথা নূতন নয়। গত ছয় বৎসর হইতে আমি তোমাকে পর বলিয়া মনে করিতেছি। ক্রমেই সে ভাব আমার মনে বাড়িয়া আসিয়াছে। এখন তোমাকে একবারও আপনার লোক ভাবিতে আমার শরীর শিহরিয়া উঠে।"

অদ্বৈত বলিল,—"সে কি মঞ্জরী ? কেন তুমি এমন ভাবিতেছ ? তোমার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে, তুমি আমার স্ত্রী,

আমি তোমার স্বামী। ইহার চেয়ে আপনার লোক আর কি হইতে পারে?"

মঞ্জরী বলিল,—"বিবাহ তোমার সহিত আমার হইয়াছিল বটে; কিন্তু সে বিবাহের জন্য আমি কত দূর বাধ্য, তাহা বলিতে পারি না। যদি কোন ভালুকের সহিত মানুষের মেয়ের বিবাহ হয়, তাহা হইলে সেই কন্যা তাহার ভালুক স্বামীকে আপনার লোক মনে করিতে পারে কি? তোমার গায়ে মানুষের চামড়া আছে, আর তোমার চেহারাও মানুষের মত। তোমার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে সত্য; কিন্তু আমি বাঘ-ভালুককে আপনার স্বামী ভাবিতে অক্ষম।"

অদ্বৈত বলিল,—"ছি মঞ্জরী, স্ত্রীলোকের এমন কথা মুখে আনিতে নাই।"

মঞ্জরী বলিল,—"কেবল মুখেও আনিতে নাই নয়, মনেও ভাবিতে নাই। আমি সে সব ধর্ম্ম-কথা বিশেষ জানি। কিন্তু তোমাকে আপনার লোক মনে করা আমার পক্ষে অসম্ভব। এ কারণে নিশ্চয়ই আমাকে পতিত হইতে হইবে। যদি এ পাপের কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্ত থাকে তাহাও করিতে হইবে।"

অদ্বৈত বলিল,—"কেন তোমার মনে এ ভাব হইল? আমি বৃদ্ধ বলিয়া, কুৎসিত কুরূপ বলিয়া, কি তুমি আমাকে আপনার লোক মনে কর না?"

মঞ্জরী বলিল,—"রাধাকৃষ্ণ! তুমি যদি গলিত-কুষ্ঠ হইয়া মানুষ হইতে, তাহা হইলেও আমি জিহ্বা দিয়া তোমার ঘা চাটিয়া দিতে পারিতাম। তুমি যদি কাণা, খোঁড়া, কালা ও বোবা, এক সঙ্গে সবই হইয়া মানুষ হইতে, তাহা হইলেও আমি সকল রকমে তোমার সেবা করিয়া, সুখী হইতাম। কিন্তু আমার পোড়া কপালক্রমে তুমি মানুষের চামড়া-ঢাকা বাঘ ভালুক। ঐ সকল জন্তু দেখিলে, মানুষ যেমন মারিতে কাটিতে চাহে, তোমাকে দেখিলে আমিও তোমার সেইরূপ শত্রুতা করিতে চাহি। কাজেই তোমাকে আমি আপনার লোক মনে করিতে পারি না।"

অদ্বৈত বলিল,—"কেন তুমি আমাকে এরূপ মনে কর, তাহা তো বুঝিতে পারি না। আমি তোমার কি ক্ষতি করিয়াছি? যদিই করিয়া থাকি, আর না হয় করিব না।"

মঞ্জরী বলিল,—"কেন তোমাকে এরূপ মনে করি, তাহা তোমাকে অনেকবার বলিয়াছি। তোমাকে মানুষ করিয়া আপনার লোক করিবার জন্য অনেক যত্ন করিয়াছি কিন্তু কোনই ফল হয় নাই। ফল কিছুই হইবার আশা নাই দেখিয়াই তোমার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছি। আমার যে ক্ষতি তুমি করিয়াছ, তাহা গুরুতর হইলেও আমি অতি সামান্য বলিয়াই জ্ঞান করি। কেবল আমার ক্ষতি করিয়াই তুমি যদি মানুষ হইতে, বাঘভালুকের মত প্রাণিহিংসা না করিতে, তাহা হইলে আমি তোমাকে দেবতা ভাবিয়া পূজা করিতাম।"

অদ্বৈত বলিল,—"আমি দুনিয়ার লোকের কাহার পাকা ধানে মৈ দিয়াছি? সংসার-ধর্ম্ম করিতে হইলে দেনা-পাওনা করিতে হইলে যাহা না করিলে চলে না, যাহা সবাই করে, তাহাই আমি করিয়া থাকি। ইহাতে আমি বাঘ-ভালুক কিসে হইলাম, তাহা তো বুঝি না।"

মঞ্জরী বলিল,—"কোন্ কথাটা তোমায় বলিব? তোমার কোন্ কাজটাই দেখাইব? আজি তুমি জেঠা গোপীনাথের পাড়ায় যে ব্যবহার করিয়াছ, মানুষে কখন কোথায় তাহা করিতে পারে না। হরে মেথের দোকানে

এখনই তুমি যে কাজ করিয়া আসিয়াছ, কেহ কখনও তাহা করিতে পারে না। একদিনের এই কথা। দশবৎসর আমি তোমার ঘরে আসিয়াছি। এই কাজের সকল কথাই আমার মনে আছে। প্রত্যেকটিই চমৎকার। সবগুলি ভাবিয়া দেখিলে মনে হয় যে, বাঘ-ভালুকও তোমার মত বাঘ-ভালুক নয়। তুমি জাল-খৎ তৈয়ার করিয়া চাটুয্যেদের বড়-ঠাকুরুণের সর্ব্বনাশ করিয়া তাঁহাকে পথে বসাইয়াছ। আহা! ব্রাহ্মণ-কন্যা কোলের ছেলেটিকে লইয়া এখন ভিক্ষা করিয়া খায়। তুমি মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়া বড়বাজারের রায়েদের সর্ব্বস্ব ফাঁকি দিয়া লইয়াছ। তাহারা এখন বাজারে পান বেচিয়া খায়। তুমি রামলাল বাবুর টাকা খাইয়া কায়েতদের জাতিকুল খাইয়াছ। সে নাকি তোমার কিছু টাকা ধারিত, কোন রকমেই শোধ করিতে পারে না। তুমি প্রতিদিনই তাহাদের বাড়ী হইতে তাড়াইবার ভয় দেখাইতে। তাহারা কত কাঁদিয়া তোমার পায় লুটাইত। শেষে তাহাদের বিধবা এক মাত্র কন্যা যদি রামলাল বাবুর সহিত প্রণয় করে, তাহা হইলে টাকা ছাড়িবে বলায় অগত্যা তাহতেই সম্মত হয়। এখন সেই কন্যাকে পাষণ্ড রামলাল বাবু ত্যাগ করিয়াছে। তোমার দুর্গতির শেষ নাই। মনে করিয়া দিতেছি, তাহাদের এইরূপ সর্ব্বনাশ করিয়া টাকা সমস্ত ছাড়িব বলিয়াও তুমি কিছুই কর নাই। তাহাদের বিরুদ্ধে ডিগ্রিজারি করিয়া তুমি তাহাদের ঘর-বাড়ী ঘটী-বাটি সকলই কাড়িয়া লইয়াছ। তুমি নরাধম, তুমি পিশাচ। এজগতে কে তোমাকে আপনার ভাবিতে পারে? তোমারই মত নরাধম ও পিশাচের হয় তো তোমার সহিত আত্মীয়তা সম্ভব। কিন্তু আমি তোমাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করি; আপনার পোড়া কপালকে শতেক ঝাঁটা মারি, পূর্ব্বজন্মের অশেষ পাপের ফলে তোমার ন্যায় জীবের হাতে পড়িয়াছি মনে করি।”

অদ্বৈত অনেকক্ষণ অধোমুখে চিন্তা করিল। তাহার পর বলিল,—“বিষয়-কর্ম্ম করিতে হইলে যাহা করা উচিত, তাহাই আমি করিয়াছি। ইহাতে যে বাঘ-ভালুক কেন হই, তাহা বুঝি না। তুমি রূপসী, যুবতী, আমি কুৎসিত বৃদ্ধ, কাজেই তুমি আমাকে ঘৃণা কর। ইহাই আসল কথা, তাই কেন ভাঙ্গিয়া বল না! তোমার কপাল মন্দ বটে, নহিলে এত রূপ লইয়া একটা বুড়ার সহিত কেন কাল কাটাইতে হইবে? ফল কথা, এ বুড়াকে আর তোমার ভাল লাগিতেছে না; একটা মনের মত লোক হইলে এত কথা উঠিত না। সেই চেষ্টাই মনে উঠিয়াছে, যোগা-যোগও হইয়াছে হয় তো! আমি একথা অনেক দিনই ভাবিয়া রাখিয়াছি। জানি আমি, অবশ্যই কোন না কোন দিন তুমি আমার কুলে কালি দিবে। তা যা তোমার ইচ্ছা হয়, তাই কর; নাহাক কতকগুলা বাজে কথা বলিয়া আমার ঘাড়ে দোষ চাপাইও না, দোহাই তোমার।”

মঞ্জরী একটু হাসিয়া বলিল,—“তোমার মত লোকের এইরূপই মনে করা উচিত; সুতরাং তোমার কথায় আমি একটুও আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতেছি না। তুমি বিশ্বাস কর বা নাই কর, এজগতে কোন পুরুষেই আমার প্রণয় নাই। যে জন্য স্ত্রীলোকে পুরুষে আসক্ত, সে আকাঙ্ক্ষা আমি বহুদিন হইতে বিশেষরূপে দমন করিয়াছি। সংসারের বয়সে বড় যত পুরুষ, সকলেই আমার পিতা; বয়সে ছোট যত পুরুষ, সকলেই আমার পুত্র। তুমি ইতর,

অধম, পশু। তুমি তোমার মনে আমাকে বিচার করিতেছ। তোমার যাহা খুসী, ভাবিতে পার। আমি তোমার অনুগ্রহ-নিগ্রহের প্রত্যাশী নহি। সুতরাং তোমার মতামতে আমার বায় আসে না।”

অদ্বৈত বলিল,—“ভাল, বুঝ লাম তোমার খুব ধর্ম্মনিষ্ঠা। তা এখন কি করিবে, স্থির করিয়াছ?”

মঞ্জরী বলিল,—“করিব যে কি তাহা বলিতে পারি না। আর করিব না যে কি, তাহাও বলিতে পারি না; তবে একটা কাজ যে করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। তোমার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছিল—আমি তোমার সহধর্ম্মিণী। বিধিমতে চেষ্টা করিয়াও তোমাকে যখন ভাল পথে আনিতে পারিলাম না, তখন অন্য উপায়ে তোমার কৃত ক্ষতি সকল নিবারণ করিয়া তোমার স্ত্রীর কাজ করিব—তোমার পরকালের ভাল যাহাতে হয়, তাহার চেষ্টা করিব। তুমি লোভে পড়িয়া যে সকল লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছ, আমি সাধ্য-মত চেষ্টা করিয়া তাহাদের উপকার করিব—তাহাদের অবস্থা যেমন ছিল, তেমনই করিয়া দিবার উপায় করিব। ইহাই আমার এক সঙ্কল্প; আমার দ্বিতীয় সংকল্প, আমি এক-জনকে ভালবাসিব। জন্মাবচ্ছিন্নে আমি কাহাকেও ভালবাসি নাই। আমার প্রাণ ভালবাসিতে ও ভালবাসা ভোগ করিতে ব্যাকুল হইয়া আছে। আমি একটা স্থানে এই ভালবাসা লেনাদেনা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।”

অদ্বৈত বলিল,—“তাহাই তো আমি বুঝিয়াছি। আসল কথাই তো তাই। এতক্ষণ সেই কথা বল নাই কেন? কে সে প্রাণের লোক—রসিক নাগর, শুনি।”

মঞ্জরী বলিল,—“তুমি ইতর—সামান্য লোক। তত, সে কথা তোমার বুঝিবার সাধ্য নাই। তথাপি তোমাকে তাহা বলা ভাল। আমার সে প্রাণের নাগর—ভগবান্। আমি যদি পারি তাহা হইলে ভগবানকে আত্ম-সমর্পণ করিব—এ জীবন-যৌবন তাঁহারই পায়ে ফেলিয়া দিব। তাঁহার নিকট ভণ্ডামি নাই, প্রেমের অভাব নাই, দয়ার সীমা নাই, সুখের শেষ নাই, আনন্দের পার নাই। আমি তাঁহারই চরণে প্রেম দিব ও সেই চরণ হইতে প্রেম লইব।”

অদ্বৈত নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল,—“আমি বুঝিয়াছি, কোন্ বেটা বাবাজী আমার মাথা খাইয়াছে। নিশ্চয়ই কোন বৈরাগী বোলচাল দিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে। এ বৈরাগী ঢঙের কথা। বল, কে তোমার মাথায় এ সকল বদমায়িসী ঢুকাইয়া দিল।”

মঞ্জরী বলিল,—“তুমি মূর্খ। তোমাকে আর কি বলিব?”

অদ্বৈত বলিল,—“আমি মূর্খই হই, আর পণ্ডিতই হই, এ সকল বৈরাগীর শিক্ষা, তার ভুল নাই। কোন বেটা আসিয়া তোমাকে নিশ্চয়ই মজাইয়াছে। সে আপনাকে ভগবান্ বলিয়া বুঝাইয়াছে; তাহার পর তোমাকে ভগবানে মজিয়া ধর্ম্ম ও পুণ্য করিতে পরামর্শ দিয়াছে।”

মঞ্জরী বলিল—“তুমি তুলসীর মালা গলায় দিয়া, সর্ব্বাঙ্গে তিলক সেবা করিয়া, নামের ঝোলা হাতে করিয়া, বাবাজী সাজ; অথচ সকল প্রকার পাপ ও কুৎসিত কার্য্যেই থাক। সুতরাং যাহা তোমার বিবেচনায় মন্দ কর্ম্ম, তাহাই কোন বাবাজী করিয়াছে বলিয়া স্থির করা তোমার পক্ষে অসঙ্গত নয়। তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যা খুসী মনে

আসে কর ; আমার তাহাতে কিছুই যায় আসে না। তোমাকে সকল কথা বলা উচিত হউক না হউক, তথাপি বলিয়া রাখিলাম।"

মঞ্জরীকে প্রস্থানোদ্যতা দেখিয়া, অদ্বৈত তাহার নিকটস্থ হইয়া বলিল,—"বলি যাও কোথা? তোমার কথাতো ভাল বুঝিতেছি না। এ সকল স্পষ্ট ব্যভিচারের কথা। তুমি কি আমার সর্ব্বনাশ ঘটাইবে? এখনই ইহার প্রতীকার করিতে হইবে?"

মঞ্জরী বলিল,—"কি প্রতীকার করিতে চাহ, কর। যদি আমাকে ব্যভিচারিণী বোধ করিয়া থাক, তাহা হইলে আমার সহিত সম্বন্ধ রাখা তোমার অন্যায়। তুমি আমাকে তাড়াইয়া দিতে পার, আমি তাহাতে একটুও দুঃখিত বা কাতর নহি। তুমি আমাকে যাহা খুসী বক, তাড়াইয়া দাও, আমি কিছুতেই তোমার সহিত আর ঝগড়া করিব না। মারামারি তো মোটেই নয়। আমাকে তাড়াইয়া দেওয়াই যদি মত হয়, তাহা হইলে এখনই বলিলে আমি এখনই চলিয়া যাইতে রাজী আছি। যাহা ভাল হয় বিবেচনা করিয়া কালি বলিও, আমি এখন আহারের উদ্যোগ করি।"

মঞ্জরী গৃহান্তরে গমন করিলে, অদ্বৈত মাথায় হাত দিয়া অকূল পাথার ভাবিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অপরিজ্ঞাত বৃদ্ধের পরামর্শানুসারে জেঠা গোপীনাথের চরণামৃত সেবনে ও লেপনে, হরিদাসের পুত্র গোপাল ক্রমেই রোগমুক্ত হইয়া উঠিল। পাঁচদিন পরে ডাক্তার বলিলেন,—"দাদা, আর আমার যাওয়া-আসার প্রয়োজন নাই। তোমার ছেলে গোপীনাথের কৃপায় সম্পূর্ণরূপ স্বচ্ছন্দ হইয়াছে।

হরিদাস বলিল,—"দাদা গোপাল যে বাঁচিয়াছে, সে তোমারই দয়ায়। তোমার এ ঋণ আমি ইহজন্মে শুধিতে পারিব না।"

ডাক্তার বলিলেন,—"মানুষের দ্বারায় কি হয় ভাই, সকলই জানিবে গোপীনাথের দয়া। দেখ না দাদা, বড় যখন বিপদ, শুশ্রূষা অভাবে ছেলে মারা যা..., বাড়ীর লোক অবসন্ন, ঠিক সেই সময়ে মা-লক্ষ্মী আসিয়া ছেলে কোলে করিয়া বসিলেন। যখন হতভাগা অদ্বৈতের অত্যাচারে আমরা সকলে অস্থির, কি উপায় করি ভাবিয়া ঠিক করিতে অক্ষম, চারিদিকে ব্যাকুলতা ... হায় হায় শব্দ, ঠিক সেই সময়ে এক দেবতা আসিয়া তোমার সকল দায় উদ্ধার করিলেন। তিনি দেবতা নয় তো কি, দাদা? আমি দেখিতেছি, তোমার উপর ভগবানের দয়া হইয়াছে, মানুষে আর তোমার কি করিবে?"

হরিদাস বলিল,—"বৃদ্ধ যে কোথায় গেলেন, তাহার আর সন্ধান হইল না। সত্যই কি তিনি দেবতা? আর একবার তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলে, তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়ি। তুমি কি তাঁহার সন্ধান বলিতে পার?"

ঠিক সেই সময়ে তাঁহাদের পশ্চাদিক হইতে এক ভুবনমোহিনী সুন্দরী বলিয়া উঠিলেন,—"আমি সন্ধান বলিতে পারি বাবা।"

উভয়ে সসম্ভ্রমে ফিরিয়া দেখিলেন, মা লক্ষ্মী জগৎ আলো করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—"আমি তাহার সন্ধান বলিতে

পারি। তিনি দেবতা নন, তোমার আমার মত মানুষ।"

ডাক্তার বলিলেন,—"তোমার মত মানুষ যদি তিনি হন, তা হইলেই তিনি দেবতা। কোথায় যাইলে তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, মা?"

মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—কোথাও যাইতে হইবে না বাবা, আবশ্যক হইলে ঘরে বসিয়াই তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। আমাকে যদি তোমরা দেবতা ভাবিয়া সুখী হও, তাহাতে আমি কি বলিব! কিন্তু আমি জানি, আমি তোমাদেরই মত মানুষ, তোমাদের মা-বাপেরা যেমন মানুষ, আমিও তেমনই মানুষ। তোমাদের চেয়ে অধম বা উৎকৃষ্ট মানুষ কখনই নহি। তা যাহা হউক, গোপাল গোপীনাথের কৃপায় সারিয়া উঠিয়াছে, বাবা এখন নিয়ম-মত পথ্যাদি দিয়া চলিতে পারিলেই আর কোন বিঘ্ন ঘটিবে না। তা বাবা, আমি এখন বিদায় হই।

হরিদাস বলিল,—"তোমার কাছে আমরা চিরদিনের জন্য কেনা রহিলাম। আমার গোপাল তোমার দাস। তুমি যাইবে শুনিলে, প্রাণ বড় অস্থির হয়। আর দুইদিন থাকিবার উপায় নাই কি মা?"

মা-লক্ষ্মী বলিলেন, "না বাবা, আমার এক যায়গায় বড় দরকার আছে। আমি তো তোমার মেয়ে। বাপের বাড়ী মেয়ে কত বারই আসিবে, সে জন্য চিন্তা কি?"

ডাক্তার বলিলেন,—"সেই দেবতা যে টাকা দিয়াছিলেন, তাহাতে অবৈদ্যের দেনা মিটাইয়া দিয়া—আমার ঔষধের দাম কাটিয়া লইয়া, এখনও একশত টাকা বাঁচিয়াছে। এ টাকা তিনি তোমাকে দিতে বলিয়াছেন। এই লও দাদা, সে টাকা।"

এই বলিয়া ডাক্তার পকেট হইতে দশ টাকার দশখানি নোট বাহির করিলেন। হরিদাস বলিল,—"এ টাকা আমি আর লইব না দাদা। ইহা তাঁহাকে যে ফিরাইয়া দিতে হইবে। মা-লক্ষ্মী তাঁহার সন্ধান জানেন, ইঁহারই নিকট ও টাকা দেও, তাহা হইলে তিনি উহা পাইবেন।"

মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—"টাকা তাঁহাকে দিতে হইবে না। গোপালের পথ্যাদির খরচ চালাইয়া যদি কিছু উদ্বৃত্ত হয়, তাহা দ্বারা তুমি ভাল করিয়া কাজকর্ম্ম করিবে। আমি বিদায় হই।"

হরিদাস বলিল,—"মা, তোমার সে বাসনগুলা কোথায় পাঠাব?"

মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—"সেগুলা আমার এই বাপের বাড়ীতেই থাকিবে। আমার মা বাবা ভাই ভগ্নী এখন তাহা ব্যবহার করিবেন। যখন দরকার উপস্থিত হইবে, তখন আসিয়া আমি সেগুলা লইয়া যাইব।"

মা-লক্ষ্মী উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেলেন। ডাক্তার ও হরিদাস তাঁহাকে প্রণাম করিবারও সময় পাইলেন না। পথে হিন্দু ও মুসলমান নানাবিধ লোক তাঁহাকে ঘেরিয়া নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, এবং অপরিসীম আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। তিনি সকলের সঙ্গেই মিষ্ট কথা কহিয়া কুশলাদির সংবাদ লইতে লাগিলেন। বালকগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া নাচিতে লাগিল। ক্রোড়স্থ শিশুগণও 'মা যাচ্ছে' বলিয়া হাত নাড়িতে লাগিল। এইরূপে লোকালয় পার হইতে তাঁহার অনেক বিলম্ব হইল। ক্রমে বেলা প্রায় দুইটা বাজিল।

একটা জলাশয়ের পার্শ্বদেশ দিয়া মা-লক্ষ্মী চলিতে লাগিলেন। তাহার ওদিকে মাঠ ও

বন, আর দুই এক ক্রোশের মধ্যে আর লোকালয় নাই। রৌদ্রে তাঁহার বড় কষ্ট হইতে লাগিল। রবিকরোদ্ভাসিত রক্তিম গৌরবর্ণ বড়ই সুন্দর দেখাইতে লাগিল। পরিশ্রম ও তাপাবলিত লোচনদ্বয় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। ললাটে স্থূল ঘর্ম্মবিন্দুসমূহ মুক্তাফলের ন্যায় অপূর্ব্ব হইল। এই অদ্ভুতপ্রকৃতিসম্পন্না সুন্দরী নারী, সন্নিহিত এক বটবৃক্ষমূলে বিশ্রামমানসে গমন করিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইবামাত্র, আর এক সুন্দরী বিপরীত দিক হইতে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। এ সুন্দরী আমাদের পরিচিতা—মঞ্জরী।

মঞ্জরী বলিল,—"আপনাকে আমি আর কখন দেখি নাই, আপনিও আমাকে আর কখন দেখেন নাই। আমি পরমহংসঠাকুরের মুখে যে পরিচয় শুনিয়াছি, তাহাতে বুঝিতেছি, আপনিই মা-লক্ষ্মী। আমি শুনিয়াছি, আজি এই পথ দিয়া আপনি যাইবেন. আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমি অনেকক্ষণ এখানে দাঁড়াইয়া আছি।"

মা লক্ষ্মী বলিলেন,—"কে আপনি? আমি আপনার কি কাজে লাগিতে পারি?"

মঞ্জরী বলিল,—"আমি যে কে, তাহা বলিলেই হয় তো আপনার দ্বারা আমার কি কাজ হইতে পারে, তাহাও বুঝিতে পারিবেন। আমি কি বলিয়া আমার পরিচয় দিব? আমি সধবা হইলেও বিধবা। আমার স্বামী আছে, কিন্তু সে নরাধম, সে পশু। আমি তাহাকে স্বামী বলিয়া কখনই মনে করি না; সুতরাং আমি কি বলিয়া পরিচয় দিব?"

মা-লক্ষ্মী দন্তে রসনা কাটিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, এবং বলিলেন,—ছি, ছি! কুলকামিনীর মুখে এমন কথা কখনও শুনি নাই। পিতার মুখে পতিনিন্দা শুনিয়া ভগবতী প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। আজি নারী নিজমুখেই পতিনিন্দা করিতেছে। তুমি রাক্ষসী। আমার নিকট তোমার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে?"

মঞ্জরী।—বাস্তবিকই মা, আমি রাক্ষসী। আমি পাপিষ্ঠার একশেষ। পতি আমার চক্ষুশূল। আমি প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়া, পতিকে ভালবাসিতে পারিলাম না। আমার প্রায়শ্চিত্ত নাই।

মা।—যাহা মনে করিলে পাপ হয়, তুমি কি সে মহাপাপেরও পাপী? স্ত্রীলোকের যাহা জীবন, নারীর যাহা সার ধন, তুমি অভাগী কি, সে সতীত্ব সম্পত্তিও হারাইয়াছ?

এইবার মঞ্জরী সতেজে বলিল,—"সে মহাপাপ এ অভাগীর শরীরে নাই। জীবনে কখন আমি পুরুষান্তরের কামনা করি নাই। স্বামীর সহিত প্রণয় না থাকিলেও অন্য পুরুষের সহিত প্রণয় করিতে কখনও আমার বাসনা হয় নাই। স্বামী আমার চক্ষুশূল হইলেও এ জগতে আমার আর কোন প্রণয়াস্পদ পুরুষ নাই। পৃথিবীর যত পুরুষ, সকলকেই আমি পিতা বা পেটের ছেলে বলিয়া জ্ঞান করি মনেও আমি কখন ব্যভিচারিণী হই নাই।"

মা।—তবে তুমি অভাগী, স্বামীকে ভালবাসিতে পার না কেন?

তখন মঞ্জরী একে একে জীবনের সমস্ত কথা বলিল। স্বামীর স্বভাব চরিত্র-সংক্রান্ত সমস্ত কথাই সে নিবেদন করিল। যেরূপে সে স্বামীকে সুপথে আনিতে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছে, যেরূপে সে নিরন্তর তাহার হিতচিন্তা করিয়াছে, যেরূপে সে অশেষ কষ্ট ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে, যেরূপে তাহার স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্যবোধ তিরোহিত হইয়াছে,

যেরূপে তাহার প্রাণে অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, যেরূপে সেই অশ্রদ্ধা ক্রমশঃ ঘৃণায় পরিণত হইয়াছে, তাহার কথা শুনিয়া, সকলই মা লক্ষ্মী বুঝিতে পারিলেন। সমস্ত কথা শুনিয়া মা লক্ষ্মী বলিলেন,—"বুঝিলাম, তোমার স্বামী নরাধম ও নিতান্ত ঘৃণার্হ মানব। তথাপি তোমাকে পাপীয়সী বলিতেই হইবে। নারী জন্ম লাভ করিয়া স্বামী-সেবায় যার সুখ নাই, স্বামীর দোষই যে দেখিল, তাহার জীবনে ধিক্! তোমার কঠোর প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হইবে। আপাততঃ তুমি কি করিবে স্থির করিয়াছ?"

তখন মঞ্জরী যেরূপে স্বাকৃত দুষ্কৃতি-সমূহের প্রতিবিধান করিতে সঙ্কল্প করিয়াছে, তাহার স্বামী যাহাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে—যেরূপে সে তাহাদের উপকার করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, এবং যেরূপে সে অন্তরের জীবন-পাত করিবে স্থির করিয়াছে, সমস্তই সে নিবেদন করিল। তাহার কথা শেষ হইলে, মা-লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি যে পরমহংসের কথা বলিতেছিলে, তিনি তোমার কে?"

মঞ্জরী।—তিনি আমার কেহই নহেন। দয়া করিয়া তিনি আমাকে তিন চারি দিবস দর্শন দিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট আমি অকপটে মনের সমস্ত কথা বলিয়াছি। আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত কথা জানাইলে, আমার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সহায়তা হইবে বলিয়া, তিনি ভরসা দিয়াছেন। তিনিই আমাকে দয়া করিয়া আপনার সন্ধান বলিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে বল মা, আমি কি করি? কি উপায়ে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে?

মা। এই পুকুরের ডাইনদিকে বাঁশগাছের কাছ দিয়া ঐ যে খড়ের ঘর কয়খানি দেখিতে পাইতেছ, উহা সনাতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটী। তিনি আমার দাদা হন। আমি ঐ বাটীতে থাকি। তোমাকে পূর্ব্বকর্ম করিতে হইবে, বেলা অপরাহ্ণ হইয়াছে, আজি তুমি বাটী যাও। কালি মধ্যাহ্ন-কালে তুমি ঐ বাড়ীতে আসিও। আমি সাধ্যমত তোমায় সাহায্য করিব। আমার দাদা যদি সে সময় বাড়ী থাকেন, তাহা হইলে তিনিও তোমাকে অনেক সুপরামর্শ দিতে পারেন।

মঞ্জরী বলিল,—"আপনার রূপ দেখিয়া ও আপনার কথা শুনিয়া, বাড়ী আর ফিরিতে ইচ্ছা হয় না। তা আচ্ছা, আমি যাই। কালি কিন্তু মা, আমি আবার আসিব।"

প্রণাম করিয়া, মঞ্জরী প্রস্থান করিলে, ধীরে ধীরে মা-লক্ষ্মী পুষ্করিণীর অপর-পারস্থিত সেই বাটীতে প্রবেশ করিলেন।

মাটীর দেওয়াল দেওয়া, খড়-ঢাকা, চারিখানি বড় বড় ঘর। এক দিকে একখানি বড় ঘরের পশ্চাতে একখানি ছোট রান্নাঘর, এবং ঢেঁকিশালা। আর এক দিকে আর একখানি বড়ঘরের পশ্চাতে একখানি প্রকাণ্ড গোশালা। সমস্ত বাটীর চারিদিকে জিওল ও ভেরেণ্ডা গাছের প্রকাণ্ড বেড়া। বাড়ীখানির সর্ব্বত্র সুপরিষ্কৃত।

একটি তিন বছরের ছেলে উঠানে বসিয়া ধূলা লইয়া খেলা করিতেছিল। মা-লক্ষ্মীকে দর্শনমাত্র সে বলিয়া উঠিল—'ওরে! পিসি-মা এয়েছে।"

ঘরের মধ্য হইতে সাত আট বছরের একটি মেয়ে ও তার চেয়ে ছোট একটি ছেলে ধাইয়া আসিয়া, পিসিমাকে জড়াইয়া ধরিল। মা-লক্ষ্মী ধূলামাখা ছোট ছেলেটিকে কোলে লইলেন, আর দুইটির মুখচুম্বন করিলেন।

রন্ধনশালায় একটি অলোকসামান্যা সুন্দরী

বসিয়া ছেলেদের খাবার তৈয়ার করিতে-ছিলেন। সেই আলুলায়িত-কুন্তলা সুন্দরী-শিরোমণি হাতের কাজ ছাড়িয়া উঠিয়া আসি-লেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—"বউ ঠাকুরুণ। প্রাতঃপ্রণাম।"

বউঠাকুরুণ বলিলেন,—আশীর্বাদ করি, ভাই-সোহাগী হও।"

"তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক।"

"এখন ভাইটিকে কোথায় রাখিয়া আসলে বল।"

মা।—ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই। ঘরে কিছু খাবার আছে, চল বাবা তোমরা কেড়ে খাইগে।

ষষ্ঠ খণ্ড।

'"জ্ঞেয়ঃ স নিত্য সন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥'

অর্থ।—যিনি দ্বেষ করেন না, আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনি নিত্যসন্ন্যাসী জানিবে; যেহেতু হে অর্জ্জুন, রাগদ্বেষাদি শূন্যব্যক্তি অনা-য়াসে সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হন।

তাৎপর্য্য।—যাঁহার হৃদয়ে কোন বিষয়েই দ্বেষ নাই, কোন পদার্থ লাভার্থ যাঁহার আকাঙ্ক্ষা নাই, সাংসারিক কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকিলেও, তাদৃশ পুরুষকে সন্ন্যাসী বলিয়া জানিবে। কারণ, হে অর্জ্জুন, সুখ-দুঃখ-রূপ দ্বন্দ্বাতীত পুরুষ অনায়াসেই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ৫ম অধ্যায়। ৩য় শ্লোক শ্রীমদ্ভগবদুক্তি।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাজীবপুরের দুই তিন ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে কানন-মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র ঘরে হারা-ধনের জননী, পত্নী ও সন্তানগণ বাস করি-তেছে, এ কথা বোধ হয় পাঠকগণের স্মরণ আছে। সেই সুপরিষ্কৃত ক্ষুদ্র ভবনের অঙ্গনে বেলা এক প্রহরের সময় হারাধনের পত্নী ভুবনমোহিনী একটী উনানে শুকনা পাতা জ্বালাইয়া ভাত রাঁধিতেছে। আর হারাধনের জননী ঘরের মধ্যে একখানি বটী পাতিয়া কাঁচকলা ও বেগুণ কুটিতেছেন। হারাধনের কন্যা রাধিকা ও খোকা অঙ্গনের এক পার্শ্বে ধূলার ঘর বসিয়া খেলা করিতেছে। সকলেই নিশ্চিন্ত ও শান্তমূর্ত্তি।

সহসা উঠানের বেড়ার অপর দিক হইতে শব্দ হইল,—"হারাধন নন্দীর পরিবারেরা এখানে থাকে কি?"

সকলের নিশ্চিন্ততা ও শান্তি ভাঙ্গিয়া গেল। সকলেই যেন এ কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। সকলেই এ স্বর বিপজ্জনক ও কঠোর বলিয়া মনে করিল। বালক বালিকা ধূলাখেলা ফেলিয়া সভয়ে জননীর পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। জননী রন্ধন ছাড়িয়া সন্তানদ্বয়ের মধ্যে শশ্রূর নিকটস্থ হইলেন। আবার শব্দ হইল, "কেউ বাটীতে আছ কি? আমার কথা শুনিতেছ কি? এ বাটীতে রাজীবপুরের হারাধন নন্দীর মা ও স্ত্রী বাস করে কি না জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

হারাধনের মা অস্ফুট স্বরে বলিলেন,—"যাহার জন্যে আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহারই গলার স্বর। জানি না, অদৃষ্টে কি

আছে।" তাহার পর স্বর উচ্চ করিয়া বলিলেন,—"এ খানেই তাহারা থাকে বটে। আপনি কে? তাহাদিগকে আপনার কি দরকার?"

বেড়ার অপর পার্শ্ব হইতে উত্তর হইল,—আমি তোমাদের পরম শত্রু ছিলাম, এখন আমি তোমাদের হিতৈষী, আমি রাজীবপুরের সুরেন্দ্রনাথ মিত্র। এ নাম শুনিয়া তোমরা ভয় পাইতে পার; কিন্তু আমি বলিতেছি এখন আর ভয়ের কোন কারণ নাই। আমি তোমাদিগকে দুইটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি। তোমরা নির্ভয়ে তাহার উত্তর দিলে আমি বড় সুখী হইব।"

হারাধনের মা ঘরের মধ্য হইতে বলিলেন,—"বলুন।"

সুরেন্দ্র বেড়ার অপর পার্শ্ব হইতে জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনি বোধ হয় হারাধনের মা?"

উত্তর হইল,—হাঁ।"

সুরে। আপনাদের সংসার কিরূপে চলিতেছে? খরচপত্রের সবকুলান হইতেছে কিরূপে?

হা-মা। সে জন্ত আমাদের কোন অসুবিধা নাই। ভগবান্ আমাদের সহায় হইয়া সকল অভাব মিটাইয়া দিতেছেন।

সুরে। বুঝিয়াছি। আপনারা যাঁহার সহায়তালাভ করিয়াছেন, তিনি ভগবানই বটেন। আমি তাঁহার উদ্দেশে ভ্রমণ করিতেছি। আমি অনেক কষ্টে আপনাদের সন্ধান করিয়াছি। আমার অত্যাচারে আপনারা অনেক কষ্ট পাইয়াছেন। সাধ্যমতে সে অত্যাচারের প্রতিকার করিতে বাসনা করি।

হা-মা। অত্যাচারের কোন কথা এখন আর আমাদের মনে নাই। আমাদের কোন অসুবিধা থাকিলে, আপনার নিকট জানাইতে পারিতাম।

সুরে। সে কথা যাউক। একণে একটা অপ্রিয় সংবাদ আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব, আপনি বলিতে পারেন, গিরিবালা এখন কোথায় আছে?

হারাধনের জননীর কণ্ঠস্বর একটু সংযুক্ত হইল। বলিলেন,—"আমি শুনিয়াছি সে মারা গিয়াছে।"

সুরেন্দ্রনাথ কাতর ভাবে বলিয়া উঠিলেন,—"মারা গিয়াছে? আপনি ঠিক জানেন কি, গিরিবালা আর এ সংসারে নাই?"

হারাধনের জননী ব্যথিত স্বরে উত্তর দিলেন,—"হাঁ. যাঁহার মুখে আমি এ সংবাদ শুনিয়াছি, তিনি মিথ্যা বলিতে পারেন না।"

তখন সুরেন্দ্রনাথ সেই স্থলে বসিয়া পড়িল এবং উড়ানির দ্বারা মুখ ঢাকিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিল। হারাধনের মা বহুক্ষণ তাহার স্বর শুনিতে না পাইয়া, সাহসে ভর করিয়া একটু অগ্রসর হইলেন এবং বেড়ার ফাঁক দিয়া সেই রোদননিরত যুবাকে দর্শন করিলেন। এদৃশ্য তাঁহাকে ব্যথিত করিল। তিনি বধূমাতাকে সংক্ষেপে সমস্ত কথা জানাইলেন এবং তাঁহার উপদেশ অনুসারে এক ঘটী জল লইয়া বাহিরে আসিলেন। সুরেন্দ্রনাথের নিকটস্থ হইয়া বৃদ্ধা বলিলেন,—"আপনি সে হতভাগিনীর জন্ত কাঁদিতেছেন কি? সে যেরূপ পাপ করিয়াছে, তাহাতে তাহার জন্ত কাহারও দুঃখ হওয়া উচিত নহে। আপনি মুখে জল দিউন, স্থির হউন।"

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"গিরিবালা পাপ করে নাই; আমিই তাহাকে পাপে মজাইয়াছি। তাহার পাপের জন্ত আমিই দায়ী।

হা ভগবন্, মোর পাপের নিমিত্ত আমাকে একবার গিরিবালার চরণ ধরিয়া ক্ষমাভিক্ষা করিবারও সুযোগ দিলেন না। আপনি জানেন বোধ হয়, কিরূপে কোথায় গিরিবালার মৃত্যু হইয়াছে?"

হারাধনের মা বলিলেন,—"অনাহারে অতিকষ্টে সে শান্তিপুরে মারা গিয়াছে।"

সুরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে এ সংবাদ বজ্রের স্থায় কঠোরভাবে প্রবেশ করিল। তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—"গিরিবালা অন্তঃস্বত্বা ছিল। সেই অবস্থায় তাহার জীবান্ত হইয়াছে কি?"

হারাধনের মা বলিলেন,—"না। এক পুত্র প্রসবের পরই হতভাগিনী মরিয়া গিয়াছে।"

সুরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসিলেন,—"বোধ হয় সন্তানও সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়িয়াছে?"

হারাধনের জননী বলিলেন,—"না। আমি শুনিয়াছি, ছেলে বাঁচিয়া আছে, ভাল আছে।"

সুরেন্দ্রনাথ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সাগ্রহে জিজ্ঞাসিলেন,—"কোথায় আছে?"

হারাধনের জননী বলিলেন,—"ঠিক জানি না, শুনিয়াছি শান্তিপুরে ঠাকুরদের নিকটে আছে।"

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"আমি এক্ষণে বিদায় হই। পুত্রের সন্ধান না করিয়া আমি আর স্থির হইব না। আমার দ্বারা যদি আপনাদের কোন উপকার হয়, তাহা হইলে আমি সুখী হইব। আমি অধম, পাপী, কিন্তু আপনার সন্তান। আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

সেই সুরেন্দ্রনাথের মুখে এইরূপ কোমল কথা শুনিয়া হারাধনের জননীর চক্ষুতে জল আসিল। সেই সন্ন্যাসীর সহিত সুরেন্দ্রনাথের সাক্ষাতের গল্প বৃদ্ধার মনে পড়িল। যদু হালদারের কথাও তাঁহার স্মরণ হইল। তিনি বুঝিলেন, সেইরূপ মহাত্মার সংস্পর্শে পাষণ্ডেরও একমুহূর্ত্তে সাধু হওয়া আশ্চর্য্য নহে। বলিলেন, "আপনি স্থির হউন, একটু বিশ্রাম করুন। তাহার পর যাহা হয় করিবেন।"

সুরেন্দ্রনাথ কোনও উত্তর দিবার পূর্ব্বেই অদূরে শব্দ হইল,—"মা কোথায় খুড়ি দিদি কোথায়? দাদা দিদি কই গো?"

তখনই মাতার অঞ্চলাশ্রয় ত্যাগ করিয়া ভীত বালকবালিকা বাহিরে আসিল। বৃদ্ধা ও সুরেন্দ্রনাথ আগন্তুকের কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে মুখ ফিরাইলেন।

আগন্তুক আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত সেই মূর্খ দোকানদার যদু হালদার। তাহার হাতে এক প্রকাণ্ড পুঁটুলি। তাহার পায়ে জুতা নাই, গায়ে জামা নাই। এক সামান্য ধুতি সে পরিধান করিয়া কোমরে এক চাদর জড়াইয়াছে। যদু হালদার বেড়ার দরজা দিয়া উঠানে প্রবেশ না করিয়া বালক বালিকার হাত ধরিয়া সুরেন্দ্রনাথের অভিমুখে অগ্রসর হইল।

তাহাকে দর্শনমাত্র সুরেন্দ্রনাথ নমস্কার করিয়া বলিলেন,—"যে দিন কৃপাময় মহাপুরুষের সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটে, তাহার পরদিন রাজীবপুরের বাটীতে আপনাকে দেখিয়াছিলাম। আপনি মহাত্মা। আমি শুনিতেছি, আমার সন্তান জীবিত আছে। আপনি নিশ্চয়ই তাহার সন্ধান জানেন। আজ ভাগ্যক্রমে আপনার দর্শন পাইয়া ধন্য হইলাম। এক্ষণে দয়া করিয়া বলিয়া দিউন, আমি কোথায় আমার সন্তানকে দেখিতে পাইব?

যদু বলিলেন,—"সে জন্য কোন চিন্তা নাই। আপনার সন্তান অতি উত্তম স্থানে সযত্নে পালিত হইতেছে। আমি আপনাকে সঙ্গে করিয়া সে স্থানে লইয়া যাইব। আপনি কাঁদিতে-

ছিলেন ; দেখিতেছি, অতীত ঘটনার নিমিত্ত কাতরতা অনাবশ্যক। বর্ত্তমানের সদ্ব্যবহারই বুদ্ধিমানের কার্য্য ; আপনি মহাপুরুষের কৃপা লাভ করিয়াছেন ; সুতরাং চিন্তা বা শোক অনাবশ্যক। এক্ষণে আপনি বিশ্রাম করুন। দিদি মা, বাবুর জন্য একটু খাবার জল আন। একটা মাদুর কি কম্বল আন।"

হারাধনের জননী জলের ঘটী সেই স্থানে রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। যদু হালদার বলিলেন,—আপনি রাজ রাজেশ্বর। এরূপ স্থানে জলগ্রহণ আপনার শোভা পায় না। কিন্তু দেহরক্ষার জন্য কৃপা করিয়া এ অযোগ্য স্থানে একটু মিষ্ট মুখে দিয়া একটু জল খাইতে আপত্তি করিবেন কি ?"

সুরেন্দ্র নাথ বলিলেন,—"আপনি দেবতার পার্শ্বচর। আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য।"

যদু বলিলেন,—"কৃপা করিয়া আপনি ঘটীর জল একটু মুখে হাতে দিউন।"

সুরেন্দ্র নাথ মুখে হাতে জল দিলেন। বৃদ্ধা আসিয়া একখানি কম্বল পাতিয়া দিলেন এবং পুনরায় জল আনিতে প্রস্থান করিলেন। সুরেন্দ্র নাথ আসন গ্রহণ করিলে যদু হালদার পুঁটুলি খুলিয়া কয়েকটী সন্দেশ বাহির করিলেন এবং তাহার দুইটী সবিনয়ে সুরেন্দ্র বাবুর হস্তে প্রদান করিয়া আর দুই দুইটী বালক বালিকার হাতে দিলেন। বৃদ্ধা পানীয় জল লইয়া আসিলেন। যদু বলিলেন,—"আপনি কৃপা করিয়া ক্ষণেক অপেক্ষা করুন। এই বাটীতে আমার মা আছেন। এই বালক বালিকা আমার ভগ্নী। আমি বাটীর মধ্যে গিয়া মার সহিত দুইটা কথা কহিয়া শীঘ্রই আসিতেছি।"

সুরেন্দ্রনাথ এখন আর সে অহঙ্কৃত, সে শিকারবিলাসী, সে বিলাসীপুরুষ নহেন। তিনি নিশ্চয়ই কোন মন্ত্রবলে আপনাকে তৃণাদপি নীচ বলিয়া বুঝিতে শিখিয়াছেন। তাঁহার বস্ত্র জামা, চাদর, জুতা সকলই সামান্য। দোকানদার মূর্খ যদু হালদারও তাঁহার এখন ঘৃণার পাত্র নহে। সহজেই সুরেন্দ্রনাথ অপেক্ষা করিতে সম্মত হইলেন।

যদু হালদার বলিলেন,—"আইস বুড়ি দিদি, আমার দুই একটা কথা শুনিতে সময় হইবে না কি ?"

বৃদ্ধা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যদু হালদার বালক বালিকার হাত ধরিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্যামবাজারে অদ্বৈত দাসের সেই বাটীতে অনঙ্গ-মঞ্জরী মধ্যাহ্নকালে একাকিনী বসিয়া ইষ্টদেবতার পূজা করিতেছে। তাহার দীক্ষা হইয়াছে। দীক্ষায় সে কি শিক্ষা লাভ করিয়াছে, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু সে নানা প্রকার পুষ্প সংগ্রহ করিয়া এবং চন্দনাদি বিবিধ উপকরণ লইয়া, অনেকক্ষণ বসিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। অদ্বৈত দাসের সহিত সে আর বিবাদ করে না, তাহাকে কোন কটুবাক্য বলে না, তাহার ভাল মন্দ কার্য্যাকার্য্যের কোন সন্ধান করে না, তাহার সহিত প্রণয় বা অভিমানের কোন কথাই কহে না। অনঙ্গ এক প্রকার উদাসীন। সে সংসারে থাকিয়াও সকল বিষয়ে নির্লিপ্ত। দিনের অধিকাংশ সময় তাহার পূজায় অতিবাহিত হয়। তাহার পর তৃতীয় প্রহরকালে সে পাক করে। অদ্বৈতকে এক পাথর ভাত

দেয়, আপনিও যৎসামান্য আহার করে। অদ্বৈতের সহিত তাহার কথাবার্তা নাই বলিলেই হয়। তাহার পর সে বাটী হইতে প্রস্থান করে। অদ্বৈত লুকাইয়া দেখিয়াছে, তাহার সুন্দরী পত্নী বাটী হইতে প্রস্থান করিয়া কোন কুস্থানে বা কুকার্য্য সম্পাদন করিতে যায় না। অনঙ্গ বাটী হইতে প্রস্থান করিয়া বক্রপথে মেলের নিকটে সেই সনাতন ঠাকুরের বাটীতে যায়। সেখানে সেই ঠাকুরের পত্নী ও কখন কখন মা লক্ষীর নিকটে সে অনেকক্ষণ ধরিয়া নানা কথা শুনে; কোন কোন দিন তাঁহাদের সহিত সে জেঠা গোপীনাথের অঙ্গনে আসিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দেয়। তাহার পর সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সে বাটীতে ফিরিয়া আইসে।

পত্নীর এইরূপ পরিবর্ত্তনে সাংসারিক আনন্দের কোন বৃদ্ধি না হইলেও, অদ্বৈত বিশেষ সুখী হইয়াছে। কারণ এ ভাবান্তরে তাহার প্রতি তিরস্কার, তাহার কার্য্যের তীব্র সমালোচনা ও তাহার সম্বন্ধে ঘৃণাসূচক বাক্যাবলী তিরোহিত হইয়াছে। সংসারে প্রণয়লীলা বা প্রেমালাপ নাই বটে, সুখ দুঃখ কার্য্যাকার্য্যে সমপ্রাণতা নাই বটে, তথাপি অসুখ ও অশান্তি নাই। কলহ ও চীৎকার অদ্বৈতের গৃহ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। সে এখন সুখী হইয়াছে। কথাবার্ত্তা থাকুক না থাকুক, গালাগালি ও কলহ নাই, ইহাতে আনন্দিত হইয়াছে। মাসাধিক কাল এইরূপ চলিতেছে।

অদ্য মধ্যাহ্নকালে অনঙ্গ পূজা করিতেছে। পূজায় বসিয়াছে অনেকক্ষণ; পূজা করিতে করিতে মধ্যাহ্ন অতীত হইয়া গিয়াছে। অদ্বৈত বাটীতে ফিরিয়াছে। পত্নীকে দূর হইতে পূজায় নিযুক্তা দেখিয়া সে আর সে দিকে আইসে নাই। বথাস্থান হইতে একটু তৈল লইয়া সে মাথায় দিয়াছে এবং ধীরে ধীরে স্নান করিতে গিয়াছে। অনঙ্গমঞ্জরী আজি বাহ্যজ্ঞান বিরহিত হইয়া দেবার্চ্চনা করিতেছে। এত দিন সে পূজা করিতেছে, কিন্তু এমন অলৌকিক আত্মবিস্মৃতি তাহার কোন দিন হয় নাই। তাহার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত, দেহ আলোকিত, নেত্র মুকুলিত, গণ্ডে অশ্রু বিগলিত। সে আর পুষ্প লইয়া চন্দন মাখাইয়া দেবতাকে দিতেছে না; সে আর মন্ত্র বা বাক্য বলিতেছে না; আত্মহারা উন্মাদিনী হইয়া গিয়াছে।

এইরূপ সময়ে স্নানাদির পর অদ্বৈত ধীরে ধীরে সেই স্থানে উপস্থিত হইল এবং পত্নীর এইরূপ ভাব দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পড়িল। বাহ্যলক্ষণাদি দেখিয়া পত্নীর কোন কঠিন পীড়া হইয়াছে বলিয়া তাহার মনে হইল। অনঙ্গের বিরাগ ভয়ে এ সময়ে কথা কহিয়া তাহার অবস্থা জানিতে চেষ্টা না করা সে অবৈধ বলিয়া মনে করিল। তখন অতি সাবধানে নিকটস্থ হইয়া সে ধীরে ধীরে ডাকিল,—"মঞ্জরী, অনঙ্গ মঞ্জরী, তুমি এমন করিয়া রহিয়াছ কেন?"

অনঙ্গ কোন উত্তর দিল না; কিন্তু তাহার শরীর যেন একটু চঞ্চল হইল। অদ্বৈত আবার ডাকিল,—"অনঙ্গ, অনঙ্গ কথা কহিতেছ না কেন?"

অনঙ্গমঞ্জরী যেন মন্ত্রচালিত হইয়া চক্ষু মেলিল এবং অদ্বৈতের বদনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। অতি কোমল, অতি মধুর, অতি প্রশান্ত দৃষ্টি। তাহার পর সহসা অদ্বৈতের অভিমুখে মুখ ফিরাইয়া গলায় কাপড় দিল এবং বহুক্ষণ অদ্বৈতের চরণে মস্তক স্থাপন করিয়া রহিল; অদ্বৈত নিস্পন্দ ও অবাক্। পত্নীর দেহের সহিত তাহার দেহের সংস্পর্শ হইবার কাল বটে নাই। আজি অনঙ্গের মস্তক তাহার চরণে

সংলগ্ন হইয়া রহিল। অদ্বৈতের দেহে যেন অননুভূত-পূর্ব্ব মোহময় মদিরার আবেশ উপস্থিত হইল। সে যেন সহসা কোন পূর্ণানন্দময় অভিনব রাজ্যে নীত হইয়া পরমানন্দের অধিকারী হইল।

মঞ্জরী বহুক্ষণ পরে মস্তকোত্তলন করিল। তখন তাহার গণ্ড বহিয়া শতধারায় অশ্রু বহিতেছে। সে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল,—"তোমার এত রূপ, এত শোভা, এত গুণ, এত পুণ্য, এত পবিত্রতা! এমন আর কখন দেখি নাই। ধন্য আমি। যুগে যুগে যেন তোমায় এই ভাব দেখিয়া আমি ধন্য হই।"

অদ্বৈতদাস পত্নীকে সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে বসিয়া থাকিতে দেখিল, তাহার নয়নের অশ্রুপ্রবাহ দেখিল, তাহার বাক্যাবলী শুনিল। কিন্তু এ অবস্থায় কি বলিতে হইবে, তাহা তাহার মনে হইল না। সে অনেকক্ষণ পরে সেই স্থানে বসিয়া পড়িল, তাহার পর আপনার বস্ত্রাগ্রদ্বারা অনঙ্গের চক্ষু ও বদন মুছাইয়া দিল। তাহার পর উভয় বাহুদ্বারা সে সুন্দরীকে বেষ্টন করিয়া ধরিল। মঞ্জরী বলিল,—"কি ভয়ানক ভ্রমে আমি এতদিন ডুবিয়াছিলাম! কি পাপে আমি এতদিন অশেষ কষ্ট ভোগ করিয়াছি! আমি তোমাকে এতদিন মানুষ ভাবিয়া কি যাতনাই না পাইয়াছি। তুমি যে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণপুরুষ, এ সত্য কথা আমি এতদিন জানিতাম না। তোমার শোভার তুলনা নাই, তোমার গুণের শেষ নাই, তোমার কার্য্যাকার্য্য নাই। ক্ষুদ্র নারী হইয়া প্রত্যক্ষ ভগবান্ স্বামীর কার্য্যের ভাল মন্দ বিচার করিতে আছে কি? ছি ছি! আমি কি পাপই না করিয়াছি।"

অদ্বৈত বলিল,—"আমি মহাপাপী, আমি প্রতারক, প্রবঞ্চক, পরস্বাপহারী দস্যু ও হিংস্র জীবের অপেক্ষাও অধম ব্যক্তি। তুমি আমাকে দেবতা ভাবিতেছ কেন?"

অনঙ্গ বলিল,—"ছি ছি! ওকথা বলিও না। ও সকল কথা কাণে শুনিলেও পাপ হয়। তুমি যাহা কেন কর না, সকলই ভাল; তোমার কার্য্যে ভাল ভিন্ন মন্দ দেখিলে আমার পাপ হয়।"

অদ্বৈত বলিল,—"অনঙ্গ, তুমি এ সকল আশ্চর্য্য শিক্ষা কোথায় পাইলে? তোমার এরূপ দেবত্ব কিরূপে হইল?"

মঞ্জরী বলিল,—"ছি, দাসীকে কি দেবতা বলিতে আছে? আমি কত পাপ করিয়াছি, তাহার সীমা নাই। তুমি দয়াময়। দয়া করিয়া অবোধের পাপ ক্ষমা করিও।"

অদ্বৈত বলিল,—"তোমার নিকট আমি শত অপরাধী। তোমার ক্ষমাই আমার প্রার্থনীয়। সে যাহা হউক, বল মঞ্জরী, কাহার উপদেশে তোমার এইরূপ জ্ঞান জন্মিল?"

মঞ্জরী বলিল,—"তিনি স্বর্গের দেবী। তাঁহাকে তুমি তো জান। তিনি মা-লক্ষ্মী। তাঁহার উপদেশে আমি আমার দেবতা চিনিতে পারিয়াছি।"

অদ্বৈত একবার সাদরে মঞ্জরীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল,—"মা-লক্ষ্মীর চরণে আমার কোটী কোটী প্রণাম। তাঁহার কৃপায় আমি আজি ধন্য হইলাম।"

মঞ্জরী বলিল,—"আমি এখন যাই। তোমার সেবার আয়োজন করিতে হইবে। বেলা অনেক হইয়া গিয়াছে।"

মঞ্জরী চলিয়া গেল। অদ্বৈত একাকী বসিয়া ভাবিতে লাগিল, বাস্তবিকই আমি অতি ঘৃণিত পাপী। তথাপি আমার আজি এই ভাগ্যোদয়। আমাকে দেবতা বলিতেছে।

পাপী হইয়াও যদি এই জ্ঞান, এই সুখ, এই ভাগ্য হইল, নিষ্পাপ হইলে না জানি কি সৌভাগ্যই ঘটিতে পারে। মঞ্জরী নিশ্চয়ই দেবতা হইয়াছে। মঞ্জরীর উপদেশে কাজ করিতে হইবে। যাই, মঞ্জরী যেখানে বসিয়া আছে তাহার নিকটে গিয়া বসিয়া থাকি। তাহার অঙ্গের বায়ু গায়ে লাগিলেও মন পবিত্র হইতে থাকে। যাহার গৃহে এমন দেবী, তাহার কি কোন পাপ করিতে আছে?"

অদ্বৈত ধীরে ধীরে উঠিয়া পাকশালায় গমন করিল। তাহাকে আসিতে দেখিয়া মঞ্জরী তাড়াতাড়ি একখানি পিঁড়ি পাতিল এবং অঞ্চলবস্ত্রে তাহা পরিষ্কৃত করিয়া অদ্বৈতকে তাহার উপর বসিতে বলিল।

যথাসময়ে অন্নাদি পাক হইলে মঞ্জরী সযত্নে অদ্বৈতের সম্মুখে আহার্য্য আনিয়া দিল। অদ্বৈত যতক্ষণ আহার করিল, ততক্ষণ মঞ্জরী পার্শ্বে বসিয়া তাহার দেহে পাখার বাতাস দিতে লাগিল। অদ্বৈতের আহার সমাপ্ত হইলে, সে বিশ্রাম করিতে গেল। মঞ্জরী তখন ভক্তি সহকারে অদ্বৈতের ভুক্তাবশিষ্ট অন্নাদি ভোজন করিল।

বড় সুখে অদ্বৈতের দিন কাটিতে লাগিল। এত আনন্দ সে আর জীবনে কখন ভোগ করে নাই। তাহার চিত্তেরও যথেষ্ট ভাবান্তর হইতে লাগিল। সে আপনার অতীত জীবনের আলোচনা করিয়া অশেষ দুষ্কৃতির আত্মলেখা দেখিতে লাগিল। সে সতত মঞ্জরীর সহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা কহিতে লাগিল। মঞ্জরী একদিন তাহাকে বলিল,—"আমি পাপিষ্ঠা নারী; ধর্ম্মাধর্ম্মের কোন কথাই আমি জানি না। পাপের আকারে জন্মিয়া মরিতে মরিতে আমি মা লক্ষ্মীর আশ্রয় লইয়াছিলাম। তিনি আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন, যে নারী স্বামীকে মানুষ বলিয়া জ্ঞান করে সে পাপীয়সীর একশেষ। জেঠা গোপীনাথ বিগ্রহ দেখাইয়া তিনি স্বামীকেও সেইরূপ জ্ঞান করিতে বলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া আমি স্বামীকে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণকে স্বামী ভাবিয়া ধ্যান পূজা করিতে অভ্যাস করি। অনেক চেষ্টায় এ অন্ধকার-হৃদয়ে আলোক আসিয়াছে। এখন আমি বুঝিতে পারিয়াছি, স্বামীর কাজ সকলই ভাল। তাঁহার ভাল-মন্দ আলোচনা করাও মহাপাপ। তোমার কি করা উচিত, কি না করা উচিত, আমি তাহার কি জানি? তুমি যাহা কর, সকলই ভাল, "আশীর্ব্বাদ কর তোমার চরণে যেন আমার অবিচলিত মতি থাকে।"

বড় সুখে দিন কাটিতে লাগিল বটে, কিন্তু অদ্বৈত ক্রমেই বড়ই চিন্তাকুল হইতে লাগিল। সে অনেক সময় আপনার বিগত ক্রিয়া কলাপের কথা ভাবিতে লাগিল। শেষে এক দিন বৈকালে সে গোপীনাথ পল্লীতে আসিয়া অন্য কোন দিকে না গিয়া সে প্রথমেই জেঠা গোপীনাথ দেবের ভবনে উপস্থিত হইল এবং সম্মুখস্থ অঙ্গনে মস্তক স্থাপন করিয়া অনেকক্ষণ সে প্রণাম করিল। যখন সে মাথা তুলিল, তখন তাহার নয়নে জল, হৃদয়ে শান্তি আসিল। এমন ভাবে দেবতা প্রণাম সে কখনও করে নাই; প্রণাম করিয়া এত সন্তোষ সে আর কখন ভোগ করে নাই।

সে স্থান হইতে অদ্বৈত হরিদাসের ভবনে উপস্থিত হইল। হরিদাসের সে দিন বড় উদ্বেগ—তাহার ঘরে চাউল নাই। এ উদ্বেগ তাহার মাসের মধ্যে প্রায় পনের দিন ভুগিতে হয়। সে কাপড় বুনিতে বসিবে, এমন সময় তাহার ভগ্নী তাহাকে এই বিষম সংবাদ দিল। হরিদাস কাজকর্ম্ম ভুলিয়া গেল। এমন

সময় মা-লক্ষ্মীর সন্তাপনাশিনী মূর্ত্তি তাহার নয়নে পড়িল। মা-লক্ষ্মী আসিবামাত্র হরিদাস উঠিয়া তাঁহাকে ভক্তিসহ প্রণাম করিল। মা-লক্ষ্মী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। হরিদাস সকল চিন্তার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া কাজে বসিল। এমন সময় দূরে অদ্বৈতদাসকে আসিতে দেখিয়া তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। ক্রমে সে দেখিল, অদ্বৈত তাহারই বাটীর দিকে আসিতেছে। অদ্বৈত অচিরে হরিদাসের সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ভাল আছ হরিদাস? ছেলে ভাল আছে?"

হরিদাসের তখন ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং সে নমস্কার করিল না। কথার প্রকৃত উত্তরও দিতে পারিল না। বলিল, —"দাদা, তা, তুমি এ দিকে কেন? দেনা তো মিটিয়া গিয়াছে।"

অদ্বৈত বলিল,—"সে জন্ত কোন চিন্তা নাই। আমি সে জন্ত আসি নাই। তোমরা কেমন আছ, তাহাই একবার দেখিতে আসিয়াছি। আর একটা কথাও আছে। তোমার কাছে ডিক্রীজারী করিয়া যে টাকা আমি আদায় করিয়াছি, তাহাতে আমার কিছু ভুল হইয়াছে।"

হরিদাস নিতান্ত কাতর ভাবে বলিল,—"দাদা আমাকে প্রাণে মারিও না। আমি আর টাকা দিতে পারিব না। আমি টাকা কোথায় পাইব? এক মহাত্মা দয়া করিয়া দেওয়ায় তোমার দেনা শোধ করিতে পারিয়াছি। দোহাই—দাদা, সে কথা আর তুলিও না।"

অদ্বৈত বলিল,—"তোমাকে আর টাকা দিতে হইবে না। তুমি যে টাকা দিয়াছ, তাহাতে ভুলক্রমে কিছু বেশী লওয়া হইয়াছে সেই টাকা কয়টী তোমাকে ফেরৎ লইতে হইবে।"

হরিদাস বলিল,—যাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহা আর ফেরৎ লইবার আবশ্যক নাই দাদা। তোমার টাকা হাতে লইলেই আবার আমার ঘর দুই খানি লইয়া টানাটানি পড়িবে। টাকার আমার দরকার নাই দাদা। তুমি ওকথা আর বলিও না।"

অদ্বৈত বলিল,—"এ টাকার রসিদ লইব না, খৎ লিখাইব না, কেহ সাক্ষী থাকিবে না; সুতরাং বিপদ ঘটিবার কোন ভয় নাই। তোমার হক টাকা আমি ফিরাইয়া দিব মাত্র। ইহাতে ভয় কি ভাই?"

হরিদাস বলিল,—"টাকা আমার নহে, আমি তাহা দিই নাই। আমি ফেরৎ লইব কেন? তোমার যদি ইচ্ছা হয়, যাঁহার টাকা তাঁহাকে তুমি ফিরাইয়া দিতে পার।"

অদ্বৈত বলিল,—"তাঁহার সাক্ষাৎ আমি কোথায় পাইব? তুমি নিশ্চয়ই তাঁহাকে জান। তুমিই তাঁহাকে টাকা দিতে পারিবে। তুমি টাকা রাখিয়া দেও।"

হরিদাস বলিল,—"না দাদা, আমি টাকা রাখিব না। আমি সে মহাত্মাকে জানি না। মা-লক্ষ্মী তাঁহাকে জানেন, মা-লক্ষ্মী এখন ঐ ঘরের মধ্যে আছেন তিনি বাহিরে আসিলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা ভাল হয় করিও।

তখনই মা-লক্ষ্মী, গোপালের মা ও পিসির সহিত কথা কহিতে কহিতে বাহিরে আসিলেন। অদ্বৈত ও হরিদাস উঠিয়া দাঁড়াইল। মা-লক্ষ্মী নিকটস্থ হইলেন। অদ্বৈত ভক্তি সহকারে ভূপৃষ্ঠে মস্তক স্থাপন করিয়া অনেকক্ষণ তাঁহাকে প্রণাম করিল।

মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—"আমি সকল কথা শুনিয়াছি। কত টাকা ভুল হইয়াছিল?"

অদ্বৈত বলিল,—"বত্রিশ টাকা সাড়ে বারো আনা ।" মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—"তুমি আমার সহিত আইস। যাঁহার টাকা তাঁহার নিকট তোমাকে লইয়া যাইব। তিনি যেরূপ ব্যবস্থা করিবেন, তাহাই হইবে ।"

মা-লক্ষ্মী প্রস্থান করিলেন। অদ্বৈতদাস তাঁহার অনুসরণ করিল।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গোপীনাথ পল্লীর উত্তর পশ্চিমে প্রকাণ্ড প্রান্তর আছে। তাহারই এক পার্শ্বে একটী ঘন বাঁশ ও আম বাগানের মধ্যে সনাতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাস। মুখোপাধ্যায় মহাশয় দরিদ্র গৃহস্থ। কিঞ্চিৎ নিষ্কর ভূমি আছে; তাহার আবাদ করিয়া তাঁহার অন্নাদির সঙ্কুলান হয়; তিনটী গাভী আছে; তাহাদের দুগ্ধ পাওয়া যায়; আবশ্যকের অধিক ধান্য বিক্রয় করিয়া কিঞ্চিৎ অর্থাগম হয়; তাহাতে অন্যান্য খরচ চলে। গৃহ-সংলগ্ন একটু ঘেরা দেওয়া জমি আছে; তাহাতে নানাপ্রকার তরকারী হয়। সুতরাং বিশেষ সমৃদ্ধির সহিত না হইলেও, অনায়াসে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া যায়।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রকৃত শ্রমশীল ও বলিষ্ঠ পুরুষ, তাঁহার বয়স প্রায় চল্লিশ; কিন্তু দেহ পঞ্চবিংশ বর্ষীয় যুবার ন্যায় মাংসল ও উজ্জ্বল। কৃষিকর্ম্ম, গো-পালন ও সাংসারিক অন্যান্য অনেক কর্ম্ম মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বয়ং সম্পাদন করেন। তিনি নিষ্কর্ম্মাবস্থায় এক মুহূর্ত্তও থাকেন না।

সনাতন মুখোপাধ্যায় লেখা পড়ায় সুপণ্ডিত। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার প্রগাঢ় অধিকার আছে এবং দর্শনাদি শাস্ত্র তিনি রীতিমত আলোচনা করিয়াছেন। ইংরাজি ভাষাতেও তাঁহার অসাধারণ অধিকার। এরূপ ব্যক্তি রাজকার্য্যাদিতে লিপ্ত হইলে নিশ্চয়ই অত্যুন্নত পদ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার প্রবৃত্তি ও শিক্ষা তাঁহাকে সে পথে যাইতে দেয় নাই। তিনি অর্থলালসা ও ভোগলিপ্সা পরিহার করিয়া এইরূপ হীন ও অপরিচিত ভাবে জীবনপাত করাই পরম সুখময় বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন।

সংসারে তাঁহার পত্নী মাধবী দেবী ও দুইটী শিশু পুত্র কন্যা আছেন। সনাতনের সহধর্ম্মিণীর মাধবী দেবীর রূপ অলৌকিক এবং স্বভাব দেবোপম। অলঙ্কার বা শোভাবর্দ্ধক পদার্থে তাহার প্রয়োজন হয় না। আলস্য বা বিলাসপ্রিয়তা তাঁহার নিকটে আইসে না। নিরানন্দ ও অসন্তোষ তাঁহাকে দেখিলেই দূরে পলায়ন করে। সীমন্তে স্থূল সিন্দুর রেখা বিন্যাস করিয়া, দেহ স্থূল ও পরিষ্কার লালপেড়ে সাটীতে সুন্দররূপে আচ্ছন্ন করিয়া, প্রকোষ্ঠে শঙ্খ ও লৌহভূষণ ধারণ করিয়া এই সুন্দরী নিয়ত সন্তুষ্টচিত্তে ও প্রসন্ন বদনে পতি-সেবা, গৃহকর্ম্ম সম্পাদন, সন্তান পালন ও অন্যান্য বিবিধ কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। মাধবী দেবীর বয়স পঞ্চত্রিংশ বর্ষ হইলেও অষ্টাদশবর্ষীয়া নারীর ন্যায় লাবণ্যময়ী।

যাঁহাকে লোকে মা-লক্ষ্মী বলিয়া পূজা করে এবং যিনি লক্ষ্মীরূপে আনন্দ ও সন্তোষ বিতরণ করিতে করিতে প্রতিনিয়ত বিপন্নের সহায়তায় আত্ম-নিয়োজন করিয়া থাকেন, তিনিও এই বাটীতে বাস করেন। সম্পর্কে তিনি সনাতনের ভগ্নী।

সনাতনের ভবন অতি সামান্য। কয়েকখানি তৃণাচ্ছাদিত ঘরে তাঁহারা বাস করেন।

একখানি ঘরে গাভী থাকে, একখানিতে পাক হয়, একখানিতে আগন্তুক পুরুষেরা বসিয়া থাকে, আর দুইখানি ঘরে সনাতন বাস করেন। সকল ঘরই সুপরিস্কৃত ও সর্ব্বত্র আবর্জ্জনা শূন্য। বাটীর চারি দিকে কচার বেড়া।

এক দিকের বেড়ার বাতা খসিয়া গিয়াছে ও কচা গাছ সকল ফাঁক হইয়া পড়িয়াছে। সনাতন অনেকবার তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহার গৃহিণীও কয়েকদিন সে বিষয়ে তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। অবকাশ অভাবে সনাতন এই প্রয়োজনীয় সংস্কারের ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অদ্য হাতে বিশেষ কার্য্য না থাকায়, সনাতন সেই কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার ভগ্নী বেড়ার অপর দিকে থাকিয়া ভ্রাতৃকার্য্যের সহায়তা করিতেছেন।

সনাতনের মাথায় গামছা বাঁধা। বক্ষের উপর স্থূল উপবীত। হাতে একখানি ছোট দা। পার্শ্বে এক তাল দড়ি এবং অনেক কচার ডাল ও কয়েকখানি বাকারি। এইরূপ হীন জনোচিত কর্ম্ম সম্পাদনকালেও সনাতনের কি প্রশান্ত মূর্ত্তি! কি অপরূপ জ্ঞানালোক সমুদ্ভাষিত অলৌকিক মুখশ্রী! কি শোভাময় সুপরিণত সমুজ্জ্বল কলেবর!

সনাতন বেড়ার বাহিরের দিকে এবং মা-লক্ষ্মী ভিতরের দিকে রহিয়াছে। মা লক্ষ্মী আবশ্যক মত দড়ি ঘুরাইয়া দিতেছেন, বাকারি ধরিতেছেন ও কচাগাছ সমান করিয়া বসাইতেছেন। কার্য্যে নিবিষ্ট থাকিলেও ভাই-ভগ্নীর সুখের বিরাম নাই। তাঁহারা নিয়ত নানা বিষয়ক কথা কহিতেছেন। মা লক্ষ্মী বলিতেছেন—"কিন্তু দাদা, সুরেন্দ্র বাবুকে এখনই ছেলে ছাড়িয়া না দিলে হইত। হয় তো সুরেন্দ্র ছেলের ভাল যত্ন করিবে না। তখন খোকা কষ্ট পাইবে, অসুস্থ হইবে, মারাও যাইতে পারে।"

সনাতন বলিলেন,—"আমার মনে সে আশঙ্কা নাই। সুরেন্দ্র যত্ন করুক না করুক, তাহার স্ত্রী যে খোকার রীতিমত যত্ন করিবেন তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহাদের সন্তান হয় নাই। তাঁহার লক্ষ্মীরূপা স্ত্রী একটী পুত্রের জন্য বড়ই ব্যাকুলা। স্বামীর পুত্র আছে জানিয়া তিনি সেই পুত্র পাইবার নিমিত্ত অতিশয় আগ্রহান্বিতা। তাঁহার নিকট খোকা স্বচ্ছন্দ থাকিবে, মাতৃহীন শিশু মা পাইবে, পিতার আশ্রয়ে পিতার ঐশ্বর্য্য ভোগে শিশু নিশ্চয়ই সুখে থাকিবে।"

মা লক্ষ্মী বলিলেন,—"হারাধন নিশ্চয়ই শীঘ্র ভাগিনেয়কে দেখিতে আসিবে। সেয়তো বার বার খোকাকে দেখিতে আইসে। এবার আসিলে কি বলিবে?"

সনাতন বলিলেন,—"হারাধনকে যথাস্থানে পাঠাইয়া দিব। সুরেন্দ্র ও হারাধন উভয়েরই মন অনেক নির্ম্মল হইয়াছে। তাহাদের সাক্ষাৎ ঘটিলে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। এ ব্যবস্থায় হারাধন নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইবে।"

মা লক্ষ্মী বলিলেন,—"আমার কিন্তু খোকার জন্য মন কেমন করিতেছে।"

সনাতন হাসিয়া বলিলেন,—"তাই কেন বল না তুমি নিজে খোকাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেছ না, তাহা না বলিয়া ব্যবস্থাটা ঠিক হয় নাই বলিতেছ কেন? কিন্তু দিদি, মায়া মোহ কমিয়া আসাই তো আবশ্যক। পরের ছেলেই হউক, আর নিজের ছেলেই হউক, কাহারও জন্য অনাবশ্যক মায়া ভাল নহে। যতটুকু প্রয়োজন, যাহা রহিলে নহে, কর্ত্তব্য-পালনের নিমিত্ত যাহা আবশ্যক, তাহার অধিক

যায়া এ জগতে কোন ব্যক্তির সম্বন্ধেই থাকা উচিত নহে।"

মা লক্ষ্মী কোন উত্তর না দিয়া একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। সনাতন বলিলেন,—বুঝিয়াছি দিদি, তোমার মৌনবাক্য আমি প্রণিধান করিয়াছি। তুমি বলিবে, অনেক স্থলে ধর্ম্ম সাধনের জন্ত মায়ার প্রয়োজন। দেবতার প্রতি মমতা পরমধর্ম্ম; তাহা বর্জ্জন করিলে অধর্ম্ম হয়। একথা সত্য। কিন্তু ভগি, এ সংসারে কর্ত্তব্য অনেক। অন্ত কর্ত্তব্যের গুরুত্বার সম্বন্ধ লইয়া একটা কর্ত্তব্য ত্যাগ করায় ক্ষতি কি? সকল কর্ত্তব্যই সমান দৃষ্টিতে দেখিতে পারিলেই বোধ হয় পূর্ণতা হয়।"

মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—"কিন্তু দাদা, আমার বোধ হয় এ ধর্ম্মনীতি নারীর পক্ষে আদরণীয় নহে। নারীর প্রধান কর্ত্তব্য ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম পতিপরায়ণতা। সে কর্ত্তব্য সাধন না করিয়া অন্ত সহস্র কর্ত্তব্য পালন করিলেও বোধ হয় নারীর ধর্ম্মহীনতা ও অপূর্ণতা ঘটে। তুমি দেখ দাদা, মঞ্জরীদাসী ধর্ম্মশীলা সতী হইলেও, এক পতিবিদ্বেষরূপ মহাপাপে সে নরকের অনলে পুড়িতেছিল।"

সনাতন বলিলেন,—"তোমারই কৃপায় তাহার চিত্তে শান্তি আসিয়াছে।"

মা লক্ষ্মী বলিলেন,—"যেরূপেই হ'ক, ভগবানকে স্বামী ভাবিয়া আরাধনা করিতে করিতে সে স্বামীকেই ভগবান্ বলিয়া চিনিতে পারিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার সকল যাতনার শেষ হইয়াছে। তবেই দাদা, নারীর পক্ষে কোন অবস্থা, কোন ধর্ম্ম, কোন কর্ত্তব্যই পতিপরায়ণতার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে।"

সনাতন বলিলেন,—"তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তবে প্রত্যক্ষরূপে যেখানে সে ধর্ম্মপালনের সুযোগ না হয়, সেখানে নারী মনে মনেও সে ধর্ম্ম পালন করিয়া পূর্ণানন্দের অধিকারিণী হইতে পারে।"

মা লক্ষ্মী পুনরায় একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। সনাতন বলিলেন,—"কিন্তু দিদি, অনঙ্গমঞ্জরীর পরিবর্ত্তনে আমি বিশেষ কোন আশ্চর্য্য জ্ঞান করি না। কেন না, সে তোমার স্তায় দেবীর সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়াছে। তোমার প্রদত্ত উপদেশ ও শিক্ষা সে লাভ করিয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অদ্বৈতদাসের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সে অতীত দুষ্কৃতির জন্ত এখন অনুতাপে দগ্ধ হইতেছে, এখন সে সর্ব্বপ্রকারে অতীত দুষ্কৃতির নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত।"

মা লক্ষ্মী বলিলেন,—"ইহাতে আমি কোন আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতেছি না দাদা। তাহার পত্নী এখন দেবীস্বভাব। সাধু সঙ্গের পরিণাম চিরকালই আশ্চর্য্য ও মন্ত্রৌষধি অপেক্ষা বলবান্। অনঙ্গমঞ্জরীর সংস্পর্শে অদ্বৈতও এখন সাধু হইয়েছে, ইহাতে আশ্চর্য্য কথা কিছুই নাই।"

সনাতন বলিলেন,—"তুমি শুনিয়াছ কি লক্ষ্মী, অদ্বৈত তাহার বহু আয়াসে অর্জ্জিত কুড়ি হাজার টাকা এই সেবাব্রতে ব্যয় করিবার নিমিত্ত আমার হাতে দিতে উদ্যত হইয়াছে?"

মা লক্ষ্মী বলিলেন,—"আমি তাহা শুনিয়াছি। আর সুরেন্দ্র বাবুও এই কার্য্যে বার্ষিক পনর হাজার টাকা ব্যয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, এরূপও শুনিয়াছি। তুমি কি ব্যবস্থা করিয়াছ দাদা?"

সনাতন বলিলেন,—"আমি অদ্বৈতকে বলিয়াছি, আবশ্যক হইলে তোমার টাকা ক্রমে ক্রমে লওয়া যাইতে পারে; সেবায় তাহাকে

এখন টাকার অপ্রতুল নাই। আর সুরেন্দ্রকে বলিয়াছি, উপস্থিত সময়ে পরোপকারব্রত যে ভাবে চলিতেছে, তাহাতে এত টাকার প্রয়োজন হইবে না। যদি সকলের চেষ্টায় এই ব্রত আরও ব্যাপকরূপে অনুষ্ঠান করিবার সুযোগ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই টাকার প্রয়োজন হইবে। তখন অবশ্যই তোমার টাকা গ্রহণ করিতে হইবে। সুরেন্দ্র এই পরসেবাব্রত বহু বিস্তৃত করিতে অভিলাষী হইয়াছে।"

মা লক্ষ্মী বলিলেন,—"গোপীনাথের কৃপায় এ অনুষ্ঠানের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হওয়াই সম্ভব।"

লাবণ্যময়ী মাধবী দেবী হাসিতে হাসিতে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন,—"ভাই বহিনে বেড়াই বাঁধিতেছ—এদিকে বেলা কত হইল তাহার জ্ঞান আছে কি?"

সনাতন বলিলেন,—"সত্যই বেলা অনেক হইয়াছে। লক্ষ্মী, তুমি যাও, আর সামান্য কাজ বাকী আছে, আমি এটুকু শেষ করিয়া যাইতেছি।"

মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—"আমি তো যাইব না। বউঠাকরুণের সহিত আমার ঝগড়া হইয়াছে। সকাল বেলা যখন ছেলেরা চালিভাজা খায়, তখন আমি বউঠাকরুণের কাছে দুইটী চালিভাজা চাহিয়াছিলাম, উনি আমাকে দেন নাই। আমার কি রাগ হইতে পারে না?"

মাধবী বলিলেন,—"বেশ তো, ভাইয়ের কাছে, আমার নামে ঠকামি করিলে। আমিও বলি, শুন ঠাকুর, কালি রাত্রিতে তোমার ভগ্নীর শরীর খারাপ হইয়াছিল, তাই আমি প্রাতে উঁহাকে চালিভাজা খাইতে দিই নাই। ইহাতে আমার অপরাধ হইয়াছে কি?"

সনাতন বলিলেন,—"তোমার যে দিন অপরাধ হইবে, সে দিন চন্দ্র-সূর্য্য নিভিয়া যাইবে। লক্ষ্মী, তোমার শরীর খারাপ হইয়াছিল, এ কথা তুমি তো একবারও বল নাই।"

মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—"কিছুই নহে—একটু মাথা ধরিয়াছিল মাত্র; বউ-ঠাকরুণ ফাঁকি দিয়া চালিভাজা খাইতে দিলেন না। অসুখ কাহাকে বলে তাহা তো তোমার কৃপায় আর জানিতে পারি না দাদা।"

বেড়া শেষ হইয়া আসিল। সনাতন বলিলেন,—কাজ শেষ হইয়াছে, বেলাও অনেক হইয়াছে, চল এখন আহারাদির চেষ্টায় যাওয়া যাউক। মাধবী দেবি, আজি কি পাক করিয়াছ বল?"

মাধবী বলিলেন,—"লক্ষ্মী ঠাকুরাণী যাহা জুটাইয়া দিয়াছেন।"

মাধবী হাসিতে হাসিতে মা লক্ষ্মীর গলা জড়াইয়া ধরিলেন। সকলে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাজীবপুরের জমিদার সুরেন্দ্র বাবুর অন্তঃপুরে এক সুন্দরী যুবতী একটী দেড় বৎসর বয়স্ক ভুবনমোহন শিশু ক্রোড়ে লইয়া সোহাগ করিতেছেন। এই সুন্দরী সুরেন্দ্র বাবুর সহধর্ম্মিণী রাজবালা; আর এই শিশু সুরেন্দ্র বাবুর পাপপ্রবৃত্তির জ্বলন্ত পরিচয় স্থল—গিরিবালার সহিত তাঁহার অবৈধ প্রণয়ের পরিণাম ফল। শিশু বড়ই সুকুমার, বড়ই পুষ্টদেহ এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। রাজবালা সন্তানরূপে এই শিশুকে পাইয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছেন। শিশু তাঁহাকে 'মা, মা' বলিয়া ডাকিতে শিখিয়াছে এবং সর্ব্বোতভাবে তাঁহার অনুরক্ত হইয়াছে। খোকার অন্য নাম থাকিলেও রাজবালা তাহাকে 'সোণাচাঁদ' এবং সংক্ষেপে

'চাঁদ' বলিয়া ডাকিয়া থাকেন। রাজবালার অন্য কাজ নাই; দাস দাসীতে সংসা র নির্ব্বাহ করে; তিনি কেবল দিন রাত্রি তাঁহার চাঁদকে লইয়া ব্যস্ত থাকেন। চাঁদ প্রায় এক মুহূর্ত্তও তাঁহার কাছছাড়া হইতে পায় না।

রাজবালা বৈকালে চাঁদকে কোলে লইয়া অন্তঃপুরের একটী প্রশস্ত প্রকোষ্ঠে পরিক্রমণ করিতেছেন; সঙ্গে সঙ্গে কত সোহাগের কথা, কত আদরের কথা বলিয়া তাহাকে আপ্যায়িত করিতেছেন। চাঁদ সে সকল কথা বুঝিতে পারুক না পারুক, সেও তাহার সঙ্গে অনেক হাস্য করিতেছে।

ধীরে ধীরে সুরেন্দ্র বাবু তথায় উপস্থিত হইলেন এবং দূর হইতে খোকার ও রাজবালার এই আনন্দাভিনয় দর্শনে বড়ই সুখী হইলেন। মনে মনে তাঁহার একটু লজ্জাও হইল। এই অতুলনীয়া সুন্দরীর সহিত প্রাণের মিলন দূরে থাকুক, কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার চাক্ষুষ পরিচয়ও ছিল না। এই গুণময়ী, লাবণ্যময়ী স্বর্ণপ্রতিমার সহিত তিনি একটা কথাও কহিতেন না, এজন্য লজ্জা হইল। আর লজ্জা হইল সেই সুন্দরীর অঙ্কস্থিত সেই নয়নবিনোদন নন্দন দর্শনে। সেই শিশু তাঁহার লজ্জার পরিচায়ক এবং তাঁহার পত্নীর ঘৃণার স্থল হইলেও, রাজবালা তাহাকে অকপটে স্নেহের সহিত গর্ভজাত সন্তানের ন্যায় সমাদরে লালন পালন করিতেছেন। মাতৃহীন শিশু স্নেহময়ী মা পাইয়াছে; পিতৃ-পরিত্যক্ত শিশু, পিতার আশ্রয় পাইয়াছে, পাপজাত পরিচয়হীন-শিশু সর্ব্ব-সমক্ষে পিতৃপরিগৃহীত হইয়াছে। শিশুর সকলই শুভ হইয়াছে সত্য, কিন্তু পিতার লজ্জা তো যায় না। এক বৎসর পূর্ব্বে হইলে এরূপ ব্যাপারে লজ্জিত হওয়া দূরে থাকুক, সুরেন্দ্র বাবু বুক ফুলাইয়া মনুষ্যসমাজের মস্তকে পদাঘাত করিতেন; পত্নী এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিলে, সুরেন্দ্র বাবু হয় তো তাঁহার কোমল কলেবরে কষাঘাত করিতেন। কিন্তু এখন আর সে সুরেন্দ্র বাবু নাই, তাঁহার হৃদয় আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

প্রত্যাবর্ত্তন কালে সহসা সুরেন্দ্র বাবুর মূর্ত্তি রাজবালার নয়নে নিপতিত হইল। তিনি একটু প্রণয়সূচক হাস্য করিয়া, মাথার কাপড় আর একটু টানিয়া দিয়া বলিলেন,—"তুমি ওখানে দাঁড়াইয়া আছ বুঝি? কেন কাছে আসিলে ক্ষতি কি? আবার চরণে কি অপরাধ করিয়াছি?"

সুরেন্দ্র একটু অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—"অপরাধ তুমি করিবে কেন? যে চির অপরাধী সেই কাছে আসিতে ভয় পায়।" "কেন, আমি কি বাঘ না ভালুক? আচঁড়াইয়া কামড়াইয়া দিব না—ভয় নাই। তুমি ও পোড়া অপরাধের কথাটা বার বার বলিয়া কেন আমাকে লজ্জা দেও বল দেখি? তোমার কিসের অপরাধ?"

সুরেন্দ্র বলিলেন,—"অপরাধ গণিয়া শেষ হয় না; কোন্‌টা বলি বল? আপাততঃ অপরাধের প্রত্যক্ষ প্রমাণ তোমার ঐ কোলে।"

রাজবালা আর একটু অগ্রসর হইয়া সুরেন্দ্রের অতি নিকটে আসিলেন। তাহার পর বলিলেন,—"অপরাধ করিয়া যদি সোণার চাঁদ লাভ করা যায়, তবে তাহা অপরাধ নয়—পুণ্য। বহু পুণ্যেও এমন সোণার চাঁদ পাওয়া যায় না।

সুরেন্দ্র বলিল,—"তাহা হউক, যেরূপে এ সোণার চাঁদের উদ্ভব হইয়াছে তাহা কি পুণ্য? তাহাও কি অপরাধ নয়?"

রাজবালা বলিলেন,—"ছিঃ! তাহাতে কি হইয়াছে? নানা কারণে পুরুষের নানাপ্রকার স্বাধীনতা আছে। তাহা যখন আছে তখন পুরুষে তাহার ব্যবহার করিলে অপরাধ

হয় না। সেইরূপ স্বাধীনতার ব্যবহার করিতে গিয়া এই সোণার চাঁদের উদ্ভব হইয়াছে। তাহাতে ক্ষতি কি ?”

সুরেন্দ্র বলিলেন,—“এরূপে অতি সহজে হাসিয়া উড়াইয়া দিলে সকলই উড়াইয়া দেওয়া যায়। তোমাকে যে এত দিন একবার ও চক্ষু দিয়াও দেখি নাই, তোমার এ সোণার দেহ যে অনাদরে শুকাইতেছে, সে কথা এক-বারও ভাবি নাই, তাহাতেও কি আমার অপ-রাধ হয় নাই ?”

রাজবালা বলিলেন,—“কিছু না। তুমি দেখ বা না দেখ, তোমাকে ভক্তি করা, মনে মনে তোমার চরণ চিন্তা করা, তোমাকে পূজা করা আমার ধর্ম্ম। সে ধর্ম্মের, সে সুখের, সে আনন্দের কোনই ব্যাঘাত হয় নাই। আর অনাদরের কথা বলিতেছ ? স্বামীর আশ্রয়ে থাকিতে পাওয়াই নারীর পরম সুখ। সে সুখে তো তুমি আমাকে বঞ্চিত কর নাই। তবে আবার অনাদর কি ?”

সুরেন্দ্র বলিলেন,—“এত অত্যাচার এরূপ সহজে উড়াইয়া দেওয়া অসাধারণ ক্ষমতার কাজ, সন্দেহ নাই। কিন্তু সে কথার বিচার এখন থাকুক। আপাততঃ তোমার সোণার চাঁদকে দেখিবার জন্য তাহার মাতুল হারাধন আসিয়াছে। একবার সোণার চাঁদকে বিশ্বাস করিয়া আমার কাছে দিবে কি ?”

রাজবালা একটু ভীতভাবে সোণার চাঁদকে আর একটু চাপিয়া ধরিলেন। বলিলেন,—“তিনি কেন আসিয়াছেন ? সত্য বটে, ছেলে আমার গর্ভে জন্মে নাই—তাঁহার ভগ্নীর গর্ভে জন্মিয়াছে। কিন্তু ছেলে যে তোমার, তাহার তো কোনই ভুল নাই। তোমার ছেলে হই-লেই, কাজেই এ ছেলে আমার। বিশেষ যখন ছেলের মা নাই, তখন ছেলে নিশ্চয়ই আমার। আমি এ ছেলে যাহার তাহার কাছে যাইতে দিব কেন ? তোমার ছেলে তোমার কাছে দিব না বলিতে আমার কোন অধিকার নাই। কিন্তু হারাধনের এ ছেলের উপর কোনই দাবী থাকিতে পারে না তো। তবে তিনি কেন ছেলে দেখিতে আসিলেন ?”

সুরেন্দ্র বলিলেন,—“তিনি অধিকার সাব্যস্ত করিতে আইসেন নাই, ছেলে লইয়া যাইতেও আইসেন নাই। ছেলের সহিত তাঁহার রক্তের সম্বন্ধ আছে, তাই তিনি স্নেহের অনুরোধে একবার সোণার চাঁদকে দেখিতে চাহেন।”

রাজবালা একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—“তা আচ্ছা। তুমি লইয়া যাইবে, আবার তুমিই লইয়া আসিবে। যাহার তাহার কোলে সোণার চাঁদকে দিতে পাইবে না। বেশী বিলম্ব করিলে হইবে না। বড় জোর আধ ঘণ্টার জন্য আমি সোণার চাঁদকে তোমার কাছে ছাড়িয়া দিব। এ সকল কথায় স্বীকার হও যদি, তবে খোকাকে লইয়া যাইতে পার।”

সুরেন্দ্র বলিলেন,—“বেশ কথা। আমি ঠিক তোমার আদেশ মত কাজ করিব।”

রাজবালা বলিলেন,—“দাঁড়াও এখ ই কোল পাতিও না। সোণার চাঁদকে গহনা পরাইয়া দিই, ভাল জামা গায় দিয়া দিই, চুল আঁচড়াইয়া দিই, সঙ্গে এক জন দাসী দিই, তাহার পর তোমার কোলে দিব।”

এক জন দাসীর নাম ধরিয়া ডাকিয়া রাজ বালা সোণার চাঁদের অলঙ্কার ও পরিচ্ছদাদি আনিতে বলিলেন। সুরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসিলেন,—“হারাধন এখন কি করেন ?”

সুরেন্দ্র বলিলেন,—“বড় কিছু করেন না। ভগ্নীর দুর্দ্দশা ও অকাল মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার চিত্ত বড় অবসন্ন হইয়াছে।”

রাজবালা বলিলেন,—"যাহা হইবার হইয়াছে, এক্ষণে তিনি মা, স্ত্রী ও সন্তানাদি লইয়া এই গ্রামেই বাস করেন না কেন? তুমি যদি অর্থব্যয় করিয়া তাঁহার একটু পাকা বাড়ী করিয়া দেও এবং কিঞ্চিৎ মূলধন দিয়া তাহাকে একটা কারবার করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেও তাহা হইলেই বড় ভাল হয়।"

সুরেন্দ্র বলিলেন,—"তোমার মুখে এ পরামর্শ শুনিবার পূর্ব্বেই আমি তাহার নিকট এ সকল প্রস্তাব করিয়াছি। তিনি বলেন, এ গ্রামে মুখ দেখাইতে তাঁহার লজ্জা হয়, আর স্ত্রীর নিকট উপস্থিত হইতে তাঁহার বড়ই সঙ্কোচ হয়।"

দাসী অলঙ্কারাদি লইয়া উপস্থিত হইল। রাজবালা খোকাকে লইয়া সেই স্থানে উপবেশন করিলেন এবং তাহাকে সাজাইতে সাজাইতে বলিলেন,"—তাঁহার লজ্জা ও সঙ্কোচ সহজেই ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। তুমি একটু চেষ্টা করিলেই বোধ হয় এই কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া আমরা সুখী হইতে পারি।"

খোকা অলঙ্কার পরিতে ও জামা গায়ে দিতে বড়ই আপত্তি করিতে লাগিল। রাজবালা তাহাকে অনেক আদর করিতে লাগিলেন, অনেক ভয় দেখাইতে লাগিলেন কিন্তু খোকা হাত ছুড়িয়া পা নাচাইয়া শুইয়া পড়িয়া পরিচ্ছদ ধারণে অসম্মতি প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন রাজবালা, "দুষ্টছেলে, ও চুপ।" বলিয়া তিরস্কার করিলেন, তৎক্ষণাৎ অভিমানী শিশু ঠোঁট ফুলাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। রাজবালা অনেকক্ষণ বুকে করিয়া, অনেক আদর করিয়া তাহাকে ভুলাইলেন।

সুরেন্দ্র বলিলেন, "তোমার কথামত হারাধনের সুব্যবস্থা করিতে আমি চেষ্টা করিব। বোধ হয় কৃতকার্য্য হইব। তোমাকে একটা কথা বলা হয় নাই। সে অভাগিনী আমার ঘড়ি, চেন, আঙ্গটী, নোট, মোহর ও টাকা প্রভৃতি যে সকল জিনিষ, লইয়া গিয়াছিল, তাহার সকলই হারাধন লইয়া আসিয়াছে। কিছুই নষ্ট হয় নাই।"

রাজবালা বলিলেন,—"সে সকল সামগ্রী না লইয়া, নন্দী মহাশয়কেই লইতে বল না কেন?"

সুরেন্দ্র বলিলেন,—"তাহা তিনি কিছুতেই লইবেন না।"

রাজবালা বলিলেন,—সে গুলা আর আমাদের লইয়া কাজ নাই। অন্য উপযুক্ত কোন কার্য্যে তাহার ব্যবহার করিলেই হইবে। খোকাকে সাজান প্রায় শেষ হইল। চুল কগুটা একটু গুছাইয়া দিলেই হয়। দেরী হইতেছে বলিয়া রাগ করিতেছ কি?

"তোমার কার্য্যে রাগ? আমাকে লজ্জা দিবার জন্যই কি এ কথা বলিতেছ রাজবালা?

রাজবালা বলিলেন,—"তুমি যখন রাগ করিতেছ না, তখন আর একটা কথা বলি। সেই তোমার বৈঠকখানায় সন্ন্যাসীরূপে যিনি দর্শন দিয়াছিলেন, কয়দিন প্রাতে দয়া করিয়া যিনি আমাকে দর্শন দিয়াছিলেন, তাঁহাকে তুমি আবার একবার দেখিয়াছ। কিন্তু আমার অদৃষ্টে সে দেবদর্শন আর ঘটিল না। সে গোপীনাথপল্লী আমি কখন দেখিতে পাইলাম না। সে প্রত্যক্ষ দেবতা গোপীনাথ বিগ্রহ দর্শনও আমার ভাগ্যে ঘটিল না। আর তোমার মুখে শুনিয়াছি, সেখানে মা লক্ষ্মী আছেন। তাঁহাকে দেখিলে পাপতাপ দূরে যায়। সে দেবীদর্শনও আমার অদৃষ্টে ঘটিল না। ইহার কোন উপায় তুমি করিতে পার না কি?"

সুরেন্দ্র বলিলেন,—"উত্তম কথা।

নিশ্চয়ই শীঘ্র ইহার সুব্যবস্থা করিব। আপাততঃ দয়া করিয়া তোমার সোণার চাঁদকে আমার কাছে দেও।"

রাজবালা বলিলেন,—"হাঁ, সব ঠিক হইয়াছে। এখন লইয়া যাও।"

গলায় হীরার হার, গায়ে মুক্তাখচিত সাচ্চা কাজ করা জামা, হাতে জড়াও বালা, তাহার পশ্চাতে সরু সরু সোণার চুড়ি প্রভৃতি নানাবিধ ভূষণে খোকা ভূষিত হইয়াছে। স্বভাবসুন্দর শিশু বড়ই শোভাময় হইয়াছে। সুরেন্দ্র তাহাকে ক্রোড়ে লইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন; কিন্তু সোণার চাঁদ ভাল করিয়া মার গলা জড়াইয়া ধরিল; পিতার কোলে যাইতে সম্মত হইল না। শেষে একটু জোর করিয়া সোণার চাঁদের অনিচ্ছায়, সুরেন্দ্র লজ্জিত ও কুণ্ঠিত ভাবে তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। রাজবালার আজ্ঞাক্রমে দাসী সঙ্গে চলিল। সুরেন্দ্র প্রস্থান করিলেন।

রাজবালা বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে বলিলেন,—তোমার আবার অপরাধ! যাঁহার অপরাধেও এমন সোণার চাঁদ পাওয়া যায়, তাঁহাকে কেমন করিয়া পূজা করিতে হয়, তাহা আমার মত অজ্ঞান নারী কি বুঝিবে? আমার কাছে লজ্জা কেন? সঙ্কোচ কেন? আমি তো আশ্রিতা দাসী। তবে এত দিন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে চরণসেবা করিতে সুযোগ পাই নাই; এখন সে অধিকার লাভ করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি।"

রাজবালা অন্য দিকে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শান্তিপুরের পূর্ব্বোত্তর প্রান্তস্থিত পল্লীতে একখানি জীর্ণ ও পতনোন্মুখ সামান্য খড়ের ঘরে এক যন্ত্রণাক্লিষ্ট পীড়িত ব্যক্তি পড়িয়া রহিয়াছে। একখানি সামান্য তক্তাপোষের উপর অতি মলিন ও ছিন্ন শয্যায় রুগ্ন পুরুষ শায়িত আছে। তাহার মাথার নিকট একটী পিতলের গ্লাসে জল রহিয়াছে, কাতর পুরুষ সময়ে সময়ে হাত বাড়াইয়া সেই গ্লাস লইতেছে এবং একটু করিয়া জল খাইতেছে। তাহার নিকটে কোন লোক নাই; ঘরের মধ্যে একটা ঘটী, একটী কলসী, দুইটা হাঁড়ি ছাড়া অন্য কোন সামগ্রী নাই। ঘর নানা প্রকার আবর্জ্জনায় পূর্ণ এবং গৃহস্বামীর নতান্ত দুর্দ্দশার পরিচায়ক। রোগীর নিকটে কোন লোক নাই। প্রবেশদ্বার অর্গলবদ্ধ নহে, চাপা রহিয়াছে মাত্র। এই রুগ্ন পুরুষ আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত কালিদাস চক্রবর্ত্তী

কালিদাস তিন মাস হইতে নানা প্রকার রোগভোগ করিতেছেন। অল্প অল্প জ্বর হয়, আহারে নিতান্ত অপ্রবৃত্তি, নিতান্ত দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা ইহাই তাঁহার পীড়া। উপযুক্ত ঔষধাদি পাইলে, রীতিমত চিকিৎসা হইলে, কালিদাস হয় তো সহজেই সারিয়া উঠিতে পারিতেন এবং তাঁহার এরূপ জীর্ণ দশা হইত না। কিন্তু তাঁহার অর্থ নাই, সহায় নাই, বন্ধুবান্ধব নাই, আশ্রয় নাই। এরূপ ব্যক্তির যত্ন করে কে? চিকিৎসা হয় কিরূপে? শুশ্রূষা করিবার লোক কোথায়? কাজেই কালিদাসের পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে তাঁহাকে শয্যাগত করিয়াছে। এক সময়ে কালিদাসের অনেক পসার ছিল, অনেক ভাল মন্দ লোক তাঁহার অনুগত ছিল। তাঁহার

কারবার উঠিয়া গেল, বাড়ী ঘর হাতছাড়া হইল, হাতের পয়সা ফুরাইল, আত্মীয় বন্ধুর সম্বন্ধও শেষ হইল। একজন কায়স্থ বেপারি কালিদাসকে পীড়িত ও নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন দেখিয়া আপনার এই ঘরে তাঁহাকে বাস করিতে দিয়াছেন। প্রথম প্রথম তিনি ব্রাহ্মণকে যৎসামান্য অর্থ সাহায্যও করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষে নানা কারণে তাঁহার সহায়তা লাভে কালিদাসকে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে।

কালিদাসের দুর্দ্দশার সীমা নাই। তিনি শুইয়া শুইয়া ভাবিতেছেন,—"শরীর আর বহিবে না। বহিয়া কাজই কি? দুর্দ্দশার চূড়ান্ত হইয়াছে; এখন মৃত্যু হইলেই মঙ্গল। আমার সকলই ছিল; বাড়ী ঘর, টাকা, জিনিষপত্র কিছুরই অভাব ছিল না, সকলই গেল। কেন এমন হইল? ঠিকই হইয়াছে। আমি কুলটা অবিশ্বাসিনীর কথা শুনিয়া লক্ষ্মীরূপা পত্নীকে অন্নবস্ত্র আশ্রয় দিই নাই,—পদাঘাতে দূর করিয়া দিয়াছি। আজি তরঙ্গিণী সুখের সাগরে ভাসিতেছে, আমার সর্ব্বস্ব লইয়া পরমানন্দে কাল কাটাইতেছে। আর আমার সে স্ত্রী? সে আমার একটু পদধূলি চাহিয়াও পায় নাই, একটু মুখের আদরও পায় নাই। আজি সে থাকিলে কি এমন দশা হইত? সে হয় তো ভিক্ষা করিয়া পরিশ্রম করিয়াও আমার সেবা করিত। সে আর নাই। হুঃ! আমি হেলায় সকলই হারাইয়াছি। এ পাপের ফল এ জন্মে ভুগিতেছি; পরজন্মেও ভুগিব।"

রোগীর চক্ষুতে জল আসিল। তিনি আবার বলিলেন,—"দুইখানা বাতাসা কি একটু মিছরি পাইলে মুখে দিয়া জল খাই; শুধু জল আর খাইতে পারি না। কিন্তু কে বা পয়সা দিবে? কে বা আনিয়া দিবে?"

কালিদাস গ্লাস টানিয়া একটু জল খাইলেন। আবার বলিলেন,—"এ সংসারে যাহার স্ত্রী নাই, তাহার কেহই নাই। আমার লক্ষ্মীরূপা স্ত্রী ছিল—আমার সব গিয়াছে।"

সহসা ঘরের দ্বার খুলিয়া গেল। সেই দ্বার দিয়া একটী নারী ও একটী পুরুষ সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। নারী বলিলেন,—"আপনার সকলই আছে। আপনি হতাশ হইবেন না।"

কি মধুর স্বর! কি আশ্বাসের বাণী! নারীর আগমনে সেই মলিন ঘর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আশা ও আনন্দ পীড়িত ব্যক্তিকে উৎসাহিত করিল। নারীর হস্তে একটী ক্ষুদ্র পুঁটুলি। তিনি তাহা শয্যার এক পার্শ্বে রক্ষা করিয়া রোগীর মূর্ত্তি একবার ভাল করিয়া দেখিলেন। নারীর সঙ্গী পুরুষ বলিলেন,—"চক্রবর্ত্তী মহাশয়, আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না? আমি কৃষ্ণনগরের সেই যদু হালদার।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—"ঠিক, তোমাকে চিনিয়াছি। আর ইনি কে?

যদু বলিলেন,—"ইঁহাকে আপনি চিনেন না? ইঁহার নাম এ অঞ্চলে কে না জানে? ইনি মা লক্ষ্মী।"

কালিদাস বলিলেন,—"তিনি তো দেবী শুনিয়াছি। ইঁহার আকার দেখিয়াও দেবী মনে হইতেছে। কিন্তু আমার ন্যায় পাপী নরাধমের প্রতি এ দেবীর দয়া কেন?"

যদু বলিলেন,—"এমন কথা বলিবেন না। মা-লক্ষ্মীর দয়া সকলের প্রতিই সমান। আপনি তো ব্রাহ্মণ, মাথার মণি। চণ্ডালের প্রতিও মা-লক্ষ্মীর কৃপার শেষ নাই।"

কালিদাস বলিলেন,—"আমি তবে প্রণাম করি?"

মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—"আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ—ব্রাহ্মণ—আমার পরম গুরু। আপনি প্রণাম করার কথা মুখে বলিলেও আমার পাপ হইবে। আমি আপনার চরণ-ধূলী মস্তকে ধারণ করিতেছি।"

মা-লক্ষ্মী তখন কালিদাসের চরণে মস্তক স্থাপন করিলেন। তাহার পর রোগীর শিয়রে বসিয়া পুঁটুলি হইতে মিছরি, বাতাসা, বেদনা, পানিফল প্রভৃতি নানা সামগ্রী বাহির করিলেন। রোগীর মুখে প্রথমে একটী পানিফল দিলেন, তাহার পর কয়েকটী বেদানার দানা দিলেন, রোগীর মুখ জুড়াইয়া গেল। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"আঃ প্রাণটা শীতল হইল। আপনি সাক্ষাৎ স্বর্গের দেবী। আমি আপনাকে দেবী বলিয়াই ডাকিব।

মা-লক্ষ্মী রোগীর শুশ্রূষা লইয়া ব্যস্ত হইলেন। এদিকে যদু হালদার ঘর পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে ঘর পরিচ্ছন্ন হইল। তাহার পর যদু হালদার নূতন কলসী আনিয়া ভাল জল রাখিলেন, পুরাতন কলসীতে সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য জল থাকিল। এদিকের কার্য্য শেষ হইলে যদু একবার সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার ফিরিয়া আসিতে একটু বিলম্ব হইল। অপরাহ্নকালে তিনি প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে দুই জন মুটে। তাহাদের মাথায় দিয়া যদু অনেক সামগ্রী আনিয়াছেন। লেপ, চাদর, বালিশ, মাদুর, কম্বল সকলই আসিয়াছে। দুধ, কড়াই, কাষ্ঠাদি আসিয়াছে। গড়গড়া, নল, কলিকা, টীকা, তামাক আসিয়াছে। লণ্ঠন, বাতি, দিয়াশলাই আসিয়াছে। ঘড়া, ঘটী, গাড়ু, থালা, রেকাব, বাটী ও গ্লাস আসিয়াছে। জিনিষপত্রে ক্ষুদ্র ঘর পূর্ণ হইল।

তখনই কালিদাসকে সরাইয়া ও তক্তাপোষ ঝাড়িয়া ভাল বিছানা করা হইল। চারিদিকে বালিশ দেওয়া হইল, সেই বিছানায় কালিদাস না শুইয়া একটু বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিলেন। তাহার পর গড়গড়ায় তাওয়া দিয়া বড় কলিকায় উত্তম তামাকু সাজিয়া তাঁহাকে খাইতে দেওয়া হইল। কালিদাস অত্যন্ত তামাকুপ্রিয়। ঘরের এক কোণে একটা খেলো হুঁকা, একটু দাকাটা তামাক এবং একটা ভাঙ্গা কলিকা ছিল। তামাক ওবেলা শেষ হইয়াছে। সহসা এই ভাগ্য পরিবর্ত্তনে কালিদাস বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

মা-লক্ষ্মী উঠিয়া দুধ গরম করিবার ব্যবস্থা করিলেন। গরম দুধ আনিয়া কালিদাসের মুখে ধরিলেন। কালিদাস অল্প অল্প করিয়া তাহা খাইয়া যথেষ্ট আরাম অনুভব করিলেন। নূতন ভাল বস্ত্র কালিদাসকে পরান হইল, দেহ জামায় ঢাকা হইল।

সন্ধ্যা হইল। হরিকেন লণ্ঠন জ্বালা হইল। একটা বাতিও ঠিক করিয়া রাখা হইল। যদু হালদার ভূতলে কম্বল বিছাইয়া তাহার উপর উপবেশন করিলেন। যে দৃশ্য পূর্ব্বে ঘৃণাজনক ও বিষাদময় ছিল, অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাহা প্রীতিজনক ও আনন্দময় হইয়া উঠিল।

মা-লক্ষ্মীর অঞ্চলে একটা ঔষধ ছিল, তিনি এক্ষণে তাহা কালিদাসকে খাওয়াইয়া দিলেন। অভাগা কালিদাস এই সকল দ্রব্য সামগ্রী, সেবা শুশ্রূষা, সর্ব্বোপরি এই দেবীর পরিচর্য্যা দেখিয়া অবাক্ হইয়া পড়িলেন। বলিলেন,—"আমি অতিশয় পাপী। আপনারা আমার জন্ত যে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতেছেন, তাহা বৃথা নষ্ট হইতেছে।"

মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—"আপনি পাপী হউন,

পুণ্যাত্মা হউন, আমরা তাহা জানি না। আপনাকে সুস্থ করা আমাদের প্রয়োজন। আমরা সে জন্য কোন অর্থব্যয় কেন, প্রাণপাত করিতে হইলেও করিব; আপনি কোন চিন্তা করিবেন না।”

কালিদাস বলিলেন,—“আমি একণে সুস্থ হইয়াছি। একটু দুর্ব্বলতা ব্যতীত আর কোন রোগ আমি বুঝিতে পারিতেছি না; একণে রাত্রি হইয়া পড়িল। এখানে থাকিলে আপনাদের অনেক অসুবিধা হইবে। আপনারা এখন প্রস্থান করিতে পারেন। কল্য কোন সময় দয়া করিয়া আমার সন্ধান করিলে চরিতার্থ হইব।”

মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—“আমরা কোথায়ও যাইব না। আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে আমরা সকলেই এ স্থান ত্যাগ করিব। আপনি আর একটু দুধ খান, একটু বেদানা খান, তাহার পর নিদ্রা যান। আমাদের জন্য কোন চিন্তার আবশ্যক নাই।”

রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রাতে হস্তমুখাদি প্রক্ষালনের পর নাপিতের দ্বারা ক্ষৌরকর্ম্ম শেষ করা হইল। ঔষধ ও পথ্যাদি সেবন করান হইল। তিন দিন পরে কালিদাস নীরোগ হইয়া উঠিলেন। বেলা দশটার সময় অন্নাদি সেবন করিয়া কালিদাস শয্যার উপর বসিয়া গড়গড়ায় তামাক খাইতেছেন। যদু হালদার আজি প্রাতে চক্রবর্ত্তী মহাশয় সুস্থ হইয়াছেন বুঝিয়া কর্ম্মান্তরে প্রস্থান করিয়াছেন। মধ্যাহ্নকালে তিনি আসিলেও আসিতে পারেন; সন্ধ্যার পূর্ব্বে তিনি যে সেই জীর্ণ কুটীরে প্রত্যাগমন করিবেন, তাহার কোনই সন্দেহ নাই।

মা-লক্ষ্মী তখনকার প্রয়োজনীয় গৃহকর্ম্মাদি শেষ করিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আর একটা পান দিব কি?”

কালিদাস বলিলেন,—“না। আমি একে মহাপাপী, তাহার উপর আবার যে কত পাপ হইতেছে তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। আপনি দেবী। আপনি আমার জন্য যে সকল পরিচর্য্যা করিতেছেন, তাহাতে আমার বড়ই পাপ হইতেছে। আমি একণে সুস্থ হইয়াছি। আপনার সাহায্য না পাইলেও এখন আমার অনিষ্ট হইবে না। আপনি আমার আর পরিচর্য্যা করিবেন না।”

মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—“স্ত্রীলোকে গৃহকর্ম্ম যেরূপে করিতে পারে, পুরুষে তাহা পারে না। এখন স্ত্রীলোকের সহায়তা না পাইলে আপনার অসুবিধা হইবে। আপনি সুস্থ হইয়া এস্থান হইতে ভাল জায়গায় যাওয়ার পর, যাহা ভাল হয় করিবেন।”

কালিদাস বলিলেন,—“স্ত্রীলোকের দ্বারা যেরূপ শুশ্রূষা হয়, এমন আর কাহারও দ্বারা হইতে পারে না, এ কথা আমি বেশ জানি। কিন্তু তাই বলিয়া সুস্থ হইয়াও দেবীর সেবা লইয়া পাপসঞ্চয় করিব কেন? আমার যাবজ্জীবন, অনুক্ষণ সাধ্বী পত্নীর সেবা পাইবার উপায় ছিল। আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক সে সুখ নষ্ট করিয়াছি।”

মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—“কিরূপে?”

কালিদাস বলিলেন,—“আপনার নিকট আমি মিথ্যা বলিব না। আমি এক চতুরা কুলটার প্রেমাসক্ত ছিলাম। পত্নীর কখন সন্ধানও করি নাই। সতী অন্নাভাবে কষ্ট পাইয়া আমার নিকট আসিয়াছিলেন। আমি সেই কুলটার মিথ্যা কথায় ভুলিয়া ধর্ম্মশীলা পত্নীকে পদাঘাতে দূর করিয়া দিয়াছি। আমার

স্বপ্নের ঘোর ভাঙ্গিয়াছে। এখন রোদন ভিন্ন আমার আর উপায় নাই।”

কালিদাসের চক্ষুতে জল আসিল। মা-লক্ষ্মী জিজ্ঞাসিলেন,—“তাহার পর আপনার স্ত্রীর কি হইল?”

কালিদাস বলিলেন,—“তাহার পর আমি কোন সন্ধান করি নাই। আমার আশঙ্কা হয়, দুঃখিনী গঙ্গার জলে ডুবিয়া মরিয়াছে।”

মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—“তবে তো সকল জ্বালাই চুকিয়া গিয়াছে। আর তাহার জন্য ভাবিয়া কি ফল?”

কালিদাস বলিলেন,—“এমন কথা বলিবেন না। যতদিন বাঁচিতে হইবে, কেবল তাহার জন্যই ভাবিতে হইবে। সংসারের সকল মোহ আমি দেখিয়াছি। সকলই অসার—সকলই স্বার্থমাখা—সকলই ক্ষণস্থায়ী। কেবল ধর্ম্মপত্নীর ভালবাসাই সার। আমি তাহাকে পাইলে, ভিক্ষা করিয়া খাইতে হইলেও সুখী হইব। আহা! আমার একটু পদধূলির আশা করিয়া অভাগিনীকে কত লাঞ্ছনাই ভোগ করিতে হইয়াছে। এখন তাহাকে দেখিতে পাইলে, তাহার চরণতলে আমি লুটাইয়া পড়ি।”

কালিদাসের চক্ষুতে আবার জল আসিল। মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—“তাহার জন্য যখন আপনার এত কষ্ট, তখন তাহাকে সন্ধান করা উচিত। তাহার আকার কিরূপ ছিল, আপনার মনে পড়ে কি?”

কালিদাস বলিলেন;—“ভাল মনে পড়ে না। বিবাহের পর আমি কখনই তাহাকে ভাল করিয়া দেখি নাই। একদিন তাহাকে একবার মাত্র দেখিয়াছিলাম। কিন্তু সে চেহারা আমার মনে বেশ জাগিয়া আছে। একবার তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়াছি। সে স্বর আমার বেশ মনে আছে।”

মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—“আপনি যদি আমাকে তাহা বুঝাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে আমি তাহার সন্ধান করিতে পারি।”

কালিদাস বলিলেন,—“পারি; কিন্তু বলিতে সাহস হয় না। যদি তাহার বর্ণ আর একটু উজ্জ্বল, আর একটু জ্যোতির্ম্ময় হইত, যদি তাহার চক্ষুতে আর একটু দয়া মিশান কোমল ভাব থাকিত, যদি তাহার শরীরে দেবভাব থাকিত, তাহা হইলে তাহাকে বলিতে সাহস হয় না—তাহা হইলে সে আপনার মত হইতে পারিত। আর তাহার কণ্ঠস্বর যদি আর একটু গম্ভীর হইত তাহা হইলে আপনার স্বরের মতই শুনাইত। বলিতে ভয় হয়, আমি অনেক সময় আপনার কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিত হইয়াছি।”

মা-লক্ষ্মী ধীরে ধীরে সেই শয্যার এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। কালিদাস বলিলেন,—“সে মানবী—আর আপনি দেবী। আমার এরূপ তুলনা করা অন্যায় হইয়াছে। কিন্তু এখন বুঝিয়াছি, তাহার ব্যবহারে ও কার্য্যে অনেক দেবত্ব ছিল।”

মা লক্ষ্মী আর একটু সরিয়া বসিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর একটু জড়িত হইত। অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—“যদিই তাহার সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা হইলে আপনি তাহাকে এক্ষণে চরণে স্থান দিবেন কি?”

কালিদাস চমকিত হইয়া বলিলেন,—“এইরূপ কণ্ঠস্বর। আমার সে বিরাজ-মোহিনীর এমনই স্বর। চরণে স্থান দিব কি বলিতেছেন? আমি তাহাকে একবার দেখিয়া মরিতে পাইলেও চরিতার্থ হইব। হায় সে কোথায় গেল!”

কালিদাস কাঁদিতে লাগিলেন। তখন নয়নের জলে মা-লক্ষ্মীর বুক ভাসিয়া যাইতেছে। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন.—"প্রাণেশ্বর! দাসী বিরাজমোহিনী তোমার চরণতলে।"

তৎক্ষণাৎ মা-লক্ষ্মী কালিদাসের চরণে মস্তক স্থাপন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গভীর রাত্রিতে বহু সংখ্যক দস্যু তরঙ্গিণীর ভবনে প্রবেশ করিয়া তাহার দেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিয়াছে এবং তাহার গৃহে ও শরীরে যে কিছু অলঙ্কারাদি ছিল, তৎসমস্ত অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। রাত্রিতেই তরঙ্গিণীর দ্বারবান থানায় এই সংবাদ প্রেরণ করিয়াছে। প্রাতে তাহার দ্বারে ভবনে, সন্নিহিত অঙ্গনে ও পথে অনেক মনুষ্যসমাগম হইয়াছে।

থানার দারোগা প্রভৃতি বহু লোক উপস্থিত হইয়াছেন। দ্বারবান্ প্রভৃতির জোবানবন্দী শুনিয়া থানার লোকেরা হারাধন নন্দী বা কালিদাস চক্রবর্ত্তী, অথবা রাজা অরবিন্দ রায়কে এই নারীহত্যার পাতকে সংলিপ্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। হয় তিন জন একযোগে, না হয় ঐ তিন জনের কোন ব্যক্তি স্বতন্ত্র ভাবে দল জুটাইয়া এই কার্য্য করিয়াছেন, ইহাই দারোগা প্রভৃতির বিশ্বাস হইয়াছে।

তরঙ্গিণী কিন্তু একবারও সে কথা বলিতেছে না। সে বলে যাহারা এ কার্য্য করিয়াছে, তাহাদিগকে সে সুস্পষ্টরূপে দেখিয়াছে এবং এখনও দেখিতে পাইলে চিনিতে পারে। তাহাদের মধ্যে উল্লিখিত তিন জনের কেহই ছিলেন না, ইহা তরঙ্গিণী জোর করিয়া বলিতেছে। কিন্তু থানার লোকেরা এ কথা সহজেই উড়াইয়া দিতেছেন। তাঁহারা বলেন, ঐ তিন ব্যক্তির কেহই উপস্থিত না থাকিলেও তাঁহাদের নিয়োজিত লোকে এ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে, ইহার কোনই ভুল নাই।

তরঙ্গিণীর আঘাত অতি গুরুতর হইয়াছে। হাতে গায়ে অনেক অস্ত্রাঘাত হইয়াছে, এবং সে জন্য প্রভূত রক্তক্ষয় হইতেছে বটে; কিন্তু তাহাতেও আহতা নারার জীবনান্ত হইবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। তাহার তলপেটে এক গভীর অস্ত্রাঘাত হইয়াছে, সেই আঘাত সাংঘাতিক; পীড়িতার যাতনা এখন আর বড় নাই। রাত্রিকালে আঘাতের পরই তাহার অসহ্য যন্ত্রণা হইয়াছিল; কিন্তু প্রাতে ক্লেশ কমিয়া গিয়াছে এবং তরঙ্গিণী অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়াছে। তাহাকে এখন কঠিন পীড়ায় পীড়িত বিবর্ণ রোগীর ন্যায় দেখাইতেছে; সহসা তাহার জীবনের সমাপ্তি হইবে, এরূপ কোন আশঙ্কা তাহাকে দেখিয়া কাহারও মনে হইতেছে না।

দারোগা প্রভৃতি অনেকে তরঙ্গিণীকে পাল্কী করিয়া হাঁসপাতালে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। তাঁহাদের লেখা পড়া শেষ হইয়াছে; এক্ষণে আহতা নারীকে হাঁসপাতালে চালান দিলেই আপাততঃ তাঁহাদের কর্ত্তব্যের সমাপ্তি হয়। তাহার পর ঐ তিন ব্যক্তিকে ধরিতে পারিলেই যে আসামীর কিনারা হইয়া যাইবে সে বিষয়ে তাঁহারা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। তরঙ্গিণীকে তাঁহারা হাঁসপাতালে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন।

অতি কাতরস্বরে তরঙ্গিণী বলিল,—"আমার জীবনের শেষ হইতে আর বড় বিলম্ব নাই। এখন আমাকে হাঁসপাতালে পাঠাইবার উদ্যোগ করিলে, হয় তো বাহির করিবার সময়েই আমার মৃত্যু হইবে; পথে যে মৃত্যু হইবে তাহার ভুল নাই। সে চেষ্টা ত্যাগ করিয়া আপনারা যে তিন ব্যক্তির উপর সন্দেহ করিয়াছে, তাঁহাদের সহিত যদি একবার এ সময় আমার সাক্ষাৎ করাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে বড় উপকার হয়।"

দারোগা বলিলেন,- "তাহারা নিশ্চয়ই ভাগড়া হইয়াছে। তাহাদের সহিত দেখা হওয়ার কোন আশা নাই। তাহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য আমি লোক লাগাইয়াছি। তোমার কথামত এখনও তাহাদের ধরিবার চেষ্টা করায় কোন ক্ষতি নাই; কিন্তু নিশ্চয় জানিও, তাহাদের কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যাইবে না।"

তখনই সেই ঘরে চারি জন পুরুষ ও একটী নারী প্রবেশ করিলেন। তরঙ্গিণী চিনিতে পারিল, রাজা অরবিন্দ রায়, কালিদাস চক্রবর্ত্তী এবং হারাধন নন্দী, তাহার সম্মুখে উপস্থিত। চতুর্থ ব্যক্তি ও আনন্দ প্রতিমার ন্যায় সমুজ্জ্বল নারী কে, সে চিনিতে পারিল না। সেই নারী মা-লক্ষ্মী এবং সেই পুরুষ যদু হালদার।

দারোগার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তরঙ্গিণী বলিল,—"যাহাদের আপনি ভাগড়া বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই এখানে উপস্থিত।"

দারোগা এই তিন আসামীর কথাবার্ত্তা ও ব্যবহারাদি মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিবেন স্থির করিয়া, একটু দূরে সরিয়া বসিলেন।

অন্য কেহ কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে মা-লক্ষ্মী অগ্রসর হইয়া তরঙ্গিণীর শিয়রে বসিলেন এবং নিতান্ত ব্যথিত ভাবে তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন,—"দিদি, আঘাত কি বড় গুরুতর হইয়াছে? বড় যাতনা হইতেছে কি?"

দেবীর করস্পর্শে তরঙ্গিণীর বড় শান্তি জন্মিল। সে বলিল,—"আঘাত বড় গুরুতর হইয়াছে, জীবনের শেষ হইতে আর বিলম্ব নাই। আপনি কে? আপনাকে তো আমি চিনিতে পারিতেছি না।"

হারাধন অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—"তুমি মা-লক্ষ্মীর নাম শুন নাই? ইনি সেই মা-লক্ষ্মী।"

তরঙ্গিণী ধীরে ধীরে কপালে হাত তুলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। হাত বাড়াইয়া তাঁহার পদধূলি লইল। কালিদাস বলিলেন, "ইহাকে তোমার ভাল করিয়া চিনিতে পারা উচিত। ইনিই আমার স্ত্রী—বিরাজমোহিনী।"

তরঙ্গিণী ভাল করিয়া মা লক্ষ্মীর মুখ পানে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল,—"অসম্ভব নহে। সেই মূর্ত্তিরই উপর কেমন দেবত্বের আলোক লাগিয়াছে। উনি এসময়ে দেখা দিয়া বড়ই দয়া করিয়াছেন; আমি অনেক পাপ করিয়াছি। আমি এই সতী লক্ষ্মীকে মিথ্যা অপবাদ দিয়া লাথি খাওয়াইয়াছি, তাঁহার ন্যায্য স্থানে তাঁহাকে তিষ্ঠিতে দিই নাই; স্বামীর অন্ন বস্ত্র ভোগ করিতে দিই নাই, কিন্তু আমার অশেষ পাপ। পাপের হিসাব দিয়া কি করিব? এখন কয়েকটী দরকারী কথা বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে বলিয়া ফেলিতে পারিলেই হয়।"

হারাধন, কালিদাস, অরবিন্দ ও যদু তরঙ্গিণীকে ঘেরিয়া বসিলেন। হারাধন বলিল,

—"ধীরে কথা বল। অল্প কথায় শেষ কর। যদি কষ্ট হয়, তাহা হইলে কোন কথা বলিয়া কাজ নাই।"

তরঙ্গিণী বলিল,—"বলিতেই হইবে। রাজা মহাশয়! এই বাটি আপনার নামে বেনামী করা হইয়াছে! অনেক জিনিষ পত্র আপনার বাটীতে রাখা হইয়াছে। সে সকলই চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের।"

রাজা বলিলেন,—"তোমার অধিক কথা বলিতে হইবে না। আমি জানি সে সমস্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সামগ্রী, পাছে তুমি কোন প্রতারকের কুহকে পড়িয়া সে সমস্ত ধ্বংস কর, এই আশঙ্কায় আমি সে সকল তোমার নিকট হইতে লইয়াছি। তুমি বলিবার পূর্ব্বেই আমি চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে এ সংবাদ জানাইয়াছি; জিনিষ পত্রের তালিকা তাঁহাকে দিয়াছি, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নামে বাটার লেখা পড়া প্রস্তুত করিয়াছি। তুমি আর কি বলিতে চাহ বল?"

তরঙ্গিণী বলিল,—"গিরিবালার নিকট হইতে আমি যে অলঙ্কারাদি লইয়া আপনার নিকট দিয়াছিলাম, তাহা হারাধনকে দিলে ভাল হয়।"

রাজা বলিলেন,—"তাহা হারাধনকে দেওয়া হয় নাই। হারাধনের দ্বারা তৎসমস্ত সুরেন্দ্র বাবুকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে।"

তরঙ্গিণী বলিল,—"আমার পরামর্শে গিরিবালার অশেষ দুর্গতি, শেষে মৃত্যু হইয়াছে। শুনিয়াছি গিরিবালার একটী ছেলে আছে। সেই ছেলের আর হারাধনের একটা ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হইত।"

রাজা বলিলেন,—"সে জন্য তোমার কোন চিন্তা করিবার আবশ্যক নাই। সুরেন্দ্র বাবু ছেলেকে আপন উত্তরাধিকারীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আর হারাধনের জন্যও সুব্যবস্থা হইয়াছে।"

তরঙ্গিণী বলিল,—"আমার শরীর বড় ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। আর দেরি নাই। চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমি আপনার নিকট অনেক পাপ করিয়াছি, অনেক অত্যাচার করিয়াছি। আপনার সহিত আমি নিয়ত প্রতারণা করিয়াছি। সে কথা আর বলিয়া ফল কি? এত অপরাধের যে কি শাস্তি হইবে, তাহা বলিতে পারি না।"

কালিদাস বলিলেন,—"আমি অকপট চিত্তে তোমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিতেছি। প্রার্থনা করি, তুমি পরকালে সুখী হইবে।"

তরঙ্গিণী বলিল,—"আমি ভাল করিয়া কথা বলিতে পারি না। বুঝি শেষ কাল আসিতেছে। হারাধন আমি তোমার ভগিনীর মৃত্যুর কারণ। তোমাকে আঘাতে মৃতপ্রায় দেখিয়াও আমি তোমাকে ছাড়িয়া পলাইয়াছি।"

হারাধন বলিল,—"বেশ করিয়াছ। তাহাতেই এই মহাত্মাদের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে। আমি সুখী হইয়াছি। আমার নিকট তুমি কোন অপরাধ কর নাই।"

তরঙ্গিণী একটু অস্থির হইয়া উঠিল। তাহার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল। মা লক্ষ্মী তাহার মস্তক আপনার ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। তরঙ্গিণী বলিল,—"তুমি আমাকে দিদি বলিয়া ডাকিয়াছ। তোমার কি কষ্টই আমি ঘটাইয়াছি।"

মা লক্ষ্মী বলিলেন,—"কিছু না। তোমার কৃপায় আমার পরম মঙ্গল হইয়াছে। আমি জেঠা গোপীনাথের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তোমার যেন শান্তি হয়।"

মা লক্ষ্মীর কোলে তরঙ্গিণীর মস্তক স্বতঃ এদিক ওদিক করিতে লাগিল। সকলেই বুঝিল, তরঙ্গিণীর আর বিলম্ব নাই। সে বলিল,—"কি মিষ্ট আলাপ। গোপীনাথ! গোপীনাথকে ডাকিব কি?"

রাজা বলিলেন,—"ডাক—ডাকিতে না পার, তাঁহাকে মনে মনে ভাব। নিশ্চয় তোমার মঙ্গল হইবে।"

তরঙ্গিণী বলিলেন,—"আর রাজা, আপনি কে? আপনি তো মানুষ নহেন। আপনি কি দেবতা?"

রাজা বলিলেন,—"আমি রাজা নহি, আমি দেবতা নহি, আমি সামান্য মানুষ আমার নাম সনাতন মুখোপাধ্যায়। সাধ্য মত পরের হিতসাধন আমার ব্রত। আমি এ ব্রত একাকী সম্পাদন করিতে পারি না। এ কার্য্যে আমার অনেক সহায় আছেন। কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত আমি কখন রাজা, কখন ব্রাহ্মণ, কখন বৃদ্ধ, কখন সন্ন্যাসী, কখন দণ্ডী সাজিয়া থাকি।"

তরঙ্গিণী বলিল,—আপনিই কি বড়বাজারে চক্রবর্ত্তীর লাঠি হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন?"

সনাতন বলিলেন,—হাঁ, আমি পূর্ব্বেই রাজা সাজিয়া সুরেন্দ্র বাবুর অপহৃতধন আদায় করিয়া তখনই ব্রাহ্মণ সাজিয়া তোমাকে রক্ষা করিয়াছি।"

তরঙ্গিণী বলিল,—"আপনাকে প্রণাম। আপনি দেবতা! এ কি হঠাৎ সকলই অন্ধকার হইল কেন? গোপীনাথ! দেখা দেও—বিরাজমোহিনী পায়ের ধূলা—দেবতা কই?"

সনাতন উচ্চস্বরে বলিলেন,—"তুমি আমাদের কথা ভুলিয়া যাও। এখন কেবল গোপীনাথকে ভাব।"

তরঙ্গিণী মুখ বড় বিকৃত করিল। তাহার মস্তক মা-লক্ষ্মীর ক্রোড় হইতে পড়িয়া গেল। তাঁহার প্রাণপক্ষী দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

শেষ

তরঙ্গিণীর মৃতদেহ সদরে চালান হইল। সেখানে অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে স্থির করিয়া কর্তৃপক্ষ লাস জ্বালাইয়া দিতে হুকুম দিলেন।

দারোগা মহাশয় দস্যুদের সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিলেন না; অথচ যে তিন ব্যক্তির উপর তিনি সন্দেহ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কাহাকেও ফাঁদে ফেলিবার কোন উপায়ও করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

ডাকাতির ও হত্যার কোন কিনারা করিতে না পারিলেও, দারোগা মহাশয় আর একটা গণ্ডগোল বাধাইয়া তুলিলেন। সনাতন মুখোপাধ্যায় আইনের ও রাজশক্তির অবমাননা করিয়া, স্বয়ং শাসন পালন নির্ব্বাহ করেন এবং পরের অর্থ আত্মসাৎ করেন, ইত্যাদি নানা কথা লিখিয়া তিনি এক রিপোর্ট পাঠাইলেন। সদর হইতে স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এই বিষম অভিযোগের তদন্ত করিতে আসিলেন। অনেক দিন ধরিয়া তন্ন তন্ন করিয়া অনেক অনুসন্ধান তিনি করিলেন। বিস্তারিত বিবরণ লিখিবার প্রয়োজন নাই। তদন্তের শেষ হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব স্বয়ং সনাতন মুখোপাধ্যায়ের সেই

পর্ণকুটীরে উপস্থিত হইলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া সাহেব বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় বুঝাইয়া দিলেন, এই সংসার বিশাল

ক

স্বার্থ ভুলিয়া পরার্থে কর্ম্ম সম্পাদন করিবার অভ্যাস করিলেই যথার্থ মনুষ্যত্ব হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহার ইংরাজী ভাষার প্রগাঢ় অধিকার, বুদ্ধির সারবত্তা, উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের উচ্চতা প্রণিধান করিয়া বার বার তাঁহার সাধুবাদ করিলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার অবলম্বিত ব্রতের প্রণালী প্রভৃতি সকলই সাহেবকে বুঝাইয়া দিলেন। যেরূপে আবশ্যক মত অর্থ তাঁহার হস্তগত হয় যেরূপে সে অর্থ ব্যয়িত হয়, যেরূপে কার্য্য নির্ব্বাহকারী লোক এ ব্রতে যোগ দেয়, সকলই তিনি ব্যক্ত করিলেন। এই আশ্চর্য্য পরসেবা-ব্রতের বিবরণাদি সাহেব লিখিয়া লইলেন। যথাসময়ে তিনি তাহা গভর্ণমেণ্টের গোচর করিলেন। গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে সনাতন মুখোপাধ্যায়ের নামে ধন্যবাদ প্রচারিত হইল। অধিকন্তু আবশ্যক হইলে, তিনি অবলম্বিত কার্য্যে পুলিশের সাহায্যপ্রাপ্ত হইবেন, এরূপ আদেশ হইল পরসেবাব্রত আরও বিস্তারিতরূপে চলিতে লাগিল। অনেক মহাত্মা ইচ্ছাপূর্ব্বক সনাতন মুখোপাধ্যায়ের অধীন হইয়া কার্য্য করিতে উপস্থিত হইলেন।

হারাধন, জননী, স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া রাজীবপুরে বাস করিতে লাগিলেন কিন্তু সনাতন মুখোপাধ্যায়ের শিষ্য হইয়া তিনি যে পরসেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করিতে তাঁহার সাধ্য হইল না।

সুরেন্দ্র বাবু ও তাঁহার পত্নী এই সেবা-ব্রতের প্রধান উদ্যোগী হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের সোণার চাঁদ ক্রমেই বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও অব্যাহত স্বাস্থ্যের পরিচয় দিতে লাগিল।

যদু হালদারের কারবারের বড়ই শ্রীবৃদ্ধি। তাহার শ্যামখুড়াই কারবার চালাইয়া থাকেন। যদুকে বড় দেখিতে হয় না। যদু ক্রমশঃ এই সেবাকার্য্যে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োজন করিল।

মা-লক্ষ্মী স্বামীর সহিত ঘরকন্না করিতে লাগিলেন। কালিদাস আর কাজ কারবার করিলেন না। সনাতন মুখোপাধ্যায়ের সহায়তায় যে সামান্য অর্থ তিনি লাভ করিলেন, তাহাতেই কোন প্রকারে গ্রাসাচ্ছাদন চালাইতে লাগিলেন। কালিদাস এই ব্রতানুষ্ঠানের একজন প্রধান উদ্যোগী হইয়া পড়িলেন। যাহারা কখনও ধর্ম্মানুষ্ঠান করে নাই, ধর্ম্মের মধুর ভাব তাহাদের হৃদয়ে একবার প্রবেশ করিলে, বড়ই বদ্ধমূল হইয়া উঠে এবং তাহার আকর্ষণ বড়ই প্রবল হয়। কালিদাস সেবাব্রতের জন্য উন্মাদপ্রায় হইয়া উঠিলেন। পতিসেবা প্রধান অবলম্বনীয় হইলেও, মা-লক্ষ্মী সেবাব্রতের নায়িকা হইয়াই রহিলেন। তিনি যখন যেখানে যাইতেন, ভরসা ও আনন্দ তাঁহার অগ্রে অগ্রে সেদিকে ধাবিত হইত। তিনি যখন যে দিকে যাইতেন, তখন অবনতশিরে তাবৎ নরনারী তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিত। তাঁহাকে দেখিতে পাইলেই লোকে সে দিন সুপ্রভাত বলিয়া জ্ঞান করিত। যে যে স্থলে তাঁহার চরণাঙ্ক নিপতিত হইত, অনেকে তত্রত্য মৃত্তিকা লইয়া মস্তকে ধারণ করিত। সকলেই

তাঁহাকে সন্তাপনাশিনী দেবী বলিয়া জ্ঞান করিত।

এই সেবাব্রত সম্পাদনে আরও শত শত সম্পন্ন ও দরিদ্র মানব মিলিত হইল। আমরা এই সেবাব্রতধারী নরনারীগণকে প্রণাম করিয়া এই স্থানে গ্রন্থ সমাপ্ত করিতেছি। প্রার্থনা করি, এই ব্রতগ্রহণের নিমিত্ত যেন সকল মানবই চিরদিন ব্যাকুল হয়।

সম্পূর্ণ।